দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

ষড়বিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৪৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

সম্পাদক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা—

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

ষড়বিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৪৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র সূচী—মাসানুক্রমিক

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

বিশেষ চিত্র

মাঘ—১৩৪৫

বহুবর্ণ চিত্র

বিশেষ এক বর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৭৫

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

চৈত্র—১৩৪৫

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৪৬

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। বন্দী
২। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সাধারণ দৃশ্য
৩। হস্তিবাহিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের রথ
৪। রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রায় হস্তিপৃষ্ঠে ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতিদিগের ফটো
৫। রায় জলধর সেন বাহাদুর

বহুবর্ণ চিত্র

১। মহাভারতের জন্ম
২। রাঙা মাটীর রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে
৩। পোড়ো বাড়ী—
৪। সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে, টি,

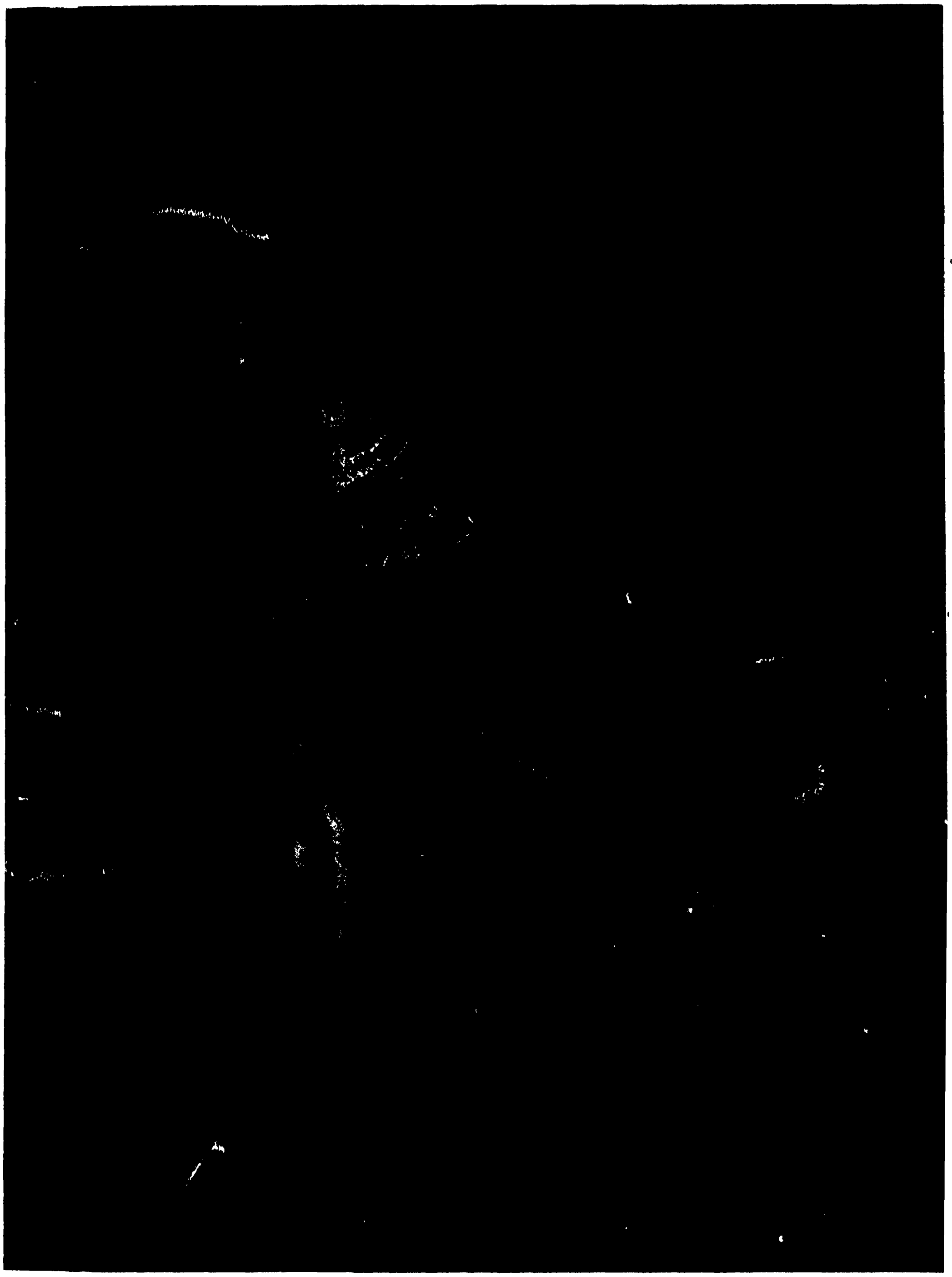
জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৬

বহুবর্ণ চিত্র

১। মাদ্রাজী সাড়ী
২। গ্রাম্য স্রোতস্বতী
৩। ধূমপান
৪। রায় বাহাদুর জলধর সেন

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। নূতন মা
২। মাটির ছেলে
৩। মা
৪। সোদপুরে সুভাসচন্দ্র ও জহরলাল
৫। মহানা
৬। মেয়র ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন
৭। ডেপুটী মেয়র সাহজাদা ইউসুফ মির্জ্জা বাহাদুর



শিল্পী—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রভূষণ ধর

আশা ভঙ্গ

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়াক্‌স



ভারতবর্ষ



পৌষ—১৩৪৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

দর্শনের নিরুক্ত

ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম্-এ, পী-আর্-এস্, পী-এইচ্-ডী. কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

কোন দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতির পরিচয় দিতে হইলেই প্রথমতঃ দর্শন বলিলে আমরা কি বুঝি তাহা বিচার করা আবশ্যক। দৃশ্ ধাতু ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া দর্শন শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ্ ধাতুর অর্থ প্রেক্ষণ—প্র+ঈক্ষণ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা সূক্ষ্ম-ভাবে দেখা। ল্যুট্ প্রত্যয়টী যদি ভাববাচ্যে হয় তবে দর্শন শব্দের অর্থ হয় শুধু দেখা; আর করণ বাচ্যে হইলে যাহা দ্বারা দেখা যায় তাহাকে বুঝায় অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষুঃ। সুতরাং দেখা শব্দে আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানই বুঝিব। চাক্ষুষ জ্ঞানই দৃশ্ ধাতুর মুখ্য অর্থ ইহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন এই, যদি চাক্ষুষ জ্ঞান ও তাহার সাধন দর্শনেন্দ্রিয়ই দর্শন শব্দের অর্থ হয় তবে দর্শন বলিলে আমরা দর্শনশাস্ত্রকে বুঝি কেন? চক্ষুরিন্দ্রিয়ই চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন হয়, শাস্ত্র তো আর চাক্ষুষ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে না। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য চোখের দেখা বা চাক্ষুষ জ্ঞান বলিলে আমরা কি বুঝিব তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। চাক্ষুষ জ্ঞান কেবল চক্ষুর যান্ত্রিক ব্যাপারের মধ্যেই পরিসমাপ্ত নহে। চক্ষু স্থূল বস্তুর বাহিরের রূপটী মাত্র গ্রহণ করে এবং ফলে উহা মনোরাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। মনোরাজ্যের বিভিন্ন ভাবনার স্তর ও পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া যখন ঐ বাহিরের রূপটী কোন এক নির্দ্দিষ্ট-ভূমিতে গিয়া পৌছায় তখন আমরা তাহাকে 'দেখা' সংজ্ঞায় অভিহিত করি; ঐ রূপের স্বরূপটী আমরা জানিতে পারি, কখনও বা ঐ রূপের মালিককেও আমরা চিনিতে পারি। এইরূপ দেখা ও রূপ চেনার মধ্যে যে কোন তফাৎ আছে সাধারণ দর্শক তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু যিনি এই দেখার ও চেনার তত্ত্ব দার্শনিকদৃষ্টিতে বিচার করেন তাঁহার নিকট ইহার জটিলতা ধরা পড়ে। বাহিরের রূপ দেখা কেমন করিয়া রূপ জানায় পর্য্যবসিত হইল? দেখার ভিতরে জানা আছে কি-না? দেখা ও জানার সম্বন্ধ কি? এইরূপ প্রশ্ন সাধারণ দর্শকের চিত্তকে আলোড়িত করে না। কারণ সে রূপকে দেখিয়া এবং চিনিয়াই সন্তুষ্ট। দার্শনিকের নিকট যখন এই সব প্রশ্ন উপস্থিত হয় তখন নানারূপ জটিল

পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ঐ পরিস্থিতির সমাধানের জন্য দার্শনিককে জীব, জড় ও মনোরাজ্যের অনেক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সমস্যাই দর্শন-চিন্তার জননী। আমরা একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সমস্যাগুলি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। আমি একটী লাল গোলাপফুলকে দেখিলাম এবং তাহাকে লাল গোলাপ বলিয়া চিনিলাম। এই দেখা ও চেনাকে যদি বিশ্লেষণ করি তবে দেখিতে পাই যে, অদূরস্থিত লাল গোলাপ তাহার অপূর্ব্ব শোভায় আমার হৃদয় স্পর্শ করিল; চক্ষু তাহার উপর পতিত হইল অথবা ঐ গোলাপটীই আমার চক্ষুর উপর পতিত হইল এবং চক্ষুর মধ্যস্থিত বর্ণপটে তাহার লাল রঙের ছাপ আঁকিয়া দিল। বর্ণপটের ঐ ছাপের সাড়া তন্ত্রীপথে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় একটা স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল, ফলে আমার মনোরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। মন ঐ স্পন্দনকে ধরিয়া বসিল। মন স্বচ্ছ এবং চিৎপ্রভায় সমুজ্জ্বল। সে তাহার আশ্চর্য্য আলোকচ্ছটায় নেত্রপটের অঙ্কিত চিত্রটী উদ্‌ভাসিত করিয়া আমার নিকট তাহা উপস্থিত করিল এবং ফলে লাল গোলাপের সহিত আমার পরিচয় ঘটিল।

ইন্দ্রিয় ও মন জড়; জড়ের নিজের কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয় ব্যাপারের ন্যায় মনোব্যাপারও এক যান্ত্রিক ক্রিয়ার মূঢ় শক্তির খেলা মাত্র। জড় যন্ত্রের পেছনে যেমন একজন যন্ত্রী থাকে সেইরূপ ঐ জড় ইন্দ্রিয় ও মনোরাজ্যের লীলাচক্রের অন্তরালে স্বচ্ছন্দচারী একটী জীব-শক্তি আছে। ঐ জীবশক্তি নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মূঢ় জড় শক্তিকে চালিত করিয়া উহার সাহায্যে নিজকে প্রকাশ করিতেছে। স্বতঃসঞ্চারী জীবশক্তি ও মূঢ় জড়-শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে। জীব জড়কে নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রপথে পরিচালিত করে এবং জড় জীবকে তাহার প্রয়োজনসিদ্ধি ও ভোগের সহায়তা করে। জীবপ্রকৃতিকে জড় ও বুদ্ধির মিলনভূমি বলা যাইতে পারে। এই ভূমিতেই জ্ঞানালোকের প্রথম বিকাশ, সুপ্ত প্রকৃতির প্রথম জাগরণ। ইন্দ্রিয় কিংবা মনো-ব্যাপারকে তো আমরা জ্ঞানের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি না, তাহা তো যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র। যদি ফটো তোলার মত ঐ যান্ত্রিক ক্রিয়াকেই আমরা জ্ঞান সংজ্ঞায় অভিহিত করি, তবে যন্ত্র যাহাদের বিকল নহে এইরূপ ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও জ্ঞানের তারতম্য ঘটে কেন? পণ্ডিত ও মূর্খের, শিশু ও বৃদ্ধের বস্তুবিজ্ঞানের প্রভেদ হয় কেন? আর ঐ জড় যন্ত্রের মূঢ় লীলাকে আমরা জ্ঞান বলিব কিরূপে? জ্ঞান পদার্থটী সমস্ত জড় পদার্থ হইতে এতই বিভিন্ন প্রকৃতির যে তাহার সহিত জড়ের কোন যথার্থ সম্বন্ধ থাকিতে পারে ইহা কল্পনাও করা যায় না। এই জন্যই আমাদের ভারতের দার্শনিকগণ জ্ঞানকে পরমার্থ চিৎ সত্যস্বরূপ কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম বা পুরুষ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন, আর জড় জগৎকে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও জ্ঞানতত্ত্বের বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে জ্ঞানের আলোকে আমাদের জীবনের যাত্রাপথ উদ্‌ভাসিত হয় তাহাতে জড়ের দান ও সম্বন্ধ বড় অল্প নহে। জড় ও চৈতন্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়াই আমাদের জ্ঞানরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে জড় যেমন আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জ্ঞানও জড়ের আকারে আকার প্রাপ্ত হইয়াই আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জ্ঞান ব্যতীত জড় যেমন মূঢ় ও অপ্রকাশ সেইরূপ জড়ের সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞানও মূক। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, জড় পরপ্রকাশ। জ্ঞান ও জড় আলোক অন্ধকারের মত বিরুদ্ধস্বভাবাপন্ন হইলেও যে শক্তির খেলায় এই দুইয়ের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগের সৃষ্টি হইয়াছে সেই জীবপ্রকৃতিই জ্ঞানকে তাহার প্রকৃত রূপ দান করিয়াছে। লাল গোলাপের যে স্পন্দনতরঙ্গ আমাদের মনোরাজ্যে আলোড়ন জাগাইয়া তুলিয়াছিল জীবপ্রকৃতিই ঐ তরঙ্গকে লাল গোলাপের রূপ ও সংজ্ঞা দিয়া আমাদের নিকট পরিচিত করিয়াছে। ঐ স্পন্দনতরঙ্গের অন্তরালে জীব-শক্তি ক্রিয়াশীলা না হইলে কোন বস্তুর সহিতই আমাদের প্রকৃত পরিচয় ঘটিত না, সমস্তই এক অব্যক্ত বেদনামাত্রে পর্য্যবসিত হইত।

জীব চেতন। তাহার চেতনা বা বোধশক্তি তাহাকে স্বার্থসিদ্ধির অধিকার দিয়াছে। জীবের প্রত্যেক প্রবৃত্তির মূলে ঐ অধিকারই প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুশলের সাধন ও অকুশলের বর্জ্জনই জীবের প্রবৃত্তির মূল। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃই পুরুষের প্রার্থনীয় বা পুরুষার্থ। আনন্দই তাহার চরম ও পরম লক্ষ্য। তাহার সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তাচক্রের

অন্তরালে রহিয়াছে সত্যের লালসা, শিবের সাধনা ও সৌন্দর্য্যের পিপাসা। এই সত্য শিব সুন্দরের উপলব্ধিই জীবের পূর্ণতার উপলব্ধি। এইখানে জীবের মানসলোক তাহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আনন্দলোকে মিশিয়া গিয়াছে। জীব যখন এই আনন্দলোকের সন্ধান লাভ করে তখন সাংসারিক বিষয়ানন্দকে বিষের মত পরিত্যাগ করিয়া ভূমানন্দে তন্ময় হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। উপনিষদের ঋষি এই আনন্দে অধীর হইয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ এই আনন্দোপলব্ধির জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিয়াছিলেন—

অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাম্,
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

যোগী তাঁহার যোগদৃষ্টিতে, ঋষি তাঁহার দিব্যদর্শনে, ব্রহ্মবিৎ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে, কবি তাঁহার কাব্য প্রতিভায়, দার্শনিক তাঁহার দর্শন মনীষায় এই আনন্দের উপলব্ধির জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন সাধকের এই জিজ্ঞাসার কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও জিজ্ঞাসার কিন্তু বিরাম নাই। সকল দেশের সকল সাধকই এই আনন্দের রসাস্বাদ পাইয়াছেন এবং এই আনন্দ রসে ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেছেন। সমস্ত দর্শন জিজ্ঞাসার মূলেই এই আনন্দলোকের স্পর্শ রহিয়াছে। যে দার্শনিক ইহার সন্ধান লাভ করেন নাই তিনি অত্যন্তই দীন। এই আনন্দময়ের সন্ধান সুস্পষ্টভাবে যিনি দিতে পারেন তাঁহার দর্শনই প্রকৃত দর্শন।

চাক্ষুষজ্ঞান যেমন এই দৃশ্যমান জড়প্রপঞ্চের একটা সুস্পষ্ট রূপ আমাদের মধ্যে আঁকিয়া দেয়, সেইরূপ যে চিন্তা বা শাস্ত্র আমাদের জীবরাজ্যের, মনোরাজ্যের ও আনন্দ-রাজ্যের অব্যক্ত অস্পষ্ট স্পর্শগুলিকে সুব্যক্ত ও সুস্পষ্টভাবে আমাদের মধ্যে জাগাইয়া দিতে পারে তাহাই প্রকৃত দর্শন শাস্ত্র।

আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দরাজ্যের সৃষ্টি। আত্মপ্রীতিই মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও প্রবৃত্তির মূল। স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে তাহা তাঁহার নিজের সুখের জন্যই ভালবাসে, স্বামীর সুখের জন্য নহে। স্বামী তাঁহার প্রকৃত প্রিয়তম নহে, তাঁহার নিজ আত্মাই তাঁহার প্রিয়তম। তাঁহার পতিপ্রেমের মূলে রহিয়াছে আত্মপ্রেম। আত্মার সমধিক প্রীতি সম্পাদন করে বলিয়াই স্বামীকে গৌণভাবে প্রিয়তম বলা হইয়া থাকে। আত্মাই আনন্দের একমাত্র কেন্দ্র। আত্মার সাক্ষাৎকারই আনন্দময়ের, প্রেমময়ের সাক্ষাৎকার। অতএব আত্মদর্শনই সমস্ত দর্শন-জিজ্ঞাসার মূল ভিত্তি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, আত্মদর্শন সম্ভব হয় কিরূপে? আত্মার তো রূপ নাই, তাহা স্থূল বস্তুও নহে যে তাহাকে লাল গোলাপ ফুলের মত চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যাইবে। চাক্ষুষ জ্ঞান বা স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখাই যদি দৃশ্ ধাতুর অর্থ হয় তবে অরূপ আত্মার যখন চক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভবই নহে তখন 'আত্মদর্শন' এই কথাটাই অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় নাকি? ইহার উত্তরে দার্শনিকেরা বলেন যে, আত্ম-দর্শন কথার অর্থ আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নহে, অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার। উপনিষদে এই অর্থেই দৃশ্ ধাতুর অনেক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনকের বিচারসভায় উষস্ত ও কহোল ঋষির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্মদর্শনের যে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আত্মার ঐরূপ অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের কথাই বলা হইয়াছে। ঋষি উষস্ত প্রশ্ন করিলেন—"হে যাজ্ঞবল্ক্য, যে আত্মা সমস্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও কোন আবরণ দ্বারা আবৃত নহেন—সেই চরম ও পরম আত্মতত্ত্ব আপনি জানেন কি? যদি জানেন তবে শৃঙ্গে ধরিয়া যেমন গরুকে দেখাইয়া দেওয়া যায় সেইরূপ আত্মাকে ধরিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন কি?"

এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, অরূপ নিরবয়ব আত্মাকে শৃঙ্গে ধরিয়া গরু দেখাইবার মত দেখাইয়া দেওয়া তো সম্ভবপর নহে, তবে মানুষ যে জড় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এই প্রত্যক্ষের অন্তরালে স্ব প্রকাশ, জড় বিষয় ও অন্তঃকরণের ভাসক আত্মা অবস্থিত আছেন এবং ঐ জড় বস্তুর প্রত্যক্ষ দ্বারাই জড়ের অন্তরালে অবস্থিত আত্মার সহিতও সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আমাদের পরিচয় হইতেছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণও জড়, বিষয়ও জড়। জড় তো জড়কে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং জড় বস্তু যে প্রকাশিত হইতেছে ইহা দ্বারাও স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় আত্মাই—প্রকাশ পাইতেছেন। আত্মাই যথার্থ সাক্ষী দ্রষ্টা এবং ভাসক। অন্তঃকরণ আত্মার আলোকেই আলোকিত হয়, সুতরাং অন্তঃকরণ নিজের ভাসক আত্মাকে প্রকাশ করিতে

ারে না। ঐই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে "দৃষ্টির অর্থাৎ ক্ষুরিন্দ্রিয়জ জ্ঞানের যিনি দ্রষ্টা প্রকাশক তাঁহাকে ক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করিবে না; এইরূপ নোবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির যিনি উদ্ভাসক তাঁহাকে মনঃ ও ুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে না"। উক্ত ৃহদারণ্যক শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে াত্মাকে জানিতে পারা যায় না। আত্মা ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের অতীত এবং ইহাই তাঁহার স্বভাব। আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে হইলে এইরূপেই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে জড়-যন্ত্রের ক্রিয়া যেমন চেতনের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হয় না, সেইরূপ এই দেহ-যন্ত্রের শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়াও চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন সম্ভবপর নহে। অতএব জড়-দেহের অন্তরালে চেতন আত্মা অবস্থান করিতেছেন এবং দেহযন্ত্রের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। আত্মা ভোগায়তন শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেও অশরীরী। সাংসারিক সুখ দুঃখ প্রিয় অপ্রিয় আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা শোকদুঃখের অতীত, জরামৃত্যুরহিত—শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ। সেই আত্মাই জগদাধার, বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বতিগ। অনাদিকালসঞ্চিত অজ্ঞানের আবরণে মানুষের বিজ্ঞান চক্ষুঃ আবৃত রহিয়াছে সুতরাং ভ্রান্ত মানব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান স্বপ্রকাশ সেই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। বিবেক চক্ষুঃ উন্মীলিত হইলে সেই আত্মাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবেই মানুষ জানিতে পারে। তাঁহার এই আত্মদর্শনে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের অপেক্ষা নাই এবং তাহা নাই বলিয়াই এই আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষ কি মানস, সে বিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান যে 'সাক্ষাৎ' অনুভবপরোক্ষ আত্মজ্ঞান নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগচক্ষু এবং জ্ঞানচক্ষুতে এই আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ উপনিষদের ভাষায় 'সাক্ষাৎ' এবং 'অপরোক্ষ'। অতএব আত্মসাক্ষাৎকার যে চাক্ষুষ জ্ঞানস্বরূপ একথা নির্ব্বিবাদে বলা যায়। আমাদের দৃষ্টিকে আমরা লৌকিক ও অলৌকিক, বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী এই দুইভাগে ভাগ করিয়া থাকি। যদিও স্থূলভাবে বিচার করিলে যে বস্তুর রূপ আছে তাহাই কেবল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, কিন্তু সেই নিয়ম কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষ স্থলেই প্রযোজ্য। আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে আমরা লৌকিক বলিব না, ইহা অলৌকিক যোগজ ধর্ম্ম জন্য। যোগচক্ষু বা দিব্যচক্ষুর সাহায্যে আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? গীতার বিশ্বরূপদর্শনে ভগবান্ পার্থসারথি অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন এবং ঐ দিব্যচক্ষুর সাহায্যে অর্জ্জুন চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য বিশ্বের অন্তরবিহারী কারণাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার ভ্রান্তি বা মিথ্যা জ্ঞান নহে, উহা ভগবৎপ্রসাদলব্ধ প্রকৃত আত্মদর্শন। আমাদের চর্ম্মচক্ষুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে এবং ঐ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে; কিন্তু ভগবানের দেওয়া চক্ষুতে অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহা দর্শনের চরম ও পরম স্তর, আনন্দময়ের যথার্থ উপলব্ধি, আর এই উপলব্ধির সাধনশাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র।



মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মহানগরীর বুকে ক্ষুধার্ত্ত পথিকের সম্বল সেই একটি টাকা দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। পাইস্ হোটেলে একবেলা খেয়ে কখন পার্কে, কখন পথের পাশে গাড়ী-বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে দুঃস্বপ্নের মত দিনগুলো কেটে যায়। যেমন-তেমন একটা মেস, অন্তত খোলার বস্তির একটা সস্তা হোটেলে মাথা গুঁজবার মত একটু জায়গা পেলেও যেন সে আজ বেঁচে যায়। আত্মগোপনের সশঙ্ক চকিত দৃষ্টি, প্রতি পদক্ষেপে আসন্ন লাঞ্ছনার বিভীষিকা ব'য়ে মানুষ কতক্ষণ বাঁচ্‌তে পারে! সত্যেন হাঁপিয়ে ওঠে। জীবনের আগা-গোড়া ভাব্‌তে গেলে মাথাটা গুলিয়ে যায়।

একটা চাক্‌রি, যে-কোন সামান্য মাইনের একটা কাজও জোটে না। ছোট-খাট অফিসে, দোকানে, এমন কি লোকের দরজায় দরজায় সে ঘুরে' বেড়ায়; কিন্তু কোথায় চাকরি! একটু আশ্রয়ের বিনিময়ে সে আজ ক্রীতদাস হ'তেও কুণ্ঠিত নয়। তবুও ত—

ওর চেহারা দেখে হয় ত লোকের মনে সন্দেহ জাগে।

পা দুটো যখন নিতান্ত অচল হ'য়ে আসে, তখন একবার লাইটপোস্টে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ায়। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে; মনে হয় পেটের মধ্যে নাড়িগুলোয় আগুন ধরেছে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনটা কখন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যায়। সিনেমেটোগ্রাফের মত অতীত দিনগুলো চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।

"—একটা পয়সা দেবে বাবা?"—নামাবলী গায়ে একটি প্রৌঢ়া এসে সত্যেনের সাম্‌নে হাত পাতে।

প্রথমটা হয় ত সত্যেনের কানে পৌঁছয় না তার আবেদন। ওর সমস্ত সম্বিৎ ক্ষুধিত দেহের প্রত্যেকটি পেশীর আর্ত্তনাদে মূর্চ্ছিত হ'য়ে থাকে।

মেয়েটি আবার হাত বাড়ায়—"ওগো ছেলে, দাও না একটি পয়সা!" আচম্বিতে সত্যেনের চমক্ ভাঙে—"পয়সা?"

"হাঁ, একটি পয়সা। দুদিন খাইনি কিছু।"—মেয়েটি হাত পেতে ওর মুখপানে চায়।

"পয়সা! একটি পয়সা!"—বিকারের মত সত্যেনের মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। গায়ের পাঞ্জাবী ও পায়ের সি্‌পার জোড়াটার দিকে একবার চেয়ে সে আবার ফুটপাথ ধ'রে এগিয়ে চলে। দুঃস্বপ্নের ঝোঁকটা যেন কোনমতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না।—"একটি পয়সা!"

ছোট গলিটার মোড়ে একটি বেদের মেয়ে গান গাইছে। নিটোল স্বাস্থ্য, পরণে একটা ছেঁড়া ঘাগ্‌রা, বুকের ওপর এক ফালি নেকড়ার বাঁধন ছাড়া গায়ে আর কোন আবরণ নেই; পিঠের ওপর ছেলেটা কোমরের সঙ্গে কাপড় দিয়ে জড়ানো। সঙ্গে একটা পুরুষ ভাঙা হারমোনিয়ম গলায় ঝুলিয়ে সুর দিচ্ছে।

পথযাত্রীদের ভিড় জমে। সত্যেন চল্‌তে চল্‌তে একবার থমকে দাঁড়ায়। মেয়েটার চোখ দুটোয় যেন বিদ্যুতের ফিন্‌কি!—একটা—দুটো—তিনটে, অনেক পয়সা সে একে একে কুড়িয়ে পুরুষটার হাতে দেয়।

পরশু থেকে একমুঠো ভাতও জোটে নি। চাকরির কোন আশা নেই। ক্বচিৎ দু-একটা চেনা মুখ হঠাৎ সাম্‌নে এসে পড়ে। আত্মসম্মানের বালাই ওর নেই আর; তবুও চাইতে পারে না কারো কাছে। কেউ চিন্‌তে পেরে এড়িয়ে যায়, কেউ না-চিন্‌বার প্রাণপণ চেষ্টায় অন্যমনস্ক হ'য়ে পাশ কাটায়। সুরেখাও একদিন এই পথ দিয়ে গেছে মোটরে, সঙ্গে অপরিচিত এক ভদ্রলোক; দূর থেকে অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার চেয়ে সত্যেন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

একটা কুষ্ঠরোগীর কাছে সি্‌পার জোড়াটা দু পয়সায় বিক্রি ক'রে কাল মুড়ি কিনে খেয়েছে। খালি পেটে কলের জল খেয়ে সারাটা দিন গা বমি বমি করে; পেটের ভিতর পাক দেয়।

আবার উপবাসের পালা সুরু হ'য়েছে।

যে সব রাস্তায় লোকচলাচল বেশী, সত্যেন সেদিকে বড় একটা যায় না। জনবিরল পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়; কখন অবসন্ন মনে বাগানের কোন একটা বেঞ্চে ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাল পাকিয়ে ওর চোখের সাম্‌নে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত দৃষ্টিটা ঝাপ্‌সা ক'রে তোলে।

কখন রাত্রি এগারোটা বেজে যায়। পাহারাওয়ালা এসে সকলকে হাকিয়ে দিয়ে ফটক বন্ধ করে। পা দুটো যেন শক্ত হ'য়ে জমে গেছে। কোন রকমে দেহটা টেনে এনে ফুটপাথের একটি কোণে সে আশ্রয় নেয়। নিতান্ত অবসাদে মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু চোখে ঘুম নেই। মাথার নীচে পাঞ্জাবীটা বালিশের মত জড়িয়ে নিয়ে ফুটপাথেই একটু শুয়ে পড়ে।

অন্ধকারের বুকে পথচারীদের জীবন-স্রোত ব'য়ে চলে। দু পাশে একে একে এসে জমে ভিখারীর দল। কেউ বেদনায় আর্ত্তনাদ করে, কেউ এঁটো পাতাগুলো কুড়িয়ে এনে কদর্য্য অন্ন বেছে নেয় পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে; এক টুক্‌রো বাসি পাঁউরুটি নিয়ে করে কাড়াকাড়ি। এখানেও চলেছে প্রেম, কলহ, দ্বন্দ্ব। পথচারিণী নায়িকার অভাব নেই। দিনের আলোয় যারা বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষে ক'রে ফিরেছে, রাতের অন্ধকারে তাদের নিয়ে গ'ড়ে ওঠে ঈর্ষা, প্রেম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কখন চোখের পাতায় নেমে আসে একটু ঘুম। জীবনের ব্যথাভরা অস্তিত্বটা মুহূর্ত্তে মুছে যায়। হঠাৎ সত্যেন চম্‌কে ওঠে একটু নাড়া পেয়ে; মৃদু একটা স্পর্শ কানের পাশে লাগে।

—একটি মেয়ে মাথার কাছে হাত দিয়ে ওর পাঞ্জাবীটার পকেটগুলো টিপে টিপে দেখ্‌ছে। চোখ দুটো ঈষৎ খুলে ও একটু দেখে নেয় মেয়েটার চেহারা; খুব হাসি পায়। কিন্তু মেয়েটাকে লজ্জার ওপর লজ্জা দেবার প্রবৃত্তি ওর হয় না। চুপচাপ প'ড়ে থাকে মরা মানুষের মত; নিঃশ্বাসটাও যেন চেপে রাখ্‌তে চায়।

মাথার কাছ থেকে হাত দুটো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে সত্যেনের ট্যাঁকের কাছে। এবার মনটাকে আরও শক্ত ক'রে ও কাঠ হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। হঠাৎ শরীরটা কেমন শিউরে ওঠে। উপবাস-ক্লিষ্ট দেহটাতেও যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগে।—মেয়েটার বয়েস কুড়ি-একুশের বেশী নয়।

* * * *

এক দুই ক'রে আবার তিনটি দিন কেটে গেল উপবাসে। সেদিন এক সঙ্গে দু-পয়সার মুড়ি না খেলে হয় ত আরও একটা দিন সে নিশ্চিন্তে কাটাতে পারত। শরীরে একটুও শক্তি নেই, মনে বিক্ষুব্ধ চিন্তার প্রবাহ। মুমূর্ষু পথিকের মত বাগানের একটি কোণে ব'সে ভাবে আসন্ন অন্ধকারের কথা।

পাঞ্জাবীটা ছিঁড়ে গেছে: কাপড়খানির অবস্থা তার চেয়ে কম জীর্ণ নয়। তিন বছর আগে যে কাপড় জামা নিয়ে সে গ্রেপ্তার হয়েছিল, জেল থেকে বেরিয়ে আসার দিন সেই গুলোই তাঁরা ফিরিয়ে দিয়েছে। ময়লায় তেল-চিটধরা পাঞ্জাবীটা এখন আর ভিকিরীরাও নিতে চায় না, নাক সিট্‌কিয়ে দূরে স'রে যায়।

পেটের ভিতর সুরু হয়েছে আবার সেই অসহ জ্বালা। একমুঠো ভাতের জন্যে এ হাহাকার—এ তীব্র তাড়না সত্যেন আর সহ্য করতে পারে না। ইচ্ছে হয়, রাস্তায় গিয়ে কারো কাছে দুটো পয়সা চেয়ে নেয়; কিন্তু মনটা আবার কি ভেবে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে।

'কুলিগিরি?' তার জন্যেও সে আজ প্রস্তুত। কিন্তু কেউ ত ডাকে না। তবুও কথাটা মনে হ'তে যেন ওর শিথিল দেহমন অনেকখানি সজীব হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ায়। কাল হয় ত দাঁড়াবার শক্তিটুকুও থাক্‌বে না তার।

পথযাত্রীর হাতে ভারী জিনিষ দেখ্‌লেই মনে হয়—এবার বুঝি ডাক্‌বে ওকে। কিন্তু ডাকে না। একজনের পর একজন—এমনই কত লোক পথ দিয়ে চলে। ওর দিকে ফিরেও চায় না কেউ।

বলি বলি ক'রেও মুখফুটে বল্‌তে যেন কোথায় ওর সঙ্কোচ লাগে। কিন্তু ক দিন আর চল্‌বে এই বৃথা সঙ্কোচের বোঝা ব'য়ে। এবার স্থির মনে সে এগিয়ে যায়। এটাচি-হাতে একটি ভদ্রলোকের পথ রোধ ক'রে হঠাৎ যন্ত্রের মত ব'লে ফেলে—"মুটে চাই? মুটে?"

"না।"—ভদ্রলোকটি পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

শুধু হতাশা নয়, একটা দারুণ গ্লানি মুহূর্ত্তে ওর সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। বুকের ভিতর মনটা আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে।

পথের এক কোণে কয়েকজন ভিকিরী গাঁজার মজ্‌লিস জমিয়ে জটলা করে। ওদের ক্লান্তিবোধ হয় ক্ষণিকের বিশ্রম্ভালাপেই মুছে যায়; কিংবা ছিলই না কোন দিন।

সত্যেন অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়ায়। চারিদিকে উৎসবের সমারোহ, তারই পাশে পাশে রিক্তের নিষ্ফল হাহাকার। দোকানের গ্লাস-কেস্‌টায় স্তরে স্তরে সাজানো থালাভরা নানা রকম খাবার। ওর বুভুক্ষিত দৃষ্টি সজাগ হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, হিংস্র জন্তুর মত লাফিয়ে পড়ে; খাবারগুলো ছিনিয়ে এনে ফুটপাথে ছড়িয়ে দেয়। পরক্ষণেই মনটা ধিক্কারে ভ'রে ওঠে।

আবার ফুটপাথ ধ'রে হেঁটে চলে। এমনি ক'রে কতদূর এগিয়ে যায়, তা নিজেও বুঝতে পারে না। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়; ফুটপাথে পা বাড়াবার পথ নেই।

ছু পাশে সারি সারি ব'সেছে কাঙালী, ভিকিরী অনাথের দল। তাদের আঁচল ভর্ত্তি ক'রে খাবার দিচ্ছে ওরা। কি কোলাহল! নিরন্ন ভিকিরীরা যেন অধীর হ'য়ে উঠেছে আনন্দে। এক সঙ্গে অতগুলো খাবার তারা কতকাল পায় নি। ইচ্ছে করে ওদের এক পাশে গিয়ে আঁচল পাতে; কিন্তু পারে না। দেহ তার অসহ বুভুক্ষায় হাত বাড়াতে চায়—মনটা বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে।

এবার চল্‌বার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে আসে; দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পা ছুটো কাঁপে।

একটি ভিকিরী-মেয়ে মাঝে মাঝে উৎসুকদৃষ্টিতে ওর দিকে চায়। সে দৃষ্টির অর্থ খুঁজে নেবার মত মনের অবস্থা নেই ওর।

ভিকিরী হ'লেও মেয়েটি ঠিক ওদের মত নয়। পরণের কাপড়খানা খুব জীর্ণ, মাথায় একরাশি রুক্ষ চুল। তাই ব'লে দেহ এখনও জীর্ণ হয় নি; সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের রেখা ঝরা শিউলির মত ছড়িয়ে আছে।

সত্যেন নিশ্চল দাঁড়িয়ে ভাবে। কত রকমের ভিকিরী,—নানা বয়েসের, নানা চেহারার মানুষ এসে আঁচল পেতেছে পেটের দায়ে। এক মুঠো খাবারের জন্যে কত কলরব কাড়াকাড়ি!...খাবারগুলো আঁচলে বেঁধে আবার তারা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল।

একজন অন্ধের হাত ধ'রে সেই ভিকিরী-মেয়েটি ওর দিকেই এগিয়ে আসে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে সত্যেনের সংজ্ঞাও যেন তখন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ছিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে; মেয়েটি এদিক ওদিক চেয়ে ঠিক ওর সাম্‌নেই এসে দাঁড়ায়।

একটু ইতস্তত ক'রে সসঙ্কোচে মেয়েটি জিজ্ঞেস্ করে—"খুব খিদে পেয়েছে, না?"

সত্যেন বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে, মুখে কথা সরে না। নিতান্ত অবসাদে চোখ ছুটোও বোধ হয় ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌ছিল।

"ভদ্দরলোকের ছেলে কি-না, তাই ব'ল্‌তে পারছ না লজ্জায়।"—মেয়েটির মুখে ম্লান এক টুক্‌রো হাসি।

সত্যেন শুধু মাথা নেড়ে জানায়—"তাই।"

মেয়েটি আর কোন কথা না ব'লে ওর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল রাস্তার নিরালা একটি কোণে। কোন আপত্তি করবার শক্তিও হয় ত তখন তার ছিল না। সে যেন কলের পুতুলের মত অসাড় হ'য়ে গেছে।

আঁচল থেকে খাবার বের ক'রে মেয়েটি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে ব'ল্‌ল—"খাও; লজ্জা ক'রো না।"

অদ্ভুত মেয়ে! সত্যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে থাকে। নিজের অবস্থাটা সে সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারে না। বুঝি-বা স্বপ্ন, সেদিনের মত এও একটা দুঃস্বপ্ন। সুরেখার মত, ওর জন্মদিনের অপ্রত্যাশিত অতিথি মঞ্জরীর মত!

মেয়েটি এবার তাগিদের সুরে সত্যেনের খাবার ভর্ত্তি হাত ছুটো তুলে ধ'রে বলে—"খাও না! কতক্ষণ বাঁচবে না খেয়ে?"

তাই, সত্যি তাই। ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে পাকস্থলীর বিস্ফোরণ। বাঁচবে না, এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌বে না আর না খেয়ে।

মেয়েটা এক রকম জোর ক'রেই খাবারগুলো ওর মুখে তুলে দিল। সত্যেনের বুকের ভিতর বুভুক্ষিত মানুষ ফুলে ফুলে কেঁদে উঠ্‌তে চায়। অনেকক্ষণ পর ভাল ক'রে মেয়েটির মুখপানে একবার চেয়ে সে জিজ্ঞেস্ ক'রল—"তুমি ভিকিরী?"

"হাঁ"।—ব'লে সে সঙ্গের অন্ধটির হাত থেকে এনামেলের কলাই-করা বাটিটা নিয়ে পাশের কল থেকে এক বাটি জল এনে সত্যেনের হাতে দিয়ে ব'ল্‌ল—"তোমার যে কত খিদে পেয়েছিল, তা আমি ওখানে ব'সেই টের পেয়েছিলাম।"

সত্যেনের চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছে। ওর সমস্ত ভাষা যেন মূক হ'য়ে গেছে।

মেয়েটির মনে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। ও তেমনি হেসে জিজ্ঞেস করে—"কদিন খাও নি বল ত ?"

"আজ নিয়ে চারদিন"।—কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে। আজ কতকাল এমন ক'রে কেউ জিজ্ঞেস্ করে নি ওকে ; ওর অভাব, ওর জীবনের কথা!

এতক্ষণ পরে অন্ধটি একবার সাম্‌নে ও দুই পাশে হাত বাড়িয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস অতসী ?"

"ও চারদিন খায় নি বাবা ; বোধ হয় ভদ্দরলোকের ছেলে।"—এবার অতসীর মুখখানা বেদনার্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

কি অপরিসীম দরদ ওর মনে! সত্যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে।

"খাবারগুলো এঁটো করিস্ নি ত অতসী ? দে মা, দে ওঁকে।"

হাতের লাঠিটা নামিয়ে বুড়ো সেইখানেই ব'সে প'ড়ল।—"তোর মা যখন মরে, তখন তুই কতটুকুই বা! না খেয়ে খেয়ে সে বেচারী শুকিয়ে মরল। আমি তখন বিছানায় প'ড়ে।—"

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে অতসী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস্ করল—"কোথায় থাক তুমি ?"

"আমি ?"—একটু ইতস্তত ক'রে সত্যেন বললে—"ও-দিকে, মোড়ের ওই বাগানটায়।"

"বাগানে ? কোম্পানীর বাগানে ত রাত্তিরে থাক্‌তে দেয় না !"—অতসী উৎসুক দৃষ্টিতে চায়।

"না। রাত্রে এদিক ওদিকে থাকি ; বারান্দা, না হয় রাস্তায়।"—কথাগুলো বল্‌তে যেন ওর দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

"রাস্তায়! বল কি ? শেষে যে একটা কঠিন ব্যামো ধ'রে যাবে। দেখ না, কত কুঠে, যক্ষ্মারুগী সারারাত গড়িয়ে বেড়ায় চারিপাশে ? একদিনও নয়, আর একটি দিনও তুমি থেকো না রাস্তায়।"

এবার সত্যেনের সত্যি হাসি পায়। অত্যন্ত করুণ অসহায়ের হাসি।—'অশিবের আবার কল্যাণ !'

"জানো না তুমি ; অমনি ক'রেই কঠিন ব্যামোগুলো রাজ্যিময় ছড়িয়ে পড়ে। কেউ ফিরেও চাইবে না মুখপানে। চল তুমি, আমাদের বস্তিতে থাক্‌বে একটা ঘর নিয়ে। পুরুষ মানুষ, প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে মোট খেটেও দিন চলবে।"—অতসী একরকম জোর ক'রেই ওর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

সত্যেনের চোখ দুটো জলে ঝাপসা হ'য়ে আসে। এত বড় দাবীর ওপর কোন আপত্তি করবার প্রবৃত্তি তার হ'ল না।

পথে যেতে যেতে অতসী হঠাৎ জিজ্ঞেস্ করে—"তোমার নামটা কি, তা ত বল্‌লে না ?"

সত্যেন একটু ভেবে নিয়ে বলে—"দীনবন্ধু।"

"দীনবন্ধু! তা বেশ। আমাদের পাড়ার হরিমতির ভাই-এর নাম ছিল দীনু।"—আবার তেমনই একটু হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে-চোখে।

সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। পথ ও প্রাসাদে জ্বলে উঠ্‌ল বিচিত্র আলোর মণিমালা।

*　　*　　*　　*

অন্ধকার গলি। দু-পাশে ছোট ছোট খোলার বাড়ী, মাঝখান দিয়ে সরু একফালি পথ ; পাশাপাশি দু জনকেও গা-ঘেঁসে চল্‌তে হয়। গলিটার শেষে অতসীদের বস্তি ; যেমন অন্ধকার তেমনি অপরিচ্ছন্ন।

পা বাড়াতেও যেন সত্যেনের ভয় করে। অতসী আগে আগে চলে অন্ধ পিতার হাত ধ'রে ; সত্যেন কতকটা যন্ত্রচালিতের মত ওদের পিছু পিছু হাঁটে।

পায়ের কাছ দিয়ে একটা মস্ত ধাড়ি ইঁদুর কিচ্‌কিচ্ শব্দে ছুটে গেল। সত্যেন আঁৎকে উঠে দু পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

অতসী বুঝতে পেরেছিল যে অন্ধকার গলিতে পা বাড়াতে দীনু শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। একটু অপ্রতিভ সুরে বল্‌ল—"ভয় করছে দীনু ? ও কিছু নয় ; একটু এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধর।"

দীনবন্ধু কোন উত্তর দেবার আগেই বুড়ো হেসে ব'লে উঠ্‌ল—"সব স'য়ে যাবে বাবা ; দু দিন পরে সবই স'য়ে যায়। এ আর কতটুকু অন্ধকার !"

ওর জীবনে যে আলো চিরদিনের মত নিবে গেছে, তারই ব্যথা ফেনিয়ে ওঠে ওই কয়েকটি কথায়।

আঁচলের একটা প্রান্ত বাপের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে, অতসী পিছিয়ে এসে দীনবন্ধুর হাত ধ'রে আবার

এগিয়ে চ'ল্‌ল। 'ভিকিরীর মেয়ে, তবু এত নরম ওর হাত!'—সত্যেন চল্‌তে চল্‌তে অতসীর হাতখানা যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে। স্পর্শে ওর উদগ্র মাদকতা নেই, অথচ অনুভূতির ছোট ছোট ঢেউগুলো নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুতে। সত্যেনের শরীর ও মন অবসাদে তন্দ্রাতুর হ'য়ে আসে।

—"অতসী!"

—"হ্যাঁ।"

"না, কিছু নয়।"—কি ব'ল্‌তে গিয়ে সত্যেন থেমে গেল। হঠাৎ যেন তার সংবিৎ ফিরে এলো।

গলিটার শেষে বড় একটা উঠান; দু পাশে বস্তি। স্যাঁৎসেতে উঠানের মাঝখানে কতদিনের ভাঙা-খোলা আর কালচূণার স্তূপ জমে আছে; বাতাসে থম্ থম্ করে তারই ভাপ্‌সা গন্ধ। দু-একটা ঘরে কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে; সেই আলোর ঝলক দরজার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে উঠানের এখানে-ওখানে।

অতসীকে অবলম্বন ক'রে ওরা দুজনে এসে উপস্থিত হ'ল বস্তির একটি কোণে। ওর বাবা অন্ধ হ'য়েও যতখানি নির্ভর অতসীর উপর করে নি, আজ সত্যেন সক্ষম হ'য়ে তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করেছে; শুধু নির্ভর কেন, আজ সে বিনাবাক্যে আত্মসমর্পণ করেছে ওই ভিখারী তরুণীর হাতে। রিক্ততা ওর জীবনের কানায় কানায় এমন ক'রে ছাপিয়ে উঠেছে যে, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারলে যেন ও বেঁচে যায়। জীবনের পেয়ালায় যখন অতীত ও বর্ত্তমান একসঙ্গে মিশে সোডা আর তীব্র য়্যাসিডের মত ফেনিয়ে ওঠে, তখন তলানিটুকু পর্য্যন্ত লুটিয়ে পড়তে চায় মাটির বুকে।

আঁচল থেকে চাবিটা বের ক'রে অতসী দরজা খুলে ভিতরে গেল। ঘরখানার মধ্যে অন্ধকার আর সারাদিনের বদ্ধ উত্তাপ যেন জমাট বেঁধে বাতাসটাকে বিষাক্ত করে তুলেছে। হাতড়ে হাতড়ে মাটির প্রদীপটা জ্বেলে অতসী তাড়াতাড়ি মাদুরখানা মেঝেয় বিছিয়ে ওর বাবার হাত ধ'রে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

সত্যেন বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে। পরিস্থিতিটা নিজের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে সে আগাগোড়া ভেবে উঠ্‌তে পারে না। বিকেল থেকে পর পর চোখের সাম্‌নে যে ছবিগুলো ভেসে উঠ্‌ছে, সে কি উপবাসক্লিষ্ট মস্তিকের বিকার, না জীবন্ত বাস্তবতা! জীবনের স্তরে স্তরে মানুষের এই প্রবাহ কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মত ওর চোখে ধাঁধা ধরিয়ে দেয়; ভেবে পায় না কোথায় এর আদি আর শেষ। সেই ভিক্টোরিয়া চেম্বার্স—আর এই বস্তি!

অতসী এগিয়ে এসে সত্যেনের হাত ধ'রে মৃদু একটা টান দিয়ে বলে—"দীনুবাবু, বস্‌বে চল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো যে ব্যথা হ'য়ে যাবে।"

আশ্চর্য্য মেয়ে! সত্যেন অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে ওর মুখপানে। বড় বড় দুটো চোখ জলে ভারী হ'য়ে উঠেছে। হয় ত সত্যেনের প্রতি সমবেদনায় নয়, নিজের অসহায়তার নগ্ন রূপ আজ অতিথির সাম্‌নে তাকে এমন বিব্রত ক'রে তুলেছে—তাই।

নিরালায় অতসীর মুখখানা এত নিবিড়ভাবে দেখবার সুযোগ সত্যেন এই প্রথম পেল। ওরা গরীব—পথভিকিরী, কিন্তু জীবনে ওদের দীনতার এতটুকু ছাপও নেই। মনের ঐশ্চর্য্যই যেন মুখখানাকে ফুটন্ত ফুলের মত সুন্দর ক'রে রেখেছে। প্রদীপের স্বল্প আলোকেও বড় বড় চোখ দুটো ফস্‌ফরাসের মত জ্বল্ জ্বল্ করে।

অতসী আবার বলে—"সারাদিন পথে পথে ঘুরেছ; একটু বস্‌বে এসো।"

তার অনুনয়ের ভিতরেও কেমন একটা দাবী! সে দাবী উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু কোথায় বস্‌বে সে? ভিকিরীর কুঁড়ে, তাও ভাড়াটে; ওই এক ফালি ঘরে কোন রকমে দুটি প্রাণীর মাথা গুঁজবার ঠাঁই হয়।

ওদের সেই অযাচিত সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে অতখানি স্বার্থপরতা করতে সত্যেনের বাধে।

বিমূঢ়ের মত খানিক কি ভেবে হঠাৎ অতসীর হাতখানা দুই হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে সত্যেন বলে—"আমায় মাপ কর অতসী; আবার আস্‌ব একদিন।"

"এখানে থাক্‌তে তোমার খুব কষ্ট হবে, নয় দীনু?"—অতসীর কণ্ঠস্বর যেন সত্যি একটু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

"কষ্ট!" দীনবন্ধুর হাসি পায়। হাসি নয়, হয় ত কান্নারই বিকার। অতসীর হাতখানা ধ'রে একটু ঝাঁকানি

দিয়ে সে আবার বলে—"ফুটপাথে যে ঘর বেঁধেছে, ঘরে থাক্‌তে তার কষ্ট হবারই কথা অতসী।"—এবার সত্যেন হেসে ওঠে খুব জোরে।

অতসী অপ্রতিভ হ'য়ে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—"রাস্তায় কত রকম ব্যামোর ভয়, তাই বল্‌ছিলাম।"

"তা জানি!"

"জান! তা হ'লে থাক্‌তে চাও না কেন? তবুও ত…"

"কেন চাই না, সেটা আর একদিন বল্‌ব। বল্‌তেও হবে না, তুমি নিজেই বুঝ্‌বে।"—অতসীর মাথায় হাত দিয়ে সত্যেন অনুনয়ের সুরে বলে—"আজ যাই তা হ'লে?"

অতসী নতমস্তকে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছিল। ঘরের ভিতর থেকে ওর বাবা উত্তর দিল—"আচ্ছা, এসো বাবা। আবার কিন্তু আস্‌বে একদিন! পাগ্‌লা মেয়েটা অতশত বোঝে না; তাই কষ্টও পায় অনেক সময়। বুঝ্‌বে, আপনি বুঝ্‌বে সব।"

নিজেকে একটু সপ্রতিভ ক'রে নিয়ে অতসী জিজ্ঞেস করে—"রাত্রে আর কিছু খাবে না বাবা?"

"না মা। যদি পারিস্‌, কাল সকালে বরং এক মুঠো ফুটিয়ে দিস্‌।"—মাদুরটার এক পাশে বুড়ো হাত পা ছড়িয়ে শু'য়ে পড়ল।

অতসী শুধু ওর বাবার কথাটাই জান্‌তে চায় নি; সেই সঙ্গে দীনুর কথাও সে জেনে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হ'য়ে প'ড়ল অন্য রকম। বাবা খাবে না শুনে ও আর নিশ্চয়ই চাইবে না খেতে।

অতসীর মুখ দেখে তার সঙ্কটটুকু বুঝে নিতে সত্যেনের দেরী হ'ল না। তাই পুনরায় সে কথা উত্থাপন করবার আগেই সে বারান্দা থেকে নেমে দাঁড়াল উঠানে—"আচ্ছা, তা হ'লে আজকের মত আসি অতসী?"

একটুক্ষণ নীরবে কি ভেবে নিয়ে অতসী ব'ল্‌ল—"আবার এসো কিন্তু।"

সত্যেনের মনটা হঠাৎ কেমন এলোমেলো হয়ে প'ড়ল। নিজেকে সংযত ক'রে নেবার চেষ্টায় সে দ্রুতপদে এগিয়ে চ'ল্‌ল গলিটার দিকে। এই গলিটার মতই তার জীবনের একটি অধ্যায় অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে। কারুর সঙ্গে পাশাপাশি চল্‌বার পরিসর সেখানে নেই।

"একটু দাঁড়াও।"—অতসী পিছু ডাকে। পর্য্যাপ্ত মমতা ওর কণ্ঠস্বরে।

সত্যেন ফিরে দাঁড়াতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো প্রদীপটা হাতে নিয়ে। এক হাতে প্রদীপ, অন্য হাতে বাতাস আড়াল দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল ওর সুমুখে। "আঁধারে তুমি একপাও চল্‌তে পার না, না দীনু? সে আমি বেশ বুঝেছি তখন।"

—অতসী হেসে ওঠে, হয়ত নিতান্ত অকারণ; সত্যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়ে।

প্রদীপের লাল আভা চোখেমুখে সোনালি ছোঁয়া দিয়ে যেন ভোরের আলোর মত মুখখানা উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। সত্যেন স্তব্ধ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বারবার চেয়ে দেখে। অতখানি অন্যমনস্কতা গোপন করা চলে না; চল্‌তে চল্‌তে পা দুটো কখন অলক্ষিতে থেমে যায়।

সারা গায়ে ওর দারিদ্র্যের নগ্নতা। চোখ, মুখ, পাৎলা ঠোঁট দুখানা অনশনের উত্তাপে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে; তবুও নিটোল পরিপূর্ণতা ছাপিয়ে উঠেছে দুটি চোখের কানায় কানায়।

তেম্‌নি মৃদু হেসে অতসী বলে—"দাঁড়িয়ে রইলে যে? চল।"

সত্যেন চম্‌কে উঠ্‌ল—"হাঁ, চল।"

"না-ই বা গেলে আজ! কদিন ধ'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, একটু জিরিয়ে নিতে—"

অতসীর কথায় বাধা দিয়ে সত্যেন তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল—"তা হোক্‌। কোন কষ্ট হয় না আর।"

এবার যেন শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ ক'রে সত্যেন এগিয়ে চলে। হঠাৎ যে অতসীর কাছে এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তটা অমন ভাবে ধরা পড়বে, সে কথা ও ভাবতেও পারে নি।

গলির মোড়ে এসে অতসী প্রদীপটা আর একটুখানি তুলে' ধ'রল। সত্যেন আবার ফিরে চায় ওর মুখপানে। রূপসী নয়, তবুও অস্বীকার করবার উপায় নেই ওর সৌন্দর্য্যকে।

ক্রমশঃ

বাংলার কৃষকের পণ্য-বিক্রয় সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী এম্-এ

বাংলার কৃষি-শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে কোন আর্থিক পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে কৃষকের পণ্য-বিক্রয়-সমস্যার সমাধান করা অপরিহার্য্য। কৃষকের আর্থিক দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে এই সমস্যা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বহু বাধা বিঘ্ন, অসুবিধা এবং অন্তরায়ের মধ্য দিয়া তাহাকে পণ্য-বিক্রয় করিতে হয়। ফলে পণ্যের বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য তাহার হাতে আসে না। কৃষকদের মধ্যে উৎকৃষ্টতর পণ্য উৎপাদন করিয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার স্পৃহা হ্রাস পাইবার ইহা একটি প্রধান কারণ। ভারতীয় কৃষি-কমিশন, ভারতীয় এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটিগুলি এই সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা সমাধানকল্পে বিস্তৃত আলোচনা এবং কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বাংলার কৃষকের পণ্য-বিক্রয় সমস্যাটির স্বরূপ এবং সমাধানের উপায় সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারে কৃষকের প্রধান অসুবিধাগুলি মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। বর্ত্তমান পণ্য-বিক্রয় ব্যবস্থাটাতেই অনেক ত্রুটি এবং গলদ রহিয়াছে; তাই ইহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, পণ্যবিক্রয় ব্যাপারে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে কৃষকগণ আর্থিক সাহায্য না পাওয়াতে সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে কোন বিজ্ঞানসম্মত পণ্য-বিক্রয় ব্যবস্থা নাই বলিলে কোন অত্যুক্তি করা হয় না। পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারে মধ্যবর্ত্তী ক্রেতার (middlemen) আধিক্য প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। পাট বাংলার একটি প্রধান কৃষিজ পণ্য। কৃষক এবং পাট-রপ্তানিকারী অথবা মিলওয়ালার ভিতর অন্তত তিন বা চার শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী-ক্রেতা রহিয়াছে। ফড়িয়াগণ কৃষকের বাড়ী হইতে পাট ক্রয় করে অথবা কৃষকগণ হাটে বেপারীদের নিকট পাট বিক্রয় করে। তাহারা আবার ভারতীয় বা মাড়োয়ারী আড়ৎদার অথবা বিদেশী পাটব্যবসায়ীর এজেন্টদের নিকট পাট বিক্রয় করে। মিলওয়ালারা ও বেলিং ফার্মগুলি ইহাদের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিয়া থাকে। ধান্যের বিক্রয় ব্যাপারেও কৃষক এবং রপ্তানিকারী অথবা মিলওয়ালার ভিতর পাইকার, বেপারী এবং আড়ৎদারদের আধিক্য দৃষ্ট হয়। এই মধ্যবর্ত্তী ক্রেতাগণ তাহাদের মজুরীস্বরূপ পণ্যের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং দেখা যায় যে, যে মূল্যে রপ্তানিকারী পণ্য ক্রয় করিতেছে তাহার অধিকাংশ মধ্যবর্ত্তী ক্রেতাদের হাতে যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটি হিসাব হইতে দেখা যায় যে, যে দামে কৃষক পাট বিক্রয় করে এবং যে দামে রপ্তানিকারী অথবা মিলওয়ালা পাট ক্রয় করে তাহার মধ্যে প্রতি মণে প্রায় আড়াই টাকার মত পার্থক্য থাকে। এই হিসাব হইতে মধ্যবর্ত্তী ক্রেতার আধিক্য হেতু কৃষককে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি অনুমান করা যায়। অন্যভাবেও কৃষক মধ্যবর্ত্তী ক্রেতা দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে। ওজন ও মাপ সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকায় এবং পণ্য ক্রয়ের সময় 'বৃত্তি,' 'মুঠ-কাবারী', 'ধল্‌তা', ইত্যাদির রেওয়াজ থাকায় নিরক্ষর এবং দরিদ্র কৃষকগণ নানাভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারে মধ্যবর্ত্তী ক্রেতাগণ যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু বাংলার মধ্যবর্ত্তী ক্রেতাদের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ উত্থাপন করা যায়। পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারে প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের আধিক্য এবং কৃষকদের সুবিধা ও স্বার্থের প্রতি ইহাদের ঔদাসীন্য সুবিদিত।

ভারতবর্ষে এবং বাংলায় জিনিষপত্রের ওজন ও মাপ সম্পর্কে নিদারুণ অব্যবস্থার কথা এই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, পাথর, ইট, লোহা প্রভৃতির সাহায্যে কৃষকের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করা হয়।

এইগুলির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই আপত্তিকর। আবার মণের পরিমাপেরও কোন স্থিরতা নাই। পাট ব্যবসায়ের কথাই ধরা যাউক। একস্থানে ৬০ তোলাতে সের ধরা হয়, কোথাও ৮৩ তোলা, কোথাও ৯৩ তোলা এবং কোথাও ১২০ তোলা হিসাবে সেরের মাপ হিসাব করা হয়। এই অভিযোগও শুনা যায় যে, মধ্যবর্ত্তী ক্রেতাগণ বা অন্য ব্যবসায়ীগণ কৃষকের নিকট হইতে প্রতি সেরে বেশী তোলা হিসাবে জিনিষ ক্রয় করে এবং তাহারা সেই জিনিষ আবার কম তোলা হিসাবে বিক্রয় করে। জিনিষপত্রের ওজন ও পরিমাপ সম্বন্ধে এইরূপ অব্যবস্থা যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু এই অব্যবস্থার দরুণ কৃষকের মধ্যবর্ত্তী ক্রেতা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়-ভাবে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা এবং সুযোগ খুব বেশী।

পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারে অন্যপ্রকার অব্যবস্থার উল্লেখ না করিলে কৃষকের বাধা-বিঘ্নের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বুঝা যাইবে না। উৎকৃষ্টতম, উৎকৃষ্টতর, উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট—এইভাবে প্রত্যেক কৃষিজ পণ্যকে গুণানুসারে নানা শ্রেণীতে বিভাগ করিবার কোন বাঁধাধরা ব্যবস্থা (grading) বাংলাতে নাই। পাটের কথাই ধরা যাউক। পাট সাধারণত গুণানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই গুণ-বিভাগ কোন নিশ্চিত এবং বাঁধাধরা চিহ্ন ও লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া করা হয় না। অনেক সময় মিলওয়ালারা উৎকৃষ্টতর পাট সুবিধাদরে ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে এই গুণ-বিভাগ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই-ভাবে কৃষিজ পণ্যের উপযুক্ত, সুনির্দ্দিষ্ট ও একইরূপ গ্রেডিং-এর বন্দোবস্ত না থাকায় কৃষক উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করিয়াও সব সময় উপযুক্ত মূল্য পায় না; যে স্থানে যে শ্রেণীর পণ্যের চাহিদা ঠিক সেই বাজারে সেই গ্রেড-এর পণ্য পাঠাইয়া বণ্টন ব্যয় কমাইতে পারে না এবং নমুনা দেখাইয়া পণ্য বিক্রয় করা (sale by samples) খুব সহজ হয় না।

কিন্তু পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারে কৃষকের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইতেছে তাহার আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে আর্থিক সাহায্যের অভাব। বাংলার কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নহে। তাই কৃষিকার্য্য চালাইবার জন্য এবং শস্য বিক্রি না হওয়া পর্য্যন্ত নিজের ও পরিবারের লোকজনের ভরণপোষণের জন্য তাহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধার করিতে হয়। পণ্য-বিক্রয় করিয়া কৃষক কি পরিমাণে লাভবান হইবে, তাহা কৃষক কি ভাবে মহাজনদের নিকট হইতে টাকা পূর্ব্বে ধার করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে। অনেক স্থানে কৃষকগণ মহাজনদের নিকট হইতে দাদন প্রথায় টাকা ধার করিয়া থাকে এবং ইহার পরিবর্ত্তে মহাজনদের নিকট অথবা তাহাদের সহযোগিতায় পণ্য-বিক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সব অবস্থায় কৃষক কখনই উপযুক্ত মূল্য পায় না। যদি মহাজনের নিকট পণ্য বিক্রয় করিবার কোন চুক্তি না থাকে তাহা হইলে কৃষককে খুব উচ্চ সুদ দিতে হয়। অবশ্য দাদন প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। তবু পণ্য বিক্রয় ব্যাপারে কৃষক চুক্তিবদ্ধ না থাকিলেও খাজনার, ধারের টাকার উচ্চ সুদের বা আসল টাকার দাবী মিটাইবার জন্য শস্য হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে-কোন মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে প্রায় একপ্রকার বাধ্য হয়। এই সব কারণে উচ্চ মূল্যের আশায় পণ্য হাতে লইয়া বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। কাজেই পণ্য বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার আর একটি প্রধান কারণ হইতেছে কৃষকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা।

পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারে কৃষকের প্রধান প্রধান অসুবিধা-গুলি কি ভাবে দূর করা যায়, তাহা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ভারতীয় কৃষি কমিশন এদেশের ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কে নিদারুণ অব্যবস্থার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার যথাবিহিত সংস্কারের জন্য সুপারিশ করেন। ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটিসমূহও এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে একটি উপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেন। ইহা খুবই সুখের বিষয় যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষে এবং বাংলায় এই সম্বন্ধে একটি বাঁধা-ধরা নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শীঘ্রই সমস্ত দেশে জিনিষপত্রের ওজন ও পরিমাপের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সরকারী বিল উত্থাপিত হইবে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহও ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়াছেন। এই আইন সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইলে বাংলার কৃষকের পণ্য-বিক্রয়ের একটা প্রধান অন্তরায় দূর হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে কৃষি-পণ্যের কোন grading-এর বন্দো-বস্ত না থাকায় কৃষককে যে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে

হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আমেরিকান কটন ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ য়্যাক্ট এবং ইংলণ্ডের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং য়্যাক্ট-এর ন্যায় আমাদের দেশেও একটি আইন প্রণয়ন করিয়া প্রধান প্রধান কৃষি-পণ্যের গুণ-বিভাগ নির্দ্ধারিত করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য কোন পণ্যের গ্রেডিং করিবার পূর্ব্বে ইহার প্রচলিত গুণ-বিভাগ কি, এই সম্বন্ধে কৃষক,মধ্যবর্ত্তী ক্রেতা ও রপ্তানিকারীর মতামত কি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই প্রকার আইনে প্রধান প্রধান পণ্যকে গুণানুসারে শ্রেণী বিভাগ করিবার প্রত্যেক grade-এর লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ নিশ্চিতভাবে নির্দ্ধারণ করিবার এবং কোন পণ্যের grade সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হইলে তাহা সমাধান করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা ও বিধান থাকিবে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট কৃষিজ পণ্যের গ্রেডিং ও মার্কেটিং নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করিয়া এই বিষয়ে কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাংলার পাট, ধান, তৈলবীজ ইত্যাদি পণ্যের একটা বাঁধাধরা গ্রেডিং-এর বন্দোবস্ত করিবার জন্য ১৯৩৭ সালের আইনের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয় নাই। প্রয়োজন বোধ করিলে আরও একটি ব্যাপক আইন প্রণয়ন করিয়া এদেশের পণ্যসমূহের গ্রেডিংএর বন্দোবস্ত করিয়া কৃষকের পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারে আর একটি মস্ত অসুবিধা দূর করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

পণ্য-বিক্রয় সম্পর্কে কৃষকের আর্থিক বাধাবিঘ্ন সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে হইলে তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক দুরবস্থার অপনোদন, সমবায় আন্দোলন, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, ঋণসালিশী বোর্ড প্রভৃতির প্রসার, প্রতিষ্ঠা এবং সাফল্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। যদি কৃষক মহাজনদের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া কৃষিকার্য্য চালায় তাহা হইলে পণ্য-বিক্রয়-লব্ধ টাকার একটা বড় অংশ উচ্চ সুদ এবং আসল টাকার বাবদ মহাজনের হাতে যায়। এইজন্যই এই ব্যবস্থায় কৃষকের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি সম্ভব নহে। কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠান অথবা জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক হইতে কৃষক সুলভে টাকা ধার করিতে পারে এবং কৃষিজ আয় হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে শোধ করিতে পারে। একমাত্র এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে ও সহযোগিতায় কৃষকের বর্ত্তমান দুরবস্থার উন্নতি সম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সমস্যাটি সমগ্রভাবে আলোচনা করিবার কোন দরকার নাই। পণ্য-বিক্রয় সম্বন্ধে কৃষকের যে আর্থিক অসুবিধার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, নানা প্রয়োজনীয় অভাব ও জরুরি দাবী মিটাইবার জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া অনেক সময় অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে পণ্য-বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। এইভাবে উচ্চ মূল্যের আশায় পণ্য হাতে রাখিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অথচ সেইজন্যই মধ্যবর্ত্তী ক্রেতাগণ পরে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। এই জটিল অবস্থাটি সমাধানের জন্য নানাপ্রকার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কো-অপারেটিভ সেল্ সোসাইটি স্থাপন করিয়া ইহা অতি সুন্দরভাবে সমাধান করা যায়। পাটের কথাই ধরা যাউক। কৃষক যদি জুট সেল্ সোসাইটির সাহায্যে পাট বিক্রয় করে তাহা হইলে নানাপ্রকার সুবিধা পাইবে। এই প্রকার বিক্রয় সমিতির নিকট পাট মজুত রাখিয়া অতি প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইবার জন্য কৃষক কিছু টাকা ধার পাইতে পারে। পরে বাজারের অবস্থা ভাল বিবেচিত হইলে বিক্রয়সমিতিগুলি কেন্দ্রীয় বিক্রয়সমিতির মারফতে এবং ফড়িয়াদের সাহায্য ব্যতীত আসল ক্রেতাদের নিকট পাট বিক্রয় করিয়া কৃষকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য টাকা দিবে। এইভাবে কৃষক পণ্যের বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য পাইবে এবং ফড়িয়াদের হাত হইতে রেহাই পাইবে। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত বাংলায় এই জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই এবং যে কয়েকটি ধান্য ও পাট বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে সেইগুলিও লাভজনকভাবে কাজ করিতে পারিতেছে না। সদস্যদের অন্যায় ব্যবহার, এই সব সমিতির গঠন-প্রণালী, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে সদস্যদের প্রকৃত জ্ঞানের এবং সমিতি পরিচালনা সম্বন্ধে উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাব ইহার প্রধান কারণ। কি ভাবে কো-অপারেটিভ সেল্ সোসাইটি বাংলায় প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে তাহা নূতন সমবায় আইনটি পাশ করিবার কালে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বিক্রয় সমিতি স্থাপন সম্পর্কে প্রচার

কার্য্য, প্রাথমিক মূলধন সরবরাহ, সমিতির পত্তন, বিশেষজ্ঞের উপদেশ প্রভৃতি ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যদি আরও অধিকতর অগ্রণী হন তাহা হইলে পণ্য-বিক্রয় সম্পর্কে কৃষকের একটি প্রধান অসুবিধা দূর হইবে সন্দেহ নাই।

লাইসেন্স-প্রাপ্ত ওয়ের-হাউস স্থাপন করিয়াও এই অসুবিধা কতক পরিমাণে দূর করা যায়। কৃষক এই সব গুদামে, আড়তে অথবা ওয়ের-হাউসে পণ্য মজুত রাখিয়া যে রসিদ পায় তাহার সাহায্যে স্থানীয় ব্যাঙ্ক, লোন কোম্পানী, সমবায় সমিতি এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে অল্প সময়ের জন্য সুলভে কতক টাকা ধার করিয়া তাহার পর বাজারের অবস্থা ভাল হইলে পণ্য-বিক্রয়ের পর ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করিয়া, ওয়েব-হাউসম্যানকে গুদাম ভাড়া বাবদ কিছু দিয়া বাকী টাকা হাতে পাইবে। এইভাবে ওয়ের-হাউসের সাহায্যে কৃষক পণ্য-বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে। উপযুক্ত গ্রেডিং-এর বন্দোবস্ত থাকিলে এবং ওয়ের-হাউসিং-সিস্টেম-এর সুবিধা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে কৃষকের অন্যের পণ্যের সহিত তাহার পণ্য একত্র রাখিবার আপত্তি ক্রমেই হ্রাস পাইবে। বাংলার সমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থায় সমবায় সমিতিসমূহের পক্ষে ওয়ের-হাউস স্থাপন করা কতদূর সম্ভব হইবে সেই সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাই বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে কমিটি ইউনাইটেড স্টেটস্ ওয়ের-হাউস য়্যাক্ট-এর ন্যায় বাংলাতেও একটি আইন প্রণয়ন করিয়া ওয়ের-হাউস স্থাপন করিবার লাইসেন্স উপযুক্ত, উদ্যমশীল ও সঙ্গতিপন্ন লোকদিগকে দিবার বন্দোবস্ত করা একান্ত দরকার হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সব অভিজ্ঞ আড়তদার এই কাজ করিতেছে তাহারাও যাহাতে লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া আইন অনুসারে কাজ করে তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এই ভাবে তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে ওয়ের-হাউস স্থাপনে উৎসাহী হইবে। অবশ্য যে সব স্থানে ব্যক্তিবিশেষের উদ্যমে ওয়ের-হাউস স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা যাইবে না সেই সব স্থানে কৃষকদের পক্ষে মূলধন সরবরাহ করিয়া এবং কো-অপারেটিভ ফাইনেন্সিং এজেন্সির নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইয়া কো-অপারেটিভ ওয়ের-হাউস স্থাপন করিবার ব্যবস্থাও আইনে থাকিবে। কিন্তু qualified graders এবং ওজনকারী না থাকিলে ওয়ের-হাউসের কাজ ভালমতে চলিবে না। তাই গভর্ণমেণ্টকে এই আইন কার্য্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের গ্রেডিং ও ওজন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষাদান করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ওয়ের-হাউসের পক্ষে পাশ-করা গ্রেডার ওজনকারী নিযুক্ত করিবার বিধান আইনে থাকিবে।

বিক্রয় সমিতি এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওয়ের-হাউসের ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সময়সাপেক্ষ। কিন্তু বেরার কটন মার্কেট য়্যাক্টের ন্যায় বাংলায়ও একটি উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া বিধিনির্দ্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপনের বন্দোবস্ত করিলে পণ্য-বিক্রয় সম্পর্কে বর্ত্তমান নিদারুণ অব্যবস্থার কতক উন্নতি শীঘ্রই হইতে পারে। পাট কৃষকের প্রধান অর্থকরী শস্য এবং পাট ব্যবসায়ের বড় বড় কেন্দ্রগুলি সংখ্যায় একশতের অধিক নহে। এই সব কেন্দ্রে এক একটি সুনিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করিলে কৃষকের অনেক অসুবিধার লাঘব হইবে। প্রত্যেক সুনিয়ন্ত্রিত বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা লইয়া একটি মার্কেট সমিতি গঠিত হইবে। এই সব নিয়ন্ত্রিত বাজারে ক্রেতাদের নাম রেজিষ্টারী করা থাকিবে, দালাল ও ফড়িয়া-দিগকে লাইসেন্স লইয়া কাজ করিতে হইবে এবং তাহারা বাঁধাধরা হারে কমিশন পাইবে। প্রত্যেকের ওজন ও পরিমাপ করিবার সরঞ্জামগুলি ঠিক আছে কি না তাহা মার্কেট কমিটি পরীক্ষা করিয়া সার্টিফাই না করিলে তাহা ব্যবহার করা চলিবে না। মার্কেট কমিটি আবার পণ্যের মূল্য, বাজারের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি কৃষকদিগকে সরবরাহ করিবে।

ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, বাংলার গভর্ণমেণ্ট পাটের বিক্রয়ের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত মার্কেট স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং এইজন্য বাজেটে অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত মার্কেটের সুবিধা যাহাতে অধিকসংখ্যক কৃষক পায় সেই জন্য যানবাহন ও গমনাগমনের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। বেরারে সুনিয়ন্ত্রিত মার্কেটে পণ্য-বিক্রয় করিয়া অনেক অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য কৃষকদিগকে ১৫।২০ মাইল দূর হইতেও পণ্য আনিয়া বিক্রয় করিতে দেখা যায়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বাংলার গভর্ণমেণ্ট যে পথ ঘাটের উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। যান বাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যাদি স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে নৌকা, গো যান, অশ্ব ইত্যাদির ব্যবহার ব্যতীত মোটর লরির ব্যবহারও প্রসার লাভ করিলে সুনিয়ন্ত্রিত মার্কেট প্রচুরতম কৃষকের প্রভূততম কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

মানুষ যখন যায়—

মণি বাগচি

রিক্সা টানে। এমনি রিক্সা তার বাবাও টান্‌তো।

ভগবান বুদ্ধের দেশ—তবু দু'পুরুষ ধরে তারা রিক্সা টেনে আসছে। কলম্বো সহরের উপকণ্ঠ থেকে যে রাস্তাটা বেরিয়েছে সেটা বরাবর সমুদ্রের ধার দিয়ে গিয়ে একটা নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে—সেখানে গাছের মাথায় মাথায় পাতার ঝালর, তার ওপর রোদ পড়েছে—আর নীচে ঝিলিমিলি আলো-ছায়ার মধ্যে এখানে-ওখানে ছড়ানো সিংহলীদের খানকতক কুঁড়ে ঘর। সেই সব কুঁড়ে ঘরের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, সেটা অতিক্রম করে স্থির জল দিনের প্রখর আলোয় সোনার আয়নার মত চক্ চক্ করে। এই কুঁড়েঘরের অধিবাসী সকলেই রিক্সা টানে। সহর বা সভ্যতা—দু'টোর একটারও এরা ধার ধারে না।

সাত নম্বর কুঁড়ে ঘরের বাসিন্দা একজন তরুণ সিংহলী। তার বাপের রিক্সা-টানা চিরদিনের মত সাঙ্গ হলে, সে তার রিক্সার তক্‌মাটি উত্তরাধিকারসূত্রে এবং একটু গর্ব্বভরে নিজের হাতে পরলো। তাদের গাড়ীর নম্বর ছিল সাত। সাত নম্বর রিক্সার লোক ব'লেই এখন থেকে তার পরিচয়। রিক্সার তক্‌মাটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে বুড়ো বাপের কথাই তার কেবল মনে পড়ে। এই রিক্সা টান্‌তে টান্‌তেই তার বাবা মরেছে।

সওয়ারীর চাবুকের আঘাতে বুড়োর পিঠের ডানার হাড় দু'খানা কোঁড়া হয়েই থাকে। বয়স হয়েছে, ছুটতে আর পারেনা, আগের মত বলিষ্ঠ হাতে রিক্সার কম্পাসও ধরতে পারেনা। তবু যে সুখ তার ভাগ্যে হয়নি, সেই সুখ যাতে তার ছেলে পায়, এই জন্যেই সে এত কষ্ট সয়। তাই, তার গাড়ীতে বসে যখন কোনো আরোহী রৌদ্রদগ্ধ সহরের ভিতরকার লাল পাথর-বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে, পথে ছড়ানো ঝরাফুলের সৌরভের মধ্য দিয়ে আরামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে, তখন বৃদ্ধের একমাত্র সান্ত্বনা থাকে যে তার ছেলে সুখী হবে। ছুটতে ছুটতে সে খুব হাঁপায়, আর জীর্ণ বুকের পাঁজরের ভেতর থেকে বাঁশীর মত আওয়াজ শোনা যায়—শ্রান্ত বৃদ্ধ পথের ধারে কম্পাস নামিয়ে একটু জিরেন নেবার চেষ্টা করে। সওয়ারীর চাবুকে বেচারা আবার লাগাম মুখে দেয়।

এম্‌নিভাবে রিক্সা টান্‌তে টান্‌তে বুড়ো একদিন মরে' গেল। ছেলে তখন বাড়ী ছিলনা। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় সে গিয়েছিল তার পাশের গাঁয়ের প্রণয়িনীর কাছে,—যার বয়স মাত্র তেরো বছর, মুখখানি বেশ গোল। বাপের মৃত্যুর খবরটা পেয়ে প্রথমটা সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যে এমন হবে তা সে কখনও কল্পনাও করেনি। তবু ওর মনে এখন যে নবীন প্রেম জেগে উঠেছে সেটা বোধ হয় পিতৃ-প্রেমের চেয়েও বলবান। বাড়ী ফিরে এসে সে দেখ্‌তে পেলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে তার বুড়ো বাপের প্রাণহীন দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বীভৎস মুখে মৃত্যুকাতরতার চিহ্ন। আর তার বুড়ো মা দরজার একপাশে উনুনের ধারে বসে কাঁদ্‌ছে।

ঘর থেকে বাইরে এল ছেলেটি। অন্ধকার রাত। সমুদ্রে বাতাসের চাঞ্চল্য। বাদুড়গুলো গাছতলা দিয়ে উড়ে গিয়ে আপন আপন রাত্রির আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছে। জমাট অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য জোনাকীর আলো। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে আর পাতার মর্মরে একটা রহস্যের আভাস। দূরের ভাঙা মন্দিরে মিট্‌মিট্ করে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলছে। ভেতরের বেদীতলে নৈবেদ্যর চাল আর ঝরা ফুলের পাপ্‌ড়ি এখানে ওখানে ছড়ানো। কালো পাথরের বেদীর ওপর ঘুণ-ধরা চন্দন কাঠে তৈরী ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি। দূর সমুদ্রের কল্লোলে জন্ম-মৃত্যু-বিধাতার অস্ফুট জয়গান উঠ্‌ছে।

নগর-প্রান্তে বনের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিক্সাওয়ালার ছেলেটা শুধু একবার ভাব্‌লো: মানুষ যখন যায়, তখন কি কিছু হয়?'

রিক্সা টানে। তার বাবা যেমন করে টান্‌তো। রোজগার হয় মন্দ নয়। জোয়ান চেহারা, তরুণ মন, খাট্‌তেও পারে বেশ। রিক্সাওয়ালারা যখন সার বেঁধে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে, তার ভেতর থেকে সাত নম্বর রিক্সাওয়ালাটাকে সকলের আগে চোখে পড়ে। বিদেশী পর্য্যটককে কোথায় কোথায় ঘোরাতে হয়, ইংরেজী কোন কথার কি মানে, কোন রাস্তার কি নাম—এ সব এখন তার কায়দাদুরস্ত হয়ে গিয়েছে। তার ওপর এখন তার প্রণয়ের পাত্র জুটেছে, তাকে নিয়ে সে এখন মনের মত সংসার পাত্‌তে চায়। কাজেই রোজগার যাতে বেশী হয়, সেইদিকে সে তার সমস্ত উদ্যম ও শক্তি নিয়োগ করে।

একদিন। সূর্য্য সমুদ্রের পশ্চিম দিগন্তে মেঘের কোলে কোলে লাল আর ধূসর আর সোনালি দেওয়া অপূর্ব্ব বর্ণ-বিন্যাস রচনা করে অস্ত গেল। একটু সকাল সকাল সে বাড়ী ফিরেছে। বাড়ীতে এসে এক নতুন দুঃসংবাদ শুন্‌লো। তার ভাবী বধূটি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। দাস-উপদ্বীপের বাজারে গিয়েছিল কি কিন্‌তে, তার পর থেকে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাগ্‌দত্তা মেয়েটির বাপ কলম্বো সহরের পথঘাট ভাল চেনে, প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করে থাকে। তিন দিন ধরে সে মেয়েটিকে খুঁজে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এল: বোধ হলো নিশ্চয়ই কিছু

সে সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু কোনো কথাই সে ভাঙ্‌লনা, কেবল একটু দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌লে, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে।

লোকটা ভয়ানক শঠ। যাদের অনেক পয়সা থাকে, সহরে গিয়ে ব্যবসা করে তারা যেরকম ধূর্ত্ত হয়, এ বুড়োও সে রকমের ধূর্ত্ত। তার শরীরটা বেজায় মাংসল, বুকের মাংস স্ত্রীলোকের মত ঝুলে প'ড়েছে; পাকা চুলে সযত্নে সিঁথি কাটা, তাতে দামী একটা চিরুণী গোঁজা। খালি পায়ে চলে, কিন্তু মাথায় ছাতা দেয়; রঙীন কাপড়ের লুঙ্গী পরে, কিন্তু হাঁসিয়া দেওয়া জামা গায়ে দেয়। তার পেট থেকে কথা বের করা বড় কঠিন।

রিক্সওয়ালা যুবক সব কথাই বুঝ্‌তে পারলো। তার বাবা তাকে একদিন বলেছিল—মেয়েমানুষ মাত্রেই চঞ্চলমতি—বিশেষ যদি অবিবাহিত হয়—নদী যেমন ক্রমাগত এঁকে বেঁকে চলে, কুমারী মেয়েদের চরিত্র ঠিক সেই রকম। তবু বিভ্রমের ঘোরে সে প্রথম দু'দিন ঘরে চুপ করে ব'সে রইলো; ভাত পর্য্যন্ত খেলে না।

তারপর নিজেকে সে সাম্‌লে নিলো। আবার সহরে গাড়ী টান্‌তে চলে গেল। ভুলেই গেল সে তার ভাবী বধূর কথা। রিক্সা নিয়ে তেমনি জোরেই সে ছোটে, কৃপণের মত পয়সাও বাঁচায়। দেখে বুঝবার উপায় নেই সে ছুটতে ভালবাসে—না টাকাই তার কাছে প্রিয়।

এমনিভাবে কেটে গেল ছ'মাস।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে হাতের তক্‌মাটা বেশ করে মেজেঘসে চক্‌চকে করে, তারপর সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে একটা পান মুখে দিয়ে সে চলে যায় সহরের দিকে। রিক্সাটা ধুয়ে মুছে, ভেতরের গদিটি ঝেড়ে এমন পরিষ্কার রাখে যে তার রিক্সাখানাই সকলের আগে সওয়ারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রণয়িনীকে সে যেমন ভালবাসত, ঠিক তেমনিভাবেই বোধ করি যুবক তার এই রিক্সাখানাকে ভালবাসে। কত সময়ে কত দেশের নাবিক এই তরুণ সিংহলী রিক্সাওয়ালার গাড়ীতে বসে তাকে সঙ্গে নিয়ে ফটো তুলেছে। তার দু'একখানা তারা উপহার হিসেবে তাকে দিয়েও গিয়েছে। গাড়ীর কম্পাস দু'টো ধরে দাঁড়িয়ে যেন সে কল্পিত দশকদের দিকে চেয়ে আছে—ঐ ধরণের একখানা ফটো সে যত্ন করে বাঁধিয়ে রেখেছে—এটা একজন রুশীর নাবিকের দেওয়া স্মৃতিচিহ্ন।

প্রশস্ত রাজপথের এক স্থানে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ। এই গাছটার তলায় আর সব রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে সে একদিন বসে আছে। গাড়ীর কম্পাসগুলো লাল মাটির ওপর বসানো। যায়গাটার আশেপাশে ছোট ছোট বাগান। বাগানের নানা রকম ফুলের আর পাকাকলার সুমিষ্ট গন্ধও একসঙ্গে ভেসে আসছে। সূর্য্যের তাত আস্তে আস্তে বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীগুলো তেতে গরম হয়ে উঠ্‌ছে। রিক্সাওয়ালারা গাছের নীচের যেদিকটা ছায়া, সেখানে বসে পাকা কলা খাচ্ছে। কলার ওপরকার সোনালি রঙের নরম খোসাগুলো একটী একটী করে ছাড়িয়ে ফেলছে, আর তার ভেতরটা দেখা যাচ্ছে কচি ছেলের শরীরের মত নিটোল সুন্দর। খেতে খেতে তারা পরস্পরে আপন মনে গল্প করছে। আমাদের 'সাত নম্বর' একধারে চুপ করে বসে আছে।

হঠাৎ দেখা গেল, অনেক দূরের একটা সাদা বাংলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে সাদা পোষাক-পরা একটী লোক আলো-ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে—তাদেরই দিকে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে লোকটা হাঁটছে, তার দৃঢ় পদক্ষেপ দেখ্‌লেই বেশ চেনা যায়,—ইউরোপীয় ছাড়া আর কেউ এমন উন্নত ভঙ্গীতে হাঁটতে পারে না। উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে সওয়ারী দেখ্‌তে পেয়ে। একসঙ্গে সবাই লাফিয়ে উঠে তখুনি সেইদিকে ছুটলো তীরবেগে—সকলেই চায় আগে তার কাছে উপস্থিত হতে। কাছে গিয়ে চারদিক থেকে তারা সাহেবকে ঘিরে ধরলো। সাহেব বেত উঁচিয়ে এক ধমকে তাদের উত্তেজনা শান্ত ক'রে দিলে। ভয়ে তারা একেবারে স্থির হ'যে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ীর কম্পাস ধরে। সাহেব বেছে বেছে সাত নম্বরের কালো রিক্সাওয়ালাটাকেই পছন্দ করে নিলে।

তার দিকে এবার তাকালো সিংহলী যুবক। দেখ্‌লে—সাহেবটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর কিছু বেঁটে, চোখে সোনার চশমা, কালো ভ্রূ দুটি জোড়া, গোঁফ ছোট করে ছাঁটা, গায়ের রঙ্‌ ঝলসানো লাল; কলম্বোর প্রখর রোদে আর লিভারের দোষে সাহেবের মুখখানা যেন তাবাটে হয়ে গিয়েছে। মাথার টুপিটার খাকী রঙ্‌; কালো ভ্রূ আর কালো পল্লবের ভেতর থেকে চোখ দু'টো চশমার পুরু কাচের মধ্য দিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে চাইতে থাকে যেন কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছেনা। কোন দর-দস্তুর না করেই সে রিক্সাতে চেপে বস্‌লো; সাহেবলোক কখনো দর করেনা তরুণ রিক্সাওয়ালা ভাব্‌লে। গাড়ীতে চ'ড়ে অভ্যস্তের মত সে এমনভাবে হেলান দিয়ে বস্‌লো যাতে রিক্সাওয়ালার টান্‌তে সুবিধে হয়; কব্জিতে বাঁধা চামড়ার ব্যাণ্ডের মধ্যে ছোট ঘড়িটার দিকে চেয়ে সময়টা একবার দেখে নিলো; তারপর হাঁক্‌লে — 'ইয়র্ক ষ্ট্রীট'!

সঙ্গে সঙ্গে সিংহলী যুবকের বলিষ্ঠ হাত দু'খানা কম্পাস দুটো তুলে ধরলো। তার পেশীবহুল দুই পায়ে এল মত্ততা, গাড়ীর দুই চাকায় এল মসৃণ গতি। ঠুন্‌-ঠুন্‌-ঠুন্‌—কম্পাসের একধারে বাঁধা ঘণ্টাটি অনবরত বাজ্‌ছে। রিক্সা চলেছে রাস্তার লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে, অসংখ্য গরুর গাড়ী আর রিক্সা গাড়ীর ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে নিপুণভাবে পাশ কাটিয়ে সে পথ করে যেতে লাগ্‌লো।

তখন গরম কাল। আর এই সময়টাই সকলের চেয়ে গরম। এখনও তিন ঘণ্টা হয়নি সূর্য্য উঠেছে, এর মধ্যেই রোদের তেজ এমন প্রখর আর বাজারে এত লোক জমেছে যে, মনে হয় প্রায় ভরা দুপুর। বড় বড় গাছের অনেক ডালপালা রাস্তার ধারের বাংলোগুলির ওপর নুয়ে পড়েছে, কত বাড়ীর মাথায় মাথায় ঝরা ফুল আর শুক্‌নো পাতা ছড়িয়ে গিয়েছে, —চারদিক্‌কার গাছ থেকে, বাগান থেকে, মাটি থেকে যেন তপ্ত নিঃশ্বাস উঠে আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেছে। কালো টালির ছাউনি দেওয়া সারি সারি দোকান ঘর, ভেতরে দেখা যায় দেয়ালের গায়ে বড় বড় সবুজ

কলার কাঁদি ঝুলছে, কত সমুদ্রের মাছ শুকিয়ে টাঙানো আছে। দেশী খদ্দেরের ভীড় সেই সব দোকানের চারদিকে।

ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্—রিক্সাওয়ালা বেদম্ ছুটেছে। এখনও শরীরে তার ঘাম দেখা দেয়নি; তেল মাখানো পিঠের চামড়া চক্‌চক্ করছে, কাঁধের ওপর থেকে সরু গলাটি গতির তালে তালে সুঠাম ভঙ্গীতে নেচে উঠছে, মাথার কালো চুলে রোদের আলো ঝিক্‌মিক্ করে। রাস্তার ধুলোর মতই সময়-কণাদের গুঁড়িয়ে দিয়ে তার গাড়ীর চাকা দুটো ছুটে চলেছে। গাড়ীর ভেতর বসে আছে সাহেবটি, চোখে তার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি।

রাস্তাটা যেখানে শেষ হলো সেখানে পৌঁছে রিক্সাওয়ালাটা হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ালো, ঘাড় ফিরিয়ে নিজের ভাষায় অস্ফুট স্বরে কি একটা কথা বললে। আরোহী ইংরাজ ভদ্রলোকটি তার মুখ দেখতে পেলো—একটা কথা মাত্র কানে এল—"পান"। পরমুহূর্ত্তেই রাস্তার ধারের একটা পানের দোকানের সামনে গাড়ী নিয়ে সে হাজির হলো। এক মিনিট পরেই হাতে একটা পান নিয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে এল, তাতে একটু চূণ লাগালে, এক কুচি সুপুরি দিয়ে সেটা মুড়ে ফেললে। পেটে কিছু না থাক্, মুখে পান থাকলেই সিংহলীরা খুসী। পানটা মুখে ভরে রিক্সাওয়ালার স্ফূর্ত্তি দেখা দিলো, হাসি মুখে কম্পাস তুলে নিয়ে আবার সে ছুটতে সুরু করে।

তখন রোদের ভীষণ ঝাঁঝ; ইংরেজ ভদ্রলোক যতবার মুখ তুলছে ততবার তার চশমার কাচ আর সোনার ফ্রেমে সূর্য্যের আলো ঠিক্‌রে পড়ছে, তাপ লেগে তার হাত পা যেন ঝলসে যাচ্ছে। ধরিত্রী যেন এখন গাঢ়, তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে। মনে হলো রাস্তার বুকে আগুনের লেলিহান শিখা—তার ওপর দিয়ে বেদম্ ছুটে চলেছে রিক্সাওয়ালা। ভেতরে ভদ্রলোক নিশ্চল হয়ে বসে আছে, গাড়ীর হুড্‌টাও মাথার ওপর টেনে দিতে বলছে না।

কেল্লার দিকে যাবার দুটো রাস্তা; একটা রাস্তা গিয়েছে ডান দিকে প্যাগোডা পার হয়ে, আর একটা গিয়েছে বাঁ দিকে সমুদ্রের ধারে ধারে। সওয়ারী চেয়েছিলো বাঁদিকের রাস্তা; রিক্সাওয়ালা ধরলো ডান দিকের রাস্তা। সাহেব তাতেই সায় দিলো।

কেল্লার কাছাকাছি রিক্সা এসে দাঁড়ালো। সাহেব একটা চায়ের দোকানের নাম উল্লেখ করে হুকুম দিলে—"চল প্যাগোডাতে"।

আবার রিক্সা ছোটে। তার দুই পায়ের গতি এখন আর সতেজ নয়, গাড়ীর চাকায় জড়িয়ে এসেছে একটা শ্লথ ভাব। রাস্তার ডান দিকে একটা খাল; তার সবুজ জল টল্ টল্ করছে, তাতে কেবল কচ্ছপ আর পচা পানা, খালের অপর পারে নারিকেল গাছের সারি। বাঁধের ওপরের রাস্তায় নানা পথিকের ভিড়। খাল পার হয়ে কিছুক্ষণ বাদে রিক্সা এসে থাম্‌লো একটা পুরোণো ডাচ্ ফ্যাসানের বাড়ীর ফটকের সামনে। সাহেব একবার ঘড়িটা দেখে নেমে গেল, সেখানে বসে কিছুক্ষণ চা-চুরুট খাবে। রিক্সাওয়ালা গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার ওপাশে এক ছায়া-নিবিড় গাছের তলায় রেখে ব'সে পড়লো; সেখানে বাঁধানো ফুটপাথের ওপর হল্‌দে আর লাল রঙের ঝরা ফুলে সমস্ত গাছতলা ছেয়ে গিয়েছে। সে সেখানে কিছুক্ষণ উবু হয়ে বসে হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে এই মধ্যাহ্নের তপ্ত সৌরভ উপভোগ করতে লাগলো। পরে কোমর থেকে গামছা খুলে নিয়ে সে মুখ মুছলে, ঠোঁট মুছলে, বুকের পিঠের ঘাম মুছে ফেললে, তারপর সেটা মাথায় জড়ালে।

আনন্দ বলেছিলেন একদিন ভগবান বুদ্ধকে—"প্রভু! আমাদের পরস্পরের শরীর পৃথক, কিন্তু হৃদয় ত সকলেরই এক।" অতএব যে যুবক কলম্বো সহরের কাছে মানুষ হয়েছে, আর সবচেয়ে তীব্র বিষ রমণী-প্রেমও একবার আস্বাদ করেছে—আকাঙ্ক্ষাময় যে জীবন আবেগভরে সুখের পেছনে নিত্য ছুটে যায় আর দুঃখ থেকে দূরে পালায়, সেই জীবন-স্রোতে যে একবার ঝাঁপ দিয়েছে—তার মনের চিন্তাধারা এখন কি হতে পারে সে কথা অনুমান করা বিশেষ কঠিন নয়। রুদ্র তাকে এরি মধ্যে তীব্র আঘাত দিয়ে গেছে, কিন্তু সেই রুদ্র, আবার ক্ষতকেও আরোগ্য করে দেয়। মানুষ সেটাকে আঁকড়ে ধরে, রুদ্র তার হাত থেকে সেটাকে ছিনিয়ে নেয়—কিন্তু আবার সেটাকেই সে নতুন করে আঁকড়ে ধরতে বলে, নয়তো নতুন কিছুকে ধরবার জন্য প্রলুব্ধ করে।...এমনি কত কথাই হয়তো রিক্সাওয়ালা সেখানে বসে বসে ভাবছিল।

হঠাৎ তার চমক ভাংলো সাহেবের ডাকে। বেলা বারটা বেজে গিয়েছে তখন। সাহেব তাকে খাবার কিনে খেতে একটা টাকা বখ্‌শিশ দিয়ে সামনের মস্ত একটা জাহাজের আফিসে ঢুকে গেল। খাবার সে খেলোনা; সেই টাকা থেকে কিনলে কতকগুলো সস্তা সিগারেট। তারই একটার পর একটা ক্রমাগত ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগলো—এমনি করে সে পাঁচটা সিগারেট একে একে শেষ করলো। তারপর কিছুক্ষণ পথের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ালো। দোকানে কত রকমারি জিনিষ সাজানো—মণিমুক্তা, কাঠের বুদ্ধমূর্ত্তি, কাঠের কাজ-করা নানা রকমের হাতী, সোনালি রঙের ওপর ডোরাকাটা বাঘের চামড়া—ঘুরে ঘুরে সে এ দোকানে সে দোকানে এইসব দেখে বেড়াতে লাগলো আর নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতে আবার সেই আগের যায়গাটিতে এসে বসলো। এইবার সে সামনের একটা দোকান থেকে পান কিনে খেলো, আবার সিগারেট কিনলো, আগের মতই আবার পাঁচটা সিগারেট শেষ করলো। ফুটপাথের গাছের ছায়ার তলায় বসে সে ধোঁয়ার নেশায় মশগুল্ হয়ে আছে—এমন সময় চোখ তুলে হঠাৎ দেখতে পেলে তারি সুমুখ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একদল সিংহলী মেয়ে। এই সাহেব পাড়ায় অনেক মেয়েই অনেক লাভের আশায় ও লোভের দুরাশায় ঘুরতে আসে।

মেয়েদের দিকে চাইতে চাইতে তার মনে পড়ে আর একখানা এমনি ধরণের মুখ। যে বধূটি তার হারিয়ে গেছে সে কি এদের চেয়ে দেখতে খারাপ ছিল? এই সিংহলের সূর্য্যতাপে সে বেড়ে উঠেছিল। তার রঙ ছিল কালো, নীল ফুল-কাটা সাদা কাপড়ের কাঁচুলি বুকে দিয়ে তাকে আরও কালো দেখাতো, আর ঘাঘরাটাও ছিল ঐ কাপড়ের। এদের চেয়ে দেখতে ছোট হলেও দেহ-সৌষ্ঠব যথেষ্টই ছিল তার। মাথাটি তার ছোট। কপালটি গোল—ভীরু চোখ-দুটিতে শিশুর মত অদম্য কৌতুহল জেগে নিত্য উজ্জ্বল হয়ে থাকতো। তার কটাক্ষে ছিল নারী-সুলভ প্রচ্ছন্ন

লাস্য-জড়িত অপূর্ব্ব কোমলতা, গলায় ছিল নকল মুক্তোর কণ্ঠী, পায়ে রূপোর মল, হাতে পৈছা…'

লাফ দিয়ে উঠে রিক্সাওয়ালা পাশের গলির ভেতর ছুটে গেল; সেখানে পুরাণো একতলা বাড়ীর এক পাশে টালি-ছাওয়া এক কাঠের ঘরের মধ্যে গরীবদের জন্যে একটা মদের দোকান—রিক্সাওয়ালা পঁচিশটা পয়সা ফেলে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে পুরো এক গ্লাস মদ খেয়ে নিলো। একেত এই আগুন খেয়েছে, তার ওপর পান তো আছেই—এখন থেকে অন্ততঃ সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মনটা বেশ ফুর্ত্তিতেই থাক্‌বে—রিক্সাওয়ালা এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ফিরে এসে তার গাড়ীর পাশেই বস্‌লো।

কতক্ষণ সে চুপটি করে বসেছিল হুঁস নেই। তার সওয়ারীর ডাকে সে আবার তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। চুরুট মুখে সাহেব দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দু'টো ঢুল্ ঢুল্, মুখটা অসম্ভব লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। তার বুঝতে দেরী হলোনা যে সাহেব এখন আর সে সাহেব নেই। টল্‌তে টল্‌তে গাড়ীর গদীতে বসে সাহেব হুকুম দেয়—'পোষ্ট অফিসে যাও'। সেখানে গিয়ে চিঠির বাক্সে তিনখানা কার্ড ফেল্‌লে; পোষ্ট আফিস থেকে গেল গর্ডন বাগানে. সেখানে গিয়ে কিন্তু ভেতরে ঢুক্‌ল না, গাড়ীতে বসেই কিছুক্ষণ মনুমেণ্ট ও অন্যান্য ষ্ট্যাচু চেয়ে দেখ্‌লে.; সেখান থেকে ফিরে সহরের এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগল,—ব্ল্যাক টাউন, ব্ল্যাক টাউনের বাজার, কল্যাণী নদী……যেমন মাতাল রিক্সাওয়ালা তেমনি তার সওয়ারী। আপন মনে সে সাহেবকে চরকির মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে; তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ঘেমে নেয়ে উঠ্‌লো;—মদ আর পান খেয়ে সে তখন ভীষণ উত্তেজিত, অনেক পয়সা পাবে এই আশায় উৎফুল্ল, আর এমন সব স্বপ্নেতে সে বিভোর যা এই মত্ত অবস্থায় মানুষকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

পড়ন্ত রোদের গুমোটে অসহ্য অপরাহ্ণ। বেহুঁস সাহেব গদীর ওপর কাৎ হয়ে পড়েছে। নিরুপায় রিক্সাওয়ালা তাকে অবিশ্রান্ত এ পাড়ায় সে পাড়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে চল্‌লো। কলম্বোর পুরোণো সহর যেমন নোংরা তেমনি বিশ্রী। পথের ধূলো আবর্জ্জনার ভেতর দিয়ে এমন বেগে রিক্সাওয়ালা ছুটছে, যেন কেউ তাদের পিছু নিয়েছে। শেষে কল্যাণী নদীর তীরে গিয়ে তারা পৌছালো; শীর্ণা নদী; জল রোদে উত্তপ্ত হয়ে আছে, দুই তীরের ঘন তালপাতার ঝোপে তার অনেকখানি ঢাকা। পড়ন্ত রোদে নদীর জলে সোনার রঙ্ ধরেছে, তার ওপর কত নৌকো ভাস্‌ছে।

গাড়ীর কম্পাস দু'টো মাটিতে ঠেক্‌তেই সাহেবের হুঁস হয়। চারদিক একবার সে চেয়ে দেখে। মুখের আধপোড়া চুরুটটি অনেক আগেই নিভে গিয়েছিল, পকেট থেকে দেশলাই বার করে সেটা আবার ধরিয়ে নিলো। আর একটা চুরুট বের করে রিক্সাওয়ালার দিকে ছুঁড়ে দিলো। মিনিট পনেরো বাদে সে হুকুম দিল ফোর্টের দিকে ফিরে যেতে। এখানে এসে এক সেলুনে গিয়ে সাহেব তার 'সেভ্' সেরে নিলো। তারপর—আর সে ছুটতে পারে না কিছুতেই। ঘেমে নেয়ে উঠেছে, রুক্ষমূর্ত্তি, ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চোখ দিয়ে থেকে থেকে সে সাহেবটার দিকে চাইছে। ছটা বেজে গেলে, লাইট-হাউস্ পার হয়ে একেবারে সমুদ্রতীরে ফাঁকা জায়গায় এসে সে যেন একটু মুক্তি বোধ করলো। দিগন্ত-প্রসারী সূর্য্যের আলো জলের ওপর পড়ে ইস্পাতের মত ঝক্ ঝক্ করছে, তার মাঝে মাঝে যেন সোনার গুঁড়ো ছড়ানো;

এই সময়টা অনেকে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্তের বিরাট সমারোহ উপভোগ করে, এমন জিনিষ সাহেবরা নিজের দেশে দেখ্‌তে পায় না। ভাব্‌লে—সাহেব নিশ্চয়ই এবার থাম্‌তে বল্‌বে। সাহেব এতক্ষণ বিমনা হয়ে পশ্চিম দিকে চেয়ে সমুদ্রের তটভূমিতে ঢেউ-ভাঙা ফেণার বৈচিত্র্য দেখ্‌ছিল। রিক্সাওয়ালা সাহেবের এই অলস তন্ময়তা লক্ষ্য করে রিক্সার গতি একটু শ্লথ করতেই, সাহেব নিজ্জীবের মত বল্‌লে—'কার্লটন্ হোটেল'।…

দাঁতে দাঁত চেপে রিক্সাওয়ালা আবার ছুটলো। যে লোকটা ওকে এত খাটাচ্ছে, সুবিধে পেলে তাকে এখন সে চিবিয়ে খেতে পারে, কিন্তু তবু না ছুটেও উপায় নেই। হোটেলের কাছাকাছি এসে সাহেব ছড়িটা দিয়ে ইঙ্গিতে পাশের একটা দোতলা বাংলো দেখিয়ে দিলো। বাংলোর উঠোনে ঢুকে রিক্সাওয়ালা এবার সত্যিই আধঘণ্টা বিশ্রাম পেলে, সাহেব ততক্ষণ ভেতরে পোষাক বদলাতে গেল। ওর বুকের ভেতর তখন হাতুড়ি পিটছে, ঠোঁট শুকিয়ে মুখখানা সরু হয়ে গিয়েছে, বলিষ্ঠ পা দুখানার অস্তিত্ব আর বোধ হয় না।

সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। এক বৃদ্ধা ইংরাজ মহিলা ঐ বাংলোর বারান্দায় একটা দোলা চেয়ারে বসে সন্ধ্যার আলোটুকুতে একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ছে। মহিলাটিকে রাস্তা থেকে দেখ্‌তে পেয়ে এক শীণকায় হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ উঠানের এসে ঢুক্‌লো; তার চেহারাটা লম্বা, বাব্‌রি কাটা পাকা চুল বুকে পিঠে ঝুলে পড়েছে, মাথায় একটা ছেঁড়া পাগড়ী, গায়ে ঝল্‌সে-যাওয়া লাল রঙের আংরাখা—তার ওপর হল্‌দে ডোরাকাটা হাতে একটা ঢাকনি বাঁধা বাঁশের চুবড়ী। লোকটা বোবা, নিঃশব্দে বারান্দার কাছে এগিয়ে এসে মাথা নীচু করে কপালে হাত ঠেকিয়ে সে সেলাম করলে, তারপর সেইখানেই বসে পড়ে চুবড়ির ডালা খুল্‌তে লাগলো। মহিলাটি তার দিকে না চেয়েই, হাত নেড়ে তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সে তার ডালা খুলে কোমর থেকে একটা বাঁশের বাঁশী বের করে বাজাতে সুরু করেছে। এই দেখেই রিক্সাওয়ালা লাফিয়ে উঠে একেবারে যেন আগুন হয়ে ধম্‌কে তাকে তেড়ে এলো। বুড়োটা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ডালাটা বন্ধ করে সেখান থেকে ছুট্ দিলো।

বুড়োটা চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সিংহলী যুবকের চোখ দু'টো জ্বল্‌তে লাগ্‌লো—তার মনে হতে লাগলো—এখনও যেন সেই ভয়ানক সাপটা ডালার ভেতর থেকে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার চকচকে গলা থেকে নীল রঙের আভা বেরুচ্ছে, সরু জিভ্‌টা লিক্‌লিক করে বেরিয়ে পড়ছে, আর তার ক্ষুদ্র চোখ দু'টো অসম্ভব ভাবেই জ্বল্ জ্বল্ করছে। রিক্সাওয়ালার দৃষ্টিকে সমগ্রভাবে আচ্ছন্ন করে রইলো একটা সরীসৃপ।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সাহেব যখন অন্য একটা ফর্সা পোষাকে

সেজে বেরিয়ে এলো, রিক্সাওয়ালা তাড়াতাড়ি গাড়ীর কম্পাস তুলে ধরলো। ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্—কিন্তু গাড়ী চলে কৈ? সাহেবের ডিনারে যাবার তাড়া, ছড়িটা দিয়ে রিক্সাওয়ালার পিঠ স্পর্শ করতেই সে তখন কম্পাস ফেলে দিলো। তার চোখের দৃষ্টি সেই বাংলোর ওপরের বারান্দার এক কোণে যেন সহসা আটকে গেল। হঠাৎ সে এমন চমকে উঠলো। যেন কেউ তার মাথায় আচম্‌কা এক ঘা লাঠি মারলে; দোতলার ওপরকার একটা খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এক সিংহলী মেয়ে।

উজ্জ্বল আলোতে যুবক স্পষ্টই দেখ্‌তে পেলে—লাল সিল্কের জাপানী পোষাক পরা, লাল পাথরের মালা গলায়, গোল হাত দুটিতে মোটা মোটা সোনার বালা, মেয়েটি তারই দিকে মুখ ফিরিয়ে জ্বল্ জ্বল চোখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি আর কেউ নয়, তারই সেই হারানো ভাবী বধূ। এখনও ছ'মাস হয়নি—যে মেয়েটি তার হাঁড়ীতে চাল দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিল, এ ত সেই মেয়ে!

রিক্সা, সওয়ারী সাহেব—সব সে এক মুহূর্ত্তেই ভুলে গেল। জানালার ফ্রেমের মাঝখানে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, সে ওকে দেখ্‌তে পেলনা, ও তাকে দেখেই চিন্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। হাত তুলে মেয়েটি যখন তার মাথার চুলগুলো একবার বিন্যস্ত করে দিলো, নিটোল তার বাহু দুটি যুবকের চোখে তখন স্পষ্ট হয়েই দেখা দিল। তারপর মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রিক্সাওয়ালা গাড়ী ফেলে রেখে ছুট্‌তে ছুট্‌তে একেবারে ফটকের বাইরে চলে গেল।

হঠাৎ তার সমস্ত শরীরে এমন মত্ততা, এমন সচেতনতা এল যেন শত অতীত জন্মের পূর্ব্বপুরুষদের সহস্র বাক্-রুদ্ধ কণ্ঠ তার অন্তরের ভেতর এক সঙ্গে নিঃশব্দে সাড়া দিয়ে উঠ্‌লো—"জাগ রে জাগ"! বাইরে এসে সে আরও ছুটতে লাগ্‌লো—এখন সে যে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটেছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে রিক্সাওয়ালাটিকে দেখা গেল সমুদ্রের তীরে ফ্লাগষ্টাফের কাছে। যায়গাটা একেবারে নির্জ্জন। নক্ষত্রের আলোয় রাত্রির অন্ধকারেও অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। সমুদ্রের বুকে অস্পষ্ট মর্ম্মর ধ্বনি। লাইট-হাউসের মাথা থেকে একটা তীব্র সাদা আলোর ছটা তীর্য্যক্ ভাবে তার শরীরের একদিকে এসে পড়েছে। সেই আলোয় দেখা যায় যুবকের হাতে একটা ডালা। বাক্সটা নেহাৎ খালি নয়; ভেতরে যে সামগ্রী আছে তা বেশ নড়াচড়া করছে, ডালার ওপর ধাক্কা দিচ্ছে, ফোঁস ফোঁস শব্দও করছে।

সেই বুড়ো হিন্দুস্থানী সাপুড়েটাকে একটা টাকা দিয়ে তার বদলে রিক্সাওয়ালা চেয়েছিল সকলের চেয়ে তাজা জিনিস, সবচেয়ে যা বিষাক্ত। পেয়ে ছিলও তাই, কি তার সুন্দর রূপ! সমস্ত গায়ে কালো চাকা চাকা দাগ, ধারে ধারে সবুজের একটু আভাস, গোল ফণাটি নীলবর্ণ, তার ওপর মরকত মণির মত উজ্জ্বল রেখাচিহ্ন, লেজটি সূক্ষ্মায়মান, আর আকারে ছোট—কিন্তু ভয়ানক তেজী ও অতিশয় ক্রূর।

রিক্সাওয়ালা ডালার বাঁধনের দড়িটা একটানে খুলে ফেল্‌লে···তারপর কেমন ভাবে কাজটা সে করেছিল সেকথা সঠিক কে জানে? তার হাত একটু কেঁপে গিয়েছিল না একেবারে স্থির ছিল? দড়িটা খোলবার পর যুবক কি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করেছিল? অনেকক্ষণ ধরে সে কি সমুদ্রের দিকে আর আকাশের তারার দিকে চেয়ে বসেছিল? শুধু একবার ডালাটা খুলে ফেলে ধীরভাবে বা হাতটা একেবারে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই কুণ্ডলীকৃত হিম দেহটার ওপর সে রাখলো। তারপর সমুদ্র-কল্লোলের মত একটা শব্দ তার মাথার মধ্যে ঢুক্‌লো, আবার থেমে গেল। পায়ের তলায় মাটি যেন সরে গেল। যুবকের আহত চেতনায় এক নিমেষের জন্যে শুধু ঝিলিক মেরে গেল সেই চিরন্তন প্রশ্ন—মানুষ যখন যায়, তখন কি কিছু হয়?

পান্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ছিনু যা আঁকড়ি' এতদিন ধরি' এবার নিয়াছ কাড়ি,
ওরে মুশাফির, গুটারে এবার হেথাকার পাততাড়ি।
প'ড়ে আছে পথ দিকে দিকে অবারিত
চ'লে যা উধাও যে দিকে অধীর চিত,
ছুটে যেতে চায় বাধা নাহি পায় অধীর আবেগ ভরে
সরল পথের 'পরে।

ফেলে যা এ ঘরে ঝুলি ভিক্ষার যা রয়েছে থাক তাতে,
পথের পাথেয় আপনি সরণি তুলি দিবে তোর হাতে।
নদী জল ধারা যে পথে চলিয়া যায়
মাটি গলে গিয়ে তার বুকে ঠাঁই পায়,
আলো-আঁধারের তরল গুলানি রবে তোর বুক ভরি'
যারে নিজপথ ধরি।

পথের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে উথলিবি তীরে তীরে,
হবে উর্ব্বর ক্ষেত্র উষর তোর প্লাবনের নীরে।
দিবি পলিমাটি মাথায়ে মরুর গায়
খালি বুক তার ভরিবে শ্যামলিমায়
নিজেরে উপাড়ি দিবি যবে পাড়ি ভরিবে সবার বুক
অপরের সুখে ভুলিবি আপন দুখ।

পথিকের বধূ সুনীল নয়নী সুদূরের ঊষারাণী,
আলোক ঝরখা খুলি পূরবের দেয় তোরে হাতছানি।
সায়াহ্নে আসি সন্ধ্যাতারাটি হাতে,
তরল আঁধারে অচল নেত্রপাতে
চেয়ে থাকে বালা কখন পথিক আসিবে দেহলি পরে
চিরবিশ্রাম তরে।

হ'য়ে ওঠা

দিলীপকুমার ও অল্লানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কানপুর ১৬. ৮. ৩৮

শ্রীদিলীপকুমার রায়, পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার সহিত আপনার বাহ্যত কোনো পরিচয় না থাকলেও আপনি আমার অপরিচিত ন'ন। আপনার লেখা প্রায়ই পড়ি ও তা থেকে আলোক পাবার প্রয়াস পাই। আপনাকে দর্শন করবার সৌভাগ্যও বহুবার হয়েছে। আপনারা জনসাধারণের অজানা নন ব'লেই চিঠিতে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে সাহসী হয়েছি। আশা করি ক্রটি নেবেন না। কিছুদিন আগে শ্রীঅরবিন্দের একটি উদ্ধৃতি চোখে পড়েছিল। আপনাকে তিনি লিখেছিলেন: "To me the ultimate value of a man is not to be measured by what he says, nor even by what he does, but by what he becomes."

বড় সুন্দর। স্বতই মনে হ'ল যে মানুষের ঐ পরিমাপই যথার্থ—সত্য। কতবার যে এ নিয়ে ভেবেছি ও অন্তরে এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করেছি বলতে পারি নে। তবু দুএকটা প্রশ্ন ওঠে।

কোনো লোকের শেষ মূল্য—ultimate value—নির্ণয় করতে হ'লে দেখতে হবে সে কী হ'য়ে উঠল—what he becomes: বেশ কথা। কেবল এক্ষেত্রে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—একজন কী হ'য়ে উঠছে বা উঠল তা কী ক'রে বোঝা যাবে? কী উপায়ে জানব সে কোন্ স্তরে রয়েছে? কেবল কি নিছক অনুভূতির আলোতেই এটা দেখা যায়, না কল্পনাকে ডাক দিতে হয়? কিম্বা তার "হ'য়ে-ওঠার"—becomingএর—কোনো বাহ্য প্রকাশ থেকে নিগূঢ় তত্ত্বটি অনুমান ক'রে নিতে হবে? একজন "যা-হ'য়ে-উঠল" তার সঙ্গে কি সে "যা-বলছে" "যা-করছে" তার কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না? এক কথায়, রামশ্যামের কথাবার্তা বা কার্যকলাপ সব বাদ দিয়ে কি তাদের মূল্যনির্ধারণ সম্ভব? অন্তর্দৃষ্টির কথা ছেড়ে দিচ্ছি এই জন্যে—যে সাধারণ মানুষের নেই এ-সম্পদ। তারা কী ক'রে কোন্ সূত্র ধ'রে পৌঁছবে অপরের আত্মরূপান্তরের রহস্যলোকে? ইতি

শ্রীঅল্লানন্দ

*   *   *

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি ২০. ৮. ৩৮

শ্রীঅল্লানন্দ, করকমলেষু

কিছুদিন আগে এক বৎসরের কাছাকাছি হবে—মহাপ্রাণ জহরলাল নেহরুর সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধটি ভারতবর্ষে লিখি আপনি নিশ্চয় তাতেই শ্রীঅরবিন্দর ঐ উক্তিটি পড়েছেন যে: "To me the ultimate value of a man is not to be measured by what he says, nor even by what he does, but by what be becomes"—কি না, মানুষের সত্য মূল্য ও শেষ পরিচিতি তার কথায় নয়, এমন কি কাজেও না—তার স্বরূপের যাচাই হ'ল সে কি হ'য়ে উঠল সেই পরখে।

কথাটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে আমার ভালো লাগল: আরো এইজন্যে যে আধুনিক কর্মঘর্ঘর বিজ্ঞাপন-মুখর যুগে এ-পরখের সত্যতা নিত্যই অস্বীকৃত হচ্ছে। মানুষকে আজকের দিনে পনের আনা ক্ষেত্রে সম্মান দেওয়া হয় তার কথা ও কাজ মেপেজুপে। এর মধ্যে একটা বেদনা আছে। সে-বেদনা মানুষের অন্তরাত্মার। কবি ব্রাউনিঙের একটি কবিতার কয়েকটি চরণে এর রেশ উঠেছিল বেজে:

> Not on the vulgar mass
> Called work must sentence pass
> Things done that took the eye and had the price,
> O'er which from level stand,
> The low world laid its hard,
> Found straightway, to its mind, could, value in a trice.
> But all, the world's course thumb
> And finger failed to plumb
> So passed in making up the main account:

All instincts immature,
All purposes unsure,
That weighed not as his work, yet swelled the man's amount :
Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act,
Fancies that broke through language and escaped :
All I could never be
All men ignored in me
This was I worth to God, whose wheel the pitcher shape.

অনামীতে এর আমি বাংলা করেছি—শেষ স্তবকের—

যত চিন্তা গহন মূর্ছনা
সীমাক্ষুণ্ণ কর্মে বাজিল না
উধাও কল্পনা – নর-ভাষা যার পেল না সন্ধান :
যত ফুল মনে ফুটিল না
নিখিল ফিরিয়া চাহিল না
তারি গন্ধমূল্যে মোর নিখিলেশ-নয়নে সম্মান।

আপনি যে-প্রশ্ন তুলেছেন তার গোড়াকার কথাটা হ'ল এই গন্ধমূল্যের মর্যাদা-বিচার। কঠিন প্রশ্ন বৈ কি—বুদ্ধির দিক দিয়ে নাগাল পেতে গেলে। অথচ আমাদের গভীর অনুভবলোকে ঋষির এ-উক্তি, কবির এ-আক্ষেপ যে আলোয় ঝল্‌কে ওঠে একথা অপ্রতিপাদ্য। না উঠলে যুগে যুগে ধ্যানী, তত্ত্বদর্শী, ঋষির চরণতীর্থে মানুষ "প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" সত্য সন্ধানে যেত কি ?

সেদিন আমার এক আত্মীয় এই শ্রেণীর এক প্রশ্ন তুলে আমাকে এমনিই মুস্কিলে ফেলেছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল যে যুগ যুগ ধ'রে যোগী ঋষি তো একশত এলেন গেলেন—কিন্তু হ'ল কি? তাঁর ভাবখানা : কর্মী বৈজ্ঞানিক বণিক এঁদের কাজে ভালো হোক বা মন্দ হোক একটা কিছু ঘটছে, কিনা দৃশ্যজগতে প্রত্যক্ষ পট-পরিবর্তন, ধরা-ছোঁয়া-যায়-এমনতর বিপ্লবাদির রকমফের অভিনীত হচ্ছে—কিন্তু দ্রষ্টা মুনি ঋষি এঁদের আবির্ভাবে কই তেমনতর কোনো ফল তো ফলছে না !

উপনিষদে বলেছে পনের আনা লোকের চেতনা বহির্মুখী—দুএকজন দেখা যায় যাঁরা অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরান। কাজেই এ দুচারজন ছাড়া কারুর চোখেই বড় একটা পড়ে না—আন্তর অঘটনের প্রত্যক্ষ বিপ্লবগুলির ছবি। এই জন্যেই ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী ৺লোয়েস ডিকিন্সন তাঁর শেষ জীবনে খেদ করেছিলেন যে "Nothing that is important can be proved."

বহির্মুখী মন, আত্মন্তরী প্রাণ চলে বাইরের পানে। হাজার পাদপ্রদীপের আলোয় হাজার মানুষের নটলীলায় যে-শোরগোল ওঠে সে সব খতিয়ে প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর (unimportant) হ'লেও তাদের ফলাফল যে চাক্ষুষ করা যায় একথার মার নেই। তাদেরকে সপ্রমাণ করা যায় : চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় যে তারা এল ও কুরুক্ষেত্র ঘটিয়ে তবে গেল—প্রায়ই। কিন্তু বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্য কবীর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দর মত মহামানবদের আবির্ভাবে যে বিপ্লব ঘটে সে মানুষের আন্তর অনুভবলোকে। সেখানকার বার্তা অনুভবগ্রাহ্য, শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মানুষের আত্মিক সব অঘটন—মিরাক্লের বেলায়ই এই কথা। তারা অনুভবগম্য, সাধনলভ্য, সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য—যুক্তিতর্কে তারা নিষ্পন্ন হয় না, হ'তে পারে না।

মানুষের "হ'য়ে ওঠা" হ'ল এই অতীন্দ্রিয় লোকের অঘটন—মিরাক্‌ল। তার বলা-কওয়া চলা-ফেরা কীর্তিকলাপ হ'ল বাইরের ঘটনা—phenomena : এদের বাটখারা আছে, নিক্তি আছে—গজকাঠি দিয়ে মেলে এদের নাগাল। কিন্তু আন্তর অনুভবের পরখ করতে হবে অন্য গজকাঠি দিয়ে—কষতে হবে অনুভবের কষ্টিপাথরে, তবে তাদের হদিশ মিলবে। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ও কবি ব্রাউনিং এই কথাই বলেছেন—কেন না একথা তাঁরা অনুভব করেছেন তাঁদের চেতনার মর্মকোষে। সেখানকার বাণী হ'ল অপরোক্ষ অনুভবের বাণী—তার মর্মজ্ঞ হ'তে হ'লে সে-রাজ্যের বাসিন্দা হ'তে হবে—তার দর্শন পেতে হ'লে চাই তৃতীয় নয়ন—দিব্যদৃষ্টি, নইলে তাদের যাথাতথ্য সম্বন্ধে যা-ই বলুন না কেন, দেখবেন বেশির ভাগ লোকই মেনে নিতে পারবে না—যেহেতু বেশির ভাগ লোকের চেতনা (উপনিষদের ভাষায়) বহির্মুখী।

কিন্তু তা ব'লে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে আন্তর অনুভব লোকে যে সত্য ফুটে ওঠে বহির্লোকে তার কোনো

ছোঁয়াচই লাগে না। তা যদি হ'ত, তাহ'লে জৈবলীলা হ'য়ে দাঁড়াত একটা অর্থহীন অসংবদ্ধ অবিন্যস্ত ঘটনাস্রোত। আন্তর অনুভবের দীপ্তি বাইরের প্রতি ঘটনায়ই লাগে—অহরহ বাইরের সঙ্গে ভিতরের চলেছে মালাবদল। যেখানে ভিতরের আলো ফোটে নি সেখানে বাইরেটাও হয় হীনপ্রভ। একই কথা দুজনের মুখে ফুটে ওঠে: একজনের মুখে তা শোনায় ছায়ার ছায়া, অন্যজনের মুখে—আলোর আলো। বিলাসী পলিটিকাল বক্তা বললেন—"ত্যাগ করো"—লোকে হেসে উঠল: সর্বত্যাগী মাটার বললেন—"ত্যাগ করো"—ছুটল লোক দলে দলে ঘর ছেড়ে। জীবনের এ-রহস্য সবাইকার চোখে পড়ে—পাসনালিটির রহস্য। এর নিদান বুদ্ধির কাছে অজ্ঞেয়। একজনের মধ্যে ফোটে অনির্ণেয় আকর্ষণী-শক্তি—অন্যের মধ্যে ফোটে না। কেন? না, একজন এমন কিছু একটা হয়েছে—(তা সে প্রাক্তনবশেই হোক বা সাধনবলেই হোক)—যা অন্যজনা হয় নি। এই জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণিকে—"কর্তার চাপরাশ পেয়েছ? নৈলে শুনবে কে তোমার কথা?" চাপরাশ হ'ল এই হ'য়ে ওঠা—জীবনসাধনায় ভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশ পাওয়া—তা সে-সাধনা যেদিকেই হোক না কেন। আসল কথা তাই এই হ'য়ে ওঠা নিয়ে।

এর পরের কথা—আপনার পরের প্রশ্ন—আরো কঠিন। কী ক'রে বুঝব কে কী হ'ল, কতখানি হ'ল, কারুর আন্তর পরিণতির বাহ্য প্রকাশ দিয়ে তাকে কতখানি বোঝা সম্ভব ইত্যাদি। এক কথায় আপনি প্রশ্ন তুলেছেন—কী ভাবে মানুষের আন্তর পরিণতি ও বিকাশ বাইরে সক্রিয় হয়।

এ-কথার সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া কঠিন এই জন্যে যে মানুষের চরিত্র বিচিত্র, প্রকাশভঙ্গী ততোধিক। কেউ কথায় নিজের অনুভবকে বাইরে সংক্রমিত করতে পারে, কেউ বা লেখায়, কেউ বা গানে, কেউ বা রূপরেখায়। এ-সব অবশ্য কর্মের—what he does—কোঠায় পড়ে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও যেটা প্রণিধানযোগ্য সেটা হ'ল এই বিচিত্র সত্য—যে এ-সব কর্মের মধ্যে দিয়ে কর্মকর্তার আন্তর অনুভব কোনো না কোনো উপায়ে সক্রিয় হ'লেও তার সমগ্র মূল্য—তার সত্তার মূল্য—এ-সবকেও ছাপিয়ে যায়। এই যে surplus—যাকে না মেলে তার বচনে, না কর্মে, না শিল্পে, না প্রতিভায়, অথচ যার প্রভাব জীবনের উপর কাজ করে এক রহস্যময় অনির্ণেয় ভঙ্গীতে—কী ক'রে করব তার মাপজোপ? একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—তাহ'লে হয়ত আমার বক্তব্যটা একটু প্রাঞ্জলতর হ'তেও পারে—যদিও (পুনরুক্তি মার্জনীয়) এ-ধরণের বক্তব্য মূলত অনুভবগ্রাহ্য ব'লে খুব সুবোধ্য ক'রে বলা কঠিন।

ধরুন একজন বড় গায়কের গান বা বড় চিত্রীর চিত্র। এমন দেখা যায় যে সে-গান কেউ হুবহু নকল করতে পারল, সে-চিত্রের হুবহু কপিও করল আর কেউ। কিন্তু মূল গান বা মূল চিত্রের সমকক্ষ হ'তে পারল না—এ নকল গান, নকল ছবি। কেন এমন হয়? দেখানো যেতে পারে—গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে—যে মূল গানের সঙ্গে নকল গানের ভঙ্গী ছন্দ কম্পন সংখ্যার তফাৎ নেই একটুও—অণুবীক্ষণ বা ফটোগ্রাফের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতেও হয়ত পারে যে, মূল চিত্রের সঙ্গে নকল চিত্রের মিল নিখুঁৎ। অথচ তবু বিশেষজ্ঞরা সবাই মানবেন যে এ-দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আশমান-জমিন। হ'তেই হবে। আর এ-হওয়ার কারণ ঐ অব্যক্ত অনির্বচনীয় অপ্রকাশ্য মানুষটির ছোঁয়াচ। বড় গায়কের গানে বড় শিল্পীর শিল্পে তাঁর পার্সনালিটির ব্যক্তিস্বরূপের ছোঁয়াচ লাগল—না লেগেই পারে না—ছোট গায়কের ছোট শিল্পীর নকলের চারদিকে নেই—এ-জ্যোতির্মণ্ডল। বড় শিল্পী যা হ'য়ে উঠেছেন ছোটশিল্পী তা তো হ'য়ে উঠতে পারেন নি। সুতরাং—

মানব এ-ও খানিকটা বাহ্য বিচার বৈ কি। কেন না এরও মূল লক্ষ্য হ'ল কৃতকর্মের ওরফে কীর্তির সমগ্র বিচার—হোক না এ বিচারভঙ্গী অন্তর্মুখী, তবু একে কীর্তির বিচারই বলতে হবে—যেহেতু গোটা মানুষটার বিচার না হ'লেও তার প্রভাবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূল্য এখানে কষা হ'ল সন্দেহ নেই। এরও পরে আছে। কিন্তু তার কথা যুক্তিবোধ্য ক'রে প্রকাশ করা আরও কঠিন। তবু একটু আভাষ দিতে চেষ্টা করব।

কি জানেন? লৌকিক বিচার হাজার সূক্ষ্মদর্শী মনের বিচার হ'লেও সে কখনই ইন্দ্রিয়কে পেরিয়ে যেতে পারে না। এই জন্যেই মনকেও আমাদের দার্শনিকেরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেছেন। কেন না মনও কোনো না কোনো প্রকাশকে আঁকড়ে তবে অকূলে পায় কূল। কিন্তু পরমার্থ হ'ল মনের

এলাকার বাইরে—সে যে অতীন্দ্রিয়। মানুষের বেলায়ও একথা খাটে, কেন না পরমতম যে, সর্বাধার যে—সে রইল "জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্ট"। তাই মানুষ যে-অনুপাতে এই ভাগবত চেতনার সত্তা পাবে সে-অনুপাতে যাবেই মনের এলাকা পেরিয়ে—না গিয়ে পারে না। এই জন্যেই বলেছে : None but Christ has ever understood Christ : এ-কথার তাৎপর্য এই যে খৃষ্টকে পুরো বুঝতে হ'লে তাঁর চেতনার সালোক্য পেতে হবে, অন্য ভাষায়—to become Christ.

এইজন্যে সব আধ্যাত্মিক সাধনারই শেষ কথা হ'ল হওয়া, হ'য়ে ওঠা—পাওয়া নয়। একথা সত্য যে কর্মের মধ্য দিয়েই এই হ'য়ে-ওঠার সন্ধান মেলে, কিন্তু তাই ব'লে একথা সত্য নয় যে কীর্তির বাটখারায় কর্তার ওজন সম্ভবপর। কেন না হ'য়ে-ওঠার নিগূঢ়তম প্রভাব ফলে তো বুদ্ধিগ্রাহ্য পথে নয়—ফলে অনুভবলোকে—সাক্ষাৎ ছোঁয়াচে। এইজন্যে প্রেমেরও সুরু ইন্দ্রিয়লোকে বটে কিন্তু সারা—ঐ অতীন্দ্রিয় অনুভবলোকে—যেখানে এক সত্তার মিলন হয় আর এক সত্তার সঙ্গে, ফলে "দুই মিলাইয়া এক অঙ্গ হয়।" এ-মিলন কী বস্তু তা প্রকাশনীয় নয়—হ'তে পারে না—অথচ এর চেয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব অপরোক্ষ অনুভূতি আর কিছু নেই—তাই এই প্রেম বলুন, ভালোবাসা বলুন, দরদ বলুন, সিম্প্যাথি বলুন—এর যা-ই নাম দিন না কেন এই আন্তর উপলব্ধির, realistationএর স্বীকার না হ'লে কিছুই হ'ল না। এইজন্যেই ভগবান গীতায় বলেছেন যে কৃচ্ছ্র, দান তপস্যা কিছুতেই তাঁকে মেলে না, মেলে কেবল ভক্তিতে প্রেমে—ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং-বিধোর্জুন, জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ভক্তিতে শুধু যে তাঁকে জানা বা দেখা যায় তাই নয়—তাঁর মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এই-ই হ'ল হ'য়ে-ওঠা—to become। কোন্ কীর্তি দিয়ে একে মেপে পাবেন বলুন—কোন বচন দিয়ে পাবেন এই আত্মরূপান্তরের গুহ্যরস—রহস্যমুত্তমম্? কোন্ প্রকাশে এ পূরো ধরা দেয়? দিতে কি পারে? মানুষ মানুষকে তার মহার্ঘতম অর্ঘ দেয় যে নৈঃশব্দ্যের নিস্তরঙ্গে—যেখান থেকে "বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—কাঙাল বচনমন দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে। ইতি।

দিলীপকুমার

বাংলার লবণ শিল্প

শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী

প্রবন্ধ

বঙ্গদেশ সমুদ্রোপকূলে। বাংলার দক্ষিণাংশকে লবণ সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে। অথচ এই বাঙ্গালীকে ভিন্নদেশীয় লোক লবণ যোগায়। বাঙ্গালীকে পরের কাছে লবণ কিনিয়া খাইতে হয়। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে চাল ডালের পরেই লবণের স্থান। ধান, পাট, লবণ—এইগুলি বাঙ্গালার সম্পদ। একদিন এই সকল সম্পদ বাঙ্গালী পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিত ; হিন্দু রাজত্বের সময়ে বঙ্গদেশেই লবণ প্রস্তুত হইত। বাঙ্গালী নিজের প্রস্তুত লবণ নিজে ব্যবহার করিত। পশ্চিম হইতে যখন মুসলমানগণ এই ভারতে আসিয়া ভারতবাসীকে পদানত করিল, তখনও বঙ্গদেশ তার শিল্প-সম্পদ হারায় নাই। মুসলমানেরা বিদেশী হইলেও এদেশের শিল্প রক্ষা করিবার জন্য তাহারা কখনও কৃপণতা দেখায় নাই। সুলতান মামুদের ন্যায় দুই একজন লুণ্ঠনকারী ব্যতীত আর কোন পাঠান এবং মোগল রাজা ভারতের ধনরত্ন, শিল্পসম্পদ এ দেশ হইতে ভিন্ন দেশে লইয়া যায় নাই ; বরং এ দেশের শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য মুসলমান্ রাজগণও সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন, উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করিতেন ; এক কথায় ভারতবর্ষ, তথা বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ ছিল।

বাঙ্গালী আত্মতৃপ্ত ছিল, দস্যুর ন্যায় দুই একজন মাঝে মাঝে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি আক্রমণ করিত বটে কিন্তু তাহারা শিল্প সম্পদ নষ্ট করিত না। বাঙ্গালার নৌ-শিল্প, লৌহ-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প, ভূমিজ ও খনিজ সম্পদ মুসলমানদের দ্বারাও রক্ষিত হইয়াছিল, বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কাপুরুষতা-বশতঃ বিদেশীয় বণিক এদেশে আসিয়া আমাদের দৌর্ব্বল্যের সুযোগ গ্রহণ করতঃ কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে এমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গালাদেশ অধিকার করে। রাষ্ট্র অধিকার করিয়া যদি তাহারা এদেশের শিল্পসম্পদ রক্ষা করিত; রাজকীয় কর গ্রহণ

করিয়াই যদি তাহারা ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলেও আমাদের এই দুর্ভাগ্য আসিত না। এক খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষমতা বিদেশীয় বণিকগণ লুপ্ত করিতে পারে নাই নতুবা আমাদের অন্য সকল শিল্প-সম্পদই তাহারা নষ্ট করিয়া দেয়। নৌ-শিল্প এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে, লৌহ-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। লবণ প্রস্তুত হইত, পৃথিবীর নানা দেশে আমাদের দেশে প্রস্তুত লবণ রপ্তানী হইত, তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ইউরোপ হইতে এদেশে লবণ আসিতে থাকে, আমরা সেই লবণ কিনিয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি। এমনই ভাবে আমাদের বিরাট বস্ত্রশিল্পও ঐ বিদেশী বণিকেরা নষ্ট করায় হাহাকারে দেশ ভরিয়া উঠে। খাদ্য শস্য নষ্ট করিবার উপায় ছিল না, সুবিধা থাকিলে বিদেশীয়গণ সে চেষ্টাও করিত, অবশ্য এই কথাও আজ আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না। এখনও আমাদের খাদ্য শস্যকে নষ্ট করিবার আয়োজন চলিতেছে। রেঙ্গুন ও জাপান হইতে চাউল, অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম এদেশে বর্ত্তমান সময়ে অবাধ বাণিজ্যের ফলে আসে। এদেশ যদি স্বাধীন হইত তবে এ অবাধ বাণিজ্য আমরা বন্ধ করিয়া দিতাম।

আমাদের মত সম্পদশালী দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে এবং আমাদের মত সভ্যদেশও পৃথিবীতে বিরল। বাঙ্গালী আমরা we are not criminal-minded uncivilized people. পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যে চিত্র আমরা পাইয়া থাকি তাহাদের চরিত্র যেরূপ দস্যু তস্কর ও পাশবিকতাপূর্ণ দেখিতে পাই, তাহাতে একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, বাঙ্গালী ঐ সকল অসভ্য জাতির ন্যায় কখনও অসভ্য ছিল না, দুষ্টচিত্তসম্পন্ন দস্যু তস্কর ছিল না। শিল্প সম্পদে সভ্যতায় মানবতায় বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ছিল। আজ তাদের শিল্প নষ্ট করিল কে?

দেশের প্রত্যেকটী শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিলেই আমাদের কত প্রাচীন ইতিহাস মনে পড়ে, রাগে ক্ষোভে তখন মুহ্যমান হইয়া পড়ি।

গত ১৯০৫ সালে আমাদের চৈতন্য ফিরিয়া আসে, দীর্ঘ নিদ্রার পরে তন্দ্রালস্ চিত্তে মানুষ যেমন জাগিয়া উঠে, তেমনই এক মণীষী ভারতের শ্রেষ্ঠতম সন্তান আমাদিগকে জাগাইয়া তোলেন, আমরা আত্মসম্বিত লাভ করিবার জন্য জীবন-সর্ব্বস্ব-পণ করি, বাঙ্গালায় সেই সময়ে "স্বদেশী আন্দোলন" আরম্ভ হয়। যদিও নিছক দেশের শিল্প সম্পদ বাড়াইয়া আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য বাঙ্গালী স্বদেশী আন্দোলন সুরু করিয়াছিল, তবুও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঐ আন্দোলনের ভিতরে রাজদ্রোহিতা দেখিয়াছিল এবং বঙ্গদেশকে তজ্জন্য অনেক নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল। পরন্তু সেই নির্য্যাতনের ভিতর দিয়াই বাঙ্গালা গড়িয়া উঠে। বাঙ্গালার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠে, আজ তাই আমরা দেখিতে পাই বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে, বিলাতী ধরণে ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য অসংখ্য কেমিকেল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, সমগ্র দেশব্যাপী বহু সাবানের ও দেশলাইএর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেশের নানা স্থানে জুতার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, দেশে বিরাট লৌহ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক অসংখ্য রকমের বীমা কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বদিক দিয়া দেশ আত্মনির্ভরশীল হইতে চলিয়াছে, ভারতবাসীর এই উন্নত হইবার প্রচেষ্টাকে বিদেশীয় বণিক রোধ করিতে পারে নাই, বরং বাধা পাইয়া আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভারতবাসী আত্মোন্নতিসাধনের জন্য অগ্রসর হইতেছে।

কেবল প্রাচীন লবণশিল্পকে পুনরুদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা অনেক দিন এত আন্দোলন সত্ত্বেও হয় নাই। পরিশেষে দেশের সুসন্তান শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে চৌধুরী, বার-এট-ল) মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলনের ফলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সভাপতি করিয়া বঙ্গদেশে লবণ প্রস্তুতকারী সমিতি গঠিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমিতি দীর্ঘ দিন আন্দোলন করিয়াও বাঙ্গালায় লবণ প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স পায় নাই। পরিশেষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নানা বাঁধন-কষণের ভিতরে বঙ্গীয় লবণ প্রস্তুতকারক সমিতিকে বঙ্গদেশে লবণ প্রস্তুত করিতে সাময়িকভাবে পরক্ষামূলক অধিকার দেওয়া হয়। এই ছাড়পত্র লইয়া বিদেশীয় বণিকের অনুকম্পায় বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যেও প্রিমিয়ার সল্ট কোম্পানী ও ন্যাশানেল সল্ট কোম্পানী নামক দুইটী লবণ প্রস্তুতকারক কোম্পানী গড়িয়া উঠে। প্রিমিয়ার সল্ট কোম্পানী—মেদিনীপুর কাঁথি মহকুমার অধীনে কাড়ুয়া নামক স্থানে প্রথমে পরীক্ষামূলক কারখানা স্থাপন করে; পরিশেষে পরগণে পুরুষোত্তমপুর, গ্রাম সমুদ্রপুর, কাঁথি—নাম স্থানে সমুদ্রের উত্তর উপকূলে স্থায়ী লবণের কারখানা স্থাপন করিয়াছে, এই কোম্পানীর মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা। একদল উৎসাহী ডিরেক্টারের পরিচালনাধীনে কারখানার কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। উক্ত কোম্পানী আপনাদের প্রস্তুত লবণ বাজারে বিক্রয় করিতেছে। সম্প্রতি সুন্দরবনে মহিজাট নামক স্থানেও এই কোম্পানী একটী কারখানা খুলিয়াছে।

ন্যাশনাল সল্ট কোম্পানী—প্রথমে সুন্দরবনে কাকদ্বীপ নামক স্থানে কারখানা স্থাপন করে এবং উক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হঠাৎ পরলোকগমন করিলে উক্ত কারখানা বহুদিন বন্ধ থাকে। সম্প্রতি উক্ত নষ্টপ্রায় কোম্পানীকে পুনর্গঠন করত সুন্দরবনে মহিপীট নামক স্থানে কারখানা স্থাপন করিবার উদ্যোগ হইয়াছে। একদল উপযুক্ত ডিরেক্টারের পরিচালনায় কোম্পানীর কাজ চলিতেছে।

বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কাজ চলিতেছে। এই কোম্পানীর ডিরেক্টারগণও দেশবিখ্যাত ব্যক্তি। উহাদের কারখানা কাঁথিতে দাদনপাও নামক স্থানে—বঙ্গসাগরের উপকূলে; কোম্পানীর মূলধন ৫ পাঁচ লক্ষ টাকা। বাজারে কোম্পানীর লবণ বিক্রয় হইতেছে। কোম্পানীর প্রস্তুত লবণ উৎকৃষ্ট। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী লবণ প্রস্তুত করিতে কোম্পানী সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান্ সল্ট কোম্পানী—বাংলার অন্যতম একটী বড় কোম্পানী। সুন্দরবনে সুধীরগঞ্জ নামক স্থানে এই কোম্পানী বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেছে। উহাদের কারখানার লবণও বাজারে

বিক্রয় হইতেছে। এ বৎসর অর্থাৎ আগামী শীত ঋতুতে এই কোম্পানীও বাজারে প্রচুর লবণ আমদানী করিতে পারিবে। অভিজ্ঞ এবং উৎসাহী ডিরেক্টারগণ এই কোম্পানী পরিচালনা করিতেছেন।

দি পাইওনিয়ার সল্ট কোম্পানী—সুন্দরবনে শিশিরগঞ্জ নামক স্থানে এই কোম্পানীর কারখানা ; ডিরেক্টার বোর্ডে বহু বিজ্ঞ ও উৎসাহী বাঙ্গালী আছেন। ইহারাও আপনাদের প্রস্তুত লবণ বাজারে বিক্রয় করিতেছে। কোম্পানী বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়াছে।

লোকমান্য সল্ট কোম্পানী—এই কোম্পানীও সুন্দরবনে কারখানা স্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেছে ; কোম্পানীর পরিচালক একজন যোগ্য ব্যক্তি এবং উৎসাহী কর্ম্মী।

চট্টগ্রাম টে্রডিং কোম্পানী—কক্সবাজারে কারখানা স্থাপন করিয়াছে এবং শুনিয়াছি তাঁহারাও যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছেন।

বঙ্গদেশ ছাড়া করাচীতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া লবণ প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে নাদির সল্ট কোম্পানী এবং খুরসোদ সল্ট কোম্পানীর কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানীগুলি স্থাপিত হইলেও এই অল্পকাল মধ্যে ঐ সকল কোম্পানী বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ মণ লবণ তৈয়ারী করিতে পারিতেছে। এডেন ও বিলাতী লবণের পরিবর্ত্তে এই করাচীর লবণ প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গলা দেশে উক্ত লবণ বিক্রয় করিতেছে। এই কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বহুদর্শী কর্ম্মঠ এবং লবণশিল্প সম্বন্ধে বিশেষভাবে পারদর্শী। উঁহাদের পরিচালনায় উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতেছে এবং ভারতবর্ষকে লবণের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হইতে উৎসাহ দিতেছে।

বাঙ্গালায় লবণ কারখানাগুলি স্বদেশী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইলেও বাঙ্গালার জনসাধারণ ও ধনীদের নিকটে উহারা বিশেষ সাহায্য ও উৎসাহ পান নাই। কোম্পানীগুলির শেয়ার বিক্রয়ের হিসাব দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য অনেক। সেই দুর্ভাগ্যকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে বাঙ্গালার ধনীরা। আমরা এমন বহু ধনীকে জানি যাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই বাঙ্গালা দেশে বিরাটভাবে লবণ প্রস্তুতের কারখানা করিয়া দিতে পারেন এবং উপযুক্ত অর্থ হইলেই আমরা বিশ্বাস করি, তিন বৎসরের ভিতরে বাঙ্গালা দেশেও এক কোটী মণ লবণ তৈয়ারী হইতে পারে।

মেদিনীপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অনায়াসে ৫০০টী কারখানা স্থাপিত হইতে পারে ; প্রতি কারখানায় বৎসরে পঁচিশ হাজার মণ লবণ অনায়াসে তৈয়ারী হইতে পারে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টও এই পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুতের জন্য দেশবাসীকে কোন উৎসাহ দেয় নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মুখে একটু আশার বাণী শুনা যাইতেছে, কিন্তু ফল ভবিষ্যতের গর্ভে। প্রথম যখন কোম্পানীগুলি স্থাপিত হয় তখন বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে বঙ্গদেশে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে না। আবগারী বিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধে একটা তদন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রিপোর্ট শেষ করিলেও বাঙ্গালীকে সেই রিপোর্ট দেখিতে দেওয়া হয় নাই।

অতিথি

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

আমার মালঞ্চে এলে যবে
ছিল শুধু একটি গোলাপ,
সারা দিবসের খরতাপ
ফুল্ল মুখে সহিয়া নীরবে।

তোমারে তুলিয়া দিব বলি।
যেমনি ছিঁড়িতে গেনু তারে,
দলগুলি পড়িল যে খলি'
শূন্যবৃন্ত দিলেম তোমারে।

হাসি মুখে করিলে আঘ্রাণ,
পুষ্পাধরে লাগিল পরাগ,
সেই মোর শেষ অনুরাগ,
খুসীতে ভরিল তব প্রাণ।
নতজানু হ'য়ে দলগুলি
স্নেহভরে নিলে তুমি তুলি।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

১৭

সুদর্শন, মিষ্টভাষী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাক্‌পটু, কর্ম্মকুশল, নিরলস-শ্রমোদ্যমী এবং অগ্রবর্ত্তিতায় অতি আগ্রহশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী—এইরূপ লক্ষ্য করিয়া ব্যারিষ্টারীর সুরুতেই এটর্ণী হরমোহনবাবু সুকেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাহার পৃষ্ঠপোষকও হইয়া দাঁড়ান ; নিজে শক্তিমান্, বিত্তবান্ পিতার সন্তান, 'আবার কর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ সহায়তার সুযোগলাভেও ভাগ্যবান্, কয়েক বৎসরের মধ্যেই সুকেশ-বাবু ব্যবসায়ে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, অর্থাগমও যথেষ্ট হইতে লাগিল। হরমোহনবাবুর আফিসের সব মামলা মোকদ্দমা যে সুকেশবাবুই বেশী এখন করেন কেবল তা নয়, তাঁহার ব্যাবসায়িক ও ব্যক্তিগত বৈষয়িক সব রকম কাজকর্ম্মেই অতি বড় একজন বিশ্বাসী মন্ত্রণাদক্ষ সহায় হইয়াও দাঁড়াইয়াছেন। নিজের যশোলিপ্সা ও ক্ষমতালিপ্সা অত্যধিক ছিল ; হরমোহনবাবুও উপদেশ দেন, কেবল নিজের ব্যবসায়ে আর টাকা-কড়িতে ডুবিয়া থাকিও না, বাইরের পাঁচটা বড় বড় কাজেও জুটিয়া যাও।—কত রকম আন্দোলন আসিতেছে, যাইতেছে, যেটা যখন লোককে বেশী টানে, তাতেই গিয়া একটা হৈ-রৈ তোল, দরকার মত টাকা ছড়াও, পার ত সুবিধা মত sacrificeও কিছু কর—ছোকরার দলগুলো সব হাতের মুঠোয় আসিয়া পড়িবে। কংগ্রেসে ঢোক, কৌন্সিলে ঢোক, কর্পোরেশনে ঢোক ; ক্ষমতা আছে, মুখের জোর আছে, কলমের জোর আছে, দেশের বড় একজন মাতব্বর লোক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। ভোগ চাও, তারও যথেষ্ট অবসর পাইবে—সুযোগও পাইবে। সবাই ওঁরা পায়, করিয়াও লয়, আটকায় না কিছু। তবু একটু সাবধানে চলিও, public scandal একটা কিছু না ঘটে! টাকায় সব কাটে। তবে তেমন টাকার জোর কি তোমার কখনও হইবে?—আর হইলেই বা কি? টাকার কি আর কাজ নাই? একটু সাবধানী হিসাবী লোক যাহারা, এ সব বেকুবীর আক্কেল সেলামী তাদের কখনও দিতে হয় না।

এই সব উপদেশের অপেক্ষা যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুকেশের বিশেষ ছিল, তাহা নয়।—তবু বৈষয়িক সব ব্যাপারে অতি পরিপক্ক ও অভিজ্ঞ এই প্রবীণ মুরুব্বির কথাগুলি বেশ আগ্রহেই তিনি কানে তুলিয়া লইলেন, মনে ধরিয়া রাখিলেন, কার্য্যতঃ অনুসরণ করিয়াও চলিতেন। সুযোগ কিছু অবহেলা ত করিতেনই না, সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে রাখিয়া খুঁজিয়াও লইতেন।—রাজনীতি, শ্রমিক আন্দোলন, সোসিয়ালিজম্, সমাজসংস্কার, যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, নারী আন্দোলন, কো-এডুকেশন, পল্লী সংগঠন, ওরিয়েন্টাল ব্রতচারী নৃত্যকলাদি রসায়নে দেশসঞ্জীবন—সব কিছুর মধ্যেই গিয়া উৎসাহে যোগ দিতেন, যেখানে যতটা সম্ভব পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইতেও চেষ্টা করিতেন।—সুবিধা বুঝিয়া অর্থসাহায্যদানেও কুণ্ঠিত বড় হইতেন না। এক বৎসর হাইকোর্টে প্রকাশ্য প্রাক্‌টিস্ ছাড়িয়া দেন, আইন ভাঙ্গিয়া মাস কয়েকের জন্য একবার কারাবরণও করেন। কংগ্রেসে ত্যাগীকর্ম্মী বলিয়া একটা প্রতিপত্তিও তাহার হইয়াছে। আবার বড় দুই একটা পিকেটিংএ বহু লেডী ভলান্টিয়ার যোগাইয়া শক্তিশালী একজন অর্গানাইজার বলিয়াও বেশ একটু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টারীতে পসার বৃদ্ধির সঙ্গে অবসর এখন কিছু কমিয়া গিয়াছে, বয়সও কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রায় চল্লিশ বোধ হয় এখন হইবে। সবদিকে তেমন মাতামাতি করিয়া এখন আর বেড়াইতে পারেন না। একটি যুব কর্ম্মিসঙ্ঘ এবং একটি নারী কর্ম্মিসঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন, ইহাদের পরিচালনাদি নিজের হাতেই রাখিয়াছেন।—অন্য যত কিছু আন্দোলন—সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ কিছু আলগা হইয়া পড়িয়াছে, কংগ্রেসেও আছেন কতকটা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানির' মত ভাবে। সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলনে কখনও বেশ একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া দাঁড়ান, আবার কখনও কিছু ঢিলা হইয়া পড়েন, অছিলা—কখনও দৈহিক অসুস্থতা, কখনও বা অতি জরুরী অন্য কোনও কোনও কাজের টান। শ্রমিক ও কিষাণ আন্দোলনে কিছু পিছনে বা আড়ালে

থাকিয়াই উপদেশে ও অর্থদানে যতদূর পারেন, কর্ম্মিদের সহায়তা করেন। তবে সভাসমিতিতে যখন যেখানে ডাক পড়ে, সর্ব্বত্রই প্রায় যান, জোর বক্তৃতাও করেন। কিছু কিছু ভাতাভোগী বেকার গ্রাজুয়েট কয়েকজন লোক আছে, নির্দ্দেশ মত ইংরেজি বক্তৃতাগুলি ছাপার মত করিয়া তাহারা লিখিয়া দেয়—রূপালী তদ্বিরে সব কাগজেও তাহা পুরাপুরি ছাপা হয়। যখন যেমন দরকার মাতান বক্তৃতা করিতে পারেন, অর্থব্যয়ে অকুণ্ঠ, ভাল অর্গানাইজার বলিয়া নাম আছে, দুটি কর্ম্মিসঙ্ঘ হাতে থাকায় সকল রকম কাজেই স্বেচ্ছাসেবকসেবিকা বেশ সরবরাহ করিতে পারেন—সুতরাং সর্ব্বত্রই বেশ একটা প্রতিপত্তি আছে, খাতিরও সকলে করে। সম্প্রতি জমিদার পক্ষ হইতে ব্যবস্থা পরিষদে ঢুকিয়াছেন—আগামী নির্ব্বাচনে কর্পোরেশনে যাইবার ইচ্ছাও আছে। তবে কংগ্রেস টিকিটে কি স্বাধীন করদাতৃ-সঙ্ঘের পক্ষে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবেন, সেটা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সময় মত অবস্থা বুঝিয়া যাহা হয় করিবেন।

বেলা আন্দাজ দশটা সাড়ে দশটায় ফোনে জরুরী ডাক আসিয়াছিল—আজই বেলা দুইটার পর সুকেশ যেন হরমোহন-বাবুর আফিসে গিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন। কোর্ট হইতে লতাকে লইয়া সেই লেডী ডাক্তারের গৃহে রাখিয়া সুকেশবাবু তাঁহার আফিসে গেলেন, সেখানে সামান্য কিছু কাজ ছিল; সারিয়া বেলা আড়াইটা নাগাত হরমোহনবাবুর আফিসে গিয়া পৌঁছিলেন।

"এই যে, এস সুকেশ! যাও, ব'স গিয়ে খাসকামরায়। আমি এই আসছি।"

তাড়াতাড়ি কাগজপত্র সব গুছাইয়া চাপা দিয়া রাখিয়া হরমোহনবাবু উঠিলেন; উভয়ে প্রায় এক সঙ্গেই গিয়া খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন।

মুষ্টিবদ্ধ হস্তে, দাঁতে কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়াইয়া থাকিয়া হরমোহনবাবু আরম্ভ করিলেন, "তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি—"

সুকেশের বেশ একটু হাসিই পাইতেছিল। তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিবার অছিলায় হাসিটুকু কোনও মতে চাপিয়া সময়োচিত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ, তা—কি হ'য়েছে বলুন ত।"

"হ'য়েছে—সে এক সর্ব্বনাশ! অতি ভয়ঙ্কর এর ব্যাপার!"

"সর্ব্বনাশ! ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কেন, কি—"

"ঐ যে বিরে হতচ্ছাড়া কেলেঙ্কারীটা ক'রে এসেছিল—তা সে ছুঁড়ীটা এসে জুটেছে আমারই বাড়ীতে বামনী হ'য়ে!"

আবার বড় হাসি পাইল। একটু কাসিয়া সেটা চাপা দিয়া বিস্ময়চকিতভাবে চাহিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "আপনার বাড়ীতে—বামনী হ'য়ে—সে কি?"

"এই ত গেরোর ফের দেখ বাবা! কাশীতে আমরা ছিলাম কিনা, সেইখেনেই এসে কাজে লাগে। রাঁধত ভাল, বৌমাও একদম নেওটা হ'য়ে প'লেন, আসবার সময় সঙ্গেই নিয়ে আসা হ'ল।"

"হুঁ।"

"ছিল ত তোমাদেরই গাঁয়ে—ওর—ওর—কে ভাল—হাঁ, মামা, মামার বাড়ীতে বলছিলে না?"

"হাঁ।"

"তা—খরচপত্তরও যাচ্ছিল—মামার বাড়ী ছেড়ে কাশীতে কেন গিয়ে পরদা হ'ল আমার এই সর্ব্বনাশটা ক'রতে? কবে গেল?"

"গেল—ওদের খরচ পত্তর যা যেত—কেন, আপনাকে কি জানায় নি ব্যাঙ্ক থেকে কিছু?"

"হাঁ, তা জানিয়েছে আমি ফিরে আসবার পর এই ত সেদিন। টাকা ফেরত পাঠিয়েছে—এই মাস তিনেক বোধ হয় হ'ল?"

"হাঁ।—তার পরেই কাশী চ'লে যায়—কাজকর্ম্ম ক'রে খাবে ব'লে। দেশে ত আর পয়সা দিয়ে রাঁধুনী কেউ রাখবে না। তারপর আবার নানারকম কুৎসার কথাও লোকে ব'লতে সুরু করলে—"

"হুঁ—তা তুমিও ত এ খবরটা আমাকে দেওনি! কথা ছিল—একটু নজর রাখবে, দরকার মত খবর আমাকে দেবে।"

একটু আমতা আমতা করিয়া সুকেশবাবু উত্তর করিলেন, "খবর—তা কি জানেন, এই দিই দিই ক'রে আর দেওয়া হ'য়ে ওঠে নি। নানান্ রকম কাজের ভিড়ে প'ড়েছি—ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই—মনেও থাকে না সব কথা

সর্ব্বদা। কাশী গেছে—তা এই বা কি ক'রে বুঝব যে আপনার বাড়ীতেই গিয়ে রাঁধুনী হ'য়ে গে ব'সবে ?"

"গেরোর ফের! তা সে যা হবার হ'য়েছে—ভুল চুক সবারই হয়। এখন—"

"কি হ'য়েছে বলুন ত ?—বিরু ত কাল ফিরে এয়েছে—"

"হাঁ, তাতেই ত মহা এই সঙ্কটটা এসে ঘট্‌ল। আর সে ঘট্‌বেই ত। আজ হ'ক্ কাল হ'ক্ ঘট্‌তই—মেয়েটা যখন আমারই বাড়ীতে এসে রাঁধুনী হ'য়ে ব'সেছে। গেরোর ফের আর ব'ল্‌ছি কেন? নইলে কাউকে আমি ঘুণাক্ষরেও কিছু জান্‌তে দিইনি। ওর গর্ভধারিণীকেও কখনও কিছু বলিনি। আমার আফিসেরও কেউ কিছু জানে না—যা ক'র্‌বার এক তোমার সঙ্গেই পরামর্শ ক'রে সব ক'রেছি। ওদের টাকাটার বন্দোবস্তও ক'রেছি এমন একটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে, আমার নিজের কি আফিসের হিসেব পত্রের সঙ্গে কোনও সংস্রব যার নেই। থ্রি হাফ পারসেণ্ট (three half per cent) সুদে বার হাজার টাকা ওদের নামে স্থায়ী আমানতে রেখেছি। আপাততঃ ত্রিশ টাকা ক'রে মাসে পাঠাবে, আর যা হয় ওদের হিসেবেই জমা থাক্‌বে। এর পর ছেলেটা বড় হ'য়ে উঠ্‌লে—ওদের যখন যেমন দরকার তুলে নিতে পারে—তার যা হয় একটা ব্যবস্থা পরে করা যাবে। আর এদিকে তুমি র'য়েছ—গোপনে খবর-টবর রাখ্‌বে, দরকার মত আমাকে জানাবে। ব্যাঙ্কেও আমার এই ইনষ্ট্রাক্‌শন ছিল, জানাতে কখনও কিছু হয়, আফিসে এসে মুখে আমাকে জানাবে—চিঠিপত্তর কখনও কিছু লিখ্‌বে না। তাইত ব'ল্লে কাশীতে চিঠি লিখে আমাকে কিছু জানাতে পারে নি, ফিরে এলে দেখা ক'রে এসে সব ব'লেছে। এত আটঘাট বেঁধে চ'লেছি ; তবু ত দেখ, এই ঘট্‌ল! ঐ যে একটা কথা ইংরেজিতে আছে Man proposes God disposes—বড় সত্যি কথাই বটে।"

"হুঁ—তা বিরুর সঙ্গে যে ওর দেখা হ'ল—কখন কি ভাবে হ'ল? তখন কি ক'রলে ওরা?—বাড়ীভরা এত লোক—সবার মাঝে—"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া হরমোহন কহিলেন, "এই ত এসেছে—এসে স্নান টেনান ক'রে শুনলাম কেবল গিয়ে খেতে ব'সেছে, ও তখন ভাতের থালা নিয়ে এল। এসে, বুঝ্‌তেই পারছ—দেখেই চিনেছে—আর অমনি মূর্চ্ছা! বিরু উঠেই অমনি নাকি বাইরে চ'লে গেল। একটু জ্ঞান হ'তেই ওকে নিয়ে একধারে নিরেলা একটা ঘরে শুইয়ে রাখা হল। মূর্চ্ছো গেছে না মূর্চ্ছো গেছে—nervous weakness থাক্‌লে মেয়েদের অমন হ'য়ে থাকে—কিন্তু এ রকম একটা সন্দেহ কারও কিছু হয় নি। কেনই বা হবে? কারণ এই রকম একটা কাণ্ড যে ঘটেছিল, আমি ছাড়া বাড়ীর আর কেউ তা জান্‌ত না। বিরুও চেপে গেল, কাউকে কিছু তখন ব'ল্লে না। ছুঁড়ীটা একা ঐ ঘরেই শুয়ে রইল—ব'ল্লে তাই ভাল থাকবে। তারপর নিশুতি রাত—সবাই তখন ঘুমিয়েছে—চুপি চুপি বিরু গিয়ে—বুঝ্‌তেই পার—সেথায় ঢুকেছে। এদিকে আবার বৌমারও গেছে ঘুম ভেঙ্গে, খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কি ক'রে তিনিও গিয়ে সেখানে উপস্থিত!"

"কি সর্ব্বনাশ। তারপর?"

"তারপর—কি যে একটা 'সিন' (scene) তখন ওখানে ঘটল—সেটা ভাব্‌তেও পারছি নি! বৌমা ফিট্ হ'য়ে প'ড়ে গেলেন, ছুঁড়ীটা ঐ রাত্তির বেলায়ই কোথায় পালিয়ে গেল। ভাগ্যিস্ চেঁচামেচি কিছু একটা হয় নি। যদি হ'ত, আর বাড়ীশুদ্ধ সব লোক উঠে প'ড়ত—সে যা একটা কেলেঙ্কারী হ'ত—সে আর বলবার নয়। মুখ রাখবার ঠাঁই আমার থাক্‌ত না। যাই হ'ক্, ওখানে একটা সোরগোল কিছু না তুলে বৌমাকে পাঁজাকোলে ক'রে এনে ঘরে শুইয়ে রেখে বিরু ওর মাকে শেষে ডাকে।"

"হুঁ! বুদ্ধির কাজ ক'রেছিল বটে। মাথা যে কি ক'রে তখন ঠিক রাখল! হাঁ, তারপর কি হ'ল?"

"তারপর আর কি? বৌমা ত সেই থেকে কেমন একটা মূর্চ্ছোর ভাবেই প'ড়ে আছেন। সকালে ডাক্তার এনে দেখান হ'য়েছে—কি ক'র্‌বে তারা? রোগ হ'ল মনের। গিন্নী গুম হ'য়ে ব'সে আছেন,—বুঝ্‌লাম বিরু তাঁকে মোটামুটি কথাগুলো সব ব'লেছে। এদিকে আবার ঐ ছুঁড়ীটাও কোথায় পালিয়ে গেল—বাড়ীর লোক সব এখানে ওখানে ফিসফাস ক'রছে—কি ব'ল্‌ছে, কি ভাবছে, তারাই জানে। আমি আর কি করব? সকাল সকাল দুটি খেয়েই অমনি বেরিয়ে প'ড়েছি। গিন্নীর যা ভঙ্গী দেখ্‌লাম—তাঁর সঙ্গে একটা open encounter (মুখো-

মুখি লড়াই) এ নিয়ে অবিশ্যি এড়াতে পারব না—হবেই সেটা—তবে কিনা অশুভস্য কালহরণম্—যতটা যে পারে, ক'রতেই চায়। আবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তেও ত বুদ্ধি একটা স্থির ক'রে নিতে হবে।"

সুকেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থির কিছু ক'রতে পেরেছেন কি ?"

হরমোহনবাবু উত্তর করিলেন, "একটা point—আর সেইটেই হ'চ্ছে essential point—গোড়ার আসল কথা—যার উপর সব নির্ভর ক'রছে—স্থির ত আছেই, নতুন ক'রেও আবার ক'রে নিয়েছি এই, যে বিরুর ঐ বিয়েটাকে—বিয়েই বল আর যাই বল—সেটাকে সিদ্ধ একটা হিন্দু বিবাহ ব'লে স্বীকার ক'রে আমি নেব না, নিতে পারি না।"

"সেটা কি সত্যিই পারেন না—আরও এখন এই ঘটনার পর—"

"না, তা পারি না! এখন এই ঘটনার পর আরও পারি না। কি জান বাবা, হাজার হ'লেও বামুনের ছেলে—হিন্দুর ধর্ম্ম, শাস্তর, সামাজিক আচার নিয়ম, পূর্ব্বাপর যা চ'লে আস্ছে—তা মেনেই চলি। সত্যিকার একটা বিশ্বাস আস্থাও আছে। হাসছ বাবা, তা হাস্তে পার, ছেলেমানুষ—রক্ত এখনও গরম—তার উপর আবার আজকালকার এই হাওয়া—তা আজ না মান কিছু, মান্বে, মান্বে একদিন, মান্তে হবে। এদেশের হিন্দুর ছেলে ত! হাজার হাজার বছরে যা গড়েছে, দুদিনে তা উল্টে যেতে একেবারে পারে না। উল্টো পাকে যতই পাক খেয়ে বেড়াও, ঘুরে আবার এই খাতে এসে যদ্দিনে হ'ক প'ড়্‌তেই হবে।"

হাসিমুখেই সুকেশ কহিলেন, "তা প'ড়তে যদি হয়ই—যখন হবে প'ড়্‌ব। তবে আজ ত—"

"হাঁ, জানি, উল্টো পাকে ঘুরছ। তা ঘোর, পাকটা যদ্দিন ঘোরায়। একটা মাতলামো নেশায় মশগুল হ'য়েও পড়ে র'য়েছ—মনটা ফিরতে চায় না, জোর ক'রেও কেউ ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না। তা সে যাক গে, হাঁ, সত্যি ব'ল্‌ছি, বাবা, উল্টো ঐ পাকটা এত বেশী জোরাল ঘোরাল না থাক্, আমাদের আমলেও ছিল, ত আমাকে টান্‌তে পারে নি। আমি মানি, বরাবরই মেনে আস্‌ছি। বাড়ীতে পালপার্ব্বণ ক্রিয়াকর্ম্ম সব—আচার নিয়ম পুরুষাক্রমে যেমন চ'লে আস্‌ছে সেইভাবেই হ'চ্ছে—মান্‌তেই শিখেছি—মানাটা মনের একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে। এই যে কাণ্ডটা হতভাগা ক'রেছে—এটাকে আমাদের ধর্ম্মে বল, কি কুলাচারে বল, সত্যিকার একটা বিয়ে ব'লে কিছুতেই আমি স্বীকার ক'রে নিতে পারি না। ঐ মেয়েটা—হাঁ, মেয়েটা ভাল, খাসা লক্ষ্মী মেয়ে—তা সে যতই ভাল হ'ক, পুত্রবধূ—আরও জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ ব'লে ঘরে ওকে এনে আমার এই কুলবংশের ধর্ম্ম, তার মর্য্যাদা আমি নষ্ট ক'রতে পারি না। ঐ ছেলেটা—না না, আমার বংশধর ব'লে ওকে গ্রহণ ক'রব, আমার পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ড ওর ঐ হাতে ও দেবে—না, সে হ'তেই পারে না। বিয়ে!—এও কি আবার একটা বিয়ে না কি? কি ওরা ক'রেছিল—কিছু একটা ক'রেছিলই কি না, তাই বা কে জানে?"

সুকেশবাবু কহিলেন, "অনুষ্ঠান—তা শাস্ত্রমত একটা হ'য়েছিল বই কি? ওর বাবা দ্বারকানাথবাবুকে জানতাম, শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন, শিক্ষকতাও ওখানে ক'রতেন—"

"তার মাথা ছিল! মাথা ক'রত! শিক্ষিত ভদ্রলোক! কোথাকার একটা ছোকরা গিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল—মেয়েকে তার সামনে বের ক'রে আলাপ করাল, গান বাজনা শুনিয়ে ভোলাল—তার পর সে ব'ল্লে বিয়ে দেও, আর অম্‌নি তার হাতে মেয়ে দিয়ে দিল—একটিবার খোঁজ খবর নিল না, ছোকরাটা কে, কোত্থেকে এল, আদবে বামুনের ছেলেই কিনা!—এও কি ভদ্রলোক কেউ করে? শিক্ষিত—হাঁ, আজকালকার শিক্ষিত তোমরা যাদের বল, বুদ্ধিভ্রষ্ট তাদের অকরণীয় কিছুই নাই। তবে ভদ্রলোকের কাজ—হিন্দু কোনও সামাজিকের কাজ—এ নয়। আর এই রকম একটা হতভাগার মেয়ে—এইভাবে আমার ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে—তাকে আমার কুলবধূ ব'লে ঘরে আনব আমি!—"

"হাঁ, অবিশ্যি কাজটা ঠিক ভাল হয় নি—"

"ভাল হয় নি!—কেবল ভাল হয় নি? অতি জঘন্য একটা কাজ হ'য়েছে—ম্লেচ্ছের ঘরেও যা কেউ কখনও হজম ক'রে নিতে পারে না। অনুষ্ঠান! শাস্ত্রমত কি অনুষ্ঠানটা ওরা ক'রেছিল? নান্দীমুখটা পর্য্যন্ত হয় নি।—আমার ঘরের ছেলে—জ্যেষ্ঠপুত্র—এক গণ্ডূষ জল পেয়ে নান্দীমুখ হ'য়ে পিতৃপুরুষরা ফিরে চাইলেন না—একেও শাস্ত্রমত অনুষ্ঠান কেউ ব'লতে পারে? আর ওর এই প্রথম

বিয়ে—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অধিকারী ও নয়, ওর পিতা আমি।—সেই পিতা আমি ঘুণাক্ষরেও একটু জান্‌তে পর্য্যন্ত কিছু পারলাম না—এও আবার শাস্ত্রমত অনুষ্ঠান? আর হিন্দুর ছেলের বিয়ে—কেবল শাস্ত্রাচারই তার আচার নয়। কুলাচার আছে; দেশাচার আছে, স্ত্রী আচার আছে—সব মিলে তবে একটা বিয়ে সিদ্ধ হয়।—কোন্‌টা এ অনুষ্ঠানে হ'য়েছে, অনুষ্ঠান সত্যি যদি কিছু হ'য়েই থাকে? নিজের নামটা বাপ পিতেমোর নামটা পর্য্যন্ত, শুনেছি ঠিক ব'লে নি—মন্তর যদি কিছু প'ড়েই থাকে!"

সুকেশ কহিলেন "বুঝ্‌তে পারছি সবই। বড় একটা ভুলই ক'রে ফেলেছিল বিরিঞ্চি—"

"তা সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি এখন ত ক'র্‌তে পারি না!—আর সে প্রায়শ্চিত্ত মানে আমার কুলবংশের, ধর্ম্মে, মর্য্যাদায়, একদম জলাঞ্জলি! তবু যদি হতভাগা আগে আমাকে একটিবার জানাত, দেখতাম, তখন ভেবে চিন্তে খোঁজ খবর দিয়ে দেখ্‌তাম, ঐ মেয়ে আমি ঘরে আনতে পারি কি না। ওরা রাঢ়ী আমরা বারেন্দর—তা হ'ক্, তবু বামুন ত। আর বোকা স্কুল-মাষ্টার—আজকালকার কন্যাদায়—লোভে প'ড়ে বেকুবী যাই ক'রে থাক্, ভদ্রলোকও ছিল বটে, ভদ্রসমাজেও চ'ল্‌ত ফির্‌ত। কিন্তু এখন—কি ক'র্‌তে পারি আমি?"

"হাঁ, সমস্যাটা—খুব শক্ত হ'য়েই দাঁড়িয়েছে বটে।"

"শক্ত ব'লে শক্ত? কিনেরা আর কিছু হ'তেই এখন পারে না। ঐ বৌমাটি—আদর ক'রে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেছি, এখন একটা সতীন এনে তার ঘাড়ে গছাতে পারি? আর এক সঙ্গে দুটো বৌ নিয়ে সংসার—সে আর আজকালকার দিনে চলে না। বেয়াই ললিতকেই বা জবাব দেব কি? সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ে খুঁৎখুতি যা আছে, সে ত আছেই—তা ছাড়া সাংসারিক ভালমন্দের বিবেচনার দিক দিয়েও এই পণ নিয়ে আমাকে এখন দাঁড়াতে হবে যে ওর এই বিয়েটা অসিদ্ধ। বিরু গোলমাল ক'র্‌বে, গিন্নীও সহজে এক কথায় ছাড়বেন না। ঐ মেয়েটার মা র'য়েছে কাশীতে ছেলেটাকে নিয়ে—আমার খুড়ীমার বাড়ীতে রেঁধে খায়। সেও ঐ ছেলেটাকে নিয়ে এসে মহা হাঙ্গামা একটা বাধাবে। আবার ঐ ছুঁড়ীটা পালিয়েছে, কার বুদ্ধিতে কি ক'রবে জানি না। কিন্তু উপায় নাই, ঐ এক খোঁটা ধ'রেই শক্ত হ'য়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে, এ বিয়েটাই অসিদ্ধ, বৌ ব'লে ওকে ঘরে আনতে পারি না। হাঁ, সহজে মুখের কথায় ওরা নিরস্ত কেউ হবে না। অগত্যা শেষে একটা declaratory suit এনে আদালতেই এ বিবাহের অসিদ্ধতা সাব্যস্ত করাতে হবে। সেটা—অবিশ্যি আমি নিজে পারব না, করাতে হবে ঐ ললিতকে দিয়ে। নিজের গরজেই সে তা ক'র্‌বে, তলে তলে আমার জোর যদি পায়।—তবে অতদূর বোধ হয় যেতে হবে না, ভয় দেখালেই সবাই ঠাণ্ডা হবে। প্রকাশ্য আদালতে এই অবৈধতার একটা ঘোষণা—কেউ ওরা চাইবে না। বৈধতার চাইতে অবৈধতার দিকেই আইনের জোর বেশী আছে, লড়তে ভরসা পাবে না। আর লড়বে সে ক্ষমতা কার কি আছে?"

ধীরে ধীরে সুকেশবাবু কহিলেন, "হুঁ—এ ছাড়া—সত্যি আর কোনও পথও দেখা যাচ্ছে না এই সঙ্কটের একটা কিনেরা যাতে হ'তে পারে।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "ঐ মেয়েটা—সত্যি ব'লছি, বাবা, বড় একটা দুঃখও তার জন্যে হ'চ্ছে। কিন্তু কি ক'র্‌ব? আমার আর উপায় নাই। বাপটা ছিল আস্ত বলদ, আর ঐ হতভাগাও অতি বড় একটা জঘন্য ঠকামো ক'রে এই সর্ব্বনাশটা তার ক'রেছে। তা আমি তার জন্যে বংশেও একটা গ্লানি আন্‌তে পারি না, সংসারটাও উচ্ছন্ন দিতে পারি না। তবে অন্য ব্যবস্থা যা দরকার—সব ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। বার হাজার টাকা তাদের নামে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছি; না হয়, বিশ হাজার, পঁচিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, কি পঞ্চাশ হাজারই—যা তোমরা বল, যাতে তারা খুসী হয়, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারে—দেব। কিন্তু সিদ্ধ বিবাহে আমার পুত্রবধূ আর পৌত্র ব'লে গ্রহণ ক'র্‌তে তাদের পারব না।"

"তা যদি না পারেন, তবে আপনার অর্থ সাহায্য সে নেবে এমন ত মনে হয় না।"

"নেবে না?"

"মনে ত হয় না। আপনি জানেন না, মেয়ে বড় তেজী।"

"হুঁ—! তা দেখা যাক্। চেষ্টা যদ্দুর ক'র্‌বার ক'রে দেখ্‌ব। না নেয় কি ক'র্‌ব? টাকা থাক্‌বে, এই ছেলেটা বড় হ'য়ে উঠলে—কে জানে সে হয় ত তখন নেবে। তা

সে যাই হ'ক্, আমার যেটা করা এ অবস্থায় উচিত, সেটা ত আমাকে ক'র্‌তেই হবে। দায়িত্বটা—না, আমি এড়াতে পারি না, এড়াতে চাইও না। ওদের সঙ্গে এই জানাশুনা একটা হয়ে আর অবস্থাটাও সব বেশ বুঝ্‌তে পেরে, এই দায়িত্বটা অতি গুরু ব'লেই বরং এখন অনুভব ক'রছি।"

"সে ত বটেই। সে কিছু নিক না নিক, আপনার দিক্ থেকে এই রকম ভাল একটা provision তাদের জন্যে করা হলে বিরু আর বিরুর মা, তাঁরাও অনেকটা ঠাণ্ডা হবেন। আর লতার মাও—অবস্থাটা সব বুঝে নরম কিছু হ'তে পারেন। আর না হ'য়েই বা ক'র্‌বেন কি? আদালতে গিয়ে প্রকাশ্য একটা কেলেঙ্কারী শেষে হবে—এটা কি আর চাইতে পারেন?"

"হুঁ—হুঁ—ঠিক কথা বলেছ বাবা! provisionটা এক্ষুণি ক'রে ফেল্‌তে হচ্ছে। পঞ্চাশ হাজারই দেব। কালই বাকী আটত্রিশ হাজার টাকা ঐ ব্যাঙ্কে ওদের নামে ডিপোজিট্ ক'রে রাখব। এদিকে ললিতের সঙ্গেও পরামর্শটা আজই ক'রে ফেলি। শুনলেই ত আমাকে মার্‌তে উঠ্‌বে। তা গায়ে হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে নিতেই হবে। না হ'য়েই বা ক'র্‌বে কি? মেয়ে ত আর ফিরিয়ে নিতে পার্‌বে না। আমি যে তার মেয়ের ভাল চেয়ে নিজেই আগু হ'য়ে গিয়ে এই বুদ্ধি তাকে দিচ্ছি, এটা বরং বড় একটা অনুগ্রহের খাতির ব'লেই শেষ গণনা কর্‌বে। তবে আর একটা কথা হ'চ্ছে কি বাবা—"

"কি, বলুন।"

"মেয়েটা কোথায় পালিয়ে গেল—এদিকে এই সব আট-ঘাট বেঁধে সবাইকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে ফেল্‌তে পার্‌বার আগে ঠিকানা ওরা খোঁজ না পায়, দেখা সাক্ষাৎ না গিয়ে ক'র্‌তে পারে। তা হ'লে কে জানে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়াবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্ততঃ এই সব ব্যবস্থা ক'রে সবাইকে কিছু ঠাণ্ডা ক'রে ফেল্‌ব ভরসা যে করছি, সেটার পথেও বহু বিঘ্ন এসে হয়ত উপস্থিত হবে। এই রকম একটা মীমাংসায় আস্‌তেই আমাকে হবে—তবে সহজে হয়ত পারব না—বেশ কিছু বেগ আমাকে পেতে হবে। তোমাকে এ বিষয়ে একটু সাহায্য আমাকে ক'র্‌তে হবে। বহু লোকজন হাতে আছে, ফন্দি-সন্দিও ঢের জান। আমার প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের কাজটা তোমাকেই হাতে নিতে হচ্ছে, আর কাউকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না।"

সুকেশবাবু একটু হাসিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে হইতেছিল লতার সন্ধান যে তিনি পাইয়াছেন, তাঁহার আশ্রয়ে নিয়া তাহাকে রাখিয়াছেন, এ কথাটা গোপন রাখা ঠিক হইবে না। আজ হউক, কাল হউক, জানিতে ইনি পারিবেনই।—তখন নানা রকম সন্দেহ ইঁহার মনে হইবে। ভাবিবেন, কিছু একটা মতলব তাঁহার ছিল, যাহাতে কথাটা গোপন তিনি রাখিতে চাহিয়াছেন। তারপর এখন সন্ধানের ভার তাঁহার হাতে ইনি দিতেছেন, নিতেও তাঁহাকে হইবে। সুতরাং গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা, বুদ্ধিমানের কাজও তাহা হইবে না।—জীবনের মত ইঁহার বিশ্বাস তাঁহাকে হারাইতে হইবে। একটু হাসিয়া তাই কহিলেন, "সন্ধান আমি পেয়েছি, আমারই হেফাজতে সে এখন আছে।"

"বটে! বল ত সব শুনি—কি ক'রে কি হ'ল?"

সব কথা সুকেশবাবু খুলিয়া তখন তাঁহাকে বলিলেন।

"বাঃ! চমৎকার হ'য়েছে! ঠিক যেমনটি হ'তে হয়!—অবিশ্যি চালচক্র যা ক'রছি, তাতে ব'ল্‌তে নেই এমন কথা—তবু মন ভ'রে উঠছে ভগবানের অপার দয়া!—সে যাই হ'ক বাবা, যে ভাবে পার ওকে আটকে তোমাকে আপাততঃ রাখতেই হবে। আর ওর মার সঙ্গে ও না communication (খবরাখবর) কিছু ক'রতে পারে—যদ্দিন না আমার কাছ থেকে instruction (নির্দ্দেশ) একটা কিছু পাও। তার সঙ্গে বোঝা-পড়া যা হয় একটা করে আমাকে নিতেই হবে, চেপে কিছু আর রাখ্‌তে পারব না। তবে সেটা ক'রে নিতে চাই, ওর সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ কি খবরাখবর একটা কিছু হবার আগে। অন্ততঃ এই সংবাদ দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আমার যা কথা—সেটা formally (বিধিমতভাবে) আমিই তাকে জানাতে চাই আগে।"

সুকেশবাবু কহিলেন, "সেটা দেখ্‌ব চেষ্টা করে—তবে পেরে উঠক কিনা ঠিক বুঝতে পারছিনি।—মেয়েটি যেমন তেমন একটা তুচ্ছ করবার মত মেয়ে নয়। দেশেও আভাস কিছু কিছু পেয়েছি। কিন্তু থানার সব ঘটনা কোর্টে দারোগাবাবুর কাছে যা শুন্‌লাম, আর নিজেও আলাপে যেটুকু পরিচয় ওর পেলাম, তাতে একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে

গেছি। ও যে কত বড় তেজী মেয়ে, অতি বড় বিপদের সাম্‌নেও কেমন শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, নিজের ইজ্জৎ-বোধ কতখানি আছে, আর বুদ্ধি কতটা রাখে, সে আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না! ওকে handle করা—সে অতি হিসেব ক'রে, অতি সতর্ক না হ'য়ে কেউ ক'র্‌তে পার্‌বে না।"

বলিয়া দিনের সব ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটা দিলেন। শুনিয়া হরমোহনবাবু চিন্তিত ভাবে নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, "হুঁ! তা যা ব'ল্লে—handle করা ওসব শক্তই হবে বটে। তা তুমিও ত নেহাৎ কাঁচা ছেলে নও—পারবে না?" বলিয়া অতি তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুকেশের দিকে চাহিলেন।

"তুমিও পার্‌বে না?"

একটু হাসিয়া সুকেশ কহিলেন—"ভাবছি ত—দেখি, যদ্দূর পারি। না পার্‌লেই বা চ'ল্‌ছে কই? তবে একটা বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই বিয়েটা সিদ্ধ ব'লে স্বীকার ক'রে যদি না আপনারা নেন, আর সত্যি যদি এমন কোনও বাধা উপস্থিত করেন যা লঙ্ঘন করা তার পক্ষে সম্ভব হবেনা—এটা যদি সে বুঝতে পারে, তবে বিরিঞ্চি তার কাছেও ঘেঁস্‌তে পারবে না, খোঁজ যদি পায়ও। আর provision যত liberallyই করুন, আপনার কি বিরিঞ্চির একটি পয়সাও সে তার হাতে ছোঁবে না।"

"বটে! কি ক'র্‌বে ঐ ছেলেটাকে নিয়ে—?"

"জানি না। দেখি, আজ সন্ধ্যেয় একবার আলাপ ত গিয়ে করি। কি ভাব্‌ছে সেটা ত বুঝি। তারপর যখন যেমন দরকার আপনাকে জানাব।"

"আচ্ছা এস তবে আজ। আমিও এদিকে যা ক'র্‌বার ক'রে ফেলবার চেষ্টা দেখি।" ক্রমশঃ

কলোন

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এ

ভ্রমণ

২৩শে জুলাই সকালবেলা প্রাতরাশ খেয়ে প্যারিস নর্দ (উত্তর) ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া গেল। আগের দিন ডক্টর সুরেন দাসগুপ্ত মার্সেলের অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। তাঁর জাহাজ ২৫শে শনিবার। তাঁকে বিদায় দিতে সত্যই মন কেমন করছিল। লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে সময় কেটেছিল আনন্দে। আজ বিদায় বেলায় সে কথা মনে হতে লাগলো দুঃখের সঙ্গে। আরও দুঃখ হলো এই কারণে যে তিনি দেশে ফিরছেন, আমার ভাগ্যে সে শুভযাত্রার তখনও বহু বিলম্ব আছে এই মনে করে।

প্যারিস থেকে মিস্ অরুণা বসু (ব্যারিষ্টার ৺আই বি সেনের ভাগিনেয়ী) আমার সঙ্গে জার্মাণীর অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেই চীনা ভদ্রলোক মিঃ লীন ও তাঁর পত্নী ষ্টেশনে এসে আমাদের বিদায় অভিনন্দন করলেন। এঁরা বযয়ে কোনও আধুনিক জাতি অপেক্ষা যে চীনারা নিকৃষ্ট নয়, তাই সবচেয়ে বেশী মনে হতে লাগলো। আজ এই চীন জাপানের যুদ্ধে যখন খবরের কাগজে পড়ি যে জাপানীরা অযুধ্যমান নিরীহ চীনা নর-নারী এবং শিশুদের উপর বোমা নিক্ষেপ করছে, তখন মনটা সেই বন্ধুদের কথা স্মরণ করে' বেদনায় টন্‌টন্ করে' উঠে।

আমার কল্পনা ছিল ব্রুসেলস্ হয়ে জার্মাণীতে যাব, কিন্তু পাছে জার্মাণী দেখা তাড়াতাড়িতে সারতে হয়, এই জন্য সে সংকল্প ত্যাগ করেছিলাম। আমি লীজের (Leige) পথে কলোন গিয়েছিলাম। বেলজিয়মের মধ্য দিয়ে যাবার সময় মনে পড়লো মহাযুদ্ধে এই ক্ষুদ্র দেশটির দশা কি হয়েছিল! যতদূর দেখা গেল, তাতে অবশ্য ধ্বংসের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। ব্যবসা বাণিজ্য যে জাতির প্রধান অবলম্বন, সে জাতির অর্থ সঞ্চয় করতেও বেশী বিলম্ব হয় না, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাতেও তার বেশী বেগ পেতে হয় না।

আমাদের মত গরীব দেশের হলে’ কত যুগ কেটে যেতো অবস্থা ফেরাতে! —

আমরা ৮টার এক্সপ্রেসে প্যারিস ছেড়েছিলাম। বেলা প্রায় ৩টার সময় বেলজিয়মের সীমানা পার হয়ে জার্মাণ-রাজ্যে প্রবেশ করলাম। যেখানে এই সীমানা পার হওয়া যায়, তার নাম আকেন (Achen) কিন্তু এটি জার্মাণ নাম। প্রচলিত নাম এক্স লা শ্যাপেল (Aix la Chapelle); ফ্রান্সের সীমানা পার হ’বার সময় শার্লিরয় ষ্টেশনে বেলজিয়মের পুলিশ আমাদের গাড়ীতে উঠেছিল, পাসপোর্ট দেখেছিল, বাক্সে কি আছে অর্থাৎ ট্যাক্সের উপযুক্ত কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু সে পুলিশের চেহারাতে বিশেষত্ব কিছু ছিল না। আকেনে যখন এলাম, তখন জার্মাণ পুলিশ নীল সার্জের পোষাক পরে’ সব গাড়ীতে উঠ্‌লো। তাদের চালচলনে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকের মুখে যেন একটা সংকল্পের ভাব (determination)। যে কাজটি করবে, তারা সেটা করবেই, এই রকমের ধারণা জন্মে তাদের দেখলে। কার কাছে কত অর্থ আছে, সেটা ষ্টেশনে নেমে অফিসে গিয়ে দেখিয়ে আসতে হলো। একজন আমেরিকান প্রায় ৩।৪শ পাউণ্ডের রেজিষ্টার্ড মার্ক নিয়ে যাচ্ছিলেন; তাঁকে নিয়ে দেখলাম ওরা খুব ধস্তাধস্তি করলো। অনেক কষ্টে সে বেচারী তার পাসপোর্ট ফিরে পেলেন।

আকেন থেকে কলোন পর্য্যন্ত ষ্টেশনগুলিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্যারিস থেকে আসবার পথে মাঝে মাঝে পাহাড়ের শ্রেণী, সুতরাং দৃশ্য সবখানেই সুন্দর। কিন্তু ষ্টেশনগুলির শ্রী আমার চোখে পড়লো—জার্ম্মাণ রাজ্যে প্রবেশ করে’। ওরা ষ্টেশন শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা নয়, ফুলগাছ লতা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে রাখাও পছন্দ করে। আমাদের দেশে কেন এমনটি হয় না, তাই ভাবতে লাগলাম। ষ্টেশন-মাষ্টারের রুচি অনুসারে কোনও কোনও ষ্টেশন অল্পবিস্তর সাজানো হলেও আমাদের দেশের প্রায় ষ্টেশন অত্যন্ত বিশ্রী। রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যদি পুরস্কার ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করে’ এই বিষয়ে ষ্টেশন মাষ্টারকে অবহিত হতে বলেন, তাহলে সব না হোক অনেকগুলো ষ্টেশন সুশ্রী হ’তে পারে।

বেলা ৪টায় কলোন পৌঁছুলাম। ষ্টেশনটি বড়। এর গঠনপ্রণালীও একটু স্বতন্ত্র রকমের। দেখলে বেশ সম্ভ্রম আসে মনে। ষ্টেশন থেকে নেমে প্রথমে আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হোটেলে গেলাম। তার নাম Baseler Hof Hospiz. আগে শুনেছিলাম যে Hospizগুলি Y. M. C. Aর মত। কিন্তু দেখলাম হোটেল-ই। এ হোটেলের একটা সুবিধা এই ছিল যে ষ্টেশন কাছে, রাইন নদী কাছে, গির্জা কাছে। কলোনের গির্জা (Cathedral) পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। বস্তুতঃ গির্জা (Domo) এবং জল (Eau de Cologne) এই দুইটির জন্য কলোন জগতে প্রসিদ্ধ হ’য়ে আছে।



কোনিগ্‌স উইণ্টার

কলোনের গির্জা যে কত বড় এবং কত সুন্দর, তা বুঝানো কঠিন। পাথরে বাঁধানো উঠানের তিনধারে রাস্তা। সে রাস্তায় ট্রাম, মোটর চলে; রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেছে, তার পরেই গির্জার প্রকাণ্ড প্রবেশ দ্বার। গির্জার ভিতর গিয়ে খুব বড় বলে মনে হলো না। কিন্তু কারুকার্য্য

অতি সুন্দর। ভিতয়ের চিত্রগুলি বহু গুণী শিল্পীকর্ত্তৃক অঙ্কিত। যীশুকে ক্রোড়ে নিয়ে মেরীর ছবিটি অতি চমৎকার। রাস্তা থেকে গির্জ্জাটির চূড়া প্রায় ৫৫০ ফুট উচু! দক্ষিণের চূড়ায় আরোহণ করবার ব্যবস্থা আছে এবং উপর থেকে অতি সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়। গির্জ্জার আয়তন মোটামুটি লম্বা ৪৫০ ফুট এবং চওড়া ১৫০ ফুট। এর ভিত্তি পত্তন হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং গঠনকার্য্য সমাপ্ত হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে।

আমরা যখন গির্জ্জায় প্রবেশ করি, তখন বিকালবেলা,



রাইন নদীর তীরে কলোনের চূড়া

উপাসনা হচ্ছিল। যাঁরা উপাসনায় যোগদান করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। গির্জ্জার প্রশস্ত কক্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র তাঁরা অধিকার করেছিলেন। জার্ম্মাণীতে যে খৃষ্ট ধর্মের প্রভাব খুব কমে গেছে, সেই কথাটি মনে হলো। গির্জ্জা থেকে বেরিয়ে এক পাহারাওয়ালার ছবি তোলবার চেষ্টা করা গেল। মিস বসু এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী বলে' খ্যাতি আছে। জার্ম্মাণীর পুলিশের মাথায় উচ্চ সোনালি বা রূপালি ক্রেষ্ট থাকাতে খুব জমকালো দেখায়। যেন বা সেনাপতি ভোন মল্‌কে (Von Maltke) স্বয়ং উপস্থিত। ইংরেজ পুলিশের চেয়েও যেন এরা গম্ভীর ও মজবুত। ইংরেজ পুলিশের বেশ কিন্তু মোটেই জাঁকালো নয়। জার্ম্মাণীতে এক লক্ষ পুলিশ ফৌজ আছে। এই পুলিশ মহাযুদ্ধের পর থেকে একটি রীতিমত সৈন্যদলরূপে গঠিত ছিল। ব্রিটিশ কমিশন যখন এ-তে আপত্তি করেছিলেন, তখন জার্ম্মাণরা নাকি বলেছিল যে ও-রা অর্থাৎ পুলিশ-ফৌজ একান্তই অ-সামরিক (Civil) শান্তি-রক্ষীর দল (Purely a civilian police force); ইংরেজ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সেই কথায় বিশ্বাস করলেন। কিন্তু এখন সে মুখোসও আর নেই। এখন জার্ম্মাণীর সমস্ত পুলিশ-ফৌজ সামরিক সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত।

কলোন কথাটি জার্ম্মাণরা 'কোল্‌ন' (Koln) রূপে উচ্চারণ করে। বহুদিনকার পুরাতন সহর এটি। রোমানরা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই সহর অধিকার করে। মধ্যযুগে কলোন জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান নগরী হয়ে উঠেছিল। মহাযুদ্ধের পরে এর আয়তন আরও বেড়ে উঠেছে। এখানে একটি ছোট বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মহাযুদ্ধের পরে শান্তি (Treaty of Versailles) হবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয় নূতন করে' গঠিত হয়েছিল (১৯১৯)। এখন এর ছাত্রসংখ্যা ছয় হাজারেরও উপর। ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবেও কলোন জার্ম্মাণীর মধ্যে একটি বড় সহর। কিন্তু প্রাচীন সহরগুলির মত এর রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত।

এর সব ত্রুটী দূর করে দিয়েছে রাইন নদী। রাইন নদী এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত। নদীটি যেমন সুন্দর, নদীর তীর থেকে গির্জ্জাসমেত কলোন সহরটিও তেমনি সুন্দর দেখায়। আমরা এই নদীর তীর ধরে' বহুদূর বেড়াতে গিয়েছিলাম! কেল্‌টিক রেন (Rhen) শব্দ থেকে রাইন এই সুন্দর নামটির উৎপত্তি; রেন শব্দের অর্থ—যা বয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন যে উর্ম্মিলা নামটি তাঁর বড় ভাল লাগে। আমারও তেমনি রাইন নামটি ভাল লাগে। নদীটি যে খুব বড় তা নয়। কলোনে ওর বিস্তৃতি ৪৫০ গজের কিছু বেশী। কলিকাতার নীচে গঙ্গার চেয়ে ছোট। রাইনের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতি বোধ হয় আধ মাইলের বেশী নয়। সেখানে আবার অনেকগুলি দ্বীপ হয়ে নদীর জলকে বিভক্ত করে' দিয়েছে।

এই রাইন নদী জার্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী এবং জার্মাণীর গৌরব। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে জার্মাণী অত্যন্ত কৃশ হয়ে' পড়েছিল। পৃথিবীর বড় বড় রাজশক্তি তাকে খর্ব করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন। ভেয়ারসাইয়ের সন্ধির সর্ত্ত দেখলেই সে কথা মনে না হয়ে' পারে না। কিন্তু জার্মাণী যখন তার বাণিজ্য ও শ্রমিক শিল্পের সুব্যবস্থা করে' দ্রুত উন্নতির সোপানে আরোহণ করলো, তখন তার প্রথম কাজ হলো রাইন উপত্যকা পরকীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করা (demilitarise)। কাউকে কিছু না বলে', সন্ধির সর্ত্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, একদিন বেশ দম্ভসহকারে রাইন উপত্যকায় যত বিদেশী সৈন্য ছিল, জার্মাণী তাদের লোটা কম্বল নিয়ে ভালয় ভালয় প্রস্থান করতে আদেশ করলো! আমি জার্মাণীতে যাবার বোধ হয় ছ'মাস কি আট মাস আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। এখন রাইন উপত্যকা বিদেশী প্রভাবমুক্ত। সুতরাং আমি গিয়ে জার্মাণীর স্বচ্ছন্দ ভাবটিই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় ষ্টেশনের ঠিক বিপরীত দিকে খেতে গেলাম। দেখলাম হোটেলটি জনাকীর্ণ। যারা পরিবেশন করছে, তাদের দেহের পরিধি দেখে আমার লজ্জা বোধ হতে লাগলো। তাদের কেহই বোধ হয় কুড়ি ষ্টোনের (৩॥ মণ) কম হবে না। ভাবলাম যে হয়ত আমাকে দেখে ওরা অবজ্ঞাই করবে। সময়টা তখন গ্রীষ্মকাল। দেখলাম সকলের পরিধানে পাতলা কাপড়ের পোষাক। বোধ হয় ফ্লানেল বা টুইড্। আর সব পুরুষগুলির মাথা প্রায় কামানো। মাথার উপরে কয়েকগাছি চুল, আর সব প্রায় নির্মূল। ফ্রান্সে যেমন সর্বত্র হাসি খুসী, গল্প গুজব কলরব, এদের দেশে কিন্তু সবাই যেন গম্ভীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইয়ুরোপের শান্তির পক্ষে এ দৃশ্যটি আমার আশঙ্কাজনক মনে হলো। কিন্তু খেতে দিল ভাল; রান্নাও বেশ। খুব যত্ন, খুব ভদ্রতা, কিন্তু তার অনুপাতে বেশী দিতে হলো না। মদ্য-পানের জন্য কোনো অনুরোধ নাই। পান না করলে ট্যাক্স দিতে হয় না।

কলোনের সর্ব্বাপেক্ষা পরিচয় তার জল অর্থাৎ ও-ডি-কলোন। আমাদের দেশের সুদূর পল্লীতেও জ্বরঘোরে লোকে ও-ডি-কলোন খোঁজে। সম্প্রতি বরফের থলীতে ও-ডি-কলোনকে কিছু হটিয়া দিলেও ও-ডি-কলোনের অপ্রতিহত প্রভাব বল্‌তে পারা যায়। যাঁরা সেই দুঃখের দিনে মস্তকে, কপোলে ললাটে ও-ডি-কলোনের 'হিমকর শীতল নীরহি তিতল' কোমল হস্ত দুইটি বুলিয়ে জ্বরের রাগ কমিয়ে দেন, তাঁদের হাতের গুণ, কি ঐ জলের গুণ, তা অনেক সময়ে বলা কঠিন। কিন্তু জার্ম্মাণীর অর্থভাণ্ডারে কোটী কোটী টাকা ঐ রাইন নদীর উচ্ছলিত জলপ্রবাহের মতই চলে' আসে। যিনি এই স্নিগ্ধকর সুগন্ধি জল প্রথমে শিশি ভরে' চালান দিয়েছিলেন, তাঁর সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ও-ডি-কলোনের অনেক অনুকরণ

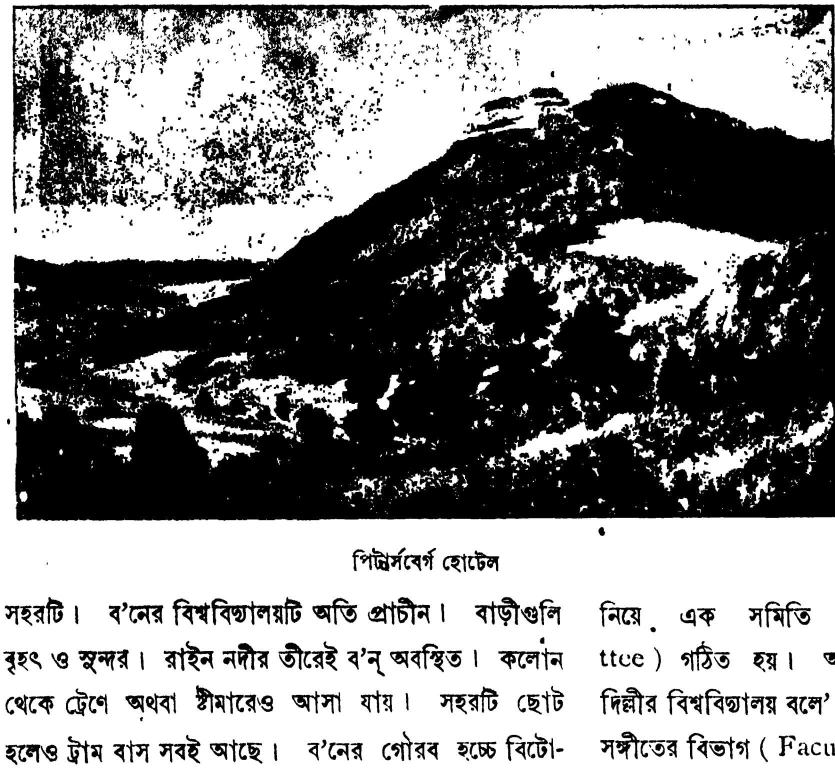


কলোন গির্জার অভ্যন্তর

বেরিয়েছে কিন্তু আসলের ট্রেডমার্ক হচ্ছে ৪৭১১। কেউ কেউ বলেন যে সেই আবিষ্কারক ভদ্রলোক আমাদেরই মত পুত্রকন্যা পরিবৃত সংসারে বাস করতেন। তাঁর ছিল ৪টি ছেলে আর ৭টি মেয়ে। সুতরাং তিনি তাঁর আবিষ্কৃত উদকে সেই দুইটি সংখ্যা এবং তার যোগফল (৪ + ৭ = ১১) জুড়ে' দিয়েছিলেন। কিন্তু এ নিছক তামাসা। বস্তুতঃ কি জন্য তিনি বিশেষ করে' এই সংখ্যাটি দিয়ে ছিলেন, তা বলা যায় না। তবে বোধ হয় তাঁর বাড়ীর নম্বর ছিল

৪৭১১। সেকালে ত রাস্তার নাম সবখানে ছিল না। তাই বাড়ীতে নম্বর দিতে হতো! যাই হোক্, খাস যায়গা থেকে একটি ও-ডি-কলোন নিয়ে আসবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলাম না। যাঁদের জন্তে এনেছি তাঁরা ত খুসী এবং যে রমণীদের কাছ থেকে ও-ডি-কলোনের নানা জয়গান করে' উহা সংগ্রহ করেছিলাম তারাও যে খুব খুসী হয়েছিল এ কথাটা বাড়ীতে না-ই প্রকাশ করলাম।

পরদিন ব'নের (Bohn) বিশ্ববিদ্যালয় দেখে সপ্ত শৈলে (Seven Mountains) যাব স্থির করেছিলাম। টমাস্ কুকের শ্যারাব্যাঙ্ক এসে আমাদের নিয়ে গেল। রাইন পার হয়ে সুন্দর রাস্তায় ২০।২৫ মাইল অতিক্রম করে' ব'ন্ সহরটি। ব'নের বিশ্ববিদ্যালয়টি অতি প্রাচীন। বাড়ীগুলি বৃহৎ ও সুন্দর। রাইন নদীর তীরেই ব'ন্ অবস্থিত। কলোন থেকে ট্রেণে অথবা ষ্টীমারেও আসা যায়। সহরটি ছোট হলেও ট্রাম বাস সবই আছে। ব'নের গৌরব হচ্চে বিটো-ফেনের (Beethoven) জন্মভূমি বলে'। বিটোভেনের বাড়ী রাস্তার ধারেই। আমরা নেমে তার মধ্যে প্রবেশ করলাম। ফটকের ধারে ছবি বিক্রয় করছে—বিটোভেনের ছবি, তাঁর বাড়ীর ছবি, তাঁর জীবনের অনেক ছোট খাটো ঘটনার ছবি ইত্যাদি। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। একটি ঘরে বিটোভেনের মূর্ত্তি রয়েছে, তার পাদ-পীঠে প্রস্তরের অলিভ্‌পত্রের মাল্য। জগতের অনেক স্থান থেকে বিটোফেনের জন্মদিনে স্মৃতিচন্দনার্চিত পুষ্পমাল্য প্রেরিত হয়। বিশ্বের সংস্কৃতির এইটি একটা চিত্তাকর্ষক সাধারণ গুণ বলা যেতে পারে যে গুণের সমাদর সর্বত্র আছে। বিটোফেন অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভায় জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইয়ুরোপীয় সঙ্গীতে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁর 'চন্দ্রালোকে সুরানা' (Moonlight Sonata) এক অপূর্ব কীর্ত্তি। বিটোফেন ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮২৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং বেশী বয়স পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া ছিলেন না। আরও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, এমন যে অদ্বিতীয় সুরশিল্পী বিধাতা শেষটায় তাঁর শ্রবণশক্তি হরণ করে' নিয়েছিলেন। ব'নে গিয়ে একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ দুঃখ হলো যে বিটোফেনের জন্মস্থানের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই। পৃথিবীর কোথায়ও যদি সঙ্গীতের চর্চ্চা থাকা আশা করা যায়, তবে এই ব'ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় কি? এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হলো—বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দিল্লীতে যখন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণকে নিয়ে এক সমিতি (Joint Select Committee) গঠিত হয়। আমি তাঁহাদের অন্যতম ছিলাম। দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় বলে' আমার মনে হয়েছিল যে এখানে সঙ্গীতের বিভাগ (Faculty of Music) থাকা উচিত। আমার সে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।



পিটার্সবের্গ হোটেল

বিটোফেনের ভবন এখন মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে। পিয়ানো, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্র একটি ঘরে রক্ষিত আছে। যতদূর মনে পড়ছে, বিটোফেনের সময়ে যে সকল মহিলা তাঁর ভক্ত হয়ে' উঠেছিলেন, তাঁদেরও ছবি রক্ষিত আছে।

ব'নে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি আছে।

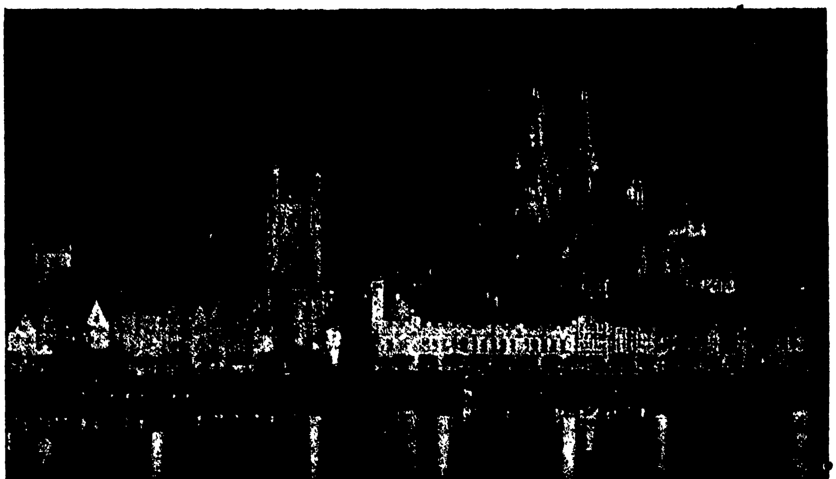
ব'ন্ পেরিয়ে আমরা প্রায় আরও ১৫ মাইল গিয়ে সপ্তশৈলে পৌঁছুলাম।

সপ্তশৈল অতি রমণীয় স্থান। ৭টি পাহাড় নিয়ে এই রম্য উপবন সাজানো হয়েছে। ও-ডি-কলোনের স্বত্বাধিকারী এই সপ্তশৈল কিনেছিলেন এবং একটি পাহাড়ের উপর এক হোটেল নির্ম্মাণ করেছিলেন। তার নাম পিটার্সবের্গ। আমরা প্রায় হাজার ফুট উঠে' সেই হোটেলের পাদমূলে গিয়ে বস্‌লাম। একটি চাঁদোয়ার নীচে বহু চেয়ার ও টিপয় পাতা। এস্থানটি বড় মনোরম; এর নাম কোনিগ্‌স্‌ উইন্টার— সেখানে বসলে বহুদূর দেখা যায়। সে কি সুন্দর দৃশ্য! বাস্তবিক এমন দৃশ্য খুব কমই দেখেছি জীবনে। চারিদিকে পাহাড়ের সারি দূরে দিগ্‌বলয়ে বিলীন হয়েছে। রাইনের রজত রেখা এঁকে বেঁকে বহুদূর চলে' গেছে!

আমরা কফি ও কেক্ ফরমাস্ করলাম বটে, কিন্তু খাবার দিকে আমাদের মোটেই মন ছিল না। যা' হোক্ কোনওরূপে বৈকালিক জলযোগ করে' উঠে আমরা হোটেল দেখতে গেলাম। যা' দেখলাম, তা' বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সমুদ্র তল থেকে এগারশ' ফুট উঁচুতে সেই হোটেলটি, চারিদিকে খোলা। সুতরাং দৃশ্য অতি সুন্দর। তার উপর হোটেলটি এত সুসজ্জিত যে আমি কোনও রাজরাজড়ার বাড়ীও তেমন দেখি নি। অথচ দৈনিক ১২।১৪ মার্ক হলেই সেখানে থাকা যায়। তার মানে এক পাউণ্ড। কিন্তু এ খুব বেশী বলে মনে হলো না। কারণ কার্পেট থেকে আরম্ভ করে' এর আলোর ঝাড় পর্য্যন্ত একেবারে প্রথম শ্রেণীর বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। বিলাসের নানা রকম কল্পনা করা যেতে পারে; কিন্তু রুচির দিক দিয়ে দেখ্‌লে এই পিটার্সবের্গ হোটেলটি বিলাসীদের পক্ষে স্বর্গের ন্যায়, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়।*



নৈশ কলোন নগরী



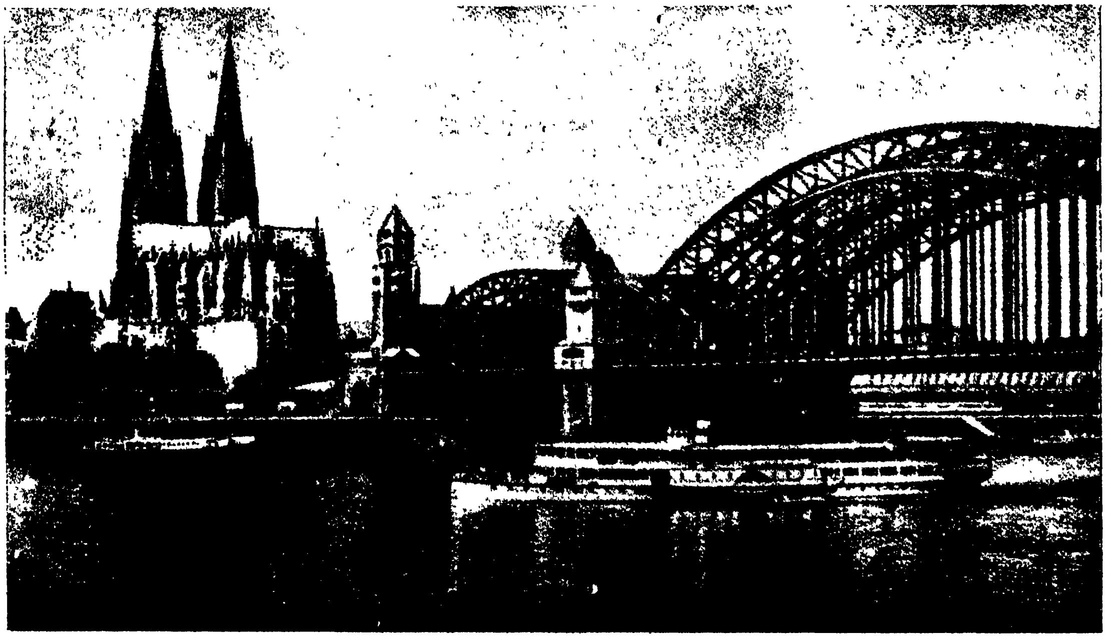
কলোনের বিখ্যাত গির্জা

কিন্তু জার্ম্মাণীতে বেড়াতে গিয়ে শুধু বিলাসের কথা ভাবলে চলবে না। ওদের জাতি যে কি অদ্ভুত শক্তিশালী,

* গত আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বার্লেন্ হের হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এই হোটেলে বাস করেছিলেন। শান্তিপ্রয়াসীর উপযুক্ত স্থান বটে।

তার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের আগে ওরা প্রকাশ্যভাবেই দাবী করতো যে, জগতে ওরা অতিমানব (superman) অর্থাৎ মনুষ্যত্বের উচ্চতম বিকাশ। কিন্তু সে যাই হোক্, আমরা যেটুকু দেখলাম, তা'ও কম বিস্ময়ের বিষয় নয়। পথে যেতে গোডেস্‌বার্গ (Godesberg) † বলে' একটি যায়গা দেখলাম। স্বাস্থ্যের জন্যে এ স্থানটি প্রসিদ্ধ। তারই নিকটে রাইন নদীর শক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করে' ওরা নানাবিধ কলকারখানা চালিয়ে নিচ্ছে। বৈদ্যুতিক তার (Cables) তৈরী করবার বিরাট কারখানা চলছে দেখলাম। মহাযুদ্ধের আগে

এর বিপদ হচ্ছে এই যে, যখন জিনিষপত্র এ পরিমাণ তৈরী হবে যে আর জিনিষের প্রয়োজন হবে না, তখন কল বন্ধ করতে হবে, শ্রমিকদের কর্ম্মচ্যুত করতে হবে এবং দেশ বেকারের হাহাকারে ছেয়ে যাবে। সে সময়ে যুদ্ধই একমাত্র ভরসা। কারণ যুদ্ধ বাধলে আবার মালপত্রের দরকার হবে, আবার লোকজন খাটবে—এবং বলা যায় কি—হয়ত দেশের অর্দ্ধেক লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। সে-ও মঙ্গল। এইজন্য রাজনীতিজ্ঞরা সব দেশে যুদ্ধের বিভীষিকা দেখছেন। যুদ্ধ যে অনিবার্য্য এ কথা সকলেই স্বীকার করছেন। নান্যঃ পন্থা—আর কোনো পথ নেই।



রাইন নদীর সেতু, অদূরে গির্জা

এবং যুদ্ধ যখন চল্‌ছে তখন ওদের কল-কারখানায় যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরী হ'তো দিন রাত্রি। এখনও বোধ হয় তাই হয়। কলে তিনবার করে' (shift) লোক বদলায়। শ্রমিকগণকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এই বাধ্যতা-মূলক শ্রমজীব্যতা জার্মাণীর একটি বৈশিষ্ট্য বলে' মনে হলো। একে বলে compulsory mobilisation of labour. এর ফল আপাততঃ মন্দ নয়। কারণ জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কাউকে ভাবতে হয় না। সকলেই কাজ পায়। কিন্তু

আমাদের সঙ্গে যে গাইড্ ছিল, সে বললো যে জার্মাণীতে কয়লা থেকে শতকরা ১৮ ভাগ তৈল বের করা হচ্ছে। যদি সত্য হয়, তবে খুবই আশ্চর্য্য। জার্মাণীর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। ওরা আর্থিক উন্নতির যে বিপুল ব্যবস্থা করেছে, তাতে খুব শীঘ্র অন্য সমস্ত জাতিকে ওরা পেছনে ফেলে' এগিয়ে যাবে। ওদের ঐ ছোট দেশে (১ লক্ষ ৮২ হাজার বর্গ মাইল) প্রায় ৭ হাজার ফ্যাক্টরী বা কারখানা আছে। আর তাতে ২০ লক্ষ মেয়েপুরুষ খাটে। বোধহয় লোকসংখ্যা ৬৫ লক্ষের খুব বেশী নয়। অর্থাৎ প্রতি ৩জন লোকের মধ্যে একজন শ্রমিক! অদ্ভুত ব্যাপার।

† এইখানে পৃথিবীর দুই প্রধান রাজশক্তির মিলন ঘটেছিল।

এই সকল ভাবতে ভাবতে আমরা অপরাহ্ণ বেলায় ফিরলাম। যাবার সময় ব'নের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, আসবার সময় কোনিগ্‌স্‌উইণ্টার (রাজার শীত) হয়ে এলাম। কোনিগ্‌স্‌উইণ্টার (Konigswinter) রাইন নদীর তীরে অবস্থিত। এ স্থানটিও ঝর্ণার জলের জন্য বিখ্যাত (watering place)। এখানে নেমে আমরা একটি ভূগর্ভস্থিত কুঠুরীতে ঢুকলাম—তার নাম Drachen kellar (Dragon's cellar) অর্থাৎ অজগরের ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে মদ্য। রাইন নদীর দুধারেই দ্রাক্ষা বন—মদ্য প্রস্তুত হয় অঢেল। সে গর্ত্তে ঢুকে দেখি—কুঠুরীটি আঁধার, কিন্তু শূন্যে ঝুলছে একটি অজগর, আর তার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে অগ্নিশিখা। একজন একটা একর্ডিয়ন বাজিয়ে বেজায় চীৎকার ক'রে গান জুড়েছে—যার সৌন্দর্য্য বুঝতে হ'লে আগে নেশা করা আবশ্যক। নানাপ্রকার মদ্য টেবিলের উপর রক্ষিত হলো—যার যা অভিরুচি। কিন্তু কিছু খেতেই হবে—কেন না এ যে ড্রাগনের রক্ত! কবে সে ড্রাগন মারা পড়েছে, তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আজও অসংখ্য নরনারী সেই উপলক্ষ ক'রে মদ্য পান ও হদ্দ আমোদ করছে! সে কি উল্লাস, আর সঙ্গীত আর কলরব! আমরা মাটীর নীচেকার সেই ঘরে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ ক'রে এসেছিলাম।

আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন নৈশ ভোজনের সময় হয়েছে। কাজেই তাড়াতাড়ি হোটেলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার সন্ধানে বেরুলাম। ষ্টেশনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় দেখলাম লাল পতাকায় ষ্টেশন লালে লাল হ'য়ে গেছে। প্রত্যেকটিতে জার্মাণীর বিখ্যাত 'স্বস্তিক' চিহ্ন আঁকা। প্রথমটা মনে হলো যে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অভ্যর্থনার জন্য বুঝি ষ্টেশন সজ্জিত করা হয়েচে। কিন্তু তার পরই মনে পড়লো যে অলিম্পিক খেলাধূলার উৎসবের ত আর বিলম্ব নেই। এ তারই অনুরাগ-রঞ্জিত আগমনী। জার্মাণী তার সমস্ত হৃদয়ের সঞ্চিত অনুরাগ দিয়ে এই উৎসবের ব্যবস্থা করেছিল।

রাইন নদীবক্ষে

শুনেছিলাম যে রাইন নদীর উপত্যকার মত সুন্দর দৃশ্য ইয়ুরোপের বহু স্থানে নেই। তাই সংকল্প করেছিলাম যে, সেইটি দেখতে হবে। আমরা ইচ্ছা করলে কলোন থেকেই ভোরে যাত্রা করতে পারতাম। কিন্তু হয়ত ষ্টীমারে বেশীক্ষণ বাস করা ভাল না লাগতে পারে, তাই স্থির করেছিলাম যে, কলোন থেকে ট্রেনে করে' কোব্লেঞ্জ গিয়ে সেখানে ষ্টীমারে চাপ্‌বো। অতএব সকালে ১০-৫২ মিনিটের ট্রেনে কলোন ছাড়া গেল।



সপ্ত শৈল

কোব্লেঞ্জ কলোন থেকে ৬০ মাইল পথ। কিন্তু সেটা যে এত অল্প সময়ে অতিক্রম করতে পারবো তা বুঝতে পারি নি। কোব্লেঞ্জে যে এসেছি তা প্রথমটা ঠিক করতে পারি নি। শেষে তাড়াতাড়ি কোনওরূপে নেমে পড়লাম। ষ্টেশনটি বড় নয়। কাজেই ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নদীতীরে যাওয়া গেল। কলোন যেমন নদী তীরেই অবস্থিত, কোব্লেঞ্জ ষ্টেশনটি সেরূপ নয়।

নদীতীরে কতকগুলি বড় বড় হোটেল আছে। ওপারে পাহাড় সবুজের ঢেউ খেলে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে গেছে। দৃশ্যটি ছবির মত। কিন্তু উপভোগের সুযোগ পেলাম না। বৃষ্টি আরম্ভ হলো আমাদের দেশেরই মত।

আমরা অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলাম লিণ্ডেন গাছের নীচে। লিণ্ডেন গাছগুলি সোজা খানিকটা উঠে গিয়ে উপরে পাতার ছাতা রচনা করেছে। পাতাগুলি ঠিক আঙুর পাতার মত। দেখ্‌তে ভারি সুন্দর। কিন্তু ঝম্‌ঝম্‌ করে' বৃষ্টি আসতেই ভারি বিব্রত হ'য়ে পড়া গেল। যারা আইসক্রীম বিক্রী করছিল, তারা যে-যার চম্পট দিল। রাস্তার পারে হোটেলে গিয়ে উঠ্‌তে পারতাম। কিন্তু ষ্টীমার আসবার বেশী বিলম্ব ছিল না।

কোব্লেঞ্জ সহরটি সুদৃশ্য। নদীতীর অতি মনোরম। নদীর ধার ঋজুভাবে চলে গেছে বহু দূর। দু'টি পুল পারাপারের জন্য নির্ম্মিত হয়েছে। তা ছাড়া ফেরি ষ্টীমার ও মোটর বোট আছে। কোব্লেঞ্জের একটু উত্তরে দুইটি নদীর সঙ্গম স্থল। মোজেলের ধারা এসে রাইন নদীতে পড়েছে। মোজেল নামটি মদের জন্য বিখ্যাত। বস্তুতঃ রাইন নদীর এই দুহিতাটি সুরারই মত লোভনীয়। ষ্টীমারে দ্রাক্ষাকুঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে অতি চমৎকার শুনেছি। দুধারে অপর্য্যাপ্ত শান্তি এবং যাঁরা ঐ রসের রসিক তাঁদের পক্ষে অফুরন্ত আনন্দ!



সঙ্গীতাচার্য্য বীটোফেন

রাইনে অনেকগুলি ষ্টীমার আনাগোনা করছে দেখলাম। কোনওটা কলোনে যাচ্ছে; কোনওটা কলোন থেকে আসছে। আরোহীর দল আনন্দে আটখানা। সোনালি রৌদ্র-করোজ্জ্বল রাইনে যেন আজ আমোদ-প্রমোদের হাট মিলেছে। কোনও কোনও ষ্টীমারে ব্যাণ্ড বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে চলেছে, মনে হলো যেন বিবাহের উৎসব লেগে গেছে। যাদের হৃদয়ে আনন্দ করবার শক্তি ও সামর্থ্য আছে, তাদেরই জন্য রাইন নদীর এই বিপুল উৎসবায়োজন।

আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল ষ্টীমারে। একেবারে সম্মুখের কামরাটীতে গিয়ে বস্‌লাম। খাবার কক্ষ হিসাবে বেশ সুসজ্জিত বলেই মনে হলো। জিনিষপত্র ষ্টীমারের কর্ম্মচারীর জিম্মায় রেখে দিয়ে খেতে বসা গেল। রাইন নদীর টাট্‌কা স্যামন মাছ (salmon) খুব ভালো শুনেছিলাম। তাই ফরমাস্‌ করা গেল। বাস্তবিকই বিলাতে যাবার পর অমন সুস্বাদু মাছ আর খাই নি। রোচ, পম্ফ্রেট, লবষ্টার, ম্যাকারেল প্রভৃতি খেয়েছি লণ্ডনে, ঈল্‌ খেয়ে দেখেছি জার্ম্মানীতে, তার মধ্যে স্যামন সবচেয়ে মিষ্টি। বিলাতেও স্যামন খেয়েছি, টিনে আমদানী স্যামন এদেশেও যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু রাইন নদীর টাট্‌কা টাট্‌কা স্যামনের স্বাদ যেন অন্য রকমের। কিন্তু তার দাম কিছু বেশী। লাঞ্চ খেতেই প্রায় নয় টাকা নিলে।

ষ্টীমার বেশ জোরেই চলে, যদিও নদী খুব গভীর নয়। লোরলাই নামক স্থানে এর সবচেয়ে বেশী গভীরতা, হাত পঞ্চাশেক। সেণ্ট গটার্ড (St. Gothard) নামক পার্ব্বত্য পথের যেখানে রাইনের জন্মস্থান সেটা প্রায় সাত-আট হাজার ফিট উঁচু! রাইনের দুধারে দ্রাক্ষার বন। তা ছাড়া অনেক উপভোগ্য দৃশ্য আছে। বহু প্রাচীন দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নদী থেকে দেখা যায়। আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট সহর বা পল্লী। ছোট ছোট গ্রামগুলিতে পর্য্যন্ত লক্ষ্মীশ্রী রয়েছে। আমাদের দেশের মত দারিদ্র্য কোথাও তার মলিন ছায়াপাত করে নি রাইনের দুধারে। অবশ্য প্রাচীন নগরের বা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ কালের অব্যর্থ পরিণামের সাক্ষ্য প্রদান করছে। কিন্তু নূতন পল্লীগুলির চেহারা যেন অন্য রকম। রেলের লাইন গিয়েছে, তাদের মধ্য দিয়ে এবং প্রত্যেক স্থানই পর্য্যটক বা টুরিষ্টের পক্ষে কিছু না কিছু বিশেষ উপভোগ্য সঞ্চিত করে' রেখেছে। যেখানেই নদীতীরে ছায়ায় ঘেরা কোনও পল্লী আছে, সেখানেই হোটেল, সেখানেই আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা। রাইন নদীর তীরে বহু পল্লী স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত। কোনো স্থানে বাত সারে, কোনো স্থানে কাশি। এসব যায়গা



শিল্পী — [illegible] চৌধুরী   প্রতীক্ষায় শ্রীরাধা   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

'বাথ' (Baden) নামে পরিচিত। ভিস্‌ব্যাডেন আমাদের পথেই পড়েছিল। সেখানে তখন স্যার বি-এল্‌-মিত্র নষ্ট-স্বাস্থ্যের জন্য অবস্থিতি করছিলেন। মনে হলো যে নেমে গেলে ভাল হতো। কিন্তু 'সময় যে নাই, সময় যে নাই।'

রাইনের দু-ধারেই পাহাড়। কোথাও কোথাও নদী তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু তরতর বেগে জলের স্রোত বইছে, আর তার উপর দিয়ে আমরা চলেছি অলস ভাবে ভেসে। শোভারও সীমা নেই, শান্তিরও সীমা নেই। পল্লীর মেয়েরা প্রায় খালি গায়ে, খালি পায়ে ক্ষেতে কাজ করছে। যুবকের দল খালি গায়ে নদীর মধ্যে তরী বাইছে। ষ্টীমারের দিকে রূপসীদের কৌতূহলপূর্ণ নেত্র যখন আকৃষ্ট হয়, তখন আরোহীদের মত তাদেরও মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। রাইন নদীর জলের দাগেরই মত একটি তরল স্মৃতি-লেখা রয়ে যায় মনে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ভিস্‌ব্যাডেনের (Weiss baden) আলোকমালা রাইন নদীর তরঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে জলপুরীর স্বপ্নবিলাস রচনা করলে। দু-ধারে পাহাড়ের উপর সুন্দর সুন্দর বাড়ী; তার থেকে আলোকবিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের পটে রঙের তুলি টেনে দিয়েছে।

রাত্রি প্রায় ৯-৩০ মিনিটে আমরা মেন্‌জ্‌ (Mainz) পৌছুলাম। ষ্টীমার থেকে নেমে যেতে দুঃখ হচ্ছিল, কারণ রাইন নদীর এই দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখবার সুযোগ যে হবে না এই কথাই বারংবার মনে আসছিল। একখানি ট্যাক্‌সি করে ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশনটি খুব বড় বলে' মনে হ'ল। আমাদের দেশে এলাহাবাদ বা আগ্রা যেমন প্রকাণ্ড, কতকটা যেন সেই রকম। গাড়ীতে বসে চোখ ঢুলে আসছিল ঘুমে। কিন্তু শীঘ্রই আবার নামতে হ'বে মনে করে' জাগ্রত থাকবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

স্বপ্ন-চকোর

শ্রীকল্যাণকুমার চৌধুরী

স্বপ্নে আসে কানে—দূর সুকণ্ঠ-চকোর-গান
নিস্তব্ধ বনানী হ'তে করুণ সুরবিতান।
রাতের রূপালি রঙে এসে যেন কাছে মোর
মৌন শান্তি রাঙে—কোন্‌ পুলক জাদুবিভোর।

ভাসে স্বরগের পাখি মোর অম্বুরাশি পারে :
অস্তাচল-দিব্যজ্যোতি দেখায় পবন তারে।
অধরা সোনার কায়া পাখনা স্বপন ছায়া :
উষার ধূসরিমায় নহে তাহা নহে মায়া।

পুষ্পপক্ষ বিথারিয়া বিহঙ্গ উল্লাস বেশে
স্বপ্নারণ্য উত্তরিয়া অমৃত বাণীর দেশে।
জীবন-জলধি ব্যাপি' যে কালো শূন্যতা আছে
হয়ে আসে ম্লান···
নিঃসীম মানসে মোর স্বপ্নের কুহেলি রাজে :
চকোরের গান।

· শ্রীরমেন্দ্রকুমার পালিতের Dream Nightingale কবিতার অনুভাবে।

মডার্ন ফুলশয্যা

"ভাস্কর"

ভূমিকা

প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বাংলার এক পল্লীগ্রামে একটি বাল্য-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পাত্রের বয়স ছিল দুই বৎসর এবং পাত্রীর এক। দুইখানি রূপার থালায় দুইজনকে বসাইয়া কন্যা-সম্প্রদান হইয়াছিল এবং তাহাদের ফুলশয্যা হইয়াছিল একখানি সুসজ্জিত বেতের দোলনায়। ইহাদের সন্তানসন্ততিরা ধনে এবং মানে সাধারণ বাঙালীর মতই হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই দুইটি নরনারীর নরত্ব এবং নারীত্বের যে অবমাননা হইয়াছিল, বাংলার সমাজ তাহা ভোলে নাই। কৌলীন্যের যূপকাষ্ঠে যে দুইটি কুসুমকলির বলিদান হইয়াছিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বাঙালীকে করিতেই হইবে। প্রেম কি, তারুণ্য কাহাকে বলে, পূর্বরাগ কিরূপ, বিবাহের পূর্বে প্রেম, না প্রেমের পূর্বে বিবাহ, বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না প্রভৃতি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার, বুঝিবার এবং নিজ জীবনে পরীক্ষা করিবার কোন সুযোগ যাহারা পাইল না, তাহাদের বিবাহের সার্থকতা কি? বিবাহ কি, মন্ত্রের কোন মূল্য আছে কি না, ইহা কি একটি চুক্তিমাত্র, না ইহার আর কোন গভীরতর অর্থ আছে, বিবাহটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, না সামাজিক ব্যাপার, প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিবার বা এতৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবার অবকাশ তাহারা পায় নাই। একই সময়ে দুইটি নারীকে বা দুইটি পুরুষকে ভালবাসা সম্ভব কি না, সম্ভব হইলে তাহা কর্তব্য কি না, কর্তব্য হইলে তাহা বাঞ্ছনীয় কি না এবং বাঞ্ছনীয় হইলে তাহা নিরাপদ কি না প্রভৃতি ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই। বিবাহ-ব্যাপারটা দৈহিক, বা মানসিক, বা আধ্যাত্মিক, বা কাল্পনিক, বা সবই, বা কোনটিই নয়, তাহা জানিবার বা বুঝিবার জন্য যেটুকু জ্ঞানলাভ আবশ্যক তাহার অবসর তাহারা পায় নাই। পাত্রের পক্ষে গ্রাজুয়েশন এবং পাত্রীর পক্ষে সঙ্গীতচর্চা, বিবাহের এই দুইটি ন্যূনতম যোগ্যতাও তাহারা অর্জন করে নাই। পাত্র এবং পাত্রীর রুচি কিরূপ, তাহারা কি খাইতে, কি পরিতে, কি শুনিতে, কি বলিতে, কোথায় যাইতে, কোথায় না যাইতে ভালবাসে, তদ্বিষয়ে পরস্পরের সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহাদের হয় নাই। স্পষ্ট, নির্ভীক ও লজ্জাহীন কলাচর্চা এবং অবাধ মিশ্রণ যে মানসিক পবিত্রতার লক্ষণ এবং দ্বিধা, সঙ্কোচ এবং লজ্জাই যে মানসিক মলিনতার নিদর্শন, এই সামান্য সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই। সর্বোপরি, যে সকল মূল্যবান্ গ্রন্থে উপরোক্ত সমস্যাগুলির, সহজ, রসাল, সুমধুর এবং মনোমুগ্ধকর সমাধান শাস্ত্ররূপে, দর্শনরূপে, বিজ্ঞানরূপে বা সাহিত্যরূপে বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিবার সুযোগটুকু হইতেও তাহারা একান্ত বঞ্চিত ছিল। এমত অবস্থায় উহাদের বিবাহ ধনীর বিড়ালের বিবাহের মত বা শিশুর পুতুলের বিবাহের মতই একটা খেলা, একটা খেয়াল, একটা প্রহসন বা একটা কৌতুক ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মানুষের মনের প্রতি এই অবিচার, এই নিষ্ঠুরতা সমাজ সহিতে পারে নাই। ইহার প্রতীকার সে করিয়াছে এবং করিতেছে। বক্ষ্যমান প্রসঙ্গ তাহারই নিদর্শন।

পাত্র

পাত্রটি মডার্ন। শ্রীমান্ সলিলকুমার বি-এ পাশ করিয়া কিছু-একটা পড়িবার জন্য বিলাত যান। সেখানে তের বৎসরে পর পর সাতটি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। পরীক্ষার ফাঁটাকে বৃথা অপব্যয় মনে করিয়া কোন বিষয়েই পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। প্রতি দুই বৎসর অন্তর তাঁহার পারদর্শিতার বিবরণসহ ফটো বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘ প্রবাসকালে তিনি ভূমিকায় উল্লিখিত সর্ববিধ গার্হস্থ্য, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে সযত্নে আলোচনা এবং সমাধান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহার মনে কোনরূপ দ্বিধা, সঙ্কোচ, সন্দেহ বা অজ্ঞতা ছিল না।

বিলাতের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি একটি খাদ্য-সংরক্ষণ ব্যবসায়ীর সহিত পরিচিত হইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় যান। সেখানে তিন বৎসর বাস করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং জনৈকা অষ্ট্রেলিয়ানার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার পত্নী অল্পদিন পরেই তাঁহার যথাসর্বস্ব স্বামীকে উইল করিয়া দিয়া পরলোকগমন করিলেন। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনা অসহ্য হওয়ায় সলিলকুমার অষ্ট্রেলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং জাপানে একটি দেশালাইয়ের কারখানায় নিযুক্ত হইলেন। চার বৎসর জাপানে অবস্থানের পর তিনি পারস্যে চলিয়া আসেন এবং সেখানে একটি বড় তৈলের খনিতে কর্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁহার দিনগুলি বেশ ভালই কাটিতেছিল, কিন্তু উপরিতন একজন কর্মচারীর সহিত হঠাৎ একদিন এমন একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া গেল যে বাধ্য হইয়া তাহাকে কর্মত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তবু সলিলকুমারের ভাগ্য ভাল বলিতে হইবে, কারণ কয়েকদিন মধ্যে আমেরিকার একটি পেট্রল-কোম্পানিতে চাকুরি পাইয়া নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিলেন। আমেরিকায় কয়েক বৎসর কাটিল। তথায় একটি মার্কিনী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ওখানকার নানাপ্রকার আইনগত গণ্ডগোলের জন্য মহিলাটি বেশী দিন তাঁহার সহধর্মিণীত্ব করিতে সম্মত হইলেন না। ফলে সলিলকুমার মনে কষ্ট পাইলেন, আমেরিকার উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং বহুদিন চাকুরি করিবার পর স্বাধীন ব্যবসায় করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।

সুযোগও আসিল। এক বন্ধুর সহিত তিনি পূর্ব-আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন। সেখানে লবঙ্গ-ব্যবসায়ে বেশ দু পয়সা উপার্জন হইতেছিল, কিন্তু জাঞ্জিবারের ব্যবসায়-সংক্রান্ত গোলযোগে সলিলকুমার ভারতমাতার দুঃখে বিগলিত হইয়া এডেন যাত্রা করিলেন। সেখানেও লবণের ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সম্প্রতি বড়বাজারে অড়হর ডালের একটি আড়ৎ খুলিয়াছেন এবং একটি সাবানের কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন।

সলিলকুমার বাস করেন একটি ইঙ্গবঙ্গ হোটেলে। ডাল-ভাত সহ্য হয় না। বাঙলা ভাল বলিতে পারেন না, তবে কাজ চলিয়া যায়। বয়স পঞ্চাশ; ওজন তিন মণ বার সের; লম্বা ছয় ফুট দুই ইঞ্চি; গায়ের রং মিশমিশে কালো; টাক আছে, গোঁফ নাই; গাড়ী আছে, বাড়ী নাই।

পাত্রী

পাত্রী শ্রীমতী রেবা। এন্‌ট্রান্স্‌ পাশ করিবার পর একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাযে নিযুক্ত হন। একবার গুরুতর অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে যাইতে বাধ্য হন এবং তথায় নার্সের কাযের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। রোগমুক্তির পর জনৈকা প্রৌঢ়া ধাত্রীর পরামর্শে রেবা ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং একটি বড় হাসপাতালে কর্মগ্রহণ করেন।

এখানে একজন তরুণ ডাক্তারের সহিত পরিচয় হয় এবং পরে ইঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। রোগীর শুশ্রূষার পরিবর্তে এখন তিনি স্বামীর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। ডাক্তার-ধাত্রীর বিবাহ—অনেকেই কটাক্ষ করিল; কিন্তু তাঁহাদের অকপট দাম্পত্য প্রেম অল্পদিন মধ্যেই সকল সমালোচনার পথ বন্ধ করিয়া দিল।

দীর্ঘ বার বৎসরের মধ্যেও তাঁহাদের সন্তানাদি হইল না। বিমনা রেবার সমগ্র মন তাহার স্বামীই জুড়িয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু বিধাতার ইহাও বুঝি সহিল না। একটি বসন্তের রোগীর চিকিৎসার পর ডাক্তার নিজেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং রেবার সকল সেবা, সকল অনুনয়, সকল ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। নিঃসন্তান শোকাতুর বিধবা স্বামীর সম্বল যাহা কিছু ছিল তাহা লইয়া এল্‌গিন রোডের একটি ফ্ল্যাটে উঠিয়া আসিলেন।

নিঃসঙ্গ জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমশ শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, মহিলামঙ্গল, বিধবামঙ্গল, সধবামঙ্গল, তরুণীমঙ্গল প্রভৃতি বিবিধ সমাজহিতকর কাযে আত্মনিয়োগ করিলেন। নিজের শূন্য হৃদয় এবং শূন্য গৃহ পরের অসংখ্য কার্যের চঞ্চলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সভা-সমিতি, কথা-বক্তৃতা, নৃত্য-গীত, আবৃত্তি-অভিনয়, শুশ্রূষা-চিকিৎসা, হাসি-কান্না, মিলন-কলহ, এমন কি মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত শ্রীমতী রেবার কর্মতালিকা হইতে বাদ পড়িল না। দিনগুলি যেন উড়িয়া পলাইতে লাগিল।

কয়েক বৎসর পরে তরুণীমঙ্গল সমিতি হইতে স্থির হইল; শ্রীমতী রেবাকে ইউরোপে পাঠাইতে হইবে। সেখানকার সমাজের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া আসিলে বাঙলার সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। মোট কথা একজন ইউরোপ-টে্‌ণ্ড্‌ এক্সপার্ট চাই। তহবিলে টাকার অভাব ছিল না—শ্রীমতী রেবা একদিন সত্তরটি ফুলের মালা পরিয়া এবং আশিটি ফুলের তোড়ায় টে্‌নের এয়ার-কন্‌ডিশণ্ড কামরা বোঝাই করিয়া হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ষ্টেশনের ভিড় দেখিবার জন্য ত্রিশ হাজার যাত্রী সেদিন টে্‌ণ ফেল করিল।

পূর্ণ পাঁচ বৎসর বিভিন্ন দেশের সামাজিক ব্যবস্থা এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং তদ্বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া শ্রীমতী রেবা দেশে ফিরিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশ; সরু ছিপছিপে গড়ন; গলায় লকেট আছে, হাতে চুড়ি নাই; বেঁটে ছাতা আছে, ব্যাগ নাই।

পরিচয়

লবণসংক্রান্ত অনুসন্ধান শেষ করিয়া সলিলকুমার এডেন হইতে জাহাজ ধরিলেন। জাহাজে উঠিয়া নিজ ক্যাবিনে ঢুকিবার সময়ে দেখিলেন, বামদিকে একটি ক্যাবিনের শিরোদেশে লেখা 'লেডিজ'। সেই ক্যাবিনের পাশেই দেখা গেল একখানি শাড়ী শুকাইতেছে। অতি সাধারণ আকাশরঙের প্লেন শাড়ী, অতি সাধারণ জরির পাড়। কিন্তু বহুদিন পরে বাঙালিনীর প্রতীকস্বরূপ এই শাড়ীখানি সলিলকুমারের চোখে স্বর্গের সুষমা ছড়াইয়া দিল। তাহার মনে হইল, যেন জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু স্নিগ্ধ, সব একত্র হইয়া ঐ শাড়ীখানির গায়ে লেপিয়া আছে। মুগ্ধচিত্তে সলিলকুমার নিজ ক্যাবিনে ঢুকিলেন।

বৈকালে ডেকে গিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া সলিলকুমার অনন্ত জলরাশির নৃত্য দেখিতেছেন, নীল আকাশ ততোধিক নীল সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনা করিয়াছে, তাহারই দিকে নির্নিমেষ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের সংঘাত, ঢেউয়ের শিরোদেশে উচ্ছলিত বারিকণার শুভ্র রমণীয়তা, মাঝে মাঝে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁকের আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং অস্তগমনোন্মুখ সৌরকিরণের স্নিগ্ধ, প্রশান্ত কমনীয়তা তাঁহার নয়ন মন বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল।

সহসা এক দিকে একটা খস্‌ খস্‌ শব্দ কানে যাইতেই সলিলকুমার চাহিয়া দেখিলেন, সেই শাড়ীর অধিকারিণী সেই শাড়ীখানি পরিয়াই একখানি ডেক চেয়ারে উপবিষ্টা হইলেন। একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল মাত্র, আর কিছু হইল না। আর কিছু হইবার কথাও নয়। উভয়েরই যে বয়স এবং যে অভিজ্ঞতা তাহাতে অন্য কোন প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। শাড়ী দেখিয়া সলিলকুমারের মন যেটুকু চঞ্চল হইয়াছিল, শাড়ীর অধিকারিণীকে দেখিয়া সে চঞ্চলতা আপনিই কাটিয়া গেল।

সূর্যাস্তের পরক্ষণ হইতেই বাতাস একটু জোরে বহিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢেউগুলির আকারও দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। জাহাজ বেশ

একটু দুলিয়া উঠিল এবং শ্রীমতী রেবা যেন একটু বমনোদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সলিলকুমার একান্ত নির্লিপ্তভাবেই বলিলেন—দেখুন, ওটা একটা মানসিক অবস্থা। একটু মনে জোর করুন, তাহলেই ও ভাবটা কেটে যাবে।

আমি বড্ড সহজেই সী-সিক্ হই।

উঠে একটু হেঁটে বেড়ান, বলিয়া সলিলকুমার নিজেই সহসা ডেকের পার্শ্বের রেলিংএর দিকে ছুটিলেন এবং ওয়াক্ করিয়া একবার বমি করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে দোষের বা লজ্জার কিছুই নাই। কারণ জাহাজ বেশী দুলিলে যাত্রীদের প্রায় অর্দ্ধেকের বেশীরই এই অবস্থা হয়। যতক্ষণ এই দোলন বন্ধ না হয়, ততক্ষণ টিনের মগ পার্শ্বে লইয়া চোখ বুজিয়া নিজের বিছানায় পড়িয়া থাকা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

এদিকে রেবারও বমনোদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনিও সলিলকুমারের পাশেই রেলিংএর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুখ মুছিবার জন্য ব্লাউজের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিতেই বাতাসের বেগে তাহা আরব্যোপসাগরের বক্ষে বিলীন হইল। সলিলকুমার তাড়াতাড়ি নিজের রুমালখানি বাহির করিয়া রেবার হাতে দিলেন। রেবাদেবী বলিলেন, থ্যাঙ্কস্।

উভয়েই ফিরিয়া গিয়া চেয়ারে বসিলেন। এবার একটু নিকটে।

সামুদ্রিক বিবমিষার পশ্চাতে কুসুমধন্বার গোপন ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত ছিল, তাহা কে জানিত?

করাচী হইতে ইঁহারা এরোপ্লেনে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। বিভিন্ন মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে বিপুল সংবর্ধনা হইল। এরোপ্লেনের পার্শ্বে যাঁহারা রেবা দেবীর সন্নিকটে যাইবার সৌভাগ্যলাভ করিলেন, তাঁহাদিগের নিকট একান্ত নির্লিপ্তভাবে সলিলকুমারকে পরিচিত করাইয়া বলিলেন, ইনি একজন মহানুভব বদান্য ব্যক্তি, আমাদের আদর্শের প্রতি এঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা। এঁর সাহায্য পেলে আমরা ধন্য হব। নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই অমৃতবাজারের ফোটোগ্রাফার এরোপ্লেনসহ রেবা-সলিলের ফটো তুলিয়া লইল।

কিছুদিন ধরিয়া বিবিধ মঙ্গল-সমিতিতে রেবা দেবী এবং সলিলকুমার সম্বন্ধে কানাঘুষা চলিতে লাগিল। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি যত বেশী নির্লিপ্ত ও পবিত্রভাবে আটচালা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তত বেশী উচ্চৈঃস্বরে ইঁহাদের সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

ফুলশয্যা

বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। ইঙ্গ-বঙ্গ হোটেলে ফুলশয্যার ব্যবস্থা রেবা দেবীর মনঃপূত না হওয়ায় ক'নের বাড়িতেই ইহার আয়োজন হইয়াছে। নিমন্ত্রিতেরা সব চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িতে আছেন শুধু বর কনে, আর রেবা দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী মীরা এবং তাঁহার ষোড়শী নাতনি রমা।

নূতন রংকরা ঘর। খাট, বিছানা, সোফা, ড্রেসিং টেবল্, আলনা প্রভৃতি সমুদয় আসবাবপত্রই নূতন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। ফুলের মালা দিয়া খাটের ছত্রীগুলি মোড়া। তিন চারটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া এবং এক গাদা ঝরা ফুলে বিছানা প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছে। শুধু পাত্র এবং পাত্রী এই দুইটি বস্তু ব্যতীত অন্য সমস্ত জিনিষেই নূতনত্বের মনোরম গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

সলিলকুমার বিছানায় শুইয়া আছেন, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। রমা রেবা দেবীকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। ইহাদের পদশব্দে তন্দ্রা ভাঙিয়া যাওয়ায় সলিলকুমার চাহিয়া দেখিলেন এবং রেবা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়েটি কে?

ও মীরার নাত্‌নি রমা।

ও!

বামস্কন্ধ হইতে ব্রুচটি খুলিয়া ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া রেবা দেবী একখানা সোফা খাটের কাছে টানিয়া আনিয়া বসিয়া পড়িলেন। দুই মিনিট কেহই কোন কথা বলিলেন না। পরে রেবা দেবী বলিলেন, বিয়েটা তাহলে হয়েই গেল!

হুঁ।

না হ'লেও ক্ষতি ছিল না।

না।

তাহ'লে এ বিয়েতে তুমি সুখী হওনি?

সুখদুঃখের হিসেব তো অনেকদিন আগেই চুকে বুকে গেছে।

তা তো বটেই! আমি তো আর অষ্ট্রেলিয়ানী নই!

আমিও তো আর হাসপাতালের ডাক্তার নই!

দেখ, মেয়েমানুষের মন তোমরা কখনই বুঝ্‌বে না।

ওসব দার্শনিক তত্ত্ব এখন রাখ। দেখ তো পাশের বাড়ীর বারান্দায় ও মেয়েটি কে?

পাশের বাড়ীতে তো স্ত্রীলোক নেই!

দেখই না একবার। আলোটা নিভিয়ে দাও—জান্‌লার পর্দাটা একটু ফাঁক করে দাও তো।

কে একজন ঘরে ঢুক্‌লো বটে। পাশের বাড়ীর জন্য তোমার অত কৌতূহল কেন?

নিজের বাড়ীতে যার দ্রষ্টব্য কিছু নেই, তার পাশের বাড়ীই সম্বল। তা ছাড়া কালকার মজলিসে একটা গল্প করবার মত বিষয় পাওয়া যাবে। একবারটি টুক্ করে ছাদে চলে যাও তো, সেখান থেকে ভাল দেখ্‌তে পাবে।

তুমি যখন বল্‌ছ, একবার দেখেই আসি।···এই তো এলুম দেখে। পাশের বাড়ীর বুড়ো ভদ্রলোকের বোধ হয় খুব অসুখ, ওঁর বুড়ো চাকরটা ফিডিং কাপে ক'রে কি যেন খাওয়াচ্ছে—ওই চাকরটাকেই তুমি দেখেছ। তোমার রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে।

যাও, সব মাটি করে দিলে! আমি মনে মনে একটা রসাল গল্প তৈরী করছিলুম—

চুলোয় যাক্ তো তোমার গল্প। তুমি যে বলেছিলে তোমার লাইফ্-ইন্‌সিওরটা বাড়াবে, তার কি হ'ল?

এত রাত্রে এজেন্টের বাড়ী যাওয়া কি ঠিক হবে? সকাল হোক্।

আমি যেন এখনই যেতে বল্‌ছি। কাল্‌কেই একটা প্রপোজাল দিয়ে দিও। রোসো দেখি, একটা অ্যাটোফ্যানের বড়ী খেয়ে আসি। বাঁ হাতটা ভয়ানক কন্ কন্ করছে।

দেখ, ঐ তোয়ালেখানা দাও তো আমার বালিশের উপরে, চুলের কলপ লেগে ওয়াড়টায় দাগ হয়ে যাবে।

এই নাও। তোমার ডালের ব্যবসাটা কি করবে, চালাবে না বিক্রী ক'রে ফেল্‌বে?

সেই কথাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। সাবানের কারখানাটা গড়ে তুল্‌তে পার্‌লেই ডালের ব্যবসাটা তুলে দেবো। তোমার যে সব মহিলামঙ্গল, শিশুমঙ্গল ইত্যাদি আছে, তারই ভিতর দিয়ে আমি কল্‌কাতার পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

বিয়ের পরে ওসব ব্যাপারে আমার তেমন আধিপত্য থাক্‌বে কি না, কে জানে?

নিশ্চয়ই থাক্‌বে। যে কারণে বিয়ের পর মেয়েদের পাব্‌লিক লাইফ্‌ নষ্ট হয়ে যায়, সে কারণ তো তোমার নেই। তুমি এতদিন যেমন ছিলে, এখনও ঠিক তেমনি থাক্‌বে। বরং আমার তো মনে হয়, এখন তোমার সুযোগ ও সুবিধা আরো বেড়ে যাবে।

হয়তো যাবে। কিন্তু এই বেতো শরীরে আর অত হৈ চৈ ভাল লাগে না। মিটিং আর ফুলের মালার সখ আমার মিটে গেছে। এখন যে কটা দিন আছি একটু নিশ্চিন্তে আরামে কাটাতে পার্‌লেই বাঁচি। এ বিয়েটাও শুধু সেই জন্যই। তুমি এখন আমার স্বামী। স্বামীর কাছে মনের কোন কথা গোপন করা পাপ। সত্য বল্‌তে কি তোমার আয়ের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে দিন কাটানো ছাড়া আমার আর কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা নেই।

তুমি এখন আমার স্ত্রী। তোমার কাছেও আমার কোন কথা গোপন করা কর্ত্তব্য নয়। তোমাকে আমি সাবানের কারখানার মূলধন ব্যতীত আর কিছুই মনে করি নে। মোট কথা আমি তোমাকে বিয়ে করি নি, বিয়ে করেছি তোমার মঙ্গল-গ্রুপকে, আর তোমার পিসে-মশাইকে। ওদের আমাকে চাই, যেমন করে হোক। বাতে নড়্‌তে না পারো, গাড়ীতে যেও। বক্তৃতা করতে না পারো, অন্যকে দিয়ে তোমার লেখা বক্তৃতা পড়িও। তোমাকে মঙ্গল-গ্রুপ হাতে রাখতেই হবে—অন্তত আমার শেয়ারগুলো বিক্রী না হওয়া পর্য্যন্ত। তোমার পিসেমশাইকে স্পষ্ট বলে দিও—তিনি আমার ভাগ্যবৃক্ষের মই। আমি তাঁকে চাই।

বেশ তো, কালই চল ও'র সঙ্গে আলাপ করে আস্‌বে। আমিও যতটা পারি তোমার জন্য বলে কয়ে দেখ্‌ব।

দেখ, একটা কথা ভাবছিলুম। একটা বাসা টাসা করবে, না যেমন চলছে এমনি চল্‌বে।

আমি তো বলি, যেমন আছে এমনি চলুক। গেরস্থালীর ঝঞ্ঝাট আর পোষায় না!

লোকে কিন্তু এটা ভাল দেখ্‌বে না।

তাও তো বটে! এসব তো আগে ভাবিই নি। ঘরকন্নার চিন্তা মনে এলেই একটা দারুণ বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে।

কিন্তু বিয়েটা যখন হ'লই, তখন—

আচ্ছা, ভেবে দেখি, তারপর যা হয় করা যাবে। এমন তাড়াতাড়িই বা কি!

নাঃ, তাড়াতাড়ি আর কি!

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। উভয়কেই যেন একটু ক্লান্ত, একটু অবসন্ন মনে হইতেছিল। রেবা দেবী একবার উঠিয়া ঘরে একটু পায়চারি করিলেন—যেন কি ভাবিতেছেন। একবার গিয়া আলোটা একটু কমাইয়া দিলেন। কুঁজা হইতে ঢালিয়া এক গ্লাস জল নিজে খাইলেন, আর এক গ্লাস বরকে দিলেন। তারপর আবার সোফাটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একটা কথা বল্‌ব—

বল।

কিছু মনে করবে না তো?

বিজনেস্ ইজ্ বিজনেস্—এর মধ্যে মনে করাকরি কিছু নেই।

তুমি বলেছিলে, তোমার কিছু শেয়ার টেয়ার আছে। ওর কিছু—ধর অর্দ্ধেক—আমার নামে ট্রান্সফার ক'রে দিতে তোমার আপত্তি আছে কি?

সবই তো তোমারই থাক্‌বে—আমি আর কদিন?

আমিই বা কদিন? বল্‌ছিলুম কি, যখন তখন হাত পেতে তোমার কাছে টাকা পয়সা চাওয়াটা একটু কেমন লাগে না? তার চেয়ে বরং—

বুঝলুম, আচ্ছা একটা ব্যবস্থা করা যাবে'খন।

দেখ, আমায় ভুল বুঝো না কিন্তু; তা'হ'লে আমি কিছুই চাই না।

না না, ভুল কেন বুঝ্‌ব, ঠিকই বুঝেছি।

যাক্ গে, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

না, এ বয়সে কি এত শীঘ্র ঘুম পায়?

আজকের কাগজ পড়েছ? চেকোস্লোভাকিয়ায় তো গোলমাল্ পেকে উঠ্‌ছে।

তাই নাকি?

আর হয়ে, মোহনবাগানের খবর জান? শুধু নামটাই আছে, কাজের বেলায় কিছু না।

না, কিছু না।

এবারও বোধ হয় মহামেডান স্পোর্টিং লীগ পাবে।

বোধ হয়।

আচ্ছা, তুমি না ষ্টীলের শেয়ার কিনেছিলে? কাগজে তো দেখলুম, দাম ক্রমাগত নাম্‌ছে।

ওতে আমার লোকসান হয় নি, সময়মতই বেচ্‌তে পেরেছিলাম।

আচ্ছা, এত থাকতে তুমি অড়হর ডালের ব্যবসা করতে গেলে কেন?

আমি কি আর নিজে সাধ করে করছি। একদিন রেসের মাঠে হঠাৎ এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে আলাপ। তারই পরামর্শে এ কাজ করছি—নিজের বেশী কিছু রিস্ক নেই। তাছাড়া ব্যবসা—ব্যবসা, তা

অড়হর ডালই হোক, আর সোনা রূপোই হোক—একই কথা, লাভ হলেই হ'ল।

তা ঠিক।

জলের গ্লাসটা একটু এগিয়ে দাও তো।

দি। দেখ আমার এক দূরসম্পর্কীয়া বিধবা পিসি আছেন, তিনি বল্‌ছিলেন, তাঁর বাড়ীর অর্ধেকটা বিক্রী করবেন। তুমি অর্থাৎ আমি কিন্‌ব?

একটু ভাল ক'রে খোঁজ খবর নাও, তারপর দেখা যাবে।

আমার এই বাতের ব্যথাটা ক্রমেই যেন বাড়্‌ছে—একবার চেঞ্জে গেলে হয় না—দেওঘর বা গিরিডি?

অবসরমত গেলেই হবে।

তোমার আবার অবসর! তুমি তো সাবান সাবান করেই গেলে। বরঞ্চ আমি একাই দিনকতক ঘুরে আসি।

বেশ তো।

বর ঈষৎ নিদ্রালু হইয়াছেন এবং একটু পরেই নাসিকা গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক'নে নীরবে উঠিয়া গিয়া রমার বিছানার পাশে গিয়া অস্ফুটস্বরে ডাকিলেন, 'রমা!' ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া রমা জিজ্ঞাসা করিল, কে, দিদিমা?

হ্যাঁ।

কি বল্‌ছ?

একটু সরে শো, আমি এখানে শোব।

সে কি! বরের সঙ্গে এরই মধ্যে ঝগড়া করেছ?

না, ঝগড়া কেন হবে?

তবে, ভয় করছে বুঝি?

যাঃ।

তবে?

ঐ শোন্, কি ভীষণ নাক-ডাকা। ওর কাছে মানুষে শুতে পারে? নে, সর্, একটু শুয়ে পড়ি।

পাশের ঘরে বরের বিকট নাসিকা গর্জন শুনিতে শুনিতে ক'নে নাতনির কোলে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

শ্রীধরের উত্তরাধিকারী

"বনফুল"

১

মক্ষিচুস্!

স্থানীয় বেহারীগণ শ্রীধর মিত্রকে এই আখ্যাই দিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত কথাটির অর্থ অনেকে হয়ত জানেন না। মক্ষিচুস্ আখ্যা সেই সকল মহাত্মাকেই দেওয়া হয় যাঁহারা মক্ষিকাকে চুষিয়াও গুড় অথবা মধু আহরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। শ্রীধর মিত্তিরের কৃপণতা ও শোষণ-পটুতা সম্বন্ধে স্থানীয় বাঙালী বেহারী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একমত। সজ্ঞানে প্রভাতে কেহ তাঁহার নামোচ্চারণ করেন না এবং দৈবাৎ করিয়া ফেলিলে উপবাস আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীধর মিত্রের দীর্ঘ জীবনের ইহাই বিশেষত্ব যে তিনি কখনও কাহাকেও এক কপর্দ্দক দান করেন নাই; কিন্তু বহু কপর্দ্দক বহু লোকের নিকট হইতে বহুভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখনও করিতেছেন। বর্ত্তমানে সুদে টাকা খাটানোই তাঁহার প্রধান উপজীবিকা। কয়েকখানা ভাড়াটে বাড়ীও প্রতি মাসে তাঁহাকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রজা বিলি করা কিছু জমি আছে। কিছু কোম্পানির কাগজও আছে। আয়ের পথ এতগুলি আছে কিন্তু ব্যয়ের পথ নাই বলিলেও চলে। জন থাকিলেই ধনক্ষয় হয়। শ্রীধরের তিন কুলে কেহ নাই। আত্মীয়স্বজন সকলেই একে একে পরলোকগমন করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। থাকিবার মধ্যে আছেন শ্রীধর নিজে এবং তাঁহার পুরাতন ভৃত্য নকুড়। নকুড় অবশ্য শুধু ভৃত্য নয়। সে একাধারে পাচক, ভৃত্য, বন্ধু, পরামর্শদাতা—সব। দিনে নকুড় ভাতে ভাত ফুটাইয়া দেয়। রাত্রে হরিগোয়ালা সুদ পরিশোধ কল্পে যে দুধটুকু দিয়া যায় তাহাই উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। জল খাবারের পাট নাই। পোষাক পরিচ্ছদের খরচও নাই বলিলেই চলে। আইন বাঁচাইবার জন্য যতটুকু আবরণ প্রয়োজন ততটুকুই শ্রীধর মিত্র অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। দিনে সূর্য্য এবং রাত্রে রেড়ির তেলের ক্ষুদ্র একটি মৃৎপ্রদীপ তাঁহার অন্ধকার মোচন করিয়া থাকে।

টাকা সুতরাং জমিতেছিল। ব্যাঙ্কে নয়—মাটির

তলায়, ইহাই জনশ্রুতি। শ্রীধর মিত্র যদিও ভুলক্রমেও কখনও নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা কাহারও নিকট উল্লেখ করিতেন না, কিন্তু সকলেই জানিয়াছিল যে শ্রীধর মিত্র নামক কদাকার বৃদ্ধটি বেশ শাঁসালো ব্যক্তি এবং তাঁহার শাঁস-টুকুর কিয়দংশও অন্তত হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে নানালোক নানা ভেক-ধারণ করিয়া সততই তাঁহার দুয়ারে ধর্ণা দিত। শ্রীধর থাকিতেন শহরের বাহিরে নিজেরই একটা শ্রীহীন পোড়ো বাড়িতে অর্থাৎ সেই বাড়িটাতে—যাহার ভাড়াটে সহজে জুটিত না। কিন্তু শহর প্রান্তের সেই পোড়ো বাড়িতেই অর্থ-অনুসন্ধিৎসু মতলব-বাজগণ গিয়া হাজির হইতেন।

২

সেদিন গিয়াছিলেন জলধরবাবু।

জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে স্বদেশ হিতৈষীও। সম্প্রতি শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অর্থ-সংগ্রহ করিতেছেন। শ্রীধর মিত্রের হৃদয় বিগলিত করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ওজস্বিনী একটি বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ শ্রীধর মিত্র তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবার দরকার কি ?"

বিস্মিত জলধর বলিলেন, "তার মানে ?"

"মানে, লেখাপড়া না শিখেই এই শহরের মেয়েগুলো যে রকম বাবু হয়ে উঠেছে লেখাপড়া শিখলে এখানকার সব গণেশই ত উল্টে যাবে। কি বলিস নোক্‌ড়ো ?"

নকুড় একটু মৃদু হাস্য করিল মাত্র।

শ্রীধর আবার বলিলেন, "ছেলেরা লেখাপড়া শিখেই গণেশকে কাৎ করেছে—মেয়েরা শিখলে একদম উল্টে যাবে। কেউ রক্ষে করতে পারবে না। ওসব দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়ুন আপনি জলধরবাবু।"

জলধরবাবু কোনদিন গণেশের দিক দিয়া স্ত্রীশিক্ষার কথা চিন্তা করেন নাই। প্রথমটা তিনি একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি উকিল মানুষ। কোথায় কি ভাবে কোন কথা বলিলে কাজ হাঁসিল হয় তাহা তাঁহার জানা আছে।

সুতরাং তিনি বলিলেন, "মেয়েরা লেখাপড়া শিখে নিজেরা রোজগার করলে তবে না বুঝবেন কত ধানে কত চাল হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন না করলে টাকার প্রতি দরদ হয় না। গণেশকে খাড়া রাখবার জন্যেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো উচিত।"

দেখা গেল, অ-উকিল শ্রীধর মিত্রও কম নন।

নকুড়ের দিকে এক নজর সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ছাগলকে দিয়ে যব মাড়িয়ে নেওয়া যদিই বা সম্ভবপর হয়, ছাগলের স্বভাব কি বদলে যাবে তাতে বলতে চান ? সে কি যব গাছে আর মুখ দেবে না ? না, যবের গাদায় ছেড়ে দিলে নয়-ছয় করবে না ? বলনারে নোক্‌ড়ো ও পাড়ার ব্যাপারখানা !"

অদূরে উপবিষ্ট নকুড় এবারও কিছু না বলিয়া মৃদু হাস্য করিল।

শ্রীধর তখন নিজেই বিবৃত করিয়া বলিলেন, "ঘোষাল পাড়ায় আমার যে বাড়িটা আছে তার এক নতুন ভাড়াটে এসেছে। স্বামী-স্ত্রী। দুজনেই বেশ লেখাপড়া জানে শুনেছি। কিন্তু তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসুন কি কাণ্ড কারখানা। স্বামীটি ক্রমাগত সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছেন আর স্ত্রীটি ক্রমাগত শেলাই করে যাচ্ছেন। কলের খটখটি শুনে মনে হয় দরজির বাড়ী! ওই যে কি এক রকম জামা মেয়েরা পরে তাই ক্রমাগত শেলাই হচ্ছে শুনলাম। জামা-গুলোর কি নাম যে ছাই—মনেও থাকে না ছাই!"

নকুড় বলিল—"বালাউস"

"বালাউস্—বালাউস্! এত বালাউস নিয়ে যে কি হবে তাই ভাবি। পরবে কখন ?"

জলধরবাবু বুঝিলেন তর্ক-পথে চলিবে না।

বলিলেন, "সবাই কি আর এক রকম হয় ? তাছাড়া আপনার মত প্রবীন বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে তর্ক করতে পারি কি আমি ? মোট কথা, সংকার্য্য আরম্ভ করেছি। একটা কিছু সাহায্য আপনাকে করতে হবে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত বদনে শ্রীধর কিছুক্ষণ জলধরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে বলিলেন—"সাহায্য !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ পাঁচজনের কাজ, কিছু দিতে হবে আপনাকে"

সকাতরে শ্রীধর বলিলেন—"আমি দরিদ্র মানুষ। এত

বড় বৃহৎ ব্যাপারে সাহায্য করা আমার সাধ্যে যে কুলোবে না জলধরবাবু। বিশ্বাস করুন অতি দরিদ্র আমি।"

জলধরবাবু বিশ্বাস করিলেন না।

বলিলেন "তিল কুড়িয়েই ত তাল। সবাই কিছু কিছু সাহায্য না করলে হবে কি করে! বুঝছেন না?"

"বুঝছি ত! কিন্তু আমার যে তিলের সামর্থ্যও নেই!"

"ও আমি শুনব না—কিছু দিতেই হবে আপনাকে!"

জলধরবাবুর ব্যবহারে একটা নাছোড়বান্দা ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীধর শঙ্কিত হইলেন। উকিল মানুষকে চটাইতেও সাহস হয় না। সহসা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রাবণের মৃত্যুকালীন উপদেশের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। অশুভস্য কালহরণম্! বলিলেন—"এখন ত কিছুতেই পেরে উঠব না। আসচে মাসে চেষ্টা করে দেখতে হবে। আধপেটা খেয়ে থাকব আর কি! কি বলিস রে নোক্ড়ো!"

নকুড় পুনরায় মৃদু হাস্য করিল।

জলধরবাবু অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন।

৩

জলধরবাবুর কথাটা একটু বিস্তৃতভাবেই বলিলাম। সকলের কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কেহই শ্রীধর মিত্রের ধনভার লাঘব করিতে পারেন নাই—সকলেই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর দল, খদ্দরধারী স্বদেশীর দল, হার্মোনিয়ামধারী বন্যাসাহায্যকারীর দল, স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়িনী-সভার সভ্যগণ, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাতৃগণ, কন্যাদায়গ্রস্ত দুঃস্থ ব্রাহ্মণ—সকলের আবেদনই শ্রীধর মিত্র ধৈর্য্যসহকারে শুনিয়া যাইতেন। ধৈর্য্য হারাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই।

৪

টাকা কিন্তু জমিতেছিল।

তিলে তিলে, ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে, মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া শ্রীধর মিত্রের ধনরাশি এমন একটা অঙ্কে গিয়া পৌঁছিল যে শেষকালে তাহা শ্রীধর মিত্রেরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

শ্রীধর চিন্তা করিতে লাগিলেন—জীবন ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যু যে কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া হানা দিতে পারে। এতগুলো টাকার পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে! মাটির তলায় এই বিপুল ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? সেদিন লটারির খেলাতেও তিনি বেশ কিছু টাকা পাইয়াছেন। লটারি খেলার দিকে শ্রীধরের ঝোঁক আছে। মাঝে মাঝে লটারির জন্যই তিনি দুই চারি টাকা বাজে খরচ করেন। গত বৎসর লটারির দৌলতে বেশ কিছু অর্থাগমও হইয়াছে। কিন্তু এত অর্থের পরিণতি কি হইবে? নকুড়টা শেষকালে সব ভোগ করিবে? আযৌবন-সহচর নকুড়কে অবশ্য তিনি কিছু দিয়া যাইবেন, কিন্তু সমস্ত টাকাটাই সে ভোগ করিতেছে এ চিত্র মোটেই মনোজ্ঞ নয়। নকুড়টা বা কতদিন বাঁচিবে? শেষকালে সমস্ত টাকাটা নকুড়ের উত্তরাধিকারী সেই ঘাড়ছাঁটা ভাইপোটার হস্তে গিয়া পড়িবে! এ কথা চিন্তা করিলেই শ্রীধরের সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া ওঠে। বালিকা বিদ্যালয়ে টাকাগুলা দিয়া যাইবেন? না, প্রাণ থাকিতে তাহা তিনি পারিবেন না। আজকালকার বিলাস-প্রবণ হাই-হিল জুতাপরা মেয়েগুলাকে দেখিলেই তাঁহার অস্থিপঞ্জর জ্বলিতে থাকে। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে টাকাটা দিলে কেমন হয়? দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বর্ত্তমান ডাক্তার খোঁচা-গোঁফ পরেশ চক্রবর্ত্তীর মুখটা স্মৃতিপটে উদিত হইলেই এ ইচ্ছা আর দ্বিতীয়বার হয় না। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের? ও ভণ্ড ব্যাটাদের টাকা দিয়া লাভ? বন্যা প্রপীড়িতদের? স্বয়ং ভগবান যাহাদের শাস্তি বিধান করিয়াছেন তাহাদের বাঁচাইবে শ্রীধর মিত্তির? ও চিন্তা করাই অনুচিত। টাকাগুলো শুধু জলে পড়িবে। স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতির ছোঁড়াগুলো কিছু টাকার জন্য ধরিয়াছিল। তাহাদের কিছু দিলে কেমন হয়? ঘোড়ার ডিম হয়! যে স্বাস্থ্য তাহাদের আছে তাহারই আহার জোগান কঠিন ব্যাপার। এমনিই ত প্রত্যেকটা ষণ্ডামার্ক। ইহার অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যবান হইলে খোরাক জোগাইবে কে! সকলেরই গণেশ উল্টাইয়া যাইবে শেষকালে!

শ্রীধরের কিছুই মনঃপুত হয় না।

রোজই চিন্তা করেন। কিন্তু কি করিলে যে অর্থটার প্রকৃত সদগতি হয় কিছুতেই ঠিক করিতে পারেন না।

৫

অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল। কি ভীষণ রাত্রি সেদিন! মুহুর্ম্মুহু বজ্রাঘাত, মুষলধারে

বৃষ্টি, প্রবল ঝড়। সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। বেচারি নকুড় সেই দারুণ ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দাহ করিবার জন্য লোক ডাকিতে হইবে। জলধরবাবুর নিকটে গেল। শ্রীধরের উপর জলধরবাবু প্রসন্ন ছিলেন না। সুতরাং তিনি বলিলেন যে তাঁহার শরীর খারাপ—এই দুর্য্যোগের রাত্রে তিনি মড়া বহিতে পারিবেন না। নকুড় তখন পরিচিত অন্যান্য ভদ্রলোকদের নিকটে গিয়া এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিল এবং সকাতরে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু মক্ষিচুসের শব বহন করিয়া এই দারুণ রাত্রে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী শ্মশানে যাইতে কেহই রাজী হইলেন না। একটা না একটা অজুহাত দেখাইয়া সকলেই ঘরে খিল দিলেন। বিপন্ন নকুড় ব্যাকুলভাবে প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল।

৬

অনেকক্ষণ পরে নকুড় ফিরিল।

একটিমাত্র লোককে সে জোগাড় করিতে পারিয়াছিল। লোকটি অপর কেহ নয়—ঘোষাল পাড়ার সিগারেটখোর সেই ভদ্রলোকটি। শ্রীধরের মৃত্যুসংবাদে একমাত্র তিনিই বিচলিত হইয়াছিলেন এবং এই নিদারুণ দুর্য্যোগসত্ত্বেও শব বহন করিতে আপত্তি করেন নাই। ব্লাউস-বিলাসিনী তাঁহার পত্নীটিও এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন; নকুড় বাহিরে দাঁড়াইয়া স্বকর্ণে তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেই মৃত শ্রীধর মিত্র উঠিয়া বসিলেন ও সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন "কে কে এলো?"

সিগারেটখোর ভদ্রলোক স্তম্ভিত!

নকুড় সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা করিল। লটারি খেলোয়াড় শ্রীধর সমস্ত শুনিলেন এবং তাহার পর অকস্মাৎ উঠিয়া সিগারেটখোর ভদ্রলোককে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চুম্বন করিলেন। শ্রীধরকে এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে নকুড়ও কখনও দেখে নাই। চুম্বনান্তে শ্রীধর বলিলেন—"তোমাকেই আমার স্থাবরঅস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলাম। নোকড়কেও অবশ্য কিছু দিতে হবে!"

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিলেন—"দেখ, নগদ চার লাখ টাকা আছে আমার। তার থেকে ইচ্ছে করত স্ত্রী শিক্ষা বাবদ কিছু খরচ করতে পার তুমি। আপত্তি করবার উপায় নেই আর আমার!"

* * *

তাহার পরদিনই যথাবিধি উইল করিয়া শ্রীধর কথাকে কার্য্যে পরিণত করিলেন। আমরণ এ উইল তিনি পরিবর্ত্তন করেন নাই।

শীত—পৌষ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সারাটি রাত্তি মনের দুঃখে
জাগিয়া বুঝি কাটালে,
ভোরের বেলা শিশির রূপে
নয়নজলে পাঠালে।
রঙীন সাড়ী ফেলেছ খুলে
খুলেছ চোলি আঙিয়া
অভিমানের বেদনাবুকে
স্বপ্ন দেছে ভাঙ্গিয়া।

বেকার

শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ

সাত বছর পর আবার সেই চিরপরিচিত শেয়ালদা ষ্টেশন। সরকারের দেওয়া রেলের টিকিটখানি গেটে টিকিট-কালেক্টারের হাতে দিয়ে বাইরে এসে পকেটে হাত দিলাম। গোটাকয়েক টাকা এখনও অবশিষ্ট আছে। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ীর দরজাটা এক হাতে খুলে আর এক হাতে ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে ডাকল—বাবু, ট্যাক্সি? সাদা কোটপ্যাণ্টপরা রেলের চেকারের মত টুপি মাথায় লম্বা ছিপছিপে একটি লোক এগিয়ে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে,—বাবু, হোটেল? দুজনের পানে তাকিয়ে একটু হাসি পেল, দুজনেই তার মানে বুঝল—আমি ট্রামের দিকে রওনা হলাম।

ট্রামে ত উঠলাম, কিন্তু টিকিট নেই কোথাকার? বকুলবাগানের সেই মেস কি আর আজও আছে? বন্ধুবান্ধবের অনিশ্চিত মেসের চেয়ে তবু নিজে যেখানে থাকতাম সেখানেই আগে ঢুঁ মেরে দেখা যাক। একটি পুরানো চেনা লোকও কি আর সেখানে পাব না? কণ্ডাক্টার এসে পড়েছে, টিকিট চাইলাম—ভবানীপুর।

সাঁঝের কলকাতা—আলোয় ঝলমল; কিন্তু তার পেছনেই অন্ধকার, ঠিক আমার ভবিষ্যৎ জীবনের মত।

এত রাত্রে কোথায় যাই? দূরে ট্রাম আসছে না তো চোখ রাঙিয়ে তেড়ে আসছে যেন আমারই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

হাজরা পার্কে বেঞ্চের উপর প্রথম রাত্রি কাটল।

সকাল বেলা সবার আগে কাজ হ'ল একটা আস্তানা ঠিক করা। বেরোলাম মেসের খোঁজে। মেস তো আর চোখে পড়ে না, সবই দেখি পাইস হোটেল। তা-ই সই—সাহসে ভর ক'রে একটাতে ঢুকলাম। সীট চাইতেই প্রথম প্রশ্ন—মশায়ের কি করা হয়?

—আজ্ঞে এখনও কিছু ক'রে উঠতে পারি নাই।

—মাপ করবেন। আমরা বেকার লোককে সীট দিই না।

তিন-চার জায়গায় ঐ একই প্রশ্ন ও একই উত্তর। বুঝলাম, এসব ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা বিপজ্জনক। সুতরাং এর পরের হোটেলে অবলীলাক্রমে কান একটু লাল না ক'রে ব'লে ফেললাম—রেলি ব্রাদার্সে চাকরি করি।

সীট পেলাম।

বকুলবাগানের মোড়। নামতে হ'ল। পা চলে ত চলে না—করতে করতে পুরানো সেই বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাত্রি তখন এগারোটা। নীচের ঘরে একটি ছেলে পড়া মুখস্থ করছিল, ভয়ে ভয়ে বারান্দায় উঠতেই তার সঙ্গে চোখোচোখি।

—কাকে চান?

—এটা কি মেস?

—না, বাড়ী। আমরা এ বাড়ীতে থাকি।

—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস রে ভুলু? বলতে বলতে এক বিরাট ভুঁড়ির আবির্ভাব।

—কি মশায়, এত রাত্রে কাকে চাই?

—চাই না কাউকে, এটা মেস কি না তাই জানতে চাচ্ছি।

—এটা মেস হতে যাবে কি দুঃখে?

—দুঃখে নয়; সাত বছর আগে এটা মেস ছিল এবং আমি এখানে থাকতাম। এখনও তাই আছে কি-না জানতে এসেছি। আচ্ছা চললাম, কিছু মনে করবেন না।

ভুঁড়িকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

সীট তো পেলাম, চাকরি পাই কোথায়? দিন কয়েক পরই তো বাড়ী থেকে চিঠি আসতে সুরু করবে—মহাজন বাড়ী গ্রাস করেছে, জমিদার জমি খাস করেছে, টাকা পাঠাও। এতকাল কৈফিয়ৎ ছিল, এখন তো আর তা থাকবে না।

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে—চাকরি আসা দূরের কথা একটা ভ্যাকান্সির খবরও আসে না। দশটা-পাঁচটা হোটেলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়, রেলি ব্রাদার্সে চাকরি করি তো! রাত্রি বেলা বিছানায় চিৎ হয়ে ভাবি, হায়রে অনিলটা যদি আজ থাকত। কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি, মেসে এক সঙ্গে থেকেছি। মনিঅর্ডারে টাকা এসেছে, এক সঙ্গে সিনেমা দেখেছি। এখন তো ট্রামে উঠতেও ভয় হয়, পুঁজিতে পাছে ঘাটতি পড়ে। ডালহৌসির দৈত্যের মত বাড়ীগুলির গহ্বরে রয়েছে চাকরি মানে জীবন, কিন্তু তার ভিতরে যাই কি করে? দরজায় ঢুকেই দেখি বড় বড় হরফে লেখা—নো ভ্যাকান্সি। তা সত্ত্বেও কাজও খালি হয়, ভর্ত্তিও হয়। সিঁড়িতে উঠতে পা চলে না, সাহেব যদি বলে—দরজায় কি লেখা আছে দেখ নি? দরজা পর্য্যন্ত পার হই—সিঁড়ির দু-তিন ধাপও উঠি, কিন্তু আর এগোতে ভরসা হয় না,

ফিরে আসি। অনিল যদি থাকত—তার ওসব চক্ষুলজ্জা ছিল না। যেখানে যাবে ঠিক করত, ঠেলে গিয়ে হাজির হ'ত, কাজ হাসিল ক'রে চ'লে আসত। সে থাকলে আজ নিশ্চয়ই আমার কাজের জোগাড় হয়ে যেত। আমি না পারি—সে আমার জন্যে একটা জুটিয়ে দিতই। অনিল—অনিল—অনিল! মনে প্রাণে যাকে ডাকা যায়, তার দেখা অনেক সময় নাকি পাওয়া যায়। কিন্তু এ যে কলকাতা—এর লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তাকে কি আর পাব? এখানে সবাই মানুষ, কিন্তু সবাই অচেনা।

দরখাস্ত অনেকগুলো করেছি, একটারও উত্তর নাই। সুবিধা ছিল, ক্যায়ার অব্ য়্যাড্ভাটাইজমেণ্ট বক্স; পয়সা লাগে নাই। হেঁটে গিয়ে পোষ্ট করেছি। একটা অসুবিধা, কার কাছে পাঠালাম সেটা জানতে পারতাম না। অনিল থাকলে সোজা আফিসগুলোতে গিয়ে চেষ্টা দেখতাম।

হোটেলে কয়েকটা টাকা বাকি পড়েছে। ম্যানেজার সকালবেলা বলছিল—কি মশায়, ৮ তারিখ হয়ে যায় এখনও টাকা দেন না কেন? চাকরি ক'রেও যদি এরকম করেন তাহ'লে কি ক'রে চলবে? চটে উঠতে গিয়েও থেমে গেলাম। এই ত সবে সুরু। আরও কত বাকি পড়বে, আরও কত খোঁচা খাব কে জানে? অনিল থাকলে ওর কাছ থেকে নিয়েই না হয় দিয়ে দিতাম।

টাকা এখন পাই কোথায়? রিলিফ কমিটিতে যাব? নাঃ, ওখানে হাত পাততে পারব না, কিছুতেই না। হেমন্তবাবুর চিঠিতেও কোথাও সুবিধা হ'ল না, ল্যান্সডাউন রোডে যাওয়া আসাই সার হ'ল; মামা বলতেন, কলকাতার রাস্তায় টাকা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে নিতে জানলেই হ'ল। আমি কি কুড়িটা টাকাও মাসে জোটাতে পারব না? আর দু-তিন দিনের মধ্যে হোটেলের দেনা শোধ করতে না পারলেই ম্যানেজার সন্দেহ করবে যে আমি বেকার। তৎক্ষণাৎ হোটেল ছাড়তে হবে। তার পর অন্ধকার। নতুন জায়গায় গিয়ে যে আগাম দিতে হবে তাও যো নাই।

সেদিন হোটেলে ফিরতে একটু রাতই হ'ল। দেখি বিছানার উপর একটা চিঠি। আমারই নামে। টাইপ করে খামের উপর আমারই নাম লেখা। কোন কোম্পানী থেকে নয় তো? খোলবার সময় হাতটা একটু কেঁপে গেল। চিঠি খুললাম—উপরে বড় বড় হরফে ছাপা—ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট। আমাকে লিখছে সোমবার বেলা বারোটার সময় ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিসে দেখা করতে।

চাকরি, এতদিন পরে তবে সত্যিই চাকরি জুটবে? দেখা যখন করতে লিখেছে তখন নিশ্চয়ই কাজ দেবে। দেবে না কেন? বি-এ পাশ করেছি, য়্যাকাউণ্টেন্সি জানি, না দেবার কি কারণ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই দেবে। না দিলে আমার যে চলবে না, বাপ-মা-ভাই-বোন সব শুদ্ধ না খেয়ে মরতে হবে। ম্যানেজারের গলার আওয়াজও ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। কাজ আমায় একটা পেতেই হবে। সুগার সিণ্ডিকেট—চিনির কোম্পানী, চিনি, চাকরিটাও নিশ্চয় চিনির মতই মিষ্টি হবে। কাল সকাল সকাল বেরোতে হবে। ভবানীপুর থেকে হেঁটে ক্লাইভ ষ্ট্রীট—পারব তো সময় মত পৌঁছাতে? ট্রামের পয়সা পাই কোথায়? অনিল যদি থাকত। রুম-মেটের একটা পাশ আছে, দুপুরবেলা সে তো পড়ে পড়ে ঘুমায়। ওর পাশটা যদি চাই, তাহ'লে কেমন হয়? দেবে কি না কে জানে? আচ্ছা, চেয়ে তো দেখি একবার। এখনই বলব? থাক না, কাল সকালে বললেই হবে। সকালে তো আর ও বেরোয় না। আঃ, রাতটা আর কাটে না। সকাল—তারপর দুপুর, ব্যস; বিকাল থেকেই আমি বড়লোক। দেখা করার পরই তো য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে দেবে। আজই আমার বেকার জীবনের শেষরাত্রি।

সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটল। ভোরের আলো ঘরে এসে আমায় জানিয়ে দিল যে, আজ থেকে আর কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়তে হবে না। আজ বিকাল থেকে অন্য লোকে পড়বে আর আমি হাসব।

সারা রাত্রির অনিদ্রার পর ঘুম এসে চোখের পাতায় ভর করল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাই নাই। হঠাৎ আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে ঘড়ি দেখলাম দশটা বেজে গেছে। সরকারের টাকায় কেনা একটা ঘড়ি ও একটা পার্কার তখনও আছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেয়ে নিলাম—পৌনে এগারোটা। এগারোটায় বেরোব—সাড়ে এগারোটায় ডালহৌসি পৌঁছাব—বারোটায় ইণ্টারভিউ। পনেরো মিনিট বিশ্রাম ক'রে ঠিক এগারোটায় বেরিয়ে পড়লাম। পাশটা রুম-মেটের কাছে চাওয়ামাত্র পেয়েছি।

ট্রামে উঠব। পকেটে হাত দিয়ে দেখি কলম নাই। তাই ত, কলম যে বালিশের নীচে রয়ে গেছে। কলম ছাড়া যাই কি ক'রে? য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার যদি সই ক'রে নিতে বলে? ফিরে গিয়ে কলম নিয়ে আসতে দশ মিনিট দেরী হয়ে গেল। আঃ, ট্রাম যে আর আসে না। আরও দু মিনিট। ঐ যে আসছে, তাও আবার সব কটা ষ্টপে থামতে থামতে। হায় রে, যদি পয়সা থাকত, তাহ'লে বাসে যেতাম। তাড়াতাড়ি যেতে পারতাম।

উঠলাম। ট্রাম ছাড়ল। পেছন থেকে চীৎকার—বাঁধকে। ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েই ঘ্যাঁচ ক'রে বাঁধল। লেডী। ওঁদের বেলায় বিনা ষ্টপেও বাঁধা চলে। তাছাড়া কেউ মাঝ পথে উঠতে চাইলে গম্ভীরভাবে হাত বাড়িয়ে ষ্টপ দেখিয়ে দেয়। বার্নিশ করা লেডী হাতে হাণ্ডব্যাগ নিয়ে খুট খুট করে এসে উঠলেন। কণ্ডাক্টার হাঁকল—লেডীজ সীট ছেড়ে দিন। লেডী সীটে উপবিষ্ট ভদ্রলোক দুটি তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে সীট ছাড়লেন। খুট খুট ক'রে লেডী গিয়ে রিজার্ভ সীট দখল করলেন।

এলগিন রোড—প্রায় সাড়ে এগারোটা। সর্ব্বনাশ, বারোটায় পৌছাব তো? ট্রাম যে চলতেই চায় না। ড্রাইভারটা একেবারে অপদার্থ। আর একটু জোরে চল্ না রে বাপু। তাও আবার এই দুপুরবেলা প্রত্যেকটা ষ্টপে থামছে, হয় লোক ওঠে—না হয় নামে। বাসগুলো ভোঁ ভোঁ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে। সাধে লোকে বাসে ওঠে? আমার পয়সা থাকলে আমিও উঠতাম। পার্ক ষ্ট্রীট—এগারোটা চল্লিশ। সবুজ আলো—আঃ ট্রামটা বেরিয়ে যাক। টিং। হয়েছে, আবার লোক নামে যে। টিং টিং—এখনও সবুজ আলো আছে—ছাড়ল। যাঃ, হলদে, লাল—ঘ্যাচ্। ঘড়ির কাঁটাটাও আজ যেন ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘুরতে সুরু করেছে। তুই একটু আস্তে চল না রে বাপু। আবার হলদে, সবুজ—ট্রাম চলল। এসপ্ল্যানেড—এগারোটা ছয়চল্লিশ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাত-পা অবশ হবার জোগাড়।

ডালহৌসি—বারোটা বাজতে চার মিনিট। ক্লাইভ ষ্ট্রীট ধরে ছুটলাম। ১০০ নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীট—সুগার সিণ্ডিকেট। ঐ তো পিতলের প্লেট। ঘড়ির উপর আপনা হতেই নজর গেল—বারোটা এক মিনিট। মরবার সময় শুনেছি লোকে ঘামে—এই রকমই বোধ হয়।

তবুও উঠি তো। ধুপধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে কে নামে? যেই নামুক না, আমি তো উঠি। সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই—হ্যালো পরেশ, তুই কবে এলি? কবে ছাড়া পেলি? এখানে কি মনে ক'রে?

—আরে, অনিল, এখানে!

—আর বলিস কেন? আজ এখানে ইণ্টারভিউর জন্য ডেকেছিল। য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়ে গেলাম। পঞ্চাশ টাকায়। কাল দশটা থেকে আফিস করতে হবে। কোথায় আছিস বল্ তো? মনোহরপুকুর, কয় নম্বর? চৌদ্দ? আচ্ছা, ফাঁক পেলেই দেখা করব। দশটা-পাঁচটা আফিস, সময় পেলে হয়। দেরী হলে কিছু মনে করিস না। তা, তুই এখানে কি মনে ক'রে?

—চাকরির খোঁজে আর কি। গলার আওয়াজটা অচেনা বলে মনে হ'ল। অনিল সেটা ধরতে পারে নাই।

—চাকরির ভাবনা আবার তোদের? কর্পোরেশন তো তোদেরই হাতে। গেলেই হ'ল। এখানে এসেছিস কি করতে? ল্যান্সডাউন রোডে হেমন্তবাবুর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে কর্পোরেশনে যা, কালই তোর চাকরি হয়ে যাবে। তুইও যেমন, এসেছিস সুগার সিণ্ডিকেটে। এসব খোঁজ খবর পাস নি বুঝি?—আচ্ছা, আজ তবে আসি। গুড লাক—তিন লাফে অনিল রাস্তায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারোটা কুড়ি। একটার মধ্যে পাশটা ফেরৎ দিতে হবে।

মোটর সাইকেলে পাঁচ হাজার মাইল

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

ভ্রমণ

দিনের আলো থাকতে থাকতেই মেথারগড় পৌছালাম। এখান থেকেই কাশ্মীর রাজ্য আরম্ভ। এখানে বাণিজ্য শুল্কের বাধা আছে। অফিসাররা বেশ ভদ্র। বোঁচ্কা-বুঁচ্কি খুলতে হ'ল না। বল্লেন, ভদ্রলোকের মুখের কথাই যথেষ্ট।

প্রতি বন্দুকের জন্য কাশ্মীররাজ্যের প্রবেশ-মূল্য এক টাকা ক'রে দিতে হ'ল। প্রতিটি বন্দুকের সঙ্গে পাঁচ শত টোটা নেওয়ার অধিকার আছে, তার জন্যে কোন রকম শুল্ক দিতে হয় না। যদি কেউ শিকার করতে চান, তাহ'লে তাঁকে আলাদা শুল্ক দিতে হয় ও অনুমতি-পত্র নিতে হয়। এই অনুমতি-পত্র ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার স্বয়ং দিয়ে থাকেন।

অনেক দূর থেকে জম্বু শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। শহরটি একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মালার মত সাজানো আলোর শৃঙ্খল রাত্রে যিনি স্বচক্ষে না দেখেছেন তাঁকে বর্ণনার দ্বারা বুঝানো যায় না, কি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য!

জম্বু শহরের উপকণ্ঠে একটা ধর্মশালায় উঠে রাত কাটাবার ব্যবস্থা ক'রে বাজারে গেলাম আহার অন্বেষণে। প্রধান বাজারে যখন ঢুকলাম রাত্রি তখন আটটা। রাস্তা ক্রমশই উপর দিকে উঠেছে। রাস্তার দু ধারেই বাজার, বাজার যেখানে শেষ হয়েছে—সেই চৌমাথায় ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে, বাজারে ঢুকবার মুখেই কতকগুলা হোটেল দেখে এসেছি, সুতরাং সেইদিকে যাবার জন্য ট্রাফিক পুলিশকে প্রদক্ষিণ ক'রে নীচের দিকে আমাদের গাড়ী চল্‌ল। হঠাৎ কানে তীব্র হুইসেলের আওয়াজ, আমি পিছন ফিরে দেখি ট্রাফিক পুলিশ আমাদের উদ্দেশ ক'রেই

বাঁশী বাজিয়েছে। কাজেই গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াতে হ'ল। পুলিশটি গোঁফ মুচ্ড়িয়ে চোখ পাকিয়ে আমাদের ধমকাতে সুরু করলে, কেন আমরা যে রাস্তায় এসেছি সেই রাস্তায়ই ফিরে যাচ্ছি। এ নিয়মবিরুদ্ধ। নিজদের অজ্ঞতা জ্ঞাপন করায় ও সমবেত জনতার সহানুভূতি আমাদের পক্ষে থাকায় পুলিশ নীরবে নীচে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিলে।

ধর্মশালায় রাতটা মন্দ কাট্‌ল না।

হোটেলে আহারাদি সেরে বেলা দশটায় জম্মু ছাড়্লাম, রাস্তা বরাবরই চড়াই। মাইল খানেক যাওয়ার পর কাশ্মীর-রাজের প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হ'ল। বাহ্য দৃশ্য বেশ রমণীয়ই মনে হচ্ছিল।

দারুণ খাড়াই রাস্তা, দু-এক ঘণ্টা অন্তর গাড়ীকে দশ-পনর মিনিট ক'রে বিশ্রাম দিয়ে চল্‌তে হচ্ছিল। এইভাবে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল যাওয়ার পর পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক ডালিমের গাছ দেখা গেল।

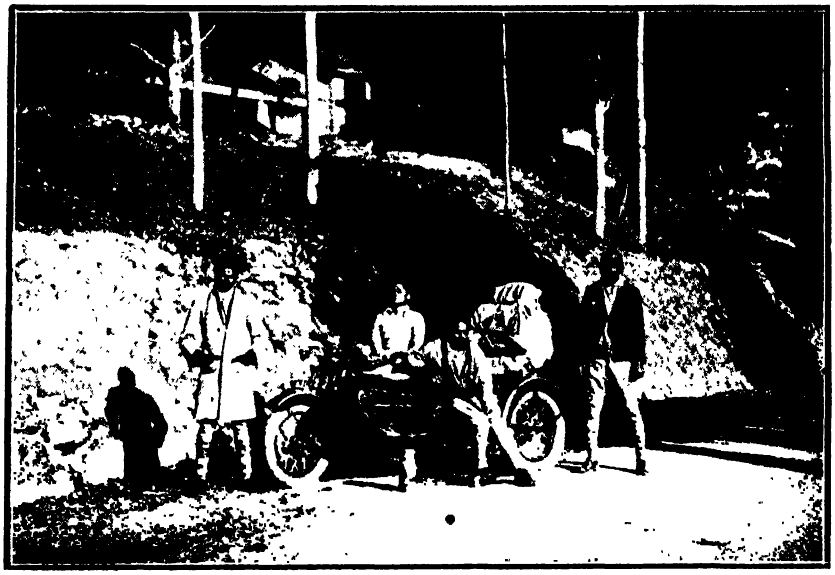
আরও কিছু দূর যাবার পর দ্রুতবেগে একখানি মোটর নেমে আস্‌ছে দেখা গেল। ঐরূপ আঁকা-বাঁকা পাহাড়-পথে এত দ্রুত চালাতে দেখে আমরা চালকের শিক্ষা ও সাহসের তারিফ করছি, এমন সময় চোখের পলক না ফেল্‌তে ফেল্‌তে মোটরখানি আমাদের কাছে এসে একেবারে থেমে গেল।

কাশ্মীর পুলিশের শিরস্ত্রাণধারী মোটর চালক আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন এর আগে, পিছু রাস্তায় আমাদের কেউ আট্‌কেছিল কি-না। আমরা যখন জানালাম যে পথে আমাদের কেউই বাধা দেয় নি, তখন তিনি বল্‌লেন, "এ পথে মহারাজকুমার মোটরে আস্‌ছেন, তিনি যতক্ষণ না এই জায়গা পার হয়ে যান, ততক্ষণ আপনারা দয়া ক'রে এইখানেই থাকবেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁরা এসে পড়বেন।

এই অনুরোধ আদেশেরই নামান্তর মাত্র।

আধ ঘণ্টা সেখানে চুপচাপ বসে রইলাম। তিনদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য পার হ'য়ে গেল। কিন্তু মহারাজ-কুমারের মোটরের দর্শন পাওয়া গেল না। ব'সে ব'সে কড়িকাঠের অভাবে জঙ্গলের গাছপালাই গুণতে লাগলাম। আরও একঘণ্টা ধৈর্যচ্যুতির পর চারখানি মোটর পার হ'য়ে গেল। 'কাশ্মীর ষ্টেট' লেখা দেখে নিঃসংশয় হ'তে পারলাম যে এদের একটাতে কুমার গেলেন। সুতরাং আমরাও অবাধে অগ্রসর হ'তে সুরু করলাম।

পথ সমানভাবেই খাড়াই উঠেছে। আমাদের বাইক বেশীর ভাগ সেকেণ্ড গিয়ারে চালাতে হচ্ছিল। এইভাবে চালিয়ে একটা গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামটির নাম কুদ।



বাটোট ডাক বাংলোয়—৫২০৪ ফিট

বেলা তখন প্রায় চারটা। বেশ ক্ষুধাও বোধ হচ্ছিল। দেখলাম কতকগুলা দোকানে চায়ের ব্যবস্থা আছে। চা ও খাবার মন্দ হ'ল না।

দোকানী আশ্বাস দিলে যে আর মাইল কতক উঠলেই পাটনীশাল এবং তার পরই দরাবর উৎরাই। এই দারুণ দুরূহ চড়াই আর বেশী নেই—দোকানীর আশ্বাসবাণী আমাদের মনে প্রাণে যে আনন্দরস পরিবেশন করলে তা তারই হাতের দেওয়া চা-খাবারের উপাদেয় রসের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়—একথা তখন আমরা হলফ ক'রেই বল্‌তে পেরেছিলাম।

চারিদিকের নৈসর্গিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। সম্মুখে পাহাড়গুলো যেন অতলস্পর্শ পাতালের শেষ ধাপে গিয়ে ঠেকেছে। অনেক নীচে একটা ছোট্ট উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। তাতে ছোট ছোট ক্ষেতগুলি সবুজ গালচের মত দেখাচ্ছে, তার পরই আবার আকাশ-চুম্বী পাহাড় উঠেছে অপরূপ মনোহর মূর্ত্তিতে, মাথায় যেন তার রূপালী তাজ। এ ত কবি কল্পনা নয়। পর্ব্বতশিখর যে কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত তা যে না দেখেছে তাকে কেমন ক'রে বোঝাব!

সত্যই আজ এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হ'ল। নিজের কথা ত বলতে পারিনে। বন্ধুদের মুখগুলে যে আনন্দের অপূর্ব দ্যুতি প্রতিভাত হ'তে সেদিন দেখেছি তার মূল্য নিরূপণ করবার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই।



হাউসবোটের ড্রইং রুম—শ্রীনগর

মাইল দুই চড়াই ওঠবার পর পাহাড়ের অপরদিকে রাস্তা নামতে সুরু হয়েছে। রাস্তা ভিজা ও কদমাক্ত।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছলাম। সাইড কারের মাডগার্ড ভেঙ্গে গিয়ে ঝর ঝর করছিল ব'লে সে আপদটাকে খুলে ফেলেছিলাম। এতদিন শুকনো রাস্তায় কোন ক্ষতি হয়নি তাতে। সুতরাং মাডগার্ড যে নেই, একথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা। এই নূতন রাস্তায় গজ কতক এসে বন্ধুরা যখন নিজেদের দেহের দিকে তাকিয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন তখন মনে পড়ল যে মাডগার্ড নেই। দ্রুতগতি-বেগবিশিষ্ট চাকা, চক্রাকারে কাদা ছিটিয়ে তাদের সারা দেহে যে কী ভব্যতা লেশহীনভাবে রাহাজানি সুরু ক'রে দিলে, তারও প্রকাশযোগ্য ভাষা আমার এ অক্ষম লেখনীর নেই।

প্রায় সন্ধ্যার মুখেই বাটোট পৌঁছালাম। এখানকার উচ্চতা ৫১০৪ ফিট। এখানে পেট্রোল কিনে আবার চলতে লাগলাম। ইচ্ছা ছিল, আরও আঠার মাইল গিয়ে রামবানে ডেরা নেবো; কিন্তু মাঝপথে পুলিশ বাধা দিয়ে বললে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর এগুতে দেবে না। বাটোট বিশ্রামের ঘরগুলি জনপূর্ণ থাকায় আশ্রয় মিলল না। অগত্যা ডাক বাংলো। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল, শোবার ঘরগুলি সব ভর্তি হয়ে গেছে। নিরুপায় হ'য়ে বাংলোর খানা-কামরাতেই রাত কাটাবার চেষ্টায় আস্তানা গাড়লাম। ঘরটি খুব বড়। দেওয়াল কাচের তৈরী। হাড়ের ভেতর শীত ঢুকে গেছলো। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপের মাত্রাও যেমন বাড়ছিল, তেমনই আমাদের অস্থিভেদী কাঁপুনিও বাড়ছিল। বলা বাহুল্য, সে রাতে কাউকে ঘুমতে হয়নি।

পরদিন প্রাতরাশ শেষ ক'রে বেরুতে বেলা সাড়ে আটটা বেজে গেল। সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীনগর পৌঁছাতে পারব, এই ভরসা।

আগের দিন আমাদের ভাঙা মাডগার্ডটি কামারের দোকান থেকে মেরামত করিয়ে নিয়েছিলুম, পথে কিছু কাদা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু দুর্ভোগ আর হয়নি।

বেলা সাড়ে বারটায় বানিহাল পৌঁছালাম। এখানকার উচ্চতা ৫৫৯৭ ফিট। বাটোট থেকে রামবান উৎরাই পেয়েছিলুম। রামবান থেকে রাস্তা আবার চড়াই। বানিহালে রাস্তার উপর শুল্ক বিভাগের ফাঁড়ি আছে। সেখানে আবার

আমরা বাধা পেলাম। কারণ বানিহাল-পাশে খুব বরফ প'ড়ে পথ বন্ধ হ'য়ে গেছল। মহারাজকুমারের শ্রীনগর থেকে জম্মুতে অবতরণ উপলক্ষে সম্প্রতি একটি মোটরের যাতায়াতের উপযুক্ত কোরে পথটিকে তুষার মুক্ত করা হয়েছে। ওঠ্‌বার সময় হচ্ছে এগারটা থেকে বারটা। আমরা গিয়ে পড়েছি সাড়ে বারটার পর, কাজেই বানিহালে আমাদের একটা দিন অপেক্ষা ক'রে থাকতে হল।

ছোট একটা গ্রাম। কত ভাল ভাল স্থান উপেক্ষা করে চলে এসেছি, পাছে শ্রীনগর যেতে দেরী হয়ে যায় এই ভয়ে। শেষে কি-না বানিহালের মত একটা নগণ্য জায়গায়—যেখানে দেখ্‌বার কিছু নেই—এমন কি, বেড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই সেখানে এসে বাধা! একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

এদিন আর ঠকিনি। ঘরের চিম্‌নিতে আগুন জ্বেলে ঘর গরম ক'রে বেশ আরাম ক'রেই ঘুমালাম। নৈশ-ভোজনে বেশ একটু বৈচিত্র্য, দুধ-ঘি-আলু সহযোগে এই-দেশী শুট্‌কী মাছের তরকারী। জলের সংস্পর্শ-মাত্র তাতে ছিল না।

পরদিন সকালে পাড়ি দেওয়া গেল। এবার আঁকা-বাঁকা পাহাড়িয়া-পথ খাড়াভাবে ক্রমশই ঊর্দ্ধদিকে উঠেছে। যত উঠি, হাওয়ার বেগ ততই বাড়ে। প্রায় ৭৮০০ ফিট উঠ্‌বার পর পথে অল্প অল্প বরফ দেখা গেল। শেষ হাজার ফিট পথ গভীর বরফের ভেতর দিয়ে রাস্তা। আর ঝড়ের প্রকোপও তেমনই বেশী। এক একটা দমকা বাতাস এসে আমাদের এমন সন্ত্রস্ত করছিল যে, মনে হচ্ছিল বুঝি বা আমাদের গাড়ীশুদ্ধ কোথায় উড়িয়ে নিয়ে ফেল্‌বে। ৮৯৯০ ফিট উঠে টানেল ক'রে পথ পাহাড়ের অপর পিঠে গিয়ে পৌঁছেছে। ও-পারে বরফ আরও গভীর, কিন্তু হাওয়া একেবারে ছিল না।

এই রাস্তা থেকে তিন মাইল দূরে ঝিলাম নদীর উৎপত্তি স্থান ভেরিনাগ। সেখানে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের তৈরী বাগান প্রভৃতি দেখলাম। সেখানে পথ পাহাড় থেকে নেমে সমতলভূমিতে পড়েছে।

পথে জাফ্‌রানের ক্ষেত একটা দেখবার মত জিনিষ।

শ্রীনগর যখন পৌঁছালাম তখন বেলা দুটা। এখানে পৌঁছে মনটা বেশ হাল্‌কা বোধ করলাম। বহু দিনের সাধ আজ পূর্ণ হ'ল, এ কি কম আনন্দ!

হোটেল অনেকগুলি ছিল। কিন্তু সবগুলিই দুঃখকারজনক-ভাবে অপরিষ্কার। বিদেশে বেরিয়ে অবধি আমাদের ত হোটেলে হোটেলেই কেটে গেল, কিন্তু এমন কদর্য হোটেল কোথাও নজরে পড়েনি।



ঝিলাম বক্ষে শিকারায়—শ্রীনগর

বলা বাহুল্য ও-রকম নোংরা হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারিনি! হাউস্‌বোটে থাকবার ব্যবস্থাই হ'ল।

বড় সুন্দর দেখ্‌তে এই হাউস বোট। ঝেলাম নদীর জলের উপর ভাসমান কাঠের দোতালার বাড়ী। এ-গুলির ভিতর-বাহির দুইই সুন্দর।

ঝেলামের উৎপত্তি স্থানের জল কাচের মত স্বচ্ছ, কিন্তু শ্রীনগরে ঝিলামের জল কালো।

পরদিন ৩রা নভেম্বর আমরা হাউস বোটের মালিককে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলাম।

শেমাশাহী বাগান থেকে কিছুদূরে এক পাহাড়ের উপরে কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে পেয়ে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, ও-গুলো কি? তিনি বল্‌লেন, ও

জায়গার নাম পরীস্থান। ওখানে গেলে চোখের অসুখ হয় বলে কেউ ওখানে যায় না।

আমাদের এক জেদী বন্ধু বল্‌লেন, তবে ত যাওয়া চাইই। হাতে হাতে ফল, এমন ভৌতিক ব্যাপারটাই না যদি পরখ কর্‌লাম তো অভিযান করতে কি জন্য বেরুনো।

আমাদের না-ছোড়বান্দা দেখে সে ভদ্রলোক'ও শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ কর্‌লেন। ধ্বংসাবশেষ দেখবার কিছুই ছিল না। তবে এখান থেকে শ্রীনগরের দৃশ্যটা অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। আর চোখ খারাপ? আট মাসের ওপর হয়ে গেছে পরীস্থান দেখে ফিরেছি, চোখের চিকিৎসা কর্‌বার মতন কোন কারণ এ পর্যন্ত আমাদের কারুরই ঘটেনি।

বিকালে শিকারা ক'রে বেড়াতে গেছলাম। এতক্ষণে



তক্ষশালা

বুঝলাম এখানকার ঝিলামের জল এত কালো কেন? কি বিশ্রী নোংরা এই নদী আর এর দুই তীর! শহরটা একেবারে নোংরা। এত নোংরা শহর আমরা জীবনে দেখিনি। ময়লায় ভর্তি নদীর জল, ময়লা প'চে প'চে যেমন দুর্গন্ধ জমে উঠেছে, তেমনই তার রঙ হয়েছে পচরাণির মত। নদীর স্রোত খুব কম থাকায় আবর্জনা জমে খুব বেশী। লোকগুলোও তেমনই। গায়ের রঙ এককালে হয়তো ফরসাই ছিল, কিন্তু তার উপর পরদার পর পরদা জমেছে ময়লার ছোপ চিটিয়ে কায়েমী হ'য়ে। বোঝবার আর উপায় নেই যে, ঐ চিটিয়ে-ধরা কদর্যতার যবনিকাতলে কোনদিন কোন সুশ্রী বস্তু ছিল। পরিচ্ছদের তো কথাই নেই। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ান যায় না, খাওয়া-দাওয়া সকল ব্যাপারই ন্যক্কারজনক।

ভূস্বর্গের উপযুক্ত অধিবাসীই বটে এরা! প্রকৃতি দেবী এক দিকে যেমন নিজে তাঁর অনন্ত রূপ-ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে দু'হাতে অজস্র দান করেছেন, অপরদিকে তাঁর সন্তানেরা তার মর্যাদা দিচ্ছে নিজেদের দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে। প্রকৃতির দানে যে বস্তুটির প্রাচুর্য প্রতিনিয়ত ক্ষরিত হচ্ছে সেই বস্তুরই অভাব দেখ্‌তে পাই আমরা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। এই না ঈশ্বরের বিধান, এমনি কোরেই না তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করেন তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে লয়ের!

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি এদের। একটা কারখানা দেখ্‌তে গেছলাম। তার কথাই বলি। কারখানার বাইরেটা এত অপরিষ্কার যে, সেখানে পা দিতেও গা ঘিন্ ঘিন্ কর্‌ছিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখলাম সে এক অপূর্ব সম্পদ। এমন সুন্দর কারুকার্য খুব কমই চোখে ঠেকে।

তাই ভাবি, এদের অন্তরটা বাহিরের মত কদর্য নাও হতে পারে। শুক্তি যেমন তার অন্তরের মহামূল্য সম্পদ একটা কদর্য আবরণে ঢেকে রাখে এ কি তাই? না, প্রকৃতির অসামান্য রূপরাশিকে উজ্জ্বলতরভাবে পরিস্ফুট করবার জন্য এই রূপহীন পটভূমিকার অবতারণা? আলোর পশ্চাতে অনন্ত অন্ধকারের আয়োজন তো তাঁরই লীলা!

৫ই নভেম্বর আমরা গুলমার্গের দিকে যাত্রা কর্‌লাম। টাঙ্গমার্গ পর্যন্ত মোটর যাবার রাস্তা আছে। এইখানেই ঘোড়া ভাড়া করে চারি মাইল চড়াই ভেঙ্গে গুলমার্গে পৌঁছালাম। আরও চারি মাইল চড়াই ঠেলে খেলনমার্গ গেলাম। বরফের দৃশ্য কি অনির্বচনীয় সুন্দর। পথ কোথাও এক ফুট কোথাও দেড় ফুট বরফে ঢাকা। তার উপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া—সে এক অনাস্বাদিত অননুভূত-পূর্ব আনন্দ।

খেলনমার্গের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার স্কী খেলা। এখানকার স্কী খেলা পৃথিবী-বিখ্যাত। নভেম্বরের প্রথম থেকেই পাহাড়ের গায়ের সমতল অংশে বরফ জ'মে কঠিন আকার ধারণ করে। তার উপর ইউরোপীয়েনেরা স্কী খেলে।

স্কী খেলা দেখে যখন টাঙ্গমার্গে ফির্‌লাম বেলা তখন প্রায় তিনটা। এখানে বখ্‌শিসের লোভে অনেকগুলি লোক আমাদের ঘিরে ধর্‌ল। শেষ পর্যন্ত সিগারেট নিয়ে যে কত কাড়াকাড়ি আরম্ভ ক'রে দিলে যেন সিগারেট তারা

কখনও দেখেনি। কিন্তু তা নয়। আসলে তারা হচ্ছে গরীব। খুব গরীব। এ জায়গার অধিবাসী শতকরা নিরানব্বই জনই খুব গরীব।

পথের বৈচিত্র্যপূর্ণ আনন্দ-নিরানন্দের লীলা উপভোগ করে শ্রীনগরে যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

শ্রীনগরের আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক রূপ উপভোগ করবারই জিনিষ। এ সৌন্দর্য সত্যই অনির্বচনীয়, কবির কল্পনা এখানে এসে মূক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে যায়, লেখনী যায় থেমে।

৭ই নভেম্বর বেলা দেড়টায় আনন্দের নিকেতন শ্রীনগর ত্যাগ করলাম। সন্ধ্যার কিছু পরে গরহী পৌঁছালাম। এইখানেই এক চটিতে রাত্রিবাস করা গেল। হিন্দুর নির্বিকার মুর্গী ভক্ষণ কাশ্মীরের একটি চমকপ্রদ বিশেষত্ব। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদাভেদ নেই।

পরদিন সকাল নয়টায় গরহী ত্যাগ করলাম। গরহীর পরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দীনতা বেশ অনুভব করলাম। তের মাইল যাবার পর ডোমেল গ্রাম। এখান থেকে একটা পথ এটাকাবাদ হয়ে হাসান আবদালে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে মিশেছে; আর একটা পথ মারী হয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে মিশেছে। আমরা মারীর রাস্তাই ধরলাম। ডোমেল থেকে চলবার পর কোহেলা। এখানে ঝিলামের উপর পুল পার হ'য়ে কাশ্মীর রাজ্য ছাড়লাম।

কোহেলা থেকে মারী আটত্রিশ মাইল দূর, আর চড়াই ও আঁকাবাঁকা পথ। এ পথেও আমাদের বাইকের ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করবার জন্য আট-দশ মাইল অন্তর থেমে থেমে যেতে হচ্ছিল, মারীতে প্রায় বারটার সময় পৌঁছে আহার্যের সন্ধান করলাম। অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ, সুবিধাজনক আহার্য মিলল না, শহরটিতে পুরাদস্তরভাবে মিলিটারী লোকই থাকে। তাদের নিয়েই শহর। শীতের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী নেমে গেছে রাওয়ালপিণ্ডিতে। তাই শহরটি জনবিরল অবস্থায় বৈধব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে।

ক্ষুধা প্রবল, কিন্তু তার নিবৃত্তির আশা নেই ভেবে রাওয়ালপিণ্ডিতেই খাওয়া সারা যাবে স্থির ক'রে মারী ছাড়লাম। সেদিন কপাল আমাদের মন্দ ছিল না। চোদ্দ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে চন্নারী নামে একটি ছোট গ্রামে এসে পড়লাম। একটা খাবারের দোকান মিলে গেল এখানে। গরম গরম পুরী তরকারীর সদ্ব্যবহার ক'রে এসে বসেছি, এমন সময় এক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক এক অভিনব উপায়ে নানা রকমের বিচিত্র সুর বাজাচ্ছিল তার সারেঙ্গীতে। আমরা শুনছি দেখে তার হঠাৎ খেয়াল চাপল বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে আমাদের আরও খুশী করবে, কি শ্রুতিমধুর সে গান! যেন মধুস্রাবী, মনে হ'ল কেউ যেন মুখে সরা চাপা দিয়ে গোঙাচ্ছে। খুশী করবার জন্যে গাইছে, কাজেই গম্ভীর হ'য়ে সেই গোঙানি ধৈর্য ধ'রে সহ্য করতে হ'ল।

গান শেষ ক'রে সে বললে, এইটি তার বাঙ্গিজী প্যাটার্ন-গান। এই প্যাটার্নের আরও অনেক গান তার জানা আছে। আমরা যদি বলি ত সে আরও অনেক গাইবে।



সেলিমচিস্তী—আকবরের গুরুদেবের সমাধি-মন্দির

বলা বাহুল্য, আমরা সমস্বরে তার এই শুভ ইচ্ছার প্রতিবাদ করেছিলাম।

ঢালু রাস্তা। বেলা চারিটার সময় আমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে নেমে এলাম। রাওয়ালপিণ্ডি শহরটা প্রদক্ষিণ ক'রে বাজারে বৈকালিক জলযোগ সেরে রাত্রির জন্য মাখন-রুটি সঞ্চয় করলাম। তারপর পেশোয়ারের পথে পাড়ি জমানো গেল।

রাত আটটায় হাসী পৌঁছালাম। তেপান্তরের মাঠে একটা উঁচু টিলার উপর হাসীর ডাকবাংলো। জনমানবশূন্য অবস্থায় সেইখানেই রাতটা কাটানো গেল।

খুব জনবিরল দেশ, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব সর্বত্র বিরাজ করছে। ৯ই নভেম্বর সকাল আটটায় হাসী ছাড়লাম। সিন্ধু নদের উপর আটক ব্রীজ পার হয়ে আমরা উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশে পড়্‌লাম। সন্ধ্যা ছটার পরে বিনা পাশে ব্রীজ পার হওয়া নিষিদ্ধ। নদীর উপর থেকে আটক ও তার দুর্গটিকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

পেশোয়ার ছেড়ে সরাসরি খাইবার পাশ অভিমুখে অগ্রসর হলাম। পেশোয়ার থেকে এগার মাইল যাওয়ার পর জামরুদ দুর্গ। রাস্তার উপর আবার বাধা।

মাইল ছয় যাবার পর খাইবারপাশ। অতীতের শত-সহস্র স্মৃতিবিজড়িত এর ইতিহাস আমাদের গদ্যময় জীবনেও একটা সাময়িক চিন্তার রেখাপাত করলে।

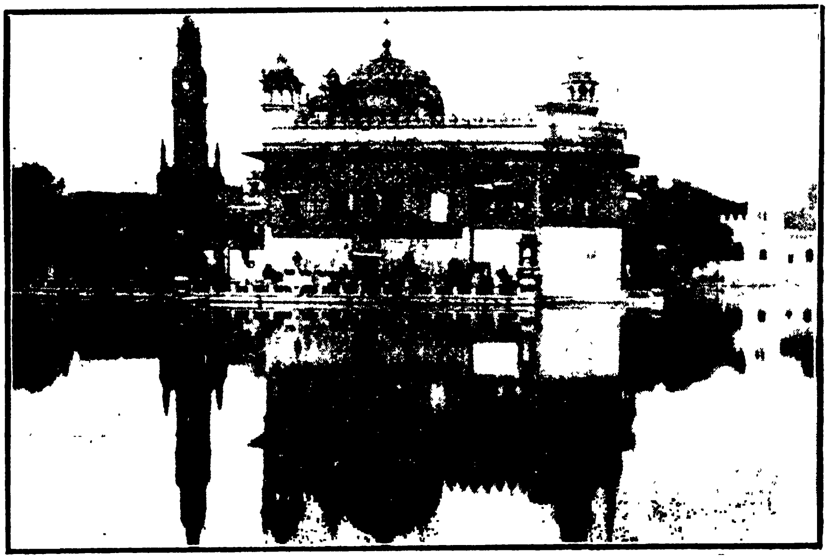
এখানে মোটর যাবার রাস্তার পাশে ক্যারাভান যাবার আলাদা পথ আছে। আর এক দিকে খাইবার রেলওয়ে। লাণ্ডিখানা থেকে আরও মাইল দুই যাবার পর উত্তর-পশ্চিম ভারতের শেষপ্রান্ত মিচনীতে যখন পৌঁছালাম তখন বেলা একটা বেজে গেছে। সকালে সামান্য চা-রুটি খাওয়ার পর এ পর্যন্ত পেটে আর কিছুই পড়েনি। সুতরাং খাওয়াটা যে বেশী রকম আবশ্যক হ'য়ে উঠেছিল তা সহজেই অনুমেয়। সঙ্গে রুটি মাখন ছিল। এক বন্ধু রুটি কেটে মাখন লাগাতে আরম্ভ করলেন। অন্য এক বন্ধুর ওটুকু দেরীও বরদাস্ত হ'ল না। তিনি খানিকটা রুটি ছিঁড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত মুখে পূরে দিয়ে এক খাম্‌চা মাখনও সেই সঙ্গে চালিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—ভেতরে মাখানো হবে।

তার ওরকম প্রচণ্ড ক্ষুধা দেখে মিচ্‌নীর এক পাহারা-ওয়ালা শাস্ত্রী তার নিজের আহার্য থেকে কিছু অংশ দান করতে চাইল।

বন্ধুবর সতৃষ্ণ নয়নে দেখ্‌লেন যে, প্রস্তাবিত খাদ্যটি আগুনে-ঝল্‌সানো একটি ভেড়ার আস্ত মাথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুহূর্ত্তখানেক চিন্তার পর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে অসহায়-ভাবে বল্‌লেন, বাঙালীর পেটে ও যে সইবে না, নইলে ছাড়তাম না।

বেলা দুইটার পর ফিরতি পথ। পেশোয়ারে ফিরে এক হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। পেশোয়ার শহরটি ছোট হ'লেও মন্দ নয়। আমরা যে সময়ে সেখানে গিয়েছিলাম সেটা "রোজার" সময়, দিনের বেলা দোকানপাট সব বন্ধ। যেন সকলেই মৃত, আর সন্ধ্যার পর কি হৈচৈ ব্যাপার! রূপকথার সোনার কাঠির ছোঁয়ার মতন সন্ধ্যার পর যেন সব কিছুই এক অলৌকিক শক্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে।

বাজারে ফল-পাকড় যথেষ্ট। আঙুর চোদ্দ পয়সা সের। ১০৫ তোলায় সের।



স্বর্ণমন্দির—অমৃতসর

পরদিন ১০ই নভেম্বর সকাল আটটায় পেশোয়ার ছেড়ে লাহোরের পথে ফির্‌লাম, আশী মাইল চল্‌বার পর যে গ্রামে এলাম তার নাম সরাইবালা, এখান থেকে একটা পথ বাঁ-দিকে চলে গেছে। সেই পথ ধ'রে মাইল খানেক এলে তক্ষশীলায় এসে সেখানকার মিউজিয়ম দেখ্‌লাম, মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ বাঙালী। তিনি খুব যত্ন ক'রে আমাদের দ্রষ্টব্যগুলি দেখালেন। মিউজিয়াম্ দেখার পর ভূগর্ভ খুঁজে বার করা পুরাণো বিহার ও শহরের অন্যান্য ধ্বংসাবশেষগুলি দেখ্‌তে গেলাম। জান্‌ডিওয়ালার ধ্বংসাবশেষটি সব চেয়ে দূরে।

এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে রাওয়ালপিণ্ডিতে আহারাদি সেরে আমরা লাহোরে এসে যখন পৌঁছালাম তখন

রাত দশটা। লাহোরে পূর্ব্বপরিচিত হোটেলেই উঠলাম। নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিবাস হ'ল, সকাল থেকে বেলা একটা পর্যন্ত সারা লাহোরটাকে চ'যে ফেলে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দেখ্‌তে যখন রওনা হলাম বেলা তখন তিনটে। অমৃতসরের পথ নিতান্ত সরু গলির মতন। খুব সাবধানে না গেলে প্রতিপদে বিপদের সম্ভাবনা।

মন্দিরের লোকেরা আমাদের খুব আপ্যায়িত করলেন। শুন্‌লাম, মন্দিরের ফটো তোলা একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার। অবশ্য আমরা যে স্বর্ণ মন্দিরের ফটো তুল্‌তে অনুমতি পেয়েছিলুম তার প্রমাণ ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রইল। কেমন ক'রে অনুমতি জোগাড় করেছিলাম, সে কাহিনী ব'লে প্রবন্ধকে আর ভারাক্রান্ত করবার প্রবৃত্তি নেই।

স্বর্ণমন্দির দেখে জালিয়ান ওয়ালাবাগে গিয়ে অতীতের সেই মর্মন্তুদ-স্মৃতি বিজড়িত দৃশ্যগুলি দেখ্‌লাম। দেখলাম গুলির দাগগুলি কাঠ কীলক দিয়ে সযত্নে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

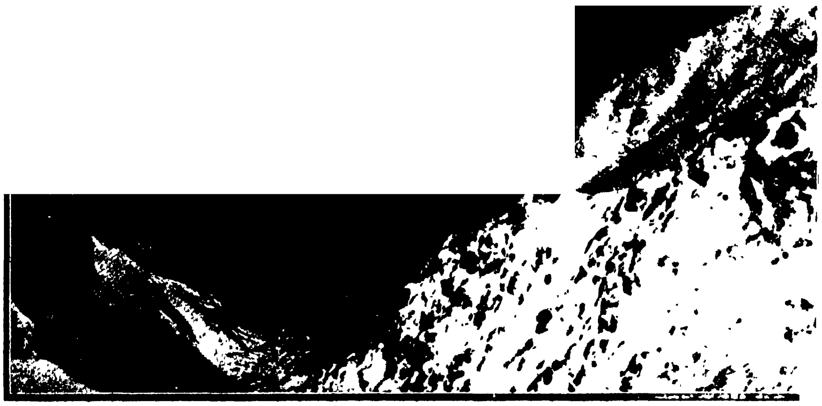
সন্ধ্যার পর অমৃতসর ছাড়্‌লুম, স্থির কর্‌লাম আজকের রাত্রে লাহোর থেকে একশত মাইল দূরবর্ত্তী ফাগওয়ারা ইন্‌স্‌পেক্‌সন বাংলোয় থাকব। ফাগওয়ারায় পৌঁছাতে অনেকটা রাত হয়ে গেছ্‌ল। বাংলোটা খুঁজে পেলাম না। তাই ঠিক হ'ল আরও কিছুদূর এগিয়ে ফিলামুর বাংলোয় থাকা যাবে। ফাগওয়ারা থেকে ফিলামুর তের মাইল। এখানকার বাংলোটা খুব বড়। ইলেক্‌ট্রিক ফিট করা, দেখে ভয় হ'ল চার্জ্জ হয় ত খুব বেশী। এক বন্ধু গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে বাংলোর চৌকিদারকে ঘুম থেকে ডেকে তুল্‌লেন। তার কাছ থেকে বাংলোর আইন-কানুন লেখা চার্ট নিয়ে দেখে শুনে বন্ধুট এসে জানালেন যে, ইতস্তত করবার কারণ নেই, চার্জ মাথা পিছু মাত্র আট আনা, কথাটা আপাতত অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও সত্যি ব'লে মেনে নিতে হ'ল, যেহেতু বন্ধু স্বচক্ষে দেখে এসেছেন স্বীকার করছেন।

বেশ আরামেই রাতটা কাট্‌ল। পরদিন সকালে লাগেজ-টাগেজ বেঁধে চৌকীদারকে দুটি টাকা দিতেই সে বল্‌লে আরও চার টাকা। তার কথা শুনে আমাদের ত আক্কেল গুড়ুম! মনে হ'ল সে বুঝি চার টাকা বক্‌শিস্ চাইছে। আমি ত ব'লেই ফেললাম, তোমার ত লোভ কম নয় বাপু, চারজনার কাছ থেকে চার টাকা বক্‌শিস্? সে বল্‌লে, বক্‌শিস্ নয়, এটা এখানকার দস্তর।

বল্‌লাম, তোমাদের চার্জ বোর্ডে কি লেখা আছে? সে বল্‌লে, মাথা পিছু দেড় টাকা।

যে বন্ধুটি চার্জ বোর্ড দেখে এসেছিলেন, তিনি সদর্পে বল্‌লে, নিয়ে এস তোমার চার্জ বোর্ড দেখি।

যে কথা, সেই কাজ। চার্জ বোর্ড আনা হ'ল। দেখা



জামু—শ্রীনগর রোডের একটি দৃশ্য—৮০০০ ফিট

গেল, এক প্যারাতে লেখা আছে, মাথা পিছু দৈনিক চার্জ্জ এক টাকা, আর ঠিক তার পরের প্যারাতে লেখা আছে ইলেক্‌ট্রিকের জন্য দেয় মাথা পিছু আট আনা। বন্ধুবর যে তাড়াতাড়িতে শুধু শেষের প্যারাটুকু দেখেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তা বলা বাহুল্য।

সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে ছটি টাকা আক্কেল-সেলামী দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রায় শ' তিনেক গজ গিয়েই বাজার পাওয়া গেল। দেখা গেল ভদ্রলোকের থাক্‌বার মতন হোটেলেরও অভাব নেই। শুনলাম বারো আনায় একবেলা খাওয়া ও থাকা চলে।

বিকাল পাঁচটায় দিল্লী পৌছে আমাদের পূর্বপরিচিত হোটেলে উঠলাম। হোটেলের মালিক আমাদের ফিরে আসতে দেখে খুশী হয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ ক'রে বল্লেন, কাল্‌কের দিনটা থেকে আমার সঙ্গে শিকার ক'রে যেতে হবে আপনাদের। এই বিনয়ী ভদ্রলোকটির সৌজন্যে আমরা পূর্বেই মুগ্ধ হয়েছিলাম, এবার দূর-পথের অন্য কোন লোভনীয় আকর্ষণ ছিল না। তাই তাঁর কথায় একদিন থেকে যেতে রাজী হলাম। পরদিন সমস্ত সকালটা গাড়ীর পরিচর্যাতেই কাটল। বিকালে তাঁর গাড়ীতে ক'রে শিকারের জন্য বেরুলাম। গুরগাঁয়ের দিকে যাওয়া গেল। গাঁয়ের লোকেরা বললে, খুব "বরা" আসে এদিকে। আমরা পায়ে পায়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুরেও কিছু না পেয়ে হতাশ হ'য়ে হোটেলে ফির্‌লাম।

পরদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন দিল্লী ত্যাগ কর্‌লাম তখন অদূরে টাওয়ার ক্লক্‌টায় ঢং ঢং ক'রে বারটা বাজল।

বেলা-বেলি বৃন্দাবন পৌছে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগোপীর সঙ্গে লীলার ক্ষেত্রগুলি দেখলাম। পাণ্ডারা অযাচিতভাবে প্রত্যেকটি স্থানের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে চল্‌ল। কত যে প্রক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা একটার পর একটা অনর্গলভাবে চল্‌তে লাগল তার আর ইয়ত্তা করা যায় না।

পাণ্ডাদের কবল থেকে অতি কষ্টে উদ্ধার পেয়ে সেখান থেকে পাড়ি দিয়ে আমরা আগ্রায় এসে যখন পৌছালাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আগ্রায় ঢুকে এক ট্রাফিক পুলিশকে ছিপিটোলা যাবার পথ জিজ্ঞাসা করতেই সে বল্‌লে, গাড়ী আগে রাখ্‌কে। চার আদ্‌মী কেঁউ চড়েহো? লাইসেন্স দেখলাও তব্ পিছে ছিপিটোলা বাতায়েঙ্গে। রেজিষ্ট্রেশন বই দেখালাম। বেচারা পড়তেই পারে না। যেখানটায় আসনের সংখ্যা চার লেখা আছে সেখানটায় আঙুল দিয়ে দেখালাম, বুঝলাম তার বিদ্যের দৌড় ইংরেজী সংখ্যা পর্যন্ত। বেঙ্গল লজ্ হোটেলে উঠে মোট-ঘাট নামিয়ে ধূলা পায়েই তাড়াতাড়ি তাজমহল দেখতে গেলাম। চাঁদের ম্লানিমাহীন শুভ্র জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত তাজের অপূর্ব সৌন্দর্য-সম্পদ দেখে সেদিন মুগ্ধ না হ'য়ে পারিনি। না হই কবি, তবু সেদিন একথা খুব সহজেই বুঝেছিলাম যে, যা সুন্দর, মনকে আকর্ষণ করবার তার একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে। উপভোক্তা ও উপভোগ্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা অতি সূক্ষ্ম যোগ-সূত্র আছে, তা যেন সেদিন কেমন ক'রে টের পেয়েছিলাম।

পরদিন সকালে ফোর্ট দেখতে গেলাম। সঙ্গে কোন গাইড নিইনি। শুনেছিলাম, এখানে একটা সুড়ঙ্গ-পথ পাতালপুরীতে নেমে গেছে। খুঁজে খুঁজে সেই জায়গায় এসে সাহস ক'রে নেমে পড়লাম চারজনেই। কিংবদন্তী আছে, ঐ পথ খানিক দূর গিয়ে চারদিকে চারটি শাখা পথে বিভক্ত হয়ে চ'লে গেছে। ইচ্ছা ছিল সেই চৌমাথাটা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কিন্তু অন্ধকারে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রে হায়রাণ হয়েও সে চৌমাথার হদিস আর মিলল না। অগত্যা উপরে উঠে পড়লাম। তারপর খানিকক্ষণ ফোর্টের মধ্যে এদিক ওদিক দেখে হোটেলে ফিরে এলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ফতেপুরসিক্রী যাওয়া গেল। সেখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য—শেখ সেলিমচিশ্‌তীর সমাধি দেখলাম। সমাধির একটি ফোটো নেওয়া হ'ল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সমাধিটি যেন জলের উপর ভাস্‌ছে। কিন্তু বাস্তবিক আসলে ও তা নয়। আমরা যখন ফতেপুর-সিক্রী পৌছালাম তখন খুব মুসলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। ফলে সেলিমচিশ্‌তির প্রাঙ্গণটিতে এক হাঁটু জল জমে গিয়েছিল। মাঝখানে সমাধি, চারিদিকে জল। তাই ছবিও উঠল বিভ্রমকারী।

সেখান থেকে ফিরে গেলাম আগ্রায়। শহরটি জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় তাজের ফটো তোল্‌বার লোভ সম্বরণ করতে পারা গেল না। জ্যোৎস্নার এত মনোহর রূপ কই আগে ত কোন দিন চোখে পড়েনি। তবে কি তাজের সংস্পর্শে জ্যোৎস্নার রূপের গরিমা গেছে বেড়ে?

১৬ই নভেম্বর বেলা সাড়ে বারোটায় আগ্রা ছেড়ে লাক্ষ্ণৌয়ের পথে অগ্রসর হলাম। পাঞ্জাবের সুন্দর রাস্তার তুলনায় এদিককার পথ খুবই খারাপ মনে হচ্ছিল, তা সত্ত্বেও আমরা বেশ দ্রুতই গাড়ী চালাচ্ছিলাম। হয় ত ঘর-মুখো ব'লে।

রাত্রি আটটায় কানপুর পেলাম। হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার রওনা। এখান থেকে লক্ষ্ণৌ আটচল্লিশ মাইল। রাত্রি এগারটায় লক্ষ্ণৌ পৌছে বেঙ্গল

হোটেলে উঠলাম। পরদিন খুব বেড়ান গেল। এখানকার পুলিশের ব্যবহার লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল। কোন কিছু জান্‌তে চাইলে খুব নম্রভাবে উত্তর দিচ্ছিল। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি দেখে ফেরবার সময় একটি মোটর আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল। দেখলাম হঠাৎ মোটরখানি থেমে গেল। তার আরোহীরা নেমে পড়ল। তারপর হাত তুলে আমাদের গাড়ী থামাতে ইঙ্গিত করলে। আমরা গাড়ী থামালাম। তারপর সেই মোটরের এক ইউরোপীয়ান আরোহী আমাদের গাড়ীর কাছে এসে লাইসেন্স চাইলেন। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন যে, আমরা নাকি নির্দিষ্ট গতির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছি। অর্থাৎ বিশ মাইলের বেশী স্পীডে যাচ্ছি—এই হ'ল প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণ চারজন এক সাইকেলে ও তৃতীয়! কারণ আমাদের সাইড কারে নম্বর প্লেট নেই। আমরা রেজিষ্ট্রেশন বই ও নম্বর প্লেট দুইই দেখালাম। তিনি বললেন যে, যুক্তপ্রদেশের আইন নম্বর-প্লেট বাইক ও তার সাইডকার দুয়েই লাগাতে হবে।

১৮ই নভেম্বর বেলা আটটায় লক্ষ্ণৌ ছেড়ে রায়-বেরিলির পথ ধরলাম। পথ বড়ই খারাপ।

প্রতাপগড়ে চা খেয়ে বেনারসের উদ্দেশে চল্‌লাম। পথের মাঝে এক জায়গায় একটা হরিণের মোহে পড়ে তার পিছু পিছু হানা দিয়ে হায়রাণি হয়েছিল। শিকারে হতাশ হয়ে মুহ্যমান হয়ে রইলাম সকলেই। তখন শুধু একটা কথাই মনে জাগছিল যে, ওটা মায়ামৃগ নয় ত!

তারাপদর দুর্গোৎসব

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখুজ্জ্যেদের অনেক দিনের পূজা এবার বোধ হয় বন্ধ হইল। আগের সে অবস্থা আর নাই—উপরা-উপরি কয়েক বৎসর অজন্মায় জোৎজমাও অনেক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ঘরে সোনা রূপার গহনা যাহা ছিল—তাহাও অন্নাভাবে নষ্ট হইয়াছে—এখন কি দিয়া দেবীর আহ্বান করিবেন?

বৃদ্ধ বিপত্নীক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র হরিপদ জামালপুর ওয়ার্কশপে কাজ করিত। পাছে বৃদ্ধ পিতার কষ্ট হয় এজন্য পত্নীকে কখনও কর্ম্মস্থানে লইয়া যায় নাই—সংসার খরচ বাবদ মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিত—মুখুজ্জ্যে মহাশয় কোন অভাব জানিতে পারিতেন না। ১৩৪০ সালে ভূমিকম্পে সেই উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম পুত্রটিও অকালে কালকবলিত হইয়াছে। ইদানীং তাহারই জোরে পূজা চলিত—তাহাকেও দেবী নিজের কোলে টানিয়া লইয়াছেন, সুতরাং অন্নহীন, নিরানন্দ গৃহে দেবী পূজায় আর কাজ নাই।

ভাদ্রের প্রভাত। আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমিয়া আছে—মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে। মুখুজ্জ্যে মহাশয় একটি হুঁকা হাতে করিয়া দাওয়ায় বসিয়া মনে মনে অতীত সুখস্মৃতি আলোচনা করিতেছিলেন। চোখ তুলিয়া চাহিতেই বেড়ার ওধারে চণ্ডীমণ্ডপের জীর্ণ চাল নজরে পড়িল—খড়ের অভাবে ভালো করিয়া ছাওয়া হয় নাই—বর্ষার জলে ফুটা দিয়া জল পড়িয়া মেঝের মধ্যে দুর্ব্বাঘাস গজাইয়াছে—মাটীর দেওয়াল স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে—আগামী বৎসর হয়তো সবশুদ্ধ ভূমিসাৎ হইবে। সেই জীর্ণ দেবী-মন্দিরের পানে চাহিয়া বৃদ্ধের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিলেন—হরিপদ যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে ঐ মন্দিরের আজ এ দশা ঘটিত না। পূজাও বন্ধ হইত না। ঐ গৃহে আগে কি সমারোহে উৎসব হইত, চারিদিন ধরিয়া যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙালী বিদায়ের বিরাম থাকিত না। কত ভিখারী বৈষ্ণব আসিয়া উৎসবানন্দে যোগদান করিত, সকাল সন্ধ্যায় ঢাক, ঢোল, নহবতের বাজনায়, শানাইয়ের করুণ সুরে যে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিত—সে স্থান এবার অন্ধকার পড়িয়া রহিবে। হায়রে, দরিদ্র সন্তানের গৃহে মহামায়ার আর শুভাগমন হইবে না। অনেক দিনের পূজা—এবার বন্ধ হইল। যাক্—সব যাক্! 'মা মা বলে আর ডাকব না, ওমা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা! ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী—আর কি বাকি রাখিস এলোকেশী।' আপন মনে বার দুই ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া গান থামাইয়া—হুঁকাটি তুলিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে একটা টান দিলেন—কলিকার আগুন অনেকক্ষণ নিভিয়া গিয়াছিল—ধূঁয়া বাহির হইল না—বার দুই বৃথায় টান দিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন।

এমন সময় বিধবা পুত্রবধূ নির্ম্মলা আসিয়া বলিল—"বাবা, এবার কি মায়ের পূজা বন্ধ হবে?"

মুখুজ্জ্যে বলিলেন—'কি করি মা, অবস্থার কথা তো তুমি সবই জান—মাকে আনবার আর সামর্থ্য নাই—"

নির্ম্মলা বলিল—"সে কি হয়! মাকে আনিতেই হবে—দেবীপূজা বন্ধ করা হবে না—"

মুখুজ্জ্যে মহাশয়ের দুই চোখে একটা অব্যক্ত কাতরতা ফুটিয়া উঠিল—কহিলেন—'আমার কি অসাধ! কিন্তু মা হাতে যে একটিও পাই পয়সা নাই—খুব গরীবানা চালে চললেও অন্তত পঞ্চাশটি টাকা না হলে ত মাকে আনা চলবে না—কাজেই বন্ধ দিতে হ'ল।"

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে নির্ম্মলা বলিল—'আপনি কেষ্টকে ডেকে ওবেলায় প্রতিমা গড়াতে লাগিয়ে দিন—বাদবাকী সব ভার আমার—আপনি কিছু ভাববেন না।"

পুত্রবধূর কথা শুনিয়া মুখুজ্জ্যের চোখ মহানন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন—"সব সামলাতে তুমি পারবে মা?"

নির্ম্মলা বলিল—'পারব।"

"টাকা কোথায় পাবে?"

"এই নিন—সংসার খরচ থেকে বহুকষ্টে এই টাকা আমি বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।" শ্বশুরের হাতে পাঁচখানি দশ টাকার নোট দিয়া নির্ম্মলা ত্রস্তপদে চলিয়া গেল। নোট কয়খানি হাতে করিয়া বৃদ্ধের চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল—বহুকষ্টে অশ্রুবেগ দমন করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন—মহামায়ার লীলা বুঝা ভার।

তখনি উঠিয়া পাটকরা মলিন চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া ছিন্ন চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া ছাতা ও লাঠিগাছটি হাতে লইয়া বৃদ্ধ তারাপদ গুন গুন স্বরে—'সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি'—ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণদাস কুম্ভকারের উদ্দেশে ঘর হইতে বাহির হইলেন।

২

মুখুজ্জ্যে মহাশয় কুমারপাড়ার পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে চারি বৎসরের নাতি অজিত ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুর্দার কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। বিব্রত হইয়া মুখুজ্জ্যে কহিলেন—"ছাড়, ছাড়, আমি কেষ্টকে ডাকতে যাচ্ছি—ওবেলা থেকে ঠাকুর গড়া আরম্ভ হবে।"

কোঁচা ছাড়িয়া দিয়া অজিত বলিল—'সত্যি দাদু, সত্যি ঠাকুর গড়বে?"

"সত্যি না তো কি—ওবেলায় দেখতে পাবি।"

"তাহ'লে চল—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"না ভাই, তুমি এখন বাড়ী যাও, তোমার মা বকবে।"

"আজ আমি মা'র কথা শুনব না—সারাদিন ঠাকুর গড়া দেখবো।"

নাতির আব্দার শুনিয়া স্নেহশীল বৃদ্ধ পিতামহ ঈষৎ হাসিয়া "আচ্ছা রে আচ্ছা, তাই চল্" বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন।

প্রতিমা নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। মহাপূজায় আর বিলম্ব নাই—আগামী পরশু সপ্তমী পূজা। আজ মজুর ডাকিয়া বিচালীর খোঁচা দিয়া চণ্ডীমণ্ডপের জীর্ণ চাল সংস্কার হইতেছে।

সকাল সাতটা। মুখুজ্জ্যে চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে দাঁড়াইয়া মজুর খাটাইতেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া কহিল—'টাকা আছে। আড়াইশো—সই করে নিতে হবে। আর এই খামের চিঠি।"

তাহার নামে মনি অর্ডার! হরিপদর মৃত্যুর পর এ ঘটনা অভাবনীয়। মুখুজ্জ্যে ক্ষণকাল বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া পিয়নের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

মুখুজ্জ্যের ভাবভঙ্গী দেখিয়া পুনশ্চ পিয়ন কহিল—'তাড়াতাড়ি সই ক'রে নিন্—আমার আর দেরী করা চলবে না।"

মুখুজ্জ্যে সই করিয়া পঁচিশখানি দশ টাকার নোট লইলেন। তাহার পর ধীরপদে বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া চালের বাতা হইতে সূতাবাধা চশমা জোড়াটি বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া কম্পিতহস্তে খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন,—

শ্রীশ্রীদুর্গা —

শরণং

জামালপুর

১৩ই আশ্বিন, ১৩৪২। সোমবার

শ্রীচরণকমলেষু—

প্রণাম শত কোটি নিবেদন,

যদিও আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কিন্তু আপনাকে আমি ভাল করিয়াই জানি। আপনি আমার সোদরপ্রতিম সহকর্ম্মী স্বর্গতঃ হরিপদর বৃদ্ধ পিতা। লিখিতে কলম সরিতেছে না—গত ভূমিকম্পে হরিপদ আমারি কনিষ্ঠা কন্যাটিকে ভয়াবহ মৃত্যুর গ্রাস হইতে বাঁচাইতে গিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহারই অসম সাহসে আমার কন্যাটি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু অতি অল্পের জন্য তাহার প্রাণ গিয়াছে। ঐ ঘটনার জন্য আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি—সে সময় আমি যদি নিষেধ করিতাম তাহা হইলে তাহার মূল্যবান জীবন হয়তো এ ভাবে নষ্ট হইত না। তাহার শোচনীয় মৃত্যুর জন্য আজও আমি অনুতপ্ত।

কিন্তু এ নিয়তির খেলা! মুহূর্ত্তে কাহার ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র লোক ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইল। লীলাময়ের লীলা আমরা বুঝি না—দুঃখতাপে অভিভূত হইয়া আমরা কেবল কাঁদিতে পারি। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রিয়জনকে একদিনও অধিক বাঁচাইয়া রাখিবার আমাদের ক্ষমতা নাই—এমনি আমরা শক্তিহীন।

এ দুর্নিবার শোকে কি বলিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিব? যিনি দুঃখ

দিয়াছিলেন, আশা করি, তিনিই এতদিনে আপনাকে কতকটা সাব্যস্ত করিয়াছেন—তাই তাহার মৃত্যুর অনেকদিন পরে চিঠি লিখিয়া পরিচয় দিতেছি। হরিপদ আমাকে কুঞ্জদা এবং আমার স্ত্রীকে বৌদি বলিয়া ডাকিত। সুতরাং সে হিসাবে আমিও আপনার পুত্রস্থানীয়। ভূমিকম্পের কয়েকদিন পূর্ব্বে সে আমার স্ত্রীর নিকট আড়াইশত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, শুনিয়াছি ঐ টাকা সে বৌমার চুড়ি গড়াইবার জন্য মজুত করিয়াছিল। সে টাকাটা এতদিন কেন পাঠাই নাই—প্রশ্ন হইতে পারে। কারণ আমার ইচ্ছা ছিল—ঐ টাকাটা কিছুদিন সুদে খাটাইয়া বৌমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিব। উপস্থিত সে মতলবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনুষ্যজীবন পদ্মপত্রস্থিত জলের মত সদাই চঞ্চল—কখন কি হয় বলা যায় কি? তাই আমার স্ত্রীর কহৎমত সে টাকাটা আপনার নামেই পাঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলাম। অযথা বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। অনুগ্রহ করিয়া প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।

এবার হইতে প্রতি বৎসর পূজার সময় পঞ্চাশ টাকা করিয়া মায়ের প্রণামী স্বরূপ পাঠাইবার বাসনা রহিল। আপনার হরিপদও যে—আমিও সে, সুতরাং দ্বিধার কোন কারণ নাই। হরিপদর শিশু পুত্রটিকে আমার স্নেহাশিষ্ জানাইবেন এবং আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি

প্রণত

শ্রীকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠি পড়া শেষ হইল। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের চোখ দিয়া কেন যে অকস্মাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল—তাহার কারণ তিনি নিজেই ভাল বুঝিতে পারিলেন না। সেই নিদারুণ পুত্রশোক আবার জাগিয়া উঠিল কি? অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছিয়া—নোটগুলি হাতে করিয়া ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

অন্দর মহলে ঢুকিয়া পুত্রবধূর হাতে খামের চিঠি ও নোট কয়খানি দিয়া প্রায় সাশ্রুনেত্রে তারাপদ কহিল—"এ টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই মা, তুমি রেখে দাও, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।" চিঠিখানি ও নোটগুলি হাতে লইয়া বিস্মিত নেত্রে নির্ম্মলা কহিল—"বাবা, এ টাকা কোথায় পেলেন?"

"চিঠিতেই সব লেখা আছে—পড়ে দেখো।"

অশ্রুগোপন করিবার জন্য মুখুজ্যে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চিঠিখানি পড়িয়া নির্ম্মলার একটা অবলুপ্তপ্রায় স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। —মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বামী একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—তাহার চুড়ির জন্য তিনি আড়াইশত টাকা মজুত করিয়াছেন—তাহার অতর্কিত মৃত্যুর পর সে টাকাটার আর সন্ধান মিলে নাই—সেই টাকা এতদিনে হস্তগত হইল, কিন্তু স্বামী আজ আর বাঁচিয়া নাই। চুড়ি গড়াইবার প্রয়োজনীয়তাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

স্বামীর স্নেহ ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া বুকের মধ্যে একটা অশ্রুর তরঙ্গ ফুলিয়া ফুলিয়া কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল, এমন সময় পুত্র অজিৎকুমার ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া মায়ের কোলে চাপিয়া কহিল—'মা, তুই যে বলেছিলি পূজোর সময় বাবা আসবে—কই এল না তো?"

বহুকষ্টে উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া নির্ম্মলা কহিল—"এই দেখ তোর বাবা কত টাকা পাঠিয়েছেন—কাল তোর ভাল ভাল পোষাক কিনে দেব।"

"টাকা পাঠিয়েছে—নিজে এল না কেন?"

গভীর স্নেহে পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া নির্ম্মলা বলিল—"সাহেব ছুটি দেয়নি রে—তাই আসা হ'ল না—ছুটি পেলেই এবার আসবেন।"

"ভারী তো সাহেব—আমার কিছু ভাল লাগে না—" মুখ ভার করিয়া সে আজও চলিয়া গেল।

নির্ম্মলার শোকসিন্ধু আজ উথলিয়া উঠিয়াছে। পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে সে মনে মনে কহিল—যেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না—সেখান থেকেও তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রকে মনে রেখেছ! তোমার অভাবে তোমার বৃদ্ধ পিতার কি দশা হয়েছে দেখ—বৃদ্ধের মুখের পানে আর চাওয়া যায় না। ওগো, খোকাকেও যে আর আমি ভুলিয়ে রাখতে পারছিনে—সে যখন জানতে পারবে তুমি নাই তখন কি ব'লে তাকে সান্ত্বনা দেব? খোকার জন্যেই আমি কেবল বেঁচে আছি—নইলে এতদিনে তোমার সঙ্গিনী হতাম। তোমার এ টাকা আমি নষ্ট করব না—তোমার ছেলেটিকে মানুষ করবার জন্য মজুত রাখব—ভবিষ্যতে যেন তার কাজে লাগে। আমার চুড়ি গড়াবার আর প্রয়োজন কি? তোমার সঙ্গেই আমার সব সুখ দুঃখের শেষ হয়ে গেছে।

বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া নির্ম্মলা টাকা আড়াইশ তখনই পোষ্টাপিসের ব্যাঙ্কে অজিতের নামে জমা দিয়া পাঠাইল।

(৫)

সপ্তমীর সন্ধ্যা।

শরতের জলভারনমিতাঙ্গ শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি সুনীল আকাশে ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। শারদ-সপ্তমীর খণ্ডচন্দ্র মধ্যগগনে বসিয়া রজত কিরণধারায় ধরাতল প্লাবিত করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণের অযত্ন-সম্ভূত রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে সদ্য-বিকসিত রজনীগন্ধা স্তবকের স্নিগ্ধ গন্ধে চতুর্দ্দিক সৌরভাকুল করিতেছিল। আরতির বাজনা অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে—চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া দেবীপ্রতিমা বিরাজ করিতেছেন।

মুখুজ্জ্যে মহাশয় নাতি অজিতকুমারকে কোলে করিয়া প্রতিমা দেখাইতেছেন—এমন সময় বাহিরে একখানি গো-শকট আসিয়া থামিল। গাড়োয়ান গাড়ী খুলিয়া দিলে ছইয়ের ভিতর হইতে একটি যুবক মুখ বাড়াইয়া শুধাইল—"মুখুজ্জ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপ নয়—তারাপদ মুখুজ্জ্যে ?"

মুখুজ্জ্যে বলিলেন—"হাঁ, আমিই তারাপদ। কিন্তু বাবা, তুমি কোথা থেকে আসছ ?"

যুবক নামিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া বৃদ্ধের চরণ ধূলি লইয়া বলিল—"আমি কুঞ্জ—জামালপুর থেকে আসছি।"

"তুমি কুঞ্জ! এস, এস বাবা এস! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে হরিপদ বুঝি আমার ফিরে এল।"

"আপনার কোলে এ ছেলেটি—"

"আমার নাতি—এইটিকেই সে দিয়ে গেছে।"

বৃদ্ধের কোল হইতে অজিতকে হাত বাড়াইয়া নিজের কোলে টানিয়া লইয়া কুঞ্জলাল বলিল—"খোকা, আমাকে চিনতে পারিস—আমি তোর জ্যাঠামশাই হই।"

অজিত বলিল—"জ্যাঠা, তুমি এলে—আমার বাবা কই ?" তারাপদ চোখের ইসারায় কুঞ্জকে বুঝাইয়া দিলেন।

কুঞ্জ বলিল—"তোমার বাবা এবার আসতে পারলেন না—আসছেবার তাঁকে নিয়ে আসব। ওরে, আমার সুটকেশটা নামিয়ে আন্—দেখবি খোকা, তোর জন্যে কেমন পোষাক এনেছি—"

তারাপদ কহিলেন—"বাবা, তুমি এলে—বৌমাকে আনলে না কেন ?"

কুঞ্জ কহিল—"আমার তো আসবার কথা ছিল না—কি মনে হ'ল হঠাৎ চলে এলাম। আগামী বৎসর তাঁকে সঙ্গে আনব।"

বেশ, বেশ! অনেকটা পথ এসেছ—বাড়ীর ভেতর এস—জলটল খেয়ে বিশ্রাম করবে। খোকা আয় তোর মাকে খবর দিইগে—তোর জ্যাঠামশাই এসেছেন—

বৃদ্ধ নাতিকে কুঞ্জলালের কোল হইতে টানিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে গাড়োয়ান সুটকেশ আনিয়া দিল।

সুটকেশটি হাতে ঝুলাইয়া—জুতা খুলিয়া ঠাকুর দালানে উঠিয়া কুঞ্জলাল ভক্তিভরে দেবী চরণে প্রণাম করিল—তার পর পকেট হইতে পাঁচখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মুখুজ্জ্যে মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিল—"এই দিয়ে এবারকার মত কাঙালীভোজন করান—আগামী বৎসর ভাল ক'রে মায়ের পুজা দেওয়া যাবে।"

নোট পাঁচখানি ফিরাইয়া দিয়া দুই হাত পিছাইয়া গিয়া মুখুজ্জ্যে কহিলেন—"না—না—বাবা! টাকা পয়সা আমি আর ছোঁব না—ও তুমি নিজের কাছে রেখে দাও—কাঙালি ভোজন যা করতে হবে নিজেই দেখে শুনে করিও—এখন বাড়ীর ভেতর এস।"

উপসংহার—

মহাষ্টমীর রাত্রি। ধূপের পুণ্য গন্ধে দেবী মন্দির আমোদিত। ওদিকের কোণে হোমের আগুন জ্বলিতেছে। দেওয়ালগিরি ও ঝাড়ের আলোকরাশি জগন্মাতার মুখে প্রতিফলিত হইয়া মৃন্ময়ী প্রতিমা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন—সে মুখে কি অপূর্ব্ব প্রশান্তভাব।

অভয়ার কল্যাণমণ্ডিত মুখের পানে তাকাইয়া হাত নাড়িয়া পল্লীবৃদ্ধ তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনের আনন্দে—গান ধরিয়া দিলেন—

"তুমি একবার শঙ্করি—
গণেশকে কোলে করি,
বোসো মা এই রত্ন সিংহাসনে।
আনিগে গিরিকে ডেকে
সোনার গাছে হীরে দেখে
জন্ম সফল করি দুই জনে॥"





সঙ্গীত

গান

ঝিলের জলে কে ভাসালো—
নাল-শালুকের ভেলা,
মেঘলা সকাল বেলা।
বেণু-বনে কে খেলেরে পাতা-ঝরার খেলা ॥
কাজল-বরণ পল্লী-মেয়ে—
বৃষ্টি-ধারায় বেড়ায় নেয়ে,
(ব'সে) দীঘির ধারে মেঘের পারে
রয় চেয়ে একেলা ॥
ছলিয়ে কেয়া-ফুলের বেণী
শাপ্‌লা-মালা প'রে,
খেল্‌তে এলো মেঘ-পরীরা ঘুম্‌তি-নদীর চরে।
বিজ্‌লীতে কে দূর বিমানে
সোণার চুড়ীর ঝিলিক্ হানে,
বনে বনে কে বসালো যুঁই-চামেলীর মেলা ॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম্ স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

II পা না -া | র্সা র্রর্সা -নর্সা I -া -া -া | -া -া -া I
ঝি লে র্ জ লে০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা না -া | র্সা র্রর্সা -নর্সা I নর্সনা -ধপা পা | ধা পা -া I
ঝি লে র্ জ লে০ ০০ কে০০ ০০ ভা সা লো ০

I মা -পা পা | মজ্ঞা রা -া I রজ্ঞা জ্ঞপা -া | -া -া -া I
নী ল্ শা লু কে র্ ভে০ লা০ ০ ০ ০ ০

I সা -জ্ঞা ; জ্ঞা | জ্ঞঋা সা -ঋা I ঋন্‌া সা -া | -া -া -া I
মে ঘ্ লা স কা ল্ বে লা ০ ০ ০ ০

I { সা সরা -গমা | মগা মা -া I গমা -গরা রসরা | গমগা রসা -া } I
বে ণু০ ০০ ব নে ০ কে০ ০০ খে০ লে০০ রে ০

I সা সা ধা | ধা ধণধণা -ধমা I মপা মা পা | -া -া -া I
পা তা ০ ঝ রা০০০ ০র্ খে০ লা ০ ০ ০ ০

I সা -জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞঋা সা -ঋা I ঋন্‌া সা -া | -া -া -া II
মে ঘ্ লা স কা ল্ বে লা ০ ০ ০ ০

II { ম্মা পা -পাধ | মপা মগা -মা I পা -ধা নর্সনা | ধপা পা -া I
কা জ ল্ ব০ র ণ্ প ল্ লী০০ মে য়ে ০

I না -া র্সা | র্সা নর্সা র্রা I র্সণা ণপা ধা | ধমা মা -গমগা I
বৃ ষ্ টি ধা রা০ য়্ বে ড়া০ য়্ নে য়ে ০০০

I (-রা -া -া | -া -া -া) } I -রা -া পা | -া পা পমা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ব' সে

I পা পা র্রা | র্রা র্রা -া I র্রা র্জ্ঞা -র্সা | ণধা ধণা র্রা I
দী ঘি র্ ধা রে ০ মে ঘে ০র্ পা০ রে ০

I ধা র্সা ণা | ধণধা -পা মা I পা পদা -ণা | পা -া -া I
র য় চে য়ে০ ০ এ কে লা০ ০ ০ ০ ০

I সা -জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞঋা সা -ঋা I ঋন্‌া সা -া | -া -া -া II
মে ঘ্ লা স কা ল্ বে লা ০ ০ ০ ০

II গা গা -মা | মধা পা -া I মা মণা -ণধপমা | মা মরমা-জ্ঞা I
ছু লি য়ে কে য়া ০ ফু লেং ০ ০র্ বে ণী ০

I জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞরা -মজ্ঞরা I সন্া সা -া | -া -া -া I
শা প্ লা মাং লাং ০ ০ পং রে ০ ০ ০ ০

I ণা -া ণা | পা মা -া I মগা -া মা | রা সা -া I
খে ল্ তে এ লো ০ মে ঘ্ প রী রা ০

I সরা -গা গমগা | গা রসা -রগা I রা সা -া | -া -া -া I
ঘুং ম্ তিং০ ন দীং ০র্ চ রে ০ ০ ০ ০

I পা -র্া র্া | র্া র্া -া I র্সর্া -র্মজ্ঞা র্া | র্সনা র্সা -া I
বি জ্ লী তে কে ০ দুং ০ র্ বি মাং নে ০

I র্সা র্সা ধা | ণধা ণা র্া I র্সধা ধর্সণা -া | ধা ধপা -া I
সো ণা র্ চু ড়ি র্ ঝি লিং ক্ হা নে ০

I ণা পা -া | রজ্ঞা জ্ঞপা -া I জ্ঞা -জ্ঞরা সা | সজ্ঞা রা -া I
ব নে ০ বং নে ৹ কে ০ ০ ব সা লো ০

I ণা -া ণধা | পধা পমা -া I পা পদা -ণা | পা -া -া I
যুঁ ই চাং মেং লীং র্ মে লাং ০ ০ ০ ০

I সা -জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞঋা সা -ঋা I: ঋন্া সা -া | -া -া -া II II
মে ঘ স কা ৈঁ লা ০ ০ ০ ০



টাকার থলি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

কি কুগ্রহ! বেচারা বরেন খেলার মাঠে চিনের বাদাম খেয়ে দাম দিতে গিয়ে দেখলে টাকার থলি নাই। তাতে ছিল দু'টাকা দশ আনা আর একখানা দশ টাকার নোট—কলেজের বেতন।

শার্টের সকল পকেট—ট্যাঁক—কাচা—কোঁচার খুঁট-রুমালের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করলে বরেন। কিন্তু ফলে একটা আগুনের ফুলকি দগ্ধ করলে তার অন্তরাত্মা। আত্মগ্লানির দাহিকা-শক্তি তার বুকের পাঁজর পূর্ব্বেও মহৎ করেছে। কিন্তু ঘরে ফিরে সবার মুখে শুনতে হবে—অসাবধান, অকেজো, আরও কত কি—সে অনাগত কালের জ্বালাও তার সরল প্রাণে ব্যথার হেতু হবে।

আর যমুনা দিদি! বেচারা খোকার রবার ক্লথ্ কেটে তার উপর সুতার আবরণে যে সব কারুকার্য্য করেছে চারু-শিল্পের জগত হ'তে সেগুলা মুছে গেল। বিপন্ন বরেনের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু গড়ের মাঠে ভর-সন্ধ্যার সময় কাঁদলে ভিড় জড় হবার আশঙ্কায় সে মাত্র বললে—ধৎ! তারপর গুন গুন স্বরে গাইলে—আ মরি বাঙলা ভাষা! কিন্তু তাতে মনের আগুন নিভল না। মনের গভীর উৎস থেকে বিদেশী ইংরেজী শব্দই উদ্বুদ্ধ হ'ল—ড্যাম্ ইট্।

অবুঝ চীনের বাদামওয়ালা কিন্তু মর্ম্মবেদনা বুঝলে না থলিহারার। বাবুরা মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর রসিকতার ফলে বিনা পয়সায় চীনা বাদাম খায়—পকেট খোঁজার মূক অভিনয়ের উদ্দেশ্য যে ঐ প্রক্রিয়া—এ সন্দেহ তার মলিন মনের মাঝে উঁকি মারতে আরম্ভ করেছিল প্রথম হ'তে। তারপর যখন বরেন গুন গুন স্বরে গান ধরল—তার ব্যবসায়ী অনুভূতি সন্দেহকে দৃঢ় করলে। থলি-হারানো আর গান-গাওয়া পরস্পরকে সখ্য-সূত্রে বাঁধতে পারে না। কাজেই সে বল্লে—গরীব মানুষ পয়সাটা দিয়ে দিন বাবু।

বাস্তব জগতের [illegible] নাটক-বর্ণিত [illegible] অবস্থা হতে চিরদিন জটিল। মাত্র একটা পয়সার সমস্যা তার পক্ষে, যার পিতা ইংরেজ সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের খাজাঞ্চী—হাজার হাজার টাকা যার গণন-দক্ষ হাত দিয়ে নিত্য আসা-যাওয়া করে। সে হতাশা রাক্ষসকে দমন ক'রে হেসে বললে—টাকার থলি চুরি গিয়েছে—কাল দেব এই জায়গায় এস—ঠিক পৌনে পাঁচটায়।

লোকটার ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটল। সকল সংযম জলাঞ্জলি দিয়ে সে বল্লে—আরে রাখুন বাবু ওসব বাত, লাইয়ে পয়সা লাইয়ে।

—বলছি, নাই।

—তব নবাবী করকে খায়া কাহে?

সামান্য একটা পয়সার জন্য! সে ইতস্তত তাকালে, চারিদিকে লোক, কিন্তু পরিচিতের অভাব। টুঁটি-টেপা কিম্বা থুবনী ভাগ ক'রে ঘুষি-মারার ঘূর্ণী-পাকে যখন তার মনোবৃত্তি—তখন প্রাণ রাখতে প্রাণান্তর কঠোর নির্ম্মম নীতি স্মরণ করলে। কিনিলে কোন দ্রব্য দাম চায় যত অসভ্য। সত্যিই তো। আর এ অসভ্য, দরিদ্র ফেরিওয়ালা। না—নিরুপদ্রব-বাদ এ ক্ষেত্রে সু-পথ।

সে ধীরে ধীরে সোনার আঙটি খুললে। কি হবে? সামান্য চীনা বাদামওয়ালার টিটকারী অসহনীয়।

ঠিক সেই সময় পুলিসের হাল্লা এলো রাস্তার ফেরিওয়ালা ধরতে। পিটটান দিলে ব্যবসায়ী। যাবার সময় বলে গেল—কাল ইসি টাইম ইসি জায়গা। এত দুঃসময়েও বরেনের গান মনে পড়ল—চলে অভিসারিকা—

(২)

জীবনরাম "ঊষার আলো" মাসিক পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে। "ঊষার আলো" এক প্রসিদ্ধ সিনেমার অনুগ্রহে দিনের আলো দেখতে পেয়েছে। তার বিজ্ঞাপনের আবশ্যক নাই। আর্টিষ্টদের অর্দ্ধ-নগ্ন চিত্র আর সিনেমার ব্যাজস্তুতি—তার সঙ্গে প্রতিযোগী সিনেমার মুণ্ডু-পাত ক'রে সম্পাদক-মোসাহেবের দিন চলে। তবে দু-একটা

কাপড় বিক্রেতার, ঘড়িওয়ালার, মাথার তেলের বা সন্ততি-নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে না পারলেই—পাঠক বুঝে ফেলবে তার প্রকৃত রূপ। তাই জীবনরামের কুড়ি টাকা বেতনের চাকুরী। তার একখানা ট্রামের পাশ ছিল।

সেদিন গোলদীঘি পার হ'য়ে ট্রামে উঠে জীবনরাম পায়ের কাছে কি একটার অস্তিত্ব অনুভব করলে। ওমা! বেশ চমৎকার একটা থলি—গায়ের ওপর সূচী-শিল্প, লক্ষ্মী-পেঁচার চিত্র—ভিতরে টাকা গজগজ করছে—কাগজ খড়মড় করছে—নোট হবে। থাক যখন বিধির অযাচিত দান তার মত যোগ্য-পাত্রে। জীবন থলিটা পকেটে ফেল্‌লে। অভাগারও ভাগ্য মোড় ফেরে।

বেগবান ট্রামের তালে তালে জীবনের অন্তরের সঙ্গীত নানা সুরে গুম্‌রে উঠল। একজোড়া নূতন জুতা—উহুঁ। হাতকাটা শার্ট, বিছানার চাদর, নরুণ-পাড় ধুতি, গেঞ্জি, নীল চশমা প্রভৃতি অশেষ পদার্থ বিশ্ব-রূপের মাঝে একে একে ভেসে উঠল। উহুঁ ওসব না।

এবার ন্যায়শাস্ত্র ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র মিলে আসল কর্ত্তব্য-পথ দেখিয়ে দিলে জীবনরাম পালিতকে। যেহেতু মঙ্গলের দৃষ্টি তার আঁখি-পথে বিভাসিত করেছে রক্ত-বর্ণ টাকার থলি—আচম্‌কা উপরি লাভ তার শুভ-গ্রহের শুভ-দৃষ্টির ফল। মাত্র দশ-বার টাকায় তার ভবের দুঃখ ঘুচবে না। জুতা—সিমেণ্টের ফুটপাথের ঘর্ষণে কদিন টিকবে। জামা রজকের সোডা ও আছাড়ের নির্য্যাতন কদিন সহ্য করবে! ইত্যাদির যম ইত্যাদি—এইরূপ সচিন্ত গবেষণার ফলে সমাধান করলে ব্যয়-সমস্যা জীবনরাম পালিত।

এবার সাহিত্য তার সহায় হল। আলিবাবা যে কুবেরের ধনলাভ করেছিল—সে দৈব-বশে একটি কথার সঙ্কেত-রহস্যের বলে। সে স্পষ্ট বুঝলে থলির মধ্যে আবদ্ধ দশ টাকার নোট মূক বাগ্মিতায় তাকে বলছে—ওগো, আমি চিচিঙ-ফাঁক মন্ত্র মাত্র। এ মন্ত্র-শক্তির সুযোগ হাতছাড়া ক'র না—ডারবী-লটারীর টিকিট কিনো। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন—পুরা বার লাক না পাও, পাঁচ লাক টাকার তোড়া তোমার শ্রীকরে তুলে দেব। তখন তুমি জুতোর শৈলে, জামার পাহাড়ে গন্ধ-দ্রব্যের হুড়রু প্রপাতের শীতল তলে বস্‌তে পারবে।

ডারবির টাকা পেয়ে কি রকম সুন্দরী মহিলার পাণি-গ্রহণ করবে জীবনরাম সে বিষয় সিদ্ধান্ত করছে সে যখন ধর্ম্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে—কে যেন তার পকেটে টান মারলে। তারপর গণ্ডগোল—হট্টগোল, পুলিস, জনতা। ভীষণ কাণ্ড হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারের কেন্দ্রস্থল হ'ল জীবনরাম পালিত উষার-আলোর ক্যানভাসার।

মোট কথা—পকেট মার তার পকেট ক্যানভাস ক'রে টাকার থলি বাণিজ্য করেছে।

(৩)

পুলিস যখন পকেট-মার দক্ষ-শিল্পীর তল্লাসী নিলে থলি পাওয়া গেল না। জমাদার বললে—ওরকম হয়। পুরাতন পাপী—এরা পকেট মেরেই বামাল অপরের হাতে দেয়—সামাল দেবার জন্য।

যখন জীবনরামকে থানার ইন্‌সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলে অপহৃত থলির আকার প্রকার, সে বললে—আজ্ঞে গেরুয়ার ছোট থলির মধ্যে ছিল মাত্র তিন টাকা দু আনা। যদি মনে করেন তো চোরটাকে ছেড়ে দিতে পারেন।

কিন্তু তা কি হয়? পুরাতন চোর। জীবনরামকে সাক্ষী দিতে হবে পুলিস কোর্টে।

জীবনরাম বুঝলে—বৃহস্পতি চম্পট দিয়েছেন, এখন তার শনির দশা।

(৪)

শ্রীরাম পরামাণিক লোহার কারখানার তাগাদা সরকার। ছাতি হাতে ক'রে যাচ্ছিল সে ভবানীপুরে লোহার বল্টুর দামের তাগাদা করতে। ভীড় দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু গম্ভীর মুরুব্বিয়ানা ক'রে চোরের পাশে গিয়ে তাকে হিত-উপদেশ দিলে। কাজ কি ঝঞ্ঝাটে বাবা? ভদ্দর লোকের টাকাটা ফেরত দিলেই তো হয়।

চোর বললে—ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করছ, তুমি দাও না বাবু।

মানীর মান থাকে না চোরের হাঙ্গামায়। অতএব দুত্তোর ব'লে শ্রীরামচন্দ্র নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হ'ল।

মনুমেণ্টের সিঁড়িতে বসে শ্রান্ত শ্রীরাম এক অনির্ব্বচনীয় হাঙ্গামার মাঝে পড়ল। তার ছাতার ভিতর লাল রবারের থলি, গায়ে নীল সুতায় লক্ষ্মী-পেঁচা আঁকা।

সর্ব্বনাশ! হট্টগোলের মাঝে চোর তারই ছাতায় ফেলে দিয়েছে বামাল!

প্রায় পৌণে তিন আউন্স ঘাম বেরুলো তার শ্যামবর্ণ শরীর হতে। কি ভয়ঙ্কর! এখন ফেরত দিতে গেলে চোরের সহযোগী ব'লে তাকে ধরবে পুলিস। সর্ব্বদুঃখহরা সুখদা মোক্ষদা গঙ্গাকে স্মরণ করলে শ্রীরাম। হ্যাঁ ঠিক! এ পাপ থলি গঙ্গার জলে ফেলে সে এক ঢোক গঙ্গা জল খেয়ে তাপিত অঙ্গ শীতল করবে। তার পর ইলিশ মাছে থাক্ আর বোয়াল মাছেরই উদরগস্থ হোক অনর্থ অর্থ—সে দুর্ভাবনা ভাববে থলি।

ইডেন উদ্যানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের টি পি পুলিস বাগানের প্রাচীরে তার সাদা ছাতা রেখে উত্তরদিকে ধাবিত এক ট্যাক্সির পিছনে ছুটছিল। এ ঘটনায় শ্রীরামচন্দ্রের মস্তিষ্কে বিজলীর ঝলকের মত দুটা সুষ্ঠু ভাব ঝলকিত হ'ল। দেশের দুর্দ্দিনে টাকা জলে ফেলা উচিত না, আর পুলিসের হাতে পড়লে যার থলি সে ফেরত পেতে পারে।

সে চক্ষের নিমেষে এ-দিক ও-দিক দেখে পাহারাওয়ালার ছাতার ভিতর টাকার থলি ফেলে বাগানের কোণের ছোট ফটকের ভিতর দিয়ে বাগানে প্রবেশ করলে। একটা শান্ত তুষ্টি তাকে অনুপ্রাণিত করলে।

(৫)

গুরগন খাঁ উনাও জেলার সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। বীরের ঘরোয়ানা ব'লে তার বংশের খ্যাতি ছিল হাতাপায়ী গ্রামে। দিনের কাজে অনবরত পাল্‌টা-পাল্‌টি ক'রে ডান-হাত বাঁ-হাত আড়াআড়ি তোলা—তার ওপর ধান-ক্ষেতের সারস-পাখীর মত চৌমাথার মোড়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা—সঙীন কাজ। পুলিসের কাজ পান থেকে চুণ খসলে কর্ত্তৃপক্ষ অগ্নি-শর্ম্মা হন।

বেচারা উর্দ্দী খুলে লুঙ্গী প'রে যখন ছদ্মবেশ গোছাচ্চে—আত্ম-প্রকাশ করলে লক্ষ্মী পেঁচা চিত্রিত লাল থলি।

বিস্মিত গুরগন আল্লা-নাম স্মরণ করলে, তার সঙ্গে পুলিসের আইন। উর্দ্দীর সঙ্গে টাকা রাখা নিষেধ—তার উপর নিশ্চয় চোরাই মাল। কি করে বেচারা আত্মানং সততং রক্ষেৎ! সে এদিক ওদিক চেয়ে পাশের খাটে বিছানার তলায় থলিটা গুঁজে দিলে। যা শত্রু পরে পরে।

পরদিন প্রভাতে স্নান করে তুলসীদাসের দোঁহা আওড়াচ্ছিল কনষ্টেবল সংগ্রাম সিং আর উর্দ্দী পরছিল।—আগে চলত মাতা জানকী পাছে লছমন ভাই রে—ই কা।

বিছানার তলায় উলুক-চিত্রিত রক্ত-থলি তার রক্তকে হিম্ করলে।

—আরে! কেয়া জঞ্জাল।

মাথায় রাখলে উকুনে খায় ভূমিতে পিঁপড়ে—জলে কুমীর ডাঙার বাঘ—এগোলেও নির্ব্বংশের বেটা ইত্যাদির অনুরূপ ভোজপুরী প্রবচন স্মরণ ক'রে সংগ্রাম সিং থলিটা কোমরে গুঁজে ডিউটি দিতে গেল।

চৌমাথার মোড়ে যখন সে বাঁশী-বাজানো আর হাত-তোলা ব্যাপারে ব্যাপৃত নিতাই সাঁই মনিবের দৈনিক পূজার জন্য কলসী ভরে গঙ্গাজল নিয়ে যাচ্ছিল। চৌমাথা পার হবার সময় সশঙ্কিত নিতাই ভাবছিল—বাবু খৃষ্টান হ'লে বেশ হয়—দু'দিন অন্তর গঙ্গাজল নিয়ে যেতে হয় না। ভাবুক বুঝতে পারলে না যে টি পি পুলিস সংগ্রাম সিং তার কলসীর ভিতর মা লক্ষ্মীর বাহন আঁকা লাল থলি ফেলে দিয়ে তুষ্ট প্রাণের সুষ্ঠু আনন্দ উপভোগ করছিল।

নিজের ভাবে আত্মহারা নিতাই সাঁই স-থলি পবিত্র কলসী বিষ্ণু বাড়ুয্যের ঠাকুর-ঘরের জল-চৌকীর উপর স্থাপিত করলে।

(৬)

বরেন চাটুয্যের আর্থিক সঙ্কটে ত্রাণ-কর্ত্রী রূপ ধারণ ক'রে যমুনা দিদির প্রসন্ন মুখ ভেসে ওঠে তার চিত্ত-পটে। পৌরাণিক যমুনার ভ্রাতা যমের মত যমুনার ভাই বরেন—অবশ্য যমের অনিবার্য্য কঠোরতা বাদ দিয়ে উপমা দিলে—স্নেহ ও আনুগত্যের দিক্ থেকে।

হাস্য-মুখী যমুনা—শ্বশুর-কুলের অতি-প্রিয়। এতে স্বামী ভবেশচন্দ্রের একাধিপত্য চোট খায়। কিন্তু স্ত্রী অবুঝ—তার কাজ ফেলে ছুটে যায় শ্বশুরের পূজার আয়োজন করতে—শাশুড়ীর হাত থেকে পানের বাটা কেড়ে নিতে।

—খবর আছে—বললে বরেন।

—কিসের? ফুটবলের, না সাঁতারের? বাবা কেমন আছেন, মা কেমন আছেন, এ খবর তোর কাছ থেকে বার করতে ডুবুরির আবশ্যক।

সেই অকেজো অপদার্থের বদনাম। কিন্তু ভাই-বোনের ঝগড়া এ ক্ষেত্রে ডিপ্লোমেসির দিক থেকে হবে অমঙ্গল। ভ্রাতা সামলে নিয়ে বললে—যমুনা দিদি, তোমার অমন সুন্দর-মুখ-লক্ষ্মী-পেঁচা আঁকা থলেটা ওর নাম কি হয়েছে?

—হারিয়েছে। সুদীর্ঘ পনেরো দিন বাদে। তার আর কি হবে? এবার আরএকটাকরে দিব, কাঠ-বিড়ালীর ছবি এঁকে।

একটু মাথা চুল্‌কে বরেন বললে—মানে হচ্ছে অর্থাৎ—

—সোজা কথা বল্ না ভাই—কিছু টাকাও তার ভেতর ছিল?

—হ্যাঁ অস্বীকার করব কেমন ক'রে। টাকা বলে টাকা—কলেজের ফি—

—য়্যাঁ!—বললে যমুনা। তার স্মৃতি-পটে ভেসে উঠল তার পিতার দিনের শেষের শ্রান্ত ক্লান্ত মুখ।

নেপথ্য হ'তে ডাক পড়ল—বৌমা!

—যাই মা—বলে ছুটে চলে গেল যমুনা। শাশুড়ীর হাতে সিঁদুর দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুরের টিপ প'রে শ্রদ্ধায় শ্বশুরের সান্ধ্য-আরাধনার আয়োজন করতে গেল যমুনা ঠাকুর-ঘরে।

সযত্নে আসন পাতলে—ধূপ-দানে ধূপ বসালে—ধূনোচিতে চন্দন কাঠের গুঁড়া মেশানো ধূনা দিলে। শ্বশুর এলে আগুন জ্বালাবে।

তার পর কলসী থেকে জল গড়াতে গেল কোশাকুশি ও পঞ্চপাত্র পূর্ণ করতে।

এ কি? এদের অসাবধানতায় দেবতা অবধি রুষ্ট হবেন। গঙ্গাজলের কলসীর ভিতর লাল ফুলের পাপড়ি—লাল নাকি? হ্যাঁ—না—ওমা, কি ও?

হাত ডুবিয়ে তুললে যমুনা—তার হাতের তৈরি টাকার থলি—লাল রবার—লক্ষ্মী পেঁচার চিত্র!

রহস্য!

নিতাই—বরেন—কি কাণ্ড—কি ব্যাপার—বল্‌তে বল্‌তে ছুটল যমুনা যে ঘরে কনিষ্ঠ প্রতীক্ষা করছিল। তারও বিস্ময়ে চক্ষু হ'ল বিস্তৃত—যমুনা দিদির হাতে তার হারানো থলি—আর তার গা দিয়ে টপ টপ ক'রে পবিত্র গঙ্গাজল ঝরছে।

সাক্ষ্য গৃহীত হ'ল—কিন্তু রহস্য নিজেকে মুক্ত করতে পারলে না।

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবশেষে গম্ভীরভাবে বললেন—কাজ কি মা? কাঠের বেড়াল হ'লে কি হয়—ইঁদুর ধরতে পারলে হ'ল। ঘরের থলি—ঘরের লক্ষ্মী-পেঁচা তো ঘরে ফিরল। জীবনের কোন রহস্যেরই সমাধান হয় না।—কাজেই এটা বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

অঙ্গার গ্যাস

(Carbon dioxide)

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

বাঙালীদের পক্ষে নামটা মোটেই উপাদেয় নয়। নূতন আমদানি শাস্ত্রের মধ্যে দেশীয় রুচিকর নাম সরবরাহ করা কঠিন। বিদেশী শব্দ সম্পূর্ণ বজায় রাখিতেও মনের কোণে দৈন্য জাগিয়া ওঠে। আবার জিনিসটাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিতে হইলে যতদূর সম্ভব দেশজ সাজসজ্জায় সজ্জিত করাই সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রেত। নামটি যদিও কাঠখোট্টা, জননী বঙ্গভাষার স্নেহসম্ভারে ইহা অতি শীঘ্র প্রাণবন্ত হউক, এরূপ আশা করা অনুচিত নয়। ঘরে ঘরে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় সকলে যখন নিত্য দৈনিক আবহাওয়ায় ইহাকে স্মরণ করিবে, তখন নামের কর্কশতা কাহাকেও উৎপীড়িত করিবে না। কার্য্যক্ষেত্রে নামের রঙিন্ নেশা বেশীক্ষণ থাকে না। শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত মাপকাঠি হইল গুণ। গুণের দিক দিয়া এই রাসায়নিক পদার্থটির মহিমা অপার।

ইহা একটি যৌগিক পদার্থ। অঙ্গার ও অম্লজানের রাসায়নিক সখ্যতায় ধরাধামে ইহার অবতরণ। ইহার জন্ম দিতে অগ্নিদেবের মত সেরা কারিকর আর নাই। অগ্নি যখন অঙ্গারের উপর কৃপা করেন তখন লোকচক্ষুর নিকট পড়িয়া থাকে একমুষ্টি ভস্ম, কিন্তু সবটা অঙ্গারই যে বর্ণহীন অঙ্গারাম্লজান-গ্যাসরূপে আকাশে উড়িয়া যায় এ সংবাদ অনেকেই অবগত নন্। উদরভর্ত্তি কয়লা লইয়া জাহাজ রওনা হয় তীর্থযাত্রায়, ফিরিয়া আসে কয়েক মুঠো ছাই লইয়া, সমস্তটা অঙ্গারই অগ্নিদেবের তৃপ্ত্যর্থে উক্ত গ্যাসরূপে চিমনী দ্বারা উৎগীরিত হয়। কয়লা ও আগুনের মধ্যে যে উৎকট প্রেম তাহার মহিমা অপার। পৃথিবীর যাবতীয় আবিষ্কারের পেছনেই উহার লীলাখেলা বর্ত্তমান। কিন্তু প্রকৃত রাসায়নিক দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখা যায়, এ সমস্ত ক্ষেত্রে

অগ্নিদেব মাত্র অবলম্বন হিসাবে উপস্থিত থাকেন, প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকার অভিনয় করে অম্লজান ও অঙ্গার। উহাদের এই ঐকান্তিক মিলনের ফলে যে শক্তিস্ফুরণ হয় তাহা দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় কর্ম্ম নিপন্ন হইয়া থাকে। অঙ্গারাম্লজান সাধারণত বায়বীয়রূপে আবির্ভূত। ইহা সচরাচর বায়ু-জগতে বাস করে এবং বর্ণহীন বলিয়া সেখানে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সংশয় বোধ করিয়া থাকি।

চিন্তাশীল রাসায়নিক পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর আদিতে অঙ্গার মৌলিক অঙ্গাররূপে পরিচিত ছিল না। ইহা অঙ্গারাম্লজানরূপেই ধরাপৃষ্ঠে ভাসমান ছিল। গাছপালা উহাকে সূর্য্যালোকের পলকস্পর্শে ভঙ্গ করিয়া অঙ্গারকে স্বীয় অবয়ব বৃদ্ধি করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছে এবং অম্লজানকে বায়ুতে নিক্ষেপ করিয়াছে। এ ভাবে বহু যুগব্যাপী অবিরাম নৃত্যের ফলে পৃথিবীতে অজস্র গাছপালা জন্মলাভ করিয়াছে এবং ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—এই মৃত্যুর শেষ পরিণতি এই অঙ্গারসম্ভার। অঙ্গারের জন্ম হয় আবার আমাদের চুল্লীতে প্রবেশ করিয়া—আদিম অবস্থা—অঙ্গারাম্লজানরূপ পরিগ্রহ করিয়া শূন্যলোকে অবস্থান করে। বৃক্ষাদির লতাপাতা কি ভাবে আহার্য্য সংগ্রহ করে ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়। আকাশে অঙ্গারাম্লজান যখন সূর্য্যালোকে নৃত্য করিতে থাকে তখন উদ্ভিদরাজি পত্রদ্বারা এক একটি বুদ্‌বুদ্‌কে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। অঙ্গার শরীর পুষ্টির জন্য রক্ষিত হয়, অম্লজান মুক্ত হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী তাহাদের খাদ্যরূপে যথেষ্ট অঙ্গার গ্রহণ করিয়া থাকে, এ সমস্ত অঙ্গার নিশ্বাসলব্ধ অম্লজানের সঙ্গে মিলিত হইয়া অঙ্গারাম্লজানরূপে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে অঙ্গার কেবল বহির্জগতেই দগ্ধ হয় তাহা নহে, অন্তরজগতেও ফুস্ ফুস্ নামক চুল্লীদ্বারা ইহার দহনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই যৌগিক (compound) গ্যাসটির পরিচয় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে প্রচুর পাওয়া যায়। আধুনিক সভ্যতার পুরস্কারস্বরূপ বোতল ভর্ত্তি যে সোডা ওয়াটার আমরা পান করিয়া থাকি তাহাতে যে অনর্গল বুদ্‌বুদ্‌ উত্থিত হয় সেই বায়বীয় পদার্থটি আমাদের এই অঙ্গারাম্লজান। মদ তৈয়ার করিবার পদ্ধতিতে শর্করা পচিয়া যে গ্যাস উত্থিত হয়, তাহাও ইহাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বায়ুর একটি উপকরণ অঙ্গারাম্লজান, সেখানে শতকরা ·০৩ ভাগ অঙ্গারাম্লজান আছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য গ্যাসের তুলনায় ইহার পরিমাণ সত্য সত্যই কম। কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর পরিমাণ গ্যাস রাখিবার মূলে বিধাতার একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে। দেখা গিয়াছে, একটি জনতাপূর্ণ প্রকোষ্ঠে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাত্রাধিক্য হেতু ইহার পরিমাণ যখন শতকরা ·৫ ভাগে আসিয়া পৌঁছে, তখনও আমরা ততটা অসুবিধা বোধ করি না; কিন্তু ইহার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৩ ভাগে পৌঁছিতেই মানুষ মাথার যন্ত্রণা অনুভব করে এবং ক্রমে যখন আরও মাত্রাধিক্য হয় তখন নানা প্রকার শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষমতা কমিতে থাকে এবং শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভবলীলা সম্বরণ করি। কাজেই বায়ুতে ইহাকে রক্ষা করায় যেমন প্রাণীমাত্রেরই অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় তদ্রূপ অকল্যাণেরও দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে। প্রাণীমাত্রই আকাশে অবিরাম অঙ্গারাম্লজান ছাড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন প্রায় এক সের (দুই পাউণ্ড) অঙ্গারাম্লজান মুক্ত করিয়া দেয়। যদি সমস্ত প্রাণীর দেওয়া অঙ্গারাম্লজান একত্র করা যাইত তবে সর্ব্বশুদ্ধ দশ লক্ষ টন্ গ্যাস দৈনিক শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। এরূপ বিশাল গ্যাসরাশি যুগে যুগে সেই অনাদিকাল হইতে আকাশে স্থান পাইয়া আসিতেছে, ইহা ছাড়া সহস্র সহস্র মণ অঙ্গার দৈনিক ভস্মীভূত হইতেছে, তাহাতে যে গ্যাসরাশি উন্মুক্ত হয় তাহার পরিমাণ এই গ্যাসরাশি হইতে দশ গুণ বেশী। আবার আগ্নেয়গিরি হইতে যে অঙ্গারাম্লজান উত্থিত হয় তাহার তুলনায় এ সমস্তের দান বড়ই নগণ্য। সেই আদিযুগ হইতে আগ্নেয়গিরির তাণ্ডবনৃত্য চলিয়াছে, আজও তাহার বিরামহীন পরিচয় স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এত শত সূত্র ধরিয়া এই একটি গ্যাসই আকাশকে সম্পূর্ণ অবরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তবুও ইহার মাত্রাধিক্য দেখা যায় নাই। একজনের চতুর বুদ্ধি যদি সব সময় প্রকৃতিকে পরিচালিত না করিত তবে এতদিনে চেতনসৃষ্টি কোথায় বিলীন হইয়া যাইত কে বলিতে পারে? একা এই অঙ্গারাম্লজানই বিশ্বসংসার এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতে পারিত। কিন্তু ইহা হইবার নহে, সদাশিব সব সময় সমন্বয়ের মাপকাঠি হাতে লইয়া বসিয়া আছেন। একচুল এদিক ওদিক হওয়ার সাধ্য নাই। যেমন অঙ্গারাম্লজান মাত্রাধিক্যে পৌঁছিল অমনি তাহাকে অপসারিত করার জন্য নানাপ্রকার ফাঁদ পাতিয়া বসিলেন। আদিকাল হইতে আগ্নেয়গিরি যে সমস্ত বস্তু উদ্গীরণ করে তাহার মধ্যে চুণ, ম্যাগনেসিয়া (Magnesia), সিলিকা (Silica) এলুমিনা (Alumina) প্রভৃতি বহু পদার্থ থাকে। এ সমস্ত অম্লজানঘটিত পদার্থ অনেকেই অঙ্গারাম্লজানকে ধরিবার সঙ্কেত জানে। ইহারা যখন আগ্নেয়গিরি দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে রক্ষিত হয়, তখন বায়ুস্থ অঙ্গারাম্লজান উহাদের আকর্ষণে পড়িয়া ক্রমশঃ উহাদের সাথে মিলিত হয়। এভাবে প্রচুর অঙ্গারাম্লজান চুণ, ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া পাষাণ-স্তূপে পরিণত হয়। পাথর হইয়া কখনও উচ্চ হইতে উচ্চতর হয় এবং বিশাল পর্ব্বতরূপ পরিগ্রহ করে, কখনও উহাই আবার অধিকতর অঙ্গারাম্লজান গ্রহণ করিয়া বৃষ্টির জলে গলিয়া বিশাল সমুদ্র বক্ষে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। আমাদের অঙ্গারাম্লজান এভাবে আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাঝে মাঝে সাগর জলেও ডুব দিয়া থাকে। কিন্তু বিশাল সাগরে ডুবিয়াও উহাদের নিস্তার নাই, লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক জীব এ সমস্ত দ্রবীভূত পাথর গ্রহণ করিয়া তাহার দেহ পুষ্ট করে এবং সময়ে নূতন রূপ দিয়া উদ্গীরণ করে। এ সমস্ত উদ্গীর্ণ পাথরগুলিই কালক্রমে প্রবাল মণি মুক্তা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কখনও কখনও এ সমস্ত সমুদ্র বক্ষে জমিয়া এক বিরাট পাহাড়রূপে মস্তক উত্তোলন করে। হাজার হাজার মাইলব্যাপী পাহাড়-পর্ব্বতের জন্ম এভাবেই সম্ভব হইয়াছে। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গণনা দ্বারা দেখাইয়াছেন, অধুনা বায়ুতে যে অঙ্গারাম্-



শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বাগচী

জেলে

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

জান আছে তাহা হইতে প্রায় পঁচিশ হাজার গুণ অঙ্গারাম্লজান পাহাড়-পর্ব্বতে চূণাপাথর অথবা ম্যাগনেসিয়া পাথররূপে আবদ্ধ আছে। একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, এ সমস্ত অঙ্গারাম্লজানই একদিন গগনমণ্ডলে সচল ছিল, ক্রমে অচলায়তনে পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃতিক কর্ম্মকুশলতা চিন্তা করিলে সত্য সত্যই বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হয়। একদিন ধরাবক্ষে কি অসীম অঙ্গারাম্লজানের চঞ্চলতা বিরাজ করিত, আজ তাহারা কোথায়? কত কোটি কোটি অঙ্গারাম্লজান এভাবে গা-ঢাকা দিয়াছে তাহার কূলকিনারা করা একপ্রকার অসম্ভব।

অনেকে মনে করেন অঙ্গার যখন আমাদের একমাত্র শক্তিউৎস, তখন ইহা যদি এভাবে অচল হইয়া পড়ে তবে ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার কি উপায় হইবে? এ প্রশ্ন খুবই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মনুষ্য-বুদ্ধির বহু ঊর্দ্ধে এক বিরাট বুদ্ধি বিরাজ করে, তাহার লীলায় কোথাও কলঙ্ক স্পর্শ করে না। অঙ্গার বা অম্লজান যদি কোথাও জমাট হইয়া থাকে তাহাও আবার কালক্রমে আবহাওয়াতাড়িত হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয় এবং তখন গাছপালার খোরাক হিসাবে মাটীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে।

অঙ্গারাম্লজানকে মনুষ্য ও পশুপক্ষীর প্রাণ বলিলেও ভুল হয় না। ইহা যেমন পাহাড়-পর্ব্বতে জমিয়া থাকে তদ্রূপ উদ্ভিদ জগতের পুষ্টি সাধনেও প্রাণপাত করে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বাবর অঙ্গারাম্লজান যখন সৌরকিরণে নৃত্যরত হয় তখন বৃক্ষাদির সবুজ পত্র ঐ চপল কিরণে ক্ষুধিত হইয়া অঙ্গারভাগ আহার্য্যহিসাবে গ্রহণ করে এবং অম্লজানকে শূন্যে ছাড়িয়া দেয়। উদ্ভিদের এরূপ চমৎকার আহারের ব্যবস্থা দেখিলে হিংসা হয়। বায়ুর কোলে হেলিয়া দুলিয়া সূর্য্যের কিরণে নৃত্য করিয়া এরূপ আহার করা কে কবে দেখিয়াছে? মনে হয়, উহাদের কোন বালাই নাই। এক নির্ম্মল সবুজ সৌন্দর্য্য দিবারাত্রি উহাদের অঙ্গে ফুটিয়া আছে। খায় দায় হাসে খেলে নৃত্য করে! অলসতারূপ জড়তা উহাদের নাই। আমরা যখন রৌদ্রাধিক্যে ঢলিয়া পড়ি বা অলস কল্পনারাজ্যে বিচরণ করি, উহারা তখন আমাদেরই জন্য বিষয়কার্য্যে রত থাকে—এক একটি অঙ্গারাম্লজান কণিকাকে ধরে এবং বিচ্ছিন্ন করে। রাসায়নিক কৌশলও উহারা জানে বেশ। যে অঙ্গারাম্লজানকে কতকটা দ্বিধা বিভক্ত করিতে মানুষের পক্ষে ১২০০°—১৩০০° ডিগ্রি তাপ প্রয়োগ করিতে হয় সেই গ্যাসটি ছিন্ন করিতে উহাদের কোন আয়াস পাইতে হয় না।

যে সমস্ত অঙ্গার বায়ুর অংশরূপে আকাশে বসবাস করিত তাহাই আবার উদ্ভিদশরীরের ভিতর দিয়া ক্রমে জীবশরীরে প্রবেশ লাভ করে। জীবদেহের পুষ্টতা রক্ষার পর আবার উহারা ক্রমে অম্লজানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং অঙ্গারাম্লজানরূপে বায়ুতে ফিরিয়া যায়। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা রক্ষার জন্য উদ্ভিদগণ ও প্রাণীগণ এ ক্ষেত্রে অনেকটা বিপরীত বুদ্ধিতে কাজ করিলেও এক্ষেত্রে অঙ্গারের একটা চক্রবৎ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রকৃতির রাজ্যে অনেক ব্যাপারে এরূপ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হয় কোন এক রসিক খেলোয়াড় ইহার পিছনে বর্ত্তমান। নিজে সম্যক উপভোগ করিবেন বলিয়া তিনি তাঁহার খেলার আয়োজনে এমন সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, এ খেলা যুগযুগান্তর চলিবে। যদি কোন বুদ্ধিমান মানুষ সেই নিপুণ চক্রীর চক্র হইতে ত্রাণ পাইতে চান তবে তাঁহাকে মনঃপ্রাণ সবই সেই শ্রীপদে সমর্পণ করিতে হইবে, তবে যদি তিনি তাহাকে এহেন গোলকধাঁধাঁ হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

বায়ুতে যে অঙ্গারাম্লজান আছে তাহার দ্বারা মোটামুটি একটা সাম্যাবস্থা রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে আকাশে দিন দিনই উক্ত গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। আজকাল কয়লা ধ্বংসের যত সব কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে বৃক্ষাদি লতাপাতা বিপরীত দৌড়ে হারিয়া যাইতেছে। বিশেষত, বৃক্ষেরা কেবল অঙ্গারাম্লজান গ্রহণ করিয়া কার্য্য শেষ করে না, প্রাণীদের ন্যায় উহারাও কিছুটা মুক্ত করিয়া থাকে। একথাও মনে রাখা দরকার যে, প্রাণীদের খাদ্যহিসাবে সকল রকম বৃক্ষ ব্যবহৃত হয় না, অধিকাংশ বনাদি কালস্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতের কয়লাসম্ভার সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি একমাত্র কয়লাখণ্ডে পরিণত হওয়াই বিটপীরাজির একমাত্র ব্যবসা হইত তবে এতদিনে আকাশে অঙ্গারাম্লজানের এক প্রকাণ্ড দুর্ভিক্ষ হইত এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে বৃক্ষাদি লতাপাতা চিরতরে অন্তর্হিত হইত।

বায়ুতে অঙ্গারাম্লজান থাকাতে ভূপৃষ্ঠের যথেষ্ট উপকার হয়। ভূতত্ত্ব ও রসায়ন যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একমাত্র এই গ্যাসটির মাত্রা পরিবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীতে আবহাওয়ায় ভূরিভূরি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। যখন গ্যাসটির মাত্রা কমিয়া যায় তখন শৈত্যাধিক্য হয়—ইহারই জন্য অনেকে বলেন, আদিকালে মধ্য ইউরোপ ও গ্রেট ব্রিটেনের উপর দিয়া বহু শীত ও গরম ঢেউ চলিয়া গিয়াছে। বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ও রাসায়নিকগণ একথার সত্যতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং এজন্য অঙ্গারাম্লজানই সর্ব্বাংশে দায়ী—ইহাও তাঁহারা ঘোষণা করেন। তাঁহারা আরও বলেন, আগ্নেয়গিরির উৎপাত তালে তালে আবির্ভূত হয় এবং যখনই ইহার প্রাদুর্ভাব হয় তখনই অত্যধিক অঙ্গারগ্যাসজনিত গরম আবহাওয়া বহিতে থাকে। অঙ্গার গ্যাস যদি সত্য সত্যই বৃদ্ধি পায় তবে বৃক্ষাদি গাছপালার খুবই আনন্দ! তখন উহারা দ্বিগুণ গতিতে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সব ব্যাপারেরই একটা সুনিয়ন্ত্রিত মাত্রা আছে। গাছপালা শতকরা নয় ভাগের অতিরিক্ত অঙ্গারাম্লজান সহ্য করিতে পারে না।

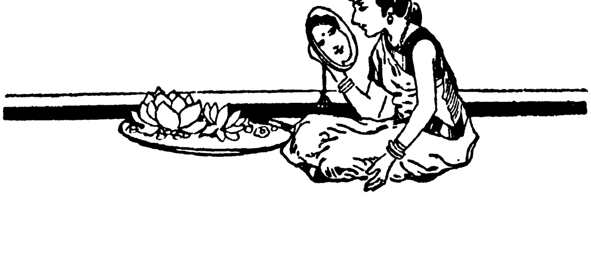
মানুষ অনেক সময় ভবিষ্যতের অভাব অভিযোগের কথা ভাবিয়া বর্ত্তমানেই ভীতি-বিহ্বল হইয়া ওঠে। ভবিষ্যৎ যে সম্পূর্ণ তাহাদের অধীন নয়, একথা ভুলিলে চলিবে কেন? প্রতি মুহূর্ত্তে পটপরিবর্ত্তন হইতেছে। আজ যাহা সুন্দর কাল তাহা কুৎসিত। আজ যাহা নবীন কাল তাহা জরাগ্রস্ত। আজ যাহা মলিন কাল তাহা তেজোদৃপ্ত। আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে একটা নূতন আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে—বুঝি বা অঙ্গার-ভাণ্ডার অতি শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া যায়। যেরূপ দ্রুতগতিতে ইহার বিপুল

ব্যবহার চলিয়াছে তাহাতে এ আশঙ্কা অমূলক নয় ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবা উচিত যে, যত বেশী অঙ্গার ভস্ম হইবে, তত বেশী অঙ্গারায়জান বায়ুর কোড়ে স্থান পাইবে এবং তদ্দরুণ নিশ্চয়ই পৃথিবীর আবহাওয়া বদ্‌লাইয়া গিয়া সব দিকে নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত হইবে। তখন ধরাবক্ষ যে এক নূতন সাজে সজ্জিত হইবে এরূপ আশা করা অমূলক নয়। হয়ত মানুষের আহার্য্য লতাপাতা শস্যাদি এত প্রচুর হইবে যে, সকলেই এক আনন্দময় পরিতৃপ্তিতে ভরপুর থাকিবে। হয়ত অঙ্গারজনিত হা-হুতাশ ও কলদৈত্যের মায়াকান্না কাহাকেও আকুল করিবে না। অবশ্য কেহই একথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে না, তবে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলে এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়।

অঙ্গারায়জান সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এক মস্ত অধ্যায় হইয়া দাঁড়ায়। উহার প্রকৃতিগত কয়েকটা বিশেষ বিশেষ গুণ লিপিবদ্ধ করিয়া —এখন বিদায় নেওয়াই সঙ্গত। এই গ্যাসটির বড় গুণ—ইহা বায়ু হইতে অনেক ভারী এবং অগ্নির মহাশত্রু। অম্লজানকে অপসারিত করিয়া তাহার সেস্থান দখল করিতে ইহার মত দক্ষ গ্যাস আর নাই। নিজে জ্বলে না এবং অপরকে দাহন পীড়া হইতে রক্ষা করে। এ জন্য এ গ্যাসটির দোষও আছে। যেখানে ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী, অম্লজান সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। ইহার হাওয়ায় পড়িয়া প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রাণপ্রদীপ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রদীপই ইহাকে মহাশত্রু জ্ঞান করে। জনাকীর্ণ স্থানে যদি আবদ্ধ থাকে তবে সেস্থানের হাওয়া ক্রমে অঙ্গারায়জানে পরিপূর্ণ হয় এবং উক্ত হাওয়া মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কতকগুলি কাঠখণ্ড জ্বালাইয়া ঘর দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি অপকার হয় ইহা দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি। শীতের দিনে কোন কোন আবদ্ধ গৃহে অগ্ন্যুৎপাদিত হয়—যাহারা বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ভাল অবগত নন, অথচ এরূপ নির্ব্বোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের অনেক সময় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু সংঘটিত হয়। গ্যাসটি অত্যন্ত ভারী বিধায় মৃত্যুর আশঙ্কা আরও তীব্র হইয়া ওঠে। সাধারণতঃ নিম্নভূমিতে ইহা জমা হয়, কতকটা জলের মত স্বভাব। গুরুত্বটা এত বেশী হওয়াতে—ইহা অনেক সময় পুরাতন কূপ, গর্ত্ত, উপত্যকা প্রভৃতি নিম্নস্থানে অবস্থান করে। জাভাতে একটি উপত্যকা আছে সেখানে বার মাস এ গ্যাসটির রাজত্ব। বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু উক্ত স্থানটির মোহে পড়িয়া অহরহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্থানটি পশুপক্ষীর অস্থিকঙ্কালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম-আমেরিকাতেও এরূপ একটি মৃত্যুর দ্বার আছে—মৃত জন্তু সেখানেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

আগ্নেয়গিরিপ্রধান দেশে অনেক সময় এত গ্যাস উত্থিত হয় যে, সময় সময় উহারা গিয়া নিকটবর্ত্তী দালান কুঠরীতে অবস্থান করে, বিশেষত —যে সমস্ত স্থানে হাওয়ার অভাব সে সমস্ত স্থানে ইহার আস্তানা হয়। এ সমস্ত কারণে যাহারা অনুসন্ধান না করিয়া হঠাৎ কোন পতিত কূপ বা অন্ধ কুঠরীতে প্রবেশ করে তাহাদের জীবন লইয়া প্রায়শঃই টানাটানি হয়। কয়লার খনি বিস্ফোরণে অনেক সময় এ গ্যাসটি তৈয়ারী হয় এবং কর্ম্মীদের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। ইটালীতে নেপল্‌স্ নগরীর নিকটে একটি বিখ্যাত গর্ত্ত আছে সেখানের নিম্নভাগ দুই-তিন ফিট্ পর্য্যন্ত সদাসর্ব্বদা উক্ত গ্যাস দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে—তিন ফিটের উচ্চ যে-কোন জীব নির্ব্বিবাদে উহার উপর দিয়া চলিয়া যায় কিন্তু কুকুর, বিড়াল-জাতীয় ক্ষুদ্র জীব সেখানে প্রবেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই গ্যাসটি জলে দ্রবণীয়। চূণের সহিত মিশিয়া ইহা চক্ বা মার্ব্বল পাথরে পরিণত হয়। চক্ জলে দ্রবণীয় নয়, এজন্য চূণের জলে এক প্রকার সাদা সাদা সর ভাসিতে থাকে। এরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। চক বা মার্ব্বল পাথর অঙ্গারায়জান জলে দ্রবণীয়—আবার এই দ্রবীভূত চকজল যদি উত্তপ্ত হয় অথবা উড়িবার অবসর পায় তবে পূর্ব্ব চক ফিরিয়া পাওয়া যায়। পৃথিবীর বক্ষে এই সামান্য রাসায়নিক চতুরতায় বিরাট কাণ্ড সাধিত হয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর বহুস্থানে একমাত্র চক বা মার্ব্বল তৈয়ারী পাহাড় বর্ত্তমান। এই সমস্ত পাহাড় যখন অঙ্গারায়জানযুক্ত জলদ্বারা ধৌত হয় তখন স্বভাবতই উহারা দ্রবীভূত হয়, ফলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় পলে পলে অদৃশ্য হইতে দেখা যায় এবং পরিণামে সেই ধৌত জল হইতে এক বিশাল পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করে অথবা প্রকৃতির মেজাজ মত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি আমাদের লোকলোচনের সম্মুখে উদ্ভূত হয়। যাঁহারা বড় রাসায়নিক তাঁহারা রাসায়নিক পদ্ধতির দ্বারা প্রকৃতির বুকে কত খেলাই খেলিয়া থাকেন। রসায়নই পর্ব্বতের মধ্যে গুহার সৃষ্টি করে, আবার সময়ে তাহা পরিপূর্ণ করে, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এজন্যই কুলকুল তানে পাথর ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, মানুষ বিস্ময়-বিহ্বলে চাহিয়া থাকে। একটি সামান্য গ্যাস দ্বারা বিরাট পুরুষের কত খেয়ালই চরিতার্থ হয়—গিরি গুহায়, নদী প্রান্তরে তিনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ছবি অঙ্কিত করেন, মানুষ তাহা পূজা করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়।



প্রাচীন ভারতীয় সৌধশিল্প

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি

প্রাচীন ভারতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ পদ্ধতি লোকের বিশেষরূপ জানা ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সূত্রধর, গৃহ-নির্ম্মাতা, ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত কারুকার্য্যে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীর অভাব ছিল না। ইহা ব্যতীত গৃহ-চিত্রকরও ছিল। কোন একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে তাহারা কাষ্ঠ ও প্রস্তর ব্যবহার করিত। গৃহে প্রবেশের জন্য এবং পুষ্করিণীতে নামিবার জন্য তাহারা সোপান তৈয়ারী করিত। গৃহ সকল চিত্র দ্বারা সুশোভিত হইত।

অট্টালিকাদির বিবরণ

অট্টালিকাগুলি বিশাল ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হইত। ইহাদের সম্মুখভাগ ইষ্টক, প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত। ইষ্টক, প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত সোপান ছিল। সোপানের পার্শ্বে রেল ও রেলের অবলম্বন স্বরূপ স্তম্ভ থাকিত। প্রাচীরের নিম্নভাগ ইষ্টক নির্ম্মিত এবং চিত্রের দ্বারা সুশোভিত। রন্ধনগৃহে ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য নল ব্যবহার করা হইত। গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য উত্তম ইষ্টক ব্যবহৃত হইত। অট্টালিকা নির্ম্মাণের দ্রব্যসকল ব্যবহারের পূর্ব্বে একটী পাত্রে জল দিয়া রাখা হইত। অট্টালিকার মেজে সাধারণতঃ ইষ্টক, প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত। জল বাহির হইবার জন্য নর্দ্দমা ছিল। স্নান ঘর প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত ছিল। স্নান ঘরের সন্নিকটে সজ্জাগৃহ ছিল। কক্ষগুলির আকার পাল্কীর মত। গৃহের ভিতরে ও বাহিরে বারান্দা, আবৃত ছাদ, খোলা বারান্দা, প্রার্থনা গৃহ ও জলঘর ছিল। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র কক্ষ, ভাণ্ডার, ভোজন কক্ষ, পাইখানা ও অগ্নি জ্বালিবার জন্য পৃথক ঘর ছিল। অট্টালিকা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে নির্ম্মাণের ব্যয় নির্দ্ধারণ করা হইত।

এই কয় প্রকারের বাসগৃহ সাধারণতঃ নির্ম্মিত হইত :—(১) ভিক্ষুদিগের জন্য গৃহ, (২) বিশ্রাম-গৃহ, (৩) প্রবেশ-দ্বারের উপর ভাণ্ডার গৃহ, (৪) খাদ্য পরিবেশন গৃহ, (৫) বড় বড় গৃহ যাহার মধ্যে অগ্নি রাখিবার স্থান আছে, (৬) বিহারের বাহিরে দ্রব্য ভাণ্ডার, (৭) ভিতরের কক্ষ, (৮) আচ্ছাদিত ভ্রমণ স্থান, (৯) ব্যায়াম ঘর, (১০) কূপ, (১১) কূপের আচ্ছাদন, (১২) স্নানঘর, (১৩) স্নান ঘরের সংলগ্ন ঘর, (১৪) বৃহৎ মণ্ডপ, (১৫) গরুড়ের ন্যায় আকার বিশিষ্ট ঘর, (১৬) উচ্চ ভিত্তির উপর নির্ম্মিত প্রাসাদ, (১৭) খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার, (১৮) সন্থাগার (motehall,



ইন্দ্রশাল গুহা

সভাগৃহ), (১৯) প্রমোদকুঞ্জ, (২০) গুহা, (২১) ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত পর্ব্বতগুহা, (২২) চূড়ার মত ছাদযুক্ত এক প্রকার অট্টালিকা, (২৩) উঠান এবং (২৪) সম্মিলন-স্থান।

সাধারণতঃ গৃহগুলি সুবৃহৎ ও উচ্চ। রাজোদ্যান,

চিত্রাগার, প্রমোদকুঞ্জ এবং উদ্যানস্থ পুষ্করিণী তৈয়ারী করা হইত। ব্যবহারোপযোগী ঘৃত ও তৈল সঞ্চিত রাখিবার জন্য প্রাসাদে ভাণ্ডার গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। বড় বড় সহর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত এবং উহাদের প্রবেশদ্বার ও নির্গম-দ্বার ছিল। সহরের দ্বার হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা ছিল। অট্টালিকা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বাস্তুভূমি নির্ব্বাচন করা হইত, নক্সা করা হইত, পরে বাস্তুভূমি পরিষ্কার করা হইত এবং এই প্রকারে অনেক বাসভূমি নির্ম্মিত হইত, যথা—পুষ্করিণী, ভ্রমণ করিবার স্থান, রাত্রিকালে আশ্রয় স্থান এবং দিবসে থাকিবার স্থান ইত্যাদি। বুদ্ধের বাসের জন্য চারিটী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, যথা—(১) করেরি কুটির (নিকটস্থ ছায়াপ্রদ করেরি অথবা বরুণ বৃক্ষের নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি), (২) কোশম্ব কুটির (কোশম্ব বৃক্ষ হইতে এই নামের উৎপত্তি), (৩) গন্ধকুটির ও (৪) সলল ঘর। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর করেরি কুটির স্থাপিত হইয়াছিল এবং করেরি মণ্ডলমালা নামে একটা বসিবার ঘর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণে বহু অর্থব্যয় হইত। প্রাচীন ভারতে পূর্ব্বারাম নামে একটা প্রসিদ্ধ বিহার তৈয়ারী করা হইয়াছিল। ইহা কাষ্ঠ ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার এক তালায় ও দোতালায়, প্রত্যেক তালায় পাঁচশত ঘর ছিল। নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বৃক্ষ কাটিবার জন্য ও জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য বহুলোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ সহরকে তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইত, মধ্য, বাহির এবং সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরের অংশ। প্রাসাদ ও আদালত মধ্যভাগে তৈয়ারি করা হইত। রাস্তা-ঘাটের সুব্যবস্থা থাকায় নগর-রক্ষকের কর্ত্তব্যের কোনরূপ ত্রুটি হইত না। রাজকর্ম্মচারীদের বাসস্থান, ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাধারণ লোকের বাসভবন, বাজার এবং গণিকাদের বাসের জন্য পৃথক পৃথক স্থানের ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন সহর

'প্রাচীন কালে একটী বড় সহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত, অন্তর্নগর ও বহির্নগর। বহির্নগরের চারিটী দ্বারে লোকের বাস ছিল।' প্রাচীন রাজগৃহ নগরের ৩২টী বড় দ্বার ও ৬৪টী ছোট দ্বার ছিল; তন্মধ্যে চারিটী প্রধান দ্বার। রাজগৃহের জনৈক গৃহস্থের একটি সপ্ততল বাসগৃহ ছিল; তাহাতে ছোট ও বড় দ্বার ছিল। পাটলগ্রামের ন্যায় বড় সহরের মধ্যে বড় বড় অট্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকাগুলির একাংশ দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য এবং অপরাংশ বাসের জন্য ব্যবহৃত হইত।

সুপ্রসিদ্ধ জেতবনারাম ৫৪ কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখেন। তিনি এই বিহারের একটি বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা শ্রাবস্তী নগরীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। ইহার প্রধান প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী কক্ষ ছিল। তাহার সম্মুখে দুইটী প্রস্তরের স্তম্ভ; বাম পার্শ্বস্থ স্তম্ভের উপরে একটী চক্র এবং দক্ষিণ পার্শ্বস্থ স্তম্ভের উপরে একটী বৃষমূর্ত্তি ছিল। বিহারের চতুর্দ্দিকে মনোহর উদ্যান ও সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। চন্দনকাষ্ঠখোদিত একটী প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল। এই বিহারের প্রধান হর্ম্ম্যটী সপ্ততল। ইহা অকস্মাৎ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়।

বৌদ্ধ বিহার

প্রাচীন অট্টালিকার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ চৈত্য। চৈত্য বলিতে সভাগৃহ বুঝায় (যেমন নাসিক, ভাজা, কার্লি ও অন্যান্য স্থানে আছে)। এই গৃহগুলি পর্ব্বত-খোদিত গুহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার শেষভাগে একটী ছোট স্তূপ এবং স্তূপের সম্মুখে উপাসকগণের সম্মিলন-গৃহ অবস্থিত। বিহারগুলি বাসগৃহের মত; কিন্তু স্তূপগুলি অর্দ্ধগোলাকার গুম্বজের মত; বৃজি জাতিরা চৈত্যকে বিহাররূপে ব্যবহার করিত। বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর চৈত্য নির্ম্মাণ করা হইত। প্রাচীন ভারতে এমন অনেক সুবৃহৎ চৈত্য ছিল যাহার মধ্যে পাঁচ শত লোকের স্থান হইত। চৈত্য নানা প্রকারের, যথা দেহাবশেষের জন্য চৈত্য, স্মৃতি-রক্ষার জন্য চৈত্য এবং ব্যবহার অথবা ব্যবহারজনিত ক্ষয়ের জন্য চৈত্য। চৈত্য ও স্তূপের প্রাঙ্গণের সিঁড়িগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। প্রকৃতপক্ষে চৈত্যগুলি মন্দির অথবা উপাসনাগৃহ অথবা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য ইহাদের চারিদিকে পথ ছিল। চৈত্যগুলি প্রস্তর অথবা ইষ্টক নির্ম্মিত। স্তূপের ভিত্তি গোলাকার কিংবা সমকোণী। পাসানক চৈত্য ও

সুপ্রতিষ্ঠ চৈত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাসানক চৈত্য দেবস্থান অথবা ধর্ম্মমন্দির। এখানে বৌদ্ধেরা সমাধিলাভের জন্য নির্জ্জনে বাস করিত। বহুপুত্তক চৈত্য ও মণিমালক চৈত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তপর্ণি গুহা প্রাচীন ভারতের গুহাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সপ্তপর্ণি লতা হইতে এই নামের উৎপত্তি। ফাহিয়ান এবং হুয়েনসাঙ এই গুহাটী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। নানা বৃক্ষ ও পুষ্প শোভিত একটী পর্ব্বতে ইহা অবস্থিত। ইহা একটী প্রাকৃতিক গুহা। ইহা ব্যতীত পিপ্পলি গুহা নামে আর একটী গুহা আছে। মহাকাশ্যপ এই স্থানে নির্জ্জনে বাস করিয়াছিলেন। পিপ্পলি বৃক্ষের নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ইহাও একটী প্রাকৃতিক গুহা।

সুন্দর অরণ্য

সুরম্য বনের মধ্যে বেলুবন ও জীবক-অম্বরন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মগধের সুপ্রসিদ্ধ রাজবৈদ্য জীবক শেষোক্ত বনকে বিহারে পরিণত করিয়া বুদ্ধ ও সঙ্ঘকে দান করেন। মগধের রাজা বিম্বিসারের রাজোদ্যান ছিল লট্ঠিবন। প্রাচীন কালে ভিক্ষুদিগের জন্য ছোট ছোট কুটির নির্ম্মিত হইত এবং উহাদিগকে বিহার বলা হইত। রাজগৃহের সোনভাণ্ডার গুহা ও ইন্দসাল গুহা (ইন্দ্রশাল) সমধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমটী দ্বিতল; অপরটী প্রাচীরবেষ্টিত, দরজা জানালা সংযুক্ত এবং ফুলের কারুকার্য্যমণ্ডিত। রাজগৃহের বৈভার পর্ব্বতের উত্তর সানুদেশে একটী বৃহৎ সর্পবৎ গুহা ছিল।

মহোসধের ভূগর্ভস্থ প্রাসাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভূমি সমতল করা হইত, স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইত এবং স্থানটী মাপকাটির দ্বারা চিহ্নিত হইত। বৃহৎ কক্ষ নির্ম্মাণের জন্য নক্সা করা হইয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি ভাগ ছিল এবং এই সকল ভাগে সাধারণ আগন্তুক, নিরাশ্রয় লোক, নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক, আগন্তুক বৌদ্ধ পুরোহিত ও বৈদেশিক বণিকদের মালপত্র রাখা হইত। এই সকল কক্ষের বহির্দ্দিকে দ্বার ছিল। খেলাধূলা করিবার জন্য একটী সাধারণ কক্ষ ও ধর্ম্ম-সম্মিলনের জন্য একটী বৃহৎ কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে চিত্রের দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। পুষ্করিণী খনন করিবার পূর্ব্বে সৌধশিল্পী আসিয়া মৃত্তিকা পরীক্ষা করিত। তারপর একশত স্নান করিবার ঘাট ও বহু বাঁকযুক্ত পুষ্করিণী খনন করা হইত।

চিত্রশালা

সেকালে চিত্রাগার ছিল। চিত্রাগারস্থিত মূর্ত্তিগুলিতে পুষ্পমাল্য, লতাপাতা, সূক্ষ্ম ফিতা এবং যক্ষের দাঁতের কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হইত। বড় বড় অট্টালিকায় বৈঠকখানা, আপিস ঘর, খাইবার ঘর, কোষাগার ও খাদ্যভাণ্ডার ছিল। উচ্চ ভিত্তির উপর গরম বায়ু পরিপূর্ণ স্নানঘর নির্ম্মিত হইত। সম্মুখভাগ ইষ্টক অথবা পাথর দ্বারা



সপ্তপর্ণী গুহা

বাঁধান ছিল। বারান্দার চারিদিকে রেল এবং স্নানঘর পর্য্যন্ত পাথরের সিঁড়ি ছিল। ছাদ ও প্রাচীর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। তাহার উপর চর্ম্ম দিয়া ঢাকা এবং তদুপরি চূণ বালির আভরণ। প্রাচীরের নিম্নভাগ ইষ্টক দিয়া বাঁধান। একটী ভিতরের ঘর, একটী গরম ঘর এবং স্নানের জন্য একটী জলাশয় ছিল। গরম গৃহের মধ্যভাগে উনানের চারিদিকে বসিবার স্থান ছিল এবং ঘাম বাহির করিবার জন্য দেহের উপর গরম জল ঢালা হইত।

পদ্ম পুষ্করিণী

প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে চারি প্রকার টালি দিয়া পদ্মপুকুর নির্ম্মিত হইত। টালির রঙ সোনার মত, রূপার মত, ফিরোজার মত এবং স্ফটিকের মত। পদ্মপুকুর পর্য্যন্ত চারি প্রকারের চারিটী সোপান ছিল। সোনালী রঙের সোপানের সোনালী রঙের স্তম্ভ ছিল। সেইরূপ রূপালী রঙের সোপানে, ফিরোজা রঙের সোপানে ও স্ফটিক রঙের সোপানে কারুকার্য্য ছিল। পদ্মপুকুরের চারিদিকে স্বর্ণ রেল দেওয়া থাকিত। দরিদ্রকে ভিক্ষা দিবার জন্য সহরের দ্বারে অনাথাশ্রম নির্ম্মিত হইত।

হরপ্পা ও মহেন্‌জোদারোর এবং ভারহুত ও সাঞ্চির ভাস্কর্য্যে প্রাচীন সৌধ-শিল্পের বিশেষ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে অট্টালিকাগুলি কিরূপ ছিল এবং সেগুলি কি ভাবে নির্ম্মিত হইত তাহা আমরা উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারি। ভারতীয় হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ পদ্ধতি খুব সুন্দর ছিল। স্বাস্থ্য ও স্থপতিবিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত।

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মধ্যম গ্রামে 'নি' স্বরকে আরোহের শেষ সীমা বলা হইয়াছে—তাহার পরে আর স্বর নাই বলিয়া। আর ষড়জ গ্রামে পঞ্চমের পরে ধৈবত ও নিষাদ—এই দুইটি স্বর থাকিলেও পঞ্চম স্বরকে আরোহের শেষ সীমা বলা হইল; তাহার কারণ তাহার পরে আরোহ করিতে গেলে গীতি রক্তিহীন বা শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। দুই গ্রামে এই নির্দ্দিষ্ট সীমার পূর্ব্ববর্ত্তী যে-কোনও অন্য স্বরকে আরোহের চরমসীমায় পরিণত করা গায়কের স্বেচ্ছাচার-ঘটিত, বিধিসম্মত নহে। অনেক সময়ে গায়ক শক্তির অভাবে অথবা নিজ খেয়ালে অস্থানে আরোহ সমাপ্ত করিয়া থাকেন, ইহা সঙ্গত নহে।

তার স্থানে আরোহের এই চারিস্বর পর্য্যন্ত আরোহের ব্যবস্থায় গীতির লক্ষণ অনুসারে কোন স্বর লুপ্ত থাকিলেও তাহা চারি স্বর বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু 'নন্দয়ন্তী' জাতিতে তার-আরোহে উক্ত নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়। নন্দয়ন্তী একটি মধ্যম গ্রামীয় জাতি, এই জাতিতে পূর্ব্ব নিয়মে তার মধ্যম ধরিয়া চারি স্বর (ম প ধ নি) পর্য্যন্ত আরোহের রীতি থাকিলেও পাঁচ স্বর (ম প ধ নি স) পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে হয়।

মন্দ্রস্থানে অবরোহণের ব্যবস্থা

মন্দ্রস্থানে অবরোহণের তিনটি সীমা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মধ্যস্থানের অংশস্বর (গ্রামভেদে ষড়জ বা মধ্যম) হইতে মন্দ্রস্থানস্থিত অংশস্বর (ষড়জ বা মধ্যম) পর্য্যন্ত অবরোহণ করিতে হইবে, ইহা একশ্রেণীর অভিমত। অপর একশ্রেণীর মত মধ্যস্থানের অংশস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দ্রস্থানের ন্যাসস্বর পর্য্যন্ত অবরোহণ করিতে হইবে। এখানে ন্যাসস্বর শব্দের অর্থ—গীতি-সমাপ্তিকারী স্বর নহে, গ্রামের শেষ স্বর। ষড়জ গ্রামের শেষ স্বর মন্দ্র গান্ধার, আর মধ্যম গ্রামের শেষ স্বর মন্দ্র নিষাদ। তৃতীয় এক শ্রেণীর মত—ষড়জ গ্রামে মন্দ্র ঋষভ পর্য্যন্ত, মধ্যম গ্রামে মন্দ্র ধৈবত পর্য্যন্ত অবরোহণ করিবে। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার মতই গ্রহণ করা যাইতে পারে। মন্দ্র স্বরে অবরোহণের চরম সীমা হইবে উহারই যে-কোন একটি। পূর্ব্বোক্ত তার স্থানে আরোহের ব্যবস্থার ন্যায় মন্দ্রস্থানে অবরোহণের এই নিয়ম লঙ্ঘন করাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং স্বেচ্ছাচার মাত্র।

ন্যাসস্বর

গীত-সমাপ্তিকারী স্বরকেই সাধারণত ন্যাসস্বর বলে। পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার (শুদ্ধ জাতি ৭ + বিকৃত জাতি ১১ = ১৮) জাতিতে ন্যাসস্বর একবিংশতি প্রকার। যথা—ষড়জী প্রভৃতি সাতটি শুদ্ধ জাতির নামকারী স্বরই ন্যাসস্বর হইয়া থাকে। ষড়জ মধ্যমা জাতিতে নামকারী দুইটি স্বর

(ষড়জ ও মধ্যম) ন্যাসস্বর হয়। তিনটি উদীচ্যবা (ষড়জোদীচ্যবা, গান্ধারোদীচ্যবা ও মধ্যমোদীচ্যবা) জাতির ন্যাসস্বর মধ্যম। কৈশিকী জাতির ন্যাসস্বর নিষাদ, পঞ্চম ও গান্ধার। কার্মারবী জাতির ন্যাসস্বর পঞ্চম। অবশিষ্ট পাঁচটি (রক্তগান্ধারী, আন্ধ্রী, গান্ধারপঞ্চমী, নন্দয়ন্তী ও ষড়জ কৈশিকী) জাতির ন্যাসস্বর গান্ধার।

অপন্যাসস্বর

আদি বিদারী ব্যতীত (আদি বিদারী সমাপ্তিকারী স্বর সম্বন্ধে পরে বলা হইবে) অন্যবিদারী বা গীতখণ্ডের সমাপ্তিকারী স্বরকে অপন্যাসস্বর বলা হয়। কার্মারবী, নৈষাদী, আন্ধ্রী, মধ্যমা, ও আর্ষভী জাতির ন্যাসস্বরসমূহই অপন্যাসস্বর নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটি উদীচ্যবার অপন্যাসস্বর ষড়জ ও ধৈবত। রক্তগান্ধারীর অপন্যাসস্বর মধ্যম। গান্ধারীর অপন্যাসস্বর ষড়জ ও পঞ্চম। ষড়জ কৈশিকীর অপন্যাসস্বর ষড়জ, নিষাদ ও পঞ্চম। পঞ্চমী জাতির অপন্যাসস্বর নিষাদ, ঋষভ ও পঞ্চম। গান্ধার পঞ্চমীর ঋষভ ও পঞ্চম। ষড়জীজাতির গান্ধার ও পঞ্চম। ধৈবতী জাতির অপন্যাস ঋষভ, ধৈবত ও মধ্যম। নন্দয়ন্তী জাতির মধ্যম ও পঞ্চম। কৈশিকীজাতির অপন্যাসস্বর ঋষভ ভিন্ন অপর ছয়টি স্বর। ষড়জ মধ্যমা জাতির সাতটি স্বরই অপন্যাস হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন—কৈশিকী জাতিতে সাতটি স্বরই অপন্যাসস্বর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে স্বরগুলি অংশস্বর হইয়াও অপন্যাসস্বর রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৯, তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার অপন্যাসস্বর ৩৭ প্রকার। এইরূপে অপন্যাসস্বর মোট (১৯+৩৭ = ৫৬) ছাপ্পান্ন প্রকার। যাঁহারা কৈশিকী জাতির (পূর্ব্বোক্ত ছয়টির স্থলে) সাতটি অপন্যাসস্বর বলেন, তাঁহাদের মতে অপন্যাসস্বর সর্ব্বশুদ্ধ সাতান্নটি।

সন্ন্যাস ও বিন্যাস স্বর

অংশস্বরের বিবাদীস্বর না হইয়া যে স্বর গীতের আদি বিদারীর সমাপ্তিকারী হয়, তাহার নাম সন্ন্যাসস্বর। আর অংশস্বরের বিবাদী না হইয়া যে স্বর বিদারীর ভাগরূপ এক একটি পদের প্রান্তে অবস্থিত থাকে, তাহাকে বিন্যাসস্বর বলে।

বহুত্ব

স্বরের বহুত্ব দুই প্রকার—(১) অলঙ্ঘনজনিত বহুত্ব, (২) অভ্যাস জনিত বহুত্ব। লঙ্ঘন শব্দের অর্থ ঈষৎস্পর্শ। গায়ক বা বাদক স্থান-বিবেচনায় কোন কোন স্বরকে মৃদুস্পর্শে ঈষৎ অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। ইহাকেই বলে—লঙ্ঘন। এইরূপ লঙ্ঘনের অভাবহেতু স্বরের সম্পূর্ণ প্রকাশই হইতেছে অলঙ্ঘনজনিত বহুত্ব। আর বিচ্ছিন্ন ভাবে বা ধারাবাহিকভাবে একটি স্বরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে বলে অভ্যাসজনিত বহুত্ব। এই দুই প্রকার বহুত্বই পর্য্যায়াংশ (বাদীস্বরূপ অংশ ভিন্ন অন্য অংশ) স্বরে এবং বাদী ও সংবাদীস্বরে প্রয়োগ করিতে হয়।

অল্পত্ব

পূর্ব্বোক্ত বহুত্বের বিপরীত অবস্থাকেই অল্পত্ব বলে। অনভ্যাস ও লঙ্ঘন রূপে এই অল্পত্বও দুইপ্রকার। অনভ্যাস পূর্ব্বোক্ত বাদী ও পর্য্যায়াংশস্বর ভিন্ন অপরস্বরে ব্যবহৃত হয়। প্রায়শ লোপ্য বা বর্জ্জনীয় স্বরেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর লঙ্ঘন বা ঈষৎ স্পর্শ সাধারণত লোপ্যস্বরেই ব্যবহৃত হয়। গীতি-বিশারদ আচার্য্যগণ কোন কোন ক্ষেত্রে অংশস্বর ভিন্ন অন্যস্বরেও লঙ্ঘন প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অন্তরমার্গ

পূর্ব্বে যে দুইপ্রকার অল্পত্বের বিষয় বলা হইয়াছে, ঐরূপ অল্পত্বযুক্ত স্বরসমূহের অংশ, গ্রহন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতি স্বরের সহিত যে তান বৈচিত্র্যকর সঙ্গতি অর্থাৎ আরোহ-অবরোহদ্বারা সংযোগ তাহাকে 'অন্তরমার্গ' বলে। এই অন্তরমার্গ ন্যাসাদি স্বরের নিজ নিজ (গীতির অন্ত্য প্রদেশ প্রভৃতি) স্থানে প্রযোজ্য নহে। ইহা প্রয়োগ করিতে হয় ন্যাস অপন্যাসাদি দুইটি দুইটি স্বরের মধ্যভাগে। এইরূপ সঙ্গতি কোথাও অনভ্যাসে কোথাও বা কেবল লঙ্ঘন বা ঈষৎ স্পর্শ দ্বারা করা হইয়া থাকে। অন্তরমার্গ সাধারণত বিকৃত জাতিতেই প্রযুক্ত হয়। শুদ্ধ জাতিসমূহে অন্তর-মার্গের ব্যবহার কচিৎ পরিলক্ষিত হয়। জাতি বা গীতিটিকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্যই অন্তরমার্গ প্রযুক্ত হয়।

ষাড়ব

যে ছয়টি স্বর শুদ্ধ বা বিকৃত জাতিকে 'অবন' বা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ ছয়টি স্বরকে বলে 'ষড়ব'। সেই 'ষড়ব' বা জাতিপ্রবর্ত্তক ছয়টি স্বর হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, এইরূপ জাতিকে 'ষাড়ব' জাতি বলে।

ঔড়ব

যাহাতে উড়ু বা নক্ষত্রগণের বা অর্থাৎ গতি হয়, এইরূপ আকাশকে 'উড়ুব' বলে। এই উড়ুব বা আকাশ পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহের মধ্যে পঞ্চম ভূত; পঞ্চম সংখ্যার উদ্ভব এই আকাশ হইতেই হইয়াছে। উড়ুবের পঞ্চসংখ্যা যে স্বরসমূহের আছে সেইরূপ পাঁচটি স্বরকে উড়ুব স্বর বলে। উড়ুব বা পাঁচস্বর হইতে যাহা উৎপন্ন, এইরূপ জাতি বা গীতকে উড়ুব জাতি বা গীত বলে। বিশেষ বক্তব্য —ষাড়বকারী ও উড়ুবকারী স্বর সম্পূর্ণ অবস্থায় যথাক্রমে অল্প ও অল্পতর ভাবে প্রয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ যে একটি স্বরের লোপে জাতি ষাড়ব হয়, তাহাকে ষাড়বকারী স্বর বলে। আর যে নির্দ্দিষ্ট দুইটি করিয়া স্বরের বিলোপে জাতিটি উড়ুব হয়, সেইরূপ স্বরযুগলকেই উড়ুবকারী স্বর বলে। সম্পূর্ণ অবস্থায় জাতি বা গীতিতে ষাড়বকারী স্বরের অল্পত্ব বা অনভ্যাস হইয়া থাকে এবং উড়ুবকারী স্বরযুগলের অল্পতরত্ব বা লঙ্ঘন হইয়া থাকে। কিন্তু পঞ্চমী জাতিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। পঞ্চমী জাতিতে সম্পূর্ণ অবস্থায় ষাড়বকারী স্বরেরই অল্পতরত্ব ও উড়ুবকারী স্বরদ্বয়ের অল্পত্ব হইয়া থাকে।

জাতি সম্বন্ধে সকল কথাই বলা হইল। অতঃপর আমরা প্রত্যেকটি জাতির বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সে বিস্তৃত আলোচনার পূর্ব্বে একটি বিষয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

সঙ্গীতরত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার কল্লিনাথ গান্ধর্ব্বগীতের উদাহরণ প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—স্বরগতরাগবিবেকয়োর্জাত্যাদ্যন্তর ভাষান্তং যদুক্তম্ তদ্ গান্ধর্ব্বমিত্যর্থঃ। অর্থাৎ সঙ্গীতরত্নাকরের স্বরাধ্যায় ও রাগবিবেকাধ্যায়ে জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরভাষা পর্য্যন্ত গীতগুলি গান্ধর্ব্ব গীতের অন্তর্গত। এই গীত বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়। রত্নাকর বলেন—

অনাদি সম্প্রদায়ং যৎ গন্ধর্ব্বৈঃ সম্প্রযুজ্যতে।
নিয়তং শ্রেয়সো হেতু স্তদ্ গান্ধর্ব্বং বিদুর্বুধাঃ॥

যে গীত গন্ধর্ব্বগণ প্রয়োগ করেন, যাহা অনাদি গুরুপরম্পরা ক্রমে প্রচলিত রহিয়াছে, যাহা শ্রেয়োলাভের নিশ্চিন্ত হেতুস্বরূপ, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব গীত বলে। এই শ্লোকের 'অনাদি সম্প্রদায়ম্' পদের ব্যাখ্যায় কল্লিনাথ বলিয়াছেন - "অনাদি সম্প্রদায়মিত্যনেন গান্ধর্ব্বস্য বেদবদপৌরুষেয়ত্বমিতি সূচিতম্।" অর্থাৎ অনাদি সম্প্রদায় বলায় সূচিত হইয়াছে— গান্ধর্ব্ব গীত বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়। বেদের শব্দরাশি যেমন অপরিবর্ত্তনীয় বর্ণপরম্পরায় চির-প্রচলিত রহিয়াছে, সেইরূপ যে সঙ্গীতপদ্ধতি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে প্রচলিত তাহাই গান্ধর্ব্ব গীত। আমাদের আলোচ্য জাতিসমূহ এই গান্ধর্ব্বগীতেরই অন্তর্গত।

প্রত্যেক জাতির লক্ষণ

ষাড়জী জাতি। ষাড়জী জাতিতে নিষাদ ঋষভ ভিন্ন অপর পাঁচটি স্বরই অংশস্বর হইয়া থাকে। এই জাতি নিষাদ-লোপে ষাড়ব হয়। সম্পূর্ণ অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে নিষাদ কাকলি-নিষাদ রূপে পরিণত হয়। একান্তরিত গান্ধার স্বর ও অবরোহক্রমে একান্তরিত ধৈবত স্বরের সহিত ষড়জ স্বরের (সগ সগ সধ গস গস ধস এইরূপ) সঙ্গতি। গান্ধার অংশ স্বর হইলে (তাহার সংবাদি স্বর বলিয়া) নিষাদ স্বরের লোপ হয় না। এই জাতির মূর্চ্ছনা ধৈবতাদি-উত্তরায়তা, মধ্যমগ্রামের ধৈবতাদি গৌরবী মূর্চ্ছনা নহে। এক-কল দ্বিকল চতুষ্কল নামক তিন প্রকার পঞ্চপাণি তাল। যেখানে এককল পঞ্চপাণি তাল, তথায় চিত্রমার্গ মাগধী গীতি। দ্বিকাল পঞ্চপাণি তালস্থলে বৃত্তি মার্গ সম্ভাবিতা গীতি। চতুষ্কল পঞ্চপাণি তাল হইলে দক্ষিণমার্গ পৃথুলা গীতি। নাটকাদির প্রথম অঙ্ক নৈষ্ক্রামিক ধ্রুবায় এই জাতির ব্যবহার হইয়া থাকে।

উপরিলিখিত ষাড়জী জাতির লক্ষণে তালমার্গ গীতি এবং ধ্রুবার নামগুলি ও তাহার স্বরূপ পাঠকবর্গের অপরিচিত সুতরাং নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

তাল যাহাতে নৃত্য গীত ও বাদ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এইরূপ কালকেই তাল বলে। মার্গ ও দেশী নামে তাল দুই প্রকার। এই কালাত্মক তাল নিঃশব্দ ও সশব্দ ক্রিয়া দ্বারা পরিমিত হইয়া গীত বাদ্য ও নৃত্যকে নিয়মিত করিয়া থাকে। নিঃশব্দ ক্রিয়াকে কলা বলে। ইহা চারি প্রকার, যথা—আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক।

আবাপ—দক্ষিণ হস্ত উত্তান বা চিৎ করিয়া তাহার অঙ্গুলি কুঞ্চিত করিলে তাহাকে 'আবাপ' বলে।

নিষ্ক্রাম—অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত করিয়া হস্তটি অধোমুখ করাকে নিষ্ক্রাম বলে।

বিক্ষেপ—অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত করিয়া উত্তান হস্তটির দক্ষিণ পার্শ্ব কিঞ্চিৎ নিম্নাভিমুখ করিলে তাহাকে বিক্ষেপ বলে।

প্রবেশক—অধোমুখ হস্তের অঙ্গুলি কুঞ্চনকে প্রবেশক বলে।

সশব্দ ক্রিয়াও চারি প্রকার; যথা—ধ্রুব, শম্পা, তাল ও সন্নিপাত।

ধ্রুব—ছোটিকা বা তুড়ি দিবার পরে হস্ত অধঃপাতন করাকে 'ধ্রুব' বলে।

শম্পা—তুড়ি না দিয়া দক্ষিণ হস্তের ঐ প্রকার অধঃপাতনকে শম্পা বলে।

তাল—ঐরূপে বামহস্তের অধঃপাতনকে তাল বলে।

সন্নিপাত—দক্ষিণ ও বাম দুই হস্তের যুগপৎ পাতনকে সন্নিপাত বলে।

এই আট প্রকার ক্রিয়া দ্বারা পরিমিত কাল নৃত্য গীত ও বাদ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া ইহাকেই তাল বলে। ধ্রুব চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মার্গ অনুসারে নৃত্য গীত ও বাদ্যের পরিমাপক তালও বিভিন্ন রূপে পরিণত হয়।

মার্গ চারি প্রকার; যথা—ধ্রুব, চিত্র, বার্ত্তিক ও দক্ষিণ। তন্মধ্যে ধ্রুব মার্গে কলা (বা ক্রিয়া) একমাত্রা বিশিষ্ট চিত্রমার্গে দুই মাত্রা, বার্ত্তিকে কলা চারি মাত্রা ও দক্ষিণমার্গে কলা আট মাত্রা বিশিষ্ট। পাঁচটি লঘু অক্ষর (যেমন ক চ ট ত প) উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ কাল আবশ্যক, তাহাকেই মার্গ তালে লঘু মাত্রা বলে। ইহার দ্বিগুণ মাত্রাকে গুরু মাত্রা ও ত্রিগুণ মাত্রাকে প্লুত মাত্রা বলে। মার্গ তাল চতুরস্র ও ত্র্যস্র নামে দুই প্রকার। তন্মধ্যে চতুরস্র তালকে 'চঞ্চৎপুট' তাল বলে এবং ত্র্যস্র তালকে 'চাচপুট' তাল; এই দুইটি তালের প্রত্যেকটি আবার যথাক্ষর দ্বিকল চতুষ্কল নামে তিন প্রকার। তন্মধ্যে 'চঞ্চৎপুট' এই নামস্থিত গুরু ও লঘু অক্ষরের সমাবেশে (SSIS') যে তালটি রচিত হয়, তাহাকে যথাক্ষর তাল বলে। SIS' এই চিহ্নগুলি যথাক্রমে গুরু লঘু ও প্লুত মাত্রার দ্যোতক বা পরিচায়ক। চাচপুট তালে নিম্নলিখিত রূপে লঘু মাত্রা সন্নিবেশ করিতে হয়—যথা—"SIS'"। দ্বিকল চঞ্চৎপুটের মাত্রা "SSSSSS" এইরূপ। ইহাই দ্বিগুণ হইলে তাহাকে চতুষ্কল চঞ্চৎপুট ও চতুষ্কল চাচপুট বলে। যথা—চতুষ্কল চঞ্চৎপুট—SSSSSSSSSSSSSSSS। চতুষ্কল চাচপুট—SSSSSSSSSSSS। তাল সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক আলোচনা করিয়া শার্ঙ্গদেব আমাদের আলোচ্য এককল দ্বিকল ও চতুষ্কল পঞ্চপাণি তালের আলোচনা করিয়াছেন।

তন্মধ্যে এককল পঞ্চপাণি তালের মাত্রা—S'ISSIS' এইরূপ। দ্বিকল পঞ্চপাণি তালের মাত্রা—SSSSSSS-SSS এইরূপ। চতুষ্কল পঞ্চপাণি তালের মাত্রা—SSS-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS এইরূপ।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক সঙ্গীত রত্নাকরের তালাধ্যায়ে তাল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করিবেন।



রাশিয়ায় কৃষি যুগান্তর

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

রাশিয়া কৃষিজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। যে দিন হইতে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার বহু পুরাতন কৃষিপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আজ যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতের ন্যায় রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষের জমি যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, রাশিয়ার জমিও সেইরূপ বহু খণ্ডে বিভক্ত। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে হাতে হেতেড়ে চাষ করিয়া রাশিয়ার কৃষক কোনকালেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না, কারণ দেশের অধিকাংশ জমিই ছিল জমিদারদের ও চার্চ্চের অধীনে। এই জমিদারেরা যে কিরূপ বিপুল পরিমাণ জমি ভোগ দখল করিতেন তাহা ট্রট্স্কিকৃত History of the Russian Revolution (রুশ বিপ্লবের ইতিহাস) নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। তিনি ঐ পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপীয় রাশিয়ায় ৭০ মিলিয়ন dessiatius জমি এই সব জমিদারদের অধিকারে ছিল এবং তিনি হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, এই পরিমাণ জমিতে ১০ মিলিয়ন কৃষক-পরিবারের অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারিত। এই সব বড় বড় জমিদার ছাড়াও রাশিয়ায় কুলক নামে ছোট-খাট জমিদারের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। ইহারাই রাশিয়ার কৃষককে শোষণ করিয়াছে এবং ষ্টেট (রাষ্ট্র) এই শোষণ-কার্য্যে সহায়তা করিয়া রাশিয়ার কৃষককে নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছে।

সম্প্রতি রাশিয়ায় এই প্রথার লোপ পাইয়াছে। লেনিনের সময় হইতেই এই সব জমিদারের জমি রাষ্ট্রের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হইয়া জমিহীন মজুর কৃষকদের মধ্যে বিলি হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিপ্লবের নেতা লেনিন রাশিয়ায় সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী রাশিয়ার সমস্ত জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। জমি কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে—জমি যে চাষ করিবে তাহারই এবং রাষ্ট্র হইতে প্রত্যেক পরিবারই পাইবে তাহার জীবনধারণোপযোগী পরিমিত জমি। এই জমি কিন্তু চাষীকেই চাষ করিতে হইবে—অপরকে দিয়া চাষ করাইলে চলিবে না—কারণ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যই হইতেছে ব্যক্তিগত পুঁজিপ্রথার লোপ করা। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাশিয়ার প্রত্যেক কৃষকের আছে পরিমিত জমি এবং রাষ্ট্র হইতে আধুনিক প্রণালীতে ঐ সব জমি চাষ করিবার ব্যবস্থা।

কিন্তু এই ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্র সব স্থলেই করিয়া উঠিতে পারে নাই। নিঃস্ব চাষীরা জমি পাইল বটে, কিন্তু মূলধন ও যন্ত্রপাতির অভাবে কুলকদের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইল, আবার উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ নহে বলিয়া যাহাদের জমি ও মূলধন উভয়ই আছে, তাহাদের আয়ও বিশেষ বাড়িল না। এইজন্য বড় বড় জমিদারী লোপ পাইলেও কুলকের অস্তিত্ব লোপ পাইল না। যাহা হউক এই সব অভাব দূর করিবার জন্য ষ্টালিন একটা নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাহার নেতৃত্বে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুইটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। এই দুইটী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়ার ফলেই রাশিয়ার কৃষিতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ার জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। এইরূপ খণ্ড খণ্ড জমিতে উন্নত প্রণালীতে চাষ করা সম্ভব নহে বলিয়াই রাশিয়ায় যৌথকৃষিপ্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা হইয়াছে। সমস্ত বিচ্ছিন্ন জমিগুলিকে একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য—গ্রাম ও শহরের খাদ্যের পরিমাণে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য—দেশের সমস্ত শস্য আহরণ করিয়া দর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্র একটা বাঁধাধরা নিয়মে এই যৌথকৃষিপদ্ধতি পরিচালনা করিতেছেন। কতকগুলি গ্রাম যদি তাহাদের খণ্ড খণ্ড জমিগুলিকে একত্রীভূত করিয়া রাষ্ট্র পরিচালিত কৃষিপদ্ধতি মানিয়া লইয়া একযোগে কাজ করিতে এবং উৎপাদিত সমস্ত শস্য রাষ্ট্র নির্দ্ধারিত দরে রাষ্ট্রকেই বিক্রয় করিতে রাজী থাকে, তাহা হইলেই কতকগুলি গ্রাম ও গ্রামস্থ জমি লইয়া একটী যৌথ কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া ওঠে। রাশিয়ায় এই কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বলা হয় কোলখোস। কোন কোলখোস যদি আবার রাষ্ট্র নির্দ্ধারিত কোন বিশেষ ফসল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে রোপণ করিয়া উৎপাদিত সমস্ত শস্য পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত দরে বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই সব কোলখোসকে কতকাংশ মূলধন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। এইভাবে কতকগুলি গ্রামকে লইয়া একটী কোলখোস গড়িয়া উঠিলে তথায় একটী ট্র্যাক্টর ষ্টেশন স্থাপিত হয়; এই ষ্টেশন হইতে বড় বড় ট্র্যাক্টর ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ কর্ম্মী সরবরাহ করা হয় এবং গ্রামের লোক রাষ্ট্র পরিচালিত এই ষ্টেশনের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য থাকে। কাজেই কোলখোসের অন্তর্ভুক্ত হইলে কৃষকের জমি বা শস্যের উপর বিশেষ কোন অধিকার থাকে না, সেটা হইয়া ওঠে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। কারণ জমির বিলি-ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র এবং উৎপাদিত শস্য রাষ্ট্রই ক্রয় করিয়া লয়। যাহা হউক এই

কোলখোসগুলি চাষের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার গবেষণা কার্য্য চালায় এবং এইজন্য প্রায় প্রত্যেক কোলখোসের একটী করিয়া গবেষণাগার থাকে—এই গবেষণাগারে কর্ম্মীরা পরীক্ষা করিয়া দেখে—কোন্ বীজে কিরূপ ফসল হয়, কোন্ বীজে কিরূপ ফসলের পরিমাণ বাড়ে, কোন্ সার ভাল, স্থানীয় জমিতে কোন্ নূতন ফসল হইতে পারে কি না এবং গ্রামের যুবকদের উন্নত প্রণালীর কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে। বলা বাহুল্য যে, গ্রাম্য কৃষকরাও এই শিক্ষা হইতে বাদ পড়ে না।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার কৃষকের জমির পরিমাণ ছিল গড়পড়তা ৪-৫ হেক্টর। এখন মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে, রাশিয়ার প্রত্যেক কৃষি পরিবারের জমির পরিমাণ হইতেছে ৮ হেক্টর। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বাংলা দেশের প্রত্যেক কৃষি পরিবারের জমির পরিমাণ হইতেছে পৌণে ৩ একর মাত্র। রাশিয়ার কৃষকের জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে, উপরন্তু উন্নত প্রণালীতে চাষ করার দরুণ অল্প খরচে অল্প পরিশ্রমে শস্য উৎপন্নের হার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এ ছাড়া রাশিয়ার শতকরা ৩৫ জন দরিদ্র চাষী জমির খাজনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। ফলন বাড়ার সম্বন্ধে মাইকেল ফার্বম্যান তাঁহার 'Russia's Five Year Plan' নামক পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, "On the average kolkhos produces about 50 poods or 10 poods more than was produced by individualist holders" অর্থাৎ রাশিয়ার কোলখোসের উৎপন্ন শস্যের গড়পড়তা পরিমাণ হইতেছে হেক্টর প্রতি ৫০ পুড। পূর্ব্বে কৃষকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় যাহা উৎপন্ন হইত, এই উৎপাদন তাহাপেক্ষা ১০ পুড বেশী। এই সব কোলখোসের অন্তর্গত কৃষকের আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে রাশিয়ার কৃষি বিভাগের কমিশনার M. Yakov'ev বলেন—"The income of a seredniak family in a kolkhos is larger than their income last year while the income of a bedniak family is larger than that of a former seredniak family." অর্থাৎ গত বৎসর কোলখোসের অন্তর্গত সেরেড্নিয়াক চাষী পরিবারের আয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী হইয়াছে, অপর পক্ষে বেড্নিয়াক চাষী পরিবার পূর্ব্বেকার সেরেড্নিয়াক চাষী পরিবারের অপেক্ষা আয় বেশী করিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় রাশিয়ার শতকরা ৬১ জন কৃষক এইরূপ যৌথ-কৃষিতে যোগদান করিয়াছে এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৭৭ জনে পরিণত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার পূর্ব্বে যে ১৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি কুলকদের অধীনে ছিল, তাহার মধ্য হইতে ১২ মিলিয়ন হেক্টর জমি যৌথকৃষির অন্তর্গত হইয়াছে—কাজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, রাশিয়ার যৌথকৃষি বেশ ভালভাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষে যে প্রায় সর্ব্বস্থলেই এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাশিয়ায় সমস্ত জমিতেই যাহাতে যৌথকৃষি প্রবর্ত্তিত হয়, তন্নিমিত্ত যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য বিরাট কারখানাসমূহ গড়িয়া উঠিবে। পূর্ব্বে বড় বড় যন্ত্রপাতির দ্বারা চাষ করিবার প্রথা রাশিয়ায় ছিল না বলিয়া এই সব যন্ত্রপাতি রাশিয়াকে আমেরিকা হইতে আমদানি করিতে হইত। এই আমদানি বন্ধ করিবার জন্য ১৯৩১ খৃষ্টাব্দেই ষ্টালিনগ্রাডে ও খারখভে (Khorkhov) ট্র্যাক্টর তৈয়ারীর বৃহৎ কারখানাসমূহ স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় রাশিয়ার কৃষিতে যে ১২৩৯০০টী ট্র্যাক্টর ব্যবহৃত হইয়াছিল তন্মধ্যে রাশিয়ার নির্ম্মিত ট্র্যাক্টরের সংখ্যা ছিল ৯৪৩০০টী কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে রাশিয়ায় আর ট্র্যাক্টর আমদানির প্রয়োজন থাকিবে না বলিয়াই মনে হয়। ট্র্যাক্টর ছাড়াও বহু যন্ত্রপাতি যেমন বীজ বুনিবার, চারা পুঁতিবার, সার দিবার, শস্য কাটিবার, ঝাড়াই মাড়াই করিবার যন্ত্রও রাশিয়ায় তৈয়ারী হইতেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার কৃষিতে শতকরা মাত্র ৯ ভাগ জমিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হইতেছে শতকরা ৮৪ ভাগ জমিতে।

আধুনিক উন্নত প্রণালীর কৃষি শিক্ষা দিবার জন্যও রাশিয়াতে বহু কৃষি কলেজ ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি কলেজে ৫৭,৭০০ জন যুবক ও কৃষি বিদ্যালয়ে ১৯৯৮০০ জন ছাত্র কৃষি শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এ ছাড়া ৫৩০০০ জন শিক্ষিত প্রচারক দ্বারা ৪৫ লক্ষ কৃষককেও উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে কার্পাস চাষে। পূর্ব্বে রাশিয়াকে প্রচুর পরিমাণে তুলা আমদানি করিতে হইত। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনাতেই রাশিয়া যে তুলা উৎপাদন করিয়াছে তাহাতে তাহার তুলার অভাব আর থাকিবে না বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বে রাশিয়ায় মোটেই ঈজিপসীয়ান তুলা উৎপন্ন হইত না, কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষে ৫১ হাজার হেক্টর জমিতে ঈজিপসীয়ান তুলা উৎপন্ন হইয়াছে ও উন্নত প্রণালীর যন্ত্রের প্রথম ব্যবহার ও প্রথম ট্র্যাক্টর ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে এই কার্পাস অঞ্চলেই। এখন শতকরা ৯০ ভাগ তুলার জমিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে এবং আমেরিকাতেও নাকি তুলা উৎপাদনে এত যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় না বলিয়া প্রকাশ। এ ছাড়া একপ্রকার গাছের ছাল হইতে আঁশ বাহির করা হইতেছে যাহা নাকি পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলিবে। এক লক্ষ হেক্টর জমিতে এই গাছের চাষ হইয়াছে এবং ঐ গাছ হইতে যে আঁশ পাওয়া যাইবে তাহার মূল্য নাকি এক কোটী রুবল!

জলসেচন সমস্যাতেও রাশিয়া পিছনে পড়িয়া নাই। ভল্গা নদীর পূর্ব্ব সীমার যে ২ মিলিয়ন হেক্টর শুষ্ক জমি জলাভাবের দরুণ চাষের অযোগ্য হইয়া আছে, সেই সব জমিতে ইউক্রেন প্রদেশস্থ বিশাল প্রান্তর ভূমিতে এবং মধ্য এসিয়া ও ট্রান্সককেসিয়া প্রদেশস্থ ২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সারের অভাব দূর করিবার জন্যও মস্কৌ প্রদেশে বিরাট কারখানাসমূহ প্রস্তুত হইয়াছে এবং সর্ব্বশুদ্ধ ২১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে নূতন চাষ হইয়াছে। এ ছাড়া ৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ৫০০০ হাজারটী রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

কৃষিপ্রসারের এই সব আয়োজন ছাড়াও কৃষকদের নিরক্ষরতা ও

শিক্ষাহীনতা দূর করিবার একটা বিরাট অভিযান রাশিয়াতে সুরু হইয়াছে। কম্যুনিষ্টপার্টির কর্ম্মীরা গ্রামে গিয়া গ্রাম্য কৃষকদের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছে। বেতনভোগী কর্ম্মী ছাড়াও বহু স্বেচ্ছাসেবক অবসর সময়ে এই সব কাযে আত্মনিয়োগ করিতেছে, মোট কথা কৃষককে তাহার অতীতের সংস্কার হইতে টানিয়া তুলিয়া একটা নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য একটা বিরাট উদ্যম একটা বিরাট চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় সমস্ত জমিতেই যৌথকৃষি প্রচলন করিবার বিরাট আয়োজন হইয়াছে এবং এই পরিকল্পনাতে ফসলের চাষ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, কত সংখ্যক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইবে, কত পরিমাণ চাষের জমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, ফসলের উৎপাদনই বা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহার একটা তালিকা দেওয়া যাইতেছে,—

	১৯৩২	১৯৩৭	মন্তব্য
সমস্ত রকম শস্যের উৎপাদন	৬৯·৮৭	১০৪·৮	মিলিয়ন টন হিঃ
সমস্ত রকম জমির পরিমাণ	১৩২,৯৩১	১৩৯·৭৫০	হাজার হেক্টর হিঃ
সমস্ত রকম জমির উৎপাদন বৃদ্ধি	০·৭০	১·০০	শতকরা হিঃ
গৃহপালিত পশু, যেমন অশ্ব গাভী প্রভৃতি	১২৪·০	২২৬·৭	মিলিয়ন হিঃ
অশ্ব পরিচালিত ট্র্যাক্টর	২,০২৫·০০	৮,২২০·০০০টী	
যন্ত্রচালিত কাটারপিলার ট্র্যাক্টর	৫,০০০	১,০০,০০০টী	
ট্র্যাক্টর কাল্টিভেটার	—	৩৫,০০০টী	
ট্র্যাক্টর ষ্টেশন	২৫০০	৬,০০০টী	
যৌথ কৃষির দ্বারা মোট উৎপন্নের হার	৭৪·৭	১০০	শতকরা হিঃ
যৌথকৃষি দ্বারা কর্ষিত মোট জমির পরিমাণ	৭৯·৭	১০০	,,
যৌথকৃষিতে মোট কৃষকের পরিমাণ	৬১·৫	...	,,
যন্ত্রদ্বারা কর্ষিত জমির পরিমাণ	৭২·	১০০	

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হইয়া গিয়াছে—কাজেই আশা করা যাইতে পারে যে, রাশিয়ায় সর্ব্বস্থলেই ও সকল কৃষকের মধ্যেই উন্নত প্রণালীর যৌথকৃষি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা যে রাশিয়ার কৃষক আদর্শ হিসাবে বিনা বাধায় মানিয়া লইয়াছে তাহা নহে। কতকটা অর্থনৈতিক সুবিধার খাতিরে ও কতকটা রাষ্ট্রের চাপে রাশিয়ার কৃষক এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আংশিক ভাবে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। রাশিয়ায় কৃষক যখন দেখিল যে, যৌথকৃষিতে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখনই সে যৌথকৃষিতে যোগদানে সম্মত হইয়াছে; কিন্তু উৎপাদিত শস্যের অধিকার হইতে যখন সে বঞ্চিত হইতে লাগিল, যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্যও সংগৃহীত হইতে লাগিল, তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করা ছাড়া আর তাহার পক্ষে গত্যন্তর রহিল না। সোভিয়েট রাষ্ট্র শহরের প্রলিটেরিয়েট মজুর ও রেড্ আর্ম্মির ফৌজদের জন্য ১৯২৬ ও ২৮ খৃষ্টাব্দে এত বেশী পরিমাণে শস্য সংগ্রহ করিলেন যে, গ্রামে খাদ্যাভাব ত ঘটিলই, উপরন্তু বীজ শস্যেও টান ধরিল। রাশিয়ার কৃষক যখন দেখিল যে জমির শস্যের উপর তাহার কোন অধিকার নাই, খাইবার মত শস্য ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাও তাহার নাই তখন রাশিয়ার সমস্ত কৃষক হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল। রাষ্ট্র তখন বিপদ বুঝিয়া কৃষকদের বাড়তি শস্য রাখার এবং ঐ শস্য ফাঁকা বাজারে বিক্রয় করিবার অধিকারে অনুমতি দিলেন। শুধু ইহাই নহে, যৌথ কৃষিতে যখন দেশের সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল এবং উহা প্রবর্ত্তনের জন্য যখন উপর হইতে কঠোর চাপ আসিতে লাগিল, তখনও রাশিয়ার কৃষক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। প্রত্যুত্তরে সে তাহার চাষের বলদ প্রভৃতি যাবতীয় গৃহপালিত পশু মারিয়া ফেলিতে লাগিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রও বহু ধরপাকড় আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ব্যাপক আন্দোলনের কাছে সামান্য ধরপাকড়ে কোন ফল হইল না—কাজেই উপায় নাই দেখিয়া ষ্টেট্ প্রত্যেক কৃষকের থাকিবার গৃহ, তাহার গৃহপালিত পশু ও গৃহসংলগ্ন সঙ্কীর্ণ কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া মানিয়া লইলেন। রাশিয়ার কৃষকও 'বিপদকালে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' এই নীতি স্মরণ করিয়া উক্ত বিধিই স্বীকার করিয়া লইল। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, কতকটা বাধ্য হইয়া ও কতকটা অর্থনৈতিক সুবিধার খাতিরে সে এই নূতন পদ্ধতি মানিয়া লইয়াছে—তাহার মন হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংস্কার এখনও মুছিয়া যায় নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, রাশিয়ার কৃষকদের মধ্যে মধ্যবিত্ত চাষী (Serdniak) ও দরিদ্র চাষীর (Bedniak) মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুধু কৃষকদের মধ্যেই নহে, এই অসাম্য শ্রমিকদের মধ্যেও দেখা যায়; কারণ রাশিয়ায় প্রলিটেরিয়ান শ্রমিক ও সাধারণ শ্রমিকের বেতন সমান নহে এবং রাশিয়ার দক্ষ শিল্পীরাও (skilled labours) আবার এই প্রলিটেরিয়ান শ্রমিকের অপেক্ষা বেশী বেতন পাইয়া থাকেন। এ ছাড়া খাঁটী commune-এর আদর্শে গঠিত যৌথ কৃষিসংস্থাও রাশিয়ায় উত্তরোত্তর কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ কৃষিসংস্থার পরিমাণ ছিল শতকরা ৫ ভাগ কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া ২ ভাগে পরিণত হইয়াছে বর্ত্তমানের পরিমাণ জানিবার উপায় নাই। কাজেই এই সব হইতে অনুমান করা শক্ত নহে যে, রাশিয়ার সাম্যনীতির পরিবর্ত্তে সামঞ্জস্যমূলক অর্থনীতিই গৃহীত হইতেছে।

কিন্তু একথাও সত্য যে, দশ বৎসরের (১৯২৮-৩৭) চেষ্টার ফলে রাশিয়ার কৃষিজগতে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনি বিস্ময়কর! বহুকালের প্রাচীন কৃষিপদ্ধতি এই দশ বৎসরের চেষ্টার ফলেই ভাঙ্গিয়া চূরিয়া এক নূতন মূর্ত্তি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে! একধারে বিপুল জমির অধিকারী জমিদার ও অন্যদিকে মান্ধাতার আমলের জমিহীন নিরন্ন কৃষক আর রাশিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রাশিয়ার প্রত্যেক কৃষক এখন ভরণপোষণোপযোগী জমির অধিকারী। অন্নের অভাব এখন তাহার দূর হইয়াছে এবং পোষাক পরিচ্ছদেও সে এখন ভদ্র হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি সভ্যজীবনের যাবতীয় উপাদান এখন তাহার আয়ত্তাধীনে! সর্ব্বোপরি একটা বিপুল আত্মচেতনায় রাশিয়ার কৃষক আজ উদ্বুদ্ধ। সে তাহার অতীতের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধ বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনের দাবী লইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। রাজনীতি, ধর্ম্ম, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে সে ভাবিতে শিখিয়াছে এবং উন্নত জীবন যাপন করিবার যে দাবী প্রত্যেকেরই আছে সেই অধিকার সে অর্জ্জন করিয়াছে! সে এখন আর যন্ত্র মাত্র নহে—সেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটী মানব এবং এই মানবতার উদ্বোধন হইয়াছে রাশিয়ার কৃষকের মধ্যে! তাই অন্যান্য দেশের কৃষকের তুলনায় রাশিয়ার কৃষক আজ বহু অগ্রগামী!

ডাকঘর

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

ফ্রান্স

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের প্রায় সকল স্থান হইতেই ছাত্রসমাগম হইত বলিয়া এই সকল ছাত্রদিগের গৃহ হইতে পত্র এবং টাকা বহন করিয়া আনিবার জন্য ফ্রান্স দেশে সর্ব্বপ্রথম ধাবক নিযুক্ত হয়।

রাজকীয় পত্রাদি বহন জন্য ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ এণ্টওয়াপ (নেদারল্যাণ্ড) এবং মিলান (ইটালী)-এর মধ্যস্থিত পথটির উপর কয়েকটি ডাকঘর নির্ম্মাণ করাইয়া এই পথে ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন।

একাদশ লুই তাঁহার রাজত্বকালে ফ্রান্স দেশের প্রায় সকল প্রধান রাস্তাগুলির উপর বার মাইল অন্তর এক-একটি ডাকঘর স্থাপন করিয়া ঐ সকল পথে ঘোড়ার ডাকে পত্র বহনের ব্যবস্থা করেন। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে চার্লিমেন ফ্রান্সের জনসাধারণে যাহাতে এই ডাকের সাহায্যে পত্রআদান-প্রদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তবে ইহার জন্য সকলকেই কিছু মাশুল দিতে হইত।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে নবম চার্লসের সময় ফ্রান্সের ডাকঘরের কার্য্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ত্রয়োদশ লুই এবং চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকালে রিচি লুই এই সকল ডাকপথগুলির আরও উন্নতি সাধন করেন। ইহাতে ডাকে পত্র আদান-প্রদানের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক স্থানে হইতে অন্য স্থানে ডাক প্রেরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন দিন বা সময় ছিল না, কতকগুলি পত্র একত্র জমা হইলেই তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইত। মেজারীন এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া সপ্তাহে দুইবার নিয়মিত ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারী শহরে এক আন্তর্জাতিক ডাক-সম্মিলন স্থাপিত হয়। এই সম্মিলন ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যাণ্ড এবং অপর কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্য-মধ্যে পরস্পর পত্রাদি আদান-প্রদানের খরচ ও সময় নির্দ্ধারিত করেন। পত্র-বিলির সময় ডাক-খরচ আদায়ের যে রীতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল তাহাও এই সম্মিলন



চতুর্দ্দশ শতাব্দির একটি রুশীয় ডাকঘর।

কর্ত্তৃক প্রচলিত হয়। রাজকীয় ডাকবিভাগের কার্য্য-পরিচালনভার এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপর ন্যস্ত ছিল; চতুর্দ্দশ লুই ডাকের উপর রাজকীয় স্বত্ব বলবৎ রাখিবার জন্য ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে সাধারণের হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া পোটিন্ নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তে ইহার ভার অর্পণ করেন। ইহাতে লুইসের সহিত পোটিনের এই মর্ম্মে এক চুক্তি হয় যে, সে বাৎসরিক রাজস্ব হিসাবে তাহার লাভের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। ১৬৭৬

খৃষ্টাব্দের হিসাব হইতে জানা যায়, ফ্রান্সের ডাকঘর ঐ বৎসর তাঁহাদের লাভের উপর আটচল্লিশ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব দিয়াছিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে লৌভিস লুইয়ের সহায়তায় ফ্রান্সের ডাকপথের এবং ডাকঘরগুলির আরও অনেক উন্নতি সাধন করেন। এই ভাবে ক্রমান্বয় রাজকীয় ডাক বিভাগের উন্নতি হইতে থাকিলে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ডাকের স্বত্ব রাজকীয় ডাক বিভাগের হস্তে ছাড়িয়া দেন। ইহাতে রাজকীয় ডাক বিভাগ প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়কে বাৎসরিক ১১৮৯৩ পাউণ্ড সাহায্য করিবার অঙ্গীকার



পঞ্চদশ লুইসের সময়ের একটি ডাকঘর।

করেন। রাজকীয় ডাক বিভাগ তাঁহাদিগের অঙ্গীকার মত ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত এই টাকা জোগাইয়া আসিয়া অতঃপর তাহা বন্ধ করিয়া দেন।

পারাবতের সাহায্যে পত্র প্রেরণ ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; অতি আধুনিক কালে ফ্রান্স, হলাণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশেও টেলিগ্রাফ সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ ভাবে পত্র প্রেরণ ব্যবস্থা ছিল বলিয়া জানা যায়। কি ভাবে এই সময় পারাবতের সাহায্যে পত্র প্রেরণ চলিয়াছিল পত্রান্তরে তাহার বর্ণনাও পাওয়া যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ যখন প্যারী অবরোধ করে, সে সময় ৩৬৩টি পারাবত এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সকল পারাবত ৫০ হইতে ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ঠিক্ নিজেদের ডেরা চিনিয়া আসিতে পারিত। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল জরুরী পত্র পারাবত সাহায্যে পাঠানর আবশ্যক হইত প্রথম প্রথম আলোক চিত্রের সাহায্যে কাগজের উপর সেই সকলের প্রতিচ্ছবি উঠাইয়া তাহা উহাদিগের পায়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। ইহাতে পত্রের আকৃতি ও লিখিত বিষয় ঠিক থাকিয়া যাইত, কেবল আকারে কিছু ছোট হইয়া যাইত। এই ভাবে কিছুকাল পত্র প্রেরণের পর পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ঐ সকল পত্র কাগজে ছাপিয়া অনুবীক্ষণ আলোক-যন্ত্র (Micro-photograph) সাহায্যে খুব পাতলা ফিল্‌মের উপর উহার প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করিয়া তাহা প্রেরণের রীতি প্রচলিত হয়। ইহাতে ২″ × ১″ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে প্রায় ষোল খানি বড় বড় কাগজে লিখিত সমস্ত বিষয় উঠাইয়া লওয়া সম্ভব হয়। এই ভাবে এক গ্রাম ওজনের এক এক রীল (কাটিম) ফিল্‌মে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পত্র উঠাইয়া তাহা উত্তমরূপে গুটাইয়া এক-একটি পারাবতের লেজের পালকের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এই ভাবে পত্র লইয়া সাতান্নটি পারাবত ঠিক্ নিজেদের ডেরায় উঠিয়াছিল, বাকী পারাবত-গুলি সম্ভবত বাজ কর্ত্তৃক নিহত হয়। এই সকল পত্র প্যারিতে পৌছাইলে প্যারীর ডাক-অধ্যক্ষ ছায়াচিত্র সাহায্যে তাহা একখানি পর্দ্দার উপর বড় করিয়া দেখাইতেন, সেই সময় ডাকঘরের কর্ম্মচারীগণ ঐ পত্রগুলি নকল করিয়া তাহা পিওন মারফৎ বিলি করিতে পাঠাইতেন। এই ভাবে কিছুকাল কার্য্য চলিলে পর এই বিষয়ের আরও উন্নতি হইতে দেখা যায়, যে পর্দ্দার উপর ছায়াচিত্র সাহায্যে ঐ পত্র-গুলি বড় করিয়া দেখান হইত সেই পর্দ্দাখানি রাসায়নিক-দ্রাবক মাখান এক প্রকার কাগজের দ্বারা প্রস্তুত করার রীতি প্রচলিত হয়; ইহাতে এই সুবিধা হইল যে একবার ছায়াচিত্র সাহায্যে ঐ কাগজের উপর আলোক সম্পাত করিলেই ঐ পত্রগুলির প্রতিচ্ছবি চিরকালের মত ইহাতে ছাপা হইয়া যাইত। তখন আর কষ্ট করিয়া ঐগুলির নকল উঠাইবার আবশ্যক হইল না, ঐ পর্দ্দাখানিকে কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া পত্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া তখনই বিলি ব্যবস্থা করার

সুবিধা হয়। বেলুনে পত্র এবং লোক প্রেরণের চেষ্টাও এই সময় মানুষের মনে প্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল।

জার্মান

পূর্ব্বে জার্মান রাজ্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকায় এই দেশের প্রায় সকল রাজ্যমধ্যেই এক একটি বিভিন্ন ডাক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে প্রুসীয়ার হেন্‌সটীক্‌-লীগ—অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মিলিত কয়েকটি নগরবাসী ও কয়েকজন জায়গীরদার শাসন কর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডাকই সর্ব্বপ্রথম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওয়েস্টফেলিয়া হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর লুবেক পর্য্যন্ত পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থায় এই ডাক স্থাপিত হয়। ধাবকেরা



ডাক হরকরা পত্র বিলি করিয়া ফিরিতেছে।

এই পথে পত্র বহন করিত। এই ডাকের যদিও তেমন সুবন্দোবস্ত হয় নাই এবং সকলে মানিয়া লইতেও পারেন নাই, তথাপি ব্যবসায়ী বণিকগণের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ডাকের তেমন বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত না হইলেও ক্লিভস্ হইতে মেমচে পর্য্যন্ত পথে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছিল, অতঃপর রাজা ফ্রেডারীক এই ডাকের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ইঁহার সময় প্রুসীয়ার ডাক ভেনিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াটেমবার্গ শহরের পত্র আদান-প্রদান ব্যবস্থায় এই দেশের সীমানার মধ্যে আর একটি ডাক সমিতি জন্মলাভ করে। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ার অন্তর্গত নিউরামবার্গ শহরেও ওয়াটেমবার্গের অনুরূপ আর একটি ডাক সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে টেক্সিস প্রথম রলার অষ্ট্রিয়ার টাইরল শহর হইতে অন্যান্য স্থানে পত্র প্রেরণ ব্যবস্থায় এক ডাক ব্যবসার পত্তনি করেন। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ম্যাক্‌সিমিলিয়ন অষ্ট্রিয়া ও স্পেন রাজ্যের সিংহাসন লাভ করিলে পর ইঁহার আনুকূল্যে টেক্সিস পরিবার এক আন্তর্জাতিক ডাক নিয়ম স্থাপিত করিয়া মিলান (ইটালী) হইতে টাইরল হইয়া ভেনিস শহরে ডাক আসিবার ব্যবস্থা করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে টেক্সিস ফ্রান্স ফন থান্ ব্রুসেলস্ (বেলজিয়ম) হইতে ভিয়েনা শহরে ডাক আসিবার



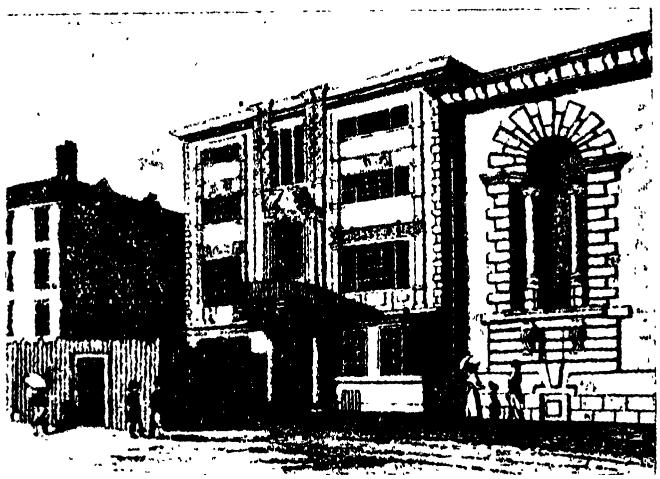
একটি গ্রাম্য ডাকঘর

ব্যবস্থায় কতকগুলি ডাকঘর স্থাপন করিয়া হরকরা নিযুক্ত করা হয়। স্পেন হইতে পত্র আসিবার জন্য মাদ্রিদ হইতে মিলান পর্য্যন্ত পথে আরও কতকগুলি ডাকঘর স্থাপিত করিয়া ঐ পথেও ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। ম্যাক্‌সি-মিলিয়নের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র রাজকীয় পত্রাদি বহন জন্যই এই সকল পথে হরকরাদিগের যাতায়াত ছিল। অতঃপর ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে জনসাধারণেও ইহার সাহায্যে পত্র প্রেরণের সুবিধা পায়। তবে ইহার জন্য ডাকের খরচ বলিয়া জনসাধারণকে কিছু মাশুল দিতে হইত। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে লিওনাউ-ফন-টেক্সিস অষ্ট্রিয়া ও স্পেনের ডাক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই সময় মিলান হইতে নেপ্‌ল্‌স্ পর্য্যন্ত

আরও একটি ডাকপথ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে লামোরাল ফন্ টেক্সিস ডাক অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন।

হাঙ্গেরী-রাজ মেথিস ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে টেক্সিস পরিবারের কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে এক পুরস্কার দানে সম্মানিত করেন এবং ডাক যাহাতে তাঁহাদের রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এম, হার্ডি ও স্যুটেন নামক দুই ব্যক্তি ভিয়েনা শহরে আসিয়া এক ডাক সমিতি স্থাপিত করেন। সম্ভবত শহরের এক পল্লী হইতে অপর পল্লীতে পত্র প্রেরণ ব্যবস্থা করা ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ কোথাও পাই না। এই ডাক সমিতি তের বৎসর



লণ্ডনের প্রধান ডাকঘর : ৭৯৩

স্বাধীনভাবে কার্য্য করার পর তাহা রাজকীয় ডাক-বিভাগের হস্তে চলিয়া আসে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে টেক্সিস পরিবার প্যারীস হইতে সপ্তাহে দুইবার ইংলণ্ডে এবং একবার অন্যান্য দেশে নিয়মিত ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এই-ভাবে পুরুষ-পরম্পরায় ডাকঘরের উন্নতি বিধান করিয়া টেক্সিস পরিবার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জার্মান দেশের ডাকঘরের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ইটালী

টেক্সিসদিগের প্রতিষ্ঠিত ডাক থাকা সত্ত্বেও ইটালীর পিডমণ্ট শহর হইতে অন্যান্য স্থানে পত্র প্রেরণ ব্যবস্থায় অপর একটি ডাক সমিতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রথমে এই ডাক বিভাগের কার্য্য জনসাধারণের উপর ন্যস্ত ছিল। অতঃপর ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে সেভয় পরিবারভুক্ত এমানুয়েল ফিলবার্ট একজন ডাক অধ্যক্ষর উপর ইহার সমস্ত ভার ইজারা দিয়া দেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। অতঃপর ইহার সমস্ত আয় রাজস্ব বলিয়া আদায় হইতে আরম্ভ হয়; ফলে ১৭১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ ডাকঘরের সমস্ত স্বত্ব রাজপরিচালনাধীনে আসিয়া পড়ে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে পিডমণ্টে পুনরায় আর একটি ডাক সমিতি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া অচিরে ইটালীর সর্ব্বত্র প্রসারলাভ করে।

স্পেন

স্পেন দেশের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির উপরও চতুর্দশ শতাব্দীতে ঘোড়ার ডাক প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে এই সকল ডাকঘর কেবল পত্র বহন উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নাই, স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার কালে পথিকদিগকে যানবাহন জোগানই ইহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

হল্যাণ্ড

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী দেশের একজন অধিবাসী হল্যাণ্ডে গিয়া ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন।

বেলজিয়ম

বেলজিয়মেও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ঘোড়ার ডাক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তবে ইহার পরিচালন ভার সম্পূর্ণভাবে ফরাসীদেশের ডাক অধ্যক্ষর হস্তে ন্যস্ত ছিল।

সুইজারল্যাণ্ড

সুইজারল্যাণ্ডের দক্ষিণ সীমান্তপ্রদেশেও দু-একটি রাজপথের উপর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাকঘর প্রতিষ্ঠালাভ করে।

রুশিয়া

রুসিয়ায়ও এই সময় ঘোড়ার ডাক প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইংলণ্ড

ইংলণ্ড সরকারের প্রাচীন দপ্তরে পত্র বহনের জন্য হর-

করাদিগকে ঘোড়াভাড়া দেওয়ার উল্লেখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথম জনের রাজত্বকাল হইতে এই দেশে রাজকীয় পত্র আদানপ্রদান চলিয়া আসিতেছে। তবে সে সময় ঐ দেশে ভাল পথঘাট না থাকায় ইহা অতি অল্প পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর তৃতীয় হেনরীর রাজ্যকাল হইতে ইহার উন্নতির সূচনা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাহার ছাত্রদিগের পত্র বহনের জন্য এই সময় কতকগুলি ধাবক নিযুক্ত করেন। এই সকল ধাবকের সর্ব্বত্র গতিবিধি ছিল। ইহাতে ইংলণ্ডের দূর নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তেও পত্র প্রেরণের সুবিধা হয়।

প্রথম এডোয়ার্ড এই দেশের রাজসিংহাসন লাভ করিলে পর তিনি হরকরাদিগের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য এবং ডাক খরচের পৃথক এক হিসাব রাখিবার জন্য তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন। ইঁহার কাল হইতেই ডাক অধ্যক্ষ পদের সূচনা। প্রথম প্রথম হরকরারা সাধারণত নিজের নিজের ঘোড়াই এই কার্য্যোপলক্ষে ব্যবহার করিত, কিন্তু ইহাতে দূর পথে কোন পত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে অত্যধিক সময় নষ্ট হইত, এই কারণে দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের এক-একজন ঘোড়ার মালিকের উপর ডাক বহন জন্য ঘোড়া জোগাইবার ভার ইজারা দিয়া দেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।



লম্বাড়ির ডাকঘরের একাংশ, এখানে পত্র বাছাই ও বিভাগ করা হইতেছে

অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ডাক অধ্যক্ষ স্যর ব্রেনটিউক্ কর্ত্তৃক লিখিত ক্রমওয়েল পত্রে আমরা জানিতে পারি যে, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ক্যালে ভিন্ন অন্য কোনও পথে ডাক প্রেরণের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। এই পত্রখানি রাজ-দরবারে পৌছিলে পর স্যর ব্রেনকে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ডাকঘর স্থাপনের আদেশ দেন। ইহাতে স্যর ব্রেন কাউন্সিলের আদেশ লইয়া উপনগরগুলির কর্পোরেশনের সদস্যবর্গকে হরকরাদিগের ঘোড়া জোগানর জন্য বাধ্য করেন; ইহাতেও যে সকল স্থানে সহজে ঘোড়া না পাওয়া যাইত, সেই সকল স্থান হইতে পুলিসের সাহায্যে ঘোড়া ধরিয়া আনিবার আদেশ স্যর ব্রেন পাইয়াছিলেন।

ফিলিপ এবং মেরীর রাজ্যকালের একখানি সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে হরকরা-দিগের নিকট একখানি করিয়া রেজিষ্ট্রী বই রাখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই বইয়ের মধ্যে সরকারী পত্রসকল পাইবার সময়, তারিখ এবং পত্রোল্লিখিত ঠিকানা লিখিয়া রাখা হইত। এতদ্ব্যতিত আধুনিক কালের ছাপা দেওয়ার ন্যায় সেই সময় প্রত্যেক ডাকঘরে ঘোড়া বদলের সময় তথাকার

সময় হইতে পথ হইতে ভাড়াটিয়া ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ঐ ঘোড়া বদল করিয়া পথ চলার রীতি প্রচলিত হয়। কিন্তু ইহাতেও নানারূপ অসুবিধা হইতে থাকিল। ঐ সকল ঘোড়ার মালিকদের উপর সরকারের কোন হাত না থাকায় এবং সে সময় ঘোড়া ভিন্ন পথ চলিবার অন্য কোন যানবাহন না থাকায় ভাড়া পাইলেই ঐ সকল মালিকেরা পথিক-দিগকে ঘোড়া জোগাইতেন, ফলে অনেক সময় ঘোড়ার অভাবে হরকরাদিগকে বৃথা বসিয়া থাকিতে হইত। এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া চতুর্থ এডোয়ার্ড লণ্ডন হইতে প্রায় দুই-শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে সে সকল প্রধান প্রধান পথ অবস্থিত ছিল, সেই সকলের উপর বিশ মাইল অন্তর-অন্তর

ডাক অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল ডাকঘরে পত্র পৌছানর সময় ও তারিখ ঐ পত্রের উপর লিখিয়া লওয়ারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।



ঘণ্টা বাজাইয়া হরকরা পথে পথে পত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে

ইহাতে হরকরারা পথিমধ্যে অনর্থা বিলম্ব করিয়াছে কি-না, তাহা জানা যাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথের রাজ্যকালে টমাস রেন্‌ডল্‌ফ্‌ ডাক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলে পর স্কটল্যাণ্ড, আয়রল্যাণ্ড, প্লাইমাউথ, ডোভার এই চারিটি পথে ডাক-তোরণের ব্যবস্থায় রবার্ট এরিক্‌, ফ্রান্সিস নরিস চাম্‌বার লাইন, এবং টমাস্‌ টাইরীর উপর ঘোড়া জোগাইবার ভার ইজারা করিয়া দেওয়া হয়। ইহার জন্য ইহাদিগকে প্রত্যেক দফায় চারিটি ঘোড়ার জন্য ৩৩ শিঃ ৪ পেনি করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু ঘোড়া জোগান দিতে তাহাদিগের যদি অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক কাল বিলম্ব হইত তাহা হইলে প্রত্যেক বারে তাহাদিগকে তাহার জন্য ৫ শিঃ করিয়া জরিমানা দিতে হইত। পরে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের একখানি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, এই সময় দুইটি করিয়া ঘোড়া সর্ব্বদা রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের এবং হরকরাদিগের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং ১৫ মিনিট কালের মধ্যে উহার সাজ চড়াইয়া জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ডাক হরকরারা নেকড়ার উপর চামড়া মোড়া দুইটি থলির মধ্যে পত্রসকল বহন করিত, ইহাদিগের হাতে একটি করিয়া শিঙা (Bugle) থাকিত। আপদ-বিপদ বুঝিলে উহারা তাহা বাজাইয়া পুলিসের সাহায্য চাহিত। এইভাবে ৭ মাইল গ্রীষ্মে এবং ৫ মাইল শীতে এই সকল হরকরা পথ অতিক্রম করিয়া চলিত। ইংলণ্ডের বাহিরে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ডাক অধ্যক্ষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, উহার ভার বিদেশীয় বণিকদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। উহাদিগের মধ্যেও সর্ব্বদাই একজন করিয়া ডাক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি পত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে এই পদ শূন্য হইলে পর রাফায়েল নামক একজন জার্মান এবং গডফ্রে নামক একজন ইংরেজের মধ্যে এই পদ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। ইহার ফলে দুজনাই এই বিষয়ে সুবিধা লাভ করেন।



তুষার বৃষ্টির ফলে ডাকগাড়ী বরফের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে।

এই সময় স্কটল্যাণ্ডের

ডাকঘরের কার্য্য কয়েকটি শহরের বিচারালয় হইতে রাজধানীর মধ্যে অবস্থিত ছিল, দূতেরা এই পথে পত্র বহন করিত। অতঃপর ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এবারডেনের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকটি ধাবক নিযুক্ত করিয়া এডিনবরা হইতে এবারডেনের মধ্যে রীতিমত ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। এই সকল ধাবক নীল রঙ্গের যে পোষাক পরিধান করিত, তাহার দক্ষিণ হাতায় রূপালি সূতায় সৈনিক পুরুষের চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। ইহারা বদল না হইয়া একাকীই সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া চলিত, প্রথম রাত্রে ডাণ্ডি এবং দ্বিতীয় রাত্রে মাউরোসে বিশ্রাম করিয়া তৃতীয় রাত্রে এবারডেনে পৌঁছাইত।

প্রথম জেম্‌স্ ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাজসিংহাসন লাভ করিলে পর তিনি একটি বিজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন প্রচারিত করেন যে, পথিকগণ আবশ্যক হইলে ডাকঘর হইতে ঘোড়া ভাড়া লইয়া পথ চলিতে পারিবেন, তবে ত্রিশ পাউণ্ডের অধিক বোঝা কেহ ঘোড়ার উপর চাপাইতে পারিবেন না, গ্রীষ্মে ঘণ্টায় সাত মাইল ও শীতে পাঁচ মাইলের বেশী এই ঘোড়া ব্যবহার করিতেও পারিবেন না, এবং ইহার জন্য মাইল প্রতি আড়াই পেনি করিয়া ভাড়া দিতে সকলে বাধ্য থাকিবেন। ঐ ভাড়া সর্ব্বদা অগ্রিম আদায় হইবে।

এই সময় বিদেশীয় বণিকগণ সাধারণত নিজদিগের লোক মারফৎ পত্র আদান-প্রদান করিতেন। এই প্রথা রহিত করিবার জন্য ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে অপর আর একখানি বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া এই আদেশ প্রচার করা হয় যে, এক সরকারের নিযুক্ত ডাক-হরকরা ভিন্ন অপর কেহ পত্র সংগ্রহ করিয়া আদান-প্রদান করিতে পারিবে না। ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের উপরও এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করা হয় যে, তাহারা ডাক-পথগুলির উপর এই বিষয়ে বেশ কড়া দৃষ্টি রাখেন। পর পর

এই দুইটি আদেশ প্রচারিত হওয়ায় এই সুবিধা হয় যে, ইহার পর সরকারের অলক্ষ্যে আর কোন পত্র বা যাত্রী



আমেরিকান ডাকগাড়ী

পথ চলাচল করিতে পারিল না। এই সময় যদি কোন লোককে বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করা হইত অথবা কাহারও



স্পেন দেশীয় ডাকগাড়ী

নিকট কোন পত্র পাওয়া যাইত তাহা হইলে তখনই তাহাকে হাজতে প্রেরণ করা হইত। বিচারে তাহার কোন মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের কারাবাস করিতে হইত।

১৬০৭ খৃষ্টাব্দে হেরিংটন পরিবারভুক্ত লর্ড স্টেনহোপ বাৎসরিক এক শত মার্ক মাহিনা এবং ডাকের সমস্ত লাভ তিনি পাইবেন এই ব্যবস্থায় বৃটিশ রাজ্যে ডাক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ডি'কোয়েস্টার নামক একজন বিদেশী বণিক এই সময় স্টেনহোপের অধস্তন কর্ম্মচারী হিসাবে থাকিয়া বিদেশীয় ডাক পরিচালন ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইঁহার কার্য্য পরিচালন ক্ষমতা দেখিয়া সরকার ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে বিদেশীয় ডাকঘরের কার্য্যভার স্টেনহোপের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া ডি' কোয়েস্টারের উপর ন্যস্ত করেন এবং বিদেশীয় ডাকঘরের কার্য্য হইতে দেশীয় ডাকঘরের কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেন। ইহাতে সর্ব্বপ্রথম ব্যবসায়ীগণ বিশেষ আপত্তি তুলেন। লর্ড স্টেনহোপও ইহার দ্বারা তাঁহাকে অপমান করা হইয়াছে মনে ভাবিয়া এই লইয়া রাজসভায় এক আন্দোলন সৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহার কোন মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। ইহাতে তাঁহার পুত্র আসিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ইনি ডাক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াই তাঁহার অধিকার লইয়া ডি'কোয়েষ্টারের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করেন, এবং ডি'কোয়েষ্টারের পথে বাধা উৎপন্ন করিবার জন্য পথিমধ্যে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া দেশবাসীদিগকে তাহার ডাক ভিন্ন অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পত্র বিনিময় করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া ব্লিংসে নামক একজন বণিকের সাহায্যে নিজেই বিদেশে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থা চালাইতে থাকেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল যাবৎ এই মামলা চলিবার পর প্রথম চার্লসের সময় ইহার শেষ নিষ্পত্তি হয়। ইহাতে দুজনারই ক্ষমতা বলবৎ থাকে, তবে ব্লিংসেকে ধৃত করা হয় এবং পার্লামেণ্টের বিনা আদেশে পত্র বহন করার দোষে তাহাকে হাজতে প্রেরণ করা হয়। ডি'কোয়েষ্টার এই সময় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, উপরন্তু তাঁহার যে পুত্র তাঁহার কার্য্যের প্রধান সহায়ক ছিল সেই ছেলেটি ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন ডি'কোয়েষ্টার এই পদে উইদারিঙ্গস এবং ফ্রিজেলকে বসাইয়া ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।



বিপদের মুখে ডাকগাড়ী

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ উইদারিঙ্গস্ ডাক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াই দেখিলেন ষ্টেনহোপ এবং ডি'কোয়েষ্টারের মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ এবং মামলা মোকদ্দমার ফলে ঘাটাদারগণ প্রায় সাত বৎসর ঘোড়ার ভাড়া আদায় না পাওয়ায় ঘাঁটিগুলির অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে, উপরন্তু প্রায় ২২,৬২৬ পাউণ্ড দেনা, পথঘাটগুলির অবস্থাও শোচনীয়। এক ধাবক ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ঐ সকল পথে পত্র প্রেরণের সুবিধা নাই। এদিকে সরকার বাৎসরিক যে ৩৪০০ পাউণ্ড করিয়া ব্যয় বহন করিতেন তিনিও তাহা বহন করিতে অক্ষম। তখন তিনি কিভাবে এক সঙ্গে এই সকলের প্রতিকার সাধন করা যাইতে পারে তাহারই উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ডাকের আয় বাড়াইতে না পারিলে উন্নতি সম্ভব নহে। এই কারণে তিনি সর্ব্বপ্রথম পত্র প্রতি দূরত্ব হিসাবে ডাক মাশুলের হার নির্দ্ধারণ করিয়া এই সকল পত্রের হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য এবং তাহা আদায় ও বিলি-ব্যবস্থা করিবার জন্য রিচার্ড লোলো নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার সহায়করূপে গ্রহণ

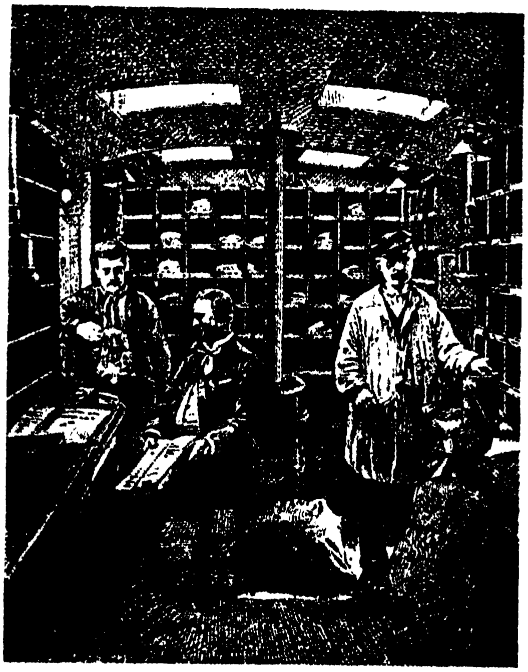
করিয়া তাঁহারই হস্তে এই কার্য্যভার এবং স্পেন দেশীয় ডাক অধ্যক্ষ থার্ন অফ টেক্সিসের উপর বিদেশীয় ডাক পরিচালন ভার অর্পণ করেন। ইহার পর উইদারিঙ্গসের লক্ষ্য হইল যাহাতে শীঘ্র দূর পথে পত্র পৌছাইতে পারে, নিয়মিত একই সময়ে ডাক চলাচল হইতে পারে এবং যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্র ও বৃটিশ রাজ্যসমূহের মধ্যেও ইহা প্রসার লাভ করিতে পারে। তিনি এই উদ্দেশ্য লইয়া ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইংলণ্ড এবং বৃটিশ রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মধ্যে পত্র আদান-প্রদান রাখিবার ব্যবস্থায় কয়েকখানি জাহাজ নিযুক্ত করিবার জন্য রাজসকাসে এক আবেদন পেশ করেন, এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যস্থিত ডাক-পথগুলির উন্নতি সাধনে তৎপর হন। আমরা ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩১এ জুলাই তারিখের একখানি সরকারি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারি, এই সময় লণ্ডন হইতে আটটি প্রধান ডাক পথ উঠিয়াছিল। ইহাদিগের প্রথমটি নর্থরোড ধরিয়া এডিনবরা; দ্বিতীয়টি হলিহেড হইয়া ডাবলিন; তৃতীয়টি ব্রিস্টল হইয়া ওয়াটারফোর্ড; চতুর্থটি সলিসবেরী হইয়া ওয়েল্‌স্; পঞ্চমটি প্লীমাউথ, ষষ্ঠটি হারউইচ, সপ্তমটি ডোভার এবং অষ্টমটি ইয়ারমাউথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই পথ কয়টির উদ্ধার সাধন করিয়া উইদারিঙ্গিস্ এই পথগুলি হইতে কিছু দূরে যে সকল স্থান অবস্থিত ছিল সেই সকল স্থানেও পত্র প্রেরণের ব্যবস্থায় কয়েকটি শাখা পথ স্থাপন করেন। কিভাবে এই সকল শাখা পথে পত্র প্রেরণ হইত তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মনে করুন, নর্থ রোডের উপর অবস্থিত কেম্বি্রজ, হান্টিংডন, লিনকোলন প্রভৃতি স্থানে কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করিতে হইবে, তাহা হইলে এই সকল স্থানের পত্র এক একটি পৃথক পৃথক ছোট ছোট থলিতে ভরিয়া লণ্ডন হইতে এডিনবরা যে ডাক যাইবে তাহার সহিত একটি বড় থলিতে ভরিয়া পাঠন হইত। উইদারিঙ্গসের চেষ্টায় ধাবকদিগের চলাফেরার সময়ও এ সময় এক রকম নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। ইহারা নিয়মিত ঠিক একই সময়ে যাত্রা করিয়া দিবা রাত্রে একশত বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিয়মিত একই সময় গন্তব্য স্থানে পৌছাইত। এই সুবিধা হওয়ায় শাখা পথগুলির কার্য্য বেশ বিনা বাধায় চলিতেছিল। প্রধান পথে ডাক আসিবার সময় হইলেই শাখা পথের ধাবকেরা মোড়ের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এইভাবে উভয়ে মিলিত হইলে পর প্রধান পথের লোক তাহার থলির মধ্য হইতে ঐ শাখা পথের জন্য নির্দ্দিষ্ট থলিটি বাহির করিয়া শাখা পথের ধাবকের হস্তে দিয়া দিত এবং শাখা পথের ধাবক যদি তাহার নিকট উত্তর পথের কোন পত্র থাকিত তাহা দিয়া দিত। এইভাবে উভয়ের আদান-প্রদান শেষ হইলে উভয়ে নিজ নিজ গন্তব্য পথে রওনা হইয়া যাইত। আবার ফিরিবার সময়ও উভয়ে ঐ একই ভাবে মিলিত হইয়া নিজেদের আদান-প্রদান সারিয়া লইত। ইহাতে পূর্ব্বে যে স্থানে ডাকের আদান-প্রদানে দুই মাস সময় লইত এখন তাহা ছয় দিনের মধ্যে সাধিত হইতে লাগিল। উইদারিঙ্গস্ ডাকের হার কিরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন তাহারও একটি তালিকা পাওয়া যায়। তালিকাটি এইরূপ—৮০ মাইল পর্য্যন্ত এক ফর্দ্দ পত্রে ২ পেনি, ৮০ মাইল হইতে ১৪০ মাইল পর্য্যন্ত



একখানি প্রাচীন পত্রের মোড়ক

৪ পেনি, তদূর্দ্ধে ইংলণ্ডের মধ্যে হইলে—৬ পেনি, স্কটল্যাণ্ড —৮ পেনি, আয়রল্যাণ্ড—৯ পেনি। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে উইদারিঙ্গস এই সকল কার্য্য সমাপ্ত



চলন্ত ডাকগাড়ীর মধ্যে পত্র বাছাই ও বিভাগ করা এবং হিসাবাদি পরীক্ষা করা হইতেছে

করিয়াছিলেন। অতঃপর উইদারিঙ্গসের চেষ্টা ছিল লণ্ডনে একটি ভাল ডাকঘর স্থাপন করা। উইদারিঙ্গসের এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ষ্টেনহোপ তাঁহার ডাকঘরের সমস্ত স্বত্ব উইদারিঙ্গসকে ছাড়িয়া দেন। উইদারিঙ্গস্ এই সুবিধা লাভ করিয়া সেই বৎসরই ডাউগেট-হীলের নিকট কুক লেনে একটি সাধারণ ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন।

এত করিয়াও উইদারিঙ্গসের আশ মেটে নাই। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের একখানি সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারি, উইদারিঙ্গস্ এবং ফরাসী দেশের ডাক অধ্যক্ষ দ্য নোভিউয়ের যৌথ চেষ্টায় এই সময় হইতে ফরাসী দেশের ডাক ক্যালে, বৌলগ্নী, এবিভেলি, এমিনথ হইয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। ক্রমান্বয় তিন বৎসর যাবৎ এইভাবে ডাকঘরের উন্নতিসাধন করিয়াও উইদারিঙ্গস্ ডাক বিভাগের স্বত্ব বজায় রাখিতে পারেন নাই। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হস্ত হইতে ডাকঘরের কার্য্য কাড়িয়া লইয় ফিলিপ বারলাম্‌চী নামক লণ্ডনের একজন ব্যবসায়ীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। তবে ইহাতে ফিলিপের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না, সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের আদেশমত তাঁহাকে চলিতে হইত। ক্রমশঃ

ডেফিসিট বাজেট

শ্রীলীলা ভট্টশালী

ডেফিসিট বাজেট। নলিনী সরকারের বেঙ্গল বাজেট নয়, কমলেশবাবুর সংসার খরচের। ঘাটতি সাতচল্লিশ টাকা তের আনা। বাজেটটা মাসিক।

হিসাব যোগ দিয়া গৃহিণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কর্ত্তার মুখ ভ্রূকুটিকুটিল, বড় ছেলে গম্ভীরভাবে তক্তপোষের উপর বসিয়া।

গৃহিণী সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, 'দেখো, দু-একটা টাকা হিসেবে বেশী না ধরলে আমার চলে না, প্রত্যেক মাসেই ত কিছু না কিছু বেশী খরচ পড়ে যায়—'

'আর আমিই বা টাকা পাব কোথায়?' কামিনী দেবীর কথা শেষ না হইতেই কমলেশবাবু তিক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন। 'এবার থেকে রাতে আমাকে শাবল নিয়ে বেরোতে হবে, নইলে আর চলছে না।'

গৃহিনী নীরব। কর্ত্তা বলেই চললেন—

'মাসের পর মাস তোমার খরচ বেড়েই চলেছে। এই যে প্রত্যেক মাসের বাড়তি খরচ মেটাবার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে আনা হচ্ছে, এর পর যখন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তখন আমি টাকা জোটাব কোত্থেকে?' কমলেশবাবুর কণ্ঠস্বর ক্রমেই ঝাঁঝাল হইয়া উঠিতেছিল।

'আমি কি তোমার টাকা নিয়ে ফূর্ত্তি করে ওড়াই। ছেলেমেয়েদের কাউকে একটি পয়সা অপব্যয় করতে দিই না; নিজে যতদূর সম্ভব সাবধান

হয়ে সংসার খরচ চালাই, তবু যদি তোমার সংসারের খরচ না চলে তবে আমি কি করব বল? এ কি আমার দোষ?'

'না, আমার দোষ।' কমলেশবাবু বিরক্ত হইয়া পা দিয়া জুতা খুঁজিতে লাগিলেন।

"তোমার দোষ নয় ত কি?' কামিনী দেবীর কণ্ঠস্বর এইবার বিকৃত হইয়া উঠিল। 'কি দরকার ছিল তোমার ঘটা ক'রে ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠাবার? মেয়েদের কেন কলেজে পড়তে দিলে? ছোট বয়সে বিয়ে দিলেই চুকে যেত। এখন তারা বড় হয়েছে, তাদের নিজেদের মত হয়েছে, জোর ক'রে বিয়ে দেওয়া চলবে না। অথচ পড়ার খরচ ত ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ছেলেরা বড় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পড়ার খরচ বাড়ছে। এমনি ক'রেই খরচ বাড়ে, আমি লুকিয়ে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিই না। আর তুমিই বা কেন যা তোমার সাধ্যে কুলোয় না তাতে হাত দিতে যাও? মেজ ছেলেকে বিদেশে পড়াতে যা তোমার খরচ হচ্ছে তাতে পাঁচটা ছেলের কলেজে পড়বার খরচ চলে যায়। আর এদিকে আমিই বা কোন খরচটা কমাব? কোনটাই ত কমালে চলে না।"

'ঠাকুর তুলে দাও না কেন? তা হ'লে কম ক'রেও মাসে বিশটা টাকা বাঁচে। কিন্তু তা দেবে কেন—উনুনের পাশে গেলে গিন্নি যে মূর্চ্ছা যান।' —বলিতে বলিতে কমলেশবাবু পাঞ্জাবীটা হাতে লইয়া লাইব্রেরীর দিকে প্রস্থান করিলেন। বড়ছেলে কলহের সূচনা দেখিয়া পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিল।

কামিনী দেবীর দৃষ্টি আনত হইয়া আসিল। এই একটি কথা চিরদিন তাহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করে। দশটি সন্তানের জননীত্ব লাভ করিয়া আজ তাহার স্বাস্থ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঘুণে ধরা কাঠের মত। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়া এই শরীর লইয়া এতবড় সংসারের তদারক করিয়া সমস্ত দিনে তাঁহার পনের মিনিটের অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামও মেলে না। সকাল ছটায় নীচে নামিয়া আসিয়া কাজে লাগেন, রাত্রি দশটায় আবার উপরে ফিরিয়া আসেন। তাহার উপর স্বামীর এই শ্লেষপূর্ণ কটূক্তি। স্বামী-পুত্রকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে কাহারই বা অসাধ! যখন তাঁহার সামর্থ্য ছিল তখন কি তিনি করেন নাই?

কমলেশবাবু চিরদিনই স্ত্রীর রান্নার অনুরাগী। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীর ভাল রান্নার পরিবর্ত্তে যখন কুৎসিত সিলেটী ঠাকুরের লোমশ হাতের বিশ্রী রান্না খাইতে হয় তখন তাহার মেজাজটা স্বভাবতই খারাপ হইয়া ওঠে।

তাঁহার মতে ঠাকুর রাখাটা নিতান্ত অনাবশ্যক। তাই খরচের টানা-টানি সুরু হইলেই তিনি খরচ কমাইবার সহজতম ও শ্রেষ্ঠতম উপায় মনে করেন ঠাকুর উঠাইয়া দেওয়াটাকে।

অপরাহ্নের রৌদ্রের তেজ বোধ হয় বড় বেশী। তাই হয়ত বাহিরের দিকে তাকাইয়া কামিনী দেবীর চোখ দুইটা জলে চকচকে হইয়া উঠিয়াছে।

২

আলোর উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছে। কামিনী দেবী একতলার বারান্দায় বসিয়া ছোট মেয়ে দুইটির চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন, এমন সময় বড় ছেলে সোমনাথ তাহার বন্ধু শশাঙ্ককে লইয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। বেণুর চুল বাঁধা হইয়া গিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি দু'খানা মোড়া আনিয়া মায়ের পাশে রাখিল। শশাঙ্ক আসিয়াই বেণুর সঙ্গে দুষ্টামি সুরু করিয়া দিল। তাহার ফ্রকের উপর দিয়া চিমটি কাটিয়া বলিতে লাগিল, 'আঃ! তোমাদের বাড়ী বড় ছাড়পোকা! তোমরা ছাড়পোকা পুষছ নাকি আজকাল?"

বেণুও ছাড়িবার পাত্রী নয়।—'হ্যাঁ! তাও জানেন না বুঝি? লোক এলেই তার গায়ে ছেড়ে দিই।' বলিয়া সেও সুবিধা মত চিমটি কাটিতে ও খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

শশাঙ্ক বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, মা লেডি-ডাক্তার। ছেলে হাতে প্রচুর পয়সা পায় এবং যখন তখন অন্তরঙ্গ বন্ধু সোমনাথকে জোর করিয়া সিনেমা ও রেস্তরাঁয় লইয়া যায়। প্রতিদান না দিতে পারিলে সোমনাথের মান থাকে না, অথচ প্রতিদান দিবার মত অর্থের প্রাচুর্য্য তাহার নাই; এদিকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর অনুরোধ এড়াইয়া চলা দায়।

কয়েকদিন আগে সোমনাথের এম্‌-এসসিতে ফাস্‌ট্‌ ক্লাশ পাওয়ার সংবাদ আসার পর হইতে সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল এ মাসকাবারে মায়ের নিকট হইতে গোটা দুয়েক টাকা লইয়া বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া সিনেমা দেখিয়া আসিবে। আসিবার পথে দেয়ালে 'প্রিজ্‌নার অফ্‌ জেণ্ডা'র বিজ্ঞাপন দেখিয়া আসিয়াছে, ইচ্ছা আজই দেখিতে যায়।

'মা, আজ দুটা টাকা না দিলে কিন্তু চলবে না বলে দিচ্ছি—জান যে—' সোমনাথ মোড়াটা মায়ের আরও কাছে টানিয়া লইয়া ছেলেমানুষের মত তাহার আবেদন জানাইল। কামিনী দেবী মুখ না তুলিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, 'না রে—টাকা পয়সা নেই, কোত্থেকে দেব।'

'বাঃ। আজ মাসের দু তারিখেই বুঝি তোমার টাকা নেই? সে সব শুনব না। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া সোমনাথ অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিল, 'এই আমি তোমার চাবি নিয়ে চললাম, টাকা বের ক'রে নিয়ে আসি। সেই লাল বাক্সটায় ত তোমার টাকা আছে?'

কামিনী দেবীর মৃদু প্রতিবাদে কান না দিয়া সে মায়ের আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ বাদে দু'টা টাকা লইয়া সে যখন নীচে নামিয়া আসিল, কামিনী দেবী তখন উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলেন, 'টাকা নিস্‌নে বলছি। এর পর যখন খরচ চলবে না তখন ত কথা শুনতে হবে আমাকেই।'

পরশু দুপুরের হিসাব করার দৃশ্যটা চকিতে সোমনাথের মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। সংসারের অবস্থাটা বোঝা তাহার পক্ষে কিছু কঠিন নয়, কিন্তু আজ এতদূর আগাইয়া গিয়া বন্ধুর সম্মুখে এখন আর ফেরা যায় না। তাহার সুগৌর মুখখানি ম্লান হইয়া উঠিল।

'কি যে ছেলেমানুষের মত বাড়ীতে বসে খুনশুড়ি করছিস তুই!' শশাঙ্ক আসিয়া সোমনাথের পাশে দাঁড়াইল। "আজ না বিকেলে মনোজদের বাড়ী যাবার কথা আছে—যাবি না, চল্‌।' সোমনাথের মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য আরক্ত হইয়া আবার ম্লান হইয়া গেল। জোর করিয়া মুখের উপর হাসি টানিয়া মায়ের কোলের উপর একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া 'না হয়

একটা নিচ্ছি' বলিয়া শশাঙ্ককে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। কামিনী দেবী পিছন হইতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বড় মেয়ে লীনা ঘরের ভিতর চা তৈরি করিতেছিল, সে দাদার অবস্থাটা বুঝিতে পারিল।

সে বারন্দায় মায়ের পাশে গিয়া বর্ত্তমানে দাদার বন্ধুর সম্মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বকুনি দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে গিয়া নিজেই একটা বকুনী খাইয়া ফিরিয়া আসিল।

সোমনাথ রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া যে টাকাটি লইয়া গিয়াছিল সেটি ফেরত দিয়া নিজের ঘরে শুইতে চলিয়া গেল। সে-রাত্রে তাহার ক্ষুধা ছিল না।

৩

এক টুকরা স্নিগ্ধ সোনালী আলো পূবের জানালা দিয়া ঘরের মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া থর থর কাঁপিতেছিল। দক্ষিণের জানালার সম্মুখে পাতা টেবিলটার সামনে বসিয়া লীনা নর্মাল ভ্যালু ও মার্কেট ভ্যালুর সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে। তাহার মাটিতে লুটান শাড়ীর আঁচলের উপরেও আসিয়া পড়িয়াছে এক মুঠো আলো। ছোট খোকা নন্তু একখানা বড় খাম তাহার টেবিলের উপর আনিয়া দিয়া বলিল, 'দিদি, দেখ তোমার কত বড় চিঠি। একজন দিয়ে গেল।'

ইংরেজীতে ছাপান একখানা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। স্যর হোসেনের মেয়ে সোফিয়ার বিয়ে। হোসেন সাহেবের ছোট মেয়ে রুকি লীনার ক্লাশ মেট। তার হাতের লেখা একখানা চিঠিও ছিল ওর মধ্যে। বার বার অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছে লীনাকে যাইতে। লীনার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গে ভাব থাকাটাই ঝকমারি। সোফির বিয়েতে ত আর খালি হাতে যাওয়া যায় না। আর স্যর হোসেনের মেয়েকে একটা যেমন তেমন কিছু দিলেও চলে না। লীনার মন তখন থিয়োরেটিক্যাল মার্কেট ভ্যালু ছাড়িয়া প্র্যাকটিক্যাল মার্কেট ভ্যালুতে নামিয়া আসিয়াছে। সে বেলার পড়া সেখানেই খতম।

লীনার মনে পড়িল রুকি পর পর সাত-আট দিন তাহাদের বাড়ী আসিয়া বেড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে একদিনও তাহাদের বাড়ী যায় নাই। রুকি রাগ করায় কথা দিয়াছিল শীঘ্রই একদিন যাইবে। এখন এ নিমন্ত্রণ এড়ান যায় কি করিয়া? মিথ্যা করিয়া লিখিবে—অসুখ হইয়াছে? না—সে ভারী খারাপ হইবে। ভাল কথা—আজ না মনসা পূজা? তাই ত! আচ্ছা লিখিয়া পাঠাইলে হয় না, "পূজোর দিন, অনেক কাজ, বাড়ীতে অনেক লোক—আসতে পারলুম না ভাই, মাপ ক'র।" মিথ্যা কথাও বলা হইবে না, নিমন্ত্রণও এড়ান যাইবে।

লীনা একটা নিস্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিছানার উপর গিয়া শুইয়া পড়িল।

জ্যাঠতুত দিদি শুভা একরাশ কাটা কাপড় লইয়া ঘরে ঢুকিল। 'কিগো, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে হঠাৎ এত কবিত্ব জেগে উঠল যে?' শুভা উদ্ভাসিত মুখে প্রশ্ন করিল।

'না মেজদি, কবিত্ব নয়। ভাবছি, আমি যদি ক্লাশে খারাপ মেয়ে হতাম তাহ'লে হয়ত ভাল হ'ত।' লীনা পরম ঔদাস্যভরে উত্তর করিল।

শুভা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'তা দুর্ভাগ্যক্রমে যখন ক্লাশের ফার্ষ্ট্ গার্ল হ'য়ে পড়েছ তখন ত আর খারাপ হওয়া যায় না। বরঞ্চ সামনের জন্মে চেষ্টা ক'রে দেখ, হলেও হ'তে পার। কিন্তু—হঠাৎ এত বৈরাগ্য যে? ব্যাপারখানা কি?'

'ব্যাপার আর কি?' লীনা বালিশের পাশ হইতে কার্ডখানা তুলিয়া শুভার দিকে বাড়াইয়া দিল। শুভা কার্ডখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'যাবে নাকি?' শুভার মুখ গম্ভীর।

'শুধু হাতে ত আর যাওয়া চলে না।' লীনা পাশ ফিরিল।

'তা রুকিকে কি উত্তর দেবে?'

'তাই ত ভাবছি। লিখে দিই—'পূজো, তাই আসতে পারলাম না'—কি বল?' লীনা উত্তরের প্রত্যাশায় শুভার মুখের দিকে চাহিল।

'তা দিতে পার।' শুভা ম্লান হাসিয়া কাটা কাপড়ের টুকরাগুলি লইয়া সেলাইয়ের কল খুলিয়া বসিল।

'মেজদি!'

'কেন রে?' শুভা ফিরিয়া চাহিল।

'জান মেজদি, লোকে নিমন্ত্রণ পেলে খুশী হয়, আর আমার হয় দুর্ভাবনা। থিয়েটারে পার্ট করে আর পরীক্ষায় একটু ভাল রেজাল্ট করে যখন কলেজের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠলাম তখন সব মেয়ে আমার সঙ্গে যেচে ভাব করতে আসত। মনে মনে এতে যে খুশীই হতাম, তা ত বুঝতেই পারছ। কিন্তু সে খাতির ফলটা যে সব সময় বহু অসুবিধা সৃষ্টি আর মন খারাপে গিয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত বল?'

'কিই বা করা যায় বল্।' শুভার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিল, 'আর কাকীমাকেই বা কি বলব। তুমি ভাবছ—আমার ত মোটে দুটাকা দরকার, সোমনাথ ভাববে—আমার দরকার মাত্র একটি টাকাই ত, নন্তু ভাববে—আমি ত সবে এগার আনা পয়সাই চেয়েছি, নন্তুর মনে দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, মা তাকে আইসক্রীম কিনবার জন্য চারটি পয়সা দিলেন না। কিন্তু যোগ করে দেখ, সবটা কতয় দাঁড়ায়। দিতে হলে ত সব এক জায়গা থেকেই দিতে হয়। কিন্তু আয় ত আর বাড়ছে না। কি আর করবে বল, আমরা বেশ ভালভাবে খেয়ে দেয়েই আছি, কেবল কতক-গুলা সাময়িক ইচ্ছা কিংবা সামাজিক দাবী মেটান আমাদের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তোমার মনের কথা কি আমি বুঝতে পারছি না? খুব পারছি।—কলেজে পড়া দিন ত আমারও গেছে, আজ না হয় আমি একটা সংসারের গিন্নি হয়েছি। ভেবে দেখ, কত মেয়ে আমাদের চাইতে ঢের বেশী অসুবিধায় আছে। তাদের কথা ভাবলেই মন খারাপ অনেক কমে যাবে।' ছোট বোনকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া শুভার মুখখানাও অন্ধকার হইয়া উঠিল। প্রথম যৌবনে এই সব ছোট-খাট আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়াটা যদিও তীব্র হইয়া বাজে না, তবু মনকে অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য অবসন্ন করিয়া দিয়া যায়।

'লীনু—ও লীনু!' ডাকিতে ডাকিতে মা ঘরে ঢুকিলেন। 'কি—এত

এত শীগগির তোর পড়া শেষ হয়ে গেল ?' মা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লীনার মুখের দিকে তাকাইলেন।

'তুমি বুঝি জান না কাকীমা, ওদের কলেজের নূতন নিয়ম কি হয়েছে ? ওদের প্রিন্সিপ্যাল সম্প্রতি হুকুমজারি করেছেন যে, থার্ড ইয়ারের মেয়েরা যদি সকালে পড়ে তবে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।' শুভ্রা এমন মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল যে হাসি সামলান দায়।

'সে বুঝতে পেরেছি—দুবছর এক ক্লাশে কাটাবার ইচ্ছে হয়েছে। তারপর—লীনু, তোর ব্লাউজের কাপড় আনবে কি রঙ্গের বলে দে। সোম শহরে যাচ্ছে।' কামিনী দেবী লীনার বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

'ব্লাউজের কাপড় ? সে কি ? কে বললে আমার লাগবে ?' লীনা অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল।

'কে আবার বলবে। ধোপা বাড়ীতে যে দুটো ব্লাউজ গিয়েছিল সে দুটোর ত রঙ্গ উঠে গিয়েছে। তাই কাপড় আনতে দিচ্ছি।'

'তা থাকগে।' লীনা তাচ্ছিল্যভরে উত্তর করিল। 'ও দুটো বাড়ীতে পড়ব'খন, বাকীগুলো দিয়ে শীত পর্য্যন্ত কাটান যাবে। কাপড়-টাপড় আনতে দিও না, আমি সেলাই করতে পারব না।'

লীনা এমনভাবে বলিল যে কামিনী দেবী বুঝিলেন সেলাই করিবার ভয়ে লীনা কাপড় আনিতে দিল না। লীনা নিজের অভিনয় ক্ষমতায় খুশী হইল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার তাহারা। যেমন করিয়া হউক—আর সকল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমানে পা ফেলিয়া তাহাদের সকল ভাইবোনকে জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে—মানুষ হইতে হইবে। নিজের অজ্ঞাতে তাহার বুক হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরিয়া পড়িল। জানালার পাশের পেয়ারা গাছটার ফাঁক দিয়া প্রভাতসূর্য্যের অজস্র ঝিলিমিলি কিরণ আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার সর্ব্বাঙ্গে ও বিছানায় নির্ব্বাক সহানুভূতির মত।

ইংরেজী অভিধানে বাঙ্গলা শব্দ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

প্রবন্ধ

আবশ্যক মত অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করা জীবন্ত ভাষার একটী প্রধান লক্ষণ। বাঙ্গলা ভাষা জগতের বিভিন্ন ভাষাসমূহের মধ্যে একটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জীবন্ত ভাষা। বিদেশীয় এবং দেশীয় বিভিন্ন ভাষা-সমূহ হইতে বহু শব্দ বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে স্থান লাভ করিয়া ক্রমশ তাহাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিতেছে।

জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের মধ্যে ইংরেজী ভাষাই সর্ব্বপ্রধান। অন্য কোন ভাষার এত অধিক প্রচার নাই। ইংরেজী ভাষার মধ্যে পৃথিবীর নানা ভাষার বহু শব্দই স্থান লাভ করিয়াছে এবং তাহাকে শব্দ-সম্ভারে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমানে বৃহত্তম শব্দকোষসমূহের মধ্যে ইংরেজী ভাষার অভিধানের শব্দসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বেব্‌স্টর সাহেবের ইংরেজী অভিধানের ১৯৩৪ অব্দের সংস্করণে সাড়ে পাঁচ লক্ষ শব্দ স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজের ও ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়ায় ক্রমে ক্রমে বহু ইংরেজী শব্দই বাঙ্গলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বহু বাঙ্গলা শব্দও ইংরেজী ভাষার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার সম্পাদিত "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" দ্বিতীয় সংস্করণে যেমন প্রচলিত বহু ইংরেজী শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরেজী "চেম্বাস' টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি ডিক্সনারী"তেও অনেক বাঙ্গলা শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের ভাষার পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবেরই কথা।

"চেম্বাস' টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি ডিক্সনারী"র ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে বাঙ্গলা ও অন্যান্য ভারতীয় শব্দের সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। সাধ্যমত সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দেবদেবী :—ইন্দ্র, কৃষ্ণ, কালী, কামদেব, লক্ষ্মী, দুর্গা, শক্তি, মহাদেব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, যম, বরুণ, শিব, সূর্য্য, সোম, রবি, রাহু, দেব, অবতার, বুদ্ধ, ত্রিমূর্ত্তি ইত্যাদি।

বৃত্তিবাচক :—আয়া, খিদ্‌মত্‌গার, ভিস্তি, সইস্, চাপ্‌রাসী, ধোবি, কুলি, লস্কর, টিণ্ডাল, চৌকিদার, মাহুত, সরকার, বক্সি, হকিম, হাকিম, ইমাম, নাজির, দেওয়ান, তালুকদার, জমিনদার, জমাদার, থানাদার, শীকারী,

সওয়ার, সরদার, সুবাদার, নায়েক, হাভিলদার, রিসলদার ইত্যাদি।

উপাধিবাচক :—বাবু, বাহাদুর, রাজা, রাণা, রাণী, নবাব, বেগম, নিজাম, গাইকোয়ার, সুলতান, মহারাজা, মহারাণী, পণ্ডিত, মোল্লা, লামা, হুজুর, সাইব, মেমসাইব ইত্যাদি।

ধর্ম্ম ও জাতিবাচক :—বৈষ্ণব, শৈব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মারাটা, পিণ্ডারী, পারিয়া, পঞ্জাবী, শিখ ইত্যাদি।

স্থানবাচক :—জিলা, তালুক, জমিনদারী, জঙ্গল, থানা, বাজার, ঘাট, সরাই, জিম্‌খানা, গোপুরা, মস্‌জিদ্, স্তূপ্, দরবার, ভারাণ্ডা ইত্যাদি।

শাস্ত্রাদি :—ঋগ্বেদ, সামবেদ, মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য, সূত্র, পুরাণ, সংহিতা, পঞ্চতন্ত্র, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, তন্ত্র, কোরান, জাতক, ত্রিপিটক, বিনয়পিটক ইত্যাদি।

বস্ত্রাদি :—চাদর, শাড়ি, ধোতি, পাজামা, পট্টি, পাগড়ী, তাজ, টোপি, শাল, জামদানি, জামেয়ার, তসর, খাকি, নয়নসুখ, মসলীন, পট্টু, কার্পেট, দড়ি, পরদা ইত্যাদি।

যান-বাহনাদি :—ডুলি, পাল্কি, গাড়ি, টঙ্গা, হাওদা, কাটামারান ইত্যাদি।

শাস্ত্রোল্লিখিত বাক্যাদি :—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মন্ত্র, কাম, কল্প, কাল, কালচক্র, মায়া, যোগ, পূজা, সিদ্ধি, নির্ব্বাণ, নাগ, শ্রাদ্ধ, শাস্ত্র, স্বস্তিকা প্রভৃতি।

খাদ্য-পানীয়াদি :—চপাটি, চাট্‌নি, পিলাও, ঘি, সরবৎ, সুরা, ছোট হাজরি ইত্যাদি।

ব্যবহারিক দ্রব্যাদি :—কলমদান, হুঁকা, লোটা, অঙ্কুশ, কুক্‌রী, দা, পাঙ্খা, শোলা, সেরাঙ্গ, সিতার, বীণা, চারপয় ইত্যাদি।

বিবিধ :—তোলা, শিক্কা, লাক্, যোজন, পাক্কা, ঢক্কর, নাচ, গজল্, আরক, আতর, ভাং, আবকারী, পিপুল, পদ্ম, দেওদার, বক্‌শিস্, নজর, সেলাম, তামাসা, হনুমান, রাক্ষস্, ডাক, খদ্, খেদা, মাচান, শীকার ইত্যাদি।

মহাত্মা, ঋষি, স্বামী, গুরু, চেলা, সিদ্ধ, হাজি, মহরম, রমজান্, স্বদেশী, স্বরাজ ইত্যাদি।

আমার এই তালিকায় হয়ত অনেক শব্দ বাদ পড়িয়া থাকিবে। তথাপি এ বিষয়ে পাঠকপাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম।

সুন্দর সুইট্‌জারল্যাণ্ডে

শ্রীসুবর্ণেন্দু গুপ্ত

ভ্রমণ

পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর শহর পারী ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌ছি। সত্যি এমন আইফেল্ টাওয়ার, এমন সাঁজ্‌এলিজ এভেনিউ, প্লাস্ দ্যলা কংকর্ডের মত এমন চৌরাস্তা, এমন লুভ্ মিউজিয়ম্, এমন সুন্দর বাগান, বাড়ীঘর কোন্ শহরে আছে? এসব তো মানুষের তৈয়ী মানুষের সাজান। এখান থেকে যাচ্ছি যেখানে, সে দেশটাকেও তো প্রকৃতি দেবী সব চেয়ে সুন্দর ক'রে সাজিয়েছেন। বরফে ঢাকা পাহাড়, শান্ত নিস্তব্ধ লেক্, ছোট ছোট নদী ঝরণা, মনোরম বেলাভুমি, পাইন ও চেষ্টনাটের সারি। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, যতদুর দেখা যায় কেবল তাই, আকাশকে যেন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কানে হিমালয় যা বলেছিল, আজ আমাকেও যেন সেই কথাগুলোই আলপ্‌স্ বল্‌ছে—

"We are our mighty front towards Heaven,
Where foot of mortal never trod
For we alone of nature's works
Are chosen children of our God."

পারী থেকে যে ট্রেন ধরছি, মনে হ'ল এ বোধ হয় আমার বদল করতে হবে, কিন্তু ষ্টেশনে অনেক খুঁজেও কোন ইংরেজী ভাষাবিদ্ পেলাম না যাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি। এখানে দিন কয়েক থেকে মাত্র দু-তিনটি ফরাসী কথা শিখেছি। অগত্যা টমাস কুকের বই থেকে "Do we

change carriages"এর ফরাসী অনুবাদটিও আমার টিকিটটি গার্ড সাহেবের কাছে ধরলাম। তিনি তা দেখে হেসে

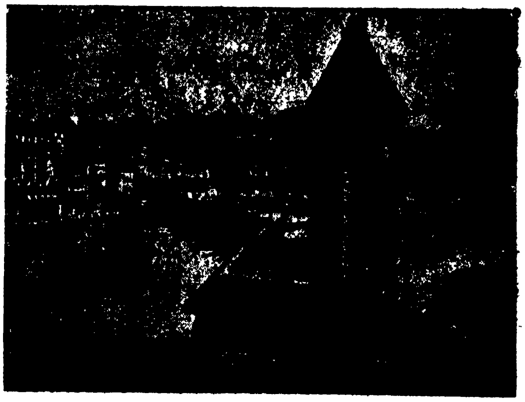


লুসার্ণ লেকের ধারে চেষ্টনাটের এভিনিউ

বললেন, "সাঁজে্ বাজেল্।" বুঝতে পারলাম, সাঁজে মানে চেঞ্জ; এবার আমার অভিজ্ঞতাটুকু কাজে লাগিয়ে বললাম, "মার্সি মেঁাসিয়ে"। বাজেলে গাড়ী বদল্ করলাম্। এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল, ইংরেজী বা জার্মান দুটোর একটা ভাষা তো কাজে লাগাতে পারব। কাস্টম্‌কে বোঝালাম্, "আমি ভারতবর্ষের লোক, তোমাদের দেশে এসেছি শুধু বেড়াতে, ব্যবসা করতে নয়।" আমার বলবার ধরণ ও আমার মুখে তাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুলি শুনে সে হেসে তখনই যেতে দিল। এখান থেকে আমি একটি সুইস্ ছেলেকে সঙ্গী পেয়েছিয়াম, সেও বিদেশী পেয়ে মহা উৎসাহে তার স্কুলের, তার খেলার গল্প ক'রে যেতে লাগ্‌ল। লুসার্ণ শহরে পৌছতে রাত্রি বারটা বাজ্‌ল, তার আগেই আমার বালক বন্ধু নেমে গেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি করে ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম্; বেড়িয়েই যেন মুগ্ধ হয়ে গেলাম, আঃ—সত্যি, মনোরম সুইটজারল্যাণ্ড। একটা লেকের পারে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছোট্ট লুসার্ণ শহর, অপর পারে পাহাড়ের গায়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, মাথা তাদের বরফে সাদা, সবে সূর্য্যের আলো পেয়ে জেগে উঠে যেন বিরক্ত হয়ে সে আলো ফিরিয়ে দিচ্ছে, এত সুন্দর জায়গা যে আমার কল্পনারও অতীত ছিল। আমাদের দেশে কাশ্মীরও প্রকৃতির অকাতর দান পেয়েছে—সেখানেও লেক্ আছে; বরফে ঢাকা পাহাড় আছে, এমনই স্বভাবের শোভা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে কি মানুষের তৈরী এত সুন্দর, এত পরিষ্কার, এমনই চোখ-ধাঁধান পশ্চিমা শহর আছে? এমনই এভেনিউ, এমনি রাস্তা, এমনি বাড়ীঘর আছে কি সেখানে? এমনি সংমিশ্রণ পাবে কি সেখানে? ঐ পাহাড়ের উপর, ঐ এভেনিউতে, ঐ লিডোতে, ঐ থিয়েটারে, ঐ কন্‌সার্টে কত যে রোমান্স মিলিয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। ভ্রমণকারী স্বাস্থ্য-অন্বেষী আসছেই দলে দলে সব সময়ে। এদের জন্য ক্যাসিনো, থিয়েটার, নাচঘর, রেস্তোরাঁ, কাফিখানা—সবই আছে। গল্‌ফে, টেনিসে, সাঁতারে, স্নানে, মাছধরাতে, নাচে—সবেতেই ভীড়। লেকে বেড়াবার ছোট ছোট ষ্টীমার, বাইবার জন্য নৌকা রয়েছে, অনেকগুলো পালতোলা নৌকাও ভাস্‌ছে। লেকের পরেই চেষ্টনাট্ গাছের সুন্দর এভেনিউ, দুদিকের গাছের ডালপালা এসে এভেনিউর ওপরে বেশ সুন্দর ছাদ করে দিয়েছে, এর ভেতরে মাঝে মাঝে রয়েছে খেলবার ও পড়বার ঘর ও রেস্তোঁরা। গাছের সারির পাশে ট্রাম লাইন আর তার পরে মোটরের রাস্তা; রাস্তার পারে ফুটপাথ দিয়ে লোক চলেছে বড় বড় শো-কেসের দিকে চেয়ে, আর কিন্‌ছে ঘড়ি, সোনা রূপা ও হাতির দাঁতের নানারকম জিনিস। রাস্তাঘাট সবই অসম্ভব রকম পরিষ্কার।

শহরের মাঝখানেই এই লেক্ থেকে ছোট্ট রয়েস্ নদী বেরিয়েছে, তার ওপরেই নতুন এক কঙ্‌ক্রিটের পোল



রয়েস্ নদীর উপর পুরাতন ও নূতন পুল

হয়েছে, তারই পাশে এক অতি পুরোণো আঁকা-বাঁকা কাঠের পোল রয়েছে, তার উপরটা ঢাকা, তাতে আবার

প্রায় শ'খানা খুব পুরোণো ছবি আঁকা আছে। অতি আধুনিকের পাশে ছয় শ' বছরের পুরোণো জিনিষ।

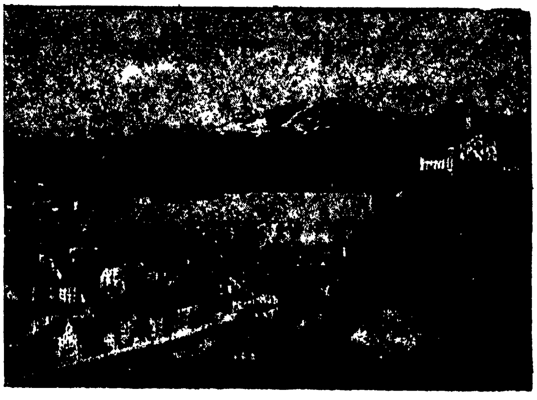


লুসার্ণ ও পিলাটুস্ পাহাড়

লেকের ধার ছেড়ে লোয়েন স্ট্রাসে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে লায়ন্স মনুমেণ্টের কাছে পৌছলাম, এখানে এটা দেখতে সবাই আসে। কয়েকজন বীরপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পাহাড় কুঁদে একটি সিংহের মূর্ত্তি তৈরী করেছে এক অন্ধ ভাস্কর। এ জায়গাটা ভারী নির্জ্জন। পায়ের কাছে একটি ঝরণা অতি ধীরে বেয়ে চলেছে, দু-পাশের গাছগুলো ঝরণার উপর নুয়ে যেন নিজেদের ছায়া দেখ্ছে, সবাই নিস্তব্ধ শান্ত, টুঁ শব্দটিও করছে না। পাহাড়ের ওপর খানিকটা উঠে সমস্ত শহরটা ছবির মত দেখা যায়। লেকের অপর পারে প্রথমে দাঁড়িয়েছে বীরদর্পে পিলাটুস্ (Pilatus), তার পরে একটু সরে দাঁড়িয়েছে বুর্গেনস্টেক (Burgenstack), এর পেছনে আকাশ ছুঁয়ে স্টান্জারহোর্ণ, আর আর এক পাশে বিশাল রিগি পাহাড়, আশে পাশে চারদিকেই অন্যান্য ছোট-বড় পাহাড়গুলো গায়ে গায়ে লেগে ঠেলাঠেলি করছে। লেকের জল স্থির, আর তাতে ছোট ছোট পালতোলা নৌকাগুলি ছবির মতই নিশ্চল হয়ে ভাসছে। লেকের এ-পারে শহর, তার বাড়ীগুলি ছোট, একটার পাশেই আর একটা যেন জোড়া, রাস্তাগুলোও মোটা সূতার মত এঁকে-বেঁকে পড়ে আছে, আর উপর দিয়ে গাড়ীগুলি চলেছে ছোট ছোট পোকার মত বুকে হেঁটে।

এই মনুমেণ্টের কাছেই বেরিয়েছে গ্লেসিয়ার গার্ডেন; অনেকগুলো গোল বড় বড় গর্ত্ত, গোল গোল ছোট-বড় পাথর, আর মসৃণ পাহাড়ের গা দেখে পরিষ্কার ধারণা হয় যে, এ দেশ ইতিহাস যুগের আগে বরফের রাজ্য ছিল। সমস্ত উত্তর সুইটজারল্যাণ্ডই বরফে ঢাকা ছিলো, গ্লেসিয়ার নাম্তো সেণ্ট্ গটার্ড পাস্ দিয়ে। এই পাসই এখন উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার একমাত্র পথ। ইলেক্ট্রিক্ ট্রেন চলে এর ভেতর দিয়ে। এই গ্লেসিয়ার যুগেরও আগে এই জায়গা ছিল সমুদ্রের নীচে, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় পাথরের স্তরে স্তরে অনেক সামুদ্রিক ঝিনুক ইত্যাদি থেকে। তারপর এসেছিল ট্রপিকের গরম, আর তার সঙ্গের ট্রপিক্যাল জঙ্গল, পাথরের ওপর তালপাতার দাগ রেখে গিয়েছে। এরপরে এসেছিল একেবারে উল্টো বরফের যুগ।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আরও বেশী পরিচিত হবার আশায় ট্রেন ছেড়ে জাহাজ ধরলাম। ছোট্ট জাহাজটা ছাড়ল বেলা দুটোয়। লম্বা সরু লেক্, দুপাশে প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়, যেন কোন পাসের ভেতর দিয়ে চলেছি; পাহাড়গুলো জলের ভিতর পা ডুবিয়ে, সাদা মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তাদের পায়ের কাছে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম রয়েছে। গোটা কয়েক বাড়ী ঘর, জনকয়েক লোক, কিন্তু রাস্তাঘাট বাড়ীঘর বাগান সব কি সুন্দর, কি পরিষ্কার। পৃথিবীর সব গোলমাল থেকে দূরে সরে এসে শান্তি যেন এখানেই এসেই বাসা বেঁধেছে। আমাদের জাহাজ প্রতি ঘাটেই ভিড়ছিল, দু-একটি করে লোক উঠ্ছে নাম্ছে। এম্নই করতে করতে প্রায় বেলা পাঁচটায় এসে আমরা ফুইলেন পৌছলাম। লুসার্ণ থেকে



লুসার্ণ শহর ও রিগি পাহাড়

ফুইলেন অবধি ইলেট্রিক ট্রেনও আসে, আর পিলাটুস্, রিগি, স্টানজারহোর্ণ প্রায় প্রত্যেক পাহাড়েরই ওপরে উঠবার

নানা রকম যানের বন্দোবস্ত আছে, কোনটা কগ্‌হুইল, কোনটা র‍্যাক এণ্ড পিনিয়ন, আবার কোনটাতে ক্যাব্‌ল্ রেলওয়েজ।

ফ্লুইলেন থেকে আবার ট্রেন্, এবার ক্রমাগত পাহাড়ে উঠছি, ছোট গ্রাম শহর অনেক পার হয়ে গেল। একটা গির্জ্জা দেখতে পেলাম, প্রথমে সেটা অনেক ওপরে ডান্‌দিকে, একটু পরে ট্রেন্‌টা গির্জ্জাটাকে বাঁয়ে রেখে তার পাশ ঘেঁষে চলল; এবার সেটা আর উঁচুতে নয়, আবার সেই গির্জ্জাটাই দেখা গেল বাঁদিকে অনেক নীচে পড়ে আছে। এম্‌নি করে আমাদের ট্রেন ক্রমাগতই ওপরে উঠে বরফের কাছে পৌঁছে গেল, আমাদের দুপাশেই পাহাড়ের গা বেয়ে বরফ নাম্‌ছে, নাম্‌তে নাম্‌তে গলে জল হচ্ছে, আবার সেই জলই ঝরণা হয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়ের মাঝে গুম্ গুম্ গম্ভীর আওয়াজ করতে করতে। গ্লেসিয়ার থেকে কি করে নদী-ঝরণার উৎপত্তি হয় আজ তা দেখতে পেলাম নিজের চোখে। গোয়েশোনেন্ স্টেশনে যখন এসে গাড়ী থামল, তখন দিনের আলো নিবে গেছে বললেই হয়, চারদিকে বরফ ছাড়া আর কিছু নেই, গাড়ী বাড়ী সবের ওপরেই বরফ জমে আছে, ফুটখানেক, কি তারও বেশী। গাছপালা সবই সাদা, বরফের ভারে তারা নুয়ে পড়েছে। এ জায়গা ছেড়ে আমরা এক টানেলে ঢুকলাম, নয় মাইল লম্বা এই টানেল আল্‌প্‌স্ ফুঁড়ে তৈরী করা হয়েছে। ধোঁয়াহীন শূন্য এই ইলেট্রিক ট্রেন্ চলল এর ভেতর দিয়ে খট্‌মট্ করতে করতে ইটালীর দিকে।

ইটালী আজ হুঁসিয়ার। বিদেশীকে তাদের দেশে ঢুকতে দেবার আগে তারা অনুসন্ধানের চূড়ান্ত করছে। মুসোলিনি চলেছেন আবিসিনিয়া ধ্বংস করে ফ্যাসিসিজমের পতাকা ওড়াতে। ইটালী আজ যে রূপ ধরেছে তা তো ম্যাৎসিনির উপদেশেই, কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী ফলও ফল্‌ছে, রাশেলের কথায় বলি, "Mazzini's doctrines could only end in perpetual war, or an iron tyranny."

আমি গাড়ীতে সঙ্গ পেয়েছিলাম ভারী সুন্দর একটি জর্মান ইহুদী মেয়ের। চলেছে সে প্যালেস্টাইনে। সে ইটালীর পয়সা এই প্রথম দেখল, দুই লিরার মুদ্রা কেন দশ লিরার চেয়ে বড় এ তার কিছুতেই মাথায় ঢুক্‌ছে না। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম ভাঙ্গা জর্মান বুলি দিয়ে, তবু তার বোধগম্য হল না। "নাঃ, তুমি দেখছি জর্মান ভাষাও বুঝবে না।" তখন সে হেসে ফেলেছে, জর্মান মেয়েকে বলছি কি-না জর্মান ভাষা বোঝ না।



লুসার্ণ লেক ও ফ্লুইলেন শহর

মিলানোতে এসে গাড়ী থাম্‌ল, এখানে আমি নামব। আমি সঙ্গিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে বল্‌লেন, "আউফ্ উইদার সেয়েন্ (আবার দেখা হবার আশায় বিদায়)।" আমি সংশোধন ক'রে বললাম, "আউফ্ নিমাল্ সেয়েন্ (আবার কখনও দেখা হবার আশা না নিয়ে বিদায়)।" তিনি আমার হাতটা ধরে রেখে বললেন, "না, না—বল, আউফ্ উইদার সেয়েন্।"



হল্‌দে মাটি

শ্রীসন্ধ্যা দাশগুপ্তা

ছোট্ট তাদের কুটীরখানির খোলা জান্‌লার ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের চূড়াটি দেখা যায়। লুলু জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌ল—তার বাবা মাঠের ধারে বসে আছেন চিন্তিত মনে।

বাবা আসছেন!

লুলু তাড়াতাড়ি জান্‌লাটি বন্ধ ক'রে দিয়ে তার রোগ-শয্যাশ্রিত সহোদর জুলুর কাছে এসে দাঁড়াল। ভয়ে তার অন্তরখানি দুরু দুরু করছে। বাবা আস্‌ছেন!—তার বাবা যে তাকে ঘৃণা করেন!

পিতার অনাদৃত লুলু! কত দূর থেকে তাকে হল্‌দে মাটি বয়ে আন্‌তে হয়; সেই মাটি দিয়ে তার বাবা বাসন তৈরী করেন। সেগুলা বিক্রী ক'রে যা পাওয়া যায়—তাই তাদের সম্বল।

একটু জল—লুলু!

লুলু তাড়াতাড়ি একটি গেলাসে করে জল এনে তাকে পান করাল।

শীতকালের ঝরণার জল। শীতল। জুলু যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব কর্‌ল। লুলু ব্যস্ত হয়ে বললে: আমি এসে তোর সঙ্গে শোব?

হ্যাঁ। জুলু অতিকষ্টে উত্তর দিলে।

লুলু তার পাশে শুয়ে গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লে: তোর গা তো এখন ভয়ানক গরম! নখগুলা কী লম্বা হয়ে গেছে! তুই যখন ঘুমোস্ তখন ওগুলা বাড়ে না কি?

জুলু পাশ ফিরে শু'ল। তার দু'টা গাল লাল—প্রভাতের শিশিরসিক্ত অনাঘ্রাত ফুলের মত অশ্রুমাখা।

জল, একটু জল, লুলু—উ!

আধময়লা জলের গেলাসটি নিয়ে লুলু নীচে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে।

বাড়ীর পাশ দিয়ে একটি ঝরণা বয়ে চলেছে অবিরাম—নিংড়ে দিচ্ছে অশ্রান্ত রবে—সিত, শীতল, স্বচ্ছ জল। লুলু গেলাসটি পুরিয়ে নিলে।

লুলু, কোথায় গেলি?

এই যে বাবা।

লুলু ভয়ে জড়সড় হয়ে উত্তর দিলে।

মাটি এনেছিস্?

না; জুলুর জন্য ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না বুঝি?

না!

লুলুর গায়ে কে যেন কশাঘাত কর্‌ল।

কোন্ সাহসে তুই ডাক্তার আন্‌তে যাবি? ঈশ্বর যা করেন, তাই হবে—এ কথা তোকে বলিনি?

লুলুর দু'চোখে জলের ধারা বয়ে নাম্‌তে লাগ্‌ল। লুলুকে কাঁদতে দেখে জুলুর অন্তরখানিও বেদনায় গেল ভরে।

শোবার ঘর থেকে একটা ডাক শোনা গেল। জুলুরই কাতর আহ্বান। লুলু জানলার দিকে তাকাল। জলের গেলাসটি জুলুর মুখের কাছে ধরে নীচু স্বরে বল্‌লে: এই যে জল! উঃ,...তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, বাবা এসে দেখে ফেল্‌বেন।

লুলুর বাবা সুবল ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। গেলাসটি লুলুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাশে টেবিলের উপর রাখ্‌ল। জুলুর দিকে চেয়ে বল্‌লে: বেশি জল খেয়ো না।

তারপর তার ভুরুর উপর হাতখানি রেখে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বল্‌লে: আজ একটু ভাল লাগ্‌ছে বাবা?

হ্যাঁ।

সুবলের মনখানি আশায় ভরে উঠ্‌ল। সে জানু পেতে হাত জোড় ক'রে অস্ফুট স্বরে ভগবানের কাছে কি যেন প্রার্থনা কর্‌ল। তারপর তার ঘর্মসিক্ত জামাটি খুলে ঘরের চালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখ্‌ল।

লুলুর দিকে চেয়ে বল্‌লে: এই নালা বেয়ে চলে গিয়ে ভাল মাটি নিয়ে আয়। একটা বড় ফরমাস্ পেয়েছি।

লুলু একবার বিছানাটির পানে তাকাল। মুহূর্তের জন্য চারিটি চোখের মিলন হ'ল: মুহূর্তের পরে সেই মিলন-গ্রন্থী ছিন্ন হ'ল আবার।

লুলু সিঁড়ি বেয়ে নেমে একখানি কোদালী আর একটি পাত্র নিয়ে নালার জল-কাদা ভেঙে চল্‌তে সুরু কর্‌ল।

তার মুখের উপর বিষাদ আর চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গরমের দিন।

আকাশখানি ছিল উজ্জ্বল। সূর্য্যের উত্তাপ যেন একটি শাদা তপ্ত-চুল্লীর আগুন—পুঞ্জীকৃত। পাহাড় যেন গলে গলে পড়ছে নীচে। বড় বড় বট-অশথগাছগুলা সবুজতা হারিয়েছে, খর রোদের তাপে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। শুধু সেই নালাটি অনর্গল চলে গেছে—সোজা—সেই জায়গাটি পর্যন্ত যেখানে হল্‌দে মাটি পাওয়া যায়। অর্ধ পথ অতিক্রম কর্‌তেই লুলু একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখ্‌তে পেয়ে উঁচু গলায় ডাক দিলে: মাসি!

বৃদ্ধার হাতে একখানি জলচৌকি, আর একটি দুধের পাত্র। ডাক শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে: লুলু যে; তোর ভাই ভাল আছে তো?

হ্যাঁ, মাসিমা!

তার নাম ললিতা। তার পরণের কাপড়খানি অপরাপর পাহাড়ীদের মত নয়: তার মধ্যে আছে একটা স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য। তার চোখ দুটা কালো, মুখে প্রবীণতার একটা স্পষ্ট ছাপ। সে তার দুধের মত শাদা দাঁতগুলা বার ক'রে হেসে বল্‌লে: তোর বাবা আজকে এদিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিও বল্‌লেন—জুলু একটু ভাল আছে।

হ্যাঁ।

তোর বাবা আজকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়েছিলেন, না, রে? আমি তখন আমার গরুগুলা গোয়াল থেকে ছাড়িনি, তখন তিনি দুটা ছাগল নিয়ে যাচ্ছিলেন বিক্রী করতে।

বাবা তো ফিরে এসেছেন।

ফিরে এসেছেন? এরই মধ্যে? সবেমাত্র তিনটে বাজল কেয়াং-এর (মগদের উপাসনা-গৃহ) ঘড়িতে।

হ্যাঁ—তবুও তো তিনি ফিরে এলেন।

ছাগল দুটা বিক্রী হয়নি তো?

না।

আচ্ছা, তুই আমার সঙ্গে আয় লুলু।

ললিতা লুলুকে তার কোলে বসিয়ে কোমরে তার একখানি হাত দিয়ে সস্নেহে বল্লে: লুলু, তোর মা'র কথা মনে পড়ে?

হ্যাঁ, একটু একটু পড়ে।

হুঁ।

একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তার মুখের উপর উঁকি মেরে গেল। তারপর আবার বল্লে: আমি তার বান্ধবী ছিলাম। দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতাম, খেলতাম, দু'জনের মনের কথা দু'জনের মধ্যে বলাবলি করতাম।

লুলু তার কোলের উপর দিব্যি বসে আছে—চেয়ে আছে বাইরের দিকে অন্যমনস্কভাবে।

আচ্ছা, তোর মা'কে কি তুই একেবারেই ভুলে গেছিস্?

না মাসিমা, আমি তাঁর ছবি দেখেছি।

ললিতা তার চোখ দুটার দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—তার বান্ধবীর কথা মনে পড়ে।

লুলু। তার দুটা চোখ তার বান্ধবীরই অনুরূপ।—না, লুলুর তাকে মনে নেই। এই হতভাগা যখন তার মাকে হারায় তখন সে নিতান্তই শিশু।

তারপর সে ফিস্ ফিস্ ক'রে কত কথাই না বল্লে আপন মনে। যে-সব কথা বিস্মরণের পারে চলে গেছে বলে তার মনে হ'ত, সে-সব পুরাণো হারাণো কথা তার স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে গেল। সূর্যের তাপ তখন প্রখরতর হয়ে উঠেছে। দুধের পাত্রটি হাতে নিয়ে সে লুলুকে বল্লে: তুই জলচৌকিখানি নে···চল্, ঘরে যাই। আচ্ছা, জুলুর কি কাশি আছে?

এখন বেশি নেই তেমন, আগে ছিল।

গলায় খুব ব্যথা, না?

হ্যাঁ, তবে এখন একটু কমেছে।

তারা দুজনে একখানি ছোট ঘরে ঢুকল। ললিতা বল্লে: একটু মাখন তোলা দুধ খাবি?

হ্যাঁ, মাসি।

এক চুমুকে দুধটুকু নিঃশেষ ক'রে লুলু পেয়ালাটি চাট্‌তে লাগ্‌ল।

ললিতা তার দিকে চেয়ে একটু হাস্‌ল।

সে তার স্মৃতির সুতোটি খুঁজে পেয়েছে। বল্লে: সে খুব ভাল সেলাই করতে পারত। কত গাঁয়ে তাঁর কাঁথাগুলো বিক্রি হ'ত। তারপর, তার সঙ্গে সুবলের বিবাহ হ'ল।

লুলু দেখ্‌ল মুখ তুলে বৃদ্ধার দিকে। তার কথাগুল কেমন যেন রহস্যে ভরা, অর্থপূর্ণ।···দু'জনের বিবাহ হ'ল। সেদিন ছিল রবিবার। বৃষ্টি হচ্ছিল মুষলধারে। সুবলের টাকা পয়সা তেমন ছিল না। দুটা বছর হাড়-ফাটা পরিশ্রম ক'রে তাকে টাকা রোজগার করতে হ'ত।··· তোর জন্ম হ'ল। তারপর সেখানেই শেষ হ'ল তার শ্রম।

কেন মাসিমা?—লুলু প্রশ্ন করল।

কারণ, আচ্ছা, আমায় একটু দুধ দে ত, লুলু! লুলু তাকে এক পেয়ালা দুধ দিলে। কারণ তোর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোর মা মারা যায়।

লুলু একটা অসহ্য ব্যথা অনুভব করল। কে যেন তরোয়াল দিয়ে তার অন্তরখানি টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কেটে দিচ্ছে।

···সেই স্মৃতি—সুবলকে পাগল করে। সেই থেকে সে আর যেখানে তোর মার শেষ নিশ্বাস পড়েছে সেই জায়গাটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি।···তারপর থেকে সে উন্মাদের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল, নেশা ধর্‌ল। পরে সে ধর্মান্তর গ্রহণ কর্‌ল। তখন তোর বয়েস তিন কি চার হ্যাঁ।

তুমিই তাহ'লে আমায় মানুষ করেছ মাসিমা?

হ্যাঁ। আমি তোকে কোলে ক'রে বাড়ী নিয়ে আসতাম রোজ সকালে, সন্ধ্যায় সুবলের হাতে তুলে দিতাম। যতদিন না লুলু তোর সব কিছু বুঝ্‌বার বয়েস হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত আমিই তোকে দেখ্‌তাম।

ললিতা হঠাৎ থেমে গেল। জান্‌লার ফাঁক দিয়ে আকাশখানি দেখা যাচ্ছিল। একখানি হাতের মত ছোট একখণ্ড মেঘ আকাশের গায়ে লেগে আছে দেখে সে লুলুর দিকে চেয়ে বল্লে: লুলু, লালির জন্মদিনে আমি তোকে যে সিকিটা দিয়েছিলাম, সেটি কোথায়?

সে তার কোমরের সঙ্গে একখানি দড়িতে বাঁধা একটি ছোট থলি বা'র করে ললিতার সামনে ধরে বল্লে: এই যে মাসি। আস্‌ছে চৈত মাসের মেলায় আমি আর জুলু দু'জনে এটি দিয়ে খেল্‌না কিন্‌ব, বুঝ্‌লে।

বেশ বাবা।

তার চোখ দুটা হঠাৎ বড় হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে: যা বাবা, তোর আবার দেরী হয়ে যাবে। লালিকে তোর সঙ্গে নিয়ে যানা। সে তোকে সাহায্য করতে পারবে।

ললিতা ডাক্‌লো: লালি!

একটি চপলা কিশোরী একপেয়ালা দুধ খেতে খেতে বেরিয়ে এল।

ললিতা মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে বল্লে: আমায় না জিগ্যেস্ করে ও-রকম করো না। তা ছাড়া, এত তাড়াতাড়ি করে গরম দুধ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনিষ্টকর।

সে এত অনুতপ্ত, এত নরম হয়ে পড়্ল যে তার মুখের চেহারা দেখে ললিতা হাসি চেপে রাখ্তে পার্‌ল না।

আচ্ছা, এখন লুলুর সঙ্গে গিয়ে খানিকটা মাটি নিয়ে এস তো!

যাই পিসি।

লালি ললিতার ভ্রাতুষ্পুত্রী। লালির বাবা তাকে তার পিসিমার তত্ত্বাবধানে রেখে দেশান্তরে চলে গেছে।

লালি কিশোরী। সুন্দর তার মুখখানির উপর তার ভেতরকার দুষ্টুমিটুকু ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। ঘন তার চুলগুলো কালো, লম্বা। ললিতা তাকে একখানি নীল শাড়ি পরিয়ে দিত। তাতে তাকে মানাতো বেশ।

সে তার পিসিমার দিকে চেয়ে একটা দুষ্টু হাসি হেসে দৌড় দিলে।

আমি তোমার সঙ্গে আস্‌তে পারি তো! পিসিমা আমায় পাঠালেন।

হ্যাঁ, তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।—উদাস গম্ভীরভাবে লুলু উত্তর দিলে।

তারা চলেছে—নীরবে—ঘন বনের ফাঁক দিয়ে—পাখীর গান শুন্‌তে শুন্‌তে। মৃদু-মন্দ সমীরণের মধুর সোহাগ-স্পর্শে তৃপ্ত প্রাণ!

লুলু, কেমন আছ?—লালি জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

ভাল।

বেশ। আমি খুব খুশী হলাম। দাঁড়াও, আমি একটু জল খাব। সে দৌড়ে ঝরণার পারে গেল, অঞ্জলি পূরে পান করলে ঝরণার শীতল স্বচ্ছ জল।

আমরাও রোজ এ জল খাই।

আমরাও। আমরা একটা গামলায় জল ধরে রাখি।

ওঃ, আমাদের একটি কুয়ো আছে।

কিন্তু গামলার জল বেশি পরিষ্কার। কুয়োতে ব্যাঙ্ থাকে।

কি বোকা রে। লালি হাস্‌ল। তার সেই আনন্দের শব্দে লুলুর ভারী রাগ হ'ল। ঐটুকু মেয়ে তাকে বোকা বলে লজ্জা দিলে।

লুলু আর তার সঙ্গে কোন কথা বলল না। ধীরে ধীরে তারা দু'জনে গন্তব্য-স্থানে পৌঁছল তাদের। কয়েক মাইল বিস্তৃত একটি সমতলভূমি। দিগঞ্চলে গাধার সারি দেখা যাচ্ছে—অস্পষ্ট, কালো।

সুবল কাকাকে আমি আজ উপাসনা কর্‌তে দেখেছি। লালি বল্‌লে।—আচ্ছা লুলু, তিনি কি রোজ এম্‌নি উপাসনা করেন?

আমি জানিনা। আমি তার কথা শুনি না, কোন দিন শুনি না।

লালি জান্‌তো একথা সত্য নয়, কিন্তু সে চুপ করে রইল।

লালি তার সেমিজটির দিকে বার বার ফিরে তাকাচ্ছিল। সেফ্‌টিপিনটা কোথায় খসে পড়ে গেছে। লুলু তা লক্ষ্য কর্‌ল। বল্‌লে: তোমার কি আর পিন্ নেই?

না।

আমার কাছে একটি আছে। এটি নাও না।

লালি পিন্‌টি সেমিজে লাগিয়ে দিয়ে বল্‌লে: বেশ ভদ্রলোক হয়ে গেলাম এবার।

অপরাহ্নের স্নিগ্ধতা অনুভূত হচ্ছিল তখন বেশ! তারা দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে অগ্রসর হচ্ছিল।

তোমার বয়েস কত লুলু?

তের—প্রায় চোদ্দ। আগামী ফাল্গুন মাসে আমার জন্মতিথি, আটই ফাল্গুন—আর লুলুর চৈত্র-মাসে। তখন তার বয়েস সতের হবে।

তখন তোমাদের বাড়ীতে কি উৎসব হবে না?

হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়—তোমারই মতো।

এক টুক্‌রা মেঘ—একখানি রুমালের মত বড়—আকাশের বুকে ভেসে উঠ্‌ল। বাতাস এত শান্ত—আর দিগঞ্চলের নীলিমা এত স্বচ্ছ ছিল—যেন নির্বাত-নিষ্কম্প সমুদ্রে একখানি বিস্তৃত পাল টেনে দিয়েছে।

লালি মেঘের আর দিকের সুন্দরতা লক্ষ্য করে চললে: লুলু, আমার জন্মদিনে "পুতুলের দেশ" অভিনয়ের কথা তোমার মনে পড়ে?

নিশ্চয়। সেদিন আমি তোমায়—

এখনও—আজও তুমি আমায় তেমনি চুমো দিতে পার?

একটা আনন্দ অপ্রত্যাশিত পুলকে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে তার মাথায় একটি চুমো দিতে উদ্যত হ'ল।

বাধা দিয়ে লালি বল্‌লে: ওখানে নয়, আমার মুখে। সে তার ঠোঁট দুটো এগিয়ে ধর্‌ল।

লুলু বল্‌লে: তোমার নাকটা কি অপরিষ্কার!

সে তাড়াতাড়ি নাকটি ঝেড়ে কাপড়ের আঁচলখানি দিয়ে মুছে ফেলে বল্‌লে: এইবার।

একটা অতৃপ্তির সঙ্গে তার দিকে চেয়ে রইল লুলু।

না।

তার হাতখানি কাঁধের উপর টেনে লালি নরম সুরে বল্‌লে: হ্যাঁ।

তার সুরে একটা অনুযোগ, অন্তরে কেমন একটা ভাব!—তার চোখে তার ছায়া। কথাই তারই রেশ।

লুলু, আমায় চুমো খেতে ভয় কর্‌ছে! কি লজ্জা! লুলু—লজ্জা পেল্লা!

হাততালি দিতে দিতে লালি কথাগুলো উচ্চারণ কর্‌ল। তারপর সাপের মত লুলুর গলা জড়িয়ে ধর্‌ল। তারা এগিয়ে চলল—যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রান্তিতে তাদের শিশু-স্বভাব-সুলভ চপলতার শক্তি কমে গেল।

লুলু বল্‌লে: চল, তাড়াতাড়ি ফিরে যাই, রাত হয়ে আস্‌ছে।

সাতটা বাজে।—লালি বল্‌লে।

তারা সেই জায়গা থেকে মাটি খুঁড়্‌তে লাগ্‌ল।

পাশাপাশি দুটি কিশোর কিশোরী।

লুলু একবার হাতখানি লালির কাঁধের উপর রাখ্‌ল। সে তার দিকে চেয়ে হাসল। উদার আকাশের দিকে চেয়ে আছে—তারা দুটি প্রাণী নিষ্পাপ, সরল!

একটি দাঁড়কাক উড়ে আস্‌ছে—তারা দেখ্‌তে পেল। যেন একটা

ছায়া। তার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করছে, চঞ্চু কেমন যেন কঠিন। তার পাখার শব্দ তারা শুন্তে পেল স্পষ্ট।

রাত হয়েছে।···

শুক্নো খড়ের মত শাদা হয়ে গেল লুলু। অস্ফুট অস্পষ্ট স্বরে লুলু বললে: সে বেঁচে নেই। জুলু জুলু!

তার নখগুলো যেন তার মাংস আঁচড়ে বা'র করে নিয়ে আস্ছে। সে আকাশের দিকে চাইল। আকাশখানি শূন্য···অন্ধকার।

দাঁড়কাকটি উড়ে গেছে।

সে দাঁড়িয়ে রইল স্থির—যতক্ষণ না তার শিরা বেয়ে রক্ত মাথায় নেমে এল। তার পর জীবনের ভয়ে যেমন বন্যপশু উন্মাদের মত পলায়ন করে—বৃক্ষপতনের শব্দে শিকারী কুকুরের পদশব্দ শুনে পথের দিকে লক্ষ্য না ক'রে—কণ্টকের মধ্য দিয়ে—সে-ও তেমনি ছুটল—উন্মাদ, চকিত, ভীত!

লালি চীৎকার ছাড়ল: লুলু, দাঁড়াও—দাঁড়াও!—তার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে এসেছে—শিরা উপশিরাগুলো ফুলে উঠেছে।

বাতাস জোরে বইতে সুরু করেছে। তাদের মুখ দুখানি আঁধারে বিলীন হ'ল! আকাশে মেঘের পাহাড়!

মুহূর্ত সেদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে লুলু বল্লে: কোদালিটা তো ফেলে এসেছি।

সে থাম্ল।

আমায় মনে করিয়ে দাওনি কেন লালি? কেন দাওনি? আবার আমায় সেখানে যেতে হবে—নইলে বাবা আমায় মেরে ফেল্বেন···। কিন্তু তুমি ফিরে যাও বাবাকে জিগ্যেস করে এস, ···জুলু কি মরেই গেছে! তারপর ফিরে এসে আমায় বল।

আচ্ছা।

লালির মুখখানি ঘর্মসিক্ত, দেহ-মন অবসন্ন।

লুলু পিছনের দিকে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগ্ল।

লালির কণ্ঠস্বর তার কানে বাজ্ল। আমি দৌড়ে যাচ্ছি।

লালের আভা রেখে সূর্য অনেকক্ষণ আগে অস্ত গেছে। ক্রমে আকাশে দু-একটি তারা উঠেছে জ্বলে। একটা শান্ত ক্ষীণ চাঁদ কাঁচির মত আকাশে ঝুলছে।

লালি ছুটেছে—প্রাণপণে ছুটেছে। কি একটা শব্দ শুনে সে চম্কে উঠ্ল।

একটা ব্যাঙ্ লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। সে তার পিসির কাছে শুনেছে ব্যাঙ্ লাফালে নাকি বৃষ্টি হয়। আজ তবে বৃষ্টি হবে।

একজন বুড়ো লোক একখানি প্রদীপ দিয়ে আঁধার দূর করে অগ্রসর হচ্ছে দেখা গেল।

সুবল কাকা!

সে যেন মাটিতে ঝুঁকে পড়ে কি তুলছে!

কেন বাছা?

লালি দেখ্ল তার দিকে। দুঃখ বুঝ্ল—তার মনের। অন্তরখানি দুরু দুরু করে কেঁপে উঠ্ল। সে চিৎকার করে উঠ্লো: কাকা, জুলু কি নেই?

···বৃদ্ধ আকাশের দিকে চাইল। লালি দেখ্ল—তার চোখে জল।

হ্যাঁ লালি, ভগবান্ কেড়ে নিয়েছেন।

দুর্বিষহ দুঃসহ ব্যথা তার অন্তরখানিকে চুরমার করে দিচ্ছিল। শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে সেখানে জানু পেতে বসে পড়্ল। তার সামনে হলদে মাটির স্তূপ। রাতের আঁধারে যেন লাল রক্তরাঙা!

লালি তার দিকে চেয়ে আছে নীরবে—বিস্ময়ে। মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্রের চিরন্তন আলোক তাদের উপর এসে পড়েছে। কখন যে সুবল উঠে দাঁড়িয়েছে—লালি তা টেরও পায়নি।

বজ্রগম্ভীর শব্দে সুবল বল্লে: লুলু কোথায়?

সে ভুলে কোদালিটা ফেলে এসেছে; সেটি আনতে গেছে আমায় পাঠিয়েছে—তাকে জানাতে—জুলু কি···আমি যাই।

না, তুমি এখানেই থাক।—সুবল বললে।

তারপর সুবল মাটী দিতে লাগ্ল—জুলুর কবরে। লালির অন্তরে সীমাহীন ভীতি, দুঃখ, আর লুলুর জন্য উৎকণ্ঠা!

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে সুবল উঠে দাঁড়াল—চোখ দু'টী পলকহীনভাবে কবরটির উপর নিবদ্ধ।

দৌড়ে এসে লুলু সেখানে পৌঁছেই থেমে গেল সেখানে। বিস্মিত, স্তব্ধ হয়ে দেখ্ল—এই শোচনীয় দৃশ্য! জুলু—জুলু!

তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে, হলদে মাটির পাত্রটি হাত থেকে উল্টে পড়ে গেল জুলুর কাঁচা কবরটির উপর। *

* বিলাতী গল্প অবলম্বনে।



পার্ল বাক্ ও তাঁহার উপন্যাস

শ্রীমতী মিনতি দেবী

প্রবন্ধ

মেট্রো-গোল্ড্উইন মায়ারের বিখ্যাত ছবি "গুড্ আর্থ্" যখন দেখি, তখন রূপালি পর্দায় প্রতিফলিত সেই অপরূপ কাহিনীর ভিতর দিয়া চীনের এক নগণ্য কৃষক পরিবারের জনকতক নর-নারীর অন্তর্জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের যে অপরূপ আলেখ্য দেখিয়াছিলাম তাহা আমার এবং আমার মত অনেকেরই মনে একটি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। মনে মনে সেদিন এই কাহিনীর রচয়িত্রীর প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম সাহিত্যে এই লেখিকা যে বিষয়-বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন তাহা দেশ, কাল ও পাত্রের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া শাশ্বত স্থান লাভ করিবে। কীর্ত্তিমান সেই সাহিত্যিক আর সার্থক তাঁহার প্রতিভা—যিনি তাঁহার সৃজনী-শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া অনায়াসেই বলিতে পারেন—এমন জিনিষ দিব, যাহা কালের শঙ্খ-কুহরে অসীমের নিশ্বাসের মত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় যুগ হইতে যুগান্তরে আমার বাণীকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। আমার বিরাট কল্পনায় এমন জিনিষ ধরা দিবে যাহাকে লোকে সৃষ্টি বলিয়াই গ্রহণ করিবে, অনাসৃষ্টি বলিয়া নহে। এ বৎসরের সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার লাভের দুর্লভ গৌরবের অধিকারিণী শ্রীমতী পার্ল্ বাকের সমগ্র সাহিত্য জীবন ও তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য হইতে আমরা ঠিক এই কথারই ষোল আনা সমর্থন পাই।

পার্ল বাক্ যশস্বিনী লেখিকা। তাঁহার রচিত গল্প ও উপন্যাস ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষভাবেই সমাদৃত। তাঁহার খ্যাতি অতলান্তিক মহাসাগরের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার নিজস্ব জীবন সম্বন্ধে জনসাধারণের তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। যে যুগে সাহিত্যে উৎকট আধুনিকতা ফ্রয়েডীয় মনো-বিশ্লেষণের অন্তরালে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক ভাবহীন ও প্রকৃত শিল্প-সুষমাবিহীন কদর্য্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, ঠিক সেই যুগেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন আকাঙ্ক্ষাকে বহন করিয়া শিল্পী পার্ল বাকের আবির্ভাব। অথচ এই অসাধারণ প্রতিভাশালিনী লেখিকা এ পর্য্যন্ত নিজেকে তাঁহার সৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, জন-সমাজের কাছে তাঁহার আত্মপরিচয় তাই আজও অসম্পূর্ণ বলিলেই হয়।

একদা লণ্ডনের অধুনা-লুপ্ত সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'ন্যাস্' ম্যাগাজিনের জনৈক প্রতিনিধি পার্ল বাকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"শিল্পীর একমাত্র পরিচয় তাহার সৃষ্টির মধ্যে—এ শিক্ষা আমি চীনের নর-নারীর কাছ হইতে পাইয়াছি। সেখানে লোকে শিল্পীর সৃষ্টিকেই আদর করে, শ্রদ্ধা জানায়, তাহার ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনী জানিবার জন্য তাহারা মোটেই আগ্রহান্বিত নয়।" প্রচার-সর্বস্ব এই যুগে পার্ল বাকের এই উক্তি আমি আমাদের দেশের তরুণ সাহিত্যিকদের একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আমেরিকার ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়াতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পার্ল বাকের জন্ম। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন মার্কিন মিশনারী। চার মাসের শিশু-কন্যাকে লইয়া এই মিশ-নারী কার্য্য উপলক্ষে চীনদেশে আসেন এবং সেইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। কাজেই পার্ল বাকের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চীনের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সে পরিচয় আবার চীনের অভিজাত ও উন্নত সম্প্রদায়ের সঙ্গে নহে, একান্ত উপেক্ষিত ও অবনমিত, সমাজের এক পার্শ্বে যাহারা কোন মতে মাথা গুঁজিয়া বাস করে সেই সব দরিদ্র, নিরক্ষর চীনের নর-নারীর সঙ্গে, তাহাদের দৈনন্দিন সুখদুঃখ, অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চীনের এই শ্রেণীর লোকদিগকে পার্ল বাক নিজের একান্ত আপনার বলিয়াই মনে করিলেন, তাঁহার নারী-সুলভ কোমল হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে আসিয়া আঘাত করিল সহস্র সহস্র

দরিদ্র চীনবাসীর দুঃখ ও নিপীড়নের কথা, তাহাদের অসীম বেদনায় তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। বেদনার্ত এই সব মূক আত্মা প্রথম ভাষা পাইল পার্ল বাকের রচনায়, অন্ধকারে অবলুপ্ত তাহাদের জীবনের ইতিহাস মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল তাঁহার অনবদ্য রচনায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রগাঢ় অনুভূতির স্পর্শে সজীব পার্ল বাকের লেখা চীন দেশের নর-নারীদের সম্বন্ধে গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়িলে মনে হয় না যে এ একজন মার্কিন লেখিকার রচনা, এমনই আন্তরিক দরদ দিয়া সেগুলি রচিত। প্রথমে শৈশবে নিজের মাতৃভাষা শিখিবার পূর্বে তিনি চীনদেশের বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। একটা জাতির অন্তরের পরিচয় লইতে হইলে নিজেকে সমগ্রভাবে তাহার সহিত মিশাইয়া লইতে হয়, তবেই ত তাহাদের জাতীয় জীবনের নিগূঢ় পরিচয়, তাহাদের মনের সব কথা জানিতে পারা যায়। পার্ল বাকের লেখনীতে চীনের যে সব মূক নর-নারী আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা কি কোন সৌখীন পর্যটক সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হইত? এ বিষয়ে পার্ল বাকেয় ব্যক্তিগত কয়েকটি কথা আছে। কথা কয়টি সত্যই মূল্যবান। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মার্কিন উপন্যাস হিসাবে সেইবার পার্ল বাকের রচিত "গুড্ আর্থ" উপন্যাসখানি যখন আমেরিকার সর্বোচ্চ সাহিত্য-পুরস্কার "পুলিট্জার প্রাইজ্" লাভ করে, সেই সময় এক অভ্যর্থনা সভায় তিনি বলিয়াছিলেন :

"I have no sense of mission or of doing any service. I write because it is my nature so to do, and I can write only what I know and I know nothing but China having always lived there···I love best to live among the people in China, the every-day people, who care nothing for official buttons."

"দি হাউজ্ অব্ আর্থ" নামে যে বিখ্যাত এপিক-উপন্যাস তিনি লিখিয়াছেন তাহারই প্রথম খণ্ড হইল এই "দি গুড্ আর্থ"। ধরিত্রী-মাতার বক্ষে অনাড়ম্বর সরল জীবন লইয়া যাহারা বাস করে, সভ্যতা যাহাদিগকে আজও কৃত্রিম ও কলুষিত করিতে পারে নাই তাহাদেরই ইতিহাস এই "গুড্ আর্থ"-এর ওয়াং পরিবারের তিন পুরুষের কাহিনীর ভিতর দিয়া বিবৃত হইয়াছে। পর্দায় এই কাহিনীর চিত্ররূপ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই আখ্যান-ভাগের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ যুগের সাহিত্যে পার্ল বাকের এই বিরাট উপন্যাস কথাসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনিয়াছে বলা চলে। ফরাসীর অন্যতম ঔপন্যাসিক জঁা রিফার এই উপন্যাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"It is a great human document which transcends all barriers of time and space and language." যে সময় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তখন চীনদেশে এক



পার্ল বাক

প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশেষভাবে চীনের তথাকথিত 'ইনটেলেকচুয়াল্' সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই উপন্যাস সম্পর্কে এই মর্ম্মে প্রতিবাদ করা হয় যে, ইহাতে প্রকৃত চীনের কথা ব্যক্ত না হইয়া ইহার অপেক্ষাকৃত অন্ধকারের দিকটি আলোচিত হইয়াছে; ইহা পাঠ করিয়া অনেকের মনে চীনের নর-নারী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। ইহার উত্তরে পার্ল বাক এইসব ইনটেলেকচুয়াল-গর্বীদের বলিয়াছিলেন—সত্যের খাতিরে আমি ইহা আদৌ

স্বীকার করিতে পারি না। নিজে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি এবং যাহাদের বিষয় ইহারা (নিজের দেশের লোক হইয়াও) দেখে নাই ও শোনে নাই, আমি তাহাই লিখিয়াছি।

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'দি হাউজ্ অব্ আর্থ' ভিন্ন, চীনের দরিদ্র ও নিম্নস্তরের নর-নারীর জীবন-কাহিনী লইয়া পার্ল বাক্ আরও পাঁচখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইহাদের নাম—'দি এগ্‌জাইল্', 'ঈষ্ট উইণ্ড্', 'ওয়েষ্ট উইণ্ড', 'দি মাদার' ও 'ফাইটিং এঞ্জেল'। এ ছাড়া কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ গল্পও আছে। এই বিষয়-বস্তুর বাহিরে অন্য বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি যে কয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অধুনা প্রকাশিত 'দিস্ প্রাউড্ হার্ট্' খুব প্রসিদ্ধ। এই উপন্যাসে তিনি নূতন সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। সমগ্রভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে, পার্ল বাক্ মার্কিণ লেখিকা হইলেও মার্কিণ সাহিত্যের সুলভ জৌলুষ তাঁহার রচনায় নাই। মানবতার গভীর বেদনাবোধই তাঁহার সাহিত্যের মূল উৎস।

সাহিত্যে যেমন সাংবাদিকতায়ও পার্ল বাকের তেমনি প্রতিষ্ঠা। তাঁহার সাংবাদিক জীবনের পরিচয় অনেকেরই জানা নাই। আমেরিকার প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'এশিয়া'র পুস্তক-সমালোচনা বিভাগের তিনি সম্পাদক এবং এই বিভাগটির সম্পাদনা ও পরিকল্পনায় গত ছয় বৎসর কালে তিনি যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে পার্ল বাকের সাংবাদিক-প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সুপ্রসিদ্ধ আত্ম-জীবনীর যে মূল্যবান সমালোচনাটি পার্ল বাক্ 'এশিয়া' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিতজীর মতে তাঁহার পুস্তকের শ্রেষ্ঠ আলোচনা কয়টির মধ্যে অন্যতম। পার্ল বাকেরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া উক্ত পত্রিকায় 'ফোর চ্যাপটারস' নাম দিয়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। ভারতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সম্পন্না এই মার্কিণ লেখিকার চক্ষে ভারত এক মহান মানবতার দেশ বলিয়া পরিগণিত।

স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে প্রথম উপন্যাস লিখিয়া যিনি যশস্বিনী হইয়াছিলেন, অষ্টাদশ বর্ষকাল 'ভারতী'র ন্যায় প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র সুযোগ্যভাবে সম্পাদন করিয়া যিনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, প্রায় ষাট বৎসর কালব্যাপী অক্লান্ত বাণীসেবার দ্বারা যিনি দেশবাসীকে সাহিত্যচর্য্যার এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গমহিলাগণের উন্নতিকল্পে এবং মহিলা শিল্পের উৎকর্ষ বিধানার্থ যিনি সখিসমিতি, মহিলা শিল্পমেলা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতির সাফল্যের জন্য যিনি তাঁহার স্বামীর সহিত একাগ্র চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাসে যাঁহার নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, এবার আমরা প্রতিভার সেই বরপুত্রীর উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

কলিকাতা যোড়াসাঁকোর যে ঠাকুর বংশ বহুকাল বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তারাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন ও করিবেন, স্বর্ণকুমারী সেই মহাবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক, সরল ও প্রাঞ্জল গদ্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔরসে রত্নগর্ভা দেবী সারদার গর্ভে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ ২৮শে অগষ্ট স্বর্ণকুমারীর জন্ম হয়।

সেকালে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে বিদ্যাশিক্ষার তাদৃশ সুবিধা না থাকিলেও ইঁহাদের বাটীতে একজন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুশিক্ষিতা বৈষ্ণবী বিদ্যাবিতরণার্থ আগমন করিতেন। স্বর্ণকুমারী একস্থানে লিখিয়াছেন—"আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণীও কাজকর্ম্মের অবসরে সারা-



জন্ম—১৪ই ভাদ্র, ১২৬২ সাল　　স্বর্ণকুমারী দেবী　　মৃত্যু—১৯শে আষাঢ়, ১৩৩৯ সাল

দিনই একখান বই হাতে; আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের তত্ত্ববিদ্যার সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মাসীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীন দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়ে-মহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী ভরা পুতুল, খেলানা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্দুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।"

অন্তঃপুরে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর নিকট দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করিয়া জনৈক পণ্ডিতের নিকট স্বর্ণকুমারীর সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার পর একজন খৃষ্টান মিশনারী মেয়ের নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ হয়; কিন্তু সে শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ না হওয়ায় মহর্ষি আদিসমাজের নবীন আচার্য্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে অন্তঃপুরে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইঁহার নিকট স্বর্ণকুমারী অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণের সঙ্গে অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজীস্কুলপাঠ্য পুস্তক পাঠ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তদীয় জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন: "এই সময়ে আমার সেজদাদাও (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। * * * আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরেজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি যেন উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরে দেখা গেল যে আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা।" পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত স্বর্ণকুমারী পরিণীতা হন। জানকীনাথ কৃষ্ণনগরে পঠদ্দশায় তদীয় গুরু পুণ্যশ্লোক রামতনুলাহিড়ী মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বিবাহের পর বৎসর স্বর্ণকুমারীর প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান বোম্বাই শাসন-পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য স্যর জ্যোৎস্নানাথ এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় সন্তান প্রসিদ্ধ দেশ-সেবিকা সরলা দেবী চৌধুরাণী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা উর্ম্মিলা দেবী শৈশবেই গতাসু হয়। সাহিত্যসেবায় ও সঙ্গীত চর্চ্চায় স্বর্ণকুমারী তাঁহার শিক্ষিত ও উদার-হৃদয় স্বামীর নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হন। তাঁহার Fatal Garland নামক ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকায় স্বর্ণকুমারী এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—"আমার পূজনীয় ও স্নেহময় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য যেভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎকালে হিন্দু বালিকাগণকে সেভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইত না। তথাপি আমার প্রিয়তম স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। আজ বহির্জগৎ আমাকে যেভাবে দেখিতে পাইতেছে, তিনিই আমাকে সেইভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ উপদেশে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও যেমন সন্তরণনিপুণ ব্যক্তি সহজে ও অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিয়া যায়, সাহিত্যজীবনের ঝটিকাময় ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিয়াছি। যদিও তিনি ইহলোকে বর্ত্তমান নাই, তাঁহার কল্যাণময়ী শক্তি এখনও আমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয় প্রভাব সঞ্চারিত করিতেছে এবং আমি প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহার সাহায্যকারী সবল হস্তের স্পর্শ অনুভব করিতেছি; আমার প্রত্যেক সাধু সংকল্পে তাঁহার সমর্থনসূচক উৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিতেছি। সাহিত্যের প্রতি যে গভীর প্রেম তিনি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে তৎকালীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানদ্যোতক মাসিকপত্রগুলির অন্যতম "ভারতী" মাসিকপত্রিকার সম্পাদনের দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে অনুপ্রেরিত করিয়াছিল এবং মানসিক স্বাধীনতার সুখের যে স্বাদ তিনি আমাকে উপভোগ করাইয়াছিলেন, তাহাই আমাকে আমার দেশবাসিগণের

সহিত বর্ত্তমান উন্নতিযুগের ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশে সহযোগিতা ও বিস্তারসাধনে সহায়তা করিতে উদ্দীপ্ত করিয়াছে।"

কিন্তু পিতা ও স্বামীর ন্যায় তাঁহার সাহিত্যানুরাগী ভ্রাতৃগণের নিকট হইতেও স্বর্ণকুমারী সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চ্চায় মন্দ উৎসাহ প্রাপ্ত হন নাই। সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং খুল্লতাত-পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ গৃহে যে সাহিত্যিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যজীবন তাহার নিকট অল্প ঋণী নহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তদীয় জীবন-স্মৃতিতে বলিয়াছেন—"জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে থাকায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।" অন্যত্র—"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিতাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। * * সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত। * * * স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চ্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি পূর্ণ হইয়া থাকিত।"

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারীর প্রথম গ্রন্থ "দীপ-নির্ব্বাণ" প্রকাশিত হয়। লেখিকার বয়স তখন অষ্টাদশবর্ষ মাত্র। ইহাই বঙ্গরমণী বিরচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'কলিকাতা রিভিউ' ত্রৈমাসিকে উহার পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক মহাশয় বলেন—

"Well, this book by a Bengali girl is an extremely creditable performance. * * * One of the most charming features of *Dipa-nirvan* is the chaste poetry which pervades it. Our fair authoress has a fine eye for all that is good and beautiful and sublime around us, and her manner of telling is accordingly poetical from beginning to end. And the excellence and perfection of her taste is simply attested by the exquisite grace, elegance, simplicity, music and eloquence of her style. She speaks of great and sublime things in the simplest of words. * * * The introduction proves the authoress to be a very learned student of Indian history and antiquities. Perhaps the excellence of her work is in a great measure due to her extensive knowledge of her country's history.

We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal."

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "ভারতী" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার প্রথম সম্পাদক হইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতে উহার সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। 'ভারতী'র অনেক পৃষ্ঠাই স্বর্ণকুমারীর রচনায় পূর্ণ হইতে লাগিল। 'ছিন্নমুকুল', 'মালতী', 'গাথা', এবং 'পৃথিবী'র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধনিচয় 'ভারতী'তেই সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত হয়। গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বোধ হয় পূর্ব্বে আর কোন বঙ্গমহিলা রচনা করেন নাই। সাত বৎসর 'ভারতী' সম্পাদিত করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ উহার সম্পাদনভার ত্যাগ করেন। উহা দ্বারা সমাজ ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বর্ণকুমারী উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) হইতে একাদশ বর্ষকাল অপূর্ব্ব কৃতিত্বসহকারে 'ভারতী' সম্পাদন করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবীর উপর সম্পাদনভার ন্যস্ত করেন। ১৩১৫ সালে তিনি পুনরায় স্বহস্তে 'ভারতী'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং ১৩২২ সালে স্বামীর পরলোকগমনে শোকবিহ্বলা হইয়া মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ভারার্পণ করেন। দুই বারে মোট আঠার বৎসরকাল স্বর্ণকুমারী 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনকালে ভারতী প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র বলিয়া গণ্য হইত এবং কোনও পুরুষ সাহিত্যিক সম্পাদিত

মাসিক পত্র অপেক্ষা উহা অল্প যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হয় নাই।

স্বর্ণকুমারীর অসংখ্য রচনা—উপন্যাস, ছোটগল্প, গাথা, কবিতা, নাটক, গান 'ভারতী'কে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। কতকগুলি রচনা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, সমস্ত রচনা সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্য-সেবার সৌভাগ্য অল্প লোকেরই ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রসিদ্ধতর গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দীপনির্ব্বাণ (১২৮৩), নব-কাহিনী (১২৮৩), বসন্ত-উৎসব (১২৮৬), গাথা (১২৮৭), মালতী (১২৮৮), পৃথিবী (১২৮৯), মিবার রাজ (১২৯৬), বিদ্রোহ (১২৯৭), স্নেহলতা (১২৯৯), ফুলের মালা (১৩০১), কবিতা ও গান (১৩০২), কাহাকে (১৩০৫), হুগলীর ইমামবাড়ী (১৩০৮), কৌতুক নাট্য (১৩০৮), দেব কৌতুক (১৩১২), কনে বদল (১৩১৩), পাকচক্র (১৩১৯), রাজকন্যা (১৩২০), বিচিত্রা, স্বপ্নপুরী, মিলন-রাত্রি, দিব্যকমল।

এতদ্ব্যতীত বহু বালকপাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্য-সেবা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ বাণীসেবার দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ 'কাহাকে' ও 'ফুলের মালা'র ইংরাজী অনুবাদ The unfinished Song ও Fatal Garland নামে লণ্ডনে টি ওয়ার্ণার লরি লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার দিব্যকমলের একটি জার্মান ভাষার অনুবাদ 'প্রিন্সেস কল্যাণী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। Short Stories নামে তাঁহার ছোটগল্পের একটি ইংরেজী সংস্করণ মান্দ্রাজে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কতকগুলি গল্প তেলেগু ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়াছে।

কেবল সাহিত্যসেবায় নহে, দেশহিতকর নানা অনুষ্ঠানে স্বর্ণকুমারী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১২৯৩ সালে তিনি 'সখি-সমিতি' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। উহার উদ্দেশ্য :—

(১) সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র সম্মিলনে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাববর্দ্ধন এবং তৎসঙ্গে দেশহিতকর কার্য্যসাধন।

(২) পিতা অক্ষম হইলে বালিকা কন্যাকে শিক্ষার্থে সাহায্যদান, অনাথ অসহায়া বিধবাদিগকে অর্থ সাহায্যদান এবং কোন বিধবা ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে আশ্রয়দান করিয়া যাহাতে তিনি দেশহিতকর কার্য্যে জীবনদান করিতে পারেন সেইরূপ শিক্ষাদান।

বায়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে মহিলাগণকে এইরূপ সভা-সমিতিতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের কার্য্য সম্পাদন করান যে কতদূর দুরূহ ছিল, তাহা আধুনিকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপিণী স্বর্ণকুমারী এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বলিয়াই এই সমিতি সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং সে যুগে অনেক সৎকার্য্য সাধিত করিয়াছিল। স্বর্ণকুমারী "মহিলা-শিল্প মেলা" নামক আর একটি অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। অন্তঃপুর মহিলাগণের হৃদয়-মনের প্রসারতা সম্পাদন এবং তাঁহাদের শিল্পোন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগের জন্য এবং মহিলাগণ কর্ত্তৃক বৎসরান্তে উক্ত নামে একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী সংগঠিত হইত। এই প্রদর্শনীতে বোম্বাই, আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর, কানপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের শিল্পাদি রক্ষিত হইত এবং মহিলাগণ তাঁহাদের রচিত নানারূপ শিল্পও প্রেরণ করিতেন। শিল্প-নৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অন্তঃপুর মহিলাগণের নিকট 'মহিলা শিল্পমেলা' একটি বিশেষ আনন্দ উৎসব বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা প্রতি বৎসর ইহার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এই মেলা হইতে যে অর্থ লাভ হইত, তাহা 'সখি-সমিতি'র ভাণ্ডারে যাইত।

স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ এদেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। যথার্থ সহধর্ম্মিণীর ন্যায় স্বর্ণকুমারী রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার স্বামীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে বাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে তিনি, ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও বসন্তকুমারী দাস প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। পরবৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতের তিনি প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যের অক্লান্ত সেবা দ্বারা তিনি সাহিত্য সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই জন্য ১৩৩৬

সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বর্ণকুমারী সভানেত্রীর আসনে বৃত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহার প্রতিভার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকলেখিকাগণকে প্রদান করিবার জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার রত্নাগর্ভা জননী জগত্তারিণীর নামে যে পদকের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই পদক স্বর্ণকুমারীকে প্রদান করা হইয়াছিল।

১৩৩৯ সালে ১৯শে আষাঢ় বালিগঞ্জে তাঁহার বাসভবনে স্বর্ণকুমারী দেহরক্ষা করেন।

পথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

দুই ধারে ধান ক্ষেত আঁকা বাঁকা পথ,
ওই পথ দিয়ে ধায় মোর মনোরথ।
ওই পথে আনা-গোনা
প্রীতির পড়েন টানা—
যোগ ক'রে রেখেছিল স্বর্গ-মরত।

২

পরিচিত প্রতি তরু রূপ কি শ্যামল—
আগ কত আতিথেয় ছায়া সুশীতল।
গুল্মের ও ফুলগুলি
চাহিত যে মুখ তুলি,
হরষ জানাত পাখী করি কলকল।

৩

দীঘিভরা পদ্মেরা চাহি বারবার—
চেষ্টা করিত যেন কথা কহিবার।
শঙ্খ চিলের দল
সুধাইত কি কুশল?
পথিকের প্রণতিতে পথ একাকার।

৪

আজি হায় ফুরায়েছে সে পথের কাজ
পিচ্ ঢালা পথে ডাকে সভ্য সমাজ।
আনমনা হরিণে সে
বনভূমি ভুলায়েছে—
বংশীর সাড়া তবু জাগে মন মাঝ।

৫

লাগে না ক' ভাল এই জনকোলাহল
যে পথের লাগি মোর চিত চঞ্চল।
পলে পলে পায় প্রাণ
সেই সে পথের টান,
তার সে মাটীর মায়া করিছে বিকল

৬

পাকা পথে চলা মোর কভু কি মানায়,
চোখে জল ভ'রে ওঠে কানায় কানায়।
মৃত মৃত্তিকাবৎ
আছে ছায়া, আছে পথ,
হায় তাতে ছায়াপথ আর কে বানায়?

বেদে বাল্যবিবাহ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

প্রবন্ধ

পাশ্চাত্য শিক্ষিত আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে বৈদিক যুগে বাল্য-বিবাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল না, রমণীগণ যৌবনপ্রাপ্ত হইবার পর স্বয়ং পতি নির্বাচন করিতেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, পরবর্তী যুগে এই বৈদিক প্রথা পরিবর্তিত হয় এবং বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়; মনু, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিতে এই পরবর্তী প্রথার উল্লেখ দেখা যায়। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে দেখিতে পাইব যে, বেদের প্রাচীন অংশেও বালিকার অল্প বয়সে বিবাহের উল্লেখ আছে; মনু, পরাশর প্রভৃতির ব্যবস্থা বেদবিরোধী. এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; বরং একটী প্রাচীন বেদ মন্ত্রের সূক্ষ্ম অর্থ আলোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন হইবে যে বালিকার অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত ইহাই বেদের অভিপ্রায়।

ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম মণ্ডল, ১২৬ সূক্ত, ৬ এবং ৭ ঋকে বৃহস্পতির কন্যা রোমশা এবং বৃহস্পতির জামাতা ভাবযব্যের কথোপকথনের উল্লেখ আছে। ভাবযব্য বলিতেছেন,

আগধিতা পরিগধিতা যা কশীকেব জংগহে
দদাতি মহ্যং যাদুরী যাশূনাং ভোজ্যাশতা।

—ঋগ্বেদ, ১।১২৬।৬

রোমশা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভাবযব্য উপহাস করিয়া বলিতেছেন যে, রোমশা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। ইহার উত্তরে রোমশা বলিতেছেন—

উপোপ মে পরামৃশ মামে দভ্রাণিমন্যথাঃ।
সর্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা॥

—ঋগ্বেদ, ১।১২৬।৭

ইহার তাৎপর্য এইরূপ যে, রোমশা ছোট নহেন, তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সায়ণাচার্যের ভাষ্য এইরূপ—"উপ উপেত্য * * মে মম গোপনীয়ং অঙ্গং পরমৃশ সম্যক্ স্পৃশ। মে অঙ্গানি রোমাণি দভ্রাণি মা মন্যথাঃ, অল্পানি মাবুধ্যস্ব, অদভ্ররোমশা বহু রোমযুক্তা অস্মি। অতঃ সর্বা সংপূর্ণাবয়বা অস্মি।"

যদি যুবতী-বিবাহই বৈদিক যুগে একমাত্র প্রচলিত প্রথা হইত তাহা হইলে ভাবযব্যের মনে এরূপ আশঙ্কা উঠিত না যে, রোমশা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। ভাবযব্যের মনে এই সংদেহের উদয় হওয়াতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে সে সময় বাল্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই কথোপকথনের সময় রোমশা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহা সত্য। কিন্তু এই কথোপকথন যে বিবাহের অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। বহু দিন একত্র বাস করিবার ফলে স্বাভাবিক সংকোচ দূর হইলেই এইভাবে কথোপকথন সম্ভবপর হয়। বিবাহের সময় রোমশা অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন, তাহার পর তিনি যে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহার স্বামী ভাবযব্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ঋগ্বেদ সংহিতার অন্যত্রও বাল্যবিবাহের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ ১।১১৬।১ ঋকে দেখা যায় যে, রাজকুমার বিমদ যখন তাঁহার নব-বিবাহিতা পত্নী লইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন; তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করেন; তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিমদের পত্নীকে নিরাপদে গৃহে পৌছাইয়া দেন। এই ঋকে বলা হইয়াছে "যৌ (অশ্বিনীদ্বয়) অর্ভগায় (বালকায়) বিমদায় (এতৎ সংজ্ঞায় রাজর্ষয়ে) সেনাজুবা (শত্রুভিঃ দুষ্প্রাপেন) রথেন ন্যূহতু (বাহিতবন্তৌ)।" বিমদকে যখন বালক বলা হইয়াছে তখন তাঁহার পত্নীর যৌবনের পূর্বেই বিবাহ হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সায়ণাচার্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বিমদ তাঁহার পত্নীকে স্বয়ম্বর সভায় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূল মন্ত্রে স্বয়ম্বরের কোনও উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদ সংহিতা ১-১২৪-৭ এবং ৩-৩১-১ এ পুত্রিকাপুত্র প্রথার উল্লেখ আছে। পুত্রিকাপুত্র প্রথাতে পিতা কন্যার বিবাহ দেন এই সর্তে যে প্রথম পুত্র কন্যার পিতা পাইবেন। এই প্রথাতে পিতাই কন্যার বিবাহ স্থির করেন। সুতরাং ইহা স্বয়ম্বর প্রথা নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উষস্তি ঋষির পত্নীকে "আটিকী" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আটিকী শব্দের অর্থ—যে রমণীর স্তনোদ্গম হয় নাই।

এক্ষণে বেদে যে সকল স্থলে স্বয়ম্বর প্রথার উল্লেখ আছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

কিয়তী যোষা মর্য্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পণ্যসা বার্য্যেণ
ভদ্রাবধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনেচিৎ।
— ঋগ্বেদ, ১-২৭-১২

"কতকগুলি রমণী মনোহর বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া অযোগ্য পতি নির্বাচন করে—যাহারা ধনী এবং রমণীপ্রিয়। যে রমণী কল্যাণগুণযুক্তা এবং সুন্দরী সে স্বয়ং সৎপাত্র বরণ করে।"

এখানে স্বয়ম্বর প্রথার উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যায় না যে, সে সময় কেবলমাত্র স্বয়ম্বর প্রথাই প্রচলিত ছিল। কারণ পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, ঋগ্বেদ সংহিতাতে বাল্যবিবাহের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের এই মন্ত্র (১০-২৭-১২) হইতে এরূপও অনুমান করা যায় না যে স্বয়ম্বর প্রথাই উত্তম, ইহাই বেদের অভিপ্রায়। শ্লোকটির তাৎপর্য আলোচনা না করিলে বরং ইহার বিপরীতই প্রতীতি হইবে। বেদ বলিতেছেন যে, কতকগুলি রমণী অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে পতিত্বে বরন করে, যে রমণী কল্যাণগুণযুক্ত অর্থাৎ সুবুদ্ধিমতী সুন্দরী সে উত্তম পতি নির্বাচন করে। উত্তম পতি নির্বাচন করিবার জন্য দুইটি গুণ প্রয়োজন—সুবুদ্ধি ও সৌন্দর্য। কেবল সৌন্দর্য থাকিলে ধনী ব্যক্তি কর্তৃক প্রতারিত হইতে পারে; কেবল সুবুদ্ধি থাকিলে উত্তম পতি কর্তৃক মনোনীত না হইতে পারে। উভয় গুণের একত্র সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। সুতরাং কন্যার উপর পাত্র নির্বাচনের ভার থাকিলে অধিকাংশ স্থলে সে নির্বাচন বাঞ্ছনীয় হইবে না। পিতার অভিজ্ঞতা অধিক; তিনি স্বভাবতই কন্যার হিতাকাংখী; সুতরাং তিনি স্থির বুদ্ধিতে যে পাত্র নির্বাচন করিবেন তাহা কল্যাণজনক হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু পিতা যদি পাত্র নির্বাচন করেন তাহা হইলে কন্যার বয়স অল্প হওয়া উচিত। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার একটি নিজস্ব মতের অনুকূল না হওয়াই সম্ভব। ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সবিতা সোমের সহিত তাঁহার কন্যা সূর্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্যা অশ্বিনীদ্বয়কে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহাদের রথে উঠিয়া বধূরূপে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন (ঋগ্বেদ সংহিতা, ১।১১৯।৫ এবং ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০।৮৫ সূক্তের সায়ণ-ভাষ্যের উপক্রমণিকা দেখুন)। বলা বাহুল্য, সূর্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মনুসংহিতাতে পিতা কর্তৃক পাত্র নির্বাচন এবং স্বয়ং কন্যা কর্তৃক পাত্র নির্বাচন উভয়েরই উল্লেখ আছে এবং পিতা কর্তৃক পাত্র নির্বাচনপ্রথার প্রশংসা আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য, এই চারি প্রকার বিবাহে পিতাই পাত্র নির্বাচন করেন (মনু, ৩।২৭-৩০)। স্বয়ম্বর প্রথা গান্ধর্ব বিবাহের অন্তর্গত। মনু ৩।৪১ এ গান্ধর্ব প্রভৃতি বিবাহের নিন্দা আছে। ৯।৯০ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, তাহার মধ্যেও তাহার পিতা বিবাহ না দিলে নিজেই পাত্র নির্বাচন করিবে। মনু ৯।৮৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, কন্যা ঋতুমতী হইলেও আমরণ পিতৃগৃহেই থাকিবেন বরং তাহাও বাঞ্ছনীয়, কিন্তু গুণহীন পাত্রে কখনও সমর্পণ করা উচিত নহে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণত ঋতুমতী হইবার পূর্বে বিবাহ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে গুণবান পাত্র না পাওয়া গেলে ঋতুমতী হইলেও অবিবাহিত রাখা যাইতে পারে। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে মনুর ব্যবস্থা বেদানুযায়ী—উহা বেদবিরোধী নহে। সে ব্যবস্থা এই যে, কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্বে তাহার পিতা উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করিয়া তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ দিতে না পারেন, তাহা হইলে পাত্র নির্বাচন করিবার ক্ষমতা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন, তখন কন্যা মনোমত স্বজাতীয় পতি নির্বাচন করিবেন। কন্যা ঐরূপ বয়সপ্রাপ্ত হইবার পরে তাঁহার অবিবাহিত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

গৃহ্যসূত্রে এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে,

বিবাহের পর তিন রাত্রি পতি পত্নীকে সম্ভোগ করিবেন না, চতুর্থ রাত্রিতে করিবেন। ইহা হইতে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কন্যা রজঃস্বলা হইবার পূর্বে তাঁহার বিবাহ দেওয়া বেদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু এই যুক্তি যথার্থ নহে। যে ক্ষেত্রে কন্যা রজঃস্বলা হয় নাই সে ক্ষেত্রে পত্নীতে উপগত হওয়া অবশ্যই অন্যায়। (পূর্বোদ্ধৃত রোমশা ও ভাবযব্য সংবাদে এ বিষয়ে বেদের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট)—যে-ক্ষেত্রে কন্যা রজঃস্বলা হইবার পর বিবাহ হইয়াছে (যেমন স্বয়ম্বর প্রথা) সে ক্ষেত্রে চতুর্থ রাত্রিতে সম্ভোগের বিধান প্রযোজ্য। সূত্রকারের যদি এরূপ অভিপ্রায় হইত যে, অজাতরজা কুমারীর বিবাহ হইবে না তাহা হইলে সেকথা স্পষ্টভাবেই বলা হইত।

বিবাহের মন্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, পত্নী পুত্রবতী হইবে। ইহারও উদ্দেশ্য কন্যা ভবিষ্যতে পুত্রবতী হইবে। বিবাহের সময় কন্যা পুত্রধারণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

পৌরাণিক যুগে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে স্বয়ম্বরেব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বয়ম্বরের উদ্দেশ্য এই যে ১৪ বা ১৫ বৎসরের পর কন্যা যেন অনূঢ়া না থাকে। অধিকন্তু ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই যে কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইবার পর বিবাহ হইত ইহা বলা যায় না। সীতার সাত বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। দণ্ডকারণ্যে রাবণ যখন ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করিতে আসিয়াছিল তখন সীতা বলিয়াছিলেন যে, বিবাহের পর তিনি ১২ বৎসর অযোধ্যায় বাস করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। অতএব ক্ষত্রিয় রমণীদের কোনও ক্ষেত্রে ঋতুর পূর্বে বিবাহ হইত, কোনও ক্ষেত্রে ঋতুর পর বিবাহ হইত—কোনও ক্ষেত্রেই ১৫।১৬ বৎসরের পর বিবাহ হইত না।

বৃহস্পতি, ভাবযব্য, উষস্তি ইঁহারা সকলে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বৃহস্পতি অজাতরজা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ভাবযব্য ও উষস্তি অজাতরজা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের আচরণ কখনও বেদবিরোধী হইতে পারে না।

মনু পরাশর প্রভৃতি স্মৃতির ব্যবস্থা যে বেদানুযায়ী, তাহা সকল প্রাচীন বৈদিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং মনুর ব্যবস্থা প্রামাণিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বেদ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মনু-সংহিতা সমর্থন করিয়াছেন :

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজং

অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন সকলই ঔষধের ন্যায় হিতকারী। বলা বাহুল্য, শঙ্কর ও রামানুজের বহু শতাব্দী পূর্বে মনু সংহিতা বর্তমান আকারে বিদ্যমান ছিল।

বিচারপতি লিণ্ড্‌সে তাঁহার প্রণীত 'রিভোল্ট অফ মডার্ন ইয়ুথ' গ্রন্থে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন যে, আমেরিকায় যে সকল বালিকা স্কুল-কলেজে পড়ে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের চরিত্র দূষিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা দেখিয়া আমাদের এইরূপ শিক্ষালাভ করা উচিত যে, অল্প বয়সে বিবাহের শাস্ত্রানুমোদিত প্রাচীন ব্যবস্থাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক।



কার্ত্তিকের বাতিক

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ

১

সকাল বেলা সিদ্ধেশ্বর কার্ত্তিকের বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখে কার্ত্তিক মনোযোগ দিয়া কি লিখিতেছে। সিদ্ধেশ্বরকে দেখিয়াই কার্ত্তিক লেখাটা চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কখন ফিরলে? একেবারে দেড়মাস! আমরা তো চিন্তিতই হয়েই পড়েছিলাম।

—কাল রাত্রে এসেছি। মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গাতেই ঘুরলাম। দু-তিনটা শহরে আমাদের ইন্‌সিওর‍্যান্স অফিসের ব্র্যাঞ্চ্ খুল্‌বার সব বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি। তুমি বুঝি সাহিত্য-সভার অধিবেশনের জন্যই কিছু লিখ্‌ছিলে? কি দেখি?

—এখনও শেষ হয় নি। শেষ ক'রে একেবারে সেই দিনই শুনাব।

—প্রবন্ধ, না গল্প?

—গল্প। কিন্তু নাম দিয়েছি—"সাহিত্য-সাধনায় সিন্দুকের প্রভাব।"

প্রভাবতী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—তোমার যে বাজারে যাওয়ার কথা ছিল, মনে আছে?

—ড্যাম্ ইওর বাজার। সকালে উঠেই আমি ঐ সব বাজে কাজে বেরোই আর কি! আমার তো আর সময়ের দাম নেই!

—কেমন বৌদি, কেমন আছেন?

—ভালই।

নির্ম্মলা দুইটা বড় বড় ফুলকপি হাতে ঘরে ঢুকিয়া কার্ত্তিকের দিকে তাকাইয়া কহিল—এবারকার কপিগুলি খুব ভাল। প্রভাবতীকে কহিল—এই দুইটা নিয়ে যাও, ভাই। প্রভাবতী কপি দুইটি হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া প্রশংসা করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। নির্ম্মলা ঐ কপি দুইটিরই পার্শ্বে টেবিলটার উপরে বসিয়া পড়িল। প্রভাবতী নির্ম্মলার পার্শ্বে টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বর কার্ত্তিককে কহিল—দাদার লেখা কতক্ষণ চলছে?

প্রভাবতী উত্তর দিল—বাতিক, বাতিক। শুদ্ধু বাতিক। ওঁর দ্বারা কোনও কাজের আশা নেই। সংসার বয়ে যাক, আমরা রসাতলে যাই—উনি লেখা নিয়েই মেতে আছেন।

—তোমাকে কার্লাইলের কথা শুনিয়েছি না? তোমাকে বিয়ে ক'রে যখন বাংলা ছেড়ে এই দেশে নিয়ে আসি, তখনকার সেই প্রথম বৎসরটির কথা মনে রেখো। কত কথা, কত গল্প, কত আলোচনা। আলোচনার প্রসঙ্গে কতবার বলেছি—প্রভা, তোমাকে নিয়ে এসে আমি যেন জেন্ বেলী ওয়েল্‌স্‌কে এনেছি। কেমন?—বলেছ—হুঁ।—কিন্তু রাখ্‌তে পারছ না। ধৈর্য্য, প্রভা! কার্লাইলের 'সারটর্ রিসারটাস্' কোনও প্রকাশকই নিতে চায় নি! এমন দিনও তাঁর ছিল। আবার তাঁরই হ'ল 'ফরাসী বিপ্লব'—ইংরেজীতে একটা স্মরণীয় দান। জেনে রেখো প্রভা, বাতিক ব'লে উড়িয়ে দেবার জিনিষ এ নয়। এরই থেকে এক দিন তোমার আনন্দ আস্‌বে। সেই দিনই আমার সার্থকতা। মাসিক পত্রিকায় এক-একটা ক'রে ছোট গল্প ছাড়্‌ব, আর এই এক-একটি ক'রে গল্প শ্রীমতী প্রভাবতীর হাতে এনে দেবে পঁচিশটি ক'রে টাকা। মাসে দু-তিনটি পত্রিকায় এমনি দুটি-তিনটি ক'রে গল্প যাবে। পঞ্চাশ-পঁচাত্তর ক'রে উপরি আয় যদি মাসে হয়, তবে সিদ্ধেশ্বরের বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি তুমি কিছু ক'রে দিতে পার্‌বে প্রভা। গল্পের পরিচ্ছদে প্রবন্ধের যে ভাস্বর মূর্ত্তি দীপ্তি পাবে, তা মনীষীদের চোখে পড়্‌বেই।

নির্ম্মলা আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতেছিল। কার্ত্তিকের সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধি সম্বন্ধে প্রভার মত নির্ম্মলার নাস্তিকতা নাই। কার্ত্তিকের সাহিত্যালোচনা নির্ম্মলা অনেক সময়ই মন দিয়া শোনে।

নির্ম্মলা কহিল—পরশু দিন যে পদ্যটা লিখেছিলেন, বেশ হয়েছে। পড়ুন না আবার ঐ পদ্যটি।

সিদ্ধেশ্বর কহিল—কার্ত্তিক পদ্যও লিখ্‌তে সুরু করেছে নাকি? রবীন্দ্রনাথের পরে তা হ'লে কার্ত্তিক মিত্রই দাঁড়িয়ে যাবে!

কার্ত্তিক এই শ্লেষটার জবাব না দিয়া গম্ভীর হইয়া গেল। কার্ত্তিক বুঝিতে পারিতেছিল না যে, এটা সিদ্ধেশ্বরের শ্লেষবাক্য, না সত্য-সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণী। স্বীয় কৃতিত্বে অবিশ্বাস থাকিলে কয়জন লেখক মাসের পর মাস দিবারাত্র মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে পারিত? উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা গভীর বিশ্বাসই তো মানুষকে অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়া থাকে, ধৈর্য্য দিয়া থাকে। আশু সাফল্য কয় জনের ভাগ্যে হয়? কে বলিতে পারে, কার্ত্তিক মিত্র একদিন রবীন্দ্রনাথের মতই যুগান্তকারী লেখক হইবে না? গদ্য, পদ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই কার্ত্তিককে বিচরণ করিতে হইবে। কার্ত্তিক তাই অনবরত লিখিয়া চলিয়াছে। তার প্রশংসাকারী বন্ধুও আছে। প্রভাটা একটা 'ইডিয়ট্'। নির্ম্মলার মত সাহিত্য-রস ওতে নাই।

নির্ম্মলা কহিল—জগতে কিছুই অসম্ভব না। কোনটাই অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বীর নেপোলিয়ান্ 'অসম্ভব' শব্দটাই অস্বীকার করত।

কার্ত্তিক কহিল—হোক না হোক, একটা মানসিক জোর তাতে পাওয়া যায়। ঐকান্তিক ইচ্ছার ফল জগতে দুর্লভ—এটা আমার মনে হয় না।

—সেই পদ্যটা পড়ুন না।

—এর মধ্যে আরও তিনটা লিখেছি। চারটা পদ্য লিখে ফেলেছি। ভাল বোধ হ'ল না। আজ আবার একটা গল্প লিখ্‌তে সুরু করেছি।

প্রভাবতী কহিল—এই যে আট বৎসর ধরে সাহিত্য-সাধনা করছ, এর মধ্যে সাহিত্য লিখে কয়টা পয়সা আন্‌লে? একটা পয়সাও লাভ ক'রেছ? অথচ সময় নষ্ট, মাথা নষ্ট, সংসারে অমনোযোগ নিয়ত। তোমার ও কিছুই হয় না। আবার বল্‌ছেন, এক-একটা গল্পে পঁচিশ-পঁচিশ টাকা! আকাশ-কুসুম ছেড়ে সংসারটা একটু দেখ। এ বাতিকে কোন লাভ নেই। সুদীর্ঘ আট বৎসরে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

—অতীত তো শুধু সাধনায় কাটে। ফল তার ভবিষ্যতে। প্রভা, কার্ত্তিকের বাতিক যে দিন সফল হবে সে দিন গললগ্নকৃতবাসে অতি বিনয়ে আমায় স্তুতি করতে আসবে।

সিদ্ধেশ্বর কহিল—তোমার পদ্যটা না হয় শুনাও। নির্ম্মলার এত ভাল লেগেছে। কি লিখেছ, শোনাই যাক।

কার্ত্তিক মনে মনে কিন্তু বিচলিত হইয়াছিল। প্রভার কথা তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। আটটি বৎসর ধরিয়া সে সাহিত্য-সাধনা করিয়া আসিয়াছে। তাহার বন্ধু-মহলে সাহিত্যিক বলিয়া তাহার একটা নামও হইয়াছে। কিন্তু নাম, যশঃ, লেখা সবই মিথ্যা। এই আটটি বৎসরে সাহিত্য তাহাকে একটি পয়সাও দান করে নাই। পয়সা চাই, টাকা চাই। আমার লেখা যখন ইহা আনে নাই, তখন এ লেখার কোনো মানেই হয় না। এ অন্যায় বাতিককে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।

কার্ত্তিক নির্ম্মলার দিকে তাকাইয়া কহিল—পদ্যটদ্য চুলোয় যাক। আমাকে মাপ করুন, বৌদি। ও কিছুই হয় নাই। সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাইয়া কহিল—চল, বাজারে যাই।

২

শহরের অন্যত্র এক আড্ডায় দুই-তিন জন ভদ্রলোকের মধ্যে এই আলোচনা চলিতেছিল:

—যাই বল, আমি জোর ক'রেই বল্‌তে পারি, কার্ত্তিকবাবুর চরিত্র নির্ম্মল। তোমরা অকারণ—

—তোমার বিশ্বাস, আর আমাদের চোখে দেখা। কোন্‌টা বড় শুনি?

—আমি আগেই বলেছিলাম না, ভদ্রলোক লাভ্‌-সিক্? আমাদের দুজনের চোখে দেখার কাছে ওর একজনের বিশ্বাসকে কে মান্‌ছে?

—আমিও তাই বলি। লজিকে যে চার রকম 'প্রমাণের' উল্লেখ আছে, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সবার বড়। তাছাড়া এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্বাস আবার কি? প্রত্যক্ষ দর্শনে যা সাব্যস্ত হ'বে তাই সত্য।

—পদ্যটা কত পৃষ্ঠা বল্‌লে?

—একুশ পৃষ্ঠা।

—একুশ! পদ্য একুশ পৃষ্ঠা! যে জীবনে কোন দিন পদ্য লেখে নাই, সে একুশ পৃষ্ঠা পদ্য লিখেছে?

—লব্‌-সিক্, লব্‌-সিক্—

—লভ্‌......সিক্ আবার কি? রীতিমত লভ্‌, অর্থাৎ প্রেম। "ক্ষুধা" নামটাই তো তা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে।

—কাল সন্ধ্যায় ওঁর 'ক্ষুধা' শোন্‌বার পরে আজ পর্য্যন্ত আমার ক্ষুধা হয় নি। কি একটা সন্দেহ, কি একটা ভাব সারা রাত্রি আমাকে পীড়া দিতে লাগ্‌ল। সকালে উঠে কার্ত্তিকবাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। পদ্যটি চেয়ে নিয়ে নিজে পড়্‌লাম; পদ্যটার মধ্যে 'প্রেম' শব্দ ষোলবার উল্লিখিত হয়েছে। উর্ম্মিলার নাম একত্রিশ বার। উর্ব্বশীর সঙ্গে উপমা সাতবার। 'সুন্দরী' পনরবার এবং 'প্রাণ' বিশবার।

—তুমি যে "ক্ষুধা"টার ওপরেই একটা মৌলিক গবেষণা করেছ।

—মৌলিক আবার কি? এ তো সকলেই বুঝ্‌তে পারে। জলের মতো সহজ সরল। উর্ম্মিলা নামটা থেকে তোমরা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? এইখানেই তো স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। একটা বিশেষ ইঙ্গিত—

—কেউ বিশ্বাস করে করুক, না করে না করুক। আমার প্রত্যক্ষ কথা আমি ব'লেই রেখেছি। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট দেখেছি, কার্ত্তিকবাবু পদ্য পড়্‌ছেন, আর নির্ম্মলা একলা ঘরে কার্ত্তিকবাবুর পদ্য হাঁ ক'রে শুন্‌ছে। সিদ্ধেশ্বরবাবু তো প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘোরেন। বেশ সুবিধা হয়েছে।

—কার্ত্তিকবাবুর স্ত্রী ছিলেন না?

—কি জানি, কোথায় গেছলেন।

—এই যে আসুন, নমস্কার।

—দী রবীন্দ্রনাথ অফ্‌ মধ্যপ্রদেশ।

—আরে, এত বড় সম্মান আমাকে...

—আপনার 'ক্ষুধা' চিরকাল আমাদের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাক্‌বে।

—মনে, না উদরে?...যাই বলুন, যতদিন টাকা না পাচ্ছি...

এই বলিয়া কার্ত্তিক গম্ভীর মুখে বসিয়া পড়িল। একটা চাপা হাসি অনুভব করা গেল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতার পরে আবার কথা চলিতে লাগিল। কথার গতি ধারাবাহিক হইলেও বাঁক ঘুরিয়াছে।

—আজকাল সাহিত্যে কেবল নকল চলেছে।

—আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি, কাল সাহিত্যের অধিবেশনে যে কয়টি পদ্য পড়া হয়েছে তার অনেকগুলিই নকল।

—নকল ছাড়া আর রোজ রোজ নূতন কোত্থেকে আসবে বল?

—আচ্ছা, কার্ত্তিকবাবু! টাকা পান না, টাকা পান না বলেন। কিন্তু বিশ্বাস হয় না। বড় বড় মাসিক পত্রিকা ছাপানো প্রতি পৃষ্ঠার পাঁচ টাকা ক'রে দেয়। বড় পত্রিকা মানেই য়্যারিষ্টক্র্যাটিক্ পত্রিকা। লেখা নিয়ে টাকা না দেওয়াটাই এরা হীনতা মনে করে।

কার্ত্তিক হাসিয়া উত্তর দিল—সেদিন আর নেই। শত শত লেখক বিনা পয়সায় লেখা দিতে রাজী। লেখা ফেরত দেওয়ার জন্যই পত্রিকার সম্পাদকদের একটা বিভাগ খুল্‌তে হয়। এই প্রতিযোগিতার দিনে কোন্ মূর্খ সম্পাদক পয়সা দিয়ে লেখা নেবে?

—তাই তো। পয়সা না পেলেই বা সাহিত্য বাঁচে কি ক'রে?

শরৎবাবু, রবিবাবু ছাড়া কাউকে পয়সা দেব না—এই বা কি বিচার? সবখানেই যেমন গুন্ গুন্ মানে নিজ নিজ, তেমনি তেলে মাথায় তেল।

—উঠ্‌লেন যে, কার্ত্তিকবাবু?

—একটা কাজ আছে। আসি।

৩

অনেক দিনের বিষণ্ণতার পরে কার্ত্তিকের মনে কয়েক দিন আনন্দ হইয়াছে। কার্ত্তিক মিত্রের লেখা মধ্যে মধ্যে দুই-একটা মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। 'ক্ষুধা'ও তেমনই বাহির হইয়াছে। তাতে আর নূতন আনন্দ কি? কিন্তু অন্যান্য অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজে 'ক্ষুধা'র অযাচিত সুবিস্তৃত সপ্রশংস সমালোচনা পড়িয়া কার্ত্তিক অত্যন্ত খুশী না হইয়া পারে নাই। এ রকম এই প্রথম। 'ক্ষুধা'র এত অভ্যর্থনা? এ কি? সত্যই কি সে সুলেখক! কিন্তু জীবনব্যাপী নিষ্কাম কর্ম্ম! অত্যন্ত খুশী ভাবে কাটে। তবুও একটু আনন্দ মনের মধ্যে থাকে।

'ক্ষুধা'ই কার্ত্তিকের মনে। ঈজি চেয়ারের উপর উপবিষ্ট কার্ত্তিক ঈজি চেয়ার ছাড়িয়া ঐ টেবিলের পার্শ্বে লেখার চেয়ারটায় গিয়া বসিয়া দোয়াত, কলম ও কাগজ হাতে লইবার সাহস পাইতেছে না। বার বার করিয়া প্রভাবতী বলিয়া যাইতেছে—কই, এখনও বাজারে গেলে না!

কার্ত্তিক প্রভাবতীকে কি ভয় করিতেছে? ভয় না, লেখার সময় বিঘ্ন হইলে লেখা অগ্রসর হয় না। এক ফাঁকে কার্ত্তিক দোয়াত কলম হাতে লইয়াছে। প্রভাবতী রূঢ় ভাবে কহিল—সে দিনও গেলে না, আজও নড়্‌ছ না। তাহলে সে জিনিষটা কি আর আনা হ'বে না?

—প্রভা, তুমি সাহিত্যের মর্য্যাদা বোঝ না।

—খুব বুঝি। কিন্তু যাতে পয়সা নেই তা নিয়ে সময়ের অপব্যবহার করাকে আমি বাতিক মনে করি।

—পয়সা আসবে।

—তোমার লেখায় পয়সা? পয়সা আসবে ব'লে এই যে মেতে থাকা এ শুধু বাতিক নয়, এ শুধু বদনেশা নয়, এটা একটা কুঁড়েমি মাত্র নয়—এ অন্ধতা; তুমি নিজেকে বুঝ্‌তে পারছ না যে, তুমি মোটেই একজন ভাল লেখক নও, তোমার লেখা কিছুই হয় না। তুমিই গল্প করেছ, লেখকেরা লেখা দিয়ে পয়সা পায়। তুমি আজও একটা পয়সা পাও নি। তুমি অন্ধ হ'য়ে গেছ। নিজেকে চিন্‌তে পারছ না। বাতিক ছাড়।

কার্ত্তিক আজ স্থিরনেত্রে প্রভাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিল। নিষ্পলকদৃষ্টিতে প্রভাবতীকে কিয়ৎকাল দেখিল। স্তম্ভ হইয়া ক্ষণকাল ভাবিল। প্রভাকে সে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে—নিজের অন্ধতায়। কার্ত্তিক নূতন দৃষ্টি পাইল। প্রভাকে সে ভালবাসিবে। তার নেশা—তার অর্থহীন নেশা—সে ছাড়িবে। কার্ত্তিক আজ নিজে উপলব্ধি করিল, লেখা তার বাতিক। সে উপলব্ধি করিল, লেখার মূল্য থাকিলে অবশ্যই তা অর্থ আনে। আট বৎসর, নয় বৎসর! না, মূল্য নাই, মূল্য নাই।

সহসা কার্ত্তিক লেখার তাড়া বাহির করিয়া তার অপ্রকাশিত নূতন পুরাতন সমস্ত লেখা ছিন্ন ছিন্ন করিয়া মেঝের উপরে ফেলিয়া দিল।

প্রভা আকস্মিকভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুঃখে অনুতাপের সুরে কহিয়া উঠিল—এ কি করলে, এ কি করলে? প্রভা মেঝের উপরে লুণ্ঠিত ছিন্ন কাগজগুলির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার চোখে অশ্রু-কণা। বাতাসে ছিন্ন টুক্‌রাগুলি উড়াইয়া ঘরময় ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

সিদ্ধেশ্বর আর নির্ম্মলা এক সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকিয়া দেখে—এই দৃশ্য।

নির্ম্মলা ডাকিল—প্রভা! প্রভা উত্তর না দিয়া চক্ষে আঁচল চাপা দিয়া ক্ষিপ্রবেগে অন্দরে চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর কহিল—কি ব্যাপার কার্ত্তিক?

কার্ত্তিক কহিল—বাতিক ছেড়ে দেব।

এমন সময় পিওন আসিয়া একখানা এন্‌ভেলাপ্ ও একটা 'মণি-অর্ডার' কার্ত্তিকের হাতে অর্পণ করিল। এন্‌ভেলাপ্‌খানা খুলিতে খুলিতে কার্ত্তিক করুণভাবে কহিল—ঐ দেখুন বৌদি, সব ছিঁড়ে ফেলেছি। কহিয়া সে পত্রখানি শেষ করিল। যে মাসিক পত্রিকা 'ক্ষুধা' ছাপাইয়াছে, তাহার কর্ত্তৃপক্ষ কার্ত্তিকের কাব্য 'ক্ষুধা'র জন্য ৫০৲ টাকা পাঠাইয়াছে এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও লেখা চাহিয়াছে। কার্ত্তিক সিদ্ধেশ্বরের হাতে পত্রখানি দিল এবং টাকা কয়টি দ্বিতীয় বার গণিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বর পত্রখানা পড়িয়া নষ্ট-লেখার দুঃখে এক মুহূর্ত্ত কার্ত্তিকের দিকে তাকাইয়া পর মুহূর্ত্তেই পত্রখানা লইয়া সটান্ খাড়া হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর হইতে টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া অন্দরে প্রভা-বৌদির কাছে ছুটিল।

বাহিরের ঘরে কার্ত্তিকের সন্নিকটে মেঝেতে কাগজের যে টুক্‌রাখানায় কার্ত্তিকের নষ্ট লেখা অনেকখানি দেখা যাইতেছিল, তাহাই কুড়াইবার জন্য নির্ম্মলা কয়েক মুহূর্ত্তের বিহ্বল নিস্তব্ধতার পরে কার্ত্তিকের দিকে অগ্রসর হইয়া মেঝের দিকে উপুড় হইল।

এমন সময় পূর্ব্ব-পরিচিত দুই জন ভদ্রলোক জানালা হইতে সেই ঘরের মধ্যে উঁকি দিতে দিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। একজন কহিল—দেখ্‌লে, কার্ত্তিকবাবু আর নির্ম্মলা? কার্ত্তিকবাবুর স্ত্রীও নেই, সিদ্ধেশ্বরবাবুও নেই।

—ঠিক তো। ও কি! নির্ম্মলা কার্ত্তিকবাবুর পায়ে পড়িতে যাইতেছে!

—চল, চল, এখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ানো দরকার নেই।

আদিশূর

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

বঙ্গের বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কুলতত্ত্ব আলোচনা করিলে ধারণা হয় যে, তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নৃপতি কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে গোত্রসমতা ব্যতীত অপর কোনও নৈকট্য নাই।

বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকাধৃত বচন "শাকে বেদকলঙ্ক ষট্‌ক-বিনিতে রাজাদিশূরঃ"(১) এবং রাঢ়ীয়কুলমঞ্জরীধৃত বচন "বেদবাণাঙ্গশাকেতু নৃপোভূচ্চাদিশূরকঃ। বসুকর্ম্মাঙ্গিকেশাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"(২) এই দুইটি হইতে জানা যায় যে, আদিশূর ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা হন এবং ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন।

ইতিহাস বলেন, যশোবর্ম্মা কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া দ্বিতীয় জীবিত গুপ্তকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া মগধ ও গৌড় স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন(৩)। যশোবর্ম্মা ৭৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন(৪)।

ইতিহাসের তথ্যের সহিত কুলশাস্ত্রের তথ্য তুলনা করিলে অনুমিত হয় যে ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মা কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন অথবা তৎকর্ত্তৃক মগধ ও গৌড় অধিকৃত হয় এবং ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ(৫) শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্ট নারায়ণ, ভরদ্বাজগোত্রীয় গৌতম, কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধর ও সাবর্ণগোত্রীয় পরাশর যশোবর্ম্মার অধিকৃত গৌড়ে(বরেন্দ্রী) আগমন করেন।

যশোবর্ম্মা কাশ্মীর-রাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হন(৬)। অতঃপর গৌড় ও মগধ আক্রমণ করেন—কামরূপপতি হর্ষদেব(৭) গুর্জ্জর বৎসরাজ(৮), রাষ্ট্রকূট ধ্রুব ধারাবর্ষ(৯)। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের রাজকীয় সাহায্য লাভের সুযোগ ছিল না। বারংবার আক্রমণের ফলে গৌড় ও মগধে মাৎস্যন্যায় বা অরাজকতা উপস্থিত হইলে প্রজাগণ গোপাল-দেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করেন(১০)।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্ম্মপাল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একতম ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞিকে যজ্ঞান্তে দক্ষিণাস্বরূপ ধামসার গ্রাম প্রদান করেন(১১)। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাজদত্ত গ্রাম প্রাপ্ত হন বলিয়া ভট্টনারায়ণের এই পুত্র কুলশাস্ত্রে আদিগাঞি নামে উল্লেখিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার পর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজসংশ্রবের উল্লেখ পাওয়া যায়—যখন সেন-বংশীয় বল্লালসেন বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ সাধু বাগ্‌ছি, রুদ্র বাগ্‌ছি ও লোকনাথ লাহিড়ী এবং বারেন্দ্র অপর গোত্রীয় চারিজন ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন(১২)।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃ ৮৩।

(২) বিশ্বকোষ, শূরবংশ।

(৩) শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ সম্পাদিত বাক্‌পতিরাজ প্রণীত গউড়বহো, শ্লোক ৩৬৫-৪১৭ এবং গৌড়রাজমালা, পৃ ১৫।

(৪) Journal Asiatique, 1895, p. 353.

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, পৃ ১৭।

(৬) Stein's Chronicles of the Kings of Kashmir, Introduction, p. 89.

(৭) Indian Antiquary, Vol. IX, p. 178.

(৮) Wari Grant, Indian Antiquary, Vol XI., p. 157.

(৯) Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 242

(১০) ধর্ম্মপালের খলিমপুর তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা, পৃ ১২।

(১১) গৌড়ে ব্রাহ্মণ ২য় সংস্করণ, পৃ ৯৬ এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, পৃ ১৭।

(১২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ পৃ ১৯ ও ৩৫।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির বরেন্দ্রী আগমন কাল ৭৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বল্লালসেন কৃত 'দানসাগর' গ্রন্থ রচনার সমাপ্তিকাল "শশি নব দশমিতে শকবর্ষ" ১০৯১ শকাব্দ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪২৩ বৎসরে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশের পঞ্চদশ পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। গড় হিসাবে প্রতি পুরুষে ২৮ বৎসর ধরা যাইতে পারে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সেনবংশীয় বল্লালসেনের নিকটে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন :তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মহেশ্বর রাঢ়ে আগত বীজপুরুষ ভট্টনারায়ণের অধস্তন নবম পুরুষ (১৩)। ইহা হইতে প্রতীতি হয় যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পাঁচ পুরুষের গৌড়বাসের পর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষগণ(১৪) শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ, কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড় ও সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ গৌড়ে আগমন করেন।

ইতিহাস বলেন, ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেব গুর্জর ও রাষ্ট্রকূট নরপতিদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন(১৫)। দেবপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ রাজ্যপাল(১৬) সম্ভবত পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগত হইলে দেবপালের কনিষ্ঠ পুত্র শূরপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭)। শূরপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল গৌড় ও মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত তীরভুক্তিতে ভূমিদান উপলক্ষে সম্পাদিত নারায়ণপালের ১৭ রাজ্যাঙ্কের তাম্রশাসন(১৮) হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে (আনুমানিক ৮৮৫ খৃষ্টাব্দ) মগধ ও তীরভুক্তি তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। গুর্জরমিহির ভোজ আনুমানিক ৮৯০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে(১৯) তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই মহেন্দ্রপাল মগধ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন। তাঁহার ২ রাজ্যাঙ্কের লিপি মগধে আবিষ্কৃত হইয়াছে(২০)। নারায়ণপাল প্রথমে মগধ ও পরে গৌড়ের অধিকারচ্যুত হইয়া ভাগীরথার পূর্ব্বতীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহীপালের রাজত্বকালে গৌড় ও মগধ পুনরায় অধিকার করিতে সমর্থ হন।

কুলশাস্ত্রে এক আদিশূরের প্রসঙ্গে আছে—শূরবংশসিংহ আদিশূর বৌদ্ধনৃপ পালবংশ পরাজিত করিয়া গৌড় শাসন করিয়াছিলেন(২১)। এই আদিশূর গুর্জর মহেন্দ্রপালের সামন্তরূপে রাঢ়ের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। অদিশূর সম্বন্ধে কুল শাস্ত্রে আর একটি শ্লোক পাওয়া যায়—"ক্ষত্রবংশ সমুৎপন্নো মাধব কুলসম্ভবঃ। বহুধর্ম্মষ্টকেশাকে নৃপভূচ্চাদিশূরকঃ॥" (২২)। ধর্ম্মের আঙ্কিকমান এক অথবা স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম ন্যায়ে দুই হইলে বসুধর্ম্মাষ্টক' শাক ৮৯৬ বা ৯০৬ খৃষ্টাব্দ হয়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি এই সময়ে রাঢ়ে আগমন করিয়া থাকিলে এই সময় হইতে বল্লালসেনকৃত দানসাগর গ্রন্থ রচনার সমাপ্তিকাল ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৭৩ বা ২৬৩ বৎসরে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশের দশ পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। গড় হিসাবে প্রতি পুরুষে ২৭ বা ২৬ বৎসর ধরা যাইতে পারে।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাহর্ত্তা যশোবর্ম্মা ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাহর্ত্তা আদিশূর উভয়েই জনপ্রবাদে আদিশূর নামে অভিহিত হইয়া আসিলেও উভয়ে বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। প্রসঙ্গত বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের এবং তাঁহাদের সমসাময়িক পাল, শূর ও সেনরাজগণের তালিকা প্রদত্ত হইল।

(১৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ ৬৩।

(১৪) কুলসারসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ ২।

(১৫ গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি, গৌড়লেখমালা, পৃ ৭৪।

(১৬) গৌড়রাজমালা, পৃ ৪০।

(১৭) গৌড়লেখমালা, পৃ ৭৪-৭৫।

(১৮) ঐ পৃ ৫৫

(১৯) Dynastic History of Northern India, Vol. I., Calcutta, 1931, p. 292.

(২০) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol V. No 3. p. 64.

(২১) গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃ ৮৩।

(২২) 'কুলদোষ গ্রন্থ', বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ খণ্ড, পৃ ২৪২।

পালবংশ	শূরবংশ	সেনবংশ	বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য বংশ	রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্য বংশ
১ গোপাল			১ ভট্টনারায়ণ	
২ ধর্ম্মপাল, বাক্‌পাল			২ আদিগাঞি	
			৩ জয়মণিভট্ট	
ত্রিভুবন পাল, ৩ দেবপাল, জয়পাল			৪ হরিকুজ	
রাজ্যপাল, ৪ শূরপাল, বিগ্রহপাল			৫ বিদ্যাপতি	
৫ নারায়ণ পাল	১ আদিশূর		৬ রঘুপতি	১ ভট্টনারায়ণ
৬ রাজ্যপাল	২ ভশূর		৭ শিবাচার্য্য	২ বরাহ
৭ গোপাল	৩ ক্ষিতিশূর		৮ সোমাচার্য্য	৩ সুবুদ্ধি
৮ বিগ্রহপাল	৪ অবনীশূর		৯ উগ্রমণি	৪ বৈনতেয়
৯ মহীপাল	৫ ধরণীশূর		১০ তপোমণি	৫ বিধুবেশ
১০ নয়পাল	৬ ধরাশূর		১১ সিন্ধুসাগর	৬ গাউ
১১ বিগ্রহপাল	৭ রণশূর		১২ বিন্দুসাগর	৭ গঙ্গাধর
১২ মহীপাল, শূরপাল, ১৩ রামপাল			১৩ জয়সাগর	৮ পশুপতি
রাজ্যপাল, ১৪ কুমারপাল, ১৬ মদনপাল		১ বিজয়সেন	১৪ পীতাম্বর	৯ শকুনি
১৫ গোপাল		২ বল্লালসেন	১৫ সাধু, রুদ্র, লোকনাথ	১০ মহেশ্বর
		৩ লক্ষ্মণসেন		



বাস্তব ও স্বপ্ন

শ্রীরণেন্দ্রনাথ সান্যাল

মানুষের মন বস্তুটি, আশ্চর্য্যরকম বেয়াড়া। অসম্ভব স্বপ্ন দেখে অহেতুক দুঃখ ডেকে আনতে এর আগ্রহের যেন অন্ত নেই। শাসন মানে না, সম্ভব অসম্ভব বোঝে না, কেবল প্রজাপতির মতন রঙীন পাখনা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ ক'রে ভুলতে চায় কঠোর বাস্তবটাকে—এর কাছে বাস্তবটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—বাস্তবকে এড়িয়ে চললেই স্বপ্ন হবে সার্থক।

রেবা সেনকে ভুলে যান নি নিশ্চয়ই—যদিচ দুবছর তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু একবার মনে করুন দু'বছর আগেকার কথা—তরুণতরুণী-মহলে সে ছিল যাকে বলে দীপ্তিময়ী অগ্নিশিখা—নব যৌবনের একটা প্রাণময়ী শক্তি।

রূপ—হ্যাঁ, রূপের গর্ব্ব তাকে মানায়। তিল তিল ক'রে সৌন্দর্য্য আহরণ ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছিল তিলোত্তমাকে কোন্ বিস্মৃত অতীতে, এই বিংশ শতাব্দীতে সে রূপের আভাসও কেউ জানত না, যদি না রেবা সেন জন্মাত। এ অনুপম রূপ দেখেনি কেউ কখনও—জীবিতেও না, ছবিতেও না। কাজেই রেবা সেন যে অননুভূত-পূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে—এতে বিস্ময়ের কি আছে?

বান্ধবীরা রেবাকে হিংসা করত—অবশ্য আড়ালে। পুরুষের চিত্ত জয় করার চেষ্টায় একটা মাদকতা আছে এবং এ মাদকতায় নারীর অধিকার একচেটিয়া। কিন্তু রেবাটা কি নিষ্ঠুর—সবাইকে বশ ক'রে বসে বসে হাসছে দিগ্বিজয়ীর মতন। বান্ধবীদের অবশিষ্ট রাখেনি একটিও।

এ-হেন রেবা সেন যে তার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে স্বপ্নের একটা সুরম্য তাজমহল গড়ে তুলবে—এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? সে ভাবত আই-সি-এস বর তার জুটবে বিনা আয়াসে। শাড়ীর পাহাড়, মোটরের বাহর, পার্টি ডিনার—এর মধ্য দিয়ে তার দিন কাটবে অফুরন্ত উত্তেজনার অনন্ত প্রবাহে।

রেবার সবই ছিল—ছিল না শুধু একটি বস্তু—ছিল না তার বাবার মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। এই একটি বস্তুর অভাবে হল না সার্থক তার রঙীন স্বপ্ন। রূপের সঙ্গে রৌপ্যের একটা পরম লোভনীয় রাসায়নিক সংযোগ না ঘটলে সব কিছুই হয় ব্যর্থ। এ ক্ষেত্রেও হ'ল না এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম। রেবা সেনের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল বুদ্‌বুদের মত।

রেবার বাবা চেষ্টার করেন নি কিছু ত্রুটি। কিন্তু বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গেলে ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক। রেবার কুমারী জীবনের অবসান ঘটাল এক গোবেচারী গোছের অধ্যাপক।

অধ্যাপক-স্বামীটি তার বিদ্যার জাহাজ, কাজেই বিনয়ের অবতার। রেবাকে নিয়ে সে কি করবে ভেবেই আকুল। রেবাকে পেয়ে আশার অতীত অমূল্য একটা সামগ্রীর অধিকারী সে হয়েছে—এমনি তার ভাব। অর্থাভাবজনিত গ্লানি তাকে করে কুণ্ঠিত, কিন্তু সে ভাবে প্রেমের স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত ক'রে যদি মানুষকে সুখী করা আদৌ সম্ভব হয়, তাহ'লে তার রেবা দুঃখ পাবে না কখনও।

রেবা ভাবে স্বামী তাকে ভালবাসতে বাধ্য, সে স্বামীকে ভালবাসুক বা না বাসুক, তার বিশ্বাস তার মত মেয়েকে ভাল না-বাসা যে-কোন পুরুষের পক্ষেই অসম্ভব। স্বামীকে সমাজের চোখে তাকে ভালবাসার অধিকার দিয়ে সে, সুকুমারকে করেছে গৌরবান্বিত—এ জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

বালির উপর রেবা বেঁধেছিল ঘর—বাস্তবের ছোট্ট একটা সংঘাতেই গেল ভেঙে—রেখে গেল শুধু অপরিসীম বেদনা। এই নিরানন্দ বৈচিত্র্য-হীন পঙ্গু জীবন দিনের পর দিন বয়ে বেড়ান অসহ্য। রেবা চায় মুক্তি ব্যর্থতার ব্যথা থেকে, কিন্তু চাইলেই কি সব সময় সব জিনিষ পাওয়া যায়?

সুকুমারকে দেখ, খুশী যেন ও ধরে রাখতে পারছে না; ভাদ্রের ভরা নদীর মত দুকূল প্লাবিত ক'রে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা স্বর্গীয় তৃপ্তির ভাব ওর চোখেমুখে, যেন এই মাত্র দিগ্বিজয় করে ফিরল। ও নিজের খুশীতে এত মশ্‌গুল যে, রেবার সুখ দুঃখ বলে একটা বস্তু থাকতে পারে, ভাববার অবসরও প্রথম দিকটায় একেবারেই ক'রে উঠতে পারে নি। ফুলশয্যার রাতে কেমন নির্লজ্জের মত—রেবার মতে—বলেছিল, "রেবা, আজ নিশ্চিন্ত হলাম তোমার হাতে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ছেড়ে দিয়ে, আজ থেকে আমার সব ভার তোমার।"

পুরুষ নারীর ব্যথা কোন দিন বোঝে নি, বুঝবেও না। দুঃখের ইতিহাস জানিয়ে কারুর—বিশেষ ক'রে স্বামীর—করুণা ও সহানুভূতি উদ্রেক করারচেষ্টায় অপমানের অবধি নেই। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়, তার বিরুদ্ধে তারই কাছে অভিযোগ ক'রে প্রতিকারের আশা করা মূর্খতার একশেষ।

ভিতরে ভিতরে রেবা যতই গুমরে মরে, ততই তার আক্রোশটা গিয়ে পড়ে বেচারী সুকুমারের উপর। রেবাকে বিয়ে ক'রে তার নারীজন্মটা সার্থক করতে। মাথার দিব্য দিয়ে তো রেবা তাকে জানায় নি অনুরোধ, বাঙলা দেশের অগুণ্তি মেয়ের মধ্যে রেবাকে বেছে নেবার যোগ্যতা ও অধিকার সুকুমারের ছিল না একটুও। কাজেই বিধাতা আর তাঁর যন্ত্র সুকুমারের বিরুদ্ধে রেবার অভিযোগের অন্ত নেই, কিন্তু প্রতিকারের পথও সে পায় না খুঁজে! এই পুঞ্জীভূত ব্যথার আগুনে তিলে তিলে জ্বলে মরা ছাড়া কি আর কোন পথই নেই? এক একবার রেবা ভাবে বিদ্রোহ

করবে—মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি এত অপরাধ সে করেছে যে, পুরুষের দেওয়া দুঃখ নীরবে বিনা প্রতিবাদে সয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে?

এ যুগের দ্রুতগতি প্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার—বিশেষ ক'রে সুকুমারের মত লোকের পক্ষে; কিন্তু যুগধর্ম্মের প্রভাব থেকে একদম মুক্ত থাকাটাও অসম্ভব; কাজেই সেকাল ও একালের চিন্তাধারার দুটি বিভিন্নমুখী স্রোত ওর মনে করেছে একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি।

সুকুমারের অভিধানে বিবাহের অর্থ নিঃশেষ ক'রে একজনের সমস্ত সত্তা আর একজনের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসবে—এটা ওর কাছে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত স্পষ্ট। রেবা তার বিবাহিতা স্ত্রী; সুতরাং তাকে ভালবাসতে সে ন্যায়ত বাধ্য এবং রেবাকে সে সত্যই ভালবাসে। রেবার উপর তার এই দাবীটি ছাড়া আর কোন দাবী নেই। রেবা যদি তাকে ভালবাসতে না পারবে ত তাকে বিবাহ করল কেন? কাজেই রেবা যে তাকে ভাল না বেসে অসুখী হতে পারে—এ সন্দেহের বাষ্পও তার মনে জাগেনি কখনও।

সুকুমার রেবাকে যতই কাছে টেনে নিতে চেয়েছে, রেবা ততই সরে গেছে দূরে।

অপরিচয়ের পাহাড় এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে, সুকুমারের অন্ধ দৃষ্টিও আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সুকুমার ও রেবা যেন দু'জন ভিন্ন দেশবাসী পথিক, দৈবাৎ এসে মিলেছে এক হোটেলে ক্ষণেকের তরে। এই অসম্ভব অবস্থা সুকুমারকেও একটু চঞ্চল করে তুলল। সুখের আশায় ঘর বেঁধে আগুনে পোড়াতে কেউ চায় না, কিন্তু কপালদোষে আগুন যখন সত্যিই লাগে, তখন ত নির্ব্বিকার হয়ে সহ্য করাও যায় না।

একদিন সুকুমার বললে, "রেবা, তোমায় ভালবাসবার অধিকার পেয়ে আমি ধন্য, স্বীকার করতে কিছু দ্বিধা করছি নে। আমার আশা ও বিশ্বাস ছিল, আমার প্রেমে তুমি সুখী হবে, কিন্তু আজ বুঝছি আমার আশা হয় ত পূর্ণ হবে না। আমারই চোখের সুমুখে তুমি দুঃখ পাবে, এও আমি সইতে পারি না; নিজের সুখের জন্য তোমার বুকে অতৃপ্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলব—এত স্বার্থপর আমি নই। যদি তুমি মুক্তি চাও, আমি বাধা দেব না—বল কি করলে তুমি সুখী হও?"

বিয়ের আগেকার সামাজিকতার হাল্কা হাওয়ায় উড়ে-বেড়ান জীবন রেবা ছেড়েছে—ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে নির্ব্বাসনে লোকলোচনের অন্তরালে—তার এই পরাজয়ে বন্ধু-বান্ধবীদের মৌখিক সহানুভূতির দাহ থেকে ত্রাণ পাবার আশায়। তাই, এই দু'বছর তাকে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। আগে যে সকল অনুষ্ঠানে রেবার অনুপস্থিতি কেউ কল্পনাও করতে পারত না, এখন সেগুলিতে তার অভাবে কেউ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—এমন ত মনে হয় না। তুমি যখন সহজ-লভ্য, তখন মানুষের মনে হয়, তোমাকে ছাড়া তার চলে না, কিন্তু যখনই তুমি দুর্লভ হয়ে উঠলে, তখন তোমাকে ভুলে যেতেও তার বেশী দেরী হয় না। এই ত দুনিয়ার নিয়ম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রেবা সচকিত হয়ে উঠল তার বন্ধু রেখা ও বেলার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে।

রেখা ঘরে ঢুকেই বললে, "ধন্যি মেয়ে তুই রেবা, বিয়ের পর লোকে আন্দামান যায় জানতুম না।"

বেলা বললে, "বিয়ের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে কে তোকে শিখিয়েছিল? বর পেলে লোকে অনেক কিছু ভোলে জানতাম, কিন্তু তোর মত এমন সব কিছুই ভোলে—এ খবরটি, স্বীকার করছি, আমার সত্যই অজানা ছিল।"

রেখা দাবী করলে, "এমন ক'রে নিজেকে নির্ব্বাসনে দিয়েছিস কেন বল্ ত? তোকে খুঁজে বের করতে যা বেগ পেয়েছি, নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করতেও এতটা পান নি।"

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য রেবা প্রস্তুত ছিল না। সে হতভম্ব হয়ে গিয়ে শুধু বললে, "তোরা কি প্রশ্নের পর প্রশ্নই করে যাবি, বসবি নে?"

"বসছি।" বেলা ও রেখা একসঙ্গে বললে, "কিন্তু তোর এ দুর্ম্মতি কেন হ'ল বল্।"

এ তিক্ত আলোচনা ঘাঁটালে বেড়েই চলবে। রেবার সে ইচ্ছা ছিল না; বললে, "নিজের দৈন্য বাইরে প্রকাশ করায় লজ্জা ও অপমানের অন্ত নেই।"

"হেঁয়ালির ছন্দে কথা কওয়া বুঝি অধ্যাপক মশাই শিখিয়েছেন!" বেলা টিপ্পনী কাটলে।

"পরাজয়ের কালিমা মেখে দশজনের সুমুখে দাঁড়াবার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই, কাজেই লুকোন ছাড়া আমার আর কোন উপায়ই ছিল না।" তারপর আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বললে, "আমার কথাটাই জানতে চাইছিস্, কিন্তু তোরা কি মনে ক'রে এসেছিস তা ত কই বলছিস্ নে।"

বেলা ও রেখা স্পষ্ট বুঝলে রেবা যতটুকু বলেছে ওর বেশী কিছুতেই বলবে না। আর তারাও কিছু এইজন্যই আসে নি।

বেলা বললে, "রেণুকে দেখে বুঝছিস নে, ওর বিয়ে পরশু, অমিত রায় টাট্‌কা আই-সি-এস-এর সঙ্গে। তোকে যেতেই হবে।"

রেখা বললে, "তুই না গেলে চলবেই না।"

রেবার মনে পড়ল এককালে এই অমিত রায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকত রেবার পানে। সে সব স্মৃতি এখন স্বপ্ন।

রেবা ভাবলে ওরা এসেছে এই নিমন্ত্রণের ছুতো ক'রে তার ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করতে। ব্যর্থ যে হয়েছে, অভিমান তার সাজে না। রেবা কি জানি কি ভেবে সহজেই রাজি হ'ল যেতে।

রেখা বললে, "পাঁচটায় গাড়ী পাঠিয়ে দেব, তোকে তুলে নিয়ে নীলাদের বাড়ী থেকে তাকে নিয়ে ছ'টার ভিতরেই গিয়ে পৌঁছবে। তুই প্রস্তুত হয়ে থাকবি, নীলাকেও প্রস্তুত থাকতে বলে যাব।"

বেলা বললে, "দেরী করিসনে কিন্তু, তুই না গেলে বেলার সাজাই হবে না, মনে রাখিস।"

ওরা চলে গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ঠিক পাঁচটায় মোটরের হর্ন শুনে রেবা নীচে নেমে গেল—সে প্রস্তুত হ'য়েই বসেছিল। মিনিট পনেরো পর নীলার বাড়ীর দোরে এসে গাড়ী থাম্‌ল।

নীলার ছোট বোন তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল, নীলার সামান্য একটু দেরী হবে।

ভিতরে গিয়ে রেবা দেখে নীলা শাড়ীর পাহাড় ও গহনার রাশি নিয়ে মহা ব্যস্ত—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা পরবে—এক বিষম সমস্যায় সে পড়েছে—রেবা বুঝলে।

রেবা আসতেই নীলা ছুটে গিয়ে তার হাত ধরলে—বিস্মিতকণ্ঠে বল্‌লে, "এ কি বেশ তোর রেবা—এ কি শোক-সভায় যাচ্ছিস নাকি?"

রেবা একটু হেসে বললে, "ঘোঁড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার প্রবৃত্তি আমার আর নেই ভাই।"

নীলা অনুযোগের সুরে বল্‌লে, "তুই চিরদিনই কি হেঁয়ালিই থাক্‌বি? নে, ওসব রাখ্‌, যা খুশী ওর ভিতর থেকে বেছে নে।" বলে শাড়ী ও গয়না দেখিয়ে দিল।

রেবা বল্‌লে, "বেশভূষার আড়ম্বর সত্যিই আমার শোভা পায় না—আর ভা ও লাগে না।"

নীলা রেবাকে সত্যই ভালবাসত—অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, "তোর ভাল লাগে না কিন্তু আমার যে লাগে; আর এই সাজে তোর লজ্জা না করতে পারে কিন্তু আমার করে। কত রকমে সাজিয়ে দেখতাম তোকে কোন্‌টাতে কেমন মানায়; মনে নেই! কথা বাড়াস নে, যা বলি কর্‌। বিয়ে ক'রে তুই যেন কি হয়ে গেছিস।"

নীলাকে বোঝান অসম্ভব—ওর দৌরাত্ম্য বহুদিন সয়েছে রেবা, আজকেও না হয় সইল। রেবা বল্‌লে, "যা খুশী তোর, কর্‌।"

নীলা ওকে মনের মতন ক'রে সাজিয়ে বড় আয়নাটার সুমুখে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "দেখ্‌, দেখে চোখ সার্থক কর্‌—কি রূপই তোর রেবা, দেখলে আমি যে মেয়ে, আমারও রক্তকণাগুলি যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।"

রেবা আদেশের সুরে বল্‌লে, "বাগ্মিতায় তুই সরোজিনী নাইডু নিশ্চয়। কিন্তু ছ'টা যে প্রায় বাজে, যাবি কখন?"

এর দশ মিনিট পর ওরা বেরিয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় একটা—মহাসমারোহে বিবাহ-উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, গান-বাজনার ভিতর দিয়ে ক'টা ঘণ্টা মহা আনন্দে কেটেছে। এবার নিমন্ত্রিতদের বাড়ী ফেরার পালা। রেবা ও নীলা মিঃ রায় ও বেলাকে শুভরাত্রি জানিয়ে নীচে নেমে এসেছে।

রেবা বল্‌লে, "কাল এসব ফিরিয়ে দেব।"

নীলা বল্‌লে, "তুই বুঝি তা না হ'লে সোয়াস্তি পাবি নে।"

রেবা হেসে উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই।"

এখন ওরা এক গাড়ীতে যাচ্ছে না।

গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার পর রেবা বুকের উপর হঠাৎ নজর পড়ায় দেখল, সেখানে মুক্তোর মালাটি—নীলা পরিয়ে দিয়েছিল—নেই। সর্ব্বনাশ—হারিয়ে গেল না কি। শাড়ী ও ব্লাইজের ভিতর রেবা খুঁজল, কিন্তু যা নাই তা আসবে কোথা থেকে। বিয়ে বাড়ীর ভিড়ে হয় ত কোথাও খুলে পড়ে গেছে। রেবা বিষম ভাবনায় পড়ল—কি এখন সে করবে। ফিরে যাবে—না, ফিরে-যাওয়া অসম্ভব—সবাই জেনে ফেলবে—নীলা শুনবে; কি ভাববে সে? হারিয়ে যাওয়ার কথা বিশ্বাস করবে? বিয়ে বাড়ীর সবাই—তারাও কি বিশ্বাস করবে? যদি না করে, এবং না করাটাই সম্ভব, তাহলে? এ কি বিষম লজ্জায় সে পড়ল—নীলাকে মুখ দেখাবার জো রইল না। কালকেই এ সমস্ত তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে—কত দাম কে জানে? দাম যাই হোক, কম হলেও তার যা অবস্থা কোথা থেকে জুটবে? সুকুমার জান্‌বে—নীলার কাছে—আর দশজনের কাছে মাথা উঁচু রাখতে গেলে সুকুমারকে না জানিয়ে ত উপায় নেই। কিন্তু কি ক'রে জানায়—এই দুটি বছর যার সঙ্গে সে হেসে কথা কয় নি, যাকে শুধু করেছে অশ্রদ্ধা, যাকে করেছে দায়ী তার এই অলীক ব্যর্থতার জন্য—উপেক্ষার নির্ম্মম আঘাতে যাকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত—সেই সুকুমারের শরণ এখন নিতে হবে? কি লজ্জা—মানুষের ভুল বুঝি ভগবান এম্‌নি সুকঠিন আঘাতেই ভাঙেন। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি আছে? রেবা কি করে এখন—পৃথিবীর বুকে গিয়ে লুকোবে, না, সুকুমারের? সোজা সুকুমারকে এ বিষয় জানায় কোন্‌ মুখে? একটু ছলনা—বুদ্ধির একটু অপপ্রয়োগ—এ ছাড়া আর ত কোন পন্থাই তার চোখে পড়ছে না।

গাড়ী এসে দাঁড়াল তার বাড়ীর দরজায়, কম্পিতপদে সে উপরে উঠে গেল। শোবার ঘরে আলো জ্বলছে—সুকুমার জেগেই আছে।

ঘরে ঢুকে বড় আয়নাটার সুমুখে বেশ পরিবর্ত্তন করার ছলে দাঁড়িয়েই আর্ত্তকণ্ঠে "সর্ব্বনাশ" ব'লে ধপাস ক'রে বসে পড়ল।

হতবাক্‌ সুকুমার রেবার সুমুখে এসে শুধু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে রইল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে রেবা রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, "মুক্তোর মালাটি পাচ্ছিনে।"

সবিস্ময়ে সুকুমার বল্‌লে, "মুক্তোর মালা!"

"নীলার—পরিয়ে দিয়েছিল জোর করে। নীলাকে মুখ দেখাব কি করে?" রেবার চোখে অশ্রু দেখা দিল।

সান্ত্বনা দিয়ে সুকুমার বললে, "হারিয়ে গেছে? না যদি ফিরে পাওয়া যায় একটা কিনে দিলেই হবে।"

সুকুমারের দিকে চাইবার সাহস রেবার নেই। দৃষ্টি অবনত ক'রে রেবা বল্‌লে, "কত দাম কে জানে?"

"দাম যাই হোক, ফিরিয়ে দিতেই হবে। বন্ধুকে ত হারিয়ে ফেলেছি বলা চলবে না।

"কিন্তু—" রেবা টাকার কথাটা বলতে পারলে না।

"রেবা, আমার টাকায় কেনা মুক্তোর মালা তোমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দিতে যদি তোমার অপমানবোধ না হয়, তবে টাকার ভাবনাটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। মিছে মন খারাপ ক'রে লাভ কি—যা হয় কাল একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলা যাবে। তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম করবে এসো।" গভীর স্নেহে সুকুমার রেবাকে তুলে বুকের কাছে টেনে নিল।

দু'বছরের সাধনা সুকুমারের আজ বুঝি সার্থক হল। স্বামীর বুকে পরম নির্ভরতায় মুখ লুকিয়ে রেবা কিছুক্ষণ কাঁদলে; তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "বল তুমি, আমায় ক্ষমা করলে।"

সুকুমার রেবার অশ্রুমলিন গণ্ডে একটি চুম্বন দিয়ে বললে, "কি ছেলেমানুষ তুমি রেবা, তোমার উপর আমি রাগ করতে পারি কখনও।"

রেবা নত হয়ে সুকুমারের পায়ের ধুলো মাথায় দিল। *

* বিদেশী গল্পের ছায়া

ভারতের শিক্ষা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী বি-টি, শাস্ত্ররত্ন

ভারতবর্ষের শিক্ষা-সম্বন্ধে বহু কথা হইয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া এখন হইতেছে। বিষয়টি যেন এতই সহজ যে, সকলেই উহা নাড়াচাড়া করিয়া একটু না একটু নূতন কথা বলিয়া খুশী হন। আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহার অনেক খসড়া হইতেছে ও হইবে। দেশ যখন জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন এটা স্বাভাবিক যে, দেশের ছোট-বড় সকলেরই মনে শিক্ষা-সমস্যার নানা দিক্ নানা আকারে দেখা দিবে। অন্ন-সংস্থান, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি খোসার আবরণে শিক্ষার গোড়ার কথাটি অনেক সময় হারাইয়া ফেলি। আমরা সেই গোড়ার কথাটির খোঁজ করিব।

শিক্ষা কি? মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের সহিত উহার সম্পর্ক কি? শুধু রাষ্ট্রীয় বা গূঢ়তর মাহাত্ম্য কিছু আছে? আপনার স্বভাবে আপনার বিবর্তন, ব্যবহারিক বস্তুতন্ত্রতা, উচ্চতর লক্ষ্যের অনুধাবন—এই তিন দিক্ হইতে শিক্ষা-সমস্যার দর্শন বিচারসহ কি-না? এই তিনের পারম্পর্য্য আছে কি-না? শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান কতখানি? ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে বা শিক্ষার প্রকৃতিতে এই জিজ্ঞাসাগুলির সার্থকতা কত দূর? আমরা প্রশ্নগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ইউরোপের একজন আধুনিক লেখক (এইচ্, এইচ্, হর্ন্) শিক্ষার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"মানুষের আত্মিক্ উন্নতির তিনটি পথ। মানুষের মনের গঠনের জন্যই ঐরূপ বিভাগ। জাতির ধারা যত দূর যায়, মানুষের আত্ম-প্রসারও তত দূর হয়। জাতীয় ধারার সহিত শিক্ষা একসূত্রে গ্রথিত। আবার জাতি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র। ব্যক্তি অথবা জাতির সক্রিয় মনের তিনটি স্তর—জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তি। সত্য, সুন্দর এবং শিবের ইহাতেই প্রতিষ্ঠান। শিশুকে এই তিনটি পথ ধরাইয়া দেওয়ার নামই শিক্ষা-দান।"

সক্রেটিস্, প্লেটো ও য়্যারিস্টট্‌ল্ শিক্ষার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন—উনবিংশ শতাব্দীতে কান্ট্ ও ফ্রোবেল তাহারই নব-প্রবর্ত্তন ঘোষণা করেন। ফল কথা, দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের মনীষিগণ শিক্ষাকে দাঁড় করাইয়াছেন। নিঃশ্রেয়স-লাভের জন্য দর্শন। দর্শন-তত্ত্ব-বিচারের নামান্তর। শিক্ষা তত্ত্ব-বিচার-মূলে জীবনের লক্ষ্য-নির্ণয় ও কর্ম্মানুসরণ।

সুতরাং শিক্ষা মানব-জীবনের সারাৎসার পদার্থ। আজ সেইজন্যই পুং-স্ত্রী ও জাতিভেদ না মানিয়া সকলেরই শিক্ষা ব্যবস্থা করা হইতেছে। অথচ প্লেটো "আর্টিজান" অর্থাৎ হাতের বা হাতিয়ারের কাজ যাহারা করে তাহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, যেমন প্রাচীন হিন্দুযুগে শূদ্রের অথবা ব্রাহ্মণেতরের অনেক বিষয়ে অনধিকার ছিল। যাহা হউক, সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুভূতি ও নৈষ্ঠিক সাধনই শিক্ষা। ভারতবর্ষের আদর্শও তাই। এখানে পূর্ব-পশ্চিমের সুন্দর মিলন দেখি। সত্যনিষ্ঠা ভারতীয় শিক্ষার আদি কথা।

জাবালির কথায় রামচন্দ্র বলেন, "ভূতগণের প্রতি অনুকম্পা-প্রধান রাজকার্য্য সনাতন। রাজ্যপরিচালন সেইজন্যই সত্যাত্মক। ঋষি ও দেবগণ সত্য একমাত্র বস্তু বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ জগতে সত্যপরায়ণ ব্যক্তি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করে। অসত্যবাদীকে সকলে সাপের মত ভয় করে। সত্যপর ধর্ম্ম (আচরণ) সকল বস্তুর সার। সত্যই ঈশ্বর। ধর্ম্ম সত্যেই সদাশ্রিত। সত্য অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বস্তু আর নাই।" তখনও শ্রীরামের নিকট বনবাস অপেক্ষা রাজ্যভার গ্রহণ অধিক লাভের জিনিষ—এই কথাই বলা হইতেছিল। শ্রীরামের কোন্ শিক্ষা হইয়াছিল? মহাত্মা গান্ধীর "সত্যাগ্রহ" নূতন যুগে পুরাতন শিক্ষার পুনরুজ্জীবন নয় কি?

বর্ত্তমান ইউরোপের কোন কোন পণ্ডিত আদর্শবাদী নহেন। একদল বলেন, নীতি কিছু নহে, শিশুকাল হইতে আমাদের কাজগুলির ফল প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া। সেইগুলির সঞ্চয়ের নাম অভিজ্ঞতা। এই সঞ্চয় হইতে ভবিষ্যতে সতর্কতা। আবার কেহ বলেন—জন্মগত সংস্কারের ক্রম-বিকাশই জীবন; ভিন্ন আবেষ্টনে পড়িয়া উহা ভিন্ন আকার ধারণ করে। একটা কুকুরের যে অনুভূতি তাহা পৃথক্ হয় না। জীবতত্ত্বের দিক্ হইতে বৈজ্ঞানিকভাবে এই বিচার। এই তত্ত্বের অনুসরণে যে শিক্ষা-প্রণালী গড়া হয়—তাহাতে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যতালিকায় ভারাক্রান্ত না করিয়া তাঁহাকে আপনার ভাবে—আপনার বেগে চলিতে দেওয়া হয়। এখানে শিক্ষকের কাজ নূতন নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন। সর্ব্বোন্নত অবস্থার দিকে মানুষকে ঠেলিয়া লইয়া গেলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়। শিক্ষাসচিবগণের কাজ তাহাই।

আর একদল কাজ দিয়া শিক্ষার মূল্য বিচার করেন। অধ্যাপক জেম্স্ এই আদর্শের নাম দেন প্রাগ্‌মাটীজ্‌ম্—কর্ম্ম বা অভ্যাসবাদ। ইংরেজি প্রাক্‌টিকাল্ কথাটি হইতে উক্ত কথার ব্যুৎপত্তি। তাঁহার কথা এই, আমরা যে-কোন কথাই ভাবি না কেন উহার কতখানি আচরণ-যোগ্য, তাহা দিয়া সেই চিন্তার মূল্য নির্দ্ধারণ হয়। অতএব কর্ম্মই আসল কথা। আমাদের কর্ম্মের উচ্চ-নীচ স্তরভেদ দ্বারা আমাদের চিন্তার বিশুদ্ধি বা আবিলতার বিচার করিব। এই কর্ম্মধারা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে উপস্থিত হয়। জেম্স্ স্বীকার করেন, তাঁহার এই মতবাদ নূতন নহে—সক্রেটিস্, প্লেটো, লক্, বার্ক্‌লে এবং হিউম্ পূর্ব্বে একই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি কেবল নূতন করিয়া এই শিক্ষার ব্যাপকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণ পণ্ডিত শীলার বলিয়াছিলেন, "কর্ম্মের গোড়ার কথা যুক্তি বা প্রজ্ঞা। যে যুক্তি উদ্দেশ্যবিহীন, জীবনে তাহার মূল্য নাই। উহা প্রকৃতির নির্ম্মম পেষণে বিলীন হইবে নিশ্চয়।" অর্থাৎ—প্রজ্ঞামূলক কর্ম্ম যে আদর্শকে চায় উহার পূর্ণরূপ এখনও কেহ জানে না। মানুষ মিলিয়া মিশিয়া এই আদর্শের পিছনে গিয়া নবতর দুনিয়া গড়িয়া তোলে।

আর একদল পণ্ডিত ষোল-আনা আদর্শবাদী। ইঁহাদের মতে—প্রকৃত মানব-জীবন মানুষেরই সৃষ্টি। জীবনের পূর্ণতা-সম্পাদন মানুষের নিজের কাজ। চিন্তাই মানুষের প্রধান শক্তি। উহা প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উহা হইতে সারসংগ্রহ করে। মানুষের বিশ্বাস, প্রকৃতি এইভাবে তাহার চিন্তার সহায়ক হইয়া তাহার ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন করে। এই শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠায় পরিণত হয়।

এই প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তি বা স্বাধীনতা আবশ্যক। এই অফুরন্ত মুক্তি-সংগ্রাম আধুনিক যুগের মানুষের বিজয়-গৌরব। এই সংগ্রাম হইতে যে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয় তাহা বিভেদ-বুদ্ধির বিনাশক—তাহা সমগ্র জগতের ইচ্ছাশক্তির সারাংশভূত। শিক্ষা এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের নামান্তর মাত্র। সুতরাং ভারতীয় আদর্শ হইতে এই চিন্তাধারাকে খুব বেশী তফাৎ বলা যায় না। অতীন্দ্রিয়ানুভূতি ভারতীয় কথা, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আদর্শ প্রকারে ভিন্ন নহে, প্রকাশেই যা-কিছু ভিন্নতা।

ইউরোপ ও ভারতে শিক্ষা কি বুঝিতে চেষ্টা করা গেল। বুঝা গেল যে, মানবজীবনের, তথা বিশ্বের দার্শনিক ভিত্তির উপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত। দর্শন-ব্যতিরেকে শিক্ষা অর্থহীন।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধানও হইয়া গিয়াছে। সমাজের আনুকূল্য ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ হয় না। সমাজ অথবা রাষ্ট্র প্রগতিশীল। উহা মানুষকে আপন বেগে গড়িয়া পিটিয়া তোলে।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে—প্রাচীন ভারতীয় সমাজে

দুইটী স্পষ্ট যুগ-রেখা দেখা যায়। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্বে আবেগ, পুলক, সৃষ্টি, প্রকৃতিজয়, আত্মরতি খণ্ডশঃ ভারতের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে। তখনও তপোবনের সংস্থিত জীবনকেন্দ্রগুলি গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্রশক্তি তখনও প্রতিযোগিতাপরায়ণ হয় নাই। সুতরাং রামচন্দ্রের সত্য-নিষ্ঠা সত্য সত্যই সফল হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে যখন 'কুরুক্ষেত্র' বাধিল, তখনই প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর ভারত শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যে ধ্বনিত হইল। আবার সেই সত্যবাণী ভীষ্মমুখে শুনিতে পাই—

সাধুদের মধ্যে সত্য সনাতন ধর্ম্ম। সত্য নমস্য। উহা পরমা গতি। সত্যই ধর্ম্ম, তপঃ, যোগ ও ব্রহ্ম। সত্যই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ ও সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়তা, ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যত্ব, ধৃতি, দয়া এবং অহিংসা সত্যের এই ত্রয়োদশরূপ।

আবার শ্রীকৃষ্ণমুখে জানিলাম, ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য, আত্মিক-বল, সাংখ্য-যোগের অপার্থক্য, মহাভারতীয় বিশ্ববাণী। একদিকে কুরুক্ষেত্রে মহাসমর, অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনগুলির উদ্ভব এবং শ্রীকৃষ্ণমুখে তাহাদের সমন্বয়। এই সমন্বিত জীবন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ।

প্রাচীন গুরুকুলের এই আদর্শ কালক্রমে ক্ষীণায়তন হইলে বৌদ্ধযুগে এক নব-জাগরণ আরম্ভ হইল। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অধিকারী-ভেদ বিনষ্ট হইল। যে নূতন ভাবস্রোত রহিল, তাহাকে কর্ম্মস্রোত বলা চলে। বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদের মত কঠিন বস্তু কেবল মুষ্টিমেয় লোকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রে এক নব-প্রেরণা আসিল। অমানুষ মানুষ হইল; শিল্প, কলা, ব্যবসায়, ক্ষাত্রবীর্য্যেও বিশেষতঃ পতিতের উদ্ধারে—দেশপ্রাণে জোয়ার রহিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও পরিস্থিতি সম্ভবপর হইল। একের নিভৃত সাধনা ও শিক্ষার স্থলে দশের সমবায় ও শিক্ষার দশদিকে প্রসার হইল। এক কথায়, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উহা একটী নব-যুগ (রেনেসাঁস্)।

ভারতে মুসলীম সভ্যতার সংঘাত আর একটী অভিনব জিনিষ। বৌদ্ধযুগের অবসানের পর হইতে ভারত শিক্ষা ও রাষ্ট্রব্যাপারে খণ্ডিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারত তখনও উত্তর ভারতীয় ভাব, ভাষা ও কর্ম্মধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই খণ্ডিত অবস্থা স্বয়ং পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল সচল থাকিত কি-না বলা যায় না। মুসলীম্ সভ্যতাই প্রথমে এক হিসাবে একাধিকার অথবা একাত্মবোধ আনিল। অবশ্য "নেশন্" বলিতে যাহা বুঝি তাহা ইংরেজের শাসন-ফল, কিন্তু বিজ্ঞানের বাহাদুরি তাহাতে কম নহে।

ইংরেজী আমল হিসাবে বাদ দিলেও ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসেই তাহার প্রকৃতি-পরিচয় হয়। এই শিক্ষার গূঢ়তর মাহাত্ম্য ধর্ম্মাববোধে মানুষ-গঠন। এ ধর্ম্ম শুধু আচরণ নহে, একেবারে অধ্যাত্ম-রসনিষিক্ত স্থিতপ্রজ্ঞতা। কর্ম্ম এই ধর্ম্মের বহিরঙ্গ মাত্র।

আজ আমরা কর্ম্মকে বড় করিয়া ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। ইহা অশ্বকে পশ্চাতে রাখিয়া অশ্বযানকে সামনে দেওয়ার মত। এই বৈসাদৃশ্য দূর না হইলে আমাদের নব জাতীয়জীবনে দীক্ষা বিফলতা-বিড়ম্বিত হইবে। ভারতবর্ষই এই জাগতিক সমস্যা সমাধানের প্রকৃত ক্ষেত্র। জাতীয় অগ্রগতির নায়কগণ এদিকে অবহিত হউন।

আমরা যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিব, তাহার স্বরূপ কি হইবে? এখনও নাম লইয়া মারামারি করিতেছি—ইহা কি শুভ চিহ্ন? এই "মহামানবের সাগরতীরে" বহু ধর্ম্ম পাশাপাশি চলিয়াছে বহুদিন; অথচ এখন যদি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—এ তিনের পৃথক ধর্ম্ম-পন্থা অনুসরণ করিয়া পৃথক্ শিক্ষা-নীতি গঠন করিতে যাই, তাহা হইলে সেই পার্থক্য আমাদের জাতীয় অনিষ্টের কারণ হইবে। সেইজন্য আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য ও শিক্ষাচার্য্যগণের নিকট এই শুভ মুহূর্ত্তে এই আবেদন হওয়া উচিত যে, সকল ধর্ম্মের মূলীভূত বিশ্বাস ও আচারগুলির মধ্যে সমত্ব বিচার করিয়া এক নব-তর ভারতীয় ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠুক্। ঈশ্বর, মানব, সমাজধর্ম্ম, জীবপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে সকল ধর্ম্মের সার সত্য এক। অনেক মনীষী তাহা দেখাইয়াছেন ও অদ্যাবধি দেখাইতেছেন। এই সত্যের উপর শিক্ষার ইমারৎ গড়িতে হইবে, তবেই ভারতীয় শিক্ষা-স্থাপত্যের নিদর্শন জগতে রাখিয়া যাইতে পারিব।

ময়ূর-প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

আয়া, আমার স্মেলিংসল্ট? বলতে বলতে মিলনীর মা প্রভাতী দেবী পার্লারের দরজার কাছে এসে পর্দ্দা সরিয়ে দেখলেন, মানব টেবিলের কাছে বসে'—একখানা বইয়ের দিকে চেয়ে কি পড়ছে। তিনি তাঁর মাথার অসুখের জন্য চোখ টানতে টানতে ঘরে ঢুকেই বললেন :

এই যে মানব, কতক্ষণ এয়েছ—খবর দেয় নি কেউ? এই কিছুক্ষণ আগেই তোমারই কথা হচ্ছিল। মিলনী এখানে এসেছে জান?

হ্যাঁ সে-ই ত বিকেলে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিল—আমাকে ডেকেছে—কি বিশেষ দরকার আছে তাই। সে কেমন আছে? ভাল আছে ত?

মিলনী যে বেশ ভাল আছে এ কথা কি ক'রে বলি বল—তবে যা মনে করছি, তা বোধ হয় যদি হয়, তবে ভালই থাকবে। তোমায় চা দিয়েছে? বয়! বয়…পার্লারের কাছে কেউ যদি থাকবে!

মাধুরী তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলে—মা ডাকছ?

হ্যাঁ, একজন লোকও পার্লারের দরজায় থাকে না কেন? বয়কে ডাকতে বল। আর তোর দিদিকে বল্ যে মানব এয়েছেন—কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসতে বল্—তুই তাকে একটু সাহায্য কর্।…আয়া! আয়া!

'হাজির মেমসাব্!' বলে আয়া এল প্রভাতী দেবীর রুমাল স্মেলিংসল্ট-এর শিশি নিয়ে।

শোন, বয়কে বল'—চা…সিগরেট।

মানব তাড়াতাড়ি বলে উঠল : মিসেস রায়, আপনি ব্যস্ত হবেন না—এই ত আমি চা খেলাম সিগারেট আমার কাছে আছে।

আচ্ছা—শোন্ আয়া, মিলনীকে একটু শীগ্‌গির পোষাক বদলে আসতে বল্, আজকে যে 'ইণ্ডিয়ান' ষ্টোরস্ থেকে নতুন কাপড় আনিয়েছি, সেই কাপড়-জামা যেন পরে। মানব, তুমি ভাল হয়ে ব'স—তোমার যেন কি রকম অস্বস্তি হচ্ছে।

আজ্ঞে না, আমি বেশ ভাল—বেশ বসে আছি।

স্মেলিং সল্টের শিশি খুলে দু'বার শুঁকে প্রভাতী দেবী অত্যন্ত কড়া এসেন্সের গন্ধমাখা রুমালখানা নাক-মুখের কাছে বুলিয়ে বললেন :

তুমি বোধ হয় সব শুনে থাকবে মানব?

কি?

মিলনীর ব্যাপার। সব শুনেছ ত? আমি আগেই জানতাম এই রকম হবে।

কি হয়েছে? আমি সঠিক কিছু শুনিনি। তবে আজ সকালেই রংরাজবাবুর কাছে ওই রকম কি একটা শুনছিলাম বটে যে, জয়ন্ত নাকি ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে মিলনীর সঙ্গে।

দেখ মানব, ঘর করতে গেলে অমন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েই থাকে—তাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু এ যে একেবারে বে-একতার কাণ্ড। এ রকম অবস্থায় মানুষ কখনও ঘর করতে পারে? বিশেষত সে ত আর গরীবের ঘরের মেয়ে নয় যে, যা বলবে, যা করবে, তাই মাথা পেতে নিতে হবে। আজকের দিনে এ কখনও চলতেই পারে না।

কি করেছে জয়ন্ত?

কি সে করে নি তাই বরং জিজ্ঞাসা করতে পার। বিয়ে হওয়া এস্তক, সে এই রকম ক'রে বেড়াচ্ছে। তার পর সেদিন মদ খেয়ে মিলনীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আজ কমাস ধরে এই রকম সব ছোট-লোকের কাণ্ড। তার পর সেদিন চিঠি লিখেছে যে, ছাড়া-ছাড়ি হওয়াই ভাল। এখন সোজা ডিভোর্স হবে আর কি!

মিলনী কি জয়ন্তকে ছেড়ে আলাদা হবে, এ একেবারে স্থির হয়ে গেছে?

নিশ্চয়ই, সে ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। এখন আর তাদের কোন রকমেই মিল থাকতে পারে না—একেবারেই অসম্ভব।

মানব একটু হেসে বললে :

তা বটে—জ্যান্ত মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে সে ছুরিখানা টেনে বার ক'রে নেওয়া—তা আপনি মিলনীর মনের কথা ঠিক জানেন?

জানাই ত উচিত। আর সে আজই এখানে এসে যখন তোমাকেই আগে ডেকে পাঠিয়েছে, তখন ত তুমিও বুঝতে পারছ—আমি ত বুঝেছিই। অবিশ্যি দু'জনের তফাৎ হওয়াতে খানিকটা কষ্ট যে একেবারে হয় নি তা বলতে পারি না—একটু হবেই, আর হওয়াটাই স্বাভাবিক; কিন্তু এখন সে একেবারে সব শেষ। আর সে হতভাগাও এখন বেশ বুঝতে পেরেছে যে, এখন আর নতুন ক'রে মিল হওয়া বা ঘর-সংসার করা একেবারে হতেই পারে না। সে ত আর গরীবের মেয়ে নয়!

মানব গম্ভীর হয়ে বললে: কেন? হতে না পারবার আপনি কি কারণ পেলেন? রাগা-রাগি হয়েছে, আবার ভাবও ত হতে পারে, আর আমাদেরও সকলের উচিত যে, যাতে তাদের সংসারটা বজায় থাকে—সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না করে।

তুমি কি বলছ মানব, এতগুলো ঘটনার পর, এত শপথ ভাঙা-ভাঙির পর সে আর কেমন ক'রে ফিরে এসে ওর কাছে মুখ দেখাতে পারে? আর কেনই বা সে মিলনীকে স্বাধীনতা দেবে না; দিতেই হবে, নিশ্চয়ই দিতে হবে।

বিবাহিতা স্ত্রীর কি স্বাধীনতা থাকতে পারে বলুন। স্বামীর ঘরই তার সব চেয়ে বড় স্বাধীন জায়গা।

কেন ডিভোর্স আছে, আইন রয়েছে। আর সে ত ডিভোর্স করে দিতে লিখিত অঙ্গীকার দিয়েছে।

মানব চমকে উঠে বললে:

কে অঙ্গীকার দিয়েছে? জয়ন্ত? ডিভোর্স করবে মিলনীকে? আপনি কি বলছেন মিসেস্ রায়?

ঠিকই বলছি। চিঠিতে সে তাই লিখে দিয়েছে যে, পুনঃ পুনঃ আমি যখন শপথ ও অঙ্গীকার রাখতে পারিনি—তখন ছাড়া-ছাড়ি হওয়াই সঙ্গত—আর আমি তাতে রাজী আছি।

আমার কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না মিসেস্ রায়। আপনার কন্যা জয়ন্তকে সত্যিই ভালবাসে, আর জয়ন্তও আমার মার পেটের ভায়ের মত—বন্ধু, আমিও তাকে সত্যিই স্নেহ করি···

হ্যাঁ হ্যাঁ—তাকে আবার স্নেহ, তাকে আবার ভালবাসা। মনে ক'রে দেখ, একবার ভেবে দেখ দিকিন মানব, কি সব সুখের বোঝা নিয়ে—মিলুনী তার সঙ্গে ঘর করছিল··· মাতলাম, জুয়াখেলা, থিয়েটারে মাগী নিয়ে ঢলা-ঢলি, বেলেল্লাপনা···এ রকম লোককে কে ভালবাসতে পারে বল?

মিসেস্ রায়, সত্যি ভালবাসা অনেক কিছুই পারে··· ভালবাসার জন্যে মানুষ যে সর্ব্বস্ব দেয়···

প্রভাতী দেবী আর একবার স্মেলিং সল্ট শুঁকে বললেন:

যারা বোকা গাধা, তারাই ভালবাসার জন্যে সর্ব্বস্ব দেয়—সংসারে বেঁচে থাকতে হলে নিজের দিক আগে দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ—নইলে খেতে পাবে না, পরতে পাবে না, খেটে মরবে, যেমন সব ছোটলোকের ঘরে হয়—তাতে মানুষের বুদ্ধি থাকলে কখনই করা উচিত নয়। তুমি কি বলছ মানব, একখানা উলি-ঝুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া বাতাসে উড়ছে, তার জন্যে কারই বা টান হয় বল? তার অবস্থা সঙীন।

কি রকম সঙীন?

সমস্ত জমিদারী বাঁধা পড়েছে—ব্যাঙ্কের সব শেষ—একটা পয়সা নেই, সেদিন তার কাকা সুজনবাবু জমিদারী বাঁধার সুদের দরুণ পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন, মিলনীর হাত মুচড়ে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেছে। মিলনীর অসুখ, সে কোথায় মদ খেয়ে পড়ে আছে—

মানব বেশ সহজভাবে বললে:

এ সব খবরই আমি জানি মিসেস্ রায়, এতেই একেবারে ডিভোর্সের জন্যে ব্যস্ত না হয়ে—উচিত সে যাতে ফিরে এসে ভাল হয়···সুস্থ হয়···অত বড় জমিদারী তাদের—দেনা শোধ দিতে চেষ্টা করলে বেশী দিন লাগবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না—দেখি জয়ন্তকে ফিরিয়ে আনা সম্বন্ধে কি উপায় করতে পারি। সে চেষ্টা আমি করে দেখব।

প্রভাতী দেবী বিরক্ত ভাবে বললেন:

না না, সে চেষ্টা তোমায় করতে হবে না। তা ছাড়া, আমি চাইনে যে, সে হতভাগার সঙ্গে তোমরা কেউ কোন সম্পর্ক রাখ। এদিকে ত এক পয়সার মুরদ নেই, অথচ জান তার কতখানি অহঙ্কার—আবার তিনি নাকি কবি···বই লেখেন!

জয়ন্ত যে কবি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই মিসেস্ রায়·· তার প্রতিভা আছে।

ছাই আছে···ওই ত থিয়েটারে সে বই চলল না—কেউ নিলে না—সবাই প্রযোজককে পর্য্যন্ত গালা-গালি করলে।

থিয়েটারে বই জমল না বলেই যে বইখানা কিছু নয়, আর সে কবি নয়, এ কথা বলা ত সঙ্গত হবে না মিসেস্ রায়। যাক, তার সঙ্গে এই বাড়ী না থাকা—দেনা-পত্তরে জড়িয়ে পড়া অবশ্য ভাববার কথা—তবে লাখ দুই টাকা ধার শোধ দেওয়া জয়ন্তর পক্ষে কিছুই নয় মিসেস্ রায়—আমি জানি···

এমন সময়ে মিলনী এসে ঘরে ঢুকল, সঙ্গে মাধুরী। মিলনী একটুও সাজ-গোজ করেনি—মাথার চুল পর্য্যন্ত আঁচড়ান নয়—তার ওপর মাথার কাপড়টা টেনে দেওয়া—পায়ে জুতা পর্য্যন্ত নেই। হাতে একখানা চিঠি। চোখের জল তখনও ভাল শুখায়নি—কান্নার জলে ধোয়া—আরক্ত বিষাদমাখা মুখ। মিলনী আসতেই মানব উঠে দাঁড়িয়ে বললে :

এই যে মিলনী, আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছে ; সেজন্যে অপরাধ নিয়ো না।

মিলনী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে :

না—না বরং, আমারই ঠিক সময়ে এসে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকা উচিত ছিল। সে জন্যে আমারই অপরাধ ; দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ব'স · তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে—যদি ভরসা দাও···

মানব হেসে বললে : প্রার্থনা—আমার কাছে, বল !

তুমি ছাড়া আর কাউকেও আমি সে কথা বলতে পারি না, আর কার' কাছে এ দয়া-ভিক্ষা···

এ কি কথা, ভিক্ষা কেন বলছ মিলনী, ও-কথা আমার কাছে বলতে নেই। আমার যা সাধ্যে কুলাবে তা আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব—এ তুমি নিশ্চয় জান···

তুমি বোধ হয়, আমাদের সব কথাই শুনেছ ?

হ্যাঁ সবই শুনেছি, তোমার মা আমাকে সকল কথা বলেছেন।

প্রভাতী দেবী উঠে মাধুরীকে অন্যের অলক্ষ্যে চোখ টিপে বললেন :

ওরে মাধুরী, আয় আমরা একটু ও-ঘরে যাই, ওরা দু'জনে একলা বসে একটু আলাপ করুক !···দেখলি না, তোর দিদির কি আক্কেল···আঁা যেন কচি-খুকী · এতদিন পরে এল · একটু যদি বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে···এই জন্যেই ত··· তবে আর ওকে ডেকে পাঠাবার কি দরকার ছিল···

কথা বলতে বলতে প্রভাতী দেবী মাধুরীকে সঙ্গে নিয়ে পার্লার থেকে চলে গেলেন। মাধুরীও অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মানবের দিকে চেয়ে মুখ ভার ক'রে ভেতরে চলে গেল। মাধুরী কিছুতেই বুঝতে পারলে না যে, তার দিদি অমন সহজ সরল ভাবে কি ক'রে মানবের সঙ্গে কথা কইছে। যার অন্যায়ে এত বড় ব্যাপার হতে পারে—তার সঙ্গে মানুষ কি করে—না দিদিকেও বোঝা শক্ত হ'ল। দেখা যাক্···

মা ও মাধুরী চলে যাবার পর—মিলনীর সামনে মানব কিছুতেই মুখ তুলে কথা কইতে পারছিল না। অন্যায়ের যে তাপ সে মানবের ভেতর পর্য্যন্ত দাহনে তপ্ত। আজ মিলনীর সেই রুক্ষ কেশ, সাধারণ একখানা কাপড়—হাতে মাত্র কয়েক গাছা চুড়ি, খালি পা—চোখের-জলে-ধোয়া মুখ—তখন কান্নার সে আভা মুখ থেকে মুছে যায় নি, বরং ক্ষণে ক্ষণে সে চোখ জলে ভরে আসছে—মিলনী সামলে নিচ্ছে। যে অনাবিল সৌন্দর্য্যের ঝলক দিনের পর দিন মানবকে তার দেহের শিরায় শিরায় বিদ্যুতের তরঙ্গ বইয়ে দিয়েছিল, সেদিনের যে অসংযত রূপ তার ভরা-যৌবনের দীপ্তি, তাকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে সেইভাবে ঝাঁপ দেওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল—এ ত সে মূর্ত্তি নয়···এ কোন্ মিলনী ? এ কি মূর্ত্তি ! মানব সে মুখের পানে একবার চেয়ে আবার মুখ নীচু ক'রে রইল। মিলনীও কথা কইতে পারছিল না। তারপর জলভরা চোখে ডাকলে : মানব ভাই !

মানবের সমস্ত দেহটা কেঁপে উঠল, সে হাত জোড় ক'রে বলল : আমায় ক্ষমা কর মিলনী, আমি বুঝতে পেরেছি···আজ আমারই অন্যায়ের ফলে তোমার এ অবস্থা। না হলে জয়ন্ত কখনও তোমাকে···

শোন মানব ! তুমি আমার একটা কথা রাখবে—একটা উপকার করবে ?

বল, আমি ত বলেছি আমার প্রাণ দিয়েও যদি তোমার কোন কাজে আসতে পারি আমি নিশ্চয়ই করব।

তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। তাতে আমার এমন আঘাত লাগল, এত কষ্ট হ'ল···আমার অপরাধ কি ··

মিলনী ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে : তুমি বল আমার অপরাধ কি ? আমি তাঁর মনের মত হতে পারি নি হয়ত—সে অপরাধ আমার ; কিন্তু ওই চিঠি পেয়ে আমার ভারি

রাগ হয়েছিল। আমি তখনই সব সম্বন্ধ ছিন্ন করতে রাজী হয়েছিলাম। আমি তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে যদি তিনি আমায় না চান, আমিও তাঁকে চাই না, কোন সম্পর্ক রাখতে আমিও চাই না—

মানব স্থিরভাবে বললে: কিন্তু সেটা ত তোমার ভুল হয়েছে মি···কেন না···

এখন আমি বুঝতে পারছি মানব, যে আমার ভুল কোথায়। তুমি যে চিঠি আমায় লিখেছিলে—সে চিঠি আমি অনেকদিন পরে তাঁর দেরাজের ভেতর পেয়েছি—আমি জানতাম না যে তিনি আমার ওপর সন্দেহ ক'রে এ অসম্ভব ব্যাপার গড়ে তুলেছেন।

কিন্তু জয়ন্তরও ত এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হওয়া উচিত ছিল। সে ত দুর্ব্বল নয়, নির্বোধ নয়, সত্য মিথ্যার বিচার করা উচিত ছিল।

মানব, এ অবস্থায় কোন্ পুরুষ বিচার করে, তুমি হ'লেও ওই রকমই করতে।

শোন নি! তোমার কাছে গোপন করবার কিছু নেই। ছেলেবেলা থেকে—তোমার জন্যে, তোমার সঙ্গের জন্যে আমার একটা টান্ ছিল, তা তুমি জান?

জানি।

তুমি জান যে তোমাকে পাবার লোভ আমার ভেতরে একদিন কি ভাবে জেগেছিল?

আগে সঠিক বুঝিনি মানব, তবে পরে মাঝে মাঝে তোমার চোখের তাকানিতে তা মনে হয়েছে, কখন কখন সন্দেহও হয়েছে বটে। মেয়েমানুষে আর সকল কথা বুঝতে না পারলেও—পুরুষের এ ভাব তাদের কাছে লুকান থাকে না।

যখন জয়ন্তর সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ল—আমি সব আশা ত্যাগ ক'রে তোমাদের যাতে মঙ্গল হয় সেই কামনাই করে এসেছি। কিন্তু মানুষের মন, তার দুর্ব্বল এ দেহ, সেদিনের অসংযমকে আমি বল্গা দিয়ে টেনে রাখতে পারি নি। যদি জয়ন্ত সেখানে সেই অবস্থায় এসে না পড়ত হয়ত আমার অসংযম আরো বেশী তোমাকে পীড়া দিত।···কিন্তু সেদিন আমি বেঁচে গিয়েছিলাম শুধু জয়ন্তর জন্যে। আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। আজ মনে আমার যাই থাক, তুমি আমাকে যা আদেশ করবে তাই করব—করব নয় শুধু, সে কাজ করতে আমি বাধ্য। বল আমায় কি করতে হবে!

আমি এই চিঠিখানা তাঁকে দিতে চাই, তাঁর হাতে—তাঁকে সকল কথা আমার খুলে ব'ল। আমি যদি কোন ভুল করে থাকি, তিনি যেন এসে তার শাস্তি দেন, আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব—কিন্তু তাঁকে ছেড়ে এ সংসারে আমি বাঁচতে পারব না। তোমার পায়ে পড়ি ভাই! আমার···

ও কি! ও কি! মি? ··অপরাধীর মান এমন ক'রে খর্ব্ব করে দিয়ো না—আমি সত্যি কথা বলতে কখন ভয় পাই নি—আমি সব কথা জয়ন্তর কাছে খুলে বলব—তার মার্জ্জনা পায়ে ধ'রে ভিক্ষা ক'রে নেব। আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেব।

শোন ভাই, এ চিঠি আমি ডাকে পাঠাতে পারতাম, আমি জানি, তাঁর সকল সদিচ্ছা থাকলেও আমাকে মার্জ্জনা করলেও এমন কেউ তাঁর সঙ্গ নিয়ে আছে—সে,···

কে তার সঙ্গ নিয়ে আছে? কার কথা বলছ? ভোলা?

না—না, ভোলাদার কি অপরাধ—সে আমার দাদা হয়—সে আমার অনিষ্ট করেনি, আর কখনও করবেও না সে—সঙ্গ নিয়েছে সে সেই থিয়েটারের একট্রেশ মীনা··

আমাকে আর বেশী কিছু বলতে হবে না মি···আমি যেমন ক'রে পারি তোমাদের আবার মিলন করিয়ে দেব—এর জন্যে যদি···আমি শপথ করছি···

না—না, শপথ ক'র না ভাই, শোন আর এক কথা—আমি কাল রাত্রে ভোলাদাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম; থিয়েটারে গিয়েছিলাম, তারপর সেখানে, যে বাড়ীতে মীনা থাকে সেখানেও গিয়েছিলাম।

সেখানে, তুমি? তুমি সেখানেও গিয়েছিলে?

মানব, তাঁর জন্যে, তাঁকে পাবার জন্যে সামান্য সে পল্লীর কথা কি বলছ, আমি জ্বলন্ত আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি, যদি সে আগুনের ভেতর তাঁকে পাই।

যাক, আর আমায় বেশী কিছু বলতে হবে না—আমি আজই সেখানে···

এমন সময় বয়্ একটা ট্রেতে সাজিয়ে বার্গাণ্ডি মদ গেলাসে ঢাকা নিয়ে এল। মানব বিরক্ত হয়ে বললে: না—না, নিয়ে যাও। এ সব কি? দেখ দিকিনি, মার যেমন কাণ্ড।

বয়্ চলে গেল বিরক্ত হয়ে।

মানব তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললে: আচ্ছা মি, আমি এখন তবে আসি, তার পর যা ব্যবস্থা হয় তা করব। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি···আমার অপরাধের জন্যে যদি তোমার জীবনে এত বড় শাস্তি···

যেমন ক'রে পার···তাঁকে আমার কাছে এনে দাও—না হলে আমি বাঁচব না···তুমি যদি না পার—তা হ'লে আর কেউ পারবে না। যদি তোমার এ দৌত্য ব্যর্থ হয়, তবে জানব আমার সব দিক অন্ধকার, তাহ'লে আমাকে যেমন করেই হোক্ তাঁর সম্মুখে পৌছতেই হবে—আমি স্পষ্ট সব কথা প্রকাশ ক'রে তাঁর ভুল ভেঙে দেব· এতে ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্···

আচ্ছা, আমি এখন তবে আসি মিঃ।

মিলনী গলায় আঁচল দিয়ে একটা প্রণাম করলে। পার্লারের পর্দ্দার অপর পার্শ্ব থেকে মাধুরী বেরিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে মানবের পায়ের কাছে একটা গড় ক'রে বললে: তোমাকে তোমার রি-ও একটা গড় করলে· আজ বুঝলাম, সত্যি তুমি কত বড়···তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা—দিদির চোখের জল মুছে দিয়ো···

মানবের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ল। মানব আর দাঁড়াল না, তখনই চলে গেল।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করলে: কিন্তু দিদি, তুমি যে ওর হাত দিয়ে চিঠি পাঠালে, সে যদি অন্য রকম কিছু বোঝে?

অন্য কি বুঝবে?

যদি মনে করে যে, দোষটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে এই মতলব ক'রে করেছ? মানুষের দুর্ব্বলতার কথা বলা যায় না। আমি দেখছি সত্যের চেয়ে মিথ্যার বল অনেক বেশী। নইলে এই মিথ্যাটাই এত বড় হয়ে উঠল?

আর ভাবতে পারি নে বোন্! কিন্তু মানব ছাড়া আর আমার উপায় কি? যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে, হয় তাকে হাত ধরে তুলতে হবে, নয় মাটীতে হাত রেখেই উঠতে হবে। মানব ছাড়া—হাত ধরবার লোক আর আমার কেউ নেই। আর মানব ছাড়া তাঁর সামনে সাহস ক'রে আমার কথা নিয়ে দাঁড়াতে পারে এমন আর কে আছে, বল্।

শোন দিদি, মানব অনেক বড়—তার মন, তার হৃদয় সাধারণ মানুষের যে নয় তা বুঝি, কিন্তু···

কিন্তু কি?

আমি তোমার ছোট, জীবনের সব রস সব কথা তোমার মত আমি এখনও জানিনি, শিখিনি, তোমার মত দুঃখও আমি পাই নি এখনও; তবু দুঃখ আমিও পেয়েছি, লজ্জা করবার আমার কোন কারণ নেই, অনেকখানি দুঃখ আমি পেয়েছি। তা থেকে আমার এই জ্ঞান হয়েছে যে, পুরুষ মেয়েমানুষের চেয়েও কাদার তাল, দেখতেই শক্ত—মেয়েমানুষ ভিতরে শক্ত, বাইরে নরম। শক্তকে আমার ভয় হয় না দিদি, ভয় হয় আমার নরমকে—কেন না, সে-ই সত্যি দুর্ব্বল। মেয়েমানুষের দুঃখে পুরুষ কাঁদে এ ত স্বাভাবিক। চোখের সামনে দেখছ বাবাকে, কীর্ত্তনের মাথুর গান হ'লে তিনি ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলেন—আজও চোখের সামনে দেখলে মানবকে—টপ্ টপ্ ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়ল! না, এরা শক্ত ন।

তা আর আমার কি উপায় আছে?

জয়ন্তও পুরুষ মানুষ, সেও এমনই দুর্ব্বল, সেও আমার মনে হয় এর চেয়েও কাদার তাল।

তোর কি মনে হয়—মানবের সঙ্গে তিনি ফিরে আসবেন?

ফিরে তাকে নিশ্চয়ই আসতে হবে। মিথ্যার বল কিছুদিন খুব জোর চলতে পারে, বরাবর চলে না—কেননা মিথ্যাটা অতি নরম, প্লাস্‌টিক্ সত্য অতি কঠোর গ্রানাইট পাথর—সে সহজে টস্‌কায় না। আমি জোর গলায় বলতে পারি দিদি, জয়ন্ত তোমা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। কিন্তু মানব···

ঘরের আলো জ্বলে উঠল। প্রভাতী দেবী আবার ঘরে এসেই বললেন: বয়কে ফিরিয়ে দিলি যে, তোদের যদি কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে· এ কি, মানব কোথায় গেল? মাধুরী তুই এখানে কি করছিস্।

মিলনী কাতর দৃষ্টিতে বললে: চলে গেছে।

চ'লে গেছে? তার মানে? আমি তার জন্যে বার্গাণ্ডি পাঠিয়ে দিলাম, তোদের জন্যে আলাদা ক'রে ডিনার ব'লে দিলাম, চলে গেছে মানে? তার সঙ্গে রাগারাগি করলি না কি?

না—তাকে একটা কাজের জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

কাজটা কি শুনি? এলে, রু· মাথাটা কাকের বাসা

ক'রে। জামা-কাপড় আনিয়ে দিলাম—তা পরা হ'ল না। ভাল গয়নাগুলোও হাত থেকে খুলে ফেলা হয়েছে···এতদিন পরে আজ এখানে এসেই তাকে ডেকে পাঠিয়ে আবার কোন্ কাজে বিদেয় করলে শুনি?

বিদায় করি নি—মানবকে একটা কাজে পাঠিয়েছি।

কি কাজে পাঠালে সেইটা শুনতে পাই না কি? বটে··· কি মাধুরী, কাজটা খুব গোপন না···

তোমার মেয়ে ত দাড়িয়ে রয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই পার? আমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলছ কেন?

মিলনী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে:

গোপন কিছুই নয় মা, আমি মানবকে তাঁর কাছে একখানা চিঠি নিয়ে যাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

তাঁর কাছে? কেন? কার কাছে? কে?

তাঁর কাছে।

তাঁর? তাঁর কে? ও, কেন? ডিভোর্সের চিঠি পাকা ক'রে নেবার জন্যে?

না।

তবে তবে? কি জন্যে মানবকে সেই মাগীর বাড়ীতে ইল্লতে জায়গায় পাঠালে শুনি?

ডিভোর্সের জন্যে নয়—ডিভোর্স আমি করতে দেব না।

তবে সেই লক্ষ্মীছাড়ার কাছে···

তিনি লক্ষ্মীছাড়া নন—আমি এখনও তাঁকে ছাড়ি নি।

তবে এ-সব ন্যাকা-পানার কি দরকার ছিল?

আমি তাঁকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারব না।

ও, তাহলে সেই আগের মতই চলবে—কেমন?

সে তুমি যাই বল, তিনি আমায় ত্যাগ করবেন এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

তার মানে তোর কাছে সে ফিরে আসবে, আবার তুই ফিরে তার ঘর করবি—সেই পাজী বদমায়েস স্কাউণ্ড্রেল্ রো'গ—লম্পট মাতাল···

মাধুরী তার মার মুখের কাছে হাত-চাপা দেবার মতন ভাবে বলে উঠল: কি করছ মা, পাগলের মত কি বকছ ·· আঃ চুপ কর না···চাকর-বাকরে কি মনে করবে!

মিলনী সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললে: মা, আমার সুমুখে তাঁকে অমন খারাপ কথা ব'লে গালাগালি দিও না বলছি···তিনি আমার স্বামী!

প্রভাতী অত্যন্ত রূঢ় ও কর্কশ স্বরে বললেন: আহা, কি আমার স্বামী রে···সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একটা রাস্তার ভিখিরী···

রাস্তার ভিখিরী হলেও সে-ই আমার স্বামী···তোমায় বারণ করছি মা, বার-বার আমার সুমুখে ওরকম কথা আর ব'ল না···

মাধুরী দিদিকে বললে··দিদি, চল আমরা ও-ঘরে যাই···

না, কেন মা, তুমি আমায় এমন করে বলবে? বাবা তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন আমাকে, আর আমারই সামনে তাঁকে ওই সব কথা ব'লে তোমার মনে খুব আনন্দ হচ্ছে, না? কেন তুমি আমায় অমন ক'রে খোঁচা দিয়ে কথা কইছ? বিয়ে হওয়া থেকে তাঁর ওপর তোমার যে কি বিষদৃষ্টি·· ওই জন্যে এ বাড়ীতে আমি আসি নে···

মাধুরী একবার তার দিদিকে বললে: চুপ্ কর দিদি! আবার তার মাকে থামাতে যায়। মাকে বললে: দেখ মা, তুমি মা, তোমায় আর কি বলব। কোন মা যে তার মেয়েকে এই রকম কথা বলতে পারে, এ আমার জানা ছিল না; নিজের মেয়ের সম্বন্ধে অন্য একজন পুরুষের সামনে যে এই রকম তার স্বামীর সম্বন্ধে এত অন্যায় কটু কথা বলতে পারে—এ আমি জানতাম না···

প্রভাতী দেবী অত্যন্ত তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন:

বটে লো বটে, তাই বটে; তোমরা সব লেখাপড়া জানা পাশ করা আধুনিকা—তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আমাদের চেয়ে ঢের বেড়ে গেছে। এখন সব স্ত্রীলোক নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে শিখেছে, আমার কথাগুলো গায়ে বড় বেঁধে, না? আগে স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির জন্যে ডাক-পাড়াপাড়ি, তারপর আবার তখনই একজনকে ডেকে পাঠালে যে তোমাকে ভালবাসে, আবার তাকে দিয়েই···

মিলনী হাত নেড়ে বল্লে: আঃ, বলছি তা নয়, তা নয়···কি বলছ?

মানব তোকে ভালবাসে না?

না।

মানব তোকে বিয়ে করবার কথা বলে নি এর আগে? তুই মানবের সঙ্গে ফ্লার্ট ক'রে বেড়াস নি···আমি বললেই যত মন্দ হয়—না?

মাধুরী আবার তার মাকে থামাতে গিয়ে বললে : ছি ছি ·· মা, কি-সব কথা বলছ···থাম না···

মা রাগের চূড়ান্ত ভাব দেখিয়ে হাতমুখ নেড়ে বললেন :

আজ আবার তাকে ঢঙ ক'রে ডেকে এনে ··তপস্বিনী সেজে ঢঙ করতে এলেন ··

মিলনী শক্ত আড়ষ্ট হয়ে গেল। চোখ দুটো তার আগুনের মত জ্বলে উঠল : বললে : মা, this is too much, থাম বলছি, তুমি যাও এখান থেকে; আমায় একটু একলা থাকতে দাও ·

প্রভাতী রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন : কি বললি, আমার বাড়ী, আমার ঘর, তোর হুকুমে আমি যাব এখান থেকে? মা তোমার যাক্ এখান থেকে, আর তুমি সেই হাবাতের জন্যে দরজা খুলে দাও। ঢুকুক ত দেখি সেই পাজী লক্ষীছাড়া-হাড়হাবাতে·· আমি চাকর দিয়ে, অপমান ক'রে তাকে বার ক'রে দেব ··

মাধুরী এইবার তার মাকে ধমক দিয়ে উঠল : কি বকছ মা, পাগলের মত···তোমার কি হিগ্গি-দীঘ্যি জ্ঞান নেই।

মিলনী আড়ষ্ট কাঠের পুতুলের-মত দাঁড়িয়ে, তার চোখের পলক পড়ছে না। সে ভেবে ঠিক করতে পারছে না যে, এখন ইতিকর্ত্তব্য কি? স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হলেও আজও স্বামীর ঘরে সে ঈশ্বরী, আর এই তার মা—এটা তার বাপের বাড়ী···বাপ তার সর্ব্বেশ্বর রায়—তাকে তার মা এমনই ক'রে অপমান করছে। এর চেয়ে যে মরা ভাল ছিল। সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে মাকে বললে :

বেশ মা, কেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছ—রাগ করছ—আমার অন্যায় হয়েছে এখানে আসা—আমি এখনই যাচ্ছি।

মাধুরী দিদির হাত ধরে ফেললে : দিদি, তুমিও কি পাগল হলে!

না রি, পাগল এখনও হইনি, তবে এ রকম অবস্থায় আর কিছুক্ষণ থাকলেই পাগল হয়ে যাব বোধ হয়। মা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না—আমি চলে যাচ্ছি তোমার বাড়ী থেকে ··

কি করছ দিদি? চল, চল, তুমি আমার ঘরে চল। কি ছেলেমানুষী করছ—মার ওই রকম কথা, ওঁর কি মাথার ঠিক আছে···

প্রভাতী দেবী এতক্ষণ শুধু দাঁতে দাঁত দিয়ে ঠক ঠক্ ক'রে কাঁপছিলেন। তারপর চীৎকার ক'রে উঠলেন : আমি কিছুতেই তাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেব না, দেব না, দেব না ··না, এ আমি দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না···ওঃ ওঃ মাথাটা গেল আয়া, ওডিকলোন-স্মেলিং সল্ট···মাথা গেল—মাথা গেল···আয়া, আয়া! স্মেলিং সল্ট—য়্যামন্ ক্লোরাইড্···

বলতে বলতে প্রভাতী দেবী আঁকা-বাঁকা চলনে পার্‌লার থেকে ছুটে চলে গেলেন।

মিলনী কাঁদতে কাঁদতে মাধুরীকে বললে : রি, আমার বোধ হয় দুকূলই গেল। স্বামী ত্যাগ করলে—সংসার আমার এত বড় প্রতিষ্ঠাকে ভেঙে চুরমার করে দিলে। এখন আমার দাঁড়াবার জায়গা কোথায়—উঃ ভগবান!

মাধুরী তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে : ভয় কি দিদি! অমন করছ কেন? মাকে ত জান। ওঁর অমনই মাথা খারাপ চিরটা কাল···

না রি, যেদিন থেকে আমার বিয়ে হয়েছে, সেইদিন থেকে ওঁর ওপরে মার যেন কি বিষদৃষ্টি, আমি জানি মার ইচ্ছা ছিল না যে আমার তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়।

ওসব কথা ছেড়ে দাও দিদি, চল তুমি আমার ঘরে—চল···আমি মাকে বোঝাচ্ছি।

মাধুরী তার দিদির হাত ধরে নিজের ঘরে চলে গেল।

ক্রমশঃ



দোলাচল-চিত্ত

শ্রীকালিদাস রায়

জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিস্থলে দাঁড়ায়ে এ পারে
দোলাচল চিত্তে মোর এই প্রশ্ন ওঠে বারে বারে
কোন্ পন্থা বীরোচিত ? রোষারুণা ভাগ্য দেবতার
ভ্রূভঙ্গি-লাঞ্ছনা-গ্লানি সহিব কি বক্ষে অনিবার ?
অথবা হুঙ্কারি ওঠে শস্ত্রপাণি দুর্দম বিদ্রোহে
সর্ব জ্বালা শান্ত করি আততায়ী পাষণ্ডের লোহে ?
কোন্ পথ ? জ্বলে বুক মুহুর্মুহুঃ বৃশ্চিক-দংশনে !
মৃত্যু ! মৃত্যু !! তাই হোক্ হাস্যমুখে বরিব মরণে ।

মৃত্যু সে ত মহানিদ্রা । চমৎকার ! ফুরাইবে সব,
আহা সে পরম ভাগ্য পূর্ণতার চরম গৌরব,
একেবারে জুড়াইবে সর্ব জ্বালা সর্ব দুঃখ ক্ষোভ,
স্বস্তি স্বস্তি ! শান্তি শান্তি ! চিরনিদ্রা তাই মোর হোক্ ।
মৃত্যু কি নির্বাণ নয় ? মহানিদ্রা তবে স্বপ্নময় ?
স্বপ্ন-বিভীষিকা তবে দেহ মনে পাবে না ক লয় ?
দেহ বন্ধ হ'তে যদি মুক্তি লভি না পাই নিস্তার,
চিরনিদ্রা ব্যেপে যদি দুঃস্বপ্নই করে অধিকার,
কি লাভ মরণে তবে ? এ রহস্য পীড়িছে অন্তর
এ গূঢ় সমস্যা সর্ব কর্মে ব্যর্থ করে নিরন্তর ।
উৎসাহের কর হ'তে খসে পড়ে নগ্ন তরবার,
কোন রূপে বহি তাই ক্লিষ্ট দীর্ঘ জীবনের ভার ?
কালের কণ্টক-কশা তা না হলে কে সহিত হায় ?
কে সহিত প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ের তীব্র বেদনায় ?
দর্পান্ধের অপমান, পীড়কের ক্রূর অত্যাচার,
দুঃসহ বিলম্ব পুন ইহলোকে প্রতিকারে তার,
পদগর্বী পাষণ্ডের অহরহঃ ভ্রূ-ভঙ্গি-লাঞ্ছনা,
অযোগ্যের করে জ্ঞানী-গুণী সাধুজনের যাতনা
কে সহিত ? সর্ব জ্বালা জুড়াবার অমোঘ উপায়
উলঙ্গ কৃপাণ রূপে সন্নিকটে থাকিতে সহায় ?
অই ভব-সিন্ধু-পারে কুহেলিকা-রহস্যে আবৃত
মানব-ভূগোল-তত্ত্বে যাহা আজো নহে আবিষ্কৃত
যে দেশ হইতে আজো কোনো যাত্রী সংবাদ বহিয়া,
ফিরে এসে আমাদের কোন বার্তা যায়নি কহিয়া
কে জানে মরণ-পারে সে পরত্রে জীবন কেমন ?
ঐহিক জীবন হ'তে আরো বুঝি দুঃসহ ভীষণ ?
অজ্ঞাতের বিভীষিকা হায় নিত্য চিত্ত-বল হরে
সর্ব পরিকল্পনারে ধ্বস্ত স্রস্ত ছিন্ন ভিন্ন করে,
বাধ্য করে এ-ধরার দুঃখ-ভার হৃদয়ে ধরিতে,
অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনেরে দেয় না বরিতে,
তা না হলে পলে পলে কে সহিত এমন সংহার ?
কে বহিত অবসন্ন সংসারের ক্লিষ্ট খিন্ন ভার ?
বিবেক-বিচার-বোধই রাখিয়াছে কাপুরুষ করি'
আশঙ্কার কুহেলিতে দগ্ধ সব সঙ্কল্প মঞ্জরী ।
এমনি করিয়া হায় কল্পনার নীহারিকা-ধূপ
মানসে বিলীন হয় সাধনায় লভে নাক রূপ,
হারায় সাফল্য-সিদ্ধি সর্ববাঞ্ছা ব্যোমপথে ওঠে
পক্ষাঘাতে স্তব্ধ পক্ষ অবসন্ন ভূমে পড়ে লোটে । *

* সেক্সপীয়রের হ্যামলেট হইতে ।



মিউনিক বৈঠকের পর

শ্রীঅতুল দত্ত

(রাজনীতি)

মিউনিক বৈঠকের পর হইতে ইউরোপের চারিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন সাধিত হইয়াছিল। কথাটা কাহারও কাহারও কানে বেসুরো ঠেকিতে পারে, কারণ আপাতদৃষ্টিতে এই চারিটি শক্তির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। বৃটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্রের গর্ব্ব করে—রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাহাদের শক্তির উৎস দেশের জনসাধারণ, সে শক্তির ধারা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখী। আর ইটালী ও জার্মানীর ডিক্টেটরী শাসন-শক্তির প্রস্রবণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর শীর্ষস্থানে অবস্থিত, উহার ধারা নিম্নমুখী। এইরূপ পৃথক্ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা লইয়া চারিটি দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন সাধিত হইল কেমন করিয়া—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিতে হইলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়ার কথা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশে জনসাধারণের ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত সমর্থনকে অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে। ডিক্টেটরী প্রথায় দেশের জনসাধারণ "ভয় ও ভক্তিতে" অব্যক্তভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন করে; এই অব্যক্ত সমর্থনই ডিক্টেটরকে অপ্রতিহত ক্ষমতা জোগায়। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের অভিমত ব্যক্ত—এই ব্যক্ত অভিমত গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের উত্থান-পতন ঘটাইয়া থাকে। ইটালী ও জার্মানীতে যাহারা প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার সমর্থক নহে, তাহারা হিট্লার ও মুসোলিনির "ডাণ্ডার" ভয়ে বাক্যে অথবা আচরণে কোনরূপ বিরুদ্ধতা প্রকাশে সাহসী হয় না। বৃটেন ও ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে "আচরণের" স্বাধীনতা না থাকিলেও উহার বিরুদ্ধে "সমালোচনা" নিষিদ্ধ নহে। এই সমালোচনার দ্বারা বিপক্ষ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটানও সম্ভব। মিউনিক বৈঠকের পর বৃটেন ও ফ্রান্সের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের এই পতনাশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। হিট্লার ও মুসোলিনি জনসাধারণের মুখ বন্ধ করিয়াছেন ডাণ্ডার ভয় দেখাইয়া; পক্ষান্তরে, চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা, মিউনিক বৈঠকের পূর্ব্বে ও পরে ক্রমাগত যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণের মুখ বন্ধ করিয়াছেন। "চেম্বারলেন এণ্ড কোম্পানীর পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন কর, নতুবা যুদ্ধ অনিবার্য্য"—এই কথাটি বৃটেনের জনসাধারণকে এইরূপভাবে বুঝান হইয়াছে যে তাহারা আর ঐ "কোম্পানী"র কোনরূপ বিরুদ্ধতা করিতে সাহসী হইতেছে না। ফ্রান্সেও অবস্থা এইরূপ—দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা ফ্রান্সের ত্রাণকর্ত্তা সাজিয়াছেন। সেখানেও জনসাধারণকে বুঝান হইয়াছে দালাদিয়ার মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র-নীতি সমর্থন কর, উহার প্রবর্ত্তিত অর্থনীতিক ব্যবস্থা মানিয়া লও, শ্রমিকদিগকে অধিক সময় কার্য্য করাইলে আপত্তি করিও না। এই কথা যদি না শুন, তাহা হইলে ফ্রান্সের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে—যুদ্ধ নিশ্চিত। দেশবাসীকে যুদ্ধের ভীতিতে এইরূপভাবে সন্ত্রস্ত রাখিয়া চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা এক্ষণে বস্তুত ডিক্টেটরী ক্ষমতাই লাভ করিয়াছেন। এই জন্য বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানীর মিলনে ঐ সকল দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দিক হইতে যে অসুবিধা ছিল, তাহা দূরীভূত হইয়াছে। "স্পেনের সমস্যা না হইলে ইটালীর সহিত মিত্রতা স্থাপন অন্যায়, জার্মানীকে আর প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে তাহার ঔদ্ধত্য দমন করা অসম্ভব হইবে"—এই সকল কথা বৃটেনে যাঁহারা তখনও বলিয়াছেন তাঁহাদের কণ্ঠস্বর আজ ক্ষীণ, সংখ্যায় তাঁহারা অত্যন্ত অল্প। ফ্রান্সে এইরূপ দলের শক্তি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে; এই জন্য তথায় ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়া, সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া দালাদিয়ার ডিক্টেটরীর বিরুদ্ধতা করিবার চেষ্টা হইতেছে। যে সময় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সেই সময় পর্য্যন্ত ফ্রান্সের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সেখানে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধতার এই চেষ্টা সফল হইবে না—শেষ

পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ পক্ষের নেতৃবর্গ দালাদিয়ার ডিক্টেটরীর নিকট নতি স্বীকার করিবেন।

ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের সহিত তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তি দুইটির মিলন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—ইহাদের যদি সম্পূর্ণ মিলনই স্থাপিত হইল, তাহা হইলে জার্মানী মধ্যে মধ্যে উপনিবেশের জন্য "হুঙ্কার" ছাড়িতেছে কেন? জার্মানীর হৃত উপনিবেশ যদি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়, তাহা হইলে বৃটেন্ ও ফ্রান্স ত কম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন কবি লং ফেলো—"কোন বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে যাহা মনে হয়, উহাই তাহার প্রকৃত রূপ নহে।" মিউনিকে বসিয়া মিঃ চেম্বারলেন ও মঃ দালাদিয়ার চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্ব্বনাশ সাধন করিলেও তাঁহাদের নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। হিটলারকে মধ্য-ইউরোপে অধিকারবিস্তৃতির স্বাধীনতা দান করিলে দুই দিন পরে তাঁহার উপনিবেশের দাবীতে বিরত হইতে হইবে—এই সাধারণ কথাটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলে বুঝিল, আর দুইটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের অধিপতি তাহা বুঝিলেন যে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুত বর্ত্তমান সময়ে জার্মানীর এই উপনিবেশের দাবী একটা বড় রকমের ধাপ্পাবাজী। উপনিবেশের দাবী তাহার আছে, ইহা সত্য; কিন্তু সে এই বিষয় লইয়া এক্ষণে মোটেই "মাথা ঘামাইতেছে" না—এখন সে সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করিয়াছে পূর্ব্ব-ইউরোপের প্রতি। তবুও সে মধ্যে মধ্যে উপনিবেশের দাবী উত্থাপন করিয়া বৃটেন্ ও ফ্রান্সের অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে, "সাবধান, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করিও না, জার্মানী এখনও শান্ত হয় নাই।" ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে জার্মানী বর্ত্তমান সময়ে ব্যাপক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অসমর্থ—ইহা জানিয়াও মিঃ চেম্বারলেন তাঁহার স্বদেশবাসীকে যুদ্ধ-ভীতিতে সন্ত্রস্ত রাখিয়াছেন এবং সেই সুযোগে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নাৎসী দস্যুবৃত্তির সমর্থন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ-ভীতি যে এখনও দূরীভূত হয় নাই, এই কথা বৃটেন ও ফ্রান্সের অধিবাসীদিগকে বুঝাইবার জন্যই জার্মানী মধ্যে মধ্যে উপনিবেশের জন্য "হুঙ্কার" ছাড়িতেছে।

জার্মানী এখন সর্ব্বতোভাবে পূর্ব্ব-ইউরোপের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছে; সে ঐ অঞ্চলে অর্থনীতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হইয়াছে। সে আশা করে, এই অর্থনীতিক প্রভাব ক্রমে রাজনীতিক প্রভাবে পরিণত হইবে। জার্মানীতে হিট্‌লার ক্ষমতাশালী হইবার পূর্ব্বে দানীয়ুব নদীর তীরস্থ রাষ্ট্র ও বলকান্ রাষ্ট্রগুলির মোট বাণিজ্যের শতকরা বিশ ভাগ বাণিজ্য জার্মানীর সহিত চলিত। এখন ঐ সকল রাষ্ট্রের মোট বাণিজ্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাণিজ্য জার্মানীর সহিত চলে। পূর্ব্ব-ইউরোপে এই বাণিজ্য বৃদ্ধির কার্য্যে জার্মানী অত্যন্ত চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছে। এই বাণিজ্যে দেয় অর্থের আদান-প্রদান এইরূপ কৌশলের সহিত পরিচালিত হইতেছে যে, পূর্ব্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ক্রমেই জার্মানীর নিকট ঋণগ্রস্ত হইতেছে। ইহা ব্যতীত জার্মানী ঐ সকল দেশের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার ব্যবস্থাও করিয়া ফেলিয়াছে। হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার গম, গ্রীসের তামাক, তুরস্কের কিস্‌মিস্ এবং যুগোশ্লাভিয়ার কাষ্ঠ সে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রয় করে এবং ঐ অতিরিক্ত দ্রব্য অন্যান্য দেশে বিক্রয় করে। এই উপায়ে জার্মানী ঐ সকল দেশের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিতেছে। পূর্ব্ব-ইউরোপের অর্থনীতিক আধিপত্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে জার্মানী কিরূপে রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐ অঞ্চলের নাৎসী দলগুলি জার্মানীর অর্থসাহায্যে পুষ্ট। সেখানকার যে সকল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত জার্মানীর ব্যবসা-সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে ইহুদী কর্ম্মচারী বিতাড়নে বাধ্য করা হয়; জার্মানীর নির্দ্দেশে তাহারা স্থানীয় নাৎসী-দলকে অর্থ সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ নাৎসী দলগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সাহসী হন না; কারণ তাঁহারা জানেন, জার্মানী যদি বিরূপ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দেশের বহির্ব্বাণিজ্য নষ্ট হইবে এবং জার্মানী তাঁহাদিগকে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় রাখিয়া যাইবে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বৃটেন্ ও ফ্রান্স ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের মন জোগাইয়া ক্রমেই তাহাদের নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন করিতেছে। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, স্পেনে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মধ্য ও পূর্ব্ব-ইউরোপে জার্মানী প্রবল হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বৃটেন্ ও ফ্রান্স উভয়ের স্বার্থ ই বিপন্ন হইবে—

এইরূপ আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। কিন্তু চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা এই আশঙ্কা করিতেছেন না কেন? আমরা জানি ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের সহিত মিত্রতা স্থাপনে সর্ব্বাধিক আগ্রহান্বিত চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্স কোম্পানী। তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই দালাদিয়ার গভর্ণমেণ্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বস্তুত সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ফ্রান্সের সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়াছে। চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্স কোম্পানীর ফ্যাসিষ্ট-প্রীতির কারণ—তাঁহারা স্থির বুঝিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সহিত সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের মিলন কখনও বাঞ্ছিত নহে। ইটালী ও জার্মানী সাম্রাজ্যবাদী; সুতরাং উহারা বৃটেনের স্বগোত্র! পক্ষান্তরে সোভিয়েট রুশিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। এইজন্য চেম্বারলেনের দল বহু পূর্ব্বেই স্থির বুঝিয়াছেন, স্ব-গোত্র ইটালী ও জার্মানীর সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আপোষ মীমাংসা করা বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে প্রাচী অথবা প্রতীচী কোথাও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ফ্রান্সে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দলগুলি কিঞ্চিৎ শক্তিশালী, এইজন্য ফ্রান্সকে দলে ভিড়াইতে চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্স কোম্পানীর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যায় ও তৎসংক্রান্ত মিউনিক বৈঠকে তাঁহাদের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইয়াছে—দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের প্রতি অনুরক্ত।

এক্ষণে কথা হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব হইতে ইউরোপকে 'মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের মন জোগাইয়া বৃটেন্ ও ফ্রান্স তাহাদের নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন করিয়াছে কি-না। এই সম্পর্কেও বলা যাইতে পারে, যে-কথাটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলে বুঝিয়াছে, সেই কথাটা দুইজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারে নাই, ইহা কিরূপে সম্ভব? চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্স কোম্পানীর অনুসৃত নীতিতে বৃটেন্ ও ফ্রান্সের স্বার্থ বিপন্ন হওয়া দূরে থাকুক, সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টায় তাঁহাদের দূরদর্শিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রথমে স্পেন সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। স্পেনে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তথায় যে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট নহে—বিভিন্ন বামপন্থী দলের মিলনে গঠিত প্রকৃত গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই স্পেনে কম্যুনিষ্টদিগের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং সোভিয়েট রুশিয়ার নিকট হইতে স্পেন সরকার নানা উপায়ে সাহায্য পাইতে থাকেন। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে সরকার পক্ষ যদি জয়ী হয়, তাহা হইলে তথায় কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ। সাম্রাজ্যবাদী চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্স কখনও কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইতে পারেন না। এইজন্য নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া তাহারা প্রকারান্তরে ফ্রাঙ্কোর দলকে সাহায্য করিয়াছেন। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রভাব বিস্তৃতির জন্য প্রাচীর সাম্রাজ্যের সহিত বৃটেনের সংযোগ বিপন্ন হইয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু ইটালী সাম্রাজ্যবাদী, সুতরাং সে বৃটেনের "স্বধর্ম্মাবলম্বী"; তাহার সহিত বৃটেনের আপোষ মীমাংসা সম্ভবপর। পক্ষান্তরে স্পেন যদি কমুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ দ্বারে একটি সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী দুর্গ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের ত্রাণকর্ত্তা চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্স কোম্পানী বহু পূর্ব্বে এই সত্য কথাটা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পেন সম্পর্কে ফ্রাঙ্কোর প্রতি পক্ষপাতিত্বে তাঁহাদের এত অধিক দৃঢ়তা। তাহার পর, মধ্য-ইউরোপ; জার্মানীর অষ্ট্রিয়া গ্রাসে এবং চেকো-শ্লোভাকিয়ার সর্ব্বনাশ সাধনে বৃটেন্ যদি তাহাকে সাহায্য না করিত এবং পূর্ব্ব-ইউরোপে জার্মানীর আধিপত্য বিস্তারে বৃটেন্ যদি উদাসীন না থাকিত, তাহা হইলে জার্মানীর উপনিবেশের দাবীতে বৃটেন্ বিব্রত হইয়া পড়িত। হয়ত জার্মানীর সহিত তাহাকে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইত। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আরব্ধ সেই সংগ্রামে বৃটেন্ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্য পাইতে পারে—এই আশা চেম্বারলেন্-হালিফ্যাক্স কোম্পানী করেন নাই। সেইরূপ আশা করিলে তাঁহারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন না, ইহা সহজবোধ্য। বৃটেন্ ও ফ্রান্স যদি সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে অচিরে ফ্যাসিষ্ট ঔদ্ধত্য বন্ধ হইতে পারে, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্য নিরাপদ হয় না; এই কথাটা চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার মন্ত্রীসঙ্ঘ উত্তমরূপে

বুঝিয়াছেন এবং উহা বুঝিয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

সুদূরপ্রাচী সম্পর্কে চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্সের নীতি তত স্পষ্ট নহে; কারণ এই ক্ষেত্রে তাঁহারা কিঞ্চিৎ সমস্যায় পতিত হইয়াছেন। জাপান সাম্রাজ্যবাদী; সুতরাং সে বৃটেন্ ও ফ্রান্সের "স্বগোত্র"। কিন্তু সে প্রতীচ্য সাম্রাজ্য-বাদীর দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত যদি জাপানের প্রভাব বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে উহা বৃটেনের পক্ষে বিশেষ আশার কথা নহে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্যে পুষ্ট এবং কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যদি বর্ত্তমান সঙ্ঘর্ষে জয়ী হয় এবং তাহাদের প্রভাব ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে উহাও চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্স কোম্পানীর পক্ষে চিন্তার কথা। এই সমস্যায় পতিত হইয়াই ঐ দল সুদূর প্রাচী সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। মিউনিক চুক্তির পর সুদূর-প্রাচীর যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এই যে, জাপান এখন দক্ষিণ চীনে সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে সে একবার এই চেষ্টা করিয়াছিল; ইহার পর দক্ষিণ চীনে বৃটেন্ ও ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চলের এত নিকটে জাপান আর সামরিক ক্রিয়াকলাপ প্রসারিত করে নাই। মিউনিক চুক্তির পর জাপানের ভাবগতিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বৃটেন্ কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়াছে। এইজন্য সে এক্ষণে আমেরিকার এত অধিক মিত্রতাকাঙ্খী হইয়াছে। আমেরিকার সহিত বৃটেনের সম্প্রতি যে অর্থনীতিক চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে বৃটেন্ যত অধিক উল্লাস প্রকাশ করিতেছে তত অধিক উল্লসিত হইবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমেরিকার সুরে সুর মিলাইয়া ধুরন্ধরগণ জার্মানীর ইহুদী উৎপীড়নের "লোক-দেখান" নিন্দা করিতেছে। আগামী বৎসর বৃটিশ সম্রাট আমেরিকা পরিদর্শনে গমন করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

জাপান কর্ত্তৃক ক্যাণ্টন অধিকৃত হওয়ায় সমুদ্রপথে চীনে সমরোপকরণ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চীনে সমরোপকরণ প্রেরণে কোন আপত্তি করেন নাই।

কাচের ইতিবৃত্ত ও ভারতে কাচ শিল্প

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

একটি অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের ঘরে কাচের কি কি জিনিষ ব্যবহার হচ্ছে?" সে আমায় যে তালিকা দিল, তাহার কোনই পরিবর্ত্তন না করিয়া পাঠকের সম্মুখে সমুপস্থিত করিলাম—

থালা, রেকাব, গেলাস, বাটী, প্লেট, খেলনা, পুতুল, দুধের পাত্র, চিনি-দানী, মাখন-দানী, শিশি, বোতল, মাপের গ্লাস (measuring glass), ছবির কাচ, ফটোর প্লেট, সারশি, আলমারির টানা বা হাতল, আয়না, ঘড়ির কাচ, থার্ম্মমিটার, ফ্লাস্ক (flask), কাগজ চাপা (paper weight), রুল, বাল্ব, চিমনি, দোয়াত, জার (jar), চশমা, চুড়ি, পিচকারি, পুঁতি, ফিডিং বোতল (feeding bottle), ঔষধ মাপের চামচ, ড্রপার, ল্যাক্টোমিটার—

তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে, ইহা যথেচ্ছা সংগৃহীত। দ্রষ্টার যখন যাহা চোখে পড়িয়াছে, তাহাই তালিকাবদ্ধ করিয়াছে। একটি গৃহস্থ ঘরে যদি এই ব্যাপার দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় অবস্থাপন্ন ঘরে কাচের আরও আসবাব জুটিয়াছে; তাহা ছাড়া ঘরের বাহিরেও বহু কাচের বা কাচ বস্তুর প্রয়োজন। দোকান সাজাইতে, মোটর প্রভৃতি যানেতে, বিজ্ঞানে, বিশেষত রসায়ন, পদার্থবিদ্যা-চিকিৎসা-বীক্ষণ-যন্ত্রে, যান-যন্ত্রে নানা প্রকারের এবং সময় সময় বহু মূল্যবান কাচের প্রয়োজন। টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপ, ব্যারোমিটার, থার্ম্মোমিটার, স্পেক্ট্রস্কোপ্ প্রভৃতি সকল যন্ত্রেই অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কাচের ব্যবহার প্রচলিত। জ্ঞান ও শিল্প প্রসারের সহায়তা করিয়া

স্বাস্থ্য সুখ ও বিলাসের সামগ্রী দৃষ্টির সুবিধা করিয়া দিয়া আজকাল কাচ প্রায় অন্য সমস্ত ব্যবহারিক দ্রব্যের উপরে স্থান অধিকার করিয়াছে।

কাচের উৎপত্তি স্থান লইয়া নানা মতভেদ আছে। কাহারও মতে ফিনিশিয়া, কাহারও মতে মিসর, আবার ভারতের নামও কাহারও কাহারও নিকট শোনা যায়। ইহা একেবারে অসম্ভব নহে যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাচের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কারণ কোনও ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক মানুষের বুদ্ধি দ্বারা কাচের প্রথম সৃষ্টির কথা বলেন না। সকলেই মনে করেন অকস্মাৎ নৈসর্গিক ঘটনার ফলে পৃথিবীতে কাচ সৃষ্টি হইয়াছে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে কাচ পাওয়া যাইতে পারে, খড় প্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হইলে কাচের মত বস্তু হয়ত পাওয়া যাইতে পারে, কারণ তৃণগাছটি দাঁড়াইয়া থাকে কাচের উপাদান সিলিকার জোরে। ধাতুর arc গলাইতে কাচের টুক্‌রা পাওয়া যাইতে পারে; আর ফিনিশিয়রা নদীতীরে রান্না করিবার জন্য natron বা নাইটার-এর পাথর আর বালু সংযোগে অকস্মাৎ কাচ সৃষ্টি করিয়াছিল, একথাও সত্য হইতে পারে। মোট কথা কাচ-সৃষ্টির সাল তারিখের কোনও স্থিরতা নেই।

সালযুক্ত প্রথম কাচ, মিসরীয়দের নীল কাচের সিংহমুণ্ড এবং তাহা ২৪২৩-২৩৮০ খ্রীষ্টপূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা, মিসর এই বিদ্যা ফিনিশিয়দের নিকট প্রাপ্ত হয়। তাহার পর নানা স্থানে মৃত্তিকার গর্ভ হইতে কাচ উদ্ধার করা গিয়াছে, কিন্তু সকল-গুলিই মিসরের কাচের পরের বস্তু। অগ্ন্যুৎপাতের কাচকে obsidian (অবসিডিয়ান) glass বলে এবং মিসর, রোম ও মেক্সিকোর অধিবাসীরা ইহা হইতে নানারূপ কাচের বস্তু প্রস্তুত করিত বলিয়া জানা আছে।

ভারতের ইতিহাস খুবই পুরাতন। যুধিষ্ঠিরের সভা-গৃহে কাচের বা স্ফটিকের বিন্যাসে দুর্য্যোধনের নানারূপ অবমাননার কথা সকলেই জানেন। সুতরাং তাহারও বহু পূর্ব্বে যে কাচের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে। সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৬ সালে মুকুর বা আসি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইত। তাহার পর কোনও কোনও কাচ এদেশে তৈয়ারী হইত, কিন্তু বিদেশীয়দের সহিত বাণিজ্যের যোগাযোগ হওয়ায় ক্রমশ ভারতীয় কাচ পিছাইয়া পড়িতে থাকে। তবে সাধারণত যাহা নিত্য প্রয়োজনে লাগে, সে সকল কাচের বস্তু এদেশে তৈয়ারী হইত। আজ প্রায় সমস্ত ভাল কাচের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেদিনের দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া আমাদের বাৎসরিক কুড়ি লক্ষ টাকার মাল দিয়া থাকে।

কাচ প্রস্তুতের তিনটি উপাদান একান্ত প্রয়োজন। প্রথম সিলিকা, যাহা বালু এবং নানা রকম পাথরে পাওয়া যাইতে পারে; দ্বিতীয় সোডা, তাহা সোডিয়ম কার্ব্বনেট হইতে পাওয়া যায়; আর তৃতীয় চূণ, কার্ব্বনেট অফ লাইম হইতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের কণ্টেনব্লো দেশের বালু সর্ব্বা-পেক্ষা ভাল বলেই মনে করা যাইত, তাহাতে শতকরা ৯৫.৫ অংশ সিলিকা। আমেরিকার বার্কলে স্প্রিংস (Berkley Springs)-এর বালুতে ৯৯.৬ এবং জার্মানীর হোহেনবোকা (Hohen bocka)-র বালুতে শতকরা ৯৯.৭ ভাগ সিলিকা আছে। ভারতবর্ষে নাইনির বালুই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহাতে ৯৯.৪ অংশ সিলিকা; কিন্তু বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বালুতে শতকরা ৮৩.৫ ভাগ বই সিলিকা নাই। সিলিকা কম থাকায় বালুর অন্যান্য ভেজাল দূর করিতে অর্থব্যয় হইয়া যায়।

সোডা বিদেশ হইতে আসে এবং তাহার জন্য রক্ষণ-শুল্ক দিয়া সাহায্য করিতে ভারত সরকার অত্যন্ত নারাজ। তবে যাহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মত এই যে, ইহার পশ্চাতে স্বজাতিপ্রিয়তাই একান্তভাবে বর্ত্তমান।

চূণ ভারতবর্ষে প্রচুর আছে। আসাম, বিহার, মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে চূণের পাথরের পাহাড় আছে এবং ভারতের সমস্ত চূণের প্রয়োজনই ভারতে সরবরাহ হইয়া থাকে। এই পাথর খুব বেশী মাত্রায় পাওয়া যাওয়াতে এখন এদেশে সিমেণ্টের কারবার গড়িয়া উঠিতেছে। সে হিসাবে কাচ-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইতেছে না।

উপরোক্ত কয়টি বস্তুই কাচের মূল উপাদান। কখনও কখনও উহার সহিত মিলাইয়া বা কখনও উহার পরিবর্ত্তে নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। স্বচ্ছ, বর্ণহীন, কঠিন—এই কয়টি গুণ থাকিলে কাচের আদর হইয়া থাকে। তাহার উপর তাপ-শীতে হ্রাসবৃদ্ধি

হয় না, ফাটিয়া যায় না, অম্ল বা রাসায়নিক দ্রব্যাদির দ্বারা আক্রান্ত না হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাচ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। Potash, Lead, Alumina, Boric acid, Sodium sulphate (Sodium carbonateএর বদলে), manganese dioxide প্রভৃতি দিয়া নানা প্রয়োজনের জন্য বিবিধ কাচ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অসংস্কৃত বস্তুগুলি খুব মিহি গুঁড়া করিয়া লইয়া প্রয়োজনের মত প্রত্যেকটী ওজন করা হয়। তাহার পর গলাইবার উদ্দেশ্যে পাত্র মধ্যে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিয়া একদিকে যেমন তাপ দেওয়া হয়, অপরদিকে উপরে "হাতা" দিয়া সমস্ত বস্তুকে বিশেষভাবে এদিক ওদিক করা হইতে থাকে। গুঁড়া বস্তু গলিয়া "কাচে" পরিণত হইবার সময় ইহার বিশেষ প্রয়োজন। যতই চটচটে ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা আলোড়ন করা ততই কঠিন হয়। বলা বাহুল্য আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, কারণ কোনও ব্যক্তির শারীরিক শক্তির দ্বারা ইহা অসম্ভব।

কাচের কয়েকটি প্রধান বিভাগ আছে। প্রথম Blown glass—ইহা মানুষের শ্বাসের জোরে বা যন্ত্রচালিত বায়ুর চাপে গলিত কাচ ফুলাইয়া দেওয়া হয়, যেমন সার্সি বোতল, জার, সিলিণ্ডার প্রভৃতি। দ্বিতীয় Plate glass অর্থাৎ পাত বা ঢালাই কাচ। পাত্র হইতে গলিত কাচ লইয়া টেবিলের উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। (বলা বাহুল্য ইহা সমস্তই যন্ত্রাদিযোগে হইয়া থাকে)। এই টেবিলের কাণা বা ধার যতখানি উঁচু থাকে, কাচ ততখানি পুরু হয়। ঐ কাণার উপর দিয়া একটা বেলার চালাইয়া দেওয়া হয় তাহাতে সমস্ত কাচ সমতল হয়। এই কাচ ঢালায় বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ একস্থানে কাচ বেশী হইলে সমস্ত কাচের গুণের হানি হইতে পারে। বড় বড় সার্সি, মোটরের কাচ, আর্শির কাচ প্রভৃতি সবই প্লেট গ্লাস। Reinforced glass অর্থাৎ কাচের মধ্যে তারের জাল দিয়া ঢালাই করা; ইহা প্লেট গ্লাসের নামান্তর। তৃতীয় sheet glass; ইহা বায়ুর দ্বারা চোঙ্গা করিয়া লইয়া পরে যন্ত্র দ্বারা কাটিয়া তাহাকে পাতে পরিণত করা হয়। এ কাচ অত্যন্ত মূল্যবান্; স্বচ্ছতার জন্য সমাদৃত; দোকানের show window, মোটরের ভাল কাচ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। Patent plate, crown sheet প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাচ। স্বচ্ছতা ও দীপ্তি Table glass-এ লাগে। তাহার মূল ব্যবহার নিত্যনৈমিত্তিক, টেবিলের উপর ব্যবহারের জন্য ফাঁপা ফাঁপা তৈজস নির্ম্মাণের কাজে। ইহার জন্য Bohemian glass—potash, sand or quarty ও চুন হ'তে প্রস্তুত বা Flint glass অর্থাৎ potash, red lead ও বালু হইতে প্রস্তুত কাচ লাগে। কখনও কখনও বিভিন্ন রঙের কাচ মূল তৈজসে যুক্ত ক'রে নানা রঙের এক একটি তৈজস তৈয়ারী করা হয়।

অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি বীক্ষণ কাচ করিবার জন্য Crown glass এবং Flint glass-এর উপকরণ লাগে। Crown glass-এ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বালু ১০০ ভাগ, খড়ি ২৪ ভাগ, সোডিয়ম সলফেট ৫০ ভাগ, কয়লা ৪ ভাগ এবং ভাল কাচ ভাঙ্গা ২০০ ভাগ লাগে। আর Flint glass-এ বালু ১০০, পটাসিয়ম কার্ব্বনেট ৩৩, রেডলেড ৬৭, ম্যানগানিস ডায়ক্সাইড আধ ভাগ, পটাসিয়ম নাইট্রেট ৭, এবং কাচ ভাঙ্গা ১০০ ভাগ লাগে। যন্ত্রপাতির এত উন্নতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও বীক্ষণ কাচ অতি পুরাতন প্রথায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট কাচ তৈয়ারী হইবার পর, তাহার মধ্যে আবার যে নির্দ্দোষ অংশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে বীক্ষণের কাচ বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক বাছিয়া লওয়া হয়। আমাদের দেশে এ সকলের কিছুই তৈয়ারী হয় না।

পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতি দেশেই রাজশক্তির সাহায্যে কাচশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভেনিসের গুপ্তবিদ্যা তাহার রাজশক্তি রক্ষা করিয়াছিল। অর্থলোভে কেহ দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে কাচ-শিল্পের শিক্ষা দিতে গেলে রাজার আদেশে লোক গিয়া সেখানে তাহাকে হত্যা করিত। জার্মানী তাহার দুই বৈজ্ঞানিককে School ও Abbe, নানাপ্রকারে অর্থ সাহায্য করিয়া কেবল যে তাহাদেরই জগতে চিরস্মরণীয় করিয়াছে তাহা নহে, জেনা (Jena) কাচ দ্বারা জগতের বীক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক কাচ সরবরাহ করিয়া নিজেও অশেষ ধনের ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে। ইংরেজ রাজশক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা সাহায্য করিয়া বিদেশের বিদ্যা আহরণ করিয়াছে। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিস হইতে লোক

আনিয়া লণ্ডনে Crutched Friar-এর এক দালানে তাহারা স্থান দিয়াছিল। তখন "The king made them liberal monetary grants. Youths were taken into their employ and in the course of a few years they imparted much of their skill to these native workmen, thus establishing the manufacture." ভেনিস হইতে আগত লোকদিগের মধ্যে Jacob Verselyne এখনও ইংরেজ জাতির নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়া আছে; ভার্সেলিনের উপকার স্মরণ করিয়া কেণ্ট-এর এক গির্জ্জায় এক স্মৃতিস্তম্ভ রাখিয়া দিয়াছে।

জাপানের কাচ-শিল্পের ইতিহাসও রাজশক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। ৭১০-৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নারা রাজত্বকালে তাহাদের কাচ-বস্তু প্রস্তুত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৮ সালে তাহাদের বর্ত্তমান জয়যাত্রা সুরু হইল। এই সময় জাপান সরকার শিল্পীদের বহু অর্থ সাহায্য করে এবং ব্যবসা প্রসারের জন্য নানা সুবিধাদান করিতে থাকে। তাহার পর জাপান জগতের বাজারে কি স্থান অধিকার করিতেছে, তাহার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে হয় না।

ইংরেজের বিস্তার এখনও শেষ হয় নাই। সেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাচ-শিল্পের তত্ত্বানুসন্ধানের এক বিশেষ বিভাগ আছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে কাচ-শিল্প সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান দরকার তাহা কাহারও মনে হয় নাই। বিদেশ হইতে যখন তৈয়ারী মাল আসে তখন আর এ-দেশের লোকে যাহাতে ঐ দিকে মন না দিতে পারে, তাহার জন্যই রাজসরকার ব্যস্ত ছিলেন। এই ভাবে বিজিত জাতিকে সকল প্রকারে কর্ম্মবিমুখ করিয়া রাখার প্রবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু নিন্দায় কিছুই আসে যায় না, যদি তাহাতে সম্পূর্ণ অর্থাগম হইতে থাকে।

আমাদের দেশে ফিরোজাবাদে আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কাচের চুড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে। দেশে কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানা রহিয়াছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান না পাওয়ায় তাহা সমধিক উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া ওঠে না। জাপান, জার্মানী, ইংলণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে অতি-আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতিতে মাল প্রস্তুত হওয়ায় দর অত্যন্ত কম পড়ে এবং জিনিষগুলিও সুদৃশ্য হয়। আমাদের দেশের কাচ-শিল্প গড়িয়া উঠিবার আগেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রক্ষণশুল্ক স্থাপিত করিবার জন্য যত আবেদন নিবেদন সবই "অরণ্যে রোদন" দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ১ কোটী ৫২ লক্ষ টাকার কাচের বস্তু আসিয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান—

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
শিশি বোতল	২৯,৩২	১৯.২
কাচের চুড়ি	২৯,২৬	১৯.১
পাত কাচ	২৫,৪২	১৬.৭
পুথি, নকল মুক্তা প্রভৃতি	১৯,০০	১২.৪
অন্যান্য	৩৪,২১	২২.৫

ইহা ছাড়া ডুম, ফানুষ, টেবিলে ব্যবহারের তৈজস-পত্রাদি আছে।

এই "অন্যান্য" জিনিষটির মধ্যে কয়েকটির বিশেষ কাজ আছে, আর সব বাজে। ইহার মধ্যে পড়ে কাচের ঝাড়, আলোর আবরণ, ব্যাটারী ধারণের পাত্র, বড় আয়না, বড় বৃক্ষাধার ও বিচিত্র পাত্র, যন্ত্রপাতি ও চশমার কাচ ইত্যাদি। উনত্রিশ লক্ষ টাকার কাচের চুড়ি পরিতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত নয় কি? উনিশ লক্ষ টাকার নকল মুক্তা পুঁতি প্রভৃতি কিনিতে আমাদের মাথা হেঁট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। শিশি, বোতল কি আমরা তৈয়ারী করিতে পারি না?

যাহারা আমাদের দেশে কাচ বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদেরও কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইহার মধ্যে জাপানই প্রধান, তাহার অংশ প্রায় আধাআধি। মোট ১ কোটী ৫২ লক্ষ টাকার হিসাব এইরূপ—

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
জাপান	৬৯,৮৩	৪৫.৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	২৫,৯৬	১৭.০
জার্ম্মাণী	২০,৭৬	১৩.৬
বেলজিয়ম	১৭,৭৪	৯.০
ইংলণ্ড	১১,২২	৭.৩

অপরাপর, যথা, অষ্ট্রিয়া, ইটালী ইত্যাদি—

একটু সুবিধা উৎসাহ পাইলে আমাদের দেশে এই শিল্প গড়িয়া ওঠা অসম্ভব নহে।

জাপানী কবিতায় জোনাকি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

জাপানে যাইনি। জাপানী ভাষা জানি না। ইংরেজ দোভাষীর দৌলতে প্রাচীন জাপানী কবিদের রচনার সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় ঘটেছিল একদা। তুদিনের সন্ন্যাসীর অঙ্গভরা জটের কথা শোনা ছিল। তাকে স্মরণ ক'রে জাপানী কবিতার বিদেশী পরচুলার অনুকরণে দেশী পাটে এই নকল জটাগুলি পাকিয়ে তোলবার খেয়াল জেগেছিল সেদিন। ইংরেজের বুলি শুনেছিলাম—Fools rush in where angels fear to tread. অর্থাৎ

দেবতা যেখানে কেঁপে মরে হৃৎকম্পে,
মূর্খ সেথায় ঝাঁপ দেয় এক লম্ফে।

দু-চারটে ইংরেজী তর্জ্জমা প'ড়ে জাপানী কবির মর্ম্মবাণী উদ্ধার করবার এই চেষ্টা, কতকটা যেন পর্দ্দানশীন নারীর নাড়ী দেখার মত, যিনি যবনিকার অন্তরালে আছেন লুকিয়ে, আর যাঁর প্রকোষ্ঠে-বাঁধা লম্বা সুতোর খুঁট হাকিম সাহেব টিপে বসে আছেন পর্দ্দার বাহিরে। সেই সুতার টেলিফোনে যে স্পন্দনটুকু আসে, তাই দিয়ে মিঞা সাহেব রোগীর হৃৎপিণ্ডের পরিচয় লাভ করেন নেপথ্যে। তবু হয়ত ওই সুতার ক্ষীণ তন্তুটি আশ্রয় ক'রে অভিজ্ঞ বৈদ্যরাজ কিঞ্চিৎ তথ্য সংগ্রহ করেন।

জাপানী কবিদের বয়েৎ সাধারণত সতেরোটি কথায় তিন লাইনের 'হক্কু' বা ওই জাতীয় ক্ষুদ্র ছড়ায় রচিত। এক টিপ কড়া নস্যিতে ভট্চাজ্জি মশায়ের মৌতাত রক্ষা হয়। দু-চার লাইনে ওই হক্কুগুলির ইংরেজী তর্জ্জমা প'ড়ে আমার নেশা জমেছিল। আফিমের নেশা, যেটা ছবি হয়ে চোখে ফোটে। সেই বেসামাল অবস্থায় ইংরেজী তর্জ্জমাগুলির বাঙলা অনুবাদ করবার দুর্ব্বুদ্ধি ঘাড়ে চাপে। এক একটি অনুবাদের গুলি সেবন ক'রে মনে যে ভাবাবেশ জেগেছিল, সেটা লিপিবদ্ধ করলাম বাঙলার ছন্দে। এ অনুবাদের সঙ্গে মূলের কতখানি বা কতটুকু সম্পর্ক আছে তার বিচার করতে হ'লে এমন একটি জাপানীর প্রয়োজন যিনি নিজে কবি এবং বাঙলা ভাষায় ওয়াকিব-হাল। এরূপ দ্বিবক্তু প্রাচ্যের বাণীকুঞ্জে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি। সুতরাং নির্ভয়েই আমার ঝুলি থেকে দু-চারটে তর্জ্জমা বার করতে পারি।

ইংরেজী গদ্যের ভস্ম থেকে যে স্ফুলিঙ্গগুলি বাঙলা ছন্দের ছাইচাপা পড়ল, তাদের মৌলিক আভার কিঞ্চিৎ আভাস হয়ত পাওয়া যেতে পারে এই ঝুঁটো হীরায়।

জাপানীরা জোনাকি ভক্ত। বহু যুগ ধ'রে জাপানী কবিরা জোনাকির উপর কবিতা লিখে এসেছেন। জোনাকির মতই কবিতাগুলি ক্ষুদ্র এবং জ্যোতির্ম্ময়। ইংরেজী তর্জ্জমার বিভাষার মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের কতগুলির শিখা বাঙলা পয়ারের প্রদীপে বেঁধেছি। শুনতে পাই, রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের একটা গুণ এই যে-কোন রাসায়নিক মিশ্রণে তারা দানা বাঁধুক না, তাদের বিকীরণ ফটোগ্রাফের ফিল্মে ছায়াপাত করে। এই বাঙলা শ্লোকগুলিতে জাপানী কাব্যকণার কিরণসম্পাত একেবারে ব্যর্থ না হ'তে পারে।

গ্রীষ্মের সময় জোনাকির পঙ্গপালের আবির্ভাব হয়, তখন সেই দীপ্তি-জটলা দেখবার জন্যে হাজার হাজার লোক ছোটে সেই আলোর হাটে। প্রতি বৎসর স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত হয় জোনাকি-মেলার যাত্রীদের জন্যে। সারারাত্রি স্ত্রী-পুরুষেরা নদীর তীরে ব'সে অথবা নৌকারোহণে জোনাকির ঝামেলা দেখে।

জোনাকি ধরা জাপানে একটি প্রাচীন উৎসবের ব্যাপার। বিলাতে যেমন Fox hunting, তেমনই জাপানে আভিজাতবংশীয়েরা মাঝে মাঝে খদ্যোত শিকারের নিমন্ত্রণ পাঠান বন্ধুদের। অন্ধকার রাত্রে বাগানের তরু-বীথিতে লম্বা লম্বা ঝুলিতে জোনাকি শিকার চলে। স্ত্রী-পুরুষ-ছেলে-মেয়ে সকলেই এই মৃগয়ায় যোগদান করে।

হাজার বৎসর ধরে জোনাকির স্তবগাথা রচিত হয়েছে জাপানীর কবির পদাবলীতে। দশম শতাব্দীর একটি

বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'গেঞ্জি মনোগারি'। তার নায়ক ঝুলিতে বন্দী জোনাকির ঝাঁক উড়িয়ে দিয়ে অন্ধকার রাতে নায়িকার মুখশ্রী দেখে নিল। এখনও জাপানের বাজারে কারুশিল্পরচিত বাঁশের খাঁচায় হাজার হাজার জোনাকি বিক্রি হয়। উৎসব সভার ভোজ যখন বসে ঘরের ভিতর, গৃহস্বামী জোনাকির পঙ্গপাল ছেড়ে দেয় সামনের বাগানে। তৃণে গুল্মে গাছে গাছে জ্বলে ওঠে জঙ্গম দীপের দীপালি।

যার সঙ্গে আর দেখা হবে না তার নাম টুকে রেখে লাভ কি? দুরুচ্চারণীয় জাপানী নামের চাপে এই ক্ষীণবৃন্ত ছড়ার ফুলগুলিকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। গণেশের বাহন যে ইঁদুর, এ কথাটা পুরাণসম্মত হতে পারে। জাপানী কাব্যচর্চ্চার সময় এই মূষিকোপম ক্ষুদ্র বাহনগুলির পৃষ্ঠারোহী ফৌজদারদের বিস্মৃত হলে ক্ষতি নেই।

আলো আর প্রেম স্বপ্রকাশ। গুণ্ঠনের আড়াল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কবি বলছেন—

ভালবাসা মোর যেন জোনাকির মত,
অঞ্চলে ঝাঁপি' রাখি তারে আমি যত,
কিছুতেই তবু পারি না যে লুকাবারে,
আপন আলোকে ধরা দেয় আপনারে।

বর্ষারাতে বৃষ্টিধারা ঝলমল করছে জোনাকির চুম্‌কিতে। কবির ছবিতে

অনল ফুল্‌কি জোনাকির দল
বাদল ধারার সনে
কিরণ ঝরণা মিশালো আজিকে
এ উতলা সমীরণে।

কবির প্রশ্ন, মূক অন্ধকারের ভাষা কি জোনাকি?

আঁধারের বেণু তিমির কণারে ডাকি'
জোনাকি ঝিলিকে বাণীময় হ'ল নাকি?

সন্ধ্যার অন্ধকারে সাঁকোর নীচে নদীর ছবি।

গোধূলির আলো এখনো নিভেনি বটে,
জোনাকিরা তবু এসেছে সুমিদা তটে।
সেতুর তলায় আঁধারের কোণে কোণে
আনাচে কানাচে যেন সব বরক'নে

যারে উঁকিঝুঁকি নয়নে ঝিলিক হানি'
পরাণে পরাণে চোখে চোখে কানাকানি।

জলার ঘাসে নামল সাঁঝের আঁধার। অমনি দেখা দিল জোনাকির দল। অন্তরে বাহিরে অন্ধকারের ঘেরে দীপিকার ঔজ্জ্বল্য ফোটে।

ঘাসে ঘাসে যবে আঁধার ঘনায়ে ওঠে,
জোনাকির বুকে আলোর কাঁপন ফোটে।
প্রেমের প্রদীপ জ্বলে না ত দিবালোকে
আঁধার না হ'লে দীপ্তি ফোটে না চোখে।
তিমির রজনী ঘনীভূত হয় যত
জোনাকির আলো উজ্জ্বলতর তত।

কবির প্রশ্ন--

নিভিল প্রদীপ।
হীরকের টিপ।
নিশিথিনী ভালে
জোনাকি কি জ্বালে?

নিঃশব্দে যে আলো ফোটে আর নিভে যায় তার নাম জোনাকি।

ওগো খদ্যোতিকা,
কি সহজে জ্বালো আলো
আবার নিভাও তার শিখা!

রুদ্ধ কক্ষ, বাতায়নে প্রবেশ-ভিক্ষু জোনাকি।

সার্শি-আঁটা রুদ্ধ বাতায়ন,
অন্ধকার ঘর
জোনাকির নীরব ক্রন্দন,
—কিরণ মর্ম্মর।

একটি জোনাকি উড়ে এসে বসল জনশূন্য মাঠে। বেদনা-বিধুর নৈঃসঙ্গ্যে এল ক্ষণিকের অতিথি।

একটি জোনাকি উড়ে এল শাদ্বলে,
হেরি তৃণে তৃণে শিশিরে হীরক জ্বলে।
আমি পোড়ো জমি, আঁখিজল ঘাসে ঘাসে,
অশ্রু আমার তোমার কিরণে হাসে।

কৌতুকময়ীর লুকাচুরি খেলার ছবি।

মোর ঘরে আসি জোনাকি নিভালো আলো,
ধরা দিয়া তবু কৌতুকে সে লুকালো।

নববধূ ঘরে এসে দিল দীপটি নিভিয়ে।

ধীরে ঘরে আসি জোনাকি নিভালো আলো,
ভীরুর মিলন আঁধারে জমিবে ভালো।

যে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়, তার আত্মপ্রকাশও স্বতঃস্ফূর্ত।

জোনাকি উড়িয়া এল মোর করতলে,
আপন কিরণ নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলে।

স্বৈরাগতার প্রতীক্ষার ছবি ফুটল কবির গানে।

একটি বিজলি কণা
উজ্জ্বল নীলমণি,
তারে হেরি উন্মনা
তিমিরের কালো ফণী।
জ্বলি' শুধু খনতরে
পরখনে নিভে যায়।
সে দীপ রয়েছে ঘরে
তিমির যাহারে চায়।

ক্ষণদীপিতা অন্ধকারকেই ঘনিয়ে তোলে।

জোনাকি আমার, তুমি এলে মোর ঘরে,
ক্ষণেক জ্বলিয়া নিভে গেলে তার পরে।
মিলনের তটে যেন ডুবে যায় তরী,
তিমির গহনে বৃথা তারে খুঁজে মরি।

কবির বিতর্ক, যা দেখছি তা কি ঘাসের ডগায় ডগায় আঁধারের দীপ্তি মঞ্জরী, না জোনাকির অক্ষৌহিণী?

আঁধারের ফুল ফুটেছে কি ঘাসে ঘাসে?
জোনাকিরা বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে?

রহস্যের কূলে ব'সে মানুষ বারবার জ্বালে তার ক্ষুদ্র দীপ, গহনের কোন সন্ধান পায় যদি।

হ্রদের গহনে জোনাকি ডুবিতে চায়,
সে ঘন তিমিরে পশিতে সে ভয় পায়।
তাই কি জোনাকি আঁধারে জেলেছে বাতি?
জ্বলে নিভে শিখা, শেষ হয়ে আসে রাতি।

কবি দুঃখ ক'রে বলছেন, রাতে যে ছিল আলোকের কণা, আঁধারের বুকে এঁকে দিত কিরণের আল্পনা, দিনের আলোয় সে থাকে ঘাসের আড়ালে ধূলোয় মিশিয়ে। এরকম দুর্গতি মানুষেরও হয়। আমাদের দেশের এক সাত্ত্বিক কবি বহুদিন পূর্ব্বে গেয়েছিলেন—

"দেখে হাসি পায় ভারতের জয়
গাহিলেন কবি নবোৎসাহময়,
না ফুরাতে গান পশুর সমান
আবার নরকে নিলেন আশ্রয়।'

অবশ্য, তিনি বেচারী পশুর উপর একটু অবিচার করেছেন। একটি কুৎসিত লোকের মুখের সঙ্গে কেউ করেছিল বাঁদরের মুখের তুলনা। সে কথা শুনে জনৈক শ্রোতা ঠিকই বলেছিলেন—এতে কেবল বাঁদরের অনর্থা নিন্দা হ'ল। বানর হিসাবে শাখামৃগের মুখখানা দেখতে এমন মন্দ কি? মানুষের চরিত্রের বীভৎসতার কাছে পশুর স্বভাবধর্ম্ম অনাবিল। অবান্তর কথা ছেড়ে জাপানী কবির ছড়ায় বলি—

গত রজনীতে পরেছিলে তুমি হেমকিরীট,
প্রভাতে জোনাকি এ কি পরিণতি! হয়েছ কীট?

পাঠান্তরে বলা যেতে পারে

আলোকের কণা　　কনককিরণা
ছিলে রজনীতে জোনাকি,
ঘাসের আড়ালে　　লুকালে সকালে
ধূলা হয়ে গেল সোনা কি?

জোনাকির ঝাঁক প্রথমে লাখে লাখে জমাট বেঁধে দেখা দেয় শুভ্রোজ্জ্বল অচলা মেঘের মত, তারপর হঠাৎ সহস্রধারায় ছড়িয়ে যায় কিরণ-বন্যায়।

একি বাঁধভাঙা জল?
তিমির পাথারে কিরণবন্যা আনে জোনাকির দল।

ছেলেমেয়েদের দল 'হোতারু'কে (জোনাকিকে) ডাকে

আয় রে আয় হোতারু,
সোনার কাঁটার সজারু।
চাঁদের মত মুখটি যার
জ্বালিয়ে দে যা দীপটি তার।

ছোট ছেলে হারিয়ে গিয়ে পথের ধারে ব'সে কাঁদছে। অন্ধকার হয়ে এল, জোনাকির পাল এল উড়ে। তাদের ধরবার উল্লাসে ভুলে গেল শিশু গৃহহারার দুঃখ।

শিশু পথহারা,
কেঁদে কেঁদে সারা।
তথাপি জোনাকি,
ধরে থাকি থাকি।

অবন্ধনাকে ধরবার জন্য ছুটেছে আড়কাটিরা।

ধর ধর রবে
যেই ছোটে সবে,
এড়ায় নাগাল
জোনাকির পাল।

জ্যোৎস্না রাতে জোনাকিরা ছিল গাছের ডালে ডালে। তাড়া খেয়ে

জোনাকি উড়ে পালায়
জোছনায় গ'লে যায়।

ভীরুর ভঙ্গুর প্রেম কবির ভাষায়

জোনাকির দীপ কি সহজে নিভে জ্বলে,
ভীরু ভালবাসা বাঁচে মরে পলে পলে।

ঘসা কাচের ফানুষ ভেদ ক'রে বাতির আলো ছড়িয়ে পড়ে। রূপসীর কোমল করপদ্মে বন্দী খদ্যোত তার অস্বচ্ছ মুঠিটি ভেদ ক'রে আঙুলের কলিগুলি উদ্ভাসিত করে স্ফটিক-স্বচ্ছ দীপ্তিতে।

জোনাকিরে যবে বাঁধে রূপসীর মুঠি
স্বচ্ছ আভায় হাতখানি ওঠে ফুটি।

অসংখ্য জাপানী কবিতায় যৌনপ্রেমের প্রতীক জোনাকি।

পতঙ্গেরা রঙ্গভরে কত কথা কয়,
মৃদু গুঞ্জরণে তারা জানায় প্রণয়।
জোনাকির নাই বাণী, তার ভালবাসা
বহ্নি প্রস্ফুরণে শুধু পায় নিজ ভাষা।

কবি প্রেয়সীকে বলছেন—

হে চিরমৌনা, বল না ত মুখ ফুটে,
হৃদয় তোমার বুঝি-বা শতধা টুটে,
নয়নে তোমার হেরি জোনাকির আলো,
তাই জানি আমি মোরে কত বাস' ভালো।

সেই একই কথা আর একজন ঘুরিয়ে বলছেন—

ভালবাসা তব চিরদিন বাণীহারা,
নয়ন গহনে অযুত কিরণ ধারা
তারায় তারায় ধরে যেন মোর তরে,
জোনাকিরা তার কণা লয়ে খেলা করে।

অন্ধকারে হঠাৎ টর্চ্চ বাতি জ্বালিয়ে জোনাকি শুভ-দর্শন ঘটিয়ে দেয়—

আঁধারে বসিয়া কথা কও যবে
গোপনে নিশুতি রাতে,
মুখখানি তব দেখায় জোনাকি
প্রদীপ লইয়া হাতে।

রূপসীর লুকাচুরি জোনাকি ধরিয়ে দেয়।

নিভালে প্রদীপ যবে,
ভেবেছিলে বুঝি আঁখির আড়ালে র'বে ?
জোনাকিরা এল' উড়ি
অঙ্গে অঙ্গে ফুটালো রূপের কুঁড়ি।

মাঝে মাঝে সে আলো দেখায় বিভীষিকা।

অন্ধকারে দেখা তোমা সনে,
পরিচয় অস্ফুট বচনে।
জোনাকি আসিয়া দীপ ধরে,
তোমারে নেহারি' মরি ডরে।

অস্তিমে

নিশি হ'ল শেষ, জোনাকিরা গেল মরি',
তাদের কবর ঘাসে ঘাসে দিল ভরি।

আমার এই তর্জ্জমার অন্ধকারে জাপানী জোনাকির নর্ম্মলীলারও এইখানে অবসান।



সাময়িকী

জাপানে হিন্দু-মন্দির—

জাপানে হিন্দু সংস্কৃতির বহু চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলেও তথায় এ পর্য্যন্ত হিন্দুদের কোন বিশেষ মন্দির বা উপাসনা-গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। জাপানীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই অন্তর্গত—এ হিসাবে জাপানে হিন্দুমন্দিরের অভাব নাই। তাহা সত্ত্বেও খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী অধুনা জাপান-প্রবাসী শ্রীযুত রাসবিহারী বসু জাপানে একটি হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। জাপানে ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও দর্শন আলোচনার জন্য দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তথায় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে এবং হিন্দু-মন্দির তাহারই অন্তর্গত হইবে। জাপানে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র উপাসনা-গৃহ আছে—এই নূতন মন্দিরটি হিন্দুদের উপাসনা-গৃহ রূপেও ব্যবহৃত হইবে। রাসবিহারী বাবু জাপানে থাকিয়াও ভারতের সংস্কৃতি প্রচারে যেরূপ উদ্যোগী, তজ্জন্য তিনি ভারতবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

স্বামী বিরজানন্দ—

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দের দেহান্তরের পর স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ মিশনের নূতন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ। বিরজানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সতর বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বিরজানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়াছিলেন; ১৯০৬ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত তিনি মায়াবতী (হিমালয়) আশ্রমের অধ্যক্ষতা করেন এবং সেই সময়েই মিশনের অন্যতম ট্রাষ্টি নির্ব্বাচিত হন। বহুদিন তিনি মিশনের ইংরেজি মাসিক মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আলমোড়া জেলার শ্যামলাতলাতে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুদিন তথায় সাধনা করিয়াছেন। কিছুদিন তিনি মিশনের সম্পাদক ও সহ-অধ্যক্ষের কাজ করিয়াছেন। মিশন এখন যেরূপ বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে তাহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য বিরাট কর্ম্মীরই প্রয়োজন; স্বামী বিরজানন্দ কর্ম্মী পুরুষ; শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার অধ্যক্ষতায়ও মিশনের কার্য্য দিন দিন প্রসার লাভ করিবে।

সিন্ধুপ্রদেশে নূতন দৃষ্টান্ত—

সিন্ধুপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট সে দেশে ব্যয়সঙ্কোচ ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, উক্ত কমিটি যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা সকল প্রদেশেই অনুসৃত হওয়ার যোগ্য। তথায় প্রাদেশিক সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের বেতন কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাসের প্রস্তাব করা হইয়াছে। জুডিসিয়াল কমিশনারের বেতন ৩৫০০ টাকা স্থলে ২০০০ টাকা, এডিশনাল জুডিশিয়াল কমিশনারের বেতন ৩০০০৫ স্থলে ১৫০০, রেভিনিউ কমিশনারের বেতন ৩৫০০ স্থলে ১৭০০ টাকা, জেলা জজ ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেতন ১৩৭৫ টাকা স্থলে ১০০০ টাকা, সহকারী জজদের বেতন ৭৫০ টাকা স্থলে ৪০০ টাকা—এই হারে সকলের বেতন কমাইতে বলা হইয়াছে। কমিটির সদস্যগণ বলিয়াছেন—পদস্থ কর্ম্মচারীদের বর্ত্তমান বেতন ও উহা ক্রমিক হারে বর্দ্ধিত হইবার যে ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত আছে তাহা অবিলম্বে পরিবর্ত্তন করা না হইলে উহার চাপে সকল প্রদেশেরই আর্থিক বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কমিটি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনারও প্রস্তাব করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশেও বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কমিটি এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রীরা কমিটির এই নির্দ্দেশ কতটা কার্য্যকরী করেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পাট অর্ডিনান্সে ক্ষতি—

বাঙ্গালার গভর্ণর সম্প্রতি পাট চাষ ও তাহার ব্যবসা সম্বন্ধে যে অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালার পাটকলসমূহের শ্রমিকগণ ও পাটচাষীরা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অর্ডিনান্সের ফলে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়াছে এবং প্রতি মাসে চটকল শ্রমিকদিগের প্রায় সাড়ে ৭ হাজার টাকা মজুরী কমিয়া গিয়াছে। অর্ডিনান্সের ফলে কাঁচা পাটের দাম কমিয়া যাওয়ায় পাটচাষীদের অবস্থা ভীষণ হইয়াছে। শ্রমিক ও কৃষকগণকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে; প্রথমে শুনা গিয়াছিল যে গভর্ণর মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন; কিন্তু গভর্ণরের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে মন্ত্রিগণের পরামর্শ লইয়াই এই পাট অর্ডিনান্স জারি হওয়ায় ব্যবস্থা পরিষদেও এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। যে সকল মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব পাইবার পূর্ব্বে নিজেদের কৃষক ও শ্রমিকদের বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তাঁহারা এখন একেবারে এ বিষয়ে নীরব। দেশের জনসাধারণের প্রবল আন্দোলন ব্যতীত এই অর্ডিনান্স প্রত্যাহৃত হইবে না।

ভূমিরাজস্ব কমিশন—

সাধারণভাবে বাংলার প্রচলিত ভূমিরাজস্ব প্রথার নানা দিক, বিশেষ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান, বাঙ্গালার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং তাহার ফলাফল কি হইয়াছে তাহার সন্ধান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য সম্প্রতি বাঙ্গালায় একটি ভূমিরাজস্ব কমিশন গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন—(১) স্যর ফ্রান্সিস ফ্লাউড—সভাপতি (২) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহতাব (৩) মিঃ এম-সি-কার্টার (৪) খাঁ বাহাদুর মোয়াজ্জামুদ্দীন হোসেন (৫) খাঁ বাহাদুর মৌলবী হাসেম আলি (৬) ব্যারিষ্টার এস-এম-মাসী (৭) খাঁ বাহাদুর এম-এ-মোমেন (৮) স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, (৯) ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, (১০) শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও (১১) স্যর এফ- এ-সাচী। মিঃ কার্টার কমিশনের সেক্রেটারীর কাজ করিবেন। পরে দুইজন মুসলমান ও একজন তপশীলভুক্ত ব্যক্তিকে কমিশনের সদস্য করা হইবে। কমিশন যদি প্রকৃতই কোন সুব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিতে পারে, তবে তাহা দেশের পক্ষে আনন্দের সংবাদ। কমিশনের নির্দ্দেশমত শেষ পর্য্যন্ত কাজ করা হইবে কি-না সন্দেহ।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন—

আগামী বড়দিনের ছুটিতে আসামের গৌহাটী শহরে এবার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থির



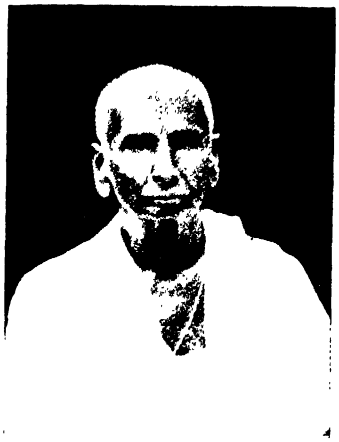
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সম্মিলনের মূল সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন দেখিয়া আমরা



ডক্টর নীলরতন ধর

আনন্দিত হইয়াছি। একজন মহিলার পক্ষে এই সম্মানলাভ যুগোপযোগীই হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সাহিত্য শাখার সভাপতি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন ধর



পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ও রাঁচীর খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক রায় বাহাদুর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় সমাজবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুত কালীচরণ সেন মহাশয়কে সভাপতি করিয়া গৌহাটীতে যে



রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়

অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহা সম্মিলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না। আমরা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার বাহিরের বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণকে এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

মহিলা-সমবায়-শিল্পভবন—

বাঙ্গালার অসহায়া হিন্দু বালবিধবাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে গ্রাম্য-বালিকা-বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষয়িত্রীর কাজের যোগ্যা করিবার জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু কলিকাতায় নারী-শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তথায় এই বিশ বৎসর ধরিয়া বহু শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইয়াছে এবং বহু বিধবার তদ্দ্বারা অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ১৫ই নভেম্বর শ্রীযুক্তা বসুর চেষ্টায় দমদমে মহিলা-সমবায়-শিল্প ভবন নামক আর একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। তথায় অসহায়া মহিলাদিগকে শিল্পশিক্ষা প্রদান করা হইবে। বাঙ্গালার গভর্ণরের পত্নী লেডী ব্রাবোর্ণ ঐ প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করিয়াছেন এবং এই নূতন প্রতিষ্ঠান পরিচালনের উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার লোপ পাওয়ার ফলে অসহায়া বিধবাদের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস শ্রীযুক্তা বসুর পরিচালনায় নারী-শিক্ষা-সমিতির মত এই নূতন প্রতিষ্ঠানটিও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

ননীগোপাল মজুমদার—

খ্যাতনামা বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় গত ১০ই নভেম্বর রাত্রিতে সিন্ধু প্রদেশের দাদু জেলায় জোহি নামক স্থানে ডাকাতদল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন—এই সংবাদে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে একটি শোকের ছায়াপাত হইয়াছে। ননীগোপালের বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করিয়া তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দিন দিন নিজ অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার বলে উচ্চতর পদ লাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তাঁহাকে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। তিনি স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্যর জন মার্শালের অধীনে

মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানে বহুদিন কাজ করিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি কলিকাতা যাদুঘরের (মিউজিয়াম) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদেও নিযুক্ত ছিলেন। পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সিন্ধু দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তথায় তাঁবুর মধ্যে অবস্থান কালে ডাকাতগণ সহসা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তিনি যশোহর জেলার অধিবাসী। তাঁহার মৃত্যু কিরূপ শোচনীয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। যে সময়ে সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট হইতে বহু নূতন নূতন ঐতিহাসিক তথ্য জ্ঞাত হইবার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল, সে সময়ে তাঁহার এই মৃত্যু সকলের মন বিষাদে



৺ননীগোপাল মজুমদার

আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাঁহার কৃত আবিষ্কারসমূহের বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা আশা করি, গভর্ণমেণ্ট সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার এই মৃত্যুতে তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই—ভগবান তাঁহাদিগকে শান্তিদান করুন।

শুভেন্দুশেখর বসু—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক শুভেন্দুশেখর বসু গত ২রা নভেম্বর মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এম-এস-সি পাশ করিয়া ১৯৩৫-এ পি-আর-এস উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং একজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গত রজত জয়ন্তী উৎসবের সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন; বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুরে তাঁহার বাড়ী ছিল। শুভেন্দু-

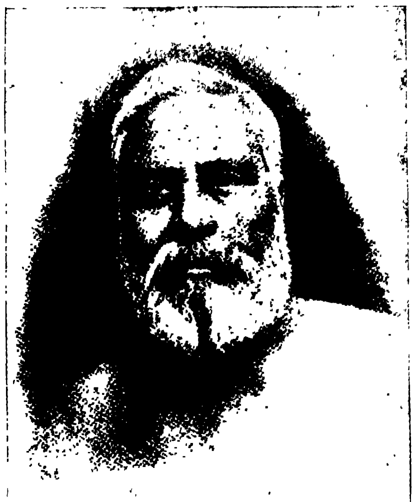


৺শুভেন্দুশেখর বসু

শেখরের এই অকালমৃত্যু শুধু তাঁহার পরিজনবর্গের নহে, দেশের পক্ষেও ক্ষতিজনক।

দেবেন্দ্রনাথ বসু—

প্রবীণ সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। কলিকাতায় তিনি 'ব্যাঙবাবু' নামে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক গল্প, উপন্যাস,



৺দেবেন্দ্রনাথ বসু

জীবনীগ্রন্থ ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং সারা জীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। গত বৎসর কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে 'গিরিশ-অধ্যাপক' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবু রামকৃষ্ণমিশনের স্বর্গত স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন; মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নিকটাত্মীয় ছিলেন। প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রবাবু কাসিমবাজারের মহারাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বন্ধু ও পরে প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার বাসিফুল, বরমাল্য প্রভৃতি গ্রন্থ এক সময়ে ঘরে ঘরে পঠিত হইত এবং পরিণত বয়সে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ', 'পরমহংসদেব' প্রভৃতি যে সকল পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিও চিরদিন এ-দেশে আদৃত হইবে।

সেতারী এনায়েৎ খাঁ—

ভারত-বিখ্যাত সেতারবাদক এনায়েৎ খাঁ মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করায় ভারতের সঙ্গীত জগতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি এলাহাবাদে নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-সম্মিলনে সেতার বাজাইতে গিয়া তথায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন; অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল এবং যেদিন তিনি এখানে পৌছেন সেই দিনই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের এটোয়া জেলার মণিপুরী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন; ষোল বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া তদবধি তিনি এখানেই বাস করিতেছিলেন। এনায়েৎ খাঁ সাহেবের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছু নাই—যাঁহারা তাঁহার সেতার বাজনা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারাই তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবিউনালের এসেসর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অমরেন্দ্রবাবু একজন নির্য্যাতিত দেশকর্ম্মী—জীবনের প্রায় অর্দ্ধেককাল তাঁহাকে কারাগারে বন্দী থাকিতে হইয়াছে। দেশ-সেবায় তাঁহার দান পরিমাপ করা যায় না বলিলেই হয়। সেজন্য তাঁহার নিয়োগে দেশবাসীমাত্রই সন্তোষ লাভ করিবেন।

স্পেনে সাহায্য প্রেরণ—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া আসিয়াই স্পেনের নিপীড়িত অধিবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। উক্ত আবেদনে বলা হইয়াছে—"ইহা পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, স্পেনে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহা সকল স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তজ্জন্য



পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। স্পেনে খাদ্যাদি প্রেরণ করিলে আমাদের উদ্দেশ্যকেই পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হইবে এবং জগতের নিকট ভারতের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। চীনে ও স্পেনে আমরা যে সাহায্য প্রেরণ করিতেছি তাহা দ্বারা আমরা জগতের দৃষ্টি আমাদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছি এবং জগতকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছি যে, আমাদের নীতি

বৃটীশ সরকারের নীতির অনুবর্ত্তী নহে। এইরূপে আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের স্বদেশের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছি। ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে আমাদের মতামতের একটা মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র আদর্শের জন্যই নহে, পরন্তু আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য এবং ভারতের আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই আমাদিগকে স্পেনের অধিবাসীগণকে সাহায্য করিতে হইবে।" পণ্ডিত জহরলাল যে ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের লুপ্ত-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছেন তাহা অভিনব ও সম্পূর্ণ নূতন। স্পেনে সাহায্য প্রেরণ উহারই অন্যতম; কাজেই আমাদের বিশ্বাস, এ দেশের লোক এ বিষয়ে পণ্ডিতজীকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দান করিতে কখনই কার্পণ্য করিবেন না।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী নাইডু—

গত কয় বৎসর হইতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বার্ষিক কনভোকেসন উৎসবে বক্তৃতা দিবার জন্য বিশিষ্ট মনীষীদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সেলার ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের পুত্র নব-নির্ব্বাচিত ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুত অমরনাথ ঝা এবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেসনে খ্যাতনামা কংগ্রেসনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন মহিলাকে এ ভাবে ভারতে সম্মানিত করা হয় নাই। শ্রীমতী নাইডু বক্তৃতায় বলেন—'আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বিলাসিতা বলিয়া মনে করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় যুবকগণ দাম্ভিক হইয়া ওঠে এবং তাহারা শ্রমবিমুখ হইয়া পড়ে।' তিনি এই ধারণা ঠিক বলিয়া মনে করেন না। তিনি যুবকগণকে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিতে বলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করিলেও তাহা জাতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। এতদিন পর্য্যন্ত কনভোকেশন বক্তৃতায় শিক্ষার সমস্যার কথাই শুধু আলোচিত হইত। ইতিপূর্ব্বে কেহ এত স্পষ্টভাবে কখনও কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ করেন নাই।



শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য—

বাঙ্গালা ও আসামের খ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ১৩ই কার্ত্তিক ৭০ বৎসর বয়সে শ্রীহট্ট জেলার বালিয়াচংয়ে নিজবাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা কলেজ হইতে ইংরেজী, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করেন; ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরেজীতে এম-এ পাশ করিয়া শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন; ১৯২২-এ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। ইংরেজী শিক্ষিত হইয়াও তিনি সারা-জীবন প্রাচীন পন্থীর মত বসবাস করিতেন এবং প্রাচীন আদর্শ বজায় রাখিয়া চলিতেন। শেষ বয়সে তিনি নিজ গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আসাম প্রদেশের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের অভাব হইল।



বিদায় বেলায়

শিল্পী—রবীন্‌ কর, সিলেট



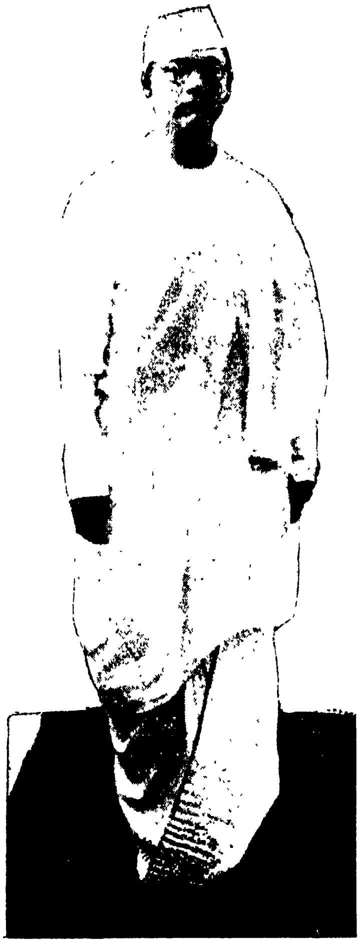
হার হিটলার্ মিউনিকে ফিল্ড মার্সাল গোরিংয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন



রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ও ডাক্তার ধরমবীর

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি—

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে জব্বলপুরের নিকট কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে যাহাতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি পুনর্নির্ব্বাচিত হন, সেজন্য সুভাষচন্দ্রের গুণমুগ্ধ সহকর্ম্মীরা সর্ব্বত্র বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া সম্মানজনক হইলেও আদৌ



রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু

সুখকর কার্য্য নহে। কংগ্রেস সভাপতিকে সারা বৎসর এত অধিক কাজ করিতে হয় যে, তাহা সুভাষচন্দ্রের মত সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মী ছাড়া অপরের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। সুভাষচন্দ্র এ বৎসর যেরূপ বিপুল উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকেই যে পুনরায় কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচন করা সঙ্গত হইবে, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। আমরাও সুভাষচন্দ্রকে পুনরায় সভাপতিরূপে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা—

গত ১৬ই নবেম্বর নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া শহরে নদীয়া জেলা শিক্ষক-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উক্ত সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—'দুঃখের



ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিষয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহেও সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে। একই গ্রামে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠশালা ও মক্তব দেখিয়াছি। কোন কোন স্থানে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় রহিয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয় বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়েরও দাবী জানাইয়াছে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী ও পার্শীদিগের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়গুলি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা থাকিবে, ততদিন কেন যে এই সকল সম্প্রদায়ের বালকবালিকাগণ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত এক সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত

হইবে না, তাহা বোধগম্য হয় না। কোন এক নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকাগণ কেন যে একসঙ্গে শিক্ষিত হইতে পারে না, তাহাও আমি বুঝিতে পারি না।” শিক্ষা সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায় উদারতা না দেখাইলে ক্রমশ শিক্ষাসমস্যা আরও গুরুতর হইয়া উঠিবে।

মহাত্মা হংসরাজ—

পাঞ্জাবের খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী মহাত্মা হংসরাজ গত ১৫ই নভেম্বর ৭৫ বৎসর বয়সে লাহোরে নিজ বাসভবনে



লালা হংসরাজ

পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট আর্য্য-সমাজী নেতা ও শিক্ষা-ব্রতী ছিলেন। পাঞ্জাবের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল; তিনি লাহোরের ডি-এ-ভি-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পরোপকারী, ধর্ম্ম-পরায়ণ ও স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। তিনি সারাজীবন অনাড়ম্বর সরল জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতে তাঁহার প্রতি লোকের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল।

নূতন সচিব নিয়োগ—

মৌলবী নৌসের আলীকে অপসৃত করার পর সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ-কে-ফজলল হকের চেষ্টায় দুইজন মুসলমানকে—মিঃ সামসুদ্দীন আহ্‌মেদ ও মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁকে —মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখন মৌলবী ফজলল হকের বিখ্যাত ফুটবল দল ক্রিকেট দলে পরিণত হইল। তন্মধ্যে পাঁচজন হিন্দু (৩ জন বর্ণ হিন্দু ও ২ জন তপশীল জাতিভুক্ত হিন্দু) ও ৭ জন মুসলমান; নূতন মন্ত্রীগ্রহণের ফলে কার্য্যগুলি এইভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও শিল্প, (২) মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী—বাণিজ্য, শ্রমিক ও পল্লী-সংগঠন, (৩) মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ—জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শাসনতন্ত্র ও নির্ব্বাচন, (৪) মিঃ সামসুদ্দীন আহ্‌মেদ—কৃষি ও পশুচিকিৎসা। অপর ৮ জন সচিবের কার্য্যভার সম্পর্কে পূর্ব্ব-ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তুরস্কের নূতন প্রেসিডেণ্ট—

তুরস্ক গণতন্ত্রের সভাপতি কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও সহকর্ম্মী জেনারেল ইসমেত ইনোনু তুরস্কের গণতন্ত্রের সভাপতি হইয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইসমেতের জন্ম হয়; ইনোনু নামক স্থানে রণক্ষেত্রে তিনি গ্রীকদিগকে পরাজিত করায় কামাল তাঁহাকে ইনোনু উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইনোনু তুরস্কের প্রতিনিধিরূপে মুদানিয়ায় ফ্রান্স-বৃটেনের সহিত সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন; পর বৎসর তিনি লোজান সন্ধিবৈঠকে যোগদান করিয়া তুরস্কের দাবীগুলি লর্ড কার্জ্জনের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। সেই বৎসর (১৯২৩) তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ইসমেত প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কামালের সহিত তিনি সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে কামাল



ইসমেত ইনোনু

তুরস্ককে এমনভাবে এত শীঘ্র নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারিতেন কি-না সন্দেহ।

বিহারে বাঙ্গালী বিদ্বেষ—

বিহারে গত কয় বৎসর হইতে—বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান কংগ্রেসপক্ষীয় মন্ত্রীদিগের আমলে—যে ভাবে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করা হইতেছে, তাহাতে ইহার পর বিহারে বাঙ্গালীদের পক্ষে বসবাস করা যে কঠিন হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সমস্যার সমাধানের কোন ব্যবস্থা না করায় বিষয়টির গুরুত্ব দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সম্প্রতি বিহার সরকার মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন স্থির করায় বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই হিন্দুস্থানী মাতৃভাষা বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় বাঙ্গালী ছাত্রদের সে সকল স্কুলে পড়া অসম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি ঝরিয়ার রাজ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গালা ভাষাযোগে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করায় বিহারীরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দারুণ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ঝরিয়ার অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ জন বাঙ্গালাভাষাভাষী। কিন্তু যে সকল স্থানের স্কুলে বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা প্রায় বিহারী ছাত্রের সংখ্যার অনুরূপ, সে সকল স্থানেও স্কুলে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। আমরা প্রাদেশিকতা প্রচারের পক্ষপাতী নই, কিন্তু কংগ্রেসপক্ষীয় মন্ত্রীরা এ অনাচারের কোন প্রতিকার না করিলে বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীদের অবস্থা কিরূপ সঙ্গীন হইবে, ভাবিয়া চিন্তান্বিত হইতেছি।

জগদীশচন্দ্রের স্মৃতি অনুষ্ঠান—

৮০ বৎসর পূর্ব্বে ৩০শে নভেম্বর তারিখে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম হইয়াছিল এবং ২০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ তারিখেই তিনি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই জন্য ঐ দিনটিকে স্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশ্যে ঐ তারিখে এ বৎসরও মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ এক স্মৃতি-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর ঐ দিন একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিকে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করিতে বলা হইবে। এবার জগদীশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঐ দিন বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল; তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশত নিজে এই উৎসবে যোগদান করিতে অক্ষম হওয়ায় লিখিত বক্তৃতা প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা পঠিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান-মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ এই ভাবে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের স্মৃতি-অনুষ্ঠান করিয়া এবং এই অনুষ্ঠানকে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

গত ২৬শে নভেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ কনভোকেসন উৎসবে ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীমান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ডি-লিট উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে একান্ত অনুরাগ, তাহার জন্যই তাঁহাকে এই উচ্চ উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক অধ্যাপক ডি-লিট আছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের পক্ষে এই উপাধি সম্মানসূচক হইলেও বিশেষ লোভনীয় ছিল না। তাহা ছাড়া শ্রীমান শ্যামাপ্রসাদের এই সম্মান বহু পূর্ব্বেই পাওয়া উচিত ছিল।



ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

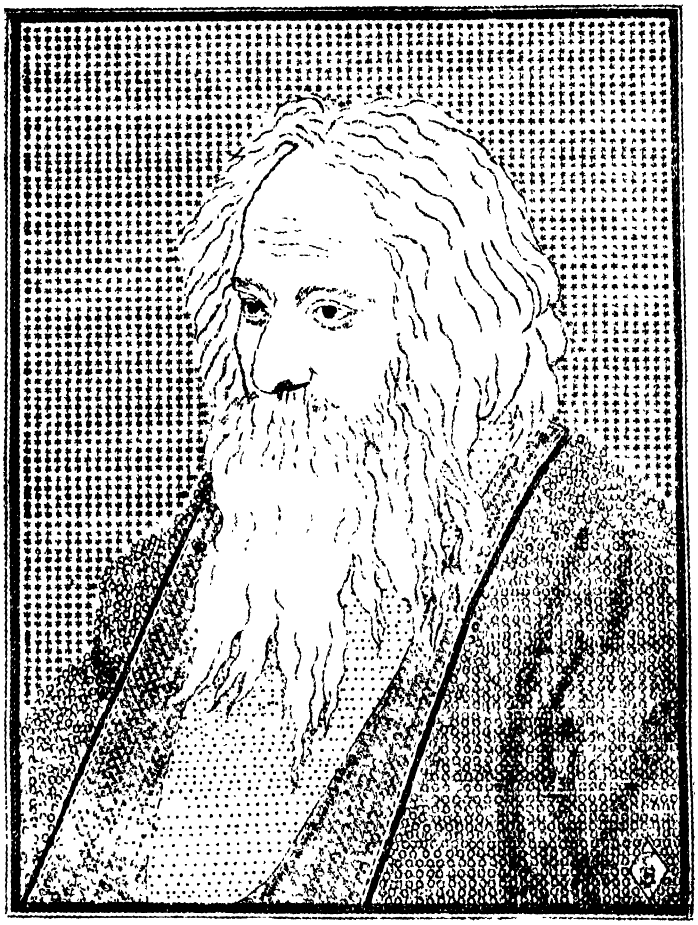
যাহা হউক, আমরা তাঁহার এই সম্মানলাভে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং আশা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার সমৃদ্ধি করুন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা একটি বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরের দুই-এক জন সুধীকে সম্মানসূচক উপাধি দানের ব্যবস্থা করিলেও এখনও বহু উপযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে অবহেলা দেখাইতেছেন।

টাইপ-রাইটার যন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্র—

কলিকাতা শিয়ালদহ পুলিস আদালতের উকীল সভার ষ্টেনোগ্রাফার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য টাইপ-রাইটার যন্ত্রে কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। হাতে প্রস্তুত কাগজে রমেশবাবু ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি এই চিত্র অঙ্কনে যে কয়টি চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও চিত্রের নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে। রমেশবাবুর এই কৃতিত্বে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।



শ্রীযুত রমেশ ভট্টাচার্য্য



টাইপ রাইটারে অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ২৪শে হইতে ২৮শে চৈত্র ঈষ্টারের ছুটীতে কুমিল্লা শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল-সভাপতি ও নিম্নলিখিত সাহিত্যিক সুধীবর্গ শাখা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদ—সাহিত্য শাখা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী—দর্শন শাখা, ডক্টর মেঘনাদ সাহা—বিজ্ঞান শাখা, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন—ইতিহাস শাখা ও শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়—সঙ্গীত শাখা। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার মহাকাব্য' সাহিত্য শাখার, 'গুপ্তরাজগণের সাম্রাজ্যবাদের সফলতা' ইতিহাস শাখার, 'শঙ্করাচার্য্যের বিজ্ঞানবাদ' দর্শন শাখার ও 'বঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রচলনের সুবিধা ও অসুবিধা' বিজ্ঞান শাখার আলোচ্য বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আশা করি, সুদূর কুমিল্লাতেও এবার সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি হইবে না।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—

গত ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রিশেষ ৪টা ১০ মিনিটে ঋষিকল্প দার্শনিক আচার্য্য স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৭৫ বৎসর

বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় বাস করিতে-ছিলেন; ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মিলনে তিনি মূল-সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার পর তিনি আর জনসাধারণের কার্য্যে বিশেষ যোগদান করিতেন না।



আচার্য্য সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ব্রজেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন—তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দর্শনে এম-এ পাশ করিয়া তিনি সিটি কলেজ, নাগপুর ম্যরিশ কলেজ ও বহরমপুর কলেজে কিছুদিন অধ্যাপকের কাজ করেন; পরে ১৮৯৬ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত কুচবিহার কলেজে প্রিন্সিপালের কাজ করেন। তিনি কয়েকবার ইউরোপে গিয়া সে-দেশের ভাবধারা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯১৩ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দেই তিনি মহীশূরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৩এ মহীশূর সরকার তাঁহাকে 'রাজতন্ত্রপ্রবীণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিল এবং ১৯২৬এ ব্রজেন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল, তাহা আর কখনও পূর্ণ হইবে না।

মহারাজকুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ—

লালগোলার মহারাজা স্যর যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের একমাত্র জীবিত পুত্র মহারাজকুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ ষাট বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতাকে রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। হেমেন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজাবন্ধু জমিদার ছিলেন; তিনি কখনও সহরের মোহে



উপবিষ্ট—মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তাঁহার পুত্র ৺হেমেন্দ্রনারায়ণ
দণ্ডায়মান—৺হেমেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণ ও
পৌত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণ

পল্লীর বাস ত্যাগ করেন নাই। ধনী দরিদ্র সকলের সঙ্গেই তিনি সমানভাবে মিশিতেন; বহুকাল তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা-বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বৃদ্ধ মহারাজার এই পুত্র-শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। হেমেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণ বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত; আমরা তাঁহার এই পিতৃশোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কুমারী প্রতিমা গুপ্ত—

কুমারী প্রতিমা গুপ্ত এবার এলাহাবাদে সঙ্গীত সম্মিলনে মহিলা বিভাগে কণ্ঠসঙ্গীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি স্বর্গত মিঃ এস-সি গুপ্তের কন্যা। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।



কুমারী প্রতিমা গুপ্ত

নালন্দা দর্শনে

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

অতীতের শত স্মৃতিব্যথা বুকে লয়ে
কালের কঠোর ঝঞ্ঝা-আঘাত স'য়ে—
দাঁড়ায়ে রয়েছ জীর্ণ শরীরে মৃত্যুরে করি' জয়;
নমি তব পদে অতীত কালের বিশ্ববিদ্যালয়।
হেথাকার এই জ্ঞানের বিরাট মুক্ত যজ্ঞাগারে—
পুরোহিত ছিল বাঙালীর ছেলে;—
নমি তাঁরে বারে বারে।
হেথাকার প্রতি ধূলিকণা আজো
পথিকের কানে কয়—
'বাঙালীর ছেলে মহাপণ্ডিত
শীলভদ্রের জয়।'
এইখানে আসি' চীন দেশ হ'তে
দুর্গম পথ বাহি'
পরিব্রাজক বাঙালীর পদে
হয়েছিল ধরাশায়ী—
বাণী-যজ্ঞের এই পূতঃ বেদীমূলে
অতীতের সেই গৌরব-স্মৃতি বাঙালী যায় নি ভুলে।

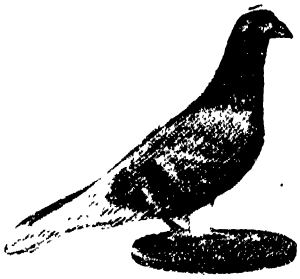
বাণীযজ্ঞের হুতাশন আজি
নিভেছে যজ্ঞাগারে,
শুধু পড়ে আছে ভস্ম তাহার
হেথা হোথা চারিধারে।
তবু ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতির পবনে ভেসে
যজ্ঞধূমের গন্ধ ভাসিয়া আসে—
অতীতের দূর স্বপ্ন-স্মৃতির মত
মহিমার ধীর শান্ত আবেশে
মাথা হয়ে আসে নত।
জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডারী তুমি,
তোমারে প্রণাম করি;
কত শত জ্ঞান-ভিখারী হেথায়
ক'রে গেছে মাধুকরী।
সেই নালন্দা বিদ্যাপীঠ যে তুমি,
চরণে তোমার বাঙালীর ছেলে আমি
নমিতেছি বারে বারে,
তোমার ভগ্ন বিরাট সিংহদ্বারে।

নিখিল প্রবাহ

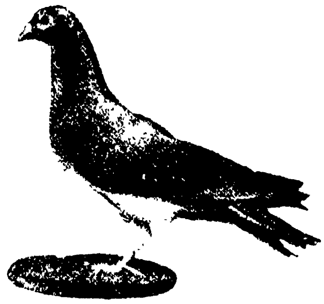
পারাবত

প্রবন্ধ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর বিশ্বস্ত বন্ধু 'দি মকার'



'প্রেসিডেণ্ট উইলসন' জার্মান সীমার উপর সংবাদ বহনকালে জার্মান কর্তৃক আহত হ'য়েছিল

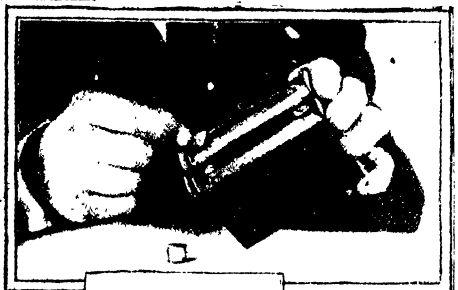
বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন দেশে সংবাদ প্রেরণের সহজ এবং বিশ্বাসযোগ্য যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমানে পারাবত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন একেবারে কমেনি। পারাবত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ অতি পুরাতন দিনের কথা। পূর্ব্বকালে বহু-সংখ্যক সংবাদ-বহনকারী পারাবত সহযোগে রোমের সেনাবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করত। তা'ছাড়া, সে সময়ের সুদীর্ঘ ভ্রমণে রাজপুরুষদিগের সহিত রাজকীয় পারাবত প্রেরণের সুব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক প্রতি-যোগিতার ফলাফল বিভিন্ন দেশে পারাবত সাহায্যেই প্রেরণ করা হ'ত। এর পূর্ব্বে অবশ্য পারস্য দেশে সংবাদ প্রেরণের অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। সম্ভবত পারসীয়দিগের নিকট হ'তে গ্রীকগণ পারাবত সাহায্যে সংবাদ-প্রেরণ-কৌশল শিক্ষা করে। বৈদ্যুতিক শক্তিসাহায্যে দূরদেশে সংবাদ প্রেরণ করবার কল্পনা যখন মানুষের আসেনি সে সময় কোম্পানির কাগজের দালাল এবং ব্যবসায়ীগণ প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরণের জন্য পারাবতের সাহায্য নিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট বোগদাদ থেকে পারাবত সংগ্রহ ক'রে জাভা এবং সুমাত্রায় সমর বিভাগের এবং জনসাধারণের সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ১৮৭০-৭১ খৃস্টাব্দে প্যারিস শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হ'লে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য পারাবত নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সমর ও নৌবিভাগের সংবাদ প্রেরণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পারাবতের শিক্ষা-ব্যবস্থাও যথেষ্ট হয়েছিল। যুদ্ধের সময় সংবাদ প্রেরণের যখন সমস্ত উপায় অচল হ'য়ে পড়ে, যখন বিজ্ঞান নিজের পরাজয় অবনত মস্তকে স্বীকার ক'রে নেয়, সে সময় মিসরের সংবাদ-বহনকারী মানবের বিশ্বস্ত বন্ধু 'হোমর'-জাতীয় পারাবতের বংশধরগণ নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংবাদ পৌঁছে দেয়। 'হোমর'-জাতীয় পারাবতই সংবাদ বহনের বিশেষ উপযোগী। 'হোমর'-এর লম্বা গ্রীবা, সুপুষ্ট পক্ষদ্বয়, লঘুদেহ এবং তীক্ষ্ণ চক্ষু যেন মানবের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজন করেছেন। সাধারণত দু-তিন শত মাইল পথ অতিক্রম ঐ জাতীয় পারাবতের পক্ষে কষ্টদায়ক নয়। এক হাজার মাইল পথ অতিক্রমে সংবাদ বহন করতে শিক্ষিত পারাবতের পক্ষে সহজসাধ্য। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে এবং প্রবল ঝটিকার বিরুদ্ধে সংবাদ বহনে পারাবত কোন দিন পরাঙ্মুখ হয়নি। বৃষ্টিতে শরীরের মধ্যে জল যাতে প্রবেশ না করে, সে জন্য ডানার উপরিভাগে এক প্রকার পাউডারের প্রলেপ দেওয়া হয়। রাত্রিকালে সাধারণত পথ অতিক্রমে পারাবত বিরত থাকে। সংবাদ বহনের উপযোগী করবার জন্য পারাবতকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহারা এরূপভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে, পথিমধ্যে অপরের প্রলোভনে পড়ে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে না। ইহারা অপরিচিত এবং সন্দেহজনক স্থানে খাদ্য-সংগ্রহ বা অপরের পরিত্যক্ত-গৃহে নীড় রচনায় উৎসাহিত হয় না—ইহাই ইহাদের জন্মগত অভ্যাস। বিশেষ পরীক্ষার পর খাদ্য গ্রহণে পথের শ্রান্তি দূর করে। প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে পারাবত-শিশুকে অভুক্ত অবস্থায় দুই-তিন মাইল

স্থান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের নিশ্চয়তার জন্যই তাহাদিকে অভুক্ত রাখা হয়—যদিও হোমার পারাবত



পারাবতদিগের স্বাস্থ্যপ্রদ বাসস্থান





প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পরীক্ষায় ব্যস্ত



বিরোধীতা দূরের জন্য সময় নির্দ্দেশ রক্ষক



এইরূপ অল্প দূরের পথ অতিক্রমে কোনরূপ খাদ্য ভক্ষণ পছন্দ করে না। 'হোমার' পাঁচ-ছয় শত মাইল দুর স্থান থেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতে অভ্যস্ত হ'লে সরকারীভাবে সংবাদ প্রেরণের উপযোগী ব'লে গণ্য হয়। 'হোমার' এক হাজার মাইল, এমন কি, তার চেয়েও বেশী দূরের পথ যে অতিক্রম করেছে সে সংবাদও পাওয়া যায়। সাধারণ প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মিনিটে এক মাইল পথ

পৃথিবীর 'অবিরাম উড্ডয়ন প্রতিযোগিতায় ম্যানিটোবা, ক্যানাডা থেকে ফ্রন্টওয়ার্থ, টেক্সাস পর্য্যন্ত এই সাতশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে পারাবত মানব-মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দূরের পথ অতিক্রম করেছিল 'বেনবোল্ট' নামক পারাবত। পথের দূরত্ব ছিল পঁয়ত্রিশ শত মাইল।

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ফ্রান্স, জার্মান, বেলজিয়াম এবং ইংলণ্ডের সৈন্য বিভাগে সংবাদ প্রেরণের জন্য সংবাদ-বহনকারী পারাবতের এক পৃথক সংবাদ বিভাগ ছিল। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বিভাগে পারাবত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রকে সংবাদ আদান-প্রদানে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। কারণ আগ্নেয় অস্ত্রের গোলা বর্ষণে টেলিফোনের তার বিধ্বস্ত হওয়ায় সংবাদ প্রেরণ সম্ভব হয়নি, এমন কি, বেতার যোগে সংবাদ প্রেরণও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। এরূপ অবস্থায় একমাত্র সংবাদ-বহনকারী পারাবতই এ সমস্যার সমাধান করেছিল। কিরূপ বিচক্ষণতার সঙ্গে সে সময়ে তারা সংবাদ আদান-প্রদান করেছিল তা মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর যুদ্ধের

লেখা হয়েছিল তা'তে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'দি মকার' নামক পারাবত শ্রেষ্ঠ বীর বলেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ১৯১৮ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর 'দি মকার' বোহিমেন্ট ফ্রন্ট থেকে তার বাসস্থানে রক্তাক্ত দেহে সংবাদ বহন ক'রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শত্রুপক্ষের গুলি বর্ষণে তার দক্ষিণ চক্ষু সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হ'য়ে যায়, তবুও বিশ্বাসী দূত শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করে নি।





নলের মধ্যে সংবাদপত্র প্রেরণ করা হ'চ্ছে





উপরে স্বাস্থ্যবান পারাবত

বার্ত্তাবহনকারী নল—পারাবতের পায়ে লাগান হয়



বাজপক্ষীর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য হোমারের লেজে বাঁশী বেঁধে দেওয়া হ'চ্ছে

তাহার আনীত সংবাদে কর্ত্তৃপক্ষ বিপক্ষ দলের অবস্থানের এবং গতিবিধির সঠিক সংবাদ লাভে বিশেষ উপকৃত হয়েছিল। এই সংবাদ আনয়নে অসমর্থ হ'লে সমস্ত সৈন্য-বাহিনী নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে সম্মুখীন হ'তে বাধ্য হ'ত।

গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিপক্ষ দলের সীমানার উপর সংবাদ সংগ্রহ-কারী সৈনিককে একাকী পরিভ্রমণ করতে হয়। সে সময়ে তার পিছনে খাঁচার মধ্যে এক জোড়া সংবাদবহনকারী পারাবত লুক্কায়িত থাকে। বিষাক্তগ্যাসের সম্ভাবনা হ'লে অক্সিজেন্ গ্যাস পূর্ণ এক সিল্কের থলি মধ্যে তাদের রাখা হয়। কর্দ্দমাক্ত পরিখার মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় অনেক সময় সৈনিককে সংবাদ সংগ্রহের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয় সেই সময় খাদ্যাভাব হওয়ায় পারাবতদিগকে সৈনিকের সঙ্গে অনেক সময় অভুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পারাবত কোনরূপ দুর্ব্বলতা অনুভব করে না। ছাড়া পেলেই দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়।

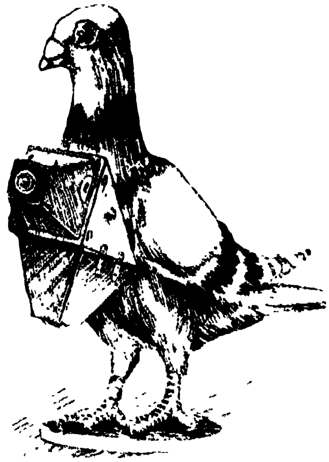
ফ্রান্সে শতকরা নব্বুইটি সংবাদ পারাবতের সাহায্যে সংগৃহীত হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ৫ই নভেম্বর প্রাতঃকালে প্রেসিডেন্ট উইলসন নামক পারাবত একুশ মিনিটে কুড়ি কিলোমিটার পথ অতিক্রম ক'রে প্রেরিত সংবাদ আনয়ন করেছিল। গুলির আঘাতে বাঁ দিকের পা একেবারে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তবুও 'উইলসন' সংবাদ পৌছে দিতে বিরত হয়নি।

'স্পাইক' নামক পারাবতকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী বলতে হ'বে। ভীষণ গোলাবর্ষণে এবং সবচেয়ে খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়েই 'স্পাইক' বায়ান্নটিপ্রেরিত সংবাদ অক্ষতদেহে সরবরাহ করেছিল।



রেসিং হোমার

১৯১৬ সালে ফ্রান্সে 'এরিয়াল' ক্যামেরার আবিষ্কার হওয়ায় যুদ্ধের বিভীষিকাময় দৃশ্য সংগ্রহের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। ক্যামেরার আকার ছোট্ট; য়্যালুমিনিয়াম ধাতু দ্বারা তৈয়ারী, ওজনে দু' আউন্সেরও বেশী নয়। প্রত্যেক ক্যামেরার দুটি লেন্স, একটি সাধারণ ক্যামেরার মতই সম্মুখভাগে এবং অপরটি নিম্নভাগে অবস্থিত। পারাবতের বক্ষদেশে ক্যামেরাটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ক্যামেরার মধ্যদেশে বায়ুপূর্ণ এক ছোট বলের গাত্রদেশে অতি এক সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখা হয়। পারাবতকে মুক্ত করবার পর বলের গাত্র দেশস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথ দিয়া বায়ু নিষ্কাশন আরম্ভ হয় এবং সম্পূর্ণভাবে বায়ু নিষ্কাশন শেষ হ'লে বলটি 'শাটার'কে মুক্ত করে—এইরূপে ছবি তোলার ব্যবস্থা ছিল।



জার্মান সীমানার উপরিভাগস্থ ছবি গ্রহণে নিযুক্ত ফ্রেঞ্চ পারাবত

পারাবত প্রায় এক শো থেকে তিন শো ফিট উচ্চ স্থানের উপর দিয়া পরিভ্রমণ করা নিরাপদ মনে করে। এরূপ উচ্চ স্থানে বন্দুকের গুলি অথবা বিষাক্ত গ্যাস পারাবতের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। সেই জন্য শত্রুপক্ষ শিক্ষিত বাজপক্ষী সাহায্যে সংবাদবাহক পারাবতদের বন্দী ক'রে সংবাদসমূহ নষ্ট করবার ব্যবস্থা করেছিল। ফ্রান্সে বাজপক্ষীর কবল থেকে পারাবতদের রক্ষার জন্য এক প্রকার বাঁশী পারাবতের লেজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়। বাতাসের বিরুদ্ধ অবস্থায় সেই বাঁশী থেকে একপ্রকার কর্কশ অদ্ভুত শব্দ বাজপক্ষীর ভয়ের সৃষ্টি করত। 'হোমার'-পারা-বতের কর্ম্মক্ষেত্র কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাশ্চাত্য দেশে সংবাদপত্র অফিসের সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগে 'হোমার'-পারাবতের সংবাদ বহনের দায়িত্ব অনেক খানি। পারাবত-সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ নিরাপদ, সাংবাদিকদের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় বর্ত্তমানে এদের প্রয়োজনীয়তা



যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত পারাবতবাহিনী

বৃদ্ধি পেয়েছে। জাপানের সংবাদপত্রগুলির নামই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে ব্যাপকভাবে পারাবত-সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

'পারাবত উড্ডয়ন প্রতিযোগিতা বর্ত্তমানে একশ্রেণী ক্রীড়ামোদীদের কাছে বিশেষ উপভোগ্যের বস্তু। উড্ডয়ন প্রতিযোগিতার প্রসারতা লাভে বেলজিয়াম বিশেষ অগ্রণী। ১৮১৮ সালের এক শো মিটার উড্ডয়ন প্রতিযোগিতা বেলজিয়ামে প্রথম আরম্ভ হয়। এবং ইহাই সে সময়ের প্রথম দূরপথগামী প্রতিযোগিতা ব'লে গণ্য। এর পর ১৮২০ সালে প্যারিস থেকে লীগ এবং ১৮২৩ সালে লণ্ডন থেকে বেলজিয়াম পর্য্যন্ত এক প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ১৮৮১ সালে বেলজিয়াম ৫০০ মিটার আন্তর্জাতিক উড্ডয়ন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। যদিও আমেরিকায় ১৮৭০ সালে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় কিন্তু ধারা-বাহিকভাবে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল ১৮৭৮ সালে।

আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর ক্রীড়া উপভোগ করবার ক্রীড়ামোদীর অভাব নেই। উড্ডয়ন প্রতিযোগিতার সঙ্গে আমরাও একেবারে অপরিচিত নই, তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পারাবত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় এর প্রসার লাভ বিশেষ হয়নি।

শিক্ষিত পারাবত-সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ এবং উড্ডয়ন প্রতিযোগিতার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এ যে শীঘ্রই জনপ্রিয়তা লাভ করবে সে বিষয়ে আমরা অনেকখানি আশা করতে পারি।

প্রতিদ্বন্দ্বী

শ্রীবীরেন দাশ

ক্লাবে সেদিন আকস্মিক ঠিক হইয়া গেল, আগামী মাসের পয়লা কলিকাতার বাইরে পল্লীগ্রামে গিয়া বনভোজন করা যাইবে। গ্রামটির পাশেই গঙ্গা। সকলে মিলিয়া গঙ্গায় খুব আমোদ করিয়া দাঁড় টানিব। প্রস্তাবক বন্ধু গাঙ্গুলী আমাকে বলিলেন: আপনি রো-ইং জানেন ত? আমি উত্তরে কি বলি, ক্লাবের সকলেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। সুতরাং আমার পক্ষে সম্মতিসূচক মাথা-নাড়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় ছিল না। গাঙ্গুলী বলিলেন: জানেন, সত্যি? ভাল, সেদিন এর সত্যতা প্রমাণ হবে। আপনি ভাল দাঁড় টানেন, না আমি। সবাই বলিলেন: নিশ্চয়। ফিরিবার পথে গিন্নী বলিলেন: জান ত সত্যি তুমি দাঁড়-টানা?

ছাই জানি। আমি রুষ্টস্বরে বলিলাম: আমার জীবনেও দাঁড় স্পর্শ করা হয়নি। গিন্নী মুখ ভার করিয়া বলিলেন: তা হলে উপায়?

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতে একটু দেরী হইয়াছিল। চোখ মেলিতেই গিন্নী বলিলেন: নকুল মাঝিকে ঠিক করেছি। দাঁড়-টানা তোমায় শিখতেই হবে। আমি চা গিলিতে লাগিলাম। গিন্নী বলিলেন: চুপ ক'রে রইলে যে বড়! তোমার কি বল! বনভোজন করতে গিয়ে দাঁড়-টানতে পারবে না। সবাই তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। ব্যাপারটা কি সেখানেই শেষ হবে তুমি ভেবেছ? গাঙ্গুলীর যা স্বভাব। বনভোজন থেকে ফিরে এসে সে ঘরে ঘরে তোমার শোচনীয় পরাজয়ের গল্প ব'লে বেড়াবে। সবাই টিট্‌কারী দেবে। সমাজে মুখ-দেখানো আমার দায় হয়ে উঠবে।···গিন্নী সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন: না না, এ লজ্জা আমি সইতে পারব না। দাঁড়-টানা তোমায় শিখতেই হবে। খুব ভোরবেলা, ছটার সময় উঠে আহিরিটোলার ঘাটে চলে যাবে। সেখানে নকুল মাঝি নৌকো নিয়ে তোমার অপেক্ষা করবে।

ছ'টার সময়? আমি বিমূঢ় স্বরে বলিলাম: এই নিদারুণ শীতে বুড়ো নকুল মাঝির এ শীত সইবে কেন। না না, শেষ কালে বেচারা নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাক্ আর কি!

গিন্নী নাক ফুলাইয়া বলিলেন: সে ভয় তোমার নয়, নকুল মাঝির।

আমি তবুও চুপ করিয়া আছি দেখিয়া গিন্নী অভিমান করিলেন। অভিমানে তার চোখে জল আসিল। হাতের সর্টের ঝোলে চোখ মুছিয়া গিন্নী বলিলেন: কি নির্দ্দয় তুমি! কোথায় আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবে, না তুমি নিজেই তার পথ খুলে দিচ্ছ।

গিন্নী আবার নাক মুছিলেন। কদিন ধরিয়া যা শীত পড়িয়াছে, সর্দ্দি না হইয়া পারে না। গিন্নী বলিতে লাগিলেন: গাঙ্গুলী ক্লাবে তোমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। সর্ব্বত্রই তোমাকে দাবিয়ে রাখতে চায় গাঙ্গুলী। ফ্লাশ খেলায় বলো, পলিটিক্‌সে বলো, স্বদেশীতে বলো, সাহিত্যে বলো। তুমি সব সইতে পার—তোমার গায়ের চামড়া শক্ত। কিন্তু আমি সইব কেন! গিন্নী মুখ ফিরাইলেন। আমার মনে হইল, তিনি অশ্রু গোপন করিলেন। আমার বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল।

আমি বীরদর্পে বলিলাম: প্রিয়ে, মা রোদ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করব। আমি নকুল-মাঝির নৌকোয় যাব। গিন্নী আমাকে মনে করাইয়া দিলেন: ভোর ছ'টায়···আমি অনুরোধে ঢেঁকি গিলিলাম।

একে ত আমার ঘুম ভাঙ্গিতে প্রায়ই নটা বাজে। কিন্তু এখন ছ'টার সময় উঠিতে হইবে। হায়রে দুর্দ্দৈব! এই শীতের দিন, গায়ে ঠাণ্ডাজল না পড়িলে কি কেউ ছটার সময় শয্যাত্যাগ করে। তবু উঠিতেই হইল। গিন্নী সাড়ে পাচটার সময় নিজের হাতে চা আনিয়া দিলেন। চা আর সুইমিং-কষ্টুম। কাপড়-জামা পরিয়া কি কেউ রো-ইং করে।

মোটরে বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। শীতের হাওয়া গায়ে বিঁধিতেছে, যেন আলপিন্।

আহিরিটোলার ঘাটে নামিতেই দেখি আর একখানি মোটর! আরে, এ যে গাঙ্গুলীর মোটর।

নকুল মাঝি আমার কাছে আসিয়া বলিল: আসুন বাবু। গাঙ্গুলী কর্ত্তা বসে আছেন। দু'বাবু একসঙ্গেই শিখবেন।

আমি আর গাঙ্গুলী মুখোমুখি তাকাইয়া রহিলাম!



বোম্বাইয়ে পেণ্টাঙ্গুলার:

হিন্দু—৬৯ ও ৩৭৭

মুসলিম—৩৪০ ও ১০৭ (৪ উইকেট)

এবারকার দুর্দ্ধর্ষ হিন্দু দল অপ্রত্যাশিত ভাবে মুসলিম দলের কাছে পেণ্টাঙ্গুলার ফাইনালে পরাজিত হয়েছে। মুসলিম দল ৬ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে। গতবারও তারা বিজয়ী ছিল। কিন্তু গতবার হিন্দুদল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নাই। খেলারম্ভের পূর্ব্বে কেহ মনে করতেও পারে নি যে হিন্দুদলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৬৯ রানে সমাপ্ত হবে। ভাগ্য বিড়ম্বনা, অমরনাথ বিবাহ করতে গেছেন, মার্চ্চেণ্ট খেলার দিন সকালে অসুস্থতার খবর পাঠালেন। হিন্দুদল বিশেষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল।



ওয়াজির আলি
[ক্যাপ্‌টেন—মুসলিম]



সি কে নাইডু
[ক্যাপ্‌টেন—হিন্দু]

মহম্মদ নিসার পূর্ব্ব খেলায় বোলিংয়ে মোটেই সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু ফাইনালে তাঁর বলে নাইডু ব্যতীত কেহই সচ্ছন্দে খেলতে পারেন নি। নিসারের অপেক্ষা ভাল ফাষ্ট বোলার এ দেশে এখনও জন্মায় নি। তাঁর বলের তীব্র গতি কোন অংশে হ্রাস পায় নাই।

সৈয়দ আমেদের বলের লেংথ ছিল সমান এবং তিনি তীব্র গতিতে ইন্-সুয়িং করেছিলেন। তার বলেও হিন্দু খেলোয়াড়রা অত্যধিক ভীত হয়ে খেলেছেন, যদিও ততটা ভয় না করলেও চলতো।

অপর পক্ষে বিখ্যাত বোলার অমর সিং বোলিংয়ে ব্যাটসম্যানদের মোটেই ভীতি উৎপাদন করতে পারেন নি। এত খারাপ বোলিং পূর্ব্বে তিনি কখনও করেন নি। ফিল্ডিংয়ে



বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ফাইনাল-খেলায় মুসলিম দল ফিল্ড করতে যাচ্ছে



চলার পথে　　　　শিল্পী—অমরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর



গৃহস্থালী　　　　শিল্পী—রমেনকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা



পেশোয়ারে মহাত্মা গান্ধী খাদি প্রদর্শনী অভিমুখে যাইতেছেন



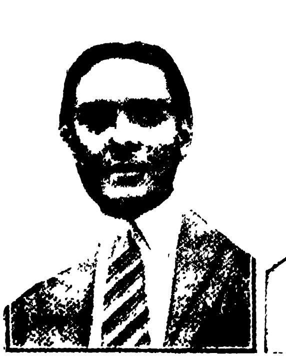
চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার বেনস ও তদীয় পত্নী। চিকাগো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর-পদ গ্রহণ করিয়াছেন

যতগুলি ক্যাচ তাঁর কাছে এসেছে অমর সিং ফস্‌কেছেন, কয়েকটি ক্যাচ অতি সোজা ছিল। ব্যাটিংয়ে একটা সট্‌ও তাঁর যোগ্য হয় নি। খেলায় এরূপ অবনতির কারণ বোধগম্য হয় না।

ভারতের ১নং উইকেট রক্ষক হিন্দেলকারের উইকেট রক্ষা তাঁর উপযুক্ত হয় নি। তিনি চার চারটে ক্যাচ নষ্ট করেছেন।

হিন্দুদের ফিল্ডিং মোটেই ভাল হয় নি। প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ের জন্য হিন্দুদের পরাজয় ঘটে। মাস্তাক ৭ রানে কাদ্রি ৩ এবং আমীর ইলাহীর প্রথম বলেই আউট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা' না হ'য়ে এই তিনজন করেছেন যথাক্রমে ২৭, ৬৫ ও ৯৬। একবার দু'বার নয় বহুবার আমীর ইলাহীকে আউট করবার সুযোগ নষ্ট করা হয়েছে।

হিন্দুদলের বোলিংয়ে সি এস নাইডু বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এক ইনিংসে ৭টি উইকেট নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তবুও তাঁর বলের কতকগুলি ক্যাচ ফিল্ডাররা নষ্ট করেছে।


এস এম কাদ্রি


আমির ইলাহি

ভাগ্য বিপর্য্যয়, সহযোগীদের সমর্থনের অভাব, পরিচালকের অন্যায় সিদ্ধান্ত প্রভৃতির জন্য হিন্দুদের পরাজয় হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে নাইডু ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে রান তুলছেন দেখে মনে হয়েছিল যে সারাদিন ব্যাট করতে পারবেন। কিন্তু আম্পায়ার ডুবাস অন্যায়রূপে তাঁকে এল-বি দিলেন। নাইডু বলেন যে তিনি ব্যাটে বল ঠেকিয়েছিলেন।

নাইডুর অধিনায়কত্বে কোন ত্রুটি দৃষ্ট হয় নি।

ক্রিকেটের ভিতরে দলাদলির জন্য দলগত ঐক্যতার অভাব এই খেলায় বিশেষরূপে প্রকটিত হয়েছে।

মেজর নাইডু টসে জিতে ব্যাট ক'রতে পাঠান হিন্দেলকার ও ভিনু মানকাদকে। হিন্দেলকার সৈয়দ আমেদের বলে মাত্র এক রানে বোলড্ হ'য়ে গেলেন। একটু পরেই বিখ্যাত অলরাউণ্ডার মানকাদের বেল নিসারের বলে পড়ে গেল। নিম্বলকার এসে শূন্য করলেন। পৃথ্বিরাজের উইকেট সৈয়দ নিলেন এক রানে। সৈয়দের বল মারত্মক হ'চ্ছে আর


সৈয়দ আমেদ


মহম্মদ নিসার

নিসারের ফাষ্ট বল কেউ আটকাতে পারছে না। মেজর নাইডু দলের সর্ব্বোচ্চ রান ২৫ ক'রে নিসারের বলে আমীর ইলাহির হাতে আটকালেন। ব্যানার্জ্জি নট আউট ১৪। হিন্দুদলের ইনিংস শেষ হ'ল মাত্র ৬৯ রানে। নিসার ২০ রানে ৫ আর সৈয়দ আমেদ ১২ রানে ৪ উইকেট পেয়েছে। উইকেটের অবস্থা খুব ভাল থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদলের এই শোচনীয় পতনের কারণ অজ্ঞাত।

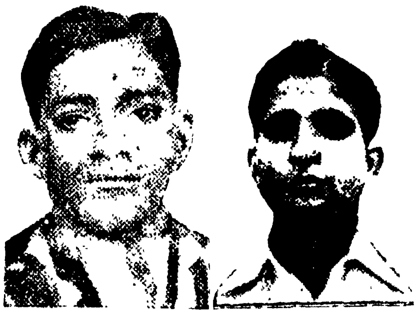
মুসলিম দল প্রথম দিনে ৬ উইকেটে ২০১ করলে। এতে মনে হয় উইকেট বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

হিন্দু দল ব্যাটিংয়ে যেমন অকৃতকার্য্যতা দেখিয়েছেন, ফিল্ডিংয়ে ততোধিক অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অতি সহজ ক্যাচ ফস্‌কান বা অবাঞ্ছনীয় বাউণ্ডারী হ'তে দেওয়া যেন তাঁদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল, এক্ষেত্রে বোলাররা হতাশ হ'য়ে পড়ে। সি এস এর বল বেশ ভাল হ'চ্ছে। এক সময় ১৫ ওভারে ৫টা মেডেন দিয়ে ৪৯ রানে তিনি চারটে উইকেট পেয়েচেন।

দ্বিতীয় দিনে মুসলিম দল খুব পিটিয়ে খেলে ৩৪০ রানে

ইনিংস শেষ করলে। আমীর ইলাহি মাত্র ৪ রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পেলে না। সৈয়দ ক'রেচে ৭৬। নাইডু ভ্রাতৃদ্বয় সব ক'টা উইকেটে পেয়েচেন। সি এস পেয়েছেন ৭ উইকেট ১০৯ রানে, সি কে ৩টা ৮৭ রানে।

হিন্দুদল ২০১ রান পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। ব্যানার্জ্জি ৮ রানে সৈয়দের বলে আউট হ'ল, হিন্দেলকার চোয়ালে আঘাত পাওয়ায় ফিরে গেল। মানকাদ আর মেজর নাইডু খেলছেন। মানকাদ ৩২ রান ক'রে মুবারকের বলে আমীর ইলাহির হাতে আটকে গেলে জয় যোগদান করেন। মেজর খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৬৬ রানের মাথায় অন্যায়রূপে এল বি হ'লেন। জয়ও একটু পরেই ৪৩ রান ক'রে দুর্ভাগ্য বশতঃ রান আউট হ'য়ে গেলেন। সি এস আর পৃথ্বিরাজ সে দিনের মত নট্ আউট রইলেন।



সি এস নাইডু পৃথ্বিরাজ

পরের দিনে সি এস খুব চমৎকার খেলছেন, একবারও সুযোগ দেন নি। হঠাৎ নিসারের একটা মারাত্মক বল কনুইয়ে লাগায় তাঁকে তাঁবুতে ফিরে যেতে হ'ল। অমর সিং এসে পিটিয়ে খেলতে গিয়ে আউট হয়ে যান। হিন্দেলকার পুনরায় এসে এক রানের বেশী ক'রতে পারেন নি। সি এস ফিরে এসে পৃথ্বিরাজের সঙ্গে যোগদান করলেন। ৭৫ রানের মাথায় সি এস আমির ইলাহির বলে কাদ্রির কাছে ধরা পড়লেন। হিন্দুদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো ৩৭৭ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে দৃঢ়তার সহিত ব্যাটিংয়ের জন্য হিন্দুদের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। আর এই প্রশংসার ব্যক্তিগত দাবী নাইডু ভ্রাতৃদ্বয়ের। হিন্দুদের সম্মান রক্ষার্থে সি এস নাইডুর ব্যাটিং ও বোলিংয়ে আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য এবারের ব্যক্তিগত জয়মাল্য তাঁরই প্রাপ্য।

১০৭ রান করলে জয় হ'বে। মুসলিম দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে এবং ৪ উইকেট খুইয়ে প্রয়োজনীয় রান সংখ্যা তুলে বিজয়ী হ'ল। নাজির আউট না হ'য়ে ৪৪ রান করেছে।

হিন্দেলকারের আউট হওয়া সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। উইকেটের বেল পড়ে যেতে দেখে আমীর আম্পায়ার বার্টহুইসিলকে আবেদন করলে তিনি 'নো আউট' বলেন। কিন্তু নিসার ও আব্বাস খাঁ লেগ আম্পায়ার ডুবাসকে আবেদন করলে, ডুবাস হাত তুলে আউট নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তার এই নির্দেশ আইন সম্মত নহে, কারণ—The Law does not permit the leg umpire to offer his decision either voluntarily or on an appeal from the players in such a case.

হিন্দু—প্রথম ইনিংস

হিন্দেলকার…ব সৈয়দ আমেদ	১
ভিনু মানকাদ…ব নিসার	২
নিম্বলকার…ক আমীর ইলাহি, ব সৈয়দ আমেদ	০
পৃথ্বিরাজ…ব সৈয়দ আমেদ	১
সি কে নাইডু…ক আমীর ইলাহি, ব নিসার	২৫
রোশনলাল… ক সাহাবুদ্দিন, ব নিসার	০
অমর সিং…ব সৈয়দ আমেদ	৯
জয়…ক আব্বাস খাঁ, ব সাহাবুদ্দিন	১
সি এস নাইডু…ব নিসার	১০
পি চুরী…ব নিসার	৪
এস ব্যানার্জ্জি… নট আউট	১৪
অতিরিক্ত	২
মোট	৬৯

বোলিং—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	১১	৩	২০	৫
সৈয়দ আমেদ	১২	৬	১২	৪
সাহাবুদ্দিন	৪	০	১৪	১
আমীর ইলাহি	২	০	২১	০

মুসলিম—প্রথম ইনিংস

মাস্তাক আলি…ক মানকদ, ব সি এস নাইডু	২৭
কাদ্রি…ক নিম্বলকার, ব সি এস নাইডু	৬৫
কে ইব্রাহিম…এল বি ডব্লিউ, ব সি এস নাইডু	৭
ওয়াজির আলি…ব সি কে নাইডু	৩০
নাজির আলি…ক পৃথ্বিরাজ, ব সি কে নাইডু	৯
আব্বাস খাঁ…ক নিম্বলকার, ব সি এস নাইডু	১
সৈয়দ আমেদ…এল বি ডব্লিউ, ব সি কে নাইডু	৭৮
আমীর ইলাহি…ব সি এস নাইডু	৯৬
মুবারক আলি…ক পৃথ্বিরাজ, ব সি এস নাইডু	০
সাহাবুদ্দিন… নট আউট	১০
নিসার · ক সি কে নাইডু, ব সি এস নাইডু	০
অতিরিক্ত	১৭
মোট	৩৪০

বোলিং—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
এস ব্যানার্জ্জি	১০	১	৩১	০
অমর সিং	১৭	৬	৪৪	০
মানকাদ	২০	১	৪৬	০
সি এস নাইডু	৩২	৭	১০৯	৭
সি কে নাইডু	২৫	৩	৮৭	৩
নিম্বলকার	৩	১	৬	০

হিন্দু—দ্বিতীয় ইনিংস

এস ব্যানার্জ্জি…ব সৈয়দ আমেদ		৮
হিন্দেলকার…ব আমীর ইলাহী		১৪
মানকাদ…ক আমীর ইলাহি, ব মুবারক আলি		৩২
সি কে নাইডু…এল বি ডব্লিউ, ব নিসার		৬৬
এল পি জয়…	রান আউট	৪৩
সি এস নাইডু…কট কাদ্রি, ব আমীর ইলাহী		৭৫
পৃথ্বিরাজ…ব নিসার		৬৫
অমর সিং…ব আমীর ইলাহী		৭
রোশন লাল…ব আমীর ইলাহী		১৩
নিম্বলকার…কট এবং ব আমীর ইলাহী		২৩
পি চুরী…	নট আউট	১৯
	অতিরিক্ত	১২
	মোট	৩৭৭

বোলিং—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	৩৩	২	১০৬	২
সৈয়দ আমেদ	৩২	১২	৫৪	১
সাহাবুদ্দিন	১০	১	৪০	০
আমীর ইলাহি	৩৫	৫	১২৫	৫
মুবারক আলি	১২	১	৩৬	১
নাজির আলি	১	০	৪	০

মুসলিম—দ্বিতীয় ইনিংস

মাস্তাক আলি…ক ও ব সি এস নাইডু		২২
এস কাদ্রি…এল বি ডব্লিউ, ব অমর সিং		১২
নাজির আলি…	নট আউট	৪৪
কে ইব্রাহিম…এল বি ডব্লিউ, ব সি কে নাইডু		১৩
আব্বাস খাঁ…ব অমর সিং		৮
ওয়াজির আলি…	নট আউট	১
	অতিরিক্ত	৭
	মোট ৪ উইকেট	১০৭

বোলিং—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
অমর সিং	১৮	৬	৪৭	২
সি এস্ নাইডু	৮	০	২৭	১
সি কে নাইডু	৮	১	২৪	১
ভিন্মু মানকাদ	২	১	২	০

পেণ্টাঙ্গুলার ঃ

ইউরোপীয়ান—১৪২ ও ৩৪৫

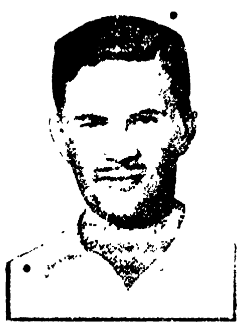
পার্শী—২৩৫ ও ২৩৩

পেণ্টাঙ্গুলারের প্রথম খেলায় ইউরোপীয় দল পার্শী দলকে ১৯ রানে হারিয়েছে। প্রথম ইনিংসে ইউরোপীয় দলের রান সংখ্যা ওঠে মাত্র ১৪২। হাভেওয়ালা ৪ উইকেট ৫২ রানে আর জামসেদ্‌জী ৩ উইকেট ৪৬ রানে পান।



কলাপেশী (ক্যাপটেন—পার্শী দল) মারে (ক্যাপটেন—ইউরোপীয় দল)

পার্শী দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৩৫ রানে। খোট মাত্র আট রানের জন্য সেঞ্চুরী নষ্ট করেন, আইবারা করেন ৫১। ইউরোপীয় দলের ক্যাপ্‌টেন মারে ৩৫ রানে ৪ উইকেট নেন। ইউরোপীয় দল খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪৫ রান তোলেন।



আইবারা

ফিলপোট-ব্রুকস্ করেন ১৪৩ রান, তার মধ্যে ১৯টা চার আর ২টা ছয়। টিউএর ৭১, ওয়েন্সলীর ৫১ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাল-সেটিয়ার বল খুব ভাল হ'য়েছে। তিনি ১০৯ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছেন। ২৫২ রান পিছনে থেকে পার্শী দল ব্যাট করতে নামে। ৩১০ মিনিট সময় আছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ইউরোপীয় দলের ফিল্ডিং অত্যন্ত খারাপ হ'য়েছে। অনেকগুলি সহজ ক্যাচ ফেলা সত্ত্বেও পার্শী দলের রান সংখ্যা হ'ল ২৩৩। মারে এবারেও চারটে

উইকেট পেলেন ৬১ রানে, ওয়েন্সলী পেয়েচেন চারটে ৮৪ রানে।

হিন্দু ৫৬০ (৭ উইকেট)

রেষ্ট—৩৫৯ ও ১৯৫

কোয়াড্রাঙ্গুলার ও পেণ্টাঙ্গুলারের রেকর্ড ভাঙ্গল। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল হোসীর ২০০ রান। অমরনাথ খেলতে নামলেন, তখন হিন্দুদলের মোট রান হ'য়েছিল মাত্র ৭৭; ৩৫৭ মিনিট ব্যাট ক'রে যখন আউট হ'লেন তখন স্কোর উঠেছে ৪৭০।



হিন্দু ও রেষ্টের পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় অমরনাথ তাঁর সেঞ্চুরী বাড়ি মেরেছেন

অমরনাথের এই নির্ভুল ও ত্রুটিহীন খেলা ক্রীড়ামোদীদের বহুকাল মনে থাকবে। ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণীর খেলায় এই সংখ্যা ভারতীয়ের সর্ব্বোচ্চ রান। ১৯৩০ সালে বিলাতে প্রথম শ্রেণীর খেলায় দলীপসিং রান তুলেছিলেন ৩৩৩, যা' এখনও কোন ভারতীয় ভাঙ্গতে পারেন নি।

হিন্দুদল ৭ উইকেটে ৫৬০ রান ক'রলে নাইডু ডিক্লেয়ার্ড করেন। রেষ্ট দল প্রথম ইনিংসে ৩৫৯ রান করে। অমরসিং, ব্যানার্জ্জি, সি এস ও সি কে নাইডুর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এত রান তোলা কৃতিত্বের পরিচয়। হ্যারিস সেঞ্চুরী করেন, ১১টা বাঁউণ্ডারী ছিল, ভাস্কর ৮৮ রান করেন। সি এস নাইডু ৫টা উইকেট পান ৯৯ রানে। রেষ্ট দলকে ফলো-অন্ করতে হয় এবং মাত্র ১৯৫ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। এবার সি এস ৪ উইকেট পেয়েচেন ৭৩ রান দিয়ে। আর হ্যারিস এবারও রেষ্ট দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান করেছেন।



এল পি জয়

পেণ্টাঙ্গুলার সেমিফাইনালে হিন্দু দল রেষ্ট দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১৬ রানে পরাজিত ক'রেচে। মেজর নাইডু টসে জিতলে হিন্দু দল ব্যাট ক'রতে নামে। আরম্ভ খুব ভাল হয়নি। হিন্দেলকার মাত্র এক ক'রে আউট হ'য়ে যান। কে বোস ৯৩ মিনিট খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট করে মাত্র ২১ রান তোলেন। পঞ্চম উইকেটে অমরনাথ ও মার্চ্চেণ্ট খেলা ঘুরিয়ে দিলেন। চায়ের সময় অমরনাথ নট আউট ১২০, মার্চ্চেণ্ট নট আউট ৭১। দুর্ভাগ্যবশতঃ মার্চ্চেণ্ট পেশী সঙ্কুচনের জন্য আর খেলতে পারেন নি। কিন্তু প্রবীণ খেলোয়াড় জয় মার্চ্চেণ্টের অনুপস্থিতি বুঝতে দেন নি। অমরনাথের খেলা হ'য়েচে অতুলনীয়। জয়ের খেলাও সুন্দর হ'য়েচে, তিনি ১০৩ রান ক'রে আউট হ'য়েচেন, তার মধ্যে ৭টা চার ছিল। অমরনাথ আউট হ'য়েচেন ২৪১ রানে, চারের বাড়ী ছিলো ২৬টা।

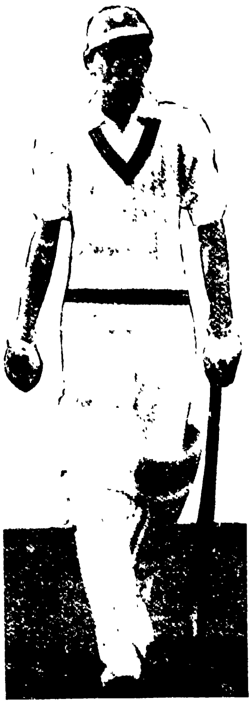
মুসলিম—২৪৬ ও ২৭২

ইউরোপীয়—১৭২ ও ২৪৯

মুসলিম দল সেমিফাইনালে ইউরোপীয়দের ৯৭ রানে হারিয়েছে। প্রথম ইনিংসে মুসলিম দল ২৪৬ করে। মাস্তাক আলি একাই করেন ১৫৭। ওয়াজির আলি, নাজির আলি, ইব্রাহিম, মোবারক, নিসার সকলেই 'ডাক' করেন। ওরটন মাত্র ৫১ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছেন এবং হ্যাটট্রিক করে



ওয়েল্সলে



মাস্তাক আলি

কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রেছেন। ইউরোপীয় দলের প্রথম ইনিংসে রান উঠে মাত্র ১৭২। ওয়েল্সলী করেন সর্ব্বোচ্চ ৫০। মোবারক চারটে উইকেট পান ২৫ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে মুসলিম দল ২৭২ রান করে। ওয়াজির সেঞ্চুরী করেন। ১১২ রান



সি টি ওরটন



সামারহেজ

ক'রতে তাঁর সময় লেগেছিল ২১৫ মিনিট, ৫১ রানের মাথায় একবার সুযোগ দিয়েছিলেন। ওয়েল্সলী ৫৯ রানে চারটে উইকেট পেয়েচেন। বহু চেষ্টা ক'রেও ইউরোপীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৯ রানের বেশী তুলতে পারেনি। সামার হেজের ৫৪, ডাউসনের ৫০, টিউয়ের ৪৩ উল্লেখযোগ্য। আমীর ইলাহি ৫টা উইকেট পেয়েচেন ৮২ রানে, সৈয়দ আমেদ ৪৮ রানে ৪টা।

রঞ্জি প্রতিযোগিতা ঃ

দক্ষিণ পাঞ্জাব—৩০৪ ও ২২১

রাজপুতনা—১০৯ ও ১৫১

দক্ষিণ পাঞ্জাব রাজপুতনাকে ১৮৪ রানে হারিয়েছে। নিসার প্রথমে ইউ পির অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হ'ন, কিন্তু হঠাৎ পাতিয়ালা মহারাজার নিমন্ত্রণ পেয়ে দক্ষিণ পাঞ্জাবের হ'য়ে খেলেন। দক্ষিণ পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংসে ৩০৪ রানের মধ্যে মহম্মদ নাজির ১০৬ আর মহম্মদ সৈয়দ ৮১ করেন। নাজিরের খেলায় অনেক ত্রুটি ছিল। তিনি অনেকগুলি সুযোগ দিয়েছিলেন। ব্রাডস্ পাঁচটা উইকেট নিয়েছিলেন ৮০ রানে। রাজপুতনার প্রথম ইনিংসে হয় মাত্র ১০৯ রান।



পাতিয়ালার মহারাজা

হংসরাজ একাই করেছিলেন ৭৩। নিসার ৫টা উইকেট নেন ৫৪ রানে। দক্ষিণ পাঞ্জাব দ্বিতীয় ইনিংসে ২২১ রান করে। পাতিয়ালার মহারাজা খুব চমৎকারভাবে খেলে ১৩২ রান তোলেন, ১৬টা চার আর দু'টা ছয় ছিল। ব্রাডস্ ৭টা উইকেট পান ৫২ রানে। রাজপুতনা দ্বিতীয় ইনিংসে রান তোলে মাত্র ১৫১। আমীর এলাহি ৬টা উইকেট ৬৪ রানে পান।

হায়দ্রাবাদ—৩৮২ ও ১৩৬ (৭ উইকেট)

মহীশূর—২৮৫

হায়দ্রাবাদ প্রথম ইনিংসে ৯৭ রানে অগ্রগামী থাকার জন্য বিজয়ী হ'য়েছে।

হায়দ্রাবাদের প্রথম ইনিংসে জাহিরুদ্দিন খাঁন ১৫২, মহম্মদ হাসান ৮২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে হাদি ৮৮ রান করে।

মহীশূরের প্রথম ইনিংসে নিকলস্ ৭৬, বিজয় সারথী ৬৬।

দিল্লী—২০৭ ও ৪০

উত্তর দক্ষিণ সীমান্ত প্রদেশ—৪১৮ (৮ উইকেট)

দিল্লী ১ ইনিংস ও ১৭১ রানে পরাজিত।

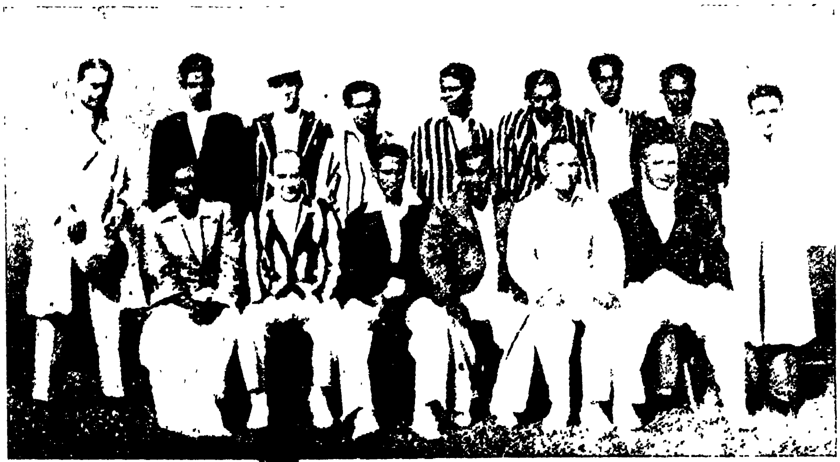
সীমান্ত প্রদেশের প্রথম ইনিংসে গোল্ডস্‌ওয়ার্থ ১৭৭, সের মহম্মদ ৯৬, হরভজন নট্ আউট ৫২।

দিল্লীর প্রথম ইনিংসে এভেটি ৭৩; ফজির ৩৮ রানে ৬ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে জরদাদ ১৯ রানে ৪, ফজির ১৮ রানে ৬ উইকেট।

বাঙ্গালা ও আসাম—৩৬৬ (৩ উইকেট)

বিহার -১০৫ ও ৭৬

পূর্ব্বাঞ্চলের প্রথম রাউণ্ডের খেলায় বাঙ্গলা ও আসাম ১ ইনিংস ও ১৮৫ রানে বিহারকে হারিয়ে দিয়েছে। বিহার দল টসে জিতে প্রথম ব্যাট ক'রে ১০৫ রানে তাদের ইনিংস শেষ করে। জে এন ব্যানার্জ্জি ৩২ রানে ৪ উইকেট পান। বাঙ্গলা দল প্রথম ইনিংসে ব্যাট ক'রে ৩ উইকেটে ৩৬৬ রান



বাঙ্গলা ও আসাম ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ছবি—জে কে সান্যাল

তুলে পুনরায় বিহারকে ব্যাট ক'রতে দেয়। ইডেন গার্ডেনের আন্তর্জাতিক খেলার ন্যায় জব্বর ও নির্ম্মলের সহযোগিতা এখানেও দর্শকদিগকে মুগ্ধ ক'রেছিল। আন্তর্জাতিক খেলায় তাঁরা ২২২ রান ক'রে কলিকাতার যে কোন উইকেটে যে রেকর্ড স্থাপন ক'রেছিলেন, টালা মাঠে ২৪১ ক'রে নিজেদের রেকর্ড ভেঙে নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রলেন। জব্বর ১০৮ ক'রে আউট হন আর নির্ম্মল ১৪১ ক'রেও নট আউট থাকেন তার মধ্যে ১৬টা চার আর ২টা ছয় ছিল। দু'জনের খেলাই খুব সুন্দর হ'য়েছিল তবে নির্ম্মলের খেলা উন্নততর। তার



উইকেটের চারিদিকে পিটিয়ে খেলা ও দ্রুত রান তোলার ভঙ্গী অনেকদিন দর্শকদের মনে থাকবে। বিহারের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৭৬ রানে পড়ে যায়। কে ভট্টাচার্য্য, এস দত্ত ও টি ভট্টাচার্য্যের মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে বিহারের কোন খেলোয়াড়ই দাঁড়াতে পারেননি। দত্ত ১১ রানে ৪ ও কমল ১৯ রানে ৪ আর তারা ভট্টাচার্য্য ১১ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

এবারের বিশেষত্ব, বাংলা ও আসামের ক্যাপ্টেন হ'য়েছিলেন একজন বাঙ্গালী। এই প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা বহুদিন থেকে খেলচে কিন্তু অধিনায়কতা ক'রে আসছে ইউরোপীয় খেলোয়াড়। এবারও ভাণ্ডারগাচ্ অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হ'য়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তিনি খেলতে সক্ষম না হওয়ায় জে এন ব্যানার্জ্জি অধিনায়কতা করবার প্রথম সৌভাগ্য লাভ ক'রলেন।

ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে বিশেষ ঘটনা ঃ

ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে অমরনাথ ২৪১ রান ক'রে পেণ্টাঙ্গুলারে ব্যক্তিগত রেকর্ড স্থাপন ক'রচেন। এবার



বিহার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ছবি—জে কে সান্যাল

পেণ্টাঙ্গুলারে 'সিঙ্গল' সেঞ্চুরী ক'রেছেন পাঁচজন। মাস্তাক আলি—১৫৭, হিকস্—১৪৩, ওয়াজির—১১২, জয়—১০৩, হ্যারিস—১০০। বোলিংয়ে ওরটন মুসলিমদের বিপক্ষে হ্যাট্ট্রিক ক'রেছেন। এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান তুলেছে হিন্দু দল ৭ উইকেটে ৫৬০ আবার সবচেয়ে কম রানও তারাই ক'রেছেন ৬৯ রান। সব কটা খেলার মধ্যে বেশী সংখ্যক উইকেট পেয়েছেন সি এস নাইডু ১৭টা। পেণ্টাঙ্গুলারের খেলায় বাবোণ ষ্টেডিয়ামে সবশুদ্ধ রান উঠছে ৩৮৯১।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ঃ

কলিকাতায় তিন দিন ব্যাপী ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে। ইউরোপীয় দল প্রথম ইনিংসে ২২৬ করে। পতনোন্মুখ উইকেটে লংফিল্ডের ৪৬ আর হ্যামণ্ডের ৩৫ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়দের আরম্ভ অত্যন্ত হতাশজনক হয়। ৪ উইকেট পড়ে ১৯ রানের মধ্যে। লংফিল্ডের বল অত্যন্ত মারাত্মক হ'চ্ছে। তিনি দু' ওভারে কোন রান না দিয়েই ৪ উইকেট নিলেন। ক্রিকেটের ফলাফল অনিশ্চিয়তার জন্যই চিরদিনই বিখ্যাত। জব্বর আর নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি পঞ্চম উইকেটের সহযোগিতায় ২২২ রান তুললে। নির্ম্মল আউট হলো ১১২ রানে আর জব্বর ১১০ রানে। জব্বর একবার মাত্র আউট হ'বার সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু নির্ম্মলের খেলা হ'য়েছিল একেবারে নির্দ্দোষ। নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করবার গৌরবের দাবী এই দু'টী তরুণ খেলোয়াড়ের প্রাপ্য। জব্বর আর নির্ম্মল আউট হ'বার পর আবার ভারতীয়দের উইকেট তাড়াতাড়ি পড়তে সুরু হয়। ক্যাপ্টেন ব্যানার্জ্জির অধিনায়কত্বে অনেক গলদ দেখা গিয়েছে। ইউরোপীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরও কমে শেষ হয়।



ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের বার্ষিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়গণ

ছবি—জে কে সান্যাল

তাঁদের এই ২১৪ রানের মধ্যে বালিগঞ্জের বেরেণ্ডের ৬০ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা ভট্টাচার্য্যের বল দ্বিতীয় ইনিংসে খুব কার্য্যকরী হ'য়ে ছিল, ৫১ রানে ৫ উইকেট পেয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল ৩ উইকেটে ৭৩ রান করে। সময়াভাবে ভারতীয় দল জয়ী হতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এম সি সি ঃ

এম সি সি ঃ—২৭৬ ও ৬৯ (২ উইকেট)

ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স ঃ— ১৭৪ ও ১৬৯

দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্স দলের সঙ্গে তিন দিনের খেলায় এম সি সি ৮ উইকেটে জয়লাভ ক'রেছে। ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্সের প্রথম ইনিংসে ১৭৪ রান ওঠে। তা'দের লেফ্‌ট্ হ্যাণ্ড ব্যাটস্‌ম্যান ভানডার স্পুই ৩১ রান করেন। ফুলির ৩৭ রান তুলতে সময় নিয়েছিল ১০১ মিনিট, তার মধ্যে ৪টা চার ছিল। এডরিচ ১০ রান দিয়ে উইকেট নিয়েছিলেন চার। এম সি সির আরম্ভ ভাল হয় নি; হ্যাটন এবং এডরিচ যথাক্রমে ১৪ ও ৭ করে উভয়েই তরুণ ফাষ্ট কেপ্ বোলার ব্রিনথাউসের কাছে আউট হ'য়ে যান। হ্যামণ্ডও মাত্র ৭ রান করে বোল্‌ড হন। এম সি সির প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৭৬ রানে। বাটলেট ৯১ রান ক'রে নট আউট থেকে যান, ১২০ মিনিট খুব পিটিয়ে খেলেন, ৯টা চারের বাড়ি মেরেছিলেন। ওয়েষ্টার্ণ প্রভিন্সের দ্বিতীয় ইনিংসে রান উঠেছিল ১৬৯। রালেফের



এডরিচ



ফারনেস

নট আউট ৬১ রান উল্লেখযোগ্য। ফারনেসের ক্ষিপ্র বল বিশেষ মারাত্মক হ'য়েছিল। চায়ের পর তিনি মাত্র ১৬ রানে ৪টা উইকেট পেয়েছিলেন। সর্ব্বসমেত তিনি ৩৮ রান দিয়ে উইকেট পান ৭টা। দ্বিতীয় ইনিংসে এম সি সির ২ উইকেটে উঠেছিল ৬৯ রান। হাটন শূন্য করে ব্রিনথাউসের হাতে ধরা দেন।

এম সি সি—৪১২ (৬ উইকেট)

অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট—১২৮ ও ২৬০

অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের সহিত খেলায় এম সি সি ১ ইনিংস ২৪ রানে বিজয়ী হ'য়েছে। প্রথমে ব্যাট করে অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের প্রথম ইনিংসে ১২৮ ওঠে। উইলকিন্‌সন ১০ রানে



রাইট ইয়াডলে

৫টা উইকেট এবং রাইট ৮১ রানে ৫টা উইকেট পেয়েছেন। ৬ উইকেটে ৪১২ রান উঠ্‌লে এম সি সি প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ইয়ার্ডলের নট আউট ১৮২ রানের মধ্যে ২৫টা চার ছিল। বার্টলেটও শত রান করেছিলেন। উভয়ে জুটী হ'য়ে তু'ঘণ্টায় রান তোলেন ২২৭। স্পার্কস ৮৯ রানে ৪ উইকেট পান।

অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬০ রান হয়। কোয়েনের ৬১ রান এবং স্পার্কসের নট আউট ৫৭ রান উল্লেখযোগ্য। ভেরিটি ৭৫ রান দিয়ে ৭টা উইকেট পেয়েছেন।

এম সি সি— ৬৭৬

গ্রিকুয়াল্যাণ্ড ওয়েষ্ট—১১৬ ও ২৭৩

গ্রিকুয়াল্যাণ্ড ওয়েষ্টের সঙ্গে খেলায় এম সি সি ১ ইনিংস ও ২৮৯ রানে জয় লাভ করেছে। এম সি সির প্রথম ইনিংসে হাটন, এডরিচ, পেণ্টার ও ইয়ার্ডলে চারজন সেঞ্চুরী ক'রেছেন। সমস্ত উইকেট খুইয়ে এম সি সি রান তুলেছিল

৬৭৬। হাটন ১৪৯, এড্রিচ ১০৯, পেণ্টার ১৫৮ এবং ইয়ার্ডলে ১৪২ রান করেন। ইয়ার্ডলে সুন্দর খেলে ২১টা চার ও ৩টা ছয়ের বাড়ি মারেন। প্রথমেই ষ্টাম্প করবার একবার সুযোগ দেন এবং দু'বার বাউণ্ডারির সীমানায় ধরা পড়তে পড়তে রক্ষা পান। ম্যাকনালি ১৫৪ রানে ৫টা এবং ফ্রাঙ্ক ১০৫ রানে ৫টা উইকেট নিয়েছেন।

গ্রিকুয়াল্যাণ্ড ওয়েষ্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১৪ রান হওয়ায় তাদের ফলো অন্ করতে হয়। ভেরিটি ২২ রানে ৭ উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে হয় ২৭৩। ষ্টেন ৬৫ এবং নিকলসন ৬১। খুব তাড়াতাড়ি উইকেট পতনের মুখে এসে নিকলসন সতর্কতার সহিত উইকেটের চারিদিকে পিটিয়ে খেলেছিলেন। তবে তাঁর রান উঠেছিল খুব ধীরে, ৬১ রান তুলতে লেগেছিল ১৭৭ মিনিট। উভয় ইনিংসে ভেরিটি মাত্র ৬৬ রান দিয়ে ১১টা উইকেট পেয়েছেন।



ভেরিটি

এম, সি সি ৪৫৮

নাটাল—৩০৭ ও ৩০ (০ উইকেট)

খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে। নাটালের প্রথম ইনিংসে হার্ভি ৯২, ওয়েড ৫৬ ও ডালটন ৪৭ রান করে। ভেরিটি ৪৯ রানে ৩, রাইট ৮১ রানে ৩ ও উইলকিনসন ৫৭ রানে ২ উইকেট পান। ফারনেস ৫৯ রান দিয়েও কোন উইকেট নিতে পারেন নি।

কোন উইকেট না খুইয়ে হাটন ও এডরিচ যথাক্রমে ৬৫ ও ৩৯ মোট রান ১০৫ উঠলে সেদিনের মত খেলা শেষ হয়। প্রথম ইনিংসে হাটন ১০৮, এডরিচ ৯৮, হ্যামণ্ড ১২২, এমস্ ৫৪। ডালটন ১১৫ রানে ৬ উইকেট পেলে। নাটালের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল, আর কোন উইকেট না হারিয়ে রান উঠল ৩০। সময় অভাবে খেলা অমীমাংসিত হ'য়ে শেষ হ'ল।

পেণ্টাঙ্গুলারের পূর্ব্ব ফলাফল ঃ

১৯৩৪

মুসলিম (৩৩৪) এক ইনিংস ও ১ রানে পার্শীদের (১০১ ও ২৩২) হারিয়েছিল।

হিন্দুরা (২২৯) এক ইনিংস ও ৩২ রানে ইউরোপীয়দের (১২১ ও ১৪৬) হারায়।

মুসলিম (২০৮ ও ১৯৮) ১০০ রানে হিন্দুদের (১৮০ ও ১২৭) পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

১৯৩৫

মুসলিম (৩৫৭) এক ইনিংস ও ১০৬ রানে ইউরোপীয়দের (১৪৮ ও ১০৩) হারায়।

হিন্দুরা [২৮১ ও ২১২ (৭ উইকেট)]

পার্শী [২২৪ ও ১১০ (৪ উইকেট)]

হিন্দুরা প্রথম ইনিংসের স্কোরের জন্য জয়ী হয়।

মুসলিম (২৯৭ ও ৩৫৭ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ২২১ রানে হিন্দুদের (২৮৮ ও ১৪৫) পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।



পুরুষ বনাম নারী। এসেক্সের বার্কিং এ্যাবে স্কুলে বালক-বালিকা যুযুৎসু শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। ছবিতে দেখা যায় একটি বালিকা যুযুৎসু কৌশলে একজন বালকের পেটে লাথি দিয়ে তাকে উল্টে দি

১৯৩৬

হিন্দু [৪০১ ও ২০২ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)]

মুসলিম [১৫০ ও ১৭৫ (৯ উইকেট)]

হিন্দুরা প্রথম ইনিংসের বেশী রান সংখ্যার জন্য জয়ী হয়।

ইউরোপীয় [৩৭৩ ও ৭৭ (২ উইকেট)]; পার্শী (২৮০ ও ২০১) : ইউরোপীয় প্রথম ইনিংসের বলে জয়ী হয়।

হিন্দু [২৯২ ও ৩৭৬ (৭ উইকেট)] ২৫৭ রানে ইউরোপীয়দের (২৪৮ ও ১৬৩) হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়।

১৯৩৭

মুসলিম ২০১ ও ১০৪ (২ উইকেট) ৮ উইকেটে পার্শীদের (১৭৮ ও ১০৮) হারায়।

মুসলিম (২৪০ ও ২২৫) ৩৩ রানে রেষ্টদের (১৯৯ ও ২৩৩) হারায়।

হিন্দুরা প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায়, ইউরোপীয়রা ওয়াক ওভার পায়।

মুসলিম (২৩৯) এক ইনিংস ও ৯১ রানে ইউরোপীয়দের (৬৪ ও ৮৪) হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

কুচবিহার মহারাজার একাদশ—১৮৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১১৭

কুচবিহার ৫ উইকেটে জয়লাভ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কে বোস ৪৪ রান করেন, ৩টা চার, ১ ছয়।

অনিল দত্ত মাত্র ১০ রান দিয়ে ৫ উইকেট পান।



পি দত্ত (ক্যাপটেন—কলিকাতা ইউনিভার্সিটি) মহারাজা কুচবিহার

কুচবিহার পক্ষে বাপি বোস ৭৯, কে রায় ৪০

৪৬ রান দিয়ে সাধু ৫ উইকেট নেয়।

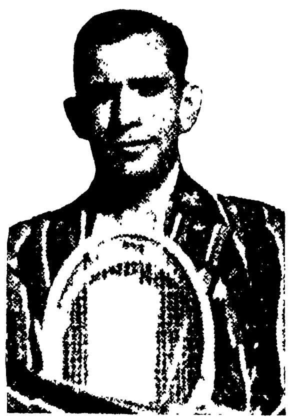
দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট ক্যাপটেন ঃ

ইংলণ্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁচটি টেষ্ট খেলাতেই ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত হয়েছেন এলান মেলভাইল।

টেনিস ঃ

সিন্ধু প্রতিযোগিতা ঃ

ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ সিন্ধুর লন টেনিস বিজয়ী বি টি ব্লেককে ফাইনালে অতি সহজেই পরাজিত করে এ বৎসরের সিন্ধু লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। গাউস মহম্মদের আরম্ভ মোটেই আশাপ্রদ হয় নি। প্রথম সেটে তাঁহার স্বাভাবিক নিখুঁত সার্ভিস এবং সুন্দর ষ্ট্রোক আশানুরূপ না হওয়ায় দর্শকগণের নিকট খেলার প্রথমটা ততো উপভোগ্য হয় নি। এই সুযোগে মিষ্টার ব্লেক প্রথম সেট ৬-৪ গেমে জয়ী হ'ন। তাঁর খেলা ভাল হ'য়েছিল; কতকগুলি মারাত্মক শক্ত সট ফিরিয়ে এবং গাউসকে বেস-লাইন ও নেটের চারিদিকে ব্যস্ত রেখে তিনি খেলায় ক্ষিপ্রতা এনেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় সেটের আরম্ভে গাউসের তীব্র সার্ভিস, ষ্ট্রোক এবং ভলির বিপক্ষে তিনি দাঁড়াতে পারেন নি।



গাউস মহম্মদ

<u>পুরুষের সিঙ্গলস ফাইনাল</u>—গাউস মহম্মদ ৪-৬, ৬-২, ৬-০ গেমে বি টি ব্লেককে পরাজিত করেন।

<u>মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনাল</u>—মিস্ হোমার বনাম ডিনশার খেলা ৭-৫, ৮-৮ গেমে অমীমাংসভাবে শেষ হ'য়েছে।

<u>পুরুষদের ডবল্‌স</u>—গাউস মহম্মদ ও জি এম মেটা ৬-৩, ৬-২ গেমে বি টি ব্লেক ও ফ্রেসারকে পরাজিত ক'রেছেন।

<u>মিক্সড্ ডবল্‌স</u>—গাউস মহম্মদ ও মিস্ ডুবাস ৩-৬, ৬-১, ৬-২ গেমে হেণ্ডারসন ব্রুকস ও মিস্ ডিন্‌শাকে পরাজিত করেছেন।

বালকদের সিঙ্গলস—ডি অয়েষ্টউড্‌ ৬-৪, ৬-৪ গেমে বি জে শিবদশানীকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েছে।

নর্দান ইণ্ডিয়া লন্‌ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস—ভারতের দু'নম্বর খেলোয়াড় এস এল আর সোহানী এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদকে ৪-৬, ৭-৫, ৬-২, ০-৬, ৬-৩ গেমে পরাজিত ক'রেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস—মিসেস এডনি ৬-৪, ৬-৩ গেমে মিসেস ক্রোচকে পরাজিত ক'রেছেন।

মিক্সড্‌ ডবলস—এইচ এল সোনি ও মিসেস এডনি ৬-২, ৭-৫ গেমে ব্লেক ও মিস ডিনশাকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েছেন।



মিস্‌ লীলা রাও

পুরুষদের ডবল্‌স—সোহানী ও সোনি ৭-৫, ৬-২, ৬-৩ গেমে আজিম এবং রমা রাওকে পরাজিত ক'রেছেন।

দিল্লী চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল—মার্শেলকে তিনটী ষ্ট্রেট সেট ৬-২, ৬-৩, ৬-২ গেমে পরাজিত ক'রে গাউস মহম্মদ দিল্লীর লন্‌ টেনিস চ্যাম্পিয়ন হ'য়েছেন।

মিক্সড ডবল্‌স ফাইনাল—মিস্‌ ডিনশা ও রমা রাও ৩-৬, ৬-২, ৬-২ গেমে মিসেস্‌ এডনি ও বলন্ত সিংকে পরাজিত ক'রেছেন।

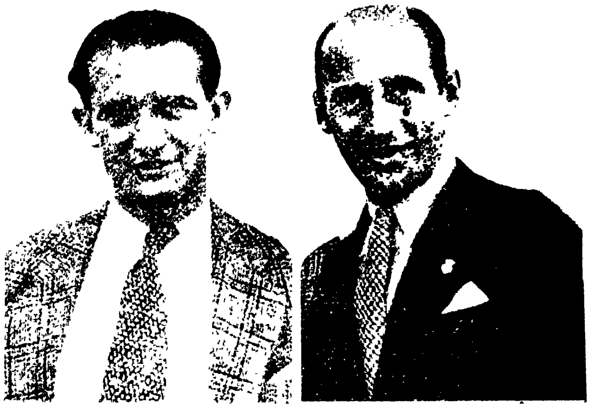
মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল—মিস্‌ লীলা রাও ৬-২, ৬-১ গেমে মিস্‌ উড্‌ব্রীজকে হারিয়ে বিজয়িনী হ'য়েছেন।

ডেভিস কাপ ও ভারতীয় খেলোয়াড় ঃ

ভারতীয় লন্‌ টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি পিথপুরামের যুবরাজ ব'লেচেন আগামী ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ থেকে কোন খেলোয়াড় যোগদান ক'রবে না। ভবিষ্যতে লন্‌ টেনিস এসোসিয়েশন থেকে এক বছর অন্তর প্রতিযোগিতায় যোগদানের ব্যবস্থা করা হ'বে। আর্থিক অস্বচ্ছলতাই ইহার কারণ।

বার্ণা ও বেলাক ঃ

পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় বার্ণা ও বিখ্যাত খেলোয়াড় বেলাক কলিকাতার টাউন হলে কয়েক-দিন প্রদর্শনী খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ ক'রেচেন! বার্ণা বলেচেন, ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে তিনি খেলেচেন



বার্ণা বেলাক

তার ভেতর কলিকাতার খেলার ষ্টাণ্ডার্ডই উচ্চতম। তাঁর মতে বাংলার অরুণ ঘোষ যদি খেলায় বিশেষ মনোযোগ দেন তাহ'লে ভবিষ্যতে তিনি একজন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হ'তে পারবেন।

হিন্দু জিমখানা সভাপতির মতামত ঃ

হিন্দু জিমখানার উদ্যোগে মেজর নাইডু ও সিএস নাইডুকে সম্বর্দ্ধনা সভায় জিমখানার সভাপতি মিষ্টার তারাসীর বক্তৃতায় জানা যায়, পেণ্টাঙ্গুলার ফাইনাল খেলার পূর্ব্ব রাত্রে হিন্দু-দলের কোন কোন খেলোয়াড় পরিমিত আহার ও পানীয় সম্বন্ধে নজর দেন নাই এবং আমোদ-প্রমোদের হুল্লোড়ে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, যে সকল খেলোয়াড় তাদের এইরূপ গর্হিত আচরণ দ্বারা হিন্দুদলের সুনাম নষ্ট করেছেন, তাদের আর ভবিষ্যতে দলে খেলতে নেওয়া হবে না। মেজর নাইডুর ক্রিকেট প্রতিভা সম্বন্ধে অজস্র প্রশংসা করে তিনি বলেন, মেজর নাইডুকে হীন-প্রতিপন্ন করে লোকচক্ষে হেয় করবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তার সাক্ষ্য সাবুদ তাঁর কাছে আছে। হিন্দু জিমখানা দল এ বিষয়ে উদাসীন থাকবে

না, শুধু বোম্বাইতে নহে, যে স্থানেই মেজর নাইডু সম্বন্ধে খেলোয়াড়দের এরূপ চক্রান্তের আভাষ পাওয়া গেলে সেই সকল খেলোয়াড়দের যাতে দলভুক্ত করা না হয়, তার বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

মধ্যভারত—১৭০ ও ২৭৯ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

যুক্তপ্রদেশ—৪৯ ও ১৫৪

রঞ্জি প্রতিযোগিতায় মধ্যভারত ২৪৬ রানে যুক্তপ্রদেশকে পরাজিত করেছে।

প্রথম ইনিংসে দিলওয়ার হোসেন ৭০, সৈয়দউদ্দীন ৩২ ;



হাজারী ভায়া দিলওয়ার হোসেন

আলেকজাণ্ডার ১৪ রানে ৬ ও গরুদাচার্য্য ৬৩ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভায়া (নট আউট) ৮২, দিলওয়ার হোসেন ৬১, বসন্তসিং (নট আউট) ৩৮ ; আলেকজাণ্ডার ৮২ রানে ২ ও গরুদাচার্য্য ৮৬ রানে ২ উইকেট।

যুক্তপ্রদেশের প্রথম ইনিংসে কেহই ১১ রানের বেশী করতে পারেন নি। দ্বিতীয় ইনিংসে আলেকজাণ্ডার (নট আউট) ৩৯, হোলকার (রান আউট) ৩৮। বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে জিয়াল হুসেন ১৮ রানে ৪, হাজারী ১০ রানে ৩ ও সাহাবুদ্দিন ১৯ রানে ২ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে জিয়াল হুসেন ২৮ রানে ৪, বসন্তসিং ১৯ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

এইবার মধ্যভারত বাঙ্গলা ও আসামের সঙ্গে খেলবে।

বিলিয়ার্ড ঃ

স্যার বিনোদ মিত্র ব্রেক হ্যাণ্ডিকাপ টুর্ণামেন্টের ফাইনালে এম এইচ্ খাঁ (+২০) ১৩৮-১০৪ পয়েন্টে ডব্লিউ এইচ হার্ডিকে (২৫) পরাজিত করেছেন। খেলার শেষ সময় বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। হার্ডি প্রথম থেকেই অগ্রগামী থাকেন শেষ দশ মিনিট পর্য্যন্ত, যখন তার সপক্ষে স্কোর ছিল ১০৪-৩৮ পয়েন্ট। এই সময় খাঁ দু'টি ব্রেক ২০ ও ৩৪ করে মাত্র ২ পয়েন্টের ব্যবধানে এসে পৌছান তখন মাত্র ৩ মিনিট সময় আছে। হার্ডি এই সময় ১৯ করে একটি অতি সোজা সট নষ্ট করলে, খাঁ ৩৬ পয়েন্ট করলে খেলা শেষ হয় এবং তিনি ৩৪ পয়েন্টে বিজয়ী হন।

নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ পুরস্কার পেয়েছেন :—

এম এম বেগ—সর্ব্বোচ্চ ৮৫ ব্রেক করবার জন্য,

আব্দুল লতিফ—সর্ব্বোচ্চ গড়পড়তা ৫১১ ব্রেকের জন্য,

আব্দুল লতিফ—১৬ বার অধিক সংখ্যক ব্রেকের জন্য।

১৯৪০ সালে ব্রিটিস্ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়নসিপ খেলা হবে কলিকাতায়।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী প্রণীত চিত্রনাট্য "মৈত্রেয়ী"—২৲

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাণুর দ্বিতীয় ভাগ"—১৸৹

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত উপন্যাস "পথের বাণী"—২৷৹

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী প্রণীত ধাঁধার বই "বল তো"—৷৵৹

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত শিশু গল্প পুস্তক "অঞ্জলি"—।৵৹

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত "বঙ্কিম প্রতিভা"—৩৲

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত ডিটেকটিভ নাটক "বাংলার বোমা"—১৲

জসীম উদ্‌দীন প্রণীত কবিতা পুস্তক "হাসু"—৷৵৹

শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রহস্য সিরিজের "মৃত্যু ষড়যন্ত্র"—৸৹

শ্রীব্যোমকেশ কোঁঙার প্রণীত "সদ্‌গুরু সঙ্গে কুলদানন্দ"—১৷৹

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী চৌধুরাণী প্রণীত "সহজ সেলাই ও কাটিং শিক্ষা"—১৸৹

আশু চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ভাল নয়, মন্দ নয়"—১৲

প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "জনতার ইঙ্গিত"—১৷৹

শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত "ভারতের পণ্য" ১ম খণ্ড—১৷৹

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর || সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1 Cornwallis Street, Calcutta





দ্বিতীয় খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(২৪শে নভেম্বর তাঁর পায়ে আঘাত পাওয়ার পরে)

যে-তুমি আশ্রয় দাও নিরাশ্রয়ে অহেতু কৃপায় ;
অপার্থিব মন্ত্র জপি' যে-ভিখারি পার্থিব-বৈরাগী ;
দিনে দিনে সর্বত্যাগী অসাধ্যসাধনী তপস্যায়
যন্ত্রণা-রজনীলগ্নে অরুণকমলস্বপ্নে জাগি' ;
প্রতিষ্ঠার চেনা পথে যে-তুমি না চাহি মহিমারে
আজিকে মহিমময়—দুর্লভের প্রিয় বরণীয় ;
বেদনার ধ্রুবতারালক্ষ্যালোকে যে দুরভিসারে
বৈজয়ন্তী মাল্যধারী ; যে প্রণম্য চিরস্মরণীয়
শুধু কল্পনায় নহে—নহে শুধু ভক্তির গৌরবে ঃ
যে-আলোদুলাল চিরনিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বের প্রণয়ী ;
সে তোমারে অপমান করে যারা নিষ্ঠুর উৎসবে
তাদেরো কল্যাণ চাও বার বার—অপমান সহি' ।
কিন্তু হায়, যারা তব "পরাজয়ে" জয়ধ্বনি করে
"জয়ে" তারা কী হারালো ভাবনায় মোর অশ্রু ঝরে ।

জৈনগুরু মহাবীরের ধর্ম্মোপদেশ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্‌-এ, বি-এল্‌, পিএইচ-ডি

জৈন আগমে মহাবীরের ধর্ম্মাপদেশ লিপিবদ্ধ করা আছে। ইহা অর্দ্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত। ইহার পূর্ব্বে কোন জৈন-গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁহার উপদেশগুলি জনশ্রুতিরূপে চলিয়া আসিতেছিল।

পালিনিকায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহাবীর তাঁহার সমসাময়িকদিগের নিকট নিগণ্ঠ জ্ঞাতৃপুত্র নামে পরিচিত ছিলেন। বহু নরনারী তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের নিকট তিনি শ্রেষ্ঠতম মানবধর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার আদর্শজীবনের গতিবিধি তাহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল। মহাবীর তাঁহার শিষ্যগণকে জীবনে ধীর ও স্থির থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশগুলি তাহারা সাগ্রহে পালন করিত। তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দেশ্য—সুখলাভ। এই সুখ পার্থিব সুখের মধ্য দিয়া লাভ হয় না; দুঃখের মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হয়। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গ পুস্তক মহাবীরকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছে—"তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহুজ্ঞানসম্পন্ন সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি নিষ্কাম ও মুক্ত ছিলেন। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং বিশ্বাসের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মের ধ্বংস করিয়া তিনি উৎকর্ষ লাভ করেন। যাঁহারা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি একজন বীরপুরুষ—যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। তিনি আজীবন আত্ম-সংযম আচরণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত দার্শনিক তথ্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন।"

জৈন-ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ লাভ করা। নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ মোক্ষ অথবা মুক্তি। মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আপনাকে সকল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। মহাবীরের শিষ্য গৌতম পার্শ্বের শিষ্য কেশীকে বলিয়াছিলেন, "যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, কষ্ট নাই, ব্যাধি নাই, এইরূপ একটী নিরাপদ স্থান প্রত্যেকের লাভ করা কর্ত্তব্য। ইহাকেই নির্ব্বাণ বলা হয়। এই স্থান নিরাপদ, সুখময় এবং শান্তি-পূর্ণ।" মোক্ষ বলিতে কর্ম্মজনিত বন্ধন হইতে মোক্ষ বুঝায়। মুক্তি বলিতে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে মুক্তি বুঝায়।

নির্ব্বাণ বলিতে সুখের প্রকৃত অবস্থা বুঝায়। পার্থিব সুখের মধ্য দিয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় না। অসিত, দেবল, দ্বৈপায়ন, পরাশর প্রভৃতি ঋষিরা এবং বৌদ্ধরা যে ভাবে জীবন-যাপন করিত তাহা মহাবীরের মতে নির্ব্বাণ লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। তিনি জৈনদের জন্য অন্যরূপ পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

জৈনরা দুর্গম এবং দুঃখময় পথাবলম্বন করিয়া মুক্তি অথবা নির্ব্বাণলাভের পথে অগ্রসর হইত। দুর্গম এবং দুঃখপূর্ণ পথ বলিতে কঠোর তপস্যা বুঝায়। দেহ, মন এবং বাক্য সম্বন্ধে সম্বর অথবা আত্ম-সংযম আচরণ করাই কঠোর তপস্যা। তপস্যার দ্বারা পুরাতন কর্ম্মের ধ্বংস করিলে এবং নূতন কর্ম্মের সঞ্চয় না করিলে সংসারে পুনর্জন্ম হইবে না। ইহার ফলে সমস্ত কর্ম্মের ধ্বংস হইবে। তাহাতে সকল দুঃখের ক্ষয় হইবে। ইহার ফলে বেদনার ধ্বংস হইবে। তাহাতে দৈহিক ও মানসিক সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইবে।

আত্মার তিনটী অবস্থা, এই তিনটী শব্দের দ্বারা সূচিত হয়—জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্র। জৈন ধর্ম্মের প্রধান বিষয়গুলি নবতত্ত্বের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১। জীব	৬। আশ্রব
২। অজীব	৭। সম্বর
৩। বন্ধ	৮। কর্ম্মক্ষয়
৪। পুণ্য	৯। মোক্ষ
৫। পাপ	

ইহার মধ্যে পাঁচটী অস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে:—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল, আকাশ এবং আত্মা।

দ্রব্য, গুণ এবং পর্য্যায়—ইহারা এই পাঁচটী অস্তিকায়ের অন্তর্গত।

স্যাদ্বাদ

ইহা কতকগুলি "ন"য়ের সমন্বয়। সূত্রকৃতাঙ্গের মধ্যে স্যাদ্বাদ শব্দটীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবীর ও বুদ্ধ সঞ্জয়ের সর্ব্ববিষয়ের সত্তা সম্বন্ধে সংশয়বাদ সমর্থন করেন নাই। এই জগৎ বিনশ্বর, কি অবিনশ্বর—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাবীর বলিতেন, "যাহারা এই জগতের স্থায়িত্ব সমর্থন করে, অথবা যাহারা এই জগতের অস্থায়িত্ব সমর্থন করে, তাহাদের কাহারও পক্ষাবলম্বন করা উচিত নহে। এই দুইটী মতের কোনটাই সত্য-সন্ধানের সহায় নয়। ইহারা মানবকে ভ্রম-পথে চালিত করে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান স্যাদ্বাদের মধ্যে পাওয়া যায়। সামান্য জগতের দিক দিয়া এই জগৎ অবিনশ্বর। পরিবর্ত্তনশীলতার দিক দিয়া এই জগৎ বিনশ্বর"।

ক্রিয়াবাদ

জৈনধর্ম্মের মধ্যে ক্রিয়াবাদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। মহাবীরের শিক্ষার মধ্যে অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদ হইতে ক্রিয়াবাদের পার্থক্য কি তাহা দেখান হইয়াছে। পালিনিকায়ের মধ্যে মহাবীরের সমসাময়িক চারিজন শিক্ষকের অক্রিয়াবাদ সম্বন্ধে কি মত ছিল তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই চারিজন শিক্ষকের নাম—পূরণ কাশ্যপ, মক্ষরি গোশাল, ককুধ কাত্যায়ন এবং অজিত কেশকম্বলী। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন নিক্রিয়াবাদী, দ্বিতীয় ব্যক্তি অদৃষ্টবাদী, তৃতীয় ব্যক্তি অবিনশ্বরবাদী এবং চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

সূত্রকৃতাঙ্গের মধ্যে অক্রিয়াবাদের মূলনীতির এইরূপ উল্লেখ আছে :—

(১) এই পৃথিবীতে পাঁচটী উপাদান আছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ইহাদের সমষ্টি হইতে আত্মার উদ্ভব। ইহাদের ধ্বংস হইলে প্রাণিগণের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

প্রত্যেক লোকেরই একটী ব্যক্তিগত আত্মা আছে। যত দিন দেহ থাকে, তত দিন আত্মা থাকে। দেহের বিনাশ হইলে আত্মার বিনাশ হয়। আত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় না।

পাপপুণ্য বলিয়া এ জগতে কিছু নাই। পরজগৎ বলিয়াও কিছু নাই। দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টিগত অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

(২) কোন লোক যখন স্বয়ং কার্য্য করে অথবা অপরের দ্বারা কার্য্য করায়, তখন তাহার আত্মা কোন কিছু করে না বা করায় না।

(৩) এই জগতে পাঁচটী পদার্থ আছে এবং আত্মা একটী ষষ্ঠ পদার্থ। এই ছয়টী পদার্থ অবিনশ্বর।

(৪) সুখ, দুঃখ এবং পরমানন্দ সমষ্টিগত আত্মার দ্বারা লব্ধ হয় না; ব্যষ্টিগত আত্মার দ্বারা অনুভূত হয়।

(৫) দেবতাদের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং শাসিত হইতেছে। বিশৃঙ্খলা হইতে ইহার উৎপত্তি।

(৬) এই জগৎ অনন্ত এবং অসীম। অনন্তকাল হইতে ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহার বিনাশ নাই।

(৭) পৃথিবী যেমন এক হইয়াও বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মা এক বস্তু হইলেও বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়।

এই সকল মত চারিটী মতে রূপান্তরিত হইয়াছে, যথা—নিরীশ্বরবাদ, অবিনশ্বরবাদ, নিক্রিয়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদ।

নিরীশ্বরবাদ

আত্মা একটী জীবন্ত পদার্থ। যত দিন দেহ থাকে, তত দিন আত্মা থাকে। দেহের ধ্বংস হইলে আত্মা থাকে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শেষ হয়। দেহ ভিন্ন মানবের অস্তিত্ব নাই। যাহারা ইহা বিশ্বাস করে তাহারা সত্য কথা বলে।

অবিনশ্বরবাদ

পঞ্চভূত ও আত্মা, এই ছয়টী পদার্থ অসৃষ্ট। ইহাদের আদি বা অন্ত নাই। সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া ইহারা ফলাফল নির্ণয় করে। ইহারা অবিনশ্বর। যাহার অস্তিত্ব আছে তাহার বিনাশ নাই।

নিক্রিয়াবাদ

সমস্ত বস্তুর মূলে আত্মা আছে। আত্মার দ্বারাই ইহারা উৎপন্ন হয়। আত্মার দ্বারাই ইহারা প্রকাশিত হয়। আত্মার সহিত ইহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আত্মার মধ্যেই ইহারা আবদ্ধ। যেমন জলবুদ্বুদ জলেই উৎপন্ন হয়, জলেই বর্দ্ধিত হয়, জল হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, জলেই সীমাবদ্ধ—সেইরূপ সকল বস্তুই আত্মার সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

অদৃষ্টবাদ

কোন কোন লোক কর্ম্ম স্বীকার করে। আবার কোন কোন লোক কর্ম্ম স্বীকার করে না। উভয় লোকই একরূপ, তাহাদের অবস্থা একরূপ, কারণ তাহারা একই বিধান অর্থাৎ অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণে কি স্থাবর, কি অস্থাবর, সকল প্রাণীকেই দেহলাভ করিতে হয়, জীবনের নানা বিপর্য্যয় সহ্য করিতে হয় এবং সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয়।

এইগুলি অক্রিয়াবাদের দৃষ্টান্ত। ইহা হইতে নৈতিক উৎকর্ষ লাভ হয় না এবং ধর্ম্মকার্য্যের উদ্দীপনা আসে না।

অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে, অজ্ঞানবাদীরা সত্য এবং জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যখন তাহারা দুইটী বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা দুইটী মতই বর্জ্জন করে। জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতাই অজ্ঞানবাদের প্রকৃত পরিণাম। বিনয়বাদীরা বলেন, নিয়মানুবর্ত্তিতা আচরণ করিলে ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য লাভ হয়। কেহ কেহ বলেন, লবণ ব্যবহার না করিলে উৎকর্ষ লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিলে উৎকর্ষ লাভ হয়।

জৈন ধর্ম্মের সহিত এই দুই প্রকার ক্রিয়াবাদের সামঞ্জস্য নাই :—

(১) যাঁহার আত্মা পবিত্র, তিনি কৈবল্য লাভ করিয়া মন্দ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবেন; কিন্তু প্রীতিকর উত্তেজনা অথবা ঘৃণার মধ্য দিয়া ইহা পুনরায় কলুষিত হইবে। যেমন স্বচ্ছ জল কলুষ হইতে মুক্ত হইয়াও পুনরায় কলুষিত হয়, সেইরূপ আত্মাও কলুষিত হয়।

(২) যদি কোন লোক শিশু-হত্যার উদ্দেশ্য লইয়া কোন একটী কুমড়াকে শিশু মনে করিয়া বলি দেয়, তাহা হইলে সে হত্যার অপরাধে অপরাধী হইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন লোক কুমড়া ভাজিবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন একটী শিশুকে কুমড়া মনে করিয়া ভাজে, তাহা হইলে সে হত্যার অপরাধে অপরাধী হইবে না।

মহাবীরের ক্রিয়াবাদের মূলনীতি এইরূপ :—স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারাই মানবের দুঃখোদ্ভব হয়। এই দুঃখের অন্য কোন কারণ নাই। সুখদুঃখ মানবের কর্ম্মফল। মানুষ একাকী জন্মে, একাকী মরে, একাকী উঠে, একাকী পড়ে। তাহার চেতনা, ধারণা, রাগ, বুদ্ধি, অনুভূতি, সমস্তই ব্যক্তিগত। আত্মীয়তার বন্ধন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।

সমস্ত প্রাণীই স্বকৃত কর্ম্মের জন্য বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন।

পাপীরা নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মের ধ্বংস করিতে পারে না। ধার্ম্মিকেরা কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া কর্ম্মের বিলোপ সাধন করে।

প্রীতিকর বস্তু প্রীতিকর বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না।

যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করে কিন্তু স্বয়ং তাহা করে না এবং যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে অজ্ঞতাবশত হত্যা করে, ইহারা উভয়েই ঈষৎ দোষে দুষ্ট হইবে।

যে ব্যক্তি নিজেকে এবং জগৎকে জানে, যে প্রাণীরা কোথায় যায় এবং কোথা হইতে আর ফিরে না জানে, যে কি স্থায়ী এবং কি অস্থায়ী জানে, যে জন্ম, মৃত্যু এবং মানবের ভবিষ্যৎ জানে, যে নরকবাসীদের যন্ত্রণা জানে, যে পাপের প্রবাহ এবং ইহার বিরতি জানে, যে দুঃখ এবং ইহার ধ্বংস জানে, সেই ক্রিয়াবাদ প্রচার করিবার যোগ্য।

ক্রিয়াবাদ বলিতে আত্মা ও কর্ম্মের পদ্ধতি বুঝায়। যে সকল কাজ (ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত) আত্মার উপর ক্রিয়া করে তাহাই কর্ম্ম। যদি কোন লোক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এমন কোন কাজ করে যদ্দারা তাহার আত্মা আহত অথবা বিচলিত হয় না, তাহা হইলে তাহার আত্মা যে নিষ্ক্রিয়, একথা বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মের প্রভাববশত আত্মাকে উপলব্ধি করিতেই হইবে। আত্মার উপর ব্যক্তিগত ক্রিয়ার পরিণতিকে 'লেসা' অথবা 'লেশ্যা' বলা হয়। 'লেসা' শব্দটীর অর্থ রঙ। প্রাণীদিগকে ছয়টী রঙের অনুপাতে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। বস্ত্র যেমন বিভিন্ন রঙের দ্বারা রঞ্জিত হয়, সেইরূপ মনও পাপের দ্বারা কলুষিত হয়। সেইজন্য জৈনরা পবিত্র লেশ্যা লাভের জন্য চেষ্টা করিত।

জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্র

জ্ঞান, বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম—এই তিনটী জৈনধর্ম্মের শিক্ষণীয় বিষয়। জ্ঞান বলিতে সম্যক্ জ্ঞান, বিশ্বাস বলিতে

সম্যক্ বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম বলিতে সম্যক্ ধর্ম্ম বুঝায়। এই তিনটী কৈবল্য, মোক্ষ এবং নির্ব্বাণ লাভের বিশেষ সহায়ক।

উত্তরাধ্যায়নসূত্রে পাঁচ প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ আছে :—(১) শ্রুত জ্ঞান অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়; (২) অভিনিবোধিক জ্ঞান অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তি অথবা উপলব্ধি হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়; (৩) অবধি জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান উদ্দেশ্যের সহিত সমব্যাপক; (৪) মনঃপর্য্যায় জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান অপরের মনের গতি আলোচনা করিয়া লাভ হয়; এবং (৫) কেবল জ্ঞান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম অসীম জ্ঞান।

অবধি জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সহব্যাপী, অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের সহিত বিজড়িত নয়। কল্পসূত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে :—"তিনি অবধি জ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জম্বুদ্বীপ দেখিতে পাইতেন।" এখানে 'অবধি' শব্দের অর্থ 'যাহা বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, যাহা পর্য্যবেক্ষণীয় বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ।'

আচারাঙ্গ সূত্রে মনঃপর্য্যায় জ্ঞানের অর্থ সমস্ত সচেতন প্রাণীর চিন্তাধারা হইতে লব্ধ জ্ঞান। কেবল জ্ঞানের অর্থ যে জ্ঞান মানবকে সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে; দেব, দানব ও নরলোকের সমস্ত অবস্থা জানিতে সহায়তা করে।

অঙ্গ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে জ্ঞান বলিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি অথবা জ্ঞান বুঝায়।

সম্যক্ দর্শন বলিতে সত্যের তাৎপর্য্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি, ধর্ম্মোৎকর্ষের মানসিক উপলব্ধি, ধর্ম্মপ্রচারকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং আত্ম-পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিশ্বাস-বস্তু গ্রহণ বুঝায়। মন হইতে সমস্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিয়া দেওয়া এবং বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা—ইহাই সম্যক্ দর্শনের উদ্দেশ্য। এই বিশ্বাসপ্রবণতা জীবনের উৎকর্ষ সাধনের একটা নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া কর্ম্মে প্রেরণা আনয়ন করে।

ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন এই কয়টী বিষয়ের উপর নির্ভর করে :—ধর্ম্মমতের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় না থাকা, অপরের ধর্ম্মমতের প্রতি অধিক অনুরাগ না থাকা, স্বধর্ম্মের মুক্তিদায়ক গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ না করা, সম্যক্ বিশ্বাসে দোলায়মান না হওয়া, ধার্ম্মিকগণের প্রশংসা করা, দুর্ব্বলদিগকে উৎসাহিত করা, ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগকে ভালবাসা ও সমর্থন করা, এবং স্বধর্ম্মমতকে উচ্চ স্থান দেওয়া।

যিনি জ্ঞানী তিনি বিশ্বাসী এবং যিনি বিশ্বাসী তিনি কর্ম্মী। সৎচরিত্রের মধ্যেই ধর্ম্ম নিহিত। সম্যক্ বিশ্বাস ভিন্ন সম্যক চরিত্র গঠিত হইতে পারে না এবং সম্যক্ সত্যোপলব্ধি ভিন্ন সম্যক্ বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। সম্যক্ চরিত্র বলিতে নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধতা বুঝায়। দৈহিক সংযম, মানসিক সংযম এবং বাচনিক সংযম; এই তিন প্রকার সংযমের দ্বারা এই বিশুদ্ধতা লাভ করিতে হয়। সমস্ত পাপ বর্জ্জন করিলে ধর্ম্মের প্রথম সোপানে আরোহণ করা যায়। পাপ অনেক প্রকারে সংঘটিত হয়, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, দৈহিক কার্য্যের দ্বারা অথবা বাক্যের দ্বারা, অথবা চিন্তার দ্বারা। পাপ বর্জ্জন করিতে হইলে সমিতি এবং গুপ্তির দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে হইবে। জীব-হত্যা না করা, নির্লোভ হইয়া এবং চরিত্রের নিয়মানুসারে জীবন যাপন করা, শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলের প্রতি যত্নবান্ হওয়া, ভ্রমণে, উপবেশনে, শয়নে এবং খাদ্যাদি গ্রহণে আত্ম-সংযম আচরণ করা, গর্ব্ব, ক্রোধ, শঠতা এবং লোভ পরিহার করা, সমিতি লাভ করা, পাঁচটী সম্বরের দ্বারা আত্মরক্ষা করা এবং অসংখ্য বন্ধনের ভিতর বন্ধনমুক্ত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করা—এই কয়টী সম্যক্ চরিত্রের মূলনীতি।

নয়টী শব্দের তাৎপর্য্য

সম্যক্, জ্ঞান, বিশ্বাস ও চরিত্র মহাবীরের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। জৈনধর্ম্মের এই পথ অবলম্বন করিলে কর্ম্মের ধ্বংস হয় এবং সিদ্ধিলাভ হয়। এই দুইটী বিষয় বুঝাইবার জন্য নবতত্ত্বের অথবা নয়টী শব্দের অবতারণা করা হইয়াছে।

জীব ও অজীব

জীব শব্দের অর্থ যাহাদের জীবন আছে এবং অজীব শব্দের অর্থ যাহাদের জীবন নাই। ছয়টী শ্রেণীর সজীব পদার্থ এবং সত্তা লইয়া জীবন-জগৎ সৃষ্ট।

'জীব'তত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সকল প্রাণীই সুখলাভ করিতে ইচ্ছুক। জীবের অনিষ্ট করিয়া মানব স্বীয় আত্মার অনিষ্ট করে। এইজন্য তাহাকে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। উচ্চ হউক, অথবা নীচ হউক, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর অধীন। প্রতি জন্মের পাপকর্ম্ম হেতু তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

প্রাণহীন পদার্থ আকৃতিবিশিষ্ট অথবা আকৃতিবিহীন। জড়পদার্থ লইয়া আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ গঠিত। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, স্থান এবং কাল, এই চারিটী অস্তিকায় লইয়া আকৃতিবিহীন পদার্থ গঠিত। 'অজীব'তত্ত্ব আলোচনা করিলে জীবন-জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায়।

বন্ধ

বন্ধ বলিতে আত্মার বন্ধন বুঝায়। জন্ম ও মৃত্যু, জরা ও নাশ, সুখ ও দুঃখ এবং কর্ম্মকৃত অন্যান্য ভাগ্য-বিপর্য্যয়—ইহাদের সহিত আত্মার যে অচ্ছেদ্য বন্ধন তাহাই বন্ধ।

পুণ্য ও পাপ

পুণ্য ও পাপ বলিতে যে সকল পুণ্য এবং পাপকর্ম্ম আত্মাকে জন্ম ও মৃত্যুচক্রে আবদ্ধ করে তাহাকে বুঝায়।

আশ্রব

আশ্রব বলিতে যাহা আত্মাকে পাপের দ্বারা অভিভূত করায় তাহাকে বুঝায়।

সম্বর

সম্বর বলিতে যে আত্ম-সংযম আচরণ করিলে পাপের গতিরোধ তাহাকে বুঝায়।

নির্জরা

নির্জরা বলিতে তপশ্চরণের দ্বারা আত্মার উপর কর্ম্মের সঞ্চিত ফল দূরীভূত করা বুঝায়।

মোক্ষ

মোক্ষ বলিতে কর্ম্ম এবং পাপের বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি বুঝায়।

সিদ্ধি

সিদ্ধি বলিতে মোক্ষ অথবা মুক্তি বুঝায়।

জগতের অন্ধকারময় দৃশ্য

মহাবীরের মতে এই জগৎ তমসাচ্ছন্ন। পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ও তাহাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আত্মাকে অতিক্রম করিতে হয়। সংসার ও মৃত্যু অব্যাহত বন্যা-স্রোতের অনুরূপ। ক্ষিতি, জল, অগ্নি ও বায়ু প্রত্যেকেরই জীবন আছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। অনুরাগ, কাম ও আসক্তির জন্য মানবকে কর্ম্ম করিতে হয়। এই জগতে দ্বন্দ্ব, কলহ, মৃত্যু, জীবহত্যা প্রতিনিয়তই সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহার ফলে গভীর নৈরাশ্য আসিয়া জীবনে ছায়াপাত করে। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, রমণী এবং অর্থের জন্য মানবকে নানাপ্রকার কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ইহার ফলে আত্মা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়। শব্দ, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইয়া সমস্ত প্রাণীকে কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়সুখের পথ জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর পথ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানবের শান্তি অথবা সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

জগতের উজ্জ্বল দৃশ্য

জগতের অন্ধকারময় দৃশ্যের পার্শ্বেই ইহার জাজ্বল্যমান দৃশ্য বর্ত্তমান। মহাবীরের ধর্ম্মবাণী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আত্মা জীবনের শ্রেষ্ঠতম সত্তা এবং নির্ব্বাণ আত্মার চিরন্তন শান্তিপূর্ণ অবস্থা। মানব কঠোর সংচেষ্টার দ্বারা ইহজীবনেই আত্মার এই শাশ্বত অবস্থা লাভ করিতে পারে। ষ্টিভেনসনের মতে জৈনধর্ম্মের অন্তর শূন্য। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। নীচবৃত্তি দূরীভূত হইলে অন্তরের মধ্যে প্রেম, দয়া, নম্রতা, অকপটতা এবং চরিত্রের অন্যান্য সদ্‌গুণ বিকাশ লাভ করে। জৈনদের পবিত্রতা, মহত্ব, সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শ্বেতপদ্ম।

মহাবীরের ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সার

মহাবীরের মতে চারিটী শীল ও আত্ম-নিগ্রহের দ্বারা আত্মার শান্তিপূর্ণ অবস্থা লাভ করা যায়। আত্মার আদি নাই বা অন্ত নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ইহাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তন করিতে হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার আকার থাকে। আকার থাকিলে ইহা চেতনা ও বুদ্ধিশূন্য হইয়া পড়ে। আকারবিহীন হইলে ইহা সমস্ত কর্ম্ম ও বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। আত্মা অস্পৃষ্ট এবং অস্তিত্ব-গুণসম্পন্ন। ইহা সকল বিষয় জানে, সকল বস্তু দেখিতে পায়, সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করে, কষ্টকে ভয় করে, মিত্রবৎ অথবা শত্রুবৎ কার্য্য করে এবং তাহাদের ফল ভোগ করে। যাহার চেতনা আছে তাহাই আত্মা। দেহের সংযোগে আত্মা সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করে। জীবহত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, মিথ্যাকথন, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগ এবং মদ্যপান এইগুলি বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যাহারা এইগুলি বর্জ্জন করিতে পারে না তাহারা নরকগামী হয়। প্রত্যেক ভিক্ষুরই আপনাকে সংযত করা উচিত। যাহা পাপ-

পূর্ণ, অনিষ্টকর এবং স্বার্থহীন, তাহা বলা উচিত নয়। উপযুক্ত সময়ে তাহাকে বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। স্বেচ্ছায় দেয় ভিক্ষাদ্রব্য সে গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শৈত্য, উত্তাপ, নগ্নতা, উচ্ছৃঙ্খল জীবন, স্ত্রীলোক, ধূলি, অজ্ঞতা প্রভৃতি জয় করিতে হইবে। প্রলোভন, গর্ব্ব, কপটতা ও লোভ বর্জ্জন করিতে হইবে। যে সকল ভিক্ষু অথবা গৃহস্থ তপস্যা ও আত্ম-সংযম আচরণ করিয়া মুক্তিলাভ করে তাহারা স্বর্গগামী হয়। যাহারা সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। যাহার সম্যক্ বিশ্বাস আছে, সে-ই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে। এই সংসারের প্রতি যাহাদের আসক্তি আছে তাহারাই কষ্টের ভাগী হয়। প্রত্যেক ভিক্ষুর সমস্ত বন্ধন ও ঘৃণা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। চিন্তায়, বাক্যে এবং কার্য্যে পাপ করা উচিত নয়। যে নিজের জীবনকে গ্রাহ্য করে না, শঠতা বর্জ্জন করে, তপস্যা আচরণ করে এবং দুষ্ট নরনারীর সংসর্গ ত্যাগ করে, সে-ই প্রকৃত ভিক্ষু। গৃহস্থের নিকট হইতে সে শয্যা, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারিবে না। যেখানে নারীদের সমাগম হয়, সেই স্থানে সে নিদ্রা যাইতে অথবা বিশ্রাম লইতে পারিবে না। তাহাকে স্থিরচিত্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, পরিতৃপ্ত, সংযত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। জন্মই দুঃখ; জরাও দুঃখ; ব্যাধি ও মৃত্যু দুঃখময়। সংসার দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ভিক্ষুকে সকল জীবের প্রতি নিরপেক্ষ হইতে হইবে এবং সত্য কথা বলিতে হইবে। তাহাকে চরিত্র রক্ষা করিতে হইবে; মানসিক ও দৈহিক তপস্যা করিতে হইবে। যাহার জীবন ও চরিত্র পবিত্র, যে আত্ম-সংযম আচরণ করে, যে পাপ পথ হইতে দূরে থাকে এবং যে কর্ম্মের ধ্বংস সাধন করে, সে-ই মুক্তিলাভের যোগ্য।

ধ্যান বলিতে কষ্টকর ও পাপপূর্ণ বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরতি বুঝায়। প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম সম্বন্ধে পবিত্র ধ্যান করা উচিত। পাপ তিন প্রকারে সংঘটিত হয়—স্বকর্ম্মের দ্বারা, সন্নিয়োগের দ্বারা এবং সমর্থনের দ্বারা। অন্তরের পবিত্রতার দ্বারা মানব নির্ব্বাণ লাভ করে। পাপকর্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি। শঠতাপূর্ণ কার্য্য করিলে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা উচিত নয়। যে শীতল জল পান করে না এবং কোন গৃহস্থের পাত্র হইতে খাদ্য গ্রহণ করে না, সে সম্যক্ চরিত্র লাভ করে। যাহারা নীচ বিলাস-বস্তুর মোহে পড়ে না তাহারা ধ্যানই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুর গল্প বলা উচিত নয়। তাহাকে সমস্ত আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে। ধার্ম্মিকেরা ইন্দ্রিয়সুখকে ব্যাধি বলিয়া মনে করে। নির্ব্বাণ শান্তির মধ্যেই নিহিত।

নির্দ্দয় পাপীরা কুকর্ম্ম করিয়া ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। দুষ্ট লোকেরা আত্ম-সুখের জন্য প্রাণীহত্যা করে। শঠেরা বিলাস-ভোগের জন্য শঠতা অবলম্বন করে। পাপ কর্ম্ম করিলে পরিণামে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পাপীরা ইন্দ্রিয়জনিত কর্ম্ম করিয়া পাপকার্য্য করে। ধার্ম্মিকেরা মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ধার্ম্মিক লোকের অল্প খাদ্য খাওয়া উচিত, অল্প জলপান করা উচিত এবং অল্প কথা বলা উচিত। স্থিরচিত্ত, উদাসীন ও নির্লোভ হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। যে কঠোর তপস্যা করে, তাহার মন হইতে ক্রোধ ও গর্ব্ব দূরীভূত হয়। জ্ঞানীলোকের সর্ব্ববিষয়ে স্বার্থ-ত্যাগ করা উচিত। প্রত্যেক ভিক্ষুর ধর্ম্মশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে জানা উচিত। জ্ঞানীলোকেরা প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আচারাঙ্গসূত্র হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানীলোকের স্বয়ং পাপকার্য্য করা উচিত নয় অথবা অপরকে পাপকার্য্য করিতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁহাকে সম্যক্ ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি অনাসক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহাকে ক্রোধ, দর্প, শঠতা, লোভ, প্রেম, ঘৃণা, প্রলোভন, জন্ম, মৃত্যু, নরক, পশুত্ব এবং কষ্ট পরিহার করিতে হইবে।

ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণীর অবিশুদ্ধ ও অগ্রহণীয় ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কোন উৎসবে তাহার যোগদান করা উচিত নয়। কোন উচ্চ স্থানে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। যে বস্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীতে পরিপূর্ণ তাহা পরিধান করা উচিত নয়। যে বস্ত্র উপযুক্ত এবং স্থায়ী তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। যে পাত্র কোন গৃহস্থের দ্বারা ক্রীত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা উচিত নয়। মূল্যবান পাত্রও গ্রহণ করা উচিত নয়। কোন ইক্ষুক্ষেত্রে অথবা রশুনক্ষেত্রে যাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইবে। যেখানে অনেক প্রলোভন আছে সেখানে যাওয়া উচিত নয়। সকল বিষয়েই কর্ম্ম নিহিত আছে। আত্মা যখন তপস্যা ও সুকৃতির দ্বারা অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করে,

তখন ইহা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। কর্ম্ম আত্মার সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট।

মহাবীরের মতে জন্ম কিছুই নয়; জাতিভেদ কিছুই নয়; কর্ম্মই সব। কর্ম্মের ধ্বংসের উপর ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি নির্ভর করে।

মানসিক স্থিরতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে একনিষ্ঠতা থাকা আবশ্যক। পূর্ণানন্দ, সত্যবাদিতা, সাধুতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সন্তোষ, দৈহিক পবিত্রতা ও মানসিক পবিত্রতা—এই কয়েকটী বিষয়ের উপর আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। মানসিক পবিত্রতা এই চারি প্রকারে লাভ করা যায়:—(১) ভালবাসা, (২) আর্ত্তদের প্রতি ভালবাসা, (৩) সুখীদের প্রতি ভালবাসা এবং (৪) অপরাধী অথবা নির্দ্দয়দের প্রতি ভালবাসা।

দুঃখ, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু-পূর্ণ এই জগতে ধর্ম্মাচরণই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। সম্যক্ জ্ঞান, বিশ্বাস ও চরিত্র সুখের মূল। ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকরই একুশটী সদ্‌গুণের মধ্যে কতকগুলি গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক:—(১) তাহাকে উৎসাহী হইতে হইবে, (২) সুস্থচিত্ত হইতে হইবে, (৩) স্বভাবত মধুরভাষী হইতে হইবে, (৪) জনপ্রিয়, দানশীল, সুমার্জ্জিত এবং চরিত্রবান্ হইতে হইবে, (৫) দয়ালু হইতে হইবে, (৬) সতর্ক ও সাধু হইতে হইবে, (৭) কতকগুলি নিয়মানুসারে বাস করিতে হইবে, (৮) পরদুঃখকাতর ও সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতে হইবে, (৯) ন্যায়পরায়ণ ও অপক্ষপাতী হইতে হইবে, (১০) কৃতজ্ঞ, নম্র, বুদ্ধিমান্ ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইতে হইবে এবং (১১) আত্ম-সংযমী হইতে হইবে।

জ্ঞান পাঁচ প্রকার:—(১) মতিজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা লব্ধ হয়, (২) শ্রুত জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিরা লব্ধ হয়, (৩) অবধি জ্ঞান, (৪) মনঃপর্য্যায় জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান অপরের চিন্তা ও ভাবধারা হইতে লব্ধ হয় এবং (৫) কেবল জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত।

লেশ্যা

যাহার দ্বারা আত্মা পাপপুণ্য অর্জ্জন করে তাহাকে লেশ্যা বলে। যোগ অথবা কশায় অর্থাৎ দেহ, মন, বাক্য অথবা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াজনিত স্পন্দন হইতে লেশ্যার উৎপত্তি হয়।

কর্ম্ম

কর্ম্ম বলিতে আত্মার ক্রিয়া বুঝায়। চারিটী বাধাজনক কর্ম্ম আছে:—(১) যে কর্ম্ম জ্ঞানকে বাধা দেয়, (২) যে কর্ম্ম বিশ্বাস অথবা অনুভূতিকে বাধা দেয়, (৩) যে কর্ম্ম আত্মার অগ্রগতি অথবা কৃতকার্য্যতাকে বাধা দেয় এবং (৪) যে কর্ম্ম আত্মাকে বিমূঢ় অথবা বিভ্রান্ত করে। এই সকল পরিপন্থী কর্ম্ম আত্মাকে এই জগতের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

মহাবীরের মতে এই জগৎ অবিনশ্বর। যে সকল পদার্থ অনন্তকাল ধরিয়া বিদ্যমান আছে ও থাকিবে, ইহা তাহাদেরই সমষ্টি। এই জগতে কোন নূতন বস্তু সৃষ্ট হয় না অথবা কোন বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এই অবিনশ্বর জগতের পদার্থগুলি জীব অথবা অজীব, আত্মা অথবা অনাত্মা রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রাণবন্ত পদার্থের প্রধান গুণ দৃষ্টি, চেতনা ও একাগ্রতা।

মোক্ষ

মহাবীরের ধর্ম্মবাণীর সারাংশ মোক্ষ অথবা মুক্তিলাভ। ইহ-জগতের দুঃখ কষ্ট বর্জ্জন করিয়া পবিত্রতার শ্রেষ্ঠতম অবস্থা লাভ করাই মোক্ষ। এতাদৃশ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মোক্ষ বলিতে পূর্ণানন্দলাভ অথবা ইহ-জীবনের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি অথবা পার্থিব কামনার সম্পূর্ণ ধ্বংস বুঝায়।

মহাবীর আত্মা ও পুদ্‌গল (ব্যক্তি), এই দুইটী বিষয়ের প্রাধান্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জৈন দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিলে কর্ম্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। জৈন নীতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, মোক্ষই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ত্রিরত্ন বলিতে সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ বিশ্বাস ও সম্যক্ চরিত্র বুঝায়। তপস্যা দুই প্রকার, আন্তরিক ও বাহ্যিক। আন্তরিক তপস্যার দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ হয়। তপস্যার মধ্যে উপবাসই বিশেষ প্রত্যক্ষ।

জৈনধর্ম্মের মধ্যে এই কয়টী বিষয় আলোচিত হইয়াছে:—মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা, সাংসারিক বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য, ধর্ম্মের বাঞ্ছিত বস্তু, একধর্ম্মাবলম্বী ও গুরুর আদেশ পালন,

গুরুর নিকট পাপ স্বীকার, আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতাপ, আত্মার নৈতিক ও জ্ঞানবিষয়ক পবিত্রতা, ২৪ জন জিনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, গুরুর প্রতি ভক্তি, আত্মত্যাগ, স্তুতি ও স্তোত্র, নিয়মানুবর্ত্তিতা, তপশ্চর্য্যা, ক্ষমা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি, চিন্তার একাগ্রতা, আত্ম-সংযম, কর্ম্মজনিত অবিশুদ্ধতা হইতে আত্ম-বিশুদ্ধি, মানসিক স্বাধীনতা, মনুষ্য-সমাগমশূন্য স্থানে বিচরণ, সংসার হইতে দূরে অবস্থান, আমোদ-প্রমোদ, খাদ্য, কাম, সংসর্গ প্রভৃতি বর্জ্জন, হিতজনক কার্য্য করা, সমস্ত সদ্গুণ পালন, কাম ও লোভ হইতে মুক্তি, সরলতা, বিনয়, অন্তরের অকপটতা, দেহ, মন ও বাক্যের সতর্কতা, দেহ, মন ও বাক্যের নিয়মনিষ্ঠা, জ্ঞান, বিশ্বাস ও পুণ্য লাভ, ইন্দ্রিয়-দমন, ক্রোধ, গর্ব্ব, শঠতা, লোভ, প্রেম, ঘৃণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস জয়, দৃঢ়-চিত্ততা এবং কর্ম্ম হইতে মুক্তি।

অভিনন্দন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩

যেতে হবে তারে না গেলে উপায় নাই
কমলে রাখিতে শরতের আলো চাই।
শুকালো তড়াগ এসেছে যে শীত—
বিধাতার শুভাশিস্ বঞ্চিত
নিদয় তুহিন ঝরিতেছে একা যাই।

ফটিক-জলের মেঘে কতটুকু জল?
শুষ্ক কণ্ঠ চাতকের সম্বল—
মরালের তৃষা, চকোরের ক্ষুধা,
মিটাতে কোথায় সে বারি সে সুধা?
টুনটুনি পারে গরুড়ে কি দিতে ঠাঁই।

জলকণাহীন নীরস ধূসর মরু
কেমনে পুষিবে সরস রসাল তরু?
মলয়ই রাখিতে পারে চন্দন,
কস্তুরী মৃগ ভূর্জ্জের বন,
মুক্তা রাখিতে সাগরই ত পারে ভাই!

পারিজাত ফুল রাখা ইন্দ্রের কাজ
সহস্র আঁখি, হস্তে যাহার বাজ।
কালিদাসে পারে রাখিতে যে থির
রাজসভা শুধু উজ্জয়িনীর
শিল্পলক্ষ্মী সেবে' যে অজন্তাই।

সে রাজ-অতিথি রাজার আদর চায়,
বামনের পদ বলীরে শির পাতায়।
চিন্তামণির খনির খপর
পেয়ে সে দৈন্তে করে নাক ডর
জনম জনম তারে যেন ফিরে পাই।

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আরও দু'দিন কেটে গেল। আগের মতই প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত যেন আবার ওর শিরায় শিরায় পা ফেলে চল্‌তে সুরু ক'রেছে। কিন্তু এবার আর সত্যেন অতখানি কাতর হ'য়ে পড়ে না। দৈনন্দিন পর্য্যায়ে সত্যেন এটাও ধীরে ধীরে স'য়ে যায়। দেহমন যখন মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, আহত সৈনিকের মত বিকল অঙ্গগুলো কায়ক্লেশে টেনে নিয়ে যায় পথের একটি পাশে। ক্লিষ্ট মনের আনাচে-কানাচে অতীতের ঘনছায়া উঁকি দেয়; বুকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করে বর্ত্তমানের পাষাণস্তূপ, আর ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্নজড়িত অজানা দিনগুলোর রূপ নিয়ে ভেসে ওঠে।

চোখের পাতা অবসাদে ভারী হ'য়ে আসে। ঘুমের ছোঁয়ায় আস্তে আস্তে আবার কখন মুছে যায় ওর বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ; অতীত ছড়িয়ে পড়ে সুপ্ত জগতের এপার হ'তে ওপারে—

মাথার কাছে মেহগ্নির টিপয়টায় আড় হ'য়ে ব'সে সুরেখা যেন লঘু হাতে খেলা ক'রে ওর এলোমেলো চুলগুলো নিয়ে; নরম আঙুলে ক্রশে বোনার মত বিলি কাটে।

সুরেখার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জোয়ার ভাটা ব'য়ে যায় সিজন্ রিগডের। মৃদু গন্ধে, ভোরের অলস বাতাসে জড়িয়ে আসে তন্দ্রার আবেশ। সত্যেনের ঘুম হাল্‌কা হ'য়ে আসে; চোখের পাতায় পাতায় আধঘুমন্ত জাগরণ; আব্‌ছা আব্‌ছা অনুভূতি, অথচ চোখ মেলে চাইতে ইচ্ছা করে না; জড়তায় কথাগুলো এলিয়ে পড়ে ঠোঁটের আড়ালে।

গুন্ গুন্ সুরে সুরেখা আবৃত্তি করে—"ওগো বন্ধু, মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হ'য়ে আসিলাম আজি তব প্রভাতের শিখরচূড়ায়, রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায় আমার পুরানো নাম।"

—ব্লো-করা এলো-চুলের গোছা ছড়িয়ে দেয় ওর মুখে চোখে।

একটা অলক্ষিত শিহরণ হয় ত সত্যেনের সারা গায়ে ঢেউ খেলে যায়। তেমনি ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে ধরে ওর বরফের মত ঠাণ্ডা হাতখানা, আস্তে আস্তে টেনে নেয় বুকের ভিতর।

"মেয়েদের ভালবাসাকে তুমি অস্বীকার কর, কিন্তু দেহটা?"—দুষ্ট হাসিতে সুরেখার মুখখানা স্থলপদ্মের মত টলমল ক'রে ওঠে।

"গন্ধকে অস্বীকার ক'রলেই যে ফুলকে অস্বীকার ক'রতে হবে, তার ত কোন কারণ নেই।"—সত্যেনের ঠোঁটের আগায় কথাগুলো ঘুমের অলসতায় লুটোপুটি করে।

"মঞ্জরী কাল ডেরাডুন এক্সপ্রেসে চলে' গেছে তপনের সঙ্গে পশ্চিমে। যাবে না তুমি?"—সুরেখা হাসে। সে হাসির তীব্র ঝাঁজ যেন মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়।

অনুনয়ের সুরে সত্যেন ওর হাতখানা চেপে ধ'রে ব'ল্‌তে চায়—"হেসো না, হেসো না তুমি অমন ক'রে। অন্তত একটি মুহূর্ত্ত আমায় বাঁচ্‌তে দাও, যেমন ক'রে উড়ন্ত পাখী আকাশের বুকে হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচে।"

"কেন, আমি কি তোমার হাত-পা বেঁধে রেখেছি? পুরুষ তুমি, মুক্তিতে তোমার জন্মগত অধিকার। যেমন ক'রে খুশী, তেমনি অবাধে—"

সুরেখার কথা শেষ না হ'তেই সে বাধা দিয়ে বলে—"না না, তা নয়। তার চেয়েও বেশী জন্মগত অধিকার তোমাদের। পুরুষকে অক্টোপাশ দিয়ে বেঁধে তোমরা বিজয়গর্ব্বে এগিয়ে যেতে চাও।"

সত্যেনের কথায় সুরেখার মুখখানা অভিমানে কালো হ'য়ে আসে। ওর বুকের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে হাতখানা টেনে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে। চোখ দুটো জলে ঝাপ্‌সা হয়।

সত্যেন বিড় বিড় ক'রে আপন মনে বলে—"ভালবাসারও রিহার্সাল দিতে হয়। একটা পুরুষের জীবন তিলে তিলে গ্রাস ক'রতে হ'লে মেয়েরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর

ক্রান্তির হিসাবে সতর্ক হ'য়ে প্রত্যেকটি পা বাড়ায়। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যার সেই হিসাবের গল্‌তি ধরা পড়ে, তারই বাজি যায় ভেস্তে। নইলে—"

সুরেখার গলায় ছিল একছড়া দামী পাথরের মালা। ওর দাদা তিব্বত থেকে এনে সেটা উপহার দিয়েছিল ওকে। সত্যেনের কথায় যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু ছিল, সেটুকু ষোল আনা বুঝ্‌বার শক্তি সুরেখার আছে। তাই সে নিজেকে সংযত ক'রে নিতেও জানে। এবার আর ধনুকের ছিলার মত ছিট্‌কে ওঠে না। কথাগুলো নিতান্ত সহজভাবে হজম ক'রে আন্‌মনে নিজের মালাটা ছিঁড়ে মিহি পাথরের দানাগুলো মেঝেয় ছড়াতে লাগল। সত্যেন দেখেও দেখল না।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরবে প্রতীক্ষা ক'রছিল অন্য কোন প্রসঙ্গ। পুরুষের কাছে সুরেখা সহজে ছোট হয় না। সত্যেন আগে আগে অনেক খোঁচা দিয়েছে তাই নিয়ে। সে বলে—"ওটা ইন্‌ফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স।"

সুরেখা গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—"কার?"—অর্থাৎ ছেলেদের, না মেয়েদের?

কিন্তু আজ আর ওদের আলোচনায় অতখানি দুরত্ব নেই। সেদিনের ব্যবধানটা যেন নিতান্ত অজ্ঞাতসারে কখন স'রে গেছে জীবনের পর্দ্দা থেকে। আজ সত্যেন চায় সুরেখার অঞ্চলপ্রান্তে একটু আশ্রয়। সর্ব্বহারা উদাসীন প্রাণটাকে সে ওর ভালবাসার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মাঝখানে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু মুখ ফুটে সে-কথা ব'লতে পারে না। বলি বলি ক'রেও নানা কথার ভিড়ে ওর ছোট্ট ওই কথাটুকু হারিয়ে যায়।

আজ ব'লবে। সত্যেন কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে হঠাৎ ব'লে ফেলল—"রেখা, আমার সৃষ্টিছাড়া জীবনটার লাগাম ধ'রে রাখতে পার না?"

"না।"

"পার না! পার না আমার ভার নিতে?"

"পারি না। সত্যি পারি না তোমার ভার নিতে। মেয়েদের ভার নেওয়ার ওপর বিশ্বাস কর তুমি?"—সুরেখা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সত্যেনের মুখপানে চেয়ে রইল।

এ দৃষ্টি আর কোন দিন দেখে নি সে সুরেখার চোখে। চোখ-দুটো, তার সঙ্গে সঙ্গে স্থলপদ্মের মত সেই মুখখানা যেন আস্তে আস্তে নেমে আসে সত্যেনের চোখের ওপর। ওর কপালে লাগে সুরেখার উত্তপ্ত ঘন নিঃশ্বাস! কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসে।

"সেন!"

"য়্যাঁ!"

"আমার জীবনের ভার তুমি পার না নিতে তোমার শক্ত ওই দুটো বাহুর ওপর?"—সুরেখা হাসে; বহুদিন পূর্ব্বে যে চটুল ভঙ্গীতে হাস্‌ত সে—আগুনের ফণার মত ঠোঁট দুখানা লেলিহান ক'রে।

সত্যেন নিমেষে সিধে হ'য়ে বসে ওর মুখোমুখি। ঢিলে পাঞ্জাবীর আস্তিনটা উল্টে বলিষ্ঠ হাতখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে—"পারি, একশো বার পারি তোমার ভার নিতে মিসেস্ সেন।"

"মিসেস্ সেন!"—সুরেখা হো হো শব্দে হেসে ওঠে—"নিজেকে চালাবার শক্তি যার নেই, তার হাতে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে চাইনিজ্ ফ্রন্‌টিয়ারে রেড-ক্রস্ হ'য়ে যাওয়াও ঢের ভাল। বোহেমিয়ানের সঙ্গে প্রেম করা চলে, কিন্তু বিয়ে করা চলে না।"

সত্যেন চম্‌কে ওঠে। বিশ্বাস হয় না ওর কথা। নিজেকে বেশ সচেতন ক'রে নিয়ে আরও স্পষ্ট সহজ কথায় জিজ্ঞেস্ করে—"তা হ'লে চাও না তুমি আমার মত একটা ভবঘুরেকে?"

সুরেখা শান্ত স্বাভাবিক হাসির সঙ্গে উত্তর দেয়—"চাই। পরিপূর্ণভাবে চাই তোমাকে; যেমন ক'রে পৃথিবী চায় বর্ষা, ফুল চায় বাতাস—"

"তবে!—" বলা হয় না। হঠাৎ তন্দ্রা টুটে যায় চলন্ত পথিকের পায়ের ছোঁয়া লেগে। ধড়ফড় ক'রে সত্যেন উঠে বসে; চোখ-দুটো বার বার রগ্‌ড়ে নিজেকে অনুভব ক'রবার চেষ্টা করে। তিতিক্ষা আর গ্লানিতে বুকখানা তোলপাড় ক'রে ওঠে।

আশেপাশে অনেক ভিখিরী এসে জমেছে। মাথার কাছে একটা ঘেয়ো কুকুর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে। ও-পাশের ফুটপাথে একদল ধাঙ্গড়ের মেয়ে বরণ-ডালা মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে পুকুরটার দিকে এগিয়ে চলেছে। হয় ত ওদের কোন উৎসব!

অত বড় একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠ্‌তে বেশ

একটু বেগ পেতে হয়। সত্যেন অস্থিরভাবে পায়চারি করে; জটপাকিয়ে-যাওয়া চুলগুলো মুঠো ক'রে ধ'রে আস্তে আস্তে টানে। বিস্মৃতপ্রায় অতীত আবার ফেনিল হ'য়ে উঠতে চায়।

· ·

পূবের আকাশ ফরসা হ'য়ে আসে। ভিস্তিওয়ালারা রাস্তায় রাস্তায় জল দিতে সুরু ক'রেছে।

* * * *

এত চেষ্টা ক'রেও জুটল না কিছু; মেস-বোর্ডিং-এর একটা চাকরের কাজও না। সম্বলের মধ্যে এখন শুধু জীর্ণ ময়লা কাপড়খানি—দু-ভাঁজ ক'রে লুঙির মত পরা, আর তেলচিটে-ধরা সেই গেঞ্জিটা। পাঞ্জাবীটি আগেই ফেলে দিতে হ'য়েছে।

জামাকাপড়গুলো যেমন ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অচল হ'য়ে গেল, তেমনি অচল হ'য়ে যেত যদি ওর পাকস্থলীটা, তা হ'লে সে বাঁচত আজ হাঁপ ছেড়ে।

নিরুপায় হ'য়ে সত্যেন রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় ভিক্ষা চাইবে ব'লে। দেহের দাবীকে অস্বীকার ক'রে কতক্ষণ বাঁচতে পারে মানুষ? পেটের ভিতরটা হু হু করে; বুক পর্য্যন্ত যেন শীষিয়ে ওঠে আগুন। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে। ওর সমস্ত সত্তা আজ হাহাকার ক'রে ওঠে এক মুঠো ভাতের জন্যে।

যে সব পল্লীতে সে কোন দিন চলাফেরা করে নি, তেমনি অচেনা জায়গায় দাঁড়িয়েও সত্যেন চাইতে পারে না। দু-একজন ভদ্রলোক যখন পাশ দিয়ে চলে যায়, চাইবে মনে ক'রে ও এগিয়ে যায়; কিন্তু পারে না। সেই সঙ্কোচ! ভিক্ষা?

মনে হয় অতসীর কথা। অমন ক'রে মুখের পানে চেয়ে কেউ বোঝে না ওর অন্তরটাকে, ওর না-বলা ব্যথা—নীরব আর্ত্তনাদ! পলকে সারা মন শ্রদ্ধায় ভ'রে যায়। ভিখিরীর মেয়ে, তবু বুকে তার লুকানো আছে কত বড় নারী, যা বন্ধুর চেয়ে, সখার চেয়ে, এমন কি প্রিয়ার চেয়েও দরদী। সেই নারীর চোখ এড়িয়ে যায় নি ওর কোন কথা, কোন গোপন অনুভূতি। সত্যেন ত কই চায় নি তার কাছে কিছু। সে-ই আপনা থেকে অযাচিত ভাবে বিলিয়ে দিয়েছে তার আঁচলভরা খাবার একটা অচেনা ক্ষুধাতুরের মুখপানে চেয়ে।

দুনিয়ায় সবাই ত অতসী নয়! একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ ক'রে সত্যেন আবার এক পা দু পা এগিয়ে যায়। পথের দুপাশে চলে কত ভিখিরী; কেমন অভ্যস্ত তারা। কেউ মাটিতে বুক টেনে টেনে চলেছে, কারো সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপে পক্ষাঘাতে। বড় রাস্তার মোড়ে একটি তরুণী ঘোম্‌টায় মুখ ঢেকে ব'সে আছে ছেলে কোলে নিয়ে; আঁচলটা বিছিয়ে রেখেছে মাটিতে; মুখে ফুটে চায় না সে কারো কাছে, শুধু নমস্কার করে—অস্পষ্ট ভাষায় মাঝে মাঝে জানায় তার রিক্ত জীবনের করুণ ইতিহাস। কচিৎ কোন পথচারী আঁচলে দিয়ে যায় একটি পয়সা, না হয় আধলা।

সত্যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে—কোথায় এর শেষ, এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার! তেমনি ক'রে ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে।

রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে একজন অন্ধ ভিখারী কাকুতি জানায়। ব্যস্ত জনতার কানে পৌঁছয় না তার কাতর আবেদন। পয়সা নয়, সে চায় শুধু চক্ষুষ্মানের হাত ধ'রে যানবহুল পথটা পার হ'য়ে আস্‌তে। জীবনের পথে অমনি অন্ধের হাত ধ'রে কত চক্ষুষ্মান নিয়ে চলেছে দেশ হ'তে দেশান্তরে। কিন্তু পৃথিবীর পথে একটি অসহায় অন্ধ পথিক হাত বাড়িয়ে পায় না নাগাল কোন দরদী পথিকের।

সত্যেনের চমক্ ভাঙে। বুড়োকে রাস্তাটা পার ক'রে দিয়ে আবার এগিয়ে চলে ফুটপাথ ধ'রে। পথের বুক কাঁপিয়ে অবিশ্রান্ত ছুটে চলে গাড়ী। ফুটপাথে অসংখ্য পথযাত্রীর তড়িৎ-চঞ্চল গতি যেন আসন্ন প্রলয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। দোকানে দোকানে চলে বেচাকেনা। ঐশ্বর্য্যের নানা উপকরণে সমুজ্জ্বল মহানগরী রিক্ত পথিকের গতিতে পদে পদে দেয় বাধা।

* * * *

দুপুর গড়িয়ে যায়। ফুটপাথটা আগুনের মত তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। এ-পথ সে-পথ ক'রে সারাটা বেলা ঘুরে এবার সত্যেনের দেহ প্রায় অচল হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু জোটে নি কিছু, একটি পয়সাও না। একটি আধলার জন্যে যারা সকাল থেকে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কেঁদে ম'রেছে, তাদেরই

জোটে নি এক মুঠো মুড়ি; আর ওর জুটবে, না চাইতে ক্ষুধার অন্ন!

একটা মুলোকে, কাঠের বাক্সে বসিয়ে একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে চীৎকার ক'রে ভিক্ষা চেয়ে চ'লেছে। উত্তপ্ত ফুটপাথে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে আর একজন পঙ্গু অসহায়। লোকটার চেহারা দেখ্‌লে ভয় করে; মনে হয় ও বেঁচে নেই, ওর প্রাণহীন দেহটায় শ্মশান চেপেছে।—সত্যেন হাসে, ম্লান ফিকে একটু হাসি। ওদের পানে চেয়ে নিজের কথা ভাব্‌তে ওর সত্যি লজ্জা করে।

আবার মোড় ফিরে অন্য পথ ধরে। এ পথে লোকের ভিড় অনেকটা কম। তবুও মাঝে মাঝে গতি ব্যাহত হয় ভিখারীর আবেদনে।

সাম্‌নের দোকানে একটি মান্দ্রাজী মেয়ে ছাপানো সার্টিফিকেট দেখিয়ে ভিক্ষা করে। তার জিভ্‌ নেই। একদল লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে সেই তরুণীকে, তার জিহ্বা-হীনতা পরীক্ষা ক'রতে। মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে ছাপিয়ে উঠেছে ভরন্ত যৌবন। জিভ্‌ নেই, তাই সে কথা ব'লতে পারে না; কিন্তু ভাষা তার অফুরন্ত হ'য়ে ওঠে দুটি চোখে। জিভ্‌টা ভাল ক'রে দেখ্‌বে ব'লে সমালোচকেরা চকিতে একবার চিবুকে হাত দিতেও হয় ত দ্বিধা বোধ করে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দরদীর সংখ্যা যায় বেড়ে। মেয়েটার আঁচলে এক দুই ক'রে অনেকগুলো পয়সা এসে জমে। আবার দু-একজন কুৎসিত ভাষায় টিপন্নীও কাটে। কেউ বা হিতৈষীর মত গম্ভীরস্বরে উপদেশ দেয়—"রাতের কারবারে একটু জোর দিয়ে, দিনের ব্যবসাটা উঠিয়ে দাও না বাবা! বেশ ত বয়েস আছে এখনও।"

মেয়েটা বাংলা কথা বোঝে না ব'লেই বোধ হয় ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে তার মুখপানে। একটু আধটু বুঝলেও না বোঝার চেষ্টাই সে বেশী করে।

পা দুটো অসাড় হ'য়ে আসে; গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন এমনি নিষ্ফল চলা কত আর সইবে!

ঝির্ ঝির্ শব্দে রাস্তার কলটা থেকে জল প'ড়ছে। বুকে সাহারার পিপাসা, তবুও ইচ্ছে করে না মিছিমিছি ওই জল গিলে শরীরটা ভারী ক'রতে। মুড়ির দোকানে বুড়ীটা বড় বড় ফুলুরি ভাজে। তেলেভাজা খাবারগুলোর কি সুন্দর সোঁদাল গন্ধ! কতকাল আগে, সেই ছেলেবেলায় কবে চুরি ক'রে তেলেভাজা কিনে খেয়েছে, আজ আর সে কথা স্পষ্ট মনেও পড়ে না। মায়ের ভয়ে বাড়ী আন্‌বার উপায় ছিল না; রাস্তায় খেয়ে আস্‌ত সে লুকিয়ে লুকিয়ে।

দোকানটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সত্যেন আন্‌মনে কি ভাবে। বলি বলি ক'রেও ব'ল্‌তে পারে না।

ওপাশে তের-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে কোলের কাছে এক-কুলো খই নিয়ে ব'সে ব'সে ধান বাছে। মেয়েটা হয় ত বুড়ীরই কেউ—মেয়ে, না হয় নাত্‌নি। না-কিশোরী, না-তরুণী! বেশ শান্ত চেহারা; প্রত্যেকটি অঙ্গে যেন অফুরন্ত প্রাণের সাড়া।

ওর বিচারবুদ্ধি, সংযম ও আত্মস্থতা কখন অজ্ঞাতে শিথিল হ'য়ে যায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার সুমুখে আঁচল পেতে হঠাৎ ব'লে ফেলে—"এক পয়সার খাবার দেবে খুকি? মুড়ি, না হয় তেলেভাজা! কাল দিয়ে যাব পয়সাটা।"

ভদ্রলোকের মত চেহারা, অথচ পায়ে জুতো নেই, পরণে কিট্‌কিটে ময়লা একখানা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি! মেয়েটি হতভম্বের মত চেয়ে থাকে। এমন ক'রে ওর কাছে কোনদিনও চায় নি কেউ। প্রতিদিন যারা দোকানে আসে যায়, তারা যেন চাইতে জানে না, শুধু জুলুম করে। খই-এর ডালাখানা সরিয়ে রেখে, সাম্‌নের দিকে একটু ঝুঁকে সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস্ করে—"কি নেবে ব'ল্‌লে? মুড়ি!"

"এক পয়সার তেলেভাজা। পয়সাটা পরে দিয়ে যাব।"—এই সামান্য কথাটুকু ব'ল্‌তেও যেন সত্যেনের শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে। এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম চাওয়া ওর।

মেয়েটা কি ভাবে। দিদিমার ভয়ে, একজন অচেনা পথের লোককে হঠাৎ ধার দিয়ে ফেল্‌তে ওর সাহস হয় না। অথচ এক কথায় জবাব দিতেও বাধে। মেয়ে ত! সত্যেনের শুক্‌নো মুখখানা বোধ হয় নিমেষে ওর স্বচ্ছ মমতায় ছায়াপাত করে। হয় ত খুব খিদে পেয়েছে ওর! নইলে, অমন ক'রে চায় কখনও!

আঁচলটা বাড়িয়ে সত্যেন আবার বলে—"দেবে খুকি! পয়সা আমার কাছে নেই কিন্তু।"

এবার বুড়ীর কানে পৌছয়। ছান্‌তাখানা জোরে কড়াই-এর ওপর ঠুকে সে চীৎকার ক'রে ওঠে—"পয়সা নেই ত খাবার সখ কেনে? ম'রতে ঠাঁই পেলে না আর!"

সত্যেন চম্‌কে উঠ্‌ল। ছি ছি, এ কি ক'রে ব'স্‌ল সে! লজ্জায়—ঘৃণায় ওর সমস্ত সত্তা যেন মুহূর্ত্তে আড়ষ্ট হ'য়ে আসে। এর আগে ওর মৃত্যু হ'ল না কেন?

তারপর প্রায় একঘণ্টাকাল যে কি ভাবে কেটে গেল তা সত্যেন নিজেও ভাব্‌তে পারে না। মাথার মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা হয়, পেটটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে, পায়ে পায়ে শরীরটা মাতালের মত টলে; মনে হয়, পা বাড়াতে বুঝি উল্টে প'ড়বে কখন।

তবুও চলে। পথের ক্লান্তি পথেই মিলিয়ে যায়। আকাশের সর্ব্বাঙ্গ ব'য়ে নামে দিনান্তের অবসাদ।

* * * *

মোড়ের ডাষ্ট্‌বিন্‌টা ঘিরে দাঁড়িয়েছে চার-পাঁচজন ভিখিরী। প্রায় উলঙ্গ বল্‌লেই চলে; পরণে শতছিন্ন নেকড়ার কৌপীন। চোখে মুখে যেন প্রস্তর-যুগের ক্ষুধার্ত্ত মানুষের ছাপ!

রাশীকৃত ছাই, আবর্জ্জনা, কয়েকটা মরা ইঁদুর, পুঁয-রক্তমাখা কতকগুলো ব্যাণ্ডেজের তুলো আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো! সারাদিন প্রচণ্ড রৌদ্রে আবর্জ্জনাগুলো প'চে উঠেছে; তীব্র দুর্গন্ধে নাকের ভিতরটা জ্বালা করে; ভ্যান্‌-ভ্যান্ করে মাছি। সেগুলো পাশে ঠেলে রেখে, সেই নরককুণ্ডের ভিতর থেকে ওরা খুঁজে খুঁজে বের করে স্পর্শমণি। অতল কয়লাখনির ভিতর যেন তারা সন্ধান পেয়েছে হীরাজহরতের। ভাত! একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, খানকতক ঝল্‌সে-যাওয়া কলাপাতা—তার মধ্যে কতকগুলো বাসি ভাত!

সত্যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে ওদের মুখপানে। কি উল্লাস! যেন সাম্রাজ্য জয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছে ওদের ক্ষুধাতুর মুখে। সেই দু'মুঠো ভাত নিয়ে অত কাড়াকাড়ি! কেউ এক টুকরো খবরের কাগজ কুড়িয়ে ভাত-গুলো তুলে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে সুরু ক'রেছে; কেউ টেনে তুলেছে ভাঙা হাঁড়িটা সুদ্ধ মুখের কাছে। বাকী লোক-গুলো সবুর সইতে পারেনি; ডাষ্টবিনের কিনারে বুক দিয়ে ঝুঁকে প'ড়েছে মুখগুঁজে। দু'হাতে সেই পচা ভাত মুঠো মুঠো ক'রে তুলছে মুখে।

মাথাটা গুলিয়ে যায়। সত্যেন আর সহ্য করতে পারে না। চম্‌কে উঠ্‌বার মত স্নায়বিক অবস্থাও বোধ হয় ওর ছিল না তখন। ভাত! ভাত! একমুঠো ভাতের জন্যে ক্ষুধার্ত্ত মানুষের বুকে কি দুঃসহ আর্ত্তনাদ! পথের পাশে পাশে রিক্ত দেবতার করুণ কান্নায় পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে মৃত্যুর ছায়া। ভাত! একমুঠো ভাত!

ভিখিরীর অন্ত নেই। ওদেরই মত পথে পথে ঘুরে সন্ধ্যা হয়; কিন্তু পারে না সে হাত পেতে কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে, পারবেও না কোন দিন। হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে সত্যেন এসে প'ড়ল ফিরিঙ্গীদের একটা হোটেলের সাম্‌নে।

মস্ত বড় হোটেল। টেম্পল্‌-হোটেলের মতই নানা আস্‌বাব; উপকরণের নানা প্রাচুর্য্যে বিজলী আলোর আঁচল-তলে এযেন এক নতুনতর জগৎ। দেশি-বিদেশী কত রকম লোকই আসে সেখানে। বাইরে সারি সারি মোটর আর ট্যাক্সির ভিড়; ভিতরে সুসজ্জিত কক্ষে কক্ষে চলেছে জীবনের উৎসব।

হোটেলের ও-পাশে নতুন একটা সিনেমা হাউস্‌। নতুন, খুবই নতুন হাউস এটা; আগে কোনদিন এর নাম শুনেছে ব'লেও ওর মনে হয় না। মেজেণ্ডা রঙের ফ্লাড্‌-লাইট দিয়ে সাম্‌নেটা সাজানো; গেটের দু পাশে মস্ত বড় দুখানা পোস্টারে গ্রেটা আর নোভারোর ছবি। সত্যেন চল্‌তে চল্‌তে অন্যমনস্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এখানেও ছড়িয়ে প'ড়েছে মহানগরীর সেই বিপুল জনসমুদ্রের ঢেউ। মেয়েপুরুষের অস্পষ্ট কোলাহল খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনিত হয়।

হাত ধরাধরি ক'রে কত পুরুষ আর মেয়ে, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, কিশোর চলেছে অবসরের উৎসব-কুঞ্জে। তারই ফাঁকে ফাঁকে দু-চারজন বাঙালী ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। ওই! ওদিকের ফটকটা পার হ'য়ে এগিয়ে আসে তিনটি বাঙালী মেয়ে, সঙ্গে দু'জন পুরুষ! সত্যেনের দৃষ্টিটা হঠাৎ কেমন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে। সংবিৎ ওর ক্ষুধার্ত্ত

অবসাদে আচ্ছন্ন, তবু জোর ক'রে নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে যেন সে জাগিয়ে তুল্‌তে চায়।

হঠাৎ যেন মনে হ'ল—সুরেখা! হাঁ, সুরেখাই বটে; মাঝের ওই লম্বা মেয়েটি। সত্যি! সন্ধ্যার এই অন্ধকারের মতই সত্যি। এত বড় ভুল ওর হ'তে পারে না, অন্তত সুরেখার বিষয়ে। তবু পারে না ঠিক বিশ্বাস ক'রতে; নিজের ওপরে ওর সন্দেহ হয়। চোখ দুটো বারবার রগ্‌ড়ে নিয়ে সত্যেন আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে।—হাঁ, তা-ই; আর কোন সন্দেহ নেই ওর। সুরেখা ছাড়া কেউ নয়, হ'তে পারে না।

সত্যেন এগিয়ে চলে। উর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে যায় ফটকের দিকে। সুরেখার ওপর সমস্ত অভিমান নিমেষে উবে যায়। সুরেখা ত কোন অবিচার, কোন অন্যায় করেনি ওর প্রতি। ও নিজেই এড়িয়ে চলেছে তাকে; দূরে—বহুদূরে ঠেলে দিয়েছে নির্ম্মম দস্যুর মত।

ওরা তখন পোর্টিকো ছাড়িয়ে ও-পাশের সিঁড়ির সাম্‌নে গিয়ে পৌঁচেছে। সত্যেন বিকৃত স্বরে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"রেখা!"

ফ্লাড্‌-লাইটের ঝলকটা ওদের চোখে মুখে ছড়িয়ে প'ড়েছে। কোথায় রেখা! নিমেষে সত্যেনের চম্‌ক ভেঙে যায়। ওরা একবার পিছন ফিরে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। মৃদু হাসির গুঞ্জন তুলে এগিয়ে চলে প্রবেশ-পথের দিকে।

একটি মুহূর্ত্তে আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে ওর জীবনে যেন শতাব্দীর ঝড় ব'য়ে গেল। নিমেষে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত অসাড় হ'য়ে আসে; ক্ষণিকের বর্ত্তমানটুকু ভাব্‌বার শক্তিও এখন আর নেই ওর। অসহায় পঙ্গুর মত ব'সে প'ড়ল ফটকটার ধারে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন শরীর থেকে খুলে পড়তে চায়।

প্রায় আধঘণ্টা পর ওর সত্তা যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ল আবার। দুর্য্যোগ রাত্রিশেষে দিনের আলো যেমন ক'রে নতুন জীবনের সঙ্কেত নিয়ে ফুটে ওঠে, তেমনি ক'রে আস্তে আস্তে ফিরে আসে ওর হারানো অনুভূতি।

হোটেলের দোতলার বারান্দা আর ঘরগুলো দেখা যায়। ডিনার চলেছে। এক একটি টেবিল ঘিরে ব'সেছে ছোট ছোট এক একটি সমাজ। গল্প, কলরব, কাণাকাণি!—স্রোতের পর স্রোত ব'য়ে যায়।······অলক্ষিতে ওর চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে সেই ডাস্টবিন্‌টা; ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে ক্ষুধাতুর ভিখিরীর দল।—দুর্গন্ধময় পচা আবর্জ্জনার ভিতর ছড়ানো কতকগুলো বাসি ভাত! মানুষের পরিত্যক্ত কদর্য্য অন্ন!

সত্যেন উঠে দাঁড়াল। অতি কষ্টে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পা দুটো আর চলে না; তবুও চল্‌তে হয়। এবার সে সঙ্কল্প ক'রল অতসীদের বস্তিতে ফিরে যাবে। অতসীর আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা ক'রে সে ভুল ক'রেছে; ভুল। ভিখিরীর আবার ভালমন্দ! ইজ্জৎ?—অতসীর আশ্রয়ে থেকে তার ভিক্ষান্নের একমুঠো ভাগ নেওয়াও ছিল এর চেয়ে ভাল।

পেটের মধ্যে সুরু হ'য়েছে আবার সেই জ্বালা। মাথা ঘুরছে; গা-টা বমি বমি করে। পায়ে একটু হোঁচট্‌ লাগলেই যেন সমস্ত শরীরের শিরাগুলো একসঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ওঠে। কাঠের পুতুলের মত প্রাণহীন পা দুটো বাড়িয়ে সে জোর ক'রে ফিরে চলে। এই চলা! তপ্ত ধূসর মরুপথে এই অকারণ চলার কি শেষ হবে না কোন দিন? বাঁচ্‌বার নেশা কেটে গেছে ওর। কি হবে এমনি ক'রে মৃত্যুর কোলে তিলে তিলে জীবনের গুণ টেনে?

আঁকা-বাঁকা গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, তারই পাশে একটা বড় বাড়ীর কোণাচিতে ব'সে একজন ভিখিরী হাতে-মুখে কিসের পাতা ঘষে। লম্বা-চওড়া চেহারা; রাতের আলোতেও পেশিগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। চেহারাটা মস্ত হ'লেও, লোকটা যে ভিখিরী সেকথা অনুমান ক'রতে সত্যেনের তিলমাত্র দ্বিধা হ'ল না। ভিখিরীদের মুখ দেখেই ও এখন চিন্‌তে পারে। ওদের না-বলা কথা ওর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে রাত্রিদিন।

আবার কতকগুলো লতাপাতা হাতের তেলোতে ঘষে, নিঙ্‌ড়ে তার রস বের ক'রে লোকটা মুখে মাখে। সত্যেন প্রথমে ভেবেছিল—হয় ত কোন ওষুধ, বেদনায় মালিশ দিচ্ছে; না-হয় মশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টায় টোট্‌কা লাগাচ্ছে গায়ে। কিন্তু আর কোন দিন ত চোখে পড়েনি ওর এমন কিছু!

লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।—রাংচিতার পাতা

সেগুলো! একদৃষ্টে ওর মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সত্যেন কি ভেবে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌ল—"ওগুলো লাগাচ্ছ কেন গায়ে?"

লোকটা হাসে; হো-হো শব্দে হেসে ওঠে ওর দিকে চেয়ে। এ হাসির অর্থ সত্যেন ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। মনে হয়, লোকটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। কিন্তু সে ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার আগেই হঠাৎ সে হাসিটা সাম্‌লে নিয়ে বলে—"জান না?"

"না।"

—"ঘা, ঘা! দগ্‌দগে ঘা না হ'লে দেবে না কেউ। এত বড় মর্দ্দ, খাট্‌তে পারি ব'লে সবাই পাশ কাটাবে।"—এবার ওর মুখে ফুটে ওঠে ফিকে একটু হাসি; যেমন করুণ, তেমনি ভয়াবহ।

সত্যেন কোন কথা না ব'ল্‌তেই ও আপনমনে আবার ব'লে ওঠে—"সাত দিন সাত রাত না খেয়ে ঘুরেছি লোকের দোরে দোরে। কে খাটাবে? কাজ নেই, কোথাও নেই।"

নিমেষে পৃথিবীটা যেন টলমল ক'রে ওঠে; পায়ের তলায় মাটিটা কাঁপ্‌ছে! সত্যেনের মুখে আর কোন কথা সরে না। স্থির হ'য়ে অবস্থাটা একটু ভেবে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ওর বুক জুড়ে শুধু ফেনিয়ে ওঠে একটি প্রশ্ন। 'কিসের জন্যে বাঁচ্‌বে সে? কেন?'

মাথার ভিতর চিন্তাগুলো তাল-গোল পাকিয়ে কেমন ক'রে নিমেষে ওলট-পালট হ'য়ে গেল সব। এবার আর চেষ্টা ক'রেও নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারল না সে।

বিরাট দৈত্যের মত একখানা দোতলা বাস্ মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসে। ট্রাম, মোটর, গাড়ী, ঘোড়া, লোক! প্রাণপণ চেষ্টাতেও সত্যেন পা'রল না নিজেকে সংযত ক'রতে। ওর মাথার মধ্যে তখন প্রলয় সুরু হ'য়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝড়ের বেগে লাফিয়ে প'ড়ল চলন্ত বাসখানার সাম্‌নে।

ব্যস্ত জনতা শঙ্কিত চীৎকারে 'হাঁ হাঁ' ক'রে উঠ্‌ল। যাত্রীরা সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে গাড়ীর ভিতর; ড্রাইভার প্রাণপণ শক্তিতে ততক্ষণে বাস্‌খানা ব্রেক ক'রে ফেলেছে।

মোড়ের পাহারাওয়ালা এসে পিছন থেকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সত্যেনকে ঠেলে দিল ফুটপাথের দিকে। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে আকস্মিক উত্তেজনার পর সে ধাক্কা ও সাম্‌লে নিতে পারল না। মূর্চ্ছাহতের মত মুখ গুঁজে প'ড়ল গিয়ে পেভ্‌মেণ্টের পাথরে।

সংজ্ঞা ছিল না, তা নয়। কিন্তু এমন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে গেছে ওর মগজ আর স্নায়ুগুলো যে, অত বড় একটা আঘাত অনুভব ক'রবার শক্তি পর্য্যন্ত নেই। কপাল ব'য়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বাঁ-দিকের ভ্রূর ওপরটায় পাথরের চোট লেগে অনেকখানি কেটে গেছে; কিন্তু সত্যেন বুঝ্‌তেও পারে নি।

এবার যন্ত্রণা সুরু হ'য়েছে। কপালটা দপ্ দপ্ করে; মাথার মধ্যে যেন মস্ত একটা জাঁতাকল চলে। এখন আর চেষ্টা ক'রেও সে উঠে দাঁড়াতে পারে না। এক হাতে কপালটা চেপে ধ'রে, অন্য হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যায় ফুটপাথের একটি পাশে।

* * * *

সত্যেন যে কতক্ষণ ওইভাবে ব'সে ছিল, তা নিজেও জানে না। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। রাস্তায় লোক চলাচল অনেক ক'মে গেছে। হঠাৎ চমক্ ভাঙ্‌ল; গায়ে হাত দিয়ে কে যেন ডাকে—"এখানে এমন ক'রে ব'সে আছ যে?"

সত্যেন বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে। আব্‌ছা আলোতে ঠিক চিনে উঠ্‌তে পারে না।

মৃদু একটু নাড়া দিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস্ করে—"সারাদিন জোটেনি বুঝি কিছু?"

"না।"—মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে সত্যেন বিহ্বলভাবে ব'লে উঠ্‌ল—"অতসী! তুমি?" কণ্ঠস্বর যেন কান্নায় রুদ্ধ হ'য়ে আসে।

"হাঁ, আমি। আবার তেমনি না খেয়ে পথে পথে গড়িয়ে বেড়াচ্ছ ত?"

সেই দাবী! পর্য্যাপ্ত আত্মীয়তার অনুযোগ! সত্যেন বিশ্বাস ক'র্‌তে পারে না। জীবনটার আগাগোড়াই এখন দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হয়। হয় ত সিনেমা হাউসের সুরেখার মত এটাও একটা ভুল, হ্যালুসিনেশান। কি ব'ল্‌তে চায়, পারে না: ঠোঁট দুখানা কাঁপে। ভুল ভেঙে যাবার আতঙ্কে জিভ্‌টা জড়িয়ে আসে। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে।

ভৎ'সনার সুরে অতসী বলে—"হরি-মটর ক'রে দিনরাত পথে পথে ঘুরে বেড়ানো কি তোমার রোগ দীমু? চারদিন ধ'রে সারা শহর ঘুরেও টিকি দেখ্‌বার জো নেই। সেই থেকে উপোস চালাচ্ছ ত?"

দীমু একটু ইতস্ততঃ ক'রে উত্তর দেয়—"না।"

"না কেন? আমি তা জানি। কিন্তু এমনি ক'রে রাজ্যিময় টহল না দিয়ে, বাসার ফিরে দু'দণ্ড শুয়ে থাক্‌লেও ত পারতে!"—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অতসী হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল—"ও কি! কপালে—?" একটা অস্ফুট কাতর শব্দের সঙ্গে ব'সে প'ড়ল ওর পাশে।

—"কি ক'রে কাট্‌ল অতখানিটা? প'ড়ে গেছলে বুঝি মাথা ঘুরে?"

"হাঁ। না, মাথা ঘোরেনি; তবে কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল হঠাৎ। নিজেকে সাম্‌লাতে পারিনি।"—কথা ব'ল্‌তেও সত্যেনের কষ্ট হয়।

অতসী ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে আস্তে মুখখানা আলোর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। প্রায় তিন-আঙুল লম্বা হ'য়েছে ক্ষতটা: তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

দুজনেই নীরব হ'য়ে কি ভাবে। অতসীর চোখে জল আসে। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে সত্যেনের ঘাড় ও কপালের নীচেটা মুছিয়ে দিয়ে অতসী বলে—"আমার হাত ধ'রে আস্তে আস্তে যেতে পারবে না?"

"পারব"—ব'লে সত্যেন আর দ্বিধা না ক'রে উঠে দাঁড়ায়। শরীরের সমস্ত জড়তা নিমেষে ঝেড়ে ফেলে মনটা যেন আবার সবল হ'য়ে ওঠে।

অতসী শঙ্কিত হয়। সত্যেন ওর হাতখানা ধ'রে সাম্‌নের দিকে একটু টান দিয়ে বলে—"চল! ও কি! কাঁদছ অতসী?"

"না।"—তাড়াতাড়ি চোখের জল গোপন ক'রে অতসী ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। তার পর দুজনে এগিয়ে চলে। এক নিঃস্ব আর-এক নিঃস্বের হাত ধ'রে অতিবাহন করে অলকাপুরীর পথ।

"আমায় একবার হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে পার অতসী? একটু ওষুধ লাগিয়ে নিতাম কপালটায়।"—একটা দীর্ঘশ্বাসে বুকখানা যেন খালি হ'য়ে পড়ে।

এবার অতসী হেসে ওঠে। "ওষুধ! ভিখিরীকে ওষুধ দেয় কেউ? দেখ না, একটু ওষুধ পাবে ব'লে রাস্তার ধারে কত লোক প'ড়ে থাকে! ওরা অমনি রাস্তায় প'ড়ে মরে, কেউ ডেকেও জিজ্ঞেস্‌ করেনা একবার।—বাসায় চল, নেকড়া পুড়িয়ে পলস্তারা ক'রে দেব।"

"ঠিক ব'লেছ অতসী। ভিখিরীর আবার ওষুধ! যে অসহায় তার জন্যে ত নয় পৃথিবীর এই সমৃদ্ধ আয়োজন।" এত দুঃখের ভিতরেও সত্যেনের মুখে ফুটে ওঠে ক্ষীণ একটু হাসি।

কতবার সে দেখেছে ক্যাজুয়াল্‌টি ওয়ার্ডগুলোর সাম্‌নে, ফটকের দুপাশে প'ড়ে থাকে কত মুমূর্ষু ভিখিরী; যন্ত্রণায় ছটফট করে। মাথার কাছে একটা মাটির ভাঁড়ে একটু জল, তাও হাত বাড়িয়ে নেবার শক্তি নেই।—ব্যস্ত জনস্রোত পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়। জীবন্ত মানুষের পথে তারা শুধু বীভৎস কবন্ধের মত দেয় বাধা; আবর্জ্জনার মত পঙ্কিল ক'রে তোলে পৃথিবীর মুক্ত বাতাসকে।

সত্যেন ক্রমেই কাতর হ'য়ে পড়ে যন্ত্রণায়। শরীরটা অবসন্ন হ'য়ে আসে; পা দুটো সমানে পড়ে না।

অতসী জিজ্ঞেস করে—"খুব যাতনা হ'চ্ছে দীমু? পারবে না বাসা পর্য্যন্ত যেতে?"

মুখে বলে পারব; কিন্তু শরীর আর চলে না ওর। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে।

অতসী বুঝ্‌তে পারে। সত্যেনের হাতখানা নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়ে বলে—"একটু জিরিয়ে নাও! ক'দিন না খেয়ে একবারে কাহিল হ'য়ে পড়েছ। আমি জানি, তুমি চাইতে পার নি কারো কাছে।"

"না।"—অতসীর ঘাড়ে ভর দিয়ে যেন সত্যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এই দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা আর ও পারে না বইতে।

"একটু আইডিন্‌, না হয় বেন্‌জইন্‌ দিলে ব্যথাটা কম্‌ত।" সত্যেন ধীরে ধীরে মাটিতে ব'সে পড়ল।

অতসী তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরে বলে "কোথায় পাব ওষুধ? একটু থির হও, আপনি কমে যাবে।"

অতসীর কথা শুনে সত্যেনের কান্না পায়। যে রিক্ত, তার বুকে এত দরদ কেন!

ক্রমশঃ

জাভার ইতিবৃত্ত

ডক্টর শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

প্রবন্ধ

১

ভূবিদ্যায় পৃথিবীর প্রাকৃত স্তরগুলি পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর বারিমণ্ডল (hydrosphere) ভেদ করিয়া সপ্তদ্বীপা ভূখণ্ডটি উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এশিয়ার সর্বদক্ষিণে সুনীলজলধিগর্ভসম্ভূত আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষ ; তাহার পূর্বভাগে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ ও মালয় উপদ্বীপ উত্তরোত্তর দক্ষিণে পর্যায়ক্রমে অবস্থিত। মালয়ের প্রান্তভাগটি যেন একটি শুণ্ড বিস্তার করিয়া ভারত মহাসাগরকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়াছে। ভারতের দক্ষিণে যেরূপ সিংহল দ্বীপটি বঙ্গোপসাগরে ভাসিতেছে। মালয়ের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবীস্, মলক্কা, নিউগিনি প্রভৃতি ছোট-বড় দ্বীপগুলি এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় মহাদেশের সংযোজকরূপে ভঙ্গ-ভঙ্গ স্থলপথ সূচিত করিয়া ভারত মহাসাগরে সেতুর ন্যায় ভাসিতেছে। এই দ্বীপগুলির সমষ্টিকে 'ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ', 'মালয় দ্বীপপুঞ্জ', 'মালয়াশিয়া', 'ইণ্ডোনেশিয়া' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

জাভা ভূখণ্ডটি এই দ্বীপপুঞ্জ-পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন না হইলেও উর্বরতায় উহা সকলের শ্রেষ্ঠ ; এই নিমিত্ত উহা সমধিক জনসংখ্যাবহুল। ব্যবসায়ীর পক্ষে এই দ্বীপটি একটি মনোরম বাণিজ্যস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জাভার উত্তরভাগটি সমতল ও বহু বন্দরশোভিত হওয়ায় ঐ দ্বীপের সংস্কৃতি প্রথমে উত্তরভাগেই সুরু হইয়াছিল ; কিন্তু দক্ষিণ ভাগ পার্বত্য ও দুরারোহ হওয়ায় বরাবর অনাদৃত হইয়া আসিতেছে। লম্বাটে ও সংকীর্ণ দ্বীপটির বুক চিরিয়া গগনচুম্বী আগ্নেয়গিরির একটি সারি চলিয়া গিয়াছে এবং সমগ্র ভূভাগটিতে কয়েকটি জেলা গঠিত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে।

জাভার অধিবাসিবৃন্দের ভিতর নিগ্রিটো জাতির নিদর্শন কিছু কিছু বর্তমান থাকিলেও উহার আদিম বাসিন্দা যে অবিমিশ্র মালয়া জাতি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দ্বীপটির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই ; এজন্য অন্যান্য জাতি যে সমুদয় বিবরণ দিয়াছে এবং দ্বীপটি আজ পর্যন্ত যে সব ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপ ও উৎকীর্ণলিপি (inscriptions) বহন করিতেছে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। সে যাহা হউক, জাভা যে মালয়াশিয়ার সভ্যতা-কেন্দ্র ও অনেক পরিমাণে রাষ্ট্রনীতি-কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি সে পূর্বতন গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ইহা খুবই সত্য। ঈশীয় কালগণনার সূচনা হইতে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ জাভার সহিত বাণিজ্য-সংশ্রবে আসিয়াছিল অবগত হওয়া যায়। সেই সময়ে জাভায় কোন প্রাথমিক রাষ্ট্রীয়-প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল এবং রাষ্ট্রীয় শাসকসম্প্রদায় ব্যবসায়িগণের সংরক্ষক ছিলেন, এইরূপ অনুমান বোধ করি অসঙ্গত নয় ; এই নিমিত্ত ভারতীয় বণিক সুদূর জাভাখণ্ডে আকৃষ্ট হইত। ইহাও অনেকটা অসমীচীন নয় যে, জাভাবাসিগণ সে সময় 'কোন কিছুর অভাব নাই—এই আদিম নিস্পৃহতার যুগ ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় বণিকগণ স্বদেশীয় সংস্কৃতি জাভায় প্রতিরোপণ করিবার যথেষ্ট সুবিধা পায়—এবং তত্রত্য রাজন্যবর্গকেও তাহাদের ধন ও শক্তিসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক সুবিধা প্রদান করে। এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রনীতির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠায় তাহারা তথায় বেশ বড় ভূমিকাই গ্রহণ করে। ঈশীয় ৭৮ অব্দ হইতে জাভার কালগণনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই সময় আদ্যশক তথায় পদার্পণ করেন বলিয়া তত্রত্য পৌরাণিক আখ্যা প্রচলিত আছে। তিনি তাহাদিগকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মশিক্ষা দান করেন এবং তাহাদের রাষ্ট্রনীতি ও আইনকানুন গঠন করিয়া দিয়া লিখন-পদ্ধতি প্রচলিত করেন। জাভার আখ্যায়িকায় লিপিবদ্ধ আছে যে কতিপয় রাষ্ট্র হিন্দু-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল ; যথা, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে

(অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে) মেণ্ডাঙ্গ কামুলাঙ্গ রাজ্য, ৮৯৬ অব্দে জঙ্গলাবংশ এবং ১১৫৮ অব্দে পাজাজারম্ বংশ।

জাভার প্রথম অধিপ্রবাসী (immigrants) হইল কতকগুলি বিষ্ণু-উপাসক, পরে বৌদ্ধগণ তথায় গমন করে; কারণ তাম্রলিপি, ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি হইতে ইহা প্রতীত হয় এবং চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়াঙ্ যে বিবরণ দিয়াছেন তদ্দ্বারা এই বিশ্বাস সমর্থিত হয়। অধিকন্তু হিন্দুত্বের স্মৃতি-চিহ্ন পশ্চিম জাভায় আবিষ্কৃত হইয়াছে—এইগুলি আধুনিক বাটাভিয়া হইতে অধিক দূরবর্তী নয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঈশীয় ৪০০ হইতে ৫০০ অব্দের মধ্যে ঐ অঞ্চলে যে রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল তাহার শাসক হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অনুকূলে ছিলেন এবং পরবর্তী বৌদ্ধগণও ঐ বিষয়ে অনুভাবিত হইয়াছিল। কতিপয় ক্ষোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, ঈশীয় সপ্তম শতাব্দীতে আদিত্যধর্ম নামে জনৈক উৎসাহী বৌদ্ধ নরপতি পশ্চিম জাভায় রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহার রাজ্যাধিকার সন্নিকটবর্তী সুমাত্রা দ্বীপের কিয়দংশ ব্যাপিয়াছিল। তিনি শিবরক নামধারী জনৈক জাভা-রাজকে জয় করিয়া জাভার কোন অংশে এক জমকালো প্রাসাদ নির্মাণ করেন। "শিবরক" নামটি হইতে অনুমিত হয় যে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এক্ষণে আদিত্যধর্মের সেই প্রাসাদটির অবস্থান সম্যক নিরূপণ করিবার উপায় নাই। মনে হয় যে কোন ধর্মের শ্রেষ্ঠতা লইয়া এই বিরোধ ঘটে নাই, পরন্তু কোন রাষ্ট্রীয় কলহই ইহার মূল। চৈনিক কাহিনী হইতে জানা গিয়াছে যে, জাভায় এরূপ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যে অষ্টাবিংশতিটি রাজা তাহার আনুগত্য স্বীকার করে এবং ৬৭৫ অব্দে সীমানাম্নী এক রাজ্ঞী সেই রাষ্ট্রের শাসিকারূপে রাজত্ব চালাইয়াছিলেন। দ্বীপটির পূর্ব ও মধ্যভাগ লইয়া উক্ত রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল; এজন্য আদিত্যধর্মের রাজ্য হইতে উহা যে একেবারে স্বতন্ত্র, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়—বিশেষত জাভার মধ্যপ্রদেশে; কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। ঈশীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে এক সমৃদ্ধিশালী বৌদ্ধরাজ্য সংগঠিত হয়। মধ্য-জাভার চমৎকার স্থাপত্যচিহ্ন, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও অসংখ্য তাম্রলিপি হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সেই সময়ে শক্তি ও ঋদ্ধি উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। ঈশীয় ৮১৩ অব্দে জনৈক জাভা-রাজ কর্তৃক চীন সম্রাটের নিকট কতিপয় নিগ্রো দাসদাসী সুদূর আফ্রিকার জাঞ্জিবর হইতে উপঢৌকনরূপে প্রেরিত হয়; ইহাতে বুঝা যায় যে সেই সময়ে জাভার বাণিজ্য বিস্তৃতি কতদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অপর পক্ষে, যদি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে রাষ্ট্রগুলির গুরুত্ব নির্ণয় করা হয় তবে "বোরোবুদর" রাজ্যটির সমকক্ষ কেহ ছিল না নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে। এই রাজ্যের বিলোপ ঘটে সম্ভবত দশম শতাব্দীর শেষভাগে। দশম শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ কাল অতীত হইবার পর মধ্য-জাভায় কোন উৎকীর্ণলিপি বা মন্দির নির্মিত হয় নাই। এতদ্দ্বারা সূচিত হয় যে, জাতীয় শক্তি তখন সম্পূর্ণ ক্ষীণাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং বৌদ্ধ চারুকলা ও সংস্কৃতির সুবর্ণ-যুগ তিরোহিত হইয়াছে।

২

উক্ত সময়েই রাষ্ট্রশক্তির ভাবকেন্দ্রটি জাভার পূর্বভাগে স্থানান্তরিত হয়। ঈশীয় একাদশ শতাব্দীর তাম্রলিপিসমূহ নির্দেশ করে যে "এর-লাঙ্গা" নামে এক নরপতি সেই সময় বর্তমান ছিলেন এবং উপস্থিত সুরবায়া নামক স্থানে তাঁহার উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি জাভার অনেকখানি অংশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ১০৩৫ অব্দে তাঁহার শক্তিসামর্থ্য সর্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত হইয়াছিল। তাঁহার এই বিশুদ্ধ মালয়া নামটিতে বুঝায় যে তিনি তদ্দেশীয় কোন বংশ-সম্ভূত; কিন্তু পূর্বজাভার একাদশ শতাব্দীয় ক্ষোদিতলিপি-গুলি বেশীর ভাগ সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ হওয়ায় আমাদের বিশ্বাস যে তিনি ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা যথেষ্ট অনু-প্রাণিত হইয়াছিলেন। চৈনিক বিবরণে প্রকাশ যে, পশ্চিম-জাভায় তাঁহার সমসাময়িক যে রাজ্য ছিল তাহা দক্ষিণ সুমাত্রার কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল।

ইহার পরবর্তী কয়েক শতাব্দীকাল গভীর তমসাচ্ছন্ন। তাহার দুই-একটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে,—যথা, (১) ব্যবসায়-বাণিজ্যের হ্রাস, (২) ভারতীয় সভ্যতার প্রভা-হীনতা এবং প্রধানতঃ (৩) জাভাখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যাওয়া। এইরূপ একতার অভাবসত্ত্বেও মুঘলসম্রাট

"কুব্লাই-খাঁ" জাভা আক্রমণ করিয়াও অকৃতকার্য হন। পূর্ব-ভাগের খানিকটা অনুর্বর থাকিয়া গেল। পশুরুয়াঁ, কাদিরি, সুরবায়া প্রভৃতি রাষ্ট্র এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল; তন্মধ্যে প্রথমোক্তটি একেবারে প্রণষ্ট হইয়া যায়। পূর্বভাগের তুলনায় মধ্যজাভার গৌরবচিহ্ন অন্তর্হিত হইয়া যায়, যত দিন পর্যন্ত না পূর্বভারতের সংস্পর্শে আসিয়া উহাতে 'সোলো' ও 'সেমারঙ্গ' নামক রাষ্ট্রদ্বয় পুনর্গঠিত হয়।

নবহিন্দুযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সমুন্নত হইয়া উঠায় পূর্বজাভার উপর প্রভাব জাগাইয়া তুলে এবং 'মধ্যোপহিৎ' নামক রাজ্যটি বহু শক্তিশালী হয়। সেই সময়ে পশ্চিম জাভায় পাজাজারম্ রাজ্যটি শক্তিমত্তায় সকলের অগ্রবর্তী ছিল। জাভার বিবরণ হইতে জানা যায় যে ১১৪৪ শকাব্দ (ঈশাব্দ ১২২১) উক্ত মধ্যোপহিৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাঙ্ক—নির্ভুল গণনায় প্রতীত হয়, পূর্ববর্তী 'তুমাপেল' রাজ্যের; শেষোক্ত রাজ্যটির প্রথম রাজার নাম কেন্-আরক্ (মতান্তরে আঙ্গ্রক্), যিনি রাজ্যারোহণ করিয়া "রায়স্" উপাধি ধারণ করেন এবং ১২৪৭ ঈশাব্দে মারা যান। মধ্যোপহিৎ রাজ্যের প্রথম রাজা ছিলেন কৈর্তারযশ [কীর্তিযশ]; তিনি ১২৭৮ অব্দের পূর্বে রাজ্যাধিকার লাভ করেন বলিয়া মনে হয় না।

মধ্যযুগের যাবতীয় জাভারাজ্যগুলির মধ্যে মধ্যোপহিৎটি সর্বজনবিদিত; কারণ এই রাজ্য তথায় য়ুরোপীয়গণ পদার্পণ করিবার কাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল এবং উহার একটি শাখা ইস্লামধর্মিগণের হস্তে ধ্বংসের মুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। অতএব, এই মধ্যোপহিৎ রাজ্যের শক্তিসামর্থ্যের বিষয় কিছু পর্যালোচনা করা শিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। কারণ সেই সময় ইণ্ডোনেশিয়ার কিরূপ অবস্থা ছিল সেই সম্বন্ধে এবং উহার সাগরতীরবর্তী অথবা দ্বীপমধ্যবাসী সমুদ্রগামী লোকসমুদয়ের বিবরণ সম্বন্ধে পরিচয় মিলিতে পারে। প্রথমেই বক্তব্য যে, সমগ্র জাভা দ্বীপটিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া একতা-বন্ধনে বাঁধিবার প্রচেষ্টা মধ্যোপহিৎ রাজ্য কখনও করে নাই, কিন্তু প্রতিবেশী দ্বীপগুলিতে নিজ শক্তির পরিচয় যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছিল। পশ্চিম জাভায় তৎকালে যে রাষ্ট্র ছিল তাহাও প্রভূত শক্তিশালী এবং তদ্দরুণ মধ্যোপহিৎ রাজ্য বেশ মুস্কিলেই পড়িয়াছিল। বিরাট নৌবহর ব্যতীত মধ্যোপহিতের অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না, ইহা স্বাভাবিক; ১২৫২ অব্দে এই তরিবাহিনীর সাহায্যেই মালয়ের প্রধান শহর সিঙ্গাপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ঈশীয় ১৩৯০ অব্দে সমরপ্রিয় রাজা 'অঙ্কবিজয়' সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে উক্ত রাজ্য সর্বাপেক্ষা প্রসার লাভ করে। অঙ্কবিজয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রিশটি রাজ্যকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সুমাত্রা দ্বীপেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তথায় জাভা-বাসিদের উপনিবেশও স্থাপিত হয়। বোর্নিও দ্বীপের দক্ষিণ তটভূভাগ অংশত তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করে। মলাক্কা দ্বীপে যে সমুদয় জাভাবাসী বসবাস করে তাহারাও তথায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভে বঞ্চিত হয় নাই। জাভার পূর্বস্থ ক্ষুদ্র বালি দ্বীপটি মধ্যোপহিৎ রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, একীভূত মধ্যোপহিৎ রাজ্যের কদাপি প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর সে প্রভুত্ব করিয়াছিল মাত্র; এই নিমিত্ত রাজ্যগুলি পুনর্স্বাধীনতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিক্ষণেই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। ১৪০৩ অব্দে পূর্ব জাভা ও পশ্চিম জাভার মধ্যে গুরুতর বিরোধ উপস্থিত হয়; তাহাতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কিছু না ঘটিলেও ইহাতে চীনা সৈন্যের হস্তক্ষেপ ছিল এইরূপ প্রকাশ।

৩

হিন্দু রাজ্যগুলির যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিলেও নৈতিক অবনতির বীজ বহু পূর্বেই উপ্ত হওয়ায় মালিন্য শীঘ্রই উপস্থিত হইল। আরবীয়গণ প্রভূত ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ওঠে; দলে দলে আরব বণিক কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জাভায় বাণিজ্য ব্যপদেশে পদার্পণ করিতেছিল; কিন্তু আরব দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পরিবর্তে তাহারা জাভাতেই চিরস্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিয়া দেয়। তাঁহাদের স্থায়ী স্থিতির ফল এই হইল যে, ইণ্ডোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপের বাসিন্দাগণ ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিল; যেমন, প্রধানত মলাক্কা দ্বীপের মালয়জাতি এবং বহু চীনা বণিক। কনরা লিমানস্ (Conrad Leemans) একটি যোগ্য উক্তি করিয়াছেন—

"The oriental merchant is a man of quite different stamp from the European. While the latter always endeavours to return to his home, the oriental prolongs his stay, easily

becomes a permanent settler, takes a wife of the country, and has no difficulty in deciding never to revisit his own land. He is assimilated to the native population, and brings into it parts of his language, customs and habits."

অর্থাৎ, "প্রাচ্য বণিক য়ুরোপীয় বণিক হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে গড়া; য়ুরোপীয় বণিক সদাই চায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে, কিন্তু প্রাচ্য বণিক বিদেশে প্রবাস-কাল বাড়াইয়া দেয়; উহারা প্রবাসে বিবাহ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষা একেবারে জলাঞ্জলি দেয়। বিদেশীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সেও একজন পরিগণিত হওয়ায় বিদেশ তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মকরণ করিয়া লয় এবং লাভ করে তাহার পরদেশীয় ভাষা, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার।"

ইস্‌লামের বীরত্বযুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, আরব-বণিক শুধু বাণিজ্যলব্ধ মুনাফা আহরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে নাই, তাহারা অপরকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া রাষ্ট্রীয় আধিপত্য লাভ করিতে সদাই উৎসুক ছিল। হিন্দুত্বের আশ্রয় মধ্যোপহিৎ রাজ্য তাহাদের লক্ষ্যের বাহিরে যায় নাই। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব তাহাদের প্রতিবন্ধকতা অল্পই করিয়াছিল; কারণ, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জ্ঞান উচ্চশ্রেণী জনগণের মধ্যেই আবদ্ধ এবং জনসাধারণ চায় কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান। পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন চীনদেশীয় ইতিবৃত্ত-লেখক বলিয়াছেন যে, জাভার লোক নিছক্ ভূত-প্রেত ও পিশাচ পূজক, এজন্য তিনি উহাদের চীন বা ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ-গণের মধ্যে ফেলেন নাই। সুমাত্রায় মধ্যোপহিৎ রাজ্যের যে অধিকার ছিল, ইস্‌লাম প্রথমে গ্রাস করিল সেই অংশটুকু; তত্রত্য অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইস্‌লাম দীক্ষার বন্যা ছুটাইয়া দিল। ইহাঁদের মধ্যে সুমাত্রার শাসনকর্তা 'আর্যদামা' ও তৎপুত্র 'রদেন পাটা'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

মধ্যোপহিৎ রাজ্যের পতন বিষয়ে যে জাভাদেশীয় বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইস্‌লাম-ধর্মী কতিপয় অভিজাত ব্যক্তি 'ব্রহ্মিজয়' রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং ষড়যন্ত্রকারিণী কতকগুলি স্ত্রী-লোকের সাহায্যে উক্ত মধ্যোপহিৎ-রাজকে সিংহাসনচ্যুত করে (ঈশাব্দ ১৪৭৮)। রাজভক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মিগণ বালিদ্বীপে পলাইয়া যায় এবং তথা হইতে সন্নিকটবর্তী পূর্বজাভার কিয়দংশের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে এবং বালিদ্বীপটিকে ইস্‌লামের আক্রমণ হইতে বাধা প্রদান পূর্বক রক্ষা করে। শুধু মধ্যোপহিৎ রাজ্যে ইস্‌লামের জয়জয়কার হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই; পরন্তু অপরাপর রাজ্যগুলিকে ও ইস্‌লাম করায়ত্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ঈশীয় ১৫৫২ অব্দে 'বান্তাম্' রাজ্যের শাসনকর্তা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পর্তু-গীজদের সাহায্যপ্রার্থী হয়; কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। ইহার দুই বৎসর পরে এক পর্তুগীজ নৌ-তরী আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু তখন বাণিজ্য-গৌরবে সবিশেষ খ্যাত উক্ত শহরটি মুসলমানের কবলে গিয়াছে। জাভার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে ইস্‌লামের দীক্ষা সম্পন্ন হওয়ায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে গোলযোগের সৃষ্টি হওয়ায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র উদ্গত হয়; ইহাদের মধ্যে 'পাজাঙ্গ' ও 'দামাক্' রাষ্ট্র দুইটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছিল। নিকটবর্তী মাদুরা দ্বীপটির ভাগ্য যেন জাভার সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিজড়িত, তত্রাচ উক্ত দ্বীপটিতে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠে।

ইস্‌লাম কর্তৃক জয়ের শতাব্দীকাল পরে এক অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিল। পাজাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত যে মাতারাম প্রদেশটি, তাহার ভূম্যধিকারিগণ ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। উহারা পরিশেষে মাদুরার পূর্ব ও মধ্যদেশটিকে স্বীয় অধিকারে আনিতে সমর্থ হইল। পশ্চিম ভাগেই ছিল বান্তাম, এক্ষণে ইস্‌লাম কর্তৃক অধ্যুষিত এবং ক্ষমতায় বেশ প্রবল। ১৫৯৮ অব্দে ওলন্দাজগণ উহার সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়, কিন্তু তাহা বান্তামের পক্ষে স্থায়ী সুবিধাজনক হইয়া ওঠে নাই। বাটাভিয়ার প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজদিগের হস্তক্ষেপ নিবন্ধন অনেক প্রতিকূল জটিলতা উপস্থিত হয়; কিন্তু ওলন্দাজদের বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। উচ্চাভিলাষী মাতারাম রাষ্ট্রের সহিত ওলন্দাজ বণিক কোম্পানীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মাতারামের সুলতান আগঙ্গ মতলব করিয়াছিলেন যে পশ্চিম জাভাকে বশীভূত করিয়া ওলন্দাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিবেন। কিন্তু তিনি ধূর্ত বণিক-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া দুইবার (১৬২৮ ও ১৬২৯ অব্দে) বাটাভিয়া আক্রমণের চেষ্টা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইঙ্গোলোগো (রাজত্বকাল ১৬৪৫—১৬৭০ ঈশাব্দ)

ওলন্দাজ কোম্পানীর সহিত ১৬৪৬ অব্দে সন্ধি স্থাপন করিয়া সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ওলন্দাজগণ জাভায় অধিকার বিস্তারের চেষ্টা কিছুকাল স্থগিত রাখায় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। 'ইঙ্গোলোগো'র কোন বংশধর সুলতান আমাঙ্গকুরাৎ সুরবায়ানিবাসী জনৈক লুণ্ঠনকারী মগদস্যুকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ওলন্দাজগণের সাহায্য ভিক্ষা করেন। দস্যু বিতাড়িত হইল এবং জনৈক বিদ্রোহী রাজা—তূর্ণজয় ওলন্দাজ নৌবাহিনী কর্তৃক ধৃত ও পরাজিত হন। ১৬৭৭ অব্দে জাভারার সন্ধি ঘোষিত হইল, তাহাতে ওলন্দাজগণ রাষ্ট্র ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অনেক সুবিধা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহাতেও জটিলতার হ্রাস হইল না। সাধারণের অপ্রিয় রাজা আমাঙ্গকুরাৎকে তূর্ণজয় যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং কাদিরিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। কিন্তু ইহার মীমাংসা ওলন্দাজের হাতে ন্যস্ত ছিল। ওলন্দাজ পুরান বংশকেই সিংহাসনে রাখিতে চায়, কারণ বিজয়ী তূর্ণজয় ওলন্দাজদের যে সর্ত দিয়াছিল, নির্বাসিত রাজা অনেক সুবিধাজনক সর্ত দিতে চাহিয়াছিল। এজন্য অবৈধরাজ্যদখলকারী রাজা তূর্ণজয়কে ওলন্দাজগণ যুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাভূত করিল এবং মৃত আমাঙ্গকুরাতের পুত্রকে রাজতক্তায় স্থাপন করিল; পরিশেষে রাজধানীতে তাহার রক্ষার ভার থাকিল একদল ওলন্দাজ রক্ষা-সৈন্যের উপর।

১৭০৭ অব্দে সুলতানের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার উত্তরাধিকারী কে হইবে ইহার মীমাংসা লইয়া ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। পকুবুত্তনো নামক এক ব্যক্তি কোম্পানীর সাহায্যে সিংহাসনের দাবী উপস্থিত করে এবং ১৭০৫ অব্দে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করায় এবং তাহাদের নানাবিধ অধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাহার দাবী পরিশেষে গ্রাহ্য হয়। তবে বিবাদ একেবারে মিটে নাই। এই সময় হইতে মাতারামের সুলতানগণ ওলন্দাজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে রাজদণ্ডধারণ অথবা কোনওরূপ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিতেন না।

৪

১৭৪০ অব্দে চৈনিক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে গোলোযোগ দেখা দিল এবং কোম্পানীর ক্ষমতার মূল বিচলিত হইয়া উঠিল। রাজ্য-শাসক সুলতান এবং বান্তাম ও চেরিবঙ্ রাজ্যের অধিনায়কগণ—যদিও কোম্পানীর স্বার্থের প্রতি কপটভক্তি দেখাইতেছিলেন—কিন্তু চৈনিক বিদ্রোহের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি অতিমাত্রায় বর্তমান ছিল। ফলে, চীনাদের পরাভব ঘটায় সুলতানকে আরও কতকগুলি অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইল এবং মাদুরাদ্বীপটির উপর প্রভুত্ব সম্পূর্ণ ওলন্দাজের হাতে সমর্পণ করিতে হইল। সাগরতীরের উপর রাষ্ট্রশক্তি অন্তর্হিত হওয়ায় মাতারাম রাজ্য ক্রমে ক্রমে আন্তর্দেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল; অর্থাৎ ওলন্দাজের সামুদ্রিক শক্তির কাছে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর রাষ্ট্রীয় শাসন-কেন্দ্র সোলো (সুরকর্তা) নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

মাতারামের উপর কোম্পানীর যতই প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল, ততই অশেষবিধ বিদ্রোহ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইল। একটি যুদ্ধ ১৭৪৯ অব্দ হইতে হইতে সুরু হইয়া ১৭৫৫ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তজ্জন্য রাজ্যটি অবশেষে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৭৫৫ ও ১৭৫৮ অব্দের সন্ধিসর্ত অনুযায়ী তৃতীয় সুলতান পকুবুওনা রাজ্যের পূর্বখণ্ড লাভ করেন; ঐ খণ্ডের রাজধানী হয় সুরকর্তা। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী মঙ্কুবুমি লাভ করেন পশ্চিম খণ্ডটি, যাহার রাজধানী হয় জোকজাকর্তা। এতদ্ভিন্ন, একজন তৃতীয় দাবীদারকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকার ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রাচীন মাতারাম রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদে যে দুইটি রাষ্ট্র উৎপন্ন হয় তদ্ব্যতীত পশ্চিমাঞ্চলে বান্তাম ও চেরিবঙ্ রাজ্য দুইটি থাকিয়া গেল কোম্পানীর প্রভুত্বাধীনে।

এইরূপ ভাগবণ্টনে প্রধান কলহ নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কোম্পানীর কু-শাসন ও তদ্দেশীয় অধিবাসিগণের প্রতি অত্যাচারে উত্তরোত্তর বাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পাইল এবং দেশে লুণ্ঠন ও দস্যুতা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। কোম্পানীর পতন (১৮০০ ঈশাব্দ) তথা নেদারলাণ্ডের বৈচিত্র্যময় উত্থান-পতন জাভার বিশৃঙ্খলা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ১৮০৮ অব্দে জেনারেল হার্মান্ উইলেম্ ডাণ্ডেল যে সব সংস্কার (reforms) উপস্থিত করিলেন তাহা কালোপযোগী হইলেও কিঞ্চিৎ বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় কার্যকরী হইল না। ১৮১১ অব্দে ইংরেজগণ দ্বীপটি অধিকার করে এবং ১৮১৬ অব্দ পর্যন্ত তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সময়ের মধ্যে

বান্তাম্ ও চেরিবঙ্ রাষ্ট্রের অবশিষ্ট অধিকারগুলি স্থানচ্যুত হওয়ায় পূর্বোক্ত সুলতানদ্বয়ের কিছুই রহিল না, কেবল থাকিল সামান্য পেন্সন্ ও শূন্যগর্ভ উপাধিটুকু ! সুরকর্তার সুসুহুনাঙ্ ও জোক্জাকর্তার সুলতান রহিলেন অর্ধস্বাধীন শাসক; ইঁহারা ইংরেজের প্রতিকূলতা করায় নিজ নিজ রাজ্যেই আবদ্ধ রহিলেন এবং রক্ষীসৈন্য পাহারায় নিযুক্ত থাকিল।

ওলন্দাজগণ দ্বিতীয় বার জাভা অধিকার করায় জাভায় এক সমৃদ্ধি-মণ্ডিত নবযুগের অভ্যুদয় হয়। পুরান কোম্পানীর সঙ্কীর্ণ একচেটিয়া অধিকারগ্রহণ ও বাণিজ্যবিষয়ক সঙ্কোচবিধি নবযুগে সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের চাষ যাহাতে খুব বিস্তার লাভ করে সে বিষয়ে নব্যতন্ত্র যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ায় রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে শুধু যে সক্ষম হইল তাহা নয়, পরন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সাধারণের হিতকর ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে অধিবাসিদিগের "কার্ভি" [খাজনা] বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্রোহ-বহ্নি মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। এইরূপ একটি বহ্নি নির্বাপিত হয় ১৮৩২ অব্দে বান্তামের জনৈক ভূতপূর্ব সুলতানকে নির্বাসিত করিয়া। ইহার পূর্বে ১৮২৫ অব্দে জোক্জাকর্তার জারজ রাজা ধিগো নিগোরোর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়—শাসনকর্তা গোডার্ড ফান্দের কাপেলেঁর বিরুদ্ধে—তাহা ছিল অধিকতর ভয়াবহ। যেমন পূর্ব পূর্ব অনেকস্থলে দেখা গিয়াছিল, মাদুরার বিভিন্ন নরপতির সৈন্যবর্গ এই বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করে, কারণ তাহারা সব ওলন্দাজভক্ত। ওলন্দাজ-শাসিত জাভার শাসনতন্ত্রের অনেক দুর্বলতা এই বিদ্রোহে প্রকাশ হইয়া পড়িলেও ১৮৬৮ অব্দ হইতেই আমূল সংস্কারের গোড়াপত্তন হয়। "কার্ভি" নামক খাজনাটি তুলিয়া দিয়া ন্যায়নিষ্ঠ শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। আধুনিক যুগে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই—কতিপয় অগ্ন্যুৎপাত ও ১৮৮৮ অব্দে একটি বিদ্রোহ ব্যতীত অপর কিছুর উল্লেখ না করিলে এখানে চলিতে পারে।

জাভা-ভূখণ্ডের পরিমাণ (নিকটবর্তী মাদুরা দ্বীপটি লইয়া) ৫০, ৫৫৪ বর্গমাইল ও উহার জনসংখ্যা তিন কোটী। শাসনকর্তা (Governor General of Dutch Indics) নেদার্লেণ্ডীয় আইন বিধি অনুসারে রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার একটি সভা আছে; উহার সভ্য পাঁচজন। জাভার প্রধান প্রধান শহরগুলি এই:—বাটাভিয়া, সুরবায়া ও সমারঙ্গ। বাটাভিয়ার জনসংখ্যা ১৩৮, ৫৫১; ইহার মধ্যে যুরোপীয়ের সংখ্যা ৮৮৯৩। সুরবায়ার জনসংখ্যা ১৫০, ১৯৮; ইহার যুরোপীয়ের সংখ্যা ৮,৯০৬। সমারঙ্গের জনসংখ্যা ৯৬, ৬৬০; তন্মধ্যে ৪,৮০০ জন যুরোপীয়। প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য এইগুলি—ধান, ভুট্টা, তুলা, ইক্ষু, তামাক, নীল, সিঙ্কোনা, চা ও চকলেট্ উৎপাদক বৃক্ষ (Cocao)। এতদ্ভিন্ন, কয়লা ও খনিজ তৈলের ব্যবসায় বর্তমান আছে।*

* হার্ম্স্ওয়ার্থ-এর পৃথিবীর ইতিহাস হইতে সাহায্য লইয়াছি, তজ্জন্য ঋণী আছি।—লেখক

বিরহ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বিবাহ-বাড়ীর হট্টগোল তখন থামিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর যে যেখানে পারে শুইয়া পড়িয়াছে। কোন দিকে সাড়াশব্দ নাই।

হঠাৎ ভয় পাইয়া মিনতি চেঁচাইয়া উঠিল, সেজদি, মা, বাবাগো—

বাহির হইতে কে যেন দরজাটায় শিকল আঁটিয়া দিয়াছে। সমস্ত শক্তি দিয়া বন্ধ দরজাটার উপর সে আঘাত করিতে লাগিল।

চীৎকার শুনিয়া যে যেখানে ছিল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অদ্ভুত একটা শব্দ করিয়া সকলে গিয়া বাসরঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

সেজদি মনোরমা গিয়া মিনতিকে জড়াইয়া ধরিল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি রে মিনু, কি ?

বাবা, মা, কাকীমা, দাদামণি—সবাই আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মিনতি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তথাপি লজ্জায় সে কিছু বলিতে পারিল না।

মা গিয়া মশারী তুলিল, পাশাপাশি দুইটা বালিশই পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু জামাই নাই।

একটা অস্পষ্ট বিপদের আশঙ্কা করিয়া মেয়েরা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

কাকীমা গিয়া মাকে ধরিল।

মনোরমা বলিল, মিনু, বল্ দিকি কি হয়েছে?

মিনতি তাহার বুকের মাঝে মাথা গুঁজিয়া বলিল, আমি কিছু জানি না।

মা ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, উঃ আমার যে দম আট্‌কে আসছে হেম! জামাই কি তবে মেয়েকে পছন্দ করেনি?

কাকীমা চোখ মুছিয়া বলিল, চুপ্ কর, দেখবে এখুনি এসে পড়বে।

মহা ভাবনায় পড়িল মনোরমা। শম্ভু তাহার শ্বশুরের আত্মীয়, বিবাহের সম্বন্ধ সেই আনিয়াছে।

যে যেদিকে পারিল লণ্ঠন লইয়া ছুটিল। কেবল বৃদ্ধ হরমোহন অন্ধকারে একা বসিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জামাই খুঁজিতে লণ্ঠন লইয়া যাহারা গিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কেহই বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে সাহস পাইল না। সেখানে মেয়েরা আছে আর আছে উগ্রচণ্ড হরমোহন, সংবাদ শুনিয়া সকলে মিলিয়া যে কাণ্ডটা বাধাইয়া তুলিবে তাহা অবর্ণনীয়। সুতরাং বাহিরের উঠানে বসিয়া সকলে মিলিয়া জটলা পাকাইতেছিল। এক বাকি আছে বঙ্কু, তাহার শক্তি সম্বন্ধে সকলের শ্রদ্ধা আছে, তাহার উপর মিনতিকে সে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে! সকলে সাগ্রহে তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু বঙ্কুও যখন ফিরিয়া আসিল তখন সকলে হতাশ হইল। অতঃপর রাত্রে খোঁজাখুঁজি করিয়া যখন সুবিধা হইল না তখন রাত্রিশেষে আবার দেখা যাইবে স্থির করিয়া চুপি চুপি সবাই সরিয়া পড়িল।

এক বঙ্কু তখনও দাঁড়াইয়া; বিড় বিড় করিয়া সে বলিল, হাটবেড়ের চকটা এখনও ঘোরা হয়নি, বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে, আর তা ছাড়া—, হ্যাঁ বিচিত্তির কি!

কানের পাশ হইতে পোড়া বিড়িটা আবার মুখে তুলিয়া সে চলিল।

অন্ধকারের ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। বাসরঘরে আলো জ্বলিতে দেখিয়া বাহির হইতে শম্ভু ডাকিল, মিনু, এই খিড়কির দরজাটা খুলতে পারবে? না হয় দাঁড়াও, পাঁচিলই টপ্‌কাচ্ছি।

মিনতি তখন ঘুমে অচেতন। মা, কাকীমা ঐ কোণে শুইয়া পড়িয়াছে, কেবল মনোরমা তখনও জাগিয়া আছে। গলার স্বর শুনিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, পাঁচিল টপ্‌কে তোমার কাজ নেই, দাঁড়াও খিড়কির দরজা আমি খুলে দিচ্ছি।

শম্ভু আসিয়া ঘরে ঢুকিল, যেন কোন কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সকলের দিকে একবার তাকাইয়া অতি স্বাভাবিক সুরে বলিল, সবাই যে এ ঘরে?

কথা শুনিয়া মনোরমার হাসি পাইল। এই পাগল ছেলেটির পরিচয় সে কিছু জানে; বলিল, এবারে আস্তে গিয়ে বিছানায় শোও।

শম্ভু বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় গিয়া উঠিল; বলিল, মেজদি, হাটবেড়ের চকে যাত্রা শুনে এলুম, কিন্তু তোমাদের বঙ্কুটা একটা আস্ত ইডিয়ট্!

মনোরমা হাসিয়া বলিল, বেশ, এখন ঘুমাও ভাই।

সকাল বেলায় বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বিবাহ করিতে আসিয়া বাসর হইতে যে-লোক শেষরাত্রে নির্বিবাদে পলায়ন করিয়া আবার ভোরে ফিরিয়া আসে সে হয় পাগল, নতুবা এমন একটা কিছু যাহার অস্পষ্ট কাহিনী ইঙ্গিতে ইসারায় কাহারও কাহারও চোখে মুখে ঘুরিতে লাগিল। যাহারা নিতান্ত আপনার তাহারা বুঝিল, অদ্ভুত খামখেয়ালী, মেয়েটার বরাতে সুখ নাই।

মনোরমা বলিল, ছেলেমানুষ, সংসারের চাপ্ পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে।

হরমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। গ্রামে তাহার মান প্রতিপত্তি আছে, বিবাহের রাতে পলাইয়া গিয়া জামাই ইয়ারদের সহিত যাত্রা শুনিবে ইহা তিনি সম্মানকর মনে করিলেন না। মনোরমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ওকে বলে দিও এসব হ্যাংলামো আমি পছন্দ করি না। সামান্য কাণ্ডজ্ঞান যার নাই—যাক্ আজ কাউকে কিছু আমি বলব না। তবে আর যদি এ বাড়ীতে সে কখনও আসে যেন ভদ্রভাবেই আসে।

কথাগুলি শম্ভু শুনিল। আস্তিন গুটাইয়া শ্বশুরের সহিত সে তাহার ভদ্রতার একটা মাপকাঠি স্থির করিবার জন্য দুয়ার খুলিয়া বাহির হইতেছিল, কিন্তু পিছন হইতে বাধা পাইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল মিনতি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়াছে, তাহার চোখে মুখে একটা অতি কাতর মিনতি।

শম্ভু তাহার নব-পরিণীতা বধূর দিকে এতক্ষণে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—মিনতির কালো চোখে জল টল্‌টল্ করিতেছে।

আস্তিন খুলিতে খুলিতে শম্ভু বলিল, আচ্ছা, কিন্তু এ বাড়ীতে কাউকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না, এক সেজদি, ইডিয়ট্ বঙ্কু, আর একজন ছাড়া।

বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল।

মিনতি লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া পলাইল।

সমস্ত দিনের মধ্যে বিবাহ-বাড়ীর উৎসবের প্রদীপ কেমন যেন নিভু নিভু হইয়া গেল।

হরমোহন গম্ভীর হইয়া মেয়ে-জামাইয়ের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

মেয়েকে একেবারে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল কি-না তাহা লইয়া মেয়েরা গবেষণা করিতে লাগিল।

একা মনোরমা লাফাইয়া বেড়াইল।

কিন্তু লজ্জায় মরিল মিনতি। ঘরের বাহির হইতে সে আর পারিল না।

বৈকালে বউ লইয়া শম্ভু নৌকায় উঠিল। আত্মীয়স্বজনেরা একটা অজানিত আশঙ্কায় চোখের জল ফেলিয়া তাহাদের বিদায় দিল।

মনোরমা শম্ভুকে বলিল, আর যেন পাগলামি ক'র না ভাই, মিনু বড্ড ভীতু মেয়ে, ওকে দেখ—

কথাটা বলিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

শম্ভু বলিল, কুছপরোয়া নেই। কিন্তু সেজদি, ভদ্র হতে না পারলে ত তোমাদের বাড়ীতে আর আমার আসা হবে না।

সেই অতি-অপ্রিয় প্রসঙ্গ বিদায় বেলায় আবার যাহাতে না উঠিতে পারে সেই জন্য মনোরমা জোরে শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, ধোৎ পাগল, ও সব কি সত্যি বলে নিতে আছে!

নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা খাল-বিলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। বিগত বন্যার রেশ এখনও যায় নাই। চারিদিকের ধানের ক্ষেত, জঙ্গলের ঝোপঝাপ সবই জলে থৈ থৈ করিতেছে। মিনতি বড় একটা ঘরের বাহির হয় নাই। নৌকা হইতে সে দেখিতেছিল, শুধু জল আর জল—যেন একটা বিরাট সমুদ্র। চারিদিকে মাটি দেখিবার উপায় নাই। মাঝে মাঝে দুই-একটা গাছের ঝোপ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার মাথায় রাজ্যের যত পাখী আসিয়া জড়ো হইয়াছে। ওই দূর আকাশের গায়ে একদল বক শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে। আবাল্যের পরিচিত সব কিছু, আত্মীয়স্বজন সব পিছনে রাখিয়া তাহার এ কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে? মিনতির যেন কেমন ভয় করিতে লাগিল, শম্ভুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, এ জলের কি আর শেষ নেই?

শম্ভু হাসিয়া বলিল, ভয় করছে? সাঁতারে আমি তিনবার প্রাইজ পেয়েছি। তুমি ত এইটুকু, তোমার মত তিনটেকে পিঠে ফেলে এ জল আমি পার হতে পারি। দেখবে?

মিনতি তাহার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, না।

শম্ভু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে বলিল, ঐ যে বট-গাছের মাথা দেখছ না, ওরই পাশে বেগবতী আর তারই কোলে আমাদের বাড়ী।

মিনতি তবু খানিকটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

শম্ভুর বাড়ীতে আছে বুড়ী অন্ধ মা আর বড় ভাই শশাঙ্ক, বউ তাহার মরিয়া গিয়াছে, রাখিয়া গিয়াছে একটা রোগা বছর দুইয়ের ছেলে।

অন্ধ বুড়ী আদর করিয়া বউ ঘরে তুলিল।

ছেলেটা সামনে দাঁড়াইয়াছিল, মিনতিকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, মা!

বুড়ী বলিল, মা নয়, কাকীমা। পোড়া বরাত তোর, নইলে—

বাধা দিয়া মিনতি মৃদু স্বরে বলিল, না না, ওরই আমি মা।

দূরে শশাঙ্ক দাঁড়াইয়াছিল। মিনতির কথা শুনিতে পাইয়া তাহাকে সে একটু মুখ উঁচু করিয়া দেখিল।

শম্ভু মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া তাহার গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মিনুকে ত তুমি দেখতে পাও না মা।

বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, তোরা সুখী হ, তাতেই আমার সুখ বাবা। মিনু আমার লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মীর মুখ আমার মনে আছে ত রে, তাতেই হবে।

কথা শুনিয়া মিনতিও চোখ মুছিল।

মিনতি কাজের মেয়ে, চুপ করিয়া এক দণ্ডও বসিয়া থাকিতে সে পারে না। কাজে-অকাজে মাজায় আঁচলটা জড়াইয়া লইয়া সে এমন-ভাবে ছুটোছুটি করে যে গম্ভীর প্রকৃতির শশাঙ্ক তাহা দেখিয়া হাসিয়া ফেলে।

সব কাজই সে একা করিবে, কেহ কিছুতে হাত দিলে আর নিস্তার নাই।

বুড়ী হাসিয়া বলে, তুই যে আমায় একেবারে আল্সে ক'রে দিলি মিনু, অন্ধ হয়েও ত আমি এমন চুপ ক'রে বসে থাকি নি।

মিনতি বলে, সারা জীবন ত কেবল খেটেই গেলে মা, এখন তোমার পেন্সন। পেন্সন বোঝ ত?

দুয়ারের আড়ালে শম্ভু ছিল। সে হাসিয়া মিনতিকে শুধাইল, আচ্ছা, তুমি বল ত পেন্সন মানে কি?

এই অতর্কিত প্রশ্নে মিনতি অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কথাটার বাঙলা অর্থ যে ঠিক কি, তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই, বলিল, কাল বলব।

শম্ভু বলিল, কিন্তু ডিক্সনারিটা আমি সরিয়ে রেখেছি।

কথা শুনিয়া দুই জনেই হাসিয়া উঠিল।

বুড়ী ভাবিল তাহার চক্ষু যেন খুলিয়া গিয়াছে, শম্ভু-মিনু তাহার কাছে আর অস্পষ্ট নাই।

মিনতি এখন পাকা গৃহিণী। কথায় কথায় গম্ভীর হইয়া বলে, আমার কি আর ছেলেমানুষী করবার বয়েস আছে, একটা ছেলে, একটা বুড়ী মেয়ে—

শম্ভু তবু শুনিবে না, তাহার ছেলেমানুষীর জন্য মিনতি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কোথা হইতে রাজ্যের যত ফুল জোগাড় করিয়া আনিবে, মালা গাঁথিয়া নাচাইতে নাচাইতে মিনতির সামনে আসিয়া গাহিবে—সখি গো, তোমার লাগিয়া মালাটি গাঁথিনু—

মিনতি ধমক্ দিয়া বলে, চুপ, দাদা শুনলে কি ভাববেন বল দেখি?

শম্ভু হাসিয়া বলে, ছাই ভাববে।

শম্ভুকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া মিনতি পলাইয়া যায়।

শম্ভু চটিয়া যায়। মিনতি যেন একটা বুড়ী, কেবল কাজ আর কাজের কথা। বাজে কথা কি সংসারে থাকিবে না?

শম্ভু টেরি কাটিয়া পিরাণের উপর উড়্‌নি চড়াইয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইতেছিল।

শশাঙ্ক ডাকিয়া বলিল, শোন্, থিয়ে-টা করেছিস—এইবার একটা কাজের জোগাড় দেখ্, নইলে শেষে খাবি কি?

এ কথা নূতন নহে, এমন রোজই সে শুনিয়া থাকে, ঘাড় নীচু করিয়া কোন রকমে আচ্ছা বলিয়া সে সরিয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু শশাঙ্ক আজ তাহাকে সহজে ছাড়িল না, একটু রুক্ষ স্বরে বলিল, কত দিন না তোকে বলেছি, কেবল আচ্ছা আচ্ছা বলে পালিয়েছিস। আমাকে কি খেটে খেটে মরতে বলিস? কালই কলকাতায় চলে যা, মোহিতকে আমি চিঠি দিয়েছি একটা প্রেসে টে সে না হয় ঢুকিয়ে দেবে।

দাদার কথা শুনিয়া শম্ভুর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, কাল যে তাহাদের পাণ্ডব-গৌরব প্লে, তাহার পর মিনতি, তাহাকেই বা কাল সে ছাড়িয়া যাইবে কেমন করিয়া! কিন্তু দাদাকে সে ভয় করে, তাই আপত্তি তুলিতে সাহস করিল না, কোন রকমে ঘাড় নাড়িয়া পলাইয়া বাঁচিল।

দাদার কথা তখন আর শম্ভুর মনে নাই। রাত্রে বিছানায় বসিয়া সে উসখুস করিতে লাগিল। এত রাত হইয়াছে তবু মিনতির দেখা নাই। আর ঐ মেয়েটা কি এত বোকাও হইতে পারে, কেবল কাজ আর কাজ—ঘানির বলদ! নাঃ, এত করিয়া আজ সে ভাবিয়া রাখিয়াছে যে নিজের শ্রীকৃষ্ণ পাটের খানিকটা মিনতিকে শুনাইয়া তাহাকে একেবারে তাক্ লাগাইয়া দিবে। চোখ বুজিয়া বেশ একটা কল্পনাও করিয়া লইয়াছিল, সে হাত নাড়াইয়া গড়্ গড়্ করিয়া পাট বলিয়া যাইতেছে, মিনতি তাহার মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিয়াছে, তুমি এত সুন্দর বলতে পার! নাঃ, সব মাঠে মারা গেল!

এমন সময় মিনতি আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

তাহাকে দেখিয়াই শম্ভু তড়াক্ করিয়া খাট হইতে নামিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, এই মিনু, ধর তুমি মধ্যমপাণ্ডব ভীম, বুঝলে, হ্যাঁ, এই কোণে বেশ গম্ভীর হয়ে মাজায় হাত দিয়ে দাঁড়াও। আমি শ্রীকৃষ্ণ, নড়ো না যেন, হ্যাঁ, এইবার আরম্ভ হবে—দেখ দেখ মধ্যম পাণ্ডব—

বাধা দিয়া মিনতি বলিল, কেষ্টোর চাইতে ভীমের জোর বেশী, তার কথাটাই আগে শোন। খোকার কাশটা আজও সারল না, কাল তার একটা ভাল অষুধ এনে দেবে, এখন শোও, রাত হয়েছে।

শম্ভু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। রাগও যে তাহার না হইল এমন নহে। এই ক'দিন ধরিয়া সকলে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে দাদা চাকরি-চাকরি করিতেছে আর উস্কাইয়া দিতেছে ঐ পোড়ার-মুখী মিনি, বুড়ীও তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। গুম হইয়া সে শুইয়া রহিল।

মিনতি ধীরে ধীরে গিয়া তাহার পাশে বসিল, গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, দাদা আমাদের জন্য কত করেন বল দেখি! তুমি তাঁর কথা শোন, কালই কলকাতায় চলে যাও।

শম্ভু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, রাগিয়া বলিল, পারব না আমি কিছু করতে, মরুক্‌গে সব।

মিনতি বলিল, হায় রে আমার কপাল, পুরুষ মানুষ যদি এই, তবে আর কে কাকে দোষ দেবে! দাদা কত দুঃখ করেন; সবাই তোমার দোষ দেয়। তুমি ত কিছুতে কাণ দেবে না, কিন্তু লজ্জায় যে মরি আমি।

শম্ভুর পৌরুষে আঘাত লাগিল, চেঁচাইয়া সে বলিল, সব দেখ খেদিয়ে, বাড়ীর ভাগ আমারও আদ্দেক। ও ওর ছেলে নিয়ে চলে যাক্, অন্ধ বুড়ীটা মরুক্, তুমিও দূর হও। সব মেরে দূর ক'রে দেব। এই জঞ্জালটাকে দূর করতে পারলে সবাই বাঁচে তা আমি জানি।

মিনতি তাহার পায়ের উপর নিজের মাথাটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, ওগো, আমার মুখ পঁচে গলে যাক্ পুড়ে ঝল্‌সে যাক, তুমি শুধু শান্ত হও। অমন অলক্ষণে কথা তুমি মুখে এনো না।

শম্ভু জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া বেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

শম্ভুর মনের মধ্যে অসন্তোষ, অভিমানের আগুন ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। দাদা, মা বকাবকি করে করুক গিয়া, কিন্তু ঐ মিনতি? সেও কি আর সবার মত হইবে? সেও কি তাহার কথা একবার ভাবিবে না? তাহার সমস্ত রাগ, অভিমান গিয়া পড়িল মিনতির উপর! এই কয়েক দিন সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলিল না, বাহিরে বাহিরে লুকাইয়া বেড়াইল।

সেদিন খাইতে বসিয়া শশাঙ্ক শম্ভুকে বলিল, আমাকে ভিন্ন ক'রে দিবি—দে, কিন্তু চিরদিন কি থিয়েটার আর বউয়ের পিছনে ঘুরে তোর কাটবে?

এই লজ্জাকর অপবাদে শম্ভুর চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল বেশ করিয়া দুইটা কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু দাদার মুখের উপর সে কোন দিন কথা বলে নাই, আজও বলিল না। অন্তর তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

শম্ভুকে নির্বাক দেখিয়া শশাঙ্ক চটিয়া গেল, বলিল, ছেলেমানুষ ত নস, সবই জানিস। জমিদারের একবছরের খাজনা বাকী, বাজারে বাকী, দোকানে দেনা, এসব কি আমি একা দেখব?

শম্ভু তথাপি কথা বলিল না।

শশাঙ্ক এইবার চরমে উঠিল, বলিল, আজ যে ভাতের গ্রাস নিশ্চিন্তে মুখে তুলে দিচ্ছিস, এমন দিন আসবে যেদিন তাও জুটবে না, সেদিন বুঝবি।

এই কথার পর শম্ভু আর ভাতের গ্রাস তুলিতে পারিল না। মুখের গ্রাস পাতের উপর রাখিয়া সে স্থির দৃষ্টিতে শশাঙ্কের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন করিয়া শশাঙ্ক তাহাকে কোন দিন বলে নাই।

শশাঙ্ক কিছুই লক্ষ্য করিল না। কোনপ্রকারে ভোজন সমাধা করিয়া সে উঠিয়া গেল।

মিনতি আসিয়া শম্ভুর সামনে আছড়াইয়া পড়িল ; কাঁদিয়া বলিল, এই কথার পরও যদি তুমি কলকাতায় না যাও তবে আমি গলায় দড়ি দেব। মাগো—আমাকে তুমি কি একটু শান্তিও দেবে না।

শম্ভু অভিমানে ক্রোধে এইবার ফাটিয়া পড়িল, অভুক্ত অন্ন রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। টান্ মারিয়া ভাতের থালা উঠানে ফেলিয়া দিল, লাথি মারিয়া জলের কলসিটা উলটাইয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, কাউকে আর কান্নুনী গাইতে হবে না, এই আমি চল্লাম।

কোন রকমে হাত মুখ ধুইয়া নিজের সুটকেশটা টান্ মারিয়া লইয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কাহাকেও সে একটি কথা বলিয়া গেল না।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা ভোজবাজীর মত হইয়া গেল। মিনতি দুয়ার ধরিয়া নিশ্চলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

শশাঙ্ক সবই শুনিল। সে জানে পুরুষ মানুষের এই অভিমান বেশী দিন থাকিতে পারে না। কাজে ভিড়িলে এইসব ছেলেমানুষী আর থাকিবে না। সুতরাং বৃথা চীৎকার করিয়া সে হৈ চৈ বাঁধাইল না।

মিনতি দুয়ার ধরিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। এমন করিয়া শম্ভু যে চলিয়া যাইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। অভুক্ত অন্নের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। শম্ভু রাগ করিয়া না খাইয়া গিয়াছে একথা আর কেহ জানে না ; কিন্তু মিনতি এই ব্যথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। অথচ কিই বা তাহার করিবার আছে? গৃহস্থ ঘরের বধূ সে, সব বুঝিয়া কেমন করিয়া স্বামীকে সে বলিবে, আমাকে ছাড়িয়া কোথায়ও তুমি যাইও না। মন তাহার কাঁদিয়া মরে কিন্তু কর্ত্তব্যের কাছে মনকে খাটো করা ছাড়া উপায় কি? লোকে কি বলিবে?

বুড়ী পাশের বাড়ী গিয়াছিল। শম্ভুর চীৎকার শুনিয়া কোন রকমে লাঠি ভর করিয়া ব্যস্ত হইয়া সে বাড়ীতে ঢুকিল, ডাকিল, মিনু!

মিনতির চমক ভাঙ্গিল, কোনপ্রকারে সংযত হইয়া বলিল, কি মা!

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, শম্ভু কোথায়?

মিনতি বলিল, কলকাতায় গেলেন।

বুড়ী বিস্ময়ের সুরে বলিল, আমাকে না বলে!

পরে একটু থামিয়া বলিল, চাকরির কথা ত অনেক দিনই হয়েছে, আমায় ছেড়ে ও যেতে চায়নি! তবে কি রাগ ক'রে গেল?

উত্তর দিতে গিয়া মিনতির চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, মুখে কোন রকমে হাসি টানিয়া বলিল, নাও কথা! তুমি এদিকে এস, ভাত জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হল!

কোন রকমে সমস্ত ব্যাপারটা সে ভুলিয়া থাকিতে চায়।

শম্ভু রাগ করিয়া সেই যে চলিয়া গেল আর কোন খবরই দিল না। মিনতি কাজের ভিড়ে মনকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিল। কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুইয়া সে আর ঘুমাইতে পারে না। কত কি চিন্তা আসিয়া তাহাকে যেন কুঁড়িয়া কুঁড়িয়া মারে। শম্ভু অভিমান করিয়া না খাইয়াচলিয়া গেল, সে দোষ যে তাহার নিজের ইহা সে ভুলিতে পারিল না, অথচ সে কি করিবে! সে যে কত বড় অসহায় তাহা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না!

বড় ভাই শশাঙ্ক গম্ভীর হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

বুড়ী অন্ধকারে বক্ বক্ করিয়া মরে।

কিন্তু মিনতি কি করিবে? মন তাহার গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, ওঁর শরীরটা তুমি সুস্থ রে'খ ঠাকুর, আর কিছু আমি চাহি না। আমাকে শুধু সহ্য করবার শক্তি দাও!

মিনতি বসিয়া বুড়ীর চুলের জট্ ছাড়াইয়া দিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা মা, প্রেসে কি খুব বেশী কাজ?

বাহিরের বারান্দা দিয়া শশাঙ্ক যাইতেছিল। প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, শম্ভু বুঝি তাই লিখেছে, তা আজকালকার দিনে কষ্ট না করলে কি আর চলে মিনুমা।

মিনতি গভীর লজ্জায় মুখে কাপড় চাপিয়া ছুটিয়া পলাইল। আড়ালে গিয়া নিজেকে সে ধিক্কার দিল, এমন নির্লজ্জ সে হইল কি করিয়া?

বুড়ী শশাঙ্ককে বলিল, কই শম্ভু চিঠি ত দেয়নি, আমি ত বাবা ভেবে মরি।

শশাঙ্ক গম্ভীর হইয়া বলিল, হাঁ, হাঁ, তোমাদের ত কথায় কথায় ভাবনা। ব্যাটা ছেলে চাক্‌রী করছে তার অত ভাবনা কিসের?

শশাঙ্ক জীবনভোর কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, তাহার নিকট ঐটি বাদে বাকী সব মেকী, ফাঁপা। সে বোঝে শুধু কাজের তাড়া, সামান্য চিঠি দিবার সময়াভাবে সে কোন গুরুত্বই আরোপ করে না।

সেজদি চিঠি লিখিয়াছে—এমন করিয়া ভাবনায় ফেলিয়া মারিস কেন? শম্ভুকে আমার মাথার দিব্যি দিয়া বলিস, সে যেন তোকে একবার এখানে লইয়া আসে। বাড়ীতে সকলে ভাবনায় মরিতেছে, তোরা কেমন আছিস শুধু এইটুকু লিখিয়া জানা।

মিনতি কি জবাব দেবে? তাহার জন্য সবাই ভাবিয়া মরিতেছে, তাই সে লিখিয়াছে—চিন্তা করিও না, কাজের জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। আমি গেলে বুড়ীর কষ্ট হয়, ছেলেটা কাঁদিয়া মরে। আমরা ভাল আছি সেজদিদি, আমার কোন কষ্ট নাই।

হাত কাঁপিয়া গিয়াছে, চোখ জলে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, ইহার বেশী সে আর লিখিতে পারে নাই।

এমন করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল। ঝরা পাতা পড়িয়া আবার কচি পাতা গজাইল, কিন্তু মিনতির ভাগ্যে নূতন কিছুই ঘটিল না। গালে হাত দিয়া বসিয়া সে ভাবে, অমন মানুষ এমন নিষ্ঠুর হইল কি করিয়া? অভিমান করিয়া সে তাহাকে এমন আঘাত করিল! চোখের জলকে সে আর শাসন করিয়া রাখিতে পারে না।

গম্ভীর প্রকৃতির শশাঙ্কও যেন আজকাল একটু বিচলিত হইয়াছে। মাকে চুপি চুপি বলিয়াছে, মোহিত লিখেছে ওর খবর সে কিছুই জানে না।

মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

মিনতি দূরে সরিয়া গিয়াছে। কত লোক কত কথা বলিয়াছে মিনতি কিন্তু আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। অন্তরে কে যেন বলিয়া দিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া সে যাইতে পারে না। শত অস্পষ্ট গুঞ্জন, শত অবাঞ্ছিত কলরবের মাঝেও অন্তরের ঐ সত্যটুকুই সে আঁকড়াইয়া রাখিতে চায়।

মিনতির অন্তর পুড়িয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল, সোনার বর্ণ তাহার কালী হইল, ভাত খাইতে বসিয়া গলা আটকাইয়া যায়, লুকাইয়া সে সব পুকুরে ফেলিয়া দেয়। অন্ধ বুড়ী কিছু দেখিতে পায় না।

সব লজ্জা সংকোচ দূর করিয়া মিনতি রাত জাগিয়া লুকাইয়া চিঠি লিখিয়াছে, ওগো তুমি ফিরিয়া আইস। আমার জন্য যে মালা গাঁথিয়াছিলে তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, আমাকে কি আরও বাঁচিয়া থাকিতে বল? এ পোড়া শরীর লইয়া আর কত দিন চাহিয়া থাকিব? শেষ রাতে জল পড়ার শব্দে ধড় মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসি, ভাবি, তুমি দরজায় টোকা মারিতেছ! ভোরে উঠিয়া তোমার গানের সুর যেন শুনিতে পাই। তোমার ভাঙ্গা বাঁশীটাকে জড়াইয়া ধরি, আমায় এমন করিয়া পাগল করিলে কেন?

কিন্তু হায় রে, চিঠি সে দিবে কাহাকে? কোথায় বা মানুষ, আর কোথায় বা তাহার ঠিকানা! এমন কত চিঠি সে রাত জাগিয়া লিখিয়াছে আবার ভোরেই তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

বুড়ী বলে, কে শম্ভু? আয়—আয়, এতদিন একটা চিঠি দিতেও নাই রে, থাক্‌লাম কি মলাম সে খবরটাও নিবিনে? বড্ড যে কাহিল হয়েছি বাবা, অ্যা,—আমি? মরবার জন্যেই বসে আছি।

মিনতি শুইয়া শুইয়া শোনে বুড়ী স্বপ্ন দেখিতেছে। বুড়ীকে ডাকিয়া আর তাহার জাগাইতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা হয়, সব ভয় দূর করিয়া ছুটিয়া যাইতে, শুধু একবার তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে, তোমার আর কাজে দরকার নাই, এবার ফিরিয়া চল। তোমার কোলে মাথা রাখিয়া আমি মরি, পরে যেখানে খুশী চলিয়া যাইও।

মিনতি ঘাটে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে বুড়ী কি একটা কাগজ হাতে লইয়া ছটফট্ করিয়া বেড়াইতেছে।

মিনতির সাড়া পাইয়া সে বলিল, কে মিনু এলি? দেখ ত মা, শম্ভুর চিঠি বুঝি এল। দেখ ত, আমার কথা কি লিখেছে।

বলিতে বলিতে বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল।

মিনতির বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল, কিন্তু সে চঞ্চল হইল না, ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলিয়া পড়িল—আমি কাহারও মুখ দেখিতে চাহি না। ডাক্তারেরা বলিয়াছে, আমি আর বাঁচিব না। তাহা হইলে ত সকলেই খুশী হয়। কেহ যদি আসিয়া দেখিতে চায় আসুক গিয়া, আমার কাহাকেও দরকার নাই।

মিনতি চিঠি হাতে করিয়া পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বুড়ী চেঁচাইয়া বলিল, অমন চুপ ক'রে থাকিস না, কি লিখেছে বল্?

মিনতির সমস্ত শরীরটা কাঁপিতে লাগিল, অতিকষ্টে বলিল, ভাসুর ঠাকুরকে ডাক মা, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

মিনতির মনে হইল, এখনই বুঝি সে দম বন্ধ হইয়া মরিবে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে এই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

বুড়ীর চীৎকার শুনিয়া শশাঙ্ক আসিয়া দাঁড়াইল। চিঠিখানি দুই-তিন বার পড়িল। সেই গম্ভীর শশাঙ্কের চোখ দিয়া আজ জল গড়াইয়া পড়িল।

তার পাইয়া মনোরমা আসিল, সাথে আসিল তাহার বাবা, মা ও বন্ধু। সকলে চীৎকার করিয়া হুলস্থূল্ বাধাইয়া দিল।

মিনতি আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখিল।

সেজদি আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, এমন ক'রে আমাদের জানতে কেন দিস নি মিনু?

মিনতি মনোরমার কোলে মাথা রাখিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিল।

বৈকালের গাড়ীতে সকলে মিলিয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল।

ঠিকানা বলিয়া দিতে মোটারটা আসিয়া একটা বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল।

রুদ্ধ নিশ্বাসে এতটা পথ মিনতি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, আর পারে না। এইবার ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল, কিন্তু লজ্জা সে কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। সকলের পিছু সে নামিয়া গেল।

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিবার শক্তিটুকুও যেন কে কাড়িয়া লইয়াছে। অতিকষ্টে উপরে উঠিয়া দরজার একপাশে সে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সকলে তখন ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কোথায় শম্ভু? চাকর বাকর যাহারা ছিল তাহারা এত লোক দেখিয়া ভড়্‌কাইয়া গেল, ঠিক মত জবাব দিতে পারিল না। বিশেষত এই লোকগুলি যাহা জানিতে চায় সে বিষয়ে তাহারা কিছুই জানে না।

এমন সময় শম্ভু আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন করিয়া সবাই যে আসিয়া পড়িবে তাহা সে কল্পনা করে নাই। দাদাকে সামনে দেখিয়া তাহার যেন লজ্জায় মাথাকাটা যাইতে লাগিল।

অত্যন্ত অসহায়ের মত সে বলিয়া উঠিল, তোমরা ভাবছ অসুখ আমার নাই, উঃ এখনও এইখানটা ব্যথা—

ব্যথা যে ঠিক কোথায় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া সর্বাঙ্গে সে হাত বুলাইতে লাগিল।

তাহার ভাব দেখিয়া সকলে জোরে হাসিয়া উঠিল।

শশাঙ্ক তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া বলিল, হতভাগা, এই তোমার ভয়ানক অসুখ! য়্যাঁ—এমনভাবেও টানা-হেঁচড়া লোকে করে, উঃ!

দূর হইতে মিনতি ভাবিল, সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে?

শম্ভু পলাইতে পারিলে যেন বাঁচে।

তাহার অবস্থা দেখিয়া মনোরমা হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, তুমি এদিকে এস ভাই।

নির্জ্জনে আসিয়া শম্ভু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনোরমাকে বলিল, তোমরা খুব ভেবে ভেবে মরেছ ত, খুব হয়েছে! ভেবেছ আমার খুব কষ্ট হয়েছে? ঘোড়ার ডিম! স্রেফ্ কারও জন্যে নয়, সেই পোড়ার-মুখিটার জন্যে ত নয়ই। হ্যাঁ, বয়ে গেছে কি-না! আমি ত দিব্যি আছি, টাকা আর টাকা, ব্যস্! চিঠি লিখে দাঁত দিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছি, বলতে পারে কেউ চিঠি লিখেছি? দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিয়েছি, চার দিন খাইনি, রেলের টিকিট অবধি কিনেছি, বলতে পারে কেউ বাড়ী গিয়েছি? বয়ে গেছে আমার? দাদা বলে, খেটে মরবে। আর একজন বলে, আমি পুরুষ! ঠেলা টের পাও, কেঁদে কেঁদে সব মর, হেঃ হেঃ হেঃ!

তাহার কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া মনোরমা হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

হঠাৎ মিনতিকে দরজার আড়ালে দেখিয়া শম্ভু খুব গম্ভীর হইবার ভান করিয়া বলিল, সেজদি, ওটা বুঝি আমাদের সেই মিনি চাকরাণীটা, কিন্তু ওকে ত আমার দরকার নাই। আমার ছুটো চাকর, একটা ঠাকুর, ওকে তুমি বিদেয় করে দাও।

মনোরমা ব্যস্ত হইয়া মিনতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ও মা তুই, এখেনে বসে আছিস, দেখ দেখি!

শম্ভু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তবে কি ও ঘরে ঢুক্‌বে নাকি? ওর বাউণ্ডারি ত কলতলা আর রান্নাঘর!

মিনতি ঘোমটার ফাঁক হইতে তাহার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিল।

মনোরমা ও শম্ভু হাসিয়া উঠিল।

বাসরঘর হইতে পলাইবার গল্প বলিয়া বঙ্ক চাকরবাকরদের হাসাইতেছে।

মা দাদা হাসিতেছে শম্ভুর উন্নতি দেখিয়া।

শ্বশুর-শাশুড়ী হাসিতেছে কন্যার বরাত ফিরিল দেখিয়া।

মিনতি দেখিতেছে কালো কালো মেঘ গলিয়া একসার হইয়াছে, তাহার মাঝে শরতের সোনালী আলো দিগ্বিদিগে সোনা ছড়াইতেছে। আগমনীর মিঠা সুরের মূর্চ্ছনা তাহার সর্ব্ব দেহমন নিস্তেজ করিয়া দিতেছে। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে সবটুকু মাধুর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল!

জনসংখ্যা কি সত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে ?

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষই বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপূর্ণ দেশ, ইতিপূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে চীন দেশই সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ, কিন্তু চীনের সে গৌরব এখন আর নাই। চীন-দেশীয় যে-কোন সংবাদ সম্বন্ধেই একেবারে নিঃসংশয় হওয়া বাস্তবিক দুষ্কর। অধ্যাপক উইলকক্স (Willcox) যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তদনুযায়ী চীনদেশের অধিবাসি-গণের সংখ্যা ৩৪ কোটী ২০ লক্ষের উপর হইবে না। এই হিসাবের মধ্যে তিনি তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীনের তুর্কীস্থান, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশ চীনের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইয়াছেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটী ২৮ লক্ষের উপর। আমরা জানি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আদমসুমারী বয়কট করিতে জনসাধারণকে নির্দ্দেশ দিয়াছিল এবং এদেশে লোকগণনার নানাপ্রকার স্বাভাবিক অসুবিধাও আছে। কাজেই আদমসুমারীতে যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ভারতের জন-সংখ্যা উহা অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম হইবে না।

১৯২১ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ভারতে জন সংখ্যা সাড়ে তিন কোটী বা ১০·৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত অধিক পরিমাণে জন বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকে ভয় পাইতেছেন যে ভারতে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য এ দেশবাসীদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নাও হইতে পারে; এইরূপভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ভারতবাসীগণ যে ক্রমেই দরিদ্রতর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমাদের জনসংখ্যা প্রকৃত বৃদ্ধি পাইতেছে কি-না এবং এই ভীতির মূলে কতটা সত্য আছে—তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। সারা ভারতের ন্যায় বঙ্গেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতের তুলনায় বঙ্গদেশের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম

হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই দশ বৎসরে শতকরা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৭·৩ জন। ইহাতে ভয় পাওয়ার কোনই হেতু নাই; কারণ বাঙ্গলার স্বাভাবিক সম্পদ দ্বারা এ-দেশের বর্ত্তমান জনসংখ্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে।

ভারতের ও বঙ্গদেশের জনসংখ্যা প্রকৃতই বৃদ্ধি পাইতেছে কি-না সে বিষয় এখন আলোচনা করিব। ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া দিলে প্রকৃত ভারতের লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক তেত্রিশ কোটী; ইহার মধ্যে ১৭ কোটী পুরুষ এবং ১৬ কোটী স্ত্রীলোক। ভারতের দুইটী প্রদেশ ভিন্ন সব প্রদেশেই স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। বঙ্গদেশের ৫ কোটী ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোক। কেবল মাদ্রাজ ও বিহার-উড়িষ্যায় পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক ছিল। কিন্তু এই উভয় প্রদেশেও উচ্চবর্ণ হিন্দুদিগের মধ্যে পুরুষই সংখ্যায় বেশী। উড়িষ্যায় ও ছোটনাগপুরে সাধারণত স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। ছোটনাগপুরে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কারণ এই যে, এখানকার আদিম অধিবাসীর মধ্যে অনেক পুরুষকেই আসামে চা-বাগানের কুলীরূপে চালান করা হয়।

১৯০১ হইতে যত আদমসুমারী হইয়াছে তাহাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার তারতম্য করিলে দেখা যায় যে, প্রতিবারেই পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই তারতম্য বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে, হাজার ভারতীয় পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৪১। হাজার ভারতীয় মুসলমান পুরুষের অনুপাতে, মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯০৪; হাজার ভারতীয় হিন্দু-পুরুষের অনুপাতে হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৫৩। সন্তানোৎপাদনক্ষম হাজার ভারতীয় পুরুষের তুলনায় ঐরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯২৪।

যে দেশে মাতৃজাতির সংখ্যা এরূপ নিশ্চিতভাবে হ্রাস পাইতেছে, সে দেশের লোকসংখ্যা বাস্তবিক বর্দ্ধমান কি-না তাহা ভাবনার বিষয়; মাতৃজাতির সংখ্যা হ্রাস হইলে যে জাতির কল্যাণ হইতে পারে না এবং ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা কমিতে থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিশেষজ্ঞগণের মতে ভগবান পুরুষ অপেক্ষা নারী জাতিকে বাঁচিবার পক্ষে অধিকতর শক্ত করিয়া গঠন করেন এবং নারীজাতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি পুরুষের অপেক্ষা অধিক। তথাপি এ-দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিতেছে। ইহার কারণ কি?

কি কি কারণে ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হইতে পারে আদমসুমারীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের হার্টন সাহেব সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে এ দেশে কন্যা অপেক্ষা পুত্র মাতাপিতা এবং আত্মীয়স্বজনের নিকট অধিকতর কামনীয় এবং শৈশবে পুত্রের তুলনায় কন্যাকে অনেক কম আদর, এমন কি, তাচ্ছিল্য করা হইয়া থাকে। ইহা কত দূর সত্য জানি না, তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, কিছুকাল পূর্ব্বেও রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে নবজাত কন্যাসন্তানকে অকালে বলি দেওয়া হইত। ইহাও জানা কথা যে পুত্রের জন্মগ্রহণে আমাদের দেশের লোকেরা যতটা আনন্দিত হন, কন্যার জন্মগ্রহণে ঠিক ততটা হন না। তার পর বাল্যবিবাহের ফলে যে অকালে জননী হইয়া অনেক নারীই অকালে দেহত্যাগ করে তাহাও জানা কথা, কাজেই নারীজাতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর হইলেও সাধারণত ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে সে শক্তির কোন পরিচয় এদেশে পাওয়া যায় না; অনেকের মতে এদেশের জলহাওয়া পুরুষের সংখ্যাধিক্যের কারণ। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানসমূহে পুরুষের সংখ্যা নারী অপেক্ষা বেশী। মাদ্রাজের জল বায়ু শুষ্ক নয় এবং সেখানে বাস্তবিক পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক। কিন্তু এ বিষয়ে দৃঢ়তা সহকারে কিছু বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে মাদ্রাজ অপেক্ষা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক অধিক হওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯২৭।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দুর্ভিক্ষজনিত অভাবের তাড়নায় সাধারণত পুরুষগণই অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই জন্যই নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক হইলেও ক্রমে পুরুষের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীলোকগণের পর্দ্দানশীনতা যে তাহাদের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পর্দ্দানশীনতার ফলে কেবল যে অকালমৃত্যু হয় তাহা নহে, গণনার ভারপ্রাপ্ত

কর্ম্মচারীগণ পর্দ্দার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ পাইতে পারেন না। কাজেই গণনাকারিগণের ইচ্ছা অথবা অনুমান অনুসারে এইরূপ স্থলে মেয়েদের সংখ্যা লিখিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় সংখ্যা কম নির্দ্ধারিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এইরূপভাবে গণনার জন্য যে সংখ্যার হ্রাস হয় তাহা মোট সংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য।

নারী জাতির সংখ্যা হ্রাসের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়া কোন কোন মনীষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একই জাতীয় মানবের সংমিশ্রণে সাধারণতঃ পুরুষ সন্তানই অধিক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। "হিষ্ট্রি অফ্ হিউম্যান্ ম্যারেজ্" (History of Human Marriage) নামক পুস্তকে ওয়েষ্টার মার্ক (Westermarck) এ বিষয়ে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বহু উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পিট রিভার্স্ (Pitt Rivers) তাঁহার "ক্ল্যাশ্ অফ্ কাল্চার্" (Clash of Culture) নামক পুস্তকেও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মত যে নিতান্ত আধুনিক, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। কারণ "তালমুদ" নামক ইহুদিগণের প্রাচীন গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, বিভিন্ন জাতীয় লোকের বিবাহে সাধারণত কন্যা সন্তান প্রসূত হইয়া থাকে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সেন্সাসে জাতিভেদ প্রথাকে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে হিন্দুগণের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত বটে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, নমঃশূদ্রগণ জাতিভেদ প্রথাযুক্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ জাতিভেদ প্রথা মানেন না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী, এ অবস্থায় সেন্সাস রিপোর্টে জাতিভেদ প্রথাকেই যে হিন্দুদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাধিক্যের কারণ বলা হইয়াছে—এই মত মানিয়া লওয়া কঠিন।

যাহা হউক, ভারতে এবং বঙ্গে উচ্চবর্ণ হিন্দুদিগের মধ্যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম। ইহার তাৎপর্য্যের প্রতি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনোযোগী হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মোট সংখ্যা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত জাতিসমূহে নারীর সংখ্যা ক্রমশই কমিতেছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৯০২ এবং বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৮৭৮। ভারতবর্ষে হাজার পুরুষ কায়স্থের তুলনায় ঐ জাতীয় নারীর সংখ্যা ৮৮৮।

বঙ্গদেশে দুই কোটী পনর লক্ষ হিন্দুর মধ্যে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা সংখ্যায় বার লক্ষ বেশী। এই প্রদেশে ব্রাহ্মণ-স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক লক্ষ কুড়ি হাজার বেশী ব্রাহ্মণ-পুরুষের বাস। কায়স্থগণের মধ্যে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা সংখ্যায় প্রায় এক লক্ষ অধিক। বৈদ্যগণের মধ্যেও স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা সাড়ে চারি হাজারের উপরে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধিবাসিগণকে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে অধিক ইহার দ্বারা উচ্চজাতির মধ্যে নিম্ন জাতি অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হয়। বাঙ্গলা দেশেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ জাতির সহিত তুলনায় নমঃশূদ্রগণের মধ্যে নারীর সংখ্যা অনেক বেশী, অসবর্ণ বিবাহের সন্তানদিগের কোন বিবরণ আদমসুমারীতে নাই, উহা পাইলে বুঝিতে পারা যাইত যে, জাতিভেদই নারী জাতির সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ কি-না।

এই প্রবন্ধে নারী জাতির যে সকল সংখ্যা দেওয়া হইল; তাহার মধ্যে সকল অবস্থার ও সকল বয়সের নারীই আছে। ইহার মধ্যে বিধবাদের সংখ্যাও কম নহে। এ দেশে বিধবা-বিবাহ সাধারণত প্রচলিত নহে। ইহার ফলে বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় আরও অনেক কম হইবে।

সেন্সাস্ রিপোর্টে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বেঙ্গল সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মিঃ পোর্টারের একটি সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। পোর্টার সাহেব উহাতে নানাপ্রকার গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বঙ্গদেশে ভবিষ্যতে হিন্দুগণের সংখ্যাবৃদ্ধির আর সম্ভাবনা নাই, বঙ্গের ভবিষ্যৎ সংখ্যাবৃদ্ধি মুসলমানগণের দ্বারাই হওয়ার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগে সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সম্প্রদায়-বিশেষের রাষ্ট্রীয় অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই অবস্থায় উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে মাতৃ জাতির সংখ্যার হ্রাস যে হিন্দু সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কিরূপ প্রতিকূল তাহা হিন্দুমাত্রেরই চিন্তনীয়।

ব্যথার বোঝা

শ্রীমতী পুষ্প বসু

সেদিন রাতে ডাক্তার শেখরকান্তি ঘোষ যখন রোগী দেখে বাড়ী ফিরছিল, তখন সমস্ত শহর ঘুমে অচেতন। সুপ্ত শহরতলী ছাড়িয়ে মোটর যখন টালীগঞ্জের মাঠে এসে পড়ল, ডাক্তার ড্রাইভারকে গাড়ী একটু আস্তে চালাতে বললে। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছিল, শুভ্র জ্যোৎস্না-লোকে উদ্ভাসিত মাঠ, কাছেই টেন লাইন চোখে পড়ল। চাঁদের আলোয় লাইনগুলো চক্‌চক্ করছে, ঠিক সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। দূরে দূরে দু'একটা খোলার ঘরে টিম টিম ক'রে বাতি জ্বলছে। লোকজনের কোলাহল নেই—গোলমাল নেই। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে চলল। এমন সময় একখানা টেনের ইঞ্জিনের সাঁই সাঁই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একখানা মালগাড়ী চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। সেই সঙ্গে সমস্ত মাঠ পথ বন কাঁপিয়ে একটা গভীর মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদ শেখরের কানে এল। রাতের নিস্তব্ধ বায়ুতরঙ্গে ভেসে-আসা সে কি তীব্র আর্ত্তনাদ। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার বলে উঠল, 'রামসিং জলদী গাড়ী রোকো' গাড়ী একবার থরথর ক'রে কেঁপে থেমে গেল। ডাক্তার গাড়ীর দরজা খুলে মাঠের উপর লাফিয়ে পড়ল। দ্রুতপদে চলল, বুকের মধ্যে তার যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। কে অমন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল? সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা, জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক স্পষ্ট পরিষ্কার—যতদূর দৃষ্টি যায়, কই কোথাও কিছু দেখা যায় না। টেনের লাইনের এধার ওধার সবই দেখা হল। ড্রাইভারও মনিবের অনুসরণ করেছে। কিছুরই উদ্দেশ পাওয়া গেল না, শুধু ধূ ধূ করছে মাঠ আর সবুজ গাছপালা। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই আর্ত্তনাদ এখনও যেন ডাক্তারের পিছু পিছু ছুটে আসছে। মনিবকে পুনরায় এদিক ওদিক বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইতে দেখে ড্রাইভার বললে, "হুজুর, এখানে এমন নিশুতি রাতে আমাদের বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। এখানে যত সব গুণ্ডা ছোটলোকের বাস, প্রায়ই এখানে নানা রকম দুর্ঘটনার কথা শোনা যায়। চলুন, আর দেখে কি হবে! ঘরে পৌছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে।" সত্যি জনমানবের সাড়া নেই, ডাক্তার অবশেষে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। পুনরায় মোটর তীরবেগে ঘরের দিকে ছোটে। কিন্তু ডাক্তার ভাবে—ঘরে পৌছতে দেরী আর শীগগীর! রাত ক'রে ফিরবার জন্য যার অভিমান তিরস্কার শুনতে হবে সেই কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর আসন যে আজও শূন্য! লক্ষ্মী নেই, তাই লক্ষ্মীছাড়ার মত যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো। সারাদিন রোগী দেখে, যতক্ষণ না সে ক্লান্ত হয় ততক্ষণ সে ঘরে ফেরে না। আজ শেখর ডাক্তার যখন ঘরে ফিরল তখন তার মাথা যেন এলোমেলো—বারে বারে সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ কানে বাজছে। শুধু একবার কি সে বিকট চীৎকার, তারপর যেন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। অমঙ্গল চিন্তায় যেন শেখর ডাক্তার আজ ভেঙ্গে পড়ল—রাতে সে কিছুই খেতে পারল না, ঘুমের মধ্যে সে দেখলে যাকে ভুলতে সে এত পরিশ্রম করেছে তারই মুখচ্ছবি স্বপ্নের মন্থর ভেলাতে বারে বারে ভেসে আসছে। মনের মাঝে অতীতের স্মৃতির সাগর সহসা যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—অমলার গলার স্বর! হ্যাঁ হ্যাঁ, তারই—তারই—কিন্তু সে এমন সময় ওখানে কেন যাবে? আর—আর, সে কি! "উঃ"! চমকে উঠে ঘুম ভেঙ্গে যায়। জেগে উঠে মনে হয় একবার অমলার খোঁজ করতে দোষ কি? অমলার শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা ত জানা নেই, তবে অমলার কাকার বাড়ীতেই দেখা যাক। প্রত্যুষে চা খেয়ে শেখর বেরিয়ে পড়ল অমলার খোঁজে।

অমলাদের সঙ্গে শেখরের দেখা হয় পুরীতে। সে আজ অনেকদিনের কথা। তখন মাতৃহারা শিশু অমলার ভাই মণি ছোট, অমলা কিছুতে তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারত না। প্রথম দেখা তাদের সঙ্গে সেই সমুদ্রতীরে। শেখর বেড়াতে বেড়াতে দেখলে একটি এগার বছরের মেয়ে ছোট ভাইটিকে কিছুতেই ভোলাতে পারছে না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মেয়েটি কত বোঝাচ্ছে—লক্ষ্মী-ভাইটি, বাড়ী চল, কিন্তু ভাইটি সেই বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে শুয়ে কাঁদছে, "না, আজ আমি মার কাছে যাবই—বাড়ী যাব না।" বিপন্না মেয়েটিকে তখন শেখর গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের বাড়ী কোথায়? চল, আমি তোমাদের বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তোমাদের সঙ্গে আর কে আছেন?" মেয়েটি লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলেছিল, "কেউ নেই, কিন্তু মণিকে কখন থেকে বলছি বাড়ী চল, ও কিছুতেই শুনছে না।" এদিকে মণি অপরিচিত লোকটিকে দেখে একটু চুপ করেছে। শেখর তাকে ভুলিয়ে কোলে তুলে নিয়ে বললে, "খোকা শীগগীর বাড়ী চল, এখানে আর একটু পরেই বাঘ বেরোবে।" পথে যেতে যেতে শেখর তাদের অনেক কথাই জেনে নিয়েছিল—মাত্র দুই মাস আগে এদের মা মারা যায়, বাপকে অমলার খুবই মনে পড়ে, কোন্ বিদেশে তিনি চাকরী করতেন, মাঝে মাঝে আসতেন। হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় সেইখানেই মারা পড়েন। তখন অমলার বয়স সাত আট বৎসর। তারপর তার কাকাই তাদের ভার নেন, কাকা কাকীমার সঙ্গেই তারা এসেছে—কাকীমার অসুখ। তাঁদেরও খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে। অমলাকে সকলকেই দেখতে হয়, কিন্তু মা মারা যাবার পর থেকে মণিকে নিয়ে সে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মণি থেকে থেকে মায়ের জন্য ভীষণ কান্না জুড়ে দেয়।

তাদের বাড়ী বেশী দূরে নয়—সেদিন শেখর তাদের দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে এসে ঘরে ফিরল।

শেখরের সারারাত ঘুমের মাঝে মনে হ'ল যে, তার মত ওদেরও ছোট বেলায় বাপ-মা মারা গেছেন। তার পরদিনও শেখর তাদের বাড়ী না গিয়ে থাকতে পারলে না। ক্রমে মণি শেখরের ভারী ভক্ত হয়ে উঠল। শেখরদা না হ'লে তার একদণ্ডও চলে না। অমলার কাকার সঙ্গে ক্রমে শেখরের আলাপ হয়েছিল। লোকটিকে দেখতেও যেমন—মনটিও যেন ঠিক তেমনই হৃদয়হীন। জানি না কেন শেখরের উপর তার খুব সহৃদয়তা দেখা গেল, কারণ বোধ হয় স্বার্থ। এই বিদেশে স্ত্রীর অসুখ, শেখর ডাক্তারী পড়ে—ছেলেটিও ভারী অমায়িক, তাকে দিয়ে অনেক কাজ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া শেখরের নিকট আত্মীয় বিশেষ কেউ নেই। মনে মনে হয় ত আরও অনেক অভিসন্ধি এঁটেছিলেন। যাহোক, ক্রমে শেখর ঘরের ছেলে হয়ে গেল। কাকীমা লোকটি খুবই শান্ত এবং নিরীহ। মনটিও ভাল, কিন্তু স্বামীর ভয়ে সদাই তটস্থ। দু-তিন মাস পুরীতে থাকবার পর যখন তারা কলকাতায় ফিরে গেল—শেখরেরও কলেজ খুলল, সেও নিয়মিত কলেজের ফেরৎ অমলাদের বাড়ী যেতে আসতে লাগল। এমনই করে দিন যায়। শেখরের ডাক্তারী পরীক্ষা শেষ হ'ল। কথায় কথায় সে একদিন জানাল সে বিলাত যাবে। অমলার কাকা শশিভূষণ আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন—"বেশ ত, আমার ইচ্ছা বিলাত থেকে ফিরে এলে অমলার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই—তোমার কি কোন আপত্তি আছে বাবাজী?" শেখর তৎক্ষণাৎ জানিয়েছিল, "আজ্ঞে না, তবে আমার অবস্থার কথা সবই আপনাকে জানিয়েছি। যা-কিছু আছে সব বিক্রি করে বিলাত যাচ্ছি।" শশিভূষণ ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, "আর সে সব ত আমি জানি, তবু তোমার মত ছেলে আমি বিনা পয়সায় আজকালকার বাজারে পাব কোথায়? সে তুমি ভেবো না। তবে আমার কথাটাও মনে রেখো বাবাজী, আমি শুধু রুলি চেলি দিয়ে বিয়ে দেব।" তারপর সঙ্গে সঙ্গে এটুকু জানাতেও দ্বিধা করেন নি যে, তার দাদা অর্থাৎ অমলার বাবা মোটা মাহিনা পেলে কি হবে, একটি পয়সাও রেখে যেতে পারেন নি। তাঁকেই সব ভরণ-পোষণ করাতে হচ্ছে। তিনি কত আর পারবেন, সামান্য আশী টাকার কেরাণী বই ত নয়। ভাগ্যিস, বসত বাড়ীটুকু ছিল তাই রক্ষে, তার উপর দাদার অনেক ধার। শেখর কিন্তু কানা ঘুষায় কথাটা শুনেছিল ঠিক অন্যরূপ। সে শুনেছিল, অমলাদের বাবা বেশ দুপয়সা রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাকার ষড়যন্ত্রে তারা আজ পথের ভিখারী। এদের মাও নাকি বড় কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন। অমলার ও মণির উপর শেখরের এমন মায়া পড়ে গেল যে, সে বিলাত যাবার আগে শুধু তাদের কথাই ভাবতে বসল। নাটক নভেলী প্রেমের কথা অমলার সঙ্গে শেখরের না হলেও তারা যে পরস্পরকে অতি নিবিড়ভাবে ভালবাসে, সে বিষয়ে এতটুকুও ভুল নেই। অমলা ও মণি শেখরের কাছেই এতদিন পড়ত, তারা ভাই-বোনে একমাত্র শেখরদাকেই আঁকড়ে ধরেছিল। শেখর বিলাত যাবে কথাটা তারাও শুনলে—অমলার স্বভাব বড়ই শান্ত ধীর—তার মনে কি হয়েছিল তা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু মণি বায়না ধরল, সেও যাবে শেখরদার সঙ্গে। অমলার কাকীমার অবস্থা খুবই খারাপ, বাঁচবার আশা খুবই কম—এদিকে শেখরের বিলাত যাবার দিন এগিয়ে এল। সেদিন সন্ধ্যায় অমলা ছাতে আলিসায় দাঁড়িয়ে চুপ করে কত কি ভাবছে, এমন সময় শেখর ছাতে এসে ডাকলে, "অমলা!" অমলা চমকে ওঠে, "ওমা শেখরদা, আমি ভয় পেয়ে গেছলাম—চলুন ঘরে।"

—"না, আমায় এখনই একটা কাজে যেতে হবে। পরশু ত আমি চললাম, কিন্তু তোমাদের জন্য আমার মনের মধ্যে সোয়াস্তি নেই। আমার জন্য বেশী ভেব না, দুটা বছর কোন রকমে কাটিয়ে দাও, পড়া-শোনার যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রো। তারপর আমি ফিরে এলে—।" অমলার চোখে জল ভরে আসে। মা মারা যাবার পর ভগবান যেন শেখরদাকে পাঠিয়েছেন তাদের সকল দুঃখ থেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য। যাকে নইলে একদিনও চলে না তাদের, দুবছর চলবে কেমন করে! অমলা ঘাড় হেঁট ক'রেই রইল। কি বলবে সে। শেখর আবার বললে, "মণিকে কতকগুলো ছবির বই, কিছু খেলনা কিনে দিয়ে যাব, তাকে ভুলিয়ে রাখতেই তোমায় বেগ পেতে হবে। আমি ফিরে এলে যেন তোমাদের ভালই দেখি—কেমন? কাল হয় ত আসতেই পারব না—তারপর পরশু ত কথা বলার সময়ই পাব না।"

অমলা এইবার ভাঙ্গাগলায় জবাব দিলে, "আমাদের কিন্তু নিয়মিত চিঠি দেবেন, যতদিন আপনি ফিরে না আসেন ততদিন আমি—" সহসা এক নিশাচর পাখী বিকট শব্দ ক'রে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। অমলার কথা বলা শেষ হ'ল না। দুজনেরই মনে হ'ল—অমানিশার গাঢ় অন্ধকার তার দুই পাখা বিস্তার ক'রে তাদের মনের মাঝে উড়ে এসে বসল। দুজনেই কিছুক্ষণ আকাশের পানে এ-দিক ও-দিক চেয়ে দেখলে—আকাশও যেন কালোয় কালো, আলো একটুও যেন কোথাও দেখা যায় না। অমলা একটু ভীতভাবে শেখরকে বললে, "শেখরদা, এখানে ভারী অন্ধকার হয়ে গেছে, চলুন নীচে।" দুজনেই নিঃশব্দে নীচে চলে গেল।

* * * * *

আজ শেখরের বিলাত যাবার দিন। ষ্টেশনে অনেক বন্ধু-বান্ধব শেখরের সঙ্গে এসেছে, অমলা, মণি ও অমলার কাকাও এসেছেন। ট্রেন ছাড়বার সময়ে ধরা গলায় শেখর বললে, "আচ্ছা, তাহলে এখন চললাম।" ট্রেন ছেড়ে দিলে—শেখর গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল। অমলার চোখের জল মুক্তার মত অবিশ্রাম ঝরতে লাগল। গাড়ীখানা কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের সামনে বিলীন হয়ে গেল। অমলার মনের ভেতর হু হু করতে লাগল। মণি কাঁদতে কাঁদতে ডাকলে, "দিদি ও দিদি, কাকাবাবু ডাকছেন।" অমলা শ্রান্ত-চরণে মণির হাত ধরে কাকার অনুসরণ করল।

শেখরের বিলাত পৌঁছান সংবাদও অমলা পেয়েছিল। মাঝে মাঝে শেখরের চিঠি আসত। মণি জবাব দিত—কখনও অমলার কাকাও চিঠি দিতেন। অমলার কাকীমা অমলাকে নিভৃতে ডেকে বলেছিলেন, "তুই মা, শেখরকে কোন চিঠিপত্র দিস্ না—কে জানে কে কি বলবে!"

কাজেই অমলার দারুণ ইচ্ছাটাকে সে দলে পিষে দাবিয়ে রাখত—চিঠি আর তার লেখা হ'ল না।

এক বছর হয়ে গেল। একদিন অমলা শুনলে, কাকাবাবু কাকীমাকে বলছেন, "দেখ, অমির একটা খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছে, মস্ত বড়লোক। টাকা কড়ি কিছু দিতে হবে না, উল্টে সে কিছু মোটা রকম দেবে। অমিকে তার ভারী পছন্দ! অমন বড়লোক—আমায় কত খোসামোদ ক'রে বলছে; শেখরের আশা ছেড়ে দাও। একে ত কিছু নেই, তারপর আবার পসার করতে আজকালকার বাজারে হাবুডুবু খেতে হবে! সে ত গেল, হয় ত শেষে একটা মেম বিয়ে করে বসে থাকবে।" কাকীমা বাধা দিয়ে বললেন, "না, না, সে কি কথা, শেখর আমাদের তেমন ছেলে নয়। আর তাকে কথা দিয়েছ যখন, আর ওদেরও দুজনের ভারী ভাব, তাতে আবার বড়-সড় হয়েছে। না, না, পয়সায় কাজ নেই—কথার খেলাপ ক'র না।" কাকা এক ধমক দিয়ে বললেন, "হুঃ, রেখে দাও তোমার কথার খেলাপ, একটা উড়নচণ্ডে ছোঁড়া, সাতকুলে কেউ নেই। এ একটা পরিচয় দেবার মত পাত্র, আমাদের ঘরের মেয়ে নিচ্ছে এই ঢের। দেখি ব্যাটার কাছ থেকে মোটারকম কিছু আদায় করতে পারি কি-না, আর দেরী নয়—তুমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামিও না. মেয়েমানুষ এ সবের বোঝ কি?"

এ কথা শুনে পান সাজতে সাজতে অমলার মাথা ঘুরে উঠল। এতদিন ত এ কথা সে ভেবে দেখেনি। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে যে শেখরদা সম্পূর্ণ দূরে চলে যাবে। না, না, সে শেখরদাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু এ কথা কাকা কাকীমাকে বলবে কেমন ক'রে? সারাদিন না খেয়ে অসুখ করেছে ব'লে অমলা শুয়ে রইল. অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক ক'রে রাখলে—সে কাকীমাকে বলবে—সে বিয়ে করবে না। এর বেশী বেচারীর কিছু করবার উপায় নেই। তারপর একদিন বৈকালে পাত্র নিজে আর একবার কনে দেখতে এল মস্ত এক জুড়ীগাড়ী ক'রে। পাত্রের সঙ্গে আর একটি লোক—সে একটা হীরার কণ্ঠি দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে গেল। অমলা এইবার কাপড় জামা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে কাকীমার কাছে চলল—সে বিয়ে করবে না। কাকীমার ঘরের দরজার কাছে যেতেই শুনলে—কাকা ও কাকীমাতে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেছে। কাকা খুব জোর গলায় বলছে, "কেন, পাত্রকে অপছন্দ করবার কি আছে? বয়েস একটু বেশী আর চরিত্র খারাপ, সে অমন বড়লোকের হয়েই থাকে।" কাকীমা বিছানায় শুয়ে ক্ষীণকণ্ঠে ব্যাকুল হয়ে বলছেন, "ওগো, না না, মেয়েটার হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিও না। দেবেন মিত্তিরকে কে না চেনে—ওর মতন—" কাকীমার আর বলা হ'ল না। কাকা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বলে উঠল, "না, না, দিও না—ঐ বুড়ো ধাড়ী মেয়ে গলায় ঝুলিয়ে আমি বসে থাকি। দেখ, রোগ হয়েছে শুয়ে থাক, বেশী বক্ বক্ করো না। হীরার কণ্ঠিটা একবার চোখে দেখেছ কি? যেমন গরীবের মেয়ে—তেমনই চামাড়ে বুদ্ধি।" কাকীমার আর সাড়া পাওয়া গেল না। অমলা কাঠ হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল—কি বলবে সে! দেখলে কাকা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাবার উপক্রম করছেন, হঠাৎ অমলা ছুটে গিয়ে কাকার পা জড়িয়ে বললে, "কাকাবাবু, আমি এখান থেকে যাব না, আপনি কেন আমার—" আর সে বলতে পারলে না। কাকা ব্যস্ত হয়ে বললে, "আরে দূর পাগলী, যাবি কোথায়? রাজার ঘরে তোর বিয়ে দিচ্ছি—চিরকাল কি আমার ঘরে উচ্ছে-চচ্চড়ি আর ভাত খেয়ে থাকবি! ওঠ! ওঠ! কি মুস্কিল! যেমন কাকীর কাছে মানুষ হয়েছে বুদ্ধিও তেমনই হবে ত! আরে দুবেলা তোকে এখানে বেড়িয়ে নিয়ে যাবে, এই শোন, গাড়ী কখানা আছে তা জানিস? পাঁচখানা মোটর, আর—" মণ্টু এসে ডাকলে, "দিদি, দিদি, শীগ্‌গির এস, শেখরদার চিঠি এসেছে।" কাকা উপস্থিত পরিত্রাণ পেয়ে বর্ত্তে গেলেও সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গজগজ করে বলতে বলতে গেল, "ভ্যালা এক শেখরদা জুটেছিল।" দুই ভাই-বোনে বারান্দার কোণে বসে শেখরদার চিঠি পড়ছে। শেখর লিখেছে—"মণ্টু বাবু, আমি আর ছ'মাস পরে ফিরব—কেমন খুব খুশী হলে ত? তোমাদের সকলের কার কি চাই—এখন থেকে লিষ্ট করে রেখো। কাকীমা কেমন আছেন? অমলা চিঠিখানা হাতে নিয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল। মণি দিদির ভাবগতিক দেখে ভাবলে বুঝি, শেখরদা দিদির নাম ক'রে কিছু আনবে লেখেনি বলে—বোধ হয় দিদির অভিমান বা রাগ হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বললে, "দিদি, শেখরদা আমাদের সকলের জন্যেই ত—" দিদি বাধা দিয়ে বললে, "যা এখন বাজে বকিস্‌নি, চান করতে খেতে হবে না?" মণি দিদির মেজাজ দেখে ক্ষুন্নমনে নিজের কাজে চলে গেল। কদিন ধরে সে দিদির মেজাজ ভাল দেখছে না। সে এক সময়ে লুকিয়ে তার শেখরদাকে লিখলে' "জান শেখরদা, দিদির মেজাজ আজকাল খুব গরম! বোধ হয় বিয়ে হবে বলে, না? ওঃ বয়েই গেল, দিদির বিয়ে হলে আমি তোমার কাছে চলে যাব। তুমি শীঘ্র শীঘ্র চলে এস কিন্তু!" আরো অনেক আগ্‌ড়ম-বাগ্‌ড়ম লিখে চিঠি শেষ করলে। শেখর যখন মণির এই চিঠি পেলে—সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না মণির এই চিঠির অর্থ—বিয়ে কার সঙ্গে—কোথায়? মণিটা ভারী ছেলেমানুষ। আমিই যে অমলার ভাবী বর সে কথা যখন মণি জানবে—তখন বেচারীর আহ্লাদের আর সীমা থাকবে না। ছ'মাস এখন কোন রকমে কাটান। শেখর আনন্দের আতিশয্যে একদিন একখানা ফটো তুলিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে অমলাদেরও একখানা পাঠাবে স্থির করলে। শেখরের একে চেহারা অতি সুশ্রী, তায় বিলেতে এক বছরের বেশী থাকায় হঠাৎ তাকে বাঙ্গালী বলে চেনা যায় না। শেখর ফটো দেখে অনেক কিছু মনে মনে সুখস্বপ্ন রচনা করতে লাগল।

এদিকে অমলাদের বাড়ীতে একদিন রাত্রে শাঁক বেজে উঠল! আজ অমলার গায়ে-হলুদ। অভাবনীয় রকম গায়েহলুদের তত্ত্ব এল। বাড়ীতে হাসি ফুটল না শুধু অমলার ও তার রুগ্না কাকীমার মুখে। কাকা এসে স্ত্রীকে একবার বললে, "ওঠ, ওঠ, একবার চেয়ে দেখ—কখনও দেখেছ কি?" কাকীমা তেমনই একইভাবে শুয়ে জবাব দিলে, "ওসব

দেখে আর কি হবে।" আরও অনেক কিছু বলবার জন্য ঠোঁট কেঁপে উঠল। কিন্তু বিয়ে বাড়ীতে আর স্বেচ্ছায় কেন অপমান হওয়া, আহা বাপ-মা মরা মেয়েটাকে কেন যে আজ হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কাকা হয়ে সন্তানের উপর একটু মায়া নেই। মেয়েটার মুখের দিকে চাওয়া যায় না! আর সেই ছোঁড়াটা ফিরলেই বা তাকে মুখ দেখাব কি বলে—বাছা কত সেবাই না করেছে তার—উঃ ভগবান, আমায় শীঘ্র নাও, বাচ্ছা দুটো ছেলে আছে, তাদের তুমিই দেখছ; আর মণি বেচারী সম্পূর্ণ ছেলেমানুষ, বিয়ের আমোদে মত্ত, জানে না সে যে দিদির কি সর্ব্বনাশই হচ্ছে।

যাহোক, ধুমধাম করে অমলার বিয়ে হয়ে গেল। বরকনে গাড়ীতে উঠেছে, মণি ছুটতে ছুটতে এল—হাতে তার একখানা ফটো। জুড়িতে উঠে দিদির কাছে বসে ছবিটা দেখাতে যাবে—নূতন জামাই গম্ভীর মুখে বললেন, 'কার ফটো হে ছোকরা? দেখি"। মণি চেয়ে দেখে—বাবা, জামাইবাবুর যা চেহারা, বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, কালো মিশমিশে রং। মুখখানা কি বিশ্রী—তার উপর আবার রাজপোষাক। মণি ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বললে "শেখরদার।" দেবেন মিত্তির বললে, "শেখরদা মানে? কি রকম ভাই হয়?" মণি একটু থতমত খেয়ে তার দিদির মুখের পানে চাইলে—জুড়ীখানা তখন শহর ছাড়িয়ে টালীগঞ্জের রাস্তায় এসে পড়েছে। গমগম শব্দে পথের লোককে সচকিত ক'রে ছুটছে। দিদির কোন সাড়াই নেই, মণি তার পাশেই বসেছিল—দিদির গায়ে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে বললে—"তুমি বল না দিদি।" দেবেন মিত্তির এবার একটু কৌতূহল দৃষ্টিতে নববধূকে জিজ্ঞাসা করলে, "শেখরদাটি কে, ভাই হয় নাকি?"

শুধু উত্তর এল, "না।'

এবার বর একগাল হেসে বলে উঠল, "হুঃ বুঝেছি, এটিকে তোমার কাকা বুঝি জিইয়ে রেখেছিল—তা পয়সা জুটল না কেনবার—হাঃ হাঃ! তা ছোকরার চেহারাটা মন্দ নয়।" নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে অস্থির হয়ে উঠল। দুটি ভাইবোনে যেন ভয়ে লজ্জায় কাঠ হয়ে রইল। তারপর তারা বাড়ীতে এল, মস্ত প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান, পাগড়ী বাঁধা দরোয়ান ঘোরাফেরা করছে, গাড়ী মোটরে লোকজনে বাড়ী সরগরম। মণি কদিন দিদির বাড়ীতে থেকে বৌভাতের ঘটা দেখে বাড়ী ফিরল। সবই ভাল, কিন্তু জামাইবাবুকে মণির এতটুকুও ভাল লাগল না। তার মন ছটফট্ করছিল, কতক্ষণে সে শেখরদাকে বিস্তারিত খবর দিয়ে চিঠি লিখবে! কাজেই বাড়ী এসেই প্রথম কাজ তার হ'ল শেখরদাকে চিঠি দেওয়া।

এদিকে বিলাতে শেখরের এক প্রিয় বন্ধু জুটেছে, নাম অচিন্ত্য। ছেলেটি খুব পরোপকারী, বিয়ে-থা করেনি। পিতার অগাধ অর্থ থাকা সত্ত্বেও সে বিলাসিতার ধার ধারে না। ছেলেটি একাধারে বিদ্বান ও সর্ব্বগুণ-সমন্বিত। সেও ডাক্তার হয়ে সবেমাত্র বেরিয়েছে। তার ইচ্ছা, দেশে একটি মেয়েদের জন্য হাসপাতাল খুলবে। বিশেষ ক'রে অনাথা, পতিতা, যাদের সংসারে কেউ নেই, তাদের ডাক্তারী এবং নার্সিং শেখান হবে—যাতে তারা সৎভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করতে পারে। শেখরও এ বিষয়ে একমত—তবে তার পয়সা না হওয়া অবধি সামর্থ্য সে দিতে খুবই প্রস্তুত। সেদিনও দুই বন্ধুতে বসে নানা গল্প করছে, এমন সময় এল অমলার বিবাহের বার্ত্তা বহন ক'রে মণির চিঠি।

অচিন্ত্য দেখলে শেখর চিঠিখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিবর্ণ হয়ে গেল, তার মুখ দিয়ে কথা যেন বেরোচ্ছে না; নিশ্চয় কোন অশুভ বার্ত্তা আছে, কিন্তু শেখরের ত কেউ নেই যার জন্য সে এমন উতলা হতে পারে—

অচিন্ত্য বসেই আছে। শেখর স্থির স্তব্ধ, যেন পাথর—সে যেন এ পৃথিবীর নয়। এবার অচিন্ত্য তার পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি খবর এল যাতে তুমি এমন ভেঙ্গে পড়লে? অবশ্য যদি আমাকে তোমার বলতে কোন আপত্তি না থাকে।" শেখর শুধু একবার উদাস-দৃষ্টিতে অচিন্ত্যের পানে চেয়ে বললে, "তোমায় সবই বলব ভাই, কিন্তু এখন আমি ভয়ানক শক্‌ড্।"

—"কেউ মারা পড়েন নি ত?"

—"না। কিছু মনে করিস নে ভাই—" বলতে বলতে শেখর শোবার ঘরে চলে গেল।

অচিন্ত্য চিন্তিত মনে পাইপ ধরিয়ে আপন মনে বলতে বলতে গেল—

"I slept and dreamt that life was beauty,
I woke and found that life is duty·

তারপর শেখর সারারাত ভাবলে, এখন সে কি করবে। কেন মানুষের মন এমন একজনকে কেন্দ্র ক'রে আকাশকুসুম রচনা করে! অমলারা তার কে! তার কাকা! ছিঃ, এরকম অভদ্র লোকের সঙ্গে সে এতদিন ঘনিষ্ঠতা করেছিল সেইজন্য নিজেকে ধিক! কিন্তু অমলা, অমলা—কি জানি তার উপর রাগ যেন কিছুতেই আসে না। বেচারী হয় ত মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি—কিন্তু, কিন্তু তবুও? থাক, তাদের কথা সে আর ভাববে না। তাদের সঙ্গে আর কিসের সম্বন্ধ! তাদের ভুলতে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দেবো। পরদিন সকালেই অচিন্ত্য এসে দেখলে শেখর প্রকৃতিস্থ, কিন্তু এক রাত্রে তাকে কে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব ক'রে দিয়ে চলে গেছে। শেখর হেসে বন্ধুকে বসতে বললে, কিন্তু অচিন্ত্য দেখলে সে হাসিতে কান্নাই ঝরে পড়ছে। অচিন্ত্য সব শুনলে। এইবার অচিন্ত্য শেখরকে সম্পূর্ণ নিজের ক'রে পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে দুজনে পড়াশোনায় মন দিলে।

অমলার দুর্ব্বহ জীবন আর কাটে না। তার একমাত্র হিতৈষিণী কাকীমাও মারা গেছেন। ছোট ভাই মণিকে খুব কম দেখতে পায়। কাকা ত আসেনই না। কানাঘুষায় শুনেছিল, কাকা নাকি এখান থেকে অপমান হয়ে একদিন চলে গেছেন। স্বামীর সঙ্গে অমলার এক-আধ দিন দেখা হয়—সে দেখা না হওয়াই ভাল। মদ্যপান ক'রে যখন একদম বেহুঁস অবস্থা হয়, তখনই তিনি বাড়ী আসেন এবং নানা অকথ্য ভাষায়

গালাগালি, দাপাদাপি সুরু করে দেন। বাড়ীতে আর এমন কেউ নেই যে অমলার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবে। ঝি-চাকরদের শুধু বলতে শোনে, "আহা, পরের মেয়ে এনে কেন কষ্ট দেওয়া!"

অমলার মনে কেবল একমাত্র দেউটি জ্বলে, সেটি তার শেখরদার স্মৃতি। কিন্তু মণি যখনই আসে—জিজ্ঞেস করে সে জেনেছে সে শেখরদার কোনও চিঠি পত্তর আর পায় না। শেখরদাও তাদের পরিত্যাগ করলে? তাদের জগতে তবে রইল কে? ভালবাসা কি এমনই ক্ষণভঙ্গুর, মানুষ তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকে? অমলা কিছুতেই ভেবে পায় না—সকলকেই ত দেখে সে—কেমন তারা হেসে খেলে আমোদ করে বেড়ায়—কিসের আনন্দে তারা এত মসগুল? হাঁা, তারও ত এত দুঃখ কখনও ছিল না—মনের অন্তস্তল থেকে—অমলা আবিষ্কার করে সে সুখের মূল কেবল শেখরদা। কই, শেখরদা ত একবার খোঁজও নেয় না যে, অমলা কেমন আছে—এতদিন হয়ে গেল একখানা চিঠিও দিলে কি তাঁর এমন ক্ষতি হত! তারপর খবরের কাগজে পড়ে জানলে শেখরদা কলকাতায় ফিরেছে। রোজই সে পথপানে চেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই সে শেখরদাকে দেখতে পাবে, কিন্তু বছর ঘুরে দুবছর হতে চলল কোথা শেখরদা! মণি আজকাল খুব কম আসে, তার চেহারা ভারী বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে। কাকা তাকে মোটেই দেখেন না, হয়ত পেট ভরে খেতেও পায় না। শেখরদা অমলাকে না হয় ভুলে গেছে, কিন্তু মণি নিষ্পাপ বালক—তার উপরও একটু মায়া হয় না? শেখরদা যদি তাকেও নিয়ে যায় তবে সে দুঃখের মধ্যেও একটু শান্তি পায়।

মণি এবার একদিন স্কুলের ছুটির পর দিদির সঙ্গে দেখা করতে এল। অমলা তার চেহারা দেখে চোখের জল রোধ করতে পারে না। একবার ভাবে, স্বামী যখন প্রকৃতিস্থ থাকবেন, তখন একবার বলবে যে মণি এখানেই থাক, পরক্ষণেই মনে হয়—না, না, স্বামী গরীব বলে একেই ত কত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, তাতে আবার এখানে মণিকে রাখলে অপমানের পরিসীমা থাকবে না। মণি যখন চলে যাচ্ছে—অমলা শুধু ভাইকে আদর ক'রে পিঠে হাত দিয়ে বললে, "মণি, যদি কখনও শেখরদার দেখা পাও তবে তার কাছে তুমি চলে যেও, তিনি তোমায় কখনও ফেলতে পারবেন না।"

মণি এখন বড় হয়েছে, সেও বার বছরের হতে চলল, কাজেই সে বললে, "শেখরদাও শুনেছি এখন খুব নামজাদা ডাক্তার, কিন্তু সে আমাদের ত খোঁজ নেয় না, আমরাই বা কেন!" অভিমানে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। অমলা শুধু বলে, "ছিঃ, তাঁর উপর রাগ করো না ভাই, তিনি আমাদের গুরুজন।"

মণি চলে গেল। অমলা প্রায়ই বাগানের দিকে বারান্দায় বসে থাকে—অনেক রাতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলে উঠে যায়—কত সময় রেলের ইঞ্জিন সামনে হুইসেল দিয়ে ওঠে—অমলার মনে হয় যেন তাকেই ডাকছে—ওরে আয়, আয় ছুটে আয়। অমলার রাতদিন ভেবে ভেবে ক্রমে মাথা এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল—কি যে সে ভাবে। বাড়ীতে যারা আছে তারা এক একবার বলে, বৌমার বোধ হয় কোন রোগ হয়েছে, খায় না, ঘুমোয় না, কি যে ভাবে রাতদিন। জিজ্ঞাসা করলে বলে—কই না, কোন অসুখ ত করেনি। বুড়ো ঝি একদিন অমলাকে বলে, "হ্যাঁ বৌমা, তুমি কেন সব মহাভারত রামায়ণ বেহুলা এসব পড় না? ভগবানকে ডাকলে মানুষের কত জন্মের পাপ ক্ষয় হয়ে যায় মা!"

অমলা কোন জবাব দেয় না, এ বিষয়ে কোন দিন তার উৎসাহ ছিল না; ভগবানকে কোন দিন ডাকতে শেখেনি—কেউ তাকে বলেনি ভগবানের কথা; মানুষ যখন নিজেকে বড় অসহায়, বড় একলা মনে করে তখন তাঁকে স্মরণ করলে—আর তার দুঃখ থাকে না। কিন্তু হায় অভাগিনী অমলা, জন্মাবধি দুঃখ পেয়ে পেয়ে সত্যই তার মাথা বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। একদিন রাতে সে বিছানায় উঠে বসে ঝিকে ডেকে বললে, "এই আমি শেখরদার কাছে যাচ্ছি।" ঝি তখন তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন—কথাটা শুনে ভাবলে—পাগলের মন বৃন্দাবন—কখন কি বলে—কিন্তু একসময় উঠে দেখে মনিব-গৃহিণী সত্যই আর ঘরে নেই—খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল, ঠিক সেইদিন সকালে শেখর মণির হাত ধরে এসে গেটে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে, "বাবুজি ঘরমে হায়?"

দরোয়ান হয় ত মনে করেছিল শেখরকে পুলিশের লোক, সেজন্য সেলাম করে বাগানের ভেতর বেঞ্চিতে নিয়ে বসালে এবং বললে—"জরুরী কামসে বাহার গিয়া হায়, আপ্ হিঁয়া বৈঠিয়ে।"

মণি বাড়ীর ভিতর ছুটে চলে গেল, দিদিকে ডাকতে…

শেখর বেঞ্চে বসে দেখলে পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড বাড়ীটা যেন নিশ্চল, কোলাহলশূন্য, মনে হচ্ছে যেন কত দুঃখের, নৃশংস ব্যাপারের অলিখিত ইতিহাস বুকে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই একটা একাণ্ড পুকুর, মনে হ'ল পুকুরের কালো জল যেন ভোরের উদাস বাতাসে কি এক লোমহর্ষণ কাহিনী বুকে নিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। শেখর একটু অস্থির হয়ে গেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, "দরোয়ান, বাড়ীমে কি কই নেই হায়?"

—"জী হুজুর, সব বাহার চলা গিয়া—বড়া জরুরী কাম প্যার গিয়া, আপ্ কাঁহাসে আতে হেঁ?"

বলতে না বলতেই মণি ছুটে এসে 'শেখরদা' বলেই কেঁদে ফেললে।

শেখর ব্যস্ত হয়ে বললে, "কি হয়েছে মণি?"

—"দিদিকে রাত্তির থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, দিদি নাকি কোথায় চলে গেছে।"

—"সে কি! কে বললে?

—"দিদির বুড়ো ঝি।"

সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনখানা মোটর বাড়ীতে ঢুকল। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে শেখরের খুব আলাপ, তাকে দেখেই শেখর ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করলে। পুলিশ কমিশনার বললে, "বড়ই দুঃখের কথা ডাঃ ঘোষ, দেবেনবাবুর অল্পবয়স্কা পত্নীটি ট্রেন লাইনে আত্মহত্যা করেছে। শুনছি,

এঁরা বলছেন মেয়েটির নাকি কিছুদিন আগে থেকে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল। ও কি, মেয়েটি আপনার কেউ হন নাকি ?"

শেখর তাড়াতাড়ি বললে, "না, তবে এই ছেলেটির দিদি।" বলেই মণির হাত ধরলে, মণির অবস্থা তখন বড় শোচনীয়—সে অবস্থা ভাষায় বোঝান সাধ্যাতীত।

শেখর গেট থেকে বেরোলেই মণি বলে উঠল, "শেখরদা, ঐ লোকটাই আমার দিদিকে মেরে ফেলেছে !"

মণি যতই প্রশ্ন করে শেখর কোন জবাবই দেয় না, সে আর দাঁড়াতে পারছিল না, পাগলের মত টলতে টলতে শেখর বাড়ী এসে শুয়ে পড়ল—তার অনুশোচনার আজ আর শেষ কোথায় ? অমলা ! তার কথা, তার মুখ কেবলই মনে আসে—উঃ কত কষ্ট পেয়েই না আত্মহত্যা করেছে ; আর সে তার নিজের দুঃখটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ভুলে তার খোঁজ একবার করেনি, তাই আজ তার এই অসহনীয় শাস্তি। মানুষের গড়া বড় আশার জিনিষই ভেঙ্গে দেওয়া বুঝি বিধাতার নিয়ম ! ভগবান বিস্মৃতি দাও ! অমলা তাকে ভোলেনি—মণিকেও সে শেখরের কাছেই দিয়ে গেছে। এতদিন কখনও শেখর ভগবানকে ডাকেনি, বড় দুঃখে শোকে আজ ভেঙ্গে পড়ে সে ভগবানকে প্রাণ থেকে ডেকে বলে, 'ভগবান, যদি থাক, তবে তাকে শাস্তি দিও !"

শেখরের ঘরে রেডিও লাগান ছিল, কে গেয়ে উঠল-

"এসে দাঁড়াও দাঁড়াও বঁধু হে
আমার জীবন-নদীর ওপারে—"

শেখর তাড়াতাড়ি উঠে রেডিওর সুইচটা অফ্ করে দিলে। তাই ত বেলা আড়াইটা বেজে গেছে, বেচারা মণি কেঁদে কেঁদে অবসন্ন হয়ে শেখরের পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে। চাকররা মনিবের মন ও মেজাজের অবস্থা দেখে পাঁচ বার ডাকতে এসে ফিরে গেছে।

এবার শেখর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বেয়ারাকে ডাকলে এবং মণির চান করার ও খাবার ব্যবস্থা সত্বর ক'রে দিতে বলে সে-ও চান করতে গেল।

শেখর ভেবেছিল, মণির কাকা নিশ্চয় একবার মণির খোঁজ নিতে আসবে, কিন্তু না, সে বোধ হয় বর্ত্তে গেছে।

শেখরের এখন একমাত্র কাজ হ'ল—মণিকে মানুষ ক'রে তোলা, অমলা যে তারই উপর ভার দিয়ে গেছে।

কতদিন রাতে শেখরের ঘুম ভেঙ্গে যায়—সে বিছানায় উঠে বসে। ঐ যে একখানা ট্রেন যায়—হ্যাঁ ঐ ত—উঃ……

আজিও ট্রেনের বাঁশী বেজে ওঠে—নিয়মিত ট্রেন যায়, কিন্তু শেখরের বুকের ভেতরের হাড়গুলো যেন মড় মড় ক'রে উঠে। ট্রেনের সেই একটানা ঝ্যাক্ ঝ্যাক্ শব্দ—উঃ শরীরের সমস্ত অস্থি পঞ্জরগুলি মাড়িয়ে আর কতদূর যাবে ?

ভূগোল আলোচনায় নববিধান

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্-এ, বি-টি (ক্যাল), ডিপ, এড (এডিনবরা ও ডাবলিন)

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমার ভূগোলের অধ্যাপক মিষ্টার অগিল্‌ভি ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার ড্রিভারের উপদেশমত তিন মাস গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে কয়েক সপ্তাহের জন্য রিজিয়ান সার্ভে প্রণালীতে ভূগোল শিক্ষা করিতে লণ্ডন হইয়া ডার্টমোর পৌছিলাম। রিজিয়ান সার্ভে ক্যাম্প সেবার ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এক্‌সিটার ইউনিভার্সিটির রীড হলে বসিয়াছিল। লণ্ডনের লিপ্লেহাউসের ট্রাষ্টি মিষ্টার আলেকজাণ্ডার ফার্কার্সনের অধীনে সমগ্র ডার্টমুরের সার্ভে অনুষ্ঠিত হয়। মিষ্টার ফার্কার্সন এই প্রণালীতে সমগ্র ইউরোপের নব ভূগোল লিখিবেন বলিলেন।

এক্সিটার শহর এক্সিটার নদীর উপর আন্দোলিত কৃষি-ভূমির মাঝে চির-সবুজ পাইনবনভূমিসহ ঈষৎউন্নত টিলা বক্ষে ধারণ করিয়া নীলিমাজড়িত পিঙ্গল মৃত্তিকাময় বিস্তৃত মালভূমি দ্বারা একদিকে পরিবৃত রহিয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সেখানকার পনীর জগদ্বিখ্যাত ; প্রথমেই শহরের দক্ষিণ অংশে বেড়াইতে গিয়া ডেরীর দোকানে বসিয়া কোকোর সঙ্গে সে পনীরের আস্বাদ গ্রহণে তৃপ্ত হইলাম। তারপর ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটারী-বাড়ী দেখিয়া বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় রীড হলে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের লেডী-সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিলাম ; তিনি আমার থাকিবার ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার পর বাট্‌লারকে ডাকিয়া আমার খাওয়াদাওয়ার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে লাঞ্চের সময় উপস্থিত হইল। আমি ভোজন-হলে প্রবেশ করিলেই অধ্যাপক তাঁহার চেয়ারের পাশেই আমার চেয়ার দিতে বলিলেন। অধ্যাপক স্মিথের স্ত্রীও তাঁহার আর একধারে বসিয়াছিলেন। খাওয়ার টেবিলের আদব-কায়দা

রক্ষার জন্য সদা উৎকণ্ঠিত ভারতীয় ছাত্রের মনোবৃত্তি লইয়া ক্ষুধার্ত্ত আমি নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিলাম—মহিলাদের সামনে ত বটেই। অধ্যাপক ফার্কাসন আমার সঙ্গে ভারত বিষয়ে অনেক আলাপ করিলেন, আর বলিলেন যে তিনি এই প্রসঙ্গে খাওয়ার সময় প্রত্যহই আলোচনা করিতে পাইলে আনন্দিত হইবেন; আমি কিন্তু সেদিন বেশী কথা বলিতে গিয়া খাওয়ার বিষয়ে পিছাইয়া পড়িতে লাগিলাম; কারণ আমরা একসঙ্গে খাওয়া ও বাজনায় ত অভ্যস্ত নই। যাহাই হউক, পেট ত ভরাইতে হইবে। শেষে তাড়াতাড়ি পনীরও বিস্কুট খেয়ে ক্ষুধানল প্রশমিত করিতে লাগিলাম। তখন অনেকেরই প্রায় খাওয়া শেষ হইয়া আসিল দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "I eat like a hungry Quartin Darward, coming as I do from Edinburg." ইহাতে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা হাসিয়া বলিলেন, "Never mind, carry on"

তারপর দুইটা বাজিলে আমাদের দল প্রাথমিক পরিদর্শনে বাহির হইলেন। তাহাতে মেয়ের সংখ্যাও কম ছিল না। সঙ্গে রহিলেন মিষ্টার ফার্কার্সন ও অধ্যাপক ওয়ার্ড। ফার্কার্সন সাহেব বিভিন্ন প্লটগুলি নোট করিতে বলিলেন। তার মধ্যে কৃষি জমি, পতিত জমি, পশুচারণ ভূমি, বনভূমি, জলাভূমি, নালা প্রভৃতি ছিল। আর ওয়াড সাহেব ফিরিবার পথে লালচে, কাল, বেলে, মেটেল, আগ্নেয় ইত্যাদি মৃত্তিকা-ভেদে গাছপালা দেখাইতে লাগিলেন; কৃষকদের জন্য ঘরবাড়ী সমেত আবাসস্থল ও কৃষিক্ষেত্রেরও ব্যবস্থা দেখিলাম স্থানীয় কাউন্সিল করিয়া দিয়াছেন। আমরা সব নোট করিতে লাগিলাম। তারপর হলে ফিরিয়া আসিয়া চা টোষ্ট জ্যাম মাখন প্রভৃতি দিয়া বিকালের চা খাওয়া সমাপন করিলাম; সন্ধ্যার পর দিনের কাজের, ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণ ও মতামতের আলোচনা হয়; সভাপতি থাকিতেন ফার্কার্সন সাহেব। তিনি আমার উত্থাপিত অনেক বিষয়ই সাদরে গ্রহণ করিয়া আমায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। সকালের ব্রেকফাষ্টে ডিম, টোষ্ট, মাখন, জ্যাম ও চা থাকিত। তারপর আমরা লেবরেটারীতে গিয়া পূর্ব্বদিনের ভৌগলিক পরিদর্শন বিষয়ক চিত্র অঙ্কন করিতাম। সংগৃহীত বিবরণ ম্যাপ, চিত্র ও লেখায় প্রতিফলিত করা হইত। এই সকল কাজের নমুনা সেখানে পর পর সাজান হইত। মেয়েরাও আমাদের সঙ্গে বসিয়া কাজ করিতেন। তাঁহারা রীড হলের এক অংশে ও আমরা আর এক অংশে থাকিতাম। মাঝখানে ছিল বিস্তৃত সিঁড়ি। নিকটবর্ত্তী আসবার্টন প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শনের দিন চ্যারাবাঙ্ক মোটরবাসে করিয়া ভৌগলিক ও ভূতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করি। এই দিন গ্রানাইট পাথর, কার্বনিফেরাস কাদা মাটি, আগ্নেয়শিলা ও শ্লেটশিলার অবস্থান আমরা দেখি। ঐতিহাসিক জিনিষের মধ্যে ডার্টমোর পাহাড়ের উপর সেকালের ব্রিটনদের কয়েকটি অবশেষ চিহ্ন ও নিম্নভূমিতে আড়াই শত বৎসর আগেকার ইংরেজী গোলাবাড়ী আমরা দেখিয়াছিলাম। গোলাবাড়ীর গড়ন ও খড়-ছাওয়া চাল আমাদের দেশের খড়ুয়া গোলাবাড়ীর মতই দেখাইতেছিল। পথের মাঝে চারাবাঙ্ক থামাইয়া আমরা একটি সরাইয়ের মত চায়ের দোকানের সামনে লাঞ্চ সমাপন করিলাম। মেয়েরাও স্নেহবশে আমাদের একটু আধটু কেক পিঠা তাঁহাদের আনীত খাদ্য হইতে দিলেন। আসবার্টন পল্লী দেখার পরে ওয়াইডিকোমের চায়ের দোকানে আমাদের পার্টি অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গদতায় চা পানে পরিতৃপ্ত হয়। পদব্রজে পরিক্রমের সময়ে আমি পিছনে আসিতেছিলাম; একদল বালকবালিকা ছুটিয়া আসিয়া আমায় লজেন্স দিয়া আপ্যায়িত করিল দেখিয়া অধ্যাপক ফার্কার্সন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ইংরেজ বালক বালিকারা দেখিতেছি তোমাকে আমাদের চেয়ে বেশী ভালবাসে।' তালীবৃক্ষ শোভিত টরকীর সুশোভন সমুদ্রতীর দেখার ভাগ্য আমাদের সকলের হয় নাই। সন্ধ্যার পর সেদিন আমরা রীড হলে ফিরিলাম। লীড্‌স হাই স্কুলের মিষ্টার স্মিথ আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন ও সমাজসম্মিলনে বলিলেন, "We like Indian students of the type of Mr. Sarkar who helped a better understanding between England and India." আমার ফিরিবার সময়ে তিনি স্নেহবশত তাঁহার অমূল্য সময়ের খানিকটা নষ্ট করিয়া আমাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন; বিদায়ের সে দৃশ্য এখনও আমার প্রাণে জাগিয়া ওঠে।

আকর্ষণ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মোটর দুর্ঘটনার পর আহত নির্ম্মলকে যখন তার মনিব মিষ্টার ঘোষাল বাড়ীতে নিয়ে এলেন তখন সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। মিষ্টার ঘোষাল ও তার বেয়ারা নির্ম্মলের রক্তমাখা জামাকাপড় ছাড়াইয়া দিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। পরিত্যক্ত জামার পকেটগুলো বেশ ক'রে দেখে নিয়ে পকেটের কাগজ ও নোটবুকখানি একখানি রুমালে বেঁধে বেয়ারাকে আদেশ দিলেন—সেগুলো তার টেবিলের উপর রেখে আসতে। ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ, বেঁধে ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন, বললেন—"ভয় নেই, আঘাত গুরুতর নয়।" মিষ্টার ঘোষাল তার কাছে লোক থাকবার ব্যবস্থা ক'রে উপরে চলে গেলেন।

বৈকালে একখানি মোটর এসে মিষ্টার ঘোষালের দরজার কাছে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নেমে এল একটি উনিশ-বিশ বছরের মেয়ে। রং তার দুধে-আলতায় মিশান, নিটোল গোলগাল চেহারা। পায়ে ফ্যাশের লেডিস্ সু. 'ফ্রেঞ্চ লেডির' অনুকরণেই তার পোষাকের পারিপাটি, চুলগুলো বব ক'রে ছাঁটা। মিষ্টার ঘোষাল তাকে দেখে উপর থেকে নেমে এসে বললে, "এই যে মিস্ রেবা! আপনি এসেছেন? আমি ভাবলাম একটা ছোট দুর্ঘটনার কথা শুনে হয়ত আপনার বাবা আমার মত নটি বয়ে'র সঙ্গে মিশতে বারণ করেছেন।" রেবা তার চোখ দুটি টেনে রেশমী আলতো চুলের গোছাটাকে মুখের সামনে সরিয়ে বললে, "ছোট দুর্ঘটনা! আপনি বলেন কি মিষ্টার ঘোষাল? প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আবার আপনি বলছেন ছোট দুর্ঘটনা! আচ্ছা, আপনার শোফার এখন কেমন আছে মিষ্টার ঘোষাল?" ঘোষাল রেবার হাত ধরে উপরে যেতে যেতে বললে, "ভালই আছে, আর ভয় নেই। এখন জ্ঞান ফিরে এসেছে।"

রেবা এখন মিস্ রেবা চাটার্জ্জি। কলকাতা শহরের নামজাদা ধনী ব্যবসায়ী মিঃ বি চাটার্জ্জির একমাত্র আদরের দুলালী। মিষ্টার চাটার্জ্জি স্ত্রী স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী। বিলাতী আদব-কায়দা খুবই পছন্দ করেন, তাই তিনি বিলাত-ফেরত শিক্ষিত যুবক মিষ্টার ঘোষালের সঙ্গে রেবার অবাধ মেলামেশায় বাধা দেন না। মিষ্টার ঘোষাল রেবাকে বসিয়ে তার টেবিলের ফ্যানখানা খুলে বেয়ারাকে চা দিতে বলে পাশের কামরায় চলে গেল সান্ধ্য ভ্রমণের পোষাক পালটাতে। রেবার চা খেতে খেতে নজর পড়ল টেবিলের উপর, তারই নামাঙ্কিত রুমালের একটা মোড়ক। বিস্ময় কৌতুকে সে রুমালে বাঁধা মোড়কটি খুলে দেখলে তার ভেতর রয়েছে, কতকগুলো আজেবাজে কাগজ ও একখানা ছোট খাতা। সেই খাতা খানার দু-এক পাতা উলটাতে তার মনটা আরও সন্দেহে ভরে উঠল। সে লুকিয়ে নিলে সে খাতাখানা তার হাতের 'ভ্যানিটি ব্যাগে'র ভেতর, তারপর মোড়কটি পুনরায় সেই রকম ভাবে বেঁধে রাখলে।

মাসখানেক পরে নির্ম্মল সেরে উঠল বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বেকার স্মৃতি ফিরে এল না। সে যেন নূতন দেশের মানুষ, সবাই তার কাছে অপরিচিত। রেবা ঘোষালের বাড়ী যায়, নিত্য নির্ম্মলের কাছে বসে। নির্ম্মলের ভাল লাগে রেবার সান্নিধ্য, সে ভুলে যায় রেবা তার মনিবের ভাবী পত্নী।

মিষ্টার ঘোষাল মিষ্টার চাটার্জ্জির কাছে নিত্য যায়। রেবাদের চায়ের টেবিলে রেবা না থাকলেও অহেতুক কতকটা গল্প ক'রে চাটার্জ্জিকে জানিয়ে দেয় রেবার সঙ্গে 'এন্‌গেজমেণ্ট'টা শীঘ্র পাকা বন্দোবস্ত না করলে সে আমেরিকায় যাবে একটা চাকরি নিয়ে। চাটার্জ্জি কোন 'ফাইন্যাল' দিতে পারে না, কারণ রেবার মতটা এখনও ঠিক জানে না; আজকাল যেন রেবা ঘোষালকে এড়িয়ে চলে, এর কারণ কি? রেবা নির্ম্মলকে সেই খাতাখানা ফিরিয়ে দেয়নি। খাতাখানায় লেখা আছে নির্ম্মলের পিছিয়ে-পড়া জীবনের কতকগুলো দিনের ইতিহাস। রেবা সেদিন সেখানা চুরি করে এনেছে, একলা বসে চুপি চুপি পড়েছে, নির্ম্মলের দুঃখ দেখে সে নিজেও কেঁদেছে গোপনে বালিসের আচ্ছাদন ভিজিয়ে। যদি জানতে চান, ডায়েরিটা কি—যা পড়ে রেবার মত মেয়ের চোখে জল আসে, ঘোষালের মত বিলাত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ারকে এড়িয়ে চলে—তবে সেকথা আমায় বলতে হবে রেবার বাপ চাটার্জ্জিকে শুনিয়ে।

মিষ্টার চাটার্জ্জি কলকাতার মধ্যে একজন মস্ত বড় ধনী ব্যবসায়ী। 'ডিস্‌ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার' মিষ্টার ঘোষালকে জামাই করবেন, একথা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সবাই জেনেছিল এবং এদের নব-দম্পতির কোর্টশিপের স্থায়ী বন্দোবস্তের আয়োজনেই ডায়মণ্ড হারবার রোডে একটা টি পার্টির দিন স্থির হয়েছিল। অথচ রেবার এই এড়িয়ে চলা ভাব দেখে রেবার পিতা অনেকটা দমে গেলেন। কারণ তিনি জানেন না, অথচ জিজ্ঞাসা ক'রে কোন জবাব পান না।

একদিন রেবা এসে বললে, "নির্ম্মলবাবুর মামার বাড়ী আমাদের দেশের পাশের গ্রামে, সেখানে একটু খবর করলে হয় না বাবা? যদি কেউ আত্মীয়-বন্ধু থাকে তাহ'লে অসময়ে যত্ন করতে পারে।" চাটার্জ্জি তখন খবরের কাগজ থেকে মুখ নামিয়ে বললেন, "হতে পারে আমাদের দেশের লোক, ওসব পরের ঝন্‌ঝাটে কি দরকার রেবা? সম্পর্ক আমাদের ঘোষালের সঙ্গে, তার ড্রাইভারের সুখদুঃখের আমরা কেন সাথী হই?" রেবা সেদিন কিছু বললে না, কিসের লুকান ব্যথায়

বুকটা টন্‌টনিয়ে উঠল। সে সেদিন রাত্রে কিছু খেলে না। যখন সে ঘরে ঢুকেছিল বাইরে তখন বাদলের ধারা, বাতাস অশান্ত গতিতে রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে ফিরে আসছে, সর্পিল গতি নিয়ে বিদ্যুৎ ছুটে চলেছে—মেঘভরা আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে। রেবা তখন বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল অসহায় একটি জীবনের মমতায়।

রাত্রি প্রভাত হয়েছে। আকাশের মেঘ কেটে এসেছে। রেবা ঘরের বাইরে এল, দেখলে বাড়ীখানা তাদের তখন ঘুমুচ্ছে। কেবল বাইরে গেটের কাছে একটা বেড়াল রাত্রের বৃষ্টিতে ভিজে কাঁদছে আর ঘুরে ঘুরে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। রেবা নীচে নেমে গ্যারেজ খুলে তার মোটরখানি বার ক'রে নিলে। তারপর রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন সাদা আকাশের ওপর জলঝরা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। রেবা ড্রাইভ ক'রে চলল তার সেই অষ্টিনখানা, ভবানীপুর কালীঘাট পার হয়ে টালিগঞ্জ ট্রাম লাইন ধরে। গাড়ীখানা চলল ফুল স্পীডে। অষ্টিনখানা তাকে নিয়ে চলল। পঞ্চাশ…ষাট…পঁয়ষট্টি মাইল স্পীডে গাড়ীখানা চলল। হাতের 'ষ্টিয়ারিং'টা যেন কোন রকম বশে নেই, স্পীড যেন আয়ত্তে নয়। এরকম করে সে চালিয়ে গেল মাইল কতক। তারপর কি মনে হ'ল, সে ফিরে এল ঘোষালের বাড়ীর দিকে।

ঘোষাল তখন ভাবী জীবনের কি একটা স্কীম করছিল। সিগারেট আধখানা পুড়ে ছাই হয়ে হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে গোঁজা রয়েছে, সামনে গরম চায়ের কাপটি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা জলের মতই হয়ে গেছে। রেবাকে দেখে তার চমক ভাঙল। সে বললে, "আসুন, মিস্ চাটার্জ্জি! আমি সকালবেলায় ভাবছিলাম আপনাদের টী টেবিলে যোগদান করব।" রেবা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, তাড়াতাড়ি সে বললে, "আমি ত সেই জন্যেই আপনাকে ডাকতে এসেছি।" ঘোষাল লাফিয়ে উঠে বললে, Well, just a minute, আমি ঘর থেকে আসছি।" রেবাও বললে, "আমি নীচে আছি মিষ্টার ঘোষাল। নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে একটা জরুরী কথা শেষ করে নিই।"

রেবা যখন বাড়ী এল, তার বাবা চায়ের টেবিলে বসেছেন। বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আনতেই রেবা বললে, "বাবা! চা-টা আজ আমি নিজেই করি।" মিষ্টার চাটার্জ্জি সস্নেহে বললেন, "বেশ ত মা, আজ তোর পরীক্ষা নিই।"

মিষ্টার চাটার্জ্জি চা খেতে খেতে বললেন, "কালকের কাগজে দিয়েছে 'টেনিস টুর্নামেন্টের' তারিখ। প্রথম খেলাতেই হীরেন ঘোষালের নাম।" রেবা তখন কি ভাবছিল, সে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, "হ্যাঁ বাবা! সোমেশ ব'লে আমাদের কেউ আত্মীয় ছিল?" মিষ্টার চাটার্জ্জি এই প্রশ্ন শুনে শিউরে উঠলেন, যেন কিসের আতঙ্কে বুকটা তার বিঁধিয়ে উঠছে। তিনি থতমত খেয়ে নিজেকে আবার ঠিক ক'রে নিয়ে উত্তর দিলেন, "না—কেউ ছিল বলে ত মনে পড়ছে না।"

রেবা ফট্ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, বাবা, আমি বিধবা, না কুমারী?" মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বললেন, "বিধবা! কে বললে? না রেবা, তুই কুমারী। তোর মনে আজ এ কি সন্দেহ জেগেছে মা?" রেবা ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে বল্লে, "সত্যিই কি আমার বিবাহ হয়েছিল আর আমার স্বামীর নাম সোমেশ?" চ্যাটার্জ্জি জোরের সহিত বললেন, "মিথ্যা কথা, বিয়ে হয়নি। সোমেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ হয়।" রেবা তখন বাপের কাছ থেকে ছুটে পালাতে যাবে, চাটার্জ্জি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "রেবা, কাছে আয়। আমার কথা শোন্।"

দিনের পর দিন কেটে যাবার পর একদিন রেবা আর মিষ্টার চাটার্জ্জি মিষ্টার ঘোষালের বাড়ীতে টী পার্টির নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল। কদিন মিষ্টার ঘোষাল 'ইন্‌স্পেক্‌শ্যানে' গিয়েছিল। কোথাকার একটা বাঁধ নাকি নদীর বাঁধনহারা গতিকে আটকে রাখতে পারছিল না। সে বাড়ী ফিরতে চাটার্জ্জি তাকে ডাকিয়ে পাঠালেন—টী পার্টির আবশ্যকীয় জিনিষের ফর্দ্দ করতে। ঘোষালের মনে যে ঝড় উঠেছিল—তা থেমে গেল, যখন দেখলে চাটার্জ্জির টী পার্টির উদ্দেশ্য নয়—এ তার ভাবী জীবনের স্কীমেরই একটা দৃশ্যাভিনয়। তাই সে উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে গেল।

উৎসবের দিন। চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ততার হৈ চৈ পড়ে গেছে, সবারই মুখে হাসির রেখা। চাটার্জ্জি চেয়ারে বসে সবাইকে আহ্বান করছেন। কেউ সবজজ, কেউ ইন্‌জিনিয়ার' কেউ বিলাত ফেরত ডাক্তার। যে আসছে তাকেই চাটার্জ্জি যত্ন করে বসাচ্ছেন। একদিকে তরুণের দল ঘোষালকে কাজে-অকাজে বাধা দিয়ে তারুণ্য-সুলভ রহস্য করছে, অপর দিকে তরুণীদল রেবার বাছাই বন্ধু অমিয়া, অসিতা, নমিতা, কণিকা—এরা সব রেবাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে। এত উৎসবে রেবার মনে আনন্দ নেই, সে কোন জবাব দেয় না। জোর করে হাসি টেনে এনে সেখান থেকে চলে যায়, খুঁজে বেড়ায় ঘোষালের সঙ্গে নির্ম্মল এল কি না?

উৎসবে সবাই জমায়েত হয়েছে। তরুণীদলে বেবির গান শেষ হয়ে গেল। রেবা তার বাপের পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়ল যেন সে কত ক্লান্ত। সে তার বাপকে বললে, "বাবা! মিষ্টার ঘোষালের শোফার নির্ম্মল কি এসেছে? যদি এসে থাকে তাহ'লে তাকে এখানে ডাকান না।" নির্ম্মল এসে হাজির হ'ল। রেবা বললে, "বসুন মিঃ মুখার্জি পাশের চেয়ারখানায়।" এর পাশেই মিষ্টার ঘোষালও বসেছিল! রেবা তার ব্লাউসের ভেতর থেকে একখানা ফটো বার করে বললে, "বলুন নির্ম্মলবাবু, এ ফটো কার? কোথা থেকে চুরি করে এনেছেন?"

নির্ম্মল সহজভাবেই উত্তর দিল, "চুরি আমি করিনি মিস্ চাটার্জ্জি! আপনি করেছেন, ও ফটো আমার নিজের। আমার বিয়ের পরদিন ঐ ফটো তোলা হয়।"



অম্বাপালী গৃহে গৌতম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

"ইনি বুঝি আপনার বিবাহিত স্ত্রী ? এঁর নাম কি ?"

"রেবতী।"

মিষ্টার চাটার্জ্জি তখনই ফটোখানা তুলে নিয়ে দেখে চমকে উঠলেন। রেবা তখন ডায়রির খাতাখানা নিয়ে বললে, "এ খাতা কার ?"

"যার নাম লেখা আছে।"

পাশ থেকে ঘোষাল তাড়াতাড়ি রেবার হাত থেকে খাতাখানা কেড়ে নিয়ে বললে, "কই দেখি, ডায়রিতে কি লেখা আছে ?"

রেবা তখন শরাহত হরিণীর মত ছটফট করছিল। সে বলে উঠল, "মিষ্টার ঘোষাল, এতদিন যা ভেবে এসেছেন সব ভুলে যান। আর আপনিই ডায়রিখানা পড়ে সভার সকলকে শুনিয়ে দিন আমার জীবনের অতীত ঘটনাগুলো।

মিঃ ঘোষাল যখন ডায়রির কথা পড়তে আরম্ভ করেছে তখন রেবা তার পিতার কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ডায়রিতে লেখা ছিল—

"আজ যাকে সবাই মিঃ বি চাটার্জ্জি বলে জানে তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জে। তোরণপুর গ্রামের সবাই জানে অমর মুখুজ্জ্যে ছিলেন তাঁর বন্ধু। সোমেশ ছিল অমরের একমাত্র পুত্র, আর রেবতী বিশ্বে-শ্বরের একমাত্র কন্যা। এই রেবতীর সঙ্গে সোমেশের বিবাহ হয়। তাদের বিবাহের সময় তাদের বয়স ছিল পাঁচ আর সাত। সর্ত্ত ছিল, বিশ্বেশ্বরের সে মেয়েকে তিনি ছেলের মতন মানুষ করবেন। যতদিন না মেয়ে আর ছেলের পড়া শেষ হয় ততদিন কেউ কাউকে চেনবার সুযোগ দেবে না বা পাবে না। এই বিবাহ হয় অমরের স্ত্রীর একান্ত জেদেই।

"কিছু দিন পরে অমর মুখুজ্জ্যে মারা গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও তাঁর অনুগামিনী হলেন। জ্ঞাতিরা সোমেশকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। কিছুদিন পরে জ্ঞাতিরাই রটালে, সোমেশ মারা গেছে কিন্তু সোমেশ মারা যায়নি! মামা-মামীর সঙ্গে কোন কারণে সে ঝগড়া ক'রে কানপুরে পালিয়ে যায়।

"কানপুরনিবাসী রসিকলাল ঘোষ তাঁকে আশ্রয় দেন, তখন সোমেশের বয়স ছিল দশ। তারপর পনর বছর কেটে গেছে। সোমেশের জীবনটা যেন একখানা নাটক, দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় হয়ে যাচ্ছে। রসিকবাবুর সাহায্য না পেলে আজ আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতাম না তিনি পুত্রহারা হবার পর আমায় পেয়ে নিজের ছেলের মতন লালনপালন করেন এবং তাঁর নিজের ছেলের নাম অনুযায়ী আমার নাম রাখেন নির্ম্মল। সেই নির্ম্মল আমি।

"তাঁরই চেষ্টায় লেখাপড়া শিখি। ডাক্তারি পাশ ক'রে বিগত মহাযুদ্ধে ডাক্তার হয়ে গিয়েছিলাম মেসোপটেমিয়ায়। মনে হয়েছিল—যাই বন্দুক নিয়ে কামানের সামনে এগিয়ে যাই ; কিন্তু কি জানি কিসের আশায় আবার মনকে দমিয়ে নিই। একদিন 'ইণ্ডিয়ার করসপনডেন্স' বইয়ে দেখি, রেজিমেণ্ট পোষাক সাপ্লায়ার রেবার বাবার নাম। তখনও জানতাম না রেবার বাবাই আমার শ্বশুর। নামটার ওপর কি রকম মমতা বা মোহ আসে। আমি চলে আসি ভারতে, দেশে ফিরে যাই। কেউ আমাকে চেনে না। আমি তখন শরীরে ও পোষাকে অনেক বদলে গিয়েছি। আমিও কারো কাছে পরিচয় দিইনি। তারপর কলকাতায় আসি। শুধু গোপনে রেবাকে দেখি, আমার ছেলেবেলার রেবতী—সাত পাকের বাঁধা। সে তখন অজ্ঞান ছিল, তাই এখন সে অপরের কাছে প্রেম নিবেদন করেছে।

"ঘোষালের বাড়ীতে কাজ নিয়েছি ড্রাইভারি শুধু রেবতীকে দেখবার জন্য। বাবা তার চিনেছে পয়সা ; জানে না অগ্নিসাক্ষাতে দুটি কোমল প্রাণের পরিণতি। পয়সা তাঁর সব হতে পারে, কিন্তু সোমেশের খোঁজ করা কি তাঁর কর্ত্তব্য ছিল না ?"

ঘোষাল ডায়রির খাতা মুড়লে। মিষ্টার চাটার্জ্জি নির্ম্মলের হাতখানা ধরে বললে, "নির্ম্মল—সোমেশ, স্নেহের বশেই করেছি। রেবাকে জানতে দিই নি যে সে বিধবা। তোমার জ্ঞাতিরা যখন আমার কাছে এসে তোমার সম্পত্তির বিক্রী কওলা লিখে নিয়ে গেল, সেই থেকে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসি—পাছে রেবা জানে যে সে বিধবা।" এই বলে মিষ্টার চাটার্জ্জি শিশুর মত কেঁদে ফেললেন।

আবির্ভূতা

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

সত্যই তুমি এসেছ কি অন্তরে ?
অথবা আমার আকুল বাসনা নয়নে রচনা করে
স্বপনের ছবি নিজেরে ছলিতে শুধু,
মরুপ্রান্তর যেথা করিতেছে ধূধূ
মায়া-মরীচিকা সেথায় এমনি বাপীতটরেখা আঁকে
দগ্ধ ধূলিরে শ্যামলাঞ্চলে ঢাকে।

সত্যাসত্যে কিবা মোর প্রয়োজন ?
আসলে নকলে কোনো ভেদাভেদ জানে না ত এ নয়ন!
তোমার মূরতি আঁকে যদি কল্পনা
ক্ষতি কিবা তায় ? স্বপ্ন ত ভিন্ন না
অনুভূতি মাঝে ; দরশে পরশে স্বরূপের ঠাঁই নাই,
অনুভবে শুধু তার পরিচয় পাই।

শিকার-কাহিনী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ

সিংহশ্রী গ্রামখানি নদীর উপরে—ভারী সুন্দর—বেশ লাগিল। রামনিধি চক্রবর্ত্তী বড় সুমানুষ। মুখে হাসি, কথায় মিঠা, ব্যবহারে ভাইএর মত। সাংসারিক অবস্থা বেশ। ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট। পুকুরভরা মাছ। চারিদিকে লোকজন আছে। নদীতে প্রচুর মাছ। মাছ ধরবার সরঞ্জাম ঘরে সাজান। পঁচিশ-ত্রিশখানি পাকা লাঠি, হলঙ্গা, জাঠা, রামদা, কুচ্, আতব, দাউন বর্শা—ঠিকঠাক আছে। আঙ্গিনার মাঝে বিশাল আটচালায় মাচার উপর বাঘধরার জাল, মাছ ধরার জাল, বাঘের রশি—সব আছে। চারিদিকের দশ-বিশ জন মানুষ দিনরাত্রি এই বাড়ীতে আছেই আছে। অনেকে এখানেই সেবা দেয়। আর তামাক।

গাই দেখলাম কুড়িখানেক। তাজা—দুধওয়ালা। কয়েকটা পোষা হরিণ—ছোট ও বড়। গুটি দশেক দেশী কুত্তাও দেখলাম—বেশ পুষ্ট—জবর আওয়াজ—বেজায় সাহসী। বাঘের দোসর—দেশী ও সরাইলী।

সন্ধ্যার পরে আঙ্গিনার চারি কোণায় চিক ঝুলান হয়। চৌকলা বাঁশের মজবুত চিক্। চালের কোণায় কোণায় বাঁধা। দিনে উঠিয়ে রাখা হয়। বাঘের ভয়ে চিকের ব্যবস্থা। রাত্রিকালে উঠলে ত অন্তত নিরাপদ থাকে।

আর একটা দেখলাম—স্থানীয় লোকেরা বাঘকে থোড়াই হিসাব করে। খোলা আটচালায় ফরাসের উপর রাত্রিতে দশ জন ত রোজই ঘুমায়।

বাড়ীতে স্থানে স্থানে শুক্না কাঠ, জঞ্জাল জমান। প্রয়োজন হ'লে আগুন দেওয়া হয়।

এ বাড়ীতে মাছ ছাড়া তৈলের ব্যবহার নাই। ঘি প্রচুর। লুচি পোলাও মাংস হামেশা হয়।

প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা মশাল তৈরি থাকে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বন্দুকও আছে। নিজে ওস্তাদ শিকারী। বয়স হইয়াছে, কিন্তু বন্দুকের নিশান ঠিক।

আমরা শিকারের জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর সৌজন্য আর খাবার ব্যবস্থায়, গড়াগড়ি দেওয়া ছাড়া অন্য কার্য্য করার অধিকারই দু দিন ছিল না।

হরিণ শিকারের খুব আগ্রহ হ'ল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বললেন—বর্ষাকালে হরিণ শিকার বড় কঠিন। জঙ্গলের বড় ঝাড়-বাড়ন্ত—চারিদিকে লতার আর আগাছার মেলা! রাস্তা ঘাট জলকাদায় ভরা—জঙ্গল অগম্য। বাঘ প্রায় সব জায়গায় ঘোরাফেরা করে—হরিণগুলা কোন্ দিকে চরে বলা কঠিন। ওরা সব জায়গায় খাবার পায় কি-না, তাই আজকাল হরিণ শিকারের চেষ্টা না করাই ভাল। জংলী লোকেরা জানে বটে, কিন্তু ওরা ত বনবিড়ালের মত ছুটতে জানে, তোমরা তাদের সঙ্গে পারবে না।

অথচ আমাদের উৎসাহ তখন ষোল আনা। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বললেন, তবে নেহাৎ যখন সখ তখন আমার ঐ জালে-ধরা হরিণটা ছেড়ে দেই—ওটাকে গুলি করিয়া মার।

গত শুক্রবার এই হরিণটা ধরা গেছে। যেমন তাজা, তেমন সুন্দর—চঞ্চল, দুরন্ত; দুটা দড়িতে বাঁধা। বেশ বড় —শিং প্রায় এক হাত লম্বা, দুখানা ডাল বার হয়েছে।

হরিণ ধরার গল্পটীও ভারী সুন্দর। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলতে লাগলেন—আমার রায়ত বেচু আর তার দুই ভাই জাল নিয়ে নদীতে মাছ ধরছিল। জোছনা রাত। হরিণটা নদীর কাছারের উপর ঘাস খাচ্ছিল—সহসা নীচে পড়ে যায়—সাত-আট হাত নীচে। উঠবার পথ অনেকটা দূরে। বেচুর ভাই আনন্দ লগী হাতে লাফিয়ে পড়ল কাছারের নীচে—ভয় পেয়ে হরিণ ছুট্ দিল—অমনই নদীর জলে পড়ে গেল। প্রবল স্রোত—আর যায় কোথায়, বেচু তার গলায় দড়ি লাগাল। রাত্রি দশটার সময় তিন ভাই তাকে নিয়ে হাজির হ'ল আমার দুয়ারে।

এটা ছেড়ে দিতে পারি, যদি তোমরা গুলি করে মারতে ভরসা পাও।

ভদ্রলোকের উপর অতটা জুলুম করতে দ্বিধা হ'ল। তিনি বললেন—হরিণটাকে ছেড়ে দেওয়া মাত্র এটা ব্যস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটবে। তখন তার সাম্‌নে পড়লে হয় আক্রমণ করবে, না হয় দূরে পালিয়ে যাবে। তার চেয়ে কতক্ষণ ছুটাছুটি করে সঙ্গীদের খোঁজ করবে। কাছে হরিণদল পাবার কথা নয়। হয়ত নদীর পাড়ে গিয়ে পড়বে—তারপর আর চিন্তা নাই। নদীর পাড়ে পাড়ে গা ঢাকা দিয়ে ছুটবে, সে সময় গুলি ক'রো। সাবধান —জঙ্গলে গুলি করতে চেষ্টা করো না—আনাড়ির কর্ম্ম তা নয়। ঝোপে জঙ্গলে বাঘ বেড়ায়—যদি গুলি গায়ে লাগে তবে কিন্তু রক্ষা নাই। বিশেষত চিতা—বড় পাজী।

আমরা প্রাতঃভোজন শেষ করলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে আর দেখা হ'ল না।

হরিণ ত ছেড়ে দিল। বাবা, তার যা লম্ফ-ঝম্প আর দিশাহীন ছুটাছুটি! বন্দীর স্বাধীনতা লাভের আনন্দটা বেশ বুঝতে পারলাম। ছুট্—ছুট্—ঐ যায়—ঐ—

আমরা চারিজন ত বন্দুক ঠিক করে ছুটাছুটি করতে লাগলাম। হরিণের কোন পাত্তা পেলাম না। দু-একবার তড়িতের রেখার মত দূরে তার বিচিত্র দৌড়ভঙ্গী ও লম্ফ দেখলাম। বিপদ ঘটাল গাঁয়ের পাশের মানুষগুলা। ওরা "কর্ত্তার হরিণ যায় রে—ধর্—ধর!" আর হরিণের উদ্দেশ পাই না। দৌড়—দৌড়—

সহসা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল—কে বন্দুক ছোঁড়ে? ধোঁয়া পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে বেলা আড়াই প্রহরকালে বাড়ী ফিরলাম। সবিস্ময়ে শুনলাম, চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বয়ং ডিঙ্গি নৌকায় বসে হরিণটাকে মেরে এনেছেন।

হরিণের মাংস ইচ্ছামত খেলাম—দিন তিনেক। এ যাত্রায় হরিণ-শিকার আমাদের কপালে ছিল না।

কয়ার শিকার

আমার পিতামহ আর্‌জান মিরশিকারী আমাদের কয়ারের মাংস খাইয়েছেন। কয়ারের মাংস সুস্বাদু—এতে তৈল প্রচুর। কবিওয়ালা রামু গেয়েছিল—

"আরে ভগবান,
কয়ারে বামাইল মোছলমান॥
কয়ার কেটে দেখি থপ্‌রা থপ্‌রা তেল"

কয়ার খেয়ে এক ব্রাহ্মণের জাত গিয়েছিল। কয়ার বনমোরগ। বেশ বড়—পরিপুষ্ট—সুন্দর পাখী।

সিংহশ্রী থেকে আমরা গড়-গজালীতে শিকার করতে গেলাম। গুটি ছয়েক "কয়ার" মাত্র শিকার করা গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রিতে ফিরে এলাম। কয়ার তাঁরা খান না। পুষ্করিণীর আড়ে স্বয়ং কয়ার রান্না করে নিলাম। বেশ মাংস।

বাঘ

জংলী ছমকু পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল হরিণ শিকার করতে। ছোট্ট একটা খালের ধারে একদল হরিণ দেখা গেল। একটা বড় গাউজ, একটা শিং কোন দুর্ঘটনায় হয় ত ভেঙ্গে গেছে। জঙ্গলের আড়ে আড়ে গুড়ি মেরে চলতে লাগলাম—যদি হরিণটাকে গুলি মারতে পারি। আমাদের সঙ্গীর বন্দুকটা আমার হাতে ছিল। তাড়াতাড়ি চলতে সহসা পা পিছলে পড়ে গেলাম—বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ পড়তেই বন্দুকের আওয়াজ হয়ে গেল।

সুতরাং হরিণগুলা এক পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আমার অদূরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের গোড়ায় এক বিশাল ব্যাঘ্র গর্জ্জন করে উঠল।

বাঘের আকৃতি দেখে আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। সঙ্গীরা কেউ কাছে নাই। ছমকুকেও দেখা যায় না। বন্দুক ঠিক করতে সময়ের প্রয়োজন। বাঘ ততক্ষণ অপেক্ষা করবে এতটা বিশ্বাস আমার ছিল না। বাঘ আমার দিকে চাইল—চোখে তার আগুন!

আমি ছিলাম একটা বটগাছের নীচে। বটের জটাজাল মাটীতে পড়েছিল; আমি সেই জটাজাল ধরে অবিলম্বে হাত দশেক উঁচুতে উঠে গেলাম। তখন বাঘ আমার অনেকটা কাছে এসে ভীষণ গর্জ্জন করে উঠল। আমার হাত অবশ হয়ে এল, উপরের দিকে উঠবার সাধ্য ছিল না। যেখানে আছি—সে স্থানটি বাঘের আয়ত্তের বাইরে নয়। আর একবার উঠতে চেষ্টা করলাম—পারলাম না। বাঘ

লাফ দিল, দৈবাৎ আমার পা পর্য্যন্ত পায় নাই। আমি দু চক্ষে অন্ধকার দেখতে লাগলাম, হাত থেকে বটের জটা ছুটে গেল। ভূপতিত হতে হতে শুনলাম—

গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্‌ গুম্‌—এক সঙ্গে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ।

আমার জ্ঞান হ'লে দেখলাম, আমি নৌকায় শুয়ে আছি। খোলা ডিঙ্গি নৌকা।

ছমকুর সাহস আর অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতায় আমার জীবন বেঁচেছিল।

বাঘটা ঘায়েল হইয়াছিল, কিন্তু মরে নাই।

স্বাধীন সৌন্দর্য্য

জনকয়েক জংলী শিকারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা মত আমাদের নিয়ে গহিন জঙ্গলে শিকার করতে চলল। জঙ্গল বলে জঙ্গল—হাতী লুকোলেও দেখা পাওয়ার কথা নয়। না আছে পথ, না আছে চলার উপায়। চড়াই আর উৎরাই—এই টেঁক—এই লুস্‌ (নিম্নভূমি), ছমকু ভারী হুসিয়ার, নিম্নভূমিতে যাওয়ার আগে চারিদিক দেখে নেয়।

সে জায়গাটাকে নাকি "বিন্দুবাড়ীর গড়" বলে। গহিন বন—খুব টেঁক—উঁচু জায়গা। মরি মরি কি সুন্দর—দুটি বুনো মেয়ে—অমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য জীবনে দেখি নাই। এমন নিটোল স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল অথচ শান্ত চক্ষু, আয়ত ললাট, অপূর্ব্ব সাহস আমি ত আর দেখি নি। দুয়েরই বয়স অনুমান পনর-ষোল বৎসর। পরণে মোটা চটের মত কাপড়, নাভি থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত। সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত। হাতে দীর্ঘ কাটারি। অসংবৃত্ত নাতিদীর্ঘ কেশপাশ। দুজনাই বিস্মিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তারপর এক অব্যক্ত শীস দিয়া পলকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ছমকু বলল, এরা আদত বুনো।

"কি সাহসে এই বাঘ ভালুকের দেশে—নির্ভয়ে এরা টি প্রাণী বেড়ায়?"

"এদের হাতে ভুজালী থাকলে এরা বাঘের ভয় রাখে না। এরা এক পলকে ঐ উঁচু গাছের আগায় উঠতে পারে। এরা হরিণের মত ছোটে। বাঘের কি সাধ্যি এদের ছোঁয়।"

বাঘের বাচ্চা

আজ যেন জঙ্গলে শিকারের সাড়া নেই। আমরা গভীর জঙ্গল মন্থন করে চলতে লাগলাম। দু-দশটা পাখী শিকার করতে পারতাম, কিন্তু সে স্পৃহা আমাদের ছিল না।

জঙ্গলে দুটা বাঘের বাচ্চা খেলা করছিল। বাচ্চা দুটি ছোট—বেশ সুন্দর—খুব পুষ্ট। মেঘু নামে আমাদের এক সঙ্গী গিয়ে একটা বাচ্চা ধরে কোলে তুলে নিল এবং গায়ের মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলল।

ছমকু চীৎকার করে উঠল—মেঘা, ও মেঘা, ও পাজী, সর্ব্বনাশ হবে রে—এখনই এটার চেঁচা-মেচিতে বাঘিনী এসে উপস্থিত হবে। উপায় থাক্‌বে না রে পাজী, শীগ্‌গির ছাড়্‌—ছাড়্‌—এ গহিন জঙ্গল—ছাড়্‌—

মেঘা বলে বসল—হঃ, হাতে দোনালা বন্দুক, উঠব গিয়ে ঐ তেঁতুল গাছে—বাঘের বড় ভয় লাগছে।

হারামজাদা পাজী, সবাইর জীবন শেষ করবি নাকি। বাঘিনীর কোপে আজ আর রক্ষা থাক্‌বে না।

অদূরে বাঘিনীর ভীষণ গর্জ্জন শোনা গেল। মেঘার কোলে বাচ্চাটাও চীৎকার করেছিল। অনন্যোপায় হয়ে আমরা গাছে উঠে পড়লাম। আমাদের দলের 'চাঁদ ঠাকুর' গাছে উঠতে পারেন না জানালেন। তাঁকে যে ভাবে উপরে তোলা হ'ল—তা বলবার নয়। ছমকুর মত শক্তিমান লোক ছিল বলেই আমরা চাঁদকে বুকে চাদর বেঁধে গাছে ওঠাতে পেরেছিলাম।

ততক্ষণ বাঘিনীর গর্জ্জনে বন তোলপাড়। রক্তচক্ষু বাঘিনী গাছের দিকে চেয়ে যে রকম ঘোঁ ঘোঁ করেছিল, তাতেই আমাদের আত্মাপুরুষ তুলারাম খেলারাম করতে লেগে গেল। মেঘা বলল—গুলি লাগাও, একবারে পাঁচটা সাতটা।

ছমকু বলল—সাবধান, যদি কখনও সময় হয় গুলি ছোড়বার—আমিই বলব।

ক্রমে তিনটা বাঘ সেই গাছতলায় এসে চীৎকার আরম্ভ করল। চাঁদ-ঠাকুরকে কাপড় দিয়া গাছে বেঁধে না রাখলে যে কি দশা হ'ত, তা বলাই বাহুল্য। আমি শীর্ণকায় দুর্ব্বল যুবক, কোন মতে গাছ ধরে বেঁচে আছি মাত্র।

বেলা পশ্চিমে হেলে পড়ল। ছমকু বলল—শীঘ্র জঙ্গল থেকে বার হতে না পারলে আজ এখানেই রাত্রিযাপন করতে হবে।

আমি প্রস্তাব দিলাম—বাঘের বাচ্চাটা ফেলে দাও—গোলমাল চুকে যাক।

ছমকু বলল,—তবু বাঘ এখান থেকে সরবে না। এখন মনে হয়, কাছে আর বাঘ নেই—যারা ছিল, এসেছে; এখন ঠিক নিশান-সই করে গুলি ছোঁড়। ঐ যে একটা খাল দেখা যায়—ওটা পার হয়ে না গেলে বাঘকে বিশ্বাস নাই।

পরামর্শমত দুজনে বাঘিনীটাকে, দুজনে বাঘটাকে 'রাম, এক, দো' বলে গুলি ছুঁড়লাম। বাঘিনী ঠায় পড়ে গিয়ে লম্বা দিল—বাঘা মাথা ঝাঁকতে ঝাঁকতে গোঁ গোঁ করে ছুটতে লাগল। অপর বাঘ পালিয়ে গেল। ছমকু গুলী-লাগা বাঘাটাকে তাক্ ক'রে আর একটা গুলি ছুঁড়ল—বাঘা লম্ফ দিয়ে খালের জলে গিয়ে পড়ল—তারপর চুপ।

আমরা দ্রুত গাছ থেকে নেমে পড়লাম। রঘু বলল—বাঘের ছানা দুটা বড় ভাল।

ছমকু ধমক দিয়ে বলল—সোজা ছুট্ দে। যদি বাঁচ্‌তে চাস্—সোজা নদীর পাড়ের দিকে—যে বেলা আছে—গড় পাড়ি দিতে পারলে হয়, আবার বাঘের ছানা!

মৃত বাঘিনীটার বুকে দ্বিতীয় বাচ্চাটা বুঝি স্তন্য খুঁজছিল। মেঘা এটাকেও নিয়ে চলল।

* * * *

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বড় পিঁজরায় বাঘের বাচ্চা দু'টাকে রেখে দিলেন। মেঘা—ইনাম পেল।

এ যাত্রার অভিযান শেষ করে আমরা পরদিন স্বগৃহে যাত্রা করলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে 'মাঝে মাঝে' যেতে নিমন্ত্রণ করে দিলেন।

দুই বৎসর পরে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি ইহলোকে নেই।

দশ বৎসর পর শুনলাম—সেই বাড়ীতে কেউ জীবিত নেই! সহৃদয় ভদ্রলোক জানি না কোন্ পাপে নির্ব্বংশ হলেন।

সাওতাল-বিদ্রোহের ছড়া

শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার

১৮৫৪-১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল-বিদ্রোহের সম্বন্ধে কোন অজ্ঞাত কবি-লিখিত একটি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছি। বারহেটের এক বৃদ্ধ সুর করিয়া ইহা শুনাইয়াছিলেন। লোকমুখে প্রচলিত ছড়া হইলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। নীচে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

সন বারশো বাষট্টি সাল, তারিখে আষাঢ়
পরগণে কনজেলা(১) তার চৌদিকে পাহাড়।
মুলুকটা ইজরদারী…করিয়ে জারি
সাহেব আর সাঁজ বলি
তার মধ্যে ফতুন ক'রে জাতিতে সাঁওতাল।
একটা ঠাটর বাজি টীপ বাঁধিলো ছাতা তার উপরে
মধ্যেতে তুলসী গায়ড়ে…বলে তাড়ে
ঠাকুর এলো ঘরে।(২)
একে একে জমিলো সবে শুমিয়ে পরস্পরে।

(১) কনজেলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাকজোল। বর্ত্তমানের রাজমহল অঞ্চল।

(২) সাঁওতাল-বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিল সিধু ও কানু। তাহারা বাড়ীর মধ্যে একটি গুপ্তঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্য দিয়া কিছুদূরে একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া লইয়া যায় ও সুড়ঙ্গের শেষে একটি তুলসী-মঞ্চ তৈয়ারী করে। একজন সুড়ঙ্গ-পথে মঞ্চের নিম্নে থাকিয়া প্রয়োজন ও সময়মত ঘণ্টা বাজাইত ও আর একজন উপরে পূজাদি করিত। প্রচার করিত, "ভগবান, সাঁওতালদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। অত্যাচারীদের ধ্বংস কর" ইত্যাদি। এই অলৌকিক কাণ্ড তাহাদের মনে বিশ্বাস আনিয়া অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল।

বলে হবো রাজা...দেখবো মজা
বলে মনে সাধে।
সব মূর্খ জমা হইল এক মাস বাদে।
এসে সব জমা হইলো ফৌজ সাজিলো
লুঠিবার তরে।
পাঁচকাঠাতে(৩) উপস্থিত দিবস শনিবারে।
এসে এক ডাগল(৪) পরে বসলো ঘেরে
মা-রাক্সি থানে(৫)
মহেশলাল দারোগা(৬) তা শুনতে পেলো কানে।

(হিঙ্গা দরজাতে)

হিঙ্গা দরজাতে···এক মতে
ছিল সবে বসি।
বুঝিতে নারে সবাই বলে চলো দেখে আসি।
এসে উপস্থিত···কহিব কত-
জনের নাম।
দারোগা চাপরাশি আর সঙ্গে হিঙ্গারাম।
এসে বসলো ভূমে পর্ণ নিয়ে দারোগা কাতর।
মাণিক মুদি গোরাচাঁদ আইল ইহার পর।
এসে বসলো সবে অবশেষে সিধ্যো কহে রাগে.
'টেকো' বলে হুকুম দিলো করিল চৌদিকে
তখন ডঙ্কা দিলো···ঢাক বাজিলো
মহাশব্দে ভাই রে।
সবলোকেতে বলে আজ প্রাণ বাঁচিবে নাই রে।
তখন আনিয়ে দড়া···নজর কড়া
করিয়ে কয় কথা
বিধির লেখন···হয় না মেটন
ধায় না রে ভাই বৃথা।
সে তো বিধির কলম···সয়না পলম(৭)
ঘটে লো প্রমাদ।

তেমনি সাঁওতালগণে···কড়া আইনে
বাঁধিল যখন।

এঁটে উঠিল পাজী···সিধ্যো মাঝি
মুড় দিলো কেটে।(৮)
কথা শুনিলে হাটে···প্রাণ ফাটে
অস্থির হইল মন।
সব পলাইল উধো মুখে ফেলিয়ে সব ধন।
পলায় সব উধো মুখে···ফিরিয়ে দেখে
পাছে আসছে কোন্ দুষ্ট।
হে ভগবান রক্ষা করো পায় না যেন কষ্ট।
সে তো পাপের ফলে···এমনি জ্বলে
চারযুগেতে আছে।
বুঝিতে যদি না পারো ত যাও পণ্ডিতের কাছে।(৯)
তাদের এমনি গতিক হলো, কি করে প্রাণ বাঁচে
এথা খুন করে সিধ্যো মাঝি পাক দিয়ে নাচে।
তখন উঠিল রঙ্গ···করিয়ে ভঙ্গ
ঘরে আগমন।
ভগনাডিহে(১০) সিধ্যো মাঝি দিলো দরশন।
ফিরে জুমলা হয়লো···ফৌজ সাজিলো
করিল মনতনা
ইকঠঠা হইয়ে চলে হিরণপুরের থানা।(১১)
গেলো সবে মহেশপুরের রাজবাটা
করিয়ে আঁটি লুটিবার মনে।
দিবস গেলো···রাত হইলো
রইলো সেখানে।
রাতে মহেশপুরে রাজার ঘরে মনকে করে আঁটা
পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইল কেহ না গেল কাটা।
রাতে শব্দ হইলো···"হরি বলো"
বিগুলো(১২) নিশানে।

---

(৩) বড়হাট বা বর্ত্তমান বারহেটের আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত।

(৪) ডাগল বোধ হয় বটগাছের অপর নাম। মা-রাক্সি-থানে এখনও একটি অতি পুরাতন বটগাছ দণ্ডায়মান।

(৫) ইহা সাঁওতালদের একটি দেবস্থান। পাঁচকেটিয়া গ্রাম-প্রান্তে অবস্থিত।

(৬) লোকে মহেশলালকে বোরিও থানার লালা কায়স্থ দারোগা বলিয়া উল্লেখ করিত।

(৭) পলক।

(৮) কথিত আছে, সিধো মাঝি চৌধুরী মাণিক মুদি, দারোগা মহেশলাল, মহাজন স্বার্থ রক্ষিত, শীতল মুদি, গোরাচাঁদ সেন, নিমাই দত্ত ও হীরু দত্ত এই সাত জনকে হত্যা করিয়াছিল।

(৯) এইখানে মানে ঠিক বুঝা যায় না। বোধ হয় কবি বলিতেছেন যে, অত্যাচারীর অত্যাচার অসহ্য হইলে প্রপীড়িতেরা চিরকালই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহাজনেরা সাঁওতালদের প্রতি অত্যাচার করিয়া পাপ করিয়াছিল। ফলে, সিধো মাঝি সাঁওতাল-বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া শত্রুদের হত্যা করিতেছিল।

(১০) লুপ-লাইনে বর্ত্তমান বারহারওয়া ষ্টেশনের প্রায় বার মাইল দূরে অবস্থিত বারহেটের পার্শ্বে "ভোগনাডী" নামে পরিচিত একটি গ্রাম আছে।

(১১) কোটালপুকুর ষ্টেশন হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে হিরণপুর অবস্থিত।

(১২) বিগুলো = Bugle.

হাতী-ঘোড়ার শব্দ সবাই শুনতে পেলো কানে।
ফিরে নদীতে ছকুল বাঁধ আয়লে ঘেরে
সাঁওতাল বলে 'সুবা বাবা'(১৩) প্রাণ বাঁচে কি কোরে ?
তার উপায় বলো…কি
ঘটলো কি দায়।
সবাই বলে ডর ছেড়ে দাও লড়াই কর ভাই।
তখন চলিলো আগে ধনুক লইয়ে কাঁড় ধরিলো করে,
তখন কাপ্তেন সাহেব…বড় নায়েব
ঘোড়ার উপরে।
তখন হুকুম দিলো…সব চলিলো আগে।
সুবেদার "ফেরো" বলি হুকুম দিলো রাগে।
তখন "মার-মার" বলি বন্দুক ছাড়ে
কাড়ে মারে
মুড়কি যেমন ফুটে।
সব বন্দুক ছাড়ে, তেজে ধা গুড়গুড় ছুটে।
যাইয়ে লাগিল বাণ…গেলো প্রাণ
পড়িল ভূমির তলে।
তা দেখিয়ে সিধ্যো মাঝি "ভাগ, ভাগ," বলে।
রণে ভঙ্গ দিলো…সব পালালো
উধো মুখে ধাইয়ে।
ধন-দৌলত সব পড়ে রইলো কেও না দেখে চাইয়ে।
তখন সাবিক দেশে লাঙ্‌টা ভেসে
পড়িল সব গিয়ে।
এইখানেতে সিধ্যোর কথা শোনো মন দিয়ে।
ফিরে জোর ধরিলো
(লড়াইয়ের মনে) সব জুমিলো
লড়াই দিতে সাহেবের সঙ্গে।
সোনাজোড়ি ডাঙ্গাল পরে…ঘুরে ফেরে
নাচ নাচিছে এসে।
আগে হ'তে …র কেহ পল্টনের ত্রাসে।
তখন সাহেব বলে · অবহেলে
শুনো সুবাদার,
উপস্থিত হ'লো এসে বাড়েতের (১৪) বাজার।
গাড়িয়া তম্বুজোড়া . হাতিঘোড়া
কে গণিতে পারে ?
আম্বেড়-পাকেড়-পাত্‌না পাড়ে (১৫) কেহ নায়খো ঘরে।

যত প্রজা ছিলো . সব পালালো
লুটমার করিয়া,
এইখানেতে জব্দ করে ভাগ্‌নাডিহে গিয়া।
তখন সাহেব সুবাদার জব্দ করে সব বস্তু নিলো,
বাড়েতের বাজারে এসে নিলাম করিলো।
তখন লাইন বনাইলো
থানা দিলো, জুমলা হবে থাকি।
মুল্‌কটা অন্ধকার দিশেহারা মানুষ না দেখি।
তখন সাহেব শুনে.. দৃঢ়মনে
কেও বলিতে নারে ভাই।
হিঙ্গারামে বুদ্ধি দিলো হাজির হয়লো তায়।
তখন তুলসী তলায় হাজির হয়ে
বয়ান করে সাহেবের কাছে ;
মনেতে বাসনা করে প্রাণ মরিবে পাছে।
মনকে নিডর করে…কইছে ফিরে
"শুনো খোদাবন্দ
"হুজুরকে তরফ হাম্‌লোগ., সিধো কাম্ কিয়া মন্দা"
তখন সাহেব বলে.. অবহেলে.
"আসল হাল্ কহেগা,
সিধোকো পক্‌ড়ানেসে কুছ্. ইনাম্ পায়েগা।"
তখন জবানবন্দী নিলো,
দিলো হুকুম লেখি
ভর দিলো সে ডর ভাঙ্গিলো
অন্ধ পেলো আঁখি।
একটা পরগণা পেলে খুশী হয়লো ঘরে এলো ফিরে।
স্ত্রীপুত্র রেখে গেলো সিধোকে ধরিবারে।
(তখন তুলসী তলায় সুন্দর আরও সঙ্গে কুণ্ডল মাঝি
চলে চার জনাতে…খুন বহাতে
যুক্ত করে সার।
সব লোকেতে বলে "চলো করি গেরেফতার"
কথা ত সারি গিয়া,
"বাবা বাংকানা লান্দা ঝুট মেনকাতে আলেরেণ
সানাম খুয়াব কিদা" (১৬)
তখন এই বলিয়ে সব চলিলো যতেক সাঁওতাল।
মানরায়ের সঙ্গে সবে চলে পাল পাল।
মানরায় হইয়ে আগে…কইছে রাগে
"কইরে বদমাস পাজী ?

(১৩) সাঁওতালদের দেবতা।
(১৪) দশ নম্বর ফুটনোট্ দ্রষ্টব্য।
(১৫) কয়েকটি স্থানের নাম।

(১৬) সাঁওতালি ভাষা।
ইহার অর্থ, "হেসে মিছে কথা বলো না। আমাদের সব লোকে খেয়ে ফেলেছে।"

লাখ ফৌজ কই আনিলো এনে দেখা সবার মাঝে।
(তবে হবে ভাল)
এখন বলি, সেটা শালার বেটা
কইরে ঠাকুর ভাড়ে
এই বলিয়া কুদে ধরিলো সিধোর ঘাড়ে।
. করিল ইহার পর . গেরেফ্‌তার

আর এক ঠাকুর ছিলো।
রশি আনিয়া দুইজনাকে কসিয়া বাঁধিলো।
বাঁধে করিল আগে · সবাই জাগে
পলাইবে পাছে।
হাজির করিল নিয়ে সাহেবের কাছে

সাহেব হাজির পেয়ে খুশী হয়ে
হাজত্‌ দিলো তার
মানরায়কে রসিদ দিলো সিধ্যো ধরলে তার।
মানরায় রসিদ পেয়ে…খুশী হয়ে
শুড-মারাতে এলো।

বাধা ভেঙ্কি দিয়ে রসিদটা ভাগ্‌না মাঝি নিলো।
মানরায় ফিরে এলো ঘরে, সিধ্যো, রইলো সেথা
সিধ্যোর বৃত্তান্ত কিছু শোনো নিগুড় কথা।
তখন সাহেব বোলা, "তুম্‌কো সাজায় করণে হোগা"
সিধ্যো বলে, "হুজুর আমরা উজুর নাহি লেগা।"

তখন সাহেব বোলা, "ঠিক্‌ ঠিক্‌ করো ইজাহার।"
সিধো বলে "শুনো হুজুর মহাজনী কা কার—
গাঁও গ্রাম নাহি থা, নাহি থা হাট্‌ঘাট
বড় বড় গাছ হুজুর মোরঙ্গিয়া কাঠ।
বন কাড়া জোড়া জোড়া আর কালা নাগ.
গাছ উপর দেখনে সে হুজুর গিরে শির কপাল।

৬

সাঁওতাল ধন্দ
মহামান্য · ধর্ম্ম অবতার,
যব্‌ যৈসা
তব্‌ তৈসা…করেঙ্গে বিচার।

পহিলে দামিন জঙ্গল থা বাঘ-ভল্লুক কা বাসা,
সাঁওতাল লোক্‌ সাফা কিয়া সাবিক দেশ এইসা।
এক্‌ বিঘা জমি নেহি থা দামিন কোল্‌ মে,
লাখ্‌ বিঘা জমি হুয়া দেখ্‌ নজর ।

আট আনাকে দরসে পঞ্চাশ হাজার শাল।
এয়সা প্রজা অবিচার মে হোগা বেহাল।
গোলাদার বাঙ্গালী দামিনের মহাজন
তাদের কাছে কর্জ্জ নেয় সাঁওতাল প্রজাগণ।
শ্রাবণ মাসে একটাকা নিলে, আটমাসে তার একুশ টাকা হলো।

বারটাকায় চুরাশি টাকা একুন করিয়া
গরু বাছুর সব তাদের লয় ডাকাইয়া।
দারোগার কাছে যদি নালিশ করিবে।
সেও বলে শালার বেটা টাকা দিতে হবে।

এইরূপে ধন মোদের সকল হরে নিলো
এইজন্য দামিনীতে হাঙ্গামা হইলো।

যেমন গাল তেমনি চাপড় অবশ্য পাইবে
অনুগ্রহ করে হুজুর মোরে ছুটি দেবে।
তখন সাহেব বলে, আগে তুম্‌ নালিশ্‌ নাহি কিয়া
ছুটী নাহি পাবেগা তুম্‌ বহুত্‌ খুণ্‌ কিয়া।
… … … … … … …

… … … ইত্যাদি। (১৭)

(১৭) ছড়াটি অসম্পূর্ণ মনে হইতেছে।



দেওঘর-শিবিরে নয়দিন

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন শুক্রবার ৮ই অক্টোবর। আমরা দেওঘরে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হলাম এবং যা যা নেওয়া দরকার একরকম সব নিয়ে সুটকেশের সঙ্গে বিছানাপত্র সব বেঁধে নিলাম। আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম বেশ সাধাসিধে পোষাকেই একটু আরামে যাব এবং সহজ অবস্থায় ট্রেনে রাতটা কাটিয়ে দেব। ভাগ্য কিন্তু বিপর্য্যয়। মার্শাল কি রকম করে খবর পেয়ে আমায় আজ্ঞা দিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ রকম পোষাকে গেলে সমস্ত দলটাই খাপ ছাড়া হয়ে যাবে। যাকে বলে এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা পড়ে যাবে। মার্শালের অর্ডার, মিলিটারী পোষাক পরতেই হবে। আমার মাথায় ত একটা মস্তবড় বোঝা এসে চাপ্‌ল। ভেবেই আকুল, ঐ পোষাক পরি কি ক'রে। বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না। জনকতক শিষ্য অমনি এসে হাজির। অন্ধকারের ভেতর একটু আলোর উঁকি পেলে যেমন আনন্দ হয় আমারও ঠিক্ তাই হ'ল। শিষ্যরা বেশ ভাল রকমই জানত যে, এসব কাজে তাদের গুরুদেবের দক্ষতা কতখানি। দেবু (ক্যাপ্‌টেন্) বলে গেল আমি সময় মত এসে আপনার পোষাক পরিয়ে দিয়ে যাব। যাক্ বাঁচা গেল।

সন্ধ্যানাগাদ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সেজেই আমাদের সমিতির (বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি) প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। কম্যাণ্ডিং অফিসার সৌরেন ও সার্জ্জেণ্ট মেজর চণ্ডীকে বলে দিলাম ছেলেদের নাম ডেকে সাজিয়ে ফেল্‌তে এবং কর্ণেল সত্য ও ভাঁড়ারি গিরিজাকে বলে দিলাম জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে স্টেসনে যাবার ব্যবস্থা করতে। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টাখানেক আগে আমরা সদল বলে স্টেসনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমরা সবশুদ্ধ প্রায় সত্তরজন গিয়েছিলাম। আমাদের এই যুদ্ধের পোষাক-পরা দল ও ছেলেদের শৃঙ্খলার সহিত ক্ষিপ্রকার্য্য দেখে স্টেসনে হয়ে গেল ভিড়। সকলকে দলের পরিচয় দিতে দিতে আমার গলা গেল ধরে এবং গায়ে এল জ্বর। সত্যিই আমার জ্বর এসেছিল। এই জ্বর হওয়ার কারণ ছিল দুটি। মাথার উপর অতবড় একটা দায়িত্ব, আর মাকে ছেড়ে দূর দেশে যাওয়া। মাকে ছেড়ে দূর দেশে গিয়ে এতদিন কাটান জীবনে আমার এই প্রথম। মাও আমায় আগে কখনও ছাড়েন নি এবং আমিও মাকে ছেড়ে থাকতে পারি নি। মার ভালবাসার গণ্ডীটা হয় ত খুব কড়া-পাহারায় ঘেরা, তাই আমার এই দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতাই আমার জীবনে আমার সাধনার গণ্ডীর প্রসারের বড় বড় সুযোগ নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

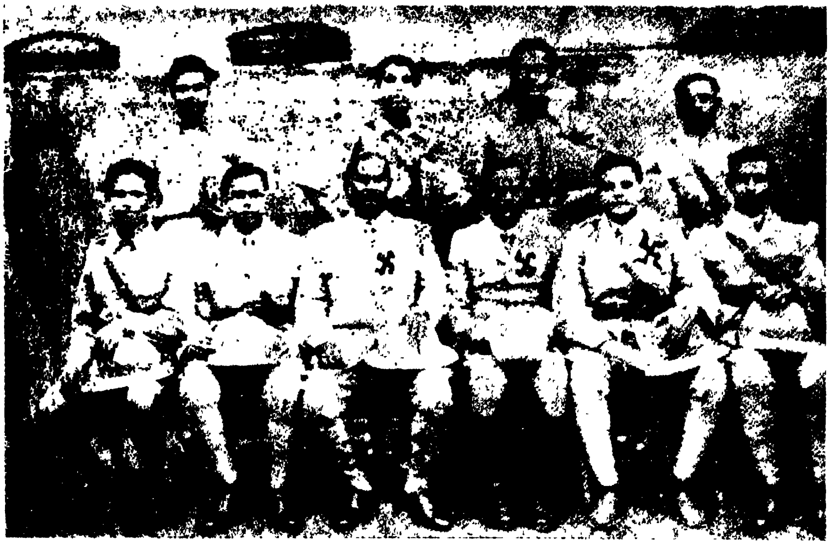


শিবিরে বালকগণ আহার করিতেছে — ফটো—পশুপতি পাল

রিজার্ভ বার্থে মালপত্র গুছিয়ে তুলে ছেলেদের সব বসিয়ে আমরাও গাড়ীর একটা কামরায় গিয়ে নিজ নিজ স্থান দখল করলাম। আমাদের কামরায় উঠে দেখি আমার তিনজন শিষ্য

কমলকৃষ্ণ, অবনী ও কিশোরী একটা ভাল জায়গায় আমার জন্যে বিছানা পেতে রেখে বসে আছে। একে জ্বরটা তখন বেশ এসে গেছে, তার ওপর মাথায় অতবড় একটা ভাবনা, আমি একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। এ রকম অবস্থায় শিষ্যদের এরকম ব্যবহারে আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আপনা হতেই মন থেকে তাদের কল্যাণে ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা পেশ করে দিলাম।

ঠিক্ নটা দু মিনিটে একটা প্রকাণ্ড হাঁফ ছেড়ে ট্রেন তার পথের দিকে পা বাড়ালে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গাড়ী ছুটলো, আর আমিও লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঘুমপাড়ানি বাতাস এসে নিদ্রার স্নিগ্ধ কোলে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেল। রাত তখন বারটা হবে, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি কিশোরী আমার পা টিপ্‌ছে আর অবনী মাথায় হাওয়া করছে। তাদের কড়া করে ব'লতে তবে তারা শুল। আর একটা লম্বা ঘুম দিয়ে উঠেই দেখি মধুপুর ছেড়ে গাড়ী প্রাণপণে দৌড়চ্ছে জসিডির দিকে, বোধ হয় আমাদের ঘুম ভাঙবার আগেই গন্তব্য স্থানে পৌছবার জন্যেই তার এই প্রতিযোগিতা। রাত পৌনে চারটের সময় এলাম বৈদ্যনাথধামে অন্ধকারের মাঝখানে। খুব সকালে আমরা যখন আমাদের গন্তব্যস্থানে যাবার জন্য জোগাড় করছি তখন আমার সম্পর্কে এক কাকা (জেনু-



আদর্শ ব্যায়াম সমিতির শিবিরে—(বামদিক হইতে)—সত্যপদ দে, পুলিন দাঁ, স্যার হরিশঙ্কর পাল, হরিমোহন পাল, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি পাল

কাকা, তাঁরা তখন বৈদ্যনাথে হাওয়া খেতে এসেছেন) আমায় দেখে চিনতে না পেরে একটা লম্বা সেলিউট্ (salute) দিলেন, আমিও রিটার্ণ দিয়ে বললাম "জেনুকাকা যে!" কাকা ত তখন আমার খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন এবং সঙ্গের কাকিমা ও অন্যান্য মেয়েরা একটু হেসে নিলেন। আমার কিন্তু তখন মার্শালের কথা মনে পড়ে গেল। হাঁ, পোষাকের একটা প্রভাব আছে বই-কি।

বটকৃষ্ণধামে পৌছেই ছেলেরা লেগে গেল তাঁবু গাড়তে। প্রকাণ্ড ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পাঁচটি তাঁবু গাড়া হ'ল। এবার ছেলেদের দেওয়া হ'ল ছুটি একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। সেদিন আমি কড়া হুকুম জারী করলাম, ছেলেদের দুপুরে সকাল সকাল খাইয়ে দিতে হবে। তাই হ'ল, ছেলেরা দুপুরে একটু বিশ্রাম পেলে। বিকেল ঠিক্ সাড়ে চারটায় অস্থায়ী শিবির উদ্বোধন করলেন আমাদের মার্শাল শ্রীযুত হরিমোহন পাল। তারপরে সব অফিসারের ও ছাত্রদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুঝিয়ে আমি ক্যাম্পগুলি সব ইনস্পেকসন্ ক'রে যা যা করা দরকার তাও সকলকে বুঝিয়ে দিলাম। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যাতে কোন রকম ত্রুটি এসে ছেলেদের ক্ষতি না করে সেদিকে আমার নজরটা গোড়া থেকেই খুব সতর্ক ছিল। ক্যাম্প-জীবন সুশৃঙ্খলে চালাবার জন্যে আমাদের কর্ত্তব্য সব ভাগাভাগি ক'রে নিতে হয়েছিল। আমার ভাগে পড়েছিল আবার দুটা ভাগ। ক্যাম্প দলপতি হয়েছিলাম এবং শিবির-স্বাস্থ্যপরিদর্শকও হয়েছিলাম আমি।

কর্ণেল পুলিন দাঁ, পশুপতি পাল, সত্যপদ দে, সুবল পাল, সৌরেন চাটুজ্জে ও বঙ্কিম নিয়োগী ক্যাম্পে থাকবার জন্যে "ক, খ, গ" ক'রে দল ভাগ ক'রে দিলে, ছেলেরা তাদের শিবির-জীবন সুরু করলে সেদিন বিকেল থেকে।

ছোটছেলেদের সঙ্গে খেলতে বসতে আমার বড়ই ভাল লাগে। দুনিয়ায় আমি সব চেয়ে বেশী আনন্দ পাই যখন কচিকাঁচাদের দলের মধ্যে থেকে তাদেরই মত একজন হয়ে হাসি ও খেলায় নিজেকে ডুবিয়ে দিই। এই কারণেই তাদেরই একটা ক্যাম্পে থাকব—এই ছিল আমার বাসনা, কিন্তু সে বাসনা আমার চুরমার করে ভেঙে দিলেন মার্শাল। তিনি হয় ত তাদের চেয়ে আমায় আরও ছেলেমানুষ ভেবে নিয়েছিলেন। খোকা বলে ডাকেন ও খোকা বলেই ঠিক্ জানেন। কথাটা একটুও মিথ্যা নয়। কারণ এদিক্ দিয়ে, তার মানে সাংসারিক জীবনে গুছিয়ে কাজ করবার দিক্ দিয়ে, আমি খুবই কাঁচা। মার্শাল তা বেশ বুঝেছিলেন, তাই শিবির-প্রাঙ্গণের ঠিক সামনেই "মোহন-লজ"-এর দ্বিতলের সামনের ঘরখানিতে আমার থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। উন্মুক্ত ঘর। বাইরে থেকে দেখলে মনে একটা বিস্ময় এনে দেয়। ঘরের দুপাশেই দুটা বড় বড় গম্বুজ, বড় বড় সারসি দিয়ে ঘরের সামনের দিকটা ঢাকা। সারসির ফাকে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের পুরো মাঠটা ভাল করেই দেখা যায়। মার্শাল বললেন, "ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের কড়া পাহারা ও কঠোর নির্দ্দেশ শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে কাজের পথে এগিয়ে দিতে এই ঠিক উপযুক্ত ঘর।"



আদর্শ ব্যায়াম সমিতির সামরিক শিক্ষা শিবিরে শিক্ষিত 'এ' ও 'বি' কোম্পানী

শিবির-জীবন যাপনের দৈনিক যে তালিকা করা হয়েছিল তাতে ছেলেরা একটা কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে কষ্টসহিষ্ণু হবার সুযোগ পেয়েছিল এবং তার সঙ্গে অফুরন্ত আমোদের ভিতর দিয়ে তাদের পরস্পরের মিলন ও একতার বাঁধনটাও বেশ পাকা ক'রে দিয়েছিল। প্রত্যহ প্রাতে ঠিক্ পাঁচটার সময় বিগ্‌লের আওয়াজে আমরা জেগে ওঠতাম ও রাত সাড়ে দশটার সময় বিগ্‌লের আওয়াজে ঘুমুতুম। যাকে বলে 'পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখীর ডাকে জাগে।' আমাদের বেলায় যদিও সেটা হয়েছিলো 'বিগ্‌লের ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে বিগ্‌লের ডাকে জাগে।'

প্রথম দিন রাতে বিশ্রাম-ঘোষণাকারী বিগ্‌লের শব্দে ঘরে শুতে গিয়েই হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সর্ব্বক্লান্তি ও চিন্তা দূরকারিণী 'মার কোল'। মনটা কেমন বিগ্‌ড়ে গেল। ক্লান্তদেহমনকে বেশীক্ষণ ভাববার সুযোগ দেয়নি। সুপ্তির কোমল স্পর্শে চোখ দুটা আপনা থেকেই বুজে এল। ওদিকে শাস্ত্রীরা ঘড়িতে যেমন দুটার ঘণ্টায় ঘা দিয়েছে ঘুমটা গেল ভেঙ্গে। ঝুপ্ ক'রে বিছানা থেকে উঠে পড়েই চুপি চুপি গেলাম শাস্ত্রীদের ইন্‌স্‌পেক্‌সন্ করতে। দেখলাম তারা বেশ ভালভাবেই তাদের কর্ত্তব্য সমাধা করছে সেই ছমছমে নিস্তব্ধতার মাঝখানে। তাদের সাহস ও উৎসাহ দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়লাম। শোব কি, বাড়ীর যা-কিছু চিন্তা একসঙ্গে দল বেঁধে আমায় করলে আক্রমণ। দূর ছাই! এ কি আপদ! আনন্দ ক'রে ছেলেদের সঙ্গে কদিন কাটাতে এলাম এখানে, তা না যত রাজ্যের ভাবনা বিপ্লবী হয়ে দাঁড়াল আমার বিরুদ্ধে। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ ক'রে আবার নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম। ঘুমুতে না ঘুমুতেই চলে গেলাম স্বপ্নরাজ্যে—স্বপ্নরাজ্য হ'লেও সেটা আমার কাছে স্বর্গরাজ্য। দেখলাম ঠিক্ মারই হাসিমাখা বিশ্বশক্তিরূপিণী মুখখানি—দেখলাম মায়েরই কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি, মারই স্বর্গীয় স্নেহমাখা একখানি হাত মাথায় রেখে।

স্বপনে দেখিনু:মাকে যেন শুয়ে মার কোলে
শান্তিরাজ্যে আছি আমি সকল আপন ভুলে।

ভোর হবার কিছু আগেই যখন নীল আকাশের অসীম ব্যেপে তারকারাজি বিদায় নেবার আগে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে তখন ঘুমটা আবার ছ্যাৎ ক'রে ভেঙ্গে গেল। স্বপ্ন-রাজ্য থেকে এলাম একেবারে আমাদের শিবির-রাজ্যে। মনটা যে ফের একটু বিগড়ে না গেল তা নয়।

কোন উপায় না দেখে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম তখনই এবং যামিনীর শেষ ও উষার গোড়ার সন্ধিক্ষণে একটা এলো-মেলো ভাব নিয়ে শিবির-প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অজানা পথের দিকে পাদুটা আমার অজ্ঞাতেই আপনা থেকে চলতে থাক্‌ল। স্নিগ্ধ ও মৃদু সমীরণ এনে দিলে মনের মধ্যে একটা পুলক শিহরণ। চলতে চলতে উষার আলো দেওঘরের ওপর তার রূপালী ওড়্‌নাখানি বিছিয়ে দেবার সঙ্গে দেখলাম মেঘের রংগুলো আল্‌তা হ'য়ে নীল আকাশের চরণে ঢলে পড়ছে। রোজ সকালে উঠে আমার একটা অভ্যাস—মনটাকে বাইরের চিন্তার ঘুর্ণিপাক থেকে টেনে এনে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ক'রে তাকে কিছুক্ষণ অসীমের ভিতর মিশিয়ে দেওয়া। বাড়ীতে এই ক্রিয়া করতে অনেক দিন নিজেকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছি যে, মা এসে ডাকাডাকি না করলে হারিয়ে যাওয়া পথ থেকে মুক্তি পাইনি।

দেওঘর শিবিরে থেকে দু-একদিন প্রথম প্রথম আমার এই সাধনা না করাতে দেহ ও মনটা বড়ই শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং আমি যে 'কি-রকম-যেন' হয়ে গেছি তা নিজেই বুঝতে পারলাম। তৃতীয় দিনে আর থাকতে পারলাম না। ভোরে ঠিক্ চারটে বেজে কুড়ি মিনিটে বেরিয়ে পড়লাম একটা নদীর দিকে। নদীটা পার হয়ে একটা খোলা ছোট পাহাড়ের কোলে নিলাম আশ্রয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনটাকে দুলিয়ে দিলে একটা বিমল আনন্দের হাওয়ায়। কেউ কোথাও নেই, কেবল পাহাড়ের বুকে একা আমি। মনে পড়ে গেল সেই লাইনটা "I am the monarch of all I survey." বেশ ক'রে গায়ের কাপড়টা গায়ে ঢেকে পাহাড়ের একটা চাঁই-এর উপর বসে গেলাম শরীরের ভিতরটা একটু মেজেঘসে নেবার জন্যে।



আদর্শ ব্যায়াম সমিতির শিবিরে মিলিটারি ব্যাণ্ড পার্টি

কি বিভ্রাট! অনেক দিনের পর একাজে বসতেই নিজেকে একেবারে ভুলে সীমাহীনের মধ্যে তলিয়ে গেছি। সাড়াশব্দ নেই। চোখ মেলে দেখি একটা ধোপা গা ঠেলে ডাক্‌ছে। বল্‌ছে, "বাবু, এ সব জায়গায় বসে এ রকম ক'রে ঘুমুতে হয় কি? দেখুন ঐ গাধাটা ও কুকুর দুটা আপনার কাপড় ধরে টানাটানি কর-ছিল। সত্যই দেখলাম গায়ের কাপড়টা আধখানা এলো মেলোভাবে পাহাড়ের গায়ে পড়ে আছে ও কোঁচার কাপড়টা কে যেন বের ক'রে হ্যাণ্ডল-ম্যাণ্ডল ক'রে জমির ওপর অগ্রাহ্য ক'রে ফেলে রেখেছে। দেওঘরে যতদিন ছিলাম সেই পাহাড়টা ছিল আমার ভোরের প্রিয়-সাথী কিন্তু সাথীর স্নেহপ্রীতির কোলে আর কোন দিনই গা ভাসিয়ে দিইনি।

আমার এই প্রথম শিবির-জীবনে একটা বড় জিনিষ যা আমি পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মোহনকাকার (মার্শাল) স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান। একটুও যাতে আমার অসুবিধা না হয় তার জন্যে তাঁর ভালবাসাপূর্ণ চোখ দুটি কেবলই আমার পিছু পিছু ছুটত। প্রথম প্রথম আমার যেন কেমন লজ্জা লজ্জা করত, কিন্তু সে লজ্জা আমার হার মানল তাঁর অগাধ

ভালবাসার কাছে। এর ওপর আবার তাঁর বড়ছেলে ও আমার একজন প্রিয়শিষ্য সুবল পালের ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি। সুবলের আড়ালে ভালবাসা ও নীরব যত্ন—যদিও সুবল সেটা আমায় জানতে দিত না—আমার মন ও চোখকে এড়াতে পারেনি। যথার্থ ভ্রাতৃপ্রেম আমি পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে।

দেওঘরে আমাদের শিবির-জীবনের প্রথম দিনে বিকেল-বেলা আমরা বেরুলাম "রুট্ মার্চ্চে" (Route March) ; কিন্তু সে 'রুট মার্চ্চ' সকলের কাছে হয়ে দাঁড়াল "রুড্ মার্চ্চ" (Rude March)। কারণ আগের রাতের ট্রেনভ্রমণের অবসাদ তখনও কারও গা থেকে বিদায় নেয়নি। মার্শালকে বললাম ছেলেরা এখনও সেরকম তাজা হয়নি। 'আর পারি না' 'আর পারি না' ক'রে তারা কোন রকমে তাদের ভারি পা-গুলোকে টেনে নিয়ে চলেছে। বেশীদূর আর যাওয়া হ'ল না। সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পের ছেলে সব ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

পরের দিনে সকালে আমায় পুরোহিতের কাজ ক'রতে হ'ল। সাতটা শপথবাণী নিজে উচ্চারণ ক'রে সমিতি পতাকা ছুঁইয়ে সকলকে তা বলালাম। বিকেল ও সন্ধ্যাটা খেলাধুলো ও আমোদে বেশ কেটে গেল। সন্ধ্যার পর ছেলেরা রোজ ক্যাম্প-ফায়ার করত এবং গান, বাজনা ও হাস্যকৌতুকে শিবির-প্রাঙ্গণটা আনন্দময় করে তুলত তারা।

দুপুরে ও রাতে খাবার জন্যে বিগ্‌লে ফুঁ দিতে না দিতেই সকলে যে-যার ক্যাম্পে ঢুকে থালা বাটী নিয়ে ছুটল রসদাগারে। হেসে আমোদ ক'রে পাশাপাশি গায়ে গায়ে বসে ছেলেরা পেটপুরে খেয়ে উঠত। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রশ্ন সেখানে ছিল না। এতে আমারও আনন্দ হ'ত অনেক। এখানে "Sceptre and crown must stumble down and to the dust be equal made"— এই মন্ত্রেই সকলে দীক্ষিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আদর্শ-ব্যায়াম-সমিতির মন্ত্রে এ ছাড়া পথ নেই।

সেদিন সোমবার। দুপুরে খেয়ে উঠে বাইরে একটু বসেছি, দেখলাম নীলাকাশের চোখের কোলে কে যেন কাজলের রেখা এঁকে দিয়ে গেল। দেখতে দেখতে সেই রেখা গাঢ় হয়ে আকাশকে কাঁদিয়ে দিলে। জল ও ঝড় এল একসঙ্গে। একটা তাঁবু গেল উল্টে পড়ে এবং অন্যান্য তাঁবু হয়ে গেল ভিজে ঢোল। ছেলেরা সেদিন দিলে তাদের আন্তরিক উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতার পরিচয়। ঝড় জল মাথায় নিয়ে তারা লেগে গেল তাঁবুর পাশে খানা খুঁড়তে জল নিকাশের জন্যে। উল্টে-পড়া তাঁবুটাকে দেখে রোয়াকে দাঁড়ান ক'জনের বোধ হয় তার ওপর দয়া হ'ল। তারা সেটাকে অনেকটা খাড়া ক'রে এনেছেন, এমন সময় আমাদের ক্ষুদ্রকায় অর্থাৎ কিনা, বিরাটবপু পদুবাবু একটা মোটা বাঁশ লাঠির মত ধরে তার গায়ে যেমন মেরেছেন ঠোক্‌কর, বেচারা অমনি আবার পড়ল ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে—ঠিক যেন ভাল্লুকের গায়ে জর এল। এই পদুবাবুটি আমাদের কি রকম দেখতে জানেন? বনজঙ্গলে বা পাহাড়পর্ব্বতে দূর থেকে তাঁকে দেখলে লোকে নিশ্চয়ই ভাববে যেন পাহাড়ের খানিকটা মানুষ হয়ে এগিয়ে আসছে। তবুও খাওয়া-দাওয়া আজকাল তাঁর নাকি অনেক কমে গেছে—তাই।

একদিন মার্শাল পালের তত্ত্বাবধানে ছেলেরা সব গেল—বম্‌পাশ টাউনের ওপারে পাহাড়ের ধারে একটা সমতল ভূমির ওপর। চাঁদনী রাতে ছেলেরা সেখানে খুব আমোদে কাটিয়ে একটু রাত করে ফিরল। ক্যাম্পের কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি যেতে না পারায় চাঁদনী রাতের সেই আমোদ থেকে হই বঞ্চিত। ছেলেদের মুখে আমোদের কথা শুনে আমার ভিতর কবির ভাব জেগে উঠল এবং মুখে মুখেই চার লাইন কবিতাও বানিয়ে ফেললাম—

পাহাড়-কোলে সবুজ মাঠে এল চাঁদের আলো
সন্ধ্যাবতী তোমার দেশে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।
প্রাণ-মাতানো ছেলেদের দল খেলছে পাহাড়-বুকে
চাঁদের আলোর আঁচলে বসে গান গায় সব সুখে॥

পরের দিন গোধুলি লগ্নে নন্দন পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসলাম আমরা। মাথার উপর অসংখ্য তারার ঝিকিমিকি, পায়ের নীচে পাহাড়ের টুকরাগুলো বিক্ষিপ্ত আর চারিদিক ছেয়ে অন্ধকারের ঘোমটা-পরা দেওঘর শহরটি ঠিক্ যেন নতুন বউ-এর মত সলাজ দৃষ্টিতে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে আছে। গভীর নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ছেলেরা বাঁশীতে ফুঁ দিলে এবং সুপ্ত পাহাড়টাকে জাগিয়ে দিয়ে তারা ঘা দিলে জয়ঢাকে। তারার মালায় আলোকিত আকাশ থেকে নেমে এল স্বর্গরাজ্যের রাজকুমারী আমাদের

আনন্দ পরিবেশন করতে। রাত পৌনে আট্টা নাগাদ্ পাহাড় ছেড়ে নামতে স্বরু করলাম। পাহাড়ের মাথা থেকে তার কাঁধের কাছে এসেছি, এমন সময় আমাদের সেই পদুবাবু (ওঁর সঙ্গে আপনারা আগেই পরিচিত হয়েছেন) পা হড়্‌কে একেবারে "পপাত ধরণীতলে" হবার জো হয়েছিলেন। কোন রকমে চাড়াটাড়া দিয়ে তাঁকে ত খাড়া করা গেল।

পরের দিন গিয়েছিলাম আমরা দেওঘরের রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে। সন্ধ্যাকালে বিদ্যাপীঠের ছেলেদের একত্র স্তোত্রপাঠ আমার বেশ ভাল লেগেছিল। আমাদের ছেলেদের কুচ্‌কাওয়াজও ওদের খুব আমোদ দিয়েছিল। বিদ্যাপীঠের সতীশ মহারাজ কতকগুলো ছেলে নিয়ে আমায় করলেন পাক্‌ড়াও। ছেলেদের মাঝে পড়ে ও সতীশ মহারাজের ভালবাসায় আমি আমার শক্তি-সাধনার ডাকের সাড়া সেখানে খানিকটা পেলাম।

শিবির-প্রাঙ্গণে আমাদের শেষ উৎসব হয় স্থানীয় সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার রায়সাহেব মিঃ বি-ধরের সভাপতিত্বে। এই মিলন-উৎসবে মিলিটারী ও ব্যায়াম প্রদর্শনীতে শিবির প্রাঙ্গণটি একটা নতুন রূপ ধারণ করে। চারিদিকে সকল শ্রেণীর নরনারীর ভীড় আর মাঝখানে শূন্যে উড্ডীয়মান সমিতি-পতাকা ভেদাভেদ দূরে ফেলে দিয়ে "স্বাগতম্" আহ্বান ঘোষণা করছে সকলকে। বন্দুকের আওয়াজে স্বরু হ'ল মিলন-প্রদর্শনী আর স্নিগ্ধ বৃষ্টি এসে টেনে দিয়ে গেল প্রদর্শনীর গায়ে শেষ রেখা। "মধুরেণ সমাপয়েৎ" ক'রে বৃষ্টিধারায় বাবা ৺বৈদ্যনাথের আশিষ মাথায় নিয়ে আমাদের শিবির-জীবনের অবসান হ'ল সেদিন রাত্রে।

দিনের আলো যার ফুরাল

শ্রীস্বরেশচন্দ্র ঘোষাল

প্রত্যেক বৎসরের মত এ বৎসরও জমিদার বাড়ীতে পূজার ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সারাগ্রামখানিও উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। নায়েব-গোমস্তা-পাইক জমিদারবাবুর পরিত্যক্ত বাস্তবাটীর হৃতশ্রী যতদূর পারা যায় ফিরাইয়া আনিয়াছে—জমিদারবাবু সবান্ধবে শহর হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

প্রতিমা, পূজা, বলিদান, বাদ্য এ সব ত প্রতিবৎসরই আছে, এবারকার বিশেষত্ব বৈদ্যুতিকবাতি আর টকী বায়োস্কোপ।

গাঁয়ের সকলেই অবাক্ হইয়া যায়—আলোর কি জলুশ, ছবিতে কি চমৎকার নাচে গায় কথা কয়। দু-চারজন হামবড়া শহুরে ছোকরা খালি বলে—দূর, এ বাইস্কোপ, কল্‌কাতায় দেখে দেখে চোখ পচে গেছে।

মহাষ্টমীর চণ্ডীপাঠ শোনার জন্য পাড়ার দু-চারজন বৃদ্ধবৃদ্ধা জমায়েৎ হয়; কেউ জ্বরে কাঁপে, কেউ বা থেকে থেকে খক্ খক্ ক'রে কেঁসে ওঠে —ক্ষীণকণ্ঠে শীর্ণ পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করেন।

বৈঠকখানায় জমিদারবাবুর তখন চায়ের মজলিস বসে—পেয়ালা পিরিচের টুং টাং শব্দ ও সিগারেটের ধোঁয়া ঘরের বাতাসটাকে শুদ্ধ আভিজাত্যে মাতাইয়া তোলে।

চা পান শেষ করিয়া সুসজ্জিত নৌকায় জমিদারবাবু শিকারে বাহির হন।

ধানের মাঠ—কচি সবুজ ধানের ক্ষেত দূরে দূরান্তরে চক্রবালে গিয়া মিশাইয়াছে, তারই বুক চিরিয়া সরু খালের কালো জল সোনালি রৌপ্যে চিক্‌চিক্ করিতে থাকে, তারই উপর দিয়া ছোট্ট নৌকা চলে ছলছল্ ছলাৎ—হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া কচি ধানের শীষগুলি ভক্ত প্রজার মতই জমিদারবাবুকে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম জানায়।

মাছের লোভে খালের ধারে ধারে কত চাষী ঘুনি মুগ্‌রী বসাইয়া দিয়া গিয়াছে, তারই মাঝে মাঝে দুটা-একটা বক নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া আছে।

পানকৌড়ি, খড় হাঁস, বিগড়ী দল বাঁধিয়া উড়িয়া আসে। জমিদারবাবুর হাতে ডবল ব্যারেল গর্জ্জিয়া ওঠে, নেপালী চাকর ধান মাড়াইয়া পাখী কুড়াইতে ছোটে।

ঠাকুর! লালভোগটা উচ্ছ্বুগ্যু ক'রে দাও—সন্ধ্যার পর খান্‌সামা গোটা দুই বোতল লইয়া আসে। পুরোহিত উৎসর্গ করিয়া দেয়।

—আমার পাওনাটা দয়া ক'রে—পূজা শেষে পুরোহিত মহাশয় নায়েববাবুর নিকট হাজির হন।

—হ্যাঁ, ওহে ঠাকুর মশায়ের হিসেবটা দেখ ত—গত বছরের চরের জমিটার দরুণ বাকী কত দেখে একটা দাখিলা কেটে দাও।

—দোহাই আপনার, এখন খাজনাটা মিটাতে পারব না, ধান তুলে আপনাদের প্রাপ্য আর রাখ্‌ব না।

—বলেন কি? গত বছরের খাজনা আর না মিটালে চলে, আশ্বিন কিস্তি ত চলে যায়।

—দয়া ক'রে আর দুটা মাস না থামলে ম'রে যাব—এ সময়টা বড্ডই হাতটান—

—বেশ, আমায় কি দিচ্ছেন।

—তা, হুজুর যখন বলছেন, আজ্ঞে পান খেতে গোটা দুই টাকা নিন, আর কি দেব গরীব আমরা।

—তা কি হয়, ওহে দাও তো আটটা টাকা পুরুত মশাইকে আর ফর্দ্দটা কোথা গেল, খরচ লেখ দক্ষিণা বাবৎ ষোল—

—হুজুর, একেবারে গলায় পা তুলবেন না, আর কিছুদিন—

—যান, আর গোল করবেন না, বাবু আসছেন। আটটি টাকা ট্যাঁকে গুঁজিয়া পুরোহিত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিয়া যান।

জমিদারবাবুর ফটক পার হইলেই গাঁয়ের একমাত্র ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানা। ডাক্তারবাবু মস্ত একটা হাঁড়িতে নিমছাল সিদ্ধ করিতেছিলেন, কুইনাইন আসিতে দিন চার দেরী আছে, কাজেই ইহাতে এই কয়দিন চালাইয়া লইতে হইবে। শীতের প্রারম্ভে ম্যালেরিয়াও বেশ চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

—ডাক্তারবাবু আছেন?

—কে রে—কৈলাস, আয় আয় এদিকে আয়—

ছেঁড়া কাপড় পরিয়া সত্তর বৎসরের শীর্ণ বৃদ্ধ কৈলাস গায়েন একমাথা পাকাচুল লইয়া উপস্থিত হয়।

—কি হবে বাবাঠাকুর, একটু দয়া না করলে ও আর ছেলেটা বাঁচে না।

—দেখ্‌ছি ত ভাই, তা আমি কি করি বল্—আমি ভিজিট্ না নিয়ে বিনা পয়সায় না হয় একবারের জায়গায় সাত বার যেতে পারি, কিন্তু ওষুধের দামটা ত দিতে হবে। সেটা ত আর আমার চাষের নয় যে অমনি দেব।

—অমনি কেন বাবাঠাকুর, ধারে দিন না, যা দাম হয় লিখে রাখুন, পৌষ মাসে কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'রে দেব।

—মাইরী আর কি? কড়ায় গণ্ডায় শোধ করব; তখন সালিসীবোর্ডে গিয়ে কলা দেখাও আর কি?

—সে কি কথা বাবাঠাকুর, আমি ফাঁকি দেব কেন? কত বার ত ধারে দিয়েছেন, কখনও একটা পয়সার গোলমাল হয়েছে কি?

—সে সব দিন কি আর আছে—এখন তোর ছেলের টায়ফয়েডের ওষুধ কম ক'রেও পঞ্চাশ-ষাট টাকার লাগবে, এত টাকা এ বাজারে দিলে আর পাব—

—কেন পাবেন না বাবাঠাকুর, আমার কথাটাই দেখুন না।

কৈলাস ডাক্তারবাবুর পা দুইটি জড়াইয়া ধরে।

—ছাড়, ছাড়, ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আমার, কথামাহাত্ম্য শুনাতে এসেছে—ছোটলোক কোথাকার—যা যা, ধার-টার আমার দ্বারা হবে না, বাজে বকাস্‌নি।

কৈলাস আর কথা বলিতে পারে না—বড় আশা করিয়া ডাক্তারের নিকট আসিয়াছিল ছেলের ঔষধ লইতে, তাহার পরিবর্ত্তে এত—

ছোটলোক, এ কথা কেউ কোন দিন তাকে বলিয়াছে? বিখ্যাত তরজাওয়ালা কৈলাস গায়েন বড় বড় আসরে গাহিয়া কত লোকের কাছে কত পুরস্কার পাইয়াছে—রাজার বাড়ী, জমিদারের বাড়ী পর্য্যন্ত তাহার কত খ্যাতি, আজ সামান্য একটা হাতুড়ে তাহাকে ছোটলোক বলিয়া অপমান করে! কৈলাস আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া আসে।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে—ডাক্তার আন্‌বে না, গা যে পুড়ে যাচ্ছে, আর কত কি ভুল বক্‌ছে—

কৈলাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—না, টাকা না পেলে ডাক্তার ওষুধ ধারে দেবে না।

—কেন, কি হ'ল আবার, বরাবর ত ধারে দেয়—

এখন আর দেবে না, আইন বদলে গেছে—পাছে কিস্তিবন্দী করিয়ে দিই এই ভয়ে—

—তবে উপায়?

—উপায় ভগবান; একবার তানপুরাটা পেড়ে দাও ত দেখি একবার জমিদারবাবুর বাড়ী গিয়ে, পূজায় কর্ত্তাবাবুর ছেলে এসেছে, দেখি গান শুনিয়ে যদি কিছু পাই।

তাহার গান শুনিয়া খুশী হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিবার লোকও যে আছে এ বিশ্বাস সে আজও করিয়া থাকে। বহুদিন পরে তাহার চিরজীবনের সঙ্গী তানপুরাটিকে বেশ করিয়া মুছিয়া লয়। তানপুরা হাতে করিলে কত কথাই মনে পড়ে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই তানপুরা লইয়া স্বর্গীয় কর্ত্তাবাবুকে কত গান শুনাইয়াছে—বারমাস্যা গাহিয়া হাসি-কান্নার সুর তুলিয়াছে, আর সেবার সেই শীতের রাত্রিতে ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে—"মা ব্রহ্মময়ী তারা" গানটি গাহিয়াছিল, কর্ত্তাবাবু নিজের গায়ের শালখানি তাহাকে বক্‌শিশ দিয়াছিলেন; সে সব দিন কি আর আছে। কর্ত্তাবাবুর ছেলেকে আজ দুই-একখানি গান শুনাইবে এই উৎসাহে বৃদ্ধের বার্দ্ধক্য কমিয়া যায়। তানপুরা হাতে করিয়া আস্তে আস্তে জমিদারের দ্বারে উপস্থিত হয়।

জমিদারবাবু সোফায় হেলান দিয়া চুরুট টানিতে থাকেন। ফরাসে ম্যানেজার, নায়েব, মোসাহেবের দল। একটি গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিতেছিল। গান থামিলে জমিদারবাবু মুখে বিরক্তির ভাব ফুটাইয়া বলেন—একঘেয়ে কানাকেষ্ট আর বাজিও না, চড়াও একখানা ভীষ্মদেব। পুনরায় গান আরম্ভ হয়।

কৈলাস দুয়ারে বসিয়া চুপ করিয়া শোনে আর ভাবে, আজ সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আর কোনরকমে আসর জমাইতে পারিবে না। তাহার মনে পড়ে, তিরিশ বৎসর পূর্ব্বের আর এক পূজার দিনের কথা—

—সেদিন এই বাড়ীর এই উঠানে তার তরজা গান শুনবার জন্য আগত চার-পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে জম্‌জম্ করছিল—তারিণীর ঢোল যেন মেঘ গর্জ্জন করছিল—অন্দর থেকে গিন্নীমার হুকুম এল, একটা গোষ্ঠ-লীলা গাইবার, মতি খুড়োর কাঁসির তালে তালে সে গেয়ে উঠেছিল—

"আমি হই তোর মা নন্দরাণী
মা ব'লে আয়রে কোলে সাধনের ধন চিন্তামণি।"

—দোরে কে রে?

—আজ্ঞে কৈলাস, একবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এলাম।

নায়েববাবু বলিয়া উঠেন—ও, আয় আয়, এদিকে প্রণামীটা দে গোমস্তার হাতে।

—আজ্ঞে গরীব—

—সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি, আমি কি বল্‌ছি নবাবের নাতি—

জমিদারবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলেন—কিছু চায় বোধ হয়।

নায়েববাবুও হাসিয়া বলেন—খাবার মতলব আর কি?

তারপর কৈলাসের দিকে চাহিয়া—যা বস্‌গে যা এখন; পরে প্রসাদ পাবি এখন—কাঙালী ভোজনের সময়।

তাহাকে ধরিয়া জুতা মারিলেও সে এত অপমানিত হইত না, তাহার পায়ের নীচে পৃথিবী তখন দুলিতেছিল, অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আস্তে আস্তে জমিদারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—মাঠাক্‌রুণ এসেছেন কি?

নায়েব ধমক দিয়া বলেন—ব্যাটা ন্যাকা নাকি?

মাঠাক্‌রুণ কি শহরে থাকেন যে পূজোর সময় আসবেন—

তিনি আছেন কাশীতে।

নায়েব মহাশয় জমিদারবাবুকে বলেন—পাকা শয়তান ব্যাটারা শক্তের কাছে ঘেঁসে না, মাঠাক্‌রুণের খোঁজ নিচ্ছেন—

জমিদারবাবু শুদ্ধ একটু হাসেন। কৈলাস ভগ্নহৃদয়ে শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসে। তাহার স্ত্রী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া বলে—ওগো দৌড়ে এস, বাছা আমার কেমন করছে।

মিরাট ও মিরাটের বাঙ্গালী

শ্রীঅবনীনাথ রায়

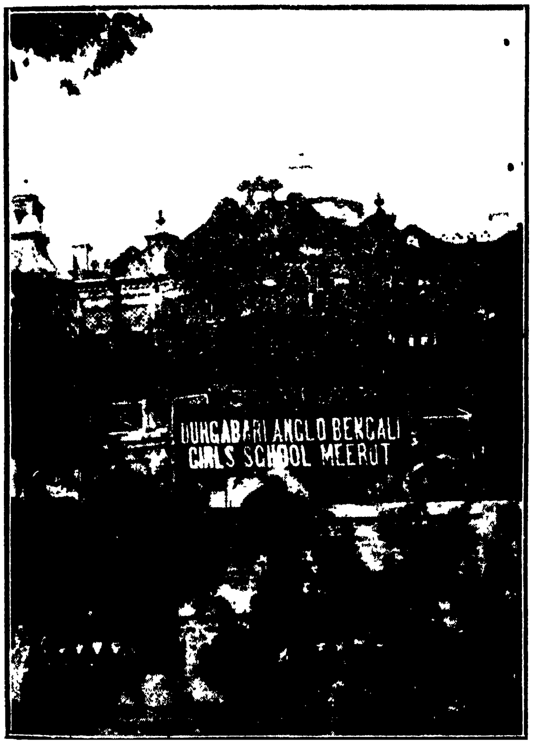
কলকাতা থেকে মিরাট ৯১৮ মাইল। যুক্তপ্রদেশের প্রান্ত-সীমায় এ শহরটি অবস্থিত বলা যেতে পারে, কেন না এখান থেকে মাত্র ৪২ মাইল পশ্চিমে দিল্লী। কলকাতা থেকে গাজিয়াবাদে নেমে গাড়ী বদলে মিরাট যাওয়া যায়—কিম্বা খুরজা জংশনে নেমে গাড়ী বদ্‌লে মিরাট যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে খুরজা হ'য়ে মিরাট সিটি পর্য্যন্ত সমস্তটাই ই, আই, আর। গাজিয়াবাদ থেকে অবশ্য নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ীতে মিরাট যেতে হয়। কলকাতা থেকে মিরাট পৌঁছুতে ২৫।২৬ ঘণ্টা সময় লাগে।

মিরাট স্বাস্থ্যকর স্থান বলে প্রসিদ্ধি আছে। শোনা যায়, যুক্তপ্রদেশের মধ্যে দুটি শহর স্বাস্থ্যের জন্য খ্যাত—একটি মিরাট, অপরটি এটোয়া। এই স্বাস্থ্যের কারণেই সম্ভবত মিরাট সৈন্যাবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল এবং সেই সূত্রেই প্রথমে বাঙ্গালীদের মিরাটে আগমন। সৈন্যবিভাগের কমিশারিয়েট্ ডিপার্টমেণ্টে অর্থাৎ রসদ জোগানোর কাজে চাকরি ব্যপদেশে বাঙ্গালীরা এখানে এসেছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা ব্যবসায় এবং ব্যাঙ্কের কাজেও লিপ্ত হয়েছিলেন দেখা যায়। মিরাটে শীত এবং গ্রীষ্ম দু-ই অতিরিক্ত মাত্রায় পড়ে।

মিরাটের শিক্ষা এবং সংস্কৃতিগত জীবন গড়ে তোলার কাজে বাঙ্গালীর দান অসামান্য। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীরা শুধু ভাগ্যান্বেষণেই প্রবাসে এসেছিলেন তাই নয়, তাঁরা প্রবাস-জীবনে তদানীন্তন সময়ে তৎপ্রদেশের অধিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং একটি উন্নততর শিক্ষা ও সংস্কৃতির জীবন গ'ড়ে তোলার কাজে অগ্রণী হ'য়েছিলেন। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক যাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন এই কারণে এই পুরাতন প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

এই বিষয়ে যাঁর অতুলনীয় দানের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁর নাম কালীপদ বসু। তাঁর বাড়ী চব্বিশ পরগণা জেলায় বারাসতের নিকটবর্ত্তী বামনমুড়া গ্রামে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এলাহাবাদের মিউর সেণ্ট্রাল কলেজে ১৮৭৯—১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকতা করেন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এর ক্যানিং কলেজে ইংরেজি, তর্কশাস্ত্র এবং অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮২-১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারত সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারিয়েটে জেনারেল সার

জর্জ চেস্‌নীর সহকারীরূপে কার্য্য করেন এবং ১৮৮৪-১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত সরকারের ফাইন্যান্‌সিয়াল ডিপার্ট-মেণ্টের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল মিঃ ই-জে-সিন্‌কিনসন্‌ আই-সি-এস-এর সহকারী ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওকালতি করতে তিনি মিরাটে আসেন এবং ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ওকালতি করেন। ১৮৮৬-১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন। ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মিঃ ফ্র্যান্সিস্‌ নেলসন্‌ রাইট্‌ (Francis Nelson Wright B. A. (Oxon) I.C.S.) উদ্‌ঘাটন করেন। তখন মিরাট এসোসিয়েসানের পক্ষ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয় তা কালীপদ বসুর রচনা এবং তিনিই সে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত টাউন হলে যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন ছোট লাট (Lieutenant Governor) সার য়্যালফ্রেড্‌ লায়েলের নামানুসারে লায়েল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধ'রে কালীপদ বসু এই লাইব্রেরির সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। উক্ত টাউন হলে তিনি জুবিলি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তেইশ বছর তার অবৈতনিক সেক্রেটারি



দুর্গাবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়—মিরাট

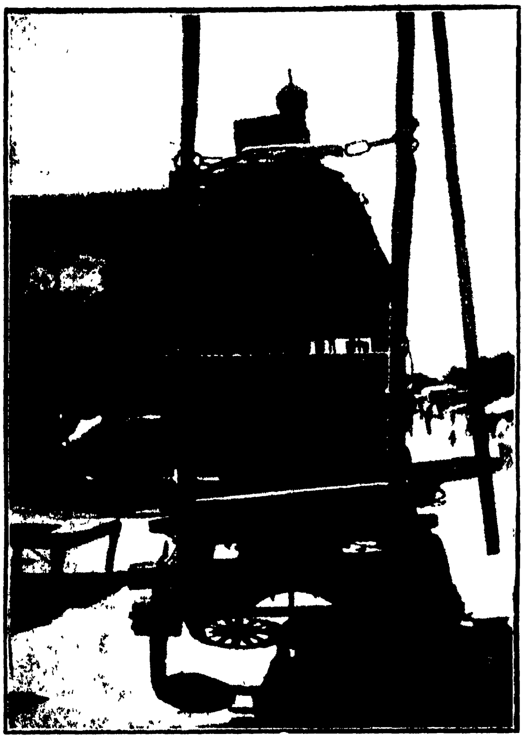


যুক্তপ্রদেশের একা

মিরাট শহর এবং হাপুর, গাজিয়াবাদ, সার্ধানা এবং বাঘ্‌পত তহশীলের পক্ষ থেকে মিরাটে একটি টাউন হল তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন তখন কালীপদ বসু তাঁকে বিশেষরূপে সাহায্য করেন। টাউন হলের যে বর্ত্তমান রূপ, তার পরিকল্পনা কালীপদ বসুর। এর ব্যবহারের আইনকানুন সবই কালীপদ বসু প্রণয়ন করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হিজ রয়েল হাইনেস্‌ দি ডিউক অব্‌ কনট এই টাউন হলের দ্বার

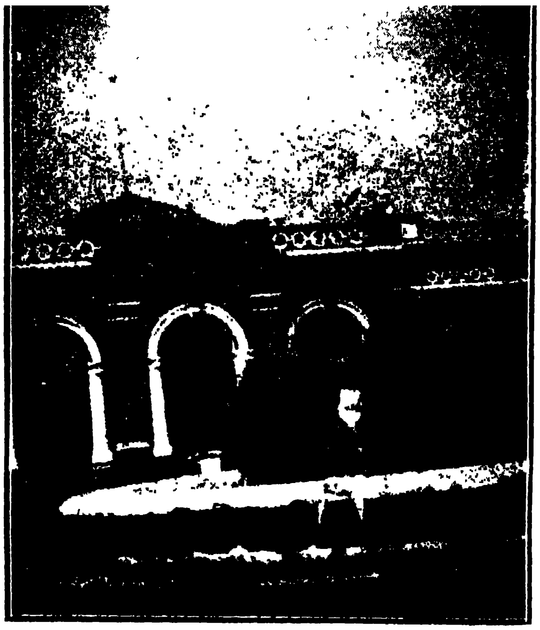
ছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান প্রচলন করা জুবিলি ক্লাবের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিরাটের সদর বাজারে কয়েকটি পাঠশালা এবং মক্তব একত্র ক'রে তিনি একটি এংলো ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপিত করেন। সাত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ, ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ এবং মিরাট ডিভিসনের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং প্রভৃতির সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে তিনি ঐ

স্কুলটিকে হাই স্কুলে পরিণত করেন। ঐ স্কুলটিই এখন ক্যাণ্টনমেণ্ট এ-বি স্কুল নামে খ্যাত এবং সুচারুরূপে পরিচালিত। উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিরাট ডিভিসনে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা তদানীন্তন কমিশনার বাহাদুর, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার প্রভৃতিকে বুঝাইয়া দেন। তাঁরই চেষ্টায় মিরাট কলেজ স্থাপিত হয় এবং তিনি মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত উক্ত কলেজের ট্রাষ্টী এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যে জিলা আদমসুমারী



মিরাটে উটের গাড়ী—বিশ্রামের সময় উঁচু করিয়া রাখা হইয়াছে

কমিটি (District census committee) বসেছিল কালীপদ বসু তার সভাপতি ছিলেন। মিরাট উকিল সভার (Bar Association) তিনি সেক্রেটারি এবং পরে সভাপতি হন। ১৯০৪-১৯০৯ পর্য্যন্ত মিরাট ল চেম্বার্স কোম্পানী লিমিটেডের তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় কাছারি-প্রাঙ্গণে উকীলদের বস্‌বার জন্য নতুন বাড়ী তৈরি হয়েছিল। নানকচাঁদ নামক মিরাটের জনৈক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক টাকা দান ক'রে যান। ১৯০৩-১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালীপদ বসু উক্ত নানকচাঁদ ট্রাষ্ট কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লী দরবারে কালীপদ বসু আসন লাভ করেছিলেন এবং উক্ত সনের ১৯এ জানুয়ারি তারিখে হিজ রয়েল হাইনেস প্রিন্স আর্থার ডিউক অব্ কনট কালীপদ বসুকে তাঁর লোকসেবার জন্য একখানি সনন্দ উপহার দেন। উক্ত সনন্দ মহামহিমান্বিত সম্রাটের তরফ থেকে যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন ছোটলাট স্যর জেম্‌স্ ডিগ্ লা টুস (Sir James Digges La Touche) স্বাক্ষরিত করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা উদয়পুরের রাজ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে কালীপদ বসু জজ হয়েছিলেন।

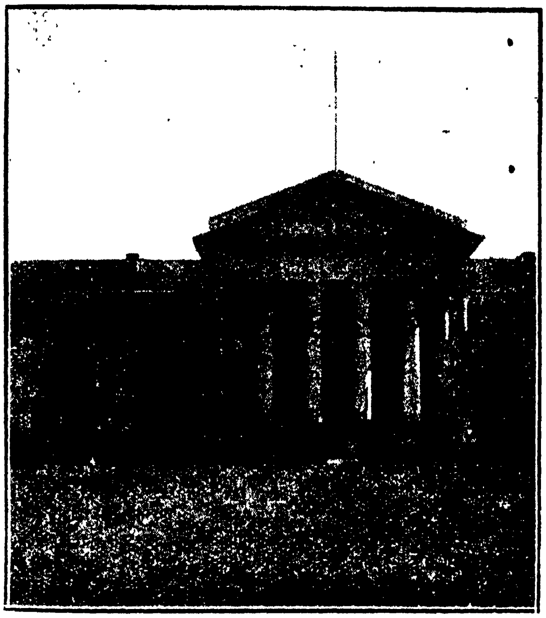


মিরাট টাউন হল এবং লায়েল লাইব্রেরী—বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

কালীপদ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু এখনও সসম্মানে মিরাটে ওকালতি করছেন। ইন্দুবাবু ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছুকাল মিরাটের অন্তঃপাতী মজঃফরনগর জেলার সরকারী উকিলের কাজ করেছিলেন।

কালীপদ বসুর পর ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা সাত ভাই ছিলেন ব'লে এঁদের বাড়ীর নাম সাত ভাইয়ের বাড়ী। বাল্যকালে ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসান

নামক স্কুলে তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। জলপানি পেয়ে তিনি কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং পাঁচ বছর পরে এল-এম-এস উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরিতে প্রবেশ করেন। পরের বছর সদর ডিস্‌পেনসারির ভার পেয়ে মিরাটে আসেন। তখনকার দিনে পাশ্চাত্য প্রথার ওষুধের উপর দেশের লোকের আস্থা কম ছিল; কিন্তু তবু কিছুদিনের মধ্যেই ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথের চিকিৎসার গুণে সদর ডিস্‌পেনসারিতে রোগীর ভিড় জম্‌তে লাগল।



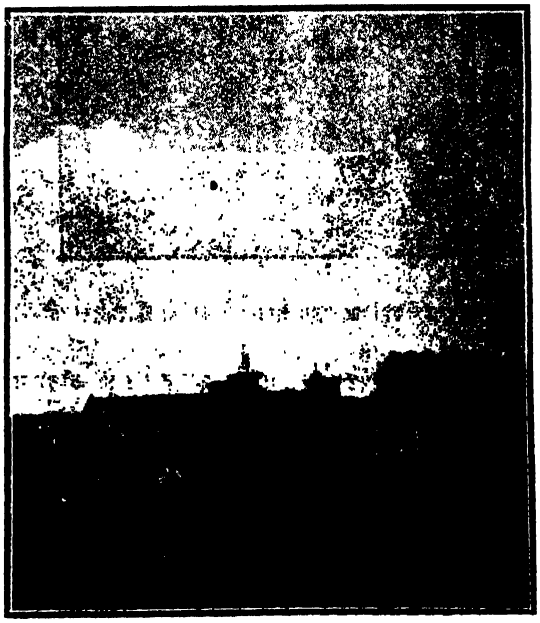
কণ্ট্রোলার আপিস—মিরাট

অল্পকালের মধ্যেই অস্ত্রোপচারবিষয়ে (Surgery) তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তাৎকালীন সরকারী নথিপত্রে তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা বের হয়েছিল। তার একটি নিদর্শন এই যে তাঁর সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের চাকরি-জীবনে মিরাট থেকে অন্যত্র তাঁকে বদলি করা হয় নি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা হ'য়েছিল তখন ডাঃ ঘোষকে যুদ্ধে পাঠাবার প্রস্তাব হয়। তখনকার সিভিল সার্জেন ডাঃ ময়ার (Lt. Col. Moir) মন্তব্য ক'রেছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে ডাঃ ঘোষের উপস্থিতি অমূল্য হবে। ("His services would be invaluable in the performance of operations and the treatment of surgical cases.") ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সেই সময় মিরাটের জনসাধারণ টাউন হলে একটি সভা ক'রে



অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

ডাঃ ঘোষকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। তাতে মিরাটবাসী লোকেরা এই কামনা জানিয়েছিল যে ডাঃ ঘোষ যেন মীরাট ত্যাগ না করেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ যেন



মিরাট কলেজের দৃশ্য—দূর হইতে

মিরাটেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, জনসাধারণের কামনা ব্যর্থ হয় নি। বাকী জীবন ডাঃ ঘোষ মিরাটেই ছিলেন। সার্জ্জন এবং চোখের অসুখ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব'লে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। সাতষট্টি বছর বয়সেও অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি অস্ত্রোপচার করতে পারতেন। নিউ মেডিকাল হল নাম দিয়ে তিনি একটি ওষুধের দোকান স্থাপন করেছিলেন। তিনি ফ্রি মেসন ছিলেন এবং বাঙলার গ্রাণ্ড লজের সঙ্গে



দুর্গাবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীহেমলতা চৌধুরী

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্থানীয় এ-ভি-স্কুলের এবং হরিসভার তিনি সেক্রেটারি ছিলেন এবং দুর্গাবাড়ীর ম্যানেজার ছিলেন। দানের জন্য তাঁর নাম সম্যক্ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রাতঃকাল থেকে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত নিজের বাড়ীতে বিনা ভিজিটে তিনি রোগী দেখ্তেন, দরিদ্রকে বিনা-মূল্যে ওষুধ দিতেন। তাঁর আতিথেয়তা প্রসিদ্ধ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা চিকিৎসিতও হয়েছিলেন। হিন্দুস্থানী মহলে তিনি এখনও ডাক্তার ত্রিলোকীনাথ ব'লে সুপরিচিত। তাদের উপর ত্রৈলোক্যনাথের অসীম প্রতিপত্তি ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুলাই ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয়।



কোম্পানীর বাগান—মিরাট

The Cyclopedia of India নামক গ্রন্থে মিরাটের দু'জন বাঙালীর নামোল্লেখ দেখ্তে পাওয়া যায়—একজন



১০ কালীপদ বসু

কালীপদ বসু, আর একজন ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ। এঁরা উভয়েই সমসাময়িক।

ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ বরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (গৌরবাবু) M. I. P., S. M. D. (Homeo) মিরাটে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন এবং মিরাটে বসবাস করছেন। ইনি হোমিওপ্যাথিক, হিপ্‌নটিক এবং মেসমেরিক চিকিৎসকরূপে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। স্বাধীন নেপালে, রামপুর নবাব-সরকারে, জাওড়ার নবাব-সরকারে গৌরবাবু চিকিৎসকরূপে কাজ করেছেন।

ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথের পর অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। হুগলী জেলায় ভদ্রেশ্বরের সন্নিকটে গৌরহাটি গ্রামে এঁর আদি নিবাস। বাল্যে কলকাতায় থেকে অশ্বিনীকুমার জুনিয়র স্কলারসিপ পাশ করেছিলেন।



ডাঃ প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিপাহী বিদ্রোহের পর অশ্বিনীকুমার কলকাতা ত্যাগ করেন এবং কতক পথ রেলে এবং কতক পথ ঘোড়ার ডাকগাড়ীতে কানপুর পর্য্যন্ত আসেন। সেখানে মিঃ ম্যাকলেভি (Mc Leavy) নামক এক সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উভয়ে মিরাটে আসেন। এই সময় ঘোড়ার ডাকগাড়ী পেশোয়ার পর্য্যন্ত যাতায়াত করত। স্থানীয় জমিদার এবং ধনী লোকদের কাছে শেয়ার বিক্রি ক'রে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এঁরা মিরাটে ব্যাঙ্ক অফ্ আপার ইণ্ডিয়া লিমিটেড্ নামক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যাক্‌লেভি সাহেব উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং অশ্বিনীকুমার চিফ একাউণ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমার উক্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ব্যাঙ্কের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। যুক্ত-প্রদেশের অনেক শহরে সিমলায় ও আম্বালায় উক্ত ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। তখনকার দিনে যৌথ কারবারের নীতি হিন্দুস্থানীরা অবগত ছিল না। অশ্বিনীকুমারের উপর বিশ্বাসের বলে সকলে শেয়ার কিনেছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে "জুড়ি বাংলা" নামক এক বিরাট বাসভবন অশ্বিনীকুমার ক্রয় করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল মুখোপাধ্যায় ইংলণ্ড থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে আসেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই হরলালের মৃত্যু হয়। সেই শোকে সাতান্ন বছর বয়সে অশ্বিনীকুমার পরলোকগমন করেন।



ডাঃ বরেন্দ্রনাথ ঘোষ

তাঁর সময়ে কোন বেকার বাঙালী যুবক মিরাটে এলেই ব্যাঙ্কে চাকরি পেত। তিনি বই পড়তে খুব ভালবাস্‌তেন এবং বাড়ীতে ভাল লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন। দুর্গাবাড়ীর বাঙ্গালা লাইব্রেরি প্রথম অবস্থায় জুড়িবাংলায় রক্ষিত হয়েছিল।

অশ্বিনীকুমারের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় মিরাটে ওকালতি করেন এবং পৈতৃক বাসভবনে বসবাস করছেন; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মিরাট কলেজে ইংরেজি শাস্ত্রের অধ্যাপক।

ডাঃ প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অতঃপর

উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তর বঙ্গে বাঙ্গালীদের বিলীয়মান প্রতিষ্ঠা তিনি কতকটা রক্ষা ক'রে যেতে পেরেছিলেন। প্রবোধনাথের পৈত্রিক বাসভূমি উত্তরপাড়ায়। তাঁর কর্ম্মজীবন মিরাটেই আরম্ভ হয়। তিনি যখন মিরাটে আসেন তখন ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথের যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি। সেই কারণে তিনি প্রথমে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথের সহকারীরূপেই ডাক্তারি সুরু করেন। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর প্রবোধনাথের পসার বাড়তে থাকে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। জটিল রোগনির্ণয়ের সমস্যায় সকল ডাক্তারই



ক্লক টাউয়ার—মিরাট

প্রবোধনাথের পরামর্শ নিতেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। প্রত্যূষকাল থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তিনি রোগীর চিকিৎসা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের আধুনিকতম পুস্তক এবং সাময়িকপত্রাদি পাঠে ব্যাপৃত থাকতেন। এইভাবে কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি চিকিৎসকরূপে প্রভূত যশঃ এবং অর্থ অর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে যখন মিরাটে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হয় তখন প্রবোধনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। ফুলের এবং ফলের বাগান তৈরি করা এবং পশুপক্ষী শিকারে প্রবোধনাথের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

প্রবোধনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মিরাটে ডাক্তারি ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

মিরাটের আর একজন পুরাণো বাসিন্দার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি দিগম্বর মুখোপাধ্যায়। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ ক'রে ভাগ্যান্বেষণে তিনি মিরাটে এসেছিলেন। তাঁর বাড়ী বেহালায়, তাঁর পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায়। তখন রেলপথ না হওয়ায় দিগম্বর এক বন্ধুর সঙ্গে নৌকায় গড়মুক্তেশ্বর পর্য্যন্ত আসেন। সেখানে পথিমধ্যে তাঁদের সর্ব্বস্ব, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হয়। হিন্দুস্থানী মেয়েরা সকালে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে তাঁদের অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে দু'খানি ওড়না তাঁদের দেন। তাই পরে হেঁটে তাঁরা মিরাটে আসেন। দিগম্বরবাবু বিশেষ লেখাপড়া জান্‌তেন না। সেই কারণে সরকারী চাকরি না পেয়ে এক ইউরোপীয় মদ্যব্যবসায়ীর দোকানে মদ্যবিক্রেতা নিযুক্ত হন। দিগম্বরবাবু খুব পরিশ্রমী, সত্যপরায়ণ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় এবং ভদ্র ব্যবহারে ঐ দোকানের আয় খুব বাড়ে। তাঁর প্রভু দিগম্বরের বিশ্বস্ততায় এবং কর্ম্মদক্ষতায় এত দূর খুশী হয়েছিলেন যে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর দোকানগুলি দিগম্বরকে দান করে যান। হঠাৎ বড়লোক হওয়ায় দিগম্বরের কোন মতিবিভ্রম হয়নি। তিনি আগের মতই ধর্ম্মপ্রবণ, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, আর্ত্তে দয়াবান, অকপট এবং নিরহঙ্কার ছিলেন। দান করার বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মুক্তহস্ত ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য রসদ সরবরাহ ক'রে তিনি এক লক্ষ টাকা লাভ করেছিলেন। তাঁর বাসভবনের পাশে সাধারণের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি বৃহৎ ইঁদারা খনন করিয়েছিলেন। সেটি এখনও আছে এবং তার জল লোকে ব্যবহার করছে। তাঁর বাড়ীর পাশে বৎসরে দুটি মেলা হয় —তাদের নাম গুড়িয়ার মেলা, আর ছড়িয়ার মেলা। দিগম্বর এই মেলার সূত্রপাত করেন। মিরাটের দুর্গাবাড়ীর পূজার দালান এবং তৎসংলগ্ন কয়েকখানি ঘর ও দরদালান দিগম্বর নিজের ব্যয়ে তৈরি করিয়ে দেন। সিপাই-যুদ্ধের সাত-

আট বৎসর পরে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মিরাটেই দিগম্বরের মৃত্যু হয়। আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত হ'য়ে লেখাপড়া না জেনে প্রবাসে বিনা মূলধনে কেবলমাত্র চারিত্রিক বলে কি ক'রে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় দিগম্বর মুখোপাধ্যায় তার উদাহরণ।

স্বর্গীয় কালীপদ বসুর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মিরাটে আর একজন লোকসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁর নাম ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্র। ইনি বড়ষে-বেহালার মিত্র পরিবারের সন্তান, কিন্তু এঁরা ছয় পুরুষ গাজীপুরের অধিবাসী। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মেসোমশায় গাজীপুরে আসেন এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে এঁর অতি-বৃদ্ধ-পিতামহ গাজীপুরে আসেন। এঁর পিতার নাম ভোলানাথ মিত্র, তিনি গাজীপুরের আফিং ফ্যাক্টরীর বড়বাবু ছিলেন। ভোলানাথের ছয় পুত্র, ছয় কন্যা—রমেশচন্দ্র দশম সন্তান। প্রথমে গাজীপুরের ভিক্টোরিয়া স্কুলে, পরে বেনারসের সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে, তার পর লাহোরের মেডিকাল কলেজে এবং পরিশেষে গ্রেট্ ব্রিটেনে রমেশচন্দ্রের শিক্ষালাভ হয়। ছাত্রজীবনেই খেলা-ধূলায় এঁর বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। হিন্দু কলেজে দু বছর হকি টিমের ক্যাপ্টেন এবং গেম-সেক্রেটারি ছিলেন। ফুটবল এবং হকিতে ইনি টুর্নামেণ্ট খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিলাত প্রত্যাগত হ'য়ে ইনি মিরাটে ডাক্তারি ব্যবসায় সুরু করেন। মিরাটের ইণ্ডিয়ান জিমখানার ইনি একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্ত্তমানে সভাপতি। হর্নেট্স্ ক্লাব নামক খেলাধূলার প্রতিষ্ঠানের ইনি একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং বহুদিন সভাপতি ছিলেন। মিরাট মেডিকাল য়্যাসোসিয়েশনের ইনি সেক্রেটারি। সনাতন ধর্ম্ম মহামণ্ডল সংযুক্ত প্রদেশের শাখার ইনি সহকারী সভাপতি। রেট পেয়ার্স এসোসিয়েশানের ইনি সেক্রেটারি। ক্যাণ্টনমেণ্ট রেসিডেণ্টস্ এবং হাউস্ওনার্স এসোসিয়েশানের ইনি সেক্রেটারি। মিরাট সেবা সমিতি বয় স্কাউট্স্ য়্যাসোসিয়েশানের ইনি সভাপতি। দেবনাগরী স্কুলের এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট এংলো বেঙ্গলী স্কুলের পরিচালক সমিতির ইনি সদস্য। গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের পরামর্শদাতা সমিতির (Advisory Committee) ইনি সদস্য। জুবিলি ক্লাবের সেক্রেটারি। ক্যাণ্টনমেণ্ট ওয়ার লোন কমিটির ইনি সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে আড়াই লক্ষ টাকা তোলেন। জুনিয়র রেড ক্রস কমিটির জয়েণ্ট সেক্রেটারি ছিলেন। দুর্গাবাড়ী সোসাইটির সমস্ত শাখার ইনি সদস্য এবং কয়েকটির সভাপতি ছিলেন। অনেকদিন দুর্গাবাড়ীর চিফ ম্যানেজার ছিলেন। সেবাসমিতির পূর্ব্ব নাম গুড্ উইল ক্লাবের ইনি প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি এবং পরিচালক-সমিতির সভাপতি ছিলেন। যুক্তপ্রদেশের মেডিকাল এসোসিয়েশানের (ইউ-পি শাখার) ইনি সহকারী সভাপতি। ডাঃ মিত্র বর্ত্তমানে ব্লাড্ প্রেসারে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি পঞ্চান্ন বছর বয়সেও মিরাটে বাস করছেন এবং জনহিতকর কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ডাঃ মিত্রের সুমধুর এবং নিরহঙ্কার ব্যবহার,



ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ

অপরের জন্য দুঃখবোধ এবং সাহায্যে তৎপরতা তাঁকে গরীবের মা-বাপ করে তুলেছে।

আর একজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যিনি জীবনে কোন দিন নাম যশের আকাঙ্ক্ষা করেননি। মিরাটের সমস্ত মঙ্গলকর কাজের পিছনেই তাঁর কর্ম্মোদ্যম আছে, কিন্তু তিনি সংসার রঙ্গমঞ্চের সামনে আসতে পরাঙ্মুখ। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে—তিনি সত্তর বছর বয়স অতিক্রম করেছেন। তিনি মিলিটারি একাউণ্টস্ ডিপার্ট-মেণ্টেই চাকরি করতেন—এখন পেন্সন পান। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রকৃত ভক্ত তিনি—তাঁর পুণ্যকথা শ্রবণ

মনন করাকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ ব'লে মনে করেন। প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তিনি বাঁধা পড়তে চাননি, যদিচ



ডাঃ রমেশচন্দ্র মিত্র (৫৫ বৎসর বয়সে)

অনেকের মনে তিনি সৎকার্য্যের প্রেরণা জুগিয়েছেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।

মিরাটের বাঙ্গালীদের সর্ব্ববিধ কর্ম্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল বেঙ্গলী দুর্গাবাড়ী সোসাইটি। এটি রেজেষ্টিকৃত প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর এখানে দুর্গাপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় এবং দোল ও সরস্বতী পূজাও হয়। দুর্গাবাড়ী সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত শাখা সমিতির তালিকা এই :—(১) বীণা লাইব্রেরি, (২) সেবা সমিতি, (৩) থিয়েটার পার্টি—নাম ফ্রেণ্ডস্ ইউ-নিয়ান্ ড্রামেটিক ক্লাব, (৪) কনসার্ট পার্টি, (৫) হরিসভা ও (৬) এংলো বেঙ্গলী গার্ল্‌স্ স্কুল। এগুলি ছাড়া খেলাধূলার জন্য "হর্নেট্‌স্ ক্লাব", "কীর্ত্তনসংঘ" এবং "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি সাহিত্য শাখা"ও মিরাটে আছে। প্রতি মাসে এক একজন গৃহস্বামীর আহ্বানে তাঁর বাড়ীতে সাহিত্যের বৈঠক বসে এবং সেখানে প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা প্রভৃতি হয়। বাঙ্গালীদের কালীবাড়ীও আছে। স্থানীয় কলেজে বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন এবং ডাক্তারি ও ওকালতি প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ে বাঙ্গালী আছেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী কনট্রোলার অব মিলিটারি একাউণ্টস্ আপিসে। এই আপিসে কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন।

নির্ম্মলা

শ্রীসমরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

গত রাত্রে ভীষণ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শতধার বৃষ্টির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গৃহের ভিতর চারিটি প্রাণী সারা রাত নিষ্ফল ছুটাছুটি করিয়া কাটাইয়াছি। প্রাতঃকালে বৃষ্টি থামিলে চালে উঠিয়া বিস্রস্ত খড়গুলিকে যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া সদ্যলিপ্ত বারান্দায় একটা জলচৌকির উপর বসিয়া এক ছিলিম তামাকু খাইতেছি, এমন সময় গৃহিণী জলের ঘড়া লইয়া হন্তদন্তভাবে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার ক্রোধের লক্ষ্যস্থল যে স্বয়ং আমি সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

হুঁকার ছিদ্রপথ হইতে ঠোঁট দুইটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া বলিলাম, এই চমৎকার ভোর বেলায় তোমার এই যুদ্ধং দেহি ভাব কেন বল তো?

প্রত্যুত্তরে হঠাৎ যেন মেঘ-মেদুর আকাশ নির্ম্মম বজ্র হানিয়া পরক্ষণে অনুতাপে গলিয়া পড়িল! কণ্ঠস্বর নিরতিশয় কঠোর করিয়া গৃহিণী বলিলেন, কাল থেকে জল আনতে পুকুরে আমি আর যেতে পারব না, বুঝলে?

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল এবং নাসারন্ধ্র দুইটিকে ঈষৎ বাঁপাইয়া তাঁহার পাণ্ডুর গাল দুইটি সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

গৃহিণীর ব্যথা ও ক্রোধের হেতুটা যে বুঝিতে পারি নাই এমন নহে, কিন্তু যে-ব্যথার আশু নিরসন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে তাহার জন্য শুষ্কগর্ভ সান্ত্বনাবাক্য কপচাইয়া নিজের অক্ষমতাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারি না। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা নিয়মিত পাঠ করিতেছিলাম। তাই গৃহিণীর শোকাবহ উক্তি মনকে গভীরভাবে নাড়া দিলেও আকারে-অবয়বে যথাসাধ্য অবিচলিত রহিলাম। বরং এক গাল ধূম্র শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কৌতুকের সহিতই বলিলাম, বেশ তো, কাল থেকে আমিই না-হয় ঘড়া কাঁধে করে জল আনতে যাব!

গৃহিণী কিন্তু এ কথায় একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন।

আমার অবিচলতার সহিত শ্রীমদ্ভাগবৎগীতার যে কি সম্পর্ক তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে জলের ঘড়াটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া একটানে আমার মুখসংলগ্ন নির্দোষ হুঁকাটি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন!

তাঁহার রোষদীপ্ত মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলাম, দেখ, কাজটা কিন্তু ভাল করনি। সংসারে আমার ঐ একটামাত্র অবলম্বন। এর উপর তোমার এত নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়। হুঁকাটি গিয়ে থাকলে আমিও বাঁচব না।

বলিয়া পরম দুঃখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হুঁকাটা আনিতে যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় গৃহিণী একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে অসংলগ্নভাবে নানা বিলাপ করিতে করিতে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, ঘরে যার এত বড় আইবুড়ো—

তাঁহার আর বলিতে হইল না। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ নিমেষে টুটিয়া গেল। আমি জলচৌকিটা হইতে স্প্রীং-এর মত লাফাইয়া উঠিলাম এবং দুই হাতে সবলে গৃহিণীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া যথাসম্ভব নিম্নকণ্ঠে ও কড়ভাবে বলিলাম, চুপ চুপ, মেয়েটা ঘরে আছে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ো না।

তাঁহাকে আর কিছু বলিবার সুযোগ না দিবার উদ্দেশ্যে ত্রস্তপদে আমার ছোট বাগানটিতে ছুটিয়া গেলাম। বাগানের মধ্যস্থলে একটি আমড়া গাছ—আমার বাগানের বনস্পতি। উহার নীচে গুঁড়ি ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলাম। দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত প্রকৃতি ধৌত ও নির্ম্মল, যেন সদ্য-স্নাতা কিশোরী বালিকা।

অল্পক্ষণ পরেই কন্যা নির্ম্মলা কাঁসার গ্লাসে করিয়া চা লইয়া আসিল। সিক্ত উনানে আগুন ধরাইতে গিয়া চোখমুখ তাহার লাল হইয়া উঠিয়াছে। চা অর্থাৎ দগ্ধ শর্করাবর্জ্জিত প্রায় এক গেলাস বিস্বাদ পানীয়। চা'র নামে এই পানীয়টুকু আমার হাতে দিতে তাহার সঙ্কোচের ও বেদনার সীমা থাকে না। কিন্তু এমনই অভ্যাস, সকালবেলা একটু চা অথবা চা-নামধেয় একটু পানীয় না পাইলে আমার কিছুতেই চলে না।

আমার সপ্তমবর্ষীয় পুত্র মাখন মাছ ধরিবার জন্য বাগানের এক ধারে একখানি কোদাল লইয়া কেঁচো খুঁড়িতেছিল। দিদিকে চা লইয়া আসিতে দেখিয়া নিঃশব্দে সে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ চা বাকি থাকিতে গ্লাসটি তাহার হাতে দিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম, মাখন, এখন থেকে তুমি আর চা খেতে পাবে না। এতে একরকম ভয়ানক বিষ থাকে যাতে—

আমার হিতোপদেশের প্রতি সে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করিল বলিয়া মনে হইল না এবং এক চুমুকে গ্লাসটি শূন্য করিয়া আবার স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা গ্লাসটি লইয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। ময়লা আটপৌরে একখানা প্রশস্ত লালপেড়ে কাপড়ে তার পদ্মবর্ণ দীর্ঘ তনুলতা বেষ্টিত। নাই অলঙ্কারের বাহুল্য, শুধু দুইগাছি পুরাতন লোহার নোয়া তার দুই মণিবন্ধে লুটাইয়া পড়িয়াছে যেন নিজেদের কৃষ্ণত্বের কলঙ্কে অপরিসীম লজ্জায় তাহাদের আত্মগোপনের চেষ্টা। অযত্নে অবহেলায় সকলের অগোচরে সৌন্দর্য্যের শতদল বিস্তার করিয়া কখন সে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার স্বভাব-সৌন্দর্য্যের কাছে সমস্ত কৃত্রিমতা তুচ্ছ। দারিদ্র্য-তমসাচ্ছন্ন, রিক্ত এই সংসারে সে যেন এক ফালি জ্যোৎস্নার আলো।

নির্ম্মলা দৃষ্টিপথ হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া বসিলাম। কি আলোড়নই না উঠিয়াছে গ্রামের বুকে এই নিষ্পাপ নিরপরাধ মেয়েটাকে কেন্দ্র করিয়া। সমাজপতিদের গুপ্ত মন্ত্রণা, নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবকদের রসাল আলোচনা এবং পুরমহিলাদের সতৃপ্তি হাস্যকৌতুক। যেন ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে সমাজবৃক্ষ যুগপৎ বিদ্রূপ, ধিক্কার, শাসন ও সমালোচনার নবপত্রদলে পল্লবিত ভারাক্রান্ত! আমার ব্যথার অশ্রু সমাজের চিত্তকে সরস সুধাময় করিয়া তুলিয়াছে। উহাকে শীঘ্র শীঘ্র এই সুধা হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় বোধ করি স্বয়ং বিধাতারও নাই। তাই পাত্রানুসন্ধানের সমস্ত চেষ্টা এ পর্য্যন্ত আমার ব্যর্থ হইয়াই আসিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মকে রসাতলগামী করিতে বসিয়াছি বলিয়া কত না অভিসম্পাত বর্ষিত হইতেছে আমার শিরে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিবার কিছুমাত্র চেষ্টাও কেহ প্রয়োজন মনে করেন না। নির্ম্মলার রূপলুব্ধ দুই-একটি ভদ্র যুবক বিনা-পণেই তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু পাত্রের পিতামাতারা পুত্রবধূর রূপলাবণ্য অপেক্ষা বৈবাহিকের তহবিলের দিকেই দৃষ্টি দেন বেশী। অবশেষে অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শিতার ফলে যখন বুঝিতে পারিলাম, বিনাপণে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করিবার মত সৎসাহস ও মহত্ত্ব কোথাও নাই তখন হইতে নিয়তির ইচ্ছার উপর জীবনের ভার ছাড়িয়া দিয়া পাত্র-খোঁজায় ক্ষান্ত দিয়াছি। কিন্তু কুৎসাকারিণীদের নিন্দাবাদে গৃহিণীকে আজ এতদূর বিচলিত দেখিয়া মন অশান্ত না হইয়া পারিল না। নির্ম্মলার বিবাহ না দেওয়া পর্য্যন্ত অশান্তির অনির্ব্বাণ তুষানল হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। কিন্তু পাত্র কোথাও নাই! বরং সুদুর্গম জঙ্গল হইতে বিরাট ব্যাঘ্রকেও গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া আনিবার সাহস করিতে পারি কিন্তু ভদ্রসমাজ হইতে পাত্র খুঁজিয়া আনা আমার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।

নিষ্ফল আক্রোশে মানুষের বিরুদ্ধে সমস্ত মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। প্রথমত যত রাগ গিয়া পড়িল ইংরেজদের উপর। তাহারা হিন্দু সমাজের কি বোঝে যে এমন একটা আইন করিয়া বসিল? তাহাদের মনে এত দয়ার সঞ্চার না হইলে গঙ্গাসাগরে অঙ্কুরেই মেয়েটাকে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হইতাম। দরিদ্র পিতার শেষ সম্বলটুকুও তাহারা কাড়িয়া লইল! মনুষ্যত্বের মহিমায় মহাপুরুষের চিত্ত এতই যদি বিগলিত হইয়াছিল তবে আর একটা আইন করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার একটা গতি কেন করিয়া দিলেন না? তার পর স্বয়ং ভগবানের পক্ষপাতিত্বটাই বা কি রকম? প্রতিবেশী রামজয়ের প্রচুর সম্পত্তি থাকিতেও তার মেয়ে মাত্র একটি, আর ছেলে পাঁচ-পাঁচটি। ভগবানের পক্ষপাতিত্বের এক বিরাট দৃষ্টান্ত এই রামজয়টা এবং আমারই চোখের সামনে অহঃরহ সে পক্ষপাতিত্বের ধ্বজাটা সগৌরবে উড়াইতেছে। কেন, রামজয়ের পাঁচটি মেয়ে আর ছেলে একটি হইলে কি

ক্ষতি ছিল এবং মেয়ের পরিবর্ত্তে আমার গুটিকয়েক ছেলে? একটি মেয়ের বিবাহে রামজয় যে খরচ করিবে তার চারগুণ কড়ি সে সিন্দুকে পুরিবে পাঁচ ছেলের বিবাহ দিয়া। আর আমি? ভাবিতেই নিদারুণ ক্রোধে সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, দুইটি চক্ষু দিয়া এখনই আগুন ঝরিয়া পড়িয়া মদনভস্মের মত একটা-কিছু ব্যাপার করিয়া তুলিবে। হাত দুইটি অজ্ঞাতসারেই কখন মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, মুখের ভাব কেমন হইয়াছিল জানি না—বোধ হয় লৌহকঠোর। হঠাৎ সমস্ত মন গর্জ্জিয়া উঠিল, কেন? কেন ভগবান তোমার এই অন্যায়, এই অবিচার, এই পক্ষপাতিত্ব? —কেন? কেন? কেন?

আজ্ঞে কর্ত্তা, ওষুধ নেবার জন্য—একটি ভীতকণ্ঠের ধ্বনি।

চিন্তার গহন অরণ্য হইতে শরবিদ্ধ হরিণের মত চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল, কোন অশরীরী প্রেতাত্মা আমাকে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। সভয়ে চক্ষু ফিরাইতেই দেখিলাম, সীতারাম বাগ্দীর বৌ একটা হলদ রঙের শিশি হাতে করিয়া সত্রাসে আমার দিকে চাহিয়া আছে। সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে কল্পনা করিতেই হাসি আর কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলাম না। অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিলাম।

বাগ্দী-বৌ অধিকতর ভীত হইয়া দুই-চারি পা পিছাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—কি ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে?

লজ্জায় এবং একটা সুস্পষ্ট ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। উত্তেজনাবশে শুধু শেষের কথা তিনটাই হঠাৎ যে কেন মানসলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া এমন অত্যুগ্রভাবে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার অভ্রান্ত হেতু মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ নির্ণয় করিতে পারেন, কিন্তু বাগ্দী-বৌটা আমার আচরণে ভাবিল কি? ভগবানের উদ্দেশ্যে মানুষের সুখদুঃখসম্পর্কিত যে কত বড় একটা দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছি সে তো আর তাহা বুঝিল না। সে নিশ্চয়ই ধরিয়া লইয়াছে, আমার এই রূঢ় প্রশ্নটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এমন জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হইয়াছে। তারপরই সামঞ্জস্যবিহীন বিশ্রী হাসিটা। বাগ্দী-বৌটা যদি আমার মস্তিষ্কের তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়া থাকে ও স্বজাতিদের মধ্যে এই তথ্যটা সালঙ্কারে একবার ঘোষণা করিয়া আসে তবে সপরিবারে আমার মহাপ্রস্থানের পথ একেবারেই নিষ্কণ্টক। কারণ আমার মরণোন্মুখ ব্যবসাটা এখন এদের শ্রেণীতেই অর্থাৎ হাড়ি, বাগ্দী, ডোম, চাঁড়াল ইত্যাদির মধ্যে আসিয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছে।

কৃতকার্য্যের সংশোধনের জন্য যথাসম্ভব কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কতক্ষণ এসেছিস বাগ্দী-বৌ? আমার মনটা আজ বড্ড খারাপ কি-না তাই যা-তা করে দিয়েছি। তুই বুঝি বড্ড ভয় পেয়েছিস?

স্বস্তির সহিত লক্ষ্য করিলাম—বাগ্দী-বৌ অমূলক আশঙ্কাটাকে মনে স্থান দেয় নাই। মাথার আঁচলটা ঈষৎ টানিয়া এবং পানের রসে বিবর্ণ দাঁতগুলি বিকাশ করিয়া বলিল, ওমা! ভয় আবার পাব না! যা হাবভাব করেছিলে। তা এত বড় সোমত্ত মেয়ে যার কাঁধে ঝুলছে তার পাগল হলেই কি!

বাগ্দী-বৌকে লইয়া আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়া উঠিলাম। ডিস্‌পেন্‌সারি অর্থাৎ কায়ক্লেশে দণ্ডায়মান একটা ছোট দু'চালা কুঠুরি যার ভিতরে দৈন্যদশাগ্রস্ত একটা আলমারি, পৈতৃক আমলের জরাজীর্ণ একটা বেঞ্চি ও নড়বড়ে একটা কাঠের চেয়ার বিদ্যমান। আলমারির ভিতরে হোমিওপ্যাথি ওষুধের ছোট ছোট শিশিগুলির অনেকগুলিই খালি। তবে অনেক সময় লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বাধ্য হইয়া ঐগুলি জল দিয়া ভরিয়া রাখিতে হয়। অবশ্য কাহাকেও প্রতারণা করিয়া খালি জল ঔষধ বলিয়া চালাইয়া দিই না।

বাগ্দী-বৌ ঔষধ লইয়া বিদায় হইল এবং মূল্য বাবদ সের দেড়েক চাল ও গোটা কয়েক গোল আলু দিয়া গেল। এই ভাবেই আমার দিন চলে। যে শ্রেণীর মানবসন্তানদিগকে লইয়া আমার কারবার তাহাদের প্রায় সকলেই নগদ পয়সা দিতে অক্ষম। কেহ বা গায়ে খাটিয়া কিছু কাজ করিয়া দিয়া যায়, কেহ বা উৎপাদিত দ্রব্যের খানিকটা, কেহ বা কিছুই দেয় না। নগদ পয়সা পাইলে গ্রামের ফার্ম্মেসী হইতে কিছু ঔষধ কিনিয়া আনি।

এককালে অবশ্য আমার এরূপ শতচ্ছিদ্র দারিদ্র্য ছিল না।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ছিল না। কঠিন রোগ হইলে অবস্থাপন্ন যাহারা তাহারা আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী শহর হইতে ডাক্তার লইয়া আসিত। যাহারা গরীব তাহারা হয় নিঃশব্দে মরিত, না হয় ত্রৈলোক্য কবিরাজের বড়ি খাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিত। তখন ত্রৈলোক্য কবিরাজই ছিলেন গ্রামের একমাত্র ধন্বন্তরী। কিন্তু তিনি স্বর্গগত হইলে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার মত চিকিৎসা-বিশারদ আর দেখা গেল না।

আমাদের আর্থিক অবস্থা তখন মোটামুটি ভাল এবং বাবা তখন জীবিত। আমি কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া সেই আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী শহরে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারি জুটাইয়া লই। তারপর চার-পাঁচ বৎসর নিষ্ঠার সহিত ডাক্তারের সাকরেদী করিয়া একদিন বগলে একখানা মেটিরিয়া মেডিকা ও হাতে এক বাক্স হোমিও-প্যাথি ওষুধ লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে গ্রামের রোগ দমনে আমার প্রসার-প্রতিপত্তি বেশ জমিয়া উঠিল এবং অর্থাগমও হইল কয়েক বৎসর মন্দ নয়। তারপর জমিদার জীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন এক বালককে মনে মনে ভাবী জামাতা স্থির করিয়া শহরে পাঠাইয়া দিলেন চিকিৎসা বিদ্যা শিখিবার জন্য। সেই অজাতশ্মশ্রু বালক চিকিৎসা বিদ্যা ও যৌবন লাভ করিয়া চক্রবর্ত্তী সকাশে উপস্থিত হইল। যথাসময়ে এই ডাক্তারবাবু জমিদারবাবুর ঘরজামাই-এর পদ অলঙ্কৃত করিয়া শ্বশুরের অর্থানুকূল্যে গ্রামে ডিস্‌পেন্‌সারি ও ছোটখাট একটি ওষুধের দোকান খুলিয়া বসিল। রকমারি ওষুধের আবির্ভাবে রকমারি রোগও তাহাদের গুপ্তস্থান হইতে দলে দলে বাহির হইয়া গ্রামবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। ক্রমে এই গ্রামে ও আশে পাশের অনেকগুলি গ্রামেই নূতন ডাক্তারের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চিকিৎসা বিদ্যার দক্ষতার জন্য না হউক, অন্তত চটকে এবং জমিদারের জামাতা বলিয়া

সকলেই তাহার কাছে ভিড়িতে লাগিল। সেই অবধি আমার গৃহে কমলা চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন এবং একদিন এমন অন্তর্ধান করিলেন যে দেবী আর ধরা দিলেন না। পৈতৃক আমলের একখণ্ড জমি ছিল, কালক্রমে ঋণের দায়ে তাহাও জমিদারের বিরাট ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বসত বাড়ীখানাও জমিদারের নিকট বন্ধকাবদ্ধ।

বিকালেও আমার ছোট বাগানটিতে একাকী বসিয়া আছি। প্রাতঃকালের ব্যাপারটা তখনও মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা গ্লানিকর অস্বস্তি জাগাইয়া রাখিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি-টুকু মুমূর্ষু ব্যক্তির নয়ন-জ্যোতির মত সকরুণভাবে আমার পদপ্রান্তে লুটাইতেছে। আমারও জীবন-সূর্য্য কালের দিগন্তরেখায় কবে মিশিয়া যাইবে ভাবিতেছি, এমন সময় হারাধন পেয়াদা আসিয়া সংবাদ দিল যে কর্ত্তা আমাকে তলব করিয়াছেন, শীঘ্র হাজির হইতে হইবে।

কর্ত্তা অর্থাৎ জমিদার জীবন চক্রবর্ত্তী। গ্রামে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার ভারও তাঁহারই উপর। তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত শাসনগুণে শাস্ত্রবাক্যের একচুল এদিক ওদিক হইবার জো নাই।

কালবিলম্ব না করিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে কর্ত্তামহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। কর্ত্তামহাশয় সাদা ধবধবে ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া গুড়গুড়ি হুঁকায় তামাক টানিতেছিলেন, সামনে একখানা খোলা পঞ্জিকা। অদূরে শাস্ত্রীয় শাসন ব্যাপারে তাঁহার দক্ষিণহস্ত ও সচিব কালীশরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উপবিষ্ট। তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরই অট্টালিকা সংলগ্ন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়া কোনও প্রকারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। উভয়কে সবিনয়ে প্রণাম করিয়া ফরাসের এক কোণে বসিয়া পড়িলাম।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—শুনতে পাই, তুমি নাকি হাত-পা গুটিয়ে চুপটি ক'রে বসে আছ। নচ্ছার কোথাকার। প্রজাপতি স্বয়ং তোমাকে পাত্র খুঁজে এনে দেবেন, না? শাস্ত্রে বলে, নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ, অর্থাৎ সুপ্ত সিংহের মুখেও মৃগ অর্থাৎ হরিণ প্রবেশ করে না, আর তুমি ত কোন ছার। অরক্ষণীয়া মেয়ে ঘরে পুষে সাত পুরুষসহ নরকে পচে মর আমার তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাকে সমাজে রেখে এসব অশাস্ত্রীয় ব্যাপার আর ঘটতে দিতে পারি না। উচিত মতে তোমার দণ্ড অনেক আগেই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তোমার অবস্থা বিবেচনায় শাস্ত্রবাক্যের অমর্য্যাদা করেও তোমায় অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। আর নয়। তোমার মত নচ্ছারকে দয়া করলে আরও মাথায় চেপে বস।

বলিতে বলিতে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। আমি নীরবে নতমস্তকে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, কি হে, কথা বলচ না কেন? তোমার মেয়ের বয়স এখন পনর'র একচুল কম নয়।

মাথা তুলিয়া সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিলাম, আজ্ঞে এবার চৌদ্দয় পা দিয়েছে।

ষাট বৎসরের চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুবিস্তৃত টাকে একবার হাত বুলাইয়া একেবারে সরলচিত্ত শিশুর মত হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আরে মূর্খ, বিবাহের বয়স পেরিয়ে গেলে পনর যে-কথা, চৌদ্দও সেই কথা।

তারপর বিদ্যাবাগীশের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—কি হে বিদ্যাবাগীশ, মনুসংহিতার সেই শ্লোকটা—প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে—

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বড়ই বিপদে পড়িলেন। প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং—যঃ কন্যাং—বার কয়েক আবৃত্তি করিয়া থামিয়া পড়িলেন। সমাজশাসনসৌকর্য্যের জন্য তাঁহারা এই জাতীয় দুই-চারিটা শ্লোক কোনও কালে হয় তো শিখিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু বহুদিন যাবৎ এই সমস্ত শাস্ত্রীয় জ্ঞান কাজে লাগাইবার সুযোগ না পাইয়া ভুলিতে বসিয়াছেন। শ্লোকের বাকী কথাগুলি কিছুতেই স্মরণ করিতে না পারিয়া বিদ্যাবাগীশ অবশেষে মুখ চুণ করিয়া বলিলেন, কই মনে পড়ছে না তো।

মনে পড়ছে না ত!—চক্রবর্ত্তী রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, বলি, মনটা কোথায় বাঁধা দিয়ে এসেছ? শাস্ত্রালোচনাকালে কোথায় সময় অসময় তোমার সাহায্যটুকু পাব, তা না, সব খুইয়ে বসে আছ। বৃথাই তোমার উপাধি।

বিদ্যাবাগীশ লজ্জায় ও অপমানে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই পরুষভাষী, মদগর্ব্বিত লোকটার ঔদ্ধত্য আশ্রিত-অনাশ্রিত গ্রাম-বাসীমাত্রকেই সহ্য করিতে হয়। প্রতিবাদ কিংবা প্রতীকারের চেষ্টা করিলে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসনও অসম্ভব নয়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতঃপর আহত বিদ্যাবাগীশের প্রতি একবার কটাক্ষ করিয়া অনেকটা সদয়ভাবে আমার দিকে চাহিলেন। তারপর কণ্ঠ হইতে সমস্ত ঝাঁজ দূর করিয়া দিয়া প্রসন্নচিত্তে আমাকে মনুসংহিতার শ্লোক সম্পর্কে জ্ঞানদান করিতে লাগিলেন; এই শ্লোকটার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, কন্যা দ্বাদশমে বর্ষে অর্থাৎ বারো বৎসর বয়সে পা দিলেই তাকে পাত্রস্থ করতে হবে। নতুবা কন্যার পিতামাতাকে অনন্ত নিরয়গামী অর্থাৎ কোটি কোটি বৎসর নরকবাস করতে হবে।

এমন সময় ভৃত্য হুঁকায় নূতন কল্কে সংযোগ করায় তিনি ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন এবং আমি তাঁহার ব্যাখ্যাত শাস্ত্রীয় হুকুম ও তাহা লঙ্ঘনের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে ভাবিতে লাগিলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথমত চিন্তান্বিতভাবে তামাক খাইতে লাগিলেন, তারপর অকস্মাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে বার কয়েক প্রচণ্ড টান মারিয়া নলটা মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া আরম্ভ করিলেন, হ্যাঁ, তারপর শোন। মহাত্মা বেদব্যাস এই শ্লোকটার যে-ভাষ্য করেছেন তাহা অতি অপূর্ব্ব, অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তার ভাবার্থ হচ্ছে, পতিই যখন নারীর পরম দেবতা তখন পতির কোন দোষই স্ত্রীলোকের গ্রাহ্য করতে নেই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখ জগন্নাথ ঠাকুর। তিনি ঠুঁটো। কিন্তু তাই বলে কি কেউ তাঁকে কম শ্রদ্ধা করে? বরং কতলোক তাঁর রথের চাকার নীচে পিষে মরতে চায়। তাই ভাষ্যকার বলেছেন, মেয়ের বারো বৎসর যাতে কিছুতেই পার হতে না পারে সেজন্য সুপুরুষ-কুপুরুষ, সুচরিত্র-দুশ্চরিত্র, ধনী গরীব বাছ-বিচার না ক'রে যেমন ক'রেই হোক একটি পুরুষ মানুষের হাতে

মেয়েকে সমর্পণ করতেই হবে। পাপের হাত থেকে তো রক্ষা পাওয়া চাই। কি বল হে বিদ্যাবাগীশ?

বিদ্যাবাগীশ ক্লিষ্ট মুখখানা একটু তুলিয়া অস্পষ্টভাবে সায় দিলেন, আজ্ঞে যথার্থ, যথার্থ।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অপূর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া আত্মপ্রসাদে কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। কিন্তু আর কেহ বক্তা না থাকায় তিনিই পুনর্ব্বার আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, শ্রীপদর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে আপত্তি কেন? পাত্র পাও না, তোমার বড় ভাগ্যে নিজে যেচে এসে বিনাপণেই ত সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, আর তুমি কি-না তার উদারতার পুরস্কার দিলে তাকে অপমান ক'রে। ধিক্ তোমায়! পয়সার অভাবে ঘরে ধাড়ি মেয়ে পুষছ আবার দেমাক কত! এখন ত শুনলে শাস্ত্রে কি লিখেছে! এর পরও যদি চৈতন্য না হয় তবে গোল্লায় যাও।

আবার তিনি বেজায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

শ্রীপদর কথা উঠিতেই ঘৃণায় আমার দেহের সমস্ত রক্ত পর্য্যন্ত যেন কলুষিত হইয়া উঠিল। নির্ম্মলার রূপে পাপীষ্ঠ এতই মজিয়াছে যে বারবার কুকুরের মত অপমানিত হইয়াও নির্ম্মলাকে বিনাপণেই বিবাহ করিবার অভিপ্রায় জানাইবার জন্য কয়েকবার আমার কাছে আসিয়াছে। এই হতভাগার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবার কল্পনাও আমি করিতে পারি না। কয়েক বৎসর হয় শ্রীপদর বাবা মারা গিয়াছেন এবং একটি দোকান ও কয়েক ঘর শিষ্যদ্বারা কিছু টাকাও রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু গুণধর পুত্র বাল্যকাল হইতেই অসৎ সঙ্গে পড়িয়া তামাক, গাঁজা, মদ এবং স্ত্রীলোক সযত্নে আয়ত্ত করিয়া এখন স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি দুই-ই বিনাশ করিয়াছে। বয়স এখন তার পঁচিশের বেশী হইবে না। শ্রীপদর ত্রিসংসারে আপনার বলিতে আছেন এক বৃদ্ধা পিসী। তিনি শ্রীপদর গৃহস্থালী সংরক্ষণের ভার অবলম্বন করিয়া ও তার মন জোগাইয়া কোনরূপে টিঁকিয়া আছেন। নতুবা ভাই-পো যে-রকম গুণধর তাঁর বার্দ্ধক্য ও জরাগ্রস্ত দেহটার প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া যে-কোন মুহূর্ত্তে তাড়াইয়া দিতে পারে।

সুতরাং জমিদার মহাশয় শ্রীপদর নাম প্রস্তাব করিতেই প্রবল প্রতিবাদ কণ্ঠে আসিয়া ভীড় করিল। কিন্তু আমি কিছু বলিবার আগে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একেবারে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, না হে, না না, তা কক্ষণো করো না। বরং সুরমা নদীর জলে ভাসিয়ে দাও, সদ্গতি হবে। আহা, মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী, কি গুণে, কি রূপে—

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া যেন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমার ঠাকুরঘরে গিয়েছিল প্রণাম করতে। প্রণাম সেরেও চলে গেল না। একটা খুঁটিতে মাথা রেখে ছল ছল চোখে শালগ্রামের দিকে চেয়ে রইল। সন্ধ্যার আবছায়ায় তার জলভরা বড় বড় চোখ দুটি ভুলতে পারছিনে হে।

বিদ্যাবাগীশের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

আমারও চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। এই বৃদ্ধ যে আমার মত হতভাগ্যের জন্য এতখানি সহানুভূতি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন ভগবানকে তার জন্য ধন্যবাদ। ইচ্ছা হইল, চক্ষের জলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের লোলচর্ম্ম চরণ দুইটি অভিষিক্ত করিয়া দিই।

কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় বজ্রনির্ঘোষে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া বিদ্যাবাগীশকে বলিয়া উঠিলেন—তুমি আবার কি বকছ? ভগবান কি কোন কালেও তোমার ঘটে এক ফোঁটা বিবেচনা দেন নি? যত বুড়ো হচ্ছ, কাণ্ডজ্ঞানও তত খোয়াচ্ছ।

তারপর আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, কর্ত্তব্যই হচ্ছে আসল। কর্ত্তব্যের কাছে হৃদয় বলে কোন জিনিষ নেই। জান না, কর্ত্তব্যের খাতিরে দাতাকর্ণ প্রাণের তুল্য নিজের ছেলেকে বলি দিলেন, রাম সীতাকে বনে পাঠালেন।

তারপর তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, এ সব সৎপ্রসঙ্গের আলোচনার বালাই ত তোমাদের নেই।

আমি ভগ্নকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা করিলাম, আমরা দুর্ব্বল মানুষ—

মুখের কথাটা সম্পূর্ণও করিতে পারিলাম না। প্রতিবাদের উদ্যম আছে বুঝিতে পারিয়া চক্রবর্ত্তী মুখভঙ্গীকে এমনই রূপ দিলেন যে অর্দ্ধপথেই আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন, একটা কাজ করলে হয়—

আমি যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন, তুমি যদি অন্তত শ'খানেক টাকা জোগাড় করতে পার তবে আমার যজমান নিধু বিশ্বাসকে রাজি করতে পারি, বাকিটুকু আমি একাই কুলিয়ে নেব।

ইহার উত্তরে আমি শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বলিলেন, ও করবে টাকার জোগাড়! সাতবার জন্মগ্রহণ করেও ও কখনও একশ' টাকার মুখ দেখবে? ও টাকা পাবে কোথায়? বসত বাড়িটা ত আমার হাতেই, জমি-জমা যা ছিল সেও ত খুইয়েছে। সব্জি-বাগানটা বোধ হয় এখনও ওর হাতে আছে। ওটা যদি বন্ধক দিতে বা বিক্রী করতে চায় ত কুড়ি টাকায় আমি নিতে পারি।

তারপর বিদ্যাবাগীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তা তুমি যখন এত দয়ালু হয়ে উঠেছ তখন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে একশ' টাকা এনে দিতে পার না?

বলিয়া চক্রবর্ত্তী হাসিতে লাগিলেন। বিদ্যাবাগীশ অত্যন্ত লজ্জা-বোধ করিতে লাগিলেন এবং আমিও একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। এইজন্য অবশ্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিচলিত হইবার পাত্র নন। কাহারও মানসিক ক্লেশের খাতিরে কর্ত্তব্য কর্ম্মে তিনি নিষ্ঠা হারাইতে পারেন না। সুতরাং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে আর বকাবকি করবার আমার সময় নেই। সমাজের হিতার্থে তোমাকে আমার শেষ কথা শুনিয়ে দিচ্ছি, আগামী ১৬ই বৈশাখ একটি শুভদিন আছে। এই তারিখে মেয়ের বিয়ে দাও ভালই, নতুবা ১৭ই বৈশাখ থেকে তুমি একঘরে ও সমাজচ্যুত হবে।

১৫ই বৈশাখ। পক্ষীরাজ ঘোড়ার স্কন্ধে ভর করিয়াই যেন তারিখগুলি একে একে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছে। আমাকে দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ঘরের বাহিরে এক-পাও আমি এ পর্য্যন্ত পাত্রের খোঁজে বাহির হই নাই। কারণ, জানি—সব নিষ্ফল। সমাজপতিগণ দণ্ড দিবার জন্য যতখানি উদ্‌গ্রীব, দণ্ডভোগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ততখানিই নারাজ। তাই স্থির করিয়াছি সমাজের চরম দণ্ডই মাথা পাতিয়া লইব। গ্রামের বুকে উষার আলো ফুটিয়া উঠিবার আগেই পত্নী ও সন্তান দুইটির হাত ধরিয়া মায়ের অঞ্চল-ঢাকা শিশুদের মত অন্ধকারের বুকে মিশিয়া ধীরে ধীরে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। এক ফোঁটা জল শুধু চোখের কোণ হইতে হয়ত ঝরিয়া পড়িবে সাত পুরুষের জীর্ণ কুঁড়েখানির জন্য। সে জল সজোরে মুছিয়া আবার চলিতে থাকিব—নির্জ্জন নদীতীর দিয়া ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে, গাছের তলা দিয়া—যেখানে সমাজ নাই, শাস্ত্র নাই। বৈরাগ্যের গৈরিক রঙ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে আমার প্রাণে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও এই মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিব। যাত্রার লগ্নও আসন্ন, শুধু আজকের রাতটা।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। জীবন চক্রবর্ত্তী আমাকে সবিশেষ বুঝাইয়া কন্যার বিবাহের জন্য আমার নিজস্ব বলিতে যেটুকু সম্পত্তি ছিল সেই ছোট বাগানটিও তাঁহার নিকট বাঁধা দিতে রাজী করাইয়াছেন। এইভাবে তিনি আমার সমস্ত বাড়িটাই হাত করিলেন। এইটির জন্য আমি মূল্য কিছুই চাই নাই। কিন্তু তিনি দান গ্রহণ করিতে পারেন না—তিনি জমিদার, আমি দীনতম ভিখারীতুল্য, আমার দানে তাঁহার আত্মমর্য্যাদার লাঘব হয়। তাই মূল্য বাবদ্ কুড়িটি টাকা আমাকে লইতে হইবেই।

বিকালে পেয়াদা মারফৎ কুড়িটি টাকা তিনি পাঠাইয়া দিলেন। পেয়াদা টাকাগুলি আমার হাতে দিয়া একখণ্ড দলিল বাহির করিল। উহাতে যথারীতি স্বাক্ষর করিলে পর পেয়াদা আমাকে জানাইয়া দিল, কর্ত্তা মহাশয়ের হুকুম, আগামী কাল মেয়ের বিবাহ দিতে না পারিলে পরশু দিনই আমাকে এই বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে। সমাজচ্যুতকে তিনি স্থান দিবেন না। পেয়াদা হুকুম শুনাইয়া আমার কোন ভাবান্তরই দেখিতে পাইল না। কিন্তু চোখ ফিরাইতেই দেখিলাম, নির্ম্মলা আমার পিছন হইতে নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

পরিবারবর্গকে আমার সঙ্কল্পের কথা তখনও জানাই নাই। ভাবিলাম, আর বিলম্ব নয়, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। টাকা কয়টি হাতের মুঠায় রাখিয়া বারান্দায় গিয়া উঠিলাম। মেঘমেদুর আকাশ বর্ষণোন্মুখ—মহা দুর্য্যোগের আভাস লইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। প্রবল হাওয়ায় উঠানের একপাশে নিমগাছের পাতাগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমার পারিবারিক জীবনেও যে মহা ও অপ্রত্যাশিত দুর্য্যোগ স্তম্ভিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে কি করিয়া তাহার উদ্বোধন করিব, একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া তাহা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় নির্ম্মলা আসিয়া ডাকিল, বাবা!

পরম স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলাম, কেন ডাকছিস মা।

কয়েক মুহূর্ত্ত মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে আবার আমার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কাঠিন্য। মনে মনে শঙ্কিত হইলাম।

নির্ম্মলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল, বাবা, আমার মত হতভাগীকে জন্ম দিয়ে তোমরা অনেক কষ্ট সয়েছ। তোমাদের কষ্ট আর আমি দেখতে পারি নে। জমিদারের নির্ব্বাচিত লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও।

ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম, যে-মেয়েটি সবে মাত্র কুঁড়ি হইতে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কি করিয়া অকস্মাৎ এমন মুখরা হইয়া উঠিল! বুঝিলাম, দুঃখে এবং ব্যথারও সেই অসীম ক্ষমতা আছে যাহা মূককেও বাচাল করিতে পারে। নির্ম্মলার কথার উত্তর সহসা আমার মুখে জোগাইল না। কতক্ষণ পরে জোর করিয়া একটু কাষ্ঠহাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, সেই পাষণ্ডটার হাতে? প্রাণ থাকতে আমি তা পারব না। তার চেয়ে চল মা, এই সব হৃদয়হীন সমাজ ছেড়ে আমরা বনে যাই। আমি অনেক আগে থেকেই তা ভেবে রেখেছি, বলি বলি ক'রেও এত দিন বলি নি।...তারপর দেখ মা, তোর মুখ চেয়েই গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই একটা কত বড় আনন্দের অপেক্ষায় আছে! পঞ্চায়েতের সভা একেবারে ঠিকঠাক। শুধু কালকের দিনটা পার হলেই কত ধুমধামের সঙ্গে তারা আমাদের সমাজচ্যুত করবে। তুই কি শেষে তাদের এত আয়োজন পণ্ড ক'রে দিবি মা? তুই যে সবার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াবি!

নির্ম্মলা পূর্ব্বের মত দৃঢ়কণ্ঠে এবং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, যা তা বকো না বাবা। আমি তোমার বাজে কথা শুনতে চাইনে। আমি ভগবানের নামে এই দিব্যি ক'রে বলছি, কাল যদি তার সঙ্গে আমার বিয়ে না দাও, পরশু ভোরের আলোয় কেউ আমাকে জীবিত দেখবে না, আমি আত্মহত্যা ক'রে মরব।

নির্ম্মলার চোখ দুটি কানায় কানায় জলে ভরিয়া উঠিল। ততক্ষণে নির্ম্মলার জননীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটি খুঁটি ধরিয়া তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। আমার চোখও শুষ্ক রহিল না।

সে যে কঠিন পণ করিয়াছে তাহা হইতে ফিরাইবার বহু চেষ্টা করা গেল, কিন্তু সমস্তই বৃথা। সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, দাবী না মিটিলে সে যে পণরক্ষায় কিছুমাত্র ইতস্তত করিবে না তাহাতে আমাদের সন্দেহ রহিল না। নির্ম্মলাকে বুকের কাছে আনিয়া চোখের জলের আশীর্ব্বাদে তাহার মস্তক সিক্ত করিয়া দিলাম। বলিবার কথা সে নিষ্ঠুরভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সন্ধ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিতেছে। নির্ম্মলা তখনও জাগিয়া আছে। শ্রীপদর সঙ্গে আজ রাত্রেই সম্বন্ধ ঠিক করিয়া না আসা পর্য্যন্ত কিছুতেই সে ঘুমাইবে না। শ্রীপদর বাড়ীতে এপর্য্যন্ত নির্ম্মলার পীড়াপীড়িতে কয়েকবার গিয়াও ফিরিয়া আসিতে

হইয়াছে। শ্রীপদর পিসীর মুখে শুনিলাম, ভাবী জামাতাবাবাজী রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে প্রায়ই দুর্লভ। কোন দুর্য্যোগময় রাত্রিও তার নৈশ অভিযানকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। শ্রীপদর পিসীকে নির্ম্মলার সহিত শ্রীপদর বিবাহ-সম্বন্ধের কথা জানাইয়াছিলাম। পণ পাওয়া যাইবে না জানিয়া তিনি যদিও ক্ষুণ্ণ আছেন, তবুও শ্রীপদর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবার সাহস তাঁর নাই। সুতরাং অনিচ্ছায় হইলেও বিবাহে তিনি সম্মতি দিয়াছেন।

ভাঙ্গা ছাতাটি মেলিয়া হাতে কাচের আবরণ দেওয়া বাতিটি লইয়া অন্ধকার পথে আবার বাহির হইলাম। পথঘাট পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত। চারিদিক নিস্তব্ধ—শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার বিরামহীন আর্ত্তনাদ সমভাবে ধ্বনিত হইয়া যাইতেছে।

শ্রীপদর দোকানের সামনে আসিয়া বন্ধ ঝাঁপে টোকা মারিয়া ডাকিলাম, শ্রীপদ, ও শ্রীপদ!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিকৃত কণ্ঠে উত্তর আসিল, কে রে শালা!

এমন মধুর সম্ভাষণে অভ্যর্থিত হইলে যে-কোন ভদ্রব্যক্তিরই ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার কথা। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, আমি বিপিন চক্রবর্ত্তী। দোরটা একটু খোল তো বাবা।

বি-পি-ন চক্কত্তি—দোর খোল ত বাবা। আহা শালা যেন আমার কত পেয়ারের! আমি তোর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি যে তুই বাড়ী বয়ে অপমান করতে এসেছিস? দাঁড়া, আমি তোকে মজা দেখাচ্ছি।

জড়াইয়া জড়াইয়া সে বলিতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া কি করা কর্ত্তব্য ভাবিতেছি এমন সময় শ্রীপদর পিসী একটি প্রদীপ হাতে লইয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, যে মাচাটার উপর চাল, ডাল ইত্যাদির পসরা সাজান হয় সেটারই একাংশে মলিন কাঁথা বিছাইয়া শ্রীপদ গড়াগড়ি দিতেছে। মদের গন্ধে কাছে যাওয়া দুঃসাধ্য এবং মদের শূন্য বোতলটা তার পায়ের কাছে লুটাইতেছে। এই জানোয়ারটার সঙ্গেই আমার লক্ষ্মীপ্রতিম একমাত্র কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইতেছি ভাবিতেই নিদারুণ ক্লেশে সমস্ত মন অভিভূত হইয়া পড়িল।

আমাকে ঘরের ভিতর দেখিয়াই শ্রীপদ ক্ষেপিয়া উঠিয়া মদের বোতলটা তুলিয়া লইয়া আমাকে মারে আর কি।

তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, শ্রীপদ, নির্ম্মলাকে বিয়ে করবি?

বলিতে বলিতে আমার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

শ্রীপদ মুহূর্ত্তমধ্যে মন্ত্রবৎ শান্ত হইয়া গেল। সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। উল্লাসের মাত্রা কমিলে বলিল, আলবৎ করব, একশো বার, হাজার বার। বল তো এক্ষুণি করব।

এখন করতে হবে না। কাল রাত্তিরে। কিন্তু জান ত বাবা, পণ আমি—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীপদ তড়াক করিয়া মাচা হইতে নামিয়া পড়িল এবং আমার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া জোড়হাতে বলিতে লাগিল,

> রাজর্ষি, করিয়াছি ভঙ্গ ধনু ভঙ্গ পণ
> জানকীরে এবে মোর করে কর সমর্পণ।

এত দুঃখেও আমি না হাসিয়া পারিলাম না। কিছুদিন পূর্ব্বে এক সখের যাত্রাদলের সীতাহরণ পালায় সে রাম সাজিয়া অভিনয় করিয়াছিল।

আমি তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আবার মাচার উপরে শোওয়াইয়া দিলাম। আগামী রাত্রেই যে নির্ম্মলার পাণি-পীড়ন করিতে হইবে তাহা আবার তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলাম না।

তারপর শ্রীপদর পিসীর সহিত দুই-চারিটা পরামর্শ করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যেই এখান হইতে বিদায় লইলাম।

বাহির হইয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই শুনিলাম শ্রীপদ ঋষভ কণ্ঠে—সখীরে—বলিয়া তান ধরিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে নারী

শ্রীঊর্ম্মিলা সেন

বিগত পাটনা প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মিলনে মহিলাদের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে মনে হ'ল যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে মেয়েদেরও বেশ একটা স্থান আছে এবং সেটা তুচ্ছ নয়।

আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য বেদ। তাতে অনেক নারীর দান আছে শুনেছি। সেই সময় ও তার পরে পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যকে অনেক মহিলা ধনশালী ক'রে গেছেন। তাঁদের মধ্যে লীলাবতী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি কতকগুলি নাম আমাদের পূর্ব্বপরিচিত। এ ত গেল সংস্কৃত সাহিত্যের কথা। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যকেও যে প্রাচীন যুগে বাঙ্গালী মেয়েরা ধনশালী করেছিল তার বহু প্রমাণ আছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরিশ্রমের ফলে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই জানতে পাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য বৌদ্ধ যুগেই প্রথম গঠিত হতে আরম্ভ

হয়। বঙ্গ সাহিত্যে তখন পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের গঠন-ভার কিছু কম ছিল না। সে কালে লিপিবদ্ধ সাহিত্য ছিল না। ছিল লোক-সাহিত্য। গানে, কবিতায়, রূপকথায় লোকের মুখে মুখে সাহিত্যের প্রচলন ও প্রসার ছিল। আগের লোকদের কাছ থেকে পরের যুগের লোকেরা সেগুলিকে শিখে রাখ্‌ত। এ রকম ভাবে সাহিত্য রক্ষা হ'ত। সেকালের সাহিত্য বেশীর ভাগ মেয়েদের তৈরী। মেয়েরাই সেগুলি কণ্ঠস্থ ক'রে রক্ষা করত। তখনকার সাহিত্য, রূপকথা, ব্রতকথা, পাঁচালী, ছড়া ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। মেয়েদের বেশ গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা আছে। কথায় কথায় প্রবাদ বলা ও ছড়া কাটা বা একটা কথাকে অলঙ্কার দিয়ে বাড়িয়ে দশখানা ক'রে বলা মেয়েদেরই স্বভাব। তারপর পূজা-পার্ব্বণ ব্রত-উপবাসে মেয়েরাই উৎসাহী বেশী। তাই প্রাচীন বাঙ্গালা ছড়া গান রূপকথা ব্রতকথা পাঁচালী প্রবাদবাক্যে ভর্ত্তি। যে যুগে লেখার বেশী চল হয়নি সে যুগে দেখা গেছে যে সাহিত্যে কবিতা বেশী। তার কারণ, দেখা গেছে যে কবিতা মুখস্থ ক'রে রেখে সহজেই সেটাকে রক্ষা করা যায়। যাক্ সে কথা।

প্রাচীন বাঙ্গালার রূপকথায় স্ত্রী-চরিত্রের মাধুর্য্য ও বৈচিত্র্য নানা দিক দিয়ে ফোটান আছে। সংসারের খুঁটিনাটি, মেয়েলি চিন্তা, মেয়েদের ব্যবহার— এইগুলিই বেশী পাওয়া যায়। কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, ময়নামতীর গান এই সব ধরণের রূপকথাতে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই সব রূপকথা থেকে দু-একটা উদাহরণ তুলে দিই।

মেয়েদের হাতে মেয়েদের যে লাঞ্ছনা তা মেয়েরা উপলব্ধি করে করুণভাবে। শঙ্খমালার শক্তি তার ননদীর কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে বলেছে :—

ঠাকুর-ঝি কি জন্য এমন কর রে ঠাকুর-ঝি
ও সাধুর বহিন আমি কি দোষ করিলাম আজ
তোমার কাছে।

একই খেলা খেলেছিলাম—ঠাকুর-ঝি গো
তোমার মালা আমিই পরাইয়া ছিলাম
ঠাকুর-ঝি দাড়িম্বের গাছে রে
একই দুধের বাটিতে ঠাকুর ঝি তুমি আমি
খাইলাম তোমার দাদার পরসাদ রে
একই আঁচল গায় দিয়া ঠাকুর-ঝি আমরা
কইলাম মনের কথা মনের সাধ রে॥

মেয়েরা সংসারে যে কত দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করে তার বিবরণ এই সব রূপকথায় আছে। এই ধরণের গল্প মেয়েদের স্বার্থত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

কত পরীক্ষা কত দুঃখের পর মালঞ্চ যখন শুনলেন যে, তাঁর স্বামী রাজকন্যাকে বিবাহ করেছেন তখন বাসর-ঘরে নিদ্রিত দম্পতীকে দেখে মালঞ্চ বলেছিলেন :—

সুখে থাইকো সুখে থাইকো রে রাজপুত্র
সুখে থাইকো রে রাজকন্যা
আমার শ্বশুরের ঘর আমার সোয়ামীর পীড়ি
অক্ষয় ক'রে রেখো তুমি পরমেশ্বর
রাজকন্যার আয়ত যেন হাতে গায়ে ক্ষয়ে রে
তুমি আমায় দেও এই বর।
চৌদ্দ ভরা পূর্ণ কর আমার শ্বশুরের সংসার রে
ওরে আমি জল মাটি হইয়া থাকিমো রে
আমি ভুঞ্জিমো রে কতই সুখ—

কি করুণ স্বার্থত্যাগী প্রেম। এ রকম কল্পনা স্ত্রীলোকের কাছ থেকেই বেশী আশা করা যায়, আর এ রকম কথা মেয়েদের মুখ থেকেই বার হওয়া সম্ভব। শুধু সাহিত্য ছাড়া এই রূপকথাগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তিও কম নয়। তখনকার দিনের সমাজ, রীতি, নীতি, লোক-কল্পনা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। পৃথিবীকে সাক্ষী ক'রে কোটাল-পুত্র শপথ করেছিলেন, "পৃথিবী পবিত্র, কারণ এখানে ফুল জন্মে।" কি সুন্দর কল্পনা। তখনকার দিনে মেয়েদের দূরদর্শিতার অভাব ছিল না। উপমা দেবার ক্ষমতা ছিল আশ্চর্য্য। শঙ্খমালার শক্তির যৌবন সম্বন্ধে আছে :—"এ ত গোলার জিনিষ নহে যে গোলা ছাঁদিয়া রাখি, কৌটার সিন্দুর নহে, কৌটায় ভরিয়া থুব।"

নির্ম্মল হাস্যরসের জ্ঞান তখনকার দিনে ছিল। শিশু স্বামীর জন্য মালঞ্চমালা বাঘকে পণ্ডিত আনতে বলেছিলেন। বাঘ তৎক্ষণাৎ রাজী, "তা লেখাপড়া শিখাও। কত পণ্ডিত

গৌড়ীয় যুগ, বৌদ্ধ যুগ ও তার পরবর্ত্তী সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব কম। সবই প্রায় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত। ঐগুলি বাঙলা দেশের নিজস্ব।

মেয়েদের প্রতিটি ব্রত-পার্ব্বণে ঠাকুরমার প্রত্যেক সন্ধ্যার গল্পের বৈঠকে বাঙ্গালা সাহিত্যের অংশ ছড়ানো ছিল।

তারপর চণ্ডীদাসের যুগে আর একটি মেয়ের সন্ধান পাই, যে নিজেও বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছিল এবং বোধ হয় চণ্ডীদাসের প্রত্যেক কবিতার রস ও কল্পনার সন্ধান সে-ই দিয়েছিল। সে রামী। রামী বলেছিল "যে ব্যক্তি রাজপাটে বসিয়াও প্রেমের আস্বাদ পায় নাই, তাহার জীবন নিরর্থক।"

রামীর পদ চণ্ডীদাসের প্রতি—

কোথা যাও ওহে প্রাণবঁধু মোর দাসীরে উপেক্ষা করি ?
না দেখিয়া মুখ ফাটে মোর বুক ধৈরজ ধরিতে নারি।
পীরিতি জালিয়া যদিবা যাইবা কবে বা আসিবা নাথ,
রামীর বচন করহ শ্রবণ দাসীরে করহ সাথ।
—"তুমি সে আমার আমি সে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর
খেদে রামী কয় চণ্ডীদাস বিনা জগৎ দেখি আঁধার॥"

যদি সত্যই রামী ছিল, তবে তাকে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রথম মহিলা-কবি বলা যেতে পারে। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করেছে। পদাবলীর কবিদের মধ্যে দু-চারজন মহিলা-কবির নাম পাওয়া গেছে, যেমন—দুঃখিনী, রসময়ী দাসী, শিবা সহচরী, রামী ইত্যাদি।

দুঃখিনীর পদ :—

না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর,
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী
হারিলে তোমার রব বেশর কাঁচলি
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী
যেমন বলে শ্যাম নাগর তেমনি নাচে রাই
মুরলী লুকা'ন শ্যাম চারিদিক চাই
সবাই বলে রাইর জয় নাগর হারিলে
দুখিনী কহিছে গোপীমণ্ডলী হাসালে।

তারপর ১৭৭২ খৃঃ অব্দে জয়নারায়ণ সেন ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী এই দুইজনে মিলে "হরিলীলা" কাব্য রচনা করেন। আনন্দময়ী বিদুষী ছিলেন। তাঁর রচনা ছিল সহজ সুললিত।

—"আসি দেখহ নয়নে
হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড রুক্ষকেশ অতি
ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব দুর্গতি
রহিয়াছি চির বিরহিনী দীন মনে
অর্পণ করিয়া আঁখি তব পথপানে—" ইত্যাদি

এই রকম কত নাম-না-জানা আনন্দময়ী বাংলা দেশে ছিল তার ঠিকানা নেই। তাদেরই কবিত্ব কল্পনায় প্রাচীন বাঙ্গালা অলঙ্কৃতা হয়েছিল। তারা মুখে মুখে গান বানিয়ে গেছে—কত স্বার্থত্যাগ, কত স্বর্গীয় প্রেমের কথা। মেয়েরা জগতে স্বামী-পুত্রকে সব চেয়ে ভালবাসে। তাদের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে তারা সর্ব্বদা প্রস্তুত। আগেই বলেছি যে কাঞ্চনমালা, মধুমালা, মালঞ্চমালা ইত্যাদি রূপকথা এই ধরণের কষ্টসহিষ্ণু ও স্বার্থত্যাগী প্রেমের নিদর্শনে ভর্ত্তি। বহুদিন থেকে এই সব ধরণের প্রেম-গীতি বাঙ্গালার নিজস্ব হয়েছিল। তারপর যখন বৈষ্ণব কবিরা কাব্য রচনা করেন তখন তাঁরা স্বদেশের এই প্রবাহিত ভাব-ধারা থেকে রস গ্রহণ করেছিলেন। সে ধারা মেয়েদের সৃষ্ট। সেই জন্যই বাঙ্গালার পদাবলী সাহিত্য একটি আশ্চর্য্য জিনিষ। পৃথিবীতে যা কেউ করেনি, বাঙ্গালা দেশ তাই করেছে। ভালবাসার মধ্য দিয়ে ভগবানের সন্ধানে গেছে। পদাবলীর পদে পদে তার প্রমাণ বর্ত্তমান।

তারপর ধীরে ধীরে বর্ত্তমান যুগের জন্মদিন এগিয়ে আসতে লাগল। দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হ'ল। মেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য-সেবায় লাগল। সাহিত্য-সেবিকার অভাব রইল না, এখনও নেই।

প্রত্যেক দেশেই নারী বিখ্যাত কাব্যগুলিতে স্থান পেয়েছে। মহাকবি হোমার, বাল্মীকি, ব্যাস প্রত্যেকেরই মহাকাব্যের কারণ এবং উপলক্ষ্য নারী—হেলেন, সীতা,

দ্রৌপদী। বাঙ্গালা দেশের কাব্যসাহিত্যে এ রকমভাবে নারীর বিপুল স্থান আছে। তবে অধিকাংশই কাল্পনিক নারী। ঐতিহাসিক সত্য না হ'লেও কাল্পনিক নারী সাহিত্য-রচনায় কোনও বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি।

এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শ্রীরাধা।

অনেক নারী অনেক লেখকের মূলধনের জোগান দিয়েছে, তাদের নাম আমাদের জানা নেই। শুধু দুজনকে আমরা জানি। একজন রানী অপরজন লছিমা। তখন মিথিলা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বাঙ্গালায় ও মিথিলায় প্রভেদ অল্প ছিল ব'লে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর লছিমা গৌড়দেশের রাণী। এ অবস্থায় তাঁকে বাদ দেওয়া যায় না। পৃথিবীর সব দেশেই নারী বেশীর ভাগ কাব্য ও গল্পের মূল বিষয়। সেই রকম বাঙ্গালার মেয়েও বাঙ্গালা সাহিত্যের কল্পনার উপাদান।

বাঙলার মেয়েরা বহুদিন ধরে যে সাহিত্যের সূচনা করেছিল তাতে মণীষীরা যোগ দিয়ে ভাষা ও সাহিত্যকে ধনী করেছেন। যেমন নিত্য নূতন জিনিষ সাহিত্যে আস্‌ছে সে রকম ভুলও অনেক হচ্ছে। বাঙ্গালার মেয়েরা চেষ্টা করলে বাঙ্গালা ভাষাকে আবার নূতন রূপ দিতে পারবেন। তাঁরা যদি একবার মনে করেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের গোড়া-পত্তন হয়েছিল তাঁদেরই রচিত ছড়া গল্প দিয়ে, তবে তাঁদের শক্তির অভাব হবে না।

বাঙ্গালা ভাষায় আজকাল অতিআধুনিকতার দোষ ঢুকেছে। বহু রচনা রুচিকর হয় না। কতকগুলি বাজে ফাজলামি দোষে দুষ্ট। এগুলি বড়ই চোখে লাগে। অনেকে হয় ত বলবেন, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সাহিত্যে অতি-আধুনিক রচনা হচ্ছে, আমাদের এখানেও বা হবে না কেন? আধুনিকতায় দোষ নেই, তবে অনেক সময় এর অরুচিকর নীতিটাকে ভয় হয়। অতি-আধুনিক রচনা আজকাল সব সময় রুচিকর হয় না। আর আধুনিকতার দোহাই দিয়ে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে বাঙ্গালা ভাষায় এখনও যথেষ্ট আধুনিকতা আসে নি। যথেষ্ট ত্রুটি আছে। আমাদের সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, কোনও কোনও লেখিকা এই ধরণের রুচি-বহির্ভূত রচনা লিখ্‌তে আরম্ভ করেছেন। সাধারণত আমরা আশা করি যে মেয়েরা যদি কলম হাতে নেন, তবে তাঁদের কাছ থেকে ঢের বেশী পবিত্র, সুন্দর ও উচ্চাঙ্গের রচনা পাওয়া যাবে। মেয়েরা বেশী ক'রে লিখতে আরম্ভ করলে সাহিত্যের এই বাজে লেখাগুলি আস্তে আস্তে সরে যাবে। আমাদের ভাষা এবং রুচির বৈশিষ্ট্য যেন নষ্ট না হয়। মেয়েরা যেন এদিকে দৃষ্টি রাখেন।

বাঙ্গালা ভাষায় যেন কুরুচি ও অসুন্দরের স্থান না হয়। মেয়ে এবং পুরুষে মিলে যদি এই আদর্শে বাঙ্গালা সাহিত্যকে সাহায্য করেন তবে ভবিষ্যতে বাঙ্গালা ভাষা পৃথিবীতে অভিজাত সাহিত্য ও ভাষা বলে গণ্য হবে।

পিতার আশীর্ব্বাদ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

তখন ভারতে আর্য্য-সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল যুগ। সে যুগের সুনির্ম্মল জ্যোতি যে কেবল ভারতকেই উদ্ভাসিত করিয়াছিল তাহা নহে, সে অপরিম্লান জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ভারতের বাহিরে দেশ দেশান্তরে এবং এমন একটা ভাবধারা আর্য্য-ভারতের আকাশ-বাতাসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল যে, ব্রহ্মবিদ্যালাভ, ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা ও ব্রহ্মে উপনীত হইবার সাধনাকে সকলেই সকলের উপর স্থান দিত। অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও সিংহাসনারূঢ় নরপতি ব্রহ্মবিদ্যাধিগত আচার্য্যের চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন।

সেই যুগে ভারতভূমিতে জানশ্রুতি নামে অতিশয় দয়ালু ও দানশীল এক নরপতি ছিলেন। তিনি জানিতেন জীবসেবা বিশেষত নর-নারায়ণের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। তাই তিনি স্বীয় রাজ্যে নানা স্থানে সুবৃহৎ পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া যাহাতে পথিকদিগের কোন ক্লেশ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পান্থনিবাসগুলি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যসম্ভারে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। পথঘাট নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি প্রজাবৃন্দের সুখসুবিধার ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সর্ব্ববিধ কার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতেন। জানশ্রুতির দানশীলতার খ্যাতি কুসুমসৌরভের মত চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

নরপতি জানশ্রুতি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন এক মনোরম সরসী তীরে তিনি একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ঝাঁক হাঁস জলকেলির জন্য সেই স্বপ্ন-সরোবরের জলে আসিয়া উড়িয়া পড়িল। রাজার বোধ হইল যেন একটি হাঁস অপর হাঁসগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, জানশ্রুতির কীর্ত্তি সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু তাঁহার চেয়েও কীর্ত্তিমান এক ব্যক্তি তাঁহারই রাজ্যমধ্যে আছেন। তাঁহার নাম রৈক্ক। রৈক্ক দরিদ্র, তবু তাঁহার কীর্ত্তি জানশ্রুতির কীর্ত্তিকে ম্লান করিয়া দিতে পারে।

এই কথা শুনিয়া অপর হাঁসগুলির মধ্যে কেহই প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা বরং সকলেই ইহা একবাক্যে সমর্থন করিল। রাজা ইহাতে অন্তরে অন্তরে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জাগরিত হইয়াও স্বপ্নবৃত্তান্ত বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, অথবা ইহাকে স্বপ্ন বলিয়া উপেক্ষাও করিতে পারিলেন না। এই স্বপ্ন কেনই যেন তাঁহার কাছে সত্যবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি আপন সভাসদ ও পারিষদবর্গের নিকট ইহা প্রকাশ করিলেন। পৌরজনও ইহা অবগত হইলেন। রৈক্ক নামে কোন ব্যক্তি তাঁহার রাজ্যে আছেন কি-না তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত তিনি বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে রাজ্যের নানা স্থানে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বহু অন্বেষণেও রৈক্কের সন্ধান মিলিল না। রাজা মনে করিলেন, স্বপ্ন বোধ হয় স্বপ্নই। তথাপি তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, আর সন্ধানেরও বিরাম রহিল না।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সন্ধান লইবার জন্য কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী দিনের কাজ শেষ করিয়া নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তবর্ত্তী পথ ধরিয়া ঘরে ফিরিতেছিল; দেখিল, কয়েকজন পল্লীবাসী একখানি গো-শকট তৈরী করিতে ব্যস্ত। রাজকর্ম্মচারীরা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদের কাছে রৈক্কের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। শকটনির্ম্মাণকারকদিগের মধ্য হইতে একজন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, কেন? আমার নামই রৈক্ক।

কর্ম্মচারীরা রৈক্কের সন্ধান মিলিয়াছে ভাবিয়া প্রথমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু এই রৈক্কের চেহারা দেখিয়া হতাশ হইয়া আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করিল না। তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, যাঁহার খোঁজে বিশাল রাজ্যটাকে তোলপাড় করিয়া তোলা হইয়াছে এবং যাঁহাকে দেখিবার জন্য নরপতি স্বয়ং অধীর উদ্বেগে কাল কাটাইতেছেন সেই রৈক্ক এই। তাই তাহারা যেমন আসিয়াছিল তেমনই চলিয়া গেল। কিন্তু আরও অনুসন্ধানে যখন রৈক্ক নামে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেল না তখন রাজকর্ম্মচারীরা রাজার সমীপে এই রৈক্কের কথাই জানাইল। তাহারা বলিল, রৈক্ক নামে একজন লোকের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে সম্ভবতঃ গরুর গাড়ী তৈয়ার করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করে। তাহার বর্ণ কালো, দেহশ্রী অত্যন্ত কুৎসিৎ কদাকার, বসন জীর্ণ। তাহাকে আমরা অন্য কোন গুণের অধিকারী বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

কর্ম্মচারীদের মুখে রৈক্কের এই প্রকার বর্ণনা শুনিয়াও রাজার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, মহাপুরুষেরা প্রায়শ অতি সাধারণ মানুষের মতই দিন যাপন করেন। এমন কি, প্রয়োজন হইলে অনেক সময় লোকে তাঁহাদের মহত্ত্ব বুঝিতে না পারে এই ভাবে তাঁহারা অবস্থান করেন। রৈক্কও হয়ত সেই ভাবে দীন দরিদ্রের মত দিনাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা ইহা না বুঝিলেও তিনি নিশ্চয়ই রৈক্ককে দেখিলে কিম্বা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলে তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। অতএব তাঁহার সাক্ষাৎলাভের জন্য রাজার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল।

নরপতির ইঙ্গিতমাত্র শত সহস্র লোক তাঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত এবং রৈক্ক তাঁহারই রাজ্যের একজন সাধারণ প্রজা মাত্র। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেই সেই রৈক্ককে রাজসভায় উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু রাজা তাহা করিলেন না; যেহেতু সেই স্বপ্নদৃষ্ট সরোবরমধ্যস্থিত হংসগণ যে রৈক্কের বিষয় আলোচনা করিতেছিল ইনি সেই রৈক্ক হইতে পারেন। ইহা ভাবিয়া বহু ধন রত্ন গাভী যান বাহন ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য সঙ্গে করিয়া নরপতি স্বয়ং যথাসত্বর রৈক্কের বাসস্থান সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুদূর পল্লীবাসিগণ সহসা রাজার আগমনে বিস্মিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; ভাবিল, নরপতির চরণ স্পর্শে আজ এই অখ্যাত পল্লী পবিত্র হইল। কিন্তু তাঁহার এখানে আসার কারণ কি হইতে পারে? রাজকর্ম্মচারী-বৃন্দ রৈক্ককে রাজকীয় শকট সন্নিধানে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নরপতি তাহাদিগকে বাধা দিয়া কহিলেন, আমি নিজেই তাঁহার নিকট যাইতেছি। তোমরা উপহার সামগ্রী লইয়া আমার পিছনে আইস।

রাজার আদেশানুযায়ী তাহারা উপহার দ্রব্যাদি বহন করিয়া প্রভুর পশ্চাদনুসরণ করিল। রৈক্কের ক্ষুদ্র কুটীরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ আজ লোকে লোকারণ্য হইল। বিশাল রাজ্যের অধিপতি স্বয়ং রৈক্কের কুটীর দ্বারে সমুপস্থিত—প্রজা-সাধারণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য নহে, নানাবিধ উপহার দানে রৈক্ককে তুষ্ট করিয়া ধন্য হইবার নিমিত্তই। কোথায়ই বা লোকজন দাঁড়াইবে, আর কোথায়ই বা পরিপূর্ণ গো-শকট ও অশ্বশকটস্থিত দ্রব্যাদি রক্ষিত হইবে? রৈক্ক আসিয়া জোড়হস্তে নরপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। নরপতি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, এই সমস্ত রত্নরাজি গো অশ্ব যান বাহন ও নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার আপনারই প্রীতির জন্য আমি আনিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া প্রসন্ন অন্তরে ইহা গ্রহণ করুন, আর অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি কি উপায়ে তাঁহার উপাসনা করেন সে সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

রৈক্ক নরপতির প্রদত্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদির দিকে একবার নির্লিপ্ত দৃষ্টিপাত করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে কোন প্রকারে খুশী হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। আর ইহার অভাবে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন তাহাও মনে করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না। রৈক্ক দেখিলেন, রাজাধিরাজ জানশ্রুতি স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত; কিন্তু রাজৈশ্বর্য্যের গর্ব্ব

তাঁহার মুখশ্রীতে অনুলিপ্ত রহিয়াছে। দরিদ্রের দ্বারে আগমনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বিনয়ের গর্ব্ব, দীনভাবধারণের অহঙ্কার। ইহাতে রৈক্ক ব্যথিত হইলেন। তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত দানাদি সদানুষ্ঠানও কি ইহারই রূপান্তর? আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারই কি জনসেবার ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিতেছে?

যে সেবা মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনে উন্নত করিয়া তোলে না, যে দান পরের অনুগ্রহে পরিপুষ্টি লাভের সহায়ক হইয়া মানুষকে পঙ্গু করিয়া দেয় তাহা সেবার অপলাপ, সে দান পাতিত্যের অগ্রদূত—দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই। পাত্রবিশেষে দান করিতে হইবে; কিন্তু সে দান যেন হয় গ্রহীতার উন্নতি ও মঙ্গল কামনায়। আপাত-অভাব পূরণ করিলেই দান সার্থক হইবে তাহা নহে, যে কারণে অভাব তাহা বিদূরিত করিতে হইবে। দান যদি তাহারই সহায়ক হয় তবেই তাহা পুণ্য, নতুবা তাহা পাপ বলিয়াই গণ্য হইবে। দাতার গর্ব্বের পরিপুষ্টির জন্য যে দান তাহা গ্রহীতার মঙ্গল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাই তাহা উভয়কেই করে পতিত। জানশ্রুতির দেশময় খ্যাতির অন্তরালে যে পাতিত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে রৈক্কের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে তাহা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। রৈক্ক ভাবিলেন, জানশ্রুতির নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার দানের গর্ব্বকে জনসেবার অহঙ্কারকে প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু সে আঘাত যেন অসহনীয় হইয়া সংহারকে আহ্বান না করে। এই কল্যাণ-মুখর চিন্তা রৈক্ককে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। তাই তিনি অন্তরের সমস্ত দরদ ঢালিয়া দিয়া বলিলেন যে, তিনি ধনরত্ন ও বিত্তলোভে অণুমাত্র আকৃষ্ট নহেন। কাজেই নরপতি তাঁহার সমস্ত উপহার যোগ্যতর পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন।

জানশ্রুতি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেন কিন্তু রুষ্ট হইতে পারিলেন না। বিষণ্ণ অন্তরে তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি রৈক্কের কথা ভুলিতে পারিলেন না। রৈক্ক যে একজন মহাপুরুষ এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। অন্তর যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলে নরপতির প্রদত্ত ধনরত্নাদি উপেক্ষা করা সম্ভব হয়, রৈক্ককে সেই ঐশ্বর্য্যের অধিকারী দেখিয়া তাঁহার প্রতি নরপতির শ্রদ্ধা গভীরতর হইল। কিছুকাল যাবৎ তিনি দানাদি পুণ্যকার্য্য বিস্মৃত হইলেন, বিস্মৃত হইলেন রাজকার্য্য, বিস্মৃত হইলেন আহার নিদ্রা—রৈক্কের চিন্তাই তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল।

তাঁহার একমাত্র দুহিতা পিতার এইরূপ মনোভাবের কারণ সম্যক জানিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিতা হইলেন এবং কিসে পিতার মানসিক ক্লেশ দূর হয়, আর কি করিলে রৈক্ক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজকন্যা একান্ত নির্জ্জনে পিতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, কিসে সেই পুরুষপ্রবর প্রসন্ন হন তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি।

রাজা কন্যার কথা শুনিয়া চিন্তাবনত মস্তক ঈষৎ উন্নীত করিয়া বলিলেন—কল্যাণি, তিনি বিষয়-বাসনা-বিবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়জয়ী মহাপুরুষ, তাহা আমি নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছি। সুখদুঃখেরও ঊর্দ্ধে আসীন তাঁহার চিত্ত। চিত্তের অক্ষয় ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী তিনি। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার কি উপায় স্থির করিয়াছ তাহা জানিবার জন্য আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত।

পিতার কথা শুনিয়া রাজকন্যার মুখকমল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং মুখ নীচু করিয়া কহিলেন—পিতা, আমার বয়স হইয়াছে। আপনার প্রসাদে আমাতে নানাপ্রকার জ্ঞানেরও উন্মেষ হইয়াছে বলিয়া নিজের ভালমন্দ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি যাঁহার সহধর্ম্মিণী হইব সেই পুরুষরত্নকে নিজের ইচ্ছায় বরণ করিবার অধিকার আমাতে বর্ত্তিয়াছে।

রাজা এই অভাবনীয় উপায়ের ইঙ্গিতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তাহা হইলে তুমি কি তাঁহাকে স্বামীরূপে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ?

কন্যা মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। রাজা কন্যার অলোক-সামান্য উজ্জ্বল রূপলাবণ্যের পাশে সেই কুৎসিৎ কদাকার অসিত বর্ণ অতি দরিদ্র কুটীরবাসী রৈক্কের কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কন্যাকে কি বলিবেন সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। পরে সস্নেহে কন্যাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—মা, তুমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখ নাই আর তাঁহার দারিদ্র্যের বিষয় লোকমুখে শুনিলেও তাহা যে কি ভীষণ তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তোমার নাই। রাজকন্যার পক্ষে এ প্রস্তাব অশোভন, অসঙ্গত ও অবিবেচনার কার্য্য বলিয়াই আমার মনে হয়।

ইহা শুনিয়া রাজকন্যার মুখশ্রী গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাবান্তর দেখিয়া রাজা ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে নিজেকে নিরুপায় বলিয়া বোধ করিলেন।

রাজকন্যা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, পিতার নিকট নির্ভয়েও নিঃসঙ্কোচে মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিবার অধিকার যদি আমার থাকে তাহা হইলে আমি বলিতে চাহি, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে আপনিও যদি শ্রেষ্ঠজ্ঞান না করিতেন, রাজ্যেশ্বর হইয়া সেই দরিদ্রকে উপহারদানে প্রীত করিতে অভিলাষী হইতেন না। দারিদ্র্য তো সে শ্রদ্ধার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই? তাঁহার চরিত্রের বিষয় আমি যাহা জানিয়াছি তাহাতে তিনি যে অসাধারণ এ বিষয়ে আমার কণামাত্র সন্দেহ নাই। শাস্ত্রবচন যদি বিন্দু-মাত্র বুঝিয়া থাকি, নারীর নীতি সম্বন্ধে যদি আমার বিন্দুমাত্র ধারণা জন্মিয়া থাকে, এই ধারণাই আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, নারী এমন কাহাকেও আত্মদান করিবে—যাহাতে সার্থক হয় সে নিজে, আর ধন্য হয় তাহার পিতৃকুল।

রাজা কন্যার এইরূপ মনোবৃত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অথচ ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়াও নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি সুমিষ্ট ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, যৌবন করে যৌবনকে বিবাহ, রূপ করে রূপকে বিবাহ, আর সকল নারীই

পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত। কৃচ্ছ্র তাহাদের অন্তরের ধর্ম্ম নহে। একটা মহৎ কিছু নারীচিত্তকে সাময়িকভাবে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা নারীর হৃদয়ে স্থায়ী হইয়া তৃপ্তি দান করে না। সাধারণ নারী-চরিত্র আমি এইরূপই জানিয়াছি। মা, তুমি যদি নিজেকে ইহার ব্যতিক্রম বলিয়া বোধ কর, উপযুক্ত আভরণে ভূষিত হইয়া প্রস্তুত থাকিও। কল্য প্রভাতে আমি পুনরায় সেই মহাপুরুষের নিকট গমন করিব—তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে।

রাজা পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে কন্যার গৃহে গমন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহা তাঁহার কল্পনারও অতীত। দেখিলেন, কন্যা সুসজ্জিতা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাজসজ্জা সকলই নিতান্ত দরিদ্রের মত। কন্যার এই দীনবেশ দেখিয়া তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিয়া বলিলেন—মা, আমি তোমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু এইরূপ আত্মদানের বাসনার শতাংশের একাংশও যদি তোমার পিতার কল্যাণকামনায় কিম্বা তাঁহার পরমার্থজ্ঞানলাভের সহায়ক হইবার জন্য উদিত হইয়া থাকে, আমি তোমাকে এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছি। সমস্ত রাজ্য ও রাজৈশ্বর্য্যের বিনিময়ে আমি সেই ঋষিতুল্য মহাপুরুষের নিকট সংবর্গ বিদ্যালাভে আগ্রহশীল হইতে পারি কিন্তু স্বীয় কন্যার বিনিময়ে আমি তাহা চাহি না।

রাজকন্যা পিতার মুখের দিকে স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য আমি এ সঙ্কল্প করি নাই। আর ইহাও বুঝিতেছি, কেন তিনি আপনার প্রদত্ত অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

কন্যার এই বাক্যে জানশ্রুতির যেন চৈতন্যোদয় হইল। সত্য সত্যই রৈক্ক কেন যে তাঁহার দান প্রকারান্তরে উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। এই মুহূর্ত্তে কন্যার সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় উজ্জ্বল প্রসন্ন বদনকমলের দিকে তাকাইয়া যেন একটা আলোর ঝলকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, কেন রৈক্ক তাঁহার দান অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিছুকাল বিস্ময়ে নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, আমি পূর্ব্বে রাজার গর্ব্ব ত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়াই তিনি আমার দান গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন! তুমি আমার সেই গর্ব্বের অজ্ঞাত গ্রন্থি ছেদন করিয়া দিলে। তথাপি আমি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না যে, সেই রৈক্ক শূদ্রকুলজাত, তুমি ক্ষত্রিয়কন্যা হইয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে বরণ করিবে?

রাজকন্যা বলিলেন, আর্য্যধর্ম্ম তাঁহার কুলকে শুচি করিয়া লইয়াছে। তিনি নিজ সাধন বলে মানবের অধিগম্য যাহা তাহার শ্রেষ্ঠতম স্তরে উন্নীত হইয়াছেন। অতএব তিনি বরণের অযোগ্য নহেন। যে মনোবৃত্তি এহেন পুরুষকে বরণের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে প্ররোচিত করে, যে অন্ধ সংস্কার এই সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় তাহা অচিরে ধ্বংস হউক—নতুবা এ জাতির কল্যাণ নাই। যে জাতিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর অখণ্ড আর্য্যজাতিকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘৃণা অবহেলা ও বিদ্বেষে অপরকে হীনতাবোধলিপ্ত করিয়া রাখিতেছে, যে জাতিভেদের পঙ্কিল কালিমা বিরাট জাতির মুখমণ্ডল মসীলিপ্ত করিতে চলিয়াছে তাহার পরিণতি কোথায় ভাবিয়া দেখুন। ব্যক্তিশক্তির উন্নয়ন যেখানে এমনই কঠিন কুসংস্কারমূলক অনতিক্রম্য বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে জাতির অধঃপতন সেখানে অনিবার্য্য। আমি এই কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত নহি, আর আমার সঙ্কল্প হইতে বিরত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

রাজা কন্যার বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। রাজার সংস্কারের প্রাচীরবদ্ধ অন্ধকার যেন সহসা এক অভিনব আলোকসম্পাতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার মনোভাব যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াই ক্ষান্ত হইব না; আমি এই শুভ পুণ্য মুহূর্ত্তে পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকিয়াই আদেশ করিতেছি যে, তুমি সেই পুরুষপ্রবরকে বরণ করিয়া সার্থক বধূত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া প্রতিভাত হও। এ আদেশ পিতৃবক্ষ-নিঃসৃত স্নেহাভিষিক্ত শুভ আশীর্ব্বাদ ধারায় স্নাত।

আঁখি ও সিন্ধু

শ্রীযতীন্দ্র সেন

তোমার নয়ন সখি, যেন সিন্ধু রহস্য-গভীর,
সুনীল স্বপন-ঘেরা, সীমাহীন, অতল, তরল;
সুদূর সৈকত-ঘেরা শ্যামরেখা যেন বনানীর—
আঁখির সীমায় তব পক্ষ্মরাজি কৃষ্ণ, সুকোমল।
স্বচ্ছ, শান্ত পারাবার—একখানি আরত মুকুর,
দিগন্তে আনমি' সুখে গগনের মূক, নীল-আঁখি
যুগ-যুগান্তর ধরি বিস্ময়-নির্ব্বাক, তন্দ্রাতুর—
কি যেন সন্ধানি' ফেরে অপলক তাহে চেয়ে থাকি'!
কৌতুক-উচ্ছল তব স্বপ্নালস নয়ন গহন—
উজ্জ্বল দর্পণ-সম, শুক্তি-স্বচ্ছ, পুলক-বিহ্বল;
অনিমেষ দৃষ্টি মেলি' আমি তাহে করি যে গাহন
খুঁজে ফিরি, কি রহস্য নিয়ে তব জাগে মর্ম্মতল।
এক বিন্দু জলে হেরি চোখে তব ক্ষুব্ধ পারাবার;
নয়নের নভে মোর নামে সখি, বারি বরষার॥



গান

ধানশ্রী (ভৈরবী ঠাট্) *—ত্রিতালী।

সন্ধ্যা মালতী যবে ফুলবনে ঝুরে।
কে আসি বাজালে বাঁশী ভৈরবী সুরে॥
সাঁঝের পূর্ণ চাঁদে অরুণ ভাবিয়া
পাপিয়া প্রভাতী সুরে উঠিল গাহিয়া,
ভোরের কমল ভেবে সাঁঝের শাপ্‌লা ফুলে
গুঞ্জরে ভ্রমর ঘুরে ঘুরে॥
বিকালের বিষাদে ঢাকা ছিল বন-ভূমি,
সকালের মল্লিকা ফুটাইলে তুমি।
রাঙিল উষার রঙে গোধূলি-লগন
শোনালে আশার বাণী বিরহ-বিধুরে॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম্। স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক।

০ ১ + ৩
II ণ্া -সা মজ্ঞা জ্ঞমা | মপা পাঃ পঃ পা | া ণণপা -ণঃ ণঃ ণর্া | র্সা -া র্সা -া I
স ন্ ধ্যা ০ মা ০ ল ০ তী য বে ০ ফুল ০ ০ ব নে ০ ঝু ০ রে ০

০ ১ + ৩
I া পণণা ণর্সাঃ ণঃ | পণা পণর্সজ্ঞাঃ র্সঃ ণদা | া দপমজ্ঞা -ঋঃ ঋঃ ঋজ্ঞা | জ্ঞসা -া সা -া II
০ কে আ সি ০ বা জা ০ লে০০ ০ বাঁ শী০ ০ ভৈ০০০ ০ র বী ০ সু ০ রে ০

* ভৈরবী ঠাটের ধানশ্রী অপ্রচলিত রাগ। কাফী এবং পূরবী ঠাটের ধানশ্রী ('পুরিয়া-ধানশ্রী') এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ভৈরবী ঠাটের ধানশ্রীর মধ্যে একটু নূতনত্ব দেখা যায়। সন্ধ্যার ও সকালের দুইটি বিভিন্ন সুরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই এই রাগের বিশেষত্ব। কবি এই দুইটি বিভিন্ন সুরের কালোপযোগী ভাব ও ভাষায় গানটি রচনা করায়, গানখানির 'মিল' অতি চমৎকার হইয়াছে।

এই রাগটি 'ঔড়ব-সম্পূর্ণ' জাতির।

আরোহী—ণ্ স জ্ঞ ম প ণ র্স।

অবরোহী—র্স ণ দ প ম জ্ঞ ঋ স।

ইতি—স্বরলিপিকার।

০ ১ +
II । প পমা -জ্ঞমজ্ঞমা -মঃ পঃ | -ণা ণর্সা র্সা র্সা | । র্সজ্ঞা -জ্ঞা -। ।
০ সাঁঝে০ ০ ০ ০ ০ র্ পূ র্ ণ ০ চাঁ দে ০ অরু ণ ০

৩ ০ ১
। -। জ্ঞমজ্ঞা জ্ঞঋজ্ঞঋা -সর্নসা I । পণা ণর্সাঃ র্সঃ | র্সণা ণর্সঋা -ণঃ ণর্সঃ ণদা ।
০ ভা বি য়া ০ ০ ০ ০ ০ পা পি য়া ০ প্র ভা০ তী০ ০ ০ সু০ রে০

+ ৩ ০ ১
। -। জ্ঞজ্ঞমা মণদা -। | ণা ণর্সা র্সা -। I । ণ ণদা -। -দঃ দঃ | পদপমা -জ্ঞপা পা পা ।
০ উঠি ০ ল ০ ০ ০ গা হি ০ য়া ০ ০ ভো রে০ ০ র্ ক ম ০ ০ ০ ০ ল্ ভে বে

+ ৩ ০ ১
। ণ্সা -মজ্ঞা মা | -পা মমা মা মা I । মপাঃ পণঃ ণপা | পণা র্সা র্সা -। ।
০ সাঁঝে ০ র্ শা প্ লা ফু লে ০ গুণ্ জ রে০ ভ্র ০ ম র্

+ ৩
। -। পণা -র্সজ্ঞা র্সা | র্সণা -দপা -মজ্ঞা ঋসা II
০ ঘু০ ০ ০ রে ঘু ০ ০ ০ রে০ ০ ০

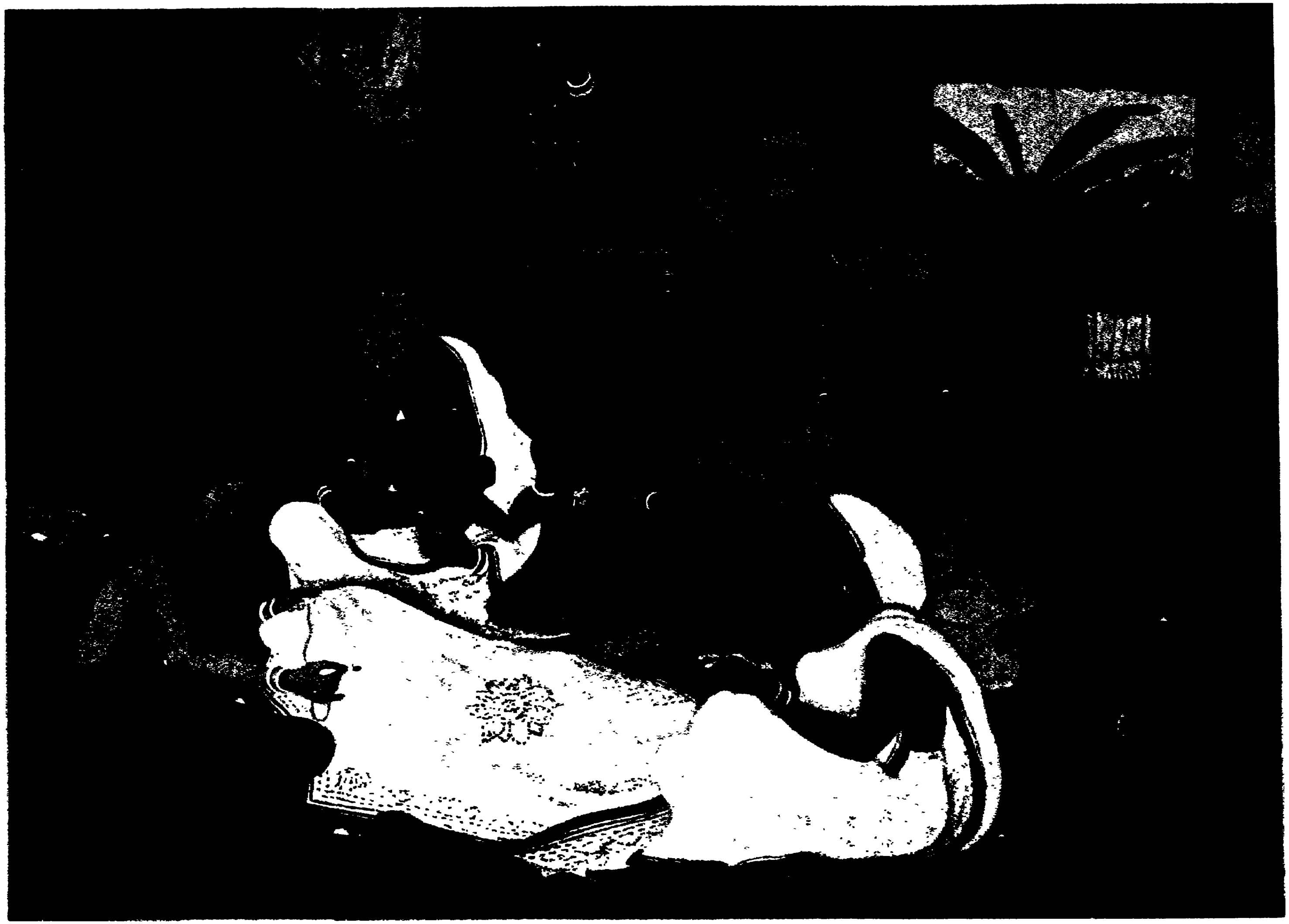
০ ১ +
II । প দপা মজ্ঞমজ্ঞা -মঃ ণ্ঃ | সা মজ্ঞমজ্ঞা -মঃ পঃ পা | । পপণাঃ ণঃ ণর্সা ।
০ বি কা লে০ ০ ০ র বি যা দে০ ০ ০ ০ ঢা কা ০ ছি ল ০ ব ন ০

৩ ০ ১
। র্সা -। র্সা -। I । র্সর্সজ্ঞা জ্ঞর্রজ্ঞা -র্রজ্ঞা | জ্ঞা -। জ্ঞঋা র্সা ।
ভূ মি ০ ০ স কা ০ লে ০ ০ ০ র ম ল্ লি কা

+ ৩ ০ ১
। । ণণা -র্সা র্সণা | ণর্সঋা -ণর্সা ণদণদা -মপা I । পপণা ণাঃ ণঃ | ণধা ণা ণদা -পা ।
০ ফুটা ই লে ০ তু ০ ০ ০ ০ মি০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ঙি ০ ল উ যা ০ র্ র ঙে

+ ৩ ০
। । ণ্ণ্সা সমজ্ঞমজ্ঞাঃ জ্ঞমঃ | মপা -। পা -। I । পপণা ণর্সাঃ র্সঃ ।
০ গোধূ ০ লি ০ ০ ০ ল গ ০ ০ ন ০ ০ শো না ০ লে ০ আ

১ + ৩
। র্সঋা -র্সঋজ্ঞা ঋজ্ঞঋা -র্সা | । ণণা ণর্সাঃ র্সণঃ | ণর্সঋা -ণর্সা ণদপমা -জ্ঞঋসা II II
শা ০ ০ ০ র্ বা ০ ০ ণী ০ বির হ ০ বি ধু০ ০ ০ ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০



জমিদারী হিসাবপত্র

শ্রীতারকগোবিন্দ চৌধুরী

জমিদারী কার্য্য যে এক প্রকার ব্যবসায়—এরূপ ধারণা অনেকেরই নাই ; এ কারণ ব্যবসায়ের প্রণালীতে ইহার কার্য্য পরিচালিত হইতে সাধারণত দেখা যায় না। অন্য ব্যবসায়ের ন্যায় ইহার লাভ অনিশ্চিত নহে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জমিদারীর লাভ-লোকসানের হিসাব প্রস্তুত হইতে প্রায়শ দেখা যায় না। ভোগবিলাসের সামগ্রীজ্ঞানে ইহার কার্য্য সম্পাদিত হয়। যথাসময়ে হিসাবনিকাশ প্রস্তুত হয় না।

প্রজার নিকট খাজনা বেশী বাকী পড়িলে উহা আদায় হওয়া কঠিন ; খাজনা আদায়ই জমিদারীর প্রধান কার্য্য। প্রজার নিকট প্রাপ্য খাজনা আদায় করিয়া উৰ্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর খাজনাদি প্রতি সন পরিশোধ করিতে না পারিলে জমিদারীর পরিণাম শোচনীয় হয়। প্রজার সহিত জমিজমার কোনওরূপ গোলযোগ থাকিলে উহা সত্বর মীমাংসা করিতে হয় ; অন্যথা প্রাপ্য টাকা সম্পূর্ণ আদায় হয় না। জমার পরিমাণ স্বল্প হইলে এবং আদালতের সহায়তায় উহা আদায় করিতে হইলে ভূম্যধিকারীর মোকদ্দমার ব্যয়সঙ্কুলানই হয় না, এজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রজার জমা ভাগ করিতে হয়।

রাজস্ব প্রদানের নির্দ্ধারিত দিনে এবং পত্তনী তালুকের খাজনা জমিদারের অষ্টমজারী করিয়া আদায় করিবার সর্ত্ত থাকিলে উহা বৎসরের মধ্যেই পরিশোধ করিতে হয়।

প্রতি সন প্রজাগণের নিকট সমভাবে খাজনা আদায় হয় না ; অথচ সম্পত্তি পরিচালনের ব্যয় প্রায় নির্দ্দিষ্ট থাকে। ভূম্যধিকারিগণের খাজনা সেস-আদি প্রদান এবং সম্পত্তি পরিচালনের ব্যয় ইত্যাদি বাদে বার্ষিক কত টাকা মুনাফা থাকে, তাহা প্রতি সন দেখা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। "আয় বুঝে ব্যয়"—কথাটি ভুলিলে পরিণামে সর্ব্বনাশ হয়। সম্পত্তির দেনা এবং পাওনার উপর প্রখর দৃষ্টি না রাখিলে সম্পত্তির পরিণাম শোচনীয় হইয়া পড়ে।

সংসারে যাবতীয় কার্য্যই কতকগুলি নিয়মাবলম্বনে করা বিধেয়। ইহা ভিন্ন কখনও কার্য্যে উন্নতি লাভ হইতে পারে না।

সম্পত্তির অবস্থা কখন কিরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহা মালিকের চোখের সামনে রাখিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট নহে ; উহা যথাযথ প্রতিপালন এবং যথাসময়ে কার্য্যে পরিণত হইতেছে কি-না তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই সম্পত্তি রক্ষার প্রধান উপায় এবং মূলসূত্র।

মালিকের পক্ষে সর্ব্বক্ষেত্রে কার্য্য পরিদর্শনের অনেক অন্তরায় ঘটে ; এজন্য নিয়মানুসারে রীতিমত কার্য্য পরিচালিত হইতেছে কি-না তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত পরিদর্শক নিযুক্ত করা আবশ্যক। তিনি মালিকের খাস-কর্ম্মচারী হইবেন, প্রধান কর্ম্মচারীর অধীন থাকিবেন না। তিনি পরিদর্শন রিপোর্ট মালিকের নিকট দাখিল করিবেন। মৌজার পতিত পলাতকা জমিতে কি পরিমাণ শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহা তদন্তের নিমিত্ত পরিদর্শক থাকা দরকার। প্রত্যেক পলাতকা জোতের বা খাস-জমির শস্যপ্রাপ্তির কাগজ প্রস্তুত করিতে হয়। বেতন প্রদানের পরিবর্ত্তে আদায়ী টাকার উপর কমিশন প্রদানের ব্যবস্থায় কিংবা কমিশন এবং কথঞ্চিৎ বেতন প্রদানের ব্যবস্থায় আদায়কারী নিয়োগ করাই শ্রেয়। জমিদারীর হিসাবপত্র সরল হওয়া উচিত এবং রিপোর্ট রিটার্ণ-আদি কাগজপত্রের সংখ্যা অধিক হওয়া সঙ্গত নহে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত হিসাবনিকাশের পদ্ধতি অনুসারে সমুদয় কাছারির সালতামামি (বার্ষিক) জমাখরচ সদর-কাছারির জমাখরচে ভুক্ত হয় না। একজাই-ফর্দী-হিসাব প্রস্তুতে জমিদারীর হিসাবনিকাশ করা হয়। এই প্রণালীতে জমিদারীর বার্ষিক আয়, ব্যয় এবং মুনাফা কত হয় তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই প্রকার হিসাবনিকাশ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। সম্পত্তির বার্ষিক আয়, ব্যয়,

মুনাফা, দেনা এবং পাওনা কত হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত সমস্ত কাছারির সালতামামি জমা-খরচ সদর কাছারির সুমারে (জমা-খরচে) ভুক্ত করিতে হয়। তদনুসারে যে নিকাশী কাগজ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে উদ্বর্ত্তপত্র (Balance-sheet) কহে। সম্পত্তির একাধিক মালিক থাকিলে উদ্বর্ত্তপত্র-পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশ করা প্রয়োজন।

কার্য্যের নিয়ম

১। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে (অর্থাৎ জুন কিস্তির লাটের পূর্ব্বে) শুভপুণ্যাহ করিয়া জমিদারীর নববর্ষ আরম্ভ করিতে হয়। যাহাতে বার মাসের অধিক সময় বৎসর গণনায় না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

২। সদর কাছারি হইতে জমিজমা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্তের কার্য্য এবং সম্পত্তির তত্ত্বাবধান হইবে। সদর কাছারির আদেশানুযায়ী ডিহি বা মফঃস্বল কাছারির কার্য্য পরিচালিত হইবে।

৩। তহশীলদারগণের সালতামামি জমাখরচ মফঃস্বল কাছারির সুমারভুক্ত হইবে এবং মফঃস্বল কাছারিসমূহের সালতামামি জমা-খরচ সদর কাছারির সুমারভুক্ত হইবে। ইহা ভিন্ন সম্পত্তির বার্ষিক প্রকৃত আয় এবং ব্যয় কত হয় তাহা সহজে জানা যাইতে পারে না।

৪। তহশীল কাছারিতে এবং মফঃস্বল কাছারিতে "ইরশাল খরচ" এবং "আমানত শোধ" ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার খরচ লিখিত হইবে না।

৫। নগদ টাকা প্রেরণের এবং জমাখরচী টাকা প্রেরণের পৃথক পৃথক ইরশাল চালান দিতে হইবে।

৬। কোন কর্ম্মচারীর নিকট কত টাকা তহবিল থাকিবে তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকা সঙ্গত।

৭। প্রত্যেক কাছারির হিসাবনিকাশ দাখিল করিবার দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ধার্য্য দিনে হিসাবনিকাশ দাখিল না হইলে কঠোর ব্যবস্থা করিতে হয়।

৮। বৎসরের প্রকৃত আয় এবং ব্যয় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আমানতী এবং হাওলাতী টাকার জমাখরচ করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় ধার্য্য থাকিবে।

৯। স্থায়ী হাওলাত (Imprest Cash or Permanent Advance নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা) প্রদান করিয়া কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করাই সুবিধাজনক। হাওলাত-গৃহীতা যখন যে পরিমাণ ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিবেন, তখন তাঁহাকে সেই পরিমাণ টাকা দিতে হইবে। এইরূপ পদ্ধতিতে ব্যয় পরীক্ষা করিবার এবং যথাসময়ে হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করিবার সুবিধা ঘটে।

১০। কর্ম্মচারিগণের দাখিলী জমা-খরচ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময় ধার্য্য থাকিবে।

১১। প্রতি সন মাঘ মাসের মধ্যেই খাজনা-বাকীর নালিশ আদালতে দায়ের (রুজু) করিতে হইবে।

১২। যে সমস্ত প্রজার নামে খাজনা তামাদির নিমিত্ত নালিশ করা হইবে না তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া উদ্ধ্বতন কাছারিতে পাঠাইয়া আদেশপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

মাঘ মাসের মধ্যে নালিশ করিলে বর্ষা আসিবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে। সাক্ষীর বারবরদারী ব্যয় কম পড়িবে। আরজির কোনওরূপ ভ্রম-সংশোধনের যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। তামাদির শেষ মুহূর্ত্তে নালিশের আরজির ভ্রম সংশোধন করিবার প্রয়োজন ঘটিলে তন্নিমিত্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ নালিশের ব্যবস্থায় আদায়কারিগণ তাহাদের নিকাশী কাগজ প্রস্তুতের যথেষ্ট সময় পাইবেন। বর্ত্তমান সনের আদায় তহশীল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আদায়কারিগণের গতবর্ষের হিসাবনিকাশ সমাধা করিতে না পারিলে হালসনের মহালের পাওনা কত টাকা হইবে তাহার তলবতৌজি প্রস্তুত করা যায় না এবং আদায়কারিগণ কোন্ কোন্ তারিখে কত টাকা ইরশাল প্রদান করিবেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট "করার-চালান" গ্রহণ করিয়া আদায়ের সুব্যবস্থা করা যায় না। এজন্য শ্রাবণ মাসের মধ্যেই অর্থাৎ আদায় তহশীল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই হিসাবনিকাশ সমাধা হওয়া প্রয়োজন।

দ্রষ্টব্য :—দাখিলা ভিন্ন অন্য প্রকার রসিদ দ্বারা খাজনা আদায় করা কখনও সঙ্গত নহে। দাখিলায় ক্রমিক নম্বর ছাপাইয়া লইতে হয় এবং নম্বরের অগ্রে ক, খ, গ প্রভৃতি সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকা দরকার। উহাতে কোন্ সনে ঐ দাখিলা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা জানা যায়। ইহাতে কেহ দাখিলা জাল করিতে পারে না।

জমাখরচ এবং হিসাব

যাহার নিকট হইতে যে টাকা গ্রহণ করা হয় তাহা জমাখরচের বামভাগে জমা করিতে হয় এবং যাহাকে যে টাকা প্রদান করা হয় তাহা জমাখরচের দক্ষিণ ভাগে খরচ লিখিতে হয়। জমার দিকে পূর্ব্ববর্ত্তী তারিখের তহবিল পরবর্ত্তী তারিখে আনিয়া যোগ দিতে হয়। প্রত্যহ জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া নিজরোজের তহবিল নির্ণয় করিতে হয়। প্রত্যহ তহবিল গণনা করিয়া যতপ্রকার মুদ্রা (নোট, টাকা পয়সা ইত্যাদি) তহবিলে থাকে তাহার বিবরণ লিখিয়া জমাখরচে লেখকের নাম স্বাক্ষর এবং মবলগবন্দী করিতে হয়।

গুণে বাজিয়ে জমা কর।
বোকা মেকির ধার না ধার॥
আগে লিখে পাছে দাও।
যত থাকে বুঝে লও॥
তহবিল ঘাটতি যদি না চাও।
নিত্য গুণিয়া নিত্য মিলাও॥

বস্তু (স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি), ব্যক্তি এবং খাজনা, সুদ, বেতন, ডাকমাশুল প্রভৃতি কাল্পনিক (অস্তিত্ববিহীন বিষয়) নামে টাকা জমা বা খরচ লিখিতে হয়।

বৎসরের প্রারম্ভ হইতে শেষ তারিখ পর্য্যন্ত জমার এবং খরচের ক্রমিক নম্বর জমাখরচে প্রদান করিবার রীতি জমিদারী সেরেস্তায় প্রচলিত আছে। মালিকের নিজ সেরেস্তার জমাখরচ হইতে খতিয়ানী করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। হিসাবে জমা এবং খরচের দুইটি অংশ থাকে। জমাখরচ হইতে খতিয়ানী হইয়া যে হিসাবের জমার অংশে জমা এবং খরচের অংশে খরচ লিখিত হয় তাহাকে সাধারণ হিসাব কহে। জমাখরচ হইতে খতিয়ানী হইয়া যে হিসাবের কোন একটি অংশ লিখিত হয় এবং হিসাবের অপর অংশটি পূর্ব্বতন কোন কার্য্যের ফল অনুসারে লিখিত হয়, তাহাকে বিশেষ হিসাব কহে।

যে খাতায় হিসাবগুলি লিখিত থাকে তাহাকে খতিয়ান বা হিসাব বহি বলে। বিশেষ-হিসাবে কেবলমাত্র ব্যক্তির নামীয় হিসাব থাকে। জমিদারী সেরেস্তায় সাধারণ-খতিয়ানে ব্যক্তির নামীয় হিসাব রাখিবার পদ্ধতি নাই।

জমাখরচে আমানত, হাওলাত প্রভৃতি দ্যোতক শব্দ ব্যবহারে ব্যক্তির নামে টাকা জমা ও খরচ লেখা হয়। পৃথক বহিতে ব্যক্তির নামীয় হিসাব রাখা হয়। ইহাতে সাধারণ খতিয়ান দৃষ্টে সহজে এবং স্বল্প সময়ে দেনা (আমানত-আদি) এবং পাওনা (হাওলাত-আদি) কত আছে জানা যায়। সর্ব্বপ্রকার দেনা এবং পাওনার বাকীজায় করিয়া সাধারণ খতিয়ানের হিসাবের সহিত মিল করিতে হয়।

জমিদারী সেরেস্তায় বার্ষিক কোন্ বিষয়ে কত টাকা জমা হয় এবং কত টাকা খরচ হয় তাহা জানিবার নিমিত্ত সাধারণ খতিয়ান অনুসারে সালতামামি জমাখরচ প্রস্তুত করিতে হয়; এ কারণ সালতামামি জমাখরচ প্রস্তুত হইবার পর সাধারণ হিসাবে গত সনের উদ্বর্ত্ত অঙ্ক আনিতে হয়। এইটি জমিদারী সেরেস্তার বিশেষত্ব।

জমাখরচের এবং সাধারণ-হিসাবের জমার দ্বারা মালিকের দেনা এবং খরচের দ্বারা মালিকের পাওনা বুঝায়।

জমিদারী সেরেস্তার করচা হিসাবে (প্রজার নামীয় খাজনার হিসাব) এবং ভূম্যধিকারীর খাজনা প্রদানের হিসাবে উপরিভাগে দেনা বা পাওনার বিবরণ এবং নিম্নভাগে ওয়াশীলের বিবরণ লিখিলে সনানুযায়ী বাকী বাহির হয়; পৃথকভাবে বাকী নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় না। করচা হিসাবে প্রজার কবুলিয়তের সন তারিখ, দাতা এবং গ্রহীতার নাম, কবুলিয়তের বিশেষ সর্ত্ত, সমস্ত দখিলকার প্রজার নামধাম এবং জমা কমিবেশীর, খাজনা রেয়াৎ প্রদানের, জমিজমা খারিজ-দাখিলের, মালিকের পক্ষে নিলাম খরিদের আদেশ-পত্রের নম্বর, সন ও তারিখ প্রভৃতি বিবরণ লিখিতে হয়।

ভূম্যধিকারীর খাজনা প্রদানের হিসাবে পাট্টা বা কবুলিয়তের সন, তারিখ, দাতা ও গ্রহীতার নাম, বিশেষ সর্ত্ত, খরিদা কবালার সন তারিখ, নিলাম খরিদা সম্পত্তির বয়নামার বিবরণ এবং ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় হিসাব পৃথক না থাকিলে অংশীদারগণের নাম ও অংশ লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

জমাখরচ লিখিবার পদ্ধতি

জমাখরচ এরূপভাবে লেখা উচিত যাহাতে দীর্ঘকাল পরে জমাখরচের লেখাতেই আপনা আপনি প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইতে পারে; এ কারণ, জমা এবং খরচের প্রত্যেক

দাগকে (বিষয়) পাঁচ অংশে ভাগ করিয়া লিখিতে হয়। যথা :—(ক) সাধারণ-হিসাবের নাম, (খ) বিশেষ-হিসাবের নাম ও বিবরণ, (গ) সাকিন বা মোকাম, (ঘ) মারফত, গুজরত বা মোতাবেক, (ঙ) দরুণ বা বাবদ (কারণ)। যে স্থলে দ্বিতীয় অংশের বিষয় লিখিবার আবশ্যকতা থাকে না, তথায় ঐ অংশ বাদ দিতে হয়।

টাকাকড়ি কি বাবদে পাওয়া যায় বা দেওয়া হয় তাহা খোলসা করিয়া লেখা কর্ত্তব্য; নতুবা ভবিষ্যতে প্রকৃত ঘটনা বুঝিবার বিশেষ গোলযোগ ঘটিতে পারে। পঞ্চম অংশটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দ্রষ্টব্য :—বিশেষ-হিসাবে যে সমস্ত কাল্পনিক নামের-হিসাব খতিয়ানী করিতে হইবে না, সেই সব হিসাব এবং বস্তুর নামীয় হিসাব জমাখরচে জমা বা খরচ লিখিতে যথাক্রমে (ক) সাধারণ-হিসাবের নাম, (খ) মোকাম, (গ) দরুণ বা বাবদ এবং (ঘ) মারফত আদিতে লিখিতে হয়।

জমাখরচের ভ্রমসংশোধন

বর্ত্তমান সনের জমাখরচে কোনওরূপ ভুলভ্রান্তি হইয়া টাকা জমা বা খরচ লিখিত হইলে উহা স্ব স্ব হেতু (বিষয়) উল্লেখে ফেরত-জমা বা ফেরত-খরচ লিখিয়া ভুলসংশোধন করিতে হয়। সাধারণ-হিসাবেই প্রকৃত আয় বা ব্যয় নির্ণীত হয়। সালতামামি জমাখরচে ফেরত জমা বা ফেরত-খরচ বাদে যে হিসাবের যে উদ্বর্ত্ত অঙ্ক থাকে তাহাই দেখাইতে হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কোন হিসাবের ভুল বর্ত্তমান সনে বাহির হইলে উহা জমাখরচে ফেরত-জমা বা ফেরত-খরচ লিখিয়া ভ্রমসংশোধন করা যায় না, ঐরূপ সংশোধন করিলে বর্ত্তমান সনের প্রকৃত আয় বা ব্যয় পরিশুদ্ধ হয় না। এ কারণ, ফেরত-জমার পরিবর্ত্তে কেফাইত-জমা বা লভ্য আদায় খাতে জমা এবং ফেরত-খরচের পরিবর্ত্তে ক্ষিয়ানত বা লোকসান খরচ খাতে খরচ লিখিতে হয়।

হিসাবনিকাশী কাগজ

বর্ত্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে নিম্নতন কাছারির সালতামামি জমাখরচ উর্দ্ধতন কাছারির জমাখরচে ভুক্ত হয় না। তহশীলদারের সালতামামি জমাখরচ এবং তাঁহার কিতাবতাধীন মৌজাসমূহের জমা-ওয়াশীল-বাকী অনুসারে যে নিকাশী কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহাকে তহশীলদারের ফর্দ্দী-হিসাব বা আখেরী হিসাব কহে। মফঃস্বল কাছারির সালতামামি জমাখরচ এবং তদধীন তহশীলদারগণের ফর্দ্দী হিসাব অনুসারে মফঃস্বল কাছারির ফর্দ্দী হিসাব প্রস্তুত হয়; ঐরূপ সদর কাছারির সালতামামি জমাখরচ এবং সমস্ত মফঃস্বল কাছারির ফর্দ্দী-হিসাবে প্রদর্শিত হয়। যথা :—আগত-বকেয়া সনের আমানত শোধের বাকী, খারিজ বকেয়া-সনের আমানত শোধের বাকী। আগত এবং খারিজের ঘরে একই অঙ্ক দেখাইতে হয়। সালতামামি জমাখরচে গত সনের তহবিল আনিতে হয়; কিন্তু জমা-খরচে পূর্ব্ব সময়ের হিসাবের অঙ্ক (আমানত, করজ) টানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। যেহেতু উহা হিসাবের বিষয়, হিসাবেই থাকিবে। জমাখরচে আসিতে পারে না। এজন্য পূর্ব্ব সময়ের অপরিশোধিত দেনা সালতামামি জমা-খরচে দেখান জমাখরচ লিখিবার রীতিবিরুদ্ধ।

ফর্দ্দী-হিসাব প্রণালীর নিকাশ-অনুসারে নিম্নের বিষয়-গুলি জানা যায় না। (ক) তহশীলদারগণ এক বিষয়ের টাকা অন্য বিষয়ের টাকা উল্লেখে ইরশাল করিলে ঐ ভুল ধরা পড়ে না। যথা: -খাজনার টাকা সুদের মধ্যে ইরশাল, নজর খাজনার মধ্যে ইরাশাল ইত্যাদি।

(খ) সমগ্র এষ্টেট হইতে কত টাকা খাজনা, সুদ ইত্যাদি আদায় হয় এবং কোন্ বিষয়ে কত টাকা ব্যয় হয় এবং কত টাকা দেনা (ভূম্যধিকারীর খাজনা, বেতন, মোকদ্দমা ব্যয় ইত্যাদি) থাকে এবং মোকদ্দমার জাবেদা খরচ কত পাওনা থাকে এবং জমিদারীর বার্ষিক মুনাফা কত টাকা হয় তাহা বুঝা যায় না।

(গ) কর্ম্মচারীর নিকট কত টাকা তহবিল আছে এবং তন্মধ্যে কত তামাদি হইয়াছে তাহা সহজে জানা যায় না।

(ঘ) স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে কত টাকা ন্যস্ত আছে, তাহা জানা যায় না। বর্ত্তমান সন পর্য্যন্ত জমিদারীর সর্ব্বপ্রকার দেনার একটি তালিকা বা ফর্দ্দ প্রদত্ত হয়, কিন্তু মোকদ্দমার জাবেদা খরচ পাওনার ফর্দ্দ দেওয়া হয় না।

ফর্দ্দী-হিসাব পরিবর্ত্তনে উদ্বর্ত্ত-পত্র প্রস্তুতকরণ

এষ্টেটের সর্ব্বপ্রকার দেনা, পাওনা এবং বার্ষিক মুনাফা জানিতে হইলে ফর্দ্দী-হিসাব পদ্ধতির নিকাশ-পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

উদ্বর্ত্তপত্র-প্রণালীর নিকাশে অপরিশোধিত ব্যয় এবং দেয় টাকা জমাখরচ করিয়া লইতে হইবে এবং নিম্নতন কর্ম্মচারীর সালতামামি জমাখরচ উর্দ্ধতন কাছারির জমা-খরচ-ভুক্ত করিতে হইবে। সদর কাছারির স্নুমার এবং সাধারণ-খতিয়ান অনুসারে হিসাব-নিকাশ হইয়া জমিদারীর বার্ষিক মুনাফা এবং বর্ত্তমান সন পর্য্যন্ত দেনা এবং পাওনা নির্ণীত হয়। এইরূপ হিসাব-নিকাশের নাম উদ্বর্ত্তপত্র (Balance-sheet); মহালের অবস্থা বুঝিবার নিমিত্ত উদ্বর্ত্তপত্রের সহিত একজাই জমা-ওয়াশীলা-বাকী দিতে হয়। ইহার দ্বারা জমিদারীর জমিজমা (হস্তবুদ) প্রাপ্য খাজনা, পতিত পলাতকা জমিজমা—হস্তবুদের কত অংশ আদায় হইয়াছে, কত খাজনা তামাদি হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় বুঝা যায়।

তহশীলদারগণের জমা-ওয়াশীল-বাকীর আদর্শানুরূপ সমস্ত মৌজার জমা-ওয়াশীল-বাকী একত্রীকরণ করিয়া একজাই জমা-ওয়াশীল-বাকী প্রস্তুত হয়।

ভূম্যধিকারীর খাজনাদি প্রদান করিয়া কোন্ সম্পত্তিতে কত টাকা লাভ থাকে তাহা বুঝিবার নিমিত্ত সম্পত্তির নাম অনুসারে একজাই জমা-ওয়াশীল-বাকী প্রস্তুত করিতে হয়।

ফর্দ্দী-হিসাবের দেনা এবং পাওনা জমাখরচকরণ

উদ্বর্ত্তপত্র পদ্ধতির হিসাব-নিকাশে নিম্নতন কাছারির পূর্ব্ব সময়ের দেনা (অপরিশোধিত আমানত, করজ ইত্যাদি) এবং কর্ম্মচারীর নিকট পাওনা তহবিল প্রথম বৎসরে উর্দ্ধতন কাছারির জমাখরচে নিম্নলিখিতরূপে দেখাইতে হয়।

(ক) গত সনের তহবিল—লভ্য আদায় বা কেফাইত জমা খাতে জমা করিয়া ঐ টাকা তহবিল খরচ খাতে খরচ লিখিতে হইবে।

(খ) আগত বকেয়া সনের আমানত বা করজ শোধের বাকী টাকা—আমানত জমা বা করজ জমা করিয়া ঐ টাকা লোকসান খরচ বা ক্ষিয়ানত খরচ খাতে খরচ লিখিতে হইবে।

ইহাতে দেনা এবং পাওনার হিসাব উর্দ্ধতন কাছারির খতিয়ানে ভুক্ত হইবে। বাস্তবিক ইহা প্রকৃত লাভ বা লোকসান নহে; হিসাব সংশোধনের নিয়ম। পদ্ধতি-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত "হিসাব সংশোধন" নামকরণে প্রথম বৎসরে এইরূপ হিসাব সৃষ্টি করিতে হয়। এই হিসাবের বামভাগে "পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত লাভ" এবং দক্ষিণ ভাগে "পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত লোকসান" লিখিতে হয়। এই হিসাবের উদ্বর্ত্ত অথবা "লাভ-লোকসান" হিসাবে দাখিল দিয়া লইতে হয়।

বর্ত্তমান সনের তহবিল উর্দ্ধতন কাছারি জমাখরচে খরচ লিখিতে হয় এবং পরবর্ত্তী সনে ঐ তহবিল (আদায় বাদে উদ্বর্ত্ত) জমা করিতে হয়।

দ্রষ্টব্য :—দেনা বা পাওনা জমাখরচ না করিয়া হিসাবেও সংশোধন করা যায়। প্রত্যেক মফঃস্বলকাছারির লাভ-লোকসানের হিসাব এবং উদ্বর্ত্তপত্র সদর কাছারির হিসাবে ভুক্ত করিয়া জমিদারীর উদ্বর্ত্তপত্র প্রস্তুত করা যায়।

তহশীল কাছারি

এই কাছারিতে নিম্নলিখিত হিসাবপত্র রাখিতে হয়। যথা :—

(ক) আমদানি বহি (খাজনা জমার রেজিষ্টার); (খ) হিসাব (প্রজার নিকট খাজনা পাওনার হিসাব); (গ) জমা-ওয়াশীল-বাকী; (ঘ) জমাখরচ। দাখিলাসূত্রে যত টাকা খাজনাদি আদায় হয় এবং নালিশসূত্রে যত টাকা খাজনাদি আদায় হয়, তাহা আমদানি বহিতে পৃথক পৃথক ভাবে জমা করিতে হয়। মোকদ্দমা খরচ সদর কাছারিতে জমা হইয়া থাকে এবং তাহার হিসাবপত্র তথায় থাকে; এজন্য উহা কিস্তাবতের কাছারিতে জমা করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। উর্দ্ধতন কাছারিতে যে সকল তারিখে টাকা ইরশাল করা হয়, তাহা আমদানি বহির পৃথক পৃষ্ঠায় লিখিতে হয়। আমদানি বহির স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় দাখিলাসূত্রে আদায়ী টাকার সমষ্টি এবং নালিশসূত্রে আদায়ী টাকার সমষ্টি আনিয়া জমা করিতে হয়। তন্নিম্নে আমানত বা করজা টাকা এবং গত সনের তহবিল জমা করিতে হয়। প্রত্যেক বিষয়ের ইরশালী টাকায় সমষ্টি এবং আমানত শোধ খরচ লিখিয়া তহবিল দেখাইতে হয়। ইহাই তহবিলদারের জমাখরচা তহশীল; কিস্তাবতের সরঞ্জামি এবং বেতন খরচ দেখাইবার নিয়ম থাকিলে ঐ জমাখরচের খরচ লিখিতে হয়।

তহশীলদারের জমিজমা বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা থাকে না; এজন্য তাহার পৃথক জমাখরচ বহি রাখিবার প্রয়োজন করে না। ক্রমশঃ

বিজয়ী বীর

বি-কে

হার্ডিং হোষ্টেলে একটি ছোট ঘরে বসে ভবেশ আর মহিম হিন্দু ল পড়ে, আর মনুকে গাল দেয়। এমন সময় সুরেশ আসে, বলে, জোর খবর আছে হে। অজিত কাল থেকে নিরুদ্দেশ।

দুজনাই বই ফেলে উঠে বসে।" মহিম বলে ওঠে, কেন, জয়নগর যায়নি ত?

সুরেশ বলে, না। আজ সকালে তার বাড়ী গিয়েছিলাম। দেখলাম ঘরদোর সব বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর ভজু বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলাম, বাবু কোথায়? বললে, জানি না। কালরাতে কোথায় গেছেন। আমি বললাম, হয় ত জমিদারীর কাজে জয়নগর গেছেন। সে হেসে বললে, না। দিন কতক হ'ল গিয়েছিলেন। জমিদারী প্রজাদের বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন। কবে ফিরবেন তার কিছুই সে জানে না। এই ত খবর!

ভবেশ আর মহিম কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থাকে; অজিতকে খাম-খেয়ালী বলে তারা জানে। তবে ছাত্র-জীবনের সাথীদের একেবারে বাদ দিয়ে যে এতদূর গড়াবে, সে তারা মোটেই আশা করেনি। অথচ এই ত কাল অজিত এসেছিল, কই কিছুই ত বলে নি।

ভবেশ বলে, ইকনমিক্স্ পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর কিছুই নয়।

মহিম বলে, এ যে একেবারে বলশেভিজ্ম্। যা হোক দিয়ে গেল তাদের, যারা এ দানের মর্ম্মই বুঝবে না।

সুরেশ বলে, দেখ, যাদের ঐশ্বর্য্য আছে, অথচ জীবনে কোন রকম বাঁধন নেই, তারা একটা না-একটা নেশা নিয়ে থাকবেই। বৈরাগ্যের নেশাই হয় ত তাকে পেয়ে বসেছে।

মহিম বলে, মনে হয় না। অজিতকে ত চেনো। চঞ্চল প্রকৃতি তার, হেসে খেলে দিন কাটায়, দুঃখ কাকে বলে জানে না। সে আবার সন্ন্যাসী হবে।

ভবেশ বাধা দিয়ে বলে, অসম্ভব নয়। যার সব আছে, সে-ই সব ছেড়ে যেতে পারে। আমি ভাবছি, হঠাৎ সে আমাদের না বলে পালিয়ে গেল কেন?

মহিম বলে, তার সোজা জবাব—আমরা বাধা দেব, সেই ভয়ে। ভাববার আসল কথা, তার বৈরাগ্য হবার কারণ কি, আমরাই বা তার আভাষ পাইনি কেন।

চায়ের পেয়ালা আসে যায়। সিগারেটের ধোঁয়া ঘর ছেয়ে ফেলে, কিন্তু তর্কের আর কোন মীমাংসা হয় না।

একদিন অজিত ফিরে আসে আবার তাদেরই মধ্যে। আগে যেমন আসত তেমনি।

মহিম বলে—কি হে, নির্ব্বাণের আলো নিয়ে এসেছ বুঝি আমাদের মুক্তি দিতে?

ভবেশ বলে, আমাদের মুক্তির জন্যই যত ওর ভাবনা। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে নিরুদ্দেশ; তারপরও যদি কোন খবর দেওয়া হয়! কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনতে পারি?

অজিত হেসে বলে, না ভাই, নিব্বাণের লোভ আমার নেই, দার্জ্জিলিং ঘুরে এলাম।

সুরেশ বলে, এদিকে আমরা ভেবে মরি, তুমি বুঝি হিমালয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছ। নইলে এসব দানপত্র কেন, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে কত তর্ক!

অজিতবলে, শুধু একটা খেয়াল আর কিছু নয়। এখন তোমাদের খবর কি বল।

ভবেশ বলে, আমাদের আর খবর! হিন্দু ল'র শ্রাদ্ধ করছি। তবে মহিমের জীবন-তরী ঘাটে লাগছিল—রূপসী রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব। ও বলে কিনা, না। এই 'না"র মাঝে একজোড়া কালো হরিণ চোখ আছে, ভেঙে বলতে চায় না। তবে ওর দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে আমাদের তোলপাড় করে।

অজিত হেসে বলে, তাই নাকি?

মহিম বলে, থাক ভাই, সে সব কথা।

অজিত বলে, আদিম যুগ থেকে প্রেমের কথা শুনে আসছি। নভেলি প্রেম কেমন যেন মনগড়া বলে মনে হয়। জীবনে তা কই দেখতে পাই না।

মহিম বাধা দিয়ে বলে, প্রেমে পড়লেই বুঝতে পারবে।

সুরেশ বলে, বাজে কথা। প্রেমে পড়লে চোখ মেলে দেখবার শক্তি মানুষ হারিয়ে ফেলে।

অজিত বলে, সত্যই তাই। তবে যতদূর দেখা যায়, প্রেমিকেরা প্রায় তিন রকম। এক যারা ক্ষণিকের অতিথি—বাঁধাধরার মধ্যে নেই; চঞ্চল, অস্থায়ী প্রেম এদের—আর ভোলা মন। এরা শুধু জয় খোঁজে, দিগ্বিজয়ী হতে চায়। আর এ-ক, যারা না-পাওয়ার ব্যথাটাকে আঁকড়ে ধরে, প্রেয়সীকে দূর থেকে পূজো করে জীবন কাটায়। এরা হয় ট্রাজিক লভার্স্; ঠিক প্রেয়সীকে এরা ভালবাসে না। তাকে উপলক্ষ্য ক'রে নিজের মনের মতন রূপ ও রং দিয়ে এক আদর্শ নারী মূর্ত্তি গড়ে, তাকে ভালবাসে। প্রেয়সীকে পেলেও এদের জীবন দুঃখময়; কারণ সে রক্ত মাংস দিয়ে গড়া।

সুরেশ বলে, আমার মনে হয়, মেয়েরা এই ধরণের প্রেমিকই চায়।

অজিত বলে, হ্যাঁ, সখের জন্য। কিন্তু তারা নিজেদের বিলিয়ে দেয় তাকে —যে তাদের চায়, ভালবাসে, পুজো করে না।

আর এক, যারা প্রেয়সীকে নিয়ে ঘরসংসার করতে চায়। না পেলে, হয় মনমরা হয়ে ভেসে যায়; নয় পাথর-চাপা দিয়ে কোন কাজের স্রোতে নিজের তৃষিত মনটাকে ডুবিয়ে রাখে। মহিম, তুমি নিজের ভেতর তলিয়ে দেখেছ?

তুমি কি চাও?

মহিম বলে, জীবনের পথে সঙ্গীভাবে তাকে চাই।

ভবেশ বলে, তবে সোজা রাস্তা নিয়ে পালিয়ে যাও। তখন দেখো, তার বাপ-মা সেধে মেয়ে-জামাই বরণ ক'রে আনবে।

মহিম বলে, সে সাহস তার নেই।

ভবেশ বলে, তবে আত্মহত্যা ক'রে ফেল, তার ঠিকানাটা দিয়ে যেও। আমরা হরিবোল ক'রে তার বাড়ীর সামনে দিয়ে নিয়ে যাব। কাগজেও নাম তুলে দেব।

মহিম চুপ ক'রে যায়।

অজিত বলে, যদি তার জন্য সমাজ ছাড়তে হয়?

মহিম বলে, পারি না এমন কিছু নেই।

তবে যা হবার নয়, ভেবে লাভ কি?

অজিত বলে, তাও বটে! তার চেয়ে চল নেন্‌কিন যাওয়া যাক্।

চীনে হোটেলের নামে সবাই উঠে পড়ে।

দিনকতক পরে, একদিন তারা অজিতের বাড়ী ধাওয়া করে। তাস খেলতে বসে, মহিম তোলে সিনেমা যাওয়ার কথা—চার্লি চ্যাপলিন আর মেরী পিকফোর্ড।

অজিত বলে, আজ ত ভাই হবে না। আজ যে আমার বিয়ে।

বিয়ে? ব'লে তাস ফেলে তিনজনেই তার দিকে চেয়ে থাকে।

অজিত হাসে, বলে, কেন, বিশ্বাস হয় না?

সুরেশ বলে, হবে না কেন, তবে লাল চিঠি কই?

অজিত বলে, এটা ঠিক বিয়ে নয়, সেজন্য লাল চিঠি নেই।

ভবেশ বলে, অর্থাৎ—

মহিম তার জবাব দিলে, নিমন্ত্রণের পাট নেই।

ভবেশ বলে, স্বার্থপর!

অজিত চুপ করে হাসে।

মহিম বলে, কেন, আমরা কি ভাঙ্গচি দিতাম যে এত লুকোচুরী!

সুরেশ বলে, না, লভে পড়েছে হে।

অজিত বলে, ঠিক তা নয়, তবে জীবনের পরিণতির সঙ্গে মনটাও ত বদলায়।

বন্ধুদের মাথায় অনেক কিছু আসে যা বলা হয় নাই। তারা উঠে যায়। অভিমান হবার কথাও বটে।

সেদিন সন্ধ্যারাতে, অজিত যায় তার জীবনসাথীকে বরণ ক'রে আনতে—একা। কোন ধুমধাম আড়ম্বর নেই। যৌতুক মেয়ের নামে চার হাজার টাকার চেক। সে নিজের পছন্দমত কিনে নেবে। মেয়ের মা বলে—এ আবার বিয়ে!

তার বাপ বলে, এ যুগের ছেলে, এম-এ পাশ, অভিভাবক নেই, ঐশ্বর্য্য আছে, অমন হয়েই থাকে। রেণু খুব সুখে থাকবে। বিয়ে হয়ে যায়, বাসর-ঘরে ছোট শালী মায়া বলে গাইতে। সে বলে আজ নয়। ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করতে এসেছি। এখনও ঠিক বুঝ্‌ছি না ছোট পানসীখানি ঘাটে লাগবে কি না।

মায়া মুচকে হেসে বলে, মাভৈ। যে মাঝীর হাতে পড়েছেন, একেবারে জীবন-নদীর পারে গিয়ে চোখ চাইবেন।

মায়া গায়— "ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার—"

পরদিন বিকালে কান্নার পালা শেষ হ'লে অজিত রেণুকে নিয়ে এল তার বালিগঞ্জের বাড়ীতে, অভ্যর্থনা করলে ভজু। রেণুকে ঘরদোর দেখে শুনে নিতে ব'লে অজিত বেরিয়ে গেল। ফিরে এল, সঙ্গে মহিম। অজিত আলাপ করিয়ে দিতে দুজনাই চমকে উঠল।

ভজু চা দিয়ে যায়। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অজিত বলে, মহিমদা যে ভারী চুপচাপ! নিমন্ত্রণ পাওনি বলে যে রেগে ছিলে তার শোধ তুলে নাও।

মহিম বলে, গাড়ী জংশনে এসে পৌচেছে। তাই এন্‌জিন ষ্টিম নিচ্ছে।

অজিত বলে, বেশ, আমিই লাইন ক্লিয়র দিচ্ছি। শোন রেণু, মহিম প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খাচ্চে। আজ মিলন-বাসরে ওর বিরহ-কাহিনী শোনা যাক্। কেমন, দেখ আপনি আলাপ জমে যাবে।

রেণু চুপ ক'রে থাকে।

মহিম বলে, আজ থাক, আর এক দিন।

অজিত বলে, অনুমতি দাও ত আমি বলি।

মহিম বলে, তুমি!

অজিত হেসে ওঠে। বলে, কেন আমি বুঝি জানি না; তবে শোন।

মহিম একটি মেয়েকে ভালবাসে। মেয়েটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, নবযৌবনা।

সবাই হেসে ওঠে।

মহিম বলে, অমন সবাই পারে।

অজিত বলে, সে বি-এ পড়ে বেথুন কলেজে।

মহিম চম্‌কে ওঠে।

অজিত বলে যায়, সে আজ প্রায় বছর দুয়ের কথা, দুজনায় প্রথম আলাপ হল পুরীতে। আলাপের ভেতর কখন প্রজাপতি দেখা দেন, তা আমি জানি না। তবে আলাপ ঘনিয়ে উঠল প্রেমে। মহিম বিয়ে করতে চায়। হিন্দু বাপ, ব্রাহ্মর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হ'ল না। দেখাশুনা বন্ধ হয়ে গেল। তারপরও চিঠির আদান-প্রদান চলত। মাস

দুই হ'ল তাও বন্ধ হয়েছে। মেয়েটির নাম রেণুকা মিত্র, কাল তার বিয়ে হয়ে গেছে অজিত বোসের সঙ্গে। রেণু তুমিও ত জান এ গল্প।

মহিম পালাবার পথ খুঁজে পায় না।

রেণুর বুকখানি ধুকধুক করে, ভাবে, এ আবার কি, এর শেষ কোথায়?

অজিত হাসে, বলে, কি মহিম, জানি কি না?

মহিম বলে, সে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। এবার গাড়ী ব্রাঞ্চ লাইনে যাবে।

অজিত বলে, কেন, তোমার ত কোন দোষ খুঁজে পাই না।

মহিম বলে, আগে যাকে রেণুকা মিত্র বলে জানতাম, আজ তাকে বন্ধুর স্ত্রী বলে গ্রহণ করছি। তবে তুমি জেনে শুনে…

অজিত বলে, এ বিয়ে করলাম? তার কারণ, রেণু মেয়েটি চোখে সুন্দর লাগল। ছেলেদের খেলনা কেনা দেখেছ? তাদের লোভ সব চেয়ে রঙচঙে জিনিষটার ওপর গিয়ে পড়ে। সেইটাই চায়। না পেলে কেঁদে কেটে রসাতল করে। দিনকতক পরে অন্য কোন একটা চকমকে খেলনা পেলেই তারা খুশী। ভালবাসাটা ঠিক তেমনি যদি না হয়, রেণু আমাকে বিয়ে করতে রাজী হ'ল কেন?

রেণু চুপ ক'রে থাকে।

জবাব দিলে মহিম, তার মতামত কখনও নেওয়া হয়নি। আমিই তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে ঘাড় নেড়ে জানায় তার কোন আপত্তি নেই। কেমন রেণু? ব'লে অজিত হাসে। তারপর বলে, আমি ভাবলাম অন্য কেউ লুফে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমার কাছে থাকলে মহিম মাঝে মাঝে দেখতেও ত পাবে। তার মনের ক্ষুধা নিরাশা কিছু শান্ত হবে।

মহিম ভাবে, তাই কি!

কথা ফুরিয়ে যায়। নিস্তব্ধতার মাঝে তাকের উপরকার ঘড়ীর টিকটিক শব্দ শোনা যায়।

অজিত সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দেয়। তারপর মহিমের হাতখানি ধরে বলে, দেখ মহিম, রেণুকে সাতপাক দিয়ে তার বাপের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি শুধু তোমার জন্য। বিশ্বাস কর?

রেণু আর মহিম চমকে ওঠে।

অজিত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবে, কেমন ক'রে সে এদের বোঝাবে এ ঠাট্টা নয়।

তারপর সে বলে যায়, কলেজে ছেলেরা নিজেদের যাচাই ক'রে নেবার অবসর পায় না। সবাই মনে করে জীবন নাটকের নায়ক হয়ে জন্মেছে। নায়ক হয় একজন, বেশীর ভাগই ত কাটা-সৈন্য। যাক, আমিও সবার মতন ভাবতাম, অসাধ্য সাধন করবার জন্যই আমি জন্মেছি। কল্পনার রাজ্যে অনেক কিছু ক'রে জয়মাল্যও নিয়েছি। কাজের বেলায় যখন কিছুই হয়ে উঠল না, মনে করলাম, সেটা শুধু উপযুক্ত কাজ পাইনি ব'লে। বেশ একরকম হেসে-খেলে দিন কাটছিল। হ্যামলেট, পড়ে মনে লাগল খট্কা।' মনে হ'ল আমিও বুঝি তারই মত নিজেকে ঠকিয়ে চলেছি। নিজের ভিতর তলিয়ে দেখলাম, কল্পনাগুলোকে রূপ দেবার শক্তি আমার নেই। কাজ নেই, সেটা আমার মনের ওজর, শুধু প্রবোধ নেবার জন্য। ভারী রাগ হ'ল। একটা কিছু ক'রে নিজের এই বিষ দাঁতটাকে ভেঙ্গে দেবার রোখ চাপল। জমিদারী প্রজাদের বিলিয়ে দিলাম। অপরের শ্রমের ফল ভোগ করবার আমি কে! বাঁধন ছিঁড়ে যেতে মনটা একটু হালকা হ'ল। ভাবলাম, একটু ঘুরে এসে তারপর একটা কাজে লাগব।

গেলাম দার্জ্জিলিং। সেখান থেকে ঘুম-এ এলাম—সূর্য্যোদয় দেখব বলে। সূর্য্যোদয় ত দেখলামই, আমার জীবন প্রভাতও হল।

সেই ভোরের আলোয় তার মুখখানি এত সুন্দ দেখাচ্ছিল যে তুষারাবৃত হিমালয় ভুলে আমার এই অবুঝ চোখ দুটি চেয়েছিল তারই দিকে। মেয়েরা নাকি না দেখেও দেখতে পায়, যদি কেউ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। সে একবার আমার দিকে চেয়ে পূবের অরুণ আলোর ছটার দিকে মুখ ফিরাল। ফেরত পথে তাদের সঙ্গে আলাপ হল। এক সঙ্গেই দার্জ্জিলিং ফিরলাম।

দিন কতক আসা যাওয়ার পরই একটা চঞ্চল ব্যাকুলতা মনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। ক্রমে জীবনের সব ইন্টারেষ্টগুলো সেই চেন-অচেনা মেয়েটির ওপর গিয়ে পড়ল।

দিন দুপুরের কল্পনাতেও সে এসে দেখা দিল।

একদিন সে নিজেই ধরা দিল।

বললে, সে আর নিজের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

অজিত থামল।

পরের দিনগুলো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটা আনন্দের ঢেউ তুলে যায়। সে ফিরে দেখল তারা দুজনেই চেয়ে আছে তার দিকে। সে বললে, পরের প্রেমকাহিনী শুনতে তাদের প্রেমপত্র পড়তে, ফুলশয্যার ঘরে উঁকি দিতে, ভারী মজা লাগে, নয়?

রেণু চোখ নামিয়ে নিয়ে নখ খুঁটতে লাগল। মুখখানি তার লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

অজিত বলে যায়, তারপর একদিন সন্ধ্যায় সে আমায় নিয়ে গেল অবজারভেটরী হিল্-এ। কতবার এমন এসেছি কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে আলোছায়ার খেলা দেখতে। প্রেমে আত্মহারা হ'লে কথা ফুরিয়ে যায়। পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকাই কাম্য হয়ে ওঠে।

যাক্। সেদিন উঠল কুয়াসা। আকাশ ছেয়ে ফেললে। আমি বললাম, চল, ওঠা যাক্। সে কিছু না বলে আমায় আরও কাছে টেনে নিলে। তারপর সে বলে, মনটা আজ আমার এই আকাশের মতন হয়ে আছে। চাঁদের আলো নিবে গিয়ে কুয়াসায় ছেয়ে ফেলছে। আজ নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারতে চাই, তোমাকে আঘাত দিতে চাই। অধিকার দিয়েছ বলেই আমার এত সাহস। এতদিন ভাববার সময় পাইনি। আজ ভোরে একটা স্বপ্ন দেখলাম, উঠে দেখি চোখ জলে ভরে আছে, ভাবতে বসে শুধু চোখে জলই আসতে লাগল।

সেই অস্পষ্ট আলোয় তার মুখ দেখে কিছুই বুঝলাম না। বললাম, স্বপ্ন নিয়ে চোখের জল ফেলা—

সে বললে, ভোরে যেটা স্বপ্ন ছিল, দিনের আলোয় ভাবতে বসে দেখলাম সেটা সত্য। ভীষণ, কঠোর সত্য।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে অসাড়ভাবে পড়ে রইল।

সে বলে গেল, আজ আমরা নিজেদের নিয়েই মত্ত। এই বিশ্বের অস্তিত্ব, জগতের কোলাহল ভুলে স্বপ্নেই বিভোর হয়ে আছি। চিরদিন কি এমনি কাটবে?

এবার বুঝলাম তার মনের ভাব; বললাম, নিশ্চয়। যদি আমাদের ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে।

সে বললে, না। স্বপ্ন চিরস্থায়ী হয় না। নেশার ঘোর একদিন কাটবেই। একদিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখবে, আমি শুধু এক নারী। মনে আসবে অবসাদ, ক্লান্তি, ব্যথা। আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে বাইরের জালে। নিজেকে ভুলিয়ে রাখবে সেই কোলাহলের ভিতর পা বাড়িয়ে দিয়ে। এ দিন আসবেই। আর তখন আমি থাকব পড়ে ঘরের কোণে। আমি যে আমার অস্তিত্বও হারিয়ে ফেলেছি তোমার প্রেমে। আমি যে আজ রিক্ত, সর্ব্বহারা। তখন আমার নারীত্ব ছাড়া এমন কিছুই থাকবে না যা দিয়ে তোমায় ধরে রাখতে পারি। আর তার লজ্জা…

সে থামল। কি ভেবে সে শিউরে উঠল। আমি বলবার কিছুই খুঁজে পেলাম না। শুধু তার হাতখানি ধরে বসে রইলাম। তারপর সে বলে গেল, আজকের-তুমি আর সেদিনকার-তুমি পাশাপাশি রেখে দেখব কেমন করে!

তার চোখ জলে ভরে এল। আমি তাকে বুকের কাছে টেনে নিলাম। সান্ত্বনা দেবার কথা জুটল না।

খানিক পরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। বললে, আজ তোমায় পেয়ে ছাড়তে পারি, নিয়ে হারাতে পারব না।

দুজনায় ফেরত এলাম। বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে সে আমার হাতখানি ধরে। মনে হ'ল যেন একটু হাসলে। বুঝলাম, এই হাসি সম্বল নিয়ে দিন কাটাতে হবে।

সমস্ত রাত ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেলাম না। নিজের সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠল। পরদিন চলে এলাম এখানে। এসেই শুনলাম তোমাদের কথা। মনে হ'ল, জন্মজন্মান্তর ধরে আমরা যেন ব্যর্থতার অভিশাপ নিয়েই আসছি। সুখের উপর যেন আমাদের জন্মগত আক্রোশ। দুঃখ ডেকে এনে ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে জীবনকে কোন রকমে অভিশপ্ত করতে পারাই বুঝি এক চরম সার্থকতা।

একদিন মহিম আমায় একখানি বই পড়তে দেয়। তার মধ্যে দেখি রেণুর একখানি চিঠি। অনেক কিছু টের পেলাম তাতে। বুকে আগুন জ্বলে উঠল। ভাবলাম, এই ত কাজ, দেখি যদি এদের মিলন ঘটাতে পারি। খোঁজ নিলাম, বছর দুই আগে রেণুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ওঠে। আমিই না করেছিলাম। আরও জানলাম, রেণুর দেবতুল্য পিতা তাঁর বংশমর্য্যাদার পায়ে মেয়ের সুখের বলিদান দিতে মোটেই কুণ্ঠিত নন। মহিমের সঙ্গে রেণুর বিয়ে অসম্ভব। হঠাৎ এক খেয়াল এল, রেণুকে সাতপাক ঘুরিয়ে এনে মহিমকে দিলে কেমন হয়। তোমরা দুজনেই যেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলে, এইটাই সবচেয়ে সহজ পথ। এ ছাড়া আর কোন উপায় ত নেই। ভাবতে মজাও লাগল। শুভস্য শীঘ্রং। তাঁদের রাজী করাতে মোটেই বেগ পেতে হ'ল না। এমন কি, বিয়ের জিদ্‌গুলোও বজায় রাখলেন। আজ নাও আমার পালা শেষ, তোমরা দুজনে আজই পালিয়ে গিয়ে এইবার আমায় ছুটী দাও। বেশ হবে, বিয়ের পরদিনই এ বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে।

অজিত হেসে উঠল।

রেণু আর মহিম তবুও চুপ ক'রে বসে রইল। অজিতের মনে হ'ল ভয়। সে বললে, তবে তোমরা কি করতে চাও?

মহিম বললে, কিছুই নয়। যখন বিয়ে করেছ, রেণু এখন তোমার স্ত্রী।

অজিত চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। পরে সে বলে, কেন, সমাজের বিদ্রূপের ভয়ে?

মহিম বলে, হ্যাঁ। আমি সহ্য করতে পারি, রেণু পারবে না। কি রেণু? অজিত কাতর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, ভালবাসার দোহাই দিয়ে এটুকুও পারবে না?

রেণু নির্ব্বিকার হয়ে শুনছিল।

এবার সে বলে, অগ্নিসাক্ষ্য ক'রে যখন বিয়ে হয়েছে…

অজিত দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল; বললে, তখন ভেবে দেখেছিলে ভালবেসেছ একজনকে যার স্পর্শে তোমার শিরায় শিরায় কাঁপন লাগে, মন অবশ হয়ে যায় আর উপহার দিচ্ছ এক প্রাণহীন দেহ আর একজনকে? ভেবে দেখেছিলে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, বাপ-মার মন রাখতে গিয়ে নিজেকেও ঠকিয়েছ, আমার সঙ্গে কি নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা করতে যাচ্ছ?

ক্লান্তি অবসাদ অজিতকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। সে নিজের মনেই বলে গেল, ভেবেছিলাম মানুষই বড়। সমাজ ও ধর্ম্ম শুধু এক আদর্শ, তার সার্থকতার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। যুগে যুগে যেমন আদর্শ বদলায়, সমাজ ও ধর্ম্মকেও তেমনভাবে গড়ে নিতে হবে। আজ দেখছি এসব নিছক কল্পনা, পাগলের স্বপ্ন, সব ভুল। মানুষ পঙ্গু, সমাজের কলে নিষ্পেষিত, ধর্ম্মের আদর্শ হারিয়ে তার আচারগুলো আঁকড়ে ধরে আছে। ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে গুমরে মরবে, তবুও বিদ্রোহ করবে না। তার শক্তি নেই, তেজ নেই, সাহস নেই। আজ দেখছি প্রেমের নামে প্রবঞ্চনা, ত্যাগের নামে দেহবিক্রয়।

আবেগের উত্তেজনায় সে চুপ ক'রে উঠে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল।

গোধূলির আলো তখনও গাছের আগায় লেগে আছে।

দার্জ্জিলিং-এর স্বপ্নময় দিনগুলোর কথা তার মনে হ'ল। আর চোখের সামনে এল এক বিভীষিকাময় জীবন, রেণু আর মহিমকে ঘিরে।

তার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। সিগারেট ধরিয়ে দু টান দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। তারপর সে হেসে উঠল, বিজয়ীবীর !

কাছে এসে সে বললে, রেণু, সমাজ ও ধর্ম্মকে ঠকাতে পারি। নিজেকে ঠকিয়ে তোমায় প্রেয়সী বলে মেনে নিতে পারব না। আজ বুঝেছি আমার ভুল। আজ আমিই তোমাদের মিলনের অন্তরায় হয়েছি। নির্ব্বোধের মতন যে গ্রন্থি বেঁধেছি, আমাকেই তা খুলতে হবে। এখন এস আমরা তিন জনেই বন্ধুভাবে থাকি। এ ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখছি না। কেমন ?

রেণু ঘাড় নাড়লে।

মহিম বলে, সে-ই ভাল।

অজিত বলে, তাহ'লে মহিম, তুমি এখানেই খাবে। আর আমাদের অপেক্ষা ক'রে বসিয়ে রেখোনা।

মহিম বলে, আচ্ছা।

সভা ভঙ্গ হ'ল।

রেণু উঠে গেল নিজের ঘরে।

মহিম চলে গেল।

অজিতও কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

রাত প্রায় নটা। টেলিফোন এল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে, অজিত বাস্ চাপা পড়েছে।

শুনে রেণু পাথর হয়ে যায়। মহিম এসে পড়ে। দুজনায় যায় হাসপাতাল।

নার্স দেখিয়ে দেয় ষ্ট্রেচারের ওপর সাদা চাদর ঢাকা একটি দেহ। মহিম মুখের কাপড় তুলে দেয়।

অজিত তখনও হাসছে, বিজয়ী বীর !

রেণুর সংজ্ঞাহীন দেহ তুলে মহিম বাইরে নিয়ে যায়।

বিবাগী

শ্রীমতী কমলারাণী মিত্র

যদি দিনের আলো ফুরিয়ে আসে
বিজন পথে,
যদি একলা চলা ফুরায় না তোর তবু ;
যদি নাই দেখা যায় তারার জ্যোতি
গহন হ'তে
আশার মতো ক্ষণিক-প্রভা ঝলক্-বিভা কভু ;—

ক্লান্ত-চরণ নাই যদি আর চলে,
শ্রান্ত হ'য়ে শুধুই খালি টলে
তবু যেন ফিরিস্ নে তুই পিছে,-

জানিস্ তো হায় সবই গেছে,
আর ফেরা যে মিছে !

যা ক'রে হোক্ আগেই চলিস্ শুধু
থাক্না ভীষণ ধুসর মরু ধূ-ধূ ;
থাক্না মরণ পরম-পরিশেষে,
বিবাগী তুই চলিস্ একা উধাও নিরুদ্দেশে॥



এলার্ম সিগন্যাল

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পূজার ছুটি আসন্ন।

হাওড়ার জনাকীর্ণ ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মের দুইপার্শ্বে দুইখানি যাত্রী বোঝাই ট্রেনের ইঞ্জিন গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে।

বামপার্শ্বে, রাঁচী এক্সপ্রেসের ছাড়িবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শেষ ঘণ্টাও বাজিয়া গিয়াছে, গার্ড সাহেবের বাঁশী বাজিয়া বাজিয়া এইমাত্র নিঃশব্দ হইয়াছে, চলিবার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া ইঞ্জিন নড়ি-নড়ি করিতেছে, অথচ নড়ে নাই—এমন সময়ে ইংরেজী পোষাক পরিহিত একটি প্রিয়দর্শন বাঙ্গালী যুবক কুলির মাথায় বড় বড় বাক্স বিছানা ও চাপরাসীর হাতে টুপি-ছড়ি-ছাতি ইত্যাদি সমেত একখানা প্রথম শ্রেণীর ছোট কামরার দ্বার ঠেলিয়া হুড়মুড় শব্দে উঠিয়া পড়িল। বেয়ারাকে যে-কোন গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া দ্রব্যাদি নামাইয়া লইল। উঠিবার আগে, ষ্টেশনের যে কুলীটা গাড়ী হইতে ঝুলন্ত রিজার্ভ বোর্ড খুলিয়া লইতেছিল, যুবা এক ঝলকে তৎপ্রতিও লক্ষ্য করিয়া লইয়াছিল। গাড়ীর ভিতরে একটি বাঙ্গালী-যুবতী বসিয়া যুগপৎ সিগারেটের ধূমপান এবং দ্বারের হাতল ধরিয়া দণ্ডায়মান দুইটি যুবকের সহিত রহস্যালাপ করিতেছিলেন। আকস্মিক ঝড়ে-ওড়া ধূলাবালির চোটে চোখ যেমন ঝাপসা হইয়া যায়, এই যুবকের আগমনে ইহাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া গেল। যুবতীর হাত হইতে সিগারেটখণ্ড কোথায় অদৃশ্য হইল; যুবাপুরুষদের চোখে মুখে হাতে জামার আস্তিনে বীরত্বব্যঞ্জক ভাব পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। আগন্তুক ত এ কাণ্ড লক্ষ্য করিতে অবসর পান নাই, কারণ তাহাকে অগণিত মোট ঘাট নামানো গুছানোতে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। যুবকদ্বয় তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, কামরাস্থিত যুবতী প্রতিবাদ স্বরূপ দাঁড়াইয়া উঠিলেন—গাড়ীও বোধ হয় আগন্তুকের আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ একটা বীভৎস চীৎকার ও উৎকট ঝাঁকানি দিয়া চলিতে সুরু করিয়া দিল।

যুবক দুইটি চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল, এর ফল আপনাকে পেতে হবে। 'লেডী ট্রাভলিং এলোন্', আপনি তাতে উঠেছেন বারণ সত্ত্বেও।

যুবতীকে তাহারা বলিল, খড়্গাপুরে ব্যবস্থা হ'বে। চীৎকার করিয়া পরামর্শ দিল, এলার্ম সিগন্যাল আছে।

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া এলার্ম সিগন্যালের হাতলের দিকে লক্ষ্য করিয়া একখানা পাখাকে নিজের দিকে ঘুরাইয়া লইয়া, দ্বার-রিজার্ভ টিকিট দু'খানি দেখিয়া আস্তে আস্তে কোটটা খুলিল; কোটের পকেট হইতে সিগারেট-কেস্, দেশলাই, টিকিট, নোটকেস্, নোটবুক, মনিব্যাগ প্রভৃতি বাহির করিয়া বেঞ্চটার উপরে রাখিয়া জামাটাকে একটা হুকে টাঙ্গাইয়া দিল; নেকটাই খুলিয়া ফেলিল, কলার খুলিয়া তাহার সিক্ততা পরীক্ষা করিয়া উপরের একটা মাচায় রাখিয়া দিল; প্যাণ্টের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে যাইবে—দেখিল, ভদ্র মহিলাটি অপলক ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তখনও তাহার পানে চাহিয়া আছেন।

মনান্তরালে অথবা রুমালান্তরালে হাসিটা গোপন করিয়া মৃদু, ভদ্র, শান্ত, সংযতকণ্ঠে কহিল, আপনি বসুন না!

কণ্ঠস্বরের নিঃসঙ্কোচ-ভদ্রতায় যুবতীর মন বোধ করি কিছু নরম হইল; বলিল, বসছি; কিন্তু আপনি ভীষণ ভুল করেছেন।

যুবক হাসিয়া বলিল, মাপ করুন, ভুল কিছুমাত্র না। রিজার্ভ টিকিটে আমার নাম অভ্রান্ত অক্ষরে লেখা।

যুবতী সেইদিকে অগ্রসর হইয়া টিকিটখানির দিকে তর্জ্জনী সঞ্চালন করিয়া কহিল, মিসেস্ বি, সিনহা—সেটা দেখেছেন কি?

যুবক চমকিত হইয়া টিকিটের উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, তাই ত বটে, ছাপা মিষ্টারের গায়ে হাতের লেখায় একটি 'এস্' বসান আছে। মুহূর্ত্তের জন্য যুবক যেন বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু ভয় বা বিহ্বলতা মুহূর্ত্তাধিক কালের বেশী স্থায়ী হইল না; হাসিতে হাসিতে বলিল, ভুল যদি কেউ ক'রে থাকে, রেলের বিদ্বানরাই করেছে, তার জন্যে আমি দায়ীও নই, দোষীও নই। বলিয়া বেঞ্চখানার উপরে কোণ ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া পুনশ্চ কহিল—আপনি বসুন; ভয়ের কোন কারণ নেই। নেক্সট্ ষ্টপ্ খড়্গাপুর, নেমে অন্য গাড়ীতে যাওয়া যাবে। রাত ন'টা পর্য্যন্ত বার্থ রিজার্ভের কোন দাম নেই, তা জানেন ত। এখন মোটে সাতটা বিয়াল্লিশ।

তাহার ইতস্ততবিক্ষিপ্ত নোট বুক, মনি ব্যাগ ইত্যাদি 'তৈজসপত্র'গুলি প্যাণ্টের পকেটে রাখিতে রাখিতে হাসিয়া আবার বলিল—বসুন বসুন, কোন ভয় নেই। আর, 'আফ্‌টার অল্, আই এম্ এ বেঙ্গলি জেণ্টলম্যান।'

একটু থামিয়া আবার হাসিয়া বলিল, ভয়ের সম্ভাবনা দেখলে এলার্ম সিগন্যাল ত হাতের কাছেই রইল; তিন সেকেণ্ডে গাড়ী 'ষ্ট্যাণ্ড স্টিল' হয়ে যাবে—বসুন।

একখানি নীচে, একখানি উপরে বাঙ্ক বা বার্থ। বসিতে হইলে একই বার্থে উভয়কে বসিতে হয়। একটা দ্বারে ঠেসান দিয়া, যুবতী দাঁড়াইয়া রহিল।

তৈজসপত্র গোছান হইয়া গিয়াছিল; সিগারেট কেস্ হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখের উপর বারকত ঠুকিয়া দাঁতে চাপিয়া অগ্নিসংযোগ করতঃ যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া যুবক কহিল—আপনি যদি নিতান্তই না বসেন, তাহ'লে আমাকে এখনই উপরের বাঙ্কে উঠে হনুমানটি হয়ে ব'সে পা ঝুলিয়ে কদলী ভক্ষণ করতে হয়। তাই চান, বলুন, উঠি?

—না থাক, বসুন, বলিয়া যুবতী গিয়া ওদিকের কোণে বসিয়া জানালার বাহিরে মুখ রাখিলেন।

—'থ্যাঙ্ক ইউ!'

পরমুহূর্ত্তে স্বর্ণমণ্ডিত সিগারেটের কেসটি খুলিয়া 'ইউ স্মোক্' ? বলিয়া অগ্রসর করিয়া ধরিল।

—'নো, থ্যাঙ্কস্।'

—'বাট্, ইউ স্মোক্।'

ইহা লইয়া জেদ বা পীড়াপীড়ি করিতে প্রবৃত্তি হয় না;' হাজার শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত সভ্য হৌক, বাঙ্গালীর মেয়ে ত! বাঙ্গালীর মেয়ের মুখে সিগারেট, দৃশ্যটাই বিসদৃশ, বীভৎস—আবার তাহার জন্য সাধ্যসাধনা, প্রবৃত্তি না হইবারই কথা। তবু যে এক-আধ বার অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার কারণ,এতটা পথ,প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় এক সঙ্গে যাইতে হইবে, অমন সুন্দর মুখটা গোমড়া হইয়া থাকে, ইহা কে-ই বা চায়! প্রসন্নতা কামনাতেই সিগারেট উৎসর্গ করিতে গিয়াছিল।

মেয়েটি তাহার মুখখানাকে এমন ভাবে জানালার বাহিরে রাখিয়াছে যে, ভিতর হইতে তাহার কোন অংশই দেখা যায় না; মাথার পিছন দিকে এলো খোঁপাটার কিয়দংশই শুধু দেখা যাইতেছে। বিকাশ এতক্ষণে নারীটির বেশভূষাগুলি বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। হ্যাঁ—মডার্ণ বটে! পায়ে যে জুতা, তাহার নীচে একটা উঁচা হিল্ ও একখণ্ড সোল্ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, উপরে চামড়ার সম্পর্ক বড় কম। তাহারই ফাঁকে ম্যানিকিওর-করা নখ-গোলাবগুলি বিদ্যুতালোকে শোভা বিকীর্ণ করিতেছে; পরণের শাড়ীখানি সূক্ষ্মতায় বোধ হয় অপরাজেয়; ভিতরের সায়া বা সেমিজে আঁকা ফুলের পাপড়িগুলির রেখা পর্য্যন্ত শাড়ী ভেদ করিয়া শোভান্বিত। যুবতী সুন্দরী। তাহার সৌন্দর্য্যের উপর কিছুমাত্র কারিগরী করিবার প্রয়োজন হয় না; তবুও মানুষ কেরামতি করিতে কার্পণ্য করে না, ইনিও করেন নাই তবে খোদ-কারীটুকুও নিন্দনীয় নয়। মুখশ্রী অনুপম, দেহলতাটি নাতিশীর্ণা বলা যায়। অধরোষ্ঠের রক্তরাগ বিকাশের মনে ছিল। চেহারাটি প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়ে মিলিয়া এমন করিয়া রাখিয়াছে যে দেখিলেই মনে আঁকিয়া যায়; দেখিতে ভাল লাগে এবং আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।

বিকাশ দেখিতেছিল আর মনে মনে রঙ্গভরে ভাবিতেছিল, চোখে কয়লা-টয়লা কিছু পড়ে ত বেশ হয়, রাগ ক'রে বাইরে চেয়ে থাকার মজা বোঝেন!

কিন্তু কয়লা-টয়লা কিছুই পড়িল না, কাজেই একের মজা বোঝা এবং অন্যের মজা দেখারও কোন সম্ভাবনাই ঘটিল না; গাড়ী যথানিয়মে গর্জ্জন করিয়া, হাঁপাইয়া, ফোঁপাইয়া, নাচাইয়া, দোলাইয়া ছুটিতে লাগিল।

ছুটিতে ছুটিতে থামিয়া পড়িল! একটা ষ্টেশন বটে, খড়্গপুর নয়, ছোট একটা ষ্টেশন, পরবর্ত্তী ষ্টেশন-প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিকাশ মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিল—ক্ষীণালোকে সম্ভব হইল না; বহুদূরে সিগন্যালের দিকে চাহিতে তাহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রক্তচক্ষু দেখা গেল। মেয়েটি যেদিকে বসিয়াছিল, প্ল্যাটফর্ম সেই দিকে। বিকাশ উঠিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল, যুবতী তাহার পানে চাহিতেই বলিল, 'দেখি, যদি কোথাও জায়গা পাই—'

বলিয়া চলিয়া গেল এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলা দেখিয়া মিনিট দুই-তিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—প্যাক্‌ড্—টু—সাফোকেসনও বলা যায়।

গাড়ীতে উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসনের পানে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসার ছলে কহিল—কি করা যায় বলুন ত?

যুবতী কোন কথাই বলিল না।

বিকাশ বলিতে লাগিল—ইণ্টার থার্ড কম্পার্টমেণ্টগুলোও দেখলুম, প্রায় ক্যাট্‌ল ‘ওয়াগন’, নইলে আপনার অসুবিধে বুঝে সেইখেনেই না হয় যেতুম ; কিন্তু অসম্ভব। তার ওপর, রাত্রে ট্রেনে ঘুমুতে না পেলে আমার ভারী কষ্ট হয়।

গম্ভীর কণ্ঠে এবার যুবতী কথা কহিল, বলিল, সে রোগ অনেকেরই আছে।

—অর্থাৎ, আপনারও ঐ রোগ আছে! তাহ’লে বোঝা যাচ্ছে, আজ দু’জনের বরাতেই দুঃখ—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এই সময় বিকাশের বেয়ারা উঁকি মারিতে, বিকাশ তাহাকে ডাকিল ; বলিল, খানা ঠিক করো।

বেহারা ছোট একটা ব্যাগ বাহির করিল ; ভাঁজ-করা একখানা টেবিল কোথায় ছিল, ধাঁ করিয়া পাতিয়া ফেলিল ; ব্যাগ খুলিয়া কাঁটা চামচ প্লেট ডিস্ সাজাইতে লাগিয়া গেল।

বিকাশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, বরাতে যদি দুঃখই থাকে কেউ খণ্ডাতে পারবে না, সে ভেবে কোন লাভ নেই। আপাততঃ খাবার তৈরী, যদি হাসি মুখে কিছু গ্রহণ করেন, আমি খুশী হই।

—আমি! যুবতী হাড়ে জ্বলিয়া যাইতেছিল।

—দোষ কি! গাড়ীতে দু’টি লোক—একজন খাবে আর একজন ব’সে থাকবে, বড় বিশ্রী দেখায়।

—ধন্যবাদ ; কিন্তু আমি খেয়ে এসেছি।

—আমি তা অস্বীকার না করেও বলতে পারি এক-আধটুকরো মুখে দেবেন মাত্র। শুধু বিশ্রী ভাবটা কাটাবার জন্যে, অন্ততঃ!

—কিন্তু—

বিকাশ বেয়ারাকে নির্দ্দেশ দিল, দু’জনের মত খানা লাগাও।

আবার—কিন্তু—

—কিন্তুটা ছাড়া যায় কি-না তাই দেখুন। আমি কথা দিচ্ছি, খড়্গপুরে ট্রেন থামলে যেখানে জায়গা পাব, গিয়ে উঠব ; অবশ্য ফার্ষ্ট বা সেকেণ্ড ক্লাস ছাড়া নয়। নিতান্তই যদি জায়গা না জোটে, ঐ বাঙ্কের ওপরে চারখানা কম্বল চাপা দিয়ে এমন পড়ে থাকব যে আপনারও মনে হবে, আমি নেই, আপনি একেবারে একলা। আমি কথা দিচ্ছি, আমার নিঃশ্বাসের শব্দ পান যদি, আপনি দেবেন ঐ এলার্ম সিগন্যালের হাতল টেনে। তার জন্যে যদি পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আপনার হয়, আমি দোব সে টাকা। বলেন ত, অগ্রিমও দিয়ে রাখতে পারি।

যুবতী কোন কথা কহিল না ; তবে নারী-চরিত্র নখদর্পণে দেখিবার শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই সময়ে উপস্থিত থাকিলে নারীর মুখ দেখিয়াই বলিতে পারিতেন, মেঘাবসান হইয়াছে, আলোক সুপ্রকাশে বিলম্ব নাই। কুণ্ডে অগ্নি নাই—নির্ব্বাণপ্রাপ্ত!

বেয়ারা ভাঁজকরা টেবিলের ওদিকটায় গোটা তিনেক সুটকেস্ সাজাইয়া একখানি অতিরিক্ত আসন তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছে ; টেবিলের উপর ক্ষুদ্র ফুলদানে এক গুচ্ছ নীলাভ নার্সিসস্, প্লেটে রুটি ও মৎস্য, গ্লাসে বরফশীতল পানীয়। বিকাশ বলিল, আপনি এইখানে আসুন, আমি ঐদিকে যাই।

—কিন্তু—

বিকাশ হাসিয়া বলিল, আপনার ‘কিন্তু’টা দেখছি নিতান্ত অবাধ্য, ঐ ছুরি-কাঁটা দিয়ে ওটাকে কুচি কুচি ক’রে কেটে ফেলুন ত দেখি!

মেঘ সত্যই কাটিয়াছিল, আলোক হাসির ঝলক হইয়া প্রকাশ পাইল। বিকাশ পুলকিতকণ্ঠে কহিল, বসে পড়ুন ; অতি কষ্টে সব গরম রাখা গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

যুবতী সলাজ হাসিমুখে বলিল—কিন্তু আমি যে—

—আবার সেই কিন্তু! বলছি ওটাকে কুচি কুচি ক’রে কেটে ফেলুন ; বলেন ত একটু সস্-ও তা’তে ঢেলে দিই।—বলিয়া সে, নিজের প্লেটে রক্ষিত ভর্জ্জিত মৎস্যখণ্ডের উপর খানিকটা সস্ ঢালিয়া লইল।

যুবতী টেবিলের সামনে বসিতে বসিতে বলিল, বাড়ী থেকে বেরুবার আগেই খেয়ে—

—সে ত তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে!

—এর মধ্যে তিন ঘণ্টা? দেড় ঘণ্টাও হয়েছে কি-না সন্দেহ। আপনার ঘড়ি দৌড়চ্ছে বলুন।

—আনন্দের সময় বায়ুভরে উড়ে যায়, তা জানেন ত!

মেয়েটির কপোল দুটিতে ক্ষণেকের জন্য লাজ-রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল।

—নিন্। নিন্!

আর বাক্যব্যয় না করিয়া উভয়েই কাঁটা ছুরি তুলিয়া লইল।

দ্বিতীয় স্তরে বেয়ারা ইংরেজী পোলাও বাহির করিতেই যুবতী বলিল, আর আমি কিছুই খাব না কিন্তু।

—কিন্তু থাকতে ছাড়াছাড়ি নেই।

– কিন্তু, আচ্ছা কিন্তু থাক্। পারব কেন?

—বেশ, পোলাও না খান্ থাক্, হিঙ্গু, মেম্ সাবকো কারি দেও।

তাহাই হইল।

গাড়ী এতক্ষণে হুইসিল্ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বিকাশ মণিবন্ধে বদ্ধ ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, প্রায় চল্লিশ মিনিট লেট্ ত এইখানেই হ'ল।

—রাঁচী পৌছোয় কখন্? দশটা?

বিকাশ বলিল, সাতটা বাইশে—মুরী, রাঁচী নটা বিশ। তার সঙ্গে যোগ দিন এই চল্লিশ; দশটা; অবশ্য আর লেট্ যদি পথে না করে।

বেয়ারা পুডিং বাহির করিল। যুবতী হাত নাড়িয়া বারণ করিতে বিকাশ বলিল, ঐটি মাপ করবেন, মিষ্টিমুখ না দেখতে পেলে আমার ভারী কষ্ট হয়। তার ওপর সুন্দর মুখ লবণাক্ত বা ঝালাক্ত আমি আদৌ বরদাস্ত করতে পারিনে।

স্বীয় সৌন্দর্য্যের কণামাত্র প্রশংসাতেও খুশীতে মন ভরিয়া ওঠে না এমন নারী বিশ্বসংসারে আছে বলিয়া মনে করা কঠিন। এই প্রশংসাও যে সহযাত্রিনী প্রসন্নমনে গ্রহণ করিয়াছে তাহা বুঝিতে বিকাশের কষ্ট হইল না। বেয়ারাকে আরও খানিকটা পুডিং ওপাশের প্লেটে দিতে বলিল। শুনিয়া ভদ্রমহিলা এক গাল হাসিয়া কহিল, আপনি আমায় রাক্ষস পেলেন না-কি বলুন ত?

—না! তা হ'লে আমিই এলার্ম সিগন্যাল টানতুম; অন্ততঃ টানবার জন্যে তৈরী হয়ে হাত বাড়িয়ে বসে থাকতুম!

হাসির কথা; উভয়েই হাসিল এবং যে একটুখানি খোঁচা ছিল, তাহাও একান্তই নির্দ্দোষ বোধে নারীও অপরাধ গ্রহণ করিল না; বরং খুব সহজ ও স্নিগ্ধ স্বরেই বলিল, এলার্ম সিগন্যালে হাত দিয়ে আমিও ব'সে নেই—জরিমানার টাকা আমার লাগবে না জেনেও।

বেয়ারা টেবিল সাফ ও ভাঁজ করিয়া ফেলিল, গাড়ীও খড়্গপুরে থামিল। ষ্টেশন আলোকে আলোক; লোকে লোকারণ্য; পণ্যবিক্রেতাদের কলরবে সরগরম। বেয়ারা নামিবার জন্য দরজা খুলিয়াছে, লাল মুখ, কাল মুখ, দাড়ী-গোঁপভরা মুখ, চাঁচাছোলা মুখ, রঙবেরঙের পোষাকধারী অনেকগুলি লোক হন্তদন্ত হইয়া এই কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারা যে রেলকর্ম্মচারী তাহা বুঝা যায়। লালমুখ লোকটার হাতে একখানা টেলিগ্রাম। লোকটি কামরার মধ্যে ঢুকিয়া রিজার্ভ-টিকিট পড়িল—অণিমা সেন; এদিকে আসিয়া অন্যখানা পড়িল—মিসেস্ বি, সিন্‌হা। বিকাশকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

—মিঃ বি, সিন্‌হা।

লোকটি একবার রিজার্ভ লেবেলের পানে, একবার বিকাশের ও একবার নারীটির পানে দেখিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু আপনার নাম না হইয়া মিসেস্ সিনহা হইল কিরূপে?

—আমি জানি না; তোমাদের হাওড়ার কর্ম্মপটু কর্ম্ম-চারীরা জানিলেও জানিতে পারে।

—আপনার কাছে রিজার্ভ-টিকিট আছে?

—বিশ্বাস, আছে।—বিকাশ নোট্ কেস্ খুলিয়া টিকিটখানি বাহির করিয়া দিল।

—ইহা ত ঠিকই আছে। সম্ভবতঃ লেবেল-লেখকই ভুল করিয়াছে। সে যাই হোক্, আপনাকে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া আমরা দুঃখিত। আমরা একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছি, এই দেখুন।

বিকাশ টেলিগ্রামটা লইয়া পড়িয়া তাহার সহযাত্রিনীর হাতে দিল। পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখখানি আস্তে আস্তে মলিন হইয়া উঠিল।

লালমুখ বলিল, এক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য, তাহা আমরা আপনার বিবেচনার উপরই ছাড়িয়া দিতে চাই।

বিকাশ বলিল, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য একটু স্থান খুঁজিয়া দাও, আমি সানন্দে নামিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।

লালমুখ একজন সহকর্ম্মীকে ইঙ্গিত করিতেই সে নামিয়া গেল। লালমুখ বলিল, টেলিগ্রাম পাইয়া ব্যাপার যেরূপ গুরুতর মনে করা গিয়াছিল, আসলে তাহা ততখানি গুরুতর নয় জানিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে হয়। আপনিই বলুন-না ভাষাটা কি রকম—

A Lady travelling First Class alone, one man jumped into it last moment. Seems an intruder.

Friend of the Lady

—বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে হয় না কি ?

বিকাশ উত্তর দিবার পূর্ব্বে সহযাত্রিনীর পানে দৃষ্টি পড়িতেই, যেন কিছু হয় নাই এই ভাব টানিয়া লইয়া বলিল, আমায় শেষ মুহূর্ত্তে উঠ্‌তে দেখে তাঁদের মনে সন্দেহ হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

যে লোক স্থানের সন্ধান করিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া হতাশাব্যঞ্জকভাবে ঘাড় ও হাত নাড়িল।

—তবে ?

বিকাশ বলিল, আপনিই বলুন ?

—ঐ ভদ্রনারীর কি এইভাবে যাইতে আপত্তি আছে ?

বিকাশ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, থাকাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

লালমুখ বলিল, তাই ত! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে জোগাইল না। তাহার সহকর্ম্মীরাও তাহাতেই সায় দিল; তাহাদের হাবে ভাবে এবং চোখেও ঐ কথা, তাই ত!

বিকাশ বলিল, আমি একটা উপায় ভাবিয়া পাইয়াছি। তোমাদের এই গাড়ীতে মহিলাদের প্রথম শ্রেণীর কামরা আছে কি ?

—নিশ্চয়।

—তাহাতে স্থান আছে ?

একজন বলিল, দেখিয়া আসিব ?

—ধন্যবাদ।

সেই লোকটি চলিয়া গেল।

বিকাশ বলিল, যদি তাহাতে স্থান থাকে, ভদ্রমহিলার অনেক অসুবিধা ও দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইবে বটে, তবু সারা রাত্রির সুবিধার কথা ভাবিয়া তিনি তাহাতে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইবেন বলিয়াই মনে হয়।

লাল-কাল-জরদা সকলেই নারীটির পানে ফিরিল, সে নির্ব্বিকারচিত্তে প্ল্যাটফর্ম্মের লোক চলাচল দেখিতেছিল, এদিকের কিছুই লক্ষ্য করিল না।

—হ্যাঁ, যথেষ্ট স্থান আছে।—বাহির হইতে রেলকর্ম্মচারী এই কথা বলিল।

লালমুখ কহিল, আমি লোকজন আনাইয়া উঁহার জিনিষপত্র পাঠাইয়া দিতেছি, উঁহাকে কোন কষ্ট সহিতে হইবে না।

একজন কর্ম্মচারী কুলী ডাকিতে গেল। লালমুখ যুবতীকে বিনীতভাবে বলিল, আপনার জিনিষগুলি যদি দেখাইয়া দেন—নারী এদিকে চাহে না, শুনেও না।

বিকাশ তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য কাছে গিয়া ইংরেজীতেই বলিল, পাশেই একটা মহিলাদের ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায়—

—আমি বেশ স্বচ্ছন্দেই আছি।

তাই ত! একথাটা ত আগে মনেই হয় নাই! অনর্থক দৌড়াদৌড়ি, হাঁটাহাঁটি, ছুটাছুটি!

লালমুখ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; বলিল, তা হ'লে আমরা যেতে পারি ?

—হাঁ, ধন্যবাদ।

—গুড্ নাইট!

বিকাশ দরজার গুপ্ত-কলটি বন্ধ করিয়া দিয়া রিজার্ভ লেবেলটি পাঠ করিয়া বলিল, অণিমা দেবী, আপনি সত্য বলছেন, আপনার কোন অসুবিধা হবে না ?

—আমি ত মনে করি, না।

—তাহ'লেই হ'ল। আলোটা জ্বালাই থাক্ বুঝলেন!

—সে দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে বেয়ারা উপরের বাঙ্কে বিকাশের বিছানা পাতিয়া ফেলিয়াছিল। বিকাশ তাহা দেখিয়া বলিল, এই যে উঠ্‌ব, সকাল সাতটার আগে সাড়াই পাবেন না।

অণিমা হাসিয়া বলিল, কুম্ভকর্ণ বলুন!

বিকাশ বলিল, নইলে যে ঐ—

বলিয়া সে এলার্ম সিগন্যাল দেখাইয়া দিল।

যুবতী উঠিয়া খটাস্ করিয়া আলোর সুইচ উঠাইয়া দিতে, বিকাশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সবেমাত্র পূর্ব্বাকাশ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিতেছে, আপাদ-মস্তক কম্বলাবৃত বিকাশ সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি কতই ফুটিল।"

অনিমা জবাব দিল, আপনার কবিত্ব অসাধারণ, 'জিনিয়াস্' বলা যায়। গাড়ীর অশ্রান্ত মাথা-ছেঁচে-ফেলা শব্দের মধ্যেও আপনি পাখীর কলরব শুনতে পাচ্ছেন। শুধু কি তাই! হতচ্ছাড়া এই পাহাড় পর্ব্বতের মাঝেও কবি কানন, কুসুম-কলি দেখছেন! ..বলিহারি!

বিকাশ আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"উঠ শিশু, মুখ ধোও পর নিজ বেশ
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।"

অনিমা বলিল, 'পাঠ' বলতে কি বুঝতে হ'বে?

বিকাশ কহিল, এই বিছানা বাঁধা, শেভ করা, চায়ের জন্যে ঘন ঘন হাইতোলা, ইত্যাদি।

বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়া পুনশ্চ কহিল, তা হ'লে সকাল হ'ল ব'লে এখন নির্ভয়ে নামতে পারি, কি বলেন? এলার্ম সিগন্যালের ভয় নেই ত?

অনিমা কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল, ভয়ে কেঁচোটি হয়ে সারা রাত খুব ঘুমিয়েছেন বোধ করি!

—উঁহু, আদৌ ঘুমুইনি। ঘুমুলেই আমার নাক ডাকে; যারা শুনেছে তারা বলে, নাকটা বেশ ভদ্রভাবে ডাকে না। পাছে সেই অভদ্র নাক ডাকার শব্দে এলার্ম সিগন্যালে টান পড়ে, চোখ বুজে ক্রমাগত নিদ্রাদেবীকে ঠেকিয়ে রাখতে রাখতেই রাত কেটে গেল।

—যান্ না মশাই! আমি যেন কিছু জানি নে। রাত্রে যখন বৃষ্টি এল, সাটারগুলো বন্ধ করতে উঠে দেখি, অকাতরে ভোঁস ভোঁস।

বিকাশ তড়াক্ করিয়া এক লাফে নীচে নামিয়া পড়িয়া সকৌতুক বিস্ময়ে কহিল—বলেন কি, ভোঁস ভোঁস! আর আপনি তাই সহ্য করলেন? আপনার সহিষ্ণুতার সীমা নেই দেখছি। লোকেও তাই বলে বটে, আমার ভোঁস ভোঁস শব্দটা নাকি বন্যবরাহের ডাকের মত! আপনার সাহস ত কম নয়! বুনো শুয়োরের ডাক ভেবে একটা কাণ্ড ক'রে ফেলেন নি, সেই ভাগ্য!

—কাণ্ড কিছু করি নি বটে, তবে বার দুই মিষ্টার সিন্‌হা, মিষ্টার সিন্‌হা ব'লে ডেকেছিলুম।

—সাড়া পান্ নি ত?

—না দিলে ও জিনিষটা পাওয়া যায় না।

বিকাশ গম্ভীরভাবে কহিল, তা বটে!

—ভয়ানক জলতৃষ্ণা পেয়েছিল, আপনার ফ্লাস্কটা খোলবার চেষ্টা করলুম—পারলুম না। সাধারণতঃ রাত্রে ট্রেনে যাবার সময় আমি ভেণ্ডারের কাছ থেকে এরেটেড ওয়াটার নিয়ে রাখি। কাল সেই সব হাঙ্গামার জন্যে ভুল হয়ে গেছল।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু, ভাল ক'রে ডাকলেন না কেন?

—আপনি যে জেগে ঘুমুচ্ছিলেন, জাগাকে জাগান যায় না।

—না, না, সত্যি নয়।

—কি জানি ম'শাই, ভাবলুম, এলার্ম সিগন্যালের আতঙ্কে—

বিকাশ হো হো হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; অনিমাও হাসিল; বলিল, সত্যি বড় কষ্ট গেছে রাত্রে! ট্রেনও কি ছাই থামে না কোথাও! একবার যদি বা থাম্‌ল, জলের সন্ধান করতে-না-করতে দিলে গাড়ী ছেড়ে।

বিকাশ থার্মোফ্লাস্কটাকে তুলিয়া লইয়া খুলিবার কৌশলটি দেখাইতে দেখাইতে বলিল, আমি হ'লে এটাকে আছড়ে খুলতুম।

অনিমা হাসিয়া বলিল, তাতে ফল এই হ'ত যে ওটা ভাঙ্গত এবং জল গাড়ীময় গড়াত, গলায় দেবার জন্যে একটি বিন্দুও থাকত না।

বিকাশ বেঞ্চের একধারে বসিয়া পড়িয়া হতাশভাবে কহিল, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে! তবে অন্যায়টা আমার নয়—আপনারই!

—আমার অন্যায়!

—নিশ্চয়। কেন আপনি ডাকলেন না জোরে? কেন দু'টো চিম্‌টি কাটলেন না? তা না পারুন, চুলের মুঠি ধরে খানিক ঝাঁকানি দিলেন না কেন?

—হয়েছে মশাই, খুব হয়েছে! আমি চুল ধরে টানি, আর আপনি উঠে ব'সে এলার্ম সিগন্যাল্ টেনে দিন আর কি!

এই স্বচ্ছ সরল হাসিগল্পের মধ্যে প্রভাতের হাসি সুস্পষ্ট

হইয়া উঠিল ; বিকাশ বলিল, গতানুশোচনায় লাভ নেই ; মুখ হাত ধুয়ে নিন ; ট্রেন থামলেই চা আসবে আশা করছি।

—সে আমার কখোন্ হয়ে গেছে।

—হোয়াট্ এ গুড গার্ল ! তবে আমি চট্ ক'রে সেরে আসি। বলিয়া তোয়ালে, কামাইবার বাক্স, প্রসাধন সামগ্রী লইয়া সে বাথরুমে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। ইত্যবসরে অণিমা তাহার হাত-ব্যাগটি খুলিয়া কেশ বেশ বাস একবার ভাল-করিয়া ঠিক করিয়া লইল।

একটু পরেই ট্রেন থামিল। বিকাশের বেয়ারা চায়ের সর্ব্ববিধ সরঞ্জামসহ কামরায় ঢুকিয়া পূর্ব্বরাত্রের মত টেবিল চেয়ার সাজাইয়া ফেলিল—আজও সে দু'জনের জন্য পাত্র-সজ্জা করিল। বিকাশ একবার দরজাটি অল্প খুলিয়া হাত বাড়াইতে বেয়ারা তাহার প্যাণ্ট শার্ট টাই প্রভৃতি আগাইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরে বাহিরে আসিয়া বিকাশ বলিল, বসে কেন, চা ঢালুন এবং গলাটা ভিজিয়ে ফেলুন।

বেয়ারা প্রভুর বস্ত্র ও প্রসাধন সামগ্রী গুছাইতে বাথরুমে চলিয়া গেল।

বিকাশ একটির পর একটি প্লেট খুলিয়া ধরিতে অণিমা বলিল, আপনি কি হোটেল সঙ্গে নিয়ে চলেন ?

—আহার্য্য এবং নিদ্রা সঙ্গে না নিয়ে আমি 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।'

অণিমা চা ঢালিয়া বিকাশকে দিল, নিজে লইল। টোষ্ট, ডিম প্রভৃতি কিছুই স্পর্শ করে না দেখিয়া বিকাশ বলিল, আজও কি সেই 'কিন্তু'—বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি !

—এত সকালে খেতে পারিনে !

—রাত্রে পারেন না—কিন্তু ; সকালে পারেন না—কিন্তু ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পারেন কখন্ ?

অণিমা মধুর হাসিয়া কহিল, বেলায় !

বিকাশ বলিল, অত্যন্ত দুঃখিত, পরীক্ষা করবার সময় পাওয়া যাবে না।

নারীর নয়নের কটাক্ষে যতখানি গরল ও অমৃত থাকিতে পারে তাহাই নিঃশেষে নিঃশেষ করিয়া দিয়া অণিমা বলিল, সে দোষ কিন্তু আমার নয়।

মহাদেব শুধু কৈলাসেই থাকেন না। যে অমোঘ অস্ত্রে বিশ্বের নর আহত হইয়া পড়ে, দেখা গেল নীলকণ্ঠ না হইয়াও তাহাই পরিপাক করিবার লোক ভূতলেও আছে। বিকাশ কটাক্ষের কোন মর্য্যাদাই দিল না ; বলিল, শুধু চা খেতে নেই, বাইবেলের নিষেধ।

প্রথম দংশন ব্যর্থ হইয়াছে, ফণিনী দ্বিতীয়বার ফণা উদ্যত করিল ; বলিল, বাইবেল্ মানিনে।

—কোরান ?

—না।

—পুরাণ ?

—না।

—তাও না ? তবে এলজাব্রা, ট্রিগনোমেট্রি, মেন্-সুরেশন, এপ্লায়েড কেমিষ্ট্রি, ইন-অরগেনিক কেমিষ্ট্রি ?

সর্পের স্বভাবই ঐ ! দংশনের সুযোগ সে হেলায় হারায় না। অণিমা বিলোল কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, বলুন বলুন, এলার্ম সিগন্যাল ! পেনাণ্টি ফর ইমপ্রপার ইউজ—

বেয়ারা বাহিরে আসিয়া জিনিষপত্রগুলা বাক্সজাত করিতেছিল, বিকাশ বলিল, আর কিছু না খান্, একটা পোচ নিন্।

—আপনার জেদকে পারবার জো নেই—বলিয়া হাসিয়া ফণা উদ্যত করিয়া একখানা প্লেট ও কাঁটা ছুরি টানিয়া লইল।

অন্য প্রসঙ্গ উঠিল।

—রাঁচী কি এখন ঠাণ্ডা ?

—বিশেষ নয়।

—আপনার কি রাঁচীতেই থাকা হয় ?

—কখনও কখনও।

—বাড়ী আছে নিশ্চয়ই।

—তা আছে।

—হুড্রু ওখান থেকে কতদূর ?

—পঞ্চান্ন-ছাপান্ন মাইল হবে।

—রাজরূপা ?

—অনেক না হ'লেও কিছু কম বটে।

—হাজারীবাগ ?

কিন্তু, এরকমভাবে কথা চলে না। একজন কেবলই প্রশ্ন করিবে, অপরে এক-আধ কথায় উত্তরই দিবে, কোন প্রশ্ন

করিবে না বা কথোপকথনকে অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিবে না, ইহাতে কথা জমে না; আর নারীমাত্রেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। অণিমাও হইল না এবং প্রশ্নের তালিকা বৃদ্ধি না করিয়া চুপ করিয়া বসিল।

আহার শেষে বিকাশ সিগারেট ধরাইল; বেয়ারা তাহার কাজ করিতে লাগিল; অণিমা জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটা ষ্টেশনে ট্রেন থামিল, সংবাদ-পত্র-বিক্রেতা কামরার দরজায় দরজায় কাগজ বিক্রয় করিয়া গেল। বিকাশ কাগজ খুলিয়া বসিল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে শেষপৃষ্ঠা একাধিক বার চোখ বুলান হইয়া গেল, পড়িবার মত সংবাদ ছিল না—সবই পুরাতন, গতকল্যকার সংবাদ, তথাপি সে কাগজখানার খুঁটিনাটিতে পর্য্যন্ত চোখ বুলাইতে লাগিল। সিগারেট নিঃশেষিত হইলে দ্বিতীয়বার সিগারেট ধরাইবার সময় অণিমার দিকে চাহিল; সে নিবিষ্টচিত্তে রবিকরোজ্জ্বল প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে দেখিয়া আবার কাগজে মন দিল। কোন্‌টা পড়িবে, ইহাই সমস্যা! পড়া খবর পড়িতে কা'র ভাল লাগে?

অণিমার দৃষ্টি প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল সত্য, কিন্তু নিতান্ত দায়ে পড়িয়া। সংবাদপত্র হাতে পড়িলে পুরুষের কিরূপ অধোগতি ঘটে, বারকতক ওদিকে চাহিয়া সে তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। নৈকট্য থাকিলে সে কাগজ-খানাকে টানিয়া লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিত ঐ বনে!

মরী! মরী!! মরী!

বিকাশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রশান্ত হাসিমুখে কহিল, য়্যাট্‌ লং লাষ্ট!—ঘড়ি দেখিয়া বলিল, বেশী নয়, দশ মিনিট লেট্‌!

অণিমা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—নিশ্চয়ই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য লোক আসিয়াছে।

বেয়ারা মুটের সাহায্যে জিনিষপত্র নামাইয়া লইয়াছিল, দেহের কিয়দংশ অবনমিত করিয়া বিকাশ টুপিটা হাতে লইয়া অণিমার উদ্দেশে নাড়িয়া বলিল, গুড বাই!

মুটে অণিমার বাক্স বিছানাও টানাটানি করিতেছিল, অণিমা বিষণ্ণমুখে তাহারই তত্ত্বাবধান করিতেছিল, বিদায়-সম্ভাষণে চক্ষু তুলিয়া বলিল, গুড বাই।

বিকাশ একটু হাসিয়া টুপিটা প্রায় মাথার কাছে ধরিয়া বলিল, আপনার হাওড়ার বন্ধুদের খবর দেবেন, এলার্ম সিগ ন্যাল্‌ টানতে হয়নি!

অপরিসীম লজ্জায় দুঃসহ বেদনায় নারীর অন্তর তখন ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে; আবার হাস্যফুল্লকণ্ঠে "গুড বাই" করিয়া বিকাশ নামিয়া গেল।

ছোট গাড়ীতে দেখা হইলে—দেখা ত হইবেই—ইহার শোধ অণিমা লইবেই! অবহেলা, ঔদাসীন্য, অনাসক্তি প্রভৃতি যতগুলি নারীনিগ্রহসূচক ব্যাধির দাওয়াই শর-অভিমান-তূণীরে আছে সকলগুলির সুপ্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একান্ত বিমর্ষচিত্তে ম্লানমুখে বড় গাড়ী ছাড়িয়া অণিমা ছোট গাড়ীর উদ্দেশে চলিল।

কথা ছিল, মরীতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য মিঃ সেন ত থাকিবেনই, রায়, বসু, মিত্রও থাকিতে পারেন; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! অচেনা জায়গা—নূতন দেশ! রাঁচীতে তাহার এক মাসীমা আছেন বটে, ঠিকানাটা জানা নাই, তবে মেসো সরকারী চাকুরে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। মিষ্টার সিন্‌হাও তাহাকে সাহায্য করিবেন নিশ্চয়!

'হি ইজ এ ফাইন জেণ্টলম্যান—ফাইনেষ্ট, আই শুড শে।'

কিন্তু কই, একখানি মাত্র ফার্ষ্ট ক্লাস, তিনি ত নাই!

যদি অগ্রে বা পশ্চাতে অন্য ফার্ষ্ট ক্লাস থাকে, অণিমা কুলীকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তাহাই দেখিতে চলিল। ফার্ষ্ট একখানি, সেকেণ্ড দুইখানি—অগ্রে পশ্চাতে আর নাই।

সম্ভবতঃ অন্য ট্রেনও আছে—কুলী সে সন্দেহেরও নিরসন করিল; বলিল, বিকালের আগে আর গাড়ী নাই।

কুলীকে বিদায় করিয়া অণিমা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার তখনও ধারণা, বিকাশ এইখানেই কোথাও আছে, গাড়ী ছাড়িবার সময়-সময় আসিবে। নিজের কতকটা অসুবিধা ও বিপদ আসন্ন বলিয়া বিকাশের উপস্থিতি একান্ত মনে চাহিতেছিল বলিয়াই আশে পাশের কথাগুলা তাহার মনে ছিল না; নহিলে তাহার মনে পড়া উচিত ছিল, ছোট গাড়ীতে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বিকাশ বার বার এত ঘটা করিয়া 'গুড বাই' করিয়া যাইত না। এ সহজ কথাটা তাহার একবারও মনে হইল না এবং সমস্তক্ষণ সযত্ন-

অন্য-মনস্কতার সহিত প্ল্যাটফর্মের উপর লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল এবং বিকাশ আসিলে কি ভাবে পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিবে বইখানি খুলিয়া তাহারই পুনঃ পুনঃ মহলা দিয়া রাখিল! সে যদি কালিকার মত লাষ্ট মোমেণ্টে আসিয়া দাখিল হয়, আজ অনিমা এলার্ম সিগন্যাল টানিবেই।

এই কথাটার সর্ব্বাঙ্গে যেন হাসিভরা ছিল; মনে পড়িবামাত্র সে-ও হাসিতে ভরিয়া গেল। এ হাসির বাহিরে প্রকাশ তত নয়, যতটা ভিতরে; তবে বড় অন্যমনস্ক করিয়া দেয়, পুরাতন কথাগুলা মনে করাইয়া দেয়। হাসি তাহাতে বাড়িয়াই চলে।

মনে মনে যখন হাসির ঢেউয়ে অনিমা নাচিতেছিল, তখন বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কোথায় রহিল হাসি, কোথায় গেল সিগন্যাল টানা, আকাশ অন্ধকার হইয়া গেল।

তাহাকে ছাড়িয়া নিজের লোকদের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে দশদিক সে শূন্য দেখিতে লাগিল। দায়িত্বজ্ঞানহীন, অভদ্র, ইতর—কত কথাই না মনে জমা হইতে লাগিল। তাহাদের সহিত অবিলম্বে সম্পর্ক ছেদ না করি ত কি বলিতেছি!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে, চলন্ত ট্রেনের পাশ দিয়া একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী যেন রেস্ করিতেছিল। একবার ট্রেন আগে যায়, মোটর পাল্লা দিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া যায়। অনেকক্ষণ এইভাবে চলিতেছিল। হঠাৎ অনিমার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। গাড়ীর আরোহী অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে পাইল না; সে কিন্তু চক্ষুজ্বালার সহিত ভাল করিয়াই দেখিল।

কিছুক্ষণ পরে মোটর আবার ট্রেনের পাশে। এবার ট্রেন চলিয়া গেলে, তবে মোটর ছাড়া পাইবে, গেট বন্ধ!

ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা যখন মোটরকে অতিক্রম করিতেছিল, অনিমা বাহিরের দিকে চাহিতেই একখানা হাসি মুখ ও মাথার উপরের টুপি আন্দোলিত হইল!

রাঁচীর বড় বড় গাছপালা ও গীর্জ্জার গম্বুজে আবছা' রাস্তায় খুব দ্রুতবেগে মোটর চালাইয়া বিকাশ কাঁকের দিকে যাইতেছিল; হঠাৎ একটা আধা-ফিরিঙ্গি হোটেলের সামনে অনিমাকে দেখিয়া থামিয়া গাড়ীখানাকে রাস্তার পাশে রাখিয়া দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িয়া নমস্কার করিল।

অনিমা তাহাকে দেখে নাই। হোটেলের কোন বোর্ডার বা বোর্ডারের ভিজিটর মনে করিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, বিকাশের কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বিকাশ বলিল, পালাবেন না, পালাবেন না, আমি পরিচিত, নিরস্ত্র এবং এলার্ম সিগন্যালের ভয় রাখি।

অনিমা ফিরিয়া দাঁড়াইল; যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইল; হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু হাসি না ফুটিতে মুখের মলিনতায় মিলাইয়া গেল।

বিকাশ বলিল, বেড়াতে বেরিয়েছেন?

অনিমা কহিল, না। আমি এইখেনে আছি।

—এই হোটেলে? সেকি! এটার ত বেশ সুনাম নেই; আর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের সঙ্গে এরা ভাল ব্যবহারও করে না ব'লেই শুনেছি। এত জায়গা থাকতে এখানে উঠ্‌তে গেলেন কেন?

অনিমা কতকটা দুঃখ, কতকটা অভিমান ভরে কহিল, আমি কি ক'রে জানব বলুন? ষ্টেশনে গাইড যা বোঝাল, তাই বুঝলুম। এই ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি।

বিকাশ বলিল, আমায় ত ট্রেনে বললেই পারতেন—

—কি?

—কোথায় থাকা যায়, কি বৃত্তান্ত, আমায় জিজ্ঞাসা করলেই পারতেন।

—আপনি যে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

বিকাশ হাসিয়া বলিল, কই, আবার তাড়াতাড়ি চ'লে গেলুম! আমি ভাবলুম, কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেই আপনি যাচ্ছেন—

—আমার দুঃখের কথা আর বলবেন না!

এই সময়ে কতকগুলা ফিরিঙ্গী যুবক-যুবতী রঙ্গ-তামাসা হাসি-গল্প করিতে করিতে হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল। দেখিয়া অনিমা বলিল, দিনরাত কি হুল্লোড় যে করে সব, কি বলব! পরশু রাত্রে ক'টা ছোঁড়া মদ খেয়ে আমার ঘরের দরজাতেই ধাক্কাধাক্কি লাগিয়েছিল।

বিকাশ বলিল, আমি জানি। এ অঞ্চলের এই হোটেলটার একেবারেই সুনাম নেই। কিন্তু এখানে

দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি ? আপনার 'স্যুটে' বসবার ঘর আছে ত ?—না, না, সে যে হবার জো নেই ! হোটেলটির ফিরিঙ্গি-নিষ্ঠা অসাধারণ, ধুতি-পরা বাঙ্গালীর প্রবেশ নিষেধ। আমার গাড়ীতে আসবার সাহস আছে ?—আজ তাহার পরিধানে ধুতি পাঞ্জাবী ও চাদর।

—খুব সাহসের দরকার আছে নাকি ?—বলিয়া অণিমা হাসিয়া কটাক্ষবিদ্ধ করিয়া আবার বলিল, আপনি বোধ হয় বেড়াতে বেরিয়েছেন ?

—না, কাজ থেকে বাড়ী ফিরছি।

—আমায় নিয়ে কোথায় যাবেন ? বাড়ী ?

—না গেলেও চলতে পারে ; খানিক বেড়িয়ে আনতেও পারা যায়।

অণিমা বলিল, চলুন ; ক'দিন এসেছি, মনে হচ্ছে গারদ-বাস করছি।

বিকাশ বলিল, গাড়ীতে উঠুন, যেতে যেতে দুর্গতির আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনব।

গাড়ীর কাছে আসিয়া অণিমা বলিল, সামনে বসাতে আপনার আপত্তি হবে না বোধ হয়।

—আপত্তির বদলে আনন্দ হতেও পারে।

—যান্, বলিয়া অণিমা আবার একটি কটাক্ষ ত্যাগ করিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে বিকাশ জিজ্ঞাসা করিল, এত হোটেল থাকতে ওটি বেছে নিলেন কেন ?

—তবে আর দুঃখের কথা বলছি কি ! ষ্টেশনে নেমে দেখি, যাঁদের কাছে আমি এসেছি, তাঁদের কারও দেখা নেই। নিজেও কিছু জানি নে, কখন আসি নি···

—তাঁদের ঠিকানাও জানতেন না ?

—না। তাঁরা এখানে আসেনই নি। এলে নিশ্চয়ই ষ্টেশনে থাকতেন।

—ঠিকঠাক্ না ক'রে···

—সমস্তই ঠিক ছিল, তাঁরা বোধ হয় পথে কোথাও আটকে গেছেন।

—আপনাকে আস্তে ব'লে ? তাঁরা ত জানেন, আপনি একলাই আসছেন।

—তা জানেন বই কি !

বিকাশ একটুখানি ভাবিয়া কহিল, কি জানি বাঙ্গালী সমাজের এতখানি প্রগতি হয়েছে কি-না !

অণিমা হাসিয়া বলিল, আমাদের হয়েছে।

—তার মানে ?

—মানে, আমরা ঠিক গৃহস্থ-ঘরের লজ্জাশীলা কুলবধূ নই, আর যে প্রোফেসনে আছি, তাতে একলাই হিল্লী-দিল্লী ক'রে বেড়াতেও প্রায় হয়।

—প্রোফেসন ?

—আমি সিনেমা করি।

—আপনার আসল নামটি কি বলুন ত ?

—অপর্ণা দেবী।

—অপর্ণা দেবী, বি-এ ? আপনি মিষ্টার সি, কে, চৌধুরীর মেয়ে ?

—আপনি জানলেন কি ক'রে ?

—কি ক'রে ? আপনি ত মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহ ! বাঙ্গালা দেশে আপনার নাম না শুনেছে কে ? ভদ্রঘরের গ্রাজুয়েট মেয়ে আপনিই প্রথম সিনেমায় ঢুকলেন। সে সময়ে কাগজে কাগজে কি কম আন্দোলন হয়েছিল ! শুধু তাই নয়, আপনাকে জানার আমার আরও কারণ আছে। আপনার ভাই সতী চৌধুরী আমার সঙ্গে কেমব্রিজে—

—আমি জানি।

—কি ক'রে জানলেন ?

—অনুমানে। ছোড়দা অনেকদিন আগে গল্প করত আপনি ব্যারিষ্টারী না ক'রে লাক্ষার কাজ করেন, রাঁচীতে থাকেন ; খুব সৌখীন লোক ! এই সব বলত !

—সে ষ্টুপিড জানলে কোথা থেকে এ সব ! বিলেত থেকে ফেরার পর ত আমার সঙ্গে তার একবারও দেখা হয় নি। সে গোয়ালিয়রে না কোথায় চাকরী পেয়েছে শুনেছিলাম।

—গোয়ালিয়রে নয়, হায়দ্রাবাদে। সেইখানেই আছে। সেইখানেই বিয়ে থা' ক'রে বসে গেছে, কার' খোঁজখবর বড় রাখে না, বুড়ো বাবারও না।

—আপনার মা ত—

—আমার যখন দু বছর বয়স, মা মারা যান্। বড়দাও এই বছর পাঁচেক হ'ল—বলিতে বলিতে অপর্ণার গলা ধরিয়া আসিল।

—সতী কি চাকরী করে ?

—জানি না ত ! তবে শুনি, ভাল চাকরীই করে ; কিন্তু একটি পয়সাও বাবাকে দেয় না। অথচ বাবার কম পয়সা ও নষ্ট করেছে বিলেতে ! বুড়ো বয়সে বাবা না খেতে পেয়ে মরতে বসেছেন। বাধ্য হ'য়ে আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি নিতে হ'ল।

বিকাশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল ; তারপর বলিল, তিনি মত দিলেন ?

—না দিয়ে কি করবেন ?

বিকাশ এ কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু বাঙ্গালী ভদ্রঘরের নির্ম্মল পবিত্রতাকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বলি দিতে হইয়াছে ভাবিতেও তাহার হৃদয় ভারী হইয়া উঠিতেছিল। সে অন্যমনস্কের মত বলিল, গাড়ীটা থামিয়ে এইখানে একটু বসা যাক্, কি বলেন ?

— বেশ ত !

বিকাশ সিগারেট ধরাইয়া বলিল, আমি সিনেমা-ফিনেমার খবর বড় রাখি নে ; ছবি-টবিও দেখি নে। আপনি কোন্ কোম্পানীতে আছেন ?

—ভারত পিকচার্স।

—বাঙ্গালীর ?

—হ্যাঁ।

—যদি কিছু মনে না করেন, কত পান ?

—ছ'শ টাকা।

—তা মন্দ কি ! বাপ ও মেয়ে, দুটি প্রাণী !

অপর্ণা ম্লান হাসিয়া বলিল, না, তিনটি ! বাবার হুইস্কীটাই বড় প্রাণী ! ছ'শতেও চলে না।

বিকাশ অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, কথাটা সহজ ভাবেই বলছি, আশা করি সহজভাবেই নেবেন। আপনার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি তিনি ?

—না। তাঁর সময়াভাব—হুইস্কী তাঁকে একটুও ফুর্সৎ দেয় না। বড়দা করছিলেন, হঠাৎ মারা গেলেন। আমি তখন বি-এ পড়ছি। দাদার মৃত্যুতে আমরা অকূল পাথারে ভাসলাম ; ছোড়দা এল না, খোঁজ নিলে না। আমার কলেজের একটি বন্ধুর সাহায্য নিয়ে পরীক্ষার ফি-টা দিয়ে পাস করলুম। সে যদি চাইত—কিন্তু তার ইচ্ছেটা বিয়ে বলে ঠিক মনে হ'ল না। তবে সে এই উপকারটুকু আমার করেছিল, ভারত পিকচার্সের প্রোপ্রাইটার মিঃ ঘোষের সঙ্গে আমার আলাপটা করিয়ে দিয়েছিল। আমার ক'খানা ছবিই তাঁকে সব রকমে খুব সন্তুষ্ট করেছে।

—এখন কি ছবি হচ্ছে আপনাদের ?

—হীরকাঙ্গুরীয় ! কোম্পানী রামচন্দ্রপুরে ছবি তুলতে গেছলেন ; কথা ছিল, শুক্রবার তাঁরা রাঁচী পৌছবেন ; আমিও শুক্রবারে ষ্টার্ট করব ; বৃহস্পতিবারেও তাঁদের তার পেয়েছি, তাঁরা আসছেন, অথচ এসে দেখি—এই বিভ্রাট।

—এর মধ্যে তাঁরা এসেছেন কি-না সে খবর নিয়েছেন ?

—সে আর কি ক'রে নেব, বলুন।

—তার ব্যবস্থা আমি করছি। রায় সাহেব কমল বিশ্বেস আর যতীন চন্দ্র দুজনকেই খবর দিচ্ছি, তাঁরা খবর দেবেন'খন।

—তাঁরা জানবেন কি ক'রে ?

বিকাশ হাসিয়া বলিল, তাঁরা ? তাঁরা হ'লেন রাঁচীর জয়েণ্ট কনসাল জেনারলস্ বা কনোসিয়ঁাস্। গেজেট বললেও মন্দ হয় না। তাঁদের অগোচর কিছুই থাকতে পারে না ; বিশেষ থিয়েটার, সিনেমা, ম্যাজিক, এসব এ দেশে ঐ দু'টি মোড়লকে বাদ দিয়ে অসম্ভব। আজই না পারি, কাল সকালেই তাঁদের খবর করছি।

অপর্ণা বলিল, এমন মুস্কিলে পড়েছি কি বলব ? সঙ্গে টাকা-কড়ি বিশেষ ছিল না ; যা ছিল, হোটেলটি এক সপ্তাহের আগাম ব'লে তাও গ্রাস ক'রে বস্‌ল। টাকা যে আনাব তারও জো নেই, কারণ কোম্পানীর আফিস কোম্পানীর সঙ্গেই রামচন্দ্রপুরে। এই রামচন্দ্রপুরটি যে কোথায়, রাঁচীর পোষ্টমাষ্টার ত কিছুতেই বার করতে পারলে না। আর কিছু হোক না হোক্, হাতে টাকা থাকলে অন্য একটা হোটেলে উঠে গিয়ে নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচতুম।

বিকাশ বলিল, আমার একটা প্রস্তাব আছে।

অপর্ণা কহিল, কি ?

—বলছি। চা খাবেন, ফ্লাস্কে আছে, আনছি।

উভয়ে চা পান করিল। বিকাশ সিগারেট ধরাইয়া বলিল, সিনেমা-জীবন লাগে কেমন ?

অপর্ণার হাসিমুখ এক মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া উঠিল ; ক্ষণকাল চিন্তা করিল, ধীরে ধীরে বলিল, জঘন্য।

বিকাশ হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, আট্‌টা বাজে, চলুন, যাওয়া যাক্।

উভয়ে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অপর্ণা তাহার প্রস্তাবটা শুনিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু বিকাশ কোন কথাই বলিল না। গাড়ীর মোড় ঘুরাইয়া যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ধাবিত করিল। আকাশের এক ভাগে এক খণ্ড চন্দ্র উঠিয়াছিল, আলোক বড় ক্ষীণ, গাছপালা ধিঁড় বেশী, কিন্তু বড় মধুর—স্বপ্ন সৃজন করে।

হোটেলের সম্মুখে আসিয়া বিকাশ কহিল, এখানকার পাওনা সব দেওয়া আছে?

—তা আছে।

—জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিতে বেশী সময় লাগবে না বোধ হয়?

—না। কেন?

—এখানে থাকা হবে না; চলুন, জিনিষপত্তর গুছিয়ে নেবেন।

—কোথায় যাব? আমার হাতে যে—

—আমার বাড়ীতে থাকবেন।

—আপনার বাড়ীতে?

বিকাশ হাসিয়া বলিল, দোষ কি!

অপর্ণা বলিতে গেল, কিন্তু···

বিকাশ বলিল, আবার সেই 'কিন্তু'? 'কিন্তু'র ব্যাখ্যা করতে হবে নাকি? ভয় নেই, সেখানেও এলার্ম সিগন্যাল আছে। আমার স্ত্রী আছেন।

অপর্ণা কহিল, ছোড়দা যে বলেছিল, আপনি চিরকাল আনম্যারেড থাকবেন পণ করেছিলেন···

বিকাশ বলিল, পণটা বিলেতের জন্যে, স্বদেশের জন্যে নয়। চলুন, চলুন, অন্য কথা বাড়ীতে গিয়ে হবে। বিয়ে করতে চান্, তারও ব্যবস্থা হতে পারবে, আমার একটা ডেয়ার ডেভিল্ শালা আছে, তার জন্যে তার দিদি পরী খুঁজে বেড়াচ্ছে, চলুন, আমি পরী ধরে নিয়ে যাই।

—আপনি বড্ড দুষ্টু!

—গৃহের এলার্ম সিগন্যালেরও ঐ মত! চলুন!

অপর্ণা বলিল—দাঁড়ান,আমি সিনেমা করি জেনেতিনি—

বিকাশ বলিল, আপনিও গেলেই জানতে পারবেন, তিনিও এককালে কলেজের হলে হাজার লোকের সামনে দাড়িয়ে জগৎসিংহকে দেখিয়ে "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" করেছেন। দোহাই, দেরী করবেন না—ডিনার য়্যাট্ নাইন্!

—একাল—

শ্রীতারকপদ চট্টোপাধ্যায়

আমরা দেখিনি সখি ঘনমেঘে মেদুর আকাশ
রামগিরি-শীর্ষ হ'তে; পাঠাইনি মেঘদূতে মোরা;
মোদের মানসে সখি বসন্তের উতলা বাতাস
প্রিয়ার সুরভি-স্পর্শ বহি আনি দেয়নিক ধরা।

আমরা যাইনি সখি অভিসারে প্রিয়ের লাগিয়া
প্রাবৃটে তামসী রাতে নীলাম্বরে তনুটী আবরি;
শুনিনি প্রিয়ের বেণু মর্ম্মমাঝে রজনী জাগিয়া;
ধোঁয়ার ছলনা করি' কাঁদি নাই প্রিয়তমে স্মরি।

আমরা শুনিনি সখি অরণ্যের স্পন্দিত মর্ম্মরে
প্রিয়ার ব্যাকুল বেণু; শুনি নাই নদীর কল্লোলে
প্রিয়ার মঞ্জীরধ্বনি; আমাদের মনের কন্দরে
জাগেনি প্রিয়ার স্মৃতি উচ্ছল তটিনী-কলরোলে।

আমাদের প্রেমে নাই মত্ততার ফেনিল আসব
আমরা জানি না সখি মৃত্যুঞ্জয় অনির্ব্বাণ প্রেম;
মোদের জীবনে আজ কাব্যরস মুছে গেছে সব;
নির্ম্মম পাষাণে কষি হৃদয়ের নিকষিত হেম।

আলডুস্ হাক্‌স্‌লীর প্রতিভা

শ্রীগোপাল ভৌমিক

(প্রবন্ধ)

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক আলডুস্ হাক্‌স্‌লী (Aldous Huxley) জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের দুইটি বিশিষ্ট কৃষ্টিসম্পন্ন বংশের রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। তাঁর পিতা ডাঃ লিওনার্ড্ হাক্‌স্‌লি ডারউইনের সহকর্মী সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টি. এইচ্. হাক্‌স্‌লির পুত্র এবং তাঁর মাতা জুলিয়া আনল্ড্ (Julia Arnold) সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডের কন্যা এবং সুপ্রসিদ্ধ নীতিবিদ্ পণ্ডিত ডাঃ আর্নল্ডের পৌত্রী। সুতরাং আলডুসের পূর্ববর্তী পিতৃ এবং মাতৃবংশীয় পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন বৈজ্ঞানিক, একজন নীতিজ্ঞ পণ্ডিত এবং আর একজন ছিলেন কবি ও সমালোচক। আলডুসের প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে এই সমস্ত গুণরাজি তাঁর একার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। আলডুস্ একাধারে কবি, সমালোচক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবিদ, ঔপন্যাসিক এবং প্রবন্ধকার।

মহাযুদ্ধের সময় থেকে আলডুস্ হাক্‌স্‌লি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন ; মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত কবিতার বই 'লেডা' প্রকাশিত হয়। এই বছরই তাঁর প্রথম গল্প রচনা 'লিম্বো' আত্মপ্রকাশ করে। 'লিম্বো' বইখানি ছয়টি ছোটগল্পের সমষ্টি। এর পর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর কতকগুলো বইয়ের নাম নীচে দেওয়া গেল ; ক্রোম্ ইয়লো, য়্যান্টিক হে, দি লিট্‌ল্ মেক্সিকান, দোজ ব্যারেন লীভ্‌স্, টু অর থ্রি গ্রেচেস, পয়ন্ট কাউন্টার পয়ন্ট, ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড এবং অইলেস ইন গাজাস। এর মধ্যে 'দি লিট্‌ল্ মেক্সিকান' ও টু অর্ থ্রি গ্রেচেস নামক বই দু'খানা ছোট গল্পের এবং বাকীগুলো সবই উপন্যাস। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে 'ওয়ার্ল্ড অফ্ লাইট'এর নাম করা যেতে পারে ; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই নাটকখানা লণ্ডনে অভিনীত হ'য়েছিল। এ ছাড়া দু'খানা ভ্রমণ-কাহিনী এবং কয়েকখানি প্রবন্ধপুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। একখানা ভ্রমণ-কাহিনীর নাম 'জেষ্টিং পাইলট'—এই বইখানি প্রাচ্যদেশের ভ্রমণ কাহিনীতে পূর্ণ। প্রাচ্যদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হাক্‌স্‌লী সস্ত্রীক আমেরিকা ভ্রমণে যান—তার বিবরণ আমরা 'বিয়ণ্ড দি মেক্সিক বে' নামক ভ্রমণ-কাহিনীর বইতে পাই। তাঁর প্রবন্ধ পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনখানা বই খুবই প্রসিদ্ধ ; 'ডু হোয়াট ইউ উইল্,' 'মিউজিক য়্যাট্ নাইট' ও 'প্রপার্ ষ্টাডিজ'। আলডুসের দৈহিক স্বাস্থ্য খুব ভাল নয়। জীবনের বেশীর ভাগ তাঁর কেটে গেছে রিভিয়েরা এবং ইটালীতে। ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের কার্যাবলীতে যোগ দিয়েছেন তিনি খুবই কম ; সবেমাত্র গত কয়েক বৎসর যাবত তিনি জনসভা প্রভৃতিতে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং নানাপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছেন। জগতে শান্তি-স্থাপন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা তিনি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে দিয়েছেন। তা ছাড়া জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তাঁর ব্যয়িত হয়েছে নির্জনে জ্ঞানান্বেষী ছাত্রের মত। একমাত্র পুস্তক প্রকাশ ছাড়া তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর নেই।

এই নির্জনতা-প্রিয় মানুষটি পুস্তকের মধ্যে কি অসীম শক্তিরই না পরিচয় দেন। তাঁর বই প'ড়ে হয় আনন্দে মন ভ'রে ওঠে, নয় প্রতিবাদে কণ্ঠ পূর্ণ হ'য়ে যায়! এমন কোন জীবিত লেখক হয়ত আর নেই যাঁর লেখা প'ড়ে পাঠকের মনে এমন যুগপৎ ভীষণ প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে! আলডুস্ যশস্বী সাহিত্যিক কিন্তু তিনি জনপ্রিয় ন'ন! তাঁর মত পরম চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী লেখকের পক্ষে জনপ্রিয় হওয়াও কঠিন। কিন্তু জনপ্রিয় না হ'লেও বর্তমান জগতে তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব খুব বেশী। তিনি ডক্টর আর্নল্ডের ন্যায় উন্নত আদর্শবাদী এবং নীতিবিদ্—তথাপি তাঁর বই প'ড়ে অনেকেই প্রথম বিচলিত হ'য়ে পড়েন। এর কারণ, হাক্‌স্‌লি অনেকটা বাস্তবপন্থী ; তাঁর বক্তব্য বিষয় যদি কুৎসিৎ হয়, তবে তিনি সেটাকে অলঙ্কারহীন কুৎসিৎভাবে বর্ণনা ক'রেই লোকের চোখের সম্মুখে তার বীভৎসরূপ তুলে' ধরেন। এতে ত অনেকের রাগ হবার কথাই। দাসী হয়ত পরিশ্রম লাঘবের জন্য রান্নাঘর ঝাট দিয়ে বাসনের তাকের নীচে লোকচক্ষুর আড়ালে সব ময়লা জমা ক'রে রেখেছে—এখন কেউ যদি এই ময়লার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে কি দাসীর রাগ হ'বে না? আমাদের মানবসমাজও অনেকটা এই দাসীর মত—সমাজের যে দুষ্প্রবৃত্তি এবং অন্যায় অত্যাচার ধামা চাপা হ'য়ে পড়ে' আছে, সে সব কথা হাক্‌স্‌লী গোপন অন্ধকার গুহা থেকে টেনে বের করেন—এতে এক সম্প্রদায়ের লোকের রাগ হবারই ত কথা। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিমত শুনুন : 'ভাল্‌গারিটি ইন্ লিটারেচার' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "I myself have frequently been accused by reviewers, in public and by unprofessional readers in private correspondence, both of vulgarity and wickedness—on the grounds so far as I have ever been able to discover, that I reported my investigations into certain phenomena in plain English and in a novel." তাঁকে যে অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত করা হয়, সেই অশ্লীলতা-দোষ সত্বেও

অথবা সেই অশ্লীলতা দোষের জন্যই হাক্স্লি আজ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সবচেয়ে প্রিয় ঔপন্যাসিক। কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিল্পী, সমালোচক, রাজনীতিবিদ্ সকলেই তাঁর বই পড়েন। এককথায়, শিল্প এবং সাহিত্য বিষয়ে যাঁরা সমাজের মত গঠন করেন তাঁরাই তাঁর পাঠকশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকেরাও তাঁর উপন্যাস পাঠ করেন। কাজেই স্পেন্সারকে যেমন বলা হয় কবির কবি (The poets' poet), আলডুস্কেও তেমনি বলা যায় ঔপন্যাসিকের ঔপন্যাসিক (The Novelists' Novelist)।

আলডুসের 'ষ্টাইল্' সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তাঁর লেখার ধরণ খুব ভাল—সরল, স্বচ্ছ এবং স্বতস্ফূর্ত! কোন লেখকের রচনার গুণাগুণ বিচার করতে হ'লেই দুটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমত, লেখকের বলবার কি আছে এবং দ্বিতীয়ত, তিনি তার বক্তব্য কেমন ক'রে বলেছেন, অর্থাৎ—আমরা বিচার ক'রে দেখব, তাঁর বক্তব্যবিষয় এবং তাঁর বলবার ধরণ। মনে হয়, লেখকের যদি কোন প্রয়োজনীয় বক্তব্য বিষয় থাকে তবে তার লেখার ধরণের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে 'ষ্টাইল' নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর থাকে না। আপনা থেকেই তাঁর 'ষ্টাইল্' সৃষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় বক্তব্য বিষয় থাকাতে তিনি তাঁর বক্তব্যকে যতটা সম্ভব স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় বলতে চান এবং তার ফলেই তাঁর নিজস্ব একটি বিশিষ্ট ষ্টাইলের সৃষ্টি হয়।

হাক্স্লি অগাধ পণ্ডিত—এত পণ্ডিত যে, তাঁর সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে পাণ্ডিত্যে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। অতীতের ঔপন্যাসিকদের প্রত্যেকের চেয়ে তাঁর জ্ঞান বেশী—আর এটা হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। কারণ অতীতে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার এত সহজে আয়ত্তাধীন করা যেত না। বিশ্বের বিজ্ঞান-জগতই যে আজ লোকের পদতলে লুণ্ঠিত তা নয়—গ্রামোফোনের কল্যাণে বিশ্বের সঙ্গীত আজ মানুষের গৃহে আবদ্ধ! হাক্স্লির অদম্য জ্ঞানপিপাসার কথা, পূর্বেই ব'লেছি—দিনরাত কেবল বই নিয়েই তিনি ব'সে আছেন!

তাঁর বই পড়লে এটা খুব স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে তিনি তাঁর পাঠকদের উপহার দিতে সর্বদাই উন্মুখ! এ সম্পর্কে জার্মান্ ঔপন্যাসিক টমাস্ ম্যানেরও নাম করা যেতে পারে। যাঁরা ম্যানের 'দি ম্যাজিক মাউণ্টেন' বইখানা প'ড়েছেন, তাঁরাই জানেন, কি অগাধ জ্ঞানের অধীশ্বর তার লেখক। হাক্স্লির উপন্যাসও নিত্য নূতন জ্ঞানে ভরা। তাঁর বইয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান, সঙ্গীত-বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, শিল্পবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সব কিছুই আমরা পাই। এ দিক দিয়ে বুদ্ধিজীবী হাক্স্লির উপন্যাসগুলি খুবই সমৃদ্ধ। সুযোগ পেলেই হাক্স্লির অগাধ জ্ঞান গুহা-নিঃসৃত ঝরণাধারার মত বেগে বেরিয়ে আসে। নীচের একটি মাত্র উদাহরণ থেকে এ কথা স্পষ্ট বোধগম্য হবে। তাঁর 'পয়েণ্ট কাউণ্টার-পয়েণ্ট' বইখানাতে দুই ঘণ্টা অতীত হয়েছে, এ কথাটা হাক্স্লি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ ক'রেছেন: "In two hours muscles of the heart contract and relax, contract again and relax only eight thousand times. The earth travels less than an eighth of a million miles along its orbit. And the prickly pear has had time to invade only another hundred acres of Australian territory. Two hours are as nothing. The time to listen to the ninth symphony and a couple of the posthumous quarters, to fly from London to Paris, to transfer a luncheon from the stomach to the small intestine, to read Macbeth, to die of snake-bite or earn one and eight pence as a charwoman." হাক্স্লি ছাড়া কারও দ্বারা এ বর্ণনা সম্ভব নয়।

বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হ'লেও, হাক্স্লির উপন্যাসে গঠন-সৌকর্য নেই বললেই চলে। তাঁর উপন্যাসগুলির অধিকাংশের



আলডুস্ হাক্স্লী

মধ্যেই 'আখ্যান' ব'লে কিছু নেই। হাক্স্লির বইয়ে আখ্যান নেই বটে, কিন্তু তাঁর গল্পের 'ট্রিট্মেণ্ট্' খুব সুন্দর! সৃষ্ট চরিত্রগুলির জ্ঞানগর্ভ সরস আলোচনাই তাঁর বইয়ের মুখ্য আকর্ষণ!

তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' বইখানাই সবচেয়ে বেশী সারবান। এ বইখানার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০০ শতেরও অধিক, কিন্তু এর মধ্যেও আখ্যানের কোন বালাই নেই! চরিত্র আছে এর মধ্যে অনেকগুলি। স্ত্রী এবং পুরুষ চরিত্রগুলির কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সঙ্গীতজ্ঞ, কেউ শিল্পী, কেউ দার্শনিক এবং কেউ বা সাহিত্যিক। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু তবুও তাঁদের মধ্যে একটা অদৃশ্য অন্তর্সংযোগ র'য়ে গেছে। এ বইয়েরও প্রধান আকর্ষণ সৃষ্ট চরিত্রগুলির জ্ঞানগর্ভ সরস আলোচনা। হাক্স্লির বইগুলি পড়লে স্বতঃই মনে হয় যে, তাঁর বইগুলিতে ভাবধারার সমষ্টি বা

works of ideas. সহজ ইংরেজীতে সুখপাঠ্য প্রেমের গল্প লেখা তাঁর উদ্দেশ্যও নয় ; আর এটা তাঁর দ্বারা সম্ভবও নয়।

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডি. এইচ্. লরেন্স্ একবার এঁর উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, হাক্‌স্‌লির উপন্যাসের একটা প্রধান দোষ এই যে, এতে মানব হৃদয়ের কোমল আবেগের বড় অভাব। সত্যই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির কারও মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মানবীয় হৃদয়াবেগ পাওয়া যায় না। এই জন্য তাঁর বই অনেক সময় শুষ্ক ও নীরস ব'লে মনে হয়। এ সম্বন্ধে আল্ডুস্ স্বয়ং কি বলেন, শুনুন : "I belong to the class of unhappy people who are not easily infected by crowd sentiment Too often I find myself sadly and coldly unmoved in the midst of the multitude's emotions.......How often one regrets this asceticism of the mind." বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে জগৎকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন—কাজ করা তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে ! কাজেই তাঁর উপন্যাসে আমরা দেখি "intellect' যথেষ্টই আছে, কিন্তু 'action'-এর অভাব। 'Action'-কে হাক্‌স্‌লি ঘৃণা করেন, কাজেই 'action'-এর উৎস 'emotion' বা হৃদয়াবেগ তাঁর বইয়ে নেই। পূর্বেই ব'লেছি তাঁর বইগুলি ভাব-গম্ভীর—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় জ্ঞানী এবং চতুর। সাধারণ মানুষ হৃদয়াবেগে পূর্ণ—তারা দিন রাত্রি কাজ করে, আর চিন্তা করে খুব কম। কিন্তু হাক্‌স্‌লির চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ উল্টো ; তারা কাজ করে খুব কম এবং চিন্তা করে খুব বেশী।

সাধারণ সাহিত্যিক উদ্দেশ্যহীনভাবে পারিপার্শ্বিক জগতের রূপ দান করেন ; কিন্তু প্রত্যেক বড় সাহিত্যিকই আদর্শ-নীতিবাদী—তাঁরা তাঁদের পাঠকদের সামনে সমসাময়িক পৃথিবীর একটা রূপ তুলে' ধরেন এবং পৃথিবীর অবস্থা উন্নততর করতে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেন। সাধারণ লেখা ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ নিয়েই ব্যস্ত ; কিন্তু প্রত্যেক বড় লেখকেরই মনে একটা আদর্শ থাকে ; তাঁরা পৃথিবীকে সেই আদর্শে উদ্বোধিত দেখ্‌তে চান। এ দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে প্রত্যেক প্রতিভাবান বড় লেখকই 'প্রপাগাণ্ডিষ্ট'—শ-এর মত তাঁরাও 'art for arts sake'-নীতির অনুকূলে নন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমসাময়িক সামাজিক জীবনের কতকগুলি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন—ডিকেন্স, চার্লস্ রীড্ এবং কিংস্‌লি এই শ্রেণীর শিল্পী। কিন্তু 'প্রপাগাণ্ডিষ্ট'দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হ'চ্ছেন এডোয়ার্ডের যুগের বাস্তব-পন্থীরা—ওয়েল্‌স্, শ', গল্‌স্‌ওয়ার্দি, বেনেট্ প্রভৃতি হচ্ছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এঁরা আশা-আনন্দ-হীন, আদর্শহীন, নিরস জীবনের ছবি এঁকেছেন এবং দুই ভাবে পাঠকের দৃষ্টি সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনের দুর্নীতির প্রতি আকৃষ্ট করেছেন ! তাঁদের বই পড়্‌লে স্বতই মনে হয় যে, সমাজ-জীবনে এবং রাষ্ট্রিক-জীবনে এই সব দুর্নীতির জন্য আমরা সমষ্টিগতভাবে দায়ী।

আর একশ্রেণীর প্রপাগাণ্ডিষ্ট্ লেখক আছেন, যাঁদের এ বিশ্ব-প্রকৃতির সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অভিমত থাকে। মানুষের সঙ্গে এ বিশ্বের অন্তর্সংযোগ সম্বন্ধেও তাঁরা সচেতন। তাঁরা লেখেন : "এ বিশ্বে এই সব দুর্নীতি অনাচার আছে ; এদের প্রতীকার বাঞ্ছনীয়। যারা এ পৃথিবীতে সৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ জীবনযাপন করতে চায়, তাদের এইরূপ জীবনযাপন করা কর্তব্য।" এই ব'লে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমগ্র বিশ্বের একটা প্রতিচ্ছবি আমাদের চোখের সাম্‌নে তুলে' ধরেন। এঁরা মানব-সমাজের জন্য বাণী নিয়ে আসেন এবং মানুষকে নূতন এবং উন্নততর জীবনের আশায় উদ্বোধিত ক'রে তোলেন। বুসিয়াম্, সুইফ্‌ট্, ব্লেক্, টলষ্টয়, শ', আল্ডুস্ হাক্‌স্‌লি প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিল্পী। তারা পাঠকদের মনে পাপের ভাব জাগিয়ে দেন ; পাঠকদের বুঝিয়ে দেন যে অন্যে যে পাপ করে তার জন্য তারাও সমষ্টিগতভাবে দায়ী। পাঠকদিগকে উদ্বুদ্ধ করতে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ব্যঙ্গের সাহায্য নিতে হয়—তাই ওঁদের পুস্তকে ব্যঙ্গোক্তি বা সেটায়ারের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। হাক্‌স্‌লির মধ্যেও যথেষ্ট 'সেটায়ার' আছে। তাঁর 'জেষ্টিং পাইলট' বইখানা প্রাচ্য দেশের ভ্রমণ কাহিনী। হাক্‌স্‌লি যখন জাহাজে ভারতে আস্‌ছেন, তখন তাঁর সহযাত্রীরা অনেকেই বল্‌ছিলেন যে ভারতে গেলে সময়টা বেশ আমোদে কাটবে। তাদের এই আমোদ-প্রমোদের ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ ক'রে হাক্‌স্‌লি তাঁর জেষ্টিং পাইলট এ কি লিখ্‌ছেন শুনুন : "Everybody in the ship menaces us with the prospect of a 'good time' in India. A good time means going to the races, playing bridge, drinking cock-tails, dancing till four in the morning, and talking about nothing. And meanwhile, the beautiful, the incredible world in which we live awaits our exploration and life is short and time flows stanchlessly like blood from a mortal wound.…And there is all knowledge, all art… Heaven, preserve me in such a world, from having a 'Good Time' ! Heaven helps those who help themselves. I shall see to it that my time in India is as bad as I can make it." বিশ্বকে জান্‌বার এই অনন্ত স্পৃহা, জ্ঞানের প্রতি এই অসীম অনুরক্তিই হাক্‌স্‌লির জীবনের মূলমন্ত্র।

একটি স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধের মধ্যে হাক্সলির সমস্ত পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা সম্ভবপর নয়। বর্তমানে আল্ডুসের নীতি-জ্ঞান (morality) সম্বন্ধে দুচারটি কথা ব'লেই প্রবন্ধ শেষ করব। প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে, নীতিপরায়ণতা আল্ডুসের প্রতি রক্তবিন্দুতে মিশে' আছে। হাক্সলির পিতামহ টি-এইচ-হাক্‌স্‌লি এবং মাতামহের পিতা ডাঃ আনল্ডের নাম ইতিপূর্বেই ক'রেছি। এঁদের মধ্যে পিতামহের বিশ্বাস ছিল যে, জ্ঞান-হীনতাই মানুষের কালস্বরূপ ; সত্যের অনুশীলন না করলে মানুষের উন্নতি হ'বে না। আর ডাঃ আনল্ড ছিলেন নীতিজ্ঞ পণ্ডিত ; তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পাপই মানুষের ব্যাধিস্বরূপ এবং এ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় চরিত্র দৃঢ় করা। আল্ডুস্ হাক্সলির মধ্যে আমরা এ দুই মতেরই সংমিশ্রণ দেখি। তিনি স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী। কাজেই যখন শুনি যে, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় তাঁর বই আগুন দিয়ে পোড়ানো হ'য়েছে বা তাঁর নিজের দেশ ইংলণ্ডে অনেক পাব্লিক্ লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ তাঁর বইকে তাঁদের লাইব্রেরীতে স্থান দেন না, তখন আমরা বিস্মিত হই নে। কারণ প্লেটো, আরিষ্টট্‌ল্, সক্রেটিস্ প্রভৃতি অনেক বড় বড় স্বাধীন চিন্তাকারী মহাত্মাদের ভাগ্যে নির্বাসন দণ্ড ঘটেছিল তা আমরা জানি।"

মৃত্যুঞ্জয় শরৎচন্দ্র

শ্রীবিমলাকান্ত লাহিড়ী এম্-এ, বি-এল্

কথাশিল্পের সব্যসাচী হে, পথের দাবীর পতাকা রথে,
হীন সমাজের চরিত্রহীন, অমর পথিক প্রেমের পথে !
সাহিত্যে নীলকণ্ঠ স্বয়ং কালকূট বিষ কণ্ঠে ধরি ;
ঝাঁপি খুলে যত বিষধর সাপে খেলায়েছ সদা বক্ষোপরি ।
ফণীর ফণায় গরলকণায় যে প্রেম অমৃত লুকায়ে থাকে
দীনা জননীর সন্তান তুমি কোন সাধনায় জিনিলে তাকে ?
বিস্মিত দেশ বীর নির্ভীক ইন্দ্রনাথের শৌর্য্য স্মরি'
অন্নদা আর বিলাসীরে বল চিনিত কে হেথা এমন করি !
শাহজীর ওই কবরের 'পরে কুলটা সতীর নয়নবারি
গড়িল তৃণের যে তাজমহল সমাজ কি খোঁজ রাখিল তারি ?
শ্মশানে মশানে ছিল তব গতি লয়ে ভবঘুরে পথেরি সাথী,
জানিতে সমাজ শাসনের ঝড়ে নিভেনা কিশোর-প্রেমের বাতি
স্বয়ম্বরের চিতানলে দহি পার্ব্বতী হ'ল ভস্মশেষ,
দেবতা তাহার দুয়ারে আসিয়া জুড়ালো জীবন বহন-ক্লেশ ।
প্রেমের বাঁধন শাশ্বত দৃঢ়, নিন্দা গ্লানি সে তুচ্ছ করে ।
চির-ভবঘুরে শ্রীকান্ত যার দুর্ব্বার টানে ফিরিল ঘরে ।
কভু প্রশান্ত কখনো ভীষণ প্রেমের প্রবাহ বহালে হেন,
পদ্মার মত কূল ভাঙ্গে কভু, অন্তঃসলিলা ফল্গু যেন !
অন্তর মাঝে সকল হারায়ে বড়দিদি দেখি আপনা ভুলে
মরণ পথের পথিকে সাজালো পরম প্রেমের সুরভি ফুলে ।
সৃষ্টি তোমার সৃষ্টিছাড়া হে,—পরের ছেলেতে নাড়ীর টান,
শান্ত শিষ্ট মেজদিদি তাই স্বামীর বচনে দিল না কান ।
স্নেহের বিন্দু গড়িল সাগর, হিংসার বায়ে উঠিলে ঝড়
বিন্দুর ছেলে তরণী বাহিয়া আনিল ফিরায়ে কূলের 'পর ।
রামের সুমতি স্নেহ রসে প্রেমে পথনির্দ্দেশ করেছ তুমি,
রমা রমেশের বিচ্ছেদে কত ব্যর্থ হয়েছে পল্লীভূমি ।
মামলার ফল হোক্ না যাহাই স্নেহের রায়েতে আপীল নাই
বসিয়া মর্ত্ত্যে বৈকুণ্ঠের উইলে আমরা প্রোবেট পাই ।
গিরীশে দিয়েছ নিষ্কৃতি তুমি উদার স্নেহের সিংহদ্বারে,
মহেশবাহন মহেশ মরেছে মহাজনেদের অত্যাচারে ।

বিপ্রদাসের বন্দনা শুনি, জানি অনুরাধা নিঃস্ব নয়,
বৃন্দাবন যে ধন্য হেরিয়া চরণ তাঁহার বিশ্বময় !
খেলার সোহাগে মালার বাঁধন পরিণীতা-মন রহিল জুড়ি,
অরক্ষণীয়া রক্ষা পেলো কি শ্মশানের ঘাটে ভাঙিয়া চুড়ি !
দত্তা যাহার তাহারেই দিলে যে ছিল দাতার মনঃপুত,
গৃহদাহধূমে হারাইয়া পথ ফিরে ধূমকেতু কক্ষচ্যুত ।
স্বামীর প্রেমের পরশপাথর না ছুঁলে যে সোনা হয় না নারী
নারীর দর্পচূর্ণ করেছ, শরণ নিয়েছ চরণে তারি !
নীলাম্বরের বিরাজবউ যে দুঃখের খাদে হীরার খনি,
তব একাদশী-বৈরাগী নয়, বামুনের সে যে মাথার মণি ।
জাতের বড়াই মিথ্যা যে কত—বামুনের মেয়ে বুঝিল ভালো
সত্য প্রেমের ত্যাগের শিখায় বিজলী দিয়াছে আঁধারে আলো !
সমাজ বড় কি অন্তর বড় বুঝিল যখন চন্দ্রনাথ
মন্ত্রী হারায়ে বিশুর দাদুটি দাবায় করিল কিস্তিমাৎ ।
শেষ প্রশ্ন যে করিয়াছো তুমি—প্রশ্নের শেষ আছে কি গুরু ?
কেউ কি জেনেছে কবে তার শেষ কবে এ জগতে প্রশ্ন সুরু !
সমাজ চাহে না সত্যের আলো, স্বার্থে সে দেয় হৃদয় বলি,
মিথ্যার বোঝা বহিয়া পৃষ্ঠে মানব চিত্ত চলেছে দলি' ।
নববিধানের নবীন অস্ত্রে মুখোস তাহার ফেলেছ দূরে
নূতন মানুষ গড়িতে এদেশে নব নব রূপে আসিও ঘুরে ।
রাজা মহারাজ ধনীর সমাজ নহে ক' তোমার বিলাস ভূমি,
শুধু দুঃখীর মরমবেদনা হৃদয়রক্তে এঁকেছ তুমি ।
কর্ম্মই শুধু মানুষের হাতে দৈবায়ত্ত জনম কুলে,
চিত্ত শুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তে, জীর্ণ সমাজ গিয়েছে ভুলে ।
ওগো সাপুড়িয়া মৃত্যুঞ্জয় ! অক্ষয় তব বিষের ঝাঁপি,
তব ডম্বরু বাজে গুরু গুরু—সমাজের বুক উঠিছে কাঁপি ।
কেউ তো জানে না কখন্ কোথায় কোন্‌রূপে হয় অভ্যুদয়,
পেয়েছিনু তোমা মানুষের মাঝে, মনে হয় তুমি মানুষ নয় ।
শিল্পী, স্রষ্টা, যুগের দ্রষ্টা, হৃদয়ের বেদ কণ্ঠে তব,
বাঁচিব আমরা যেদিন তোমার অমৃতমন্ত্রে দীক্ষা লব ।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম্‌-এ

১৮

লেডী ডাক্তার মিসেস্ চম্পটী বয়সে প্রবীণা, বেশে বিধবা, স্বভাবেও কিছু গম্ভীরা, অথচ সুশিষ্ট সুমন্দস্মিত সুমিষ্ট স্বল্প-ভাষিণী—অন্ততঃ প্রথম সাক্ষাৎকালে লোকের এইরূপ মনে হইবে।' বেশ ফিট্‌ফিট্ বিধবার বেশধারিণী কুরঙ্গ (বা কুরঙ্গিণী) নাম্নী একটি পরিচারিকাসহ বড় একটা বাড়ীর ত্রিতলস্থ একটি ফ্লাটে বাস করেন। বাড়ীটিও ছিল মধ্য-কলিকাতার গৃহস্থ বাঙ্গালী-বসতি-বিরল কোনও পল্লীর অনতিপ্রশস্ত একটি রাস্তার উপরে। এদিক ওদিক দুই তিনটি খোপর ও নব্য কায়দার দুইটি স্যানিটারী বাথরুমসহ চারিটি ঘর ছিল এই ফ্লাটে।—একটিতে মিসেস চম্পটি বসিতেন, একটিতে শয়ন করিতেন, আর একটিতে প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যাদিসহ কুরঙ্গ থাকিত; চতুর্থটিও বেশ একটি সুসজ্জিত গৃহ, বন্ধুজন কেহ কখনও আসিলে থাকিতেন, চিকিৎসার্থিনী কোনও রোগিণী আসিয়াও প্রয়োজনমত কখনও আশ্রয় গ্রহণ করিত।—এই ঘরটিকে মিসেস চম্পটী guest room বলিতেন। পাশেই একটি দরজা থাকিত সাধারণতঃ তালা বন্ধ। দরজার ওধারে আরও একটি ঘর বোধ হয় ছিল—কি প্রয়োজনে ব্যবহার হইত সাধারণতঃ কেহ জানিত না। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ডানদিকে এই ফ্লাট, বাহিরে একখানি পিত্তল ফলকে পরিচয়সহ মিসেস্ চম্পটীর নাম উৎকীর্ণ। বাঁ-দিকেও তালা বন্ধ একটি দরজার উপরে Nook (নুক) এই নামাঙ্কিত আর একটি পিত্তল ফলক। অন্যান্যদিকে যে সব ফ্লাট আছে সেগুলির সিঁড়ি সব পৃথক্ পৃথক্—প্রত্যেকটি সিঁড়ির সঙ্গে দ্বিতলে ও ত্রিতলে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি ফ্লাট। একতলার বড় একটি অংশে বড় একটি রেস্তরাঁ আছে, অন্যান্য অংশে কতকগুলি দোকানঘর। ভাড়াটিয়া বেশীর ভাগই মাদ্রাজী, মারাঠী, গুজরাটী, দুই একজন ফিরিঙ্গী ও ফিরিঙ্গী কায়দায় বাঙ্গালী। কেহ পরিবারসহ কেহ বা বন্ধুজনসহ বাস করেন; আহারাদির বন্দোবস্ত অনেকেই রেস্তরাঁর সঙ্গে করিয়া লইয়াছেন। তবে মিসেস্ চম্পটীকে কুরঙ্গ একটি খোপরে পাক করিয়া দেয়। ব্যয়ও কিছু কম পড়ে; আবার উভয়েই, বিধবা, হিন্দু বিধবাই নাকি বটেন। স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা কিছু দেখা দিলে চিকিৎসকের আদেশে সামিষ পথ্যগ্রহণে scruple (কুণ্ঠা) বিশেষ কিছু না থাকিলেও নিরামিষ ভোজনই সাধারণতঃ করিয়া থাকেন।

এ হেন লেডী ডাক্তার মিসেস চম্পটীর গৃহে লতা আশ্রয় পাইল। আদরের বাগ্‌বহুল আগ্রহাতিশয্য কিছু না দেখাইলেও যথাযোগ্য সৌজন্যেই লতাকে তিনি গ্রহণ করিলেন। 'গেষ্ট-রুমটি'ই আপাততঃ তাহার থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। আহারাদির ব্যবস্থা—তা কুরঙ্গর হাতে খাইতে যদি আপত্তি উঁহার না থাকে, একসঙ্গেই চলিতে পারিবে। আর যদি থাকে, পৃথক্ পাক করিয়াও খাইতে পারেন, কুরঙ্গ সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। বিনীতভাবে লতা জানাইল, অসুবিধা ইঁহাদের কিছু না হইলে নিজেই পাক করিয়া খাইবে। প্রয়োজনীয় কিছু কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য খরচের জন্য কিছু টাকাও মিসেস্ চম্পটীর হাতে সুকেশবাবু দিলেন; লতা চাহিয়া দেখিল, মুখখানি একদিকে একটু ফিরাইয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধীরে ধীরে একটি নিঃশ্বাস ছাড়িল। কিন্তু কি করিবে? মুড়ী কিনিয়া খাইবে এমন একটি আধলা, স্নান করিয়া পরিবে এমন একখানি ছিন্ন বস্ত্রও যে তাহার সম্বল নাই। আপাততঃ ইঁহার এই দয়া ব্যতীত আর কি উপায় তাহার আছে? আজ এই মহা বিপদ হইতে মুক্তি, আর তার পর এই আশ্রয় যে সে পাইল, তাহাও ত ইঁহারই দয়ায়—আরও কিছুদিন ইঁহারই দয়ার উপরে তাহাকে নির্ভর করিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর—রাত্রি আটটা তখন বাজিয়াছে, সুকেশ-বাবু আসিলেন। কুরঙ্গ দরজা খুলিয়া দিল।—

"কই, উনি—"

কুরঙ্গ উত্তর করিল, "মিসিস্ (missis) ত বাড়ীতে নেই—এই ত মিনিট দশ পনের হ'ল বেরিয়ে গেলেন।"

"ও—তা কখন ফিরবেন?"

"ঠিক ত কিছু নেই। ন'টা তকও ফিরতে পারেন। আর যদি আটক প'ড়ে যান—একটি পেসেণ্টের পেন সুরু হ'য়েছে কিনা—কখন ফিরতে পারবেন, ফিরতে আজ পারবেনই কিনা—জানি না।"

"ও—তা'এলাম একবার ওর খবরটা নিতে—বিকেলে আর সময় ক'রে উঠতেই পারলাম না। কালও দিন ভর পারব না। তাড়াতাড়ি ক'রে অম্‌নি রেখে গেলাম—"

"ডেকে দেব?"

"দেও।"

"আর চা-টা কিছু—"

"হাঁ—বড্ড হয়রান! কোর্ট থেকে—একটা মিটিং ছিল—রাত হ'য়ে গেল—অম্‌নি ছুটে এসেছি, বাড়ীতে ফির্‌তেই পারিনি। তা এক কাজ কর বরং—রেস্তরাঁয় অর্ডার দিয়ে এস; কিছু সাণ্ডুইচ, ডিম আর চা—এই তারা পাঠিয়ে দিক্। এই নেও- এই পাঁচ টাকার নোটখানা নিয়ে যাও। চেঞ্জটা—ও আর ফেরত দেবার দরকার নাই—জান্‌লে?"

বলিতে বলিতে প্রসন্নস্মিত নয়নে চাহিয়া একখানি নোট বাহির করিয়া কুরঙ্গর হাতে দিলেন।

"ওমা! এ যে দশ টাকার নোট!"

"দশ টাকার নোট! আঁ!—ও দিইছি ত আর ফিরিয়ে নেব না—তোমার ভাগ্যি ভাল।"

একগাল হাসিয়া কুরঙ্গ কহিল, "তা—এত কেন, এত কেন? দিচ্ছেনই ত—কতই দিচ্ছেন—দয়ার পার নেই আপনার—"

"কি আর এমনদিচ্ছি? বিরক্তওত কম করি না। যাও, ওকে ডেকে দিয়ে চট ক'রে গে' রেস্তরাঁয় অর্ডার দিয়ে এস।"

বলিয়া গদী-মোড়া লম্বা একখানি আসনে গিয়া একটু কাত হইয়া বসিয়া গামোড়া দিয়া একটা হাই তুলিলেন। ছোট একটি হালকা টেবিল সম্মুখে সরাইয়া দিয়া কুরঙ্গ বাহির হইয়া গেল।

লতা আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। একটু শিরঃসঞ্চালনে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া সুকেশবাবু কহিলেন—"বস।"

এদিক ওদিক চাহিয়া একটু দূরে একখানি চেয়ারে গিয়া লতা বসিল।

"কেমন—অসুবিধে এমন কিছু হ'চ্ছে না ত?—"

"না।—অসুবিধে আর কি হবে?"

"শরীর আছে ভাল?"

"আছে।"

সুকেশবাবু একটি সিগারেট ধরাইলেন। একটুকাল নীরব থাকিয়া লতা কহিল, "ক'দ্দিন আর থাকৃতে হবে এখানে?"

সুকেশবাবু কহিলেন, "সে যদি অসুবিধে বোধ না কর, যদ্দিন ইচ্ছে হয় কি দরকার, থাকতে এখানে পার। আপত্তি ওঁর—যদ্দুর জানি—কিছু হবেনা। ওই ঘরটি ওঁর নিজের লাগেনা। অতিথি কেউ এলে থাকেন, আবার বাইরের লোককেও মাঝে মাঝে ছেড়ে দেন।"

কুরঙ্গর সঙ্গে রেস্তরাঁর একটি পরিচারক তখন খাবার ও চা ইত্যাদিসহ ট্রেখানি আনিয়া সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। একটু হাসিয়া লতার দিকে চাহিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "বড্ড হয়রান হ'য়ে এসেছি—তাই ওকে ব'লেছিলাম, কিছু চা আর খাবার নীচের ঐ রেস্তরাঁ থেকে পাঠিয়ে দিতে—হাঁ, দেও, চা-টা তৈরী ক'রেই দিয়ে যাও।"

কুরঙ্গ চা ঢালিতেই আরম্ভ করিয়াছিল, দুধ চিনি মিশাইয়া তৈরী করিয়া দিয়া গেল। কুরঙ্গ বেশ জানিত, কি পরিমাণ দুধ চিনি মিশান কিরূপ চা তিনি পছন্দ করেন।

লতা কহিল, "কদ্দিনে আমি একেবারে ছাড়া পেতে পারি?"

"দেখব, যত শীগ্‌গির পারি, একটা বন্দোবস্ত ক'রে নেব। তবে তেমন গরজ ওদের এখন হবে না। দেখি কাল পরশু তক্ পারি ত একটা তাগিদ গিয়ে দেব।—তা তুমি এখন কি ক'র্‌তে চাও? অবিশ্যি এখানেও যদ্দিন হয় থাকৃতে পার এভাবে। খরচ-পত্তর তা—সঙ্কোচের এমন কোনও কারণ নেই। বিপদে প'ড়েছ, আমি তোমার পাড়া-পড়সী লোক—আপন ভেয়ের মত—"

লতা কহিল, "কাজ-কর্ম্ম কোথাও কিছু পেলে সুবিধে হ'ত। মা কাশীতে আছেন—বেশীদিন আর থাকা সেখানে চ'লবে না। শীগ্‌গিরই তাঁকে এখানে আনাতে হবে।"

"হুঁ—তা কাজকর্ম্ম কি ক'র্‌বে ভাবছ? আবার উনিও আসবেন ঐ ছেলেটিকে নিয়ে—"

"আস্‌তেই ত হবে। কদ্দিন আর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে

থাক্‌ব ?—কাজ-কর্ম্ম সে যেখানে হয় রাঁধুনীর কাজই ক'রতে হবে। কি আর ক'রব ?"

"রাঁধুনীর কাজ! রাঁধুনীর কাজ কি হবে? কটা টাকা পাবে ? কি ক'রে চালাবে ?"

"কাশীতেও ত তাই ক'রতাম। যে ক'রে হয় দুজনে মিলে কাজ ক'রে চালিয়ে নিতেই হবে। কি ক'রব ? উপায় ত আর কিছু নেই ?"

"কাশীতে আর ক'ল্‌কেতায় অনেক তফাৎ। কাশীতে যাতে চলে, ক'ল্‌কেতায় তাতে চ'ল্‌তে পারে না।"

"কালীঘাটে দেখেছি অনেক বামনী কাজ ক'রে খায়, ছেলেপিলে নিয়েও ঘরভাড়া ক'রে থাকে।"

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "আরে রাম! তাকে কি থাকা বলে ? এক একটা খোলার কি টিনের বাড়ী। খুপরী খুপরী সারি সারি দেলাই ঘর ; হাওয়া নেই, আলো নেই, আবার বারান্দায় এক একটা উনুন ক'রে নিয়ে রাঁধে! এক কল, এক পাইখানা ; সব বাড়ীতে আবার কলও নেই—রাস্তার কলে গিয়ে জল আনে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, কেউ কেউ আবার স্নানও করে ব'সে এক একটা বাল্‌তি পেতে—আর সে কি হুড়োহুড়ি! এক একটা কল আর এক এক পাল লোক! মেয়ে পুরুষ ছেলেপিলে সবাই গিয়ে এক সঙ্গে জোটে।"

একটি নিশ্বাস চাপিয়া লতা কহিল, "কি করবে ? যারা গরীব, ভাল কাজে ভাল রোজগার কিছু ক'রতে পারে না, এইভাবেই জীবনটা তাদের কাটিয়ে দিতে হয়। এর চাইতে পাড়াগাঁয়ের কুঁড়ে ঘরেও অনেক ভাল থাক্‌তে লোকে পারে। কিন্তু কাজ ত সেথায় কিছু জোটে না। কাজেই সহরে এসে সবাই ভিড় করে। কি ক'রবে ? উপায় ত কিছু নাই, এইভাবেই জীবনটা কাটাতে এদের হয়। ভাল একটু কাজে ভাল রোজগার ক'রে ভাল একটু থাক্‌বে, এটা দেখ্‌বার ত কেউ নেই।—'সোসিয়ালিজম', 'সোসিয়া-লিজম্'—সোর গোলই একটা শুন্‌ছি। কিন্তু কাজে—কই কিছুই ত দেখ্‌তে পাইনে। গরীবের দুঃখু—দিন দিন বাড়ছে বই কমছে ত না কিছু।"

"বটে! সোসিয়ালিজম—তা সোসিয়ালিজমের কথাও তুমি জান ? এসব কথাও ভাব কিছু ?—কি জান ? কি ক'রে জান ? এর সব বই-টই কিছু প'ড়েছ ?"

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু চাহিলেন।

সলজ্জ একটু মৃদু হাসি লতার মুখেও ফুটিল ; উত্তরে কহিল, "বই-টই আর কোথায় কি পাব ? তবে বাবা সভায়-টভায় নিয়ে যেতেন, বক্তিতে অনেক শুনেছি। আর খবরের কাগজ-টাগজ পেলে মাঝে মাঝে দেখি, তাতেও অনেক কথা থাকে। কি ক'রে সেটা হ'তে পারে বুঝ্‌তে অবিশ্যি পারি না, তেমন বুঝিয়েও কেউ বলে না, লেখেও না ; তবে সবাই এঁরা বলেন, ওতে নাকি গরীবের কোনও দুঃখ থাক্‌বে না, সবাই ভাল কাজ-কর্ম্ম ক'রে ভাল থাক্‌তে যাতে পারে তার ব্যবস্থা হবে, আর ধনী দরিদ্রে এই যে ভেদ তাও উঠে যাবে।"

বেশ একটু উদ্দীপনার ভাবে সুকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কেবল তাই নয় লতা, নারী পুরুষেও এই যে ভেদ, নারীর এই যে দাসত্ব, নারীর উপরে পুরুষের এই যে সব অবিচার অত্যাচার—তাও সব উঠে যাবে, সোসিয়ালিজমকে সত্যি যদি দেশে প্রতিষ্ঠা করা যায়—আর সেটা ক'রতেও হবে! তবে আন্দোলনটা কেবল সুরু হ'য়েছে, দলও একটা বেঁধে উঠ্‌ছে। তবে কি জান, কর্ম্মীর বড় অভাব, পুরুষ কর্ম্মী নারী কর্ম্মী দুইই চাই—কিন্তু যেমন চাই, তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। তবে—(একটু হাসিয়া) থাক্ বরং ও-সব কথা এখন। পরে যদি সুযোগ হয় আলোচনা করা যাবে। এখন তোমার নিজের কথাটায় আসা যাক্। তোমাকে অন্ততঃ কালীঘাটে কোনও বস্তীতে গিয়ে থেকে কারও বাড়ীতে ভাত রেঁধে কোনও মতে দিনপাত ক'রতে হবে না। লেখাপড়াও বেশ শিখেছ, গানবাজনাও শুনেছি বেশ জান—"

আনত মুখখানি অন্য দিকে একটু ফিরাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে লতা কহিল, "শিখেছিলাম কিছু। কিন্তু অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি—"

"দিয়েছ আবার ঝালিয়ে নিতেও সহজে পারবে, সত্যি একটা দখল যদি হ'য়ে থাকে। আর লেখা পড়া—তাও বোধ হয় ম্যাট্রিক্‌তক পড়েছিলে ?"

"হাঁ।"

"কোনও মেয়ে ইস্কুলে শিক্ষকতা ক'রতে পার। কোথাও ঢুকিয়ে বোধ হয় আমি দিতে পারব। তখন প্রাইভেট ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রে একটা ট্রেণিং যদি নিয়ে

নিতে পার, উন্নতিও বেশ ক'রতে পারবে। তারপর ক্রমে আই-এ, বি-এ, বি-টি—"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লতা কহিল, "মেয়ে ইস্কুলে চাকরীতে কে নেবে? পরিচয় কি দেব?"

মুখখানি একদিকে একটু ফিরাইয়া অতি আয়াসে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইল।

সুকেশবাবু কহিলেন, "হাঁ, সে একটা শক্ত কথাই বটে। কোনও গেরস্ত বাড়ীতেও মেয়েদের পড়াতে কি গান শেখাতেও পরিচয় একটা দিতে হবে।"

লতা নীরব। নীরবেই মুখ ফিরাইয়া অশ্রু সম্বরণের চেষ্টা করিতেছিল। সুকেশবাবু কহিলেন, "তবে কাজ আরও অনেক আছে—যা তুমি বেশ ক'রতে পার, আর তাতে বেশ দু-পয়সা রোজগারও হ'তে পারে।"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে লতা কহিল, "কি, বলুন।"

"কেঁদো না। একটু স্থির হ'য়ে ব'সে শোন।"

অশ্রু মুছিতে মুছিতে লতা ঘুরিয়া বসিল; সুকেশবাবু কহিলেন, "নার্সিং আর মিডওয়াইফের কাজ ক'রেও ঢের মেয়ে এই ক'লকেতায় বেশ রোজকার ক'রে খায়, স্বামী আর ছেলেপিলেদেরও পালন কেউ কেউ করে। মিসেস্ চম্পটীর খুব বড় প্রাক্‌টিস্ আছে; তাঁর সঙ্গে থেকে যদি কাজ কর—অল্পদিনেই প্রসূতির শুশ্রূষা, আর তার পর ক্রমে প্রসব করাতেও বেশ শিখে উঠ্‌তে পার্‌বে।"

"কিন্তু সময় ত কিছু লাগবে। ততদিন—"

"ততদিন—খুব বেশী দিনও লাগ্‌বে না। তা—তোমার বুদ্ধির আর যোগ্যতার পরিচয় পেলে—এখুনি হয় ত তাঁর একজন এসিষ্টান্ট ব'লে তোমাকে নিতে পারেন। যাতে নেন, সেটা আমিও ব'লে ক'য়ে করিয়ে দিতে পারি। অনেকেই এখানে প্রসবের পর নার্সের মত একজন স্ত্রীলোক রাখে, খোরাকী সমেত দৈনিক অন্ততঃ একটা ক'রে টাকা দেয়। প্রসবের সময়ও সাহায্যের জন্য কাউকে এঁরা সঙ্গে নিয়ে যান। তাতেও গোটা দুই টাকা অন্ততঃ পায়। সুবিধা হ'লে এদেরই কাউকে আবার নার্সিংএর কাজে নিযুক্ত ক'রে দেন। আর সে নার্সিং তোমার মত শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে দেখিয়ে দিলে কাল পরশু থেকেই করাতে পারবে।—"

"তা পারব। দেশে থাক্‌তেও আঁতুড় ঘরে অনেক পোয়াতীর সেবা-শুশ্রূষা মাঝে মাঝে ক'রেছি।"

"তবে থাক্‌তে হবে তোমাকে আপাততঃ এখানেই ওঁর সঙ্গে—"

"এখানে—"

"হাঁ, সর্ব্বদা ওঁর কাছে থাকা চাই যে যখন তখন প্রসবের কাজে কি প্রসূতির কোনও তদ্বিরে সঙ্গে তোমায় নিয়ে যেতে পারেন। ঘরেও অবসরমত তোমাকে শেখাতে টেখাতে পার্‌বেন।"

"তাই তবে থাক্‌ব।—কিন্তু মা—"

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "এখানে কি তাঁর এসে থাকবার সুবিধে হবে? আপাততঃ কাশীতেই তিনি আছেন, থাকুন না আর কিছুদিন? একটু তৈরী হ'য়ে নিয়ে কাজকর্ম্ম কিছুদিন করে আলাদা একটা বাসা ক'রে থাকবার মত সুবিধে যখন হতে পারে বুঝবে, তখন তাঁদের আনাবে।"

"দেখি—তবে ওখানে আর বেশীদিন থাকবার সুবিধে বোধহয় তাঁর হবে না—"

"সে না হয়, তখন যা হয় একটা কিছু করা যাবে। আপাততঃ এইখেনেই ওঁর এসিষ্টান্ট হ'য়ে থাক। এখুনি হয়ত উনি আস্‌বেন, আমি ব'লে যাব খ'ন। তারপর তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে পাকা বন্দোবস্ত যা ক'রতে হয় উনিই ক'রে নেবেন।"

লতা আর কিছু বলিল না। ঘড়ীর দিকে একবার চাহিয়া একটা হাই তুলিয়া সুকেশবাবু আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। নীরবে কিছুক্ষণ টানিয়া শেষে কহিলেন, "অবিশ্যি এই সব কাজও তোমার ঠিক যোগ্য কাজ হয় সেটা ব'ল্‌তে পারিনা, তবে চ'লে এক রকম যাবে। খোকাটিকেও কষ্টে সৃষ্টে মানুষ ক'রে তুলতে বোধহয় পারবে। কিন্তু যে শক্তি তোমার আছে তার সার্থকতা এতে কিছু হ'তে পারে না। যে বুদ্ধি, যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, চরিত্রের যে দৃঢ়তা, দুঃখে যে সহিষ্ণুতা, অতিবড় বিপদের কঠিন সব সঙ্কটে অসাধারণ যে ধীরতার পরিচয় তোমার পেয়েছি—আজ আরও পেলাম—তাতে অনেক বড় কাজের যোগ্য তুমি, আর সে সব কাজের প্রবল একটা ডাকও দেশে এসেছে।"

একটু বিস্ময়ে লতা মুখ তুলিয়া চাহিল; কহিল, "বুঝতে

—ঠিক পারলাম না কি আপনি ব'ল্‌ছেন, কি আর আমি ক'রতে পারি।"

হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "বুঝতে পারছ না? তা কিছু কিছু পারছও বই কি? খবরাখবরও ত বেশ কিছু রাখ—খবরের কাগজও পড়। দেশে যে বড় একটা উলট পালটের যুগ এসেছে, কত বড় বড় আন্দোলন যে দেশকে অতি চঞ্চল অতি মুখর ক'রে তুলেছে। রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, কোনও কিছুই যেমনটি ছিল তা আর থাক্‌তে পার্‌ছে না, পুরোণো সব বাঁধন ছিঁড়ে নূতন জীবনে নূতন ধারায় নূতন পথে চ'লবার জন্যে, আর তাতে ক'রে দেশকেও নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলবার জন্যে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। ঐ যে সোসিয়ালিজমের কথা ব'ল্লে, তাও এর ভেতর অতিবড় অতি ব্যাপক আর গভীর একটি আন্দোলন—অন্য সব আন্দোলনই যার ভেতর গিয়ে আত্ম-সমর্পণ ক'রছে, ক'রে সেইটেকেই অতি প্রবল, একেবারে দুর্ব্বার ক'রে তুল্‌ছে। নারীকর্ম্মীও বহু এসে এইসব কর্ম্মপ্রবাহে প'ড়েছেন, কিন্তু ঠিক পথে এদের চালাতে পারেন, এমন কাউকে বড় পাওয়া যাচ্ছেনা। যে শক্তি, যে সব গুণ থাক্‌লে এদের ঠিক 'গাইড,' (guide)—নেত্রী হ'তে পারেন, সেই শক্তি, সেইসব গুণ তোমাতেই আছে। চাই কেবল একটু ট্রেনিং—কাজের একটু অভ্যাস—যাতে প্রচ্ছন্ন এই শক্তি, এইসব গুণ—যোগ্য পথ পেয়ে তার যোগ্যক্ষেত্রে মহীয়সী, অশেষ কল্যাণকরী একটা কর্ম্মশক্তি-রূপে বিকাশ লাভ ক'রে নিজে সিদ্ধির গৌরবে ধন্য হবে, দেশকেও তার কাম্য লক্ষ্যস্থলে নির্ব্বিঘ্নে গিয়ে পৌছবে।—এই যে ইনিও এসে পৌছবেন। আসুন মিসেস চম্পটী, নমস্কার!"

"নমস্কার!—কখন এলেন আপনি?"

"সে এই ঘণ্টাখানেক—না, ঘণ্টা দেড়েকের ওপর হ'য়ে গেছে—দশটা প্রায় বাজে। আচ্ছা থাক্ তবে এসব কথা আজ লতা। তুমিও বোধ হয় চ'ম্‌কে গেছ। তা—সে পরে ক্রমে আলোচনা করা যাবে, বোঝাতেও বোধহয় তোমাকে পারব। আজ তবে এঁর সঙ্গে যে কাজ ক'রবার কথা হ'চ্ছিল, তাই হ'ক। আর ক'রতেও হবে আপাততঃ তাই বটে।"

বলিয়া মোটামুটি কথাগুলি মিসেস চম্পটীকে সুকেশবাবু বুঝাইয়া বলিলেন।

একটু হাসিয়া মিসেস্ চম্পটী কহিলেন, "তা বেশ, ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে বুঝি। যদি পছন্দ করেন, আর এসব কাজ পারবেন বুঝ্‌তে পারি, আমার সঙ্গেই উনি থাক্‌বেন, কাজ যখন যেমন এসে জোটে ক'রবেন। খুব শীগ্‌গিরই একটা কাজে বোধহয় লাগিয়ে দিতে পারব। কেনই বা পারবেন না? বুদ্ধি আছে, লেখাপড়াও শিখেছেন, কাজকর্ম্মেও বেশ চ'টপটে ব'লে মনে হয়। একটু দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারলে চালিয়ে বেশ নিতে পারবেন।"

সুকেশবাবু কহিলেন, "এসব কাজকর্ম্মের অভ্যেসও কিছু আছে। দেশে থাক্‌তে আঁতুড় ঘরে গিয়ে প্রসূতি আর শিশুর সেবাশুশ্রূষা মাঝে মাঝে ক'রত।"

"তবে ত কথাই নাই।"

"আচ্ছা, উঠি তাহ'লে আজকে। নমস্কার! আসি তাহ'লে লতা। দেখি—যদি পারি—কাল সন্ধ্যেয় আবার এসে খবর নেব। মনস্থির ক'রে লেগেই যাও আপাততঃ এই কাজে।"

লতা উঠিয়া নমস্কার করিল। সুকেশবাবু বিদায় হইলেন।

১৯

বৈকালে সুকেশবাবু উঠিয়া যখন গেলেন, আফিসের কাজে আর না আসিয়া হরমোহনবাবু খাস কামরায়ই বসিয়া রহিলেন, বসিয়া কিছুক্ষণ অতি নিবিষ্টভাবে কি ভাবিলেন। যখনই হউক, বাড়ীতে আজ ফিরিতেই হইবে এবং গৃহিণীর সঙ্গেও তীব্র একটা সংগ্রামের সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইবে। কিন্তু তার আগেই এদিকের আট-ঘাট সব এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে যে সহজেই তাঁহার মুখ বন্ধ হয়; আর কোনও জিদ কোনও যুক্তি এতটুকুও জোর কোনও ফাঁকে না পায়। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও চারিটা বাজে নাই। বৈবাহিক ললিতবাবু ছিলেন বড় একটা ইন্‌সিওরান্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট; পাঁচটায় এই আফিসে আসিয়া অবশ্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন, ফোনে এই খবর দিয়া আফিস ব্যাগে ব্যাঙ্কের চেক বহি ও আরও কি কি কাগজপত্র লইয়া তিনি বাহির হইলেন। যে ব্যাঙ্কে লতার জন্য টাকা রাখিয়াছিলেন, সেই ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। ব্যাঙ্কের 'ট্রাষ্টে' বা

ন্যাসরক্ষকতায় বার হাজার টাকা পূর্ব্বেই আমানত ছিল—আরও আটত্রিশ হাজার টাকায় পুরা পঞ্চাশ হাজারের একটা 'ট্রাষ্টে'র ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পাঁচটা তখন প্রায় বাজে। ললিতবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বৈবাহিকের কথা সব শুনিতে শুনিতে ললিতবাবুর চক্ষু-মুখ অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল; কহিলেন, "এই সব জেনে শুনেও আপনি এই সর্ব্বনাশ আমার ক'রেছেন?"

ধীরভাবেই হরমোহনবাবু উত্তরে কহিলেন, "যা ক'রেছি তা ক'রেছি—ফেরাবার পথ কিছু আর নাই। গাল ফৈজৎ—যত খুসী তুমি দিতে পার—আমিও মাথা পেতে নিচ্ছি; ধ'রে মার্‌লেও কথাটি কব না। কিন্তু লাভ ত কিছু ওতে হচ্ছে না। তোমার মেয়ে বউ হ'য়ে আমার ঘরে এসেছে, বউ হ'য়েই তাকে থাকতে হবে। এখন সুখে শান্তিতে সে যা'তে থাক্‌তে পারে—সেটা যেমন আমাকে, তেমনি তোমাকেও ত দেখ্‌তে হবে।"

"সুখ শান্তি!—কি আর সুখ শান্তি তার হ'তে পারে? যার হাতে তাকে দিয়েছিলাম—"

"জানি, অতি বড় নোংরা নচ্ছার-মো একটা সে ক'রেছে। তা—হরেক রকম এমন নোংরামো নচ্ছার-মো ব্যাটাছেলেরা ক'রে থাকে—বিশেষ যদি বাপের ঘরে পয়সা তেমন কিছু থাকে। এসব ঘরের ছেলের হাতে মেয়ে যারা দেয়, তারা অনেক কিছু এখন জেনে শুনেও দেয়। পৃথিবীর হাল চালের জ্ঞান একটু যাদের আছে, তাদের এটা অন্ততঃ বোঝা উচিত, পয়সাওয়ালা বাপের ধরের অতি কম ছেলেই এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে একেবারে মুক্ত, অথবা মুক্ত চিরকাল থাক্‌বেই।—"

ললিতবাবু উত্তর করিলেন, "বলতে পারি না। তা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি যাই বুঝে থাকুন, আমি তেমন কিছু বুঝবার অবসর পাইনি। তবে আপনার মত অত বড় ধনীও ত আমি নই। আর জেনে-শুনেও—না, আমি অন্ততঃ জান্‌তাম না কিছু। জান্‌লে মেয়ে আমি ওর হাতে দিতাম না।"

"অন্ততঃ বিয়ের পরেই যখন তাকে বিলেত পাঠান হ'ল—বছর তিনেক সেথায় থাক্‌তে হবে জেনেও—আপত্তি ত কিছু করনি। আর বিলেতের ছাত্র-জীবনও জান। আর এদেশের ছেলে যারা যায়, প্রচুর টাকাও হাতে পায়, তারাও যে একেবারে গুরুকুলের ব্রহ্মচারী হ'য়ে সেথায় থাকে না—আরও আজকালকার এই নাইট ক্লাব, ড্যান্সিং হল, মিউজিক হলের যুগে—সেটাও অজানা কারও আর নাই। তবু বিয়ে দিয়েও জামাইকে লোকে বিলেত পাঠায়। বিলেত-ফেরত একটা ছেলে পেলেও মেয়ে দেবার জন্যে বাপ মায়েরা সব পাগল হ'য়ে ওঠে; হাজার হাজার টাকার দাবী মিটিয়েও মেয়ে দিয়ে কৃতার্থ হয়।—"

একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া আমতা আমতা করিয়া ললিতবাবু কহিলেন, "তা—যেখানকার যেমন আবহাওয়া—গিয়ে একবার প'ড়লে প্রভাবটা একেবারে এড়িয়ে চ'ল্‌তে সহজে বড় কেউ পারে না। তবে দেশে আবার ফিরে এলে—দেশের এই আবহাওয়ায়—"

"অদ্দূর এসে কেউ বড় পৌছয় না—ও-দেশের যে একটা আবহাওয়া দেশে এসে প'ড়েছে—ওরাই এনে ফেল্‌ছে—তারই ভেতর র'য়ে যায়। একটু বড় পদে যারা উঠেছে, দেখ গিয়ে সন্ধ্যেয় ডিনার টেবিলে তাদের মদের বোতলও শোভা পাচ্ছে। আর আমাদেরই মেয়ে যারা তাদের মেম-সাহেব গিয়ে হ'চ্ছে, ঢুকু ঢুকু একটু তাদেরও যে শেষে কারও কারও না চলে তা নয়। আবহাওয়া এড়াবে কি ক'রে? আর এক টেবিলে খানা-পিনা বন্ধু-বান্ধবও এসে জোটে—যেমন এটা তেমন ওটা সমান ভাবেই চ'ল্‌বে; দুটোর ভেতর একটা গণ্ডী টেনে কদিন কে রাখতে পারে?"

"কি ব'ল্‌ছেন আপনি! এত বড় একটা libel বিলেত-ফেরতদের বিরুদ্ধে—"

"না, সবাই ওরা এই ধারা ধ'রেছে এমন কথা বল্‌তে চাইনি। আর বড় পদের বড় রোজগারে খানা-পিনার অতখানি উঁচু কায়দায়ও সবাই গিয়ে ওরা উঠ্‌তে পারে না—গরীবানা দিশী চালে কতকটা দিশী গেরস্তর মতও অনেকে থাকে, থাকতে বাধ্য হয়। তবে ঐ চালে গিয়ে যারা উঠেছে, খবর নিয়ে গে দেখ, বুঝতে পারবে মিছে একটা মনগড়া অপবাদ আমি দিই নি। বাপ মা যারা তারাও বেশ এটা হজম ক'রে যায়—বরং মেয়ে যে মস্ত একটা মেম-সাহেব হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে টেবিলে খানা-পিনা করে—বড় বড় হোটেলের কি সাহেব বাড়ীর লঞ্চে, ডিনারে, টি-পার্টিতে, স্বামীর সঙ্গে মিষ্টার ও মিসেস্ অমুক অমুক হয়ে গে

বসে, কাগজেও নাম বেরোয় তাতে বরং গৌরবই বোধ করে।"

"তাহলে আপনি বল্‌তে চান, বিরিঞ্চি যা করেছে, সেটাকেও ধন্য ধন্য করে গৌরবে আমাকে মাথায় তুলে নিতে হবে?"

"না, তা বলছি নি। অতটা পাগলও হই নি।—কথার ওপর কথা উঠল, একটা দৃষ্টান্ত কেবল তুল্লাম। কথা হচ্ছে কি জান, চরিত্রনীতির হিসেবে এই যে ত্রুটিটা তার ঘটেছে, এটা তুমি উপেক্ষা করতে পার। আর বল্‌তে কি, তুমিও জান, আমিও জানি, এ সব বিষয়ে ওর দোষ-ত্রুটি দেখ্‌তেই বড় কিছু পাওয়া যায় না, নিন্দেমন্দের কথাও কখনও কিছু শুনিনি; সে ধারারই ছেলে ও নয়। তবে এই একটা কাণ্ড যা করে ফেলেছে—"

"সেইটে যে অতি গুরুতর একটা ত্রুটি হ'য়েছে।—অন্য সব দোষ ত্রুটি—হাঁ, অনেক ছেলেরই থাকে বটে—ক্ষমা কি উপেক্ষা বরং করা যেতে পারে।—শুধরেও কেউ কেউ যায়। কিন্তু এই যে একটা বিয়ে ক'রে তাই চেপে আর একটি ভদ্রলোকের মেয়েকে গিয়ে বিয়ে ক'রেছে—তাও আবার আপনারই জ্ঞাতসারে ও অনুমোদনে—কেবল তাই কেন, করিয়েছেনই আপনি তাকে বাধ্য ক'রে, নইলে হয়ত ক'রত না—"

"ঠিক কথা! কিন্তু অপরাধটা তাতে তার এমন কিছু হয় নি, হ'য়েছে যা আমার।—সুতরাং আমার সম্বন্ধে যে ভাবই তুমি পোষণ কর, তাকে অবশ্য মাফ ক'রতে পার। এখানে সে হ'চ্ছে rather passive victim, active offender নয়।"

একটু কাল চাপিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ললিতবাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ, ঠিক কথাই ব'লেছেন আপনি। বিরিঞ্চি—victimই বটে।—দুর্ব্বলতা যাই দেখিয়ে থাক, তেমন কোনও moral turpitude তার বড় দেখ্‌তে পাচ্ছিনি। তবে আপনি—আপনার কি ক'র্‌তে পারি আমি?"

"ক'র্‌তে কিছুই পার না।—তবে কিনা তুমি আমার প্রথম আর প্রধান কুটুম্ব, নিজের ছোট ভাইটির মত অতি স্নেহের চক্ষেই তোমায় দেখি। সেই তুমি মনে মনে আমার ওপর চ'টে থাকবে, অতি পাজি একটা লোক ব'লে ঘেন্না আমায় ক'র্‌বে—সেটাও কম শাস্তি আমার পক্ষে নয়। তবে সে শাস্তির যোগ্য আমি। ক্ষমা চাইব না, চাইতে পারি না—তবে ক্ষমা যদি কখনও ক'রতে পার, ব'লব তোমার অশেষ দয়া।"

মনে মনে ললিতবাবু তখন বেশ একটু নরম হইয়াই পড়িলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া শেষে কহিলেন, "যাই হ'য়ে যাক্‌, স'য়ে ব'য়েই এখন নিতে অবিশ্যি হবে। আর আপনার সঙ্গেও—মনে মনে আজ যত বড়ই আঘাত পেয়ে থাকি, এ নিয়ে কোনও বিরোধ আমার করা চ'ল্‌তে পারে না।—কিন্তু এখন এর উপায় কি হ'তে পারে? এই যে আর একটা বিয়ে ক'রেছে, আবার একটা ছেলেও তার হ'য়েছে—"

"হাঁ, সেই কথাই ত ব'ল্‌ছিলাম। কাজটা ক'রেছে সে অতি কাঁচা—আস্ত বেকুবের মত। কে বুদ্ধি দিয়েছিল জানি না।—একটু হিসেবী বুদ্ধির পাকা বদমায়েস ছেলে হ'লে সে বিয়ে ক'রত না, মেয়েটাকে নষ্ট ক'রত, হয় ত বা নিয়ে ভাগত। তা না ক'রে বিয়ে যে ক'রেছে, এইটুকু যা মন্দের ভাল ব'লতে পার। মনে মনে কিছু শ্রদ্ধাও বোধ হয় তাকে ক'রতে পার—"

"কিন্তু সেই বিয়েটা থেকে এই যে বিশ্রী একটা সঙ্কট এসে উপস্থিত হ'ল, তার এখন কি হবে!"

"হাঁ, তারই একটা কিনেরার কথা এখন আমাদের ভাব্‌তে হবে। তোমাকেও ডেকে পাঠিয়েছি তাই। বিয়েটা সিদ্ধ বিয়ে ব'লে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না, আর ঐ মেয়েটাকে আর তার ছেলেটাকেও ধর্ম্মতঃ আমার পুত্রবধূ আর পৌত্র ব'লে ঘরে আন্‌তে পারি না। সিদ্ধ বিয়ে এটা হয় না জেনেই তোমার মেয়ের সঙ্গে বিরুর বিয়ে দিতে কোনও দ্বিধা তখন করি নি। না দিয়েই বা করি কি? কিছুই ত হতভাগা আগে আমায় জানায় নি। বিয়ের সম্বন্ধ, পাকা-দেখা, হ'য়ে গেছে; দিন তারিখ সব ঠিক, আয়োজন উদ্যোগ আরম্ভ হ'য়ে গেছে; হঠাৎ বন্ধ ক'রে কি ক'রে দিই—আবার তোমার কথাটাও ত ভাব্‌তে হল। আমাদের বারেন্দর সমাজ—বাগ্‌দত্তা মেয়ে—'অন্যপূর্ব্বা' দোষ নিয়ে কোথায় কোন্ সম্ভ্রান্ত ঘরে ওর বিয়ে তুমি আবার দিতে পারতে?—তাই তিন কাণ আর না ক'রে, সব চাপাচুপি দিয়ে, এমন ব্যবস্থা একটা ক'রেছিলাম যে ওদের দেখাশুনো

আর কখনও না হয়, আর ঐ মেয়েটা না খোঁজ পায় কোথায় কার সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়েছিল। তাদের খরচপত্রেরও একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলাম।—আর বিরিঞ্চিও, দেখ্‌লাম, অবস্থাটা সব বুঝতে পেরে নরম হ'য়ে গেল, বিয়ে হ'তে হ'তেই বৌটির ওপরেও বেশ একটা টান গিয়ে তার প'ল। আর অমন লক্ষ্মী মেয়ে—না গিয়ে তা পারে? ভাবলাম, যাক্, গোলমাল সব চুকেই গেল—"

"কিন্তু চুকে ত গেল না। আবার এই যে গোলমালটা এসে উপস্থিত হল, তার কি কিনেরা আপনি ক'র্‌তে পারেন? আমিই বা কি ক'র্‌তে পারি?"

"শোন। সিদ্ধ বিয়ে ব'লে তখনও আমি এটাকে স্বীকার করি নি, এখনও ক'রতে প্রস্তুত নই। মেয়েটা কোথায় পালিয়ে গেছে। তবে ওর মা র'য়েছে কাশীতে ছেলেটাকে নিয়ে। খুব চালাক মেয়ে, তার মার সঙ্গে গিয়ে জুটে একটা দাবী দাওয়া উপস্থিত ক'রতে পারে। একটা public scandalও তাতে হবে।—সেইটি যাতে না ঘটে, তারই চেষ্টা আমাদের এখন দেখ্‌তে হবে।—আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তাদের নামে আজ ব্যাঙ্কে আমানত ক'রে রাখলাম; ওর মাকেও জানাচ্ছি, সিদ্ধ বিয়ে ব'লে ওদের আমি গ্রহণ ক'রতে পারি না—সুখে স্বচ্ছন্দে যাতে থাক্‌তে পারে, ছেলেটা মানুষ হ'য়ে ওঠে, তার জন্য এই ব্যবস্থা ক'রেছি।"

"কিন্তু যদি সন্তুষ্ট ওরা না হয়? তবু যদি দাবী একটা উপস্থিত ক'রে বিরিঞ্চির বৈধ স্ত্রী ব'লে?"

"তাহ'লে আদালতে একটা declaratory suit উপস্থিত ক'রতে হবে।—অতটা যেতে হবে না, ভয় দেখালেই তারা নিরস্ত হবে।"

"হুঁ—"

"কিন্তু সেটা ক'রতে তোমাকে তোমার মেয়ের পক্ষে—আমি নিজে পারি না। কথা কি জান? ওরা ভয় দেখালেই নিরস্ত হবে। কিন্তু ভয় হ'চ্ছে আমার বিরিঞ্চিকে নিয়ে, আর তোমার বেয়ানকে নিয়ে।—আবার মেয়েদের sentiment—কিছুই ত বলা যায় না—বৌমাও হয় ত আবদার নেবেন, ওদের ভাসিয়ে দিতে পার্‌বেন না, ঘরে আন্‌তেই হবে, ছোট বোনটির মত আমি অধীন হ'য়ে থাক্‌ব ইত্যাদি—ভাল্‌ত ওরে খুব বাস্‌ত। আমাকে তখন বড় নিরুপায় হ'য়েই প'ড়তে হবে। অন্য আপত্তির জোর বড় থাক্‌বে না। এই ব'লেই নিরস্ত ওদের ক'র্‌তে হবে, ললিত ছাড়বে না, declaratory suit আন্‌বেই। তোমাকেও সেই জিদ নিয়ে শক্ত হ'য়ে থাক্‌তে হবে। তোমার মেয়ে গিয়েও যদি পায়ে ধ'রে কাঁদে, ধম্‌কে তাকে দাবিয়ে রাখ্‌বে। সেটা তুমি পার, আমি পারি না।—"

"কিন্তু ওরা যদি ভয় না পায়? দাবী নিয়ে যদি আদালত পর্য্যন্ত যায়?"

"যাবে না, ভয় পাবেই। আইনকানুন নজির অনেক ঘেঁটেছি—শাস্ত্রের কি দেশাচারের কুলাচারের প্রমাণে সিদ্ধ বিবাহ এটা হয় না। তবে আমি যদি স্বীকার ক'রে নিই, বৌটাকে ঘরে আনি, কেউ কিছু ব'ল্‌বে না, সামাজিক গোলমালও কিছু হবে না। কিন্তু সেইটে আমি নিতে চাই না। নিতে না শেষে বাধ্য হ'তে হয়, তাই তোমার এই সাহায্য চাইছি।—তোমার নিজেরও স্বার্থ এই। আজ একটা ভাবের বশে যাই বলুক—যে ধাতুর মেয়ে, ব'লবে ব'লেই আশঙ্কা হ'চ্ছে—তা ঘরে একটা সতীন এসে ব'স্‌লে দুঃখ শেষে তাকে পেতেই হবে। তাই তুমি যদি শক্ত হ'য়ে থাক, অগত্যা তোমার দোহাই দিয়েই ওদের ঠাণ্ডা ক'রে রাখ্‌তে আমি পারব।—ওরা লড়বে না; আর আমার সঙ্গে লড়বে এ বল তাদের কোথায়? এখন ত চুপ চাপ একরকম আছে, আদালতে গেলে একটা টি টি প'ড়ে যাবে। হারলে তখন আর লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। যার কাছেই বুদ্ধি নিতে যাক্, এটা তাদের বুঝিয়ে দেবেই। নিজেরাও নিরস্ত হবে। হাঁ, তাহ'লে কি বল?"

ললিতবাবু উত্তর করিলেন, "এর আর কথা আছে কি? এ ত ক'র্‌তেই হবে আমাকে। যদ্দুর যা হ'বার হ'য়েছে, এখন শেষরক্ষা যতটা সম্ভব তার চেষ্টা ক'র্‌তেই সে হবে। নিশ্চিন্ত আপনি থাক্‌তে পারেন, কারও কথায় এ জিদ আমি ছাড়ব না, দরকার হয় suitও আন্‌ব।—"

"বাঁচালে দাদা, এখন আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। জোর যা পেলাম, ওদের দাবিয়ে রাখতে পারব।"

"কিন্তু—" বলিতে বলিতে ললিতবাবু কেমন যেন একটা সঙ্কোচে থামিয়া গেলেন।—

"কি?—"

"একটা জানাশুনো এখন হ'য়ে গেল; ভাব্‌ছি বিরিঞ্চি

যদি ওদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখে, যাওয়া আসা করে—”

“তা পারবে না। আপাততঃ চেষ্টা ক’র্‌ছি, কোনও খোঁজ না পায়। যাক্‌ আর কিছুদিন, এদিকে এই বন্দোবস্ত-গুলো সব ক’রে ফেলি, কাশীতেও ওর মাকে যা জানাবার formally জানাই। আঘাতটা আর লজ্জাটা যা পেয়েছে, একটু সাম্‌লে বিরিঞ্চি উঠুক। বৌএর সঙ্গেও একটা মান-অভিমানের পালা যা চ’ল্‌বেই, সেটাও মিটেমেটে গিয়ে একটা মিলমিশ ওদের হ’ক। তখন কোনও সম্বন্ধ হয়ত রাখতে আর চাইবেই না। আর সে মেয়েটাও, যদ্দূর বুঝ্‌তে পার্‌ছি, স্ত্রীর অধিকার না পেলে কাছেও ওকে ঘেঁস্‌তে দেবে না। তবু যদি দেখি, এরকম কিছু ঘটছে বা ঘটতে পারে, তখন ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখতে হবে; টাকাকড়ির বন্দোবস্ত যা ক’রেছি, সব cancel (নাকচ) ক’রে দেব।”

“কি ক’রে আর তা ক’র্‌বেন? টাকা নাকি তাদের নামেই আমানত রেখেছেন ব্যাঙ্কে।”

“দিয়েছি—মাত্র তাদের পক্ষে ব্যাঙ্ককে এই টাকার ট্রাষ্টী (ন্যাসরক্ষক) ক’রে। টাকার পুরো মালিকানা স্বত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় নি। হ’তেও সেটা পারে না। তাদের জানিয়ে সেটা দিতে হয়, গ্রহণ ক’রে ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেন-দেনের বন্দোবস্ত সাক্ষাৎভাবে তাদের ক’রে নিতে হয়। ব্যাঙ্ককে ট্রাষ্টী ক’রেছে, ট্রাষ্টী থাক্‌বে, যদি না অন্য ট্রাষ্টী আমি নিযুক্ত করি। এই মর্ম্মে একটা চিঠি দিয়ে টাকা জমা দিয়ে এসেছি, পাকা একটা trust deed (ন্যাসের দলিল) কাল পরশু ক’রে দেব। সুতরাং আমার অমতে এ টাকায় তারা হাত দিতে পারবে না। আর দেবে কি ক’রে? আমি ছাড়া কোন্‌ ব্যাঙ্কের হাতে এই টাকার টাষ্টটা র’য়েছে কেউ আর জানে না। ছেলেটা সাবালক হ’য়ে উঠ্‌লে তখন এই টাকাটা তার হাতে যাবে। এখন এই মাত্র জানাব—এই বন্দোবস্ত আমি ক’রেছি। ট্রাষ্টডীডের (trust deedএর) একটা নকল তাদের দেব, যখন দেখ্‌ব কোনও রকম গোলমালের আশঙ্কা কিছু আর নাই।—”

“হুঁ—দেখছি, যা দরকার এ অবস্থায় সবই আপনি ক’রেছেন, আর ক’র্‌তে আপনিই পারেন। আমি আর কি ব’লব? মেয়েটাকে আপনার ঘরে দিয়েছি, তার সুখ-শান্তি মানমর্য্যাদা সব এখন আপনার হাতে। যা হবার হ’য়ে গেছে, ক্ষমা ঘেন্না ক’রে নিতেই হবে। এখন ভবিষ্যতটা নির্ভর ক’র্‌ছে বিরুর ওপরে। তাকে যদি ঠিক রাখতে পারেন, সব ঠিক হ’য়ে যাবে। আর সত্যি কতই ত এমন হয়। বিলেত থেকে মেম বিয়ে ক’রে আসে, আবার এখানে এসে বিয়ে করে—তাও ত মিটিয়ে মাটিয়ে লোকে ফেলে।”

“ফেলে না?—কি করে?—টাকাকড়ি দিয়ে এসব মিট-মাটের ব্যবস্থা আমিও কয়েকটা ক’রেছি। বিয়ের আগে ধরা প’ড়েছে এমন ঘটনাও জানি। মেয়ের বাপ নিজে উদ্যোগী হ’য়ে টাকাকড়ি দিয়ে ডাইভোর্স করিয়ে তারপর সেই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। মেয়ের একটা ভাল settlement (সংসার স্থিতি) যদি হয়, এসব ত্রুটিবিচ্যুতি সব বাপেরাই উপেক্ষা করে। মেয়ে নিজেও সব জেনে শুনে সেই স্বামীর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে আবার সংসার করে। এও দেখো, তেম্‌নিই সব ঠিক হ’য়ে যাবে। তবে ঐ যা ব’ল্লে, বিরুকে ঠিক রাখ্‌তে হবে। সে পারা যাবে। সে জাতীয় জবী বেপরোয়া ছেলেই সে নয়। আমি শক্ত হ’য়ে থাক্‌তে পারলে শেকল ভেঙ্গে বেরোতেই পার্‌বে না। সেইটে পারব কিনা, অনেকটা নির্ভর ক’রছে তোমার ওপর।”

“আমি ঠিক আছি—হাল কিছুতেই ছাড়ছি নি। আচ্ছা, তবে আজ উঠি এখন।—কড়া দুটো কথা গোড়াতে ব’লে ফেলেছি, মনে রাখ্‌বেন না।”

“পাগল! মনে আবার রাখব কি? এত সহজে তোমার ক্ষমা পেয়েছি এইটেই যে বড় ভাগ্য ব’লে মনে ক’র্‌ছি। যে কারণে যাই ক’রে থাকি, এত বড় একটা প্রতারণা ত তোমাকে ক’রেছিলাম।—হাঁ, বৌমাকে একটি-বার দেখে যাবে না?”

“না! আজ আর পারব না। একটু ঠাণ্ডা হ’ক—কাল পরশু একদিন আসব। আর ভাবনাই বা কি? আপনাদের মত মা বাপের কোলেই ত সে আছে। আচ্ছা, উঠি তবে এখন—নমস্কার।”

“সুখে থাক—এস তবে।”

(ক্রমশঃ)

ভুল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ভুলে ভুলে পা ফেলিয়া চলিয়াছি কোন্ ধ্বংসমুখে ?
—শুধাই নিজেরে যবে নৈরাশ্যে ও দুখে
চিত্ত মোর ওঠে না ত ভরি।
তবু আশা করি
ভুল পথে একদিন উত্তরিব ঠিক ঠিকানায়
সব পথ ঘুরি ফিরি আমার গন্তব্য পানে ধায়।

জানে নদী
অজানিত পথে যদি ছোটে নিরবধি
নীলিমার ছায়াবক্ষে ধরি,
গিরি নদী অরণ্য উত্তরি'
অবশেষে উপনীত হবে সে যে সুনীল সাগরে
শুধু অন্ধ আবেগের ভরে।

যে পথ ধরিয়া চলেছে সে,
হোক ভুল হোক ঠিক, এই নিরুদ্দেশে
সম্মুখে অকুতোভয়ে যদি পারে যেতে
তার তরে আছে বুক পেতে
চিরন্তন আশ্রয় কুলায়,
অগ্রসর গতি তারে সেথায় নিতেছে পায় পায়।

হে ভূধর, সমুন্নত শিরে
আগুলিয়া পথ মোর অলঙ্ঘ্য প্রাচীরে
ছিলে তুমি সম্মুখে আমার।
পেরেছ কি রোধিবারে মোর অভিসার ?

কতটুকু ভঙ্গুর শৃঙ্খলে
এ দুর্ব্বার তরঙ্গের দলে
বাঁধিয়া রাখিবে তুমি
পাদমূলে হে বন্ধুর ভূমি ?
আমার প্লাবন বারি পাষাণের বাঁধে
কোন্ পরমাদে
বেঁধেছিলে হে নগরী মোর তটে বসি ?

ভাঙনের জলে গেছে ধসি
ব্যর্থ তব সে প্রচেষ্টা, ডুবায়ে তোমায়
ভাসিয়া গিয়াছি চলি উন্মত্তের প্রায়
দৃকপাতে না আনি
তব হানি।

আমি উল্কাপারা
আলোকের রেখা টানি মহাশূন্যে হব আত্মহারা
যায় যাক ঝরি
ক্ষণিকের ফুলগুলি, অন্ধকারে একাবলী পরি
তুমি দেখা দিয়াছ আমায়
আঁধারে এলায়ে কেশ নভো নীলিমায়।

হোক ভুল,
তথাপি অতুল
চিরন্তন ক্ষণগুলি, গগনে আমার
তারকা বিথার।
জীবনের মহাকাব্য লিখে যাব জ্বলন্ত অক্ষরে
তিমির অম্বরে।

ভুলে ভুলে আমারে করেছে অগ্রসর
নিরন্তর
অতিথি-বৎসল পরমাদ।
হয় হোক ফাঁদ
আশ্রয় পেয়েছি নিশিতরে।

তার পরে
নবীন অরুণালোকে যবে হাতছানি
দিবে মোরে দীর্ঘ পথখানি,
নিঃশব্দে খুলিয়া দুয়ার
যাব চলি, রেখে যাব ক্ষুদ্র উপহার
স্মারক-লিপির সাথে
বিদায়ের নমস্কার নীরবে জানাতে।



জন্ম— সন ১২৪৭ সাল | আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য | মৃত্যু— [illegible]শে শ্রাবণ, ১৩৩৯ সাল

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

যাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া স্যর রাসবিহারী ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, রমেশ-চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়া শত শত প্রতিভাশালী ছাত্র ব্যবস্থাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ ও ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহার নিকট দুই দণ্ড যাপন করিলে কত নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইত, যাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী ও ভাষার লালিত্য, সেকালে তাঁহাকে সাহিত্য-সেবকগণের মধ্যে একটি সম্মানজনক স্থান দিয়াছিল, যাঁহার 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' বাঙ্গালার বিগত যুগের সামাজিক জীবনের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান জোগাইয়াছে, সেই সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি-পূজা করা 'ভারতবর্ষ'-এর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করা ব্যক্তিগত কারণে আমার পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর, কারণ স্বর্গগত আচার্য্য কৃষ্ণকমল আমার পিতামহ পরম পূজ্যপাদ ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন সুহৃদ এবং তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে 'ধ্রুব-দর্শন' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীর বিশিষ্ট লেখক ছিলেন; আমার জ্যেষ্ঠতাত বঙ্গ-সাহিত্যের পরম অনুরাগী ও সেবক, পরম পূজনীয় ৺অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম-এ বি-এল মহাশয়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট সাহিত্য সেবায় উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে ছাতুবাবুর বাজারের নিকট যে স্থানে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ কাশীনাথ ঘোষ মহাশয় আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন (কাশী ঘোষের লেন, বীডন ষ্ট্রীট), সেই স্থানকে পূর্ব্বে মালীর বাগান বলিত। এই মালীর বাগানে আমাদের বাড়ীর নিকট একটি গলিতে—রামজয় তর্কালঙ্কার নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র রামকমল ও কৃষ্ণকমল।

রামকমল সংস্কৃত কলেজের একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। ইঁহার রচিত বেকন সন্দর্ভ, ইংলণ্ডের ইতিহাস ও দ্বাদশ স্বীকার্য্য বর্জ্জিত জ্যামিতি তাঁহার নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। আমার পিতামহ এবং তাঁহার অগ্রজদ্বয় সেকালে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন এবং (আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন) রামকমল ইঁহাদের তিনজনের সহিতই সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণকমল রামকমল অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট ছিলেন। তিনি অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কৃষ্ণকমল যাত্রা গান শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমাদের বাড়ীতে ঝুলনের সময় পাঁচদিন যাত্রা গান হইত; কৃষ্ণকমল 'পুরাতন-প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন, তিনি পাঁচদিনই যাত্রা গান শুনিতে আসিতেন; তাঁহার অগ্রজের কঠোর শাসন কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিত না।

সাত-আট বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার অগ্রজের সহিত সংস্কৃত কলেজে যাইতেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। সংস্কৃত কলেজে কৃষ্ণকমল, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতগণের নিকট মুগ্ধবোধ, শ্রীনাথ দাসের নিকট গণিত এবং প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর নিকট ইংরেজী অধ্যয়ন করেন।

১৮৫৫-৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভায় যোগদান করেন। এই সভায় তিনি বাঙ্গালায় প্রবন্ধাদি পড়িতেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ১৬৲ টাকা বৃত্তি পান। এই বৃত্তি লইয়া ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন।

বোধ হয় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রভাবে তাঁহার এই সময়ে সাহিত্যসেবার ইচ্ছা বলবতী হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি "বিচারক" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত

করেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিতেন। পত্রখানি পাঁচ ছয় সংখ্যার অধিক বাহির হয় নাই।

এই সময়ে হঠাৎ খেয়ালবশে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণে বহির্গত হন। সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধের প্রধান লীলাভূমি দেখিয়া দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষ্ণকমল 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" নামক উপন্যাস রচনা ও প্রকাশিত করেন। উহার আখ্যানবস্তু ইংরেজী "রোমান্স অফ্ হিষ্ট্রি" হইতে গৃহীত হইলেও উহা দ্বারা তৎকালে উপন্যাসবিরল বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' উহা নিন্দনীয় বোধ করেন নাই এবং আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার উহার ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী বলিয়া মনে করিয়াছেন।

এই সময়ে কৃষ্ণকমল মধ্যে মধ্যে কবিতাও লিখিতেন এবং ১৮৫৮-৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বন্ধু কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত 'পূর্ণিমা' পত্রে "জুঁই ফুলের গাছ" ও "তাঁতিয়া তোপী" শীর্ষক দুইটী কবিতা লিখিয়াছিলেন।

উপরিলিখিত ঘটনাসমূহের জন্য তাঁহার পাঠের যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি, মেধা ও প্রতিভাবলে তিনি গৃহে পাঠ করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষা দেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

এই বৎসরে একটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তিনি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার প্রতিভাশালী অগ্রজ রামকমল জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া আত্মঘাতী হন। তিনি নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকমলকে অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে হইল। সৌভাগ্যবশতঃ শিক্ষাবিভাগের ইন্স্পেক্টর উড্রো সাহেবের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন এবং উড্রো সাহেবের সুপারিশে তিনি ২৪পরগণার দক্ষিণাংশের ডেপুটী ইন্স্পেক্টার-অফ্-স্কুলস-এর পদ প্রাপ্ত হন।

কৃষ্ণকমলের শিক্ষাগুরু (৺স্যার দেবপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ-তাত) প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী তাঁহার স্বগ্রাম খানাকুল কৃষ্ণনগরে একটি আদর্শ সংস্কৃত-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণকে তিনি ক্রমান্বয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণবাবু কার্য্যান্তরে গমন করিলে কৃষ্ণকমল ৮০্ টাকা বেতনে এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয় হইতেই সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি মনীষী ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল দুইশত টাকা বেতনে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং উক্ত বৎসরের শেষভাগে তিনশত টাকা বেতনে বাঙ্গালার প্রধান অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন।

ইনিই প্রথমে কলেজে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে কৃষ্ণকমল 'বিচিত্রবীর্য্য' নামক বীররসাশ্রিত আখ্যান প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি প্রকাশের ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং উহার ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃতানুসারিণী হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "এ ত বাঙ্গালা না, এ ত সংস্কৃত।" আমার পিতামহদেব 'বেঙ্গলী'তে যে সমালোচনা করেন, আচার্য্য কৃষ্ণকমল আমাদিগকে বলেন, তাহা পড়িয়া তিনি কিছু বিচলিত হইয়াছিলেন; "কিন্তু ধীরভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তিনি অবিচার করেন নাই। আমার সেই সংস্কৃতভাবাবহুল রচনাকে তিনি অন্যান্য বিশেষণের মধ্যে turgid আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছিলেন।"

কৃষ্ণকলল পরীক্ষার্থীদিগের উপকারার্থে নাগানন্দ, কুমার-সম্ভব, রঘুবংশম্, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের প্রিয় ছাত্র আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি তিনি কুমারসম্ভব অধ্যাপনাকালে সংস্কৃত দুরূহ শ্লোকগুলিরও এমন সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ বলিয়া দিতেন যে তাহাতে ইংরেজীতেও তাঁহার যে কতদূর অধিকার ছিল তাহা সহজেই প্রতীত হইত। কবিবর বিহারীলালের সহিত একত্রে কৃষ্ণকমল বায়রণ সেক্সপীয়র প্রভৃতি কবির কাব্যরস উপভোগ করিতেন।

এই সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে কোমতের দর্শন লইয়া খুব আলোচনা হইত। আমার পিতামহদেব তৎ-

সম্পাদিত বেঙ্গলী পত্রে বিশিষ্ট লেখকগণ কর্ত্তৃক কোমত দর্শনের আলোচনা করাইতেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লেখক ছিলেন শিক্ষাবিভাগের উজ্জ্বলরত্ন (হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ) মিষ্টার এস্ লব। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, স্যর হেনরি কটন প্রভৃতির সহিত আচার্য্য কৃষ্ণকমলও কোমত দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং অধ্যক্ষ লব আমার পিতামহদেবকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহার অনেকগুলিতেই তিনি কৃষ্ণকমলের অভিমত কিম্বা তাঁহার দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল বেঙ্গলীতে কোমত দর্শন সম্বন্ধে যে সকল সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন তৎকালে পণ্ডিত সমাজে তাহা আদৃত হইয়াছিল।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে চোরবাগাননিবাসী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ "অবোধবন্ধু" নামক একটি মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী উহার প্রধান লেখক ও পরে সম্পাদক হন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল উহাতে "পৌল ভর্জ্জিনী", "নেপোলিয়নের জীবন বৃত্তান্ত" প্রভৃতি প্রকাশিত করেন। এই পত্রে কবিবর বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে 'উপহার' সর্গটি ১২৭৪ সালের 'অবোধ বন্ধু'তে 'প্রিয়সখা' নামে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটী কৃষ্ণকমলের উদ্দেশে রচিত এবং উহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য :—

প্রিয়তম সখা সহৃদয়!
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

আহা কিবে প্রসন্ন বদন।
তারা যেন জলে ডুনয়ন;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধিবিভাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

অমায়িক তোমার অন্তর
সুগম্ভীর সুধার সাগর,
নির্ম্মল লহরী মালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উবে যায় হৃদয়ের ভার।

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নই।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পরবৎসর তিনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং কিছুদিন হাইকোর্টে ও পরে হাওড়া কোর্টে ওকালতী করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন।

কৃষ্ণকমল সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কোষগ্রন্থাদি সঙ্কলনেও সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি On some unsettled questions of succession under the Bengal school of Hindu Law প্রকাশিত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি একবার ভুলক্রমে হাইকোর্টের উকীলদের বাৎসরিক দেয় পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে উমাকালী বাবুর হস্তে পাঁচশত টাকার একখানি নোট দেন। উমাকালীবাবু উহা কবিবর হেমচন্দ্রকে জানাইলে রহস্যপ্রিয় কবি এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া 'নাকে খৎ' নামক একটি প্রহসন রচনা করেন। উহার নায়ক ছিলেন কষ্টকল্প বিদ্যানিধি (বন্ধু-সমাজে মিষ্ট-অম্ল বিদ্যাম্বুধি)।

'নাকে খৎ' প্রহসনটি শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'আর্য্যাবর্ত্তে' মুদ্রিত এবং পরলোকগত বন্ধু বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণকমলের ঠাকুর-আইন বিষয়ক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'যৌথ হিন্দু পরিবার সংক্রান্ত আইন'; এই বক্তৃতা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

কৃষ্ণকমলের পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তির জন্য সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে তাঁহাকে লিখিতে অনুরোধ করেন এবং বঙ্গদর্শনের অনুষ্ঠানপত্রে লেখকগণের মধ্যে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণকমল উহাতে লিখিবার অবসর পান নাই। "ভারতী" নামক মাসিক পত্রে তাঁহার কোমত দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর অনুরোধে তিনি পরাশর সংহিতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। উহার কোন কোন অংশ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংশোধন করিয়া দেন এবং উহা Bibliotheca Indica গ্রন্থাবলীর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে "হিতবাদী" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের প্রথম সম্পাদকপদে বৃত হন; কিন্তু অধিক দিন উহার সম্পাদনভার বহন করেন নাই। তিনি উক্ত বৎসরেই রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। তাঁহার অধ্যক্ষতা কালে রিপণ ল কলেজ প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার হিন্দু আইন সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী আইন পরীক্ষার্থীমাত্রই পাঠ করিতেন এবং পাঠে বৎপরোনাস্তি উপকৃত হইতেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অধ্যক্ষপদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তৎস্থলে অভিষিক্ত হন।

তিনি বহু সাহিত্যিককে প্রেরণা দিয়াছেন, বহু সাহিত্যিককে সাহায্য করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ১২৯২ সালে রমেশ দত্ত লিখিতেছেন:—"আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমলবাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্য্যে যে কতদুর উপকার লাভ করিতেছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।"

"হিন্দুশাস্ত্র" প্রকাশ কালেও রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত ভাষায় আমার শিক্ষাগুরু এবং অশেষশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র অংশ সঙ্কলন করিয়াছেন।"

লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধন হইলে নূতন নিয়ম অনুসারে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল উহার সম্মানিত সদস্য নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদ তিনি অধিকৃত করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেরও বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৩৩৯ সালে ২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৩ই আগষ্ট ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে) ইনি পরলোকগমন করেন।



জলের কথা

শ্রীধ্রুবচন্দ্র মল্লিক

প্রবন্ধ

প্রাণীজগৎ অনুক্ষণ যার প্রত্যাশী, চাতক নীলাকাশে যে ফটিক জলের জন্য অবিরত কাঁদে, ধরিত্রীর প্রান্তানুপ্রান্তে অনুদিন যার অবস্থিতি—গগনে, বাতাসে, মর্ত্তে ও পাতালে, সকল কিছুতেই যার রূপের রেখা মূর্ত্ত—সেই জল, তরল, কঠিন ও গ্যাসের সাকার ও নিরাকার অবস্থায় অস্থাবর।

জল অম্লজান ও উদ্‌জানের সংমিশ্রণ। রসায়ন শাস্ত্রের সংকেত অনুসারে ইহা—'উ$_2$অ', অর্থাৎ উদজানের অবস্থিতি ⅔ অংশ, আর অম্লজানের ⅓ ভাগ। এটুকু থেকে প্রতীয়মান যে পৃথিবীর আদি অবস্থিতির গলিত ধাতবাদি শৈত্যানুবর্ত্তনের সময় নানা প্রকার তরল গ্যাসের সংমিশ্রণে বিভিন্ন পদার্থ ও হাওয়ার রূপে পরিবর্ত্তিত। এটুকুও অনুমেয় যে জলজান ও অম্লজানের আধিক্যতায় পৃথিবীর উপরে জলের পরিমাণ বেশী। পৃথিবীর ক্ষেত্রফলের ¾ অংশের কিছু অল্প কেবল জল এবং তার আয়তন নির্দ্ধারণ সম্ভব হ'লেও অসম্ভব; কারণ সাগর ও সমুদ্রের সকল স্থলের গভীরতার সঠিক কিনারা আজও অজ্ঞাত। তবে মধ্যবর্ত্তী পরিমাণে ধার্য্য গভীরতা ও কালির গুণফল ৫৬ কোটি ঘন মাইল। পৃথিবীর আয়তন ২৫৯৮৮ কোটি ঘন মাইলে—জল, স্থল ও অভ্যন্তরীণ গলিত ধাতু গ্যাস ইত্যাদি সকল কিছুই বর্ত্তমান। সমুদ্রস্থ বারি ব্যতীত স্থলের উপরে ও অভ্যন্তরে যে জলের অবস্থিতি তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা অনুমানের বাইরে। বায়ুমণ্ডলেও জলের পরিমিতি অপরিজ্ঞাত।

জলের উষ্ণতা বায়ুচাপের উপর নির্ভর করে। জল গরমের সময় কিংবা প্রকৃতিপ্রভাবে উষ্ণাবর্ত্তনে স্থলের উত্তাপের তারতম্য আপন শক্তি বিকাশের পথে প্রতিভাত। সাধারণতঃ তাপমান যন্ত্রের ৩২° ফ্যারেণহিটে সলিলের ঘনীভূত সীমা, আর ২১২°তে তার প্রতিকূল রূপান্তের প্রগতি। সেন্‌টিগ্রাডের পরিমাপ ০° হ'তে ১০০°। কিন্তু কখন কখন এ পরিমাপের বিচ্যুতি ঘটে। ব্যারোমিটারে বায়ুচাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির উপরেও এর ক্রিয়া প্রকাশ পায়। অর্দ্ধ সের বরফ ৩২° ফ্যারেণহিটে থেকে প্রাকৃতিক উত্তাপে বিগলিত পরিবর্ত্তন অতি স্বল্পক্ষণের জন্য ৩২°তেই অবস্থানের পর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের অনুপাতে ন্যূনাধিক ৯০°তে উপনীত হয়। ক্রমশঃ সলিলে আগত এ উত্তাপটুকুর নাম 'গুপ্ত-উত্তাপ' (latent heat) অর্থাৎ এটুকুর প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি ধীরে ধীরে রূপান্তে অনুগমন করে। কিন্তু ঐ উষ্ণ জল পুনরায় বরফে অনুপ্রাণিত হ'লে তার গুপ্ত উত্তাপটুকু বিলুপ্ত হ'য়ে 'ধারণক্ষম উষ্ণতায়' (sensible heat) পরিবর্ত্তিত হয়। বস্তুত বরফের মধ্যেও উত্তাপের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

অপর বস্তুর সহিত সলিলের উষ্ণতা বর্দ্ধিত হইলে তার সমতায় অপর বস্তু অপেক্ষা জলে অধিক উত্তাপের প্রয়োজন; ৩২ ফ্যারেণহিটে অবস্থিত অর্দ্ধ সের জলের সহিত ৯২° উত্তপ্ত অর্দ্ধ সের পারদের সংমিশ্রণে—গণিতশাস্ত্রানুসারে ৬০° পার্থক্যটুকুর ৩০° উত্তাপ পারদ হ'তে সলিলে প্রবর্ত্তিত হ'তে পারে;—অর্থাৎ উত্তপ্ত পারদ এবং শীতল জলের মিশ্রণ ৬২° উত্তাপে অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। জল এরূপ উষ্ণতায় উপনীত হয় যে পারদের উত্তাপটুকু ৩৪°তে অবতরণ করে এবং জলও ৩৪° উষ্ণ থাকে। অর্দ্ধ সের পারদে এক ডিগ্রী উত্তাপোত্তলনে যে তাপের প্রয়োজন সে অনুপাতে অর্দ্ধ সের জলের উষ্ণতা বর্দ্ধনে তিরিশ গুণ উত্তাপ বেশী লাগে। এ-কে বলে 'বিশেষক উষ্ণতা' (specific heat)। অন্য বস্তুর তুলনায় জল গরম হ'তে সাধারণতঃ যে সময়ের প্রয়োজন, তারো অধিক সময় তা শীতল হ'তে আবশ্যক। অনুবর্ত্তী স্থান ও বস্তু অপেক্ষা জল অধিক গরম হ'লে সমানুপাতে শীতল না হ'য়ে তাদের উত্তাপ দেয় এবং সেইরূপ, স্থান ও বস্তু অপেক্ষা শৈত্যের অবস্থিতি তাদের শীতল করে। এ হ'তে বেশ প্রাঞ্জল হ'য়ে পড়ে যে সমুদ্রতীরস্থ ও নদী-উপকূলবর্ত্তী একই লঘিমার স্থানসমূহে কেন চিরকাল সমভাবাপন্ন জলবায়ু

বর্ত্তমান। উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর উপকূলস্থ স্থানে কিন্তু এ' নিয়মের ব্যতিক্রম হয়।

জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে অবিরাম। বায়ুর শুষ্কতার অনুপাতে বাষ্পের উদ্ভাবন হয়। সদাসর্ব্বদা বায়ুতে বাষ্পের স্থিতি। ধারণশক্তির শেষ সীমা অবধি বায়ুতে বাষ্পের অবস্থিতি, জল হ'তে বাষ্পের তিরোধানে বিরামের আমন্ত্রণ ক'রে। হাওয়ার উষ্ণতাধিক্য বায়ুতে জলীয় বাষ্প ধারণের তারতম্য আনে। বরফ হ'তে দ্রবীভূত জল গুপ্ত-উষ্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বরফ তরল হ'লে যে পরিমাণ উত্তাপ সলিলে প্রতারিত হয় সে অনুপাতে বাষ্প অধিক-পরিমাণ উষ্ণতা ধারণের পর হাওয়ার সাথী হ'য়ে পড়ে। বাষ্প ঘনীভূত হ'লে উত্তাপটুকু ত্যাগ করে।

বাষ্পের রূপে জলের তিরোধান এবং পুনরায় তার ঘনত্ব-প্রাপ্তি ধরার উপরে উষ্ণ ও শৈত্যের আবর্ত্তন আনে। হাওয়ায় শুষ্কতা ও তাপাধিক্য জল শীতল করে। একটী সাধারণ দৃষ্টান্ত বোধ হয় ইহাকে ঋজু করে তুলবে। জলপূর্ণ একটী মৃণ্ময় পাত্রের দিকে লক্ষ্য করলে অনেক সময় দেখা যায় তা হ'তে বাষ্পোদ্গীরণের প্রতিরূপ। এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আভ্যন্তরীণ জল শীতল রাখে।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের স্থিতি ধরণীর উত্তাপ তিরোধানের অন্তরায় এবং উষ্ণতার পরিত্রাতা। হাওয়ার লঘুতায় অর্থাৎ শুষ্কতায় পৃথিবীর তাপ বিকীরণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বায়ুতে বাষ্পের পর্য্যাপ্ত অনুকূলতা সেটুকু হ্রাস করে। সমুদ্র হ'তে বহু দূরবর্ত্তী গ্রীষ্মমণ্ডলীর মরুভূমির হাওয়া সকল সময়েই শুষ্ক থাকে। সেখানে কখন কখন দিনে রাতে প্রায় ৯০° তাপ ও শৈত্যের ব্যবধান প্রতীয়মান। প্রখর রৌদ্রে ধরিত্রী অধিক উষ্ণ হ'য়ে পড়ে। দিবসান্তে সে উত্তাপ তিরোধানের পর সত্বর এরূপ শৈত্যে উপনীত হয় যে প্রভাতের পূর্ব্বে ভূমি উপরস্থ বারি ঘনীভূত হ'য়ে পড়ে। এ প্রকার দ্রুত রূপান্তের আবর্ত্তন—বাষ্পসিক্ত বায়ু প্রবাহিত স্থলে নেই।

জল বহুরূপী। বিভিন্ন প্রসাধনে বছরের নানা ঋতুর সহিত কেবল হাসে। বাষ্পাকারে অদৃশ্য অবস্থায় হাওয়ায় ভাসে। লঘু বাষ্প বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে আরোহণকালে তার উত্তাপটুকু বিনষ্ট হয়। তার পর শৈত্যের সহবাসে হয় মেঘ। মেঘ জলীয় বাষ্প নয়—বায়ুতে ভাসমান ক্ষুদ্র অদৃশ্য জলবিন্দু রাশির বিশাল সমষ্টি। এক শ্রেণীর মেঘ স্তূপীকৃত ও কুঞ্চিত শ্বেত অলকাদামের রূপে বায়ুস্তরের বহু ঊর্দ্ধে ভেসে চলে। কখন কখন ভূমি হ'তে তার অবস্থিতি প্রায় দশ মাইলেরও অধিক হয়। এর নাম তুলাকার অলক—মেঘ (cirrus)। বৃষ্টির পূর্ব্বে স্তূপমেঘ (cumulus) আকাশে দেখা যায়। এ মেঘ অত্যন্ত ঘন। চিম্‌নির ধূমোদ্গীরণের কুণ্ডলীরূপের অনুরূপ বহুসংখ্যক মেঘ স্তরে স্তরে একটীর পর একটী সংস্থাপিত হইয়া স্তূপমেঘের সংঘটন। স্তরীভূত মেঘ (stratus) সুদীর্ঘ ও স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত। ইহা রজনীর সাথী। দিনের আলোয় এর অবস্থিতি বিরল। সন্ধ্যার প্রারম্ভে স্তরীভূত মেঘের উদ্ভাবন আর সূর্য্যালোকের তাপগমনে তার তিরোধান। যে মেঘ হইতে কেবল বৃষ্টি পড়ে তাকে অম্বুদ বা বর্ষণ মেঘ বলে। এ চারিটী মেঘের সর্ব্বদা একাকী অবস্থান অচল। একের সাথে অপরে মিশে যায়। ঝড়ের সময় বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে যে মেঘ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে ছুটে চলে তাকে বিরল মেঘমালা বা ছত্রভঙ্গ মেঘ (scuds) বলা যায়।

কুহেলিকা ও কুয়াশা মেঘেরই রূপান্তর। ধরার অঙ্গে, পর্ব্বতের মাথায় ও পদতলে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে। উষ্ণ বায়ু কখন কখন শীতল ধরিত্রীর বুকের পরশে কুহেলিকায় পরিবর্ত্তনশীল। নাতিশীতোষ্ণ লঘিমার সমুদ্র তীরে কুহেলিকার সৌন্দর্য্য প্রতিভাত। যেন বলে—তোরা দেখে নে রে—তোরা দেখে নে। কিন্তু অধিকক্ষণ নিজ রূপ ধারণে অক্ষম হয়। উত্তাপের আগমনে কোথায় চলে যায় এবং পুনরায় তার তিরোধানে হয়ত প্রত্যাগমন করে। কুহেলিকার নিবিড়তা কুয়াশা। এর প্রভাব মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রবল হয় যে সমুদ্র পথে নিকটের বস্তু-সমূহ দৃষ্টি পথে আসে না। আশু বিপদের আশঙ্কায় পথিকেরা ত্রস্ত হয়ে থাকে। কুয়াশা বহুবার জাহাজের বিপদ আমন্ত্রণ করেছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত করবে। নগরের আবর্জ্জনাপূর্ণ বায়ু ও ধোঁয়ায় কুয়াশা এরূপ দুর্ভেদ্য হ'য়ে পড়ে যে দিবসেই যেন ধমনীকে অজ্ঞান করে; সে ঘনঘটা শীঘ্র অনতিক্রমণীয়। রূপটুকু তার বিষণ্ণতায় আনত। মনকেও সেইরূপ করে তোলে। শিশিরবিন্দু কিন্তু মনের আনন্দবর্দ্ধন করে। প্রভাতে দূর্ব্বাদলের উপর শিশিরের বিকশিত রূপ ক্ষণিকের প্রতিভাদানে স্তিমিত হ'য়ে পড়ে। নীলাকাশে মেঘের শালীনতা ও উৎপাতের অন্তর্দ্ধান ধরিত্রীকে অতি শীঘ্র শীতল

করে। স্থলের এই শৈত্য গতিশীল বায়ুর নীরবতায় বায়ুমণ্ডলের বাষ্পটুকু শিশিরকণার রূপে গাছের পাতায়, ঘাসের মাথায় শিলাখণ্ডের উপরে প্রদীপ্ত। একটী জলপূর্ণ গ্লাসের মধ্যে একখণ্ড বরফের নিক্ষেপণ স্বল্পক্ষণ পরেই অনুরূপ ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করে। গ্লাসের অঙ্গে জলবিন্দু পরিদৃষ্ট হয়। স্থল এবং বায়ুর শৈত্যে ও গরমের তারতম্যে শিশির নিঃসৃত হওয়ার পূর্ব্বে সমীরণের উষ্ণতা ঘনীভূত সীমার নিম্নে অবতরণ কালে হিমানীকণার উদ্ভাবন। মেঘের দেশের জলবিন্দু শৈত্যের সমাগমে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বিন্দুতে পরিণত হয়, তারপর সেগুলি হাওয়ার ধার্য্য শক্তির আঙ্গিনায় অবস্থানের অক্ষমতায় বৃষ্টির রূপে ধরিত্রীর বুকে অবতরণ করে। বৃষ্টি হ'তে পৃথিবী তার বিলুপ্ত জলরাশি ফিরে পায়।

বায়ুস্তরের বহু উপরস্থ অত্যন্ত শীতল স্থলের জলীয় বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার খণ্ডে ঘনীভূত হয় এবং ধরিত্রীর বুকে নিঃশব্দে অবতরণ করে। শীত-প্রধান দেশেই তুষার পড়ে। আমাদের দেশে এর প্রবর্ত্তন কেবল হিমালয়ে। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুষার পড়ে থাকে। তখন মনে হয় শ্বেতবর্ণের চাদরে আবৃত পৃথিবী যেন তার শালীনতাকে ঢেকেছে। অধিক উত্তরে যেখানে শ্বেত ভল্লুক, শীল ও সিন্ধুঘোটক ব্যতীত মানবের আহারের বিশেষ কিছু নেই, সেখানে তুষার পতনের সময় শ্বেত ভল্লুকগুলি কিরূপে বরফের মধ্যে অবস্থান করে তা আশ্চর্য্য ব্যাপার। শীতকালে তুষার পতনের সময় তারা বিভিন্ন দলবদ্ধ হ'য়ে এক এক স্থানে সমবেত হয় এবং উর্দ্ধে মুখ তুলে একত্র উপবেশন করে। তুষারে আবৃত হবার পর মুখ ও নাসিকা দিয়ে সামান্য জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করে। বরফের পর বরফের চাদর ঘনীভূত হয় আর তারা ঐরূপ করে চলে। অবশেষে বরফে আবৃত হ'য়ে অনেক নীচে পড়ে যায় এবং নিশ্বাসের উত্তাপটুকুর জন্য বরফ দ্রবীভূত হ'য়ে মুখের সন্নিকট হ'তে একটী সরু রাস্তা উপর পর্য্যন্ত চলে আসে। এই পথ দিয়ে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস গমনাগমন করে। গ্রীষ্মকালে বরফ বিগলিত হবার সময় এস্কিমো জাতীয় মানুষ শিকারের সন্ধানে শ্বাস-প্রশ্বাসের পথগুলির অন্বেষণ করে।

পৃথিবী হ'তে যে বাষ্প মার্গে গমনান্তে জল ও তুষারের রূপে পুনরায় ধরাতে প্রত্যাগমন করে, তার কতকাংশ ধরিত্রীর নিম্ন পথগামী, কতক বাষ্পাকারে প্রতীত এবং অবশিষ্টের স্থান স্থলের ও সমুদ্রের উপরে। এরূপ আবর্ত্তনের জন্য সমুদ্রের জল লবণাক্ত। প্রতি বছর প্রায় সকল সময়ে নদীগুলি স্থল হ'তে সমুদ্রে লবণ বহন করে নিয়ে যায়। প্রবাহমান কাল হ'তে এরূপ বহনের শেষ নেই। কিন্তু সমুদ্রের জলে আগত লবণটুকু বাষ্প পরিনয়নের সময় থেকে যায়। সেজন্য সমুদ্রস্থ সলিলে লবণের প্রবৃদ্ধি এবং হয়ত কোন দিন লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে সমুদ্রের ত'ল হ'তে পাহাড়ের পর পাহাড়ের উদ্ভাবন হ'তে পারে। কিন্তু নদীর বহন করে আনা লবণের প্রায় সবটুকুই সমুদ্রস্থ জীব ও আগাছায় বিলুপ্ত হয়।

ভূগর্ভস্থ সলিলের প্রবাহগতি আছে। কখন কখন সে গতি কঠিন স্তরের নিম্নস্থ কর্দ্দমাক্ত স্থলে কিংবা প্রস্তরময় দেশে গিয়ে পৌছায়। সেখানে গমনের পর অধিকদিন থাকা চলে না। দিক হ'তে আগত জলরাশির বেগ নীচের জলকে উর্দ্ধে ঠেলে তোলে এবং যে জলস্রোত ঝরণার রূপে পৃথিবীতে দেখা দেয়। তার মৃদু-মন্দ ও ত্বরিত গতি আপন ছন্দ-নৃত্যে আপ্লুত। নিয়ন্তার মিষ্ট শব্দ ঝির্ ঝির্ সুরে সমীরণে খেলা করে। প্রাণে আনে অজানা পুলকের উৎস। যেন বলে দেয়—তোদেরো গতিতে এম্নি নাচন আছে। ঝরণা নানাপ্রকারের লবণ বহন করে আনে। ডাক্তারি শাস্ত্রের অনুকূলে এ-জলের মূল্য অধিক।—পৃথিবীর উপরস্থ কঠিন আবরণের নিম্নে পাহাড়ের দেশে বা কর্দ্দমাক্ত স্থলে জল আবদ্ধ থাকার পর কখন কখন আভ্যন্তরীণ উত্তাপে অধিক হয়ে পড়ে। সে বারি হ'তে উৎপন্ন বাষ্প, শক্তিপ্রভাবে ধরিত্রীর কঠিন স্তর ভেদ করে উষ্ণ জলের সাথে ধরার উপরে আসে। এর নাম উষ্ণ-প্রস্রবণ। বহু বিজ্ঞানবেত্তা গন্ধক ও নানাপ্রকার লবণের জন্যও প্রস্রবণে উষ্ণতার কারণ দেখিয়ে থাকেন। উষ্ণ-প্রস্রবণ এক হ'তে দুই শত ফিট উর্দ্ধে উঠে থাকে। আগ্নেয়গিরি ধরার উপরে আগমন পথে সময়ে সময়ে ঐ প্রস্রবণের উদ্ভাবন করে। আগ্নেয়গিরির সন্নিকটেই এদের অবস্থিতি। আইস্ল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডেই অধিক। আমেরিকার 'ইয়োলোষ্টোন পার্কের (yellow stonepark) 'ওল্ড ফেথ্ফুল' (old faithful) উষ্ণ প্রস্রবণ জগতে বিখ্যাত।

প্রবাহিত জলস্রোত কোন স্থান হ'তে নির্গত হ'য়ে স্থলের উপরে তার রূপ বিকাশান্তে হ্রদ বা সমুদ্রকে চুম্বন

করলেই সে নদী। উদ্‌বহনের সাথে সম্মুখের বস্তুসমূহ আহরণ করাই এর কর্ম্ম। উপরে উঠ্‌বার শক্তি নদীর নেই। নীচে নেমে যায়। গমনপথে সাথীর অনুসন্ধানের চেষ্টায় থাকে। কখন অনেকগুলি এসে সংযোজিত হয়, কখন বা দু'একটী। সাথীর নাম শাখানদী। নদীর সাথে মনোমালিন্য হ'লে শাখানদীর ভগিনী একাই বহির্গত হয় দিগন্তে আপন গতিতে। বিরহ অসহ্য হ'লে কখন হয়ত দিদির নিকট প্রত্যাগমন করে। দ্বেষের অনুবর্ত্তী মানুষ নদীর রূপ দেখ্‌তে পারে না। তাকে কুরূপ ও মলিন করবার চেষ্টা করে। সেজন্য নদী ক্রুদ্ধ হ'য়ে, বর্ষার সময় পর্য্যন্ত আহারের পর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে কখন কখন আমাদের অত্যন্ত পীড়া দেয়। প্রবাহের সাথে নদী আহরণের শেষটুকু সঞ্চয় করে আপন গতিতে চল্‌তে থাকে। কিন্তু সে গতি হ্রদ বা সমুদ্রকে চুম্বনের সময় ভুলে যায় তার বহন করে আনা ধনের কথা ;—সেগুলি ফেলে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং বদ্বীপের সৃষ্টি করে। নদীর গমন পথে অন্তরায় তার গতির প্রত্যাবর্ত্তন আনে, কিন্তু তবু সে গতি অশেষ। পর্ব্বত হ'তে প্রপাতের অবতরণ দৃশ্যের রূপ অতীব মনোরম। প্রপাত কিংবা নদীর ত্বরিত প্রবাহ হ'তে বৈদ্যুতিক শক্তির উদ্ভাবন একটু আশ্চর্য্য। এত সুলভে তড়িত-শক্তি অন্য কোন প্রকারে উৎপাদন করা যায় না। জলপ্রপাত নিম্নে অবতরণ করে অবিরাম শব্দের নিরন্তন গতিতে। যেন তার শেষ নেই। শূন্যতায় সাড়া দিয়ে যায়। দৃষ্টি নিবদ্ধ আঁখি তার রূপে বিভোর হ'য়ে থাকে। আশার পরিতৃপ্তি হয় না। তার পতন কতরূপেই না আসে। কোথাও আলুলায়িত তুলার রাশি—যেন বিক্ষিপ্ত ও কুঞ্চিত শ্বেত জলধির স্ফীতি কিসের সন্ধানে চলেছে। কোথাও ক্ষিপ্র জলস্রোতের বেগমান গতি সৃজিত গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয়ের আশায় দ্রুত ছুটেছে। এ গতির সহিত কোন জীব বা বস্তুর পতনের অবস্থা কিরূপ তা বর্ণনার অতীত। নিম্নে তাকালে অনেক সময় দেহের শিহরণ জাগে। কি ভীষণ সে পতন!

পর্ব্বতের উপরে ও গহ্বরে তুষার-ক্ষেত্রগুলি মেরুপ্রদেশ ও তুষার-লঘিমার উর্দ্ধে দেখা যায়। তুষারের পর তুষার ঘনীভূত হ'য়ে বরফে পরিণত হয় এবং স্বল্প বিগলিত হ'লে নিম্নে অবতরণকালে তার নাম হয় বরফের নদী। বৃহৎ বরফের চাপ কি প্রকারে প্রবাহিত হয় তার কারণ বর্ণনা করা হয়ত সম্ভবপর নয় ; সেজন্য সঙ্গতও হ'বে না। বরফ গরমেই বিগলিত হয়, কিন্তু বরফের চাপ বরফকে বিগলিত করে। এ কারণে বরফের নদীর মৃদু-মন্দ গতি আছে। প্রবাহের সময় চাপের কম্‌তি হ'লেই তরল জলটুকু ঘনীভূত হয় এবং প্রবাহে বিরাম আনে। সাধারণতঃ নদীর প্রবাহ গতি ঘণ্টায় বিশ হ'তে এক মাইল, কিন্তু বরফের নদীর সঞ্চালন ঘণ্টায় কয়েক ফিট্ বা ইঞ্চি মাত্র। এ নদী পর্ব্বত ক্ষয় করে বেশী। নিম্নে অবতরণকালে প্রস্তরখণ্ড কর্দ্দম ও মৃত্তিকা বহন করে আনে। তুষার লঘিমায় পৌঁছালে ঋতুর আবর্ত্তনে আগত উষ্ণতার তারতম্যে দ্রবীভূত হ'য়ে মন্থর গতি প্রবাহে পর্ব্বত হ'তে নামে। মেরুপ্রদেশ হ'তে সমুদ্রে আগত হাজার ফিট্ বরফের খণ্ডকে ভাসমান তুষারগিরি বলা চলে। ইহা জাহাজের অতি বড় শত্রু। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জাহাজ টাইটানিকের ভাসমান তুষারগিরি হ'তেই বিনাশ হ'য়েছিল। ইহা বায়ু ও সমুদ্রকে শীতল করে। নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড ও কানাডার পূর্ব্ব প্রান্তে ইহার অধিক সমাগম হয়।

পৃথিবীর উপর জলের স্ফীতি আছে। বিশ্বের আকর্ষণী শক্তি জোয়া ভাঁটার আমন্ত্রণ করে। এ আকর্ষণ এক দিকে সমুদ্রে স্ফীতি আনে, আর অপর দিকে করে হ্রাস। জলাশয়ের স্ফীতি নেই, কারণ তার প্রবৃদ্ধির কিছুই বুঝা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে।

সিন্ধুর বারি-প্রবাহ বায়ু ও শৈত্যের উপর নির্ভরশীল। মেরুপ্রান্তর হ'তে শীতল জল সমুদ্রের নিম্নপথে বিষুব-রেখাভিমুখে গমনাগত। পথেই শীতল জল উষ্ণ জল অপেক্ষা গুরুত্বের জন্য নিম্ন স্তরে অবতরণ করে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ উষ্ণ জল সে স্থান পূরণের জন্য ছুটে যায়। নিম্নস্থ জল ক্রমশঃ বিষুবরেখার নিকটে এসে উষ্ণতা লাভের পর উপরস্থ শূন্য স্থানের অভাব দূরীকরণে উপস্থিত হয়। এরূপে সমুদ্রে জল সঞ্চালন হ'য়ে থাকে। বায়ুবেগ প্রবল হ'লে এক স্থানের জল অন্য স্থানে পরস্পর স্থানান্তরিত করে। এরূপ গতি সাগর ও সমুদ্রের উপর যুগান্তের অনাহূত খেলায় বাস্তবের পথে প্রতীয়মান।

আহারোপযোগী জল নানা প্রকারে আহার করে মানুষ। বকযন্ত্রে চুয়ান জল বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার। তাতে ময়লার শেষ অণুর সন্ধান পর্য্যন্ত মেলে না। সাধারণতঃ সলিলে ন্যূনাধিক

ময়লা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। স্বাস্থ্যের পক্ষে ফুটান জল অত্যন্ত হিতকর, কিন্তু তাতেও ময়লার অস্তিত্ব আসীন। সেটুকু অনিষ্টের প্রতীককে আমাদের উপকার করে। জল তাপাদির অপরিচায়ক দ্রব্য অর্থাৎ 'ব্যাড্-কন্ডাক্টার'। রসায়নিক গবেষণায় এক প্রকার জলের উদ্ভাবন হ'য়েছে যা সাধারণ জল অপেক্ষা ভারী। এ জল মানবের বিশেষ হিতকর না হ'লেও ব্যাঙাচি ও মৎস্যের এক হ'তে দুই ঘণ্টার অধিক জীবনধারণ অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এ সলিলে তাপযন্ত্রের প্রক্রিয়ায় স্বতন্ত্র ডিগ্রীর পরিমাপ দেখা যায়।

জলের নাকি বর্ণ নেই। কিন্তু তার সৌন্দর্য্যের বিকশিত রূপ অতীব মনোরম। ভাল মন্দের সর্ব্বমুখী প্রতিভায় মূর্ত্ত। ক্ষতির তুলনায় ভালই বেশী। ধরার উপরে জলের আল্পনা পরিবর্ত্তনের যুগান্তর আনে। কোথা তার শেষ—সে শেষই জানে। হ্রাস-বৃদ্ধির কোন তারতম্য নেই। নিত্য নূতন রূপে প্রতীক। তবু নূতনত্বে সেই পুরাতন হাসি। যেন বলে দেয়—'আমার মরণ নেই। ধরার প'রে যুগযুগান্তর হ'তে রূপের রূপে চলে এসেছি। এমনি ভাবেই চল্‌বো চিরদিন।'

সলিলের পবিত্রতা মানবের মনে কতদূর শুচিতার অর্ঘ্য আনে তা দুরই জানে। হরিদ্বার হ'তে গঙ্গোদক সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হয়। দূর দূরান্তর হতে নর-নারীর দল স্নানের তরে আসে গঙ্গায়—যেন সে স্নান নিষ্পাপের কল্পতরু। বিশ্বাসের সীমাই পাপ হ'তে মুক্তির প্রমুখ গতি। জলের প্রক্রিয়া শুধু উপরের অপরিচ্ছন্নতা পরিষ্কার করে। বিশ্বাসের স্ফীতিই আত্মপ্রাবল্যের প্রবৃদ্ধি এবং ইহাই বোধহয় অন্তরের ভীতি ও অশুচিতার শান্তি। প্রায় সকল ধর্ম্মই জলের শুচিতা মানে। খৃষ্টধর্ম্ম শুচিতা পেয়েছে জর্ডনের জলে।

বিজ্ঞান জগতে সলিলের প্রবর্ত্তনে যে দ্রুত উন্নতির বিকাশ মানবের মর্ম্মান্তর হ'তে মস্তিষ্কের পথে প্রতীয়মান তার প্রবৃদ্ধি দিনে দিনে চলেছে দূরে। বাষ্প-বিতাড়িত সুন্দর যান অতীতের দূরগামী মাসাধিক পথের গমনকাল মাত্র ঘণ্টার দ্বারে এনেছে সলিলের খেলা। অপর শতাধিক নিয়োজনেও জলের শক্তির গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তড়িৎশক্তিও জলেরই রূপান্তর গতি। বায়ু দ্বারাও তড়িৎ উৎপাদিত হয় কিন্তু তার শক্তি সেরূপ প্রবৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। সলিলের শক্তি এত অধিক যা সীমা অতিক্রান্তে অনন্তে বিলীন। বোধহয় সেখানেও অশেষ প্রতিবন্ধন। সেজন্য একে বলি—অসীম।

শরৎ স্মৃতিতর্পণ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এত কাছে ছিলে দরদী বন্ধু ছিলে এত আত্মীয়,
কত বড় তুমি দিনেকেরো লাগি ভাবিতে পারিনি, প্রিয়।
মৃত্যু তোমারে চিনায়ে দিয়াছে আজ,
রাখাল তুমি ত নও হে বন্ধু তুমি রাজ-অধিরাজ।
তোমার সঙ্গে হেসেছি মিশেছি আপনার জন জেনে,
আপন মহিমা লুকাইয়া তুমি নিকটে নিয়েছ টেনে।
কত অপরাধ করেছি বন্ধু করিয়াছি কত হেলা,
আপন বিভূতি সংবরি' তুমি করিয়াছ ছেলেখেলা।
অবোধ জনের প্রেমে
কোন রসরাজ লীলা রসমধু ভুঞ্জিতে এলে নেমে।
মাঝে মাঝে শুধু হইয়াছে মনে নও তুমি সাধারণ,
তোমার মাঝারে লোকোত্তরের হেরিয়াছি আভাসন।
ভক্তি-তারকা যেমনি উঠেছে জেগে,
ঢাকিয়া দিয়াছ তাড়াতাড়ি প্রীতি-ঘন মাধুরীর মেঘে।
মোহ মাধুর্য্যে ঘিরিয়া রাখিলে, টুটাইলে ব্যবধান,
প্রিয়জন জেনে তোমার উপরে করিয়াছি অভিমান।
পাছে তোমা কভু ধ'রে ফেলি, তাই অবোধ সেজেছ নিজে
আবেদনে ভরা নয়ন তোমার না জানি চাহিত কী যে।
জানিতে দাওনি কত যে তোমার আত্মার গভীরতা,
আমাদেরি মত হাসিতে কাঁদিতে কহিতে ঘরেরই কথা।
বিশ্বজিতের দাতা,
কিসের লাগিয়া কাঙ্গালের দ্বারে তব অঞ্জলি পাতা?

আজি মনে হয় কত অপরাধই ক্ষমিয়াছ আচরণে,
মূঢ়তা হেরিয়া কতবারই তুমি হাসিয়াছ মনে মনে।
সাধ ক'রে ভুল ক'রে কতবার মানিয়াছ পরাজয়,
অমানীরে মান দিতে করিয়াছ বালকের অভিনয়।
ধূলার মতন ঝাড়িয়া ফেলেছ মোদের আঘাতগুলি,
স্বপ্ন ভঙ্গ পাছে হয় বলি' আঘাত করনি ভুলি'।
পাছে পাই প্রাণে ব্যথা,
কোনদিন তুমি বলনিক কটু কঠোর সত্য কথা।

মর্য্যাদা তব কখনো রাখিনি উৎসব কোলাহলে,
কত কথা আজ মনে পড়ে আর আঁখি ভ'রে উঠে জলে।
সারা বঙ্গের হৃদয়ের তুমি ভূপ
মৃত্যুই শেষে দেখালো বন্ধু তোমার বিশ্বরূপ।
আবিষ্কারের বিস্ময়ে লভে হৃদয় বিষ্ফারণ,
লজ্জায় ভয়ে অনুশোচনায় চকিত হৃদয় মন।
সে দিনও যাহার সাথে পরিহাস করেছি বন্ধু ব'লে,
সে সারা দেশের হৃদিরাজস্ব পায়ে ঠেলে গেল চ'লে!
আঁখিজলে ভেসে ভাবি আজ বারবার,
কেন দিলে নাক পূজা করিবার অবসর অধিকার।
চ'লে গেছ তুমি মহাসমারোহে জয়ভাস্বর রথে,
ব্রজ রাখালিয়া চোখে চেয়ে আছি আজো সে বিদায় পথে

ময়ূরপঙ্খী

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

মিলনীর কথার মধ্যে সত্য অনেকখানি আছে। একথা খুবই সত্য যে, মানুষ যে মানুষকে ভালবাসে স্নেহ করে এ তার ব্যাভারেই জানা যায়। প্রভাতী দেবী কোনদিন জয়ন্তকে দেখতে পারতেন না। কি-যে তার কারণ তা কেউ ঠিক বলতে পারত না। জামাইকে শাশুড়ী যে-ভাবে আদর স্নেহ মমতা আত্মীয়তা করেন, তা তিনি কখন করেন নি। আর এটাও অত্যন্ত সত্যকথা যে, মিলনী ও জয়ন্তর বিয়ের পর থেকেই এভাবে নিজেদের লোকেদের সঙ্গে বা সমাজের সঙ্গে মেলামেশা না করা—এও একটা কারণ।

মাধুরী ঘরে গিয়ে দিদিকে বুঝিয়ে মায়ের কাছে গেল। কত বোঝালে যে দাস-দাসী চাকর-বাকরের সামনে এই রকম করে একটা চেঁচামেচি করাটা কি ভাল হ'ল। তার কি এখন এই সময় যে, সে সাজ গোজ করে মানবের কাছে এসে বসবে। এ মা তোমার যে অন্যায় রাগ করা—সে চায় না, জয়ন্ত ছাড়া আর কার' স্নেহ বা ভালবাসা— সে তার স্বামী, তুমি মা, তুমি তোমার মেয়েদের কিছু বোঝ না—মানবের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকে জানা-শোনা ভাব আছে, তাই বলে সে ওই রকম কখন করতে পারে। এইমাত্র সে তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে এল। তুমি কোথায় তাকে অন্য রকমে ভরসা দেবে, সান্ত্বনা দেবে—তা নয়, একটা হৈ-হৈ করে কাণ্ড বাধিয়ে দিলে। তারপর তোমার একে মাথার অসুখ—ডাক্তার ভার্গব বলে গেছেন, কোন রকম উত্তেজনা হলে এ রকম কেস্ অনেক সময় ফেটাল্ হয়। তুমি কোথায় একটু সাবধানে রবে, তা নয়।···

প্রভাতী দেবী কোন কথা কানেই নিলেন না—আপনার মনে বকতে লাগলেন···আমি কেউ নয়, আমি মা, আমার বাড়ীতে আমার ওপর কথা—আমি আমার মেয়ের ভালমন্দ বুঝি না—এইকথা, এতবড় কথা সে আমায় বলে··· একটা লোফারকে ধরে তোর বাবা যেমন মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়েছে···আজ যদি নতুন করে একটা সুরাহা হয় তা না···বকাবকি করতে করতে প্রভাতী দেবী আবার সেই পারলারের দিকে—আয়া, আয়া, আমার স্মেলিংসল্ট· বয় বয় বার্গাণ্ডি! বার্গাণ্ডি! বলে এলেন। ঘরে ঢুকে সোফার একপাশে বসে কাতরভাবে—ওঃ ওঃ মাথা গেল, মাথা গেল—বলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। বয়! বয়! বার্গাণ্ডি! বার্গাণ্ডি!

মাধুরী মার সঙ্গ ছাড়েনি, সে কেবলই মাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। বয় বার্গাণ্ডি দিয়ে গেল। প্রভাতী দেবী এক নিঃশ্বাসে সেটা পান করলেন।

পারলারের বাইরের পর্দ্দা ঠেলে রংরাজবাবু এসে উপস্থিত। এসেই জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ কি প্রভাতী! তোমার সেই অসুখটা আবার আজ বেড়েছে না কি? Me voila, আমার দিকে চাও—দেখ···

প্রভাতী দেবী সুর করে বললেন, Mon amie! বন্ধু আমার এসেছে বন্ধু! না—প্রভাতীর আর বাঁচা হ'ল না।···

সঙ্গে সঙ্গে সেই কথার ধ্বনিকে ধ্বনিত করে স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর রায় ঘরে ঢুকেই বললেনঃ মরাটা তাহলে কবে হ'ল প্রভাতীর?

রংরাজ একটু উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠলেনঃ দেখ সর্ব্ব, তুমি বড় অবিচার কর···

দি রাইট ও—আমি কৌন্সুলী, বিচার ত করিনি—আমার কাজই হচ্ছে অবিচারকে প্রতিষ্ঠা করা বিচার বলে··· ক্রিমিনাল অপরাধীদের বাঁচানই আমার কাজ। যাক্, তা কি হ'ল প্রভাতীর? মাধুরী মার কি হ'ল আবার, সকালে ত ছিল ভাল। ললিত বললে খুব মার্কেটিং করা হয়েছে দুপুরের দিকে, তবে···

প্রভাতী দেবী আরও কাতরস্বরে বলে উঠলেনঃ উঃ মাথা গেল, মাথা গেল, স্মেলিংসল্ট···

কোন ভয় নেই প্রিয়তমে···মাথা যায়নি ঠিক আছে··· এখন কার—কোন নিরপরাধীর শির যাবে সেটা বলে দাও—কৌন্সিলীগিরি ত আমাকেই করতে হবে, সে ত, আর

তোমার mon amie রংরাজ করবে না···বল—বল—বলে ফেল···এই চানকা, তামাক দিয়ে যা।

চান্‌কা গড়গড়া নিয়ে কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে হাজির হল—গড়গড়া রেখে নলটা সর্ব্বেশ্বর রায়ের হাতে তুলে দিয়ে একটা সেলাম করে চলে গেল।

রংরাজও সঙ্গে সঙ্গে সুর্ ধরে বললে : Mon amie বন্ধু আমার! এখন একটু সুস্থ বোধ হচ্ছে কি?···

সর্ব্বেশ্বর বললেন : ওগো প্রভাতী, তুমি ঘরে গিয়ে শোওগে, বুঝলে···মাধুরী! যদি দরকার হয় তবে না হয়, ডাক্তার ভার্গবকে খবর দে, ফোন কর···

মাধুরী মাকে বললে : মা চল, ঘরে গিয়ে শোবে চল আয়া, শিশিটা নাও·· বাবা! আজ দিদি এয়েছে।

ও! মাথাটা আজ তা হলে তারই যাবে দেখছি ·· শুনছ প্রভাতী, ঘরে গিয়ে শোওগে···কপালে খুঁব কষে মেন্থল দাও গে···বেশ কোল্ড ফীল্ করবে, তারপরই নিদ্রা··· কেমন? যাও, শোওগে···আর না হয় মাধুরী একটা ভেরামন টেবলেট খাইয়ে দাও গে। ডাক্তার ভার্গবকে খবর দিয়ে রাখ, রোগ হ'লে ডাক্তার দেখানই উচিত···

আরদালী চানকা তখন মদ ও গেলাস নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলে। সর্ব্বেশ্বর রায় গেলাস হাতে নিয়ে বললেন, ওরে চানকা, দেখ ত, বাইরে কে কথা কইছে। এই যে···কি কালীপদবাবু? কালীপদবাবু সর্ব্বেশ্বর রায়ের বাড়ীর খাজাঞ্চী, তিনি এসেই জানালেন যে, একটা লোক চিঠি নিয়ে এসেছে—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

চিঠিখানা আনুন, কার কাছ থেকে এসেছে?

তা সে বলতে চায় না, বলে সায়েবের সঙ্গে দেখা করে চিঠি দিতে বলেছেন; দেখা না করে দিতে পারব না—কোথা থেকে এসেছে তাও বলতে চায় না, বলে চিঠিতেই তা লেখা আছে।

ডাকুন তাকে—কোন খুনী আসামী নয় ত? ডাকুন তাকে। মাধুরী তোমার মাকে নিয়ে যাও ত মা। রংরাজ, তুমি উঠছ কেন, তোমার mon amie না হয় একটু ঘুমোক না···তুমি বোস, কথা আছে। বোস বোস···দেখ রংরাজ, দেখ তোমার জজ বন্ধু কি বলে···তার কাছে পৃথিবীটা খুব নতুন-না? আমার কি মনে হয় জান রংরাজ? পৃথিবীটা অত্যন্ত পুরোন হয়ে গেছে। একঘেয়ে মানুষ একটুও বদলায়নি? কেবল সাজ বদলাচ্ছে···

রংরাজ একটু হক্-চকিয়ে গিয়ে বসে রইলেন বটে কিন্তু সর্ব্বেশ্বর রায়ের কথার অর্থ যে কোন্ দিকে যাচ্ছে তা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, হঠাৎ সর্ব্ব আজ এ ভাবে কথা কইছে কেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ আজ এ কথা কেন সর্ব্ব?

কিছু না, এমনিই বলছিলাম, নতুন কিছু বলা মানে মনকে চোখ ঠারা, তোমার Mon amieও তাই। আগে ছিল সই-সয়া, ইংরেজীর তর্জ্জমা করে হল বন্ধু আর প্রিয়বান্ধবী। আগাগোড়াই সেক্স অথচ তার মানে করলে প্লাটনিক লভ্ ···এখন আবার তোমাদের আর এক পাপ এসে জুটেছে—mon amie!

কেন, কথাটা কি মিষ্টি নয়?

খুব! দেখ রংরাজ, পাপ করাটা—ক্রাইম করা খুব সোজা, একটুও শক্ত নয়, আর মানুষ আকছার তাই করে আসছে; কিন্তু 'ঘরে-বাইরের' নিখিলেশ হওয়া খুব শক্ত··· কদাচিৎ মানুষ পারে। অনেকখানি ত্যাগদের দরকার। তুমি যে রকম mon amie কর তাতে তোমার নিখিলেশ হওয়া অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু তোমার পক্ষে ঘরে-বাইরের সন্দীপ হওয়াটা বেশী শক্ত একেবারেই নয়। তবে রকমটা হবে মিন্‌মিনে—প্যান্-পেনে।

রংরাজ মনে মনে কেবলই ভাবতে লাগল সর্ব্ব কি জন্যে এসব কথা বলছে। অথচ সে সর্ব্বেশ্বর রায়ের কোন প্রতিবাদ করতে সাহস পর্য্যন্ত করছে না।

ইতিমধ্যে কালীপদবাবু সেই লোকটিকে নিয়ে এলেন। সর্ব্বেশ্বর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে খানিকক্ষণ সেই লোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। লোকটা ঘরে ঢুকেই দাঁতের মাড়ি পর্য্যন্ত বার করে হাসির ভঙ্গীতে সঙ্গে সঙ্গে ঢোক গিলে বললে : নমস্কার হুজুর!

নমস্কার···আপনি আপনি···অ তুমি···তোমায় যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি; হয়েছে, বছর আঠার উনিশ আগে রংপুরে···তোমার নাম বাঁকা পঞ্চা না।

লোকটা দিব্যি সারডোল হয়ে বললে···আজ্ঞে না হুজুর, আমার নাম শশধর চুড়ামণি···বাড়ী আমাদের খানাকুল

কৃষ্ণনগর···শ্রীপাট ফুলিয়ার সঙ্গে আমাদের অতি নিকট আত্মীয়তা আছে।

সে কি হে, সব পাট হ'য়ে পালটে দিচ্ছ যে, তুমি রংপুরের খুনী মোকদ্দমায় মিথ্যে সাক্ষী ছিল। তোমার পিঠে গাব-ভেরাণ্ডার আঠা দিয়ে ঘা করার দাগ এখন আছে না? ভয় কি হে, সত্যি বলতে অত ভয় পাচ্ছ কেন?

আজ্ঞে, হুজুর যে কার কথা বলছেন তা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

তাই নাকি? তা হলে তোমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর বলতে হবে। বুঝতে পারছ না বটে—হুঁ অনেকদিনের কথা, এমনিই হয়ত ভ্রম হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সেই যে হে! তোমার সঙ্গে কি হ্যাঁ একজন মেয়েমানুষ ছিল·· কি নাম তার···

শশধর এমনভাব দেখাল যে, সে যেন এ-সব কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, সে বললে—হুজুর! আমি ত এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না—আপনি ভুল করছেন; আমার নাম শশধর চূড়ামণি···আর ও চিঠিতেও সেই নামই লেখা আছে।

"হুঁ।" বলে সর্বেশ্বর রায় চিঠিখানা দু'বার তিনবার পড়লেন। অন্যমনস্কভাবে গড়গড়ার নল মুখে তামাক টানতে টানতে ডাকলেন, চান্‌কা, চেক বই নিয়ে আয়।

রংরাজও কিছু এ ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না। তিনি একবার সর্বেশ্বর রায়ের পানে, একবার সেই শশধর চূড়ামণির পানে তাকাতে লাগলেন। চান্‌কা চেক বই ও কলম এনে দিল। সর্বেশ্বর রায় একখানা চেক লিখে সই করে—সেই লোকটার হাতে দিয়ে বললেন: দেখ চূড়ামণি ঠাকুর, নগদ অত টাকা বাড়ীতে থাকে না—তুমি এই চেকখানা নিয়ে তাকে দিও, আর যদি নিতান্তই আজ টাকার দরকার হয় তবে এই চেক শোভাবাজারে কোন গদিতে জমা দিয়ে দাওগে—তারা আমার সই করা চেকে এখুনি টাকা দেবে। এখনও দশটা বাজতে দেরী আছে রায়দের ওখানে দাওগে। দিলেই পাবে।···শোন, দাঁড়াও, তুমি সত্যি সেই বাঁকা পঞ্চা নয়? তাই ত—এত ভুল হল! একেবারে চূড়ামণি ঠাকুর হয়ে গেছ?

শশধর ততই জোরভাবে বললে: এ আপনি কি আমায় বার বার বলছেন, আমার নাম শশধর চূড়ামণি, আমার এখানে যজমান আছে, আমি পৌরহিত্য করি—আপনি বলছেন কি?

হুঁঃ তা হলে যার চিঠি নিয়ে এসেছ, সে এখন তোমার ওখানেই···হুঁ! তাই ত, তা দেখ, একটু যত্নটত্ন কর, মাতাল মানুষ। দে'খ এই মদ খাচ্ছি কি-না; তাই বোধ হয় আমার নেশার খেয়ালে তোমায় দেখে ভুল হচ্ছে। আচ্ছা—তাকে একটু দেখো-শুনো ভাল করে। বুঝলে?

বলেন কি—আপনি দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি··· আপনার আদেশ কি অমান্য করতে পারি···

সর্বেশ্বর রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন: আবার বলবা মাত্রই অতগুলো টাকা একসঙ্গে, তোমার মতে দিতে পারি···কি বল···আচ্ছা···আচ্ছা।

মর্ণিং স্যর—নমস্কার—গুড্ নাইট···বলে নমস্কার করে শশধর চূড়ামণি চলে গেল।

সর্বেশ্বর রায় জানালার দিকে চেয়ে কেবল গড়গড়ার নল টানতেই লাগলেন।

রংরাজের অতি-কৌতূহল জেগে উঠল, কেবলই মনে করতে লাগলেন—সর্বেশ্বরের কথাগুলো যেন আজ কেমন কেমন—আর এই শশধর চূড়ামণিকে টাকা দেওয়া, এও এক রহস্য; অথচ তাঁর মন কেমন যেন ভয় পাচ্ছিল এ কথা জিজ্ঞাসা করতে। তবু অতি কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করে ফেললে, হ্যাঁ সর্ব্ব, ব্যাপারটা কি বল দিকিন্?

ব্যাপার কিছুই নয়—এ একটা ক্রিমিনাল, মহা পাজী লোক—আমি মদের খেয়ালে বলছিনি, এ সেই বাঁকা-পঞ্চা; রঙ্গপুরে একটা খুনের মামলায় পুলিসের সাক্ষী হয়েছিল, এখন নিশ্চয়ই নাম ভাঁড়িয়ে এখানে পুরুতগিরি করে বেড়াচ্ছে।

তা ওকে টাকা দিলে?

টাকা ওকে দিইনি—টাকা জয়ন্তকে দিয়েছি।

জয়ন্তকে?

হ্যাঁ ওরই ওখানে সেই থিয়েটারের মীনা মেয়েটা থাকে। জয়ন্ত থিয়েটারের হুজুগে সেইখানেই পড়ে থাকে। টাকাটা তারও দরকার, তাই দিলাম।

একটা ক্রিমিনাল-এর সাহচর্য্য করছে এই জয়ন্ত, তার ওপর থিয়েটার করব বলে অত টাকা উড়িয়ে দিলে—আর সেই অবস্থায় তুমি তাকে টাকা দিচ্ছ—সে কি হে!

নিজের মেয়ে যাকে দিয়েছি, তাকে না হয় দু-চার হাজার টাকাই দিলাম।

টাকা নিয়ে এই রকম বদখেয়ালী করে বেড়াচ্ছে—ওদিকে তার সর্ব্বস্ব গেছে···

আমি যখন সর্ব্বেশ্বর, তখন সর্ব্বস্ব বজায় রাখবার চেষ্টার কল্পনাও ত' আসতে পারে?

তা বলে এই রকম প্রশ্রয় দিলে···

রংরাজ, সুবর্ণ চিরকালই মানুষকে পাগল করে রেখেছে। আজ নতুন নয়। তোমরাও জান, এমন দিন আমার গেছে, যেদিন বাবা ইন্‌সল্‌ডেন্সী নিলেন, আমি বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এলাম, ঘরে এমন পয়সা নেই যে কি খাই, তোমরা ছেলেবেলার বন্ধু—খেলুড়ী, তোমরা পর্য্যন্ত আমার অবস্থা দেখে মুখ বাঁকালে··

ও কথা আমায় তুমি বলছ কেন সর্ব্ব?

পুরোমাত্রায় তোমায় অবশ্য সে কথা বলতে পারি না বটে; কিন্তু তার কারণ, তুমি গরীবের ছেলে ছিলে, ততটা ঘৃণা করতে হয় ত সাহসে তোমার কুলোয়নি। কিন্তু তুমি জান যে সেদিন আমার ছ-টা পয়সা ছিল না যে ট্রাম-ভাড়া দিয়ে হাইকোর্ট যাই। তোমার কাছে তোমাদের বড় মিস্তির বলেছে, ওরে সাবধান, ওই সর্ব্ব আসছে, হয় টাকা ধার চাইবে, নয় ফাঁক পেলেই হয়ত কিছু সরাবে···আমি ভুবনেশ্বর রায়ের ছেলে, আমাকে এ কথা শুনতে হয়েছে। কেমন, ঠিক বলেছি ত? তুমি সামান্য চাকরী করতে, সেদিন তুমি তোমার স্ত্রীর হাতের চুড়ি বিক্রী করে আমায় পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলে···আমি ভুলিনি। আজ টাকা পকেটে রাখতে ছুঁতে আমার হাত কামড়ায়—দেখেছ টাকা পকেটে রাখতে পারিনে। কিছু না, সবটাই মানুষের নেশার খেয়াল···জয়ন্ত যে সর্ব্বস্ব নষ্ট করে এমনি করে বেড়াচ্ছে, এও তার নেশার খেয়াল··

তাই বলে কি একটা ক্রিমিনালকে টাকা দিয়ে··

ক্রিমিনাল কে নয়—রংরাজ বলতে পার? যদি ভগবান থাকে তা হলে ভগবান সব চেয়ে বড় ক্রিমিনাল; নইলে তাঁর সৃষ্টিতে এত বড় পাপ? সব পাপ যদি তাঁরই সৃষ্টি না হয় তবে এত বড় পাপ মানুষে সৃষ্টি করতে পারে? এত পাপতাপ মানুষে কখন সহ্য করতে পারে? যদি তোমাদের বুড়ো ভগবান না এতখানি তাপ সহ্য করে?···সংসারে স্ত্রী স্ত্রী নয়, তবু তাকে নিয়ে ঘর করতে হয়—ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি বসায়—বন্ধু বন্ধুর স্ত্রীকে লোপাট করে, আধলা পয়সার জন্যে মানুষকে মানুষ অন্ধকারে ঠেঙিয়ে মারে। সৃষ্টিতে পাপ না থাকলে এ কখন হয়? আমি আজ এত বড় কৌন্‌সুলী, ভাবছ বড় সুখে আছি! না? খুনীকে বাঁচিয়ে, জালিয়াত জুয়াচোরকে বাঁচিয়ে, সেই পাপকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, শুধু তা নয় তার প্রতিষ্ঠা করছি; আইনের ফাঁকি তৈরী করে আদালতে জজের চোখে ধূলো দিয়ে যারা সৎ তাদের গলা টিপে মেরে এই বাঁকাপঞ্চার মত মানুষ—যারা পুরো-শয়তান, তাদের কাছ থেকে সেই পাপের টাকা নিয়ে টাকা করছি—এত বড় বাড়ী, নাম-ডাক—শুধু ক্রাইম-এর দৌলতে—পাপের প্রশ্রয় দিয়ে। তোমার সততা ও জপতপের টাকা নয়।

তাহলে কি বলতে চাও যে সততা অনেষ্টি বলে কোন জিনিষ পৃথিবীতে নেই?

নেই। বাজে কথা, নেই। মিছে কথা· যেদিন থেকে বৈশ্যের বেনের ব্যাসাতি সৃষ্টি হয়েছে, সেইদিন থেকে এই অনেষ্টির মূর্ত্তি খাতির জমা পেয়েছে। বুঝলে রংরাজ, তোমরা যাকে ধর্ম্ম বল, সত্য বল, অনেষ্টি বল—ও হ'ল ছোটলোকদের জন্যে। ইতিহাস পড়ে দেখ—বড় বড় ঘটনার মধ্যে কোনদিন কোন অনেষ্টি ছিল না। আজ যত পাতি-ব্যবসাদার—তারা এই অনেষ্টি শব্দ সৃষ্টি করেছে। শতকরা চার টাকা করে সুদের জন্যে। তা না হ'লে না-খেতে পেয়ে এ বেটারা মরে যেত। কেবল গুনছে কত টাকা শতকরা হারে পাব। ছেলে-মেয়ে, মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সবারই ভেতর যে অনেষ্টি কথাটার এত চল্ তার কারণ—সবাই সুদ খেতে চায়। তাই মূলধন করে নিয়েছে অনেষ্টিকে।

তোমার কৌন্‌সুলীর যুক্তিকে হয়ত খণ্ডন করতে আমি পারব না—কেন না এতখানি তর্কবুদ্ধি আমার কস্মিনকালেও নেই সর্ব্ব। যদি তুমি অনেষ্টিকে সৃষ্টিতে সত্যি না মানতে তবে তোমার বাপের ইন্‌সলভেন্সী থেকে তুমি এত বছর পরে তাঁর সে ঋণ শোধ করলে কেন?

পিতৃঋণ শোধ করা মানুষের প্রকৃতিতে আছে—তাই সে ঋণ শোধ করতে চেষ্টা করেছি। এতে অনেষ্টির সততা তুমি কোথায় দেখলে?

রংরাজবাবু কিন্তু এর আর কোন প্রতিবাদ করলেন না;

বললেন : ও তর্কে আমি তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না, কিন্তু এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না সর্ব্ব, যে তাই বলে এই রকম ক্রিমিনালিটি, এই সব পাপাচারের প্রশ্রয় দেওয়া এবং তাদের এইভাবে টাকা দেওয়া···

দেখ রংরাজ, আজ প্রায় পঁচিশ বছর ক্রিমিনাল প্রাক্‌টিস করছি—ফৌজদারী মামলা করে টাকা আর যশ কম উপার্জ্জন হয় নি। ক্রিমিনাল-এর চোখ দেখলে বুঝতে পারি। এত বড় পাপী আজও দেখলাম না—যার ভেতর কিছু না কিছু সদ্‌গুণ আছে। এই যে বাঁকা-পঞ্চা এত বড় পাজী, ওরও—ওর রক্ষিতার জন্যে মমত্ব বোধ আছে, তার ওই মেয়েটার জন্যে দস্তুরমত মায়া আছে, বুঝলে ?

কথা শেষ করতে না করতেই প্রভাতী দেবী সেই চেক-বইখানা চান্‌কার হাত থেকে নিয়ে ঝড়ের মত ঘরের ভেতর এসেই বললেন : তুমি সেই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া পাজী হাড়-হাবাতেকে···

সর্ব্বেশ্বর রায় চাপা-হাসির সঙ্গে কৌতূহলের ভঙ্গীর ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : কি হয়েছে ডিয়ারি ? কে হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া···কে ?

কেন, যার নামে চেক্ দিলে।

সর্ব্বেশ্বর রায় হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, আরে ও যে সেল্‌ফ্ চেক্—নিজের নামে দিয়েছি।

নিজের নামে ? দেখ, আমার সঙ্গে ন্যাকরা ক'র না···তুমি সেই লক্ষ্মীছাড়াকে তিন হাজার টাকার চেক দিয়েছ !

ভুল ক'রনা প্রিয়তমে, তিন নয়, পাঁচ হাজার টাকার চেক্, বইখানা আর একবার তাকিয়ে নাও।

কি সর্ব্বনাশ · অ্যাঁ···কি সর্ব্বনাশ···তুমি···তুমি···

এবার কি আমার মাথা গেল বলে স্মেলিং সল্ট শুকব না কি ?

তুমি জান যে টাকা নিয়ে কি রকম কাণ্ডকারখানা সে করেছে।

জানি বই-কি ডিয়ারি, সেইজন্যেই ত টাকা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলাম···যেখানে সে আছে, আজ রাত্তিরে টাকাটা না দিলে, তারা হয়ত মদ দেবে না, রাস্তায় বার করেও দিতে পারে বা যে অবস্থাই তার হোক, তার ইজ্জত আমাকে রাখতে হবে 'খই কি। আর যাই হোক, সে ত আমার জামাই—জামাইও যে পেটের ছেলেও সে—জয়ন্ত যদি তোমার ছেলেই হত···

আমার অমন ছেলে হলে নুন খাইয়ে গলা টিপে মারতাম···

বালাই ষাট···ছেলের গলা টিপে মারতে, তা তুমি পারতে বটে !

একটা রোগ্ রাফিয়ান·· টাকা কি খোলামকুচি—

একেবারেই নয়, অনেক কষ্টে রোজগার হয়, মুখ দিয়ে রক্ত-ওঠা পয়সা···অন্যায় হয়ে গেছে প্রিয়তমে, অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে···টাকাগুলো সবই জলে ফেলে দেওয়া হয়ে গেছে—উপায় কি বল···তাই ত—জন, জামাই, ভাগ্‌না···কেউ নয় আপনা, আমি কথাটার মানে এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

দেখ, তোমার ওই গা জ্বালান কথা শুনলে···

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা, সমস্ত অঙ্গ জল হয়ে যায়···

দেখ, এসব আমার একটুও ভাল লাগছে না···

মোটেই না ডিয়ারি, ভাল লাগবার কোন কারণ নেই !

রংরাজ হতভম্বের মত হাঁ করে কৌনসুলী ও কৌনসুলী-পত্নীর রসাভাষ শুনে ভয় পেতে লাগলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দু'জনকে থামিয়ে দেবার জন্যে বললেন : আহা—mon amie না হয় দিয়েই ফেলেছে···তার জন্যে···

সর্ব্বেশ্বর গড়গড়ার শব্দের সঙ্গে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, না-না-না-না—ভূমিকম্প হতে পারে···অগ্নিবৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়—সত্যি কথা···

রহস্যের ভঙ্গী এত মধুর—শ্লেষের স্বরে সর্ব্বেশ্বর রায় বলতে লাগলেন—আর প্রভাতীর গলা এত জোর নিখাদে বাজতে লাগল যে, মাধুরী ও মিলনী তাড়াতাড়ি এল—মিলনীর চোখ তখনও জলে উচ্ছল।

বাবা ! বাবা !

ভয় কি মা। কোন ভয় নেই···

বাবা কি হবে!

একটা কিছু হবে নিশ্চয়ই। তোমার মা যখন সিনেমার ছবির মতন ভেতর থেকে প্রপেলারের পাখা ঘুরিয়ে এত বড় ঝড় তুলেছেন তখন একটা কিছু হবেই···তবে ভয় বেশী নেই, যা হবার তা ঠিক হবে। আসল ঝড় নয়—ওটা নকল ঝড়। সব ঠিক হবে···

প্রভাতী মুখ একেবারে অন্য ভঙ্গী করে বললেন : যা হবে তা ত দেখতেই পাচ্ছি। বার বার করে তখন বারণ করেছিলাম—ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও না—এখন আমার কথা ফলল কি-না দেখতেই পাচ্ছে।

সত্যই ত ফল যে কিছু ফলেছে—তা ত দেখতেই পাচ্ছি, তাই ত—তাই ত। এখন তার কি করা যায় প্রভাতী ডিয়ারি ?

এখনও বলছি ওর ডাইভোর্সের ব্যবস্থা করে···

সর্ব্বেশ্বর রায়ের মুখখানা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। তিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন বেদনার হাসি হাসলেন—চোখ মুখ ঘাড় নেড়ে বললেন : তা হলেত ডিয়ারি, সর্ব্বাগ্রে তোমারই ডিভোর্স স্যুট ফাইল করা উচিত : কি বল রংরাজ, অ্যাঁ···হে-হে-হে-হে-হে-হে···সর্ব্বেশ্বর রায় একটু রকম করে হেসে নিলেন।

রংরাজ ভয়-চকিত স্বরে বললে : কি যে কথা কও সর্ব্ব—তার মানে হয় না···

অনেকখানি মানে হয় বন্ধু, অনেকখানি মানে হয়। তোমাদের স্যর জেম্‌স্‌ জিন্‌সের 'ইন্‌ দি ডীপ ওয়াটার'-এর মহা গহন রহস্যের মত মানে হয়।

তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : শোন প্রভাতী, যতক্ষণ তুমি স্মেলিং সল্ট আর আয়া আয়া কর, কোন আপত্তি নেই···যত ইচ্ছে বার্গাণ্ডি পান কর, কোন বারণ নেই ; কিন্তু এটা তুমি স্থির জেনো, যদি কোন কারণে এই ডিভোর্সের সূচনা হয়, সে অঘটন ঘটে, তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে আমি সর্ব্বেশ্বর রায়—আমার জামাই—ওই যাকে মাতাল লম্পট লক্ষ্মীছাড়া বলে আমার সামনে মেয়ের সামনে গালা-গালি দিলে, সকলের আগে—ওই জয়ন্তকে আমি ডিফেণ্ড করব—তার পক্ষে আমিই হব কৌনসুলী।

বল কি সর্ব্ব, তুমি জয়ন্তকে ডিফেণ্ড করবে ?

প্রভাতী দেবী কেমন যেন থতমত খেয়ে বললেন : ডিভোর্স স্যুট ফাইল আমি···তুমি জয়ন্তকে···

হাঁ আমি সর্ব্বেশ্বর রায়, এই আমার মিলনী মা'র জন্যে···যাও মা, তোমরা ঘরে যাও। যতক্ষণ আমি আছি—কোন ভয় নেই।

সর্ব্বেশ্বর রায় পারলার থেকে বাইরে চলে গেলেন। বাইরে থেকে তাঁর গলার স্বর শোনা গেল : চানকা ! চানকা ! গাড়ী বের করতে বল্‌।

মাধুরীও মিলনীকে হাত ধরে নিয়ে এ-ঘর থেকে তার নিজের ঘরে গেল।

রংরাজ মনেমনে ভাবতে ভাবতে গেলেন, ছেলেবেলা থেকে সর্ব্বর সঙ্গে ভাব—তারপর এতদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু—হঠাৎ সর্ব্ব ও-রকম বলে উঠল কেন ? অতি রূঢ় কথা···তবে কি ? · নাঃ···কিন্তু মনের মধ্যে নিজেকে যদি খাঁটি বিচার করে দেখি—তা'হলে · নাঃ মনকে চোখ ঠারলে হবে কেন··· সন্দীপ ত আমি নই সত্যি—কিন্তু···সর্ব্বেশ্বর—হ্যাঁ সর্ব্বেশ্বরের খানিকটা যে নিখিলেশ তাতে সন্দেহ নেই · কথাটা গুরুতর···প্রভাতীকে ডেকে কিছু বলব না, আজ থাক্‌··· আমায় অন্য পথ নিতে হবে···

প্রভাতী দেবী আবার তেমনি ভাবে দ্রুত ফিরে এলেন। রংরাজবাবু তখনও ঘর থেকে যান নি। দরজার কাছ পর্য্যন্ত পৌচেছেন—প্রভাতী দেবী তাঁকে ফিরে ডাকলেন : দাঁড়াও !

রংরাজ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

প্রভাতী দেবী চানকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : সায়েব কোথায় গেলেন।

কিশোরীবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে চলে গেলেন, বললেন যে জজ সাহেবের কোঠিতে ডিনার আছে। তিনি জজ সাহেবের বাড়ী গেলেন।

জজের বাড়ী, না যমের বাড়ী···

চানকা ভয়ে একটা সেলাম করে চলে গেল।

দেখলে ত বন্ধু ! এই মানুষ—জজের বাড়ী ডিনার··· কিশোরী হ'ল তাঁর সঙ্গী, আমি যেন কিছু জানি নে, কিছু বুঝি নে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ—আমি মাথায় কপালে মেন্‌থল্‌ ঘষে ঘুমব···mon amie···প্রিয় বন্ধু · আমার মত দুঃখী এ জগতে আর নেই···সাধ ক'রে কি মেয়ের ডাইভোর্স চাই। বোস বন্ধু বোস, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

রংরাজ একটু ভয়চকিত স্বরে বললেন : আজ থাক্‌ অন্য দিন আসব বন্ধু আমার···

না তুমি বোস—বয়, বার্গাণ্ডি ! বয় ! জলদি লাও···তবু দাঁড়িয়ে রইলে কেন—তোমাকে আজ সব কথা শুনতে হবে।

রংরাজ ভয়েও বটে আবার প্রভাতীর সঙ্গে গল্প করবার লোভেও বটে—বসল। একটা হাভানা সিগার ধরিয়ে—বসল।

বল বন্ধু, কি বলবে···বল···

বলছি আগে মাথাটা ঠিক করে নিই। শোন—এক এক সময় আমারও মনে হয় আমি আমার স্বামীর এ ঘর ত্যাগ করে চলে যাই।

ও কি কথা! সর্ব্বনাশ, ও-কথা বলতে নেই বন্ধু।

কেন নেই? তোমার সংস্কারে বাধে, এই না? তোমার সংস্কার বলবে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার মত জঘন্য ঘৃণিত পাপ আর নেই···টেরিব্‌লি মন্‌সট্রাস, ভয়াবহ রাক্ষসী বৃত্তি, কেমন? বিশেষত, এমন নাম-ডাকওয়ালা ধন-দৌলতওয়ালা স্বামী, নিজের পেটের এত বড় বড় সন্তান। হ্যাঁ বন্ধু, সমাজ তাই বলে এবং চিরকালই বলবে। আমিও হয়ত তাই-ই বলতাম···

যেটা লোকচক্ষে হীন বলে প্রতিষ্ঠা হয়েছে···সে কাজ ···সভ্যতার—

লোকচক্ষে হীন বলে প্রতিষ্ঠা করেছ, সভ্যতা না ছাই··· তোমরা পুরুষ, সেই জন্যে, নইলে এটা হীন বলে বোঝাতে কখন চেষ্টা করতে না। নারীর অন্তর তোমরা বোঝ না, জান না, শুধু তাকে আদর ভালবাসা আর প্রেম দেখাও, না বন্ধু! নারী ব'লে আশ্রিত লতা মনে ক'রে, ক্ষেমা-ঘেন্না না ক'রে বরং একটু যদি কম ভালবাসতে, তা হলে নারী তার জীবন নিয়ে বেঁচে যেত। তুমি জান না বন্ধু, আমি অনেক দুঃখে অনেক আশার-নিরাশার পর তবে, আমার পেটের মেয়ের জন্যে ডিভোর্স চেয়েছি এবং যদি আমি সত্যি নারী হই, তবে এ ডিভোর্সের ব্যবস্থা আমি করবই করব। আর তোমাকে তার সহায় হতেই হবে।···

আমি কি করে এর সহায় হতে পারি বল···সর্ব্ব বললে যদি ডিভোর্স কেস হয়, সে নিজে জয়ন্তকে ডিফেণ্ড করবে, তার কৌনসুলী হবে সে।

তাই ত হবে, তাই ত হয়—এটা যে তোমাদের এতদিনের সভ্যতার সমাজগত অধিকার, নারীর ওপর সকল রকমে জোর দেখান, জোর ফলান···পুরুষের জন্মগত অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কি করতে বল আমাকে?

দেখ, আমার বয়স খুব কম হয়নি। একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে ছত্রিশ বছর—অনেকখানি বয়েস। তার ওপর আমি মা হয়েছি এবং আমার মেয়েদেরও মা হবার বয়েস হয়েছে। ষোল বছরে আমার বিয়ে হয়েছে। আজ কুড়ি বছরের ওপর আমার এই ঘর সংসার। উনি সায়েব, বড় ব্যারিষ্টার। কি দুঃখে কষ্টে সে দুর্দ্দিনে আমি ওঁর মুখ চেয়ে সংসারের সকল কাজ করে এসেছি তুমি জান?

জানি তোমার মত পরিশ্রম, তোমার মত নীরবে অক্লান্ত-ভাবে সব দুঃখের বোঝা মাথায় পেতে নিয়ে সংসার করা, আমি হয় ত আর দেখিনি। সেই জন্যেই ত তোমায় অত শ্রদ্ধা করি।

প্রভাতী দেবী একটু হাসলেন।

'আমায় বোকা মনে ক'র না বন্ধু, তুমি শুধু শ্রদ্ধা সেই জন্যে কর না, আর কিছু এর মধ্যে, ওই শ্রদ্ধার মধ্যে তোমার আর কিছু আছে, আমি জানি···চোখের পাতা নীচু কর না, তাকাও···সত্যির জন্যে লজ্জা পাও কেন? তুমি জান যে আমি আমার স্বামীকে ভালবাসতাম···

ভালবাসতে?

হ্যাঁ তাই, এখন আর বাসিনি · তোমার বন্ধু সায়েব সেটা অনেকদিন বুঝেছেন···আজ দশ বছর পরে গুলিমারার মত তাই ঘুরিয়ে তোমার সামনে বলে গেলেন। জান বন্ধু, আজ দশ বছর ধরে এই যে বাড়ীটা এই টাকাকড়ি গাড়ী নাম-ডাক—হৈ চৈ ··এ সবগুলো আমার কাছে একেবারে ফাঁকা—আমি যেন আলাদা একটা মানুষ দেখছি তাকিয়ে, আছি একটা সলিটারী সেল্‌-এর মধ্যে—চোখের ওপর সিনেমার ছবির মত এই খেলাগুলো হয়ে যাচ্ছে। mon ami—এ দশ বছর এমনি নির্জ্জনকারাবাস যদি না করতাম, তা হলে কি তুমিই বন্ধুত্ব করতে পারতে—না আমার এই নরম হাতে কখন হাত দিতে পারতে। তোমার ভেতরের অন্ত পর্য্যন্ত আমি সার্চ্চ-লাইট ফেলে দেখেছি, তুমি কি চাও। কেমন বন্ধু, বল···ও কি, আবার মাথা নীচু কর কেন? হায়! হায়! কত দুর্ব্বল তোমরা ··

সত্য কথা প্রভাতী, আমি অস্বীকার করতে পারি না।

তুমি যেদিন তোমার স্ত্রীর হাতের চুড়ি বিক্রী করে টাকা দিয়েছিলে—সেদিন তুমি শুধু আমাদের দুঃখের সহানুভূতি

থেকে করনি···তার মধ্যে তোমার, আমার জন্যে কিছু ছিল।

রংরাজের সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে: আমি আজ উঠি প্রভাতী, না-না—এসব কথা শোনা ভাল নয়। তোমারও বয়েস হয়েছে—আমারও বয়েস হয়েছে, এখন এসব কথা শোনা ভাল নয়।

দু'দিন আগে শুনলেই কি ভাল হ'ত? না—উঠ না, বোস। কথাটা পরিষ্কার হওয়া ভাল; তোমরা পুরুষ, নারীকে হত্যা করে সমাজ তৈরী করতে শিখেছ। তোমরা যতখানি অবিশ্বাসী, নারী কখন এতখানি অবিশ্বাসিনী হয় না। আর যদি হয় সেটার প্রধান কারণ তোমরা নিজে, সে দোষের প্রথম কারণ তোমরা।

একথা বলা কি সঙ্গত হচ্ছে বন্ধু? কেউ যদি অবিশ্বাসী হয়—হয় তাকে ত্যাগ করতে হয়, আর না হয়···

ভয় পাচ্ছ কেন বলতে? বল তাকে হত্যা করতে হয়—এই পুরুষের ধর্ম্ম সমাজশাসন। রোহিনীকে গুলি করে মারা ছাড়া গোবিন্দলালেরা আর কিছু পারে না। ওথেলোর মত গলা টিপে মারা ছাড়া আর তোমরা কিছুই পার না।···তা সে সন্দেহ সত্যিই হোক্ আর মিথ্যেই হোক্···

হ্যা, তা আমি জানি বন্ধু। তবে আজকের দিনে তাকে আমরা বর্ব্বর মনে করি। তাই ত আজ ডিভোর্স আইনের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু বন্ধু, সমস্তই তোমার কল্পনা। তোমার ত কোন অভাব নেই—সংসারে মানুষ যা চায় সে-চাওয়ার মধ্যে তোমার পাওয়া ত কম হয় নি। আর নারীকে বোঝবার কথা যে বলছ, তাহলে পুরুষ তার ভালবাসার মধ্যে কি নারীর চেয়ে কম সহ্য করে? যদি কোন নারী তার স্বামী ত্যাগ করে চলে যায়, তাকে কি করে মানুষ সহ্য করে বল।

এক কথা বার-বার বলছ—কেন চলে যায় সেটা যদি বুঝতে, তাহলে নারীর ভালবাসা বোঝবার ক্ষমতা হয়েছে স্বীকার করতাম। তুমি জান না বন্ধু, তোমরা তা জান না। তোমরা মাঝে মাঝে দয়া দেখাও—যত দয়াই তোমরা কর ততই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ববোধ তোমাদের নিজেদের মধ্যে পাহাড়ের চূড়ার মত মাথা তুলে ওঠে। পুরুষ মানুষের স্বভাব এই যে, যেটার পরিণতি ভুক্তি তার মধ্যেই থেকে যায়, তার জন্যেই সে দরদ করে, আর তা ছাড়া বাকী সংসারে যা-কিছু সব জিনিষের ওপরই তার অপরিসীম নিষ্ঠুরতা—এত বড় নিষ্ঠুর সৃষ্টিতে আর কিছু নেই। যে নারী তোমার সঙ্গে বাস করে, ঘর করে, তার সত্যি পরিচয় তোমাদের কোন দিনই হয় না। তোমরা যে ভালবাস সে তোমাদের ফ্যাসানের মত, তোমাদের মনের ধাঁজার মত। নিজেদের মধ্যে নিজেদের নিয়ে এতই তোমরা সন্তুষ্ট থাক যে তোমাদের অন্যের কথা ভাববার কোন ফাঁকই পাও না। হায়, হায়, তোমরা ভাব তোমরা আমাদের জান বোঝ···যদি কখন বুঝতে যে কি পরিমাণ তাপ, কত যাতনা, আমাদের এই সংসার করার মধ্যে পেতে হয়! এক এক সময়, সমস্ত দেহ-মন সঙ্কুচিত হয়ে হাত-মুঠো শক্ত করে প্রাণটা বার হয়ে যাবার মত হয়, তখন বলতে ইচ্ছে হয়, রাখ, রাখ, তোমার ওই ভালবাসা মমতা—ওটা বাদ দিয়ে আর কিছু বল, আর কিছু কর। উঃ কি ভীষণ।

প্রভাতী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তাঁর সমস্ত মুখখানা বেদনায় যেন নীলাভ দেখাতে লাগল। চোখ জলে ভরে এল। তারপর বললেন—নাঃ বন্ধু, তুমি বাড়ী যাও···নাঃ—নাঃ তুমিও এ বুঝবে না, কেন যে আজ আমি মেয়ের ডিভোর্স চাই···আমি আমার বিবাহিত জীবনে যে দারুণ শাস্তি ভোগ করছি, সেই অশান্তি থেকে বাঁচাতে চাই তাকে···সে কথা তোমরা পুরুষ, তোমরা বুঝবে না; মেয়ের সংসারের ভালবাসার মোহ এতখানি, যা যৌবনে সব মেয়েরই থাকে—সে ডিভোর্স চায় না—তবু তারই ভালর জন্যে আমি এতখানি বিরোধ করছি···যাক্···নাঃ—বন্ধু, তুমি বাড়ীই যাও···যে আগুনের শিখা একদিন আমার পাজরা পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছিল আজও আমার নিভল না, সেই আগুন আজ আমার মেয়ের অন্তরে জলে উঠেছে। এ আগুন নিয়ে খেলা···এ আগুনের তাপ এত বেশী যে তার রূপ দেখা যায় না—শুধু পুড়ে ভেতর ছাই হয়—ওপরের রঙও বদল হয় না।

Mon amie তুমি দেখছি আজ বড় উত্তেজিতা হয়ে পড়েছ।

অঃ···উত্তেজিতা হব না? দেখ মেয়েমানুষ সহজে সুখী হয় না। নারী হয়ে সুখী হওয়া যে কতখানি শক্ত তা তোমাদের ধারণা নেই। পুরুষ মানুষের চেয়ে অনেক

গুণ কষ্ট ও দুঃখ নারীকে সইতে হয়। সে সওয়ার মধ্যে তাদের আনন্দ আছে সুখ আছে। যখন তাতে সে আনন্দ ও সুখ পায় না—তখন জীবন তার অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আর তোমরাই আমাদের অতিষ্ঠ করে তোল। তোমাদের স্বভাবই হচ্ছে বাসা-ভাঙ্গা—বাসা-গড়া তোমাদের স্বভাব নয়।

একথা তুমি ভুল বলছ প্রভাতী। এ তোমার উত্তেজনার জন্যে···

কে বললে উত্তেজনা? বটে! তুমি নভেল প'ড়ে দিন কাটাতে পার, পেটের জন্যে গোলামী করে দিন কাটাতে পার, তোমার সায়েব কৌনস্থলী-গিরি, তার মামলার হার-জিতের দম্ভ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, তোমাদের কাছে বাইরে বলে একটা বস্তু আছে সে বস্তুটি তোমাদের কাছে নিছক খাঁটি। সত্য, তোমরা নিজেদের তার মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের খণ্ড খণ্ড করে অখণ্ড আনন্দের হয়ত আস্বাদ পাও, একজন সুস্থ সবল চিত্ত নারী তা পারে না—তাকে অনেক সইতে হয়। একটা মানুষের কতক অংশকে এমন করে কণ্ঠরোধ করে ধরা, অতি নৃশংস ব্যাপার। ছোরা মেরে খুন করার চেয়েও ভয়ানক···

বাইরে না হলে যে আমাদের চলে না।

তা নয় বন্ধু, তা নয়; মেয়েমানুষের প্রাণের ভেতরে অনেকগুলো ঘর থাকে, সে ঘরের একটা যদি খালি হয় বা খালি থাকে, তাহলেই আমরা অসুখী হই। তোমাদের একটা মাত্র প্রাণ আর সে অতি বলবান, সত্য—যা বুঝে বলতে গেলে হয়, একেবারে পশুর মত—পাশবিক, এমন কি দানব বললেও ভুল হয় না। আমি তোমাদের এই দানবত্বকে প্রশংসা করি। কিন্তু এত স্বার্থপর তোমরা কেন হও, তা ভেবে ঠিক করতে পারি নি।

কি করব বল, সেটা ঠিক আমাদের দোষ নয়···স্বাভাবিক ভাবে আমরা বাস করতে পারি নে। সন্ন্যাসী হওয়াও স্বাভাবিক নয়; বিয়ে—তাও স্বাভাবিক নয়। বিয়ে না করে প্রেম ভালবাসা, দুর্ব্বলকে বলবানের কবলের মধ্যে এনে দেয়। এই যে সমাজ—এও স্বাভাবিক নয়। আমরা বুদ্ধি দিয়ে তৈরী করেছি।

ওঃ, বলতে চাও তোমরা তোমাদের হাতে-গড়া সমাজের সামাজিক জীব। বাজে কথা! বোকার কথা! মনকে চোখ ঠেরে কথা। এই রকম করে বাস করতে সমাজ তোমায় বাধ্য করেছে! তোমার সুবিধের জন্যে তুমি এই সমাজ সৃষ্টি করেছ—প্রথম তোমাদের আত্মরক্ষা, তারপর তোমাদের সুখের নেশা, তারপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় করার জন্যে আগ্রহ। সত্যি কি তোমরা নারীর চেয়ে বড়? প্রকৃতিও তোমাদের জন্যে তৈরী হয় নি, এ সৃষ্টি শুধু তার শক্তিকে দাবাবার জন্যে আর তার চেষ্টাই করে আসছ। এ ত শুধু একটা বিরোধ—আর এও আশ্চর্য্য নয় যে, তোমরা পদে পদে তার কাছে হেরেই যাও। কি করে তবে সংসারে জয়লাভ করবে বল। শুধু বল দিয়ে···

তার মানে?

তার মানে অত্যাচার করে···যদি কোনদিন মনে করতে যে আমরা তোমাদের সমান—তাও কখন করবে না—শুধু বলবান দুটো বাহু দিয়ে টেনে নিয়ে, আমাদের একেবারে খেয়ে ফেলে সকল রকমে নিজের কবলের মধ্যে নিয়ে, ভোগ করে তবে তোমাদের তৃপ্তি···না—নাঃ···না···এ তোমরা কখন বুঝতে পারবে না।

দুজনে চুপ করে বসে রইলেন। প্রভাতী দেবী ভাবতে লাগলেন: কেন আজ এ সকল কথা এর কাছে বলে ফেললাম। পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করা অত্যন্ত ভুল।

রংরাজবাবুও মনে মনে ভাবতে লাগলেন: প্রভাতী অনেক কথাই সত্য বলেছে—কিন্তু এ-ভাবে দু'জনে দু'জনের কাছে ধরা-পড়াটাও বোধ হয় ভাল হল না।

প্রভাতী একটু হেসে বললেন: কি ভাবছ বন্ধু, কথাটা বড় খোলা-খুলি বলে ফেলেছি, না? ··দেখ বিষ হজম হয় না, বিষে জর জর হতে হয়···বিষ বার করে দেওয়াই ভাল। এ বাড়ীর হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আমার দম আটকে আসে আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারি নি।

Mon amie—এ-সব হচ্ছে তোমার অতিরিক্ত ইবসেন্ পড়ার ফল বন্ধু···

ভুল বলছ বন্ধু! ইবসেন পড়ার ফল এ নয়, রবি ঠাকুরের স্ত্রীর পত্র পড়ার ফলও এ নয়। ইংরেজী লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চেতনা জেগেছে, আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পাবার চেষ্টা হয়েছে—ইবসেন পড়ে সেইটে নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পেয়েছি—ইবসেন পড়ে তা হয় নি—হয়েছে আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে—তোমাদের এই অত্যাচার থেকে বাচাবার জন্যে, আজ এতদিন পরে আমরা পথ খুঁজে

দেখছি, তোমাদের এই পুতুল খেলার মত আমাদের নিয়ে হেলা-ফেলা খেলা তাই ভাঙবার জন্যে চেষ্টা করছি। দুঃখ এই যে, অনেক বয়সে—সেটা বোঝবার শক্তি হল। যাক্‌ গে, তুমি এখন যাও বন্ধু···বাড়ী যাও···স্বামীকে নারায়ণ বলে পূজো করবার সাধ আমাদের ভেঙেছে—স্বপ্ন ভেঙে গেছে—তার বদলে সত্যিটা অতি রূঢ় পরিহাসের মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের চোখের সামনে হাসছে···না, তুমি বাড়ী যাও··· বোধ হয় তোমাকে সকল কথা বলে ভাল করিনি—যাও···

প্রভাতী দেবী উঠে দাঁড়ালেন। এখনও তাঁর রূপের দীপ্তি সেই আয়ত বিস্ফারিত চক্ষুর ভাব-প্রবণতা মুছে যায় নি। পারলারের পর্দ্দা সরিয়ে প্রভাতী দেবী যখন ভিতরের দিকে গেলেন, রংরাজ তাকিয়ে দেখলেন—যৌবনে ভাঁটা পড়লেও সে মুখ বেদনায় খিন্ন হলেও নারী প্রকৃতির দম্ভের যে রূপোন্মাদনা তা চোখের প্রতি পাতাটি দিয়ে এখনও ঠিকরে পড়ছে। পুরুষ এখনও তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে পারে সম্মোহনের বাণ এখনও একেবারে নিঃশেষ হয় নি।

যাও বন্ধু, যাও—অপূর্ব্ব ধর্ম্মস্রষ্টা-সমাজস্রষ্টা তোমরা ·· পুরুষ তোমরা ছত্রিশ গণ্ডা স্ত্রীলোক নিয়ে তাল-বেতালের খেলা খেল—তাতে কোন দোষ নেই। কতকগুলো বুনো কুকুর-কুক্কুরীর জন্য ফোঁস ফোঁস আর ঘেউ ঘেউ কর। মানুষের জীবন, নারীর জীবনটা চটকে থেঁতলে পা দিয়ে দলে—জীবনের যে শ্রেষ্ঠ মূল্য সেটাকে লুঠেরার মত লুণ্ঠন করে ধর্ম্ম পূজো সতীত্বের আদর্শের জয়গান কর···এই ত? এ জীবনের কোন মানে আছে? কিছু না—শুধু নিঃশ্বাস ফেলা আর নেওয়া এই পিণ্ড মাংসের মধ্যে রক্তের প্রবাহ—এই হল সব চেয়ে বড় মূল্য···স্ত্রীলোকের এ মাংসটা ছুঁলেই বড় পাপ···যাও যাও বন্ধু···যাও···মানুষের নিজের মর্য্যাদা নিজের কাছে, অন্যে সহজে তার মূল্য দেয় না। আজের দিনে স্বামীর কাছে স্ত্রীও মর্য্যাদা পায় না—তবু আমি সন্তানবতী···হায়! হায়!

রংরাজের মনে প্রভাতী দেবীর কথাগুলো যেন তীরের ফালের মত বিঁধতে লাগল।

নীরবে মাথা নীচু করে রঙরাজ চলে গেলেন। বাইরে এসে দেখলেন আকাশ মেঘে ঢাকা—বায়ুর গতি বেগবান—ক্ষণে ক্ষণে যেন অতি জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। শীতকাল না হলেও এমন একটা ঠাণ্ডা বাতাস যে, গায়ে লাগলেই শরীরটাকে জড় করে তোলে। চলার পথের দিকে চেয়ে রংরাজবাবু আপন মনে বলে উঠলেন—পন্থ বিপথ অতি ঘোর···সম্মুখের দিক জানা খুব ভাল বলে একটুও মনে নিচ্ছে না। বিধীনি বিথারিত পন্থা···

(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধযোগী বিরূপাক্ষ

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ কুমার

প্রবন্ধ

বিরূহা বর্দ্ধমান জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লী। এই গ্রামে বৌদ্ধযুগের দুটি স্তূপ অবস্থিত। স্তূপ দুটি শিবলিঙ্গ রূপে পূজিত হচ্ছে—বর্ত্তমান পূজারী হচ্ছেন ঐ গ্রামের অধিবাসী গোপালচন্দ্র নাথ। স্তূপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই কাহিনীটুকু পাওয়া যায়। বহু পূর্ব্বে বল্লুকা নদীর তীরে ছিল গভীর বন। এর মধ্যে অষ্টসিদ্ধযোগী বিরূপাক্ষের আশ্রম। একবার তিনি বহুদিন ধরে সমাধিস্থ ছিলেন—যখন তাঁর ধ্যান ভাঙ্গল, দেখেন আশ্রম নদীর প্লাবনে নিশ্চিহ্ন। রাগান্বিত হ'য়ে তিনি এক গণ্ডূষে নদীর জল পান করলেন—ঋষি অগস্ত্যের মত। সেই জায়গায় এক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করলেন—নাম দিলেন বিরূহা। আর তিনি দেহ রাখবার ইচ্ছা ক'রে তাঁর এগারজন শিষ্যকে আহ্বান ক'রলেন।

দেহরক্ষার পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হ'ল এবং কিছুদিন পরে সেখানে হ'ল একটি বল্মীক স্তূপ। সেই স্তূপ মাটী দিয়ে রূপান্তরিত ক'রে বিরূপাক্ষনাথ শিবরূপে সেবিত হন। এর পাশে আর একটি স্তূপ আছে--তা কালভৈরবের ব'লে বিদিত। বিরূপাক্ষেরটি উচ্চতায় পাঁচ হাত এবং কাল-ভৈরবের প্রায় চারি হাত। দৈনিক পূজার বন্দোবস্ত থাকলেও প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তাঁর সমাধি পূজা হয়—শিবপূজার বিধানে। পূজার মেলাতে বহু দূরাগত বৌদ্ধদেরও সমাগম হয়। কিংবদন্তী আছে, প্রতি বাৎসরিক পূজার গভীর রাত্রে একটি বাঘ বিরূপাক্ষের কাছে এসে থাকে এবং তার প্রমাণও পাওয়া যায়। পূজার রাত্রে সেই রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়। দুটি স্তূপই দিন দিন আকারে বর্ধিত হচ্ছে। বিরূপাক্ষ দেবের শিষ্যদের সমাধি বিরূহার নিকটস্থ বেলে, হাসনহাটী, পাতিলপাড়া ও হুগলী জেলার কোঁচমালি গ্রামে বর্তমান। এখন বিরূহাতে বল্লুকা নদীরও চিহ্ন পাওয়া যায়। স্তূপগুলি কোন অংশেই শিবলিঙ্গের মত নয়--বরং দেখিতে সারনাথ স্তূপের মত। ঐ গ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলেন—যিনি বিরূপাক্ষ-নাথ, তিনিই বুদ্ধদেব এবং একথা এ অঞ্চলের সর্বজন বিদিত।

এষা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(বাঞ্ছিতা)

বিলাসী যে-সুখে মত্ত—সোচ্ছ্বাস চাহো নি মা তুমি :
ধনমান, পরিজন, রূপমুগ্ধ পতঙ্গের দল ;
সংসার আকুল যার তরে--কভু তব চিত্তভূমি
চাহে নি সে-পরিচয়।
তুমি যে মা আজন্ম-উচ্ছল
যে-আলো ফোটে নি আজো তারি তরে—যে কমলকায়া
পার্থিব স্বপ্নের বৃন্তে ওঠে নি পুষ্পিয়া—তুমি তারি
অপার্থিব মধুগন্ধ-গরীয়সী : তাই মোহছায়া
তোমারে স্পর্শিতে নারে।
হায়, যারা অল্পের পসারী,
সুলভ রক্তের স্বত্বে দুর্লভারে অধিকারে চায়,
তন্বী তনু আয়তনে করে তব আত্মার বিচার
তারা মা কেমনে বলো বুঝিবে তোমার দুরাশায় ?
ক্ষিপ্ত হয় তারা শুনি' ক্ষুদ্র কণ্ঠে শাশ্বত ঝঙ্কার
তোমার "আপন" তারা নয় বলি'।
তাই অহঙ্কারে
দেহ তব বন্দী করি' গর্বে ঘোষে পেয়েছে এষা-রে।



অব্যাহতিলাভ—

শ্রীযুত অজিতকুমার বর্দ্ধন বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র; দার্জ্জিলিং মেলে সার্জ্জেণ্ট-মেজর বেরাগানকে হত্যা করার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন; বিচারে অজিতকুমার নিরপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায় বিচারক তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। যে ঘটনা বিবৃত করিয়া বেরাগান অজিতকুমারের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। অজিতকুমার বাঙ্গালী যুবক—আর বেরাগান গোরা সৈনিক, সে বর্ডার রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ানে চাকরী করে। বাঙ্গালী যুবকের সহিত ঐ গোরার কোন শত্রুতা ছিল না, থাকিবার কারণও নাই। অভিযোগে বলা হইয়াছিল—বেরাগান ইংরেজ বলিয়াই অজিতকুমার তাহাকে ছুরি মারিয়াছিল এবং সে বিকৃত-মস্তিষ্ক। অজিতকুমার প্রমাণ করিয়াছেন যে উক্ত গোরা অজিতকুমারকে কালাআদমী বলিয়াছিল ও গাড়ীর একই কামরায় তাহার সহিত যাইতে অসম্মত হইয়া তাহাকে জোর করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বেরাগান সরকারী চাকরী করে; এখন অজিতকুমার যখন খালাস পাইয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে বেরাগান তাঁহার নামে মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিয়াছিল। এ অবস্থায় বেরাগানের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট হইতে মামলা করা কি সঙ্গত নহে? ট্রেনে এইভাবে বহুবার বহু ভারতীয়—শুধু কৃষ্ণাঙ্গ বলিয়াই—বহু শ্বেতাঙ্গের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যদি বেরাগানকে শাস্তি দিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শ্বেতাঙ্গগণ এইভাবে কাহাকেও নিগ্রহ করিতে সাহসী না হইতে পারেন; কিন্তু তাহা হইবার নহে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা স্বজনবিয়োগবেদনা অনুভব করিতেছি। ১২৮৫ সালের ২৫শে আশ্বিন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বি-এ পাশ করিয়া তিনি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে প্রথম চাকরী আরম্ভ করেন; ১৩১৬ সালে তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন; ঐ কাজ করিবার সময়েই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে ঢাকায় গমন করেন ও ১৯৩৬ পর্য্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পর তিনি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম বয়সেই তিনি বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, মেঘদূত, মাঘ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশ করেন এবং 'সাহিত্য' মাসিক-পত্রে সে সকল লেখা প্রশংসিত হয়। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' চারুবাবুর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। মধ্যে কিছুদিন ভারতীতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ও সেই সময়ে কিছুকাল তাঁহাকে ভারতীর সম্পাদকের কাজও করিতে হইয়াছিল। ১৩০৯ সালে প্রবাসীতে তাঁহার প্রথম গল্প 'সরমের কথা' প্রকাশিত হয়। অধ্যাপকের কাজ করিবার সময় চারুবাবু 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' সম্পাদন করিয়া-ছিলেন এবং উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আরও অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের টীকাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকসমূহের মধ্যে রত্নাবলী, আগুনের ফুল্‌কি, ধূপছায়া, চাঁদমালা, বরণডালা, কনকচুর, মতিমঞ্জীর, স্রোতের ফুল, দোটানা, মুক্তিস্নান, চোরকাঁটা, যমুনাপুলিনের ভিখারিণী, সর্ব্বনাশের নেশা, রাবেয়া, বারণ, জোড়বিজোড়, রূপের ফাঁদ, নষ্টচন্দ্র, হাইফেন, মন না মতি, ধোঁকার টাটি, জয়শ্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার কয়েকখানি বই ফিল্মেও তোলা হইয়াছে;

শেষজীবনে 'রবিরশ্মি' নামক তিনি রবীন্দ্রনাথের এক সমালোচনা পুস্তক রচনা করেন ; তাহার একখণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর সহজে পূর্ণ হইবে না। পরিণত বয়সে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিলেও তিনি অধ্যাপনার জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতেন ও সেজন্য ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন।

রাজা জগৎকিশোর—

মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার খ্যাতনামা জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী গত ২২শে ডিসেম্বর ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহার মত সদাশয় জমিদার এ যুগে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে তিনি দানবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ; তিনি নানাস্থানে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন ; মৈমনসিংহে বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বহু তীর্থস্থানেও তিনি অর্থদান করিতেন ; কাশীতে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি একটি 'সত্র' চালাইতেন ; বিরাট ধনী হইয়াও তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন ; তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; শিকারী হিসাবেও তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদিগেরই সমান আদরের পাত্র ছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ তিনি সমভাবে রক্ষা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের একজন আদর্শ জমিদারের অভাব হইল।

নৃপেন্দ্রমোহন গুহ—

গত ৫ই ডিসেম্বর সোমবার কলিকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও অর্থনীতিবিদ নৃপেন্দ্রমোহন গুহ মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' বাণিজ্য সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করিয়া আইন পড়িবার সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও বহুদিন কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য উপলক্ষে বাঙ্গালার নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি সাংবাদিকের কার্য্যগ্রহণ করেন। মধ্যে কিছুদিন তাঁহাকে বীমার কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। শুধু সাংবাদিক বলিয়া নহে, খেলোয়াড় মহলেও তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। তিনি ঈষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল—কিন্তু তাঁহাকে কেহ কখনও সেজন্য দম্ভ করিতে দেখে নাই। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

বিহারে বাঙ্গালী সমস্যা—

গত ১৫ই ডিসেম্বর বিহারের গভর্ণর পূর্ণিয়া জেলায় সফরে গেলে স্থানীয় বাঙ্গালী সমিতির পক্ষ হইতে গভর্ণরকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাতে বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের অভাব ও অসুবিধার কথা গভর্ণরকে জানান হইয়াছিল ; উত্তরে গভর্ণর স্থানীয় বাঙ্গালীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, বিহার গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালাভাষাভাষী সম্প্রদায়ের প্রতি যাহাতে কোনরূপ অন্যায় আচরণ না করেন, সে বিষয়ে তিনি মনোযোগ দিয়াছেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে বিহার শাসিত হইতেছে, বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মনোভাব কিরূপ তাহা অপ্রকাশ নাই। এ ক্ষেত্রে গভর্ণরের প্রতিশ্রুতি কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহাতে সন্দেহ আছে। বিহারে-প্রবাসী বাঙ্গালী সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এখন পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, কতদিনে পারিবেন বা কোন কালে পারিবেন বলিয়াও মনে হয় না। কেবল নানা অজুহাতে সমাধান স্থগিত করা হইতেছে। বাঙ্গালীদের বিহারে বাস দিনে দিনে অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। বিহারীরা কিন্তু বাঙ্গলায় নির্বিঘ্নে বসবাস করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ দেশে পাঠাইতেছে।

অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—

অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত ; তিনি এখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করেন। এদেশে নূতন শাসন ব্যবস্থা

প্রবর্ত্তনের পর বাঙ্গালায় যে উচ্চতর পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে, ডক্টর রাধাকুমুদ তাহার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টও তাঁহার উপর সম্প্রতি একটি কার্য্যভার প্রদান করিয়াছেন। সেজন্য রাধাকুমুদবাবুকে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে দেড় বৎসর কালের ছুটী লইতে হইয়াছে। ঐ ছুটীর সময় তিনি যে বেতন পাইবেন, তাহা এবং প্রভিডেণ্টফণ্ড প্রভৃতির টাকা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হইবে। বাঙ্গালী রাধাকুমুদবাবুকে দীর্ঘকাল – প্রায় সমগ্র জীবন বিদেশে অধ্যাপকের কাজ করিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি যে তিনি অল্পকালের জন্য হইলেও স্বদেশ বাঙ্গলার সেবা করিবার অধিকার লাভ করিলেন, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের সংবাদ। রাধাকুমুদ-বাবুর মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা দেশ সমৃদ্ধ হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যে এইভাবে যোগ্যের সমাদর করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য—

গত ১০ই ডিসেম্বর কাশীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেসন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এবার ঐ উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও পণ্ডিত মালব্য সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবারের উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; সকলেই জানেন, একমাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টার ফলে কাশীধামে এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে; শীঘ্রই পণ্ডিতজীর ৭৯তম জন্মোৎসব সম্পাদিত হইবে, —সেইদিন পণ্ডিত মালব্যকে একটি পাচ লক্ষ টাকার থলি উপহার প্রদান করা হইবে বলিয়া সভায় স্থির হইয়াছে। পণ্ডিতজীও ঐ থলিটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এইভাবে একই সঙ্গে পণ্ডিতজীকে সম্মানপ্রদান ও বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্যদান প্রথা অভিনব বটে; হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন।

সীতাকুণ্ডে ধর্ম্মশালা—

ভারতবর্ষের নানাস্থানে হিন্দুদের যে সকল তীর্থস্থান আছে, প্রায় সকল স্থানেই যাত্রীদের বাসের জন্য ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে; দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান চট্টগ্রামের সন্নিহিত সীতাকুণ্ডে এতদিন পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মশালা ছিল না, সেজন্য তথায় সমাগত যাত্রীদিগকে নানারূপ অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হইত। খ্যাতনামা ব্যবসায়ী কুমিল্লার দানবীর শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে সীতাকুণ্ডে শীঘ্রই একটি ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইবে; চট্টগ্রামের বর্ত্তমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মণিভূষণ দত্তের চেষ্টায় এই ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। মহেশচন্দ্র যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সদ্ব্যয়ও করিতেছেন; কুমিল্লা শহরে তাঁহার বিরাট দান সর্ব্বজনবিদিত।

অধ্যাপক আলডুস হাক্সলী—

বিখ্যাত গ্রন্থকার ও সমালোচক আলডুস হাক্সলীর নাম পৃথিবীর সভ্যজগতে সর্ব্বজনবিদিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ হাক্সলীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ষ্টিফেনোস নির্ম্মলেন্দু ঘোষ অধ্যাপক'পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। শীঘ্রই মিঃ হাক্সলী এ দেশে আসিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন। তাঁহাকে সেজন্য এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। তাঁহার ঐ বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় সেই পুস্তকের ৩০০ খণ্ড আরও এক হাজার টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইবেন। তাঁহার মত একজন পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গুণের আদর করিয়াছেন। আমরা অন্যত্র মিঃ হাক্সলীর পরিচয় প্রকাশ করিয়াছি।

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের সম্মান—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাঁচীতে লাক্ষা গবেষণাগারের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। সম্প্রতি বাঙ্গালোরস্থ

ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মাসিক ষোলশত টাকা বেতনে সাধারণ ও জৈব রসায়নের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষক শ্রীযুত পি-সি-গুহকে ও মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে জৈব-রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান-মন্দির ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্র, তথায় দুইজন বাঙ্গালীর এই উচ্চপদলাভ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরবের কথা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটি দেশীয় রাজ্যগুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধীয়। ঐ প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যের গণজাগরণকে অভিনন্দিত করিয়া তথায় দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী সমর্থন করা হইয়াছে। যে সকল দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ জাগরণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যের সুখ্যাতি করা হইয়াছে এবং যাহারা গণজাগরণ দমন করিবার জন্য নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার করিতেছেন তাঁহাদের কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। অপর প্রস্তাবটিও বিশেষ প্রয়োজনীয়—টাকার বিনিময় মূল্য যাহাতে ১ শিলিং ৪ পেন্স ধার্য্য করা হয়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেজন্যও দেশবাসীর দাবী জানাইয়াছেন। টাকার বিনিময়-মূল্য সম্বন্ধে অব্যবস্থার ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে নানা-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

বিদেশে ছাত্রদের শিক্ষার অসুবিধা—

বাঙ্গালা দেশ হইতে যে সকল ছাত্র বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভ করিতে চাহে, তাহাদের সুযোগসুবিধা বিধানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি সমিতি আছে; উক্ত সমিতির নিকট বিদেশগামী ছাত্রগণ আবেদন করিলে সমিতি ছাত্রদের নির্দ্দিষ্ট বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধে সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন। উক্ত সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, গত বৎসর সমিতি বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বিদেশে 'হাতে কলমে' কোন শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গালী ছাত্রগণ এইরূপ শিক্ষার জন্য আবেদন করিলে যেরূপ সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল, এখন আর তাহা নাই। বিদেশে কোন কলকারখানার মালিকরা এখন আর বাঙ্গালী ছাত্রদের ব্যবসায়ের বিষয় শিক্ষা দিতে চাহেন না। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ঐ সকল ব্যবসা বাঙ্গালীদিগকে শিক্ষা দিলে তাঁহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এ অবস্থায় ছাত্রগণ যাহাতে এদেশে থাকিয়া নানাপ্রকার শিল্প ও ব্যবসা শিক্ষার সুবিধা লাভ করেন, ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। শিল্প ও ব্যবসা শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা না হইলে অর্থনীতির দিক দিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।

পণ্ডিত ভগবান দাস দুবে—

গত ১২ই ডিসেম্বর ফ্রান্সে খ্যাতনামা ভারতীয় ব্যারিষ্টার পণ্ডিত ভগবান দাস দুবে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী; ছাত্রজীবনেই তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। কিছুদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়া তথায় ব্যারিষ্টার হন এবং স্থায়ীভাবে তথায় বাস আরম্ভ করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'কিংস কাউন্সেল' (কে-সি) উপাধি লাভ করেন। তিনি লণ্ডনে একখানি ও ব্রাইটনে একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন এবং বাড়ীগুলির নাম দিয়াছিলেন 'আনন্দধাম'। ইংলণ্ডের শীত তাঁহার পক্ষে অসহ্য হওয়ায় তিনি কিছুদিন হইতে ফ্রান্সে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রতিভাবান ভারতীয়ের অভাব হইল।

সার আশুতোষের চিত্র প্রতিষ্ঠা—

গত ২২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতার মেয়র মিঃ এ-কে-এম জ্যাকেরিয়া কলিকাতা টাউন হলে স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মত কৃতী বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। টাউন হলে তাঁহার মত ব্যক্তির চিত্র বহু পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল।

দেশবাসী স্থায়ীভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন এই চিত্র প্রতিষ্ঠা তাহাদের অন্যতম। বাঙ্গালী জাতি সার আশুতোষের কার্য্যের কথা চিন্তা করিয়া নব-ভাবের ভাবুক হইলেই সার আশুতোষের স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে।

কলিকাতায় শ্রীনিকেতনের শাখা—

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের অদূরে 'শ্রীনিকেতন' নামক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। তথায় গ্রামোন্নতিকর বিষয় শিক্ষার সঙ্গে নানা-প্রকার কুটীরশিল্পও শিক্ষা দান করা হয়। তাহার ফলে তথায় অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্যই শ্রীনিকেতনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু উহার উদ্বোধন করেন। শিক্ষার্থীদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। শ্রীনিকেতন বীরভূমের নিভৃত পল্লীতে অবস্থিত হইলেও তদ্দ্বারা দেশ কিরূপ উপকৃত হইতেছে তাহা শ্রীনিকেতনের কলিকাতাস্থ বিক্রয়-কেন্দ্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই – তাহার প্রেরিত লিখিত অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন— "সব শেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান; একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্য্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন। তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি, দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্য্যে এবং সকল কার্য্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের এই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্ম্মমন্দির রচনা করেছি, আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখ, এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না—এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও, তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের এই আবেদন যেমন মর্ম্মস্পর্শী, তেমনই সত্য। এই আবেদনের কথা চিন্তা করিয়া সকলেরই শ্রীনিকেতনকে সাহায্য দানে অগ্রসর হওয়া উচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকের অব্যাহতি—

গত বৎসরের মার্চ্চ মাসে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'মেদিনীপুর জেলে রাজনীতিক বন্দীদের অবস্থা' সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশ করার অপরাধে কলিকাতার অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে-কে-বিশ্বাসের বিচারে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছয় মাস এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করায় হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁহাদের দণ্ডাদেশ রহিত করিয়া আবেদনকারীদিগকে অব্যাহতি দানের আদেশ দিয়াছেন। সংবাদপত্রে নানাপ্রকার সংবাদ প্রকাশ করাই সম্পাদকের কাজ- এই ভাবে কোন একটি বিষয়ে সংবাদ-প্রকাশের লঘু অপরাধে যে গুরুদণ্ড হইয়াছিল, তাহা বাতিল হওয়ায় সংবাদপত্রসেবী মাত্রই সুখী হইবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি মামলার কথা বলা প্রয়োজন। আনন্দবাজার পত্রিকার ম্যানেজার প্রবীণ দেশকর্ম্মী শ্রীযুত মাখনলাল সেন জেলে একজন কয়েদীর মৃত্যু সম্বন্ধে এক জনসভায় বক্তৃতা করার অপরাধে চারি মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও আড়াইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে বিচারপতিরা নিম্ন আদালতের আদেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুধু এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এই ব্যবস্থাকেও মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন—

আগামী ৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারী জলপাইগুড়ি শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। সেজন্য তথায় যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে, শ্রীযুত চারুচন্দ্র সান্যাল তাহার সভাপতি এবং ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাহার সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা দেখিয়া



শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যাল

সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন, জলপাইগুড়ি

আনন্দিত হইলাম যে খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে উক্ত সম্মিলনের সভাপতি পদে বরণ করার জন্য নানা স্থান হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে শরৎবাবুর মত ত্যাগী কর্ম্মী অধিক নাই; দেশসেবায় তাঁহাকে নির্য্যাতন ও কম ভোগ করিতে হয় নাই। এ অবস্থায় তাঁহাকে জলপাইগুড়ি সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইলে যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করা হইবে।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

খাঁ বাহাদুর সেখ ফজল ইলাহি আগামী বৎসরের জন্য কলিকাতার নূতন সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন—তিনি 'সার ফজল ইলাহি' নামক প্রকাণ্ড ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। তিনি দেশের বহু প্রকার জনহিতকর কার্য্যেও যোগদান করিয়া থাকেন। সেই সঙ্গে ডেপুটী সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন প্রসিদ্ধ সলিসিটর শ্রীযুত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায় এম-বি-ই মহাশয়—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর যখন সেরিফ ছিলেন



কলিকাতায় নূতন সেরিফ খাঁ বাহাদুর এস. ফজল ইলাহি এম-এল-সি

সে সময়েও রতনবাবু ডেপুটী সেরিফের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্রবংশের সন্তান এবং প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাগিনেয়।



ডেপুটী সেরিফ শ্রীযুক্ত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায় এম-বি-ই

আমরা তাঁহাদের নিয়োগে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আসামে কংগ্রেস দলের জয়—

আসাম কংগ্রেসদল কর্ত্তৃক মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে পর উহার বিরুদ্ধে দারুণ আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার সদস্যগণ অনেকে একত্র হইয়া কংগ্রেস মন্ত্রিসভার অবসানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই উদ্দেশ্যে গত ৮ই ডিসেম্বর আসাম ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে পাঁচটি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোটগ্রহণের সময় পরিষদের সদস্যদিগের মধ্যে ৫৪ জন উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ৫০ জন পক্ষে ভোট দেওয়ায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে ঐ ভাবে পরাজিত হইয়া বিরুদ্ধবাদী দল মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আর কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে সাহসী হন নাই। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, ঐ ঘটনার পর হইতে দিন দিন আসাম ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকজন সদস্য বিরুদ্ধ দল ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়াছেন এবং অনেকেই এখন আর প্রকাশ্য-ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইতেছে। বাকী শুধু পাঞ্জাব ও বাঙ্গালা। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রথম হইতেই কংগ্রেস-শাসিত, ক্রমে সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু ও আসাম কংগ্রেসের অধীনে আসিয়াছে। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব যে অচিরে কংগ্রেস শাসনে আসিবে এ আশা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় খৃষ্টান সম্মিলন—

এবার বড়দিনের ছুটীতে মাদ্রাজ শহরে ভারতীয় খৃষ্টানগণের বার্ষিক সম্মিলন হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ সম্মিলনের সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। অভিভাষণে তিনি স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ঐ সঙ্গে ভারতের সামাজিক জীবনের প্রত্যেক বিভাগের উন্নতি সাধনের জন্য কংগ্রেস নূতন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। অস্বীকার করা যায় না। আমাদিগের সম্প্রদায়ের যে সকল লোক প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিতে চাহেন, তাহাদিগকে বাধাপ্রদানের জন্য ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠানগত-ভাবে কোনরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। কংগ্রেসকে প্রভাবান্বিত করিবার এবং আমাদিগের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতিগঠনে সাহায্য করিবার পক্ষে ইহাই একমাত্র উপায় বলিয়া আমার মনে হইতেছে। * * যে নয়টি প্রদেশে কংগ্রেস শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন তথায় কংগ্রেসের আদর্শ অনুসারেই কার্য্য চলিতেছে। এমন কি, অকংগ্রেসী দুইটি প্রদেশে ইতিপূর্ব্বে যে সকল উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে অথবা অবলম্বনের প্রস্তাব হইয়াছে, সেগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে কংগ্রেস পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়াছে। কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার অনুকূলে উহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।" খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কোন নেতা ইতিপূর্ব্বে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এভাবে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই। ডক্টর হরেন্দ্র-কুমার নিজে কংগ্রেস দলের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াই কংগ্রেসের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়কে স্বমতে আনিবার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা দানে তাঁহার সম্প্রদায়ের দরিদ্র ব্যক্তিগণ উপকৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন। কাজেই তাঁহার আদেশে যে সকলে আন্তরিকতার সহিত সাড়া দিবেন, এ বিশ্বাস আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

শিল্পোন্নতি পরিকল্পনা—

গত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে কংগ্রেস শাসিত মন্ত্রীদের সম্মিলনে ন্যাশানাল প্ল্যানিং কমিটী গঠিত হয়। গত ১৭ই ডিসেম্বর উক্ত কমিটীর প্রথম অধি-বেশন বোম্বায়ে হইয়াছিল। উক্ত কমিটী বৃহৎ শিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিয়া-ছেন, প্রশ্নগুলির উত্তর পাইয়া কমিটী ঐ বিষয়ে ব্যবস্থা স্থির করিবেন। ঐ অধিবেশনে দেশের নদনদী সমস্যা সম্পর্কে কমিটী যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—তাহাতে বলা হইয়াছে, (১) কৃষি ও শিল্পকার্য্যে

(৩) সহজে জলযানের চলাচল, (৪) বন্যা, নদীর তীরদেশ ধ্বসিয়া পড়া ও নদী ভরাট হওয়ার প্রতিকার এবং (৫) জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের নদনদীসমূহের উন্নতিবিধান এবং উহার জলস্রোত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশকে এবং প্রয়োজন হইলে একাধিক প্রদেশকে মিলিতভাবে এক একটি কমিশন গঠনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বাঙ্গালা সরকারের সেচ বিভাগের মন্ত্রী কাসিমবাজারের মহারাজাও বাঙ্গালায় একটি গবেষণাগার স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, এখন সকল প্রদেশেই এই বিষয়ে উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাব অপেক্ষা কমিটীর উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কমিটীর উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা অধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের দেশ শিল্পোন্নতির ব্যাপারে বর্ত্তমানে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যে সমস্ত কলকব্জা প্রয়োজন হয় তাহার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত ধাতুদ্রব্য, রঞ্জনদ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োজন হয় তাহারও বহুলাংশ বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। শিল্প কারখানা পরিচালনার জন্য যে বিদ্যুৎশক্তি, গ্যাস প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তাহারও অনেক অংশ বিদেশী কোম্পানী কর্ত্তৃক সরবরাহ হয়। এই বাবদে ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর যে কেবল চল্লিশ-পঞ্চাশ কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যায় এমন নহে, বিদেশীর উপর নির্ভরতার ফলে যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে এই সমস্ত জিনিষের আমদানি বন্ধ হইয়া ভারতের শিল্প প্রচেষ্টা পঙ্গু হইয়া পড়ারও আশঙ্কা রহিয়াছে। কাজেই ভারতবর্ষের শিল্পপ্রচেষ্টাকে যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া উহার ভবিষ্যৎ উন্নতি দ্রুততর ও স্থায়ী করিতে হয়, তাহা হইলে মৌলিক শিল্প অর্থাৎ যে সব শিল্পের উপর অন্য দশটি শিল্পের অস্তিত্ব নির্ভর করে সেই সব শিল্পের দিকে বর্ত্তমানে ভারতবাসীকে দৃষ্টি দিতে হইবে। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র কমিটীর অধিবেশন উদ্বোধন করিলে পরিকল্পনা কমিটীর সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু জাতীয় সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণে কমিটীকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা উল্লেখ করিয়া সংক্ষিপ্ত এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় এই যে শিল্প পরিকল্পনা কমিটী গঠিত হইয়াছে, ইহা দেশের শিল্পজগতে বিপ্লব আনয়ন করিতে পারে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেশ যে স্বদেশীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার তেত্রিশ বৎসর পরে আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এতদিন জাতীয় শিল্পপ্রচেষ্টা ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে আরম্ভ হইলেও এরূপ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করার কল্পনা হয় নাই। এই একটি সমস্যার সমাধানই দেশের অপর সকল সমস্যার সমাধানে সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। দেশের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আনুসঙ্গিক অভাব অভিযোগও ক্রমে কমিয়া যাইবে।

কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিক উৎসব—

গত বড়দিনের ছুটীতে কয়দিন আবার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শুধু কলিকাতায় নহে, পাটনা, এলাহবাদ, কানপুর, কটক, নাগপুর প্রভৃতি স্থানেও ঐ উপলক্ষে সভা প্রভৃতি হইয়াছিল। কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কেশবচন্দ্র উৎসব উপলক্ষে একটি সংস্কৃতি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে; তথায় বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির পরিচয় প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। প্রদর্শনীতে কেশবচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে বহু পুস্তক ও দ্রব্যাদি দেখান হইতেছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বর্ত্তমান বাঙ্গালার উন্নতির একজন পথিপ্রদর্শক ছিলেন, কাজেই তাঁহার জীবনী শুধু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস নহে, তাহা বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়। ঐ উপলক্ষে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতি ভারতখ্যাত নেতারাও কলিকাতায় আসিয়া প্রদর্শনী ক্ষেত্রে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুসভা ও কংগ্রেস—

কিছুদিন পূর্ব্বে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দু মহাসভাকে মোসলেম লীগের ন্যায় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কোন কংগ্রেস কর্ম্মীর হিন্দু মহাসভায় যোগদান করা উচিত নহে। গত বড়দিনের ছুটিতে নাগপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক সভায় কংগ্রেসের ঐ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে—এই সিদ্ধান্তের পর কংগ্রেস আর হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারেন না।



'পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তিকাড়ে'—রবীন্দ্রনাথ



শীতের প্রভাত

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী



স্বপন



রঞ্জি প্রতিযোগিতা ঃ

বাঙ্গলা ও আসাম—৩৭৮ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

মধ্যভারত—১০৮ ও ১৪৯

আন্তঃপ্রাদেশিক রঞ্জি প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের তিন দিন ব্যাপী খেলায় বাঙ্গলা ও আসাম মধ্যভারতকে এক ইনিংস ও ১২১ রানে পরাজিত করেছে। এইরূপ শোচনীয় পরাজয় স্বীকার এর পূর্ব্বে মধ্য-ভারত দলকে কখনও করতে হয় নি। নাইডু ভ্রাতৃদ্বয়, মাস্তাক ও ওয়াজীর আলীর অনুপস্থিতিই এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ। মধ্যভারত দলের অধিনায়ক দিলওয়ার হোসেনও তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলা দেখাতে পারেন নি।



টম লংফিল্ড (ক্যাপটেন—বাঙ্গলা ও আসাম)   দিলওয়ার হোসেন ক্যাপটেন—মধ্যপ্রদেশ)

ছবি—জে কে সান্যাল

টসে জিতে অধিনায়ক দিলওয়ার হোসেন এবং সায়িদুদ্দীন আরম্ভ করেন। মাত্র ২০ রানের মাথায় সায়িদুদ্দীন ১০ রান করে বাঙ্গলাদলের অধিনায়ক টি লংফিল্ডের বলে এল বি ডবলিউ এবং ২২ রানের মাথায় দিলওয়ার হোসেন মাত্র ৯ রান করে আউট হ'লেন। প্রথম ইনিংসে হাজারীর ৩২ রানই সর্ব্বোচ্চ। টম্ লংফিল্ড ও বেরেণ্ডের বলের বিরুদ্ধে খেলোয়াড়রা মোটেই স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেন নি। তাঁদের বল বিশেষ মারাত্মক হয়েছিল, যথাক্রমে ২৮ ও ১৪ রান দিয়ে ৫টি ও ৪টি উইকেট পেয়েছেন। বেরেণ্ডের বলে এস দত্ত সাহাবুদ্দিনকে একটী শক্ত ক্যাচে লুফেন। মধ্যভারত দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২-৩৫ মিনিটে।

বাঙ্গলা দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল ভাণ্ডারগাচ ও বেরেণ্ডকে দিয়ে। সূচনা ভাল হ'য়েছিল; জিয়াল হোসেনের সর্ব্বপ্রথম বলেই বেরেণ্ড চারের বাড়ী পিটলেন। প্রথম থেকেই রান সংখ্যা দ্রুত উঠতে সুরু হ'ল। বেরেণ্ড নিজের ১০ রানের মাথায় স্লিপে



বাঙ্গলা ও আসাম ফিল্ডিং করতে যাচ্ছে

একটি ক্যাচ তুললেও বোটাওয়ালা তা' লুফতে পারলে না। চা পানের সময় বাঙ্গলার রানসংখ্যা হ'য়েছে ৭৪।



ভাণ্ডার গাচ্‌ নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি

৫০ মিনিটে ভাণ্ডারগাচ্‌ তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করলেন। বাঙ্গলার শতরান পূর্ণ হ'তে সময় লাগল ৭৪ মিনিট। রান খুব দ্রুত ওঠায় বোলার পরিবর্ত্তনও দ্রুত হ'চ্ছে, কিন্তু সুফল ফলছে না। সাহাবুদ্দিনের পর পর কয়েকটি নো বল হ'লো। দিনের শেষে কোন উইকেট না খুইয়ে বাঙ্গলার রান সংখ্যা উঠ্‌ল ১৫৪। ভাণ্ডারগাচ্‌ ৯৫ ও বেরেণ্ড ৫৪ রান ক'রে নট্‌ আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনে হাজারীর প্রথম ওভারেই ভাণ্ডারগাচ্‌ একটি বাউণ্ডারী ও দুই রান করে নিজের শত রান পূর্ণ করলেন। বাঙ্গলার ১৮৭ রান উঠলে হাজারী ও জিয়াল হোসেনের পরিবর্ত্তে সাহাবুদ্দিন ও বসন্ত সিং বল দিতে থাকেন। ভাণ্ডারগাচ্‌ ১৫৮ মিনিট খেলে ১১৫ রান করে সাহাবুদ্দিনের বলে এল বি ডবলিউ হ'লেন, তাঁর রানে ছিল ১৭টি চার। তিনি ১০৬ রানে একবার সুযোগ দিয়েছিলেন। জব্বর যোগ দিলেন। মাত্র দু'রান হ'বার পরই বসন্ত সিংয়ের বলে বেরেণ্ড ৬৯ রান করে বোটাওয়ালার হাতে আট্‌কালেন। কার্ত্তিক বসু এলেন, কিন্তু বসন্ত সিংহের একটি বল পেটাতে গিয়ে কোন রান না করেই বোটাওয়ালার হাতে ধরা দিলেন। স্কিনার জব্বরের সঙ্গে যোগ দিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় বাঙ্গলার ২৫২ রান উঠেছে।

২৭২ রান উঠলে জব্বর হাজারীর বলে একটি ক্যাচ তুললে ভায়া লুফলেন। ৮৭ মিনিট সুন্দরভাবে খেলে জব্বর ৪৪ রান করেন, ছয়টি চারের বাড়ি ছিল। উদীয়মান খেলোয়াড় এন চ্যাটার্জ্জি স্কিনারের জুটী হ'লেন। স্কিনার উইকেটের চারিদিক পিটিয়ে খেলে ৫২ রানের মাথায় জিয়াল হোসেনের হাতে আট্‌কালেন। এন চ্যাটার্জ্জি সুন্দর খেলেছেন, তাঁর কয়েকটি লেগের মার বেশ দর্শন-যোগ্য হ'য়েছিল। কার্টার মাত্র ছয় রান করে সাহাবুদ্দিনের বলে এল বি ডবলিউ হ'লে জে এন ব্যানার্জ্জি এলেন। চ্যাটার্জ্জি বাঙ্গলার মোট ৩৪৫ রানের মাথায় সাহাবুদ্দিনের বলে বসন্ত সিংএর হাতে ধরা পড়লেন, প্রায় এক ঘণ্টা খেলে ৫টা বাউণ্ডারীর মার পিটিয়ে ৪১ রান করে। অধিনায়ক লংফিল্ড ও ব্যানার্জ্জি খেলছেন। সাহাবুদ্দিন ও জিয়াল হোসেনের ক্ষিপ্র বলের বিরুদ্ধেও ব্যানার্জ্জি ২৫ রান করে শেষে কট্‌ আউট হ'ন। তাঁর কয়েকটি বাউণ্ডারীর মারও ছিল। হাজারীর বলে পর পর লংফিল্ড ও ব্যানার্জ্জি আউট হ'ন। লংফিল্ড ১০ রান করে সায়িদুদ্দিনের হা'তে কট্‌ হ'লে পি ডি দত্ত আসেন। ব্যানার্জ্জি বিদায় নিলে এস দত্ত এসে যোগ দেন। চা পানের সময় ৯ উইকেটে বাঙ্গলার মোট ৩৭৮ রান উঠলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করা হয়। সাহাবুদ্দিন, হাজারী ও বসন্ত সিং প্রত্যেকেই ৩টি ক'রে উইকেট পেয়েছেন। বসন্ত সিং মাত্র ৩৫ রানে তিনটি উইকেট পান। জিয়াল হোসেনের বলেই বাঙ্গলা দলের রান খুব বেশী উঠে। ১১৪ রান দিয়েও তিনি কোন



কে এ ডি নাওরোজি (ক্যাপটেন—বিহার) জে এন ব্যানার্জ্জি (বাঙ্গলা)

উইকেট পান নি। সাহাবুদ্দিন ৩ উইকেটে ১০২ রান দিয়েছিলেন। ফিল্ডিংএ ভায়া পূর্ব্ব সুনাম বজায় রেখেছেন।

চা পানের পর ২৭০ রান পিছনে থেকে মধ্যভারতের দ্বিতীয় ইনিংস সাযিদুদ্দিন ও সর্দ্দার মহম্মদ খাঁকে দিয়ে সুরু হয়। মোট ৮ রান হ'লে সাযিদুদ্দিন ৩ রান ক'রে রান আউট হন। এর পূর্ব্বে এস দত্তের হাত থেকে তিনি একবার কট্ আউট থেকে অব্যাহতি পান। তিন উইকেটে ২১ রান হ'লে সে দিনের মত খেলা বন্ধ থাকে।



ভায়া



এ জব্বর

তৃতীয় দিনের খেলায় একমাত্র ভায়ার ব্যাটিংই উল্লেখযোগ্য। মোট ২৭ রানে দিলওয়ার হোসেন মাত্র ২ রান ক'রে জে এন ব্যানার্জ্জির বলে এল বি ডবলিউ হন। জে এন ভায়া খেলতে নেমেই প্রথমে চারের বাড়ি দেন। ব্যানার্জ্জি এই সময়ে তিন ওভারে মাত্র ছয় রান দিয়ে দু'টি উইকেট পান। ভায়া শেষ পর্য্যন্ত জিয়াল হোসেনের সঙ্গে জুটী হ'য়ে খেলেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজের ছয় মিনিট পূর্ব্বে লংফিল্ডের বলে ভায়া ৮৯ রান ক'রে আউট হ'ন, ১৩টি বাউণ্ডারী ছিল। মধ্যভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৯ রানে শেষ হ'লে বাঙ্গলা ও আসাম ১ ইনিংস ও ১২১ রানে বিজয়ী হয়।

লংফিল্ডের বোলিং উভয় ইনিংসেই বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছিল। স্বাচ্ছন্দভাবে কোন খেলোয়াড়ই তাঁর বলে খেলতে পারে নি। ১৬৩ ওভারে মাত্র ৬ রান দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৩টি উইকেট পান। এস দত্ত দ্বিতীয় দিনের খেলায় পি ডি দত্তের বলে চমৎকার ভাবে একটি শক্ত ক্যাচ লুফে সর্দ্দার মহম্মদকে আউট করেন। কার্টারের ফিল্ডিং খুব চমৎকার হ'য়েছিল। কার্ত্তিক বসুর ফিল্ডিংএ কোন উন্নতিই দৃষ্ট হয় নি। সর্ট লেগে একটি সহজ ক্যাচও তিনি লুফতে সক্ষম হননি, ব্যাটিংয়েও অকৃতকার্য্য হয়েছেন।



পি দত্ত

এবার বাঙ্গলা ও আসাম মাদ্রাজ প্রদেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

মাদ্রাজ—১৫৯ ও ১৫০ (৪ উইকেট)

হায়দ্রাবাদ—১৩৯ ও ১৬৮



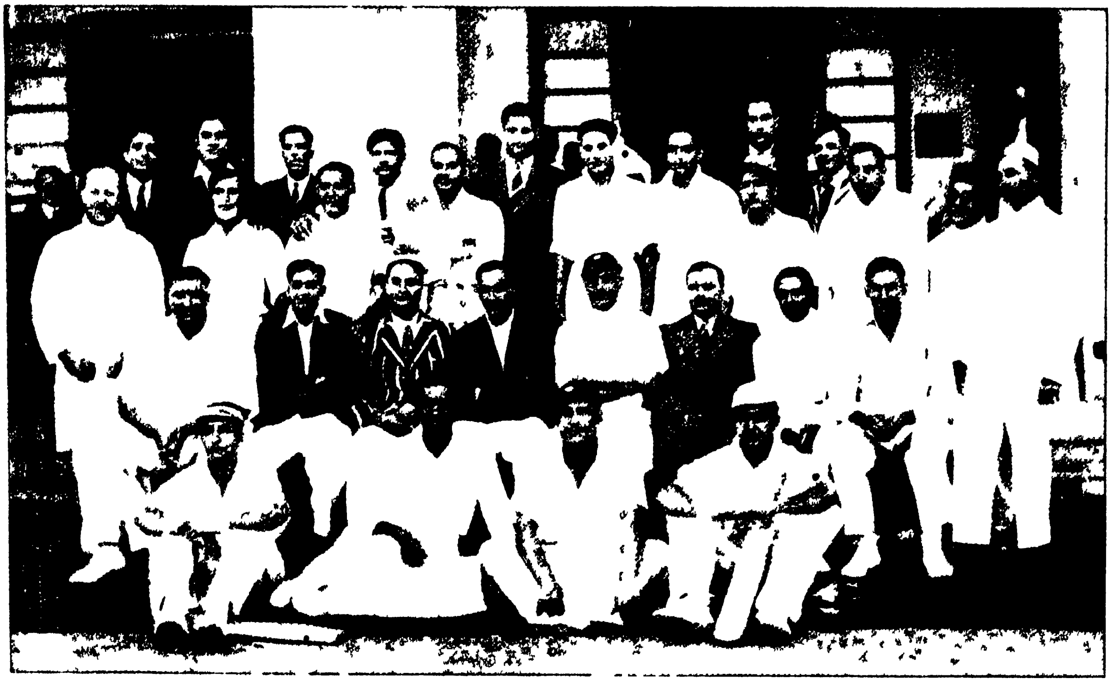
রঞ্জি প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ অঞ্চলের ফাইনালে বিজয়ী মাদ্রাজ ও বিজিত হায়দ্রাবাদের খেলোয়াড়গণ

রঞ্জি প্রতিযোগিতার দক্ষিণ অঞ্চলের ফাইনালে মাদ্রাজ প্রদেশ ৬ উইকেটে হায়দাবাদকে পরাজিত করেছে।

হায়দাবাদের প্রথম ইনিংসের ১৩৯ রানের মধ্যে হাসানের ৩৪ রানই সর্ব্বোচ্চ। গোপালন ১২ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট এবং রঙ্গ আচারিয়া ১৮ ওভারের ২৬ রানে ৩ উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে রফিকুদ্দিন ৫৮।

মাদ্রাজের প্রথম ইনিংসে রাম্স ৫৬ রান করে নট আউট থাকেন। ইব্রাহিম খাঁ ২৯ রানে ৪ উইকেট পায়। দ্বিতীয় ইনিংসে রামস্বামীর ৫৫ রানই সর্ব্বোচ্চ।

বিজয়ী হ'য়েছে। উত্তর পূর্ব্ব ট্রান্সভাল দল প্রথমে ব্যাট করে। টেষ্ট খেলোয়াড় লেন্ ব্রাউন ৮৪ মিনিটে ৭৫ রান করেন, ৭টা চার ও ৪টা ছয় ছিল। উইলকিনসন ৫ উইকেট এবং গডার্ড চার উইকেট পান। দিনের শেষে দুই উইকেটে এম সি সি ১০৯ রান তোলে। পরদিন ৬ উইকেটে ৩৭৯ রান উঠলে এম সি সি ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। পেণ্টার ১০২, ভ্যালেণ্টাইন ১০০, ইয়ার্ডলে ৪২ ও হাটন ৬৬। উত্তর পূর্ব্ব ট্রান্সভালদলের দ্বিতীয় ইনিংসে লেন ব্রাউনের ৩৫ রানই সর্ব্বোচ্চ। ডেবিটি ২০ রানে ৪ উইকেট এবং এড্রিচ ১৭ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।



বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ফাইনাল বিজয়ী মুসলিম ও বিজিত হিন্দু খেলোয়াড়গণ

দক্ষিণ আফ্রিকায় এম সি সি ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকায় এ পর্য্যন্ত এম সি সি নয়টি ম্যাচ খেলে পাঁচটি জয়ী হ'য়েছে এবং চারটি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে। আজ পর্য্যন্ত কোন খেলায় পরাজিত হয় নি।

এম সি সি— ৩৭৯ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

উত্তর পূর্ব্ব ট্রান্সভাল—১৬১ ও ১৪২

প্রেটোরিয়ায় এম সি সি ও উত্তর পূর্ব্ব ট্রান্সভাল দলের তিন দিনের খেলায় এম সি সি ১ ইনিংস ও ৭৬ রানে

এম সি সি—২৬৮

ট্রান্সভাল—৪২৮ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ১৭৪ (২ উইকেট)

জোহান্সবার্গে ট্রান্সভাল ও এম সি সির খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে। প্রথম দিন ব্যাট করে ট্রান্সভাল দল দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩০০ রান করে এবং পরদিন ৮ উইকেটে ৪২৮ রান উঠলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ব্রুস মিচেল ১৩৩, ভিল জোয়েন ৯৭ ও ল্যাংটনের

৫৮। উইলকিনসন ৭৮ রানে ৪ এবং ফারনেস ৯৩ রানে ৪ উইকেট পান।

এম সি সির প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৬৮ রানে। এইমস ১০৯ ও এডরিচ ৩৮ রান করেন। হাটন শূন্য করে আউট হন। ফাষ্ট বোলারের বলে তিনি মাথায় দারুণ আঘাত পান। ট্রান্সভালদলের ফাষ্ট বোলার ডেভিসের বলের সামনে এম সি সির খেলোয়াড়গণের দ্রুত পতন হয়। শেষের ৪ উইকেট তিনি মাত্র ১৯ রানে নিয়েছিলেন। এম সি সি ১৬০ রান পিছনে থাকা সত্বেও তাদের ফলো অন না করিয়ে ট্রান্সভাল দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে এবং ২ উইকেটে ১৭৪ রান উঠলে খেলা শেষ হয়। কার নাও ৫১ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড—৪২২ ও ২৯১ (৪ উইকেট)

দক্ষিণ আফ্রিকা— ৩৯০ ও ১০৮ (১ উইকেট)

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেষ্ট অমীমাংসিত হ'য়ে শেষ হয়েছে। ২৪শে ডিসেম্বর, জোহান্সবার্গে প্রথম টেষ্ট আরম্ভ হয়। পূর্ব্বদিনে বেশ বৃষ্টি হওয়াতেও উইকেটের কোন ক্ষতি হয়নি। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা, আকাশে একটু একটু মেঘ আছে। দর্শক সমাগম হ'য়েছে তিন হাজার। হ্যামণ্ড টসে জিতে এডরিচ আর গিব্‌কে ব্যাট ক'রতে পাঠালেন। টেষ্ট খেলায় এডরিচের কপাল বরাবরই খারাপ। মাত্র চার ক'রে এডরিচকে ফিরে যেতে হ'লো। পেণ্টার যোগ দিলেন। পেণ্টার রান তুলচেন খুব দ্রুত। গিব কিন্তু খুব ধীরে ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে খেলচেন। লাঞ্চের পর দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ালো দশ হাজারে। পেণ্টার ১৫৭ মিনিট খেলে তাঁর নিজস্ব শত রান ক'রলেন, পরে ১১৭ রান হ'লে মিচেলের বলে আউট হ'লেন, ১টা ছয় আর আটটা চার ছিলো। হ্যামণ্ড এসে ৫ রান করলে টেষ্ট খেলায় তাঁর নিজস্ব ছ'হাজার রান পূর্ণ হ'লো। মাত্র ২৪ রান করে হ্যামণ্ড গর্ডনের বলে এল বি ডবলিউ এবং গিব্ ৯৩ রান করে মেলভিলের হাতে ধরা দিলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৬ উইকেটে হ'লো ৩২৬ রান।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হ'লো ৪২২ রানে। ভ্যালেণ্টাইনের যখন সেঞ্চুরী ক'রতে আর মাত্র তিন রান বাকী সেই সময় ওয়েড তাঁকে লুফলেন গর্ডনের বলে। গিব এবং ভ্যালেণ্টাইন ভাগ্যদোষে সাত ও তিন রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পারলেন না। গর্ডন ৫টা উইকেট পেয়েচেন ১০৩ রান দিয়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট খুইয়ে রান তুললো ১৬৬। মিচেল নট্ আউট ৭২, নোর্স ৭৩ ক'রে গডার্ডের বলে তারই হাতে আটকে গেলেন।

তৃতীয় দিনে আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার; দর্শক সমাগমও হ'য়েচে বাইশ হাজারেরও ওপর। আগের দিন হ'য়েছিলো পঁচিশ হাজার। মিচেল আজ মাত্র এক রান ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন, তিনি ২৪০ মিনিট খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যাট ক'রেচেন। তাঁর আরম্ভ খুব ভাল হ'য়েচে; কিন্তু চারের বাড়ি ছিল মাত্র তিনটি। দক্ষিণ আফ্রিকার খেলায় একটু ভাঙ্গন সুরু হ'লো। ভিল-জোয়েন, ডালটন ও লংটন আবার খেলার গতি ঘুরিয়ে নিলেন। ভিল-জোয়েন ৫০ ক'রে বোল্ড হ'লেন, ডালটন ১০২ ক'রে ভেরিটির বলে এডরিচের হাতে ধরা দিলেন। লংটন ৬৪ ক'রে নট্ আউট রইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে রান সংখ্যা উঠলো ৩৯০। ভেরিটি, ফারনেস, গডার্ড ও উইল্‌কিন্‌সনের মত বোলারদের বিরুদ্ধে এত বেশী



ভ্যালেণ্টাইন



গিব্

রান তোলা সত্য সত্যই কৃতিত্বের বিষয়। ভেরিটি ৬১ রানে চার এবং গডার্ড ৫৪ রানে তিন উইকেট পেয়েছেন।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস সুরু ক'রলো। এডরিচ এবারও হতাশ ক'রলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের ১ উইকেটে ১০৩ রান হ'ল। গিব নট্ আউট ৫৩, পেণ্টার নট্ আউট ৩২।

চতুর্থ দিনে দর্শক সমাগম খুব কম। পেণ্টার ১০০ রান ক'রে লংটনের কাছে ধরা দিলেন এবং গিব ১০৬ ক'রে বোল্ড হলেন। পেণ্টার দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরী ক'রেছেন। এর আগে আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেষ্টে দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরী করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রেছিলেন রাসেল ও সাট্‌ক্লিফ্। পেণ্টার ১৮৯ মিনিট খেলেচেন, তাঁর ১০টা চার ছিলো। গিব ১৮৪ মিনিট খেলে চারের মার মেরেচেন ৭টা। ৪ উইকেটে ২৯১ রান উঠলে ইংলণ্ড ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড ক'রলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ১০৮ হ'লে সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো।

রঞ্জি প্রতিযোগিতা ঃ

সিন্ধু—২৭৬ ও ২৬৩ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

নওনগর—২৭১ ও ১২৫ (২ উইকেট)

পশ্চিম বিভাগের ফাইনালে নওনগর সিন্ধুর কাছে পরাজিত হ'য়েচে। সিন্ধু টসে জিতে ব্যাট ক'রতে নাবলো। সূচনা খুব খারাপ হ'য়েচে ৪ উইকেট পড়ে গেছে মাত্র ১৫ রানে। লাঞ্চের সময় ৭টা উইকেট পড়ে গেল ১৪৩ ক'রে। প্রবীণ নওমল ব্যাটিং পর্য্যায়ের অষ্টম স্থানে খেলতে নেবে খেলার গতি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলেন। উইকেটের চতুর্দ্দিকে চমৎকার পিটিয়ে খেলে বিভিন্ন প্রকারের মার দেখিয়ে আউট হ'বার কোন সুযোগ না দিয়ে তিনি ক'রলেন ২০৩, রইলেন নট্ আউট। পতনোন্মুখ উইকেটে সাড়ে চার ঘণ্টা নির্ভীক ভাবে খেলে সিন্ধুকে জয়ী করবার সমস্ত কৃতিত্ব তিনি নিয়েছেন। তাঁর খেলায় ৩০টা চার ছিল। নওনগরের মোবারকের বল খুব ভালো হ'য়েছে। তিনি ছ'টা উইকেট পেয়েচেন ৮৯ রানে। অমর সিং খেলায় যোগ দেন নি। ব্যানার্জ্জি উইকেট পেয়েছেন মাত্র ১টা। নওনগরের প্রথম ইনিংসে ইন্দ্রবিজয় সিংজী ১২১ রান ক'রে নট আউট থাকেন, ১৪টা বাউণ্ডারী ছিল। মানকাদ ৫৬, এস ব্যানার্জ্জি ৪১।



জে নওমল



এম্ জে মোবেদ (ক্যাপ্‌টেন—সিন্ধু)

সিন্ধু দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৬৩ রান তুলে নওনগরকে পুনরায় ব্যাট ক'রতে ছেড়ে দিলে। এবার সব থেকে বেশী রান ক'রেছেন মোবেদ ৫৪, নওমল ৪৯। নিশ্চিত পরাজয় জেনে নওনগর ৩১৮ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস সুরু ক'রলো। সময় আছে মাত্র ১০০ মিনিট, ৩১৯ রান তোলা অসম্ভব। দিনের শেষে নওনগর দুই উইকেটে তুললো ১২৫ রান। সিন্ধু প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার জন্য জয়ী হ'লো। ইন্দ্রবিজয় সিংজী দুই ইনিংসেই নট্ আউট রইলেন, এবারও তিনি ক'রেছেন ৪০।

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড—৫৫৯ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

দক্ষিণ আফ্রিকা—২৮৬ ও ২০১ (২ উইকেট)

খেলা অমীমাংসীত ভাবে শেষ হ'য়েছে।

মাঝ রাত্রি থেকে ভীষণ বৃষ্টি হওয়ার জন্যে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ অনেক দেরীতে সুরু হ'লো। হ্যামণ্ড আবার টসে জিতলেন। তিনি যতবার টেষ্টে ক্যাপ্‌টেন হ'য়েচেন তার ভেতর মুদ্রা নিক্ষেপণে একবারও অকৃতকার্য্য হন নি ; এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সাড়ে তিনটের সময় গিব আর হ্যাটনকে দিয়ে ইংলণ্ডের ইনিংস আরম্ভ হয়। দর্শক এসেছে চার হাজার। হ্যাটন এবারের অভিযানে এই প্রথম টেষ্টে নামলেন এবং ১৭ ক'রে গর্ডনের বলে বোল্ড হলেন। পেণ্টার এসে এক ক'রেচেন, হঠাৎ লংটনের একটা অফ্ ব্রেক বলে বেল পড়ে গেল। ক্যাপ্‌টেন নিজে এলেন। গিবের সহযোগিতায় হ্যামণ্ড বেশ চমৎকার রান তুলচেন। বেলা শেষে গিব আর হ্যামণ্ড দু'জনেই নট আউট রইলেন, ৫৬

আর ৫৪ ক'রে। দু'টো উইকেটে সবশুদ্ধ রান উঠেছে ১৩১।

দ্বিতীয় দিনে গিব আর ২ রান ক'রেই ওয়েডের হাতে ধরা দিলেন। এইমস্ খেলতে নাব্‌লেন। রান খুব দ্রুত উঠ্‌ছে। ৬৩ রানের সময় হ্যামণ্ড একবার আউট হবার সুযোগ দিলেন, এইমস্ তখনও কোন সুযোগ দেন নি। ২০৯ মিনিট খেলে হ্যামণ্ড নিজস্ব শত রান পূর্ণ ক'রলেন, ৯টা বাউণ্ডারী ছিল। ৩৩৬ রানের মাথায় এইমস নিজস্ব ১১৫ রান ক'রে গর্ডনের বলে বোল্‌ড হ'লেন। এডরিচ এলেন ও শূন্য করে ফিরে গিয়ে আরও হতাশ ক'রলেন। ভ্যালেণ্টাইন হ্যামণ্ডের সঙ্গে যোগ দিলেন, ৪৮০ রানের মাথায় নিজস্ব ১৮১ রান করার পর হ্যামণ্ডের উইকেট ডেভিসের 'ইনস্যুয়িং' বলে পড়ে গেল। ভ্যালেণ্টাইন ১৫১ মিনিট খেলে নিজস্ব শত রান পূর্ণ ক'রলেন। ভেরিটি এসেছেন। ১১২ রান ক'রে ভ্যালেণ্টাইন গর্ডনের বলে এল বি ডবলিউ হ'লেন। গর্ডনই প্রথম টেষ্টে তাঁকে ৯৭ রানের সময় নিয়েছিলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৮ উইকেটে ৫৫৩ উঠলো। আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব রেকর্ড ছিলো ৬ উইকেটে ৫৩৪, ১৯৩৫ সালে ওভাল মাঠে হয়।

তৃতীয় দিনে ইংলণ্ডের ৯ উইকেটে ৫৫৯ উঠলে হ্যামণ্ড ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড ক'রলেন। গর্ডন ৫টা ভাল ভাল উইকেট পেয়েছেন ১৫৭ রানে। হাটন, গিব, এইমস, এড্‌রিচ ও ভ্যালেণ্টাইন তার বলে আউট হ'য়েছেন।

আফ্রিকার আরম্ভ খুব খারাপ হয় নি। ৬৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট খোয়া গেলে। ভ্যালাণ্টাইন ভ্যাণ্ডার-



ওয়েড



হ্যামণ্ড

বিলকে লুফ্‌লেন। দিনের শেষে আফ্রিকার ২১৩ রান উঠল ছয় উইকেটে। নোর্স খুব চমৎকার খেলছেন। তিনি ৭৪ ক'রে নট আউট থাকলেন।

শেষ দিনে দর্শক সমাগম খুব কম হ'য়েছে। সবশুদ্ধ ২৪২ মিনিট খেলে নোর্স নিজস্ব শত রান পূর্ণ ক'রলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের ঠিক পরেই তিনি ১২০ করে ভেরিটির বলে এল বি ডবলিউ হ'লেন, ১টা ছয় আর বারটা চার ছিল। নোর্স আউট



রোয়েন

হবার পর আর কেউই টিকে থাকতে পারলে না। আফ্রিকার প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২৮৬ রানে। ভেরিটি ৫টা উইকেট পেয়েছেন ৭০ রানে। প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের থেকে ১৭৩ রান পিছিয়ে থাকায় আফ্রিকা ফলো অন ক'রতে বাধ্য হ'ল। দিনের শেষে দু' উইকেটে ২০১ রান তুললো। ভ্যাণ্ডারবিল ৮৭ করে দুর্ভাগ্যবশতঃ গডার্ডের বলে নিজের উইকেটেই হিট করলেন। রোয়েন নট আউট ৮৯।

মেলবোর্ণ মাঠের শতবার্ষিকী ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট দল—৪২৬

অবশিষ্ট দল—২১৫ ও ৩২৪ (৮ উইকেট)

মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠের শতবার্ষিকী উপলক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার অবশিষ্ট দলের সহিত ইংলণ্ড প্রত্যাগত অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্টদলের চারদিন ব্যাপী খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে। অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংস ২১৫ রানে শেষ হয়। উদীয়মান খেলোয়াড় বার্ণশ দলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ৬১ রান করেন। টেষ্টদলের ও'রিলি ও ফ্লিটউড্‌স্মিথের বোলিং বিশেষ প্রশংসনীয় হ'য়েছিল। ও'রিলি ৭৩ রানে ৫ এবং ফ্লিটউড্‌স্মিথ ৭৯ রানে ৪ উইকেট পেয়েছিলেন। টেষ্টদলের প্রথম ইনিংসে রান উঠে ৪২৬। ব্র্যাডম্যান ১১৫, ম্যাক্‌ক্যাব ১০৫, ব্রাউন ৬৭ এবং ব্যাডকক্ (নট্ আউট) ৫১ রান করেন।

ইংলণ্ডে পঞ্চম টেষ্ট খেলায় আহত হওয়ার'পর ব্র্যাডম্যান

এই প্রথম ক্রিকেট খেলায় যোগদান করলেন। দীর্ঘকাল অবসর গ্রহনের পরেও খেলায় তাঁর স্বাভাবিক গতিবেগ নষ্ট হয়নি। অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় ইনিংসে রিগ ৭১ রান এবং এড্ওয়ার্ড ৮৫ রান করেন।

শেফিল্ড শীল্ড ঃ

সাউথ অষ্ট্রেলিয়া—৬২,০ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

নিউসাউথ ওয়েলস—৩৯০ ও ১৫৫

সাউথ অষ্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৫৫ রানে বিজয়ী হ'য়েছে।

ব্রাডম্যান ২৩০ মিনিট ব্যাট করে ১৪৩ রান করেন এবং ব্যাডকক্ ২৭১ রান করেও নট্ আউট থাকেন, দু'টো ছয় আর সতেরটা চার ছিল। আউট হ'বার একবার মাত্র সুযোগ দেন। নিউসাউথ ওয়েলসের প্রথম ইনিংসে ৩৯০ রান হয়। তার মধ্যে বার্ণেশের ১১৭ রান, চিপারফিল্ডের ১৫২ রান। ১১৬ রান দিয়ে গ্রিমেট উইকেট পান ৭টা। ফলো অন করে নিউসাউথ ওয়েলসের দ্বিতীয় ইনিংসে রান উঠলো ১৫৫। গ্রিমেট এবার উইকেট পেলেন ৫৯ রানে ৪টে; আর ওয়ার্ড ৪০ রানে ৪টা।

কুইন্স্ল্যাণ্ড—২০০ (ব্রাউন ৯৫) ও ২৭৯ (২ উইকেট) ব্রাউন ১৬৮, কুক ৯৩।

নিউ সাউথ ওয়েলস—২১৪ (ডিক্সন ৬১ রানে ৪ উইকেট) ও ২৬৪ (বার্ণেস ৫১)

কুইন্সল্যাণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েছে।

অধিনায়ক ব্রাউন কুকের সহযোগিতায় প্রথম উইকেটে ২৬৫ রান তুলে নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। ইতিপূর্ব্বে এত অধিক রান অষ্ট্রেলিয়ায় উঠে নাই। প্রথম উইকেটে ১৮৪ রানই সর্ব্বাধিক ছিল।

ক্রিকেট বোর্ডের মিটিং ঃ

কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট বোর্ডের মিটিংয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত হ'য়েচে। ইংলণ্ডে যে ভারতীয় দলের ১৯৪১ সালে যাবার কথা ছিল, পরিবর্ত্তন ক'রে ১৯৪৩ সালে যাওয়া স্থির হ'য়েচে। নির্ব্বাচন কমিটি প্রথমে নিখিল ভারতের ক্যাপটেন নির্ব্বাচিত ক'রবেন এবং নির্ব্বাচিত ক্যাপটেন কমিটিতে স্থান পাবেন। রঞ্জি প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনের খেলাতেও যদি উভয় পক্ষের প্রথম ইনিংস খেলা শেষ না হয়, তাহ'লে আগন্তুক দল ইচ্ছে ক'রলে পুনরায় খেলার ব্যবস্থা করাতে পারবে। অবশ্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দিন ধার্য্য হবে। তা' না হ'লে টস্ ক'রেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'তে পারবে। রঞ্জি প্রতিযোগিতায় আগন্তুক দল তের জনের বেশী খেলোয়াড় সঙ্গে নিতে পারবে না, তবে একজন ম্যানেজার এবং একজন ভৃত্য সঙ্গে থাকতে পারে। বাঙ্গলা প্রদেশ এবার থেকে পৃথক ভাবে বোর্ডে স্থান পেয়েচেন। আসাম এখন ইচ্ছে ক'রলে 'এফিলিয়েসনের' জন্য আবেদন করতে পারে। বাঙ্গলা ও আসাম মান্দ্রাজকে হারাতে পারলে রঞ্জি প্রতিযোগিতার ফাইনাল ইডেন গার্ডেনেই হ'বে।



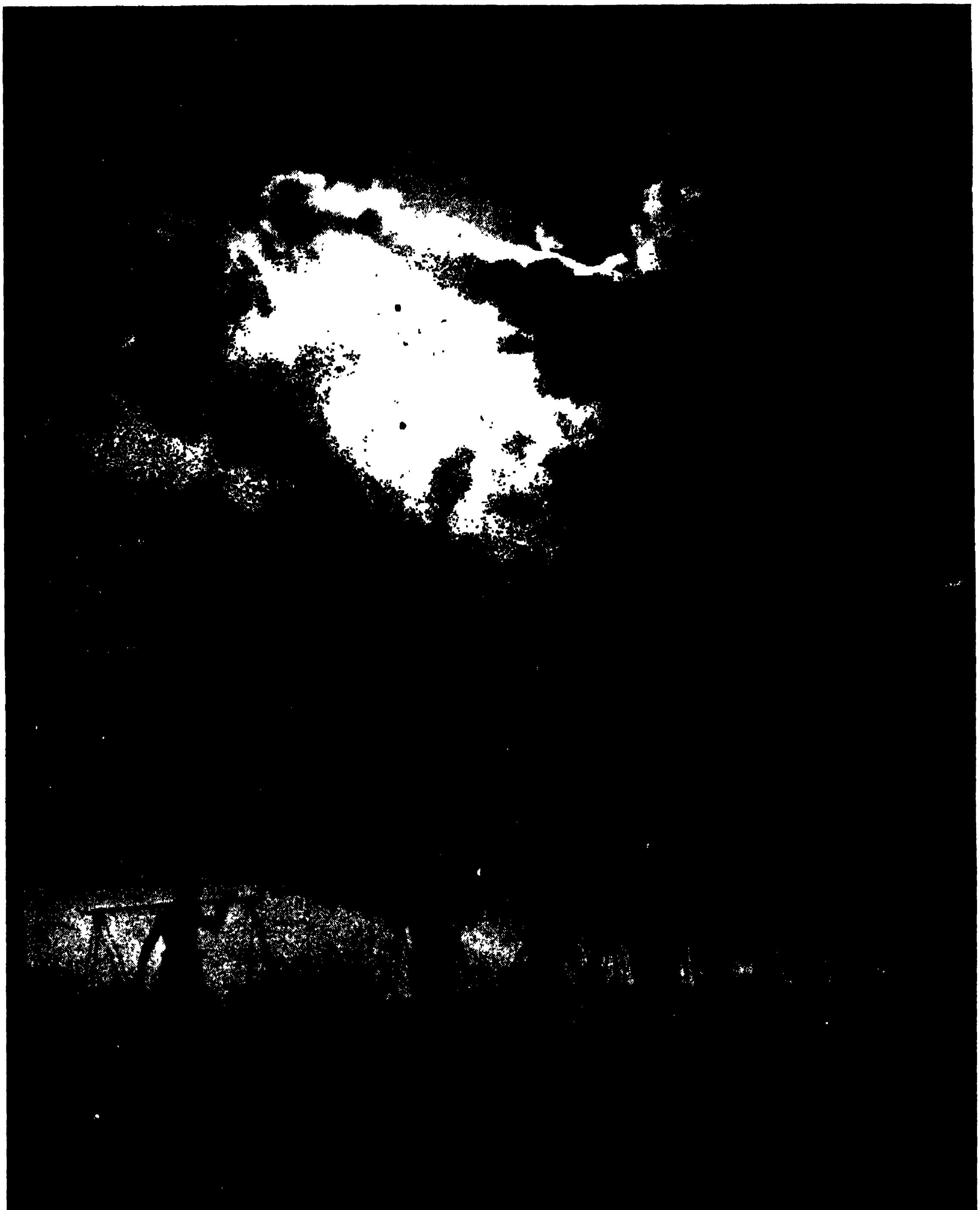
ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভ্যবৃন্দ ও সভাপতি ডাঃ সুব্বারায়ণ (বাম থেকে তৃতীয়)

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—২২৭ ও ১১৫

দক্ষিণ পঞ্জাব—৩৭৯

দক্ষিণ পঞ্জাব এক ইনিংস ও ৩৭ রানে উত্তর অঞ্চলের ফাইনালে জয় লাভ করেছে। প্রথম ইনিংসে উত্তর পশ্চিম



ফিরতি পথে

শিল্পী—বি দালাল, কলিকাতা



মোটর জিমখানা কার্নিভালে প্রদর্শিত জাপানী গৃহ-উদ্যান ছবি—ডি রতন, কলিকাতা



পঞ্জাবের গভর্ণর স্যর হেনরী ক্রেক লাহোরে নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতেছেন

সীমান্ত প্রদেশের হোল্ডসওয়ার্থ শতরান করেন; দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ ১৭ রানে ৪ উইকেট, সাহাবুদ্দিন ১৪ রানে ১ উইকেট ও পাতিযালা ২২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছিলেন।



বখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথ
ও তাঁর নবপরিণীতা পত্নী

দক্ষিণ পঞ্জাবের প্রথম ইনিংসে অমরনাথ ৮৭, পাতিয়ালা ৭৫, আবদুল রহমান ৭২ ও ওয়াজির আলী ৫২।

পূর্ব্ব ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পূর্ব্ব ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে আমেরিকার তরুণ খেলোয়াড় ডন্ ম্যাকনীল ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদকে ষ্ট্রেট সেটে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচেন। ম্যাকনীল দলের সবচেয়ে তরুণ খেলোয়াড়। তাঁর বয়স মাত্র একুশ। আমেরিকার অপর খেলোয়াড় এণ্ডারসন গাউসকে Reveiraতে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা সকলেই আমেরিকার উদীয়মান খেলোয়াড়; আমেরিকার প্রতিনিধি-মূলক খেলায় এঁদের স্থান এখনও হয়নি। এই পরাজয়ে টেনিস খেলায় ভারতবর্ষ যে এখনও কত পিছিয়ে আছে তা' প্রতীয়মান হ'লো। গাউসের সার্ভিস খুব ক্ষিপ্র, প্লাসিং খুব চমৎকার। ম্যাক্‌নীল ব্যাক্‌হাণ্ড ড্রাইভে অদ্বিতীয়, ভলি এবং হাফ্ ভলিতে কোন প্রতিযোগীরই সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। সর্ব্বোপরি তিনি খুব ধীর ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে খেলেন। গাউস স্থির মস্তিষ্কে খেললে কিন্তু একটা সেট নিতে পারতো। ফোরহাণ্ডে দুজনেই সমান পারদর্শী। ম্যাক্‌নীল এই প্রতিযোগিতায় সকলকেই ষ্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন। ম্যাকনীল সোহানীকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন, আর গাউস হারান যুধিষ্ঠির সিংকে।

বাঙ্গলার উদীয়মান খেলোয়াড় দিলীপ বসু খুব চমৎকার খেলে প্রবীণ খেলোয়াড় ডগলাস্ হজেসকে ষ্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেন। পরের খেলায় ভারতের দু'নম্বর খেলোয়াড় সোহানীর সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রেও হেরে যান। দিলীপ সোহানীকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন। প্রথম সেট হেরে যাবার পর দিলীপ দ্বিতীয় সেটে ৩-০ গেমে অগ্রগামী থাকেন এবং শেষে ৬-৩ গেমে সেটটি বিজয়ী হন। শেষ সেটে দিলীপ বসুর ক্লান্তির সুযোগে প্রবীণ খেলোয়াড় সোহানী বিজয়ী হন ৬-৪ গেমে।



ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী ম্যাক্‌নীল (আমেরিকা) ও
বিজিত গাউস মহম্মদ (ভারতবর্ষ)

ছবি—জে কে সান্যাল

খস্রু সেন বড়লাট পুত্র লর্ড জন্ হোপকে কৃতিত্বের সহিত পরাজিত করে আমেরিকার খেলোয়াড় রবার্টসনের সঙ্গে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে তৃতীয় সেটে হেরে যান। এই



লর্ড জন্ হোপ খস্রু সেন

দুইটি তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের নিকট বাঙ্গলার টেনিস অনেক আশা রাখে। ভারতের সব চেয়ে তরুণ ডেভিস কাপ্ খেলোয়াড় জিমি মেটা রবার্টসনকে হারিয়ে সুনাম অর্জ্জন ক'রেছেন। জিমির খেলা যে বিশেষ দর্শনীয় হ'য়েছিলো তা রবার্টসনও স্বীকার ক'রেছেন। শেষ সেটের শেষ গেমে রবার্টসন নিজের সামান্য ভুলে একটি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করেন।

যুধিষ্ঠির সিং এণ্ডারসনকে অতি সহজে ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠেন। এণ্ডারসন একবার গাউসকে হারাবার কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রেছিলেন।

লীলা রাও এবার প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রতে পারেন নি। মহিলাদের সিঙ্গল বিজয়িনী হ'য়েছেন শ্রীমতী বোলাণ্ড। মহিলাদের ডবলসেও তিনি বিজয়িনী হ'য়েছেন শ্রীমতী এডনির সহযোগিতায়। ডবল্‌সের খেলায় সোহানী খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি সোনীর সহযোগিতায় ডবলস্ ফাইনালে হ্যারিস ও ম্যাকনীলকে ষ্ট্রেট সেটে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েছেন এবং মিক্সড ডবলসে কুমারী হারভে জনষ্টোনের সঙ্গে খেলে এণ্ডারসন ও শ্রীমতী বিশপকে হারিয়ে জয়ী হ'য়েছেন। প্রবীণদের ফাইনালে ব্রুক সীমের কাছে একটি গেমেও জয়ী হ'তে পারেন নি।

পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে ডন্ ম্যাকনীল ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩ গেমে গাউস মহম্মদকে হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবলস্ ফাইনালে সোহানী ও সোনি ৬-২, ৯-৭ ও ৬-২ গেমে ম্যাকনীল ও হ্যারিসকে পরাজিত ক'রেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে শ্রীমতী বোলাণ্ড ৬-৩, ৭-৫ গেমে কুমারী উডব্রিজকে পরাজিত ক'রেছেন।

মহিলাদের ডবলস্ ফাইনালে শ্রীমতী বোলাণ্ড ও শ্রীমতী এডনি ৭-৫, ৬-১ গেমে শ্রীমতী ফুটিট ও কুমারী হার্ভে জনষ্টোনকে হারিয়েছেন।

মিক্সড ডবলস্ ফাইনালে সোহানী ও কুমারী হার্ভে জনষ্টোন ৬-৩, ৬-২ গেমে এণ্ডারসন ও শ্রীমতী বিশপকে হারিয়েছেন।



ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়িনী মিসেস্ বোলাণ্ড (দক্ষিণে) ও বিজিতা মিস্ উডব্রিজ (বামে) ছবি—জে কে সান্যাল

প্রবীণদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে স্লীম ৬-০, ৬-০ গেমে ব্রুককে পরাজিত ক'রেচেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্লেটে (জুনিয়ার) কানওয়ার কৃষণ ৬-৩, ৬-১ গেমে কাননকে হারিয়েচেন।



পূর্ব্বভারত টেনিস প্রতিযোগিতার মিক্সড ডবলস বিজয়ী সোহানী ও মিস্ হার্ভে জনষ্টোন এবং বিজিত এণ্ডারসন ও মিস্ বিশপ (দক্ষিণে) ছবি—জে কে সান্যাল

মধ্যপ্রদেশ টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে—ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ ৬-১, ১-৬, ১০-৮, ৬-৩ গেমে ওয়াই সিংকে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ান হ'য়েছেন।

পুরুষদের ডব্‌লস ফাইনালে—ডি এন কাপুর ও দিও ৬-০, ৩-৬, ৬-৪, ৬-২ গেমে ওয়াই সিং ও রাজনারায়ণকে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে—মিস্ হোম্যান ৬-৩, ৬-৪ গেমে মিসেস্ মোবাইএর নিকট বিজয়িনী হ'য়েছেন।

মিক্সড্ ডব্‌লস ফাইনালে—মিস্ হোম্যান ও গাউস মহম্মদ ৭-৫, ৬-২ গেমে মিসেস্ ফিলিপস্ ও কোল স্মিথকে পরাজিত ক'রেছেন।

নিখিল ভারত ব্যাড্‌মিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

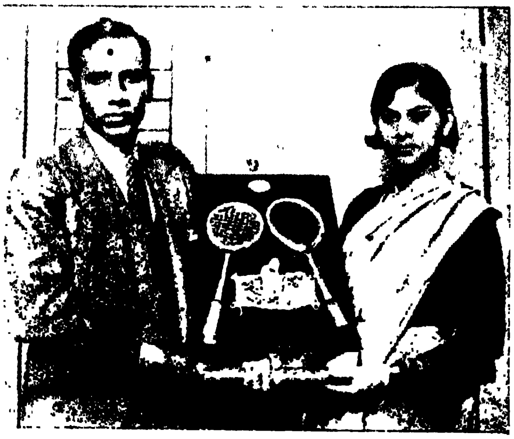
পঞ্চম বার্ষিক নিখিল ভারত ব্যাড্‌মিণ্টন্ প্রতিযোগিতার ফলাফল :

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে—মিস্ কুক্ ১১-৬, ১২-১১ গেমে গত বৎসরের বিজয়িনী মিস্ পি গোসকে পরাজিত ক'রেছেন। মিস্ কুক এ বৎসরেই খেলায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি চাপ্ মেরে এবং শক্ত চাপ্ তোলার কৌশলে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর নেটের সম্মুখভাগে বলের প্লেসিং দর্শকদের বিশেষ মুগ্ধ ক'রেছিল।



নিখিল ভারত ব্যাড্‌মিণ্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী মিস্ পি কুক

মিক্সড ডবল্‌স ফাইনালে—মিষ্টার ও মিসেস্ লুইস্ ১৫-৬, ১৭-১৮, ১৮-১৫ গেমে মিসেস্ কে মিনোস ও ডি মিনোসকে পরাজিত ক'রেছেন।



অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন মিক্সড ডবলস্ বিজয়ী ও বিজয়িনী মিষ্টার ও মিসেস্ লুইস

পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে—গত দুই বৎসরের বিজয়ী জি লুইস ১৭-১৮, ১৫-৪, ১৫-৮ গেমে তরুণ খেলোয়াড় করতার সিংকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হ'য়েছেন।

পুরুষদের ডবল্‌স ফাইনালে—জি লুইস ও করতার সিং ১৮-১৩, ১৮-১৭ গেমে গত দুই বৎসরের বিজয়ী হদায়াত ও হরনারায়ণকে পরাজিত ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ভেটার‍্যান ডবলস্ ফাইনালে—ভি মিনোস ও জি লোডার ১৫-২, ১৫-১০ গেমে এইচ ক্রক ও জি হেড্‌কে পরাজিত ক'রেছেন।

বাচ প্রতিযোগিতা ঃ

সিনিয়ার প্রতিযোগিতা :

প্রথম—কে সি সেন। প্রথম থেকেই লেক্ ক্লাবের কে সি সেনের সহিত ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের স্কটের



সিনিয়ার স্কাল বিজয়ী কে সি সেন

জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'য়েছিল। সেনের পৌছানর সঙ্গে সঙ্গেই স্কট্ উপস্থিত হ'ন।

'কক্সোয়েনলেস পেয়ার' প্রতিযোগিতা :

প্রথম—রবি দত্ত। সময় ৩ মিঃ ৪৭-২/৫ সেকেণ্ড। এই প্রতিযোগিতাটি প্রথম থেকেই খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হ'য়েছিল। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব হাফ্ লেংথে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও লেক্ ক্লাবের রবি দত্ত প্রবল উদ্যমে হাল চালনার দ্বারা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ'য়েছেন।

জুনিয়ার ও সিনিয়ার ফোরস' প্রতিযোগিতা :

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং



বাচ প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার ও জুনিয়ার ফোরস বিজয়ী ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব

ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়ী হ'য়েছে। সময়—৩ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড ও ৩ মিনিট্ ২১ সেকেণ্ড।

নোভিস রেস :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাব মারোয়ারী ক্লাবকে পরাজিত ক'রেছে।

আন্তর্জ্জাতিক টেনিস ঃ

সাউথ ক্লাব পরিচালিত আন্তর্জ্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ভারতকে ৪-১ ম্যাচে পরাজিত করে বিজয়ী হ'য়েছে।

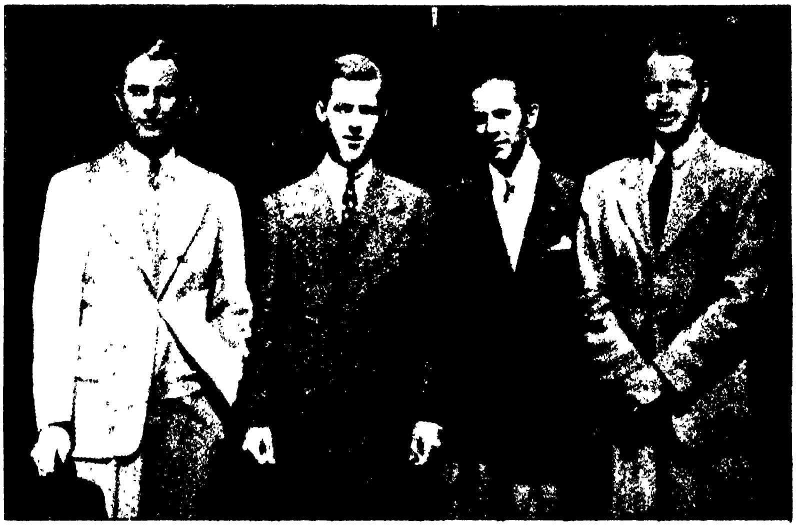
ভারতীয় খেলোয়াড়দের এরূপ শোচনীয় পরাজয় কেহই আশা করে নি। পূর্ব্বভারত টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল থেকে সকলেই আশা করেছিলেন একমাত্র ম্যাকনীন ছাড়া কেহই ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের পরাজিত করতে সক্ষম হ'বেন না। আমেরিকার ম্যাকনীন দু'টি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হ'লেও বাকি দু'টি সিঙ্গলসে এবং একটি ডবলসে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ বিজয়ী হ'বেন। কিন্তু ওয়েন এণ্ডারসন পূর্ব্বভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় যুধিষ্ঠির সিংয়ের নিকট ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হ'লেও এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দু'নম্বর খেলোয়াড় এস এল আর সোহানীকে পরাজিত করেছেন। আমেরিকার খেলোয়াড়গণ তিনটি সিঙ্গলসে বিজয়ী হ'লে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ডবলসে আর যোগদান করেন না। একমাত্র ভারতীয় এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ ওয়েন এণ্ডারসনকে পরাজিত করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। দ্বিতীয় সেটের খেলায় গাউস মহম্মদ অনেকগুলি ভুল করেন, ফলে এণ্ডারসন ঐ সেটটি জয়ী হ'ন। পরে গাউস তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে তৃতীয় সেটে এণ্ডারসনকে পরাজিত করেন। ম্যাকনীলের সহিত খেলায় তাঁর অনেক ভুল ত্রুটি দেখা যায়। খেলাটি মোটেই উন্নত ধরণের না হওয়ায় দর্শকরা নিরাশ হয়। সোহানীর খেলা মোটেই সুবিধাজনক হয় নি। সার্ভিস পর্য্যন্ত ঠিক না হওয়ায় গেমটি নষ্ট হয়। তিনি অনেক সহজ বল জোরে মেরে নিজের বিপদের সৃষ্টি করেন।

খেলার ফলাফল :—

ডন্ ম্যাকনীল (আমেরিকা) ৬-২, ৬-৮, ৬-৩ গেমে এস এল আর সোহানীকে (ভারত) পরাজিত করেন।

গউস মহম্মদ (ভারত) ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩ গেমে ওয়েন এণ্ডারসনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ডন্ ম্যাকনীল (আমেরিকা) ১-৬, ৬-৪, ৬-৩ গেমে গউস মহম্মদকে (ভারত) পরাজিত করেন।



হ্যারিস, ম্যাক্‌নীল, রবার্টসন্ ও এণ্ডারসন—আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড়গণ ছবি—জে কে সান্যাল

ওয়েন এণ্ডারসন (আমেরিকা) ৭-৯, ৬-২, ৬-১ গেমে এস এল আর সোহানীকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডবলসে ডন ম্যাকনীল ও ওয়েন এণ্ডারসন (বিজয়ী)। এস এল আর সোহানী ও এইচ এল সোনী অনুপস্থিত ছিলেন।

প্রদর্শনী খেলা

ওয়াই সাবুর ও এস সি বিটী ৮-৬, ১০-৮ গেমে হ্যারিস ও রবার্টসনকে পরাজিত করেন।

ডবলিউ রবার্টসন ও ওয়েন এণ্ডারসন ৬-৩, ৬-৪ গেমে ডবলিউ মিচেলমোর ও এস সি বিটীকে পরাজিত করেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

আগামী আন্তঃপ্রাদেশিক টেনিস প্রতিযোগিতা বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হ'বে। সর্ব্বসমেত ছ'টি প্রদেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেচে। বাঙ্গলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'বে পাঞ্জাব প্রদেশের। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন :—



মদনমোহন

মদনমোহন (ক্যাপ্টেন), মিচেলমোর, দিলীপ বসু। ব্রুক এডওয়ার্ডস রিজার্ভে আছেন।

পাঞ্জাবের হ'য়ে খেলবেন,—এইচ এল সোনি (ক্যাপ্টেন), সোহানী, শোহনলাল, ইফ্তিখার আহমেদ।

আন্তঃপ্রাদেশিক টেবিল টেনিস ঃ

হাঙ্গেরীর পৃথিবী বিখ্যাত টেবিল টেনিস বার্ণা ও বেলাক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রতে এসে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য একটি কাপ উপহার দিয়ে গেছেন। কাপটির নাম দেওয়া হ'য়েচে বার্ণা ও বেলাক কাপ। পাঞ্জাবপ্রদেশ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ'য়ে এবার কাপটি লাভ ক'রেচে।

টেবিল টেনিস ঃ

কাইরোতে মার্চ্চ মাসে বিশ্বের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ থেকে একটি টীম যোগদান ক'রবে। দলে আছেন—এম আয়ুব (পাঞ্জাব), এ ঘোষ (বাঙ্গলা), কোওাল (পাঞ্জাব) কাপাদিয়া (বোম্বাই), বাসিন (বাঙ্গলা)। আশ্চর্য্যের বিষয় অসিত মুখার্জ্জি স্থান পাননি। কাপাদিয়া দু'বার অসিতের কাছে হেরে গেছেন। একবার ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় এবং একবার টীম চ্যাম্পিয়ানসিপে। তথাপি তিনি স্থান পেয়েচেন। পাঞ্জাবের কোওালের বয়স বত্রিশের উপর; এবং তিনি কোন অংশেই অসিত অপেক্ষা ভাল খেলেন না এবং বয়সে তিনি অসিত অপেক্ষা বড়। তরুণ যোগ্য খেলোয়াড়েরই নির্ব্বাচিত হ'বার দাবী সর্ব্বাগ্রে। একজনকে বাদ দিয়ে অসিতকে দলভুক্ত করা উচিত ছিল।



নিখিল ভারত টেবল্ টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী মিষ্টার আয়ুব (দক্ষিণে) ও বিজিত অসিত মুখার্জ্জি (বাঙ্গলা)

ছবি—জে কে সান্যাল

অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ ঃ

সিঙ্গলসে—আয়ুব ২১-৭, ২১-১৭, ২১-১২ গেমে অসিত মুখার্জ্জিকে পরাজিত ক'রেচেন।

ডাব্‌লসে—অরুণ ঘোষ ও ভাসিন, ২১-১৮, ১৯-২১, ২১-১৫, ২১-১৭ গেমে আয়ুব ও কোওালকে হারিয়েচেন।

বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা ঃ

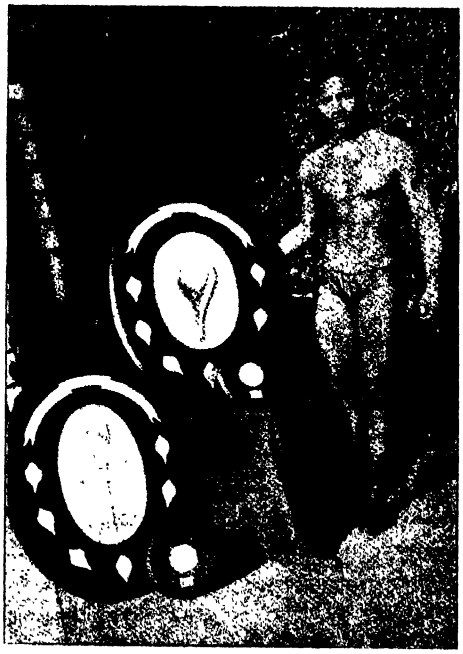
সিমলা ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে শেষ হ'য়েছে। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বহু প্রতিযোগী যোগদান

করেছিলেন। বিভিন্ন বিভাগে সিমলা ব্যায়াম সমিতি বিশেষ সাফল্য লাভ ক'রেছে।

এই প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে উচ্চাঙ্গ ধরণের বিভিন্ন প্যাঁচের কৌশলগুলি সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। ধারণা হয় যে অন্যান্য প্রদেশের অবৈতনিক মল্লবীর বিশেষভাবে হালকা ওজনের কুস্তিগীরদের মধ্যে বাঙ্গলা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ী ও বিজিতকে একখানি করিয়া চ্যালেঞ্জ-শীল্ড, ফরগুড শীল্ড দেওয়া হয়েছে। রাম দে (সিমলা ব্যায়াম-সমিতি) সকল প্রতিযোগীর মধ্যে উৎকৃষ্ট মল্লক্রীড়ার জন্য শ্রীযুক্ত শচীন মজুমদার প্রদত্ত একটি রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হয়েছেন।

প্রতিযোগিতার ফলাফল :

৭ ষ্টোন ফাইনাল—মনিদাস (সিমলা ব্যায়াম) শ্যাম অধিকারীকে (সিমলা ব্যায়াম) পরাজিত ক'রে। সময় ৩ মিঃ ২৪ সেকেণ্ড



১১ ষ্টোন ও দৈহিক সৌন্দর্য্যে বিজয়ী ঘনশ্যাম দাস

৮ ষ্টোন ফাইনাল—বলাই দে (তরুণ সঙ্ঘ) রাম দের (সিমলা ব্যায়াম) নিকট বিজয়ী হ'য়। সময় ৮ মিঃ ৫৭ সেঃ

৯ ষ্টোন ফাইনাল—সুনীল দত্ত (তরুণ সঙ্ঘ) নীলমণি দাসকে (লক্ষ্মী সম্মিলনী) পরাজিত ক'রে। সময় ৩ মিঃ ১২ সেকেণ্ড

১০ ষ্টোন ফাইনাল—উপেন দলুই ও ধীরেন দে এক ক্লাব হওয়ায় টসে করে উপেন দলুই জয়ী হ'য়।



বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতার বিজয়ী বিজিতগণ ছবি—জে কে সান্যাল

১১ ষ্টোন ফাইনাল—ঘনশ্যাম দাস (সিমলা ব্যায়াম) নিতাই দাসকে (বাগবাজার জাতীয় সঙ্ঘ) পরাজিত করে।

১২ ষ্টোন ফাইনাল—মলয় ঘোষ (নেবুতলা কপাটি) বিভূতি শীলএর (সিমলা ব্যায়াম) নিকট বিজয়ী হয়। সময় ১৪ মিঃ ১৫ সেকেণ্ড।

হেভিওয়েট ফাইনাল—মুরারি বসু (সিমলা ব্যায়াম) জয়ী হ'য়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বি ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী আঘাতের জন্য প্রত্যাহার করে।

দৈহিক সৌন্দর্য্যে বিজয়ী—ঘনশ্যাম দাস (সিমলা ব্যায়াম সমিতি)

ক্লাব চ্যাম্পিয়ানসিপ বিজয়ী—সিমলা ব্যায়াম সমিতি

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৯ (এস মেটা ও ইব্রাহিম্ ৪৯) ও ১৬৭ (পি ডি গুপ্তে ৮০)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১০৬ (আর গুপ্ত ৪১) ও ১৫৯

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বোম্বাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০১ রানে পরাজিত ক'রেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যাটিং, ফিল্ডিং ও বোলিং মোটেই সুবিধার হয়নি; ফিল্ডিং অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বহুবার বিপক্ষরা অধিক রান তুলতে সক্ষম হন। বোম্বাইয়ের

এস মেটা মারাত্মক বোলিং করে প্রথম ইনিংসে ২৮ রানে ৫ উইকেট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৭ রানে ৬ উইকেট পেয়েছেন। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি প্রথম ইনিংসে শূন্য করে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২২ রান তোলেন।

পেশাদার বাজের সাফল্য ঃ

এ পর্য্যন্ত বাজ ও ভাইন্‌সের মধ্যে ৩টি প্রতিযোগিতা হয়েছে। প্রথম দু'টি খেলায় বাজ জয়ী হয়, কিন্তু তৃতীয় খেলায় ভাইন্‌স বাজকে হারাতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল ঃ—

নিউ ইয়র্কে ঃ বাজ ৬-৩, ৬-৩, ৬-২ গেমে ভাইন্‌সকে পরাজিত করে।

বোষ্টনে ঃ বাজ ৬-৩, ৮-৬, ৬-৪ গেমে ভাইন্‌সকে হারিয়েছে।

ফিলাডেলফিয়ায় ঃ ভাইন্‌স ৬-৩, ৬-৩, ৬-৪ গেমে বাজকে পরাজিত করেছে।

ফুটবল ঃ

দিল্লীর আর্মি স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন, যতদিন না আই এফ এ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ ক'রতে পারছেন যে, তাঁদের এসোসিয়েশনের অধীনে কোন পেশাদার খেলোয়াড় খেলে না ততদিন কোন সৈনিকদল কলিকাতার কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রবে না। তাঁদের মতে বর্ত্তমানে কলিকাতার কয়েকটি বিভিন্ন ক্লাবে পেশাদার খেলোয়াড় খেলছে। এর প্রতিবিধান আই এফ এ ক'রতে না পারলে বাধ্য হয়ে সৈনিক দলকে আই এফ এর কোন প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেওয়া হবে না; আর্মি স্পোর্টসের নিয়মানুযায়ী সৈনিকরা পেশাদার খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।

কলিকাতায় যেভাবে বাইরে থেকে পেশাদার খেলোয়াড় আমদানী হচ্ছে, এখনও পেশাদার খেলোয়াড় নিয়ে খেলেন না এমন যে কয়টি দল আছেন, দু' এক বৎসরের মধ্যে তাঁদের আর প্রথম বিভাগে স্থান হ'বে না। পেশাদার খেলোয়াড় আমদানী হয় বাঙ্গলার বাহির থেকে। বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা অনুশীলনের উপযুক্ত সুযোগ পাচ্ছে না, তাতে বাঙ্গালী নবীন খেলোয়াড়দের দক্ষ হওয়ায় বিশেষ বাধা হচ্ছে। বহুদিন থেকেই এ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ হয়েছে কিন্তু আই এফ এ নির্বিকার। তাঁদের এই নীরবতার কারণ কি? আর্মি বোর্ডের মতে আই এফ এ এবং রোভার্সের খেলার পরিচালনা সন্তোষজনক নয়। কোন প্রতিযোগিতার পরিচালনা একেবারে নিখুঁত হয় না বা হ'তে পারে না। আর্মি পরিচালিত ডুরাণ্ডের পরিচালনাও যে অসন্তোষজনক তার পরিচয় বহুবার পাওয়া গেছে।

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব গত বৎসর প্রথম বিভাগে শেষ স্থান লাভ করায় নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের এবার দ্বিতীয় বিভাগে খেলবার কথা। কিন্তু ক্যালকাটাকে প্রথম বিভাগে রাখবার জন্য নূতন নিয়ম করবার জন্য নানা আলোচনা হ'য়েছে। সম্প্রতি ক্যালকাটা ক্লাব ঘোষণা ক'রেছেন, এ বৎসর তাঁরা দ্বিতীয় বিভাগেই খেলবেন এবং প্রথম ডিভিসনে থাকবার জন্য আই এফ এর কাছে তারা কোন আবেদন ক'রবেননা। তবে হকির মত বিনা আবেদনে যদি অনুরূপ ব্যবস্থা হয়, সে বিষয়ে এখনও তাঁরা কিছু জানেননা। আমাদের বক্তব্য, ক্যালকাটা ক্লাবের কোন রকম দয়া ভিক্ষা না নিয়ে প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে, দ্বিতীয় বিভাগে খেলাই উচিত।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ঝিন্দের বন্দী"—২৲
শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত এম-এ প্রণীত "আতঙ্ক"—৸৹
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত "সাহিত্যিক বর্ণপরিচয়"—৸৹
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য "এক পেয়ালা চা"—৷৵৹
শ্রীনিধিরাজ হালদার প্রণীত ভ্রমণ কাহিনী "দক্ষিণাপথের যাত্রী"—১৲
শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য "গুজবের জন্ম"—৷৵৹
মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "মীরকাশিম"—১৷৹
শ্রীদুঃখীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "সহজ সাবান শিক্ষা"—১৷৹
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত গল্পপুস্তক "ছন্দপতন"—১৲
শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "নীল সাড়ী"—১৷৹
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত কিশোর উপন্যাস "নীল সাগরের পারে"—৷৵৹
শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "রামমোহন রায় ও মূর্ত্তিপূজা"—৷৹

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



শিল্পী—শ্রীযুক্ত মন্মথ দত্তগুপ্ত

উড়িস্যার হাট

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



দ্বিতীয় খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

সম্রাট রামগুপ্ত

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

গুপ্ত-বংশীয় মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পর বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (দেবগুপ্ত) তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এই ধারণাই এতকাল লোকের ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরা-শিলালিপি, স্কন্দগুপ্তের বিহার-শিলাস্তম্ভলিপি, স্কন্দগুপ্তের ভিটারি-শিলাস্তম্ভলিপি প্রভৃতি কতকগুলি গুপ্ত-যুগের লিপিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে 'তৎ-পরিগৃহীত' বলিয়া একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দটিই উপরোক্ত ধারণার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ইহার সাধারণ অর্থ এই যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক (তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী বলিয়া) পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের অন্যান্য পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই তিনি অধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের একাধিক পুত্র ছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ। মধ্যপ্রদেশের এরাণে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের মহিষী দত্তদেবীকে 'বহুপুত্র সংক্রামিণী' বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, 'তৎ-পরিগৃহীত' শব্দটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে বার বার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কি? প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রমাণাভাবে অনেক কথা জানা যায় না, অনেক কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। এ কারণে মতভেদের সৃষ্টিও হয় পদে পদে। কিন্তু যাহা হউক, সমুদ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, বারংবার এই কৈফিয়তের যথার্থ উদ্দেশ্যটি এখন ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রামগুপ্ত নামে তাঁহার এক (জ্যেষ্ঠ?) পুত্র গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। গুপ্ত-যুগের লিপিগুলিতে যে রাজার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম প্রথম কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা বিশেষজ্ঞ-

গণের মধ্যে প্রায় সকলেই একমত ও সন্দেহাতীত হইয়াছেন যে, রামগুপ্তই সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে প্রথম আরোহণ করিয়াছিলেন। তবে এই ব্যক্তির দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিধবা রাণী ধ্রুবদেবীকেও তিনি রাজা হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসটুকু জানা যাওয়ার ফলেই 'তৎ-পরিগৃহীত' শব্দ ব্যবহারের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং গুপ্তযুগের লিপিগুলি হইতে রামগুপ্তের নাম বাদ দেওয়ার কারণ অনুধাবন করা ঐতিহাসিকগণের সহজ-সাধ্য হইয়াছে।

রামগুপ্ত সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ, বিশাখদত্তের 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' নামে একখানি নাটক। অবশ্য এই নাটকের কোনও স্বতন্ত্র পুঁথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে ভোজদেবের 'শৃঙ্গার প্রকাশ' এবং রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের রচিত 'নাট্যদর্পণ' নামে গ্রন্থদ্বয়ে ঐ নাটকখানি হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং ইঁহারা চালুক্য-রাজ কুমারপালের গুরু সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য হেমচন্দ্রের শিষ্য। অতএব 'মুদ্রা রাক্ষসে'র নাট্যকার বিশাখদত্তের 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' অধুনা না পাওয়া গেলেও খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পণ্ডিত-সমাজে উহার প্রচলন ছিল, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই নাটকে রামগুপ্তকে 'রাজা', চন্দ্রগুপ্তকে 'কুমার' এবং ধ্রুবদেবীকে 'দেবী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত 'দেবী-চন্দ্রগুপ্তে'-র নায়ক হইলেও, 'দেবী' (ধ্রুবদেবী) ইহার নায়িকা নহেন, 'নাট্যদর্পণে'র গ্রন্থকারদ্বয়ের উক্তি অনুসারে নায়িকাটি একজন বেশ্যা ("বেশ্যায়াং নায়িকায়াং"), —তাহার নাম মাধবসেনা।

নাটকের প্রাপ্ত অংশগুলি পাঠ করিয়া যে ইতিহাস উদ্ধার করা যায় তাহা সংক্ষেপে এই:—অলিপুর নামক স্থানে কস্মিংশ্চিৎ 'শক' (-রাজের) নিকট রাজা রামগুপ্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। (সন্ধির সর্ত্তে শক-রাজের হস্তে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে সমর্পণ করিবার নির্দ্দেশ ছিল)। কিন্তু কতকটা ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ ("ত্বয়্যপারোপিত প্রেম্না") এবং প্রধানতঃ প্রকৃতিপুঞ্জের আশ্বাসের (সন্তুষ্টির) জন্য ("প্রকৃতীনামাশ্বাসনায়") রামগুপ্ত তাঁহার জনপ্রিয় ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্তকে শক্রহস্তে অর্পণ করিতে বিরত হইলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন তাঁহার রাণী ধ্রুবদেবীকেই তিনি শক্রকে প্রদান করিয়া সন্ধির সর্ত্ত পালন করিবেন। ভ্রাতৃবধূর এই নিদারুণ অপমান ও বংশের অপরিমেয় কলঙ্কের আশঙ্কায় চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া রামগুপ্তের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তিনিই স্বয়ং ধ্রুবদেবীর বেশ ধারণ করিয়া শক্রর শিবিরে গিয়া শক্রবধ করিবেন। রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; বরং তিনি চন্দ্রগুপ্তকে এইরূপ অভিসন্ধি ত্যাগ করিবার জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। ইহাতে চন্দ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠের প্রতি বিরক্তই হইলেন, নিজের সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। নিশাকালে তিনি তাঁহার বন্ধু বিদূষক আত্রেয়ের সহিত বেতালের পূজা (বেতালসাধন) করিলেন এবং তৎপর জনৈক চেটী কর্ত্তৃক আনীত ধ্রুব দেবীর এক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রামগুপ্তের সহিত দেখা করিতে গেলেন। রামগুপ্তের অনুরোধ-উপরোধে কোনও ফল হইল না। স্ত্রী-বেশ পরিধান করিয়া চন্দ্রগুপ্ত শক-পতিকে বধের নিমিত্ত অলিপুরে শক্রশিবিরে গমন করিলেন ("স্ত্রীবেশনিহ্নুতঃ চন্দ্রগুপ্তঃ শক্রোঃ স্কন্ধাবারং অলিপুরং শকপতিবধায়াগমৎ")। (শক্রবধের পর চন্দ্রগুপ্তের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা আরও বর্দ্ধিত হইলে রামগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন)। চন্দ্রগুপ্ত তখন ভ্রাতার ষড়যন্ত্র হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উন্মত্তের ভাণ করিয়া মাধবসেনা নাম্নী বেশ্যার গৃহে কিছুদিন গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। ফলে মাধবসেনাকে তিনি ভালবাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু (সম্ভবতঃ রামগুপ্তের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝিবার উদ্দেশ্যে) তাহার প্রতি ভালবাসা (কিছুকালের জন্য) গোপন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত রাজকুলে (রাজপ্রাসাদে) যাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন ("মদনবিকার-গোপনপরস্ত... রাজকুল-গমনার্থং নিষ্ক্রম হূচিকেতি")।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-মূলক কাব্য এবং নাটকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, বাণের 'হর্ষচরিত', বাকপতিরাজের 'গৌড়বহো', বিল্‌হনের 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত', হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত', শম্ভুর 'রাজেন্দ্র-কর্ণপূর', মদনের 'পারিজাতমঞ্জরী নাটিকা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ইহাদের গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব নৃপ-প্রভুর জীবদ্দশায়ই রচনা করিয়াছিলেন। এই হিসাবে অনুমান করিতে

হয়, বিশাখদত্তও 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত', দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জীবিতাবস্থায় রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য বিশাখদত্ত 'মুদ্রারাক্ষস'ও রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু যিনি গুপ্ত-সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ('দেবী-চন্দ্রগুপ্ত') ইতিহাস জানিতেন, তিনি কখনও মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ('মুদ্রারাক্ষস') সময়ে বিদ্যমান থাকিতে পারেন না। তা ছাড়া 'মুদ্রা-রাক্ষসে'র যতগুলি প্রাচীন পুঁথি এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের দু-একখানির ভরত-বাক্যে 'দন্তিবর্ম্মা' (Hill-ebrandt সাহেব ভুলবশতঃ ইহাকে 'বন্তিবর্ম্মা' পাঠ করিয়া 'ঃ (অ) বন্তিবর্ম্মা' রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন) নাম দেখা গেলেও, বাকী সকল পুঁথির ভরত-বাক্যেই (দ্বিতীয়) 'চন্দ্রগুপ্তে'র উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয়, বিশাখদত্ত শুধু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িকই ছিলেন না, খুব সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার আশ্রিত বা অনুগৃহীতও ছিলেন। এই কথাটা আরও স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, 'দেবীচন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ধ্রুব দেবীকে 'দেবী' বলিয়া অভিহিত করায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী কোনও সময়ে বিশাখদত্তের আবির্ভাব হইলে তিনি তাঁহার রাণীকে 'দেবী' বলিয়া উল্লেখ করিতে যাইবেন কেন ? আরও এক কথা, 'মুদ্রারাক্ষসে'র ভরত-বাক্যে চন্দ্রগুপ্তকে 'বন্ধুভৃত্যঃ' বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ এই শব্দটির অর্থ করিয়াছেন, "যিনি ভ্রাতার বন্ধু বা হিতকামী' ছিলেন। এই অর্থ গ্রাহ্য হইলে প্রশ্ন ওঠে, বিনা উপলক্ষে ভ্রাতার সম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্তের এই সম্পর্ক বিশাখদত্ত উল্লেখ করিতে গেলেন কেন ? চন্দ্রগুপ্ত ভ্রাতাকে গোপনে হত্যা করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন এই কথাটা স্মরণ রাখিলেই বুঝা যায় যে, অনুগৃহীত কবির পক্ষে তাঁহার প্রভুর সাফাই গাহিবার কি প্রয়োজন ছিল। বিশাখদত্ত যে খুব সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের একজন সভা-কবি ছিলেন একথা সম্প্রতি অধ্যাপক ষ্টেন্ কোনো (Sten Konow)-ও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া নামকরণের রীতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাসের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তা', কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশীয়' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি প্রায় একই সময়ে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে রচিত হইয়াছিল। অবশ্য মহাকবি ভাস গুপ্ত-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না ; কিন্তু ষ্টেন্ কোনোর মত পণ্ডিতকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে বিশাখদত্তের চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের সভায় থাকাই সম্ভবপর। পরলোকগত কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল সাহেব আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, যে নাটকে একজন বেশ্যার সহিত রাজার প্রণয়-দৃশ্য রহিয়াছে সেইরূপ একটা রুচি-গর্হিত নাটক রাজার (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের) জীবদ্দশায় রচিত বা অভিনীত হইতে পারে না। সুতরাং তিনি অনুমান করিয়াছেন, বিশাখদত্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় জীবিত থাকিলেও এই নাটকখানি তিনি রচনা করিয়া-ছিলেন তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্তের সময় এবং রচনা করিয়াও উহা তিনি আমরণ প্রকাশিত হইতে দেন নাই। কিন্তু যে বই বিশাখদত্ত জানিতেন যে লিখিলেও তাহা তাঁহার জীবন্ত-কালে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না, সে বই তিনি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেন, কোন্ স্বার্থে ? আর যে বেশ্যার কথা নাটকে আছে, সে নারী বিপদের দিনে চন্দ্রগুপ্তকে নিজের আবাসে স্থান দিয়াছিল ; সুতরাং নাটকে তাহার ভূমিকা থাকায় শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন ওঠে কেন ? বুঝি না, মধ্যভারতে ধারের পরমার-রাজ অর্জ্জুনবর্ম্মণকে নায়ক এবং তাঁহার প্রণয়িনী পারিজাতমঞ্জরী বা বিজয়শ্রীকে নায়িকা করিয়া রাজার গুরুদেব বাঙ্গালী মদন 'পারিজাতমঞ্জরী' নামে যে নাটিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্ত্রী-চরিত্রে অর্জ্জুনবর্ম্মণের রাণী সর্ব্বকলার ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও নায়ক ও নায়িকার প্রণয়দৃশ্যগুলি রাজা ও রাণীর জীবিতাবস্থায় রাজধানী ধার-নগরীতে বসন্তোৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহে অভিনীত হইতে পারিলে,—কুমার চন্দ্রগুপ্তের এবং নায়িকা মাধবসেনার প্রণয়দৃশ্যগুলি চন্দ্রগুপ্ত রাজা হওয়ার পর রাজধানী পাটলি-পুত্রে অথবা অপর কোনও স্থানে কেন অভিনীত হইতে পারিবে না ? মাধবসেনার সহিত প্রণয়দৃশ্যগুলি বর্ণনা করিলে রাজরোষে পতিত হইব, এ আশঙ্কা থাকিলে বিশাখ-দত্ত নাটকখানির রচনায় পার্থিব কোন্ লোভে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ? তাঁহার মৃত্যুর পরেই বা কাহারা কোন্ ভরসায় প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে নাটকখানির অভিনয় করিয়াছিলেন ?

কল্হনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে পাই, অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড় বাঙ্গালাদেশে ছদ্মভাবে অবস্থানকালে

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে কমলা নাম্নী যে নর্ত্তকীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি শুধু ভালবাসিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিবাহও করিয়াছিলেন। তদ্রূপ বিল্হনের 'বিক্রমাঙ্ক-দেব চরিতে' দেখি, রাজা বিক্রমাদিত্য পরে তাঁহার প্রণয়াস্পদা চন্দলদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত'-নাটকের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া না যাওয়ায় বুঝিতেছি না, চন্দ্রগুপ্ত মাধবসেনাকে পরে বিবাহ করিয়াছিলেন কি না। তবে মাধবসেনাকে যে তিনি নিরতিশয় ভালবাসিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত, নতুবা তাহাকে নায়িকা করিয়া বিশাখদত্ত নাটকখানি লিখিতে সাহসী হইতেন না। সে সাহস তাঁহার হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়, মাধবসেনার প্রতি রাজা চন্দ্রগুপ্তের ভালবাসা শিথিল হইবার পূর্ব্বেই এই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অর্থাৎ মাধবসেনাকে বিবাহ না করিয়া থাকিলে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' লিখিত ও অভিনীত হইয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্ত যে কামিনীবেশ ধারণ করিয়া অলিপুরে গিয়া শক-পতিকে হত্যা করিয়াছিলেন, একথা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিতে'ও উল্লিখিত আছে—"অরি (অলি)-পুরে চ পরকলত্রকামুকং কামিনীবেষ গুপ্তশ্চন্দ্রগুপ্তঃ শকপতিমশাতয়ৎ"। বাণ শকপতিকে 'পরকলত্রকামুক' বলিয়া বিশেষিত করায় মনে হয়, শকপতি যে প্রথমে চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে তিনি সেকথা জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই 'পরকলত্র' যে চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃজায়া ধ্রুবদেবী ("চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রাতৃজায়াং ধ্রুবদেবীং") একথা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও 'হর্ষচরিতে'র টীকাকার শঙ্করার্য্য জানিতেন। শঙ্করের টীকায় আরও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—শকাধিপতিকে হত্যা করিতে গিয়া চন্দ্রগুপ্ত নিজেই কেবল "ধ্রুবদেবী-বেশধারী" ছিলেন না, তাঁহার সহিত আরও কতকগুলি পুরুষ স্ত্রী-বেশ পরিধান করিয়া গিয়াছিল ("স্ত্রী-বেশ-জনপরিবৃত")। কিন্তু 'শকপতি'-টি কে তাহা লইয়া প্রচুর মতভেদ আছে। কাহারও মতে, ইনি কণিষ্কের এক বংশধর ; কেহ অনুমান করেন, তিনি গুজরাটের ক্ষত্রপবংশীয় কোনও ব্যক্তি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শঙ্কর বলেন, "শকানামাচার্য্যঃ শকাধিপতিঃ"। শঙ্করের ব্যাখ্যায় 'আচার্য্য' শব্দ দেখিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় মনে করিয়াছেন, রামগুপ্তের বিজেতা শক-বংশীয় কোনও রাজা ছিলেন না, তিনি অন্য কোনও রাজার আশ্রয়ে শকদিগের একজন ধর্ম্মগুরু ছিলেন। 'শকপতি' শব্দের টীকা করিতে গিয়া শঙ্কর 'আচার্য্য'—শব্দের ব্যবহার কেন করিয়াছেন, তাহা আন্দাজ করা কঠিন ; কিন্তু ইহা স্থির যে, মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্রের সাম্রাজ্যের বিরাট সৈন্যবাহিনীকে যিনি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি কখনই একজন ধর্ম্মগুরু-শ্রেণীর লোক হইতে পারেন না।

রামগুপ্তের অস্তিত্বের সম্বন্ধে অপর এক প্রমাণ, রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'র একটি শ্লোক :—

"দত্ত্বা রুদ্ধগতিঃ খসাধিপতয়ে দেবীং ধ্রুব স্বামিনীং
যস্মাৎ খণ্ডিত-সাহসো নিববৃতে শ্রীশর্ম্ম (সেন)
গুপ্তো নৃপঃ ॥
তস্মিন্নেব হিমালয়ে গুরুগুহাকোণা-ক্বণৎ-কিন্নরে
গীয়ন্তে তব কার্ত্তিকেয়নগর স্ত্রীণাং গণৈঃ কীর্ত্তয়ঃ ॥"

এই শ্লোকে পাই, হিমালয়ে যে কার্ত্তিকেয়নগর হইতে রাজা 'শর্ম্মগুপ্ত' তাঁহার রাণী ধ্রুবস্বামিনীকে 'খসাধিপতি'কে দান করিয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই স্থানের নারীগণ কর্ত্তৃক গীত (জনৈক) রাজার গুণগানে হিমালয়ের গুহা প্রতিধ্বনিত হয়। এই শ্লোকে রাণীর নাম, রাজার 'গুপ্ত' উপাধি এবং শত্রুহস্তে স্বীয় রাণীকে সমর্পণ করার কথায় বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না যে, নাগরী-পুঁথির লিপিকরের প্রমাদের ফলে 'রামগুপ্ত' 'শর্ম্মগুপ্ত'তে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু 'খসাধিপতি'-শব্দটিও কি 'শকাধিপতি'-র স্থলে লিপিকর প্রমাদের ফল ? রাজশেখর যুদ্ধস্থানের নাম 'অলিপুর' বলেন নাই, বলিয়াছেন 'হিমালয়স্থিত কার্ত্তিকেয়নগর'। অতএব এমনও হইতে পারে যে, তিনি রামগুপ্তের শত্রু সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করিয়া 'খসাধিপতি'ই লিখিয়া গিয়াছেন।

'অলিপুর' কোথায় জানা যায় না, 'কার্ত্তিকেয়নগর'ও যে হিমালয়ের কোন্ অঞ্চলে অবস্থিত তাহাও বলা দুষ্কর। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'কার্ত্তিকেয়-নগর' যুক্তপ্রদেশের আলমোরা জেলার বৈজনাথ নামক স্থানের নিকট অবস্থিত কার্ত্তিকেয়পুরের সহিত অভিন্ন এবং ঐ 'কার্ত্তিকেয়নগর' ছিল সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি

(হরিষেণ-প্রশস্তি)-তে বর্ণিত 'কর্ত্তৃপুর'-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কর্ত্তৃপুরে কি করিয়া খসাধিপতির প্রভাব বিস্তৃত হইল সে তথ্য যেমন অজ্ঞাত, যুদ্ধস্থানটি বিশাখদত্তের ও বাণের 'অলিপুর' না হইয়া কেন রাজশেখরের 'কার্ত্তিকেয়নগর' হইতে যাইবে, তাহারও কোনও সুসঙ্গত হেতু দেখা যায় না। তবে 'অলিপুর'ও 'কার্ত্তিকেয়নগর' যদি সন্নিহিত স্থান হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু নূতন আবিষ্কারের আলোকসম্পাত না হইলে পর উহার অবস্থান সম্বন্ধে কোনও কথাই বলা চলে না।

'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' হইতে যেটুকু অংশ উদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত রাজকুলে গিয়া কি করিয়াছিলেন অর্থাৎ রামগুপ্তকে কিভাবে হত্যা করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন, সে কথা পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই ঘটনার উল্লেখ ছিল গ্রন্থের শেষ দিকের কোনও অঙ্কে, কিন্তু পঞ্চমাঙ্কের পর 'নাট্যদর্পণ' বা 'শৃঙ্গারপ্রকাশে' কোনও স্থান উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম-অমোঘবর্ষের সন্‌জানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে পাওয়া যায় যে, গুপ্তবংশীয় এক রাজা ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার রাণীকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, "হত্বা ভ্রাতরমেব রাজ্যমহরৎ দেবীঞ্চ দীনস্তথা। লক্ষং কোটিমলেখয়ন্ কিল কলৌ দাতা স গুপ্তান্বয়ঃ॥" এই 'গুপ্তবংশীয় রাজা' যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহা পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক রামগুপ্তকে হত্যার কথা বিশদরূপে পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে লিখিত 'মুজমলু-ৎ-তবারীখ' নামে একখানি মুসলমানী গ্রন্থে। এই গ্রন্থ অনুসারে, 'বর্কমারিস্' (অর্থাৎ বিক্রমার্ক, বিক্রমাদিত্য, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) কর্ত্তৃক শক্র (শক) হত হইলে পর, 'রব্বাল' (অর্থাৎ রামগুপ্ত) তাঁহার প্রধান মন্ত্রী 'সতর্' (?)-এর পরামর্শে ও চক্রান্তে বর্কমারিসের উপর ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। বর্কমারিস্ তখন উন্মাদের ভাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। একদা গ্রীষ্মকালে বর্কমারিস্ সন্ন্যাসীর বেশে নগ্নপদে নগরের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজপ্রাসাদের ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, রাজা ও রাণী একটি সিংহাসনে বসিয়া ইক্ষু চর্ব্বণ করিতেছেন। রব্বাল সন্ন্যাসীকে অবলোকন করিয়া দয়াপরবশ হইয়া এক টুকরা ইক্ষু তাঁহাকে দিলেন এবং ইক্ষুদণ্ড পরিষ্কারের জন্য একখানি ছুরিকার প্রয়োজন অনুভব করিয়া রাণীকে একখানি ছুরিকা দিতে বলিলেন। রাণী উঠিয়া ছুরিকা আনিয়া দিলে সন্ন্যাসী তাহা দিয়া ইক্ষুখণ্ড পরিষ্কার করিতে করিতে, সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ রব্বালকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার নাভিদেশে সেই ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। বর্কমারিস তখন প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য সকলকে ডাকিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 'মুজমলু-ৎ-তবারীখ' বর্ণিত এই বিবরণ অনেকটাই অতিরঞ্জিত বা অ-সত্য হইতে পারে, কিন্তু রামগুপ্তকে হত্যা করিয়া (বা করাইয়া) চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এই মূল কথাটায় সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ভ্রাতার হত্যাসাধনের পর ভ্রাতৃজায়া ধ্রুবদেবীকেও যে চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ তাহা না হইলে, গুপ্ত-বংশীয় লেখগুলিতে এই ধ্রুবদেবীই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 'মহাদেবী'-রূপে কি করিয়া উল্লিখিত হইলেন?* এই প্রকার বিবাহ যে একান্তভাবে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয়, সেকথা অধ্যাপক ভাণ্ডারকর মহাশয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তা ছাড়া, 'মুজমলু-ৎ-তবারীখ'-গ্রন্থে একটা কথা আছে যে, এক স্বয়ম্বর-সভায় ধ্রুবস্বামিনী চন্দ্রগুপ্তকেই মাল্যদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া যখন চন্দ্রগুপ্ত স্বগৃহে আসিলেন, তখন রামগুপ্ত তাঁহার নিকট হইতে ধ্রুবস্বামিনীকে গ্রহণ করিয়া নিজে বিবাহ করিলেন। এই বৃত্তান্ত সত্য হওয়া বিচিত্র নয়; কারণ রাজা চন্দ্রগুপ্ত কেন অপরের উপভুক্তা বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার একটা সঙ্গত ও স্বাভাবিক হেতুর নির্দ্দেশ আছে। আর ঐরূপ হইয়া থাকিলে, ধ্রুবদেবীরও বিবেকের দিক দিয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত পুনর্মিলনে তেমন আপত্তি না থাকিবারই কথা। কে জানে, হয়ত রামগুপ্তের সহিত বিবাহের পরেও চন্দ্রগুপ্তের উপর ধ্রুবদেবীর একটা গোপন আকর্ষণ ছিল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া পড়ে, রামগুপ্তের হত্যাসাধন ব্যাপারে ধ্রুবদেবীরও কোনও গোপন অংশ ছিল না ত?

রামগুপ্ত ঠিক কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা

* বলিয়া রাখা ভাল, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 'কুবেরনাগা' প্রভৃতি আরও একাধিক মহিষী ছিলেন।

জানি না, কিন্তু তাঁহার রাজত্বের আয়ু যে দীর্ঘ হইতে পারে নাই তাহা সুনিশ্চিত। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গুপ্ত-যুগের যে সকল মুদ্রায় 'কাচ' নাম লেখা আছে, সেই মুদ্রাগুলি এই রামগুপ্তের এবং তাঁহার প্রকৃত নাম 'রামগুপ্ত' নয়, 'কাচগুপ্ত'। রামগুপ্তের অল্পস্থায়ী রাজত্ব-কালের মধ্যে তাঁহার নামে কোনও মুদ্রা বাহির হইয়াছিল কি-না তাহাই সন্দেহজনক; হইয়া থাকিলেও 'কাচ'-নাম-সংযুক্ত মুদ্রাগুলি তাঁহার হইতে পারে না, কারণ সেইগুলির সম্মুখপৃষ্ঠে "সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা" (সকল রাজগণের উচ্ছেদকারী), এবং বিপরীত পৃষ্ঠে "গামবজিত্য দিবং কর্ম্মভিরুত্তমৈর্জয়তি" (পৃথিবী জয় করিয়া যিনি উত্তম কর্ম্মের দ্বারা বিজয়ী হইয়াছেন) উৎকীর্ণ আছে। রামগুপ্তের জ্ঞাত ইতিহাস অনুসারে তাঁহার মত দুর্ব্বল ও অপদার্থ রাজার প্রতি এই দুই কথার কোনওটি এতটুকুও প্রযুজ্য হইতে পারে না। 'কাচ'-নাম-সংযুক্ত মুদ্রাগুলি খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তেরই। এই নামটি অদ্ভুত হইলেও একেবারে অজ্ঞাত নয়। অজন্তা-গুহায় প্রাপ্ত একখানি ভগ্ন লিপি হইতে বাকাটকদিগের অধীনস্থ এক রাজবংশের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই বংশে 'কাচ' নামে দুই জন রাজা ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তেরও যদি অপর এক নাম 'কাচ'-(গুপ্ত) থাকিয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু 'কাচ'-মুদ্রাগুলি যদিই বা সমুদ্রগুপ্তের বলিয়া স্বীকার না করি—'কাচগুপ্ত' নামে এক রাজার নাম যত্র-তত্র-সর্ব্বত্রই লিপিকর-প্রমাদের ফলে 'রামগুপ্ত'-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, এই মতবাদটি নিতান্তই অসার।

কিছুদিন পূর্ব্বে ষ্টেন্ কোনা সাহেব চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে গুপ্ত-যুগের লিপিগুলির 'তৎপরিগৃহীত' শব্দ এবং রামগুপ্ত সম্বন্ধে 'দেবী-চন্দ্রগুপ্তে' ব্যবহৃত 'রাজন্' শব্দ—এই দুইয়ের একটা সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া এক অভিমত প্রচার করিয়াছেন যে, রামগুপ্ত তাঁহার পিতার অধীনে সাম্রাজ্যের একাংশের 'চার্জ্জে' ছিলেন বলিয়া, অথবা পিতার প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া, 'দেবী-চন্দ্রগুপ্তে' তাঁহাকে 'রাজা' বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত কিছু (অর্থাৎ সমগ্র গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর) তিনি কখনই ছিলেন না। ষ্টেন্ কোনার ন্যায় খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিকের নাম প্রবন্ধের উপরে আছে বলিয়া কথাটার উল্লেখ করিতে হইল; কিন্তু এই জাতীয় মতবাদ প্রচার করার সার্থকতা কি, কে জানে?

গ্রন্থ-পঞ্জিকা :—

1. Fleet's C. I. I, Vol. III.
2. Ramaswamy Sarasvati,—Ind. Ant., 1923, p. 181 f.
3. Sylvain Levi,—Jour. Asiatique, 1923, p. 200 f.
4. A. S. Altekar,—Jour. Bih. Or. Res. Soc., XIV, 1928, p. 223 f.
5. " ,— " , XV, 1929, p. 134 f.
6. K. P. Jayaswal,— " , XVIII, 1932, p. 17 f.
7. D. R. Bhandarkar,—Malaviya Commemoration Volume, 1932, p. 189 f.
8. V. V. Mirashi,—Ind. Ant., 1933, p, 201 f.
9. D. Sarma,—Jour. Ind. Hist., XIV, p. 30 f.
10. R. D. Banerji,—Age of the Imperial Guptas, pp. 29-30.
11. M. Winternitz,—Krishnaswamy Aiyangar Commemoration Volume, 1936, p. 359 f.
12. Sten Konow,—Jour. Bih. Or. Res. Soc., 1937, p. 444 f.
13. Kavya-Mimamsa of Rajasekhara, ed. by C. D. Dalal and R. A. Sastri, Third ed., 1934, Baroda, Intro, pp. XXI—XXV.
14. N. N. Das Gupta,—Indian Culture, IV, p. 216 f.



বেদেনী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(মোপাসাঁর The Chair Mender হইতে)

মারকুইস্ বারট্র্যার বাড়ী সেদিন আমাদের শিকার-পর্ব্বের প্রথম ভোজের রাত্রি। খানার টেবিল ঘিরে বসেছেন এগারোজন শিকারী, আটটি মহিলা এবং স্থানীয় ডাক্তার সাহেব। আলোকোজ্জ্বল টেবিল, ফলের পাত্রে ফল, আর ফুলদানিতে ফুলের বাহার।

প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। তর্ক উঠল—সেই মামুলি তর্ক, সত্যিকার ভালবাসা জীবনে একবার আসে কিম্বা একাধিকবার? মানুষ জীবনে শুধু একটিবার মাত্র যথার্থ প্রেমে পড়ে, এরূপ উদাহরণ কেউ কেউ দিলেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রতিপক্ষীয়েরা প্রমাণ করতে চাইলেন, বহুবার একই ব্যক্তি ভীষণ প্রেমে পড়তে পারে। উপস্থিত নিমন্ত্রিতের মধ্যে পুরুষ যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশের মতে প্রেমোন্মাদ রোগবিশেষ। এক ব্যক্তিকে বহুবার আক্রমণ করতে পারে এবং বাধা পেলে হয় সাংঘাতিক। এ তথ্যটি অগণনীয় হলেও উপস্থিত মহিলাবৃন্দ—যাঁদের মতামত সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতার চেয়ে সাহিত্যের উপরেই বেশী নির্ভর রাখে—তাঁরা একবাক্যে জোর করেই বললেন—প্রেম, প্রকৃত প্রেম, মহৎ প্রেম জীবনে আসে শুধু একবার। বজ্রের মত অমোঘ এই ভালবাসা যে হৃদয়কে দীর্ণ করে একটিবার মাত্র, চিরদিনের মতই সে হৃদয় হয় শূন্যময়, দগ্ধশেষ ভস্মরাশি। কোন ভাবাবেশ বা স্বপ্নালুতা সে প্রাণে আর ঠাঁই পায় না।

মারকুইস্ অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন, তাই সজোরে করলেন প্রতিবাদ।

"আমি বলি, একজন অনেকবার মনপ্রাণ ঢেলে ভীষণ প্রেমে পড়তে পারে। আপনারা আত্মহারা প্রেমের প্রমাণস্বরূপ নজির দেখাচ্ছেন যে, সত্যিকার প্রেমিক যারা, তারা বরং আত্মহত্যা করে, কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। আমার মতে, তারা যদি মূর্খের মত আপনার বুকে ছুরি মেরে নূতন প্রেমের সম্ভাব্যতা বিলুপ্ত না করত, তাহ'লে নিশ্চয়ই আবার তাদের ভাঙা বুক দিব্যি জোড়া লাগত এবং বারবার এই পালার পুনরভিনয় চলত যতদিন না সহজ মৃত্যুর যবনিকা পতন হত তাদের রঙ্গমঞ্চে। প্রেমিক আর মাতালের একই দশা। প্রেমরস বা সোমরসের আস্বাদন যে একবার পেয়েছে সে নিত্য প্রেমিক বা বদ্ধ মাতাল।"

সবাই মিলে ডাক্তারকে করল মধ্যস্থ। তিনি প্যারিসের প্রবীণ চিকিৎসক, সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত। শহর ছেড়ে পল্লীতে পেতেছেন আস্তানা।

ডাক্তার হেসে বললেন, "আমার মতামত কিছুই নেই। যার যেমন স্বভাব, তার সেই রকমই ঘটে। মারকুইস্ ঠিকই বলেছেন, ওটা মেজাজের ব্যাপার। তবে আমি একটি ঘটনার কথা জানি, পঞ্চান্ন বৎসরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সে প্রেমোন্মাদ, একদিনের জন্যেও ছিল না তার বিরাম, শেষ হ'ল কেবল মৃত্যুতে।"

মারকুইস্ হাততালি দিয়ে উঠলেন।

একটি নারীকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হ'ল, "চমৎকার! স্বপ্নের মত মধুর! পঞ্চান্ন বছর ধরে একটি প্রেমে ডুবে থাকা কি সৌভাগ্যের কথা! জীবন তার কত মধুময়— এমন অপূর্ব্ব ভালবাসার অধিকারী যে!"

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, "তাই বটে। একটি পুরুষের ভাগ্যে এই রকম সুদুর্লভ প্রেমের উপলব্ধি ঘটেছিল। আপনারা তাকে চেনেন। তার নাম মঁসিয়ে শুকে, এই গ্রামের ডাক্তারখানার মালিক। আর যে স্ত্রীলোকটি তার প্রেমে পড়েছিল তাকেও আপনারা জানেন। সে হচ্ছে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যে পুরাণো চেয়ারে বেতের ছাউনি বুনতে আসত এই বাড়ীতে। কিন্তু কেমন ক'রে তার বৃত্তান্তটি আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করাই?"

হঠাৎ মহিলাদের কৌতূহল যেন নিভে গেল, তাঁদের মুখে ফুটল একটা নিঃশব্দ ছি, ছি—যেন ভালবাসা জিনিষটা শুধু অভিজাত সম্প্রদায়েরই একচেটে।

ডাক্তার বলে চললেন:

"তিন মাস আগে এই বুড়ীর মৃত্যুশয্যার পাশে আমার ডাক পড়ল। সে এ অঞ্চলে এসেছিল তাই সেই পুরাণো যাযাবর গাড়ী। বুড়ো ঘোড়াটার অস্থিচর্ম্মসার মূর্ত্তি আপনারা সকলেই দেখেছেন। আর সেই সঙ্গে ছিল তার মস্ত কালো কুকুর দুটো, যারা তার বন্ধু ও বরকন্দাজ। পাদ্রী সাহেব আগেই এসেছিলেন। আমাদের দুজনকে সে করল তার উইলের অছি। তার ওয়ারিশান কে হবে সে কথাটা বোঝবার জন্যে তার জীবনের ইতিহাস আমাদের কাছে প্রকাশ ক'রে বলল। এরকম অদ্ভুত ও মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী আগে কখনও শুনিনি। ওর বাবা চেয়ারে বেত বুনত, মাও সেই কাজে জোগান দিত। ওই গাড়ীখানা ছিল ওদের চাকাওয়ালা কুঁড়ে, মাথা রাখবার ভিটে ছিল না কোথাও। শহরে শহরে ওই গাড়ী ক'রে ওরা কাজের সন্ধানে ঘুরত। শহরের বাইরে ঘোড়ার জোত খুলে দিত, সে মাঠের উপর চরে বেড়াত। কুকুর দুটো থাবায় মুখ গুঁজে পড়ত ঘুমিয়ে। পথের ধারে গাছতলার ছায়ায় বসে ওর বাপ-মা পাড়ার চেয়ার সংগ্রহ ক'রে জীর্ণ সংস্কারে যখন ব্যস্ত, ও তখন উকুনেভরা ময়লা ছেঁড়া ঘাগ্‌রা পরে আশপাশে ঘুরে বেড়াত, ঘাসের উপর একলা বসে করত খেলা। এমনি ক'রে কাটল ওর শৈশব।

"কথার বালাই ছিল না ওদের। না বললে নয় এমন এক আধটা কথায় কাজের বিলিব্যবস্থা হ'ত। "চেয়ার সারাবে গো" ব'লে কে ফিরিওয়ালার হাঁক দেবে আর কে-ই বা দোরে দোরে ঘুরে চেয়ারগুলো ব'য়ে আনবে গাছতলায়। তারপর দুজনে নিঃশব্দে মুখোমুখী অথবা পাশাপাশি বেত বুনতে বসে যেতো। মেয়েটা যখন দূরে চলে যেতো কিম্বা পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে কথা কইত, অমনি ওর বাপ দিত হুঙ্কার—"ফিরে আয় বেটি!" এই সাদর সম্ভাষণটুকু ছাড়া ওর ভাগ্যে আর কোন মিষ্টি কথা কোনদিন জোটেনি।"

"মেয়েটি যখন বড় হ'ল তখন ওর উপর বাড়ী বাড়ী চেয়ার সংগ্রহ করবার ভার পড়ল। এখন থেকে দু-একটি ক'রে রাস্তার ছেলের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। তাদের বাপ-মা দেখতে পেলে ধমকে বলে, "চলে আয় এক্ষুনি, লক্ষ্মীছাড়া, ফের যদি জংলি ছুঁড়িটার সঙ্গে কথা বলবি ত দেখবি মজা!"

"মাঝে মাঝে পাড়ার ছোঁড়াগুলো ওকে ঢিল মারত। কখনও বা গিন্নীরা দু-একটা পয়সা দিতেন, ও সযত্নে লুকিয়ে রাখত।"

"একদিন—তখন ওর বয়স এগারো বছর—ওরা এই পল্লীতে সবে ঢুকেছে, এমন সময়ে ওর হঠাৎ দেখা হ'ল শুকের সঙ্গে গোরস্থানের পিছনে। বেচারী শুকে তখন কাঁদছে, কারণ খেলার সাথীরা তার হাত থেকে দুটো পয়সা ছিনিয়ে নিয়েছে। বড়মানুষের ছেলের চোখে জল! এও কি সম্ভব হয়? চিরদুঃখীর দুঃখে বেদের মেয়ের মনটা অস্থির হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি গেল শুকের কাছে ছুটে। কী হয়েছে সে কথা শুনল যখন, অমনি যথাসর্বস্ব পুঁজিটুকু অর্থাৎ সাতটা পয়সা, দিল শুকের হাতে গুঁজে। শুকে চোখের জল মুছে হাসিমুখেই পয়সাকটা নিল অবশ্য। মেয়েটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে দিল তাকে একটা চুমা। শুকে তখন একমনে পয়সাগুলো গুণছে, সুতরাং কোন বাধা দিল না। ও যখন দেখল, শুকে না দিল একটা ধাক্কা, না মারল একটা চড়, তখন সজোরে একবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল তারপর দে ছুট।

"মেয়েটার মাথায় কি পোকা ঢুকল কে জানে! যথাসর্বস্ব যাকে দিয়েছে তার জন্যে ভিখিরি মেয়ের প্রাণে জাগল কি প্রাণের টান? ওই প্রথম স্নেহচুম্বনটিতে এমন যাদু! ছোট-বড় সকলেরই প্রাণে চিরদিনের একই রহস্য।

"মাসের পর মাস ওর কেবল মনে পড়ে গোরস্থানের সেই নিভৃত কোণটি, আর ওই ছেলেটির কথা। আবার কবে দেখা হবে তার সঙ্গে, সেই আশায় সে এখন থেকে দু-একটা ক'রে পয়সা চুরি ক'রে রাখে উপহারের জন্য।"

"আবার যখন বেদের পরিবার এই গ্রামে ফিরে এল তখন মেয়েটির হাতে জমেছে দু টাকা। ডাক্তারখানার বড় বড় রঙিন বোতলের পিছনে দোকানের স্বত্বাধিকারীর ছেলে শুকের মুখশ্রী দেখতে পেল দূর থেকে দুটো বোতলের ফাঁকে।

"ছবির মত সেই মুখখানি চিরমুদ্রিত হয়ে রইল স্মৃতিপটে। আবার এক বৎসর পরে দেখা, শুকে তার বন্ধুদের সঙ্গে পথে মারবেল খেলছিল। মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরল, তারপর চুমার পরে চুমা। ছেলেটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তাকে খুশী করবার জন্যে সে তার এতদিনের সঞ্চিত যক্ষের ধন—তিন টাকা বারো আনা—উজাড় ক'রে তার হাতে ঢেলে দিল। ছেলেটা অবাক হয়ে দেখে, চোখে পলক পড়ে না। সে টাকা-কটা পকেটে ফেলে নিরাপত্তিতে সোহাগের প্রকোপ সহ্য করল।

"তারপর চার বছর ধরে মেয়েটি তাকে উঞ্ছবৃত্তির সঞ্চয়নটুকু নিঃশেষে দিয়ে এসেছে। শুকে নির্ব্বিবাদে সে পয়সা হাত পেতে নিয়েছে এবং বিনিময়ে দিয়েছে অযাচিত চুম্বনের অনুমতি। প্রথমবার সাড়ে সাত আনা, দ্বিতীয়বার দশ আনা, তৃতীয়বার চোখের জলের সঙ্গে মোটে তিন আনা, কারণ সেবার দুর্বৎসর, শেষবার পাঁচ টাকার একখানা নোট। শুকের মুখে আর হাসি ধরে না।

"সমস্তক্ষণই তার মনে জাগত কেবল শুকের স্মৃতি, অন্য চিন্তা স্থান পেত না। শুকেও বৎসরান্তে তার প্রতীক্ষায় থাকত। দেখা হলেই দৌড়ে কাছে যেত এবং পাওনা-গণ্ডা আদায় করত। গর্ব্বে আনন্দে মেয়েটির প্রাণ উথলে উঠত।

"পরের বছর শুকে নিরুদ্দেশ। গোপনে খোঁজখবর নিয়ে মেয়েটি জানতে পারল তাকে কলেজের হোষ্টেলে পাঠানো হয়েছে। এখন থেকে নানা ফন্দি ফিকির ক'রে এই গ্রামে আসবার পালাটা তার বাপ-মাকে দিয়ে ঠিক সেই সময়ে ফেলত যখন শুকের কলেজে হত দীর্ঘ অবকাশ। দুই বৎসরের চেষ্টায় সে চাতুরী সফল হয়েছিল। তৃতীয় বৎসরে যখন দেখা হল তখন শুকের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আর যেন চিনতেই পারা যায় না। দিব্যি লম্বা চওড়া সুশ্রী পুরুষ, কোটে ঝকঝকে পিতলের বোতাম আঁটা, কাছে এগোতে সাহস হয় না। পাশ দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যায়, ওকে আর চিনতেই পারে না।

"মেয়েটি দুদিন ধরে কেবল কাঁদল, তারপর থেকে নিঃশব্দে বহন করল দুঃসহ দুঃখের ভার।"

"প্রতি বৎসরই এই গ্রামে তারা ফিরে আসত। দূর থেকে দেখা হত, সেলাম করতে সাহস হত না। শুকে ঘাড় গুঁজে পাশ দিয়ে চলে যেত একটিবার দৃকপাতও করত না। কিশোরী তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসত। তার মৃত্যুশয্যায় সে আমাকে বলেছিল "ডাক্তার সাহেব, এ সংসারে সে-ই ছিল আমার চোখে একমাত্র পুরুষ, আর কাউকে চোখে দেখিনি!"

"অবশেষে বুড়ো বাপ-মার হ'ল মৃত্যু। পৈত্রিক ব্যবসার ভার পড়ল এখন তরুণীর উপরে। সঙ্গে সঙ্গে থাকে দুটো ভীষণ কুকুর, সাধ্য কি তার কাছে কেউ এগোয়!"

"একদিন গ্রামে ঢুকে দেখে ডাক্তারখানা থেকে শুকের বাহুলগ্ন একটি যুবতী বাহির হয়ে এল। শুকের ইতিমধ্যে বিবাহ হয়েছে, ওরা স্বামী-স্ত্রী।"

"সেদিন সন্ধ্যার সময় ও টাউনহলের দীঘিতে ঝাঁপ দিল ডুবে মরবে ব'লে। একটা মাতাল ওকে টেনে তুলে ডাক্তারখানায় এনে হাজির

করল। শুকের আনুকূল্যে ওর চৈতন্য হ'ল। তার মৃদু ভর্ৎসনা ওর কানে গেল। "ছিঃ, পাগল হলে নাকি? এমন আহাম্মকি আর কখনও করো না।"

"এই কথা ক'টি ওর পক্ষে হ'ল সঞ্জীবনী সুধা! এতকাল পরে শুকে ওর সঙ্গে কথা বলেছে এ সুখের আর অন্ত ছিল না। প্রাণরক্ষা করবার জন্য কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য স্বরূপ তার কাছ অনেক অনুনয় উপরোধেও সে একটি কপর্দ্দকও গ্রহণ করে নি। দীর্ঘজীবন ধরে গ্রামে গ্রামে পুরাণ চেয়ার মেরামত ক'রে সে প্রাচীনা হ'ল শুকের স্মৃতি বক্ষে ধারণ ক'রে। প্রতি বৎসর এখানে এসে ডাক্তারখানার জানালার ফাঁকে চিরবাঞ্ছিতকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'ত। ওই দোকান থেকে ওষুধপত্র কিনে শুকের সঙ্গে কথা বলবার ও তাকে কিছু টাকা দেবার সুযোগ ছাড়ত না।"

"আমি আগেই বলেছি তিন মাস হল তার মৃত্যু হয়েছে। মরবার আগে তার জীবনের করুণকাহিনী আমাকে সব খুলে বলেছিল। তার সারা-জীবনের যা-কিছু পুঁজি-পাটা আমার হাতে দিয়ে গেল শুকেকে দেবার জন্যে। যতদিন বেঁচে ছিল অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে উপবাস ক'রে শুকের উদ্দেশ্যে তার অন্তিম দানটি সঞ্চিত করেছিল, মৃত্যুর পরে অন্ততঃ সে একটিবারও তাকে স্মরণ করবে।"

"আমার হাতে দু হাজার তিনশো সাতাশ টাকার পুঁটলিটি তুলে দিল। তার শেষকৃত্যের জন্য পাদ্রী সাহেবের হাতে সাতাশ টাকা দিয়ে বাকী টাকাটা নিয়ে তার পরদিনই শুকেদের বাড়ী হাজির হলাম। শুকেদম্পতীর প্রাতরাশ সবে শেষ হয়েছে। চারিদিকে ওষুধের গন্ধ, খানার টেবিলে দুজনে মুখোমুখী বসে আছে। গালে রক্তাভা, মুখে তৃপ্তি ও আত্মগরিমার ছটা।"

"আমাকে সামনের চেয়ারে বসতে বলে কিঞ্চিৎ পানীয় নিবেদন করল, আমি গ্রহণ করলাম। তারপর আমার কথাটা পাড়লাম, ভাবের আবেগে কম্পিত আমার কণ্ঠস্বর, নিশ্চয় জানি ওদের চোখে জল আসবে।"

"যখন শুকে বুঝতে পারল এ ভবঘুরে বেদেনী—যে পল্লীতে পল্লীতে চেয়ার মেরামত ক'রে বেড়াত—সেই হতভাগিনী ছিল তার অনুরক্তা, তখন শুকে লজ্জায় ঘৃণায় লাফিয়ে উঠল। যেন ওই স্ত্রীলোকটা ভদ্রলোকের মানসম্ভ্রম সুনামে কালি ঢেলে দিয়েছে—যে ইজ্জত জীবনের চেয়েও মূল্যবান।"

"তার স্ত্রীও উগ্রচণ্ডী হয়ে কেবল বলতে লাগল—"পোড়ারমুখী! পোড়ারমুখী! পোড়ারমুখী!" মুখে আর কোন কথা জোগায় না। শুকে বিক্ষুব্ধ হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কেবল ঘরে পাইচারী করতে লাগল, তার মাথার ছোট টুপিটা কাৎ হয়ে পড়ল কানের উপর। কেবল বিড়বিড় ক'রে বলে "কি ভীষণ ব্যাপার! কি করি বলুন ত ডাক্তার সাহেব? সে বেঁচে থাকতে যদি ঘূণাক্ষরেও টের পেতুম তার এই বেয়াদবি, তাহলে নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিয়ে ওকে ঠেলতাম গারদে। জেলখানার বাইরে একটি পা বাড়াবার পথ রাখতুম না, এ কথা জোর করেই বলতে পারি।"

"আমি ত একেবারে হতভম্ব, এই নিরীহ ব্যাপারের মুখপাত্র হয়ে এদের আতিথ্য গ্রহণ করে! কি বলব কি করব কিছুই ভেবে পাই না। যাহোক, আমার কর্ত্তব্য ত শেষ করতে হবে। বললাম,—'সে তার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে দেবার ভার আমার হাতে দিয়ে গেছে। সব শুদ্ধ দু হাজার তিনশো টাকা। আমার মুখে যা শুনলে, তাতে যদি তোমার মানে বাধে, তাহলে টাকাটা না হয় গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিই।"

ওরা স্বামীস্ত্রীতে খানিকক্ষণ আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, মুখে রা নেই। আমি ওভারকোটের পকেট থেকে টাকার পুঁটলিটা বার ক'রে টেবিলের উপর রাখলাম। হায়, কত বুকের রক্ত জল করা কত দুঃখের টাকা, কত পল্লীতে শহরে তিলে তিলে সঞ্চিত হয়ে নোটে মোহরে পরিণত হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে তোমরা কি ঠিক করলে?" শ্রীমতী শুকের মুখ ফুটল প্রথমে। বললেন, "আচ্ছা, স্ত্রীলোকটার শেষ অনুরোধ যখন—আমার মনে হয় একেবারে পায়ে ঠেলা মুস্কিল বই কি!" স্বামী কতকটা আমৃতা আমৃতা ক'রে বললেন, "হাঁ,—তা বটে—আমরা ছেলেপিলেদের জন্যে ওই টাকা দিয়ে কিছু কিনতে পারি—কি বলেন?"

আমি শুষ্ককণ্ঠে বললাম—"তোমাদের যা অভিরুচি।" শুকে বলল, "তাহলে টাকাটা আমাদের কাছেই রেখে যান, তার শেষ অনুরোধটা ত রাখতে হবে। কোন একটা সৎকাজে লাগানো যাবে।"

"আমি টাকাটা রেখে সেলাম ক'রে বেরিয়ে এলাম।"

পরদিন সকালেই শুকে আমার কাছে এসে উপস্থিত। কতকটা উদাসীন রুক্ষভাবেই বলল, "স্ত্রীলোকটির একটা গাড়ী ছিল না? সে গাড়ীটা কি হল?"

"কিছু হয়নি। পড়ে আছে, তুমি ইচ্ছা করলে নিতে পার।"

"তা বেশ, আমিই নেব। আমার বাগানে ওটা দিয়ে একটা গুদামঘর গোছের করা যাবে।"

"শুকে চলে যাচ্ছিল। তাকে পিছু ডেকে বললাম "স্ত্রীলোকটির একটা ঘোড়া আর দুটো কুকুর আছে। তুমি তাদের নেবে?"

লোকটা যেন একটু আশ্চর্য্য হয়েই বলল, "না, না, আমি নিয়ে কি করব? আপনি যা হয় একটা বিলি ব্যবস্থা করবেন।" তারপর একটু হেসে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দ্দনের জন্য। আমি গ্রহণ করলাম। কি করব? এক গ্রামে বাস করি, ডাক্তারে আর কম্পাউণ্ডারে দা-কুমড়ো হয়ে এক পল্লীতে বসবাস করা চলে না। আমি কুকুর দুটো নিলাম। প্যাদরী সাহেবের কুটীর সংলগ্ন একটা মাঠ আছে। তিনি ঘোড়াটা নিয়ে তাঁর মাঠে ছেড়ে দিলেন। গাড়ীখানা এখন শুকের গুদামঘর, আর ওই টাকাগুলো দিয়ে সে কিনেছে রেলওয়ে কোম্পানীর পাঁচখানা শেয়ার।

"আমার দীর্ঘ জীবনে গভীর প্রেমের এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত শুধু আমার চোখে পড়েছে।"

ডাক্তার চুপ করলেন। জলভরা চোখে মার্‌কুইস্-পত্নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন "বাস্তবিক, মেয়েরাই শুধু ভালবাসতে জানে।"

বসন্ত-বিদায়

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আজ বসন্ত এসেছে সোনার রঙে রঙীন হয়ে—
গন্ধমদির লঘু বাতাস এল তার সঙ্গে,
তুষার-শুভ্র ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্যে
সহস্র নয়নে জাগল ব্যাকুল অভিনন্দন
আর বসন্তের আননে ফুটল স্মিতহাস্য,
সেই তাই দিয়ে করবে নোতুন করে' মনোহরণ।

সবুজ-গালিচা বিস্তীর্ণ হল চারিদিকে,
অরুণালোকের নম্র আভায়
নিশিভোরের শিশির কণায় সে আজ ডাক দিয়েছে,
ডাক দিয়েছে
মানুষের মধ্যেকার অনুগৃহীতের দলকে।
প্রথম ডাকেই সাড়া দিল যত মূঢ়ের দল।
সেজে গুজে বেরিয়ে এল নরনারীরা হেলে দুলে,
তরুণেরা বেরিয়ে এল বুক ফুলিয়ে—
তরুণীরা দিল বুকের বসন আল্‌গা করে।
নগরের কবি এসে হলেন জমায়েত,
হাতে তাঁর পেন্সিল আর কাগজ
নাকের উপর চড়ান একজোড়া সন্ধানী চশমা।

বসন্তের আকস্মিক উন্মাদনায়
বহির্দ্বার দিয়ে তৃণভূমিতে বেরিয়ে এল অনন্ত জনস্রোত।
গাছে গাছে তখন লেগেছে ফুল-ফোটার তাড়া
তরুণতরুণীদের আর বিস্ময়ের অন্ত নাই,
ফোটা আধফোটা ফুল নিয়ে
সুরু হ'ল তাদের ছেলেখেলা;
আসঙ্গ-লিপ্সু পক্ষীমিথুনের সঙ্গীতে
শ্রুতিযুগল তাদের হল আকৃষ্ট;
নীলাকাশ বিদীর্ণ করে' উঠ্‌ল আনন্দধ্বনি—
বসন্ত এসেছে, বসন্ত এসেছে।

আমারো কাছে এসেছিল এই বসন্ত,
বার বার সে আমার দ্বারে আঘাত করে
বলেছে আমায়—আমি যে বসন্ত!
এস, এস হে স্বপ্নবিভোর বিষণ্ণ কবি,
বাইরে এস, তোমায় আমি করি চুম্বন!
অবরুদ্ধ রইল আমার গৃহদ্বার,
হেঁকে বল্‌লাম—
অবাঞ্ছিত অতিথি তুমি,
বৃথা তোমার এ প্রলোভন—
দৃষ্টি আমার বিদীর্ণ করে দেখে নিয়েছে তোমায়,
দেখেছে এই পৃথিবীর প্রতি অণু-পরমাণুকে।
আমি দেখেছি অনেকখানি, অনেক গভীরে।
আনন্দ আর নাই আমার,
চির-যন্ত্রণা এখন আমার হৃদয়ে।
মানুষের পাষাণ-কঠিন আবরণের নীচে
অতি নীচে আমি দেখতে পেয়েছি,
দেখতে পেয়েছি তাদের গৃহ-সংসার,
আর তাদের অন্তঃকরণের অন্তস্থল।
আর কিছু দেখতে পাইনি সেথায়—
দেখেছি শুধু মিথ্যা আর প্রতারণা,
অনিবার দুঃখ ও মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা,
মানুষের চোখে মুখে তার কামনার কালো ছাপ,
—কদর্য্য ও কুৎসিৎ:
সলজ্জ তরুণীর লজ্জার রাঙিমা
লুকিয়ে রাখে তার উদগ্র অদম্য লালসা,
তরুণের উৎসাহদীপ্ত বহিরাবরণে
ঢাকা থাকে তার রঙ-বেরঙের ছদ্ম বাসনা।

এ পৃথিবীতে মানুষ দেখি না আমি,
দেখি শুধু মানুষের বিলীয়মান ছায়া,
তার বিকৃত রূপ, সৃষ্টিছাড়া চেহারা;
সন্দেহ জাগে—
এ কি উন্মাদাগার?
—না, এ হাসপাতাল?

মাটির ভিতর দিয়ে আমি দেখতে পাই
সেই প্রাচীনা পৃথিবীকে,—
—এ যেন স্ফটিকে গড়া ;
আমি দেখতে পাই
আনন্দ-উচ্ছল সবুজের আড়ালে বসন্ত,
বৃথাই লুকাতে চায় তার বিভীষিকা,—
আমি দেখতে পাই,
সঙ্কীর্ণ শবাধারে মৃতের দল
দুটি হাত জোড় করে' শুয়ে আছে,
উন্মিলিত নয়নে তাদের স্থিরদৃষ্টি,
কঠোর ও ভয়াবহ।
শ্বেতবস্ত্রের আবরণে শ্বেত দেহ,
ততোধিক শ্বেতবর্ণ তাদের মুখাবয়ব।
সেই মুখ-বিবর হ'তে হামাগুড়ি দিয়ে
অনর্গল বেরিয়ে আস্‌ছে জঘন্য পীত কীট্।
আমি দেখ্‌ছি—পিতার কবরের উপর
উপপত্নী নিয়ে বসে আছে তার সন্তান,
সেই বারবণিতা নিয়ে চলছে তার নির্লজ্জ-কৌতুক
উন্মাদের সোহাগের উচ্ছৃঙ্খল অভিনয়।
চারিদিকে বুলবুলির অবজ্ঞা ও ঘৃণার কাকলি—
মাঠের ছোট্ট ফুল—সেও হাস্‌ছে বিদ্রূপের হাসি।
মৃত পিতা সন্তানকেও টেনে নেয় তার কবরে,
প্রাচীনা ধরিত্রী মাতা—
কেঁপে ওঠে যেন তারি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায়।

অভাগিনী জননী পৃথিবী,
তোমার এ বেদনাকে আমি ভাল করেই জানি,
আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই—
তোমার বুকের প্রজ্জ্বলন্ত ক্ষোভ-বহ্নি,
দেখতে পাই, তোমার সহস্র ধমণী হতে
প্রবহমান তপ্ত শোণিত-ধারা,
বিদীর্ণ ক্ষতমুখ কঠিনাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ;
—সেই ক্ষতমুখ হতে
উদ্গীরিত হতে দেখি—
ভীষণ অগ্নি, বিক্ষুব্ধ ধূম্ররাশি
উষ্ণ-উৎকট রুধির ধারা।

দেখ্‌তে পাই, তোমার আদি যুগের সন্তান
দৈত্যের দলকে ;
অন্ধকার রসাতল থেকে ওঠে তারা,
নিখিল বিশ্বকে করে তারা তুচ্ছজ্ঞান—
হাতে জ্বলছে তাদের উগ্রগন্ধী মশাল,
আকাশের গায়ে লাগিয়েছে তারা
লোহার সিঁড়ি,
অটল স্বর্গের উপর বর্ষণ করে চলেছে তারা
উন্মত্ত ঝড়ের অসহ্য আঘাত।
কৃষ্ণবর্ণ বামনের দল
কষ্টে সৃষ্টে ওঠে তারপর, একটির পর একটি ;
আকাশের নক্ষত্র
সোনার গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে
মাটির উপরে।
অপবিত্র হাতের কঠিন স্পর্শে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়
ঈশ্বরের পটমণ্ডপের স্বর্ণাবরণ ;
দেবদূতের দলকে দেখি
আর্ত্তস্বরে চিৎকার করে
নিম্নভূমিতে পতিত হতে।

নৈরাশ্য-পাণ্ডুর ঈশ্বর,
সিংহাসনে বসে—টেনে ফেলে দেয়—
স্বহস্তে তার রাজমুকুট—
ছিঁড়ে ফেলে তার দেবদুর্লভ কেশরাশি।
প্রমত্ত ইতরদলের কোলাহল
এগিয়ে আসে তাঁর নিকটে—অতি নিকটে।
স্বর্গরাজ্যের চতুর্দ্দিকে চলে
দৈত্য দানবের জ্বলন্ত মশাল ছুড়াছুড়ি—
পলায়মান দেবদূতের পৃষ্ঠে পড়ে
কৃষ্ণবামনের বহ্নি-কশার অবিরাম আঘাত ;
আঘাত-বেদনায় নতজানু হয়ে
দেবদূতের সে কী নিরুপায় নিস্ফল ক্রন্দন !
কেশাকর্ষণে নিষ্কাশিত হয় তারা
আপনার চির অধিকৃত স্বর্গধাম হ'তে।

আমি দেখেছি, আমার দেবদূতকে
কমনীয় তার আকৃতি
স্বর্ণকেশে কি সুন্দর তার শিরশোভা,
অধরোষ্ঠে তার শাশ্বত প্রেম,
প্রশান্ত নয়নে তার
নিশ্চিত মুক্তির পরম আশ্বাস ;—
আমি দেখেছি—
কৃষ্ণকায় এক শয়তান
জঘন্য বীভৎস তার রূপ,
হঠাৎ এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল
আমার সে চির-আরাধ্য দেবদূতকে—
নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দেহের উপর দিল হানা,
কি কদর্য্য সে শয়তানের মুখব্যাদান
আর তার হিংস্র কটাক্ষ-নিক্ষেপ,
দেবদূত আজ বন্দী হল
শয়তানের দৃঢ় আলিঙ্গনে।
আকাশ বিদীর্ণ করে উঠ্‌ল আর্ত্তধ্বনি,
স্তম্ভের পর স্তম্ভ
ফেটে ভেঙ্গে পড়ে চৌচির হয়ে ;
স্বর্গমর্ত্ত হল স্তম্ভিত অভিভূত :
—আর সবার উপর ঘনিয়ে এল
চিরন্তন রাত্রির
সূচিভেদ্য গভীর অন্ধকার। *

* Heine-এর The Twilight of the Gods হইতে।

অপরাধীর মনস্তত্ত্ব

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

অপরাধতত্ত্বের মত-অনুযায়ী অপরাধীমাত্রেই দুর্ব্বল চিত্তের লোক। দুর্ব্বলতা যে কারণেই আসুক না কেন তাহাদের প্রবৃত্তির গতি সাধারণ গতির চাইতে বিভিন্ন ইহা সত্য। মূল কারণ হইল মনের বিকার এবং বিকার হইলেই কোন না কোন স্থানে দৌর্ব্বল্য থাকিবেই। মনের দুর্ব্বলতার কি ভাবে সৃষ্টি হইল অথবা দুর্ব্বলতার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ কি, তাহাও অপরাধতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয়। সাধারণত অপরাধতত্ত্ববিদ্‌গণ, যেমন—প্যারেটো, পারমেলে, লম্ব্রোসো প্রভৃতি মনীষীগণ মনে করেন যে, মানসিক দুর্ব্বলতার জন্যই অপরাধীদের ধীশক্তির অভাব থাকিয়া যায়। যদি ধীশক্তির অভাব হয়, পৃথিবীতে অন্নসংস্থান করিয়া লওয়া কষ্টকর। সে কষ্ট সহ্য করিবার মত ক্ষমতাও ইহাদের থাকে না। কাজেই সহজে যাহাতে দু পয়সা রোজগার হয় অথবা সহজে যাহাতে নিজের মনস্কামনা পূর্ণ হয় তাহার দিকেই লক্ষ্য থাকে। সহজে এবং বিনা-পরিশ্রমে নিজেদের বড়লোক করার একমাত্র উপায় আইন অমান্য করা, অর্থাৎ—অপরাধীর শ্রেণীতে নিজেকে ভুক্ত করা। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত যে, কতগুলি ক্ষেত্রে অপরাধীরা জন্মগত অপরাধ করিবার বা আইনভঙ্গ করিবার স্বতঃপ্রবৃত্তি লইয়াই জন্মিয়া থাকে। হিলি বলেন যে, মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকই জন্মগত অপরাধীর শ্রেণীতে পড়িয়া থাকে। এই সম্পর্কে তাঁহার মতামত একটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করিলাম, "The gist of the whole situation concerning 'born criminals' is that they are individuals who definitely belong in the scientific categories of mental defect and mental abersation" (১) (বাঙ্গালায় জন্মগত অপরাধী সম্বন্ধে মোট কথা হইল যে, তাহারা ব্যক্তিগতভাবে বৈজ্ঞানিক মতে মানসিক বিকৃতি বা মানসিক রোগগ্রস্ত শ্রেণীতে পর্য্যায়ভুক্ত হইবে ইহা নিশ্চয়) অনেক স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য, শিক্ষার তারতম্যের জন্য, কিম্বা মনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যৌন-অপরাধ, জুয়াচুরি প্রভৃতি কয়েক প্রকার অপরাধ করার দিকে তাহাদের প্রবৃত্তি যায়।

যাহারা মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য অপরাধী তাহাদের লক্ষণ সাধারণতঃ কি কি তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা আবশ্যক। অধিকাংশ সময়েই লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইতে পারে যে, অপরাধীরা গোড়ার দিকে নিজের বুদ্ধির অভাবে বোকামীর জন্য একটা কাজ করিয়া ফেলে অথবা কাহারও প্ররোচনায় লুব্ধ হইয়া কিছু করে। ঠিক যে অন্যায় করিবে বলিয়া অন্যায় করিল অর্থাৎ তাহার মনের নিভৃত দেশও যে অন্যায়ের কালিমাতে লিপ্ত ইহা নাও হইতে পারে। মনের অবয়ব ঠিকমত বৃদ্ধি না পাইলেও মানসিক বিকৃতি হইতে পারে। যেমন ধরা যাক, "সেরিব্রাল" যদি খুব কম বা যতটা হওয়া আবশ্যক ততটা বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির মধ্যে কি কি অভাব বা বৈলক্ষণ্য দেখা যায়? প্রথম হইল সহানুভূতির অভাব; দ্বিতীয় হইল সামাজিকতার অভাব :

(১) উইলিয়ম হিলিঃ "দি ইণ্ডিভিডিয়াল ডেলিনকোয়েণ্ট", বসটন, ১৯১৫, ৭৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় হইল নির্ম্মমতার সম্যক প্রমাণ। ঐ শ্রেণীর লোক মিথ্যাবাদী না হইয়া যাইতে পারে না। তাহার মধ্যে অশ্লীলতা, কামুকতা, অস্থিরতা, শুভাশুভ জ্ঞানহীনতা অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। * (২)

ট্রেডগোল্ড বলেন যে, ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং ভাবপ্রবণতাই অনেক সময়ে অপরাধীর বিশেষ লক্ষণ বলিয়া দেখা যায়। যেমন কোন লোকের যদি "ক্লেপ্টোম্যানিয়া" রোগ থাকে তাহা হইলে প্রায়ই সে লোকের "চুরি" অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি অধিক দেখা যায়। তিনি আরও একটি রোগের নাম করিয়াছেন, তাহা হইল 'পাইরোম্যানিয়া"। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রায়ই ঘরে আগুন দিতে অথবা কোন জিনিষ ভাঙ্গিতে উৎসুক দেখা যায়। উক্ত দুই প্রকার রোগই মানসিক।

এস্থলে আরও দুই-একটি লক্ষণ যাহা আমার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসিয়াছে তাহা বলিলাম। প্রথম হইল দৈহিক এবং মানসিক দুর্ভেদ্যতা। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। যাহাদের কোন মতেই দৈহিক কষ্ট দিয়াও মনের উপর বা কাজের উপর ঘৃণা আনিতে পারা না যায় তাহাদিগকে দৈহিক দুর্ভেদ্য বলিতে চাই। আর এক শ্রেণীর লোক, যাহাদিগকে ভাল কথা বলিয়া বোঝাইলে বুঝিবে না, তিরস্কার করিলেও না, শাস্তি দিবার ভয়ও তাহাদের কিছু করিতে পারে না, তাহারা হইল মানসিক দুর্ভেদ্য শ্রেণীর অপরাধী। এই মত সম্বন্ধে লম্ব্রোসো বলেন যে, জন্মগত অপরাধীর দৈহিক সাড় বা (সেনসিবিলিটি) খুবই কম। এলিসের মতে উক্ত প্রকারের অপরাধীর শরীরে ঘা বা স্ফোটক অথবা আঘাত অতি সত্বর শুষ্ক হইয়া যায়, ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে মানসিক দুর্ভেদ্যতা এই দৈহিক কাঠিন্যের উপরই নির্ভর করে। মানুষের দৈহিক কাঠিন্য থাকিলে সাধারণত দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তির অপরের প্রতি সহানুভূতি জাগিতে পারে না। এই বিষয়ে ব্যক্তিগত মতহিসাবে বলিতে হইলে এই কথা বলা যায় যে, অনেক সময়ে দৈহিক কাঠিন্য থাকা সত্ত্বেও মানুষকে পরোপকারী বা চিন্তাশীল ব্যক্তি হইতে দেখা গিয়াছে। সক্রেটিসের দেহ খুবই কঠিন ছিল বলিয়া জানা যায় ; যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার মত মনীষী জগতে দু-চারটিই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এক যায়গায় বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর উন্নতির উপায়ের মধ্যে "আয়রণ্ মাস্‌ল্ এবং ষ্টীল নার্ভের" দরকার। কাজেই ইহা বলা চলে যে hardness "কাঠিন্যই" প্রকৃত মানসিক বিকৃতির মাপকাঠি নহে, Invulnerability বা দুর্ভেদ্যতাই ইহার যথার্থ লক্ষণ। ইহার কারণ-স্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের হৃদয় একস্থলে কঠিন হইলেও অপর স্থলে কোমল হইতে পারে এবং তাহাই সাধারণত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি মনের অবস্থা এমন হয় যাহাতে বাহিরের কোন জিনিষই প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তাহা হইলে উহাকে "দুর্ভেদ্য" শ্রেণীর অন্তর্গত করা উচিত। উক্ত দুর্ভেদ্য শ্রেণীর লোকই হইল প্রকৃত অপরাধী শ্রেণীর। যে লোককে, তিরস্কার করুন, অপমান করুন, জুতা মারুন কিছুতেই তার মধ্যে "reaction" বা প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাইবেন না, সেই প্রকারের লোক "অপরাধী" শ্রেণীর মধ্যে পড়িতে বাধ্য। আধুনিক সমাজ মানুষকে ঠিক এই রকম অপরাধী গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছে এবং এই শ্রেণীর লোককেই "প্র্যাকটিক্যাল" বা কাজের লোক বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া থাকে। আমাদের দেশে, বিশেষত বাঙ্গলা দেশে, এমন একটা ঢেউ এসেছে যে "সেনসিটিভ" বা "সচেতন" প্রকারের লোককে একেবারে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে দ্বিধা করে না। অপরাধীর সৃষ্টির মূলে সমাজের এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কার্য্যকরী শক্তি অনেক। এখানে আরও একটু বলা আবশ্যক যে, দৈহিক বা মানসিক "দুর্ভেদ্যতা"-হেতু যে সকল লোককে "অপরাধী" বলিয়া গণ্য করা যায় তাহারা প্রকৃতই অপরাধী হইবে এ কথা নির্দ্ধারণ করিলে ভুল হইবে। উক্ত লক্ষণ প্রকাশ থাকার জন্য তাহাদিগকে অপরাধীর দৌর্ব্বল্যবিশিষ্ট ব্যক্তি বলিতে পারা যায়। (৩)

অপরাধীর শ্রেণীবিভাগবিষয়েও নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। এস্থলে সারলক্, টেডগোল্ড এবং অন্যান্য কয়েকজন অপরাধতত্ত্ববিদের শ্রেণীবিভাগ লইয়া আলোচনা করিব। সারলক নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীভাগ করিয়াছেন :—

১। "দি আনষ্টেব্‌ল্" (স্থিতিবিহীন শ্রেণী)

২। "দি মেণ্ডেসাস্" (উদাসচিত্ত)

৩। "দি সেক্স্যুয়াল" (কামুক)

৪। "দি কনটেনসাস" (বিবাদ-প্রিয়)

টেডগোল্ড শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন বিভিন্ন ভাবে। তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। "দি মর‍্যালি পারভার্স" (নৈতিক অবনতিশীল) ইহারাই হইল স্বাভাবিক অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত।

২। "দি ফ্যাসাইল টাইপ"—(নমনীয় শ্রেণী) এই শ্রেণীর লোক অপরাধ করিব বলিয়া অপরাধ করে না। দৌর্ব্বল্য বা মূর্খতার জন্য অপরাধী হইয়া পড়ে।

৩। "দি এক্সপ্লোসিভ টাইপ" (অকস্মাৎ "ঘটিত" অপরাধী)

১। নৈতিক অবনতিশীল শ্রেণীর অপরাধীরা সাধারণত কোন দুর্ব্বলতা বা প্রেরণার জন্য অপরাধ করিয়া ফেলে তাহা নহে, ইহাদের

---

(২) এই সম্বন্ধে আরও দু-একখানি পুস্তকের সংবাদ এখানে দেওয়া গেল। উক্ত পুস্তকগুলিতে মনের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(ক) ই. বি, সারলক্—"দি ফিব্‌ল মাইণ্ডেড্", লণ্ডন, ১৯১১। পৃঃ ১৯২-৩।

(খ) এইচ্ এইচ গডার্ড—"ফিব্‌ল্‌মাইণ্ডেডনেস্", নিউইয়র্ক, ১৯১৪। পৃঃ ৫১৪।

(৩) দৈহিক দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়—(ক) একেলার লিখিত "ফিজিক্যাল ইনসেনসিবিলিটি, নিউইয়র্ক, ১৯০১। (খ) ডবলিউ হিলি লিখিত "দি ইণ্ডিভিডুয়াল ডেলিনকোয়েন্ট।

মধ্যে জন্মগত এমন কতগুলি গুণসমষ্টি আহৃত হইয়া থাকে যাহাতে ইহারা অসামাজিকতা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই ধারণা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রাখে না। তাহারা যে অপরাধ করে হঠাৎ রাগ বা কোন কামের বশবর্ত্তী হইয়া করে তাহা নহে, সম্ভবত ইহাদের জ্ঞানের স্থান বৃদ্ধি না পাইয়া সামাজিক শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিবার শক্তিও থাকে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ নমনীয় শ্রেণীভুক্ত অপরাধীরা সাধারণত কোন একটা অন্যায় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে ; কিন্তু নিজেরা তাহার ফলাফল সম্বন্ধে সত্যই হয় তো কিছুই জানে না। বাস্তবিক একটা দোষণীয় কার্য্য করিব এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা কখনও কার্য্যে ব্যাপৃত হয় না। এ সকল স্থলে অজ্ঞতা এবং চিন্তার অভাবই প্রায় অপরাধের কারণস্বরূপ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। ট্রেডগোল্ড বলেন, "জেনারেল ইনারসিয়া" হইল উক্ত অপরাধের মূল কারণ। অর্থাৎ তাহারা এমন দুর্ব্বল যে, ভালমন্দ জানিবার ইচ্ছাও নাই, জানেও না, অথচ কর্ম্ম একটা করিয়া বসিল। সেখানে একটা ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং দমন করার শক্তির অভাব প্রকট হইয়া উঠে।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক, সাধারণত হঠাৎ রাগান্বিত হইয়া অথবা মনের উত্তেজনাবশত একটা অপরাধ করিয়া বসে। যাহারা এই প্রকার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অপরাধ করে তাহাদিগকে ঠিক অপরাধী শ্রেণীর মধ্যে না ফেলাই উচিত ; কারণ তাহাদের মূর্খতার জন্যই একটা কার্য্য করিয়া ফেলে এবং তাহা এত অকস্মাৎ যে, মানসিক কল্পনার স্থানও সেখানে থাকে না।

ফেরি অপরাধীদিগকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—(১), "ক্রিমিন্যাল ইনসেন"—বিকৃতমনা অপরাধী ; (২) "বরন্ ক্রিমিন্যাল" জন্মগত অপরাধী ; (৩) "ক্রিমিন্যাল বাই একোয়াড হ্যাবিটস"—যে সকল অপরাধী কু-স্বভাব আহরণ করিয়া অন্যায় কার্য্যে নিয়োজিত হয় ; (৪) "অকেসনাল ক্রিমিন্যালস্"—বা সাময়িকী অপরাধী ; (৫) "ক্রিমিন্যালস্ অফ প্যাসন্"—যে সকল অপরাধী কামবশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় করে। ফেরি এবং লম্ব্রোসো এখানে প্রায় এক মতাবলম্বী, কারণ উভয়েই "জন্মগত" অপরাধীর শ্রেণীকে অভ্যাসগত অপরাধীর শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। এ স্থলে অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বলিয়া অন্য কিছুই নাই, কারণ জন্মাবধি সে অপরাধীর মন লইয়া জন্মিয়াছে, যে মনটী কোনক্রমেই কোন দিন পরিবর্ত্তিত হইবে না। এসাফানবুর শ্রেণীভাগ করিয়াছেন আর এক প্রকার :—

(১) চান্স ক্রিমিন্যাল বা আকস্মিক অপরাধী ; (২) ক্রিমিন্যালস্ অফ প্যাসন্ বা কামপরবশ অপরাধী ; (৩) ক্রিমিন্যালস অফ অপরচুনিটি বা অবসর অনুসারে অপরাধী ; (৪) ডেলিবারেট ক্রিমিন্যালস বা সুবিবেচিত অপরাধী ; (৫) রেসিডিভিষ্টস্ ; (৬) হ্যাবিচিউয়াল ক্রিমিন্যাল—স্বাভাবিক অপরাধী ; (৭) প্রফেসানাল ক্রিমিন্যালস—অপরাধ করাই যাহাদের ব্যবসা।

আকস্মিক অপরাধীরা নিজেদের অসাবধানতার জন্য অথবা অজ্ঞতার জন্য অন্যায় কাজে ব্যাপৃত হয়। হয়তো অন্যমনস্কতা বশত মোটর ঠিক মত না চালাইবার জন্য কেহ চাপা পড়িল এ স্থলে অপরাধীর নিজের মন সেই কার্য্যের বিরুদ্ধ হইলেও হঠাৎ ঐ রকম ঘটনাচক্রে অপরাধী হইয়া পড়ে। যে সকল অপরাধী কামাদি পরবশ হইয়া কোন কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য দেখিতে হইলে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা যায় না। উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা নিজস্ব বা "নরম্যাল সেল্ফ" হারাইয়া ফেলে। জার্ম্মান পেনাল কোডে উত্তেজনা হেতু অপরাধ শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। ঠিক এই ধরণের আর এক শ্রেণীর অপরাধ হইল "ক্রাইম্স অফ অপরচুনিটি" বা অবসরপ্রাপ্ত অপরাধী। এ সকল ক্ষেত্রে লোভ সংবরণের শক্তির অভাবই অধিক মাত্রায় প্রকাশ পায়। যেমন ধরুন, লে মিজেরেবল'-এর ঘটনা। তাহাতে অপরাধী ক্ষুধার জ্বালায় রুটি চুরি করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং রুটিখানি পাইবার যে লোভ তাহাও সম্বরণ করিবার শক্তি হারাইয়াছিল। এ সকল ক্ষেত্রে অপরাধের গুরুত্বকে সামান্যভাবে লওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সুবিবেচিত অপরাধসমূহ গুরুত্বের দিক হইতে খুবই অধিক সাংঘাতিক বলিয়া বিবেচিত হয় ; কারণ সেখানে দেখা যায় বহুদিন পূর্ব্ব হইতে চক্রান্ত করিয়া স্থির মস্তিষ্কে একটা অপরাধ করা হইতেছে। সেখানে কোন উত্তেজনা বা হঠাৎ-আসা কারণ কিছুই থাকে না। যেমন, 'পাকুড় হত্যার মামলায়' বলিতে পারা যায় যে, "ডেলিবারেট অপরাধ" শ্রেণীর অন্তর্গত। ইন্সিওরেন্স ফ্রড কেস, ব্যাঙ্ক এম্বেজল্‌মেণ্ট কেস্ প্রভৃতিও উক্ত শ্রেণীভুক্ত। যখন ঐ প্রকার অপরাধ বার বার একই অপরাধী কর্ত্তৃক হইতে থাকে তাহাকে বলিব "রেসিডিভিষ্ট"। তাহার পর হইল "প্রফেসনাল ক্রিমিন্যালস্" বা অপরাধ করাই হইল যাহাদের ব্যবসায়। এই শ্রেণীর অপরাধী সমাজের পক্ষে ভয়ানক অনিষ্টকারী, যেমন ধরুন, ভদ্রলোক জুয়াচোর। তাহাদের দ্বারা এমন কোন অন্যায় কার্য্য নাই যাহা হয় না। এই প্রকারের অপরাধীকে কোন প্রকারেই সংশোধন করা সম্ভব নহে।

শ্রেণীবিভাগের শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে, উপরিউক্ত শ্রেণীভাগগুলি বিশেষ নির্দ্দোষ নহে। কারণ, কোন স্থলে বা উহারা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, আবার কোন স্থলে পুনরুল্লেখ দোষে দূষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এসাফানবুরের শ্রেণীবিভাগই যথাযথভাবে করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহাতে পুনরুল্লেখ দোষ নাই, অথচ প্রত্যেক রকমের অপরাধীকেই তাঁহার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পাওয়া যায়।

নেপাল ও পশুপতিনাথ

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভগবান বুদ্ধদেব—যিনি শাস্ত্রমতে নবম অবতার—তাঁর জন্মস্থান কপিলবস্তু নগরে। এই নগর নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডুর নিকটে। সুতরাং নেপাল যে হিন্দু ও বৌদ্ধের একটি তীর্থস্থান হবে এ বলাই বাহুল্য। একদা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে নেপাল রাজ্যে পৃথিবীর একটি নূতন সভ্যতাও জন্মগ্রহণ করেছিল—সেই সভ্যতা আজও অম্লান ও জীবন্ত।

নেপাল রাজ্য বিশাল ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত, কিন্তু বৃটিশ ভারতের এলাকার মধ্যে নয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন—এই দুই কারণে আমরা মনে করি নেপাল বুঝি ভারতের বাইরে। আজ আমি নেপালে পৌঁছবার রাস্তাটার কথা কিছু ব'লে আপনাদের কাছে বিদায় নেবো।

নেপালে সহসা যাওয়া যায় না। নেপাল রাজসরকারে চাকুরী আছে অথবা কাজকারবার আছে এমন লোক না হ'লে সেখানে যাওয়ার কিছু অসুবিধা ঘটে। এমনি অবস্থায় একটা সুযোগ পাওয়া গেল। ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীর পর্বে নেপালে যাওয়ার ছাড়পত্র মেলে। অতএব একদিন পাকা তীর্থযাত্রীর বেশ ধ'রে পথে বেরিয়ে পড়া গেল। শিব-চতুর্দশীর দিন পশুপতিনাথ দর্শন করলে একেবারে মোক্ষলাভ।

বিহারে মোকামা ষ্টেশনে নেমে গঙ্গা পার হয়ে গেলে সামরিয়া ঘাট ষ্টেশন। সেখান থেকে ট্রেণে উঠলে উত্তর-বিহারের পথ। সেটা ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ বিহার ভূমিকম্পের ঠিক এক বছর আগে। পথে মুজফ্‌ফরপুর, দ্বারভাঙা, বরৌনী প্রভৃতি শহর পার হয়ে যেতে হয়। সকালবেলা গাড়ীতে উঠলে অপরাহ্ণে সগৌলী পৌঁছনো যায়। এই সগৌলী কেন্দ্রে ইংরাজ ও নেপালীতে একদা যুদ্ধ বেধেছিল, যুদ্ধের পরে দুইটি শক্তি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তির অন্যতম সর্ত্ত হোলো নেপালে বৃটিশ লিগেশন্ এবং নেপালের ডাক ও পররাষ্ট্র বিভাগে বৃটিশের আংশিক কর্ত্তৃত্ব। যাই হোক্, সগৌলী থেকে গাড়ী সোজা উত্তরে হিমালয়ের অভিমুখে রক্সৌলে এসে সন্ধ্যার সময় পৌঁছয়। রক্সৌল শহর অতি সামান্য, কিন্তু এই শহরের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তার কারণ এই যে, এখানে দুটি রেল-ষ্টেশন। একটি বৃটিশ এলাকায় ও অপরটি নেপালের এলাকায়। এই দুইটি ষ্টেশনের সর্বত্র নেপালী ও বৃটিশ ভারতীয় প্রহরী সতর্ক প্রহরায় অহোরাত্র নিযুক্ত; দুইদিক থেকে যাত্রীদের আনাগোনার প্রতি তারা সকল সময় প্রখর দৃষ্টি রাখে। ভারতবর্ষ ও নেপালের সীমা রেখার উপর এই ক্ষুদ্র শহরটি সর্বাপেক্ষা সমতল ভূমিতে অবস্থিত এবং সেই কারণে সুগম।

দুইটি ষ্টেশনের মধ্যস্থলে ছাড়পত্রের দপ্তর। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ছাড়পত্রের জন্য দুটি পয়সা লাগে। তারপরে ট্রেণে অর্থাৎ নেপাল গভর্ণমেণ্ট-রেলওয়ে দিয়ে অমলেকগঞ্জ পর্যন্ত যেতে গাড়ী ভাড়া লাগে চার আনা কিম্বা ছয় আনা। রেলপথটি অতি কৃশ, গাড়ীগুলি ছোট ছোট, এঞ্জিনের গতি অপেক্ষা শব্দই বেশি এবং অনেক সময় গাড়ী গ্রামের পথ দিয়েই চলে। দুধারের গ্রামগুলি অরণ্যময়। মধ্যপথে সকলের বড় ষ্টেশন বীরগঞ্জ। এই বীরগঞ্জের দুধারে হিমালয়ের টিরাই অরণ্য। সেই অরণ্য ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, লেপার্ড—প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ারে পরিপূর্ণ। নেপালের মহারাজা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী অনেক সময়ে এই পথ দিয়ে শিকারে যান্।

অমলেকগঞ্জ ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌ল, এর পরে অসমতল পার্বত্য পথ, সুতরাং ট্রেণ আর চলে না। যাত্রীরা নেমে সবাই যে যার আশ্রয় খুঁজে নিল। জনতা বেশি হলে আশ্রয়ের অভাব ঘটে, কারণ যাত্রীনিবাসের সংখ্যা বড় কম। সেই রাত্রে আমরা একটা কাঁচামালের আড়তে আশ্রয় নিলাম। বৎসরের সকল সময়েই এদিকে শীতের প্রকোপ বেশি। আশে পাশে হিমালয়ের অরণ্য।

পরদিন প্রভাতে মোটর বাস পাওয়া গেল। সকালের আলোয় দেখলাম ছোট গ্রামে দুই চারটি বাড়ীঘর, আর সবই পতিত জমি। আমদানি রপ্তানি ছাড়া এই সকল জায়গার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। মোটরবাসে ভীমপেডী পর্যন্ত যেতে বোধহয় একটাকা থেকে দেড়টাকা ভাড়া লাগে। সিলিগুড়ী থেকে যেমন দার্জ্জিলিঙ, অথবা

কাল্কা থেকে যেমন শিমলা—তেমনি অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডী। পথের একদিকে বিশাল পাহাড়, অন্যদিকে বাগমতী নদী। এই বাগমতী নদী শুনেছি তিস্তা নদীতে গিয়ে মিলেছে। কিন্তু পথ অতি সুন্দর, ভারতবর্ষের পার্বত্য পথগুলির মধ্যে এমন মনোরম ভ্রমণের আনন্দ অন্য কোনো দেশে বিরল। মাঝে মাঝে পথ রাঙা, বসন্তকালের ঝরা পাতায় ছাওয়া, কোথাও কোথাও ঝরণার ঝরো-ঝরো শব্দ। প্রভাতে পাখীর দল পাইন আর ঝাউয়ের বনে কলকুজনে মত্ত; পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট গ্রাম।

চব্বিশ মাইল পথ অতি আনন্দে পার হয়ে আমরা ভীমপেডীতে এসে পৌছলাম। এখান থেকে কাটমাণ্ডু শহর আন্দাজ কুড়ি বাইশ মাইল। এই কুড়ি মাইল পথ অতি দুর্গম। এই পথে জল, জলাশয়, খাদ্যবস্তু ও আশ্রয়ের একান্ত অভাব—সেই কারণে যাত্রীরা ভীমপেডীতে স্নানাহার ও বিশ্রাম ক'রে নিয়ে যাত্রা করে। পাহাড়ীরা স্বভাবত কঠিন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, সেজন্য তাদের গায়ে এই সব শারীরিক শ্রম ও রুচিকর খাদ্যের অভাব লাগে না। পথ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাবশত ভীমপেডীতে আমরা অপেক্ষা না ক'রে অগ্রসর হয়ে চললাম। চললাম উত্তরদিকে। সম্মুখে দুরারোহ দুর্গম কঠিন পর্বত, এই পর্বত আমাদের হেঁটে পার হতে হবে। মনে অহঙ্কার ছিল, পর্বত আরোহণে আমি অতি সুপটু; কিন্তু ঘণ্টাখানেক চড়াই উঠে চারিদিক অকূল দেখলাম। পরেশনাথ পাহাড়ের যে-চড়াই তার চারিদিকে স্নিগ্ধ অরণ্যছায়া আছে এবং সেখানে অনেক সময়ে কৌতূহলবোধ জাগ্রত থাকে; কিন্তু এই পথ আমাকে বদরিকাশ্রমের ছান্তিখাল চড়াইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। রৌদ্র প্রখর, ছায়া নেই, পানীয় জলের চিহ্ন কোথাও দেখিনে, চটি নেই, পথের আন্দাজ পাইনে—অথচ আবার ভীমপেডীতে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। অতিশয় ক্লান্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় আমাদের পাহাড় ভেঙে ভেঙেই এগিয়ে যেতে হোলো।

এই পাহাড়ের নাম সিসাগড়ি, হয়ত নামটা শ্রীশগিরির অপভ্রংশ। পাহাড়ের অনেক অংশে নেপাল-সরকারের গোরা-ছাউনী আছে, তারা দুর্গম পর্বতের কোনে কোনে বহিঃশত্রুর প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। তিব্বত, চীন এখান থেকে দূর নয়। একটা গোরা-ছাউনীর ধারে এসে আমরা স্নান করবার সুযোগ পেলাম, কিন্তু নিকটবর্তী দু' একটা দোকানে বাঙালী রসনার উপযুক্ত খাদ্য না পাওয়ার জন্য নিরাশ হয়ে আমাদের ফিরে যেতে হোলো।

অপরাহ্নকালে আমরা বহুপ্রত্যাশিত কুলেখানি ধর্মশালায় এসে পৌছলাম। সাত আট মাইল মাত্র পাহাড় অতিক্রম করেছি কিন্তু ক্লান্তি এতই বেশি যে আমরা কুলেখানিতে পৌছে একেবারে অনড় হয়ে পড়লাম। এখানে প্রকাণ্ড একটা যাত্রীনিবাস, নিকটে ছোট একটি নেপালী গ্রাম—শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষে যে সব যাত্রীরা আসে তাদের নিয়েই প্রধানত এখানকার কাজকারবার। মালপত্র আহার্য প্রভৃতি বস্তু যা কিছু এদিকে মেলে সে সব পাহাড়ের Ropeway অর্থাৎ রজ্জুপথ দিয়েই আমদানি হয়ে থাকে। আমদানি রপ্তানির সহজ উপায় আর কিছু দেখা গেল না। পাহাড়ের মাথায় মাথায় রজ্জুপথ আমরা আগেই আমাদের আসার পথে লক্ষ্য ক'রে এসেছি। দুর্গম পার্বত্য দেশে এই রজ্জুপথ পাহাড়ীদের জীবনযাত্রাকে অনেকটা সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছে বলতে হবে।

শীতপ্রধান দেশে মাটি আর পাথর অপেক্ষা কাঠের তৈরী বাড়ীঘর বেশি দেখা যায়। একখানা সাধারণ বাড়ীতে কাঠের দেয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের অন্যান্য আসবাব আমরা দেখতে পাই। অরণ্যবহুল পার্বত্য শহরগুলিতে এদের সংখ্যা অনেক বেশি। কুলেখানির ধর্মশালার অনেক অংশ কাঠের তৈরী—কাঠের কাজের জন্য ঠাণ্ডা থেকে অনেকটা আত্মরক্ষা করা যায়। যাঁরা হিমালয়ের শহরগুলিতে ভ্রমণ করেছেন—অর্থাৎ কালিম্পঙ, দার্জিলিঙ, কাটমাণ্ডু, নৈনিতাল, আলমোড়া, শিমলা, কো-মারী প্রভৃতি—তাঁরা আমার কথা উপলব্ধি করবেন।

কুলেখানিতে এসে নেপালের আর এক পরিচয় পাওয়া গেল—সেটি নেপালের কারুশিল্পকলার বৈচিত্র্য। মঙ্গোলীয়ান্ টাইপ থেকে যে সকল মানব-গোষ্ঠি উৎপন্ন—যেমন জাপানী, চীনা, তিব্বতী, নেপালী প্রভৃতি—তাদের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে অতি সুপরিচিত। জাপানী ও চীনা শিল্পকলার যে সকল বিখ্যাত আঙ্গিক পদ্ধতির সঙ্গে শিল্পরসিকগণ পরিচিত, তারই সুস্পষ্ট চিহ্ন কুলেখানির ধর্মশালার গঠনভঙ্গী ও পারিপাট্যের মধ্যে পাওয়া যায়। কাঠ খোদাইয়ের সেই বৈচিত্র্য, সেই অলঙ্কার, সেই চিত্রাবলী। নেপালীরা শক্তির পূজারী, সেইজন্য মানবজীবনের আদিম বৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ

ক'রে তার মূল্য নিরূপণ করতে তারা ভয় পায় না। যে বিপুল অগ্নিকুণ্ড থেকে মানুষের জন্ম অবিরাম বিচ্ছুরিত হচ্ছে নেপালীরা সেই অনাদি অনন্ত চৈতন্যকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে। সেইজন্য পুরীধামের জগন্নাথ মন্দিরগাত্রে যে সকল চিত্র অথবা কাশীতে নেপালী মন্দিরে যে সকল চিত্র খোদিত, সেই সকল চিত্র অসংখ্য পরিমাণে সমগ্র নেপালের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে।

কুলেখানিতে রাত্রি যাপনের বিশেষ অসুবিধা হোলো না। আহার্য বস্তু কিনতে পাওয়া গেল। নেপালী মুদ্রাগুলি বৃটিশ ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে এখানে চলে। যতদুর আমার মনে আছে আমাদের দশ আনায় ওদের একটাকা হয়।

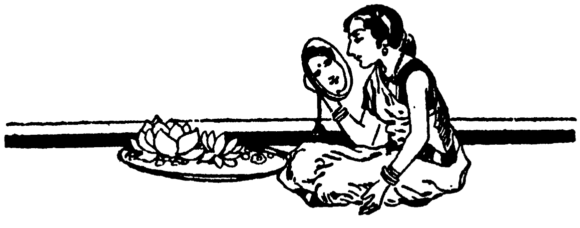
পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করলাম। পথ উঁচু বটে, কিন্তু অনেকটা সমতল। দুই ধারে যতদুর দৃষ্টি চলে পর্বতের পর পর্বত। আমরা চেৎলাঙের দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে চড়াই, মাঝে মাঝে উৎরাই। পথে নদী পার হয়ে আবার চড়াই উঠতে হয়। শিবরাত্রির তখনও দুই দিন দেরি, সেজন্য তাড়া নেই। মধ্যাহ্নের পরে অনেকটা দুর্গম পথ পার হয়ে আমরা চেৎলাঙ ধর্মশালায় এসে পৌছলাম। যাত্রীর জনতা অনেকটা বেড়ে গেছে, আগেভাগে যারা এসেছিল তারা জায়গা দখল করার জন্য আমরা নদীর তটে এক তাঁবুতে আশ্রয় পেলাম। দেখতে দেখতে শীতকালের অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে গেল। সেই হিমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় আমরা নদীর তটে ব'সে কাঁপতে লাগলাম। অজানা অচেনা সেই দুর্গম দেশের এক তুহিন-শীতল নদীর তটে একটি দরিদ্র তাঁবুর মধ্যে আমাদের সেই রাত্রিটি স্মরণীয়। চতুর্দিকে অন্ধকার, আলোর ব্যবস্থা কোথাও নেই, কেবল কোথাও কোথাও শীতার্ত যাত্রী অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে উত্তাপ সেবন করছে, সেই আগুনের আভায় হাতড়ে হাতড়ে সকলের চলাফেরা। সেই অবস্থাতেও হাস্যকর উপায়ে চাউল ফুটিয়ে আমরা নিজেদের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করলাম। এরপরে নদীর পাথর কুচির উপরে একখানি মাত্র কম্বল সম্বল ক'রে সেই তুষারশীতল রাত্রিযাপন।

দুঃখের রাত দীর্ঘ হয়, তবু সকাল হোলো। সকালবেলা যাত্রা ক'রে দেখি সম্মুখে বিশাল খাড়াই পর্বত—অনেকটা দেয়ালের মতো। সেই দেয়ালের গা বেয়ে পিপীলিকার সারির মতো যাত্রীর দল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। সকলের মুখেই—'জয় বাবা পশুপতিনাথ।' আমরাও তাদের অনুসরণ করলাম। এই পাহাড়টির নাম চন্দ্রাগড়ি। বোধ করি চন্দ্রগিরির অপভ্রংশ। চারিদিক অরণ্যময়। সেই উত্তুঙ্গ চড়াইপথে কোথাও বিশ্রামের অবকাশ নেই, পথ প্রস্তরময়। একশো গজ উঠতে পনেরো মিনিট লেগে যায়। সকলেই ক্লান্ত, সকলেরই দম ফুরিয়ে আসে। এইভাবে প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর আমরা চন্দ্রগিরির চূড়ায় গিয়ে পৌছলাম। নেপালের যিনি মহারাজা তাঁকেও ডাণ্ডিতে এই পথ পার হতে হয়—এইটুকু কেবল আমাদের সান্ত্বনা।

চূড়ায় উঠে অপরদিকে নীচে চেয়ে দেখি, দূর স্বপ্নপুরীর মতো কাটমাণ্ডু শহর চিকচিক করছে, আর তারই চারিদিকে চিরতুষারময় হিমাচল সূর্যের কিরণে জাজ্জ্বল্যমান। আমরা তখন কমবেশি চারহাজার ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আজ এই পর্যন্ত ব'লে আপনাদের কাছে বিদায় নেবো। *

* বেতারে পঠিত। আগামীবারে সমাপ্য।



জাতকারি-কর

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

চপলা এক কড়াই আঁঠাল মাটি প্রবীরের সম্মুখে ঝপাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া ঝাঁঝাল স্বরে বলিল, আর পারি না—দিন নেই রাত নেই, কেবল কাদামাটি নিয়ে চানাছানি। আহাঃ কি আমার ছিরি রে! দেখলে আমার গা জ্বলে!

প্রবীর আপন মনে পুতুল বানাইয়া চলিয়াছে, স্ত্রীর কথায় কান দিল না, ঝাঁঝাল সুরটাও তাহাকে স্পর্শ করিল না। প্রবীর কোন প্রতিবাদ করিল না দেখিয়া চপলার রাগ আরও বাড়িয়া গেল, আবেগের স্বরে বলিল, শুনচ—এই, এই সদাই-শিব শুনচ—বাতাস না কানে ঢোকে!

তবু প্রবীরের কানে বাতাস ঢুকিল না, গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে পুতুল গড়িতে লাগিল।

চপলা সুন্দরী রাগে জ্বলিয়া উঠিল। কোমরে দুই হাত চাপিয়া, ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল, আমায় রাগিও না বলচি—সব কিন্তু উড়িয়ে ফেলব আস্তা কুঁড়ে।

প্রবীর মাটির ঢেলা টিপিতে টিপিতে আড় চোখে ক্রুদ্ধা স্ত্রীর রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসি হাসিয়া বলিল, এই সকাল বেলায় অত ক্ষেপেচিস কেন রে সুজনের মা! কাল বুঝি দুষ্টু ছেলের জন্যে সোহাগের ভাগটা ছেলের মার কম পড়ে গিয়েছিল। সুজন এখন নেই, আয়—কাছে আয় সুদে আসলে পূরণ করে দিচ্চি!

চপলা ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, ঢঙে আর বাঁচি না!

প্রবীর উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

দাঁত বের করে হেস না বলচি। লজ্জা করে না সব সময় হি হি করে হাসতে—গা আমার জ্বলে যায় বাপু।

কাছে আয় মণি, রাগ জল করে দিচ্চি। রাগলে পরে তোর চাঁদ মুখ থেকে যেন আলোক ঝরে!

ঢঙের কথা রাখ বাপু! আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করব।

প্রবীর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিল, ওরে বাবা! মাইরি, আমার কিন্তু ভয় করচে—

চপলা বলিল, যার দুবেলা ভাত জোটে না, তার অমন দিনরাত সোহাগ করা মানায় না—মজুরদের অমন বাবুয়ানা কেন বাপু!

আরে, হোল কি বল না। কে কি বলেচে শুনি!

কে আবার বলবে? ছেলেটা যে দুধের অভাবে শুকিয়ে যাচ্চে সেদিকে বাবুর কোন হুঁস আছে? এই মুণ্ড চটকালেই কি নুনভাত আসবে?

প্রবীর ব্যস্তভাবে বলিল, ও! এই কথা, আমি ভেবেছিলুম না জানি কত গুরুতর কথা। আজ রোদ লাগিয়ে রাত্রে রঙ পরাব। কাল হাটবার আছে—ভাবিসনি মণি, কাল নিশ্চয়ই ভাল বিক্রি হবে!

কি আমার পুতুলরে। পেটে ভাত জোটে না, সব হাঁ করে বসে আছে—পুতুল কিনে তোমায় রাজা বানিয়ে দেবে বলে। কাল নয় পুতুল বেচে জমিদারী কিনবে কিন্তু আজ কি গিলবে শুনি?

সে-দিন ত আড়াই সের চাল এনেচি, সবই কি এরই মধ্যে—

আমি রাক্ষুসী কি-না তাই পাঁচ-ছ দিনে অতগুলি চাল শেষ করে ফেলেচি।

ও—তাই ত। আগে বলিসনি কেন সুজনের মা। এই তোদের দোষ, বাড়ন্ত না হলে আর তোদের হুঁস নেই।

যে ইচ্চে করে ভুলে যায় আর ইচ্ছে করে কালা হয় তাকে কি করে বলব?

আজ যেমনি বলেচিস। প্রবীর দাঁত বাহির করিয়া যেন কৃতিত্বের হাসি হাসিতে লাগিল।

হাসচ, কাল ত আবার ইচ্ছে করে ভুলে যাবে।

পাগল আর কি! যা রাগা রেগেচিস—এর পর কি ভুলতে পারি। কারও কাছ থেকে ধার চেয়ে আন, কাল শোধ করে দেওয়া যাবে'খন।

ধার!—আমার শ্রাদ্ধের দায় ঠেকেচে আর কি। বাড়িতে বাড়িতে ধার, শোধ দেবার মুরদ নেই—লজ্জা করে না ফের ধার চাইতে।

প্রবীর মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া অকারণে গা চুলকাইতে লাগিল।

যার স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করবার মুরদ নেই সে আবার বিয়ে করে কোন আক্কেলে! চপলা একটু শ্লেষের স্বরে কথাটি বলিয়া বড় ঘরের দিকে পা বাড়াইল।

প্রবীর ছোট করিয়া বলিল, ভুল করে ফেলেচি, কি আর করব বল।

চপলা ফিরিয়া দাঁড়াইল, রাগতভাবে স্বামীর দিকে চাহিয়া একটু বিকৃত সুরে বলিল, ভুল করে ফেলেচি—আমাকে যেন একেবারে সগ্যে তুলে দিলেন আর কি।

প্রবীরও একটু চটিয়া উঠিয়া বলিল, তুই রোজ অমন কথা শুনাস কেনরে। আগে যখন দু'পয়সা ছিল তখন ত নিত্যি ঝগড়া করতে আসিসনি। মেয়েরা বড় স্বার্থপর হয়।

কি স্বার্থপর! উচিত কথা বল্লেই স্বার্থপর। দু'মুঠি খাবার দেবার—

ছাখ., বারবার ভাতের খোঁটা দিসনি বলচি !

দেব না—একশ'বার দেব। উচিত কথা আমি একশ'বার বলব, কি করবি আমার। চপলা ক্ষেপিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

প্রবীর আর ঘাঁটিতে সাহস করিল না, ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া তামাক ধরাইবার দিকে মন দিল।

বাবুর আবার তেজ আছে। চপলা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ঘাড় ফিরে যে বাবুর মত তামাক টানা হচ্চে—বলি বাচ্চাটাকে আজ খেতে দিই কি? কুঁড়ের বাদশার মত বসে বসে নবাবী চালে তামাক টানলেই সব আসবে নাকি?

প্রবীর তবু কোন উত্তর করিল না, আপন মনে তামাক টানিয়া চলিল।

চপলা চেঁচাইয়া বলিল, বলি বাবুর কানে বাতাস গেচে না পুতুলগুলি সব উড়িয়ে ফেলব!

তবু প্রতিপক্ষ হইতে কোন জবাব আসিল না দেখিয়া চপলা একটা পুতুল পায়ে মাড়াইয়া দিল।

প্রবীর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, ছাখ., মানুষের সহ্য করবার একটা সীমা আছে। ভাল হবে না কিন্তু।

কি করবি?

প্যান প্যান করিসনি।

প্যান্ প্যান্ করব না! দুধের ছেলেকে খেতে দেবার ক্ষমতা নেই, বসে বসে মুণ্ড বানাচ্চেন। চপলা আরও দুই তিনটা পুতুল মাড়াইয়া দিল।

ফের মাড়াচ্চিস!

মাড়াবই ত। কি করবি?

কি করব? প্রবীর মাটি ভাঙ্গিবার কাঠটা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

কাঠের কোণটা চপলার ললাটে গিয়া পড়িল। চপলা 'ও মাগো' বলিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কপাল কাটিয়া দর্ দর্ বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। প্রবীর রক্ত দেখিয়া বিষম ভয় পাইয়া গেল। বিমূঢ়ের মত খানিক চাহিয়া থাকিয়া ছুটিয়া গেল। চপলাকে তুলিবার জন্য দুই হাতে ধরিতেই চপলা দুই হাতে প্রবীরের মুখে জোরে জোরে ধাক্কা মারিয়া বলিল, বের হ, বের হ আমার সুমুখ থেকে। ছোটলোক, চাষা কোথাকার, খুনী—দূর হ!

প্রবীর ভয়ে ভয়ে বাড়ি হইতে পলাইয়া গেল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। প্রবীর সেই সকাল বেলায় স্ত্রীকে যে আঘাত করিয়া পালাইয়াছিল আর ফিরিয়া আসে নাই। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীকে ফিরিতে না দেখিয়া চপলা রীতিমত ভয় পাইয়া গেল। এমন পাগল মানুষকে লইয়া আর সে পারে না। স্ত্রীকে স্বামীই শাসন করিয়া থাকে, মারধরও করিয়া থাকে—কিন্তু তাহাতে এমন কি গুরুতর অন্যায় হইয়াছে যে, সারাদিনে আর বাড়ি ফেরবার নাম নাই! রাত্রিই কি কম হইয়াছে। এত রাত হইল, পেটে হয়ত এক কণা দানা পড়ে নাই, এক ফোঁটা জল পড়ে নাই—কোথায় কোন্ ঝাড়ে ঝোঁপে, কোন ঘুপচিতে পড়িয়া রহিয়াছে কে জানে। যতই সে অভুক্ত স্বামীর কথা ভাবিতে যায় ততই মনটা বেদনায় করুণায় ভরিয়া ওঠে—সময়ের দৈর্ঘ্যের মাপে অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা বাড়িয়া যায়।

আজ আর বাড়িতে উনুন জ্বলে নাই। সেই কোন্ সকাল বেলায় ছেলের জন্য যে দুধ গরম করিয়াছিল, আর উনুনের পাশে যায় নাই। অল্প দুধ, কখন শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘরে একটু বার্লিও নাই যে জ্বাল দিয়া খাওয়াইবে। ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে সারাক্ষণ স্তন দিয়া রাখিয়াছে। সন্তান কাঁদিতে কাঁদিতে—ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে খানিক পূর্ব্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

প্রবীর অনেক রাত্রে চুপি চুপি বাড়ি ফিরিল। চপলা অন্ধকারেও স্বামীর আগমন বুঝিতে পারিল। যাহার চিন্তায় সে এতক্ষণ ব্যাকুলিত হইয়াছিল, দুশ্চিন্তায়, অস্বস্তিতে বারবার বাড়ির চারি পাশে খুঁজিয়া আসিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়াছে তাহাকে গভীর রাত্রে চোরের মত প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুর্বল মনটা আবার কঠিন হইয়া উঠিল। অপরাধী স্বামীর ক্লিষ্ট মুখখানি দুর্জয় অভিমানে গর্জিয়া উঠিল। প্রিয় সম্ভাষণ ভুলিয়া গিয়া ঘুমের ভান করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল।

প্রবীর স্ত্রীর শয্যা পাশে আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, ওগো—ওগো!…ঘুমিয়ে আছিস সুজনের মা?

জাগ্রত মানুষের ঘুম অত শীঘ্র ভাঙ্গিল না। প্রবীর জোরে ডাকিতে বা শরীরে হাত দিয়া ডাকিতে সাহস পাইল না।

খানিক ডাকাডাকির পর প্রবীর কুপিটা জ্বালাইয়া আনিল। স্ত্রীর মুখের উপর ক্ষীণ আলোটা ধরিয়া একটু হাসিতে চেষ্টা করিল কিন্তু মুখে হাসির রেখা ফুটিল না।

সহজভাবে প্রবীর বলিল, নিশ্চয়ই ঘুমাসনি—জোর করে চোখ বন্ধ করে আছিস।

চপলা প্রবীরের হাত হইতে এক ঝটকায় হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, দুপুর রাত্রে কোন্ চুলো থেকে এসেচেন আমার হাড় জ্বালাতে। দূর হ—আমার সুমুখ থেকে।

প্রবীর অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

চপলা বলিল, স্ত্রীর গায়ে হাত তুলে মরদগিরি ফলায়—লজ্জা করে না আবার এমুখো হতে। এতক্ষণ যে চুলোতে ছিলি সেখানে ঠাঁই হয়নি যে আবার এলি?

এখনও তোর রাগ পড়েনি। তোর ত অমন সর্বনেশে রাগ কখনও ছিল না সুজনের মা।

না, ছিল না—ছিল না বলে তিনি আমার মাথা কিনে রেখেছেন আর কি।

অন্যায় করেচি—শাস্তিও কম পাইনি—এবার ক্ষমা দে সুজনের মা।

চপলা কোন উত্তর করিল না।

প্রবীর বলিল, ক্ষমা করবিনি? সত্যি করে বল্ ত এর আগে কখনও তোর গায়ে হাত তুলেচি, না কখনও বকেচি! যখনই ঝগড়া হয়েচে তোরই জিত থেকে গেচে—তুই-ই বকেচিস, আমি কখনও চোখ তুলে কোন কঠিন কথা কইনি। আজ আমায় যে কি ভূতে পেয়েছিল—সারাটা দিন ভেবে ভেবে একশেষ হয়েচি।

প্রবীর চপলার হাত ধরিয়া বলিল, এবার ক্ষমা কর মণি। তুই এমনি ভাবে চটিয়েচিস বলেই ত চটেছিলুম—খুব সাজা হয়েচে আর কখনও অমন হবে না।

চপলা শয্যায় উঠিয়া বসিল। ললাটের ক্ষত স্থানটা প্রবীরের চোখের উপর তুলিয়া ধরিয়া অভিমানে বলিল, স্থাখ্, ত কেমন কেটে গেচে। আর কখনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলবি?

পাগল—যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে। প্রবীর স্ত্রীর মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

(২)

পরদিন।

আজ হাটবার। চপলা তাড়াতাড়ি করিয়া রান্না শেষ করিয়াছে।

প্রবীর এক থালা ভাত দেখিয়া বলিল, চাল ধার করে এনেচিস বুঝি।

চপলা গরম ভাতে হাওয়া করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া বলিল—হুঁ।

প্রবীর বলিল, অত ভাত দিয়েচিস কেন? কিছু ভাত তুলে নে সুজনের মা, থালা ভরা ভাত আমি কখনও খেতে পারি! মাইরি বলচি, অত আমি খেতে পারব না।

যাও বাজে বকো না। ভারি ত ভাত—ওটুকু ওঁর চলবে না। তিন-চার ক্রোশ হেঁটে বাজারে যাবে—ফিরতে ফিরতে সেই রাত নটা। লক্ষীছেলের মত পেট ভরে খেয়ে নাও ত!

সত্যি অত ভাত চলবে না, কিছু তুলে রাখ।

মোটেই বেশি ভাত দিইনি। তুমি কতখানি খাও তা তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি। পেট ভরে খেয়ে নাও—কাল যার দিন রাতে একটি দানা পেটে পড়েনি।

সত্যি বলচি অত খেতে পারব না, বিশ্বাস কর—অত খেতে পারব না। কিছু ভাত তোর জন্যে তুলে রাখ, লাগলে আমি চেয়ে নেব। আর চাইতেই হবে কেন, তোরা ত স্বামীর মনের কথাও টের পাস।

প্রবীর দাঁত বাহির করিয়া মৃদু হাস্য করিল।

আর বকো না, এবার খেতে আরম্ভ কর। সব কটি খেতে না পার পাতে রেখে যেও—আমি খাব'খন।

না, না, তুলে রাখ। তোর কথাগুলি এত মিষ্টি যে খাবারের দিকে মোটেই লক্ষ্য থাকে না। অন্যান্য দিনের মত পেট ঠেসে খেয়ে ফেলব, তখন আর নড়বার চড়বার উপায় থাকবে না।

ফের বকচো—এবার কিন্তু সত্যি আমি রাগ করব। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও—একটু জিরোতে ত হবে, নতুবা পথে খুব কষ্ট হবে।

মাইরি, তোর জন্যে ভাত রেখেচিস? দেখি হাঁড়িটা!

আমি বাপু আর পারিনে। বাবা রে বাবা—এ যেন উকিলের জেরা। বলচি ভাত রেখেছি তবু দেখি দেখি, বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে দেখে এস।

প্রবীর স্ত্রীর কৃত্রিম ক্রোধে হাসিয়া উঠিল।

প্রবীরের খাওয়া অর্দ্ধেক হইয়াছে, অমন সময় সুজন সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া জননীকে পাশে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। চপলা স্বামীকে সবগুলি ভাত খাইবার জন্য মাথার দিব্যি দিয়া বড় ঘরে চলিয়া গেল।

চপলা চলিয়া যাইতে প্রবীর তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়ির ঢাকনাটা তুলিয়া দেখিল—হাঁড়িতে মোটেই ভাত নাই। অল্প কিছু ভাত হাঁড়ির নীচে পড়িয়া আছে। প্রবীর থালার পরিষ্কার ভাতগুলি তাড়াতাড়ি হাঁড়িতে রাখিয়া ঢাকনা বন্ধ করিয়া দিল।

চপলার বিশ্বাস নাই। ছেলেকে কোলে লইয়া স্বামীর পাশে আসিয়া বসিল।

প্রবীর বলিল, বাবামণি যে—ঘুম ভাঙ্গল বাবুর। ভাতু খাবে বাবা।

সুজন বার কয়েক চোখ রগড়াইয়া ভাত খাইবার জন্য মুখ বাড়াইয়া দিল! প্রবীর হাসিয়া দুই-তিনটা ভাত আঙ্গুলে পিষিয়া সুজনের মুখে দিল।

প্রবীর দুই গ্রাস ভাত মুখে লইয়া বলিল, আর চলচে না।

চপলা জোর দিয়া বলিল, চলচে না মানে—কাল কিছু খাওনি, পাত মুছে খেয়ে উঠতে হবে। একটু তেঁতুল দেব? এই তেঁতুল মেখে খেয়ে নাও—একটি ভাত পড়ে থাকে ত কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।

একটা ভাত অন্তত পাতে রাখতে হয় নতুবা দারিদ্র্যে ধরে।

চপলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা একটা ভাত রাখতে পাবে।

তোর জন্যে রেখেচিস ত?

না, হাঁড়ি উজাড় করে তোমাকে দিয়েচি। আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না, অনেক ভাত তোলা আছে।

প্রবীর পাত মুছিয়া খাইয়া উঠিল।

চপলা হাসিয়া বলিল, লক্ষীছেলে!

মায়ের কথা শুনিয়া বালক হাসিয়া উঠিল। চপলা ছেলের হাসিতে নিজেও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দুষ্ট ছেলের গাল টিপিয়া দিল।

হাট হইতে ফিরিতে প্রবীরের প্রায় দেড় প্রহর হইয়া গেল। পুতুলের ঝাঁকাটা ঝপাত করিয়া দাওয়ায় রাখিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

চপলা ব্যস্তভাবে বলিল, অমন করে বসে পড়লে কেন?

একগ্লাস জল দে ত সুজনের মা—বড্ড তেষ্টা পেয়েচে।

প্রবীর আধ ঘটি জল ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া হাঁপাইয়া উঠিল। চপলা পাখা লইয়া পাশে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

একটু সুস্থ হইয়া প্রবীর বলিল, আর পোষাবে না সুজনের মা। তোর কথাই সত্য হল—দেশের লোকের চোখ ফুটেচে, ওরা আর দেশের তৈরি মাটির পুতুল চায় না, বিদেশীয় তৈরি পুতুল চায়। দেশে এই দুর্দ্দশা—খাবার নেই ঘরে, তবু জাপানী খেলনা কিনে। কি বলব তোকে, জাপানী জিনিষে দেশ ছেয়ে গেচে। রাস্তাঘাট দোকানে জাপানী মেয়ের ছবিতে ভরে গেচে—লোকে বলচে সের হিসেবে নাকি জাপানী মেয়েও বিক্রী হবে।

দূর বোকা কোথাকার!

না রে না, বোকা নই। সেদিন আর নেই, দেশে শনির কোপ পড়েচে। কি বলব তোকে, দুঃখে আমার ছাতি ফেটে যায়। এই মজবুত সুন্দর পুতুলগুলি পয়সায় তিনটে করে দিলাম, কেউ তুলেও দেখতে চায় না, নিরুপায়ে পাঁচটা করে ছেড়েচি। মেহনত্ পোষায় না রে। তা'ও যদি ভাল কাটত, তবু নয় খেয়ে পরে থাকা যেত। পুতুল বেচা মানে ভূতের বেগার খাটা—ওতে কোন ফয়দা নেই।

ভয়ে চপলার মুখ শুকাইয়া গেল। কোন কথা বলিল না, নীরবে স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

প্রবীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, এবার পাততাড়ি গুটাতে হয়। ছোট-বড় নয়, সব্বাইর চোখ পড়েচে ওই চকচকে ঠুনকো কাচের পুতুলের উপর। দিশী জিনিষ আর চলবে না।

আমাদের জমিজমাও নেই—কি উপায় হবে তবে?

উপায়—আপাতত কিছু দেখচিনে। সারা রাস্তা ধরে এই ভেবে আসচি। উপায় নেই, জাপানী জিনিষের বন্যায় রাজা, উজির, বান্দা কেউ বাদ যাবে না। আজ এত সস্তাদর দিলাম, তবু চার আনার বেশি বিকি গেল না—কি যে গতি হবে!

সপ্তাহে মাত্র দুটো বাজার—না খেয়ে যে মরতে হবে!

চল, আমরা পালিয়ে যাই।

পালিয়ে! কোথায় যাবে?

ক'লকাতায়। সেখানে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না। নবীনকাকা আছে, ওর তিন সংসারে কেউ নেই। ওর কাছে গেলে খুশিই হবে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে কি করবে?

একটা কিছু উপায় হবেই। ক'লকাতায় স্ত্রী-পুরুষে কাজ করে, তাতে দোষ হয় না, জাতও যায় না। নবীনকাকার কাছে গিয়ে পড়লে সাহেব-টায়েবকে ধরে একটা চাকরি করে দেবেই। সে কথা এখন থাক, পরে ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে। ক্ষুধা পেয়েচে, একটু হাত চালিয়ে রান্নাটা শেষ করে নে।

বাজার করে কিছু এনেচ?

একটা বাইম মাছ এনেচি, গরুর সিং (গ্রাম্য একপ্রকার তরকারী) এনেচি। সুজনের জন্য বার্লি ও এক পয়সার মিশ্রি এনেচি।

চপলা লোভী পশুর মত বাজারের ডালার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল। ডালার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া জিনিষগুলি লইয়া যেন খেলা জুড়িয়া দিল। আনন্দে তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল।

প্রবীর অদম্য আনন্দ অস্ফুটতার মাঝে পূর্ণ করিয়া চপলার সরল সবুজ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাস্তব পৃথিবীটা যেন ক্ষণকালের জন্য মুছিয়া গিয়াছে।

(৩)

মাস দশেক হইয়া গেল প্রবীর ও চপলা কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতায় আসিলেই চাকুরি পাওয়া যায় না—প্রবীরও চাকুরি পায় নাই।

ভবানীপুরের কোন বস্তিতে একটা কুঁড়ে ঘর ভাড়া করিয়া বাস করে। খুব সকালবেলায় প্রবীর ঘুম হইতে উঠিয়া ঝাঁকা কাঁধে বাহির হইয়া যায়—মুটের কাজ করে। চপলাও বসিয়া থাকে না, সুজনকে কোলে লইয়া শাকসব্জী বেচিতে বাহির হয়। স্বামী-স্ত্রীর রোজগারে দুইজনে বেশ দিন চলিয়া যায়। তা ছাড়া নবীনকাকা আছে।

নবীনের মেজাজ ভাল নয়। খামকা যেন চটিয়া ওঠে। মেজাজ বোঝা যায় না, ভাল মানুষ সাজিলেও নিষ্কৃতি নাই।

ভাল করিতে গেলেও চটিয়া যায়, আবার খারাপ করিলেও রক্ষা নাই। মাথার ছিটও যে না আছে তেমন নয়—অদ্ভুত মানুষ।

প্রবীরকে প্রথম দিনই নবীন আপন সন্তানের মত গ্রহণ করিয়াছিল! সে কি আনন্দ! যেন আপন পুত্র বহুকাল পরে স্ত্রী-পুত্র লইয়া পিতার কাছে আসিয়াছে। মানুষ যে এত ভাল হইতে পারে তাহা চপলা ধারণা করিতে পারে নাই। রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ অস্বীকার করিবার কোন উপায় ছিল না। পাঁচ-ছয় মাস পর্য্যন্ত নবীন তাহাদের ভরণপোষণ করিয়াছে—শেষটায় কেন যে তাহাদের তাড়াইয়া দিল তাহা আজও তাহারা বুঝিতে পারে না।

বিপত্নীক ব্রহ্মচারী মানুষ—বয়স চল্লিশের উর্দ্ধে—সর্ব্বদা কাজ লইয়া থাকে। কোন ঝগড়া বিবাদ নাই, মনোমালিন্য নাই, হঠাৎ একদিন অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য বলিল। নবীনের কথার উপর কথা বলা যায় না—তাহারা বাধ্য হইয়া নীরবেই চলিয়া আসিয়াছে।

নবীন শুধু হাতে তাড়াইয়া দেয় নাই। সঙ্গে কিছু টাকাকড়িও দিয়াছিল এবং এখনও সুজনের অছিলায় মাঝে মাঝে সাহায্য করে।

নবীনের অদ্ভুত আচরণের রহস্য এখনও বুঝা যায় নাই। সেই যে নবীন বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে তারপর আর কখনও চপলার সুমুখে আসে নাই। প্রবীরের সঙ্গেও একবার দেখা হইয়াছিল। নবীনের সাহায্য ফিরাইয়া দিলে নবীন ঝগড়া করিতে আসিয়াছিল। ঝগড়ার পর হইতে প্রবীর সুজনের উপহার আর ফিরাইয়া দেয় না।

চপলা ও প্রবীরের সংসার কোন রকমে চলিয়াছে। দুইজনেই রোজগার করিতে বাহির হইয়া যায়—এ যেন একটা নূতন জীবন।

প্রবীর ঝাঁকা কাঁধে বাবুদের পিছনে পিছনে চলে, আর চপলা তরিতরকারি লইয়া বাড়ি বাড়ি যায়। পথে কখনও কখনও দুইজনের দেখা হইয়া যায়। দুইজনেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। সুজন অত বুঝে না, 'বাবা, বাবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। দুদণ্ড দাঁড়াইয়া কথা বলিবার উপায় নাই। অশান্ত ছেলেকে শান্ত করিতে করিতে চপলা একদিকে যায়, অপরদিকে প্রবীর শিকারের সন্ধানে ঘুরিয়া মরে।

চপলা চলিতে চলিতে ফিরিয়া তাকায়। তাহার মনে হয়, কলিকাতায় আসিয়া কোন লাভ হয় নাই। প্রবীরের শরীর শুকাইয়া যাইতেছে, মন জড় হইয়া পড়িতেছে—চঞ্চল প্রাণের গতি যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পেটের জন্য সারাক্ষণ শুধু কাজ—ক্ষুধা নিবৃত্ত করা ভিন্ন যেন দুনিয়াতে আর কিছু নাই।

একদিন প্রবীর সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরিল।

চপলা জিজ্ঞাসা করিল, আজ এত সকাল সকাল ফিরলে যে।

শরীর ভাল নয়।

জ্বর হয় নি ত—দেখি গা! একটু একটু গরম মনে হচ্ছে! নাও আর মাটিতে বস না, হাত পা ধুয়ে বিছায় শুয়ে পড় ত! আমার কথা ত শুনবে না, কাজেই নিষ্কৃতি নেই!

প্রবীর চপলার পিঠে মাথাটা এলাইয়া পা ছড়াইয়া বসিতে বসিতে বলিল, অত মেহনত আর সইচে না। মানুষে মোট বয় না, মোট বয় গাধায়। কিছু টাকা যদি পেতাম।

কি করতে তবে।

মোড়ে যে ঘরটা খালি পড়েচে ভাড়া নিতাম। বেশ হত না রে। একটা ছোট দোকান দিতাম; তুই বসে বসে চাল, চিঁড়া, গুড় সব বেচতিস, আর আমি জগুবাবুর বাজারে একটা তরকারির দোকান দিতাম। তুই হলি ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কি রাস্তায় মানায়। প্রবীর স্ত্রীর চিবুক টিপিয়া ধরিয়া বলিল, ইস্ দু'দিনে কেমন মলিন হয়ে গেচিস।

চপলা স্বামীর কণ্ঠ আগলিয়া বলিল, আর তুমি!

প্রবীরের মনটা দমিয়া গেল।

চপলা বলিল, জাত-ব্যবসাটা এখানে করতে পার না? তুমি হলে জাত-কারিকর, পুতুল বানাবে, প্রতিমা বানাবে—তা না মোট বইচ!

প্রবীর উৎফুল্ল হইয়া বলিল, নবীনকাকা সুজনকে একটা টাকা দিয়েছিল না, ওতে আমি মাটি কিনেচি। নবীনকাকা বললে, আমাদের দেশের চৌধুরী বাড়ি সরস্বতী প্রতিমা এবার আমাকে দিয়ে বানাবে।

সত্যি!

তাই ত বলল। আরও বানাতে বলবে যদি বাজারে কিছু চলে।

আমারও মনে হচ্ছিল একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না! কিছু পুতুল বানিয়ে দাও—আমিও চেষ্টা করে দেখব যদি কিছু বেচতে পারি।

চপলা স্বামীর চুলগুলি টানিয়া দিতে দিতে প্রশ্ন করিল, নবীনকাকার সঙ্গে তোমার কবে দেখা হয়েছে?

প্রবীর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, ও-হো, আমার বলতে মনেই ছিল না। খবর পেলাম নবীনকাকার খুব অসুখ।

কি হয়েচে?

ওর কি অসুখের মাথামুণ্ড আছে। মনের অসুখই বেশি। ভারি খিট-মিটে স্বভাব। বউ মরার পর থেকে অমন স্বভাব হয়েচে। তবে যাই বলিস, লোকটা কিন্তু ভারি ভাল। তোকে একবার দেখতে চেয়েছিল—জ্বর নাকি খুব বেশি। একবার দেখে আয় না।

আজ থাক, কাল একবার যাব।

প্রবীর বলিল, নবীনকাকা না থাকলে কিন্তু আমাদের আর দুর্গতির সীমা থাকত না। যদিও আমাদের তাড়িয়ে দিয়েচে তবু ওর ঋণ শোধ করবার নয়। এখনও ছলে অছিলায় সাহায্য করে যাচ্চে। আমি যখন টাকা ফিরিয়ে দিলাম তখন নবীনকাকার সে কি রাগ—আমায় যেন মারতে আসে।

যাব একবার—একা একা পড়ে আছে, কেউ হয়ত মুখে জল দেবার নেই।

আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। চল একবার দেখে আসি।

নবীন যে শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়া খবর দিয়াছে তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে নাই। অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ—খেয়ালবশত ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে, আবার খেয়াল বশেই চটিয়া উঠিবে—আবার নাও চটিয়া উঠিতে পারে।

প্রবীর স্ত্রীকে রোগীর পাশে বসাইয়া রাখিয়া ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে।

নবীনের জ্ঞান নাই, হয়ত ঘুমাইয়া আছে! চপলা শিয়রে বসিয়া নিঃশব্দে হাওয়া করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে নবীনের যেন একটু জ্ঞান হইল। চপলা কানের পাশে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন?

দুই-তিনবার ডাকাডাকির পর নবীন চপলাকে চিনিতে পারিল। কোন জবাব দিতে পারিল না, আনন্দের অতিশয্যে চপলার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইল।

চপলা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, তাহার মনে হইল ইহা রোগীর সাময়িক দুর্বলতা মাত্র।

আরও কিছুক্ষণ পরে নবীন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—এতদিনে এলে চপলা, আমি যে তোমার জন্য সময় গুণছিলাম।

চপলা অভিমানের সুরে বলিল, আরও আগে কেন খবর দেন নি—আমাদের ওপর নয় রাগ করেচেন, কিন্তু নাতি ত কোন দোষ করেনি।

নবীন মৃদু হাসি হাসিল। হাসিতে যেন প্রকাশ পাইল—'ভরসা পাইনি।'

নবীন ধীরে ধীরে বলিল, বালিসের নীচে একশো' টাকা আছে।

বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকি, কখন কে নিয়ে যাবে, তোমার কাছে রেখে দাও। তোমরা ভিন্ন তিনকুলে আমার কেউ নেই, মরে গেলে টাকাগুলি প্রবীরকে দিও। ও জাত-কারিকর, জাত-ব্যবসা যেন করে।

নবীনের মৃত্যু হইয়াছে। নবীনের টাকাতেই প্রবীর নূতন করিয়া সংসার রচনা করিয়াছে। চপলা রাঙা শাড়ি পরিয়া চাল, ডাল, লঙ্কা, হলুদ কত কি বেচে। প্রবীর পুতুল বানায়, পূজার সময় প্রতিমা গড়ে, আর জগুবাবুর বাজারে তরিতরকারি বেচে। চপলার পরণে লাল শাড়ি দেখিয়া প্রবীর ঠাট্টা করিয়া বলে 'রাঙা বউ।' চপলা দাঁড়ি পাল্লা কাৎ করিয়া দিয়া বলিয়া ওঠে 'ধ্যুৎ!' প্রবীর স্ত্রীর ওই রাঙা মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ কষ্ট ক্লেশ ভুলিয়া যায়।

চপলা কিন্তু আজও বুঝিতে পারে না নবীনের কথা। কেনই বা নবীন তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর কেনই বা ছল করিয়া সর্বদা সাহায্য করিত? দয়ামায়াশূন্য লোকটি কেনই বা বুকের উপর হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল? ইহাও কি রোগীর নিছক দুর্বলতা। তাহার পরশে এত শান্তিই বা সে পাইল কি করিয়া।

চপলা কিছুই বুঝিতে পারে না।

দেবদাসী

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নাচে দেবদাসী দেব-অঙ্গনে
অদূরে দেবতা ধোঁয়ায় ঢাকা।
পুণ্যলোভীরা করে আছে ভিড়
জনতারে ঠেলি যায় না রাখা।
আলোকের মালা দোলে সারি সারি
বাজিছে বাঁশরী মোহন সুরে।
নাচে দেবদাসী চরণ নূপুরে
তরলিত মোহ অঝোর ঝুরে।
কণ্ঠে তাহার দোলে বনমালা
বনফুল তার খোঁপায় গোঁজা।
ঘিরি নিতম্ব কুসুম-মেখলা,
—দেবী কি মানবী যায় না বোঝা।
সরমের মত নরম তনুতে
অগুরু গন্ধ গুমরি কাঁদে।
মুগ্ধ জনতা পড়িয়াছে বাঁধা
ও-দুটি কোমল চরণফাঁদে।
উড়ে-পড়া চুল পড়েছে কপোলে,
আহা মরি মরি লাগিছে ভালো।
ছিন্ন মেঘের মোহন মাধুরী—
ঢাকিয়াছে আধা-চাঁদের আলো।
শ্যাম-সুন্দর মন্দির মাঝে,
আভরণে ঢাকা পাষাণ-তনু।
উত্তরীখানি কণ্ঠ বেড়িয়া
উঠিয়াছে যেন ইন্দ্র-ধনু।
দেবদাসী তারে সঁপিয়াছে প্রাণ
অধিকারী শুধু দেবতা তার।
তনু-মন-ধন, রূপ-যৌবন,
পারে না বহিতে ও-দেহ ভার।
পেয়ে দেবত্ব হায় রে দেবতা
অবিচার কর নারীর প্রতি।
মানবের লাগি মানবীর প্রাণ,
কঠিন বাঁধনে রুধিলে গতি।
নাচিবে গাহিবে দুয়ারে তোমার
বিনিময়ে তার লভিবে কি-বা।
জ্যোছনা মত্ত মধুর-যামিনী
তাহার নয়নে ঠেকিছে দিবা।
দেবদাসী নাচে বরষ বরষ
বাদলের ধারা নামিছে চোখে।
ভক্তেরা ভাবে ভক্তির ধারা
তাই চলিয়াছে বিশ্বলোকে।
বাতাসে উড়িছে শাড়ীর আঁচল
ভক্তের মন উড়িছে সাথে।
রুণু রুণু রুণু নাচে দেবদাসী,
জ্যোছনা উজল মাধবীরাতে।
গুরু হিয়াভার কাঁচুলীতে ঢাকা,
ছোট যেন দুটি হিমানী-গিরি।
চোখে চোখে তার বিদ্যুৎ নাচে,—
জাগে যৌবন তাহারে ঘিরি।
নাচে দেবদাসী আবেশ বিভোর,
কাঁপে রাঙা তনু নৃত্য-ছাঁদে।
থেমে যায় ধীরে,—পাষাণ দেবতা!
তোমার লাগিয়া দেবতা কাঁদে!

ঘাতে প্রতিঘাতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

২০

বৈবাহিককে জয় করিয়াছেন—গৃহিণীকেও পারিবেন। বিরু—সে ত একটা কাদা মাটির পুতুল—চাপিয়া টিপিয়া যে দিকে যে ভাবে খুশী তাকে নোয়াইয়া বাঁকাইয়া নেওয়া সম্ভব। নহিলে এমন এ কাঁচা একটা কেলেঙ্কারী মরদ ছেলে কেউ করে? করিয়া আবার এমনভাবে হাত পা ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়ে, যেন একদম কচি খোকাটি! না, তাকে লইয়া কোনও ভাবনা এক্ষেত্রে আপাততঃ নাই, ভাবনা যাহা সে পরের কথা। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি, তাঁহার বুদ্ধিবলে, অবিচলিত অধ্যবসায়ে, গড়িয়া তোলা এই ব্যবসায়—সেই একদিন উত্তরাধিকার করিবে, আর তখন—না, কিছুই সে রাখিতে পারিবে না, সব ছানবিছান হইয়া যাইবে। অতি চতুর—অতি ধড়িবাজ, সুকেশের হাতের একটি পুতুলমাত্র সে হইয়া পড়িবে, ফাঁকি দিয়া সব সে লুঠিয়া খাইবে। আজ তিনি আছেন—ভয় খাতির করিয়া চলে, কিন্তু ওটাকে ভয় খাতির করিবে কিসে? বৌমাটিও একেবারে 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'! ভাল—তা কেবল অত ভালই কি ভাল? মিঠা—সে যত মিঠাই হউক, ঝা'ল অম্বলের মিশালী কিছু না থাকিলে শেষে তিতা হইয়া ওঠে, তার খাতির কদর করিয়া কেউ চলে না।—তবে ঐ যে মেয়েটা—হাঁ, একটা মরদের মেয়ে বটে। বীরু যে বল্‌দামো ধাতুর ছেলে, তার হাতে পড়িলে সেই পারিত; রাশ টানিয়া তাকে ঠিক পথে চালাইতে, তাঁহার নামে সব যাহাতে বজায় থাকে তাহাকে দিয়া তাহা করাইত। তবে—যাক্, যাহা হইবার নয় তাহার জল্পনা কল্পনা বৃথা। এখন যে পথ ধরিয়াছেন, সেই পথেই চলিতে হইবে, চলিয়া এই সঙ্কটের একটা কিনারা করিতে হইবে।

গৃহে পৌছিয়া হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগের পর তিনি গিয়া তাঁহার বিরাম কক্ষে বসিলেন; যেখানে বসিয়া সন্ধ্যার পর কখনও কিছু পড়াশুনা করেন, কখনও বা জরুরী দলিল-পত্রও দেখেন। ভৃত্য তামাক দিয়া তাঁহার দলিলের ব্যাগটি, আর খান দুই পুস্তক রাখিয়া গেল। গৃহিণী কাছে আসিয়া একটিবার দাঁড়াইলেন না—পরিচর্য্যাদি যাহা প্রয়োজন তাঁহার খাস পরিচারক কানাই-ই করিল। যাহা হউক, এই দুর্নিমিত্তে ভয় পাইলে ত চলিবে না! এই ঘনঘটা যে দুর্য্যোগের সূচনা করিতেছে, তাহার সম্মুখীন হইতেই হইবে, প্রস্তুতও হইয়া আসিয়াছেন। মনে মনে একটু হাসিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে কানাই, গিন্নীকে ডেকে দে ত।"

কমলিনী আসিলেন, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মুখখানি আড়াল করিয়া ভার হইয়া একধারে বসিলেন।

"শোন!"

"বল।"

"সব শুনেছ বোধ হ'চ্ছে?"

"হাঁ।"

গড়গড়ার নলে জোর গোটা দুই টান দিয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "তা হ'লে আমার কথাগুলোও শোন।"

"বল।"

স্বর কম্পিত, বুঝিলেন, গৃহিণী অশ্রুপাত করিতেছেন। ভাল কথা। ধীর বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, ঘোর ঝটিকার আশঙ্কা তবে নাই!—ধীরে ধীরে সব কথা তাঁহাকে বলিলেন।

বেদনা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কমলিনী বলিয়া উঠিলেন, "তখন—তখন কেন আমায় সব বল নি?"

"বল্লে—কি কর্‌তে?"

"এই বিয়ে আমি দিতে দিতাম না।"

"তার পর?"

"ওই বউই ঘরে আন্‌তাম।"

"বউ ঠিক হ'লে আমিও আন্‌তাম। আর একটা বিয়ে দিতাম না—"

"ঠিকই বা একেবারে নয় কিসে? বিয়ে ত করেছিল।"

"করেছিল খোস খেয়ালে একটা খেলা, বিয়ে নয়।"

"খেলা—কেন, বিয়েটা কেন ঠিক বিয়ে হয় না? বড় বড় কত বামুন পণ্ডিত এই ক'ল্‌কেতায় আছেন, তাঁদের কারও

কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলে? তাঁরা কি বলেন সেটা জেনেছিলে?”

“না, তা—কিছু তখন করিনি—” একটু যেন থতমত খাইয়া গেলেন।

“তবে? নিজেই অমনি রাগের মুখে ঠিক ক’রে ফেল্লে, বিয়েটা অসিদ্ধ? হাঁ, রাগ তোমার হ’তে পারে, খুব তখন হয়েছিল বুঝি।—কিন্তু তাই বলে হিতাহিত ন্যায় অন্যায়টাও ত একটু ভাব্‌তে হয়?—ভদ্রলোকের একটা মেয়ে—জীবনের মত তার ভাগ্যটা নিয়ে যে সমিস্তে—মাথা ঠাণ্ডা ক’রে তার একটা বিচার আলোচনাও করলে না কারও সঙ্গে? নিজের রাগের ঘোরে নিজেই একটা রায় দিয়ে ফেল্লে বিয়েটা অসিদ্ধ!—সাত তাড়াতাড়ি অমনি ছেলের আর একটা বিয়ে দিয়ে তাকে বিলেত পাঠিয়ে দিলে—আর সে মেয়েটা জন্মের মত ভেসে গেল! আর ভেসেই যাতে যায়, তারই বা তোড়জোড় কত!—ছি ছি ছি! এই ঘরে জন্মেছ, এত বড় নামকরা একটা মানুষ হয়েছ, আর মানুষের আত্মা এতটুকু নেই? আর ঐ হতভাগা—বলব কি, এই রক্তেই ত জন্মেছে, মানুষের আত্মা তারই কোত্থেকে আস্‌বে! এমন পাষণ্ড ছেলে পেটে ধরেছিলাম, ঘেন্নায় লজ্জায় ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরি।”

ধূমপান করিতেছিলেন, নীরব মুখে ধীরে ধীরে হরমোহনবাবু ধূমপানই করিতে লাগিলেন। মনে মনে একটু লজ্জা—আবার বেশ একটু পরিতাপও—তখন বোধ করিতেছিলেন। সস্নেহ একটা করুণার চক্ষেই লতাকে তিনি দেখিতেন। তার বুদ্ধির ও তেজস্বিতা এত সপ্রতিভ যে এমন কঠিন বিপদের সম্মুখেও আশ্চর্য্য ধীরতার পরিচয় আজ পাইয়াছেন, তাহাতে বেশ একটা শ্রদ্ধাও তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। আহা, এই মেয়েটি যদি তাঁহার ঘরে আসিত! প্রায় ত আসিয়াছিলই, কিন্তু তিনিই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া কঠোর হস্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। সত্যই অতি বড় একটা অন্যায় অবিচারও তিনি করিয়াছেন।—হাঁ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত কাহারও কাহারও উপদেশ তখন লইলেও পারিতেন। কিন্তু ক্রোধ আর জিদের বশে কথাটা মনেও তখন হয় নাই। বিবাহের ধর্ম্মীয় বৈধতা সম্বন্ধে দারুণ যে একটা খুঁৎখুঁতি সত্যই তাঁহার মনে তখন উঠিয়াছিল, সেটা হয়ত ইঁহাদের উপদেশে ও অনুমোদনে দূর হইত।—আর আইন? তা তিনি যদি বধূ বলিয়া ঘরে আনিতেন, সে প্রশ্নই বা কে তুলিত?—আর এ বিবাহ যে বৈধ নয়, এইরূপ একটা ধারণা বা জিদের খেয়াল লইয়াই আইনের প্রমাণ তিনি খুঁজিয়াছেন। ঝোঁক যেদিকে গিয়াছিল, প্রমাণের সমর্থনও সেই দিকের পক্ষে পাইয়াছেন, অথবা ওকালতি-বুদ্ধিতে সমর্থন টানিয়া বাহির করিয়াছেন। তবে একথাও সত্য, লড়িলে প্রমাণের জোর এই দিকেই বেশী হইবে, আর দরকার হইলে লড়িবেন এই পণও তখন তাঁহার ছিল। কিন্তু আজ—এখন—গৃহিণী যে সব কথা বলিলেন, তার পর—না, না, ওসব চিন্তা কিছু আর মনেও স্থান দিতে পারেন না—যে পথ ধরিয়াছেন, শক্ত হইয়াই সেই পথে দাঁড়াইতে হইবে। পাকা উকিল যেমন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করিয়া থাকে, সেই ভাবেই তিনি কমলিনীর কথার একটা উত্তর মনে মনে গুছাইয়া লইলেন।

বুকভরা বেদনার উচ্ছ্বাস কোনও মতে একটু দমন করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে কমলিনী আবার বলিয়া উঠিলেন, “হতভাগা যদি তখন এসে আমাকেও একটিবার বল্‌ত, আমি দেখ্‌তাম, ভাল জন দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ডাকিয়ে, তাদের সব জানাতাম—কি তাঁরা বলেন শুনতাম। সুরাহার একটা ব্যবস্থা তাঁদের কাছে পেতামই।”

হরমোহনবাবু তখন কহিলেন, “না, তা পেতে না। অশাস্ত্রীয় কোনও ব্যবস্থা তাঁরা দিতে পারেন না। তাঁদের কাউকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা অবিশ্যি আমি করি নি—কথাটা সত্যি মনেও তখন হয় নি, আর প্রয়োজনও এমন ছিল না। আইন-কানুন ত এর একটা আছে, সব দেখেছিলাম। আর এই আইন যেটা হয়েছে, আগেকার অতি বড় বড় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবস্থামতই হয়েছে। তাতে এ বিয়ে সিদ্ধ হয় না।—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আজ নূতন কোনও ব্যবস্থা দিতে পারত না, যাতে এই বিয়ে সিদ্ধ বিয়ে হ’তে পারে। বিশ্বাস না হয়, নাম-টাম কিছু না ক’রে যাকে ইচ্ছে হয় ডেকে জিজ্ঞেসা কর্‌তে পার। সিদ্ধ হয়েছে ব’লে ব্যবস্থা একটা কিছুতেই তাঁরা দিতে পারবেন না।”

শাস্ত্রবিধি কি, আর দেশাচার কুলাচার স্ত্রী-আচার প্রভৃতি লইয়া সেই বিধিতে হিন্দুবিবাহ কিসে সিদ্ধ হয়, কিসে হয় না, সব তখন হরমোহনবাবু বুঝাইয়া বলিলেন।

একটু ভাবিয়া কমলিনী কহিলেন, "তা তুমি যদি তখন বউ ব'লে ঘরে আনতে কে এসব ছল তুল্‌ত ?"

হরমোহনবাবু উত্তর করিলেন, "নিজেরই মন যা তুলেছিল, তা যে কোনও ছলে দূর করতে পারলাম না কমল! কি ক'রে পারব? বউ ব'লে ওকে আমার এই ঘরে আন্‌ব, ওর গর্ভের ঐ ছেলেকে ধর্ম্মতঃ আমার বংশধর ব'লে স্বীকার ক'রে নেব, আমার আর আমার পিতৃপুরুষদের জল-পিণ্ডের অধিকারী করব—সত্যি ক'রে যখন দেখ্‌লাম বিয়ে শাস্ত্রমতে কি আচারমতে সিদ্ধ বিয়ে হয় নি—কি ক'রে তা করব ?"

একটু কি ভাবিয়া কমলিনী কহিলেন, "ভাল, সত্যিই যদি তাই বুঝেছিলে, সত্যিই এই খুঁৎখুঁতি যদি তোমার মনে উঠেছিল, কেন, শাস্ত্রমত আচার নিয়মে আবার বিয়ে দিয়েও ত আন্‌তে পার্‌তে? আমি যদি জান্‌তাম, পরামর্শ যদি আমার চাইতে, তাই আমি বল্‌তাম।"

"ওই ছেলে তখন ছয়-সাত মাসের পেটে, লোকে দেখে কি বল্‌ত? মাস তিনেক পরে যখন ঐ ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'ত, কি কৈফিয়ৎ লোককে দিতে? আর সেই ছেলে—ছেলেই ত পেটে এসেছিল সেই সিদ্ধ বিয়ের আগে!"

স্তব্ধ হইয়া কমলিনী বসিয়া রহিলেন। কম্পিতকণ্ঠে শেষে কহিলেন, "কিন্তু ঐ মেয়েটা—কি অপরাধ সে করেছিল—একেবারে যে ভেসে গেল। আর ঐ ছেলে—আমার বিরুরই ছেলে—সেই বা কি অপরাধে—"

বলিতে বলিতে অতি তীব্র একটা রোদনের উচ্ছ্বাসে কমলিনীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

হরমোহনবাবুও গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "অপরাধ—তা অন্যের অপরাধে নিরপরাধকেও অনেক এমন দুঃখ এ পৃথিবীতে পেতে হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল! তাতে ক'রেই হতভাগা ঐ বাপের ঘরে এসে জন্মেছিল, আর এই কুলাঙ্গারের সঙ্গে কুক্ষণে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল।"

কমলিনী বলিয়া উঠিলেন, "সেই কুলাঙ্গার তোমার কুলেই রয়েছে, কুলেই তাকে রেখেছ, রাখ্‌বেও। তাকে দিয়ে যে কালী তোমার কুলে পড়েছে, তার চাইতে বেশী কালী পড়বে, ঐ মেয়েটাকে আর তার ছেলেটাকে আজ ঘরে আন্‌লে—বিনা অপরাধে সেই নাকি এম্‌নি ক'রে ঠকিয়ে যাদের আজ এই অকূলে ভাসিয়েছে? —তাকে যদি রাখতে পেরেছ এই কুলে, ওদের আন্‌তে পারবে না?"

হরমোহনবাবু উত্তর করিলেন, "এই কুলে এসে সে জন্মেছে—যত বড় অপরাধীই হউক, আর যত কালীই কুলে তাতে সে আনুক, কুলে তার যে স্থান তা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারি, সে অধিকার আমার নেই। কুলের বাস্তু ভদ্রাসন, কুলের বিষয়-সম্পত্তি মান-মর্য্যাদা আমার অর্জ্জিত নয়। পিতার থেকে জন্মের যে অধিকারে আমি পেয়েছি, আমার থেকে সেই অধিকারেই সে পাবে।"

"আর ওরা—ওরা—ওদের কোনও অধিকার নাই?"

"না, যদি এই বিয়েটা ধর্ম্মত আর আইনত সিদ্ধ তাই না প্রমাণ ক'রতে কেউ পারে।"

"তুমি মেনে নিলেই আর প্রমাণ কিছু লাগে না।"

"মনটাকে বুঝিয়ে মেনে নিতে আমি পারছি নি।"

"ওগো, দোহাই তোমার, পার না পার তবু নেও। ভদ্রঘরের নিরপরাধ একটা মেয়ের এত বড় সর্ব্বনাশ ক'রো না—ধর্ম্মে সইবে না, আর ঐ খোকাটি—আহা, যেন সোনার চাঁদ—কোলে করতাম, বুকে চেপে ধরতাম, আমার বুক জুড়িয়ে যেত—ঠাকুমা ঠাকুমা ডাকত, কানে আমার মধু ঝরত—খুকুটিকে বুকে ধ'রে যে আনন্দ পেয়েছি, ঠিক তেমনি আনন্দ ওকে বুকে ধ'রে পেয়েছি। পাবই ত, ও যে সত্যিই আমার রক্ত-মাংস, আমার বিরুর দুলাল! —ওগো, ও যে তোমারও রক্তমাংস, তোমারও বংশের দুলাল! বিরু ত বিয়েই ওর মাকে করেছিল, যখন করেছিল ধর্ম্মত সত্যিকার বিয়ে হ'ল বুঝেই করেছিল। আজ তোমাদের শাস্তরের প্যাঁচ, আইনের প্যাঁচ, যাই তোমরা তোল, এ সত্যি তাতে মুছে যেতে পারে না। আর বিরু—সত্যি বল্‌ছি, তোমার শাসনে যাই ক'রে থাক্‌, সেও মনে মনে বুঝছে না, সত্যিকার বিয়ে এটা নয়। —কেন তবে ওদের ভাসিয়ে দেবে, এত বড় একটা মহাপাপের ভাগী ওকে করবে—যাতে—যাতে ক'রে সত্যিই সে কুলে কুলাঙ্গার হবে, কুলে কালী আনবে। নইলে—নইলে যাই গালমন্দ দিই, সত্যি তা হ'ত না।"

"কি করতে বল তুমি?"

"ওদের ঘরে আন।"

"কিন্তু একটা কথা ভাব্‌ছ না? ঐ বৌমাটি রয়েছে—"

"না হয় সতীনের ঘরই করবে। তাও ত লোকে করে।"

"সে দিনকাল আর নেই। আজকালকার কোনও মেয়ে—আজকালকার কোনও সংসারে—"

"বড় লক্ষ্মী মেয়ে—সে তা পারবে।—যখন বুঝ্‌বে কত বড় একটা অবিচার ওদের ওপর করা হচ্ছে, সব দুঃখু স'য়ে সতীনের ঘর সে করবে, আজকালকার এই সংসারেই। আর সেই দুঃখু—না, দুঃখুই কিছু পেতে হবে না—সেও ত তেম্‌নি লক্ষ্মী মেয়ে—কত ভাল দুজনে দুজনকে বাস্‌ত। সতীন্ হ'য়ে যদি দুটি মেয়ে মিলে মিশে এক সংসারে সুখে থাক্‌তে পারে, ওরাই দুটিতে পার্‌বে। দুঃখু? নাঃ দুঃখু তাতে পাবে না। পাবে, সত্যি বিনা অপরাধে ওদের এভাবে ভাসিয়ে যদি দেও।"

"হ'তে পারে। কিন্তু তাও যে পার্‌ছি নি। ললিত এসেছিল—সে ব'লে গেল, যদি ওকে ঘরে আনি, এমন কি আলাদা থাক্‌লেও বিরু যদি ওর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখে, আদালতে সে মামলা করবে—প্রমাণ দেখিয়ে এই বিয়ে অসিদ্ধ ব'লে আদালতের একটা রায় বের করবে।"

"আমরাও মামলা করব, যত টাকা লাগে খরচ করব, বড় বড় উকিল কৌঁসিলি দেব—"

"কিন্তু এটা ঠিক জেনো, প্রমাণ করাতে পারবে না, এই বিয়েটা সিদ্ধ বিয়ে। কেলেঙ্কারীটা এখন ঘরে চাপা রয়েছে, বাইরে ছড়িয়ে পড়বে, একটা ঢি ঢি প'ড়ে যাবে। —আর প্রমাণ যদি না হয় বিয়েটা সিদ্ধ, তবে ঐ মেয়েটা আর তার ছেলেটা—মুখ তাদের কোথায় থাকবে? আর এই রকম একটা মামলা আর তা থেকে এই রকম একটা রায় বেরোবার সম্ভাবনা আছে, এটা জান্‌লে তারাই দূরে স'রে থাক্‌বে; বউ-এর দাবীতে তোমার ঘরে এসে বস্‌তে রাজিই হবে না।"

একটু কি ভাবিয়া কমলিনী কহিলেন, "ললিতবাবুকে ব'লে ক'য়ে রাজি করান যাবে না, তার মেয়ে যদি আপত্তি না করে?"

হরমোহনবাবু উত্তর করিলেন, "ভরসা ত আমি করি না। মেয়ের ঘরে একটা সতীন আস্‌বে, তার ছেলেরা ওর নাতিদের সমান ভাগীদার হ'য়ে শেষে দাঁড়াবে, কোনও বাপ এতে রাজি হয়?—মেয়ে রাজি আছে, সেটা গ্রাহ্যিই করবে না। বলবে ভুলিয়ে ভালিয়ে কি বাধ্য ক'রে ওকে আমরা রাজি করিয়েছি। কড়া দুটো ধমক দিয়ে তাকে চুপ করাবে।—আর কোন্ মুখে গিয়ে আজ তাকে একথা বলি? আজ যে এসেছিল, কেবল ধ'রে মার্‌তে আমাকে বাকী রেখেছে! তবে ইচ্ছে হয় ব'লে ক'য়ে তুমি নিজে দেখ্‌তে পার। তাই বা কাকে কি বলবে? বেয়ান হয় ত রাতটা পোয়াতেই খাঁড়া হাতে ক'রে এসে উপস্থিত হবেন—"

ঠিক কথা! কিছু বলা কওয়া—অত সহজ হইবে না।—নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অশ্রু মুছিয়া কমলিনী শেষে কহিলেন, "তাহ'লে এর একটা সুরাহা কিছু হ'তেই পারে না?"

হরমোহনবাবু উত্তর করিলেন, "সুরাহা এ অবস্থায় যতটা যা হ'তে পারে, তার একটা ব্যবস্থা আমি করেছি।"

"কি, কি করেছ?"

"ঘরে তাদের আন্‌তে পারছি না—সে মর্য্যাদায় তাদের বঞ্চিত থাক্‌তেই হবে। তবে সুখে স্বচ্ছন্দে যাতে থাক্‌তে পারে, ছেলেটা লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, তারপর রোজগারপত্র তেমন কিছু না করতে পারলেও দুঃখু না পায়, তাই পঞ্চাশ হাজার টাকা আজই একটা ব্যাঙ্কের জামিনে তাদের নামে আমানত ক'রে রেখেছি।"

"আর তোমার বিষয় সম্পত্তির ভাগ কিছু?"

"তাতে হাত দিতে পারি না—আর বিরুরও ত পাঁচটি ছেলে পরে হ'তে পারে। কি হিসেবে কি ভাগ তাদের আজই লিখে প'ড়ে দেব? আর তা দেবই বা ছাই কি ব'লে? মিছে একটা অনর্থ আর কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হবে পরে। নগদ টাকা—আমারই টাকা—যারে যা খুশী দিতে পারি, কোনও কথা নেই তাতে।"

"প—ঞ্চাশ—হা—জার—" কি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে কমলিনী এই কথাটা উচ্চারণ করিলেন।—

হরমোহনবাবু কহিলেন, "কত আর দিতে পারি? কতই আমার আছে? বিরুর যদি, ঈশ্বরেচ্ছায়, সুসন্তান পাঁচটি হয়—তাদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের কথাটাও ত ভাব্‌তে হয়—"

আবার চক্ষু মুছিয়া কমলিনী কহিলেন, "ভাল, যাক তবে এই বন্দোবস্ত আপাতত। তবে—তবে—"

"কি?"

"একটা বাড়ী—আমার দরুণ যে বাড়ীটা করেছ কালীঘাটে—সেইটে তাদের দিয়ে দেও।"

"দেব।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিয়া কমলিনী কহিলেন, "তুমি তাকে ঘরে আন্‌তে পারবে না, বিরু তার সঙ্গে সম্বন্ধ কিছু রাখ্‌তে পারবে না—নেই যদি পার না পারবে।—কিন্তু আমি—না, আমি তাদের ত্যাগ করতে পারব না।"

"কি করবে তবে ?"

"ঐ বাড়ী তাদের লিখে দেবে। যখন আমার ইচ্ছে হয়, তাদের সঙ্গে গিয়ে সেথায় থাক্‌ব।—ঠিক আপনার বৌটি, আপনারই নাতিটির মত তাদের দেখব। টাকাকড়ি যতই দেও, মেয়েমানুষের যে মর্য্যাদা সে হারাল, মাথা যে তার হেঁট হ'ল, টাকায় তা কতটুকু শোধরাতে পারে? এই গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মরণও ঢুশোবার ভাল।—কি দাবীতে এই টাকা সে পাচ্ছে? কি পরিচয় সে লোককে দেবে? আমি গিয়ে যদি ঠিক তার শাশুড়ী হ'য়েই মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকি, তবু একটু সান্ত্বনা সে পাবে; লোকেও দেখ্‌বে, বুঝবে, সোয়ামী ত্যাগ ক'রে গিয়ে আর একটা বিয়ে ক'রেছে, শাশুড়ী ত্যাগ করে নি; যখন পারে, ওকে নিয়ে এসে থাকে। ছেলেটি, যখন বড় হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন বুঝ্‌বে, মাকে দিয়ে তার মুখ ছোট হবার কিছু হয় নি। তার দুঃখে সে দুঃখ পাবে, দরদে তাকে জড়িয়ে ধ'রে থাক্‌বে—কোনও অপরাধ গ'ণে বিরাগে মুখ ফেরাবে না। আমিও দেখাব, আমি তার সত্যিকার পিতেমই বটি। আমিই তাকে বলব, এই বংশেরই ছেলে সে, এই বংশেরই নামে সে পরিচয় দেবে। এখন—এখন—মা কালী করুন, যেন এই কটা বছর আমি বেঁচে থাকি।"

"কিন্তু ললিত—"

"তার কেনা বাঁদী আমি নই। বাপে বেটায় তোমরা যা করেছ, নাকে খত দিয়ে যা খুশী দাসখত গিয়ে তাকে লিখে দেও। আমি কোনও দাসখত তাকে লিখে দেব না।" বলিয়াই কমলিনী উঠিয়া গেলেন।

(২১)

"হুঁ—! দেখা যাক্‌!"

মনে মনে এই বলিয়া লম্বা একটা হাই তুলিয়া হরমোহনবাবু তাকিয়ায় গা ঢালিয়া পা দুটি ছড়াইয়া দিলেন। কানাই আর এক কলিকা তামাকু দিয়া গেল।—কমলিনী আবার ফিরিয়া আসিলেন,

"কি ?"

"কোথায় সে গেল—খোঁজ খবর করবে না ?"

"সে ত করতেই হবে।—কাঁচা বয়েসের একটা মেয়ে—এই কল্‌কেতার শহর—চেনে শোনে না কিছু—একা সেই নিশুতি রেতে গিয়ে পথে বেরোল—খোঁজ খবর না ক'রে পারি? আমার আশ্রিত ছিল—আর বল্‌তে কি, তার মান ইজ্জৎ ভালমন্দের একটা দায়িত্ব যে আমার আছে, সেটাও অস্বীকার করতে পারি না।—আবার এই যে বন্দোবস্ত সব করব, তাকে না পেলে কার সঙ্গে ক'রব? তা—লোক আমি লাগিয়েছি—থানায় থানায় খবর দিলে খোঁজ একটা পাওয়া যাবে বই কি ?"

"আর তার মা—"

"তাঁকেও একটা চিঠিতে সব জানিয়ে লোক পাঠাচ্ছি।"

"একেবারে তাঁকে নিয়ে আসতেই ব'লে দেও না? ঐ বাড়ীতেই থাক্‌বেন, আমি গিয়ে দেখ্‌ব শুন্‌ব—বরং চিঠি একটা সঙ্গে আমিও লিখে দিচ্ছি—"

একটু হাসিয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "সেও ত তোমার কেনা বাঁদী নয় যে, হুকুম ক'রে পাঠালে আর অম্‌নি ছুটে এল! এই একটা গোলমাল ত রয়েছে। মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হোক, অবস্থাটা সব ভাল ক'রে বুঝে মায়ে-ঝিয়ে পরামর্শ ক'রে একটা বুদ্ধি স্থির ক'রে নিক্‌, তারপর না তুমি তাদের এনে তোমার ঐ বাড়ীতে নিয়ে রাখ্‌তে পার, যদি রাজি তারা এতে হয়। কি তারা করবে, কার কাছে কি বুদ্ধি নেবে, কিছুই ত জানা যাচ্ছে না এখন। তাদের সব কথাবার্ত্তার যা জান্‌তে পেরেছি, তাতে বেশ বুঝ্‌তে পারছি, মেয়ের কথা মতই মা চলে। মেয়ের সঙ্গে দেখা যদ্দিন না হয়, একার বুদ্ধিতে সে কিছুই করবে না।"

"বেশ, তাহ'লে খোঁজ ত কর। দেখি—"

বলিয়া কমলিনী বাহির হ'য়ে গেলেন।

হুঁ!—গৃহিণীর ত এই ভঙ্গী! এখন বিরিঞ্চি কি ভাবিতেছে? যত নরম ধাতুরই হউক, মাতার সঙ্গে দেখা হইলে তাহার এই মনের আগুনটা তার মনটাকেও বেশ গরম করিয়াই তুলিতে পারে বটে। আর বড় একটা আঘাত—লজ্জাও বড় একটা পাইয়াছে। একদিকে ঐ

মেয়েটা আর তার ছেলেটা, আর একদিকে ঘরে এই বৌটি আর কোলের ঐ মেয়েটি—দোটানায় পড়িয়াও হাকুপাকু করিতেছে। ভালবাসিয়াই তাকে বিবাহ করিয়াছিল,—আবার বিবাহ করিয়া এই বউটিকেও বেশ ভালবাসে, মনের মিলে বেশ খুশীই ত দুজনে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। দুটিকে লইয়াই যদি সংসার করিতে পারিত, রফা একটা শেষ হইয়া যাইত। দুই বউ লইয়া সংসার এখনও কেউ কেউ ক'রে বটে। কিন্তু ও তা পারিতেছে না—একটিকে একদম ত্যাগ করিয়া কেবল নয়, বিনা দোষে সামাজিক একটা কলঙ্কের পাঁকেই ফেলিয়া, আর একটি লইয়া সুখে সংসার করিবে—সেটাও যেমন তেমন একটা কথা নয়। বরদাস্তই হয়ত করিতে পারিবে না, পরিতাপে আর বেদনায় মনের টানটা তার দিকেই গিয়া পড়িবে বেশী—আবার মায়ের সব কথা শুনিবে, এই টানে বড় একটা জোর গিয়া পড়িবে। সে-ই বা কি ভঙ্গী তখন ধরে, তাই বা কে জানে? তবে ফলাফল কি হইতে পারে, আগুতেই সেটা বেশ একটু সমঝাইয়া দিতে পারিলে ভয় পাইবে, বিবেচনাও একটা আসিবে। একটা রক্ষাকবচের মতই সেটা হইয়া দাঁড়াইবে, মাতার এই মনোভাবের প্রভাবটা তেমন জোরে গিয়া তার মনটায় পড়িতে পারিবে না। আবার এদিকে এই বউটি কাছেই রহিয়াছে তার টানটাও টানিবে, তার দুঃখটাও মনটাকে নরম করিয়া রাখিবে। ইহাও একটা রক্ষাকবচের মত হইবে। ধূমপান করিতে করিতে এই সব কথাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। নাঃ! যত সহজে কেল্লা ফতে করিয়া ফেলিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইবার নয়। অনেক বেগ তাঁহাকে পাইতে হইবে, কৌশল-জাল আরও জটিল করিয়া বিস্তার করিতে হইবে। কিন্তু ঐ একটা অভাগা মেয়ে—তা—যতদুর তিনি যাহা করিতে পারেন সবই করিতেছেন। ইহার উপর আর করুণা—এই করুণা—না, করিতে তিনি পারেন না। বংশধর হইয়া এত বড় সম্ভ্রান্ত এই বংশে এই গ্লানি কি করিয়া তিনি আনিবেন? মনের এই কুণ্ঠা—কোনও যুক্তির ছলেই ত দূর করিতে পারিতেছেন না। তারপর পাঁচ কান হইয়া গিয়াছে, চাপাও কিছু থাকিবে না। ওই বউটি—আজ যদি ভাবের উচ্ছ্বাসে সপত্নী বলিয়া তাকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হয়ও, চিরকাল প্রীতির চক্ষে তাহাকে দেখিবে না। মনান্তর কথান্তর কিছু হইলেই খোঁটা দিবে, বড় হইয়া উঠিলে তার পেটের ছেলেরাও ওর ছেলেটাকে খোঁটা দিবে, বিরাগ দেখাইবে—আর সেই হইবে ঘরের বড় ছেলে। অত দূরই বা যাইতে হইবে কেন? বাড়ীতে এই লোকজন সব রহিয়াছে—আজ বামনী ছিল, পালাইয়া গেল, কাল আবার একটি বউ থাকিতে আর একটি বউ হইয়া ঘরে আসিল। পাঁচ জায়গায় গিয়া কত কথাই ইহারা রটনা করিবে। তারপর ঐ ললিত—কি বলিয়া তাকে তিনি আর এখন চাপিয়া রাখিতে পারেন? কিছু বলিতে গেলেই চটিয়া আরও মরিয়া হইয়া আদালতে গিয়া লড়িতে চাহিবে,—তাঁহারও বড় একটা নিন্দা লোকসমাজে হইবে।—না না, সে আর হয় না। তবে গৃহিণী—তা যাই তিনি করিবেন ভাবুন, যোগাযোগ একটা ঘটিবে—সে বহু দূর।—যত দূর সম্ভব দূরেই রাখিতে হইবে। ইতিমধ্যে কোথাকার জল কোথায় গিয়া কি ভাবে গড়াইবে কেহই বলিতে পারে না। এখন ঐ বিরিঞ্চি, হাঁ, তাকে এই রক্ষাকবচে ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে, মাতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা একটা কিছু হইবার আগেই।

সোজা উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, "ওরে কানাই!"

"এজ্ঞে কর্ত্তাবাবু!"

"বিরু কোথায় রে?"

"এজ্ঞে শুয়ে আছেন।"

"কোথায়?"

"এজ্ঞে, ঐ তানার লাইবেরী ঘরে। সারাটি দিনই দাদাবাবু শুয়ে প'ড়ে রয়েছেন—কত সাধ্যিসাধনা ক'রে দুপুরে দুটি—"

"আরে দূর হতভাগা!—ও সব কথা তোকে সুধোচ্ছে কে!"

"এজ্ঞে, তবে কি বল্‌ছেন?"

"বলছি আমার মাথা। যা, এক্ষুণি গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দে। বল্‌গে আমি ডাক্‌ছি।"

"এজ্ঞে যদি ঘুমিয়ে প'ড়ে থাকেন?"

"ঘুমোইনি রে হতভাগা!—যা যা, এক্ষুণি গিয়ে পাঠিয়ে দে—ঘুমিয়ে থাকে, তুলে দিবি।"

"এজ্ঞে।"

অতি হতভাগা! সারাদিন বাহিরে শুইয়া পড়িয়া আছে—বাড়ীভরা এত লোকজন—কি তারা ভাবিতেছে?

এইটুকু আক্কেল বিবেচনা নাই?—বউ ফিট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ঘরটিও একটিবার মাড়ায় নাই। আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা!—এও নাকি আবার একটা মরদ! আস্ত বলদ! আর ঐ মেয়েটা—এক হাটে কিনে নাকে দড়ী নিয়ে সাত হাটে ওকে বিকিয়ে আস্‌তে পারে। হাতে যদি একবার পায়, কি না কর্‌তে পারবে ওকে দিয়ে!"

বিরিঞ্চি আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইল।

"এস বাবা, বস।—বস!—হাঁ, এস আমার কাছে এসে বস।" বলিয়া একেবারে নিজের কোলের কাছে তাকে টানিয়া আনিয়া পিঠে হাতখানি রাখিয়া কহিলেন, "হাঁ, তা—শরীরটা আছে ত ভাল?"

"আছে।"

"তা—বাইরে কেন সারাটি দিন শুয়ে প'ড়ে রয়েছ?—ব্যাটাছেলে—একটু ধৈর্য্য ধরতে হয়। বাড়ীভরা এত লোকজন—কত কি তারা ভাব্‌ছে, বলাবলিও করছে! সে অবসর কি তাদের এ অবস্থায় দিতে আছে?"

দুই হাতে বিরিঞ্চি মুখ ঢাকিল। পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ-করুণ কণ্ঠে হরমোহনবাবু কহিলেন, "কেঁদো না, কেঁদো না বাবা!—যা ঘটেছে—উপায় ত কিছু নাই, স্থির হয়ে এখন ভাবতে হবে কি করা যায়। লোককেও দেখাতে হবে, বাড়ীতে এই যা ঘটল—তার সঙ্গে তোমার একটা যোগাযোগ কিছু নাই।—"

বিরিঞ্চি চক্ষু মুছিল।

"হাঁ, শোন।" বলিয়া ধীরে ধীরে তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ললিতবাবু কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার মাতা কি বলিয়া গেলেন, সব কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। শেষে কহিলেন, "কি করবে বাবা? খুব সাবধানে সংযত হ'য়ে তোমাকে চল্‌তে হবে। ললিত যদি আদালতে গিয়ে দাঁড়ায়, বড় একটা কেলেঙ্কারী হবে। লোক-সমাজে তুমিও মুখ দেখাতে পারবে না, আমিও পারব না তাদের পক্ষেও—বুঝ্‌তেই পারছ—ভাল এতে কিছু হবে না। লোকসমাজে মুখ তুলে থাকবার একটু ঠাঁই কোথাও পাবে না। সুখে স্বচ্ছন্দে যাতে থাকতে পারে, সব ব্যবস্থা আমি করেছি, আরও যখন যা দরকার হয় করব। তাদের ভালমন্দের সব দায়িত্ব আমিই মাথায় তুলে নিইছি, মাথায়ই রাখ্‌ব। নিশ্চিন্ত তুমি থাক্‌তে পার। খোঁজের জন্য লোক লাগিয়েছি, একটা স্থিতি যদি তাদের করিয়ে দিতে পারি, আর তোমার গর্ভধারিণী সত্যিই যদি তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে থাক্‌তে পারেন, যেমন বলছেন, তাহ'লে গ্লানিটা তাদের অনেকটা কেটে যাবে। তবে দুঃখু—তোমাকে পেল না—মনের এই যে বড় একটা দুঃখু—"

ফুঁকরাইয়া বিরিঞ্চি কাঁদিয়া উঠিল—দুই হাতে পিতার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কোনও—কোনও উপায় কি হ'তে পারে না বাবা—"

মাথায় হাত বুলাইয়া হরমোহনবাবু কহিলেন, "কি করব বাবা?—উপায় কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনি। ললিত এসে যে ক'রে ব'লে গেল—ধ'রে যে জুতো মারেনি, সে কেবল এই প্রতিশ্রুতি আমার কাছে পেল তাই। আর সে প্রতিশ্রুতি তোমার হ'য়ে না দিয়েই বা করি কি? রোক যা দেখলাম, হয়ত কালপরশুই আদালতে গিয়েই দরখাস্ত দাখিল করত। তাহ'লে ত একটা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'ত, যেমন আমাদের, তেম্‌নি ওদের।—কি করব বাবা? ওদেরও দুর্ভাগ্য, আর আমারও—সে আর কি করব! ভুলই বল, আর যাই বল, যা ক'রে ফেলিছি তা ফেলিছি। ফেরবার ত আর পথ কিছু এখন নেই। তার মেয়েটি ঘরে এনে ফেলেছি। আর তার কথাটাও ত ভাব্‌তে হয়, বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছ—আর কি—লক্ষ্মী মেয়ে—দুটি আর অমন দেখিনি! দারুণ এই আঘাত পেয়ে একেবারে মর্ম্মে ম'রে আছে। এরপর আবার যদি ওখানে একটা সম্বন্ধ রাখ, দেখাশুনো গিয়ে কর, বরদাস্তই সে করতে পারবে না। মুখে কিছু না বল্লেও মনে মনে গুম্‌রে মরবে। কোলে ঐ মেয়েটি—শরীর একদম ভেঙ্গে পড়বে। ও তবু শক্ত আছে, এদ্দিনও যুঝে চলেছে, এখনও এই দুর্ভাগ্যটার সঙ্গে যুঝ্‌তে পারবে। আর আমার এই ইলা মা দেখ্‌ছ ত বাবা, যেন দেবলোক থেকে ঝ'রে পড়া কোমল একটি লতার ফোটা পরশ সয়না এমন ফুলটি—অতি সাবধানে নরম হাতে পোষণ ক'রে জিয়িয়ে তাকে রাখ্‌তে হবে। এই আঘাতটা সাম্‌লে হয়ত উঠবে, যদি তোমার কাছে তেমন স্নেহযত্ন একটা পায়—বিশ্বাসে তোমার উপরেই নির্ভর ক'রে থাকতে পারে। আর তা যদি না পারে, কি হবে বল্‌তে পারি না।"

বলিতে বলিতে একটি নিশ্বাস হরমোহন ত্যাগ করিলেন। বিরিঞ্চি একটু যেন শান্ত হইয়া তখন চুপ

করিল। অশ্রু মুছিয়া ধীরে ধীরে সোজা হইয়া বসিল। হরমোহনবাবু কহিলেন, "হাঁ, এক কাজ ক'রো—এখুনি পারবে না—বৌমা আর একটু সুস্থ হ'য়ে উঠুক—তার সঙ্গে নিরিবিলি একটু আলাপ কর, বুঝিয়ে সুঝিয়ে নেও। —তোমার স্নেহ যে সে হারায় নাই—এইটে তাকে দেখিয়ে তার মনটাকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা কর। হবে, শান্ত হবে, যদি বোঝে স্নেহ তোমার হারায়নি, হারাবে না—শান্ত তখন হবে। মনের একটা মিলমিশ তার সঙ্গে যদি হয়ে যায়, তখন দেখো, তোমারও মনটা অনেকটা শান্ত হয়ে উঠেছে। তাকে শান্ত ক'রে তার সঙ্গে আগের মত একটা মিলমিশ ক'রে নেওয়া এটা তোমার এখন বড় একটা কর্ত্তব্যও বটে। ওদের কথা—তা কি করবে? দোটানা ভাব ত একটা চল্‌তেই পারে না, কারুরই শান্তিসোস্তি তাতে হবে না। ওদের ভার—আমাদের ওপরই ছেড়ে দেও। আমি রয়েছি, তোমার গর্ভধারিণী রয়েছেন, ওদের যাতে ভাল হয়, ভাল যাতে ওরা থাকে, যতটা সম্ভব শান্তিসোস্তিও একটা পায়, সেটা আমরা দেখ্‌ব।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিরিঞ্চি কহিল, "দেখি, চেষ্টা ক'রব, যদ্দুর পারি। আর করতেও বোধ হয় তাই হবে।"

—"হাঁ।—আচ্ছা, রাত হ'য়ে গেল—এখন খাওয়া দাওয়া ক'রো গে,। আর কাল থেকে একটু সামলেও চ'লো, লোকে না এটা ওটা ভাববার অবসর কিছু পায়।"

"যে আজ্ঞে।"

বিরিঞ্চি উঠিয়া গেল। হরমোহন একটা স্বস্তির নিশ্বাস তখন ফেলিলেন।

ক্রমশঃ

নূতন-মা

শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

ও কি খুকু, দুধ খাও
কিছুই যে খাও নাই—
আর একটু···ফেলে দিলে ?
কি যে তুমি কর ছাই !

সারাদিন ছুটোছুটি—
এটা ওটা ভাঙ্‌ছো—
কত কাজ—না খেলে যে
ক্ষতি কত জান্‌ছো ?

কত কথা কও তুমি
হিজিবিজি ভাষাতে
কিছুই যে বুঝি না কো
কত পার হাসাতে !

থাক্—থাক্—বই ছাড়
পড়া কর বন্ধ—
হবে তুমি পণ্ডিত
তাতে কিবা সন্ধ !

আহা—ছাড়—গল্পটা
বাকী আছে অল্প—
বাবা ! মেয়ে একগুঁয়ে
অটুট সংকল্প !

মেয়ে নিয়ে কোন কাজ
করবার পথ নাই,
জ্বালাতন—সারাক্ষণ
বল্ দেখি কি উপায় !



খাসি ও জয়ন্তি পাহাড়

শ্রীকাননগোপাল বাগ্‌চী

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কাজ করবার জন্য আমাদের একবার শিলং যেতে হয়েছিল। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, খাসি ও জয়ন্তি পাহাড়ের ভূতত্ত্ব, তাদের আকৃতি, গঠন ও প্রাকৃতিক বৈষম্য সম্বন্ধে



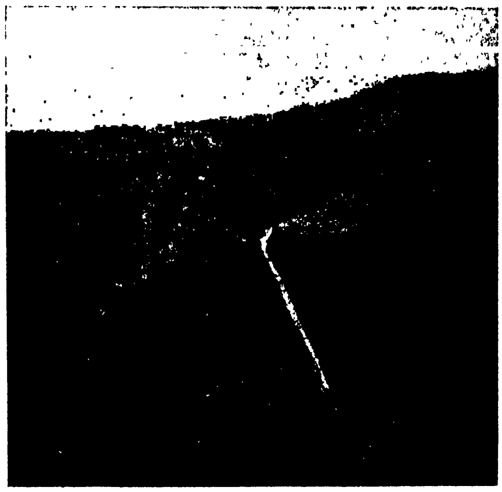
সবজি বাজার—শিলং

তথ্য সংগ্রহ করা। এর জন্য পায়ে হেঁটে আমাদের বনে জঙ্গলে, নদী নালা অনুসরণ করে বহুদূর ঘুরতে হয়েছে এবং সেই সুযোগে এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন বিচিত্র ও মনোরম, এদেশের লোকেরাও তেমনি সরল নির্ভীক। এদের ব্যবহারও বেশ অমায়িক। বস্তুত খাসি ও জয়ন্তি পাহাড় মনের মধ্যে এমনিই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, আজও সে সব স্মৃতি মনে হ'লে প্রচুর আনন্দ দেয়।

শিলং—যাকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য প্রাচ্যের স্কটল্যাণ্ড বলা হয়—খাসি ও জয়ন্তি পাহাড়ের অন্তর্বর্তী, শিলং মালভূমির ওপর অবস্থিত। বাঙলা দেশের বিস্তীর্ণ শস্য-শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মপুত্র পার হ'লেই গারো পাহাড়ে পৌঁছন যায়। গারোর পরই আরম্ভ হ'ল খাসি ও তারই সংলগ্ন জয়ন্তি পাহাড়। এখানকার লেবু ও পাথুরে চুণ বহুকাল থেকেই বাঙলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। খাসি ও জয়ন্তি পাহাড় সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই এদের উৎপত্তির কথা প্রথমে এসে পড়ে। আসামের পাহাড়গুলো দেখতে হিমালয় থেকে স্বতন্ত্র মনে হ'লেও আসলে তারা একই গোষ্ঠীর। আজ এদের উচ্চতা দেখে আমরা বিস্মিত হ'লেও মনে রাখতে হবে যে, বয়সে আরাবল্লী বা দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতমালার তুলনায় এরা একেবারেই শিশু।

এখন যেখানে হিমালয় বা আসাম পর্ব্বত রয়েছে এক সময়ে সেখানে বিরাজ করত 'টেথিস্' নামে এক মহাসমুদ্র। এর উত্তরে এবং দক্ষিণে যে সব স্থল ছিল সেখান থেকে পলি পড়ে পড়ে এটা আস্তে আস্তে ভরাট হতে আরম্ভ হয়। পলির গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো চাপ খেয়ে শক্ত পাথরে পরিণত হ'তে লাগল। অবশেষে একদিন প্রকৃতিজগতের এক প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে টেথিসের গর্ভে সঞ্চিত পাথর মাথা চাঁড়া দিয়ে হিমালয় ও আসাম পর্ব্বতের সৃষ্টি করল। একদিন যে এরা সমুদ্রের গর্ভে বিলীন ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ, এদের ভেতর বিভিন্ন স্তরের সামুদ্রিক জীবের অস্থি ও ছাঁচ পাওয়া যায়। আসামে যে পেট্রোলিয়াম জাতীয় তেল পাওয়া যাচ্ছে তাও এই সামুদ্রিক জীব থেকেই উদ্ভুত। এই সে দিনের কথা, মানুষের আবির্ভাবের মাত্র কয়েক কোটি বছর আগে আসাম পর্ব্বতের উৎপত্তি হয়েছে।

কিন্তু উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছে এদের ক্ষয়। দিনের উত্তাপ এবং রাত্রের শীতলতা, ঝড়ের বেগ ও বৃষ্টির প্রভাবে প্রতিনিয়ত গা থেকে কত যে পাথর ক্ষয় হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌশুমী বায়ু সমুদ্র থেকে অপরিমেয় জলীয় বাষ্প



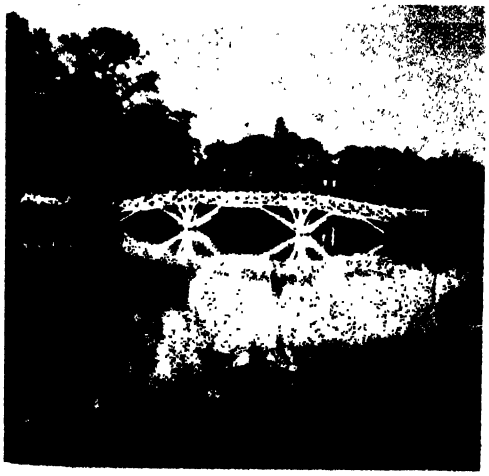
বিশপ প্রপাত—দূর হইতে

নিয়ে এসে সোজা এদের বুকে আঘাত করে। ফলে সমস্ত বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে প্রচুর বারিপাত ঘটায়। শিলং থেকে চব্বিশ

মাইল দক্ষিণে, চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়—প্রায় পাঁচশ' ইঞ্চি। পাহাড়গুলো অল্প বয়সের বলে এত বৃষ্টির ঘা খেয়েও এখনও খাড়া আছে, ক্ষয়ে চ্যাপ্‌টা হয়ে যায়নি। এর ওপর বৃষ্টি পড়লেই অসংখ্য বেগবতী নদীর সৃষ্টি হয়। এরা এঁকে বেঁকে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ঝরণা ও জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে বয়ে যায়। কোন কোন স্থানে এই সব জলপ্রপাত থেকে শক্তি নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। শিলংএর সমস্ত বিদ্যুৎই বিশপ্‌ ও বীডন্‌ প্রপাত থেকে সরবরাহ করা হয়। এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক রমণীয়তা অনেক পরিমাণে এই সব খরস্রোতাদের কাছে ঋণী।

খাসি ও জয়ন্তি পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে পাথরের উপাদান ও গঠনের তারতম্য অনুসারে আকৃতিরও পার্থক্য দেখা যায়। শিলং পিক্‌ ও মালভূমি কোয়ার্ট্‌জাইট্‌ নামে জমাট শক্ত পাথর দিয়ে গঠিত। এই জন্যই এখানকার মাটী বেশ শক্ত ও সহজেই পাহাড়ের গা ধ্বসে যায় না। কোয়ার্টজাইট্‌ কিন্তু বেশী রকম রূপান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত গাছপালা জন্মানর উপযোগী হয় না। শিলং পিকের গায়ে ভূট্টার চাষ ছাড়া অন্য কিছু নজরে পড়ল না। এখানকার উদ্ভিদের মধ্যে দেওদারু গাছই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে—পাহাড়ের চূড়োর সঙ্গে খাপ খাইয়ে এদের মাথাগুলোও যেন বরের টোপরের মত। কোয়ার্টজাইটের নীচেই আসে শিষ্ট্‌—এগুলো অপেক্ষাকৃত নরম ও সহজেই মাটীতে রূপান্তরিত হয়। শিলং বা চেরাপুঞ্জির মালভূমি ডোমনাইস ও গ্রানাইটের জন্যই হয়েছে।

চেরাপুঞ্জিতে আমরা বালিপাথরের ভেতর কয়লা পাই। এই স্তরগুলো আট দশ ফিট্‌ গভীর হয় এবং অনেকগুলোতে কাজও হচ্ছে! এখানকার কয়লাতে বাঙ্গলাদেশের কয়লার চেয়ে ছাই খুবই কম, কিন্তু



শিলং হ্রদ

গন্ধকের সংমিশ্রণের জন্য রাসায়নিক কাজে লাগান যায় না। এখানেই চুণাপাথরে যে চুণ তৈরী হয় তাতেই কয়লা ব্যবহার করা হয়। শ্রীহট্ট অঞ্চলে বহু চুণ ভাঁটা আছে। সেখানে রজ্জুপথে কয়লা সরবরাহ করা হয়।

চেরাপুঞ্জির মালভূমি থেকে নীচের দিকে কি কি পাথর আছে

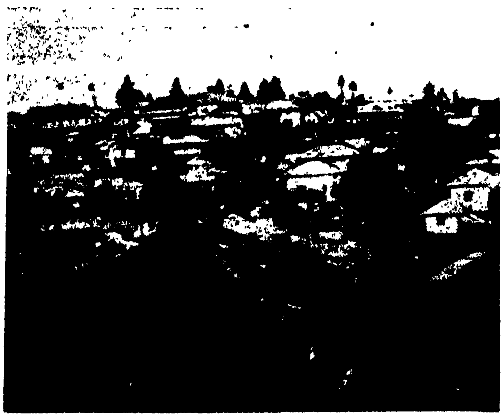


শিলং মালভূমি

দেখার জন্য আমরা শ্রীহট্টের দিকে সুকটিয়া খাদে দুহাজার পাঁচশ ফিট্‌ নেমে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময় বিশেষ কষ্ট হয়নি ও পথে কোন্‌ জাতীয় পাথর থেকে কি ভাবের মাটী উৎপন্ন হয় এবং তাতে কি কি গাছ জন্মে এ দেখার খুব সুযোগ হয়েছিল। পাহাড়ের ঢালুতে অজস্র কমলালেবুর চাষ দেখেছিলাম এবং এদের সাহায্যে শ্রম শান্তিরও যথেষ্ট সাহায্য হয়েছিল। সঙ্গে তাঁবু ছিল না বলে সেইদিনই আমাদের উঠে আসতে হয় এবং ওঠার সময় অন্ধকারে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। চেরাপুঞ্জির সর্ব্বখ্যাত জিনিষ হচ্ছে মসময় প্রপাত—উচ্চে প্রায় আঠার শ' ফিট্‌! তবে বর্ষার সময় না দেখলে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না। চেরাপুঞ্জি থেকে মাইল তিনেক দূরে মমলু কেভ্‌ বলে একটা গুহা আছে। চূণাপাথরের ওপর জলের প্রভাবে খানিকটা অংশ দ্রবণীয় অবস্থায় অপসারিত হয়ে এই গুহার সৃষ্টি করেছে। গুহাটি বেশ বড়—এক দিকে ঢুকে অন্য দিকে বেরোতে প্রায় আট-নয় মিনিট লেগেছিল। স্থানে স্থানে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, বুকে হেঁটে চলতে হয়। এর ভেতর দু-এক জায়গায় সূর্য্যের আলো পড়ে ক্যালসাইট্‌ স্ফটিক্‌গুলো জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে।

শিলংএ গেলে প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এদেশের দিগ্‌ন্তব্যাপী সুদৃশ্য পথ। যাঁরা মোটর ভ্রমণে আনন্দ পান তাঁদের পক্ষে এ এক অপূর্ব্ব সুযোগ। তবে পথগুলো বড়ই বন্ধুর। খাড়া খাড়া উঁচু পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তাগুলো এঁকে বেঁকে চলে গেছে—অত্যন্ত সাবধানে মোটর চালাতে হয়, জায়গায় জায়গায় অসম্ভব ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার ক'রে পাহাড়ের গা ধ্বসিয়ে বা ছিদ্র করে রাস্তা নিয়ে যেতে হয়েছে। এর উপর নদীবহুল বলে, অনেক সেতু করার জন্য খরচও বেড়ে যায়। বিপদের সম্ভাবনা থাকায় রাত্রে চেরাপুঞ্জি বা শ্রীহট্টের পথে গাড়ী চালাতে দেওয়া হয় না।

দুর্গমতা বা অন্যান্য স্থানের সঙ্গে আদান-প্রদানের অভাব, সমাজের উপর কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, খাসিদের লোকালয় পর্য্যবেক্ষণ করলে তা সহজেই বোঝা যায়। দূরের গ্রামগুলোয় এখনও শহুরে



শিলংএর সাধারণ দৃশ্য

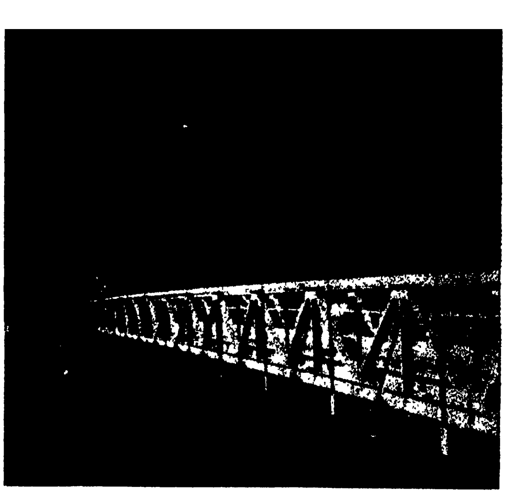
সভ্যতার ঢেউ এসে পৌঁছয় নি। প্রকৃতির সন্তানের মত এরা এখনও সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে। এরা যে কেন এই সব অঞ্চলে এল তার সন্ধান পাওয়া মুস্কিল। সহজে মানুষ এরকম দুর্গম বিপদসঙ্কুল স্থানে আসতে চায় না। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, কিংবা দেশদ্রোহী হয়ে কেউ হয়ত স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য এসব অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেয়। পরে তাদেরই বংশবৃদ্ধির ফলে সেখানে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে এক জনতা।

খাসিরা যে কোথা থেকে কি ভাবে এখানে এসেছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এদের ভাষার সঙ্গে ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদের, কাম্বোডিয়ার অধিবাসীদের বা আসামের মীরদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। কি ক'রে এই বিচ্ছিন্ন কয়েকটি জাতের মধ্যে ভাষার সাদৃশ্য সম্ভব হ'ল, নৃতত্ত্ব আজও তার সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দেশ ক'রে উঠতে পারে নি। খাসিরা কি করে শিলং ও জয়ন্তি পাহাড়ে এসেছে সে সম্বন্ধে ওদের যে জনশ্রুতি আছে তাইই বলছি। উত্তর দিক থেকে বিচরণ করতে করতে এরা নাকি শ্রীহট্টে বাঙ্গালীদের সঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করে। পরে প্রবল এক বন্যায় শ্রীহট্ট ডুবে যায়। সেই সময় খাসি ও বাঙ্গালীরা নিজেদের ইতিহাস ও পুস্তকাদি নিয়ে সাঁতরে এসে জয়ন্তি ও খাসী পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। বাঙ্গালীরা নিজেদের পুঁথিসমেত আসতে পেরেছিল, কিন্তু খাসিরা সমস্তই বন্যার জলে হারিয়ে ফেলে এবং সেই অবধি ওদের লেখার চিহ্নও চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য এর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই, কেবল কৌতুকজনক বলেই এই প্রবাদের উল্লেখ করলাম। যে ভাবেই হোক খাসিরা এদেশে আসার পর সমতল-প্রদেশের সঙ্গে খুব কমই সম্বন্ধ রাখত। নিছক কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য এরা লোকালয়ে আসত এবং সেই সুযোগেই প্রাচীন টিবেটো-বার্মাণদের সঙ্গে আমাদের যেটুকু সম্বন্ধ ছিল।

অনুকূল আবহাওয়ার জন্য এরা খুব বলিষ্ঠ সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করে এবং সমতলপ্রদেশের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখতে আরম্ভ করে। এর ওপর পাহাড়ে রাস্তায় যাতায়াতের অসুবিধা তো আছেই। ফলে এদের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের আদানপ্রদান প্রায়ই রহিত হয়ে গেল। সমতলপ্রদেশের লোকেরা যখন নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে ক্রমশ সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে লাগল, এরা সেই প্রাচীন প্রথা বজায় রেখে অপেক্ষাকৃত অপরিবর্ত্তিতই রয়ে গেল। এখন অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা এসব অঞ্চলে সহজেই যাতায়াত করছি এবং আমাদের সভ্যতাও এদের ভিতর ক্রমশ সঞ্চারিত হচ্ছে। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বহু বিদেশী প্রচারক এদের ভিতর অবস্থান ক'রে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আবহাওয়া এনে ফেলছেন। প্রত্যুষে বা সন্ধ্যায় পাহাড়ের স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি সুদূর গ্রামেও শুনতে পাওয়া যায়।

খাসিদের বলিষ্ঠ গঠন, সুদৃঢ় পেশী ও পরিষ্কার রং দেখে অতি সহজেই চেনা যায় যে এরা পাহাড়ী। তবে পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীদের মত এরা লম্বা তো নয়ই—বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের নাক বেশ চওড়া এবং ছোট ছোট দুই চোখের মাঝখানে অনেকটা দূরত্ব থাকে। চোয়ালগুলো বেশ উঁচু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে অধিবাসীদেরও বর্ণ ও আকৃতিতে পার্থক্য ঘটে। শিলংএর অধিবাসীদের চেয়ে চেরাপুঞ্জির লোকরা বেশী সুন্দর ও ফর্সা হয়। এদের ভেতর যারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে এবং পাশ্চাত্য পোষাক পরে তাদের দেখে য়ুরোপীয় বলে ভ্রম হয়।

খাসিরা স্বাধীনতাপ্রিয় জাত এবং এই গুণটা সব পাহাড়ীদেরই আছে। ব্রিটিশ সরকারও যথাসম্ভব এদের অভ্যন্তরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। কতকগুলো সন্ধির বাধ্যবাধকতায় উভয়ে আবদ্ধ আছে। খাসিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে এক একজন সীম্ বা দলপতির অধীনে বাস করে এবং সর্ব্ববিষয়ে সিমের কথাই শিরোধার্য্য। তবে এ থেকে কেউ মনে



ডাউকি নদীর উপর ঝুলান সেতু

করবেন না যে, এদের ভিতর আইনের কোন শৃঙ্খলা নাই বা সীমের স্বেচ্ছাচারিতার ওপরই এদের নির্ভর করতে হয়। খাসিদের রাজনীতি

বা সমাজ সম্বন্ধে কোন সমস্যা উঠলেই সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হয়ে দলপতির নেতৃত্বে তার মীমাংসা করে। বিচারের সময় কয়েকজন বিচক্ষণ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয় (আমাদের যেমন জুরী) সর্দ্দারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। শুধু তাহাই নয়, উভয়পক্ষই নিজের নির্দ্দোষ প্রমাণের জন্য ভাল ভাল বক্তা (উকিল ?) নিযুক্ত করতে পারে।

এদের শাস্তির বিধানও অত্যন্ত কঠোর, তবে নেহাৎই যুক্তিশূন্য বলে মনে হয় না। কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। নরহত্যার অপরাধীকে মুগুরের আঘাতে মেরে ফেলা হ'ত। তবে পূজার জন্য নরবলি দিলে তার শাস্তি সামান্য জরিমানা দিলেই হয়ে যায়। চোর ইত্যাদি বধ করলেও জরিমানা দিলেই খালাস পাওয়া যায়। পাশবিক অত্যাচার বা অবৈধ প্রণয়ের জন্য যাবজ্জীবন কারাবাস, নয় গুরু অর্থদণ্ড দিতে হয়। নিজ পরিবারের ভিতর কাহারও সঙ্গে সহবাস করলে তার নির্ব্বাসন, নয় ত সাড়ে পাঁচশ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয় সিমকে। শেষোক্ত অপরাধটী খাসিদের চোখে অত্যন্ত গুরুতর বলে বিবেচিত হয়।

এদের সামাজিক নিয়মও অদ্ভুত। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় মেয়ে এবং অন্যান্য পরিজনবর্গকে তাকে মেনে চলতে হয়। পূর্ব্বপুরুষদের পারলৌকিক ক্রিয়া এবং পারিবারিক পূজা-পার্ব্বণের ভার ন্যস্ত হয় কনিষ্ঠা কন্যার ওপর এবং সে-ই মাতৃসম্পত্তির বৃহত্তর অংশ পেয়ে থাকে। খাসিরা পরিচিত হয় মায়ের নামে এবং এদের আসল পরিচয় হচ্ছে মাতৃকুল। পিতার নামে কেউ পরিচয় দেয় না। কোন পুরুষ মারা গেলে তার শব মামার বাড়ী পাঠান হয় সমাধিস্থ করতে। সে যদি কোনও সম্পত্তি উপার্জ্জন করে রেখে যায় তাহ'লে মামার বাড়ীর লোকেই তা পেয়ে থাকে, স্ত্রী নয়। জোয়াই অঞ্চলে স্ত্রীর বাড়ীতে পুরুষ খায় না পর্য্যন্ত !

আদি যুগের মত এদেশের লোকেরা পাহাড়, নদী, জঙ্গল ইত্যাদির



দেওদার গাছ, লাইসিং কোট

অপদেবতাকে উপাসনা করে থাকে। এরা খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং প্রত্যেক বিষয়েই মানত করে। পূজা-পার্ব্বণের ক্ষেত্রেও মেয়েদের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পৌরহিত্য করে মেয়েরাই—পুরুষরা সাহায্য করে মাত্র। এরা অনেকগুলি দেবীর পূজা করে থাকে এবং সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে সর্ব্বোপরি এরা এক আদ্যাশক্তির উপাসনা



মসময় প্রপাত, উচ্চতা আঠার শ

করে থাকে। এ সবের জন্য এখানের মেয়েদের সমাজে একটা প্রতিষ্ঠা আছে এবং তারা পুরুষের মত সব বিষয়ে পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হওয়ার সুযোগ পায়। আগন্তুকদের চোখে স্থানীয় মেয়েদের স্বচ্ছন্দ, আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন গতি ও হাস্যময় ভাব বিস্ময় এনে দেয়।

বর্ম্মার মত এখানের পুরুষদের সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শোনা যায়। কেউ কেউ নাকি কুঁড়ে ও কাজকর্ম্মে নিরুৎসাহ হয়। তবে আমার নিজের যতদূর ধারণা তাতে এদেরও বেশ কর্ম্মঠ বলে মনে হয়। বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে এরা আধুনিকতা থেকে বড় বেশী পিছনে নয়। এদের ভিতরও বিবাহের বহু পূর্ব্ব থেকে পূর্ব্বালাপ সুরু হয় এবং ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'লে পাত্রপক্ষের লোকেরা কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব আনে। উপহারাদির বিনিময় ও বরপণ দেওয়ার পর আমোদ আহ্লাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। খাসিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে-কোন উপলক্ষেই এরা দুঃখ প্রকাশ করে না। সমাধিক্রিয়ার সময়ও এরা নাচগান করে থাকে। সমাধিক্ষেত্রের উপর ছোট-নাগপুরের মুণ্ডা ইত্যাদি জাতির মত এরাও পাথরের বেদী নির্ম্মাণ করে। এখানে এদের সঙ্গে য়ুরোপের প্রস্তরযুগের অধিবাসীদেরও মিল আছে।

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য খাসিরা কুলিগিরি ও কৃষিকার্য্য করে থাকে। পাহাড়ের জঙ্গল পুড়িয়ে সে স্থানে চাষ দিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করে এরা শস্য উৎপন্ন করে। জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য সারের ব্যবহারও এদের জানা আছে। ধান ভুট্টা ইত্যাদিই প্রধান চাষ। শাকসব্জির বাগানও এরা করে থাকে। এ ছাড়া মৃৎশিল্প এবং তুলা বা শিল্কের কাপড় বুনেও অনেকে উপার্জ্জন করে। শীতপ্রধান দেশ বলে এরা সাধারণত একটু বেশী পরিচ্ছদ ব্যবহার করে—তবে পা অনাবৃত থাকে। এরা বড় অপরিচ্ছন্ন। খাসিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুব উপভোগ করে

এবং অবসর সময়ে বনে জঙ্গলে বিচরণ করে। বিভিন্ন ফল, গাছ বা ফুলের জন্য এরা পৃথক নাম দিয়েছে এবং তাইতেই বোঝা যায় এরা কতদূর প্রকৃতিকে ভাল বাসে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অশরীরী শক্তি বা বংশগৌরব নিয়ে এদের ভিতর বহু জনশ্রুতি বা গল্প প্রচলিত আছে। চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধেও এদের আগ্রহের সীমা নাই। চাঁদের কলঙ্ক নিয়ে এদের যে গ্রাম্যপ্রবাদ আছে সেটা তুলে দিলাম।

এক বৃদ্ধার তিন কন্যা ও এক পুত্র ছিল। কন্যা তিনজন যথাক্রমে সূর্য্য, জল ও অগ্নি। পুত্রের নাম "উ বিনাই" বা চন্দ্র। বিনাই অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হয়ে পড়ে এবং বড় বোন সূর্য্যের সঙ্গে প্রেম করবার প্রয়াস পায়। সূর্য্য এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ছাই মাখিয়ে বের করে দেয়। আগে চন্দ্র সূর্য্যের মত উজ্জ্বল ছিল কিন্তু এই অপমানের পর লজ্জায় সে পাংশু হয়ে গেল আর সাদা কিরণ দিতে লাগল। পূর্ণিমার দিন চাঁদে যে কলঙ্ক দেখা যায় তা নাকি সূর্য্যের দেওয়া ছাই।

এর থেকে বোঝা যাবে যে, পাহাড়ীদের ভিতরও উচ্চশ্রেণীর নৈতিক অনুশাসন রয়েছে।

উপরোক্ত বিবরণীতে খাসিদের সমাজ, রাজনীতি বা ব্যক্তিগত জীবনের অনেক তথ্য মূলত পি-টি গর্ডনের "দি খাসিস্" নামে পুস্তক থেকে লেখা। তাঁর প্রতি ও চিত্রাংশের জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

জমিদারী হিসাবপত্র

শ্রীতারকগোবিন্দ চৌধুরী

প্রত্যেক মুড়ি দাখিলার পৃষ্ঠায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দাখিলা দ্বারা যত টাকা আদায় হইয়াছে, সেই টাকা আনিয়া যোগ দিতে হয়। দাখিলাসূত্রে কত টাকা আদায় হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করা যায়। এই পদ্ধতির দাখিলা কেহ কৃত্রিম করিলে উহা সহজে ধরা যায়। আদালতে এইরূপ দাখিলাবহি বিশ্বাসযোগ্য।

ডিহি বা মফঃস্বল কাছারি

তহশীলদারগণের কার্য্য পরিদর্শনের নিমিত্ত যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, তাঁহাকে নায়েব কহে। কাছারি সৃষ্টি করিলে সদর কাছারির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সেরেস্তা (বিভাগ) সৃষ্টি করিতে হয়। তদ্দরুণ সরঞ্জামীব্যয় বৃদ্ধি পায়। সম্পত্তি দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হইলে কাছারি সৃষ্টি করা ভিন্ন উপায় নাই। সাধারণতঃ চারি-পাঁচ হাজার টাকার আদায়ী মহালের নিমিত্ত একজন তহশীলদার নিযুক্ত করা হয়। পাঁচ-ছয় জন তহশীলদারের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য নায়েব থাকেন। তাঁহাকে আদায়-তহশীলের সহায়তা এবং তহশীলদারগণের হিসাবনিকাশ গ্রহণ করিতে হয়।

এই কাছারিতে নিম্নলিখিত হিসাবপত্র রাখিতে হয়। যথা :—(ক) সুমার ; (খ) সুমারের খতিয়ান ; (গ) তলব-বার্মাণদের · ·ন্তি (আদায়কারিগণের নিকট প্রাপ্য টাকার অনুকূল আবহা৷

হিসাব) ; (ঘ) দাখিলাবহি—বিলির রেজিষ্টার বা ঠিকানা বহি।

তহশীলদারের প্রেরিত টাকা সুমারে কত নম্বরে জমা হইয়াছে তাহা তাঁহার ইরশাল চালানে উল্লেখ করিয়া নায়েবের নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। ইহা ভিন্ন অন্যরূপ রসিদ মালিক স্বীকার করিতে বাধ্য হন না।

তহশীলদারের ইরশাল চালানে কত নম্বর দাখিলা হইতে কত নম্বর দাখিলার আদায়ী টাকা প্রেরিত হইল তাহা উল্লেখ থাকিবে। ইহাতে তহশীলদার আদায়ী টাকা সাকুল্য না পাঠাইলে আইনতঃ দোষী হন। আমানত লইয়া বা কর্জ করিয়া তহশীলদার টাকা ইরশাল করিলে চালানে তাহা উল্লেখ করিতে হয়। তহশীলদার দাখিলা বহি ফেরত দিয়া নূতন দাখিলা বহি গ্রহণ করিবার সময়ে অথবা মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট হইতে দাখিলা বহি আনাইয়া তহশীলদারের তহবিল পরীক্ষা করিতে হয়। দাখিলা বহি-বিলির রেজিষ্টারে তহবিল রাখিবার কারণ লিখিতে হয়।

কোনও কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কাহাকে টাকা হাওলাত প্রদান করিলে তাহার নিকট হইতে একমাস মধ্যে জমা-খরচ গ্রহণ করিতে হয়। বৎসরান্তে তহশীলদারগণের হিসাব নিকাশ লইতে হয়। এই সময়ে আমদানি, চেকমুড়ি,

করচা হিসাব এবং জমাওয়াশীলবাকী প্রভৃতি কাগজপত্র রুজু (মিল) দিতে হয়।

নিকাশী কাগজ রুজু দিবার নিয়ম

(ক) প্রত্যেক দাখিলার পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববর্ত্তী দাখিলার আদায়ী টাকার সমষ্টি আনিয়া যোগ দিতে হয়। বৎসরে দাখিলাসূত্রে যত টাকা আদায় হইয়াছে, আমদানির সহিত তাহার মিল হইবে। দাখিলার পৃষ্ঠার সমষ্টি আনিয়া যোগ দিতে ভুল হইয়াছে কি-না, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়।

(খ) হালসনের করচা হিসাবের সহিত গত সনের করচা হিসাবের প্রত্যেক নামের জমি, জমা এবং সেরেস্তার লিখিত প্রজার নামের (মুদাকত) মিল আছে কি-না।

(গ) প্রত্যেক জমার নিমিত্ত একাধিক দাখিলা প্রজাকে দেওয়া হইয়া থাকিলে শেষ দাখিলার এবং আরও দুই-চারিখানি দাখিলার সহিত করচা হিসাবের মিল করিতে হয়। কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে তদ্বিষয়ে আদেশপত্র দেখিতে হয়। সমস্ত দাখিলা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নাই।

(ঘ) গত সনের জমাওয়াশীলবাকীর সারা জমার সমষ্টির সহিত হালসনের জমাগুজস্তার সমষ্টির মিল হইয়াছে কি-না ?

(ঙ) খারিজ দাখিল, জমা কমবেশীর খাজনা রেয়াৎ, তামাদি খাজনা প্রভৃতির আদেশপত্র আছে কি-না ?

(চ) মোকদ্দমার হিসাবের সহিত জমাওয়াশীলবাকীর নালিশীবাকীর মিল হইয়াছে কি-না ?

(ছ) পতিত পলাতকা এবং খাস জমিতে কত শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাব গ্রহণ করিতে হয়।

তহশীল কিতাবতের নিকাশী কাগজ আদায়কারিগণকে ফেরত না দিয়া নিজ সেরেস্তায় উহা রাখিতে হয়। নিজ সেরেস্তার নিকাশ প্রদানকালে উহা সদর কাছারিতে দাখিল করিতে হয়।

পতিত পলাতকা এবং বেবন্দোবস্তী জমির উৎপন্ন শস্যের হিসাবের শুদ্ধতা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে হয়। মহাল ওয়াশীলাত ভিন্ন কর্ম্মচারীর দোষগুণ প্রকাশ পায় না।

মোকদ্দমা বিভাগ

কোন্ বিষয়ের মোকদ্দমা কোন্ সময়ে তামাদি হইবে, তদ্বিষয়ে আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে। সর্ব্বশ্রেণীর মোকদ্দমার তামাদিকাল এক প্রকার নহে। কোনও মোকদ্দমা তামাদির শেষ মুহূর্ত্তে রুজু করা সঙ্গত নহে; আরজির কোনওরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে দাবীর বা তাহার কোন অংশ তামাদি হইতে পারে।

ডিক্রি সাধারণতঃ দুই প্রকার। যথা :—খাজনা এবং টাকা। খাজনার ডিক্রির এবং টাকার ডিক্রির নিলামে সম্পত্তি বিক্রয় হইলে উহার ফল বিভিন্ন প্রকার হয়। টাকার-ডিক্রিতে নিলাম খরিদদার দায়রাহিত্যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন না; কিন্তু খাজনার ডিক্রিতে নিলাম খরিদদার দায় রাহিত্যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন। ডিক্রিজারির দরখাস্তে কোনও দখলিকার পাইকের নাম বাদ পড়িলে তাহার স্বত্ব স্বামিত্ব নষ্ট হয় না।

ডিক্রি তামাদির সময়

মূল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ হইতে উহার ডিক্রির তামাদিকাল গণনা করা হয়। খাজনা-প্রাপ্তির, সায়রাত মহালের টাকা-প্রাপ্তির এবং মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ভূমির টাকা-প্রাপ্তির নিমিত্ত ডিক্রি আদালতব্যয়সহ পাঁচশত টাকার অধিক হইলে—ঐ ডিক্রি মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর অন্তে তামাদি হয়।

আদালত ব্যয়সহ পাঁচ শত টাকার নিম্ন ঐ শ্রেণীর ডিক্রি মোকদ্দমা চূড়ান্ত-নিষ্পত্তির তারিখ হইতে তিন বৎসর অন্তে তামাদি হয়। এতদ্ভিন্ন দেওয়ানি আদালতের সর্ব্বপ্রকার ডিক্রি মূল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ হইতে দ্বাদশ বৎসর অন্তে তামাদি হয়। পাঁচ শত টাকার উর্দ্ধ খাজনা ও টাকা-প্রাপ্তির ডিক্রি এবং সর্ব্বপ্রকার দেওয়ানি ডিক্রি তিন বৎসরের মধ্যে জারী করিয়া ডিক্রি সতেজ রাখিতে হয়। প্রত্যেক জারীর তারিখ হইতে পুনরায় তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রি জারী না করিলে ডিক্রি তামাদি হয়।

দাইক ডিক্রিদারকে আপোষে টাকা প্রদান করিলে টাকা প্রদানের তারিখ হইতে নব্বুই দিন মধ্যে আদালতে দরখাস্ত দিতে হয়; অন্যথা ঐ টাকার দাবী তামাদি হয়।

নিলাম খরিদা সম্পত্তিতে নিলাম মঞ্জুরের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে সম্পত্তি দখল না লইলে উহা তামাদি হয়। যথসময়ে দখল না লইলে পুনরায় স্বত্বের মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রি করিতে হয়। ঐ ডিক্রি জারী করিয়া সম্পত্তি

দখল লইতে হয়। বার বৎসরের মধ্যে ক্রেতা কোনরূপ ব্যবস্থা না করিলে ঐ নিলাম খরিদা সম্পত্তিতে ক্রেতার স্বত্ব এক-কালীন লোপ পায়।

খাজনা তামাদির সময়

যে ভূমিতে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রযোজ্য তাহার খাজনা বাকীর নালিশকে খাজনার নালিশ কহে। যে বৎসরের খাজনা বাকী সেই বৎসর হইতে চতুর্থ বৎসরের মধ্যে আদালতে নালিস করিতে হয়; নতুবা প্রথম বৎসরের খাজনা পঞ্চম বৎসরের ১লা বৈশাখ তারিখে তামাদি হয়। মিউনিসি-পালিটির অন্তর্গত কৃষি-ভূমির নালিশ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হইবে। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত অন্য ভূমির খাজনা-বাকীর নালিশকে এবং সায়রাত মহালের খাজনা বাকীর নালিশকে আইনানুসারে টাকাপ্রাপ্তির নালিশ কহে; খাজনার নালিশ বলে না। প্রজার কবুলিয়ত না থাকিলে প্রত্যেক কিস্তি খেলাপ হইবার পর তিন বৎসর অন্তে টাকা প্রাপ্তির নালিশে কিস্তির প্রাপ্য টাকা আদায় হয়; কিন্তু রেজেষ্টারী কবুলিয়ত থাকিলে ছয় বৎসর অন্তে উহা তামাদি হয়। নিষ্করের সেসাদি প্রাপ্তির নালিশ প্রত্যেক কিস্তি খেলাপের পর তিন বৎসর অন্তে কিস্তির প্রাপ্তি টাকা তামাদি হয়। বেশ্যার নামে ঘর ভাড়ার নালিশ কবুলিয়ত না থাকিলে করা যায় না। কর্ম্মচারীর অবসর লইবার তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে তাহার নামে নালিশ করিতে হয়।

জ্ঞাতব্য বিষয়

জমি এবং জমা উভয়ই বিভাগ বণ্টন হইলে পৃথক জোত সৃষ্টি হয়; ভূম্যধিকারী প্রজার জমা বিভাগ (হিসাব পৃথক) করিলে পৃথক জোত সৃষ্টি হয় না। সমগ্র ভূম্যধিকারী এবং সমগ্র-প্রজা খাজনার মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত থাকিলে ঐ নালিশের ডিক্রীকে খাজনার-ডিক্রি কহে। কোনও পক্ষের নাম বাদ পড়িয়া ডিক্রি হইলে ঐ ডিক্রি টাকার ডিক্রি স্বরূপ গণ্য হয়।

কোন্ কোন্ প্রজাকে খাজনার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে তাহা খাজনার আইনের ১৪৬এ ধারায় লিখিত আছে। কোনও পক্ষের নাম বাদ পড়িলে কিংবা কোন মৃত ব্যক্তির নামে ডিক্রি হইলে উহা খাজনার ডিক্রি হয় না; টাকার ডিক্রি হয়। কোনও ভূম্যধিকারী তাঁহার নিজাংশের খাজনা বাকীর নিমিত্ত নালিশ করিলে, উহার ডিক্রি টাকার-ডিক্রি হয়। সরিক-ভূম্যধিকারীকে মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ করিয়া খাজনার নালিশ করিতে হয়। মূল মোকদ্দমা কিংবা ডিক্রিজারীর মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যদি কোনও পক্ষ তাঁহার সম্পত্তি হস্তান্তর করেন, তবে ক্রেতাকে মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করিতে হয়। কোনও পক্ষের মৃত্যু ঘটিলে তাহার মৃত্যুর তারিখ হইতে নব্বই দিন মধ্যে তাহার ওয়ারিশকে পক্ষভুক্ত করিতে হয়; অন্যথা ঐ মোকদ্দমার ডিক্রি টাকার-ডিক্রি স্বরূপ গণ্য হয়।

যদি কোনও সরিক-ভূম্যধিকারী খাজনার-ডিক্রি নিলামে (সম্পূর্ণ) জোত ক্রয় করেন, তবে তাঁহার অপর সরিকগণকে তিনি খাজনা প্রদান করিবেন। এজন্য মূল মোকদ্দমায় কিংবা ডিক্রিজারীর মোকদ্দমায় সরিক-ভূম্যধিকারিগণ যোগদান না করিলে সরিক-ভূম্যধিকারীর পক্ষে তাঁহার নিজাংশের পড়তা মত জমি এবং জমা উল্লেখে টাকার ডিক্রি-জারী করিবার পদ্ধতিতে ডিক্রিজারী করাই শ্রেয়। নালিশের কারণ যে জেলায় বা মহকুমায় উদ্ভব হয় তথায় যদি মোকদ্দমার কোনও পক্ষের বসতবাস না থাকে তবে তাহার নামে আদালতের পরওয়ানা কিরূপ প্রণালীতে জারী করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উকিলবাবুর পরামর্শ গ্রহণে আরজিতে এবং ডিক্রিজারীর দরখাস্তে সেই পক্ষের ঠিকানা লিখিতে হয়। খাজনার মোকদ্দমায় ডিক্রিদার বাকী-পড়া সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় না করাইয়া দায়ীকের ভিন্ন জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় করাইতে পারিবেন না।

মোকদ্দমার আপিল করিবার সময় উত্তীর্ণ হইলেই ডিক্রি জারী করা কর্ত্তব্য। পঞ্চাশ টাকার নিম্ন পাওনার ডিক্রি এলোমেলোভাবে জারী না করিয়া নিষ্পত্তির তারিখ অনুসারে জারী করাই সঙ্গত। খাজনা প্রাপ্যের ডিক্রি বিলম্বে জারী করিলে নালিশের পরবর্ত্তী কালের খাজনা আদায়ের বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। খাজনার ডিক্রিতে বাকী-পড়া সম্পত্তি ক্রয় করিলে নিলাম মঞ্জুর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তি দখল লইয়া জোতের অধীন প্রজার নামে স্বত্বধ্বংসের নোটিশ আদালতযোগে দিতে হয়। দায়ীক

নিলাম রদের নালিশ করিবে বলিয়া দখল লইতে কাল বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর আদালতে দাখিলী সাক্ষীর খোরাকী ইত্যাদি ব্যয় বাদে বক্রী টাকা একমাস মধ্যে ফেরত লইতে হয় এবং দাখিলী দলিল মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর সমগ্র দায়ীক দরখাস্ত না করিলে নিলামে সাবকাশ পাওয়া যায় না। খাজনার ডিক্রি ব্যতীত অন্য প্রকার ডিক্রির নিলামে ক্রয় করিবার নিমিত্ত ডিক্রিদারকে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। দায়ীক নিজ নামে নিলাম ক্রয় করিতে পারেন না। খাজনার-ডিক্রির এবং টাকার ডিক্রির ইস্তাহারে আদি পরওয়ানা জারীর বিভিন্নতা আছে।

মোকদ্দমার জাবেদা বেজাবেদা খরচ কাহাকে বলে

দেওয়ানী আদালত ভিন্ন কালেক্‌টরী, ফৌজদারী প্রভৃতি আদালতের মোকদ্দমার জাবেদা খরচ পাওয়া যায় না। আদালতে কোর্ট-ফি দিয়া দরখাস্ত করিতে হয় এবং প্রমাণে ব্যবহারের নিমিত্ত আদালত ঘটিত দলিলপত্রের নকল লইতে ষ্টাম্প-আদি প্রয়োজন হয়। পরওয়ানা জারী (সাক্ষীমান্য, সমনজারী প্রভৃতি) করিবার নিমিত্ত ব্যয় করিতে হয়। এই ব্যয়কে জাবেদা খরচ কহে। ফয়সালাতে যে খরচ লিখিত হয়, তাহাই জাবেদার ব্যয় বলিয়া গণ্য হয়। এতদ্ব্যতীত মোকদ্দমার অন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যয়কে বেজাবেদা খরচ কহে। উকিল ফিস্ যাহা ফয়সালায় লিখিত হয়, তাহাই বিজয়ী পক্ষের লাভ। যে পক্ষ মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন, তিনি অপর পক্ষের নিকট ফয়সালার লিখিত খরচ পাইয়া থাকেন।

ফয়সালা পরীক্ষা

ফয়সালায় পক্ষেয় নাম, দাবী এবং জাবেদা খরচ লিখিতে কোনওরূপ ভুল হইয়াছে কি-না, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। কোনওরূপ ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে আদালতে দরখাস্ত করিয়া উহা সংশোধন করাইতে হয়। ডায়েরী (Diary) বহি দেখিয়া মোকদ্দমা যে তারিখে আদালতে দাখিল হয়, সেই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া নিষ্পত্তির তারিখ পর্য্যন্ত বিচারের যতগুলি দিন ধার্য্য ছিল তাহা একখানি কাগজে টুকিতে হয়, তদনুসারে জমা-খরচ হইতে তারিখ বাহির করিয়া যেরূপ শ্রেণী বিভাগে ফয়সালায় খরচ লিখিত থাকে তদনুরূপ জাবেদা খরচ নির্ণয় করিতে হয়। ফয়সালা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে ঐ ফর্দ্দটি উকিলবাবুকে দিতে হয়। তিনি ফয়সালা প্রস্তুতের সময়ে বা উহা স্বাক্ষর করিবার সময়ে জাবেদা খরচ মিল করিয়া দেখিতে পারেন। কোনও শ্রেণীতে খরচের অনৈক্য হইলে মোকদ্দমার নথী দেখিয়া ভুল বাহির করিতে হয়।

মোকদ্দমা সেরেস্তায় নিম্নলিখিত হিসাবপত্র রাখিতে হয়। যথা :—(ক) জমা-খরচ ; (খ) মোকদ্দমার রেজিষ্টার ; (গ) ডিক্রিজারীর রেজিষ্টার ; (ঘ) ডায়েরী বহি ; (ঙ) মোকদ্দমার এবং ডিক্রিজারীর রিটার্ণ (বিবরণী) ও (চ) আদালতে দলিল দাখিলের রেজিষ্টার।

মোকদ্দমার বিচারে ফল সদর কাছারিতে জানাইতে হয়। মালিকের প্রতিকূলে কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে উকিল-বাবুর মত গ্রহণে সদরে জানাইয়া তথাকার আদেশ মত আপিল-আদি করিতে হয়।

৺শারদীয়া পূজার বন্ধের তারিখ পর্য্যন্ত এবং জমিদারী বৎসর শেষ হইবার তারিখ পর্য্যন্ত মোকদ্দমার দুইটি রিটার্ণ প্রস্তুত করিয়া সদর কাছারিতে পাঠাইতে হয়। ইহাতে কোনও মোকদ্দমা নষ্ট হইবার কিংবা কোনও ডিক্রি বা নিলাম খরিদা সম্পত্তির দখল তামামি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। উকিল ফিসের বিল ফয়সালা বা চুক্তি অনুসারে প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর সদর কাছারিতে পাঠাইতে হয়।

ডিক্রির আদায়ী টাকা ইরশাল চালান যোগে সদরে পাঠাইতে হয়। ইহাতে মফঃস্বল কাছারির হিসাব-নিকাশ সম্পন্নের সুবিধা ঘটে। প্রত্যেক মাসের জমাখরচ পরবর্ত্তী মাসের মধ্যে সদর কাছারিতে পাঠাইতে হয়। ডিক্রির আদায়ী টাকার ইরশাল চালানে সদর কাছারিতে টাকা জমা হইবার সন, তারিখ ও নম্বর থাকে, তদনুসারে নিজ সেরেস্তার জমারখরচে টাকা জমার এবং খরচের পার্শ্বে ঐ নম্বর-আদির নোট দিতে হয়। এইরূপ নোট্ থাকিলে ইরশালী টাকা জমাখরচ হইতে বাদ দিয়া উহা সদর সুমারে ভুক্ত করিবার সুবিধা ঘটে, ভুলভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। ফয়সালা গ্রহণের পর উহা সদর কাছারিতে মোকদ্দমার হিসাবে নোট প্রদানের নিমিত্ত পাঠাইতে হয়। মোকদ্দমা সেরেস্তার জমাখরচ যথাসময়ে, সদর কাছারির

সুমারে ভুক্ত না হইলে জমিদারির হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হয় এজন্য ডিক্রির আদায়ী টাকার চালান প্রদানের ব্যবস্থায় কার্য্য করা দরকার।

সদর কাছারি

সদর কাছারির আদেশ অনুসারে জমিদারীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। মফঃস্বল কাছারির কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে, তাহা স্থির করিয়া দিতে হয়। তত্ত্বাবধানই সদর কাছারির প্রধান কার্য্য।

এই কাছারিতে নিম্নলিখিত হিসাবপত্র রাখিতে হয়। যথা:—১। সুমার: ২। সাধারণ খতিয়ান; ২ক। আমানতী টাকার এবং হাওলাতী টাকার ব্যক্তির নামীয় হিসাব; ৩। বিশেষ খতিয়ান, যথা:—(ক) ভূম্যধিকারীর খাজনা প্রদানের হিসাব; (খ) বেতনের হিসাব; (গ) মোকদ্দমার হিসাব; (ঘ) তলব তৌজিবহি; (ঙ) এষ্টেটের দেনার হিসাব; ৪। ডাকমাশুল ব্যয়ের হিসাব; ৫। প্রজার নাম পত্তন ও খারিজ দাখিলের সাধারণ রেজিষ্টার; ৬। পতিত পলাতকা এবং খাস জমি পত্তনের সাধারণ রেজিষ্টার; ৭। পতিত পলাতকা এবং খাস জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের সাধারণ রেজিষ্টার; ৮। প্রজার খাজনা রেয়াত প্রদানের সাধারণ রেজিষ্টার; ৯। প্রজার জমা কমবেশীর সাধারণ রেজিষ্টার; ১০। মিয়াদী বন্দোবস্তী সম্পত্তির রেজিষ্টার; ১১। শিকস্তী মহালের রেজিষ্টার; ১২। ভূম্যধিকারী ফিসের নোটীশ জমার রেজিষ্টার; ১৩। দাখিলাবহি বিলির রেজিষ্টার এবং তাহার খতিয়ান; ১৪। রেজিষ্টার; ১৫। অস্থাবর সম্পত্তির রেজিষ্টার; ও ১৬। দলিলদস্তাবেজের রেজিষ্টার।

সাধারণ রেজিষ্টার অনুসারে মৌজাওয়ারী (প্রত্যেক মৌজার নামে) রেজিষ্টার প্রস্তুত করিতে হয়।

জমিজমার খারিজদাখিল, বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত প্রজার জমিজমার পরিবর্ত্তন ঘটে। মূল কাগজে (চিঠা, পৈঠা, জমাবন্দী, সেটেলমেণ্ট খতিয়ান) পরিবর্ত্তনের নিদর্শন রাখিতে নাই। প্রত্যেক বিষয়ের নিমিত্ত পৃথক পৃথক খাতা বাঁধিয়া তাহাতে দাগ নম্বর লিখিয়া রাখিতে হয়, যখন যে দাগের পরিবর্ত্তন ঘটে তখন সেই দাগে নিদর্শন রাখিতে হয়।

রাজস্বাদায়ী মহাল, পত্তনী তালুক, জোত, নিষ্কর প্রভৃতি বিভিন্ন স্বত্বের সম্পত্তির মৌজার নাম, অংশ, ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজনা, সম্পত্তি অর্জ্জনের দলিলের নিদর্শন ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির রেজিষ্টারে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অস্থাবর সম্পত্তির রেজিষ্টারে দ্রব্যের নাম, খরিদের সময়, মূল্য এবং কোনও দ্রব্য নষ্ট হইলে তদ্বিষয়ের নোট লিখিয়া রাখিতে হয়।

দলিলদস্তাবেজ হেপাজাত মত রাখা দরকার। প্রয়োজন মত যাহাতে ঐ সব দলিল স্বল্প সময়ে বাহির করা যায়, তন্নিমিত্ত মৌজা বিভাগে উহা রাখা কর্ত্তব্য।

জমিজমা বন্দোবস্ত, খারিজদাখিল, খাজনাদি রেয়াত প্রভৃতি কার্য্য সদর কাছারি হইতে সম্পাদিত হওয়া সঙ্গত। মফঃস্বল কাছারিতে ঐ সকল বিষয়ের কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

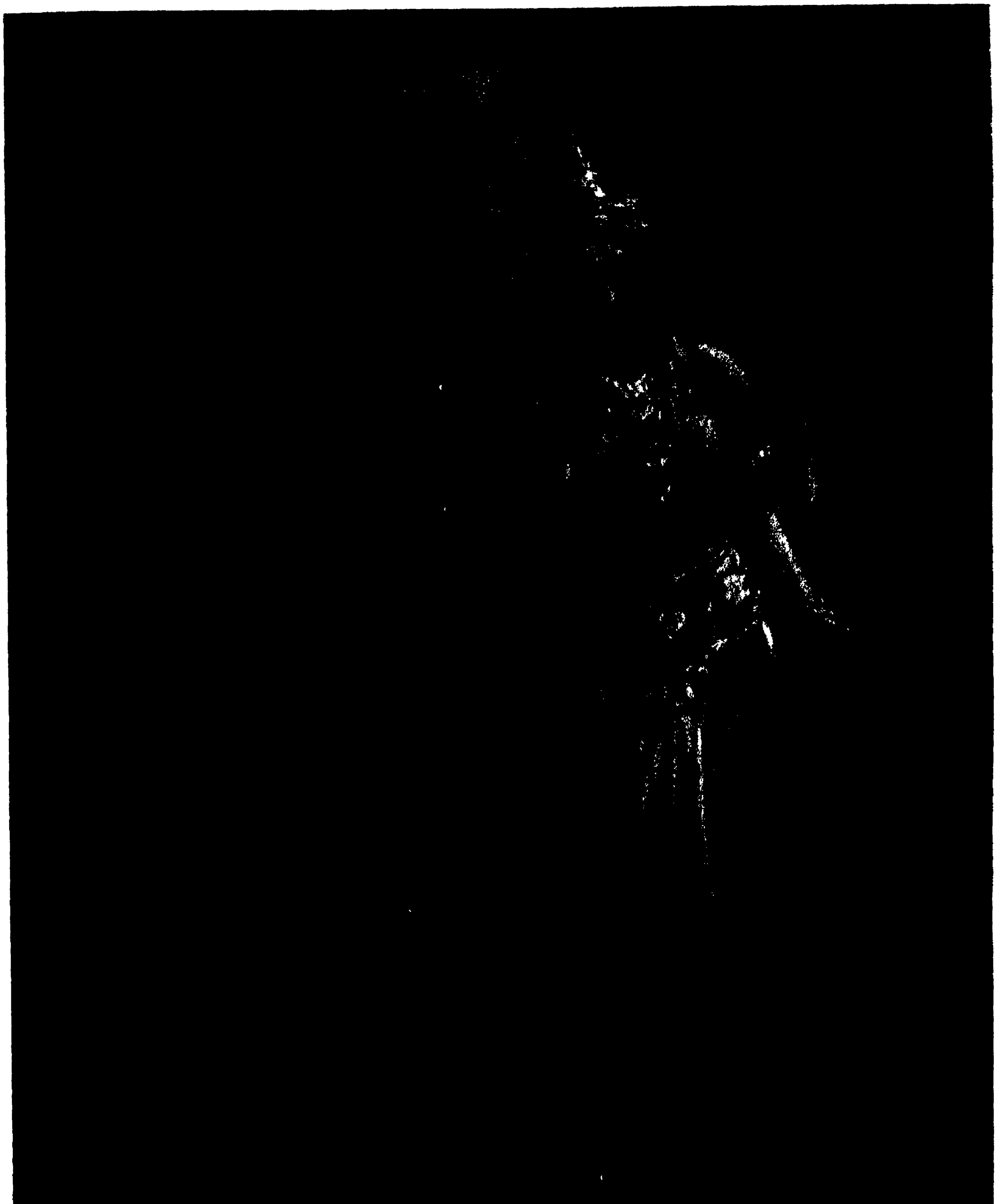
বৎসরের প্রথমেই খাজনা তামাদির, কর্ম্মচারীর তহবিল তামাদির, খত ইত্যাদি তামাদির তালিকা গ্রহণে কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হয়।

ডিহি কাছারির ইরশাল চালানে সুমারের কত নম্বর সেহা (জমা) হইতে কত নম্বর সেহার টাকা সদরে প্রেরিত হইল তাহা উল্লেখ থাকা নিতান্ত দরকার। ইহাতে মফঃস্বল কাছারির সুমারের কার্য্য মুলতবী থাকিতে পারে না। সদর কাছারি হইতে সংবাদ প্রদান না করিয়া মাঝে মাঝে তথায় গিয়া তহবিল পরীক্ষা করা দরকার।

তহশীলদারগণের এবং নায়েবগণের সেরেস্তায় কোন্ কোন্ ব্যক্তির নামে টাকা আমানত বা কর্জ্জ জমা আছে তাহার এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মচারীর নিকট কত টাকা তহবিল আছে তাহার তালিকা প্রতি সন সদর আপিসে আনাইতে হয়।

খাজনার টাকা তহশীল কর্ম্মচারীর নিকট এবং মোকদ্দমা-সূত্রে পাওনা টাকা মোকদ্দমা সেরেস্তার কার্য্যকারকের নিকট প্রদান করা উচিত। ইহার ব্যতিক্রমে অনুপযুক্ত স্থানে টাকাকড়ি প্রদান করিলে যথাস্থানে বিজ্ঞপ্তিপত্র (সংবাদ) পাঠাইতে হয়।

মোকদ্দমার হিসাববহি দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী প্রভৃতি আদালতের শ্রেণীবিভাগে লিখিতে হয়। খাজনার মোকদ্দমার হিসাব মৌজা বিভাগে রাখিতে হয়; অন্যথা



শিল্পী—শ্রীযুক্ত শৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী শুক্রাচার্য্যের স্বপ্ন ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

কোন্ মৌজায় নালিশসূত্রে খাজনাদি কত টাকা পাওনা থাকে তাহা মৌজার জমাওয়াশীলবাকীর "নালিশীবাকীর" সহিত মিল করা যায় না। এষ্টেটের বিরুদ্ধে খাজনা বাকীর মোকদ্দমা মৌজা বিভাগে লিখিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। ভূম্যধিকারীর খাজনা-প্রদানের হিসাব-বহিস্থত্রে বাকীজায়ের সহিত নালিশী দেনার মিল হইবে।

দেওয়ানী আদালতের প্রত্যেক মোকদ্দমায় যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে ফয়সালার লিখিত উকিল-ফিস্ ব্যতীত জাবেদা খরচ বাদ দিলে বক্রী টাকা বেজাবেদা খরচ অর্থাৎ নাপত্তি টাকা হয়। প্রত্যেক মোকদ্দমার হিসাবের খরচের সমষ্টির বিতং দিয়া জাবেদা এবং বেজাবেদা খরচের পরিমাণ দেখাইতে হয়। প্রতি সন মোকদ্দমা হিসাবের বাকীজায়ে বেজাবেদা খরচ রেয়াত দিতে হয়। পরবর্ত্তী সনের হিসাবে জাবেদা খরচ লইতে হয়। মোকদ্দমা হিসাবের বাকীজায় অনুসারে সাধারণ-খতিয়ানের মোকদ্দমা হিসাবের ব্যয়ের সমষ্টির বিতং দিয়া জাবেদা এবং বেজাবেদা খরচ দেখাইতে হয়। সালতামামি জমাখরচে মোকদ্দমার ব্যয়ের বিতং দিতে হয়। মূল মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জাবেদা খরচ পাওনাশ্রেণীভুক্ত থাকে। প্রতি সন মোকদ্দমার বেজাবেদা খরচ বাদ না দিয়া এবং মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পর উহা বাদ দিলে সেই বৎসর ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া লাভ কম হইবে। এজন্য প্রতি সন বেজাবেদা খরচ বাদ দিতে হয়। প্রত্যেক মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত ব্যয় হিসাবগুলি দেখিলেই জানা যাইবে।

নিম্নতন কাছারির সালতামামি জমা-খরচ উর্দ্ধতন কাছারির সুমারভুক্তকরণ

নিম্নতন কাছারির সালতামামি জমা-খরচে জমার অংশে যে সকল বিষয়ে যত টাকা জমা আছে এবং তন্মধ্যে উর্দ্ধতন কাছারির সুমারে ঐ সকল বিষয়ে কত টাকা জমা হইয়াছে তাহার মিল করিতে হয়। কোনও বিষয়ে টাকা কমিবেশী হইয়া থাকিলে, সেই বিষয়ের টাকা উর্দ্ধতন কাছারির সুমারে জমা-খরচ করিয়া লইতে হইবে। নিম্নতন কাছারির গত সনের তহবিলের মধ্যে আদায় বাদে বক্রী যে টাকা তহবিল থাকে তাহা উর্দ্ধতন কাছারির সুমারে জমা করিতে হয়। অর্থাৎ নিম্নতন কাছারির প্রত্যেক বিষয়ের জমার মধ্য হইতে ইরশালী টাকা বাদ দিয়া বক্রী টাকা উর্দ্ধতন কাছারির সুমারে জমা বা খরচ লিখিতে হয়। নিম্নতন কাছারির বর্ত্তমান সনের তহবিল উর্দ্ধতন কাছারির সুমারে খরচ লিখিতে হয়।

সুমারের তহবিল বুঝ্‌করণ

সুমার হইতে সাধারণ হিসাবে খতিয়ানী করিতে ভুল হইতে পারে কিংবা সুমারে যোগ-বিয়োগের ভুল থাকিতে পারে কিংবা সুমারের এক পৃষ্ঠার অঙ্ক অন্য পৃষ্ঠায় লইবার (ইজাবাজের) ভুল থাকিতে পারে, ইহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাকে "তহবিল বুঝ"কাগজ বলে।

জমিদারী সেরেস্তায় সালতামামি জমা-খরচ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে গত সনের সাধারণ হিসাবের উদ্বর্ত্ত অঙ্ক পরবর্ত্তী সনের সাধারণ-হিসাবে আনিবার রীতি নাই।

সাধারণ-খতিয়ানের সমস্ত হিসাবের জমার এবং খরচের সমষ্টি করিতে হয়। জমার সমষ্টির সহিত গত সনের সুমারের তহবিল যোগ দিতে হয়। তৎপর জমার মোট সমষ্টি হইতে খরচ বাদ দিলে যে উদ্বর্ত্ত অঙ্ক থাকিবে, উহা জমা-খরচের তহবিলের সহিত মিল হইবে। ইহাকে তহবিলবুঝকরণ কহে। তহবিলবুঝকাগজের দ্বারা এক হিসাবের টাকা ভুলক্রমে অন্য হিসাবে খতিয়ানী হইলে উহা ধরা পড়ে না।

প্রতি মাসে তহবিলবুঝকাগজ প্রস্তুত করিতে হয়; অন্যথা সহজে পূর্ব্বোক্ত ভুলভ্রান্তি বাহির করা যায় না। সুমারে প্রত্যেক মাসে যত টাকা জমা এবং খরচ হয়, তাহার সহিত সাধারণ-খতিয়ানের সমস্ত হিসাবের জমার এবং খরচের সমষ্টির মিল হইবে, জমা বা খরচের যে দিকে মিল হইবে না, সেই দিকে সুমারের সহিত হিসাবগুলির রুজু দিয়া ভুল বাহির করিতে হয়। তহবিল-বুঝ হইবার পর বাকীজায় অনুসারে বিশেষ-হিসাবের বর্ত্তমান সনের অপরিশোধিত দেনা প্রত্যেক বিষয়ের নামে (ব্যক্তির নামে নহে) সুমারে জমা-খরচ করিতে হয়। তৎপর সাধারণ খতিয়ানের সমস্ত হিসাবে গত সনের উদ্বর্ত্ত অঙ্ক আনিয়া শেষ তহবিলবুঝকাগজ (দোফর্দ্দী) প্রস্তুত করিতে হয়।

দ্রষ্টব্য :—তহবিলবুঝকাগজ প্রস্তুতের সহায়তার নিমিত্ত জমা-খরচে গত রোজের তহবিল অগ্রে না আনিয়া

দৈনিক জমার সমষ্টি করিবার পরে গত রোজের তহবিল আনিবার রীতি আছে।

লাভ-লোকসানের হিসাব

কাল্পনিক নামের হিসাবগুলিকে লাভ বা লোকসানের হিসাব কহে। যে টাকা মালিককে ফেরত দিতে হইবে না, তাহাই মালিকের লাভ এবং যে টাকা মালিক ফেরত পাইবেন না, তাহাই মালিকের লোকসান। সাধারণ-খতিয়ানে লাভ-লোকসান কিংবা লভ্য-ক্ষতি নামকরণে একটি হিসাব সৃষ্টি করিতে হয়; উহাতে কাল্পনিক নামের হিসাবগুলি দাখিল দিয়া লইতে হয়।

নিকাশী জমা-খরচ বা রেওয়া বা উদ্বর্ত্তপত্র

কার্য্যের সৃষ্টি হইতে দেনা এবং পাওনা উদ্বর্ত্তপত্র দৃষ্টে জানা যায়। সাধারণ-খতিয়ানে তিন শ্রেণীর হিসাব থাকে। যথা:—(ক) ব্যক্তির নামীয় হিসাব (জমিদারী-সেরেস্তার আমানত, হাওলাত ইত্যাদি দ্যোতক শব্দ); (খ) স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির (বস্তু) হিসাব; (গ) কাল্পনিক নামের (বেতন, খাজনা ইত্যাদি) হিসাব।

সাধারণ-খতিয়ানের হিসাবগুলির উদ্বর্ত্ত অঙ্ক লইয়া নিকাশী জমা-খরচ প্রস্তুত হয়। সুমারের তহবিল (নগদ ও হাওলাত) পাওনার দিকে দেখাইয়া উদ্বর্ত্তপত্রের দুই অংশ (দেনা এবং পাওনা) সমান করা হয়।

জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্পত্তির উন্নতি কল্পে বেশী টাকা ব্যয় হইলে, উহা একযোগে লাভ-লোকসানের হিসাবে বাদ না দিয়া ক্রমে ক্রমে বাদ দিতে হয়।

জমিদারী সম্পত্তির প্রকৃত আয় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার সহিত অন্য প্রকারের উৎপন্ন আয় (যথা:—ব্যাঙ্ক আদিতে গচ্ছিত টাকার সুদ, ডিভিডেণ্ড ইত্যাদি) দেখাইতে হয়। অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত (নষ্ট) হয় এবং উহার মূল্য হ্রাস পায়। যে দ্রব্য বিক্রয় করিলে ভবিষ্যতে কথঞ্চিৎ মূল্য পাইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই দ্রব্যকে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা বিধেয়। অস্থাবর সম্পত্তির স্থায়িত্ব কত বৎসর হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণে প্রতি বৎসর মূল্যের মধ্য হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কিংবা বার্ষিক শতকরা হারে কিছু টাকা বাদ দিতে হয়। ইহাকে খাস্তা (depreciation) কহে। অস্থাবর সম্পত্তির নামে টাকা জমা করিয়া খাস্তা হিসাবে খরচ লিখিতে হয়। খাস্তা বাদ পড়িয়া পরিণামে উহা মূল্যবিহীন অবস্থায় উদ্বর্ত্তপত্রে প্রদর্শিত হয়। জমিদারীর মুনাফার একটি হিসাব এবং খাঁটি (নিট) মুনাফার একটি হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। অনাদায়ী পাওনার বিবরণী (অর্থাৎ সমগ্র জমিদারীর একজাইজমাওয়াশীলবাকীর সদর ফর্দ্দ) উদ্বর্ত্তপত্রের সহিত সম্যক অবস্থা জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রদান করিতে হয়।

নিকাশী কাগজ পরীক্ষা

১। প্রত্যেক বিশেষ-হিসাববহির বাকীজায়ের সহিত সাধারণ-হিসাবের উদ্বর্ত্ত অঙ্ক মিল করিতে হইবে।

২। একজাইজমাওয়াশীলবাকীর সহিত নিম্নলিখিত বিষয়ের মিল করিতে হইবে।

(ক) ওয়াশীলের সহিত সালতামামি জমা-খরচের খাজনা এবং সুদ;

(খ) খারিজদাখিলের সহিত ৫ নম্বর ও ৬ নম্বর সাধারণ রেজিষ্টার;

(গ) জমা কমবেশীর সহিত ৯ নম্বর সাধারণ রেজিষ্টার;

(ঘ) রেয়াতের সহিত ৮ নম্বর সাধারণ রেজিষ্টার।

৩। পতিত পলাতকা এবং খাস জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের সাধারণ রেজিষ্টারের সহিত সালতামামি জমা-খরচের আকর বিক্রয়ের মূল্য জমার বা উৎপন্ন শস্য প্রাপ্তির রেজিষ্টারের মিল করিতে হইবে।

৪। কোনও ডিগ্রী বা কর্ম্মচারীর নিকট প্রাপ্য তহবিল বা হাওলাতী টাকা বা নিকাশী নালিশ তামাদি হইয়াছে কি-না, তাহা পরীক্ষাকরণ,

৫। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির রেজিষ্টারের সহিত সম্পত্তি মিলকরণ,

৬। দাখিলাবহি-বিলির রেজিষ্টার শুদ্ধ মত লিখিত হইয়াছে কি-না?

৭। কর্ম্মচারিগণ নির্দ্দিষ্ট তহবিলের অতিরিক্ত তহবিল রাখিয়াছে কি-না?

৮। আমানত গ্রহণের এবং হাওলাত প্রদানের আদেশ-পত্র আছে কি-না? উহা জমা-খরচ করিতে বাকী আছে কি-না, থাকিলে কারণ কি?

৯। সুমারের জমার এবং খরচের রসিদপত্র ঠিকমত আছে কি-না?

১০। প্রজার খাজনা তামাদির কারণ কি? গত সন পর্য্যন্ত তামাদির টাকা, বেতানাদি টাকা এবং বর্ত্তমান সনের হস্তবুদের টাকা শতকরা কি হারে আদায় হইয়াছে? হাল সনে শতকরা কি হারে খাজনাদি তামাদি হইয়াছে?

সালতামামি জমা-খরচ

সাধারণ-খতিয়ানের হিসাবগুলির জমার এবং খরচের সমষ্টি লইয়া সালতামামি জমাখরচ প্রস্তুত হয়। ফেরত-জমার ফেরত-খরচ বাদ দিয়া জমার এবং খরচের উদ্বর্ত্তঅঙ্ক দেখাইতে হয়। সালতামামি জমাখরচ প্রস্তুতের পর সাধারণ হিসাবের মুসমা (বাদ) কাটিতে হয়।

আদর্শ

জমা

১। খাজনা আদায় খাতে
২। সেসাদি।
৩। সায়রাত মহালের খাজনা
৪। খাজনার সুদ
(ক) দাখিলা সূত্রে; (খ) নালিশ সূত্রে
৫। আকর বিক্রয়
৬। নজর সেলামী, যথা:—
(ক) শুভপুণ্যাহ; (খ) খারিজ দাখিল; (গ) জমি পত্তন, (ঘ) ভূম্যধিকারীর ফিস্ (নামজারীর নজর); (ঙ) হিসাব-পৃথক; (চ) নজর
৭। বিবিধ বা বাজে আদায়
* ৮। মোকদ্দমা খরচ
(ক) জাবেদা; (খ) বেজাবেদা
* ৯। তহবিল আদায়
* ১০। আমানত জমা
(ক) প্রজার; (খ) অন্য ব্যক্তির
* ১১। কর্জ্জ জমা
১২। কেফাইত জমা
* ১৩। দেনা জমা।
(ক) হাল সনের ভূম্যধিকারীর খাজনা বাকী; (খ) ঐ বেতন বাকী; (গ) ঐ মোকদ্দমা খরচ; (ঘ) ঐ বিবিধ।
** ১৪। বিবিধ, যথা:—
(ক) কোম্পানী কাগজের সুদ; (খ) ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার সুদ; (গ) ডিভিডেণ্ড; (ঘ) অন্য প্রকার।

খরচ

১। রাজস্ব প্রদান খাতে (হাল সনের)
২। ভূম্যধিকারীর খাজনা ঐ
৩। সেসাদি ঐ
৪। হাল সনের অপরিশোধিত খাজনা সেসাদি খরচ খাতে;
* ৫। বকেয়া খাজনাদি প্রদান
৬। সুদ প্রদান খাতে
(ক) দাখিলা সূত্রে; (খ) নালিশ সূত্রে
৭। ট্যাক্স-আদি প্রদান
(ক) ইন্‌কামট্যাক্স; (খ) চৌকিদারী ট্যাক্স; (গ) মিউনিসিপাল ট্যাক্স।
৮। শুভ পুণ্যাহ খরচ
(ক) সদর কাছারি; (খ) মফঃস্বল কাছারি: (গ) তহশীল কাছারি।
৯। সম্পত্তি পরিচালনের ব্যয়
(ক) সদর কাছারির বেতন: (খ) ঐ মফঃস্বল কাছারি; (গ) ঐ তহশীলদার; (ঘ) কমিশনসূত্রে আদায়
(ঙ) হালসনের অপরিশোধিত বেতন
* ১০। বকেয়া বেতন শোধ
১১। বারবরদারী খরচ
১২। বিবিধ খরচ যথা:—প্রজা, কর্ম্মচারী প্রভৃতি
১৩। হিসাব নিকাশ গ্রহণের ব্যয়
১৪। ডাকমাশুল ব্যয়—
(ক) সদর; (খ) মফঃস্বল
১৫। দপ্তর সরঞ্জামী
১৬। ছাপা খরচ
১৭। বহি বাঁধাই খরচ
১৮। দাখিলা বহি
১৯। জরিপজমাবন্দী

খর

২০। অতিরিক্তি সরঞ্জামী, যথা:—
ঠিকা কর্ম্মচারী; ঘাট পালী নৌকা ইত্যাদি
২১। সম্পত্তি রক্ষণ্নোতি
২২। মেরামতি খরচ;
২৩। দাতব্য
(ক) বন্ধানী; (খ) রাজসিক দান (গ) বিবিধ
* ২৪। বকেয়া বিবিধ দেনা শোধ খাতে
* ২৫। অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ
* ২৬। স্থাবর সম্পত্তি খরিদ
(ক) নিলামে; (খ) কবালা মূলে
* ২৭। মোকদ্দমা খরচ, যথা:—
(ক) দেওয়ানী আদালতের জাবেদা খরচ; (খ) ঐ বেজাবেদা; (গ) ফৌজদারী প্রভৃতি আদালত; (ঘ) হালসনের অপরিশোধিত খরচ
* ২৮। মোকদ্দমার দেনা শোধ
* ২৯। কর্জ্জ শোধ (আসল)
৩০। কর্জ্জাটাকার সুদ
* ৩১। আমানতী শোধ
(ক) হাল; (খ) বকেয়া;
* ৩২। তহবিল খরচ
** ৩৩। মালিকের ভরণপোষণ বৃত্তি
** ৩৪। মালিকের ব্যয়, যথা:—
(ক) ধর্ম্মক্রিয়া; (খ) লৌকিকতা; (গ) শিক্ষাব্যয়; (ঘ) চিকিৎসা; (ঙ) স্কুল; (চ) হাসপাতাল; (ছ) বিবিধ।
৩৫। হালসনের অপরিশোধিত বিবিধ দেনা
* ৩৬। ব্যাঙ্ক আদিতে আমানত।

দ্রষ্টব্য : * চিহ্নিত বিষয়গুলি জমিদারীর দেনা এবং পাওনা। ইহার সহিত লাভ-লোকসানের সংস্রব নাই। জমিদারীর লাভ-লোকসানের হিসাব প্রস্তুত করিবার পর নিট মুনাফার হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। এই হিসাবে ** চিহ্নিত বিষয়গুলি সন্নিবেশ করিয়া প্রকৃত লাভ বা লোকসান নির্ণয় করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সালতামামি জমাখরচে যে যে বিষয় (হেড্) প্রদর্শিত হইবে তদনুরূপ সাধারণ হিসাবের হেডিং নির্ণয় করিতে হয়।

লাভ-লোকসানের হিসাব

কাল্পনিক নামের জমা ও খরচ অনুসারে প্রস্তুত হয়

লাভ বা লভ্য বা আয়

১। খাজনা ও সেসাদি
২। সায়রাত মহালের খাজনা
৩। খাজনার সুদ
৪। আকর বিক্রয়
৫। নজর সেলামি
৬। বিবিধ বা বাজে আদায়
৭। গত সনের মোকদ্দমার বেজাবেদা খরচ আদায়
৮। উকিল ফিস (যাহা ফয়সালায় বার হয়)
৯। কেফাইত জমা

সমষ্টি

বাদ লোকসান

জমিদারীর লাভ

লোকসান বা ক্ষতি বা ব্যয়

১। রাজস্ব, খাজনা ও সেসাদি।
২। হাল সনের ভূম্যধিকারীর অপরিশোধিত খাজনাদি।
৩। সুদ প্রদান
(ক) খাজনার ; (খ) কর্জ্জা টাকার।
৪। ট্যাক্স প্রদান
৫। সম্পত্তি পরিচালনের ব্যয়
(৮।৯।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০ নম্বর সালতামামি জমাখরচ)
৬। হাল সনের অপরিশোধিত বেতন (৯ ঙ)
৭। সম্পত্তি রক্ষণোন্নতি
৮। মেরামতি খরচ
৯। দাতব্য
১০। হাল সনের অপরিশোধিত বিবিধ দেনা
১১। মোকদ্দমার বেজাবেদা খরচ (২৭ খ ও গ নম্বর)
১২। হাল সনের অপরিশোধিত মোকদ্দমা ব্যয় (২৭ ঘ নম্বর)
১৩। বাকী খাজনার নালিশে নিলাম খরিদা জোত যাহা মালিকের খাস হয়

সমষ্টি

দ্রষ্টব্য :—জমিদারী সেরেস্তায় সালতামামি জমাখরচ উদ্বর্ত্তপত্রের সহিত প্রদত্ত হয়, এ কারণ লাভ-লোকসানের হিসাবে প্রত্যেক অধীন হেডের (বিষয়ের) নাম প্রদত্ত হয় না। প্রধান হেডে আয় বা ব্যয় প্রদর্শিত হয়। সম্পত্তি পরিচালনের ব্যয়ের হেডে অধিকাংশ ব্যয় লিখিত হয়।

বাকী খাজনার নিলামে এষ্টেটের পক্ষে সম্পত্তি খরিদ হইয়া যদি উহাতে সম্পূর্ণ মালিকীস্বত্ব বর্ত্তে তবে ঐ খরিদা সম্পত্তি লোকসান হেডে দেখাইতে হয়।

জমিদারীর মুনাফা হিসাব প্রস্তুত করিয়া তাহার পর নিট মুনাফার হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়। আদর্শ, লাভ-লোকসানের হিসাবের অনুরূপ।

উদ্বর্ত্তপত্র (Balance Sheet)

সাধারণ খতিয়ানের হিসাবগুলির উদ্বর্ত্ত অঙ্ক

দেনা

১। মূলধন
২। অপরিশোধিত দেনা
(ক) ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনাদি
(খ) বেতন
(গ) মোকদ্দমার ব্যয়
(ঘ) বিবিধ
৩। আমানত জমা
৪। নিট মুনাফা

সমষ্টি

পাওনা

১। স্থাবর সম্পত্তি
২। অস্থাবর সম্পত্তি
৩। মোকদ্দমা খরচ
৪। কর্ম্মচারীর তহবিল
(ক) ভূতপূর্ব্ব ও (খ) বর্ত্তমান কর্ম্মচারী ;
৫। ব্যাঙ্ক-আদিতে ন্যস্ত টাকা
৬। নগদ টাকা
৭। হাওলাতী টাকা

সমষ্টি

সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

শ্রীকৃষ্ণের পার্ট নিয়েই হ'ল মুস্কিল।

বইয়ের সেরা পার্ট, কিন্তু কেউ নিতে রাজী নয়। অথচ অন্য পার্ট নিয়ে রীতিমত ঝগড়া বেধে যায়—ভাল পার্টটা কার ভাগ্যে যাবে।

নিতাই 'রূপ বাসর'-এর আর্ট-ডিরেকটার। মুরুব্বিয়ানা চালে সে বলল: আরে, শ্রীকৃষ্ণই তো আসর জমিয়ে রাখবে। এ পার্ট যে নেবে, এবার পূজায় তো তারই বাজী মাত।

নিতাই সকলের দিকে একবার চোখ ঘুরাল। কাঠের জলচৌকিতে হ্যারিকেনটা দপ্ দপ্ করছে। কারো চোখেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পার্ট নেবার আগ্রহ দেখা গেল না।

নিতাই ওপাশের হ্যাংলা ছেলেটাকে বলল: এই সতে, তুই নে না পার্টটা। তোকে বেশ মানাবে। বেশ শ্যামলা রঙ। তাছাড়া, দেখতেও তুই অনেকটা নুনুর মতই।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিতাইর বুকের বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন ঠেলে উঠল। ঘরের বাতাস হয়ে উঠল ভারী, বেদনাতুর।

সতে ওরফে সতীশ বলল: মাফ করো নিতুদা, কৃষ্ণের পার্ট আমি করতে পারব না। ও পার্ট নুনু যা করে গেছে, তেমন আর কেউ করতে পারবে না। কৃষ্ণ সেজে ষ্টেজে যে নামবে, সে-ই গোবর খাবে।

নিতাই জানে, কথাটা মিথ্যা নয়। এ পর্যন্ত যত 'রিলিজাস্' বই তারা প্লে করেছে, সবগুলিতেই কৃষ্ণের পার্ট করেছে নুনু। ওঃ, সে কি চমৎকার অভিনয়। যেমন একহারা শ্যামলা চেহারা, কোকরা চুল, নীলাভ টানা দুটি চোখ, তেমনই মধুর গলা।

কিন্তু নুনু নাই বলে তো আর থিয়েটার বন্ধ হতে পারে না। নিতাই তাই গলা ঝাঁঝিয়ে উঠল: হ্যাঃ, সে আবার একটা কথা। জানিস্ তোরা যে-সাজাহানের পার্ট শিশির ভাদুড়ী এমন মার্ভেলাস করত, সেই সাজাহানের পার্ট ক'রেই অহীন্দ্র চৌধুরী শেষে টেক্কা মেরে দিল। জানিস্ তোরা সে কথা?

সতীশ ঘাড় নীচু ক'রে বলল: তুমি যাই বল নিতুদা, কৃষ্ণের পার্ট করে ষ্টেজের উপর আমি টিটকারী খেতে পারব না।

নিরাশ হয়ে নিতাই গণেশকে ধরল। কিন্তু গণেশও গররাজী, সে তো সুর ধরেই বলে উঠল: ওরে বাপরে, পঙ্গু হ'য়ে লঙ্ঘিব সুমেরু? দোহাই তোমার নিতুদা, সে আমারে দিয়ে হবে না। জান তো সেবার, নুনুদার অসুখ হলে কৃষ্ণের পার্টের জন্য কত রিয়ার্সেল দিলাম। নুনুদা অসুখ শরীরে কত শিখাল, তুমি হাত ধরে দেখিয়ে দিলে বারবার, কিন্তু কিছুতেই তার মত ক'রে বলতে তো পারলাম না:

ভেসে এস আকাশের নীলের তরঙ্গ,
এস কোথা জলদের আভা,—

রিয়ার্সেল-ঘর স্তব্ধ। সবারই মনে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের একটি দৃশ্য ভেসে উঠল: সিংহাসনে দুর্যোধন, চারদিকে পাত্রমিত্র। নীচে পঞ্চপাণ্ডব। মাঝখানে দুঃশাসন ক্ষিপ্রহস্তে ভীতা ব্যাকুলিতা দ্রৌপদীর বসনাঞ্চল আকর্ষণ করছে। এমন সময় তীব্র জ্যোতিতে আবির্ভাব হল শ্রীকৃষ্ণের। দৃঢ়হাতে সুদর্শনচক্র ঘুরিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল বজ্রগম্ভীর স্বরে:

ভেসে এস আকাশের নীলের তরঙ্গ,
এস কোথা জলদের আভা···

রিয়ার্সেল-ঘরে সমবেত সকলের কানে বাজতে লাগল একটি দূরে-চলে যাওয়া তরুণের কণ্ঠস্বর—সে স্বর, নুনুর গলার।

পাগ্‌লা ঐতিহাসিক বইয়ের পক্ষপাতী। এবার সে সুযোগ বুঝে বলল: সত্যি নিতুদা, কৃষ্ণের পার্ট আর আমাদের চলবে না, ও বই তুমি বাদ দাও। তার চেয়ে বরং একখান ঐতিহাসিক বই-ই ধর এবার।

নিতাই জবাব দিল: না না, তা হয় না। একে তো পূজার বাজার। তাতে ও পাড়ার বুড়ো কর্তা এবার কটা টাকা দেবে বলেছেন। কিন্তু কেষ্ট-বিষ্টু না হলে তাঁর মনও মজবে না, আর আমাদের চিঁড়েও ভিজবে না।

যাহোক, শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে মিলল। বড় পার্টের লোভে ও সকলের অনুরোধে সতীশই কৃষ্ণ সাজতে রাজী হল। রাতের দুটো তিনটে পর্যন্ত হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় রিয়ার্সেল চলতে লাগল।

দেখতে দেখতে পূজা এসে গেল। 'রূপ বাসর'-এর কর্মীরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে থিয়েটারের কাজে ব্যস্ত। কেউ বাঁশ কাটছে, খাদ খুঁড়ছে, ষ্টেজ বাঁধার কাজকর্ম দেখছে। কেউ শহরে গেল প্রোগ্রাম ছাপতে। কেউ-বা ওপাড়ার কর্তার কাছে গেছে লাল সালুর পর্দাটা চেয়ে আনতে ষ্টেজের স্ক্রীন হবে সেটা।

তার উপর আছে ড্রেস-পত্রের হাঙ্গামা। পাড়াগাঁয়ের সখের থিয়েটার। চারটে বহুরঞ্জিত দৃশ্যপট, একটা রঙচটা হার্মোনিয়ম, চেয়ে-আনা ডুগী-তবলা, আর তীর-ধনুক-বর্শা-ছোরা প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিষ ছাড়া কিই বা আর আছে। অথচ থিয়েটার করতে হ'লে তো চাই সবই। রাজারাজড়ার পোষাক, বিচিত্র সাজসজ্জা, ঝকমকানো শিরস্ত্রাণ, কবচ-কুণ্ডল-মালা। কত কি।

ড্রেস-সমস্যা নিয়ে তাই সকলে ব্যস্ত। অবশ্য চেষ্টার অসাধ্য পৃথিবীতে কিছু নাই। এবং নাই বলেই প্রতি বছরই 'রূপবাসর'-এর থিয়েটার হাততালির ভিতর দিয়েই শেষ হয়ে আসছে এযাবৎ। এবং এবারও হবে।

পোষাক কারো কারো নিজেরই একসেট ক'রে আছে। পাট-রেশমের রঙিন কাপড় একখানা, ফুলতোলা একটা জামা, একটা ওড়না আর ঝুটো মতির কিছু মালা, বাস। দেবসভার ইন্দ্র হতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেনাপতি পর্যন্ত সকলেরই এই পোষাক। আর এও যাদের নাই, তারা কোন-রকমক'রে বৌদির শাড়ীখানা, বড়দির ব্লাউজটা, চার পয়সার ফুকার দানার মালাছড়া,—এই দিয়েই কাজ সেরে নেয়। মোট কথা, অভিনয় অচল থাকে না।

এবার কিন্তু গোল বাধাল সতীশ। একে তো সকলে বলেকয়ে তাকে কৃষ্ণের পার্ট করতে রাজী করিয়েছে, তার উপর রিয়াসেলেও সে উৎরেছে ভালই। সুতরাং বায়নাক্কাও তার বেড়ে গেছে। এতদিন সে মুনিঋষির পার্ট ক'রে আসছে। ঠাকুরমার নামাবলী দিয়েই সেরেছে কাজ। ড্রেসপত্র তার কিছুই নাই। এবার সে বেঁকে বসল: ভাল পোষাক না পেলে ষ্টেজে নেমে আমি লোকহাসাতে পারব না।

ভাল পোষাক পাওয়া তো সোজা কথা নয়। যাদের দু-এক সেট আছে, তারাই-বা তা দিতে যাবে কেন। সখ-আহ্লাদ তো তাদেরও আছে।

নিতাই ঠিক করেছিল,—কিছু ঝুটো মতি এনে মালা, কবচ, কুণ্ডল বানিয়ে দেবে, আর নীল কাপড় সাজিয়ে গুছিয়ে ষ্টেজ মাত ক'রে দেবে।

কিন্তু সতীশ এত সহজে মাত হল না। ভাল পোষাক তার চাই-ই।

নিতাই ঠোঁট ঝাঁকি দিল: ভাল পোষাক মানে—কি পোষাক তোর চাই বল্ তো?

সতীশ জবাব দিল: ভাল হ'লেই হল। এই—নুনুদা যেমন পরে নামত ষ্টেজে তেমনই।

নুনুর কৃষ্ণের ড্রেসটি ভারী সুন্দর। একসেট মালা। লাল-নীল পাথর বসানো তাতে। মাথায় চূড়া। গায় হলদে অরগ্যান। পিঠে পীতবসন। পরনে হলদে পাটের কাপড়, পায় ভেলভেটের হলদে নাগরা। চমৎকার!

শ্রীকৃষ্ণ-বেশী নুনুর ছবি ভেসে উঠল সকলের চোখে। সারা কপালে চন্দন লেখা। নাকের উপর রসকলি। গায় ঝকঝকে পোষাক। হাতে পিতলের চকচকে বাঁশী। বেশ বাঁশী বাজাত নুনু।

নুনুর থিয়েটারের ভারী সখ। পূজার জুতা কিনবার জন্যে পাঁচ টাকা আদায় ক'রে নিল বাবার কাছ থেকে। শহরে গিয়ে আঠার আনা দিয়ে কিনল সাদা কেড্‌স্। আর বাকী টাকা দিয়ে তৈরী করে নিয়ে এল জমকালো একটা অরগ্যানে-পোষাক। ভোলানাথ অপেরার শ্রীকৃষ্ণ যেমন গায় দিয়েছিল অবিকল তেমনই একটি জরির ফুলকাটা হলদে রঙের অরগ্যান-পোষাক।

গণেশ বলিল: নুনুদার পোষাকটা হলে সতেকে বেশ মানাত কিন্তু সত্যি।

নিতাই জবাব দিল নিরাশার স্বরে: সে পোষাক তো তার মার কাঠের সিন্দুকে আটকানো। তা আর এখন পাওয়া যাচ্ছে কোথায়।

গণেশ চটপট উত্তর দিল: কেন? চাইলেই হয় তার মা'র কাছে। একটা রাতের জন্যে তো মোটে।

নিতাই চোখ তুলল, সেখানে ব্যথার ছায়া: কিন্তু ওর মার কাছে কি তা চাওয়া যায় রে? চাইতে গেলেই ওর মা যে ড়ুকরে কেঁদে উঠবে।

: সরাসরি কি আর চাইতে হয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক সময় কথাটা পাড়তে হয় আর কি।

: তুই পারবি বলতে গণেশ?

গণেশ হঠাৎ কথা বলতে পারল না। থেমে গেল। একটু পরে বলল: এক রকম ক'রে বলতেই হবে। নইলে যে থিয়েটারই মাটি হয়ে যায়।

তাই ঠিক হ'ল। সেদিন সন্ধ্যার পরেই গণেশ নুনুর মায়ের কাছে হাজির হ'ল। এবং নানা কথার ফাঁকে কৃষ্ণের পোষাকটা একরাতের জন্য চেয়ে এল। নুনুর মা রাজী হয়েছে।

সতীশ নতুন দম নিয়ে পার্ট মুখস্থ করতে লাগল।

সপ্তমী পূজার দিন থিয়েটার।

কাক-ভোরে উঠে গণেশ শহরে গেছে প্রোগ্রাম আনতে। বেলা গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তার দেখা নাই। সকলে মহা ভাবনায় পড়ল। দুপুরের পরে ছিটেফোঁটা খানিকটা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। শহরের ওদিকে জল নামে নাই তো। তাহলে তো সর্বনাশ। কাঁচা রাস্তা। গণেশ সাইক্‌ল্ নিয়ে গেছে।

সন্ধ্যা ক্রমে রাতের আঁধারে মিশে গেল। পূজা-মণ্ডপে আরতির ঢাক বেজে বেজে থেমে গেল। গণেশ এল না।

'রূপবাসর'-এর কর্মীবৃন্দ 'গ্রীন রুম' নিয়ে ব্যস্ত। পার্টের তাড়া হাতে নিয়ে সতীশ বসে আছে একটা টুলে। তার 'পেন্ট' শেষ হয়েছে। সমস্ত কপালেও গালের নীচু অবধি চন্দনের ফোঁটা এঁকে দেওয়া হয়েছে দুসারি ক'রে। নাকের উপর আঁকা হয়েছে সরু রসকলি।

এখন পোষাকটা এলেই হয়।

কিন্তু পোষাক যে আনবে সেই শ্রীমান গণেশেরই যে পাত্তা নাই এখনও। যতসব দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে। সেই ভোরে গেছে শহরে, এখনও ফিরবার নাম নাই। কর্মীরা সব রাগে ফেটে পড়তে লাগল।

বাইরে লোকজন জমা হয়েছে বিস্তর। চারদিকে হাঁকডাক সুরু হয়েছে। ভিতরে কনসার্টের টুংটাং শব্দ উঠছে। রামচরণ সিনের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বত্র উচ্চকিত প্রত্যাশা। অথচ—

নিতাই মরিয়া হয়ে গর্জে উঠল চাপা গলায়: নাঃ, এ অকর্মার আশায় বসে থাকলে আজ আর জাতমান থাকবে না। আমিই যাচ্ছি পোষাক আনতে। তোমরা কেউ একজন এস আমার সাথে। যতসব ছেলেমানুষ নিয়ে কারবার।

নিতাই আবছা আঁধারে একাই বেরিয়ে গেল জোরকদমে। পাগলা

তাড়াতাড়ি একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে তার পিছু নিল। প্রথম বেল দিয়ে তখন জোর কনসার্ট সুরু হল।

মুমুদের উঠানে পা দিয়েই নিতাই থমকে দাঁড়াল।

পাগলা চমকে শুধাল : কি নিতুদা?

নিতাই ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে বলল : আস্তে। শুনছিস্?

দুজনে কান পাতল। ভিতরে চাপা আর্তনাদ। কে যেন কাঁদছে। দুঃসহ যাতনায় কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে।

দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। তাদের চোখে জিজ্ঞাসা।

নিতাই বলল : মুনুর মা।

দুজনে খানিক দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে। কান্নার শেষ নাই। দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ক্রন্দনধারা আজ যেন মুক্তি পেয়েছে প্রকাশের সমতলক্ষেত্রে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল ওরা। কনসার্টের শব্দ কানে আসছে। লোকজনের হৈ চৈ ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিটি সেকেণ্ড ওঠা-নামা করছে ওদের বুকে। আর ওরা দেরী করতে পারে না। অথচ সাহস ক'রে মুমুর মাকে ডাকতেও পারছে না।

অতিষ্ঠ হয়ে নিতাই জানালার পাশের পেয়ারা গাছটায় উঠল অতি সতর্ক পায়ে। দোডালায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েই নিতাই শিউরে উঠল। মুমুর সমস্ত ড্রেস বিছানার উপর ছড়িয়ে নুনুর মা উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে। বিশ্রস্ত বসন। একরাশ রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে। কান্নার আবেগে সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠছে ঝড়ের সাগরের মত।

ধীরে ধীরে পেয়ারা গাছ থেকে নেমে নিতাই বলল : চল্।

: কোথায় নিতুদা?

: থিয়েটারের ওখানে।

: পোষাক?

: পোষাক নেওয়া হবে না।

নিতাই পা চালিয়ে দিল। পিছু পিছু এসে পাগলা শুধাল পরম বিস্ময়ে, কেন? কি হ'ল নিতুদা?

নিতাই হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিল : মাত্র সাত মাস আগে যে মারা গেছে তারই মার কাছ থেকে তার পোষাক এনে থিয়েটার করা যায় না রে, পাগলা। মানুষে তা পারে না।

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

থিয়েটার সে রাতে হয়েছিল। তবে আরম্ভ হবার আগে নিতাই স্বয়ং দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল : আধুনিক রুচি অনুযায়ী কৃষ্ণ-চরিত্রের উপর আমরা নতুন আলোকপাত করতে চাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ আজ সম্পূর্ণ একবস্ত্রে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন। বিশ্ব যাঁর অম্বর, তাঁর কি প্রয়োজন জমকালো পোষাকের আর ঝুটো মতির মালার!

ছেলেরা হাততালি দিয়ে উঠল।

পাশের গাঁয়ের 'অরুণোদয় নাট্যসঙ্ঘ'-এর সদস্যগণ দল বেঁধে এসেছিল থিয়েটার দেখতে। তাদের একটি ছোকরা টিপ্পনি কেটে উঠল : বুঝেছি। ভাল পোষাক জোটে নাই বলে শ্রীকৃষ্ণ এবার সন্ন্যাসধর্ম নিয়েছে।

একটা হাসির রোল পড়ে গেল। 'রূপবাসর'-এর ড্রপসিন তখন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে।

সন্ধানী

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়

১

রজনীর অন্ধকারে
জলিছে আমার দীপখানি
ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ দ্বারে
মৃদু মন্দ করাঘাত হানি'
কে যেন কহিয়া যায়,
"ওঠ জাগো, মুক্ত করো দ্বার,
আজিকার এ নিশায়
চিরাগত সেই অভিসার
লগন এসেছে বুঝি!
যা তোর পথের পুঁজি
সাথে লয়ে, ওরে ব্যর্থ প্রাণ
যাত্রা করো, এসেছে আহ্বান!"

২

"যাত্রা করো, যাত্রা করো—"
বাজে কানে, বাজে প্রাণে প্রাণে
সচকিত থরথর
প্রাণ মোর পথ নাহি জানে!
যারে খোঁজে নাহি পায়
যারে পায় তারে নাহি খোঁজে,
অদোসর নিরুপায়—
কেহ তার ব্যথা নাহি বোঝে!
ভীরু দীপ নিভে যায়
"সে কোথায়, সে কোথায়
কত দূর তাহার সন্ধান?"
কেঁদে কয় দিশাহারা প্রাণ।

৩

নিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গি
মর্ম্মে মর্ম্মে লাগে মোর দোলা ;
রাতের শিশির-বাণী
বনানীর কানে-কানে-বলা
ঘুমন্ত মালতী-বনে
জাগরণ-শিহরণ আনে ;
জাগ্রত টগর সনে
আঁখি মেলি দূরাকাশ পানে
অধীর প্রহর গুণি—
শিরায় শিরায় শুনি
সচঞ্চল শোনিতের গান,
"যাত্রা করো, ওরে ব্যর্থ প্রাণ !"

৪

আজিও পাইনি যারে
আমার জনম-ভোর খুঁজি,
অজানার অভিসারে
পূর্ণ প্রাণে লভিবারে বুঝি
নিভায়ে ঘরের বাতি
ছুটে যাই বাধা-বন্ধ-হারা ;
ঘনায় আঁধার রাতি,
কোথা কারো নাহি পাই সাড়া।
অসীম অরণ্য ধূ ধূ
বিষণ্ন বাতাস শুধু
বেদনায় মরে গুমরিয়া—
আরো দূর— ওরে ব্যর্থ হিয়া !

৫

ডাকে যেন সে আমারে
আমি যারে বাসিয়াছি ভালো
চলি তারি অভিসারে
সে যে মোর আঁধারের আলো ;
চলে যাই, দলে যাই
বিদায়ের শত ব্যথা-স্মৃতি,
পথে পথে ফেলে যাই
দল-ঝরা ফুল, প্রেম, প্রীতি ;
যারে আজ এনু ভুলে
বক্ষে তারে লব তুলে
যবে শুভ্র অভিসার-ক্ষণে
পূর্ণ প্রেম ঝলিবে মিলনে !

৬

সে লগ্ন আজিও দূর
অনিশ্চিত নিশীথের পারে,
তবু তার মায়াপুর
ডাকে যেন মুগ্ধ কামনারে ;
ডাকে যেন ডাকে মোরে
গ্রহতারা ডেকে চলে যায়,
কুসুমের গন্ধ-কোরে
ফোটা ফুল ডাক দিয়ে যায় !
হৃদয়ের অভিযানে
যুগে যুগে তারি পানে
ধেয়ে যাই দূর ছায়াপথে,
জ্যোতিষ্কের আলোতে আলোতে।

৭

চিরায় দিগন্ত-লীন
আজো তার পাইনি উদ্দেশ,
যত চলি রাত্রিদিন
যাত্রা মোর হয় না ক' শেষ ;
জীবন-সীমানা ভুলে
পার হ'য়ে এল বুঝি প্রাণ
মরণের উপকূলে,
শুনি যেন তুমুল তুফান
সেথা তারে নাহি পাই—
সিন্ধুপার হ'তে দেয় সাড়া,
পারাণির কড়ি নাই
কাঁদি তাই খেয়াতরী হারা !

৮

"কত দূর সে নিঠুর ?"
প্রশ্ন জাগে শঙ্কা লাগে মনে
তবু তার সে নুপূর
বক্ষে বাজে রুধির-স্পন্দনে ;
কণ্ঠ যদি হয় ক্ষীণ
অবসন্ন অচেতন তনু
তবু জানি, অমলিন
আত্মা মোর পিছে রেখে গেনু
মৃত্যুহীন প্রেমের গৌরবে
ভবিষ্যৎ চম্পার সৌরভে।
নাই হোল পথ-শেষ ?
শুধু তার গীত-রেশ
ভেসে থাক্ গন্ধ-সমীরণে
অন্তরের অন্তিম স্মরণে !

চিতাবাঘ

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ

(শিকার)

সেবার কেন জানি না, চিতাবাঘের উপদ্রব গারো পাহাড়ের নিম্নদেশে খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি, পাহাড় হইতে দুই মাইল দূরে আমাদের বাড়ীর পিছনেও বাঘ আসিতেছে—মাঝে মাঝে শুনা যাইত। প্রায়ই শুনিতে পাইতাম—'আজ এই পাড়ায় ছাগল পাওয়া যাইতেছে না; কাল ঐ পাড়ার কুকুরটাকে লইয়া গিয়াছে—সেদিন, গারো স্ত্রীলোকেরা কাঠ কাটিতে গিয়া বাঘের হুমকি খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে'—ইত্যাদি বাঘের অত্যাচার কাহিনী! আমারও তখন বসিয়া থাকিবার অবসর ছিল না; প্রায়ই পাহাড় জঙ্গলে শিকার অন্বেষণে কাটাইতে হইত।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে একদিন বেলা এগারটার সময় শ্রীযুক্ত 'গ'—বাবু বলিলেন,—"আজ সকালে একটা লোক আসিয়া বলিয়া গেল—'পলুয়াপাড়া' টিলা হইতে গতকল্য বৈকালে বাঘে একটা বাছুর লইয়া গিয়াছে—আমি তাহাদের কাল যাইব বলিয়া দিয়াছি।"

একথা শুনিয়া আমার বড়ই অনুতাপ হইল। এই তাজা খবরটা পাইয়া পরের দিন গেলে বাঘ পাইবার আশা নাই বলিলেই চলে, কারণ দুই রাত্রির মধ্যে "মরী" * (kill) খাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ, চিতাবাঘগুলির ঐভাবে থাকার কোনই নিশ্চয়তা থাকে না। উহারা এক একদিন এক এক জায়গায় গিয়া 'মরী' (kill) করিয়া থাকে। যাহা হউক, তখন আর শিকারে যাইবার কোনও উপায় ছিল না, সুতরাং মনের দুঃখ মনেই রহিল।

'গ'—বাবু একটু ভীরু প্রকৃতির লোক এবং বাঘের খবর পাইলেই যে তিনি নানাপ্রকারে তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকেন তাহা অনেকবার দেখিয়াছি; সুতরাং এক্ষেত্রেও আমার তাহা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। যাহা হউক, পরদিন সময়মত হাতীগুলিকে আনাইবার জন্য মাহুতদিগকে বলিয়া দিলাম এবং 'গ'—বাবুকে একটী হাতীতে লইয়া যাইব বলিয়া রাখিলাম।

পরদিন বেলা আড়াইটার সময় আমি ও 'গ'—বাবু দুইটী গদী-কসা হাতীতে এবং সঙ্গে আরও চারিটী খালি হাতী লইয়া রওয়ানা হইলাম। আমার "গ্রীনারের" (12 bore Greener gun) দোনালা বন্দুকটী এবং "মসার ত্রিশ স্প্রিংফিল্ড" রাইফেলটী (Mauser 30 Springfield Rifle) সঙ্গে লইলাম। 'গ'—বাবুও একটী দোনালা



মৃত চিতাবাঘ ও শিকারী

বন্দুক এবং একটী রাইফেল সঙ্গে লইলেন। উক্ত টিলাটী আমাদের বাড়ী হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত, কাজেই পৌছাইতে বেশী দেরী হইল না। সেখানে পাঁচ-ছয়টী ছোট ছোট টিলা ছিল। আমরা প্রথমে পশ্চিম দিকের টিলাতে হাতীগুলি দিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চলিলাম। পর পর তিনটী টিলাই ভাল করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দেখা হইল কিন্তু কোনও জন্তুর দেখা পাওয়া গেল না।

* "মরী" (kill) অর্থাৎ বাঘে মারা মৃত জানোয়ার।

তখন প্রায় বেলা সাড়েচারিটা বাজিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে যাহার বাছুর বাঘে লইয়া গিয়াছে—সেই লোকটী আসিয়া দেখাইল—"হুজুর! বাঘে বাছুরটাকে এই টিলায় লইয়া উঠিয়াছিল!" উহা পূবদিকের একটী উঁচু খাড়া টিলা। টিলাটী এইরূপ খাড়া যে উহার উপর দিয়া হাতীর লাইন করা কঠিন; কিন্তু শীতের দিন, সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই—শীঘ্রই সূর্য্য অস্ত যাইবে! আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া মাহুতকে আমার হাতী লইয়াই টিলার উপরে উঠিয়া পড়িতে বলিলাম এবং অন্যান্য হাতীগুলিকে আমার দুই পাশে লাইন করিতে বলিলাম। এবার আমরা পূবদিক হইতে পশ্চিমদিকে লাইন করিয়া চলিলাম। টিলাটী খাড়া, সেজন্য আমার দুই পাশের হাতীগুলি একটু নীচে দিয়া চলিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই আমার সম্মুখে 'বন-লড়া' (বাঘ পলাইবার সময় একেবারে মাটির সাথে মিশিয়া যাইতে থাকে—তখন সামান্য বনেও কেবল 'বন-লড়া' ভিন্ন তাহার শরীর দেখা যায় না) দেখা গেল।

মাহুত বলিল—"হুজুর! ইহাই বাঘের লড়া—শীঘ্র গুলি করুন!"

বন-লড়া বড়ই দ্রুত চলিল—ইহা দেখিয়া জানোয়ারের গায়ে গুলি লাগান খুবই কঠিন এবং অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে—তবুও একটা গুলি ছুঁড়িলাম! তারপর কিছুই দেখা গেল না। মাহুত হাতী থামাইয়া বলিল, "বাঘটা দৌড়াইয়া আমাদের ডান পাশের টিলায় উঠিল!" 'গ'—বাবু আমার ডান পাশেই ছিলেন কিন্তু তিনি অনেক পরে একটী গুলি করিলেন। হাতী দৌড়াইয়া আমরা ঐ টিলায় গিয়া উঠিলাম এবং বেশ ভালভাবে সবগুলি হাতী দিয়া লাইন করিয়া চলিলাম। আবার সামান্য যাইতেই আমার সম্মুখে বন-লড়া দেখা গেল—এবার আরও দ্রুত! মাহুতও আমার হাতী দৌড়াইল, কিন্তু বাঘের সাথে দৌড়ান সম্ভবপর হইল না। টিলার শেষ সীমায় পৌছাইয়া অন্য হাতীগুলির জন্য অপেক্ষা করিলাম। অপর হাতীগুলি আসিতেই হঠাৎ আমার ডান পাশের একটা হাতী শুঁড় তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলাম যে বাঘ হাতীর লাইন ভাঙ্গিয়া পিছনে পলাইল। হাতীগুলি ফিরাইয়া লাইন করা হইল, কিন্তু বাঘের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। মাহুতকে পুনরায় পূর্ব্বের টিলায় উঠিতে বলিলাম—যেখানে প্রথমে বাঘ পাওয়া গিয়াছিল। এবার 'গ'—বাবু নীচেই রহিলেন।

আমি যখন পুনরায় টিলার উপরে উঠিয়াছি তখন দিনের আলো নিভিয়া গিয়াছে। টিলার শেষ সীমায় নীচ দিকে নামিতেছি—এমন সময় দূরে পাশের টিলায় বন-লড়া দেখা গেল! টিলা দুইটী পাশা-পাশি সেজন্য বাঘটা উভয় টিলার মধ্যে দৌড়াইতেছিল। এদিকে আমি দেখিলাম যে এখন বাঘ না মারিতে পারিলে আর তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না। কারণ রাত্রির অন্ধকার বড়ই দ্রুত পাহাড় রাজ্যটাকে গ্রাস করিতেছিল। এবার আমি ঐ বন-লড়া লক্ষ্য করিয়া পর পর তিনটী গুলি করিলাম—যদিও তাহা আমার নিকট হইতে প্রায় ১০০গজ দূরে ছিল! গুলির পর সবই নীরব! সমস্ত হাতীগুলিকে দৌড়াইয়া ঐ টিলায় লইয়া লাইন করা হইল এবং মাহুতদিগকে কড়া হুকুম দেওয়া হইল—'সাবধান! এবার যেন বাঘ পূর্ব্বের মত হাতীর লাইন ভাঙ্গিয়া পলাইতে না পারে।'

হাতীগুলি প্রায় টিলার শেষ সীমায় আসিয়াছে—এবার আর বন-লড়াও দেখা গেল না। তখন আমার হাতী দাঁড়াইয়া আছে—এমন সময় লোকগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"হেই যায়; ডাঙ্গর! ডাঙ্গর!!" ("ঐ যায়, প্রকাণ্ড! প্রকাণ্ড!!") সম্মুখেই দেখি কাটা ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়া একটী প্রকাণ্ড চিতাবাঘ (Leopard) দৌড়াইয়া অপর একটী টিলার দিকে চলিয়াছে। উহা এত বড় যে দেখিয়া মনে হইল বড় বাঘের (Royal Tiger) গায়ে যেন চিতাবাঘের ছাপ। আমি উহাকে বেশ লক্ষ্য করিয়া পর পর দুইটী গুলি করিলাম এবং 'গ'—বাবুও একটী গুলি করিলেন! বাঘ টিলায় গিয়া উঠিল! ১০০ গজ দূর হইতে সাধারণ দোনালা (12 bore gun) বন্দুকের 'এস-জী' সট্ (S. G. Shot—মটরের মত সাত-আটটী গুলি একটী টোটাতে থাকে) সামান্য লাগিলে তাহাতে শিকারের কিছুই হইবে না; কিন্তু আমরা সাধারণতঃ ঐগুলি দিয়া চিতাবাঘ মারিয়া থাকি; তাই রাইফেল ব্যবহার করি নাই।

এবার অন্ধকার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া রাইফেলে গুলি ভরিলাম, কিন্তু উহা মাহুতের হাতে রাখিয়া—

দোনালা-বন্দুক হাতে লইয়াই পুনরায় উক্ত টিলায় প্রবেশ করিলাম।

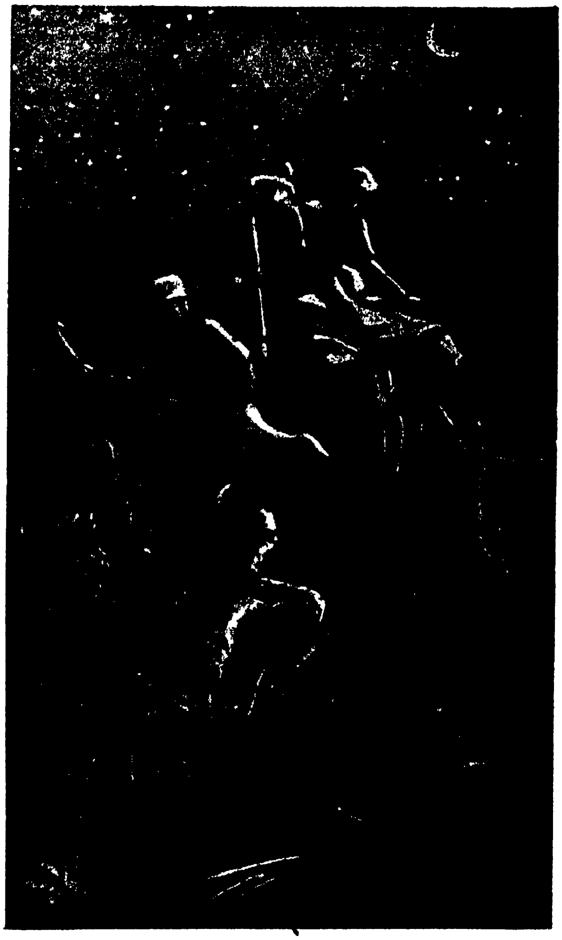
আমার হাতী জঙ্গলে প্রবেশ করা মাত্রই একটা জন্তু যেন দৌড়াইয়া পলাইল! আমি মাহুতকে বলিলাম;—"বাঘটা গুলি খাইয়াছে, হাতী সাবধানে রাখিও!" আমি সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন অপর দিক হইতে অন্য হাতীগুলি লাইন করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় বাঘটা হঠাৎ আসিয়া আমার হাতীর সম্মুখ দিয়া ("ঘঁা—ঘঁা"! শব্দে) চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়া বাঁ দিকে একটা ধান ক্ষেতে বাহির হইল। আমি পর পর দুইটা গুলি করিলাম বাঘের পিছন দিকে। দ্বিতীয় গুলির সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা ফিরিয়া পুনরায় টিলায় প্রবেশ করিল। এবার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে বাঘটা গুরুতর আহত হইয়াছে।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে—তখন আর জঙ্গলে প্রবেশ করিলে কিছুই দেখা যাইবে না; সুতরাং খালি হাতী দিয়া উহাকে তাড়াইতে বলিলাম এবং আমরা রাইফেল হাতে ধানক্ষেতে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাঘটা পুনরায় হাতীর লাইন ভাঙ্গিয়া পিছন দিকে ৩০০ গজ দূরে একটা টিলায় গিয়া উঠিল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলেও এত কষ্টের শিকার ফেলিয়া যাইতে কোনমতেই ইচ্ছা হইল না; কাজেই সেই অন্ধকারেই পুনরায় ঐ টিলা খালি হাতী দিয়া তাড়াইতে বলিলাম।

এবার 'গ'—বাবু আমার পশ্চিমে উক্ত টিলা হইতে প্রায় ১৫০ গজ দূরে দাঁড়াইলেন। আমি পূর্বদিকে 'গ'—বাবুর নিকট হইতে ২০০ গজ দূরে দাঁড়াইলাম। হাতীগুলি জঙ্গল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল—কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারের অস্পষ্ট ছায়ায় দেখি বাঘটা ঠিক 'গ'—বাবুর সম্মুখে বাহির হইয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার হাতী আক্রমণ করিল!! তিনি একটা গুলি করিলেন কিন্তু রাইফেলের গুলি অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল—বাঘের গায়ে লাগিল না। তারপর অন্ধকারে আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না—কেবল হাতী আর বাঘের ভীষণ চীৎকারে পাহাড় রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল!

বাঘটা শেষে 'গ'—বাবুকেই আক্রমণ করিল দেখিয়া মনে বড়ই ভয় হইল—কি জানি যদি একটা কিছু দুর্ঘটনাই ঘটিয়া যায়। আমি চীৎকার করিয়া তাঁহার মাহুতকে বলিতে লাগিলাম—"সাবধান! হাতী যেন বসিয়া না পড়ে!" কারণ এরূপ ক্ষেত্রে হাতী বসিয়া পড়িলে আর রক্ষা পাইবার উপায় থাকে না। বাঘ হাতীতে উঠিয়া শিকারীকে গুরুতর জখম করিবেই করিবে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব নীরব হইয়া গেল, তখন আমার হাতীর মাহুত বলিল—"আজ কর্ত্তাকে বোধ হয় বাঘে কামড়াইয়াছে!" আমি তাঁহার নিকটে গেলে—আমাকে দেখিয়াই তিনি দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি কি এখানে প্রাণ দিতে আসিয়াছি। এখনই পাহাড়ের নিকট হইতে চলিয়া যাইব!" তিনি আমার উপর যেরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাতে মনে হইল যেন আমিই তাঁহাকে বাঘ দিয়া আক্রমণ করাইয়া ছিলাম। যাহা হউক; জিজ্ঞাসা



বাঘটা গ-বাবুর হাতীকে আক্রমণ করিল

করিয়া জানিতে পারিলাম যে বাঘ তাঁহাদের কোনও ক্ষতি করিতে পারে নাই। তবে খুব অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন। বাঘের একটা পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দূর হইতে লাফ্ দিয়া সে হাতীর উপর উঠিতে পারে নাই, কাজেই রাগে চীৎকার করিতে করিতে পিছনের টিলায় গিয়া উঠিয়াছে।

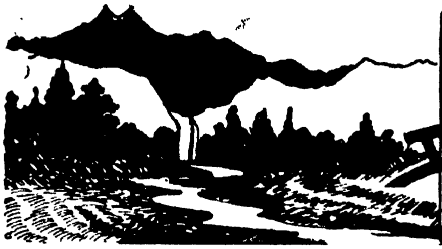
বাঘ যখন হাতীকে আক্রমণ করে তখন হাতীটী সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় 'গ'—বাবু নাকি গদী হইতে মাহুতের কাঁধে গিয়া পড়েন এবং মাহুত তাঁহাকে কোন প্রকারে রক্ষা করে। অনেক অনুরোধেও 'গ'—বাবু পুনরায় ঐ টিলার নিকট দাঁড়াইতে রাজি হইলেন না; সুতরাং মনের দুঃখে বাড়ী ফিরিতে হইল এবং সেবার বাঘের কবল হইতে 'গ'—বাবু রক্ষা পাওয়ায় ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

কিছুদিন পর্য্যন্ত আর বাঘের কোন খবর পাওয়া যাইতেছিল না। মনে করিলাম বোধ হয় অত্যাচারটা একটু কমিয়াছে। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে সময় কতকগুলি লোক আসিয়া বলিল যে, আমাদের বাড়ীর পিছনেই নাকি একটা বাঘকে তাহারা ঝোপের মধ্যে আটক করিয়াছে। বাড়ীর পিছনে বাঘের সংবাদ অনেকবারই শুনিয়াছি কিন্তু কখনও বাঘের দেখা মিলে নাই—তাই সংবাদটায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না। স্নান আহার শেষ করিয়া শুনিতে পাইলাম যে, একজন বাঘের উপর গুলি (bullet) করিয়াছিল কিন্তু গুলি বাঘের গায়ে লাগে নাই। তখন আমরা পায়ে হাঁটিয়া গিয়া বাঘ মারিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু বাঘটা এত ধূর্ত্ত যে সে কখনও গাছে চড়ে—কখনও বা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে—এমনইভাবে লুকাইয়া থাকে যে, তাহার দেখাই পাওয়া যায় না। হাতীগুলি ঘাস আনিতে গিয়াছিল সুতরাং তখনকার মত সকলকেই ফিরিয়া আসিতে হইল। দিন প্রায় শেষ হইল!—

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মাহুত একটী হাতী লইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল—"সকলে অপেক্ষা করিতেছেন—বাঘের নিকট হাতী লইয়া গেলেই সে কামড়াইতে আসে! হুজুরকে সত্বর যাইতে বলিয়াছেন!" আমি তখনই ঐ হাতীতে চড়িয়া শিকারের জায়গায় গেলাম। মাহুতরা একটা ঝোপ দেখাইয়া বলিল—উহাতেই বাঘ বসিয়া আছে। আমি অপর দুইটী হাতী দিয়া ঝোপটী ভাঙ্গাইতে বলিলাম। ঐ ঝোপটী ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিতেই—হঠাৎ বাঘটা আসিয়া আমার হাতীকে আক্রমণ করিল এবং হাতীটা মাথা নীচু করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! তখন দেখি বাঘটা আমার বাঁদিক দিয়া দৌড়াইয়া পলাইতেছে! ঐ অবস্থায় যদিও আমার পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল, তবু কোন প্রকারে সম্মুখের দিক হইতে বন্দুকটা ঘুরাইয়া গুলি করিলাম! গুলি লাগিয়া বাঘের কোমর ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তবুও অপর একটা ঝোপে প্রবেশ করিল। আমার পিছনে আর একজন শিকারী ছিলেন, তিনিও একটী গুলি করিলেন কিন্তু তাহা বাঘের ঠিক লেজের উপরে লাগিল! প্রথম গুলিতেই বাঘটা গুরুতর আহত হইয়াছিল—দৌড়াইতে পারিতেছিল না;—কিছুদূর গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল! দ্রুত অগ্রসর হইয়া আমি আর একটী গুলি করিলাম, গুলি বাঘের পঞ্জরে লাগিল! এবার সে প্রাণপণে একটা দৌড় দিয়াই মাটির উপর পড়িয়া গেল।

পূর্ব্বের বাঘটা না পাওয়ায় মনে বড়ই দুঃখ ছিল—যাহা হউক, পরে এই বাঘটিকে মারিতে পারিয়া সে দুঃখ দূর হইল। বাঘটা মাপিয়া দেখা হইল, উহা লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফিট। এখানে তাহার একটী ফটো দেওয়া হইল।





সঙ্গীত

হোরী

ইমনকল্যাণ—ধামার

আজি কি সুন্দর শোভা দেখরে মথুরাধামে,
হোরি খেলিছে রাধাশ্যাম পুলকিত মনে।
অগণন সখিগণ নাচিছে গাইছে গান,
মৃদঙ্গ ধ্বনি বাজিছে যেন মেঘ গর্জ্জনে।
শ্যাম বরণ কৃষ্ণ কনক বরণী প্যারী
আবীরে লাল বরণ চিনিব বল কেমনে।
পিচকারী জলে এবার ভিজিল বাস সবার,
তবু খেলায় মত্ত হ'ল গোপেশ্বর প্রলোভনে॥

কথা ও সুর ঃ—
সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ঃ—
গীতসাগর শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১´ ০ ২ ০ ৩ ১´
{ পা -া পা | হ্মা গা | হ্মা -া | পা পা -া | ধহ্মা -া গা -া | হ্মা হ্মা রা
আ - জি কি ০ সু - ন্দ র - শো - ভা - দে খ ০

০ ২ ০ ৩ ১´ ০ ২
গা া | রা মা | গা গা রা | ন্‌া রা সা -া } | সা ন্‌া ধ্‌া | ন্‌া -া | রা রা
রে - ০ ম থু রা ০ ধা ০ মে - হো রি ০ খে - লি ছে

০ ৩ ১´ ০ ২ ০
সন্‌া গরা া | গা রা গা গা | গা গা হ্মা | নধা -া | পা পা | হ্মা রা গা |
রা ধা - ০ ০ শ্যা ম পু ল ০ ০ ০ - কি ত ০ ০ ০

৩
রসা ন্‌া রা সা ‖
০ ০ ম নে

১´ ০ ২ ০ ৩ ১´

ক্ষা ধা -া | না ধা | না র্সা | র্সা র্সা -া | না র্সা র্সা র্সা | র্সনা র্রা -

অ গ - ০ ০ ণ ন স খি - ০ ০ গ ণ না চি

০ ২ ০ ৩ ১´ ০

র্গা র্রা | না র্রা | র্সা না ধা | না ক্ষা ধা পা } | ক্ষা ধা -া | না -া

ছে ০ ০ গা ই ছে ০ গা ০ ০ ন মৃ দ - ঙ্গ -

২ ০ ৩ ১´ ০ ২

র্রা র্সা | না ধা -া | ক্ষা ধা পা পা | পা ক্ষা রা | গা ৷ | ৷ মা

০ ধ্বা নি বা - ০ ০ জি ছে যে ন ০ মে - - ঘ

০ ৩

গা রা গা | রসা ন্‌া রা সা ‖

গ ০ ০ র্জ ০ ০ ০ নে

১´ ০ ২ ০ ৩ ১´

ক্ষা -া গা | ক্ষা ৷ | পা পা | পা পা -া | পা -া পা ক্ষা | রা গা রা

শ্যা - ০ ম - ০ ব র ণ - কু - ঙ্কু ০ ক ন ০

০ ২ ০ ৩ ১´ ০ ২

গা -া | ৷ মা | গা রা -া | ন্‌া ৷ রা সা | সা ন্‌া ধ্‌া | ক্ষ্‌া ধ্‌া | ন্‌া ধ্‌া

ক - - ব র ণী - প্যা - ০ রী আ বী ০ রে ০ লা ০

০ ৩ ১´ ০ ২ ০

ন্‌া রা -া | সা -া সা -া | সা গা রা | গা -া | ৷ মা | গা রা -া

ল ব - র - ণ - চি নি ০ ব - - ব ল কে -

৩

ন্‌া -া রা সা ‖

ম - ০ নে

১´ ০ ২ ০ ৩ ১´

{ ক্ষা ধা -া | না ধা | না র্সা | র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা -া | র্সনা র্রা -া

পি চ : কা ০ রী জ লে এ - বা - র - ভি জি -

০ ২ ০ ৩ ১´ ০
র্গা র্রা | র্সা র্সা | র্সা না ধা | ক্ষা ধা পা -া } | ক্ষা ধা -া | না ধা |
ল ০ বা স স ০ ০ ধা ০ র - ত ব্ - খে ০

২ ০ ৩ ১´ ০ ২
না র্সা | না ধা -া | ক্ষা ধা পা -া | পা ক্ষা -া | রা -া | গা মা
লা য ম ত্ত - হ ০ ল - গো পে - ০ - শ্ব র

গা রা -া | ন্া রা সা -া ||
প্র লো - ভ ০ নে -

বাঙলায় 'আধুনিক সঙ্গীত'চর্চ্চা

শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী

সঙ্গীত বলতে গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনের একত্র সমাবেশ। এই জন্যই সঙ্গীতকে তৌর্য্যত্রিক-বিদ্যা বলে। তৌর্য্যত্রিক-বিদ্যা সম্বন্ধে এ যাবৎ অনেকে অনেক কথাই বলেছেন। সেই সকলের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করা সুখকর হবে না। আমারও আজ আলোচনার উদ্দেশ্য অন্যরকম। ভারতীয় বিশুদ্ধ-সঙ্গীত বলতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীই বোঝায়। আজ পর্য্যন্ত অনেক সঙ্গীতজ্ঞ বহু রকম কৃচ্ছ্র-সাধন দ্বারা বিশুদ্ধ-সঙ্গীত আয়ত্ত করেছেন এবং সাধারণকে নিজেদের সাধনার স্বর্ণ-প্রসূ-ফল উপভোগ করিয়েছেন। এখনও বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আদর আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আজকাল বাংলা-দেশে 'আধুনিক সঙ্গীত' ব'লে এক শ্রেণীর গানের বহুল প্রচার জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়। সেটা অন্য কিছু নয়, বাঙালী কবিগণের রচিত এবং বাঙালীর দেওয়া সুরে সাজানো এক নূতন সৃষ্টি।

বাঙালী চিরদিনই ভাবপ্রবণ জাতি। বৈঠকী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই ভাবপ্রবণতা পূর্ব্বে এত বেশী প্রকাশ পায়নি। তাই যখন কবিতা সুরের ভাবধারায় কণ্ঠে প্রকাশ পেলে তখনই বাঙলার সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু সে স্পন্দন প্রথমত এত অস্পষ্ট ছিল যে, অনেকেই তা অনুভব করতে পারেননি। আবার অনুভব করলেও কেউ কেউ সেটি আমল দেননি। অবশ্য আমল না দেওয়াটা ওস্তাদগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাই ব'লে তাঁদেরও দোষ দেওয়া চলে না। গানের প্রধান জিনিস সুর ও তাল। রাগ-রাগিণীর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে তাল মাত্রা নিয়ে অপূর্ব্ব খেলা যা বিশুদ্ধ সঙ্গীতেই দেখা যায়, আধুনিক বাঙলা গানে তা নেই, একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হবে না।

পূর্ব্বেই বলেছি, বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। ভাবের দিক থেকে তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অনুরূপ সুরে ভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখাতে গেলে সুরের ধরাবাঁধা নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হয়। তাতে ওস্তাদীর একটু হীনতা হ'লেও যাঁরা সুর দিয়ে কথা ও ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বজায় রেখে সাধারণের কাছে সে রসের পরিবেশন ক'রে তাঁদের আনন্দ দিচ্ছেন, সেটা লক্ষ্য ক'রে তাঁদের অনায়াসেই ক্ষমা করা চলে।

প্রাচীন-পন্থীদের অনেকেরই বিসদৃশ লাগে, লাগারই কথা। তাঁদের কাছে নিবেদন—বাঙালী যদি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়ে সঙ্গীতে এক নূতন সৃষ্টি করতে পারে, মন্দ

কি ? সে ওস্তাদীর দিক থেকে একটু হালকা বা চটুল হলেই বা কি এসে যায় ? তবু ত সে বাঙালীরই একটি নূতন সৃষ্টি। নাই-বা পেলে উচ্চ সঙ্গীতের দরবারে সম্মানিত আসন। তার লীলায়িত-মাধুর্য্যই তাকে স্বতন্ত্র রাখবে। আর এই স্বাতন্ত্র্যই হবে তার বৈশিষ্ট্য।

এই শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞগণ কতই-না হীন হয়েছেন তাঁদের এই নূতন সৃষ্টির অপরাধে। কারণ, তাঁরা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চ্চা ছেড়ে এক তরল সাধনায় নিজেদের মাতিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আজ সাধারণের কাছে তাঁদের এবং তাঁদের নূতন দানের আদর বেশী। অসাধারণের আদর চিরদিনই বেশী। তাই ব'লে সাধারণকেও ত অবহেলা করা চলে না। বাঙলার জনসাধারণের কাছে তাঁদের দানের উপযুক্ত আদর পেয়ে আজ তাঁরা গৌরবান্বিত। জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক সঙ্গীতেরই বহুল-প্রচার।

বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সমঝদার ক'জন পাওয়া যায় ? কারণ সেটা আয়ত্ত করাও যেমন কঠিন, অনুভব করাও তেমনই শক্ত। আধুনিক সঙ্গীতের বহুল প্রচারের পূর্ব্বে অনেকেই সঙ্গীতের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। অবশ্য এতে তাঁদের নিজেদেরই অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে এসেছে। তা হোক, তবুও সাধারণের আলোচনার জন্য এই যে নূতন অবদান ইহা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চলার পথের প্রথম সোপান বলা চলে। কারণ, প্রথমত গান বাজনায় আসক্তি আসুক, পরে অনুসন্ধিৎসু মন আপনিই ক্রমোন্নত সোপান খুঁজে নেবে। সেই পথে চলতে চলতে ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের দ্বারে উপস্থিত হবে—প্রাচীন পন্থীদের যা চিরদিনের কামনা।

প্রথমেই কেউ বেশী ভারী জিনিষ মাথায় তুলতে পারে না আগে তুলতে হয় যা সহজেই উত্তোলন করা যায়। ক্রমে অভ্যাসের ফলে অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়। আধুনিক সঙ্গীত-চর্চ্চার ফলেও ঠিক একদিন জনসাধারণের উচ্চ সঙ্গীতে আসক্তি জন্মাবে। কোন কিছু সৃষ্টি ক'রতে হ'লে স্রষ্টা নিজের জ্ঞাতসারেই সৃষ্টি ক'রে থাকেন। সুতরাং সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও স্রষ্টারা নূতন কিছু সৃষ্টি করতে হ'লে তাঁদের জ্ঞাতসারেই করবেন। সুরের নূতনত্ব কিছু সৃষ্টি করতে হ'লে সুরে রীতিমত অধিকার থাকা চাই, তজ্জন্য বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সাধনা করতে হবে। ফলে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আদর থাকবেই।

বর্ত্তমানে বিশুদ্ধ সঙ্গীতে জনসাধারণের আগ্রহের অভাব থাকলেও এমন দিন আসবে যখন সাধারণেই বিশুদ্ধ সঙ্গীত চর্চ্চা করবে। তখন বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মধ্যে যে-কোন সুরেই হোক্, আধুনিক সঙ্গীতের একটি স্থান হবে। অবশ্য যদি সঙ্গীতের প্রতি প্রকৃত আসক্তি থাকে।

'আধুনিক-সঙ্গীত' বোধ হয় বাঙলার জনসাধারণের সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি আনার ইঙ্গিত। এতে আক্ষেপ করার কিছু নেই, কারণ মঙ্গলময়ের রাজ্যে কি অমঙ্গলের প্রভাব থাক্তে পারে!

বসন্ত—ফাল্গুন

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

প্রিয়ারে ডাকে আজি পাপিয়া কেবলি
এতদিন কোথা ছিল লুকায়ে,
মাধবীর শাখে শাখে থাকে থাকে ফোটে ফুল
বহু দিন গিয়াছিল শুকায়ে।

কুয়াসার আবরণ পড়ে গেছে ছিঁড়িয়া
হাসে উষা, নবভূষা পরিয়া,
নীপবনে ওঠে মৃদু মর্ম্মর, হাসে চাঁদ
বকুল নীরবে পড়ে ঝরিয়া।

আম্র মুকুলের গন্ধ মদিরায় মত্ত অলি ধায়
কানন হতে ফুল কাননে,
নূতন সাজে সেজে প্রকৃতি এসেছে যে
জ্যোৎস্না হাসিভরা আননে।

রামায়ণ ও মহাভারতে বাঙ্গালার ইতিহাস

শ্রীজনরঞ্জন রায়

প্রবন্ধ

কলিকাল আরম্ভের পূর্ব্বেও বাঙ্গালাদেশের অস্তিত্ব ছিল। শুধু তাহাই নহে, তখনও বঙ্গবাসী শৌর্য্যে বীর্য্যে প্রতিবেশীদের অপেক্ষা হীন বলিয়া গণ্য হইত না। ধনধান্যে ও শিল্পে বাঙ্গালা দেশ সে সময়েও প্রথম শ্রেণীর জনপদ বলিয়া পরিচিত ছিল। আজ সেই পুরাতন কথাটাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

ঐতিহাসিক আলোচনা করিতে বসিয়া অযথা স্বদেশের গৌরব-বৃদ্ধি করা সঙ্গত নয়। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই সব মহাজন বাক্য(১) মনে রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

এইরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে বিদেশীগণ আমাদের পথপ্রদর্শক। সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহাদের সংস্কার ও সভ্যতা বিভিন্ন। সুতরাং তাঁহাদের দর্শনভঙ্গিও বহু ক্ষেত্রে বিপরীত ও প্রতিকূল। এজন্য তাঁহাদের ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তীগণের সিদ্ধান্ত হুবহু-ভাবে সর্ব্বদা গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। এই সাবধান বাণীও(২) আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমরা স্পষ্টত দেখিতেছি, রামায়ণ মহাভারতের বিবরণকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা কেবল বিদেশীর অনুকরণ স্পৃহার ফল। অথচ কলি-পূর্ব্ব যুগের ঐতিহাসিক উপকরণ তাহাতে ভারে ভারে সাজানো রহিয়াছে। তাহা ছাড়া পুরাণগুলির ঐতিহাসিক সম্ভার কিছু কম নয়। আমাদেরই ঘরের খবরে সে সমস্ত পরিপূর্ণ। একটু মমতার সহিত সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। তাহা করিলে বাসুদেবপ্রমুখ রাজাগণের কাল নির্ণয় করা মোটেই দুঃসাধ্য নয় বুঝিতে পারা যাইত। বরং পুরাণগুলিতে তাহা সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ আছে(৩)। তথাপি বাঙ্গালার ইতিহাস লেখকেরা তাহা না-জানিবার ভাণ করিয়া থাকেন।

পুরাণগুলিকে ফোক্‌লোর বা পল্লীগাথা বলিয়া উপেক্ষা করিবার দুঃসাহস কেহই করেন না বোধ হয়। সেগুলিতে অতিরঞ্জন আছে সত্য। তাহা বাদ দিলে প্রচুর কাজের জিনিষ চোখে পড়িবে, যাহা ফোক্‌লোরে থাকে না। কুসংস্কারগ্রস্ত লোকদের গল্পগাথাকেই ফোক্‌লোর আখ্যা দেওয়া হয়(৪)। আমাদের পুরাণগুলি তাহা নয়।

পুরাণগুলির মধ্যে বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্ম, গরুড় ও ভাগবত প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত গ্রন্থে বহু রাজার ও বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও অন্যান্য হিন্দু জ্যোতিষের গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ঐ সব ঘটনাদির সময় জানা সম্ভবপর। এইরূপে দ্বাদশ সহস্র বৎসরের চতুর্যুগের বিভাগ, মনুকাল, লৌকিক কল্পকাল ও রাজাগণের রাজ্যকাল স্থির করিবার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে(৫)। রামায়ণ মহাভারতের রাজাদের ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অনেক কথা পুরাণ-গুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এই জন্যই পুরাণের প্রসঙ্গটি লইয়া আমরা এতটা আলোচনা করিতেছি।

হিন্দুগণের নিকট রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দুগণের বিশ্বাস, মহাকাব্য বলিলে এই গ্রন্থদ্বয়ের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে। আবার রামায়ণের পরে যে মহাভারত লেখা হইয়াছে ইহা হিন্দু মাত্রেরই

---

(১) "The Bias of Patriotism—whoever entertains such a sentiment has not that equilibrium of feeling required for dealing scientifically with social phenomena. Patriotism is nationally that, which is egoism individually—it has in fact the same root; and along with kindred benefits brings kindred evils,"—The Study of Sociology : Herbert Spencer : 22 Edn. p. 204

(২) "The Spoiled Child of Modern Humanity—I am trying to point out the fundamental psychological differences in the very constitution of the European and Indian, to explain to you the reason why, inspite of their high education and superior intelligence, even the very best of the European residents or students of India have, almost invariably failed to truly understand or interpret us. * * Even those (Indians) who try to verbally deny his (a European's) superiority, really admit it, by seeking with all his might to imitate him (a European)."—The Soul of India : B. C, Paul. p. 36.

(৩) "* * the most systematic record of Indian historical tradition is that preserved in the dynastic lists of Puranas."—The Early History of India ; Vincent A. Smith. 2nd Edn. p. 9.

"পুরাণে যে কয়জন রাজার নাম পাওয়া যায় সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের বংশের পুরুষপরম্পরা ও সূতগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে * * * পুরাণই যথার্থ ইতিবৃত্ত বা হিষ্টরি।"—পুরাণ প্রবেশ : শ্রীগিরিন্দ্রশেখর বসু ; পৃঃ ৫৯।

(৪) "Properly speaking folklore is only concerned with the legends, customs, beliefs of the folk, of the people, of the classes which have least been altered by education."—Customs and Myth—Method of Folklore : Andrews Long, New Edn, p. 11.

(৫) 'পুরাণ-প্রবেশ' দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্ত। কিন্তু দেশী ও বিদেশী দুই জন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বিপরীত কথা বলেন(৬)। তাঁহাদের মতে মহাভারত আগে লেখা হয়, তৎপরে রামায়ণ। ইহাও বলা হয় যে, মহাভারতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। ভারতের ভৌগলিক বিবরণ মহাভারতে রামায়ণ অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া জোর দেওয়া হয়। 'ইলিয়ড' নামক মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনাতেও রামায়ণকে নিম্নে স্থান দেওয়া হয়। ইলিয়ডের কাহিনী হইতে প্রাচীন গ্রীকেরা না-কি পরিচয়-সূত্র বাহির করেন। বলা হয় যে ভারতের সামন্ত ও অভিজাতবংশ সকল রামায়ণে বর্ণিত বংশপরম্পরার সঙ্গে সেইরূপ সম্বন্ধ বাহির করেন। যেহেতু মহাভারতে হিংসাশীলতার, নির্ম্মম যুদ্ধের ও দুঃসাহসের বিবরণাদি অধিক, সেইজন্য ইহাকে পূর্ব্বযুগের মহাকাব্য বলা হইয়াছে। পরের যুগে মানুষ সভ্য ও সংযত হইয়াছে এবং সামাজিক কর্ত্তব্যের প্রতি ও ধর্ম্মযাজকদের প্রতি অধিক আনুগত্য দেখাইয়াছে। রামায়ণে এইরূপ সভ্যতার নিদর্শন থাকায় তাহা মহাভারতের পরবর্ত্তী সময়ের বিবরণ বলা হইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় লইয়া বেশ মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইহা খ্রীঃ পূঃ ১২শ কিম্বা ১৩শ শতকের ঘটনা। সেই সময়েই বেদগুলি সঙ্কলিত হয় বলা হইয়া থাকে(৭)। কেহ বলেন ইহা খ্রীঃ পূঃ ১৪৫০ সালের ঘটনা(৮)। কাহারও মতে ভারতযুদ্ধ ১৫১২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের ঘটনা এবং যুধিষ্ঠির তৎপরে ৩৭ বৎসর অবধি রাজত্ব করিয়াছিলেন(৯)।

পুরাণ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে রামচন্দ্রের রাজ্যকাল ২১২৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে(১০)। সুতরাং ভারত যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে। নিষ্ঠুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণাদি দেখিয়া মহাভারতকে আমাদের প্রথম মহাকাব্য বলা হইয়াছে। ভদ্রভাবে সামাজিক অনুষ্ঠানাদি মানিয়া চলার বিবরণাদি রামায়ণে থাকায় তাহা দ্বিতীয় মহাকাব্য এইরূপ যুক্তি দেখানো হইয়াছে। কিন্তু কোনও সাল তারিখ লইয়া রামচন্দ্রের রাজ্যকাল এতদিন বিচার করা হয় নাই। পুরাণ হইতে যে প্রমাণ পাওয়া গেল তাহা যদি ভারসহ হয় তবে সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে। রামায়ণের প্রাচীনত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

ঋক সংহিতায় ৩।৫৩।১৪ অঃ কীকট (মগধ) দেশের নাম আছে। ঋকের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭।১৮ অঃ পুণ্ড্র দেশের (মালদহ হইতে বগুড়া) নাম আছে। অথর্ব্ব সংহিতায় ৫।২২।১৪ অঃ অঙ্গ (ভাগলপুর) দেশের নাম আছে। কিন্তু বঙ্গ নামটি সর্ব্বপ্রথমে পাওয়া যায় ঋকের ঐতরেয় আরণ্যকে।

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।

বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্তনা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥" ঐঃ আঃ ২।১।১

উক্ত শ্লোকের ভাষ্যকার বঙ্গ, মগধ ও চেরপ্রদেশবাসীদের বৃক্ষ, ওষধি ও সর্পের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। টীকাকার আবার ঐ সব দেশ-বাসীদের যথাক্রমে পিশাচ, রাক্ষস ও অসুর বলিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ, চের প্রভৃতি এক একটি নাম মাত্র। এইরূপ সংজ্ঞা দ্বারা সেই সব দেশকে এবং দেশবাসীকেই বুঝানো হইত(১১)।

---

(৬) "The story of Mahavarata is much more probable than that of the Ramayana. It (Mahavarata) contains more particulars about the state of India, and has a much greater appearance of being founded on facts. Though far below the 'Illiad' in appearance of reality, it bears nearly the same relation to the Ramayana—that the poem on the Trogen War does to the legend on the adventures of Hercules and like the 'Illiad' it is the source to which many chiefs and tribes endeavour to trace their ancestors.—Elphinston's History of India, 9th Edn, p. 225.

"* * * when the first Kurus and Panchalas settled in the Dorab, they gave indications of a vigorous national life, and their internecine wars form the subject of the first National Epic of India, the Mahavarata, * * * although this work in its present shape, is the production of a later age. * * * The Kosalas too were a polished nation, but the traditions of that nation, preserved in the second National Epic of India, the Ramayana (in its present form, a production of later ages), show more devotion to social and domestic duties, obedience to priests and regard for religious forms, than the sturdy valour and fiery jealousies of the Mahavarata."—Early History of Civilisation, B. C. 2000 to 320, R. C. Dutt, p. 7.

(৭) "The Vedas were finally compiled and Kuru Panchala war was fought sometime about 13th Century or 12th century B. C."—Ibid., p 11.

(৮) "* * * as far as depends on the evidence of the Puranas, that the war of the Mahavarata ended 1,050 years before Nanda, or 1450 years before Christ."—Elphinston.

(৯) "(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়) বর্ত্তমান কালোপযোগী ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ১৪৭৫ বৎসরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। আর মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৫১২ খ্রীঃ পূঃ বৎসরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। * * * মহাভারতের মধ্যে রামায়ণের উপাখ্যান পাওয়া যায়। ঐ উপাখ্যান বেশ পুরাতন তাহাও বুঝা যায়।"—হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২য় ভাগ—১৬৩ পৃঃ।

(১০) 'পুরাণ প্রবেশ' পুস্তকে ইক্ষ্বাকুবংশ বিচার (অনুবৃত্তি) ও সমপর্য্যায় বিভিন্ন বংশীয় প্রাচীন রাজাগণের (অনুবৃত্তি) কাল নির্ণয়ের অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য। তাহা হইতে পাওয়া যাইবে যে (বিষ্ণুপুরাণধৃত) দশরথ কাল খ্রীঃ পূঃ ২১৫৮ বৎসরে। তাঁহার সমকালে (পুরু) চক্ষু ও (নীপ) বিশ্বজিৎ। রামচন্দ্রের কাল খ্রী০ পূঃ ২১২৪ বৎসরে। রামের সমপর্য্যায় (পুরু) হর্য্যশ্ব ও (নীপ) সেনজিৎ।—পুরাণ প্রবেশ, ১১৩।১১৪ পৃঃ।

(১১) "Possibly they are all old ethnic names like Vanga, Chera etc."—Sacred Books of the East, vol. I, Max Muller, p 202 f.

মহাভারত হইতেও আমাদের যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়, তবে ভিন্ন ভাবে। মহাভারত বলেন যে, রাজার নাম হইতে এই সব প্রদেশের নামকরণ হয়।

"অঙ্গো বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্র সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥"

—মহাভারত, আদি, ১০৪।৫০

অর্থাৎ বলিরাজার পাঁচ পুত্রের নাম হইতে এই পাঁচটি দেশের নামকরণ হয়। মনে হয়, বলিরাজা এই সব প্রদেশ জয় করিয়া নিজ পুত্রদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। যিনি যে প্রদেশ পাইয়াছিলেন তিনি তথাকার অধিপতি বলিয়া খ্যাত হন। এইরূপে বর্ত্তমান ভাগলপুরের অধিপতিকে অঙ্গরাজ, ভাগিরথীর পূর্ব্বদিকস্থ ভূভাগের অধিপতিকে বঙ্গরাজ, উড়িষ্যার অধিপতিকে কলিঙ্গরাজ, মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিপতিকে পুণ্ড্ররাজ ও রাঢ়ের অধিপতিকে সুহ্মরাজ বলা হইতে লাগিল। আর্য্যদের সঙ্গে এই সব দেশের সংস্কৃতি ও ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। কারণ তাহারা আর্য্য ছিল না। জগতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়—ইহা সকলেই স্বীকার করেন (১২)।

আর্য্যগণের এই সব দেশে আসার ইহাই ইতিহাস। তাহার পূর্ব্বে আর্য্যগণ এসব দেশের লোককে ঘৃণা করিয়াছেন, নিন্দা করিয়াছেন ও আর্য্যদের এদেশে আসিতে মানা করিয়াছেন, কিন্তু বংশবৃদ্ধির সঙ্গে আর্য্যদের বিস্তৃতির দরকার হয়। তখন তাঁহারা আর অনুশাসন বা বিধিনিষেধ মানেন নাই দেখা যাইতেছে।

অনুশাসনগুলির সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। মনুর নামে যে অনুশাসনটি চলিয়া আসিতেছে তাহা বিশেষভাবে পরিচিত।

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

—মনুসংহিতা, ১০ম অঃ

অর্থাৎ আর্য্যগণ তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র বা মগধ দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু মনুসংহিতার বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ গুলিতে ঐ শ্লোকটি নাই। জার্মাণ পণ্ডিত ডক্টর জুলিয়স জলি বহু পাণ্ডুলিপি বিচার করিয়া যে মনুসংহিতা ছাপিয়াছেন তাহাতে উহা নাই। অধ্যাপক জি, বুলারের সম্পাদিত প্রাচ্যের ধর্ম্ম গ্রন্থাবলী নামক পুস্তকে (Sacred Books of the East) উহা নাই। রাও সাহেব বিশ্বনাথ মাণ্ডলিক সি, এস, আই সম্পাদিত মনুসংহিতাতেও উহা নাই। সুতরাং উহা বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশকে নিন্দিত করিবার জন্ত প্রক্ষিপ্ত শ্লোক (১৩)। আধুনিক কালে প্রাদেশিকতার ঈর্ষাবশে মনুর নাম জুড়িয়া দিয়া ইহা চালানো হইতেছিল দেখা যায়। এইরূপ বৌধয়নের নাম দিয়াও একটি অনুশাসন প্রচলিত আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এসব স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিলেও আর্য্যগণকে 'পুনস্তোম' প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

মহাভারতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন। এ দেশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁহারা হারিয়াছেন, জিতিয়াছেন। ভীমার্জ্জুন এদেশে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নাই। যদি হইত তাহা মহাভারতে উল্লেখ থাকিত। এইরূপে ক্রমে শত্রুতা, মিত্রতা ও যৌন সম্বন্ধের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার সঙ্গে আর্য্যদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে উভয়ের সভ্যতার সংমিশ্রণ, ভাব ও ভাষার সংমিশ্রণ দ্বারা ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়—স্বজাতিত্ব বোধ জন্মায়। এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে সকল দেশেই অন্তরের মিল ঘটিয়া থাকে (১৪)। ক্রমে বাঙ্গালারও অপাঙক্তেয় দোষ কাটিয়া যায় ও তাহাকে গৌরবের আসন দেওয়া হয়। যে স্থানে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত তাহাকে পরে ধর্ম্মস্থান বলা হইল। যে-সে ধর্ম্মস্থান নহে, একেবারে ঋষিদের বাসের উপযুক্ত ধর্ম্মস্থান বলা হইল।

"ঋষিভিঃ সমুপযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতং।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতং॥"—বনপর্ব্ব, ১১৪।৪-৫

লেখনী বা শাসন ক্ষমতা হাতে থাকিলে বুঝি বা এইরূপই হয়। একজনকে পায়ের তলায় ফেলিতে যতক্ষণ লাগে, রাজসম্মান দিতেও ততক্ষণ লাগে।

রামায়ণের সময়ে বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। দশরথের উক্তি হইতে তাহাই প্রমাণ হয়। কৈকেয়ীকে প্রবোধ দিতে গিয়া তিনি দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ ও দক্ষিণ রাষ্ট্রের নাম করেন। ধনধান্য, গবাদি পশু এবং কারুকার্য্যখচিত দ্রব্যাদির আকরভূমি বলিয়া এই সব প্রদেশের প্রসিদ্ধি ছিল। তাই দশরথ বলিলেন, কৈকেয়ী, তুমি রামের প্রতি প্রসন্ন হও, তাহার বনবাস প্রার্থনা করিও না। তৎপরিবর্ত্তে এই সব স্থানের দ্রব্যাদি যথেচ্ছ প্রার্থনা কর। যাহা চাও তাহাই দিব।

"দ্রাবিড়া সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥
অত্রজাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ কৈকেয়ি যদ্যত্তং মনসেচ্ছসি॥"

—রামায়ণ, অযোধ্যা, ১০।৩৭-৩৮

রামায়ণে প্রাগজ্যোতিষপুরের নামটি পাওয়া যায়। চন্দ্রবংশীয় অমূর্ত্ত-

(১২) "There are fundamental differences between the different races of It men, must be universally admitted."—Introduction to the Study of Hinduism: B. C. Paul, p. 143.

(১৩) "পৃথিবীর ইতিহাস," ৪র্থ খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ।

(১৪) There is in every country a certain national harmony, which is the result of the community of manners, laws, language and events, and this harmony is imprinted in the civilization."—Guizot's History of Civilization, p. 271.

রজা ইহা স্থাপন করেন (রামায়ণ ১।৩৫ সর্গ)। জলপাইগুড়ী রঙ্গপুর হইতে আসামের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত প্রাগজ্যোতিষ দেশ বিস্তৃত ছিল। প্রাগজ্যোতিষপুর এখন গৌহাটী নামে পরিচিত হইতেছে (১৫)

মহাভারতে পাওয়া যায় যে, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরের আদেশে বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। তখন তিনি প্রাগজ্যোতিষপুরে (গঙ্গাদ্বারে) উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি নাগরাজ কৌরবকন্যা উলূপীকে বিবাহ করেন।

"এবমুক্তস্তু কৌন্তেয় পন্নগেশ্বর কন্যয়া
কৃতবাংস্তত্তথা সর্ব্বং ধর্ম্মমুদ্দিশ্য কারণম্ ॥
স নাগভবনে রাত্রিং তামুষিত্বা প্রতাপবান।
পুত্রমুৎপাদয়ামাস স তস্যাং সুমনোহরম ॥"

—আদি, ২০২ অঃ, ৩৩।৩৪ শ্লোঃ

(মহাভারত পি, পি, এস, শাস্ত্রী সম্পাদিত)

তৎপরে অর্জ্জুন মণিপুরে উপস্থিত হন। সেখানে মণিপুর-রাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে তিনি বিবাহ করেন।

"স তথেতি প্রতিজ্ঞায় তাং কন্যাং প্রতিগৃহ্য চ।
মাসে ত্রয়োদশে পার্থঃ কৃত্বা বৈবাহিকী ক্রিয়াম্ ॥
উবাস নগরে তস্মিন্ মাসাংস্ত্রীন্ স তয়া সহ ॥"

—আদি, ২০৩ অঃ, ঐ সং

চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের যে পুত্র হন তাঁহার নাম বভ্রুবাহন। বভ্রুবাহন তাঁহার মাতামহের সিংহাসনের অধিকারী হন।

রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শমত ভারত-বিজয় অনুষ্ঠিত হয়। যুধিষ্ঠির তাঁহার চারি ভ্রাতাকে ভারতের চারিদিকে দিগ্বিজয়ে পাঠান। পূর্ব্বভারতে ভীম আসেন। সেই সময়ে তিনি বাঙ্গালা দেশের রাজগণকে বিজয় করেন। ভীমের এই দিগ্বিজয়ের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মগধ (বিহার), অঙ্গ (ভাগলপুর), মোদগিরি (মুঙ্গের), পুণ্ড্র (মালদহ হইতে বগুড়া), কৌশিকীকচ্ছ (হুগলী), বঙ্গ (ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশ), সুহ্ম (রাঢ়), প্রসুহ্ম, তাম্রলিপ্ত (তমলুক), কর্ব্বট প্রভৃতি প্রদেশে পূর্ব্বভারত বিভক্ত ছিল।

"* * * অথ মোদং গিরিপতিং রাজানাং বৈ মহৈজসম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেন নিজঘান মহাবলঃ।
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবাক্ষমাযযৌ ॥
ইদানীং বৃষ্ণিবীরেণ ন যোৎস্যামীতি পৌণ্ড্রক।
কৃষ্ণস্য ভুজসন্ত্রাসাৎ করমাশু দদৌ নৃপঃ ॥
কৌশিকং কচ্ছ নিলয়ং রাজানং চ মহৌজসম।
উভৌ বলভৃতাং বীরাবুভৌ তীব্র পরাক্রমৌ ॥
নিৰ্জ্জিত্যাজৌ মহাবীর্য্যং বঙ্গরাজ মুপাদ্রবৎ ॥

সমুদ্রসেন নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনং চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানম্ কাচং বঙ্গাধিপং তথা ॥
অঙ্গানামধিপংচৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে পুরুষর্ষভঃ ॥"

—মহাঃ, সভা, ২৬ অঃ, ৩৮।৪২ শ্লোঃ, ঐ সং

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। সেই যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগজ্যোতিষ দেশে (আসামে) বজ্রদত্ত কর্তৃক ধৃত হয়। এজন্য বজ্রদত্তের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। তাহাতে বজ্রদত্ত পরাস্ত হন। পরে বজ্রদত্তের সঙ্গে সন্ধি করিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে আগামী অশ্বমেধযজ্ঞে আমন্ত্রণ করেন (অশ্বমেধ ৭৫।৭৬ অঃ)। অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনও এই অশ্ব ধরেন। তাহাতেও অর্জ্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাস্ত হন। পিতাপুত্রে তখন পরিচয় ছিল না। যাহা হউক, পরে বভ্রুবাহন নিজ মাতা চিত্রাঙ্গদাকে ও বিমাতা উলূপীকে লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন (অশ্বমেধ পর্ব্ব, ৮৮ অঃ)।

হরিবংশের ভবিষ্য পর্ব্বে (১৯-২১ অঃ) শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব কর্তৃক তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে নিধন প্রসঙ্গ জানা যায়। এই যুদ্ধে কাশীরাজ তাঁহার বন্ধু পুণ্ড্রপতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অপরাধে শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজকে নিধন করেন ও কাশীধাম দগ্ধ করেন (মৎস্যপুরাণ, ২০৭ম অঃ)। এইরূপে ক্রমে বঙ্গদেশ মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল(১৭)।

এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন একটি বৃহৎ রাজ্য ছিল। ত্রিহুত, মালদহ, রাজসাহি, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া প্রদেশ লইয়া পুণ্ড্ররাজ্য গঠিত ছিল(১৮)। বাসুদেব, সমুদ্রসেন প্রভৃতি এখানকার রাজা ছিলেন।

এইরূপে রামায়ণ ও মহাভারতে বাঙ্গালার ও বঙ্গভূমির রাজাগণের অনেক কথাই আছে। নাগ, মণিপুর, গঙ্গারাঢ়ীয়(১৯) পৌণ্ড্র প্রভৃতি

---

(১৫) 'বিশ্বকোষ', ১৭শ ভাগ।

(১৬) ঐ, ঐ, ৪০৪ পৃঃ।

(১৭) 'পৃথিবীর ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ২৪২ পৃঃ।

(১৮) "* * * it included Tirhut, Malda, Rajshahi. Dinapur (Dinajpur ?) Rangpur and Bogra, which constituted the great ancient kingdom of Pundra-vardhana." Indo-Aryan : Dr. Rajendralal Mitra.

(১৯) "মহাবংশ নামক সিংহলীয় গ্রন্থে বাঙ্গালার এক রাজপুত্রের সিংহল গমনের কথা আছে। বুদ্ধদেবের জন্ম যদি ৫০৭ খ্রীঃ পূঃ স্থির হইয়া থাকে, তবে তৎপূর্ব্বেও বাঙ্গালী সভ্যতার কথা জানা যায়। * * * চন্দ্রগুপ্তের সভায় বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক গঙ্গারাঢ়ীয়গণের সভ্যতার ও শৌর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, * * * ইহারা কখনও শত্রু দ্বারা বিজিত হয় নাই। * * * সর্ব্বজয়ী আলেকজেন্দার গঙ্গাতীরে আসিয়া তথাকার অধিবাসীদের শৌর্য্যের কথা জানিতে পারিয়া তাহাদের আক্রমণ না করিয়াই ফিরিয়া গিয়াছিলেন"—'প্রচার' পত্রিকায় 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' শীর্ষক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ (বঙ্গাব্দ ১২৯১ —শ্রাবণ)।

শক্তিশালী জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত। কিন্তু বাঙ্গালীর সিংহল-বিজয়ের ন্যায় "মহাভারত ও রামায়ণের ঐতিহাসিকতা এখনও তর্কের বিষয়" হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসলেখক তাঁহার "গ্রন্থে মহাভারত ও রামায়ণের প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত বোধ" করেন নাই(২০) এবং "বাসুদেব প্রমুখ রাজাগণের" কাল "নির্ণয় করা দুঃসাধ্য" বলিয়াছেন। বাঙ্গালী মনীষা কি এতই দুর্ব্বল হইয়াছে—এতই অনুচিকীর্ষাপ্রিয় হইয়াছে? সাহেবদের অঙ্কিত গণ্ডীরেখা পার হওয়া দুঃসাধ্য বলিয়া চিরদিনই কি গণ্য হইবে? সত্যানুসন্ধানে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কবে অবহিত হইবেন? বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন যে, আলেকজেন্দারের আক্রমণের পূর্ব্বের (বিশ্বাসযোগ্য) কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা নাই বলিলেই হয়(২১)। গৌড়বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির ঐতিহ্যসিকতা নস্যাৎ করিয়া দিতেছেন। সুতরাং বাঙ্গালার ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগ, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের "অনুসন্ধান চেষ্টার অভাব" বলিয়া কেহ গৌরচন্দ্রিকায় খেদ প্রকাশ করিলেও সেই ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে আলেকজেন্দার হইতেই(২২)। এইরূপে হাল ছাড়িয়া দিলে কত দিন বাঙ্গালীর সুনাম রক্ষা হইবে? রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শুধু ঘটনাপরম্পরার ইতিহাস নয়—সেগুলি যে আমাদের সভ্যতার ইতিহাস। নিজ সভ্যতার ইতিহাসে যে জাতির এত অরুচি, জগৎসভায় তাহার শ্লাঘার বস্তু কি থাকিল? ভারতের অতীত গৌরব, প্রাচীন ভাবধারা ও কৃষ্টির বাহক এই সমস্ত গ্রন্থকে অনৈতিহাসিক বলিবার ধৃষ্টতা সংযত হওয়া উচিত।

(২০) "মহাভারত ও রামায়ণে বাসুদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি পৌণ্ড্র-জাতীয় ও বঙ্গদেশীয় রাজাগণের উল্লেখ আছে। অনাবশ্যক জ্ঞানে গ্রন্থমধ্যে তাঁহাদিগের উল্লেখ করি নাই। মহাভারত ও রামায়ণের ঐতিহাসিকতা এখনও তর্কের বিষয়। এতদ্ব্যতীত যে অংশে বাসুদেব-প্রমুখ রাজাগণের নাম আছে সেই অংশের বয়স কত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই সকল কারণে এই গ্রন্থে মহাভারত ও রামায়ণের প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত বোধ করি নাই।"—বাঙ্গালার ইতিহাস : রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ পৃঃ।

(২১) "No date of public event can be fixed before the invasion of Alexander."—Elphinston.

"In India with very few exceptions, contemporary evidence of any kind is not available before the time of Alexander."—Vincent A, Smith.

(২২) 'গৌড়রাজমালা'র উপক্রমণিকায় ৺অক্ষয়কুমার মৈত্র বলিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, 'গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড় তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল সে দেশের ইতিহাস নাই।'—উপাদানের অভাবকে ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না—অনুসন্ধান চেষ্টার অভাবই প্রধান অভাব।"

[কিন্তু বাঙ্গালার এই ইতিহাসখানিও ('গৌড়রাজমালা') সেকেন্দার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।—লেখক।]

যাত্রা-সঙ্গী

শ্রীগিরিবালা দেবী

এম-এ, এম-এস্‌সি পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। যাদের জানিবার তারা জানিয়াছে।

বেণু বাবার কাছে বায়না ধরিল, "এবারে আমাকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা কর বাবা, তোমাদের ওজোর আপত্তি আমি আর শুনচি নে।"

বাবা আশ্বাস দিলেন, "হবে বেণু, ব্যস্ত কি? আগে গেজেট বেরুক, তোমার মা'র মত নাও, তবে না যাবে?"

বেণু আবদার করিতে লাগিল, "না বাবা, এখন থেকে পাসপোর্টের চেষ্টা না করলে দেরী হয়ে যাবে। গেজেট দিয়ে আমাদের দরকারই বা কি? পাশ ত হয়েচি। মা'কে তুমি বলগে, আমি বলতে গেলে ঐ এক কথা—'একলা যেতে দেব না।' এদেশের মায়েরা একলার ভয়েই সারা হলেন। তোমায় সত্যি বলচি বাবা, মা'র ঘ্যান ঘ্যান আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল না লাগলেও তাঁর মত তোমায় নিতে হবে বেণু। তিনি সেকেলে, অল্পশিক্ষিতা হ'লেও তোমার মা; তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রে কিছু করতে গেলে চলে কি? তোমার-আমার মত যাই হোক, তবু তাঁকে অবহেলা করতে পারি নে।"

বেণু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তাহলে চল বাবা, মা'র কাছে যাই। এখুনি বুঝিয়ে বলিগে। শোন বাবা, তুমি কিন্তু আমার পক্ষে কথা ক'য়ো। খবরদার, মা'র পক্ষ নিও না।"

বেণুর বাবা প্রিয়তোষবাবু হাসিলেন, "আমি ত বরাবরই তোমার পক্ষে আছি বেণু, তুমি আমাদের প্রথম সন্তান; তোমার উপরে আমার সমস্ত আশা ভরসা। আমার এত বড় কারখানা, সাবান সেন্টের কারবার দেখার লোক চাই। তোমার ছোট ভাই, বাবুল, কাবুল দুটো নেহাৎ নাবালক; কাজেই ব্যবসা চালাবার যোগ্যতা তোমাকেই অর্জ্জন করতে

হবে। সেইজন্যে আমার ইচ্ছা তোমায় বাইরে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনি। তা চল, তোমার মা'র সঙ্গে আগে কথাবার্ত্তা ঠিক হোক।"

তাদের এত বড় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষদেশে বাবা তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী জানিয়া বেণুর গর্ব্বের সীমা রহিল না। সে আনন্দে উদ্দাম হইয়া প্রিয়তোষবাবুর হাত ধরিয়া মা'র নিকটে চলিল।

মস্ত বাড়ী, মস্ত গাড়ী, মস্ত কারবারের মালিকের গৃহিণীকে কোন দিক দিয়া মস্ত বলা চলে না। বিরাজমোহিনী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছোট-খাট মানুষটি, চালচলন নিতান্ত সাধারণ। স্বভাবটি যেমন কোমল, হাসিটি তেমনই মধুর।

বেণুর বাবার সহিত বেণুকে দেখিয়া তার অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে বেণু, পাহাড়ের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়তে এসেচিস? বিলাত যাবার কথা ত? না, নতুন কিছু?"

বেণু মুখ ভার করিয়া জবাব দিল, "নতুন আবার কি? তুমি ত আমায় বলেই রেখেছিলে, আমি এম-এস্‌সি পাশ করলে বিলেতে পাঠিয়ে দেবে। এখন অমত করলে ত চলবে না মা। কেবল আমারই ইচ্ছা নয়, বাবাও পাঠাতে চাচ্ছেন?"

প্রিয়তোষবাবু মাথা চুলকাইয়া সায় দিলেন, "হাঁ, বেণুকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনা দরকার। বাবুল কাবুল ছোট, ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বেণুকেই আমি তৈরি ক'রে নিতে চাই।"

"তুমি যা চাইচ, তাতে আমি অমত করব কেন? তবে আগেও আমি যা বলেচি, এখনও তাই বল্‌চি, সঙ্গীছাড়া একলা বেণুকে যেতে দেব না।"

প্রিয়তোষবাবু কাশিয়া জবাব দিলেন, "হাঁ, তা তুমি বলেচ বটে, বরাবর বলেচ সঙ্গীছাড়া যেতে দেবে না। তা বেণু, তুমি তোমার যাত্রা-সঙ্গী বেছে নাও। আমার টাকার অভাব নেই। দু'জনার খরচ অনায়াসে বহন করতে পারব। তোমায় তৈরি ক'রে আনা কারবারের কাজ, খরচও কারবারের। হাজার হোক মায়ের প্রাণ, একলা যখন পাঠাতে চাচ্ছেন না; কাজেই একজন যাত্রা-সঙ্গী চাই।"

বেণু রাগে জ্বলিয়া উঠিল, "আমি যেন মা'র বাবুল কাবুল হয়েছি। দিনরাত আঁচলের নীচে লুকিয়ে রাখা। বড় হয়েছি, চার চারটে পাশ করেছি, এমনই নাকি? আমি একলা যাব, একলা আসব, কারুকে আমার দরকার নেই। আজ বলচেন যাত্রা-সঙ্গী চাই, কাল বলবেন ভোজন-সঙ্গী আন। পরশু ধরবেন শয়ন-সঙ্গী না হ'লে চলবে না। এত কথা আমি শুনব না; যাব কি, যাব; একলা যাব।"

বেণুর উত্তেজনায় প্রিয়তোষবাবু গলিয়া গেলেন। একে তিনি সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, তায় বেণু তাঁর অতি আদরের, অতি স্নেহের। বেণুর স্বাধীন মতবাদের বিরুদ্ধে মা সময় সময় অন্তরায় হইলেও তিনি কখনও হন নাই। নদীর তরঙ্গের মত স্বাচ্ছন্দ্য সাবলীল গতিতে বেণুকে বহিয়া যাইতেই সাহায্য করিয়াছেন। নিষেধের উপলখণ্ডে কোথাও বাধে নাই। এখন বাধার সৃষ্টি করিলে সে মানিবে কেন?

প্রিয়তোষবাবুর কিন্তু দুই দিকেই সমান, দুই জায়গাতেই দুর্ব্বলতা, তিনি বেণুকে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না। আবার বেণুর মাকেও ব্যথা দিতে পারেন না। নিরুপায় ভালমানুষটি মহাসমস্যায় পড়িয়া কেশবিরল মস্তকে কেবলই হাত বুলাইতে লাগিলেন।

স্বামীকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া বিরাজ হাত বাড়াইয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তার মুখখানি বুকে চাপিয়া স্নেহস্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "বেণু, রাগ করে কি? রাগ ক'রো না। তুমি যেতে চাইচ নিশ্চয় যাবে। তোমার অনেক বন্ধু, অনেকেই তোমায় ভালবাসে, তাদের ভেতর থেকে যাকে তোমার ভাল লাগে, বিশ্বাস হয়, সাথী হিসাবে বেছে নাও। তোমার পাশের উপলক্ষে একদিন বরং সকলকে চায়ের নেমন্তন্ন করি।"

এতক্ষণে প্রিয়তোষবাবু অকূল সমুদ্রে যেন কূল পাইলেন। তিনি সাগ্রহে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "হাঁ, হাঁ, তা ত করতেই হবে। বেণুর পাশের খাওয়া না দিলে চলবে কেন। এম-এস্‌সি পাশ কি সোজা কথা? ক'জনা পারে? গেজেট বেরুলেই আত্মীয়বন্ধুদের ডেকে খাইয়ে দিও।"

বেণু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইল, "ভারী ত পাশ, সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়ে, এত ঘটা কিসের? আমি চাইনে কাউকে ডাকতে, চাইনে চা' খাওয়াতে।"

বিরাজ বেণুকে সান্ত্বনা দিলেন, "এ কি কথা বেণু? তোমার ফল খুব ভাল হয়েছে। এর চেয়ে খারাপ হ'লেও আমি দুঃখিত হতাম না।"

বেণু কহিল, "তুমি ত বলবেই মা; কম নম্বর পেয়ে আমার যে কি হ'য়েচে তা আমিই জানি। কত খেটেছিলাম, চেষ্টা ক'রেছিলাম, তোমার বাপের বাড়ীর দেশের ছেলে রণজিতের সমান হ'তে। তা হ'ল না, ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হ'য়ে সে-ই রইল।"

মা বলিলেন, "তাতে দুঃখ কি বেণু? পরীক্ষার ফলাফল ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রে। কত ভাল ছেলে কম নম্বর পায়, মন্দ ছেলে হঠাৎ উত্‌রে যায়। পরীক্ষার ফলের জোরে রণজিতকে ক'রে খেতে হবে। তোমার ত সে ভাবনা নেই।"

প্রিয়তোষবাবু কহিলেন, "তা ঠিক, তুমি মন খারাপ ক'রো না বেণু; বেশ করেচ, সুন্দর করেচ। রণজিতের কথা ছেড়ে দাও, ও কি ছেলে! ছেলে নয় বিদ্যুৎ, অমনটি আর চোখে পড়ে না। কি ধার, কি বুদ্ধি! তেম্‌নি কি সৎস্বভাব! ওর বাবা ললিত ছিল আমার বাল্যবন্ধু; আহা, বেচারা অল্প বয়েসে মারা গেল। রণজিতকে অনেক দিন দেখি না; এখন আসে না বুঝি? বেণু, তুমি তাকে ডাক না কেন? সে ত তোমারও বন্ধু!"

বেণু ঝাঁঝের সহিত উত্তর করিল, "না বাবা, সে আমার বন্ধু নয়। যার অত অহঙ্কার, অত তেজ সে কারুর বন্ধু হ'তে পারে না। মা'র বাপের বাড়ীর দেশের লোক, তোমার বন্ধুর ছেলে, তাই তোমরা দু'জনা মিলে ওকে যতটা বাড়াও, আসলে ও ততটা নয়। ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হ'য়ে মাটিতে পা পড়ে না। অমন কাজ উনি ভিন্ন আর যেন কেউ পারে নি!"

প্রিয়তোষবাবু এ আক্রোশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। বিরাজমোহিনী নীরবে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে গেজেট বাহির হওয়া মাত্র একখানা গেজেট লইয়া বেণুকে অভিনন্দন করিতে আসিলেন নবীন ব্যারিষ্টার মিঃ চৌধুরী। বেশভূষার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি, মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন, বাক্যালাপে বিচক্ষণ, ধনী পিতার ধনগৌরবে গৌরবান্বিত। চৌধুরীর ওজন-করা হাসি, ওজন-করা শিষ্টাচার শেষ হইতে না হইতেই সদ্যঃপ্রকাশিত গেজেট হস্তে আগমন করিলেন মিঃ রায়। ছেলেটি বলিষ্ঠ, দেখিতে ভাল, অল্প দিন হইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। চাকরীর বাজার মন্দা বলিয়া এখনও কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজিতে হইতেছে। চৌধুরীর ন্যায় আভিজাত্যে পরিপক্ব না হইলেও রায় অভদ্র নহে। দিব্য হাসি-খুশী সপ্রতিভ।

রায়ের অভিনন্দন অভিবাদনের মধ্যে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে আবির্ভূত হইলেন মিঃ মজুমদার। লোকটির যেমন ছুঁচালো চেহারা, তেমনই ধারালো কথাবার্ত্তা। বহুকাল বিদেশে থাকিয়া বীমা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন।

মজুমদার এটাচিকেস্ হইতে সযত্নে আনীত গেজেটখানি বাহির করিয়া সহাস্যে আরম্ভ করিলেন, "আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আনন্দজ্ঞাপন করতে এসেছি ; ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার সাফল্য যে এতদূর এগিয়ে যাবে, আশা করি নি। যে দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন, তাতে এ হ'ল গিয়ে আশাতীত ফল।"

বেণু সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি ভুল করেছেন মিঃ মজুমদার, এবার আমার শরীর ভালই ছিল। অসুখ হ'য়েছিল বি-এস্‌সি পরীক্ষার আগে।"

চৌধুরী হাসিলেন, "কোথায় ভাল ছিলেন ? মোটেই না। নিজে বুঝতে পারেন নি, আমরা পেরেছি।"

রায়ের বয়স কম, কথা বলে কম, তবু দুইজনার কথার পৃষ্ঠে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। মৃদুস্বরে বলিল, "পরীক্ষার পড়ার চাপে শরীরের দিকে লক্ষ্য থাকে না। অসুখ হলেও অনুভূতি চলে যায়।"

মজুমদার অভয় দিলেন, "শরীর এবারে ভাল হয়ে যাবে। ঝঞ্ঝাট ত মিটে গেল। শুনলাম, আপনি নাকি লণ্ডনে যাচ্চেন ? মা একলা যেতে দেবেন না। ঠিকই ত, ছেলেমানুষ, একা কি অতদূরে যায় ? আপনার সঙ্গী হবার সৌভাগ্য আমাকে যদি দেন, তাহলে কোন ভাবনা থাকবে না। লণ্ডনই বলুন, আর নিউ ইয়র্ক, জর্মনী, প্যারিস, বার্লীনই বলুন, আমি ছয় ছয়টা বছর তন্ন তন্ন ক'রে ঘুরে এসেছি, কোথাও বাকী রাখি নি।"

রায় বলিল, "আমিও ছিলাম চার বছর, দেখাশোনা বেড়ানো আমারও ঢের হয়েচে ; অনুমতি পেলে আমিও আনন্দের সঙ্গে আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি।"

চৌধুরী সগর্ব্বে রায় দিলেন, "বছরের কথা কি বলচেন ম'শায় ? প্রচুর টাকা না থাকলে ওদেশে যাওয়া বিড়ম্বনা। ছিলাম বটে দু বছর, তার ভেতরে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে যাই নি, এমন কোন উৎসব ছিল না, যাতে আমি যোগ দিই নি। ও অঞ্চলের সবাই আমার নাম রেখেছিল ধনকুবের। আমিও যেতে পারি বেণুর সঙ্গী হিসাবে। কাজের জন্যে আমার যাওয়ারও দরকার হয়েচে।"

বেণু তার সম্মুখে উপবিষ্ট তিনটি মূর্ত্তির পানে চোখ তুলিয়া বলিল "বেশ ত, আপনাদের ভেতরে যে-কেউ হোক যাবেন আমার সাথে। আমায় ক'দিন ভাববার সময় দিন ; ভেবে চিন্তে পরে বলব।"

বেণুর আশ্বাসে তিনখানি মুখে আশার আলো জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। ইহারা তিনটি বেণুর অবসর-সঙ্গী, চায়ের টেবিলের একনিষ্ঠ ভক্ত। ইহাদের আশা অফুরন্ত, আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত। ইহারা জানে, বেণুর বাবার মস্ত বাড়ী, মস্ত গাড়ী, মস্ত বড় কারবার কারখানা। বেণু বাবার বড় আদরের, বড় স্নেহের।

সত্যিকারের বেণুর জন্য যতটা না হোক, তাদের বাহ্যিক সম্পদের সৌরভে লুব্ধ ভ্রমরের মত অনেকেই আসিল অভিবাদন জানাইতে, অভিনন্দন দিতে। হাসি, গল্পে, মিষ্টান্নে চা'এ সমারোহ পড়িয়া গেল।

একে একে সকলের পালা শেষ হইল ; শেষ হইল না কেবল রণজিতের পালা ; সে না আসিল অভিনন্দন দিতে, না আসিল খবর লইতে।

একদিন বিরাজমোহিনী বলিলেন, "রণজিতের একটা খোঁজ নিতে হয় বেণু, কোথায় কি ভাবে রয়েচে। মাঝে শুনেছিলাম, চাকরীর চেষ্টায় ব্যস্ত। ছেলে পড়িয়ে মেসের খরচ চালাচ্চে। আহা, বড় ভাল ছেলে, দুঃখী মায়ের বুক-জোড়া মাণিক। বেঁচে থাকুক।"

বেণু তিক্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "তোমাদের দেশের ছেলে তুমি মাথায় তুলে নাচগে মা, আমার দায় পড়েচে খোঁজ নিতে। আমাদের কারখানায় কত লোকের চাকরী হয় ; আমার বাবা কত লোকের উপকার করেন। বাবার কাছে এসে দাঁড়াতে যার মাথা কাটা যায়, সে ছেলে পড়িয়ে খাবে না ত খাবে কে ?"

বিরাজ বেণুকে বুঝাইয়াছিলেন—দুনিয়ার সকলেই এক ধাতের নয়, করুণার ভিক্ষা সকলেই লইতে পারে না। যারা আত্মনির্ভরশীল, আত্মনিষ্ঠ তারাই প্রকৃত মহৎ।

মা'র মহত্ত্বের উদাহরণ লইয়া বেণু চিন্তা করে নাই। কোথাকার কে, বাবার বন্ধুর ছেলে, মা'র বাপের দেশের লোক, তাকে দিয়া বেণুর কিসের প্রয়োজন ? সেই একদিন আসিয়াছিল ; অযাচিত অনাহূতভাবে বেণুর সহিত মিশিয়াছিল। তার আগ্রহে বেণুর রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ।

তার পর কোথা দিয়া কি হইল, বেণু তা জানে না। জানিবার মধ্যে এইটুকু জানিয়াছে, দূরের মানুষ কাছে আসে, কাছের মানুষ দূরে যায়। এমনই যাওয়া-আসা লইয়া সংসার। ইহার নিমিত্ত বেণু ব্যস্ত নহে, ব্যাকুল নহে। বেণুর কি আর কেহ নাই ? যারা আছে, তাদের সাজানো হাসি, সাজানো বাক্যের অন্তরাল হইতে স্বার্থের কঙ্কাল উঁকি

উঁকি-ঝুঁকি দিলেও স্তব স্তুতির মূর্চ্ছনা কিছু মন্দ শোনায় না। ইহাতে বেণুর আর কিছু হোক বা না হোক, লোকের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। বেণু এখন অনেক জানে অনেক চেনে।

এত বেশী জানিবার চিনিবার সুযোগ পাইয়া বেণু স্তাবকের দলদের জন্য মনে মনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে প্রবল বিরাগ, বিতৃষ্ণা, অকথ্য ঘৃণা। যাকে বিদ্বেষ করে, অবহেলা করে, সামান্য সংবাদটা পর্য্যন্ত লইতে চাহে না, তাহার জন্য হৃদয়ের গোপন গহনে কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তাহা কেহ জানে না। জানে শুধু বেণু।

সেদিন সন্ধ্যায় অকাল-বর্ষার রিমিঝিমি সুরের গুঞ্জনে বেণুর চিত্তে জাগিল সুপ্ত-সঙ্গীতের রেশ। হাঁ, আর একটা কথা বলা হয় নাই, পরীক্ষায় বেণু দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পাইলেও গান গাহে প্রথম শ্রেণীর। বন্ধুমহলে প্রচার, বেণুর সঙ্গীত-সাধনায় মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের গলার মালা খুলিয়া বেণুর গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সম্মানে বেণু নাকি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু গাহে না।

অনেক দিন পর বেণু তার বেহালার তার বাঁধিয়া মুক্ত জানালার নীচে গিয়া বসিল। সামনে মেঘে মেঘে মেঘময় আকাশ, পাতায় পাতায় বাদল ঝরিতেছে—টিপ-টিপ টুপ-টাপ। সজল শীতল বাতাস অব্যক্ত বেদনায় কাঁদিয়া সারা।

বেণুর গলাটা কেবলই ধরিয়া আসিতেছিল ; সেই ধরা গলায় বেণু গাহিতে লাগিল—

> "আমি, নিতি নিতি কত রচিব শয়ন, আকুল পরাণ রে,
> নিতি নিতি কত করিব যতনে কুসুম চয়ন রে।
> কত শরত যামিনী বিফলে যাবে, বসন্ত যাবে চ'লে,
> কত উদিয়া তপন, আশার স্বপন প্রভাতে যাবে ছ'লে।"

বেণুর গলায় আজ যেন কি হইয়াছিল? গাহিতে গাহিতে থামিয়া গেল। মুখর বাতাসে চালিত বৃষ্টির ছাট আসিয়া বেণুর সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিতে লাগিল। বেণু উঠিল না। বারিসিক্ত নয়নে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দ্বারের ভারী পর্দ্দা সরাইয়া বিরাজমোহিনী আসিয়া ডাকিলেন, "বেণু!"

বেণু চমকিয়া ঘাড় ফিরাইল ; মা একাকী আসেন নাই, তাঁর পিছনে রণজিত। বেণুর মনের মধ্যে কি হইতেছিল, কে জানে? বাহিরে মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তন হইল না।

বেণু রণজিতের পানে চোখ তুলিয়া শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এতকাল পর কি মনে করে আসা হয়েচে? আগের মত এলে গেলে পাছে আমাকে পড়াতে হয়, পাছে আমি বেশী নম্বর পেয়ে ভাল ছেলের নাম ডুবিয়ে দিই, সেই ভয়ে পালিয়ে থাকার কারণ আমার জানতে বাকী নেই।"

রণজিত নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। চা আনিবার ছুতায় মা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন।

বেণুর কি সোজা রাগ, সোজা অভিমান? তার অশেষ বিদ্বেষের পাত্রকে নিকটে পাইয়া সে কি সহজে ছাড়িতে পারে?

কোলের বেহালাটাকে মেঝের নামাইয়া বেণু রণজিতের সামনে মুখোমুখী বসিয়া কহিল, "এখানকার ফল যাই হোক, লণ্ডনের পি এইচ্-ডি, আমায় হতেই হবে। তুমি এ পরীক্ষায় আমায় সাহায্য না করলেও আমি অপদার্থ হয়ে থাকব না। ভারী ত পাশ করেছ, ভারী ত জান, এত গুমোর কিসের? তোমার মত আর কি কেউ নেই? না, থাকতে পারে না?"

রণজিত ধীরে জবাব দিল, "কে বলেছে নেই, থাকতে পারে না? আছে বলেই না আমি স'রে রয়েচি। পরীক্ষার সময় আমায় যদি তোমার এত দরকারই ছিল বেণু, তবে ডাকো নি কেন?"

বেণু গর্জ্জিয়া উঠিল, "ডাকব কেন? আমার কিসের দায়? না ডাকলেও আমার কাছে কত জন আসে। তারা নেহাৎ হেলা-ফেলার নয়।"

"জানি বেণু, হেলাফেলার লোক আসে না। আমার চেয়ে উঁচুদরের জনসমাগমেই না আমি সরে গিয়েচি। আমি আর যাই হই, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আলাদীনের স্বপ্ন দেখি না। তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব অসম্ভব, অসমান সমুদ্রে নালায় যতটা প্রভেদ, তেমনই।"

বেণু বিগলিত হইল। নরম গলায় কহিল, "কিসের প্রভেদ? যারা আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসে, তারা কোন দিক দিয়েই তোমার সমান হতে পারে না। তোমার সবচেয়ে বড় দোষ, তুমি নিজেকে ভারী ছোট করো, নিজের অধিকার জোর ক'রে নিতে পার না। যাদের যোগ্যতা নেই কাণাকড়ির, তারাই আসে। ঘেন্নায়, লজ্জায় আমি যে ম'রে যাই, তা কি তুমি দেখতে পাও না?"

"কেমন ক'রে দেখব বেণু? দেখবার সাহস হয়নি। থাকুক ওসব কথা ; তুমি কবে যাচ্ছ? মা তোমায় একলা যেতে দেবেন না, কাকে নিয়ে যাবে?"

বেণু চিন্তিত মুখে বলিল, "এখনও তা ঠিক করিনি। তোমারও পি-এইচ্-ডি দেওয়া দরকার। ওটা দিয়ে ফেলে ডিএসসিটাও দিও। আমি জানি, তুমি পারবে, কোথাও আট্‌কাবে না। একবার লণ্ডনে গেলেই হয়।"

রণজিত ক্ষোভের হাসি হাসিল, "তুমি পাগল বেণু, আমি যাব লণ্ডনে? আমার টাকা কোথায়? আমি এখানেই চেষ্টা করব, যা হয় হবে।"

বেণু বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "তোমরা বড় দোষ, নিতে জান না? তোমার বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তুমি আমার মা'র বাপের বাড়ীর দেশের লোক, তোমার আবার টাকার অভাব? বাবাকে বলো তিনিই টাকা দেবেন।"

রণজিত ঘাড় নাড়িল, "তা হয় না বেণু, যেখানে অধিকার নেই, সেখানে ভিক্ষাবৃত্তির প্রবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি। তোমার বাবার টাকা আমি নিতে পারব না।"

বেণু কহিল, "না নিলে বাবার টাকা, আমার টাকা ত নেবে? আমার নিজের হাজার কয়েক টাকা জমেছে। আমার সমস্ত খরচ বাবা দেবেন, তোমায় আমার ক্যাবিনে সাথী করে নিয়ে গেলে ভাড়া ঢের কম লাগবে।"

রণজিত চমকিয়া উঠিল, "তুমি কি বলচ বেণু? এক ক্যাবিনে বন্ধু পরিচয়ে দুইজন যেতে পারে না। নিয়ম নেই। কারা যায়, যেতে পারে, তা কি তুমি জান না?"

বেণু মিষ্টহাসি হাসিয়া কহিল, "কে বললে জানি নে? জানি বলেই না তোমায় যাত্রা-সঙ্গী করছি। তোমার নেবার ক্ষমতা নেই, আমার দেবার শক্তি আছে। সেই শক্তিতেই আমি তোমায় নিয়ে যাব। তোমার সাধ্য নেই, আমায় বাধা দাও।"

হাঁ, আর একটা কথা, এতক্ষণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বেণু ছেলে নয়, মেয়ে।

কাজলা দীঘির পাড়ে

শ্রীমতী যূথিকা মুখোপাধ্যায়

কাজলা দীঘির পরে
আজো বনফুল প্রণতির ছলে প্রতিদিন পড়ে ঝরে।
তারি পাড়ে ভাঙ্গা মাটীর কুঁড়েটি যেন পটে ছবি আঁকা
কত সে স্মৃতির কাহিনী তাহার বুকের মাঝারে ঢাকা।
ক্ষীণ শশী-রেখা আঁধার নিশীথে ম্লান হাসি হেসে চায়
নিঃশ্বাস ফেলি ধীর মন্থর বয়ে যায় মৃদু বায়।

এখনও যে ম্লান সাজে—
বুড়ো বটগাছ দাঁড়ায়ে রয়েছে পঞ্চবটীর মাঝে;
পাতাগুলি তার ঝরে পড়ে গেছে শুষ্ক হয়েছে দেহ
অজানা পথের যাত্রী আজিকে—ফিরেও চাহে না কেহ।
তারি পূব দিকে সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে—সুজনের বাঁধা ঘর,
মাটী ঝরে গেছে মাথা তুলে আছে আগাছা যে পর পর।

কত শত আশা নিয়ে
বেঁধেছিল সে যে সুখের কুঁড়েটি, ছেলে আর বৌ নিয়ে,
কেটে যেত কত সারা দিনমান হাসি গান কথা কয়ে।
এমনি করিয়া সুখের তরীটি ভরা কূলে যেত বয়ে;
হঠাৎ লাগিল ভীষণ ঝঞ্ঝা হয়ে গেল ছারখার
ছ মাস না যেতে ভেঙ্গে গেল ঘর, চলে গেল রাণু তার।

ছেলেটির পানে চেয়ে
অতীতের সেই সুখের স্বপন নয়নেতে যেত ছেয়ে।
ঝরিয়া পড়িত জলের বিন্দু ধীরে ধীরে গাল বাহি;
পিতার অশ্রু ছলছল চোখে ছেলেটি দেখিত চাহি।
কোনক্রমে ছিল ভুলিয়া সুজন ছেলেটিরে নিয়ে হায়,
ছাড়িত না কভু এক তিলও তারে রাখিত আঁচল ছায়!

রহিত না যারে ছাড়ি
বছর না যেতে বুক হতে তারে দেবতা যে নিল কাড়ি!
পাগল হইয়া পথে সে বেরুল, ফিরিল না আর ঘরে;
সুখের কুঁড়েটি মলিন হইয়া একেলা রহিল পড়ে।
কোথায় সে আছে কেমনে যে আছে কেহ নাহি আর জানে;
নিঠুর দেবতা বোঝেনিক ব্যথা, গেছে তাই অভিমানে।



ফ্রান্সের সঙ্কট

শ্রীঅতুল দত্ত

(রাজনীতি)

ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ উদ্বেগপূর্ণ বৎসরের অবসান হইল। বনেদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন্ ও ফ্রান্স প্রধানতঃ জার্ম্মানীকে লইয়াই এই বারটী মাস ব্যতিব্যস্ত ছিল। এই বৎসরের প্রথমে ইটালীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া বৃটেন মনে করিয়াছিল যে মুসোলিনি আর তাহাকে বিব্রত করিবেন না; তিনি যাহাতে ফ্রান্সের প্রতিও সদয় হন সেই উদ্দেশ্যে বৃটেনের ইঙ্গিতে ফ্রান্সও ইটালীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু মুসোলিনি ফ্রান্সের এই আগ্রহে সাড়া দেন নাই। তিনি সেই সময় জেনোয়ায় এক বক্তৃতায় বলেন যে, ফ্রান্সের সহিত ইটালীর মিলন হইবে কেমন করিয়া—স্পেনে ফ্রান্স চাহে সরকার পক্ষের বিজয়, আর ইটালী চাহে জেনারল ফ্রাঙ্কোর বিজয়। ইহার পর মধ্য ইউরোপে রাজনীতিক বিপর্য্যয় আরম্ভ হয়; জার্ম্মানী অকস্মাৎ অষ্ট্রীয়াকে কুক্ষীগত করিয়া লয় এবং এই সম্পর্কিত চাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবামাত্র চেকোশ্লোভেকিয়ার কতকাংশ উদরস্থ করিবার উদ্দেশ্যে সুযোগ খুঁজিতে আরম্ভ করে। তাহার পর গত সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ ধুরন্ধর মিঃ চেম্বারলেন ও ফরাসী ধুরন্ধর মঃ দালাদিয়ার মিউনিক আসেন এবং হিট্‌লার ও মুসোলিনির সহিত একাসনে বসিয়া "যাক্-শত্রু-পরে-পরে"-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া সানন্দে ঘরে ফেরেন। চেকোশ্লোভেকিয়ার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়—সে তাহার রাজ্যের এক বিরাট অংশ হারায়, সুরক্ষিত সীমান্ত হারায়, অর্থনীতিক ক্ষতি স্বীকার করে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে তাহার মর্য্যাদা নষ্ট হয়। এক কথায়, সে জার্ম্মানীর রক্ষিত রাজ্যে পরিণত হয়। মিউনিক বৈঠকের পর মুসোলিনি গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তাঁহার মনের কথা কেহ বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না। মিউনিকের পর হিট্‌লার বলেন, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, তিনি ইউরোপে আর কোন দাবী করিবেন না। এই ব্যক্তিটী "আর চাহি না" বলিয়া অল্পকাল পরেই "না পাইলে "যুদ্ধ করিব" বলিয়া হুমকি দিতে অভ্যস্ত। কাজেই মিউনিকের পর তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ না করাই উচিত ছিল। কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন ও মঃ দালাদিয়ার চেকোশ্লোভেকিয়ার নিকট বিশ্বাসঘাতকতা-জনিত নিজেদের বিনষ্ট আত্মমর্য্যাদা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে হিট্‌লারের এই উক্তিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উল্লাস প্রকাশ করেন। তাঁহারা দুইজনে উচ্চ কণ্ঠে সকলকে শুনান, হিট্‌লারের শেষ দাবী পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে আর বিঘ্ন নাই। তাঁহারা নিজ নিজ দেশে সকলকে জানান যে, জার্ম্মাণীর সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া না চলিলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। মিঃ চেম্বারলেন মিউনিকে বসিয়াই ইঙ্গো-জার্ম্মান্ মিলনপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। মিউনিক হইতে প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর হইতেই মঃ দালাদিয়ার এইরূপ একখানি পত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠেন। ২৩শে অক্টোবর তারিখে রেডিক্যাল সোস্যালিষ্ট কংগ্রেসে তিনি ঘোষণা করেন, ফ্রান্সের এক্ষণে জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত সহযোগিতা করা প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধভীতি প্রদর্শন করিয়া নিজেদের নিরঙ্কুশ করিবার উদ্দেশ্যে দালাদিয়ার-মন্ত্রিসভা যে সকল আইন প্রণয়ন করেন, তাহা ফ্রান্সের জনসাধারণ সহজে মানিয়া লইতে চাহে নাই। ইহা লইয়া নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই সকল গোলযোগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার পর জার্ম্মান্ পররাষ্ট্র সচিব হের ফন্ রিবেন্‌ট্রপ প্যারিসে আগমন করেন; দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা তখন সাগ্রহে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান্ মিলন-লিপি স্বাক্ষর করেন। হঠাৎ জার্ম্মানীর সহিত এই মিলন ফ্রান্সের জনসাধারণ সুনজরে দেখে নাই। ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান্ মিলন সম্বন্ধে প্যারিসের একখানি নরমপন্থী পত্রিকা পর্য্যন্ত লিখিয়াছে, ফ্রান্স এবং তাহার সাম্রাজ্যকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ইটালী ও জার্ম্মানী ষড়যন্ত্র করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মিত্রতার কথা অসহ্য। জার্ম্মানীর নাৎসী দলের "আর্য্যপুত্রেরা" অনার্য্য জাতির

ছায়া স্পর্শ করেন না। এই জন্য, "আর্য্যপুত্র" রিবেনট্রপের আপ্যায়নের জন্য প্যারিসে যে ভোজের আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে দুইজন অনার্য্য ফরাসী মন্ত্রী নিমন্ত্রিত হন নাই। এই সম্পর্কে একখানি ফরাসী পত্রিকা প্রশ্ন করিয়াছিল, "হিট্‌লার কি ফ্রান্সের জন্যও আইন করিতেছেন?"

মিউনিক হইতে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুসোলিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ হিট্‌লারের উপর 'চাল চালিতে' চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি হাঙ্গেরিকে আগাইয়া দিয়া ইটালীর প্রভাবাধীনে একটি বল্‌কান্ রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, যুগোশ্লেভিয়া, হাঙ্গেরি ও পোলাণ্ডকে লইয়া একটি রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠন করিবেন। মিউনিক বৈঠকের পর মুসোলিনির ইঙ্গিতেই হাঙ্গেরি ও পোলাণ্ড চাহিয়াছিল—তাহারা চেকোশ্লোভেকিয়ার কিয়দংশ উদরসাৎ করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত দেশে পরিণত হইবে। হিট্‌লারের নিকট তাঁহার ফ্যাসিষ্ট বন্ধুর এই চাল ধরা পড়িয়া যায়; তিনি কিছুতেই পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরির দাবী পূরণ করেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ফ্যাসিষ্ট শক্তিত্রয়ের মধ্যে ইটালীর অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক। মুসোলিনি বহ্বাস্ফোট করিয়াই "বাজার মাৎ" করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার নীতি কোন দিকেই সফল হইতেছে না; যে আবিসিনিয়া লইয়া তাঁহার এত গর্ব্ব তাহা হইতে ইটালীর কোনপ্রকার আয় হওয়া ত দূরের কথা—প্রতি বৎসর নয় মিলিয়ার্ড লীরা এই নূতন সাম্রাজ্যের জন্য ব্যয় হইতেছে। চারি লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত এক কোটি বিদ্রোহী অধিবাসীকে শাসনাধীনে আনয়ন করিতে হইলে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন তাহা ইটালীর নাই। তাহাব পর, স্পেনে আজ আড়াই বৎসরকাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে সৈন্য ও সমরোপকরণ জোগাইবার পরও সেখানকার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে, জার্ম্মানী মাত্র ছয়টি মাসের মধ্যে পঁয়ষট্টি লক্ষ নর-নারী অধ্যুষিত অষ্ট্রীয়া এবং চেকোশ্লোভেকিয়ার পঁয়ত্রিশ লক্ষ নর-নারী অধ্যুষিত সিউডেটেন্ অঞ্চল কুক্ষীগত করিল। অথচ, তাহার একটি সৈন্য ক্ষয় হইল না, একটী গুলী নিক্ষেপের প্রয়োজন হইল না! মুসোলিনি তাঁহার নাৎসী বন্ধু হিট্‌লারের সহিত নিজের "হিসাব মিলাইয়া" যে কেবল ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছেন তাহাই নহে, বন্ধুর এই শক্তিবৃদ্ধিতে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইয়াছে। ইটালীর একটি বড় অসুবিধা—আধুনিক শ্রমশিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দুইটি বস্তু তাহাকে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়; তৈল ও কয়লা ইটালীতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া হইতে ইটালী লোহ ও কাষ্ঠ আমদানি করিত; এক্ষণে এই সকল বস্তুর উপর একচেটিয়া অধিকার জার্ম্মানীর।

পূর্ব্ব-ইউরোপে মুসোলিনির কৌশল ব্যর্থ হইবার পর তিনি এইবার ভূমধ্যসাগর এবং আফ্রিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। ইটালী দাবী উত্থাপন করিয়াছে যে, কর্সিকা, টিউনিস ও জিবুতি তাহাকে দিতে হইবে; ইহা ব্যতীত সুয়েজ খালের পরিচালনা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপটির উপর বহু দিন হইতেই ইটালীর শ্যেনদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এই দ্বীপটি ইটালীর অধিকারভুক্ত হইলে ভূমধ্যসাগরকে "ইটালীর হ্রদে" পরিণত করিবার পথে আর কোন বিঘ্ন থাকিবে না। বেলিয়ারিক্ দ্বীপপুঞ্জে বহু পূর্ব্বেই ইটালীর বিমান ও সাবমেরিনের ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে কর্সিকা দ্বীপটি যদি ইটালীর অধিকারে আসে, তাহা হইলে তাহার বহু দিনের স্বপ্ন সফল হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত এই দ্বীপটি ইটালীর অধিকারভুক্ত ছিল। নেপোলিয়নের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দ্বীপটি ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। নেপোলিয়নের পিতা জোসেফ্ বোনাপার্ট যখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তাঁহার জননী লেটিসিয়া নেপোলিয়নকে গর্ভে ধারণ করিয়া অশ্বারূঢ়াবস্থায় স্বামীর সহিত পাহাড়ে, জঙ্গলে, গিরিকন্দরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্স তাঁহার জন্মভূমি কর্সিকাকে বলপূর্ব্বক আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নেপোলিয়ন তাঁহার বাল্যজীবনে ফ্রান্সের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। অবশ্য পরবর্ত্তী জীবনে ফ্রান্সই তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। কর্সিকা দ্বীপের সহিত ইটালীর সেই দুই শত বৎসর পূর্ব্বের সংযোগ সে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। নেপোলিয়ন্ কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইটালীতে তিনি এখনও "ইটালীর সম্রাট" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

টিউনিসের উপর ইটালীর লোলুপ দৃষ্টি পতিত হওয়া স্বাভাবিক। ইটালী এক্ষণে সাড়ম্বরে আফ্রিকায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে; সুতরাং ত্রিপলির (লিবিয়া নামেও পরিচিত) নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলের এই স্থানটুকু লাভ করিতে পারিলে তাহার বিশেষ সুবিধা হয়। টিউনিসে ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা দুই লক্ষ তের হাজার; ইহাদিগের মধ্যে এক লক্ষ আশী হাজার ফরাসী এবং চুরানব্বই হাজার ইটালীয়। চেকোশ্লোভেকিয়া ও অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মানদিগের উপর অত্যাচারের মিথ্যা অভিযোগ করিয়া জার্ম্মানী যেরূপে ঐ দুইটি দেশ কুক্ষীগত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, টিউনিস্ সম্পর্কেও ইটালী তাহাই করিতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের অধিকার বিস্তৃতির বহু পূর্ব্ব হইতেই ইটালী টিউনিস্ পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। আলজেরিয়া অধিকারের পর ফ্রান্সও টিউনিসের উপর শ্যেনদৃষ্টিপাত করে; কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণ সহজে ফ্রান্সের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে চাহে নাই। ইহার পর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে টিউনিস্ যখন ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়, তখন ইটালী "মনের দুঃখে" অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মানীর সহিত যোগ দিয়া "ত্রিশক্তির মিলন" সঙ্ঘটিত করিয়াছিল। ইহার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইটালী অটোম্যান্ সাম্রাজ্যের ত্রিপলি অধিকার করে এবং ঈজিয়ান্ সাগরের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। এই সকল দ্বীপ সানন্দে ইটালীর প্রভুত্ব মানিয়া লয় নাই, তাহারা গ্রীসের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিয়াছিল। গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সন্ধিতে ইটালীকে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, সে যদি যুদ্ধে যোগদান করে, তাহা হইলে উপনিবেশ সম্পর্কে তাহার ক্ষতি পূরণ করা হইবে। ইহার পর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ফরাসী মন্ত্রী লাভালের সহিত ইটালীর এক চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে প্রধানত টিউনিসে প্রবাসী ইটালীয়দিগের অধিকার সম্পর্কে ব্যবস্থা হইয়াছিল; ইহা ব্যতীত ফ্রান্স সাহারার অন্তর্গত তিরেস্তি, লোহিত সাগরের ডুমেরিয়া নামক দ্বীপটি, লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলের সামান্য স্থান এবং জিবুতি রেলপথের কতকগুলি অংশ ইটালীকে প্রদান করে। ইটালী সম্প্রতি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছে যে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পালন করা হয় নাই।

জিবুতি বন্দরটি ইটালীর অধিকৃত আবিসিনিয়ার দ্বারস্বরূপ। সুতরাং ইহাকে আপনার অধিকারভুক্ত করিবার জন্য দাবী উত্থাপন ইটালীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তাহার পর সুয়েজ খাল। গত আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষ-এ" "ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে সুয়েজ খাল সম্পর্কে বলিয়াছিলাম, "চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় সুয়েজ খালের অবাধ ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ব্ব ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছে। যতদূর মনে হয়, এই স্থলেই সুয়েজ খাল সম্পর্কিত চুক্তির শেষ নহে। গত আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় সুয়েজ খাল দিয়া সৈন্যপূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইবার জন্য মুসোলিনিকে ২০ লক্ষ পাউণ্ড মাশুল দিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই।" এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে সীনর গায়দা "জারনেল্ দ্য ইতালীয়" পত্রে লিখিয়াছেন যে, সুয়েজ খালের শুল্ক-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন; জনসাধারণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যবস্থা যেরূপ, সুয়েজ খাল সম্পর্কে পরিচালন-ব্যবস্থাও সেইরূপ হওয়া উচিত।

মিউনিক বৈঠকের পর মনে হইয়াছিল যে, ইউরোপের দুইটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহিত ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র দুইটির মিলন সঙ্ঘটিত হইল। ফ্রান্স আশা করিয়াছিল, চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে হিট্লারকে তুষ্ট করিলে মুসোলিনিও তাহার উপর তুষ্ট হইবেন এবং গত এক বৎসরকাল ধরিয়া ইটালীর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য তাহার যে আগ্রহ তাহা সফল হইবে। যতদূর মনে হয়, মুসোলিনির বলকান্ রাষ্ট্রসংক্রান্ত কৌশল যদি সফল হইত, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় এত শীঘ্র ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকা সংক্রান্ত দাবীগুলি উত্থাপন করিতেন না; স্পেনের সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কে বৃটেনের মধ্যস্থতার জন্য অপেক্ষা করিতেন। বল্কান রাষ্ট্রসংক্রান্ত কৌশল বিফল হইবার পর মুসোলিনি দেখিলেন, স্পেন সম্পর্কে তাঁহার অভিসন্ধি প্রধানত ফ্রান্সের জন্যই সিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। আমরা জানি, যদিও দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা জনসাধারণকে যুদ্ধ-ভীতি প্রদর্শন করিয়া ডিক্টেটরী ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তবুও তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত নহেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের প্রতিনিধি-সভায় মাত্র তেরটি ভোটাধিক্যে দালাদিয়ার মন্ত্রিসভার

প্রতি আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় দালাদিয়ার মন্ত্রিসভাকে কতক পরিমাণে বামপন্থীদিগের মন জোগাইয়া চলিতে হইতেছে। মুসোলিনি আশা করিয়াছিলেন, নিরপেক্ষতা সমিতির বিধান অনুসারে স্পেন হইতে স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ ব্যাপারে "গোঁজামিল" দিয়া বৃটেনের সহায়তায় জেনারল ফ্রাঙ্কোকে যুধ্যমান শক্তির অধিকার প্রদান করাইবেন। যুধ্যমান শক্তির অধিকার লাভের পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের উপকূলে অবরোধ ঘোষণা করিয়া ক্যাটালোনিয়ার অধিবাসীদিগকে খাদ্যাভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিবেন। এইভাবে স্পেনের সমস্যার সমাধান হইলে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিও পাকা হইবে, বৃটেনের নিকট হইতে ইটালী আর্থিক সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু মুসোলিনির এই পরিকল্পনা বিফল হইল। গত নভেম্বর মাসে মিঃ চেম্বারলেন প্যারিসে আসিয়া ফ্রান্সের "নাড়ী টিপিয়া" দেখিলেন যে, তাঁহাকে এই বিষয়ে সম্মত করান যায় না। পূর্ব্ব-ইউরোপে তাঁহার চক্রান্ত বাধা পাইয়াছে; এদিকে ফ্রান্সে বামপন্থীদিগের চাপে পড়িয়া স্পেনের স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ ব্যাপারে ইটালীর "গোঁজামিল" দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা মানিয়া লইলেন না। এই অবস্থায় ফ্রান্সকে একটু ভাল করিয়া চাপ দিবার উদ্দেশ্যে ইটালী ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকা সম্পর্কে দাবী উত্থাপন করিল।

ইটালী কর্ত্তৃক এই দাবী উত্থাপিত হইবার পর ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব মঃ বনেট্ জোর গলায় বলিয়াছেন যে, তাঁহারা "সূচ্যগ্রমেদিনী" প্রদান করিবেন না। কিন্তু ইটালী জানে, এই সময় ফ্রান্সকে চাপ দিলে সে বিব্রত হইয়া পড়িবেই। পীরেনিজের অপর পার্শ্বে আজ ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত, ভূমধ্যসাগরের বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জেও ইটালীয় বিমান ও সাবমেরিনের ঘাঁটি! ইটালীর সহিত যদি সত্যই ফ্রান্সের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ফ্রান্স 'বেড়াজালে' পড়িয়া যাইবে; উত্তর আফ্রিকার সাম্রাজ্যের সহিত তাহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। শুধু তাহাই নহে, আন্তর্জ্জাতিকক্ষেত্রে ফ্রান্স এক্ষণে বন্ধুহীন। চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তাহার মিত্রতা-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে; বৃটেনের সহিত তাহার যে মিত্রতা, উহার মূল্যও অধিক নহে। মিঃ চেম্বারলেন সম্প্রতি ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ মিত্রতা সম্পর্কে সত্যভাষণের পর কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তি সংশোধন করিয়া বলিতে হইয়াছিল, "ফ্রান্সের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে উহার গুরুত্ব আইনগত বাধ্যবাধকতা অপেক্ষা অনেক বেশী।" মিঃ চেম্বারলেন যাহাই বলুন না কেন, বৃটেন্ যে এক্ষণে কিছুতেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে চাহিবে না, তাহা ইটালী ভাল করিয়াই জানে। সম্প্রতি যে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান্ যুদ্ধ-বিরোধী (No-war) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, উহা ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান্ সীমান্ত সম্পর্কে নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। উহার সহিত "ঘরের বাহিরের" কোন বিষয়ের সম্পর্ক নাই। ফ্রান্সের নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার এই বন্ধুহীনতা সম্বন্ধে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াই ইটালী তাহাকে আজ চাপ দিতেছে।

যে সময় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সে সময় জিবুতিতে ইটালীয় সৈন্য সমাবেশের চাঞ্চল্যকর সংবাদ শুনা যাইতেছে। ফ্রান্সও সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে বীরুট্ হইতে একখানি গান্‌বোট এবং একখানি টরপেডো-বোট সোমালিলাণ্ডে প্রেরণ করিয়াছে; ইহা ব্যতীত, মার্সাইস্ হইতে একটি সেনীগেলীস্ বাহিনীও প্রেরিত হইয়াছে। এদিকে "জারনেল্ দ্য ইতালীয়া" পত্রিকায় সীনর গায়ডা লিখিয়াছেন, ইটালী টিউনিস্ অধিকার করিতে চাহে না; ঐ স্থানের ইটালীয় অধিবাসীদিগের উপর যে দুর্ব্ব্যবহার হইতেছে, উহাই ইটালীর আপত্তির কারণ। জিবুতি সংক্রান্ত চাঞ্চল্যে কর্সিকার প্রসঙ্গ এখন চাপা পড়িয়াছে।

ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, এইবার আর মিঃ চেম্বারলেন মধ্যস্থতা করিবেন না। মিঃ চেম্বারলেনও কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে তিনি যখন জানুয়ারী মাসে ইটালীতে যাইবেন, তখন তিনি নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া মুসোলিনির সহিত আলোচনা করিবেন না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, মিঃ চেম্বারলেনকে রোমে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনায় বাধ্য করিবার জন্যই ইটালী ঠিক এই সময় সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সঙ্কট দূরীকরণের উৎকোচ স্বরূপ মুসোলিনি মিঃ চেম্বারলেনের মারফৎ সর্ব্বপ্রথম দাবী উত্থাপন করিবেন যে, দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা স্পেন সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে যুধ্যমান শক্তির অধিকার প্রদান করুন। জিবুতি এবং সুয়েজ খাল সম্পর্কে মীমাংসা করিবার জন্যও তিনি দালাদিয়ার মন্ত্রিসভাকে বাধ্য করিবেন।

আফ্রিকার ইটালীয় সাম্রাজ্যের দ্বারস্বরূপ জিবুতি বন্দরটি মুসোলিনির চাই-ই ; সুয়েজ খাল সংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন তিনি করাইবেনই—আবিসিনিয়ার সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য উচ্চহারে মাশুলের কড়ি তিনি আর গণিবেন না। যতদূর মনে হয়, টিউনিস্ ও কর্সিকা সম্পর্কে রাজ্যগত দাবী (territorial claims) আপাতত চাপা পড়িবে।

* * * *

জানুয়ারী মাসের প্রথমে এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর মিঃ চেম্বারলেন সদলবলে রোম পরিভ্রমণ শেষ করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ফ্রাঙ্কো-ইটালীর বিরোধ সম্পর্কে তিনি মধ্যস্থতা করেন নাই ; কারণ তাহার আর প্রয়োজন হয় নাই। এই সময় স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ত্রিশ হাজার ইটালীয় সৈন্য এবং জার্ম্মানী ও ইটালীর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সরকার পক্ষের অধিকৃত অঞ্চলে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন। মুসোলিনী বুঝিতে পারেন, জেনারল ফ্রাঙ্কোকে যদি যুধ্যমান শক্তির অধিকার দেওয়া না-ও হয়, তাহা হইলেও বৈদেশিক সৈন্য ও বৈদেশিক সমরোপকরণ লইয়া তিনি জয়লাভ করিতে পারিবেন। তবে ফ্রান্সের মনোভাব সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। মুসোলিনি আশঙ্কা করেন, স্পেনে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত সম্ভাবনায় বামপন্থী-দিগের চাপে পড়িয়া দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা শেষ সময় মনোভাব পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইতে পারেন ; স্পেন হইতে ইটালীর সৈন্য অপসারিত হয় নাই—এই অজুহাতে ফ্রান্স পীরেনিজের পথ উন্মুক্ত করিয়া সরকারপক্ষের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারে। এই আশঙ্কায় মুসোলিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, অন্য পক্ষ যদি বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ না করেন, অথবা জেনারল ফ্রাঙ্কোকে যদি যুধ্যমান শক্তির অধিকার দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ইটালীর সৈন্য অপসারিত হইবে না। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, বার্সেলোনার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কোন শক্তি যদি স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ইটালী যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। মুসোলিনির প্রথম উক্তিটি ধাপ্পাবাজী, দ্বিতীয়টি ফ্রান্সের প্রতি হুম্‌কি। জাতি-সঙ্ঘের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, সরকার পক্ষে মাত্র বার হাজার বৈদেশিক সৈন্য ছিল ; তাহার অর্দ্ধেক অপসারিত হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ সত্বর অপসারিত হইবে। পক্ষান্তরে, জেনারল ফ্রাঙ্কোর বাহিনীতে ত্রিশ হাজার ইটালীয় সৈন্য রহিয়াছে! সুতরাং অন্য পক্ষের সৈন্য অপসারণের কথা কতবড় ধাপ্পাবাজী তাহা সহজেই বুঝা যায়। সোজা কথা এই যে, মুসোলিনি স্পেন হইতে ইটালীর সৈন্য অপসারণ করিবেন না এবং ফ্রান্স যদি সরকারপক্ষের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তিনি আরও ব্যাপক-ভাবে জেনারল্ ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিবেন। এই বিষয়ে জার্ম্মানীও তাঁহাকে সাহায্য করিবে বলিয়াছে।

ফ্রান্স যাহাতে স্পেনের সরকার পক্ষের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে মুসোলিনি আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। আফ্রিকার ফরাসী সোমালি-লণ্ডের সীমান্তে বহুসংখ্যক ইটালীয় সৈন্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, মাসোয়ায় কতকগুলি সাব-মেরিন ও গান বোট সজ্জিত রাখা হইয়াছে। আজ ফ্রান্স যদি পীরেনিজের পথ উন্মুক্ত করে, তাহা হইলে ইটালীর সৈন্য তৎক্ষণাৎ ফরাসী সোমালিলণ্ড আক্রমণ করিবে। অবশ্য ফ্রান্সের পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা নাই ; দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা ইটালীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহেন। মুসো-লিনি আশ্বাস দিয়াছিল যে, জেনারল ফ্রাঙ্কো বিজয়ী হইবার পর স্পেন অথবা স্পেনের অধিকৃত কোন অঞ্চলে ইটালীর সৈন্য থাকিবে না। ইহাতেই দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা খুশী হইয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ফ্রান্সের দুই শত ব্যাঙ্কারের ক্রীড়নক দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা স্পেনে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবান্বিত সরকার পক্ষের বিজয় চাহেন না। ফ্রান্সের বামপন্থিগণ এক্ষণে এত প্রবল নহে যে, তাহারা দালাদিয়ার মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইয়া স্পেন সম্পর্কে ফ্রান্সের নীতির পরিবর্ত্তন করাইবে। কাজেই স্পেনে অদূর ভবিষ্যতে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবেই এবং ফ্রান্সের বামপন্থিগণ পীরেনিজের অপর পারে দাঁড়াইয়া নিজেদের অঙ্গুষ্ঠ দংশন করিবে মাত্র।

টিউনিস্-সুয়েজ-জিবুতির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে নাই। মুসোলিনি এই সম্বন্ধেও মিঃ চেম্বারলেনের নিকট মনের কথা "গাহিয়া রাখিয়াছেন।" স্পেনের ব্যাপার মিটিলে টিউনিসের প্রবাসী ইটালীয়দিগের অধিকার, সুয়েজখাল পরিচালনায় ইটালীর অংশ জিবুতি বন্দর ইটালীকে প্রদান প্রভৃতি প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে। এই সকল বিষয়েও ফ্রান্সকে "ঘায়েল করিয়া" ইটালীর দাবী পূরণ করা হইবে। স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ফ্রান্স ফ্যাসিষ্ট শক্তির বেড়াজালে পড়িয়া যাইবে ; কাজেই তখন ইটালী নিজের দাবী পূরণের জন্য ফ্রান্সকে আরও জোর করিয়া চাপ দিতে পারিবে।

বৈশেষিক দর্শন

শ্রীগুণমণি দাস

প্রবন্ধ

ম্যাক্স মুলার বলিয়াছেন, "ছয়টি দর্শনের সূত্রগুলি সম্ভবত দর্শনকারদের মৌলিক গবেষণার প্রথম ধারাবাহিক স্ফুরণ নয়। পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমে যাহা চিন্তিত ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল দর্শনকারেরা তাহাই সূত্রাকারে নিজেদের দর্শনমধ্যে সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র।

যদি তাহাই হয় তবে বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি নিশ্চয়ই তখনকার সভ্যসমাজে প্রচলিত ছিল। এই সূত্রগুলির অধিকাংশই নির্ভুল। সবগুলি নির্ভুল হইবার প্রয়োজন নাই, হয়ও না,—আধুনিক বিজ্ঞানেও হয় না। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কথা বলিতে বলিতে কণাদ কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অস্পষ্টতা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিশেষত্ব ; ইহার দ্বারা ভাবী আবিষ্কারের পথ খোলা থাকে।

যে বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি বৈশেষিকে আছে সেগুলি যে সময়ের মনুষ্য-সমাজে আলোচিত হইয়াছিল, সে মানবসমাজের সভ্যতা কেমন ছিল? উন্নত যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে চিন্তার স্রোত বন্ধ হইয়া গেল কেন? কল্লোলিনী এতদূর আসিয়া নীরব হইল কেন?

সমষ্টি জাতিজীবন ব্যষ্টি মনুষ্যজীবনের নিয়মেই চলিয়া থাকে। মনুষ্যজীবনে সময়ে সময়ে ব্যাধি জোটে। কোন কোন ব্যাধি হঠাৎ আসে, কোন কোন ব্যাধি বা সহজাত হইয়া অনুকূল অবস্থায় প্রবল হয়।

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।—"

ইহাকে বলে হঠাৎ-ব্যাধি। ইহা প্রায় দুরারোগ্য।

শরৎচন্দ্রের পার্ব্বতীর যখন বিবাহ হইয়া গেল তখন দেবদাসের সহজাত ব্যাধি অনুকূল অবস্থা পাইয়া প্রাবল্য বিস্তার করিল। এ ব্যাধির মারাত্মকতা আরও বেশী।

ঐ সব ব্যাধির হাত হইতে যাহা আত্মরক্ষা করিতে সুবিধা পায় নাই, তাহারা বস্তুজগতে—জমাখরচের জগতে—প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

উক্ত ব্যাধিগ্রস্তেরা পরের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দৈহিক বিপদ আনে। যে সংসারে তাহারা বাস করে তাহা ভালভাবে গড়িবার তাহাদের ইচ্ছা নাই, তাহা সাজাইবার বাসনা নাই, তাহা মেরামত করিবার ঔৎসুক্য নাই ; তাহারা গাছতলায় থাকিতে চায়। তাহারা হাসিতে চায় না, খেলিতে চায় না, আমোদআহ্লাদে যোগ দেয় না ; তাহারা শুধু নীরবতা চায়। পিতামাতা ভাইভগিনী প্রভৃতি স্নেহাস্পদেরা কেহই তাহাদের বাঞ্ছনীয় নয়। সমস্ত পৃথিবী যেন ক্ষণিকের মধ্যে বিস্বাদ হইয়া ওঠে। যাহাকে চায় তাহাকে পায় না ; বাঁচিয়া থাকাটা পলে পলে ব্যর্থ হইয়া যায়। না মরিলে শান্তি কই? তাই লেকের জলে ডুবিয়া মরিবার কারণ আসে।

জটিলা-কুটিলার মনোবৃত্তি বর্জ্জ করিয়া শ্রীমতী রাধার উৎকণ্ঠা বুঝিতে যাইতে নাই।

জাতিকুলশীলমান সব ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত অনাগতের জন্য জীবন ব্যর্থ করার মধ্যে একটা মহৎ হৃদয় লুকানো থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ প্রকার করাটা কদাপি গঠনমূলক নয়,—সাংসারিক জমাখরচের হিসাবে গঠনমূলক নয়। কিন্তু অমৃতাব্ধি নিমজ্জিত মক্ষিকার যেমন মরণযন্ত্রণা নাই, শুধু জীবনযন্ত্রণাই আছে, তেমনই উক্ত ব্যাধিগ্রস্তদের মরণযন্ত্রণা নাই, শুধু জীবনযন্ত্রণাই আছে। তাই উহারা মরিতে ভয় করে না, ভাঙ্গিতে ভীত হয় না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" বুদ্ধিমান সংসারীরা মরণকে ভয় করে।

ঐ ব্যাধিগ্রস্তেরা অতি আশ্চর্য্য মনোভাবসম্পন্ন। তাহারা প্রিয়-মিলনে একযুগকে একনিমিষে কাটাইয়া দেয়। আবার প্রিয়বিরহে তাহার বিপরীত করে। তাহারা চিন্তার শৈথিল্য ও ঘনত্ব দ্বারা কালব্যত্যয় ঘটায়।

সমস্ত সহচরেরা যখন লাফাইয়া চলে, ঐ ব্যাধিগ্রস্তেরা তখন সাধ করিয়া খঞ্জ হইয়া বসিয়া থাকে,—উদ্দেশ্য, বসিয়া বসিয়া প্রিয়চিন্তা করিব। তাহাদের দ্বারা অগ্রগতি হয় না।

যে সমাজের অধিকাংশ লোকই শ্রীমতী রাধা ও দেবদাসের মতন মনোভাবসম্পন্ন সে সমাজের বহির্জগতে অগ্রগতি হয় না।

আধ্যাত্মিকতা ভারতের ঐ প্রকার ব্যাধি। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ভারত ধ্যান করিয়া কাঁদিয়াছে, মনে করিয়া কুল ত্যাগ করিয়াছে, জীবনকে যন্ত্রণাদায়ক ভাবিয়াছে, সময়ের দাম মানে নাই, সকলের সঙ্গে কর্ম্মজগতে লাফাইয়া পড়ে নাই ও ব্যবহারিক জগতে আগাইয়া চলে নাই।

ঐ ব্যাধির বিশেষত্ব এই যে, যে উহাতে গ্রস্ত হয় সে কদাচ উহাকে খারাপ বা ধ্বংসমূলক ভাবে না, ভাবিতে পারে না। কিন্তু অপরে সকলে দোষ দেয়। ভারত নিজের দোষ-গুণ বিচার করে নাই।

যৌবনেই আত্মার প্রেমে পড়িয়া ভারতবর্ষ জীবনটাকে অবৈজ্ঞানিক করিয়া ফেলিয়াছিল। লেবরেটরী ছাড়িয়া মঠে আসিয়া বসিল। কখনও কাঁদে, কখনও হাসে—যেন পাগল। জটিলা-কুটিলার গৃহছাড়া হয় নাই। তাহারা ঘরে বসিয়াই চেষ্টাচরিত্র করিয়া আপনাদিগকে বৈজ্ঞানিক করিয়া ফেলিল। তাহারা শারীরিক সুখের সর্ব্ববিধ উপায়

উদ্ভাবন করিয়া বাঁচিয়া থাকাটা বেশ গুলজার করিয়া গৃহ ছাড়াকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল। কিন্তু কৌপীনধারী, গৃহছাড়া ভারত সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিতে পাইল না, কারণ সে তখন আত্মার ধ্যানে মগ্ন ছিল। সে ভাবিতেছিল, "হায়, হায়, মানুষ কি মূঢ়! সহজাত আনন্দেষণা লইয়া মানুষ জগতে আসিল কিন্তু আনন্দের উৎসের সন্ধান করিল না। মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শারীরিক ও মানসিক আনন্দ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বাহ্য-জগতের টুঁটি টিপিয়া ধরিল—আনন্দের উৎস আদায় করিতে; কিন্তু তাহাতে ফল ফলিল না। শারীরিক ও মানসিক আনন্দের তুচ্ছ কণিকাগুলি যে উৎস হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসে, ভারতবর্ষ তাহা আবিষ্কার করিয়াছিল। আবিষ্কার করিয়া ভারত সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল,—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা।". কিন্তু কেহ আসে নাই।

আর মাধুকরী ভিক্ষা মিলিতেছে না। গৈরিকবসন দেখিলেই সকলে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছে। রাজসিকতার উচ্চরোলে সুকণ্ঠ সাত্ত্বিকতা কোথায় ডুবিয়া যাইতেছে। এখন উপায় কি? ও সব আত্মার প্রেম-বিলাসাদি ভারতকে ছাড়িতে হইবে। গৃহে ফিরিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বেই যদি লেকের জলে ডুবিয়া মরিতে পারিতে তবে আর পরিত্যক্ত গৃহে ফিরিবার বিড়ম্বনা সহিতে হইত না।

ভারত, ফিরিয়া এস। ফিরিয়া আসিয়া রামের মত রাজা সৃষ্টি কর, কিন্তু তাঁহাকে যেন আর বশিষ্ঠের মুখে যোগবাশিষ্ঠ শুনিতে দিও না। অর্জ্জুনের মত যোদ্ধা প্রস্তুত কর, কিন্তু দেখিও যেন রণক্ষেত্রে যোদ্ধার মনে বিমূঢ়তা আনিয়া সারথির মুখে আত্মার কচ্‌কচি শুনাইও না। হে ভারত, আগামী শঙ্করাচার্য্যদিগকে বেদান্ত পড়িতে না দিয়া রাজনীতি পড়িতে দিও; শ্রীচৈতন্যকে আধুনিক অসহযোগ ও অহিংসা শিখাইও। যে আসিবে আমাদের আত্মার মুক্তি সাধন করিতে তাহাকে বলিও, আগে রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে। এস ভারত, ফিরিয়া এস।

ফিরিয়া এস নহিলে উপায় নাই। কেন মূর্খের জগতে জ্ঞানী হইতে গিয়াছিলে? কেন জড়সর্ব্বস্ব জগতে চেতনান্বেষণে গিয়াছিলে? মস্তকে অবহেলা ও তিরস্কার পুঞ্জীভূত করিয়া ফিরিয়া এস। জানি, যে গৃহ ছাড়িয়া দিয়াছ সেই গৃহে আর মন বসিবে না; যে সপিণ্ডা মনে তোমার বাসা বাঁধিয়াছে সে চিন্তা ত্যাগ করিয়া তুমি এ জীবনে অন্য চিন্তায় কদাপি নির্ব্বিকারভাবে লিপ্ত হইতে পারিবে না। তথাপি ফিরিয়া এস।

সন্ন্যাসী ভারত সংসারী হইবার জন্য গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে; তাই পূর্ব্বে গৃহ ত্যাগ করিবার কালে ভারতের কি কি ছিল তাহা জানিয়া রাখিলে উপকার ছাড়া অপকার নাই।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান ডাল্টনের য়্যাটমিক থিওরির উপর ভিত্তি করিয়া দণ্ডায়মান। যদিও উক্ত মতবাদ বর্ত্তমানে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া বৈদ্যুতিক মতবাদে আত্মদান করিতেছে, তথাপি ডল্টনের থিওরি মূলত আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে অপরিত্যজ্য।

(ডাল্টনের য়্যাটমিক থিওরি)

১। মৌলিক পদার্থের অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশগুলিকে পরমাণু বলে। উহারা অবিনশ্বর।

২। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত।

৩। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুপুঞ্জের গুরুত্ব ও বস্তু পরস্পর সমান।

৪। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুপুঞ্জের গুরুত্বাদি বিভিন্ন।

মনুষ্যজাতি যেমন কতকগুলি ব্যষ্টি মানুষের সমষ্টি মাত্র, তেমনি বস্তু-জগৎও কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জেরই সমষ্টি। মনুষ্যেরা যেমন একাকী থাকিতে পারে না, তেমনই পরমাণুরাও বন্ধুত্ব, সখ্যতা ও মিত্রতা ব্যতিরেকে থাকিবার মত প্রবণতা প্রদর্শন করে না। কতকগুলি মনুষ্য লইয়া একটি পরিবার হয়, কতকগুলি পরিবার একটি সমাজ গঠন করে, গঠিত সমাজসমষ্টি জাতির এক-একটি অংশ। তেমনই কতকগুলি পরমাণু সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অণু (মোলেকিউল) সৃষ্টি করে। এক-একটি বস্তু কতকগুলি অণুর সমষ্টি মাত্র।

(কণাদের পরমাণুবাদ)

১। অতো বিপরীতমনু।১০।৭

২। সদকারণ বন্নিত্যম্।১।৪

৩। নিত্যে নিত্যম্।১৯।৭

৪। নিত্যং পরিপরিমণ্ডলম্।২০।৭

কণাদের সূত্রগুলির অর্থ:—

১। মহত্তের আকারের বিপরীত অণুর আকার। নারিকেলের অপেক্ষা বদরী ছোট, কিন্তু দ্ব্যনুক অপেক্ষা বদরী বড়। দ্ব্যনুক প্রভৃতি অপেক্ষা আবার অণু ছোট। অনুর পরে আর নাই। কোনও দ্রব্যের সহিত তুলনায় অণুর মহত্ব নাই। বড়কে ছোট করিতে করিতে যখন তাহাকে আর ছোট করিতে পারা যায় না তখন তাহা অণুতে আসে। বৈশেষিকের মতে অণুই পৃথিব্যাদির পরম বা চরম উপাদান। ইহাদের সন্নিবেশচাতুরী দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বৈচিত্র্যের অনুভব আসে।

২। এই পরমাণু বা চরমাণু নিত্য। ইহার কোন উৎপাদক নাই। ইহা এত সূক্ষ্ম যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিগম্য করিবার উপায় নাই। তবে কি করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব ঠিক করিব? কণাদ বলিতেছেন,—"তস্য কার্য্যং লিঙ্গম্।" ২।৪—তাহার কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া তাহার অস্তিত্ব পরীক্ষা করিতে হয়।

বলা বাহুল্য যে, রসায়নশাস্ত্র বুঝিতে যাওয়া মানে,—লেবরেটরিতে বসিয়া বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা পরমাণুদের কার্য্যপদ্ধতি পরিদর্শন করা। ইহা কণাদও জানিতেন। কণাদের সমসাময়িক ভারতও জানিত। কেমন করিয়া জানিত? আম্রভোজন না করিয়া কেবল গুড়লিপ্ত শ্মশ্রু লেহন করিলেই ত আস্বাদ সম্বন্ধীয় এমন সুন্দর কথা কেহ বলিতে পারে না!

পাশ্চাত্য প্রভুরা বলেন, "না, তাহা পারে; পরের কাছে শুনিয়া বলিলে অনেক সময় অমৌলিকতা ধরিতে পারা যায় না।" ভারত কাহার কাছে শুনিয়াছিল? শুনাইবার মত কেহ পৃথিবীতে ছিল না তখন।

বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক যুগকে অবহেলা ত করিয়াছেনই,তাহা ছাড়া, আমাদের যাহা-কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য

এ পর্য্যন্ত নিজস্ব তাহাকে অপহৃত পরস্ব বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছেন। য়্যাটমিক থিওরি সম্বন্ধে পার্টিংটন্ বলেন, "It is uncertain whether it was independently proposed in India, but certainly appears there in a novel form in later Buddhist and Jainist treatises."—Partington: Inorganic Chemistry, p. 104.

সম্ভবত বৌদ্ধ ও জৈনেরাই ভারতে পরমাণুবাদের জন্মদাতা। কণাদ উঁহাদের শূন্যবাদ ও পরমাণুবাদ সংশোধন করিয়া গ্রহণ করেন। পার্টিংটন সাহেব পরমাণুবাদের সূত্রগুলি ভারতে পাইলেন কিন্তু তাহা অপহৃত পরস্ব মনে করিয়া সেগুলির উৎপত্তির পশ্চাতে কি প্রকার আলোচনা, গবেষণা, পরিদর্শন ও পরীক্ষণাদি থাকিতে পারে তাহার ইঙ্গিত কিছু করিলেন না! এরূপ করিবার কারণ কি? কারণ আছে।

অমন সুন্দর তাজমহল প্রস্তুত করিয়া, কে গড়িল, কখন গড়িল, কেমন করিয়া গড়িল, তাহার যদি একটা ইতিহাস না রাখিয়া যায়, তাহা হইলে 'উহা বৈদেশিক-গঠিত'—ইহা প্রমাণ বা ইঙ্গিত না করিলে ঐ প্রকার অবহেলার উচিত শাস্তি হয় না। অশোক-স্তম্ভের লৌহের বিশুদ্ধতা দেখিয়া মনে হয়, এমন করিয়া লৌহ বিশুদ্ধ করিতে তখনকার দিনে কেমন করিয়া শিখিল? যদি ঐ স্তম্ভটি কথা কহিতে পারিত তাহা হইলে আজ কত বৈজ্ঞানিক কাহিনী বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু ও অচেতন স্তম্ভ কেমন করিয়া বাঙ্ময় হইবে? যাহারা তৎকালে চেতন মনুষ্য ছিল তাহারাই যখন ইতিহাস লিখিয়া যাওয়ার গুণ বুঝিতে পারেন নাই, তখন ও অচেতন আর কি বুঝিবে? "অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষতে।"

৩। নিত্যেনিত্যম্। পরমাণুতে যে পরিমান বস্তু আছে তাহা অক্ষয় ও অব্যয়। সেই জন্য এই বস্তুজগৎও অক্ষয়-অব্যয়। বস্তুজগতের বহিরাকৃতি নশ্বর হইতে পারে, কিন্তু ইহার বস্তুভাণ্ডার একই থাকিবে। যে সমস্ত বস্তু নিত্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতেছে তাহারা তাহাই। যতগুলি স্বর্ণ পরমাণু জগতে আছে তাহা নিত্য, তাহার বেশীও হইবে না তাহা কমিয়াও যাইবে না। এইরূপ হইবার কারণ কি? কারণ, পরমাণুতে যেটুকু বস্তু থাকে তাহা নিত্য। প্রত্যেক বস্তুরই গুরুত্ব আছে, অতএব পরমাণুর ওজনও নিত্য। এই ভাবে প্রত্যেক নিত্য পদার্থের পক্ষে।

৪। নিত্যং পরি পরিমণ্ডলম্।

'পরমাণু পরিমাণকে পরিমণ্ডল বলে; উহা নিত্য।'

বোহর্ সাহেব বলেন, একটি ধনাত্মক বিদ্যুতের চারিধারে একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি হাইড্রোজেন (জলজান) পরমাণুর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে একাধিক ধনাত্মক বিদ্যুতের চারিধারে একাধিক ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আবর্ত্তন করিয়া এক একটি পরমাণুর পরিমণ্ডল গঠন করে। যেমন পরিমণ্ডলের গঠনপ্রণালী, তেমনই প্রত্যেক পরমাণু পরিমণ্ডলের গঠনপ্রণালী। মণ্ডল মানে চক্রাকার অবস্থিতি; তাহা বুঝা যায়, যথা—সবিতৃমণ্ডলবর্ত্তী, সৌরমণ্ডল ইত্যাদি। পরিমণ্ডল মানে, সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত এক বা একাধিক মণ্ডল। প্রত্যেক পরমাণুর গঠন এই পরিমণ্ডল লইয়া। এই পরিমণ্ডলকে মানুষ ইচ্ছা মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে পারে না। বৃহৎ সৌরমণ্ডলকে মানুষ যেমন অব্যবস্থিত করিতে অক্ষম তেমনই সূক্ষ্ম পরমাণু পরিমণ্ডলকেও বিপর্য্যস্ত করিতে মানুষ অপারগ। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে লৌহ পরমাণুকে স্বর্ণ পরমাণুতে পরিণত করা যাইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে সে চেষ্টাও চলিতেছে এবং সিদ্ধির সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। তথাপি এই পরিমণ্ডলকে নিত্য বলিতে বৈজ্ঞানিকের বাধা নাই; তাই কণাদ বলিতেছেন, "নিত্যং পরিমণ্ডলম্।"

ইহা ছাড়া আনবিকতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বৈশেষিকে আছে। এখানে যেগুলি বলা গেল সেগুলির সঙ্গে ডাল্টনের সূত্রগুলির সমানতা সব স্থলে নাই। পরে আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় সূত্র আলোচনা করা যাইবে।

হিমালয়ের পাদদেশে

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

ভ্রমণ

অবসর-বিনোদনের জন্য ভ্রমণের মত জিনিষ নেই, তাই ছুটি হলেই যাযাবর প্রকৃতিটা কিছুতেই চাপা পড়তে চায় না—বাইরের আকর্ষণ বোধ করি চুম্বককেও হার মানায়। ঘুরে এসে কাজে কর্ম্মে পুনরায় নব উদ্যম অনুভব করছি—সারা বৎসরের শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ ঘুচেছে। কিন্তু যে দেশগুলো ঘুরে এসেছি তাদের জন্যে মাঝে মাঝে মন কেমন করে—কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনের আনাচে কানাচে তাদের কথা প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়। অবসর পেলে চুপ ক'রে বসে লক্ষ্য করি, আমার অন্তরের অন্তস্থিত সাদা পর্দায় কতকগুলো অসংলগ্ন দৃশ্যের স্রোত নড়াচড়া করছে।

সেই কোজাগরী রাতে স্বচ্ছ শারদ পৌর্ণমাসীর চন্দ্রকিরণ কিরূপে মুসুরী পাহাড় ও ডুন ভ্যালিকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিল, কেমন ক'রে একটা মেঘলা সকাল ঠাণ্ডা উত্তর বাতাসে দেবপ্রয়াগ-পথে সুরধুনী গঙ্গার

স্রোতকে দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত ক'রে হিমালয়ের পাদদেশকে কম্পিত ক'রে তুলেছিল—এই সব ছেঁড়াখোড়া দৃশ্যপটের আবির্ভাব মনে করিয়ে দেয় অনেক কথা—যার প্রয়োজনীয়গুলি শুধু এইখানে লিপিবদ্ধ করলাম।



তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গমালা, মুসৌরী

মনে পড়ে, হরিদ্বারে স্রোতস্বিনী জাহ্নবীর অবিরাম প্রবাহ, তার ওপারে বন ও গিরিমালা—যার চূড়াগুলির ফাঁকে অরুণোদয়ের রক্তরশ্মিচ্ছটা এবং স্বর্ণাভ বর্ণবিচিত্রতা কবিপ্রাণকে মুগ্ধ করবার জন্যে ঘর থেকে বার ক'রে আনত।

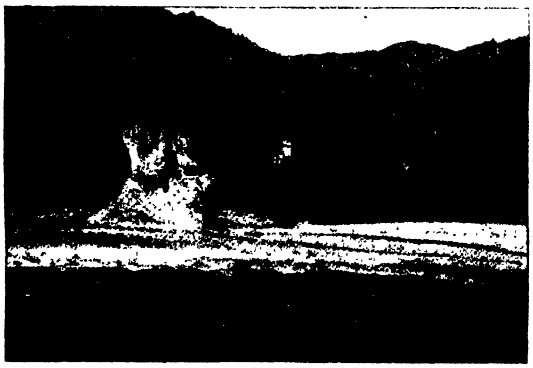
মহাষ্টমীর দিন ডুন এক্সপ্রেসে সদলবলে আমরা মুসৌরীর উদ্দেশ্যে রওনা হই। পাহাড়ে যাবার লোভ ছাড়া আমাদের সকলেরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভেরও বাসনা ছিল, সেজন্য পথে অনেকগুলি দেশ ও তীর্থস্থান দেখে ফিরি। প্রথমে যাই হরিদ্বারে, সেখানে বন্যাকাতর বাঙ্গালী হয়ে রুরকি খালটা যতটুকু পারা গেছল ভাল ক'রে দেখে আসি, সে সম্বন্ধে এ কাহিনীতে অল্প কিছু বলে যাব।

ডুন এক্সপ্রেস্ ছুটছিল ফয়জাবাদ লুপ দিয়ে বি-এন্-ডব্লিউ রেলপথের কোল ঘেঁসে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেছে তার পরিচয় পেলাম ফসল এবং ইক্ষুবৃক্ষভরা ক্ষেতগুলি দেখে। এদিকে পাট চাষের মত ইক্ষুচাষের এত রেওয়াজ যে, নিকটে দূরে বহু চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে এ পথে আসি নাই, কারণ পঞ্জাব মেলে রায়বেরিলীর সব চাইতে সোজা পথ দিয়ে গেলাম। এই পথ দিয়ে যেতে সোজা গন্তব্য পথে না গিয়ে কোথাও নেমে পড়ে ছোট রেল ধরে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের উত্তরাখণ্ডে বেড়িয়ে আসবার জন্যে মাঝে মাঝে লোভ হচ্ছিল। ওদিকে যেতে সব চেয়ে সুবিধা, অযোধ্যায় নেমে সরযূ পার হয়ে পাকা রাস্তা ধরা বা কাটিহারের ছোট গাড়ী ধরা।

লক্ষ্ণৌতে গাড়ী এল প্রায় বিকাল ছটায়। খাদ্যান্বেষণে প্ল্যাটফরমে নেমে ঘোরাঘুরি করতে দেখা হ'ল বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাচ্ছেন?' বল্লেন 'যাচ্ছি আলমোড়ায়।' প্র—কোথায় আছেন বর্ত্তমানে? উ—আলমোড়াতেই আছি। প্র—এখানে? উ—একটু কাজে এখানে এসেছিলাম। প্র—আপনার নাচ আবার কবে দেখতে পাব কলকাতায়? উ—উপস্থিত আমি ব্যস্ত আছি—কবে তা ঠিক বলতে পারি না। বুঝলাম শঙ্কর তাঁর সেই নৃত্যকলাশিক্ষার স্কুল সম্বন্ধে খুব খাটছেন। কথাবার্ত্তায় তাঁর সেই অমায়িক ভাবটি ভারী আনন্দ দেয়—একটু অহমিকার পরিচয় পাইনি।

হরিদ্বার

হরিদ্বারে উঠলাম গিয়ে সব ভোলাশ্রমে—একেবারে গঙ্গার উপর এই ধর্ম্মশালাটি বঙ্গদেশীয় ভ্রাম্যমানদিগের একচেটিয়া বল্লেই হয়। মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য-শিষ্য ভোলানন্দ স্বামীর শিষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে বহু বাঙ্গালী ছিলেন—যদিও তিনি ওদেশেরই লোক ছিলেন—এই বাঙ্গালী শিষ্যদের কল্যাণেই আমাদের এই সুবিধাটি লাভ হয়। নিকটেই ৺স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষা ধারণ করে লালতারাবাগ আশ্রমটিতে বাঙ্গালীরই আধিপত্য দেখলাম। এখানে একটু বলা ভাল যে যাত্রীর সংখ্যা বাড়লে শিষ্যদের সংশ্লিষ্ট যাঁরা তাঁরা স্বভাবতই বেশী সুযোগ পান, সেইজন্য জানা শুনার পরিচয়পত্র হলে ভাল হয়—যা আমরা পেয়েছিলাম। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর কংখল খালের পশ্চিম তীরে শিবালিক পর্ব্বতমালার পদপ্রান্তে হরিদ্বার ক্ষুদ্র নগরী শতাব্দী শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে শুদ্ধমাত্র তীর্থপিয়াসী ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর আনুকূল্যে। এটি খাঁটি তীর্থধাম যেমন আমাদের তারকেশ্বর বা বৃন্দাবন। আমার মতে এটি হচ্ছে ধর্ম্মশালাসমাকীর্ণ একটি ছোট্ট শহর। পাহাড়ের উপরে উঠে দেখি সত্যিকার লোকবসতিপূর্ণ শহর কংখল, তার কারণ কংখল সমতলভূমির উপর বৃদ্ধি পেয়েছে। হরিদ্বার বিস্তৃতি লাভ করবে কোথা থেকে—শিবালিক পাহাড় এসে মিশেছে গঙ্গাধারায়, তারই কোলে কোলে যতটুকু সম্ভব গড়ে উঠেছে। হরিদ্বারের মনোরম দৃশ্যাবলী মুগ্ধ করে বলেই বোধ করি তাঁরা এই তীর্থস্থানটি বেছে নেবার পশ্চাতে ছিলেন যাঁরা প্রকৃতির পূজারী। এই মহাতীর্থের অবস্থান—যেখানে পবিত্র গঙ্গানদী, হিমালয় ও শিবালিক পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিত গাঙ্গেয় উপত্যকার তরঙ্গায়িত উচ্চ-নীচ ভূমিখণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত



শ্রীলক্ষ্মণের মন্দির—কোল দিয়া প্রবাহিত সুরধুনী

হয়ে সমতলভূমিতে এসে পড়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যাঁরা দেখতে ভালবাসেন তাঁরা যত নাস্তিকই হোন, তাঁদের আমি গঙ্গা-হিমালয়ের

সঙ্গম এই পুণ্যভূমিতে আসতে অনুরোধ করি। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—এই পরম সত্য তাঁরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করবেন।

হরিদ্বার না হয়ে এই স্থানের সত্যিকার নাম গঙ্গাদ্বার চলিত হওয়াই উচিত ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় গঙ্গামায়ীর আরতি—মথুরায় যেমন যমুনার আরতি দেখেছিলাম, সেই রকমেই কাঁসর ঘণ্টা বেজে অনুষ্ঠিত হয় হর-কি-পিয়ারী ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে। বৈষ্ণবেরা গঙ্গাদেবীর মন্দিরসংলগ্ন একটি মন্দিরের পাথরে বিষ্ণুপদচিহ্ন অঙ্কিত আছে বলে হরি-কি-চরণ বা হরি-কি-প্যারী বলে থাকে। কিন্তু রাজা বিরলার নূতন প্লাট্‌ফরমে মিউনিসিপ্যালিটীর নোটিশে হর-কি-পিয়ারী আছে লক্ষ্য করেছি। রাজা বিরলার কৃপায় এই নূতন ঘাটে স্নানের যে ভয় আর নাই—বর্ত্তমানে আর চেন্ ধরে সন্তর্পণে স্নান করতে হয় না। যাঁরা বহু পূর্ব্বে গিয়েছিলেন তাঁরা ব্রহ্মকুণ্ডকে হয়ত চিন্‌তেই পারবেন না—শ্বেতপাথরের ঘাট ও মন্দির একেবারে ভোল ফিরিয়ে দিয়েছে।

হর-কি-পিয়ারী ঘাটে এবং অন্যান্য ঘাটে হরিদ্বার পি-ডব্লিউ-ডির কাজ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কেমন পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। জলের কলের



কেদার-বদরি পথে লছমন ঝোলা

সুবন্দোবস্ত। কোন তীর্থস্থানের ঘাট আমি এমন পরিচ্ছন্ন দেখি নাই। বিজলীবাতির আলো রাত্রে ঘাটগুলিকে বেশ আলোকিত ক'রে রাখে।

প্রতি বৎসর গঙ্গানদীর তথাকথিত জন্মদিন ১লা বৈশাখে এখানে পুণ্যমেলা হয়—ছয় বৎসর অন্তর অর্দ্ধকুম্ভ এবং বার বৎসর অন্তর পূর্ণকুম্ভ। এই কুম্ভের সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আশা করি গত বৈশাখের পূর্ণকুম্ভ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের যথেষ্ট ধারণা হয়েছে। এই কুম্ভমেলার জন্যই হরিদ্বার তীর্থের বিশেষত্ব বেশী, তা না হলে বিগ্রহ বা দেবদেবীর মন্দির সম্বন্ধে যে খুব মাহাত্ম্য আছে তা মনে হয় না।

বিস্তৃত গঙ্গাবক্ষের অপর পারে চণ্ডীপাহাড় এবং এপারে মনসা পাহাড়, এই দুটির উপর থেকে হরিদ্বারের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। এপারে পাহাড়ের কোলে মায়াপুর ও অন্যতম দর্শনযোগ্য স্থান—এখানে পুরাকালে শহর ছিল তার উল্লেখ পাই এই দুটি পংক্তিতে—

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

মায়াপুরে মায়াদেবীর মন্দির প্রায় হাজার বৎসরের পুরাতন প্রবেশদ্বারের উপর যে সমস্ত শিলালিপি আছে তাতে লিখিত আছে ইহা দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।



মূলগন্ধ কুঠীবিহার, সারনাথ

কংখল

মায়াপুর থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণে রুড়কি খালের অপর পারে মূল গঙ্গার তীরে কংখল শহরটিই প্রকৃত শহর। হরিদ্বার কংখলের সম্বন্ধটা অনেকটা আমাদের আগেকার কলিকাতা ও কালীঘাটের মত। লোকের বসতি খুব—ঠাসাঠাসি ইমারত প্রাসাদ বড় চোখে পড়ে—মনসা পাহাড়ের বা চণ্ডী পাহাড়ের উপর থেকে। কংখলে



হরিদ্বারের দক্ষমন্দিরে মুসলমান স্থাপত্য

দক্ষঘাট এবং সতীঘাট পুণ্যভূম—কথিত আছে এটি দক্ষরাজার রাজধানী। এই ঘাটের ধারে দক্ষরাজা যজ্ঞ করেছিলেন, যে যজ্ঞে সতী

পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করেন। সতীঘাটে স্নান করা পুণ্যার্থী সতীলক্ষ্মীদের কাম্য—কাছে মধ্যবিত্ত লোকের বসতির মাঝে মাঝে দেবালয় দেউল ও আশ্রম কয়েকটি চোখে পড়ে। সমতলভূমির উপর



মায়াপুর বাঁধের নীচে থেকে হরিদ্বারের দৃশ্য

অবস্থিত বলে কংখল বর্দ্ধিষ্ণু শহর। বিদ্যাশিক্ষার জন্য অনেকগুলি স্কুল আছে, ছেলেছোক্‌রাও বহু চোখে পড়ল। বিকেলে দেখলাম, দক্ষঘাটের মাঠে হকি খেল্‌ছে। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে গুরুকুল টে্‌নিং বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ নামকরা। আমাদের বেশ ভাল লাগ্‌ল রামকৃষ্ণমিশনের শাখাটি। এটির সম্বন্ধে বহুপূর্ব্বেই জানা ছিল, তবু আর একবার দেখে আসা গেল। যেমন সব জায়গায় এখানেও স্বামীজীরা বেশ জনহিতকর কাজ করে থাকেন দরিদ্রনারায়ণের সেবা করে।

কংখলে ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যাপীঠ একটি বিশেষ সংস্কৃতির কেন্দ্র। আশ্রমটি জ্বাওয়ালপুর রোডের উপর। আশ্রমের পূর্ব্বসীমানা দিয়ে গঙ্গার জল রুড়কি খাল দিয়ে অবিরাম গতিতে প্রবাহিত। কি সুন্দর স্থানটিতে আশ্রমটি নির্ম্মিত—তপোবনের উপযুক্ত স্থান বটে। এখানকার বেদভবন ও পুস্তকালয়টি দর্শনযোগ্য। কতকগুলি মন্দিরও আছে—মন্দিরে দেবতাদের নিয়মিত সেবা হয়ে থাকে এবং তাঁদেরই প্রসাদে শিক্ষার্থীরা ভোজন সমাধা করে। ঋষিকুল টে্‌নিং'এর আয়ুর্ব্বেদ-বিভাগটি বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য—এইজন্য যে, এর উন্নতির সাহায্যে কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের উদ্যম যথেষ্টই আছে। এই বিভাগের একটি আউটডোর ডিস্‌পেন্সারী আছে।

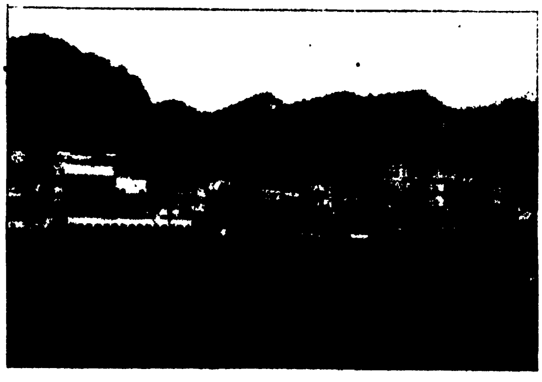
এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কাশীপুর নিবাসী পণ্ডিত দুর্গা দত্ত মহাশয় এবং আরও কয়েকজন সনাতনপন্থী পণ্ডিত। ব্যবহারিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিদ্যাবিস্তারের ব্যবস্থা আছে। কুটীরশিল্প সম্বন্ধেও ছেলেরা শিক্ষা পেয়ে থাকে—তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে ছেলেরা আমাদের শান্তিনিকেতনের মতই ইচ্ছা করলে বি-এ পর্য্যন্ত পড়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করতে পারে।

রুড়কি ও রুড়কি খাল

ভরা ভাগীরথীকে বারি বঞ্চিত করল রুড়কিখাল মায়াপুর ড্যামে। সুবৃহৎ গঙ্গা খালের জন্মভূমি হরিদ্বার এবং তার স্রষ্টা রুড়কি। হরিদ্বার দেখে সেইজন্য রুড়কি যাবার বাসনা জাগ্‌ল। রুড়কি খালটিকে জানবার ঝোঁক চাপ্‌ল আরও এইজন্য যে, আমাদের দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতারা যদি কোন দিন বাংলার বন্যাকে বাধা দেবার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করেন। সামান্য দামোদর খাল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেই এঁরা ভাবেন কি না করেছি, কিন্তু তিনশত মাইলব্যাপী গঙ্গা খাল কেটে যুক্তপ্রদেশ কেমন ক'রে বন্যার হাত থেকে বেঁচেছে ১৮৩৮-এর পর থেকে—তা একবার বাংলার সেচ বিভাগকে ভাল করে দেখে যেতে বলি।

হরিদ্বার থেকে কংখল যাবার পথে মায়াপুরে সারকিট হাউস-এর সামনে খালে প্রবাহিত জলধারাকে বেঁধে এই মুখ থেকে রুড়কি খাল কাটা হয়েছে। এর ফলে মূল ভাগীরথী বক্ষ একপ্রকার শুষ্ক থেকে যায় বল্লেই হয়—মূল বাঁধের স্লুইস্‌ দিয়ে যেটুকু যায় তা অত বড় নদীর পক্ষে অতি সামান্য বল্লেই হয়। সেচ বিভাগের কার্য্যকারিতার জন্য হরিদ্বারে দূরে কাছে ছোটবড় সেতু বাঁধ (dam) এবং স্লুইসের অনেকগুলি ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ে। এই সমস্ত কলা-কৌশলের পশ্চাতেই রুড়কির পত্তন এবং খ্যাতি।

হরিদ্বারে পৌঁছাবার পর দিনই মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে তপঃক্লান্ত দুপুরে



হরিদ্বার ঘাট

ডাকঘরের সামনে থেকে রুড়কি যাবার জন্য সাহারাণপুরের বাস ধরলাম। প্রতি ঘণ্টায় একখানি করে বাস ছাড়ে সন্ধ্যা ছটা পর্য্যন্ত,

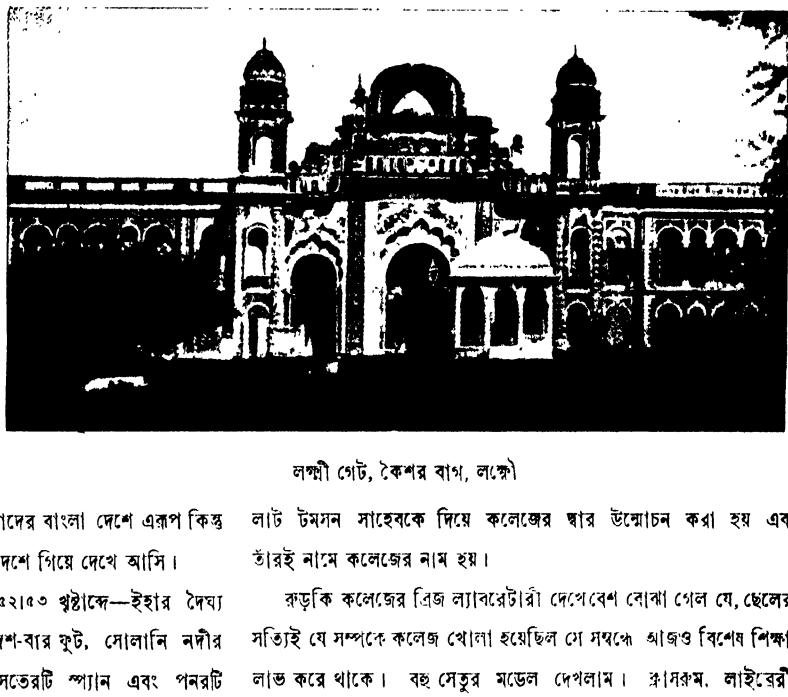
ভাড়া নিল যাতায়াতে এক টাকা মাত্র। দূর বেশী নয়—বাইশ মাইল মাত্র, এক ঘণ্টার পথ। পথটি কিন্তু ভারী চমৎকার, প্রায় বরাবর খালের ধার দিয়ে চলে গেছে—অপর পার্শ্বে উর্ব্বরভূমি শস্য দূর্ব্বা ও তরুলতায় ভরা। পাঁচ মাইল এসে পড়ল রামপুর সুপারপ্যাসেজ রাণিরাও নদীর বালুময় শুষ্ক বক্ষ ক্রশ্ করেছে জলনালী দিয়ে গঙ্গাখালের উপর দিয়ে।

মাইল নয়েক এসে দেখতে পেলাম পাওয়ার হাউস এইখান থেকে রুড়কি ও হরিদ্বারে বৈদ্যুতিকশক্তি সরবরাহ হচ্ছে। দশম মাইলে পুটুরি সুপার প্যাসেজ—খালের উপর দিয়ে পুটুরি নদীর প্যাসেজ ক্রস্ করেছে। ত্রয়োদশ মাইলে ধনৌরীতে কিন্তু এই রকম একটি ক্রসিংকে আগের মত প্যাসেজ না করে মিশতে দেওয়া হয়েছে যার ফলে রত্না নদীকে খালের জলে পুষ্ট ক'রে পশ্চিম দিকে চালিত করা হয়েছে। এটা পার হয়ে মাইল খানেক আসাতে ড্রাইভার পথের ডানদিকে নাতিদূরে একটি মসজিদ্ দেখিয়ে দিল। এটির নাম পিরাণ-কলিয়া বা পীর-কি-মোকাম—মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান, প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে (কুম্ভের পর) এখানে বড় গোছের মেলা হয়। রুড়কি শহরে প্রবেশ করবার পথে সোলানি নদীর উপর সুবৃহৎ জলনালীর পাশ দিয়ে চলে এলাম বরাবর সেতুপথে। এই জল নালীর উপর দিয়ে গঙ্গার খালটি তর তর বেগে বয়ে যাচ্ছে। এটি দেখবার জন্যে এখানকার কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছিলেন। এসে দেখলাম, সত্যই দর্শনযোগ্য এবং শিক্ষার যোগ্য—যদিও প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত, তবু এটি সুক্কুর ব্যারেজের চেয়ে কিছু কম দক্ষতার পরিচয় দেয় না। আমাদের বাংলা দেশে এরূপ কিন্তু দর্শনযোগ্য কিছু নাই, আমরা পঞ্জাব যুক্তপ্রদেশে গিয়ে দেখে আসি।

এই জলনালী নির্ম্মাণ হয় প্রায় ১৮৫২।৫৩ খৃষ্টাব্দে—ইহার দৈর্ঘ্য নয়শো বিশ ফুট, চওড়া ত্রিশ ফুট, গভীরতা দশ-বার ফুট, সোলানি নদীর বেড় থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চে—ষোল-সতেরটি স্প্যান এবং পনরটি খিলান এটিকে ধারণ করে আছে। সাধারণ সেতু থেকে এইটুকু তফাৎভাবে এর নির্ম্মাণ যে, সকল সময়েই দশ-বারো ফুট গভীর জলের ভার বহন ক'রে আছে এবং এই গভীর জলের অবিরাম স্রোতেও এর ধারণশক্তি খর্ব্ব হয়না। এটির জন্য সরকার ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন—তখনকার দিনে ভারতীয় মজুর মিস্ত্রী এবং শ্রমে বিলাতের ইঞ্জিনীয়রদের এটি চুক্তি করা যে বিশেষ কার্য্য কুশলতার পরিচয় দেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রুড়কিতে বাস থেকে নেমে একটি টাঙ্গা ক'রে আমরা ভারতবর্ষের বহুখ্যাত সর্ব্ব পুরাতন টমসন কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনীয়ারীং দেখতে গেলাম। বিরাটত্ব এমন কিছু নেই, তবে খাঁটি সাহেবী কলেজের সুবন্দোবস্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এখানেও সেটি বেশ অধিকমাত্রায়ই বর্ত্তমান। স্থানের অকুলান নেই, সেই জন্য কলেজের হুদ্দা অনেকখানি। যতটা দেখবার দেখলাম, কিন্তু মনের মত হ'ল কই?—বার্ষিক অবকাশের জন্য কলেজ তখন বন্ধ ছিল।

মুসলমান বাদশাহদের যমুনার খালের মত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যাপ্রদেশের উত্তরভাগে বন্যা এবং দক্ষিণ ভাগে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গঙ্গানদীর খাল খনন করে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এর কাজ আরম্ভ হয়, তখন রুড়কি সোলানি নদীর তীরে সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। খালের প্রধান উদ্যোগী ইঞ্জিনীয়ার স্যর কট্‌লে এই স্থানটাতে প্রথম আস্তানা বেধে কারখানা এবং লোহার ফাউণ্ডি প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু কারখানা চালান এবং খাল খননের জন্য অনেক শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হওয়ায় দেশীয় যুবকদের শিক্ষা দিবার জন্য কট্‌লে সাহেব কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তখনকার ছোট-



লক্ষ্মী গেট, কৈশর বাগ, লক্ষ্ণৌ

লাট টমসন সাহেবকে দিয়ে কলেজের দ্বার উন্মোচন করা হয় এবং তাঁরই নামে কলেজের নাম হয়।

রুড়কি কলেজের ব্রিজ ল্যাবরেটারী দেখে বেশ বোঝা গেল যে, ছেলেরা সত্যিই যে সম্পর্কে কলেজ খোলা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আজও বিশেষ শিক্ষালাভ করে থাকে। বহু সেতুর মডেল দেখলাম। ক্লাসরুম, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী, ওয়ার্কশপ, হষ্টেল—সবই দেখাল—কিন্তু ছেলেরা নেই, মাষ্টাররাও নেই—চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। কলেজের জন্যই রুড়কির অস্তিত্ব, লোকজনের বাস যে খুব তা মনে হ'ল না। ওদিকে ক্যাণ্টনমেণ্ট আছে শুধু, আর বিশেষ কিছু নেই। রুড়কি শহরটি কিন্তু ভাল লেগেছিল, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বেশ অনুভব করা গেল যে, স্বাস্থ্যকর স্থান এটি। অনেকটা দেরাদুনের মত, তবে লোকজনই যখন অল্প তখন বাঙ্গালীর মুখ যে তখন দেখতে পাব সে আশাই করিনি। তবে দশ-বিশ ঘর আছেন নিশ্চয়ই। রুড়কি খাল খোলা হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, প্রথমে রুড়কি পর্য্যন্ত কাজ হয়, তার পর শেষ পর্য্যন্ত ক্রমশ এটিকে নিয়ে গিয়ে কানপুরে পুনরায় গঙ্গা নদীর

সঙ্গে মিশানো হয়েছে। আলিগড় জেলার মধ্যে একটি শাখা বার ক'রে যমুনায় মিশানো হয়েছে। এই খালের জলে সাহারানপুর, মোজাফর নগর, মীরাট, বুলান্দ শহর, আলিগড়, এটাওয়া এবং কানপুর প্রভৃতি জেলার পল্লীগ্রাম ও ক্ষেত্রভূমি কেমন সুন্দর উর্বর হয়ে চাষীদের কত কল্যাণ সাধন করেছে দেখলে আনন্দ হয়—ঈর্ষাও হয় বাংলার জলপ্লাবিত বন্যা-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চাষীদের কথা ভেবে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মত তার পরেও বহুবার গঙ্গায় বন্যা হয়েছে—গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বন্যা হয়, তার লেভেল্ হরিদ্বারে সার্কিট হাউসে আছে সবচেয়ে উঁচুতে কিন্তু ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মত ক্ষতি হয়নি এই খালটি খোলার জন্য। জলকে প্রতি বাঁধে শ্লুইস্ সাহায্যে এমনভাবে চারিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, একই জায়গায় বহুদিন বন্যা থেকে ক্ষতি করতে পারেনি এবং সেই জল অজন্মা বা অনুর্বর স্থানে গিয়ে বরঞ্চ আরও সুবিধা ক'রে দিয়েছিল। বাংলাদেশ অতিবৃষ্টির দেশ স্বীকার করি, তবুও এইরকমভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে পূর্ববঙ্গে বা উত্তরবঙ্গে প্রায়ই বন্যা হয়ে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় না।



কেমিকেল লেবরেটারী, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

হৃষীকেশ ও লছমনঝোলা

হরিদ্বার থেকে প্রত্যুষেই একখানি বাস রিজার্ভ ক'রে হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ চোদ্দ-পনর মাইল, হৃষীকেশ থেকে লছমনঝোলা আরও তিন মাইল। এই তিনমাইল-রেলপথ নাই বলে বাসই সুবিধা। যে-পথে আমরা চললাম সে-পথ কেদারবদরীর পথ। এই পথ ধরেই প্রতি বৎসর পুণ্যলিপ্সু নরনারী বা তীর্থযাত্রীদের বদরী পথের যাত্রা শুরু হয়।

শিবালিক পর্ব্বতমালা অতিক্রম ক'রে বাস ছুটতে লাগল সুসুয়া নদী পেরিয়ে কংসরাও এবং সত্যনারায়ণ মন্দিরের পর থেকে রিজার্ভ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতি মনোরম পথে। রাইওলার পর থেকেই দূরে হিমালয়ের একটি গিরিচূড়ায় নরেন্দ্রনগর বা টিহরীর রাজপ্রাসাদটি চোখে পড়ল। ড্রাইভার বললে, ওখানে মোটর যাবার পথ আছে হৃষীকেশ থেকে। গাড়োয়াল রাজ্য এই টিহরী থেকেই আরম্ভ।

হৃষীকেশে চা খাওয়া সেরে নিয়ে প্রথমে লক্ষ্মণঝোলা চলে যাওয়া গেল। বাস হিমালয়ের পাদদেশে চড়াই পথে ধোঁয়া উড়িয়ে খানিকটা উঠে লক্ষ্মণজীর মন্দিরের কাছেই নামিয়ে দিলে। যে পথে নামালে সে-পথ (অতি চড়াই) দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত চলে গেছে পঁয়তাল্লিশ মাইল এঁকে বেঁকে ঘুরে জঙ্গল পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। এই পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ আজকাল বদরীনারায়ণের ফটক খোলা হলে বাস এবং মোটর যায়—গোটা পাঁচেক টাকা খরচা করলেই কয়েক ঘণ্টায় দেবপ্রয়াগ পৌঁছান যায়।

হাঁটা পথটি দিয়ে আমরা ডান দিকে অগ্রসর হলাম চাষ করা ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ঝোলার অভিমুখে। লক্ষ্মণজীর মন্দিরটি শীতল জনমানবহীন নির্জ্জন স্থানে প্রতিষ্ঠিত, আর শ্বেতপাথরের মূর্ত্তিটিও ভারী সুন্দর। এরা বলে, লক্ষ্মণ এইখানে এসে সত্যের সন্ধানে কঠোর সাধনা করেছিলেন। হিমালয়ের এক গহন কন্দরে গাঙ্গেয় উপত্যকার মুখদেশে প্রবাহিত ভাগীরথী, তার বহু উপর দিয়ে ঝোলানো সেতু দিয়ে নদীর পূর্ব্বপারে রামসীতার মন্দিরের কোলে পৌঁছে গঙ্গাস্নানোদ্দেশ্যে বসা গেল।

অতীতের ঝোলার বদলে বর্ত্তমান সেতুটি যেন খাপ খায় না, যদিও এটা তৈরি হবার পর থেকে কত সুবিধা হয়েছে। সেকালের লক্ষ্মণ-ঝোলা সম্বন্ধে জলধরবাবুর অভিমত তুলে দিলাম। "সেকালে খুব মোটা দুগাছি দড়ি সমান্তরালভাবে বসাইয়া তাহার মাঝে মাঝে ছোট ছোট শক্ত কাঠ বাঁধিয়া একটি দড়ির সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে হইত। এই সিঁড়িটি দুই পারে সংলগ্ন হইলে অবলম্বনের জন্য উপরে আরও দুগাছি শক্ত রশি বাঁধিয়া দেওয়া হইত। যাত্রীরা রশি দুইটি দুই কক্ষের মধ্যে রাখিয়া সবলে ধরিত ও দড়ির সিঁড়ির উপর পা দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত। এখন একবার মনে করুন ব্যাপারটা কি ভয়ানক—দুই কুক্ষির মধ্যে দুই রশি আর পা সেই রশিনির্ম্মিত দড়ির উপর—চারি-পাঁচ শত হাত নিম্নে কল্লোলময়ী বেগবতী গঙ্গা—কোনরকমে পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই।"

সৌভাগ্যবশত এই ঝোলার স্থলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সুরজমল ঝুনঝুনওয়ালা এখন যে রকম রয়েছে সেই রকম একটি তারের ঝোলাপুল তৈরি ক'রে দেন। সেটি কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের বন্যায় নষ্ট হয়ে যায়, পরে গবর্ণমেন্ট বর্ত্তমান ঝোলা সেতুটি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তৈরি করে। রামসীতা মন্দিরের ঘাটে কন্কনে শীতে গঙ্গার খরস্রোতে স্নান সমাপন ক'রে ফলহরি বাবাজীদের শান্ত সেবাশ্রমের মুষ্টিমেয় ছোলায় পিত্তরক্ষা করা গেল। স্বর্গাশ্রম দেখে সেইখান থেকেই কোম্পানীর ফেরী নৌকাতে এ-পারে ফিরে এসে পুরী মিঠাই দোকানে জলযোগ ক'রে বাসে ওঠা গেল।

হৃষীকেশ তীর্থধামে ভরত নারায়ণের মন্দির এবং গঙ্গার দৃশ্য ছাড়া আর একটা জিনিষ চোখে পড়ল। হৃষীকেশ একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র, এখানে সব জিনিষ আপনি পাবেন—যে কয়মাস কেদারনাথের পথ খোলা থাকে সেই কয়মাস এখানে যাত্রীদের আসা-যাওয়ার ষ্টেশন বলেই

কেনা বেচার ধুম পড়ে যায়। নানা ভাষার কেদারবদরীর গাইড থেকে আরম্ভ করে ছাতালাঠি, লণ্ঠন, কম্বল, দড়ির জুতো কি না পাবেন আপনি! শিলাজিতের মার্কেটও বেশ। খাবার-দাবারও সব প্রচুরই পাওয়া যায়।

মুসুরী

ত্রয়োদশীর দিন দেরাদুন পৌঁছলাম বেলা একটায়—ষ্টেশনের সামনেই দুটি মাত্র মোটর ছিল বড় এবং ভাল। সীডান বডি গাড়ী হলে কি হবে, আমরা সবশুদ্ধ জন আষ্টেক মাত্র যাত্রী দেখে জোঁকের মত ড্রাইভার দুটো আমাদের কামড়ে পড়ল। জন পিছু পাঁচ সিকায় রফা হলে গাড়ীতে বসা গেল—কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে, মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমরা যত না চিন্তিত হই, কতকগুলো হোটেলের ক্যানভাসার কামড়ে পড়ল কচ্ছপের মত খাদ্য সরবরাহ করবার অনুমতি পাবার জন্য। বেছে বেছে সিন্ধ-পঞ্জাব হোটেলটাই ভাল মনে হল—বেলা ১-৪৫এ গেট খুলবে, তখনও আধ ঘণ্টা দেরী দেখে আমরা ওখানেই আহার সেরে নিলাম।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই মুসুরীর ক্যানভাসিং আরম্ভ হল। বাঙ্গালী ম্যানেজার আছে বলে সেণ্ট্রাল হোটেলেই উঠব স্থির করা হল—এরাই ওপরে ফোন করে জানিয়ে দিলে। হোটেল অবশ্য মুসুরীতে খুবই ভাল পেয়েছিলাম বলে মনে হয়, কিন্তু ওটি (সবই তাই) পাঞ্জাবীরই হোটেল—বাঙ্গালী বোর্ডার জোগাড় করবার জন্যে ফুরানে বাঙ্গালী কোন লোককে ম্যানেজার বলে খাড়া ক'রে দেয়। যিনি এখানে ছিলেন তিনি বোধ করি বিনা পয়সায় থাকবার সুবিধা পেয়েছিলেন; তাই তিনি পরিচালক সেজেছিলেন আমাদের কাছে।

মুসুরীর পথে দেড় টাকা টোল সত্যিই গায়ে লাগে। দারজিলিং শিলং কি পরিষ্কার তকতকে পার্ব্বত্য শহর, একটি পয়সার টোল নেয় না অথচ মুসুরীর মত নিতান্ত সাধারণ পার্ব্বত্য জায়গায় যার ম্যুনিসিপ্যালিটীর কোন রাস্তাই সুন্দর মনে হয় না, তায় এতটা চার্জ্জ করা অনুচিত। ওরা বলে শীতের সময় পরিত্যক্ত বাড়ী ঘর আগলাতে ম্যুনিসিপালিটী এই অর্থ ব্যয় করে। মুসুরীর বর্ত্তমান মোটর পথ ভারী রুক্ষ, উন্মুক্ত বৃক্ষলতাহীন এবং শ্রীহীন মনে হল—কৃষির পরিচয় গোড়ার দিকে পাওয়া গেলেও পরে কয়লা ও চূণাপাথরকুচি (limestone quarries) সংগ্রহে শ্যাম পর্ব্বতগাত্র হিমালয়ের এই পাদদেশে সৌন্দর্য্য হারিয়ে ফেলেছে।

চড়াই পথে রাজপুর থেকে মাইল সাতেক এসে চার হাজার ফুট সীলেভেল পাহাড়ের উপর থেকে নীচে গভীর খাদে পাওয়ার হাউস দেখা গেল। মাথার উপর দিয়ে রেলওয়ে চলে গেছে, এরই সাহায্যে লোকজন এবং কয়লা যায়। এই পাওয়ার হাউস হাইড্রলিক নয়, জলের স্রোতগতিতে ডায়নামো সব সময় চালান যায় না বলেই বোধ হয়। এই পাওয়ার হাউস থেকে উপরে মুসুরীতে এবং নীচে দেরাদুনে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ হয়। এরাও প্রত্যহ রাত্রি নটায় ভোল্টেজ কমিয়ে সময় জ্ঞাপন করে।

মোটরের পথটি অসমাপ্ত বললেই ঠিক হয়, কারণ গাড়ী পৌঁছে দেয় কিনক্রেগে (Kincraig), সেখান থেকে আরও শ পাঁচেক ফুট উঠলে তবে শহরে পৌঁছান। এই খারাপ উৎরাই খারাপ পথটাতে যেমন উঠতে বিরক্ত লাগলে, তেমনি জ্বালাতন করেছিল হোটেলের দালালগুলো—



পাহাড়ের উপর হইতে হরিদ্বার

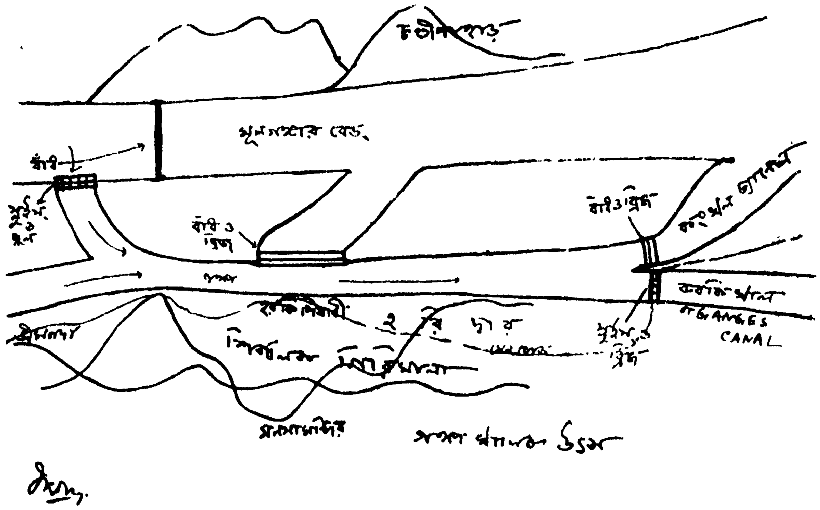
গয়ার পাণ্ডাদেরও হার মানায়। সেণ্ট্রালে জায়গা ঠিক আছে কি শোনে না! বকতে বকতে হায়রান।

কিন্তু সকল ক্লান্তি দূর হল যখন পশ্চিম গগনে সূর্য্য অস্ত গেল, আর পূবের আকাশে সোনার রঙে ছেয়ে উদয় হলেন চন্দ্র। দিকচক্রবালে রবি শশীর যাওয়া-আসার রঙখেলায় মধুর লাগলে দেওদার-ঠাসা মুসুরী পাহাড়। হোটেলের পিছনে পাইন ঘেরা টেনিস্ কোর্ট থেকে দেখতে পেলাম উত্তর হিমালয়ের গিরিপঙ্কতচূড়া ভেদ ক'রে উঁকি মারছেন বদরীনারায়ণের তুষারাবৃত সুউচ্চ পাহাড়শৃঙ্গ—চাঁদের আলো পড়ে চিক্ চিক্ করছে। ঠাণ্ডা বাতাসে কি ভাগ্যিস্ দারজিলিংএর মত শৈত্য নেই, ধূমপানে শরীর উত্তপ্ত ক'রে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে।

মুসুরী লাটসাহেবদের গ্রীষ্মাবাস না হয়ে ভালই হয়েছে। সিমলা, নৈনীতাল, দারজিলিং বা শিলং-এর মত পোলিটিকাল গন্ধ নেই—

শাসক-দূষিত হাওয়ায় বাস করতে হয় না, সেই জন্যই বোধ করি মুসুরীর আবহাওয়া খুব ভাল লেগেছিল এবং শারীরিক উন্নতিও হয়েছিল। কালিম্পংটা বড় ফাঁকা এবং অল্প ভিজে, কিন্তু মুসুরী খুব জমজমাট এবং শুকনো।

মন্সূ বৃক্ষের প্রাচুর্য্য হেতু গাড়োয়ালীরা এই জায়গাটাকে বল্‌ত মন্সূরী, যার থেকে বর্ত্তমানে মুসুরী নামে পরিচিত। এই পাহাড়ী জায়গাটিরও বয়স প্রায় শতবর্ষ—সিমলার কিছু পরে বৃদ্ধি লাভ করে। দেরাদুন সমভূমি থেকে হঠাৎ এতটা উঁচু (তিন-চার হাজার ফিট) উঠে যাওয়াতে এবং এত নিকটে অতি মনোরম স্বাস্থ্যকর বাতাস এবং সুন্দর সুন্দর হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় বলে গোরা পণ্টনের দল এবং তাদের সেনাপতি মহোদয়দের এই রমণীয় স্থানটার প্রতি নজর পড়ে। তারা ১৮২৩।২৪ খৃষ্টাব্দে ক্যামেল্‌ ব্যাকে-এর উপর একটি শীকারের ঘাঁটি নিৰ্ম্মাণ করে। যাতায়াত সুরু হয় এই থেকেই, যার ফলে বৎসর চারেক বাদে গবর্ণমেণ্ট ল্যাণ্ডোরে উচ্চ পাহাড়ের উপর সাত-আট হাজার ফুট উচ্চে ভাগ্যবান বৃটিশ সৈন্যদের জন্য একটি স্বাস্থ্য-নিবাস খোলে। পরে কাস্‌ল্‌ পাহাড়ের উপর গরমের সময়ের জন্য দেরাদুনের ত্রিকোণমিতির সার্ভে অফিসের কেন্দ্র খোলে। তখন থেকে ল্যাণ্ডোর বাজারের উৎপত্তি এবং শ্রীবৃদ্ধি বর্ত্তমানে শতবৎসর পরমায়ু লাভে এই এর যা রূপ হয়েছে তাতে বড়বাজারের মত আর ঢুকতে ইচ্ছা করে না, যদিও এখানে সমস্ত জিনিষই পাওয়া যায়।



নর্দাপথের মানচিত্র

ল্যাণ্ডোরে গোরা সৈনিকদের স্বাস্থ্যাবাসটি খুলবার পর থেকে মুসুরী পাহাড়ে সাহেবরা এবং ধনী ভারতীয় রাজন্যবর্গের কেউ কেউ গরমের সময় হাওয়া বদলে আস্‌তে আরম্ভ করেন এবং এঁদের কল্যাণে ক্রমশ ক্রমশ বাড়ী ঘর তৈরী হতে থাকে। বিলেতী আবহাওয়ার লোভে ফেরঙ্গদের সংখ্যা এমন বাড়তে থাকে যে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ক্রাইষ্ট চার্চ্চ-এর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। এর বৎসর পাঁচেক পরেই কুলরী বাজারে হিমালয় ক্লাব স্থাপিত হয়। এই প্রথম হোটেলে তখন মাত্র দেড়শ লোকের স্থান ছিল, তাও সাহেবদের জন্য। এখন কস্‌মপলিট্যান সর্ব্বজাতির জন্য—এখন প্রায় তিনশ-সাড়ে তিনশ লোকের স্থান আছে। গরমের কমাস থাক্‌বার জন্য সকলের পক্ষে বাড়ীঘর তৈরি করা সম্ভব হত না বলে হোটেলের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে।

নাম করা সাহেবী হোটেল স্যাভয়-এর উপর কপূরতলার মহারাজা বাড়ী করেন। এই রকম ওদিককার বহু করদরাজ্যের ধনী অধীশ্বর মুসুরীতে প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন এবং প্রতি বৎসর এসে দেওদার-ওক্‌ ঢাকা পার্ব্বত্যপথে ভ্রমণ ক'রে শোভাবর্দ্ধন করেন—আমার মত অধম দরিদ্রের তা বর্ণনা না করাই শোভন।

আমার মতে মুসুরীর লাইব্রেরী বাজারটাই ভাল, এদিকে থাকলে ম্যালে আড্ডা মারা, ডুন ভিউ এবং উত্তর হিমালয়ের বরফের চূড়াগুলি এই তিনটি উপভোগ করা যায়। মুসুরী লাইব্রেরীতে ঢুকে প্রায় হপ্তাখানেক বাদে কল্‌কাতার কয়েকখানা ইংরেজী কাগজ দেখ্‌তে পেলাম। ভিতরটা ভারী পরিষ্কার এবং গোছাল—বহু পুস্তকের সমাবেশ। প্রায় একশ বৎসর ধরে জড়ো হচ্ছে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদা তুলে আড়াই হাজার টাকায় ছোট বাড়ী কিনে এটির স্থাপনা সুরু হয়। উত্তর চৌহদ্দিতে ল্যাণ্ডোর ডিপো, সার্ভে অফিস্‌ প্রভৃতি, পূবে ক্ষরিপানি ওক্‌স্‌ গ্রোভ, রেলওয়ে স্কুল—দক্ষিণে ভাট্টা, পশ্চিমে দুটি পাহাড়ের ফ্যাক্‌ড়া—ভিন্সেণ্ট হিল এবং ব্লু চার্য হিল। লাইব্রেরীর ডানদিকে হ্যাপি ভ্যালির পথে বিখ্যাত চার্লিভিলে হোটেল—অনেকটা গেলে পোলো গ্রাউণ্ড রেস্‌কোর্স প্রভৃতি। এই দিক দিয়েই কোম্পানীবাগান (Botanics) এবং কেম্‌টী ফল্‌সে যাওয়া—কেম্‌টী সাত মাইল। হ্যাপি ভ্যালি রোডের তলা দিয়ে শাখায়িত হয়ে বেরিয়ে গেছে সিমলা যাবার রাস্তা চাক্‌রাতা হয়ে।

সবচেয়ে ভাল রাস্তা ক্যামেলস্‌ ব্যাক্‌ রোড। কেমন সুন্দর ছায়াবীথি নিয়ে পাহাড়ের বুকে এঁকে বেঁকে সাপের মত চলে গিয়েছে—চড়াই উৎরাই নেই বললেই হয়, চল্‌তে বা ঘোড়-শওয়ারীতে কষ্ট হয় না। ম্যালের আগে থেকে বেরিয়ে বরাবর পাহাড় ভেঙ্গে চলে গিয়ে কুলরী বাজারের পিছন দিয়ে রিঙ্কের পাশে পৌঁছে বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। এই পথে চলে রবিবাবুর ক্যালকাটা রোডের (দারজিলিং) বর্ণনার কথা মনে পড়ে। দেখেছিলাম নানা জাতীয় পাইন দেবদারু এবং ওক্‌ কত যে নাম-না-জানা বুনো পাহাড়ে অভ্রভেদী তরুসারি লতায় মণ্ডিত হয়ে ঘিরে আছে খাদের সীমানা। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা ফ্লোরার অনেক জাত পেয়ে থাকেন বলেই দেরাদুনে ফরেষ্ট কলেজের সৃষ্টি। এই পথে বরাবর তুষারমৌলি-গিরিচূড়ার দৃশ্য মেলে, মাঝে শেড্‌ দেওয়া স্যাণ্ডাল পয়েণ্ট

থেকে সবচেয়ে ভাল করে নন্দাদেবী, নাঙ্গাপর্ব্বত, শ্রীকণ্ঠ, কেদার বদরী, গঙ্গোত্রি, যমুনোত্রি প্রভৃতি তুষারাবৃত বিখ্যাত শৃঙ্গগুলি দেখা যায়।

এইটুকু শহরের মধ্যে সিনেমা রঙ্গালয়ের যেন ছড়াছড়ি; প্যালেস্ (পিক্‌চার) থেকে আরম্ভ ক'রে রিঙ্ক, রিয়ালটো, প্যালাডিয়াম—আরও কয়েকটা দেখলাম। প্যালাডিয়ামটাই ভাল বলে মনে হল। সীজ্‌নে খুব জমে। আমরা গিয়েছিলাম অক্টোবরে—যখন ওদের বন্ধ হয়ে আসছিল—যদিও আবহাওয়া ওই সময়টায়ই সবচেয়ে ভাল কিন্তু ওদিকে ছুটি থাকে না বলে বড় কেউ যায় না। কলকাতার লোকই বেশী আসে—অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল—রতনগড়ের রত্নাও এসেছেন দেখ্‌লাম, অনুরাধাও বাদ পড়েন নি।

সুখের বিষয় মুসুরীতে বাঙালী কয়েকজনের বাড়ী আছে—তাঁরা বেশীর ভাগ প্রবাসী বাঙালী, পশ্চিমেই থাকেন। দেরাদুনে টেলিফোন করতে মাত্র তিন আনা খরচা, যাঁরা দেরাদুনে থাকেন তাঁরা এর উপর বাড়ী করেন—অনেকটা আমাদের বাগানবাড়ীর মত, হপ্তা শেষে কাটিয়ে এলেন কাজের মাঝে একটু তাজা হবার জন্য।

অধিবাসীদের মধ্যে সাহেবী-আনায় দুরন্ত পাঞ্জাবী, গাড়োয়ালী, হিন্দুস্থানী এবং নেপালী বেশীর ভাগ টিহরী থেকে আসে কুলিমজুরী করে রোজগারের চেষ্টায়—পাঞ্জাবীরা ত সমস্ত বড় ব্যবসা অধিকার ক'রে নিয়েছে—হিন্দুস্থানী ত থাকবেই—মুসুরী যখন যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত। নেপালীরাও কিছু ছড়িয়ে পড়েছে।

কিছুদিন থাক্‌বার পর আমরা মুসুরী পাহাড় থেকে নেমে ফিরবার পথ ধরলাম। দেরাদুন থেকে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ থেকে কাশীধাম, কাশী থেকে পাটনা এবং নালান্দা হয়ে এক শুভপ্রাতে ঘরে প্রত্যাগমন করা গেল।

নিঝুম রাতে যখন তুমি রইতে ঘুমে চেতনহারা

শ্রীঅনুরাধা দেবী

ওদের দিকে পড়েছে মন, তোমার দিকে চাই না আর?
যা হোক তুমি তথ্যটা বেশ করেছ আজ আবিষ্কার!
চেষ্টা দেখ, এবার যদি থিসিস্ দিয়ে ডি-লিট হও;
সাইকোলজি ধন্য হবে; স্কলার তুমি কম ত নও!
আগের মত বাসি না ভালো? হয়নি যবে মন্টি খোকা,
বুঝতে যে গো শিখিনি অত, ছিলেম বুঝি সত্যি বোকা;
তখন আমি মনের ভুলে বুড়োর মোহে রাত্রিদিন—
ছিলেম খুশী, তোমায় নিয়ে চাতক পাখী নিদ্রাহীন।
তোমার সাথে ঠাট্টা করি? হয়তো হবে,—মূর্খ আমি;
এবার হ'তে শিখবো তবে, পরম গুরু ত্বংহি স্বামি!
সকালবেলা প্রণাম ক'রে ঘোমটা টেনে মুখটি ঢেকে,
কইব কথা সসম্ভ্রমে, সাধ্যি মত তফাৎ রেখে।

হবে না তাও? বলুন শুনি, কেমন ক'রে চল্‌বো তবে?
সহজভাবে তোমার কাছে মনের কথা বলতে হবে!
তাও কখনো হয়কি বলা, স্বামীর সাথে সহজ কথা!
পারব না সে, চাইনে হ'তে সীতার মত পতিব্রতা।
অনেক প'ড়ে তোমার বুঝি মাথার কোন নেই ক' ঠিক?
তাই ত দেখি খেয়াল চাপে কেমনতর আকস্মিক!
এটাও কিগো বুঝতে তুমি পারলে না ক' এতকালে?
তোমার ছায়া, মন্টি-খোকা, কিশোর-কায়া অন্তরালে।
ওদের আমি পাইনি যবে, তোমায় শুধু পেয়েছিলাম,
দিবস রাতি স্বপন গেঁথে আর যা কিছু চেয়েছিলাম,
তারি ভেতর লুকিয়ে ওরা আধো হাসির লহর তুলে,
বুকের তলে অথই জলে খেলত হোলি কুমুদ ফুলে।

নিঝুম রাতে যখন তুমি রইতে ঘুমে চেতনহারা,
ঘুমিয়ে যেত আকাশ-মাটি, জাগত শুধু ঝুমকো-তারা,
প্রদীপ ধরে চুপটি ক'রে চেয়ে তোমার মুখের পানে
দেখেছিলেম ওদের হাসি; ওরাই যেন আমার কানে
নূতন ডাকে তুল্‌ত সাড়া আধো-বুলির ছন্দ ক'য়ে,
তোমার বাহু-বাঁধন হ'তে নাম্‌ত প্রীতিঝর্ণা ব'য়ে।

দর্শন-পরীক্ষা

ডক্টর শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ্-ডি, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ

দর্শন বলিলে আমরা সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবহুল সুসম্বদ্ধ চিন্তাশাস্ত্রকে বুঝি এবং ঐরূপ শাস্ত্রে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শন শব্দের এইরূপ ব্যবহারের মূল কোথায়? ইহা বিচার করা আবশ্যক। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সামবেদ যজুর্ব্বেদ বা অথর্ব্ববেদে দর্শন শব্দের কোন প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্ বেদে (১।১১৬।২৩) একবার মাত্র দর্শন শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে সাধারণ 'দেখা' অর্থেই দর্শন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; কোন পারিভাষিক অর্থ নাই। বৈদিক সংহিতায় দর্শত পদের একাধিক প্রয়োগ আছে কিন্তু সেখানেও কোন পারিভাষিক অর্থ পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'দর্শনায় চক্ষুঃ' (৮।১২।৪) এইরূপ যে দর্শন শব্দের উল্লেখ আছে ইহাতে রূপ দেখার কথাই বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মদর্শনের যে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সেখানে আমরা দর্শন শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই দর্শন শব্দে রূপ দেখার কথা বলা হয় নাই, অরূপ আত্মদর্শনের কথাই বলা হইয়াছে এবং আত্মদর্শনের সাধন বিবিধ দর্শনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে অবশ্য দর্শন করিবে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে আত্মার স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করিবে, তর্কের সাহায্যে উহার বিচার করিবে এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া তাহাকে ধ্যান করিবে। আত্মার শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের ফলেই সমস্ত জড়প্রপঞ্চও পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। উক্ত শ্রুতিতে আত্মদর্শনের যে তিনটী উপায় বিহিত হইয়াছে সেই উপায়মূলে দর্শনকেও আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি—

(১) শ্রবণাত্মক দর্শন

(২) মননাত্মক দর্শন

(৩) নিদিধ্যাসনাত্মক দর্শন

জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা ও ব্যাস-কৃত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; কারণ, শ্রুতিই মীমাংসার একমাত্র উপজীব্য, শ্রুতি দ্বারা যে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে মীমাংসা শাস্ত্র তর্কের আলোকসম্পাতে তাহা আরও উজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শী করিয়াছে সুতরাং শ্রুতি ব্যাখ্যার প্রধান অবলম্বন বলিয়া মীমাংসাদ্বয়কে শ্রবণাত্মক দর্শন বলা যায়। ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি যে সকল দর্শনের প্রমা ও প্রমাণের স্বরূপনিরূপণই প্রধান লক্ষ্য তাহাদিগকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিব। কারণ, মনন শব্দের অর্থ যুক্তি দ্বারা বিচার, এখানে তর্ক ও যুক্তিপ্রধান শাস্ত্রেরই উপযোগিতা অধিক। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অভ্রান্ত যুক্তি-তর্কের স্বরূপ ও কৌশল প্রতিপাদন করিয়া আমাদের সত্যোপলব্ধির সহায়তা করিয়া থাকে সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে আমরা মননাত্মক দর্শন বলিব। সাংখ্যদর্শনেও যুক্তিই প্রধানভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রুত্যর্থের মননই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য, সুতরাং সাংখ্যদর্শনও মননাত্মক দর্শন। যোগশাস্ত্র তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যোগের স্বরূপ, সাধন ও ফলনির্ণয় করিয়া যোগশাস্ত্র ধ্যানের সহায়তা সম্পাদন করে, অতএব যোগদর্শনকে নিদিধ্যাসনাত্মক দর্শন বলা যায়। এইরূপে ষড়্ দর্শনই আমাদের আত্মবিজ্ঞানের সাধন হইয়া 'দর্শন' আখ্যাপ্রাপ্ত হইতে পারে। 'দৃশ্যতে জ্ঞায়তে অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা দর্শন শব্দে আত্মজ্ঞান সাধন (দর্শন) শাস্ত্রকে বুঝাইয়া থাকে। বিচার দৃষ্টির সাহায্যে আত্মদর্শন ও তাহার উপায় বর্ণনা করাই দর্শন শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য; সুতরাং কেবল ষড়দর্শন কেন? যে শাস্ত্রে আত্মবিচার ও আত্মদর্শনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে মুখ্যতঃ তাহাই দর্শন শাস্ত্র; যে শাস্ত্রে আত্মদর্শনের কোন কথা নাই বা যে শাস্ত্র আত্মদর্শনের সহায় হয় না এইরূপ শাস্ত্র মুখ্য দর্শন নহে। দর্শনের সাদৃশ্যপ্রযুক্ত উহা গৌণ দর্শন। ইহাই বৃহদারণ্যক শ্রুতির তাৎপর্য্য। বৃহদারণ্যকোক্ত বিচারদৃষ্টির সাহায্যে কি আস্তিক, কি নাস্তিক, ভারতের সর্ব্ববিধ দর্শন শাস্ত্রই ত্রিবিধ দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'দর্শন'

সংজ্ঞালাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শন শব্দের ব্যবহারের মৌলিক প্রমাণও আমরা খুঁজিয়া পাই।

এই মূলকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীনকাল হইতে সাংখ্যাদি শাস্ত্রে দর্শন শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের রত্নাকর মহাভারতে সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।(১) শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শন শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।(২) মহামতি কৌটিল্য ষড়্‌দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বিদ্যার যে বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাংখ্য যোগ ও লোকায়ত—এই ত্রিবিধ দর্শন শাস্ত্র কৌটিল্যের মতে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, বেদান্ত ও মীমাংসা, এই মীমাংসাদ্বয় ত্রয়ী বিদ্যা, ন্যায় ও বৈশেষিক তাঁহার দৃষ্টিতে লোকায়তের অন্তর্গত। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক—এই ষড়দর্শনেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু দর্শন শব্দ ব্যবহার করেন নাই। মহাকবি ভাস তদীয় প্রতিমা নাটকে মহেশ্বরের যোগশাস্ত্র ও মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু দর্শন শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। ললিতবিস্তরে গৌতমবুদ্ধের বিদ্যা শিক্ষা প্রসঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ও হেতুবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় কিন্তু সেখানেও দর্শন শব্দের প্রয়োগ নাই। এই সকল কারণে কেহ কেহ মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের যে সকল শ্লোকে সাংখ্যাদি দর্শনের উল্লেখ আছে ঐ সকল শ্লোকের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন। আমরা এইরূপ সন্দেহ সমর্থন করি না, কেন না, অনেক পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থেও সাংখ্য, সাংখ্যশাস্ত্র এইরূপ সাংখ্যাদি দর্শনের নামতঃ বা শাস্ত্র শব্দের দ্বারা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, দর্শন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। ভাস কবির নাটকে আমরা শাস্ত্র শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্রে ও ললিতবিস্তরে কেবল নামের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এইরূপ ব্যবহার আধুনিক কালেও আমরা করিয়া থাকি, বেদান্ত, বেদান্তশাস্ত্র বা বেদান্তদর্শন এইরূপ যে-কোন ব্যবহারই আজও চলিতেছে সুতরাং ভাস ও কৌটিল্যাদির গ্রন্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ নাই দেখিয়া মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বের শ্লোকগুলির প্রামাণ্য সন্দেহ করা কোনমতেই সমীচীন বলা যায় না। মহাভারতের পরবর্ত্তী অনেক প্রামাণিক গ্রন্থেও আমরা দর্শন শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই সুতরাং মহাভারতের উক্তি অপ্রমাণ বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

সূত্রাকারে যে ষড়্‌দর্শন প্রচলিত আছে তাহাতে স্থানে স্থানে দর্শন শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহা দর্শন শাস্ত্রকে বুঝায় না। যোগদর্শনের ব্যাস ভাষ্যে প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য পঞ্চশিখের যে সূত্র উদ্ধৃত আছে তাহাতে দর্শন শব্দের প্রয়োগ আছে সত্য কিন্তু তাহাও দর্শন শাস্ত্রবোধক নহে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে (1-85 A. D.) জৈন পণ্ডিত উমাস্বতি তদীয় তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে দর্শন শব্দের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। পণ্ডিত উমাস্বতি তাঁহার প্রথম সূত্রেই সম্যগ্‌ দর্শনকে মোক্ষের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সূত্রে তিনি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে সম্যগ্‌ দর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া তৃতীয় সূত্রে ঐ দর্শনকে (১) নিসর্গ দর্শন ও (২) অভিগম দর্শন এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ভিতর হইতে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা তাঁহার মতে নিসর্গ দর্শন এবং আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অভিগম দর্শন। এই দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ পণ্ডিত উমাস্বতি তাঁহার গ্রন্থের পর পর অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা দেখিলে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, তিনি দর্শন শাস্ত্রোক্ত চরম দর্শনের কথাই সূত্রে বিবৃত করিয়া তদীয় গ্রন্থের নাম সার্থক করিয়াছেন। খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তদীয় ভাষ্যে দর্শন শাস্ত্র বুঝাইতে দর্শন শব্দের একাধিক প্রয়োগ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ, কি, পঞ্চম শতকে বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদও দর্শন শাস্ত্র অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিরণাবলী রচয়িতা আচার্য্য উদয়ন ও ন্যায়-কন্দলী রচয়িতা শ্রীধর ভট্ট ভাষ্যোক্ত দর্শন শব্দে, দর্শন শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব বিবেকের উপ-সংহারেও উদয়নাচার্য্য 'ন্যায় দর্শনোপসংহারঃ' বলিয়া ন্যায়-শাস্ত্রকেই স্পষ্টতঃ ন্যায়দর্শন বলিয়াছেন। শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যও 'বৈদিক দর্শন' ঔপনিষদ দর্শন প্রভৃতি বাক্যে দর্শন শাস্ত্রকেই বুঝাইয়াছেন। মোট কথা,

(১) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৯।৬৪-৬৫, ৩০০।৫, ৩০৬।৬, ৩০৭।১

(২) শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৮।১৪।১০

প্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, প্রশস্তপাদ, উদয়নাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ধুরন্ধর দার্শনিকগণ সকলেই দর্শন শব্দে দর্শন শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় পরিভাষায় দর্শন শব্দের প্রয়োগও করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দশম শতকে বৌদ্ধ পণ্ডিত রত্নকীর্ত্তি তদীয় ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিতে দর্শন শাস্ত্র অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রাচীন পালি ত্রিপিটকে (খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতক) সম্প্রদায়গত মতবাদকে লক্ষ্য করিয়া বহু স্থানে 'দিটি্‌ঠ' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। পালির এই 'দিটি্‌ঠ' শব্দ সংস্কৃত দৃষ্টি শব্দের অপভ্রংশ। দৃষ্টি শব্দ ও দর্শন শব্দ একই দৃশ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন, অতএব 'দর্শন' অর্থে দৃটি্‌ঠ শব্দের প্রয়োগ করিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন দৃষ্টি শব্দ ও দর্শন শব্দ তুল্যার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্র ভাষ্যে আচার্য্য বাৎস্যায়ন 'সাংখ্যদৃষ্টি' শব্দে সাংখ্যদর্শনকেই গ্রহণ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় "যা বেদবাহ্যা স্মৃতয়ো যাশ্চ যাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ"—এই শ্লোকে দর্শনশাস্ত্র অর্থেই 'দৃষ্টি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। চার্ব্বাক প্রভৃতির বেদবিরুদ্ধ দশনশাস্ত্রকেই 'কুদৃষ্টি' বা নিন্দিত দর্শন বলা হইয়াছে। টীকাকার কুল্লুক ভট্টও এইরূপেই 'কুদৃষ্টি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দশনশাস্ত্র বুঝাইতে দশন শব্দের ব্যবহারই প্রাচীন কালেই বিশেষ প্রচলিত ছিল। মনে হয়, এই জন্যই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে জৈন নৈয়ায়িক পণ্ডিত হরিভদ্র সূরি তৎকৃত ভারতীয় দর্শনের প্রথম সংগ্রহ গ্রন্থ 'ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়'কে দশন নামাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিভদ্র সূরির 'ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়' ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত, বৌদ্ধ ও জৈন—এই ছয়টী দার্শনিক মতবাদের একখানি অতি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থ। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে মাধবাচার্য্য বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের সার সংকলন করিয়া সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ রচনা করেন। সর্ব্বদশন সংগ্রহ ভারতীয় দর্শনের অতি অপূর্ব্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। মাধবাচার্য্যের এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার সময়ে দার্শনিক চিন্তাধারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতদূর পুষ্টি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। মাধবাচার্য্য চার্ব্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্ত পর্য্যন্ত ষোলটী বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দর্শন শব্দই কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সর্ব্ববিধ দার্শনিক চিন্তার পরিচায়ক; এই জন্যই মাধবাচার্য্যের গ্রন্থের নাম সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ রাখা হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নামকরণ আর সম্ভব হয় না। এই সকল সংগ্রহ গ্রন্থ আলোচনা করিলে দর্শন বলিলে আমরা দর্শন শাস্ত্রকে বুঝি কেন, এই প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা পাওয়া যায়। আমরা এই মীমাংসার মূলেও প্রদর্শিত বৃহদারণ্যক শ্রুতিকেই প্রমাণ বলিয়া উপন্যাস করিব। বৃহদারণ্যক শ্রুতির বিবৃতি প্রসঙ্গেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আত্মদর্শনই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। ইহাই মুখ্য দর্শন। বিচারের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং ইহার উপায় বর্ণনা করার জন্যই বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই বিচার প্রক্রিয়া পরীক্ষা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই জন্যই দর্শন শাস্ত্রের অপর নাম পরীক্ষা শাস্ত্র। সৃষ্টিতত্ত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দার্শনিক পরীক্ষার সূচনা হইয়াছে। যে দিন মানব ধরণীর বুকে আবির্ভূত হইল, সে দেখিল তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া সে হইল আত্মহারা। সৌন্দর্য্যোন্মাদ জাগাইল তাঁহার প্রাণে কাব্য প্রেরণা। ক্রমে ক্রমে এই সৌন্দর্য্যোন্মাদ কাটিয়া গেল। মানব মনঃ প্রকৃতির নানা তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তর্ক। সে প্রশ্ন করিল, এই পরিবর্ত্তনশীলা লীলাময়ী প্রকৃতির মূল কি? প্রকৃতির এই সাবলীল গতি ভঙ্গির মধ্যে যে ছন্দঃ ও ঐক্যের সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কে সেই সূত্রধর? জড়প্রকৃতির বুকে প্রাণীজগৎ কোথা হইতে আসিল? ইহার পরিণতি কোথায়? আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি! কোথায় আমার ভবিষ্যৎ? এইরূপ অনন্ত প্রশ্ন হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের আদিম মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্তও মানুষের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ সহজাত প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ঐ সকল প্রশ্নের যে সমাধান করিয়া আসিতেছে তাহাই হইল তাঁহার দর্শন, আর, পদার্থসমূহের তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্রই দর্শন শাস্ত্র।

প্রাণ কাঁপে শাঁখের ডাকে

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

ডাক্তারবাবু গোটা দুই লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের কেস্ জোগাড় করেছিলেন সেই উপলক্ষেই আমার এই অভিশপ্ত পল্লীতে আসা। সমস্ত দিন ধ'রে পরোপকার ক'রে অর্থাৎ ক্লায়েন্টের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য সদুপদেশ দিয়ে তাদের রাজী করিয়ে মনে মনে উৎফুল্ল হ'য়ে সবে চায়ের কাপে একটী মাত্র চুমুক্ দিয়েছি, এমন সময় পাশের বাড়ীতে ঘনঘন শাঁখ বেজে উঠ্ল। ডাক্তারবাবুকে বললাম—ব্যাপার কি, বিয়ে নাকি?

—আর বলেন কেন, বাহান্ন বৎসরের বৃদ্ধের তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ। ব'লে ডাক্তারবাবু বেশ একটু হেসে উঠ্লেন।

আমি তাঁর হাসিতে যোগ দিতে না পেরে বললাম—কি রকম?

তখন ডাক্তারবাবু আরম্ভ কর্লেন—

যেখানে নেমে এলেন, ঠিক ঐ ষ্টেশনের সাম্নেই একটা বাজার আছে। ঐ বাজারের মধ্যেই হীরু পোদ্দারের তিরিশ বছরের দোকান—ওখানে জিনিসপত্তর গড়া হয়—আর চলে বন্ধকী কারবার। শোনা যায়, সোনার খাদ চিন্তে আর মুখে মুখে সুদের হিসেব করতে হীরুর জুড়ি আর এ তল্লাটে নেই—একটা জিনিস নাকি হাতে ক'রেই বলে দিতে পারে ওটার ওজন কত, ওতে কত খাদ, কত ময়লা—আর গালালে ওটা কমে কতয় দাঁড়াবে। একমাত্র তার দোকানের জিনিস ছাড়া অন্যসব দোকানের জিনিসই ওর কাছে পানে ভর্ত্তি, আর সেগুলি ওর কাছে বেচ্তে গেলে খদ্দেররা পায় কেনা দামের অর্দ্ধেক। বিধবা স্ত্রীলোক জিনিস বন্ধক রাখ্লে সে জিনিস আর বেরোয় না; আবার কারো কারো জিনিস মাঝে মাঝে কড়ারি ব'লে তমাদির সামিল হ'য়ে যায়। এইভাবে কারবার চালিয়ে হীরু পোদ্দার এখন গ্রামের মাতব্বর—গণ্যমান্য বরেণ্য প্রেসিডেন্ট মশাই। স্বনামধন্য পুরুষ—পোদ্দার মশায়ের নাম এদিকে সবাই জানে, তবে খাওয়া দাওয়ার আগে কেউ মুখে আন্তে সাহস করে না; কেন না নামটির মাহাত্ম্য এরূপ যে, উচ্চারণ করলে সেদিন নাকি উচ্চারণকারীর অদৃষ্টে অন্ন নেই—এটা নাকি গুজব নয়, অনেকেরই প্রত্যক্ষ করা।

তারপর শুনুন, বেশ দিন যাচ্ছিল—পোদ্দার মশায়ের ছেলে নেই, মেয়ে নেই, আত্মীয়স্বজন থেকেও নেই, শুধু নিজে আর গিন্নী। পয়সার অভাব নেই, জায়গা, জমি, পুকুর বাগান কিছুরই অভাব নেই, নিলামের কল্যাণে একে একে সবই হয়েছে—আজকাল একটু অসুবিধে হ'য়েছে আইন-কানুন খারাপ হয়ে—কেন না পোদ্দারমশাই প্রায় ব'লে থাকেন, ব্যাটারা আজকাল আর সুদের সুদ ডিক্রী দেয় না, আবার আসলের চেয়ে বেশী সুদও দিতে চায় না—ক্রমেই কলি ঘনিয়ে আস্ছে কি না, নইলে কি রাম রাজত্বই না ছিল।

যাক্, নির্ঝঞ্ঝাটে সংসার চলছিল, হঠাৎ গোল হল আর বছর গরমের প্রথমটায়। পোদ্দারের গিন্নী হঠাৎ পড়ল মারা—ব্যাপার শুনুন একবার—গিন্নীর হল কলেরা, বাড়াবাড়ি হতেই স্যালাইনের সব বন্দোবস্ত করলাম, খরচের ভয়ে আমাদের সব হাঁক্ডাক্ ক'রে তাড়িয়ে শেষে ওরই এক খাতক কোয়াক্ হোমিওকে কোথা থেকে নিয়ে এল ওই জানে, তারপর সেইদিনই রোগী সাবাড়, পাড়ার লোককে পোদ্দার বলেন—দেখ্লে, ও যে মর্বে সে আমি আগেই জানতাম, বুজরুক ডাক্তার কিছু কামাবার ফন্দীতে ছিল আর কি—তা আমার কাছে বুজরুকী—হ্যাঁ, হাঁ, দেরী হবে, জোচ্চোর, দমবাজ কোথাকার—

তারপর ছ'মাসের মধ্যে আর একটা বিয়ে হ'য়ে গেল। বাঙ্গালায় মেয়ে খুব সস্তা কি না, কাজেই অমন টাকার কুমীর বেনই বা হবে না বলুন।

এ মেয়েটি ছিল পোদ্দারের নাতনীর বয়সী—ছেলেমানুষ, একলা থাক্তে পার্ত না, কান্নাকাটি করত, পোদ্দার মারধোর কর্তেও কসুর করে নি।

শীতকাল—একদিন রাত্রে কর্ত্তার হুকুম হল—তামাক সাজ্। গিন্নী উঠ্তে না পেরে শুয়ে শুয়ে কি একটা উত্তর দিয়েছিল।

পরক্ষণেই গিন্নীর পিঠে প্রচণ্ড পদাঘাত। গিন্নী মনের দুঃখে নিজের পথ নিজেই পরিষ্কার কর্লে। পরের দিন দুপুরে খিড়কী পুকুরে গিন্নীর লাস ভেসে উঠ্তেই পোদ্দারের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল; দারোগা, চৌকীদার আর তিনখানা গাঁয়ের সব লোকই একে একে জড়ো হ'তে লাগ্ল। শেষে কিসে কি হল, লাস জ্বালানর হুকুম মিল্ল—পোদ্দারও পেল নিস্তার।

—বলেন কি? এমন একটা ব্যাপার এত লোক জানাজানি সত্ত্বেও চেপে যায়।

—আগ্ছার, তারপর আজ আবার এই তৃতীয় পক্ষ গ্রহণের পালা—, এই যে সাম্নের বাড়ীর আমাদের রজনীবাবুর মেয়ের সঙ্গে।

—আপনারা এত জেনে শুনেও মেয়েটাকে দিচ্ছেন একটা কসায়ের হাতে?

—গরজ বড় বালাই কি না, রজনীবাবুর জ্যেষ্ঠাটিকে পার কর্তে লেগেছে হাজার দুই, সেটা এখন মায় সুদে দাঁড়িয়েছে প্রায় চারে—এখন পোদ্দারমশাই একসঙ্গে রজনীবাবুকে কন্যাদায় আর ঋণদায় থেকে মুক্তি দিচ্ছেন কি না।

—তবুও এ রকম পিশাচের হাতে—

—নাচার, ঋণশোধের আর দ্বিতীয় উপায় নেই; আজকাল গোটাকতক ঋণসালিশীবোর্ড হয়েছে জানেন, পল্লীগ্রামে গোটা দুই ছাগল পুষে

চাষীঘাতক ব'লে অক্লেশে মহাজনকে অনেকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে; ওপাড়ার গোকুল দত্ত একটা কারবারের শুষ্ক অংশীদার ছিল, এই হিড়িকে মহাজনের হাজার পাঁচেক টাকা বেমালুম হজম ক'রে দিলে; নালিশ করতেই একটা লাঙ্গল কিনে চাষী হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে টাকাটাও কিস্তিবন্দী হল মাসিক দুটাকা হারে। এখন সেই টাকায় কারবার চালিয়ে গোকুল দত্ত মাসে দু'শ টাকা কামাচ্ছে আর যার টাকা সে পাচ্ছে মাসে দু'টাকা—তবে রজনীবাবুর সে গুড়ে বালি, কেন না গোকুলবাবুর অন্তরঙ্গ হচ্ছে ঋণসালিশীবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট; আর রজনীবাবুর মহাজন হচ্ছে স্বয়ং হীরু পোদ্দার, সালিশীবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়—

... ...

অর্দ্ধরাত্রে পুরাঙ্গনাগণের উলু ও শঙ্খধ্বনির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়—বাহিরে সুপ্ত পল্লীর স্নিগ্ধবক্ষ তখন শুভ্র জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে; দূরে নারকেল গাছের মাথায় একটা হুতোম পেঁচা শুধু নৈশনিস্তব্ধতা ভেঙে থেকে থেকে ডেকে ওঠে—থুম্ থুম্ হুতোম্ হুম্।

আমাদের শ্যামসুন্দর

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

মানুষটীর সঙ্গে তার দেশের মাটি, বংশধারা এবং আবেষ্টনী মিশাইয়া চক্রে ফেলিয়া, মহান কুম্ভকার তার মনভাণ্ডটী গড়েন।

শ্যামসুন্দরের মনভাণ্ডটীর প্রথম ও দ্বিতীয় উপকরণ তাঁহার দেশ ও বংশ ধারা। পাবনার মাটীতে চক্রবর্ত্তী বংশে বহুলোক জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন, নবীন এবং নব-প্রাচীন সংস্কারের আবেষ্টনীর মধ্যে শ্যামসুন্দর বর্দ্ধিত। একদিকে কর্ণেল অলকট্ ও মাদাম ব্লাভেট্স্কির থিঅসফি প্রচার এবং আর এক দিকে শশধর তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক ধর্মব্যাখ্যা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল প্রাচীন সমাজে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উদার স্বাধীন ভাবের প্রভাবসূত্র তাঁহাকে টানিয়া আনিল পুরাতন সমাজের অর্থহীন-সঙ্কীর্ণতা-গণ্ডীর বাহিরে। এই উভয়বিধ প্রভাবের ফল উদারভাবাপন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু শ্যামসুন্দর।

পাবনা জিলার অন্তঃপাতী ভারেঙ্গা গ্রামে শ্যামসুন্দরের জন্ম। তাঁহার পিতৃদেব হরসুন্দর তর্কালঙ্কারের অগাধ পাণ্ডিত্য, ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠা ও ধর্মভাব সেই সময়ে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্যামসুন্দর তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্মসময়ের গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচার করিয়া গ্রহাচার্য্য বলেন—এই বালক যে কেবল অসাধারণ পণ্ডিত হইবে তাহা নহে, বালকের চরিত্রও স্ফটিকবৎ নির্ম্মল হইবে। আত্মীয়-স্বজন তাই বালককে 'ফটিক' বলিয়া ডাকিত। উত্তরকালে যাঁহারা শ্যামসুন্দরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিশ্চয়ই জানা আছে—কী অপূর্ব্ব চারিত্রিক স্বচ্ছতা ছিল এই ব্রাহ্মণ সন্তানের। বর্তমান লেখক তাই ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের স্মৃতিবার্ষিকী প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"Shyamsunder's interior, however, was seen through his transparent exterior."

অল্প বয়সেই শ্যামসুন্দরের পিতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে হরসুন্দর তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে বিশেষভাবে বলিয়া যান—আমার পুত্র দুটি (দ্বিতীয় পুত্র শ্যামসুন্দরের অনুজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তী) যেন ইংরাজী পড়ে না। শ্যামসুন্দর সম্বন্ধে এ অনুরোধ যদিও অক্ষরে অক্ষরে রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু বিদেশী শিক্ষা লাভ করিয়াও তিনি তাঁহার পিতার অভিপ্রেত স্বদেশ-প্রীতি ভুলেন নাই। শ্যামসুন্দর ছিলেন পুরামাত্রায় স্বদেশী—তাঁহার আচার-ব্যবহার ছিল স্বদেশী, চাল-চলন ছিল স্বদেশী, ধ্যান ধারণা সবই ছিল স্বদেশী, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল স্বদেশী। তাঁহার কাছে তাঁহার স্বদেশ একটিপ্রাণবন্ত বিরাট দেবতা ছিল। কলিযুগের শ্যামসুন্দরের ন্যায় প্রেমে সুন্দর এবং বর্ণে "শ্যাম ইব শ্যাম"; অনন্ত আকাশের ন্যায় বর্ণহীন ও সীমাহীন।

শ্যামসুন্দর বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মেধার অভাব ছিল বলিয়া নহে, দারিদ্র্যের প্রভাব ছিল বলিয়া। কুচবিহারের স্কুল ও কলেজে, এণ্ট্রান্স্ ও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা স্কলারশিপ সহ পাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়িবার সময় গণিতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ

গণিতাধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ছিল না, শ্যামসুন্দরের কিন্তু ছিল অধ্যয়নস্পৃহা এক ব্যাধির মতন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা অনন্যসাধারণ না হইলেও বেশ উচ্চস্তরের ছিল। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল।

ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তির পর ভাগ্যান্বেষণে শ্যামসুন্দর কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণদেবের ভাগিনেয়কে পড়াইবার একটা চাকুরী পাইলেন। শোভাবাজারের রাজাদের মত ধনী লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ইচ্ছা করিলে, শ্যামসুন্দর এইখান হইতেই নিজের ভাগ্যের ইমারত গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্য-নিয়ন্তা তাঁহার জন্য জীবনের কর্মক্ষেত্র অন্যত্র নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন; রাজ-অনুগ্রহের কাঞ্চন-গণ্ডীর মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে কিরূপে? কোন একটি ঘটনা উপলক্ষে তিনি রাজবাড়ীর গৃহশিক্ষকের কার্য্যে ইস্তফা দেন। দ্বারবঙ্গাধিপতি, নাভার মহারাজা, কত ধনী ভাটিয়ার সংস্পর্শে উত্তরকালে তিনি আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই সদা-সন্তোষপরায়ণ পণ্ডিত কোন দিন পরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন নাই। এই নির্লোভ মহত্বই শ্যামসুন্দরের চরিত্রের মেরুদণ্ড। শেষ বয়সে, নানা চিন্তাভারেও অন্তিম মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত এই মেরুদণ্ড একটুও অবনমিত হইতে দেখি নাই।

রাজবাড়ীর গৃহশিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়া শ্যামসুন্দরের মনে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সাংবাদিকতার দিকে ছিল তাঁহার আশৈশব আগ্রহ। সেই সময় বাংলার চিন্তাজগতে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব। শ্যামসুন্দর একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ লইয়া একপ্রকার রিক্ত হস্তেই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। "প্রতিবাসী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাংবাদিক শ্যামসুন্দরের প্রথম আত্মপ্রকাশ। দেশসেবার জলন্ত আগ্রহ "প্রতিবাসী"র ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিল। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হয়। যতদূর স্মরণ হয়, সুরেশ সমাজপতি, বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'ট্রিবিউন'-সম্পাদক কালিনাথ রায় প্রভৃতি 'প্রতিবাসীর' প্রধান ও নিয়মিত লেখক ছিলেন কিছুদিন বাদে অর্থদুগ্ধাভাবে শিশুর মৃত্যু হয় সূতিকাগারে। শ্যামসুন্দর দমিলেন না, আবার নবীন উদ্যমে 'People' নাম দিয়া একখানি দৈনিক সান্ধ্য ইংরাজী কাগজ বাহির করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহারও ভাগ্যে ছিল অকালমৃত্যু।

এই সময় শ্যামসুন্দরের সহিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পরিচয়। জাতীয় জীবনের যুগ-সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যার' আবির্ভাব। 'সন্ধ্যায়' বাজিত ঐক্যতানিক; সব যন্ত্র একই সুরে একই তালে বাজিত। কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না, কোন লেখা কাহার। উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, মনোরঞ্জন, পাঁচকড়ি, সমাজপতি ছিলেন লেখক। লেখকের কোনো নিজস্ব ধারা সেসব লেখায় ধরা পড়িত না। বাঙ্গালী সেই প্রথম চিনিল আপনার জননীকে। বঙ্গভঙ্গের বিরাট আন্দোলন-নাদে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত। দিকে দিকে নব জাতীয়তার জাগরণী। সেই শুভ মুহূর্তে বঙ্গজননী সহসা স্বদেশী আন্দোলনের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে আহ্বান করিলেন। সে আহ্বান জাতির কান দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। সপ্তকোটী আকুলকণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিল—**বন্দেমাতরম্।** স্বয়ং ভগবান আরম্ভ করিলেন দেশপ্রেম-সাগর মন্থন। মন্থনের কালে সাগর গর্ভ হইতে একে একে উঠিল নবযুগের নূতন মানুষ। স্বদেশী যুগের সেই নূতন মানুষদের অন্যতম শ্যামসুন্দর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাতে উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' যখন আমলাতন্ত্রের সন্ধ্যা ঘোষণা করিলেন, সেই সন্ধ্যামন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হইলেন শ্যামসুন্দর। ইহার পর, 'যুগান্তর' ও তাহার কিছুকাল পরে 'বন্দেমাতরম্'—এই দুই যুগান্তকারী পত্রিকায় শ্যামসুন্দরের তেজস্বী লেখনী—জাতীয়তার আদর্শ প্রচারে তাঁহার নির্ভীক সিংহনাদ সহস্র সহস্র হৃদয়ে নবীন উত্তেজনার সঞ্চার করিল। বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর—এই তিনজনের লেখনীর প্রভাবে সেই যুগে 'বন্দেমাতরম্' সমগ্র ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরাজী দৈনিক পত্র বলিয়া গৌরব অর্জন করিয়াছিল। একবার 'বন্দেমাতরমের' কোনো এক সংখ্যায় শ্যামসুন্দরের লিখিত "The crime of Nationalism" 'শীর্ষক প্রবন্ধটি সমগ্র ভারতে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তে-

জনার সঞ্চার করে এবং সেই বিশেষ প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রিত লক্ষ লক্ষ সংখ্যা সমগ্র দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

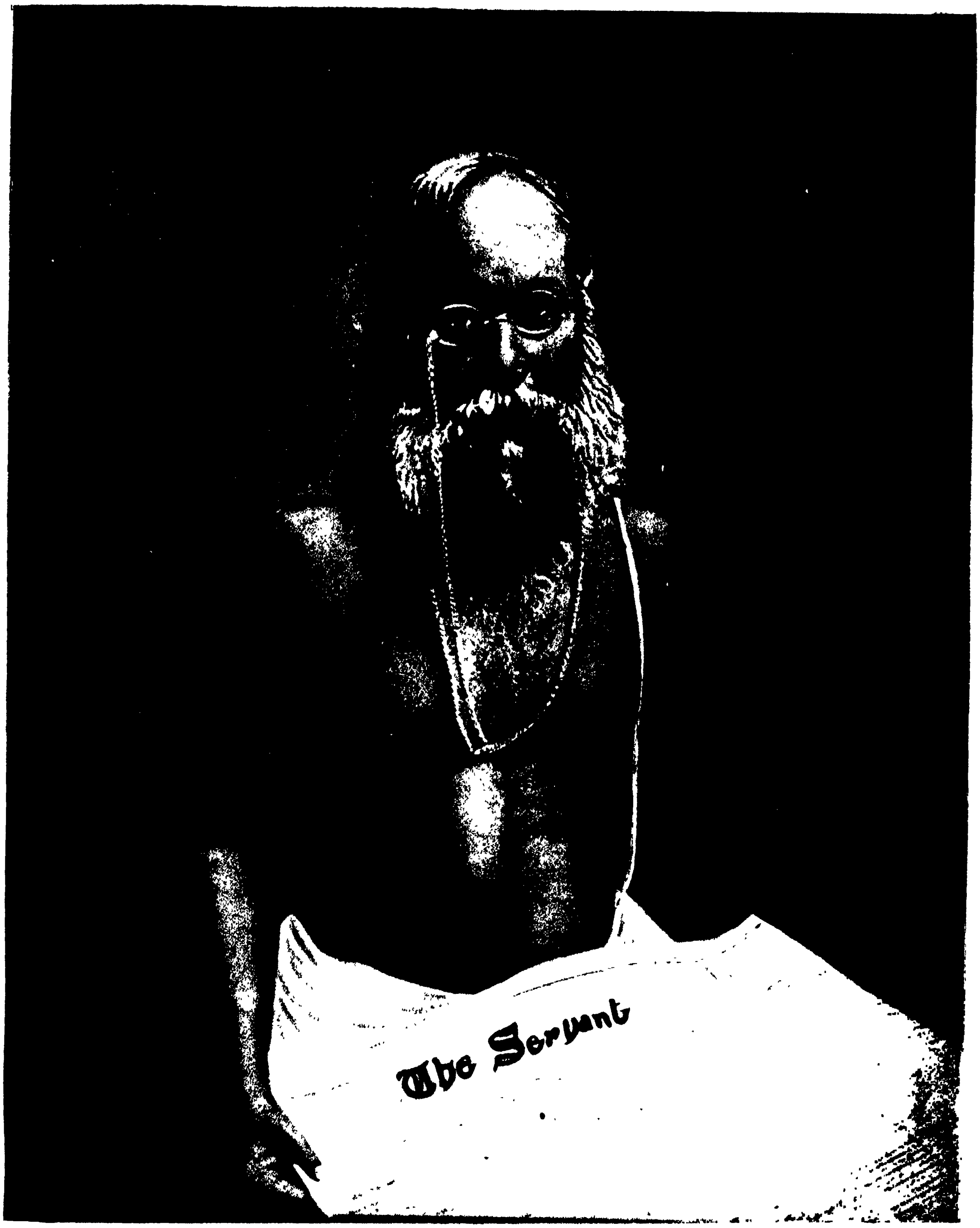
এই সময় হইতে শ্যামসুন্দর যুগপৎ সাংবাদিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নেতা হিসাবে দেশে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। একদিকে 'বন্দেমাতরমের' ভিতর দিয়া শ্যামসুন্দরের নির্ভীক লেখনী, অন্যদিকে তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও আবেগময়ী কণ্ঠস্বর, সমগ্র বাংলার বুকে নবীন উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। তাহার পর আসিল স্বদেশীযুগের সেই চিরস্মরণীয় তারিখ—১৯০৮ সালের ১১ই (অথবা ১২ই) ডিসেম্বর। দেশসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার—নির্ব্বাসন-দণ্ড-লাভ করিবার সর্ব্বপ্রথম সুযোগ যে নয়জন প্রথম পাইলেন, শ্যামসুন্দর তাঁহাদের মধ্যে একজন। সুদূর ব্রহ্মদেশের থ্যায়াঠমো জেলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তিনি হইলেন বন্দী।

দীর্ঘকাল নির্বাসনে থাকিবার পর মিণ্টো-মর্লি শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইবার সময় নির্বাসিত নেতৃবৃন্দ একে একে মুক্তিলাভ করেন। শ্যামসুন্দরও ফিরিয়া আসিলেন। "through sorrows and solitude" নাম দিয়া শ্যাম স্বয়ং রচিলেন শ্যাম-নির্বাসন পালা। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি সেই সময় কিছুকাল অমৃতবাজার পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক মতিলাল ঘোষের বিশেষ অনুরোধে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। এই অস্থায়ী কর্মে তিনি বেশি দিন ছিলেন না। "ন রত্ন মন্বিষ্যতিমৃগ্যতেহি তৎ।" জহরী জহর চিনিয়া লইলেন। দেশ-প্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ডাকিয়া 'বেঙ্গলী' পত্রের সহযোগী সম্পাদক পদে বৃত করেন।

দুই বছর পরে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ভীমনাদে শঙ্কিত পৃথিবী মাতিয়া উঠিল। ভারত গবর্ণমেণ্টের বিস্ফারিত দৃষ্টি পড়িল বাংলার "তথা-কথিত" বিপ্লবী দলের উপর। ভারতরক্ষা আইনে শ্যামসুন্দরকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কালিম্পঙ্-এ আটক রাখা হয়। কালিম্পঙ্-এ তিনি তিন বৎসর অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। ১৯২০ সালে আটক অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্যামসুন্দর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সমগ্র দেশ সেদিন নির্য্যাতিত এই জননায়ককে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল।

ইহার পর শ্যামসুন্দরের জীবনের আর এক অধ্যায় সুরু হয়। 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকার পত্রে পত্রে তাঁহার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ, এই 'সার্ভেণ্ট' ছিল তাঁহার পরিণত বয়সের প্রিয় সন্তান—আদর্শবাদী শ্যামসুন্দরের তেজস্বিতার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়, অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে এই 'সার্ভেণ্ট' পত্রিকায়। 'সার্ভেণ্টের' মধ্য দিয়াই একক শ্যামসুন্দর সেদিন মহাত্মা গান্ধীর নবীন আদর্শবাদ সারা বাংলায় প্রথম প্রচার করেন। যে কয় বৎসর এই পত্রিকা বাঁচিয়াছিল, ততদিন ইহা আকুমারীহিমাচল ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল। এই পত্রিকার সম্পাদনার সময় শ্যামসুন্দরের ছয়মাস কারাদণ্ড হয়। সেই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে শ্যামসুন্দর বাংলার সর্ব্বজনপ্রিয় জননায়ক হিসাবে যে শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের মূল্যবান পুরস্কার।

ইহার পরের কাহিনী বেদনাময়। অসহযোগী শ্যামসুন্দর স্বরাজ্যদলের নীতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। দল-নিরপেক্ষতা এবং বিবেক-স্বাধীনতাই তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সম্মান। শেষ বয়সে মিসমেয়োর অখ্যাত পুস্তক "Slaves of the Gods"এর প্রত্যুত্তরে শ্যামসুন্দর "My Mothers Picture" নামে একখানি সুপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। হিন্দুর সংস্কৃতি ও সাধনার মর্মকথা এমন নিপুণভাবে খুব কম পুস্তকেই লিপিবদ্ধ আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আদর্শবাদীর দুঃখ অনেক। "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহ" শ্যামসুন্দরের পূত জীবনের শেষ অধ্যায়ে ছিল জনজাগরণের প্রকৃষ্ট উপায়—ধর্মভাব-উদ্দীপনের বিবৃতি। শ্যামসুন্দর সাজিলেন "অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর"। নদীয়ার প্রেমাবতারের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাম-প্রেম বিলাইতে লাগিলেন লোকের দ্বারে দ্বারে। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা সেই মহাপুরুষকে পুরস্কার দিলাম—'পেলেগ্রা' নামক যথোচিত-আহারাভাব—ঘটিত রোগ। ভগবান তাঁহাকে হস্ত প্রসারণ করিয়া লইয়া গেলেন সেই আনন্দধামে—যেখানে নাই রাজনৈতিক দ্বেষ—দলাদলিজনিত বাগ্‌বিতণ্ডা এবং পরাইয়া দিলেন শিরে শতযুদ্ধ-জয়ীর রাজমুকুট।



পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ধ্বংসেতে লভ নূতন জীবন, নাহিক তোমার লয়,
ক্ষয়ের মাঝারে অক্ষয় তুমি বিশ্ববিদ্যালয়।
পুণ্যাভিষেক হয়েছে তোমার ভারতের তপোবনে,
তব উজ্জ্বল পরিমণ্ডল বিশ্ব মানব মনে।
তুমি নালন্দা, তুমি 'অল্ অজর,' সারনাথ, ইলিনয়,
নূতন প্রাচীন অতীত ভবিষ্যতের সমন্বয়।
তুমি ফ্রাঙ্কফোর্ট, তুমি মালার্ণো পেডুয়া বলোঙনা
তুমি নটারডেম্ তুমিই ফেরারা যে বলে বলুক না।
সত্যদ্রষ্টা কুলপতি তুমি বিলাও জ্ঞানের বীজ,
তুমিই নদীয়া ভট্টপল্লী অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ।

২

আত্মার মত অবিনশ্বর—নশ্বর তব দেহ
ধ্বংস করেছে, অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম করেছে কেহ।
লুণ্ঠন করি মঠে ও বিহারে করেছে অত্যাচার,
মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ঝরেছে রক্তধার।
পাঠরত কত বিদ্যার্থীর লাঠিতে ভেঙ্গেছে মাথা,
মুদ্গর ঘায়ে রঞ্জিত হল 'মোহমুদ্গর' পাতা।
হল ত্রিপিটক বেদ বেদান্ত রক্তেতে মাখামাখি
হিংসা আসিয়া অহিংস দেশে রাঙা ছাপ গেল রাখি।
কালেতে সকল ধুয়ে মুছে গেল, লুপ্ত রাজ্য রাজ,
নব প্রাণ পেয়ে তুমি যাহা ছিলে তার চেয়ে বড় আজ।

৩

জাতির দ্বন্দ্ব অপরে করুক তাহাতে নাহিক খেদ
বর্ণের গুরু তোমার নাহিক বর্ণের ভেদাভেদ।
জাতি ও যুগের দান গ্রহণেতে হয় না ক তব হানি
তুমি নিখিলের নিকষ কুলীন—যদিও অগ্রদানী।
তুমি বৈষ্ণব বিশ্বের দ্বারে করিতেছ মাধুকরী
তুমি দরবেশ জমজম বারি আনো করঙ্ক ভরি।
তুমি রঘুরাজা চলেছে তোমার যজ্ঞ বিশ্বজিৎ
ভবিষ্যতের রামরাজ্যের তুমিই পাতিছ ভিত।
জ্ঞানের আলোক, ধ্যানের আলোক, জ্বেলে রাখো নিশিদিন
তুমি নৈষ্ঠিক অগ্নিহোত্রী—ভেষ্টাল ভার্জ্জিন।

৪

জগৎ জুড়িয়া আনিছ মৈত্রী সাম্য ও স্বাধীনতা
পৃথিবীর সব জাতির সহিত তোমার কুটুম্বিতা।
সিজারের চেয়ে তুমিই বৃহৎ জগৎ করিলে জয়
তোমার রাজ্য অশোক-রাজ্য চেয়ে গৌরবময়।
তুমি চেঙ্গিস, তুমি তৈমুর লুটিছ ভুবন সব—
জ্ঞানভাণ্ডারে আনো সঞ্চয় বিশ্বের বৈভব।
কলম্বসের মতন নূতন ভুবন জানিতে সাধ,
কল্পনালোকে কর সদাগরী বণিক সিন্ধুবাদ।
মার্কণ্ডেয় সম পরমায়ু তুমিই করেছ লাভ,
অনাগত মহাকালের সহিত স্থাপিয়াছ সদ্ভাব।

৫

তান্ত্রিক সাথে সুফী ফুঙ্গিরে করিছ আমন্ত্রণ
তোমার লাগিয়া বহে আনে লামা টাসিলাম্পুর ধন।
কোলাকুলি করে নান্নুর শিরাজ রোম ও উজ্জয়িনী
এভনের সাথে সিপ্রা মিশিছে উঠিছে কলধ্বনি।
প্রাচী প্রতীচ্যে একাসনে বসি চলিয়াছে আলাপন
নাৎসী ইহুদী বিভোর হইয়া শুনিতেছে কীর্ত্তন।
বিপুল বসুধা এক হয়ে তব লভিতেছে অবদান
সে অর্দ্ধ-নর-নারীশ্বরের করি আমি জয়গান।
গোপনে গড়িছ জীবন এবং ভুবন মহত্তর
উর্জ্জ্বল সুমেরু শিখরে রাজিছে তোমার ঘর।

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভোর না হ'তেই ওঠে কলরব ; রূপকথার প্রেতপুরীতে যেন হঠাৎ যুদ্ধের বাঁশী বেজে ওঠে। অবসন্ন পৃথিবীর বুক থেকে তখনও ঘুমের পর্দ্দা সরে না ; তন্দ্রাতুর বাতাসের সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গনের মাদকতা। শীতার্ত্ত কম্পনের মত ঝির্ ঝির্ শব্দে ভেসে আসে অসংখ্য নিঃস্বের অস্ফুট করুণ আর্ত্তনাদ। মাঝে মাঝে সবল কণ্ঠের চীৎকার, আর সেই সঙ্গে ভাঙা টবের বাক্সগুলোর খট্‌খট্ শব্দ চাবুক মেরে জড়তাচ্ছন্ন মনটাকে সচেতন ক'রে তোলে।

ওদের কণ্ঠস্বরে যেন মরচে ধ'রে গেছে। একঘেয়ে কান্নায় এমন একটু ধারও নেই, যাতে ক'রে মানুষের বুকে এতটুকু করুণার স্পর্শ পৌছে দিতে পারে। আকাশে ওর প্রতিধ্বনি হয় না। বেসুরা পর্দ্দার এলোমেলো শব্দে শুধু ভোরের বাতাসটাকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। ছিঁচ-কাঁদুনে ছেলের মত রাতদিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে ওরা যেন সত্যিকারের কান্না ভুলে গেছে। টবের গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে এক একটী সুর আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায়। ভোর চারটে থেকে সুরু হয়েছে, পাঁচটা বাজবার আগেই সমাপ্ত হ'য়ে গেল ওদের উদ্যোগ-পর্ব্ব। আর কান্না নেই, শব্দ নেই ; কোলাহল থেমে আসে। এ পাশের ঘরগুলোয় বোধ হয় তখনও কেউ জাগেনি। আবার তেমনি নিঝুম হয়ে পড়ে সারা বস্তিটা। হাল্‌কা ঘুমের আবেশটুকু দেখতে ঘন হয় চোখের পাতায়।

বস্তির এ পাশের ঘরগুলোয় থাকে ভাড়াটেরা, ও পাশের লম্বা চালাঘরগুলো ঠিকে ভিখিরীদের আড্ডা। শেষ দিকের বড় দুখানা ঘরে থাকে মাণিক পেয়াদা, পদ্ম আর রাধা বোষ্টুমী। মাণিক ভিখিরীদের পোষে। পদ্ম ওদের রাঁধুনী। রাধি বোষ্টুমী মাণিকের রক্ষিতা। এ ছাড়া আরও দু-একজন আছে, যারা মাণিক পেয়াদার কেনা-গোলাম। পেটভাতায় তাঁবেদারি করে।

'গন্নাকাটা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটার নাম পদ্ম। গায়ের রং কালো, কিন্তু দেহের গঠন ওর সত্যি ভালো। তা হ'লে কি হয়, মেয়েটা যেন অগ্নিচক্রের ঘুরন্ত নাটাই। সারা বস্তিটায় না হবে ত একশো পাক দেয় রাতদিনের ভিতর। ভাঙা কাঁসরের মত ওর গলার ট্যাঁক-টেঁকে আওয়াজ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিধ্বনিত হয় এর ঘর থেকে সে ঘরে। মাণিকের আড্ডায় প্রায় চল্লিশজন নুলো ভিখিরী আছে। পদ্ম তাদের ভাত রাঁধে, আর অবসর সময়ে টহল দিয়ে বেড়ায় ভাড়াটেদের ঘরে ঘরে। এলিজাবেথ মারবারির মতই যেন ওর অখণ্ড প্রতাপ একদল যাযাবরের ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে আছে। অন্যান্য মেয়েরা ওকে দস্তরমত ভয় করে। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ওপরেই ওর তোক বেশী।

রাত না পোহাতেই মাণিকের লোকেরা নুলো ভিখিরী-গুলোকে রাস্তায় রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে আসে ; আবার তাদের ফিরিয়ে আনে রাতের অন্ধকারে, যখন পথে লোক চলাচল কমে যায়। সারাটা দিন রোদবৃষ্টি মাথায় ক'রে পথে পথে কেঁদে ওরা যা রোজগার করে, তার পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত জমা দিতে হয় মাণিকের আখড়ায়। সে জোগায় ওদের দিনান্তের দু মুঠো ভাত, আর পরণের একফালি জীর্ণ বস্ত্র।

অতসীদের বস্তিতেই সত্যেন নিয়েছে ছোট একখানি ঘর, দৈনিক ছ পয়সা ভাড়ায়। সত্যেন ভাড়া নিয়েছে, তা ঠিক নয় ; অতসীই জোর ক'রে আট্‌কে রেখেছে তাকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কঠিন ব্যামো ধরবে সেই ভয়ে। সে চায়নি ওদের এই বস্তিতে আশ্রয় নিতে। অতসীর অযাচিত দরদ পলে পলে দিয়েছে বাধা ওর দুরন্ত মনের গতিকে।

ওই ভিখিরী মেয়েটার দাবীকে অবহেলা করতে ওর সাহস হয় না, মনটা কেমন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। অথচ উৎপীড়িত বন্দীর মত সারা মন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। ওর সব চেয়ে বড় দুঃখ এইখানে যে, অতসীকে ও কোনরকমেই বোঝাতে পারে না—এ বস্তির চেয়ে পথ ওর কাছে কত বড়। আকাশের বুক থেকে যে গ্রহ ঠিক্‌রে পড়েছে, মাটির বুকে সে চায় না আশ্রয়; তার চেয়ে মহাসাগরের অতল গহ্বরে সে মিলিয়ে যেতে চায়। কল্পান্তের স্রোতে বুদ্‌বুদের মত যারা ভেসে চলেছে, কে রাখে তাদের হিসাব! সত্যেনও ঠিক তেমনি করেই মিলিয়ে যেত পথের ওই প্রবহমান জনস্রোতে, লোকচক্ষের অন্তরালে।

কেরোসিন কাঠের ফ্রেমে ক্যানিস্তারের টিন-আঁটা দরজাটা বাতাসের ছোঁয়াতেই যেন খন্‌খন্‌ করে। ওপরের ফাঁকগুলো দিয়ে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ভিতর।

সত্যেনের চোখে ঘুম একটী মুহূর্ত্তের জন্যেও নামে না। মাঝে মাঝে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয় ওর অবসন্ন দেহমন।

দরজাটায় টোকা দিয়ে অতসী ডাকে—"দীনু!"

তন্দ্রা টুটে যায়। সত্যেন উঠে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সর্ব্বাঙ্গে যেন পাষাণ চাপানো; ব্যথায় হাত-পা জড় হ'য়ে গেছে; কপালের ঘা-টা উঠেছে আওরে। হয় ত জ্বরও হয়েছে।

দরজাটা খোলাই ছিল। চাপা গলার অস্পষ্ট শব্দে অতসীর বুঝ্‌তে দেরী হ'ল না যে আজ আর দীনুর উঠবার শক্তি নেই। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে এসে একবার সে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল ওর বিছানার পাশে। ছেঁড়া একখানা মাদুর, আর অতসীর ব্যবহার করা কতকালের পুরান সেই ময়লা বালিসটা! নির্ব্বিকারভাবে সত্যেন সর্ব্বাঙ্গ ঢেলে দিয়েছে ওই জীর্ণ শয্যায়। পৃথিবীর কোলে এমন ক'রে যেন কতকাল ও নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। বিছানাটার দিকে চেয়ে অতসী নিজেই লজ্জিত হ'য়ে পড়ে। ওকে শুতে দেবার মত আজ একখানা কম্বল, একটা ফর্সা বালিসও যদি থাকৃত ওর!

—"কে, অতসী!"—সত্যেন ব্যথিত দৃষ্টিতে চায়।

"শরীর কি আজ ভাল নেই দীনু?"—বলতে বলতে অতসী ব'সে পড়ল মাদুরখানার একটী পাশে।—"এ যে জ্বর! গায়ে আগুন ছুটছে।"

"ও কিছু নয়। ক'দিন ঠাণ্ডা লেগেছে কি-না, তাই।" —হাতের তেলোতে মাথাটা রেখে কনুই ভর ক'রে সত্যেন একটু আড় হ'য়ে বসল।

অতসী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চায়, ভাবতে পারে না—কি করবে! কাল্‌কের সঞ্চয় ওর কালই হয়েছে শেষ। আবার নতুন দিনের সূর্য্য উঠেছে আগামী দিনান্তের আসন্ন হাহাকার নিয়ে। একমুঠো চাল আর কয়েকটা আধলার জন্যে অন্ধ বাপের হাত ধ'রে এখনি সুরু হবে ওর নিরুদ্দেশের খেয়া।

অতসীকে নীরব দেখে সত্যেন হেসে বলে—"কি ভাবছ অমন ক'রে? ভিক্ষেয় যাবে না!"

"সারাটা দিন একলা থাক্‌বে তুমি?"—অন্য কি বলতে গিয়ে হঠাৎ কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে অতসী আবার বলল—"আজ আর চাকরির খোঁজে বেরিও না যেন, অত জ্বরে—"

"না, বেরুব না। তা ছাড়া, চাকরিই বা দেবে কে? কাল যেটা সম্ভব মনে হয়েছে, আজ ভাবতে গেলে সেটা বিকার ব'লে মনে হয়। পদ্মায় যখন ভাঙন ধরে, তখন বাঁশের পিন দিয়ে তার গতিরোধ করবার চেষ্টা করতে সত্যি লজ্জা করে।"—সত্যেন হাসে, অদ্ভুত রকমের একটা বিচ্ছিন্ন হাসি।

অতসী কোন জবাব দেয় না। হয়ত সত্যেনের কথাগুলো ও সব সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না; না-হয়, অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবে।

আপনমনে সত্যেন আবার বলে, অজিজ্ঞাসিত প্রলাপ কাহিনীর মতই ওর কথাগুলো যেন স্রোতের মুখে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে।—"কাল গিয়েছিলাম পটলডাঙ্গার একটা মেসে, বাসন-মাজা চাকরের কাজ খুঁজতে। খালি ছিল একটা। কিন্তু নিতে চায় না ওরা। সবাই বলে 'স্পাই'। সত্যি ত! অন্য কিছু ভাবতে পারে না ওরা। কেন ভাববে? এ ছাড়া যে আর কিছু তাদের মগজে জোগায় নি, সেইটাই ভাগ্য অতসী, সেইটাই সৌভাগ্য আমার।"

অতসী বোঝে না স্পাই কাকে বলে। বোকার মত সত্যেনের মুখপানে চেয়ে সে বলে, "গরীবদের সবাই গালাগাল দেয়; তাই ব'লে কি মান ক'রে ব'সে থাকা চলে!"

সত্যেন হো হো শব্দে না হেসে পারে না;—"গালাগাল নয়, ইজ্জৎ! স্পাই কাকে বলে জানো! যারা গোয়েন্দার খবরদারি করে।"

"ওঃ"—ব'লে অতসী উঠে দাঁড়াল। ওর বাবা তাগিদ সুরু করছে। পদ্ম এর ভিতর তিনবার এসে উঁকি দিয়ে গেছে দীনুর ঘরে। ওই গন্নাকাটা মেয়েটাকে অতসীও কম ভয় করে না।

দু'পা এগিয়ে এসে অতসী কি ভেবে আবার পিছিয়ে গেল। একটু ইতস্তত ক'রে হঠাৎ ব'লে ফেলল—"পালিয়ে যাবে না ত দীনু?"

কথাটা বলবার আগে যে সঙ্কোচ ওকে বাধা দিচ্ছিল, বলবার পর যেন সেটা আড়ষ্ট ক'রে তুলল আরও বেশী।

– "না।" সত্যেনের চোখেমুখে কেমন একটা ভাবান্তর।

অতসী শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ওর মনে হয় দীনুর মাথার গোলমাল হয়েছে।

—"তুমি যে এখানে থাক্‌তে পারবে না, তা জানি। আর কেনই বা থাক্‌বে? ভিখিরীদের বস্তিতে জোর ক'রে তোমায় রাখব না আট্‌কে। তবুও যে ক'টা দিন আছ তাই খুব। একটা কাজের জোগাড় হ'লে ভাল দেখে জায়গা খুঁজে নিও; তখন আর যাব না বিরক্ত করতে।"

সত্যেন আস্তে আস্তে কপালটায় হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইল। অতসীকে কি ব'লে বোঝাবে ওর মনের কথা, তা ভেবে পায় না। অশিক্ষিতা ভিখিরীর মেয়ে। রাতদিন কেঁদে কেঁদে হাত পাতে ও মানুষের কাছে, কিন্তু ওর বুকে যে উদ্‌গ্রীব দেবতা রাত্রিদিন একান্তে জেগে আছে—সে চায় শুধু মুঠো মুঠো ক'রে ওর সেই মুষ্টি ভিক্ষার অন্ন বিলিয়ে দিতে।

"দাঁড়িয়ে রইলে যে! বেলা কম হয়নি। এর পর দুপুর রোদে কত ঘুরবে পাড়ায় পাড়ায়?"—সুস্থ স্বাভাবিক কণ্ঠে সত্যেন অতসীকে বিদায় দেয়।

কিন্তু অতসীর মুখে যেন কেমন একটা ভয়। মনের দ্বিধাটুকু সে কোন মতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। সত্যেনের মুখপানে চেয়ে আবার সসঙ্কোচে বলে, "দিনের-বেলায় রান্না করতে পারি না। দু'মুঠো চাল যদি থাকত, দোকানে বদল দিয়ে চাট্টি মুড়িমুড়কি এনে দিতাম। সারাদিন না খেয়ে তোমার খুব কষ্ট হবে আজও। শরীর ত তাজা নেই।"

"কোন কষ্টই হবে না অতসী। তোমায় ত বলেছি, কষ্ট আমার হয় না আর। আগে হ'ত খেতে না পেলে কষ্ট; কিন্তু এখন বেশ স'য়ে গেছে। এখন বরং খাবার পেলেই কষ্ট হয় বেশী। ওদের বঞ্চিত ক'রে নিজের পেটটা ভরাতে চোখে জল আসে। না খেতে পাওয়ার কথা আর ভাবি না। আমি ভাবি—"

"কি ভাব তুমি?"—অতসী তটস্থ হ'য়ে ওঠে। হয় ত দীনু হঠাৎ ব'লে ফেল্‌বে সেই কথা, যা ও প্রতিনিয়ত আশঙ্কা করে। তবুও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস্ করে, "থাম্‌লে যে! বল না, বল কি ভাব তুমি?"

"কিছু না।"—একটা দীর্ঘশ্বাসে সত্যেনের অনাহারক্লিষ্ট শরীরটা যেন কেঁপে ওঠে।

"কিছু না, নয়। জানি কি বলতে চাও তুমি। আমাকে ভুল বুঝ না।" অতসী নীরব হ'য়ে যায়। ওর চোখদুটো যেন চক্‌চক্ করে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে, "আচ্ছা দীনু, আমরা ভিখিরী ব'লে এখানে থাক্‌তে তোমার ঘেন্না হয়?"

"অতসী!" সত্যেনের কণ্ঠস্বরে কান্নার আবেগ; মুখখানা লোহার কাঠামোর মত শক্ত।

অতসী চম্‌কে ওঠে। এমন স্বর ও সত্যেনের কথায় কোন দিন শোনে নি। কথাটা ব'লে ফেলে ও যে অন্যায় করেছে, সেটা বুঝ্‌তে অতসীর দেরী হ'ল না। একটু থতমত ক'রে লজ্জিত হ'য়ে বল্‌ল, "আমি আর কিছু ভেবে বলি নি। শুধু আমরা নই; এখানকার সবাই পথভিখিরী। তাই বলছিলাম—হয় ত এখানে থাক্‌তে তোমার কেমন মনে হ'তে পারে।"

সত্যেন ততক্ষণে সাময়িক আবেগটুকু সাম্‌লে নিয়েছে। এবার শান্ত স্বাভাবিক সুরে উত্তর দিল, "এত বড় দুনিয়ায় দীনুর জায়গা যে কোথায়, তা কেমন ক'রে বুঝবে অতসী। ভিখিরীদের কুঁড়েতে যেটুকু জায়গা আছে, সেটুকু দুনিয়াতেও নেই। ঘেন্না আমার হয় না, হয় লজ্জা। সুস্থ দেহে ভিক্ষান্নের ভাগ নিতে পারছি না আর।"

অতসী আবার সরে' এসে বসল ওর পাশে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত নিবিড় হ'য়ে।—"ভিক্ষে তোমায় করতে

হবে না। আমি পাঁচবাড়ী ফিরে যা রোজগার করি, তাতে তোমারও জুটবে এক মুঠো। না হয় আগের চেয়ে দু বাড়ী বেশী ক'রে ঘুরব। ক'দিনই বা! শরীরটা সেরে উঠ্‌লে, আজ না হোক, দু'দিন পরেও ত জুটবে একটা কিছু।"

হাসিও পায়, কান্নাও আসে। ওর বিশ্বাস, পুরুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সুনিশ্চিত কল্পনা দেখে সত্যেন না হেসে পারে না। অতসীর পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বলে, "তাই হবে। এখন ভিক্ষেয় যাও।"

নিশ্চল দারুমূর্ত্তির মত ব'সে অতসী ভাবে। পাশের ঘর থেকে ওর বাবা তাগিদ দিচ্ছে। এতবেলা অবধি বোষ্টুমির ঘরখানায় ঝাঁট দেওয়া হয় নি ব'লে সে চীৎকার ক'রে গালাগালি করে পদ্মকে। ওদিকের চাতালে মাণিক পেয়াদার তর্জ্জন শোনা যায়—ভিক্ষের পয়সা গোপন ক'রে মুড়ি কিনে খেয়েছিল ব'লে একটা খোঁড়া ভিখিরীকে শাস্তি দিচ্ছে সে। চাপা কান্নার শব্দে বস্তির ঘরে ঘরে যেন দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি হয়।

আস্তে আস্তে দরজাটা টেনে দিয়ে অতসী আবার বলে—"পালিও না কিন্তু।"

বাইরে পা বাড়াতেই ও আঁৎকে উঠ্‌ল পদ্মকে দেখে। ওপরের কাটা-ঠোঁটখানা চাপা হাসিতে বক্র ক'রে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অতসীর দিকে চেয়ে সে ব'লে, "কি লো অতসী! ভিখ্‌ মাগা বন্ধ করলি না কি?"

অতসী কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে' গেল, কিন্তু আশঙ্কায় বুকখানা তার কেঁপে উঠল আজ। পদ্মর স্বরূপ ও খুব ভালভাবেই জানে। ওই হাসিটুকু ছাপিয়ে ও বেলায় ফেনিয়ে উঠ্‌বে সাগরের মত বিষের ঢেউ।

* * * *

জনবিরল বস্তিতে কর্ম্মহীন মধ্যাহ্ন যেন ঝাঁ ঝাঁ করে। সেই হুলো ভিখিরীটা, পদ্ম, আর মাঝে মাঝে রাধি বোষ্টুমি ছাড়া আর কারও কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। একটা ঘেঁকি কুকুর মস্ত জিভ্‌ বের ক'রে অকারণ হাঁপিয়ে বেড়ায় এঘর থেকে সে-ঘরের দরজায়। টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জল ঝরে ওর লোলুপ জিভ্‌টা ব'য়ে।

সত্যেন তেমনি গুটিশুটি দিয়ে জড়পদার্থের মত পড়ে থাকে বিছানায়। ভাল ওর লাগে না আর, এমন কি বাঁচতে পর্য্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়। সেই কবে থেকে সুরু করেছে, তিরিশ বছর আগেকার কোন এক অভিনন্দিত প্রাতঃসূর্য্য ওকে পৃথিবীর পথে ভগীরথের মত বরণ ক'রে এনেছিল। সেই থেকে দিনের পর দিন রাতের পর রাত বেঁচেই চলেছে। এ বাঁচার যেন বিরাম নেই আর। অতদিনে পুরান একঘেয়ে সেই জীবনের বোঝা মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলেছে সে সীমাহীন পথে, যেখানে পদে পদে শাণিত কণ্টকের বাধা। এক পা এগিয়ে যেতে ওর গতি পিছিয়ে এসেছে দশ বার।

মস্তিষ্কটা শুকিয়ে যেন পাথরের মত জমাট বেঁধে গেছে। দেহের শিরা-উপশিরায় কেমন একটা টন্‌টনানি; মনে হয় চড়া সুরে বাঁধা পাকখাওয়া তারের মত একটু ছোঁয়া পেলেই সবগুলো একসঙ্গে ছিঁড়ে যাবে।

ভাবনার সূত্রে দেখতে দেখতে জট পাকিয়ে যায়। দেয়ালের টিকটিকি দুটোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন দৃষ্টিটা ঝাপসা হ'য়ে আসে; চিন্তার বিক্ষুব্ধ স্রোতে উদ্বেলিত মনটা সহসা অন্তরীক্ষের শূন্যতায় ভ'রে ওঠে।

সকাল থেকে না হবে ত সাতবার পদ্ম ওর ঘরে উঁকি দিয়ে গেছে। কেমন একটা উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার চোখে। সত্যেন দেখেও দেখে না; ইচ্ছা ক'রেই তার চোখ থেকে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখতে চায়। তবুও মাঝে মাঝে ওর চোখে চোখ প'ড়ে যায়। অবিকল সুরেখার মত চাউনি। নিভৃত আলাপের অবসরে এক একবার সুরেখার চোখে যেমন ধক্‌-ধক্‌ ক'রে উঠত কিসের আগুন, ঠিক তেমনি একটা উদগ্র শিখা জ্বলে ওঠে ওই গন্নাকাটা মেয়েটার চোখে। সত্যেনের ভয় হয়; চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

"অতসী তোমাদের আপনার লোক বুঝি?"

সত্যেন চম্‌কে ওঠে। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পদ্ম। ঠোঁটের আগায় বাসি ফুলের মত মরা-মরা এক টুক্‌রো হাসি। পদ্মকে ওর ভাল লাগে না। কেমন একটা অস্বস্তিতে সত্যেন হাঁপিয়ে পড়ে। একবার মনে হয় নিঃশব্দে গুটিশুটি হ'য়ে প'ড়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে নতুন ক'রে আলাপ করবার প্রবৃত্তি ওর নেই আর। কিন্তু সংস্কারে বাধে।

অযাচিত হ'লেও মেয়েদের প্রশ্ন উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু ভাবতেও পারে না কি উত্তর দেবে সে ওই অপরিচিতা মেয়েটির নিরর্থক জিজ্ঞাসার!

একটু ইতস্তত ক'রে সত্যেন হঠাৎ ব'লে ফেলে, "হাঁ, আত্মীয়।"

পদ্মর মুখেচোখে ফুটে ওঠে তীব্র একটা হাসি। ঠিক অবিশ্বাসের হাসি নয়, অথচ বিশ্বাসের সমতাও যেন নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টায় সত্যেন পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করতেই পদ্ম আবার জিজ্ঞেস্ করে, "ভাড়া নিয়েছ বুঝি, ঘরখানা?"

মনটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। ভাড়া! হাঁ, ভাড়াই ত নিয়েছে। এবার আর কোন উত্তর দেওয়া হয় না। ভাড়ার কথা ভাবতে সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। মাথাটা আবার কেমন গুলিয়ে যায়।—অতসী ভিক্ষে করে। সারাটা দিনের প্রাণান্ত চীৎকারে দুমুঠো চাল আর কয়েকটা পয়সা কুড়িয়ে আনে লোকের বাড়ী বাড়ী ফিরে। দুটি লোকের এক বেলার সংস্থান হয় কোন রকমে; তাও নিতান্ত কায়ক্লেশে। তার ওপর রোজ ছ'পয়সা হিসাবে দুখানা ঘরের ভাড়া।

অতসীর অতিথি হ'য়ে থাক্‌তে ওর সঙ্কোচ নেই এতটুকুও। ও-ও ত ভিখিরী এখন। ভিখিরীর আবার মান-ইজ্জৎ কি! কিন্তু কেমন ক'রে অতসী জোগাবে ওর খরচ! প্রতি মুহূর্ত্তে দুর্ব্বার দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ওই গরীব মেয়েটা যে কেমন ক'রে আজ তিন দিন ধ'রে দিচ্ছে দু'খানা ঘরের ভাড়া, সে কথা সত্যেন ভেবে উঠ্‌তে পারে না। রোজ সন্ধ্যাবেলা দারোয়ান এসে যখন চোখ রাঙিয়ে ভিখিরীদের ঘরে ঘরে আদায় ক'রে বেড়ায় ভাড়া, তখন ত কই আসে না সে একটী দিনের জন্তেও ওর ঘরে। হয় ত অতসী দেয়, হয় ত কেন, নিশ্চয়ই দেয় সে মিটিয়ে।

সত্যেনকে নীরব দেখে পদ্ম বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। মাথা ঝাঁকিয়ে একবার ভিজে চুলের গোছা পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে, "নেশা কর নাকি?"

সে কথার উত্তর আর দিতে হয় না। সত্যেন বেঁচে যায়। মুখখানা হাঁড়ির মত ক'রে পদ্ম আপন মনে গজ্‌গজ্ করতে করতে চলে গেল।

পদ্মর ধারাল দৃষ্টি যে দীনুর মনের ভিতর পৌঁছয় না, তা ঠিক নয়। কিন্তু দেহমন আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে এমন একটা দুর্ভেদ্য অন্যমনস্কতায় যে, নতুন ক'রে পৃথিবীর কোন কিছু দেখবার অবকাশ থাকে না ওর।

নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বটাকে সত্যেন নাড়া দিয়ে সচেতন ক'রে তোলে। অতসীকে দেবে সে আজ মুক্তি। দুর্ভাগ্যের বেড়াজালে জড়িয়ে ওর সহজ জীবনটাকে নিয়ে সে পারবে না ছিনিমিনি খেল্‌তে। তড়িৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়িয়ে উঠে সে আগে নিজেকে একটু সাম্‌লে নেয়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেই যেন আজকাল চোখে কেমন ঘোলাটে অন্ধকার ধাঁধিয়ে আসে; মাথার মধ্যে পাকস্থলীর বিস্ফোরণের মতই একটা তীব্র জ্বালা হু হু করে।

'না-না, হয় না; হ'তে দেবে না ও।' খরস্রোতে সত্যেনের মস্তিষ্কে ব'য়ে যায় অসংখ্য সংকল্পের দ্রুত প্রবাহ। দুর্ব্বল মমতার সুযোগ নিয়ে ও তার জীর্ণ নৌকায় কেন চাপাবে নিজের অসহ ভার? ওর প্রায়শ্চিত্তের বোঝা বইতে অতসীর সর্ব্বস্ব ডুবে যাবে অতল অন্ধকারে। ওই অসহায় অন্ধ বাপ;—সম্ভাবনা, ওর জীবনের যা-কিছু সম্ভাবনা—যত কমই হোক না কেন, বাঞ্চাল খেয়ায় টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেসে যাবে নিরুদ্দেশের পথে।

সত্যেন অস্থির হ'য়ে পড়ে। নেশার ঝোঁক কেটে যাবার আগে মানুষ যেমন তার স্তিমিত চেতনাকে মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে সজাগ ক'রে তুলবার চেষ্টা করে, তেমনি ক'রে সে টেনে তুলতে চায় নিজেকে—দুর্ভাগ্যের এই জটীল আবর্ত্ত থেকে।

ঘরের শিকলটা আট্‌কে দিয়ে বেদুঈনের মত সে আবার বেরিয়ে পড়ল। অতসীর অনুনয়, ভিক্ষেয় যাবার আগে তার সেই কাতর শঙ্কিত দৃষ্টি যেন লোহার বেড়ির মত পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে। পা বাড়াতে সত্যেনের চোখে জল আসে। মনে হয়, অতসী তেমনি ক'রে চেয়ে আছে ওর মুখপানে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে যেন বারবার বলে, "পালিও না কিন্তু। সন্ধ্যে না হ'তেই আমি আস্‌বো ফিরে।"

উঠান পার হ'য়ে সত্যেন যখন গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ মুচ্‌কি হেসে পাশ কাটিয়ে গেল পদ্ম। সত্যেন চম্‌কে উঠ্‌ল। কয়েক পা এগিয়েই সে আবার ঘাড়

বাঁকিয়ে ওর দিকে চেয়ে তেমনি হেসে বলে, "কোথায় চল্‌লে দীনু ? অতসী যে মরবে কেঁদে।"

এবারও সত্যেন জবাব দিতে পারে না। কিম্বা হয় ত চলে না ওই কেমনতর কথাগুলোর জবাব দেওয়া।—কিন্তু পদ্ম ওর নাম জানল কেমন ক'রে! অতসী ত ডাকেনি কখনও ওদের সাম্‌নে ওই নাম ধ'রে।

সত্যেন এগিয়ে চলে।

* * * *

শন্ শন্ ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার ক'রে জমেছে মেঘ। এখুনি হয়ত নাম্‌বে বৃষ্টি। ঘূর্ণী বাতাসে পথের ধুলো উড়ে ঝাপ্‌টা দেয় চোখে। সাম্‌নের দিকে দৃষ্টি চলে না।

রাস্তার মোড়ে নুলো আর অন্ধ ভিখিরীগুলো তখনও ব'সে চীৎকার করে। আসন্ন দুর্য্যোগের ক্ষিপ্রতায় পথস্রোত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু ওদের কান্নায় চঞ্চলতার লেশমাত্র প্রতিধ্বনি হয় না।

স্থবির এক বুড়ী, অন্ধ, ছোট্ট একটী মেয়ের হাত ধ'রে তখনও ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে এগিয়ে চলেছে ভিক্ষে চেয়ে—"আজ একাদশী। অন্ধ অনাথাকে দাও একটী পয়সা—"

ছোট মেয়েটা সারাদিন ঘুরে ঘুরে এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে থম্‌কে দাঁড়ায়, আর চল্‌তে পারে না। কিন্তু কে বুঝ্‌বে তার সেই ক্লান্তি!

আকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে। সারা পথে ধুলো আর আবর্জ্জনার ধূপ উড়িয়ে বাতাসের মাতামাতি; চোখ খুলে চাওয়া যায় না। পথের দুপাশে দোকানগুলো দেখতে দেখতে বন্ধ হ'য়ে গেল। ফিরিওয়ালারা ঝাঁকা গুটিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গাড়ীবারান্দায়।

বুড়ীটা তখনও চীৎকার ক'রে হাত বাড়ায় একটী পয়সার আশায়। সঙ্গের মেয়েটা কাঁদে।

সত্যেন প্রায় জোর ক'রেই ওদের হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল বড় বাড়ীটার খিলানের নীচে। ঝড় ও বৃষ্টিতে যেন তখন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

* * * *

অতসীকে সে আজ মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু নিজে পায়নি মুক্তি একটী মুহূর্ত্তের জন্যেও। সত্যেন যতই চেষ্টা করে অতসীকে ভুল্‌বার, ততই যেন ওর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

বৃষ্টির চাপ কেটে গেছে; মাঝে মাঝে ইল্‌সে গুঁড়ি ঝরে। রাস্তায় জমেছে একহাঁটু জল। ফুটপাথের ওপরেও যেন ঢেউ খেলে যায় নোংরা জলের। কোথাও এতটুকু জায়গা নেই দাঁড়াবার। বন্যার মত মহানগরীর পঙ্কিল বুক ধুয়ে' নেমেছে বর্ষণের ধারা। যারা পথভিখিরী, পথেই বেঁধেছে জীবনের বাকী দিনগুলোর আস্তানা, তাদের জগতে নিমেষে হ'য়ে গেছে মহাপ্রলয়। কার্ত্তিকের হিমেল হাওয়ায় বুকের পাঁজরাগুলো পর্য্যন্ত ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপে। তার ওপর এই বর্ষা। শতছিন্ন কাপড় দিয়ে উলঙ্গ শরীরটা কোনরকমে ঢাকবার উপায়ও নেই আর; ভিজে শপ্ শপ্ করে। জট-পাকিয়ে-যাওয়া রুক্ষ চুলগুলো ব'য়ে জল ঝ'র্‌ছে। বুকের ভিতর হাত দুটো শক্ত ক'রে চেপেও যেন কাঁপুনির বেগ থামানো যায় না।

পথের ধারে এখানে-সেখানে দু-একটা বাড়ীর রোয়াকে কেঁচোর দলার মত কাঙালের দল ভিড় জমিয়েছে শীতে আড়ষ্ট হয়ে। রাস্তার মোড়ে অন্ধ ভিখিরীগুলো পথ অনুমান করবার চেষ্টায় অকারণ এদিকে সেদিকে হাত বাড়িয়ে ঘুরে মরে। আশ্চর্য্য! এদের দেখে সত্যেনের চোখে আর জল আসে না। বেশ স'য়ে গেছে এদের কান্না। এমনি ক'রেই কাট্‌বে ওদের রাত। আজ আর দিনান্তের সেই একমুঠো ভাতও জুটবে না। শীত গ্রীষ্ম দুই-ই ওদের কাছে সমান হ'য়ে গেছে। তবুও চেষ্টা ক'রবে, হয় ত সারাটা রাত ধ'রেই চেষ্টা ক'রবে একটু আশ্রয় পাবার। মাঝে মাঝে চোখের পাতায় যখন ঘনিয়ে আস্‌বে সারাদিনের ক্লান্তি, তখন পা দুটো যাবে যেখানে-সেখানে থেমে। অতর্কিতে পাহারাওয়ালার সাড়া পেয়ে রাতচোরা ভীরু জানোয়ার-গুলোর মত হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়বে খানায়।

একটা পানের দোকানের ছাউনির তলায়, এক পাশে দাঁড়িয়ে সত্যেন ভাবে।—অতসী বোধ হয় তখনও ফিরতে পারেনি বাসায়। এই এক-হাঁটু জল ভেঙে কোন্ শহরতলী থেকে ফিরতে হবে আজ কে জানে! অন্ধ বাপের হাত ধ'রে এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আস্‌তে হবে সারাটা পথ।—হ'লই-বা, কি যায় আসে ওর! সত্যেন চেষ্টা ক'রেও এ কথাটা ভাব্‌তে পারে না। অতসীদের পর ভাবতে তার

সত্যি কষ্ট হয়। আজ আর ওদের চেয়ে বেশী আপনার কে-ই-বা আছে ওর? এমন একটা চেনা মুখও বুকের নিভৃত তলায় উঁকি দেয় না, যার কাছে গিয়ে অন্তত একটী মুহূর্ত্তের আশ্রয় চেয়ে নিতে পারে ও নিঃসঙ্কোচে।

তড়িৎ ওরই মত ভেসে গেছে কোন নিরুদ্দেশের পথে। বান্ধবীদের স্মৃতিগুলো পিছনের পথে আলেয়ার মত ভাসে অতীত জীবনের দিক্‌চক্রবালে। সুরেখার স্মৃতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপে ওকে আজ শুধু বিব্রত করে, মাঝে মাঝে বিপন্ন করতেও ছাড়ে না। তাদের সহানুভূতি চাইবার প্রবৃত্তি ওর মনে ভুলবশেও জাগে না একবার।

বৃষ্টিতে ভিজে মাথাটা যেন আরও ভারী হ'য়ে উঠেছে। চোখের পাতায় কেমন একটা ব্যথা। পায়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঝিরঝির করে অবসন্নতা। জ্বরটা বোধহয় এ বেলা বেড়ে উঠেছে।

কাপড়খানার এমন অবস্থাও নেই যে, আঁচল দিয়ে মাথাটা একটু মুছে ফেল্‌তে পারে।—তবুও বেঁচে থাক্‌তে হবে। বাঁচ্‌বার কি অদম্য নেশা মানুষের বুকে! শুধু বাঁচ্‌বার জন্যেই বাঁচ্‌তে চায় তারা, এত ভালবাসে জীবনকে! তাই তিল তিল ক'রে স'য়ে নেয় মৃত্যুর সহস্র লাঞ্ছনা।

—আঁচলে শক্ত কি একটা বাঁধা! চাবি? চাবি! অতসীদের ঘরের চাবিটা ওর আঁচলে বাঁধা। সকালে ভিক্ষেয় বেরুবার আগে অতসী কখন বেঁধে রেখে গেছে চাবিটা! যদি ওদের ঘরে কিছু দরকার হয় ওর। কিম্বা, ওকে আট্‌কে রাখ্‌বার ফন্দিতে—

কি লাভ ওর মত একটা বেকার, একটা ভবঘুরে নিষ্কর্ম্মা ভিখিরীকে আট্‌কে রেখে? ওদের বস্তির সেই হুলোটার যে মূল্য, সেটুকু মূল্যও নেই দীনুর। সেও কাঁদ্‌তে জানে, দশ জনের কাছে হতাশ হ'য়ে অন্তত একজনের কাছে একমুঠো চাল না-হয় একটা আধ্‌লা আদায় করবার ধৈর্য্যও আছে তার।

অতসী! একটা অন্ধ কাঙালের মেয়ে, উদয়াস্ত হাত পেতে বেড়ায় লোকের দুয়ারে দুয়ারে! উপবাসে উপবাসে উই ধ'রে গেছে তার জীবনের মূলে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কোন দিন পেট ভ'রে খেতে পেয়েছে কি-না সে কথা স্মরণ করতেও পারে না সে। তবুও তুলে দেয় হাসি-মুখে তার ভিক্ষালব্ধ অন্নের ভাগ নিজেকে বঞ্চিত ক'রে।

অতসীর সেই অকারণ সঙ্কোচ, অনুনয়-ভরা কাতর দৃষ্টি স্পষ্ট ভেসে ওঠে ওর চোখের সাম্‌নে। সন্ধ্যার এই আকাশের মতই যেন অতসীর প্রকৃতিটা বর্ষণোন্মুখ। ওর অফুরন্ত অনুভূতি তৃষিত মানুষকে ঘিরে অজস্র ধারে ঝরে পড়তে চায়। অতসী কাঁদতে জানে না, তাই নিঃশব্দে ঝরে চোখের জল। দারিদ্র্য ধুয়ে যায় করুণার বন্যায়।

না, না; পারবে না ও অতসীকে অমন নির্ম্মমভাবে আঘাত করতে। তার সেই বিশ্বাসকে চুরমার ক'রে তাকে দেউলিয়া করতে পারবে না! সারাটা দিনের পর এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় ক'রে অতসী ফিরেছে বাড়ী ওর অন্ধ বাপের হাত ধ'রে। নীড়হারা কপোতের মত নিরুপায় হ'য়ে ভিজ্‌ছে দুজনে দাঁড়িয়ে।

রাত্রি তখন বারোটা। সত্যেন অধীর হ'য়ে ওঠে। দ্রুতপদে এগিয়ে চলে অতসীদের বস্তির দিকে।···হঠাৎ কি ভেবে আবার থেমে যায় মাঝপথে। তা হোক্ আজ সে বিজয়ীর মত উপেক্ষা করবে ব্যথিত ধরিত্রীর করুণ ক্রন্দন। ওরা এসেছে, অমনি ক'রে পলে পলে মৃত্যু বুকে মিলিয়ে যাবে ব'লেই এসেছে ওরা পৃথিবীতে। কি লাভ ওদের বেঁচে থেকে? কেন বাঁচবে এই প্রাণহীন কঙ্কালের দল!—অতসী, ওর বাবা, সেই হুলো ভিখিরীটা—আরও কত হাত-পা-কাটা ক্ষুধার্ত্ত অপদেবতা কিলবিল করে ওর চোখের সাম্‌নে। এখুনি বুঝি বিশ্বের শ্বাস রোধ ক'রে তুল্‌বে ওরা।

ওই ওপারের ফুটপাথে একটা পঙ্গু পা টেনে টেনে চলেছে এগিয়ে!

সত্যেনের মাথাটা হঠাৎ যেন বিগ্‌ড়ে গেল আবার। আঁচল থেকে চাবিটা খুলে, ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে—রাস্তার সেই আবর্জ্জনাময় জনস্রোতে।

(ক্রমশঃ)

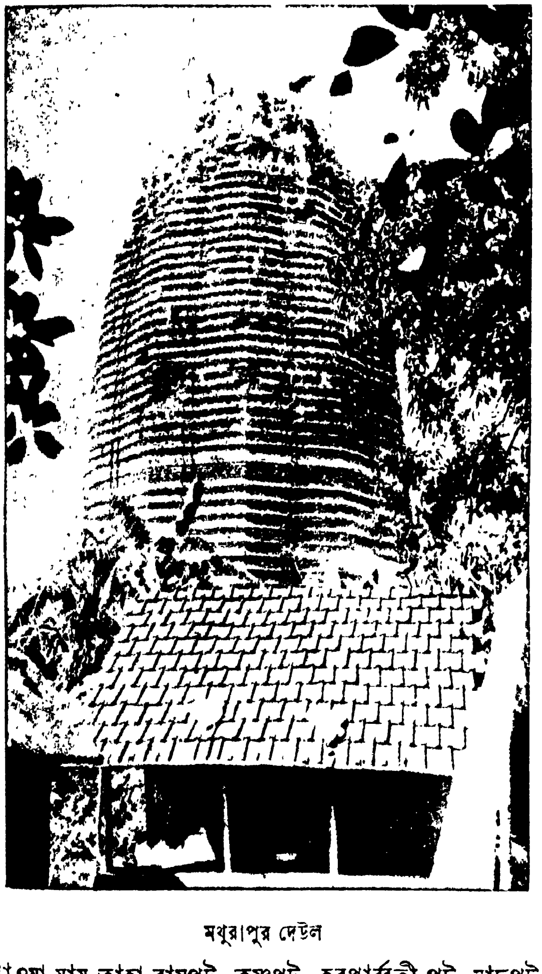
বাংলার পটচিত্র ও পোড়া মাটির ফলক

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(প্রবন্ধ)

বাংলা দেশে 'পট' কথাটির অর্থ একখানি অঙ্কিত চিত্র। এই 'পট' কথা হইতে চলতি বাংলায় 'পটুয়া' কথার প্রচলন হইয়াছে অর্থাৎ যে 'পট' অঙ্কন করে তাহাকে 'পটুয়া' নামে অভিহিত করা হয় এবং বর্ত্তমানে 'পটুয়া' কথাটি শিল্পী শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

এই পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রাবলী যাহা আজও দেখিতে



মথুরাপুর দেউল

পাওয়া যায় তাহা রামপট, কৃষ্ণপট, হরপার্ব্বতী পট, যাদুপট, গাজীর পট, কালীঘাটের পট নামে পরিচিত। পটুয়া ভিন্ন বাংলা দেশে আচার্য্য উপাধিধারী আর একরকম চিত্রকর আছেন যাঁহারা সাধারণতঃ চালচিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। উক্ত সব পটের মধ্যে কালীঘাটের পট ভিন্ন সমস্তই 'জড়ানো পট'। 'জড়ানো পট' দৈর্ঘ্যে দশ হাত হইতে বিশ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং বিস্তৃতি দেড় হাত



পোড়ামাটির ফলক

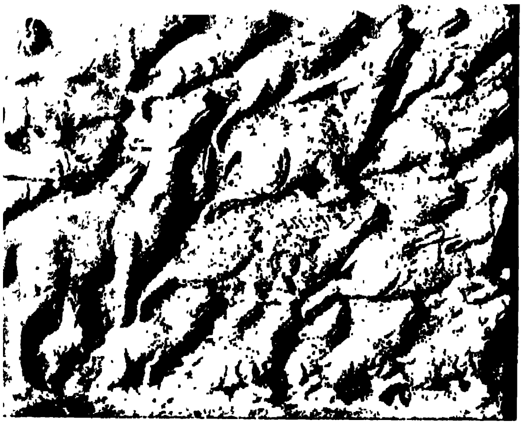
পরিমিত। 'জড়ানো পট' প্রস্তুত করিতে প্রথমে উহার আকার অনুযায়ী একখানি শক্ত বস্ত্রখণ্ড মাটিতে রাখা হয় এবং ঐ বস্ত্রখণ্ডে পাতলা মৃত্তিকার লেপ দেওয়া হয়।



পোড়ামাটির ফলক

ইহার উপর কখনও কাগজ আঁটিয়া কখনও বা খড়ি মাটির সাদা প্রলেপ দিয়া রামলীলা, কৃষ্ণলীলা কিংবা শিব-পার্ব্বতীর

প্রধান প্রধান উপাখ্যানগুলি চিত্রিত করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পটুয়াগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই সব পট পরিবর্ত্তন সময়ে স্বরচিত গান করিয়া চিত্রিত বিষয় জনসাধারণের নিকট বুঝাইয়া দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।



পোড়ামাটির একখানি ফলক —ননী দাসের সংগ্রহ

জড়ানো-পটের পটুয়াগণ দুই শ্রেণীর :—এক শ্রেণীর পটুয়া রামপট, কৃষ্ণপট কিংবা শিবপার্ব্বতীর পটের মত বৃহৎপট অঙ্কিত করিয়া থাকেন এবং অন্য শ্রেণীর পটুয়া যাঁহারা যাদু-পটুয়া নামে খ্যাত তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার পট অঙ্কিত করিয়া থাকেন। বীরভূমের সাঁওতালদের মধ্যে এই যাদুপট এবং পূর্ব্ব বঙ্গে বেদে কিংবা ফকীরদের মধ্যে গাজীর পটের প্রচলন বেশী।

বৃহদাকার জড়ানো-পট যাহাতে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা এবং শিবপার্ব্বতীর উপাখ্যান-ভাগ অঙ্কন করা হইয়া থাকে তাহা দুই ধরণের। ইহার এক ধরণের পট ঝরঝরে এবং ফ্রেস্কো-রীতিতে অঙ্কিত, অন্য ধরণের পট ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অলঙ্কৃত। প্রথমোক্ত ধরণের পটগুলির প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, উহা বৃহৎ ফ্রেস্কো চিত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। এই পটগুলিতে শিল্পীর বক্তব্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট এবং চিত্রাঙ্কণ রীতিতে রেখা ও রঙের সুস্পষ্টতা মূর্ত্তিগুলিকে সহজ ও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মুখ, হাত, পা, দুইটি দীর্ঘরেখার দুইপার্শ্বে তুলি দিয়া রঙের নিটোল টানে অঙ্কিত এবং এইরূপ সাহসিক বর্ণসঙ্গীত দ্বারা পটগুলি জীবন্ত মূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। হিঙ্গুল, পীত, নীল ও সবুজই ইহার প্রধান রঙ। হিঙ্গুল দ্বারা সর্ব্বদাই পট-ভূমিকা রঞ্জিত করা হয় এবং ঐ গুলির কমনীয় ভাবই ইহার প্রধান গুণ।

অন্য পক্ষে আলঙ্কারিক যে পটচিত্রের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে উহার চিত্রগুলির মূর্ত্তির মুখে ভাবপ্রকাশ নাই, কেবলমাত্র ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশের দ্বারা শিল্পী এখানে তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে অলঙ্কার-সজ্জা ও বেশ-ভূষার বাহুল্য বেশী। এই শিল্প পদ্ধতির বাহিরের রেখা কঠোর, রঙ প্রখর ও পাশ্বিক দৃশ্যের মধ্যে কেমন একটা ভাবের দৈন্য আছে।

পূর্ব্বোক্ত ধরণের পটগুলি হইতে যাদুপট ও গাজীর পট সম্পূর্ণ পৃথক রকম। ইহাদের আকার ছোট এবং বিষয় বস্তুও নির্দ্দিষ্ট। বীরভূমের সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত যাদুপটের যে অঙ্কন-রীতি তাহা মনে হয়—ধাতু শিল্পে যে অঙ্কন-রীতি



মথুরাপুর দেউল-গাত্রের এক সারি ফলক

ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত। যাদু পটুয়ারা ধাতুর উপরও নক্সাকাজ করিয়া থাকেন এবং ধাতু শিল্পের চাহিদা অভাবে তাহারা পরবর্ত্তী কালে পটচিত্রে অধিকতর মনোযোগ

দিয়াছেন। এই সব যাদুপটে সূক্ষ্মভাবে সরল রেখা দ্বারা কাপড়ের ভাঁজ দেখান, জ্যামিতিক রীতিতে নানারূপ নক্সার কাজ তোলা, বিন্দু দ্বারা অলঙ্করণ প্রভৃতি ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত গাজীর পট যাদুপট হইতে সামান্য পৃথক। ইহাতে বর্ণ-বিন্যাস বেশী এবং মূর্ত্তিগুলি যেন ছাঁচে-ঢালা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে আচার্য্যদের অঙ্কিত আর একরকম জড়ানোপট আছে যাহা চালচিত্র বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। উহার আকার অর্দ্ধ-গোলাকৃতি, কেন না, সাধারণত দুর্গাপূজার অর্দ্ধ-গোলাকৃতির কাঠামোর উপর এই চিত্রগুলি সংলগ্ন করা হয়। এই জন্য দেখিতে পাই, চালচিত্রের অঙ্কন-পরিসর অপর্য্যাপ্ত। দুর্গার উপাখ্যানের কয়েকটি প্রধান ঘটনাই



কালীঘাটের পট

সমস্ত চালচিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে চালচিত্রও বিসর্জ্জিত হয় বলিয়া প্রত্যেক বৎসরেই আচার্য্যদের চালচিত্র অঙ্কন করিতে হয়। এই জন্য আচার্য্যেরা কালের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই ; আধুনিক চালচিত্রে বাহিরের প্রভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।



একটি মন্দির

চালচিত্রের মধ্যে যে সব ডাকিনী যোগিনী কিংবা ষাঁড়ের অঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায় উহাতে আচার্য্যদের হাতের সেই সাবলীল গতির ছাপ পাওয়া যায়।

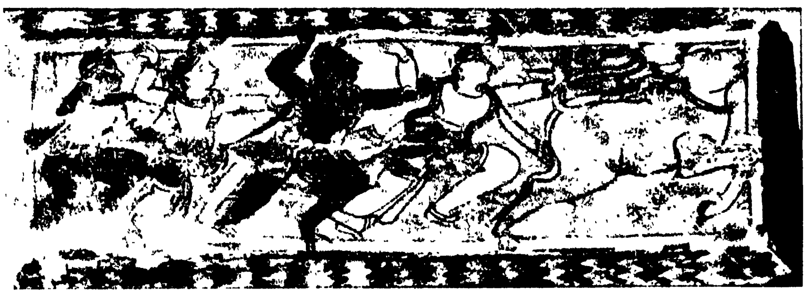
পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পট হইতে কালীঘাটের পট সম্পূর্ণভাবে পৃথক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রারম্ভে দক্ষিণ কলিকাতায় অবস্থিত এই কালীঘাটের পটুয়ারা ফুলস্কেপ আকারের কাগজের চেয়ে একটু বড় আকারের তুলোট কাগজের উপর চিত্রাঙ্কণ করিয়া যাত্রীদের নিকট উহা সস্তায় বিক্রয় করিতেন। তাঁহারা বর্ণ-বিন্যাস অপেক্ষা রেখা চিত্রাঙ্কণে অতি চমৎকার মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কালীঘাটের পটের রেখা টানের নৈপুণ্য অনির্ব্বচনীয়।

পুঁথির পাটায় চিত্রাঙ্কন বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়। পুঁথির পাটার উপর শ্রীমদ্ভাগবত, পৌরাণিক ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক ঘটনাবলী চিত্রিত হইয়া থাকে। সাধারণত পুঁথির পাটাতে ময়দা, খোল, বেল, বাবলার আঠার লেপন দিয়া চিত্রাঙ্কণ করা হইত। পাটার উপর ব্যবহৃত রং প্রখর এবং ইহার অঙ্কন-রীতির সহিত পূর্ব্বোক্ত আলঙ্কারিক জড়ানো পটের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক পাটার চিত্রাঙ্কণে

বাহিরের প্রভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। পাটার উপরে অঙ্কিত চিত্রগুলি যদিও দেখিতে ক্ষুদ্রাকৃতি কিন্তু উহা বৃহৎ চিত্রাঙ্কণের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র।



পাটা চিত্র —অজিত ঘোষের সংগ্রহ



পাটা চিত্র —অজিত ঘোষের সংগ্রহ



জড়ানো পট চিত্র

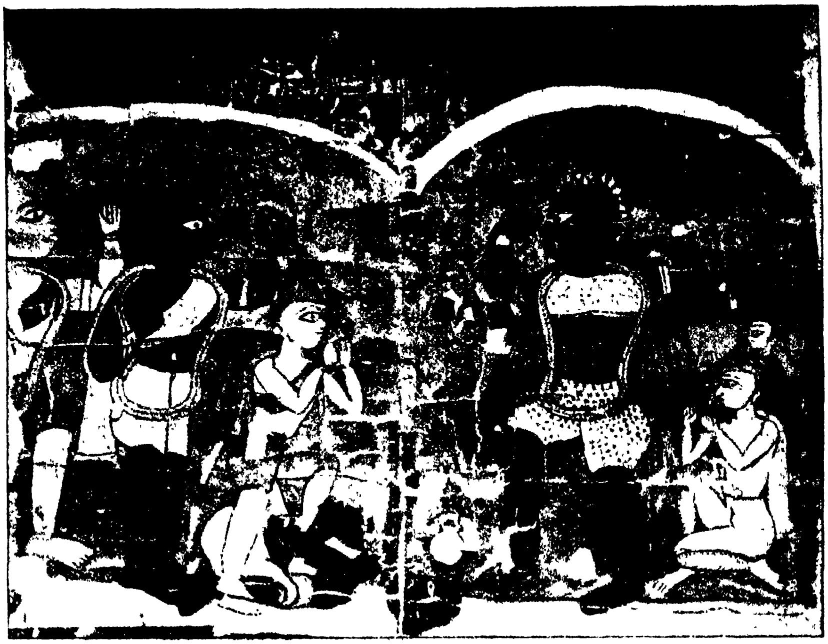
পোড়ামাটির ফলক

বাংলা দেশে প্রস্তর অভাবে পোড়ামাটির ফলক দিয়া মন্দিরগাত্র অলঙ্কৃত করিবার প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কুম্ভকারেরা ছিলেন পোড়ামাটির ফলকগুলির শিল্পী। রাজমিস্ত্রীর আদেশানুসারে তাহাদিগকে ফলকগুলির আকার ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ করিতে হইত, তবে সাধারণত পোড়ামাটির ফলকগুলি দৈর্ঘ্যে নয় ইঞ্চি এবং প্রস্থে আট ইঞ্চি হইয়া থাকে। অর্দ্ধশুষ্ক মাটির ফলকে নরুণ কিংবা পাতলা বাঁশ দিয়া নক্সা তুলিবার পর উহা আগুনে পোড়ান হইত এবং পরে মন্দিরগাত্রে শক্ত মশলা দ্বারা ফলকগুলি গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোড়া মাটির ফলকে যখন কোন গল্প বলা হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন ফলকের উপর সেই দৃশ্যের প্রত্যেকটি ঘটনা খোদাই করিয়া পর পর ফলকগুলি সজ্জিত করা হইয়া থাকে। কোন কোন গল্প শেষ করিতে এইরূপ দশ-বারটি সারি দরকার হয় কিন্তু ইহাতে দৃশ্যের পরিপূর্ণতায় কোন ব্যাঘাত জন্মে না। পোড়ামাটির ফলকগুলির বিষয়বস্তুতে কোন সীমা নির্দ্ধারিত নাই; তবে ইহাতে সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যানের দৃশ্য, সামাজিক কিংবা সমসাময়িক ঘটনার চিত্রাবলী, নানারূপ শিকারের দৃশ্য, গজ-সিংহ, হস্তী এবং অগণিত পদ্ম ও লতার নক্সাই বেশী। প্রত্যেকটি

পোড়ামাটির ফলক স্বতস্ফূর্ত্ত এবং ব্যঞ্জনাপূর্ণ। শাস্ত্রীয় পদ্ধতির দ্বারা এই পোড়ামাটির ফলকগুলির স্বাধীনতা ব্যাহত হয় নাই।

পোড়ামাটির ফলকে দুই রকম পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। একটি চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি, অন্যটি দারুশিল্পে যে পদ্ধতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া উহা দ্বারা প্রভাবান্বিত। চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে অঙ্কিত পোড়ামাটির অধিকাংশ ফলকেই 'রিলিফ্' কাজ এবং মূর্ত্তিগুলির পার্শ্বদেশ ঈষৎ উন্নত করিয়া রেখার জোর টান দেওয়ায় মূর্ত্তিগুলি সজীব হইয়া ওঠে। গতিশীলতা হইতেছে এই ধরণের পোড়ামাটি ফলকের প্রধান ধর্ম্ম। এই চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে খোদিত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ পোড়ামাটির ফলক অধুনা ফরিদপুরে আবিষ্কৃত মথুরাপুরের দেউলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানই এই পোড়ামাটির ফলকগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়। ডক্টর কুমারস্বামী ভারহুতের ভাস্কর্য্য বিচার করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, ঠিক সেই কথাটির পুনরুল্লেখ করিয়া মথুরাপুরের এই পোড়ামাটির ফলকগুলি সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, "The form is always reached by a process of synthesis and abstraction, rather than by observation, and is always in the last analysis a memory image."—এই ধরণের অধিকাংশ ফলক সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রয়োগ করা যায়।

কিন্তু দারুশিল্পের পদ্ধতিতে খোদিত পোড়ামাটির ফলকগুলি বাস্তবতা দ্বারা দুষ্ট। এখানে শিল্পীর স্বাধীনতা ব্যাহত হইয়াছে, তাহাকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথে এই সব পোড়মোমাটির ফলকগুলিতে ধরাবাঁধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে। এই ধরণের ফলক—দেয়ালগাত্রে যদৃচ্ছভাবে



জড়ানো পট চিত্র

সজ্জিত করা হয়, ঝরঝরেভাবের অভাব উহাতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

ইহা ব্যতীত পোড়ামাটির ফলকে অসংখ্য রকমের পদ্মের ও লতার নক্সা কাজ করা হয়। এই সব পদ্ম, লতা এবং বৃক্ষের পরিকল্পনা অতীব মনোরম। বিশেষভাবে পোড়ামাটির উপরে খোদিত গজসিংহের রূপ শিল্পীর এক অনবদ্য দান।

সাধারণত পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যস্থিত বাংলার মন্দিরগাত্রে—উক্ত সব পোড়ামাটির ফলক দেখিতে পাওয়া যায়।



চাল চিত্র

বেশ ছিলাম

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

বেশ ছিলাম ; কপালে সহিল না।

ফ্ল্যাট্ সিষ্টেমের কল্যাণে গৃহস্থ ভদ্রলোকে বাঁচিয়াছে। পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাস করা এখন আর তেমন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নহে। দশ টাকা বারো টাকা মাসিক ভাড়া দিতে পারিলেই মাথা গুঁজিবার আশ্রয় মিলে। মেসের ভাত খাইয়া শরীরপাত করিতে হয় না, স্ত্রী-পুত্র দেশে পড়িয়া বারমাস ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। আর কথার মধ্যে প্রধান কথা, দিনের পর দিন বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এগার টাকা আট আনায়—(দেড় টাকা লাইটের জন্য বেশী দিতে হয়)—লেনের এই বাসায় উঠিয়া আসিয়াছি দেশের বাড়ীতে চাবি দিয়া। "খোলার ঘর" নয় যে মর্য্যাদার হানি হইবে ; কলি-ফিরাণ দেওয়াল, রঙ, লাগান দরজা জানালা, খাসা সিমেণ্ট করা মেজে ; ছাদ করগেটের বটে, কিন্তু এমন কৌশল করিয়া সামনের আলশে গাঁথা যে বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই।

ইলেকট্রিক লাইট পর্য্যন্ত রহিয়াছে, আর চাই কি ? গৃহিণী বলেন—লণ্ঠন মোছার কাজ গিয়েছে না বেঁচেছি, হাড় জুড়িয়েছে, দেওয়ালে হাত দিলেই আলো, সোনার দেশ।

খোলা উঠানে দাঁড়াইয়া স্নান করিতে হয় ; কল-পায়খানা এক ; তা হউক, সে তো ভিতরের কথা।

এই যে আমার পাশের ঘরের গোবর্দ্ধনের স্ত্রী, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনী খাটে, জুতা সেলাই চণ্ডীপাঠ কিছুই বাদ যায় না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা স্বামী বাড়ী আসিলে যখন চওড়া পাড় স্মার্ট শাড়ী পরিয়া ভেলভেটের স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়া বেড়াইতে বাহির হয়, তখন কে বলিবে সে জজবাবুর পুত্রবধূর চাইতে কিছু খাটো ?

গোবর্দ্ধনের চাকরী নাই, সে না কি চার-পাঁচটা টিউশনি করিয়া খায়। কিন্তু এ বিলাসটুকু তাহার না করিলেই নয়। হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া এক পেয়ালা চা ও দুইখানা রুটি খাইয়া বেড়াইতে বাহির হয় ; আবার ফিরিয়াই ছোটে আপন ধান্ধায়। তাহোক তবু তো আছে ভাল। বৌ লইয়া বেড়াইবার বয়স আর নাই, তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবি—আহা সোনার কাল হেলায় হারাইয়াছি।

আজও গোবর্দ্ধন নিত্যকার মত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। তাহার শিশুপুত্র গোবিন্দ চীৎকার করিয়া কান্না সুরু করিয়াছে, সে আর থামে না। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, দেখ ত গা ব্যাপারটা কি ? ওরা ছেলেটাকে নিয়ে যায় নি কেন ?

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, নিয়ে আবার কবে যায় ? রোজই তো পড়ে থাকে।

কই, কাঁদে না তো কোন দিন ?

ওই যে ও ঘরের তারিণীবাবুর মেয়ে বিমলা রাখে—

তা হলে আজ ?

কি জানি বাবু দেখি। জ্বালালে বাবা, গলা তো নয় ছেলের যেন ঢাকের বাজনা।

বোধ হয় বাহিরে গিয়া গৃহিণী কিছু প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন, তারিণীবাবুর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—কেন গা, আমার মেয়ে তো কারুর ছেলে নেওয়া চাকরাণী নয় যে, উনি বরের হাত ধরে হাওয়া খেতে বেরুবেন আর ও 'নিত্য'দিন ছেলে আগলাবে। খবরদার বলছি বিমলি, ছেলে যদি ছুঁবি তোরই একদিন কি আমারই একদিন। বুড়ো হাতী-মাগী যত্তধিঙ্গি হচ্ছেন, আদিখ্যেতায় যেন গলে পড়ছেন। দিনরাত্তির 'বৌদি' 'বৌদি', ভারী আমার সাতকালের বৌদি রে—ফের যদি—বলি অত কিসের ? কথায় ছেদ পড়িল ছেলেটার তীব্রস্বর সপ্তগ্রাম ভেদ করিয়া সহসা এমন উদ্দণ্ড হইয়া উঠিল, আশঙ্কা হইল গড়াইয়া উঠানে পড়িয়াছে। উঠিতেই হইল, উঁকি মারিয়া দেখি সন্দেহ অমূলক নয়, রাগ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে ছেলেটা বোধ করি ইচ্ছা করিয়াই উঠানে পড়িয়াছে। মদীয় গৃহিণী তাহাকে তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে 'হিমসিম' খাইতেছেন, কিন্তু ছেলেটার যে সেরূপ ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আছে তাহা মনে হয় না। চারিখানি হাত-পা ও একখানি মাত্র গলার সাহায্যে সে যেরূপ একটা ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে তাহাকে তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

অদূরে সেই 'বিমলা' নামধারিণী 'বুড়ো হাতী মাগীটি' একটা খুঁটি ধরিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মা মিথ্যা বলে নাই, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স তাহার নিশ্চয়ই হইবে। আজও বিবাহ হয় নাই এবং চেহারা দেখিলে, হইবে বলিয়াও বিশ্বাস করাই শক্ত। কিসের প্রেরণায় যে মায়ের গালি খাইয়াও সে স্বেচ্ছায় ছেলেটাকে বহিয়া বেড়াইবার ভার লয় কে জানে। বাড়ীতে আরও যে কয় ঘর বাসিন্দা ছিলেন সকলেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়া ছিলেন ; তাঁহাদের সম্মিলিত সমালোচনা যখন তুমুল আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, রঙ্গস্থলে আসামী যুগল দর্শন দিল। গোবর্দ্ধনকে কিন্তু আদর্শ প্রেমিক বলিয়া মনে হইল না ; এতগুলি উদ্যত বজ্রের নীচে অনায়াসে প্রেয়সীকে আগাইয়া দিয়া ফরসা জামাটা তারের উপর মেলিয়া আধময়লা একটা কোট গেঞ্জির উপর চাপাইয়া বাহির হইয়া গেল নিঃশব্দে নিশ্চিন্তে।

সকলেই দেখিলাম তারিণী গৃহিণীর পক্ষে। সত্যই তো বাপু, আটটাকা ভাড়া দিয়া একখানি মাত্র ঘরে যাহাকে থাকিতে হয়, আর দুই টাকা দিয়া একটু রান্নাঘর পর্য্যন্ত লইবার ক্ষমতা নাই, তাহার আবার এত সখ কিসের ? হাওয়া খাইবেন ? সায়েব-বিবি নাকি ? কথাটা বলিলেন উঠানের ওপারের ঘরের মোটাগিন্নি। গলা চিনি ; দেখিতে পাইলাম না। ছ্যাঁচা বেড়ার দেওয়াল দেওয়া দেড় হাত চওড়া ও

দুইহাত লম্বা যে মেটে ঘরটুকু 'রন্ধনশালা' নাম লইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে তাহারই ভিতর হইতে কথাটা ভাসিয়া আসিল।

গোবর্দ্ধনের বৌ চালাক মেয়ে, সে একটিও কথার উত্তর দিল না; আঁচলের পিন্ খুলিয়া ঘুরান শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়াইল, জুতা-জোড়াটা স্বস্থানে রাখিয়া আসিল। আর কিছু করিবার মত কাজ হাতে না থাকাতেই বোধ হয় উঠানে নামিয়া ক্রন্দনরত ছেলেটার পিঠে সজোরে কয়েক ঘা চড় কসাইয়া টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিয়া দুম করিয়া খিল লাগাইয়া দিল।

আন্দোলনটা আর ভাল করিয়া জমিল না। বিষ্ণুবাবুর বিধবা দিদি পুনরায় হরিনামের মালাসমেত হাতটি ঝোলায় ডুবাইয়া চক্ষু মুদিলেন। মোটা গিন্নির খুন্তির আওয়াজ প্রখর হইয়া উঠিল। ভোলানাথের স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজাইয়া দিল। ভোলানাথ এইমাত্র বাড়ী ফিরিয়াছে, হয় তো এটা তাহাদের রসালাপের সময়।

নন্দ বলিয়া যে ছোকরা মোটাগিন্নির পাশের অংশটায় থাকে সে আজ দুই দিন হইল পুত্রকলত্র লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে একটা বিবাহ-উৎসবে গিয়াছে। তাহার দরজায় তালা ঝুলিতেছে। কাজেই ও অঞ্চলটা অন্ধকার। তারিণী-গৃহিণীও আপন মনে গজগজ করিতে করিতে এক সময় উঠিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন। শুধু বিমলা মেয়েটা রোয়াকের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়াই রহিল।

গৃহিণী আসিয়া বিমর্ষমুখে ঘরের মেজেয় পা ছড়াইয়া বসিতে হাতের বইখানা মুড়িতে হইল; কহিলাম, কি গো, তোমার আবার কি হ'ল?

আমার? নাঃ আমার আর কি হবে? এরকম স্থলে কথা বাড়াইতে নাই—পুনরায় বইয়ের পাতাটা খুলিয়া ধরিলাম।

গৃহিণী কিছুক্ষণ উসখুস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ গা, এরা বারোমাস এমনি ক'রে কাটায়?

বলিলাম—তা কাটায় বই কি?

আচ্ছা একসঙ্গেই যখন থাকতে হ'বে তখন ঝগড়া ক'রে মরে কেন? ওরে বাবা, এ যে রীতিমত দার্শনিক প্রশ্ন, হাসিয়া উঠিলাম—একসঙ্গে থাকে বলেই তো ঝগড়া করে গো, এই ধর না কেন তুমি যখন বাপের বাড়ী যাও, ক'দিন গিয়ে ঝগড়া করে আসি? অথচ সামনে থাকলে—

গৃহিণীও হাসিলেন বটে কিন্তু মনটা তাঁহার ঠিক যে প্রকৃতিস্থ হইল তাহা মনে হইল না। কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্ব্ব কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন—হ্যাঁ গা, গোবর্দ্ধনের বৌ আর বেড়াতে যাবে না বোধ হয়!

কি জানি? ছেলেটাকে নিয়েও যেতে পারে।

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাগল, ও কি ছেলে? শয়তান! মার কাছে যতক্ষণ থাকে চুল ছিঁড়ে কাপড় টেনে মেরে ধরে কি কাণ্ড যে করে—পথে বেরুলে রক্ষে আছে? বিমলার মা তাই তো অত ক্ষেপেছে, বিমলার পরনের একখানা নতুন কাপড় না কি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে, আর খামচে গালের মাংসই খুবলে নিয়েছে এতখানি। হস্তপ্রসারিত করিয়া দেখাইলেন, অবশ্য যতখানি দেখাইলেন ততখানি মাংস তুলিয়া লইলে গালের আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবার কথা নয়; তবু যা রটে তার কিছু তো বটেই।

অফিসের যে রকম হালচাল কখনও যে মাহিনা বাড়াইবে এমন আকাশ কুসুমের কল্পনা সজ্ঞানে করিবার কথা নহে, তবু মনের নিভৃততম প্রদেশে ক্ষীণ একটি আশার রেখা সযত্নে পালন করিতেছিলাম। এই তো একরকম চলিয়া যাইতেছে আর যদি গোটা দশেক টাকা বেশী পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ আলাদা একখানি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লওয়া অসম্ভব নয়, তাহা হইলে পিসিমাকেও আনা যায়। আহা বুড়ো মানুষ একলাটি—মুখের উপর সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া যে ছোকরা সাঁ করিয়া চলিয়া গেল তাহাকে কিছু কড়া কথা শুনাইব বলিয়া ফিরিয়া দেখি সস্ত্রীক গোবর্দ্ধন আমাকে চিনিতে না পারার ভান করিয়া তাড়াতাড়ি মোড় ফিরিল। থাক আর লজ্জা দিয়া কাজ নাই, পা চালাইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। আজ ত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু ছেলেটার কি হইল? সন্দেহভঞ্জন হইতে দেরী হইল না, স্নেহময়ী জননী ছেলেটার অসদ্গতি করিয়া যায় নাই। ঘুম পাড়াইয়াছে, মাদুর বালিশ পাতিয়া সযত্নে শোয়াইয়াছে এবং জাগিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় একখানা গামছার একটা খুঁট পায়ে বাঁধিয়া অপর দিকের খুঁটটি জানালার গরাদেতে কসিয়া গিঁঠ দিয়া গিয়াছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ শিয়রের কাছে একটা থালায় করিয়া কয়েকখানি বাতাসা ও দুইখানা বিস্কুট পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতে ভোলে নাই। আহা! ইহাকেই বলে মাতৃস্নেহ!

ঘরে ঢুকিতেই গৃহিণী কহিলেন, দেখেছ গা, ছুঁড়ির আক্কেল? ঘুমন্ত ছেলেটার ঠ্যাঙে দড়ি দিয়ে—যাট্ যাট্। কেন বাপু, দু'দিন বেড়াতে না গেলে কি সংসার রসাতলে যাবে? আর ক'দিন বা বেড়াবি? এই তো দুদিন পরে আবার একটা হবে—

চমকিয়া বলিলাম, তাই নাকি? চমকানিটা এমন সুস্পষ্ট যে গৃহিণীর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, ওমা, তা আকাশ থেকে পড়চ কেন? এই তো হবার বয়স? এ বছর আর বছর হবে বই কি, যে সময়ে যা।

তা সত্য, যে সময়ে যা। হইবে বই কি। অপ্রতিভ হইয়া গেলাম।

গৃহিণীকে কিন্তু চিন্তিত দেখিলাম, কহিলেন, বাপ-মা তো নেই বলে। এখানে—যে হবে—একখানা তো ঘর?

বুঝিলাম "সব একাকার" হইবার আশঙ্কায় ভদ্রমহিলা এখনই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। আশ্বাস দিয়া কহিলাম, পাগল, তাই কি হয়? 'সেবাসদন' আছে কি করতে?

সেবাসদনের বিশদ বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিবার পর গৃহিণী চুপ করিলেন বটে কিন্তু মুখে হাসি ফুটিল না। গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কি জানি বাবু ওসব ম্লেচ্ছপনা সাতজন্মে দেখিওনি শুনিওনি। হিঁদুর ঘরের মেয়ে হয়ে ছিঃ। ছিঃটা এত সবেগে এবং সতেজে বাহির হইয়া আসিল যে প্রতিবাদ করিবার পথ রহিল না। "হতচ্ছাড়া দেশ!" বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইঁহারই মুখে 'সোনার দেশ' সম্বন্ধে মন্তব্য শুনিয়াছি—যাই বল বাবু, থাকতে হয় তো এখানেই জন্ম

জন্ম থাকতে হয়। ইহকাল পরকাল দু'কালের মঙ্গল, কালী, গঙ্গা, পাঠ, 'কেত্তন' কি নেই? ওই মোটাগিন্নিদের সঙ্গে আজ গিয়েছিলাম পাঠ-বাড়ীতে—আহা প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। তোমাদের দেশে কি ছাই আছে? কিছু নেই। মুখপোড়া দেশ।

কয়দিন হইল বর্ষা নামিয়াছে। গৃহিণীর মুখেও মেঘ। কাপড় শুকাইবার জায়গা নাই, শোবার ঘরে কাপড় মেলিতে হয়, বিছানায় ঠেকিয়া কাচা কাপড়ের শুদ্ধতার আর কিছু বাকী থাকে না। বুড়ো বয়সে মেলেচ্ছপনার দেশে আসিয়া জাত জন্ম যে আর কিছু থাকিবে না, মুখে চোখে সেই অনুযোগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টিতে উঠানের ড্রেন বুজিয়া জল থই থই করে এবং সেই জল না মাড়াইয়া কলে যাইবার উপায় নাই। বুঝিতেছি মেসের ভাত আবার কপালে নাচিতেছে। নিজের দিকে চাহিয়া যে একটু ক্লেশবোধ না করিলাম তাহা নয়। গৃহিণীর হাতে পড়িয়া ক'য়দিনেই বেশ একটু চেক্‌নাই ফিরিয়াছিল। তিনিও যে এই জন্যই কথাটা মুখে আনিতে পারিতেছেন না তাহা বুঝি। কিন্তু আমার শ্রী ফিরাইতে তাঁহার অবস্থা বিশ্রী উঠিয়াছে। অবলা বঙ্গ ললনা, কঠোর বিরহজ্বালা অবলীলা ক্রমে সহ্য করিয়া থাকে, কিন্তু সংসার জ্বালায় বেচারারা দুই দিনে শুকাইয়া ওঠে।

বলিলাম, দেখ বর্ষার সময়টা না হয় বাড়ী গিয়ে—শীত পড়লে আবার—

গৃহিণী শুষ্কমুখে কহিলেন, তাই কি আর হয়? সংসার পেতে বসা হয়েছে যখন। সংসারের মধ্যে তো ছেলেটা। দেখি বৃষ্টির পানে তাকাইয়া ম্লানমুখে বসিয়া আছে। বলিলাম, কি রে নানু, মুখখানা শুকনো কেন রে? নানু মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, না তো বাবা।

মাথাটা নাড়িয়া দিয়া কহিলাম, বাড়ী যাবি নানু? ছেলেটার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। পরদিন বাড়ীওয়ালাকে নোটিশ দিলাম।

আবার মেসের ভাত খাইতেছি; গালের অস্থি দুইটা পুনরায় যেন আপনার অস্তিত্ব জাহির করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তা উঠুক, মাহিনা বাড়িলে অদূর ভবিষ্যতে কি করিব সেই আশায় মনে অসুখ নাই। পুরোণা বাসার সকলের সঙ্গেই প্রায় দেখা হয়। ওইটাই একমাত্র পথ, দুই:বেলা আনাগোনা করিতে হয়।

মোটাগিন্নি ও বিষ্ণুবাবুর বিধবা দিদি কলকণ্ঠে পথ সচকিত করিয়া তেমনি 'পাঠ' শুনিতে যান। গোবর্দ্ধন ইস্ত্রিকরা আদ্ধির পাঞ্জাবী পরিয়া সস্ত্রীক হাওয়া খাইতে বাহির হয়। ভোলানাথ বাজার করিয়া ফিরিবার পথে ফুলকপি ও গলদা চিংড়ির ঠোঙাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলে।

নন্দ ছোকরা তেমনই সকাল সন্ধ্যা ভাঙা হারমোনিয়মটা লইয়া স সরস্বতীকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতে থাকে।

তারিণীবাবু গোবর্দ্ধনের ছেলেটাকে কোলের ভিতর চাপিয়া বসাইয়া ডাক্তারদের রোয়াকে 'দাবার ছক' সাজাইয়া খেলুড়ি আহ্বান করেন। অনুমানে বুঝি, গোবর্দ্ধন-দম্পতির সহিত কলহ আর নাই। ডাকিয় বলেন, এই যে চাটুয্যে, এস না, একহাত হোক। কাজ আছে ছুত করিয়া সবিনয়ে পাশ কাটাইতে কাটাইতে বলি—খবর ভাল তো? বাড়ীতে? মেয়ের বিয়ের কিছু হল? অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইয়া বলেন—কোথায়? যেতে দিন মশায়, যেতে দিন, আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাইনে। ও যাঁর কাজ তিনিই করবেন, আমার কি সাধ্য। খেলবেন না তাহলে?

পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসি। পথে, বিষ্ণুবাবু গ্রেপ্তার করেন এবং বাসায় থাকিতে তেমন আলাপ কিছু হয় নাই। এখন কিন্তু পরম আত্মীয়ের মত হাত ধরিয়া টানিয়া জনান্তিকে বলেন—মেয়ের বিয়ের কথা বলছেন? হুঃ ও মেয়ের কি আর বিয়ে হয় মশায়, মিলিটারী মেয়ে—চেহারা তো বলে কাজ নেই। হ্যাঁ, সেদিন যে এক কাণ্ড হয়ে গেল নন্দর সঙ্গে।

নিরুৎসাহে বলি, কি রকম?

কি জানি মশায়, পরিবার তো বাপের বাড়ীই রয়েছে সেই ইস্তক; হোটেলে খো খায় জানি, একদিন বুঝি তারিণীবাবুর রান্নাঘরে একটু চায়ের জল চাইতে গিয়েছিল—কর্ত্তার মেয়ে মুখের ওপর কাঁচের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছেন, কেটে একেবারে 'ওয়ার' রক্তে ভাসাভাসি। নন্দ যাই ভাল লোক, তাই থানা-পুলিশ করলে না।

মাগী গঙ্গা নেয়ে এসে ধেই ধেই করে নাচ। বলে, নন্দ না কি ওর মেয়ের দিকে কুনজরে চেয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ। নন্দর পরিবারকে দেখেছেন তো আপনি? ছবির মতন চেহারা, সে যাবে ওই কালির দোয়াতের সঙ্গে—রগড় আর কি?

চুপ করিয়া চাহিয়া থাকি, মুখে কথা জোগায় না। বিষ্ণুবাবু আবার বক বক করিতে থাকেন, আপনার পোরশানটায় যে লোক এসে গেল এদিন—? বেশ ছিলেন, আবার দুর্ম্মতি হ'ল কেন বলুন তো? যাই বলুন, আপনার কিন্তু চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। মেসের ভাত, আর পরিবারের ভাত অনেক তফাৎ। চলিতে চলিতে, আমার ঘরখানা নজরে পড়ে, যাহারা আসিয়াছে, সৌখিন বলিতে হইবে, জানালায় দরজায় জাপানী ছিটের পর্দ্দা ঝুলাইয়াছে। সামনের সেই একহাত চওড়া রোয়াকটায় মোড়া পাতিয়া এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছেন। চাহিয়া চাহিয়া একটা নিশ্বাস পড়িল; সত্যই তো বেশ ছিলাম। এই তারিণী-নন্দ-বিষ্ণু-গোবর্দ্ধন কি আর মন্দ আছে?

ময়ূরপঙ্খী

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

সাত

কার্য্য ও কারণ দুটো কথা। কোন্‌টা আগে আর কোন্‌টা পরে, এ নিয়ে অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তর্ক সংসারেও চিরকাল ধরে হয়ে আসছে, কিন্তু তার মীমাংসা কোন দিনই কেউ আজও পর্য্যন্ত করে উঠতে পারেন নি। এ-পারেও না, ও-পারেও না। কার্য্য থেকে কারণের উৎপত্তি, কি কারণ থেকে কার্য্যের উৎপত্তি, এ তর্ক হয়ত জয়ভেরীর আসরে ভোলা রায় করতে পারে; আমরা উপস্থিত এই কথাটা মেনে নিয়েছি সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যে, কারণ থেকেই কার্য্যের উৎপত্তি—এবং একই সময়ে একই কারণ সংসারে নানা বিচিত্র ফল প্রসব করে। একই জল যেমন নানা বিভিন্ন রঙের কাচের পাত্রে রাখলে নানা আকার ধারণ করে—তেমনি মানুষের এই একই কাম-কামনা নানা বিচিত্র মানুষের মধ্যে বিচিত্র রূপ নেয়, বিচিত্র খেলা খেলে। বিজ্ঞানই হোক, দর্শনই হোক, সাহিত্যের যে কোন ভাগের কথাই হোক—নাটক বা নভেল বা কাব্য—যাই হোক্, মানুষ তার ভেতরে কারণ ও কার্য্যের জিজ্ঞাসাবাদ রাখে এবং চিরকালই তা রাখবে। কেন-না, কারণ ও তার ফলের সম্বন্ধে মানুষ সর্ব্ব যুগ থেকে সর্ব্বদাই সচেতন। সেই কারণ কতখানি মানুষের নিজের ভেতর থেকে হয়, কতখানি বা সমাজের সমষ্টিগত ভাবের, কতখানি তার দেশের অবস্থার ভেতর থেকে ফুটে ওঠে, তা বিচার করা ও জানবার ইচ্ছা মানুষের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। সেই জন্য নভেলে বা নাটকে যে চরিত্র চিত্রিত হয় তা সে যত বিচিত্রই হোক, মানুষ তার কারণ খুঁজে দেখবে ও চিরকালই দেখতে চাইবে। দেখবে এই জন্য, তা না হলে তার মনের যে বিজ্ঞান-বুদ্ধি সে কদাপি সুস্থ হয় না, মানুষের মন মানে না। অথচ এ-কথা খুবই সত্য যে, সাধারণ মানুষ তার ভাবসম্বেগ দিয়েই চালিত হয়। বিজ্ঞান-বুদ্ধির কোন প্রাকৃতিক ইতিহাস কেউ খুঁজে বার করতে পেরেছেন কি-না বলা শক্ত, তবে মানুষের শরীর-গত পদার্থের ভেতর থেকে যে ভাব-সম্বেগ বাইরের সংস্পর্শে এসে জাগ্রত হয় এটা নতুন কথা নয়। সেই ভাব-সম্বেগ মূলগত তিনটী। কামনা, সুখ ও দুঃখ। মানুষ এই বাইরের সংস্পর্শে এসে যে আঘাত পায় সেই আঘাত থেকে তার কামনা জাগে, ফল হয় সুখ নয় দুঃখ। এই সুখ-দুঃখের খেলার নেশায় মানুষ ভরপুর। এই কাম-কামনা থেকে নানা বিচিত্র ভাব-সম্বেগ জন্মলাভ করে। তাদের শক্তি, সেই ভাব-সম্বেগের গতি এতই তীব্র যে জলপ্রপাতের ধারার মত আশে-পাশে উৎক্ষিপ্ত জলকণার আবহাওয়া তৈরী করে সব দেশকাল সিক্ত করে দেয়। মানুষ স্বভাবত এই ভাব-সম্বেগের দাস—এমন কি, ক্রীতদাসেরও অধম ভাবে চালিত হয়। এই সব ভাব-সম্বেগকে মানুষের নিজের মনের শক্তি দিয়ে আয়ত্ত করা বা ঘোড়ার মুখে বল্গা দিয়ে যেমন চালায়—সেইভাবে চালিত করতে না পারাকেই দাসত্ব বলতে হবে। কেন না, যে মানুষ এই ভাব-সম্বেগের দাস সে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না—সে জানে, হয়ত সে বোঝে যে, জীবনের পথে কোন্‌টা তার ভাল কিন্তু সে নিজে শক্তিহীন, বলবৎ ভাব-সম্বেগের স্রোতে কুটোর মত ভেসে যায়। এই নভেলের পাত্র ও পাত্রীগণ ভাব-সম্বেগ দ্বারা চালিত হয়ে বিচিত্র রসের খেলা খেলেছে ও খেলছে। বিজ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সেই ভাব-সম্বেগকে সংযত করার অবসর তাদের কোনদিনই হয় নি। মানুষের চরিত্র সৃষ্টি হয় সেইখানে যে ভাব-সম্বেগকে সংযত করে বিজ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে চলতে পারে—না পারলেই অঘটন ঘটনায় ফল দাঁড়ায়। জয়ন্তর পক্ষেও ঠিক তাই ঘটেছিল। যে ভাব-সম্বেগের দ্বারা চালিত বা তাড়িত হয়ে জয়ন্ত ছুটে বেরুল, সে ভাবাবেগকে সে বিচার বা বিজ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে দেখলে না। জলপ্রপাতের মত ফেণমুখ ক্ষিপ্ত জলধারার স্রোত বইয়ে বেগে ধাবিত হয়। তাই হয়। যে বাধা সে অভিনয়ের অসাফল্যে পেলে বাইরে থেকে—সেই সঙ্গে ভেতর থেকে এল মানবের সম্পর্কে ভাব-সম্বেগ—সেই তোড়ের মুখে উঠল দ্বন্দ্ব—জাগল ঈর্ষা। তার অন্তরের যে প্রেম—নিজের স্ত্রীর প্রতি, সেখানেও এসে

লাগল আঘাত। সে ভাবাবেগ এত দ্রুত গতিশীল যে, সে তার এই গতির মুখে বল্গা দিয়ে ইচ্ছামত চালনা করতে পারে নি—তাই লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মত, বাঁধভাঙা জলের তোড়ের মত ছুটে এসে পড়ল। পড়ল এসে আবর্ত্তে। সে আবর্ত্তের ঘূর্ণীতে সে কেবল পাক খেতে লাগল। আবর্ত্ত হল থিয়েটার আর সেই ঘূর্ণী জলের যে পাক-কেন্দ্র—সে কেন্দ্রে এসে মীনা তার হাত ধরে টেনে অতলের পানে নিয়ে যেতে সাধনা করতে গেল। জয়ন্তর ইচ্ছা যে সব ভুলে এই ঘূর্ণীর কেন্দ্রে ডুবে তলিয়ে যায়···সে মীনাকে বললে: "I sink, I pant, I expire···ডুবি, ডুবি···নিঃশ্বাস মিলিয়ে আসে·· সব যেন শেষ হয়ে আসছে···

মীনা একটু তীব্র দৃষ্টিতে জয়ন্তর মুখের দিকে চেয়ে বললে: ও কি! তোমার কি হয়েছে? আজ কদিন ধরে কেবল মদই খাচ্ছ—থিয়েটারে গেলে না। এখানে আজ রিহার্স্যাল হবার কথা—তারা সব এসে বসে রয়েছে—পাশের ঘরে···ভোলাদাও ত এখন এলো না···হ্যাঁগো···কি হোল · হ্যাগো কি হোল তোমার?

জয়ন্ত ও মীনা ঘরের ভেতরে বসে কথা কইছিল। বাইরে আকাশভরা মেঘ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, দূর থেকে ক্ষীণ আলোক রেখার মত গানের সুর ভেসে আসছে। সারসির ভেতর দিয়ে বাইরের গ্যাসের আলো ধোয়া-ঘসা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেমন দেখায় তেমনি জলের ছিটেয় ঝাপসা হয়ে গেছে। জয়ন্ত মীনার কথার কোন উত্তর দিলে না। আবার বোতলটা টেনে নিয়ে গ্লাসে ঢাললে···

আবার খাচ্ছ?

দাঁড়াও—দাঁড়াও মীনা···ভেতরটা যেন আগুনের মত জ্বলে যাচ্ছে···

তাই আরো আগুন ঢালছ?

বিষে বিষক্ষয়···বুঝলে!

হুঁ···বুঝলাম—কিন্তু বিষটা কি···কিসের বিষের জ্বালায় জ্বলছ শুনি?

সেইটেই ঠিক বুঝতে পারছি নি।

দেখ, এক এক সময়ে মনে হয়, তুমি এখানকার মানুষ নও—অথচ তুমি কেন এখানে এলে তাই ভাবি।

বুঝতে পারছি না মীনা—আমি এখানকার মানুষ নই, না তুমি এখানকার মানুষ নয়। তোমায় যা দেখছি তুমি তা নয়।

তাই নাকি, বটে, কি করে বুঝলে বল ত?

মানুষ বুদ্ধি দিয়েই বোঝে···

মীনা খুব জোরে হা-হা করে হেসে উঠল। জয়ন্ত মীনার মুখের দিকে চেয়ে বললে: হাসলে যে?

তোমায় ভোলাবার জন্যে···কিন্তু দেখ, বুদ্ধি তোমার নেই, বুদ্ধি দিয়ে তুমি কোন জিনিষ বোঝ না, বুদ্ধি থাকলে এখানে আসতে না, এখানে এমন করে থাকতে না—দিনরাত এমন করে মদ খেতে না, আর আমার মা-বাবার পরামর্শ শুনে—আমার জন্যে এত টাকা নষ্ট করতে না।

অথচ তুমিই বলেছ, পাঁচ হাজার টাকা তোমায় আগাম না দিলে তুমি প্লে করবে না।

সেটা আমার কথা নয়, আমার বাপ-মার কথা···আর টাকা যদি তোমায় ধোঁকা দিয়ে পাই, তবে তা ছেড়ে দেব কেন? টাকার জন্যেই ত সব···

জয়ন্ত একটু হেসে বললে: টাকাটাই সব, না মীনা?

দুনিয়ার সংসারে জ্ঞান হয়ে অবধি দেখছি তাই। আচ্ছা, টাকার কথা থাক -তোমার কি হয়েছে আমায় সত্যি করে বলবে?

কিছু ত হয়নি মীনা···শুধু তোমায় আমার ভাল লেগেছে তাই··

মিথ্যা কথা কয়ো না · আমাকে কারও ভাল লাগতে পারে না···

কিসে বুঝলে?

মীনা আবার হাসলে।

হাসলে যে?

হাসলাম···মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষকে যতখানি বোঝে—ততখানি কি পুরুষ মানুষ আমাদের বোঝে—না, আমরা তা সহজে বুঝতে দিই! বুঝতে দিলে আমাদের কদর চলে যায়।

তা হয় ত নাই বুঝি—কিন্তু ভাল লাগতে পারে না, বা ভাল লাগে না—এটা কি করে বুঝলে?

কিছু না—ও বাজে কথা থাক্—তুমি ত এখানে এসেছ থিয়েটার করবে বলে, আমায় অভিনয় শেখাচ্ছ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সত্যি উত্তর দেবে?

আমি যে মিছে কথা বলতে পারি—এটাও বুঝে ফেলছ দেখছি!

জয়ন্ত জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললে।

সত্যি কথা বলতে জন্ম-এস্তোক—জ্ঞান-হওয়া-এস্তোক কাকেও শুনি নি। নিজেরাও ত সত্যি কথা ভুলেও বলি নি।

তুমি যদি আমার কাছে সত্যি কথা না বল, তবে আমি যে সত্যি কথা বলব এ রকম আশা কর নাকি?

মীনা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর তার স্বাভাবিক হাসির ভঙ্গীতে বললে: দেখ, আমার বিশ্বাস তুমি কখন মিছে কথা বলতে শেখ নি। আমি কিন্তু অনেক মিছে কথা বলতে অব্যেস করে ফেলেছি—ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যে বলতে পারি। কিন্তু তোমার ওই মুখের দিকে চাইলে আমার ভেতরের মিথ্যেটা আমার ভেতর লুকিয়ে পড়ে। 'সাপ যেমন ইসের মূল ধরলে আপনি তখনি ফণা নামায়—আমার মিথ্যেটাও ঠিক তেমনি মাথা লুকিয়ে তলিয়ে যায়। আর সত্যিটা ঠেলে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। কি আশ্চর্য্য মানুষ তুমি···নাঃ, তুমি দেখছি নিজেরও সর্ব্বনাশ করবে···আর আমারও পেশাটা মাটী করে দেবে।···নাঃ···

তার মানে?

তার মানে যা তাই।···কথাটা বলে মীনা তার পদ্মের পাপড়ির মত চোখের ভেতর দিয়ে ঝলক তুলে জয়ন্তর মুখের পানে চেয়ে মুখ টিপে হাসলে।

জয়ন্ত আবার মদ ঢালতে লাগল।

ও কি! কি করছ· আবার ঢালছ? আমার সব কথা শোন, কেবল—

ওই কথাটা শুনি না?

অত মদ খেলে শরীর থাকে না—তা জান?

জানি···তাই ত মদ খাই। তোমার প্রাপ্য ত তুমি পেয়েছ।

না পাই নি আমার প্রাপ্য শুধু টাকা নয়···

জয়ন্ত সোজা খাড়া হয়ে বসল: জোরে বললে: মীনা, তুমি কি চাও?

কিচ্ছু না···কিচ্ছু না···

টাকা ছাড়া তোমার আর কি প্রাপ্য আছে?

কিছু না—অভিনয়ের নাম-ডাক···

হঁ!

আচ্ছা তোমার বউ আছে—বউকে বাড়ীতে একলা ফেলে রেখে এখানে এমনি মদ খেয়ে যে পড়ে থাক, বউ কিছু বলে না?

বলে বোধ হয়।

তুমি শোন না—কেন শোন না? বউয়ের কথা শোন না, অথচ আমার কথা ত বেশ শোন, শুধু একটা বাদ···

কি বাদ?

মদ খেতে বারণ করি—তবু মদ খাও।

তুমিও ত খাও।

আমি খাই মিথ্যেকে সত্যি করে দেখাবার জন্যে।

আর আমি খাই সত্যিকে মিথ্যে করবার জন্যে।

না-না শোন, বউকে একলা ফেলে তোমার এখানে থাকা উচিত হয় না।

অনেক উচিতই সংসারে হয়ে ওঠে না···উচিতটা না হয় অমনি চাপাই থাক্।

দেখ, তুমি আমার কাছে চালাকি ক'র না—বউকে হয় তুমি ভালবাস না—নয়···

জয়ন্ত হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে: মীনা! মীনা, ও-সব কথা তু'ল না বলছি···

নিশ্চয়ই তুলব। কেন তুমি বউকে ত্যাগ ক'রে এখানে পড়ে থাকবে, মদ খাবে? তোমায় বাড়ী যেতে হবে···তুমি যদি বাড়ী না যাও···তবে আমি অভিনয় করব না।

অঃ টাকা নেবার আর একটা ফন্ বার করছ দেখছি·· আরও কত টাকা চাই?

তুমি অতি বোকা—তোমাকে এত ক'রে বোঝালে বোঝ না কেন? আমি টাকার জন্যে বলি নি···আমারও যেমন রক্ত-মাংসের শরীর—তারও তেমনি রক্ত মাংসের শরীর—বোঝালে বোঝ না কেন?

হুঁ!·· জয়ন্ত আবার মদ ঢালতে লাগল।

এবার আমি গেলাস টান মেরে ফেলে দেব, খেতে পাবে না··

নিশ্চয়ই খাব···ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও বলছি মীনা···

না কিছুতেই না—আমাকে খুন করলেও আর মদ খেতে দেব না।

মীনা মদের গেলাস কেড়ে নিয়ে সমস্ত মদটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে:

পাশের ঘরে সবাই বসে আছে রিহার্স্যালের জন্যে—গানগুলো ঠিক করে নিতে হবে—আজ বাদে কাল প্লে··· তুমি এখানে পড়ে পড়ে মদ খাচ্ছ·· তোমাকেই বা বলবে কি,

আর আমাকেই বা বলবে কি। একটু যদি ঘটে বুদ্ধি থাকে···চল—চল রিহার্স্যালের পর মদ খেও···

মীনা!

কি?

আমি জয়ন্ত সেন, তোমার আঁচল ধরে আমায় চলতে হবে···নাঃ···

তুমি ত তুমি···শিবকে গৌরীর আঁচল ধরতে হয়েছিল···

মীনা জয়ন্তকে ঠেলে পাশের হল-ঘরে নিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই শশধর চূড়ামণি ওরফে বাঁকা···পঞ্চা—মীনাকে ডেকে বললে:

আরে না—না— জয়ন্ত এখন দেউলে হয়ে পড়েছে। এ একটা মস্ত বড় কাপ্তেন—কিছু নয়, শুধু কথা কয়ে চলে যাবে—আহা···বুঝতে পাচ্ছিস নি···জয়ন্তর কাছ থেকে যা পাবার তা সব হয়ে গেছে। দলবল গেল মাসের মাইনে পায়নি···আজ রাত্রে দেবার কথা ছিল···ভোলা মাতাল বেটাও আসেনি আজ কদিন···টাকা আর কোথায় পাবে? আমার কথা শোন্।

মীনা বললে: কে মানুষটা?

আরে সে বড়লোকের ছেলে···এত লোক চরিয়ে খেলুম বলিস কি, আমি মানুষ চিনি নি আমি তাকে এই ঘরে ওদিক দিয়ে নিয়ে এসে বসাই···তুই একটু সাজগোজ করে নে···ওরা ততক্ষণ দিক না মহলা···তুই সেই ফাঁকে একবার বাজিয়ে নে না লোকটাকে···

মীনা একটু দ্বিধার সঙ্গে বললে:—আর জয়ন্তবাবু যদি কিছু মনে করেন?

আহা—সে আবার মনে কি করবে··· এই তার শশুরের কাছে চিঠি দিয়েছিল, সে এই পাঁচ হাজার টাকার চেক দিয়েছিল তাই শোভাবাজারের গদী থেকে ভাঙিয়ে এনেছি···শশুর কিছু আর রোজ টাকা দিচ্ছে না—থিয়েটারের দলের মাইনে—কালকের সকালবেলার মধ্যে না দিতে পারলে—সে থিয়েটার করা আর হচ্ছে না এই সময়ে এমন একটা লোক—হাতের মধ্যে এসে পড়েছে এ কি আর এখন ছাড়ে—না কি বলে···তুই যা একটু সাজগোজ করে নে—আমি তাকে নিয়ে আসি···যে গাড়ীখানা করে এসেছে···গাড়ীখানা রোলসরইস, কোন্-না পচিশ হাজার টাকা হবে। দেখ না এবার একখানা বাগান আর মোটর ঠিক করে নেব···যা মা যা, একটু শাগ গির···

মীনা চলে গেল ঘর থেকে। বাঁকা-পঞ্চা সেই লোকটাকে আনতে যাবে এমন সময় মীনার মা এসে বললে·

হ্যাগা—ও কে বল দিকিন?

ও একজন মস্ত বড়লোক।

তা ত বুঝলাম; মেয়েকে যখন বোঝাচ্ছিলে তখন সব শুনেছি, কিন্তু এদিকে আবার না গোলমাল হয়।

গোলমাল আবার কিসের···আরে তুমি বুঝছ না ক্ষীরো, এতবড় কাতলা কি হাতছাড়া হতে দেয়—যখন আপনি এসে জালে পড়েছে।

আমি দূর থেকে দেখেছি, আমার কেমন যেন চেনা-চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে।

চেনা মুখ! পাগল হয়েছ—কস্মিনকালের চেনা নয়।

উহুঁ! আমার মনে হচ্ছে এরা সেই রঙপুরের লোক···

আরে পাগল হলে নাকি ক্ষীরো, শোন; আর তাই যদি হয়—সে আজ বিশ বছরের কথা ও চিনতে পারবে না—আমাকে ত সে চিনতে পারেনি। যাক্ সে ভয় ক'র না, এখন মেয়েটাকে একটু তাড়া করে নিতে বলে দাও—আমি যাই তাকে ও পাশের বারান্দায় বসিয়ে এসেছি, নিয়ে আসি।

বাঁকা-পঞ্চা চলে গেলে মীনা ফের ফিবে এসে বললে:

মা! ওঘরে জয়ন্তবাবু রয়েছেন—ওরা সব সুর বাঁধছে, এখনই গানের রিহার্স্যাল আরম্ভ হবে···এখন কি করে কথা-বার্ত্তা কই বল দিকিন্।

তা ত বুঝছি, কিন্তু যখন এসে পড়েছে, এখন দুটো কথা কয়ে আলাপ জমিয়ে নে···তার পর যা হয় হবে।

আমি কোন দিন তোমার কথার ওপর কোন কথা বলিনি, কিন্তু আজ আমার কেমন মনে হচ্ছে—এটা ভাল না—শেষটা ভাল হবে না—না মা, আজ না হয় থাক ··

মীনার কথা শেষ না হতে-হতেই বাঁকা-পঞ্চা মানবেন্দ্রকে সঙ্গে করে ঢুকল। এসেই বললে: আসুন! আসুন! আজ্ঞে আজ্ঞা হোক্—এই আপনি যাকে খুঁজছিলেন ইনিই মীনা···আচ্ছা ক্ষীরো, চল—ওরা বসে একটু আলাপ-সালাপ করুক···

বাঁকা-পঞ্চা ও ক্ষীরো দুজনে তাড়াতাড়ি চলে গেল। যাবার সময় ক্ষীরো দুবার ভ্রূ কুঁচকে আড়ে আড়ে মানবের দিকে তাকিয়ে গেল।

মানব মীনাকে দেখেই চমকে উঠল।

মীনা বললে : বসুন, আপনি যে দাঁড়িয়ে রইলেন

না-না হ্যাঁ বসছি।

মানব একখানা কৌচের ওপর বসল। বার বার মীনার মুখের দিকে সতৃষ্ণভাবে দেখতে লাগল।

অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন কেন? আর কখন এমন দেখেননি বুঝি?

আপনার নাম মীনা?

হ্যাঁ, আমার নাম মীনা; কেন, নামটা আপনার পছন্দ হল না?

না, তা নয়—আমি যা শুনেছিলাম, আপনাকে দেখে তা ত মনে হচ্ছে না।

কি শুনেছিলেন?

আচ্ছা, আপনি আমার একটা উপকার করতে পারেন?

মীনা একটু হেসে বললে: কি শুনেছিলেন তা ত বললেন না, অথচ এসেই একেবারে উপকারের প্রত্যাশা করছেন! আমি আপনার উপকার করব···কি আশ্চর্য্য! আপনি কি আমার কাছে শুধু উপকৃত হতে এসেছেন না কি? আমার এখানে উপকারের প্রত্যাশায় কেউ আসে বলে আমার জানা নেই কিন্তু।

সত্যি, আপনি যদি আমার সে উপকার করেন··· আপনাকে আমি প্রচুর অর্থ দেব।

কি কথাটা শুনি? আপনার নাম কি? অর্থের প্রলোভনে কি সব সময়ই মানুষ উপকার করে?

আমার নাম জেনে তোমার কোন লাভ হবে না, আমি এসেছি আমার এক বন্ধুর জন্যে··

কে আপনার বন্ধু? তিনিই বা কে—আর আপনিই বা কে? কে বন্ধু আপনার?

জয়ন্ত সেন—আমি তার সঙ্গে দেখা করব। আমার নাম মানবেন্দ্র দাশ।

কেন, তাঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার, জানতে পারি কি?

আমি তার স্ত্রীর চিঠি নিয়ে এসেছি। তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

তাতে তাঁর স্ত্রীর উপকার হ'তে পারে—আপনার বন্ধুত্বের কদর বাড়তে পারে, কিন্তু আমার তাতে লাভ কি? আমি কেন সে উপকার করে নিজের অপকার করতে যাব? একজনের উপকার করলেই আর একজনের অপকার করতে হয়।

আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি—আপনি দয়া করে শুধু আমাকে জয়ন্তর সঙ্গে দেখা করতে দিন। এই উপকারটা আমার করুন।

তাই ত একজনের সঙ্গে শুধু দেখা করিয়ে দেওয়ার উপকারের বিনিময়ে আপনি পাঁচ হাজার টাকা দিতে চান, কথাটা একটু যেন কেমন-কেমন ঠেকছে! এর মধ্যে আরও কথা নিশ্চয়ই আছে। ব্যাপারটা কি মানববাবু? জয়ন্তবাবুর স্ত্রী আপনার কে হন?

ব্যাপার, জয়ন্ত ঘর-বাড়ী ছেড়ে এখানে পড়ে আছে—তার স্ত্রী দিনরাত কান্নাকাটি করছে।

বাড়ী ছেড়ে তিনি এখানে আছেন কেন, তা আমাকে বলতে পারেন? তাঁর স্ত্রী আপনার কে হন—তা ত জানতে পারলাম না।

শুনেছি যে, সে নাকি আপনার জন্যেই ঘর-বাড়ী ছেড়েছে। তার স্ত্রী আমার পরম আত্মীয়ারই মত, আমার ছেলেবেলার খেলুড়ি!

আমি তাঁর থিয়েটারের অভিনেত্রী মাত্র—বিশ্বাস করুন, তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। আর আমি কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে বাড়ী ছেড়ে আসার জন্যে অনুরাগ করছিলাম। আমি বুঝতে পারি না—স্ত্রী ঘরে থাকতে তিনি এখানে এমন করে পড়ে থাকেন কেন? আমি যখনই তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা তুলেছি, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে কথা কেবলই চাপা দিয়েছেন।

আপনি একবার আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন—আমি তার স্ত্রীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তাকে বাড়ী নিয়ে যাব যেমন করে পারি।

বাড়ী নিয়ে যেতে পারবেন কি-না তা আমি বলতে পারি না। তবে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তিনি কি যাবেন?

ধন্যবাদ; এই নিন আপনার পাঁচ হাজার টাকা···যদি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দেন তবে আরও অর্থ···

মানব পকেট থেকে এক তাড়া গোছা-করা-নোট মীনার হাতে দিলে।

মীনা হাসতে হাসতে বললে: তা ভাল কথা, টাকা নেওয়াটা আমাদের ডান হাত বাঁ হাত জানতে পারে না; ভোজনের আগেই দক্ষিণে দিলেন যে। আচ্ছা, আপনার উদ্দেশ্য কি? আচ্ছা সত্যি করে বলুন ত···আপনি সত্যি জয়ন্তবাবুর স্ত্রীর জন্য এসেছেন, না—জয়ন্তকে সরিয়ে স্বনামখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রীর জন্যে এসেছেন? আপনার বিয়ে হয়েছে?

মীনার সে কি হাসি আর কি চটুল চপল দৃষ্টি—তার চোখ পর্য্যন্ত তীব্র—জিজ্ঞাসু কৌতূহলে হাসছে।

মানব মীনার আপাদমস্তক ভাল করে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগল, মীনার কথার উত্তর দিল না। মীনার কথার ভঙ্গীতে সে যেন থ-মেরে গেল।

মীনাও আবার চুপ করে মানবের ভঙ্গী লক্ষ্য করে হেসে উঠল: কোন্‌টা উপকার বলুন · সুন্দরী মীনা, না, বন্ধু জয়ন্ত, বলুন · পাঁচ হাজার টাকা অমনি দিলেন: এর মধ্যে কেনা-বেচা নেই? এমন হয় না।

না—বন্ধু জয়ন্তকে দেখা করিয়ে দেবার মূল্য দিলাম। আমি জীবনে কখন এ সব পল্লীতে আসিনি—আপনাদের রীতিনীতি লোকমুখে ও কেতাবে পড়েছি··অর্থ শুধু আপনাদের কামনা, তার জন্যে আপনারা সব করতে পারেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আপনাকে এই অর্থ দিয়েছি···

লোকমুখে শুনেছেন, আর কেতাবে পড়েছেন—এখন ত চাক্ষুস আমাকে দেখলেন·· কথাটা সবই মিল পেলেন ত? অর্থই আমাদের সব চেয়ে বড় ··নইলে কি আর···থাক··· আমরা যে মানুষ নই, এটাও বোধ হয় আপনাদের কেতাবে লেখে···না?···কেতাব-ওয়ালারা মানুষ চেনে কি-না—সেই জন্যে তারা এই সব লেখে।

আচ্ছা, যিনি আপনার বাবা বলে পরিচয় দিলেন, তিনি কি সত্যিই আপনার বাবা?

এ কথা জিজ্ঞাসা করা খুব অবান্তর—কেন, আমার বাবার সম্বন্ধে লোকে ত তাই বলে, আর আমিও তাই জানি। সে বিষয়েও আপনার সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

আশ্চর্য্য!

কি আশ্চর্য্য?

আমার একটী ছোট বোন আছে—আপনার গলার আওয়াজ মুখের-কাট, চোখের ভঙ্গী, গায়ের রঙ—সমস্ত ঠিক তার মত—আশ্চর্য্য আরও যে আপনার ডানদিকের কপালে একটা লাল জড়ুল—থুঁতির নীচে একটা তিল—ঠিক আমার মার মত···আপনার দাঁড়ানর ভঙ্গীটাও ঠিক আমার মার মত।

মানব দেখলে যে তার কথা শুনে মীনার সমস্ত শরীরটা যেন কেঁপে উঠল। সে যেন কেমন হয়ে গেল! কাঁপতে-কাঁপতে বললে—কি বলছেন আপনি! আপনার মা কি বোনের মত আমার চেহারা ব'লে—নিজের মা-বোনের অসম্মান করবেন না মানববাবু—ও কথা বলতে নেই; মহাপাপ হয়··হায়! হায়! আমার আবার মা-বোন্‌। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কথা। যাক্‌, আপনি একটু বসুন। ও-ঘরে গানের রিহার্স্যাল হচ্ছে, আমাকে এখুনি যেতে হবে—আমি একটু পরে জয়ন্তবাবুকে এখানে ডেকে এনে দিচ্ছি—তবে তাঁর স্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে আপনি পারবেন কি-না তা সে আপনি বুঝুন।

আপনি যদি দয়া করে ব্যবস্থা করে দেন—আপনি ছেড়ে দিলেই নিশ্চয়ই সে বাড়ী যাবে।

আমি ছেড়ে দিলেই যাবে? মানববাবু! দুঃখ এই যে, আমাদের সত্যি কথাটাও কেউ বিশ্বাস করে না—আমি সত্য বলছি, আমি তাঁকে আটকে রাখি নি—আর' সত্য কথা, তাঁর সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্পর্ক নেই; বিশ্বাস করুন। আপনি যখন আমাকে ছোট বোনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, তখন আমাকে আপনার ছোট বোন বলেই জানবেন ···আজ এই হঠাৎ-দেখার প্রথমেই আমি আপনাকে মানবদা বলব · আপত্তি করবেন না ত?

মীনা তুমি যাদু···না—না ··আপত্তি করব কেন, তুমি কি কোন মায়াবিদ্যা জান? কেন, তোমাকে দেখে অবধি মায়া হচ্ছে?

না দাদা, মায়াবিদ্যা—ব্যবসার জন্যে শিখতে হয়েছে, কিন্তু জীবনে এই প্রথম দেখলাম, এই প্রথম শুনলাম যে, আমাকে বোন বলে কেউ এক মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহের চোখে দেখলে···ব'স দাদা, তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি খাবে; আমার বাড়ীতে বোন বলে সম্মান দিয়েছ—না খেয়ে ফিরতে পাবে না···মায়াবিদ্যার পরিচয়টা ভাল ক'রেই তবে দেখে যাও।

না-না মীনা, চা আমি খাব না, আমি শুধু জয়ন্তর সঙ্গে দেখা করব।

না খেলে জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হবে না···কিন্তু আর একটা কথা বলে রাখি মানবদা—আমার যেন নতুন সন্দেহ ফিরে না আসে আপনার ওপর।

মীনা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

মানব অবাক হয়ে চুপ করে রইল। সে ভাবতে লাগল —এ কি এই পল্লীর মেয়ে! কি আশ্চর্য্য, এক মুহূর্ত্তে আমাকে যেন কি করে দিলে। আমি যেন সত্যি তার কত আপনার। অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি···না, এও তার একটা মায়া-বিদ্যা···জয়ন্তর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তা কি হতে পারে? মিলনী যা বলেছে, এর কথার ভাবে ত তা কিছুতেই মনে হয় না। না, যারা অভিনয় করে, তারা এই রকম মায়াবিদ্যা জানে। হয়ত অতি বড় ধূর্ত্ত, পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে আমায় ভোলাচ্ছে···আরও হয়ত বোকা বানিয়ে ছাড়বে। মানব হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল রাত ন-টা বেজে গেছে।

বাঁকা-পঞ্চা আবার ফিরে এল। এসেই 555-এর সিগারেটের টীন সামনে খুলে ধরলে।

আসুন—আপনি যে সিগারেট খান—

আমি যে এ সিগারেট খাই এ আপনি কি করে জানলেন?

হে-হে-হে-হে - বাঁকা-পঞ্চা একগাল হাসি হেসে বললে: এটা আর এমন বিচিত্র কি বলুন! আপনারা খানদানি লোক—এ-সব আমার বেশ জানা আছে। আর তা ছাড়া, আমার যে সব দিকে দৃষ্টি আছে—সিগারেটটা যখন সিঁড়ির কাছে ফেলে দিলেন না, তখনি দেখে নিয়েছি যে, 555···

অ···আপনি খুব বিচক্ষণ লোক দেখছি···

ক্রমে আরও দেখবেন, আমাদের সঙ্গে আপনার ভাল রকমের জানা-শোনা হলে ক্রমে ক্রমে আরও দেখবেন—আমরা কি রকম মানুষ···দেখুন তা হলে—আমি ঠিক বুঝেছিলাম, কি-না?

কি বুঝেছিলেন?

যখন জয়ন্ত সেনের সঙ্গে দেখা করার কথাটা বললেন, তখনই জানি আমি—যে আপনি খানদানি লোক; নিজের লক্ষ্য শিকারের কথা গোপন রাখলেন—তাই ত চাই মশাই। এই ত চাই— এ-সব জিনিষ গোপন রাখাই হল সদ্‌বিবেচকের কাজ।·· কেমন কি-না···এসব হল ওই যে আপনাদের কি বলে বিলাস-বিলাস—বুঝছেন না—আর আমার বয়েস হচ্ছে—কথাটা কি জানেন—প্রেমের কথা যত গোপন থাকে ততই সেটা মিষ্টি হয়। হে-হে-হে-হে···কেউ জানবে না···বরং পারেন যদি···পারবেন নিশ্চয়, একখানা নতুন গাড়ী করে ফেলবেন—বুঝলেন না, তখন আর কেউ বুঝতে পারবে না—কে কোথায় আসছে···কেমন কি-না···আর মীনা আপনার সঙ্গে বেড়াতে পারে।

অনেকটা ঠিক বলেছেন, আপনি যে একজন অতি বিচক্ষণ লোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই···দেখুন আপনি ঠিক বলেছেন—সংসারে গোপন করার ক্ষমতাটাই সবচেয়ে বড় ক্ষমতা···বিশেষত প্রেমের কথাটা···

দেখুন: কি করে যে এই মেয়েটাকে মানুষ করেছি সে আর আপনাকে কি বলব। মেয়েটার ভালর জন্যে কি কম করেছি। আপনার কাছে লুকো-ছাপার কি আছে—আপনি এখন আপনার জন···মেয়েটাকে মানুষ করতে পেরায় হাজার দশেক টাকা আমার খরচা হয়েছে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—কয়েক ঘর যজমানী আছে—তাই ভিক্ষে-শিক্ষে করে এতটা করেছি—এই দেখুন না, নান্নে খাঁ সকালে —আর এমদাদ্ হোসেন রাত্তিরে-এই দুটো ওস্তাদ ক'বছর ধরে গান শিখিয়েছে—এখন সে নিজেই একজন ওস্তাদ বললেই হয়। তারপর ধরুন, লেখা-পড়া শেখান—ম্যামরে, ম্যাষ্টোর রে—তয়কা নাচের জন্যে বিন্দাদিনের যে খাটি সাকরেদ—ঘরওয়ানা তাকে রেখেছি। ওর অদেষ্ট ভেবেছিলাম—একটা রাজা-রাজড়ার ঘরে পড়বে···তা হ'ল না, কপাল—কপাল—পেটের দায়ে করতে হ'ল থিয়েটার··· তারপর দুঃখের কথা কি বলব···

বাঁকা-পঞ্চা কান্নার ভঙ্গীতে চোখ মুছে বললে: এখন সে মেয়েও আর আমাকে মানতেই চায় না···

মানব একটু গম্ভীর হয়ে বললে: তাই ত বড় দুঃখের কথা—আপনাকে মানতে চায় না—আর আপনি তার ভালর জন্যে এতটা করেছেন···

অ্যাঃ বল ত বাবা···এখন তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি—তুমি দেখো···আর কি বলব।

তাই ত—তা আপনি আমার হাতেই একেবারে সঁপে দিতে চান না কি?

চাই কি সাধ করে বাবা···ওই জয়ন্ত সেনকে কত বুঝিয়েছি—যে বাবা, তুমি বড় ঘরের ছেলে—বড় শশুরের

জামাই—তোমার এই মাগী-ছাগী নিয়ে থিয়েটার করা কি ভাল দেখায়···শুনলে না,টাকা পয়সা বরবাদ করলে—পয়সার জন্যে থিয়েটারের চাকরী মেয়েকে নিতে হ'ল···নইলে এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি বাবা···মীনা জয়ন্তকে দুটী চক্ষের বিষ দেখে—বিষ—বিষ বললেও কম বলা হয়।···আর টাকা পয়সা যা ছিল সবই শেষ···শুনেছি বউটা, বড়মানুষের মেয়ে হলে হবে কি—মেয়েটাও নাকি একেবারে বিবি কসমের তোমার কাছে বলতে কি বাবা—আমি শুনেছি বউটা না কি থাক্‌গে···থাক, বড়ঘরের কথা—আলোচনা না করাই ভাল।

হুঁ। আচ্ছা, জয়ন্তর বউ সম্বন্ধে এ-সব কথা আপনি কি করে জানলেন ?

হে-হে-হে-হে বাবা, আমি শশধর চূড়ামণি—যজমানী করে খাই—মানুষ চিনি··বউ ভাল হলে কি আর কেউ ঘর ছেড়ে এমন করে বেড়ায়··বাবা বুড়ো হয়ে গেলাম, সংসারটাকে ত ঘেঁটে-ঘুঁটে—ডালঘোঁটা করে দেখেছি··· এখন শুধু নিমতলার চচ্চড়ি রাঁধতে বাকী···বুঝলে বাবা !

মানব বাকা-পঞ্চার কথার ভাবভঙ্গীতে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। একবার ভাবলে লোকটাকে দুই দাব্‌ড়ি দিয়ে দেয়—আবার ভাবলে, না আমি এসেছি জয়ন্তকে নিয়ে যাবার জন্যে—মিলনীর সম্বন্ধে এই সব ঠারে-ঠোরে অকথা কুকথা শুনে তার এতই বিরক্তি হতে লাগল যে, সে নিজের ভেতরে রাগে ফুলে ফুলে উঠছিল। অথচ বাইরে তার প্রকাশকে অতি সতর্কতা ও সংযমের সঙ্গে নিজেকে রোধ করে রইল। রাগের ভাবকে চেপে রেখে সে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে :

আচ্ছা···দেখছি আপনি যখন এত রকমের খবর জানেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—জয়ন্তর এই থিয়েটারের ব্যাপারটা কি বলতে পারেন ?

হুঁ হুঁ ! থিয়েটার করা কি ওর কাজ। বলে আঠে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার ওপর চড়—বুঝলেন কি-না··· থিয়েটার একটা বড় ব্যবসা—ব্যবসা যারা করে তারা কি ওই ভোলা মাতালের হাতে ভার দেয় ? বলে ডাইনের হাতে পো-সমর্পণ।

আপনি ভোলা মাতালকে চেনেন ? সে মাতালটা এখানে কি করে.?

কিছু না ; শুধু মদ খায় আর কেলেঙ্কারী করে—ও-ই ত টাকাগুলো বরবাদ করে দিলে মশায়···

কি রকম ?

কেশ কেশ মদ···কেবল হুল্লোড়···এদিকে দানছত্তরের মত টাকা ছড়িয়ে দিলে···আজ তিনটে মাস ধরে এই করছে —থিয়েটারে ত ওই রকমই—আবার এখানে এসে কি হুল্লোড় দেখুন না ; ওই পাশের ঘরে মহলা দেবার আসর বসেছে···আপনি যখন এসেছেন তখন দেখবেন কাল আমি সব সাফ করে দেব···আর জয়ন্তকে এখানে ঢুকতে দেব মনে করছেন · হেঁ-হেঁ···পঞ্চু শর্ম্মা এমন লোক নয়···

পঞ্চু শর্ম্মা আবার কে ?

ও আমার একটা ডাক নাম আছে। হে-হে-হে···আমাকে সবাই 'পাঁচু' ঠাকুরও বলে··· আমার নাম হোল শশধর চূড়ামণি··অই অই · শুনুন গান···অই···রোজই এক বেটী ফুলঅলী আছে সেটা ফুল বেচে আর নাচ গান করে··· বেশ দু-দশটাকা কামিয়ে নেয়। আরে ফুল আজ ফুটলে কাল শুখিয়ে যায়—তা এদের রোজ ফুল চাই, ফুলের মালা চাই—আর রোজ সকালে ফেলে দিতে হয়···আচ্ছা দেখুন এদের বুদ্ধি, রোজ পাঁচ-সাত-দশ টাকার ফুলই কিনছে··· এমন করলে পয়সা থাকে···দেখুন জয়ন্তর ত আর রোজগার করা টাকা নয়, কাজেই টাকায় ওর কোন দরদ নেই··· কত রকমে বারণ করেছি মশায়···বুঝলে বাবা···কে কার কড়ি ধারে—ন দেবায় ন ধর্ম্মায়···

মানব খানিকক্ষণ চুপ করে বললে :

আচ্ছা জয়ন্তকে এখান থেকে সরাবার কি হবে বলুন দেখি ? কথাটা বুঝছেন ত ?

আহা সে আর আমি বুঝি নি ··সে না গেলে আপনার অসুবিধা, এই ত ? সে দেখুন না, আপনি কাল থেকে দেখবেন—এ বাড়ীর ছায়া ওকে মাড়াতে দেব না—আর ওই যে থিয়েটারের দল—ওদের তাড়াতে কতক্ষণ···তার-পর আপনারই রাম-রাজত্ব—বুঝলে না বাবা···একেবারে রাম-রাজত্ব।

তা বুঝলাম কিন্তু তাড়াবার উপায়টা কি ?

সেজন্যে আপনি ভাববেন না—ভাববেন না···আমার মেয়েটী অতি বুদ্ধিশীলা—সে ঠিক তাতে রাস্তা করে দেবে— আপনি যদি বলেন···যদি আমার মেয়ের সব ভার নেন—

আমি এখুনি তাকে বলছি···এখুনি···আপনারা হলেন খানদানী লোক···আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত ; এই ধরুন, আমার এই বাড়ীখানা হাজার পাঁচেক টাকায় বাঁধা··· মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে মানুষ-মনুষ করতে কত ব্যয়ই না হয়েছে—তারপর আপনার মত লোকের এখানে গতাগতি করতে হলে—দুটো চাকর দরকার, ফাইফরমাস আছে—একটা গুরখা দরোয়ান রাখতে হবে—কি বলেন—অ্যাঁ সাবধান হওয়া ভাল···মেয়ের গায়ে পাঁচখানা সোনা-দানাও ত দিতে হবে। তারপর ধরুন, মাসিক খরচ আছে—রোজই যেমন সূর্য্যি ওঠে রোজই তেমনি ক্ষিধে ত পায়···তারপর আমরা দুটো বুড়ো-বুড়ী—আমাদের কথা ছেড়ে দিন··· আমাদের দু মুঠো আলো চাল আর কাঁচকলার পিণ্ডি হলেই চলে যাবে···সেজন্যে ভাববেন না···মেয়েটার কি জানেন ভাল খেয়ে-পরে মুখ খারাপ হয়ে গেছে···কাজেই বুঝছেন তো··জয়ন্তকে সরাবার কথা বলছেন—ও ত আপনি যদি দয়া করে সব ভার নেন···তাহলে তুড়ি মেরে তাড়াব—দেখুন না···আজই—কাল সকালে সূর্য্যি ওঠবার আগেই ওকে সরিয়ে দেব···সেজন্যে কিছু ভাববেন না···এখনই আপনি বললেই হয়—

মানব একটু ভুরু কুঁচকে বললে···আপনার মীনার সঙ্গে তার যে রকম ভাব শুনেছি···

বাঁকা-পঞ্চা হাসতে লাগল—মাড়ি বার করে বললে :

হা হা হা হা—আপনার মনের মধ্যে যে এ রকম একটা সন্দেহ দেখা দেবে—এ আমি আগেই জানতাম—তাই ত হয়···ভালবাসার ঝোঁক যখন মানুষের ঘাড়ের ওপর ভূতের মত চাপে—তখন ও হতেই হবে, হতেই হবে। তবে কথাটা কি জানেন··মীনা আমার শত্রু মুখে রসগোল্লা দিয়ে অতি সৎ মেয়ে—যখন যার কাছে থাকে তখন সে-বই আর কাকেও জানে না—তখন অন্য কাকেও একেবারে যেন চেনেই না··আপনি পরখ করেই দেখুন না কেন···

এমন সময় মীনা একখানা রূপোর থালায় ফল মিষ্টান্ন ও রূপোর পেয়ালায় চা নিয়ে এল :

বাঁকা-পঞ্চা দেখেই বলে উঠল : দেখলেন ত যা বলেছি তা ঠিক কি-না—আমার কাছে সাঁচ্চা কথা পাবেন—ঝুঁটো কথা বলতেও যেমন নারাজ—তেমনি শুনতেও নারাজ·· আচ্ছা মা, তুমি তাহলে ওঁকে একটু যত্ন-আয়িত্বি কর হেঁজি-পেঁজি ঘর নয়—ঘরওয়ানা ঘরের ছেলে, বুঝলে··আমি একবার সংবাদটা নি ভোলা মাতালটা এল কি-না—আসে নি বোধ হয়··আপনি তাকে চেনেন না—সে একটা পগেয়া হারামি। যেমন চেহারা—তেমনি বুদ্ধি···যার খায় তারি সর্ব্বনাশ করে। আপনাকে সকল কথা বলতে লজ্জা করে··· আচ্ছা তা'হলে আমি ঘুরে আসি। মেজাজটা ভাল নেই··· দেখো মা, বড়ঘরের ছেলে—যেন যত্ন-আয়িত্বির ক্রটি না হয়···যোগ্য লোকেই যোগ্য লোকের কাছে আসে—দরদ কর মা, দরদ কর···তোমাকে আর বেশী বোঝাতে হবে না। তোমার কত ভাগ্য যে ওঁর মত লোকের চোখে পড়েছ। এ নেক-নজর যেন নজরে নজরে থাকে। ক্রমেই বুঝবে যা বললাম।

বাঁকা-পঞ্চা চলে গেলে মানব মীনার দিকে চেয়ে বললে : প্রথমত এ-সব খাবার আমার সময় নেই—দ্বিতীয়ত এই সময় আমার খাবার সময় নয়—তৃতীয়ত···

কথা বলবার আগে মীনা মুখখানা নীচু করে নিঃশ্বাস ফেললে : তার পর বললে :

তৃতীয়ত আমার হাতের খাবার—আমার এই জায়গায় —খাওয়া আপনার উচিত নয়···এই কথা বলবেন ত ?

মানব দুঃখিত হয়ে বললে : না বোন, কোন কথাই আর বলব না।

মানব নিঃশব্দে সমস্ত খাবার ও ফল নিঃশেষ করে চায়ে চুমুক দিয়ে বললে :

ভোজনের আগে ত তোমায় দক্ষিণা দিয়েছি—আমার ভোজনের পরে দক্ষিণা দেবে ত ?

মীনা হাসতে হাসতে বললে : আগে ভোজন শেষ হোক।

মানব রুমাল দিয়ে মুখ পোঁছা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে মীনা গলায় কাপড় দিয়ে মানবের পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে : এই আমার দক্ষিণা··আশীর্ব্বাদ করলে না দাদা ?

মানব অভিভূত হয়ে বললে : কি আশীর্ব্বাদ করব বোন—ভাবা খুঁজে পাচ্ছি নি চিরায়ু···

মীনা মানবের কথা বলতে না বলতেই হেসে বলল :

আশীর্ব্বাদ কর যেন মীনার শীগ্‌গির মরণ হয়··শীগ্‌গির মরণ হয়···

শোন মীনা—শোন বোন, শোন···

মীনা মানবের কথা কানে না তুলে ঘর থেকে চলে গেল। মানব অবাক হয়ে শুধু দূর আকাশের দিকে চাইলে। সন্ধ্যা থেকে যে বৃষ্টি ও জোলো হাওয়ার সঙ্গে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে রেখেছিল—তখনও ঠিক তেমনি সার্সীর ভেতর দিয়ে গ্যাসের আলো ঝাপসা দেখাচ্ছে। তেমনি বৃষ্টির টিপ্ টিপ্ ঝিম্ ঝিম্ শব্দ—পাশের ঘর থেকে নাচের সঙ্গে গানের সুর ভেসে আসছে···

ফোটা ফুলের মালা নিবি কে
নিয়ে ফুলের ঝারী ফুল-পসারি
ইসারাতে যাই ডেকে
ফোটা ফুলের মালা নিবি কে ?
চুমে চুমে চামেলী কলি
গেঁথেছি ফুলের কাঁচলি
পরলে বুকে নাগর ঝুঁকে
পায়ে পড়ে ঢলি
বোঁটায় তোলা গোলাপ বেলা
বুক ফেলেছে ঢেকে
ফোটা ফুলের মালা নিবি কে ?

গান গাইবার যথেষ্ট কায়দা আছে—সুরের কর্ত্তবও আছে বেশ, কিন্তু মানবের কানে গায়িকার গলার সুর তেমনি মিঠে বলে লাগল না। মানবের কানও আর সেদিকে গেল না সে কেবলই ভাবতে লাগল—এটা কি হ'ল—এখানে এসে কি আমি আবার কোন ফাঁদে পড়লাম নাকি ? না এ মেয়েটা—এই মীনা এক আশ্চর্য্য বস্তু···চকিতের মধ্যে সে আমাকে কি পরিমাণ আপনার করে নিয়ে ফেললে··· ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বুঝতেই দিলে না—যেন হাওয়ায় একেবারে দুলিয়ে নিয়ে ভুলিয়ে দিলে। কি আশ্চর্য্য··· ক্রমশঃ

রহস্যস্তনিততীরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কত যে স্বজন বিশ্বে বিভীষণ সম বন্ধু করে সর্ব্বনাশ,
তরনী হারায় তনু, সরমার ঝরে অশ্রু তনয়ের শোকে !

মানব-প্রধান কত রামচন্দ্র সম আজি এ অনন্ত লোকে
কিষ্কিন্ধ্যার অধীশ্বরে বধ করে বিনাদোষে মনো অভিলাষ
পুরাইতে আপনার,—তারার হৃদয়ে জ্বালে চিতার অনল !
আমি তাই ভাবি মোর প্রাণ-যাত্রাপথপ্রান্তে রাখি অশ্রুজল।

কত যে শকুনী রহে সত্যের সংহার লাগি দুর্য্যোধন সনে,
পার্থসারথীর সম সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে নানা ছল করি
কত নর ধর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ করে নীতিধর্ম্ম—কাঁদে রাজ্যেশ্বরী
আমি ভাবি প্রাত্যহিক জীবনের রূপায়িত প্রতি সন্ধিক্ষণে।

রহস্যস্তনিততীরে স্তিমিত মঙ্গলদীপ মাগি পরাজয়,
রক্তের কল্লোল গান স্বার্থের সংঘাতে শুনি
জেগে ওঠে ভীতি,
যীশু ও নিমাই বুদ্ধ তবু আসে যুগে যুগে শুনাইতে নীতি,—
কে শোনে তাদের বাণী-বিশ্বপ্রেম !—সবলের
হেরি অভ্যুদয়।

কোথায় অন্যায় আর কোথা রহে ন্যায়ধর্ম্ম—বল বন্ধু মোরে,
স্বার্থ বিনা মানবেরে কোথা নর বাসে ভালো
আপনার ক'রে !



ফিলিপাইনে বাঙ্গালী পর্য্যটক

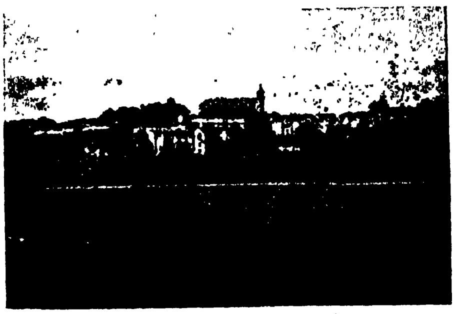
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

দীর্ঘ দিনের ভ্রমণে মন ও শরীর যেন ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছিল, তাই কয়েক দিন পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে এক সুপ্রভাতে মেনিলা থেকে রওনা হলাম বাগিওর দিকে। বাগিও মেনিলা থেকে প্রায় দেড় শত মাইল দূরে। পাঁচ-হাজার ফিট উচ্চে এক রমণীয় পাহাড়শ্রেণী বেষ্টিত ছোট্ট একটি সমতল ভূমিতে এ স্থানটি অবস্থিত। এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া বিদেশী পর্য্যটকদেরও মুগ্ধ করে।

পথিমধ্যে ছোট্ট দুটি শহর সান্‌ফারনন্দ ও তারলাকে থেকে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় বাগিওতে পৌছলাম। শহর দুটি ছোট হলেও তাদের অধিকাংশ অধিবাসীই বিদেশী, এবং বিদেশীয়দের মধ্যে অধিকাংশই চীনা, অবশ্য অল্প কয়েক-জন ভারতীয়ও আছেন। তারা সকলেই সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসী, সিল্কের ব্যবসা করেন।

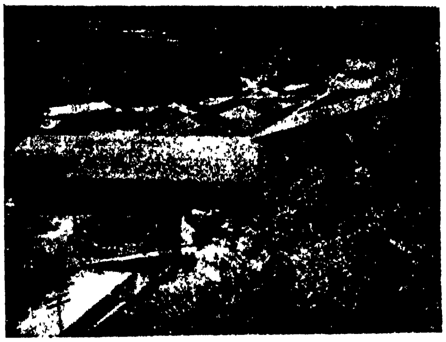
ফিলিপাইনের সুদূরতম পল্লীতেও চীনারা বাস করে। তাই এদেশকে দেখলে মনে হয়, এ যেন চীন দেশেরই একটি অংশবিশেষ। এদেশে অনেক ভারতীয়ও আছে, তাদের সংখ্যা কম হলেও প্রায় চারশ। তবে তারা এখানকার চিরস্থায়ী বাসিন্দা নয়। কিন্তু চীনাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা প্রায় তিন-চার শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসে ও সেই



বাগিও ও বড় পুকুর

থেকে এখানেই বসবাস করছে। এদেশে জাপানীও অনেক আছে। তাদের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত।

ফিলিপিনো বললে সাধারণত যাদের আমরা বুঝি, তারাও অবশ্য খাঁটি ফিলিপিনো নয়। সভ্য ফিলিপিনো প্রায় সকলেই মালয়বাসীদের বংশধর। তারা গত ১৪০০ খৃঃ



বালতক সোনার খনির কারখানা

অব্দে ও তার পূর্ব্বে এসে এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং এজন্যই এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লোকদের আচার ব্যবহার ও ভাবে পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়।

খাঁটি ফিলিপিনো হচ্ছে এটাস্‌রা। তারা আজও অসভ্য। দেশের সুদূর অঞ্চলে পাহাড়ে তারা বাস করে। অজ্ঞানতা ও অসভ্যতার অন্ধকারে তারা আজও আছে। সভ্যতার সংস্পর্শ বোধ হয় তাদের ভাল লাগে না। তাই তারা কখনও সভ্য লোকালয়ে আসে না।

এদেশের অধিকাংশ লোকই খৃষ্টান, তবে কিছু মুসলমানও আছে। মুসলমান হলেও পর্দ্দা প্রথার মত পালনীয় অনেক কিছুই তারা পালন করে না। এখানেও আমাদের দেশেরই মত বহু কথ্য ভাষা আছে যার সংখ্যা প্রায় আশী। এর মধ্যে প্রধান ভাষাই হচ্ছে দশটি যার সাহিত্য আছে। তবে প্রত্যেক ফিলিপিনোই, সে শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক, ইংরেজীতে মাতৃভাষার মতই কথা বলতে পারে। এজন্যই এদেশের সুদূর পল্লীতেও কোন

ইংরেজী জানা বিদেশীকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। অনেকে স্পেনিশ ভাষাও বলতে পারে।

ফিলিপাইনে দীর্ঘ চারিশত বৎসরের স্পেনীয় রাজত্ব এক বিভীষিকাময় যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পিতামহ, প্রপিতামহগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় তাদের বংশধররা আজ স্পেনে করছে! ফিলিপিনোরা সুদীর্ঘ চারি শত বৎসর ধরে পেয়েছে তাদের কাছ থেকে শুধু অত্যাচার ও অপমান। আর এদেরই জন্য আমাদের আজ কত সহানুভূতি! আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, ইউরোপের যে-কোন দলেরই লোক, সে গণতান্ত্রিকই হউক, আর স্বেচ্ছাচারী আমলাতান্ত্রিকই হউক, অপরকে পদানত করতে কিংবা রাখতে গিয়ে সকলেই তাঁরা ভাই ভাই। ইউরোপীয় গণতান্ত্রিকরাও আসলে স্বেচ্ছাচারী আমলাতান্ত্রিকদেরই মত, কেউ কারুর চেয়ে বিশেষ উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট নয়। এজন্যই দেখতে পাই—গণতান্ত্রিক ফ্রান্স ও ব্রিটেনের অধীন দেশসমূহের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা স্বেচ্ছাচারী আমলাতান্ত্রিক জাপানের অধীন রাজ্যসমূহের অবস্থারই মত।



পাহাড়ীয়া ইগ্রট জাতি

ফিলিপাইন যখন স্পেনীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে আমেরিকার অধীনে যায়, তখন সেখানকার শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল, সমগ্র দেশে শিক্ষার জন্য তখন ছিল মাত্র দু হাজার এক শ ষাটটি নিম্ন ও চল্লিশটি উচ্চ বিদ্যায়তন ও একটি ছিল মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। আর আজ এদেশে আছে' আটচল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়, তিন শ অষ্টাশীটি উচ্চ ও ছ হাজার সাতশ'টি নিম্ন বিদ্যালয়। বর্ত্তমানের ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ১৩,২৫,৫২১ জন, অথচ এদেশের লোকসংখ্যা হচ্ছে মাত্র ১,২০,০০,০০০। এই সংখ্যা থেকেই সম্যক উপলব্ধি হয়, আমেরিকানরা তাদের মাত্র চল্লিশ বৎসরের শাসন কালেই শিক্ষার দিক থেকে এদেশে কি করেছেন। স্পেনীয় আমলে এদেশ ছিল ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের লীলানিকেতন আর আজ ঐ সকল রোগ এখান থেকে চিরনির্ব্বাসিত। আমেরিকানরা এদেশে রাস্তাঘাট ও রেল নির্ম্মাণ করে যাতায়াতের সুবিধা করে দিয়েছে। ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল হয়েছে। তবে আমেরিকানদের বড় দান হচ্ছে—এদেশের লোকদের হাতে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ এবং তার জন্যে ফিলিপিনোদের কোনও রকম ত্যাগস্বীকারই করতে হয়নি, অথচ স্পেনীয় শাসনকালে স্বাধীনতার জন্য তাদের কতই না দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে!

বাগিওতে পৌছে একজন সিন্ধি ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করলাম। এখানেও চার-পাঁচজন ভারতীয় সিল্ক ব্যবসায়ী আছেন। প্রাচ্যে সিল্ক ব্যবসায় যেন ভারতীয়দেরই একচেটিয়া।

প্রতি সপ্তাহে এখানকার হাটে যখন বহু দূর দূরান্তর থেকে কৌপিন পরা অসংখ্য পার্ব্বত্য অধিবাসী এসে স্থানীয় সভ্য অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন এক অভিনব দৃশ্যেরই সৃষ্টি হয়। এই সকল নেংটা পার্ব্বত্য লোকের আকৃতি প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয় অনগ্রসর পার্ব্বত্য জাতির লোকদের আকৃতি প্রকৃতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন সিলিবিসের, তেমনই সুমাত্রার পার্ব্বত্য অধিবাসীদের মধ্যেও ঐ একই রূপ সাদৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করেছে। এদের পরস্পরের মধ্যে কখনও কোনরূপ যোগসূত্র বর্ত্তমান ছিল বলে ত জানি নে, মানুষ জন্ম গ্রহণ করেই বোধ হয় প্রকৃতিগত কতকটা ঐক্য নিয়ে।

এখানে যে কয়দিন ছিলাম, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজবে দিনগুলো আমার বেশ কেটে গেল একান্ত নিশ্চিন্ততার মধ্যেই। একবার ভুলেও মনে হত না যে, আমি দেশ থেকে দূরে, বহু দূরে আত্মীয়স্বজন বিরহিত অবস্থায় আছি। বোধ হয় নিজের অন্তরালেই নিজেকে এমনিভাবে গড়ে তুলে-ছিলাম। যেখানেই যেতাম, অসংখ্য বন্ধুবান্ধব আমার জুটে যেত, আর তাদের ভালবাসার মধ্যেই যেন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, এমনি করেই বিদেশীদের মধ্যে আমার দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস একরূপ অলক্ষ্যেই কেটে যেত।

একদিন আমেরিকান এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি ছিলেন বাল্তক সোনার খনির একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। এই সোনার খনিটি শহর থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে। আমাদের আলাপ পরিশেষে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাতেই পরিণতি লাভ করেছিল। বিদায়কালে তিনি আমাকে তাঁদের খনিটি দেখবার জন্যে অনুরোধ করলেন এবং আমিও তাঁর এই অনুরোধ সোৎসাহে গ্রহণ করলাম।

সেখানে পৌছতেই ঐ ভদ্রলোক তাঁদের প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধই হয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম কারখানাটি দেখতে। তিনি



বাগিওতে পৌছিবার মোটর রোড

আমাকে বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখালেন। কি করে সোনা মিশ্রিত পাথরগুলোকে পাউডার করা হয় ও কি করে সেগুলো থেকে জলের সাহায্যে স্বর্ণ-কণাগুলিকে বার করা হয় এবং কি করেই বা স্বর্ণ-কণামিশ্রিত জল শুকিয়ে



জাপানী বন্ধুর সহিত জাপানী পোষাকে লেখক

অপরিষ্কৃত স্বর্ণ তৈরী হয়—এ সকলই তিনি আমায় দেখালেন।

এই সোনার খনিটি বেশ বড়। কারখানাটি খনি থেকে প্রায় চারি মাইল দূরে। খনিতে প্রায় পাঁচ হাজার ফিট নীচু থেকে স্বর্ণমিশ্রিত পাথর উঠান হয়। এখানে সোনা রিফাইন করা হয় না। রিফাইনের জন্য স্বর্ণ খণ্ড-গুলিকে কালিফর্নিয়ায় পাঠান হয়। এই সোনার খনিতে প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষ ডলারের স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। এখানকার কর্ম্মচারী ও কুলী প্রায় সকলেই আমেরিকান। ফিলিপাইন দেশ হিসাবে ক্ষুদ্র হলেও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী।' এখানে

বহু সোনার খনি আছে। বাগিও শহরটি ছোট, মাত্র কয়েক হাজার লোকের বাস। তা'হলেও শহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘর-দুয়ারগুলোর কোনটিই খারাপ নয়। পাকা বাড়ী। রাস্তাগুলিও সব পিচের। শহরের পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ ফুলের বাগান ও পুকুরটি শহরের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করেছে। এর আবেষ্টনগুলিও বেশ চিত্তাকর্ষক। এ যেন কবিদেরই উপযুক্ত স্থান! এটি শহর বটে, কিন্তু এতে নেই শহরের কোলাহল ও গাড়ী ঘোড়ার ঘড়ঘড়ানি শব্দ, অথচ এতে আছে গ্রামের নিস্তব্ধতা ও শহরের সকল প্রকার সুখ সুবিধা। এর অদূরে একটি উচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় রয়েছে এখানকার মানমন্দির। সেখান থেকে তাকালে নয়ন সার্থক হয়—



পার্ব্বত্য অধিবাসীদের নৃত্য

মনোরম দৃশ্য দেখে দর্শক তার সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। এ যেন সত্যই স্বর্গ!

এই শৈলাবাসে কয়েক দিন থেকে মেনিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম, বাগিওতে পৌছতে সুউচ্চ পাহাড়গুলো ডিঙিয়ে যেতে যেরূপ বেগ পেতে হয়েছিল, এবার নামবার পথে আর সেরকম কষ্ট পেলাম না, বরঞ্চ পাহাড় থেকে নামতে আরামই বোধ করলাম বেশী। কিন্তু পথিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে আমার মনের কোণে একটি উদ্বেগ ও অশান্তিরই সৃষ্টি করল, যখন পাহাড় থেকে নামছিলাম, তখন রাস্তার একটি মোড়ে জনকয়েক লোক আমায় হঠাৎ আক্রমণ করে আমার টাকা-পয়সা সব লুট করে নির্ব্বিবাদে প্রস্থান করল। আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুধু তাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করলাম। বহুক্ষণ এমনিভাবে কেটে গেলে আমার যেন চেতনা ফিরে এল, বিমর্ষ চিত্তে আবার রওনা হলাম ও সেই সন্ধ্যায়ই তরিলাকে পৌছলাম, সেখানে সোজা থানায় গিয়ে নালিশ করলাম, কিন্তু ফল কি হল—ফিলিপাইন ত্যাগ করবার পূর্ব্বে তার কিছুই জানতে পারলাম না।

এদেশে পৌছবার মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বেই ফিলিপাইনে আমেরিকার অধীনে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হয়। আমি তখন জাপানে। সেখানে আমরা ভারতীয়েরাও ফিলিপাইন-দিবস উদ্‌যাপন করে ফিলিপাইনের প্রথম নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ মেনুয়েল কেজনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তার করেছিলাম। ফিলিপাইনের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র ১৯৩৫ সনে মাত্র দশ বৎসরের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়, এবং এই হল পূর্ণ-স্বাধীনতার পূর্ব্বাভাষ। বলা হয়েছিল, দশ বৎসর পর, অর্থাৎ—১৯৪৫ সনে ফিলিপাইন পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু আজকাল শুনছি, ১৯৪৫-এর অনেক পূর্ব্বেই, অর্থাৎ—১৯৪০-এর কাছাকাছি কোন সময়ে ফিলিপাইন সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। ইহা আমেরিকানদের সহৃদয়তাই বটে। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন, আমেরিকা নিছক সদিচ্ছা বশেই বিনা রক্তপাতে ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিচ্ছে না—তাঁরা দিচ্ছে শুধু জাপানের ভয়ে। তা ছাড়া ফিলিপাইনে তাঁদের লাভ থেকে নিজেদের ক্ষতিই বেশী হত, ফিলিপাইনেও রাজনৈতিকগণের অনেকেই আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না। কারণ ফিলিপাইন কখনও জাপানের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না—এটা তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং এরকম বিশ্বাস করবার অনেক কারণও বর্ত্তমান।

ডক্টর কেজনের বিরুদ্ধবাদী দল দুটি। একটি হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টি ও অপরটি হচ্ছে সাক্‌দালিষ্টা পার্টি।

শেষোক্ত দলের অধিনায়ক হচ্ছেন মিঃ রামোস। ইনি জাপানে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইনিই গত ১৯৩৫ সনের ২রা মে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা করেন, কিন্তু তা গবর্নমেণ্টের ক্ষিপ্রকারিতায় বিশেষ কার্য্যকরী হয় নি। তিনি অকৃতকার্য্য হয়ে জাপানে পালিয়ে যান এবং সে থেকে তিনি সেখানেই আছেন। বর্ত্তমানে জাপান থেকে তিনি ফিলিপাইনে বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াসে আছেন। তাঁর দেশের অনেক লোক তাঁকে জাপানীদের ক্রীড়নক বলে সন্দেহ করেন। আজকাল আর ফিলিপিনোদের উপর তাঁর প্রভাব বিশেষ নেই।

অপর দলের নেতা হচ্ছেন মিঃ কাপিটাং কুলাস এন-কাল্লাডো। এর অন্যতম নেতা মিঃ তিউভোরো আসেডিল্লো দীর্ঘ ষোল মাস গবর্নমেণ্টের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে গত ১৯৩৫ সনের শেষ দিন একটি খণ্ড যুদ্ধে নিহত হন। এদেশের লোকদেরও আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় এবং এজন্যই গবর্নমেণ্টের শত অত্যাচার সত্ত্বেও জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল তাদের সাম্যবাদী বন্ধুদের উপর।

একে একে অনেক দিন চলে গেল, তারপর এক দিন সত্যিই জাহাজে চড়ে চললাম সিলিবিস্ দ্বীপে যাব বলে। এপথে একটি মাত্র কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করে এবং এজন্যই যাত্রীদের নির্য্যাতন করবার সুযোগ পায়। নিয়ম আছে কোন বিদেশী, অবশ্য চীনা ছাড়া, জাহাজের প্রথম শ্রেণী ব্যতীত অন্য ক্লাসে ভ্রমণ করতে পারবে না, তবে জাহাজের কাপ্তেনের অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভ্রমণ করা যেতে পারে। আমিও এ আইনের ভিতরেই পড়ি, তাই কাপ্তেনের অনুমতি নিয়ে আমি অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণীরই যাত্রী হলাম।

জাহাজ ছাড়বার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র-সংঘের সভাপতি মিঃ শোষণ সিং প্রভৃতি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজবে কেটে গেল। কিন্তু বিদায়ের



পার্ব্বত্য অধিবাসীদের ঘরবাড়ী

সময় যখন এল, আমি যেন বদলে গেলাম। আমার মুখে যেন আর হাসি এল না, তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভীষণ নিঃসঙ্গ অনুভব করতে লাগলাম। পৃথিবীর নানান দেশে বিক্ষিপ্ত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কথা যখন আজও মনে হয়, আমি তাদের দেখবার জন্য চঞ্চল হই, অস্থির হই। মনে কোনও শান্তি পাই নে। ভাবি স্বজনবিরহিত অবস্থায় থাকা যেন একটা অভিশাপ।

বঞ্চিত

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বড়ুয়া

সে কুঞ্জ শুকায়ে গেছে অনুদার ঋতুর আঘাতে।
ফাল্গুনি পূর্ণিমা প্রাতে
ফোটে নাই লীলা শতদল
সঞ্চিয়া রাখিতে পরিমল।

স্বর্ণআভা প্রজাপতি ফুলমধু আশে
যদি কভু আসে,
শূন্য মোর সেই পাত্রখানি
সম্মুখে ধরিব আনি।

পূর্ণ হবে জীবনের যাহা-কিছু মৌন সম্ভাবনা,
ছলনার হীন ছলে লভিয়াছে চির-প্রবঞ্চনা।

সমস্যা

শ্রীসুকান্তকুমার হালদার

শুনেছি পুরো নামটি কুঙ্কুম। ছোট হ'লেও নামটির ক্ষুদ্রতম সংস্করণই সকলের মুখে মুখে ঘোরে। ছোট যারা তারা বললে: কুমিদি, বাসন্তী শাড়ীতে তোমাকে মানায় ঠিক যেন সরস্বতী। কুমিদি হেসে উঠল সকৌতুকে, বললে: আমার বীণা কই রে? উত্তর পেলে সমবয়সীদের মুখে। কুমিদির সমবয়সী—অর্থাৎ যাদের কথার ফলে পুরোপুরি পাক ধরেনি এখনও, রসে রয়েছে কিন্তু অম্লতার স্বাদ, তারা বললে: তোর কণ্ঠেই যে বীণার আভাস মেলে; বীণার আর যেটা বাকী থাকে সেটা তো বোঝা; তাও খুঁজলে পাওয়া যাবে তোর দেহে। হ্যাঁ ভাই কুমি, রূপের সঙ্গে রূপকের মিল ঘটাতে চাস্ বুঝি? কুমির মুখ রাঙা। মনে মনে কথাটা নিশ্চয় ক'রে জানে ব'লেই অভিনয় ক'রে মুখে বললে: হ্যাঁ, তা বই-কি! কুমি অনিচ্ছায় বেরিয়ে গেল ঘরের থেকে।

আমি কুমি বলি না; ওটা সাধারণের। কু—ঙ্কু—ম, ছন্দ আছে কিন্তু একটু দীর্ঘ, আমি বলি কুমু। বললাম: তোমার চিঠি পেয়েছি, কুমু, তাই আমায় আসতে হ'ল। পাশে দাঁড়িয়েছিল কুমুর ছোট ভাই; বয়সে কম হ'লেও বুদ্ধি কিছু তার কম ছিল না। আমার কথা শুনে ঠোঁট চেপে সে একটু হাসল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কুমু কেঁপে উঠল মুখ রাঙা ক'রে। মাথা নীচু ক'রে স্পষ্ট অথচ মৃদুস্বরে উত্তর দিল:

গল্পটি এই অবধি লিখিয়াছি। কিন্তু লিখিয়া এক মহাসমস্যার মধ্যে পড়িয়াছি। অর্থাৎ কুমিকে দিয়া এখন কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। আপনারা বলিবেন, ঢের কথা আছে; এতটুকু লিখিয়াই যদি সামান্য একটি কথার জন্যে সমস্যার মধ্যে পড়িতে হয় তো আপনি লেখা ছাড়িয়া দিন। মনে করিতেছি, তাহাই করিব; অর্থাৎ লেখা ছাড়িয়াই দিব। এবং ছাড়িয়া দিতামও, কিন্তু ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

কুমির জন্যে মনে মনে যখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছি, সেই বিরক্তিকর মুহূর্তে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন যিনি লোকচক্ষে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ নিকটতম; তিনি আমারই অর্দ্ধাঙ্গের অধিকারিণী—শ্রীমতী শোভারাণী দেবী। দেবী মন্দ পদবিক্ষেপে আমি কি কুকর্ম্মে লিপ্ত আছি তাহাই দেখিতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং স্বাভাবিক ঝঙ্কৃত কণ্ঠে কহিলেন:

—কি হচ্ছে আলসের মত চুপ-চাপ ব'সে?

নিরতিশয় বিনীত কণ্ঠে কহিলাম: চুপ-চাপ ক'রে ব'সে যা করা যায়, তাই, অর্থাৎ চিন্তা।

- চিন্তা কিসের শুনি?

—সে শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

পাশে একখানি টুল ছিল, সেইখানি টানিয়া তাহার উপর বসে চাপাইয়া আদেশ করিলেন: ভাল লাগা না লাগা সে আমার, তোমাকে বলেছি বলতে, তুমি বলবে।

সত্যি বলিতেছি হাসি পাইয়াছিল, কিন্তু মুখে তার কোন আভাষই দিলাম না।

—তোমার আদেশ যখন তখন বলছি। কিন্তু শুনলে তোমার মনে যদি আঘাত লাগে সে দায় কিন্তু আমার নয়।

তাঁহাকে আঘাত করা আমার পক্ষে অসম্ভব, বোধ করি ইহাই ভাবিয়া তিনি কোন উত্তর দিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। শুধু এমন করিয়া একবার তাকাইলেন যে, সে দৃষ্টির সম্মুখে আমি মুগ্ধ হইলেও আসন্ন একটা দুর্য্যোগের আভাষ পাইলাম।

অভিনয়ের ভঙ্গীতে দুই হাত জোড় করিয়া কহিলাম: দোহাই দেবি, আপনার ওই দৃষ্টিতে ভস্ম হইলে আপনার কমল নয়নের কলঙ্ক রটিবে যে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হোন দেবি, অধম সবিস্তারে তাহার চিন্তা সরবে ওই চরণকমলে এই মুহূর্ত্তেই নিবেদন করিতেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য। দেবী প্রসন্না হইলেন না; ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন মাত্র। সুতরাং আমি গম্ভীর মুখে কহিলাম: কুমির কথা ভাবছি।

—কুমি কে?—শান্ত, গম্ভীর প্রশ্ন। চোখ নামাইলাম।

—একটি মেয়ে।

—ন্যাকা আর কি! কে তাই জানতে চাইছি।

—তার নাম কুমি।

—বয়েস কত?

—যত হলে মানায়।

—এখনও বোধ হয় বিয়ে হয় নি?

—কি বুদ্ধি! ঠিক ধরেছ।

—হুঁ। দেখতে?

—বন্ধুরা অবিশ্যি বাড়িয়ে বলে; তারা বলে, ভগবান তাকে নাকি নিজে পছন্দ ক'রে তৈরী করেছেন। আর কণ্ঠস্বর,—ঠিক যেন কেউ বীণা বাজাচ্ছে।

—ন্যাকামি রাখো। তুমি ছাড়া আরও বন্ধু আছে?

—আছে; কিন্তু শুনিছি তারা মেয়ে।

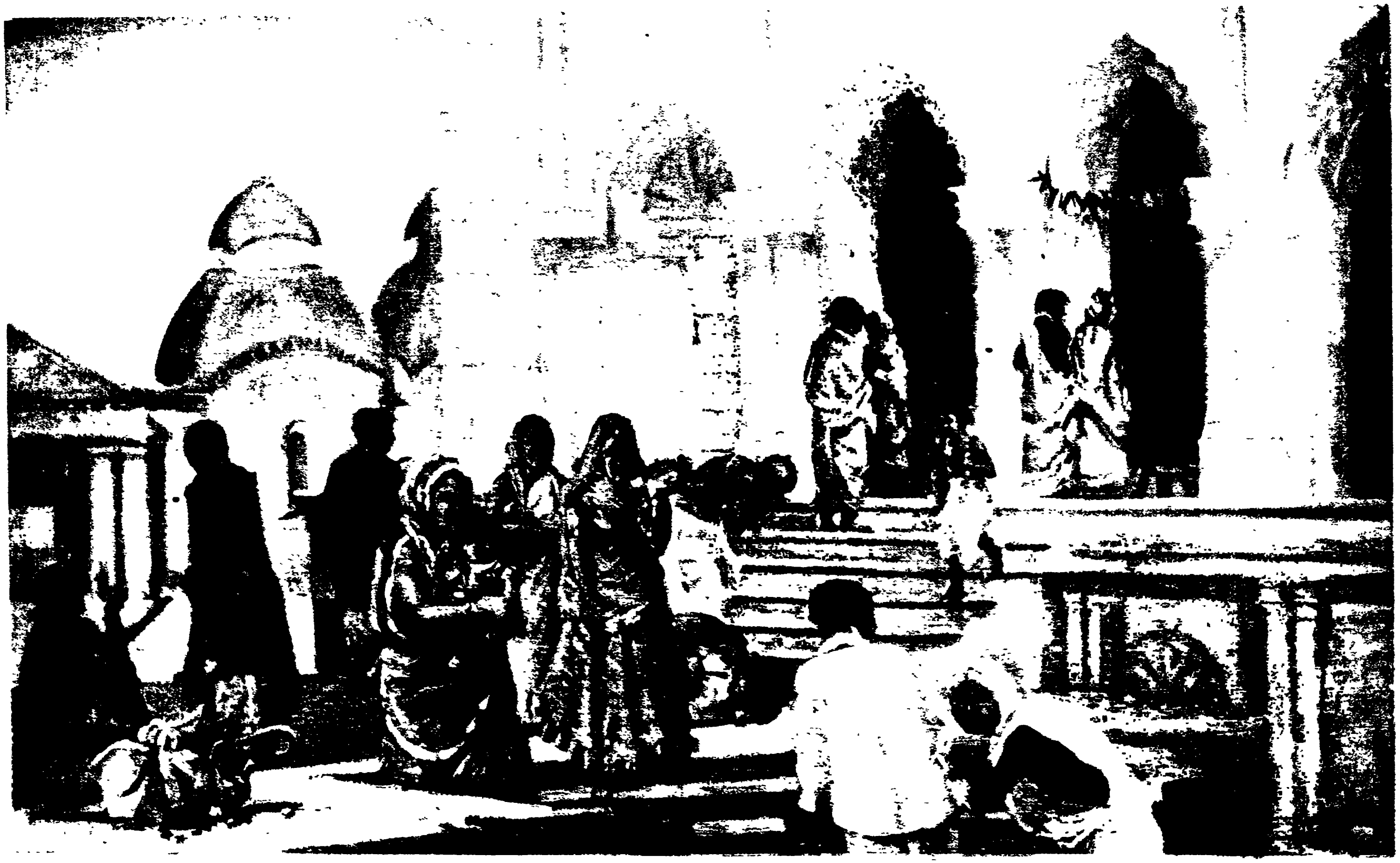
আবার ভ্রূ-কুঞ্চিত হইল!

—পুরুষ বন্ধু তুমি একা?

—আপাতত তাই তো দেখছি; তবে পরে হয় তো—

—থামো। এতক্ষণ তাকেই বুঝি চিঠি লেখা হচ্ছিল ব'সে ব'সে?

—না গো না। বলেছি তো, তাকে নিয়ে চিন্তায় পড়েছি।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত কানাই ধর

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

—তাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করবার কি দরকার ?

—আমার নয় তো কার দরকার ?

—দেখি কি লিখ্‌ছিলে ?

—পরে দেখো, আগে সবটা লিখে নিই।

শোভারাণী এইবার শোভাময়ী হইয়া উঠিলেন। সমস্ত মুখ ক্রোধাগ্নিতে রাঙা হইয়া উঠিল। এতক্ষণ মনের ভিতর একটু একটু যে ক্রোধের বারুদ সঞ্চয় হইতেছিল আমার শেষের উত্তরটি বোধ করি সেই স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া পড়িল। তিনি চীৎকারে ফাটিয়া গেলেন: তুমি মনে করেছ কি ? ছুঁড়িকে আমি চিনতে পারিনি ?

আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম। বিস্ময়—কুমিকে চিনিতে পারিয়াছেন বলিয়া নহে, তাঁহার নিকট হইতে এতটা আশা করি নাই তাই জন্য। তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার মানসে সহজ স্বরে কহিলাম: যদি চিনে থাক সে তো ভালই। কিন্তু তার সম্বন্ধে এখন কি করা যায় তাই বল দেখি। তুমি তো আমার সচিবও বটে। সেই যে গো তোমাদের কালিদাস বলেছেন—

উত্তেজনার ধাক্কায় তিনি টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এখন আমার পাশে আসিয়া কহিলেন: তুমি ভবানীপুরে যাও সে কথা আমায় এতদিন কেন জানাওনি ?

—ভবানীপুরে !—একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম।

—হ্যাঁ, ভবানীপুরে।

—কিন্তু ভবানীপুর তো যাই না।

ভ্রূ-কুঞ্চিত ও সঙ্গে সঙ্গে মুখবিকৃতি ঘটিল: আমায় কচি খুকীটি পেয়েছ কি না ! আমি কিছু বুঝি না, তাই ভাব ?

মনে মনে কহিলাম, তোমাকে কচি খুকীও ভাবি না আর তোমাকে বোকা মনে করিবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আমার মত বোকারও নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে নীরব হইয়া রহিলাম।

—তবে কুমির সঙ্গে দেখা হ'ল কি ক'রে শুনি ?

—ভবানীপুরেও এক কুমি থাকে নাকি ?—এমন করিয়া কহিলাম, যেন সে কথা আমি এই মাত্র জানিতে পারিলাম। গৃহিণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিলেন; কহিলেন: আমার মুখের দিকে তাকাও।

রাগলে তোমায় চমৎকার মানায়; তাই তোমাকে আমি সব সময় এমন সুন্দর দেখি।

—হু। আমার চোখ এড়িয়ে কিছু করতে চেষ্টা করো না, বুঝলে ?

কহিলাম: বুঝেছি। তুমি হরিণ-নয়না।

—আমি কমলির কাছে স্পষ্ট জিজ্ঞেস ক'রে পাঠাব, তোমার সঙ্গে তার কি দরকার ? আর এ-ও ব'লে দেব যদি কিছু দরকার থাকে তাহ'লে আমায় জানাতে। তোমার সঙ্গে তার দেখা হওয়া আমি পছন্দ করিনে।

পায়ে দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া গৃহিণী বসিবার গৃহ ত্যাগ করিলেন।

ঘটনাটি বুঝিতে পারিয়াছি। শোভা বাহির হইয়া যাইতেই হো হো করিয়া এক চোট হাসিয়া লইলাম। ভবানীপুর আমার শ্বশুর-গৃহ। তাঁহার তিনখানা বাড়ী পর একখানিতে যাহারা থাকে, ও অঞ্চলের সকলেই তাহাদের জানে। তাহাদের কমলী বড় হইয়া এখন কুমু হইয়াছে। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি ও পাড়ার অনেকেরই মনোহরণ করিয়াছে। শোভার শঙ্কা যে কোথা হইতে উঠিয়া কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই বুঝিয়া কৌতুক অনুভব করিলাম।

সদ্যলিখিত গল্পাংশটি লইয়া গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। কহিলাম:

—আমাকে সন্দেহ ক'র পরে; আগে এটা পড়ে দেখ।

এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পড়িয়া প্রশ্ন করিলেম: এ গল্প ?

—হ্যাঁ গো; নিছক গল্প।

স্ত্রী হাসিলেন। কহিলেন: এর পর কুমু কি উত্তর দিল ?

সস্মিতমুখে কহিলাম: তাই তো; এই সমস্যাটার কথাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছিলাম। কিন্তু তুমি হঠাৎ এমন কাণ্ড ক'রে বসলে যে—

—ইস্! তাই বই কি। তুমিই তো আমায় আগে পড়তে দিলে না।

হাসিয়া কহিলাম: তুমি যে আমায় এমন মনে ক'রে ব'সে আছ সে কি আমি জানি ?

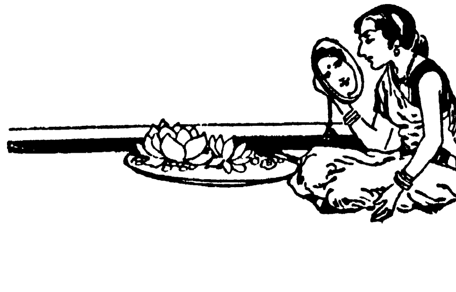
স্ত্রীর মুখে একটু আগে যে মেঘ জমিয়াছিল এখন তাহার উপর অপ্রস্তুতির লাল আভা ছড়াইয়া পড়িল। যুগল হরিণ নয়ন তুলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল: তোমার কুমি কি উত্তর দিল আমি জানি।

তাহাকে কাছে টানিয়া কহিলাম: কি উত্তর দিল, বল দেখি ?

—কুমি বলল, যারা চিঠি না পেলে আসে না তাদের সঙ্গে আমি বাইরের ঘরে দেখা করব। তুমি বাইরে যাও।

—আমায় নিশ্চয়ই বাইরে যেতে বলছ না ?

শোভা হাসিয়া উঠিল।



ভূস্বর্গ-চঞ্চল

দিলীপকুমার রায়

(ভ্রমণ ও প্রসঙ্গত)

(প্রথম স্তবক)

নারায়ণ !

চিঠিতে চঞ্চলতা আমার খোলে ভালো—একথা ভুক্তভোগী হ'য়ে তুমি জানো : বিশেষ ভ্রমণচাঞ্চল্য। তবু এ-চিঠির শিরোনামা দেখে ভাগবত ভক্তদের মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে এ-ভ্রাম্যমান আগে 'নমস্কৃত্য' তবে সুরু করবেন ব'লেই এ ধরণের পুরশ্চরণ। তাঁরা হয়ত ভুলে যাবেন যে তুমি বৈকুণ্ঠে থাকতে ত্রেতাযুগে—এ যুগে তোমার আবির্ভাব গানের আসরে, কথা বনাম সুর তর্কে এবং লাস্ট্ দো নট্ লীস্ট্—প্রোলেটেরিয়ান হিতৈষণায়। তোমার প্রথম ছুটি চঞ্চলতায় আমাকে হৃষ্ট করেছিল—শেষের গবেষণাটি ঠিক বিমর্ষ না করলেও thou too Brutus-জাতীয় একটা খটকার উদয় হচ্ছে বৈ কি : প্রশ্ন জাগছে বৈ কি—কাশ্মীর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু লেখা বুর্জোয়া-প্রযত্ন ব'লে অনাদৃত হবে কি না। তবে যেহেতু কাশ্মীর সম্বন্ধে আমার এসব লেখায় অবকাশরঙ্গিনী বুর্জোয়াতৃপ্তি ছাড়াও কোনো কোনো মনোবৃত্তির পরিচয় থাকবে সেহেতু আশা করছি যে, তুমি এতে খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠবে। কিন্তু পাছে তোমার ধৈর্যচ্যুতি হয় সেই ভয়ে এ-কাহিনী গুটি সাত-আট সংখ্যায় সারব—সাত-আটজন বন্ধুবান্ধবীকে উদ্বাস্ত ক'রে। কি জানি—একজনের স্কন্ধে এ-গুরুভার যদি না সয় ? এ কথা শুনে আশা করি তোমার উদ্বেগের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে—যেহেতু প্রথম স্তবক যদি তোমার ভালো না লাগে, পরের গুলির দিকে নেকনজর না হেনে খুশমেজাজে বাহাল তবিয়তে তোমার গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের অথই জলে আরো ডুব সাঁতার কেটে চলতে পারবে। "আশা করি" বলছি বড় আশা ক'রে : জানোই তো আশা শুধু কুহকিনী নয়, সে মরিয়া না মরে রাম—এ কেমন বৈরী !

তোমাকে নিশানা ক'রে শর-সন্ধানে প্রথম হাত-পাকানোর এ-চেষ্টার মানে আছে একটু : তুমি আমার ভ্রাম্যমান্ দিকটার কিছু খবর রাখো। কাজেই জানো যে আমার মনটা স্বভাব-চঞ্চল। আমার গানেও রাগমিশ্রণের এ-চঞ্চলতার পরিচয় তুমি বহুবারই পেয়েছ—তবু তোমাকে দেখেছি নির্বিচল। সেই জন্যেই তোমার প্রতি আমার মনে বেশ একটু সমীহের ভাব জেগেছে। ফলে ভূস্বর্গে আমার চঞ্চলতায় তোমার সাড়া যদি পুরোপুরি নাও পাই—দরদ হয়ত একটু পাব এঁচে মনটা খুশি আছে। যদি বলো তোমাকে কতটুকু জানি যে এ-ভরসাকে মনে ঠাঁই দিলাম ? উত্তরে কবির শরণাপন্ন হ'তে পারতাম যে, "Hope springs eternal in the human breast",—কিন্তু ওদিক দিয়ে না ঘেঁষে বলব :

জানা বলে কারে—ঠেকে বারে বারে ঠ'কে
তবু হায় মানো না !
মৃদু হাসো তাই যবে বলি : "তাই যারে
জানো ভাবো—জানো না।"
ধূসর ধরায় যারে মন চায় বেশি—তারি নাম বঁধু যে—
তারে মোরা কভু চিনি না তো, তবু না চিনেও
বলি মধু সে।
যার সব কিছু জানি—তার পিছু ছুটে কবে ?
সে যে ঘরোয়া।
ছুঁতে যে লুকায় সেই তো মজায়—তবু বলি
নাই পরোয়া।

কিন্তু নারায়ণ, আমাকে যাকে বাংলা ভাষায় বলে এক্সিউজ—তাই করতে হবে। আমার যা প্রাণ চায় লিখে যাব—কোনো পাতা ছকে চেনা ঘুঁটি চেলে সাত চিতে গোলকধামও যে আমার বাঞ্ছিত নয় এ-খবরও তুমি হয়ত রাখো। অতএব—অবহিত হও।

*   *   *   *

আট-নয় বৎসর নির্জনবাসের পর মানুষের ভিতরটার নড়চড় একটু হয়ই। নির্জনবাস বলতে আমি ঠিক আরণ্যকতা জাতীয় কিছু বুঝি না—বুঝি নিজের সঙ্গে মুখো-

মুখি করার নিরালা সুযোগ, উদার অবকাশ। প্রতি মানুষের মধ্যেই একটি বৈরাগী ভাবুক রয়েছে—তার খোরাক হ'ল এই ইচ্ছামত আত্মজিজ্ঞাসার অবসর। একে স্বেচ্ছাচারই বলো বা ভাববিলাসই বলো, আমি অননুতপ্ত চিত্তে কবুল করব—একে আমি আজ ভারি ভালোবাসি, তাই না ভালোবাসি ফাশিস্‌ম্‌, না ওর উল্টোটা—বল্‌শেভিসম্‌। যদিও বিলেত দেখে বছর পনের আগে ফেরবার সময়ে বাকায়দা কম্যুনিস্ট হ'য়েই ফিরেছিলাম—কিন্তু রুষদেশে ওদের কথায় কথায় সবাইকার হাতে মাথা কাটাটা একটু বেকায়দা করেছে আমাকে। আজকাল কে যেন বলে অন্তরের অতলে যে, ঘাতকবৃত্তির পথে মানুষ হয়ত রাতারাতি নিরভিমান প্রেমিক ব'নে যেতে পারে না—মনে পড়ে গীতার কথা যে পূর্ণ পরিণতি স্বভাব-স্বচ্ছন্দ হ'তেই চায়, বাইরের কাষ্ঠবন্ধনে তার নির্বাণ। অবশ্য বাইরের পরিবেশ দাবি করেই—কিন্তু সে দাবি যতক্ষণ না আন্তর মানুষটির স্বভাবের ছাড় হ'য়ে নিজেকে জানান দেয়—যতক্ষণ বাইরের সাজসরঞ্জাম দায়িত্বকর্তব্য নিজের হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে না চায় ততক্ষণ মানুষের সঙ্গে সমাজের বা রাষ্ট্রের হ'তেই থাকে বেবনতি, ঠোকাঠুকি। দুঃখ ব্যথা অশান্তি থেকে আমরা শিখি প্রচুর—তবু বলতেই হবে এরা জীবনের লক্ষ্য নয়—এরা সৌষম্য—হার্মনির—মর্মকথাটি শেখায় ব'লেই বন্ধু, নৈলে এরা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ ভেবে দেখলে, মুখে আমরা যতই বলি না কেন, লক্ষ্য আমাদের এই সৌষম্যের শান্তি, উপলব্ধির পরমানন্দ। আর সে লক্ষ্যের সহজ গতি হ'ল মুক্তিপানে। আর মুক্তি মানেই অবান্তর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতির বাহ্য হুকুম থেকে অব্যাহতি। যে-হুকুম অন্তরদেবতার, যে-বাধা স্বনির্বাচিত—মানে আমাদের শুদ্ধ স্বভাবের নির্বাচিত—তার শৃঙ্খল নূপুর হ'তে পারে, কিন্তু যে-গতি পরের অনুজ্ঞা-নির্দিষ্ট, হাজার যুক্তি দিলেও মানা যায় না, যে অমৃতের পুত্র তারই বান্দা হয়ে জন্মেছে। তুমি জাঁকালো তর্ক বল্লম নিয়ে রুখে উঠবে জানি। বলবে—জানি—যে স্বাধীনতা মানে স্বৈরাচার নয়—ফ্রীডম ইজ নট্‌ ইকল্‌ টু লাইসেন্স—রাষ্ট্রের মধ্যেই আমাদের বিশুদ্ধ সত্তা আসীন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—উঃ, "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোয়মস্মিন্‌ মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ"—আমার নির্বিবাদী নরম স্বপ্নবিলাসের কোমল ত্বক্‌ বিঁধো না এ-হেন অগ্নিশর্মা যুক্তিবাণে।

আমি জানি সবই, কেবল হয়েছে কি জানো? এসব যুক্তিবাণ শাণিত হ'লেও অন্তরের তৃষ্ণা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন এদের অমোঘ সন্ধানেও কোনো লক্ষ্যভেদই হয় না—মনে হয়, এসবই কথা কথা কথা—ছায়াবাজি। মনে পড়ে সেই মাতালের কথা যাকে মৃত ভেবে সবাই শ্মশানে নিয়ে চলেছিল। গণককার বলেছিল সেদিন সে মরবে—অগত্যা তার নাভিশ্বাস উঠল। কিন্তু তবু বেচারি মরেনি। রাস্তায় শ্মশানসঙ্গীরা যখন নিমতলা ও কাশীমিত্তিরের ঘাট নিয়ে তর্কাতর্কি সুরু করল তখন জ্যান্তে ম'রে সে ডুকরে কেঁদে উঠল: "ভাই রে, নিমতলাও চিনি, কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি—কেবল গণকের গণনায় ম'রে আছি বৈ তো নয়।"

জীবনেও এমনিই হয় নারায়ণ! যখন অন্তরতৃষ্ণা বলেন



দিলীপ—হাসি—এণা

ঐ পথ—তখন বাইরে হাজার বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি উড়ুক না কেন অন্তর বলেন: "তৃষ্ণার তাড়নায় ম'রে আছি।

তাই না ইস্‌ম্‌-চর্চা করা ছেড়ে দিয়েছি আজকাল—তর্কাতর্কি ছাড়লাম ব'লে। তাছাড়া কোন্‌ ব্যবস্থায় যে সমাজের মুক্তি মিলবে সেটা বাৎলে দেওয়া না আমার নেশা, না আমার পেশা। আমি কাশ্মীরকে উপলক্ষ্য ক'রে আমার নানা আনন্দ-চাঞ্চল্যের কিছু বিবরণী দিতেই এযাত্রা কলম ধরেছি, কোনো কিছু প্রমাণ করতে নয়—এমন কি ভ্রমণ বৃত্তান্তও আমার কাছে গৌণ—কাশ্মীর যাওয়ার সূত্রে হাজারো উড়ো চিন্তা আকস্মিক অভিজ্ঞতা আমাকে এবার

যেভাবে স্বপ্নচঞ্চল চিন্তাচঞ্চল করেছিল—তারই অসংবদ্ধ যথারুচি ইতিহাস লিখবারই বাসনা। তবে কোথাকার জল যে কবে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়—

এক ভাবি, হয় আর নিয়তই ভবে :
পথ আশা দেয়…হায়, দিশা দেয় কবে ?

* * * *

যাঃ, খেই ? কী বলতে যাচ্ছিলাম—না, মনে পড়েছে। নির্জনবাস ক'রে একটা মস্ত পরিবর্তন হয়েছিল আমার এই যে ট্রেনে দীর্ঘ যাত্রাপথের নামে হ'ত হৃৎকম্প। ভাবতাম : অজান্তে হয়ত ভিতরটা বড় বেশি বয়স্ক হয়ে পড়েছে বা—(বৃদ্ধ কথাটা বলতে আশা করি পীড়াপীড়ি করবে না—mot juste ব'লে ?) নির্জনবাসের ফলে আরো একটা জিনিষ ঘটে দেখেছি : যে সব বাইরের পরিবেশ বেশি গোলমেলে বেশি ঘটনামুখরিত সেসব তেমন মন টানে না আর। আমি বলছি না সব আগুটান পিছুটান থেকে রেহাই পাওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার মনে হয় মনের সেই অবস্থাই কাম্য যার প্রসাদে সব পরিবেশের মধ্যেই স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়ে থাকা যায়—যার সংজ্ঞা হ'ল "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ—নির্দ্বন্দ্ব আত্মারাম। কিন্তু সে-অবস্থা থেকে আমি এখনো ঢের দূরে। আমি বলছি আমার মনের প্রাণের এখনকার প্রতিক্রিয়া। এখন আমি যে-অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেটাকে বলা যেতে পারে অ-টেরেন্সীয় অবস্থা। জানো নিশ্চয় গ্রীক লেখক টেরেন্সের জগদ্বিখ্যাত উক্তি : "I am a man, and nothing that concerns man do I deem a matter of indifference to me."—

যা কিছু মানবে করে বিচলিত, তোলে ঢেউ, ধরে
জীবনে বাতি :
আমারো মনের সাগরসঙ্গী—চির দিন আমি
স্রোতের সাথী।

না, সদুঃখে বলতে হচ্ছে আমি এভাবে উধাওপন্থী নই। মানুষের অনেক আবত অনেক ঘূর্ণীই আমার ভালো লাগে না—তার অনেক স্রোতগর্জন অনেক ঝঞ্ঝাহুঙ্কারই আমার কাছে ভ্রান্তিসঙ্কুল বর্জনীয় ব'লে মনে হয়। এসব বিষয়ে সাবেক কালের সুন্দরসন্ধানী আভিজাত্যবোধই আমার স্নেহাস্পদ। আমি মনে করি না যে যা-কিছু হচ্ছে তা-ই হওয়া উচিত, বা না হ'য়েই উপায় ছিল না। এক কথায়, আমি ভবিতব্যবাদী নই।

অনেকের ধারণা ভবিতব্যবাদ—fatalism—হ'ল ভারতের আত্মসমর্পণ মন্ত্রের গোড়াকার কথা। কিন্তু আমি মনে করি না যে, এ-ধারণা মূলত সত্য। যাঁরা বলেন "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" তাঁরা প্রায়ই বোঝেন না কী বলছেন। ব্যাপারটা বলিই না একটু খুলে।

আমাদের দেশের বহু ধর্মপন্থীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে—বিশেষ ক'রে গত দশ বৎসরে। আমি লক্ষ্য করেছি—যেকথা বিবেকানন্দও বলতেন—যে, এঁরা প্রায়ই মনে প্রাণে তামসিক—কিন্তু ফন্দি-ফিকিরে এ-তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে প্রচার ক'রে পরকে ঠকাতে গিয়ে নিজে পড়েন ফাঁকি। অবশ্য আমি বলছি না—এ ঠকানেপনায় কোনো আপাত-সুবিধাই নেই—না থাকলে সবাই হ'ত যুধিষ্ঠির। এ-আত্মপ্রবঞ্চনারও সুবিধা তাই আছেই কিছু। কিন্তু ঠকাতে যাওয়ার পরিণাম বড় শোচনীয় হয় এই জন্যে যে, এসবের ফলে যা লাভ হয় সে হ'য়ে দাঁড়ায় আমাদের প্রভু—যে সিদ্ধি দেয় না সে হ'য়ে দাঁড়ায় নেশা, যা পাই তার জন্যে দাম দিতে হয় বড় বেশি।

কিন্তু আমার আপত্তি ঠিক্ নিয়তিবাদে না—আমার আপত্তি সেই মনোভাবে যা তামসিকতারও সমর্থন খোঁজে নিয়তির দোহাই দিয়ে। কারণ এতে আমাদের আখের নষ্ট হয়।

তাছাড়া সত্যের দিক দিয়েও একথা অশ্রদ্ধেয় যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোনো স্বাধীনতাই নেই। কারণ, এ-ই যদি সত্য হয় তাহ'লে এ-বিরাট বিশ্বলীলাকে একটা হৃদয়হীন অর্থহীন পুতুলনাচ ছাড়া আর কী বলা যায় ?

তর্ক রেখে এর একটা মজার দিক দেখাই। তুমি দেখবে অনেক ভবিতব্যবাদীই আছেন যাঁরা বেশ জানেন যে তাঁরা যা করছেন তার জন্যে নিজের দায়িত্ববোধ রয়েছে বেশ টন্‌টনে—অথচ মুখে বলবেন নেই। যতই তাঁদের বোঝাও তাঁরা সেই একগুঁয়ে শিশুর মতন বলবেনই বলবেন—ব-য়ে হ্রস্ব-ই বি, ড়-য়ে আকার ড়া, আর ল—কী হ'ল ? কেন—মেকুর ?

কিন্তু এভাবে তাঁরা ঠকান কাকে ? যে লোক তার পাওনা গণ্ডা বিলক্ষণ বোঝে—ঠিক অন্য সবাইয়ের মতনই রিপুর অধীন, সে কী ক'রে বলে সে বিশ্বাস করে "ত্বয়া হৃষীকেশ—" ইত্যাদি ?

বাস্তবিক নারায়ণ, মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনার অন্ত পাওয়া ভার। আমরা প্রায়ই থাকি নিজের বাসনার তাঁবে—অথচ মনকে দিয়ে ওকালতি করাই যে আমরা মনে প্রাণে সত্যাশ্রয়ী সত্যলক্ষ্য। এই ওকালতির কাজেই ভবিতব্যবাদ মস্ত সহায়—তাই তো আমরা ইচ্ছার জোর দিয়েই বলি "ইচ্ছা নাস্তি", দেখেও দেখি না যে,—পরমহংসদেবের ভাষায়—"যতই বলো না কেন তিনিই সব করাচ্ছেন, পাপ করলেই বুক ধুক ধুক করবে।"

ধরো যদুবাবু ভবিতব্যবাদী। রোজ মালা জপ করেন ত্বয়া হৃষীকেশ, বলেন কারুর কোনো দায়িত্ব নেই—সবই করাচ্ছেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ছেলে বলল: "বাবা আমি সন্ন্যাসী হব।" অমনি যদুবাবু তাকে উপদেশ দিতে লেগে গেলেন: "সে কি সোনা—সংসারই তো ভগবান্—ভগবান্ কোথায় নেই বলো দেখি—গীতায় বলেছে কর্ম করতেই হবে—জনকরাজার চেয়ে বড় মহাত্মা কে?"—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ছেলে বলল: "বাবা—কারুর তো কোনো দায়িত্ব নেই তবে এত শত উপদেশ কেন?" বাপ রেগে উঠলেন: "ঠাট্টা!" ছেলে বলল: "বাবা ঠাট্টায়ই বা রাগছেন কেন? যখন আমার ঠাট্টা করাটাও ভবিতব্য।" বাপ রেগেও কথার লকড়ি খেলা ধরলেন: "হ্যাঁ, কিন্তু তাহ'লে আমার রেগে ওঠাটাই বা ভবিতব্য নয় কেন?" ছেলে বলল: "বেশ—কিন্তু আপনার রেগে-ওঠায় আমার হেসে-ওঠাটাও তো সমানই ভবিতব্য।" বাপ আর পারলেন না—দিলেন এক চড় কষিয়ে। পরমহংসদেব বলতেন মনে আছে তো—টিয়া পাখি দাঁড়ে ব'সে বেশ রাধাকৃষ্ণ বলে—কিন্তু গলা টিপে ধরলেই—ক্যাঁ ক্যাঁ! ভবিতব্যবাদীর বাড়িতে হুলস্থুল। শেষে তাঁর এক পশ্চিমে বন্ধু (সেও ভবিতব্যবাদী কিন্তু রসিক) বলল: "বাবুজি, এ ক্যা? যানে দিজিয়ে সাব্—কুছ হরজ নহি—সুনিয়ে তো সহি এক উম্‌দা গজল—ময় বোলা যা এক বাইকো:

'নশে মে লে লিয়া বোসা খফা কেয়া হো গই সাহব
চলো মিল্ বৈঠো জানে দো কে ঐসা হো হী জাতা হয়।'
ঝোঁকের মাথায় করেছি চুমন—দপ্ ক'রে
কেন উঠলে জ্ব'লে?
এসো মিলে মিশে থাকো—এমনটা হ'য়েই থাকে এ
ভূমণ্ডলে।

তথাকথিত আধ্যাত্মিক ভবিতব্যবাদের চেয়ে এ ধরণের বেপরোয়া খোলাখুলি 'খাও দাও নৃত্য করো'-ভাবও ভালো।

আমার আপত্তি কিন্তু ভবিতব্যবাদের ফিলসফিতে নয়। আমি মানি যে, যদি কেউ প্রতি কাজেই নিজের ইচ্ছাকে অবান্তর বোধ করেন তবে তাঁর একথা বলবার অধিকার



কাশ্মীরের জয়যাত্রী—ধরণীদা, লীলা, হাসি, দিলীপ, এণা, মান্নদা, বাবুল, মায়া,
রুণু, প্রভাদি, সীতাংশু, মামা (পেশোয়ারে তোলা—অক্টোবর, ১৯৩৮)

আছে যে স্বাধীন ইচ্ছা ব'লে কিছুই নেই। আমার আপত্তি থিওরিতে নয়—কেন না, এ থিওরিতে সপ্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না—এ হ'ল মনের ধাঁচের কথা, গড়নের কথা। আমি শুধু বলি যে, আমাদের ভালো লাগে অপরাজেয় তেজস্বিতার জ্যোতির্মন্ত্র—উপনিষদের উত্তিষ্ঠত-জাগ্রত-র শৃঙ্গধ্বনি। ভালো লাগে বিবেকানন্দর আত্মবোধ যে, উঠতে হবে, ভাবতে হবে, লড়তে হবে মিথ্যার সঙ্গে করতে হবে সৃষ্টি, বলতে হবে—আমরা শক্তিরই বরপুত্র—লজ্জাকর পুতুল-নাচ নাচতেই জন্মাই নি। আমরা সাজা দেই শেক্সপীয়রের অগ্নিময় ধিক্কারে:

The fault dear Brutus, lies not in our stars
But in ourselves, that we are underlings.

কারণ ভেবে দেখ, এই যদুবাবুরা কিসের জন্যে দাঁড়াচ্ছেন। পাঁজি, পুঁথি, গণককার, জ্যোতিষী, ভৃগুসংহিতা, গ্রহ, তারা কোষ্ঠি—কী নয়? এই রকম এক যদুবাবুকে দেখেই কাশীতে ভৃগু-সংহিতা আশ্রমে আমি লিখেছিলাম :

ভৃগুসংহিতা ভাবে বিমোহিতা হায় রে মানবহিয়া!
যেখানে যা হয় জয় ভৃগু জয় গাও না হুঙ্কারিয়া।
আকাশের তারা সিপাই পাহারা : পালাবে কোথায় ছুটি'?
খাও দুটি পান—রয়েছে বিধান, না খেলে ধরিবে টুঁটি।

পরমহংসদেবের গল্প মনে পড়ে না নারায়ণ?—

"তুমিই হৃষীকেশ, হৃদয়ে থেকে তারে
চালাও যেমনি—সে তেমনি চলে :
সকলি তব লীলা—গোবধও মোরে দিয়ে
করালে আহা প্রভু মৃগয়াছলে।"
ভাবিত হৃষীকেশ বিপ্ররূপ ধরি'
মিষ্টতম সুরে শুধায় "রাজা!
রাজ্য রচিল কে?" "আমিই," নৃপ কহে।
"চোর পাপিষ্ঠেরে কে দেয় সাজা?"
"কে আর আমি ছাড়া?" কহিল ভূপ। "আহা,
গড়িল কে মণির অতুল বেদী?"
"সে আমি।" "মগধের কন্যা?" "তাঁহারেও
জিনেছি আমি ভীম লক্ষ্য ভেদি'।"
"চণ্ডে কে শাসিল?" "আমারি কীর্তি যে!
শোনো নি?" "শুনেছি গো," শ্রীহরি বলে,
"কীর্তি সবি তব—কেবল গোবধের
অকীর্তিই হৃষীকেশের গলে।"

সেদিন পড়ছিলাম মহাভারত। শ্রীকৃষ্ণ যে দুর্যোধনের কাছে গেলেন পাণ্ডবদের জন্যে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চাইতে, সে কি শুধু এইজন্যেই নয় যে দুর্যোধনের রাজি হবার সম্ভাবনা কিছু ছিলই ছিল—নইলে এ দৌত্য হ'য়ে উঠত না কি একটা নিষ্কর্মা লোকের প্রহসন। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বহুবার লিখেছেন যে, জীবনটা হচ্ছে সর্বদাই "a play of possibilities", সবই আকাশের তারারা বেঁধে ধ'রে দিয়েছে কাজেই আমাদের আর কিছুই করবার নেই তাদের উপর বরাত দিয়ে চলা ছাড়া এ ভাব্‌তেও মনটা কি বিদ্রোহী হ'য়ে ব'লে ওঠে না "ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে"? আমরা জন্মেছি শুধু পুতুল-নাচ নেচে চলতে. এই কথাকেই কি মেনে নিতে হবে মানুষের জ্ঞানের শিখরদৃষ্টি ব'লে? ধিক্।

* * * *

যাহোক্ কাশ্মীর মুখেই এগিয়ে চলি ফের। শৈশবের স্বপ্ন—কাশ্মীর যেতেই হ'ল আরো একটা জরুরি কারণে—তুমি জানো। আমার বোন মায়া বিধবা হ'ল গত সেপ্টেম্বরে। স্বাস্থ্য তার অনেক কারণেই খারাপ হয়েছিল। ওর মেয়ে এষারও। ভাবলাম কাশ্মীর যাওয়াই ভালো। এষারও ছিল খুব বেশি ইচ্ছে।

তবু এতদূর ওকে একলা নিয়ে যেতে ভরসা পেতাম না যদি না বন্ধুবর শ্রীধরণীকুমার বসু সপরিবারে সহযাত্রী হবেন বলতেন। তাঁর মেয়ে রমা—হাসি—আমার গানের ছাত্রী। শুনলে নিশ্চয় তোমার মতন ওস্তাদ লোক মর্মাহত হবে যে আমার শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদের ওস্তাদি গানের চেয়ে উমা ওরফে হাসি-র গান বেশি সুন্দর মনে হয়। পনর বৎসর আগে বালক চন্দ্রশেখরের গান শুনেও মনে হ'ত এই কথাই যে, 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।' তাই এ লোভ—তার ওপর আমার ভাগনি এষার ভক্তিভাবের নাচ। মনটা রুখে উঠল—যাব কাশ্মীর—দীর্ঘ রেলপথ, মোটর পথ—কুছ পরোয়া নেই :

"ওহে দীর্ঘপথ, তুমি কী দেখাও ভয়?
মৃত ভ্রাম্যমান হস্তী পূরো মৃত নয়;
যদিও বয়স-রবি ঢলেছে পশ্চিমে
বারেক চলিলে 'দূনে' হবে না সে ঢিমে।

* * * *

আমাদের দল বেশ পুরু ছিল। ধরণীকুল আট, আমরা চার—একুনে পূরো এক ডজন যাত্রী—সোজা কথা?

পারি যে শাসিতে হাসিতে হাসিতে
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে
রেলগাড়ি যদি পারি রিজার্ভিতে
যাইব কাশ্মীর করিনু পণ
যত বাধা আসে হেলায় জিনিব
অচেনা বিদেশী পরকে চিনিব
গান বিনিময়ে আতিথ্য কিনিব
"মাভৈঃ"—গর্জিল সাহসী মন।

*　　*　　*　　*

কিন্তু ট্রেণে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফের সাহসী মন মন্ত্রৌষধি-হতবীর্য আশীবিষের মতন নম্রফণা হয়ে পড়ল। কেন—একটু শুনলেই বা।

হয় কি জানো, তোমরা গণতান্ত্রিক বিরাটবক্ষরা আমাদের মতন পুরাতান্ত্রিক পেলবপ্রাণদের দুঃখ বোঝো না। তাই "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" ব'লে থেকে থেকে হাঁক দিয়ে আমাদের আরো চম্‌কে দাও। অসংখ্য বন্ধনের মাঝে তোমাদের আছে মহানন্দ—কিন্তু সেটা মুক্তির স্বাদে কি না যদি সংশয় আসে আমাদের—তাহলে? (সংশয় তো ভাই শুধু তোমাদেরই একচেটে সম্পত্তি নয়) অন্তত যাদের অসংখ্য বন্ধনের মাঝে নিরানন্দ আসে তাদের বেলা কী বলবে? একটা দৃষ্টান্ত নাও। ষ্টেশনে পৌছতে না পৌছতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ আমার পিছু নিলেন। কী? না, তিনি আমার এক পিসতুত দাদার বাল্যবন্ধু ছিলেন। বললেন "মায়া—আহা! কোথায় সে? তাকে দেখতেই হবে।" কী করি? অচেনা অতিথিটিকে মায়ার কামরায় পরিবেশন ক'রে দিতে হ'ল। তিনি আহাপনায় বিকশিত হ'য়ে উঠলেন। এ-ধরণের লোকের ধারণা: বৈধব্য জিনিষটা এমনই একটা কিছু, যার জন্যে প্রতি সুভদ্র নাগরিকেরই আহা করা একটা মানবিক কর্তব্য। তাঁকে যদি বলতাম যে বৈধব্যের মধ্যে অনেক সময়ে একটা মুক্তিস্বাদ থাকে—বন্ধন মোচন হয় ব'লে, তাহ'লে তিনি মূর্ছা যেতেন কি না বলতে পারি না; তবে এটা বলতে পারি যে ভাবতেন যোগসাধনায় মানুষ খানিকটা অমানুষ হয়ই।

মানি, সংসারে এমন অনেক বন্ধন আছে দায়িত্ব আছে পরীক্ষা আছে যারা আত্মবিকাশের সহায়। কিন্তু এমন বন্ধন এমন পীড়ন এমন কারাগারও সংসারে আছে যাদের জাঁতাকল যাদের পেষণ মানুষকে ঠিক আকাশচারী মুক্তিস্বাদ দেয় না। মানুষের কাছে বাইরেকার আবেষ্টনীর মুক্তিও একটা ফেল্‌না জিনিষ নয় নারায়ণ—এমন কি সুযোগের আনুকূল্যকে অনেক সময় বিধাতার শ্রেষ্ঠ করুণার নমুনা ব'লে মনে না ক'রে থাকতে পারাই শক্ত। জগতে সবাই জনক রাজা নয়, একথা অ-জনক অরাজবৃন্দ প্রায়ই ভুলে যায়। পরমহংসদেব বলতেন: "জনকরাজা হওয়া মুখের কথা নয়—জনকরাজা বহু বৎসর হেঁটমুণ্ডে তপস্যা করেছিল।

মানি যে এ সংসার মায়া নয়। কিন্তু মায়া নয় ব'লেই এ সংসারের সব দায়িত্ব বা সব বন্ধনই মুক্তির পথে আমাদিগকে রাতারাতি রওনা করে দেয় এতটা সংসার-উচ্ছাসী আমি হ'তে পারি না। তুমি নিজেই কি জানো না যে অন্তত গবা ছেলে পড়ানো নিশ্চয়ই সেই শ্রেণীর কর্ম—যাকে গীতায় বলেছে "বিকর্ম" কি না অপকর্ম। যে যাই বলুক না কেন, আমার অবসর সময় যদি এক রাশ গডাচর চণ্ডুকে বোধোদয় পড়াতে ফুরিয়ে যেত তাহ'লে আমি রাতারাতি নির্বাণপন্থী হ'য়ে যেতাম চ'লে মানসসরোবর—তবু এ-ধরণের মহানন্দময় মুক্তিস্বাদ চাইতাম না। তাই বলি, আমি জানি যে এমন অনেক স্বামী আছেন যাঁদের বন্ধন অনেক সধবা অহরহ কামনা করেন—যদিও সমাজে একথা স্বীকার করা নিশ্চয়ই গর্হিত—যেহেতু Hypocrisy is a sort of homage that vice pays to virtue···

ঠিক তেম্‌নি ভ্রমণের এই একটা অতি গ্লানিকর দিক আছে, যা থেকে মানুষের লাভের চেয়ে লোকসান হয় ঢের বেশি।

কিন্তু - দার্শনিক এমার্সন বলেছেন—প্রায় প্রতি ক্ষতিরই উল্টো পিঠে কিছু না কিছু লাভ থাকেই। কাশ্মীর ভ্রমণের সূত্রে আমার বন্ধু ধরণীকুমারের মহত্ত্বদর্শন পথকষ্টের এমনিতরো ক্ষতিপূরণ। সে দৃশ্যে সত্যিই ভুলে গেলাম আমরা বাক্সতোরঙ্গ কুলিগাড়ি ধুলো ঠাণ্ডা চেঁচামেচির কষ্ট। ধরণীদার মহিমা দেখে হ'য়ে পড়লাম অভিভূত। এইচ্‌ জি ওয়েল্‌স্ রোলাঁর জন ক্রিস্টফার প'ড়ে বলেছিলেন: Hats off boys! here is greatness"···আমিও ধরণীদার ভ্রামণিক মহত্ব দেখে গেরুয়া টুপি খুলে ফেলতাম অহর্নিশ। কুলি রে, গাড়ি রে, মোটর রে, বিছানা বাঁধা রে, তোরঙ্গ খোলা রে, হারানো জিনিষের তদারক করা রে—কী নয় রে? জানো তো নারায়ণ, unknown warrior এর বীরত্বে বিলেতে ঘরে ঘরে স্তব হয়—কিন্তু unknown traveller-এর মহত্ব বোঝে কজন? ধরণীদা না থাকলে আমরা ঘরে ফিরতাম কেউ তোরঙ্গ-হারা হ'য়ে, কেউ বা পকেটকর্তিত হ'য়ে, কেউ টিকিট হারিয়ে দণ্ড দিয়ে, কেউ বা বাজে হোটেলে অখাদ্য সেবনে ভগ্নস্বাস্থ্য হ'য়ে, কেউ

কুলি সংঘর্ষে চেঁচিয়ে গলায় ক্যানসারগ্রস্ত হ'য়ে, কেউ বা হিমালয়প্রমাণ তোষক উইটিবি প্রমাণ হোল্‌ডলে ধরাতে গিয়ে ভগ্নহস্তপদ পঙ্গু হ'য়ে—উঃ ভাবা যায় না অগতির গতি এই ধরণীদা না থাকলে কী গতি হত আমাদের! মেটারলিঙ্কের "জ্ঞান ও নিয়তি" বইটিতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন জীবনে হিরো হবার হাজারো রাজপথ খোলা রয়েছে—শুধু আমরা খবর রাখি না ব'লেই সংসার হ'য়ে রইল অন্ধকার। কাশ্মীর যেতে ট্রেণে একথার মর্মার্থ যেন আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম।

তবে জেগে ওঠার দুঃখও তো ভাই কম নয়। ধরণীদার বীরত্ব তথা মহত্ব দেখে থেকে থেকে অনুতাপে আমার সারা মনটা ধিক্ ধিক্ ক'রে উঠত। একে দাদা, তায় বয়সে বড়—তাকে খাটাচ্ছি আমার বিছানা বাঁধতে—জীবনের হারানো চাবির থোকা খুঁজতে—এমার ক্ষিধে কখন পেল ঠাহর করতে—তবে "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"—হতাশারও শেষ আছে: অমৃতসর পৌছবার মুখে যখন ধরণীদা ভোর রাত্রে অন্য গাড়ি থেকে এসে আমাদের বিছানা সিংহবিক্রমে চক্ষের নিমেষে বেঁধে ফেললেন তখন হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম: Heroes are born, not made সেই মুহূর্তে বিমল আনন্দে গায়ে কাঁটা দিল—বুঝলাম হতাশার গহ্বরেই আলো নামে সব আগে। জলের ম'ত সাফ হ'য়ে গেল আনাতোল ফ্রাঁসের পাদ্রী জেরোম তাঁর মন্ত্রশিষ্য-জাককে কেন বলেছিলেন:

হে বৎস জাক্, পাপ কোরো রোজ সাঁঝবিহানে
পাপ হ'তে আসে অনুতাপ জেনো যিশু বিধানে
অনুতাপ এলে তবে পাবে কৃপা—জীবন পথে
সুতরাং ভায়া, পাপ কোরো রোজ মুক্তি-ব্রতে।

আমরাও ধরণীদাকে দেখে মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলাম কেন অকর্মণ্য না হ'লে বিশ্বকর্মার কর্মিষ্ঠতার মহিমা পুরোপুরি বোঝা অসম্ভব। যখন হাল ছেড়ে দেই তখনই তো আসে শান্তি। আমাদের এক মামা ছিলেন—টাকের জন্যে কী অশান্তি যে! কত তেল, কত বড়ি, কত টোটকা—উঁহুঃ টাক বেড়েই চলে। অশান্তিও ছিনে জোঁক। হঠাৎ শান্তি এল—গভীর নিশ্চিন্ততা যাকে বলে—একটা ছবি দেখে দেয়ালে। সপ্তম এডোয়ার্ড। টাকের প্রতিকার যদি থাকত ঐ ভদ্রলোক কি আয়ত্ত না ক'রে ছাড়তেন? অতএব মন, হাল ছেড়ে দাও—আনন্দ করো—টাকের উপায় নেই—বললেন মামা সঘনে।

আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল আমরা প্রত্যেকেই এক একটা স্‌ভেন হেডন্—বাঘা যাত্রী। কিন্তু ধরণীদার নব নবোন্মেষশালিনী ভ্রমণ-প্রতিভা দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু ক'রে তবে পেলাম শান্তি, গাইলাম প্রত্যেকেই:

মোর মাথা নত ক'রে দিলে কি তোমার চরণধূলার তলে।
মোর সকলি পাবার অহমিকা গেল ডুবে দুচোখের জলে।
আমি কত কী যে প্রভু পারি না
কত মহিমার ধার ধারি না
হায় ট্রেণে কাশ্মীর-পথে এ শিক্ষা দিলে কী করুণা ছলে
বীর ভেবেছিনু আপনারে—তাই ভুল ভাঙিলে চোখের জলে।

নারায়ণ, তুমি স্বভাব-সাম্যবাদী। কিন্তু যেতে যদি আমাদের সঙ্গে কাশ্মীর দেখতে—বুঝতে—শিখতে—বদলে যেতে। আমরা রওনা হয়েছিলাম সব মাথায় সমান—প্রত্যেকেই এক এক পোটেনশিয়াল মহাযাত্রী—কিন্তু অমৃতসর পৌছতে না পৌছতে দেখি ট্রেণকুশলতায় কোথায় ধরণীদা হিমালয়—আর কোথায় আমরা উইটিবি!

* * * *

বলতে ভুলেছি, ট্রেণ মধুপুরে পৌছল নিশুত রাতে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল—ডাকাত ডাকাত—চোখে মশাল—কানে দামামা। লাফ দিয়ে উঠে আস্তিন গুটোচ্ছি—পাঞ্জাবি অভাবে মরীয়া হ'য়ে গেঞ্জি গেঞ্জিই সই—এমন সময় কলহাস্য:

নিঠুর বেশে হাঁকিল যারা ডাকাত নহে—বরণীয়:
ষ্টেশনে এসে নিদ্রা হ'বে সবারে তুলি' গর্জিয়া—
তিনটি ভাই হস্তে পান ওষ্ঠে হাসি কমনীয়—
কহিল: তারা বীরের জাত—এসেছে ঘুম বর্জিয়া।

এদের নাম লাটু, শচীন, কল্যাণ—ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবে এ নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যে। ক্রমশঃ

পেচক

প্রবন্ধ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

নিস্তব্ধ রজনীতে পেচকের কর্কশ চীৎকার অতি সাহসী পথিকেরও মনে ভয়ের সঞ্চার করে। নিশাচর পক্ষীদের মধ্যে পেচক অন্যতম। অন্ধকার রাত্রিতে পেচকের জন্মগত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি শিকার অন্বেষণে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে। ইহাদের হালকা ডানা উড্ডয়নকালে বিশেষ কোন শব্দ সৃষ্টি করে না এবং প্রথমাবস্থায় পেচক ধীর গতিতে আকাশে পরিভ্রমণ ক'রে থাকে। নিম্নদেশে শিকারের মৃদু-গতিবিধির শব্দও ইহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

পেচকের মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, পা দু'টি লম্বা, তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় নখ দ্বারা সুসজ্জিত; সেইজন্য সহজে শিকার পলায়নে সক্ষম হয় না। প্রায় সকল শ্রেণীর পেচকের পা পাতলা পালক দ্বারা আবৃত। পেচকের চঞ্চু দেখিয়া ইহাদের মুখ-গহ্বর খুব ছোট মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে পেচকের মুখ-গহ্বর বেশ বড়। পেচক মাংসাশী পক্ষী। বিশেষজ্ঞগণ পূর্ব্বে বলতেন পেচকের চীৎকারে ইন্দুর, ভেক্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণিরা যখন আতঙ্কিত হ'য়ে পড়ত সেই সুযোগে পেচক তাদের নিজের আয়ত্বের মধ্যে আনতো। বর্ত্তমানকালের বিশেষজ্ঞগণ বলেন পেচকের চীৎকারের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে যা নাকি ক্ষুদ্র প্রাণিদের সম্মোহিত করে দেয়—তাতে গতি-বিধির সমস্ত শক্তিটুকু তাদের লোপ পায়। খাদ্য ভক্ষণ ও খাদ্য পরিপাক প্রণালীতেও ইহাদের বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ ইহারা ছোট ছোট শিকারের কিছু অংশ অথবা সমস্ত অংশ-টুকু গলাধঃকরণ ক'রে ফেলে। এইরূপভাবে গলাধঃকরণ করায় শিকারের লেজ অথবা অবশিষ্টাংশ যখন পেচকের চঞ্চুর অগ্র-ভাগে ঝুলিতে থাকে তখন এক হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। খাদ্য পরিপাক হ'লে অস্থি, চর্ম্ম অথবা পালক প্রভৃতি আহারের অনুপযুক্ত খাদ্যাংশসমূহ খাদ্য হ'তে পৃথক হ'য়ে যায় এবং পেচক তাহা সহজেই উদ্গীরণ করে। এইরূপ উদ্গীর্ণ বহু অস্থি ও পালকের অংশ ইহাদের বাসস্থানে দৃষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞগণ সদ্য উদ্গীর্ণ খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করে



খাদ্যভোজন রত গোলাঘরের পেচক

পেচক তাহার সর্ব্বশেষ খাদ্য কি গ্রহণ ক'রেছিল তা' অনায়াসেই ব'লতে পারেন।

পেচক সূর্য্যের রৌদ্র সহ্য করতে অভ্যস্থ নয়, দিবাভাগে অন্ধকার কোঠরে নিদ্রা যায়। সেই সময় বিরক্ত করলে এরা একপ্রকার শব্দ করে এবং দুই ডানা দ্বারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে। গ্রীবা এতই নমনীয় যে চারিদিকে তাহা চালিত করে অন্যের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিতে সক্ষম হয়।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে পাঁচ জাতীয় পেচক দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে তিন জাতীয় পেচক সকলেরই বিশেষ পরিচিত।

এই পাঁচ প্রকার পেচকের মধ্যে বার্ণআউল অর্থাৎ গোলাঘরের পেচকের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর পেচকের গোলাকৃতি মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিক পীত ও

পীঙ্গলবর্ণ মিশ্রণে রঞ্জিত। মুখমণ্ডলের অবশিষ্টাংশ শ্বেতবর্ণ। দেহের উপরিভাগ প্রভাশূন্য আপীত পিঙ্গলবর্ণের এবং শ্বেত



গোলাঘরের পেচক (বার্ণ আউল)

ও ধূসর বর্ণের ছোট ছোট দাগযুক্ত। নিম্নদেশের বর্ণ শ্বেত; পা শ্বেত বর্ণের পালক দ্বারা আবৃত। এই শ্রেণীর পেচক বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে না। গোলাবাড়ীর পারাবতদের পরিত্যক্ত গৃহে বাস করে, সেইজন্যই ইহাদের এইরূপ নামকরণ। পুরাতন বাড়ী ও বৃক্ষের কোঠরেও বাস করতে ইহাদের দেখা যায়। প্রয়োজন হ'লে ইহারা দিবাভাগেও শিকার অন্বেষণে বের হয়। গ্রীষ্মের পরে গোধূলি-সময়ে গোলাঘরের পেচককে ঝোপঝাড়ের দিকে দ্রুতবেগে শিকার অন্বেষণে উড়ে যেতে দেখা যায়। লম্বায় ইহারা মাত্র এক ফুট দু'ইঞ্চি হ'য়ে থাকে। তবে দুই ডানা বিস্তারে ইহাদের সাধারণ আকার দ্বিগুণ আকার ধারণ করে। আমরা পেচকের যে চীৎকারের সহিত পরিচিত সেইরূপ শব্দ গোলাঘরের পেচকের কণ্ঠ হ'তে ধ্বনিত হয়না। বিশেষজ্ঞগণ বলেন ইহাদের চীৎকার নাসিকা মধ্য দিয়া নিঃসৃত হয় বলিয়া শব্দ এইরূপ অদ্ভুত শুনায়। এই শ্রেণীর পেচক দুই তিনদিন অন্তর ডিম প্রসব করে, কিন্তু সংখ্যায় চার হ'তে আটের বেশী হয় না।

টনি আউল অর্থাৎ অসীত পিঙ্গলবর্ণের পেচক বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সকল জাতীয় পেচকদের মধ্যে আকারে বৃহৎ। ইহাদের ডানার প্রধান রং পিঙ্গল। ধূসর বর্ণের পেচকও এই শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। পৃষ্ঠদেশে উজ্জ্বল লাল রংয়ের ডোরা এবং লালচে রংয়ের ছোট ছোট দাগ আছে। দেহের নিম্নভাগ পাণ্ডুবর্ণ এবং পিঙ্গলবর্ণের ডোরা দ্বারা লম্বালম্বিভাবে চিত্রিত—মুখমণ্ডল পিঙ্গল আভাযুক্ত। আকারে বৃহৎ হইলেও ইহাদের ডানা ছোট। জঙ্গল মধ্যে ইহাদের বাস, কদাচিৎ লোকালয়ে দেখা যায়। ইহাদের খাদ্য অন্যান্য শ্রেণীর পেচকদেরই মতন। রাত্রে জলাশয়ের ধারে মাছ শিকারেও অভ্যস্ত। গাছের ফোকরে নীড় রচনা করে বাস করে। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে সংখ্যায় তিন কি চারটি শ্বেতবর্ণের ডিম পাড়ে। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র, এসিয়া এবং অন্যান্য দেশেও এই শ্রেণীর পেচক পাওয়া যায়।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে টনি আউলের "হো-ও-ও-হো-ও-ও" চীৎকার যখন রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সে সময় অপর দিক হ'তে "কি-উইক" চীৎকারে তাদের সঙ্গিনীরা প্রত্যুত্তর জানায়। লং ইয়ার্ড অর্থাৎ 'লম্বাকান বিশিষ্ট' পেচক দেখিতে বেশ সুশ্রী। ইহারা দীর্ঘাকৃতি এবং ইহাদের মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি লম্বা কান আছে; কানের মত দেখাইলেও সেগুলি ঠিক



গোলাঘরের পেচকের পাঁচটি শিশু

কান নহে—পালকের ঝাড় মাত্র। ইহাদের চক্ষুর বর্ণ পিঙ্গল। মুখমণ্ডলের দু'ভাগের প্রান্তদেশের পালক ধূসরবর্ণ। চঞ্চু Y আকার হওয়ায় ইহাদের সম্পূর্ণ মুখটী যখন দেখা যায় সেই সময় মুখের মধ্যস্থলে Y আকারের একটী চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হয়। দেহের পালক আপীত বর্ণের এবং উপরি-ভাগ ধূসর ও পিঙ্গল বর্ণের চিহ্নে সজ্জিত। নিম্ন-ভাগে লম্বা-লম্বিভাবে পিঙ্গল বর্ণের ডোরা দৃষ্ট হয়। দেবদারু বৃক্ষের জঙ্গলে ইহাদের বাস। সাধারণতঃ পারাবত, ঘুঘু প্রভৃতি পক্ষীদিগের নীড়ে ডিমপ্রসব করে; কাঠবিড়ালীর পরিত্যক্ত গৃহেও ইহাদের দেখা যায়। নরফক্‌ব্রোড্‌সে এই জাতীয় পেচক মৃত্তিকা মধ্যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে। অন্যান্য পেচকদের মতই দিবাভাগে বিশ্রাম নেয়। এই শ্রেণীর পেচকদের মধ্যে এক বিশেষত্ব আছে। ইহারা শিকার অন্বেষণ সময়ে প্রথমে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে—শ্রবণযোগ্য কোন উচ্চরব করে না। পরে যখন চীৎকার করে, চারিদিকের নিস্তব্ধতা তখন ভঙ্গ হয় এবং শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হ'লে ইহাদের স্বভাব এক ভীষণ আকার ধারণ করে। সে সময়ে ডানা পীঠের উপর তুলে দেয়—মস্তক সম্মুখভাগে অগ্রবর্ত্তী হয়—এবং মুখ হ'তে এক-প্রকার লালা নিঃসৃত হয়। এক অদ্ভুত শব্দও মুখ থেকে শুনা যায়। ইহারা পক্ষী শিকারে নিপুণ। মার্চ্চ মাসে তিন থেকে পাঁচটি ডিম প্রসব করে।



লম্বা কান বিশিষ্ট পেচক (লং-ইয়ার্ড আউল)

সর্ট-ইয়ার্ড আউল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ছোট কানবিশিষ্ট পেচককে স্থানীয় পেচক বলা যায়। ইহাদের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। উত্তর অঞ্চলের দেশসমূহে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী এবং মৃত্তিকার মধ্যে বাস করে। আমাদের দেশেও এই জাতীয় কানবিশিষ্ট পেচক দৃষ্ট হয়।



ছোট কান বিশিষ্ট পেচক (সর্ট-ইয়াড) ও তাহাদের শ্বেতবর্ণ ডিম

লিট্‌ল আউল অর্থাৎ ছোট পেচক বেশ সুপুষ্ট; বক্রচঞ্চু, তীক্ষ্ণ নখর ও হলদে চক্ষুই ইহাদের বিশেষত্ব। ইংলণ্ডে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত ছোট পেচকের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রচুর পরিমাণে ইহাদের দেখা যায়। মৃত্তিকার গর্ত্তে বাস করে এবং মৃত্তিকার উপরেও ইহারা দ্রুতবেগে ছুটিতে পারে।

আমেরিকা ছোট ছোট বরোয়িং আউল অর্থাৎ মৃত্তিকা-বাসী পেচকের বাসভূমি। এই শ্রেণীর পেচক অপরের বাস-গৃহে বাস করে; এমনকি কখনও কখনও ইহাদের র‍্যাট্‌ল-স্নেকের সহিত বাস করিতে দেখা যায়; এইরূপ একসঙ্গে বাস করায় কোনরূপ বিপদের সৃষ্টি হয়না। প্রয়োজন হ'লে নিজেরাও গৃহ নির্ম্মাণ করে। দিবাভাগে এই শ্রেণীর পেচক গর্ত্তের সম্মুখ-ভাগে বসিতে পছন্দ করে এবং পার্শ্বস্থ পথিকদের অদ্ভুতভাবে

মাথা নাড়িয়া অভিবাদন জানায়। কিন্তু কোন কারণে বিরক্ত হলে শান্তমূর্ত্তি আর বেশীক্ষণ থাকেনা।

গ্রেটব্রিটনে স্নোয়ি আউল অর্থাৎ তুষার দেশের পেচক শীতকালের আর এক দর্শক। ইহারা খুব কমই এসে থাকে। সময়ে সময়ে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করবার জন্য শৈত্যময় আরটিক্ প্রদেশ থেকে স্কট্‌ল্যাণ্ডের উত্তরে আগমন করে। ইহাদের দেহের পালক্ শ্বেত বর্ণের ও কাল বর্ণের ফুট ফুট দাগযুক্ত। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেন তুষার দেশের পেচক উত্তর আমেরিকা থেকে এটালান্টিক সাগর অতিক্রম করে। যদি ইহা সত্য হয় তা'হলে এইরূপ অবিরাম উড্ডয়ন সত্য সত্যই বিস্ময়জনক। নিশাচর পক্ষী শ্রেণীভুক্ত হ'লেও ইহারা দিবাভাগে খাদ্য সংগ্রহে অভ্যস্ত। ইথিওপিয়া আফ্রিকার পেল্‌স্ পেচক বিদেশীয় পেচকদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চক্ষু ইহাদের পিঙ্গলবর্ণ ও পা অনাবৃত। উপরিভাগের পালক গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের ডোরা দ্বারা রঞ্জিত; নিম্নভাগের ধূসরবর্ণ পালকের উপর কাল বর্ণের দাগ। ব্রেজিলে আট জাতীয় পেচক পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে চশমাধারী পেচক বিশেষ দর্শনীয়। ইহাদের চক্ষুর উপর গোলাকৃতি আঙ্‌টা থাকায় এই নামে অভিহিত।



তুষার-দেশের পেচক (স্নোয়ি আউল)

শিকারী পক্ষী হিসাবে সিলনের ফিস্ আউলের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রিকালে জলের উপর হ'তে এরা মাছ শিকার করে; অন্যান্য পেচকের চীৎকার ধ্বনি যেমন শোকসূচক ইহাদের কিন্তু তাহা নহে। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থানে ফিস্ আউল দৃঢ়ভাবে "গ্লুম—ও-গ্লুম" চীৎকার ক্রমাগত ক'রে থাকে। ঈগল পেচকই ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পেচক বলিয়া পরিচিত। গ্রেট- ব্রিটনে এই জাতীয় পেচক কদাচিৎ দেখা যায়।

পেচকের শত্রু অনেক। কাক, চড়ুইপাখী প্রভৃতি ছোট বড় পাখীরা পেচকের উপস্থিতি লক্ষ্য করলে একত্র-যোগে আক্রমণ করে পেচকদের বিরক্ত করে। নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করা ছাড়া পেচকের তখন আর কোন উপায় থাকে না। এইরূপ ঘটনার সহিত আমরাও পরিচিত। আমাদের দেশেও লক্ষ্মী, হুতুম, কালপেচক প্রভৃতি চার পাঁচশ্রেণীর পেচক পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে লক্ষ্মী পেঁচাই সুশ্রী। লক্ষ্মীদেবীর বাহন বলিয়া এই শ্রেণীর পেচক আমাদের নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে।



সহপাঠিনী

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্-সি

শেফালি আমার চেয়ে এক মাসের বড়। কিন্তু সে আমাকে বেলাদি বলে। আমি যে-বছর ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি, ও সে-বছর প্রথম স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হয়। আমরা দু'জনে হষ্টেলে থাক্‌তাম। উভয়ের কি ভাবই না হয়েছিল। আমার বড় ইচ্ছে হ'ত, একটা দাদা থাক্‌লে শেফালির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে চিরকালের জন্য আমার নিবিড় বাহু দুটির আশ্রয়ে রাখি। কত আফ্‌শোষ হ'ত—পাল্‌টি ঘর—ওরা সেনগুপ্ত, আমি দাশ-গুপ্ত। মাকে চিঠি লিখ্‌লাম, আমার '—তুত' কেউ কোথাও আছেন কি-না। মা আমার 'এন্‌কোয়ারি' জেনে অবাক হ'য়ে চিঠি লিখ্‌লেন—"কেউ নেই, কিন্তু আমি এমন খোঁজ কেন ক'রছি?" 'কাজিন্ ম্যারেজের' কোনও চেষ্টায় আছি কি-না এই ভাবনা বোধ হয় তাঁর হ'য়ে গেছ্‌ল। বাবা মুন্সেফ্ ছিলেন। কিছু টাকা জমাতে পেরেছিলেন। বদ্‌লি হ'বার হুকুম পেয়ে মাণিকগঞ্জের ঘাটে ষ্টীমারের অপেক্ষায় জিনিষপত্র নিয়ে চাপরাশী সহ দাঁড়িয়েছিলেন। 'প্ল্যাটুনে' পায়চারি করতে করতে অন্যমনস্ক হ'য়ে হঠাৎ অতল গহ্বর জলে প'ড়ে প্রাণ হারান। আমি তখন কয়েক দিনের মাত্র শিশু। মা সূতিকাগারে নোয়া ও সিঁদূর ফেলেন। আমি কোনও দিন পিতৃ-স্নেহের আস্বাদ পাই নাই—এমনই কপাল। সেই আমি বাবার সঞ্চিত অর্থে হষ্টেলে থেকে লেখাপড়া শিখ্‌ছি। যতদূর সম্ভব ভালভাবে পড়াশোনা ক'রে আস্‌ছি। কখনও কোন বিষয়ে সেকেণ্ড হই নি। শিক্ষয়িত্রীরা বলতেন, বেলার ফার্ষ্ট প্রাইজ একচেটিয়া। এমনই 'আমি'র সঙ্গে পরিচিত হ'তে সেকেণ্ড ক্লাসের নবীন-তমা ছাত্রী শেফালির আগ্রহ কেমন—সহজেই অনুমেয়। সে এসেছিল—তার বাবার সঙ্গে। তার বাবা পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষুদ্র জমিদার। সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা পাড়াগেঁয়ে ভাব নিয়ে শেফালি আমার 'রুম্‌মেট' হ'য়ে ঘরে ঢুক্‌ল। আমি 'হাঁ' 'হাঁ' ক'রে উঠ্‌লাম তার আধ ময়লা কাপড় ও কাদামাখা চটি পায়ে ঘর ঢোকা দেখে। কিন্তু কেমন যেন একটা মমতা দিয়ে তার দিকে চেয়েছিলাম। তার সৌন্দর্য্য দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। মেয়েমানুষের এত রূপ, ভগবান যেন শেফালিকেই সব দিয়েছেন ব'লে মনে হ'ল। সহজেই নতুন পরিচয়ের সঙ্কোচ কেটে গেল। সে এর আগে কলি-কাতায় কখনও আসে নি। বাড়ীতে মেম রেখে পড়ছিল। ম্যাট্রিক অন্তত পাশ না হওয়ায় ভাল ভাল বিয়ের সম্বন্ধ কয়টা ভেঙে যাওয়ায় তার বাবা তার এই নতুন ব্যবস্থা করলেন। সে খুশী হ'ল ব'লে প্রথমটা মনে হয় নি।

আমি 'টেষ্ট্' পরীক্ষা দিয়ে এসে বড়দিনের ছুটিটা কোথায় কাটাব ভাবছি,—হষ্টেলের খাটে শুয়ে শ্লথবেশে মুক্তকেশে প'ড়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কখন একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। হঠাৎ স্বপ্ন দেখ্‌লাম: আমি যেন আমাদের দেশের বাড়ী গেছি, প্রত্যেক ঘরে খুঁজেও আমার মাকে কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। যাকে জিজ্ঞেস করি, সে-ই আমার মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চায়, আর অদৃশ্য হ'য়ে যায়। হঠাৎ আমাদের হষ্টেলের 'মেট্রন' আমায় ডাক্‌ছেন ব'লে মনে হ'ল। চোখ মেলে দেখি তিনি খুব নরম স্বরে বলছেন, "এত অবেলায় ঘুমোচ্ছ কেন বেলা? যাও, বাগানে বেড়িয়ে এস, আর দেখ, তোমার মায়ের শরীর কেমন ছিল, কোনও চিঠি সম্প্রতি পেয়েছ?···আমি এই দুঃস্বপ্নের পর বিশ্ববিখ্যাত খেঁকী মেট্রনের এমন কোমল স্বরে মায়ের কুশলপ্রশ্ন শুনে লাফিয়ে খাট থেকে উঠ্‌লাম। কাপড় ও চুল মোটামুটি ঠিক ক'রে নিয়ে তাকে জেরা করতে লাগ্‌লাম। তিনি আমায় ব্যস্ত দেখে আশ্বস্ত ক'রে বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই, লেডী প্রিন্সিপ্যালের কাছে একটু আগে 'তার' এসেছে তোমার মায়ের শরীর ভাল নয়—তুমি যেন আজই বাড়ী রওয়ানা হও। খবরটা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। ততক্ষণে আমি হষ্টেলের পশ্চিম দিকের বারান্দায় রেলিঙে ঝুঁকে কাঁদ্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। মাকে বুঝি জন্মের মত হারালাম, এই ভাবনায় আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। পিতৃহীনা

আমি, মা আমায় একাধারে পিতা ও মাতার স্নেহ ও কর্ত্তব্য দিয়ে এতবড় ক'রে তুলেছেন। একটা কিছু বড় হব এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার জীবনের লক্ষ্য ও ধ্রুবতারা হয়ে ছিল। সেই লক্ষ্য অনুসরণ ক'রে আমি ঠিক আস্‌ছিলাম, হঠাৎ এ কি পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা! এইখানেই কি ভগবান আমার সব শেষ ক'রে দিলেন! অশ্রু আর বাধা মানছিল না।.. মেয়েরা একে একে খবরটা শুনে আমায় ঘিরে দাঁড়ালে। শেফালি আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ব্যস্ত হ'তে নিষেধ করল। বোঝাতে লাগ্‌ল—অসুখ মানেই মৃত্যু নয়, টেলিগ্রাম মানেই শেষ-সংবাদ নয়,—আরও কত কি। পাপিয়া ব'লে একটি মেয়ে আমার স্যুটকেস গুছিয়ে দিলে এবং ট্যাক্সি ডাক্‌তে দ্বারওয়ান পাঠালে। প্রিন্সিপ্যাল মেট্রনের মারফৎ আমায় ছুটির অনুমতি জানিয়ে পাঠালেন। নিজে কিছু করতে হ'ল না। শেফালি একটি মিনিটও আর কাছছাড়া হয় নি। একেবারে আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে নিঃশ্বেস ফেললে। সন্ধ্যার স্বপ্নের কথা মনে ক'রেছি আর আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠেছে। মৃতপ্রায় অবস্থায় রাতটা ট্রেনে কাটিয়ে ঊষার আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমি বাড়ী পৌছলাম। পাড়া-প্রতিবেশীতে বাড়ীটা পূর্ণ। আমার কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না। উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠ্‌লাম। তাতেই আমায় দু-একজন বললেন মায়ের 'ব্লাড প্রেসারের' অসুখ খুব বেশী হয়েছে। সমস্ত রাত বড় কষ্ট পেয়েছেন। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছেন। এখন যদি আমার কান্না তাঁর কানে যায় তাহলে সেই মুহূর্ত্তে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। এতে আমি এই জান্‌লাম, মা তখনও আছেন। আমি সমস্ত রাত এটুকুও আশা করতে সাহস করি নি। ভগবানের চরণে মনে মনে কোটি কোটি প্রণিপাত জানালাম।

বেলা চারিটার সময় মায়ের ঘুম ভাঙল। আমায় পায়ের কাছে ব'সে থাক্‌তে দেখে বুকে টেনে নিলেন—কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সকলে চুপ করতে বললেন। আমি বললাম—আমি আজ ভোরে এসেছি, তিনি যেন কথাবার্ত্তা এখন না বলেন। ডাক্তার এসে বললেন, অবস্থা অনেক ভাল, পরদিন আরও খানিকটে রক্ত বের ক'রে দেবেন, তাহ'লে সেরে উঠ্‌তে দেরী হবে না। ডাক্তার বললেও মায়ের সেরে উঠ্‌তে বেশ দেরী হ'ল, অর্থাৎ—মা যেদিন প্রথম বিনা সাহায্যে চলাফেরা করতে আরম্ভ করলেন—আমি হিসেব ক'রে দেখ্‌লাম সেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা সুরু হ'য়ে গেছে। পরদিন 'কম্পালসারি' গণিত ও সংস্কৃত পরীক্ষা হবে। বলা বাহুল্য, আমি টেষ্টে সকল বিষয় ফার্ষ্ট হ'য়ে ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। মধ্যে শেফালি এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছ্‌ল এবং আমার ক্লাসের ও হষ্টেলের বন্ধুদের হ'য়ে আন্তরিক-ভাবে মায়ের আরোগ্য কামনা জানিয়ে গেছ্‌ল।

আমি যখন মাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ দেখে হষ্টেলে ফির্‌লাম—তখন গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুলেছে। শেফালি এখন আমার সহপাঠিনী। কিন্তু সে ঠিক আগেকার মত আমাকে শ্রদ্ধা করত। বরং এখন একসঙ্গে ভাগ্যচক্রে তার সঙ্গে আমি পড়ছি ব'লে সে একটু সঙ্কুচিত ভাব দেখাত। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সে বলত,—বেলাদির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব না হ'লে তাকে অনেক দিন আগে স্কুল ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ত—অমন আগ্রহ ও যত্ন ক'রে কে আর তাকে 'এলজেব্‌রা' 'ইকোয়েশান্‌' শেখাত। কে—বা তাকে ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্রগুলি সহজ ও সরলভাবে বুঝিয়ে দিত।

এম্‌নি ক'রে আরও কয়েক মাস কাটিয়ে দিয়ে শেফালি ও আমি টেষ্ট্‌ দিলাম। তারপর দু'জনে এক ঘরে থেকে রাতদিন প'ড়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম। আমি একটা ফিমেল্‌ স্কলারশিপ্‌ পেলাম, শেফালি শুধু ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করলে। শেফালির বাবা তাকে কত উপহার দিলেন। তার উৎসাহ বেড়ে গেল। সে আরও পড়তে চাইলে তার বাবা সম্মত হলেন। আমার মা লিখে জানালেন, আমি যদি ইচ্ছা করি বি, এ, পর্য্যন্ত অনায়াসে প'ড়ে যেতে পারি—তাঁর কোনও আপত্তি নেই। আমি খুব খুশী হলাম। এ কলেজ ও কলেজ ঘুরে নানারকম সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা ক'রে আমরা দুজনে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে ভর্ত্তি হলাম। প্র্যাক্‌টিকালের পেয়ারের অভাব আমরা পরস্পর পূরণ করতে পারব ব'লে আমরা সায়েন্স্‌ কোর্স নিলাম। ছেলেদের সঙ্গে সহ-শিক্ষার কলেজে পল্লীবালা শেফালিকে ভর্ত্তি হ'তে রাজী করাতে আমায় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ব্রাহ্ম-বালিকা-

বিদ্যালয়ের প্রান্তস্থিত হষ্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে তার সরমজড়িত লাজ কিছুই স্যাক্রিফায়িস্ করতে হয় নিই। কিন্তু এখানে এসে তার যেন দমবন্ধ হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। আমি তার অবস্থা দেখে প্রথমটা বড় বিব্রত হয়েছিলাম। ক্রমে ক্রমে স'য়ে এল বটে, কিন্তু আই এস্-সি পাশ ক'রে সে আর থার্ড ইয়ারে সে কলেজে কিছুতেই থাকতে রাজী হ'ল না। আমি এতেও একটা ফিমেল্ স্কলারশিপ্ পেলাম। শেফালি শুধু ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ হ'ল। পরীক্ষার ফল গেজেট হবার পরদিন আমার বাড়ীতে শেফালি বেড়াতে এসেছে, ভেতরে ব'সে আমরা গল্প করছি, এমন সময় চাকর একটা কার্ড নিয়ে এল—বাংলা লাইনো টাইপে লেখা আছে—শঙ্কর রে, আই, এস্-সি, স্কটিশ, কলিকাতা। কার্ড পেয়ে আমি হাসি চাপ্‌তে পারলাম না। মনে পড়ল, এই শঙ্কর রে'র জন্যই বিশেষ ক'রে শেফালি ওকলেজে পড়তে আর যায় না। মেয়েদের সম্বন্ধে অসাধারণ ইন্টারেষ্ট এই রে-পুঙ্গবের। তা'ছাড়া ক্লাসের দেওয়ালে ও টেবিলেও অনেক কিছু লেখার অথার ত ইনি ব'লেই জনরব শোনা গেছল। এহেন রে হঠাৎ আমার বাড়ীতে কেন—দেখ্‌তে গিয়ে জান্‌লাম, তিনি আমাকে কংগ্র্যাচুলেট করতে এসেছেন ও তিনি নিজেও একটা স্কলারশিপ্ পেয়েছেন, সেটা জানাতে এসেছেন। আমার কাছে রে-র এই ধৃষ্টতা অসহ্য বোধ হ'ল। ইতিপূর্ব্বে কখনও বাক্যালাপ এর সঙ্গে হয় নি—হঠাৎ আজ পরীক্ষার রেজাল্ট-এর সূত্র ধ'রে বাড়ী বয়ে আলাপ করতে এসেছে বুঝে আমি তাকে ব'লে দিলাম, "আপনার বক্তব্য শুন্‌লাম, আপনি যেতে পারেন।" সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল। আমি তাকে আবার চ'লে যেতে ব'লে তার চোখের সাম্‌নে সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলাম। একটু বাদে জানালার একটা পাখী একটু ফাঁক ক'রে দেখ্‌লাম, রে রাস্তায় নেমে গেছে এবং কি যেন ভাবছে। খানিক বাদে সে চ'লে গেল। শেফালি আমার কাণ্ড দেখে অবাক! হাজার ইচ্ছা থাকলেও সে নাকি অপরাধীর এরূপ শাস্তিবিধান করতে পারত না। রে প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হ'ল। কিন্তু স্কটিশে ভর্ত্তি হওয়ার কল্পনা সম্পূর্ণরূপে আমরা ত্যাগ করলাম। অনেক খুঁজে শেষ পর্য্যন্ত আশুতোষ কলেজের মর্নিং ডিপার্টমেণ্টে আমরা দুজনে থার্ড ইয়ার সায়েন্সে ভর্ত্তি হ'লাম। আমি গণিতে অনার্স নিলাম—শেফালি শুধু পাশ্ কোর্স। আই, এস-সি'র রেজাল্ট বা'র হবার মাসখানেক আগে থেকে আমি কলিকাতায় বাসা ক'রে আছি—মাও সঙ্গে আছেন। শেফালির দাদা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সম্প্রতি শিয়ালদহে বদ্‌লি হ'য়ে এসেছেন। তার দাদা ও বৌদির সঙ্গে শেফালি বীডন ষ্ট্রীটে একটা ভাড়া-বাড়ীতে থাকে। আমি ও মা বীডন ষ্ট্রীটে তাদের বাড়ীর কাছে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছি। মা তাঁর প্রতিশ্রুতি মত আমায় বিয়ের জন্যে কোনও পীড়াপীড়ি ইতিমধ্যে করেন নি। শেফালির মাঝে মাঝে একটা সম্বন্ধ হয়—তার পর কি হয়ে যায় সে জানে না—সে প'ড়েই যাচ্ছে। একটা কিছু নূতন করবার ইচ্ছা আমার মনে মনে জাগে—আবার মনে হয় আমার দ্বারা কি আর হ'তে পারে—মেয়েমানুষ আমি। বড় হবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়ি নি—ভরসাও কিছু পাইনে। পড়াশোনা মন দিয়ে ক'রে যাই; এইটুকুমাত্র আমার হাতে আছে—সেদিকে ত্রুটি করিনে।

ক্রমশঃ

বাঘবলি

শ্রীহরিপ্রসাদ নাথ

(প্রবন্ধ)

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঠাকুরগাঁও মহকুমার অধীন এই লাহিড়ী হাট যাহা আজ নানা দিক দিয়া শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা একদা ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাসস্থল ছিল। তৎকালে লাহিড়ী উপাধি বিশিষ্ট জনৈক বারেন্দ্র শ্রেণীর অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ সাধু সেই গভীর অরণ্যমধ্যে তাঁহার আস্তানা করেন। অচিরে চতুর্দ্দিকে তাঁহার কেরামতি জাহির হইতে লাগিল। এবং অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে তাঁহার আস্তানার চতুর্দ্দিকে কিছুটা স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া তিনি তাঁহার সাধনা পিঠে ক্ষুদ্র একখানা

কুটীর রচনা করিলেন। এবং কালী প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। আরও কিছুকাল গত হইলে তিনি তাঁহার কালীবাড়ীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র হাট বসাইলেন। এই হাটের জনসমাগম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার হইতে লাগিল। এবং সাধুর কেরামতিও চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে সুযোগ পাইয়া তিনি তাঁহার গদির পূর্ব্ব দিকের অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইলেন। হাটেরও দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। ইত্যবসরে হঠাৎ একদিন সাধুর অন্তর্ধান হইল। যে স্থানের কথা বলিতেছি ইহা ঠুমানিয়া মৌজার একটি অংশ মাত্র। উক্ত লাহিড়ী সাধুর নামানুসারে এই স্থানের নাম "লাহিড়ী" হইয়াছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে উহা রামচন্দ্র সিংহ (ক্ষত্রিয়) নামক জনৈক জমিদারের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাহা হউক, কালক্রমে উক্ত হাটের তদানীন্তন ইজারাদারের অকথ্য দুর্ব্যবহারে ঐ হাটের কাছারির নায়েব এবং ঠুমানিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পিতামহ মৃত নারায়ণ সিংহ তহশীলদার, এমন কি এলাকার জনসাধারণ পর্য্যন্ত চটিয়া গেল। ফলে, ঐ নায়েব এবং তহশীলদার বর্ত্তমান বর্ষালু পাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রপিতামহ মৃত রামপ্রসাদবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ স্থান হইতে হাট সরাইয়া অনতিদূরে ছোট সিঙ্গিয়া গ্রামে লইয়া গেলেন। এবং রামপ্রসাদবাবু নিজ পুত্রের নামানুসারে উক্ত হাটের নাম "তারিণীগঞ্জ" রাখিলেন, পুত্রের নাম ছিল তারিণীপ্রসাদ রায়। হাট সরাইয়া লইলেন বটে ইহাতে পুরাতন হাট সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিল না। এই প্রকারে গোলযোগ উপস্থিত হইলে মৃত রামচন্দ্রবাবু স্বয়ং এখানে আসিয়া হাট রক্ষার্থে মনোযোগ দিলেন। উভয় পক্ষই হাটরক্ষার্থে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদবাবুর নূতন হাটে জগদ্ধাত্রীর আহ্বান হইল আর রামচন্দ্রবাবুর হাটে হইল মহিষমর্দ্দিনীর। তথাপি কোনদিকেই হাট পূর্ণভাবে না লাগায় উভয় হাটেই প্রত্যক্ষ ফলদায়িনী কালীমাতার আহ্বান হইল এবং উভয় স্থানেই কালীমাতার ফলারের প্রাচুর্য্য বাড়িয়া গেল। তথাপি কোনদিকেই হাট সুবিধা হইল না। পক্ষপাতশূন্য স্নেহময়ী জননী তাঁর উভয় পুত্রকেই সমান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মায়ের মন টলিল না দেখিয়া নিরামিষ ছাড়িয়া আমিষ ভোগের আয়োজন হইল। নিরীহের গায়ে হাত পড়িল। অসংখ্য ছাগ পরার্থে আত্মত্যাগ করিতে লাগিল। মহাসমারোহে স্নেহময়ী জননীর অভ্যর্থনা হইতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে কুচবিহার হইতে একটি সার্কাস পার্টি আসিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রামচন্দ্রবাবু তখন অনন্যোপায় হইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া "যাক্ প্রাণ থাক্ মান" মূল্যে একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং উক্ত পূজা মণ্ডপের প্রাঙ্গণের বাহিরে প্রায় ২০০ ফিট দূরে দেবীর দৃষ্টিপথে বৃহৎ একটি হাড়কাষ্ঠ প্রোথিত করিলেন। তৎপরে ঐ ব্যাঘ্রকে খাঁচা হইতে গলে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বাহির করতঃ দুই পার্শ্বে সজোরে টানিয়া ধরিয়া অসংখ্যদর্শক পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত লাহিড়ী দীঘিতে স্নান করাইয়া আনাইলেন। পুরোহিত পাঁঠার ন্যায় উহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ফুল জলে উৎসর্গ না করিয়া দূর হইতে একবারমাত্র দৃষ্টি দ্বারা উৎসর্গ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তৎপর অসংখ্য লোক সম্মুখে দুই দিক্ হইতে সজোরে পূর্ব্ববৎ শিকল টানিয়া উক্ত হাড় কাষ্ঠে ব্যাঘ্রের গলদেশ প্রবেশ করান হইলে সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক খাঁড়াতী মৃত শশী সিংহ সিংহবিক্রমে দৌড়িয়া আসিয়া ব্যাঘ্রকে সংহার করিয়া অসীম সাহসের পরিচয় প্রদানান্তে পূজা শেষ করিল। এই ঘটনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বহুলোক এখনও জীবিত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অত্র থানার অন্তর্গত সরোজপুর নিবাসী হাজি গুলু মহম্মদের বয়স ৮০ বৎসর। কোণ্‌পাড়া নিবাসী বগু মহাম্মদ (বয়স ১১৪ বৎসর), সাবাজপুর নিবাসী বৈদান্তিক শ্রীযুক্ত চিত্তানন্দ নাথ মহাশয় (বয়স ৭২ বৎসর) ও উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত সাঁতালসিংহ সরকার মহাশয়ের (বয়স ৮৮ বৎসর) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই বাঘবলি ব্যাপার ১২৮৪ সালে সংগঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, রামচন্দ্রবাবুর হাটে এইরূপ বাঘবলি হওয়ায় রামপ্রসাদবাবুর ভয় হইল—এই বুঝি হাট ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং তিনিও অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তারিণীগঞ্জ হাটের কালীবাড়ীতে আরও উচ্চাঙ্গে মায়ের পূজা সুসম্পন্ন করিলেন। সে পূজা আরও বিস্ময়কর। উক্ত বিষয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়া পাঠকবর্গের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও বাধ্য হইয়া উহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলাম—ক্ষমা করিবেন।

চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিত্র



নূতন শাড়ীর আব্দার

স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত) শিল্পী—ভি এ মালী



গ্রাম্য স্রোতস্বতী

আলোকচিত্র—ফটোগ্রাপ্‌ ষ্টুডিও, ২৫এ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা শিল্পী—বি মজুমদার



আণ্ডার দি ইয়োলো

(তৈল চিত্রে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত)

শিল্পী—সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ



মাদ্রাজী শাড়ী

(স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

শিল্পী—সতীশ সিংহ

আলোকচিত্র—ফটোস্নাপ, ষ্টুডিও, ২৫এ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা



পাখীওয়ালা

(সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল চিত্রের জন্য মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

শিল্পী—ভি এস গুরজ্জের



রাধা-কৃষ্ণের নৃত্য

(পৌরাণিক বিষয়ের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

শিল্পী—বি এন জিজ্জা

১৫এ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট কলিকাতা



মেহেরউন্নিসা

(ভারতীয় চিত্রের প্রথম পুরস্কার)

শিল্পী—রাধাচরণ বাগ্‌চি



কালী মাত

শিল্পী—রণদা উকিল

আলোকচিত্র—ফটোগ্রাপ্‌ ষ্টুডিও, ২৫এ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাময়িকী

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন ঃ

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বল্লভভাই কোম্পানীর দম্ভোক্তির সমুচিত উত্তর দেশবাসী দিয়াছে। গণতন্ত্র গঠিত কংগ্রেসে যে ডিক্টেটারী আধিপত্য চলিতেছিল তাহা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের জয় গান্ধীজী কেন যে নিজের পরাভব বলিয়া স্বীকার করিলেন তাহা বোধগম্য হয় না। সীতারামিয়ার নির্ব্বাচন সুপারিসে তাঁহার নাম প্রকাশিত হয় নাই। অতএব ভোটদাতৃগণ জানিতে পারেন নাই সীতারামিয়ার বিপক্ষে ভোট দিলে তাহা গান্ধীজীর বিপক্ষে দেওয়া হইবে। যদি তাহাও হইত তথাপি তাঁর ক্ষুব্ধ হইবার কারণ থাকে না। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে ভোটদান সম্পর্কে ভোটারদের স্বাধীনতা থাকা উচিত ও প্রয়োজন। নহিলে কংগ্রেসের মূল নীতির ব্যতিক্রম হয়।

বল্লভভাই স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচন দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। তিনি অবশ্য কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই। মহাভারতের যুগে সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু বধ হইয়াছিল। কলিকালে সপ্তরথীর ঘোষণাপত্র ও বিরুদ্ধাচরণের বিপক্ষে জয়ী হইয়াছেন সুভাষচন্দ্র! ওয়ার্কিং কমিটির কর্ত্তৃত্বপ্রয়াসী সপ্তরথীর অনধিকারচর্চ্চা গণতন্ত্রবিরোধী কার্য্যকলাপ সুভাষচন্দ্রকে এত বেশী ভোটে জয়যুক্ত করিতে সহায়তা করিয়াছে। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে যে অপ্রত্যাশিত চাঞ্চল্যময় বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রতি ছত্রে অভিমান ও রোষজনিত আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁর অনুগামী দক্ষিণপন্থীদলকে সহযোগিতা করিতে না পারিলে বাধা দান না করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে পরামর্শ দিয়াছেন। দক্ষিণপন্থী দল কর্ত্তৃক কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর কর্ম্মনীতি পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা যে পার্লামেন্টারী কর্ম্মনীতির উপর এই পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে। কিন্তু দেশবন্ধু ও মতিলালের স্বরাজ্যদলের আন্দোলনের সময় কাউন্সিলে প্রবেশ পাপ বলিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন।



রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

গান্ধীজী বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে প্রথমাবধি তিনি সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন; কিন্তু কেন ছিলেন তাহা উল্লেখ করা উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন বিধায় করেন নাই। কোন হেতু না দেখাইয়া গান্ধীজীর

এরূপ বিরুদ্ধাচরণের কারণ কি? গান্ধীজী স্বয়ং জহরলালকে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার মত দিয়াছিলেন। যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সে প্রদেশের লোক সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না; সে নিয়মও ব্যতিক্রম করান হইয়াছিল। তাহাতেও কোন দোষ ঘটে নাই। সুভাষচন্দ্র সহকর্মীদের সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা তিনি সমর্থনযোগ্য ও উপযোগী নহে বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রতি কটূক্তিকারী বল্লভভাই প্রভৃতির সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—মোট কথা, সুভাষবাবু তাঁহার দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতিত্ব পাইয়াছিলেন গান্ধীজী ও তাঁহার অনুগামীদের অনুগ্রহে, আগামী রাষ্ট্রপতিত্ব লাভ করিলেন সুভাষচন্দ্র নিজের শক্তিবলে। এই কারণেই আমরা তাঁহার এবারের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

পৃথিবীর অগ্রগমনের সঙ্গে গতি রাখিতে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহা রোধ করা সম্ভব নহে। গান্ধী পন্থীরাও তাহা পারেন নাই। তাঁহাদেরও অবশেষে কাউন্সিল প্রবেশ মানিয়া লইতে হইয়াছিল। মন্ত্রীত্ব গ্রহণও প্রথমে কংগ্রেস অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু পরে তাহা করিতে হইয়াছে এবং উপস্থিত পার্লামেণ্টারী কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইতেছেন। সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন, সভাপতি নির্ব্বাচনের উপর বহু বিষয়ের প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেই সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ও কার্য্যক্রম স্থিরীকৃত হয়। নির্ব্বাচকদিগের মতের সহিত সভাপতির মতের অনৈক্য ঘটিলে, নির্ব্বাচকদিগের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্রও বলিয়াছেন, বামপন্থীরা কখনই কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে অসহযোগিতা করিবার কোন কারণ উপস্থিত হইবে না। বামপন্থীরা নির্ব্বাচন প্রতিশ্রুতি ও পার্লামেণ্টারী কার্য্যসূচী অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে। তিনি বলিয়াছেন, মহাত্মার বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইবার জন্য আমি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিব। কেন না সকলের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইয়াও আমি যদি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থা লাভ না করিতে পারি তাহা আমার পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় হইবে।

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বল্লভভাই কোম্পানীও জানাইয়াছেন যে, এ বিষয়ে তাঁহাদের মতানৈক্য নাই। কিন্তু মানবেন্দ্র রায় বলিয়াছেন, বোম্বাইয়ে বল্লভভাইয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে প্রীতি-সম্মিলন হইয়াছিল তাহাতে বল্লভভাই বলিয়াছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য লাভের সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। ডাক্তার খারেও বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্রী কে হইবে, সে সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু এসব উক্তির কোন প্রতিবাদ হয় নাই। সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে সেতু স্বরূপ। তাঁহারা পরিবর্ত্তন চাহিলেও, কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয় ঘটাইবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই।

সীমান্ত নেতা ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষের অভিমত—গান্ধীজীর বিবৃতিতে যে ঔদার্য্যের অভাব দেখা গিয়াছে অপর কোন বিবৃতিতে আজ পর্য্যন্ত ততখানি অনুদারতা পরিলক্ষিত হয় নাই। সহকর্ম্মীগণের প্রতি সুভাষচন্দ্রের উক্তি গান্ধীজীর মতে অযৌক্তিক ও অশোভন। কিন্তু কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রচারকার্য্য ও প্রতিনিধিগণের উপর আদেশজারী কি ন্যায়সঙ্গত ও শোভনকার্য্য হইয়াছে।

শ্রীকমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় বলেন—এই পরাজয় মহাত্মার পক্ষে নিজের অথবা নিজের মতবাদের পরাজয় বলিয়া মনে করা ক্ষোভের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কংগ্রেসের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণই এই নির্ব্বাচনে প্রকৃত বিচার্য্য বিষয়।

মহাত্মাজীর নিজস্ব উক্তিতেই প্রকাশ যে, তিনি কংগ্রেস সংশ্রবে নাই, এমন কি সাধারণ চারি আনার সদস্যও নহেন। তথাপি মহাত্মাজী ও কংগ্রেস অভিন্ন; ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সকল সভায় ও আলোচনায় তাঁহার উপস্থিতি ও তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার সম্মতিতে অধিকাংশ জরুরী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি কংগ্রেসের সভ্য থাকুন বা না থাকুন কংগ্রেস তাঁহার অধিনায়কত্বেই কার্য্য করিতেছে।

মালদহে রাজনীতিক সম্মিলন—

গত ৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী দুই দিন মালদহে জিলা রাজনীতিক সম্মিলন উপলক্ষে কলিকাতা হইতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু মালদহে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় উক্ত সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সম্মিলনে একটি মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। সম্মিলনে বলা হইয়াছে যে, জলপাইগুড়িতে প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মিলনে এবং পরে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশনেও যেন ঐ প্রস্তাবটি সকলে গ্রহণ করেন।

জলপাইগুড়ি প্রাদেশিক সম্মিলন—

গত ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়ি শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র শুধু খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার নহেন; তাঁহার ত্যাগ প্রকৃতই অসাধারণ। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য ও কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় যেরূপ অর্থদান করেন, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহাকে দেশসেবার জন্য লাঞ্ছনাও কম ভোগ করিতে হয় নাই। কাজেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় গুণেরই আদর করা হইয়াছে। শ্রীযুত চারুচন্দ্র সান্যাল জলপাইগুড়িতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন; তাঁহার ত্যাগের কথাও সর্ব্বজনবিদিত। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রও জলপাইগুড়ি সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। সুখের বিষয় মালদহের মত জলপাই-গুড়িতেও একটি মাত্র প্রধান প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটির সার মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম—"সকল লোকের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি এক্ষণে আধুনিক জগতের সর্ব্ববাদিসম্মত নীতি। এই নীতির যুক্তিতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের অবসানে ইউরোপের মানচিত্র নূতন করিয়া প্রস্তুত এবং নূতন সীমান্ত নিরূপণ করা হয়। ভারতের অধিবাসিগণ মনে করেন যে, ভারতে এই নীতির প্রয়োগে বিশেষ বিলম্ব হইয়াছে এবং অবিলম্বে তাঁহাদিগের স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। বৃটেনে বৃটিশগণ কর্ত্তৃক রচিত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সহিত ভারতীয়দিগের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির কোনও সাদৃশ্য নাই। এজন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ কংগ্রেস কেবলমাত্র ঐ আইন অগ্রাহ্য করিয়াই সন্তুষ্ট নহে; ইহা ছাড়া কংগ্রেসের দাবী এই যে, ভারতীয়দিগকে গণ-পরিষদ মারফত আপনাদিগের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে হইবে। বৃটিশ সরকারকে ভারতের স্বাভাবিক দাবী অর্থাৎ গণপরিষদ গঠন ও তাহার মারফত শাসনতন্ত্র রচনার দাবী পূরণ করিতে বলা হউক। বৃটিশ সরকার সেই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করুন এবং গ্রেট বৃটেন ও ভারতের মধ্যে একটি মৈত্রীসূচক চুক্তি সম্পাদন করা হউক। এই চুক্তিতে উভয় দেশের সমানাধিকারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করা হইবে। ছয় মাসের অনধিক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৃটিশ সরকারকে ভারতের জাতীয় দাবীর সুস্পষ্ট ও সঠিক উত্তর প্রদান করিতে অনুরোধ করা হইবে। উত্তর যদি না পাওয়া যায় অথবা অসন্তোষ-জনক হয়, তবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীকে কংগ্রেসের মূলনীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জাতীয় দাবী পূরণের যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।"

আগামী মহাযুদ্ধ ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় মালদহ জেলা রাজনীতিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তিনি বলিয়াছেন—"পৃথিবীব্যাপী আসন্ন মহাযুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। আজ হোক, কাল হোক, জার্ম্মানী, ইটালী, জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ড ও তার মিত্রশক্তির যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়? যেহেতু জার্ম্মানীতে নাৎসিজম চলছে, ইটালীতে ফ্যাসিজম্ চলেছে এবং আমরা তা পছন্দ করি না এবং যেহেতু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ভোটতন্ত্র চলেছে ও আমরা ভোটতন্ত্র অত্যন্ত

পছন্দ করি, অতএব যে পক্ষে ভোটতন্ত্র সে পক্ষেই আমাদের যা কিছু করণীয় করব কি ? পৃথিবীব্যাপী ভোটতন্ত্রের জয় হউক, কিন্তু দেশীয় কি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আপাতত ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই যেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে।' আগে নিজের ঘরের মালিক হই, তাহার পর না হয় কোন্ তন্ত্রে পৃথিবী চলবে, সে বিষয়ে মনোযোগ দেবো। আজ আমাদের সকল কাজ সকল গঠনের মূলে যেন এই উদ্দেশ্য থাকে যে আসন্ন সংঘর্ষের সময়ে আমাদের পূর্ণ দাবী আদায় করে নিতে হবে।" এই কথা কয়টি এখন ভারতের সকল রাজনীতিককে মনে রাখতে হবে।

জলপাইগুড়ি সম্মিলনে বাঙ্গালার দাবী—

জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে রাষ্ট্রনেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের নিকট বাঙ্গালার দাবীর কথা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। সেই দাবী প্রধানত দুই ভাগে তিনি বিভক্ত করিয়াছেন—(১) সকল বাঙ্গালী এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এখনও বাঙ্গালা ভাষাভাষী ও বাঙ্গালীর দ্বারা অধ্যুষিত কয়েকটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাঙ্গালার বাহিরে অন্য প্রদেশের অংশরূপে রহিয়াছে। ইহাদিগকে বাঙ্গালায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কংগ্রেস যখন ভাষাকেই প্রদেশ বিভাগের মূলনীতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তখন এ বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। * * * কোন বাঙ্গালীর পক্ষে এই ন্যায্য দাবী ত্যাগ করা সম্ভব নহে। যদি সকল বাঙ্গালী এক প্রদেশের মধ্যে একীভূত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে প্রকৃত রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হইতে পারে না। অন্তত বাঙ্গালীর পক্ষে সেইরূপ রাষ্ট্রসংঘকে স্বাভাবিক ও ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না। (২) বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক অধিকারের কোন সঙ্কোচ হইবে না।

ভারতের নিকট বাঙ্গালার এই দাবী যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেজন্য বাঙ্গালী মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা—

বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদিগের মধ্যে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একটি 'নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ড' গঠন করিয়াছিলেন ও শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল মহাশয়কে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত বোর্ড কলিকাতার প্রধান প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগকে কর্ম্মী সরবরাহ করিতেছেন। এইভাবে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতেছে। প্রায় শতাধিক বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এই কার্য্যে বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। সম্প্রতি উক্ত নিয়োগ ও সংবাদ সরবরাহ বোর্ডের পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে ২৪টি ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বক্তৃতাগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্য ; কলিকাতার বহু খ্যাতনামা শিল্পী ও ব্যবসায়ীকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। প্রায় বড় বড় সকল দেশী ও বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিজ নিজ ব্যবসা-জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন ; কি ভাবে যুবকগণ ঐ সকল ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারেন, সে কথাও তথায় আলোচিত হইতেছে। আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে ঐ বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—"যাতায়াতের ও সংবাদ আদান প্রদানের দ্রুত উন্নতির ফলে বাঙ্গালীরা কেবল পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে নহে, পরন্তু চীন, জাপান ও ভারতের অবাঙ্গালী জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে পরাজিত হইতে চলিয়াছে। এই দুঃখ ও মর্ম্মবেদনা গত ২১ বৎসর যাবত আমাকে ব্যথিত করিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায়কে দোষ দেওয়া যায় না ; তাহাদের প্রতিভা আছে। স্বদেশ প্রেমের যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহারা জগতকে চমৎকৃত করিয়াছে, ব্যবসাক্ষেত্রেও তাহারা সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইবে

বলিয়া আশা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। কারণ গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত আমিও সময়ে অসময়ে ঐ আদর্শই যুবকদের সম্মুখে ধরিয়াছি। আমি জানি সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, সেখানে সাফল্য সুনিশ্চিত।" আচার্য্য রায়ের পর আরও কয়েকজন বক্তা ঐ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে পাট, কয়লা, চা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। আনন্দের বিষয় এই যে, শিক্ষিত যুবকগণ দলে দলে গিয়া বক্তৃতা শুনিতেছেন ও ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চেষ্টার ফলে যদি এ দেশের যুবকগণ শিক্ষা সমাপ্তির পর চাকরীর জন্য ছুটাছুটি হইতে বিরত হইয়া শিল্পবাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহা দেশের পক্ষে সত্যই মঙ্গলদায়ক হইবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের এই উদ্যমের প্রশংসা করি।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা—

একদল দেশকর্ম্মী যেমন হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে ও কয়েকজন সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশে গত ১৯শে মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ভবনে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় স্থির হইয়াছে যে, দেশে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার পর দেশশাসনের কর্ত্তৃক পূর্ণভাবে দেশবাসীর হাতে আসার পূর্ব্বে রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা স্থির করিবার প্রয়োজন নাই। তবে ইতিমধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার প্রভৃতির চেষ্টার জন্য একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সেদিনের সভায় রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। যাঁহারা হিন্দী ও উর্দ্দু উভয় ভাষা মিলাইয়া 'হিন্দুস্থানী' নামক একটা নূতন ভাষা গড়িয়া তাহাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী তাঁহারা সকলে ঐ বিষয়ে একমত এবং সে বিষয়ে তাহারা প্রবল আন্দোলন পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা—বাঙ্গালা ভাষাকে অপর সকল প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়াও বাঙ্গালা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে একমত নহি এবং এ বিষয়ে কোনরূপ আন্দোলন করি না। বাঙ্গালা দেশের চিন্তাশীল মনীষীবর্গ ও সুধী সাহিত্যিকবর্গ যদি এ বিষয়ে বার বার আলোচনা করিয়া একমত হন এবং এ বিষয়ে প্রবল আন্দোলন করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালাও যে রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশে আন্দোলনের অভাব হইবে না।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মৃতিপূজা—

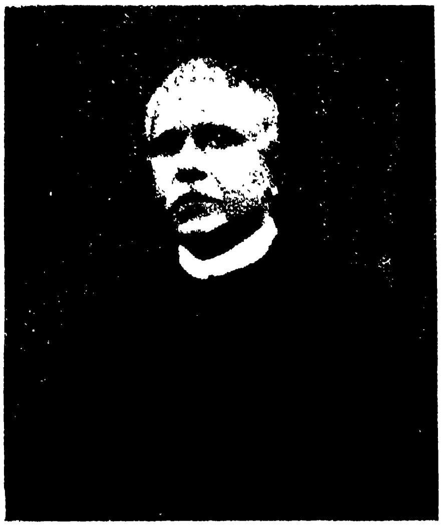
১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ বাঙ্গালা দেশের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; এ বৎসর ঐ দিনে বাঙ্গালার নানাস্থানে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিপূজা করা হইয়াছে। ১লা মাঘ শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি হুগলীর নিকটস্থ দেবানন্দপুর গ্রামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় শরৎচন্দ্রের স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবানন্দপুর নিবাসী উকীল শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী, হুগলীর পাবলিক প্রসিকিউটার, শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু রায় বাহাদুর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ঐ দিন কলিকাতা হইতে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক দেবানন্দপুরে গমন করিয়াছিলেন। দেবানন্দপুর শুধু শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি নহে; তথায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ দিন ভারতচন্দ্রের স্মৃতিফলকেরও উন্মোচন উৎসব করা হইয়াছিল। ঐ উৎসবের পরদিন ২রা মাঘ কলিকাতা এলবার্ট হলে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় শরৎচন্দ্রের স্মৃতিপূজা করা হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, সেই সমিতি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন —(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে

নিয়মিতভাবে বিশেষ বক্তৃতা করিবার জন্য একটি অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা, (খ) বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি তিন বৎসর অন্তর একটি পদক ও অর্থ পুরস্কার প্রদানের জন্য একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা, (গ) শরৎচন্দ্রের নামে কলিকাতা শহরের একটি বড় রাস্তার নামকরণ ও (ঘ) সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় দফার প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা করার পর অবশিষ্ট অর্থ যথেষ্ট বিবেচিত হইলে কলিকাতা শহরে শরৎ-চন্দ্রের একটি প্রতিমূর্ত্তি ও স্মৃতিমন্দির স্থাপন। প্রথম দুইটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অন্তত ২০ হাজার টাকা প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশে শরৎচন্দ্রের গুণগ্রাহীর অভাব নাই। কাজেই আমাদের বিশ্বাস, শরৎ-স্মৃতি-সমিতির কর্ম্মীরা সামান্য চেষ্টা করিলেই এই অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। দেবানন্দপুরেও দুই হাজার টাকা ব্যয়ে একটি শরৎচন্দ্র স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনার মধ্য দিয়াই অমর হইয়া থাকিবেন। কাজেই তাঁহার স্মৃতি-মন্দিরও সেই সঙ্গে চিরদিন দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

৺দেবব্রত বিদ্যারত্ন

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত ভারত-বিশ্রুত বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শিষ্য বেদবিৎ পণ্ডিত দেবব্রত বিদ্যারত্ন এম-এ মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিগত ২২শে পৌষ শনিবার রাত্রি ১৷৷০ ঘটিকার সময় তিনি সজ্ঞানে তাঁহার বরাহনগরস্থ ভবনে ইহলোক সম্বরণ করিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বারাণসী ধামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতায় সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সী কলেজে দেবব্রত বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি অতিশয় অধ্যবসায়শীল ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উক্ত বিষয়ে গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করিয়া "প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী সুবর্ণ পদক" প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বেই কাঁঠালপাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার ৺রতন-কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রপৌত্রীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার দাম্পত্য জীবন অতি মধুময় হইয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সম্ভাবনা হয় কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার এ সুযোগ নষ্ট হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দেবব্রত সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষা দেন এবং গুণানুসারে চতুর্থ স্থান অধিকৃত করেন। এই সময়ে তিনি বিদ্যারত্ন উপাধি ও চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন কিন্তু তাঁহার অগ্রজ কলিকাতার বাহিরে যাইতে দিতে আপত্তি করেন বলিয়া তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই।



দেবব্রত বিদ্যারত্ন

অতঃপর দেবব্রত কণ্ট্রোলার জেনারেলের অফিসে একটি কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যথাকালে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল সেণ্ট্রাল রেভিনিউজ অফিসে 'সিনিয়র একাউণ্টেণ্ট' পদে উন্নীত হন। হিসাব-বিভাগের নীরস ও পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যের অবসরে তিনি যথাসাধ্য সাহিত্যের আলোচনা করিতেন এবং "রাঠোর দুহিতা" নামক একখানি নাটক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে হারান এবং স্বয়ং চক্ষুঃরোগে আক্রান্ত হইয়াও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। আমরা

শুচিব্রত ও তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস্—

আয়ার্লণ্ডের কবি ও নাট্যকার উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস্-এর লোকান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের যে অন্তর্দ্ধান হইল, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান যুগে যে কয়জন অসামান্য প্রতিভাশালী লেখক রাষ্ট্র ও বর্ণের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিখিল-মানবের মনোরাজ্যে স্থায়ী আসন রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইয়েটস্ তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহার কবিতা ও নাটক শুধু বিশ্বসাহিত্যে যুগান্তর আনে নাই, আয়ার্লণ্ডের জাতীয় জীবনেও নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। সেই



কবি ইয়েটস্

আদর্শবাদের উপর আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি, সেই কেলটিক আদর্শের প্রচারক ও পুরোহিতরূপে ইয়েটস্ সর্ব্বকালের অর্ঘ্য লাভ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল আয়র্লণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্বেরই ক্ষতি হইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইয়েটস্ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কাররূপে যে অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ না করিয়া তিনি আয়র্লণ্ডের শিক্ষা ও সংস্কৃতির হিতার্থে দান করেন; ইহা তাঁহার দেশপ্রেমের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পরে তাঁহাকে 'গেটে প্রাক অব দি সিটি অব ফ্রাঙ্কফার্ট' সম্মানে ভূষিত করা হয়। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান উপেক্ষণীয় নহে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি আইরিশ গণতন্ত্রের সিনেটর ছিলেন এবং মিঃ কসগ্রেভকে সমর্থন করিতেন। আনুগত্যের শপথের উচ্ছেদ বা পরিবর্ত্তন (modification) যদিও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে আয়র্লণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—

পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি রায় বাহাদুর অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২২শে পৌষ সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। অমরবাবু ২৪ পরগণার নিমতা গ্রামে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ভগবতীচরণ



অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়

আলিপুরে রেজিষ্ট্রার এবং মাতুল সার ৺প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তিনি নিমতা হইতে এণ্ট্রান্স ও সিটি কলেজ হইতে বি-এল পাশ করিয়া কিছুকাল শিয়ালদহ ও আলিপুরে ওকালতী করেন ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মুন্সেফ হন। পরে পাটনা হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার হইয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তথায় বিচারপতি নিযুক্ত হন। পরে কিছুদিন তিনি বিহারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বর ছিলেন। তিনি পাটনায় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিজে বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। তিনি আজীবন দুস্থ আত্মীয়গণকে 'সাহায্য করি-

তেন ও নিমতা গ্রামে অনেক টাকা দান করিতেন। বিহারে বাঙ্গালীদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনে তিনি ব্যারিষ্টার মিঃ পি আর দাশ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।

শ্রীমতী হরিদাসী দাসী—

'ভারতবর্ষ' সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুত জলধর সেন মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীমতী হরিদাসী দাসী গত ৮ই মাঘ ৬০ বৎসর বয়সে ৭ পুত্র ও ৪ কন্যা ও ৮০ বৎসর বয়স্ক স্বামীকে রাখিয়া পরলোকগতা হইয়াছেন জানিয়া আমরা স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি। তিনি সুগৃহিণী ছিলেন এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে

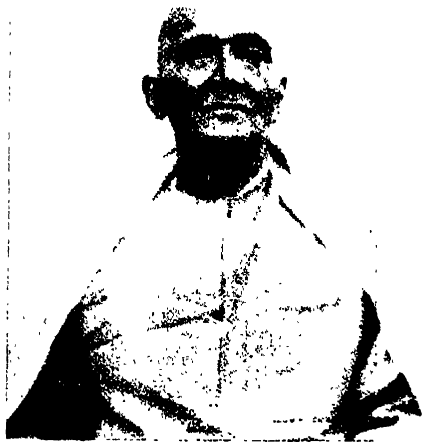


হরিদাসী দাসী

ভালবাসিতেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন এবং অনেক সময়ে রায় বাহাদুরকে সাহিত্য সেবায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। পরিণত বয়সে স্বামীপুত্রাদি রাখিয়া পরলোক-গমন হিন্দু মহিলার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। আমরা রায় বাহাদুরকে তাঁহার এই দারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি রায় বাহাদুরকে শান্তিময় দীর্ঘজীবন প্রদান করুন।

শিবরতন মিত্র—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক বীরভূম জেলার সিউড়ী নিবাসী শিবরতন মিত্র মহাশয় গত ২০শে পৌষ ৬৬ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগত হইয়াছেন। গত বৈশাখ মাসে তাঁহার তৃতীয় পুত্র ব্যায়াম-জগতে সুপরিচিত বনগোপালের ৩৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুর পর তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ১২৭৮ সালের ১লা চৈত্র তাঁহার জন্ম হয়। সিউড়ী হইতে এণ্ট্রান্স ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ-এ পাশ করিয়া তিনি কিছুদিন জেনারেল এসেম্বলী কলেজে বি-এ পড়িয়াছিলেন—কিন্তু কনিষ্ঠ সহোদরের পীড়ার জন্য পরীক্ষা পাশ করিতে পারেন নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বীরভূমে সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করেন ও জেলা অফিসের বড়বাবু হইয়া ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩১৫ সালে পিতৃবিয়োগ ও পুত্রবিয়োগ হইলে তিনি এক বৎসরের ছুটী লইয়া এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউসে চাকরী করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি 'মানসী' পত্রের সম্পাদক চতুষ্টয়ের অন্যতম ছিলেন। ১৩০৬ সালে 'বীরভূমি' মাসিকপত্র প্রকাশিত হইলে তিনি তাহাতে বীরভূমের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। সারা



শিবরতন মিত্র

জীবন পরিশ্রম করিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক নামক সুবৃহৎ চারিতাভিধান রচনা করেন। তাহার মাত্র ১৬ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে ৫ হাজার গ্রন্থকারের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি প্রায় সকল মাসিক পত্রেই প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রতন লাইব্রেরীতে ৫ হাজার মুদ্রিত পুস্তক ও ১০ হাজার হস্তলিখিত পুঁথী আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উকীল শ্রীযুত গৌরীহর মিত্রও বীরভূমের সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্নী, পুত্র ও ২ কন্যাকে তাঁহাদের এই দারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপায়বিহীন

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

কোথা হইতে চারিটি প্রাণী আসিয়া শহরের উপকণ্ঠে একখানি ভাঙা বাড়ীতে বাসা বাঁধিয়া এক লিমিটেড কোম্পানি খুলিয়া ব্যবসা সুরু করিয়া দিল। কোথাকার বাসিন্দা, কি জাতি, কোন্ বংশের—একথা বিশ্বের মানবসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলেও উহারা পরস্পরের কাছে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ চেনা ও জানা হইয়া পড়িল। দুটি পুরুষ এবং দুটি নারী; এক নম্বর হাবলা, তাহার হাত এবং পা উভয়েরই আঙুলগুলি দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে খসিয়া গিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে ঘা, মাথার চুলগুলি রুক্ষ এবং খাড়া খাড়া। ব্যাধির অখণ্ড প্রতাপ যে সেখানেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা হাবলার চেহারা দেখিলেই বোঝা যায়। চোখ দুটিকেও রোগে আক্রমণ করিয়াছে; কারণ, চোখের কোণে ক্ষত ও ময়লাভর্ত্তি এবং চক্ষু দুইটি অসম্ভব লাল। দু'নম্বর সাধন—সে হাঁটিতে পারে না। কোন গতিকে পা এবং হাত দুখানির উপর নির্ভর করিয়া চলে। যখনই সম্মুখে কোন লোক পড়ে, তখনই ধনী-নির্ধন বিচারের সমস্যা ত্যাগ করিয়া, দু'খানি পা এবং একখানি হাতের উপর ভর দিয়া অন্য হাতখানি তুলিয়া বলে, "ভগবান আপনার ভাল করবেন—রাজা হবেন—একটা পয়সা দিন। কেহ হয়ত এই অভিশপ্ত জীবটিকে একটা পয়সা দেয়, আবার কেহ হয় ত তাহার রাজা হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই একথা জানিয়া বর্ত্তমানের সম্বল পয়সাটিকে আর খরচ করে না। তিন নম্বর শুঁটকি—তাহারও অবস্থা প্রায় হাবলার মতই। তবে সে হাবলার মত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত নয়, তাই তার আঙুলগুলি খসিয়া যায় নাই—সে নুলো নয়, কিন্তু অথর্ব্ব। তাহার বয়েসও হইয়াছে, জরার ছাপ তাহার সর্ব্বাঙ্গে। উহাদের মধ্যে মানদাই যা একটু শক্তসামর্থ্য এবং বয়সও কম। তাও তাহার পায়ে একজিমা, দগদগে ঘা—সমস্ত দিনরাত পুঁজ রক্ত ঝরিতেছে। তবু সে-ই একটু শক্ত সক্ষম এবং রান্নার ভারটাও লইয়াছে বলিয়া দলের দেবী-চৌধুরাণীর পদ তাহাকেই দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ সে-ই দলের নায়িকা।

কিন্তু ব্যবসাটা তাহাদের অতি তুচ্ছ—ভিক্ষা করা। একমাত্র মানদা ছাড়া দলের আর তিনজনেরই পেশা ভিক্ষা করা। নিত্য প্রভাতে হাবলা শহরের বড় রাস্তার মোড়টায় গিয়া বসে এবং কণ্ঠ হইতে এক প্রকার অদ্ভুত স্বর বাহির করিয়া সকলের করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করে। কেহ হয় ত একটা পয়সা দেয়, কেহ দেয় না। পয়সা পাইয়া ক্ষতগ্রস্ত ঠোঁট দুইটা নাড়িয়া কি বলিয়া যে তাহার মঙ্গল কামনা করে, তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারে না। সাধন তাহার দুই হাত এবং দুই পায়ের উপর ভর দিয়া শহরের গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে 'একটা পয়সা মা' বলিয়া চীৎকার করে। শুঁটকি বড় বিশেষ কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে না, কোনগতিকে আগাইয়া চলে। কোন দিন দু-একটা পয়সা পায়, কোন দিন পায় না। আর মানদা পায়ের একজিমা কাপড়ের নীচে চাপা দিয়া রাখিয়া মোড়ের মাথায় পানের খিলি বিক্রি করে।

সমস্ত দিনটা যেভাবেই হউক, যেখানেই হউক, এক প্রকারে কাটিয়া যায়, কিন্তু গোলমাল বাধে সন্ধ্যাবেলা। কারণ, সন্ধ্যাবেলাতেই সকলকে দৈনিক আয়ের হিসাব দিতে হয়। হিসাব নেয় মানদা।

শুঁটকি গোটা পাঁচ-ছয় পয়সা বাহির করিয়া দিয়া একপাশে সরিয়া গিয়া বসে। মানদা পয়সা কয়টিকে কুড়াইয়া লইয়া বেশ চিবাইয়া চিবাইয়া বলে—পাঁচটা-ছ'টা পয়সা হলে আমি তোমায় খেতে দিতে পারব না বুড়ি, বেশী ক'রে রোজগার কর—

বুড়ি অস্পষ্ট ভাষায় গোঁ-গোঁ করিয়া কি যে বলে তাহা বোঝা যায় না। বোধ হয় সে নিজের অক্ষমতার কথাই বলে, বোঝা না গেলেও মানদা অনুমানে তাহা বুঝিয়া লয়; বলে—তবে হেবো আর সাধনাকে বল, ওরা যেন তোমায় খেতে দেয়—আমি পারব না—

শুঁটকি কাতর দৃষ্টিতে হাবলা এবং সাধনের পানে চায়। হাবলা মাথা নাড়িয়া সম্মতিই দেয়। কারণ, এ দলের মধ্যে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করে; কিন্তু সাধন একেবারে তুবড়ির মত ফাটিয়া পড়ে। দুই হাতের ভর দিয়া একটু আগাইয়া আসিয়া বলে, খেতে দেবে না কচু দেবে—হাতী দেবে, ওই হারামজাদী বুড়ীকে আমি চিবিয়ে খাব—খাব—খাব—

হেবোর সম্মতি দেখিয়া বুড়ীর চোখ দুইটা যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল—ঠিক সেই পরিমাণেই আবার নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। মানদা বলিল—তবে হেবো একাই ওকে খেতে দেবে—

এইবার হিসাব দিবার পালা আসিল সাধনের। সে ট্যাঁক হইতে আনা আষ্টেক পয়সা বাহির করিয়া মানদার সম্মুখে রাখিল। মানদা পয়সা কয়আনা গণিয়া বলিল—মোটে আটআনা! আর কই রে—

—আর নেই। সাধন বলিল।

সন্দিগ্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মানদা বলিল—নেই, না দিচ্ছিসনে?

—দেখি তোর কাপড়টা ঝাড় ত—

চক্ষু দুইটি যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সাধন বলিল—মাইরি না—মাইরি না—কোন শালা মিছে কথা বলে। সবে এই তিনটি পয়সা রেখেছি বিড়ি দেশলাই কিনব বলে।—

বলিয়া তিনটি পয়সাশুদ্ধ বামহাতখানি মানদার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিল। মানদা যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া দাঁতমুখ খিচাইয়া বলিল—ঢং দেখে আর বাঁচিনে—মাইরি না—মাইরি না—শুধু বিড়ি খাবার

জন্যে তিনটে পয়সা রেখেছি। অত বিড়ি খাস কেন রে "নাৎখোয়ারা"! তোদের আবার গতর খাটিয়ে রেঁধে দেব, বয়ে গেছে—উননের পাশ তুলে দেব, খেও। এবার হাবলার পালা। সে পয়সা বাহির করিয়া দিলে দেখা গেল যে, তাহার উপার্জ্জনই সকলের অপেক্ষা অধিক। হইবারই কথা, কারণ তাহাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম অভিশাপে অভিশপ্ত দেখিয়া পথচারী সকল পথিকেরই বোধ হয় দয়া হয়, তাই সে উপার্জ্জনও করে বেশী।

কিন্তু মানদা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহে, সে আরও অধিক চায়। অবশ্য তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে। বয়স তাহার বেশী নহে, চেহারাও খুব খারাপ নয়। কোন গতিকে একবার যদি পায়ের এগজিমাটা সারাইয়া লইতে পারে, তাহা হইলে এখনও হয় ত তাহার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আছে। চাই কি, কোন সহৃদয় ব্যক্তির নজরে পড়ে তার নসিব খুলিয়া যাইতে পারে। থিয়েটার কিম্বা সিনেমার নটী হইয়া প্রভূত যশ ও অর্থের অধিকারীও হইতে পারে; কিন্তু তাহার কল্পনার এই সুখোজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে বাস্তবে টানিয়া আনিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন টাকার। তাই সে চায় টাকা, কিন্তু নিজে সে মোড়ের মাথায় বসিয়া পানের খিলি বিক্রয় করিয়া দৈনিক আট-নয় আনার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে না। তাই সে এই নিরীহ প্রাণী তিনটিকে পোষণ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিবার এই অভিনব পন্থাটি আবিষ্কার করিয়াছে। হাবলার দেওয়া পয়সা কয় আনা গণিয়া সে বলিল, মোটে চোদ্দ আনা পয়সা কেন রে হেবো?

সাধন একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—মোটে চোদ্দ আনা, তুই বলিস্ কি মানদি—ও শালা চুরি করেছে, নির্জ্জলা চুরি করেছে; ও শালা আজ ঢের বেশী রোজগার করেছে। আমি যে আজ সারাদিন ওর কাছেই বসেছিলাম। কি পয়সাই পড়েছিল, যেন পয়সার বৃষ্টি—ও নিঘ্যাত চুরি করেছে, তুমি বরং ওর কাপড় ঝেড়ে দেখ—

আর কিছু বলিতে হইল না; কাপড় ঝাড়ার প্রস্তাবে শ্রীমান হাবলচন্দ্র রাগে একেবারে তুবড়ির মত ফাটিয়া পড়িল। বিকৃত কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব উচ্চ করিয়া বলিল—কে বলে—কোন্ শালা বলে আমি চুরি করিছি? আমি কারও মত তাড়া তাড়া বিড়ি ফুঁকিনে। যে চুরি করেছে তার মুখে যেন রক্ত ওঠে—তার হাতে পায়ে যেন কুষ্ঠ হয়।

সাধনও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে হামাগুড়ি দিয়া হাবলের ঠিক সম্মুখে আসিয়া বলিল—করিস নি চুরি?

হাবল কণ্ঠস্বরের উচ্চতার স্কেল বজায় রাখিয়া বলিল—করিছি?

—করিস নি?

—করিছি?

এইবার কিন্তু সাধন এক অভাবনীয় কার্য্য করিয়া বসিল; সহসা হাবলের চুলের মুঠি ধরিয়া মাথায় এক গাঁট্টা বসাইয়া দিয়া বলিল—তুই করিস নি তোর বাবা করেছে—

হাবল তাহার নুলো হাত দিয়া সাধনের মুখে এক ঘুঁষি বসাইয়া দিয়া তাহার কান কামড়াইয়া ধরিল। সাধন যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেও হাবলকে ছাড়িল না। সেও পাল্টা আক্রমণ করিল। ফলে উভয়পক্ষে রীতিমত হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল। কিন্তু হাবলা সাধনের সহিত শক্তিতে পারিয়া উঠিবে কেন? সাধন চলচ্ছক্তিহীন হইলেও তাহার হাত পা দুইই আছে, আর হাবলা হস্তপদবিহীন। সুবিধা পাইয়া সাধন হাবলের পায়ের ক্ষতযুক্ত বুড়ো আঙ্গুলটার উপর এক কিল বসাইয়া দিল। ফ্যাট করিয়া একটা শব্দ করিয়া হাবলের বুড়ো আঙ্গুলের ভিতর হইতে খানিক পুঁজ রক্ত পচা মাংস বাহির হইয়া আসিল। হাবল যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া সাধনকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়া সাধন দূরে গিয়া হাঁপাইতে লাগিল। মানদা ততক্ষণে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।

হাবল নিজের ছেঁড়া কাপড়ের কোণায় তাহার পায়ের পুঁজ-রক্ত মুছিতে মুছিতে নিজের সাফাই গাহিতে থাকে। সে পয়সা চুরি করে নাই, একথা সে তামা-তুলসী গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলিতে পারে। সে রোজ যাহা পায়, তাহাই মানদাকে আনিয়া দেয়।

অথচ সে সত্যই পয়সা চুরি করিয়াছে। রাস্তার যে জায়গায় বসিয়া সে ভিক্ষা করে, তাহার অনতিদূরে সেদিন একটি লোক চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া একটা তেল বিক্রয় করিতেছিল। ইহাতে যাবতীয় ঘা ভাল হয়—পচা ঘা, নালী ঘা…সর্ব্বপ্রকার ঘা-এর অব্যর্থ মহৌষধ—মূল্য মাত্র ছ'আনা—তাই হাবলা ছ'আনা পয়সা লুকাইয়াছে। তেলটা কিনিয়া আনিয়া ব্যবহার করিয়া দেখিবে। লোকটা তো নিজেই বলিয়াছে—সর্ব্বপ্রকার ঘা ভাল হয়, চাই কি সে তাহার আঙুলগুলিও ফিরিয়া পাইতে পারে। সে সকলকে শুনাইয়া নুলো হাত দুখানি উঁচু করিয়া বলিতে থাকে—পয়সা চুরি করেছি আমি—হে ভগবান, হে ভগবান—

শ্রাদ্ধবাড়ী, চতুর্দ্দিকে একটা হৈ-চৈ বাধিয়াছে, "দিয়তাং ভুজ্যতাং" রব। প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটান হইয়াছে। তাহার তলায় কত পুরুষ ও নারী। যদিও একজন আত্মীয়ের মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত হইয়াছে, অর্থাৎ দুঃখ প্রকাশ করিতে আসিয়াছে, তথাপি হাসি, তামাসা, ঠাট্টা, সকলই চলিতেছে। এমন কি, অন্দরমহল হইতে তরুণীর কণ্ঠনিঃসৃত "মাধবী রাতে মম মনোবিতানে"—সঙ্গীতের সুরের রেশটুকুও শোনা যাইতেছে। এক পার্শ্বে একখানি চৌকির উপর গালিচা পাতিয়া কয়েকজন চশমাধারী যুবক কি যেন কি সমস্যার মীমাংসা করিতে লাগিয়া গিয়াছে—বুঝি-বা তাসই খেলিতেছে। শোকসভা বিলাসোৎসবে পরিণত হইয়াছে।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে, সামিয়ানার বাহিরে উঠানের একপার্শ্বে দূর-দূরান্তর গ্রাম হইতে আগত ভিখারীসম্প্রদায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের সহিত হাবলা, সাধন, মানদাও আসিয়াছে। এমন কি, শুঁটকি বুড়িও কোনমতে ছ্যাঁচড়াইতে ছ্যাঁচড়াইতে তাহার জরাগ্রস্ত অথর্ব্বদেহটা টানিয়া আনিয়াছে, বড় আশা—দু'খানা লুচি খাইবে। অথচ হয় ত ইহারা জীবনে কখন লুচি চোখেও দেখে নাই। লুচি বস্তুটা যে কি, কি দিয়া প্রস্তুত হয়, তাহার স্বাদ কিরূপ তাহাও জানে না। তথাপি আসিয়াছে।

হাবলা তাহার বিকৃত দেহটা লইয়া আগাইয়া আসিতেই কে একজন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল—আ মর্! এ মিন্সে যে ঘাড়ের ওপর আসছে।

ওমা! মিন্সের যে কুষ্ঠ হয়েছে, তবু মিন্সের নোলা দেখ, লুচি খেতে এসেছে। ঝ্যাঁটা মার ঝ্যাঁটা মার অমন নোলার মুখে—অমন নোলা পুড়িয়ে দিতে পারিস নে! বলিয়া সে বোধ করি বিষাক্ত রোগের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটু দূরে গিয়াই দাঁড়াইল। হাবলা যেন কতকটা অপ্রতিভ হইয়াই পড়িল; কিন্তু বুঝিতে পারিল না লুচি খাইতে আসিয়া সে কি অপরাধ করিল। সেও ভিখারী, ইহারাও ভিখারী। তবে? মানুষে তাহাকে ঘৃণা করে সে কথা সে জানে, তাই বলিয়া কি তাহার সমপর্য্যায়ভুক্ত ইহারাও ঘৃণা করিবে?

মানদা একটু দূরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল। সে হাবলার কাছে গিয়া অন্যে যাহাতে না শুনিতে পায় এমনভাবে বলিল—হেবো, তুই একপাশে সরে দাঁড়া—

হাবলা বিরক্ত হইয়া বলিল—কেন?

মানদা বলিল—যা বল্‌ছি তাই কর্ না—সরে দাঁড়া একপাশে।—

এইবার হাবলা রীতিমত চটিয়া গেল; বলিল—তা বই কি, তোমরা সব কোঁচড় ভর্ত্তি করে নিয়ে আসবে, আর আমি যাব না, নয়? আমি যাব না সরে—

মানদাও চোখ পাকাইয়া বলিল—"যা বলছি তাই কর্—বেরো—বেরো, দূর হয়ে যা—" তার পর অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলিল—আমি বেশী করে নেব এখন, তোকে তার থেকে দেব, যা!

দূরে সরিয়া যাইবার ইচ্ছা হাবলের ঠিক ছিল না, কিন্তু দলের দেবীচৌধুরাণীর আদেশও অমান্য করিতে পারিল না। তাই রুদ্ধ আক্রোশে গোঁ গোঁ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মানদার উপর ভরসা করিয়া দূরে সরিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলাদের আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবেরও শেষ হইয়াছে। একজন ঠিকা ঝি এঁটো পরিষ্কার করিয়া এক ঝুড়ি নিমন্ত্রিত অতিথিগণের পরিত্যক্ত লুচি-তরকারী লইয়া বাহির হইয়া আসিল। অমনি যে যেখানে ছিল, সকলেই এক সঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করিল। ঝি যথাসাধ্য সকলের মধ্যে লুচি-তরকারী বিতরণ করিল। যখন ঝুড়ি একেবারে শেষ হইল, তখন নানা প্রকার প্রশ্ন আসিতে লাগিল। কেহ বলিল—আর দুখান দাও বাছা, ঘরে আমার সোয়ামী আছে। কেহ বলিল যে, তাহাকে আরও কয়েকখানি না দিলেই চলিবে না, কারণ গৃহে সে ম্যালেরিয়াপীড়িত পুত্রকন্যা রাখিয়া আসিয়াছে, তাহারাও দু-একখানা খাইবার আশা রাখে। কেহ বলে—লুচি কই বাছা, তুমি যে শুধু তরকারীই দিলে—

ঝি উত্তর দিল—ওই যা ছিল—দিলাম। আর সকলকেও তো দিতে দিতে হবে, না একলা শুধু তোমাকে দিলেই চল্‌বে—

পূর্ব্বোক্ত রমণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"আমর! চেড়ী মাগীর আবার রকম দেখ না, যেন তেড়ে মারতে এল। কি বল্‌ব, এই হতচ্ছাড়ী লুচি খাব লুচি খাব করছে তাই এখানে আসা—নইলে কোন শতেক খোয়ারী এদের দরজায় আসত—বড়লোকের মাথায় মার ঝ্যাঁটা"—

বলিয়া বোধ করি নিজের প্রেষ্টিজ বজায় রাখিবার জন্যই সে হতচ্ছাড়ী কন্যা-রত্নটির হাত ধরিয়া সদম্ভে স্থান ত্যাগ করিল। হাবলা একপার্শে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মানদা হাসিমুখে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বেশ কিছু হাতাইয়াছে। হাবলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—নে, চল।

হাবল গর্জ্জন করিয়া বলিল—লুচি এনিচিস্?

মানদা উত্তর দিল "কই আর পেলাম—পেইছি খানিক কুমড়োর তরকারী, চল্ তোকেও ভাগ দেব এখন।"

হাবলা কিন্তু এত সহজে মানদার কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। মানদার মত মেয়ে যে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অসম্ভব। সন্দিগ্ধভাবে মানদার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—কই তোর কোঁচড় দেখি?

এরকম ঘটনা যে ঘটিতে পারে, তাহা মানদা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল, তাই সে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিল। অর্থাৎ সে তাহার পেটের কাপড়ের নীচে অন্য একটা কোঁচড় তৈয়ারি করিয়া তাহার ভিতর লুচি, মিষ্টি প্রভৃতি লোভনীয় দ্রব্যগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল এবং উপরেরটায় রাখিয়াছিল তরকারী। হাবলার কথায় সে অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া পরম সত্যবাদিনীর মত বলিল—আমি কি তোর সঙ্গে মিছে কথা বলছি রে হেবো—এই দেখ্ না, দেখ্—

এই বলিয়া সে কোঁচড় প্রসারিত করিয়া ধরিল। হাবলা উঁকি মারিয়া যখন দেখিল সত্যই কিছুই নাই, তখন রাগে তিনটা হাবলা হইয়া ফুলিতে ফুলিতে চলিল।

এই ভাবেই উহাদের দিন কাটে। ঝগড়া করে, মারামারি করে, তথাপি কোন দিন উহাদের একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয় না। কারণ, উহারা জানে যে উহারাই উহাদের একমাত্র অবলম্বন—উহারা ভিন্ন আর কেহই অবলম্বন নাই। তাই শত দ্বন্দ্ব-কলহেও উহারা পরস্পরের নিকট হইতে ছিন্ন হইয়া যায় না—আবার এক হইয়া পড়ে।

সেদিন উহাদের উৎসব-রজনী। এমন উৎসব-রজনী উহাদের জীবনে সচরাচর আসে না। হাবলা, সাধন, শুঁটকি ও মানদার জীবনে এ রকম উৎসব-রজনী বোধ হয় এই প্রথম। কারণ উৎসব করিতে হইলে সব প্রথম প্রয়োজন অর্থের। সে অর্থ উহাদের নাই। ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে অর্থ তাহারা উপার্জ্জন করে, তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী মানদা আত্মসাৎ করে। সে কথা উহারা জানে, বোঝে। তথাপি মানদাকে উহারা কিছু বলিতে পারে না, কারণ সে তাহাদের জীবনধারণের পক্ষে প্রধানতম অবলম্বন।

সৌভাগ্যক্রমে হাবলা একখানি পাঁচ টাকার নোট কুড়াইয়া পাইয়াছে, তাই এই উৎসব-রজনী। তাই মহা উৎসাহে চারিটি প্রাণী ভোজন-পর্ব্বের ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

সাধন বলিল—মাংস ভাত হোক।

হাবলা সেদিন শ্রাদ্ধবাড়ীর লুচি খাইতে পায় নাই, তাই সাধন প্রস্তাবে বাধা দিয়া বলিল—না—লুচি।

শুটকিও এ সভায় আসন গ্রহণ করিয়াছিল ; সে বলিল—না বাবা হাবুল, মাংসই হোক—অনেকদিন খাইনি। অনেকদিন আগে একবার 'যশড়ার' মিত্তির বাড়ী খেয়েছিলাম। আহা, সে তো আর মাংস নয়, যেন 'অমৃত্য'—আজো যেন মুখে লেগে রয়েছে। মানদারও ইচ্ছা তাহাই ; কারণ মাংস ভাত হইলে খরচ কিছু কম হয়। এই পাঁচটা টাকা হইতে তাহাকে যেমন করিয়াই হউক, তিনটা টাকা বাঁচাইতে হইবে। সুতরাং ভোটে পরাজিত হইয়া হাবলাকেও তাহাতে মত দিতে হইল। যদিও তাহার মনে আরও একটু আড়ম্বর করিবার ইচ্ছা ছিল।

শুঁটকিও সাধনাকে ভাত দিয়া মানদা হাবলার জন্য ভাত আনিয়া ডাকিল—হাবলা, ভাত খাবি আয়।

হাবলা থালাখানার সামনে থাবা গাড়িয়া বসিল, আর মানদা তাহার মুখে থাবা থাবা মাংসের ঝোল মাখা ভাত তুলিয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে হাবলা বলিল—মাংস কই, শুধুই তো ঝোল দিচ্ছিস।

মানদা নিজের জন্য প্রায় সমস্ত মাংসটাই লুকাইয়া রাখিয়াছে, দুই দিন ধরিয়া খাইবে। পরম নির্বিকারভাবে বলিল—আর পাব কোথায়, ওই যা ছিল দিইছি। অসহ্য ক্রোধে হাবল বলিল—হ্যাঁ দিইচিস বই কি হারামজাদী, নিজের জন্যে সব লুকিয়ে রেখেছিস্।

তাহার কথার যা ফল ফলিল, তাহা তুলনাবিহীন। মানদা রাগ করিয়া ভাতের থালা উল্টাইয়া দিল। রাগে অন্ধ হইয়া সে মুখে চোখে কথা বলিতে সুরু করিল ; বলিল—হতচ্ছাড়া কুঠে মড়া, রইল তোর এই ভাত, তোর কোন্ চোদ্দপুরুষ এসে তোকে খাওয়ায় তা দেখি। ফল হইল এই যে ভাতগুলি সব ছত্রাকার হইয়া পড়িল—একটা কুকুর আসিয়া সেগুলি খাইতে সুরু করিল। কিছুক্ষণ পরে মানদাকে পান চিবাইতে চিবাইতে আসিতে দেখিয়া হাবলা বলিল—পয়সা যদি বেঁচে থাকে তো দে দিকিনি, খাবার কিনে খাই, বড় খিদে পেয়েছে।

মানদা বলিল—পয়সা পাব কোথায় ? পয়সা কি একটাও বেঁচেছে নাকি যে দেবো ? হাবলা মুখ ভার করিয়া রহিল। মানদা চলিয়া যাইতেই সে আপন মনে বলিয়া উঠিল—টাকা পাঁচটা ডাহা ফাঁকি দিয়ে নিলে। একটা রুল কিনবার ইচ্ছে ছিল তাও হল না, খেতেও দিলে না —হে ভগমান—হে ভগমান—

অবশেষে একদিন তাহাদের লিমিটেড কোম্পানি লিকুইডেশনে গেল, অর্থাৎ দল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। সুবিধাবাদিনী মানদা দলের নেত্রীত্ব করিয়া বেশ কিছু জমাইয়া লইয়াছে, তাহার উপর তাহার পায়ের ঘাও ভাল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার আর এ দলে থাকা পোষায় না। সে তাহার সঞ্চিত অর্থ লইয়া অন্যত্র গিয়াছে—হয় ত বা এতদিন কোন থিয়েটার বা সিনেমার অভিনেত্রী হইয়াই গিয়াছে। শুঁটকির মানদা ভিন্ন চলে না। সে মানদাকে হারাইয়া ষ্টেশনে মাছের বাজারের টিনের শেডের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরের অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে। সাধন কোথায় গিয়াছে তাহার কিছু ঠিকানা নাই। কেবল একা হাবলা তখনও সেই পোড়ো বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। কোন দিন খাইতে পায়, কোন দিন পায় না। যদি কোন দিন কোন গৃহস্থ দয়া করিয়া দুটি খাইতে দেয় ত কুকুরের মত উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখ দিয়া খায়।

সেদিনও হাবলা ভিক্ষার আশায় পথের পার্শ্বে বসিয়াছিল। দেখিল, দূরে হাত এবং পায়ের উপর দিয়া সাধন আসিতেছে। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া হাবলার রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানি আনন্দে ভরিয়া গেল। অনাহারে অনাহারে তাহার চেহারা আরও বীভৎস হইয়াছে, তথাপি সাধন তাহাকে চিনিল। কাছে আসিয়া বলিল—ভাল আছিস ত রে হাবলা !

—হ্যাঁ তুই ?

—ওই আছি এক রকম। তুই বুঝি সেখানেই থাকিস ?

—তা নয় ত কোথায় যাব বল্ ? হাবলা বলিল।

সাধন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল—মানিদি মারা গেছে শুনেচিস্।

—কই—না ! হাবলা চমকাইয়া উঠিল, বলিল—কবে মারা গেল ? কি হইছিল ?

সাধন বলিল—হয়নি কিছুই—ওই বস্তীতে থাকত। আমিও সেখানে থাকতাম কি-না, একদিন শুনলাম কে একজন মদ খেয়ে রাগারাগি করে ছুরি মেরেছে—ঈস্ ! সে কি মা রে ভাই, বুকটা একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল। একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল—বেশ হয়েছে, যেমন আমাদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে পয়সা নিত—খুব হয়েছে !

হাবলা কিন্তু অত সহজে তার কথায় সায় দিতে পারিল না। মানদার মৃত্যুসংবাদ তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। মানদা তাহাকেও ঠকাইত, তথাপি সে মানদাকে শ্রদ্ধা করিত, হয় ত, মনে মনে একটু ভালও বাসিত। মানদা যত মন্দই হউক, সে অশ্রদ্ধা করিয়াও হাবলাকে যতখানি যত্ন করিয়াছে, হাবলার জীবনে আর কেহই তাহা করে নাই।

তাহার চোখের কোণ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

সেই বিষাদাচ্ছন্ন মুহূর্ত্তে সহসা সাধন বলিল—তাহলে এখন যাই ভাই।

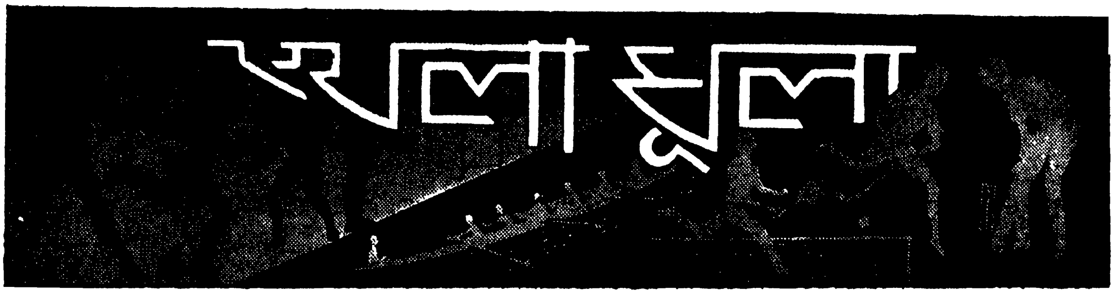
চোখ মুছিয়া হাবলা বলিল—আচ্ছা।

রাস্তার এপার হইতে অপর পারে যাইবার জন্য সাধন আবার পথে নামিল। কিন্তু তাহাকে আর পথের পারে যাইতে হইল না—একেবারে জীবনের পরপারে গিয়া পৌঁছিল। একখানা মোটর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া—সাধনকে চ্যাপটাইয়া ছ্যাচড়াইয়া একেবারে গোলাকার মাংস পিণ্ডে পরিণত করিল।

লোকের ভিড় জমিল, কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। একেবারে সব শেষ হইয়াছে দেখিয়া সকলে সরিয়া গেল। হাবলা দেখিল কয়েক জন লোকে সাধনের মৃতদেহটা একখানা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেহই একবিন্দু অশ্রু ফেলিল না।

একদিন সেও মরিবে—যে অবস্থায় সে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে তাহারও আর বিলম্বও নাই। এমনি করিয়াই হয় ত কয়েকজন অপরিচিত লোক হাসিতে হাসিতে তাহার মৃতদেহ লইয়া যাইবে, কেহই একবিন্দু অশ্রুও ফেলিবে না। কিন্তু সে কি করিবে—এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আর করা যায় না—সে উপায়হীন। তাহার ক্ষতগ্রস্ত দুই চক্ষুর কোণ বহিয়া শোণিতের সহিত দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কোথা হইতে চারিজনে আসিয়া জুটিয়াছিল—আজ আর কেহই তাহার কাছে নাই, সকলেই চলিয়া গিয়াছে—একদিন আর সেও থাকিবে না।



রঞ্জি প্রতিযোগিতা ঃ

বাঙ্গলা—৫১৫

মান্দ্রাজ—১১৪ ও ১১৬

বাঙ্গলা এক ইনিংস ও ২৮৫ রানে মান্দ্রাজকে সেমি-ফাইনালে হারিয়ে ফাইনালে উঠলো।

২১শে জানুয়ারী বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজের খেলা সুরু হ'ল। গোপালন্ দু'জন ফাষ্ট বোলার দিয়ে আক্রমণ সুরু ক'রল্। ১৫ মিনিটে ১৪ রান হ'য়েচে; রঙ্গচারীর ইনসুইং বল ভাণ্ডারগাচ্‌কে বোল্ড ক'রলে। মিলার এসে যোগ দিলেন। বেশ রান উঠতে লাগলো। মান্দ্রাজের ক্যাপ্‌টেন রামস্বামী বোলার বদলে স্পিটলার ও পার্থসারথিকে বল ক'রতে দিলেন। এক ঘণ্টা খেলার পর বাঙ্গলার রান উঠলো ৫০।



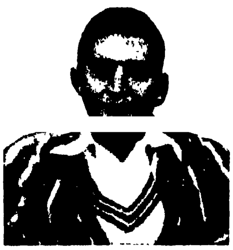
বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ ক্রিকেট দল। বাঙ্গলা মাদ্রাজকে এক ইনিংস ও ২৮৫ রানে পরাজিত করে রঞ্জি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে

ছবি—জে কে সান্ন্যাল

তিন বছর আগে বাঙ্গলা এই প্রতিযোগিতাতেই মান্দ্রাজের কাছে হেরে যায়। সেবার খেলা হ'য়ে ছিল মান্দ্রাজে। বাঙ্গলার ক্যাপ্‌টেন লংফিল্ড টসে জিতে বেরেণ্ড আর ভাণ্ডারগাচ্‌কে খেলতে পাঠালেন। মান্দ্রাজ রঙ্গচারী ও ৮১ রানের সময় বেরেণ্ড নিজস্ব ৩৯ রান ক'রে রামস্বামীর কাছে ধরা দিলেন। কে বোস খেলতে এলেন। মিলার খুব ভাল খেলচেন। ১১২ মিনিটে ১০০ রান উঠলো। লাঞ্চের পর মিলার তাঁর নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ ক'রলেন।

কার্ত্তিক বোস ও মিলারের সহযোগিতায় রান সংখ্যা দ্রুত উঠচে। উভয় খেলোয়াড়ই দৃঢ়তার সঙ্গে খেলচেন। ঘন ঘন বোলার বদলও হ'চ্ছে।

নিজস্ব ৮৩ রানের মাথায় মিলার পার্থসারথির বলে তারই হাতে আটকে গেলেন। মিলার খেলেচন ১২৮ মিনিট; চার ছিল ছ'টা; একবারও আউট হবার সুযোগ দেন নি। জব্বর এলো। কার্ত্তিক নিজস্ব-৫০ রান ক'রে দুর্ভাগ্যবশতঃ রান আউট হ'য়ে গেলেন। তাঁর খেলা বেশ চমৎকার হ'য়েছিলো; বিশেষতঃ লেগের মারগুলি, চার ছিলো ৮টা। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি যোগ দিলেন। বাঙ্গলার ২০০ রান পূর্ণ হ'ল ২ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে। নূতন বলে ফল ভালই হ'ল। বোর্ডে আর মাত্র ৫ রান উঠবার পরই এন চ্যাটার্জ্জি আউট হ'লেন। ম্যাল্‌কম্ জব্বরের সঙ্গে যোগ দিলেন। ২৭২ রানের মাথায় রামস্বামী ম্যাল্‌কম্‌কে লুফতে পারলেন না। ৭৭ মিনিট ব্যাট ক'রে জব্বর ৪৬ রান ক'রে আউট হ'য়ে গেলেন। লংফিল্ড খেলতে নামলেন। ম্যাল্‌কম্ পার্থসারথিকে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে বাঙ্গলার ৩০০ রান পূর্ণ ক'রলেন। ম্যালকম্ একবার নিশ্চিত ক্যাচ আউট হওয়া থেকে রক্ষা পেলেন, অকৃতকার্য্য হলো রঙ্গচারী। লংফিল্ড ৮ রান ক'রে রান আউট হ'য়ে গেলেন, জে এন ব্যানার্জ্জি এলেন ও মাত্র তিন রান ক'রে গেলেন। ম্যাল্‌কম্ ১০৭ মিনিট খেলে নিজস্ব শত রান পূর্ণ ক'রলেন; তিনবার আউট হ'বার সুযোগ দিয়েছেন। কমল ভট্টাচার্য্য ও তিনি সেদিনের মত নট্ আউট রইলেন। বাঙ্গলার রান উঠেছে ৮ উইকেটে ৩৭৯।


কে বোস


গোপালন


রামস্বামী

দ্বিতীয় দিনে আরম্ভের ১৫ মিনিট পরেই বাঙ্গলার ৪০০ রান পূর্ণ হ'ল। কে ভট্টাচার্য্য ২৩ রান ক'রে আউট হ'য়ে গেলে শেষ খেলোয়াড় তারা ভট্টাচার্য্য খেলতে নামলেন। ম্যাল্‌কমের যখন ১৪৫ রান হ'য়েচে তখন নেলার তাঁর একটা অতি সহজ ক্যাচ্ লুফতে পারলে না। ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট খেলার পর বাঙ্গলার ৫০০ রান উঠলো। নিজস্ব ৪৪ রান ক'রে তারা ভট্টাচার্য্য পার্থসারথির বলে এল বি ডবলিউ হ'লে বাঙ্গলার প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ৫১৫ রানে। ম্যাল্‌কম্ ১৮১ রান ক'রে নট্ আউট রইলেন; চার ছিলো চব্বিশটা। শেষ খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে নেমে টি ভট্টাচার্য্যের ৪৪ রান করা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

রঞ্জি প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার বিপক্ষে নওনগর দলের ৪২৪ রান ছিল রেকর্ড। এবার ইডেন গার্ডেনে সে রেকর্ড ভঙ্গ হ'য়ে নূতন রেকর্ড স্থাপিত হ'ল। শেষ উইকেট সহযোগিতায় ম্যাল্‌কম্ ও তারা ভট্টাচার্য্যের রান উঠেছে ১১৫, ইহাও বাঙ্গলার পক্ষে রেকর্ড। অবশ্য রঞ্জি প্রতিযোগিতার শেষ উইকেটের রেকর্ড মোবারক আলি ও যাদবেন্দ্র সিংজীর ১৩৩ রান।

মান্দ্রাজ লাঞ্চের একটু আগে প্রথম ইনিংস আরম্ভ ক'রে বেলা শেষে মাত্র ১৪৪ রানে সকলেই আউট হ'য়ে গেল। ভাণ্ডারী আর গোপালন্ ছাড়া আর কেউই বিশেষ সুবিধা ক'রতে পারেন নি। তাঁরা যথাক্রমে ২৯ ও ২৩ ক'রেছিলেন। চার জন ক'রেচেন শূন্য। তারা ভট্টাচার্য্য ও এন ব্যানার্জ্জির বল খুব মারাত্মক হ'য়েছিলো, যথাক্রমে ৩৭ ও ২৯ রানে চারটে ক'রে উইকেট পেয়েছেন।

তৃতীয় দিনে মান্দ্রাজ ফলো অন ক'রে দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্ত করলে ১১৬ রানে। সর্ব্বোচ্চ রান করেছেন নেলার ৩১; গোপালন্ ২০। ম্যালকম্ ৩টা, তারা, নির্ম্মল ও লংফিল্ড প্রত্যেকে দুটো করে উইকেট পেয়েচেন।

মাদ্রাজ ক্যাপ্টেনের অভিমত, তাঁদের খেলোয়াড়দের সুয়িং বলে খেলবার অক্ষমতাই এই পরাজয়ের কারণ। তাঁর মতে উভয়দলের শক্তিতে বিশেষ তারতম্য ছিল না।

বাঙ্গলা মাদ্রাজে খেলতে গেলে ঐ দলেরই খেলায় কি ফল হতো তা' বলা যায় না। বাঙ্গলার খেলোয়াড়রা নাকি গুগলি বলে মোটেই খেলতে পারে না। কিন্তু তাঁদের দলে ঐরূপ বোলার ছিল না। তিনি এরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েও বিজয়ীদলের কাহারও খেলার মৌখিক সুখ্যাতিও করতে পারেন নি। ইহা একপ্রকার মনোবৃত্তির পরিচয়! ফিল্ডিং মাদ্রাজের ভাল হয় নাই। ফিল্ডিং খেলার একটি প্রধান অঙ্গ, তা' যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করতে না পারা বিশেষ অক্ষমতা। সি এস নাইডু একজন সুদক্ষ গুগলি বোলার, তাঁর বলেও বাঙ্গলার খেলোয়াড়রা নিতান্ত মন্দ খেলেন নাই। মাদ্রাজের প্রবীণ অধিনায়কের খেলোয়াড় জনোচিত মনোভাবের পরিচয় না পাওয়া বিশেষ দুঃখের কারণ।

দক্ষিণ পাঞ্জাবঃ—১৮০ ও ১২০ (১ উইকেট)

উত্তরভারতঃ—১১৬ ও ১৮৩

দক্ষিণ পাঞ্জাব ৯ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে।

উত্তরভারত প্রথমে ব্যাট ক'রে ১১৬ রানে ইনিংস শেষ করে। সর্ব্বোচ্চ রান করেন রামপ্রকাশ ২৭। নিসার ৫টা উইকেট পান ৩৬ রানে এবং আমীর ইলাহি ৩টা ৫০ রানে। দক্ষিণ পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৮০ রানে। সর্ব্বোচ্চ রান নাজির আলি ৫৫, সুরজিৎ সিং ৪৩। উইকেট কিপিং অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বাই হ'য়েছে ৪০। হবিবুল্লা খুব



আমির ইলাহি



নিসার

চমৎকার বল ক'রেছেন ও ৫টা উইকেট পেয়েছেন ৪০ রানে। উত্তরভারত দ্বিতীয় ইনিংস শেষ ক'রে ১৮৩ রানে। সর্ব্বোচ্চ রান ৪১ গোলাম মহম্মদ করেন। অমরনাথ ও আমির ইলাহি যথাক্রমে ৪৫ ও ৬৫ রানে ৪টা করে উইকেট পেয়েছেন।



অমরনাথ



নাজির আলি

দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ পাঞ্জাবের রান উঠে এক উইকেটে ১২০ ; রোশনলাল ৬৫ ও ওয়াজির আলি নট্ আউট ৩৫।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে সিন্ধু ও দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিজয়ী দল বাঙ্গলা প্রদেশের সহিত ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ডঃ—৪৬৯ (৪ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

দক্ষিণ আফ্রিকাঃ—১০৩ ও ৩৫৩।

ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ১৩ রানে বিজয়ী হ'য়েছে।

পর পর দুটো টেষ্ট ম্যাচ ড্র হ'য়ে গেছে। তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ সুরু হ'বে। দারুণ উত্তেজনা, যেমন খেলোয়াড়দের তেমনি দর্শকদের আর অধিনায়কদের ততোধিক। হ্যামণ্ড আর মেলভীল টস্ ক'রতে গেলেন। হ্যামণ্ড জয়ী হ'লেন। ইংলণ্ড ক্যাপ্টেনের টেষ্টে মুদ্রানিক্ষেপনে এইবার নিয়ে পর পর সাতবার জয়লাভ।

আবহাওয়া খুব পরিষ্কার। দর্শক সমাগম হ'য়েছে পাঁচ হাজার। ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যাট ক'রতে নামলেন গিব আর হাটন। ৩১ রান ক'রে হাটন এল বি ডবলিউ হ'লে পেণ্টার নামলেন। গিব ৩৮ ক'রে ডেভিসের বলে ওয়েডের কাছে ধরা দিলেন। এবার ক্যাপ্টেন নিজে এলেন, ১৪৪ মিনিট খেলা হ'বার পর পেণ্টার নিজস্ব শতরান পূর্ণ ক'রলেন। প্রথম টেষ্টে তিনি দু'ইনিংসে দু'টা সেঞ্চুরী ক'রেছেন। তিনি

৫৪ রানের সময় ষ্টাম্প হ'বার একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের দু'উইকেটে ৩৭৩ রান উঠেছে। পেণ্টার নট্ আউট ১৯৭, হ্যামণ্ড নট্ আউট ৯৯।



হ্যামণ্ড



ওয়েড

দ্বিতীয় দিনে ১২০ রান ক'রে হ্যামণ্ড গর্ডনের বলে মিচেলের হাতে আটকে গেলেন। হ্যামণ্ডের সেঞ্চুরী ক'রতে ১৬৯ মিনিট লেগেছিল, চার ছিল ১৩টা। পেণ্টার ২১১ রান অতিক্রম করে ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকা টেষ্টে ব্যক্তিগত রেকর্ড ভঙ্গ করলেন। পূর্ব্বে রেকর্ড ছিল জ্যাক্ হব্‌সের ১৯২৪ সালে লর্ডস মাঠে। ২২৩ ক'রে পেণ্টার এই অভিযানে তাঁর নিজস্ব হাজার রান পূর্ণ করলেন। পেণ্টারের ২৪৩ রানের মাথায় লংটনের বলে মিচেল তাঁকে লুফলে হ্যামণ্ড ইংনিস ডিক্লিয়ার ক'রলেন। ইংলণ্ডের তখন ৪ উইকেটে হ'য়েচে ৪৬৯ রান।

প্রথম ইনিংসে সাউথ আফ্রিকার প্রথম জুটি ছাড়া কেউই সুবিধা ক'রতে পারলেন না। মিচেল ক'রলেন সর্ব্বোচ্চ রান ৩০। প্রথম ইনিংস মাত্র ১০৩ রানে শেষ হ'ল। ফারনেসের বলই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হ'য়েছে, তিনি ২৯ রানে ৪টা উইকেট পেয়েছেন।

সাউথ আফ্রিকা ফলো অন্ ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৭৩ রান ক'রলে সেদিনের মত খেলা শেষ হ'ল। মিচেল নট্ আউট ৪৩ রইলেন, রাওয়েন নট্ আউট ৭।

পরের দিন উভয় ব্যাটস্‌ম্যানই খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে লাগলেন। মিচেল ১৯০ মিনিট খেলে ১০৯ রান ক'রে ফারনেসের বলে এইম্‌সের হাতে ধরা দিলেন। তাঁর খেলায় চার ছিল ১৪টা, একবারও আউট হ'বার সুযোগ দেননি। রাওয়েন খুব সতর্কতার সঙ্গে ২০৮ মিনিট খেলে ৬৭ রানের মাথায় হ্যামণ্ডের বলে এইম্‌সের হাতে আটকালেন। তাঁর একটাও বাউণ্ডারী হয়নি। ভীলজোয়েন ৬১ রান ক'রে গেলেন ফারনেসের বলে, ৭৮ মিনিট খেলে; চার ছিল ৭টা। দক্ষিণ আফ্রিকা বহু চেষ্টা'য়ও ইনিংস পরাজয় রক্ষা করতে পারলে না। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের রান হ'ল ৩৫৩। এক ইনিংস ও ১৩ রানে তারা পরাজিত হ'ল। ফারনেস্ ৮০ রানে, ভেরিটি ৭১ রানে এবং উইলকিনসন্ ১০৩ রানে প্রত্যেকেই তিনটে ক'রে উইকেট পেলেন।

পূর্ব্বপ্রদেশ ঃ—১৭২ (কয় নট্ আউট ৫৪ ; ফারনেস ৫৮ রানে ও রাইট ৪৫ রানে ৪ উইকেট) ও ১১১ (ফারনেস ১৪ রানে ২ ও পার্কস ২৯ রানে ৩ উইকেট)

এম সি সি ঃ—৫১৮ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) (হ্যাটন ২০১, পেণ্টার ৯৯, হ্যামণ্ড ৫২ ও বার্টলেটের নট্ আউট ৬৩) বার্টলেট্ এক ওভারে পর পর ৫টি বাউণ্ডারী করেছিলেন।

এম সি সি এক ইনিংস ও ২৩৫ রানে বিজয়ী হ'য়েছে।



পেণ্টার খেলছেন

এম সি সি ঃ—৩২০ (ইয়ার্ডলে ১২৬) ও ৭৯ (১ উইকেট), এডরিচ নট্ আউট ৫০।



ভেরিটি



রাওয়েন



ফারনেস

বডার্ড—১২১ (রাইট ৩২ রানে ৪ ও উইলকিনসন ১৫ রানে ৩) ও ২৭৫ (ইভেনস ৮৮ ও ডাওলিং ৬১ ; উইলকিনসন ৬৩ রানে ৪, পার্কস ৮৬ রানে ৩ উইকেট) এম সি সি ৮ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েছে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাই ঃ—৩৮৬ ও ৪৫ (০ উইকেট)

পাঞ্জাব ঃ—২১৪ ও ২১৫

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে।

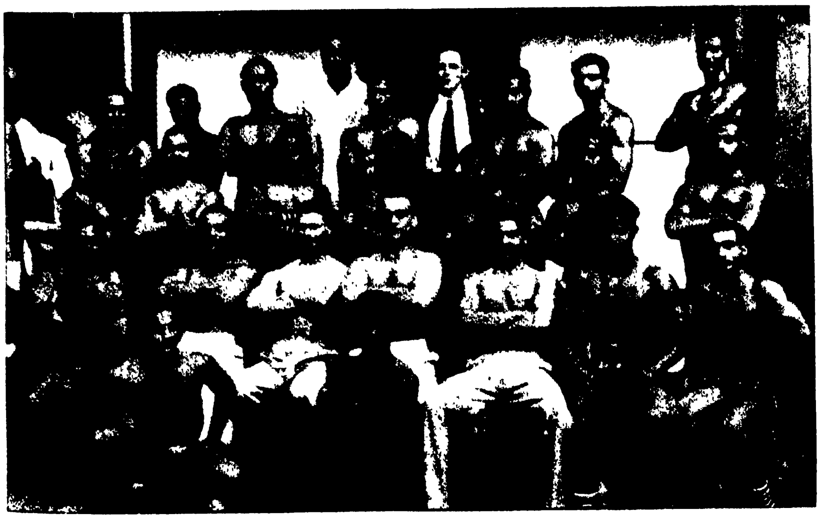
পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংসে ২১৪ রানের উত্তরে বোম্বাই ৩৮৬ রান করে। পাঞ্জাবের সের মহম্মদের ৬৫ ও খাঁর ৪৬। রাও ৪টি উইকেট ৪৪ রানে পান। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসের ৩৮৬ রানে অধিকারী ১১০ রান করে নট্ আউট থাকেন। মেটা ৫৬, ইব্রাহিম ৫৬ ও ক্যাপ্‌টেন ওয়াদিয়া ৫৮ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে পাঞ্জাবের ২১৫ ওঠে। এহায়াৎ ৮২ ও জগদীশলাল ৬৪ রান করেন। মেটা ৪ উইকেট পান ৪৯ রানে। বোম্বাই দল দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না খুইয়েই প্রয়োজনীয় ৪৫ রান তুলে বিজয়ী হয়। গত দুই বৎসর পাঞ্জাব দলই জয়লাভ ক'রেছিল।

জ্যাকসন কাপ ঃ

স্পোর্টিং ইউনিয়ান—১৬৩ (এ চ্যাটার্জ্জি ৫৮, বি ভট্টাচার্য্য ৮৭ রানে ৭ উইকেট) ও ১১১ (৫ উইকেট, বাপী বসু ৪৬ ; বি ভট্টাচার্য্য ৪১ রানে ২ উইকেট)

ওয়ারী—১৯৯ (অনিল দে ১০০ ; কে বসু ৪১ রানে ৪) ও ৭৩ (এস মিত্র ৩ রানে ৪ উইকেট)

কলিকাতার স্পোর্টিং ইউনিয়ান ক্লাব জ্যাকসন কাপের ফাইনালে ৫ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েছে।



হাটখোলা ক্লাব পরিচালিত নিখিল বঙ্গ পেশীসঞ্চালন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিগণ ছবি—জে কে সান্যাল

আগামী অলিম্পিক ঃ

১৯৪০ সালে পৃথিবীর একাদশ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত

হ'বে ফিন্‌লাণ্ডের হেলসিন্‌কি সহরে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০টি দেশকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হ'য়েচে। হেলসিনকি ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ কার্য্য ১৯৩৪ সালে, আরম্ভ হয়ে সমাপ্ত হ'য়েছে ১৯৩৮ সালে। এখানে ত্রিশ হাজার দর্শকের বসবার স্থান আছে। কিন্তু অলিম্পিক অনুষ্ঠানের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে ইহা বর্দ্ধিত ক'রে ৬৩ হাজার দর্শকের বসবার উপযোগী করা হ'চ্চে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে কাজ সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হ'বে। ফিনিস পার্লামেণ্ট অলিম্পিকের খরচের জন্য দশ লক্ষ পাউণ্ড সরকারী তহবিল থেকে দেবার ব্যবস্থা ক'রেচেন। হেনসিনকি মিউনিসিপালিটি পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন। সহর থেকে একটু দূরে অলিম্পিক গ্রাম তৈরী হ'চ্চে। সেখানে ২৯টি ত্রিতল গৃহ নির্ম্মিত হবে, তা'তে আড়াই হাজার ঘর থাকবে। সহর থেকে এখানে যাতায়াতের কোন অসুবিধা হ'বে না, অথচ সহরের কোলাহলের বিরক্তি আসবে না।

বিগত অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিষয়ের সংখ্যা ছিল ১৮৯৬ সালে এথেন্সে ৪৪; ১৯০০ সালে প্যারিসে ৫৮; ১৯০৪ সালে সেণ্টলুইয়ে ৬৮; ১৯০৮ সালে লণ্ডনে ৯৭; ১৯১২ সালে ষ্টক্‌হলমে ১০২; ১৯২০ সালে এণ্টোয়ার্পে ১৪১; ১৯২৪ সালে প্যারিসে ১২৬; ১৯২৮ সালে আমষ্টার্ডামে ১১৩; ১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেলে ১১৮; ১৯৩৬ সালে বার্লিনে ১২৯। এবারে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিষয়ের সংখ্যা হ'বে ১৩২, তথাপি হকি প্রতিযোগিতাকে এবার বাদ দেওয়া হ'য়েছে। বোধ হয়, ভারতবর্ষকে এই প্রতিযোগিতায় না পেরে ওঠাই, ইহার একমাত্র কারণ।



বেঙ্গল অলিম্পিকের কুড়ি মাইল সাইকেল রেস বিজয়ী এন ব্যানার্জ্জি ছবি—জে কে সান্যাল

আন্তঃপ্রাদেশিক টেনিস ঃ

যুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাবকে হারিয়ে আন্তঃপ্রাদেশিক টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ'য়েছে। পাঞ্জাবের দু'জন শ্রেষ্ঠ



যুধিষ্ঠির সিং জি এম মেটা

খেলোয়াড় সোহানী ও সোনির এই প্রতিযোগিতায় যোগদান না করার কারণ বিশেষ রহস্যপূর্ণ। পাঞ্জাবের তরুণ খেলোয়াড় প্রেম গান্ধী ও ইফতিকার আমেদের স্বীয় প্রদেশকে পরাজয় হ'তে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা প্রশংসনীয়। বাঙ্গলা প্রদেশ মান্দ্রাজকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। দিলীপ বসুর খেলা প্রশংসনীয় হ'য়েছিল। বাঙ্গলা পরবর্ত্তী ম্যাচে যুক্তপ্রদেশের কাছে হেরে যায়। যুক্তপ্রদেশের হ'য়ে খেলেছিলেন গাউস মহম্মদ ও যুধিষ্ঠির সিং।

নিখিল ভারত টেনিস ঃ

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে গাউস অতি সহজে রামনাথমকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েচেন। খেলা অত্যন্ত নিকৃষ্ট হ'য়েছিল। গাউসের কাছে রামনাথম্ দাঁড়াতেই পারেন নি। ডবল্‌সে জিম মেটা অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েচেন। সাবুরের সহযোগিতায় তিনি পুরুষদের এবং শ্রীমতী ফুটিটের সহযোগিতায় মিক্সড্

ডবলসে বিজয়ী হ'য়েছেন। দিলীপ বসু তাঁর তৃতীয় গেমে ববের কাছে হেরে যান। বব্ হারেন সেমি-ফাইনালে গাউসের কাছে। যুধিষ্ঠির সিংএর পরাজয় রামনাথমের কাছে এবং কুমারী লীলা রাওয়ের পরাজয় কুমারী উড্‌ব্রিজের কাছে যথেষ্ট বিস্ময়ের সঞ্চার ক'রেছিল। ছু'জনই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে ও তৃতীয় সেটে পরাজিত হন।



ফুটিট

পুরুষদের সিঙ্গলসে—গাউস মহম্মদ (লক্ষ্ণৌ) ৬-১ ও ৬-২ গেমে 'রামনাথমকে (মাদ্রাজ) পরাজিত ক'রেছেন।

পুরুষদের ডবলসে—জিম মেটা ও সাবুর (মাদ্রাজ) ৬-১, ৩-৬ ও ৭-৫ গেমে ব্রুক এডোয়ার্ডস (কলিকাতা) ও টিউকে (বোম্বাই) হারিয়েছেন।

মিক্সড্ ডবলসে—জিম মেটা ও শ্রীমতী ফুটিট, ৬-০, ৩-৬ ও ৬ ১ গেমে কৃষ্ণস্বামী ও কুমারী উড্‌ককে হারিয়েছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—কুমারী কার্টিস ৬-২, ৬-৮ ও ৯-৭ গেমে কুমারী উড্‌ব্রিজকে পরাজিত ক'রেছেন।



বোম্বাইয়ের নিখিল ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়িনী মিস এ জি কার্টিস (বামে) ও বিজিতা মিস উড্‌ব্রিজ

মহিলাদের ডবলসে—শ্রীমতী ফুটিট ও কুমারী উড্‌ব্রিজ, ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে কুমারী কার্টিস ও শ্রীমতী টিউকে পরাজিত ক'রেছেন।

পেশাদার সিঙ্গলসে—মুরাদ খাঁ ৬-৩ ও ৬-২ গেমে রামসেবককে হারিয়েছেন।

পেশাদার ডবলসে—টি খাঁ ও মুরাদ খাঁ ৬-২ ও ৬-৪ গেমে সিরাজুল হক ও আজিজুল হককে হারিয়েছেন।



আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড়গণ হ্যারিস, ডন ম্যাকনল্টী, এণ্ডারসন ও রবার্টসন

উত্তর-পশ্চিম ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা :

আমেরিকার সর্ব্বকনিষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় ডন ম্যাক-

নীল অপূর্ব্ব কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রেছেন। তিনি গাউসকে পরাজিত করেন সিঙ্গলসে এবং হ্যারিসের সহযোগিতায় এণ্ডারসন ও



সেণ্ট জন্ এম্বুলেন্স প্রদর্শনীতে স্বব্ চেটউড কাপ বিজয়ী রিপন কলেজ ছবি—জে কে সান্যাল

রবার্টসনকে পরাজিত ক'রে ডবলসে বিজয়ী হ'য়েছেন। গাউস প্রথম সেটে ম্যাকনীলের কাছে দাঁড়াতেই পারেন নি। তারপর গাউস দ্বিতীয় সেটে বিজয়ী হ'লেও ডন পরবর্ত্তী সেটে পুনরায় জয়ী হ'ন। ডবলসে বিজয়ী হ'তে তাঁদের কোনই কষ্ট করতে হয়নি।

সিঙ্গলসে—ডন্ ম্যাকনীল ৬—১, ৩—৬ ও ৭—৫ গেমে গাউসকে পরাজিত ক'রেছেন।

ডবলসে—ডন্ ম্যাকনীল ও হ্যারিস ৬—১ ও ৬—১ গেমে এণ্ডারসন ও রবার্টসনকে পরাজিত করেছেন।

মিক্সড ডবলসে—ডন্ ম্যাকনীল ও মিস্ উডকক ৬—৪ ৬—২ গেমে হ্যারিস ও মিস্ দিনসাকে পরাজিত করেছেন।

প্রদর্শনীতে খেলায়—বি টি ব্লেককে ৬—২ ও ৬—৩ গেমে ডন্ ম্যাকনীলকে পরাজিত ক'রে বিস্ময়ের সঞ্চার করে-



এস চৌধুরী
ক্যাপটেন বিদ্যাসাগর কলেজ ক্রিকেট ক্লাব

ছেন। সিঙ্গলসে ম্যাকনীলের ইহাই ভারতবর্ষে প্রথম পরাজয়।

ইণ্টার কলেজ টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

মেডিক্যাল কলেজের টার্লটন ও টি ব্যানার্জ্জি ৫-৭'



ইণ্টার-কলেজিয়েট ডিউক কাপ বিজয়ী—(দক্ষিণে) টার্লটন ও এ ব্যানার্জ্জি (মেডিক্যাল) ও (বামে) বিজিত ব্যানার্জ্জি ও সেন (পোষ্ট গ্রাজুয়েট) ছবি—জে কে সান্যাল



সেণ্ট জন এম্বুলেন্স প্রদর্শনীতে জন এণ্ডারসন কাপ বিজয়িনী ভারতীয় মহিলাগণ　　ছবি—জে কে সান্যাল

খেলোয়াড় নন এবং তাঁরা আমেরিকার প্রতিনিধিমূলক খেলায় যোগদান করবার সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করতে পারেন নাই। ভারতের নামকরা খেলোয়াড়, যাঁদের ডেভিস কাপে খেলতে যাওয়া সুনিশ্চিত, আমেরিকার তরুণ খেলোয়াড়দের নিকট তাঁদের বার বার পরাজয়ে আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, ডেভিস কাপে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়ার ফলাফল আমাদের হতাশ করবে।

৬-৩, ৬-৩, ৩-৬ ও ৬-১ গেমে পোষ্ট গ্রাজুয়েটের এন সেন ও এ ব্যানার্জ্জিকে ডিউক কাপের ফাইনালে পরাজিত করেছেন।

মেডিক্যাল কলেজ গত বৎসরও বিজয়ী ছিল।

ডেভিস কাপ ও ভারতীয় খেলোয়াড় ঃ

আর্থিক অস্বাচ্ছল্যতার জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ডেভিস কাপে যোগদান ক'রবেন না জেনে বরোদার যুবরাজ ভারতীয় খেলোয়াড়দের উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান কালীন প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য ক'রতে প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন। যুবরাজ বাহাদুরের এইরূপ পৃষ্টপোষকতায় সমগ্র ক্রীড়ামোদিরা তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রবেন সন্দেহ নেই। যুবরাজ বাহাদুরের নেতৃত্বেই ভারতীয় টীম ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রবে। ডেভিস কাপের ক্রীড়া তালিকায় প্রকাশ, ভারতবর্ষ বেলজিয়ামের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

আমেরিকার যে টেনিস দলটি ভারত পরিভ্রমণ ক'রচেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল দেখে ডেভিস কাপে ভারতীয়দের সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করবার কারণ র'য়েচে। আমেরিকা থেকে যাঁরা খেলতে এসেচেন তাঁরা কেউই সেখানকার নামকরা

ইণ্টার কলেজ মহিলা স্পোর্টস ঃ

মহিলাদের ইণ্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস এসোসিয়েসনের



ডাঃ (মিসেস) সুবর্ণ মিত্র এম বি
মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস এসোসিয়েশনের জয়েণ্ট সেক্রেটারী

নিখিল ভারত রেকর্ড ঃ

লাহোরে পাঞ্জাব এথ্‌লেটিক্‌ চ্যাম্পিয়নসিপ প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত বিষয়ে রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে :—

উচ্চ লম্ফনে—কুমারী উনা লায়নস্‌ (করাচি) ৪ ফুট ১০·৫ ইঞ্চি লাফিয়ে পূর্ব্ব রেকর্ড ভেঙেছেন।

১১০ মিটার বেড়া রেসে—সুন্দর সিং (ফরমান কলেজ) ১৫·৩ সেকেণ্ডে বিজয়ী হ'য়ে রেকর্ড করেছেন।

সট্‌পুটে—কুমারী কে' আই হলওয়ে (লাহোর) ২৫ ফুট ৭½ ইঞ্চি দূরত্ব করে রেকর্ড করেছেন।

ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এথ্‌লেটিক্‌ স্পোর্টস এসোসিয়েশন পরিচালিত ২৬শ বার্ষিক ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস সমাপ্ত হয়েছে। প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটির অব্যবস্থার বহু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইউনিভার্সিটি পরিচালিত স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে এরূপ বে-বন্দোবস্ত বিশেষ নিন্দনীয়। নিমন্ত্রিত দর্শকদের বসবার স্থানের বহু দূরে অধিকাংশ প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ায় নিমন্ত্রিতদের হতাশ হয়ে বসে থাকতে এবং বোর্ডে ফলাফল দেখেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। ফলাফলও সময়মত তৎপরতার সঙ্গে বোর্ডে দেওয়া হয় নাই। বিজয় মঞ্চ সাজানো ছিল, তাতে বিজয়ীদের একবারও উঠ্‌তে দেখা যায় নাই।

ক্রীড়াগুলির সমাপ্তির স্থানও বহুদূরে নির্দ্দিষ্ট থাকায় বিজয়ীদের লক্ষ্য করা দুরূহ হ'য়েছিল। অনায়াসে সমাপ্তি স্থানকে প্যাভিলনের সম্মুখে করা যেতে পারতো। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হ'য়েছে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ ৭০ পয়েণ্ট পেয়ে কলেজ চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েছে ; উক্ত কলেজের ছাত্র সুরেশ ভড় ৩৯ পয়েণ্ট লাভ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ পেয়েছেন। কয়েকটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব লক্ষিত হয়। ল' কলেজের ছাত্র সুশীল বসু ১৬৫ ফুট ১০½ ইঞ্চি দূরত্বে বর্শা নিক্ষেপণ করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ছাত্র ও ছাত্রীদের উভয় স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের সাফল্য তাদের বিশেষ কৃতিত্ব ও আনন্দের বিষয়।

ক্রিকেট ঃ

এম সি সি—৩০৭ (৫ উইকেট, হাটন ১৪৫, ২০টা চার)

রোডেসিয়া—২৪২ (ম্যানসেন ৬২ ; রাইট ৬৪ রানে ৪ উইকেট)

খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "তটিনীর বিচার"—১৷০

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত "রক্তপায়ী সবুজ মোটর"—॥৵০

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত "বাঙ্গলা ধ্রুপদ মালা"—১৸০

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "দারিদ্র্যের ইতিহাস"—২৲ ও "সোনার সংসার"—১৷০

শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত প্রণীত গান ও কবিতা "সুধা-রা"—১৲

মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "রূপ-কথা"—৸০

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "বাসুদেব"—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত "হাসি খেলা" প্রথম ভাগ—।৴০

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গান সংগ্রহ "কথা ও সুর"—১৲

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত রাজনীতিক তর্কনাট্য "মৌচাকে ঢিল"—১॥০

শ্রীহৃষীকেশ বসু প্রণীত কবিতা গ্রন্থ "অন্তরাল"—১৲

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর || সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



গাগরী লয়ে শিরে
চলিছে ঘরে ফিরে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



দ্বিতীয় খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, পিএইচ্-ডি

(প্রবন্ধ)

এই যুগের বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করিলে মন সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। গীতায় ভগবান আশ্বাস দিয়াছেন, পৃথিবীতে যেখানেই যখন গ্লানি দেখা দেয়, তাহা দূর করিবার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'ন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দের প্রথম ভাগে বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে সামাজিক জীবনে নানা রূপ ধরিয়া গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ লেখক মেকলে এই যুগের বাঙ্গালীর চিত্র মসীবর্ণে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সে চিত্র আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করে, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারক সে চিত্রের সত্যতা অস্বীকার করিতে পারেন না। সেই অমা-রজনীর অন্ধকার দূর করিতে বাঙ্গালার গগনে জ্যোতিষ্কের পর জ্যোতিষ্ক উদিত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালার আকাশে যেন উল্কাবৃষ্টি দেখা দিল, দেশময় যেন দীপালি বসিয়া গেল। ভাগবত বলেন—অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ, যে মহানুভবগণের মধ্য দিয়া ভগবৎশক্তি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তাঁহাদের সংখ্যা করা কঠিন। আকাশের বড় বড় জ্যোতিষ্ক কয়টিকেই আমরা চিনি ও নাম ধরিয়া ডাকিতে পারি। এ যুগের বাঙ্গালার গ্লানি দূর করিতে যাঁহাদের মধ্য দিয়া ভগবৎশক্তি বাঙ্গালা দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁহাদের অন্যতম সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সমস্ত দেশ যখন জড়তার, গতানুগতিকার, যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কারের গভীর আঁধারে ঢাকিয়া গিয়াছে, এমনি সময়ে সন্ধ্যা তারার মত উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলো লইয়া বাঙ্গালার গগনে উদিত হইলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। যুগ যুগ সঞ্চিত গ্লানির কালিমা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া যে বৎসর এই মহাপুরুষ দেহ রক্ষা করিলেন, সেই ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দেই যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম! এই

অত্যদ্ভুত relay race-এর কথা চিন্তা করিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, বঙ্গদেশের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া নয়ন অশ্রু-সজল হয়। এই পুণ্য বৎসরের পূর্ব্বে ও পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অতি বড় অবিশ্বাসী নাস্তিককেও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হইবে—জাতীয় জীবনে রেনাসাঁস বা পুনর্জীবনের ক্রিয়া দেখিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতে হইবে। বঙ্গের অহল্যাভূমিকে হল্যা করিবার জন্য মুহুর্মুহু যেন বজ্র বর্ষণ হইতে লাগিল, দিকে দিকে ভগবৎ-শক্তি মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হইতে লাগিল! ১৮০৭ সনে আসিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ১৮২০ সনে নামিলেন ধর্ম্মনীতিব্যাখ্যাকার অক্ষয় দত্ত ও ভগবানের ঘনীভূত দয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়। ১৮২৯ সনে নীলকর বিষধর বিষ-জর্জ্জর বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমান প্রজার দুঃখ দূর করিতে বিধাতা দীনের বন্ধু দীনবন্ধুকে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৩৮ সনে অবতীর্ণ হইলেন দুই দিক্‌পাল কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র—ভগবানের এই উভয় দানেরই জন্মশতবার্ষিকী আজ নগরে নগরে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র এক প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে বঙ্কিম-প্রতিভার দিগ-দর্শন করাইতে গিয়া নিতান্তই যেন দিশাহারা হইয়া পড়িতেছি। প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক দেশের মনকে সৃষ্টি করেন, তাঁহার ভাবে আমরা ভাবিতে শিখি, তাঁহার কণ্ঠে আমরা গান করি, আমাদের হৃদয় বীণায় সুপ্ত সহস্র তার তাঁহারই অঙ্গুলিস্পর্শে অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে জাগিয়া উঠে। এই হিসাবে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের মানস-সন্তান। মনের গহীন অতলের বুকে অহরহ কত তরঙ্গ জাগিতেছে—তাহাতে ঝঙ্কার আছে, শব্দ আছে, কিন্তু ভাষা নাই। অনাদিকাল হইতে মানব জাতির প্রকাশ-ব্যথাতুর মন ভাষা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—দেশের কবি ও সাহিত্যিক এই ভাষা জোগাইয়া থাকেন—আমরা তাঁহাদের মুখের বাণী শুনিয়া গভীর সহানুভূতিভরে বলিয়া উঠি—"ঠিক্ ঠিক্,এত আমারই মনের কথা।" পাশ্চাত্য শিক্ষার তরঙ্গাভিহত বাঙ্গালীর মনে যত কথা জাগিয়াছিল তাহারই প্রকাশের মুখ হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যাহা স্পষ্ট ছিল তাহা ত প্রকাশিত হইলই, যাহার অস্পষ্ট অনুভূতিমাত্র স্বপ্ন দেখার মত বাঙ্গালীর অর্দ্ধ-জাগরিত মনে জাগিতেছিল, বঙ্কিমের বাণীতে তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিয়া বাঙ্গালী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

তোমার কণ্ঠে গাহিল যত বঙ্গ তরুণ তরুণী
নীরব ব্যথা লভিল ভাষা কোমলা।
মরণ হ'ল সরসতর পীরিতি অরুণ বরণী
স্বদেশ লভিল মাতৃমুরতি অমলা!

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩০০ সনের চৈত্র মাসে বঙ্কিম-সূর্য্য অস্তমিত হয়। এমন অনেকে আজও জীবিত আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে স্বয়ং বঙ্কিমকে আলো দান করিতে নিজ চোখে দেখিয়াছেন, পশ্চিম গগনস্থিত বঙ্কিম-সবিতার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মির আনন্দময় উত্তাপ-সম্ভোগ-সৌভাগ্য যাঁহাদের কপালে ঘটিয়াছিল। তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। মহা-গ্রন্থ কৃষ্ণচরিত্র মাসে মাসে তখন 'প্রচার'-এ প্রকাশিত হইতেছিল—'প্রচার'-এ তখন (১২৯১—৯৪ সন) বৃক্ষশাখারূঢ়া রণমদে মত্তা শ্রীর সিংহবাহিনীবৎ বিক্রম দেখিয়া হিন্দু জনতা অক্লেশে রণজয় করিয়াছিল—এই সমস্ত পরম বিস্ময় মাসে মাসে তাঁহারা সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান লেখকের সাহিত্যিক চেতনা জাগ্রত হয় ইহার বছর দশেক পরে। তখন পর্য্যন্ত অস্তমিত বঙ্কিমরবির রশ্মিতে বাঙ্গালার গগন রক্তিম। আমার পরমারাধ্য খুল্লতাত ৺অক্ষয়চন্দ্র ভট্টশালী মহাশয় অত্যন্ত সাহিত্য ও সঙ্গীতামোদী ব্যক্তি ছিলেন—জীবনের অনেক প্রেরণাই আমি তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ—১৩০৭ সনের কথা বলিতেছি। এই সময় ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমারসভা' বাহির হইতেছে, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সুমুদ্রিত সুচিত্রশোভিত 'প্রদীপ' পত্রিকা প্রতি মাসে নব নব বিস্ময় জোগাইতেছে। খুড়া মহাশয় "ভারতী" "প্রদীপ" ইত্যাদি পত্রিকা ত রাখিতেনই, চারি বৎসরের সম্পূর্ণ এক সেট বাঁধান "প্রচার" পত্রিকা তাঁহার নিত্য-সহচর ছিল। সেই 'প্রচার' হইতে যখন তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বঙ্কিম প্রণীত গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি, পুষ্প নাটক, "রাজার উপর রাজা" কবিতা, এবং সর্ব্বোপরি সীতারাম ও কৃষ্ণচরিত্র সহকর্ম্মীগণকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং নানাবিধ আলোচনায় তাঁহার বাসগৃহখানি মুখর হইয়া উঠিত, তখন সেই আনন্দস্নান হইতে আমরা বালকের দলও বঞ্চিত হইতাম না।

তাহার পরে বসুমতী যখন—যতদূর মনে পড়ে ১৯০৩

সনে (বাঙ্গালা ১৩১০) বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী গ্রাহকগণকে বার্ষিক উপহার প্রদান করিল, তখন হইতে এই রত্নরাজি বাঙ্গালার শিক্ষিত পরিবারমাত্রেই ছড়াইয়া পড়িল। আমরা বালকের দল এতদিন বঙ্কিম-রস বয়স্কগণ যতটুকু পরিবেশন করিতেন ততটুকুই পাইতাম; কখনও বা উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক বৃক্ষশীর্ষে সুখে সমাসীন হইয়া তথায় নিশ্চিন্তে লুকাইয়া বসিয়া বঙ্কিমের গ্রন্থ বা পূর্ব্বদিনের ডাকে আগত 'ভারতী' পত্রিকা পাঠ করিতাম। কিন্তু স্বনামধন্য উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় ঘরে ঘরে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী বৃষ্টি হইয়া গেল। লুকোচুরির আর কোন প্রয়োজন রহিল না—দিবানিশি আমরা বঙ্কিম-স্পষ্ট রসতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। খুড়া মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত বসুমতীর সেই প্রথম উপহার সংস্করণের বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী অদ্যাপি আমি সযত্নে রক্ষা করিতেছি।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' যখন নূতন জ্যোতিষ্কের মত বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইল, তখন উহা সর্ব্বত্র সহৃদয় অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল এমন কথা বলা যায় না। কেহ ইহাতে সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষার সহিত অতি তরল ভাষার সংমিশ্রণ দেখিয়া ভাষার শুচিতা নষ্টের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কেহ বা ইহাতে নিছক্ 'আইভান্‌হোর' অনুকরণ আবিষ্কার করিয়া বঙ্কিমের মৌলিক রচনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিচক্ষণ বোদ্ধাগণ কিন্তু বুঝিতে পারিলেন, 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'হুতোম পেঁচার নক্সার' যুগ শেষ হইয়া গেল, নব যুগের অরুণোদয়রাগে রঞ্জিত হইয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়াছে। প্রভাত সূর্য্যের আলোকস্নাত শুভ্রপক্ষবিহঙ্গমের পক্ষসঞ্চালনলীলা আমরা যেমন মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত নিরীক্ষণ করি, বাঙ্গালার রসিক সম্প্রদায় তেমনি বিস্ময়ে বঙ্কিম-স্পষ্ট এই প্রথম বিহঙ্গমটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পরের বৎসর 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইলে সন্দেহ-বাদীগণ নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

"গভীর জলকল্লোল তাহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল।… অকস্মাৎ নবকুমার বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র! অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকট আনন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয়পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেণার রেখা, স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম গ্রথিত মালার ন্যায়, সে ধবল ফেণরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইতেছে, কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ!…অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছে।…নবকুমারের চেতনা হইল, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন, ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধি তীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি। কেশভার অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত—রাশিকৃত আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন—যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে!… নবকুমার স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।…অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন— "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

—অতিবড় ভ্রূকুটি-কুটিলমুখ সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইল—ঘনায়মান সন্ধ্যায় কল্লোলমুখর সমুদ্রসৈকতে এই নবকুমার-কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ চিত্র মহাকবির অঙ্কিত।

কাব্য হিসাবে কপালকুণ্ডলার যতই উৎকর্ষ থাকুক না কেন, বঙ্কিম-প্রতিভার মূল সূত্র, বঙ্কিম-হৃদয়ের অতন্দ্র অভিমান উহাতে ধ্বনিত হয় নাই। পরমহংসদেবের সহিত বঙ্কিমের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডে, পরিশিষ্টের ৫৩ পৃষ্ঠায় সেই সাক্ষাতের বর্ণনা আছে। স্থান, ভক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অধর সেনের বাড়ী, সময় ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। পরমহংসের তিরোভাবের দুই বৎসর আগের কথা, বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পর আরও দশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। সেই দশ বৎসরকাল মধ্যেই তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্করণ ইত্যাদি রচিত হয়। স্থানটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্য বদনে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন এমন সময় অধর কয়েকটি বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

অধর (বঙ্কিমকে দেখাইয়া ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়,

ইনি ভারী পণ্ডিত, অনেক বইটই লিখিয়াছেন। আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন। ইঁহার নাম বঙ্কিমবাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বঙ্কিম, তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)। আর মহাশয়! জুতোর চোটে! (সকলের হাস্য) সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

পরাধীনতা দুঃখ বঙ্কিম কি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন, পরমহংসদেবের কথার উত্তরে কথিত এই সামান্য দুইটি কথাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দুঃখ ও অভিমানই মৃণালিণী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণীর জন্মদাতা।

কপালকুণ্ডলার তিন বৎসর পরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মৃণালিনী প্রকাশিত হয়। উহার বিষয়বস্তু বক্তিয়ার-পুত্র ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার ও বাঙ্গালার স্বাধীনতা লোপ। মীনহাজউদ্দিন সিরাজের তবকত্‌-ই-নাদিরী গ্রন্থে বঙ্গ-বিজয়ের আদিতম বিবরণ পাওয়া যায়। তথায় লিখিত আছে, অষ্টাদশ-অশ্বারোহী-সহায় মুহম্মদ নদীয়া আক্রমণ করিয়া লুন্ঠিত করিয়াছিলেন। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের নিকট এই তথ্য কতদূর অপমানজনক, কতদুর মর্ম্মবিদারক বোধ হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বাঙ্গালা দেশের কেন এমন দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহারই ব্যাখ্যা দিতে মৃণালিণীর রচনা।

কেন এমন হইয়াছিল, তাহারই ব্যাখ্যা মৃণালিনী দিল; কিসে এই অবস্থা দূর হইতে পারে, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সেই চিন্তাধারা বঙ্কিমের বিশাল হৃদয় অহরহ আলোড়িত করিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা কথায়, দুই-একটা চিত্রে আমরা কুম্ভকারের পুনের অভ্যন্তরস্থ এই অন্তর্গূঢ় অগ্নিকাণ্ডের আভাস পাই। এই ক্ষোভ, এই দাহ কমলাকান্তে বিশেষ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রসন্ন গোয়ালিনীকে একটি গীত শুনাইতে শুনাইতে কমলাকান্তের অনির্ব্বাণ অন্তর্দাহ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে :—

অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমাধনে মিলাইল বিধি, হে!

...দিবস গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখীজন দিবস গণিয়া থাকে।...আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী,.. সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য—আকাঙ্ক্ষা-শূন্য—আমি কি জন্য দিবস গণিব? গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যেইদিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে সেই দিন হইতে দিন গণি। যেই দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়, কত গণিব? দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? এক-জাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়, সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?"

"...আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি—এ সময়ের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিশর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্‌ দিকে?"

"চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে, নবদ্বীপ। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশানভূমির প্রতি চাই।...মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্ষাফলক উন্নত করিয়া অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া যবন সেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গলার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন! সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনের পক্ষীগণ নীরব হইল; গৃহ-ময়ূর কণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকায় অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকায় দীপমালা নিভিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্‌ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেব-মন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল, কুঞ্জতীরভূমি,

নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে আঁধার—আঁধার—আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন!"

এমন বিভীষিকাময় স্বপ্নচিত্র, বিদীর্ণ হৃদয়ের এমন বিদাহী শোণিতধারা বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই।

এই কালসাগরে নিমজ্জিতা বঙ্গরাজলক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার কামনা কমলাকান্তের একান্ত প্রাণের কামনা ছিল। পূজার দিনে আফিঙ্গ চড়াইয়া সে ইহারই স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কালস্রোতে ভেলা ভাসাইয়া কমলাকান্তপ্রভৃতি বঙ্গভূমির সন্ধানে গিয়া দূর-দিগন্তপ্রান্তে সে ইঁহারই সুবর্ণমণ্ডিত প্রতিমার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। আবেগের সহিত বলিয়া উঠিয়াছিল—

"এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না। কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা!"

স্বদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়া এই স্বপ্ন-বিলাসী পাগল কমলাকান্ত বলিলেন—

"এস ভাইসকল, আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দেই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে। চল চল অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি, সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি।"

এই স্বপ্নই ঘনীভূত হইয়া আনন্দমঠে বন্দেমাতরম্ মহাসঙ্গীতে পরিণত হইয়াছিল। পাগল কমলাকান্তের আহ্বান দেশবাসী শুনিয়াছে, দিকে দিকে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—কালসমুদ্র সত্যই আজ দ্বাদশ কোটি নহে, সপ্ততি কোটি ভুজের দ্রুত প্রক্ষেপে সন্তাড়িত। কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া মন বিষাদে ভরিয়া উঠে। জন্মভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে কাহারও কাহারও আপত্তি শোনা যাইতেছে! ভাই রে, তোমাদের আপত্তি থাকে' তোমরা জননী জন্মভূমিকে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা, কমলদল-বিলাসিনী কমলা অথবা বিদ্যাদায়িনী বাণী বলিও না—যদিও এই সকল অত্যন্ত সহজবোধ্য অলঙ্কারময় উপমা বুঝিতে কাহারও ভুল হওয়া উচিত নহে। তাই বলিয়া জন্মভূমিকে কি জননী বলিয়া ডাকিতেও বিমুখ হইবে? তোমাদের গর্ভধারিণী জননী যেমন তোমাদের বিবিধ সুখের কারণ হইয়া সুখদা, বিবিধরূপে কামনাপূরণ করিয়া বরদা, রোগ-বিপদে রক্ষা করিয়া তারিণী, সমস্ত শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া রিপুদলবারিণী—তোমাদের স্বদেশ, তোমাদের জন্মভূমিও কি তেমনি তোমাদের সুখদা, বরদা, তারিণী ও রিপুদলবারিণী নহেন? সেই সুজলার জলে যুগ যুগ ধরিয়া কি তোমরা তৃষ্ণা-নিবারণ শস্য-উৎপাদন কর নাই, অবগাহন করিয়া শীতল হও নাই? সেই সুফলার রসাল আম্রপনসে বিল্বকদলীতে, লিচুআনারসে কি তোমাদের রসনা তৃপ্ত করে নাই? গ্রীষ্মতাপে তাপিত হইয়া সেই মায়ের মলয় পবনশীতল আঁচলের ছায়ায় বসিয়া কখনও কি তোমরা দেহমন জুড়াও না? এইভাবে তোমাদের জন্মভূমি কি সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা নহেন? তোমাদের এই জন্মভূমি কি শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী নহেন? তিনি কি ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনী নহেন? শরতে বসন্তে জ্যোৎস্নায় যখন দিগ্‌দিগন্তে সৌন্দর্য্যসাগরে জোয়ার আসে, গাছে গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া চারিদিক্ গন্ধে মাতাইয়া তোলে—তখন কি জন্মভূমিকে মা মা বলিয়া ডাকিয়া একবারও বলিতে ইচ্ছা হয় না—"মা, আমার মা, তুমি এত সুন্দর!" ভাই, আজ তুমি ভাইয়ের উপর রাগ করিয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিতেছ না, মায়ের আহ্বান শুনিলে মুখ ফিরাইয়া লইতেছ। কিন্তু সেদিন বেশী দূরে নহে যেদিন তুমি মা মা বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইবে, সপ্তকোটিকণ্ঠের মিলিত মা মা ডাকে মা রাজরাজেন্দ্রাণীর মত সুখে হাসিবেন।

বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রতিভার সম্যক আলোচনা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবপর নহে। ঔপন্যাসিকের প্রধান উপজীব্য নরনারীর প্রেম, সেই প্রেম-চিত্রণে বঙ্কিম পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ঔপন্যাসিকগণের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন, ইহা জোর গলায়ই বলা যায়। অধিকন্তু বলিতে পারি যে,

এই বাল্য-বিবাহের দেশে, এই সতীদাহের দেশে বঙ্কিম নারী-প্রেমের যে গভীরতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে অন্যত্র ক্বচিৎই তাহার তুলনা মিলে। নায়িকাগণের এই প্রেম-তন্ময়তা বঙ্কিমের প্রথম গ্রন্থ দুর্গেশনন্দিনীতেই দেখা দিয়াছে। তিলোত্তমা এবং আয়েষা, এই উভয় চিত্রই আমাদের মুগ্ধ করে। তৃতীয় গ্রন্থ মৃণালিনীতে মৃণালিনীচরিত্রে এ চিত্র গাঢ়তর। চতুর্থ গ্রন্থ বিষবৃক্ষকে নিঃসঙ্কোচে প্রেমের মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কপালকুণ্ডলার নবকুমারের প্রেমের গভীরতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে—বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী-কুন্দ বিচিত্র ভ্রম ও মোহের মধ্য দিয়া প্রেমবন্যায় পাঠকের হৃদয় ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মধুর চিত্রণ আছে দেবীচৌধুরাণীতে। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি জানি, বঙ্কিমের এক এক গ্রন্থ এক একজনের প্রিয়তম—কেহ কমলাকান্তের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ জগতের সাহিত্যে আর দেখেন না, কেহ-বা বিষবৃক্ষের নামে পাগল, কেহ-বা কৃষ্ণকান্তের উইলের জন্য লাঠি লইয়া লড়িতে প্রস্তত আছেন। আহ্বান করিলে আমি ইঁহাদের প্রত্যেকেরই পিছনে গিয়া দাঁড়াইতে রাজি আছি। কিন্তু দেবী চৌধুরাণী আমার একান্ত নিজস্ব, বাঙ্গালা বা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্য কোন পুস্তক পাঠেই আমি এত অনাবিল অশ্রুময় আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। সেই এগার-বার বৎসর বয়সে সাহিত্য-চেতনার জাগরণের দিন হইতে, এই জীবনের অপরাহ্ন পর্য্যন্ত দেবীচৌধুরাণী কখনও পুরাতন হইল না—উহার আনন্দ ও অশ্রুজলের উৎস কোনদিন কিছুমাত্র বিশীর্ণ হইল না।

বঙ্কিমের উপন্যাসের গৌণ চিত্রগুলি লইয়া আলোচনা করিতে গেলে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। কিন্তু আবাল্য পরিচিত বিমলা, গিরিজায়া, কমলমণি, সুন্দরী, লবঙ্গলতা, নিমাইমণিগণকে বিন্দুমাত্র সম্ভাষণ না করিয়া বিদায় লইতে বড়ই কুণ্ঠিত হইতেছি। আর কমলমণির পুত্র সতীশবাবু, যাহাকে কোলে লইয়া কমলমণি স্বামীর উপর মানে বসিতেন, সুকুমারীর কন্যাটি যে নিমাইমণির শূন্য বুকখানি ভরাইয়া দিয়াছিল—নবপ্রাপ্তনয়নারঞ্জনীয় সেই ছেলেটি যে অমরনাথকে বলিয়াছিল—"দা"—, সুভাষিণীর সেই ছেলেটি যে নির্ব্বিচারে সকলকে "হোগাদুম" বিতরণ করিয়া বেড়াইত—ইহারা সকলেই যে পিছনে জামার প্রান্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে!

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে সম্রাট আকবরের মুখে এমন একটি মহিমময় রাজশ্রী ছিল যে, না চিনিয়াও সহস্র লোকের মধ্যে দেখিয়াও বলিয়া দেওয়া যাইত যে এই ব্যক্তি রাজাধিরাজ। বঙ্কিমের মুখেও অমনি ঐশ্বর্য্য ছিল। না চিনিয়াও বলিয়া দেওয়া যাইত—এ ব্যক্তি দশজনের একজন নহেন, ইহার ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺চন্দ্রনাথ বসু, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যুগ-প্রবর্ত্তনকারী সাহিত্যিক-প্রতিভার সহিত অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের মিলনে দেখিতে দেখিতে বঙ্কিম একটি সাহিত্যিক সৌরজগতের কেন্দ্রস্থ সূর্য্য হইয়া দাঁড়াইলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে—১২৭৯ সালে যখন নবগ্রহ-সমন্বিত বঙ্কিম-সবিতার কিরণপুষ্ট 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইল, তখন উহাতে নিত্য নব আনন্দরসের আস্বাদ পাইয়া বাঙ্গালী পুলকিত হইয়া উঠিল।

বস্তুতঃ 'বঙ্গদর্শন'রথে আরূঢ় বঙ্কিমের মূর্ত্তি যেন সব্যসাচী অর্জ্জুনের মূর্ত্তি, যেন সপ্তাশ্ব-বাহিত-রথ প্রদীপ্ত ভাস্করের মূর্ত্তি। উহাতে আলোচিত বিষয়ের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ সমস্ত দিক হইতে, সমস্ত বিষয়ে, বাঙ্গালীর সুপ্ত মনকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন—বাঙ্গালীর মন জড়তায়, গতানুগতিকতায় মুহ্যমান ছিল, উহা ভাবিতে শিখিল। বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শন চারি বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিল—কিন্তু এই চারি বৎসরেই বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে উহা যুগান্তর ঘটাইয়া গেল। বঙ্গদর্শনের সাহায্যে বঙ্কিম শুধু লোকশিক্ষাই দিলেন না, শিক্ষকমণ্ডলীও তৈয়ার করিয়া তুলিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অনেকেই আত্মক্ষমতায় সন্দিহান ছিলেন, তাঁহাদের কলমে বাঙ্গালা বাহির হইবে কি-না সেই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। ব্রহ্মা যেমন বাল্মীকিকে বর দিয়াছিলেন—তুমি যাহা লেখ তাহাই রামায়ণ হইবে, বঙ্কিমও তেমনি এই সকল লেখককে অভয় দিলেন—তোমাদের মত কৃতবিদ্য লোক যাহা লেখে তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য হইবে। সেই আশ্বাসের ফলেই জন্মিল বঙ্গবিজেতা,

মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, মহারাষ্ট্র জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ। বঙ্কিমের সহচরগণের কাহারও কাহারও লেখা এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে স্বরচিত কমলাকান্তের দপ্তরে তিনি তাঁহাদের কয়েকটি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই এবং বঙ্কিমের রচনা হইতে ঐ সমস্ত রচনার পার্থক্য করা কঠিন।

বঙ্গদর্শনে বিষয়বৈচিত্র্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্কিম-রচিত অধিকাংশ প্রবন্ধ ও রচনাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম্-এ ক্লাশে পাঠ্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। এই সমস্ত প্রবন্ধে বঙ্কিম যে সূক্ষ্মদর্শিতা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও বিচারক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীতে তাহা দেখা গিয়াছে। "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে তিনি নির্ম্মম হস্তে অত্যাচারী জমিদারবর্গকে কশাঘাত করিয়াছেন; যে সাম্যবাদ উহাতে প্রচার করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের কোন সাম্যবাদীও তাহার অপেক্ষা জ্বালাময়ী ভাব ও ভাষার প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা-গুলি সূক্ষ্মদর্শিতা ও সহৃদয়তার সমবায়ে অপূর্ব্ব; বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে, বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে কয়টি নিবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন সেইগুলি ভাল করিয়া বিচার না করিয়া অদ্যাপি কেহ বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় হাত দিতে পারেন না। বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রায় অবিকল অদ্যাপি বাঙ্গালার ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে। এই ইতিহাসের কথা হইতেই মনে পড়িল বঙ্কিমের সেই মেঘমন্দ্র আহ্বান :—

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।...বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। ...আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।"

এ যেন সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার আহ্বান! দেখিতে দেখিতে দিকে দিকে ঐতিহাসিক জাগিয়া উঠিল—দেশময় অনুসন্ধান সমিতি ও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। রাজা রাজেন্দ্রলালের গবেষণায় বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক তথ্য ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল---তাহার পরে আসিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্ত্তমান কালে যাঁহাদের প্রশংসনীয় গবেষণার ফলে ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের সকলের নাম করিতে গেলে এক পৃষ্ঠা ভরিয়া যায়, বঙ্কিমের মেঘমন্দ্র আহ্বানের ফল দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। বিশ্বামিত্রের নূতন জগৎ সৃষ্টির কথা মনে পড়ে না কি?

বঙ্কিম স্বয়ং পুরাণ মহাভারতের ক্ষেত্রে যে বিচারমূলক গবেষণাপদ্ধতি তাঁহার মহাগ্রন্থ কৃষ্ণচরিত্রে দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা একান্ত বিস্ময়জনক। শাস্ত্রকেও যে সন্দেহ করা চলে, পুরাণ মহাভারতের সাক্ষ্যপ্রমাণও যে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হয়, এই শিক্ষা ভারতীয়গণের মনের মুক্তির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিচার-ফলে তিনি মহাভারত-সূত্রধার, ভগবদ্গীতাকার মহাপুরুষ মহামানব শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ আদর্শরূপে জড়তাচ্ছন্ন সমাজের নিকট ধরিলেন, তাহাতে সমাজের বাতপঙ্গুদেহে তড়িৎ-সঞ্চালনের কার্য্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কালে হয় ত বঙ্কিমের অনেক কীর্ত্তি ম্লান হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার এই কৃষ্ণচরিত্রোদ্ধার কীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়িনী হইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমের রচনার দোষ সম্বন্ধে আমি অন্ধ বা উদাসীন নহি। ভাষার অসংযম, অনাবশ্যক চটুলতা, স্থানে স্থানে গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ বঙ্কিমের রচনায় প্রধান দোষ। মূলতঃ এই দোষে বাঙ্গালা দেশের কেহ কেহ আজ তাঁহার উপর বিরূপ। কিন্তু দুই-একটা অবাঞ্ছিত শব্দই বড় করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালা দেশের কৃষকের জন্য, বাঙ্গালী-জাতির জন্য, বঙ্কিমের কি গভীর দরদ ছিল, তাহা কি একবারও তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে না?

আমি বুঝিতেছি, বিরাট বঙ্কিম-প্রতিভা সম্বন্ধে আমার এই আলোচনা অন্ধের হস্তীদর্শনের মত হইয়াছে ও হইতেছে, কাজেই আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। আমি প্রায়ই অনুভব করি, মূলতঃ বঙ্কিম-সাহিত্য আমার মনকে গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই মানসপিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম।

ময়ূরপঙ্খী

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এমন সময় জয়ন্তর হাত ধরে টানতে টানতে মীনা ঘরে পুনরায় ফিরে এসে বললে, মানবদা, এই নাও তোমার বন্ধু। হাজির করে দিলাম—পার এঁকে গিরাফতার করে নিয়ে যাও···

জয়ন্ত ঘরে ঢুকেই মানবকে দেখে ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেল—সে একবার মানবের দিকে একবার মীনার দিকে চেয়ে তারপর ফিরে মানবকে বললে :

I see you have come···তাইত মানব, তুমি হঠাৎ—কি মনে করে? আবার মীনা তোমায় মানবদা বলে সম্বোধন করলে—ব্যাপারটা কি মানবেন্দ্র···এখানে তুমিই বা কোথা থেকে এলে—মীনাকেই বা কে মানবদা বলতে শেখালে? তোমাদের জানা-শোনা আছে না কি?

কৌতূহল ও আগ্রহ প্রচ্ছন্নভাবের মধ্যে লীন হয়ে থাকলেও জয়ন্ত যথেষ্ট রুক্ষ ভঙ্গীতে মানবের দিকে চেয়ে বললে : অতঃপর কিবা তব উদ্দেশ্য মহান···কহ সবিশেষ···

কাল কল্পে বিস্মৃতির তমরাশি হ'তে
হে বন্ধু সহসা···

মানব প্রথমে জয়ন্তর ভাবভঙ্গী দেখে ভীত ও ব্যথিত হয়ে উঠল, তারপর সাহস ভরে জয়ন্তের কাব্যে কথা কওয়ার স্রোতে বাধা দিয়ে বললে : তোমার কাব্য রাখ কবি! আমি এসেছি অত্যন্ত প্রয়োজনে···

তাত বুঝতেই পাচ্ছি—অপ্রয়োজনে মানবেন্দ্র দাশ কখন প্রয়োজন বোধ করে না···কহ কিবা তব অনুজ্ঞা আদেশ··· কি করিতে হবে মোরে···করহ আদেশ···

জয়ন্ত, রসিকতার সময় নয়, আমি তোমার কাছে সত্যিই অত্যন্ত দরকারে এসেছি···

ভাল কথা, কিন্তু এতদিন পরে এলে, তোমায় দেখে আমার কাব্য যে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে, বন্ধু!

মনে হয় প্রলয়ের বহ্নিশিখা যেন
সহসা উঠেছে জ্বলি চারিভিতে,
দিকে দিকে লেলিহান জিহ্বা মেলি তার,
দীপ্তবহ্নি গরজি উঠিছে ঘোর বিস্মৃতির
ধূম্ররাশি ভেদি···উগারি সহস্র-জিহ্ব
ফণী ফণা সর্পের মতন···গরজিছে

মানব জয়ন্তর এ কাব্যের অর্থ যে মনে মনে বুঝতে পারছিল না তা নয়—পেরেও সে যে-কথা আজ জয়ন্তকে বলতে এসেছে—তা সরল সহজ ভাবে বলতে যতবার সে চেষ্টা করতে লাগল জয়ন্ত ততবারই তাকে—কাব্যের আবরণে ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে অন্য কথা বলে। অথচ উভয়ে উভয়কে পরিষ্কার করে বলতে পারে না। মীনা চতুরা; মীনা বললে : আমি এখানে আছি বলে মানব-দা তোমাকে এখন কথা বোধ হয় বলতে পারছেন না; কেমন মানব-দা, তুমি ত জয়ন্তবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছ, জয়ন্তবাবুকে নিয়ে যাবার জন্যে···

জয়ন্ত এত জোরে হেসে উঠল—যেন ঘরখানা কেঁপে গেল। তারপর বললে : কি বন্ধু! এর মধ্যে মীনার সঙ্গেও সব পরামর্শ ঠিক করে ফেলেছ?

মানব বললে : হ্যাঁ আমি মিলনীর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছি···তুমি বাড়ী যাও না কেন? সেই কথা মীনাকে বলেছি।

জয়ন্ত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল—একখানা সোফার এক পাশে ধপ্ করে বসে পড়ল। তারপর মীনার দিকে তাকিয়ে বললে : তুমি রির্হাস্যাল দাও গে···আমি একটু পরে যাচ্ছি। মানবের সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।

মীনা চলে গেল। জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ? কি বলছিলে—মির চিঠি···এনেছ তুমি? তুমি যে বড় চিঠি নিয়ে এলে···বাস্তব জগতে···

যেহেতু তোমার কাছে—এখানে আসতে আর কেউ সাহস করে না···

কেন, আমি কি বাঘ-ভাল্লুক···কেউ যদি আসতে সাহস

না করে তবে তোমার সাহস হ'ল কি ক'রে? তোমার সাহসটাও মনে সন্দেহজনক বলে ভাবতে আপত্তি নেই··· বিশেষ ক'রে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, আজ ক-মাস প'রে হঠাৎ শ্রীযুত মানবেন্দ্র মির চিঠি হাতে নিয়ে জয়ন্ত সেন মাতালের কাছে এল যে? এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলে?

কারণ অপরাধী আমি, অপরাধী সে নয়···শাস্তি যদি দিতে হয় তবে যে তোমার বন্ধুত্বের অপমান করেছে—যে রূঢ় বর্ব্বরোচিত কাজ করেছে তাকে তুমি শাস্তি দাও—আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু যে নিরপরাধী—যে জ্ঞানত কায়েন মনসা কোন অন্যায় করে নি, তাকে কেন এ অসম্ভব যন্ত্রণা দাও!

তার কৈফিয়ৎ কি তোমার কাছে দিতে হবে?

কৈফিয়ৎ চাইতে আমি আসি নি—কৈফিয়ৎ দিতে এসেছি।

আমি ত কারও কৈফিয়ৎ তলব করিনি বন্ধু!

তার চেয়ে বেশী করেছ! কৈফিয়ৎ না নিয়ে—তাকে শাস্তি দিয়েছ ও দিচ্ছ বিনাবিচারে। কারণটা না জেনে নিজেকেই বা এ দারুণ অবস্থায় আনলে কেন? আর তাকেই বা এমন দুঃখের মধ্যে ফেললে কেন?

হুঁ···দেখি মির চিঠি···কিন্তু শাস্তি ত আমি কাউকেও দিইনি।

মানব মিলনীর চিঠি পকেট থেকে বার করে জয়ন্তকে দিলে···জয়ন্ত চিঠিখানা পড়তে লাগল: পড়তে পড়তে একটু মুখ টিপে হাসলে। তারপর মানবের মুখের দিকে চেয়ে বললে: হুঁ···এর কোন জবাব নেই মানব। আমার জবাব দেবার যা তা অনেক আগেই দেওয়া হয়ে গেছে।

সেটা সে অভিমান করে লিখেছিল—তুমি ··তাই

অভিমান! মানব, কিসের অভিমান শুনি? শোন মানব, আমি জানতাম—এবং এখনও জানি যে ছেলেবেলা থেকে তোমাদের দু'জনে খুব ভাব ও ভালবাসা···তা সত্ত্বেও যখন আমাদের বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরেও—তোমাদের ভাব আমি লক্ষ্য করেছি—তারপর নিজের চোখে আমি সেদিন যে ছবি দেখেছি···আমাকে অন্য কথা দিয়ে ভুল করেছি, তুমি অপরাধী—এ-সব বলে ভোলাতে চাও কেন? শুনি? উদ্দেশ্য কি? সোজা কথা কও মানব! মির চিঠি তুমি হাতে করে নিয়ে এলে কি সাহসে?

সাহস এই যে, আমিই তোমার কাছে সমস্ত কথা অকপটে বলতে পারব বলে। শুধু তা নয়, ভোলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তার কাছ থেকে আমি সব খবর সংগ্রহ করেছি···তুমি থিয়েটার কর, কি টাকা নষ্ট কর—কি মীনার সঙ্গে ইয়ারকি কর···এ নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার দরকার হয় নি, হবেও না কোন দিন—চিরদিন তুমি ও আমি পরস্পর বন্ধুত্বের দাবী করে এসেছি। আমার দুর্ভাগ্য ও দুর্ম্মতি আমি সে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখতে পারি নি—অলক্ষ্যে আমার ভেতরের যে কামনা অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছিল—সে আগুনে আমি নিজেই পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি···তার সঙ্গে মিলনীর কোন অনুভূতি নেই, সহানুভূতিও নেই··তোমার কাছে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করলাম···মার্জ্জনা চাইব না, চাইতে আসিও নি; আমি এসেছি—বেচারী মিলনীকে রক্ষা করবার জন্যে···আমাকে তুমি তোমার যে কোন শাস্তি মনে আসে তাই দাও; কেবল আমার সঙ্গে বাড়ী চল···মিলনী তোমার জন্যে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে—আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটী করেছে। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তোমাকে যেমন করে পারি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

মানবের সরল সহজ কাতর-প্রার্থনা জয়ন্তর কানে যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছিল। তাই হয়—মানুষের কাম্য-কাম যখন বাধা পড়ে—যখন প্রেমের এই আবহাওয়ার মধ্যে সন্দেহ বস্তুটি জেগে ওঠে—তখন তাকে রোধ করা খুবই দুরূহ।

জয়ন্ত মিলনীর চিঠিখানা দুবার তিনবার পড়লে—দু-একবার অন্যমনে ঘাড় নাড়লে—একটু মুখ টিপে হাসলে—তারপর বললে: শোন মানব, তোমার বন্ধুত্বে আমি শ্রদ্ধা করতাম, তা জান?

জানি। আমি তার··

চুপ কর, আমায় কথা শেষ করতে দাও যদি তুমি সত্যি বন্ধু হতে, যদি তুমি কাপুরুষ না হতে, তাহলে মিলনীর সঙ্গে আমার বিয়ের সময়—বিয়ে হতে দিতে না, বাধা দিতে। তাতে তোমার ও আমার দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা থাকত—তা তুমি করনি। সে-সময় সকলের চেয়ে যা ভাল উপহার তাই আমাকে ও মিলনীকে দিয়েছ। তার পর দিনের পর দিন আমার বাড়ী তোমার ভাববৈলক্ষণ্য আমি লক্ষ্য করেছি। কিছু বলি নি—

ভেবেছিলাম, বুঝেছিলাম তোমার ভেতরে একটা ক্ষত হয়েছে—কালের হাতের প্রলেপে সেটা মিলিয়ে যাবে, সুস্থ হবে। তা হয়নি—সেদিনকার সে ঘটনা—কার দোষে হয়েছে সে বিচার আমি করব না—আমি শুধু এইটুকু বলব যে, তুমি কাপুরুষ···তোমার এতখানি বলশালী বিশাল দেহ থাকা সত্ত্বেও তুমি মেরুদণ্ডহীন···আমি বর্ব্বর নই···আমি মিলনীর ডিভোর্সের পক্ষপাতী—রাজীও আছি—তোমাদের ভালবাসা যদি সত্যি ভালবাসা হয়, তবে তার সুযোগ আমি সহজ করে দেব। আমার মদ্যপান, আমার অর্থনষ্ট, আমার নানা রকমের ব্যাভিচারের অজুহাতে মিলনীকে ডিভোর্সের মামলা করতে ব'ল—তোমাদের পথ সহজ হয়ে যাবে।

তুমি ভুল বুঝেছ জয়ন্ত—আমার অপরাধ আমি নিজেই স্বীকার ক'রেছি; মিলনীর কোন অপরাধ নেই, তুমি অযথা তাকে সন্দেহ করছ···

দেখ মানব, অন্য কেউ হ'লে তাকে আমি গুলি করে মারতুম্, কিন্তু আমি বুঝেছি যে, দোষী তুমি একা নও··· সে ছলাকলাময়ী মিলনীও দোষী, তার সাফাই গাইবার চেষ্টা ক'র না—অন্তত তুমি ক'র না।

আমি শপথ করছি জয়ন্ত···

শপথ ক'র না মানব, কামাতুরের শপথ আমি বিশ্বাস করি না—কাম-বিমোহিত তোমার প্রকৃতি কৃপণ হয়ে গেছে ···যে পরস্ত্রীর রূপ যৌবন ভোগ লালসার ক্ষুধায় পীড়িত হয়—যে বন্ধুত্বের অপমান করে, যে অভিজাত-বংশমর্য্যাদা ভুলে ইতরের স্বভাব ও সংস্কার গ্রহণ করে তাকে আমি বিশ্বাস করি না। কেন বৃথা আমাকে ও-সব বোঝাতে চাইছ—মিছে সময় নষ্ট ক'র না।

আচ্ছা তুমি আমার কথাটাই শোন···বিচার কর—বোঝ··· জয়ন্ত হাত নেড়ে চলে যেতে-যেতে ফিরল।

কি বলছ ..পৃথিবীতে যার দ্বারা বন্ধুত্ব পদদলিত, যার দ্বারা নিজের স্ত্রী অবমানিত, সেই ব্যক্তি এসে আমাকে বোঝাতে চায়—আমার অন্যায় হয়েছে, তোমার স্ত্রী সতী লক্ষ্মী···এই ত কথা, তা বারবার কি বলবে···শোন মানব, তোমরা আমাকে চিরদিন ধরে দেখে আসছ, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলা-ধুলা করেছি—একসঙ্গে লেখাপড়া শিখেছি, তোমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে মিলনীদের বাড়ী যাওয়া-আসা ও তারপর বিয়ে। তোমরা জান, অন্তত তোমাদের মত এই যে, আমি একজন অত্যন্ত সেন্টিমেণ্টাল ভাবুক লোক···কিন্তু এটা বোধ হয় জান না সেই ভাবুক কবির—রক্তমাংসের শরীর—তার ভেতরেও এতখানি শক্তি আছে যে একটা বন্য জানোয়ারের চেয়েও ভীষণ ··শুধু শিক্ষা ও বুদ্ধি বিচার দিয়ে সেই পশুত্বকে সে দমন করে রেখেছে... প্রয়োজন হ'লে তার নখদন্ত বার করে সে হৃদপিণ্ড উপড়ে ছিঁড়ে খাবে—সেটা ত জান না।

মানব উত্তেজিত হয়ে উঠে সোজা হয়ে বসল।

জয়ন্ত উগ্রভাবে ঘরের মধ্যে দু'বার টাল খেয়ে পাক দিয়ে ফিরল। মাঝে মাঝে তার জামার পকেট হাতের দৃঢ়-মুষ্টিতে চেপে ধরতে লাগল। তারপর সোজা হয়ে বললে: শোন মানব, আমি আবারও তোমার পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে বলছি···ফিরে যাও—আর আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা ক'র না···এই নাও তোমার মিলনীর চিঠি ··

বলে চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে মানবের সামনে।

আরও শোন···

বলেই পকেট থেকে ব্রাউনি রিভলবার বার করে মানবের সামনে ধরে বললে·· দেখেছ ?···

মানব হাসতে হাসতে বললে: বাঃ, playing গোবিন্দলাল···Don't be sentimental জয়া···

Hands up!

জয়ন্ত অত্যন্ত রূঢ়মূর্ত্তিতে রিভলবার হাতে নিয়ে বললে— ভয় পাচ্ছ বন্ধু, মৃত্যুকে এত ভয়···যাও কাপুরুষ, ফিরে যাও, ইচ্ছা মাত্রেই তোমাকে গুলি করতে পারতাম, কিন্তু কোন লাভ তাতে নেই। যাও মিলনীকে ব'ল তার পথ পরিষ্কার···live ye the life of adultery ··if you like···পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় কোন rival পরস্পর একটা স্ত্রীলোকের সতীত্ব নিয়ে তোমার মত ডুকরে কেঁদে তাকে বাঁচাতে আসেনি—আর তার প্রতিপক্ষ তাকে হাতের কাছে পেয়ে নিষ্কণ্টকে ফিরে যেতে দেয় নি···আমি দিলাম, চলে যাও···Damn incest···

Better kill me···আমায় হত্যা কর, কিন্তু মিলনীকে ত্যাগ ক'র না···

—হাহা হাহা—হাহা-হাহা marvellous···চমৎকার··· অভিনয় মন্দ করলে না বন্ধু! Yes, you are a good actor, clever too···I see···

মানব জয়ন্তর পায়ের কাছে পড়ল করজোড়ে।

O ! what a fall, the giant—crawling like a snail···out, out, coward get hence···দূর হও··· দূর হও···

মানব সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল—মিলনীর চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রেখে বললে—

আচ্ছা···কিন্তু শোন জয়া, মানুষের অপরাধ করবার যেমন সীমা থাকে, মার্জ্জনা চাইবারও সীমা থাকে, শাস্তি নেবারও সীমা থাকে শোন, চলে যেয়ো না···সীমা ছাড়িয়ে তোমার পায়ের তলায় পড়েছি···তুমি বুদ্ধিহীন, বিচার করলে না···আমাকে রিভলভার দেখালে, কিন্তু যাবার সময় বলে যাচ্ছি···আমি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে যে অন্যায় করেছি—তুমি অখণ্ড সতী সাধ্বীর প্রতি বিনা বিচারে যে অন্যায় করেছ, সে তার চেয়েও বেশী অন্যায়·· সে অন্যায়ের শাস্তি তোমাকে একদিন গ্রহণ করতে হবে···ওই মিলনীকে তোমায় ইন্দ্রাণীর পূজা দিয়ে গ্রহণ—করতে হবে—করতে হবে—করতে হবে দেখে নিয়ো, হয়ত সেদিন এই বন্ধুকেও শুধু মার্জ্জনা নয়, আলিঙ্গন করতেও হবে···সেদিনকার সেই অনুশোচনার জ্বালা—নিবৃত্তির পথ এখন থেকে ভেবে রে'খ। ইচ্ছা হলে এই মুহূর্ত্তে তোমার হাত থেকে আমি পিস্তল কেড়ে নিতে পারতাম···শুধু পারতাম না, তোমায় ওইখানে শেষ করে যেতে পারতাম···পারিনি বা করিনি শুধু মিলনীর মুখের পানে চেয়ে · আজ দেখছি পশু শুধু আমি নয়, সত্যি পশু তুমিও···

মানব দ্রুত ঘর থেকে চলে যেতে উল্টো পথে গেল। বাইরে থেকে মীনা ছুটে এসে বললে, দাঁড়াও মানবদা, এদিকে নয়—এদিক দিয়ে এস···

মানব মীনার নির্দ্দিষ্ট পথে ঘর থেকে চলে গেল।

জয়ন্ত তখন দাঁতে দাঁত দিয়ে পিস্তল হাতে করে কাঁপছিল। মীনা তাড়াতাড়ি জয়ন্তর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলে। জয়ন্ত সোফার ওপর বসে পড়ল।

মীনা কাছে এসে দাঁড়াল।

মীনা, মদ দাও···মদ দাও···পিস্তল আমার একটা নয় মীনা, আরও আছে।

মীনা কোন কথা না বলে মদে গেলাস ভরে দিলে। জয়ন্ত এক নিঃশ্বাসে পান করলে। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললে: মীনা! তোমাকে ও-ঘরে যেতে বলেছিলাম—এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?

এক টুক্‌রো মাংসের জন্যে দু'টো সিঙ্গীর কামড়াকামড়ি আর গর্জ্জন শুনছিলাম।

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে বললে: এক টুকরো মাংস!

তা না ত আর কি?

তার মানে?

তোমায়ও দেখছি মনের কারবার কর না, শুধু দেহেরই কারবার কর···কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মীনার মাথাটি খাবার জন্যে তার মরণবাণ হাতে নিয়ে কেন এসেছিলে? তোমার পায়েই মীনার শেষ হবে ...

মীনা সোজা জয়ন্তর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল।

মীনা—মীনা—মীনা, কি হ'ল, অমন করছ কেন?

মীনারও রক্ত মাংসের শরীর তারই বা কতখানি সয়? উঃ!

মীনা মুখ তুললে।

কি বলছ মীনা?

মীনা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। একটু হেসে বললে··· গর্জ্জনের পর বর্ষণের প্রথা আছে—তাই দেখছিলাম অভিনয়টা কেমন মানায় এখানে।

এ যদি অভিনয় হয় তবে সত্যি কোন্‌টা?

সত্যি এই যে তোমার বউ তোমাকেই ভালবাসে, আর কাউকেও নয়···

মীনা, সাবধান! আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার কাছে কোন কথা ব'ল না।

আমার ত তার কথা বলবার জন্যে ঘুম হচ্ছে না, সেই জন্যেই ত মীনার মরণ অভিনয় করলাম গো···বুঝতে পারলে না—তুমি নাটক-কার। তোমার নাটকের হিরোয়িন—নাটক জমিয়ে নিলে—সাব হিরোয়িন একটা সিন্ এখনি আছড়ে পড়ে বললে কথা—কেমন জমে সেইটে দেখছিলাম গো—এটা ধরতে পারলে না···

মীনা! তুমি সত্যিই একটা প্রহেলিকা···

একেবারেই নয়—মানে একই। আগে ছিল গরুর গাড়ীর খোট্টা গাড়োয়ানের ভাষা—এখন তার ওপর তোমরা রঙ ধরিয়েও কবির মোলায়েম ভাষা দিয়ে—তোমাদের ইকার মানেও যা ও গাড়োয়ানের কথার মানেও তা··বেচা কেনার

কারবার একই···কিছু বদল করতে পারনি·· যাক্ গে তুমি এখন রিহার্স্যাল দেবে, না—মদ খাবে···বাড়ীতে যাবে, না যাবে না ?···চুপ্ করে রইলে কেন মুখের কথাই খসাও···

একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—আমি যে তোমার এখানে আছি, থাকি তাতে কি তোমার অত্যন্ত অসুবিধা হয় ?

হয় না ? আমার শোবার ঘরটি তোমায় ছেড়ে দিতে হয়েছে—আমি শুই কোথায়···আমি রাত্রে এই ঘরে পড়ে থাকি।

বুঝলাম—আর ?

থিয়েটারটায় নাম-ডাক হচ্ছিল, সেথান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে—আজ কমাস চুপ্—তোমার থিয়েটার যে কবে হবে—হবে কি-না—তাই বা কে জানে ? মিছিমিছি আমার বাড়া-ভাতে ছাই পড়ল। অসুবিধা হচ্ছে না ?

তারপর ? আর ?

তারপর ? তোমার বউ আঙুল মটকে না জানি কত গালই পাড়ছে···কেন বাপু খেলাম না ছুঁলাম না—মাঝে থেকে দোষী হই কেন ?

মীনা এসব তোমার মনের কথা নয় ঠোঁটের কথা—

কথা ত আর লোকে মন দিয়ে কয় না, ঠোঁট দিয়ে কয়।

আমার বউ যে তোমায় গাল দিচ্ছে তুমি তা জানলে কি করে ?

এ আবার শুনে জানতে হয় নাকি··ও মেয়েমানুষে হাওয়ায় বুঝে নেয় ?

তাহলে তোমার ইচ্ছে যে এ বাড়ী ছেড়ে আমি চলে যাই।

চলে গেলেই ভাল—না হলে, দিন-রাত্তির এমন আগুন নিয়ে আর জ্বলে-পুড়ে মরতে পারি নে—বুঝলে···

মীনা ঘর থেকে চলে গেল। যাবার সময় পিস্তলটা নিয়ে গেল। জয়ন্ত চোখ বুজে সেই সোফায় শুয়ে পড়ল। মানবের কথাগুলো তাকে ছুঁচের মত বিঁধছিল। হঠাৎ চোখ খুলে উঠল—উঠে বোতল থেকে মদ গেলাসে ভরতি করে ঢালল। হাতে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে নাকটা দুবার রগড়ালে—তারপর এক নিঃশ্বাসে পান করে গেলাসটা কার্পেটের ওপর গড়িয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

মীনা বাইরে এসে বাড়ীর দালানের বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াল। সামনে পাশের হলঘরে যাবার যে দরজা সেটা বন্ধ করে দিলে। বাইরে আকাশ অন্ধকার—অবিরাম টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ীর উঠানে একটা কামিনী গাছের ঝাড় বর্ষায় ফুল ফুটে ভিজে হাওয়াকে মাতাল করে দিয়েছে তার গন্ধে। আকাশে তারা নেই, মেঘ-ঢাকা অন্ধকার—মাঝে মাঝে দেয়ার ডাক—বাতাস হিমসম শীতল। মীনা সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। উঃ এই মানুষ কি···বাপরে! এখুনি হয়ত একটা খুন-খারাপী হয়ে যেত। কি হ'ত তা হ'লে। নাঃ···বড় বিপদেই পড়লাম—কি করি···আমারই বা একি হ'ল ? ওর নিঃশ্বাস পড়লে আমার বুকের ভেতর যেন ঢেঁকিতে পাড় দেয়। ওর বউ আছে···আজ না হয় কাল চলে যাবে··· কিন্তু আমার···ভগবান! ও মুখখানা থেকে চোখ যে পালটাতে পারিনি···ভগবান! আমায় ভুলতে দাও—আমায় ভুলতে দাও···তুমি জান আমার অন্তর···আর কার কাছে বলব···কেউ ত আমার নয় যে, বলেও তার কাছে দু'দণ্ড মনের ব্যথা হালকা করব।

বারান্দার দরজায় কে ধাক্কা দিলে : মীনা! মীনা! মীনা!

মীনা দরজা খুলে বললে—মা ডাকছ ?

হ্যাঁ রে--সে চলে গেছে ?

হ্যাঁ মা।

কি বলে গেল ?

কিছু বিশেষ বললে না—এই হাজার টাকার নোট দিয়ে গেছে···বললে আবার আসবে।

কি বুঝলি ?

বুঝব আবার কি ? দেখা যাক আসা-যাওয়া করুক। ফট্ করে জয়ন্তকে কি ছাড়া ভাল হবে—দেখিই না একটু বেয়ে চেয়ে—একদিন হাজার দিলেই মাথা নীচু করব কেন—অ্যাঁ, কি বল মা ?

তা ত সত্যি মা—হাল-চাল না বুঝে কিছু করা ঠিক নয়। যাক্ তা রাত হয়ে গেছে। ওদের আজকে যেতে বল! জয়ন্তর খাবার দেব ?

সে ত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছে—তুমি আন, দেখি খায় ত খাবে—না হয়—তোমরা শোওগে।

ওদের বলে দিই, তবে আজ আর কিছু হবে না ?

দেখি একবার আমিই যাচ্ছি।

মীনা হল ঘরের দিকে চলে গেল। মাও খাবার আনতে গেল।

জয়ন্তর খুব নেশা হয়েছে, তার ওপর মানসিক উত্তেজনা আরও বেশী মাতাল করে দিয়েছে, একবার করে মাথা তুলতে যায় আবার লুটিয়ে পড়ে—মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

জোর করে উঠল :

এই···মীনা! মীনা!

টেবিলের ওপর মদের বোতলে একটুখানি মদ ছিল। ঢক্ ঢক্ করে সেটা পান করে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

আবার ডাকলে : মীনা! মীনা! আঃ মীনা!

আবার সোফায় লুটিয়ে পড়ে ছট-ফট করতে লাগল।

ওঃ মি · মি···মি···

মীনা খাবার নিয়ে শোবার ঘরে রেখে—ড্রয়িংরুমে এসে দেখলে জয়ন্ত সোফায় পড়ে ছটফট করছে।

সোফায় বসে মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললে : কেন অতখানি মদ খেলে·· বললে ত কথা শোন না।

জয়ন্ত অর্দ্ধনীমিলিতআঁখি হ'য়ে বললে : মীনা! আমায় সব ভুলিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও···

চল ঘরে খেয়ে শোবে চল।—বুকের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে: কেন অমন কর···বুঝেও বোঝ না কেন—চল ঘরে—মাথাটা গোলাপজল দিয়ে ধুয়ে দিই, কেমন? মাথা ধুয়ে খেয়ে নেবে, কেমন?

মীনা, তুমি না আমায় এখান থেকে চলে যেতে বলছিলে—তবে এত যত্ন করছ যে—

মীনা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল : আহাহা···যত্ন করবার জন্যে আমার যেন বড় দায় পড়ে গেছে; আমার সাত-পুরুষের নাউখোলা কি-না···মাতাল হয়ে পড়েছ—তাই বলছি···তোমার শোবার জায়গায় শোওগে—খাবার দেওয়া হয়েছে···আমি খাব-দাব না, ঘুমবোনা? কি ঝঞ্ঝাটেই পড়েছি—মাগো প্রাণটা আমার জ্বলে-পুড়ে গেল।

আচ্ছা মীনা! বলে জয়ন্ত উঠল। খানিক চুপ করে দাঁড়াল—জিজ্ঞাসা করলে :

ভোলা আসেনি?

না—

এরা সবাই চলে গেছে?

হ্যাঁ, শুধু শুধু তারা আর কতক্ষণ থাকবে?

আচ্ছা, তোমার চাকরকে দিয়ে একখানা ট্যাক্সী-গাড়ি ডাকিয়ে দিতে পার?

কেন? এই মাতাল অবস্থায় কি মানবদার সঙ্গে লড়াই করতে যাবে, না, পথের মাঝখানে পাঁচ আইনে আটক হবে রেতের মতন—কোথায় যেতে হবে শুনি?

তোমার এখানে আমার থাকা আর উচিত নয়, আমি অন্যত্রে যাব।

অন্যত্রটা কোথায়—বাড়ী যাও ত বল—চাকর তোমায় পৌছে দিয়ে আসুক···আর যদি বাড়ী না যাও, অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা কর—তা হলে যেতে দেব না—ঘর থাকতে বাবুই ভেজে তোমার হয়েছে সেই দুর্দ্দশা···ছিঃ ছিঃ, আচ্ছা তোমার একটা আক্কেল বিবেচনা কিছু নেই···খেয়েদেয়ে শোবে তা নয়—এখন যাব—কেন যাবে তাই শুনি? কোন শালী নেমকহারামী বলে যে তোমার জন্যে আমার অসুবিধে হয়েছে—তাই রাগ ক'রে চলে যাচ্ছ ··আশ্চর্য্য—তোমার মত এমন নিষ্ঠুর লোক আমি কখন দেখিনি।

এই ত বললে তোমার শোবার কষ্ট হয়···আবার···

আমার ঘাট হয়েছে, আমার ঘাট হয়েছে, আমার ঘাট হয়েছে—বলতে বলতে মীনা জয়ন্তর পায়ের কাছে ঢিব্-ঢিব্ করে মাথা খুঁড়তে লাগল···

জয়ন্ত দু হাতে মীনাকে তুলে ধরলে। মীনার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে, ঝর ঝর করে জল পড়ছে।

ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও···উঃ মাগো!

জয়ন্ত হতভ্রষ্টের মত মীনাকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইল।

মীনা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে হেসে ফেললে···

তারপর জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বললে :

কেমন অভিনয় করলুম, বেশ অভিনয় করতে পারি, না?···

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বললে :

দুর্ভাগ্য আমার মীনা! আমি ভালবাসা দিয়ে, ভালবাসা পেলাম না, আবার ভালবাসা পেয়েও তাকে প্রাণের ভেতর নিতে পারলাম না।

যে ভালবাসে সে পাবার জন্যেই ভালবাসে, না? খুব,

ভালবাসতে শিখেছ। তা না হলে আর পিস্তল পকেটে নিয়ে বেড়াও···কি ভালবাসার বীর রে, মৃত্যুর দোসরকে পকেটে পুরে বেড়ান···চল চল খুব ভালবাসাবাসি হয়েছে···এখন খেয়ে-দেয়ে শোবে চল দিকিন্—

কথা শোন—আর জ্বালাতন ক'র না। আমি আর পারি না।

জয়ন্তকে নিয়ে মীনা শোবার ঘরে চলে গেল।

জয়ন্তকে খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে গায়ে একখানা পাতলা গায়ের কাপড় ঢাকা দিয়ে—ঘরের আলো নিভিয়ে—দরজা বন্ধ করে চলে এল সেই ড্রয়িংরুমে। দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্না আর তার থামে না। বাইরে বৃষ্টির জোর বেড়ে উঠল—হাওয়ার ঝাপট এসে দরজার কাছ পর্য্যন্ত পড়তে লাগল। মীনা উঠে কাঁচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিলে। তার পর সোফার ওপর থেকে একটা কুশন টেনে নিয়ে—সেইটে মাথায় দিয়ে ঘরের মেঝেয় পাতা কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল।

অন্ধকার ঘর, শুধু সারসির গায়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট এসে পড়ছে—তারই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঘুম আসে অথচ আসে না। ক্লান্ত আঁখি-পাতা চোখের নীচের পাতার সঙ্গে আটার মত নেপটে যায়—আবার চোখ খুলে ফেলে। অন্ধকারের ভেতর মনের ছবিগুলো খোলা চোখ দিয়ে মূর্ত্তিমন্ত করে আঁকে—আবার অন্ধকারে সেটা আপনিই মুছে যায়—অন্ধকারে ঢেউ তুলে তুলে কত সাধ-আহ্লাদের ছবির সঙ্গে কাহিনী ও কথা বলে—আবার তারা সব সেই আঁধারেই লীন হয়ে যায়।

মীনা আবার উঠে বসল—ঘুম তার কিছুতেই আর এল না। এবার উঠে আলো জ্বাললে—বাইরে তখন বেশ ঝড় উঠেছে—শুধু জোর হাওয়া নয়। এক একবার সেই জোর ঝোড়ো হাওয়া কাঁচের দরজার ফাঁক দিয়ে এসে শব্দ করতে লাগল—সে হাওয়ায় যেন কার বেদনা-কাতর সুর থেকে থেকে ব্যথায় বেজে উঠছে। মীনা কান পেতে সেই সুর শুনতে লাগল। তাতে ভাষা নেই কথা নেই—শুধু যেন সুর—কখন জোরে কখন ধীরে কখন ঝঞ্ঝার গতির মত ঝন্‌ঝনা—আকাশ তোলপাড় করে ঘরের ভেতর এসে সে সুর টেনে দিচ্ছে। ভাবাবেগে সে সেই সুরের অনুকরণ করতে গেল। ভেতর থেকে কে যেন তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিলে—যাতনায় মীনা যেন ছটফট করে উঠল। তার পর ভাষাহীন সুর মীনার কণ্ঠ থেকে বেরুল—সেই সুরের প্রকাশের জন্যে মীনা যেন সুযোগ পেলে। প্রথমে সুর গলায় ঘনাতে লাগল, তার পর তার ভাষা এল, কথা ও সুরে মীনার মনের ছবির রূপ তখন ফুটে উঠল। মীনা কবি নয়, সে কখন গান বাঁধেনি—চিরদিন পরের গান আর পরের দেওয়া সুরই গেয়ে আসছে; আজ সে নিজেই জানে না যে, এই গভীর রাতে কোথা থেকে এ সুর জাগল—কোথা থেকে এল তার ভাষা···সে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গাইতে লাগল···

ব্যথা যদি দিলে তবে
ফিরিয়ে দেব না

বাইরে অবিশ্রান্ত ঝর্ ঝর ধারা—মীনার কণ্ঠের ঝর ঝর সুরধারা—আজ মীনার কাছে ত্রিভুবন যেন বিরহে তন্ময়। গান থামল—কিন্তু চোখের ধারা থামল না। মীনা উঠে আবার আকাশ পানে চাইলে, তেমনি গাঢ় কাল। পাশের ঘরের দরজার লক্ ঘুরানর শব্দ হ'ল। মীনা ফিরে দেখলে জয়ন্ত এদিকের দরজা খোলবার জন্যে টানা-টানি করছে। লক খুলে দিতে জয়ন্ত বেরিয়ে এল।

মীনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বললে:

কি পাপেই পড়েছি বাপু, হ্যাঁগা তুমি কি মানুষকে ঘুমতেও দেবে না।

ঠিক উল্টো বলছ, বরঞ্চ তুমি মানুষকে ঘুমতে দিচ্ছ না। মীনা, তুমি এ গান কোথা পেলে?

কে জানে মনে নেই···গান আবার গাইছিল কে?

মীনা আমার সঙ্গে ছলনা ক'র না।

ছলনা করা যে আমার পেশা। তুমি ঘুমতে ত দেবে না, আমার পেশাটাও কি মাটী করতে চাও···

আমি কিছুই চাইনি···তুমি ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেন?

তুমিই ত আমার ঘুম ভাঙালে···আমি!

বা রে! রোজ পায়ে হাত বুলোও আর আমি ঘুমুই—আজ···

তুমি কি নেশার ঘোরে স্বপন দেখছিলে না কি···

স্বপ্ন নয় মীনা, সত্যি—তুমি রোজ রাত্রে আমার পায়ে···

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—আমি কি তোমার সেবাদাসী নাকি যে পদসেবা করব?

সেবাদাসী তুমি নয়, কিন্তু···দুঃখ এই যে, সে অধিকারও তোমায় দিতে পারব না···

আহা, কি আমার আপনার জন গো—বলে লোকে মাথা খুঁড়ে পায়ে ধরাধরি করে মীনারাণীর নখের ছায়া দেখতে পায় না—উনি আবার সেবাদাসীর অধিকার দিতেও নারাজ···ওঃ কত রসিকতাই শিখেছ তোমার যে রাণীগিরী করতে চায় না, সে সেবাদাসী হতে চাইবে···ওঃ তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়···

স্পর্দ্ধা আমি কিছুরই করি নি মীনা—

আচ্ছা গো, তোমায় কিছুই করতে হবে না, এখন ঘরে গিয়ে ঘুমবে বলতে পার? কেন জ্বালাতন করছ বল দেখি···

রাত্রি কত?

রাত প্রায় দু'টো বেজে গেছে···

তাই ত কাল সকালেই তবে যাব···

তাই যেয়ো গো—তাই যেয়ো। না যাও যদি ত আমার দিব্যি রইল·· যাও এখন শোওগে যাও দিকিন্···

দেখ মীনা, তোমার কথার ভঙ্গী এত রূঢ় শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু তোমার অন্তরে কি একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখ রয়েছে···

সেই জন্যেই ত তুমি নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছ···আমি ত আর তোমার মত ছন্নছাড়া নই···যে পাগলের মত বকব···

মীনা, আমায় আর খানিকটা মদ দাও···

না·· দোব না···

সেইটুকু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব।

না দোব না···যাও এ-ঘর থেকে।

একটুখানি দাও···বড় তৃষ্ণা···বুকটা শুখিয়ে যাচ্ছে।

না দোব না···কখন দোব না।

মীনা, তোমার দু'টো পায়ে পড়ি···

জয়ন্ত মীনার পায়ে হাত দিতে গেল।

ওকি! ওকি! কি কর—কি কর! তুমি আমার পায়ে হাত দিলে পদগৌরব বেড়ে যাবে—শেষটা সুন্দুরী মীনার পায়ে গোদ হবে···রক্ষে কর···

হুঁ···মীনা, তুমি খুব সুন্দরী বলে নিজেকে মনে কর, না?

ওমা আমি সুন্দরী নই?···ও বুঝেছি, আমার চেয়ে সুন্দরী বুঝি—তোমার বউ···

জাহান্নমে যাক্ আমার বউ···তুমি মদ দেবে কি না?

না···

দেবে না।

না···

দেবে না—দেবে না?

জয়ন্ত হঠাৎ মীনার হাত ধরে জোরে ঝাঁকি দিল·· মীনা উঃ! শব্দ করে যন্ত্রণায় বলে উঠল: ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, হাতটা ভেঙে গেল···আমি ত তোমার মত লড়ায়ে কার্ত্তিক নই।

জয়ন্ত অপ্রস্তুত হয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে বললে: মীনা, এতদিনে আমি সত্যই মাতাল হয়ে গেছি···নাঃ···

মীনা ছাড়া পেয়ে হাতের কব্জির ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বললে···অনেক দিন মায়ের দুধ খেয়েছিলাম তাই হাতটা বেঁচে গেল—নইলে ভেঙে যেত। মাগো, কি ডাকাতে মনিষ্যি গো···আচ্ছা তোমার শরীরে কি একটু মায়া-দয়া নেই গা—এখুনি যে হাতখানা হাড় মড় মড় কেলে জীরে হয়ে যেত···

আমায় মার্জ্জনা কর মীনা···

আর মাজা ঘসায় দরকার নেই—আচ্ছা, আমি তোমার কে, ঘর না দোর, পর না পিরথীমি···এত ধকল সহ্য করব কেন বল দিকি···সারা রাত মাতলাম—সহ্য করব কেন? ও···কি আমার রসকে রে···কে গা তুমি আমার···

জয়ন্ত মীনার মুখের ভঙ্গী দেখে ও সুর করে কথা বলার টান শুনে বললে· মীনা! তুমি এ-সব কথা শিখলে কোথায়···

কেন হাটের পাঠশালে··যেখানে দিন-রাত্তির কথার বেচা-কেনা হয়···

বেচে কে আর কেনেই বা কে?

কেন বেচি আমরা, কেনে তোমার মত রাহাগীর রে। যারা ওপরের রঙকেই রস বলে মনে করে···এই পাঠশালায় না পড়লে কি আর তোমার ধকল সইতে পারি গো···

সইতে ত তোমায় বলছি না—আমি ত যেতেই চাচ্ছি··· মীনা···

দেখ, বার-বার অমন মীনা মীনা করে ডেকো না বলছি—ভাল হবে না কিন্তু···হ্যাঁ।

কি বলে ডাকব তবে? মীনা···

তোমায় আর অমন করে ডাকতে হবে না গো—তুমি শোওগে···আমায় একটু ঘুমতে দাও···আঃ!

আমায় একটু মদ দিলেই আমি চলে যাব ঘরে…

মদ নেই এ-ঘরে—আর এত রাত্তিরে মদ আমি দেব না…

মীনা !

আবার এত মিষ্টি করে ডাকে…আঃ আমায় কি পাগল করবে না কি ?

মীনা !

ফের ডাকে ? নাঃ জ্বালাতন-পোড়াতন, আর সয় না বাপু…

মীনা ঘরের কোণে একটা ছোট দেরাজের ভেতর থেকে বোতল বার করে গেলাসে খানিকটা স্যাম্পেন ঢেলে দিয়ে বললে : এই নাও গেলো… হয়েছে ত…

জয়ন্ত নিংশেষে পান করলে, করে বললে : আচ্ছা মীনা, আমি শুইগে।

জয়ন্ত চলে গেল। মীনা ঘরের লকটা বন্ধ করে দিয়ে আবার সারসির কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে তখনও তেমনি বৃষ্টি হচ্ছে। তেমনি মেঘ থেকে থেকে ডেকে উঠছে! একবার ক'রে বৃষ্টি একটু আসছে—কাল-ঘন-নীলাভ আকাশের মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে—আবার লুকিয়ে পড়ছে।

মীনা আপন মনে বলে উঠল, মানুষের ভালবাসার রূপও এমনি, একবার অন্ধকার-ঘন আবেগ—আবার থেকে থেকে চাঁদ উঁকি দেয়। চাঁদটাই সত্যি—মেঘ তাকে ঢেকে ফেলে· মনের হাওয়ায় যে মেঘ জমা হয়—তায় ভালবাসার ওই আলোকটুকু ঢাকা পড়ে· মানুষ মনে করে অন্ধকার—অন্ধকারে ভাবে ভালবাসা কোথায়। ভালবাসা না থাকলে মানুষ কি সংসারে বেঁচে থাকতে পারত! কিন্তু আমি কি বেঁচে আছি! না—এতদিন ধরে বেঁচে ছিলাম না—এইবার বাঁচব—মরে জন্মালাম…এতদিন সবারি সঙ্গে মিথ্যাকে সত্যির রূপ দেখিয়ে অভিনয় করেছি, আজ সত্যিকে মিথ্যার ভান দেখিয়ে অভিনয় করছি। তাই ত এ আমার কি হ'ল ? সারাটা জীবন-ভোর কি এমনি বাইরে-ঘরে অভিনয় চলবে! ভালই হয়েছে—আগে পলে পলে তিল তিল করে মরছিলাম—আর আজ এই ব্যথা বেদনা—এই জ্বালার ভেতর দিয়ে সত্যি বাঁচতে পারব। এতদিনে জীবনে তবু একটা লক্ষ্য পেলাম, একটা উদ্দেশ্য হ'ল। জয়ন্তর জন্যে শেষ আমায়ই মরতে হবে না কি ? তাই ত পেশাটা গেল দেখছি।

দেখতে দেখতে কলের বাঁশী বেজে উঠল। রাত্রি প্রায় শেষ, পাঁচটা বাজল। পাশে ডোমপাড়া। বস্তি থেকে ধোঁয়া ও মানুষের কলরব উঠল। কলসী নিয়ে রাস্তার কলের কাছে ভিড় জমা হতে লাগল। কলে জল আসবার আগেই কে আগে জল নেবে তার ঝগড়া সুরু হয়ে গেল।

মীনা সারসির ওপরের পর্দ্দা টেনে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে—সেই কুশনটা নিয়ে আবার কার্পেটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

দিনের আলো আসছে, পৃথিবীর লোক যে যার নিজের কাজ কারবার করতে ছুটছে, আর আমি সারা রাত ডাপিঠে—ঘরে স্যুয্যির আলো পাছে এসে হানা দেয় তাই পদ্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে দিলাম। কি জীবন, আর কি চমৎকার কারবার। ওঃ জীবনটাই মিথ্যে, এতবড় মিথ্যেটাকে হজম করতে হচ্ছে। বাঃ…যাক্‌গে একটু ঘুমিয়ে নিই।

মীনা চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্রমশঃ

সান্ত্বনা

শ্রীসমীর ঘোষ

পাণ্ডুর জ্যোৎস্না আসি পড়িয়াছে সহসা শয়ানে,
বর্ষার নিঃসঙ্গ রাত্রি মুছে যায় অতি ধীরে ধীরে ;
অনেক পুরাণো কথা, কলহাসি আসে ফিরে ফিরে,—
আনমনে চেয়ে আছি শান্ত নীল আকাশের পানে।
রজনীগন্ধার দল সুরভিত শিথিল শিথানে
বক্ষের বন্ধন খুলে আমন্থর পূবালী সমীরে
ফিরায়ে দিতেছে কত যৌবনের চঞ্চল স্মৃতিরে :
স্পন্দিত আবেগ জাগে জীবনের আনন্দ বিতানে।
বাহিরে সেদিন বর্ষা মুখরিত নদী কূলে কূলে ;
শ্রাবণ গভীর করে কেতকীর বিরহ-বেদনা ;
তুমি কেন বয়ে তারে এনেছিলে কালো মেঘ চুলে
অভিভূত করি মোর সে সন্ধ্যার সকল চেতনা !
তার পর জ্যোৎস্না আসি শয্যা'পরে পড়িয়াছে ভুলে
বর্ষার নিঃসঙ্গ রাত্রি কানে কানে কহিছে—কেঁদ না !

সনাতন সঙ্গীতের সরল সংস্করণ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল বি-এস্‌সি (গ্লাস্‌গো), এ-এম্‌-আই-ই

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন যখন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষপুরে হয়েছিল তখন আমি সঙ্গীত-শাখার সভাপতির অভিভাষণে বাংলা গানের ক্রমোন্নতির বিষয় কতকগুলি কথা বলেছিলাম। যাঁরা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা আমায় সঙ্গীতের বিষয় বারান্তরে "আরও কিছু" বলতে সস্নেহে এতই উৎসাহিত করেছিলেন যে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, পরবর্ত্তী চারটি অধিবেশনে সঙ্গীত সহযোগে বক্তৃতা দিয়ে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে উপস্থিত সভ্যদের মোটামুটি সঙ্গীতের বোদ্ধা করে তুলব। আজ সেই বক্তৃতামালার এক কিস্তি পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি।

মতভেদে মধ্যপথ

আমি প্রত্যেকবার জোর দিয়েই বলছি যে আমাদের সঙ্গীতে মতভেদের অভাব নেই এবং এ বিষয় তর্ক করে সনাতন যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ কোন কূলকিনারা পাননি। অতএব আমরা তর্ক করব না। আমরা মধ্য-পথের যাত্রী। এক দিকে যেমন আমরা সনাতনীদের নাদ, ব্রহ্ম, ব্যোম প্রভৃতি পৌরাণিকতা (legend) বাদ দিয়ে চলব, অন্য দিকে তেমনি গ্রামফোন ও রেডিওর উদ্ভট সঙ্গীত, তথাকথিত গজলের তারল্য ও একটা "নূতন কিছু"র হুজুগেরও পোষকতা করব না। আবার এক দিকে যেমন ওস্তাদদের বুজরুকি ও দীর্ঘকালব্যাপী স্বরগ্রাম শেখবার কসরতের ব্যবস্থা আমরা মেনে নেব না, তেমনি অন্য দিকে স্বল্পায়াসে ফাঁকি-রাজ্যে জ্ঞানীর আখ্যা আমরা যাকে তাকে দেব না। আমরা সনাতন জিনিষ নূতন প্রথায় শিক্ষা করব। আমরা পুরাণো নীরস কঙ্কালকে নূতন অমৃতে সঞ্জীবিত করে তাকে নূতন রূপ প্রদান করব। আমরা সঙ্গীত সরস্বতীর মন্দির, পুরাণো দৃঢ় ভিত্তির এমন অংশের উপর তৈরী করবো, যাতে সে মন্দির আধুনিক শিল্পকলার রুচি অনুসারে নির্ম্মিত হয়ে তার মর্য্যাদা রক্ষা করে। তবে, আবার বলি, এটা হ'ল আমাদের মত এবং এ মতে আমরা চলব, তবে অন্য মতের বিষয়ে আমরা অসহিষ্ণু হব না।

জনসাধারণের সঙ্গীতবিমুখতার কারণ

সঙ্গীতের বিষয় অনেক প্রবন্ধ পড়েছি ও অনেক বক্তৃতা শুনেছি। অনেক রকম গায়কের গানও শুনেছি এবং এগুলির বিষয়ে গুণী ও অগুণীর সমালোচনা শুনেছি ও দেখেছি। সাধারণত দেখতে পাই যে, গুণী বা পণ্ডিত সঙ্গীতজ্ঞেরা গান বা লেখায় এই দেখাতে চান যে তাঁরা কতটা জানেন। এ কথাটা তাঁরা একবারও ভাবেন না যে, তাঁদের শ্রোতা অথবা পাঠকেরা কি শুনলে বা পড়লে প্রীত বা উপকৃত হবেন। ফল হয় এই যে, তাঁদের প্রচেষ্টা প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় ও জনসাধারণ সঙ্গীতবিমুখ হয়ে পড়েন। তাই আজ সঙ্গীত-ভীতি এত বেশী, যদিও সকলেরই সঙ্গীত শুনতে ভাল লাগে ও তার বিষয় জানতে ইচ্ছা করে। আবার অন্য দিকে সাধারণ শ্রোতা বা পাঠকের অসহিষ্ণু-তারও অন্ত নেই। তাঁরা নিজের অজ্ঞানতায় যেটা বুঝতে পারেন না সেটাকে "থার্ড ক্লাশ" বলে উপেক্ষা করে ফেলে দেন। আগ্রহ সহকারে সে বিষয় কিছু জানতে চান না। আবার এ কথা বললেও অন্যায় হয় না যে, জানতে চাইলেও অনেক সময় সন্তোষজনক উত্তর পান না এবং তাই জানবার আগ্রহও কমে যায়। একেই বলে 'দুষ্ট চক্র' (vicious circle) অর্থাৎ একটি ত্রুটির জন্যে হ'ল অন্য ত্রুটির সৃষ্টি — আবার সেই ত্রুটি করল আর একটি ত্রুটির সৃষ্টি এবং শেষ পর্য্যন্ত যে ত্রুটির দ্বারা সমস্ত ত্রুটির সৃষ্টি হয়েছিল সেইটি আবার নিজেই সৃষ্ট হ'ল।

সঙ্গীতবিমুখতা দূর করার উপায়

আমার মতে এই 'দুষ্ট চক্র' ছিন্ন করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জনসাধারণকে সহজ উপায়ে সঙ্গীত-বোদ্ধা করে তোলা। তাহ'লে তাঁরা গান দেখা ভুলে গিয়ে গান শুনতে শিখবেন অর্থাৎ মুদ্রাদোষ প্রভৃতির দিকে তত দৃষ্টি না দিয়ে সুরের দিকে কান দিতে শিখবেন এবং ধীরে ধীরে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতেও শিখবেন।

আর্টের অনুভূতির উপায়

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আর্টের চরম অনুভূতি চোখ, কান, নাক দিয়ে হয় না, বুদ্ধি (intellect) দিয়ে হয়। এই বুদ্ধি তখনই বিশ্লেষণে প্রখর হবে যখন তাকে প্রত্যেক কথায় জিজ্ঞাসা করা হবে—'কেন'? গান ভাল লাগছে—বেশ—কেন? কারণ কি—গায়কের রূপ না তার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য, না শ্রদ্ধেয় কবির ভাষা ইত্যাদি, অথবা সত্যি সত্যি সুররাজ্যের মাধুর্য্য? প্রায় ক্ষেত্রেই সাধারণ শ্রোতা দেখবেন যে, আসল বিষয়টি ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়গুলিই তাঁকে বেশী আনন্দ দিচ্ছে। বুদ্ধিকে যে জিনিষ আনন্দ দেয় তার বিষয় জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রথমে উচিত এবং এই উদ্দেশ্যেই আমার এই চেষ্টা।

খোসা ও শাঁস আলাদা করা

এখন আমরা দেখব সঙ্গীতে কোন্ বিষয় আমরা বুঝতে পারব না অথবা কোন্ বিষয় জানতে চাইলে পণ্ডশ্রম হবে অথচ কাজ কিছুই হবে না; কিংবা তার মধ্যে কতটুকু জানলে আমাদের চলবে ও সঙ্গে সঙ্গে যে কথাগুলি পরিষ্কারভাবে জানলে আমাদের সঙ্গীত বোঝার সুবিধা হবে সেগুলি বিশেষভাবে চর্চ্চা করব।

পৌরাণিকতা

শুনতে পাওয়া যায় যে দেবাদিদেব মহাদেব যখন তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন তখন তাঁর পাঁচটি মুখ দিয়ে পাঁচটি রাগ নির্গত হয় এবং পার্ব্বতীও তাঁর সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন, তখন তিনি নট-নারায়ণ রাগ সৃষ্টি করেন। কারো কারো মত যে তাণ্ডবের আদি অক্ষর 'তা' এবং লাস্যর (মহিলাদের নৃত্য) আদি অক্ষর 'ল' নিয়ে নাকি 'তাল' কথাটা সৃষ্টি হয়। এসব কবির কল্পনা বলে ধরে নিলে হয় ত কারোই মনক্ষোভের কথা হবে না। আমার বিশ্বাস যে ব্যাখ্যার আসল তাৎপর্য্য এই যে, সঙ্গীত অত্যন্ত পবিত্র জিনিষ যা দেবতারা সৃষ্টি করেছিলেন এবং মেয়েদেরও এতে অধিকার আছে; এমন কি, তাঁদেরও পক্ষে নাচ দূষণীয় নয় এবং আমরা তাই আবালবৃদ্ধবনিতাকে সঙ্গীত শিখতে উৎসাহিত করব। চারিদিকে শুনতে পাওয়া যায় 'গ্রাম' 'মূর্চ্ছনা' 'জাতি' 'শ্রুতি' 'ছত্রিশ রাগিণী' এবং তাদের পুত্র-পুত্রবধূর কথা; কিন্তু এর মধ্যে কোনটির বিষয় কোথাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না; এমন কি প্রধান ছয়টি রাগের বিষয়ও অনেক মতান্তর আছে এবং যদিও একাধিক স্থলে বলা আছে, কোন্ রাগের আকৃতি কি রকম, কি পরে আছেন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ ইত্যাদি; এমন কি, কোন্ স্বরগুলি বর্জ্জিত আছে। কিন্তু কোন জায়গায় তাঁদের ধ্বন্যাত্মক রূপ দেওয়া নেই। অর্থাৎ বলা নেই কোন্ স্বরটি কোমল বা কোন্ স্বরটি তীব্র এবং সেগুলি কি পরিমাণে ব্যবহৃত হবে। তাই আমরা রাগের ছবি দু-দশ জায়গায় দেখতে পেলেও তাদের সেকালকার সুরের রূপ কোথাও সঠিক শুনতে পাইনে। আর যদি কোনরূপে তা পাওয়াও যায়, তা হ'লে আজকালকার দিনে হয় ত সেটা অচলই হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি যে, দামোদরের মতে ভৈরব রাগ রে ও পা বর্জ্জিত, কিন্তু আজকালকার ভৈরব রে ও পা প্রধান এবং এ দুটি পর্দ্দা বাদ দিয়ে কোন দিন যে ভৈরব নিজের ভৈরবত্ব রক্ষা করতে পারবে এ কথা আমি অবিশ্বাস করি। এখানে এ কথাও বলে রাখি যে, স্বরের সঠিক রূপ বীণার তারের হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দীর অহোবল পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দেশ করেছিলেন এবং তার পূর্ব্বে ঋষভ গান্ধার ইত্যাদি বলতে যে আজকালকার রে গা বোঝাত এর কোন নিশ্চয়তা নেই। রাগিণী এবং তাদের পুত্র ও পুত্রবধূর কথা আরও অপরিষ্কার। কবে কোথায় তাদের জন্ম হয় এবং একটি রাগের রাগিণীরা কেন তারই স্ত্রী বলে গণ্যা হলেন, অন্য রাগের হলেন না, এ সব বিষয় জিজ্ঞাসা করে কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। গ্রাম ও মূর্চ্ছনা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন কিন্তু এদের কোনই স্বচ্ছ বিবরণ পাওয়া যায় না এবং সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে এগুলির কোনই মূল্য নেই। তাই আজকালকার সঙ্গীতে এদের বড় একটা প্রভাবও নেই।

শ্রুতি

শ্রুতি কিন্তু নিজের জায়গা থেকে একটুকুও সরতে রাজি নন এবং যদিও শ্রুতির বিষয় স্বচ্ছ জ্ঞান বড় একটা কারোরই নেই, তবুও সঙ্গীতজ্ঞেরা যেন এর মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। পুরাণ সঙ্গীত-পণ্ডিতেরা চোদ্দ থেকে উনত্রিশ পর্য্যন্ত শ্রুতির সংখ্যা নির্দ্দেশ করেছেন, কিন্তু রাগ-নির্ণয় করতে সাধারণ বারটি প্রচলিত স্বরের গণ্ডী কেউই অতিক্রম করেন নি। যদিও শুনতে পাই, আজকাল শ্রুতির

হারমোনিয়ম চলেছে এবং গায়ক নাকি বাইশটি শ্রুতি গেয়ে শোনাতে পারেন, আমি এর সত্যতা ও সার্থকতার (practical utilityর) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দিহান। আমি আজ পর্য্যন্ত কোন গায়ককে শ্রুতির নাম বলে সেটাকে গাইতে শুনিনি—যেমন সাধারণত লোকে (১) পা, কোমল ধা ইত্যাদি স্বর গেয়ে দেখিয়ে থাকেন। তবে শ্রুতির অনুভূতি একটা কাজের জিনিষ, যেহেতু সেই অনুভূতির দ্বারাই কোন বাঁধা স্বরের নিজের জায়গা থেকে একটু-আধটু কমা বা বাড়া বোঝা যায়; যথা—দেশকারের তীব্র 'ধা' ভূপালীর তীব্র 'ধা'এর চেয়ে একটু উঁচু হয়। শ্রীরাগের কোমল রে ভৈরবীর কোমল 'রে'র চেয়ে একটু উঁচু হয় ইত্যাদি।

উচ্চ-নীচ স্বরের নৈকট্যে একই স্বরের রূপান্তর

কিন্তু এগুলি স্বর-সম্পর্ক দ্বারা সম্ভব হয়; সপ্তদশ শ্রুতির 'ধা' লাগাচ্ছি বা তিন শ্রুতির কোমল 'রে' লাগাচ্ছি ব'লে কোন গায়কই তা পারেন না। স্বরবিন্যাসে এই সম্পর্ক দ্বারা স্বর আপনিই উঁচু-নীচু হয়, যেমন ভূপালীর বিন্যাসে সা ধা পা বলার জন্যে 'ধা', 'পা'র কাছে ঘেঁষে আসে এবং দেশকারের সা পা ধা বলার জন্যে 'ধা', 'পা'র কাছ থেকে সরে যায়। শ্রীরাগের 'রে' 'গা'র সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্যে একটু উঁচু হয় এবং ভৈরবীর কোমল 'রে' সাধারণত 'সা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্যে 'সা'র কাছাকাছি এসে পড়ে। কিন্তু এ সব হ'ল অনেক দূরের কথা, যা সাধারণ বোদ্ধা না জানলেও ক্ষতি হয় না। তবুওএ বিষয় উল্লেখ করলাম শুধু এই দেখাতে যে, হাতেকলমে শ্রুতির অনুভূতি আমাদের কতটুকু কাজে লাগে। শ্রুতির বিষয় এর বেশী জ্ঞান সঙ্গীতশিক্ষার কোন স্তরে না হ'লেও চলে। এখন আমরা বিচার করব যে সঙ্গীতের এবং সঙ্গীত শিক্ষার বিষয়ে কোন্ জিনিষগুলি না জানলেই নয়।

সঙ্গীত ও তাহার পদ্ধতিদ্বয়

সঙ্গীত বলতে নৃত্য, গীত ও বাদ্য বোঝায়। কিন্তু সাধারণত গীতকেই সঙ্গীত বলে। আমাদের দেশে সঙ্গীতে দুটি পদ্ধতি আছে, উত্তর-ভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি এবং দক্ষিণ-ভারতীয় অথবা কর্ণাটি পদ্ধতি। আমাদের পক্ষে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির বিষয় জ্ঞান অপরিহার্য্য (দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতির বিষয় তুলনামূলক সমালোচনা এই জ্ঞানের অতি উচ্চ স্তরের কথা এবং সেই জন্যে আপাতত আমাদের সেটার দরকার নেই)। যে কোন ভাষাতে রচিত গান এই পদ্ধতির অন্তর্গত হ'তে পারে এবং বাংলারও এই পরিবারভুক্ত হওয়াই উচিত।

নাদ

নাদ বলতে আমরা বুঝব সঙ্গীত-উপযোগী শব্দ এবং যিনি যাই বলুন, আমরা এইটুকুই স্বীকার করব যে কোন শব্দযন্ত্রের কম্পন দ্বারাই এই নাদ তৈরী হয় ও বিশেষ কারণে একটি অন্যটি থেকে পৃথক। নাভি থেকে কোন নাদই উৎপন্ন হয় না এবং ব্রহ্ম, ওঁঙ্কার ইত্যাদির প্রভাব এর উপর আছে কি-না এ বিষয়ও আমাদের জানবার কোন প্রয়োজন নেই। আসল কথা, কণ্ঠনালীর শব্দযন্ত্রে নাদ উৎপন্ন হয় এবং নিম্নতর নাদ শরীরের ভিতর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে গলনালী ও মুখ-গহ্বর বিস্তারিত হয়। সাধারণ নাদ মুখ-গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র এবং চড়া সুরের নাদ মূর্দ্ধস্থানে, অর্থাৎ নাক ও গালের হাড়ে ধ্বনিত হয়। তবে, আবার বলি, গান গাইবার সময় সব নাদেরই উৎপত্তি স্থান হ'ল কণ্ঠস্থিত শব্দযন্ত্র এবং মুখ্যত মুখে ও নাকে সামঞ্জস্যভাবে ধ্বনিত হ'লে তবেই স্বচ্ছ নাদ বেরয়। তা না হ'লে তথাকথিত 'নাকিসুর' বেরয়। (ক) নাদের যে গুণে মানুষ শুনে বুঝতে পারে সেটা কি রকম শব্দযন্ত্র থেকে উৎপন্ন হচ্ছে সেই গুণকে নাদের জাতি বলে। যথা—বেহালা, স্বরদ, সেতার, বাঁশী ও মানুষের গলা থেকে একই সুর বেরুলে সেটি সমান সংখ্যক কম্পনযুক্ত হওয়ার দরুণ একই নাদ হ'ল, কিন্তু এই জাতিভেদের কারণেই সেগুলির বিভিন্ন উৎপত্তি স্থান চেনা গেল। (খ) আবার একই শব্দযন্ত্র থেকে উৎপন্ন একই নাদ ধীরে বা জোরে বার করলে তাদের ছোট বা বড় বলা হয়। কিংবা নীচু বা উঁচু ক'রেও নাদের প্রকারভেদ করা যায়। নাদের জাতি ভেদের সাহায্যে আমরা কন্সার্ট বা অর্কেষ্ট্রার সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করি। কণ্ঠ সঙ্গীতে

(১) স্বরপরিচয় লিখতে হিন্দী অক্ষর ব্যবহার করতে পারলে পাঠককে এই বোঝাতে পারতাম যে, এগুলি সুর করে বলতে হবে এবং সে সুর ভুল হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু অনিবার্য্যকারণে তা সম্ভব হল না। অথচ এগুলি বাংলায় লিখলে পাঠক সাধারণত বই পড়ার মতন করে সা রে গা মা উচ্চারণ করবেন। সেটা অবাঞ্ছনীয়।

আমরা নাদকে স্থানবিশেষে বড়, ছোট, উঁচু বা নীচু ক'রে গানের রস ফুটিয়ে তুলি (২)।

গানে ভাবানুযায়ী সুরযোজনা

আমরা দেখেছি যে সাধারণ কথা কইতে গিয়ে 'যাও' বলতে, লোকে সুর নীচে থেকে উপরে তোলে ; যতদূরে যেতে বলে ততই সুর উঁচুতে ওঠে এবং আসতে বললে সুর উঁচু থেকে নীচের দিকে নামিয়ে নেওয়া হয়। এর বিপরীত সুর করলে কথাটার মানে যাই হোক না কেন, মানুষ স্বভাবতই কিন্তু তার সুরের মানেটাই ধরে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যখন অভিভাবকেরা নীচু থেকে উঁচুর দিকে সুর চড়াতে চড়াতে বলেন 'এস—ও—ও' তখন ছেলেদের স্বভাবতই ইচ্ছা করে যে দূরে পালিয়ে যাই এবং যখন কেউ লজ্জা সহকারে উপর থেকে নীচে সুর নামাতে নামাতে বলেন 'যা-আ-ও' তখন দূরে যাওয়ার তো কথাই ওঠে না, কাছে আসবারই ইঙ্গিত বেশী পাওয়া যায় (৩)। সঙ্গীতেও যাওয়া, আসা, স্থিরতা, চঞ্চলতা ও আলস্য নাদের নীচে থেকে উপরে যাওয়া, উপরে থেকে নীচে আসা, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা, এলোমেলোভাবে উঁচু-নীচু হওয়া ও একস্থান থেকে অন্য স্থানে গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া দিয়ে বোঝান হয় (৪)। এই গানগুলির মধ্য দিয়ে নাদের উঁচু-নীচু ও ছোট-বড় হওয়ার সার্থকতা আমরা বুঝতে পারলাম। কিন্তু সুচারুরূপে নাদের এই রকম বিকাশের জন্যে চাই নমনীয় কণ্ঠ।

গানে কৃত্রিম ঢং

যেমন বাজখেয়ে অথবা চেড়ে গলায় গান করলে শুধু বড় নাদই প্রবল হয়ে থাকে, ফলত রসসৃষ্টির অনেক ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি আবার গানকে কৃত্রিম উপায়ে মিষ্ট করবার জন্য ছোট নাদের আশ্রয় আধুনিক গায়ক গায়িকারা এত বেশী নেন যে, তাঁদের গান একঘেয়ে বোধ হয়। আমরা এই ইঙ্গ-বঙ্গ, হাঁপানি ও বাঁধান দাঁত, অথবা এককথায় ন্যাকা ন্যাকা স্টাইল বর্জ্জনের পরামর্শ দিই (৫)। সঙ্গীতের বিকাশের জন্য স্বচ্ছ নাদের বৈচিত্র্যই যথেষ্ট। কোন রকম কৃত্রিমতা দ্বারা তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতে গেলে তার অপমানই করা হয়।

বর্ণ

সঙ্গীতশাস্ত্রে এই বৈচিত্র্যগুলিকে গানক্রিয়া বা বর্ণ বলে। একই নাদ বার বার উৎপন্ন করলে সেটা হবে "স্থায়ী বর্ণ"। নীচে থেকে উঁচু দিকে গেলে তবে "আরোহী বর্ণ", উঁচু থেকে নীচে এলে "অবরোহী বর্ণ" এবং তিনটিকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেললে হবে "সঞ্চারী বর্ণ"। গানে যে স্থায়ী (অস্থায়ী ?) আরোহী অবরোহী ও সঞ্চারীর কথা শুনতে পাই সেগুলি এই বর্ণেরই রূপান্তর মাত্র।

সপ্ত স্বরের সম্পর্ক

যাতে এই বর্ণগুলি পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে, সেজন্য নাদের কতকগুলি স্থান বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং এই বিশিষ্ট কম্পনযুক্ত নাদকে বলা হয় 'স্বর'। ধরুন একটি স্বরের নাম দেওয়া হলো "ষড়জ" কিম্বা স। এর দ্বিগুণ কম্পনযুক্ত স্বরকেও বলা হয় স এবং যাতে এ দুটি 'স'র মধ্যে ভ্রম না হয় সেইজন্য দ্বিতীয়টিকে বলা হ'ল 'তার স' বা 'চড়া স' অর্থাৎ উচ্চতর স। এই দুটি স'র ঠিক মাঝামাঝি স্বরকে বলা হয় পঞ্চম কিম্বা প। তাহলে প আমাদের স'র দেড়গুণ কম্পনযুক্ত হ'ল। এখন স আর প'র মধ্যে এমন কম্পনযুক্ত একটি স্বর বসানো হ'ল যাতে 'তার স'র কম্পন এর কম্পনের দেড় গুণ হয়। এই স্বরটির নাম দেওয়া হলো মধ্যম বা 'ম'। তাহ'লে 'স' থেকে প যত উঁচু, ম থেকে 'তার স' ততই উঁচু। আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে ধরুন আমাদের স প্রতি সেকেণ্ডে ২৪০ কম্পনযুক্ত, তাহ'লে 'তার স'র কম্পন হবে ৪৮০, প'র ৩৬০ ও ম'র ৩২০। এবার 'স' ও 'ম'র মধ্যে ২৭০ ও ৩০০ (১) কম্পনযুক্ত দুটি স্বর বসানো হ'ল এবং তাদের নাম দেওয়া হ'লা ঋষভ (অর্থাৎ র) ও গান্ধার (অর্থাৎ গ)।

---

(২) এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের 'এ কি জ্যোৎস্না গর্ব্বিত শর্ব্বরী", অতুলপ্রসাদের "বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে" প্রভৃতি গেয়ে দৃষ্টান্ত দেখান যায়।

(৩) দুই রকম "যাও" বলা যেতে পারে।

(৪) দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের "পাগলকে যে পাগল ভাবে" ও অতুলপ্রসাদের "আমি অলকে পরিতে পড়ে গেল মালা" গেয়ে দেখান যায়।

(৫) এই ঢংগুলির নমুনা দেখান যায়।

(১) গান্ধারের কম্পনের সংখ্যা নিয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে।

আর প ও 'তার স'র মধ্যে দুটি স্বর ধৈবত ও নিষাদ (ধ ও ন) এমনভাবে বসান হ'ল যাতে তারা 'র' ও 'গ'র দেড়গুণ কম্পযুক্ত হয়। এইভাবে আমরা সাতটি বিশিষ্ট কম্পনযুক্ত শুদ্ধ স্বর যথা—'স র গ ম প ধ ন পেলাম। এই সাতটি স্বরের সমষ্টির নাম দেওয়া হলো "সপ্তক"।

পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ

পশ্চিমের পণ্ডিতেরা 'তার স'কে এই সপ্তকে মিশিয়ে নিয়ে এই সমষ্টির নাম দিলেন "অক্টেভ" বা "অষ্টক" এবং তার চার-চারটি সুর নিয়ে 'স র গ ম' ও 'প ধ ন র্স'র নাম দিলেন টেট্রাকর্ড। আমরা এ দুটির নাম দিলাম পূর্ব্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ। শুধু তফাৎ এই যে পূর্ব্বাঙ্গে প যোগ করে ও উত্তরাঙ্গে ম যোগ করে পাঁচটি করে সুর হ'ল।

বিকৃত স্বরের (কড়ি ও কোমল) উৎপত্তি

শুদ্ধ স্বর ও স্বরান্তরের বিষয় আরও চিন্তা করে দেখা গেল যে, যদিও গ থেকে ম যত উঁচু, ন থেকে র্স ততই উঁচু, কিন্তু অপর স্বরান্তরগুলি (যথা, স থেকে র, র থেকে গ, ম থেকে প, প থেকে ধ ও ধ থেকে ন) এর প্রায় দ্বিগুণ। তাই এই বড় বা দীর্ঘ স্বরান্তরগুলিকে ছোট বা হ্রস্ব স্বরান্তরের মাপে দুটি করে ভাগ করা হলো এবং সেই মধ্যবর্ত্তী স্বরগুলির নাম দেওয়া হ'ল বিকৃত স্বর, যথা—র কোমল, গ কোমল, তীব্র বা কড়ি র্ম, কোমল ধ ও কোমল ন। তাহলে মোট স্বরসংখ্যা দাঁড়াল বারটি। সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত।

ঠাট

এথেকে সাতটি করে স্বর প্রত্যেকবার নিয়ে দক্ষিণের পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখী বাহাত্তরটি "মেলকর্ত্ত" বা "ঠাট" নির্দ্দেশ করেছেন। আমরা তা থেকে দশটি বেছে নিয়েছি পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বার থেকে দুশ বিশ পর্য্যন্ত ঠাটের কথা বলেন, কিন্তু আমরা পণ্ডিত ভাতখণ্ডেরই মতানুসরণ করব। এই প্রত্যেকটি ঠাটের অন্তর্গত অনেকগুলি করে রাগ প্রচলিত আছে এবং তাদের বিষয় সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রত্যেকটিতে (ক) আরোহী অবরোহী রূপ পরিষ্কার ও বিশিষ্ট হবে, (খ) কম করে পাঁচটি স্বর ব্যবহার হবে, (গ) কোন ক্রমে সা স্বরটি বর্জ্জিত হবে না এবং (ঘ) একটি স্বর অন্য স্বরগুলির চেয়ে বেশী করে লাগবে। এই প্রধান স্বরটিকে আমরা বলি 'বাদী', 'অংশ' কিংবা 'জান'। যথা—আশাবরীর আরোহী-রূপ হল সা রে মা পা ধা র্সা এবং অবরোহী রূপ হলো নি ধা পা মা গা রে সা। কোমল ধা হল এর প্রধান বা বাদী স্বর। রাগেরই চলিত নাম হলো সুর।

রাগের শ্রেণীবিভাগ

যে রাগে পাঁচটি স্বর লাগে সে রাগকে ঔড়ব, যাতে ছয়টি স্বর লাগে তাকে ষাড়ব ও যাতে সাতটি স্বর লাগে তাকে সম্পূর্ণ রাগ বলে। আবার একই রাগ আরোহীতে এক রকম ও অবরোহীতে অন্য রকম হতে পারে এবং ব্যবহৃত স্বর-সংখ্যা হিসাবে ওড়ব-ওড়ব, ওড়ব-ষাড়ব ও ওড়ব-সম্পূর্ণ ইত্যাদি করে নয় প্রকারের রাগ হয়। এই হল স্বর ও সংখ্যা হিসাবে রাগের জাতিভেদ। ঋতু হিসাবেও রাগের শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে, যথা—শ্রাবণে সায়ন্, ফাল্গুনে হোলি, বসন্ত ইত্যাদি।

সময়ভেদে গেয় রাগ

দিনের বিশেষ ভাগেও বিশেষ বিশেষ রাগ গাইবার নিয়ম আছে। মোটামুটি নিয়ম এই—যে সমস্ত রাগের বাদী স্বর পূর্ব্বাঙ্গে (অর্থাৎ সা রে গা মা ও পা 'র মধ্যে কোন একটি) হয়, সে রাগগুলি দুপুর বারটা থেকে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত গাওয়া হয় এবং যে সব রাগের বাদীস্বর উত্তরাঙ্গে (অর্থাৎ মা পা ধা নি সা'র মধ্যে কোন একটি) হয়, সেগুলি রাত বারটা থেকে দিন বারটা পর্য্যন্ত গাওয়া হয়। এই দুই শ্রেণীর রাগকে যথাক্রমে পূর্ব্বরাগ ও উত্তররাগ বলে। আবার এও দেখা যায় যে, কড়ি মা যে রাগে ব্যবহার হয় সে রাগগুলি প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে গাওয়া হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, কোমল রে ও কোমল ধা যে রাগগুলিতে ব্যবহৃত হয় সেগুলি ঠিক ভোরে বা ঠিক সন্ধ্যার সময় গাওয়া হয়। তাই এই শ্রেণীর রাগকে "সন্ধিপ্রকাশ রাগ" বলে। রাগ চেনবার জন্য প্রত্যেক রাগের একটি করে ছোট স্বরবিন্যাস আছে তাকে হিন্দীতে বলে "প্যাক্যড়", অর্থাৎ এমন বিন্যাস যা দিয়ে রাগ ধরা যায় বা চেনা যায়। 'প্যাক্যড়না' মানে ধরা।

যথা ইমনে "গা রে সা, নি রে গা, রে সা" ও আশাবরীতে "রে মা পা, নি ধা পা"।

রাগের সমবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর

রাগের বিষয় আর কিছু জানতে ইচ্ছা করলে ওঠে 'সমবাদী' 'অনুবাদী' ও 'বিবাদীর' কথা। এও অতি সোজা বিষয়। বাদী হল রাগের ব্যবহৃত সমস্ত স্বরের প্রধান। কেউ কেউ বলেন রাজা, যথা ইমনে গা ও আশাবরীতে ধা। তার পরেই সমবাদী যেন হলেন মন্ত্রী, অর্থাৎ বাদীর পরে ইনি প্রাধান্য লাভ করেন (যথা—ইমনে নি, আশাবরীতে গা) এবং অনুবাদী হল যেন সভাসদ, অর্থাৎ এমন স্বরগুলি যা রাগে ব্যবহৃত হয় অথচ বাদী সমবাদীর মতন প্রাধান্য লাভ করে না। বিবাদী স্বর এমন স্বরকে বলে যেটা সাবধানে না লাগালে অন্য রাগ ফুটে ওঠে, কিন্তু অনেক গুণী বিবাদী স্বর ব্যবহার করে রাগের সৌন্দর্য্য অধিক মাত্রায় ফুটিয়ে তোলেন। যেমন বেহাগে কড়ি মধ্যম।

মাত্রা, তাল ও লয়

এখন বাকী রইল শুধু তাল, লয় ও মাত্রার কথা। এ সবেরও সরল ব্যাখ্যা এই যে সময়ের নির্দ্দিষ্ট মাপকে (অর্থাৎ ইউনিটকে) মাত্রা বলে। বিভিন্ন শ্রেণীর গানের মাত্রা বিভিন্ন। যথা- ধ্রুপদ বা বড় খেয়ালের মাত্রা বড়, ছোট খেয়ালের মাত্রা মধ্য ও ত্যরানা (যাকে বাংলাতে সাধারণত 'তেলেনা' বলে) মাত্রা ছোট। এই রকম মাত্রা-বিশিষ্ট তালে বাঁধা সঙ্গীত যে গতি প্রাপ্ত হয় তাকে 'লয়' বলে। যথা—বড় মাত্রার গান বিলম্বিত লয়ে, মধ্য মাত্রার গান মধ্য লয়ে ও ছোট মাত্রায় বাঁধা গান দ্রুত লয়ে গীত হয়। বিলম্বিত লয়ের গানেতে দুন বা চৌদুন, তান, সারগম প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাতে তালের মাত্রা ছোট-বড় হয় না। এক মাত্রায় দুটি বা চারটি সারগম বা অক্ষর গীত হয় মাত্র। (৬)

আলাপ

গানের বা কোন রাগরাগিণী যন্ত্রে বাজাবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ দেখা যায় সঙ্গীতজ্ঞেরা প্রথমে ধীরে ধীরে স্বর ভাঁজেন। একে বলে 'আলাপ'। এটি করবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রোতা প্রথমেই রাগের সঙ্গে পরিচিত হবেন ও সেই রাগের উপযোগী আবহাওয়ায় সৃষ্টি হবে। আলাপেতে তালের কোন বাঁধাবাঁধি নেই। পুরাণ পণ্ডিতেরা এর মধ্যে গ্রহ, ন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব ইত্যাদির কথা বলেছেন; সে সব অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা যা আমাদের জানবার প্রয়োজন নেই।

গানের শ্রেণীভেদ

ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, চতুরঙ্গ, ত্যরানা, সরগম, লক্ষণ-গীত ও গজলের নাম প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। এ সবের বিষয় আমাদের কিছু কিছু জেনে রাখা উচিত। (ক) ধ্রুপদ পুরাকালে প্রচলিত ছিল। এগুলি গম্ভীর চালের গান, সাধারণত ঈশ্বরের বিষয় রচনা এবং পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গের সঙ্গে পাওয়া হয়। হরিদাস স্বামী, তানসেন, গোপাল নায়ক ইত্যাদি ধ্রুপদ গানই করতেন। এতে তান ইত্যাদি নিষিদ্ধ। (খ) খেয়াল—মুসলমান গায়কেরা খেয়ালের সৃষ্টি করেন এবং জৌনপুরের সুলতান হোসেন সাকী নাকি সর্ব্বপ্রথম খেয়ালকে ভদ্রসাজের উপযোগী করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ বিখ্যাত খেয়ালী ছিলেন। আজকাল ধ্রুপদ জরাগ্রস্ত হয়েছে ও খেয়ালের আদর সর্ব্বত্র। তার মুখ্য কারণ হল এই যে, ছোট খেয়াল অতি মধুর ও অল্পায়াসে শেখা যায় এবং এগুলি ধ্রুপদের মতন তত দীর্ঘ হয় না। এই খেয়ালই বিশেষ বিশেষ রাগে এবং চটুল তালে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহকারে গেয়ে টপ্পা ও ঠুমরীর উৎপত্তি হয়। টপ্পা পাঞ্জাবে বেশী প্রচলিত ও ঠুমরী যুক্তপ্রদেশে, বিশেষত লক্ষ্ণৌয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সাধারণ বাঙ্গালীর ভুল ধারণা যে লক্ষ্ণৌ-ঠুমরী বলতে "কত কাল পরে বল ভারত রে" এই গানের সুরই বোঝায়। লক্ষ্ণৌতেই চারজন বিখ্যাত ঠুমরিয়া ছিলেন—সনদ, বিন্দাদীন, কদরপিয়া ও লালনপিয়া। দেশী সঙ্গীত, যথা—ক্যজরী, সাওনী, চৈতী ইত্যাদি ঠুমরিরই অন্তর্গত। গানের আলাপ সাধারণত তা, না, রি, তে, দুম্ ইত্যাদি শব্দ সহকারে লোকে করে থাকে। এই শব্দগুলি বাঁধা তালে দ্রুত লয়ে গাইলে ত্যরানা (তেলেনা) হয়। সা রে গা মা উচ্চারণ করে' গাইলে

(৬) দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'একে তো আধেরি গিয়া' গেয়ে দেখান যায়।

'সরগম' হয় এবং ছোট খেয়াল, ত্যরানা, সরগম ও তবলার বোল সহকারে গান করলে সেগুলিকে চতুরঙ্গ বলে।

গজল

গ্যজ্যল মানে মেয়েদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলা (বাজ্যনা স্থ্যনে মুলায়্যম্ গুফ্‌ত্যন্)(১) কিংবা প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলা (স্থ্যনে বা মাশূক ক্যরদ্যন্)। গ্যজ্যল কবিতা বিশেষ। তাতে সুরের কথাই ওঠে না। আজও লোকে গ্যজ্যল গাইতে বলে না, কইতে বলে 'গ্যজ্যল ক্যহিয়ে'। গ্যজ্যলের নামে একঘেয়ে সুরে যে গান প্রায় শোনা যায় তাকে ক্যওবালী বলে। সময়োপযোগী করে শোকাত্মক রচনাকে 'মর্সিয়া' ও বিবৃতিমূলক রচনাকে 'কসিদা' নাম দেওয়া হয়। কিন্তু সর্ব্বোপরি কথা হচ্ছে এই যে, গজলের 'ম্যত্‌লা', 'ম্যক্‌তা', 'কাফিয়া' ও 'র‍্যদিফে'র সামঞ্জস্য, বাংলার ভাবধারা একেবারে বদলে না দিলে আমাদের গানে হতে পারে না। বাংলায় কসিদার উদাহরণ অতুলপ্রসাদের "কে আবার বাজায় বাঁশী"তে পাওয়া যায়, অবশ্য একটু রঙ্গ বদল করে। কারণ ক্যসিদার নিয়ম হচ্ছে ছ'টি লাইনে একটি 'ব্যন্দ' হবে এবং শেষ দুটি' লাইনে কাউকে উদ্দেশ্য করে কোন উক্তি থাকবে। সেই সর্ত্তগুলি এই গানেতে রক্ষা হয়েছে। আর একটি কথা হলো এই যে, হিন্দী ও বাংলাতে পরমার্থ সঙ্গীত না হলে অধিকাংশ গানই মেয়েদের উক্তি। কিন্তু উর্দ্দুতে, যেহেতু মেয়েদের পক্ষে গান দূষণীয় ('মায়ুব'), তাই উক্তিগুলি পুরুষের পক্ষ থেকে মাশূককে (প্রিয়াকে) উদ্দেশ্য করে। যে গানকে আমরা সাধারণত গজল বলে স্বীকার করে নিয়েছি সেটা একটা জগাখিঁচুড়ি এবং সুখের বিষয় এই যে বাংলা থেকে এইটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে।

উপসংহার

প্রবাসী বাঙ্গালী, তথা বাঙ্গালী সাধারণের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল গান শেখান, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস "আগে গান পরে জ্ঞান," আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ। বহু গান শেখার পর সঙ্গীতশাস্ত্র ধীরে ধীরে বোঝান উচিত। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতির একান্ত অভাব, আমাদের দেশে কেউ দেখেও দেখছেন না। সাধারণ ছেলেমেয়েদের তান ইত্যাদি শেখাবার কোন দরকার নেই। ওসব যারা সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ হ'তে চায় তাদের জন্য। যারা সংস্কৃতির (cultureএর) জন্য গান শেখে তাদের খাঁটি রাগগুলির লক্ষণগীত ও ছোট খেয়াল শেখানই যথেষ্ট। এই উদ্দেশ্যে আমি "সঙ্গীত বিকাশ" প্রণয়ন করছি এবং তাতে স্বরলিপি হিন্দীতে দিয়েছি যাতে তা দেখে শিক্ষার্থীর মনে সুরসংশ্লিষ্ট ছাপ পড়ে ও তারা সুর করে সেগুলি পড়ে—ভাষা বা কবিতার মত না পড়ে। হিন্দী স্বরলিপি ব্যবহার করবার আমার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীসাধারণকে এমনভাবে তৈরী করা যাতে তারা ইচ্ছা করলে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বই থেকে সুরগুলি শিখতে পারে। ছেলেমেয়েদের বয়সোপযোগী ভাষাবিশিষ্ট অন্য সব গান—যা তাদের ভাল লাগে—শিখতে উৎসাহিত করতে বলি, যাতে তারা আনন্দ ক'রে সুর চর্চ্চা করে; কিন্তু শাস্ত্রবিহিত গান শেখার সুরুচি তাদের মধ্যে গড়ে তোলা একান্ত কর্ত্তব্য, যাতে যথাসময়ে সুফল ফলে। হিন্দীর স্বচ্ছ উচ্চারণ একটু চেষ্টা করলেই হ'তে পারে এবং সেটার দিকে, গানের সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে, অভিভাবকদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বলি—আমরা কখন লিখব 'ক্যব' তখন উচ্চারণ হবে "cub" ('কাব' বা 'কঅব' নয়) 'অ্যাপ' হবে "up" ('আপ' বা 'অপ' নয়) 'হ্যম' হবে "Hum" ('হম' বা 'হাম' নয়) ইত্যাদি—এতে নূতন রসের আস্বাদ পাওয়া যাবে আর বাংলা গানও সমৃদ্ধ হবে ও তার বিকাশ সুন্দরতর হবে—বাঙ্গালী চিরদিনই সৌন্দর্য্যের পূজারী এবং এ সামান্য বিষয়ে ঔদাসীন হ'য়ে তার গুণগরিমা খর্ব্ব করা আমি অনুচিত মনে করি। আমি বৈদিক ঋষিদের উৎসাহ বাক্য স্মরণ করিয়ে বলি "ওঠ—চল"।

---

(১) উর্দ্দু ফার্সি ও আর‍্যবীর ('আরবী' শুদ্ধ উচ্চারণ নয়) খে, গায়েন ও কাফ অক্ষরের কণ্ঠ্য স্বর (gutteral sound) ও ইংরেজির F ও Z অথবা ফার্সির ফে ও জে, জাল অথবা জোয়াদ অক্ষরের উচ্চারণ প্রকাশের জন্য হিন্দীতে যথাক্রমে খ, গ, ক, ফ ও জ অক্ষরের নীচে ফুটকি দেওয়া হয়। যথা—খ়, গ়, ক়, ফ় ও জ়। বাংলাতেও আমরা তাই করলাম।

বাংলার প্রপিতামহী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

"হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত,"*
নব জামাতার কাছে জুড়ি দুই হাত,
জননী একথা বলি স"পিত কন্যায়
প্রসাদী কুসুম সম অশ্রুর বন্যায়।

একাহারা? আমাদেরই দূর পিতামহী
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে দুঃখ দৈন্য সহি
কত ক্লেশে কত দিন র'য়ে অনশনে
অঙ্গ ঢাকি শতগ্রন্থি মলিন বসনে
মানুষ করিয়াছিল আপন দুলালে,—
মোদের প্রপিতামহে।

সুখ-স্বপ্ন জালে
আচ্ছাদিয়া অতীতেরে বাঙ্গালী নন্দন,
ভাবে আজ তাহাদের পিতামহগণ
সোনার পালঙ্কে বুঝি সৌভাগ্যে লালিত,
হীরা মণি মুক্তা খেয়ে হয়েছে পালিত।

ভুলেছে নিষ্ঠুর সত্যে স্বপ্ন মোহ ঘোরে
ভুলে গেছে কি দুশ্ছেদ্য স্নেহঋণডোরে
বাঁধা মোরা তাঁহাদের দৈন্য দাহময়
মর্ম্মের গ্রন্থির সাথে।

নেত্রে ধারা বয়,
তোমাদেরে স্মরি আজ, তোমাদের ঋণ
করে হৃদি বিগলিত। প্রাণধারা ক্ষীণ
নিদাঘ তটিনী সম দৈন্য সিকতার
মাঝারে বাঁচায়ে রাখি এ দেহে আমার
বহাইলে।

এ হৃদয়ে রহিয়াছে আঁকা,
আয়তির চিহ্নখানি এক হাতে শাঁখা
অন্য হাতে লাল সুতা শাঁখার অভাবে,
রাজরাজেশ্বরী তবু পতিপ্রেম লাভে।

চলিয়াছ জীর্ণবাস অঞ্চল আড়ালে
কম্পিতদীপটি রাখি নিত্য সন্ধ্যাকালে
তুলসীমঞ্চের পানে। আজো বেঁচে আছে
সেই দীপ, দীপ্তি তার এবে বাড়িয়াছে
শতগুণ। গৃহে গৃহে তুলসীমঞ্জরী
তোমাদের পুণ্যস্মৃতি তুলিছে গুঞ্জরি।

গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ বট অশ্বত্থের মূলে
ষষ্ঠী-শিলা রূপ ধরি নদী কূলে কূলে,
আজো রাজে তোমাদের হাতের সিন্দূর,
হেরিতেছি আমাদেরি জীবন অঙ্কুর

তারে ঘেরি দূর্ব্বারূপে যেন রোমাঞ্চিত,
তোমাদেরি অশ্রুপুষ্ট মমতা সঞ্চিত।

যেই বীজ রোপেছিলে কুটীর-প্রাঙ্গণে
পুষ্পিত তা এ জীবনে। সেই পুষ্প সনে
অশ্রুর তর্পণ ঝারা ঝরে এই চোখে,
পৌছিবে কি স্মৃতিস্বর্গে, সেই মাতৃলোকে?

* রামেশ্বরের শিবায়ন

দুঃখ

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

—এক—

আবার সেই একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। নাগরিক জীবনের কোলাহল সত্যি ভারী বিশ্রী। মাঝে মাঝে মন হাঁপিয়ে ওঠে। সীমাহীন মানুষের মধ্য থেকে এই বনের ধারে এসে তৃপ্তি পাই।

বনের পিছনে অনেকটা জমি ফাঁকা। ওখানে সাদা চিমনি মাথায় করে মস্ত একটা পুরানো বাড়ী। ওর জানালার নীচে নীচে বার্চ গাছের শাখা মাথা তুলতে সুরু করেছে। পাইন গাছের মৃদু মর্ম্মর ওকে ঘিরে কেবলই উপ্‌চে ওঠে। ওর পিছন দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ, বনের মধ্যে কোথায় যেন পথ হারিয়েছে। মানুষের সাড়া শব্দ নেই।

এমনি ধারা একটা জায়গার প্রয়োজনীয়তাই আজ আমাকে নিবিড় করে পেয়ে বসেছিল। তাই এর অস্তিত্বে মন আমার তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। মন যখনই হাঁপিয়ে ওঠে—তখনই চাই তার এমনিধারা একটু আশ্রয়, মনকে সজীব করে তুলতে।

ওরা আমাকে খুব নিবিড়ভাবেই গ্রহণ করেছে। অতিথির উপর ওদের যেন আর দরদের অন্ত নেই। আমার মধ্য দিয়ে কি এক পরিবর্ত্তনের আভাস নাকি ফুটে উঠেছে। আমি যেন আর আগের মানুষ নই। অন্ততঃ এই ওদের মত। কোন একটা বিরাট ক্ষতির আশঙ্কা করে ওরা আমায় প্রশ্ন করে।

এম্নি ধারা প্রশ্ন সত্যি ভারী বিশ্রী। ওদের দৃষ্টি এড়াতে জানালার পাশে এসে দাঁড়াই। মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—যেমন ছিলাম আজও ঠিক তেম্নি আছি—পরিবর্ত্তন যা একটু হয়েছে তা দুদিনেই কেটে যাবে।

—দুই—

পত্রহীন বার্চ গাছের মাথায় সোনালীর আমেজ রেখে বসন্তের সূর্য্য অস্ত যায়। ঘরের জানালায় এসেও সেই রঙিন্ আলোর ছোঁয়াচ লাগে; —বুঝি-বা দূরের ঐ পাইন বনের শাখায়ও।

দরজার পিছন থেকে একটা বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে বনের পথে বেরিয়ে পড়ি।

এপ্রিলের বাতাস বসন্তের ছোঁয়াচ লেগে মদির হয়ে উঠেছে। ঢালু জায়গাগুলো থেকে বরফ এখনও গলে শেষ হয়ে যায়নি। ছোট্ট নদীর মৃদু কল্লোল বেশ স্পষ্ট করেই শোনা যায়।

একটা বুড়ো বার্চ গাছের গায়ে বন্দুকটা ঠেকিয়ে রাখি। ওখান থেকেই পথটা বনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির উপর আন-মনা হয়ে বসে পড়ি। বনের ওপারে সূর্য্যটা অনেকখানি নেমে এসেছে। পত্রহীন পপ্‌লার গাছের মাথায় লেগে অনেকগুলো সূর্য্যরশ্মি নীচেকার ঐ ঝরণাটার বুকে এসে ঠিকরে পড়ে। বরফের চাপ গলে গলে ঐ ছোট্ট ঝরণাটার সৃষ্টি।

বুকের কাছে জামার নীচে একটা কাগজের খস্ খস্ শব্দ। ছোট্ট এই কাগজটুকু চিঠি হয়ে সেদিন আমার কাছে এসেছিল। পকেটে ফেলে রেখেছি তাই আজও ওটা সেখানে রয়েছে। জামার চাপ লেগে লেগে খামটা ইতিমধ্যেই অনেকটা মুসড়ে গেছে।

চিঠি··· । এম্নি ধারা চিঠি হয়ত জীবনে আর একটাও মিলবে না।

বসন্তের নিস্তব্ধতায় পুরাতন পথের বুক বেয়ে কি যেন একটা সম্ভাবনার স্বপ্ন ভেসে আসে। অজানা বেদনার ছোঁয়াচ লেগে মন কেমন যেন ভারী হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা শব্দ আজ আমার কাছে অর্থময়। কান পেতে বসে আছি। মনে হচ্ছে না-জানি কিসের প্রতীক্ষায় সময় আমার বয়ে চলেছে।

বনের মধ্য থেকে একটা পাখী হঠাৎ চীৎকার করে ডেকে উঠ্‌ল। ভিজে মাটীর গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। উইলো গাছের ফুল থেকে একটা মিষ্টি গন্ধের আমেজ পাচ্ছি। পথের ধারে ধারে ওদের গন্ধ আরও বেশী করে জমাট বেঁধেছে। পথ চল্‌তে ওই হলুদ ফুলগুলোর নরম গন্ধে মন আমার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বসন্তের প্রথম প্রকাশ······। বুকের কাছে কার চিঠিটা মুখর হয়ে উঠেছে। জীবনের পরিপূর্ণ দিনগুলো শুধুই ক্ষণিকের। সেদিন অন্দরের স্বপ্নে মন মশ্‌গুল হয়েছিল; কিন্তু আজ সুন্দর বিদায় নিয়েছে। জীবন ঘিরে আজ শুধু ব্যথা আর বেদনা—হতাশার ব্যর্থতা। সুন্দরের স্বপ্নে মানুষের তৃপ্তি। কেউ বা আবার হারানো স্মৃতির মধ্যেই খুঁজে পায় আনন্দের পরিপূর্ণতা।

চিন্তায় মন ভারী হয়ে ওঠে। বহুক্ষণ ধরে দূরের ঐ অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে থাকি। ঘুমে ভরা নিশ্চল বনটা আমার চোখের আগে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ কখন এক সময় অন্ধকার পথের বুক বেয়ে বাড়ীর পানে মুখ ফিরাই।

আকাশের নীল খিলানে তখন শিশু চাঁদের কচি হাসি ফুটে উঠেছে।

—তিন—

ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে অনেকগুলো মেঘ আজ আকাশে ভিড় জমিয়েছে। রাতের দিকে ভারী এক পশলা বৃষ্টি এলো। জানালার খড়খড়িতে বৃষ্টি ঝরার শব্দ পাচ্ছি। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালার কথা মনে হ'ল। বাইরে হু হু করে ঝড়ো হাওয়া বইছে।······

উননে আঁচ দিয়েছি। টেবিলের গায়ে—চেয়ারের পায়ে ওর রাঙা

আলোর ছোঁয়াচ লাগল। ঘরময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছি। চুল্লীটার পানে চেয়ে কেবলই ভাব্ছি—কই, তেমন কিছুই ত হয়নি। ছোট্ট একটু ঘটনা, তাই নিয়ে আবার এত চিন্তা। অবসরের ফাঁকে দুদিনেই স্মৃতির দাগ মন থেকে মুছে যাবে। কিন্তু হায়, এই ছোট্ট ঘটনাটিকে ঘিরেই আজ যত ব্যথার আনাগোনা। আশা নেই বলেই বুঝি বেদনা এমন নিবিড় হয়ে ওঠে।

বসন্তের হাওয়ায় সবারই মন এম্নি ধারা উতল হয়। নিঃসঙ্গ জীবনের পরতে পরতে কিসের্ অভাব বেদনার মত গুমরে কাঁদে। মানুষ ভাবে কোথায় ব্যথা—কূল পায় না।

সাত দিন আগে আমার মনেও ঠিক এম্নি একটা অভাবের সাড়া পাচ্ছিলাম। উদ্দেশ্যহীনের মত শহরের পথে বেরিয়ে এলাম। সাম্‌নেই একটা উঁচু লাল বাড়ী। এ পথ দিয়ে অনেকদিন আমি পাড়ি জমিয়েছি।

ঐ বাড়ীটার সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত। তিন বছর আগে এক ঝড়ের দিনে ওর বুকে আশ্রয় পেয়েছিলাম। পৃথিবী জুড়ে সেদিন বসন্তের মহোৎসব। বিকালের দিকে হঠাৎ আকাশটা ভয়ানক কালো হয়ে এল। আকাশের অমন বিশ্রী কালো চেহারা আর কোন দিন দেখিনি। দেখতে দেখতে সূর্য্যটার লাল মুখও ভয়ে কালো হয়ে গেল। আকাশ ভেঙ্গে এরই মধ্যে বাজ পড়তে সুরু করেছে। উঃ—কি সে দারুণ শব্দ। বিদ্যুতের ঝিলিক লেগে চোখের দৃষ্টি ঝলসে যাচ্ছিল। তার উপর বৃষ্টি। এমন দুর্য্যোগেও সেদিনের মনে দাগ লাগেনি—হয়ত বা একটু লাগতেও পারে। আজ সেই ঝড়ের দোলা আমায় মাতাল করে তুলেছে। মনে কেবলই প্রশ্ন উঠ্ছে—কেন? আশার দীপ নিভে চোখের দৃষ্টি কালো হয়ে এল, তবুও ব্যাকুলতা! বাড়ীটার দিকে চোখ তুলে চাইতেই হঠাৎ কখন থেমে গেলাম··· । আজের ব্যর্থতা সেদিনও সত্য ছিল কিন্তু ভাবতে পারিনি। আজ সব কথা সত্য হয়ে বুকের কোণে ঘনিয়ে উঠেছে।

বৃষ্টির ভেজা গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। টেবিলের উপরকার ফুলদানি থেকে একটা বুনো ফুলের গন্ধ সিল্কের মত নরম আঁধারকে গন্ধময় করে তুলেছে। হাতের মধ্যে একটা নারী দেহের নিবিড় স্পর্শ অনুভব করছি। বাইরের আকাশে বাজপড়ার শব্দ শুনে মেয়েটার চোখে ভয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু কই, সেদিনও ত আজের মত মন উতলা হয়ে ওঠেনি। দুর্ভাগার ভাগ্যে ঠিক এম্নি হয়।

—চার—

ঐ একই পথের উপর পরের দিনও আবার তার সঙ্গে দেখা। দূর থেকে দেখেই ওকে চিন্‌তে পেরেছি। ওর চলার ভঙ্গী আমাকে ঠিক তারই কথা মনে করিয়ে দিল। মুখের ছায়া—টুপির পেছনটাও যেন কত যুগের চেনা।

আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই লজ্জায় ওর গালদুটো রঙীন হয়ে উঠ্‌ল। একটু ভয়ও হয়ত পেয়েছিল। কালো দস্তানা-পরা হাত দুটো তুলে ওর বুকটাকে হঠাৎ ও চেপে ধরল। উত্তেজনাকে দাবিয়ে রাখারই এই প্রচেষ্টা। মনে হ'ল—আমাকে দেখে হঠাৎ যেন ও কেমন ভয় পেয়ে গেছে।

ওকে আমার অভিবাদন জানালাম। ওর তরফ থেকেও ত্রুটি হ'ল না। দুজনের মধ্যেই কেমন যেন একটা সঙ্কোচের ভাব। দুজনেই পাশাপাশি পথ চলছি, কিন্তু কেউ যেন কথা বলার হঠাৎ কোন সূত্র খুঁজে পেলাম না।

কেমন করেই বা কথা বলব। আর একজনের জীবনের সঙ্গে ওর জীবন যে আজ জড়িয়ে গেছে। আমার মত উদ্দেশ্যহীনভাবে সেও হয়ত একদিন এ বাড়ীতে ঢুকেছিল। কিন্তু আজ···? দৃষ্টির সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনের বাড়ীটাকে একবার দেখে নিলাম। অতীতের দিনগুলো চোখের সাম্‌নে ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ল।

ঐ ত দরজার পাশে সেই পিতলের হাতলটা যেমন ছিল আজও ওটা তেম্‌নিই আছে—একটুও পরিবর্ত্তন হয়নি।

দুজনেই পাশাপাশি চলছি। কারুর মুখেই কথা নেই। ভারী বিশ্রী লাগছিল। সঙ্কোচের আব্‌ছা কেটে কথা আমিই প্রথম বললাম—আজকের এই উদ্দেশ্যহীন পথচলার কথা। সন্ধ্যাটা ভারী মদির। এতক্ষণ ঐ নদীর ধারে বসে ছিলান। উদ্দেশ্যহীনভাবে এখন এই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

প্রশ্ন হ'ল--"এত পথ থাক্‌তে হঠাৎ এই পাশের রাস্তায় কেন?"

প্রশ্ন শুনে ওর মুখপানে তাকালাম। সেই একই দৃষ্টি। আমার দিকে ও মুখও ফিরাল না। নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে ও এগিয়ে যাচ্ছিল। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ভয়েই যেন ওর দৃষ্টি মাটীর দিকে আবদ্ধ। আমরা ততক্ষণ সেই লাল বাড়ীটার আগে এসে দাঁড়িয়েছি।

উত্তর দিলাম—দিনটা ভারী নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। মানুষের সান্নিধ্য পেতে তাই পথে বেরিয়ে এলাম। দরজার হাতলটা ধরে ও আমার পানে মুখ তুলে চাইল।

কথার সঙ্গে ওর দৃষ্টির কোন মিল পেলাম না—আগের মত করেই যেন ও আমার দিকে চেয়ে আছে। বড় চোখ দুটোর মধ্যে সে কি রহস্য। দরজা ডিঙিয়ে দুজনেই ভিতরে ঢুকে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে দু-এক পা মাত্র উঠেছি। ওপানে সেই পিনের দাগগুলো আজও রয়েছে। ওকে বাসায় না পেলে ওখানে আমার আগমন সংবাদ রেখে যেতাম। আর একধাপ সাম্‌নে যেতেই পেছন থেকে ও আমায় ফেরার আভাস জানাল। হঠাৎ মুখ যেন ওর কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। অবাক হয়ে আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

ভিতরে অন্য কেউ আছে। সুরটা ওর কেমন যেন কেঁপে গেল।

অন্য লোকের কথা সত্যি তখন আমার মনেও ছিল না। দুজনেই দরজার পাশে থমকে দাঁড়ালাম। কারুর মুখেই কথা নেই। বাড়ীর ভিতরে অন্য লোকের আবির্ভাব যেন আমি কল্পনাই করতে পারছিলাম না। ঐ ত দরজার পাশে সেই পিনের দাগগুলো আজও তেম্নি রয়েছে।

পিনে এঁটে চিঠি রেখে যাওয়ার কথা তোমার মনে পড়ে? প্রশ্ন করেই একটু হাসতে চেষ্টা করলাম।

ওর হাতটা তখন আমার হাতের সঙ্গে সংবদ্ধ। ও আমার হাতটাকে আরও একটু জোরে চেপে ধরে যেন একটু দম নিয়ে নিল। চোখ ফেটে আমার কান্না আসছিল। হঠাৎ ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। হাত দুটো ধরে ও আমাকে ওর বুকের কাছে টেনে নিল। ওর পাপড়ির মত নরম গালের ছোঁয়াচ তখন আমার ঠোঁটে এসে লেগেছে। প্রশ্ন হল—এখনও সেদিনের কথা মনে পড়ে?…মনে পড়ে?

হঠাৎ পিছনে সরে গিয়েই ও ওর কাঁধের ওপর থেকে সিল্কের ওড়নাটা ফেলে দিল। ওর মুখে চোখে তখন উত্তেজনার তুফান বয়ে চলেছে। প্রজাপতির পাখার মত হাল্কা ঠোঁট দুখানিতে সে কি মিষ্টি হাসি। ওর বুকের অনাবৃত অংশটুকু কামনায় রঙিন হয়ে উঠেছে। লজ্জায় ও আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাল। সমস্ত শক্তি দিয়ে ও আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে। স্বপ্নাবিষ্টের মত উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, মনে পড়ে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, এ বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধই যেন আমাদের নেই।

—পাঁচ—

ওর চোখদুটো বেদনায় টলমল করছে। ওঃ, সে কি করুণ দৃষ্টি! বুকের সমস্ত বেদনা চোখ ফেটে যেন বেরিয়ে আস্‌তে চাইছিল। আমার হাতদুটো চেপে ধরতেই ওর ঠোঁট দুখানি একটু কেঁপে উঠ্‌ল। আজের তৃপ্তি চিরদিন আমার স্মৃতিকে রঙিন করে রাখবে। জীবনে এমিধারা একটা মুহূর্ত্তও এসেছিল—একথা ভাবতেও কত সুখ। স্মৃতি আছে, মানুষ তাই বেঁচে থাকে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে ওর কথাগুলো শুনলাম। বুকে তখন আমার উত্তেজনার ঝড় দুলছে।

নূতন বন্ধুর কাছ থেকে কিছুই কি চাও নি? প্রশ্ন করেই একটু অপ্রতিভ হয়ে গেলাম।

উত্তর এল—হ্যাঁ পেয়েছি, কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। বেঁচে থাকার পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সে আমায় শুধু তাই দিয়েছে। তার বেশী নয়। তার দানে শরীরের তৃপ্তি আছে, আত্মার নেই। তুমি আমায় স্বর্গের আভাস দিয়েছ। মানুষের আত্মা যা চায় তোমার কাছ থেকে আমি তাই পেয়েছি। আবেগের ধাক্কায় ওর শেষের কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখের জল চাপ্‌তে গিয়ে এবার সত্যি ও কেঁদে ফেল্‌ল।

ওর আনত চিবুক ধরে সান্ত্বনা দিলাম। আঙুলগুলোর ডগায় ভারী মিষ্টি একটা স্পর্শ লাগল।

আগেও তোমাকে পেয়েছি কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। আর দশ জনের মত তুমিও ছিলে সেদিন বিশেষত্বহীন। কিন্তু……আজ তোমার দৃষ্টিতে এক নূতন জীবনের আভাস পাচ্ছি। এই মুহূর্ত্তে যে-কোন নারী তোমায় তার সব কিছু দিতে পারে।

কথাগুলো মনটাকে ভারী চঞ্চল করে তুলল। ও চায় বুকভরা জীবন আর প্রেম। বেঁচে থাকার মধ্যে ওর তৃপ্তি হারিয়ে গেছে।

সেদিনের ঝড়ের কথা মনে পড়ে? প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ পড়ে। বেশ স্পষ্ট করেই সেই ঝড়ের কথা মনে পড়ে। তোমার সেই বৃষ্টি-ভেজা হাতের গন্ধটুকু পর্য্যন্ত আজও আমার মনে পড়ে। আটই যে সেদিন। আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগের কথা।

উত্তর দিলাম—তিন বছর পর আবার সেই বসন্ত। ও আমার কথাটার শুধু প্রতিধ্বনি করল। আজ থেকে আমাদের জীবনের নূতন যবনিকা উঠল। কথাটা বলেই আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

কথার ধাক্কায় ওর মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল—আমার মুখের দিকে এমন করে তাকাল যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। দু হাত দিয়ে ও আমার দৃষ্টি থেকে ওর মুখটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করল।

তাকে সব বলে তোমায় চিঠি লিখে জানাব। উপর থেকে দরজা বন্ধ করার একটা শব্দ এল। ওর কথায় বেশ একটা দৃঢ়তার আভাস পেলাম। হঠাৎ আমার হাত দুটোকে ও আবার ওর হাতের মধ্যে টেনে নিল। ওর সারা দেহ তখন থরথর করে কাঁপছে। হাতের স্পর্শেই তা অনুমান করতে পারছি। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ও ওর নরম আর রাঙা ঠোঁট দুটোকে আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল। ওর উঁচু আর কোমল বুকের স্পর্শে আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত মাত্র। দেহটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ও ততক্ষণ সিঁড়িটার অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

চিঠি লিখে সব জানাব। উপর থেকে উত্তর এল।

—ছয়—

বনের বুক ঘেঁষে নদীর ধারা বয়ে চলেছে। অনেক দিন ওর তীরে বসে কাটিয়েছি। গাছের গুঁড়িটা আজও ঠিক তেমি আছে। ওর উপরে সেদিনও বস্‌তাম। সন্ধ্যায় ও জায়গাটায় বসে থাকতে ভারী আরাম। নীচে নদীর ধারা বয়ে চলেছে। গাছের আড়ালে অনেকগুলো বাড়ী দেখা যায়। সূর্য্যের শেষ আলো ওদের জানালায় ঠিকরে পড়ে। এখান থেকে সবই দেখতে পাই। নদীর আঁকা বাঁকা গতিভঙ্গি ভারী সুন্দর।

আজও সেই চেনা পথের উপর দিয়েই চলেছি। মাথার উপরে পাইন গাছের শাখা দুলছে। কচিপাতার উৎসব তাদের এখনও শেষ হয়নি। একঝাঁক সূর্য্যকিরণ আমার মুখে এসে লাগল। বাইরের দিকে নদীর ধার ঘেঁসে চলেছি। সামনেই গাছের সেই গুঁড়িটা। ওটা ঠিক একই রকম আছে—কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি।

মানুষের জীবন কি রহস্যময়। যতক্ষণ প্রাণে আনন্দ থাকে সব কিছুকেই সজীব মনে হয়। গুঁড়িটার উপর বসে পড়লাম। ওর একদিক থেকে খানিকটা বাকল ঝরে গেছে।

তিন বছর আগের কথা। সে এই গুঁড়িটার উপর বস্‌ত—আর আমার জায়গা ছিল পাশের ঐ সবুজ ঘাসের উপর। সেদিনও আজের

মতই সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। চারদিক কুয়াসায় আবছা। ধীরে শান্ত নদী বয়ে চলেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো টলমল করে দুলছে। দু-একজন শ্রমিক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সে দিনগুলো আজও কত স্পষ্ট।

আর আজ?··· আজ জীবনে কি মস্ত পরিবর্ত্তন। সৌভাগ্য যখন হাতে এসে ধরা দেয় মানুষ নিঃঝুম হয়ে ঘুমায়। কিন্তু আবার দুদিন বাদেই আকাঙ্ক্ষার সে কি আকুতি! সেই একই পুরানো ঘটনার আবর্ত্তন।

এম্নি ধারাতেই জীবন বয়ে যায়। আশা আর আকাঙ্ক্ষা—বেদনা আর ক্রন্দন। আনন্দেও মানুষ কাঁদে। জীবনের কোন তৃপ্তি দিয়েই এ চোখের জলের পরিমাপ হয় না। তৃপ্তি পেতে হলেই দুঃখ সইতে হয়। চোখের সামনে এক একবার জীবন উপচে ওঠে। উঃ জীবনের সে কি সুন্দর অভিব্যক্তি! সে আনন্দ মরুর বুকে সবুজ সাড়া দেয়—শুক্‌নো শাখায় জাগে ফুলের স্বপন। যার জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে—সে ধন্য।

বিচিত্র জনস্রোত জীবনের পথে ছুটে চলেছে। কারও মাথায় জীবন-ধারণের উপকরণ—কেউ বা বিচিত্র বসনে সারা দেহ ভরে তুলেছে। সবারই দৃষ্টিতে একই স্বপ্ন—কোন-মতে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা। অমূল্য জীবনের বিনিময়ে মানুষ চায় বেঁচে থাকতে—শুধুই বেঁচে থাকতে। এই ত জীবন। বেঁচে থাকা—কেবলই কোন মতে বেঁচে থাকা।

সূর্য্য ডুবে গেল। ঢেউগুলো নদীর বুকে মৃদু মৃদু দুলছে। দু একটা ছোট মাছ লাফিয়ে উঠে আবার ডুব মারছে। দূরের ঐ আব্‌ছা গ্রামটার পানে চেয়ে আছি। চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে।

কালই চিঠিখানা পাব—হ্যাঁ, ঠিক কালই। তারপর?··· তারপর আনন্দ, কেবল অফুরন্ত আনন্দ। এই গাছের গুঁড়িটা পর্য্যন্ত সে আনন্দে সজীব হয়ে উঠ্‌বে। এ জনহীন নির্জ্জনতায় কাল আর কেউ নয়, —কেবল আমি আর সেই চিঠিটা। সারা আকাশ কান পেতে চিঠির ভাষা শুন্‌বে।

—সাত—

চিঠি। লম্বা আর শক্ত একটা খামের মধ্যে সেই চিঠিটা। বনের ধারে গাছের গুঁড়িটার উপর বসে আছি। কত স্বপ্ন চোখের সাম্‌নে দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। খামটা খুল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এম্নি করে চিন্তা করতেও কি আরাম। হাতের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ছোঁয়াচ পাচ্ছি। গাছের গুঁড়িটার উপর খামটা নামিয়ে রাখলাম। ওকেও আমার এ আনন্দের ভাগ দিতে এসেছি। সাম্‌নেই ছোট্ট নদীটা দুলছে। বাতাসে পাইনশাখার মর্ম্মর ধ্বনি। সে লিখেছে :—

প্রিয় বন্ধু আমাদের মিলনের স্মৃতিকে স্মরণ করে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই। সিঁড়ির পাশেকার সেই মধুমিলনের কথা আজও ভুলিনি। সমস্ত অতীত স্বপ্ন হয়ে সেদিন আমার বুকে জেগেছিল। জীবনে সত্যি এমন বুকভরা তৃপ্তি আর পাইনি। তোমার মধ্য দিয়ে আবার সেদিন হারানো দিনের সন্ধান পেয়েছিলাম—যেদিন প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসতাম।

সবই মনে পড়ে। স্মৃতির দাগ বুক থেকে আজও মোছেনি। পাইন গাছের মধ্য দিয়ে সেই সেদিনের ফিরে-আসা—আকাশভরা সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার, ঝড়বৃষ্টি—সবই মনে পড়ে। সেদিনকার সেই চেরী ফুলের কথা ভুলিনি। চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে ভিজে হাওয়া ফুরফুর করে আমার চুলগুলোকে ওড়াচ্ছিল।

সবই মনে পড়ে। সেদিনের অতি নগণ্য ঘটনাটি পর্য্যন্ত। সেদিনের সেই ঝড়ের স্মৃতি মন থেকে কোন দিনই মুছবে না! সমস্ত আকাশভরা মেঘ—কালো আর বিশ্রী আর ভয়ঙ্কর। চারিদিকে বুঝি হলুদেরও আমেজ ছিল। দৌড়ে এসে আমরা একটা ঘরে আশ্রয় নিলাম। ওরা যেন আমাদের তাড়া করে আসছিল। এমন ভয়ঙ্কর মেঘ আমি আর দেখিনি। এত দুর্য্যোগেও ভারী ভাল লাগ ছিল। আমাদের মিলনকে মধুময় করতেই যেন সেদিনের ঝড়ের আবির্ভাব। ভয়ে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ভারী ভাল লাগ্‌ছিল কিন্তু।

জানালা দিয়ে হাওয়া এসে তোমার গায়ে লাগছিল। বৃষ্টির ভিজে গন্ধের কথাও ভুলিনি। সেদিনের কথা মনে হলে আজও চোখে জল আসে। মাধুর্য্যের মধ্যে একটু বেদনারও ছোঁয়াচ আছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকি। চোখের পাতা জলে ভিজে ভারী হয়ে ওঠে। দু-এক ফোঁটা জল হাতের উপরেও গড়িয়ে পড়ে। কান্না চাপ্‌তে ইচ্ছা করে না।

এম্নিধারা চোখের জলেও একটা আনন্দ পাই। আর কিছু দিয়েই এ আনন্দের পরিমাপ হয় না।···

ঠিক এম্নিই হয়। মানুষের বুকে আনন্দের বান এম্নি করেই আসে। ওঃ সে কি আনন্দ; বুকভরা প্রাণভরা আনন্দ। কথার ছন্দে গানের সুরে বেজে উঠে। অফুরন্ত তৃপ্তির নেশায় মন মশ্‌গুল হয়ে ডুবে যায়।

অনেকে ভাবে আনন্দ কেবলই কল্পনার। কিন্তু না, তা নয়। এ আনন্দ বুকের আনন্দ—এ আনন্দে আত্মার মধুময় প্রকাশ। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এর চির-বিচ্ছেদ। কষ্টের আনন্দে স্বার্থের বিকাশ, কিন্তু এ যে শাশ্বত।

চোখের জলে অভিষিক্ত এক একটা সুর যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে। সবই নির্ভর করে নিজের উপর; নিতান্তই নিজের মূল্যের উপর।

মনে পড়ে? বন্ধু, তোমারও মনে পড়ে? ঘরের মধ্যে সেই আধ-অন্ধকারের কথা—টেবিলের উপর সেই বুনোফুলের গন্ধ? নিশ্চয়ই মনে পড়বে। এমন কথা জীবনে সবারই মনে পড়ে। ঘর ভরা বৃষ্টি আর ভিজাঘাসের গন্ধ।···

সে এক ছুটির দিন। সেই কখন ঘর ছেড়ে বের হয়েছি। খাবারের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ছোট্ট একটুকরা খাবার ভাগ করে খেয়েও সে কি তৃপ্তি!

সেদিন কোন্ পোষাকটা পরেছিলাম সে কথাটা পর্য্যন্ত মনে আছে।

সাদার উপর লাইলাক ফুলের কাজ-করা একটা পোষাক। নয়?… তোমাকে কাছে পেতে মন কখন আমার উন্মুখ হয়েছিল জান? সেই যখন আমরা ঘরে ফিরে এলাম। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। কি যেন একটা বুনো ফুলের গন্ধে ঘর ভরা।

তারপর তারপর এল একটা পরিসমাপ্তি। তুমি আসতেই আমি দরজা খুলে দাঁড়ালাম। আমায় বুকে চেপে তুমি ঘরের মধ্যে ছুটে গেলে। তোমার বাহুর নিবিড় বন্ধনে সেদিন সত্যি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর?…আর নয়…

তুমি নীরবে আমার পাশে বসেছিলে। তোমায় দেখে মনে হচ্ছিল যেন অনিচ্ছায় কোন কর্ত্তব্যের সামনে দাঁড়িয়েছ।

এম্নিই হয়। অমূল্য সম্পদ যখন কাছে ধরা দেয় তখন তার মূল্য এম্নি করেই যায় বিকিয়ে। বুকের ছন্দে গান এলে সুরকে ফেলে হারিয়ে।

এক একজন মানুষ কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সফলতায়ও তার ছন্দ হারায় না। যুগ যুগ ধরে এরা মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই কম।

আত্মার এই দারিদ্র্য সত্যিই বড় করুণ।

তুমি চলে গেলে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতাম। নিজের মুখের দিকে নিজেই অবাক হয়ে চেয়ে থাক্‌তাম। কত শরত সন্ধ্যা তোমার প্রতীক্ষায় কেটে গেছে। সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কথা মনেই পড়ত না।

বসে বসে এক এক সময় ভারী বিরক্ত লাগত। ঘর ভরে পায়চারী করতাম। বুক ভেঙ্গে এক একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত।

নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতাম। আরও কত রাত এম্নি একলা কাট্‌বে? প্রতীক্ষার কি অবসান হবে না কোন দিনই? নিঃসঙ্গ জীবনের সে কি বেদনা!

এক এক সময় বেঁচে থাকার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌তাম, সব আনন্দের কথা ভুলে যেতাম। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার মত মানুষ কি একজনও নেই? আর কিছুই নয়—কেবলই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে আমি একজনকে চাই। তার কাছ থেকে আত্মা আমার হয়ত তৃপ্তি পাবে না। তা নাই বা পাক্।

শেষে একদিন সত্যি একজন বন্ধুকে পেলাম। কেমন করে পেলাম জিজ্ঞাসা করো না। তার আলিঙ্গনে বুক ভেঙ্গে আমার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত। সে জানতেও পারেনি কোন দিন কোথায় আমার দারিদ্র্য। তার আলিঙ্গনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি—একটুও আপত্তি করিনি। আমার দেহ নিয়েই সে তৃপ্ত।

সেদিন তোমায় দেখে কতখানি ভালবেসেছিলাম তোমায় আর তা বল্‌ব না। তোমার দৃষ্টিতে সে কি ব্যাকুলতা! কেবল ব্যাকুলতা নয়, প্রেমও। আমার সমস্ত প্রাণ সে দৃষ্টির কাছে নত হয়ে গেছে। সেদিন সত্যি তোমার পানে প্রাণ আমার উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

মানুষের জীবনে আনন্দ আসে, কিন্তু খুবই ক্ষণিকের জন্য। তারপর ব্যথা আর বেদনা, প্রতীক্ষার শুরু। সুন্দরের প্রতীক্ষায় আত্মার সে কি আকুতি! আনন্দ কারো ভাগ্যে চিরস্থায়ী নয়।

মনকে প্রশ্ন করেছি—জীবনের পথে কাকে চাই? দুর্লভ আনন্দ যে দিল তাকে, না যাকে আশ্রয় করে চলবে নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা, তাকে? কেবল প্রশ্নই করিনি, সমাধানও করেছি।…

হঠাৎ বুক ভরে কান্না উথ্‌লে উঠ্‌ল। ঝাপসা চোখে চিঠিখানার কিছুই দেখ্‌ছিলাম না। আঙ্‌লের ডগাগুলো পর্য্যন্ত আমার সাদা হয়ে উঠেছে। গাছের গুঁড়িটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। নিজেকে যেন স্থির রাখতে পারলাম না। কোনমতে চিঠিখানা শেষ করলাম। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল…

বন্ধু! শেষপর্য্যন্ত নিশ্চিন্ততাকেই বেছে নিলাম। বেঁচে থাকা আমার নিতান্তই প্রয়োজন।

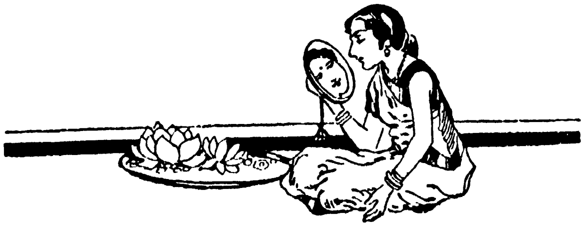
সেদিন তোমায় যে চুম্বন দিয়েছিলাম সেই আমার শেষ চুম্বন। বুনোফুলের গন্ধে ভরা ঝড়ের মধ্যে যে জীবনের সূত্রপাত ঐ চুম্বনের মধ্যেই ছিল তার সমাপ্তি।

—আট—

এইটুকু ত ঘটনা।

ষ্টোভের আগুন নিভে গেল। সব ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠ্‌ল। বাইরে ঝড়োহাওয়ার দাপাদাপি শুন্‌ছি। জানালার গায়ে বৃষ্টি ঝরার শব্দ। কেউ যেন হাত দিয়ে জল ছিটিয়ে যাচ্ছে ওখানে। দম নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ এখন আরাম পাচ্ছি। হাতের উপর গরম কি যেন ঝরে পড়লো। নিভন্ত ষ্টোভটার দিকে চেয়ে আছি। জামায় হাতটা মুছে নিলাম। তারপর…? খুবই সামান্য ঘটনা—যেমন চিরদিন হয় এও তেম্নি স্বাভাবিক।*

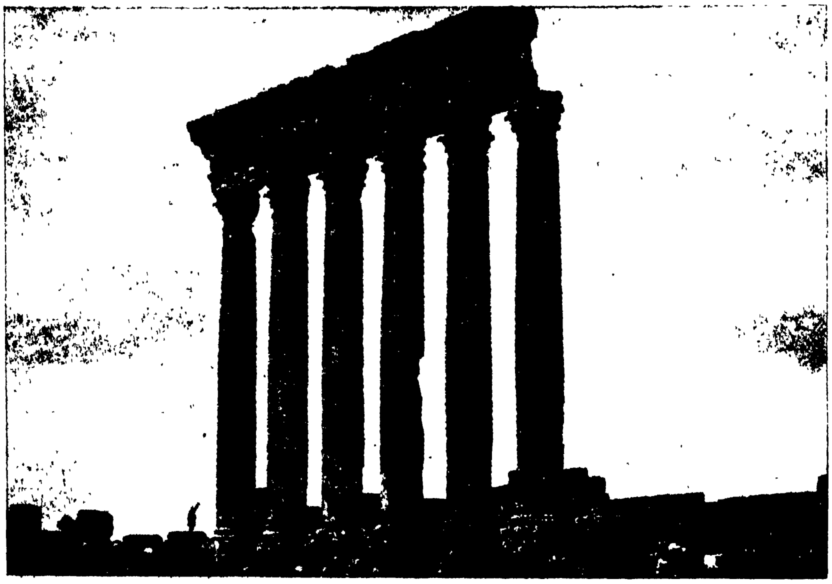
* রোমানফের Sorrow নামক গল্প হইতে।



ইবন্ বতুতার ভারত ভ্রমণ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বি-টি, বি-এল

সৃষ্টির আদি যুগ হইতে দূরের মরীচিকা মানবকে ধর্ম ও অর্থের সন্ধানে প্রলুব্ধ করিয়া আসিতেছে। সম্মুখে বালুকাস্তীর্ণ বিস্তৃত মরুভূমি, গভীর নীলাভ দুস্তর পারাবার, ব্যাঘ্রগজাদি-সেবিত দুর্ভেদ্য শ্যামল বনানী, তুষারমণ্ডিত গগনচুম্বী দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ—কিছুই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। কিসের সন্ধানে মানব সৃষ্টির আদি যুগ হইতে গৃহ-কোণ ছাড়িয়া, পিতা-পুত্র আত্মীয় স্বজন-বিরহ-ব্যথা সহ্য করিয়া দুঃখকষ্ট ভুলিয়া এমন কি, জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া এই অজানা দূরপথের সন্ধানে মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে কে বলিবে? দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের দূরাগত বংশীধ্বনি যেমন করিয়া গোপিকাগণকে ঘরের বাহির করিত, কোন বাধা বন্ধন, লোকলজ্জা ও ভয় তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না, তেমনই করিয়া দূরের মোহ মানবের মনে কল্পনার জাল বুনিয়া আজিও তাহাকে প্রলুব্ধ করে। অজানার গান তাহাকে গৃহকোণে নিরালা নিভৃতে সুখশান্তি ও তৃপ্তি ভোগ করিতে দেয় না। সকল বাধা-বন্ধন মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সে গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের উত্তেজনায় ছুটিয়া চলে, কোন দিকে ফিরিয়া চাহে না। নদীর কলতান, পর্বতের মর্মর ধ্বনি, বন গহনের ঝিল্লীরব তাহাকে বিমুগ্ধ করে, সে প্রাণ ভরিয়া সেই সৌন্দর্য সেই আনন্দসুধা উপভোগ করে। যাহারা সে দৃশ্যে বঞ্চিত রহিল, সে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল না তাহাদিগের উপর তাহার করুণার সঞ্চার হয়।



সয়ান বেকে জুপিটারের বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ—সিরিয়া ভ্রমণকালে ইবন্ বতুতা ইহা দেখিয়াছিলেন

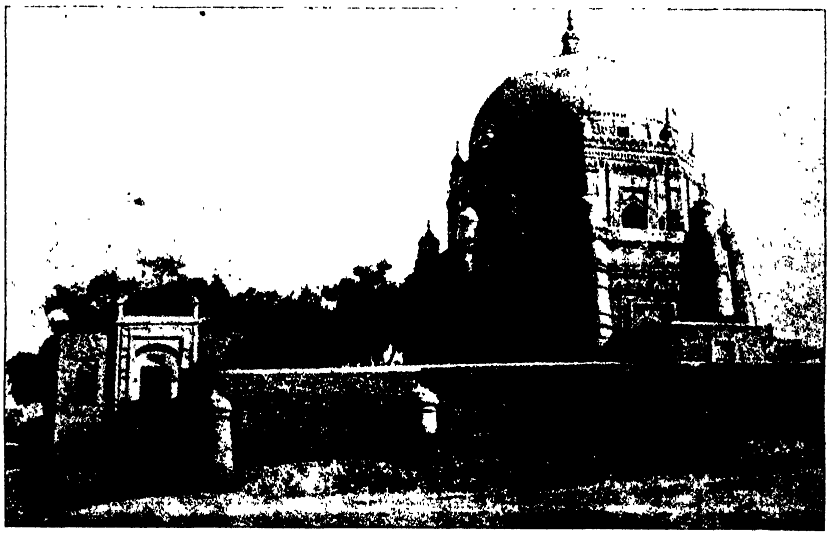
এমনি অজানার মোহে কলম্বাস একদিন দুস্তর সাগরে পাড়ি দিয়াছিলেন, অ-দেখাকে দেখিবার ও অ-জানাকে জানিবার আকুল আগ্রহে মার্কো পোলো একদিন গৃহকোণ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইবন্ বতুতা ধর্মপ্রাণ ফকিরের সন্ধানে নিঃসম্বল অবস্থায় পথে বাহির হইয়া পড়িয়া ছিলেন। প্রাবৃটের ঘনঘটা, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্তণ্ড তাপ, কঠোর হিমানি—সকলই তাঁহারা তুচ্ছ করিয়াছিলেন। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত গহন কানন, কত মরু, কত দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-পারাবার তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন কে বলিবে? অনাহারে অনিদ্রায় গভীর গহন কাননে হিংস্র পশুর সম্মুখে দস্যু হস্তে পড়িয়াও তাঁহারা অজানার সন্ধানে বিরত হন নাই।

গ্রীষ্মের এক মধুর প্রভাতে আফ্রিকার অন্তর্গত সমুদ্র উপকূলবর্তী ট্যাঞ্জিয়ার নগর হইতে এক যুবক অজানার সন্ধানে এমনই এক নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন। সে আজ ৬১৩ বৎসর পূর্বের কথা। তাঁহার নাম আবু আবদুল্লা মহম্মদ ইব্‌ন্ বতুতা। বয়স মাত্র একুশ বৎসর; যৌবনের প্রারম্ভ। পথ সুদূরপ্রসারিত, দীপ্ত চক্ষে চঞ্চলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, হস্তপদে অসীম শক্তি, তেজোদীপ্ত হৃদয়ে অসীম

উৎসাহ। স্নেহময় পিতামাতা তাঁহাকে নয়নের জলে বিদায় দিলেন। আলো ও আঁধারের সন্ধিক্ষণে যুবক বতুতা অজানার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। ট্যাঞ্জিয়ার হইতে বহির্গত হইয়া তিনি ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি দিয়া আফ্রিকা, মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, এসিয়ামাইনর, ইরাক, উত্তর পারস্য এবং তুরস্ক প্রভৃতি দেশ একে একে অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পথে তিনি দুইবার হজ করিলেন এবং দুইবার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার বনিতাদ্বয়ও তাঁহার নিরুদ্দেশ যাত্রায় কিয়ৎদূর সাথী হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। কিন্তু কামিনীর মোহ তাঁহাকে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। কামিনী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। মক্কায় শরীফে তিনি তিন বৎসর বাস করেন। সেকালে কায়রো ছিল পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ নগরী। বতুতা লোহিত সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নীল নদের উপকূলে এই কায়রো নগরে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে আসিলেন এসিয়া মাইনর। এখানে কিয়ৎকাল ইতস্তত পরিভ্রমণ করিলেন। তৎপরে ভল্‌গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর রুশিয়ার দিকে পদ চালনা করিলেন। সেখানে ছয়শত বৎসর পূর্বে তিনি কুকুর বাহিত শ্লেজ গাড়ী দেখিয়া বিস্মিত হন। তাহার কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি রুশিয়া ভ্রমণ সম্পূর্ণ করিয়া দক্ষিণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার পদচারণার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। এক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে যদি কোন মুসলমানের দ্রষ্টব্য স্থান থাকে দেখেন। তৎকালে রেল, মোটর, এয়ারোপ্লেন, সুগঠিত পথ—কিছুই ছিল না। ঝড়, ঝঞ্ঝা, অবিশ্রান্ত বারিধারা, প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপ—কিছুই নিবৃত্ত করিতে পারিল না। অবশেষে তিনি কনস্টাণ্টিনোপ্‌লে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নগরীর সুদৃশ্য হর্ম্যাবলী দেখিয়া তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন।

সিরিয়া ভ্রমণকালে তিনি ব্যালবেক নগরে রোমকগণের সর্বাপেক্ষা বিশাল জুপিটারের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করেন। সমগ্র নগরীর কথা বাদ দিলেও সমগ্র লিওনাইট উপত্যকার উপর ইহা মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মুসলমানসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যতীত কিছুতেই তাঁহার আগ্রহ ছিল না। সেই জন্য এই বিরাট ধ্বংসাবশেষ তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে স্থান লাভ করে নাই। কিন্তু তিনি এই নগরীর পৌরজনের সুখ সুবিধার কথা, এখানকার নানাবিধ রসনা-তৃপ্তিকর সুখাদ্যের কথা এবং অপর্যাপ্ত চেরী বৃক্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এখানকার কারুশিল্পের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ একের উপর একখানি করিয়া উপর্যুপরি দশখানি পৃথক থালিকা নির্মাণ করিতে পারে এবং তাহাদের নির্মাণ-কৌশল এমনই মনোরম যে সকলগুলি একত্রে একখানি থালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। এখানকার চামচ প্রস্তুত সম্বন্ধেও তিনি ইহাই লিখিয়াছেন।



মুলতানে সাহ রুকুন-ই-আলমের কবর—ইবন্ বতুতা কর্তৃক দৃষ্ট

পারস্য দেশে তিনি ইস্‌পাহান হইতে সিরাজ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেন। এখানে তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল প্রসিদ্ধ সেখ মসজিদ-উদ্দীন ইসমাইলকে দর্শন। প্রসিদ্ধ

তিনি পার্সিফোলিসের প্রসিদ্ধ ভগ্নাবশেষের কোন উল্লেখ করেন নাই।

তৎপরে নৌযানে এডেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এডেন তখন এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ের স্থান। চতুর্দশ শতাব্দীতে পানীয় জলের জন্য বৃষ্টির জলের উপর কিরূপ নির্ভর করিতে হইত বতুতা তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে লোহিত সাগরের প্রবেশ-পথে এই নগরী চতুর্দিকে মরুভূমি বেষ্টিত। লবণাক্ত সমুদ্র বারি একেবারে অপেয়; সুতরাং এখানে পানীয় জল অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। বৃষ্টিপাতও অতি অল্প। এক্ষণে এই এডেন শহরে বৃষ্টিবারি রক্ষার নিমিত্ত বৃহৎ ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা হইয়াছে। বতুতা মসজিদ ও সমাধিস্থানগুলিই পরিদর্শন



দিল্লীতে সম্রাট তোগলকের সমাধি ও দুর্গের সাধারণ দৃশ্য

করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন; সেখানকার অন্যান্য বিষয়ে তিনি মনোযোগ দেন নাই। তিনি লাক্সর নগর পরিদর্শন করিয়াছেন। সেখানে আবুল হাজাজ নামক একজন হাজীর সমাধি স্থান দর্শন করিয়া তাহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমাধি স্থানটি এমনের বৃহৎ মন্দিরের এক পার্শ্বে অবস্থিত, কিন্তু তিনি এই বৃহৎ মন্দির সম্বন্ধে নীরব। নদীর অপর তীরে থিবসের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। বতুতা তাহার সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ করেন নাই।

পারস্য ও আফগানিস্থান উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৩৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন। মুলতানের শাসনকর্তা কুতব-উল-মালিক তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। মুলতান তখন সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী ছিল। তিনি সেখান হইতে বহু জনাকীর্ণ নগরের মধ্য দিয়া চল্লিশ দিবস ক্রমাগত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে তিনি ঘগরা নামক এক বিস্তীর্ণ স্রোতস্বিনী উত্তীর্ণ হইলেন। এখন তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তখন দিল্লী এক অদ্বিতীয় বিশাল নগরী। শুধু ভারতে নয়, সমগ্র মুসলমান জগতে এরূপ বৃহৎ নগরী আর কোথাও ছিল না। তৎকালে মহম্মদ বিন তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইবন বতুতা তোগলকের চরিত্রে বহু গুণ ও দোষের একত্র সমাবেশ দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—তিনি ছিলেন রক্তপিপাসু। পিতৃহত্যা ও ভ্রাতৃহত্যা কিছুতেই তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। প্রতিদিন কাহারও প্রতি সদয় হইয়া তিনি তাহাকে ধন রত্ন দান করিতেন এবং প্রতিদিন কাহাকেও অশেষ যন্ত্রণা দিতেন অথবা কাহারও প্রাণ বিনাশ করিতেন।

মহম্মদ তোগলক ইবন্ বতুতাকে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার এবং দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতনে দিল্লীর কাজীর পদ দান করিলেন। তাঁহাকে কয়েকখানি গ্রাম ও প্রদত্ত হইল। তিনি আট বৎসর এই ভারতবর্ষে বাস করেন এবং সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু অবশেষে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু অতি কৌশলে তিনি পুনরায় বাদশাহের অনুগ্রহভাজন হন।

মহম্মদ তোগলকের বিষয় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—তিনি সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর কোন সম্রাট তাঁহার ন্যায় অত্যাচার ও নৃশংসতায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে দেবগিরি নামক স্থানের

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ হইলেন। দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজধানী দেবগিরিতে পরিবর্তন করিতে আদেশ দিলেন। তাহাতে দিল্লীবাসিগণের দুঃখ দুর্দশার অন্ত রহিল না। দিল্লী ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়া মুলতান নগরের গৃহাদি, সরাইখানা প্রভৃতি মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেন। তৎপরে নাগরিকগণকে দৌলতাবাদে গমন করিতে আদেশ করিলেন। প্রথমত তাহারা ইতস্তত করিল। রাজকর্মচারী তারস্বরে নগরবাসিগণকে জ্ঞাপন করিল, তিন দিবস পরে কেহই দিল্লীতে থাকিতে পাইবে না। অধিকাংশ ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিল এবং হত্যা ও অত্যাচারের ভয়ে নিকটবর্তী বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেহ কেহ গৃহমধ্যে লুক্কায়িত রহিল। রাজকর্মচারী নগরের রাজপথ হইতে দুই ব্যক্তিকে সুলতানের সম্মুখে ধরিয়া উপস্থিত করিল। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অপরটি অন্ধ। পক্ষাঘাতগ্রস্তটিকে তোপে উড়াইয়া দিবার আদেশ হইল। অন্ধটিকে দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ (দেবগিরি) আটশত মাইল, চল্লিশ দিনের পথ, টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল। হতভাগ্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পথে একে একে খসিয়া পড়িতে লাগিল। একখানি মাত্র পা রাজধানীতে গিয়া পৌছিল। এইরূপে নির্মম সুলতানের আদেশ পালিত হইল।

তিনি দিল্লীতে কুতবমিনার ও লৌহস্তম্ভের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দিল্লী হইতে রাজধানী তোগলকাবাদে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পানীয়জলের অভাবে এ স্থানও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এ-স্থানে তাঁহার পরিত্যক্ত রাজধানীর বিশাল ধ্বংশাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। স্থাপত্যশিল্পে তিনি বিশেষ কোন কীর্তি রাখিয়া যান নাই।

তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং আরব্য ও পারস্য ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তর্কশাস্ত্রে, গণিত বিজ্ঞানে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি সাহসী, বীর ও চরিত্রবান ছিলেন। ইসলাম ধর্ম বিশেষভাবে মানিয়া চলিতেন। মুসলমান পণ্ডিতগণের প্রতি তিনি যথেষ্ট বদান্যতা প্রদর্শন করিতেন।

রাজ্যের নানা স্থানে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং দীন-দরিদ্রের জন্য আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সুলতান একবার তাঁহাকে কিছু পুরস্কার দান করেন। কিন্তু তৎকালে তোষাখানা হইতে সেই পারিতোষিক বাহির করা যে কিরূপ কষ্টকর এবং দস্তুরি না দিলে পারিতোষিক পাওয়া যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার ছিল তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

একবার তিনি প্রাণভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। তিনি পাঁচ দিবস অনাহারে উপবাসে কাটাইলেন। কুর্‌আণখানি কয়েকবার আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। এ কয় দিবস পানীয় জল ব্যতীত আর কিছুই আহার করিলেন না। তৎপর দিবস উপবাস ভঙ্গ করিলেন। পুনরায় চারি দিবস এইরূপ উপবাস ও কুরআণ পাঠে অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে তাঁহার মৃত্যুভয় দূর হইল।

চীনের মোঙ্গল বংশের শেষ সম্রাট মহম্মদ তোগলকের রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন। ভদ্রতা রক্ষার নিমিত্ত মহম্মদ তোগলকও চীনে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। ইবন্ বতুতার প্রতি রাজদূতরূপে চীন দেশে গমনের আদেশ হইল।

তাঁহারা সদলে মধ্যভারতের ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কাম্বে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখান হইতে জাহাজযোগে তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে আগমন করিলেন। তৎকালে কালিকট এক অতি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। সেকালে সমুদ্রগামী জাহাজ পাল তুলিয়া চলিত। তাহার অভ্যন্তরে ঘর বাড়ী, উদ্যান প্রভৃতি থাকিত। তাহাতে সহস্রাধিক ব্যক্তি একত্রে যাইত। জাহাজগুলি দেখিতে অতি সুদৃশ্য ছিল এবং তাহাদিগকে ভাসমান প্রাসাদ বলিয়া মনে হইত।

চীনা সম্রাটের নিকট প্রেরিত সমুদয় উপঢৌকন লইয়া তিনি চীনা জাহাজে যাত্রা করিবেন। তাঁহার সমুদয় দ্রব্যাদি জাহাজে প্রেরিত হইল। কিন্তু কোন কারণে তিনি সাগরবেলায় পড়িয়া রহিলেন। জাহাজ পাল ভরে চলিয়া গেল।

সুলতানের নিকট দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতে তাঁহার আর সাহস হইল না। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিলে হয়ত খেয়ালী সম্রাট তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক অথবা আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিবেন, এই কথা মনে করিয়া বতুতা আর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন না।

তিনি পশ্চিম উপকূলে নানা শহরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মালদ্বীপ পরিদর্শনের বাসনা

জন্মিল। সেখানে গমন করিয়া তিনি কাজীর পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি সেখানে মাত্র কয়েকমাস বাস করেন। ইহারই মধ্যে তিনি তথাকার উজীরের কন্যা এবং অপর তিনটি কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

এখানে স্ত্রীলোকগণ বিনাবস্ত্রেই রাজপথে বাহির হইত। তিনি এই প্রথা নিবারণের যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। এখানে তাঁহার পত্নীগণ এই যাযাবর বতুতার জীবন-সঙ্গিনীরূপে আপনাদের ভাগ্য বিড়ম্বিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং এই দ্বীপ-ত্যাগের পূর্বেই তিনি পত্নীগণকে পরিত্যাগ করেন। তিনি এখানেও অধিককাল বাস করিতে পারিলেন না। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি সিংহল যাত্রা করিলেন। তথাকার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তিনি সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বীচিবিক্ষুব্ধ সাগরবেলায় উপবেশন পূর্বক আলো ও আঁধারের সন্ধিক্ষণে ম্লান সন্ধ্যায় পশ্চিম গগনে অস্তায়মান সূর্যের বর্ণ-বৈচিত্র্যে তিনি মুগ্ধ হইতেন। উপরে নীলাকাশ, পদতলে যতদূর দৃষ্টি যায় সফেন নীল সলিলরাশি গর্জিয়া ফুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে দিকচক্রবালের সীমারেখায় এই উভয়ের মিলন হইয়াছে। নিশাগমে সমুদ্রতটে অসংখ্য নারিকেল, তাল প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে শুভ্র চন্দ্রমা তাহার স্নিগ্ধ মধুর জ্যোৎস্নায় পৃথিবীবক্ষে এক অপরূপ রূপের হিল্লোল তুলে। পশ্চাতে অভ্রভেদী ধবল তুষারমৌলি নীল হিমাদ্রি অচলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যে মরুবাসী ইবন্ বতুতা বিস্মিত হইবেন তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

প্রকৃতির এই অপরূপ লীলানিকেতন ও তাঁহার অন্তরের ভ্রমণস্পৃহা নিবারণ করিতে পারিল না। তিনি বঙ্গদেশে এক মুসলমান ফকিরের উদ্দেশ্যে নৌযানে বাহির হইয়া পড়িলেন। তেতাল্লিশ দিন ভ্রমণের পর চট্টগ্রামের সমুদ্রবেলায় উপনীত হইলেন। ধর্মপ্রাণ ফকির সেখ জালালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীহট্টে সাহ জালালের সমাধিস্থান অদ্যাপি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আছে।

এখান হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে ঢাকায় আসিয়া পুনরায় বতুতা নৌযানে আরোহণ করিলেন। এবার চল্লিশ দিনে সুমাত্রায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাহির নামক জনৈক ধার্মিক মুসলমান রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং চীন দেশ পরিভ্রমণের জন্য নৌযানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি সুমাত্রা, মালাবার, ওমান, পারস্য, বাগদাদ প্রভৃতি দেশ একে একে অতিক্রম করিয়া তোদমরের মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া আসিলেন। দমাসকাস নগরে আগমন করিয়া বহুদিবস পরে তাঁহার পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ পাইলেন। শুনিলেন পনর বৎসর পূর্বে তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখানে দেখিলেন, চতুর্দিকে মৃত্যুর করালছায়া বিস্তার করিয়াছে। এক দিবসে চব্বিশ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই প্লেগের সূত্রপাত হইল রুশিয়ার দক্ষিণে। তৎপরে ক্রিমিয়া ও জেনোয়ার মধ্য দিয়া পশ্চিম ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। আরমেনিয়া দেশের ভিতর দিয়া প্লেগ মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়িল। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে এই রোগ ইংলণ্ডেও দেখা দিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ষাট জন ছাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইংলণ্ডের ছয় আনা রকম অধিবাসী কালের করালগ্রাসে পতিত হইল। ইউরোপে আড়াই কোটী নরনারী অন্তর্হিত হইল।

বতুতা এখান হইতে চতুর্থবার হজ করিলেন। অবশেষে চব্বিশ বৎসরে পঁচাত্তর হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়া ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

তত্রত্য বাদশাহ প্রতিদিন বতুতা বর্ণিত উপন্যাস অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক এই ভ্রমণকাহিনী শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে ইহা লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তাঁহার এক প্রধান কর্মচারী—মহম্মদ ইবন্ জুজাইকে এই বিচিত্র কাহিনী লিখিয়া যাইবার জন্য নিয়োগ করিলেন। দিনের পর দিন বতুতা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গেল। ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর এই অমূল্য ইতিবৃত্ত রচনা সম্পূর্ণ হইল।

বতুতা অধিক দিন গৃহে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। রাজসম্মান, গৃহের সুখশান্তি, অতিক্রান্তপ্রায় যৌবন—কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না! উপরে সুদূর প্রসারিত নীলাকাশ, সম্মুখে সফেন নীল দুস্তর পারাবার, অন্তরে অদম্য

ভ্রমণস্পৃহা। তিনি এবার ইউরোপের দিকে পদচালনা করিলেন। সে কাহিনী এখানে দিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না।

কয়েক বৎসর পরে তিনি পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তিয়াত্তর বৎসর বয়সে ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহাবসান হইল।

কলম্বাস ও মার্কো পোলো সম্বন্ধে দীর্ঘ পুস্তকাবলী রচিত হইয়াছে; কিন্তু মিসরবাসী ইবন বতুতার বহুমূল্য ইতিবৃত্ত সেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ইহার কারণ তিনি ইউরোপবাসী ছিলেন না।

এই ভ্রমণকাহিনী আরবী ভাষায় লিখিত বলিয়া উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইহা ইউরোপে অজ্ঞাত ছিল। ফরাসীগণ কনষ্টেনটাইন দেশ জয় করার পর এই হস্তলিখিত বিবরণ ফরাসী পণ্ডিতগণের হাতে পড়িল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত দি ক্রিমেরী এবং ডক্টর সেনগুইনেথি চারিখণ্ডে ইহার সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন।

অভাবনীয়

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

"প্রিয়তম, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।"

"অনুরোধ? আবার টাকার দরকার হয়েছে বুঝি?"

"সত্যি, টাকার জন্য বার বার তোমায় বিরক্ত করতে লজ্জা করে। কিন্তু এমনই তাদের অবস্থা যে সাহায্য না করলেই নয়। বাপ হাসপাতালে—দেনার দায়ে তারা সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছে। পঞ্চাশ পাউণ্ড তাদের বিশেষ দরকার।"

"তোমার কথা শুনে তাদের ওপর সবারই দয়া হবে। কিন্তু এ ভাবে আর আমি টাকা খরচ করতে পারি নে। তুমি তো জানই, এ মাসে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে—হিসেব ক'রে না চললে পরে হয় ত মুস্কিলে পড়তে হবে।"

স্বামী মঁসিয়ে দ্য তার্সাক একটু রূঢ়ভাবেই কথাগুলো বলেন; কিন্তু তাঁর ঐ অসন্তোষ স্থায়ী হয় না বেশীক্ষণ। কথা শেষ ক'রেই স্ত্রীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদু হাসেন তিনি—সুন্দরী স্ত্রীটির উপর বেশীক্ষণ রাগ ক'রে থাকা তাঁর পক্ষে সত্যিই কষ্টকর। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি—নৌ-বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ। বাড়ীতে থাকেন খুব কম—সমুদ্রের উপরেই কাটাতে হয় বছরের বেশীর ভাগ সময়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর সময় কাটে দুঃস্থ প্রতিবেশীদের পরিচর্য্যা ক'রে। এ কাজে তার উৎসাহ এত বেশী যে অত্যন্ত জঘন্য ইতর পল্লীতেও সে যাতায়াত করে এবং ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলামেশা করে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে।

লোকে বলে, পিতার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই দরিদ্রের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করেছে। পিতা ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল—নানা রকম দুষ্কর্ম্ম ক'রে লোকনিন্দা ও অপমানের ভয়েই শেষটা তিনি আত্মহত্যা করেন। মেয়ে কিন্তু বাপের সম্পূর্ণ বিপরীত—অতি নির্ম্মল তার চরিত্র। স্বামী তার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত—তার নির্ম্মল চরিত্র ও অনুপম লাবণ্য দুই-ই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। মঁসিয়ে তার্সাকের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কিন্তু খুব বেশী খরচ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র মেয়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করা তিনি কর্ত্তব্য বলেই মনে করেন।

স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে স্বামী বলেন, "আমাদের যদি কোন সন্তান না থাকত তাহ'লে তুমি এখন যা পাও তার চেয়ে অনেক বেশী তোমায় দিতে পারতাম, কিন্তু জীনের কথা আমাদের ভাবতে হবে ত—তার ভবিষ্যৎটা নষ্ট হতে দিতে পারি নে!"

"তুমি ঠিকই বলেছ, প্রিয়তম। সাংসারিক বুদ্ধি আমার কম।" স্ত্রী হেসে জবাব দেয়।

*　*　*　*　*

চৌদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ে জীন্—মাথায় ঘন সোনালি কেশ, নীলাভ চক্ষু—মুখে ম্যাডোনার কমনীয়তা। ঘরের অপর কোণে কি একটা সেলাই নিয়ে সে ব্যস্ত—মা-বাপের কথাবার্ত্তা কানে এসে পৌঁছতেই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সে উঠে পড়ে। জড়িতকণ্ঠে বলে, "না বাবা, মা যা চান তাই ওঁকে করতে দাও—আমার জন্য তোমরা অত উদ্বিগ্ন হয়ো না। টাকাকড়ি কি হবে আমার? আমি চাই ধর্ম্মোপাসনায় এ জীবন উৎসর্গ করতে। স্কুল ছেড়ে চলে আসার আগেই আমি ঠিক করেছি, কন্ভেণ্টে ভর্ত্তি হব।"

পিতা সস্নেহে মেয়েকে আলিঙ্গন করে বলেন, "এখন তুমি একটু ও ঘরে যাও—তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্য এক সময়ে আলোচনা করা যাবে।"

"দয়া ধর্ম্ম তোমার চেয়ে জীন্ বোঝে বেশী!" স্ত্রী শান্ত স্বরে অনুযোগ করে।

তার্সাক প্রতিবাদ করেন না, শুধু একটু হাসেন। তারপর স্ত্রীর নরম হাতদুখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলতে সুরু করেন, "দেখো,

তোমার মনে আঘাত দিতে আমি চাই নে। পঞ্চাশ পাউণ্ড তোমার দরকার—এত টাকা দেওয়া আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার ঐ আংটি ক'টা বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পার—এতে আমার সম্মতি আছে ; আর আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আসছে মাসে ঐ জিনিষগুলো খালাস ক'রে নেবে।"

"আংটি বন্ধক দেবো?" স্ত্রী বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চায়।

"দিলেই বা—আসছে মাসেই ত ছাড়িয়ে নেবো।"

"বন্ধু-বান্ধব যখন দেখবে আমার হাতে আংটি নেই তখন তারা ভাববে কি?"

"ছুটো থাকলেই যথেষ্ট—ঐ হীরের আংটি আর…"

"না, না, তা হতে পারে না। ঐ আংটিগুলোর সঙ্গে অতীতের অনেক পবিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ও গুলো হাতছাড়া করলে অপরাধী হ'তে হবে!"

"তার মানে অলঙ্কারের ওপর তোমার এতটা আকর্ষণ যে তুমি ঐ আংটিগুলো আঙুলে না পরে একদণ্ডও থাকতে পার না!" স্বামী বিরক্তির সুরে বলেন।

"তুমি ভুল বুঝছ।" তাড়াতাড়ি আংটিগুলো আঙুল থেকে খুলে স্ত্রী গহনার বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়।

"এই দেখো আংটিগুলো বাক্সের মধ্যে সরিয়ে রাখলাম। আংটি পরার ওপর আমার কোন লোভ সেই—বন্ধক দিতে আপত্তি।"

স্ত্রী চলে যাবার পর মঁসিয়ে তাস'াক অন্যমনস্কভাবে গহনার বাক্সটা খুলে অলঙ্কারগুলির দিকে তাকান একবার। বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে স্ত্রীকে তিনি যে সমস্ত উপহার দিয়েছেন সবই রয়েছে তার মধ্যে, বিবাহের প্রতিশ্রুতির নিদর্শন সেই স্বর্ণাঙ্গুরী… প্রথম দাম্পত্য কলহ নিষ্পত্তির উপঢৌকন সেই হীরার ব্রেসলেট…সন্তান প্রসবের পর পত্নীর পুরস্কার সেই পান্নার দুল…জন্মদিনের ছোট ছোট রকমারি উপহার, বিবাহ দিনের স্মারক উপহার—সেই সব মণি মুক্তার অলঙ্কার। একগাছা মুক্তার হার তুলে নিয়ে আনমনে তিনি নাড়াচাড়া করেন। হঠাৎ হাত ফসকে সেটা মেঝেয় পড়ে যায়—নিজের অসতর্কতার জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে তিনি সেটা তাড়াতাড়ি তুলে নেন—লক্ষ্য ক'রে দেখেন ছুটো মুক্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

হঠাৎ সন্দেহ জাগে তাঁর মনে। আসল মুক্তা এত সহজে ভেঙে যায় কি? আশ্চর্য্য!…পরক্ষণেই নিজের এ সন্দেহের জন্য মনে মনে তিনি লজ্জিত হন…কিন্তু সন্দেহটা কিছুতেই যেতে চায় না যেন!

অবশেষে তিনি তাঁর পরিচিত জহুরীর দোকানে উপস্থিত হন।

দোকানদার মুক্তাগুলো ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বলে, "এ জিনিষ আমার দোকানের নয়। আমি যে মুক্তার হার আপনাকে বেচেছি, এ তার অনুকরণ মাত্র।"

এখন তিনি বুঝতে পারেন কেন তাঁর স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে আপত্তি! গহনাগুলো রেখে কেউই যে টাকা দেবে না তা সে জানে… তা'ছাড়া গহনা বন্ধক দিতে স্বামী যদি কোথাও যান তা'হলে তো সমস্ত রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে।

তাড়াতাড়ি তিনি গৃহে ফিরে আসেন—এতদিন যাকে সত্যনিষ্ঠ বলে জেনে এসেছেন তার এই মিথ্যাচারে মন তাঁর অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত!

বাড়ীতে এসে দেখেন, স্ত্রী বাইরে গেছে, তবে শীঘ্রই যে ফিরবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মঁসিয়ে তাস'াক বাইরের ঘরে বসে থাকেন—স্ত্রীর অপেক্ষায়। জীনও বসে থাকে কাছে।

আটটা বেজে যায়। এখনই সে ফিরবে নিশ্চয়। এত দেরী ত কোন দিনই হয় না তার!…তাস'াক মেয়ের কাছ থেকে উৎকণ্ঠা গোপন করার চেষ্টা করেন।

হঠাৎ সদর দরজা খোলার শব্দ কানে আসে। কারা যেন কি সব বলতে বলতে হলের ভিতর ঢুকছে। ব্যস্তভাবে উঠে পড়েন তিনি—এক আশঙ্কায় মন তাঁর চঞ্চল হয়ে ওঠে—দ্রুতপদে অগ্রসর হন হলের দিকে।

হলে ঢুকতেই দেখেন, জন কয়েক লোক তাঁর স্ত্রীকে ধরাধরি করে উপর তলায় নিয়ে যাচ্ছে—সে যে সংজ্ঞাহীন তা বুঝতে কষ্ট হয় না—সঙ্গে একজন ডাক্তার।

* * * * *

"তেমন কোন বিপদের আশঙ্কা নেই" ডাক্তার ধীরভাবে মন্তব্য করেন। "তবে একটু জ্বর আছে, মাঝে মাঝে হয়ত বিকারের লক্ষণ দেখা যেতে পারে।…ওতে ভয় পাবেন না যেন……মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন উনি, বেঁচে গেছেন শুধু ঐ ঘন চুলের জন্যে।"

"কিন্তু এমনভাবে ওকে আঘাত করলে কে?" একটু আশ্বস্ত হবার পর তাস'াক জিজ্ঞাসা করেন।—"কখন্ এ ব্যাপার ঘটল, আর এর কারণই বা কি তা কিছু জানেন?"

ডাক্তারের পিছনে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল, সে এগিয়ে আসে এখন। সে একজন কর্ম্মচারী।

"আমি তখন কোয়ার্তিয়ার দু লা শ্যাপেলে ডিউটিতে ছিলাম," সে বলতে সুরু করে, "হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে অর্দনেয়ার ষ্ট্রিটের পোষ্ট অফিসের দিকে ছুটে আসছে—চীৎকার ক'রে সে বলছে ৫৬ নম্বর বাড়ীতে খুন হয়েছে। কাছে যেতে শুনতে পেলাম, সে বলছে, যে-লোকটা খুন করেছে তাকে সে দেখেছে ঐ বাড়ী থেকে পালাতে—লোকটাকে সে চেনে—ঐ অঞ্চলের একজন নাম-করা বদমায়েস। দু'জন সহকর্ম্মীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ৫৬ নম্বর বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। ওটা একটা হোটেল—শহরের যত সব বদমায়েস ওখানে আড্ডা জমায়। দোতালার একখানা ঘরে দেখতে পেলাম, বিছানার উপর একটি মেয়ে অচৈতন্যের মত শুয়ে আছে—দেহ অর্দ্ধনগ্ন।…সৌভাগ্যের বিষয় পকেটে তার একখানা চিঠি ছিল—সেই চিঠি থেকেই আমরা তার পরিচয় ও ঠিকানা জানতে পারলাম। ডাক্তার ডাকা হ'ল, পরীক্ষা ক'রে তিনি বললেন, মেয়েটিকে আমরা অন্যত্র নিয়ে যেতে পারি ; আমরাও তাই নিয়ে এলাম এখানে।"

"আততায়ীকে তোমরা কেউ দেখতে পাওনি?"

"না। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।"

"তবে এখনও তাকে গ্রেপ্তার করনি কেন?"

লোকটি ইতস্তত করে। তারপর তাসাককে একপাশে ডেকে নীচু গলায় বলে, "দেখুন, এ ব্যাপার সম্বন্ধে চুপ ক'রে যাওয়াই কি ভাল নয়? এ রকম একটা ব্যাপারে আপনার নাম যদি খবরের কাগজে ছাপা হয়, তাহ'লে আপনার সম্মান···পদমর্য্যাদা···"

"আমি বেশ বুঝতে পারছি," তাসাক উত্তেজিতভাবে বলে ওঠেন, "পরোপকার করতে গিয়েই আমার স্ত্রী দুর্ব্বৃত্তদের ফাঁদে ধরা পড়েছে—তারা ওর ওপর নির্য্যাতন করেছে টাকার লোভে। তারা হয় ত ভাবছে, আদালতে যেতে ভয় পাব আমি···কিন্তু আমি অত ভীরু নই, শাস্তি ওরা কিছুতেই এড়াতে পারবে না।"

"কিন্তু এ নিয়ে হৈ চৈ করা ঠিক হবে না মোটেই···"

"ওসব কথা আমি শুনতে চাই নে। আমি তোমায় আদেশ করছি, অপরাধীর সন্ধান ক'রে যথাসম্ভব শীঘ্র আমায় খবর দেবে।"

"তাই হবে। আপনার যদি তাই ইচ্ছা হয় আমরা আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। তবে একটা কথা—এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করবার আগে আমার অনুরোধ আপনি একবার কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবেন। আমি যা ইঙ্গিতে জানাতে পেরেছি, তিনি হয় ত সে সম্বন্ধে এমন সব তথ্য দিতে পারেন যাতে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে।"

আর কিছু না বলে লোকটি বিদায় নেয়। তার্সাকের মনে ভয় ও সন্দেহ জাগে যেন। লোকটা কি বলতে চায়?

তার্সাক উপরতালায় উঠে যান—স্ত্রী কেমন আছে দেখবার জন্যে।

দেখেন ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার—শুধু যে অসুস্থ তা নয়, অন্য বিষয়েও সে একেবারে বদ্‌লে গেছে!···মনে হয় যেন তার ঐ আকস্মিক পীড়া তার মুখোসটাকে খুলে নিয়ে তার সত্যকারের রূপ তাঁর চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছে!··

হঠাৎ সে শয্যায় উঠে বসে কি সব বলতে সুরু করে—কথাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ও খাপছাড়া।

ডাক্তার এগিয়ে আসেন।

"সবাইকে এখান থেকে সরে যেতে বলুন," ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলেন, "আপনার স্ত্রীর এই প্রলাপোক্তি···অত্যন্ত পীড়াদায়ক।"

"তার অর্থ?"

"গাড়ী করে আমরা যখন ওঁকে নিয়ে আসছি তখন উনি প্রলাপ বকেছেন। যে-সব কথা উনি তখন বলছিলেন তা শুনলে সাধারণ লোক হয় ত অবাক হয়ে যাবে।"

"কেন—অবাক হবে কেন?"

"বিকারের ঘোরে শান্ত নিরীহ মেয়েরাও যা-তা প্রলাপ বকে—অত্যন্ত বিশ্রী অশিষ্ট ভাষাও তাদের মুখ থেকে বেরোয়। এটা···এটা হচ্ছে বিকারেরই একটা লক্ষণমাত্র।"

"আপনি কি বলতে চান যে আমার স্ত্রী ·"

"আমি বলছি কি একজন নার্স ডেকে আনা ভাল", ডাক্তার ধীরভাবে বলেন, "আর আপনি নিজেই যদি যান ত আরও ভাল হয়।"

"কেন, আমি অনায়াসে কাউকে পাঠাতে পারি ·"

"এই কার্ডের ওপর ঠিকানা আছে—এই বেলা চলে যান—"

হঠাৎ তার্সাকের মনে ধারণা হয়, এ যেন তাঁকে বিদায় করবার কৌশল।

কিন্তু কেন ওরা তাঁকে বিদায় করতে চায়? কি সে রহস্য যা ওরা তাঁর কাছে গোপন করছে?···তাসাকের জেদ্ চেপে যায়। বলেন, "আমার যাওয়া সম্ভব হবে না—কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

হঠাৎ স্ত্রীর দিকে একটু ঝুঁকে কি যেন লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি।

"দেখ'ছ ডাক্তার, ঠোঁটে রুজ মাখানো রয়েছে না? মুখে পাউডার, ভুরু রঙ দিয়ে আঁকা।···আশ্চর্য্য! আমার স্ত্রী ত এসবে অভ্যস্ত ছিল না কোন দিন!"

ডাক্তার অন্যদিকে মুখ ফেরান—চাঞ্চল্য গোপন করবার জন্য।

হঠাৎ রোগিণী চোখ মেলে চায়। রঙ দিয়ে আঁকা ভুরুর নীচে বিস্ফারিত চোখের বিহ্বল দৃষ্টি!···ভীত উদ্বিগ্নমুখে দুজনে তার মুখের পানে চেয়ে থাকেন—তার কথা বলার অপেক্ষায়।

"আমি এসেছি, বন্ধু!" চাপা মিহিগলায় সে বলতে সুরু করে, "দেখো তোমার আদেশ পালন করেছি আমি···তোমাকে খুশী করবার জন্যে কেমন সেজে এসেছি!···বল ত আজ আমায় মেসালিনার মত দেখাচ্ছে কি-না?···আমি জানি এসব তোমার ভারী পছন্দ "

ডাক্তার তার্সাকের হাত ধরে টানেন।

"বাইরে যান আপনি···আমি একাই রোগিণীকে দেখতে পারব।"

ডাক্তারের কথায় তার্সাক কান দেন না।

"সব কথা আমি শুনব—সব কথাই। শোনার অধিকার আমার আছে।" তার্সাকের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

* * * * *

আবার তাঁর স্ত্রী বকতে সুরু করে। হঠাৎ তার স্বর বেদনায় করুণ হয়ে ওঠে—

'আমায় মার···তিরস্কার কর···কিন্তু ত্যাগ কর না আমায়··· আমি তোমায় ভালবাসি···তোমায় ছেড়ে বাঁচব না আমি···শপথ ক'রে বলছি, আমার কাছে এখন এক কপর্দ্দকও নেই···রাগ ক'র না তুমি, শীঘ্রই কিছু টাকা তোমায় জোগাড় ক'রে দেবো···মিনতি করছি, রাগ ক'র না···আসল হীরাজহরতগুলো যদি আমার থাকত···কিন্তু সব আমি বেচে দিয়েছি···প্রিয়, তোমার চিঠিগুলি কতবারই না পড়ি···পড়ে যেন আশ মেটে না—কি সুন্দর, কি মাধুর্য্যভরা "

আর কিছু শোনবার অপেক্ষা করেন না তার্সাক। পাশের ঘরে গিয়ে স্ত্রীর দেরাজটা খুলে ড্রয়ারের ভিতরকার কাগজপত্র পরীক্ষা করতে থাকেন ব্যস্তভাবে। খানিক পরে একরাশ কাগজের ভিতর থেকে বের

করে আনেন সিল্কের ফিতা বাঁধা একতাড়া চিঠি। প্রত্যেক চিঠির উপরে পুরুষের হস্তাক্ষরে লেখা তাঁর স্ত্রীর নাম। এইগুলোই তাঁর দরকার।

চিঠিগুলো তিনি পড়তে সুরু করেন। কোন চিঠিতে অতীত বিলাস-রজনীর অফুরন্ত আনন্দের কথা, কোনটায় ভাবী মিলনের প্রতিশ্রুতি, কোনটায় বা টাকার তাগাদা। চিঠি পড়তে-পড়তে তার্সাক শুনতে পান, মাঝে মাঝে স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠছে—তার গোপন জীবনের ইতিহাস অভিব্যক্ত হচ্ছে প্রলাপের মধ্যে।

টলতে টলতে তার্সাক ডাক্তারের কাছে ফিরে আসেন।

"ডাক্তার, আর আমি শুনতে পারছি না। তুমি ওকে শান্ত কর।··· মর্ফিয়া—হ্যাঁ, মর্ফিয়া দাও না ওকে—যাতে ও আর কথা বলতে না পারে।"

"মর্ফিয়া!" ডাক্তার বিস্মিত দৃষ্টিতে তার্সাকের মুখের পানে তাকান। "আপনি কি পাগল হলেন নাকি? এখন উনি এত দুর্ব্বল যে মর্ফিয়া দিলে ওঁর মৃত্যু হবে।"

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার বিদায় নেন, স্ত্রীও ঘুমিয়ে পড়ে, তার্সাক ঐ কদর্য্য চিঠিগুলি একটি একটি করে পুড়িয়ে ফেলেন।

মায়ের গোপন পাপাচারের কথা যদি সে কোন দিন টের পায়, তবে তাঁর মেয়ে—নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ঐ জীন্—কি মনে করবে? এই নারীর সাহচর্য্য কি ঐ নিষ্পাপ কিশোরীর পক্ষে শুভকর হবে? কি অজুহাতেই বা তিনি তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবেন?

তার্সাক ধীর সংযতভাবে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে আলোচনা ক'রে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সারা রাত চিন্তায় কেটে যায়।

প্রভাতের ক্ষীণ পাণ্ডুর আলো যখন বাতায়নপথে দেখা দেয় তখন তার্সাক ধীরে ধীরে উঠে ঘরের কোণে ছোট একটি দেরাজের কাছে উপস্থিত হন। দেরাজটি খুলে একটি সিরিঞ্জ বের করে হলদে রঙের একটা তরল পদার্থ ভরে নেন তার মধ্যে। এতটুকু চঞ্চল না হয়ে—অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত ধীর অবিচলিতভাবে—স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ান—তারপর তার বাঁ হাতখানা তুলে ধরে সিরিঞ্জের তরল পদার্থ সঞ্চালিত করে দেন দেহের মধ্যে।

খানিক পরে স্ত্রীর মুখখানা পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দেন—তার কলঙ্কিত জীবনের ছাপ নিঃশেষে মুছে দিতে। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীর হাতদুখানা তুলে ধীরে ধীরে যুক্ত করে দেন।

প্রবল চেষ্টায় দেহটাকে সোজা ক'রে স্থির পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে যান এবং সশব্দে দরজাটা উন্মুক্ত করেন।

"জীন্!" চীৎকার করে ডাকেন তিনি, "জীন্! এদিকে এস··· তোমায় এখন সাহস সঞ্চয় করতে হবে···তোমার মাকে···হতভাগিনী মাকে বিদায় জানিয়ে যাও।" *

* ফরাসী লেখক—আলফ'স দোদে হইতে।

মনে হয়—

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার

মনে হয় বৈশাখের জল-ভরা কালো মেঘ হ'য়ে
সাহারার শুষ্ক তালু দিই জুড়াইয়া র'য়ে র'য়ে

আমার শীতল ধারে। বিদ্যুতের আলোক শিখায়
এঁকে' যাই আলিপনা কুণ্ঠাহীন অপূর্ব্ব-লিখায়

নিরালোক পথ-মাঝে, দিশেহারা পথিকের লাগি।
গোপনে যেথায় হায় বিরহিনী রহিয়াছে জাগি'

শূন্য মনে একাকিনী; মনে হয়, আপনারে দিয়া
মিলনের সেতু রচি'—প্রণয়ের পূর্ণতারে নিয়া

দু'জনের মাঝে যেন।—সেই পথে আসিয়া দোঁহায়
মুখোমুখি থাক্ বসি সোহাগের নিবিড় ছায়ায়!···

যে-কথা বলে নি কেহ, ভাবে নাই কেহ কোনদিন—
তাহারে করিব বিশ্বে চিরন্তন বন্ধন-বিহীন;

অনিত্য কালের বুকে নিত্য তার জয়মাল্যখানি,—
গাঁথা হোক্ ল'য়ে মোর কুণ্ঠাহীন সেই কণ্ঠবাণী!···



সহপাঠিনী

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এসসি

২

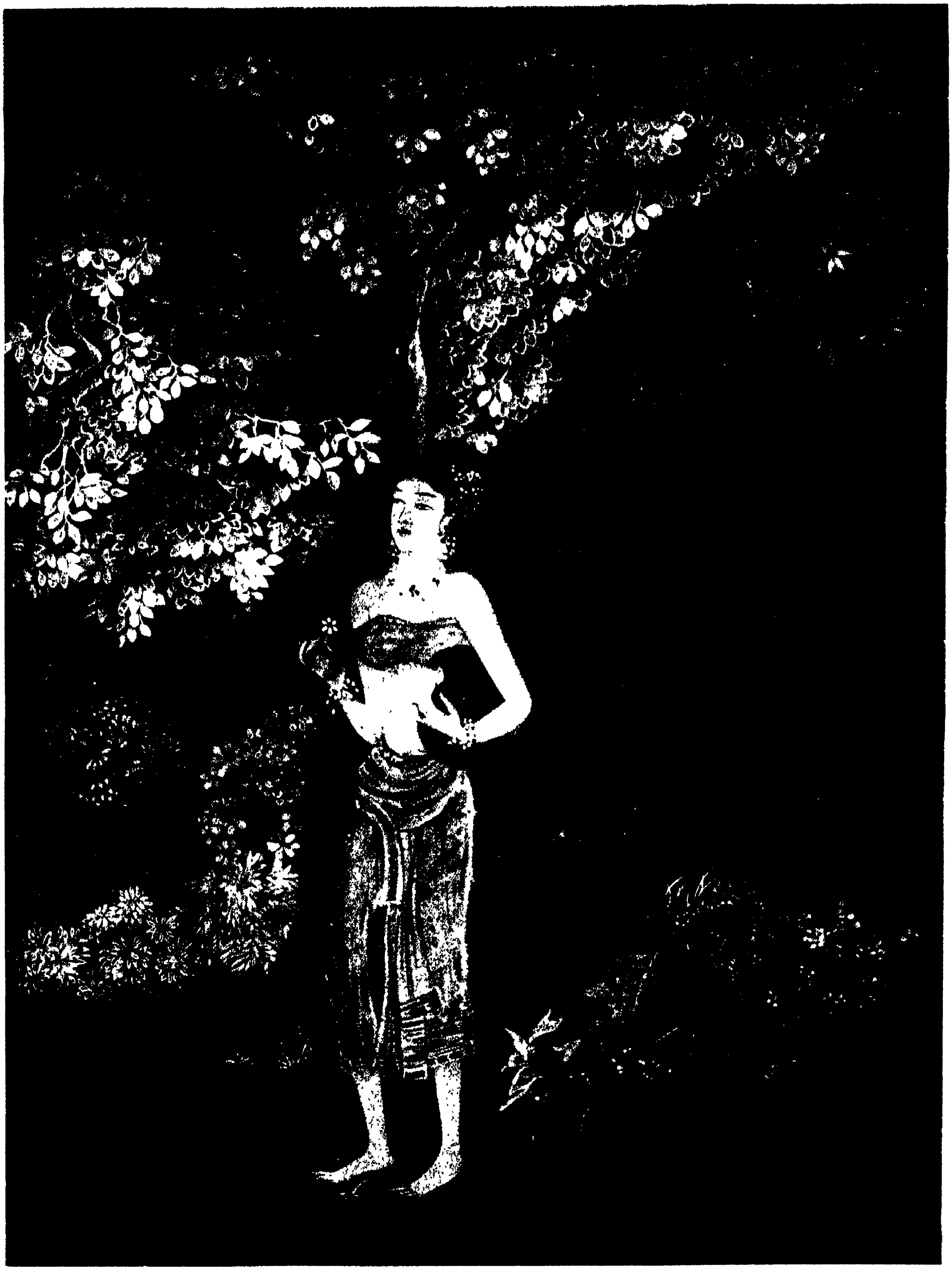
আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় আমাদের কর্ম্মজীবনে বেশ একটু বদল হ'ল। ভোরবেলায় রাত থাক্‌তে উঠ্‌তে হ'ত—তাড়াতাড়ি সকালবেলায় প্রাতঃকৃত্য সেরে, কাপড়-চোপড় পরে দুজনে একসঙ্গে বাসে ভবানীপুর যেতাম। সাড়ে ছটায় ক্লাশ আরম্ভ হ'ত। সাড়ে দশটায় ছুটি। যাবার সময় বাসে বেশ যেতাম—আস্‌বার সময় কালীঘাট থেকে শ্যামবাজারের বাসে আসা একটা সমারোহ ব্যাপার। আপিসের বেলা—বাসে দাঁড়াবার যায়গা থাক্‌ত না। ড্যালহৌসী পর্য্যন্ত লেডীজ্‌ সীটে মেয়েরা কোনও রকমে দেহ রেখে আস্‌ত। তার পর আবার খালি হয়ে যেত। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি বর্ষা—এইভাবে দুবৎসর গেছ্‌ল। শেফালি এতদিনে বেশ একটু ফক্কড় হয়েছিল—সে আমায় বাসে বসে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে এমন সব কথা বলতে থাক্‌ত যে আমার হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধরে যেত। আমি যত হাসি চাপ্‌তে চেষ্টা করতাম, তত হাসি যেন পেট ফেটে বেরোত। অত লোকের সাম্‌নে আমার অমন হাস্‌তে লজ্জা হ'ত কিন্তু শেফালির ভ্রূক্ষেপ নেই। 'ওই প্যাসেঞ্জারের ভুঁড়িটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে', 'ওর গোঁফের পাক্‌টা কেমন', 'ওর দাঁড়াবার ভঙ্গী কেমন', 'ওই লোকটা বাস থেকে নাম্‌বার জন্যে 'বাঁধকে বাঁধকে' করে কেমন চেঁচাচ্ছে' 'ওই লোকটা আমার দিকে কেমন চুরি ক'রে দেখ্‌তে গিয়ে ধরা পড়ে কাঁচুমাচু খাচ্ছে' 'ও কেমন এইটুকুর মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছে'—ইত্যাদি আমার কানের কাছে বলে—আর আমার হাসিতে পেট ফেটে যায়। সেও হাসে। এমনই ক'রে যাওয়া-আসা করতে করতে দেখি, এল্‌গিন রোড়ের মোড় থেকে রোজ একজন যুবক আমাদের বাসে ওঠে আর কোনও দিন এস্‌প্ল্যানেড্‌, কোনও দিন ড্যালহৌসী, কোনও দিন বা বৌবাজারে নেমে যায়। সে চাকরি করে বোঝা যায়। আউট-ডোর কাজ ব'লে অনুমান হয়। দু-চার দিন তাকে লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম্‌—সে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে প্রত্যহ চেয়ে চেয়ে দেখে এবং চোখের ভাষায় কোনও চিরন্তনী বাণী শোনাবার চেষ্টা করে। দৃষ্টিতে বেশ একটু সম্ভ্রম মাখানো আছে। মধ্যে মধ্যে তার সঙ্গে আর একটি ছেলে থাকে। এরা উভয়েই যে আমায় ওয়াচ্‌ করে, এটা বুঝতে কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। এদের কথোপকথনে জান্‌লাম, প্রথমোক্ত যুবকের নাম উৎপল মিত্র, দ্বিতীয়োক্ত অনঙ্গ সেনগুপ্ত। আমাদের কলেজের শ্যামবাজারবাসিনী মেয়েরাও বলে তাঁরা বাসে বাড়ী ফিরে যাবার সময় দেখেছে প্রত্যহ উৎপল এল্‌গিন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আমি যে বাসে না থাকি, সে বাসে সে ওঠে না। কত দিন মেয়েরা দেখেছে—তাড়াতাড়ি ভিড়ে বাসে উঠে আমায় যদি না দেখ্‌তে পেয়েছে তবে তখনই সে বাস্‌ থেকে সে নেমে গেছে। কোন কোনও দিন আমাকে হয়ত ভিড়ে সে দেখ্‌তে পায় নি—আমি দেখি সে চারিদিক খুঁজে লক্ষ্য বস্তু দেখ্‌তে না পেয়ে নেমে গেল। মেয়েরা সকলে হেসে উঠ্‌ল। উৎপলের এইরূপ নীরব পূজারির ভাব দেখে মেয়েরা তার সম্বন্ধে বেশ একটু 'ইণ্টারেষ্টেড্‌' হ'য়ে উঠ্‌ল। অনঙ্গকে খুব কম তার সঙ্গে দেখা যায়। সে উৎপলের চেয়ে একটু বেশী 'ডিগ্‌নিটি' দিয়ে আমার দিকে দেখে। এদের উভয়ের দেখার মধ্যে এমন একটা ভাব আছে—যে আমাদের মনে কোনও রকম ক্রোধ বা বিরক্তির সঞ্চার করতে পারে না। সহপাঠিনী মেয়েরা কেউ কেউ হয়ত নিত্য এরকমটা তাদের একজনকার 'ওয়াচ্‌ড্‌' হয়ে আমার থাকাটা বরদাস্ত করতে মনে মনে অরাজি, এমনভাবে আমাকে বলাবলি করে। কিন্তু আমার বা অন্য মেয়েদের তরফ থেকে কোনও রকম 'প্রটেষ্ট' বা আপত্তি জানাবার অবকাশ তারা কখনই তাদের ব্যবহারে দেয় না। কারণ তাদের কাজে বাহ্যত আপত্তিজনক কিছুই নেই—। একদিন আমরা পরামর্শ ক'রে বাসে না গিয়ে ট্রামে ফিরছি। দেখি উৎপলচন্দ্র ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ট্রামের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে লাফিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে

পড়ল। আমরা এস্‌প্লানেডে শ্যামবাজারের ট্রাম বদলে নিলাম। সেও সেই ট্রামে উঠ্‌ল। সে সময় আমাদের মধ্যে নিভা বলে একটি মেয়ে বলে উঠ্‌ল, "ছেলেটা কি বেহায়া, মাগো, মা!" আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম নিভার এই নির্লজ্জ উক্তি শুনে—তাকে একটা জোরে চিম্‌টি কেটে দিলাম। শেফালি তা দেখে বলে উঠ্‌ল, "বেলাদির প্রাণে লেগেছে, অমন ক'রে বলিস্‌নি।" শেফালির ভাগ্যেও একটা চিম্‌টি জুট্‌ল। মেয়েমানুষের এটা সনাতন অস্ত্র—বি. এস্‌-সি পড়লে কি হবে—সংস্কার কোথা যাবে। উৎপলের কিন্তু এ সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দিব্যি শ্যামবাজারের টিকিট কেটে বসে আছে। আমি ভাব্‌ছি—এ ছেলেটার যদি ইন্‌ডোর চাকরী হ'ত··আর এ্যাটেণ্ডান্‌স্‌ থাক্‌ত, তা হ'লে ওকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে হ'ত। সেদিন কিন্তু নিভার কথায় আমার মনে হ'ল যে উৎপল ছেলেটার জন্য আমার একটু মমতা হয়। বেচারার জল রোদ মাথায় ক'রে সকল ঋতুতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এবং বাসের পর বাস ছেড়ে দিয়ে আমি যে বাসে আসি সেই বাসে নিত্য আসার কথা ভেবে যেন নিজেকে ফ্ল্যাটার্ড মনে করি। নিভার মাথায় কি এ কথা ঢোকে, ও বৃথা চেঁচামেচি করলে সেদিন ট্রামে। উৎপল শুন্‌তে পেয়ে কেমন অনাসক্তভাব দেখালে—তাতে নিভাকেই ঠক্‌তে হ'ল।

সপ্তাহে সবদিনই আমার সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ক্লাস—কেবল বৃহস্পতিবার পৌনে দশটায় ছুটি হ'ত। সেদিন শেষের ঘণ্টায় বটানির ক্লাস ব'লে আমার, শেফালির ও শ্যামবাজারের অলকার আগে ছুটি হ'ত। বৃহস্পতিবারে উৎপলকে মোড়ে প্রথম প্রথম দেখ্‌তে পেতাম না। তার পর হঠাৎ একদিন বৃহস্পতিবারে যাবার সময় দেখি দশটার সময় সে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে! সপ্তাহের একটি দিনও তার বাদ যাবার যো নেই। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—সে কি রোজই এত সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় পৌনে এগারটা পর্য্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকে, না বৃহস্পতিবার আগে ছুটি হওয়ার খবরটুকু সংগ্রহ ক'রে ফেলেছে। অলকা ও শেফালি তাকে তাদের দৃষ্টি দিয়ে গাড়ীতে অভ্যর্থনা করলে। শেফালি ধরে নিয়েছে—ওর জন্যে আমার একটু সফ্‌ট্‌ কর্ণার মনের মধ্যে হয়েছে। আমার এ নিয়ে কোনও তর্ক করবার প্রবৃত্তি হয় না। ওরা যে যা পারে মনে বুঝে নেয়।

আমাদের এক সহপাঠিনী রমলা দত্ত বিবাহিতা। পশ্চিমে তার স্বামী বড় চাকরী করেন। কলকাতায় শ্বশুরের বাড়ী আছে—মোটরে কলেজ আসে ও যায়। সে প্রায়ই তার মোটরে আমাকে বাড়ী ফিরে যাবার জন্য পীড়াপিড়ি করত। সে থাকে শ্যামবাজার হাতিবাগানে। একদিন উৎপলচন্দ্রের অবস্থা দেখ্‌বার জন্য রমলার মোটরে যেতে রাজী হলাম। আমাদের মোটরের আগে আগে একটা শ্যামবাজার অভিমুখী বাস যাচ্ছিল; মোড়ে সেটা পৌছবামাত্র উৎপল উঁকি মেরে চারিদিকে দেখে নিলে, তাতে তার লক্ষ্যবস্তু নেই—সেটা ছেড়ে দিয়ে এসে সে মোড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল—পরের বাসের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ আমাদের হুড খোলা মোটরে আমরা কয়জন তার সামনে দিয়ে চলে গেলাম। সে দেখ্‌তে পেল। মেয়েরা তার অবস্থা দেখে 'হো হো' ক'রে হেসে উঠল—আমাকে শেফালি একটা ঠেলা দিল—সেটাও উৎপলের চোখ এড়াল না। যা হোক আমরা এগিয়ে গেলাম। তখনই একটা হাওড়ার বাস এসে মোড়ে দাঁড়াল। আমরা লোয়ার সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত আস্‌তেই পুলিশের হস্তসঙ্কেতে মোটর থাম্‌ল—চৌমাথায় পূর্ব্ব-পশ্চিমাভিমুখী গাড়ী পুলিশ তখন 'পাশ' করাচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাওড়াভিমুখী 'বাস'টা পেছন থেকে আমাদের মোটরের বাঁয়ে দাঁড়াল। উৎপল বাসের ডানদিকের বেঞ্চিতে ছিল—শেফালি তাকে দেখে আমাদের ইসারায় জানিয়ে দিলে। দেখি সে অপলকদৃষ্টিতে তার লক্ষ্য বস্তুর দিকে সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। পুলিশ হাত নামিয়ে দিলে—আমাদের গাড়ী এগিয়ে গেল।

ফোর্থ ইয়ারের শেষের দিকে গণিতের অনার্স ক্লাস রবিবারে ও ছুটির দিনও হ'ত। উৎপল তাও লক্ষ্য করত। এক একদিন রবিবারে উৎপলকে এগারটার সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখ্‌তাম। শেফালি সে সময় থাকত না। আমি তার মুখ দেখে মনের কথা বুঝবার জন্যে সেই সুযোগে একটু একটু তার দিকে তাকাতাম। তাতে সে যেমন উৎসাহিত হ'ত, তেমনি সম্ভ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দিত। এক এক দিন সে যখন ড্যালহাউসী বা এসপ্ল্যানেডে নাম্‌ত—তার মুখের দিকে আমি চেয়ে দেখ্‌তাম্‌—হঠাৎ চোখোচোখি হলে সে পলকে চোখ নামিয়ে নিত। শেফালি আমাকে তাতে সাবধান ক'রে দিয়ে বলত, "ওরে অত



শিল্পী—শ্রীযুক্তা বধূরাণী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

বনবালা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বাড়াবাড়ি করিস্ না, আবার 'সখি হৃদয় আমার হারায়েছে' ব'লে কেঁদে মরবি। হাজার হোক তুই মেয়েমানুষ—কচি ও কোমল প্রাণ—আর ও পুরুষ, তা ভুলিস্ না।" আমি বলতাম, "তার আগে তোর কাছে একটা পয়সা মেগে নিয়ে কল্সী ও দড়ি কিন্‌ব—সে সময় পয়সাটা দিতে কার্পণ্য ক'রিস না।"

শেফালির দাদা, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের জয়ন্তী উপলক্ষে টাউন হলের অভ্যর্থনা-সভায় যোগদান করবার দুখানি 'পাশ' শেফালিকে দিয়েছিলেন। সেদিন শরৎ চট্টোপাধ্যায় কোনও কারণে সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। অভ্যর্থনা সভায় যখন তিল ধারণের আর স্থান নেই—এমন সময় খবর এল শরৎবাবু সভায় যোগ দিতে পারবেন না ব'লে দুঃখ প্রকাশ ক'রে ফোন করেছেন। এ অবস্থায় সভা ভঙ্গ হবে বা সাধারণভাবে শরৎবাবুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মন্তব্য পাশ করা হবে—এ নিয়ে দুদলের দুমত হ'ল। এদের কথা থেকে বচসা—তার পর হাতাহাতি হ'য়ে গেল। সিঁড়ির ধারে দু দল যুবকের মারামারি লেগে গেল। ওপরে সহস্র সহস্র নরনারী উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পাখার তলে বসে সাজান ফুলের তোড়া ও মালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সময় কাটাতে লাগল। আমি ও শেফালি বাসে বসে গল্প করছি—নীচের গোলমাল থামার অপেক্ষায়। এমন সময় স্পষ্ট অথচ অনুচ্চ স্বরে আমার নাম ক'রে কে যেন কি কথা বলছে মনে হ'ল। তাকিয়ে দেখি, আমার ঠিক সাম্‌নে উৎপল ও অনঙ্গ ব'সে গল্প ক'রছে। শেফালি ভাগ্যে দেখ্‌তে পায় নেই—তা হ'লে এতক্ষণ হয়ত রূঢ় বা উপহাস-জনক কোনও কথা ব'লে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিত। পেছন ফিরে দেখি নীচের গোলমাল মিটে গেছে ব'লে দর্শকরা উঠ্‌তে আরম্ভ করছে। আমি শেফালিকে ঠেলে দিয়ে নিজে উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের চেয়ার ঠেলার শব্দে উৎপলের দল পেছন ফিরে দেখ্‌ল। বলা বাহুল্য, চারি চক্ষের মিলন হতে সে অনঙ্গকে সাড়া দিয়ে কিছু ব'ললে। অনঙ্গর মর্য্যাদা জ্ঞান একটু বেশী। সে আমার এত কাছে এসে পড়েছে দেখে উৎপলের হাত ছাড়িয়ে আমাদের চেয়ে দূরে পেছনে চ'লে গেল। উৎপলও তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। শেফালি এদের 'দুর্ব্বলতা' দেখে হেসে অস্থির—আমার কানে কানে ব'ললে—'শুধু চোখ দেখেই এই, বাণী শুন্‌লে কি হবে এদের!' আমি তাকে একটা চিম্‌টি কেটে 'সজাগ' ক'রে দিলাম—সে উহু উহু ক'রে আমার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। নীচে ভাঙ্গা লাঠি ও দরজার ভাঙ্গা কাঁচ—খণ্ড যুদ্ধের সাক্ষ্যস্বরূপ প'ড়ে র'য়েছে দেখ্‌লাম। একজন বীরকে এ্যাম্বুলেন্স আরোহণ ক'রে মেডিকাল কলেজে যেতে হয়েছে—শুন্‌লাম। আমাদের মাথাটা গোটা আছে কি-না হাত দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গভর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণ দিক দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমরা কার্জ্জন পার্কের ভেতর দিয়ে এস্‌প্ল্যানেডে শ্যামবাজারের বাসে উঠ্‌লাম। ষ্ট্যাণ্ডে দেখি উৎপল ও অনঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে। শেফালি বললে 'তোর অপেক্ষায়।' আমি কিছু না ব'লে তাকে টেনে নিয়ে বাসে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লাম।

ফোর্থ ইয়ার ক্লাস শেষ হ'য়ে গেল—ডিসেম্বর মাসে। বড়দিনের ছুটিতে সেকেণ্ড ও ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের মেয়েদের একটা ফেয়ার-ওয়েল—'ফার্ষ্ট' ও 'থার্ড' ইয়ারের মেয়েরা দিতে ইচ্ছা জানাল। ঠিক হ'ল, নির্দ্দিষ্ট দিনে সব মেয়ে চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত থাক্‌বে। সকলে একসঙ্গে 'ষ্টিমারে' চ'ড়ে শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনে পৌছান হবে এবং সেখানে একটু ছোট গোছের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে। প্রথমে সেখানে গিয়ে থার্ড ইয়ারের একটি মেয়ে সময়োপযোগী নিজ রচিত একটি গানে সকলকে যথাযোগ্য অভিনন্দিত করলে। তারপর "পৌষের শীতের এম্‌নি এক দিনে প্রতি বছর কতকগুলি ছাত্রীকে ছেড়ে দেবার পুলকব্যথা আমাদের সহ্য করতে হয়" ইত্যাদি ব'লে "বালিকা-সভা"র সম্পাদিকা মিস্ বোস্ (একজন শিক্ষয়িত্রী) বিদায়বাণী পাঠ করলেন। সেকেণ্ড ও ফোর্থ ইয়ারের মেয়েদের হ'য়ে আমি একটি জবাব উত্তরে পাঠ করলাম। তারপর জলযোগ, শেষে ফটো নেওয়া হ'ল। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে 'বালিকা-সভার' সম্পাদিকা মিস্ বোস্ কেবল এসেছিলেন। তিনি তাঁর সন্নিকটস্থ কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলের 'ষ্টীমার' ঘাটে সমবেত হবার কথা থাকল। মেয়েরা ইতিমধ্যে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে 'দলগত' হ'য়ে বাগান বেড়াবার জন্যে চারিদিকে ছিট্‌কে পড়ল। আমি ও শেফালি খানিকক্ষণ সেইখানে ব'সে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

আলোচনা করতে লাগলাম। একটা সিরীষ গাছের নীচে বেঞ্চির ওপরে পরস্পর পরস্পরের দেহে নিবিড় ভাবে ঠেস্ দিয়ে ব'সে আমরা গল্প করছিলাম। দু-চারজন ছোট মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। একজন ব'ললে, 'ওমা, বেলাদির মাথায় একটা প্রজাপতি কেমন চুপচাপ ব'সে রয়েছে, নিশ্চয় বেলাদির বিয়ের সম্বন্ধ আস্‌ছে।' শেফালি একটু উৎসাহিত হ'য়ে দেখ্‌লে সত্যি একটা প্রজাপতি আমার মাথার চুলের মধ্যে পরম আনন্দে দ্বিপ্রহর যাপন করছে। সে সেটাকে ধ'রে আমার কানে ও মুখে বসাতে গেল—সেটা উড়ে গেল। আমি ছোট মেয়েদের বেড়াতে যেতে বললাম—তারা চ'লে গেল। শেফালি গল্প ক'রছিল—সে কখনও বড় চাকরেকে বিয়ে ক'রবে না—হয় কবি, নয় চিত্রশিল্পী তার পছন্দমত বর। বড় চাকরেরা থাকে কেবল নিজের 'ষ্টাইল' নিয়ে ব্যস্ত। কিসে তাদের 'পোজিশান্' বাড়ে এই ভাবনায় মগ্ন। স্ত্রী, ঘর, সন্তান-সন্ততি কি চায়, তা দেখ্‌বার ও জান্‌বার অবকাশ বা প্রবৃত্তির দু'য়েরই তাদের অভাব। খানিকক্ষণ এই রকম কথা হ'তে হ'তে আমরা দেখ্‌লাম—রোদ বেশ প'ড়ে গেছে। শেফালি বললে 'চল্ একটু বেড়িয়ে নি—আর জীবনে কখনও এমন দিনটি ফিরবে না। যদি দু'জনে বি-এস্-সি পাশ করি—খুব সম্ভব আস্‌ছে বছর দুজনেই এমন দিনে কারও ঘর ও মন আলো ক'রে ব'সে থাক্‌ব—তোর হয়ত দেহে কোনও আগন্তুকের আগমন-চিহ্নও ততদিনে ফুটে উঠ্‌তে পারে।' আমি শেফালির ঘাড় চেপে ধ'রে বললাম, 'তোর মনের সাধ ওটা, তাই সেটা ঢেকে আগন্তুকের চিহ্ন আমার মধ্যে দেখ্‌তে পাবার কল্পনা করছিস্। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোর সাধ অচিরে পূর্ণ হোক্।' বেড়াতে বেড়াতে আমরা অনেক লতা, কুঞ্জ ও ঝোপ পার হ'য়ে গার্ডেন-আফিসের ধার দিয়ে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পর্য্যন্ত এসে পড়লাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম দূরের থেকে মিহি গলার গানের শব্দ আস্‌ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে 'শে—ফা—লিকা' ব'লে সুরের শব্দ পেলাম্। আমরা বেশ একটু আগ্রহান্বিত হলাম। আরও কিছুদূর গিয়ে দেখি লাল রাস্তার বাঁয়ে গঙ্গার তীরে একটু নেমে দুটি যুবক—একজন ব'সে, তার কোলে মাথা দিয়ে আর একজন লম্বা হ'য়ে ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে। যে ব'সে আছে সে গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে গান গাইছে—শ্রোতা আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে রয়েছে। গায়কের পিঠ দেখা যাচ্ছে কেবল—তার গানের সুর বাতাস ব'য়ে নিয়ে আস্‌ছে আমাদের কাছে—আমাদের নিঃশ্বাস তাদের কাছে পৌছে দেওয়ার কাজটাও ঠিক ভাবে করছে কি-না কে জানে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা কর্ম্মজীবন অবসানে সন্ধ্যায় নদী বক্ষের সমীরণ লুটে উপভোগ ক'রে নিচ্ছে ভেবে আমরা তন্ময় হ'য়ে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গান শুন্‌তে লাগ্‌লাম। দূরে অস্তোন্মুখ লাল সূর্য্যের বিদায়দৃশ্য গঙ্গাবক্ষে প'ড়ে সে জায়গাটা লাল ক'রে দিয়েছে। এক-আধটা কৃষ্ণচূড়া ফুল ওপর থেকে গাছের হেলনে আমাদের গায়ে মাথায় প'ড়ছে। গায়ক বারে বারে গাইছে :—

দিন আনয়িল
দিনকরী
মুদিত আঁখি কেন
মঞ্জরী,
বিরহ পালঙ্ক ফেলি
পুরাণো মালিকা
চল মম ভুবনে
চল গো বালিকা !
তুলে লহ আঁচলে
পীত শেফালিকা
গাহিয়া কহিছে অলি
গুঞ্জরি।"

কিছুক্ষণ পরে ওরা দু'জনে উঠে পড়ল—যে শুয়েছিল সে বললে, "চল ষ্টীমারের আর দেরী নেই !" ব'লেই তারা বাম্মিজ শ্যাওলার ভেতর পা ঢুকিয়ে দিয়ে লাফিয়ে তীরে উঠে একেবারে আমাদের সাম্‌নে দেখ্‌ল—তাদের এত কাছে আমরা দাঁড়িয়ে চুরি ক'রে কোনও দিন গান শুন্‌ব—তারা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি—আমরাও না। আমি ত লজ্জায় লাল হ'য়ে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাম্‌নে তীরে উৎপল ও অনঙ্গ—এক মুহূর্ত্তের জন্য তারা দাঁড়াল—তার পর ষ্টীমারের দিকে না গিয়ে আরও দক্ষিণ তীর দিয়ে চ'লে গেল—বোধ হয় আমাদের এগিয়ে

যাবার অবকাশ দেওয়া হ'ল—আমরা সেই অবসরে দ্রুত পাদক্ষেপে ষ্টীমার ঘাটে এসে পৌছলাম। পেছনে এরা দু'জনে আস্‌ছে কি-না দেখবার মত আমার সাহস হ'ল না—শেফালিরও না। ঘাটে এসে দাঁড়াতে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে মিস্ বোস্ ও অন্যান্য সকল মেয়েরা এসে পড়লেন। ষ্টীমার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। সন্ধ্যার এই রোমান্টিক এক্সকারসানের পর নদীর হাওয়া, চাঁদের আলো ও ছোট ছোট ঢেউ আমাদের এত আনন্দ দিয়েছিল যে এ দিন জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না। শেফালি আর আমি ডেকের একপ্রান্তে রেলিঙ ধ'রে ব'সে কি ক'রে অঘটন ঘট্‌ল তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, আর আজকের সন্ধ্যা আর এ জীবনে ফিরবে না—এজন্য খুব মৌন হ'য়ে রইলাম। "অনঙ্গ এত ভাল গান গাইতে পারে এটা আজ এখানে না এলে আমার জানা হ'ত না," আমি বললাম। আবার ব'ললাম "তা জেনেই বা আমরা কি স্বর্গ হাতে পেলাম?" শেফালি ব'ললে, "আবার বহু বচন কেন, একবচন হচ্ছিল, তাই চলুক্ না। 'স্বর্গ' যখন নরকের দ্বারের দিকে দক্ষিণ তীর দিয়ে ছুটে গেল—তখন তাকে ছুটে গিয়ে ধ'রে এনে দিতাম, বললে না কেন?" আমি তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে বললাম, "তবে রে পোড়ারমুখী, আমি কি তাই ব'লছি? তোকে আমি বধ করব আজ।" সে ব'ল্‌লে, "তা ক'রবে বই কি—অনঙ্গ 'শেফালিকা' ব'লে গান করছিল, 'বেলাদি' ব'লে ত ক'রে নি--তাই বুঝি রাগটা আমার ওপর পড়ল—আমি কালই দাদাকে দিয়ে পুলিশে ওর নামে 'কেস' করাচ্ছি—অনঙ্গর নামে ১৪৪ ধারা জারী করা হোক এবং যদি 'শেফালিকা' নাম পুনরায় মুখে নেয় তাহলে যেন ওর নামে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মুচেলেকা' নেওয়া হয়। এখন আমার প্রাণবধ করায় আর রুচি নেই ত?" আমি বললাম "তোর পেটে কি প্রশ্নোত্তর সর্ব্বদাই মজুত থাকে? কখনও পেছপা হ'তে দেখ্‌লাম্ না। তুই কবি হ'লি না কেন? বিজ্ঞান না নিয়ে তোর আর্টস্ নেওয়া উচিত ছিল।" সে বলল, "কবি হ'লাম না ব'লেই ত কবি বিয়ে করতে চাই; বিজ্ঞান না নিয়ে আর্টস্ নিলে তোর মত বেলাদিকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পেতাম কি মুখ্‌পুড়ী?" আমি চুপ হ'য়ে গেলাম। শেফালি নিজের পছন্দ বিষয় পাঠ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেছে আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার জন্যে! মনে মনে কত আনন্দ হ'ল আমার। বেচারা ভালয় ভালয় যদি পাশ হয়ে যায়—ওর 'আমার পছন্দে' পছন্দর জন্য কখনও যেন আফ্‌শোষ ক'র্‌তে না হয়।

ষ্টীমার চাঁদপালঘাটে লাগ্‌ল্। মেয়েরা সকলে নেমে পড়ল। কলেজের বাস্ দাঁড়িয়ে ছিল, সকলে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ গৃহাভিমুখী বাসে' উঠে বসল। খুব ঘনিষ্ঠ মেয়েদের মধ্যে বয়সের অনুপাতে প্রণাম, চুম্বন, আলিঙ্গন হ'ল—কেউ রুমাল বের ক'রে চোখ মুছ্‌লে। মিস্ বোস সেকেণ্ড ও ফোর্থ ইয়ারের মেয়েদের পরীক্ষায় সাফল্য কামনা ক'রে মাথায় হাত দিয়ে "সুগৃহিণী ও সুমাতা হও" ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রে নিজের গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন। আমি ও শেফালি ট্রামে উঠ্‌লাম।

৩

কলেজের দৈনন্দিন ক্লাস বন্ধ হ'য়ে গেছে—কেবল রবিবার প্রাতে একঘণ্টা ক'রে অনার্স ক্লাস হয়। ডক্টর ডস্ গণিতের অনার্স পড়ান। তিনি বলেন আমি 'ফাষ্ট ক্লাস' একটা নিশ্চয় পাব—যদি নিজে একটু লাগু হ'য়ে চেষ্টা করি। আমি ছাড়া অলকা ব'লে একটি মেয়ে শ্যামবাজার থেকে আসে অনার্স পড়তে। আর কারও গণিতে অনার্স ছিল না। শেফালি এ সময় আর বেরোত না। দুপুরে আমাদের কলেজের দুজন লেডী প্রফেসার আমাকে ও শেফালিকে গৃহে পড়িয়ে যেতেন। আমি অধিকন্তু রবিবার প্রাতে অনার্স্ ক্লাস য়্যাটেণ্ড কর্‌তাম। অলকার বউদিদির কলিকাতার বাড়ীতে ছেলে হওয়ায় সে শেষের কয় রবিবার অনার্স্ ক্লাসে আস্‌তে পারে নি। তখন আমি একা মাত্র ছাত্রী। ডক্টর ডস্ পড়াতেন যতক্ষণ, ততক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তেন। আমার ক্রমেই ইন্‌টারেষ্টিং' বোধ হওয়ায় আমিও তাঁর মুখের দিকে চুরি ক'রে মধ্যে মধ্যে চেয়ে দেখতাম। তাঁর উৎসাহ বোধ হয় এতে বেড়ে গেল। তিনি সপ্তাহের মধ্যে আর একদিন আমার ক্লাস করবেন ব'লে ফতোয়া দিলেন। পড়ান বেশী হ'তে লাগ্‌ল কি-না সেটা পরে বোঝা যাবে—তবে তিনি এখন থেকে আমাকে কেবল

ক্লাসে বসিয়ে একটা অধ্যায় পড়তে দিতেন—এবং অনিমেষ নয়নে আমার মুখ, চুল ও চোখগুলির মধ্যে বিশেষ কোনও পরমাণুর সন্ধান পেয়েছেন, এমনভাবে নিরীক্ষণ করতেন—এইটুকু গোপনে আমি লক্ষ্য করতাম। আমার মনে কেমন যেন একটা ঔৎসুক্য ক্রমে গাঢ় হ'তে লাগ্‌ল। শেফালিকে কিছু বলতাম না। অলকার এ সময় অনুপস্থিতি বেশ সুখকর ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌ল। তার বউদিদির মনে মনে কল্যাণ কামনা করতাম। অলকার আর অনার্স্‌ ক্লাস করা হয় নি। আমি যে সোমবার থেকে অনার্স্‌ পরীক্ষা আরম্ভ হবে তার ঠিক আগের রবিবার পর্য্যন্ত ডক্টর ডসের ক্লাস ক'রে গেছি। কেমন একটা নেশায় দেড় মাস পড়েছিলাম। হলফ্‌ ক'রে বলতে পারি—পড়ান হ'ত এই ক্লাসে—আমার মাথা আর মুণ্ডু। একদিন ক্লাসেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার কুল-পরিচয়, কেন বিয়ে করি নি, গার্জেন কে ইত্যাদি। লজ্জার মাথা খেয়ে আমিও ঠিক ঠিক জবাব এই নিরিবিলিতে ওই আইবুড়ো কার্ত্তিককে দিয়েছিলাম এবং সে সময় মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছিলাম।

যথাসময়ে অনার্স্‌ পরীক্ষা হ'য়ে গেল। মধ্যে কয়েক দিন বাদ দিয়ে অন্য দুটি বিষয় পরীক্ষা হবে। ফিজিওলজি, 'জুলজি' 'এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজি' প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা বাকী—এগুলি হ'লে আমাদের বিষয়গুলির পরীক্ষা হবে। এমন সময় শেফালির বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এল, তার বাবা সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন—সেজন্য পত্র-পাঠ সে যেন বাড়ী যায়। শেফালি এ খবর পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল। আমি গিয়ে দেখি তার দাদা, বৌদি ও সে তিনজনে বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমি তাকে যতদূর প্রবোধ দিতে হয়—দিলাম। আমার মা যখন পাঁচ বছর আগে ব্লাডপ্রেসারের অসুখে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন তখন শেফালি আমার কি না করেছিল। পরীক্ষার জন্য তাকে চিন্তিত হ'তে নিষেধ করলাম। চার-পাঁচদিন মধ্যে তার বাবা সেরে উঠ্‌লে সে পরীক্ষা দিতে আস্‌তে পারবে—তাকে বললাম। চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে সে তার দাদার সঙ্গে মোটরে উঠ্‌ল। আমি তার দাদা ও বৌদিকে প্রণাম করলাম। তার বৌদি বললেন, "তুমি আমাদের শেফুর পূর্ব্বজন্মে কে ছিলে বল ত গো?" তার দাদা ব'ললেন "শেফুর বর ছিল ও—তাই ওদের দু'জনের এত ভাব। এখন চলি বোন্‌। দুর্গা দুর্গা!" মোটর তাদের নিয়ে চ'লে গেল।

বাড়ী ফিরে এসে মনটা বড় খারাপ লাগল। পড়া-শোনায় বসতে পার্‌লাম না। মনে হ'তে লাগ্‌ল, শেফালির বাবা যদি না বাঁচেন—তাহলে আমাদের এমন প্রীতি ও সদ্ভাব কি ক'রে বাঁচিয়ে রাখ্‌ব। ওরে সঙ্গে যদি আর দেখা না হয় ইত্যাদি।

এম্‌নি গভীর চিন্তায় মগ্ন আছি এমন সময় মা ঘরে এসে জানালেন, ডক্টর ডস্‌ আমায় বিবাহ করতে চেয়ে মায়ের কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'আমার প্রেমে তিনি উন্মত্ত, আমার পরীক্ষা হ'য়ে গেলে আষাঢ়েই তিনি বিবাহ করতে পেলে বড় সুখী হন।' মা ডক্টর দাশের কুল-পরিচয় এবং অন্যান্য সংবাদ আমার কাছে জান্‌তে এসেছিলেন। আমি চুপ ক'রে রইলাম—তিনি মৌনতা সম্মতি লক্ষণ ভেবে এটা ওটা নেড়ে চেড়ে চ'লে গেলেন।

মা চ'লে গেলে আমার মনে হ'ল, হায় হায় একবার শেফালিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস ক'রে রাখা হ'ল না। এখন আমি কি করি? শেফালির পরামর্শ না নিয়ে এ বিষয়ে কোনও মত দেওয়া কতদূর অন্যায় হবে—এই সব ভেবে আমি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—জানি না। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে শয্যাত্যাগ করলাম। রাত্রে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কারণ মা জিজ্ঞেস্‌ করতে এলেন। আমি কোনও সদুত্তর দিতে পারলাম না, বোধ হয় কিছু ছিল না।

প্রাতে স্নানান্তে বই নিয়ে বসলাম। ভাগ্যক্রমে অনার্স পরীক্ষা হ'য়ে গেছে এই মানসিক চাঞ্চল্যের পূর্ব্বে—নতুবা আমাকে ভাবনায় গলায় দড়ি দিতে হ'ত। কোনও রকমে ফাঁসীর আসামীর মত ভাবনায় দিন কাটিয়ে 'ফিজিক্স' ও 'কেমিষ্ট্রী' পরীক্ষা দিয়ে এলাম। শেফালি ফেরে নি। তার দাদার বাড়ীর চাকরেরা কেউ কোনও খবর দিতে পারল না—একটা চিঠি লিখেছিলাম্‌—ডেড্‌ লেটার আফিস্‌ হ'য়ে ফিরে এল। আরও কিছুদিন পরে শেফালির দাদার বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লাম—বাড়ী সম্পূর্ণ

খালি—প্রতিবেশীরা কেউ কিছু বলতে পারলেন না। এইটুকু জান্‌লাম—দু দিন হ'ল জিনিষপত্র নিয়ে তাঁরা চ'লে গেছেন। বাড়ীতে 'টু লেট্' বোর্ড্ টাঙান আছে। এসব দেখে আমার মনে কি পরিমাণ ভাবনা হল—তা বর্ণনাতীত। শেফালির ভাবনায় আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। আবার একবার মনে হ'ল—হয় ত' তার বাবাকে নিয়ে তারা কোথাও চেঞ্জে গেছে। এইরূপ দোদুল্যমান্ চিন্তায় সজল চক্ষে বাড়ী এলাম। মায়ের কাছে ব'সে খানিকটা কাঁদ্‌লাম। মাও শেফালির বিপদের কথা ভেবে চোখের জল ফেল্‌লেন। আমার আর ভাইবোন নেই—শেফালি আমার যে কি ছিল—তা মায়ের অজানা ছিল না। তিনি বুঝ্‌লেন শেফালির বিপদাশঙ্কায় আমার মনে কত বড় আঘাত লেগেছে।

এরূপ অবস্থায় পুনরায় ডক্টর ডসের কাছ থেকে লোক এল আমার মত ও মায়ের অনুমতি জানবার জন্য। মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—আমি 'জানি না' ব'লে সেখান থেকে উঠে এলাম।

শেফালির সঙ্গ এবারকার পরীক্ষায় লাভ হইবার কোনও আশা নাই জেনে আমি 'প্রাক্‌টিকাল' পরীক্ষার জন্য বইগুলি একটু নাড়াচাড়া করছিলাম। এমন সময় সেদিনকার সংবাদপত্রের একটি অংশে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল। শেফালির পিতার মৃত্যুসংবাদ। তারিখ হিসেব ক'রে দেখ্‌লাম তিনি যে দিন মারা গেছেন—তার দু'দিন পরে শেফালির দাদা কলিকাতার বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন। সংবাদ এক শৈলনিবাস থেকে প্রেরিত। অতএব শেফালিরা কলিকাতা ত্যাগের পর তার বাবাকে তারা দেখ্‌তে পেয়েছিল এবং তার পর শৈলনিবাসে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। আমি তখনই তাকে একটি 'টেলিগ্রামে' সহানুভূতি জানালাম এবং প্রাণের আবেগ নিঙ্‌ড়ে দিয়ে ভগ্নীর মত এবং প্রিয়তমা সখির মত একটি দীর্ঘ পত্রে তাকে সমবেদনা জানালাম।

মা সব শুনে বললেন, "প্র্যাক্‌টিকাল পরীক্ষা হ'য়ে গেলে আমি একবার তার বাড়ী গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এলে তার মন ভাল থাকবে।" আমারও কথাটা খুব মনে লাগ্‌ল। 'প্র্যাক্‌টিকাল' পরীক্ষার জন্যে ব'সে রইলাম। যখন পরীক্ষা শেষ হ'ল—তখন জ্যৈষ্ঠমাস প'ড়ে গেছে—দারুণ গ্রীষ্মে কলিকাতায় থাকা ভীষণ কষ্টকর হ'য়ে গেছে। আমরা এখন কোথায় যাব, কি করব, কিছুই ঠিক করতে পারছি নে। শেফালিকে চিঠি লিখে কোনও উত্তর পাই নি। তার দাদা চার মাসের ছুটি নিয়েছেন 'গেজেটে' দেখেছি। সম্ভবত তারা সকলে কোথাও বেড়াতে গেছে।

আমি ও মা কলিকাতার বাইরে কোথায় যাই ঠিক করতে পারছি না—এমন সময় ডক্টর ডস্ আমাদের বাসায় এসে জানালেন, তিনি গোপনে খবর পেয়েছেন আমি সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে পাশ হয়েছি। তিনি বিবাহের যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন—তারও উত্তর চাইলেন—আমারই কাছ থেকে। আমি কিছু বলতে পারলাম না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, এ রকম নাছোড়বান্দার প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত যে কাটাতে পারব তার আশা কম। কিন্তু আমি সারাজীবন একটা কিছু বড় হ'ব এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুসরণ ক'রে আসছি—তার পরিণতি কি—এই 'সিভিল ম্যারেজ'? ডক্টর ডসের ও আমার উভয়েরই গোত্র এক—এক্ষেত্রে তিন আইন ছাড়া বিবাহবন্ধন সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। নিজের মনকে অনেক জিজ্ঞাসা ক'রেছি—মন যেন টানে, আমিও যেন মজেছি। কিন্তু কেবল শেফালির সঙ্গে পরামর্শ ক'রি নি ব'লে এখনও নিজের মতামত জানাতে সঙ্কুচিত হ'চ্ছি। মা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার ভাব অনেকক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন—তিনি সেখান থেকে বললেন, "মাষ্টার মহাশয় পাশের খবর এনেছেন, ওঁকে প্রণাম কর।" আমি তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত হ'য়ে মাকে প্রণাম ক'রে এলাম—তার পর ডক্টর ডস্‌কে প্রণাম করলাম। চাকর মায়ের প্রেরিত সরবৎ ও কিছু মিষ্টান্ন ডক্টর ডস্‌কে দিল। তিনি কিন্তু এতক্ষণেও নিজের প্রশ্ন ভোলেন নি—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বগোত্রে বিবাহে তোমার কি সংস্কারে বাধ্‌ছে?" আমি ব্যাপারটা আর গড়াতে দিলাম না। মাকে ও আমার মাষ্টার ম'শায়কে একটা প্রণাম করে কিছু না বলে সেখান থেকে চম্পট দিলাম। সব কথা স্পষ্ট হয়ে গেল। মাষ্টার ম'শায় মাকে প্রণাম করে বৈকালে পুনরায় আসবেন বলে গেলেন। বৈকালে তিনি ঠিক এলেনও এবং আমার জন্য কি সব উপহার এনে

মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা দিনস্থির করে গেলেন। এখন আমার মনে হ'তে লাগল, "কিছু ভুল করলাম না ত?" এতদিন অপেক্ষার পরে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত মাষ্টার মশায়ের পাণিগ্রহণ করাই কি আমার জীবনের ব্রত ছিল? এঁকে সুপুরুষ এঁর খুব অতি বড় শত্রুও বলবে না—লম্বা খদ্দরের পাঞ্জাবী ও চাদর গায়ে দিয়ে যখন থাকেন, তখন আজমগড়ের এক্কাওয়ালা রাম নেওয়াজ সিংএর আকৃতি থেকে ওঁর বিশেষ বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। উৎপলকে ইতিমধ্যে দু-চার দিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখেছিলাম। একদিন বেচারা আমায় দেখ্‌তে না পেয়ে, আমি যে বাসে ছিলাম সে বাসে ওঠে নি—আরও কতকক্ষণ হয় ত দাঁড়িয়ে তার পর সে নিরাশ হ'য়ে চ'লে আস্‌বে। সে বিবাহিত কি-না কে জানে? কিন্তু কি দরকার আমার ওসব খোঁজে। ক্রমশঃ

মরুমায়া

শ্রীসুশীল জানা

যে রাঙা মাটির পথ হারায়ে গিয়াছে দূর
ছায়াম্লান স্বপ্ন-গিরিপারে,
দিগন্তের নীলান্তের ধারে—
তন্দ্রাতুরা প্রেয়সীর অসহায় ঘুমলীন
কম্প্রভীরু দীর্ঘশ্বাসে,
ওগো বন্ধু, সেথা হ'তে কতদিন
উদাসী বাঁশীর সুর কার
ডেকে গেছে কতবার
কোথা দূর ঘাসে ভরা
লীলায়িত জনহীন বনপথ 'পরে,
ফাল্গুন শ্বসিত কোন দিকভোলা অসীম প্রান্তরে।
দূরান্তের গহন সন্ধ্যায়
যৌবন ভীরুর দুটি স্থির কালো চোখের মতন
জল ছল ছল কোন
প্রান্তরবর্ত্তিনী বুক 'পরে
হিজলের কালো ছায়া ধীরে ধীরে
ঘুমাল কাতরে।
…কোথা সে সৌন্দর্য্যলোক!
রাত্রি জাগরণম্লান আনত অলস
ভোরের তন্দ্রায় ভরা দেহলতা তার
আছে আছে—আছে কোথা
স্বপ্নসম আলুণ্ঠিত বিহ্বল বিবস
তখনই হয়েছে মনে : চলে যাই
সন্ধ্যাশ্রান্ত পাখীটির মত মন্থর পাখায়—
মেঘমৌন অনন্ত সীমায়।
তখনি হয়েছে মনে : বসুন্ধরা
কত যুগ যুগান্তের পুঞ্জীভূত বেদনার
শূন্যতায় ভরা;
কত দীর্ঘ রাত্রি দিনে
মমে মর্মে দিয়ে গেছে সেই পরিচয়—
নয় নয়—বুঝি কিছু নয়।
সত্যের বুদ্‌বুদ শুধু—নির্মম মরুর মায়াজাল,
তৃষিত চঞ্চল।

বেকার

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

সকালবেলা চা পান শেষ করিয়া অফিসের খাতাপত্র লইয়া বসিব মনে করিতেছি এমন সময় পাড়ার রসিকবাবু প্রবেশ করিলেন এবং কপালে এক হাত ঠেকাইয়া কহিলেন—গুড্ মর্নিং! তারপর কি করা হচ্ছে আপনার। চা খাওয়া শেষ হলো বুঝি।

একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তিনি বসিলেন এবং কহিলেন—এলুম আপনার কাছে দু'একটা পরামর্শের জন্যে। এইবার এক পেয়ালা চায়ের হুকুম করুন।

চায়ের হুকুম করিলাম। কিন্তু রসিকবাবুকে দেখিয়া বড় প্রীত হইতে পারিলাম না। আফিসের ফাইল দস্তুরমত জমিয়াছে—সকাল বেলায় দু'একঘণ্টা এর পেছনে না লাগিলে ফাইলের বোঝা ক্রমশই ভারী হইয়া উঠিবে। আমি জানি রসিকবাবু আসিলে পাকা দুই ঘণ্টার কম আমার রেহাই নাই। তবু মুখে হাসি টানিয়া কহিলাম—কি মনে করে রসিকবাবু?

—আর কি মনে করে! বুড়ো বয়সে বেকার হ'লাম মশাই, এর একটা বিহিত করুন তো আপনি। আপনারা হলেন সরকারি চাকুরে—অভাব নাই তো কিছুরই। আমার কথা একবার ভাবুন তো দেখি। করতুম জমিদারের চাকুরি মশায়—বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছে, শুনেছেন তো সবই আপনি। আগে ছিল রামরাজত্বি—খাও মাখ যত ইচ্ছে। জমিদারবাবুর পার্শোনাল ষ্টাফের কাজে—খাতির কত। ভাববেন না যেন মোসাহেবি করেছি। তবে বুঝলেন কিনা—আমার কথায় ম্যানেজারকে শুদ্ধ কাঁপতে হতো। এমনিই ছিল আমার প্রতাপ। তারপর যা হয়ে থাকে। জমিদারবাবুর টাকার অভাব পড়লো—আমাদেরও সুখ সুবিধে ফুরলো। তারপর এই দু'বছর কাজ দিয়েছি ছেড়ে। আর না দিয়েই বা করি কি বলুন—তিন বছরেরর মাইনে বাকি। পঞ্চাশ টাকা করে মাস মাইনে—তিন বছরে কত বাকি বলুন দেখি?

আমি হাসিয়া কহিলাম—আঠার শ'।

—একবার ভাবুন, কি কাণ্ডখানা। আঠার শো—একি চাট্টিখানি কথা?

স্বীকার আমাকে করিতেই হইল যে ইহা বড় একটা সহজ কথা নয়।

—অথচ ঐ টাকা যে আর পাব তারও আশা নেই; এই বুড়ো বয়সে বেকার হলাম মশায়—হাতে নেই এক পয়সা। এতে মনটা ঘোরে কি না একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন তো? অথচ ঐ যে বল্লেন—আঠার শো—ওটা যদি আমি পাই তাহলে ভাবুন একবার কি না করতে পারি আমি। ছেলেটা ম্যাট্রিক দিত এবার—ইস্কুলের মাইনে দিতে পারিনি বলে দিয়েছে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে। টাকাটা পেলে কি ছেলেকে গণ্ডমূর্খ হয়ে ঘরে বসে থাকতে হ'তো! এদিকে মেয়ে যোলো উৎরিয়ে সতেরোয় পড়েছে—আপনার কাছে আর বয়স ভাঁড়িয়ে কি হবে। মেয়ে আমার অপ্সরী না হলেও একেবারে ফেলে দেবার মত নয়—ঐ টাকাটা পেলে মেয়ের ভাল বিয়ে দিতে পারি কিনা বলুন দেখি আপনি? তারপর চাকুরি যখন ছিল বাড়ী ঘরের দিকে মন দিইনি—তখন আর সময় ছিল কখন। জমিদারের—একরকম রাজা বল্লেই হয়—পার্শোনাল ষ্টাফে কাজ করা—ফুরসুৎ হত না বাড়ী ঘর দেখবার। এখন যে বাড়ীর ছাদ হাঁ করে আছে, ঘরে রোদবৃষ্টির ফুলঝুরি খেলছে—কখন ছাদ মাথায় ভেঙ্গে পড়ে তার ঠিক নাই—এই সময়টা যদি ঐ টাকাটা—কত বল্লেন যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঐ আঠার শো টাকা, সুসার হতো কিনা—আপনিই শপথ করে বলুন।

সমস্তই মানিয়া লইলাম এবং কহিলাম—হ্যাঁ, এ অতি ঠিক কথা।

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—আপনার বয়স এখনও আমার মত হয়নি বটে, কিন্তু আপনি যে বিজ্ঞ এই অল্পদিনের পরিচয়েই আমি বুঝতে পেরেছি। তারপর এই যে মশাই নিত্য নাই নাই—এই যে দোরে দোরে ধার চেয়ে বেড়ানো—আজ চাল নাই, কাল নুন নাই—গিন্নির যে এই নিত্য অভিযোগ—এর কোনও মানে হয়? আজ যদি ঐ টাকাটা পাই তাহলে ব্যবসা বাণিজ্যে একটা কিছু করে কত বড় একটা কাণ্ড করা যায় কিনা আপনিই বলুন। তবু লোকে বলে আমি বেকার! এই বলিয়াই তিনি গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল, কহিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ একটা কথা শুনে আসা। শুনলাম কি না পোষ্টমাষ্টারবাবুর কাছে। আপনি নাকি—তা পেয়েছেন কোনওদিন কিছু?

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—বুঝলুম না তো আপনার কথা।

তিনি সহাস্যে কহিলেন—বুঝলেন না আমার কথা। ক্রসওয়ার্ডের নেশা নাই আপনার? পোষ্টমাষ্টারবাবুর কাছে শোনা—এ কি মিথ্যে হবার জো আছে। এই জন্যেই তো আজ আমার আপনার কাছে আসা। ১৩৪ নম্বরটা দিয়েছেন তো? সেদিন লাইব্রেরীতে বসেছিলুম—চোখে পড়লো—পঁচিশ হাজার টাকা তার সাথে আবার এক মোটর গাড়ী। পাতাখানা এদিক ওদিক চেয়ে ফস করে ছিঁড়ে পকেটে ফেল্লুম: ওরা আবার দেখতে পেলে ফ্যাসাদ করতে পারে। আর মশায়, এ না করে আর করি কি। বই কেনবার আর পয়সা কোথায় পাই বলুন। একে আপনি চুরিই বলুন আর জুয়াচুরিই বলুন। তারপর লেগে গেলাম সলভ করতে। তিন দিন পরিশ্রমের পর বুঝলেন কিনা—ইংরেজী বিদ্যে তো আমার খুব বেশী নয়—তবু করলাম একটা খাড়া। জুতসই হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে সার—ছেলের ডিক্শনারী ভাগ্যে একখানি

ছিল—তার একটা পাতাও বাদ রাখিনে কিনা। কিন্তু মুস্কিল দাঁড়ানো টাকা সংগ্রহ করা। অন্ততঃ পক্ষে একটাকা দুই আনা চাই-ই কিনা—পোষ্টেজ সমেত। এ দেশের বড় জমিদারের পার্শোনাল ষ্টাফে কাজ করেছি—টাকা তখন খোলামকুচির মত ছড়িয়েছি তো ছড়িয়েই চলেছি। আর এখন সেই রসিক মিত্তিরকে একটাকা দুই আনার জন্যে কি ঘোরাটাই না ঘুরতে হয়েছে। কিন্তু করি কি সার—পঁচিশ হাজার টাকা, তার ওপর মোটরকার তখন মাথার মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে কি না! কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলুম না। শেষটায়—না আপনি হাসছেন!

আমি হাসিয়াই কহিলাম—না, এতে আর হাসির কথা কিই বা আছে বলুন।

—শেষটায় ঐ গিন্নির কাছেই ধন্না দিতে হ'লো। বিপদে পড়লে এই দুঃখের সময়েও তিনিই অভয়দাত্রী কিনা—হ্যা হ্যা! কিন্তু তিনি কি সহজে রাজি হন। আর রাজিই বা হ'বেন কি করে—দিন চল্‌ছে কি করে তা আমার চাইতে তিনিই জানেন কিনা বেশী। আহা বাঙ্গালীর ঘরে এম্‌নি সতীলক্ষ্মী এখনও আছে বলেই না এখনও আমরা চলা ফেরা করছি মশায়—না হলে কি যে দশা হ'তো আমাদের। অনেক তোষামোদ, অনেক ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে—মশায়, আর চারটি খানি কথা নয়—তবে গিন্নীর কাছে থেকে টাকাটা আদায় করি—তাও বেশী সেকরার দোকানে নাকের নথ বাঁধা দিয়ে। আমার তো বুক বেঁধে রয়েছি মশায়—এখন বরাত আর ভগবানের আশীর্ব্বাদ। এই বলিয়া তিনি যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিলেন।

ঘড়িতে দেখিলাম—নয়টা বাজিয়া গিয়াছে—রসিকবাবুর গল্প শুনিবার আর সময় নাই! স্নানাহার সারিয়া না লইলে অফিস যাইতে বেলা হইয়া যাইবে। কিন্তু রসিকবাবুর বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই—তিনি পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন—সলিউশন এতে লেখা আছে আমার। আপনার বের করুন তো, একবার মিলিয়ে দেখি। আচ্ছা, এই চারের 'এক্রশটা'—'গান্' না 'ফান্' করেছেন বলুন তো। আমার তো 'ফান্'ই ভাল মনে হয়েছে। আপনার?

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমার যে বেলা হচ্ছে রসিকবাবু। যদি কিছু মনে না করেন এইবার উঠ্‌তে হয় আমার।

রসিকবাবু বলিলেন—ও বেলা হয়েছে বুঝি। তবে এরপর কিন্তু মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসব। আপনারা হচ্ছেন বিদ্বান লোক—সলিউশন্‌টা তাড়াতাড়ি মাথায় আসে আপনাদের। একটু কনসল্ট করতে পারলে—বুঝলেন না? তা কি মনে হয় আপনার—এবার লাগ্‌বে কিনা বলুন দেখি। পঁচিশ হাজার টাকা মশায়—সোজা কথা? পাই তো দেখবেন কি করি। ছেলেকে দেব জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করে। মেয়ের বিয়েতে অন্ততঃ ছয় হাজার টাকা তো খরচ করবোই। আর বাড়ী? ও পুরোণো বাড়ীতে পোষাবে না মশায়—নতুন একটা করতেই হবে—তাতে খরচ হোক না দশ হাজার টাকা। আর গিন্নীর বয়স হয়েছে বটে—কিন্তু ভারিক্কি গোছের চার গাছা করে দুই হাতের আট গাছা চুড়ি বেশ মানাবে—হাতের গড়ন এখনও যা রয়েছে—চমৎকার। এ না দিলে কি আর হয়। যদি টাকাটা পাই তবে ওর বরাতেই পাব কিনা। তারপর মোটর গাড়ী মাসখানেক রেখে বেচে ফেলে দেব—কি বলেন? ও হাতী পোষা চল্‌বে না।

অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম, ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলাম—আচ্ছা, আজ তাহলে—।

—ও, বেলা হয়ে যাচ্ছে বুঝি আপনার। মাঝে মাঝে আসবো কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করতে। টাকাটা যদি পাই তাহলে এ নেশা আরও বেশী পাবে কিনা। তখন তো আর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। আচ্ছা নমস্কার।...এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—শুনতে পেলাম আপনার সাথে জমিদারের বেশ খাতির হয়েছে এরই মধ্যে। ওঁকে বলে কয়ে যদি বাকী মাইনের মধ্যে কিছু টাকা—সব আমি চাইনে এখন—অন্ততঃ যদি পঞ্চাশটা টাকা ও দেন তাহলেও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারি। এই উপকারটা যদি দয়া করে করেন আপনি। আচ্ছা, আজ আসি। মনে রাখবেন কিন্তু আমার কথাটা।

রসিকবাবু বাহির হইয়া গেলেন। আমি কিন্তু ঠিক তখনই উঠিতে পারিলাম না। বেকার রসিকবাবুর কথায় মনে মনে হাসিতেছিলাম বটে—কিন্তু তাঁহার মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস অনেকদিন আমার স্মরণ থাকিবে।

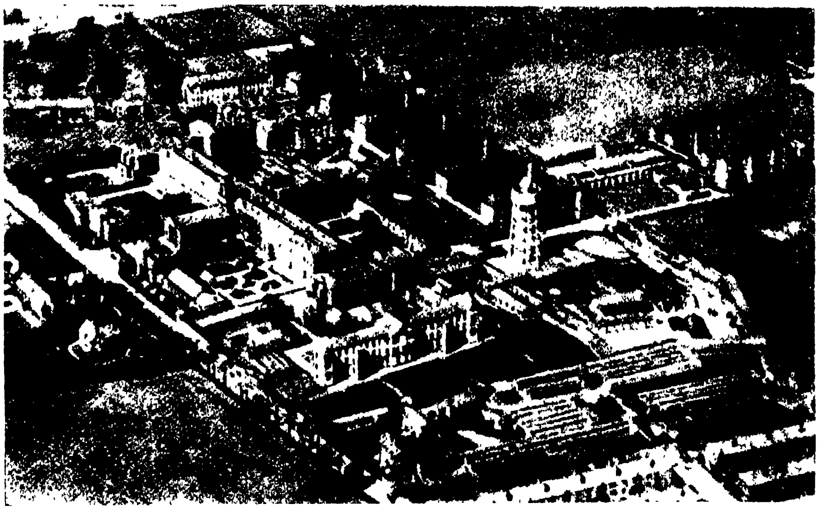


ম্যান্‌চেষ্টার—পৌরপ্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য

শ্রীবিনয়কুমার সেন বি-এস্‌-সি, বি-এ (কমার্স) এ-সি-এ, এ-এস্‌-এ-এ*

জনসাধারণের স্বার্থ ও সুবিধাকে কেন্দ্র করে বড় বড় শহর গড়ে ওঠে, আর তারই সঙ্গে নাগরিকদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য গড়ে ওঠে বড় বড় ম্যুনিসিপালিটী। শহরের জনবহুলতা হয় যত বেশী, ম্যুনিসিপালিটীর কর্ম্মক্ষেত্র হয়ে পড়ে ততই বিস্তৃত, ততই ব্যাপক। ম্যাঞ্চেষ্টার ম্যুনিসিপালিটীর বেলাও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এটী পৃথিবীর জনবহুল শহরগুলির অন্যতম -২৭২৫৫ একর পরিধির মধ্যে ৭,৭৮,৪৭১জন নাগরিকের বাস।

এই জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য শুধু পথঘাট, গ্যাস্‌ ও ইলেক্ট্রীকের সুব্যবস্থা করলেই ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশনের কাজ ফুরিয়ে যায় না, নাগরিকদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে তার সেবা করতে হয়—কর্পোরেশনের সেবাসদন থেকে হয় শিশুর জীবনের সুরু, কর্পোরেশনের সমাধিক্ষেত্রে হয় নাগরিকদেহের পরিসমাপ্তি। শিশু জন্মের পরেই 'শিশুরক্ষা বিভাগের' রক্ষণাবেক্ষণে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হতে সুরু করে, তারপর শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধানে



ম্যাঞ্চেষ্টারের একটি ম্যুনিসিপাল হাসপাতাল

আরম্ভ হয় লেখাপড়া, শিখিয়েই ছেড়ে দিলেন তা নয়, শিক্ষার্থীর চোখ দাঁত ও দৈহিক পুষ্টিসাধনের দিকে যথেষ্ট যত্ন নিলেন। একদিকে যেমন বিদ্যালয়, আর্ট গ্যালারী, গ্রন্থাগার প্রভৃতি আছে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, আর এক দিকে তেমনই আছে ব্যায়ামগার, স্নানাগার, খেলার মাঠ এবং স্বাস্থ্যকে সঞ্জীবিত করার নানান সুবিধা। ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশন নাগরিকদের দস্যু তস্কর ও পকেটমারের হাত থেকে রক্ষা করে, অগ্নিভয় নিবারণ করে, বহু দূর থেকেও বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে, নাগরিকদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ করে, দরিদ্র, রুগ্ন ও অন্ধদের সেবা করে, অর্থাৎ নাগরিকদের জন্য যা-কিছু করা কর্ত্তব্য সবই করে।

ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশনের সমগ্র কার্য্যক্রম আলোচনা করা ছোট একটী প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নয়; শুধু তার স্বাস্থ্য বিভাগের কথাই আলোচনা করব। স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ হচ্ছে নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, আবর্জ্জনা পরিস্কার, ময়লা জল নিষ্কাসন, স্নানাগারের ব্যবস্থা, রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু। স্বাস্থ্য বিভাগটীই হচ্ছে কর্পোরেশনের মুখ্য বিভাগ এবং এই একটী বিভাগের কার্য্য-ব্যাপকতা আমি বিশেষভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই।

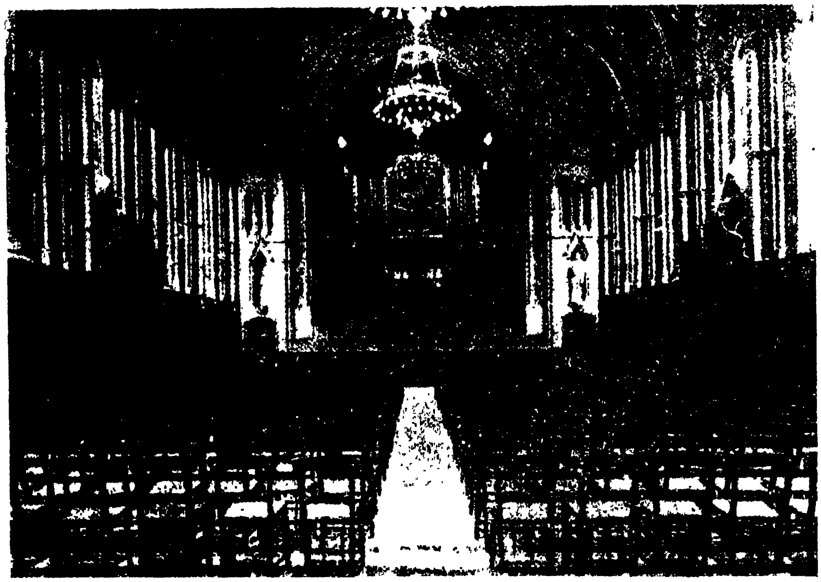
বর্ত্তমান যুগের জগৎব্যাপী অর্থসঙ্কটের দিনে যখন সকল বিভাগেই ব্যয়সঙ্কোচ করা হচ্ছে তখন ম্যানচেষ্টার কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগের বেলায় সে কথাই ওঠে না; কেন না, জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার মূল্য যে কত বেশী তা কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বোঝেন এবং বোঝেন বলেই সমগ্র ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ তাঁরা ব্যয় করেন স্বাস্থ্য-বিভাগের জন্য। ৮,৮৫,৮১,৮৯৪ টাকার মধ্যে ২,২১,৪৫,৭৪৭ টাকা গত

* চার্টার্ড ও ইনকরপোরেটেড্‌ একাউন্টেন্ট, ম্যাঞ্চেষ্টার মিউনিসিপাল কর্পোরেশন।

বছর এই বিভাগে ব্যয় হয়েছে। টাকাটা কি ভাবে ব্যয় হয় সেই কথাই এবার বলি।

প্রথমেই হচ্ছে হাসপাতালের কথা। স্বাস্থ্য-বিভাগের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে হাসপাতাল পরিচালনা করা। প্রত্যেক নাগরিকের কোন না কোন আত্মীয় জীবনে অন্তত একবারও হাসপাতালের শরণাপন্ন হয়েছেন। সেই জন্যই এই হাসপাতালের কার্য্যক্ষেত্রই সবচেয়ে অর্থসাপেক্ষ। স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগও সে বিষয়ে সচেতন! তাঁরা সওয়া দু কোটী টাকার মধ্যে দেড় কোটী টাকারও অধিক এই ব্যাপারে ব্যয় করেন। দশটী হাসপাতাল, দুটী স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অসংখ্য আরোগ্য-নিকেতন তাঁদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। সর্ব্বসমেত ৯২৩৪টী বেডের খরচ তাঁদের বহন করতে হয় এবং বছরে প্রায় ৪০,০০০ নাগরিক এই সব বেডের সব সুখসুবিধা গ্রহণ করেন। এইজন্য প্রতি বছরে স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগকে ব্যয় করতে হয় ১০,০০০ পাউণ্ড ওজনের মাংস, ৩,২০,০০০ পাউণ্ড মাছ, ১,৬০,০০০ পাউণ্ড মাখম, ৬২,০০০ পাউণ্ড চা, ৩০০০খানা কম্বল, ৩৫,০০০ গজ কাপড় এবং আরও অনেক কিছু।

এই প্রসঙ্গে আমি একটীমাত্র হাসপাতালের উল্লেখ করব, সেটী ক্রামসল্ হাসপাতাল। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় যে, এক বছরে এখানে ১১,৪৭৪জন রোগী ভর্ত্তি হয়েছে এবং ২,১০০জন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে এখানকার প্রসূতি আগারে। ১২৫৭টী অস্ত্রোপচার হয়েছে, ১৭২৭৯ ব্যক্তির রোগমুক্তির পর সেবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ১৪১৩৯জন ক্লিনিকাল বিভাগে চিকিৎসিত হয়েছেন। এখানে ২৭০জন নার্স কাজ করেন; আর যে কয়জন ডাক্তার আছেন তাঁদের মধ্যে মেডিকেল সুপারিণ্টেডেণ্ট, ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্ট, প্রসূতি-আগার ও স্ত্রীরোগের তত্ত্বাবধানে দুজন মহিলা চিকিৎসক, অস্ত্রোপচারক, ছ জন রেসিডেণ্ট ডাক্তার; তাছাড়া রেডিওলজিষ্ট, প্যাথলজিষ্ট, ডেণ্টিষ্ট ও অন্যান্য বিশেষ চিকিৎসা পারদর্শী বহু চিকিৎসকও আছেন।



কর্পোরেশনের সুবৃহৎ সভাগৃহ

তারপর স্যানাটোরিয়ামের কথা। যে সব হতভাগ্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের জন্য বার্ডলে স্যানাটোরিয়াম। যক্ষ্মার হাত থেকে বাঁচার জন্য রোগীর পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন তার কোন ত্রুটি এই স্বাস্থ্য-নিবাসটীতে নেই; এখানে সর্ব সমেত ৩৩৩জন রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে। আর আছে এই সব রোগীর জীবন আনন্দময় করে তোলার জন্য একটী রঙ্গমঞ্চ (এখানে সবাক চিত্রও দেখান হয়) ও খেলার মাঠ; ঝুড়ি বোনা, ছুতোরের কাজ প্রভৃতি স্বল্প আয়াসসাধ্য সুখকর কাজের ব্যবস্থা; তাছাড়া প্রত্যেক বেডে একটী করে হেড ফোনের ব্যবস্থা।

উত্তর ওয়েল্সের সমুদ্রতটে শিশুদের জন্য 'এবার-হিল' স্যানাটোরিয়াম। পাহাড়ের বুকে সুদৃশ্য এই প্রাসাদটীর গায়ে যখন প্রভাতী সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে তখন বড়ই সুন্দর দেখায়। ১,৮০,০০০ পাউণ্ড খরচ করে এটী প্রতিষ্ঠিত এবং এর প্রতিটি পাউণ্ড ব্যয় যে সার্থক হয়েছে তা এখানে একবার গেলেই বোঝা যায়। দরিদ্র সন্তানদের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার কি করতে পারে এইটীই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বছর পাঁচেক আগে ম্যাঞ্চেষ্টার কর্ত্তৃপক্ষ একটী 'টিউবারকিউলিসিস ক্লিনিক'-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে শুধু যে যক্ষ্মা রোগীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয় তা নয়, যারা অর্থাভাবে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা করতে পারে না সেই সব রোগীকে এখান থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করা হয়।

যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণত দুটী পথ অবলম্বন করেছেন—রোগীর প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও রোগীর চিকিৎসাবিধান। তাছাড়া যক্ষ্মার মত ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির যাতে বিস্তার না ঘটে সেদিকেও এঁদের বিশেষ দৃষ্টি আছে। যাঁরা রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হন তাঁদের বার্ষিক হিসাব রাখা হয়। সেই হিসাব থেকে দেখা যায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যত লোক এই রোগে মারা গেছে বর্ত্তমান মৃত্যুহার তার এক তৃতীয়াংশেরও কম। রোগের বিস্তারও লক্ষ্য করার বিষয়—১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে হাজারে ৫·৩২জন এই রোগে ভুগ্‌তেন, আর এখন হাজারে মাত্র ১·৭৯জন এই রোগে আক্রান্ত হন। এই থেকেই বোঝা যায় ম্যাঞ্চেষ্টার কর্ত্তৃপক্ষ যক্ষ্মার সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করেছেন।

সংক্রামক রোগের জন্য আছে 'মনসল' হাসপাতাল। এখানে ডিপ্‌থিরিয়া চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। শিশুর বয়স ছমাস হলেই তার বাহুতে তিনটি ইঞ্জেকসন দেওয়া হয়, সেজন্য কোন ব্যথা বোধ হয় না; তার ফলে শিশু আর ডিপ্‌থিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় না। এই জন্য বহু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই বিভাগে নিযুক্ত আছেন। প্রায় ৯০,০০০ শিশুর এই বিভাগে চিকিৎসা হয়েছে। কেবল শিশু রোগের জন্য 'বুথ হল' হাসপাতালেই ৭০০টী বেড আছে। যে সব শিশু জন্মাবধি চিররুগ্ন অথবা রিকেট প্রভৃতি রোগে ভুগ্‌ছে, তাদের জন্য বেবি হাসপাতালের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

ব্ল্যাক্‌বার্ণ অঞ্চলে 'রিবল' উপত্যকায় 'লাঙ্গো কলোনী' আছে। যাঁরা সামান্য উত্তেজিত হয়ে পড়্‌লেই মূর্চ্ছা যান তাঁদের এখানে রাখা হয়। ৬২০ জন রোগীর জন্য এখানে বন্দোবস্ত আছে। এখানকার রোগীরা কৃষিকার্য্যে সহায়তা করে, নানা ধরণের স্পোর্টসের আয়োজন আছে, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলাও চলে। শীতের দিনে এখানে নৃত্যগীতের নিয়মিত বৈঠক বসে; তার উপর চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা ত আছেই।



যানবাহনের কর্ম্মচারীদের দন্ত চিকিৎসা গৃহের একটী কক্ষ

এই ত গেলো মাত্র কয়েকটি হাসপাতালের কথা; আরও হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় আছে, তাদের সব কথা আলোচনা করলে এ প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে, পাঠকেরাও হবেন বিরক্ত; কাজেই জনসাধারণের স্বাস্থ্য-বিভাগের অন্যান্য কার্য্যক্রম এখন আমি আলোচনা করব।

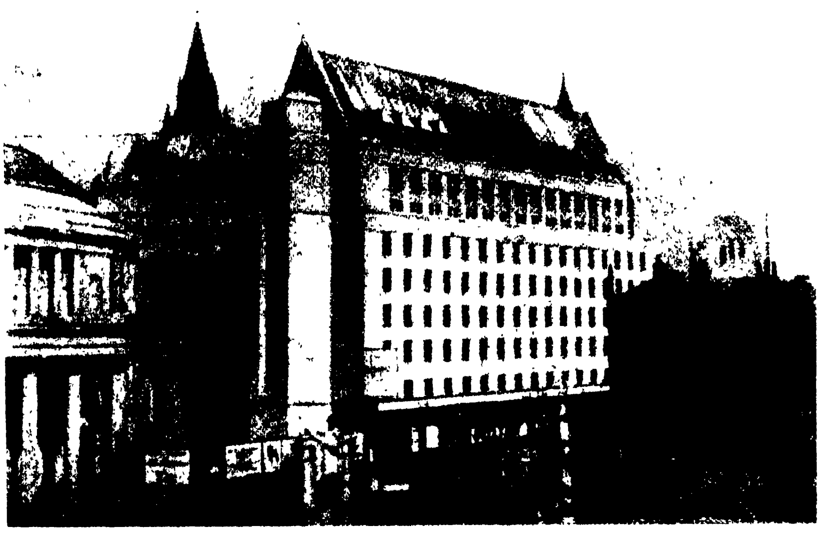
ম্যাঞ্চেষ্টারের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল সম্পর্কিত অসংখ্য হাসপাতাল আছে। একুশটী শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে সূর্য্যরশ্মি সৃষ্টি ক'রে মালিস ক'রে নানা শিশুরোগ সারানো হয়; তাছাড়া দন্ত রোগেরও

বিশেষ প্রতিকার করা হয় এবং প্রয়োজন মত খাঁটি দুধও সরবরাহ করা হয়।

পঞ্চাশ বছর আগেও শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১৭৫টী, কিন্তু এখন মাত্র হাজারে ৭৫টী। এই অসাধ্য সাধন করেছে ওখানকার শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলি। শিশুমঙ্গল-কেন্দ্রগুলির নিয়মিত সেসন বসে শহরের প্রতি ওয়ার্ডে এবং সেই সময় চিকিৎসক ও ধাত্রীরা নানা ভাবে সন্তান-বতীদের শিক্ষা দেন সন্তানদের যথোপযুক্ত যত্ন লওয়া সম্পর্কে। সন্তান সম্ভাবিতাদের নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়, দেখা হয়, ব্যবস্থা করা হয়; দৈহিক ওজন লওয়া হয় এবং কিভাবে সন্তানদের সেবা করতে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব সুব্যবস্থার ফলে ম্যাঞ্চেষ্টারে প্রতি হাজারে মাত্র পাঁচটী প্রসূতি প্রসবাগারে মারা যায়।

এই ত গেলো প্রসূতির কথা। শিশুর বেলাও সুবন্দোবস্তের ত্রুটি নেই। তারও ওজন লওয়া হয়, পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়। সামান্য অসুস্থ মনে হলে চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত করা হয়। তাছাড়া শিশুর দেহের প্রতি পেশীটীর ব্যায়াম করিয়ে, মালিস করে, শৈশব থেকেই তাকে বলিষ্ঠ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত করে তোলা হয়। পিতামাতা অসমর্থ হলে শিশুর বিশেষ পথ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা কমিটী এই উদ্দেশ্যে বছরে ৫০০০ পাউণ্ড ব্যয় করেন। এই টাকাটা শুধু দরিদ্র শিশু ও প্রসূতির পথ্য সরবরাহেই ব্যয় হয়। শিশুর পিতামাতা সত্যই গরীব কি-না জানার জন্য তাদের পারিবারিক আয় নির্দ্ধারণ করা হয় এবং ধার্য্যস্তরের (fixed label) নিম্নে আয় হলেই তাদের গরীব বলে গণ্য করা হয় এবং সেই গৃহে বিনামূল্যে বা অর্দ্ধমূল্যে খাঁটি দুধ জোগান হয়।

স্বাস্থ্য-বিভাগে ৭০ জন বেতনভোগী কর্ম্মচারী আছেন; তাঁরা সকলেই বিশেষভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষিত। তাঁরা শহরের প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রসূতিদের উপদেশ দেন—কি ভাবে শিশুর পরিচর্য্যা করতে হ'বে। শিশুর পাঁচ বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত এই সব পরিদর্শকেরা তাদের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এই সব পরিদর্শকের অন্তত পাঁচ লক্ষ শিশুর তত্ত্বাবধান করতে হয়।



ম্যুনিসিপাল অফিস বিল্ডিংয়ের এক দিক—এই গৃহে স্বাস্থ্য বিভাগ অবস্থিত

যৌন ব্যাধির চিকিৎসার জন্যও বড় বড় হাসপাতাল আছে। ম্যাঞ্চেষ্টার রয়াল ইন্‌ফারমারী, সেণ্ট মেরী হাসপাতাল, স্কিন হাসপাতাল, মনসাল হাসপাতাল প্রভৃতি তাদের মধ্যে অন্যতম; এগুলি স্বাস্থ্যবিভাগের দ্বারা পরি-চালিত নয়, তবে ম্যুনিসি-পালিটীর অর্থের উপরেই তাদের নির্ভর করতে হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব থেকে দেখা যায়, ৭,২০০ জন এই বিভাগে চিকিৎসিত হয়েছেন এবং তন্মধ্যে ১,৬৩৯ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

বস্তী অঞ্চল পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিয়ম কানুন হয়েছে। একটী নির্দ্দিষ্ট পঞ্চবার্ষিকী কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে; যাতে আগামী পাঁচ বছরের পরে বস্তী সম্পর্কে অভিযোগ করার কিছু না থাকে। নোংরা বস্তী-বাসিন্দাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটায়; সেইজন্য এই বিষয়ে এখন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বস্তীগুলি রোগবিস্তারের সহায়তা করে, বাসিন্দা-দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে; সবল ব্যক্তিও এখানে বেশী দিন সুস্থ থাক্‌তে পারে না। জাতির ভিত্তি দৃঢ়

কর্‌তে হ'লে জাতীয়, উন্নতি কামনা কর্‌লে বস্তীর উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তার উপর এই বিষয়ের ভার আছে এবং শাসনবিভাগের মন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে যথাযথ নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন।

সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটী গবেষণাগারও আছে। সেখানে যক্ষ্মা, টাইফয়েড, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে যথারীতি গবেষণা করা হয়।

বিশ্লেষক আছেন, খাদ্য ঔষধ প্রভৃতি তিনি নিয়মিত ভাবে বিশ্লেষণ করে থাকেন। এইজন্য তিনজন ইন্‌সপেক্টর আছেন—তাঁদের কাজ হচ্ছে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করা। পরে এই খাদ্য বিশ্লেষণ করে দেখা হয় এগুলি বিশুদ্ধ কি-না। অবিশুদ্ধ হ'লে তার বিক্রেতাকে আইনত অভিযুক্ত করা হয়। গত ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দেই ৩,৩১৬ প্রকার খাদ্যের নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল এবং তার মধ্যে মাত্র ১৩২টী ভেজাল-মিশ্রিত।

ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে প্রতিদিন ৫০ গ্যালন দুধের প্রয়োজন হয়। দুধ থেকেই নানা রোগের বীজাণু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেইজন্য দুধের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়। প্রথমত, প্রত্যেক গোশালা ও দুধের দোকান নিয়মিত-ভাবে পরিদর্শন করা হয়। দুধবাহী গাড়ী, বাসনপত্র, ছানা মাখনের কারখানার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতি গরুকে বিশেষভাবে গো-চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানো হয়। তৃতীয়ত, দুধের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়, তাতে যক্ষ্মা কিম্বা অন্য কোন রোগের বীজাণু আছে কি-না।

দুস্থ গরীবেরা অসুস্থ হ'লে অনেক সময় ডিষ্ট্রিক্ট্‌ মেডিকাল্‌ অফিসারের কাছে বিনামূল্যে ঔষধ পায়। মুানিসিপালিটীর অর্থভাণ্ডার থেকে সেই ঔষধের দাম দেওয়া হয়। এই জন্যই ২৬ জন বেতনভুক ডাক্তার আছেন এবং এই বিভাগে গড়ে প্রতি বছরে ১২,৫০০ পাউণ্ড ব্যয় করা হয়। ইহা ছাড়াও এই বিভাগে আরও ৪২ জন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতি বছর টীকা দিতে ম্যাঞ্চেষ্টার ম্যুনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ৪,৩০০ পাউণ্ড খরচ করেন।



ভিক্টোরিয়া বাথ্‌স—একটি সাধারণ স্নানাগার

তারপর স্যানিটারী বিভাগের কথা। শহরকে রোগ-মুক্ত রাখার জন্য এই বিভাগ একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক গৃহটী পরিদর্শন করা হয়, খাদ্যে ও ঔষধ পথ্যে দুষণীয় কিছু আছে কি-না দেখা হয়; সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা

করা হয়, ড্রেন ও জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হয়, দোকান, কারখানা, বেকারী প্রভৃতি, হোষ্টেল ও পথঘাট বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিভাগে ৫০ জন ইন্সপেক্টর কাজ করেন। তাঁদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেক ধাত্রী ও বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ব স্বাস্থ্যকর রাখা, ড্রেন থেকে কোনরূপ দুর্গন্ধ বাহির না হয়, ইঁদুর তেলাপোকা বাড়ীতে না থাকে, চুল্লীর ধোঁয়ায় বাড়ী যেন না আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, খাবারের দোকানে যাতে দোকানীরা পরিচ্ছন্ন থাকে। বড় বড় কারখানাগুলি দেখা হয়; সেখানকার কর্ম্মচারীরা



মাঞ্চেষ্টার টাউন হল

যাতে পর্য্যাপ্ত আলো-বাতাস পায়, অগ্নিকাণ্ড ঘটলে পলায়নের যেন পথ থাকে, দোকানের কর্ম্মচারীরা নিয়মিত ছুটী পাচ্ছে কি-না সেদিকেও তদ্বির করা হয়। নাগরিকদের পক্ষ থেকে সব রকম অভাব অভিযোগের প্রতিকার করা হয়। গত বছর ৭,৪০০ অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেই সম্পর্কে ১৮৩,৯০১ বার তল্লাস করা হয়।

দুধ ও ঔষধপত্র বিশ্লেষণ করার কথা পূর্ব্বেই বলেছি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐই সম্পর্কে ৩,২৪২টী নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তার মধ্যে ৮৮টি ভেজাল মিশ্রিত; তার ফলে ১৪ জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাদের জরিমানা করা হয়। শুধু দুধের বেলাই যে খুব সতর্ক হতে হবে তা নয়, দুধ সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। উদাহরণ হিসাবে আইসক্রীমের কথাই ধরা যাক্। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন করা হয়েছে—যে আইস-ক্রীম প্রস্তুতকারক তার প্রস্তুত পদ্ধতির বিশুদ্ধতা স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক পরীক্ষা করিয়ে না নেবে সে আইনত দণ্ডনীয় হবে।

লাঙ্কাসায়ারের লোকেরা মাছ খেতে ভালবাসে, হোটেল থেকে মাছ সরবরাহ করা হয়। কর্ত্তৃপক্ষ হোটেলগুলির উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন। কেন না, মাছ যদি অসতর্কভাবে, কি অপরিচ্ছন্ন ভাবে রন্ধন করা হয় তাহলে অনেক সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে। বেশী মাছের দোকান হলে প্রতিযোগিতায় অল্প মূল্য করার জন্য অনেক অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে সেই জন্য প্রতি সিকি মাইল তফাতে একটী করে মাছের হোটেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়। মাংসও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতার বেলায়ও পরিচ্ছন্নতার কড়াকড়ি নিয়ম আছে। খাদ্যদ্রব্যে যদি মাছি বসে বা অপরিচ্ছন্ন স্থানে রক্ষিত হয়, তাহ'লে সে খাবার বিক্রয় আইনত দণ্ডনীয়।

সহসা কোন লোক শহরে এসে কোন অসুবিধা না ভোগ করেন সেজন্য মুনিসিপালিটীর নিজেরই দুটী হোষ্টেল আছে—একটী পুরুষদের জন্য, অপরটী মেয়েদের জন্য। মেয়ে হোষ্টেলে ২১০টী বেড আছে, দৈনিক ১ শিলিং বা সপ্তাহে ৬ শিলিং দিলে সেখানে থাক্‌তে পারা যায়। পুরুষদের হোষ্টেলে আছে ৪৬৩টী বেড; এরও ভাড়া মেয়ে-হোষ্টেলের সমান। হোষ্টেল সংলগ্ন খাবারের দোকান আছে, মুচির দোকান আছে, কাপড়জামার দোকান আছে; সাধারণ বাজার মূল্যে সেখান থেকে সব জিনিষই পাওয়া যায়। এই মেয়ে-হোষ্টেলটীতে গত বৎসর ৬০,০০০ নারী আশ্রয় পেয়েছিল; আর পুরুষ হোষ্টেলটী তো কোন দিনই খালি যায় না। যাদের নিজেদের বাড়ী নেই, তারা এখানে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারে।

এই সব কর্ম্মপদ্ধতি দেখলেই বোঝা যায়, নাগরিকদের দীর্ঘজীবন লাভের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা করতে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পরাঙ্মুখ নন। এর ফলে জনসাধারণের

আয়ু গড়পড়তায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পুরুষের জীবন ছিল ৪১ বছর, মেয়েদের জীবন ৪৩ বছর ; ১৯২২এ সেই আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫৫ ও ৬৯ বছরে এসে পৌছেছে। এই সুন্দর স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার জন্য ৮০ বছরের মধ্যে গড়ে ১৫।১৬ বছর করে নাগরিকদের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দিক দিয়ে নাগরিকদের দেওয়া কর সার্থক হয়েছে স্বীকার করতেই হ'বে। সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, এ ভাবে তাঁরা ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলছেন, কি করে ভবিষ্যতে তাঁরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘজীবন পেতে পারে। এই সব আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এঁদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা করার মত অনেক কিছু আছে।

নূতন ঘর

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ এম-এ.

বেদনা হাসিতে বেঁধেছি নূতন ঘর
ধূসর উষর বালুকাবেলার 'পর।
সমুখে গরজে সীমাহীন পারাবার,
ভাঙে আর গড়ে আপনারে বারে বার ;
ভাঙে আর গড়ে উর্মি উন্মুখর।
বালুকাবেলায় বাঁধিয়াছি ছোট ঘর ॥

ঝিনুক কুড়ায়ে কভু কেটে যায় দিন
কভু কেঁদে সারা, কভু বা বাজাই বীণ।
আকাশ যেথায় সাগরের সনে মেশে
কে যেন আমায় ডেকে যায় সেই-দেশে ;
সেই সুদূরের তারার প্রদীপ ক্ষীণ,
ডাকে মোরে ডাকে, ডাকে মোরে নিশিদিন।

রামধনু রঙ নয়নে মিলায় ধীরে ;
ছুটে যেতে চাই সকল বাঁধন ছিঁড়ে।
প্রতি নিয়তের কলরব কোলাহল
কাঁপে সাগরের কালো জলে অবিরল :
এই খেলাঘর আমায় রাখে গো ঘিরে,
আমি যেতে চাই সকল বাঁধন ছিঁড়ে ॥

হেথা আনাগোনা অতিথির ভিড় শত ;
ফেরে তাহাদের পায়ে পায়ে মীড় কত।
না-বলা না-ক'য়া কথাগুলি থরে থরে—
তাদের হিয়ায় ফুল সম ফোটে ঝরে ;
তাদের গোপন স্বপন কাহিনী যত
অবিরত প্রাণে গুঞ্জন তোলে কত।

আজিকে বিমনা দাঁড়ায়ে সাগর-কূলে ;—
এ পারের পানে জোয়ার আসিছে ফুলে,
এ পারের পানে আসিছে জোয়াররাশি—
হাসি আর শুনি ভুবন-ভোলানো বাঁশি ;
নিমিষে কোথায় ভেসে যাব দুলে-দুলে।
ফিরিব কি আর এই ঘরে এই কূলে ?



নিষ্কৃতি

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দিগম্বর মুখুয্যের পৌত্রকেও যে ইস্কুল-মাষ্টারী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে ইহা কেহ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই ; অথচ দিগম্বর মুখুয্যের মৃত্যুর দশ-বার বৎসরের মধ্যেই পৌত্র বিপিনকে গ্রামের ছোট একটি মাইনর ইস্কুলে শিক্ষকতা করিতে দেখা গেল। শুধু তাহাই নহে, পৈতৃক প্রাসাদতুল্য বিরাট বাসভবন হইতে কেমন করিয়া যে বিপিন বঞ্চিত হইয়া মাসিক ছয় টাকা ভাড়ার একটি খোলার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহা বস্তুতই এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। পৃথিবীতে অহরহ এইরূপ কত অচিন্ত্যনীয় কত বিস্ময়কর ব্যাপারই ঘটিয়া চলিয়াছে! মানুষের অভিজ্ঞতায় কত বিচিত্র, কত অসম্ভব ঘটনাই না সঞ্চিত আছে, কিন্তু তবু মানুষ বিস্মিত হয়।

সে দিন শনিবার। এই কিছুক্ষণ হইল ইস্কুলের ছুটি হইয়া গিয়াছে। চৈত্রের রৌদ্রদগ্ধ প্রখর মধ্যাহ্ন। ছাত্রশূন্য ক্লাসে আপন জীর্ণ চেয়ারখানিতে বসিয়া দ্বিতীয় শিক্ষক বিপিন মুখুয্যে জানালার মধ্য দিয়া দক্ষিণের শুষ্ক-তৃণাবৃত বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

মেজ মেয়ে কমলা তিন-চার দিন ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। আমরুল পাতার রস, ভেরাণ্ডার আটা সহযোগে বাতাসা, ছাগলের দুধের সঙ্গে জাম পাতার রস প্রভৃতি কত টোট্‌কাই না করা হইল, তবু ছোট ছেলে বিশুর রক্তামাশয় আজ দিন পনেরোর মধ্যে একটুও কম পড়িল না। প্রতিদিনই ডাক্তার দেখাইবে বলিয়া স্ত্রীকে সে স্তোকবাক্য দিয়া আসে, কিন্তু আর চলে না।

আজ সকালে ডাক্তারখানার দরজার নিকট গিয়াও সে ফিরিয়া আসিয়াছে—ভিতরে যাই যাই করিয়াও যাইতে পারে নাই। এই কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার আসিয়া কড়া তাগাদার সঙ্গে একখানি বিল্ দিয়া গিয়াছে—এখনও ষোল টাকার উপর তাহাদের পাওনা।

ঔষধ বা ফলমূল ত দূরের কথা, কিছু বার্লি ও খানিকটা মিছরি লইয়া না গেলে রুগ্ন মেয়ে ও ছেলেটাকে আজ উপবাসে কাটাইতে হইবে। ইস্কুলে আসিবার কালে স্ত্রী বার বার করিয়া এই বার্লি ও মিছরির কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। মুদির দোকান হইতে আর এক পয়সাও ধার পাইবার উপায় নাই, সেখানে প্রায় চল্লিশ টাকা ধার পড়িয়া গিয়াছে। মাসকাবারে শোধ না করিলে নালিশ করিবে বলিয়া তাহারা শাসাইয়া রাখিয়াছে পর্য্যন্ত। ইস্কুলে যে তিন-চার জন শিক্ষক আছেন সকলের নিকটই সে দুই-এক টাকা করিয়া ধারে ; কোন্ লজ্জায় তাঁহাদের নিকট সে পুনরায় গিয়া হাত পাতিবে! পীড়িত ছেলেমেয়ের বার্লি ও মিছরির জন্য মাত্র চারিটা পয়সা সংগ্রহ করাও তাহার পক্ষে আজ দুঃসাধ্য।

ইস্কুলের চাকর সনাতন ঘর ঝাঁট দিবার জন্য ঝাঁটা হাতে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টারবাবু এখনও যে আপনি ব'সে?" একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এই যাই।"

বিপিন ধীরে ধীরে ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধ সনাতন সেইদিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর ঝাঁট আরম্ভ করিল।

চৈত্রের রৌদ্রতাপে পল্লীগ্রামের মাটির পথ ফুটি-ফাটা হইয়া আছে। প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী ছায়াবিহীন সেই উত্তপ্ত পথের উপর দিয়া নগ্নপদ বিপিন অন্যমনস্কের মত চলিয়াছে। কয়দিন হইতে জীর্ণ চটি জোড়াটা বাড়ীতে পড়িয়া আছে—পয়সার অভাবে তাহা মেরামত করা ঘটিয়া উঠে নাই। এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথে চলিতে চলিতে সে একবার হোঁচট্ খাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল ও তাহার পর আবার চলিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া একটি মেটে খোড়ো-বাড়ীর প্রাঙ্গণের বেড়ার ধারে আসিয়া সে থামিয়া পড়িল। দু একবার কাশিয়া গলার স্বরটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে ডাকিল, "শিবু বাড়ী আছ নাকি?"

অশীতিপর বৃদ্ধ শিবু মণ্ডল তখন দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ডাক শুনিয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়া তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না—"কে—দাদাঠাকুর আপনি! আসুন আসুন।"

"না শিবু, ভেতরে আর যা'ব না।—হ্যাঁ, বলছিলাম কি দু'আনা পয়সা আমায় ধার দিতে পার? আর দেখ, এ পয়সা এখন আর আমি শোধ দিতে পারব না—দিন দশ,বারো পরে মাইনে পেলে শোধ করব।"

পুরুষানুক্রমে শিবু মুখুয্যেদের প্রজা। দিগম্বর মুখুয্যে যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতি বৎসর মহাষ্টমীর দিন সে ছেলেপুলে লইয়া জমিদার বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া আসিয়াছে। বিপিনকে এতটুকুবেলা হইতে সে জানে। একদিন এই বিপিনেরই অন্নপ্রাশনে দশখানা গ্রামের লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল—সেই বিরাট জনসমাগমের দৃশ্য আজও শিবুর চোখের উপরে ভাসিতেছে। নহবৎখানা হইতে শানাইয়ের সুর ও দশদিক্ প্রকম্পিত করিয়া গোরা-বাদ্যির সে বিরাট ঢকা-নিনাদ যেন আজও তাহার কানে আসিয়া বাজে। মুখুয্যেদের বাড়ীঘর সমেত জমিদারী নিলামে উঠার কাহিনী শিবুর অজানা নয় ; বিপিন যে ইস্কুল-মাষ্টারী করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছে তাহাও শিবু জানে, কিন্তু মাত্র দুই আনা পয়সার বিপিনের এমন কি প্রয়োজন পড়িতে পারে যাহার জন্য সে এতখানি পথ এবং শিবুর নিকট হইতে ধার চাওয়ার নিদারুণ লজ্জাকেও অতিক্রম করিয়া গেল, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে দু'আনা পয়সা আনিয়া শিবু বিপিনকে দিতে ভাঙ্গা গলায় সে বলিল, "তা হ'লে ঐ কথাই রইল শিবু—মাসকাবারে—"

শিবু বলিয়া উঠিল, "ও কি কথা বলছেন দাদাঠাকুর—সাতপুরুষ আপনাদের খেয়েই আমরা মানুষ।"

মাঠের পথ ধরিয়া বিপিন চলিয়াছে। সে দিগম্বর মুখুয্যের পৌত্র —সামান্য দু'আনা পয়সার জন্য যে আজ অনায়াসে তাহাদেরই এক দরিদ্র কৃষক প্রজার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে পারিল!…লজ্জা?…অপমান? —কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত এক প্রকার অদ্ভুত নিদারুণ হাসিতে তাহার সারা মুখখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। ইস্কুলের ছুটি অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে—রোগ-ক্লিষ্ট ছেলেমেয়ে দু'টির ক্ষুধা-কাতর ক্রন্দন যেন তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

মুদির দোকান হইতে দুই পয়সার বার্লি ও দুই পয়সার মিছরি কিনিয়া লইয়া যখন সে বাড়ী আসিয়া ঢুকিল তখন স্ত্রী মেজমেয়ে কমলার মাথায় জলপটি দিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। বিপিন সসঙ্কোচে নিকটে আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"জ্বর কি খুব বেড়েছে নাকি?"

ইন্দু কাতর-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ডাক্তার না দেখালে আর ত চলে না; সারা দুপুর ছট্‌ফট ক'রেছে, আর ক্রমাগত ভুল বক্‌ছে।"

বিপিন নীরব নত-দৃষ্টিতে চুপ করিয়া রহিল।

কমলা তাহার ঘোর রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু মায়ের দিকে মেলিয়া বলিল, "একটু জল।"

ইন্দু তাহাকে জল খাওয়াইয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "মিছরি আর বার্লি এনেছ? সারাদিন শুধু জল খেয়েই রয়েছে।"

বিপিন নিতান্ত অপরাধীর মত পকেট হইতে কাগজে মোড়া বার্লি, মিছরি ও চারিটি পয়সা বাহির করিয়া ইন্দুর হাতের নিকট রাখিয়া দিল।

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইন্দু বলিল, "মাথায় তুমি একটু বাতাস কর—আমি বার্লি ক'রে আনিগে।"

বিশুর রক্তামাশয় ভাল হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া জানি না, বিনা চিকিৎসায়—এই দুই দিন হইল কমলারও জ্বর ছাড়িয়াছে। তবে একেবারে কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে, এখনও উঠিয়া বসিতে পারে না। ইন্দুর মাতৃ-হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা হয় ত বা ভগবানের কানে গিয়া পৌঁছাইয়া থাকিবে! এই সীমাহীন দারিদ্র্যের অন্তহীন চিন্তার মাঝেও বিপিন যেন একটা ছেদ দেখিতে পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। জীবনে সে ত কোন অন্যায় করে নাই; ভগবান্ কি এত নির্দ্দয় হইবেন! চিরদিন কি এমনিই যাইবে!

দিন কাটিয়া চলে।

আম-জাম-পেয়ারা বাগানের মাঝে যদি একটা উন্নতশীর্ষ তালগাছ বিরাজ করে তবে তার অশোভন উচ্চতায় যেমন একটা উদ্ধত-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়, তেমনি বিপিন ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মেটে খোলা-বাড়ী ও কয়েকখানা একতলা পাকা-বাড়ীর মাঝে জীবন ঘোষের গগনস্পর্শী ত্রিতল হর্ম্ম্য অপর সকলের হইতে আপন পার্থক্য জ্ঞাপনের দ্বারা যেন একটা রূঢ় ঔদ্ধত্য ঘোষণা করিতেছিল। লক্ষ্মী কখন যে কাহার উপর হঠাৎ দয়া প্রকাশ করিয়া বসেন পূর্ব্ব হইতে তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। গ্রামের প্রাচীন-প্রাচীনারা এই জীবন ঘোষকে বাড়ী বাড়ী দুধ বিলি করিতে দেখিয়াছেন এবং সে যে কোন দিন ইস্কুল-পাঠশালায় গিয়াছে তাহা তাঁহারা স্মরণ করিতে পারেন না। অথচ কোন্ পুঁজির জোরে পাটের কারবারে সে রাতারাতি লাখপতি হইয়া উঠিল বহু গবেষণা সত্ত্বেও আজও কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারে নাই।

জীবন ঘোষ সপরিবারে তাহার কলিকাতার বাড়ীতেই বাস করে। গ্রামের এ বাড়ীটা প্রায় বারমাসই তালাবন্ধ পড়িয়া থাকে; কচিৎ কখন জীবন অথবা তাহার ছেলেরা—গুর্খা দ্বারবান, উড়ে পাচক ও বহু চাকর-বাকর লইয়া মাত্র দু-চার দিনের জন্য এখানে আসিয়া দেখা দেয় এবং জাঁকজমক ও বিরাট হৈ-চৈয়ের দ্বারা আপনাদের ঐশ্বর্য্যকে সপ্রমাণিত করে।

প্রায় হপ্তাখানেক হইল জীবনের ছোট ছেলে বন্ধু মাছ ও পাখী শিকার করিতে বন্ধুবান্ধব লইয়া এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে। বন্ধুরা সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু হঠাৎ বন্ধুর খেয়াল হইয়াছে সে কিছু দিন এখানে কাটাইয়া যাইবে।

বিপিনের ভাড়াটে খোলা-বাড়ীর ঠিক উত্তর সীমানা ঘেঁসিয়া জীবন ঘোষের এই অট্টালিকা। সেদিন দুপুরে ইন্দু উঠানে বসিয়া কয়লার গুল পাকাইতেছিল, হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক কাশির শব্দে চাহিয়া দেখে, ঘোষেদের দ্বিতলের খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একটি যুবক অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া সিগারেট টানিতেছে। তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা সে অনেকখানি টানিয়া দিল।

গৃহস্থালীর কত না কাজে, ইন্দুকে ঐ মেটে খোলা-বাড়ীর অনাবৃত প্রাঙ্গণেই দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হয়। ঘোষেদের বাড়ীর ঐ ছেলেটির কি কোনও কাজ নাই! যখনই দেখ সে জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, না হয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে। আবার কখনও বা হারমোনিয়ম সহযোগে নাকিসুরে ঐ জানালার ধারে বসিয়াই সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেছে। যুবকটির নির্লজ্জ লুব্ধ-দৃষ্টির সম্মুখে ইন্দু লজ্জায় যেন একেবারে মরিয়া যাইতে চাহে। কিন্তু দরিদ্র ঘরের বধূ সে, তাহার আবার লজ্জা—তাহার আবার সম্ভ্রম!

পরদিন দুপুরবেলা ইন্দু তখন খাইতে বসিয়াছিল, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইতে কমলাকে বলিল—"দেখ ত কমলা, কে ডাকছে?"

কমলা গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি মধ্যবয়সী রমণী "কি হচ্চে দিদিমণি" বলিয়া সহাস্যমুখে ইন্দু যেখানে বসিয়া খাইতেছিল তাহারই অনতিদূরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণে তাহার ধব্‌ধবে পাটভাঙ্গা একখানি সৌখিন শাড়ী, গায়ে সেমিজ, দেহে দু-চারখানা সোনার অলঙ্কারও আছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ইন্দু

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া রমণীটি বলিল, "আমায় চিন্‌তে পারবে না দিদিমণি ; আর কি ক'রেই বা চিন্‌বে—এখানে ত' আর থাকিনে! পাশের এই বাবুদের কল্‌কাতার বাড়ীতে আমি কাজ করি ; নাম আমার বিরাজ।"

ইন্দু তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "বস।"

রমণীটি বলিল, "তুমি কেন ব্যস্ত হচ্চ দিদিমণি, এখানে যখন কিছুদিন এখন থাকতেই হবে—তখন মাঝে মাঝে আসব। আর তুমিই বল না দিদিমণি, চুপ্‌চাপ্‌ কি সারাদিন কাটান যায়! ছোটবাবুর একার কাজ ত ভারি, ও আমি এক্ষণ্টার মধ্যেই সেরে ফেল্‌তে পারি।"

অভাবের সংসার, কয়দিন বাজার হয় নাই। দুইটা আলু পড়িয়াছিল—বিপিন ও ছেলেপিলেরা শুধু ডাল ও ঐ আলু দু'টা দিয়াই তাহাদের আহার সারিয়াছে। মাত্র দু'টি খানি ভাত অবশিষ্ট ছিল—খানিকটা তেঁতুল গুলিয়া সেই ভাত কয়টি লইয়া ইন্দু খাইতে বসিয়াছিল। ঘোষেদের সেই ক'ল্‌কাতার দাসীর যেন এতক্ষণে তাহা নজরে পড়িল। সে ইন্দুর আরও খানিকটা নিকটে আগাইয়া গিয়া বেশ জুত করিয়া বসিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে চক্‌চকে প্রকাণ্ড একটি জার্ম্মান সিলভারের ডিবে ও জর্দ্দার কৌটা বাহির করিল ; তাহার পর ডিবের ভিতর হইতে দুইটা পান ও কৌটা হইতে খানিকটা জর্দ্দা লইয়া মুখের ভিতর পুরিয়া তাহা চিবাইতে চিবাইতে সহানুভূতি-বিগলিত কণ্ঠে বলিল, "আহা দিদিমণি, শুধু তেঁতুলগোলা দিয়েই ভাত খাচ্ছ! যাই বল, দেখে কিন্তু ভারী কষ্ট হয়। স্বামী অবশ্য মাথায় থাকুন—সবই অদেষ্ট দিদিমণি, নইলে রাজরাণীর মত তোমার রূপ—"

ইন্দু সহসা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই বিরাজ একটা ঢোক গিলিয়া কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা দিদিমণি, শুনতে পাই তোমার শ্বশুর ত এখানকার জমিদার ছিলেন, তা—"

—এমন সময় বাবুদের বাড়ী হইতে ডাক শুনিয়া বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদিমণি, এখন তবে চললাম ; দেখি ছোটবাবুর আবার কি দরকার পড়ল।"

সম্পূর্ণ অপরিচিতা এই রমণীটির বেশভূষা, ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তার মধ্যে যে রুচির দৈন্য ও হীন মনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহারই গ্লানিতে ঐ স্ত্রীলোকটার প্রতি ইন্দুর সমগ্র অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই বিরাজ চলিয়া গেলে ইন্দু যেন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সন্ধ্যার সময় বিপিন বাড়ী ফিরিয়া বলিল, "হল না। টাকায় এক আনা অবধি সুদ দিতে রাজী হয়েছিলাম—তবুও দিলে না।"

ইন্দু উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর কিছুদিন সময় চাইলে কি তারা দেবে না?"

অধরে একটু নৈরাশ্যমাখা শুষ্ক হাসি টানিয়া বিপিন বলিল, "সময় আর তারা দেবে না। টাকা না পেলে কালই নালিস করবে।"

ইন্দুর সহস্র অনুরোধ সত্ত্বেও বিপিন সেদিন রাত্রে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে রাত্রে সে একটুও ঘুমাইতে পারিল না।

সবেমাত্র তখন ভোর হইতেছে। বাহিরে সদ্যনিদ্রোত্থিত পক্ষীকুলের বিচিত্র কলরবধ্বনি শুনা যাইতেছিল। সহসা বাহির হইতে ভারী ও মোটা গলায় ডাক আসিল "বিপিনবাবু!" বিনিদ্র বিপিন বিছানায় শুইয়া তখন আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা করিতেছিল। এ যে কিসের আহ্বান, বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তথাপি এই প্রত্যাশিত ডাকেও সে চম্‌কাইয়া বিছানার উপর ধড়মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে 'যাই' বলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সারারাত্রি অনাহার, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় তাহার মাথা তখন ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছে—পাশের দেওয়ালে ভর রাখিয়া আগত ব্যক্তিদ্বয়ের মুখের পানে অপরাধীর নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া সে নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল।

মুদির দোকানের লাল-খেরো বাঁধানো প্রকাণ্ড হিসাবের খাতা বগলে যে লোকটি অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, সে বিপিনের একেবারে কাছে আসিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলিল, "প্রাতঃপ্রণাম বিপিনবাবু, আপনার আদেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি কি-না!"

বিপিন নিরুত্তর। আজ প্রভাতেই তাহাদের সমস্ত ঋণ সে পরিশোধ করিবে কথা দিয়াছিল, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হইয়াছে। অসহায় দারিদ্র্যের করুণ ব্যথায় সে মহাজনদের হৃদয়ে করুণা উদ্রেকের ব্যর্থ চেষ্টা দ্বারা আর উপহাস সহ্য করিতে পারিবে না। তাই কাঠের মূর্ত্তির মত সে নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। এতক্ষণ খাদ-পর্দ্দায় নিবদ্ধ মহাজনের বক্রোক্তি, বিপিনের নিরুত্তরতায় একেবারে পঞ্চমে উঠিয়া যে অজস্র কটূক্তি বর্ষণ আরম্ভ করিল, তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া একে একে পাড়ার লোক আসিয়া সেখানে জমিতে আরম্ভ করিল।

প্রভাতেই এইরূপ একটা অস্বাভাবিক গোলমালের শব্দে বঙ্কুরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই কৌতূহলী দর্শকের ভিড় হইতে খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া সে সকল কথাই শুনিতেছিল ; তাহার পর বিপিনের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শুনুন!" বিপিন যন্ত্রচালিতের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ খানিকটা তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের কি কথা হইল জানা গেল না ; তবে ইহা দেখা গেল যে, বিপিন মহাজনদের হাতে তাহাদের প্রাপ্য চল্লিশ টাকার চারখানি দশ টাকার নোট দিতেই তাহারা খাতায় তাহা জমা করিয়া লইল ও হাত তুলিয়া ছোট একটি নমস্কার জানাইয়া বলিল, "কিছু মনে করবেন না বিপিনবাবু—আমাদেরও ত কারবার চলা চাই।"

মহাজনেরা চলিয়া গেলে কৌতূহলী জনতা পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিয়া যে যাহার গৃহে ফিরিল।

গোলমাল শুনিয়া ইন্দু জানালার ফাঁক দিয়া সমস্তই দেখিয়াছিল। অপমানাহত বিপিন লজ্জানত-শিরে যখন বাড়ী আসিয়া প্রবেশ করিল, ইন্দু তখন তাহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ বাদে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া বিপিন বলিল, "পাশের ঐ ঘোষেদের বাড়ীর একটি ছেলে আজ আমায় রক্ষে ক'রলে।"

ইন্দু বলিল, "কেন—তোমায় বুঝি টাকা ধার দিলে ?"

বিপিন বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ইন্দুর পানে চাহিয়া বলিল, "ধার !"

"তবে ?"

"দান করলে। আমাকে কিছু বলতে হয়নি, নিজে ডেকে অনায়াসে আমার হাতে চল্লিশ টাকার নোট দিয়ে বল্‌ল—কিছু মনে করবেন না, এ আর আপনাকে শোধ দিতে হবে না। বল ত কত বড় মহাপ্রাণ !" বলিয়া ইন্দুর মুখের পানে বিপিন চাহিয়া রহিল।

ইন্দু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন প্রভাতেই কি একটা কাজে বিপিন বাহির হইয়াছিল। দুধ দিতে আসিয়া গোয়ালিনী দুধের বাকী দামের জন্য চীৎকারে বাড়ী একেবারে মাথায় করিয়া তুলিল, "বলি দাম দেবার ক্ষ্যামতা যখন নেই, তখন ছেলেদের জল গিলিয়ে রাখ্‌লেই হয়—দুধ রোজ ক'রে নবাবী করা কেন ! এই আমি ব'লে যাচ্চি, কাল সকালের মধ্যে চার মাসের দুধের পাওনা বারোটাকা যদি না পাই ত আদালত-ঘর করিয়ে তবে আমার কাজ।"

ইন্দু দাওয়ার বাঁশের খুঁটি ধরিয়া নির্ব্বাক মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরের ভিতর ছোট ছেলেটা তখন ক্ষুধায় কাঁদিতেছিল, ইন্দু ব্যস্ত হইয়া ভিতরে যাইতে যাইতে সহসা উপরে চোখ পড়িতেই দেখে, ঘোষেদের বাড়ীর সেই ছেলেটি তাহারই দিকে দৃষ্টি মেলিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

কয়েক মিনিট পরে "দিদিমণি কোথায় ?" বলিতে বলিতে বিরাজ একেবারে ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল "ব'স যাচ্ছি।"

"'এস' 'ব'স', দিদিমণির কুটুম্বিতে দেখে আর বাঁচিনে !" বলিয়া একগাল হাসিয়া বিরাজ বলিল, "একবার এধারে এস—একটা কথা আছে দিদিমণি।"

ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া ইন্দু দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ বলিল, "কথা আর এমন কি, ব'ল্‌ছিলাম এই আমাদের ছোটবাবুর কথা। এমন দয়ার প্রাণ আর কখন দেখিনি দিদিমণি ! লোকের দুঃখের কথা শুনেছে কি অমনি আছে কোথায় ! তাই ত গরীব দুঃখী ছোটবাবু বলতে একেবারে অজ্ঞান !"

ইন্দু বলিল, "তা হয়েছে কি ?"

বিরাজ একটু থতমত খাইয়া বলিল, "না হয় নি কিছু। এই যে গয়লানী মাগিটা এসে দামের জন্যে অবাচ্য কুবাচ্য অনেক কথা তোমাদের শুনিয়ে গেল না—ছোটবাবু ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। আমায় ডেকে তাই বললে—এই টাকা ক'টা নিয়ে তুই বৌদিকে দিগে যা ; আর দেখ্, কিছু মনে ক'রতে বারণ ক'রে দিস্।"

ইন্দু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিরাজের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া সে বলিল, "আমরা গরীব হ'তে পারি, কিন্তু ভিখিরী নই।"

গোয়ালিনীর নিকট হইতে অত বড় অবমাননার পরও উপযাচিত এতগুলা টাকা যে কেহ দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, ইহা বিরাজের অভিজ্ঞতার অতীত ; তাই সে বিস্ময়ের সুরে বলিল, "টাকা তুমি নেবে না দিদিমণি ?"

তাহার মুখের পানে চাহিয়া ইন্দু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না।"

বিরাজ হতবুদ্ধির মত ইন্দুর মুখের দিকে ক্ষণকালের জন্য চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে বিপিন যখন দুই হাতে করিয়া একটা বড় ঝুড়িতে প্রচুর বাজার লইয়া বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল ও তাহার ঠিক পশ্চাতেই একটা মুটে মাথায় প্রকাণ্ড মোট লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ইন্দুর আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

মুটের মাথা হইতে মোটটা নামাইয়া লইয়া ও তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া বিপিন বলিল, "গয়লানী মাগিটা নাকি দামের জন্যে তোমায় যাচ্ছেতাই শুনিয়ে গেছে ?"

ইন্দু বিস্ময়ের সুরে বলিল "তুমি শুন্‌লে কোথা থেকে ?"

বিপিন বলিল, "ঘোষেদের সেই ছেলেটির সঙ্গে পথে দেখা হ'ল—সে-ই বল্‌লে।"

ইন্দু অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া বিপিন বলিল, "দেখ ভগবান্ আছেনই, নইলে ঐ ছেলেটি কোথা থেকে এসে জুট্‌ল বল ত ! সে-ই ত আমার হাতে জোর ক'রে কুড়িটা টাকা দিয়ে বল্‌লে—এ আপনাকে নিতেই হ'বে। যদি কিছু মনে করেন, না হয় পরে শোধ দিয়ে দেবেন। ওর থেকেই গয়লানীর বারোটা টাকা ফেলে দিয়ে এসেছি, আর এ মাসের যুগ্যি দোকানের জিনিষগুলো নিয়ে এলাম।"

দারিদ্র্যান্ধ বিপিনের যদি দৃষ্টি থাকিত ত দেখিতে পাইত, দুর্ব্বিসহ ঘৃণায় ইন্দুর সারা মুখখানা কিরূপ বিকৃত ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দিন দুই-তিন পরে বেলা তখন একটা কি দেড়টা হইবে, বিপিন কাঁপিতে কাঁপিতে ইস্কুল হইতে ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ইন্দু তাড়াতাড়ি স্বামীর নিকটে আসিয়া গায়ে হাত দিয়া দেখে—গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে ; চোখ দুইটা জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল। পেটের কি একটা অসহ্য যন্ত্রণায় বিপিন বিছানায় কেবলই এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। ইন্দু জলপটি দিয়া ক্রমাগত বাতাস করিতে লাগিল। সন্ধ্যার দিকে জ্বর কিছু কম বলিয়া মনে হইল, কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় সে একেবারে ছটফট্ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে 'আমাকে বাঁচাও' 'আমাকে বাঁচাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। সারারাত্রি জাগিয়া ইন্দু পেটে গরম জলের সেঁক দিল। বোধ হয়

তাহারই ফলে শেষরাত্রের দিকে বিপিন কিছুক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, কিন্তু ভোর হইতে পেটে আবার সেই অসহ্য যন্ত্রণা।

ডাক্তার ডাকিবে কি, হাতে তাহার এমন একটি পয়সা নাই যে রুগ্ন স্বামীর বালি মিছরি সে কিনিতে পাঠায়। দুইগাছি সাদা শাঁখা ব্যতীত দেহে এমন একখানিও অলঙ্কার নাই, যাহা বন্ধক রাখিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে। দুই-তিন মাস সে ছেঁড়া-কাপড় পরিয়া কাটাইয়েছে এবং নীরব উপবাসে মাসের মধ্যে কতদিন যে তাহার কাটিয়া যায় বিপিন তাহা জানেও না। কিন্তু সে সব যাক্, এখন কেমন করিয়া সে ডাক্তার ডাকিবে সেই চিন্তাই তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। 'আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও' বিপিনের এই মর্ম্মান্তিক কাতরোক্তি তাহার সমগ্র অনুভূতিতে একটা অস্থির উন্মাদনা আনিয়া দিল। কি মনে হইল জানি না, রোগ-যন্ত্রণাকাতর বিপিনের শয্যাত্যাগ করিয়া ইন্দু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল ও বড় মেয়ে কমলাকে ডাকিয়া বলিল, "মাথায় তুই একটু বাতাস কর ত মা—আমি এখুনি আসছি।" সদর দরজা খুলিয়া ইন্দু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিরাজ আসিয়া যখন বঙ্কুকে জানাইল যে, ও-বাড়ীর দিদিমণি এখনই তাহার সহিত দেখা করিতে চায়—তখন সে এমনি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে বিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যে, যেন সে ইহা বিশ্বাস করিতেই পারিতেছে না। বিরাজ পুনরায় বলিল, "আপনি আসুন দাদাবাবু—দিদিমণি এই পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে র'য়েছেন।"

ইজি-চেয়ারে শুইয়া বঙ্কু তখন একটা সিগারেট টানিতেছিল; তাড়াতাড়ি সেটা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সত্যি বিরাজ?"

বিরাজ বলিল, "সত্যি নয়ত কি আমি আপনার সঙ্গে তামাসা করছি দাদাবাবু!"

বিরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বারান্দায় আসিয়া বঙ্কু দেখিল—এতদিন ধরিয়া যাহার অনাবৃত মুখমণ্ডল দেখিবার কত না লুব্ধ-প্রয়াস তাহার ব্যর্থ হইয়াছে, সেই চির-অবগুণ্ঠনবতী বধূটি আজ রহস্যালোকভ্রষ্ট হইয়া তাহারই গৃহদ্বারে অনাহূত অনবগুণ্ঠিত দাঁড়াইয়া। প্রবল ঝটিকা-পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে জলে স্থলে যেমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক একটা কঠিন স্থির সমাহিত ভাব দেখা যায়—অবগুণ্ঠনহীন বধূটির পলকহীন অচঞ্চল দৃষ্টিতে যেন তাহারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। বিমূঢ়-বিস্ময়ে বধূটির মুখের পানে চাহিয়া বঙ্কু নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল—মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না। বঙ্কুর দিকে চাহিয়া ধীর থরবিকম্পিত কণ্ঠস্বরে বধূটি বলিল, "আমার কিছু টাকার দরকার—আপনি সাহায্য ক'রতে পারেন?"

বঙ্কু বিহ্বলের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিরুত্তর রহিয়াছে দেখিয়া সে বলিল, "আপনি আমাকে বিশ্বাস ক'রতে পারছেন না—আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু সত্যই আমি আজ বিপন্ন—আমি ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

যন্ত্রচালিতের মত বঙ্কু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রুত একগোছা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল ও কম্পিত হস্তে তাহা বধূটির দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বধূটি অগ্রসর হইয়া নোটের গুচ্ছ হইতে একখানি মাত্র গ্রহণ করিয়া বলিল, "আপনার এ ঋণ আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।" তাহার পর দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। বঙ্কু স্বপ্নাবিষ্টের মত সেই দিকে চাহিয়া স্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

নীচের দরজায় বিরাজ অপেক্ষা করিতেছিল—ইন্দুকে দেখিয়া সে একগাল হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "ভাবসাব হ'ল দিদিমণি! দু'টিতে দাঁড়িয়েছিলে কি চমৎকারই মানিয়েছিল মাইরি!"

সে কথার কোনও জবাব না দিয়া ইন্দু দুই হাত দিয়া বিরাজের একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "আমার যে একটা উপকার করতে হ'বে ভাই বিরাজ।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে ইন্দুর মুখের পানে চাহিয়া সে বলিল, "কেন, কি হ'ল দিদিমণি?"

"ওঁর ভারী অসুখ, এখুনি রমেশ ডাক্তারকে যে একবার খবর না দিলে নয়।"

প্রথমটায় যেন আশ্চর্য্য হইয়া ইন্দুর মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল; তাহার পর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি কিছু ভেবো না দিদিমণি—এখুনি দাদাবাবুকে ব'লে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাড়ী ফিরিয়া ইন্দু দেখিল, ছোট ছেলে বিশু ক্ষুধায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে ও পাশের বিছানায় শুইয়া বিপিন রোগ-যন্ত্রণা-বিকৃতমুখে মাঝে মাঝে অস্ফুট কাতরোক্তি করিতেছে। কমলা বাপের কাছে বসিয়া মাথায় বাতাস করিতেছিল; ইন্দু তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে দশটাকার সেই নোটখানি দিয়া বলিল "যা ত মা, রায়-গিন্নির কাছ থেকে নোটখানা ভাঙ্গিয়ে নিয়ে আয় ত।"

মায়ের মুখের দিকে সবিস্ময়ে একবার চাহিয়া কমলা নোটখানি হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

পাশাপাশি দশখানা গ্রামের মধ্যে রমেশ ডাক্তারেরই সবচেয়ে নাম-ডাক। চিকিৎসায় তাঁর বেশ হাতযশ আছে। বুক পরীক্ষার যন্ত্র, থার্ম্মোমিটার প্রভৃতির সাহায্যে তিনি বিপিনকে বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর ঘরের একপাশে দণ্ডায়মানা অবগুণ্ঠনবতী ইন্দুর পানে ফিরিয়া বলিলেন, "রোগটা বেশ জটিল, সারতে কিছুদিন সময় নেবে; তবে ভাবনার কোনও কারণ নেই। আমি এখুনি গিয়ে দু শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি—একটার পর একটা দুঘণ্টা অন্তর খাইয়ে যাবেন।"

ডাক্তারের নির্দ্দেশমত বিপিনকে ঔষধ খাওয়ানো চলিতে লাগিল। এদিকে বিরাজ আসিয়াও দুই-তিন বার বিপিনের খোঁজ খবর লইয়া এবং ইন্দুকে সান্ত্বনা দিয়া গেল।

রাত্রে বিপিন যন্ত্রণায় একটুও ঘুমাইতে পারিল না; সারারাত্রি জাগিয়া ইন্দু স্বামীর পরিচর্য্যা করিল। ভোর হইতেই ইন্দু কমলাকে

দিয়া বিরাজকে ডাকিতে পাঠাইল এবং বিরাজ আসিলে তাহারই সাহায্যে রমেশ ডাক্তারকে আসিবার জন্য খবর পাঠান হইল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিয়া গুটিকয়েক ইন্‌জেক্‌সান্ করিলেন ও নতুন প্রেসক্রুপ্‌সন্ করিয়া ঔষধ বদ্‌লাইয়া আনিতে বলিয়া গেলেন।

বৈকালের দিকে বিপিনের সেই অসহ্য পেটের যন্ত্রণা যেন অনেকটা কম বলিয়া মনে হইল এবং রাত্রে বহুক্ষণ সে শান্তির সহিতই ঘুমাইল। সকালে উঠিয়া ইন্দু স্বামীর মাথায় ছোঁয়াইয়া সোয়া পাঁচআনা পয়সা পূজা দিবার জন্য তুলিয়া রাখিল। মনটাও আজ তাহার যেন একটু প্রফুল্ল বলিয়া মনে হইতেছিল এবং অবসর পাইয়া স্বামী-পরিচর্য্যার ফাঁকে ফাঁকে সে সংসারের বিপর্য্যস্ত কাজগুলিতে মন দিল।

তখন সন্ধ্যার কাছাকাছি। উঠানের তারের উপর সে কয়েকখানি ভিজা কাপড় মেলিয়া দিতেছিল—সহসা "দিদিমণি" ডাক শুনিয়া সে তাকাইয়া দেখে যে ঘোষেদের দ্বিতলের খোলা-জানালায় দাঁড়াইয়া বিরাজ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে এবং তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া বঙ্কু মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ইহা দেখিয়া ইন্দুর সারা দেহমনে এমনই একটা ধিক্কার আসিল যে মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে আর না দাঁড়াইয়া সে ঘরের এককোণে গিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া পড়িল। লজ্জা ঘৃণা ও ক্ষোভের একটা অননুভূত অসহ্য উত্তেজনায় তাহার প্রতি ধমনীর প্রতিটি চঞ্চল রক্তকণা যেন দুর্দ্দাম উন্মত্ততায় তাহার সারা দেহে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। বঙ্কুর প্রথম আবির্ভাবের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার জীবন ও সংসারকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কু ও বিরাজের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ইতিহাস তাহার মনের পাতায় জ্বলন্ত রক্ত-রেখায় সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সান্ধক্ষণে যখন সে উন্মত্তার মত অনাহূত অনবগুণ্ঠিত হইয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে বঙ্কুর করুণাপ্রার্থিরূপে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা মনে পড়িতেই সহসা তাহার মুখ ফ্যাকাসে ও বিবর্ণ হইয়া গেল। আত্মহত্যার যন্ত্রণায় তাহার সমগ্র অন্তর যেন অসহ্য তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িতে চাহিল।

"দিদিমণি!"

চম্‌কাইয়া সে চাহিয়া দেখে দরজার সম্মুখে বিরাজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যন্ত্রচালিতের মত সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ তাহার একান্ত সন্নিকটে আসিয়া চুপি চুপি কি বলিতেছিল, সহসা ইন্দু ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া গ্রীবাবক্র করিয়া দৃপ্ত ভঙ্গিমায় বিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কি।" তাহার দুই চোখ হইতে যেন তখন অগ্নি ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছে।

অপ্রত্যাশিত এই অগ্ন্যুৎপাতে বিরাজ প্রথমটায় একটু থতমত খাইয়া দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর কুঞ্চিত-ক্রূর-দৃষ্টিতে ইন্দুর পানে চাহিয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "আর সতীগিরি ফলাতে হবে না। পরপুরুষের সঙ্গে হাসিঠাট্টা ক'রে তার গায়ে ঢলে প'ড়ে টাকা আনবার সময় এ সতীগিরি ছিল কোথায়! বললেই হয় যে আরও কিছু চাই। ওরকম ছেনালি এ বয়েসে ঢের দেখেছি—দেখে দেখে হাড়-হদ্দ হ'য়ে গেছে।"

সদম্ভ-পদক্ষেপে বিরাজ চলিয়া গেল। সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় দাওয়ার বাঁশের খুঁটি ধরিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়া রহিল—সারাদেহ তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

* * * *

রাত্রি তখন একটা হইবে। অনেকদিন পরে আজ যেন বিপিন অনেকটা তৃপ্তির সহিতই ঘুমাইতেছিল। ঘরের এককোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে ও তাহারই অনুজ্জ্বল ম্লান আলোক আসিয়া ঘুমন্ত ছোট ছেলেটির মুখের উপরে পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছে। কোঁকড়া কোঁকড়া একমাথা কালো চুল, নিমীলিত আয়ত দু'টি চোখ, সুগঠিত চিবুক···সেইদিকে চাহিয়া সহসা ইন্দুর অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃউচ্ছ্বসিত একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

কমলা ও বীণা ঐ পাশাপাশি শুইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। শব্দহীন সমাহিত গভীর রজনী। এই সুগভীর নৈশ নিস্তব্ধতার মাঝে শুধু এক-একবার কুকুরের ঘেউ ঘেউ রবের দূরাগত ক্রমবিলীয়মান ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। সহসা বিশু মা মা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধড়্‌মড়্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ইন্দু তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে শোয়াইয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেই সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া তাহার গণ্ডদেশে গভীর একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলা ও বীণা পাশাপাশি তেমনই ঘুমাইতেছে; হাত দিয়া উভয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহাদের সে চুম্বন করিল। এইবার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিপিনের শয্যাপার্শ্বে গিয়া সে দেখিল, সুগভীর পরিতৃপ্তির সহিত সে ঘুমাইতেছে। দুই হাত দিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ভক্তিভরে আপন মাথায় স্পর্শ করিয়া তেমনি নিঃশব্দে সে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর অতি সন্তর্পণে দরজার কপাট টানিয়া ভেজাইয়া দিল। সীমাহীন কালো আকাশে অনুজ্জ্বল দুই-একটি তারকা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিক নিবিড় নিস্তব্ধ। অঙ্গনের দরজা খুলিয়া ইন্দু সেই নৈশান্ধকারে অস্পষ্ট পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

জনশূন্য শব্দশূন্য গভীর নিশীথে পথ চলিতে চলিতে ইন্দু আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের, প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল। নিকটবর্ত্তী গৃহ হইতে সহসা কোন শিশু কাঁদিয়া উঠিতেই সে একবার চম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—তাহার পর আবার চলিতে লাগিল। নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতার বুক চিরিয়া রহিয়া রহিয়া শিশুকণ্ঠের দূরাগত সেই ক্রন্দনধ্বনি তখনও কানে আসিয়া বাজিতেছিল।

এই সেই তালদীঘি! ইন্দু দাঁড়াইয়া পড়িল। বায়ুপ্রবাহহীন শব্দহীন অন্ধকারমগ্ন বিশাল মূঢ় প্রকৃতির মাঝে দীঘির চারিদিকে সমুন্নত-শির দীর্ঘ তালগাছগুলি অস্পষ্টতায় যেন দৈত্যপুরীর নির্ব্বাক ভয়ঙ্কর প্রহরীর মত দণ্ডায়মান। নিকটে একটা খস্ খস্ শব্দ উঠিল ও ক্রমে তাহা দূরে মিলাইয়া গেল। বোধ হয় কোন ভীত শৃগাল চারিদিকের বিক্ষিপ্ত শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

দীঘির বাঁধানো ঘাটের উপর আসিয়া ঊর্দ্ধে অন্ধকার অন্তহীন আকাশের দিকে একবার চাহিয়া ইন্দু ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দ শুনা গেল ও পরমুহূর্ত্তেই পাখা ঝটপটানিতে নিকটস্থ তালগাছের শীষ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। শকুনি-শিশুর ক্রন্দনে তাহার মাতা বোধ হয় জাগিয়া উঠিল।

অন্ধকারের অস্পষ্টতায় দীঘির রূপহীন জলরাশি যেন অপরূপ কালো দেখাইতেছিল। ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া ইন্দু দীঘির সেই জলের মধ্যে নামিতে লাগিল—জানু, ঊরুদেশ, কটি, বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ক্রমে ক্রমে সমস্তই জলের মধ্যে অদৃশ্য হইল। তাহার পর—তাহার পর—মানব-সমাজের হাত হইতে, প্রতিদিনের আত্মহত্যার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইবার জন্য—দীঘির সেই কালো জলে লুকাইয়া ইন্দু আত্মরক্ষা করিল।

* * * *

রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। বেলা আটটা হইবে। রাত্রে ছোট ছেলেটা বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে—রোগশয্যাশায়ী অসহায় বিপিন স্ত্রীকে কয়েকবার ডাকিয়াও সাড়া পায় নাই। প্রদীপটা কখন নিভিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে শেষরাত্রের দিকে ছেলেটা কখন আপনিই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রোগদুর্ব্বল বিপিনও আপনার অজ্ঞাতসারে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিল।

বাহিরে একটা অস্বাভাবিক কলরবের শব্দে হঠাৎ বিপিনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে পাড়ার বালকবালিকা, বৃদ্ধ ও যুবক হুড়্ হুড়্ করিয়া তাহার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। হতবুদ্ধির মত বিপিন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞধরণের প্রৌঢ়গোছের এক ভদ্রলোক বিপিনের শয্যার নিকট আগাইয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন—আজ সকালে, তালদীঘির জলে—আপনার স্ত্রীর—মৃতদেহ—"

"য়্যা!" বলিয়া বিপিন একবার ভয়ানক চম্‌কাইয়া উঠিল ও রোগ-স্তিমিত কোটরাগত দুইটি চোখ বিস্ফারিত করিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সংসারে ধৈর্য্যই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ও দেহ অনিত্য, এ বিষয়ে বিশদ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ভদ্রলোক বিপিনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাহার কথাগুলি বিপিনের কানে প্রবেশ করিতেছিল কি-না বুঝা গেল না—গভীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অপলক ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে সে নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল।

চক্রতীর্থের পথে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সাগরের সেই হা-হা রব হ'তে দূর দূরান্তে চলেছি একা
ক্ষুব্ধ জলধি আজিও অবধি দয়িতের কি গো পায় নি দেখা ?
সর্ব্বহারা সে আমারি মতন বুকের রতন হারায়ে ফেলে
বালু-বেলা পরে বৃথা খুঁজে মরে ব্যগ্র বাহুর লহরী মেলে ?
বিশাল বুকের হা-হুতাশ তার বাজে অনিবার শ্রান্তিহীন
কত না যুগের ক্রন্দন ভরা উর্ম্মি-মুখর রাত্রিদিন !
মোর অশান্ত বক্ষের সেই হাহাকার হেরি হেথাও বাজে
তট হ'তে তাই স'রে যেতে চাই দূর লোকালয়ে নগরী মাঝে—
* * * * *
বালু-পথ ক্রমে ভাঙ্গা কাঁকরের রাঙ্গা রাজপথে মিলালো 'আসি'
ঝাউ তরু শ্রেণী দুলাইয়া বেণী বাতাসের চুমে বাজালো বাঁশী !
মনোহর শ্যাম-দূর্ব্বা শোভিছে, নয়নাভিরাম কুসুম কত,
রম্য প্রাসাদ, কুঞ্জ কুটির, রচেছে মানব মনের মত !
চক্রতীর্থে বক্র রেখায় চ'লে গেছে দূর দুরান্তরে—
বিষণ্ণ মনে সান্ধ্য ভ্রমণে আমি চলি একা সে পথ 'পরে ॥
* * * * *
এমন সময় হেরি বামে মোর জীর্ণ একটি অট্টালিকা
প্রাঙ্গণে তার কাঁটা আগাছার ধ্বংস দেবীর বিজয়টীকা
ঘন-সবুজের সাড়ী-পরা, রাঙ্গা, তারি মাঝে এক রূপসী মেয়ে
কুসুম-সুষমা-সুরভিত-তনু মৃদু হাসে মোর মুখেতে চেয়ে !
পুলকিত হিয়া গেনু আগাইয়া বিস্ময়ে ভাবি বিজন বাটে
এত রূপ লয়ে কেমনে বালার এ পোড়ো-বাড়ীতে জীবন কাটে ?
সঙ্গে করিয়া আনিনু তাহারে যতনে রাখিনু 'হোটেলে' মোর
বুকের নিকটে রাখিয়া কখন ঘুমায়েছি, দেখি হয়েছে ভোর !
রূপসীর চোখে সারা রাতি ধরি' নিদ গেছে উড়ি',
রয়েছে জেগে,
সুরভিত হ'ল শয্যা আমার ফুল-কুমারীর সুবাস লেগে !
সকালেও তার গালের গোলাপী আভার কিছুই হয়নি ম্লান
ফুল্ল সুষমা তখনো তাহার পেলব অঙ্গে গাহিছে গান।
চক্রতীর্থে কণ্টক বনে লভিনু যা তার নাহিক তুল
চুম্বন করি গাছ হ'তে ভাঙ্গা, প্রস্ফুট রাঙ্গা করবী ফুল !

দক্ষিণ-ভারত

ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ভ্রমণ

১০ই মে বেলা সাড়ে দশটার সময় আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর ছাড়লুম। কথা ছিল, আমরা একদিন ওখানে থাকব, কিন্তু ধরমশালায় থাকার সুব্যবস্থা কিছুতেই হয়ে উঠল না। অগত্যা আমরা সময়ের অভাবে "বাড়া ভাত" পর্য্যন্ত টিফিন কেরিয়ারে পূরে ঝট্কা ডেকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলুম রেলওয়ে স্টেশনে। গাড়ীতে ইঞ্জিন এসে লেগেছে আর গার্ড হাতের সবুজ নিশানখানা খুলে দেখাবার জন্য প্রস্তুত, এম্নি সময়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় আমরা এসে গাড়ীতে চাপলুম। সঙ্গে-সঙ্গেই গার্ডের বাঁশী বেজে উঠ্‌ল আর গাড়ীর ইঞ্জিনও একটা বিকট বংশীধ্বনি ক'রে ধপাস্‌ধপাস্ ক'রে চলতে আরম্ভ করলে। কুলীরা খানিকটা গাড়ীর সঙ্গে ছুটে এসে প্রাপ্য নিয়ে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে জিনিসপত্তর গুছাতে লাগলুম, পত্নী তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন।

পাম্‌বন্ জংশনে আমাদের গাড়ী বদলাতে হল। আমরা ছোট গাড়ী ছেড়ে ইণ্ডো-সিলোন্ একস্‌প্রেস গাড়ীতে এসে উঠ্‌লুম। সেখানে বন্ধুরা দুধের হাঁড়ি আমাদের গাড়ীতে পৌছে দিয়ে বল্লেন যে দুধ খেয়েই তাঁরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন, ভাত মুখেও তুলতে পারেননি। ডাক্তার মিত্র তখনও অনুপস্থিত পাচক ঠাকুরের উদ্দেশে অসংখ্য 'সুমিষ্ট' গালভরা গালিগালাজ করছেন, কিন্তু যার উদ্দেশে এই বৃথা বাক্যব্যয় সে বোধ হয় ততক্ষণে সুমধুর গঞ্জিকা-রসে ভরপুর হয়ে মনের আনন্দে তন্ময় হয়ে আছে। পাম্‌বন্-এ খুব ভাল ডাব নারকেল পাওয়া যায়। মাথার উপরে রোদ বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। আমরা সকলেই গাড়ী যতক্ষণ স্টেশনে ছিল, নীচে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ ডাবের জল পান করে নিলুম; আরও গোটা কয় পথের সম্বল করে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লুম।

আমাদের কামরায় আমরা দুজন ছাড়া আরও একজন ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসী ছিলেন, তিনি সিংহল থেকে আসছেন এবং বেশ নাসিকা গর্জ্জন করে সুখনিদ্রা উপভোগ করছিলেন। এ ক'দিন আমরা শুধু রাত্রিবেলাই গাড়ীতে চলেছিলুম, তাই দিনের বেলা প্রখর গ্রীষ্মের দুঃসহ গরমটুকু ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু রামেশ্বর ছেড়ে মাদুরার পথে যতই রোদ চড়তে লাগল, গাড়ীও ততই তেতে উঠে একেবারে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতন বোধ হতে লাগল। পাখার হাওয়া পর্য্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, মনে হচ্ছিল, যেন পাখার হাওয়াতেই গায়ে ফোস্কা পড়বে। গাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে বসে ছট্‌ফট করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। বলা বাহুল্য, অপর ভদ্রলোকটিও খুব বেশীক্ষণ সুখনিদ্রা উপভোগ করতে পারেননি; সুতীব্র গরমে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তিনিও উঠে বসতে বাধ্য হলেন। শ্রীমতী প্রতিমার কষ্টই হচ্ছিল বোধ হয় সব চেয়ে বেশী! তিনি অনবরত ঢক্ ঢক্ করে ডাবের জল খাচ্ছিলেন, আর "উঃ, আঃ, আর পারা যায় না, কেন মরতে এলুম" ইত্যাদি নানা রকম interjection-এর ন্যায় এবং অন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ একটির পর একটি করে যাচ্ছিলেন।

পাম্‌বন্ থেকে মাদুরা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখবার মত বেশী কিছু নেই, শুধু লাখ লাখ নারকেল আর কলাগাছ ছাড়া! প্রত্যেকটি গাছই ফলভারে অবনত। যতদূর দৃষ্টি যায়, দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত শুধু 'বনঋষি' নারকেল গাছ, আর নারকেল গাছ! শুধু মাঝে মাঝে দু-একটি কলা-বাগান! আবার নারিকেল গাছের অগুণ্‌তি সারি, আবার কলা গাছ। সুতরাং দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে যায়, আর দেখতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং পাম্‌বন্ থেকে মাদুরা পর্য্যন্ত আমরা কামরার জানালা আর খুলিনি, একরকম পর্দ্দানশীন-ভাবেই নিজেদের অন্ধকার কামরায় অবরুদ্ধ রেখেছিলুম, বাইরের গরম হাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে। এম্নি করে বেলা প্রায় সাড়ে চারটার সময় আমরা এসে মাদুরায় পৌছলুম।

অপরাহ্ণ সাড়ে চারটায়ও মাদুরায় গ্রীষ্মের যা প্রকোপ,

তাতে মাদুরায় রাত কাটাতে আমার মোটেই ভরসা হচ্ছিল না; আমার মনে হচ্ছিল, সন্ধ্যার সময় মীনাক্ষির্ মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখি, যদি রাত্রিতেই কোন গাড়ী পাই তবে মালাবার-এর পথে ত্রিবেন্দ্রম্ যাত্রা করি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ের সময়-নিরূপণ-তালিকা অনেকবার উলটে পালটে দেখেও রাত্রিতে মাদুরা ছাড়বার মত কোন সুবিধাজনক গাড়ীর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তখন অগত্যা মাদুরায় রাত্রিবাস করা ছাড়া আর উপায় কি? আমরা স্টেশনেই "বিশ্রাম কামরায়" রাত্রি-যাপন সুবিধাজনক মনে করে উপরে দোতালায় তিনখানি ঘর দখল করলুম; একখানিতে ডাক্তার মিত্র ও নায়ক, দ্বিতীয়টিতে ডাক্তার চাটার্জ্জি ও তৃতীয়টিতে সপত্নী আমি।

সারাদিনের গরমে ভাজা হওয়ার পর ঠাণ্ডা জলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে দু বোতল লেমনেড-এর সদ্ব্যবহারের পর খানিকটা সুস্থবোধ করা গেল! সাতটা পর্য্যন্ত গরম হাওয়া সমানভাবে নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখলে, তাই আমরা আর বের হতে পারিনি। অবশেষে দিনের আলো যখন পশ্চিমের আকাশে ম্লান হয়ে এল, আর গরমও একটু কমলে তখন আমরা ধীরে ধীরে পথে নামলুম। মন্দির বেশী দূরে নয়, এক মাইলের চেয়েও কম জেনে আমরা ধীরে ধীরে হেঁটেই মন্দিরের দিকে চললুম। খানিক দূর এগিয়েই আমরা অনতিদূরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত সু-উচ্চ মন্দির দেখতে পেলুম। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যতই এগোতে লাগলুম, মন্দিরের সিংহদ্বার (গোপুরম্) ততই আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে লাগল। অবশেষে যখন আমরা সত্যিসত্যিই মন্দিরের সন্নিকটে এসে পৌছলুম, তখন আমাদের দৃষ্টি একেবারে গিয়ে নিবদ্ধ হ'ল উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাসিত মন্দিরের অলোকসামান্য কারুকার্য্যের উপর। কাঁধের উপর মাথা ফেলে অপলক দৃষ্টিতে আমরা মিনিটের পর মিনিট প্রায় আধঘণ্টা তাকিয়ে রইলুম সেই অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের দিকে, মনে হচ্ছিল যেন ক্ষমতা থাকলে চোখ দিয়ে পান করে নিঃশেষ করে নিই সবটুকু সৌন্দর্য্য।

রাত্রি গভীর হতে চলিল দেখে আমরা ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলুম। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হ'ল যে এত সুবিশাল মন্দির আমরা আগে আর কখনও দেখিনি! চারিদিকে উঁচু দেওয়ালে ঘেরা দুর্গের মত মন্দিরটি। লম্বা ৮৩০ ফিট এবং চওড়া ৭৩০ ফিট্। অভ্যন্তরে চত্বর, মণ্ডপ, গুদাম, পুকুর প্রভৃতি পার হয়ে তবে মন্দিরে পৌছতে হয়। পীঠস্থান-গুলিতে যেমন মহাদেব ও ভগবতী একসঙ্গে বিরাজ করেন, মাদুরার মন্দিরেও ঠিক তেমনই। এখানকার শিব সুন্দরেশ্বর এবং দেবী মীনাক্ষি। মাদুরার মন্দির শিবের উদ্দেশে স্থাপিত হলেও মীনাক্ষির মন্দির বলেই প্রসিদ্ধ। কিম্বদন্তী আছে যে একজন পাণ্ড্য রাজার মীনাক্ষি নামে একটি কন্যা ছিল। জন্মাবধি মীনাক্ষির তিনটি স্তন থাকাতে পিতামাতা অতীব আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে দৈববাণী হ'ল যে দয়িতের দর্শন মাত্র রাজকন্যার তৃতীয় স্তনটি খসে পড়বে! হ'লও তাই, পতি শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হ'ল! কিন্তু কারো কারো মতে মীনাক্ষি ছিলেন দ্রাবিড় জাতির উপাস্য একজন দেবী। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তারের ফলে ব্রাহ্মণেরা কিছুতেই লোকের বদ্ধমূল সংস্কার মীনাক্ষির প্রতি ভক্তি দূর করতে না পেরে, অবশেষে নিজেরাই তাঁকে শিবের পত্নীরূপে নিজেদের উপাসনা-গণ্ডীর মধ্যে টেনে নিতে বাধ্য হন। এইভাবে মাদুরাতে পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটে এবং তারই ফলে মাদুরার বিখ্যাত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।

মন্দিরের চারিদিকে চারিটি সুউচ্চ সিংহ-দ্বার আছে, এদেশে তাদের গোপুরম্ বলা হয়। অনেকদূর হতে এগুলি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষিণের গোপুরমই সবচেয়ে উঁচু। এদের নীচের বৃহৎ প্রবেশদ্বার পাথরের দ্বারা তৈরী, উপরের কারুকার্য্য ও মূর্ত্তিগুলি ইটের উপর চূণ সুরকির সাহায্যে নির্ম্মিত। কথিত আছে যে, গোপুরমগুলি হিন্দু শাস্ত্রমতে যে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উল্লেখ আছে, তাদের সকলের মূর্ত্তিই এগুলির উপর দেখতে পাওয়া যায়। তেত্রিশ কোটি হউক বা না হউক, তারা যে অসংখ্য তা নির্ভুলভাবে বলা যেতে পারে। পূর্ব্বে উত্তরের গোপুরমকে 'মোটাই' অর্থাৎ কারুকার্য্যহীন গোপুরম বলা হ'ত। এটি অনেকদিন এরকম ছিল, কারণ লোকে মনে করত অন্যের আরব্ধ কোন নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করলে অমঙ্গল হয়। অবশেষে একজন দুঃসাহসী চেট্টি এই কুসংস্কার দূর করে উপরের

মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করান। এইভাবে চারিটি গোপুরম-এর একইভাবে নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

আমরা পূবের গোপুরম্ দিয়েই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। এই পথেই অষ্টশক্তি মণ্ডপে ঢুকতে হয়। কথিত আছে, অহমিকার জন্য অষ্টশক্তি স্বর্গচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন এবং এই আটজন দেবী মানুষকে সর্ব্বদা আসুরিক প্রভাব থেকে রক্ষা করেন। এই মণ্ডপে স্তম্ভের উপর আটটি নারীমূর্ত্তিই অষ্টশক্তির প্রতীকরূপে বিরাজিত। অষ্টশক্তি মণ্ডপ পার হয়ে আমরা খানিক দূর এগিয়ে গণপতির মন্দিরে প্রবেশ করলুম। এখানেই অন্যান্য দেবদেবীর অর্চ্চনার পূর্ব্বে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা হয়। গণেশের মন্দিরের পাশেই 'সুব্রহ্মণ্য' অর্থাৎ শিবের অপর পুত্র দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়র মন্দির। এগুলি দেখে আমরা একটি সুবিশাল মণ্ডপে গেলুম। কার্ত্তিক ও গণেশের মন্দির তেমন আলোকিত ছিল না, কিন্তু এই মণ্ডপটি বৈদ্যুতিক আলোকে একেবারে দিনের মতন দেখাচ্ছে। ছয় সারি উঁচু এক প্রস্তরে নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর পাথরের ছাদ। এটি মীনাক্ষি-নায়ক নামক নাইডু জাতীয় বৈষ্ণবপ্রধান মন্ত্রীর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইনি যাহাতে এই মন্দিরে হাজার বাতি জ্বলে সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি গ্রাম মন্দিরের নামে উৎসর্গ করে যান। এখনও দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে ঐ গ্রামগুলির আয় থেকে মন্দিরের প্রত্যহ দীপান্বিতার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এখানেই উৎসবাদি উপলক্ষে মন্দিরে মেলা বসে। মণ্ডপের অপর প্রান্তে সহস্র দীপ-সমন্বিত একটি সুবৃহৎ পিত্তল নির্ম্মিত দরজা আছে। ঐ দরজার সম্মুখে দুধারে অনেকগুলি হাতীর মূর্ত্তি ও দ্বারপালের মূর্ত্তি আছে।

তারপর আমরা মুদালী মণ্ডপে ঢুকলুম। এখানে কয়টি চমৎকার মূর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের ভিক্ষুকবেশে মূর্ত্তিগুলিই উল্লেখযোগ্য। এই মণ্ডপ পার হয়ে আমরা স্বর্ণ-পদ্মপুকুরের কাছে পৌছলুম। পুকুরটির চারিদিকে অগুণতি সারি সারি স্তম্ভ এবং তাদের উপর চিত্রিত নানা রংএ শিব সম্বন্ধে নানা আশ্চর্য্য কাহিনী ও মাদুরার ইতিহাস।

স্বর্ণ-পদ্মপুকুরের পশ্চিমে রাণী মঙ্গম্মলের উপাসনা-মন্দির। ইনি ১৬৮৯ হতে ১৭০৪ পর্য্যন্ত পৌত্রের অভিভাবিকারূপে মাদুরার রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। তিনি অতীব দয়াশীলা এবং প্রভাবময়ী শাসনকর্ত্রী ছিলেন। পৌত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলেও ইনি রাজদণ্ড ত্যাগ করতে অস্বীকৃত হন। প্রধান মন্ত্রী তাহার অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রাণীকে সাহায্য করতে থাকেন। কিন্তু প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ করে ও রাণীকে কারাগারে বন্দিনী করে রাখে। সেখানে উৎপীড়কেরা তাঁকে দূর থেকে খাদ্য দেখিয়ে নিয়ে যেত, তাঁকে কিছুই স্পর্শ করতে দেওয়া হত না। এইভাবে অত্যাচারের মধ্যে অনশনে এই মহীয়সী মহিলার কারাগারে মৃত্যু হয়। যেখানে তাঁকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল,



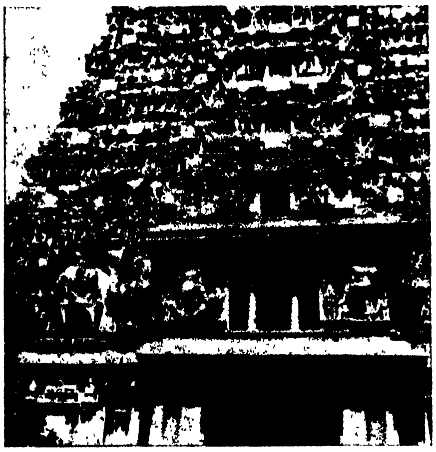
মাদুরার মন্দিরের একটি সিংহদ্বার (গোপুরম্)

এখনও তা মঙ্গম্মল-প্রাসাদ নামে অভিহিত। উপাসনা মন্দিরের ছাদে রাণী মঙ্গম্মলের প্রতিকৃতির মুখোমুখি প্রধান মন্ত্রীর প্রতিকৃতি অবস্থিত। রাণীর ছবি দেখলে মোটেই বিধবা বলে বুঝতে পারা যায় না, কারণ তাঁর পরিধানে বহুমূল্য বেশভূষা ও নানা রত্ন আভরণ দেখে তাঁকে বিবাহিতা বিলাসিনী মহিলা বলেই মনে হয়।

পদ্মপুকুরের পর আমরা তোতা মণ্ডপে এলুম। এখানে ভক্তদের দেওয়া অনেকগুলি তোতা ও টিয়াপাখী আছে।

তাই এর নাম। পাখীগুলি খাঁচার মধ্যে থেকে নানা রকম শব্দ করে ও মানুষের অনুকরণে কথা বলে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে একটি কালো মার্বেল পাথরের বেদী আছে। শুনতে পেলুম, এখানে সেপ্টেম্বর মাসে একটি উৎসব হয়। তখন সুবেশিনী ব্রাহ্মণ কন্যারা ফুলের সাজে নানা রত্নাভরণ পরে মীনাক্ষি, শিব ও কালী প্রভৃতি দেবদেবীর সম্মুখে নৃত্যগীত করে।

ঐ কালো মার্বেলের বেদীর উত্তরেই একটি ষাঁড়ের মূর্ত্তি আছে। তার পাশেই মীনাক্ষির মন্দিরে প্রবেশের পথ। প্রবেশ দ্বার পার হয়ে একটি সোনার জলে রং করা তাল গাছ। এরকম তাল গাছ মান্দ্রাজে প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরেই একটা করে আছে। মন্দিরের পথ অন্ধকারে



সিংহদ্বারের উপর অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি

ঢাকা, তাই সোনার রংএ রং করা খিলান মিটি মিটি প্রদীপের আলোকে একেবারেই চোখে পড়ে না। মন্দিরের বাইরে মণ্ডপগুলিতে বিজলী বাতি থাকা সত্ত্বেও মূল মন্দিরে অথবা তার প্রবেশ-পথে একেবারেই তা নেই, তাই খুব অন্ধকার বলে মনে হয়। সামনেই প্রকাণ্ড একটি পাথরের বেদী, তার উপর দর্শকেরা ও ভক্তেরা অসংখ্য কর্পূরের বাতি জ্বালিয়ে কর্পূরের ছাইভস্ম কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলুম। মন্দিরের দ্বারে ভীষণ ভিড়, আর পুরুষ ভক্তেরা এক অপরূপভাবে দেবীকে প্রণাম করছে। প্রণাম করতে গিয়ে হাতে নাক এবং কান ছুঁয়ে বার দু-তিন হাঁটু ভাঙ্গা 'দ'-এর আকারে হাঁটু ভেঙ্গে ও সোজা হয়ে, পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাচ্ছে। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে আমরা যখন আসল মন্দিরের দরজার নিকটবর্ত্তী হলুম, তখন দূর হতে দেখতে পেলুম, মীনাক্ষি দেবীর চোখের দুটি তারকা ভীষণভাবে জ্বল জ্বল করছে। এইজন্যই নাকি দেবীর নাম মীনাক্ষি অর্থাৎ মৎস্য-চক্ষু দেবী! উজ্জ্বল আলোকে বোধ হয় এই বহুমূল্য প্রস্তরময় চক্ষুতারকা দুটি এত তীব্রভাবে জ্বল্ জ্বল্ করতে পারত না, সেইজন্যই মনে হ'ল মন্দিরটি যতদূর সম্ভব কম আলোকিত করা হয়েছে। অন্ধকারে দূরের আলোক দেবীর চোখের তারকায় পড়ে, তা থেকে আলো আবার প্রতিফলিত হচ্ছে, সম্মুখে যারা আছে তাদের চোখে! মান্দ্রাজের প্রত্যেক মন্দিরেই লক্ষ্য করেছি, বাইরে যতই আলো থাকুক না কেন, দেব-দেবীর বিগ্রহ যেখানে সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকারের রাজত্ব। শুনতে পেলুম দেবীর আরতি রাত সাড়ে নটায় হবে, সুতরাং আমরা আর সেই ভিড়ের মধ্যে গলদ্‌ঘর্ম্ম না হয়ে বাইরে চলে এলুম। কথা হয়ে রইল, আমরা পর দিন ভোরবেলা গিয়ে পূজা দেব ও দেবীর প্রসাদী সিঁদুর ও ফুল ইত্যাদি নিয়ে আসব।

আসল মন্দিরের সন্নিহিত স্তম্ভগুলির উপর মহাভারতোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। এদের অপরদিকে পদ্মপুকুরের কাছে একটি অদ্ভুত বেদী আছে। শুনলুম এর উপর নাকি রোজ অসংখ্য কাককে খাবার দেওয়া হয়।

আমরা এখান থেকে সোজাসুজি শিবের মন্দিরে চললুম। শিবের মন্দিরের পথে অনেকগুলি সারি সারি স্তম্ভ আছে দু'ধারে। উত্তর দিকে ভিতরের দেওয়ালের কাছে মহা-পাঠকতীর্থ নামে একটি ছোট জলাশয় আছে। দূর হতে তার অনেকগুলি সিঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়। চারিধারে শুনতে পেলুম, এর জল নাকি অতি পবিত্র এবং সেখানে স্নান করলে যত বড়ই পাপ থাকুক না পাপীর, একেবারে দূর হয়ে যায়। পুকুরের অপর পারে একটি বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

এর পরেই শিবের মন্দির। মন্দিরটি পূর্ব্ব-মুখী। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে প্রকাণ্ড দুটি দ্বারপাল জয়-বিজয়ের মূর্ত্তি। এ মন্দিরটিও অন্ধকার, কিন্তু দূর থেকেই চন্দন ও ফুল বেলপাতার গন্ধ আমাদের নাকে এল। মন্দিরের দেওয়ালে মীনাক্ষি দেবীর সঙ্গে সুন্দরেশ্বর শিবের বিয়ের ছবি! মিটি মিটি বাতির স্তিমিত আলোকে মনে হ'ল,

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি বিয়ের বরযাত্রীর ছবিও আছে, আর পাশেই পাকাদাড়ি সন্ন্যাসী দেখে মনে হ'ল নারদ না হয়ে যান না। এই ছবিগুলি স্বতই শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, তবে তফাৎ এই যে আমাদের পার্ব্বতী গৌরী, আর দাক্ষিণাত্যের মীনাক্ষি কৃষ্ণা। আর একটু এগিয়েই আবার পাথরের বেদীর উপর অসংখ্য জ্বলন্ত কর্পূরখণ্ড দেখতে পেলুম। তার চারিদিকে অসংখ্য ভক্তবৃন্দ, কেউ বা সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানাচ্ছে, কেউ বা 'দ'এর আকারে ত্রিভঙ্গিম অবস্থায় প্রণাম করছে, আবার কেউ বা ভক্তিভরে কর্পূরদগ্ধ ছাই কুড়িয়ে নিচ্ছে। জ্বলন্ত কর্পূরের ধোঁয়ায় মন্দিরের অন্ধকার যেন আরও নিবিড় হয়ে আছে। আমরা তাই অতিকষ্টে এক-পা দু-পা করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলুম, যেখানে বিগ্রহ আছেন তারই দরজার সম্মুখে। পুরুত দু-হাতে লোক সরিয়ে, আমাদের কাছে পঞ্চপ্রদীপ হাতে এগিয়ে এসে বল্লে শুধু বামুনেরই প্রবেশের অধিকার আছে। অগত্যা আমাদের দুজন এগিয়ে বিগ্রহ স্পর্শ করে এলেন। আমরা বাকী তিনজন দূর থেকেই পুরুতের হাতের অনুজ্জ্বল পঞ্চপ্রদীপের সাহায্যে যতদূর দর্শন ও পুণ্যসঞ্চয় সম্ভব তাই করে নিলুম। মনে হচ্ছিল ঐটুকু মিটিমিটি আলো না থাকলে হয়ত অন্ধকারেই আরও ভাল দেখতে পেতুম, কারণ অনুজ্জ্বল পঞ্চপ্রদীপ কর্পূরদগ্ধ ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে আমাদের কাছে মন্দিরের অন্ধকারটুকুকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। লোকের ঠেলাঠেলিতে এবং গরম হাওয়ায় আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তাই আর অধিক পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য মন্দিরে কালবিলম্ব না করে কোনও প্রকারে ভিড় ঠেলে বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

শিবের মন্দির ছেড়ে আমরা এসে পৌছলুম একটা প্রকাণ্ড বেদীর সামনে, যার উপরে শিবের বাহন নন্দী ষাঁড় অবস্থিত! এখানকার ছাদ অনেকটা উঁচু এবং তার উপর নানা দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত আছে। সম্মুখে ও পশ্চাতে স্বর্ণময় অতিকায় প্রদীপাধার আছে। এগুলি যখন ঠাকুরকে সমারোহ করে উৎসবের সময় বার করা হয়, তখন 'ধ্বজস্তম্ভ'রূপে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ কথায় এদের সোনার তালগাছ বলা হয় এবং দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক মন্দিরেরই এরা বিশিষ্ট অঙ্গ বলে পরিগণিত।

নন্দী বেদীর দক্ষিণে একটি বিচিত্র উপাসনাস্থান আছে এর চারিদিকে চারিটি কালো স্তম্ভ। নব-গ্রহের মন্দির বলে এর প্রসিদ্ধি। দেখতে পেলুম এখানে উপাসকেরা একজনের পর একজন লাইন বেঁধে পরিক্রমা করছেন, আর দুই সারি স্তম্ভের মাঝখানে কতকগুলি নাগেশ্বর ফুলের বিচির মত বিচি জ্বালানো হচ্ছে! শুনতে পেলুম নবগ্রহের গ্রহশান্তির জন্য, দুর্ভাগ্য যাঁরা তাঁরা নাকি এগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, এখানে, যাতে বিমুখ গ্রহেরা প্রসন্ন হয়ে দুর্ভাগ্যের পরিবর্ত্তে সৌভাগ্যবর দান করেন।

শিবমন্দিরের বারান্দার বাইরের দিকে কল্যাণ অথবা বিবাহ মণ্ডপ অবস্থিত। প্রত্যেক চৈত্র মাসে শিব এবং মীনাক্ষির বিবাহ-উৎসব হয়। উৎসব প্রায় দু'মাস চলে



মাদুরার মন্দিরের আভ্যন্তরীণ কারুকার্য্যময় স্তম্ভ সারি

এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ হয়। দেওয়ালে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের ছবি আছে। বিয়ের সময় এই দুই-গ্রহ সুপ্রসন্ন না থাকলে অমঙ্গল হয়, এই লোকের ধারণা। এই মণ্ডপটির খানিকটা মাত্র কুড়ি বছর আগে একজন ধনী চেটি দ্বারা নির্ম্মিত হয়েছে।

শিবমন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে রাজমণ্ডপ অবস্থিত। নামে রাজমণ্ডপ হলেও শিবের ধ্বজস্তম্ভ-প্রাঙ্গণের তুলনায় এই মণ্ডপটি কিছু নয় বলতে হবে। গত শতাব্দীতে নাট্টুকোট্টাই চেটিদের দ্বারা এটি নির্ম্মিত হয় এবং এক একটি পাথরের উপর নৃত্যরত শিব, কালী ও অন্যান্য মূর্ত্তির জন্যই এটি প্রসিদ্ধ। কালীর মূর্ত্তিটি সিঁদুর, হলুদ ও মাখনের দ্বারা নানা রং বেরঙ-এ রঞ্জিত হয়ে আছে। রোগক্লিষ্ট লোকেরা রোগমুক্তির জন্যই এ ভাবে কালীর পূজা করে থাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নটরাজের মন্দির, প্রবেশদ্বারে দুটি প্রকাণ্ড পাথরের হস্তী। পাশেই কয়টি লৌহ নির্ম্মিত সুদৃঢ় কামরা। এদের ভিতর মন্দিরের নানা মূল্যবান্ আসবাবপত্র ইত্যাদি রক্ষিত আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপার সিংহাসন, যার মাথায় বাসুকি ফণা বিস্তার করে ছাতি ধরেছে। তারপরই উল্লেখযোগ্য একটি রূপার তোতাপাখী, এটি দশ হাজার টাকা খরচ করে একজন চেট্টি দান করেছেন। তা ছাড়া মাদুরার শেষ রাজার দেওয়া সোনার পালকি ও শিব-গঙ্গার কোনও জমিদারের দেওয়া দুশো



স্বর্ণময় ধ্বজস্তম্ভ ও ষণ্ডের মূর্ত্তি—মাদুরার মন্দির

বছর আগের আর একখানা পালকিও দ্রষ্টব্য। শিবের বিবাহ উৎসবের সময় এগুলি ব্যবহৃত হয়।

উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সঙ্গতার অথবা তৃতীয় সঙ্গমের সভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি কামরা আছে। অনেক পুরাতন কাল থেকে মাদুরা বিদ্বানদের স্থান বলে প্রসিদ্ধ। শতাব্দীর পর শতাব্দী মাদুরাতে নানা বিদ্বৎসভ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের অধিবেশন মীনাক্ষির মন্দির-প্রাঙ্গণে যেখানে হ'ত, তাই সঙ্গতার নামে খ্যাত। এ সম্বন্ধে মাদুরার পুরাণে তৃতীয় অথবা শেষ সঙ্গম সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। কোনও এক সময়ে জ্ঞান-দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার কোপে আটচল্লিশ বার মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণের শাপগ্রস্ত হন। এতে তিনি ভীত হয়ে অনেক সাধ্যসাধনার পর একজন্মেই আটচল্লিশ বারের জন্য মর্ত্ত্যবাসের অনুমতি ভিক্ষা করেন। ব্রহ্মা সম্মতি দিলে তিনি নিজেকে আটচল্লিশ ভাগে ভাগ করেন ও তার প্রত্যেক অংশে একজন কবির আবির্ভাব হয়। তাদের খ্যাতি পাণ্ড্যরাজার কর্ণগোচর হলে তিনি তাদের সকলকে আহ্বান ক'রে তৃতীয় সঙ্গমের সৃষ্টি করেন। অপ্রতিভাসম্পন্ন কবিদের বাগাড়ম্বরে ক্ষুণ্ণ হয়ে এঁরা সকলে শিবের শরণাপন্ন হন। তখন আশুতোষ বরদান করেন যে, সঙ্গমের সভ্যসংখ্যা অনুযায়ী হীরক আসন সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত হবে, যাতে আর কেউ সেখানে আসন না পায়। সেই থেকে শুধু সেই আটচল্লিশজন ছাড়া আর কারুর সেখানে বসবার অধিকার থাকে না।

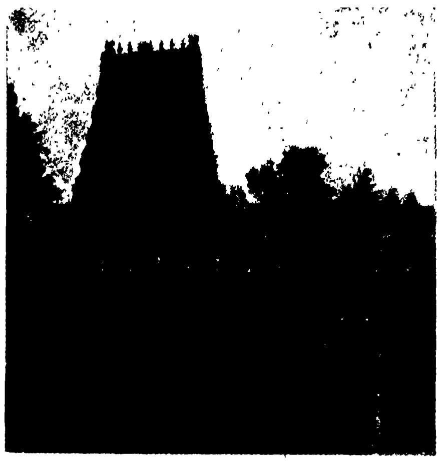
পাশেই তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর মন্দির। তিনি মাদুরার একজন প্রসিদ্ধ কবি ও ঋষি ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে কুব্জ পাণ্ড্য রাজা নেডুমারার জৈন ছিলেন এবং সেজন্য শৈবদের উপর উৎপীড়ন করতেন। রাণী কিন্তু শৈব ছিলেন এবং গোপনে শিবের পূজা করতেন। তিনিই জ্ঞানী-ঋষি তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরকে মাদুরায় ডেকে আনেন। অকস্মাৎ রাজার কঠিন পীড়া হয় এবং জৈন চিকিৎসকেরা তাঁকে আরোগ্য করতে অক্ষম হলে রাণী রাজাকে দিয়ে তিরুজ্ঞানকে ডেকে পাঠান। তিরুজ্ঞান এসে রাজাকে নীরোগ করলেন এবং কুব্জ দেহকে শুদ্ধ সোজা করে দিলেন। তখন রাজা সুন্দরপাণ্ড্য নাম গ্রহণ করে শৈব ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন এবং জৈনদের উপর অত্যাচার করতে থাকেন। তখন তারা ঋষির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করে। দুই ধর্ম্মমতের মন্ত্র তালপাতার উপর লিখে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় জৈন তালপাতা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিন্তু শৈব অক্ষত থাকে। আবার দুই রকমের তালপাতা জলে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু জৈন জলে ডুবে যায়, আর শৈব ভেসে ভেসে এসে শিবের মন্দিরের গায়ে এসে পৌছয়। রাজা শৈব-ধর্ম্মের প্রাধান্যের এরকম পরিচয় পেয়ে যেখানে এসে শৈব তালপাতাগুলি পৌছয়,

সেই তিরুভেদ গ্রামে (মাদুরা থেকে বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে) শিবের এক সুবৃহৎ মন্দির রচনা করেন।

এর পরে উত্তর-পূর্ব্বে আমরা সহস্র-স্তম্ভগৃহে পৌছলুম। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই এই গৃহের নির্ম্মাতা রাজা বিশ্বনাথের প্রধান মন্ত্রী (ষোড়শ শতাব্দী) আর্য্যনাথের হাতীর উপরে প্রতিমূর্ত্তি আছে। স্তম্ভগুলির যথার্থ সংখ্যা ৯৮৫, সেইজন্য একে সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ বলা হয়। এই মণ্ডপটি অনেকাংশ ভেঙ্গেচুরে গেছে। এর মাঝ দিয়ে যে চিত্রিত রাস্তা আছে, তা শেষ হয়েছে গিয়ে অপর প্রান্তে নটরাজের মন্দিরে।

অনেক রাত্রি হতে চলেছে দেখে আমরা বেরিয়ে এলুম মন্দির থেকে আবার সেই পূর্ব্বের গোপুরম্ দিয়ে। শুনতে পেলুম বাইরেই পুড়ু মণ্ডপ বলে একটি মন্দির আছে, তা তিরুমাল নায়কের ছত্রি নামে প্রসিদ্ধ। এর নির্ম্মাণ করতে বাইশ বছর লেগেছিল। এখানেই গ্রীষ্মকালে নাকি শিবকে মন্দির থেকে সরিয়ে আনা হয়। অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় আমাদের আর সেটা দেখা হয়ে উঠে নি।

এখানে এই অদ্ভুত বিখ্যাত মন্দিরের একটু ইতিহাস বলা আবশ্যক মনে করি। এর বেশীর ভাগই ষোড়শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। অতি পুরাতন যে সকল অংশ পাণ্ড্য-রাজারা নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন, তা দিল্লী সম্রাট আলাউদ্দীন খিলিজির সেনাপতি মালিক কাফুর কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য আক্রমণের সময় বিনষ্ট হয়। তখনকার চৌদ্দটি গোপুরম একেবারে ধ্বংস করে মুসলমানেরা; শুধু সুন্দরেশ্বর আর মীনাক্ষির মন্দির দুটিই কোন রকমে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ "তিরুবাচকম্" প্রণেতা মাণিক্য বাচকরই প্রথমে কবিতা ছন্দে মাদুরার মন্দিরের কীর্ত্তি দেশ দেশান্তরে প্রকাশ করেন। ইনি পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে পাণ্ড্যরাজার প্রধান মন্ত্রী হন। এত উচ্চ পদ সত্ত্বেও তিনি ঐহিক বিষয়ে অনাসক্ত ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। রাজা তাঁকে অনেক ধনরত্ন দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য অশ্ব সংগ্রহের আদেশ দেন। পথে শিব মন্ত্রীকে পরীক্ষা করবার জন্য ছদ্মবেশে ধন প্রার্থনা করেন। মন্ত্রীও অম্লান-বদনে রাজদত্ত অর্থ তাঁকে দান করেন। এই সংবাদ যখন রাজার কানে গেল, তিনি রাজধানীতে অমাত্যকে ডেকে পাঠালেন। শিব বলে গেলেন মন্ত্রীকে যে ঘোড়া তার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে পৌছবে। সত্যিই দেখা গেল মন্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসংখ্য তেজস্বী অশ্ব রাজধানীতে গিয়ে হাজির হল। রাজা ত মহা খুশী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রিতে ঘোড়া কটি শেয়াল হয়ে রাজ-আস্তাবল ছেড়ে চীৎকার করতে করতে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। এই সংবাদ যখন রাজার কানে পৌছল তখন তিনি মন্ত্রীকে কারাগারে বন্দী করলেন। এতে শিব কুপিত হয়ে নগর ধ্বংস করার জন্য ভীষণ বন্যা সৃষ্টি করলেন। বন্যার হাত থেকে নগর বাঁচাতে লোকেরা একটি বাঁধ তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। একটি বৃদ্ধা নিজের অংশের কাজ শেষ করে উঠতে পারে নি, তাই শিব নিজে কুলীর ছদ্মবেশে তাকে সাহায্য করছিলেন। এই সময়ে



স্বর্ণপদ্ম পুকুর

রাজা সেখানে উপস্থিত হন এবং কাজ শেষ হয় নি দেখে ছদ্ম-কুলীকে আঘাত করেন। শিব বিশ্বনাথ, রাজার আঘাত তাই পৃথিবীশুদ্ধ লোকের গায়ে লাগল, এমন কি, রাজা নিজেও বাদ গেলেন না। এই দৈবঘটনায় রাজা অনুতপ্ত হয়ে মন্ত্রীকে মুক্তি দান করলেন। মন্ত্রী মুক্তি পেয়ে নিজের কবিতা ও গ্রন্থগুলি পৃথিবীতে প্রচার করেন। তিনি অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তীর্থভ্রমণ করতে থাকেন এবং মাদুরার মন্দিরের মাহাত্ম্য অমর কবিতাছন্দে প্রকাশ করেন। প্রায় পনর শ বছর চলে গেছে, আজও মাদুরায় তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য ভাদ্র-আশ্বিন মাসে 'অবনীমূলম' নামক উৎসব হয়। তখন শিবের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক নাটক অভিনীত হয়, তার মধ্যে শেয়ালের অশ্বাকার ধারণ

একটি প্রধান। উৎসবের সময় সত্যিই একটি শেয়ালকে মন্দিরে আনা হয় এবং পরে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন সকলে গিয়ে মিউনিসিপাল জলের কলের নিকটবর্ত্তী, বৈগাই নামক স্থানে সমবেত হয়। সেখানে আবার বাঁধ-নির্ম্মাণ অভিনীত হয়। একজন ব্রাহ্মণ শিবের ভূমিকার অভিনয় করেন, আর একজন রাজা হন। রাজা অজ্ঞানভাবে শিবের গায়ে আঘাত ক'রে বিশ্বকে আঘাত করেন।

অন্যান্য তামিল কবিরা মাণিক্য বাচকার-এর পূর্ব্বেই মাদুরার মন্দিরের গুণকীর্ত্তন করেন। তাঁরা একে রৌপ্য-মন্দির বলে বর্ণনা করেন ও এর সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্যের অজস্র প্রশংসা তাঁদের কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়।



নাটমন্দির—তিরুপারণকুণ্ডম্

আমরা প্রায় সাড়ে নটার সময় আমাদের বিশ্রাম-কামরায় ফিরে আসি। ডাক্তার বন্ধু তিনজন মন্দিরেই থেকে যান, আরও কিছু দেখবার আশায়। তাঁরা বোধ হয় ঘণ্টা-খানেক পরে স্টেশনে ফিরে আসেন।

ভোরবেলায়ই আমরা স্নান করে নিলুম, কারণ ভোর ছটায় যা গরমের প্রকোপ, তাতে ঘরে পাখার নীচে বসেও গলদ্ঘর্ম্ম হচ্ছিলুম। প্রাতরাশ শেষ করে আমরা সাড়ে সাত-টার গাড়ী ধরলুম, তিরুপারণকুণ্ডম্-এর পথে। ঐ স্থানটি মাদুরা থেকে পাঁচ মাইল দূরে, এবং তার গুহা-মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। গাড়ীতে রেলওয়ে স্টেশনে পৌছতে লাগল প্রায় পোনর মিনিট। তারপর প্রায় এক মাইল পায়ে হেঁটে আমাদের যেতে হ'ল মন্দিরে।

তিরুপারণকুণ্ডম্-এর মন্দিরটি একটি বাজারের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরটি একটি পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে, তাই এর নাম গুহা-মন্দির! মন্দিরের দেবতা, সুব্রহ্মণ্যম্, অর্থাৎ দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়। আসল মন্দিরটি পাহাড়ের মধ্যে, সম্মুখেই প্রকাণ্ড নাটমন্দির, তাতে পাথরের উপর নানা রকমের কারুকার্য্য আছে। নাট-মন্দিরের মধ্যে যেন একটা ছোটখাটো বাজার বসেছে বলে মনে হ'ল। পূজার ফুল, মালা, চন্দন, নারকেল, কাঁঠাল প্রভৃতি অন্যান্য ফল, এ সবেরই দোকান অসংখ্য। তাছাড়া সদ্য আগত উপাসক, পূজা শেষে প্রসাদ ভক্ষণরত ভক্ত, বিশ্রামসুখউপভোগী পথিক, অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক, ক্রন্দনরত শিশু, এমন কি ফলমূলভক্ষণপ্রয়াসী গোমাতার পর্য্যন্ত অভাব ছিল না!

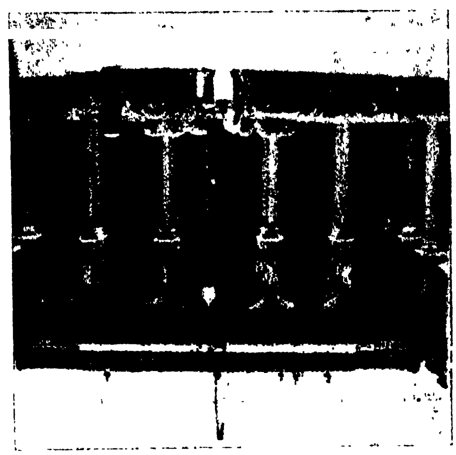
নাটমন্দিরটি পার হয়ে আমরা নাতি প্রশস্ত দ্বার দিয়ে মন্দির-গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। ভিতরে ঢুকেই দেখি, লোকে লোকারণ্য, কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে সেদিন মন্দিরে ভীষণ ভিড়! ভিড়ে ধৈর্য্য পরীক্ষার চরম আমারও হয়েছিল, তাই কোন রকমে পত্নীকে ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টাদিকে জনস্রোতের অনুগামী হলুম। নেহাৎ দুরদৃষ্ট বলেই আর সুব্রহ্মণ্যম্ দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় আমাদের ভাগ্যে ঘটল না, কোন রকমে নাটমন্দিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। বন্ধুরা কিন্তু নাছোড়, লোকের ভিড়ের সঙ্গে দেহবলের পরীক্ষা দিয়ে দেবদর্শন করে যখন ফিরে এলেন, দেখে মনে হ'ল যেন সদ্যস্নানসিক্ত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

বাসে করে আমরা যখন মাদুরায় এসে পৌছলুম তখন প্রায় দশটা বাজে। সুতরাং কালবিলম্ব না করে অন্য যানাভাবে আমরা মাদুরার অগতির গতি ঝট্কার শরণাপন্ন হলুম। মাথার উপরে রোদ, আর অনবরত ঘাম ঝরছে সর্ব্বাঙ্গ থেকে, তাই তেষ্টা পেয়েছিল সকলেরই, সুতরাং ঝট্কারোহণের পূর্ব্বে ডাবের শীতল জলে ক্ষণকালের জন্য তেষ্টা নিবারণ করলুম সকলে। তখন আমাদের মন্দিরে গিয়ে পূজা দেওয়া হয়নি, সুতরাং আমাদের গন্তব্য স্থল হ'ল আবার মাদুরার মন্দির। মন্থরগতিতে ঝট্কা চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গলার ঘণ্টা বাজছে। আমাদের ঝট্কা আগে ছিল, অপর ঝট্কায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন্ধুরা আসছিলেন; এমন অবস্থায় ডাক্তার মিত্র কখন যে

আমাদের ছবি অতর্কিতে তুলে নিয়েছেন টেরও পাইনি। আমরা সোজা আবার গিয়ে মন্দিরের দ্বারে পৌঁছলুম। কাল রাত্রিবেলা বৈদ্যুতিক আলোকে যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম, আজ আবার সুস্পষ্ট দিনের আলোকে সবকিছু ভাল করে দেখে নিতে নিতে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলুম। ক্যামেরা হাতে ডাক্তার মিত্র দ্রষ্টব্য অনেক কিছুর ছবি নিলেন। দিনের বেলায় মন্দিরের সেই একই অবস্থা, ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারই মাঝে পূজার কাজ শেষ হ'ল! মীনাক্ষির প্রসাদী মালা আমি পত্নীর হাতে তুলে দিলুম, আর চাটার্জ্জি এনে দিলে তাঁর হাতে মীনাক্ষির সিঁদুর, কেন-না, স্বামীর নাকি স্ত্রীর হাতে সিঁদুর তুলে দিতে নেই।

যাক্ বেলা বেড়ে চলেছিল, সুতরাং আমরা তাড়াতাড়ি করে চললুম পুরাতন রাজপ্রাসাদ 'তিরুমল নায়কের প্রাসাদ' দেখতে। মন্দির হতে প্রায় তিন মাইল দূরে প্রাসাদটি। ইহা মাদুরার পুরাতন দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। আগে প্রাসাদটি অনেক বড় ছিল, এখন শুধু তার একাংশ মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। ১৬৬২—১৬৮২ খৃষ্টাব্দে প্রাসাদটি অব্যবহার্য্যরূপে থাকে, কারণ প্রসিদ্ধ রাজা তিরুমল নায়কের পৌত্র ছোক্কনাথ, রাজধানী মাদুরা হতে ত্রিচিনাপোলিতে সরিয়ে নিয়ে সেখানেই রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। প্রাসাদটি হলদে রংএর। প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ, প্রায় আড়াইশো ফিট লম্বা এবং দেড়শো ফিট চওড়া। তার চারদিকে প্রকাণ্ড বারান্দা—প্রায় চল্লিশটি প্রকাণ্ড স্তম্ভে ঘেরা। এক একটা স্তম্ভ এত বড় যে দশজন লোক হাত ধরে দাঁড়িয়ে তবে সেগুলি বেষ্টন করতে পারে। স্তম্ভগুলির উপর চূণ-সুরকিতে চমৎকার কারুকার্য্য। এর পশ্চাতে আরও তিন সারি স্তম্ভ। এখনও কোথাও কোথাও লাল ও কমলা রং, হলদে রং-এর মধ্য দিয়ে উঁকি দিয়ে জানিয়ে দেয় আগে তাদের কি রকম রং-এর বাহার ছিল। ছাদেও নানা রকম কারুকার্য্য, তখনকার দিনের ভাস্কর্য্যের উৎকর্ষের পরিচায়ক।

প্রাঙ্গণ পার হয়ে আমরা একটা প্রকাণ্ড হলঘরে পৌঁছলুম, এর চারিদিকে পাঁচ সারি প্রকাণ্ড স্তম্ভ বিরাজ করছে এবং উপরে তিনটি বিশাল ডোম আছে। সব চেয়ে বড় ডোমটির পরিধি ষাট ফিট এবং তা মেঝে থেকে তেয়াত্তর ফিট্ উঁচু। সম্মুখেই প্রকাণ্ড বারান্দা, যার স্তম্ভগুলির উচ্চতা পঞ্চান্ন ফিট্। এখানেই মাদুরার ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্স জজের আদালত বসে। সেদিন করোনেশন দিবস, সুতরাং নানা রকম পতাকা ও ফুল লতার সাহায্যে হলগুলি সাজানো হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যে পুরাতন রাজপ্রাসাদে আবার কোন উৎসবের আয়োজন চলেছে। প্রাসাদের অন্যান্য কক্ষে নানা রকমের অফিসের কাজ হয়। মাদুরা একটা ডিভিশনেল হেড্ কোয়ার্টার। শুনতে পেলুম, তার প্রত্যেকটি অফিসই এই প্রাসাদের মধ্যে, এমন কি পাবলিক্ ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট পর্য্যন্ত। বড় হলটিই আগে দরবারকক্ষ ছিল। সেখানকার পাহারাওয়ালা আমাদের একটি ছোট দরজা খুলে প্রাসাদের অন্দরমহলে নিয়ে গেল, এবং কোথায় রাণীদের মহল ছিল, কোথায় কি হ'ত অন্তঃপুরে এবং



তিরুমল নায়কের প্রাসাদ, মাদুরা

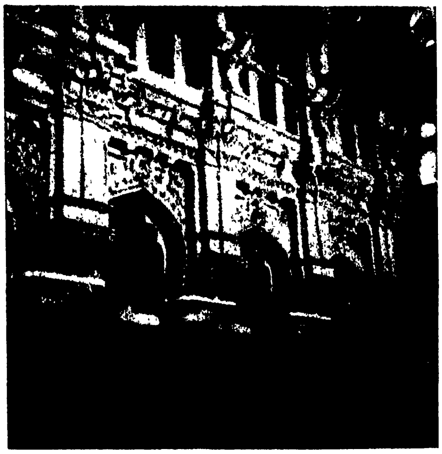
কি করে একদিন ছাতের উপর থেকে চোর এসে ঢুকেছিল রাজপ্রাসাদে তারই সবিস্তার বর্ণনা করছিল। এখন নাকি অন্তঃপুর মহলে সাব-জজ্ কোর্ট বসে। মাদুরায় এই প্রাসাদটি সাধারণের কাছে 'স্বর্গ-বিলাস' বলে পরিচিত। কারো কারো মতে প্রাসাদের কক্ষগুলির স্থাপত্যকলা, রং-এর খেলা ও কারুকার্য্য প্রভৃতির নাকি তুলনা নাই। আমাদেরও মনে হ'ল, সত্যই প্রাসাদটি অপূর্ব্ব!

পশ্চিমের দিকে একটি চতুষ্কোণ কালো পাথরের বাড়ী আছে; তারই অভ্যন্তরে হাতীর দাঁতে তৈরী একটি কক্ষ আছে। এই কক্ষে নানা বহুমূল্য রত্ন বসানো একটি সিংহাসন রক্ষিত আছে। নবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে, রাজা এসে পাত্র-মিত্র-সভাসদ ও সামন্ত রাজ-ঐশ্বর্য্য নিয়ে

এখানে বসতেন, এবং অন্যান্য সামন্ত রাজারা তাঁকে অভিবাদন জানাত। এরই পশ্চাতে তিনটি কামরা আছে, আগাগোড়া কালো মার্ব্বেল পাথরে তৈরী।

ডাক্তার মিত্র এই প্রাসাদেরও কতকগুলি স্ন্যাপ্ নিলেন।

তিরুমলনায়কের প্রাসাদ থেকে ঝটকায় চড়ে আমরা যখন স্টেশনের দিকে ফিরলুম তখন প্রায় দু'টা বাজে। মাথার উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, এবং পেটের মধ্যে জ্বলন্ত হুতাশন, এই দুই উত্তাপে আমাদের নশ্বর দেহের অবস্থা কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। বন্ধুরা পথের পার্শ্বেই ভোজনাগার দেখে বললেন "না খেয়ে পাদমেকমপি ন গচ্ছামি।"



তিরুমল নায়কের প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ কারুকার্য্য

পত্নীকে বললুম "তুমি কি করবে?" তিনি বললেন এ রকম হোটেলে তিনি প্রাণ গেলেও খেতে পারবেন না। সুতরাং আমাদের যান আর অপেক্ষা না করে ছুটল স্টেশনে স্পেন্সারের হোটেলের পানে! কিন্তু মানুষ সংকল্প করে, এবং ভগবান বিরূপ সাধেন। আমাদেরও অবস্থা হ'ল তাই; স্পেন্সারের ভোজনাগারে পৌছে শুনলুম, অত বেলায় খাবার কিছুই নেই! শ্রীমতী প্রতিমার তখন মাথার উপর হাত উঠেছে!

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে আমি ছুটে গেলুম স্টেশনের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলে। সেখানে যা আছে, বাচ্‌বিচার না করে টিফিন কেরিয়ারে করে নিয়ে এল পরিচারক! সেদিন সাম্বার, কত্রিকা কুটু, আবিয়ল্ আর তৈর্ (ডাল, বেগুনের ঘ্যাঁট্, তরকারী আর দই) দিয়ে অতি তৃপ্তিসহকারে ভোজন-পর্ব্ব সমাধা করলুম, একেবারে দক্ষিণ ভারতীয় ভাবে! একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস!

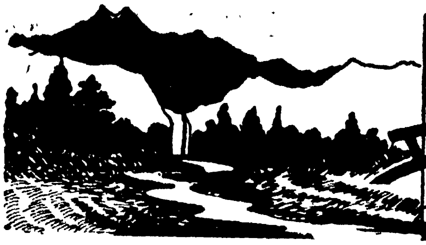
আমরা সাড়ে চারটায় মাদুরা ছাড়লুম, পুনরায় কুনুরের পথে! সেদিন পথে আর খুব কষ্ট হয় নি, কারণ একপশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় গরমটা একটু বেশ কমে গিছ্‌ল। বন্ধুরা বিস্কুট কিনে বানরদের পথের দু'পাশে খাইয়ে আসছিলেন, আমরা তাই খুব উপভোগ করছিলুম। রাত প্রায় বারোটায় আমরা পদোনুর জংশনে পৌছলুম। সেখানে সারারাত্রি আমাদের থাকতে হ'ল গাড়ীতে। ভোর চারটায় চাটার্জ্জি আমাদের ডেকে উঠিয়ে মালপত্র নিয়ে পৌছে দিল অন্য গাড়ীতে! আমাদের গাড়ী যখন চলতে আরম্ভ করলে, তখন পাশের কামরা হতে ডাক্তার মিত্র ডেকে বললেন, "পাল সাহেব, শৈলেন পড়ে রইল।"

আমি অবাক্ হয়ে বললুম, "সে কি? আমাদের সকলকে উঠিয়ে সে-ই পড়ে রইল?" ডাক্তার মিত্র বললেন, "হাঁ"।

মিসেস্ পাল বল্লেন, "বেচারা!"

মেটুপালায়ামে পৌছে 'বেচারা'র জন্য আমাদের তৈরী গাড়ীতে যাওয়া হ'ল না। সেদিন করোনেশন ডে, আর 'উটি'তে রেস্, তাই আধঘণ্টা পরেই একটা স্পেশাল গাড়ী ছিল; আমরা প্রাতরাশ করে সেই গাড়ীতেই উঠে চাটার্জ্জির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। এ গাড়ীখানাও ছাড়ে ছাড়ে, এমি সময় হাঁপাতে হাঁপাতে চাটার্জ্জি অন্য গাড়ী থেকে ছুটে এসে আমাদের কামরায় উঠ্‌লে! ডাক্তার নায়ক বললেন, "বেশ লোক!" ডাঃ মিত্র বললেন, "কোথায় ছিলেন?" শৈলেন কি করে অত্যাবশ্যকীয় প্রাতঃকৃত্যের জন্য আসতে পারে নি, সে কথাটা বলতে না বলতেই গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে নীলগিরির গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে, আমাদের গন্তব্য স্থান কুনুরের পথে!





সঙ্গীত

যাওয়া আসা

(গান)

আঁধারের ডোরে গাঁথা আলোকের মণিমালা।
গগনের দেবালয়ে স্বপনের প্রদীপ জ্বালা।

অচেনার রূপ-উদাসী
চেতনায় বাজে বাঁশি
বেদনার অশ্রুফুলে অজানার গন্ধঢালা।

মলয়ে মিলায় যে-সুর—শিশিরে পাই যে তারে
(প্রভাতে মিলায় যে-সুর—নিশীথে পাই যে তারে)
মরণে আসে ফিরে—জীবনে হারাই যারে
বিরহে আসে ফিরে—মিলনে হারাই যারে)
(এ কেবল যাওয়া আসা
ঝরার পথে ফোটার ভাষা)

যারে চায় যুগের তৃষা
রজনী অনিমিষা
জেগে রয় স্মৃতির বুকে তারি নয়ন নিরালা।

কথা ও সুর ঃ—শ্রীদিলীপকুমার দাদ্‌রা স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা

+ ° + ° +
II রা | মা পা র্সা | ণদা ণদা পা | দা পা দপা | দমা া মা | পা জ্ঞমা পদা
আঁ ধা রে র ডো রে গাঁ থা আ লো কে র

° + ° II + ° +
মপা মজ্ঞা মজ্ঞা | সরা সা -া | -া -া রা | মা পা র্সা | ণদা ণদা ণদা | ণপা পা ণদা |
ম ণি মা লা - আঁ ধা রে র ডো রে গাঁ

° + ° + ° +
পা দা মা | পা জ্ঞমপা ণদা | মপা মজ্ঞা মজ্ঞা | সরা সা -া | া া রা | মা পা র্সা |
থা আ লো কে র্ ম ণি মা লা আঁ ধা রে র

০ + ০ + ০
র্রসা ণর্সা দণা | দা পা দা | মপণা দপা দা | মপা জ্ঞমা -া | পা মজ্ঞা মজ্ঞা |
ডো রে গাঁ থা আ লো কে র্ ম ণি

+ ০ +
+ ০ [পমা জ্ঞা রা সরা জ্ঞা মা পা মগা পমা পমা] ০
সরা সা -া | া া { সা | রা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা মা | মগা মা -া | া া } পা |
মা লা গ গ নে র্ দে বা ল য়ে স্ব

+ ০ + ০ +
দা ণা ধণা | ণর্সা ণপা ণা | দা পা -া | মপণা দপা মপণা | দপা মপণা দপা |
প নে র প্র দী প জ্বা লা

০ + ০
মপণা দপা মজ্ঞা | রজ্ঞা রজ্ঞা রজ্ঞা | সা -া | II

+ ০ + ০ +
{ মা | পা ণদা ণা | র্সা -া দণা | র্রা র্সা -া | -া -া র্সা | র্রা র্সর্রা র্জ্ঞা |
অ চে না র্ রূ প উ দা সী চে ত না

০ + ০ +
র্জ্ঞর্রা র্সণা র্সণা | র্রর্সা ণর্সণা দা | পা -া -া | (মপা ণর্সা র্রজ্ঞা |
য় বা জে বাঁ শি বা

০ + ০ +
র্সর্রা মর্জ্ঞা -া | র্জ্ঞর্রা র্সণা ধণা | ধণা র্রসা -া | র্রসা ণদা পদা |
জে গো

০
মপণা দপা মপা | মপণা দপা মপা | জ্ঞমা পর্সা } র্সা | র্রা র্রজ্ঞা মর্জ্ঞা |
বে দ না র্

র্জ্ঞর্রা র্সণা র্সা | র্রা র্রপা -া | -া -া মা | পা জ্ঞমপা ণদা | দপা মজ্ঞা মা
অ শ্রু ফু লে অ জা না র্ গ ন্ ধ

পা পসা -া | -া -া II
ঢা লা

পা | পা দপা হ্মাপা | জ্ঞা পা হ্মাপা | ণদা পা -া | -া -া পা | ণদা র্সণা র্সা |
ম ল য়ে মি লা য় যে সু র্ শি শি রে
প্র ভা তে মি লা য় যে সু র্ নি শী থে

র্রর্সা ণর্সা ণদা | ণা র্সা -া | -া -া র্সর্রা | র্সর্রা র্সর্রা র্সা | ণর্সা ণর্সা ণদা |
পা ই যে তা রে ম র ণে আ সে
পা ই যে তা রে বি র হে আ সে

ণা র্সা -া | -া -া পা | ণদা পা -া | সা মজ্ঞা পমা | পা দা -া | -া -া পা |
ফি রে জী ব নে হা রা ই যা রে
ফি রে মি ল নে হা রা ই যা রে এ,

ধা ণা -া | পা ণদা ণপা | মপা মজ্ঞা মজ্ঞা | সা র্সা -া | ণধা র্সণা ধণা |
কে ব ল যাও য়া আ সা ঝ রা র প থে

[র্জ্ঞা]
জ্ঞা পমা দপা | ণদা ণা -া | { পদা | মপা ণর্সা র্রর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা র্সা |
ফো টা র ভা ষা যারে চা য় যু গে র

র্ঋা র্সা -া | া া } { র্সা | র্সর্ঋা র্ঋা -া | সা সা র্ঋা | র্ঋা র্সা -া | -া -া } -া |
তৃ ষা র জ নী অ নি মি ষা

া া র্সা | র্সর্রা র্সর্রা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্সণা দা | দণা দণা র্সা | র্সণা দপা মা |
তৃ ষা অ নি

মপা মপা ণা | ণদা পমা জ্ঞা | জ্ঞমা পদা ণর্সা | র্রর্জ্ঞা র্মর্জ্ঞা র্রর্সা |
মি ষা

ণর্সা র্রর্জ্ঞা র্রর্সা | ণর্সা র্রর্জ্ঞা র্রর্সা | ণর্সা র্মর্জ্ঞা র্রর্সা | ণদা পদা পদা |

মা া মপা | মপা ণর্সা র্রর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্রা র্সা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া | া া র্সা |
যারে চা য় যু গে র্ তৃ ষা র

সর্ঋা ঋর্া | সা সা ঋা | ঋা র্সা -া | া া { র্সা | র্র্সা র্জ্ঞা -া |
জ নী অ নি মি ষা জে গে র য়

র্সর্রা· র্সণা -া | সা ণ্দা ণ্দা | -া -া } দা | ণ্দা পা -া | সা মা পা |
স্মৃ তি র্ বু কে তা রি ন য় ন্ নি

ণ্দা পা -া | মপণা দপা মপণা | দপা মপণা দপা | মজ্ঞা রজ্ঞা রজ্ঞা | সরা সা | II
রা লা

এ গানটি শ্রীমতী উমা বসু (হাসি) গ্রামোফোনে দিয়েছেন শীঘ্রই প্রকাশ হবে। তাতে কয়েকটি আঁখর (বন্ধনীর মধ্যে যেগুলি দেওয়া হ'ল)·গাওয়া হয়নি সময়াভাবের দরুণ। তানগুলি প্রায় এইভাবেই দেওয়া হয়েছে। এই গানটির আড়ির চাল বিশেষরূপেই লক্ষণীয়।

পরাজয়

শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ

(১)

সুখের সংবাদ বই কি! পুত্রলাভ! প্রথম পুত্র! আনন্দকিশোরের বুকখানা আনন্দে দুলে উঠ্‌ল, আর চোখে মুখে পুলকের একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। যে লোকটি ওখান থেকে সংবাদ দিতে এসেছিল আনন্দকিশোরের বাবা তাকে কাছে ডেকে পৌত্রের সংবাদ নিতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন; খোকা কেমন হ'য়েছে, বেশ মোটাসোটা কি-না, গায়ের রঙ্ কেমন হবে, মুখখানি কার মত ইত্যাদি এমন সব প্রশ্ন তিনি আরম্ভ করলেন যেগুলি দেড় দিনের ছেলের সম্বন্ধে হ'তেই পারে না। সংবাদবাহক কেষ্ট'র বয়স পনর-ষোল, সে বোধ হয় নিজেই ভাল ক'রে ছেলে দেখে নি, তাই বিপদের তার সীমা রইল না। যাই হোক অনেক কষ্টে কর্ত্তার জেরার হাত থেকে বেচারা কেষ্ট নিষ্কৃতি পেল; কিন্তু হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই আনন্দকিশোরের কাছ থেকে সমন এসে হাজির হ'ল! নিজের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে আনন্দকিশোর কেষ্টকে প্রশ্ন করল—"হাঁ রে কেষ্ট, ও কেমন আছে রে?"

—আজ্ঞে, কার কথা বলছেন দাদাবাবু?

—তোর দিদিমণি রে!

—আজ্ঞে তেনার শরীর ত ভাল নয়, শুনমু একটু জ্বর হয়েছে, বড় কষ্ট পেয়েছেন কি-না।

—হাঁরে, খুব কষ্ট হয়েছিল?

—আজ্ঞে তা হয়ে ছ্যাল বই কি!

—এখন একটু ভাল আছে ত?

—আজ্ঞে, তা ভাল বই কি! আপনাকে যাবার জন্যে কত ক'রে বলে দিল!—কথাবার্ত্তা বেশ ত কইতেছেন।

কেষ্টর উত্তরে আনন্দকিশোর নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ল না। একটা ভাল দেখে লোক পাঠান কি উচিত ছিল না? গৌরী কি দু ছত্র লিখে দিতে পার্‌ল না? না, তারই বা দোষ কি? এখন ত কাগজ কলম হাতে করবার অধিকার তার নেই, তা ছাড়া তার কি এখন লেখবার শক্তি আছে? আহা, কত কষ্টই না পেয়েছে গৌরী! আনন্দকিশোর চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল, চাঞ্চল্য বিরক্তিতে পরিণত হ'ল! কার উপর বিরক্তি, কিসের জন্য বিরক্তি? আনন্দকিশোর ঠিক ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ল না তার মন কি চায়, তবে এটা বুঝ্‌ল কিছু সে চায়! এটা বুঝ্‌ল আনন্দের দিনেও তার কি যেন একটা দারুণ অতৃপ্তি!

* *

সুখের সংবাদ বই কি! কিন্তু সে রাত্রে আনন্দকিশোরের ঘুম আর এল না। একবার শুয়ে পড়ে আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। শীতের রাত। দারুণ শীতে প্রকৃতি যেন কুঁকড়ে রয়েছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া, আকাশে কেমন একটা ঘোলাটে ভাব, পাণ্ডুর চাঁদ

অতিকষ্টে ছোট ছোট মেঘগুলো পার হয়ে চলেছে। এই শীত, এই কন্‌কনে ঠাণ্ডা, এই ঝিরঝিরে উত্তুরে হাওয়া—কত না কষ্ট পাচ্ছে ও, ওরা। আনন্দকিশোর একটু একটু কাঁপছে আর ভাবছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগ্‌ল ওর বুকে—কে যেন একটা নিঃশ্বাস ফেলে গেল! কে? এ নিঃশ্বাস কি ওর স্বর্গগতা জননীর আত্মার স্পর্শ! আনন্দকিশোরের জননী! দুঃখিনী! যাকে নিরাভরণা ক'রে আনন্দ বি-এ পর্য্যন্ত পড়্‌তে পেরেছে, আজ তার সম্মান প্রতিপত্তি। দেশ প্রকৃতির সমস্তখানি অধিকার ক'রে দেখা দিলেন মা, তাঁর মুখখানি বিষণ্ণ, তাঁর চোখের কোণে জল। কত আদরের আনন্দ, বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করা আনন্দ, সেই আনন্দর প্রথম সন্তান, পুত্র সন্তান! আনন্দের অধিকার ত তারই! আনন্দকিশোরের বুকের মধ্যে কান্না জমাট বেঁধে উঠ্‌ল।···আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ!···গৌরীর মুখখানি কি ওরই মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! এই শীতের প্রকৃতির মতই কি গৌরী নিষ্প্রভ হয়েছে? সত্য বল্‌তে কি শিশুকে আনন্দ মনের মধ্যে বিশেষ স্থান দিতে পার্‌ল না।

টাকা! গৌরীকে দেখতে গেলে দেখ্‌তে হবে পুত্রের মুখ, চাই সোনার জিনিষ, চাই টাকা। কিন্তু পাড়াগাঁর প্রাইভেট টুইশানের উপার্জ্জনে ছয়টি প্রাণে জীবনীশক্তি দান করতে হয় যাকে, টাকা পাবে সে কোথা? যে বাড়ীতে আনন্দ ভাড়া থাকে সে বাড়ীর গিন্নি বল্লেন, "অন্তত একখানা হাফগিনি নিয়ে গিয়ে ছেলের মুখ দেখে এসো।" গৌরী বলেছিল, "হাঁ গা, খোকা হ'লে দেখ্‌তে আসবে ত? আচ্ছা, কি দিয়ে দেখ্‌বে বল ত? মকরের স্বামী হার দিয়েছিল, তুমি না হয় যা হোক ক'রে একগাছা বালা কিনে এনো, কি বল?" সে কথা আনন্দ-কিশোর ভোলে নি। সেভাবে—হায় মধ্যবিত্ত বাঙালী, তোমার দুঃখ কে বুঝবে? তুমি নিঃস্ব, রাস্তার মোড়ের ঐ কুলিটার মতই নিঃস্ব, অথচ তোমার জীবনযাত্রার আদর্শ ওর চেয়ে অনেক বেশী ব্যয়সাপেক্ষ। তোমার জামা চাই, জুতা চাই, পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার হওয়া চাই। তোমার সমাজ আছে, আত্মীয়স্বজন আছে, আত্মীয়স্বজনের দাবী আছে, নিমন্ত্রণে লৌকিকতা আছে, পূজার চাঁদা আছে—অথচ অর্থ নাই, গৃহ নাই, সাহায্য নাই, সহানুভূতি দেখাইবার লোক নাই। মিথ্যার বনিয়াদে তুমি দণ্ডায়মান, তুমি মিথ্যা, তোমার জীবন মিথ্যা, তোমার হাসি মিথ্যা, তোমার সমাজসেবা মিথ্যা, তোমার সাহিত্য মিথ্যা, সঙ্গীত মিথ্যা। ভাড়া-করা পোষাক পরিহিত রঙ্গমঞ্চের মীরকাশিম তুমি! এ প্রবঞ্চনার বিড়ম্বনা নিয়ে তোমার অস্তিত্ব আর কত দিন?

হার! বালা! গিনি! হাফ্‌গিনি!—ঠেকল এসে টাকায়। ক'টি টাকা হ'লে মানরক্ষা হয়? ক'টি টাকার বিনিময়ে সমাজের মানপত্র? ঠিক ক'টি টাকা আনন্দকিশোরের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে? অনেক চিন্তা, অনেক গবেষণা, অনেক অতীত ইতিহাস মন্থন ক'রে আনন্দকিশোর স্থির বুঝ্‌লে, অন্তত পাঁচটি টাকার দরকার। সমস্যার সমাধান হ'ল, পথ মিল্‌ল, কিন্তু যে তিমির সেই তিমিরই রয়ে গেল। বহু সাধনার পর ধার পাওয়া গেল চারটি টাকা। আনন্দ-কিশোর ভাবে—ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্যই; বেশ হবে, দুহাতে সমান ভাগেই দেওয়া যাবে। আর ছোট ছোট হাতে দুটোর বেশী দেওয়াই ত বোকামি! নিজের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে আনন্দকিশোর মনে মনে খুশী হয়ে উঠ্‌ল। কি মধুর আত্মতৃপ্তি, কি নিদারুণ আত্মপ্রবঞ্চনা! কিন্তু যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েও আনন্দকিশোর জয়লাভ কর্‌তে পার্‌ল না। সমাজদানব তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নিয়ে রুখে দাঁড়াল, তার ভীষণ হাঁ দেখে আনন্দকিশোর শিউরে উঠ্‌ল; আনন্দ স্পষ্ট দেখ্‌ল, তারই মত জামাকাপড় পরা কত হতভাগ্য ঐ হাঁ'র মধ্যে ডুবে যাচ্ছে—আনন্দ শিউরে উঠ্‌ল। দানবটার আগুনের গোলার মত চোখদুটি দেখে আনন্দ ভয়ে চোখ বুজে ফেল্‌ল।

একুশটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল আনন্দ তা বুঝ্‌তেই পার্‌ল না; কারণ তার মনের মধ্যে দিনরাত্রির আনাগোনা হয় নি, আনাগোনা হয়েছে চিন্তার, বিশ্রী, উৎকট, ভয়ানক সব চিন্তার। অবশেষে গৌরীর কাছ থেকে এল আহ্বান, আনন্দ চম্‌কে উঠ্‌ল। যাকে কেন্দ্র ক'রে চিন্তা, চিন্তার চাপে সে-ই গিয়েছিল হারিয়ে, তাই আনন্দ চম্‌কে উঠ্‌ল। গৌরীর আহ্বান! সে আহ্বানে কত যে অভিমান আর অনুনয়, অভিমানের পুনরাবৃত্তি আর অনুনয়ের পুনরাবৃত্তি তা বুঝ্‌বে না কেউ, কিন্তু আনন্দ বুঝ্‌ল' চিঠির শেষের দিকে লেখা ছিল—আমার শরীর ভয়ানক খারাপ, তার উপর তুমি যদি এমন ক'রে ভাবাও তা হ'লে আমাকে আর তোমার কাছে যেতে হবে না। শনিবার আসা চাই, চাই, চাই!

* * * *

শনিবার! ধার করা চারটি টাকা আর নিজের পকেটের দুটি—এই নিয়ে সন্ধ্যার পর চোরের মত চুপি চুপি আনন্দকিশোর শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হ'ল। গৌরীর মুখে ফুট্‌ল হাসি, বুকে জাগ্‌ল আশঙ্কার বেদনা। গৌরীর মেজবোন উমা বল্‌লঃ দিন সন্দেশের টাকা, না হ'লে ছেলে দেখ্‌তে দেব না। আনন্দকিশোর একটি টাকা দিল উমার হাতে, পার্শ্ববর্ত্তিনী দিদিমা, বল্‌লেন, নাতজামাইয়ের হাত দরাজ বটে, নোটের কম···।

আনন্দ উমার হাতে আর একটি টাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আত্মরক্ষা কর্‌ল। ওর বুকের ভিতরটা মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যে অপমান এখনও অপেক্ষায় আছে তার গুরুত্ব স্মরণ ক'রে হতভাগ্য আনন্দ বিহ্বল হ'য়ে পড়্‌ল।···ছেলেকে কোলে নিয়ে গৌরী এসে দাঁড়াল, সঙ্গে সেজ বোন ভবানী। চারটাকা ত ছিল না, তিনটাকাও দেওয়া যায় না; দুটি টাকা নিয়ে আনন্দ খোকার হাত লক্ষ্য ক'রে ফেলে দিল। তার হাত দুখানি বোধ হয় কাঁপছিল, টাকা দুটি মাটিতে প'ড়ে বেজে উঠ্‌ল'। সে শব্দ তিরস্কারের মতই কর্কশ হয়ে বেজে উঠ্‌ল আনন্দর বুকের মধ্যে! "দু টাকা! মাগো! দুটাকা দিয়ে ছেলের মুখ দেখা!" বল্‌তে বল্‌তে এগার বছরের ভবানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে সে ঐ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল।

অপমানিত, মর্ম্মাহত আনন্দকিশোর বিহ্বলদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে তাকাল। এ কি! ওর মুখেও যে অতৃপ্তির ছায়া!

রসায়নের নূতন পাতা

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায় এম-এসসি

বিজ্ঞান

রসায়নশাস্ত্রে ইহা একটি নূতন অধ্যায়। প্রকৃতির রাজ্যে এতদিন লুক্কায়িত ছিল, ইদানিং ধরা পড়িয়াছে। নূতন যুগের সোনার কাঠি ঘুমন্তপুরীতে জাগরণের সাড়া তুলিয়াছে, প্রকৃতির বস্তান্তরালে যাহা কিছু রাসায়নিক সম্ভার আছে সবই আজ একে একে মানুষের করায়ত্ত হইবে। এই নূতন রাসায়নিকশাস্ত্র পণ্ডিতদের যাত্রাপথে এক অপূর্ব্ব জয়মাল্য। বস্তুজগতের কলয়ড্ (Colloid) অবস্থা সম্ভবতঃ বস্তুমাত্রেরই এক অবিচ্ছেদ পরিণতি। সুযোগ সুবিধা পাইলে সকলেই উক্ত অবস্থা পাইয়া থাকে। কলয়ড অবস্থাটা (Colloidal state) কি—তাহার একটু আভাস পাইবার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

সাধারণতঃ দেখা যায় ধূলি বালুকণা প্রভৃতি কঠিন জড়পদার্থ জলে মিশ্রিত হইলে অচিরেই পাত্রের তলদেশে পতিত হয়, জলের সঙ্গে গলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায় না; কিন্তু লবণ ও চিনি জাতীয় পদার্থ জলে নিক্ষেপ করিলে উহারা জল হইতে সরিয়া না দাঁড়াইয়া নিজদিগকে সম্পূর্ণ ওতপ্রোতভাবে জলের মধ্যে মিলাইয়া দেয় এবং দৃশ্যতঃ উহাদের অস্তিত্ব তখন কোথাও পাওয়া যায় না। এই দুইটী ক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করিলে বস্তুজগতে দুইটী অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। একপ্রকার বস্তু মোটা, ভারি এবং অদ্রবণীয়—এজন্য অতি সহজেই জল হইতে সরিয়া দাঁড়ায় এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর থাকে। দ্বিতীয় প্রকার বস্তু জলে দেওয়া মাত্র অণুতে অণুতে বিভক্ত হইয়া—উহার সঙ্গে একাকার হইয়া যায়, তখন উহাদের অস্তিত্ব দৃষ্টিবহির্ভূত থাকে। এই যে দ্বিবিধ পরিণতি ইহার মধ্যবর্ত্তী কোন অবস্থা আছে কি না, এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। রাত্রি ও দিন সময়ের দুইটী বিশিষ্ট সংজ্ঞা। যেমন একদিকে রাত্রি, সেরূপ অপরদিকে দিন। একটি অন্ধকারের আধার, অপরটি আলোর স্বরূপ। এই দুইএর মাঝামাঝি ও একটি অবস্থা আছে তাহাকে বলে প্রদোষ। প্রদোষ কিন্তু রাত্রিও নয়, দিনও নয়—দুইএর সমন্বয় বলা যায়। আমাদের এখানেও দেখি পাথরকণা ও লবণ বস্তুজগতের দুই বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান। এক জাতীয় পদার্থ জলের সংস্পর্শে আসিয়াও সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর থাকে—আকারেও বেশ বড়; অপর জাতীয় পদার্থ জলসংযোগের অণুতে অণুতে বিভক্ত হইয়া কোথায় লুকাইয়া যায় যে অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা যায় না। ইহাদের মাঝামাঝি অবস্থায় যে বস্তুজগৎ অবস্থান করে তাহাদিগকে কলয়ড্ বলে। কলয়ড্ জলসংযোগে অতি ক্ষুদ্র কণিকায় অবস্থান করে সত্য, কিন্তু উহারা একেবারে দৃষ্টিবহির্ভূত হয় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ইহাদিগকে অবলোকন করা যায় এবং উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা হইতে সময় সময় আলো প্রতিফলিত হইয়া উহাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। কলয়ড-কণিকা অণু হইতে বড় এবং সাধারণ জড়পদার্থ অণু প্রভৃতি হইতে সহস্রগুণে ক্ষুদ্র। জিলাটিন (Gelatin), এলবুমিন (Albumin), সাবান, রজন, রবার, সিমেণ্ট প্রভৃতি পদার্থ কলয়ড শ্রেণীভুক্ত।

বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক গ্রাহাম ১৮৬১ খৃঃ এই নূতন অবস্থা আবিষ্কার করেন। এই গুলিকে চিনিবার একটি সঙ্কেত আছে। জলে লবণের মত মিলিয়া না যাওয়াতে সাধারণতঃ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট পাতলা চামড়া বা পার্চমেণ্টের (Parchment) মধ্য দিয়া ইহা গলিতে পারে না; অথচ চিনি ও লবণ জাতীয় পদার্থ আণবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অতি সহজেই উক্ত চামড়া ভেদ করিয়া সরিয়া পড়ে। দেখা যায় ঐ চামড়ার সাহায্যে দ্বিবিধ পদার্থ আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়—কলয়ড্ ও ক্রিষ্টলয়ড্ (Crystalloid)। শেষোক্ত পদার্থগুলি সহজে দানারূপ গ্রহণ করে বলিয়া সম্ভবতঃ উহাদের ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। উহা কিন্তু একটি হাত-পা-বাঁধা বৈষম্য নয়, ক্রিষ্টলয়ড্ ও কলয়ড হামেশা একে অন্যের রূপ গ্রহণ করে।

কলয়ড্ জল যখন কতকটা শোষাণ হয় তখন জেলি (Jelly) নামে একপ্রকার ঘন পদার্থ পাওয়া যায়; উহাদের রাসায়নিক নাম জেল্ (Gel)। একটু জিলাটিন জলে

গলাইয়া শোষাইলে কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা আমরা অবগত আছি। পাকা ফলের জেলি করিবার সময় দেখা যায় ঐ ফলের মধ্যে পেক্‌টিন নামে একটি কলয়ড পদার্থই জেলিত্বের মূল কারণ।

প্রকৃতির রাজ্যে কলয়ডের পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। ভোরের রৌদ্র যখন জানালার ফাঁকে ফাঁকে গৃহমধ্যে সরল রেখায় পতিত হয় তখন সকলেই ঐ ক্ষুদ্র রাস্তার মধ্যে অসংখ্য নৃত্যপরায়ণ বালু-কণিকা দেখিয়া আনন্দানুভব করেন। উক্ত গোপন রাজ্যের ক্ষুদ্রাবয়বগুলি কদাচিৎ ভূমিতে অবতরণ করে। এগুলি কলয়ডের একরূপ। বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেত্রজল-কণিকা অতি উর্দ্ধে কলয়ড্ রূপে অবস্থান করে বলিয়া আকাশ নীলবর্ণ। নেবুলীগুলিও কতকগুলি কলয়ড্ বস্তুরাশির সমষ্টি বলিয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। রাশি রাশি কলয়ড্ মেঘ অতি উর্দ্ধে সদা সঞ্চরণ করে, আবার কলয়ড্-কুজ্ঝটিকা প্রদোষে ও সন্ধ্যায় আমাদের ঘরের দুয়ারে হাজির হইয়া কত কথা বলিয়া যায়।

কলয়ড্-রসায়ন গৃহস্থদের নিজস্ব জিনিস। আমাদের শ্রেষ্ঠ খাদ্য দুধ একটা কলয়ড ইমালশন (Emulsion)। টক্‌সংযুক্ত হইলে দুধ হইতে কলয়ড ছানা সরিয়া দাঁড়ায়; জেল হওয়ার ইহাও একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। সাবান একটি কলয়ড—সাবান জল একটি কলয়ড ইমালশন। তৈলাক্ত পদার্থ ও সাবান জল একত্র নাড়াচাড়া করিলে ফেনা হয়, ঐ কলয়ড ফেনাই বস্ত্রাদির ময়লা কাটিবার পথ।

কলয়ড জিনিসের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে উহা অনেক জিনিস অতি সহজে ধরিয়া ফেলিতে পারে। এই অপরূপ আশ্রয় নিয়া দুনিয়ায় বহু অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংসাধিত হয়। নানাবিধ কলয়ড রং এ জন্যই কলয়ড কাপড়ে লাগিয়া উহাদিগকে রঞ্জিত করে। অঙ্গার বা হাড়-অঙ্গার একই কারণে চিনির রং কাড়িয়া নিয়া চিনিকে পরিষ্কার রূপ দিয়া থাকে। শুনিয়াছি অঙ্গারের এই নব তাৎপর্য্যের সাহায্য নিয়া যুদ্ধের সময় প্রচুর অঙ্গার গ্যাস-মোখসে (Gas mask) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলয়ডের আরও নূতন নূতন গুণ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ কতকগুলি কলয়ড ধনাত্মক ও কতকগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুতে জড়িত থাকে। ইহার ফলে প্রকৃতির রাজ্যে সময় সময় অভাবনীয় ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। কলয়ড-চামড়া স্বভাবতঃই ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত। ট্যান (Tan) করিবার সময় প্রথমতঃ উহাদিগকে জলে ভিজান হয়—এই সংযোগের ফলে ইহা জেলে (Gel) পরিণত হয়; এমতাবস্থায় উহাতে ঋণাত্মক পীবৎযুক্ত ট্যানিন (Tannin) যোগ করিলে জেল চামড়া সহজেই ট্যানিনকে ধরিয়া ফেলে—ফলে উভয়ের মিলনে সুন্দর তৈয়ারী চামড়ার (Leather) আবির্ভাব হয়। আবার শুনিতে পাই বড় বড় নদী পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে ঋণাত্মকতড়িৎযুক্ত বালুকণা জাতীয় বহু কলয়ড পদার্থ বহন করিয়া সমুদ্রের বক্ষে যখন উপস্থিত হয়, তখন উক্ত বালুকণাগুলি সমুদ্রগর্ভস্থ নানাবিধ লবণ জাতীয় পদার্থের ধনাত্মক পরমাণুর সংস্পর্শে আসিয়া প্রায়শঃ বিদ্যুৎমুক্ত হইয়া জড়বৎ তলদেশে পতিত হয়। এরূপ ক্রমাগত জড়পদার্থের সমাবেশে নদীর মোহনায় মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থলভূমির আবির্ভাব হয়। মিসিসিপি নামক বিখ্যাত নদীর মোহনায় এরূপ বিস্তীর্ণ স্থলভূমি পাওয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে নদী, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ের কলয়ড কণিকা হইতে প্রতিফলিত আলোক-রাশিই ঐ সমস্ত জলভাগে নানাবিধ বর্ণ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এজন্যই ভূমধ্যসাগরের জল নীল।

সাধারণতঃ অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমাবেশমাত্রই কলয়ড্ অবস্থা। এজন্য বালু কণিকার মেঘ, গ্যাসে জমান ছোট ছোট জলবিন্দু (কুয়াশা), তরল পদার্থের মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরল কণিকা—(ইমালশন্), কঠিন পদার্থে নিমজ্জমান বিন্দু বিন্দু কঠিন পদার্থ (কাচের মধ্যে ভাসমান স্বর্ণ বা রৌপ্য কণিকা)—এ সমস্তই কলয়ডের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্ত। মূল্যবান পাথরে যে নানাবিধ বর্ণের কারুকার্য্য দেখা যায় তাহাও ধাতু-কলয়ড-কণিকার উপস্থিতি হেতু। হিরকখণ্ডের বর্ণচ্ছটা একই বার্ত্তা বহন করে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির বুকে বর্ণচাতুর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারিকর এই কলয়ড রসায়ন। আকাশের দিকে দিকে যে সময় সময় বর্ণসৌন্দর্য্য দেখা যায় তাহার একমাত্র কারণ ঐ কলয়ড। সূর্য্যাস্তকিরণের বর্ণমাধুরী কলয়ড বালুবিন্দুর মেঘ দ্বারা পরিস্ফুট হয়। শীতপ্রধান দেশে মাঝে মাঝে আকাশের উর্দ্ধদেশে আলোপূর্ণ বর্ণচ্ছটা দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করে—কলয়ড বরফ রাশীই সম্ভবতঃ উহার মূলীভূত কারণ।

শীতপ্রধান দেশে বাষ্পীয় বরফের অত্যাচার অত্যন্ত বেশী। সময় সময় উহাদের আতিশয্যে শস্যাদি জন্মান কঠিন হইয়া উঠে। আজকাল কলয়ড রসায়নের কৃপায় শস্যাদিকে শীতের চাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য—বিশেষজ্ঞগণ নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। যখন উহারা দেখিতে পান, চূর্ণ বরফ কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক নিমজ্জমানপ্রায়, তখন উহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য রাসায়নিকগণ ভূরি ভূরি পেট্রোলিয়াম (Petroleum) পোড়াইতে থাকেন; উক্ত পেট্রোলিয়ামের গ্যাস উর্দ্ধে উঠিয়া বরফ বাষ্পকে ধরিয়া রাখে এবং এই নূতন কলয়ড্ মেঘ—শস্যাদির উপর পতিত না হইয়া বরং আবরণ হিসাবে শৈত্যাধিক্য হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।

কলয়ড্ রসায়নের বিশেষ পরিচয় ঐ কৃষিক্ষেত্রে। ভূমির অধিকাংশ স্থানই কলয়ডের সমষ্টি। আবার যে সমস্ত সার-পদার্থ ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে তাহারাও প্রায়শঃ কলয়ড্। বৃক্ষাদি লতাপাতার শরীর কলয়ডের পরিপূর্ণ উদাহরণ। ঐ সমস্ত লতাপাতা যখন পচিয়া গলিয়া মাটিতে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন ভূমির উর্ব্বরতা বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি পায়। আমরা যে উর্ব্বরতার জন্য সার পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকি, দেখা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কলয়ড জাতীয় চূর্ণ সবচেয়ে বেশী কার্য্যকরী।

কলয়ডের প্রধান আধার আমাদের এই জীবশরীর। রাশী রাশী কলয়ড্ ধারা এ শরীরে প্রবাহিত। ইহাদেরই অসামঞ্জস্যে দেহ পীড়ার উৎপত্তি। শরীরের কোথাও একটু ক্ষত হইলে তৎক্ষণাৎ তরল কলয়ড্ সেস্থানে প্রবাহিত হয় এবং স্থানীয় অভাব দূর করে। জীব-শরীরের জীবনকেন্দ্র (Protoplasm) এই কলয়ডেরই সমষ্টি। আমাদের খাদ্য পরিপাক করায় যে শ্রেষ্ঠ যন্ত্র এনজাইম (enzyme) তাহার গঠনও কলয়ডীয়। শরীরের মাংস, পেশী, গ্রন্থি সবই কলয়ডীয় রূপ বহন করে। আমাদের শরীর যখন সবই কলয়ড, তখন ইহাকে সুস্থ রাখিবার জন্য ঔষধ হিসাবে যত কলয়ড বস্তু গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল। ডাক্তারদের দৃষ্টি আজকাল ঐ দিকে প্রসারিত হইয়াছে। এজন্য অধুনা ঔষধ হিসাবে কলয়ড্ রৌপ্য, কলয়ড্ স্বর্ণ, কলয়ড্ তাম্র, কলয়ড্ ক্যালসিয়াম প্রভৃতির প্রচুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

শাস্ত্রটীর মাত্র শৈশবাবস্থা। এখনই ইহার এত শত মঙ্গলময় প্রয়োগ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং স্বতঃই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের নিকট মাথা নত হইয়া আসে।

রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা সর্ব্বদাই পাশাপাশি উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও দুইএর সামঞ্জস্যে এক অপূর্ব্ব বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। জীবন সমস্যায় এ শাস্ত্রের স্থান কত উচ্চে এখনও আমরা যথাযথ তাহার মীমাংসা পাই নাই। অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই তাহা সম্ভব হইবে।

পিয়াল-শালের বন

কুমারী শিবানী সরকার

ছায়ায় ঘেরা ঐ যে শ্যামল শালপিয়ালের বন,
দূর গহনে কেমন যেন করে উদাস মন।
সকালবেলা পূব আকাশে আলোর রেখা ফোটে,
মেঠো ফুলের সুবাস বয়ে ভোরের বাতাস ছোটে,
পিয়াল বনে মাথায় মাথায় লেখে অরুণ লেখা,
রূপকথার সোনার হরিণ যায় কি সেথা দেখা?
ওখানে ওই বনের কোলে শ্যামল তরু ছায়া,
পিয়াল বনে ফাঁকে ফাঁকে রচে কি কোন মায়া।

দুপুরবেলা গ্রামটি যখন নীরব নিঝুম থাকে,
মাটীর 'পরে রোদের রেখা আলপনাটি আঁকে,
উদাস করে থেকে থেকে ঘুঘুপাখীর সুর,
চলে যেতে ইচ্ছে করে কোথায় কত দূর।
ওইখানে কি উপকথার কঙ্কাবতী থাকে?
শুভ্র কোমল ললাট 'পরে চাঁদের তিলক আঁকে?
দুপুরবেলা গাছের তলে ছড়ায় এলো চুল,
কান্নাতে তার মাণিক ঝরে হাসলে গোলাপ ফুল!

স্বর্গপুরীর সোনার দুয়ার গোধূলি দেয় খুলি,
সবুজ ঘন পাতায় যেন বুলায় রঙের তুলি।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] ত্রি-অম্বিকা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ছাদ

'ভাস্কর'

শুনিলাম ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট হইতে এ স্থানটি কিনিয়া লইয়াছে। শীঘ্রই এখান দিয়া প্রকাণ্ড রাস্তা বাহির হইবে। এ বাড়িটাও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এখানে আসিয়াছিলাম। এই জীবনসন্ধ্যায় কত কথাই বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। সব কথা বলিবার সামর্থ্যও নাই, উৎসাহও নাই। শতবর্ষ পূর্বে যে শতাধিক নরনারী মিলিয়া পিটিয়া পিটিয়া আমাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের কেহই হয় ত ইহলোকে নাই। মনের উৎসাহ ও শরীরের বল দিয়া যাহারা আমায় সৃষ্টি করিয়াছিল, আমার বিনাশের দিনে তাহারা ত চোখের জল ফেলিবার অবকাশ পাইল না!

অনেক কথাই মনে হইতেছে। কিন্তু সব বাক্ সব ভাষা নীরব হইয়া যাইবার পূর্বে কয়েকটি কথাই শুধু বলিব। গুছাইয়া বলিবার শক্তি নাই; হয় ত একসঙ্গে যে দুইটি ঘটনার কথা বলিব তাহাদের ব্যবধান অর্ধ শতাব্দী বা আরও বেশি।

স্পষ্ট মনে পড়ে, ভীষণ নির্ঘোষের সঙ্গে যেদিন এই পূব কোণটায় বজ্রপাত হইল। একটা পাশ আমার ফাটিয়া গেল। চিকিৎসা হইল, বুকের কয়েকখানি হাড় কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল। সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু এখনও এ পাশটা মাঝে মাঝে টন্ টন্ করে, আর আকাশে বিদ্যুৎ দেখিলেই এখনও আতঙ্কে চম্‌কাইয়া উঠি।

এই বুকের উপর দিয়া কত বৃষ্টি কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তার ইয়ত্তা কে রাখে? কতবার নর্দমা বন্ধ হইয়া এক হাটু জল জমিয়া দারুণ অস্বস্তিতে দিন কাটাইয়াছি। কেহ আসিয়া জল বাহির করিয়া দিলে তবে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছি। ধূলায়, কাদায়, শেওলায় কতবার এ দেহ কলঙ্কিত হইয়াছে, আবার কতবার গৃহলক্ষ্মীদের মঙ্গলহস্তের স্পর্শে শুচি শুভ্র রূপধারণ করিয়াছি।

কলিকাতার সর্বাপেক্ষা দুর্লভ দুইটি বস্তু, রৌদ্র ও বাতাস, আমি চিরদিন নিজের বুকে বহিয়া সকলকে অকাতরে বিলাইয়াছি। তৈলসিক্ত স্নানরত শিশু আমার বুকে বসিয়া রৌদ্র পোহাইয়াছে। কত কিশোরী তরুণী তাহাদের সিক্ত কেশদাম আমারই বুকের উপরে এলাইয়া ছড়াইয়া শুকাইয়াছে। কাপড়, গামছা, সাড়ি, সেমিজ, লেপ, তোষক, বালিশ, কাঁথা, রাশি রাশি শুকাইয়া দিয়াছি। চাল, ডাল, মসলা, আমের আচার, লেবুর আচার, তেঁতুলের আচার, বড়ি, আমসত্ব ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার খাদ্যদ্রব্য শুকাইয়া শুকাইয়া ভাঁড়ারে পাঠাইয়াছি। আমার অদৃষ্টে ঘুঁটেও বাদ যায় নাই। শীতের দিনে কত দিন কত শিশু, কত যুবক, কত বৃদ্ধ আমার বুকে বসিয়া রৌদ্র পিঠে করিয়া মুড়ি খাইয়াছে, পিঠে খাইয়াছে, গল্প করিয়াছে, কাগজ পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা কে বলিবে?

গুমোট গরমে অতিষ্ঠ হইয়া কত দিন সন্ধ্যায় ও রাত্রে কত জনে আমার আশ্রয় লইয়াছে। সাধ্যমত যতটুকু পারি বায়ু সংগ্রহ করিয়া তাহাদের তপ্তদেহ শীতল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রীষ্মের দিনে কতদিন সারারাত্রি কত লোক আমারই বুকের উপর সুখে নিদ্রা গিয়াছে, বিচিত্র আকাশের শোভা, মনোরম বায়ুহিল্লোল উপভোগ করিতে করিতে কত মধুর স্বপ্ন দেখিয়াছে! দারুণ গ্রীষ্মে নীচে টিকিতে না পারিয়া কত বালকবালিকা হারিকেন-সহ আমার বুকে বসিয়া পড়াশুনা করিয়াছে, কত কর্মক্লান্তা রন্ধনগৃহনিরুদ্ধা বধূ ক্ষণেকের তরেও আমার বুকে আসিয়া অঞ্চল ছড়াইয়া শরীর জুড়াইয়া গিয়াছে। কত বালক লাটাই-হস্তে আমার বুকের উপর নাচিয়া নাচিয়া বিচিত্রবর্ণের ঘুড়ি উড়াইয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছে।

মানুষের রুচি, মানুষের প্রয়োজন, মানুষের অভ্যাসের জন্য আমাকে কি কম সহিতে হইয়াছে? নিতাই বাঁড়ুয্যে সেবার তেতালাটা ভাড়া লইয়া রান্নাঘর বাঁধিল আমারই বুকের উপর। কি করিব? দিনের পর দিন সেই কয়লার আগুন বুকখানি যেন পুড়াইয়া খাক্ করিয়া দিল। এখনও পাচড়ার দাগের মত সে কাল দাগ মিলাইয়া যায় নাই। নিতাই গেল, নিমাই আসিল। রান্নাঘর গেল, কিন্তু ওই চিলের ঘরের পাশে উঠিল ছোট বাথরুম। তাও কি তেমন পরিষ্কার রাখিত? দুর্গন্ধে আমার সারা শরীর ঘিন্ ঘিন্ করিত। কি অশুচিই নিজেকে মনে করিতাম। কাহাকেও আমার কাছে আসিতে বলিতেও সঙ্কোচ হইত। রসিক চাটুজ্যে আসিতে এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। সে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পরিষ্কার করিয়া এখানে করিল ছোট একটা ফুলের বাগান। সারি সারি টবের মধ্যে নানাপ্রকার ফুলের গাছ। বুকটা যেন ফুলের সুবাসে জুড়াইয়া গেল। সকাল সন্ধ্যা যখন ফুলের গাছে জল পড়িত, তখন তার খানিকটা আমার গায়ে পড়িয়া মৃদু শৈত্যে আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিত।

কত জনের কতপ্রকার গোপনীয় কথা আমাকে কান পাতিয়া শুনিতে হইয়াছে, অথচ ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারি নাই। সেবার রতন গাঙ্গুলীকে এ বাড়ীর একটা অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য যে গভীর ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, সে ত আমারই বুকের উপর বসিয়া। সবই শুনিলাম, সবই বুঝিলাম, কিন্তু প্রতীকার করিতে পারিলাম কই? বিপিন চক্রবর্তীর আসল উইলখানা আমারই এই দক্ষিণ কোণে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কোর্ট যদি আমাকে সাক্ষী মানিত, তবে আমি ত

দেশালাইটি শুদ্ধ সনাক্ত করিতে পারিতাম। রাইমণির বিবাহের দিন রাইমণির পরিবর্তে লক্ষ্মীমণিকে কনের পিড়িতে বসাইয়া দিবার যে নিষ্ফল পরামর্শ হইয়াছিল, সেও ত এখানে বসিয়াই। সৌদামিনী যে সেবার পাশের বাড়ীর গোবিন্দর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল, তাহার গোপন পরামর্শও ত আমার এই কোণে দাঁড়াইয়াই চলিয়াছিল। আবার সতীশ বোস তার ঋণী বন্ধুর খতখানা এখানে বসিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; রমেশ ঘোষ ওই চিলের কোঠায় বসিয়াই তার যথাসর্বস্ব হাসপাতালের নামে উইল করিয়া দিবার পরামর্শ করিয়াছিল।

কত উৎসবের ভার বহিয়াছি এই বুকের উপর। মেয়ে দেখা, ছেলে দেখা, গাত্রহরিদ্রা, বিবাহ, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কত উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে এইখানে। কত লোকসমাগম, কত বাক্যালাপ, কত তর্কবিতর্ক, কত পূজা, কত অনুষ্ঠান, কত নৈবেদ্য, কত ভোজ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তার তালিকা করিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানা বই হইয়া পড়িবে। কখনও মুক্ত আকাশের নীচে, কখনও বিচিত্র চন্দ্রাতপের নীচে, কখনও প্রকাণ্ড ম্যারাপের নীচে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে কলহাস্যময় নরনারীর সমাগমে, তৃপ্ত নিমন্ত্রিতদিগের চপ্ চপ্ সপ্ সপ্ শব্দে, পরিবেশক ও তত্ত্বাবধায়কদের হুঙ্কারে, বিমিশ্রিত পাদুকারাশির নিজ নিজ প্রভুপদলাভের উৎকণ্ঠায়—আর গৃহস্বামীর সবিনয় আদর-আপ্যায়নে। সে অনেক দিনের কথা। গজানন সিংহকে এক পংক্তিতে বসানো লইয়া কি বিশ্রী ব্যাপারটা হইয়া গেল আমারই সম্মুখে। তার অপরাধ, তার পিসিমার দেওরের মেজছেলে ছোট ঘরে বিবাহ করিয়াছিল। সবাই পংক্তি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বেচারা গজানন হেঁটমুখে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

কত তরুণ-তরুণীর শুভদৃষ্টি দেখিয়া মুচ্‌কি হাসিয়াছি, কত নববধূর সাতপাকের সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা দুরু দুরু করিয়া উঠিয়াছে, কত বাসি-বিবাহের কলাগাছের পাশে নবদম্পতির স্নান দেখিয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইয়াছি। কত শিশুর দন্তবিহীন মুখে মধুর পরমান্ন তুলিয়া দিয়াছি, কত কিশোরের পবিত্র বক্ষে উপবীত পরাইয়াছি, নিজে সম্মুখে থাকিয়া কত আদর করিয়া। আমারই পাশে বসিয়া কত কিশোরী, কত যুবতী চুল বাঁধিয়াছে, টিপ পরিয়াছে, সিন্দুর পরিয়াছে, আলতা পরিয়াছে, অন্যকে পরাইয়াছে, হাসিয়াছে, হাসাইয়াছে, রসিকতা করিয়াছে। চিম্‌টি কাটিয়াছে, গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াছি আর হাসিয়াছি। প্রায় ষাট বছর আগের কথা। নবপরিণীতা অষ্টম বর্ষীয়া মালতী যখন বরের ঘর হইতে পলাইয়া আমারই বুকের পাশে আসিয়া লুকাইল, বাড়ীশুদ্ধ লোকের সে কি উৎকণ্ঠা! আমি হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাই না। কতবার কত নবদম্পতি নীরবে নিঃশব্দে রাত্রে এখানে উঠিয়া আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া শুইয়া, গল্প করিয়া, গান গাহিয়া, কত সুমধুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করিয়া কাটাইয়াছে, তাহার সংখ্যা গণিয়াও বোধ হয় শেষ করিতে পারিব না। সে সব মনে করিলে মনে হয় এই নির্বাক নিস্তব্ধ নিশ্চল পাষাণের বুকেও বসন্ত আসিয়াছিল, মলয় বহিয়াছিল, চাঁদ উঠিয়াছিল, ফুল ফুটিয়াছিল।

দুঃখই কি কম পাইয়াছি? কত চোখের জল, কত দীর্ঘশ্বাস, কত মর্মবেদনা, কত অন্তরজ্বালা জমাট হইয়া আছে এই বুকের মধ্যে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগের কথা—অথচ মনে হইতেছে যেন এই মাত্র সেদিন—বিধবা সুরমার একমাত্র সন্তান, তিন বৎসরের ফুটফুটে একটি ছেলে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ভাসা ভাসা চোখ, এইখান হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইল। সুরমার সে কি মর্মভেদী আর্তনাদ! সকলে ধরিয়া না রাখিলে সেও হয় ত তার সন্তানের অনুগমন করিত। তার পরেই ত এই আড়াই হাত উঁচু প্যারাপেট নির্মিত হইল। বছর ষাট পঁয়ষট্টি হইবে, যোগেশের নতুন নাত-বৌ শাশুড়ীর আর ভাসুরের অসহনীয় অত্যাচার সহিতে না পারিয়া এই চিলের কোঠাতেই ত গলায় দড়ি দিয়াছিল—সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য! এই ত সেদিনের কথা—বছর কুড়িও বোধ হয় হয় নাই—সতীশের মেজ মেয়েটি সাড়ীতে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া আমারই চোখের সম্মুখে পুড়িয়া মরিল, কিছুই ত করিতে পারিলাম না! এমন সাংঘাতিক দুর্ঘটনা, একটি নয়, দুইটি নয়, বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই শতাব্দীব্যাপী জীবনে, দেখিয়া শুনিয়া দেহমন পাষাণ হইয়া গিয়াছে।

এছাড়া ছোট খাটো দুর্ঘটনাও কি কম ঘটিয়াছে আমার এই বুকের উপর! বর্ষাকালে একবার আমার এই শেওলাঢাকা কোণ্‌টায় পা পিছলাইয়া শ্যাম চক্রবর্তী তিন মাস বিছানায় শুইয়াছিল। কাণামাছি খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়া রতন মিত্রের দশ বছরের ছেলেটির বাঁহাতখানা ভাঙ্গিয়া গেল, আর ভাল করিয়া জোড়া লাগিল না। বক্সিং করিতে করিতে এইখানে পড়িয়াই হাবুর ঘুসিতে কাৎ হইয়া সাবুর বুকের একখানা হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। হারিকেনের আলোয় তাস খেলিতে খেলিতে রামদাস চটিয়া গিয়া কৃষ্ণদাসের গালে যে চড় মারিয়াছিল, তাহা লইয়া ব্যাপারটি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াইয়াছিল। রঘুনাথ আর যদুনাথ দাবা খেলিতে খেলিতে রাত্রি শেষ করিয়া যখন নীচে নামিয়া গেল, তখন যদুনাথের বগলে থারমোমিটার দিয়া দেখা গেল জ্বর একশ চার ডিগ্রি। এক বৎসরের মধ্যে আর তাহাদের সাক্ষাৎ পাই নাই। পনের টাকা কম পড়ায় নরহরি চাটুয্যে ছাদনাতলা হইতে তার ছেলেটিকে তুলিয়া লইয়া গেল, সে তো আমারই চোখের সামনে। পাড়ার নবীন ছোক্‌রাটি ছিল, তাই সেবার মেয়ের বাপের মানরক্ষা হয়। পাড়ার লোকের সঙ্গে ঘুড়ি কাটাকাটি নিয়ে কি কম ঝগড়া শুনেছি এই কানে! কাপড়-চাপা-দেওয়া ইটের টুকরাগুলি পড়িয়া গিয়া কত পথিককে বিব্রত করিয়াছে, তাহা গণিয়াও শেষ করিতে পারিব না। রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া কাপড় জামা উড়িয়া যাওয়ায় মায়ে-ঝিয়ে, শাশুড়ী-বৌয়ে, মনিবে-চাকরে কত কলহ বসিয়া বসিয়া শুনিয়াছি।

কত আর বলিব! দীর্ঘ শতাব্দীর কত কথা, কত ব্যথা জমিয়া উঠিতেছে এই বুকে। নানা চিন্তা, নানা ভাব এমন করিয়াই জট পাকাইয়াছে যে চোখ শুকাইয়া গিয়াছে, মুখও নীরব হইয়া আসিতেছে।

ওই বুঝি নীচে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ! এই বাড়ীর শবব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। টুকরা টুকরা করিয়া এর প্রতিটি অংশ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইয়া যাইবে, একটি বালুকণাও ফেলা যাইবে না। আর কয়েকঘণ্টা বা আর কয়েকদিন পরেই এই শতাব্দীদর্শী বুকখানা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো সব এ জন্মের মত নিভিয়া যাইবে। তা যাক্‌। আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। সকল বৃষ্টি, সকল ঝঞ্ঝা, সকল রৌদ্রের তাপ হইতে আমার আশ্রিতদিগকে প্রাণপণে বাঁচাইয়াছি। ইহা অপেক্ষা বড় সার্থকতা আমি কল্পনা করিতে পারি না। অসংখ্য নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা, সারাদিন নানা ক্লেশ, নানা দুঃখ, নানা ক্লান্তি ভোগ করিয়া আমারই নীচে নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে আশ্রয় পাইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মহত্তর আদর্শ আমার বুদ্ধির অতীত। বিপদে বা সম্পদে, মৃদু চন্দ্রালোকে বা প্রখর সৌরতেজে, মধুর মলয়হিল্লোল বা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায়, সুখের পরম শান্তিতে বা মর্মবেদনার দুঃসহ গ্লানিতে, কখনও কোন অবস্থায়ই আমার দৃষ্টি নীচু করি নাই, ইহাই আমার শেষ মুহূর্তের পরম সান্ত্বনা।

ডাঙ্গার টান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শহরে বসে না মন, ডাঙ্গা পানে ধায়,
আকন্দ মারিছে উঁকি পাষাণের গায়।
চেনা তৃণ ফুলগুলি
চাহিতেছে মুখ তুলি,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তবু আমি ভালবাসি তায়।

২

সেখানে আছে যে ছোট শিশিরেরও দর,
ফুলের মহল বোঝে দুলের কদর।
রবি তারে ভালবাসে
কাছে তার আগে আসে
স্বচ্ছ বুকেতে ভাসে আলোর আদর।

৩

বরষা সেখানে আসি আঁকে আলিপন
ধরে শোভা অপরূপ ভূতল গগন।
চারিদিকে কচি ধান,
স্থলে জলে সে কি গান!
অজানা ফুলের বাস আনে সমীরণ।

৪

উঠে চাঁদ, করে তারে উৎসবময়,
সুধাকর সে যে তার দেয় পরিচয়।
মানুষে চকোর করে
লয় ক্ষুধা তৃষা হরে,
বঞ্চিত সেই জন দূরে সরে রয়।

৫

বটগাছ ভরা রাঙ্গা বর্ত্তুল ফল—
শাখে শাখে বিহগের কল-কোলাহল।
ভুলায় আমার মন
দান করে কি যে ধন—
কুবেরও তা পেলে ভাবে জীবন সফল।

৬

সেথা নিতি নব কচি হৃদয়ের ভিড়
আঁখির পাতায় মোর জমায় শিশির।
কত হাসি কত গান
হায় সেথা লয়ে মান
অবসান করে ঘন মনের তিমির।

৭

আমি পাই সে ডাঙ্গার নীরবতা মাঝ
কার অভয়ের বাণী, বাঁশীর আওয়াজ!
কোলাহলে পাই সেথা
যক্ষের স্নিগ্ধতা,
নির্জ্জনতার মাঝে সুধীর সমাজ।

৮

সে ডাঙ্গা আমার পানে ফিরে ফিরে চায়
ধূ ধূ বেলা ডাকে যেন কুম্ভমেলায়।
যে সুধা হৃদয়ে পাই
পারি না নিঙাড়ি ভাই
আধা তার দিতে আমি মোর কবিতায়।

পল্লীগীতিতে ধর্ম্মভাব

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

(প্রবন্ধ)

আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা যে সব আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইত, তাহার সন্ধান আমরা রাখিতাম —তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আনন্দ উপভোগ করিতাম। তাহাদের সুখদুঃখকে আমাদের নিজেদের সুখদুঃখ বলিয়া গণ্য করিতাম—শুধু বাতাসের প্রীতিকে তখন আমরা বড় করিয়া ধরি নাই। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারেও সকলের সঙ্গেই ছিল আমাদের সহজ একাত্মবোধ। সাম্প্রদায়িকতার কালকূট বিষ তখন অন্তরে প্রবেশ করে নাই। গ্রামের কানাই মণ্ডল ও রহিম শেখ একযোগে দল বাঁধিয়া "পুরান গান" করিত। গনি শেখের "মনসার রয়ানি" গান শুনিতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিত। দশ-এগার রাত্রিও গান গাহিয়া ফুরাইত না, অন্য পক্ষে পীরের গানেও গ্রামের বলাই পরামাণিক যোগ দিত। গাজীর গীত আমরা মনোযোগ সহকারে শুনিতাম। গ্রামের গাছতলায় প্রতি বৎসর কবির গান ও তরজায় যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইত, তাহা শুনিবার জন্য কোন শ্রেণীর লোকের অভাব হইত না। আমরা ঘরে ঘরে ভক্তিভরে সত্যনারায়ণের সির্ন্নি পূজা করিতাম—পাশের গ্রামের আব্দুল শেখও সত্যনারায়ণের সির্ন্নি করিত। প্রতি বৎসর পীরের যে মেলা বসিত, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান লোক-সমাগমও প্রচুর পরিমাণে হইত—কোন ভেদ মনে না করিয়া সকলেই "পীরের দরগায়" মানত করিয়া আসিত এবং মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইলে অভিপ্রেত সামগ্রী প্রদান করিত। সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়া আমরা অনেক কিছুই হারাইয়া ফেলিয়াছি—বিশ্বাস হারাইয়া মায়া মরীচিকার মোহে দিন দিন ফিরিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছি। এখন শুধু সে সব কথা স্বপ্নের মত মনে হয়···তাহাকে প্রকৃত বলিয়া গণ্য করিতে পারিলে ধন্য হইতে পারি সন্দেহ নাই।

কোন অনিবার্য্য কারণে আমরা উভয় সম্প্রদায়ই বহুদিন হইতে এক স্থানে প্রীতির সূত্রে বসবাস করিয়া আসিতেছি। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে কেহ আঘাত করিতে পারে নাই, আমরাও করিতে চেষ্টা করি নাই—এমন কি, অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করিবার প্রচেষ্টা কখনও দেখা দেয় নাই। বিভিন্ন মত থাকিলেও "যত মত তত পথ" এই ধারণাই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

পল্লীগীতিকার মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নানারূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া সম্প্রীতির যে যোগসূত্র মুঘল আমলের সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সংগ্রথিত হইয়াছিল, তাহাকে ভিত্তি করিয়া বহু কবি হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির স্রোতধারা গীতিকায় প্রবাহিত করাইয়া দিয়াছেন। যদিও আকবরের পূর্ব্বে যুগপ্রবর্ত্তক চৈতন্যদেব আবেগপূর্ণ ভাষায় সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন, তথাপি আকবরের রাজত্বের সুশাসনের প্রভাবে সম্প্রীতির ভাব যে আরও বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের প্রীতিভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল মানসিংহের বাঙ্গালা শাসন কালে। রাজা মানসিংহের এবং মুঘলের উল্লেখ পাই আমরা কৃষ্ণহরিদাসের সত্যপীরের মহিমা বর্ণনায়। কবি কৃষ্ণহরিদাস সত্যপীরের পাঁচালী কীর্ত্তনের অন্তরে মাঝে মাঝে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তাহের মহাম্মদের গুরু সমস নন্দন,
তাহার সেবক হয় কৃষ্ণহরি গায়ন।
হরনারায়ণদাসে লেখে রচে কৃষ্ণহরি,
মোছলমানে বলে আল্লা ভক্তে বলে হরি॥
বামদেব দাস পিতা, পঞ্চমী নামেতে মাতা,
কৃষ্ণহরি তনয় তাহার,
লিখি পদ অনুপম, আমার গুরুর নাম
তাহের মহাম্মদ সরকার॥
আছিল নিবাস যথা, শুন কহি তার কথা,
জন্মভূমি সাথারিয়া গ্রাম,
সেই গ্রাম ছেড়ে আসি, নিবাস যে করিয়াছি,
মইপুর সে গ্রামের নাম॥

কবি কৃষ্ণহরিদাসের "সত্যপীরের কালাম" হিন্দু-মুসলমান সকলেই ভক্তিসহকারে শুনিয়া থাকে। "সত্যপীরের পাঁচালীতে" হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম্মের সমন্বয় করা হইয়াছে। সত্যপীর নিজের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

সত্যপীর বলে···শুন নিজ কথা।
যবনের পীর আমি হিন্দুর দেবতা ॥
আমাকে চিন না আমি পরিচয় নেই,
সত্যনারায়ণ আমি সত্যপীর হই ॥

নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সত্যপীর নিজের মহিমা প্রকাশ করিতে থাকেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রাহ্মণের ছেলের বেশে এক ব্রাহ্মণ-দম্পতির বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহাদের পুত্র নাই—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পীরকে খুব আদরের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। সত্যপীর হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্রাদি না পড়িয়া কুর্‌আন্ পড়িতে থাকেন, তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে নিষেধ করিলেন। সত্যপীর তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে সব ধর্ম্মই এক। বিষ্ণু আর বিসমোল্লায় কোন ভেদ নাই। যত মত তত পথ। নদী যেমন বিভিন্ন দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া চলিলেও তাহার গতি সমুদ্রের দিকে, সেরূপ নানা ধর্ম্মের মধ্য দিয়া আমরা অনন্তের দিকে ছুটিয়া থাকি—

ঈষৎ হাসিয়া বলে সত্যনারায়ণ।
নাম লিতে জাত নষ্ট বলে কোনজন ॥
এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই।
সকলের কর্ত্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই ॥
সেই নিরঞ্জনের নাম বিসমোল্লা কয়।
বিষ্ণু আর বিসমোল্লা কিছু ভিন্ন নয় ॥
কোন কোন নদী বয়ে কোন দিকে যায়।
সমুদ্রে যাইয়া সব একত্র মিশায় ॥
পৈতা ধরিয়া পীর জোড় কৈল হাত।
বেদবাণী উচ্চারিয়া কৈল আশীর্ব্বাদ ॥

সত্যপীর নাম গ্রহণ করিলেও তাহার আসল জন্ম হিন্দুর ঘরে। মালঞ্চাধিপতির কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। সন্ধ্যাবতীর গর্ভে গন্ধরূপে সত্যপীরের স্থিতি হইয়াছিল। কুমারী অবস্থায় গর্ভসঞ্চারের কথা শুনিয়া মালঞ্চাধিপতি তাহাকে বনবাসের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। বেগবতী নদীর কূলে গিয়া সন্ধ্যাবতী তাহার তিন সখীসহ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে থাকেন—সেখানে ঈশ্বর তাহাদের জন্য পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাবতীর গর্ভ হইতে রক্তের দলা বাহির হইল, তাহাকে বেগবতীর তীরে ফেলিয়া দিয়া সকলে চলিয়া যান। সত্যপীর যখন দেহধারী হইয়া তাহার মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তখন তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন।

ঈশ্বরের কিবা লীলা, হৈলা রক্তের দলা,
ফেলাইনু বেগবতীর কাছে।
তুমি দেহধারী হইয়া, আমাকে করিলে দয়া,
পুনর্ব্বার আইলে মোর কাছে ॥
মনের দ্বারেতে দিব নয়নের খিল,
কোন্ পথে পালায়ে বাছা যাবে সত্যপীর ॥

সত্যপীর মালঞ্চাধিপতির বাড়ী যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জননী সন্ধ্যাবতী তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। সত্যপীর মহাবিপদে পড়িলেন, জননী তাহাকে যদি ছাড়িয়া না দেন, তাহা হইলে যে তাহার মহিমা প্রকাশিত হয় না। সন্ধ্যাবতীকে কপট নিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া সত্যপীর মালঞ্চদেশের অভিমুখে গমন করিলেন। মালঞ্চনগরে যাইবার সময় সত্যপীর যে বেশ ধারণ করিলেন, কবি তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাম লক্ষ্মণের নিল হাতের ধনুর্ব্বাণ,
নিতাই অবতারে দণ্ড করিল নির্ম্মাণ,
বলরাম অবতারে লইল মুষল,
দ্বাদশ অবতারের লইল সকল।

সত্যপীর যখন যাত্রা করিতেছিলেন, তখন শুয়া পাখি করুণ ক্রন্দনে সন্ধ্যাবতীকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল যে, তাহার প্রাণের পুত্রধন বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

উঠ মা ও সন্ধ্যাবতী তেজ্য কর নিন্দ,
উদাস হৈল অলি বুকে দিয়া সিন্দ ॥

* * *

সন্ধ্যার রোদনে গর্ভিণীর গর্ভ ছাড়ে,
নবীন বৃক্ষের পত্র সেহ ঝরে পড়ে ॥

জননীকে কাঁদাইয়া সত্যপীর মালঞ্চাভিমুখে গমন করিলেন। দরিয়া পার হইতে গিয়া জলের স্ত্রী-কুম্ভীর তাহাকে গিলিয়া

ফেলিয়াছিল। সত্যপীর সুবর্ণকঙ্কন দ্বারা স্ত্রী-কুম্ভীরের উদর চিরিয়া ফেলিলেন। কুম্ভীর বিদ্যাধরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গপথে চলিয়া গেল।

সর্গের বিদ্যাধরী আমি ইন্দ্রের নাচনী। * *
একদিন নৃত্য করি ইন্দ্রের সভাতে,
কর্ম্মদোষে তাল্ ভঙ্গ হৈল অকস্মাতে॥
রথে চড়ি সুরকন্যা গেল সর্গপুরে—
সত্যপীর চলে যায় মালঞ্চ নগরে॥

পথে ভীমা চোর ভদ্রকালীকে পূজা করিতেছিল। সত্যপীর তাহাকে আপনার শিষ্য করিয়া লইলেন এবং সত্যের মহিমাগুণে তাহার মনের কালিমা দূর করিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করিয়া সত্যপীর মালঞ্চাধিপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। সত্যপীর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ফুলবনে আছে এক রাজার কুমারী,
চারি মাস বাসিন্দা ছিলাম তার পুরী॥
তার এক পুত্র আছে নাহি তার পিতা,
নাম সত্যনারায়ণ মোর হয় পিতা॥
তার মাতা সন্ধ্যাবতী আমার মাগুাই,
বসিয়া মায়ের কোলে থাকি দুই ভাই॥
আমি সত্য করিয়াছি সন্ধ্যাবতীর ঠাঁই,
বাঁচি প্রাণে আসিব মা মৈলে দেখা নাই॥

রাজা সন্ধ্যাবতীর কথা শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন এবং সন্ন্যাসী সত্যপীরকে তাহার প্রকৃত পরিচয় দিতে বলিলেন।

সন্ন্যাসী বলে রাজা শুন সমাচার,
আকারে কহিব নাম পার বুঝিবার॥
আমার পিতার নাম নিরাকার বটে,
মথে বুঝিতে যত পণ্ডিতের চান্দি ফাটে॥
মাতামহ মৈদানব বারিন্দা ব্রাহ্মণ,
পূর্ব্বপর নিবাসী তার মালঞ্চা ভুবন॥

বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ মৈদানব রাজা সত্যপীরের মাতামহ। মালঞ্চ নগরে তিনি সর্ব্বসময়ে বাস করিতেন। রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত বগুড়া জেলায় এই মৈদানব রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী শোনা যায়। বগুড়া জেলা খনন করিয়া অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

ক্রমে সত্যপীর মালঞ্চাধিপতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মালাবতী, রূপবতী নামে তাহার দুই মামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইল। সত্যপীরের এত অল্প বয়সে ফকির-বেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহারা সন্ধ্যাবতীর মুখের মত সত্যপীরের মুখ দেখিতে পাইলেন। সন্ধ্যাবতীর পুত্র বলিয়া তাহাদের সন্দেহ জন্মিল।

রূপবতী বলে দিদি মোর কথা শুন,
সন্ধ্যাবতীর মুখের মত ফকিরের বদন॥
মালাবতী বলে দিদি কি কথা কহিলে,
নিভান আগুনি মোর জ্বালাইয়া দিলে॥

সত্যপীর ফকির-বেশ ধারণ করিলেন। তাহার পায়ে সোনার খড়ম, অঙ্গ ঝলমল করিতেছে। তিনি কখনও বিসমিল্লা বলেন, কখনও রাম বলেন—কেহ তাঁহাকে প্রণাম করে, কেহ তাঁহাকে সালাম জানায়। মালঞ্চাধিপতি এই ফকিরকে ধরিবার জন্য খোজাকে আদেশ প্রদান করিলেন। খোজা উর্দ্দু ভাষায় ফকিরকে উঠিয়া যাইতে বলিল।

ও ফকির মিঞা ভিক্ষা লেকে ওঠ্কে খাড়া হো।
ও দরবেশ মিঞা ভিক্ষা লেকে ওঠ্কে খাড়া হো॥

মালঞ্চাধিপতির আদেশে ফকির সত্যপীরের হস্তপদ বন্ধন করা হইল। সত্যপীর বন্ধন জ্বালায় কান্দিতে লাগিলেন—কল্য প্রভাতে তাহাকে বলিদান দেওয়া হইবে। আল্লার নাম করিয়া সত্যপীর ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে আল্লার কৃপাবলে সত্যপীর বন্ধন মুক্ত হইলেন।

সত্যপীরের বন্দী ছুটা শুনে যেবা জন।
কভু না পড়িবে সেই বিপাকে বন্ধন॥

সে স্থান হইতে সত্যপীর রাখালের বেশে গমন করিলেন—পথে রাখালের দলে মিশিয়া গেলেন। এক ব্রাহ্মণ তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণঘরে সত্যপীরের ঘটনা বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

সত্যপীর স্বর্গপথে গমন করিয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্রকে মালঞ্চা ভুবন ভাসাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। মালঞ্চা ভুবন জলে ডুবিয়া গেল—

মালঞ্চা ভরিয়া গেল চৌদ্দতাল জল,
লোকজন যত ছিল সব হল তল ॥
আকাশের গুমুকা যত পাতালেতে যায়,
পাতালের গুমুকা উঠি স্বর্গেতে মিশায় ॥
মালঞ্চানগর সব হৈল নৈরাকার,
হস্তী ঘোড়া লোক মৈল হাজার হাজার ॥

রূপবতী, মালাবতী দুই মামীও ভাসিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সত্যপীর চিন্তিত হইলেন এবং হস্ত ধরিয়া তাঁহাদিগকে উপরে উঠাইলেন। এদিকে মৈদানব রাজা জলে ভাসিয়া চলিলেন। সত্যপীর তখন দুই মামীকে রাজার অপরাধ বিবৃত করিলেন। শ্বশুরকে জলে ভাসিতে দেখিয়া কন্যাদ্বয় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাহারা যে স্বামীহারা হইয়াছেন ; শ্বশুর দোষ করিয়াছেন সেজন্য তাহাদের এত দুর্গতি কেন ? সত্যপীরের পা ধরিয়া দুইজনে কান্দিতে লাগিলেন। সত্যপীর বলিলেন যে, তাহারা কেহই প্রাণে মরিবে না। যত দিন সত্যের মহিমা জাহির না হইবে, তত দিন তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে। মালাবতী, রূপবতী, সখীগণ সঙ্গে লইয়া সত্যের সিন্নী করিতে লাগিলেন। সত্যপীর সিন্নীর উপকরণ জোগাইয়া দিলেন। দুই কন্যা সিন্নী গ্রহণ করিয়া ক্ষুধা দূর করিলেন। তখন দুই কন্যা সত্যপীরের নিকট মানত করিলেন, যাহাতে তাহাদের শ্বশুরকুলের সব বাঁচিয়া ওঠে। মৈদানব রাজা সত্যপীরের স্তুতি আরম্ভ করিলেন, পীর তাহাকে উঠিবার জন্য কলসী ফেলিয়া দিলেন ; কিন্তু রাজার শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। সত্যপীর নাবিকের বেশ ধরিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি যদি সত্যের সিন্নী দিতে রাজী হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে পার করিয়া দিবেন। রাজা নাবিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি সত্যপীরের কে হন! নাবিক বলিলেন যে তিনিই সত্যপীর !

আমাকে চিন না আমি সত্যপীর হই।
কোপ দৃষ্টে চাহিলে দালান করি ছাই ॥
শুকনায় ডুবাতে পারি সাধুজনার ভরা।
হুঙ্কারে জিয়াইতে পারি ছয়মাসের মরা ॥
হিন্দুর দেবতা আমি মুছলমানের পীর।
দুই কুলে লই সেবা করিয়া জাহির ॥

রাজা সত্যপীরকে মিনতি জানাইলেন এবং তাহার সিন্নী করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন সত্যপীর তাহাকে উদ্ধার করিলেন। রাজা নানা উপচারে সত্যের সিন্নী করিলেন। পীর তখন নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজাকে দর্শন দিলেন। সত্যপীর অনন্ত বেশ পরিগ্রহ করিলেন।

অনন্ত বেশ ধরিলেন সত্যনারায়ণ।
মূর্ত্তিময় নিরক্ষর দেখিল নিরঞ্জন ॥
দক্ষিণ দুই করে নিল গদাচক্র ধর।
বাম দুই করে শোভা শঙ্কর মগচ় ॥
বামেতে টলেনি চুড়া শুলকান ওলাটে।
আসন করিয়া বৈসে গরুড়ের পৃষ্ঠে ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হৈল সত্যনারায়ণ।
দেখিয়া মৈদানব রাজা হরষিত মন ॥

রাজা সেই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং "নমঃ নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন। সত্যনারায়ণের স্তব স্তুতি করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হইলেন। সত্যপীর সেস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া ইন্দ্ররাজের নিকট "বাওভরে" উপস্থিত হইলেন। মালঞ্চ নগর সাগরে পরিণত হইয়াছে, তাহা শুকাইয়া দিতে হইবে। ইন্দ্র হস্তের দ্বারা জল শুষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। মালঞ্চার জীবজন্তুরা পাথর হইয়াছিল, তাহাদিগকে সত্যপীর বাঁচাইয়া তুলিলেন। "কামিলা"গণকে ডাক দিয়া ময়দানব পুরী পুনরায় নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। মৈদানব রাজার পুত্র হরিহরকে জলের কুম্ভরী খাইয়া ফেলিয়াছিল—তাহার নিকট হইতে লইয়া হরিহরের প্রাণ দান করিলেন। তার পর সত্যপীর হরিহরকে সঙ্গে লইয়া কুলবনে সন্ধ্যাবতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইতে পথে নির্ম্মল রাজার সহিত তাহাদের যুদ্ধ হইল—নির্ম্মল রাজাকে পরাস্ত করিয়া সত্যপীর নিজের মহিমা প্রকাশ করিলেন। সত্যপীর তখন রাজকন্যা লীলাবতীর সহিত হরিহরের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বিবাহের নাম শুনিয়া হরিহর পলাইতে উদ্যত হইলেন। সত্যপীর তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। হরিহর বলিলেন যে, তাহার বিবাহ দিবার জন্য পিতামাতা আছে, সত্যপীর নিজেই লীলাবতীকে বিবাহ করুন। সত্যপীর বলিলেন যে, জগতের সকল নারী তাহার মায়ের সমান ; সুতরাং তাহার নিকট এ প্রস্তাব করিতে পারে না।

সত্যপীর বলে মামা মুখে মাটি খাও।
কোন্ ছার কালা মুখে হেন কথা কও॥
সংসারের নারী যত আছে স্থানে স্থান।
সকলেরে জানি আমি মায়ের সমান॥

হরিহর বিশেষ লজ্জিত হইয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন। লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া হরিহর প্রস্থানোদ্যত হইলেন। লীলাবতী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার সময় মাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন।

লীলাবতী বলে মাও করি নিবেদন।
মিছা কাজে তুমি কেন করিছ ক্রন্দন॥
বিল সুখাইলে মৈচ্ছের নাহি কোন দায়।
যেহি জেলে দেয় কড়ি সেই লয়ে যায়॥
ব্রহ্মা ত করিছে সৃষ্টি বিধির লিখন।
পর পুত্র পর কন্যা একত্রে মিলন॥

পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গমন কালে কন্যার মন কিরূপ ভাবে ভরিয়া যায়, কবি অতি নিপুণভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। হরিহর তখন লীলাবতীকে দোলার উপর উঠাইয়া সন্ধ্যাবতীকে আনিতে গমন করিলেন। সত্যপীর হরিহরের আগমন বার্ত্তা জননী সন্ধ্যাবতীর নিকট নিবেদন করিলেন এবং তাহাকে জানাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা হরিহর তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যাবতী এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না, বিশেষত হরিহর তাঁহার ভ্রাতা নহে। সত্যপীর তখন হরিহরের বিবরণ মায়ের নিকট নিবেদন করিলেন। হরিহরের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্ধ্যাবতী হরিহরকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন। সন্ধ্যাবতীকে সঙ্গে লইয়া হরিহর মালঞ্চ অভিমুখে গমন করিলেন। সত্যপীর মায়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি দুনিয়া দেখিয়া আসিবেন। মালাবতী, রূপবতী, লীলাবতী সত্যপীরের নিকট মিনতি জানাইলেন যে, তাহাকে না দেখিলে তাহার মা সন্ধ্যাবতী বাঁচিবেন না। তাহারা সত্যনারায়ণকে দুধকলা দিয়া ভোজন করাইলেন। সত্যপীর অন্তর্হিত হইলেন এবং অমরপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে মালঞ্চ ভুবনের পালা সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যাবতী, মালাবতী, রূপবতী, লীলাবতী নাম কবির খুবই প্রিয়—এমন কি বেগবতী নদীও কবির 'বতী'-প্রিয়তার নিদর্শন স্বরূপ। কবি যে রকমে সত্যপীরের পদে মিনতি জানাইতেছেন, তাহা সত্যই সরলতার পরিচায়ক।

পঞ্চম রসের গান শুনিতে মধুর।
কৃষ্ণহরিদাসে ভণে ধাম মইপুর॥
আইস মোর দয়ার হাদী তোমাকে কুরনীস।
আমাকে বলিয়া দেও পথের উদ্দিশ॥
আমি অতি মূঢ়মতি নাহি কিছু জ্ঞান।
আমাকে কহিয়া দেহ কালামের সন্ধান॥
তোমার কপট হৈতে কত বুদ্ধি ঘটে।
বিদ্যার গরব নাহি তোমার নিকটে॥
শিরে বসি সত্যপীর কর রঙ্গ কেলি।
কুহকে নাচাও মোর কণ্ঠের পুতলী॥

তারপর "গলায় রুদ্রাক্ষের মালা" ধারণ করিয়া "গেরুয়া বসন" পরিধান করিয়া সত্যপীর শিশুপাল রাজার পুরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শিশুপাল রাজা অর্দ্ধকালীর নিকট দুই শিশুকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—সত্যপীর সেই শিশুদ্বয়কে মুক্ত করিলেন। রাজার নিকট নিজের মহিমা প্রকাশ করিলেন—পঞ্চ রাণীকে পুত্রপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রাণীর ফলদান ব্রত আরম্ভ করিলেন। পথের মাঝে সত্যপীরের সহিত তাহাদের সাক্ষাত হয়—সত্যপীর তাহাদের নিকট কলা ভিক্ষা চাহিলেন। চারিজন রাণী কলার "চোপা" দেখাইয়া ফকিরকে ঠাট্টা করিল—ফকির তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন—তাহাদের পুত্র হইবে না। ছোটরাণী ফকিরকে কলা দিয়া নিজে "খোছা" খাইলেন। তাহা খাইয়া ছোটরাণীর সন্তান হইল—অন্য রাণীরা চক্রান্ত করিয়া চামড়ার পুতুলি রাখিয়া ছেলেটীকে "দরিয়ায়" ভাসাইয়া দিল। বসুমতী তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং দুগ্ধ দানে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। বসুমতী পুত্রের নাম রাখিলেন সত্যবান।

এদিকে ছোটরাণীর দুর্গতির সীমা নাই। অন্য চার রাণী তাহাকে ঝাড়ুদারণী করিয়া রাখিল। মনোদুঃখে ছোট রাণী লীলা নদীর জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন সত্যপীর পুত্র সত্যবানকে কোলে করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সত্যপীরের পরিচয় পাইয়া রাণী তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন এবং সত্যপীরের আদেশ অনুসারে নিজ মহলে ফিরিয়া গেলেন। তখন সত্যপীর

রাজাকে স্বপ্নে জানাইলেন যে তাহার পুত্র কোলে করিয়া ছোটরাণী ঢেঁকিশালে শুইয়া আছেন। রাজা পুত্রলাভ করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

তবে রাজা শিশুপাল ডাকিয়া পণ্ডিত।
নাম কল্প করে ছাইলার হয় আনন্দিত ॥
শাস্ত্র গণি নাম রাখে করিয়া ধেয়ান।
কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম কৃত সত্যবান ॥

সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সত্যপীর হিরা মুচীর বাড়ীতে ফকিরের বেশে উপস্থিত হইলেন। হিরা মুচী ফকিরকে দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইল, তাঁহার জন্য বাজারে জিনিষ আনিতে চলিয়া গেল। পথে সেপাইবেশী সত্যপীর তাহাকে ছলনা করিলেন। হিরা মুচী গমির মুঘলের বাড়ী "চার আনা কৌড়ি" কর্জ্জ করিয়া আনিতে গেল—সেস্থান হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্ত্রীর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পুনরায় গমীর মুঘলের বাড়ী গমন করিল। আপনার স্ত্রীকে গমীর মুঘলের বাড়ী রাখিয়া কড়ি লইয়া হিরা মুচী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। এদিকে সত্যপীর তাহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। হিরা মুচী আসিবামাত্র চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। হিরা মুচী বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ফকিরের কাজ এ রকম নহে। যেজন ফকির হইবেন, তিনি বৃক্ষ হইতে ছোট হইবেন।

আল্লার ফকির হইয়া ক্রোধ কি কারণ
আমি কি বুঝিব তুমি—দরবেশ বট।
যেজন ফকির হয় বৃক্ষ হৈতে ছোট ॥
ফকিরে না করে ক্রোধ, সুধা হয়ে চলে।
সইয়া থাকিবে যেন তরুর সামিলে ॥
শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়।
গাছ সম হৈতে পারে ফকির বলি তায় ॥

সত্যপীর তাহাকে বাজার হইতে হাঁড়ি কিনিয়া আনিয়া পাকা কলা গুড় চিনি মাখিতে বলিলেন, সত্যপীর তাহাই ভোজন করিবেন। সত্যপীরের কথা শুনিয়া মুচি বিশেষ বিস্মিত হইল—মুচী নরলোকে অধম, তাহার হাতে ফকিরের খাইতে নিষেধ। সত্যপীর বলিলেন যে মুচির হাতে খাইতে নিষেধ নাই। ছত্রিশ জাত একজাত হইয়া একসঙ্গে কাল-ক্রমে মিশিয়া যাইবে।

সত্যপীর বলে হিরা শুন সমাচার।
খাইলে তোমার হাতে ক্ষতি কি আমার ॥
আচার বেভার হেতু হৈয়াছে জাতি মানা।
একি সমুদ্রের জল হৈছে তুলা আনা ॥
ঘোলা মৈলা রাঙ্গা কাল কি বর্ণ হৈয়া।
একি সমুদ্রে সবে যাবে মিশাইয়া ॥
এমতি ছত্রিশ জাত এক জাত হইয়া।
এক পথ দিয়া সবে যাবে মিশাইয়া ॥

হিরা মুচি তাহার আহারের আয়োজন করিয়াছিল। ফকিরকে গোচর্ম্মে আসন দিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। ফকির গোচর্ম্ম স্পর্শ করিলেন, তাহা সোনা হইয়া গেল। হিরা মুচি তখন নিজের দুঃখের কথা পীরের নিকট জানাইল—তাহার স্ত্রী গমির মুঘলের বাড়ী শুরখি ভাঙ্গিয়া খাটিয়া মরিতেছে। সত্যপীর বলিলেন যে তাহার কোন দয়ামায়া নাই। হিরা মুচী বলিল যে সকলকে একদিন মরিতে হইবে, সুতরাং অনুতাপ করিয়া লাভ কি!

হিরা মুচী বলে সাহেব করি নিবেদন।
দশ দিন আগে পাছে সবারি মরণ ॥
যার মৃত্যু যেইরূপে না পারে খণ্ডাতে,
সে মরিল আগে আমি মরিব পশ্চাতে ॥

হিরা মুচীর মুখ হইতে পয়গম্বরের বাণী শুনিয়া সত্যপীর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহার নিকট নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন।

এদিকে গমীর মুঘল হিরা মুচীর স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে সত্যপীর তাহাকে অন্ধ করিয়া দিলেন। গমীর মুঘল কাঁদিতে কাঁদিতে হিরা মুচীর স্ত্রীর পায় পড়িল। ক্রমে সত্যপীরের কৃপায় গমীর চক্ষু দান পাইল। হিরা মুচীর স্ত্রী তখন মুক্তি পাইল—হিরা মুচীর দীন কুটির প্রাসাদে পরিণত হইল। হিরা মুচী ভক্তিভরে সত্যপীরের সিন্নী করিতে লাগিল। হিরা মুচীর ধনসম্পদ দেখিয়া রাজার লোক তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া হিরা মুচী করুণ ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং ছাত্রিশ অক্ষরে সত্যপীরের নিকট মিনতি জানাইতে লাগিল ॥

ক, কান্দিতে লাগিল হিরা হইয়া অস্থির।
কোথা গেলেন আমাকে ছাড়িয়া সত্যপীর ॥

খ, খোদার ফকির হইয়া ধন বর দিল।
খাইতে নারিলাম বিপাকেতে গেল॥
খেতিপতি আনি মোকে কারাগারে রাখিলে,
খণ্ডা ও আমার দুক্ষ তুলিয়া লও কোলে॥

গ, গাড়া ধন তুলিলাম আপনাকে খাইয়া,
গেল সে আমার প্রাণ বন্ধনে পড়িয়া।

ঘ, ঘরবাড়ী ধনকড়ী তারা রৈল কোথা।
ঘোর কারাগারে আমি রহিলাম হেথা॥

ঙ, উঠিতে নাহিক শক্তি দেখে লাগে ডর।
উড়াইল প্রাণ মোর গেনু যমঘর॥

এইরূপে হিরা মুচীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া সত্যপীরের কৃপা হইল—তিনি মানসিংহ রাজাকে স্বপ্ন দেখাইলেন। রাজা চৈতন্য পাইয়া পণ্ডিত ডাকিয়া আনিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতগণ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

স্বপনে প্রদীপ বিনে চক্ষু হয় অন্ধ।
স্বপনে খাইলে মধু পড়ে সেই বন্ধ॥
স্বপনে আগুন দেখিলে জল বরিষণ।
জলেতে আগুন হয়ে পোড়ে নিকেতন॥
স্বপনে যদি জোঁকে ধরে পায় দিব্য নারী,
স্বপনে দোলাতে চড়ে যায় যমপুরী॥

* * * *

স্বপনে পাইলে ধন চোরে পায় তার।
রাজা বলে রাখ কথা না বলিহ আর॥

মানসিংহ রাজা তখন কোটালকে আদেশ দিয়া হিরা মুচীকে রাজসভায় লইয়া আসিলেন এবং হিরা মুচীকে "ধনকড়ি" দিয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

পীরে তোকে দিছে ধন আমি ত না জানি।
স্বপনে শুনেছি আজ যতেক কাহিনী॥

এইরূপে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইল। শাস্ত বেশ্যা, যসমস্ত সাধু প্রভৃতিকে সত্যপীর নিজের গুণ জানাইলেন—তাহারা তাহার ভক্ত হইয়া পড়িল। প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হইবে আশঙ্কায় এস্থলে আর উল্লেখ করিলাম না। মোট পক্ষে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির ভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দু-মুসলমান সকলে সত্যপীরের পূজা-সিন্নী করিয়া থাকে।

সত্যপীরের জাহির হইল জানাজানি।
কেহ বা করেন পূজা কেহ বা সিরিণী॥
সত্যের মহিমা গুণ কি বলিব আর।
অনেক জাহির করে দেশ দেশান্তর॥

সত্যপীরের পাঁচালী গান ভিন্ন অনেক পল্লীগীতি আছে যাহার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। রঙ্গপুরের পল্লী অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায় "রহিম সাধুর গান" করিয়া থাকে। রহিম সাধুর গানের বিবরণ এইরূপ। ইলেংপুরের কিলেংবাদসার রাণীর পুত্রকন্যা নাই; রাণী পাষাণে মাথা দিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। তাহা দেখিয়া আল্লার লহুকলম চলিতে আরম্ভ করিল—জিব্রাইলকে ডাক দিয়া রাণীর মহলে "মস্‌সিত" তাহাকে পাঠাইলেন। জিব্রাইল বাম্মনের বেশ ধারণ করিয়া রাণীর মহলে উপস্থিত হইলেন এবং রাণীকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া জানাইলেন যে, রহিম সাধু তাহার উদরের মধ্যে জন্ম-পরিগ্রহ করিবে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পরদিনই মরিবে। কিন্তু বার বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতে পারিলে ছেলের মৃত্যু হইবে না। উজ্জ্বলনগরের বিদ্যাধর রাজার কন্যা রূপধন কুমারীর সহিত ছেলেটির বিবাহ দিতে জিব্রাইল প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রাজা সম্মতি প্রদান করিলেন। রূপধন কুমারীর সহিত রহিম সাধুর বিবাহ হইয়া গেল। রূপধন কুমারী "আড়াই দিনের" ছেলেকে পিঠে বান্ধিয়া বিজন বনে গমন করিলেন। রূপধন কুমারীর হাত হইতে দুধের ঘটি মাটিতে পড়িয়া গেল—পিঠে থাকিয়া রহিম সাধু কাঁদিতে লাগিলেন।

দুধের ঘটি নিলে কইনা হস্তের মাঝারে।
বিজাবন জঙ্গলার লাগি লাগ্‌ছে যাইবারে॥
কতেক দুর হইতে কইনা কতেক দুর গেল
ওষ্ঠা নাগি দুধের ঘটি মিতিলায় পড়িল—
পিষ্ঠে থাকি রহিম সাধু কাঁদিতে লাগিল॥

"রহিম সাধুর" ক্রন্দন শুনিয়া "আল্লার লহুকলম" আবার চলিতে লাগিল। জিব্রাইল আল্লার নিকট রহিম সাধুর ও রূপধন কন্যার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। আল্লার আদেশ-

ক্রমে জিব্‌রাইল দুইটি বদরী ফলের বৃক্ষ তৈয়ার করিয়া দিলেন—রূপধন কন্যা তাহার ফল খাইয়া রহিম সাধুকে পালন করিতে লাগিলেন। রহিম সাধুর বয়স তখন ছয়মাস, তাহাকে দেখিয়া রূপধন কন্যার ভাবনার অন্ত নাই। বড় হইলে ছেলেটি যদি তাহাকে মা বলিয়া ডাকে তাহা হইলে তাহার "সাত সিঁড়ি" নরকের মধ্যে পড়িবে।

দেখ, চেল্‌কে ফড়্‌কে রহিম সাধু কোলার মাঝারে,
কোন্ বা দিনে সোয়ামি হআ "মাউ" বলিয়া ডাকে।
সোয়ামি হআ হামাক্ যদি মাও বলিয়া ডাকে—
সাত সিড়ি পড়িবে আমার নরকের মাঝারে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রূপধন কন্যা "ফুল বাগিচার" দিকে রওনা হইলেন। ফুল বাড়ীর মধ্যে রাত্রি কাটাইলেন। দিন হইলে এক রাখাল "মাইলানীর" নিকট সেই বৃত্তান্ত জানাইল। ক্রমে মালিনীর সহিত রূপধন কন্যার পরিচয় হইয়া গেল—রহিম সাধুকে মালিনীর হস্তে অর্পণ করিয়া রূপধন কন্যা "আয়না বান্দা" ঘরের মধ্যে বসবাস করিতে লাগিলেন। মালিনী রূপধন কন্যাকে পুত্রজ্ঞানে পালন করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় রহিমের হাতে খড়ি দেওয়া হইল। গুরুর পাঠশালাতে রহিম সাধু পড়িতে লাগিলেন। এদিকে পাঠশালার ছেলেরা তাহার প্রতিভা দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইল এবং নানা প্রকারে রহিম সাধুর অপকার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু রূপধন কন্যার সতর্কতার জন্য কেহই তাহার কিছু করিতে পারিল না। বয়স্ক ছেলেকে এক ঘরে নিয়া থাকা সঙ্গত নহে এই আলোচনার ছলনায় মালিনী রহিম সাধুকে একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই ঘরের মধ্যে রূপধন কন্যা পান লইয়া রাত্রিতে রহিম সাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। এইরূপে মালিনীর সুচক্রান্তে রহিম সাধু ও রূপধন কন্যার মিলন সংঘটিত হইল। গানের শেষে বলা হইয়ছে—

রূপধন কন্যা রহিম সাধু মিলন হইল মুকুন্দ মুরারি।
মছলমানে বল আল্লা ভক্তে বল হরি॥

"বৈষ্টম বাউদিয়ার গান" নামে একটি ধর্ম্মসমস্যামূলক গান রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত। গানটি অনেক দিনের। "বাউদিয়া" অর্থে অবিবাহিত পুরুষ, যে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাকে বুঝায়। গানের মধ্যে অনেক রঙ্গ কথা থাকিলেও তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে যে তত্ত্বকথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই।

কাশী গেইলে লাগে ভাই দড়ি আশি হাত।
করগেতে নাইরে জল মস্তকে মাথি হাত॥
হরিনাম কৃষ্টর নাম বড়ই যে মধুর—
যেইজন ভজে ভাই সে বড় চতুর॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
হরিনাম বিনে সংসারেতে কেহ নাহি আর॥
বড় বড় পুণ্য করে হইয়া ধনবান—
দুঃখি কৃষ্ণ বহলে ডাকে নহে ত সমান॥
হরি বল হরি বল নগরবাসীগণ॥

এইরূপে হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে "বৈষ্ণব বাবাজী" ঘুটুর বাড়ীতে আগমন করিলেন। "ঘুটু" বৈষ্ণবের প্রধান ভক্ত—তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িল। বৈষ্ণব গোঁসাইএর পদবন্দনা করিয়া ঘুটু তাহার নিকট "নবদা ভক্তির" তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ণব এক কথায় বলিলেন—বাবা ঘুটু, নবদা ভক্তি নও রকম। আইজ যে ভক্তি সে উপমুক্তি। আর কি বলিব বাবা; ঘুটু গোসাইকে আপ্যায়িত করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। বৈষ্ণব অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং নানারূপ তত্ত্বকথা বিবৃত করিতে লাগিলেন। ঘুটুর কন্যা নয়নসরি গোসাইর নিকট অনেক ধর্ম্মসমস্যা উত্থাপন করিল। নয়নসরি নিজের দুঃখের কথা গোসাইএর নিকট নিবেদন করিল।

গোসাই, আমার কপাল খারাপ,
দীক্ষা শিক্ষা মন্ত্র নিলে জিবের হয় উদ্ধার॥
ও মরি রে, মোর মোতন দুঃখিনী মাইয়া ত্রিভুবনে নাই।
একায় থাকি সাধনসিদ্ধি হয়নারে গোঁসাই॥
হরি কথা মুখে বলিব—
হরি বিনে আমার কেহই নাই॥

একা নাকি সাধনসিদ্ধি করা যায় না। এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব বলিলেন যে, একা তৃশঙ্কু, সুধন্য রাজা, প্রহ্লাদ, রাজা ঘোড়াসুর ইত্যাদি সাধন-ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বস্থানেই একের মহিমা দেখিতে পাইতেছি।

এক ভিন্ন দুই নাই। সর্ব্বধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এক। যিনি গুরু, তিনি হরি, তিনিই আল্লা—এক ঈশ্বরই নানা বিভূতিতে আপনাকে প্রকাশিত করে।

যেই গুরু সেই হরি—সেই আল্লা, সেই খোদা।
যেই জল সেই পানি—এক বেতিত দুই নাই॥
নয়ন ভরিয়া দেখিলে রিদয় মন্দিরে পাওয়া যায়,
একই জিব আত্মা সকল ঘটে ঘটে আছে॥

সকল ঘটে ঘটে হরি আছেন। নানা অবতারে হরি নানা ভাব গ্রহণ করিয়াছেন—

রাম অবতারে রামের ধনুক, কৃষ্ণ অবতারে বাঁশী।
কদমতলায় থাকিয়া কৃষ্ণ ফুকুর ফুকুর হাসি॥

তারপর হিন্দু-মুসলমান সকলেই এক পরমপুরুষকেই ভজনা করিয়া থাকে। আর হিন্দু-মুসলমানের দশরথ, হজরত প্রভৃতি প্রত্যেকের সঙ্গেই মিল আছে।

হেন্দুলোকে বৈলে থাকে রাজা দশরত।
মুছলমান বৈলে থাকে আল্লি হজরত॥
হেন্দুলোকে বৈলে থাকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুছলমান বৈলে থাকে হাসেন হুসেন॥
হেন্দুলোকে বৈলে থাকে চণ্ডী আর দেবী।
মুছলমানে বৈলে থাকে ফতেমা আর বিবি॥
হেন্দুলোকে বৈলে জল, মুছলমানে পানি॥

সকলের মূলেই এক। এইরূপে একের মাহাত্ম্য লইয়া আলাপ চলিতে চলিতে চারের কথা উত্থাপিত হইল। বৈষ্ণব বলিলেন, সর্ব্বস্থানেই চারের প্রভাব দেখিতে পাইতেছি। চারি বেদ, চারি কাল, চারি অবতার, আর চার গুরু। এমন কি কুরআন্-এর মধ্যেও চারের কথা আছে।

নয়নসরি কোরাণের মধ্যে লেখা আছে।
আথ, আতস, খাগ্, বাই॥
আথেতে জন্মিল আল্লা, আতসে জন্মিল যত দেবগণ।
খাকেতে জন্মিল খেতি তৃণগণ॥
বাততে জন্মিল যত বেয়াদিগণ॥
এইরূপে আল্লা সৃষ্টি করিল ধারণ॥

বৈষ্ণব গোঁসাই চারি গুরুর কথা বলিলেন।

আছে গুরু পিতা মাতা,
দ্বিতীয় গুরু মন্ত্রদাতা
তৃতীয় গুরু প্রেমের আলয়,
চতুর্থ গুরু ভাব আশ্রয়॥

নয়নসরি প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, গোঁসাই যে চার গুরুর কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। চার গুরু ভিন্ন আরও পাঁচ গুরু আছে।

বাপের চাইর, মায়ের চাইর, চারি নিরঞ্জন।
দশ আঠার মোকামের মধ্যে হইল মহারণ॥
রক্ত মাংস চুলি চর্ম্ম এ চারি মাতার।
বার স্থানে শ্রীমণি কবচ এ চার পিতার॥
চতুর্থ গুরু হইল বেত কর্ণধারি।
যাহাতে গরভ পাপ তোমারে ঘুচালি॥
পঞ্চম গুরু বিদ্যা গুরু জানে সর্ব্বজন।
যাহা হইতে হয় তোমার বিদ্যার সম্মান॥
সৃষ্টি গুরু শ্বশুর শাশুড়ী জানিবা নিশ্চয়।
যাহা হইতে হয় তোমার প্রেমের আলয়॥
সপ্তম গুরু শিক্ষা আশ্রিত জানিবা নিছয়।
যাহা হইতে হয় তোমার পথের পরিচয়॥
অষ্টম গুরু স্ত্রীলোক তোমার জানিহ কারণ।
যাহা হইতে হয় তোমার ভবের দরশন॥

এইরূপে তত্ত্বকথা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে বাহির হইল যে স্ত্রীলোক ছাড়া পুরুষের গতি নাই। "হরিনাম" নামক নৌকাখানির একমাত্র কাণ্ডারী স্ত্রী—তাহার দ্বারাই পার হইতে হয়।

ভব নদীর ঘাটে খেওয়া বাঞ্ছা কল্পতরু।
সেইখানে ছাড়িয়া যাবে শিক্ষা দীক্ষার গুরু॥
হরিনাম নৌকাখানির স্ত্রী গুরু কাণ্ডারি।
দুই বাহু পশারি ডাকে আইস হে প্রাণনাথ পার করি॥
সাধুজনা হবে পার প্রেমের বাতাসে।
নর্ছন দাস পড়ে রবে নিজ কর্ম্ম দোষে॥

ক্রমে নয়নসরি তাহাকে তাহার জীবনপথে সঙ্গী হইতে বলিল। গোঁসাই উত্তর করিলেন যে, তাহার দ্বারা এরূপ সম্ভব হইবে না। কারণ তাহাতে তাহার বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে। বৈষ্ণব ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সার।

বৈষ্টবেরে চিনিতে নারে দেবের শকতি।
বৈষ্টব পদেতে হয় সর্ব্ব জীবের মুক্তি ॥
বৈষ্টব ধর্ম্ম অতি ধর্ম্ম—সব ধর্ম্ম সার।
হইলে বৈষ্টব-ধর্ম্ম কলিতে প্রচার ॥
বৈষ্টব হইয়া করে শৃঙ্গার যেজন।
অবসে হইবে তার নরকে গমন ॥

বৈষ্ণব গোঁসাই স্ত্রীজাতির নিন্দা করিতে লাগিলেন। জগতে স্ত্রীলোকের কোন দরকার করে না। নয়নসরি তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে স্ত্রী ভিন্ন অন্য গতি পুরুষের নাই। যে কালিদাস, ব্যাসমুনি প্রভৃতির গর্ব্ব পুরুষেরা করিয়া থাকে তাহারাও সরস্বতীর বরে জগতে বড় বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। স্ত্রী হইল আদ্যাশক্তি মহামায়া—তাহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই।

মাইয়া হয় তোর মাতা পিতা,
মাইয়া হয় তোর জন্মদাতা।
মাইয়া হইতে দেখয়ে দুনিয়া—
মাইয়ার নিন্দা কোন শাস্ত্রে লেখে না ॥

তখন সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা চলিল। গোঁসাই বলেন, সৃষ্টি বিষয়ে স্ত্রীলোকের কোন হাত নাই। নয়নসরি বলে, স্ত্রীলোক ভিন্ন কোন উপায় নাই। এইরূপে নানারূপ যুক্তি-তর্কের কাটাকাটির পর নয়নসরির নিকটেই গোঁসাইকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তখন উভয়ে একযোগে যুগলমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণব নয়নসরিতে তীর্থধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তুমি তীর্থ তুমি নিত্য তুমি বিন্দাবোন।
তুমি বিনে না হবে আমার যুগল সাধন ॥

নয়নসরিও একযোগে স্বীকার করিয়া লইল যে, চৈতন্য গোসাই ব্রহ্মাণ্ডের গুরু—আবার চৈতন্য গোঁসাইর গুরু রসমতী রাধিকা।

১৪ ব্রহ্মাণ্ডের গুরু চৈতন্য গোসাই।
চৈতন্য গোসাইর গুরু রসমতী রাই ॥

আসল কথা, পল্লী গীতিকার মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, তাহা সত্যই উপভোগ্য। আমরা যদি তাহার মধ্য হইতে তত্ত্বের সন্ধান করিতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে বোধকরি বিফলমনোরথ হইব না। স্বদেশ-প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষিতেরা এদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে; বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

চন্দ্র যে পাণ্ডুর কেন—

শ্রীযতীন্দ্র সেন

চন্দ্র যে পাণ্ডুর কেন, আজি তাহা বুঝিয়াছি সখি,—
দিগন্ত আলোকি কেন সঙ্গোপনে ওঠে রজনীতে,—
কেন বা পশ্চিম নভে ডুবে যায় ঝলকি ঝলকি—
তপনের তীব্র তাপ-স্পর্শাতুরা চন্দ্রিকা ত্বরিতে।
তব দুটি গণ্ড হ'তে শুক্তি-শুভ্র পাণ্ডুরতা হরি—
চন্দ্রমা পাণ্ডুর তাই; নভঃপ্রান্তে উঠে যে উলসি,
তোমার ও আননের সুধা লাগি আবেশে শিহরি
জ্যোছনার ছলে তোমা পরশিতে চাহে যে উচ্ছ্বসি'।
আমার এ বক্ষোনভে সন্ধ্যা-লগ্নে উদিতা সজনি,
অপাংশু কপোল তব পান করি তৃষাতুর চোখে—
অতন্দ্র চন্দ্রের মত অপলক, সারাটি রজনী;
তোমারে লভি যে আমি অনুরাগ-কম্প্র চিদালোকে
প্রভাতে মিলায়ে যায় পাণ্ডুরতা তব গণ্ড হ'তে,
লজ্জারুণ ওঠে ফুটি উচ্ছ্বসিত শোণিতের স্রোতে ॥



মিলির কলঙ্ক

শ্রীরাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবাহ বাড়ীর সমস্ত উৎসবকে ম্লান করিয়া বসন্ত যখন সগর্জ্জনে শ্বশুরবাড়ী হইতে চলিয়া গেল মিলি তখন শয্যার আশ্রয় লইয়া নীরব ক্রন্দন ছাড়া পথ পাইল না এবং প্রমথ নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

ছোটবোন হিলির বিয়েতে মিলিকেই গৃহকর্ত্রীর স্থান লইতে হইয়াছিল। এতবড় একটা কেলেঙ্কারীর পর তাহার আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। বাড়ীময় আত্মীয়কুটুম্বের ভীড়। কথাটা তখন শাখাপল্লবে বিস্তারিত হইয়া সকলের মধ্যে একটা কাণাঘুষার সৃষ্টি করিয়াছে। মিলির বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে দু'একজন ব্যাপারটা জানিত তাহারা ব্যথা পাইল, যাহারা জানিত না অদম্য কৌতূহল তাহাদিগকে মিলির শয্যাপার্শ্বে ঠেলিয়া আনিল। কিন্তু কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না।

সবচেয়ে প্রমাদ গণিল হিলি। গোঁয়ার বলিয়া বসন্তকে সে কোনদিন দেখিতে পারিত না। তারপর তারই বিবাহ উপলক্ষে অগণিত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে চীৎকার করিয়া যে নিজ স্ত্রীর কুৎসা কীর্ত্তন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবার বাসনা তীব্র হইয়া উঠিলেও কিছু বলিতে না পারিয়া সে রাগে ফুলিতে লাগিল। প্রমথকে বলিল "দাদা, আমার বিয়ে না হয় নাই হল, তবু তোমাকে ঐ কাপুরুষটাকে শিক্ষা দিতে হবে। তা না হ'লে তোমার এতদিনকার স্বাস্থ্যচর্চ্চা সবই বৃথা।"

প্রমথর যে রাগ না হইতেছিল তাহা নহে। তথাপি তাহাকে চাপিয়া যাইতে হইয়াছিল। পিতৃমাতৃহীনা বোনেদের অভিভাবক বর্ত্তমানে একমাত্র সে। দিতলের বারান্দার রেলিং ধরিয়া সে এই কথাই ভাবিতেছিল। মাত্র দশদিনের ব্যবধানে পিতা ও মাতা যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন প্রমথ তখন একুশ বৎসরের যুবক মাত্র। তারপর সুদীর্ঘ আটটী বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। পিতামাতার স্নেহ দিয়া সে বোনগুলিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে বড় বোনটীর মৃত্যু হওয়াতে যে ব্যথা সে পাইয়াছিল আজও তাহা ভুলিতে পারে নাই। দেখিয়া শুনিয়া ভালছেলের সঙ্গেই সে লিলির বিবাহ দিয়াছিল, খুসীও হইয়াছিল সে ; কিন্তু মৃত্যুর হাত হইতে তাহাকে সে রক্ষা করিতে পারে নাই। পিতা তাহার প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন ,বলিয়া বোনেদের সে কোনদিন অভাব অনুভব করিতে দেয় নাই। তাহাদের সকল প্রকার আব্দারই সে হাসিমুখে সহ্য করিত। কিন্তু তাহার এই স্নেহাধিক্যই হইয়াছিল যত অনর্থের মূল এবং আজ মিলির যে কলঙ্কের কথায় বিবাহ বাড়ীর উৎসব ম্লান হইতে বসিয়াছে তাহার জন্য সে নিজেই দায়ী। হিলির কথায় তাই সে ম্লানমুখে জবাব দিল "ওকে তো দোষ দেওয়া যায়না হিলি। অপরাধ আমাদেরই। তবে এ যুগের ছেলে হয়েও যে এত গোঁয়ার হবে আগে তা ভাবিনি। তাহ'লে জেনে শুনে এ পাষণ্ডের হাতে মিলিকে কোনদিন আমি তুলে দিতাম না।" বলিতে বলিতে প্রমথর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

"তা তুমিই বা কি ক'রে চিনবে দাদা। বসন্তবাবু প্রগতির বুলি আওড়ান, সেকেলে প্রথার নিন্দা করে' গল্প কবিতা লেখেন। এইতো 'অগ্রগতি'তে সেদিন 'নীড়হারা' নামে যে গল্পটা লিখেছেন তাতে এম্নি-সব ঘটনার কি তীব্র সমালোচনা। অথচ আজকে তিনি যে কাণ্ডটা কল্লেন, এটা একশত বৎসর পূর্ব্বে ঘটলে ঠিক হ'তো।"

"এইখানেই তো মানুষ ভুল করে হিলি। দূর থেকে পলাশফুলকে সুন্দরই দেখায়, কাছে না গেলে টের পাওয়া যায়না যে ওতে' গন্ধ নেই। বসন্তর গল্পকবিতাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, ভেবেছিলুম যদিই বা কোনদিন মিলির পূর্ব্বজীবনের কাহিনী প্রকাশ পায় বসন্ত ওকে ক্ষমা কর্ব্বে। তাই মিলির শত অনুনয়, বিনয়, তোদের অনুরোধ সব উপেক্ষা করে' বসন্তের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিলুম। আজতো আমি কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না বোন। বাড়ীময় কথাটা যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে নতুন কুটুম্বদের কানে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাহ'লে যে কাণ্ড হবে তা মনে করতেও ভয় হচ্ছে।"

"কি আর হবে, না হয় আমার বিয়ে হবেনা। তাতে এত ভয় পাবার কি আছে দাদা। আর বসন্তবাবুর কাণ্ড দেখে বিয়ে কর্ব্বার ইচ্ছে আমার কর্পূরের মতই উবে' গেছে।"

"তা হয়না হিলি। বিয়ে করতে এসে বর যদি ফিরে যায় তার চেয়ে বড় কলঙ্ক আর নেই। মল্লিকপাড়ার রায়-বাড়ীর বংশমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য পূর্ব্বপুরুষগণ যে চেষ্টা করে' গেছেন আজ যদি আমার দোষে তাতে কলঙ্ক পড়ে তাহ'লে আমি বাঁচবো না হিলি।"

"তোমার মুখে এ কথা শোভা পায়না দাদা। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান। বসন্তবাবুর মত গোঁড়ামি তোমাকে আশ্রয় করে' বাঁচতে পারে না। ভুয়া মান-মর্য্যাদার জন্য তুমি যদি আত্মবোধ বিসর্জ্জন দাও তাহ'লে বুঝবো আমাদের দাদা মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। মেজদি'র পূর্ব্বজীবনের কাহিনী শুনে যিনি আসছেন তিনি যদি ফিরে যান তাহ'লে আমার মঙ্গলই হবে। কারণ এ ত্রুটী মার্জ্জনা কর্ব্বার মত মনোবৃত্তি যাঁর নেই তাঁর সঙ্গে বিয়ে না হওয়াটাকেই আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।"

মল্লিকপাড়ার বিখ্যাত এটর্ণী অশোক রায় ছিলেন উদারপ্রকৃতির মানুষ। পত্নী ইলাদেবী অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়ে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম রায়বাড়ীর চিরাচরিত গোঁড়ামি লঙ্ঘন করিয়া আধুনিকতার হাওয়া

আসিয়াছিলেন। মেয়েদেরও তিনি অবাধ মেলামেশার প্রশ্রয় দিতেন। মক্ষিরাণীর চতুঃপার্শ্বে মৌমাছির মত বহুভক্ত তাই লিলি, মিলি ও তিলির চারিদিকে ঘোরাফেরা করিত। অশোকবাবু এ সকল লক্ষ্য করিবার সময় পাইতেন না। বাড়ীতে যেটুকু সময় থাকিতেন ইলাদেবীর স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। পুত্র প্রমথও পিতার স্বভাব পাইয়াছিল। বিদ্যা ও স্বাস্থ্য চর্চ্চাতেই সে নিজেকে একান্তভাবে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে বোনেদের অত্যাচারে সিনেমা বা পার্টিতে তাহাকে যোগ দিতে হইত বলিয়া অভিযোগ করিতে শোনা গেলেও অসন্তুষ্ট হইতে দেখা যায় নাই। বোনেদের সে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাই তার পড়ার ঘরে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলেও বোনেদের ছিল অবারিত গতি। তিন বোনের মধ্যে মিলির অফুরন্ত প্রাণশক্তি তার সকলপ্রকার বিধিবিধান ছিন্ন করিয়া দিত। মাঝে মাঝে পড়ার ঘরেই রীতিমত বিতর্কসভা বসিয়া যাইত।

এমনি সময় দশটী দিনের ব্যবধানে অশোকবাবু ও ইলাদেবী পরলোকে পাড়ি জমাইলেন। রাখিয়া গেলেন অগাধ সম্পত্তি, অনভিজ্ঞপুত্র ও তরুণী তিনকন্যা। প্রকাণ্ড সংসারের ভার স্কন্ধে আসিয়া পড়ায় প্রথমটা অস্বস্তি অনুভব করিলেও প্রমথ বিচলিত হয় নাই। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পিতার ব্যবসায় দেখিতে লাগিল। অন্দরের ভার পড়িল লিলির উপর। অনভ্যস্ত কর্ত্রীর অধীনে নানাদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও সংসার অচল হইল না।

ইলাদেবীর আধুনিকতায় বিরক্ত হইয়া যে আত্মীয়েরা দূরে সরিয়া গিয়াছিল এখন তাহারা আসিয়া প্রমথকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এতবড় বোনেদের বিবাহ না দিলে সমাজে যে তাহার স্থানাভাব ঘটিতে বিলম্ব হইবে না এমন ভয় দেখাইতেও তাহারা ত্রুটী করিল না। আত্মীয়দের এই অনুগ্রহের দিকটা প্রমথ কোনদিন চিন্তা করে নাই। সে মুস্কিলে পড়িল। মিলিই তাহাকে এ বিপদে পথ দেখাইল। পিতৃবন্ধু রমেশ বসুর পুত্র অসীমের সহিত লিলির বিবাহ হইল। ইলাদেবীও জীবিতকালে উভয়ের মিলন স্থির করিয়াছিলেন।

কলেজের সহপাঠী সতীনাথ ছিল প্রমথর অন্তরঙ্গ বন্ধু। পড়ার ঘরে এই সতীনাথ হইয়াছিল মিলির প্রধান আকর্ষণ। দাদার সহিত সকল বিতর্কের অবসান করিতে হইত সতীনাথকে। তাহাদের এই পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্বের কোঠায় আসিয়া পৌছিল। পড়ার আকর্ষণের চেয়ে এখন মিলির আকর্ষণই সীতানাথকে প্রত্যহ মল্লিকপাড়ায় টানিয়া আনিত। প্রমথ হাসিয়া বলিত "কিরে সতীনাথ, বই পড়তে এসে শেষে প্রেমে পড়লি নাকি।" উত্তরে সতীনাথ বলিত "আপত্তি কি?"

আপত্তি যে কিছু ছিলনা তাহা অল্প কালের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাতেই সতীনাথ ও মিলিকে চৌরঙ্গীর সিনেমাগুলির একটী না একটীতে দেখা যাইত। সপ্তাহের সাতটী দিনই সীতানাথকে অশোকবাবুর বাড়ী আসিতে দেখা যাইতে লাগিল।

এই লইয়া পাড়াতে উঠিল মৃদুগুঞ্জন, আসিল আত্মীয়দের গর্জ্জন ও উপদেশ। তখন প্রমথর জ্ঞান হইল। সতীনাথ ও মিলির অন্তরঙ্গতার সে একটা অর্থ খুঁজিয়া পাইল। সতীনাথকে সে খুবই ভালবাসিত সুতরাং সতীনাথের সহিত মিলির মিলন হইলে সে সুখীই হইত। ভাবিয়াও রাখিয়াছিল সে এম্নি একটা মিলনের কথা। কিন্তু এখন এই মিলনের মাঝখানে একটা পর্ব্বত প্রমাণ বাধা আসিয়া জমিয়াছে, যাহাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। সতীনাথের থাইসিস—প্রায় এক সপ্তাহ হইল সে পুরীতে গেছে আত্মরক্ষার জন্য। মিলিকে সতীনাথ এই দুরন্ত ব্যাধির কথা জানায় নাই। মিলির কথা ভাবিয়াই সে নিঃশব্দে দূরে চলিয়া গিয়াছে।

এইরূপ দোটানায় পড়িয়া প্রমথ যখন কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছিল না তখন দূরসম্পর্কীয় এক মামা তাহাকে বসন্তের বার্ত্তা দিয়া গেলেন। বসন্ত সেনের অনেক গল্প ও কবিতা সে পড়িয়াছে। প্রগতিপন্থী লেখক সে—হিন্দু সমাজের জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে উদগ্রবিদ্রোহ তাহার প্রতি লেখায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বিস্তীর্ণ সমুদ্রে পথহারা নাবিক হঠাৎ তীর আবিষ্কার করিতে পারিলে যেরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, বসন্তের মাঝে প্রমথ ও যেন তেম্নি পথ দেখিতে পাইল। মিলির প্রতি অত্যন্ত স্নেহই তাহাকে গভীর চিন্তায় ফেলিয়াছিল। সতীনাথকে মিলি যেরূপ ভালবাসে তাহাতে অন্যের সহিত বিবাহের সম্বন্ধে তাহাকে রাজী করানো যাইবে না। এদিকে সতীনাথ ও মিলির প্রণয় কাহিনী যেরূপভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাতে অন্যে সহজে তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইবে না। বিবাহ না দিলেও আত্মীয়-স্বজনের উদ্যত রোষ তাহাকে ক্ষমা করিবে না। তাই বহুচিন্তার পর মিলির নিকট সে রঙ্ ফলাইয়া বসন্তর নাম উত্থাপন করিল। মিলি প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, ঠাট্টা মনে করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দাদার কণ্ঠে পরিহাসের সুর লক্ষ্য না করিয়া সে বলিয়াছিল "দাদা তুমি কি বলতে চাইচো আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। হঠাৎ তুমি সতীনাথবাবুর উপর এত বিরূপ হ'লে কেন? আমাদের দু'জনার মধ্যে যে সম্বন্ধ তোমার কাছে তা তো অজ্ঞাত নয়। তবে তুমি আজ একথা বলছো কেন দাদা? তাই কি সতীনাথবাবু আজ কদিন আমাদের বাড়ী আসছেন না।"

"ঠিক তাই নয় মিলি। আমি জানি সতীনাথকে তুই কতখানি ভালোবাসিস। কিন্তু তার হাতে তোকে তুলে দিতে পারি না বোন। মৃত্যু যার মাথার শিয়রে, কোন প্রাণে তার সাথে তোর বিয়ে দিই। সতীনাথের থাইসিস—আজ দিন সাতেক হ'ল ডাক্তারদের পরামর্শ মত সে পুরী গেছে। জীবনের আশা তার অতি অল্প।"

অকস্মাৎ বাণাহতা হরিণীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া পাংশুমুখে মিলি বলিল "তাহোক দাদা। থাইসিস হোক আর কুষ্ঠই হোক, সতীনাথবাবুকে ছাড়া অন্য কারুকেই আমি বিয়ে কত্তে পার্ব্বো না।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে দ্বারে অর্গল দিল। সমস্ত রাত্রি সেদিন বাড়ীর কাহারও নিদ্রা হইল না। বহু অনুনয় অনুরোধের পরও যখন সে দরজা খুলিল না তখন প্রমথকে তখন দ্বার ভাঙিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হইল।

এই ঘটনার পর হইতে দাদার উপর একটা তীব্র অভিমান মিলিকে মরিয়া করিয়া তুলিল। বসন্তের সহিত বিবাহের সম্বন্ধে সে কোন কথাই বলিল না। প্রমথ মনে করিল মিলির মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বন্ধু-বান্ধব লইয়া বসন্ত যেদিন মেয়ে দেখিতে আসিল, রুদ্ধ অভিমানের কঠিন বিতৃষ্ণা লইয়া মিলি পরীক্ষা সভায় গেল। প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে উদ্ধত প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়া ভাবিল সে নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত; মিলির এই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিই বসন্তকে আকর্ষণ করিল অগ্নিশিখার প্রতি লুব্ধ পতঙ্গের মত। ফাল্গুনের এক শুভ রাত্রে মিলি ও বসন্তর বিবাহ হইয়া গেল। মিলির নিকট এই রাত্রি যে শুভ হয় নাই তাহার বিবর্ণ মুখ, অর্থহীন চাহনি ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের গোপন আলোচনাতে তাহা বুঝা গেল। তবুও যথারীতি বিবাহ হইল এবং প্রমথ আপাততঃ নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলিল!

দুষ্টক্ষত যেমন রহিয়া রহিয়া রোগীকে যন্ত্রণা দেয়, বসন্ত ও মিলির দাম্পত্যজীবন প্রমথর জীবনে তেমি একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। গোঁয়ার বসন্তর উদ্ধত ও অভদ্র আচরণে তাহার একান্ত স্নেহের বোনটীর প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কারণে অকারণে সে মিলিকে নির্য্যাতন করিতে লাগিল। একদিকে সতীনাথের স্মৃতি ও অন্যদিকে স্বামীর নির্ম্মম ব্যবহারে পীড়িত হইয়া কতবার সে ভাবিয়াছে আত্মহত্যা করে। পারে নাই দাদার মুখ চাহিয়া। সে জানিত দাদা তাহাকে কতখানি ভালোবাসে। তাহাছাড়া জ্যেষ্ঠা লিলি অকালে সকালের মায়া কাটাইয়া অজ্ঞাতদেশে চলিয়া গেলে তাহাদের সকলের বিশেষতঃ দাদার বুকে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা এখনও শুকাইয়া যায় নাই। বিবাহের পরও মাঝে মাঝে সে সতীনাথের সংবাদ লইত কিন্তু দাদা তাহাতে দুঃখ পায় দেখিয়া সতীনাথের চিন্তাকে সে বিসর্জ্জন দিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কুমারের কাঁচা হাঁড়ির গায়ে আঁচড়ের মত তরুণ জীবনের প্রথম প্রেমের পরশ স্থায়ী দাগ কাটিয়া গিয়াছে।

তথাপি কোন দিন সে স্বীয় কর্ত্তব্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নাই। মনের কোণে দুর্ব্বলতা ছিল বলিয়াই জোর করিয়া পরিপাটিভাবে সে স্বামীসেবা করিয়াছে। ইহাতেও সে বসন্তের মন পায় নাই।

সংসারে একশ্রেণীর মানুষ আছে যাহাদের সন্তুষ্ট করা যায় না। সেবা করিলে ইহারা মনে করে আড়ম্বর, আবার ত্রুটী হইলে মনে করে অবহেলা। এইরূপ মানুষ লইয়া যাহাদের সংসার করিতে হয় জীবন হয় তাহাদের দুর্ব্বিসহ, মন যায় মিথিয়ে, পৃথিবীর লোকেদের প্রতি আসে একটা বিজাতীয় ঘৃণা। মিলিরও হইয়াছিল তাহাই। কোন কাজে উৎসাহ পাইত না। কোনক্রমে দিন গুজরাণ করিয়া চলিয়াছিল সে।

এমন সময় হিলির বিবাহে তাহার ডাক পাড়িল। লিলির অবর্ত্তমানে তাহাকেই রায় বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্রীর স্থান লইতে হইল। স্বামীর একটানা নির্য্যাতন ও অনাদরের আবহাওয়া হইতে মুক্তি পাইয়া বিবাহ বাড়ীর কর্ম্মস্রোতে সে নিজেকে মগ্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু বিধাতা যাহার প্রতি বিমুখ কোনখানেই তাহার সুখ নাই। বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। রাত্রি নয়টায় বর আসিবে। উৎসব-মুখরিত বাড়ী আনন্দের কলহাস্যে পরিপূর্ণ। অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় কোন সূত্রে মিলির প্রণয় কাহিনী বসন্তের কর্ণগোচর হইল। হইবামাত্র আর বিলম্ব হইল না—অগণিত আত্মীয় কুটুম্বের মাঝখানে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কটুভাষায় স্বীয় পত্নীর কলঙ্ক কাহিনী প্রচার করিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে বসন্ত বিদায় লইল।

দেখিতে দেখিতে দাবানলের ন্যায় সংবাদটা বাড়ীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। প্রমথর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বরপক্ষের কর্ণে কে তাহা পৌঁছাইয়া দিল এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে তাহাই ঘটিল। বরের পিতা কয়েকটী হিতোপদেশ সহ সেই রাত্রেই সভা-মণ্ডপ ত্যাগ করিলেন।

হিলির বিবাহ পণ্ড হইল। কলঙ্কিতা মিলি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই যে শয্যার আশ্রয় লইল আর তাহা ত্যাগ করিল না।

মোর চোখে ঘুম নাই

শ্রীদক্ষিণা বসু

মোর চোখে ঘুম নাই ঘুম নাই শ্রান্ত শর্ব্বরীর!
আমার দুপাশে বয় সহস্রের উষ্ণ অশ্রুনীর।
আমার জগতে যত মানুষেরা হয়েছে মেশিন,
উদয়াস্ত অন্ধকার—শুধু রাত্রি; যেথা নাই দিন;
রূপালী চাঁদের রেখা যেথা কভু আনে না পুলক,
কোকিল কাকলী শুনি যাহাদের ভাঙ্গে না চমক,
জীবনের প্রশ্নে ব্যস্ত, যৌবনেরে করি অনাদর
নিজ রক্তে গড়ে যারা সভ্যতার বিরাট মর্ম্মর,
প্রেমরূপী দেবতারে প্রাণ-তীর্থে দেয় না অঞ্জলি,
শতাব্দীরে অর্ঘ্য দিতে আপনারে দিয়াছে যে বলি;
আমারে জাগায়ে রাখে তাহাদের তিক্ত আঁখিজল।
যুগের সমাধি 'পরে ফুটিবে ত ব্যথার কমল!
আমি গাহি নিদ্রাহীন, অনাগত সেদিনের গান—
উড়িবে ধরার বুকে যেইদিন তাদের নিশান।

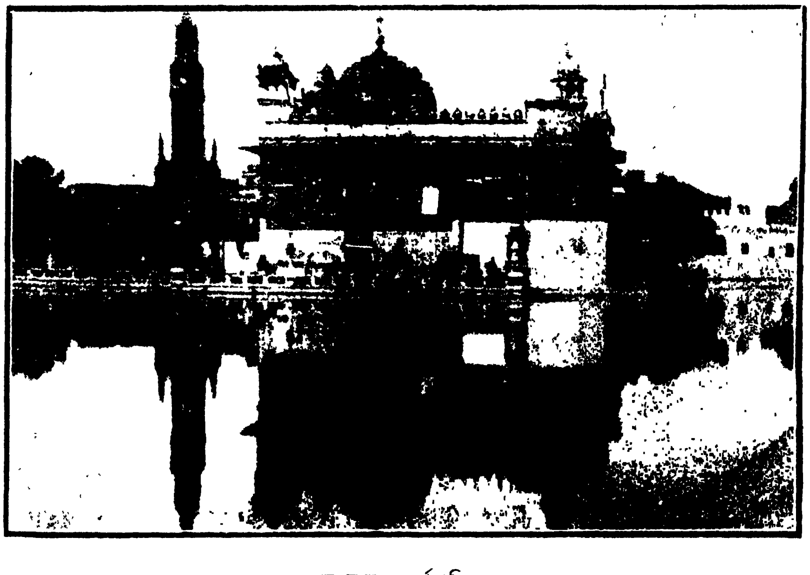
ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভ্রমণ ও প্রসঙ্গত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির বাইরে থেকে দেখলাম। তার সমালোচনা না-ই বা করলাম। হাসি, এষা, লীলা, প্রভাদি, ধরণীদা ও ছোটছোটরা গেল—মায়া, আমি ও আমাদের এক আত্মীয় মানুদা রইলাম হ্রদতটে। মন্দিরটি হ্রদ মধ্যে। চূড়াটি সোণার পাত দিয়ে মোড়া। তবে ভারতবিখ্যাত এ-মন্দিরটির কথা সর্ব্বজনবিদিত। এরই উপর তলায় গুরু নানকের গ্রন্থসাহেব প্রতিমা—তাকে পূজা করা হয়।



অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির

দেখলাম মন্দিরের পথে চাতালে অনেক শিখ নরনারী খুব গান ও ভজন করতে করতে চলেছে। এখানে মেয়েদের পাজামা দেখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফের একমত হ'তে হ'ল : ভারতে সুষমাময়ী হ'ল বঙ্গবালা। আর তার একটা প্রধান কারণ শাড়ি।

সত্যি বেশভূষা মন্দ হ'লে সুন্দরীদেরও শ্রীহীন দেখায়, একথা সেদিন যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। কালিদাস মস্ত কবি; কিন্তু তাই ব'লে তাঁর সব কথাই কিছু বেদবাক্য নয়। শকুন্তলায় বলেছেন তিনি : "কিং পুনর্ভূষণানাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ?

তিলোত্তমা যাহাই পরে অঙ্গে সমাদরে
ভূষণ হয় তনুশ্রীর পরশমণিবরে।

না, নারায়ণ! আমি এ কথা কোনোদিন মানি নি—আশা করি কোনোদিন মানব না—যে অলঙ্কার মন্দ জিনিষ। এ একটা কথাই নয় যে সাজসজ্জায় রূপের শ্রীবৃদ্ধি হয় না—নিশ্চয় হয়। অবশ্য সাজ মানেই যে শ্রীঅঙ্গকে জড়োয়া গয়না দিয়ে মুড়ে দেওয়া তাও বলছি না—কিন্তু সুরুচিসঙ্গত বেশভূষাপ্রসাধনের সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। বিবসনা তনুশ্রীর চিত্রমূল্য আমি স্বীকার করি—কিন্তু তবু বলব সভ্যতার সংস্কৃতির একটা মস্ত পরিচয় মেলে এই সাজসজ্জায়—প্রসাধনে। বাঙালি মেয়ের সাজসজ্জার ধরণটি সুন্দর এ কথা যখন ভাবি, তখন গৌরবে আমার মন কানায় কানায় ভ'রে ওঠে। তুমি বলবে—ফের নারী-উচ্ছ্বাসের কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে। গিল্টি প্লীড করতে পারলাম না। তুমি নারীভক্ত নও—তবু একটা কথা বলি, ভেবে দেখো দেখি। ধরো, তোমার সামনে গানের আসরে যদি সার বেঁধে বোরখা-পরা মেয়েরা বসতেন তাহ'লে তোমার চোখ জুড়িয়ে যেত, না পথ চেয়ে থাকত কখন একটি সুবেশা সুন্দরীর আবির্ভাব হবে? যা না চাইতে পাই তার মূল্য

আমরা ভুলি সহজে। বাংলাদেশে থেকে আমরা বুঝিনা আমাদের চোখকে কতখানি পুরস্কার দেয় বাংলার মেয়েরা। যাওনা একবার আফগানিস্থানে বা কাশ্মীরে—টেরটি পাবে।

মনে আছে কাশ্মীরে একটি নবাবজাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক কাশ্মীরী আসরে। তিনি পরেছিলেন শাড়ি—নীল রঙের। চোখ গিয়েছিল জুড়িয়ে ওদেশে। তিনি বাংলা জানলে গাইতাম :

সুনীলবসনা! হেরি' তোমারে
মনে পড়ে মোর চিনি গো চিনি।
অচেনার মাঝে পরিচিতারে
বরি তব বেশে লো বিদেশিনী!

* * * *

অমৃতসর থেকে লাহোর কয়েক ঘণ্টার পথ। চললাম সবাই কুতূহলে। কারণ সেখানে ডাক্তার ধর্মবীর সপরিবারে



ডাক্তার ও শ্রীমতী ধরমবীর

আসীন। তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবার কথা। এঁদের কথা ব'লে কাশ্মীরের উপক্রমণিকা পর্বের ইতি করব।

ও বছর—১৯৩৭ সালে—সুভাষ এঁদের বাড়িতে শরীর সারতে যায় ডালহৌসিতে—কাগজে তুমি নিশ্চয়ই পড়েছিলে। এ-ও জানো যে সুভাষ ও ধর্মবীর আমাকে বার বার চিঠি ও তার পাঠায় সেখানে যেতে। যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হ'য়ে ওঠেনি সে সময়ে—গানের দাঙ্গাহাঙ্গামে। সে হাঙ্গামও তুমিই তুলেছিলে। স্বর ও কথার কোঁদল—মনে আছে। এখানে চট্ ক'রে একটা কথা সেরে নিই নারায়ণ। রবীন্দ্রনাথকে যদি তুমি বড় সুর-কার মনে করো তবে কেন কথা-সুর সমস্যা তুলেছিলে? কারণ রবীন্দ্রনাথকে যে-মুহূর্তে মস্ত সুর-কার বললে সে-মুহূর্তে তো ও তর্কের মীমাংসাই হয়ে গেল যে সুর ও কথার দাম্পত্য ঘরকন্না একটা চমৎকার ব্যাপার। ধূর্জটি এবং উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও রবীন্দ্রনাথকে বড় সুর-কার ব'লে তবু কথাকে বলেন গানের সতীন। এ ধরণের উল্টোপাল্টা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারিনা। হয়ত বুদ্ধি আমার কম ব'লে। কিম্বা গান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শিখিনি জানিনি ব'লে। যাক্।

বছর আঠারো আগে ইংলণ্ডে সুভাষকে নিয়ে আমি যাই এঁদের ওখানে ল্যাঙ্কাশায়ারে। ডাক্তার ধর্মবীর পঞ্জাবি—আর্যসমাজী—৺লালা লাজপৎ রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁর স্ত্রী—ইংরাজ মহিলা। হাসি ও আমি "অকূলে সদাই" ব'লে যে ডুয়েটটি গ্রামোফোনে দিয়েছি তার মূল রাশিয়ান সুর ইনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। তাকেও আমি হিন্দি গজল ও কবীরের ভজন শিখিয়েছিলাম। প্রায়ই তিনি পিয়ানো বাজাতেন আমি গাইতাম। যাক।

ইনি বাল্যকালে ছিলেন রুষ দেশে—তাই রুষভাষা বেশ জানেন। ফরাসিভাষাও। এর ফলে এঁর স্বভাব আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। কী চমৎকার যে এঁর স্বভাব সে বলব কী? মনে আছে সুভাষ সে-সময়ে বিলেতে আমাকে কেবল শাসাত: "দেখ দিলীপ, মেয়েদের সঙ্গে মেশামেশা নয়—আগুনের ছায়া মাড়াবে না—বুঝেছ?" আমার বুক উঠত কেঁপে, ঢোঁক গিলে বলতাম তবু: "হুঁ।" ('ইতি গজ' করতাম—"তোমার সাম্‌নে না।") শুনে হয়ত শিউরে উঠবে যে দুবছর ইংলণ্ডে আমি কোনো বিদেশিনীর দিকে ভালো ক'রে তাকাতে সাহস করিনি—পাছে সুভাষ ধ'রে ফেলে। সে সময়ে ওর একটা কথায় সত্যিই আমি জেলে যেতে পারতাম—অবশ্য চরকায় সুতো কাটতে পারতাম এতটা

জ্ঁাক করলে ধরা প'ড়ে যাব। অসাধ্য সাধনেরও তো একটা সীমা আছে।

কিন্তু এহেন সুভাষ শ্রীমতী ধর্মবীরের স্নেহে সখিত্বে আদরে যত্নে স্বভাবের সহজতায় আতিথ্যের দাক্ষিণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়ে স্বচ্ছন্দে আমাকে পাঞ্জা দিয়েছিল: "আচ্ছা, কেবল ওঁর সঙ্গে মিশতে পারো।" সুভাষ ও আমি যখন ওঁদের ওখান থেকে চ'লে এলাম, তখন ট্রেণে তুলে দেবার সময়ে শ্রীমতী আমাদের হাতে দিয়েছিলেন এক ঠোঙা বাদাম ভাজা। ডাক্তার পরিবার নিরামিষাশী—ফলমূল, পুডিং ও বাদামভক্ত। চলন্ত গন্থময় ট্রেণে বাদাম খেতে খেতে সুভাষের চোখে এলো জল। (বাদামে ঝাল ছিল ভাবছ?—না না) বলল: "দিলীপ, মেয়েরা সব দেশেই কী যে—" কথাটা শেষ হ'লনা।

সুভাষকে এত বিচলিত কখনো দেখিনি। কিন্তু কেন সে এত মুগ্ধ হয়েছিল বুঝেছিলাম। পৌরুষ রুখে উঠে খবর্দার বললে হবে কি—হৃদয় যে আমাদের তৃষিত থাকে মেয়েলি স্নেহ আদব-কায়দা যত্ন-দরদের জন্যে। শ্রীমতী ধর্মবীরের কাছে ওদেশে আমরা প্রথম পাই ঘরোয়া আদর—পারিবারিক যত্ন।

বিদেশে এ-আদরযত্ন যে কত বেশি তৃপ্তি দেয় সেটা তোমরা কখনই পূরো কল্পনা করতে পারবেনা। যে-জিনিষ প'ড়ে পাওয়া যায় তার দাম আমরা প্রায়ই ঠিক্ ম'ত দিতে শিখিনা। জীবনে অনেক মূল্যবান্ সম্পদই আমাদের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ ক'রে রেখে যেতে পারেনা এই কারণেই। যে-গ্রহণ অকৃতজ্ঞ—তাকে গ্রহণ নাম না দিয়ে লুট নাম দেওয়াই ভালো। ধূ ধূ বালির বুকে অস্বীকৃত জলকণার মতন সে ঝরতে না ঝরতে যায় উবে, ফসল ফলাবে কে? কিন্তু যেখানে গ্রহণ করি শ্রদ্ধায় সেখানে সে হ'য়ে ওঠে উর্বর, কেননা তখন সে পায় হৃদয়ের অঙ্গীকার। তুমি একটি পত্রে আমাকে মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব সংশয়ী প্রশ্ন তুলেছিলে তার সমাধানও হবে এইখানেই। মেয়েদের কাছে পাওয়া স্বীকারের অপেক্ষা রাখে। বিশেষ করে আমাদের দেশে—যেখানে মেয়েদের দান ঠিক অনাদৃত না হ'লেও অগ্রাহ্য থাকে—প্রায়ই। তাঁরা বাড়ির মধ্যে থেকে আমাদের সুখশান্তির খোরাক জুগিয়ে খালাস—আমরাও বড় জোর বক্তৃতায় বা লেখায় বঙ্গরমণীর স্নেহশীলতা সম্বন্ধে দুটো বোলচাল দিয়ে খালাস।

কিন্তু এ দেওয়া-নেওয়ার ভিতরকার ছন্দটিই ভুল—কেননা এর মূলে অনুভবদৈন্য। এই জন্যে অনেক আধুনিক তরুণদের নারীনিন্দায় আমি দুঃখ পাই। এ-ব্যঙ্গে সস্তা বাহাদুরি একটু-আধটু থাকতে পারে হয়ত, কিন্তু বহুমূল্য পৌরুষ যে নেই এ ধ্রুব। কারণ মেয়েদের কাছে আমরা নিত্য নিয়ত কতখানি যে পাই সেটার হিসাব ভুলি—আমাদের চেতনা অসাড় থাকে ব'লে, তাঁদের দেওয়ার হাত দরাজ নয় ব'লে না। আর জীবনে সব চেয়ে বড় লজ্জা এই চেতনার অসাড়তা।

ওদেশে গিয়ে নারী সম্বন্ধে এ কথাটি সুভাষ প্রথম উপলব্ধি করে শ্রীমতী ধর্মবীরের সৌভ্রাত্র্যে। আমিও।



সুভাষচন্দ্র—জেন—দিলীপকুমার

তবে সুভাষের সঙ্গে আমার তফাৎ ছিল এই যে, ও এ সৌভ্রাত্র্য বড় একটা চাইতনা ওদেশে (এদেশে হয়ত একটু আধটু চায় অনেক ভেবেচিন্তে বুঝে সুঝে); আমি এ বিষয়ে একটু বেপরোয়া হ'লেও হাত বাড়াতে সাহস পেতামনা—সুভাষ কি বলবে ভয়ে। সুভাষকে এই নিয়ে গত বছরও আমি খুব ঠাট্টা করেছি। আজকাল সুভাষ

মেয়েদের প্রসঙ্গে খুব হাসে। কিন্তু সে সময়ে নারী-প্রসঙ্গ ওর সাম্‌নে তোলে কার সাধ্য। ১৯২০ সালে লণ্ডনে একবার একটি ছবি তুলেছিলাম আমরা তিনজন: সুভাষ, আমি ও একটি ফরাসি বালিকা। সেটিও ছাপতে পাঠাচ্ছি। • সুভাষের মুখের গুমট অনুধাবনীয়। এ নিয়ে বড় মজা হয়েছিল সেদিন।

থিয়েটার রোডে আমার মাতুলালয়ে গত বছর আগষ্টে সুভাষকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। লীলা দেশাইকেও। অবাক্ হ'য়ে গেলাম দেখে যে সুভাষ বেশ সুস্থ মানুষের মতনই কথা-বার্তা কইল লীলার সঙ্গে। কে বলে মিরাক্লের যুগ গত। লীলাকে বললাম: "জানো লীলা, এ-সুভাষ কী ছিল এক-দিন। লণ্ডনে জেন ব'লে একটি নয় বছরের ফরাসি মেয়ের সঙ্গে আমার যখন খুব ভাব, তখন তাদের বাড়ি একদিন ওকে চায়ে ডেকেছি হ্যামারস্মিথে। মেয়ের মা সুভাষের কমনীয় কান্তি দেখে বল্‌লেন—ফটো তুলবেনই তুলবেন। সুভাষ খাসা হাসছিল আমার সঙ্গে। জেন মাঝে দাঁড়াতেই ওর মুখ ছেয়ে গেল শ্রাবণের ঘনঘটায়। বললাম: "সুভাষ, বলি ও সুভাষ! বদন তোলো, জেনের বয়স দশের বেশি নয় নয় নয়, তিন সত্যি করছি।" সুভাষ ওর প্রাণখোলা হাসি হেসে আমার কাঁধে গুম্ গুম্ ক'রে কিল বসিয়ে দিয়ে বলল: "মিথ্যুক।" আচ্ছা, আমি মিথ্যুক কিনা তোমরাই বলো না ভাই ছবিটা দেখে। শুনি ওয়াশিংটন বাল্যকালে মাকে বলেছিল: "মা, ভয় কি জিনিষ?" এ-সুভাষকে দেখে মনে হয় না কি যে ও ছেলেবেলায় বলেছিল মাকে: "মা, হাসি-খুশি কাকে বলে?"

কিন্তু এখানেই সুভাষের প্রভাব ছিল সবচেয়ে অসামান্য। নারী সম্পর্কে আমরা (শতকরা নিরানব্বই জন অন্তত) যে বিলক্ষণ দুর্বল, একথা (ঈষৎ সলজ্জে) স্বীকার করলে ভরা-ডুবি হবে না। কিন্তু সুভাষ পড়ে সংখ্যালঘিষ্ঠেরই দলে। এ বিষয়ে ওর মনের জোর আমাদের কাছে ছিল—(কি বলব?)—প্রায় একটা আদর্শ গোছের। মনে পড়ে কেম্ব্রিজে পুরী ব'লে একটি পাঞ্জাবি ছেলে ছিল—সে কাউকে রেয়াৎ করত না। আর ওদেশে তরুণরা চায়ের টেবিলে যে ভঙ্গিতে নারীচর্চ্চা করে সে তো জানো না। এ-প্রতি-যোগিতায় পুরী প্রায়ই পেত প্রথম পুরস্কার। এ-হেন পুরী সুভাষকে দেখলেই কথাবার্ত্তায় সেণ্টপার্সেণ্ট শুকদেব ব'নে যেত। বলত সুভাষকে দেখলে ওর জিভ Sweet-heart বলতে গিয়ে ব'লে বসে madonna! এটা হাসির কথা নয় নারায়ণ! সুভাষের ব্যক্তিত্বের এই অসামান্য ক্ষমতা চোখে দেখলে বুঝতে কী ব্যাপার। একথা সত্যিই বাড়িয়ে বলছি না যে সুভাষের কথা ভেবে মনের বহু দুর্বল মুহূর্তে অনেক ভারতীয় ছাত্রই জোর পেয়েছে ওদেশে। হয়ত কন্টিনেণ্টে সুভাষ আমার কাছাকাছি থাকলে য়ুরোপীয় নারী বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে কেবল পুঁথিগত জ্ঞান নিয়েই ফিরে আসতাম। তাতে ফল ভালো হ'ত না মন্দ দাঁড়াত, এ নিয়ে অবশ্য মতভেদ থাকতে পারে—কিন্তু সুভাষের চরিত্রবলের যে-প্রভাব আমাদের অনেকের কাছে এমন অক্ষুণ্ণভাবে জাগ্রত ও সত্য ছিল তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে যে পারা যায় না, এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ হবে না বেশি।

কিন্তু না—এ-বিপজ্জনক প্রসঙ্গ শেষ করি—কেঁচো খুঁড়তে কখন কী বেরোয়, কাজ কি ভাই।

কি বলছিলাম যেন? হ্যাঁ, এহেন সুভাষকে শ্রীমতী ধর্মবীর পোষ মানিয়েছিলেন—চালাকি নয় হে নারায়ণ, চালাকি নয়। সে সময়ে আমাদের আর একটি প্রিয় বন্ধু ছিল ঐ রুদ্র। অবাঙালি। এখন সে এলাহাবাদের অধ্যাপক। কী চমৎকার ছেলে যে! সে কিন্তু খুব নারী-ভক্ত ছিল। কেম্ব্রিজেও তার ভালো বান্ধবী ছিল। সুভাষ পরে তার সঙ্গে ভাব ক'রে মত অনেকখানি বদ্‌লেছিল, মনে আছে একবার যেন বলেছিল আমাকে: "রুদ্র এদেশে সত্যি লাভ করেছে—আমি করতে পারি নি।" না, যতদূর মনে হচ্ছে একথা ও লিখেছিল পত্রে—দেশে রওনা হ'য়ে। সে চিঠি আমি পাই ধর্মবীরদের ওখানেই। সুভাষের চিঠি প'ড়ে শ্রীমতীর চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল। সেদিনের একটা কথা মনে আছে এখনো। সুভাষ লিখেছিল দুঃখ ক'রে যে সে শ্রীমতী ধর্মবীরের সঙ্গে একটু আড়ষ্ট মতন হ'য়েই মিশত—কারণ মেয়েদের সঙ্গে মিশতে সে শেখে নি কোনোদিন। লিখেছিল: "It is easier for a leopard to change his spots than it is for me to come out of the shell of my reserve in mixed company"—বাঘের উপমাটা স্পষ্ট মনে আছে—ওর ভাষাটা হয়ত হুবহু এই ছিল না। কিন্তু মনটা এই।

এমন যে-সুভাষ, সেও বিদেশিনীদের সঙ্গে মেলামেশা শুভ ব'লে মেনেছিল প্রধানত শ্রীমতী ধর্মবীরের চরিত্রগুণে। তাহ'লেই বুঝে নিও—ইনি কি রকম গুণবতী ছিলেন। না—আরো একটু ব'লেই ফেলি বেপরোয়া হ'য়ে। শুধু গুণবতী হ'লে সুভাষও এতটা মুগ্ধ হ'ত না—তিনি বিলক্ষণ রূপবতীও ছিলেন। (একথা সুভাষ কখনো পড়বে কি না জানি না—তবে পড়লে যদি নারী-শব্দে ওদেশের ম'ত রাঙা হ'য়ে ওঠে তো "সৌভ্রাত্র্য" রক্ষাকর্তাকে ডাক পেড়ে শেষ-রক্ষা করতে পারব এই যা ভরসা)।

নারায়ণ, তুমি নারীভক্ত না হওয়া সত্ত্বেও হয়ত মানবে যে নারীর রূপ একটা মস্ত বিস্ময় এ জগতে। হয়ত পুরুষের রূপেও বিস্ময় আছে, কিন্তু নারীর রূপে—আমার মনে হয় অন্তত—একটা বিশেষ যাদু আছে—যা থেকে যুগে যুগে বহু শক্তিধর পুরুষ জীবনে বহু লাভ করেছে—পেয়েছে অনেক স্থায়ী সম্পদ, সঞ্চয় করেছে সৃষ্টির প্রেরণা, উৎসাহের আগুন, কর্মের নিষ্ঠা। অবশ্য তনুশ্রীর রূপ চঞ্চল করে একথা বলারও দরকার করে না—নারীলাবণ্য এমন কি ইতিহাসের গতিও অনেক সময়ে বদ্‌লে দিয়েছে। কিন্তু আমি একটা গুরুগম্ভীরতার দিকে না ঘেঁষে আজ শুধু বলতে চাই যে নারীর রূপের একটা মস্ত ক্ষমতা হচ্ছে এই যে তার ছোঁয়াচ লাগে গুণেও। তাই গুণবতী যখন রূপবতী হয়, তখনই গুণও পারে তার পূরো শক্তিতে সক্রিয় হ'তে। মানি যে গুণহীন রূপের প্রভাব বেশি দূর পৌঁছয় না, কিন্তু শুধু রূপহীন গুণের সমষ্টিতেই কি মন পূরোপূরি ভরে নারায়ণ? এখানে রূপসী বলতে আমি কিন্নরী অপ্সরীদের কথা বলছি না—বলছি শ্রীমন্তিনীদের কথা। আমি বারবার অনুভব করেছি যে গুণের পালে রূপের হাওয়া লাগলে তবেই মেয়েদের স্নেহ প্রীতি ভালোবাসার তরী তর্ তর্ ক'রে চলে—গুণের বীজে রূপের জল পড়লে তবেই সে আমাদের মনের মাটিকে করে উর্বর। অন্য ভাষায়, একই হাসি একই প্রভাব রূপের সহযোগে যেভাবে আমাদের মনকে সচল করে, বেগ দেয়, জাগিয়ে তোলে—শুধু গুণের মাধ্যমে সেভাবে সক্রিয় হয় না। তাই রূপকে শুধু রূপের এলাকাতেই নয়—গুণের দরকষায়ও আমি বাহ্য মনে করি না। রূপের এমন ক্ষমতা আছে যে সে আছি বললেই লোকে চম্‌কে ওঠে। এ সহজ কথা নয়। মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের একটি কথা: ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি অন্তরাত্মায় আবির্ভাব হয় প্রেমে, মনে আবির্ভাব হয় জ্ঞানে, প্রাণে আবির্ভাব হয় শক্তিতে, বস্তুতে আবির্ভাব হয় রূপে। রূপকে ছোট করতে গেলে হবে কী বলো?

এ-চিঠির সমাপ্তি টানবার সময় এলো—তবে তার আগে একটু বলার আছে শ্রীমতী ধর্মবীরের সম্বন্ধে। তাঁকে আমরা অনেকেই দিদি বলতাম। এখনো বলি। সুভাষকে ও আমাকে তিনি সত্যিই ছোট ভাইয়ের মতন দেখতেন। আজকালকার বাস্তববাদী অনেকে বিশ্বাস করেন না যে সঙ্গিনী অনাত্মীয়ার সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য সম্বন্ধ হ'তে পারে—কিন্তু না করলে কিছু যায় আসে না—যেহেতু এ যে সত্য সে বিষয়ে নির্জলা অনুভবস্বাক্ষরিত দলিল রয়েছে বহু সত্যনিষ্ঠ স্বজনের। শ্রীমতীকে দিদি বলতে পেরে সত্যিই কি-যে তৃপ্তি পেতাম আমরা! এখনো মন ভ'রে ওঠে ভাবতে—যে এঁর সেই স্নেহ আজও আছে সুভাষ ও আমার প্রতি। কী মিষ্ট অথচ রসাল পত্রই যে ইনি লিখতেন ওদেশে। ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে এঁর রসিকতার মধ্যে প্রায়ই মিষ্ট ফরাসি খোঁচা ভারি উপভোগ্য হ'য়ে উঠত। ওদেশে বিদেশিনীর সঙ্গে প্রথম অন্তরঙ্গতা হয় আমাদের এঁরই সঙ্গে। সেই জন্যে এঁর কাছে ঋণকে বলা চলে—সেই ধরণের ঋণ যা সুদে বাড়লেই মন হয় খুশি। বিশেষ ক'রে আমার কত উপদ্রব যে তিনি সইতেন বিলেতেও। সদলবলে ছাড়া তো বড় একটা আমার অভ্যুদয় হ'ত না; প্রায়ই বন্ধুবান্ধবী নিয়ে হানা দিতাম তাঁর ওখানে। ১৯২৭শে বিলেতে ওঁদের ওখানে শেষবার যাই শ্রীমতী রাণী মহলানবিশকে নিয়ে।

ডাক্তার ধর্মবীরও অতি সদাশয় লোক। যেমন আতিথেয়, তেম্‌নি উদার, দেশভক্ত, রসিকতাপ্রিয়, হাস্য-প্রবণ—দেশের কৃতী সন্তান। ওদেশে তিনি ছিলেন ভারতীয়দের কৃতিত্বের স্তম্ভ হ'য়ে। মস্ত বাড়ি, মোটর, পসার যথেষ্ট, লোকপ্রিয়, ডাক্তারিতে সুনামেরও অভাব নেই, সচ্চরিত্র, শ্রমশীল। এ ধরণের মানুষই থাকে সমাজকে ধারণ ক'রে। নারায়ণ তুমি "বুর্জোয়া মেণ্টালিটি" উচ্চারণ করতে নিশ্চয়ই প্রত্যহ শিউরে ওঠো—কিন্তু আমি উঠি না। সমাজে বুর্জোয়াদের অনেক দোষ ত্রুটি আছে মানি—সলজ্জে। কিন্তু এ-ও একটা নির্লজ্জ সত্য যে এ-বুর্জোয়া সংস্কৃতির মধ্যে বিরল সৌন্দর্যও অনেক আছে।

ডাক্তার ধর্মবীরকে দেখলে একথা মনে না হ'য়েই পারত না। তিনি ছিলেন বুর্জোয়া-বনস্পতির একটি শ্রেষ্ঠ ফল। মানি এ-নমুনায় অসম্পূর্ণতা আছে, অসম্পূর্ণতা কিসে নেই? তবু এ যে সুন্দর তার প্রধান কারণ এ-শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দুটি মস্ত গুণ নিখুঁৎ হ'য়ে ফুটে ওঠে প্রায়ই: সংযম ও দাক্ষিণ্য।

তাঁকে সুভাষ বলত "the brave doctor": আমি জুড়ে দিতাম—and always braving the weather. কারণ ঝড় বৃষ্টি যাই হোক না কেন, ডাক্তার নির্ভয়ে বেরুতেন মোটর হাঁকিয়ে। আমাকে ডাকতেন। কিন্তু এখানে আমি বুর্জোয়া সভ্যতার চেয়ে আরিস্টক্রাসিরই বেশি অনুরাগী ছিলাম—বলাই বাহুল্য। ও শীতের দেশে ঘরে ব'সে আগুনের পাশে গালগল্প করার মতন জিনিষ আছে? —বাইরে যখন সারা আকাশ ভেঙে বরফ পড়ত—তখন এমন কি সুভাষের দুন্দুভিও আমাকে মোটর বিহারে টেনে বার করতে পারত না। আদর্শবাদে আরাম আছে মানি—কিন্তু কাঁপন লাগানো শীতে গৃহচুল্লিবাদ আরো সরেস নারায়ণ, বিশ্বাস কোরো।

এঁদের দুই মেয়ে: সীতা ও লীলা। ভারি মিষ্টি দুজনেই। সে সময়ে (১৯২০তে) সীতার বয়েস হবে এগার বছর, লীলার বয়স আট নয়। আজ সীতা লীলা দুজনেই ডাক্তার। সীতা বিবাহ করেছে বাঙালি, আছে দিল্লিতে। লীলা খুব ভালো পাশ ক'রে প্র্যাক্টিস করবে ঠিক ক'রে গোড়ায়ই লম্বা জিরিয়ে নিচ্ছে। এম্‌নি সময়ে আমরা পুরো এক ডজন অতিথি ওখানে হানা দিলাম—কাশ্মীরের পথে। "ইতিহাসের পুনরাবর্তন" বলে না? এগার বৎসর বাদে এঁদের সঙ্গে ফের দেখা।

দ্বিতীয় স্তবক

রেবা—সুধীন!

প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদের আলাদা আলাদা দুখানা চিঠি লিখব। কিন্তু ঐ ভয়—পাছে তোমাদের পৃথক্ করলে তোমরা রাগ করো! শাস্ত্র বলছেন: পুরুষ ও প্রকৃতিকে আলাদা করতে নেই। যেহেতু ওরা উভয়েই অনাদি। যেহেতু "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"—যে সে না—স্বয়ং গীতা! যে কারণেই হোক আমার 'পরে তোমাদের একটা প্রীতি মতন জন্মেছে—আমি শাস্ত্র কখন কিছু আয়ত্ত করেছি ব'লে। তোমাদের আলাদা করলে পাছে সেই অপল্‌কা সম্ভ্রমটুকু খোয়াই, সেই ভয়ে ভাবছি discretion is the best part of valour: তাছাড়া তোমরা একে কুলীন, তাতে রাজবংশীয়—না না ভাই, ও পুরুষ-প্রকৃতির ছাড়াছাড়িতে আমি নেই। আখের তো ভাবতে হবে। বিশেষ যখন তোমাদের দেখলে মন শুধায়: এ কলিযুগে শাস্ত্রজ্ঞদের টীকা কি রকম দাঁড়ায়? জায়া-পতির ছায়া, না উল্টো? যেটিই সাব্যস্ত হোক, তোমাদের নিবিড় বন্ধনের মধ্যে জোড়-ভাঙা কোনো কাজের কথা নয়। তাই যুগলে সম্বোধন।

এ-স্তবক তোমাদের শিরোনামাঙ্কিত করার একটু মানে আছে। তোমরা সুভাষের অনুরাগী। এতে সুভাষ সম্বন্ধে আরো কিছু লিখবার ইচ্ছা। আমার মনে আছে—গত বছর সুভাষকে সেই যেদিন আমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ করেছিলাম—তোমরা এলে না—তোমাদের বলতে দেরি হ'য়ে গিয়েছিল এই অভিমানে। আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছিল ভেবে দুঃখ হয়েছিল বৈ কি, কিন্তু তার উল্টো পিঠে এই ক্ষতিপূরণটুকু অন্তত ছিল যে তোমরা সুভাষকে বেশি ভালোবাসো ব'লেই এলে না। তাই সুবিধা পেয়ে নিজের একটু সাফাই গেয়ে নিই তোমাদের কাছে। কি জানো? সুভাষ সম্বন্ধে আমার পক্ষপাত আছে ব'লে একটা গুজব শুনতে পাই। আমার মনে হয় গেটের কথা: "আমি অকপট হব ভরসা দিতে পারি, কিন্তু নিরপেক্ষ হব এ-ভরসা দেই কী ক'রে?"

কিন্তু কি জানো? আমার এজন্যে খুব অনুতাপও হয় না। যাকে ভালবেসেছি তার বিচারক হ'তে আমার মন সরে না। কারণ সংসারটা যদি ডোবেই, তবে বিচারকের অভাবে ডুববে এ-ভয়কে আমি কোনোদিনই খুব আমল দিতে পারি নি। সুধীন, সংসারে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যত মেলে, তার সিকির সিকিও যদি মিলত দরদী!

তোমরা হয়ত ভাবতে পারো সুভাষ সম্বন্ধে আমার দুর্বলতার কারণ আমাদের কৈশোর বন্ধুত্ব। কিন্তু শুধু তা নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে কৈশোরের সখ্য বড় মধুর। বিশেষ যদি পরিণত বয়সেও প্রীতি সে-স্নেহের জের টেনে

চলে। কিন্তু সুভাষের সম্বন্ধে আমার দরদের মূলে আছে আরো দুটো জিনিষ—শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা : এই জন্যে যে, জীবনে পবিত্রতার দিকে সবচেয়ে বড় প্রেরণা আমি পাই প্রথম তার কাছে—তারপর আমার এক ইংরাজ বন্ধু কৃষ্ণপ্রেম ওরফে রোনাল্ড্ নিক্সনের কাছে। নেপোলিয়ন এক মহিলাকে বলেছিলেন : "মাদাম, আমি সতীত্বকে শ্রদ্ধা করেন কেন আমি জানি—আমরা শ্রদ্ধা করি সেই বস্তুকেই যা আমাদের নেই।" একথাটা হয়ত নিছক পরিহাস নয়। আমার জীবনে ও চরিত্রে দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতা বড় বেশি—সেই জন্যেই কৃষ্ণপ্রেম ও সুভাষের চরিত্রের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা আমাকে এত স্পর্শ করে কি না আমি ভেবেছি বহুবার। কিন্তু এ ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে দেখতে চেয়ে একথা তুলি নি। এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম বোঝাতে—কেন সুভাষের এই দিকটা আমার অত্যন্ত ভালো লাগে। শ্রীঅরবিন্দ একথায় বলেছিলেন বাঙালির নেই দুটি জিনিষ—তপস্যা ও নিষ্ঠা। কৃষ্ণপ্রেমের নিষ্ঠা, জহরলালের নিষ্ঠা বুঝি—কিন্তু সুভাষ বা অনিলবরণ বাঙালি ব'লেই ওদের ঐকান্তিকতার দাম দেই বেশি। হরিণ ছুটতে পারে—এজন্যে তাকে বাহবা দেই না আমরা। কিন্তু শামুক যদি দেখি হরিণের সঙ্গে পাল্লা দিল, তো সাবাস না ব'লে পারা যায় কি? সুভাষের মধ্যে নিষ্ঠা ও ব্যূহ-গড়ার (অর্গ্যানাইজেশন) ক্ষমতা আমাকে অভিভূত করে। এগুল বাঙালির ধাতে নেই।

এই যে নিয়ম ক'রে গুছিয়ে কাজ করা—এ সুভাষের মজ্জাগত। মনে পড়ে ওর কেম্ব্রিজের জীবন। বই পড়বে—তাও অতি সন্তর্পণে। একটি বই নামাবে তো আর একটি রাখবে তুলে। সব গোছালো—পরিপাটি। শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা ওর সহজাত—কবচকুণ্ডল। আর আমি? এখানে বই, ওখানে বই, সেখানে কাগজ। কোথায় পেন্সিল? প'ড়ে ভেঙে গেছে শিশ। আঃ—ছুরি? ভোঁতা হ'য়ে গেছে—ধার দেওয়া আর হ'য়ে ওঠে না। কবিতার খাতাটা? ও যাঃ, হারীনের ওখানে ফেলে এসেছি। সাধে কি সুভাষকে শ্রদ্ধা করি! "যা আমাদের নেই, তা-ই তো আমাদের অভিভূত করে—" নেপোলিয়ন মিথ্যা বলেন নি।

কিন্তু এসব বিষয়ে সুভাষ বোধহয় খুব বদলায় না। বড় বড় চ্যুতি সম্বন্ধে আটঘাট বাঁধা যায়, কিন্তু ছোটখাটো তুচ্ছ ত্রুটি—কে অত খেয়াল করে? সুভাষ বকত আমাকে। আরও বকত আমি বড্ড বাজে লোকের সঙ্গে মিশতাম ব'লে। বলত : "দিলীপ, তুমি আড্ডা দিয়ে বড় বেশি সময় নষ্ট করো—মনে রেখো, দেশ তোমার কাছে অনেক আশা করে। জানি না আমার কোন্ অপরাধে ও নিজের আশা দেশের ঘাড়ে চাপাত। তবে ভরসার কথা এই যে, বিচক্ষণদের মধ্যে কেউই আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতখানি আশান্বিত নন। আমিও তাঁদেরই দলে এখানে। কারণ আমি বেশ জানতাম দেশের ও দশের একজন হওয়া আমার সম্ভব হবে না। এর জন্যে চাই ঐকান্তিক অধ্যবসায় ও একমুখী নিষ্ঠা। এ দুটির কোনোটাই আমার নেই। আমি আজ যা ধরি, কাল তা ছাড়ি। এক জায়গায় দুমাস থাকতে বাধ্য হওয়ার চেয়ে কৃচ্ছ্র আমার কাছে কমই আছে। দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তানরা অন্য ধাতু দিয়ে গড়া, সমাজের স্তম্ভ যাঁরা—তাঁদের শিকারি গোঁফ দেখতে না দেখতে চেনা যায়! child is the father of man বলে না? সুভাষকে দেখলে এটা বোঝা যেত প্রথম থেকেই—প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন ও তর্কসভার উদ্যোগ করত, তখন থেকেই মনে হ'ত ওর প্রকৃতি একমুখী—রোখালো। না ভাই রেবা, ও একটা কথাই নয়—আমার দ্বারা মস্ত কোনো কাজ হবে এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। কিন্তু এ-আত্মনিন্দার উদ্দেশ্য আত্মপ্রসাদ নয়—সুভাষ-প্রশংসা। ওর নীরস পলিটিক্স চর্চা দেখলে যদিও আমি ত্রস্ত হ'য়ে উঠি, তবু মনে হয় আহা, আমার যদি থাকত ওর সিকির সিকি সহিষ্ণুতা, লক্ষ্য নিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে উঠল। তুমি সুধীন, বড় ভালো ছেলে, তাই ভাবো যে "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ"—birds of a feather flock together; কিন্তু বন্ধুত্বের বেলায় একথা যে প্রায়ই খাটে না, এ একটু চোখ চেয়ে দেখলেই বোঝা যায় না কি? ধরো না কেন সুভাষ ও আমার বন্ধুত্ব। বলো দেখি, আমাদের মধ্যে কি ম-ত আছে? তবু কেম্ব্রিজে ওতে আমাতে খুবই ভাব ছিল এ সবাই জানত। ক্ষিতীশ, দিলীপ ও সুভাষ কেম্ব্রিজে উপাধি পেয়েছিল "থ্রি মস্কেটিয়ার"। ক্ষিতীশের সঙ্গে সুভাষের ভাব বুঝতে পারি—কিন্তু আমার জীবনের সঙ্গে

ওর জীবন জড়ালো যে কী ক'রে—ভেবে সবাই হ'ত অবাক্। একজন ভালোবাসে গান বাজনা আমোদ প্রমোদ: আর একজন—কর্ম পড়াশুনো কর্তব্য। একজন ভালোবাসে বাজে লোকের সঙ্গে মিশতে: আর একজন—বাছা বাছা মনীষীর বক্তৃতা শুনতে। একজন ভালোবাসে থিয়েটার, টেনিস, দাবা: আর একজন পড়াশুনো, সভাসমিতি, ভাবা। একজন ভালোবাসে অপব্যয়: আর একজন—মিতব্যয়। একজন আশৈশব হিরো-ওয়র্শিপর, গুরুবাদী: আর একজন মনে প্রাণে পুরুষসিংহবাদী—স্বাবলম্বী। বুঝলে রেবা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞানী ছিলেন, বলতেন: "ঈশ্বরের কাণ্ড কিছুই বোঝা যায় না, তাই আমি আদপে বুঝবার চেষ্টা করি না।" সত্যি—

কে যে কখন কার পানে ধায়—কার ছোঁয়াতে কে দেয় সাড়া
কেউ কি জানে? টান-হেঁয়ালির কেউ কি পেল কূল কিনারা?
তবুও ভাই সবাই বলি—মিলের পথেই জানাজানি:
হায় অমিলেই হয় যে মিলন—মালাবদল কানাকানি।
কোন্ বেসুরের ছদ্মবেশে বেজে ওঠে সুরের বাঁশি
কেউ কি জানে? কেমন ক'রে কে করে কার মন উদাসী?

* *

শ্রীমতী ধর্মবীরের সঙ্গে এই কথা হ'ত প্রায়ই। ডাক্তার ধর্মবীরও সুভাষকে বলতেন আমাকে শুধরোতে। সুভাষ হাসত। পেয়েছি সুধীন, ইউরেকা। একেবারে কোনো মিলই কি আর ছিল না? হয় কখনো? এই হাসির ক্ষেত্রে ছিল মিল। সুভাষের একটা দুর্নাম আছে ও বড় গম্ভীর ব'লে। কিন্তু অমন মিষ্ট প্রাণখোলা হাসি জীবনে আমি কমই দেখেছি। আমি প্রায়ই মনকে প্রশ্ন করি,

বল্ দেখি মন কার পানে তুই পাল তুলে চাস যেতে?
অকূল মাঝে কোন্ সে-কূলের চাস বা নাগাল পেতে?
মন বলে: "ভাই, কাকে যে চাই ঠাহর না পাই হায়,'
শুধু জানি—চাই না কাকে: হাসতে যে না চায়।"

সুভাষ শরৎচন্দ্রকে প্রথম ভালোবেসেছিল তাঁর হাসাবার ক্ষমতার দরুণ। বেশ মনে আছে, শরৎবাবুর প্রতি কথায় সুভাষ কিরকম হো হো ক'রে হাসত—হাসতে হাসতে চোখে জল আসত ওর—গড়িয়ে পড়ত। সেদিনও—মানে. যেদিন তোমরা এলেনা—সুভাষ এক গল্প বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় বিষম খাবার জো। গল্পটা বলিই না—সুভাষের জীবনের একটা দিকের ট্রাজিডিও ফুটবে। কিন্তু না—

দিলীপ-সুভাষ-কথা অমৃতসমান
বলিব ছড়ায়, শোনে যে—সে পুণ্যবান্।
বলিল দিলীপ: "সুভাষ, তুমি দরদী শোনো তাই বলি:
সুরের জীবন নয় সুরেলা-ই বহুৎ বেসুর যায় ছলি'।
এই সেদিন এক শিখ কালোয়াৎ ধরল:
'শুনুন গান আমার।'
ক্ষিধেয় মরি হায়, ও লাগায় দিনদুপুরে হুহুঙ্কার!
রক্ত হ'ল হিম—আর প্রায় খাঁচাছাড়া হয় পরাণ।
কোলের শিশুর ঘুম ভেঙে যায়—কোকিয়ে কাঁদে কম্পমান।
বিকেলে তান থামে, বলে: 'বখশিশ? হুজুর জহরী!'
গানও সুভাষ, হয় কাবুলি—নয় সে শুধুই সুরপরী।"
চোখ-ছলছল বলল সুভাষ: "ব্যথার ব্যথী পেলাম ভাই,
আমার কাঁটাপথের কথাও শুনিয়ে তোমায় প্রাণ জুড়াই।
উমেদার এক এলেন সেদিন—হায়, গেছে তাঁর ঘর প'ড়ে,
বললেন 'আমায় দিন তুলে আজ পাঁচশো টাকা কম ক'রে।'
মর্মভেদী লিখলাম আপীল—জুটল টাকা, উঠল ঘর,
পেলাম অঢেল ধন্যবাদের পুষ্পবৃষ্টি অতঃপর।
দুদিন বাদে—ওমা! আবার তিনিই উদয়—কন্যাদায়!
'দয়াল ঠাকুর বিনা হবে হাজার টাকার কী উপায়?'
বললাম আমি: 'নেইক টাকা—যান না
আর কারুর কাছে।'
বললেন: 'হায়, ঠাকুর বিনা ভক্তের আর কে আছে?'
বললাম: 'নই আমি ঠাকুর, ভক্তি তাকে দিন—যে চায়'
বললেন: 'সে-ই পায় ভক্তি—আসক্তি যার নেইক তায়।
আচ্ছা, টাকা না দেন, আমার কন্যাটিকে নিন নিজেই।'
অবাক্!—'বলি, ঠাট্টার আর জায়গা কি এ বিশ্বে নেই!!'
'ঠাকুর সাথে ঠাট্টা!'—হ'ল রাগ: 'তবে কি বলতে চান—
ভক্তের আছে কন্যা ব'লেই নেবেন ঠাকুর কন্যাদান?
এ কোন্ দেশী কথা?—বাঃ! এ-ই বা কথা কোন্ দেশী!!!"
বলে সুভাষের সে কী হাসি—! থামতে চায় না।

শ্রীমতী ধর্মবীরকেও ওর এত ভালো লাগার কারণ তাঁর রসবোধ। ক্ষেপাতে খুনসুড়ি করতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

টপাটপ জবাব দিয়েও তিনি কী যে হাসাতেন সবাইকে! কিন্তু এসব কথা এখন রাখি—নইলে কাশ্মীরে পৌছব যে কবে?

*　　*　　*　　*

ডাক্তার ও শ্রীমতী ধর্মবীরকে আমরা তার করেছিলাম। দুপুর রোদে ওঁরা এসে হাজির। ভারি লজ্জা করতে লাগল। পঞ্জাবি রোদ—তার বাধা হল্কা। কিন্তু আনন্দও হ'ল। বহুদিনের বন্ধুবান্ধবীকে এগারবৎসর বাদে দেখে সেই আগেকার কৃতজ্ঞ স্নেহস্পন্দন বুকের মাঝে অনুভব করার রোমান্স যে কী, তা তোমরা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারবে। বিশেষত বিদেশিনীর সঙ্গে স্বদেশে দেখা।

কত দিন বাদে! দিদির চুল কত যে পেকে গেছে। ডাক্তার বীরেরও। সেই ছোট্ট লীলা কত বড়টি হয়েছে। কিন্তু মুখের কমনীয়তা তেম্‌নিই রয়েছে। মনটা ভ'রে ওঠে কানায় কানায়; কেবল থেকে থেকে মনে হয়—সুভাষ যদি থাকত! দুদিন আগেও ছিল—দুদিন বাদে ফের আসার কথা। কেবল একসঙ্গে আর থাকা হ'ল না। কখনও হবে কি না তা-ই বা কে জানে? না হোক। স্মৃতির সম্পদ মণি হ'য়ে জ্বলবে আরো। বাইরে যা না পাই, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি কেনই বা? অন্তরের ঐশ্বর্যেই তো বাইরের রিক্ততার ক্ষতিপূরণ।

*　　*　　*　　*

আমাদের জন্যে বন্ধুবর তিন তিনখানি মোটর মজুদ রেখেছিলেন। আমরা শেক্ষপীয়রের দুর্ভাগ্যের মতন "বাটালিয়ন্‌" বেঁধে এসেছিলাম যে—পুরো একটি ডজন ছাঁকা। কিন্তু "স্বভাবো নাতিবিচ্যতে" আক্রান্ত বীরবন্ধুর চোখ বিপদের মশালে বাঘের চোখের মতন উঠল জ্ব'লে—ধর্মবীর তো ধর্মবীরই, তাঁর প্রতি ভঙ্গিই যেন হেঁকে উঠল স্পষ্ট:

অধর্মের কর্মভোগ! ধর্মবীর গর্জে: "হোক্‌,
নারভাস নহি।
দেখাবো যে কত সয় হে অগণ্য, নাহি ভয়
হব মোরা জয়ী।
'বাহান্ন জন যেথা তেষট্টি ধরে সেথা'—
শাস্ত্র-দৈববাণী।
অতএব এসো চ'লে দলে দলে কুতূহলে
দেব দানাপাণি।"

*　　*　　*　　*

শুধু দানাপাণিই নয়। রথযাত্রাও হ'ল তুমুল কল্লোলে। অবশ্য তোমরা হ'লে রাজবংশীয়। তোমাদের রাজ্যে খাঁটি সৎকার বুঝি হাতি চাপানো? কিন্তু হায়, ডাক্তার বীর হ'লেও তাঁর মুরদ মোটরের বেশি নয়। তবে কি জানো? এ-যুগে হয়ত তোমাদের কুলীন হাতির চেয়ে ম্লেচ্ছ মোটরই বেশি আরামের। তাছাড়া হাতির পিঠে থেকে যখন তোমার মতন বীরশ্রেষ্ঠের পায়ে বাঘে থাবা দেয়—না ভাই কাজ নেই আমাদের হাতির হাতিয়ার। নিরীহ মোটরই বেঁচে থাক আমার অক্ষয় মাদুলি হ'য়ে।

তাছাড়া আমরা এযুগের মানুষ। ছোঁয়াচ কি কাটানো যায় পুরোপুরি? আরো এক কথা: লাহোরের রাস্তাঘাট মোটরেরই উপযোগী। কী লম্বা চওড়া যে—! মনটা ছাড়া পেল অমৃতসরের পরে লাহোর দেখে।

দেখা হ'ল সেখানে এক অনেক দিনের বিলিতি বন্ধুর সঙ্গে—কুপার। পার্শি। সজ্জন, সুশ্রী, ভার্যার ভর্তা এখন—বেশ সঙ্গতিপন্ন। দেখে হিংসায় প্রায় গুপ্ত কবির কথা মনে হয় আর কি—"হ্যাদে দেখ ঘরে ঘরে সকলেই খায় পরে সুখে আছে পরস্পরে আজো এরা মরেনি!" মোটরে নিয়ে গেল বিকেলে এক বাগান দেখাতে। কিন্তু না—থাক বাগানপর্ব। হয়েছে কি জানো, এই সব দৃশ্যপটের রঙচঙ ভনিতা ক'রে ফলাতে আর ভালো লাগে না। তাছাড়া কী-ই বা বলব বলো দেখি? চমৎকার বাগান? বেশ। তারপর? জাহাঙ্গিরের সমাধির ওপর? তোফা। কিন্তু সে পঞ্জাবি সমাধি যদি জাহাঙ্গিরের না হ'য়ে সেলুকস বা সমুদ্রগুপ্তরই হ'ত, কী আসত যেত আমাদের—বা তোমাদের? যাঁরা ইতিহাসের নামে লাফিয়ে ওঠেন তাঁদের নাম "মার্কিন যাযাবর"—আমরা ভারতীয়রা, সত্যি সত্যি ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপে আনন্দে গলদ্‌ঘর্ম কলেবর হ'য়ে উঠতে পারি না ভাই সুধীন। ও যাঃ, ভুলেছিলাম তুমি পণ্ডিত লোক, খবর-বিলাসী। ওহে, শোনো শোনো—বাস্তবিক বাগানটি আমাদের খু—ব ভালো লেগেছিল। এর বেশি কিন্তু আজ নয়—কেমন?

আমার সত্যিই মনে হয় রেবা, সে সুন্দর দৃশ্য যদি বর্ণনা করতেই হয় কবিত্বকে তলব করা উচিত—নৈলে যা-ই বলো না কেন, দাঁড়াবে এই যে, লেখকের ভালো লাগল—কিন্তু পাঠকের, তাতে কী গেল এল ? আনাতোল ফ্রাঁসের একটি গল্প পড়ছিলাম—শোনোই না :

দুঃখ ক'রে বলেন রাজা : "পণ্ডিত আর অমাত্য হে !
এই জগতের ইতিহাসটা দখল করা অসাধ্য যে !
সংক্ষেপে সব লেখো। আমি না প'ড়ে কি মরতে পারি ?
মানুষ হ'য়ে বলব কি : 'হায়, ইতিহাসের ধার না ধারি ?"
বিশটি বছর খেটে তখন লেখে তারা বিশখানা বই।
রাজার সামনে বিজ্ঞে বোঝা নামিয়ে বলে : "মনের ম'তই
বিশ্ব-ইতিহাস ছেঁকেছি রোমাঞ্চকর তথ্যজালে,
এ-সরাবে চুমুক দিলেই জম্‌বে নেশা খুশখেয়ালে।"
বলেন রাজা : "বাঁচব বলো ক'টাই বা দিন ? বিশটি পুরাণ
পড়ব আমি ? ক্ষেপলে নাকি ? দাও ছেঁটে এ-হাতিবাগান।"
পণ্ডিতেরা দশটি বছর খেটে আরো দশটি কেতাব
মুটের মাথায় হাজির করে : "জনাব,
এবার চাই-ই খেতাব।"
"খেতাব !" রাজা হাঁকেন : "বেরো।
চোখের মাথা খেলি নাকি ?
শিয়রে যম—পড়ব পাহাড় ! পণ্ডিতি, না বেবাক ফাঁকি !
করব কোতল—অল্প কথায় ইতিহাস না হ'লে লেখা।
বিন্দুমাঝেই সিন্ধু ধরে—কবে তোদের হবে শেখা ?"
আরো পাঁচটি বছর খেটে পাঁচটি খণ্ডে ছকলো তারা।
রাজার তখন শ্বাস উঠেছে, বলেন : "হা রে বুদ্ধিহারা !
সময় আমার কোথায় মহাভারত পড়ার ? মরণক্ষণে
র'য়েই গেল অজানা হায় বিশ্ব-ইতিহাস জীবনে।"
একটি বালক ওদের মাঝে বলল রাজার কানের কাছে :
"হুজুর ! বিশ্ব-ইতিহাসের সবই জানার সময় আছে।
মরার আগে শুনুন—কী চায় বলতে এঁদের লেখাজোখা :
মানুষ সবাই জন্মায়, আর ভোগে—শেষে মরে বোকা।"

সাড়ে পনর আনা ভ্রমণবৃত্তান্ত-ও এই। তার সংক্ষিপ্তসার হ'ল

দেখেছি যাহা লিখেছি তাহা আহা !
তোমরা সবে বলিও বাহা বাহা !

* * * *

ডাক্তার বন্ধু বললেন, ওখানে লালা লাজপৎ রায় প্রতিষ্ঠিত যক্ষ্মাকাশী হাঁসপাতালের কিছু টাকা দরকার—আমরা যদি একটু গানটান করি…

বললাম পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ—পরোপকার করব ক্লান্তদেহে—কাশ্মীর থেকে ফিরতি মুখে…

সেদিন সন্ধ্যায় ওখানে একটু গান হ'ল নিজেদেরই মধ্যে। এঁরা নাচল না—সাজ সরঞ্জাম ছিল না। হাসি ও আমি গাইলাম। দিদি বাজালেন পিয়ানো। গাইলেনও।

কতদিনের পুরোণো স্মৃতি উঠল জেগে—মনে হ'ল যেন সেদিন ! সেই পিয়ানো সেই দিদির সঙ্গে একত্র গান বাজনা—সেই সুইজর্লণ্ডে একসঙ্গে মোটর বিহার—সেণ্ট বার্ণার্ড মঠে যাওয়া—কত কী !

সত্যি রেবা, জানো ? এক একটা ছোট্ট ঘটনায়, তুচ্ছ ছোঁওয়ায় বুকের মধ্যে তোলপাড় ওঠে জেগে। যা মনে ক'রে এসেছি হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যেই—দেখি, কই হারায় নি তো ! হারায় না ভাই, কিছুই। অনেক স্মৃতির সারে যেন নতুন আনন্দের নব-উপভোগের ফুল ফোটে। মনে পড়ল সেদিন সন্ধ্যায় বিশেষ ক'রেই সুভাষ ও আমার ল্যাঙ্কাশায়ারে এঁদের ওখানে একত্র স্থিতি—যাক্।

দিদি প্রথমটা খুব রাগ ক'রে গুম্ হ'য়ে ছিলেন আমার 'পরে। হয়েছিল কি ১৯২৮শে আমি ওঁদের ওখানে যাচ্ছিলাম—সত্যি রওনা হয়েছিলাম—আর একটু হ'লেই গিয়েছিলাম আর কি—সত্যি রেবা, বলছি হলফ ক'রে। কিন্তু কেন এ-একটুটা হ'ল না শুনবে ? শুনলে নিশ্চয় ক্ষমা করবে। হ'ল কি, লাহোর যেতে পথে লক্ষ্ণৌয়ে করলাম "যাত্রাভঙ্গ"—৺অতুলপ্রসাদের অতিথি। আর যাবো কোথায় ? তিনি কি ছাড়েন ? গান গান গান—লক্ষ্ণৌয়ে তখন গানের মৌসুম। অমন অচ্ছন বাই, ইন্দর বাইয়ের গান ছেড়ে যাওয়াও সোজা কথা নয়। কিন্তু ওদিকে দিদি পথ চেয়ে ছিলেন লাহোরে—আমি এলাম ব'লে। দু'সপ্তাহ বাদে আমার চিঠি গেল—যাওয়া হ'ল না—অতুলদা ছাড়লেন না। দিদি রাগ ক'রে বহুদিন আমাকে চিঠিই লেখেন নি। রক্তমাংসের শরীর তো—রাগ হ'লে দোষ দেওয়া যায় না। এ ধরণের চ্যুতি হ'লেই তো সুভাষ আগুন হ'য়ে ওঠে, বলে : এই পাপেই আমরা আরো ডুবলাম—আমাদের কথার ঠিক নেই, ব্যবস্থায় বেভুল, বন্দোবস্তের সব তছনছ। হঠাৎ

দেখি—সম্প্রতি—ওর অ-গোছালোদের ওপর একটা মমতা মতন হয়েছে: ও সেদিন বললে আমার সাম্‌নে বন্ধুবর শিশিরকুমার ভাদুড়িকে যে, তিনি যে ভালো রোজগেরে নন এতে সে বিস্মিত হয় নি—কারণ শিল্পীদের কাছে ভালো বন্দোবস্ত যোগান যন্ত্রের প্রত্যাশা করাই ভুল।

বললাম দিদিকে একথা। তিনি বললেন: "কিন্তু তাই ব'লে ১৯২৮শে আসব ব'লে—দশবছব বাদে আবির্ভাব?" ডাক্তার বীর বললেন হো হো ক'রে হেসে: "বাঃ, তুমি জানো না ওকে? ও চিরদিই একটু লেট-এ আসে—স্পিরিচুযাল লোক যে! এবার এই বিলম্বটা করেছে চুটিযে - কারণ আরো স্পিরিচুয়াল হয়েছে তো।"

স্পিবিচুয়াল কথাটার একটু ইতিহাস আছে। আমি তখন বার্লিনে। একটি রুষ সাঙ্গীতিক পরিবারে যাই রোজই। সামোভারে রুষ চা, খাদ্য ও আড্ডা! সেখানে একদা হাজির আমার রসিক বন্ধু শাহেদ সুরবর্দি। ললনারা জেরার সুর ধবলেন: "লেট কেন?" শাহেদ বলল হেসে



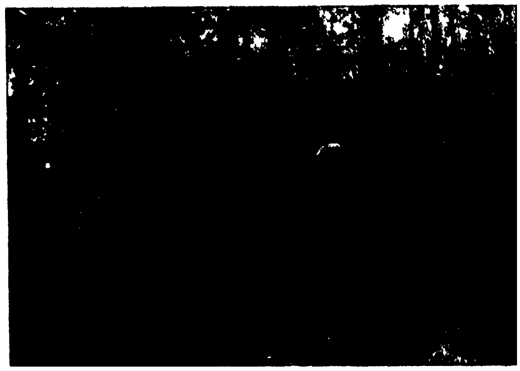
শাহেদ সুরবাদ

ফরাসি ভাষায়: "Mademoiselle, punctuality is the beginning of materialism."

ওঁদের একথা বলেছিলাম ১৯২৭শে ল্যাংকাশায়ারে। ডাক্তার বন্ধুও দিদি তো হেসে কুটি কুটি।

* * * *

দিদিকে বললাম: "দিদি শোনো তোমার রুষ গানের কী হাল করেছি। ব'লে হাসি ও আমি ডুয়েট গাইলাম



রুষ গীতশ্রী চতুষ্টয়

"অকূলে সদাই চলো ভাই ছুটে যাই··" মূল রুষ গানটি সাঙ্গীতিকীতে দিযেছি। গ্রামেফোনে এটি শুনেছ নিশ্চয়ই।

দিদি শুনে ভারি খুশি। সবচেযে খুশি হ'লেন হাসির গলা শুনে। বললেন: "এতদিনে আমি একটি প্রথম শ্রেণীর কণ্ঠ শুনলাম এদেশী মেযের। রাগ কোরো না দিলীপ—তোমাদের দেশে মেয়েরা কেন যে একটু ভালো ক'রে কণ্ঠসাধনা করেন না আমি ভেবে পাই নি।"

আমি বললাম: "আমি কিন্তু পেয়েছি দিদি। এযাবৎ গানে কণ্ঠমাধুর্যের খুব বেশি দর দেওযা হয় নি—যা আমি সেদিন কালিম্পঙে বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে।"

দিদি তো অবাক্, বললেন: "হেঁযালি?"

আমি বললাম: "না-না। আমবা গানে যে সব গুণপনার দাম বেশি দিয়েছি তাবা হ'ল—রাগ কৃতিত্ব, তাল কৃতিত্ব, তান কৃতিত্ব—এই সব। কিন্তু কণ্ঠলাবণ্যের স্থান যে গানের রসাবেশে খুবই বড়, একথা সবে হাল আমলে স্বীকৃত হ'তে সুরু হয়েছে।"

দিদি বিলিতি আবহাওয়ায় মানুষ, প্রথমে এটা বুঝতেই পারেন না, বললেন: "তুমি বলো কি দিলীপ? গানে কণ্ঠলাবণ্যের দাম দেব না তো দাম দেব কিসের?—কুস্তি কসরতের?"

হাসলাম, বললাম: "দিদি, তুমি বয়সে বড় হ'লে হবে কী—আছ ছেলেমানুষই। তাই জানো না—যে ঠাট্টা করতে গেলে অনেক সময়েই দৈববাণী বেরিয়ে যায় শ্রীমুখে। আমরা যে গানে সত্যিই কোস্তাকুস্তি হুহুঙ্কার তালঠোকা

এই সবেরই মূল্য দিয়ে এসেছি এতদিন। ভাবছ এ ঠাট্টা? না। আমি ভুক্তভোগী, বহুবার ঠেকে তবে শিখেছি যে আমাদের সমজদাররা গানে মিষ্টকণ্ঠকে ঠিক অবান্তর না হোক মস্ত কিছু মনে করেন না। এমনও দেখেছি যে শিক্ষার্থীর মিষ্ট কণ্ঠ ওস্তাদিয়ানার রৌদ্র-তাণ্ডবে অমিষ্ট হ'য়ে উঠল; কিন্তু হা অদৃষ্ট, একজন সমজদারও এতটুকু আক্ষেপ করলেন না! কারণ গানে মিষ্ট-কণ্ঠের তারিফ করার মধ্যে বাহাদুরি কী? ও তো সবাই পারে। এ বাড়িয়ে বলা নয় দিদি, লক্ষ্ণৌয়ে বালক চন্দ্রশেখরের গন্ধর্বকণ্ঠে সমজদাররা শুধু একটু দাঁত বের ক'রে হাই তুলে ক্ষান্ত হ'লেন। আমি প্রাণপণ চেষ্টা না করলে তার আশ্চর্য কণ্ঠ কেউ শুনতেই পেত না সেখানে। দুঃখের কথা বলব কি, এই উমা ওরফে হাসি—এর কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্বের দাম আমি ওস্তাদদের চেয়ে ঢের বেশি দেই ব'লে কত সমজদার কদরদানরাই যে অট্টহাস্য করা কর্তব্য মনে করেন জানো না তো। তাই শুনতে অবাক্ লাগলেও একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে গানে আমাদের পাকামির ফলে আমরা কণ্ঠের কাঁচা মিষ্টত্বের রসবোধটি হারিয়ে ব'সে থাকি—অথচ z-ন্তি পারি না।"

দিদি বললেন: "একথা এদেশে এসে অনেক দেখে শুনে আমারও সত্য মনে হয়। বিলেতে গায়ক-গায়িকারা সবচেয়ে বেশি যত্ন নেন আওয়াজকে গাঢ় মধুর সতেজ ও বোলন্দ্ করতে। এদেশে কিন্তু নারীকণ্ঠ মিন্‌মিনে কণ্ঠ—এমন কি কর্কশ কণ্ঠকেও আদর পেতে দেখেছি তোমাদের ও হুহুঙ্কারী ওস্তাদির নৈপুণ্যে। কিন্তু গানে কণ্ঠই যে সৌন্দর্য-প্রকাশের প্রধান বাহন—মীডিয়াম। কাজেই কণ্ঠলাবণ্য না ঘটলে গান পঙ্গু না হ'য়ে পারে? অন্তত আমাদের দেশে অসুন্দর কণ্ঠ যে গানে একেবারেই অচল এ বিষয়ে মতভেদ নেই। হাসির কণ্ঠ অপূর্ব লাগল। ধন্যবাদ হাসি! ওস্তাদি করতে গিয়ে এমন কণ্ঠ নষ্ট কোরো না লক্ষ্মীটি, মান রেখো—A beautiful voice is half the battle."

হাসি যথাবিধি সলজ্জ আপত্তি করল—ইংরাজি ভালো বলতে পারলে নিশ্চয়ই বলত তাঁকে:

I'm something Didi, I know well
But (Why on earth I cannot tell)
I keep protesting I'm no good
Though none believes nor ever should.

শুনে দিদিও বলতেন হেসে:

But I know Hashi, why you say,
That you are nothing : girls but play
At modesty which none believes,
Since for the nonce it still deceives.

* * * *

হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি একটা মস্ত কাহিনী। দুদিন ট্রেনে ঝাঁকুনি স'য়ে দুপুরে ধর্মবীরের আতিথ্যে ক্লিষ্ট মনকে চুটিয়ে আয়েষের বখশিশ দিচ্ছি, এমন সময়ে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড!—হা অদৃষ্ট! ভূমিকম্প আসবার কি আর সময় পেল না ছাই? কিন্তু না—ভূমিকম্প না—লাহোরে ভালো কানের দুল পাওয়া যায়। ঐ পঞ্জাবি রোদ মাথায় ক'রে বেরুল হাসি, এষা ও (হাসির মাসি) লীলা পানের বাটা হাতে।

রেবা, তুমি পান খাওয়া কাকে বলে জানো? হেসো না—কারণ সত্যিই জানো না। লীলাকে না দেখলে এ-তত্ত্ব-জ্ঞান হয় না, হ'তে পারে না। মনে পড়ে ছেলেবেলায় যখন পরীক্ষার জন্যে ভালো ভালো ইংরাজি কাব্যবিন্যাসের চোরাই মাল পুঁজি করতাম তখন আইভ্যান হো থেকে নির্মলদা একবার তুলে দিয়েছিলেন ছাঁকা এই উপমাটি: No spider ever took more pains to repair the shattered meshes of his web than did so and so—" পানের বাটার যে-যত্ন লীলা অহরহ করত তাতে সেই স্কচ্ মাকড়সার কথা মনে পড়ত। ভাবছ এটা ঠাট্টা? সত্যিই তা নয়। লীলার কোলে তার পানের বাটা দেখলে তোমারও মনে হ'তই:

জননী তার সদ্যোজাত শিশু নিয়েও হেন
মাতে না কভু—বাটা এ নয়—পরশমণি যেন,
পলক তরে আড়াল হ'লে নয়নে দেখে হায়
অন্ধকার—রোদনে তার পাষাণো গ'লে যায়।

কিন্তু হেসো না সুধীন। ছি! সুকুমারীর দুঃখে হাসি! তুমি না শিভাল্‌রির অবতার—রেবার আদর্শ পুরুষ? না—আদর্শ পুরুষের পৌরুষ শুধু "বজ্রাদপি কঠোরাণি" নয়—তাকে "মৃদূনি কুসুমাদপি"-ও হ'তে হয়। এমন কোনো বেদনারসই নেই, যা দরদ বিনা বোঝা যায়। যতই বলি না

কেন, ভাই হে, আমরা সবাই ছোটরই দাস। বড় আসক্তি ছাড়া যায়—ছাড়ার ও-পিঠে পাওয়ার অঙ্কও যে হয় বড়। কিন্তু যে-পণ্ডিত পুত্রশোকে নির্বিকার তিনিও নস্যের শিশি হারালে চোখে সর্ষের ফুল দেখেন, এ কি তোমার মতন সুধীন্দ্র জানে না? The wearer knows where the shoe…তাই খবর্দার!

পানের বাটার তরে অনিবার লীলা রয় লালায়িত—
ইথে দোষ কোথা? ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝে হও সমাহিত।

* * * *

কী যে সব প্রগল্‌ভতা ক'রে ফেললাম। লীলা না চটে। তবে ওর এক মস্ত গুণ—

ক্ষেপিয়ে কখনো ক্ষিপ্ত করতে পারি না কখনো যারে
সর্বংসহা সে-সুহাসিনীরে রসিক নমস্কারে।

যাক যা বলছিলাম। ওরা সেই অগ্নিশর্মা মার্তণ্ডদেবকে ডুয়ো দিয়ে ছুটল কানের দুল না ঝুমকো খুঁজতে। ভাবো সুধীন, সে কাঠফাটা রোদে—একবার ভাবো। হেমচন্দ্র লিখেছিলেন না

না জাগিলে হায় ভারত ললনা
এ ভারত কভু জাগিতে পারে না—

না, ঐ ধরণের কি একটা আর্তনাদ? তিনি আজ বেঁচে থাকলে লিখতেনই একালে হেসে:

জেগেছে জেগেছে ভারত-ললনা
এ সুখ কোথায় রাখিব বলো না!

ভালো কথা, এখানে সেদিন আমার এক ইংরাজ বান্ধবী শ্রীমতী পিণ্টো এসেছিলেন। আমার ঘরে হাসি ও কণার ছবি দেখে প্রথম আশ্চর্যোক্তি (ejaculation) করলেন:

"What lovely ear-rings!" (কারণ তিনি পরমাসুন্দরী, দুল পরলে তাঁকে কী চমৎকার যে দেখায়!) শুনে শ্রীমান্ পিণ্টো বললেন আমাকে "দেখো দিলীপ, আমার কিন্তু মিস্ বোসের কানের দুল চোখেই পড়ে নি।"

অথ, পাঠ নেও: যার যেখানে ব্যথা।

* * * *

প্রগল্‌ভতা রেখে দুটো কাজের কথা বলি। শনৈঃ শনৈঃ এগুতে হবে তো। ঝুম্‌কো পর্বের পরেই এল ফের যাত্রা পর্ব। তখন সবাই একবাক্যে তাকালাম ধরণীদার পানে। বললাম কোরাসে:

পড়েছি বেঘোরে এ-দূর লাহোরে তব ভরসারই জয়,
রাখিলে বাঁচিব, মারিলে মরিব—রাখিলেই ভালো হয়।

তিনি সহাস্যে বরাভয় দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে এগার জন উদ্‌ভ্রান্ত পথিককে পুরলেন রাওলপিণ্ডের ট্রেনের দুটো কামরায়—সেই রাত্রেই। ডাক্তার, দিদি ও দিদির কন্যা লীলা (ধর্মবীর) এলেন ষ্টেশনে রাত ন'টায়। ফের সেই হৈ হৈ ব্যাপার—গাড়ি রে, বাক্স রে, ডুলি রে, ভাড়া রে—কী নয় রে? কিন্তু ধরণীদার যাত্রা-প্রতিভা অঘটনঘটনপটীয়সী। সব খাপে খাপে মিলে গেল—ঠিক শেষ মিনিটে—ওঁ, শান্তিঃ: ছাড়ল ট্রেন—উড়ল রুমাল। দিদির স্নেহকোমল মুখখানি ক্লান্তিতে কী সুন্দর দেখায় যে!

* * * *

প্রেমিক দার্শনিক লিখেছেন: "When we are liberated we are able to realise more fully, through music or poetry, through history or science, through beauty or through pain, that the really valuable things in human life are individual, not such things as happen on a battlefield or in the clash of politics or in the regimented march of masses of men towards an externally imposed goal"

রেবা, একথা যে কত সত্য তা আমরা জীবনের নানা টুকরো মুহূর্তে যেন হঠাৎ বুঝতে পারি, না? বুঝতে পারি যে জীবনের সাঁচ্চা রত্নরূপকে আমরা প্রায়ই হারাই মেকি জাঁকজমকের মোহে। তাই ভুলি, যে আমাদের অন্তর তৃষিত থাকে বাইরের সাজসজ্জার তরে নয়—তার শেষ আর্জি হৃদয়েরই কাছে। বাজে কাজে তুচ্ছ নেশায় জীবন কাটে, যে-বাতি জ্বলতে পারত মনের মন্দিরে, তার অপব্যয় হয় জনারণ্যে—আমরা এ-আলোর দাম দেই না ব'লেই তো। খুঁজি টাকা যশ মান প্রতিষ্ঠা—খেয়াল করি না, তৃষ্ণা কী চায়।

চায় এই দেখতে ছোট কিন্তু আসলে মস্ত জিনিষটিই—অনাবিল স্নেহ, নিঃস্বার্থ প্রীতি, স্থায়ী বন্ধুত্ব। আর এরাই

দেয় তাঁর আভাষ যিনি জীবনের চকিত মণিমুহূর্তগুলিকে চিরন্তন ক'রে ধরেন—তাঁর অনির্বাণ আকাশ আলোয়।

* * * * *

রাওলপিণ্ডি পৌছলাম পরদিন সকালে—পয়লা অক্টোবর বুঝি। আমার মেশোমহাশয় শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর এক পেশোয়ারি উকিল বন্ধুকে লিখে দিয়েছিলেন সেখানে—রণবীর সানি। কী মধুর যে তাঁর স্বভাব। পেশোয়ারি আতিথ্য এই প্রথম পেলাম। নবস্বাদ, তাই আরো রসিয়ে উঠল মন।

অনেকগুলি মোটরে রণসজ্জা সাজিয়ে রণবীর সাহেব বীরপদভরেই হাজির ষ্টেশনে যথাকালে। সবাইকেই ধ'রে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। আমাদের সেদিন সকালেই কাশীতে পাড়ি দেবার কথা—মোটরের বন্দোবস্ত তিনি ক'রেই রেখেছিলেন—আমাদের কিছুই করতে হয়নি। কিন্তু সকালে না—সে কি হয়? না খেয়ে দেয়ে? ও ভাবাই যায় না। তাছাড়া ইনি খুব গানপ্রিয়। বাংলা গানের রেকর্ড বৈদ্যুতিক গ্রামোফোনে বাজিয়ে শুনিয়ে দিলেন "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম।" বললেন: "রায় সাহেব, যে যাই বলুক, গানে নতুন সৃষ্টি এযুগে যদি কেউ ক'রে থাকে তবে সে বাঙালি—আর কেউ নয়।" বাঙালি সংস্কৃতি সম্বন্ধে এঁর খুবই উচ্চ ধারণা।

বিদেশে স্বজাতি-স্তুতি শুনে মনটা বেশ একটু ভিজে উঠল বৈকি। যতই বলি না কেন সুধীন, বাঙালির রসসৃষ্টির কথা ভেবে একটু গৌরববোধ হয়ই। সার পি সি রায় যতই দুঃখ করুন না কেন, বাঙালির চা খাওয়া ও বাণিজ্যে-হারা নিয়ে—কিন্তু আমি প্রায়ই ভাবি যে বাঙালি যে রাতারাতি বেনে হ'য়ে উঠতে পারছে না এতে লজ্জায় অধোবদন না হ'লেও হয়ত বিধাতা ঠিক আমাদের হাতে কাটবেন না। তবে জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকা—যোগ্যজনের উদ্বর্তন—?—বাসরে, কাজ নেই ভাই, ওসব বড় বড় সমস্যার চাবি আমার হাতে নেই। বড় বড় অর্থনীতিক গেলেন তল—এখন মাদৃশ অজ্ঞনীতিক বলবে কত জল? যার কর্ম তারে সাজে—

রণবীরের বাড়িতে ঠিক এই সময়েই বিবাহের দুন্দুভি। পেশোয়ারি বিয়েও দেখলাম এই সূত্রে। সুনীতিবাবু থাকলে একেবারে পেশোয়ারি বিবাহের নাড়িনক্ষত্রের ছক কেটে ধরতেন তোমাদের সামনে। কিন্তু আমি প্রকৃতিতে খুব সজাগ নই জানোই তো। কাজেই

দেখলাম এক ভারি বিয়ে
মানলাম হার—আঁকতে গিয়ে

ব'লেই এ-কাজে ইস্তাফা দেই। তবে এটা বেশ মনে আছে যে বাজনা বেজেছিল, বর কনে সেজেছিল, লোক খেয়েছিল, ছেলেরা হেসেছিল, মেয়েরা কেঁদেছিল, বুড়োরা কেশেছিল, আলো জ্বলেছিল এবং পুরুত ছলেছিল। One touch of nature makes the whole world kin আর কি।

* * * * *

যেটা মুগ্ধ করল সেটা এদের বিয়ে নয়—আতিথেয়তা। বাড়ির মেয়েরা সম্ভ্রান্তা, পর্দানশীনা। কিন্তু অতিথিদের মান রাখতে আমাদের সঙ্গে খেতে বসল। মোটা মোটা ইয়া পরোটা—তরকারি, কাবাব, পোলোয়া, কালিয়া—কী নয়? তোমাদের সুষঙ্গের রাজবাড়ির খানাকেও হার মানালো বুঝি, রাগ কোরো না রেবা! লক্ষ্মীটি! তুমি রাঁধো যৎপরনাস্তি চমৎকার—ব্রাহ্মণ জাত নিমকহারাম নয়—কিন্তু পেশোয়ারি রান্নাকেই বা ছোট বলি কোন্ মুখে? সত্যি, এরা সরেস মশ্‌লাবাজিও জানে। দুষ্পাচ্য—কিন্তু কী সুস্বাদু! কী কী রেঁধেছিল তারও বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম—তবে খাসা খাসা জিনিষ একথা সবাই স্বীকার করল একবাক্যে। আমাদের মাসুদা তো পুলকিত, যেহেতু রান্নায় তিনি সাক্ষাৎ দ্রৌপদীর উত্তরে—পৌরুষ প্রত্যয়।

গান করতে হ'ল। এক ভক্ত এসে হাজির—পেশোয়ারি। গাইলেন ভজন। তারপর আমার ডাক পড়ল। গাইলাম তুলসীদাসের ভজন। ভক্তের চোখে জল। সঙ্গত-কার এক পেশোয়ারি ঢোলক-বর্গীয় তবলা নিয়ে বসলেন। লয় রেখে গেলেন একরকম ক'রে। মোটের ওপর গান-বাজনার আসরটা দেখতে দেখতে ভারি জ'মে উঠল। কত মেয়ে যে হাজিরা দিল! যতই বলো সুধীন, গানে এমন কিছু আকর্ষণী শক্তি আছেই—যা কবিতার নেই, ছবির নেই, বক্তৃতার নেই। গান করতে করতে এই সব অপরিচিত বিদেশী ও বিদেশিনীকে এত আপনার মনে হ'ল! কতবারই যে এ-অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে! যাদের কখনো দেখিনি, আর কখনো দেখব না, তারাও হঠাৎ কাছে এসে গেছে

গানে সৌহৃদ্যে—সুরের আলোয় মিলেছে, স্নেহের উদ্দেশ !··· গান যখন শেষ হ'ল, দেখি কত লোক যে চোখ মুছছে। এরা ভজন বড় ভালোবাসে। ওস্তাদরা বলবেন "তাতে কী হ'ল ? ভজন কি আবার গান ?" আমি বলি : "না-ই হ'ল গান—লোকে শুনে মুগ্ধ হ'ল, কাছে এল, ভক্তির রস আস্বাদন করল—এর চেয়ে বড় অঙ্গীকার আর কী আছে ?"

এবার শ্রীমতী হাসির পালা। ওর নাম পৌছেছে এখানেও গ্রামোফোনের প্রসাদে। কিন্তু ও একেবারে বিদ্রোহের নিশান দিয়েছে উড়িয়ে। এ ধরণের পাঁচমিশেল আসর ও পেশোয়ারি সঙ্গত দেখে বোধহয় ভড়কে গেছে ছেলেমানুষ। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী বললেন : "হাসি রে ! গেয়ে দে।" 'যো হি ধর্মো যো হি স্বর্গো য অত্র পরমং তপঃ' সেই সাক্ষাৎ পিতা বললেন : "ছি হাসি ! গাইতে হয়।" হার-শাড়ি-দুলের অকূল পাথারে 'চক্ষুরুন্মীলিতং যেন' সেই গুরুকল্পা মাসি বললেন : "অ হাসি ! গা না।" কিন্তু উঁহুঃ—

হাসি-ভবী হায় ভুলিতে না চায় কথায় কি ভেজে চিঁড়ে ?
যত বলা যায় কেঁদে সে ভাসায়—গাবে না এ হেন ভিড়ে।
কত ডাকাডাকি—আদরিণী পাখি বেঁকে যে বসেছে হায় !
সোজা করা ভার, আঁখি নীর তার অঝোরে ঝরে ধরায়।
গলা ভেঙে গেছে, কথা পালিয়েছে, সুর-থেই গেছে ভুলে।
কেটে যাবে তাল হা পোড়া কপাল, ক্ষোভ ওঠে ফুলে ফুলে।
বুক দুরু দুরু : "কে কোথায় গুরু ! কে বা গুরু কেবা চেলা ?
এরা কী নিঠুর—গাব কোন্ সুর, এ ঠিকে দুপুর বেলা !
কেন আমি গান শিখেছিনু—প্রাণ আফ্‌শোষে আনচান !"
তবু অন্তিমে ধরল সে ঢিমে তেতালে গজল তান।
দেখা গেল হায় কথাও যোগায় সুরও আছে খাসা ঠিক
তালও নির্ভুল গমকে দোদুল গায় হেসে ফিক ফিক।
ওরা ভালোবেসে তার কাছে এসে, বলল : বাহবা গান !
'রাগিণীরো' মুখে স্তবে দোলে দুখে—সুখের হাসি নিশান।

ইতি। স্নেহতৃপ্ত দিলীপদা

পল্লী ও প্রবাস

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

কতকাল যেন
দেখিনি নয়নে পল্লীর শ্যাম শোভারে—
সেই পাখী-ডাকা
ছায়া-ঢাকা কুটীরাঙ্গন মনোলোভারে !
গহিন নীলিমা-স্বপন-মগন
হেথা কোথা ওরে উদার গগন ?
কোথায় বনানী ?—এ যে পিঞ্জর !—
বিহগ হয়েছে বোবারে !

পল্লী—সেথায় শীতের অন্তে
বসন্ত আজ জাগিছে,
লতায় পাতায় তরুর শাখায়
প্রাণের পরশ লাগিছে।
বিকচ কুসুমে সেথা ঋতুরাজ
পরিয়াছে যেন নাগরের সাজ ;
সাজিয়া ধরণী নাগরী তরুণী
সম্ভাষ তার মাগিছে !

মালা গাঁথে আজ পল্লী-প্রেয়সী
মল্লী-মালতী-মুকুলে,—
মোর পথ চাহি'—গাঁথি' বন-ফুল
পরি' পল্লব-দুকুলে।
হেথা প্রাণহীন এই মথুরায়
থাকিতে কি আমি পারি আর হায়—
কাঁদে দিবানিশি হৃদয় আমার
ফিরে যেতে মোর গোকুলে !

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

২২

বিন্দী সুকেশবাবুর বাড়ীতেই ছিল, মধ্যে মধ্যে হরমোহনবাবুর বাড়ীতেও বেড়াইতে যাইত। লতার সঙ্গে আলাপ তেমন জমিত না; বরাবরই উহার গরিমা কিছু বেশী, তাহাদের মত লোকের সঙ্গে মন খুলিয়া হাসিগল্প কখনও করে না। কিসে যে এত গরিমা, বিন্দী তাহা ভাবিয়া কুল পাইত না। যাহা হউক, দুই একটা কথা তাহার সঙ্গে বলিয়া ঝিদের কাছে গিয়া সে বসিত,গল্পসল্প করিত। কিছু ভাবও তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়াছিল। ক্ষিরী ঝি খুকীটিকে (অর্থাৎ ইলার শিশু কন্যাটিকে) রাখিত, বাড়ীর সাম্‌নে তাকে কোলে করিয়া বেড়াইত, নিকটবর্ত্তী পার্কে লইয়া গিয়াও বসিত; আলাপের অবসর ইহার সঙ্গেই বেশী হইত; কখনও রাস্তায় দাঁড়াইয়া, কখনও বা সঙ্গে পার্কে গিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ হাসিগল্প বিন্দী করিত; সুতরাং ভাবটা ইহার সঙ্গেই তাহার জমিয়া উঠিয়াছিল বেশী। সেদিন বৈকালেও বিন্দী গিয়াছিল—গিয়া শুনিল, লতা হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কেন গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, ঝিরা তাহার খবর কিছু জানে না।

"এসব বাড়ীতে ঝি বামনী কত এমন আসে, কত যায়, কে আর খবর রাখে বাছা?" পাকের ঘরের প্রধানা পরিচারিকা প্রবীণা রাসমণি ভার মুখে একটু ভ্রূকুটি করিয়া ঈষৎ কঠোর তীব্রস্বরে শেষ এই উত্তর বিন্দীকে দিয়া উনানে আঁচ দিতে গেল। আর একটি ঝি মশলা পিষিতেছিল; একটু মুচকি হাসিয়া বিন্দীর দিকে চাহিয়াই আবার ঘুরিয়া বসিল। বিন্দী বুঝিল, কথাটা এমন সোজাসুজি কথা একটা নয়, ভিতরে অনেক কিছু আছে, আর উহারাও সকলে তাহা জানে। আর সত্য—কাশী হইতে উহাদের সঙ্গে আসিয়াছে এই ত সেদিন বলিলে হয়।—এত মানে আদরে আছে—ঝিরা মান্যি মাননা করে যেন ঘরেরই একজন লোক সে! হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া অচেনা অজানা এই সহরে কোথায় যাইতে পারে? কেনই বা যাইবে? না না, ও একটা কথাই নয়, আসলে—

রাসমণি তখন মুখ বাড়াইয়া কহিল, "হাঁ গা বাছা, যার কাছে আনাগোনা ক'র্‌তে, ব'লেই ত দিনু সে আর নেই এ বাড়ীতে। মিছে কেন আর দাঁড়িয়ে র'য়েছ—আমাদের এখন কাজের ভিড়—তা আজ কেন এখন এস না বাছা? বলি, ও সাবী! তোর বাসনকোসন কি মাজা এবেলা হবে না?"

কলতলা হইতে সাবী উত্তর করিল, "এই ত হ'ল দিদি, নিয়ে আসছি!"

রাসমণি কঠোর দৃষ্টিতে বিন্দীর দিকে আবার চাহিল; বিন্দী বুঝিল, আর দাঁড়াইয়া এখানে থাকাটা বুদ্ধির কাজ হইবে না। মাগী হয়ত ঝাঁটা লইয়াই এখন তাড়া করিবে—যে গরম হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু হঠাৎ আজ এত গরমই বা কেন? চাহিয়া দেখিল, ক্ষিরী খুকীটিকে কোলে লইয়া বাহিরের দিকে যাইতেছে। অমনই ঘুরিয়া সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল; ক্ষিরীর পিছু পিছু বাহির হইয়া রাস্তায় তাহার সঙ্গে জুটিল—পার্কে গিয়া দুইজনে বসিল। ভিতরের খুঁটিনাটি সব খবরও তাহার কাছে শুনিল!

শরীর কিছু অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন; হাতেও জরুরী কাজ ছিল। সন্ধ্যার পর নিজের আফিস ঘরে গিয়া বসিয়া ফোনে সুকেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, লতা কেমন আছে এবং কোনও কথা তাহার আছে কি না। শরীর কিছু অসুস্থ। নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন না হইলে আজ আর তিনি যাইতে চান না। কুরঙ্গ উত্তরে জানাইল, দিদিঠাকরুণ ভালই আছেন। তেমন জরুরী কোনও কথা তাঁহার আজ নাই; কাল পরশু—যেদিন বাবুর সুবিধা হয় আসিলেই চলিবে। নিশ্চিন্ত হইয়া তখন টাইপ করা একটা কাগজের নথি খুলিয়া বসিলেন। ভৃত্য আসিয়া এক কাপ চা রাখিয়া তামাক দিয়া গেল। কাগজ দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে চা পান করিয়া গড়গড়ার নলটি মুখে তুলিয়া দিলেন।

বিন্দী এতক্ষণ ছটফট করিতেছিল নিরালা একটু ফাঁক কখন পাইবে। নিঃশব্দে আসিয়া তখন পর্দ্দাটি সরাইয়া

উঁকি দিল ; ঘরে আর লোক নাই দেখিয়া ঢুকিয়া হাসিমুখে গিয়া টেবিলটির সম্মুখে দাঁড়াইল।

"কি গো? খবর কি?"

একটু হাসিয়া মুখ তুলিয়া সুকেশবাবু চাহিলেন।

"খবর—সে এক মস্ত খবর আছে।"

একগাল হাসি বিন্দীর মুখ ভরিয়া ফুটিল।

"কি?"

"লতি কোথায় পালিয়ে গেছে—এই ত পরশু রাত দুপুরে।"

"বটে! কেন, পালিয়ে গেল কেন?"

"সে বাবু, এক লম্বা কেচ্ছা! এই ত ওদের ক্ষিরী-ঝির ঠেঁয়ে সব শুনে এলাম।"

"কি, কি শুনে এলে?"

বিন্দী তখন একটু ঘুরিয়া কাছে গিয়া ঈষৎ চাপাস্বরে কেচ্ছার কথা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল সালঙ্কারে নিজেরও বহু টীকাটিপ্পনীসহ বর্ণনা করিল। শুনিয়া যাহা আসিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই:—উহাদের বড় ছেলে বিরুবাবু বাড়ীতে সেদিন আসিয়াছিল, তা রাত দুপুরেই আবাগী তার সঙ্গে ধরা পড়ে, ধরে গিয়া হাতে পাতে আবার ওদের বৌটা! দেখিয়াই বৌটা যায় মূর্চ্ছা, সেই ফাঁকে অমনই লতাকে লইয়া বাবু কোথায় সরাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। আগেই কোন্ ফাঁকে একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। নিরালা একটা ঘরেই ত ঠাট করিয়া মাগী সারাটি দিন—রাত দুপুর তক—শুইয়া পড়িয়াছিল। ফাঁক কেন পাইবে না? আর সত্য একদিনেই কি আর এতটা হয়? আবার যেমন বাবু বাড়ীতে আসিল, ভাতের থালা লইয়া গিয়া অমনই মূর্চ্ছা গেল। তাই বা যাইবে কেন? মূর্চ্ছাটুর্চ্ছা ত কেহ আর কখনও দেখে নাই। বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী নিরুদ্দেশ—সব ছল। ঐ বাবুই ছিল ওর রসের নাগর, ছেলেটাও ঐ বাবুরই ছেলে। ওর মুখেও নাকি বাবুর মুখের ধাঁজ অনেক পাওয়া যায়—বলাবলিও উহারা করিত। তা বড় ঘরের দুলাল—সক মিটিয়া যখন গেল—তখন ছাড়িয়া দিয়া আসে, সবাই যেমন দিয়া থাকে। চাকরী করিতে বাহির হইল, তা দৈবের চক্রে আসিয়া জুটিল ওদেরই ঐ ঘরে। কারও কাছে খোঁজ পাইয়া মতলব করিয়া গিয়াও হয়ত জুটিতে পারে। যে পাকা শয়তান মেয়ে—কিছুই বিচিত্র উহার পক্ষে নয়!

বাস্তবিক রাত্রি প্রভাতে উঠিয়া বাড়ীর অবস্থা যাহা দেখিয়াছিল, তাহার সঙ্গে পূর্ব্বদিনের সব ঘটনা যোগ করিয়া এইরূপ একটা সিদ্ধান্তই যে বাড়ীর লোকজন সব করিয়া লইবে, ইহাই স্বাভাবিক। প্রধানা পরিচারিকা রাসমণি অবশ্য অতি কঠোরভাবে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—মনিবের ঘরের এই কলঙ্কের কথা 'তিন কান' যেন কেহ না করে। তবে কথাটা অনেক 'তিন কান' আগেই হইয়া গিয়াছিল এবং প্রভুভক্তির সহস্র দোহাই সত্ত্বেও বাহিরে যে আরও অনেক 'তিন কান' অচিরেই হইবে, তাহাও নিশ্চিত। ঘরের সুনাম, কি মনিবের নুনের গুণ, যেই যত গণনা করুক, এতবড় একটা রহস্যরসের ফুটন্ত উদ্বেলতা—ভৃত্য দূরে থাক, আত্মীয়ও সহজে কেহ কোথাও পেটে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ক্ষিরীও পারিল না—বিন্দীকে যেমন ফাঁক মত পাইল, তার কানে ঢালিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল!

সুকেশবাবু সব শুনিয়া একটু হাসিলেন। গড়গড়ায় কয়েকটা টান দিয়া শেষে কহিলেন, "তাই ত! এতখানি কাণ্ড হ'য়ে গেছে! এটা ত ভাবতেও কখনও পারি নি? তা—ওদের বড়বাবুই যে সরিয়ে ওকে নিয়ে কোথায় রেখে এসেছে, এটা ওরা কিসে বুঝ্‌ল?"

"তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? এক ব'ল্‌তে পার, ধরা প'ড়ে ভয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। তা কাঁচা বয়েসের একটা মেয়ে—অজানা অচেনা এই ক'ল্‌কেতার সহর—নিশুতি রাত—একা রাস্তায় বেরোতে পারে? আর কেনই বা বেরোবে?—হারাণ নাগর যদি ফিরে পেল, তাকে ছেড়ে একা কোথায় যাবে? সেই বা যেতে দেবে কেন? তাই যদি দেবে, নিরিবিলি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখাই বা ক'র্‌বে কেন? হয়ত নিয়ে যখন বেরোবে, তখনই ঠিক গিয়ে বৌটা ধরেছে। ধ'রে যেমন মূর্চ্ছা গেল, সেই ফাঁকে তাড়াতাড়ি ক'রে নিয়ে ও রেখে এল। বড়লোকের ছেলে—টাকার ত কম্‌তি নেই—দিনের বেলায় গিয়ে যায়গা-টায়গা একটা ঠিকঠাক ক'রে রেখে এসেছিল। ওকেও কোনও চিঠিফিটি একটা লিখে জানিয়ে সব রেখেছিল যে সময়মত তৈরী হ'য়ে থাকে। ওদের সাবী ঝি তখন আবার একটা গাড়ীর শব্দও রাস্তায় শুনেছিল। ঘুমটা তেমন ভাঙ্গে নি তখনও—তবু যেন তার মনে হ'ল, বাড়ীর দরজা থেকেই গাড়ীটা ছাড়ল।"

"হবে ; সত্যিই যদি এই রকম একটা সম্বন্ধ ওদের আগে ঘটেই থাকে—"

"তাতে কি আর সন্দে কিছু আছে ?—নইলে ভাতের থালা নিয়ে এসেছে, দেখেই অমনি মূর্চ্ছো যাবে কেন ? তা না হয় গেছল গেছল—মূর্চ্ছো হঠাৎ এমনিও লোকে কত এমন যায়।—কিন্তু তারপর—এই যা সব ঘটল—সকালে উঠে সবাই দেখে, বৌটা র'য়েছে মূর্চ্ছো পড়ে, গিন্নী ব'সে রয়েছেন তোলোপনা মুখ ক'রে ;—লতির খোঁজও কোথাও নেই। আর ঐ বাবু—একেবারে নাকি বৌ-অন্ত প্রাণ ছিল—তা সারাটি দিন একটিবার গিয়ে খোঁজ খবর নিলে না, বৌএর কাছে দুদণ্ড গিয়ে ব'সল না! কেন ? বাড়ীর লোকজন সব—তা ঝি চাকরই হ'ক্ আর যাই হ'ক্—মানুষ ত বটে, ভাত জলও খায়—কাণ্ডটা রেতে কি ঘ'টেছিল, সত্যি কি আর ঠাউরে কেউ নিতে পারে নি ?"

"হুঁ—"

"তাই ভাব্‌ছি বাবু—সত্যি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেছি! কত মেয়ের কত রকম ঠাটই দেখ্‌লাম—তা লতির এই সতীপনার ঠাট সবাইকে হার মানিয়েছে!—তলে তলে সত্যি ওর এই চরিত্তির—এটা বাবু ভাব্‌তেই কখনও পারি নি! আর ঐ মন্দা ঠাক্‌রুণ—ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার! এ পথিমীর লোককে সত্যি বাবু বিশ্বেস ক'রতে নেই!"

"তা হ'ক্ গে তারা যা খুসী—কতই এমন আছে।—তা খবরটা এনে দিলে—শুন্‌লাম—ব্যস্!—"

"হাঁ, বড় গাছে নাও বেঁধেছে, খুলে আন্‌তে তুমিও পারবে না, আমি ত পার্‌বই না।"

"যাক্, তা হ'লে তুমি এখন এস।—আমার কাজ র'য়েছে হাতে মেলাই।"

"হাঁ, এই যাই।—তা ভাব্‌ছিলাম কি বাবু, আমি এখন কি করি—"

"কি করতে চাও ?"

"ভাবছিলাম মিছেমিছি এখানে আর ব'সে থেকে কি ক'র্‌ব ? ভালও সত্যি আর লাগছে না। কেবল খাচ্ছি আর গড়াচ্ছি—ছেলেপিলেদের কখনও একটু ধরি, কোলে টোলে করি—তা তাদেরও ত ঝি র'য়েছে—"

"কি ক'র্‌তে চাও ? দেশে ফিরে যাবে ?"

"তাই ত ভাব্‌ছিলাম।—তবে কিনা যখন আসি—সবাইকে ব'লে এসেছিলাম, বাবা বিশ্বনাথ যদি দয়া করেন, মা অন্নপূন্নো যদি দুটি অন্ন ওখানে মিলিয়ে দেন, ফিরে আর পাপের পুরীতে আসব না।—এখন আবার লজ্জার মাথা খেয়ে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব সবার সাম্‌নে!"

"তবে কি কাশীতেই আবার ফিরে যেতে চাও ?"

একটু হাসিয়া বিন্দী কহিল, "এক একবার মনে হ'চ্ছিল, গিয়ে একটিবার দেখি, মন্দাঠাকরুণ কি ক'রছে।—তবে কিনা—সেই বিদেশ বেঁঠাই—কাজকর্ম্ম যদি কিছু না পাই, খাব কি ?—সব গেছে ব'লে পোড়া পেট ত যায় নি।—আবার বাপের ভিটেয় ঐ কুঁড়েটুকু র'য়েছে—সন্ধ্যে পিদ্দীমটি দিতে আমি বই আর কেউ এ ভবে নেই। যে কয়দিন আছি বেঁচে—"

"বেশ, তবে দেশেই যাও।"

"তাই তবে দেও পাঠিয়ে।—হাসিও পায় বাবু—ঐ রটুন্তী ঠাকরুণ—তেজ কত!—ধরাকে সরা জ্ঞান করে না। দেবতার তুল্যি ঐ শিরোমণি ঠাকুর—তাকে নিয়ে কি না লতির হাতের ভাত খাওয়াল! এখন যদি শিরোমণি ঠাকুর একটা প্রাচিত্তি করেন, মাগী মুখ রাখ্‌বে কোথায় ?"

হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "তুমি মজাবে দেখ্‌ছি। এই সব কুচ্ছোর কথা আবার দেশে গিয়ে রটাবে নাকি ?"

"আমি কেন রটাতে যাব বাবু ? পাপ কি চাপা থাকে ? আপনিই র'টে যাবে। কত লোক ক'ল্‌কেতায় আস্‌ছে যাচ্ছে—কেউ কি শুন্‌বে না ? আর শুনে গিয়ে দেশে কাউকে ব'ল্‌বে না ?"

"সে আর যার যা খুসী করুক, তুমি যেন গিয়ে মেয়েটার একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলো না।"

"সর্ব্বনাশ নিজেই নিজের ক'রে রেখেছে। আমি আর কতটুকু কি ক'রব ? আর সামলাবই বা কতটুকু ?—তা দেও বাবু, দেশেই আমাকে দেও পাঠিয়ে।—ভালও সত্যি আর লাগছে না এখানে।"

"আচ্ছা, পরশু আমার একটি লোক যাবে—তার সঙ্গেই বরং যেও।"

"তাই পাঠিয়ে দিও বাবু। আর—কি আর ব'লব সেজবাবু—তিনকুলে ত কেউ আর নেই—তোমরাই মা বাপ—হাত একেবারে খালি—গিয়ে পেটেও দুটি দিতে

হবে, আবার ঐ কুঁড়েটুকু—কবে একটা দমকা হাওয়া উঠ্‌বে, আর প'ড়ে অমনি গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাবে—"

"আচ্ছা—আচ্ছা—সে যাহক ব্যবস্থা একটা ক'রে দেওয়া যাবে। তুমি এখন এস, হাতে এত কাজ র'য়েছে আমার—"

"হাঁ, এই যাই বাবু। সে ত দেখছিই—কাজের আর অন্ত নেই—খেতে শুতেও সময় একটু হয় না।—তা হ'লে আসি এখন—"

বলিয়া দরজার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ঘুরিয়া আবার কহিল, "হাঁ, আর একটা কথা বাবু—তা তোমরাই মা বাপ—কাকেই বা আর ব'লব? এই ত শীত সামনে—"

"সে হবে—হবে—মোটা একখানা গায়ের কাপড় কিনে দেওয়া যাবে। এখন যাও, ভেতরে যাও।"

অগত্যা বিন্দী তখন বাহির হইয়া গেল। আর কি বলিবে, কি অভাব জানাইয়া আর কি চাহিবে, মনেও ছাই তখন পড়িতেছিল না। যাহা হউক, যাইবার আগে দেখা ত হইবে—তখন আর যাহা পারে আদায় করিয়া লইবে। এখন আর বেশী প্যান্ প্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিলে বাবু বড় চটিয়া যাইবেন, বেশ একটু গরমই হইয়া উঠিয়াছেন। বড় লোকের মেজাজ—এখন আবার গরজও তেমন কিছু নাই। পাখী ত উড়িয়া আর এক পিঁজরায় গিয়া ঢুকিয়াছে—তার পুরাণ সেই সোনার পিঁজরা!. সেখান হইতে কি আর সহজে বাহির করিয়া আনিতে পারিবেন? তা সে পারুন না পারুন, নিজে গিয়া বুঝুন। —সে আর কি করিবে?—ভালও সত্য তাহার আর লাগিতেছিল না। এখন দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। গাঁয়ে সে স্বচ্ছন্দভাবে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, কত কাহিনী শোনে, কত কাহিনী বলে—খাসা রঙ্গরসে দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। কত বাড়ীতে কত ক্রিয়াকর্ম্ম হয়, গিয়া ঘোরে ফেরে, আমোদ আহ্লাদ করে, আবার পেট ভরিয়া পাঁচ ব্যঞ্জন পিঠাপায়েস খাইয়াও আধা বৎসর অমন কত কাটাইয়া দেয়।—এই ত কাশী যাইবার আগে দেখিয়া গিয়াছিল, কেষ্টরাম বসুর ঠাকুমা, সিধু গাঙ্গুলীর মা, মর মর। এতদিন কোন্ না মরিয়াছে? কত ঘটার শ্রাদ্ধ হয় ত হইয়াই গিয়াছে।—আর আবাগী সে পোড়া কলিকাতার এই একটা বাড়ীতে যেন কয়েদখানায় বন্দী হইয়া রহিয়াছে!—মাগো! কেবল খাইয়া শুইয়া গড়াইয়া একটা বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে দিনের পর দিন কি করিয়া মানুষ কাটায়! কালীঘাটে কয়দিন গিয়াছে—তা মা কালী-গঙ্গা মাথায় থাকুন—খুলিয়া দুটি মনের কথা কহিবে, কারও কোনও কথা শুনিবে—এমন একটা লোক যদি ছাই চোকে পড়িল! এক লতার মনিব বাড়ী—ঐ সাবী ক্ষীরী ওরা আছে—দুটি কথা বলিয়া একটু সুখ যা পায়। তা আবার রাসমণি আসিয়া দাঁড়াইলেই—সব চুপ! গরবে মাগী চোক তুলিয়াই কাহারও পানে চায় না। বাপু, করিস ত চাকরাণীগিরি—না হয়, বড় লোকের বাড়ীই আছে।—তাই বলিয়া এত গরবেরই বা তোর কি হইয়াছে? গাঁয়ে যদি হইত, মুখের মত দুকথা শুনাইয়া দিয়া আসিত! হাঁ! তা সে যাহা হউক, বাবু পাঠাইয়া দিবেন, দেশের মাটীতে এখন গিয়া পা দিতে পারিলে বাঁচে! আবার লতির এই রসের কেচ্ছাটা—মাগো!—লম্বা আরও দুইটা দিন—কি করিয়া সে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে?—মনে হইতেছিল, উড়িয়া যদি যাইতে পারিত, রাত্রি প্রভাতেই পাখনা তুলিয়া উড়ন দিত! আজকাল যে ঐ উড়ো জাহাজগুলো হইয়াছে—এক ঘণ্টায় নাকি দুদিনের পথ যায়। আহা, বাবু যদি একটা টিকিট করিয়া তার একটা জাহাজে তাকে তুলিয়া দিতে পারিতেন!

বিন্দী যে এত দিন তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়া রহিয়াছে, সুকেশবাবুরও এটা বিশেষ ভাল লাগিতেছিল না। অবসর মত গ্রামে গিয়াও মধ্যে মধ্যে তিনি থাকিতেন। যখন থাকিতেন, ভোগ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বিন্দীর সহায়তাও গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহার অসংযত রসনাকেও বড় ভয় করিতেন। এখানে তাঁহার ভোগের ক্ষেত্র ও ভোগ্য বস্তু সব নাগরিক সমাজের যে স্তরে অবস্থিত, সেখানে বিন্দীর ন্যায় অসংযত-অসংস্কৃত-বাক্ গ্রাম্যা নারীর কোনও স্থানই হইতে পারে না।—তাহার দ্বারা যেটুকু কাজ তাঁহার হইতে পারে তাহা হইয়া গিয়াছে, কাশী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে লতা বাধ্য হইয়াছে। আসিয়া কোথায় ছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। সেখানেও যে বিন্দীর গ্রাম্য মোটা দূতীয়ালী চলিবে না, তাহাও বেশ বুঝিতেন এবং বিন্দী যে সেখানে যায় আসে

তাহাও বড় পছন্দ করিতেন না।—এরূপ একটা সঙ্কট শীঘ্রই উপস্থিত হইবে তাহাও জানিতেন, আর তখন অবস্থা বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাঁহাকেই করিতে হইবে, বিন্দী কিছুই করিতে পারিবে না। আর এখন ত কথাই নাই। ঘটনাচক্রে লতা তাঁহার হাতেই আসিয়া পড়িয়াছে। প্রয়োজন ত কিছু নাই-ই, তাহার উপস্থিতি বরং বিরক্তিকরই হইয়া উঠিয়াছে। যখন তখন আসিয়া বহু সময় তাঁহার নষ্ট করে; আবার ভয়ও হয়, কখন গৃহিণীর কাছে বে-ফাঁসে কি বলিয়া ফেলিবে, একটা সর্ব্বনাশ শেষে উপস্থিত হইবে! আজ আবার যাহা শুনিলেন, তাহাতে অচিরে তাহার দেশে ফিরিয়া যাওয়া আর এক দিক্ হইতেও বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। দেশে গিয়াই এই সব কথা সে রটনা করিবে; মাতুলগৃহে গিয়া আশ্রয় নেওয়া লতার পক্ষে একদম অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। পুলিস আদালত হইতে মুক্তি পাইলেও তাঁহার হাত ছাড়াইয়া সহজে আর কোথাও যাইতে পারিবে না।—এক কাশীতে তাহার তাহার মাতার আশ্রয়। তা বিন্দী রহিয়াছে, ভাবনা কি!

মাতার সঙ্গে মাতুলগৃহে গিয়া আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে লতাকে তিনি কখনও দেখেন নাই। তবে তাহার পিতা দ্বারকানাথ যে তাঁহারই প্রতিবেশী যোগেশ বাড়ুয্যের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছেন ইহা জানিতেন, দুই একবার তাঁহাকে দেখিয়াছেনও। হরমোহনবাবুর নিকটে সকল ঘটনা তিনি যখন শুনিলেন, তখনই বুঝিতে পারিলেন লতা কে। চমৎকার এমন রহস্য-নাটকের নায়িকাটিকে দেখিবার জন্যও বেশ একটা কৌতূহল তাহার জন্মে। যখন শুনিলেন লতা তাহার মাতুলগৃহে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তখনই বাড়ীতে গিয়া তাহাকে দেখেন এবং দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। হাঁ, সত্যই একখানি উপন্যাসের নায়িকা বটে, আর সে উপন্যাসখানিও তাহার রহস্যরসে যারপরনাই মনোমন্থন! সঙ্গে সঙ্গে লতাকে লাভ করিবার জন্যও প্রবল একটা আগ্রহ তাঁহার চিত্তে জাগিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য এ আগ্রহ কেবল সাময়িক একটা দৈহিক ভোগলালসার আগ্রহ নহে, ভাবরসিকের ভাবরসোন্মাদনাই তাঁহাকে এমন মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। লতার কেবল দেহটা নয়, তার প্রেমই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছিল। সে যে প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মুরুব্বি হরমোহনবাবুর পুত্রবধূ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুল্য বিরিঞ্চির একরূপ বিবাহিত স্ত্রী, ইহাতেও কোন কুণ্ঠা তাঁহার হয় নাই। এরূপ আগ্রহের কোনও বস্তু লাভে কোনও দ্বিধা অনুভব করিবেন অথবা অনুভব করিলেও তাহা মানিয়া চলিবেন, সেরূপ ধাতুরই মানুষ তিনি ছিলেন না। এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন কখনও মনে উঠিলেও এই উত্তরে তাহা চাপিয়া পড়িত—উঁহারা ইহাকে বধূ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। আর বিরিঞ্চির সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ, সে ত—। সুতরাং যদি পারেন, কেন না তিনি উহাকে গ্রহণ করিবেন? এরূপ পথে-ফেলা রত্নমালা হাতের কাছে পাইলে তুলিয়া যে লইতে পারিবে, কণ্ঠে ধারণ করিবার অধিকারই বরং তাহার আছে।—তবে দেখিয়াই অমনই তুলিয়া লইবেন, সে সম্ভাবনা এস্থলে নাই। বলে গ্রহণ করিবেন, পৌরুষের সে মহিমার দিনও আর নাই। সুযোগের অপেক্ষা করিতে হইবে। সুযোগ যখনই উপস্থিত হইল, যথাপ্রয়োজন কৌশলও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কতক সেই কৌশলের ফলে, কতক ভাগ্যক্রমে আকাঙ্ক্ষার বস্তু হাতে আসিয়াছে—এখন ভোগে তাহাকে আনিতে হইবে। তাহার জন্যও অপেক্ষা করিতে হইবে, অতি সাবধানে কৌশলও অনেক অবলম্বন করিতে হইবে। দেশে থাকিতে লতার যেটুকু পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছিলেন হাতে আনিতে পারিলেও আয়ত্ত ইহাকে সহজে করিতে পারিবেন না; তবে অসম্ভব তাঁহার পক্ষে হইবে না। এখন এই ঘটনায় এবং সাক্ষাৎ আলাপে অতি প্রখর যে বুদ্ধির, অসামান্য যে প্রচ্ছন্ন শক্তির, আর চরিত্রগত যে ধীর দৃঢ়তার পরিচয় পাইলেন, তাহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মনে হইল, হাঁ, এই নারীই তাঁহার ন্যায় শক্তিমান্ কর্ম্মী পুরুষের 'বন্ধুত্বের' যোগ্য। লাভ করিতে পারিলে 'বন্ধু'রূপে ইহার নিয়ত সাহচর্য্য ও সহযোগিত্ব কর্ম্মজীবনকেই তাঁহার মধুময় করিয়া তুলিবে—নূতন নূতন কর্ম্মে অক্লান্ত আনন্দে, অদম্য উৎসাহে, তাঁহাকে প্রেরিত

করিবে! বহু কর্ম্মবীরের জীবন এ পৃথিবীতে এরূপ 'বন্ধু'র সাহচর্য্য মধুময় করিয়া তুলিয়াছে, শক্তির উৎসকে নিত্য নূতন রসধারায় উচ্ছলিত রাখিয়াছে, সঙ্কটে বল দিয়াছে, আঁধার সমস্যায় আলোকপাত করিয়াছে। ইহার এই 'বন্ধুত্বে' তেমনই একটা ভাগ্য তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে! সহজসাধ্য না হউক, অসাধ্য হইবে কি? না, এই অসাধ্যকেই সিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তুলিতে হইবে, সেই সিদ্ধিতেই নারীচিত্তজয়ে তাঁহার সিদ্ধির গৌরব, পৌরুষমহিমা তাহার পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইবে। তথা-কথিত স্বামী বিরিঞ্চির সঙ্গে তাহার যে বন্ধন, প্রকৃত পক্ষে সেটা সত্যকার একটা বন্ধন আর নাই। বিরিঞ্চি অস্বীকার করিয়াছে, তাহার পিতা অস্বীকার করিয়াছেন। আর লতার চিত্তে বন্ধনের মূল-সূত্র—অন্তরের যে প্রেমের সূত্র, আর তাহার ধারক যে শ্রদ্ধার অবলম্বন—তাহার কোনও অস্তিত্ব আর থাকিতেই পারে না। আছে কেবল তাহার বহিরাবরণ, অন্তঃসারশূন্য খোলস—অভ্যাসজাত একটা সংস্কারের প্রভাব মাত্র, এ দেশীয় হিন্দুনারীর পক্ষে যাহা ঝাড়িয়া ফেলা সহজ নহে। তবে প্রতি-প্রভাব তেমন আনিয়া ফেলিতে পারিলে তাহাও অনেকে পারে। প্রেমের বন্ধনই তেমন টানে কত এমন ছিন্ন হইয়া যায়, আর এই সংস্কারের বন্ধন হইবে না? বিরিঞ্চির প্রতি ইহার চিত্তে একটা অশ্রদ্ধার ভাব নিশ্চয়ই দেখা দিয়াছে—না দিয়াই পারে না। এখন কথাপ্রসঙ্গে তাহার ও তাহার পিতার ব্যবহারের সুকুশল আলোচনায় অচিরেই ইহাকে পরিস্ফুট একটা বিরাগে পরিণত করিতে হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে অতি দরদী একজন বান্ধব বলিয়া তাঁহার প্রতিও গভীর একটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর তাহার কিছু নাই, এই আশ্রয়ও আন্তরিক একটা দরদের আশ্রয়, এইটি যদি সে বুঝিতে পারে—বুঝাইতেও তাঁহাকে হইবে—মনে প্রাণে একান্তভাবেই তাহার উপরে নির্ভরশীল সে হইয়া উঠিবে। সহজেই তখন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সাহচর্য্যে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া আনিতে পারিবেন। যদি পারেন, তবে আর কথা কি? সর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাৎ, কত বিষয়ের কত সরস আলাপ আলোচনা, ভাবের কত বিনিময়, কত হাস্য-কৌতুক—অতি হৃদ্য একটা মিত্রতার বন্ধনে উভয়কে বাঁধিয়া ফেলিবে। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁহার নারীজনমোহন সুকান্ত মুখের চটুল হাসি, আয়ত উজ্জ্বল চক্ষের লালসাকুল বিলোল দৃষ্টি, ললিতশব্দঝঙ্কার-সমৃদ্ধ সরস বাকপটুতা—প্রতি কথা-টিতে তাহার প্রাণভরা মধুর রসের উচ্ছলন, যখন তখন একত্র ভ্রমণে দেহে দেহস্পর্শের, হাতে হাতের চাপের চৌম্বক আকর্ষণ—অপ্রতিবাধ্য এক যাদুর মোহে লতাকে অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে; স্বপ্নবিভোরতার কোনও মধুমুহূর্ত্তে তখন আত্মসমর্পণ তাহাকে করিতেই হইবে! যৌবনে উপনীত হওয়ার পর জীবনে সে কখনও সুখী হয় নাই, পরিমার্জ্জিত নাগরিক রসবিলাসের যে কি মাদক আনন্দ তাহার স্বাদও কখনও কিছু পায় নাই। তাঁহার সাহচর্য্যে তাহাও কিছু কিছু পাইবে, প্রলুব্ধও তাহাতে হইয়া উঠিবে, না হইয়াই মানুষ কেহ পারে না।

তবে একটি ভয়ের কথা আছে—যে আবেষ্টনীর মধ্যে আপাততঃ সে গিয়া পড়িয়াছে, সেটা—ঠিক অনুকুল নহে। তবে উপায়ান্তরও আর ছিল না। যাহা হউক্, যতদূর সম্ভব সাবধানতা তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে, চম্পটীকেও সাবধান করিয়া দিতে হইবে। যতশীঘ্র সম্ভব—অন্য কোথাও স্থানান্তরিত তাহাকে করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু কোথায় করিবেন? এক আছে তাঁহার নারী কর্ম্মীসঙ্ঘ—ইহারই অধ্যক্ষতায় তাহাকে বসাইতে অবশ্য হইবে—কিন্তু এখনই তাহার যোগ্যস্থান তাহা হইতে পারে না। দেখা যাক! তাঁহার সব কৌশল আর অনুকূল দৈব যদি এতখানি সুযোগ হাতে আনিয়া দিয়াছে, সিদ্ধিলাভে ব্যর্থকাম তিনি হইবেন না।

আর এক পেয়ালা গরম চা ও আর এক কলিকা তামাক ভৃত্য রাখিয়া গিয়াছিল। পান করিয়া তামাকে জোর কয়েকটা টান সুকেশবাবু দিলেন; নাকে মুখে উদ্গীরিত ধূমকুণ্ডলীতে ঘর ভরিয়া উঠিল—

'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ!'

২৩

পরদিন সন্ধ্যার পর সুকেশবাবু যখন গিয়া পৌঁছিলেন, মিসেস্ চম্পটী গৃহে ছিলেন না। লতা আসিয়া নমস্কার করিল। কুরঙ্গ আসিয়াও হাসিমুখে অভিবাদন করিয়া

জিজ্ঞাসিল, বাবু 'চা'টা কিছু খাইবেন কি না। বাবুও মিষ্টহাসিমুখে উত্তরে জানাইলেন, আজ আর প্রয়োজন নাই—চা এই মাত্র সেবন করিয়াই তিনি আসিয়াছেন; প্রয়োজন যদি বোধ করেন তখন ডাকিবেন। কুরঙ্গ গৃহান্তরে নিজের কাজে চলিয়া গেল। তবে সুকেশবাবু জানিতেন, তাঁহাদের যাহা কিছু আলাপ আলোচনা হয়, কুরঙ্গ আড়ালে আড়ি পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা অনেক সময় করে, ডাকিলে নিঃশব্দে দূরে সরিয়া যায়, দূর হইতে সাড়া দেয়।

"ব'স। ভাল আছ ত?"

"আছি একরকম। আপনার শরীর ভাল ত?"

সুস্মিতমুখে সুকেশবাবু কহিলেন, "সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ!—কি মনে হয় দেখে? ভাল না থাকার মত কিছু দেখ্‌তে পাও?"

ঈষৎ কুঞ্চিত হাসিভরা চটুল চোক দুটি তুলিয়া চাহিলেন।

মৃদু একটু মধুর হাসি লতার মুখেও ফুটিল; কহিল, "না, ভালই ত মনে হচ্ছে।"

"হাঁ, তাই বল, ভাল যে থাক্‌তেই হবে। নইলে কি চলে আমাদের? এই ছুটোছুটি—এই হাঙ্গামা হুজ্জোৎ—আবার নিজের ব্যবসাও আছে—সারাটি দিন বিরাম নেই! রাত দুপুরও হ'য়ে যায় এক একদিন! তবে কি না, কাজেও বড় একটা আনন্দ আছে; আর সেই আনন্দই কাজের লোককে তার স্বাস্থ্যের স্ফূর্ত্তিতে ধ'রে রাখে। হাঁ, তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন?—ব'স না? হাঁ, চেয়ারটা একটু কাছে টেনে এনেই ব'স। কথা আছে অনেক।"

বলিয়া ভিতরে যাইবার দরজাটার দিকে একবার চাহিলেন। লতাও চেয়ারটা একটু কাছে টানিয়া আনিয়া বসিল।

"তার পর? কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও কথা আর কিছু হ'ল ওঁর সঙ্গে?"

"হাঁ, ব'লেছেন ত একটি পোয়াতীর কাজে লাগিয়ে দেবেন কাল পরশু তক্।—বয়েস অল্প—একা আছে—হয়ত কিছু বেশী দিনই থাক্‌তে হবে তার ওখানে।"

"কি, রাতদিন থাক্‌তে হবে?"

"হাঁ, রাতদিনই থাক্‌তে হবে। তবে একটি ঝিও তার আছে, দরকার মত এখানেও আস্‌তে পারব।"

"প্রসব হয় নি এখনও?"

"না। ব'ল্লেন, প্রসবের সময় আমাকেই সঙ্গে রাখ্‌বেন; শিখ্‌তেও তাতে অনেকটা পারব। প্রশ্নও অনেক ক'র্‌লেন। তা প্রসব ত অনেক দেখেছি, আঁতুড় ঘরেও কত গিয়েছি—ব'ল্লেন, তাঁর সাহায্য আমাকে দিয়ে হবে।"

"হুঁ।—লেগে যাও এই কাজেই তবে। এইটে ধ'রেই সুরু কর। তবে কি জান—এ কাজটা ঠিক তোমার যোগ্য কাজ নয়। তা আপাততঃ—এই-ই কর। এর পর—সে যখন হয় বোঝা যাবে। কাজ হাতে কিছু এলে—যাই হ'ক্—তা ছাড়্‌তে নেই। কাজেই কাজের অভ্যেস হয়। কাজ যে ক'রতে পারে, যে কাজের ডাকই যখন আসে, সেই কাজে গিয়েই অম্‌নি সে লাগ্‌তে পারে। অলস, উদাসীন, নিশ্চেষ্ট, কাজের ভয়ে জড়সড় লোক আমার দুচক্ষের বিষ। কাজ খুঁজে নেয়, পেলেই উৎসাহে গিয়ে লাগে, এই সব লোক দেখ্‌লেও কি যে আনন্দ আমি পাই সে আর ব'ল্‌তে পারিনে লতা!"

বলিয়া একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন। কেমন আনমনাভাবে লতা কি ভাবিতেছিল। ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "একটা কথা—আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রব ভাব্‌ছিলাম—"

"কি, বল!"

"ওবাড়ীর—এই আমি যেখানে চাকরী ক'রতাম—সে বাড়ীর—খবর কিছু জানেন? সেদিন ব'লেছিলেন ওঁরা আপনার জানাশুনো লোক—"

"হাঁ, জানাশুনোই ত। বহুদিনেরই খুব জানাশুনো লোক ওঁরা আমার। খবর—হাঁ, তাও জানি। সবই আমি জানি লতা।"

বলিয়া একটু হাসিমুখে লতার দিকে চাহিলেন।

"সব—"

অতি বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া লতা চাহিল!

দরজার দিকে একবার চাহিয়া, লতার দিকে কিছু সরিয়া ঈষৎ মৃদুস্বরে সুকেশবাবু কহিলেন, "হাঁ, সবই জানি—তোমার সব কথাও!"

মুখখানি লতা অন্যদিকে একটু ফিরাইয়া নিল। সুকেশবাবু কহিলেন, "তুমি পালিয়ে আসবার পর যা যা ঘ'টেছে, তাও সব শুনেছি। তবে এসব কথার আলোচনা এখানে

ঠিক হবে না। মিসেস্ চম্পটী এখনই এসে প'ড়বেন, আবার কুরঙ্গ র'য়েছে পাশের ঘরে—"

"কোথায় তবে যাব?"

"ঐ 'নুকে' (Nookএ) গিয়ে ব'স্‌তে পার্‌লে সুবিধে হ'ত।"

"নুক্!"

"ঐ যে সিঁড়ির ওধারেই দরজায় একটা ট্যাব্‌লেট্ (ফলক) র'য়েছে 'নুক' লেখা, দেখ নি? ভিতরে আমাদেরই কয়েকটা ঘর র'য়েছে। আমাদের সব কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নিরেলা কোনও পরামর্শের দরকার যখন হয়, ওখানে গিয়ে বসি। বাইরের বিশিষ্ট কোনও কর্ম্মী এলে থাক্‌তে দেওয়া হয়। একটা লোক আছে, দেখে শুনে গুছিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে রাখে। তাহ'লে—চল, বরং ওখানেই গিয়ে বলি।"

একটু কি ভাবিয়া লতা কহিল, "চলুন।"

সুকেশবাবু হাত বাড়াইয়া ঘণ্টাটা টিপিলেন। কুরঙ্গ আসিয়া দাঁড়াইল।

"হাঁ, হরিসিংকে ডেকে বল, 'নুকে'র দরজাটা খুলে আলো জ্বেলে দিক। আমাদের কিছু কথাবার্ত্তা আছে, ওখানে গিয়ে ব'সব।"

মুখে একটু হাসি চাপিয়া কুরঙ্গ বাহির হইয়া গেল; হরি সিংকে ডাকিয়া বাবুর আদেশ জানাইল।

"এস," বলিয়া সুকেশবাবু উঠিলেন; লতাও উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল। হরি সিং সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, উভয়ে গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হরি সিং দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল। লতার সমস্ত শরীরটা কেমন ছম ছম করিয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল, পুরু গালিচায় আস্তৃত মেঝের উপরে একটি টেবিলের এধারে এধারে গদীমোড়া অতি সুদৃশ্য কতগুলি চেয়ার কৌচে এবং আরও কত রকম বিচিত্র আসবাবে সুসজ্জিত গৃহখানি যেন মৃদু দিবালোকের স্নিগ্ধ আলোকে ফুট ফুট করিতেছে। দুই ধারে দুইটি দরজার পর্দ্দার ফাঁকে দুইটি শয়নগৃহও দেখা যাইতেছে; সুন্দর দুখানি করিয়া পালঙ্কে বিচিত্র আস্তরণে আবৃত যেন দুইখানি করিয়া রাজশয্যা শোভা পাইতেছে!—যারপরনাই বিস্মিত মুগ্ধভাবে অবাক্ হইয়া লতা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। গৃহসজ্জার এরূপ পরিপাটি চ'ক্ষেও সে কখনও দেখে নাই; এরূপ যে হইতে পারে কল্পনায় সে কখনও আনিতে পারে নাই। একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "কি, কি ভাবছ? অতি বড়মানষী সব ঘর। নয়? তা কি করি বল? নানা যায়গার অতি বড় বড় লোকও মাঝে মাঝে এসে অতিথি হ'য়ে থাকেন, তাঁদেরই রুচির মত ক'রে সাজিয়ে রাখ্‌তে কাজেই হয়। তবে ঘরটায় এসে ব'স্‌লে, ঐ সব বিছানায় গিয়ে কখনও একটু গড়াগড়ি দিলে নিজেরাও বেশ একটা আরাম যে না পাই তা নয়!"

বলিয়াই হাসিয়া উঠিলেন।

লতা কোনও উত্তর করিল না; গভীর একটি নিশ্বাস মাত্র ত্যাগ করিল। হয় ত বা মনে হইতেছিল, ইঁহারাই ত দেশের নায়ক; অনেকে আবার হয় ত সাম্যবাদের কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন! কিন্তু কালীঘাটের সেই সব খোলার ও টিনের বাড়ী, ঘরে ঘরে দরিদ্র এক একটি পরিবারের জীবন, আর এই সব গৃহের এই সব রাজভোগসজ্জা! ইহার কমে ইঁহাদের দুটি দিনও চলে না!

সুকেশবাবু কহিলেন, "দেখ্‌বে ঘুরে ঘরগুলো?"

মাথা নাড়িয়া লতা কহিল, "না, দরকার কি তার?"

"আচ্ছা, তবে ব'স।—" বলিয়া একখানি কৌচে একটু হেলিয়া বসিলেন। লতাও টেবিলটির পাশে একখানি চেয়ারে বসিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "হরমোহন-বাবুর কাছে সব শুন্‌লাম, আগের কথাও সব জানি।—উনিই সব ব'লেছেন। ব্যবসার সুরু থেকেই ওঁর সঙ্গে আমার খুব জানাশুনো আছে, অনেক কাজকর্ম্মও ওঁর করি। বড় একজন আপন জনের মতই উনি আমাকে দেখেন।—যখন যা হয় বলেনও সব খোলাখুলিভাবে। তা যা শুন্‌লাম, মনে হ'চ্ছে বিরিঞ্চির সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছিল?"

"হ'য়েছিল।"

"তা হ'লে—সব কথাও তোমাকে ব'লেছে?"

"ব'লেছেন।"

"কি ব'লেছে?"

"সবই ত জানেন—আমি আর নতুন কি ব'লব ?"

"হুঁ ।—তা পালিয়ে এলে—"

"কি ক'রব ? কি ক'রে আর ওখানে থাকব ?—পালিয়ে আসব ব'লেই তৈরী হ'য়েছিলাম, তখন হঠাৎ উনি এলেন। খানিক বাদে ইলাও এসে উপস্থিত হ'ল ; সে মূর্চ্ছা গেল ; সেই ফাঁকে অমনি বেরিয়ে এলাম।"

"হুঁ ! ওঁরাও তাই অনুমান ক'রেছেন। তা বিরিঞ্চি কি কৈফিয়ৎ দিল তোমাকে ? তোমার সম্বন্ধে কোনও একটা ব্যবস্থা করা যে দরকার—"

"ব'লেছিলেন ক'রবেন। তা এ অবস্থায় আমি তা কিছু স্বীকার ক'রে নিতে পারি না।"

"না, তা পার না ! ঠিক ব'লেছ !—তোমার মত কোনও মেয়ে এত হীন আপনাকে ক'রতে পারে না !—ব'লব কি, বলাটা আমার বোধ হয় উচিত হবে না—দুঃখও তুমি পাবে —তবে না ব'লেও পারছি না—বিরিঞ্চি যদি একটু শক্ত হ'ত, মনুষ্যত্বের পরিচয় একটু দিতে পারত, আজ দারুণ এই দুর্ভাগ্যে তোমাকে প'ড়তে হ'ত না।"

মুখখানি একটু ফিরাইয়া লইয়া ঈষৎ স্খলিতকণ্ঠে লতা কহিল, "থাক্, ও সব কথায় আর লাভ কি এখন—"

অশ্রু সম্বরণের চেষ্টা করিল ; কিন্তু দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

সুকেশবাবু বলিতে লাগিলেন, "অবিশ্যি তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে সে যে মুগ্ধ হ'য়েছিল, এতে বিস্মিত কিছু হই নি। তরুণবয়স্ক যুবক কেউ না হ'য়েই পারে না।—তবে বিবাহ ওভাবে ফাঁকি দিয়ে নাম পরিচয় ভাঁড়িয়ে গিয়ে করা একদম উচিত হয় নি তার। পিতার মত পাওয়া তার সহজ হ'ত না ঠিক্। তবে মাকে ধ'রে পাকড়ে চেষ্টা একটা ক'রতে পারত, হয় ত তিনি ঘটাতেও এটা পারতেন। তা সে যাই হ'ক্, অতটা ভরসা যখন পেল না, অল্পে অল্পেই তার স'রে আসা উচিত ছিল। তবে সেটা পারে নি।—পারাও সোজা নয়, তা বুঝি। কিন্তু উচিত ছিল তার তখন তোমার বাবাকে সব খুলে বলা। তিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা যা হয় ক'রতেন। তা সে যাই হ'ক্, বিবাহ যখন ক'রলই, নামটাম গুলো ব'দ্‌লে ক'রবার কোনই দরকার ছিল না। তারপর বাপের এক ধমকে অম্‌নি ভেঙ্গে প'ল—ছি ছি ছি ! সে একটু দুর্ব্বল নরম ধাতুর ছেলে, তা জান্‌তাম। কিন্তু তাই ব'লে—"

"ভয় দেখিয়েছিলেন—"

"জানি সব ! তা ভয় যাই দেখান, সে যদি তার দায়িত্ব বুঝে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে পারত, কি ক'রতে পারতেন তিনি ? আদালতে গিয়ে অসিদ্ধতার একটা রায়—না, অতটা তিনি যেতেন কিনা সন্দেহ। গেলেই বা কি ? সাবালক ছেলে, না হয় সিভিল ম্যারেজের আইনে রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়েটা পাকা ক'রে নিত। তবে পিতা ত্যজ্যপুত্র তাকে ক'র্‌তেন, তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হ'ত। তা লেখাপড়া শিখেছে, কাজকর্ম্ম ক'রে খেতে পারত না ? যদি মানুষ হ'ত, তাই সে ক'রত। ভদ্রলোকের একটি মেয়ে—ভালও নাকি তাকে বেসেছিল—তা পৈতৃক সম্পত্তির লোভে তার এই সর্ব্বনাশটা অনায়াসে ক'রল—"

লতা বলিয়া উঠিল, "থাক্ ! আর ও কথায় কাজ কি ? যা হবার হ'য়ে গেছে—"

"যা হবার সে ত হ'য়ে গেছেই, ফেরাবারও আর পথ কিছু এখন নেই। তবু ব'ল্‌তে কি লতা—সহ্যই আমি ক'র্‌তে পারছি না !—তোমার এই দুঃখ, বিনা অপরাধে দারুণ এই দুর্গতি—এই লাঞ্ছনা—তোমার বন্ধু কেউ, হাঁ, বন্ধু ব'লেই আমাকে জান্‌বে—সহ্য কেউ ক'র্‌তে পারে না ! —হতভাগা তখন যদি আমাকে এসেও সব ব'লত, আমি অন্ততঃ এই পরামর্শ তাকে দিতাম। হরমোহনবাবু আমার বড় একজন মুরুব্বি—জান্‌তে পারলে খুবই রেগে যেতেন, হয় ত বা সকল সম্বন্ধই আমার সঙ্গে ত্যাগ ক'র্‌তেন ; তবু এই পরামর্শই তাকে দিতাম, সহায়তাও তার ক'রতাম। অবিশ্যি তোমাকে তখন তেমন জান্‌তাম না, আজ যে বন্ধুত্বের দরদ অনুভব ক'রছি সেটাও তখন ছিল না। তবে মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে যে একটা দরদ মানুষের ওপর মানুষের থাকে সেই দরদে—নারীর দুঃখে নারীর উপরে অবিচার অত্যাচারে যে বেদনা পুরুষমাত্রেরই প্রাণে জেগে ওঠে, সেই বেদনায়—এটা আমি ক'র্‌তাম, না ক'রেই পারতাম না !"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লতা কহিল, "তখন আপনি কিছুই জান্‌তেন না ?"

"না। জান্‌লে কি আর এতটা হয় ? নিজে গিয়ে বিরিঞ্চিকে ধ'রে এই করিয়ে নিতাম। না, তখন হরমোহন-বাবুও আমাকে কিছু বলেন নি। বলেছিলেন, বিয়ের পর বিরিঞ্চিকে বিলেতে রওনা করিয়ে দিয়ে তোমাদের খরচ

পত্রের বন্দোবস্ত যখন করেন, তখন। তখনও ঠিক ধ'রতে পারি নি তুমি কে। চিনতে পারলাম, যখন তোমরা তোমার বাড়ীতে গেলে, আর সেই খবরটা হরমোহন আমাকে দিলেন। তার পর দেশে গিয়ে যখন তোমাকে দেখ্‌লাম—আর প্রথমই সেই দেখ্‌লাম তোমার এই দুর্ভাগ্য জীবনের সকল ইতিহাস জেনে—বড় দুঃখও তখন হ'ল।—কিন্তু উপায়ের কলকাঠি সব তখন হাতছাড়া হ'য়ে গেছে!"

একটু কি ভাবিয়া লতা কহিল, "কিন্তু আমাদের ত কিছুই জানান নি। একটু খবরের জন্য কি যে আকুলি বিকুলি আমরা ক'রেছি—"

"জান্‌তাম সব। অস্বস্তিও বড় একটা তাতে বোধ ক'রেছি। কিন্তু কি তোমাদের গিয়ে ব'লব? তবু এই একটা বিশ্বাস নিয়ে তোমরা ছিলে, বিবাহ হ'য়েছে, স্বামী নিরুদ্দেশ। আর আমাকে গিয়ে জানাতে হ'ত, ক'ল্‌কেতার ধনির ঘরের এক দুলাল ফাঁকি দিয়ে বিবাহের একটা ছল ক'রে এই সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে স্থাপনা ক'রেছিল, এখন ছেড়ে দিয়ে গেছে। খোরপোষের একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে, যেমন যেমন নাকি সৌখিন ধনির ছেলে আরও অনেকে ক'রে দিয়ে থাকে—বিশেষ যদি সন্তানের দায়ও এসে পড়ে।"

অগ্নিবর্ণ মুখখানি লতা অন্যদিকে ফিরাইয়া নিল। লক্ষ্য করিয়া স্থকেশবাবু কহিলেন, "কিছু মনে ক'রো না লতা—বড় কড়াভাবেই কথাটা মুখে বেরোল—মনের বেগ সামলাতে পারিনি!—ব'লবার মত কথা নয় ব'লেই তোমাদের কিছু তখন বলিনি। তবে সে যাই হ'ক, ফিরে এসে বিরিঞ্চি তোমাদের খোঁজখবর কিছু নিয়েছিল কিনা জানি না। আমাকে কিছু বলেনি। হয়ত জান্‌তই না আমি সব জানি। আমিও যেচে তাকে গিয়ে কিছু বলিনি। তবে এক একবার মনে হ'য়েছে ক'ল্‌কেতায় যদি তোমরা যেতে পারতে, কি কোন কৌশলে তোমাদের নিতে পারতাম, বিরিঞ্চিকে সব ব'লে তোমার সঙ্গেও দেখা করিয়ে চেষ্টা একটা ক'রে দেখতাম—যে ভাবেরই হ'ক, বিবাহের অনুষ্ঠান ত একটা হ'য়েছিল—সেই রকম কোনও সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে সম্ভব হয় কিনা—অবিশ্যি তার পিতা কি আত্মীয় স্বজন আর কেউ জান্‌তে কিছু না পারেন এমন ভাবে—"

একটু ভ্রুকুটি লতার ললাটে উঠিল; কহিল, "সে রকম কোনও সম্বন্ধ উনি চাইলেও আমি স্বীকার করে নিতাম না, নিতে পারতাম না!"

"হুঁ—নেওয়াটা—না, তোমার মর্য্যাদা তাতে বজায় থাকৃত, এ কথা আমিও ব'ল্‌তে পারি না। তবে মনে কথাটা মধ্যে মধ্যে উঠ্‌ত। মামার বাড়ী ছেড়ে যখন কাশী তোমরা যাও, তখন আমি দেশেই ছিলাম। কেবলই মনে হ'ত, ক'লকেতায় যদি তোমরা যেতে কি নিতে আমি পার্‌তাম—তার সঙ্গে একবার দেখা অন্ততঃ আমি করিয়ে দিতাম। একটা বোঝাপড়া ত তার সঙ্গে তোমার হ'ত। এই যে দৈবচক্রে ওদের ঐ বাড়ীতেই হঠাৎ তার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল আর নিরুপায় হয়ে পথে বেরিয়ে এই বিপদে তোমাকে পড়তে হ'ল, সেটা ত ঘটত না। ভাগ্যে থানার ঐ দারোগাবাবুটি ভাল লোক ছিলেন, আর আমি গিয়ে জামিন হ'য়ে দাঁড়াই। নইলে—কার হাতে পড়তে, কোথায় নিয়ে যে সে তোমায় আটকাত—গুণ্ডা বদমায়েস শ'য়ে শ'য়ে রেতে কলকেতায় বেড়ায়—কি যে হ'ত ভাবতেও প্রাণ শিওরে ওঠে! তবে কথাটা মনেই কেবল হচ্ছিল; সুবিধে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারলাম না।"

লতা একটি নিশ্বাস ছাড়িল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে শেষে কহিল, "আমি চ'লে আস্‌বার পর ওবাড়ীতে—হাঁ, ওঁরা কি সবাই জান্‌তে পেরেছেন আমি কে, কেন পালিয়ে এসেছি?"

"বৌটি মূর্চ্ছা গিয়েছিল, শুনলাম অসাড় ভাবেই নাকি প'ড়ে রয়েছে। বিরিঞ্চি বোধ হয় তার মাকে সব ব'লেছে। হরমোহনবাবু নিজেই সব বুঝে নিয়েছেন, আভাসও বোধ হয় দুই একটা কথায় বিরিঞ্চির মার ঠেঁয়ে পেয়েছিলেন। বিরিঞ্চির কাছেও কিছু কিছু শুনে থাকতে পারেন। তবে বুঝ্‌তেই পার, ঘটনা যা সব ঘটেছে তাতে বাড়ীর লোকজন সব জল্পনা কল্পনা নানা রকম ক'রবেই। বিন্দীটা আবার কাল ওখানে গিয়েছিল। সে এসে যা ব'ল্লে—"

"কি বল্লে?"

"সে কথা—ব'লবার মত কথা নয় লতা। তবে মনে হয়—সবই তোমার জানা উচিত। যে দুর্ভাগ্য তোমাকে

বহন ক'রতে হ'চ্ছে, তার উপরে বেশী আর কি ভারবোঝা তা হবে? আর সব জেনে বুঝে—ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতও সেইভাবে তোমাকে হ'তে হবে।"

"ঠিক। তা হ'লে বলুন, জান্‌তেই আমি চাই।—"

সঙ্কুচিত ভাবে সুকেশবাবু কহিলেন, "ওরা—ওরা নাকি বলাবলি ক'রছে, বিরিঞ্চির সঙ্গে তোমার একটা সম্বন্ধ আগেই কোথাও হ'য়েছিল—ঐ ছেলেও তারই ছেলে। রাত্তিরে সে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে, বউ গিয়ে ধ'রে ফেলে,—তারপর সেই তোমাকে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।"

"আর উনি—উনি—কিছুই কাউকে বলেন নি! জান্‌তে দেননি কাউকে বাস্তবিক ঘটনা কি, কি সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে আমার ছিল—আর কি অবস্থায় কি ভাবে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি?"

অগ্নিবর্ণ চক্ষুমুখ তুলিয়া লতা চাহিল। একটা ঢোক গিলিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "শুনিনি ত কিছু। তবে—তবে—হয় ত এ সব কথা কানেই তার আসেনি।"

"অন্ততঃ এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল এইরকম একটা কথা হবে, আর বাইরেও এ কালী ছড়াবে।"

"হাঁ, সেটা তার বোঝা উচিত ছিল বইকি, আর যাতে না এই রকম একটা কলঙ্ক তোমার নামে হয়, তারও চেষ্টা করা উচিত ছিল। তবে অত খানি হিসেবের বুদ্ধি কি মনের বল বিরিঞ্চির নাই। কালী ত ছড়াবেই। বিন্দীটা আবার দেশে যাচ্ছে, থাক্‌তে আর চাইছে না। সে গিয়ে আরও রঙ ফলিয়ে কি যে না বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে ব'লবে—"

অসহ্য একটা জ্বালায় সমস্ত শরীর লতার ছটফট করিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল, গায়ের সব চামড়ামাংস কামড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে! কিন্তু উপায় নাই! উপায় নাই! ইহাও তাহাকে সহ্য করিতে হইবে! আর তার সেই মামী—কত ভালবাসিতেন, কত বড় একটা বিশ্বাস তার উপরে ছিল—হায়, কি করিয়া সে তাঁহাকে বুঝাইবে এত বড় কলঙ্কের ভাগিনী সে নয়! সে মুখো হইবারও সব পথ যে তার বন্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে বুক চাপিয়া মাথাটি লতা টেবিলের উপরে রাখিল।

"লতা!"

স্বর অতি করুণ, কোমল, সমবেদনার উচ্ছ্বসিত আবেগে যেন ঈষৎ শ্লথ! অর্দ্ধব্যক্ত একটা রোদন ধ্বনি লতার মুখে উঠিল।

"লতা!"

"আজ্ঞে!"

"তুমি—তুমি—কাঁদছ!"

স্বর আরও করুণ, আরও কোমল, আরও শ্লথ! লতার প্রাণে গিয়াও কেমন মধুর স্নিগ্ধ একটা স্পর্শ দিল! অশ্রুধারা-সিক্ত মুখখানি তুলিয়া কহিল, "আমি কাঁদব না ত কে আর এ পৃথিবীতে কাঁদবে! এত বড় অভাগী কে আর এ ধরায় আছে?—মেয়েমানুষের সবার উপরে যে আশ্রয়—দুদিনেই হারালাম।—কেন হারালাম, কি অপরাধে জানি না। মামার বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়ালাম, ছেড়ে বেরোতে হ'ল। কাশীতে একটু ঠাঁই নিলাম—কাজ ক'রে দুটি খাব, থাক্‌তে পারলাম না। শেষে যে আশ্রয় পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম বড় শান্তির আশ্রয় হবে, ছেলেটাকেও হয়ত মানুষ ক'রে তুলতে পারব। কিন্তু পালিয়ে আস্‌তে হ'ল এই চূণকালী মুখে নিয়ে!—এখন কি ক'রব, কোথায় যাব? আবার—আবারই বা কি অবস্থার কোথায় গিয়ে পড়ব!"

ফুঁকরাইয়া লতা কাঁদিয়া উঠিল,—দুই হাতে মুখ চাপিয়া আবার টেবিলটির উপর উবুড় হইয়া পড়িল।

"কেন ভাবছ লতা? ভয় কি? যে আশ্রয় পেয়েছ এ থেকে কখনও বঞ্চিত হবে না।"

উঠিয়া সুকেশবাবু লতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আবেগের আরও উচ্ছ্বাসে বলিতে লাগিলেন, "না, এ আশ্রয় ছেড়ে কখনও তোমাকে কোনও ভয়ে এমন ক'রে পালাতে হবে না! জেনো, আমি তোমার বড়—বড় একজন দরদী বন্ধু! যা ক'রছি, ক'রতে চাইছি, অসহায় ব'লে কেবল একটু দয়া ক'রে নয়—বন্ধু ব'লে সত্যিকার একটা দরদে, তোমার ব্যথার ব্যথী হ'য়ে। দুদিনের এই পরিচয়ে কত গভীর যে একটা স্নেহ, কত বড় উচ্চ যে একটা শ্রদ্ধা তুমি আমার আকর্ষণ ক'রেছ, সে তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারব না লতা! এই যে সব বিপদজাল তোমাকে ঘিরে ফেলেছে, এ থেকে মুক্ত ক'রে তোমার যোগ্য কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে যদি

দাঁড় করিয়ে তোমাকে দিতে পারি, যার গৌরবভাতির সম্মুখে সকল অবিচার অত্যাচার লজ্জায় নতশির হবে, সকল বিরুদ্ধ রসনা বিস্ময়ে স্তব্ধ হবে, তবেই আমার এই বন্ধুত্বের সকল দরদ, সকল শ্রদ্ধা, সকল প্রয়াস সার্থক হবে—কৃতকৃতার্থ আমি হব! সত্যি জেনো লতা, ঠিক এই রকমই একটা বন্ধুত্বের টান মনে প্রাণে আমি অনুভব করছি! ভয় নেই লতা, কিছু ভেবো না, আমার এই বন্ধুত্ব—আশ্রয়ই যদি বল—সে আশ্রয় অটুট অটল হ'য়ে তোমার থাকবে। কারও সাধ্য নাই, এর ভিত্তির কোনও একটু বন্ধন এতটুকুও শিথিল কখনও করতে পারবে।"

"—আপনার দয়া। আর কোনও উপায়ই যে আমার নাই।"

"দয়া! দয়া নয় লতা, দাবী, বন্ধুত্বের দাবী! আমার যেমন দেবার, তোমারও নেবার দাবী; এই বন্ধুত্ব আমাদের সত্য ক'রে তুলেছে!"

বড় কাছেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একটু সরিয়া লতা কহিল, "আপনি বসুন।" কেমন ত্রস্তভাবে পিছাইয়া সুকেশবাবু গিয়া নিজের আসনে বসিলেন। প্রসঙ্গটা ঘুরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "হাঁ, তোমার মাকে কোনও চিঠি লিখেছ?"

"না, লিখিনি এখনও। কি লিখ্‌ব তাই ভাবছি।"

"দেখাশুনোর সম্ভাবনা শীগ্‌গির—"

মাথা নাড়িয়া লতা কহিল, "না, আমিও সেখানে যেতে পারি না, তিনিও এখানে আস্‌তে এখন পারেন না। কোথায় আস্‌বেন? একটা স্থিতি কোথাও আমার যদ্দিন না হয়—"

"হুঁ! তাহ'লে—"

"একটা চিঠি লিখে তাঁকে সব জানাব—"

"কিন্তু খবর পেয়েই যদি তিনি চ'লে আসেন?"

"আস্‌বেন—কোথায়? ঠিকানা কিছু জানাব না। লিখব, আমি নিরাপদেই আছি, কোন ভাবনার কারণ তাঁর নেই। আমার খবর তিনি চিঠিতে যখন যেমন দরকার—পাবেন।—তাঁদের খবরও আমি পাব—হাঁ, আপনি ওবাড়ী থেকে মাঝে মাঝে জেনে এসে খবর যা থাকে, জানাতে অবিশ্যি আমাকে পারবেন?"

"নিশ্চয়ই! তার আর কথা আছে কি? খবর পাবই। ওঁরাও তাঁকে সব জানাচ্ছেন।"

"জানাচ্ছেন! কি—কি জানাচ্ছেন?"

"সবই ত জানাতে হবে—জানাশুনো সব হ'য়ে গেল, আবার তুমি পালিয়ে এলে—চেপে আর কি রাখতে পারেন কিছু? শুন্‌লাম, খোলাখুলি সবই জানাবেন। বিরিঞ্চি যাই ভুল ক'রে থাক্, বৈধ বিবাহ ব'লে মেনে নিয়ে বধূ ব'লে কেন তোমাকে গ্রহণ ক'রতে পারেন না, সব খুলে তাঁকে লিখ্‌বেন। আর কি ব্যবস্থা তোমার আর তোমার ঐ শিশুটির জন্য করতে চান—"

"ব্যবস্থা! কিসের ব্যবস্থা?"

"এই তোমাদের খরচপত্রের। সত্যি একেবারে ফেল্‌তেও ত তোমাদের এখন পারেন না। কথার ভাবে মনে হ'ল, আগে যা ক'রেছিলেন তার চাইতে অনেক ভাল ব্যবস্থাই এখন ক'রবেন।"

একটু বিরাগভরে মুখখানি লতা একদিকে ফিরাইয়া নিল।

"তাহ'লে সে ব্যবস্থা তুমি গ্রহণ ক'রে নিতে চাও না?"

"নিতে যদি পারতাম, মামার বাড়ীতে ডাকঘরের টাকা ফিরিয়ে দিতাম না। তবে এই খবর পেয়ে মণিঠাকুরুণের বাড়ীতে মা থাকবেন কিনা, তিনিও রাখ্‌বেন কিনা, তাই ভাব্‌ছি। তিনি আবার—'

"জানি।—হরমোহনবাবুর নিকট সম্পর্কে একজন খুড়ী-মা। আচ্ছা, ওঁদের চিঠি গিয়ে পৌঁছুক—তারপর কে কি করেন, কি হয় না হয়, সব তোমাকে জানাব। অবস্থা বুঝে যা দরকার তখন করা যাবে।"

"আচ্ছা।"

"হাঁ, তাহ'লে ওটা থাক এখন। রাতও অনেক হ'য়ে গেল।"

উঠিয়া ঘণ্টাটা টিপিলেন। হরি সিং আসিয়া দরজাটা খুলিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে তখন বাহির হইলেন।

মিসেস্ চম্পটী তখন ফিরিয়া আসিয়াছেন; নমস্কার করিয়া চাহিয়া একবার দেখিলেন; উক্তি কিছু করিলেন না। সুকেশবাবু কহিলেন, "এই যে—আপনি এসেছেন ফিরে! আসি তবে এখন—রাত হ'য়ে গেছে ঢের, ব'সব না আর—নমস্কার!"

"নমস্কার। আসুন তবে। হাঁ, ওঁকে—কাল পরশু তক্ একটা কাজে বোধহয় লাগিয়ে দিতে পারব।"

"হাঁ, শুনেছি। ধন্যবাদ! আসি তবে লতা।"

(ক্রমশঃ)

শিল্প-ফলক

শ্রীবেলাবাসিনী গুহ

প্রবন্ধ

বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের শিল্পই একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা। শিল্পী স্বীয় মনের কথা শিল্পে অভিব্যক্ত করিয়া পৃথিবীবাসী সকল মানুষের সাথেই আলাপ করিতে পারেন এবং বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই ছবিতে প্রতিফলিত করিতে পারেন। চিত্রশিল্পই মানুষের প্রাচীনতম লিখিত ভাষা, আধুনিক অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বে আলেখ্যই মনোভাব লিখিয়া প্রকাশ করিবার একমাত্র অবলম্বন ছিল। একজন মানুষের পক্ষে পৃথিবীর সকল দেশের ভাষা আরত্ত করিয়া প্রত্যেক দেশের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির মর্ম্মবোধ করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু শিল্পের ভাষা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি-মাত্রেরই সহজাত। এ ভাষার বর্ণমালা প্রকৃতির পাঠশালায় মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শিখিতে পারে, তাই শিল্পী যেদেশের ও যে যুগেরই মানুষ হৌন, তাঁহার রচিত শিল্পের রসবোধ করিতে কাহারও কোন বাধা জন্মে না।

শিল্প ছাড়া ইতিহাসেরও উদ্ধার সাধিত হয় না। অতীতের কত কাহিনী ভাস্কর্য্য ও চিত্রে মূর্ত্ত হইয়া আছে। যদি একটা শিলালিপি অথবা তাম্রশাসন পাওয়া যায়, তবে তৎকালীন ভাষার অনভিজ্ঞতার দরুণ তাহার পাঠোদ্ধার করা শক্ত হয়। কিন্তু একটি পাথরে উৎকীর্ণ শিল্প বা চিত্রপট পাইলে সেকালের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা বুঝিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না।

বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতবর্ষ শিল্পে কত বড় ছিল, তাজমহল, অজন্তা, ইলোরা, বরভুধর, ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের শিল্প তাহা পৃথিবীতে ব্যক্ত করিতেছে। একই দেশে এইরূপ পরস্পর স্বতন্ত্র মৌলিক-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পের সমাবেশ এদেশের অধিবাসীদের অভিজ্ঞ, সুস্থ ও সৃজনক্ষম মনের নিদর্শন। এখন কিন্তু আমরা আর আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের শিল্প-প্রতিভার অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্য্যবিদ্যা আমাদের নিকট উপেক্ষিত, আমরা এখন লেখাপড়া শিখিয়াই বিদ্বান্ হই। জীবনে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কত আয়াসে কত যত্নে আমরা লেখাপড়া শিখি, কিন্তু শিল্পও যে সযত্নে শিক্ষণীয় ইহা মনে করি না। অতীত ও বর্ত্তমানকে ভাষা দান করিয়া যে অনুপ্রেরণাময় বিদ্যা আলোক-সম্পাতে ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশ করিতে সমর্থ, তাহাতে অনভিজ্ঞ থাকিয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করা আদৌ চলে না। সকলেই যে চিত্রশিল্পী অথবা ভাস্কর হইবেন একথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য্য ও ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিবার যোগ্য পরিপ্রেক্ষণ ক্ষমতা সকলেরই আয়ত্ত করা উচিত।

বিশুদ্ধ ছবি স্বয়ংসিদ্ধ। অভ্রান্ত ছবির অর্থ বা রূপ ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভাষার আবশ্যকতা নাই, পক্ষান্তরে ভাষা যেমন শিক্ষার বাহন ছবিও তেমনই, যথা—গ্রন্থকার যেখানে কোন জটিল বিষয়ের সমাধান করিবার নিমিত্ত রাশি রাশি কথা লিখিয়াও কূল পান না, সেখানে একটি ছবিই তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। বৈজ্ঞানিক যখন তাঁহার গবেষণা লিপিবদ্ধ করেন, তখন সকল তথ্য যথাযথরূপে প্রকাশ করিবার জন্য শুধু মাত্র লেখার সাহায্যই পর্য্যাপ্ত মনে না করিয়া চিত্রের সাহায্যও লইয়া থাকেন। ব্যবসায়ীরা তাহাদের বিজ্ঞাপনের জন্য প্রধানত ছবিই ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ সর্ব্বত্রই সকল ব্যাপারে মানুষ নিজের বক্তব্য, লেখা ও ছবি এই দুইয়ের সমান সহায়তায় প্রকাশ করে। সর্ব্বত্রই দেখা গেল মানুষের ব্যাপক প্রয়োজন চিত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকে। ক্যামেরা শুধু প্রতিচ্ছবিই গ্রহণ করিতে পারে, রচনা করিতে পারে না, তাই ফটোগ্রাফ্ কখনও ছবির প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যতীত নর-নারীনির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশ জীবিকা সমস্যায় অভিভূত; সুতরাং মেয়েরা যদি উপযুক্তরূপে অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চিত্রোপজীবিনী হয় তবে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে পারে।

বাংলা দেশে সরকারী একটিমাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Govt. Art School) আছে; সেইটি শুধু ছেলেদের জন্য, মেয়েদের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। গভর্ণমেণ্ট ছেলেদের জন্য

যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই অভাব দূর করিবার সংকল্পে একটিমাত্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান নারীর শিক্ষকতায় এবং নারীর পরিচালনায় গড়িয়া উঠিয়াছে যেখানে শুধু মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ধারাবাহিকরূপে ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ "গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের" কাছে বনস্পতির তুলনায় চারাগাছের মত, ইহার সার্থকতা নির্ভর করে মেয়েদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার আগ্রহের উপর। বাংলার মেয়েরা অন্য সকল বিষয়ে প্রগতিশীলা হইয়াও চিত্রবিদ্যায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ; মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং বরোদা, মহীশূর ইত্যাদি করদ রাজ্যগুলিতেও মেয়েদের জন্য চিত্র এবং ভাস্কর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, শুধু বাংলার মেয়েরাই এ শিক্ষায় বঞ্চিত।

ভরার মেয়ে

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

ভরার মেয়ে নিয়ে বজ্‌রা এলো ঘাটে।
তীরে পাত্রী-সন্ধানীর জটলা।
উৎসুক দৃষ্টি তাদের চোখে,
প্রত্যেকেই খোঁজে তার মনোনীতাকে।

দুটি চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে
যেখানে পড়ে গাঁঠ্‌-ছড়া
মাঝির মাশুল সেখানে হয় দ্বিগুণ চতুর্গুণ।
মূল্যাভাবে কঠিন গ্রন্থি ছিন্ন হয়,
সোনার কড়িতে গাঁথা হয় বরমাল্য।

ছিন্নবল্‌গা চক্ষে পড়ে পল্লব,
নত নেত্রে যাকে দিতে হয় রক্তজবার মালা
তার সঙ্গেই যেতে হয় বলির উৎসর্গকে
হাড়িকাঠের উপকণ্ঠে।

মাঝি চলে ঘাটান্তরে
ক্রেতান্তরের উদ্দেশে।
স্বয়ং প্রজাপতি যেখানে পণ্য-ব্যবসায়ী
সেখানে পুষ্পধন্বার ধনুশ্রম পণ্ড।
তাঁর তূণের পুষ্পশরের ফুলে ফুলে কীট,
গেরো বাঁধা ছিলায় ধনুকে আর গুণ চড়ে না

কন্দর্পের এখন বেকার-সমস্যা।
অভিন্নহৃদয়া রতির সঙ্গে নিত্য চলে গৃহ-বিবাদ।
দেবী বলেন,
তোমার ধনুঃশরে দাও জলাঞ্জলি,
আমার অলঙ্কার বেচে কিনব ভাউলে।
আঁচলে বাঁধব পালের হাওয়া।
প্রাণে প্রাণে যাদের পড়বে গাঁঠ্‌-ছড়া
তাদের নিয়ে পাড়ী দেব অকূলে,
তুমি চুপ্‌টি করে ব'সে থেকো হাল ধ'রে।

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতসীর বাবার নাম উপেন। গরীব গৃহস্থের ঘরে উপেনের জন্ম। ওরা জাতিতে কায়স্থ। গরীব ব'লে একেবারে ভিখিরী হবার মত গরীব সে ছিল না কোনদিন। নিজের ব'ল্‌তে একটা বাস্তু ভিটে আর বিঘে চার আবাদী জমিও ছিল ওর। উপেন পনের টাকা মাইনেয় চটকলে কাজ ক'রত। পর্য্যাপ্ত না হ'লেও, একমুঠো মোটা ভাত, আর পরণে একখানা ন'-হাত ধূতির অভাব হয় নি কখন। তেমনি ক'রেই চল্‌ছিল দিন।

মাত্র বারো বছর আগেকার কথা! কাল-বোশেখীর ঝড়ে যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৃথিবীর রূপটা যায় বদ্‌লে, সবুজ কচিপাতার শাখায় শাখায় কাঁপন লেগে শান্ত প্রকৃতির বুকে প্রলয়ের বিভীষিকা ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনি ক'রে ওর জগতে ব'য়ে গেল একটা ভাঙনের ঝড়। তিনটি বছর বিছানায় প'ড়ে থেকে উপেন ধীরে ধীরে উঠ্‌ল অতসীর হাত ধ'রে, চিরদিনের মত জীবনের অমূল্য সম্পদ দুটি হারিয়ে। আকাশের অফুরন্ত আলো, পৃথিবীর বিচিত্র রূপ, প্রিয়জনের মুখে হাসির হাল্‌কা রঙ জন্মের মত বিদায় নিল ওর দৃষ্টিপথের রুদ্ধ বাতায়ন হ'তে। চট্‌কলের সেই চাকরি, জমি, এমন কি, বাস্তু ভিটেটুকু পর্য্যন্ত গেল তার আগে।

অতসীর মা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন নিজে খেয়ে না-খেয়েও সে যোগাত ওদের একমুঠো অন্ন। কিন্তু দিনের পর দিন শুধু উপবাসের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'দিন বাঁচ্‌তে পারে মানুষ! দুগ্ধপোষ্য ছেলেটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু ভাতের ফেন আর চিঁড়ের কাৎ খাইয়ে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল দু'বছর। শেষে তাও আর জুট্‌ল না। প্রতিবেশীর সহানুভূতি শেষ হ'য়ে এলো। অবোধ শিশু যখন পেটের জ্বালায় চীৎকার করে, মায়ের শীর্ণ পাঁজরা ক'খানা ভেঙে পড়ে হাহাকারে। ওই কচি ছেলের মুখেও ফুটে ওঠে অনশনের ক্লেশ; আস্তে আস্তে কাঁদবার শক্তি-টুকুও যেন লোপ পেয়ে আসে।

আজও জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে চোখের সাম্‌নে! নিস্তব্ধ দুপুর রাতে পাড়া নিশুতি হ'য়ে যায়, খোকার চোখে নামে না ঘুম। কেমন একটা অস্ফুট কাৎরানি! থেকে থেকে চীৎকার ক'রে ওঠে; দুরন্ত পিপাসায় গলার ভিতর হঠাৎ আট্‌কে যায় সেই কান্না। ওর মা পাগলের মত দু'হাতে বুকে চেপে ধরে সেই ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে, কিন্তু স্তনে তার দুধ নেই; একমুঠো ভাতের অভাবে শুকিয়ে গেছে মায়ের বুকের দুধ! তবু তুলে দেয় খোকার মুখে সেই বিশীর্ণ স্তনের শুক্‌নো বোঁটাটুকু।—যদি নামে, একবার কোন রকমে যদি নেমে আসে এক ঝলক দুধ! না হয়, বুকের খানিকটা রক্ত!

উপেন তখন চোখে দেখে না—কিন্তু বুঝ্‌তে পারে; মুমূর্ষু পত্নীর পাশে ব'সে সে কাণ পেতে শোনে তার অন্তরের হাহাকার, আর ক্ষুধার্ত্ত শিশুর আর্ত্তনাদ! ছেলেটা তিল তিল ক'রে ফুরিয়ে গেল। তার পর গেল তার মা।—অন্ধের চোখে যে জল গড়ায়, সে জল বুঝি অশ্রু নয়! রিক্ত উপেন উপবাসক্লিষ্ট অতসীর হাত ধ'রে এসে দাঁড়াল পথে। অতসী তখন ন বছরের মেয়ে।—গ্রামের মায়া ছেড়ে ওরা আশ্রয় নিল এসে শহরের রাজপথে।

সেই থেকে ওরা ভিখিরী। পেটের জন্যে হয় ত উপেন ক'রত না ভিক্ষে। কিন্তু ওই কচি মেয়েটাকেও না খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে আর সাহস হয় না ওর। প্রথম প্রথম মেয়েটার হাত ধ'রে এর-ওর বাড়ী সাহায্য চেয়ে বেড়াত; কখনও আপিসে কখনও আদালতে বাবুদের কাছে গিয়ে জানাত তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। কেউ বা দয়া ক'রে দিত একটা পয়সা, কেউ বিরক্তির সঙ্গে ক'রত প্রত্যাখ্যান। সহানুভূতি নিয়ে ক'দিন চলে মানুষের! তাই আবার নতুন পথ দেখ্‌তে হয়।

চোখের সাম্‌নে যে ওলট-পালট হ'য়ে গেল, ন বছরের মেয়ে অতসীর মাথায় যোগায় না তার সবটুকু চিন্তা। সকাল

থেকে সন্ধ্যে অবধি বাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওর হাতে-পায়ে যখন নেমে আসে ক্লান্তি, তখন আর ভাল লাগে না চলা; পথের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। উপেনের বুকের কাছে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বলে—"বাড়ী যাবে না বাবা? কত দিন ত হ'য়ে গেল!"

"বাড়ী! হাঁ বাড়ী। যাবো বৈ কি মা। আর ক'দিনই বা!"—অতসীর মুখখানা ও দেখ্‌তে পায় না। হাত দিয়ে অনুভব করে তার মুখচোখ। চোখের জলে আঙুলগুলো ভিজে ওঠে।—মুখখানা হয় ত শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে! আজ কতকাল ও পেট ভ'রে খায় নি।

অতসী ভাবে। ওর নিজের হাতে লাগান শশা-গাছটা বুঝি এতদিনে আঙুল বাড়িয়ে মাচানের কাটিগুলো জড়িয়ে ধ'রেছে। সাতুদের ছাগলটা আর নাগাল পাবে না তার কচি ডগা।—থোপ্‌না গাঁদার কুঁড়িগুলো ফুটেছে বাড়ী আলো ক'রে। পান্নুরা কখন তুলে নিয়ে যাবে বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

ওদের ভাগ্যবিধাতা হাসেন। সেই হাসি, যার উত্তাপে মায়ের বুক শুকিয়ে হয় সাহারা; অন্ধের অশ্রু জমাট বেঁধে যায় বুকের তলায়।

"তোর মায়ের কথা আর মনে পড়ে না, না-রে?"—উপেন আকাশের দিকে মুখ তুলে একটু আলো খুঁজবার চেষ্টা করে। একটু আগুনের ফিন্‌কির মত এতটুকু আলোও যদি ভেসে ওঠে চোখের সাম্‌নে, অতসীর মুখখানা একবার দেখে নেয়। খোকা আর তার মায়ের মুখের আদল আছে ওর চেহারায়। খোকার কপালটা হ'য়েছিল ঠিক অতসীর মত। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপ্‌তে গিয়ে বুকের ভিতরটা টন্ টন্ ক'রে ওঠে।

"বাবা! কোথায় থাক্‌বে আজ?"—অতসী ভয়ে ভয়ে বলে।

উপেনের চেহারাটা মাঝে মাঝে এমন ব'দ্‌লে যায়, কণ্ঠস্বরে এমন একটা আর্ত্ততা ফুটে ওঠে, যে দেখে শুনে ওই ন বছরের মেয়ের মনেও লাগে আতঙ্কের ছোঁয়া।

"ভয় কি মা? যেখানে সন্ধ্যে হবে, সেখানেই থাক্‌ব আমরা। কত লোক থাক্‌বে সেখানে।"—অতসীর ঘাড়ে হাত দিয়ে উপেন ওর গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়। একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে আবার চলে এগিয়ে।

দিন কেটে যায়। কোলের অভাগী পথেই বেড়ে ওঠে। অতসীর গায়ে পায়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাপিয়ে ওঠে ভরন্ত যৌবন। পথচারীদের দৃষ্টি চঞ্চল হয় ওর দিকে চেয়ে। উপেন চোখে দেখে না, তবুও বোঝে। মনটা তার শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাক্‌তে উপেনের ভয় করে। ওর মনে হয় দু'পাশের লোলুপ দৃষ্টি বুঝি কখন গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে অতসীকে। অতসী ওর জীবনের শেষ সম্বল! অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি, মিট্‌মিটে প্রদীপের মত জ্বল্‌ছে; কখন দম্‌কা হাওয়ায় হয় ত যাবে নিবিয়ে। তারপর সব অন্ধকার—

* * * *

অতসী দিন দিন বড় হয়। মনে ওর গড়ে' ওঠে আশা-নিরাশার নতুন জগৎ। দারিদ্র্যের ক্রূর ভ্রূকুটিকে বিদ্রূপ ক'রে সর্ব্বাঙ্গে ছাপিয়ে ওঠে অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য। জীর্ণ কাপড়খানি দিয়ে তখন আর ঢাকা চলে না নিজেকে। পথচারীদের দৃষ্টির সাম্‌নে অকারণ সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে সে। শঙ্কা ওর উপেনের চেয়ে কম হয় না। অথচ কিসের শঙ্কা, তাও বোধ হয় অতসী তখন ভাল রকম বুঝ্‌তে শেখে নি।

নিজে থেকে না বুঝ্‌লে কি হয়, বাইরের জগৎ ওকে পদে পদে বুঝিয়ে দিতে চায় তিক্ত অভিজ্ঞতায়। ওরা যখন পাড়ায় পাড়ায় ভিখ্ মাগে, রাস্তার ছোঁড়াগুলো নেয় ওর পিছু। হাতছানি দেয়, নানা ইঙ্গিতে বারবার ডাকে অতসীকে। তাদের দৃষ্টি যেন সরীসৃপের মত ওর সর্ব্বাঙ্গে পিল্‌পিল্ ক'রে ওঠে। বাপের হাতটা আরও শক্ত ক'রে ধ'রে অতসী বলে—"বাবা, চল ভিন্ পাড়ায় যাই।"

উপেন চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে থম্‌কে দাঁড়ায়। হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে অতসীর মাথায় হাতখানা রেখে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ব'লে ওঠে—"পাড়া বদ্‌লালে কি কপাল বদ্‌লায় মা?—গেরস্তদেরই বা দোষ কি! একটির পর একটি—"

"তা হোক্ বাবা, পাড়ার লোকগুলো"—কি একটা ব'ল্‌তে গিয়ে অতসী থেমে যায়।

লুঙি-পরা সেই বেঁটে ছোঁড়াটা আধ-খাওয়া পোড়া-বিড়ির টুক্‌রোটা কানে গুঁজে তখন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওরই দিকে; মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে আর শিস্ দেয়।

অতসী শিউরে ওঠে। মনে হয়, ছেলেটার চোখ দুটো বুঝি ঠিক্‌রে প'ড়বে ওর গায়ে! ছেঁড়া আঁচলটুকু দিয়ে

কায়ক্লেশে শরীরটা ঢেকে বাপের হাত ধ'রে ও হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলে।

ইচ্ছে হ'লেও উপেন কোন কথা জিজ্ঞেস্ করে না। অনুমান ক'রে নিতে ওর বিন্দুমাত্র ভুল হয় না, অতসী কেন তাড়াতাড়ি পাড়া ছেড়ে পালাতে চায়।

রাস্তাটা ছাড়িয়ে ওরা মোড় ফিরল। বেশ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ যেন অতসীর মনে ল্যাগে লঘু একটা পিছুটান। ইচ্ছে করে ফিরে চাইতে—ছেলেটা নিশ্চয়ই প'ড়েছে অনেক পিছনে। না হয়, অন্য পথ ধ'রে ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে এতক্ষণ। মনটাকে আরও একটু শক্ত ক'রে নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর চায়।—যায় নি সে! এগিয়ে এসেছে মোড়ের কাছাকাছি।

চক্‌চকে একটা নতুন সিকি দেখিয়ে ছেলেটা হাসে! সিকি!—অনেকগুলো পয়সা এক সঙ্গে।

অলক্ষ্যে অতসীর গতি একটু যেন শ্লথ হ'য়ে আসে। কি জানি, যদি দেয় ওই সিকিটা ওদের ভিক্ষে! ঠিক বিশ্বাসও হয় না। কেন দেবে? মিছিমিছি অতগুলো পয়সা কেউ দেয় কখনো!

উপেন হতাশকণ্ঠে বলে—"আজ আর ভিন্ পাড়ায় গিয়ে কখন্ সাধ্‌ব মা! হয় ত বেলা হ'য়ে গেছে অনেক।"

"বেলা?"—অতসী সূর্য্যের দিকে একবার মুখ তুলে চায়। একটু ইতস্ততঃ ক'রে ঢোক গিলে বলে—"বেলা ত খুব বেশী হয় নি বাবা।"

ছেলেটা আবার শিস্ দেয়; একেবারে অতসীর কাছে, ওর নিতান্ত কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে চাপা শিস্ দিয়ে সিকিটা চোখের সাম্‌নে তুলে ধরে। তারপর এগিয়ে যায়, ক্ষিপ্র-গতিতে ওদের পাশ কাটিয়ে স'রে যায় সাম্‌নের দিকে।

অতসীর গা-টা যেন কেমন ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে। বেশ চেহারা ছেলেটার! পরনের নীল লুঙিখানা বোধ হয় রেশমি; কেমন ঝলমল করে! ওই সিকিটা পুরো পেলে ও একখানা পুরনো সাড়ি কিনত বাসনওয়ালীদের কাছে।—এ কাপড়খানা এখন ওর ছোট হয়। কতদিনের কাপড়, ছিঁড়ে জালজাল হ'য়ে গেছে।

—"বাবা, আজ আর যাব না ভিক্ষেয়। চল, যা চাট্টি চাল পেয়েছি তাই ফুটিয়ে দেব তোমাকে।"

"আমাকে?—আমার জন্যে ত ভাবি না মা। বাঁচা ভিন্ন আমার আর উপায় নেই, তাই খেতে হয় একমুঠো। নইলে, কতদিন আগেই চুকিয়ে ফেল্‌তাম এ বালাই। না খেয়ে তিল তিল ক'রে মরতে পারলে আমার যে কি আনন্দ হ'ত, তা তুই বুঝ্‌বি না অতসী। বুঝ্‌বে ভগবান, না, ভগবানেরও হয় ত তা বুঝ্‌বার শক্তি নেই মা। সে পাথর!" —উপেন হাত বাড়িয়ে অতসীর মাথাটা খোঁজে, বুকের কাছে একবার টেনে নেবে ব'লে।

* * * *

উপেন আর সাহস করতে পারে নি অতসীকে নিয়ে পথের পাশে রাত কাটাতে। তাই পথের মায়া কাটিয়ে আশ্রয় নিতে হ'য়েছে আবার ঘরের কোণে, চাঁপাতলায় ছোট একটা খোলার বস্তিতে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে অতসীর মনও যে সচেতন হ'য়ে ওঠে নি তা নয়—তবু মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে বাইরের জগৎ উল্টো হাওয়ার দোলায় ওর ছোটখাট অনুভূতিগুলোকে টাল খাইয়ে দেয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মন আস্ত একটা সিকিকে জয় ক'রতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে পড়ে। চকিতে দেখা একটা নতুন আধুলির কথা ভুল্‌তে, কমপক্ষে তিনদিন সমানে লড়াই ক'রতে হয় নিজের সঙ্গে।

অতসীরা যে ঘরে থাকে, তার সাম্‌নের বড় বস্তিটায় আছে কতকগুলো ছোট ছোট কারখানা; ছাতার বাঁট তৈরি হয় সেখানে। যেতে আস্‌তে অতসী নিবিষ্ট মনে চেয়ে দেখে। ছেলেগুলো কেমন সুন্দর কাজ করে! রাশীকৃত বেত আর বাঁশের টুক্‌রো আগুনে ঝল্‌সে নিয়ে চোখের নিমেষে ওরা তৈরি করে রকমারি ছাতার বাঁট। ও-ও যদি শিখ্‌তে পার্‌ত অম্‌নি একটা কাজ, তাহ'লে আর লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে মেগে বেড়াতে হ'ত না। ভিক্ষে ওর ভাল লাগে না। একদিন দু-দিন নয়, রোজ—দিনের পর দিন লোকের দোরে দোরে ঘুরে, না হয় পরনের একখানা কাপড়, না হয় দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাত।

দিন চলে। শীর্ণ নদী যেমন ক'রে বৈচিত্র্যহীন স্রোতে ক্রমে ক্রমে মাটির বুকে নিজেকে ক্ষয় ক'রে এগিয়ে চলে, তেমনি ক'রে পথের বুকে জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে ওদেরও কাটে দিন। কোন পরিবর্ত্তন নেই; এমন কি, একটা আকস্মিক কল্পনাও আর জেগে ওঠে না মনে।

অতসী এখন সবই বোঝে। তাই অন্ধ বাপকে কথায় কথায় দুঃখ-দৈন্যের খুঁটিনাটি শোনাতে আর ইচ্ছে হয় না ওর। মনের কথা মনেই কেঁদে মরে। নিতান্ত অসহ দুঃখে যখন আর ও পারে না নিজেকে সাম্‌লে নিতে, তখন শুধু কাঁদে; বুক ছাপিয়ে নেমে আসে ওর অশ্রুর বন্যা।

কোথাও সোয়াস্তি নেই। এখানে এসেও আবার তেমনি ক'রে ফেউ লেগেছে ওর পিছনে। পাড়ার ছোঁড়াগুলো দুদিন বেশ শান্ত ছিল। অতসীও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল নতুন জায়গায় এসে। কিন্তু আবার সুরু হ'য়েছে ওকে নিয়ে সেই কানাকানি আর ইসারা। বিড়িওয়ালা থেকে আরম্ভ ক'রে ছাতার কারখানার ছোঁড়াগুলো পর্য্যন্ত—সবাই যেন চন্‌মন্ ক'রে চায় ওর দিকে। ওদের দৃষ্টি, কথা বলার কেমন একটা বিশ্রী ভঙ্গী অতসীর সর্ব্বাঙ্গে শেয়াকুলের কাঁটার মত ধরে জড়িয়ে। ও অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে; ভাব্‌তে পারে না, কি চায় ওরা! কি চায় ওর মত একটা কাঙাল মেয়ের কাছে!

তবে কি ভিখিরী ব'লে? ভিখিরী ব'লে রাতদিন করে ওরা অমনি বিদ্রূপ! ভিখিরী ত ইচ্ছে ক'রে হয় নি ও। ওর বাবা, ওই অন্ধ অসহায় বাপ আজ একমুঠো ভাতের জন্যে করে ভিক্ষে। কিন্তু এমনি ভিখিরী ওরা ছিল না চিরদিন। হয় ত থাক্‌বেও না পরে—

ভাব্‌তে গিয়ে অতসীর মনটা হঠাৎ কেমন শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটুকু ভাব্‌তেও ওর সঙ্কোচ হয় এখন। সাম্‌নের পথে এগিয়ে চ'ল্‌বার এইটুকু সম্বলও যেন আর নেই ওদের।

* * * *

ও-দিকের কারখানাটায় কাজ করে তিনটী মেয়ে। ওর চেয়ে বয়েস তাদের অনেক বেশী, তবু বেশ কাজ করে তারা। বাঁশের ছড়িগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগুনে সেঁকে কেমন কায়দায় তৈরি করে ছাতার বাঁট; অতসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।—এক দুপুর খেটে নগদ ছ' আনা পয়সা নিয়ে ওরা হাসিমুখে বাড়ী ফিরে যায়।

ও-ও ত পারে খাট্‌তে, ওদের চেয়ে অনেক বেশী। এক দুপুর কেন, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি খেটেও যদি ছ' আনা পয়সা পায়, তা হ'লে বেঁচে যায়; পেটের দায়ে ভিক্ষে করার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ওদেরই মত হাসিমুখে বাঁচ্‌তে পারে পৃথিবীতে। ওর বাবা—

বাবা নিশ্চয়ই ক'রবে না অমত। বাবাও ত পাবে একটু বিশ্রাম। বুড়ো হাড় ক'খানা ঠক্ ঠক্ ক'রে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে বাবারই কি কম কষ্ট হয়।

অতসীর বুকের ভিতর একটা ঘুমন্ত মানুষ যেন সব কিছু নাড়া দিয়ে হঠাৎ জেগে ওঠে। আশৈশব সঞ্চিত জড়তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে স্থির মনে ও এগিয়ে যায় সাম্‌নের কারখানাটার দিকে।—ছেলেগুলো হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে, কিন্তু আজ আর ও ভ্রূক্ষেপও করে না তাদের সেই দৃষ্টি। রাস্তা থেকে পা বাড়িয়ে পরচালায় উঠ্‌তে গিয়ে চকিতে একবার থম্‌কে দাঁড়ায়, তারপর মনটাকে বেশ শক্ত ক'রে নিয়ে বলে—"মালিকের সঙ্গে একবার দেখা হবে না?"

ছোঁড়াগুলো চাপা হাসির সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কিন্তু ওর চোখের দিকে চেয়ে আজ আর কোন ইঙ্গিত ক'রবার সাহস বোধ হয় হয় না তাদের। অথচ ওরাই, ওই ছেলেগুলোই ক'রেছে ওকে প্রতিদিন কত কুৎসিত ইসারা।

কারখানার মালিক ব'লতে অতসীর ধারণাটা খুব অসাধারণ না হ'লেও নিতান্ত সাধারণ ছিল না। কিন্তু ওদেরই ভিতর থেকে একটা ছেলে যখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পিছনের তক্তপোষখানার দিকে, তখন ওর মনটা যেন কেমন দমে' গেল।

—সেদিন ও-পাড়ায় ভিক্ষেয় গেলে যে-লোকটা ওকে সিকি দেখিয়েছিল, কতকটা তেমনি চেহারা, বয়েস বোধ হয় তার চেয়ে কিছু বেশী; তক্তপোষের ওপর পা ছড়িয়ে ব'সে ছাতার বাঁটগুলোয় পালিস দিচ্ছে। গায়ে ময়লা একটা ফতুয়া; মাথায় একরাশ চুল, তেলে চব্‌চব্ করে।

মুহূর্ত্তে কি ভেবে নিয়ে অতসী এগিয়ে গেল। সমস্ত সঙ্কোচকে ও প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলে রাখ্‌বে আজ।—"আপনি?"

"হাঁ।"—লোকটা যেন দম্-দেওয়া জাপানী পুতুলের মত ছিট্‌কে ওঠে। হাত দুখানা দুই হাঁটুর ওপর লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে বলে—"আরে, তুমি যে! আমাদের নতুন পড়্‌শী!"—চোখে-মুখে ওর সারা দেহে কেমন একটা অদ্ভুত চঞ্চলতা।

অতসী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগ্‌ল। মনে হ'ল, ভাল করে নি এমন ক'রে হঠাৎ কারখানায় ঢুকে পড়ে'। বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে; হৃৎপিণ্ডটা যেন অস্বাভাবিক রকম দ্রুত হ'য়ে উঠেছে। তবু ব'ল্‌ল ও সাহসে ভর ক'রে—"একটা কাজ দেবেন?"

"কাজ?"—লোকটা হা হা ক'রে হেসে ওঠে—"নিশ্চয়ই। কি কাজ ক'রবে তুমি?"

"ওই ওদের মত ছাতার বাঁট তৈরি—" সঙ্কোচে কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে।

অতসীর কথা শেষ না হ'তেই সে আবার হেসে ওঠে। —"অম্‌নি হয় না মাইরি, শিখ্‌তে হয়।"

"শিখ্‌ব। যে-ক'দিন না পারি, বিনি মাইনেতে—"

তেম্‌নি ক'রে ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিশ্রী একটা হাসির সঙ্গে দম টেনে টেনে সে বলে—"বিনি মাইনে কেনে, মাইরি ডবোল মাইনে দেব। রোজ সাঁঝবেলায় এসে শিখে যেও এই ঠাঁয়ে।" কথা শেষ হয়, কিন্তু হাসি ওর থামতে চায় না।

ভয়ে অতসীর তালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে ওঠে। কি ভয়ঙ্কর লোকটার চোখের চাউনি! মনে হয় যেন ওর সমস্ত শরীরটা মুঠো ক'রে ধ'রে এই মুহূর্ত্তেই গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে ওকে। ইচ্ছে করে ছুটে পালায়; কিন্তু পা-দুটো কেমন অসাড় হ'য়ে গেছে। গলার ভিতরটা এমন শুকিয়ে উঠেছে যে চীৎকার ক'রলেও হয় ত আওয়াজ বেরুবে না আর।

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত জড়িত পায়ে অতসী ধীরে ধীরে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে। ওর বুকের ভিতর অদম্য বেগে ফেনিয়ে ওঠে কান্না! অতর্কিত মূর্চ্ছার ভারে শরীরটা যেন মাটির বুকে আছাড় দিয়ে পড়তে চায়।

লোকটা উঠে আসে; তেমনি ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে আসে ওর পিছু পিছু। টানা টানা হাসির সঙ্গে অস্পষ্ট শব্দে অতসীর কানে আসে আবার সেই কথাগুলো—"মাইরি ডবোল মাইনে দেব। রোজ সাঁঝবেলায় এসো শিখ্‌তে। অমন ডাগর বয়েস।"

অতসী প্রাণপণ শক্তিতে দেহটা টেনে এনে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ঢুক্‌ল। উপেন তখন ব'সে ব'সে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে। উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা ক'রছে অতসীর পায়ের শব্দ।

পরদিন থেকে আবার তেমনি চলে নিতস্রোতের জোয়ার-ভাঁটা। কালকের কথা মুছে যায় ওর অতীতকালের আঁচলে। সেই লোকটা, কারখানার সেই ছোঁড়াগুলো—সবারই সাম্‌নে দিয়ে তেমনি ক'রেই চল্‌তে হয় আবার অন্ধ বাপের হাত ধ'রে মুষ্টি ভিক্ষায়।

অতসী মনে করে ওদের পানে চাইবে না; দেহটাকে কাঁটা-লাগামে বেঁধে জোর ক'রে এগিয়ে চলে হেঁট-মুখে। তবুও যেন আচম্বিতে কখন্ ওদেরই চোখে গিয়ে আহত হয় ওর ভীরু দৃষ্টি।

"এই যে, পড়্‌শী!"—লোকটা গলা-ঝাড়া দিয়ে ঠুং ক'রে বাজায় একটা টাকা।

অতসীর বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। আড়ষ্ট হ'য়ে উপেনের গায়ে গা দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় বড় রাস্তার দিকে। মনটা কেমন একটু দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। ইচ্ছে হয়, একবার চেয়ে দেখে—ওটা টাকা না আধুলি!—কিন্তু পরক্ষণেই আসে গ্লানি। নির্ম্মম কশাঘাতে নিজেকে সংযত ক'রে নেয়।

লোকটা কি অদ্ভুত! রোজ অমনি করে সে; অতসীকে দেখে বিষিয়ে ওঠে যেন ওর সারা গা। নতুন পাড়ায় এসে দুদিন হাড় ক'খানা জুড়িয়েছিল। আবার জ্বালাতনে উদ্‌বাস্ত ক'রে তুল্‌ল এরা।

তবুও ওই রাস্তা দিয়েই চল্‌তে হয়। অতসীদের বাড়ী থেকে বেরুবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। যতবার যাতায়াত করে ও, ততবারই যেন লোকটার দরকার পড়ে রাস্তায়। একটা না একটা ছুৎনোর অভাব হয় না ওর। কখনো হুপিং কাশির রোগীর মত কাশ্‌তে কাশ্‌তে দম আট্‌কে ফেলে; কখনো ইচ্ছে ক'রে দোকানের সেই তক্তপোষখানার ওপর ছড়িয়ে দেয় কতকগুলো পয়সা।

অতসীর হাসি পায়। চোখে প'ড়লেও দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফিরিয়ে আন্‌মনা গতিতে ও পাশ কাটিয়ে যায়। তাও, রেহাই পাবার জো নেই। লোকটা মরিয়া হ'য়ে উঠেছে।

এক একদিন ওর সাম্‌নে, না হয় নিতান্ত পাশে এসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—"ময়ূরকণ্ঠী সাড়ি আর পাঁচটাকা নগদ, ফি মাসে—"

অতসী হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে না; ভয়ে কেমন বিকল হ'য়ে যায়। দেহে ও মনে রাত্রিদিন তীব্র দারিদ্র্যের

যে অসহ জ্বালা হু হু করে, তারই তাড়নায় মাঝে মাঝে ওর বুকের ভিতর বুভুক্ষিত নারী আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌তে চায়—'দাও, ওগো দাও তোমাদের করুণার দানে আঁচল ভ'রে।' কিন্তু পারে না। মুখে ওর যোগায় না কোন উত্তর। গুরুভার আতঙ্ক চেপে বসে জিভ্‌টার ওপর; মগজটা কেমন অবশ হ'য়ে আসে। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন বড় বড় চোখদুটো তুলে চায় ওর মুখপানে। লোকটার সারা গা হেসে ওঠে অনুভূতির মাদকতায়। গুন্ গুন্ সুরে আওড়ায় পুরনো গানের একটা কলি—"কও না কথা মুখ তুলে"—

অতসী পিছিয়ে আসে। মুহূর্ত্তে ওর মনটা আবার রুখে দাঁড়ায়। অস্ফুট উচ্চারণে কামনা করে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের মৃত্যু।

"—বকুলমালা ক'রবে আলো তেলচোঁয়ানি তোর চুলে; কও না কথা মুখ তুলে।"—অতসীর মুখের সাম্‌নে অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাতটা নেড়ে সে আবার ফিরে গিয়ে বসে সেই ভাঙা চৌকিটার ওপর।

*　　*　　*　　*

চারদিন হ'ল উপেনের জ্বর। সেই সঙ্গে আবার সুরু হ'য়েছে তার চোখের অসহ যন্ত্রণা আর মাথাব্যথা। চোখদুটো হারিয়েও ওর চোখের যন্ত্রণা ঘুচ্‌ল না। ফসল হ'য়েছে শেষ, কিন্তু পঙ্গপাল বেঁধেছে বাসা ওর শুকনো ক্ষেতের ফাটলে।—তবুও বাঁচ্‌তে হবে! উপেন হাসে। সেই জীবনজোড়া অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে মেপে নেবার চেষ্টা করে তার অদৃষ্টের পরিধিটা।

দুহাতে কপালের শিরাদুটো টিপে ধ'রে অতসী রাত্রিদিন ব'সে থাকে বাপের শিয়রে। কখন চোখদুটো ঝাপ্‌সা হয় জলে, আবার কখন নিঃশ্বাসটা পর্য্যন্ত থ‌ড়িয়ে ওঠে শুষ্কতায়।

"অতসী!—" কি ব'ল্‌তে গিয়ে উপেন থেমে যায়। শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে অতসীর মুখখানা একবার অনুভব ক'রবার চেষ্টা করে। তারপর দীর্ঘশ্বাসটা চেপে নিয়ে জিজ্ঞেস্ করে—"আজও কিছু না খেয়ে রইলি মা?"

"না বাবা, একবার ত খেয়েছি তখন।"—অতসী জানে, উপেন সে কথা বিশ্বাস ক'রবে না। তবুও বলে—তা ছাড়া ব'ল্‌বারও যে নেই কিছু ওর।

উপেন একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বলে—"আজকাল আমার কিছুই মনে থাকে না রে, সব ভুল হ'য়ে যায়। শুধু ভুল্‌তে পারি না খোকার সেই কান্না, আর তোর মায়ের—" হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লে নেয়। অতসীর হাতখানা দুহাতে চেপে ধ'রে বারবার বুলিয়ে নেয় নিজের মুখেচোখে।

"ঘরে একমুঠো চালও নেই অতসী। সব জানি আমি; চোখে না দেখ্‌লেও, তোর মুখে হাত দিয়ে বুঝ্‌তে পারি মা। আমি যে বাবা।—" উপেন পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করে।

এ ক'দিন ওরা ভিক্ষের বেরুতে পারে নি। ঘরে সত্যিই নেই চাল, থাক্‌বেই বা কেমন ক'রে। ওদের সারা দিনের মুষ্টিভিক্ষা দিনান্তেই হয় শেষ। উপেন কতবার অতসীকে বলে দু-বাড়ী সেধে শুধু ওর মত দুমুঠো চাল আন্‌তে। কিন্তু অতসী চায় না ওকে ছেড়ে যেতে। উপেনেরও হয় ত সাহস হয় না ওর কথা শুনে।

কিন্তু চল্‌ল না। এমনি ক'রে দিনের পর দিন উপবাসে, ক'দিন চলে! অতসীর মনটা এক একবার বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। চোখের জল ওর নিমেষে শুকিয়ে যায়। অন্ধ বাপের মুখে একটু জল-সাবুও তুলে দিতে পারে নি আজ ক'দিনের ভিতর।—সব ভয়কে তুচ্ছ ক'রে সে একাই বেরিয়ে পড়ে পথে। উপেনের বাধা মানে না।

রাস্তার মাঝখানে এসে একবার চারিদিকে চেয়ে পা দুটো কেমন জড়িয়ে আসে শঙ্কায়। এই জনসঙ্কুল মহানগরীর পথে ও আর কোনদিন চলে নি একা। প্রবহমান জনস্রোত যেন ঘূর্ণীবাতাসের মত চারিদিক থেকে ওকে জড়িয়ে ধরতে চায়। অতসী ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। অজ্ঞাতসারে ওর পা-দুটো পিছিয়ে আসে, আবার পরমুহূর্ত্তেই সঞ্চিত শক্তিতে এগিয়ে চলে এলোমেলো ক্ষিপ্র গতিতে।—ঘরে ওর অন্ধ বাপ আজ পাঁচদিন অনাহারে!

ক্ষণিকের উত্তেজনায় অতসী অনেকদূর এগিয়ে যায়। কিন্তু জোটে না; একটা পয়সাও জোটে না কারো কাছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওর রক্তেও জমে ওঠে উপবাসের অবসাদ। পা দুটো অবশ হ'য়ে আসে ক্লান্তিতে।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অতসী আনমনে কি ভাবে। আজ আর একটা

লোকও চায় না ফিরে ; কেউ করে না ইসারা। একটা দুআনি, একটা আনি, এমন কি একটা পয়সা পর্য্যন্ত তুলে ধরে না কেউ। সেদিন ও-পাড়ার ছোঁড়াটা দিতে চেয়েছিল একটা নতুন সিকি—

অতসী যে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, তা নিজেও বুঝ্‌তে পারে নি। ওর চেতনা যখন ফিরে এল, তখন রাত্রি প্রায় আট-টা। পথে লোকজনের ভিড় অনেক কমে' এসেছে। মোড়ের ভিখিরীগুলো একে একে কখন উঠে গেছে সব। ভয় ও উদ্বেগে ওর মনটা যেন হঠাৎ কেমন বিকল হ'য়ে পড়ে।

বাবা একলাটি প'ড়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রছে ; হয় ত অস্থির হ'য়ে উঠেছে ওর দেরী দেখে। অতসী আর স্থির থাক্‌তে পারে না। ক্ষিপ্রপদে ফিরে চলে বাড়ীর পথে। অবসন্ন পা সমানে পড়ে না, তবুও চলে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে।

—গলিটার বাঁকে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে ; হাতে তার খাবার! মস্ত এক ঠোঙা ভর্ত্তি খাবার নিয়ে কোথায় চ'লেছে সে। অতসীর গতি শ্লথ হ'য়ে আসে ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে থেমে যায় গলিটার মাথায়। অতগুলো খাবার! একলাই খাবে ছেলেটা ওই অতগুলো খাবার! মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে ওঠে। অতসী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ঠোঙাটার দিকে। খাবারগুলো যেন জ্যান্ত হ'য়ে উঠেছে ; মোমের পুতুলের মত টলমল ক'রে নড়ে' ওঠে! ঠোঙাটা ছাপিয়ে উপ্‌ছে প'ড়তে চায় মাটিতে।

মুহূর্ত্তে ওর সব অনুভূতি ঘোলা হ'য়ে উঠল। স্বপ্নাবিষ্টের মত গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটার পাশে। ইচ্ছে করে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ওর মুখটা, গলাটা টিপে শ্বাস রোধ ক'রে দেয়। কিন্তু পারে না। রাস্তার পুলিশটা খট্ খট্ শব্দে বুঝি এই দিকেই এগিয়ে আসে! পাশের মুদির দোকানে বসে অনেকগুলো লোক জটলা করে।

অতসী আরও একটু সরে' যায় ছেলেটার কাছে ; একেবারে গা-ঘেসিয়ে দাঁড়ায়। চোখ দিয়ে যেন আগুনের শিষ বেরুচ্ছে তখন। হাত দুটো চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

অতসীর মুখপানে চেয়ে ছেলেটা হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল ভয়ে। অতসী শিউরে উঠ্‌ল। ওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত নিমেষে বিবশ হ'য়ে গেল আতঙ্কে। অতি কষ্টে দেয়ালটা ভর ক'রে মূর্চ্ছাহতের মত ব'সে প'ড়ল সেইখানে। —ওর স্তিমিত চেতনা জর্জ্জরিত হ'য়ে আসে গ্লানিতে।

সেদিনও জুট্‌ল না ভিক্ষে। অতসী যখন বাড়ী ফিরে এলো তখন রাত্রি প্রায় দশটা। এতক্ষণ উপেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চেয়ে ছিল ওর পথপানে ; সবেমাত্র নেমেছে একটু ঘুম, তার উপবাসক্লিষ্ট শীর্ণ কঙ্কালটাকে ঘিরে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে অতসী কাণ পেতে শোনে ওর ঘুমন্ত পিতার দ্রুত নিঃশ্বাস। ঘুমিয়েছে,, না-খেয়ে না-খেয়ে কাহিল হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে আজ। সে ঘুম ভাঙাবার ইচ্ছে হ'ল না তার। যেমন চুপি চুপি এসেছিল ঘরের মধ্যে, আস্তে আস্তে পা টিপে তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল আবার।

ঘরে আজ প্রদীপটা পর্য্যন্ত জ্বলে নি। সঞ্চয় ব'ল্‌তে একটী আধ্‌লাও নেই ওদের ; এমন এক-ছটাক চালও নেই, যা দিয়ে কিনে আন্‌বে একটু বার্লি না হয় সাবু!

ভালভাবে মনে পড়ে না ; শুধু আব্‌ছা একটা স্মৃতির ছাপ লেগে আছে ওর বুকে। তবু উপেনের কাছে যতটুকু শুনেছে, তাতে অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধা হয় না—কেমন ক'রে দিনের পর দিন না খেয়ে ম'রেছে খোকা আর মা। দীর্ঘশ্বাসটা বুকের ভিতর আট্‌কে যায়। খোকা বেঁচে থাক্‌লে আজ মস্ত বড় হ'ত! ওরা দুজনে রোজগার ক'রে খাওয়াত বাবাকে—

হঠাৎ চিন্তাটায় কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে যায় ; ভাব্‌তে পারে না। অতীত ও বর্ত্তমান একসঙ্গে নির্ম্মম ভ্রূকুটি করে ওর দিকে চেয়ে। ইচ্ছে করে—চীৎকার ক'রে কাঁদে ; ওদের জীবনে যেমন ক'রে আগুন ধ'রেছে, তেমনি ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দেয় সারাটা পৃথিবীতে।

পাচদিন কেটেছে অনাহারে। কালও হবে তা-ই। তার পর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুরু হবে সেই পালা। ওর মা—ওর ভাই—ঠিক তেমনি ক'রে যাবে ওই অন্ধ বাপ। তার পর? তারপর যা ঘট্‌বে, তা অতসী ভাব্‌তেও পারে না। উদ্বেলিত দ্রুত চিন্তায় শরীরের সবটুকু রক্ত যেন নিমেষে চন্‌চন্ ক'রে উঠে পড়ে ওর মগজে। নিঃশ্বাসটা ঘন হ'য়ে ওঠে ; পা দুটো কাঁপে, বুকের ভিতর গুমরে ওঠে কেমন একটা অস্বস্তি।

অস্থির পদে অতসী রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। মগজটা চৌচীর হ'য়ে ফেটে এখুনি বুঝি জ্বলে উঠ্‌বে আগুন।—গায়ের আঁচলটা খুলে নিয়ে অতসী কোমরে জড়ায়। নগ্ন বুকে হু হু ক'রে লাগে উত্তপ্ত বাতাস।

ওদের গলিটা তখন অন্ধকার হ'য়ে গেছে। কারখানার লোকগুলো দোকান বন্ধ ক'রে কখন চলে গেছে সব। শুধু দু'একটা ঘরের ভিতর থেকে শোনা যায় অস্পষ্ট কথার টুক্‌রো।

অতসী এগিয়ে যায়। ঘুমন্ত পৃথিবীর পথে ওর পায়ের জড়তা যেন নিঃশেষে উবে গেছে।—ওদের সেই কারখানাটার ভিতর থেকে দেখা যায় আলোর একটা ক্ষীণ রেখা! লোকটা কতদিন দেখিয়েছে ওকে টাকা; আস্ত একটা রূপোর টাকা, না হয় আধুলি। যেতে-আস্‌তে কতবার শুনিয়েছে হাত-ভরা পয়সার শব্দ, ওর চোখের সাম্‌নে ছড়িয়ে দিয়েছে সিকি, দু'আনি, আনি, পয়সা—কত কি!

একটা, অন্ততঃ একটা পয়সাও যদি আজ দেয় ওকে! অতসী দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়; কাণ পেতে শুনবার চেষ্টা করে সেই লোকটার কণ্ঠস্বর। ইচ্ছে করে, একবার কড়াটা নাড়ে; কিন্তু পারে না। মনটা আবার কেমন পিছিয়ে আসে। শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ ক'রে কপাটের ফাঁক দিয়ে একবার চেয়ে দেখে, সে আছে কিনা।—আছে! সেই তক্তপোষখানায় ঠিক তেমনি ক'রে পা ছড়িয়ে ব'সে আছে সে।

ঘরে দ্বিতীয় কোন জনমনুষ্যও নেই। লোকটা চৌকির ওপর রাশীকৃত পয়সা ঢেলে হিসেব মেলাচ্ছে। তাকের ওপর জ্বল্‌ছে একটা কেরোসিনের ডিবে। পয়সাগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করে; টাকা, আধুলি, সিকি, দু'আনি—অনেক! একসঙ্গে অনেকগুলো ঢেলেছে সে হাতের কাছে।

চেয়ে থাকতে থাকতে অতসীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ মাতাল হ'য়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে একবার ভেবে নেবার চেষ্টা করে। ক্ষুধার্ত্ত আর্ত্তনাদে সংবিৎ ওর লুপ্ত হ'য়ে আসে। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন জোরে নেড়ে দেয় দরজার কড়াটা।

প্রেতমূর্ত্তির মত আচম্বিতে ওর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল সেই লোকটা। 'পড়্‌শী!'—উল্লাসে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন সাপের জিভের মত লক্‌লক্‌ করে। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে অতসীর দিকে। ওর কাছে, একেবারে বুকের কাছে এসে দাঁড়ায়।

অতসী বিহ্বলদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওর চেতনা তখন তলিয়ে গেছে কোন অতল অন্ধকারে। হাত-পা যেন অসাড় হ'য়ে জমে গেছে। চৌকাঠখানা চেপে ধ'রেও নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারে না। শরীরটা আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে সাম্‌নের দিকে। নগ্ন বুকে আঁচলটা জড়িয়ে নেবার কথাও ওর মনে নেই তখন।

ক্রমশঃ

অক্ষমালা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

অনাত্মীয় এ মরুবিথার,
জন্ম তব প্রাণোচ্ছল প্রবাহিনী-কূলে,
কে তোমারে রোপিল হেথায়?
এ উষর মরুর মাঝার
পেলে না ত প্রাণরস, শুষ্ক মূলে মূলে
ঢালে বহ্নি মধ্যাহ্ন মাথায়।

আমার নয়নে অশ্রুবারি
দরদে তুষার সম পড়ে বিগলিয়া
অবৎসল রুক্ষ সে মাটিতে।
তোমারে সন্তাপ-তৃষ্ণাহারী
অশ্রু মোর মুঞ্জরণে দিল মুকুলিয়া
ফোটে ফুল বিশীর্ণ শাখীতে।

দুদিনের পান্থ শুধু আমি,
অফুরান যাত্রাপথে হেথায় দৈবাতে
এসেছিনু শুধু ক্ষণতরে।
গতিবেগ গেল মোর থামি',
তুলিনু মুকুলগুলি মোর অশ্রুপাতে
যাদেরে ফুটালো থরে থরে।

গাঁথি' মালা পরিনু গলায়।
সে অ-ফুট কুঁড়ি আজি বিশুষ্ক কঠিন,
কণ্ঠে ধরি রুদ্রাক্ষের মালা।
সমীরণ কি যাদু বুলায়!
অক্ষ-গুটি ওঠে ফুটি কুসুমে নবীন
কি সুষমা কি সুরভি ঢালা!

আচার্য্য গৌরীশঙ্কর দে

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌

আজ আমরা যে মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি, তিনি কোনও বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক ছিলেন না—যাঁহার রচনামৃত পাঠকগণের হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবে, তিনি কোনও প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন না—যাঁহার বাণী শ্রোতৃগণের হৃদয় অপূর্ব্ব উদ্দীপনায় ঝঙ্কৃত করিয়াছে বা করিবে, তিনি কোনও অসাধারণ রাজনীতিক ছিলেন না—যাঁহার নেতৃত্বে দেশবাসী রাজনীতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত করিতে পারিয়াছে বা পারিবে, তিনি কোনও ধর্ম্মসংস্কারক বা ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন না—যাঁহার উপদেশ দেশবাসীর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত করিতে সহায়তা করিয়াছে বা করিবে—তিনি ছিলেন কলিকাতার একটি বে-সরকারী কলেজের গণিতশাস্ত্রের স্বল্প বেতনভোগী অধ্যাপক মাত্র। তথাপি আমরা মনে করি তাঁহার শান্ত সংযত মধুর জীবন, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্য, তাঁহার গভীর জ্ঞানানুরাগ, তাঁহার অপরিসীম ছাত্রবাৎসল্য, তাঁহার অনন্যসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ আমাদের জাতীয় গৌরব-ভাণ্ডার অভূতপূর্ব্ব ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং তাঁহার ন্যায় আদর্শ শিক্ষক অধিক জন্মগ্রহণ করিলে সমগ্র জাতি উন্নত হইবে। সরল জীবন যাপনের সহিত উচ্চতম বিষয়ের ধ্যান ও চিন্তায় আজীবন অতিবাহিত করিতে এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। পাঁচ বৎসর কাল আমরা এই দেবোপম আচার্য্যের পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আমাদের ব্যর্থ জীবনে যখনই অকৃত-কার্য্যতার গ্লানি আমাদিগকে বিষাদাচ্ছন্ন বা অবসাদগ্রস্ত করিয়াছে, তখনই দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ, সর্ব্বা-বস্থায় সমান সন্তুষ্ট আচার্য্য গৌরীশঙ্করের সহাস্য আনন ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় আমাদের মানসনয়নের সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে এবং পার্থিব যশঃ, মান, ঐশ্বর্য্য, সুখ, দুঃখের ঊর্দ্ধে কর্ত্তব্যের উচ্চতর লক্ষ্যে আমাদিগের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছে।

আচার্য্য গৌরীশঙ্করের পূর্ব্বপুরুষগণ কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে বরাহনগরে বাস করিতেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ বা প্রপিতামহ কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে (মাঘ ১২৫১ বঙ্গাব্দে) গৌরীশঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন, মাতার নাম শিবসুন্দরী। মধুসূদনের চারি পুত্র হরশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর, ভবানীশঙ্কর ও দেবশঙ্করের মধ্যে গৌরীশঙ্কর মধ্যম ছিলেন। হরশঙ্কর রাধাবাজারে ক্ষেত্রমোহন দে কোম্পানীর দোকানে কায করিতেন, ভবানীশঙ্কর গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে কায করিতেন, দেবশঙ্কর তাঁহার মধ্যমাগ্রজ গৌরী-শঙ্করের ন্যায় অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রিপণ কলেজে অস্থায়ী অধ্যক্ষের কায করিবার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গৌরীশঙ্কর বাল্যকালে ফ্রী চার্চ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করেন। নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার একবার ভীষণ বসন্ত রোগ হয় এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে বসন্তের দাগ ছিল। এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর আর কখনও তাঁহার কোনও কঠিন রোগ হয় নাই এবং যে পাঁচ বৎসর আমরা তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করি তাহার মধ্যে একটি দিনের জন্যও তাঁহাকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত দেখি নাই।

এণ্ট্রান্স ও এল্‌-এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন এবং গুণানুসারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পর-বৎসর তিনি এম্‌-এ (অনার্স-ইন-আর্টস্) পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে একজন মাত্র গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম্‌-এ (অনার্স-ইন্‌-আর্টস) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার নামও বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয়—স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের



জন্ম—মাঘ, ১২৫০ সাল　　আচার্য্য গৌরীশঙ্কর দে　　মৃত্যু—২২শে চৈত্র, ১৩০৮ সাল

সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া দশ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি লাভ করেন।

গৌরীশঙ্কর বি-এল উপাধি লাভের পর হাইকোর্টের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং সেকালে, যখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অল্প ছিল এবং ব্যবহারাজীবের সংখ্যাও অধিক ছিল না, তখন গৌরীশঙ্করের ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ এবং প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু নির্লোভ গৌরীশঙ্কর শান্তিপূর্ণ জনহিতকর অধ্যাপনার কার্য্যই পছন্দ করিলেন এবং গীতার সেই অমূল্য উপদেশ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" শিরোধার্য্য করিয়া যৎসামান্য বেতনে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে (এক্ষণে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) সামান্য বেতনে গণিতের অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ৬৩ বৎসর কাল তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কতবার গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে, রাজস্ব-বিভাগে এবং অন্যান্য স্থানে উচ্চতর বেতনের প্রলোভন তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অন্য কোনও পদ গ্রহণ না করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই একই বিদ্যালয়ে দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটার ন্যায় যথাসময়ে কলেজে উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়া যাইতেন। বোধ হয় মৃত্যুকালেও তিনি ৩০০৲ তিন শত টাকার অধিক বেতন পান নাই, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না। সহস্র সহস্র ছাত্রের গভীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন ও কঠোর কর্ত্তব্য সানন্দে পালন করিয়া তিনি পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে অতীত হিন্দু যুগের আচার্য্যগণের কথা মনে পড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কত উজ্জ্বল রত্ন বিদ্যা-শিক্ষার পর জ্ঞানচর্চ্চা ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরীশঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে আর্থিক উন্নতি করিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু দেশকে হয়ত অধিকতর উপকৃত করিতে পারিতেন। কেম্ব্রিজের প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক এবং বহু মৌলিক গণিত-গ্রন্থের রচয়িতা চার্লস ব্যাবেজের অন্যতম শিষ্য মিষ্টার মল সিনিয়র র‍্যাংলার হইবার পর ব্যারিষ্টারীতে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং পরে বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। এক সময়ে কোনও ব্যক্তি অধ্যাপক ব্যাবেজকে তাঁহার ছাত্রের কৃতিত্বের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, হয় ত মিষ্টার মল একদিন ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার হইবেন। ইহাতে ব্যাবেজ উত্তর দেন, "তাহাতে জগতের কি উপকার হইবে? আহা, যদি সে গণিতশাস্ত্রের চর্চ্চাতেই আত্ম-নিয়োগ করিত!" আমাদের দেশেও এই আদর্শ ছিল এবং অধ্যাপকগণ বিশেষ সম্মানলাভ করিতেন। এ আদর্শ হইতে আমরা দিন দিন স্খলিত হইতেছি বটে, তথাপি গৌরীশঙ্করের ন্যায় অধ্যাপক বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে জীবিতকালে অল্প সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হন নাই; এমন কেহ নাই যিনি তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত, সম্ভ্রমের সহিত, উচ্চারণ করিতেন না বা এখনও করেন না।

তিনি কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন তৎসম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কিছু বলিব। যে সময়ে আমরা জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে ছাত্র ছিলাম (১৯০০-৫ খ্রীষ্টাব্দ) তখন উক্ত বিদ্যালয়ে একজন মাত্র গণিতের অধ্যাপক ছিলেন—আচার্য্য গৌরীশঙ্কর। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণী, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণীর অনার্স বিভাগ এবং পঞ্চম বার্ষিকী শ্রেণী (এম্-এ)—সকল শ্রেণীতেই তাঁহাকে পড়াইতে হইত; কেবল জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মহাশয় মধ্যে মধ্যে প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীতে জ্যামিতি পড়াইতেন। এতগুলি শ্রেণীতে পড়াইবার জন্য গৌরীশঙ্করের উপযুক্ত অবসর কখনও মিলিত না; সেইজন্য এম্-এ ক্লাসের ছাত্রগণকে তিনি প্রধানতঃ গ্রীষ্মের ছুটী বা পূজার ছুটী বা অন্যান্য ছুটীতে প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা কাল ধরিয়া পড়াইতেন। এম্-এ পরীক্ষার পাঠ্য সমস্ত গ্রন্থগুলি পড়ান হইয়া উঠিবে না বলিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত সহজ বহিগুলি আমাদিগকে বাড়ীতে পড়িতে বলিতেন এবং প্রতি শনিবার অধীত অংশগুলির উপর প্রশ্নপত্র দিতেন। তিনি যখন অন্য শ্রেণীতে অধ্যাপনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, আমরা তখন কলেজে বসিয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিতাম; উত্তর পত্রগুলি তিনি বাটীতে লইয়া গিয়া সযত্নে সংশোধন করিয়া আনিতেন। বহুবৎসর বিশুদ্ধ গণিত শাস্ত্রে এম্-এ উপাধি কেবল তাঁহার ছাত্রগণই লাভ করিত। একবার গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ-ভবনের সংস্কার হইতেছিল, কখনও এ কক্ষে কখনও অন্য কক্ষে যেখানে সুবিধা আমাদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেছিলেন।

একবার কোনও কক্ষেই বসিবার স্থান হইল না। অবশেষে গেটের পাশে দ্বারবানের যে অতি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, সেই গৃহে কয়েকদিন আমাদের এম্-এ ক্লাস বসিল। একে দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে উত্তপ্ত রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত ঘর, পাখা নাই, আমরা ত গলদ্‌ঘর্ম্ম। আচার্য্য গৌরীশঙ্কর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা উচ্চ গণিতের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে লাগিলেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন একজনের পক্ষে এফ্-এ, বি-এ (পাশ ও অনার্স), এম্-এ সকল শ্রেণীতে পড়ান অসম্ভব, একজন সহকারী প্রয়োজন। কর্ত্তৃপক্ষগণ নিশ্চয়ই আশা করিতে পারিতেন না যে গ্রীষ্মাবকাশ বা পূজাবকাশে তিনি বিশ্রাম না লইয়া এম-এ ক্লাসে পড়াইবেন। কিন্তু ছাত্রগণকে শিক্ষাদান যেন গৌরীশঙ্করের অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য, বিদ্যাদানে যেন তিনি মহাপুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, ইহা যেন তাঁহার ধর্ম্ম।

গৌরীশঙ্করের জীবনযাত্রাপ্রণালী অতি সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কলেজে যে বিষয় পড়াইবেন তাহা একবার দেখিয়া লইতেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং বাজারে গিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বহস্তে কিনিয়া আনিতেন। আহারাদি করিয়া যথাসময়ে কলেজে যাইতেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কলেজের কায কিছু করিতেন। সন্ধ্যার সময় ভবানী দত্তর লেনে সাধনাগারে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। রাত্রি ১০টায় বাটীতে ফিরিতেন। সমস্ত জীবন একই ভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন—ঠিক ঘড়ীর কাঁটার মত। পল্লীতে যদু পণ্ডিতের মাইনর স্কুলের তিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ গৌরীশঙ্কর সেখানেও প্রত্যহ একবার প্রাতে বা বৈকালে যাইতেন। গীতা এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তিনি আনন্দলাভ করিতেন। কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকগণের সহিত সময়ে সময়ে তিনি এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতেন, তাঁহারা উহাঁর সংস্কৃত-শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইতেন। অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গৌরীশঙ্করের স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন, গৌরীবাবু কেবল গীতার উপদেশ পাঠ করেন নাই, সমস্ত জীবন গীতার উপদেশানুসারে যাপন করিয়াছেন। অবসর বিনোদনের জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে বন্ধুগণের সহিত 'দাবাবড়ে' খেলিতেন। খেলিবার সময় কোনও ছাত্র কোন কঠিন অঙ্ক কষাইয়া লইতে গেলে তিনি উহারই মধ্যে অবসর করিয়া কষিয়া দিতেন।

তিনি পারিবারিক দুঃখ বিশেষ পান নাই। একবার মাত্র মধ্যম জামাতার মৃত্যুশোক তাঁহাকে পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার চারিপুত্র ও তিন কন্যাকেই তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে তৃতীয় পুত্র এটর্ণি শ্রীযুত চণ্ডীচরণ এবং কনিষ্ঠ স্কটিশচার্চ্চ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত বিজয়চণ্ডী এবং দুই কন্যা এখনও বর্ত্তমান আছেন। কনিষ্ঠ জামাতা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাস ভারত গবর্ণমেণ্টের হিসাব বিভাগে উচ্চকর্ম্ম করিয়া এক্ষণে অবসর লইয়াছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদ অধিকার করিয়াছিলেন। গণিতশাস্ত্রবিষয়ক বোর্ডে তাঁহাকে সভাপতিপদে বরণ করিবার প্রস্তাব উঠিলে তিনি সবিনয়ে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে তৎপদে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কমিটিতে সদস্য ছিলেন। তিনি বক্তৃতা দিতে ভালবাসিতেন না, কিন্তু যখন কিছু বলিতেন সকলেই শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনিতেন এবং তাঁহার সমীচীন অভিমত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিতেন। তিনি বহুবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উচ্চতর পরীক্ষা গুলিতেও, এমন কি এম-এ পরীক্ষাতেও তিনি পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি গণিতসংক্রান্ত স্কুল ও কলেজে পাঠ্য অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতির ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংস্করণ বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে অনেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হয়। তিনি অতি সরল ও সহজ প্রণালীতে কঠিন গাণিতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে পারিতেন। যাঁহারা আমাদের সময়ে বিশুদ্ধ গণিতে এম্-এ (Group A) পরীক্ষা দিতেন তাঁহাদিগকে মুখ্যভাবে বিশুদ্ধ গণিত এবং গৌণভাবে মিশ্রগণিত শিক্ষা করিতে হইত। যাঁহারা মিশ্রগণিতে এম্-এ(Group B) পরীক্ষা দিতেন তাঁহাদিগকে মুখ্যভাবে মিশ্রগণিত এবং গৌণভাবে বিশুদ্ধ গণিত পড়িতে হইত। আমাদের সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ডাক্তার সি-ই-

কালিস নামক একজন প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় গণিতবিদ্ মিশ্রগণিতে এম্-এ পড়াইতেন। আমরা রাজস্ব বিভাগের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় সুবিধা হইবে মনে করিয়া বিশুদ্ধ ও মিশ্রগণিত উভয়ই শিক্ষা করিবার জন্য জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে গৌরীশঙ্করের নিকট বিশুদ্ধ গণিত এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ডাক্তার কালিসের নিকট মিশ্র-গণিত শিক্ষা করিতে যাইতাম।

উচ্চগণিতের একই অঙ্ক, অনেক সময়ে দেখিয়াছি, আচার্য্য গৌরীশঙ্কর ডাঃ কালিস অপেক্ষা সহজে ও সরল প্রক্রিয়া দ্বারা সমাধান করিয়া দিতেন। যে সকল গ্রন্থ পাঠ্য, তদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও গৌরীশঙ্কর শিক্ষা দিতেন। এফ্-এ পরীক্ষার পাঠ্য বীজগণিতে Theory of determinants ছিল না, কিন্তু উহা জানিলে উচ্চতর গণিত শিক্ষার সুবিধা হয় বলিয়া তিনি এফ্-এ পরীক্ষার্থীদের জন্য রচিত তাঁহার কলেজপাঠ্য বীজগণিতে প্রথমেই উহা সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি কেবল পাশ করাইবার জন্য পড়াইতেন না, যাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এবং গণিত শাস্ত্রে ছাত্রদের অনুরাগ জন্মে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি প্রত্যহ নানা গ্রন্থ হইতে typical examples স্বয়ং বোর্ডে কষিয়া দিতেন। পাঠ্য পুস্তকগুলি তিনি দুই তিনবার পুনঃ পুনঃ পাঠ করাইতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন কিরূপ বিশদভাবে তিনি কঠিন বিষয়ও বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বহুদিন উহার আয় ব্যয় পরীক্ষক ছিলেন।

শেষ বয়সে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার চক্ষুতে অস্ত্র প্রয়োগ করায় তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পান। ঐ বৎসরেই এপ্রিল মাসে (২২শে চৈত্র ১৩১৯ বঙ্গাব্দ শুক্রবার) তিনি বাজার হইতে আসিয়া কলেজে যাইবার পূর্ব্বে বলেন 'আমার বেজায় গরম লাগিয়াছে, আমি শুইব।' একখানি মাদুর পাতিয়া তিনি শুইলেন। পুত্রগণ ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। বাক্শক্তি তিরোহিত হইয়াছিল, পুত্রের হাত ধরিয়া মাথায় রাখিয়া দেখাইলেন, মাথার অসুখ। সেইদিনই বৈকালে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার সহস্র সহস্র ছাত্র, সহকর্ম্মী ও বন্ধু বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া ভস্মীভূত করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে তাঁহার চিত্র ও তাঁহার নামে একটি ছাত্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার আবাসভবনের সন্নিকটস্থ একটি রাস্তার নাম "গৌরীশঙ্কর লেন" রাখা হইয়াছে।

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুতে শিক্ষা জগতের যে কি অপরিসীম ক্ষতি হয় তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী সমাবর্ত্তন উৎসবে ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এইভাবে বিবৃত করেন :—"By the death of Babu Gaurisankar De, we have lost a veteran Professor, who was rightly regarded as a tower of strength to the cause of education in these Provinces. After an academic career of exceptional brilliance he attached himself to the cause of instruction of our youths and unremittingly toiled in the performance of his task for forty-six years to the very day of his death. His extensive knowledge of mathematics, his powers of exposition, the accuracy and thoroughness with which he accomplished whatever he undertook, the innate modesty of his nature, secured for him the spontaneous admiration of all who ever came into contact with him. His services to the institution to which he adhered through life, with a fine sense of loyalty which would not even tolerate the thought of preferment elsewhere in his own line and his services to the University as a member of the Senate, of the Board of studies in Mathematics and of the Board of Examiners, for more than a quarter of a century, will be held in grateful remembrance by all who are interested in the progress of education amongst our people."



পশ্চিম-ইউরোপে কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

শ্রীঅতুল দত্ত

(রাজনীতি)

গত জানুয়ারী মাসের শেষভাগে জেনারল ফ্রাঙ্কো বার্সিলোনা অধিকার করিয়াছেন ; ইহার পর সমগ্র ক্যাটালোনিয়া প্রদেশটি ক্রমে তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ক্যাটালোনিয়ার পতনের পর হইতে স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ; সরকার পক্ষে নেতৃবৃন্দের মধ্যে এখন যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে মতদ্বৈধ ঘটিতেছে। প্রেসিডেণ্ট আজানা—ইনি এখন ফ্রান্সে—বিজয়লাভ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া স্বদেশবাসীর রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, প্রধান মন্ত্রী সীনর নেগ্রীন, পররাষ্ট্র সচিব সীনর দেল্‌ভায়ো এবং প্রবীণ সেনাপতি জেনারল মিয়াজা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বদ্ধপরিকর ; তাঁহারা সরকার পক্ষের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের অবশিষ্ট অংশে—মধ্য স্পেনে পূর্ব্ব-পশ্চিমে তেরুয়েল হইতে করদোবা এবং উত্তর-দক্ষিণে মাদ্রিদ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে—বিদ্রোহী সৈন্যকে বাধা দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট আজানার ধারণা, তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইতে পারে যে, মধ্য স্পেনে সরকার পক্ষের প্রতিরোধ-প্রচেষ্টায় তাঁহার সম্মতি আছে। এই জন্য তিনি ফ্রান্স হইতেই সরকার পক্ষের নেতৃবৃন্দের সহিত যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

ক্যাটালোনিয়া প্রদেশ হস্তচ্যুত হইবার পর সরকার পক্ষের জয়ের আশা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। বিদ্রোহী পক্ষ হইতে ইটালীয় সৈন্য যদি অপসারিত না হয়, তাহা হইলে মধ্য স্পেনে সরকার পক্ষের প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার ফলে এই আত্মঘাতী সমরের কাল বর্দ্ধিত হইবে মাত্র—প্রতিরোধের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত সফল হইবে না। সীনর নেগ্রীন প্রভৃতি আশা করেন, সরকার পক্ষ যদি আত্মসমর্পণ না করিয়া দৃঢ়তার সহিত বিদ্রোহী বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে থাকে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের "চাকা ঘুরিয়া" যাইবে। তাঁহাদের আশা, ফ্রাঙ্কো-ইটালীয় বিরোধ ; এই বিরোধ যদি "পাকিয়া ওঠে," তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত বৃটেনের পক্ষেও উদাসীন থাকা সম্ভব হইবে না। ফ্রান্সের সহিত ইটালীর যদি সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে স্পেনের বিদ্রোহী-অধিকৃত অঞ্চলকে ইটালী সামরিক ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিবে ; তখন বৃটেন্ ও ফ্রান্স স্বভাবতঃ সরকার পক্ষের সহযোগিতা-প্রার্থী হইবে। ইহা ব্যতীত, সীনর নেগ্রীন প্রভৃতির ধারণা—ফ্রাঙ্কো-ইটালীয় মনোমালিন্য যদি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পরিণত না-ও হয়, তাহা হইলেও প্রতিরোধ সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিলে সন্ধির সময় তাঁহাদের অনুকূলে দুই-চারিটি সর্ত্ত গৃহীত হইতে পারে।

সন্ধি সম্পর্কে সীনর নেগ্রীন প্রভৃতির দাবী—স্পেন হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ, প্রতিশোধমূলক নিগ্রহ না চলিবার প্রতিশ্রুতি, সমগ্র স্পেনবাসীর অভিমত অনুসারে শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। ফ্যাসিষ্ট মতাবলম্বী "জেনারল ফ্রাঙ্কো এণ্ড কোম্পানীর" পক্ষে শেষের দাবীটি কখনও মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে ; তবে প্রথম দাবী দুইটি তাঁহারা মানিয়া লইতে পারেন। এই জন্য যবনিকার অন্তরালে বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে প্রথম দুইটি সর্ত্তে স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ফ্রান্সের পক্ষ হইতে সিনেটার বেরার্ড এই বিষয় লইয়া জেনারল ফ্রাঙ্কোর ডেরায় "হাঁটাহাঁটি" করিতেছেন। বৃটেন্ ও ফ্রান্স একদিকে যেমন যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে জেনারল ফ্রাঙ্কোর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। অন্যদিকে তেমনি প্রতিরোধের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য সরকার পক্ষকে "চাপ" দিতেছে।

ক্যাটালোনিয়া পতনের পর স্পেন সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্সের নীতির যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। ক্যাটালোনিয়া পতনের সময় ইহা একপ্রকার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, স্পেনের ব্যাপারের গুরুত্ব হ্রাস পাইলে—অর্থাৎ জেনারল ফ্রাঙ্কোর বিজয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করিবামাত্র—ফ্রান্সের নিকট ইটালী তাহার টিউনিস্-সুয়েজ-জিবুতি সংক্রান্ত দাবী উত্থাপন করিবে। অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানের পর স্পেনে আর ইটালীয় সৈন্য অবস্থান করিবে না—এই মর্ম্মে ইটালীর যে প্রতিশ্রুতি তাহার পালন সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ ঘটে ; কারণ এই সময় ইটালীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে জেনারল ফ্রাঙ্কোর শুধু সামরিক বিজয় নহে—নৈতিক বিজয়লাভ পর্য্যন্তও স্পেনে ইটালীয় সৈন্যের অবস্থিতি আবশ্যক। তাহার পর জার্ম্মানী ঠিক এই সময়ে ইটালীর সহিত তাহার অচ্ছেদ্য মিলনের কথা উল্লেখ করে এবং উপনিবেশ সম্পর্কে তাহার দাবী দৃঢ়তার সহিত জ্ঞাপন করে। একই সময় ফ্রান্সের "মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিবার" জন্য ইটালীর দাবী এবং বৃটেনের "ধনে ভাগ বসাইবার" জন্য জার্ম্মানীর দাবী চেম্বারলেন এণ্ড কোম্পানীকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। ইহা ব্যতীত, বৃটেনের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মিনরকা দ্বীপটি ইটালীর অধিকারভুক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এইরূপ অবস্থায় বৃটিশ মন্ত্রিসভা ফ্রান্সের সহিত তাঁহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর হইতেই বৃটেন ও ফ্রান্স স্পেন সম্পর্কে ইটালী ও জার্ম্মানীর উপর "চাল চালিয়া" জেনারল ফ্রাঙ্কোকে স্বদলে টানিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। জার্ম্মানী ও ইটালীর অজ্ঞাতেই বৃটেন ও ফ্রান্স জেনারল ফ্রাঙ্কোকে বুঝাইয়া মিনরকা দ্বীপটি তাঁহার দ্বারা

অধিকার করাইয়াছে। "ডিভন্সায়ার" নামক একখানি বৃটিশ জাহাজেই জেনারল ফ্রাঙ্কোর "লোকজন" মিনরকায় গিয়াছিল। এই জাহাজের উপর ইটালীয় বিমান বোমা-বর্ষণ করে; বৃটেন ও ফ্রান্স এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া জেনারল ফ্রাঙ্কোকে বলিতেছে, "বুঝিনে ইটালীর অভিসন্ধি? তোমার মিনরকা অধিকার তাহার মনঃপূত নহে।"

বৃটেন ও ফ্রান্স এখন জেনারল ফ্রাঙ্কোকে ইটালী ও জার্ম্মানীর প্রভাবমুক্ত করিতে চাহে। জিব্রালটারের ভূতপূর্ব্ব গভর্নর স্যর চার্লস্ হেরিংটন্ বৃটেন ও ফ্রান্সকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, জেনারল ফ্রাঙ্কো ইটালীয় ও জার্ম্মান্ সৈন্যের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত (sick to death)! বৃটেন্ ও ফ্রান্স এখন জেনারল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে একটি শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করাইতে সচেষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধ-বিরতি না হইলে স্পেনকে ইটালী ও জার্ম্মানীর প্রভাবমুক্ত করা দুষ্কর। প্রথমত ফ্রাঙ্কোর দলের সামরিক শক্তি পর্য্যাপ্ত নহে, বৈদেশিক সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে ঐ দলে সরকার পক্ষকে পরাভূত করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, ফ্রাঙ্কোর পক্ষে ইটালী ও জার্ম্মানীর ঋণ শোধ করাও অসম্ভব। যুদ্ধ-বিরতি হইলে সরকার পক্ষের যে অর্থ এখন ফ্রান্সের নিকট গচ্ছিত আছে, তাহা জেনারল ফ্রাঙ্কোর হস্তে অর্পিত হইবে; কারণ তখন তিনিই হইবেন স্পেনের বৈধ রাষ্ট্রের অধিপতি। এই অর্থের দ্বারা জেনারল ফ্রাঙ্কো অনায়াসে ইটালী ও জার্ম্মানীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স একদিকে যেমন ফ্রাঙ্কো-গভর্ণমেণ্টের বৈধতা স্বীকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে, অন্য দিকে সরকার পক্ষকে আত্মসমর্পণ করাইবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করিতেছে। প্রেসিডেণ্ট আজানা যুদ্ধ বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় বৃটেন ও ফ্রান্সের সুবিধা হইয়াছে।

স্পেনের ব্যাপারে বৃটেন ও ফ্রান্সের এই হস্তক্ষেপে ইটালী ও জার্ম্মানী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ঐ দুই দেশের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি বৃটেন্ ও ফ্রান্সের প্রতি নানারূপ কটূক্তি বর্ষণ করিতেছে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের যদি অবসান হয় এবং জেনারল ফ্রাঙ্কো যদি ইটালী ও জার্ম্মানীকে "কদলী প্রদর্শন" করিয়া বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সহায়তায় শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে, তাহা হইলে মুসোলিনির আড়াই বৎসরব্যাপী উদ্যম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। কাজেই, স্পেনের ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপে ইটালী ও জার্ম্মানীর উষ্মা স্বাভাবিক। স্যর চার্লস্ হেরিংটন্ জেনারল ফ্রাঙ্কোর মনোভাব সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্য না-ও হয়, তাহা হইলেও ইটালী ও জার্ম্মানীর "মুখ চাহিয়া থাকা" জেনারল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে আর বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আড়াই বৎসরব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে স্পেনের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ ইটালী ও জার্ম্মানীর নিকট হইতে পাওয়া সম্ভব নহে; অর্থের জন্য ফ্রাঙ্কোকে "হাত পাতিতে" হইবে বৃটেনের নিকট। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইটালী ও জার্ম্মানী আশঙ্কা করিতেছে যে তাহাদের "অনুগত জীবটি" বোধ হয় এইবার "শিকল কাটিবে।" ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বারে একটি অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃটেন্ ও ফ্রান্সের নিকট হইতে নিজেদের দাবীগুলি কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার যে মধুর স্বপ্নে হিট্লার ও মুসোলিনি বিভোর ছিলেন, তাহা বুঝি এইবার বিফল হয়। স্যর চার্লস্ হেরিংটন্ বলিয়াছেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে জেকোস্লোভেকিয়া সংক্রান্ত আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটের সময় হিট্লার জেনারল ফ্রাঙ্কোকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি বিদ্রোহী-অধিকৃত স্পেনকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিবেন। স্পেনে অধিকার বিস্তার না করিয়াও তাহাকে ঘাটীরূপে ব্যবহার করিবার এই স্বাধীনতা ইটালী ও জার্ম্মানী এতদিন চাহিয়াছে। বৃটেন্ ও ফ্রান্স আজ তাহাদিগের এই আশা বিফল করিতে উদ্যত হইয়াছে।

স্পেনে সরকার পক্ষের বিজয় চেম্বারলেন মন্ত্রি-সভা কখনই চাহেন নাই। ফ্রান্সের রেডিক্যাল্ দলও—বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী মঃ দালাদিয়ার এই দলের নেতা—কোনদিনই স্পেনের সরকার পক্ষকে সুনজরে দেখে নাই। গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এই দলের "চাপে পড়িয়া" সম্মিলিত "ফ্রণ্ট" ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কায় মঃ ব্লুম্ স্পেনে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করিয়াছিলেন। স্পেনে সরকারপক্ষ বিজয়ী হইলে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বারে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দুর্গ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে; ইহা চেম্বারলেন্-দালাদিয়ার কোম্পানীর কখনও মনঃপূত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, জেনারল ফ্রাঙ্কো বিজয়লাভ করিয়া যদি ইটালী ও জার্ম্মানীর ক্রীড়নকরূপে কার্য্য করেন, তাহা হইলেও চেম্বারলেন-দালাদিয়ার কোম্পানীর দুশ্চিন্তা! ইটালী ও জার্ম্মানী আফ্রিকায় বৃটেন ও ফ্রান্সের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহারা যদি স্পেনকে সামরিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিবার স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে আপাতত ফ্রান্স এবং অদূর ভবিষ্যতে বৃটেন্ আফ্রিকায় "সরিষার ফুল" দেখিবে। এই "উভয়-সঙ্কট"-অবস্থা হইতে বৃটেন্ ও ফ্রান্স এখন পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিতেছে—তাহারা "লাঠি না ভাঙ্গিয়া সাপ মারিতে" চাহিতেছে। তাহারা বুঝিয়াছে যে, তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া স্পেনের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সেখানে জেনারল ফ্রাঙ্কোর রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, অথচ জেনারল ফ্রাঙ্কোকে জার্ম্মানী ও ইটালীর ক্রীড়নক হইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এই জন্যই চেম্বারলেন-দালাদিয়ার কোম্পানী আজ স্পেন সম্পর্কে এই নূতন নীতি অবলম্বন করিয়াছে।



উড়িষ্যার করদ রাজ্য

শ্রীজনরঞ্জন রায়

রণপুর প্রজা-বিদ্রোহের জন্য উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। নতুবা ময়ূরভঞ্জ ব্যতীত এ প্রদেশের আর কোনও করদ রাজ্যেরই খবরের জন্য এতদিন বঙ্গবাসীর কোন কৌতূহল ছিল মনে হয় না। অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ভাবিয়া তাই আমরা উড়িষ্যার ইতিহাসের এই অংশটি আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি।

উড়িষ্যার মানচিত্রের প্রতি তাকাইলেই দেখা যায়, এইসব করদরাজ্য উৎকলের সমতল ভূমিতে অবস্থিত নহে। সেগুলির স্থান পর্ব্বতসঙ্কুল অংশে। যত অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি সেখানকার অধিবাসী। ইহারা ভারতের অন্যান্য পার্ব্বত্য আদিম জাতিরই বংশধর। তাহারাও নিজেদের সর্দ্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া দল বাঁধিয়া বাস করিত। অপেক্ষাকৃত দুর্গম পাহাড়ে সর্দ্দারের গড় বা কিল্লা থাকিত। তাহারা স্ব স্ব স্বাধীন ছিল। এখনকার গড়জাত ও কিল্লাজাত রাজাগণ এই সমস্ত সর্দ্দারের বংশধর কি-না তাহা অনুমান করা শক্ত। কথিত হয় যে ভাগ্যান্বেষী রাজপুত বীরগণ ক্রমে এইসব সর্দ্দারকে পরাভূত করিয়া তাহাদের গড় বা কিল্লা দখল করিয়াছিলেন (উড়িষ্যা গেজেটীয়ার)। কিন্তু তাঁহারা কেহই চন্দ্র বা সূর্য্যবংশ অথবা বিশেষ কোনও ক্ষত্রিয়বংশের শাখা বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেছেন না।

যাহা হউক, এই সব পার্ব্বত্য দলপতিগণ দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সম্রাটের গড়জাত সেনাধ্যক্ষের ন্যায় গণ্য হইত। ১৫৬৭ খ্রীঃ আফগানেরা উড়িষ্যা জয় করে। কিন্তু আকবর কর্ত্তৃক তাহারা বিজীত হয়। ১৫৯১ খ্রীঃ তোদড়মল ও মানসিংহ উড়িষ্যা প্রদেশের জরিপ-জমাবন্দী করেন। ইহার পর উড়িষ্যা মাহরাট্টাদের করতলগত হয়। কিন্তু সকল সময়েই গড়জাতগণ নিজেদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে (ম্যাডক্স সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট)।

বৃটীশ কর্ত্তৃক ১৮০৩ খৃঃ উড়িষ্যা পরাজিত হয়। পর বৎসরেই এইসব গড় ও কিল্লাজাতগণের সঙ্গে সন্ধি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সন্ধির দ্বারা এই সতরটি পার্ব্বত্য দলপতি বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া বৃটীশের আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা এখনও রক্ষিত হইতেছে বলা হইয়া থাকে। কেবল সীমানা-সরহদ্দ খবরদারী, বিবদমান ওয়ারীশগণের দাবী মীমাংসা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাহাদের মাথায় একজন উপরওয়ালাকে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি হইতেছেন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। তিনিই বৃটীশ সিংহের প্রতিনিধি। তাঁহার ক্ষমতায় বিস্তৃত বিবরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১১নং রেগুলেশনে ও ১৮৫০ সালের ২১শ এক্টে বর্ণীত হইয়াছে।

এই সকল করদ রাজ্যের ক্ষমতা এবং বৃটীশের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের একটা বর্ণনাপত্র লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ১৮৬২ খৃঃ যখন এইসব রাজাদের সনন্দ প্রদান করা হয়, তখন বড়লাট লর্ড ক্যানিং সনন্দগুলিতে তাহা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া দেন।

১৮৮২ খৃঃ কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে স্থির হয় যে, উড়িষ্যার এইসব করদরাজ্য বৃটীশ ভারতের অন্তর্গত নহে অর্থাৎ বৃটীশের অধীনে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ইহারা পরিগণিত হইবে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই বিচারকেই চরম বলিয়া গণ্য করিয়া ১৮৯৪ খৃঃ ও ১৯০৮ খৃঃ পূর্ব্বে প্রদত্ত সনন্দগুলির সর্ত্ত সকল রদবদল করিয়া দিয়াছেন।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনের কার্য্যে কোনও বিধিবদ্ধ আইন বা শাস্ত্রের অনুশাসনের অভাব উপলব্ধি করিতে থাকেন। এজন্য ১৮১৪ খৃঃ তিনি এইসব মহালের মালিকদের কাছে পঁচিশটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পঁচিশ সওয়াল নামে এইগুলি প্রসিদ্ধ। এইগুলির যে উত্তর পাওয়া যায় তাহাই মনুস্মৃতির বিধানের মত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এইসব প্রদেশের বিচার্য্য বিষয়ে অনুসৃত হইতেছে।

এইরূপে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টই প্রথম বিচারকর্ত্তা। তাঁহার রায়ের আপিল হয় সদর দেওয়ানী আদালতে। তথা হইতে প্রিভিকাউন্সিলে আপিল হইতে পারে।

সংক্ষেপে এই পঁচিশ সওয়াল ও জবাবের উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রথম—সওয়াল রাজাগণের স্ত্রীর সংখ্যা, দ্বিতীয়—রাণীদের উপাধি, তৃতীয়—কোন রাণীর পুত্রের কি উপাধি, চতুর্থ—রাজার মৃত্যুতে কোন্ রাণীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে, পঞ্চম—পাটরাণীর পুত্র না থাকিলে কোন্ কুমার গদি পাইবে, ষষ্ঠ—উক্ত কুমারের কি উপাধি থাকে, সপ্তম—এই রাজগণ কি এক জাতীয় এবং কোন্ কোন্ রাজার পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি হয়, অষ্টম—এক জাতীয় না হইলে কোন্ বংশে কোন্ রাজার বিবাহ হয়, নবম—নূতন রাজা গদি পাওয়ার পর মৃত রাজার ভ্রাতাগণ, আত্মীয়গণ ও বর্ত্তমান রাজার ভ্রাতাদের ভরণপোষণের কি ব্যবস্থা হইবে, দশম—রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার বিবাহিত রাণীর কোন পুত্র না থাকিলে যদি কোন ভ্রাতা থাকে বা কুলবিবাহীর পুত্র থাকে তবে কে রাজা হইবে, একাদশ—ঐমত, তৎসঙ্গে ভাগীনেয় ও রাণীগণও বাঁচিয়া থাকিলে কে গদি পাইবে, দ্বাদশ—দাসীপুত্র ব্যতীত কেহ না থাকিলে কে গদি পাইবে, ত্রয়োদশ—রাজভ্রাতা, ভাগিনেয়, পাটরাণী ও তাঁহার কন্যার মধ্যে কে গদি পাইবে; চতুর্দ্দশ—কেবল পাটরাণী ও অন্য রাণীর কন্যা থাকিলে কে গদি পাইবে, পঞ্চদশ—পাটরাণী ব্যতীত অন্য রাণী ও তাহাদের কন্যার মধ্যে কে গদি পাইবে, ষোড়শ—ওয়ারীশগণ থাকিতেও রাজা তাঁহার রাজ্য বিক্রয় করিতে পারে কি-না, সপ্তদশ—ওয়ারীশ না থাকিলে এরূপ বিক্রয় সিদ্ধ কি-না, অষ্টাদশ—এরূপ বিক্রয় হইয়া থাকিলে রাজার পূর্ব্বপুরুষগণের জায়গীর নষ্ট হইবে কি-না, ঊনবিংশ—রাজা যদি সম্পত্তি দানবিক্রয়াদি করে তবে খোরপোষদার ভ্রাতাদের জায়গীর নষ্ট হইবে কি-না, বিংশ—পাইক,সর্দ্দার ও ঘাটওয়ালাদের নগদ বেতন অথবা জায়গীর কি প্রকার মজুরী দিবার প্রথা আছে, একবিংশ—জায়গীরদারগণকে প্রয়োজন মত একা আসিতে হয় অথবা তাহার দলসহ আসিতে হয়, দ্বাবিংশ—কোন পুত্রহীন রাজা ভ্রাতাদি বর্ত্তমানে পোষ্যপুত্র লইলে কে গদিপাইবে, ত্রয়োবিংশ—পাটরাণী রাজার জীবিতকালে প্রদত্ত অনুমতি অনুসারে রাজার মৃত্যুর পর দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলে সে গদি পাইবে কি-না, চতুর্বিংশ—রাজার অনুমতি ব্যতীত এরূপ দত্তক পুত্র লওয়া হইলে রাজার ভ্রাতাগণ গদি হইতে বঞ্চিত হইবে কি-না, পঞ্চবিংশ—পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে গৃহীত দত্তকপুত্র রাজ্য পাইবে কি-না? গড়জাত রাজগণের পক্ষ হইতে ১। ময়ূরভঞ্জ, ২। কেওনঝড় ৩। ঢেনকানল, ৪। বৃরম্বা, ৫। তেবরীয়া, ৬। তালচর, ৭। হিন্দোল, ৮। নরসিংহপুর, ৯। বাচ্চি. ১০। দশকুলা, ১১। আঙ্গুল, ১২। নয়াগড়, ১৩। কুন্দপাড়া, ১৪। নীলগিরি, ১৫। রণপুর ও ১৬। আটগড়ের রাজা উত্তর দেন। (পঁচিশ সওয়াল জবাবের প্রথমভাগে উহা লিপিবদ্ধ আছে)। কিল্লাজাত রাজগণের উত্তর ১। খোদ্দা, ২। আউল, ৩। পুটীয়া, ৪। কণিকা, ৫। কুজঙ্গ, ৬। মধুপুর, ৭। সুখীন্দ, ৮। চন্দ্র ও ৯। ডোমপাড়ার রাজার নিকট হইতে পাওয়া যায় (তাহা দ্বিতীয় ভাগে লিপিবদ্ধ আছে)। উত্তরগুলি হইতে জানা যায় যে, রাজারা এক হইতে সাতটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেন (১), ভিন্নজাতীয়া রাণীদের ফুলবিবাহী (বা ফুলবাহী) বলা হয় (২), রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ (কোনও রাজ্যে তাঁহার পদবি গম্ভীর সামন্ত, কোথাও টকাইত বাবু) গদির মালিক হন (৩), রাণীরা পূর্ব্বে সতী হইতেন, মৃতরাজার রাণীরা এবং বর্ত্তমান রাজার ও মৃতরাজার ভ্রাতারা ও ভাগীনেয়গণ ভাতা পাইয়া থাকেন (৯), কোন রাজপুত্র না থাকিলে রাজভ্রাতা গদি পাইয়া থাকেন (১০), এখন প্রত্যেক গড়জাত রাজ্যে দাসবংশীয়গণ গদির মালিক (…"hence is it that in every Gurjat the sons of slave girls are now on the Guddee." 12th. answer in pt. 1.), মৃতরাজার অনুমতিক্রমে পাটরাণীর গৃহীত পোষ্য পুত্র গদি পাইবে কিন্তু সেরূপ অনুমতি না থাকিলে গৃহীত দত্তক গদি পাইবে না (১৩, ১৪)। কিল্লাজাত রাজাদের প্রদত্ত উত্তর গড়জাতগণের দেওয়া উত্তরের প্রায় অনুরূপ। উত্তর সকল হইতে দেখা যাইতেছে যে নীলগিরি, কুজঙ্গ ও কণিকার রাজপরিবারে খণ্ডায়িত ও মাহান্তি বংশের কন্যা গৃহীত হইতে পারে। উড়িষ্যার খণ্ডয়িত ও মাহান্তিগণ সংকায়স্থ। সুতরাং এইসব রাজবংশে কায়স্থরক্তও আছে।

এই সমস্ত রাজ্য বণ্টন দ্বারা ওয়ারীশগণের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে না। এমন কি, উইল দ্বারা বা দানপত্র দ্বারা কোন রাজা তাঁহার রাজ্যের কোন অংশ কাহাকেও দিতে পারেন না। ওয়ারীশ শূন্য না হইলে রাজ্য বিক্রয় করা যায় না। কোনও স্ত্রীলোক গদি পাইতে পারেন না।

এইরূপে এই সমস্ত রাজ্য অবিভক্ত (impartible and inalienable) অবস্থায় কুলপ্রথা ও দেশাচার অনুসারে প্রাপ্ত ভূস্বামীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ও হইবে (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১শ রেগুলেশনের ৩য় ধারা) এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রানুক্রমিক (rule of primogeniture) রাজ্য-প্রাপ্তির বিধানই সর্ব্বত্র বলবৎ রহিয়াছে।

শিশুর পঠন ও পাঠনাপ্রণালী

শ্রীনগেন্দ্রকুমার চৌধুরী বি-এ, বি-টি

প্রবন্ধ

শিশুদের বাঙ্গালা পড়িতে শিখাইবার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে আজকাল কিছু কিছু আলোচনা চলিতেছে দেখিতে পাই। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভাবিত একটি পরীক্ষিত প্রণালীর আলোচনায় সাহসী হইতেছি।

বাঙ্গালী শিশুরা আজও প্রায়শ তাহাদের ঠাকুরদাদা-দিদিমাদের মত চিরাচরিত প্রথায় প্রথমে বর্ণশিক্ষা, পরে অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণযোজনা সমাপ্ত করিয়া পঠনানুশীলন করে। শিশু-শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বিশেষ্য ও বিশেষণের তালিকা মাত্র। অনেক শব্দ শুধু বর্ণযোজনার দৃষ্টান্তের খাতিরে গৃহীত—ব্যবহার-বিরল এবং দুর্ব্বোধ্য। শিশুর নিকট কতিপয় শব্দের বানান মুখস্থ করিবার কোন সার্থকতা উপলব্ধ হয় না বরং উহা নীরস ঠেকে তো বটেই। শিশু চাহে প্রথমেই পড়িবে। ছাপার হরফগুলির ধ্বন্যাত্মক রহস্যোদ্ভেদ তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয়। প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারেই শিশুদের আচরণ উহার দৃষ্টান্ত-স্থল। কিন্তু আমরা করি কি? পঠনক্ষম করিতে শিশুকে বানান মুখস্থ করিতে দেই। শিক্ষাদান ও শিখিবার প্রণালী বর্ণবিশ্লেষাত্মক। সমগ্র শব্দটি একবারে উচ্চারণ করিতে না শিখাইয়া শিশুকে প-আর-ড় পড়, ম-য় আকারে মা এইরূপ শেখান হয়। পঠনের জন্য বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়। শিশুকে গোড়াতেই বানান না করিয়া পড়িতে শেখান যাইতে পারে।

শিশু পড়িবে—

বক

ব ব ব ব ব

ক ক ক ক ক

তারপর পড়িয়া পড়িয়া পরিচয় করিবে ও চিহ্নিত করিবে—

ব ক ক ব ক ব

ব ব ক ব ক ক

অনেক পুস্তকে বিভিন্ন বর্ণযোজনার দৃষ্টান্তের পর পাঠ অভ্যাসের জন্য কয়েকটি বাক্য দেওয়া হয়। ভাব-সঙ্গতির দিক হইতে বাক্যগুলি পরস্পর বিযুক্ত। একে-ই বানান করিবার অভ্যাসের ফলে শিশু বাক্যগুলি একটানা পড়িয়া যাইতে পারে না, তাহার উপর বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলির মধ্যে ভাবের সঙ্গতি না থাকায় পরবর্ত্তী বাক্যের দিকে তাহার মন স্বাভাবিক ভাবে উন্মুখ হয় না। এইরূপ পুস্তক ও শিক্ষাপ্রণালীদ্বারা শিশুর নিকট রসের পরিবেশন সম্ভব নয়।

বর্ণযোজনার প্রারম্ভেই মনোজ্ঞ গল্পের অবতারণা সম্ভব। বর্ণযোজনা শিক্ষাদানে আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার ইত্যাদি ধারাবাহিক ক্রম অপরিত্যজ্য বিবেচনা করিবার হেতু নাই। কোন পুস্তক-কার এই গতানুগতিক পন্থা শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্মত কি-না চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। ব্যবহারের বহুলতা এই বিষয়ে ক্রম-নির্দ্দেশক হওয়া উচিত। ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার অথবা ঋ-কার অপেক্ষা এ-কারের ব্যবহার বহুলতর। এ-কার যোজনা ব্যতিরেকে বিভক্তি-যোগ ও ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করা একরূপ অসম্ভব। বিভক্তি যোগ না করিয়া বাক্য রচনা চলে না। ব্যবহারের বহুলতাসিদ্ধ বর্ণযোজনার ক্রমব্যতিরেকে শিশুর প্রাথমিক পাঠে গোড়াতেই মনোজ্ঞ গল্প বা বিষয়-বস্তুর অবতারণা সুকঠিন। শিশুর পাঠ মনোজ্ঞ করা যে কত আবশ্যক সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

বর্ণযোজনার নূতন ক্রম অবলম্বন করিয়া মনোজ্ঞ গল্পের

পাঠনাদ্বারা উদ্ভাবিত প্রণালীতে শিশুকে অতি সহজে পঠনক্ষম করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রণালীতে আ-কার, ই-কার-এর পর এ-কার, উ-কার, ঈ-কার, ঊ-কার, ঁ, ঋ-কার, ঔ-কার, ঐ-কার, ং, ঃ, এইরূপ ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। শিশুর পাঠ-সৌকর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি গল্পে নূতন শব্দের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। শিশুর চঞ্চল মন অধিকক্ষণ একাগ্র থাকিতে পারে না। এই জন্য শিশু অল্প সময়ের ভিতর একটানা পড়িয়া যাহাতে একটি গল্প শেষ করিয়া উঠিতে পারে ও রস গ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গল্পের শব্দ-সমষ্টি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। এক একটি গল্পের শব্দ সংখ্যা পুনরুক্তি সহ প্রথম ভাগে পঁচিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ এবং দ্বিতীয় ভাগে চল্লিশ হইতে ষাট। উদাহরণ স্বরূপ পাণ্ডুলিপি হইতে কয়টি গল্প উদ্ধৃত করা হইল।

(১)

বক বউ কয়—
বক মল পরব।
বক কয়—
বড় বক বক কর।
বক বউ কয়—
বক মল আন, ঝট পট।
বক তখন মল আনল।
বক বউ তখন কয়—
চল সইর ঘর।
সইর ঘর চল।
বক উড়ল ঝটপট।
আর বক বউ মল পরল ত অচল।

(২)

গা মা পা ধা বা কা যা খা না
গাধার সখ গান গায়। গান গাইয়া মান পায়।
গাধা গান গায় আর সবার কান যায়।
কান যায় সবার; গাধার সখ যায় না। গাধা
মার খায়, মান পায় না।

(৩)

তিনকড়ির না'য় তিন মণ চিনি। মাঝ দরিয়ায় ঝড় উঠিল। ঝড় উঠিয়া চিনি দরিয়ায় উজাড় হইল। তিনকড়ি হাবা নয়। হায় হায় করিল না। ভাবিয়া ভাবিয়া মতলব করিল। দরিয়ার জল সরবৎ হইল। সরবৎ ফিরি করিয়া বরাত ফিরাইব।

পাঠনাপ্রণালী এইরূপ: নূতন বর্ণযোজনা গল্পের শিরোভাগে প্রদর্শিত। রূপান্তরিত এক একটি বর্ণের নীচে অঙ্গুলি রাখিয়া শিশু উহার পরিবর্ত্তিত উচ্চারণ অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ ক-য় আ-কার কা না বলিয়া 'কা' উচ্চারণ অভ্যাস করিবে। পরে নিম্নের গল্পটি বানান না করিয়া পড়িবে। আবশ্যকমত শিক্ষক উচ্চারণ বলিয়া দিয়া সাহায্য করিবেন। বানান করিতে দিবেন না। শব্দের পুনরুক্তির জন্য পাঠ সহজ হইবে। শিশুর কৌতূহলপ্রসূত প্রশ্নের উত্তর দিয়া গল্পের ভাব গ্রহণে শিক্ষক মহাশয় সাহায্য করিবেন এবং বাক্যের কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া দ্যোতক প্রশ্ন করিয়া শিশুমনকে উহার অর্থগ্রহণে চালিত করিবেন।

বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালী লক্ষ্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পড়া ও বানান শিখাইবার প্রণালী পৃথক্। পড়িতে শিখাইবার উদ্দেশ্যে পাঠনাকালে শিশুকে বানান না করিয়া উচ্চারণ করিতে সাহায্য করিতে হইবে। বানান শিক্ষাদান কালে শিশুকে কয়েকটি শব্দের প্রতিলিপি করিতে বলা হইবে। সে এক একটি শব্দ কয়েকবার লিখিয়া অভ্যাস করিবে। এইরূপ লিখিয়া অভ্যাস হইলে ক্রমশ সে একটি সমগ্র গল্পের প্রতিলিপি করিবে। পঠিত গল্প হইতে শ্রুতলিপি অভ্যাস করিবে। নিজের মনের কথা লিখিয়া প্রকাশ করিতে গেলেই বানানের আবশ্যকতা সমধিক উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ আবশ্যকতাই শিক্ষার প্রেরণাস্থল। এই জন্য পঠিত গল্পের বাক্য পরিপূরণও প্রশ্নোত্তর লিখিবার অনুপ্রেরণাদ্বারা শিশুর নিকট বানান অভ্যাসের অপরিহার্য্যতা প্রতীয়মান করিতে হইবে। প্রত্যেকটি বানান অধিকবার লিখা শিশুর পক্ষে আয়াসসাধ্য। তাই পাঠ অভ্যস্ত হইয়া গেলে লিখিতে ভ্রমের আশঙ্কা আছে; এইরূপ শব্দের প্রতিলিপি ও মৌখিক বানান একযোগে অভ্যাস করান যাইতে পারে। একটি গল্প বার বার পড়িয়া ও লিখিয়া শিশুর মন উহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলে শুধু দুই-একটি অনভ্যস্ত বানানের নিমিত্ত তাহার শিক্ষাপ্রচেষ্টা আর একই গল্পের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা সমীচীন নহে।

গুরু মহাশয়েরা শিশুকে একটি গল্পের চর্ব্বিতচর্ব্বণ করাইয়া পাঠবিষয়ে বীতরাগ করিয়া তোলেন। এইরূপ

অনুদার দৃষ্টি মঙ্গলজনক নহে। শিশুর পঠন ক্ষমতা বুদ্ধির বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টাও লক্ষ্যের অভাবে মাত্র কতিপয় পৃষ্ঠা পরিব্যাপ্ত একখানা বই সে সারা বছর রোমন্থন করে। সাহিত্য নামধেয় একখানা পুস্তক ছাড়া বিদ্যালয়ে বছরে দ্বিতীয় বই পড়িবার অনুপ্রেরণা শিশুরা পায় না। এই কারণে অধিকাংশ বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ের জ্ঞান পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে। গোড়াতে অনভ্যাসের ফলে ব্যাপক পাঠ কোন কালেই অভ্যস্ত হয় না। শিক্ষাপ্রণালীতে এইরূপ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির সুদূরপ্রসারী ফল সম্পর্কে আমরা এখনও যথেষ্ট অবহিত নহি। মাত্র এক দুই বৎসর পাঠ গ্রহণ করিয়া যাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতেই শেষ বিদায় নেয় তাহারা অর্জ্জিত পঠন ক্ষমতার প্রয়োগে মোটেই অভ্যস্ত হয় না। স্বল্পার্জ্জিত পঠনক্ষমতার অব্যবহারে পড়িবার পটুত্ব হারাইয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই তাহারা পুনরায় নিরক্ষরতায় ডোবে। প্রতিকার-স্বরূপ গোড়া হইতেই পঠন-ক্রিয়ার যথেষ্ট অনুশীলন আবশ্যক। প্রত্যেক মানের শিশুদের জন্য নিবিষ্ট পাঠ ও ব্যাপক পাঠের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

শিশু-শিক্ষায় শব্দনির্ব্বাচনপদ্ধতি প্রয়োগ-বহুলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ-বহুলতা নির্নীত হইয়াছে বলিয়া জানি না। অসংযুক্ত বর্ণবিন্যাস পাঠসুখকর হইলেও সর্ব্বত্র সহজবোধ্য নহে। 'তপন' শব্দটি পড়িতে সহজতম, আকার, ই-কার প্রভৃতির সংযোগ নাই, কিন্তু শিশুর পক্ষে মোটেই সহজবোধ্য নহে। 'সূর্য্য' পড়িতে কঠিন হইলেও সকল শিশুই বোঝে। শিশুপাঠ্য রচনায় অনেকে অসংযুক্ত বর্ণযোজনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সংযুক্ত বর্ণবর্জ্জিত বহুলবিজ্ঞাপিত অনেক পুস্তকেরই শিশুপাঠ্যের উপযোগিতার দাবী ভূয়া প্রতীয়মান হয়। পাঠে শিশুর মনোনিবেশ-ক্ষমতা ধৈর্য্যশীলতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তকে শিশু-মনের প্রতি সুবিচার আবশ্যক। বিভিন্ন বয়সে মন বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহশীল। বিষয়বস্তুর উপযোগিতাই পাঠে শিশুমনের অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে পারে। শিশুমনের অনুকূল পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা-প্রণালীই শুধু শিশুকে অধিকতর আগ্রহান্বিত, অনুসন্ধিৎসু ও পরিশ্রমী করিতে সমর্থ।

ভগ্ননীড়

শ্রীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একটা নেহাৎ সামান্য কাহিনী—সব দিক দিয়েই ছোট। এতে না আছে রিজেন্ট পার্ক, রোল্‌স্ রয়েস, র‍্যাফেল—আর না আছে শেক্সপীয়র, কীটস্ থেকে কোটেশন্—পিয়ানোর ঠুং ঠাং, টাপেষ্ট্রীর খুস্‌খাস বা জেস্‌মিনের ছড়াছড়ি। একটা নগণ্য পরিবারের অনাড়ম্বর কাহিনী—যা হয় ত অজানার অন্ধকারের মধ্যেই সমাধি লাভ করত, যদি না তার বিষাদ-স্মৃতি আজও আমাকে ব্যথাতুর ক'রে তুলত।

ছোট্ট তার সংসার—সে, তার স্ত্রী, আর একটা ছোট্ট ছেলে। আমাদের সভ্যতার মাপকাটিতে সে ছোটলোক—ছোট্ট তার ঘর, ছোট সে জাতে, এবং কাজ করে ছোট। ছোট তার আশা; নিজের গতর খাটিয়ে ছোট ভাবেই দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চায়। অভাব বোধ করা তার স্বভাব নয়; কাজেই বিরাট্ তার শান্তি, পরিপূর্ণতার আনন্দ। নন্দনের পারিজাত তার ঘরে। ফুটফুটে ছেলে, কুচকুচে কাল কোঁকড়ান চুল, টুকটুকে রাঙ্গা ঠোঁট দুটিতে মিঠে হাসির রেখা লেগেই আছে; ডাগর চোখ দুটি দিয়ে সবাইকে হিপ্‌নটাইজ করতে চায়। লোকে বলে—ব্যাটা ছোট লোকের বরাত দেখ—গোবরে পদ্মফুল। মরুভূমিতে এ ফুল ফোটার কি প্রয়োজন? এ রকম ছেলের বাপ হওয়া তার পক্ষে যেন একটা গর্হিত কাজ; তাই নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জিত। সত্যি কথা কি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ছেলেটাকে মোটেই খাপ খাওয়ান যায় না—যেন চালা ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো।

সে লোকের বাড়ী জন খাটে। দুপুরে ক্লান্ত দেহে পা দুখানাকে টানতে টানতে বাড়ী ফেরে। স্ত্রী তাড়াতাড়ি জল আর পাখা নিয়ে আসে। ছেলেটা দরজার পাশ থেকে চুপিচুপি এসে তার চোক দুটো টিপে ধরে; তারপর দুখানা কচি হাত দিয়ে তার লোহার মত শক্ত দেহটাকে জড়িয়ে ধ'রে দুমড়ে দিতে চেষ্টা করে। ঊষর মরুর মাঝে এই স্নেহশীতল ছায়াটুকু তার খুবই ভাল লাগে। সে চোখ বুজে তা উপভোগ করে; সব অবসাদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা দূর হ'য়ে যায়। শেষে তাগিদের পর তাগিদে পাশের ডোবা থেকে ঝট্ ক'রে একটা ডুব দিয়ে আসে। খাওয়া দাওয়া সেরে ছেলেটাকে নিয়েই কাটায়, যতক্ষণ না সে ঘুমোয়; পরে আবার কাজে বেরিয়ে যায়। দিনগুলো বৈচিত্র্যহীন হ'লেও তার পক্ষে বেশ কাটে। কিন্তু এই ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো আর পাঁজনের মত বিধাতা পুরুষেরও বোধ হয় পছন্দ হয় না।

* * * *

সেদিনও দুপুরে নিত্যকার মত সে খাওয়াদাওয়া সেরে ছেলেটাকে নিয়ে বিশ্রাম করে। ছেলেটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি জানি কেন হঠাৎ চীৎকার ক'রে বাপকে জড়িয়ে ধরে; তারপর জিদ্ ধরে, বাপকে কিছুতেই কাজে যেতে দেবে না। তার না গেলেই নয়—জমিদার-বাবুদের বেড়াটা আজই শেষ করতে হবে; নইলে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। ছেলে কাজে আসতে দেয়নি, একথা একদিন বলায় তাকে কত বিদ্রূপই না সহ্য করতে হয়েছিল। অনেক ক'রে বুঝিয়ে শেষে দুহাতে দুটো পয়সা ঘুষ দিয়ে তবে কাজে বেরুতে পায়; মাথার উপর একটা কাক বিকট সুরে ডেকে ওঠে। ডোবার ধারে বাব্‌লাগাছের তলায় ছেলেটা পয়সা দুটো নিয়ে খেলা করে। হঠাৎ একটা পয়সা হাত ফস্কে গড়িয়ে যায়। সে ঝুঁকে প'ড়ে পয়সাটা ধরে ফেলে; কিন্তু টাল রাখতে পারে না—ডোবায় তলিয়ে যায়। একটা করুণ চীৎকার তার মার কানে এসে পৌঁছায়। খানিক পরে তার ঘুমন্ত দেহটা জল থেকে তোলা হয়। এক ফোঁটা রক্ত তার কান দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। তার বাপ ধীরে ধীরে এসে লম্বা লম্বা চুলগুলো তার মুখ থেকে সরিয়ে দেয়; অতি সন্তর্পণে রক্তের ফোঁটাটা মুছে দেয়। পয়সা দুটো মুঠোর মধ্যে ঠিক সেই রকম ভাবেই দেখতে পায়। তারপর পাশের গাছটায় ঠেস্ দিয়ে পাষাণে খোদাই করা মূর্ত্তির মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে বিরাট শূন্যের পানে চেয়ে থাকে। আকাশে তখন নূতন অতিথিকে বরণ ক'রে নেবার জন্য আলো সাজাবার হুড়াহুড়ি পড়ে যায়।

সাময়িকী

রাজকোট ও মহাত্মা গান্ধী—

গুজরাটের অন্তর্গত রাজকোট রাজ্যে প্রজাদিগের সহিত শাসকবর্গের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন হইতে ঐ রাজ্যে সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই গান্ধী, কুমারী মণিবেন পেটেল, কুমারী মৃদুলাবেন সারাভাই প্রভৃতি খ্যাতনামা দেশসেবিকাগণ ঐ সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ সত্যাগ্রহের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত উহাতে বিচলিত হইয়া শাসকের সহিত প্রজাদিগের বিরোধ মিটাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিরোধ ত মিটে নাই, রাজকোটের শাসক ও তাঁহার মন্ত্রী মহাত্মাজীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করায় মহাত্মা গান্ধী গত ৩রা মার্চ্চ শুক্রবার দ্বিপ্রহর হইতে ঐ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সমগ্র ভারতে আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসকর্ম্মীরা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন সে সকল প্রদেশের প্রধান-মন্ত্রীরা বড়লাটকে তারযোগে জানান যে বড়লাট ঐ বিষয়ে মধ্যস্থতা না করিলে সকল প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা একযোগে পদত্যাগ করিবেন। বড়লাট ঐ সময়ে রাজপুতানায় সফরে বাহির হইয়াছিলেন; তিনি সফর স্থগিত রাখিয়া সোমবার ৬ই মার্চ্চ বেলা ১০টায় দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং গান্ধীজির সহিত পত্রালাপ করিয়া মঙ্গলবার রাজকোটের শাসককে গান্ধীজির সর্ত্তে সম্মত হইতে বাধ্য করেন। মহাত্মা গান্ধীকে ঐ সংবাদ প্রদান করা হইলে পূর্ণ ৪দিন উপবাসের পর গান্ধীজি ৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ২-২৫ মিনিটের সময় প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে ৪দিন উপবাসের ফলে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সেজন্য তিনি এবার আর ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারিবেন না। এইভাবে রাজকোট সমস্যার সমাধান হওয়ায় সমগ্র ভারত-বর্ষের লোক আনন্দিত হইয়াছেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্র—

গত ৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের নিকটস্থ ত্রিপুরী গ্রামে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এবং আগামী ১০ই, ১১ই ও ১২ই মার্চ্চ তিনদিন তথায় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে। ২০ দিন জ্বরভোগের পরও অসুস্থ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গত ৫ই মার্চ্চ রাত্রিতে কলিকাতা হইতে ত্রিপুরী যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে গিয়াও তাঁহার জ্বর বৃদ্ধি হইয়াছে, সেজন্য ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রথম দিনের সভায় তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই; সেদিন মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র যেরূপ অধিক পীড়িত হইয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির ইতিপূর্ব্বেই কংগ্রেসের অধিবেশন অন্তত ৭ দিনের জন্য পিছাইয়া দেওয়া উচিত ছিল—সেজন্য যদি অভ্যর্থনা সমিতির আর্থিক ক্ষতি হইত, তাহা হইলে তাহা কুমারী অমৃত কাউর প্রমুখ মহিলারা সংগ্রহ করিয়া দিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, অভ্যর্থনা সমিতি কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন পিছাইয়া দিতে সম্মত হন নাই ও সেইজন্যই সুভাষ-চন্দ্রকে জীবন বিপন্ন করিয়াও কর্ত্তব্যের আহ্বানে দারুণ অসুস্থ শরীরে ত্রিপুরীতে গমন করিতে হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্র এবার কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ১৩জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করায় যে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত সমাধান করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এই অসুস্থ শরীরে কিছুতেই সম্ভব নহে। কিন্তু কেহই এ বিষয়ে মনোযোগী নহেন। ত্রিপুরীতে নেতাদের সঙ্গে রোগ-শয্যায়ও তাঁহাকে আলাপ ও পরামর্শ করিতে হইতেছে। ইহাতে তাঁহার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের প্রায়

সকল নেতাই উপস্থিত হইয়াছেন। কংগ্রেসে যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সুসমাধান করিতে পারিলে তবে আগামী বর্ষে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কংগ্রেস-সভাপতির কার্য্য করা সম্ভবপর হইবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ফলাফল জানিবার জন্য এখন সমগ্র ভারতের লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের পদত্যাগ—

ওয়ার্কিং কমিটির তের জন সদস্যই একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন। সভাপতির অসুস্থতাবস্থায় তাঁহারা তার যোগে তাঁহাকে বার জনের স্বাক্ষরিত বিবৃতি মারফৎ পদত্যাগ করিয়াছেন। জহরলালও ইঁহাদের বা গান্ধীজীর প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তিনিও স্বতন্ত্র বিবৃতি দিয়া কার্য্যকরী সমিতিতে থাকিতে অসম্মত হইয়াছেন। গান্ধীজীর অনমনীয় দৃঢ়তার নিকট জহরলাল হতাশভাবে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বের ন্যায় এবারও করিয়াছেন। সঙ্কট সৃষ্টি হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি সঙ্কট অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি পেটেল-পন্থীদের পূর্ব্ব ষড়যন্ত্রে না থাকিয়াও শেষে সেই দলেই ভিড়িলেন। এরূপ তাড়াহুড়া করিয়া পদত্যাগ না করিলেও চলিত, অল্পদিন পরেই ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করিয়া শেষ নির্দ্ধারণ কি করা যাইত না? ইতিমধ্যে এমন কিছু গুরুতর মারাত্মক মতভেদের সৃষ্টি হয় নাই বা হইত না, যাহাতে তাঁহাদের কার্য্যকরী সমিতিতে থাকা চলিত না। কিন্তু তাঁহাদের মতলব সভাপতিকে একযোগে পদত্যাগের দ্বারা বিব্রত করা। যদিও বিবৃতিতে তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন সভাপতিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াই কর্ত্তব্য, তাঁহার মনোমত কর্ম্মপরিষদ গঠন ব্যাপারে। বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী দলের আপোস নিষ্পত্তির উপর রচিত কর্ম্মনীতির অপেক্ষা একটা সুস্পষ্ট কর্ম্মনীতির অনুসরণের সময় আসিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন অর্থাৎ তাঁহারা চান, গান্ধীজী এবং গান্ধীপন্থীদের দ্বারাই কংগ্রেস চালিত হইবে, নতুবা তাহা অচল করিতে তাঁহারা সরিয়া আসিবেন।

জহরলালের বিবৃতি অধিকতর বেদনাদায়ক। জহরলালকে বল্লভভাই দলভুক্ত হইতে দেখা সত্যই মর্ম্মান্তিক। জহরলাল মতের মিল না হইলেও সভাপতি পদে থাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে মতানৈক্য হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিবৃতিতে বেশ প্রতীয়মান হইয়াছে যে তাঁহার নিজের কোন মত নাই, গান্ধীজীর আদেশেই তিনি চালিত হইয়াছেন, তাঁর আদেশ অমান্য করা তাঁহার সাধ্যাতীত।

জহরলাল সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় এই ধরণের নির্ব্বাচনের ফলাফলে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকেই ঐ অবস্থার মধ্য দিয়া আসিতে হয়। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির ঘোরাল অবস্থা ও ঘটনাচক্রের দ্রুত অচল অবস্থার দিকে আবর্ত্তিত হওয়ায় সমুদয় শক্তিকে সংহত করিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দরকারের জন্যই তিনি কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনের বিরোধী ছিলেন। কারণ উহার পরিণতি তাঁহার জানা ছিল। কিন্তু তাঁহার উক্তরূপ ধারণা পোষণের কারণগুলি বর্ণনা করা কঠিন এবং অবাঞ্ছনীয় বলিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থীর কোন সংস্রব উহার মধ্যে নাই বলিয়া স্পষ্ট ঘোষণাও করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জহরলাল পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন, সুভাষচন্দ্র মনোনীত হইলেই ওয়ার্কিং কমিটির ধুরন্ধররা কংগ্রেসের মিলিত শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবে এবং ঐ কারণেই তিনি সুভাষচন্দ্রের মনোনয়ন আকাঙ্ক্ষা করেন নাই।

সুভাষচন্দ্র সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ করিয়াছেন, পণ্ডিত জহরলালের মতে ঐ সব ভিত্তিহীন। ঘুণাক্ষরেও সত্য না হইলে উহা বিনাসর্ত্তে প্রত্যাহার করা উচিত, ইহা তিনি সভাপতিকে বলা সত্ত্বেও সভাপতি কোনরূপ ব্যবস্থার চেষ্টা করেন নাই। জহরলাল বলেন যে তিনি পাকা সমাজতান্ত্রিক এবং গণতন্ত্রে আস্থাবান হইয়াও গত বিশ বৎসর যাবৎ মহাত্মা গান্ধীর অনুসৃত অহিংসার শান্তিময় পন্থা সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস কি সুভাষচন্দ্রের সভাপতি নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই অহিংসার পথ ত্যাগ করিয়াছে—যে জন্যে তিনি সহযোগিতা ত্যাগ করিলেন? জহরলালজীর সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁহার উপযুক্ত হয়

নাই। তাঁহার সভাপতিত্বকালে মন্ত্রিত্বগ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে জহরলাল বলিয়াছিলেন, আমাদের কেহ কেহ মন্ত্রিত্বগ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যগ্র, এমন কি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহারা মন্ত্রীদের তালিকা পর্য্যন্ত রচনা করিতেছেন। ইহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের ও স্বার্থের হানি হইতেছে। তখন তো কংগ্রেসী নেতারা তাঁহার এই উক্তিতে কোন আপত্তি করেন নাই। এই রকম মতভেদ আছে জানিয়াও জহরলাল সেই সময় পদত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে হইলে জহরলালের সুভাষচন্দ্রকে সহায়তা করাই উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহার বিপরীতই করিয়াছেন।

জহরলালকে মন্ত্রিত্বগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করিয়াও তাহা মানিয়া লইতে হইয়াছে। মন্ত্রিত্বগ্রহণ বিষয় লইয়া রাষ্ট্রপতি জহরলাল ও ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য বল্লভভাই ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষও ঘটিয়াছিল, তাহাতেও কেহই পদত্যাগ করেন নাই বা কেহই তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করেন নাই। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে এই মন্ত্রিত্বগ্রহণ সম্বন্ধে তিনি এ প্রস্তাবের বিরোধী এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিরোধিতা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন—রাষ্ট্রপতি জহরলাল ইহা ঘোষিত করিলেও রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু জহরলাল তাহাতেও বিচলিত না হইয়া ঐ ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিছু রদবদল করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবার আগ্রহ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দেখা গিয়াছে, এই সত্য অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

পণ্ডিত জহরলাল চিরদিন সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কারণেই তাঁহার ঐক্য বিবৃতি বিশেষ মর্ম্মন্তুদ ও বেদনাদায়ক। ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র ও জহরলালে একটা মিলিত কর্ম্মপন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিবেন ইহা অনেকেই আশা করিয়াছিলেন।

নেতৃবর্গের ওয়ার্দ্ধার সিদ্ধান্ত আদৌ সমীচীন নহে, ইহা দ্বারা কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্র বার জন সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। সাধারণ সম্পাদক কৃপালনীও পদত্যাগ করায় অস্থায়ীভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নরসিংহমকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কৃপালনী সম্পাদক থাকাকালীন সভাপতির বিরুদ্ধে কোন নিয়মে যে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধতা করেন তাহা বোধগম্য হয় না। তাঁহার উচিত ছিল, পূর্ব্বাহ্ণে সম্পাদক-পদ ত্যাগ করা, পরে পেটেলপন্থীদের ঘোষণায় যোগ দেওয়া।

ইদানিং কংগ্রেসে প্রথা দাঁড়াইয়াছিল, কার্য্যকরী সমিতির রচিত প্রস্তাবসমূহ মাত্র নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে আলোচিত হইতে পারিত। কোন অদল-বদলের প্রস্তাবও কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ গ্রহণ করিতেন না। বে-সরকারী কোন প্রস্তাবই আলোচিত হইত না। গণতান্ত্রিক অধিকার এইরূপে হ্রাস পাইতেছিল। প্রতিনিধিরা এবার যে কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, নূতন কার্য্যকরী সমিতি সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন বলিয়া রাষ্ট্রপতি জানাইয়াছেন।

জহরলালের অভিযোগের উত্তরে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র রোগশয্যা হইতে বিবৃতি দিয়াছেন। জহরলালজী বোম্বাইতে তাঁহার বন্ধুদের নিকট সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদলের প্রার্থীরূপে প্রতিযোগিতা করিলে তাঁহার আপত্তি নাই। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে কর্ম্ম-পরিষদের পক্ষে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা উচিত নহে—কিন্তু ১৩ই জানুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির শেষ অধিবেশন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া সুভাষচন্দ্র জ্ঞাত নহেন। পণ্ডিতজীর সভাপতি থাকাকালীন আবহাওয়া প্রীতিপদ না হওয়ায় তিনি সময় সময় পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী শব্দ দুইটির অর্থ বিষয়ে পণ্ডিতজীর জিজ্ঞাস্যের উত্তর—পণ্ডিতজী কি হরিপুরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের দাবাইয়া রাখিতেছে বলিয়া অভিযোগ করেন নাই? ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশমত মামুলী কার্য্য না হইবার উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, কৃপালনী তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সভা স্থগিত রাখিবার সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীকে তার করেন এবং সর্দ্দার পেটেলকেও তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া মতামত জানাইতে বলেন।

কংগ্রেসগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা প্রচলিত

নিয়মানুসারে না হইয়া সোজা কর্ত্তার দ্বারা হইয়াছে এই অভিযোগের উত্তরে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য এই যে, ঐ রকম অভিযোগ তাঁহার আমল অপেক্ষা জহরলালের আমল সম্বন্ধে বেশী প্রযোজ্য। তাঁহার নিকট লিখিত জহরলালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রই ইহা সমর্থন করিবে। পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "কর্ম্ম নির্দ্দেশকারী রাষ্ট্রপতি না হইয়া আপনি মাত্র স্পীকারের মত কার্য্য করিয়াছেন।" দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতজী কোন দলভুক্ত নহেন, এই উক্তির উত্তরে রাষ্ট্রপতি বিস্ময়বোধ করিয়া বলিয়াছেন, এ প্রকার অবস্থা অন্য কোনও দেশে সম্ভব কি না, তিনি জ্ঞাত নন। একজন গোঁড়া সমাজতন্ত্রবাদী কি করিয়া যে এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাতীত। প্রগতিবাদিগণ যদি দলগঠনের কথা চিন্তা করে, তাহা কি দূষনীয়? গান্ধী সেবাসঙ্ঘ নামে কি কোন দল নাই।

গান্ধী মতবাদ ও উহার কৌশলে আস্থা নাই বলিয়া একটা সন্দেহের সৃষ্টির চেষ্টা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—কংগ্রেসী রাজনীতিতে গান্ধীবাদটা কি? সত্য ও অহিংসাই উহার আদর্শ! অহিংস অসহযোগ উহার নীতি। এই নীতি ও মৌলিক আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, কোন পার্থক্য সৃষ্টি করাও উচিত হইবে না।

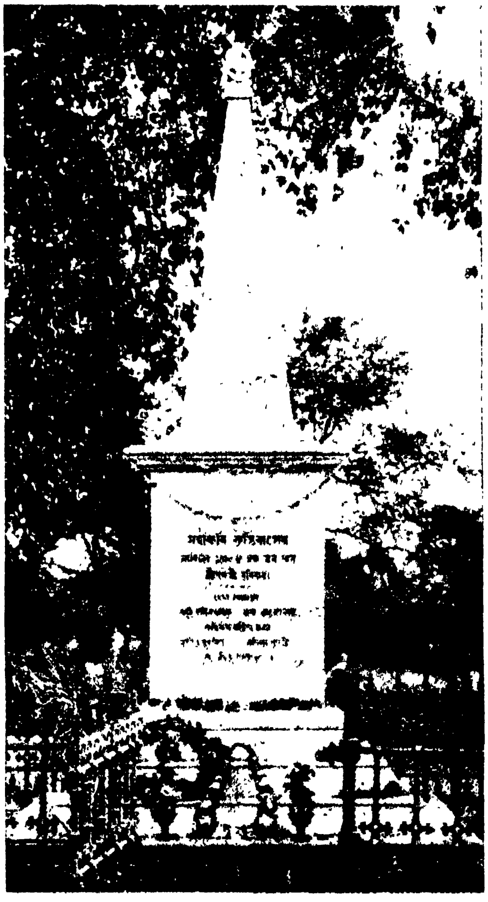
মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ ইহা নহে যে, অন্ধের মত তাঁহার ইচ্ছা ও চিন্তাধারার অনুসরণ করিতে হইবে। যতক্ষণ কেহ গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার মৌলিক নীতি হইতে বিচ্যুত না হন, ততক্ষণ তাঁহার বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করাও মহাত্মাজী পছন্দ করেন না। তাঁহার প্রতি আমার মনোভাব এই যে আমি আমার আদর্শের প্রতি আস্থাবান হইয়াও তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইবার জন্য কার্য্য করিয়া যাইব। কারণ আমি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, তিনিই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব।

আসাম প্রাদেশিক সম্মিলন—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী আসাম প্রদেশের গোলাঘাট নামক স্থানে যে আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়েরই সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণে শরৎবাবু ঐ সময়ে আসামে যাইতে পারেন নাই, সেজন্য আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত হেমচন্দ্র বড়ুয়া সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বড়ুয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। যখন বাঙ্গালার চারিদিকে সকল প্রদেশে বাঙ্গালী বিতাড়ন আরম্ভ হইয়াছে, সে সময়ে আসামে শরৎবাবু সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, ঐ প্রাদেশিকতা এখনও আসামে সংক্রামিত হয় নাই। আমরা আশা করি, চিরদিন আসামের অধিবাসীদের এই মনোভাবই বর্ত্তমান থাকিবে। রাজনীতিক হিসাবে আজ আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইলেও আসাম যে বাঙ্গালারই একটি অংশ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কৃত্তিবাস স্মৃতিউৎসব—

বাঙ্গালা রামায়ণের রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাস নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটস্থ যে ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ



কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ

করিয়াছিলেন, তথায় এখনও বৎসর বৎসর কৃত্তিবাস স্মৃতি-উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ বৎসর গত ২৯শে মাঘ শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ফুলিয়ায় উৎসব হইয়াছিল। শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা, এবার রাণাঘাট সাহিত্য সংসদের সদস্যগণও সোৎসাহে এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহার উপর এবার ই-বি-রেলের কর্ত্তৃপক্ষ নানাপ্রকারে উৎসবটিকে জাঁকাল করিবার চেষ্টা করায় কলিকাতা হইতে বহু লোক ঐ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। এবার স্থির হইয়াছে যে আগামী বৎসর হইতে তথায় একটি মেলা বসান হইবে। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথায় যে কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহার চিত্র আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। কৃত্তিবাসের ভিটার নিকটেই মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হরিদাসের সাধন-পীঠ। সেই স্থানের চিত্রও এই সঙ্গে দেওয়া হইল। কৃত্তিবাস-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের পাটেও উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এবার রামায়ণ গান উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। যাঁহাদের চেষ্টায় সেই সুদূর পল্লীগ্রামে এই উৎসব সম্পন্ন হয়, তাঁহারা সকলেই দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।



ঠাকুর হরিদাসের সাধন পীঠ

বর্দ্ধমানে খালকর সমস্যা—

বর্দ্ধমান জেলার দামোদরের খালের পার্শ্ববর্ত্তী জমির কৃষকগণ চাষের জন্য খালের জল ব্যবহার করিবার সুবিধা পায় বলিয়া ঐ জলের জন্য তাহাদিগকে অতিরিক্ত খাল-কর দিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি একর জমির জন্য সাড়ে পাঁচ টাকা কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। প্রজা-সাধারণ প্রতি একর (প্রায় তিন বিঘা) জমির জন্য বার্ষিক দেড়টাকা কর দিতে প্রস্তুত আছে। ঐ বিষয় লইয়া বহুদিন হইতে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের সহিত প্রজাপক্ষের বিরোধ চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুকে সভাপতি করিয়া এ বিষয়ে একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল—কমিটী স্থির করিয়াছেন, প্রতি একর জমীর জন্য ১মণ ধান বা ১পণ খড় কর ধার্য্য হইতে পারে, উভয় জিনিষেরই দাম কম-বেশী দেড় টাকা। তাহার পর গভর্ণমেণ্ট হইতে যে তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটীও প্রতি একর জমির কর আড়াই টাকা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কোন কমিটীর নির্দ্ধারণই না মানিয়া সার্টিফিকেট জারি করিয়া পূর্ব্বহারে কর আদায়ের ব্যবস্থা করায় ঐ অঞ্চলে এক ভীষণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। কৃষকগণ সত্যাগ্রহ করিতেছে; তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তথাপি পূর্ব্বহারে কর দিবে না; কারণ উহা দিতে তাহারা সমর্থ নহে। গভর্ণমেণ্ট পক্ষও জিদ করিয়া অধিক কর আদায় করিতে চাহেন। ইহার ফল কিরূপ হইবে তাহা এখনও বুঝা কঠিন। ঐ অঞ্চলে বহু সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে; দরিদ্র কৃষকদের গরুবাছুর আনিয়া খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রাখা হইতেছে ও

নীলামে বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সত্যাগ্রহ প্রবল হওয়ায় ক্রেতার অভাব হইয়াছে। এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যাহাতে অচিরে বিষয়টির সুমীমাংসা হয়, তাহার ব্যবস্থা না হইলে গ্রামগুলি চিরকালের জন্য ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সঙ্গীতাচার্য্যের পরলোক প্রাপ্তি

গত ১১ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রিতে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য হারাধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থী সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে তাঁহাকেই শেষ সঙ্গীতজ্ঞ বলা যায়। যৌবনে তিনি কলিকাতায় মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে গায়ক ছিলেন—পরে দেশে ফিরিয়া গিয়া স্থানীয় অনন্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের আচার্য্য হইয়াছিলেন।



সঙ্গীতাচার্য্য হারাধন চক্রবর্ত্তী

তিনি বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতে গান করিতেন বলিয়া একশ্রেণীর মধ্যে তাঁহার বিশেষ আদর ছিল।

মহেন্দ্রনাথ মিত্র—

সাহিত্যসেবী ও সুকবি মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় গত ৪ঠা ফাল্গুন ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জ গ্রেভলেনস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। কোন্নগরে তাঁহার পৈতৃক বাস ছিল এবং বাল্যে তিনি খ্যাতনামা দার্শনিক দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের



মহেন্দ্রনাথ মিত্র

সান্নিধ্যে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। নব্যভারত, নবজীবন, পন্থা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে মহেন্দ্রনাথের বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং চণ্ডীর পদ্যানুবাদ করিয়া ও 'কপালিনী' নামক নাটক রচনা করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারত সরকারের বাজেট—

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। অত্যধিক সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য আগামী বর্ষে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। সেই ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানি তুলার উপর শুল্ক দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই নূতন শুল্কে অতিরিক্ত ৫৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইলে ঐ ৫০ লক্ষ টাকা দিয়াও ৫ লক্ষ টাকা বাড়তি হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয়গণের কোন সুবিধাই হইবে না—বরং মাঞ্চেষ্টারকে সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দেশের কাপড়ের কলে যে লম্বা আঁশের তুলা ব্যবহৃত হয় তাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না। কাজেই মার্কিন

ও মিশর হইতে ভারতের তূলা আমদানি করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট এই নূতন কর ধার্য্য করায় বিদেশী তূলার দাম বাড়িয়া যাইবে। ফলে এ দেশে প্রস্তুত মিহিকাপড় অপেক্ষা বিলাতী কাপড়ের দাম তুলনায় অধিক হইলে লোক দেশী কাপড় ব্যবহার না করিয়া বিলাতী কাপড়ই ব্যবহার করিবে। কাপড়ের দাম ইতিমধ্যেই বাড়িয়া গিয়াছে—যদি ব্যবস্থা-পরিষদের বাধাপ্রদান সত্বেও তূলার উপর এই কর ধার্য্য হয়, তাহার ফলে মাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালারাই সুবিধাভোগ করিবে ও এদেশে যে সকল কলে মিহিকাপড় প্রস্তুত হইত সেই সকল কলকে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এই তূলা শুল্কের বিরুদ্ধে দেশের সর্ব্বত্র আন্দোলন না করিলে দরিদ্র ভারতবাসীদিগকে যে ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে কাপড় কিনিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ঈস্টারের ছুটীতে কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। এবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া সুসাহিত্যিক মৌলবী আবদুল ওদুদ সাহিত্যশাখার, ডক্টর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন ইতিহাস শাখার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী দর্শন-শাখার, অধ্যাপক ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী বিজ্ঞান শাখার ও শ্রীযুত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতশাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এবারের সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই চারিটি শাখায় আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত চারিটি বিষয় স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও বাঙ্গালার সুধীবৃন্দকে এই সকল বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে—(১) উন-বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার মহাকাব্য (২) শঙ্করের বিজ্ঞানবাদ (৩) গুপ্তরাজগণের সাম্রাজ্যবাদের সফলতা ও (৪) বঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রচলনের সুবিধা ও অসুবিধা। কুমিল্লায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন জননায়ক শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত এম-এল-সি মহাশয়। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত জ্যোতিষ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতাবাসী বহু সাহিত্যেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং সকলকে কুমিল্লায় যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ই-বি-রেল ও এ-বি-রেলের কর্ত্তৃপক্ষও কমভাড়ায় কুমিল্লা যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ত্রিপুরার মহারাজা স্বয়ং এবার সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া উহার উদ্বোধন করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমরাও বাঙ্গালার সাহিত্যসেবী-দিগকে এই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সাধ্যমত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বাঙ্গালার গবর্ণরের মৃত্যু—

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ কলিকাতা লাট প্রাসাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। পাকস্থলীর যন্ত্রণায় তিনি প্রায় একমাস কষ্ট পাইতেছিলেন; ঐ রোগের উপশমের জন্য তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল—ঐ অস্ত্রোপচারের পর হইতে ক্রমেই তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে থাকে ও ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। মৃত্যুর পরদিন ২৪শে ফেব্রুয়ারী সমারোহের সহিত তাঁহার মৃতদেহ কলি-কাতার সেণ্টজন চার্চ্চে সমাহিত করা হইয়াছে; কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের সমাধি উক্ত চার্চ্চের মধ্যেই অবস্থিত এবং তাহার পার্শ্বেই লর্ড ব্রাবোর্ণের শব সমাহিত হইয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন; তাঁহার পুরা নাম ছিল মাইকেল হার্বার্ট রুডল্‌ফ নাচবুল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন—১৯৩২এ তিনি ভারতসচিবের পার্লামেণ্টারী প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন ও ক্রমে বোম্বায়ের গভর্ণর পদ প্রাপ্ত হন। ১৯৩৩এর ৮ই ডিসেম্বর মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি বোম্বায়ের গভর্ণর হইয়াছিলেন। ১৯৩৭এর নভেম্বরে তিনি বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। ১৯৩৮এর জুন মাসে ভারতের বড়লাট লর্ড লিং-লিথগো ছুটী লইয়া বিলাত গেলে লর্ড ব্রাবোর্ণ কয়েকমাস বড়লাটের কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার মৃত্যুকালে এখানেই ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—নর্টন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ও ইউনিক নাচবুল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছেন। বাঙ্গালার লাটদিগের মধ্যে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর সার

জন উডবার্ণ এদেশে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ দেহত্যাগ করিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে বাঙ্গালায় নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর যে কয়জন গভর্ণর হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ইতিপূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। লর্ড রোনাল্ডসে (বর্ত্তমানে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড), লর্ড লীটন, সার ষ্টানলী জ্যাকসন ও সার জর্জ এণ্ডারসন সকলেই জীবিত আছেন। লর্ড ব্রাবর্ণ এই অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালায় জনপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য্য দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীই শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই বিদেশে অকালমৃত্যু বাস্তবিক বিশেষ শোকের কারণ। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয়-ব্যয়—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বাঙ্গালার অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের খসড়া হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে আয় হইয়াছিল ১৩,০০,৮৫,০০০ টাকা, ব্যয় হইয়াছে ১১,৮৩,১৩,০০০ টাকা ও উদ্ধৃত হইয়াছে ১১,৭,৭২,০০০ টাকা। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ এখনও শেষ হয় নাই—আগামী ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইবে—তাহার যে আনুমানিক আয়-ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়—আয় হইবে ১২,৭১,২৯,০০০ টাকা, খরচ হইবে ১২,৯৩,০১,০০০ টাকা ও ঘাটতি হইবে অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইবে ২১,৭২,০০০ টাকা। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের যে খসড়া হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে আয় হইবে ১৩,৭৭,৭৬,০০০ টাকা, ব্যয় হইবে ১৪,৬৪,-৫৬,০০০টাকা ও ঘাটতি হইতে৮৬,৮০,০০০টাকা। তহবিলের টাকায় ঘাটতি পূরণ করা অসম্ভব, কাজেই অর্থসচিব স্থির করিয়াছেন যে, তহবিল ঠিক রাখিয়া দীর্ঘকালের মেয়াদে এক কোটি টাকা ঋণ তোলা হইবে ; বর্ত্তমানে আয়ের যে সকল পন্থা আছে তাহা হইতে আর বেশী আয় হইবে এমন আশা নাই। অথচ আয় বৃদ্ধি না হইলে চলিবে না। কাজেই নূতন ট্যাক্স বসান দরকার। পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই অর্থসচিব দুইটি নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার জন্য বিল আনিবেন ; কুকুর-দৌড়ের উপর ট্যাক্স বসান হইবে এবং যাহারা ইনকম ট্যাক্স দেয়, তাহাদের উপর (ব্যবসায়, স্বাধীনবৃত্তি ও চাকরীতে নিযুক্ত প্রত্যেকের উপর) বার্ষিক ৩০ টাকা করিয়া কর ধার্য্য করা হইবে। এই দুই প্রকারে ১২ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া মনে হয়। কুকুর দৌড়ের উপর ট্যাক্স বসিবে, কিন্তু ঘোড়-দৌড়ের উপর কোন ট্যাক্স বসিবে না। খেলা-ধূলার টিকিটের উপর কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই ট্যাক্স আদায় হইতেছে। ইহা ছাড়াও নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে, ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইলে পরে অর্থসচিব পুনরায় সে সম্বন্ধে আইন উপস্থিত করিবেন। আয় অপেক্ষা ব্যয়ের হিসাব বেশী হইলেও ধার করিয়া যে বর্ত্তমান অর্থসচিব দান খয়রাতী করিবেন না এমন নহে! যদিও শিক্ষাব্যবস্থা বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ দেওয়া এ অবস্থায় সম্ভব বিবেচিত হয় নাই, তথাপি 'আজাদ' নামক দৈনিক সংবাদপত্রকে খয়রাতী হিসাবে ৩০ হাজার টাকা আগামী বর্ষে দান করা হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার সমর্থক মৌলানা আক্রাম্ খাঁ সাহেব উক্ত পত্রের মালিক। ইহা ছাড়া সরকারী প্রচার বিভাগের জন্যও গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরে যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন, আগামী বৎসরেও তাহা চলিবে। 'আজাদ'কে অর্থদান ব্যাপারেই বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ইহার পর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কর্পোরেশনে হিন্দু প্রাধান্য খর্ব্ব

বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতার মিউনিসিপাল আইন সংশোধনের জন্য যে নূতন বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুদের প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার চেষ্টাই দেখা যায়। নূতন বিলে প্রতিনিধিদের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে—মোট হিন্দু প্রতিনিধি ৪৬ জন, তন্মধ্যে বর্ণহিন্দু ৩৯ জন ও তপশীলভুক্ত হিন্দু ৭ জন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকিবেন মুসলমান ২২, শ্রমিক ২, এংলো ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয়ান ১২ ও গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ১০ জন। কলিকাতা কর্পোরেশনে হিন্দুরাই ৯৫ ভাগ

ট্যাক্স দিয়া থাকে, অথচ তাহারা অর্দ্ধেকেরও কম প্রতিনিধি পাইবে—ইহা ন্যায়বিচার সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় মুসলমান, শ্রমিক, এংলো-ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয় ও মনোনীত কাউন্সিলারগণ একদিকে থাকিলে বর্ণহিন্দুগণ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়াও দলে ভারী হইতে পারিবেন না এবং অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনেও তাঁহাদের কোন হাত থাকিবে না। বর্ত্তমানে কর্পোরেশনে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা ১৯ জন—তাহা বাড়াইয়া ঐ সংখ্যা ২২ করা হইয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য ২টি ও শ্রমিকদের জন্য ২টি পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইউরোপীয় ও মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা পূর্ব্বের মত ১২ ও ১০ রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারের সংখ্যা ৭৭ জন—গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ১০জন ও উক্ত ৮৭জন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত অল্ডারম্যান ৫ জন, মোট ৯২ জন; নূতন বিলে সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া ৯৯ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত হইবেন ৮৪ জন, মনোনীত ১০জন ও অল্ডারম্যান হইবেন ৫ জন। বর্ত্তমানে সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভোটেই মুসলমান প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন; নূতন আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক কেন্দ্র করা হইয়াছে ও শুধু মুসলমান ভোটদাতাদের ভোটেই মুসলমান প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচিত হইবেন। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ যেভাবে গঠিত, তাহাতে এই বিল যে আইনে পরিণত করা কঠিন হইবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহার বিরুদ্ধে দেশবাসীর প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা উচিত। কলিকাতায় ইহার বিরুদ্ধে বহু সভাসমিতি হইতেছে। আমরা শুধু এই নূতন আইনের তীব্র নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত হইব না, যাহাতে কলিকাতাবাসী হিন্দুগণ সকলে এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন, সেজন্যও সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

মন্ত্রিসভায় ভাঙন—

মিঃ এ-কে-ফজলল হক প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া যে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথমে ১১জন সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ নৌসের আলি তাঁহাদের মন জোগাইয়া চলিতে না পারায় কৌশলে মন্ত্রিসভা হইতে অপসৃত হন। তাহার পর দল রক্ষা করিবার জন্য মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ ও মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ—এই দুইজনকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ ৩ মাসের মধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে সকল সর্ত্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রধান মন্ত্রী মিঃ হক তাহার একটিও পালন করেন নাই—ইহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ। এই পদত্যাগ লইয়া উল্লাস করিবার কিছুই নাই। আমরা শুধু মিঃ সামসুদ্দীনের মন্ত্রিত্বগ্রহণের সর্ত্তগুলি এইখানে প্রকাশ করিলাম। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যে প্রজাহিতকর বা জনহিতকর কোন কাজই করিতে পারিতেছেন না, তাহা এই সর্ত্তগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। সর্ত্তগুলি এইরূপ—(১) বাঙ্গালার আইন সভায় কৃষক-প্রজাদলের পৃথক সত্তা বজায় রাখা, (২) মন্ত্রিসভাকে ধনিক-জমিদার-প্রভাব মুক্ত করিবার জন্য প্রজাদলের দুইজন ও তপশীলভুক্ত জাতির একজন প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ, (৩) সচিবদিগের বেতন হ্রাস, (৪) খাজনা হ্রাস সম্পর্কে গঠিত কমিটীতে প্রজাদলের কয়েকজন সদস্য গ্রহণ, (৫) দরিদ্র জনসাধারণের উপর কর স্থাপন না করিয়া অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, (৬) পাটের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে গঠিত কমিটীতে প্রজাদলের কয়েকজন সদস্য গ্রহণ, (৭) নির্ব্বাচনে মনোনয়ন প্রথা লোপ, (৮) রাজনীতিক বন্দি-মুক্তিবিধান ও (৯) রাজস্ব কমিশনে প্রজাদলের তিনজন প্রতিনিধি নিয়োগ।

দুঃখের বিষয় এই যে মিঃ সামসুদ্দীন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর তিনমাস সময় অতিবাহিত হইলেও প্রধান মন্ত্রী একটিও সর্ত্ত পালন করেন নাই। ইহার পর প্রধান মন্ত্রীর যে সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালার হিন্দুসাধারণের উপর তাঁহার দারুণ অবিশ্বাসের মনোভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। এ অবস্থায় হিন্দু-মন্ত্রীরা যে কি করিয়া তাঁহার সহিত একযোগে মন্ত্রিসভায় কাজ করিতেছেন, তাহাও একটি সমস্যার বিষয়।

জাতীয় সঙ্কট—

ত্রিপুরীতে মহাত্মা গান্ধী যাইলেন না; সুভাষচন্দ্রের অনুরোধের উত্তরে মহাত্মা তাঁহাকে তারে জানাইয়াছেন, "আপনি চিকিৎসকদের নির্দ্দেশ অবহেলা করিয়াছেন, কিন্তু আমার সে সাহস নাই।" তাঁহার ডাক্তাররা তাঁহাকে সোমবারের পূর্ব্বে কোথাও রওনা হইতে নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ যতদিন না কংগ্রেস শেষ হয়। তিনি সুস্থ হইলেই দিল্লী যাত্রা করিবেন রাজকোটের মীমাংসা করিতে। কংগ্রেসের এই ভাঙ্গনের সময় মহাত্মা কংগ্রেসকে উপেক্ষা করিয়া রাজকোট সমস্যাকে প্রধান করিয়া লইলেন। কংগ্রেসের পরে দিল্লী যাইলে এমন কিছু অসম্ভব কাণ্ড ঘটিত বলিয়া মনে হয় না।

অথচ কর্ত্তব্যানুরোধে বিশেষ অসুস্থতাবস্থায় জীবন বিপন্ন করিয়াও সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীতে গিয়াছেন। কংগ্রেসের এই সঙ্কট সৃষ্টির দায়িত্ব হইতে মহাত্মা কিছুতেই নিজেকে মুক্ত বলিতে পারেন না।

ত্রিপুরীতে মিটমাট হয় নাই। পদত্যাগী সদস্যরা যদিও বলিয়াছিলেন যে মতানৈক্য না হইলে তাঁহারা বাধা সৃষ্টি করিবেন না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীতই হইয়াছে। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাব বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে ২১৮-১৩৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। সমস্ত সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়াছে। বল্লভচারীদল একটি অক্ষরও পরিবর্ত্তন করিতে রাজী হন নাই।

জহরলালের আপোষ রফার সর্ত্ত—ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক আনীত সমস্ত অভিযোগ বিনা সর্ত্তে প্রত্যাহার করিতে হইবে; কমিটিতে পণ্ডিত নেহেরু সহ তাঁহাদের দশজনকে লইতে হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় কংগ্রেসের নীতি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব গান্ধীজির উপর অর্পণ করিতে হইবে।

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে হইলে উভয় পক্ষেরই তাহা করিতে হইবে এবং নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের সদস্য সংখ্যা সমান হইবে। নেতৃত্বের ভার রাষ্ট্রপতির উপর থাকিবে, কিন্তু কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইহা যদিও খুব সমীচীন, কিন্তু যাঁহারা পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতেই বদ্ধপরিকর তাঁহারা উচিত অনুচিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।

কংগ্রেসের জাতীয় শক্তি ঐক্যবদ্ধ না হইলে জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই দুর্দ্দিন।

সভাপতির প্রতি অবজ্ঞা-প্রস্তাব ঃ

গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু কেহ কি মহাত্মার প্রতি কখনও অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন? সুভাষচন্দ্র বা তাঁহার সমর্থকরা কি তাঁহাদের কোন বক্তৃতায় কোথাও ঐরূপ কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন—যাহার জন্য অজুহাতের ছদ্মবেশে এইরূপ প্রস্তাব আনিয়া কংগ্রেসকে বিদেশে ও স্বদেশে হীন প্রতিপন্ন করা হইল, গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠানে জনমতে নির্ব্বাচিত সভাপতির প্রতি অবজ্ঞা দেখান হইল।

গোবিন্দবল্লভও তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে এতকাল ওয়ার্কিং কমিটির অভিপ্রায়ানুসারে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন হইত। অর্থাৎ এবার সে নিয়মে নির্ব্বাচন না হওয়ায় কংগ্রেসের নীতির পরিবর্ত্তন হইবে, এই আশঙ্কায় গান্ধীর নেতৃত্বে এতকাল যে নীতি চলিতেছিল তাহার উপর আস্থা জ্ঞাপন করার আবশ্যকতা হইয়াছে।

বল্লভাচারী কোম্পানী কার্য্যকরী সমিতি হইতে হঠাৎ পদত্যাগ করিয়া বোধ হয় এক্ষণে অনুতপ্ত। সেজন্য তাঁহারা পন্থের প্রস্তাবে যোগ করিয়া দিয়াছেন, গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্রপতিকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত করিতে হইবে। পদত্যাগী সদস্যরা অনিচ্ছা প্রকাশ না করিলে, রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের যে সকলকেই কার্য্যকরী সমিতি থেকে বাদ দিতেন তাহা মনে হয় না। কিন্তু এই জোর করিয়া কার্য্যকরী সমিতিতে প্রবেশের প্রয়াস কি স্বনামধন্য ধুরন্ধরদের পক্ষে অধিক সম্মানকর হইল। এইরূপ প্রস্তাবের বদলে পন্থ যদি খোলাখুলি ভাবে প্রস্তাব করিতেন, ভবিষ্যতে মহাত্মা গান্ধীকে ডিক্টেটর বা ডাইরেক্টর—যে নামেই অভিহিত করিতে চান—করা হউক, ভবিষ্যতে জয়ের পথে দেশকে চালিত করিবার জন্য, তাহাও শোভন হইত। গান্ধীজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাব আনয়ন করিয়া মহাত্মাকে অসম্মানই করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। জোর করিয়া কি হৃদয়ের প্রকৃত ভক্তি কেহ আদায় করাইতে পারে! বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে মহাত্মার উপর অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলেও যেমন মহাত্মার মহত্ত্বের কিছুমাত্র লাঘব হয় না, তেমনি আস্থা জ্ঞাপন করিয়াও তাঁহার প্রতি দেশবাসীর অধিক শ্রদ্ধা আদায় করা যায় না।

যিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্য থাকিতেও অস্বীকৃত, তাঁহাকে প্রস্তাব দ্বারা ডিক্টেটর বানান কতদূর শোভন তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। অতঃপর মহাত্মা কি কংগ্রেসের চার আনার সদস্য হইতে এবং তাহার অভ্যন্তরে আসিতে সম্মত হইবেন, তাঁহার সে সম্মতি কি বল্লভ কোম্পানী পাইয়াছেন?

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ—কংগ্রেসের সমগ্র সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযান। দেখা যাউক, কংগ্রেসের সাধারণ সভায় ইহার ফল কিরূপ হয়।

সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ ঃ

সুভাষচন্দ্র তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার মতভেদ পরিহার করিয়া সমস্ত শক্তি লইয়া একযোগে জাতীয় সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবার বর্ত্তমান সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা স্বরাজের প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারা আমাদের জাতীয় দাবীর চরমপত্র বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিব এবং চরমপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে প্রত্যুত্তর দাবী করিব। আটটি প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র বৃটিশ ভারতে গণ-আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহেও ব্যাপক জাগরণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণের সার কথা।

দিন-মজুর

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

(রেখা-চিত্র)

ভোরবেলা।

একটি অস্বাস্থ্যকর নোংরা গলি। এর দু'ধারে কয়েকটি আলো-বাতাসহীন জীর্ণ টিনের শেড্ : অদৃষ্ট যাদের অনুক্ষণ ধিক্কার দিচ্ছে—রোগ, শোক আর দারিদ্র্য যাদের নিত্য-সঙ্গী ; জীবনের ঘানি টেনে টেনে যারা ক্লান্ত অবসন্ন, অত্যাচারীর রথ-চলার পথ ক'রে দেওয়াই শুধু যাদের কাজ—এমনি অনেক হতভাগ্য দিন-মজুর এসে নীড় বেঁধেছে এখানে। দিন কয়েক হ'ল তারা কোন এক মিলে ধর্ম্মঘট করেছে। এই নিয়ে আলোচনা চলেছে তাদের মধ্যে : এখন তারা কি করবে, কি হবে তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা ইত্যাদি। এমন সময় কোন দেশকর্ম্মীর হ'ল সেখানে আবির্ভাব। কিন্তু তাকে দেখে দিন-মজুরদের মনে কেমন একটা অবিশ্বাসের ছায়া এল ঘনিয়ে, কেমন একটা সন্দেহ—কেউ বা ভাবলে, হয় ত লোকটা বিরুদ্ধদলের, হয় ত বা স্পাই।

জনৈক দিন-মজুর—আপনি কে ? এখানে কাকে চাই ?

আগন্তুক—কোন ভয় নেই। আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদের বন্ধু।

দিন-মজুর—(নিমেষের জন্য সে স্তব্ধ বিস্মিত হ'ল। এত বড় একটা আত্মীয়তার দাবী নিয়ে কোন দিন কেউ তাদের সুমুখে দাঁড়ায়নি, তাই সহসা এই অধিকারটুকু তাদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব হ'ল না) সে আর বলতে আছে !......এমনি অনেক চাটুকথা বলে পুলিসের লোক আমাদের হামেশা সর্ব্বনাশ করেছে, এসব চালাকি এখানে চল্‌বে না।

আগন্তুক—মিথ্যা আমাকে ভুল বুঝলে ভাই, আমি তোমাদেরই একজন।' (যেন একটা অজ্ঞাত আলোর আভাষ দেখতে পেলে আগন্তুকের মুখে)

দিন-মজুর—এ:হয় ত শুধু কথার কথা। (একটু নরম হয়ে এল সুর) দেখুন, আমাদের মধ্যে তফাৎ অনেকখানি, অনেক। আমরা গরীব মানুষ, নিত্য আনি নিত্য খাই। (একটু থেমে) আপনারা রাজার ছেলে—এই ত—ছেঁড়া কোর্ত্তা, ভাঙ্গা ঘর, দুবেলা পেটপুরে খেতে পাইনে। উঃ এ কি দুঃখ—সে আপনারা ভাবতেও পারবেন না।

আগন্তুক—(হাত দুখানা তার দিকে প্রসারিত ক'রে) দেখ, এই দেখ আমার হাতে শৃঙ্খলের দাগ। জেলে থেকে থেকে আমিও অনেকদিন নরক ভোগ করেছি ভাই—হিম ঠাণ্ডা মেঝেতে ঘুমানো, তেলের ঘানিটানা—রোদে পুড়ে ও শীতে জমে আমাকেও অনেক দুঃখ যাতনা সইতে হয়েছে।

দিন-মজুর—(আস্তে আস্তে সে তার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল, একটা গভীর বিস্ময় দিলে দেখা তার চোখে) তাই, একেবারে গাঢ় দাগ পড়ে দেখছি শিকলের।—

আগন্তুক—হ্যাঁ, লোহার শিকলের দাগ—পুরো দু'টি বৎসর ছিল এই হাতে লোহার বেড়ী, ঠিক দু'টি বৎসর আমি কারাগারে শৃঙ্খল বহন করেছি।

দিন-মজুর—কেন, কিসের জন্য ?'—

আগন্তুক—কেন ?—কারণ, আমি চেয়েছিলুম তোমাদের মঙ্গল—মানে, মানুষ যাতে মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে, চেয়েছিলুম সেই ন্যায্য অধিকারটুকু। এই আকাশ, এই বাতাস, এই আলো—এ ঈশ্বরের দান, সকলেরই এতে সমান অধিকার। কিন্তু এই যে মুষ্টিমেয় ধনিক—এরা চাচ্ছে আজ সমাজ পরিচালনার চাবি-কাঠি সকলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে, এই লোকদের বিরুদ্ধে করেছিলুম বিদ্রোহ। কোটি কোটি মানুষ আজ 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করছে—নিষ্ঠুর ধনিকদের বর্ব্বর নিদারুণতায় আজ এরা নিঃস্ব, রিক্ত, অসহায়। শুধু দিলে যারা, কোন দিন পেলে না কিছু, তাদের হয়েই নালিশ জানিয়েছিলুম সকলের কাছে, চেয়েছিলুম তাদের মুক্তি—ধনিক সম্প্রদায়ের আশার মূলে করেছিলুম কুঠারাঘাত—তাই তারা আমাকে বন্দী করলে।' (একটু থেমে) কিন্তু জান, জান সেই দিন আসছে—বেশি দেরী নেই, জন-সমুদ্রে এসেছে জোয়ার, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েচে একটা প্রলয়ঙ্কর ক্ষোভ, একটা অশান্ত বিদ্রোহ,...মানুষে মানুষে এই দুস্তর ব্যবধান থাক্‌বে না। এই আলো বাতাস, বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত অফুরন্ত অবদান হবে সকলের—তোমার, আমার, এই সর্ব্বমানবের...

দিন-মজুর—(সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠে) উঃ আর তারা তোমাকে বন্দী করলে !'

দুবছর পরের কথা।

সেই দিন-মজুর (অপর কোন সহকর্ম্মীকে উদ্দেশ্য ক'রে বল্‌লে) দেখ মনে পড়ে সেই বছর দু-এক আগেকার কথা—সেই মোটা খাদিপরা ছিপ্‌ছিপে কালোপানা ভদ্রলোকটিকে ?—

২য় দিন-মজুর—হ্যাঁ, কেন, কি হয়েছে ওর ?—

১ম দিন-মজুর—তুমি বুঝি শুননি (চোখ দুটো কপালে তুলে)—আজ যে তার ফাঁসী।

২য় দিন-মজুর—উনি কি সাম্যবাদী ?—

১ম দিন-মজুর—আলবৎ, সে আর বলতে আছে।

২য় দিন-মজুর—(কি যেন খানিকক্ষণ ভাবলে) তা,...আচ্ছা সে থাক্। এখন সে জন্যে আর দুঃখ করে কি লাভ—যার ভাগ্যে যা থাকে ঠেকিয়ে রাখবে কে ? (ফের একটু ইতস্তত করলে) সে থাক, একটা কাজ করতে পার এখন, এক টুকরো ফাঁসির দড়ি যদি কোনক্রমে জোগাড় করে আনতে পার।—

১ম দিন-মজুর—(সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল—একটা অজানা লোকের আলো দেখা দিলে তার চোখে মুখে) কেন, কি জন্যে ?

২য় দিন-মজুর—এ একটা অমূল্য বস্তু—এই ফাঁসীর দড়ি পেলে আর চাই কি। কোন দুঃখ, কোন দৈন্য এসে তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না। নির্ঘাত বড়ো মানুষ হয়ে যাবে দুদিনে—

১ম দিন-মজুর—(উল্লসিত, উৎফুল্ল সে—আশার আর আনন্দের আগুনে চক্‌চক্ করছে তার চোখ) সত্যি, সত্যি...তবে চল না চেষ্টা ক'রে দেখা যাক ; একটুকরা ফাঁসির দড়ি সংগ্রহ করা, এ আর এমন দুঃসাধ্য কি !'...*

---

* টুর্গেনিভের ছায়া নিয়ে।



রঞ্জি ট্রফী ফাইনাল ঃ

বাঙ্গলা ঃ—২২২ ও ৪১৮

দক্ষিণ পাঞ্জাব ঃ—৩২৮ ও ১৩৪

বাঙ্গলা ১৭৮ রানে বিজয়ী।

দক্ষিণ পাঞ্জাবের পক্ষে পাতিয়ালার মহারাজা এবং মহম্মদ নিসার আসতে পারেন নি। বাঙ্গলার তরুণ খেলোয়াড় নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় পরীক্ষার জন্য খেলতে পারলেন না। বাঙ্গলার ক্যাপটেন লংফিল্ড টসে জিতে বেরেণ্ড আর ভাণ্ডারগাচ্‌কে ব্যাট ক'রতে পাঠালেন। দর্শক সমাগম হ'য়েচে মাত্র তিন হাজারের কিছু উপর। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। প্রথম বলেই ভাণ্ডারগাচ্‌ সাহাবুদ্দিনকে ফাইন লেগে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। অমরনাথ প্রথম ও'ভার মেডেন পেলেন। আধ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে বাঙ্গলার ৩৬ রান হ'ল। বাঙ্গলার ৫২ রান হ'বার পর আমীর ইলাহি বল ক'রতে এলেন ময়দানের দিক থেকে। বোলার পরিবর্ত্তনে ফল হ'ল। আমীর ইলাহির প্রথম বলেই ভাণ্ডারগাচ্‌কে মুরায়াত অত্যাশ্চর্য্য ক্যাচে লুফলেন। মিলার এসেই আমীরকে বাউণ্ডারীতে পাঠালেন কিন্তু পরের বল সেইরূপই পিটতে গিয়ে ষ্টাম্পড্‌ হ'য়ে গেলেন। মিলার এত অল্পে আউট হওয়ায় দর্শকরা হতাশ হ'লো। কার্ত্তিক বোস এসে বেরেণ্ডের সঙ্গে যোগ দিলেন। অমরনাথ আবার বল ক'রতে এলেন ; তিনি অতি চমৎকার বিভিন্ন রকমের বল দিচ্চেন। কার্ত্তিক আর বেরেণ্ড খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলচেন। দর্শক সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চ'লেচে। কার্ত্তিক সাহাবুদ্দিনকে দর্শনীয়ভাবে লেগে পাঠিয়ে বাঙ্গলার শতরান পূর্ণ ক'রলেন। পাঞ্জাবের প্রত্যেকের ফিল্ডিং হ'চ্চে খুব উচ্চ স্তরের, হামিদের ফিল্ডিংয়ের তুলনা নেই। লাঞ্চের সময় বাঙ্গলার দু' উইকেটে ১২২ রান উঠেচে। কার্ত্তিক ও বেরেণ্ড যথাক্রমে নট্ আউট ৩২ ও ৩৪।



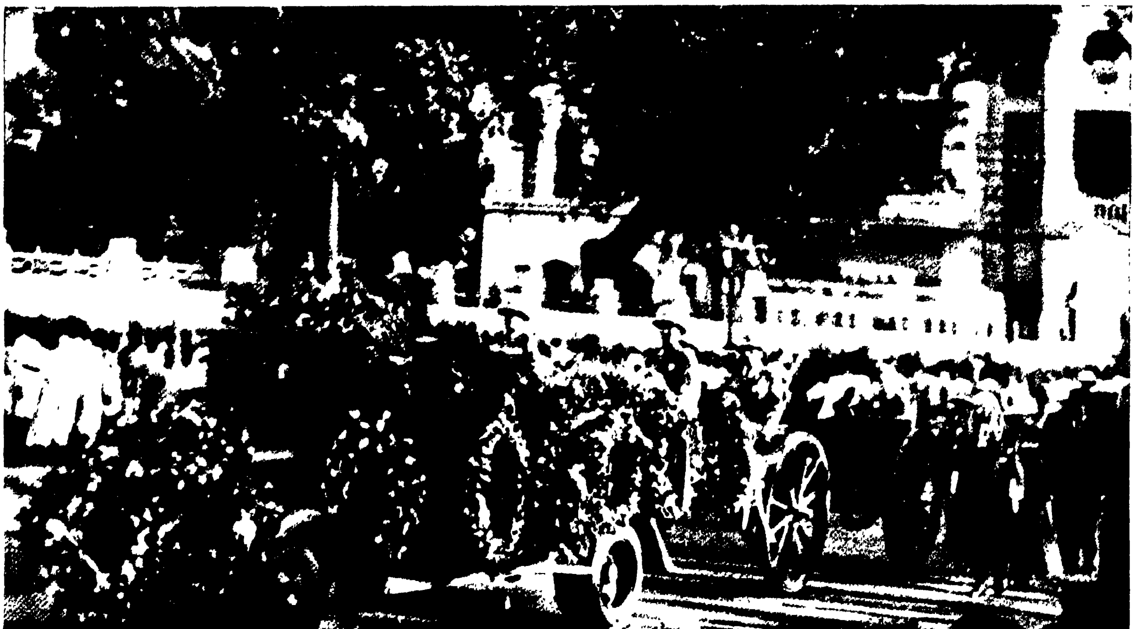
রঞ্জি প্রতিযোগিতা বিজয়ী বাঙ্গলা দল



লর্ড ব্রাবোর্ণ
(বাঙ্গলার লোকপ্রিয় গভর্ণর)

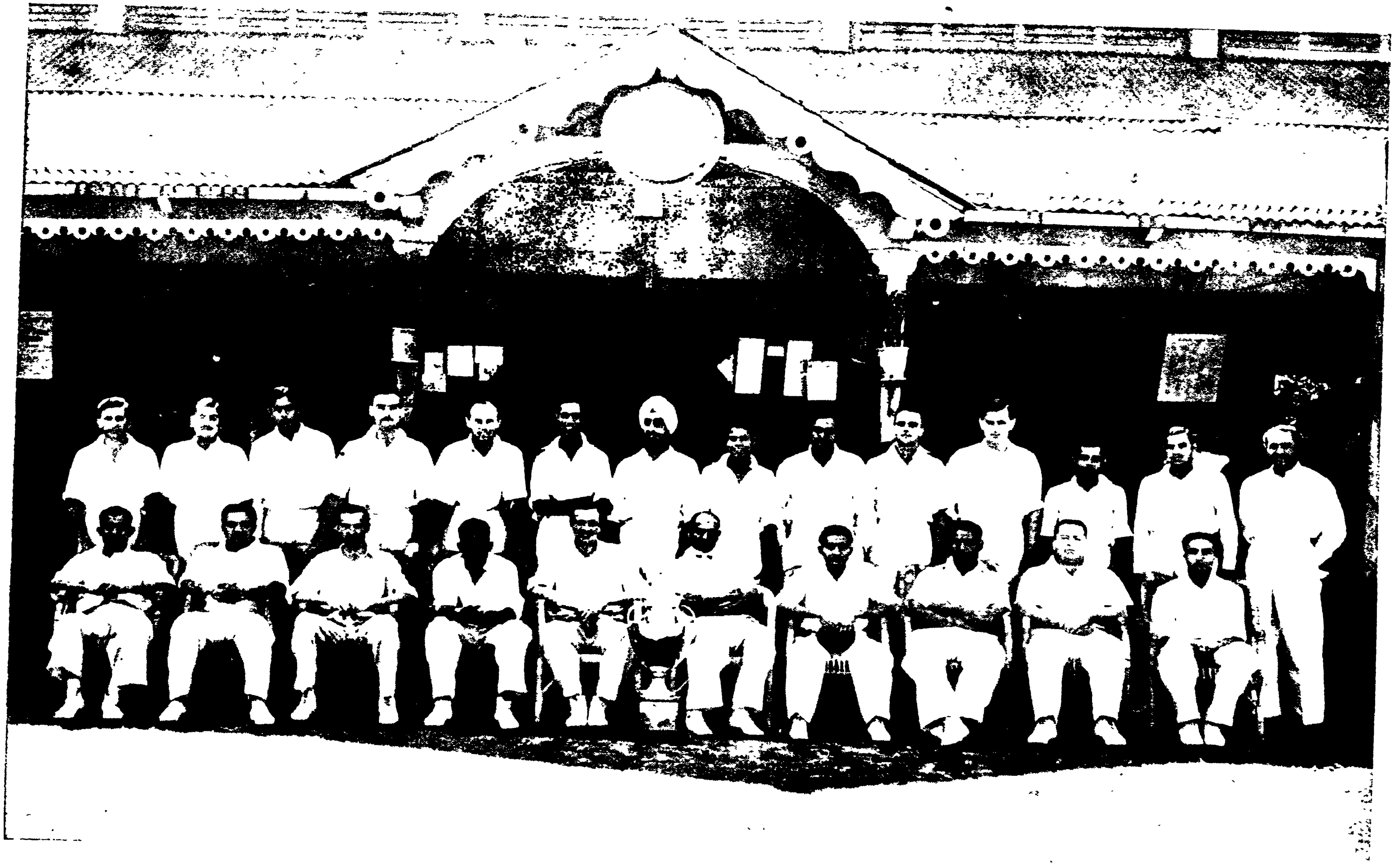


লেডী ব্রাবোর্ণ
(গভর্ণর-পত্নী)



বাঙ্গলার গভর্ণরের শব-শোভাযাত্রা—সঙ্গে প্রধান বিচারপতি, বাঙ্গলার অস্থায়ী গভর্ণর, বোম্বাইয়ের গভর্ণর প্রভৃতি

ছবি—ডি'রতন এণ্ড কোং



রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বিজয়ী বাঙ্গলা ক্রিকেট দল ও বিজিত দক্ষিণ-পাঞ্জাব দল

ছবি—পি বসু, বালিগঞ্জ

লাঞ্চের পর দর্শক প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। বেরেণ্ড ডু'ঘণ্টা ২১ মিনিট খেলে ৩৯ রান ক'রে আমীর ইলাহির বলে বোল্ড হ'লেন। স্কিনার এলেন। নিজস্ব ৪৮ রান ক'রে কার্ত্তিক অতি সহজেই অমরনাথের হাতে ধরা দিলেন, চার ছিলো তিনটে। লেগে বিভিন্ন প্রকারের দর্শনযোগ্য মার দেখিয়ে তিনি দর্শকদিগকে মুগ্ধ ক'রলেও যে মারে আউট হ'লেন তা' অত্যন্ত দুঃখের। অমরনাথের বলে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দভাবে খেলেছিলেন। জব্বর এসে ৭ রান ক'রে চলে গেলো; তার ভেতর আবার একটা অদ্ভুত রকম বাউণ্ডারীও ছিলো। জব্বর একটা বলও ভালভাবে মারতে পারেনি। ম্যালকম্ এসে স্কিনারের সঙ্গে যোগ দিলেন। ২২ রান ক'রে স্কিনার অমরনাথের বলে বোল্ড হ'লেন। ম্যালকমের ভাগ্য ভাল; রহমন তাঁর সোজা ক্যাচ ফেলেচে; এবার লংফিল্ড ব্যাট ক'রতে এলেন। অমরনাথের স্থানে সাহাবুদ্দিন বল ক'রচেন। লংফিল্ড দলের ২০০ রান পূর্ণ ক'রলেন। অমরনাথ আবার বল ক'রতে এলেন নূতন বল নিয়ে। ম্যালকম ৩০ রান ক'রে ২০৯ রানের মাথায় তাঁর বলে বোল্ড হ'লেন। তারা ভট্টাচার্য্য এসে মাত্র ডু'রান ক'রে অমরনাথের বলেই বোল্ড হ'লো। নূতন বল পেয়ে অমরনাথ মারাত্মক বল দিচ্ছেন। চা পানের একটু আগেই মুরায়াত লংফিল্ডকে বোল্ড করলে। চা পানের একটু পরেই জে এন ব্যানার্জ্জি মাত্র ১ রান ক'রে অমরনাথের বলে এল বি হ'লে বাঙ্গলার প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল মাত্র ২২২ রানে। অমরনাথ চার উইকেট পেয়েচেন ৪৪ রানে; আমীর ইলাহি পাঁচ উইকেট ৭৩ রানে।



টম্ লংফিল্ড

৪-২১ মিনিটের সময় পাঞ্জাব দল তাদের ইনিংস আরম্ভ ক'রলে রহমন ও রোসনলালকে দিয়ে। বল ক'রচেন তারা ভট্টাচার্য্য ও জে এন ব্যানার্জ্জি। ব্যাটস্‌মানরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলচে, তবুও ১৯ রানের মাথায় রহমন বোল্ড হ'লো ব্যানার্জ্জির বলে। এলেন ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি। রোসনলাল কমলের বলে এল বি হ'লে আজামত হায়াত খেলতে নামলেন, দিনের শেষে পাঞ্জাবের ২ উইকেটে ২৯ রান হ'ল।



কে ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় দিনে ওয়াজিরের যখন ৫ রান হ'য়েচে, মিলার তার অতি সোজা ক্যাচটা ফেলে দিলেন। দর্শকরা বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। লংফিল্ডের বলে কার্ত্তিক শ্লিপে আজামতকে লুফলেন। অমরনাথ মাত্র ৮ রান ক'রে কমল ভট্টাচার্য্যের বলে বোল্ড হ'লেন। সৈয়দ যোগ দিলেন। খেলা বেশ জমেচে; ওয়াজির দ্রুত রান তুলচেন। লাঞ্চের সময় ওয়াজির ৭৯, সৈয়দ ৯। সৈয়দের ২০ রানের সময় জিতেন তাঁকে আউট ক'রলেন। খেলতে এলেন সুর্জ্জিৎ সিং। দর্শকরা বেরেণ্ডকে বল দেওয়াবার জন্য চিৎকার করছে, পরের ওভারে বেরেণ্ড বল দিতে এলেন। ফল ভালই হোল; বেরেণ্ডের পঞ্চম বলে সুরজিৎ সিংএর ষ্টাম্প উড়ে গেল। আব্দুল হামিদ এলেন এবং মাত্র ১



ওয়াজির আলি



অমরনাথ

রান ক'রে কমলের বলে মিল্লারের হাতে আটকালেন। মুরায়াত এলো। ২ঘণ্টা ৫১ মিনিট খেলে ওয়াজিরের শতরান পূর্ণ হ'ল। কমলের বলে ওয়াজির আবার একটা সোজা ক্যাচ তুললে ম্যালকম তা' লুফতে পারলেন না। কার্ত্তিক দ্রুত বল ছোঁড়ার জন্য মুরায়াতকে ভাণ্ডারগাচ্ রান আউট ক'রতে পারলেন। ৮ উইকেটে পাঞ্জাবের ১৯৫ রান হয়েচে। ওয়াজির খুব পিটিয়ে খেলতে আরম্ভ করছেন। আমীর কোন রকমে উইকেট রক্ষা ক'রে যাচ্চেন। ২৩৯ রানের সময় লংফিল্ড কমলের বলে আমীরকে লুফলেন। চায়ের সময় পাঞ্জাবের রান সংখ্যা উঠলো ৯ উইকেটে ২৮৮ রান।

ওয়াজির পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ বলে 'ইন' নিচ্চেন এবং উইকেটের চারি দিকে পিটিয়ে খেলচেন। ২৭৫ মিনিটে ৩০০ রান উঠল। ওয়াজির ২৫১ মিনিট খেলে নিজস্ব ২০০ রান পূর্ণ ক'রলেন। ওয়াজিরের ভাগ্য খুবই ভাল। কমলের বলে পুনরায় তিনি ক্যাচ তুললে লংফিল্ড তা' ধরে ও হাতে রাখতে পারলেন না। সাহাবুদ্দিনকে ভাণ্ডারগাচ্ লুফলে পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ৩২৮ রানে। ওয়াজির ২২২ রান ক'রে নট্ আউট রইলেন। তিনি একাই বাঙ্গলা-দলের রান সংখ্যা তুলেচেন; তাঁর খেলা বেশ দর্শনযোগ্য হ'য়েছিলো; উইকেটের চতুর্দ্দিকে পিটিয়ে বিভিন্ন প্রকারের মার দেখিয়ে নির্ভিকভাবে খেলে দর্শকদের মুগ্ধ ক'রেচেন, যদিও তিনবার আউট হ'বার সহজ সুযোগ দিয়েছিলেন। ইডেন গার্ডেনে ওয়াজিরের ইহা দ্বিতীয়বার ডবল সেঞ্চুরী এবং রঞ্জি প্রতিযোগিতার রেকর্ড। ১৯৩৫ সালে বড়লাটের একাদশের বিরুদ্ধে তিনি ২৬৮ নট্ আউট করে এই ইডেন গার্ডেনেই রেকর্ড স্থাপন করেন। এই বৎসরই রঞ্জি প্রতিযোগিতায় নওনগরের বিরুদ্ধে সিন্ধুর পক্ষে নওমল ২০৩ রান ক'রে রেকর্ড স্থাপন ক'রেছিলেন।



ভাণ্ডারগাচ্



জব্বর



কার্ত্তিক বসু



জে এন ব্যানার্জ্জী



দক্ষিণ পাঞ্জাব দল ফিল্ডিং করতে যাচ্ছেন ছবি—জে কে সান্যাল

বাঙ্গলার ফিল্ডিং অত্যন্ত খারাপ হ'য়েচে। তারা ভট্টাচার্য্য, জব্বর ও কমল ছাড়া আর কারও ফিল্ডিং ভাল

হয়নি। দলের ইউরোপীয়গণ দিন দিন নিম্নস্তরের ফিল্ডিং প্রদর্শন ক'রচেন। কমল ভট্টাচার্য্য ৫টা উইকেট পেয়েচেন।



আমির ইলাহী বল দিচ্ছেন

১০৬ রান পিছনে থেকে বাঙ্গলাদলের দ্বিতীয় ইনিংস সুরু হ'লো বেরেণ্ড ও মিলারকে দিয়ে। বেলা শেষে মোট ২০ রান উঠ্‌লো, বেরেণ্ড ১১ ও মিলার ৮।

গত রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। তৃতীয় দিনে আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা, একটু একটু রোদ উঠছে। বেরেণ্ড খেলা আরম্ভ ক'রে কোন রান না করেই আউট হ'লেন। কমল ১৯ রান ক'রে এল বি হ'লেন, কার্ত্তিক কোন রান করবার আগেই রান আউট হ'য়ে গেলেন। দর্শকরা হতাশ হ'চ্চেন। ভাণ্ডারগ্যাচ ব্যাট ক'রচেন মিলারের সঙ্গে। দুজনেরই রান তোলার দিকে বিশেষ লক্ষ্য নেই, কেবল উইকেট রক্ষা ক'রে যাচ্চেন, আর বোলাররা পর পর মেডেন ওভার পেয়ে চ'লেচেন। রান খুব ধীরে ধীরে উঠে লাঞ্চের সময় হ'লো ১১৫, বেরেণ্ড ৪০ ও ভাণ্ডারগাচ্‌ ৩৭। ১৬১ রানের সময় স্লিপে ভাণ্ডারগাচ্‌ মুরায়াতএর বলে ৬৫ রান করে আমীর ইলাহির হাতে ধরা দিলেন। তিনি ১২৭ মিনিট ব্যাট ক'রেচেন ; চার ছিলো ৭টা। স্কিনার এসে মাত্র ১ রান ক'রে গেলেন। ম্যালকম এসেই পিটিয়ে খেলতে আরম্ভ ক'রলেন, অমরনাথ পর্য্যন্ত রেহাই পেলেন না। বোলার বদলান হ'চ্চে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমীর ইলাহির 'নো-বলে' বাঙ্গলার ২০০ রান পূর্ণ হ'ল। অমরনাথ নূতন বল নিয়ে বল দিতে আরম্ভ করলেন। ম্যালকম কিন্তু একইভাবে খেলে যাচ্চেন ; মিলারেরও রান উঠছে যদিও ধীরে। চায়ের পর ওয়াজির কয়েকবার বোলার বদলেচেন, কিন্তু সুফল হয়নি। অমরনাথ বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন, ম্যালকম তাঁর এভারেজ অত্যন্ত খারাপ ক'রে দিচ্চে। ২৫৫ মিনিটে বাঙ্গলার ২৫০ রান হ'ল। ২৭৮ রানের মাথায় মিলার বোল্ড হ'লেন মুরায়াতএর বলে। মিলার খুব সংযত ও দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেচেন। প্রায় পাঁচঘণ্টা খেলে ৮৫ রান ক'রেচেন ; চার ছিলো মাত্র পাঁচটা। ম্যালকমের খেলা হ'য়েছিলো ঠিক বিপরীত ; মিলারের ন্যায় ধীর ও স্থির খেলোয়াড়ের সহযোগিতা পেয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে তার সদ্ব্যবহার ক'রে নিয়েচেন। তাঁদের দুজনের খেলাই বহুদিন স্মৃতিপথে থাকবে। মিলারের সমান রান সংখ্যা তুলতে ম্যালকমের সময় লেগেছিলো মাত্র ৯৫ মিনিট। লংফিল্ড এসে ম্যালকমের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনশো মিনিটে বাঙ্গলার ৩০০ রান পূর্ণ হ'ল। ম্যালকম সেঞ্চুরী করবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছেন বুঝে, ওয়াজির নিজে শেষ ওভারে বল দিতে এলেন এবং শেষ বলে ম্যালকমকে বোল্ড করলেন। তিনি মোট ১০৫ মিনিট খেলে ৯১ রান করেচেন, চার ছিলো ১৩টা। লংফিল্ড ১৭ করে নট্‌ আউট



কলিকাতা টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ বিজয়ী ভাসিন
ও বিজিত এ ঘোষ (দক্ষিণে) ছবি—জে কে সান্যাল

রইলেন। দিনের শেষে বাঙ্গলার ৭ উইকেটে মোট ৩১০ রান হ'ল।

পরের দিন লংফিল্ড কোন রান করবার আগেই আউট হ'য়ে গেলেন। জব্বর ও তারা ভট্টাচার্য্য খেলেছে। তারা ৯ রান ক'রে অমরনাথের বলে বোল্ড হ'লো। বাঙ্গলার শেষ খেলোয়াড় জিতেন ব্যানার্জ্জি খেলতে নাব্লেন। দু'জনেই বেশ পিটে খেলছে, দর্শকরা উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। ৪১৮ রানের মাথায় জব্বর ৫৮ রান ক'রে আউট হ'লে বাঙ্গলার দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্ত হ'লো।

লাঞ্চের কয়েক মিনিট আগে পাঞ্জাবের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল। বল ক'রচেন তারা ও লংফিল্ড, ব্যাট ক'রচেন মুরায়াত ও রহমন। লংফিল্ড ১ ওভার বল ক'রেই নিজ স্থানে কমলকে বল ক'রতে দিলেন। ফল ভালই হ'ল; বোর্ডে যখন মাত্র ৪ রান উঠেচে, কমল রহমনকে নিজের বলে নিজেই লুফ্লেন। লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভ ক'রলেন আজামত হায়াত ও মুরায়াত। মাত্র ১ রান যোগ হবার পর জব্বর তারার বলে মুরায়াতকে লুফ্লে। অমরনাথ নাব্লেন। জিতেন একটা বাউণ্ডারী বাঁচাতে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়ে বসতে বাধ্য হ'লে হজেস ফিল্ড ক'রতে এলো। লংফিল্ড আবার বল দিচ্ছেন; এবারও ফল ভালই হ'ল। তাঁর বলে আজামতের উইকেটের একটা বেল ভেঙ্গে গেল। রোসনলাল এলেন। রান এবার ধীরে ধীরে উঠচে, ৭৫ মিনিটে পাঞ্জাবের ৫০ রান হ'ল। ৬১ রানের মাথায় বেরেণ্ড বল ক'রতে এলেন। অমরনাথ তাঁর প্রথম বল আটকালেন। কিন্তু পরের বল পিটতে গেলে তার বেল পড়ে গেল। অমরনাথ ৭২ মিনিট ব্যাট ক'রে ৩৭ রান ক'রেচেন, চার ছিলো ৫টা। ওয়াজির এলেন। দুদিকেরই বোলার বদলান হ'য়েচে। এবারও সুফল ফললো। ওয়াজির মাত্র ১০ রান ক'রে লংফিল্ডের বলে পরিষ্কার বোল্ড হ'লেন। মহম্মদ সৈয়দ ম্যালকমের বলে ক্যাচ তুলতেই হজেস তাকে লুফ্লে। ৮০ রানে পাঞ্জাবের ৬টা উইকেট পড়ে গেল। রোসনলাল খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলচেন, সুরজিৎ সিং যোগ দিয়ে পিটে খেলচেন। আবার বোলার বদল হ'য়েচে। বেরেণ্ডের বলে সুরজিৎ সিংকে মিলার দুর্ভাগ্যবশতঃ লুফ্তে পারলেন না। ৩৫ মিনিট খেলে পাঞ্জাবের ১০০ রান পূর্ণ হ'ল। সুরজিৎ ১০৫ রানের মাথায় লংফিল্ডের বলে কমলের হাতে আটকে গেলো। আবদুল হামিদ এসে মাত্র ১ রান করলে লংফিল্ডের বলে তার বেল ছিটকে গেল। আমীর ইলাহি এসে লংফিল্ডের বলে ক্যাচ তুললে, কিন্তু হজেস ঐ অতি সহজ ক্যাচ ধরতে পারলে না। ১৩৪ রানের মাথায় আমীর ইলাহি কমলের বলে স্কিনারের হাতে ধরা দিলে, আর ঠিক তার পরের বলেই ভাণ্ডারগাচ সাহাবুদ্দিনকে উইকেটের পিছনে লুফে নিলে, পাঞ্জাবের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল মাত্র ১৩৪ রানে।



মহিলাদের ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় কলেজ টীম চ্যাম্পিয়ান বিজয়িনী—স্কটিশ কলেজের ছাত্রীগণ

লংফিল্ড ৪টে উইকেট পেয়েচেন ৪৮ রানে। কমল

৩টে ৫৭ রানে। সময়োপযোগী বোলার পরিবর্ত্তনে দ্বিতীয় ইনিংসে আশাতীত সুফল লাভ হয়েছে।

ভারতের ক্রিকেট-জগতের চির অবজ্ঞাত বাঙ্গলা আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবার বিজয়ী হ'য়েচে। পাঞ্জাবের টিমে ভারতের কয়েকজন টেষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গলার কোন খেলোয়াড়ই এ পর্য্যন্ত টেষ্ট খেলাতে মনোনীত হ'তে পারেন নি। এইজন্য বাঙ্গলার এই বিজয় খুব কৃতিত্বের। কিন্তু বাঙ্গালার দলে অর্দ্ধেকের উপর ইউরোপীয় খেলোয়াড় আছে। পাঞ্জাবের দল ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত। ব্যাটিংএ পাঞ্জাবের ওয়াজির ছাড়া আর কেহই সুবিধা করতে পারেন নাই, এমন কি বিখ্যাত অমরনাথও নয়। বোলিংএ বিশেষ কৃতিত্ব দেখালেও বাঙ্গলার খেলোয়াড়রা রান তুলতে বেশ সক্ষম হয়েছেন। অমরনাথের বোলিং চাতুর্য্য সত্যই চমৎকার। পাঞ্জাব দল সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েচেন ফিল্ডিংয়ে, ফিল্ডিং সাজানর পদ্ধতি, খেলোয়াড়দের ক্ষিপ্রতা, বল নিক্ষেপ ও সংগ্রহণের তৎপরতা বিশেষ দর্শনীয় ও কার্য্যকরী হয়েছিল। বাঙ্গলার পক্ষে মিলার, ম্যালকম, কে বোস, ভাণ্ডারগাচ ও জব্বর ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েচেন। বোলিংএ কমল ও টম্ লং ফিল্ড তাঁদের কৃতকার্য্যতার জন্য প্রশংসার দাবী ক'রতে পারেন। টি ভট্টাচার্য্য দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হ'তে পারেননি। উইকেট কিপিং উভয় দলেরই ভাল হ'য়েচে।

খেলার জয়-পরাজয় আছেই, কিন্তু তাই একমাত্র কাম্য নয়। বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের নিকট খেলোয়াড়জনিত মনোভাব সকলেই আশা করেন। এবারের খেলায় দু'-একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এ বিষয়ে দর্শকদের হতাশ ক'রেচেন। আম্পায়ার নিয়োগ ব্যাপারে ওয়াজিরের আচরণ সমর্থন করা যায় না। খেলার মাঠে আমীর ইলাহির ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। আম্পায়ার তাঁর বলে 'ওয়াইড বল' অথবা 'নো বল' ডাকিলে তিনি আম্পায়ারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাত করেছেন। দর্শকগণ আশ্চর্য্য! ইহা একাধিকবার হ'য়েছে। তাঁর কি ধারণা যে তাঁর কখনও 'নো বল' বা 'ওয়াইড বল' হ'তে পারে না। তাঁর আর একটি বদ অভ্যাস আছে। প্যাডে বল লাগলেই তিনি এল-বি'র জন্য আবেদন করেন। দর্শকরা বিরক্ত হ'য়ে 'ব্যারাকিং' আরম্ভ ক'রলে তিনি দর্শকদের দিকে হাত তুলে শাসান ও মুখভঙ্গি করেছেন। একজন টেষ্ট খেলোয়াড়ের এই রকম ব্যবহার অত্যন্ত দোষনীয়। তিনি দর্শকদের প্রশংসা পান নি, কিন্তু তাঁর দলের অন্য খেলোয়াড় দর্শকদের হাততালি ও বাহবা পেয়েচেন। দর্শকরা ব্যারাকও ক'রে আবার গুণের কদরও করতে জানে। নামকরা খেলোয়াড়দের এত উগ্র হওয়া শোভা পায় না; তাঁদের একটু স্থির মস্তিষ্ক হওয়াই উচিত।



মহিলাদের সিনিয়ার হকি প্রতিযোগিতা

বিজয়িনী—র্‌ বার্ডস দল ছবি—জে কে সান্যাল

বাঙ্গলা—প্রথম ইনিংস

পি ভাণ্ডারগাচ…কট হোসেন, ব আমির ইলাহি	৩৫
এস বেরেণ্ড…ব আমির ইলাহি	৩৯
পি মিলার…ষ্টাম্পড রহমান, ব আমির ইলাহি	৪
কে বোস…কট অমরনাথ, ব আমির ইলাহি	৪৮
এ স্কিনার…ব অমরনাথ	২২
এ জব্বর…ষ্টাম্পড রহমান, ব আমির ইলাহি	৭
বি ম্যালকম…ব অমরনাথ	৩০
টি সি লংফিল্ড…ব মহম্মদ হোসেন	২১
টি ভট্টাচার্য্য…ব অমরনাথ	২
কে ভট্টাচার্য্য… নট আউট	৪
জে ব্যানার্জ্জি…এল-বি, ব অমরনাথ	১
অতিরিক্ত	৯
মোট	২২২

বোলিং :—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
সাহাবুদ্দিন	১৪	১	৭৩	০
অমরনাথ	৩০	১২	৪৪	৪
মুরায়াত হোসেন	১৫	৫	২৩	১
আমির ইলাহি	২৫	৫	৭৩	৫

বাঙ্গলা—দ্বিতীয় ইনিংস

পি মিলার…ব মুরায়াত হোসেন	৮৫
এস বেরেণ্ড…কট মহম্মদ সৈয়দ, ব সাহাবুদ্দিন	১১
কে ভট্টাচার্য্য…এল-বি, ব অমরনাথ	১৯
কে বোস… রান আউট	০
পি ভাণ্ডারগাচ…কট আমির, ব মুরায়াত হোসেন	৬৫
এ স্কিনার…কট আব্দুর রহমান, ব মুরায়াত হোসেন	১
বি ম্যালকম্…ব ওয়াজির আলি	৯১
টি সি লংফিল্ড…কট মহম্মদ সৈয়দ, ব মুরায়াত হোসেন	১৭
এ জব্বর…এল-বি, ব অমরনাথ	৫৮
টি ভট্টাচার্য্য…ব অমরনাথ	৯
জে ব্যানার্জ্জি… নট আউট	২৯
অতিরিক্ত	৩৩
মোট	৪১৮

বোলিং :—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
অমরনাথ	৫৪.৩	২৪	৯৭	৩
সাহাবুদ্দিন	৯	০	৪৪	১
আমির ইলাহি	২৪	১	১০১	০
মুরায়াত হোসেন	৪৩	১৬	৯৭	৪
আব্দুল হামিদ	২	০	৭	০
ওয়াজির আলি	৫	১	১৫	১
মহম্মদ সৈয়দ	৯	২	২৪	০

দক্ষিণ পাঞ্জাব—প্রথম ইনিংস

আব্দুর রহমান…ব জে ব্যানার্জ্জি	১৬
রোসনলাল…এল-বি, ব কে ভট্টাচার্য্য	৮
ওয়াজির আলি… নট আউট	২২২
আজমত হায়াত…কট কে বোস, ব লংফিল্ড	২১
অমরনাথ…ব কে ভট্টাচার্য্য	৮
মহম্মদ সৈয়াদ…কট ভাণ্ডারগাচ, ব জে ব্যানার্জ্জি	২০
সুর্জিৎ সিং ব বেরেণ্ড	৩
মুরায়াত হোসেন… রান আউট	৩
আব্দুল হামিদ…কট মিলার, ব কে ভট্টাচার্য্য	১
আমির ইলাহি…কট লংফিল্ড, ব কে ভট্টাচার্য্য	৮
সাহাবুদ্দিন…কট ভাণ্ডারগাচ, ব কে ভট্টাচার্য্য	১৩
অতিরিক্ত	৫
মোট	৩২৮

বোলিং :—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
টি ভট্টাচার্য্য	১১	২	৩৭	০
জে ব্যানার্জ্জি	১৯	৪	৪৯	২
কে ভট্টাচার্য্য	২৪.২	১	১০০	৫
টি সি লংফিল্ড	১৯	১	৬৮	১
বি ম্যালকম্	৩	১	১৩	০
এ স্কিনার	৫	১	২০	০
এস বেরেণ্ড	৯	১	৩৩	১

দক্ষিণ পাঞ্জাব—দ্বিতীয় ইনিংস

আব্দুর রহমান…কট ও ব কে ভট্টাচার্য্য	৪
মুরায়াত হোসেন…কট জব্বর, ব টি ভট্টাচার্য্য	০
আজমত হায়াত…ব লংফিল্ড	১০
অমরনাথ…ব বেরেণ্ড	৩৭
রোসনলাল… নট আউট	৩৫
ওয়াজির আলি…ব লংফিল্ড	১০
মহম্মদ সৈয়দ…ক হজেস, ব ম্যালকম	১
সুর্জিৎ সিং…কট কে ভট্টাচার্য্য, ব লংফিল্ড	১৫
আব্দুল হামিদ…ব লংফিল্ড	১
আমির ইলাহি…কট স্কিনার, ব কে ভটাচার্য্য	১৯
সাহাবুদ্দিন…কট ভাণ্ডারগাচ, ব কে ভট্টাচার্য্য	০
অতিরিক্ত	২
মোট	১৩৪

বোলিং :—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লংফিল্ড	১৭	৩	৪৮	৪
টি ভট্টাচার্য্য	৪	২	২	১
কে ভট্টাচার্য্য	২০.৪	৫	৫৭	৩
বেরেণ্ড	৪	০	১৪	১
ম্যালকম্	৩	০	১১	১

সিন্ধু—৩৩৯ ও ২৩

দক্ষিণ পাঞ্জাব—১৯৭ ও ১৬৮

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ পাঞ্জাব ৭ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েছিলো।

সিন্ধু দল প্রথম ইনিংসে ১৪২ রানে অগ্রবর্ত্তী থেকেও দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ ও নিসারের মারাত্মক বোলিংএর জন্য পরাজিত হ'তে বাধ্য হয়। অমরনাথ ২ রানে ৪টী আর নিসার ১৭ রানে ৬টা উইকেট পেয়েছিলেন। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংএ কৃতিত্ব দেখিয়েচেন সিন্ধুর আব্বাস খাঁ ৮৪ ও মাসকারেনহাস নট আউট ৬৪ ; দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ নট আউট ৯৫।

ট্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল ঃ

হিন্দুদল—২৪৮ ও ৯৪ (৬ উইকেট)

মুসলীম দল—২৫৯ ও ৭৯

লাহোরের ট্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে হিন্দুদল ৪ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েচে। টীম গঠন কোন পক্ষেরই শক্তিশালী হয়নি। হিন্দুদের পক্ষে নওমল, সি এস নাইডু ও হিন্দেলকার এবং মুসলীমদের পক্ষে মাস্তাক-আলী, বাকাঝিলানী ও আব্বাস খাঁ খেলেছিলেন। মুসলীম দলের প্রথম ইনিংসে তরুণ খেলোয়াড় গোলাম মহম্মদের ৯৫ রান ও মাস্তাকের ৭৮ রান উল্লেখযোগ্য। নওমল ৮ রানে ৫ উইকেট পান। হিন্দুদের প্রথম ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান করেন হিন্দেলকার ৬১। গোলাম মহম্মদ ৩০ রানে ৪ উইকেট পেয়েছিলেন। সি এস নাইডুর মারাত্মক বোলিংএর জন্য মুসলীম দলের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৭৯ রানে শেষ হয়। নাইডু মাত্র ২১ রান দিয়ে ৭টি উইকেট পান।



হ্যাসেট

শেফিল্ড শীল্ড ঃ

এ বৎসর দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ২১ পয়েণ্ট পেয়ে শেফিল্ড শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। শেফিল্ড শীল্ডের সর্ব্বশেষ খেলা হ'য়েছিল দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে।

বৃষ্টি হওয়ার জন্য খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় ভিক্টোরিয়াদল অপেক্ষা মাত্র ১ পয়েণ্ট বেশী পেয়ে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া শীল্ড বিজয়ী হ'ল। প্রথম দু'দিনের খেলায় ভিক্টোরিয়া ৩২১ রান করে। হ্যাসেট ১০৮ ও রিগ ৭৮ রান করেন; ওয়ার্ড ৫৭ রানে ৪ উইকেট পান। সাউথ অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ২০৭ রান করেছে; ওয়েট নট আউট ৬৩ রান। বৃষ্টি হওয়ার জন্য খেলা আর হয় নি। এই খেলায় ডন্ ব্রাডম্যান মাত্র ৫ রান করায় পর পর ছ'টি খেলায় শত রান করার পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করতে পারলেন না। ১৯০১ সালে ফ্রাই পর পর ছ'টি খেলায় শত রান করে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড করেন। এ বৎসর ব্রাডম্যান পর পর



নিখিল ভারত স্কুল স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ানসিপ বিজয়ী কলিকাতার বিভিন্ন স্কুলের প্রতিযোগীগণ　　ছবি—জে কে সান্যাল

ছ'টি খেলায় শত রান করে এ রেকর্ডের সঙ্গে সমান করে সপ্তম খেলায় অকৃতকার্য্য হ'লেন।

শেফিল্ড শীল্ডের ফলাফল :—

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া	২১ পয়েন্ট
ভিক্টোরিয়া	২০ "
কুইন্সল্যাণ্ড	১৩ "
নিউ সাউথ ওয়েলস	২ "

ভিক্টোরিয়া দল এ পর্য্যন্ত পাঁচবার শেফিল্ড শীল্ড পেয়ে সবচেয়ে বেশী বার শীল্ড বিজয়ী হ'বার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে।

ইংলণ্ড ও আফ্রিকার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ইংলণ্ড—২১৫ ও ২০৩ (৪ উইকেট)

দক্ষিণ আফ্রিকা—৩৪৯ (৮ উইকেট, ডিক্লিয়ার্ড)

জোহান্সবার্গে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ড্র হ'য়ে গেছে। বরুণ দেবতার কল্যাণে ইংলণ্ড বহুবার নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। জয় পরাজয় চিরদিনই অনিশ্চিত হ'লেও বৃষ্টি হওয়ার জন্য তৃতীয় দিনের খেলা বন্ধ হওয়ার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের আশা নষ্ট হ'য়ে গেল। মুদ্রা নিক্ষেপনে হ্যামণ্ড রেকর্ড স্থাপন ক'রলেন; এবারও তাঁর জয়। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ২১৫ রানে শেষ হ'ল। হ্যাটন সবচেয়ে বেশী রান ক'রলেন ৯২। ল্যাংটন পাঁচটা উইকেট পেলেন ৫৮ রানে। দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেটে ২৪৯ রান ক'রলে। তৃতীয় দিনের খেলা দারুণ বৃষ্টির জন্য বন্ধ রইল। চতুর্থ দিনে ৮ উইকেটে ৩৪৯ হ'লে দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড ক'রলে। মেলভিল ৬৭, রাওয়েন ৮৫ ও মিচেল ৬৩ রান ক'রেছেন। ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ২০৩ রান করার পর খেলা শেষ হ'য়ে গেল হ্যামণ্ড দলের সর্ব্বোচ্চ ৬১ রান ক'রে নট আউট রইলেন, গিব ৪৫। গর্ডন ৩ উইকেট পেয়েছেন ৪৮ রানে। হাটন ৪৯ রান ক'রলে, এ অভিযানে তাঁর ১,০০০ রান পূর্ণ হলো।



হ্যামণ্ড





হকি ঃ

হকি খেলা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। চ্যাম্পিয়নসিপ নিয়ে কাষ্টমস্ ও রেঞ্জার্সের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চ'লচে। দুই দলই এ পর্য্যন্ত প্রায় সব খেলাতেই জয়লাভ ক'রেচে। কাষ্টমস্ দলের খেলা রেঞ্জার্স অপেক্ষা উন্নততর। তাদেরই



চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তারা ডালহাউসীকে ১০ গোল দিয়ে রেকর্ড ক'রেচে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা পূর্ব্বের অপেক্ষা উন্নত হ'য়েচে। মোহনবাগানের বিখ্যাত সেণ্টার ফর্‌ওয়ার্ড এম এ খাঁ এবার তাদের দলে খেলচেন। নামকরা খেলোয়াড় থাকলেও গোলদাতার অভাবে মোহনবাগান জয়ী হ'তে পারছে না। ডালহাউসী, ভবানীপুর, ইষ্টবেঙ্গল ও হাওড়া প্রত্যেকেই প্রায় সমান সমান যাচ্চে। বর্ডার রেজিমেণ্টের পয়েণ্ট আরো খারাপ। এদের মধ্যে কোন দল যে দ্বিতীয় বিভাগে নাম্‌বে তা' এখনও অনিশ্চিত।

নিখিল ভারত মহিলা হকি চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

বাঙ্গলার মহিলা হকিদল ফাইনালে মাদ্রাজ দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে এ বৎসরের চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েছে; বাঙ্গলা বোম্বাইকে ২-০ গোলে ও দিল্লী বুস্‌কে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। গত বৎসরের ফাইনাল বিজয়িনী খড়্গাপুর দলকে পরাজিত করে মাদ্রাজ প্রদেশ ফাইনালে ওঠায় বাঙ্গলার চ্যাম্পিয়নসিপ পাওয়া সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দিগের সহযোগিতা ও ক্ষিপ্রতার সম্মুখে মাদ্রাজ দল বিপর্য্যস্ত হ'য়েছে। বিজয়িনী দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড মিস ই ডারহাম একাই তিনটি গোল দিয়ে হ্যাট্‌-ট্রিক করেন। বাঙ্গলার আরও তিনটি গোল অফ্‌সাইড হওয়ার জন্য অগ্রাহ্য হয়। মাদ্রাজের গোলরক্ষক মিস নেলার কয়েকটী শক্ত বল রক্ষা করে অবধারিত গোলের হাত থেকে নিজ দলকে রক্ষা করেন। তা'ছাড়া রক্ষণভাগে তাদের ব্যাক মিস বয়টন ও হাফ্‌ব্যাক মিস পাওনাল ও শ'য়ের খেলা ভাল হ'য়েছিল; ফরওয়ার্ড দের খেলা নিকৃষ্ট হ'য়েছে। এ বৎসর বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রদেশের সঙ্গে ক্রিকেট, টেনিস ও হকিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং প্রত্যেকটিতেই বাঙ্গলা বিজয়ী হ'য়েছে।



নিখিল ভারত মহিলা হকি চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়িনী বাঙ্গলার মহিলা হকি দল
ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গলার মহিলা হকিদল বিজয়িনী হ'য়ে বাঙ্গলার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বাঙ্গলা—মিস বোনার; মিস এণ্ডারসন ও হার্ভে জনষ্টন; মিস বি স্মিথ, মিস ক্যাচিক ও মিস বার্ব্বরা এডওয়ার্ডস; মিস সুরিটা, মিস মার্সেলিন, মিস ডারহাম, মিস এন এজরা ও মিস বেটি এডওয়ার্ডস্‌;

মাদ্রাজ—মিস ডি নেলার; মিস বয়টন ও মিস পি স্মিথ; মিস পি সেফার্ড, মিস শ', মিস পাওনাল; মিস রড্রিগাস, মিস হজেস, মিস সেফার্ড, মিসেস বুলক্‌ ও মিস জে নেলার।

বাঙ্গলার অতিরিক্ত—মিস এস লাডিড, সি রবিনসন ও ম্যার্কে। মিসেস হাওয়েল ম্যানেজার হ'য়ে গিয়েছিলেন।

ইণ্টার কলেজ টেনিস ফাইনাল ঃ—

সিঙ্গলসে—এ মুখার্জ্জি (ল'কলেজ) ৬-০, ৬-১ গেমে পি বোসকে (মেডিকেল) পরাজিত ক'রেছেন।

ডবলসে—বি বড়ুয়া ও এ মুখার্জ্জি (ল'কলেজ) ৩-৬, ৬-২, ৬-১ গেমে এ সোম ও এস ব্যানার্জ্জিকে (মেডিকেল কলেজ) পরাজিত ক'রেছেন।

নিখিল ভারত ভারত্তোলন

প্রতিযোগিতা ঃ

নিখিল ভারত ভারত্তোলন প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত বিষয়ে রেকর্ড স্থাপিত হ'য়েচে।



নিখিল ভারত ভারোত্তলন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীগণ ; বামদিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি ১১ ও ১২ ষ্টোন বিজয়ী কৃষ্ণ নান, দক্ষিণে—৮ ও ৯ ষ্টোন বিজয়ী ভাস্কর ছবি—জে কে সান্যাল

১১ ষ্টোনে—এ কে সেন টু হ্যাণ্ড স্নাচে ১৮০ পাউণ্ড তুলেচেন।

হেভি ওয়েটে পাঞ্জাবের মোহম্মদ নফি মিলিটারী প্রেসে ২২২½ পাউণ্ড, এ ক্লিন এণ্ড জার্কে ২৯২½ পাউণ্ড এবং সর্ব্বসমেত ৭২৭½ পাউণ্ড তুলেচেন।

পৃথিবীর টেবল টেনিস

চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পৃথিবীর টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সোয়াথলিংকাপের সকল খেলাতেই ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছে। ইংলণ্ড ৫-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে।

ফলাফল :—

ই বাবলে ২১-৩, ২১-১৩ গেমে কাপাদিয়াকে পরাজিত ক'রেছেন। এইচ লুরি ২১-১১, ১৮-২১, ২২-২০ গেমে অরুণ ঘোষকে পরাজিত ক'রেছেন। কে ষ্টানলি ২৩-২১, ২১-১৮ গেমে ভাসিনের নিকট বিজয়ী হ'য়েছেন। লুরি ২১-৭, ২১-৮ গেমে কাপাদিয়াকে পরাজিত ক'রেছেন। বাবলি ২১-৭, ২১-৮ গেমে ভাসিনের নিকট বিজয়ী হ'য়েছেন।

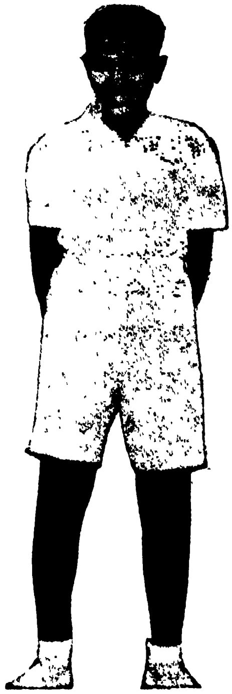
গ্রীস ৫-৩ খেলায় ও ফ্রান্স ৫-২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে।

লিথুয়ানিয়া, ঈজিপ্ট ও জুগোশ্লোভিয়া প্রত্যেকেই ৫-০ ম্যাচে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে।

চেকোশ্লোভাগিয়া ইংলণ্ডকে ৫-১ ম্যাচে পরাজিত করায় পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ানসিপ পাবার বেশী আশা তাদেরই আছে।

হার্ডকোর্ট টেনিস ঃ

বোম্বাই প্রদেশের হার্ডকোর্ট টেনিসে জিমি মেটা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েচেন।



জি এম মেটা



মিস্ লীলারাও

পুরুষদের সিঙ্গলসে—জিমি মেটা ৬-০ ও ৬-৪ গেমে আজিমকে পরাজিত ক'রেচেন।

পুরুষদের ডবলসে—জিমি মেটা ও ভথারিয়া ৬-২, ৯-১১ ও ৭-৫ গেমে পদমজী ও ওয়েলসকে হারিয়েচেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—কুমারী লীলা রাও ৬-২, ২-৬, ৭-৫ গেমে কুমারী দিনশাকে হারিয়ে বিজয়িনী হ'য়েছেন।

পশ্চিম ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—ই, ভি, বব্ ৩-৬, ৬-১ ও ৬-৩ গেমে আজিমকে পরাজিত ক'রেছেন।

পুরুষদের ডবলসে—জিমি মেটা ও আজিম ৬-৩, ১-৬ ও ৬-১ গেমে টিউ ও ব্রুকএড্ওয়ার্ডসকে পরাজিত ক'রেছেন।

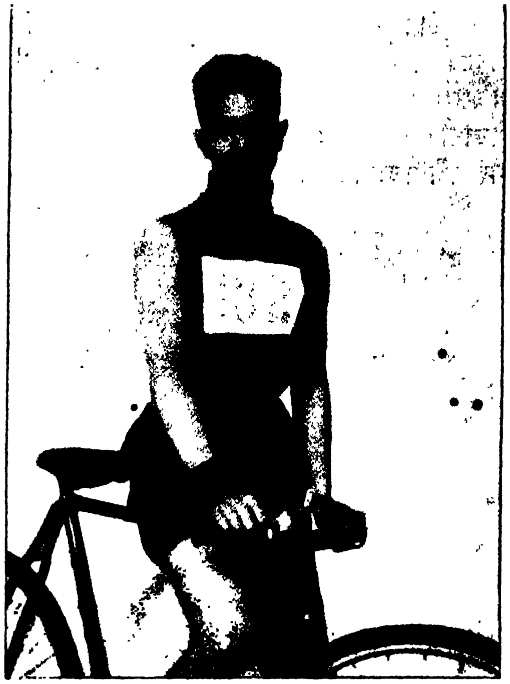
মহিলাদের সিঙ্গলসে—শ্রীমতী উইলিয়ামস্ ৬-৪ ও ৬-০ গেমে কুমারী এমেরীকে পরাজিত ক'রেছেন।

মিক্সড ডবলসে—জিমি মেটা ও কুমারী দিনশা ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ওয়েলস ও কুমারী এমেরীকে হারিয়েছেন।

বাঙ্গলার চ্যাম্পিয়ান সাইক্লিষ্ট ঃ

শ্রীঅজিত ঘোষ বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন অনুষ্ঠিত তিন হাজার ও পাঁচ হাজার মিটার সাইকেল রেসে বিজয়ী হওয়ায় এ বৎসর বাঙ্গলা দেশের সাইকেল চ্যাম্পিয়ান হ'য়েছেন।

অজিত ঘোষ ১৯৩৫ সালে কালীঘাট স্পোর্টসে সাইকেল চালনা কালে আহত হওয়ায় গত তিন বৎসর কোন প্রতিযোগীতায় যোগদান করতে অসমর্থ হন।



অজিত ঘোষ

তিনি ১৯৩২ সাল থেকে সাইকেল প্রতিযোগিতায় যোগদান করছেন; ১৯৩৩ সালে বেঙ্গল অলিম্পিকের পাঁচ মাইল রেসে বিজয়ী হন। এতদ্ভিন্ন ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ পর্য্যন্ত বেঙ্গল এথেলেটিক, বয়েজ ইউনিয়ন, সিটি এথেলেটিক, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ক্যালকাটা এথেলেটিক, মোহনবাগান স্পোর্টস, কালীঘাট স্পোর্টস, প্রভৃতি কলিকাতার প্রায় সকল সাইকেল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন।

তিনি একজন উচ্চাঙ্গের মুষ্টিযোদ্ধা, ফুটবল খেলোয়াড় ও শ্রীযুক্ত বি ডি চ্যাটার্জ্জির আই এ ক্যাম্পের সভ্য।



ইণ্টার কলেজ ষোল মাইল সাইকেল রেসের প্রতিযোগীগণ—
(দক্ষিণে) বিজয়ী—ওয়াণ্টান (মেডিকেল কলেজ)	ছবি—জে কে সান্ন্যাল

আই এফ এ ঃ

আই এফ এর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বর্ত্তমান বৎসরের জন্য পুনর্গঠিত হ'য়েচে। এবার আই এফ এর কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবার সম্ভাবনা ঘটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নির্ব্বিবাদে মনোনয়ন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাপ্ত হয়েছে।

সভাপতি—মিষ্টার এইচ এন নিকলস্

সহকারী সভাপতি—মিষ্টার সুশীল সেন

যুক্ত সম্পাদক—মেসার্স এম দত্ত-রায় ও ডবলিউ রবিনসন

কোষাধ্যক্ষ—মিষ্টার এম কে আনোয়ার



ইণ্টার-ভার্সিটি স্পোর্টসের ১০০ মিটার দৌড়ে সলিমউল্লা প্রথম হ'চ্ছেন

দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট ঃ

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাতদিন খেলার পরও সমাপ্ত হয় নাই। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৩০ (ভাণ্ডার-বিল ১২৫, নোর্স ১০৩, মেলভিল ৭৮, গ্রিভসন ৭৫) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৮১ রান (মেলভিল ১০৩, ভাণ্ডার-বিল ৯৭, মিচেল ৮৯, ভিলজোয়েন ৭৪) করেছে। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৩১৬ রান করে (পেণ্টার ৬২, এইমস ৮৪); দ্বিতীয় ইংনিস শেষ হয় নি, ১ উইকেটে ২৫৩ রান হয়েছে (এডরিচ ১০৭ নট আউট, গিব নট আউট ৭৮)। উপস্থিত তারা ৪৪২ রান পশ্চাতে আছে। জয়-পরাজয় কোন পক্ষে এখনও নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ইংলণ্ড অঘটন যে ঘটাতে পারে না তা' নয়, যখন এক উইকেটে ২৫৩ রান তুলতে পেরেছে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস ঃ

কলিকাতা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম বার্ষিক স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১২টি বিষয়ে বিজয়ী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ৩টি বিষয়ে, হপ্ ষ্টেপ এবং জাম্প, উচ্চ লম্ফন ও রিলে রেসে জয়ী হ'তে সক্ষম হ'য়েছে। পূর্ব্ব বৎসর পাঞ্জাব ১২-২ বিষয়ে বিজয়ী হ'য়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েছিল। এবার নিয়ে পর পর আটবার উক্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান সিপ পাওয়া পাঞ্জাবের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এখনও চৈতন্য হইলনা।

পোলো ঃ

প্রিন্স-অফ্ ওয়েলস পোলো টুর্ণামেণ্টে জয়পুরেরই দুটি দল ফাইনালে ওঠে এবং ফাইনাল খেলায় জয়পুর এ, জয়পুর বি কে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচে। মহারাজা, রাওরাজা হানুৎ সিং ও রাজকুমার পৃথ্বী সিং-এর খেলা দর্শনীয় হ'য়েছিল। রাজকুমার বিজিত দলের হ'য়ে খেলেছিলেন, তাঁর খেলা সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের উপন্যাস "আশ্চর্য"—১৲
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম এ সংশোধিত মাইকেলের "মেঘনাদবধ কাব্য"—১।০, "ব্রজাঙ্গনা কাব্য (সচিত্র)—৮০
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "স্ত্রীর চিঠি"—১॥০
শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত "বাঙ্গলার মেয়ে"—১।০
শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ সম্পাদিত "জাতকবল্লভঃ"—২৸০
শ্রীগুরুনাথ বিদ্যানিধি ও শ্রীতারানাথ ন্যায়-তর্কতীর্থের "সুহৃদ্ভেদঃ"—১৲
শ্রীহৃষীকেশ শীল অনূদিত সংস্কৃত নাটক "বিদগ্ধ মাধব"—১।৵০
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "সাম্যবাদের গোড়ার কথা"—১।০
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "হিন্দুসঙ্গীতে তান সেনের স্থান"—১৲
শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "পণ পরিণাম"—১॥০
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস "লক্ষ্মী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল"—২৲ ও "চোখের জলের পিছল পথে"—২৲
শ্রীঅমূল্যগোবিন্দ মৈত্র প্রণীত "ছাঁটকাট ও সীবন শিক্ষা"—১॥০
শ্রীহরিদাস মজুমদারের "কামাল পাশা"—॥০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প "সূর্য্যোদয়"—১॥০
শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবীর উপন্যাস "অভিশপ্তা"—১৲
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত "ঘুমের ঘোর"—৸০
শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "মেয়েদের খেলা"—১৲
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের "মহাচীনে মহাসমর"—৸০
শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরীর "জীবজগতের আজব কথা"—১।০

সম্পাদক—রায় জলধর সেন বাহাদুর সহঃ সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



বৈশাখ—১৩৪৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম

শ্রীঅনিলবরণ রায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে হিন্দুর দর্শন ও হিন্দুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি কোন মৌলিক গবেষণার পরিচয় দেন নাই; পরন্ত এ বিষয়ে অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্ট পাশ্চাত্য সমালোচকগণের কতকগুলি মামুলি কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান মন্তব্য এই যে, হিন্দু ভগবানকে কেবল দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপেই পরিকল্পনা করিয়াছিল; সেই জন্যই হিন্দুজাতি দার্শনিক, ভাবুক, কল্পনাবিলাসী হইয়া পড়িয়াছে, জীবনের বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা কোন উন্নতিই করিতে পারে নাই। আজ ভারতবাসী যদি জীবনে উন্নত ও প্রগতিশীলী হইতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের প্রাচীন দর্শন ও ধর্ম্মবিশ্বাস সকল বর্জ্জন করিতে হইবে—পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মের দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। ডক্টর সাহার মতে জীবনের এই নূতন নীতিই ভারতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নবনীতি অবশ্য ডক্টর মেঘনাদের আবিষ্কৃত নহে; পাশ্চাত্য জগৎ জীবনে যে নীতির অনুসরণ করিতেছে, যাহার বিষময় ফল ইতিমধ্যেই তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ডক্টর সাহা ভারতে সেই নীতিই প্রবর্ত্তিত করিতে চান।

হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম্ম ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ডক্টর সাহা যদি কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন, শুধু পরের মুখেই ঝাল না খাইতেন, তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন যে এ-বিষয়ে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল হইতেছে বেদ; সেখানে ভগবান সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে কেবল দার্শনিক বলা হয় নাই, তিনি একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ বাহূ রাজন্যকঃ কৃত।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রোঽজায়তে॥

—ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্ত

ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের আদানপ্রদান ও সৃষ্টিকুশলতা এবং শূদ্রের কর্ম্ম—এই চারিটি হইতেছে ভগবানের চারিটি দিক, চারিটি প্রধান ভাব। ভগবান সম্বন্ধে এই পরিকল্পনা হইতেই প্রাচীন ভারতে চারি বর্ণ-বিভাগের উদ্ভব হইয়াছিল; আপন আপন ক্ষেত্রে প্রত্যেক বর্ণই প্রধান ছিল, সাধারণ সমাজ-জীবনে সকলেই অংশ গ্রহণ করিত, সকলেরই মর্য্যাদা ছিল, সম্মান ছিল—সকলের সহযোগিতায়ই সমাজের সর্ব্বতোমুখী সমৃদ্ধ জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজিকার এই অর্থহীন জাতিভেদে শতধা-ভিন্ন বিচ্ছিন্ন মুমূর্ষু হিন্দুসমাজকে দেখিয়া হিন্দুর দর্শন ও ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করার মত বড় ভুল কিছুই নাই; অথচ ডক্টর সাহা পাশ্চাত্য সমালোচকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই ভুলই করিয়াছেন। পদের স্থান নিম্নে, তাই বলিয়া জীবন্ত দেহে মস্তিষ্ক বা হস্ত হইতে পদ বিচ্ছিন্ন নহে, সকলের সহযোগিতায়ই সমস্ত দেহের জীবনক্রিয়া চলিতে থাকে। সকল জীবন্ত সমাজেই এই চারি বিভাগ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব এ বিষয়ে হিন্দুর পরিকল্পনায় কোনই দোষ বা ত্রুটি ছিল না। মানুষ মনোময় জীব; দেহ ও প্রাণ অপরিহার্য্য হইলেও মনের উৎকর্ষেই মানবের উৎকর্ষ। মেঘনাদ বা রবীন্দ্রনাথ কেহই কারিগর নহেন; তাই বলিয়া কি একজন নিপুণ তাঁতী বা মুচির স্থান তাঁহাদের ঊর্দ্ধে হইবে?

ডক্টর সাহা হিন্দুদের সহিত ইহুদীদের প্রভেদ দেখাইয়া বলিয়াছেন, ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ভগবানকে আইন ও শৃঙ্খলার বিধানকর্ত্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুমতেও ভগবান আইন ও শৃঙ্খলার বিধানকর্ত্তা, তাঁহার এক নাম হইতেছে বিধাতাপুরুষ। বস্তুতঃ হিন্দুরা ভগবানের যে পরিকল্পনা করিয়াছে তাহা হইতেছে সমগ্র, integral, তাহাতে ভগবানের কোন ভাব বা দিকই বাদ পড়ে নাই; গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে সে-সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন,

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।

ডক্টর সাহা বলিয়াছেন, চীনাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন কারিগর। কিন্তু হিন্দুরাও ভগবানকে কারিগররূপে দেখিয়াছে; আজও ভারতের সকল শিল্পী ভগবানকে বিশ্বকর্ম্মা রূপে পূজা করে। হিন্দুমতে জগন্মাতা হইতেছেন ভগবানের পরাশক্তি। তাঁহার চারি রূপ—মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী; ইঁহারা যথাক্রমে জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য ও কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মহাসরস্বতী সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার যোগলব্ধ দিব্যদৃষ্টিতে বলিয়াছেন, "This power is the strong, the tireless, the careful and efficient builder, organizer. administrator, technician, artisan and classifier of the worlds. ...Carelessness and negligence and indolence she abhors; all scamped and hasty and shuffling work, all clumsiness and *a peu pres* and misfit, all false adaptation and misuse of instrumants and faculties and leaving of things undone or halfdone is offensive and foreign to her temper. Nothing short of a perfect perfection satisfies her and she is ready to face an eternity of toil if that is needed for the fullness of her creation."—*The Mother.* অর্থাৎ "এই শক্তিই সকল জগতের সমর্থ, অক্লান্ত, সতর্ক, সুনিপুণ নির্ম্মাতা, প্রয়োগবিৎ কারিগর। অযত্ন, অবহেলা, আলস্যের উপর তিনি একান্ত বিরূপ। কোন প্রকারে ত্বরিতে কাজ সারা, সকল অপটুতা, ন্যূনাধিকতা, লক্ষ্যভ্রষ্টতা, অঙ্গের ও বৃত্তির ভুল যোগাযোগ বা অপব্যবহার, অর্দ্ধসম্পন্ন কি অসম্পূর্ণ করে জিনিস ফেলে রাখা—এ সমস্তই তাঁর প্রকৃতির অপ্রিয় ও বিরোধী। পূর্ণ পূর্ণতার ন্যূন কিছু তাঁকে তৃপ্তি দেয় না। আপন সৃষ্টিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে যদি অনন্তকাল ধরে তাঁর পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয় তার জন্য তিনি প্রস্তুত।"

ডক্টর সাহা হয়ত বলিবেন, হিন্দু যদি ভগবান সম্বন্ধে এমনই পূর্ণ ও সমগ্র পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহা হইলে তাহার জীবনে সে পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না কেন? কেন তাহার জাতীয় জীবনে এত ত্রুটি, এত গ্লানি, এত দারিদ্র্য ও অক্ষমতা? পুনরায় আমরা বলি, হিন্দুর দর্শন ও ধর্ম্মের শক্তি ও সার্থকতা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে হিন্দুর উন্নতি ও গৌরবের যুগের পরিচয় লইতে হইবে, তাহার আজিকার এই চরমতম অবনতির যুগের নহে।

একটা আমগাছের গুণাগুণ জানিতে হইলে তাহার একটা পচা পোকাধরা ফল আস্বাদ করিলে চলিবে না, ঐ গাছে যে উৎকৃষ্ট ফল ধরিয়াছে তাহারই আস্বাদ লইতে হইবে। এই দৃষ্টি লইয়া যদি আমরা হিন্দু সভ্যতার বিচার করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে হিন্দু তাহার গৌরবের যুগে শুধু ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতায় নহে, পরন্তু রাষ্ট্রে, সমাজে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে যে কর্ম্মশক্তি যে সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে হিন্দু-সভ্যতাকে জগতের প্রাচীন কিম্বা আধুনিক অন্য কোন সভ্যতার নিকটেই মাথা হেঁট করিতে হইবে না। অজন্তা, এলোরা, বাগগুহায়, অসংখ্য অপরূপ মন্দির, মঠ, স্তূপে হিন্দু কারিগরগণ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে আজ সভ্য জগৎ বিস্ময়ের সহিত তাহা দেখিতেছে, মুগ্ধ হইতেছে; কেবল এই হতভাগ্য দেশের নিজের সন্তানই কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে আজও সে সবের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং নিজেই নিজের সভ্যতার, নিজের ধর্ম্মের, নিজের অতীতের কুৎসা করিতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় দিয়া কালবশে ভারতবাসী সাময়িকভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; সেই সুযোগে বিদেশী আসিয়া তাহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে; পরাধীন, পরপদদলিত ভারত আজ ঘরে-বাইরে সকলেরই কৃপার পাত্র, নিন্দার পাত্র। তথাপি সেই প্রাচীন ভারতীয় শক্তি আজও মরে নাই, একটু সুযোগ পাইবামাত্র সে আবার মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে; আবার রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে সর্ব্বত্রই নূতন জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ডক্টর মেঘনাদ সাহার মত বৈজ্ঞানিক প্রসব করিতেছে। তাহা হইলে এই প্রাচীন সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে?

ডক্টর মেঘনাদ সাহা এককথায় সমস্ত প্রাচীন দর্শনকে নাকচ করিয়া দিয়াছেন—"কেন না, উহাতে পৃথিবীর যে চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ প্রতিপন্ন হইয়াছে।" পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ইউরোপের মধ্যযুগের দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকেন ডক্টর সাহা তাহাই সাধারণ-ভাবে ভবিষ্যতের সকল প্রাচীন দর্শন সম্বন্ধে, বিশেষতঃ হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের দেশের দার্শনিক সম্পদ সম্বন্ধে যদি তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি এরূপ ব্যাপক মন্তব্য প্রকাশ করিতে কখনই অগ্রসর হইতেন না। কারণ ভারতের উপনিষদে, বেদান্তে, গীতায় জগতের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন না হইয়া সমর্থিতই হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন বেদান্তের মতই বলিতেছে যে এই জগতের মূলে রহিয়াছে একমেবাদ্বিতীয়ম্ শক্তি; জগতের সকল পদার্থ, সকল ক্রিয়া এক মূলশক্তিরই বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়া। একই বহু হইয়াছে, বেদের সেই পুরাতন কথা, একোঽহং বহু স্যাম্। তবে আধুনিক বিজ্ঞান এই মূল শক্তির কেবল যন্ত্রবৎ বাহ্যিক ক্রিয়াটিই দেখিতেছে; ইহার পশ্চাতে কোন চৈতন্য আছে কি-না সাক্ষাৎভাবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন যন্ত্র বা পদ্ধতি বিজ্ঞানের আয়ত্তে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হন নাই; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, এই বিশ্বজগতের পশ্চাতে একটা বিরাট চৈতন্য রহিয়াছে, এই সিদ্ধান্তটিই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি সঙ্গত। ডক্টর মেঘনাদ সাহা এখনও সেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই পড়িয়া রহিয়াছেন। ফরাসী দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লাপলাস্ নেপোলিয়নকে বিশ্ব-জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সকলের স্থান ও তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতেছিলেন। নেপো-লিয়ন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার এই জগতের মধ্যে ভগবানের স্থান কোন্ খানে?" লাপলাস উত্তর দিয়াছিলেন, "There is no place for god in the universe." "বিশ্বমাঝে ভগবানের কোন স্থান নাই।" লাপলাসের ন্যায়ই ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলেন, জগতের একটা সৃষ্টিকর্ত্তা আছে এটা প্রাচীন কুসংস্কারমাত্র। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে লাপলাসের ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আবির্ভূত হওয়া উচিত ছিল, এই বিংশ শতাব্দীতে তিনি একটা anachronism হইয়া উঠিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, জগতের পশ্চাতে একটা চৈতন্য রহিয়াছে তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যখন নাই—তখন তিনি তাহা মানিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু কোন জিনিষের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না থাকিলেই যে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার

করিতে হইবে ইহা বৈজ্ঞানিক মনোভাব নহে, ইহা গোঁড়ামি বা কুসংস্কার। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই Indeterminism রহিয়াছে, সেখানে কি হয় তাহা বলিবার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নাই, ইহা আধুনিকতম বিজ্ঞানই স্বীকার করিতেছে। অতএব যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তাঁহার কর্ত্তব্য ভগবান চৈতন্য প্রভৃতি সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকা—যদি অন্য কোন পদ্ধতিতে কেহ তাহাদের অস্তিত্বের সন্ধান পায় তবে তাহাদের সেই অনুভূতি উপলব্ধিকে শ্রদ্ধার সহিত দেখা।

বিজ্ঞানের প্রমাণের প্রধান যন্ত্র হইল চক্ষুআদি বাহ্য ইন্দ্রিয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মহত্তর ইন্দ্রিয় ও শক্তি রহিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে ভগবানের আত্মার, চৈতন্যের যে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায়, ভারতের বেদ, বেদান্ত, দর্শন, গীতা তাহারই পরিচয় দিয়াছে। সে সকল সত্যকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করা বিজ্ঞানের শক্তির অতীত, কারণ সে-সকল সত্য বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর অতীত। পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকেরা আজ ইহা স্বীকার করিতেছেন, ডক্টর মেঘনাদ এখনও তাঁহাদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছেন।

কোন বৃত্তের পরিধি যদি অনন্ত হয় তাহা হইলে তাহার কেন্দ্র হয় সকল স্থানে। এই বিশ্বজগতের সীমা চৌহদ্দি এখনও বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারে নাই; তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর মানুষ, আমরা যদি পৃথিবীকেই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলে অন্ততঃ গণিত বা বিজ্ঞানের দিক দিয়া কোন ভুলই হয় না। তবে পৃথিবীই যে ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জিনিষ একথা অন্ততঃ হিন্দু দর্শন কোন দিনই বলে নাই। মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যই এই সৌরজগতের কেন্দ্র এবং সূর্য্য হইতেই সকল গ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে।

সর্ব্বগ্রহাণামেতেষামাদিরাদিত্য উচ্যতে।

বলা হইয়াছে আকাশমণ্ডলে পৃথিবী বিনা আধারে স্থিতি করিতেছে। গ্যালিলিওর বহু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পৃথিবী চলমান হইলেও স্থির বলিয়া দেখাইতেছে,

চলা পৃথ্বি স্থিরা ভাতি।

এই বিশ্বজগতের পশ্চাতে যদি এক বিরাট চৈতন্য শক্তি থাকে তাহা হইলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদির পশ্চাতেও সে শক্তি রহিয়াছে, অতএব এই সকলকে দেবতা বলিলে ভুল হয় না।

গ্রহগণ মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে এ কথাটা কি শুধু প্রাচীন দর্শনের কথা? আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইউরোপে কি কেহ ইহা বিশ্বাস করে না? ডক্টর মেঘনাদ সাহা এখানে Astronomy এবং Astrology—এই দুইয়ের মধ্যে গোলমাল করিয়াছেন। Astronomyর জ্ঞান বর্দ্ধিত হওয়া সত্বেও ইউরোপ হইতে Astrologyর চর্চ্চা উঠিয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতেও দুইয়েরই চর্চ্চা ছিল—এবং Astronomy বিজ্ঞানে ভারতের দান নগণ্য নহে। চান্দ্রবৎসর ও সৌরবৎসরের সমন্বয়, সূর্য্যালোকের প্রতিচ্ছায়ায় চন্দ্রের জ্যোৎস্নাবিকাশ, দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, ঋতুভেদ, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও গ্রহণসমূহের গণনার প্রণালী—এই সবই হিন্দুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রকট হইয়াছিল।

নিম্নতর জীবন হইতে মানুষের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে; আধুনিক বিজ্ঞানের এই জ্ঞান খ্রীষ্টান বাইবেলের মূলে আঘাত করিলেও ইহা হিন্দু দার্শনিকগণের অজ্ঞাত ছিল না। আজও হিন্দু জনসাধারণ গান করে,

আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে
মানব জনম পেয়েছ রে!

গীতা ও উপনিষদে বলা হইয়াছে, জল হইতে উদ্ভিদের উদ্ভব, উদ্ভিদ হইতে প্রাণী সকলের উদ্ভব। জড় হইতে প্রাণের বিকাশ হইয়াছে, প্রাণ হইতে মনের বিকাশ হইয়াছে। এইভাবে ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা হিন্দু দর্শনের কথা। হিন্দুর যে দশ অবতারের পরিকল্পনা তাহাও এই বিবর্ত্তনবাদেরই ইঙ্গিত। প্রথম জন্মে মীন অবতার, তাহার পরে জলে স্থলে বিহারকারী কূর্ম্ম অবতার, তাহার পর স্থল-পশু বরাহ, তাহার পর অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ মানব নৃসিংহ অবতার, তাহার পর আদিম মানুষ বামন অবতার, ক্রমশঃ সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশে পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতির অবতার। মানব সভ্যতা যে ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, ইহাও হিন্দু দর্শনে স্বীকৃত। রামায়ণে রাক্ষস রাবণ ও বানর বালীর সহিত রামের যে যুদ্ধ তাহা মানুষের পাশবিকতার স্তর হইতে মানবীয় নৈতিকতা ও সভ্যতার স্তরে উঠিবারই স্থূল রূপক। তার সভ্যতার বিকাশে হিন্দু cycles বা চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের ধারা দেখিয়াছে; এক যুগে মানুষ সভ্যতার উন্নতি করে

সেইটিই সত্য যুগ, ক্রমশঃ তাহার অবনতি হয়, চরম অবনতিকেই কলিযুগ বলা হয়; আবার মানুষ নূতনভাবে সভ্যতার বিকাশ করে, এক নূতন সত্য যুগ আরম্ভ হয়। এইভাবে মানুষ ক্রমশঃ আদর্শের দিকে চলিয়াছে—প্রকৃত যে সত্যযুগ, যখন মানুষ তাহার জীবনের প্রকৃত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই প্রাকৃত জীবনের দুঃখ ছন্দ অপূর্ণতাকে জয় করিয়া অধ্যাত্ম জীবনের দিব্য শান্তি, জ্যোতি, শক্তি, আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা এখনও আসে নাই। যে অবতার ইহার প্রতিষ্ঠা করিবেন তাঁহার আবির্ভাব এখনও হয় নাই, হিন্দু পুরাণে ইঁহাকেই কল্কি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের সাহায্যে, বহু যুগচক্রের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া মানবজাতি ক্রমশঃ সেই সত্য-যুগের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে—ইহাই হিন্দু দর্শনের পরিকল্পনা, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত ইহার কোন বিরোধই নাই।

বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার যে পরিকল্পনা ডক্টর মেঘনাদ সাহা দিতেছেন ইহারও সহিত ভারতীর দর্শন ধর্ম্মের কোনই বিরোধ নাই। * উপনিষদে বলা হইয়াছে, অন্নং বহু কুর্ব্বীত, প্রচুর অন্ন সৃষ্টি করিবে। ঐশ্বর্য্যের দেবী লক্ষ্মী হিন্দুর আরাধ্যা দেবী, হিন্দু দরিদ্রকে লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া নিন্দা করে। দারিদ্র্য, আলস্য, কর্ম্ম-বিমুখতা, দুর্ব্বলতা - এই সবকে হিন্দুর দর্শন ও ধর্ম্ম কখনও সমর্থন করে নাই, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে শেষ আদেশ দিয়াছিলেন,

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্

"অতএব উঠ, যশ লাভ কর, যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ কর"—ইহাই হিন্দুর প্রকৃত আদর্শ। সুতরাং ডক্টর মেঘনাদ সাহা হাওয়ার সহিত লড়াই করিতেছেন এবং অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে কেবল বুদ্ধিভেদেরই সৃষ্টি করিতেছেন।

হিন্দুর ধর্ম্মে ও সমাজে নানা গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে, হিন্দুর সভ্যতা ও অধ্যাত্ম আদর্শ সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ডক্টর মেঘনাদ সাহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য নহে কি এ-বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ যত্নের সহিত প্রকৃত তথ্যের সন্ধান করা? তাহা করিলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে, হিন্দু-সভ্যতা ভগবান ও আধ্যাত্মিকতাকেই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও দেহ, প্রাণ ও মনের এই প্রাকৃত জীবনকে অবহেলা করে নাই; বরং এই দেহে হইবে, এই সংসারেই ভাগবত জীবনের পরম সম্পদ বিকাশ করিতে চাহিয়াছে এবং সেই জন্যই দেহ, প্রাণ, মনকেও সংযত ভোগ ও কর্ম্মের দ্বারা পূর্ণতমভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে। রামায়ণে, মহাভারতে, কালিদাসের কাব্যে আমরা যে সভ্যতা, যে সমাজ-জীবনের পরিচয় পাই তাহা শুধু দার্শনিকতা ও কল্পনা বিলাসের জীবন নহে, তাহা পরিপূর্ণ ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও কর্ম্মের জীবন। আর জীবনকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য ভারত যেমন দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার চর্চ্চা করিয়াছে তেমনিই বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চ্চা করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার *A Defence of Indian Culture* নামক মহামূল্যবান গ্রন্থে দেখাইয়াছিলেন—"Not only was India in the first rank in mathematics, astronomy, chemistry, medicine, surgery, all the branches of physical knowledge which were practised in ancient times, but she was, along with the Greeks, the teacher of the Arabs from whom Europe recovered the lost habit of scientific enquiry and got the basis from which modern science started." একথা সত্য যে, আজ ইউরোপ বিজ্ঞানে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে, ভারত পিছনেই পড়িয়া আছে; কিন্তু ইহার কারণ ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক প্রবণতা নহে, ইহার কারণ ভারতের জাতীয় জীবনে ভাঁটা পড়া—সেই ভাঁটায় যেমন বিজ্ঞান চর্চ্চা বন্ধ হইয়াছিল তেমনিই দার্শনিক বিকাশও বন্ধ হইয়াছিল; কেবল প্রাচীন দর্শনের টীকা ও ব্যাখ্যা করাতেই দার্শনিক চর্চ্চা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া-ছিল। আর যে-মুহূর্ত্তে আবার ভারতে দর্শন ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প ও

* ডক্টর সাহার ন্যায় আমিও চরকার বিরোধী। আমার The Illusion of the Charkas গ্রন্থে আমি বিশদভাবে দেখাইয়াছি, "the Khaddar movement is not only useless, it is positively harmful; it truly stands in the way of the political, economic and spiritual advancement of India."

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নব নব সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। ভারতের এই সর্ব্বতোমুখী Renaissance—নবজীবন, ইতিমধ্যেই সমগ্র মানবজাতির জীবনকে প্রভাবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ভারতের প্রাচীন সভ্যতায়, ভারতের দর্শনে, ধর্ম্মে, আদর্শে অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা নিহিত না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। আর ইউরোপের যে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে ডক্টর মেঘনাদ সাহার চমক লাগিয়াছে তাহাও খুব বেশী দিনের নহে। সেদিন পর্য্যন্ত ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্র ব্যস্ত ছিল—কেমন করিয়া অন্যান্য ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করিতে পারা যায় তাহারই গবেষণা ও পরীক্ষা লইয়া। যে সময়ে ইউরোপ বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়াছে, সেই অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দী ভারতের পক্ষে কি দুর্দ্দিন গিয়াছে, কি ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মর্ম্মভেদী দুঃখ ও বেদনার মধ্যে ভারতের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে কি? ভারত যে সে আঘাতও সামলাইয়া লইয়া আবার এক নূতন জীবনের নূতন যুগ আরম্ভ করিয়াছে ইহাই ভারতীয় সভ্যতার অমৃতত্বের প্রকৃত প্রমাণ।

আর বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়া আধুনিক ইউরোপ যে খুব লাভবান হইয়াছে তাহাও নহে। এবার্ডিনে বিটিশ এসোশিয়েসনের সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"There are many who attribute most of our national woes including unemployment in industry and the danger of war to the recent rapid advance in scientific knowledge." অর্থাৎ আজ যে বেকার সমস্যা, যুদ্ধের বিপদ প্রভৃতি বিষম অশুভ আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ইহাদের অধিকাংশের জন্যই দায়ী হইতেছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্রুত উন্নতি। আর একজন সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"We have spent much and long upon the science of matter and the greater our success the greater must be our failure, unless we turn also at long last to an equal advance in the scienced man."—*Sir Josiah Stamp.* এই যে "Science of man," মানুষের আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ঞান, ভারত তাহার অতি দুর্দ্দিনেও ইহার চর্চ্চা পরিত্যাগ করে নাই, ইহাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, আর ইহার জন্যই আজ বিপদগ্রস্ত জগৎ ভারতের নেতৃত্বের অপেক্ষা করিতেছে।

খ্রীষ্টানধর্ম্মের জগৎতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্তিপূর্ণ প্রতিপন্ন হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, খ্রীষ্টানধর্ম্ম পরকালের দিকেই চাহিয়া থাকে, ইহজীবনের সহিত তাহার সমন্বয়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাই ইহজীবনবাদী পাশ্চাত্য জাতি তাহাদের জীবন হইতে ধর্ম্মকে কার্য্যতঃ বাদ দিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার ভিত্তিও ধ্বসিয়া গিয়াছে, কারণ ধর্ম্মের সহিত নৈতিকতার ছিল অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ইহার ফলে সমাজে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ যে দুর্নীতির স্রোত বহিতেছে তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকেই বলিতেছেন religion যাউক, কিন্তু ethics বা morality রক্ষা করিতেই হইবে। ডক্টর মেঘনাদ সাহাও এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"যদি আমরা আমাদিগের সভ্যতার উৎসকে নূতন করিয়া গড়িতে চাই, তবে উহার মূলে কতকটা নৈতিক ও সামাজিক মহত্বের স্থান রাখিতে হইবে।" ডক্টর মেঘনাদ সাহা ধর্ম্ম চান না, কেবল "কতকটা" নৈতিকতা চান; কিন্তু ইহা হইতেছে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা। মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা, নীচ স্বার্থপরতা প্রভৃতি যে-সব অশুভ প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহাদের দ্বারা চালিত না হইয়া কোন উচ্চতর নীতি বা আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করা—ইহাই নৈতিকতা। সাধারণকে এই সংযম ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদিগকে ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত করিতেই হইবে। দুই-চারিজন মানুষ বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে, ধর্ম্মভাবের সাহায্য না লইয়াও নিজেকে "কতকটা" সংযত ও নৈতিক করিয়া রাখিতে পারেন; কিন্তু সে সংযম কখনই পূর্ণ হয় না এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে সে সংযমের বাঁধ ভাসিয়া যাইতে পারে। আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম ভিন্ন মানব সভ্যতা টিকিতে পারে না, বিকশিত হইতে পারে না এবং ইহার জন্য উর্দ্ধের ভাগবত শক্তির সহায়তা অপরিহার্য্য। অতএব ধর্ম্মকে জীবন হইতে বাদ দিবার "নব নীতি" প্রচার করিয়া ডক্টর সাহা দেশের ও সমাজের কোন কল্যাণই করিতেছেন না। এই ভ্রান্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মভাবে যাহাতে দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে তাহাই করা তাঁহার কর্ত্তব্য। হিন্দু-

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম্ম—যা বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও দার্শনিক চিন্তাধারা সকলের পূর্ব্বাভাস দিয়ে, তাদিকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে জড়বাদের উপর জয়ী হতে পারে।" ডক্টর মেঘনাদ সাহা যদি বিজ্ঞানের আধুনিকতম জ্ঞান লইয়া দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন যে উহার সহিত হিন্দুর প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার কোনই বিরোধ নাই, তাহা হইলেই তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তির উপযুক্ত কর্ম্ম করা হইবে এবং তিনি দেশের এবং জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে পারিবেন।

শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আতা-গাছের নির্দ্দিষ্ট ছায়াটুক ঘেঁসে প্রকাণ্ড ব্রাউন-রঙের গাড়ী এসে দাঁড়ায়। সোফার দরজা খুলে দেয়; গাড়ী থেকে আস্তে আস্তে নেমে পড়েন শশাঙ্কশেখর।

হাতের কাজ ফেলে ছুতোর-মিস্ত্রী কারিগর শশব্যস্তে উঠে' দাঁড়ায়। সকলের আগে ছুটে আসে সুকুমার সস্মিত অভ্যর্থনা নিয়ে।

'কদ্দূর এগোলো হে!' হেসে শশাঙ্কশেখর সুকুমারের পিঠের ওপর সস্নেহে মৃদু চাপড় দেন।

'আজ্ঞে, কাল পর্য্যন্ত বারান্দার কাজ শেষ হ'য়ে যাবে আশা করছি।'

'বেশ বেশ,' বা-হাতে শশাঙ্ক মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নেন, 'মার্বেলের কাজ তো হ'য়ে গেলো?'

'হ্যাঁ—' বিনীত কণ্ঠে সুকুমার জবাব দেয়।

'তবে আর কি!' শশাঙ্কর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

'আজ্ঞে, আর বেশি সময় নেবে না, জানলাগুলো একরকম হ'য়ে গেছে।'

'দেখতে দেখতে বাকিটুক হ'য়ে যাবে, কেমন!' শশাঙ্ক জোরে হাসেন। চোখ তুলে তাঁর নতুন বাড়ীর দিকে একবার সগর্বে তাকান। পাথরের প্রাসাদ নাকি! এমন সুন্দর প্যাটার্ণের দু'খানা বাড়ি এ পাড়ায় ওঠেনি। পরম তৃপ্তিতে শশাঙ্কশেখরের বুক ভরে' ওঠে। গর্ব করবার মতো। এ-বাড়ি সম্পূর্ণ তাঁর—তাঁর অর্থে। মজুর-মিস্ত্রীরা মাথা গুঁজে' কাজ করে' যাচ্ছে, শেষ হ'য়ে এলো বলে, আর ক'দিন।

সুকুমার তাকিয়ে দেখছে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষকে—যাঁর বিপুল অর্থে এ-বাড়ি গড়ে' উঠলো; একটা বাড়ির জন্যে যিনি জলের মতো অকাতরে টাকা ঢালতে পারেন। সোণার চসমা রোদ লেগে চিক্‌মিক্ করছে, গায়ে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি হাওয়ায় উড়িয়ে নেয়, প্রশস্ত ললাট, চুল পেকে উঠেছে, দীর্ঘ মজবুত গড়ন এ বয়সেও।

'গাড়ী-বারান্দা'র এমন চমৎকার ডিজাইন কোথায় পেলে, সুকুমার!

সুকুমারের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

ভিতরে ঢুকে শশাঙ্কশেখর অবাক হ'য়ে যান। উপরে-নিচে, এদিক-ওদিক বার বার ঘুরে ফিরে দেখে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন।

'তুমি যথার্থ গুণী, সুকুমার।'

'সিঁড়িটে এখনো ইচ্ছে করলে—'

'করো করো যা তোমার খুসী,' দুধের মতো সাদা মার্বেলের ওপর শশাঙ্ক পাইচারী করেন।

'তোমার পছন্দের ওপর আমি সব ছেড়ে দিয়েছি।'

'বাথরুম দুটো একবার দেখবেন?'

'না না,'—শশাঙ্ক মাথা নাড়েন: 'রোজই তো দেখে যাচ্ছি।' কথার শেষে শশাঙ্ক শব্দ করে' হাসেন:—'তোমার ওপর আমি অন্ধের মত নির্ভর করতে পারি।' বলতে বলতে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ান।

সুকুমার পিছনে।

'রেন্-পাইপ্‌গুলো পূবদিকে নামিয়ে দিয়েছি।'

'বেশ বেশ!' শশাঙ্ক গিয়ে গাড়ীতে ওঠেন।

'আরো দুটো মিস্ত্রী কাল থেকে আসছে—'

'আচ্ছা।' গাড়ীর ভিতর থেকে শশাঙ্কর গলার স্বর শোনা যায়। তীর হ'ণ দিয়ে ব্রাউন্ রঙের গাড়ী হাওয়ার আগে ছুটে যায়।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুকুমার ফিরে আসে।

রোদ অসম্ভব চড়ে' গেছে।

রাজ-মিস্ত্রী বলছিলো, 'নাবার খাবার টাইম হ'ল বাবু!'

'আচ্ছা যাও, সকাল সকাল ফিরে এসো।'

মিস্ত্রীদের বিদেয় করে' সুকুমার আর বসে থাকে না। শশাঙ্ক-শেখরের ইমারৎ গড়া এখন থাক্—রাস্তার ওপারে তার সতেরো টাকা ভাড়া বাড়ির স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

খেতে বসে এক গাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুকুমার অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। এতো বকতে পারে সুধা!

'গাড়ী নিয়ে আজো এসেছিলো বুঝি ?'

'হুঁ।'

'কি বলছিলো তোমাকে ওখানে দাঁড়িয়ে ?'

'কিচ্ছু না'—সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে সুকুমার হাসে : 'কি বলছিলো বললে বুঝবে নাকি কিছু ?'

'আ—রে !' সুধা ঠোঁট উল্টালো :

'কণ্ট্র্যাক্টারি করো বলে' তুমিই সব বোঝ, না ?'

স্ত্রীমতীর গলার অদ্ভুত স্বর শুনে' সুকুমার এবার শব্দ করে' হাসে :

'সারাদিন জানালায় বসে ওদিকে চেয়ে থাক বুঝি ।'

'হ্যাঁ চেয়ে থাকি ।' সুধা রীতিমতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : 'রাঁধা ভাত জুড়িয়ে জল হ'য়ে যায়, বাবুর ইমারৎ-গড়ার শেষ নেই—ক'টা বাজে খেয়াল রাখো ?'

অভিমানে সুধার মুখ থমথম্ করে।

বাধ্য হ'য়ে সুকুমার কণ্ঠস্বর নরম করে' আনে :, 'এই তো, আর ক'টা দিন, হ'য়ে গেছে কাজ।'

কতোক্ষণ চুপ থেকে সুধা আবার আরম্ভ করে :

'ক'হাজার টাকা খরচ পড়লো ?'

'বলো লাখ।'

'অতো টাকা !'—সুধার দু'চোখ কপালে ওঠে : 'খুব বড়োলোক ?'

'বড়োলোক বলে বড়োলোক,' সুকুমার মাথা নাড়ে : 'একটা বাড়ি থাকতে অতো টাকা খরচ করে' আবার কেউ বাড়ি করে !'

'তাই নাকি।'

'শ্যামবাজারে প্রকাণ্ড বাড়ি রয়ে গেছে যে নিজেদের।'

'এটা ভাড়া খাটাবে নাকি ?'

'হুঁ, যেও, দেবে তোমাকে ভাড়া।' নিজের রসিকতায় সুকুমার হো হো করে' হাসে।

'ঠাট্টা রাখো—তবে আর পায়রার খোপে পচে মরি কেন।' ভুরু কুঁচকে সুধা মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'আমি জানি নাকি, কে না কে থাকবে ওখানে।' যেন দেয়ালের সঙ্গে ওর কথা হচ্ছিলো।

'লাখলাখ টাকা খরচ করে' বাড়ি তৈরি করালেন ভাড়া খাটাবার জন্যে।' জলের গ্লাশটা নামিয়ে রেখে সুকুমার শশাঙ্কশেখরের পরিচয় দেয় :

'শ্যামবাজারের বিখ্যাত মল্লিক পরিবার—ওঁদের কতো বড়ো বাড়ি, কতো জ্ঞাতি-গুষ্টি আত্মীয়-স্বজন—আসছেন নিজেরাই। পুরণো বাড়িতে কুলোয় না, তাই তো অত তাড়াহুড়ো। সামনের পূর্ণিমায় গৃহ-প্রবেশ, খুব সম্ভব।

খাওয়া দাওয়ার পর সুকুমার এক মিনিট অপেক্ষা করে না। আবার বেরিয়ে পড়ে বাড়ির তদারক করতে। একটা নেশার মতো তাকে ওটা পেয়ে বসেছে যেন। সিঁড়ি থেকে দেয়াল, দেয়াল থেকে আরম্ভ করে' দালানের কার্ণিশ অবধি প্রতিটি ইট-পাথরের সঙ্গে মিশে আছে তার শিল্পী-হৃদয়, তার অসীম দরদ, মিশে গেছে সে নিজে। বাড়িটাকে সুকুমার ভালোবেসে ফেলেছে। ক'মাস ধরে' বাড়িটাই তার দিন আর রাতের স্বপ্ন।

রাস্তার ওপাশেই শশাঙ্কশেখরের নতুন বাড়ি উঠেছে। ঘরের জানালা দিয়ে বাড়িটা—উপরের ঘরগুলো বেশ দেখা যায়। বাড়িটাকে ভালোবেসে ফেললো সুধাও। হাতের কাজ-কর্ম কোনোমতে শেষ করে' কতোক্ষণে ছুটে আসবে জানালায়।

সুকুমার মিথ্যা বলে নাক : জানালা দিয়ে তুমি বুঝি চেয়ে থাক কেবল।

চেয়েই থাকে সে, সত্যি।

জানালা দিয়ে চেয়ে থাকতে সুধার ভালো লাগে। আশ্চর্য দ্বীপের মতো, রহস্যের অজানা পুরার মতো নতুন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক-একদিন ওর দু'চোখে দিবা স্বপ্নের ঘোর নামে। নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে।

মিস্ত্রীরা কাজ করে—টুক্‌টাক্ ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ আসে ভেসে ; ব্যস্ত হ'য়ে সুকুমার এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে দেখা যায় ; বাড়ির সামনে সবুজ মাঠটুকু ঘেঁসে পীচের রাস্তা চুপচাপ শুয়ে থাকে, রোদে চিক্‌চিক করে ;—আতা-গাছের তলায় ছোটো গোল ছায়া। দুপুরবেলাটা গুনগুনিয়ে চলে অলস পোকার মতো। ভাবনার রঙিন-সুতো বেয়ে সুধা টুক্ করে কখন ঢুকে পড়েছে নতুন বাড়িটার ভিতরে ;—সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দা—সারা বাড়ি গম্‌গম্ করছে। শ্যামবাজারের বিশাল মল্লিক পরিবার সারাবাড়ি ছড়িয়ে পড়েছে। বারান্দা পার হ'য়ে আবার সিঁড়ি—এই বুঝি দোতলা ! মস্ত ফাঁকা এক একটা ঘর। দু'দিক থেকে মুখোমুখি জানালা, হাওয়া আসে জোরে। দক্ষিণের ঘরটায় বাড়ির কর্ত্তা থাকেন ? বেশ নিরিবিলি। পাশেরটায় ? মেয়েরা। বড়ো মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে, কখনো এলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মাঝের বড়ো ঘরটায় শোয়—দেয়ালের এ-মাথা থেকে ওমাথা জুড়ে' প্রকাণ্ড খাট। ও-ঘরে কে থাকে ? এমনি—পরিবার নিয়ে আত্মীয়-স্বজন এলে ওখানে। ছেলেরা ? তিনতলায়—সুধা সিঁড়ি বেয়ে উঠলো তেতলায়। এই বুঝি বড়ো ছেলের ঘর ! টেবিলটা এলোমেলো, আলনাটা একটু অগোছালো, আলনায় অনেকগুলি পেনি-ফ্রক। ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়বৌ অস্থির, ঘর গুছোবার সময় নেই। সাজানো গুছোনো ঘর দেখবে চল সেজ-বৌকে—ঘরটা সব সময় আয়নার মতো তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে—চুলের ফিতে থেকে আরম্ভ করে' আলপিনটি এখান থেকে ওখানে হ'বার জো নেই। আলনায় শাড়ী-কাপড়গুলো কুঁচিয়ে ফুলের মতো করে' রাখা। দেয়ালের ছবিগুলো তুলির টানের মতো মিছিল করা। ফুলদানি রাখবার জায়গায় ফুলদানি—দুধের মতো ধব্‌ধবে বিছানায় পাশাপাশি বালিশ বিকেল না পড়তে। হাসতে হাসতে বড়ো-বৌ ঠাট্টা করে : পেটে একটি হোক, তখন দেখব কতো সাজিয়ে রাখতে পারিস। শুনে' ছোট-বৌ মুখ টিপে হাসে। স্কুল থেকে এসে মেয়েরা বেণী দুলিয়ে ওদিকের ব্যাল্‌কনিতে

[illegible]ড়ালো, ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে ঝি নিচে খোলা মাঠে। সন্ধ্যা [illegible]। ছেলেরা আসে আপিস থেকে গাড়ী নিয়ে বাড়ির কর্ত্তা এই মাত্র [illegible]রে এলেন, বেড়ানো হ'য়ে গেছে। মেয়েরা মাঝের ঘরটায় গোল হ'য়ে বসলো। চলেছে রেডিও। বারান্দা দরোয়ান-চাপ্‌রাসী, নিচে চাকর-বাকর, গোলমাল···মল্লিকবাড়ি গমগম ক'রছে ; বিশাল বাড়িটার গায়ে [illegible]লো-জ্বালা জানালাগুলো আলপনার মতো মনে হয়······

এদিকে দিন গড়িয়ে কখন আলো নিভে যায়, ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে বাড়ি-ঘর গাছ-পালা—সুধার খেয়াল থাকে না মোটে। ঘরময় অন্ধকার নিয়ে জানালার ধারে হয়তো তেমনি চুপচাপ বসে।

দরজায় সুকুমারের জুতোর শব্দ হয়, তখন ওর চমক ভাঙ্গে।

পাথরের টুকরো সাজিয়ে সুকুমার গড়ছিলো স্বপ্নপুরী, আর তাই বুকে নিয়ে জানালার ধারে বসে সুধা গড়ে কাব্য।

'কবে শেষ হবে কাজ?' সুধা জিজ্ঞেস করে।

'হয়ে গেছে প্রায়।' সুকুমার উত্তর দেয়।

কিন্তু বাড়ির কা[illegible] তবু যেন সম্পূর্ণ হয় না। এখানে এটা র'য়ে গেলো, ওখানে ওটা—ড্রেনগুলো সবে আরম্ভ করা হ'ল বাথরুম দুটোর আরো কি বাকি আছে দেখতে হবে।

শশাঙ্কশেখর প্রত্যহ গাড়ী নিয়ে একবার আসেন।

ছ'জন মিস্ত্রীর জায়গায় অতিরিক্ত চারজন মিস্ত্রী জুড়ে দেওয়া হ'ল।

বাড়ি শেষ করবার জন্য সুকুমার উঠে পড়ে লেগেছে।

সুকুমার চেয়ে দেখে [illegible] বাড়িটা, আর [illegible]ধা কান পেতে শুনতে বাড়ির [illegible]কের স্পন্দন : কর্ত্তা[illegible] কা[illegible] হবে, ক[illegible] ও[illegible]।

[illegible]ধার বহুদিনের ইচ্ছা [illegible] পূরণ হ'ল। [illegible] বাড়ীটার ভিতরে গিয়ে একদিন ভালো [illegible]রে' সব দেখে আসে। সুকুমার বললে, [illegible]লো।'

সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম্ম সেরে মিস্ত্রীরা চলে গেছে। স্বচ্ছ নীল আকাশে [illegible]কা চাঁদ মুক্তার মতো [illegible]। অপেক্ষাকৃত অল্পবসতি বলে' পাড়াটা নিঝুম।

রাস্তা পার হ'য়ে [illegible] হাত ধরাধরি ক'রে নতুন বাড়ীতে এসে ঢুকলো।

সুধার বুকের ভিতর দুরুদুরু করছিলো। চারদিক তাকিয়ে তার মনে [illegible]ল বিশাল ঘুমন্ত রাজপুরীতে সে এসেছে। পাথরের কেমন একটা ঠাণ্ডা, নতুন গন্ধ।

নিচের ঘরগুলো দেখা হ'য়ে গেলে দুজনে উপরে এসে উঠলো।

সুকুমার বললে, 'এখানে ত বারান্দার দুদিক থেকে দুটো ড্রয়িং-রুম্, [illegible]টার ঠিক একরকম চেহারা, হঠাৎ দিক্-ভ্রম হবে তোমার, কোনটা [illegible]নদিকে।'

'ওই সরু রাস্তাটা কেন ?'

'স্নানের ঘরে যাবার।'

'ওটা বুঝি ঠাকুর-ঘর হবে ?'

'পাগল !' সুকুমার হাসলো : 'ওই তো স্নানের ঘর, তেতলায় আছে আরেকটা—দেখতে ভারি সুন্দর, না ?'

সুধা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে থাকে।

'ওই সিঁড়িটে আবার কিসের ?'

'সিঁড়ি কোথায়, পশ্চিম দিকের একটা ব্যাল্‌কনি, তিন কোনাচে বলে বাঁক পড়েছে একটু।'

'এই বুঝি তেতলার সিঁড়ি ?'

'হুঁ।'

'ও ঘরটায় কে থাকবে ?'

'থাকবে কেউ—সব না এলে কি করে বলি।'

'ছোটোর মধ্যে খুব সুন্দর—কেমন !'

সুকুমার মাথা নেড়ে কথার উত্তর দেয় :

'আড়াই হাজার টাকার শুধু মার্ব্বেল বসানো হয়েছে, অন্য খরচ ছেড়ে দাও।'

'তাক কোথায়—তাক ?' সুধা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিরাশ হয়ে ওঠে।

'কিসের আবার তাক—তাক দিয়ে তোমার কি হবে ?'

'বারে—শিশিবোতল, এটা সেটা রাখবে না—ঘরে তাক দুয়েকটা না থাকলে মেয়েদের কত অসুবিধে।'

'ও, তাই বলো !' সুকুমার মৃদু হাসলো : সে-জন্যে তোমার ভাবতে হবেনা, শিশি-বোতল এটা-সেটা রাখবার আলাদা জায়গা আছে—অন্য ঘর,—এখানে না।'

'সিলিংয়ে দু'টো কড়া বা আংটা রাখলে পারো—'

'কেন ?' সুধার ব্যবস্থাগুলি নতুন নতুন সুকুমারকে আমোদ দিচ্ছিলো।

'ধরো, ছোট শিশু একটি আসবে—দোলনা টানাবার দড়ি আটকাবে কোথায় ?'

সুকুমার ভয়ানক জোরে হেসে উঠলো।

'তা, পরে একটা ব্যবস্থা হবে।'

সিঁড়ি বেয়ে সুধার হাত ধরে সুকুমার তেতলায় উঠে আসে।

'এ-জায়গাটা এমন কেন, উপরে ছাদ নেই ?'

'ওই তো এর সৌন্দর্য্য !' সুকুমারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : 'এখানে বসে সন্ধেবেলা আকাশের তারা দেখা চলে, রাতে ঘুমোনো যায় ; বিকেলে বসে' যত খুসী বই পড়ো, সেতার বাজাও।'

'বাড়ির মেয়েদের এখানটায় খুব ভালো লাগবে—কেমন ?' সুধা চোখ বড়ো করে' তাকায়।

'হ্যাঁ—আর তুমি বলতে, আমি ডালের বড়ি শুকোতে দেব এখানে, আমের দিনে আমসত্ব।'

'ঠাট্টা রাখো।'

'দেখো, কেমন চমৎকার এ-ঘরটা।'

দুজনে এসে আরেকটা ঘরের ভিতরে দাঁড়ালো।

সুকুমার সবগুলো জানালা খুলে দেয়, ফিকে সাদা জ্যোৎস্নায় দেয়ালগুলো ভেসে ওঠে।

'কতো বড়ো বড়ো জানালা, মনে হয় ঘর চারদিক ফাঁকা—চারদিকে আকাশ।'

দেখে সুধা চুপ করে থাকে।

আরো কতোক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে তারা শেষে নিচে নেমে এলো।

সিঁড়ি-বারান্দা ছাদ সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে।

মেঝে থেকে সিলিং তক্‌তকে ঝকঝকে হ'য়ে আছে মানুষের পায়ের শব্দ আর মানুষের নিঃশ্বাসের অপেক্ষায়, তবে আর দেরি কেন!

সুকুমার বললে, 'দরজা জানালার বার্ণিশ র'য়ে গেছে, ইলেকট্রিক্ ফিট্ করা এখনো হয়নি—সিঁড়ি-মেঝে ধুয়ে মুছে সাফ করতেই অন্ততঃ পুরো দুটো দিন লাগবে।'

সুধার মনে হচ্ছিলো বাড়ি যেন এক বেলা অস্থির হ'য়ে উঠেছে। ঘরগুলো মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করে, জানালাগুলো হাঁ-করে' চেয়ে আছে পথের দিকে, কবে শশাঙ্কশেখর তার প্রকাণ্ড পরিবার নিয়ে উঠে আসবে—শশাঙ্কর ছেলে, বৌরা, কচি ছোটো মুখগুলো। বাড়ি ভরে' উঠতে চায়—ভরে' তুলতে চায় ছুটোছুটি, হাঁক ডাক, অনর্গল অফুরন্ত কলগুঞ্জন দিয়ে নিজেকে। শূন্যতার অন্ধকার আর সহ্য হয় না। বাড়ি চায় চুড়ির রিনিঝিনি, পেয়ালা-পিরিচের টুং-টাং, শিশুর কান্না, ঘুমপাড়ানির গুনগুন্, জুতোর শব্দ। বাড়ি কী না চায়!

বাড়ির প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে; সে চায় প্রাণের স্পন্দন, জীবনের কল্লোল।

নির্জনতার অরণ্যে বাড়ী হাঁপিয়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন সুকুমার এসে বললে—

'বাড়ি এবার সম্পূর্ণ হ'ল, কাল শশাঙ্কশেখর ওঁদের নিয়ে উঠে আসছেন—কাল গৃহ-প্রবেশ।'

কথাটা সুধা বিশ্বাস করতে পারছিলো না—

'কাল কখন আসবে?'

'বিকেলের দিকে'—সুকুমার বলছিলো, 'বাড়ি বদলাবার হাঙ্গাম কম নয়, লটবহর কতো টানাটানি করতে হবে—মালপত্তর সব গুছিয়ে নিতে এক হপ্তা লাগবে।'

পরদিন দেখা গেলো গোরুর-গাড়ী বোঝাই হ'য়ে আসবাব-পত্র আসছে—সোফা-সেট, চেয়ার-টেবিল, আলনা-খাট, আরো কত কি। সব নতুন, ঝকঝকে—যেন এই মাত্র সাহেব বাড়ি থেকে কিনে পাঠানো হচ্ছে।

শশাঙ্ক বললে 'খুব দামি জিনিষ না হ'লে এ-বাড়িতে মানাবে কেন।'

শুনে' সুধা চুপ করে' রইলো।

উৎসুক অধীর হ'য়ে জানালার ধারে সে বসে আছে সেই পরম ক্ষণটির অপেক্ষায়—কখন ওরা আসবে।

বিকেলে শশাঙ্কর প্রকাণ্ড ব্রাউন্ রঙের গাড়ী এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে। গাড়ী থেকে আগে নামেন শশাঙ্ক, পিছনে একটি মেয়ে—আঁট করে টেনে ঘাড়ের ওপর প্রকাণ্ড খোঁপা, রূপোর ঝুম্‌কো কানে, গা-ময় ঝলমলে জর্জেট্।

'এই বুঝি।' রুদ্ধস্বরে সুধা প্রশ্ন করে।

'হাঁ।' সুকুমার এসে জানালায় দাঁড়ায়।

'বাড়ির আর লোক-জন কৈ।'

'আসছে হয়তো পরে।' আন্দাজের উপর সুকুমার উত্তর দেয়।

কিন্তু আর কেউ আসবে লক্ষণ দেখা গেলো না। গেট্ বন্ধ হয়ে গেলো, গাড়ী গিয়ে ঢুকলো গ্যারেজে; মেয়েটির হাত ধরে শশাঙ্কশেখর বাড়ির ভিতরে ঢুকে' পড়েছেন।

'ওরা সব কোথায়।' কেমন যেন অস্বস্তি ঠেকছিলো সুধার: 'ছেলেমেয়ে, বৌ-ঝিরা?'

'কি জানি—' ব্যাপারটা সুকুমার ঠিক অনুমান করতে পারলে না। শ্যামবাজারে বিশাল পরিবার রেখে শুধু একটি মেয়েকে সঙ্গে করে এমন ভাবে শশাঙ্কশেখরের গৃহ-প্রবেশের কি অর্থ হয়!

ফিস্ ফিস্ করে' সুধা জিজ্ঞেস করছিলো—

'মল্লিক বাড়ির মেয়ে?'

'হুঁ।'

'ওঁর কি হয়?'

'অতো আমি জানি নাকি।' জানালা থেকে সুকুমার সরে গেলো।

সুধা আর কোনো প্রশ্ন করেনি।

দেখতে দেখতে বাড়ির রং করা শেষ হ'ল। ওদিকে তাকিয়ে এখন মনে হয় একটা সাদা মেঘ মাটির ওপর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার ধূসর আলোয় সুধা বাড়িটাকে মাঝে মাঝে আকাশ বলে' ভুল করে।

দরজা-জানালার রঙ হ'লো কচি পাতার মতো সবুজ; রেলিংগুলো নিটোল নিখুঁত, হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে।

সেদিন লোকজন এসে ইলেকট্রিকের লাইন বসিয়ে দিয়ে গেলো বাড়ির আষ্টেপৃষ্ঠে; এ ঘরে সবুজ বাল্‌ব্, ও-ঘরে সাদা; স্নানের ঘর থেকে রান্না ঘর—বারান্দা আর ব্যাল্‌কনি কোনোটা বাদ রইলো না।

এবার বাগানের কাজ। বহু টাকা ব্যয় করে শশাঙ্ক নাকি বিলিতি মরশুমি ফুলের চারা নিয়ে এসেছেন। পাঁচটা মালি প্রাণপণে খাটছে।

বাগানের বুক চিরে দুদিক থেকে রক্তের মতো লাল রাস্তা তৈরী হ'ল। গেটে উঠলো পিতলের ফলক।

সব প্রস্তুত, এখন শুধু অপেক্ষা।

কবে তারা উঠে আসবে শশাঙ্ক আর তাঁর পরিবার পরিজন।

বাড়ি যেন হাত বাড়িয়ে আছে অভিনন্দন নিয়ে। রথ প্রস্তুত, সারথির প্রতীক্ষা।

সময়ের সমুদ্রে বাড়ি ভেসে পড়তে চায়: তোমরা এস, এস।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে রাত হ'ল, উঠলো সাদা শুভ্র চাঁদ। দূর থেকে বাড়িটাকে দেখাচ্ছিলো বরফ-পিণ্ড—বরফ দিয়ে মোড়া কোনো আদিম রহস্য-স্বপ্ন। শুধু তেতলার ছোটো ঘরটায় এক টুক্‌রো সবুজ আলো ;—তাকিয়ে সুধা ভাবছিলো তখন মেয়েটির কথা, ওর কানে বিশাল রূপোর ঝুমকো, ঘাড়ের উপর টেনে আঁট করে' বাঁধা নিটোল সুন্দর খোঁপা।

পরদিন আবার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সুধা একবার বাড়িটার দিকে তাকায়, একবার পথের দিকে : কখন ওরা আসবে।

'অতো বড়ো বাড়িতে একা একটি মেয়ে থাকতে পারে নাকি ?'

'যদি থেকে যায় তুমি কি কর্ত্তে পারো ?' সুকুমার একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়।

সুধা সাময়িক চুপ করে থাকে।

ইতিমধ্যে মেয়েটিকে তিনবার সুধার চোখে পড়েছে। ওদিকের বারান্দায় পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়িয়েছিলো। একবার দেখা গেলো পশ্চিমের জানালায়—চুল আঁচড়াচ্ছিলো বোধ হয় তখন। ধব্‌ধবে ফর্সা রং, অটুট স্বাস্থ্য, মেঘের মতো চুল। একবার দোতলায়।

নির্জ্জন নিঃশব্দ পুরীতে সুধার মনে হ'ল বন্দিনী রাজকন্যা। আরো কত কি আকাশ-পাতাল ভেবে মরছিলো সুধা।

ঠিক সন্ধ্যার সময় বাইরে থেকে ঘুরে এসে সুকুমার বললে, 'হয়েছে।'

'কি—ওরা সবাই এসেছেন !'

'কে আসবে, কার কথা বলছো ?'

'বাড়ির মেয়েছেলেরা ?'

'আসবে এখানে মরতে !' অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে' সুকুমার জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'দেখো চেয়ে।'

ঘরের কাজ-কর্মে কিছুক্ষণের জন্য সুধা ওদিকে সরে' পড়েছিলো, ইতিমধ্যে দৃশ্য-পটের এতখানি পরিবর্ত্তন সে ধারণা করতে পারেনি।

—সুধা জানালার ধারে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। দেখা গেলো বাড়ির সামনে তখন আরো তিনচারখানা গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। দোতলার সেই বড়ো ঘরটা, মনে হচ্ছিলো আলোর স্বপ্ন-পুরী। মেঝে জুড়ে' প্রকাণ্ড পুরু বিছানায় চারপাঁচজন লোক তবলা-বাঁয়া, হারমোনিয়ম নিয়ে গোল হ'য়ে বসেছে। একপাশে গণাস্থপেগব। অশ্রান্ত হাসি গান, টুক্‌রো-টুক্‌রো কথাবার্ত্তা ঘরের আবহাওয়াটাকে উত্তাল, উলঙ্গ করে' তুলেছে।

পাশাপাশি হ'য়ে দুজন জানালা দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলো।

ফিস্‌ ফিস্‌ করে' সুধা বললে—

'ব্যাপার কি।'

'দেখা যাক কদ্দূর গড়ায়।' দাঁতে দাঁত চেপে সুকুমার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কতোক্ষণ পর দেখা গেলো সেই মেয়েটাকে। সমস্ত শরীর তরল লীলায়িত করে' সকলের মাঝখানে এসে কিনা নাচতে সুরু করে দিয়েছে, শরীরের রেখায় রেখায় ফুটে বেরুচ্ছিলো কদর্য্য লালসা ; মেয়েটা হঠাৎ হাসতে হাসতে একজনের গায়ের ওপর দিব্যি ঢলে পড়লো

হাত বাড়িয়ে সুকুমার জানালাটা টেনে খড়খড়ি নামিয়ে দেয়। উদাস, বিশুষ্ক চোখে সুধা দেওয়ালে অন্ধকার দেখে।

আমার সকল গর্ব্ব

দিলীপ দাশগুপ্ত

আমার সকল গর্ব্ব বিন্দু হয়ে প্রজ্জ্বলিছে সীমন্তের সিন্দূরেতে তব—
অলকার রূপ জিনি উৎসব লেগেছে সেথা নিত্য অভিনব।
প্রত্যুষের রক্তরাজ তরুণ তপন
কখন জানালো নতি ভালে তব ? সে শুভ লগন
দেবেন্দ্রের প্রার্থনায় ভুবনেতে ফোটায়েছে ফুল ?
কাহারা আকুল
সে লগনে দুষ্মন্তের রূপবহ্নি হেরিয়া সলাজে ?
তাহাদের চিত্তখানি কার লাগি বারেবারে বাজে ?

স্বপ্ন ভাঙি' নিশাশেষে জলপরী জানালো প্রণাম
অন্তরালে উচ্চারিল মনেপ্রাণে তাই মধুনাম।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন তোমা হেরি' গোপন লজ্জায়
হৃদয়ের নৈবেদ্যরে রেখে গেছে অরূপ সজ্জায়,
সীমন্তের স্বর্ণদ্বারে তাই—
সুন্দরেরে ধ্যান করি বাজিল সানাই।
ক্রন্দসীর যতো ব্যথা লজ্জা যতো আর যতো শোক—
তোমার ললাট হেরি' উন্মুখর হো'ক।

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তৃতীয় স্তবক

মুকুললতা !

তৃতীয় শর তোমাকে নিশানা করার সাফাই এই যে, তোমার ১৮ জানুয়ারির চিঠিটা আমার খুব ভালো লেগেছে। তাতে তুমি এক জায়গায় লিখেছ: "সামনে আপনার জন্মদিনে আপনি সুখী হোন এটা বলতে পারছি না, কারণ আপনি যে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির সঙ্গে বেদনার নিকট সম্বন্ধ—সুখ ও সৃষ্টি একসঙ্গে থাকতে পারে না। বাইশে জানুয়ারির জন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি সৃষ্টির পরম বেদনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পান।"

একথায় বেশ একটু চমকে উঠেছিলাম বৈ কি। এ ধরণের চিঠি কখনো পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না, যদিও আমি নিজে সেদিন একজনকে লিখেছিলাম: "তুমি সুখী হও এ-প্রার্থনা আমি করি না, প্রার্থনা করি সাধক হও।"

কিন্তু তোমার ও আমার বলবার কথাটা বোধ হয় একই। হয়ত হুবহু এক নয়—তবে এ-দুয়ের অন্তঃশীলা ছন্দ যে এক—সন্দেহ নেই। এ-সম্পর্কে আমার যা মনে হয় বলতে বলতেই গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজি, কেন না আন্দাজ করছি, এ স্তবকের বাদী সুরটি না হোক অনুবাদী সুরটি এই রেশেই উঠবে বেজে।

সুখ দুঃখ নিয়ে ভেবেছি অনেক। কে না ভেবেছে বলো? বেদনার মধ্যে দিয়ে বড় আনন্দ আসে এ-ও যুগে যুগে বহু লোকই উপলব্ধি করেছে। কিন্তু সুখ ও আনন্দ এক বস্তু নয়—যেমন দুঃখ ও বেদনা সমার্থক নয়। একটা গভীর দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় শুনেছি যে দুঃখ বেদনা সবই আনন্দের অপভ্রংশ—কিন্তু সে হ'ল খুবই এত উচ্চাঙ্গের কথা যে আমার কাছে মনে হয় প্রায় আকাশবাণী। তাই আমি নিজে যতদিন না ওকথা উপলব্ধি করার কিনারায় আসি ততদিন এ-জাতীয় বুলি আওড়ে পরকে বা নিজেকে ঠকাব না। তবে এটুকু বললে শত্রুর আদালতে হাসির হররা উঠলেও মিত্রপুরীতে হয়ত চাল-মারার চার্জে পড়ব না যে, আমি বিশ্বাস করি এমন চেতনা সাধনলভ্য যেখান থেকে জীবনের সব স্পন্দনকেই আনন্দ-স্পন্দন ব'লে মনে হয়। কেন করি? কারণ স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দর মুখে একথা শুনেছি। এমন কি, দুঃসহ দৈহিক যন্ত্রণায়ও তিনি তীব্র আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন। (আমার বাস্তববাদী বা ডাক্তারিবাদী বন্ধুরা হয়ত একথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন। হাসুন—they won't laugh last.)

কিন্তু আমি সে-ধরণের তুরীয় চেতনার বা যৌগিক সিদ্ধির কথা বলছি না এখন। আমি শুধু বলব, সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আমার নিজের দু-একটি উপলব্ধির কথা—অনেক দিন বাদে কাশ্মীর ভ্রমণের সূত্রে যা আমি ফের বুঝতে পেরেছিলাম যেন নতুন ক'রে

এ-ভ্রমণে নানা দুঃখই আমি পেয়েছি, বেদনাও। মানুষ নানা ক্ষেত্রে নানান্ আশা করে—সব চেয়ে বাজে তখন, যখন সূক্ষ্ম আশাগুলি পূর্ণ হয় না। তখন যে-সব বেদনা আসে সেগুলি বহুমূল্য—কেন না, সে-বেদনা আসে আলো হ'য়ে—মেঘ হ'য়ে না। এ-ধরণের দুঃখ কষ্টকর, কিন্তু এরা রিপু নয়—সুহৃৎ, যেহেতু এদের হাতে আছে আত্মপরিচয়ের বরদান। আমি মিলিয়ে দেখেছি বহুবারই যে, এই সব তীব্র সূক্ষ্ম আশাভঙ্গ স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ বেদনা, এমন কি, নিরাশা থেকেও নব সৃষ্টির প্রেরণা মেলে। তাই আমি তোমার সুরে সুর মিলিয়ে অকপটেই বলতে পারি যে, এ-ধরণের দুঃখ ব্যথার সঙ্গে সৃষ্টির নিকট সম্বন্ধ সত্যই আছে।

কিন্তু কি ভাবে এধরণের বেদনা সক্রিয় হয়, কি ভাবে এরা স্রষ্টার সৃজনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, এটা সব সময়ে স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে কই? এটুকু বুঝি যে বেদনা যেন একটা আলোড়ন, যার অভিঘাতে ঘুমন্ত সৃজনাগ্নি চমকে ওঠে; ফলে যেখানে মনের নানা শক্তি বিচ্ছিন্ন বিস্রস্ত হ'য়ে নিষ্ফল হ'তে চলেছিল, সেখানে তা হয় সুগ্রথিত ব্যূহবদ্ধ। তাই দেখা যায়, একটা বড় বেদনার আঁধারের পরেই আলোর শক্তি হয় প্রত্যক্ষ। এক হিসেবে আনন্দের (যাকে চলতি ভাষায় আমরা সুখ বলি) চেয়ে বেদনা বেশি বাস্তব—মানে, "রিয়াল"। কারণ আনন্দ

আসে একটা ঢেউয়ের মতন, কিন্তু চ'লে যায় শুধু আক্ষেপ জাগিয়ে। (ব্রহ্মানন্দর ছন্দ হয়ত অন্য ভাব, আমি বলছি সে-আনন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—তারই কথা) বেদনা আসে হলফলকের আঘাত নিয়ে, মনের পতিত জমিকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে রেখে যায়—কিন্তু এ ক্ষতের ক্ষতি বিনা বীজ বোনাই যে হ'ত না—পতিত জমি সুখে থাকত হয়ত, কিন্তু উর্বর হ'ত না। বেদনার কর্ষণে আমাদের মনের মাটিতে ওলটপালট হয় ব'লেই আমাদের নিহিত সৃজনী শক্তি সেখানে গর্ভাধান করে। তুমি বলবে আনন্দেও তো আমরা বিচলিত হই। মানি, কিন্তু সেখানে কোনো প্রশ্নের ক্ষতচিহ্ন থাকে না। আনন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ—বেদনা পায়ের নীচে থেকে বনেদ নেয় টেনে—তখন প্রাণ ক'রে ওঠে আকুলি বিকুলি, চায় সে একটা দাঁড়াবার জায়গা, মাথা-গুঁজবার-ঠাঁই। এক কথায়, তখন এই বাইরের বিপুল বিশ্ব তার কাছে দেউলে মনে হয়—তাকে হাত পাততেই হয় অন্তরপুরুষের কাছে। সেই চাওয়াতেই ভিতরের শক্তি দানা বাঁধে, জেগে ওঠে, অভয় দেয়—মানুষ তখন উপলব্ধি করে খৃষ্ট কি বলতে চেয়েছিলেন যখন তিনি অভয় দিয়েছিলেন, "খোঁজো—মিলবে, চাও—পাবে, আঘাত করো—খুলবে দুয়ার।" মানুষ তখন দেখে কোন্ পথে বেদনা ও আনন্দ রূপান্তরিত হয়ে ওঠে—অনাসৃষ্টিতেও ঝলকে ওঠে রূপসৃষ্টির দীপ্তি। এই জন্যেই গেটে বলতেন যে, খুব বড় দুঃখ পাওয়াও সার্থক, যদি তার ফলে একটি মাত্র মহৎ কবিতা লেখা যায়। মানুষ জীবনে সবচেয়ে বেশি চায় শান্তি। গভীর উচ্ছল আনন্দ এ-জগতে প্রায় একটা আশাতীত ব্যাপার—spirit of delight হ'ল দেবদূতের মতনই বিরল, ক্ষণজন্মা। কিন্তু শান্তি বিনা বাঁচা কঠিন। বেদনা করে অশান্ত। তাই তো বহির্মুখীরাও অন্তর্মুখিতার দীক্ষা পায় বেদনার গুরুবাদে, দেখে যে তুফান বাস্তব বটে, কিন্তু নক্ষত্র আরো বাস্তব—করুণার দিশা মেলে নিরভিমান দীনতারই পথে। এ আমি বহুবার উপলব্ধি করেছি—শুধু আমি না, যুগে যুগে দেশে দেশে হাজার হাজার সন্ধানী বেদনায়ই পেয়েছে পথের পাথেয়। বাস্তবিক বেদনার সবচেয়ে মহৎ দান হ'ল এই অন্তের পাথেয় জোগানো—কালোয় আলো দেওয়া, এর চেয়ে বড় বর পথ চলায় খুব বেশি মেলে না। তোমার চিঠিখানি ভালো লাগল আরো এই জন্যেই—এই বেদনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে যে একটা মনের দ্বীপ আর একটা মনের দ্বীপকে ছুঁতে পারে এটা তুমি উপলব্ধি করেছ দেখে। মানুষে মানুষে গভীরতর পরিচয়ও এই উপলব্ধির লক্ষ্যসন্ধানে। আমার "মনের পরশ" বইখানি অনেক দিন আগেও তোমার মনে 'গভীর দাগ' বসিয়েছিল বোধ করি এই কারণেই: মানবমনের একটা আদিম আকাঙ্ক্ষা হ'ল অপর মনের সঙ্গে ছোঁওয়াছুঁইয়ি—অচেনার সঙ্গে মালাবদল চাওয়া। অথচ চাইলেই তখনি তখনি পাওয়া যায় না—চাবি নৈলে প্রবেশ-পথ রুদ্ধ। বেদনাই দেয় এই চাবি, যাকে সুখ ব'লে মেতে উঠি সে জানে না এই পরম দিশা। তাই কুন্তী বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে:

সুখের উচ্ছ্বাসে আমি তোমারে যে ভুলি চিরসাথী,
বেদনায় ফিরে চাই—জ্বেলে রেখো তাই ব্যথা বাতি।

লিখেছিলাম এই গানটি—তুমি সামনের আগষ্টে এলে শোনাব:

কোথা উড়ে যাও ওগো স্বপনের পাখি,
ছায়াপথে তব আলোকের মায়া রাখি'?
ঘুম যবে মোর ভাঙে,—
স্মৃতিরাগে মন রাঙে,
চিরবসন্ত গাঙে
তোমারি গন্ধ মাখি':
বালুচরে বাণ চলে
ফুলে ছায় কাঁটাশাখী
তুমি গান গাও ব'লে ও স্বপন পাখি!
কত আশা-নিড় রচি'
ঢেউয়ে জ্বালি তব মণি,
মণি যায় নিভে—তবু
আভা তার রহে জাগি:
তারি সান্ত্বনা বাতি
পথ চেয়ে মোরা ডাকি
তোমারে গগন সুরে ও স্বপন পাখি!
জানি পাখি, আমি জানি
তোমার নীলিমা বাণী
তাই সাঁঝ ছেয়ে এলে
পাখাছবি প্রাণে আঁকি,

বিরহ-পরাগ মাথে
তোমারি মিলন লাগি' :
উড়ে যাবে বলো কেমনে স্বপন পাখি,
ছায়া-পথে ওই আলোকের মায়া রাখি' ?

* *

রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর যখন রওনা হই—এই বেদনার রসে মন ছিল আমার আপ্লুত হ'য়ে। কেবলই মনে হচ্ছিল যেন আশে পাশের অফুরান সৌন্দর্যের অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই বেদনার আলো। বেদনা জড় বস্তুকেও যে চিন্ময় ক'রে তোলে সেদিন যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম আমি। কত গানের লাইন কবিতার উপমা যে মনের আকাশে বিজ্‌লির মতন চমকেই মিলিয়ে যায়: সে এক অপূর্ব অনুভূতি! মিল ছন্দ সব যেন কে জুগিয়ে দেয়। প্রতি বাইরের শোভা মনের তারে আঘাত করে ছন্দের কাঁপন হ'য়ে—মরন্ত হ'য়ে ওঠে জীবন্ত। সঙ্গে সঙ্গে বেদনা হ'য়ে ওঠে আনন্দ। ঝিলমের সে অফুরন্ত নির্ঝরনৃত্য কি ভোলবার ?—

নির্ঝর ধারা! নির্ঝর ধারা!
কার পূজারিণী আপনহারা
গান গাও কুলু কুলু-ধ্বনি
মিলনমানি
অঙ্গে অঙ্গে চমকে তোমার
আলো পারাবার
ডাকে যে তোমায় ডাকে যে তারা!
তাই কি উধাও নির্ঝর ধারা!
ওগো চঞ্চলা কলোচ্ছলা!
আনন্দ কার সুর উপলা
নূপুরিকা! হেন দিনরজনী
সাধো সজনি?
নৃত্যে কার বা উঠিলে তুমি
রূপে কুসুমি'
অলখ বঁধুর বাশি বিভলা!
তাই ধাও বুঝি নীলাঞ্চলা?
শান্তিময়ী কান্তিময়ী!
ছন্দে যে তুমি দিগ্বিজয়ী!
লক্ষ্যহারা তো নহ গমনে
চল চরণে
পুলকে তোমার সাধিলে যারে
বাঁধিলে তারে
অশ্রু মালারো বরণে অয়ি
দূরভিসারিণী, স্বপ্নময়ী!

সত্যি ভাই মুকুল, এসব কথা তোমায় বলছি কোনো লেকচার দিতে নয়—পাছে ভাবো তোমার সরলা লিপির সুবিধে নিয়ে বেশ এক হাত নিচ্ছি, তাই নিজের ওকালতি করছি শোনো: এসব বলছি শুধু দুটো মনের কথা কইতে - মনের পরশ তুমি চাও ব'লে। তাছাড়া আমি অকেজো মানুষ জানোই তো, এই সব বাজে কথা বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে ভালোবাসি—আমার মতন অকেজো শ্রোতাও দু চারটে আছে এই যা ভরসা। আশা করি একথায় রাগ করবে না। তুমি বিদুষী, এম্-এ পাশ—লক্ষ কাজ তোমার, তাই ভয় হয় বৈ কি তোমাকে দলে টানতে। যাক্।

কাশ্মীরের পথে যখন বেরুলাম তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ—ঠিক দুপুরবেলা। পেশোয়ারি বন্ধুদের সহৃদয়তা ও আতিথেয়তার কথা কেবলই মনে পড়তে লাগল। এদের আচরণে এমন একটা সরল ভদ্রতার সুর বেজে উঠেছিল যে ছাড়তে কষ্ট হচ্ছিল। ওরা খুব ধরল যেতে দেতে দুদিন। বলল পেশোয়ার দেখাবে, খাইবার পাশ—তক্ষশীলা, আরো কত কি। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমার প্রকৃতি বিষম অনৈতিহাসিক। য়ুরোপে "প্রতিহিংসার সহিত" ঐতিহাসিক পর্যটন করতাম। কিন্তু কিছুদিন বাদে এমন অসহ্য ক্লান্তি ও বিতৃষ্ণায় মনটা এলিয়ে পড়ল যে বুঝলাম—বীরচূড়ামণিদের সমাধি বা মহানগরীদের ধ্বংসশেষ দেখে আমার মন সাড়ার মতন সাড়া দেয় না। আমি মনে করি না মুকুল, যে সব মনের পক্ষে সব ভালো জিনিষই ভালো। সত্যি লাভ করে মানুষ সহজ ঔৎসুক্যের পথে—জোর ক'রে যা লিখতে হয় তা প্রায়ই পরিণামে অম্লশূলের বা অজীর্ণের যন্ত্রণা আনে। ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন দেখা কারুর কারুর মানস স্বাস্থ্যের অনুকূল হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে ওসব অবান্তর। তবু য়ুরোপে বড় বড় প্রায় সব শহরে কীর্তিমন্ত গির্জা,

যাদুঘর, সমাধিচিহ্ন প্রভৃতি দেখে কত সময়ই যে নষ্ট করেছি! উঃ ভাবতে এখনও ক্লান্ত হয়ে পড়ি। গরম দেশে অলেষ্টার চোখে দেখলেও যেমন ঘামতে হয় না—সেই রকম।

ভাবছ বাড়িয়ে বলছি? আমি সত্যিই মনে করি, সাইটসীইং ক'রে আমার সময় বেচারি একেবারে স্রেফ্ নষ্ট হয়েছেন। কারণ আমার কাছে বড় বড় ঐতিহাসিক মনুমেণ্ট, যাদুঘর, স্তূপ, দুর্গ একেবারে বাহ্য। ওসবের রস যদি কিছু থাকে তো আমার ইন্দ্রিয়ের পাল্লকেই যায় আটকে—মনের প্রাণের মজ্জায় পশে না। নরওয়ে, সুইডেন, সুইজর্লণ্ড, উইণ্ডারমিয়ার, ট্রসাক্—এই সব থেকেই আমি সত্যিকার লাভ করেছি আমার য়ুরোপ ভ্রমণে। এদেশেও এক তাজমহল ছাড়া কোনো স্মৃতিসৌধ আমাকে আনন্দ রসে আবিষ্ট করে নি। তাজমহলও আমার কাছে বড়—সুন্দর ব'লে, মোগল স্থাপত্য ব'লেও না—শাজাহানের ঐতিহাসিক স্মৃতি-গৌরবেও না। সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর ছবি বা সুন্দর কারুকলা আমার ভালো লাগে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঔৎসুক্যবশে নয়—সৌন্দর্যের টানে। পারিসে মনে আছে নানা স্মৃতিসৌধ দেখে ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে নিজের দুর্বলতাকে ধিক্কার দিতাম। রাগ হ'ত নিজের 'পরে—কেন যাই এসব সাইট-সীইং ক'রে অর্থ সময় ও শক্তির অপব্যয় করতে? তখন সান্ত্বনা খুঁজতাম সেভ্‌রের একটি ছোট্ট কুঞ্জবনে (bois) একা ব'সে। বলতাম:

বুলবুল হেথা গায় গান ঐ সবুজের স্নেহনীড়ে!
প্রজাপতিশিখা জ্বলে ফুলদীপে—আলোছায়ামন্দিরে।
গগনের গান ঝরে অপরূপ স্বপনের মায়া সম।
লতায় পাতায় লাবনী বিলায়—কে মধুর নিরুপম!
অদূরে সরল শিশুর কণ্ঠে উছলে কলহাসি
অনামা গন্ধমুকুল কত যে ফোটে গাছে রাশি রাশি!
প্রতি সুষমার শান্তির আভা হৃদয় মুকুরে ফলে
তবু কেন প্রাণ ধায় মালা দিতে চঞ্চলতার গলে!

কিন্তু সত্যি, চঞ্চল যে হ'ত সে আমার প্রাণ নয়—আত্মাভিমান। পঞ্চদশ শতাব্দীরই হোক্, কিম্বা পৌনে চার শতাব্দীরই হোক—কোনো ঐতিহাসিক গির্জার নীরস স্থাপত্য দেখে এতটুকু আনন্দ হ'ত না আমার। তবু (প্রথম প্রথম) যেতাম দেখতে ঐ সব। কেন? বলতে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "লাজ বাসি"। কারণ এ কুকার্যটি করতাম আমি ফ্যাশনের ফেরে। অথচ বিশ্বাস কোরো—আমি সত্যই অত্যন্ত অপছন্দ করি ফ্যাশন বা গড্ডালিকা-প্রবাহ। পাঁচজনে যা করছে তা-ই করা কর্তব্য, এ-নীতিতে আমার মন কোনো দিনই সায় দেয় নি—কিন্তু হ'লে হবে কি, যে-জিনিষ আমার কাছে অত্যন্ত অবান্তর তাকেও দেখে-আসার সেলামি দিতাম বাহাদুরির লোভে, সবজান্তার জাঁক করবার লোভে। ধিক্ মূঢ়তা!

খানিক আগে বলছিলাম না, শিখি আমরা শুধু স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের পথে? মানি যে অনেক কিছুতে প্রথমেই ঔৎসুক্য আসে না—অনেক রসবোধ চর্চা সাপেক্ষ। এ-ও জানি যে আজ যা ভালো লাগে না, কাল তা ভালো লাগে এমনও ঘটে। মানবমন বিচিত্র—তার পরিণতির স্ফূর্তির ধরণধারণ বাঁধাধরা নয়। কিন্তু সব বলা হ'য়ে গেলেও বলা চলে যে, আলাদা আলাদা মনের গড়নের মধ্যে একটা প্রভেদ আছেই। অনেকে আছে শিশুকে ভালোবাসে না। আমি বাসি—শৈশব থেকেই। অনেকে গান ভালোবাসে না। আমি বাসি। আবার অনেকে প্রত্নতত্ত্বের নামে হুহুঙ্কার ক'রে ওঠে, আমি পারি কই তাদের কীর্তনে আখর জোগাতে?

কিন্তু মনে রেখো আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। আমি সত্যি একেবারে মুখ্যু নই—ইতিহাস পড়তে যে আমার ভালো লাগে না তা-ও নয়। কিন্তু তবু আমি দেখেছি যে পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার নেই। তাই ঐতিহাসিক সমারোহে আমি সে-আনন্দ পাই নি—যে-আনন্দ পেয়েছি গানে কাব্যে চিত্রে শিশুর সখ্যে, নারীর সখিত্বে, নিসর্গ সৌন্দর্যে, মহতের বন্ধুত্বে, জ্ঞানীর উপদেশে। এবার কাশ্মীর থেকে ফিরতি পথে তাজমহল দেখলাম আবার। কি আনন্দ যে হ'ল বলতে পারি না। কিন্তু কই, তাজ-মহলের ইতিহাসের কথা তো একবারও মনে হ'ল না। তাজমহল দেখে কি আমার মনে হয়েছিল বলি শোনো, তাহ'লে হয়ত স্পষ্ট হবে এ সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশা ও তৃষ্ণা।

যতবারই দেখি তোমায় মনে হয় যে তোমার সাথে যেন
অনেক দিনের চেনা—তুমি স্বপ্নে ছিলে! বলতে পারো—কেন

এমনতর সুর রণিয়ে ওঠে আমার বুকের বীণায় ? তোমায়
দেখেছি তো কতবারই···তবু তোমার মধুরিমায় কোথায়
চিরন্তনী পরিচিতি বেজে ওঠে · মনে হয় যে তুমি
নও নিষ্প্রাণ। নও কি পাষাণ ?—প্রশ্ন জাগে !
অমনি ঐ···কুসুমি'
ওঠে রুক্ষ কঠিন পথের নরম পরাগ—আবেশ নিয়ে···ব্যথা
যায় মিলিয়ে···কণ্ঠে মালা লতিয়ে যায়···কয় কে এমন কথা
আবছায়া এক অভয় তালে ? এমন তো আর হয় না
কিছু দেখে !
কেউ কি তোমার মূর্তিখানি আথর ক'রে এমন লিপি লেখে
ছন্দ যেথায় ছল, উপমা—ছবি ?···তবু মনে হয় যে আরো
শুনতে যদি ভাই তো আরো গভীর ছবির সুর ফোটাতে পারো।

কী সে গভীর সুর !—যদি কান পাতি, শুধাই :
"এমন স্নেহে ডাকো
কোন্ অতলে ? প্রেমের লোকে ?—সুন্দরের ?" না—
তুমি চেয়েই থাকো
জলভরা নিষ্পলক চোখে—অশ্রুমতী স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা !
এ জগতে তাও কি তুমি আনতে কোনো সান্ত্বনাবারতা
ব্যর্থ আশা পূর্ণ যেথায় হয় সহসা অচিন ইন্দ্রজালে ?
জীবনে যায় মিলিয়ে যে-মিড়—জাগে তোমার করুণারি তালে ?

কেউ বলে : "এ জীবনটা নয় এমন কিছু।" কেউ বা
বলে : "বেশ"।
কেউ কাঁদে : "এ আঁধার।" হাসে কেউ হরষে :
"এই তো রূপের দেশ।"
কেউ বলে : "এ-পারাবারে শুধুই তুফান।"
কেউ বা বলে : "হেথায়
ধ্রুবতারার বাতি জ্বলে—হায় আমাদের নেশার
আঁখিই নেভায়।"
ভাবনা কত ভিড় ক'রে যে আসে···কত গন্ধ নীড়হারা
দল বেঁধে দেয় হানা—আবার উষর ক্ষণে ঝরে রঙের ধারা !
বেদন-বীণায় কি গান যে গাই—ঠাহর কি পাই নিজেই ?
কেউ কি জানে ?
তোমার কাছে এলেই তা'রা থামে : ব্যথা তাই কি
তোমায় মানে ?

বাদলঝড়ের হাহুতাশেও শুনি যেন তারকা-রাগমালা
বেজে ওঠে অস্ফুটে—ঐ স্পষ্ট আরো ! যেন প্রদীপ জ্বালা
হয় নিসাথী দেবালয়ে···অচিহ্নিত পথে বাঁশি বাজে···
কান্না যেথায় বলে : "কিছুই নেই"—কে যেন বলে :
"আছে, আছে।"

কাঁটার কোলে ফুলের শিশু···আঁধার সাথে আলোর
কানাকানি···
বিদেশেও এই যে মনে হয় চেনা কে ডাকে—জানাজানি
ছিল আমার সঙ্গে যেন তার···কত—সে কতদিনের কথা !
শুকিয়ে-যাওয়া মরুশাখায় দুলে ওঠে তারই লীলার লতা !
সুষমা কি বাণী তোমার রূপলতিকা ! তাই কি ওঠো দুলে ?
মেঘ দূরে যায়···নীল চাহনি উপছে পড়ে প্রাণের কূলে কূলে।
হারিয়ে-যাওয়া কিরণকুঁড়ি সেই পুলিনের ঢেউয়ে ফোটে বুঝি ?
বিরহ কি নয় বিরহ ? তাই কি সেথা নিত্য-মিলন খুঁজি ?

কিসের অঙ্গীকার এ-মিলন ? আংটিবদল কে করে
কার সনে ?
জীবন অসঙ্গতিভরা—কেমন ক'রে পূর্ণতা-প্রস্বনে
জাগে সেথা এমন ছায়ামূর্ছনারা ? কোথায় ছিল তারা ?
তোমার মৃত্যুমর্মরে ছায় জীবনজোয়ার কোন্ কোমলে হারা?
বিশ্বরে কে সুর দেয় ? কে মূর্ছাতারে জাগায় স্পন্দন ?
কুরূপ পঙ্কিলতার রাজ্যে দেয় হানা কোন্ কুসুম-প্রস্রবণ ?

তোমার মাঝে কেউ বা শোনে প্রেমের বাঁশি।
কেউ শোনে মাধুরীর
লাজুক কূজন। কেউ বা শোনে কীর্তির দূর কল্লোল।
কেউ ছবির
সিন্ধুরসে হয় ডুবুরি। কেউ বা খোঁজে চিরন্তনীর বেশ।
কেউ তোমাকে বলে : "চিনি।" কেউ বলে : "হায়,
নয়ন নিরুদ্দেশ !"

আমি তোমার কাছে আসি আমার আশা নিয়ে, ক্ষুধা নিয়ে
তুমি অচিন আকাশ উছল করো ব'লে। তোমায় ভাষা দিয়ে
তাই তো প্রকাশ করতে গিয়ে বিফল হ'য়েই
সফলতায় জানি :
বচন কোথায় হার মানল জেনেই অনির্বচনীয়ে মানি।

তাই তোমাকে আঁকতে গিয়ে দেখি—তোমার ছায়ার
কোলে আলো!
চম্‌কে উঠি: জীবন যারে লুকিয়ে রাখে তারেই বেসে ভালো
মরণ যাদুর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তুমি জাগাও চির-অমল!
অশোক তোমার মর্মে জ্বলে, তাই না শোকের কালোয়
তুমি ধবল।
তাই না তোমার বিদায়ের এ-মন্ত্রে আগমনীই ওঠে দুলে:
পাষাণঘায়ে ফুল ঝরে—তাই স্বপ্নপাষাণ ফোটে অঝর ফুলে!

গগনের নয়নতারা,
স্বপনের দৃষ্টিবীণায়
উছলে সুরের সুরা,
হৃদয়ে আবেশ জাগায়!
অচলও পাখা মেলে
উড়ে চায় ধরতে তারে,
তটিনী বলে: "না, না,
আমি যাই অভিসারে।"
গিরি কি আনমনে তাই
রয় দূরে চেয়ে?

কাশ্মীরের পথে তাই কি ভালোই যে লাগল! ঐতিহাসিক ভাব জাঁকানো কোনো বালাই-ই নেই এ রাজ্যে। দুধারে শুধু সৌন্দর্যের জয়ধ্বনি। বিশেষ ক'রে দুমেল বলে একটি গ্রাম আছে সেখানে। রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর যেতে প্রায় মাঝামাঝি পড়ে এই অপূর্ব গ্রামটি। জীবনে যত সুন্দরতম স্থান দেখেছি দুমেল তার মধ্যে একটি। সে যে কি মনোহর বলা যায় না। পাহাড় প্রহরীরাও যেন কাজ ভুলে উদাসচোখে চেয়ে আছে চরণাশ্রিতা ঝিলমের নীল প্রণতির শোভাযাত্রায়। দুমেল পৌছলাম গোধূলিলগ্নে। তাই আরো ভালো লাগল।



ঝিলমে বজরা ও শঙ্করাচার্য্যের শিবমন্দির—কাশ্মীর

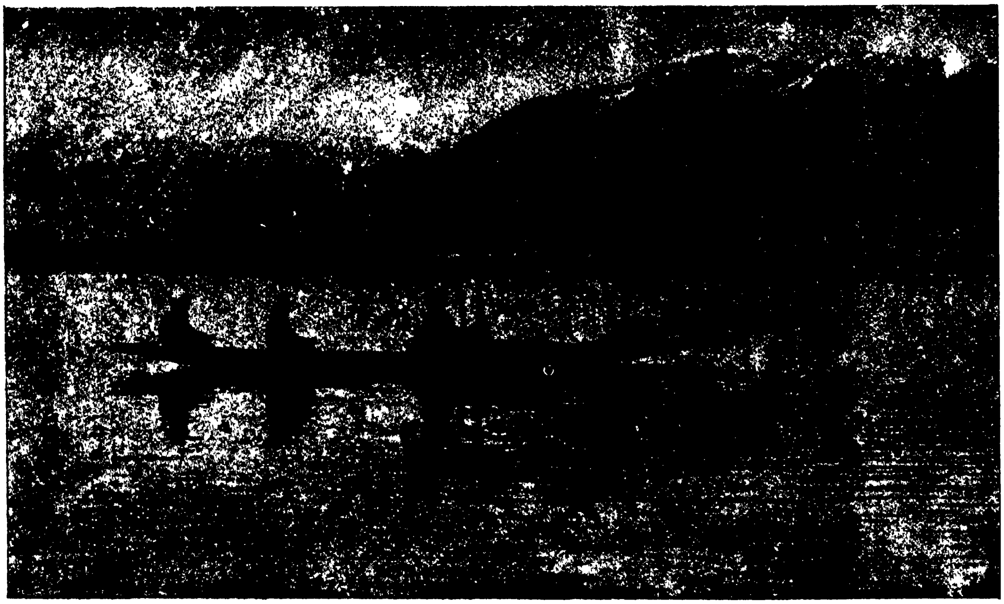
ডাক-বাংলোটিও মঞ্জু-স্নিগ্ধ—শান্ত-রসাস্পদ। পাহাড়ের একেবারে কোলে। তার প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেখা যায় তল দিয়ে অশ্রান্ত ঝর্ঝরে চলেছে নীলাঞ্চলা ঝিলম। আর সাম্‌নে পাহাড়ের ঢেউ চলেছে সরব রাগে নীরব তাল দিয়ে। ঠিক এখানে মিলেছে দুটি পাহাড়—মধ্যে ফাঁক। সেখানে প্রথমে উঠল একটি তারা—তারা তো নয়, সে যে—

অথবা শোনে বুঝি
নদী ধায় কি গান গেয়ে?
এ অচল শান্তি বিলায়:
ও উতল—মুখর লীলায়।
ওই চাঁদ উঠল ওদের
মিতালির নাচদুয়ারে
রূপালি সঙ্গতে মিড়
মেলাতে সুরবাহারে।
আঁখরে জলে স্থলে
জাগে এক অচিন মায়া!

অকায়া মন্ত্রময়ী
মরমে বিছায় ছায়া।
অদেখা দিল দেখা,
বেদনার রত্নশিখা।
পুলকের পরিমলে
জ্বালালো আরতিকা।
এ ডাকে নীহারিকায় :
ও সাজে দীপালিকায়।

* * * *

মুকুল, লক্ষীটি ভাই, রাগ কোরো না—গদ্যে পদ্য আনছি ব'লে। আমি এসব বিষয়ে কোনো প'ড়ে-পাওয়া রঙ রূপের সরঞ্জাম থাকলেও নেই পদ্যের সে লক্ষ্যসন্ধানী শক্তি—মানে ছন্দের যাদু। অন্নদাশঙ্করের কি একটা লেখায় সেদিন পড়লাম, ভারি চমৎকার লাগল : গদ্যে কবিত্ব হয়—কিন্তু কবিতা হয় না। কারণ কবিতার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে শুধু ছন্দের দোলা। মিলও এ-সৃজনের কাজে বড় কম যায় না—তবে কবিতার পক্ষে মিল অপরিহার্য নয়—কিন্তু ছন্দ অপরিহার্য্য। কারণ একমাত্র ছন্দের হাতেই আছে সে অনিবার্য গতিবেগ শব্দভেদী বাণ। গদ্যে কবিত্ব হয়—কিন্তু কবিতা না। অন্নদাশঙ্কর থেকে থেকে এক একটা মোক্ষম কথা বলে কিন্তু। শ্রীঅরবিন্দের "Future Poetry"-তে তাঁর একটি বাণী মনে পড়ে :



ঝিলমে শিকারা—কাশ্মীর

সমালোচকী কোড বিধিবিধান ডগমা মানি না। সত্যি বলতে কি, আমি জীবনে কিচ্ছু মানি না—শুধু এক দিশারি ছাড়া: আন্তরিকতা। তাই গদ্যের পদ্যানুবাদ করি জেনেও যে ক্রিটিকরা এতে ঠোঁট ফোলান—এ দস্তর নয় ব'লে। গদ্যে পদ্য মিশাই ও ঐ একই কারণে—ভালো লাগে ব'লে—আমার মনের ভাবপ্রকাশ শুধু এতে অব্যাহত ও স্বচ্ছন্দ হয় ব'লেনা—এ ভঙ্গি আমার কাছে রুচিকর ও সুন্দর মনে হয় ব'লে। তাছাড়া এর আরও একটা কারণ আছে: আমি মনে করি—ভাব যেখানেই গভীর হ'য়ে ওঠে সেখানেই সে ছন্দিত হ'য়ে ওঠে; কেন না গদ্যের হাতে

• Poetical speech is the spiritual excitement of a rhythmic voyage of selfdiscovery among the magic islands of form and name is these inner and outer worlds.

কবিতার বাণী ছন্দতরণী বাহিয়া চলে
আপনারে চায় নব নব ভায় লভিতে যে সে
কত না রূপের নামের দ্বীপ যে রসে উছলে
বাহিরে ভিতরে—ফুটাতে সে ধায় সুর-আবেশে।

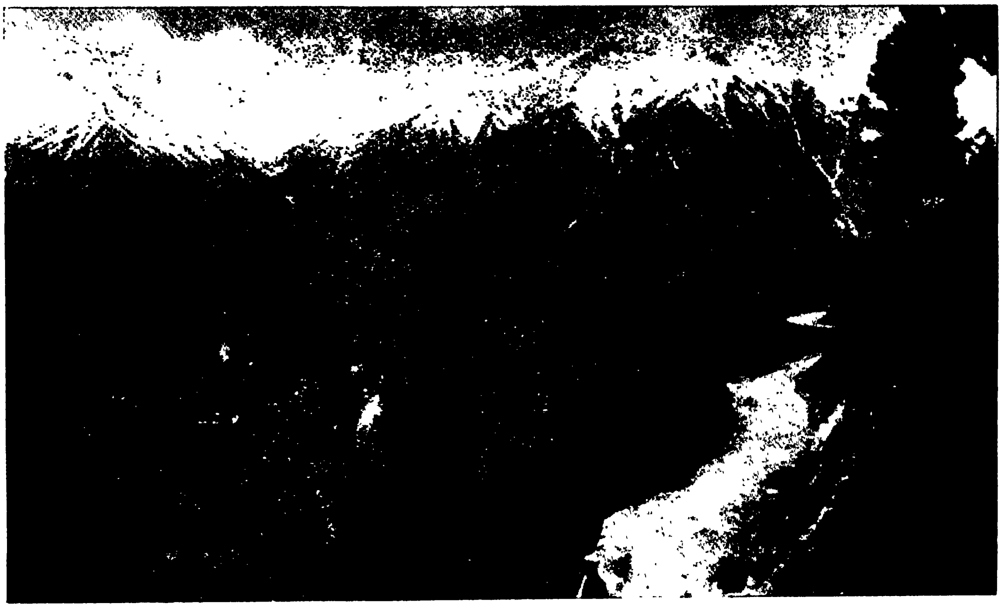
সৌন্দর্য্যের গভীরতম উপলব্ধিরা চিরপলাতক। কেবল ছন্দের ফাঁদে তারা থেকে থেকে ধরা দেয়—তাই ভাব

যেখানে নিটোল হ'য়ে ওঠে সেখানে ছন্দ ওঠে তেম্‌নি সহজে ফুলে যেমন বসন্তে ফুল, আনন্দে কৃতজ্ঞতা, ভক্তিতে প্রণাম।

*   *   *   *

পরদিন সকালে যখন আমরা বারোজনে তিনখানি মোটরে রওনা দিলাম, তখন সূর্য সোনার হাসিতে ঝলমল করে উঠেছে। চারিদিকে পাহাড়ের মালা—কিন্তু তুষার তখনো উঁকিঝুঁকি দিলেও ঘোমটা খোলেনি। ঝিলম চলেছে সাথে সাথে। পাহাড়ের রঙ কোথাও লালচে, কোথাও ছায়াভ, কোথাও ধূসর, কোথাও বা সবুজ। যত উঠি ঝিলম স'রে যায় দূরে—কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে না। কখনো বাঁ দিকে, কখনো ডাইনে চলেছে নীলবসনা চঞ্চলা স্বপ্নের নূপুরে বিশেষ ক'রে তার ব্যাপ্তিতে ও বিপুল তুষার-মহিমায়। তাছাড়া এত জম্‌কালো শৈলমালা এমন গম্ভীর মহিমায় শান্ত্রীর মতন দাঁড়িয়ে থাকতে আর কোথাও দেখি নি। কিন্তু দার্জিলিঙও কাশ্মীরের তুলনায় একঘেয়ে—সে যে জানে না variety is the spice of life.

কাশ্মীরের পথে আর একটা জিনিষ বড় তৃপ্তি দেয়। পার্বত্য নগরীর গিরিবেষ্টনী আমাদের মতন নদীবিলাসী মানুষের কাছে কিছুদিন যেতে না যেতে যেন অজীর্ণ আনে। আমরা—বিশেষ বাঙালি জাত—সত্যি ভালোবাসি নদী। কোনো জনপদ হাজার সুফলা হোক না কেন, সুজলা না হ'লে আমাদের মনে মানে না মানা। নদীর আদর স্নেহ-



গুলমার্গ—কাশ্মীর

রত্নের বোল বাজিয়ে। সুইৎজর্লাণ্ড জারমাট্‌-এ (Zermatt) উঠবার সময়ে এম্‌নি একটি স্রোতস্বিনীর কথা মনে পড়ল—কিন্তু সে এত দীর্ঘকায়া ছিল না। কালিম্পঙের পথে তিস্তা? হ্যাঁ—তবে তিস্তা আরো সুন্দর। সত্যি বলতে কি, যদি পাহাড়ে নদীর সৌন্দর্য একলা দাঁড়ায় তবে তিস্তার মতন সুন্দরী আর নেই ভূভারতে। তবে কাশ্মীরের পাহাড় যে নিজে এসে যোগ দিয়েছে ঝিলমের সঙ্গে। কাজেই সব জড়িয়ে কালিম্পঙ ম্লান হ'য়ে গেল। সে-বেচারি কোথায় পাবে এত বৈচিত্র্য, এ-বিস্তার, এমন উদারতা! দার্জিলিঙ? হ্যাঁ দার্জিলিঙ একদিক দিয়ে অতুলনীয় বটে—কাকলি, জোয়ার-ভাঁটা—এসবের ছন্দ আমাদের ঘরোয়া জীবনের ছন্দের সঙ্গে মেলে। তাকে আঁকড়ে পাই কি না। পাহাড় সম্ভ্রম জাগায়, আবিষ্ট করে, কিন্তু কাছে ডাকে কই?

নদী বলে : ওরে হিয়া, তোরি তরে গাথি আমি জলমালা।
গিরি বলে : মোর নয়নশিখায় ধেয়ান-প্রদীপ জ্বালা॥
নদী বলে : আমি প্রাণময়ী, তাই ভালোবাসি মর-প্রাণ।
গিরি বলে : আমি সুচিরের সাথী—শক্তি আমার দান॥
নদী বলে : আমি কভু হাসি হিয়া, কভু কাঁদি ফুলে ফুলে।
বিরহে মিলন-মোহানায় ধাই তোরি ম'ত দুলে দুলে॥

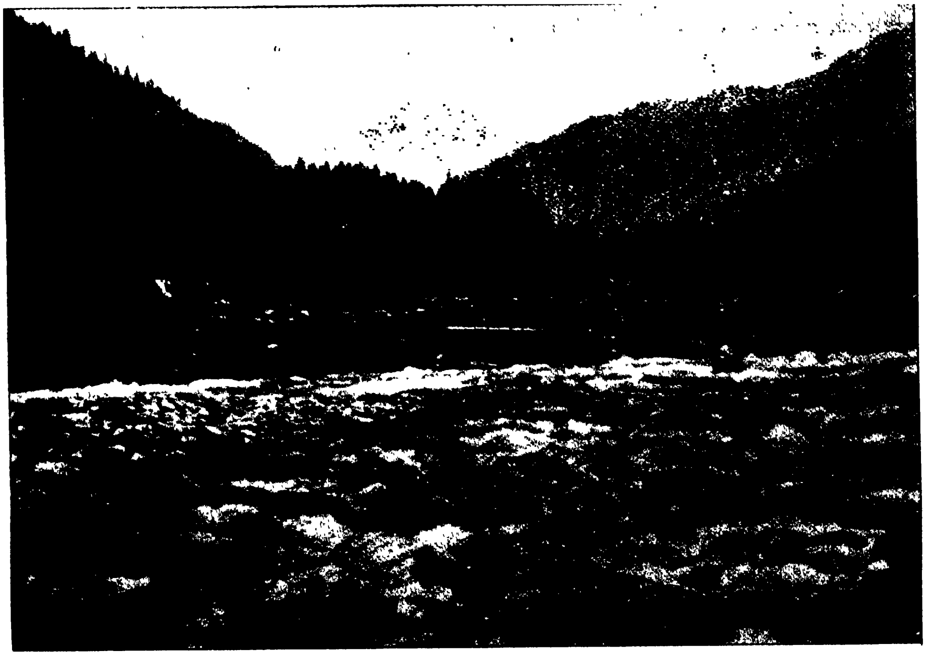
গিরি বলে : মোর শান্তি-শিখর কামনা-ভ্রান্তিহারা।
শুধু তারে দেই বর—যে চাহে না ধ্বনির ধূমল কারা॥
নদী বলে : আমি মৃণ্ময়ী, গানগতি শুধু মোর বাণী।
গিরি বলে : স্থিতি-ওঙ্কারে আমি অম্বর-অভিমানী॥

কাশ্মীর ভালো লাগে আরো এইজন্যে যে, এখানে প্রকৃতির সব বিভাব সব ছন্দ পাওয়া যায় অজস্র সমারোহে। পাহাড় পর্বত গাছপালা নদী হ্রদ ফল ফুল পাখি তুষার—কি নেই এখানে?

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লাগে এ পার্বত্য রাজ্যের প্রসারে। শ্রীনগরের কাছাকাছি আসতে না আসতে চলেছে সমতল ধ'রে আছে। পাহাড়ের তুঙ্গতা চাইলে এখানেও পাওয়া যায়, কিন্তু সমতল বিস্তারই হ'ল পার্বত্য কাশ্মীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এমন বহুদূর বিস্তীর্ণ সোজা চড়াই-উৎরাই-হীন রাস্তা অন্য কোনো পার্বত্য নগরে বা উপত্যকায় দেখিনি—না এদেশে, না ওদেশে।

*　　*

শ্রীনগর পৌছতে বেলা আড়াইটে। ধর্মবীর তার করেছিলেন ওখানে রাজভিষক কর্ণেল চুনিচাঁদকে। ধর্মবীরের বিবাহ দিয়েছিলেন ইনি লণ্ডনে। শুনেছিলাম চমৎকার লোক, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হ'ল পিতৃদেবের



ঝুমেল ও ঝিলম

রাস্তা যোজনের পরে যোজন। পাহাড়ের গাম্ভীর্য বনের গালপাট্টা প'রে সিপাইয়ের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে সমানে, অথচ পথিক নজরবন্দী হ'য়েও মুক্ত—যেধারে চায় পারে উধাও হ'তে। পার্বত্য প্রদেশে প্রায়ই নিশ্বাস আটকে আসে এই পাহাড়ের পাহারায়। এখানে পাহাড় যেন—কি বলব—শাসক বটে, কিন্তু সে শাসন প্রেমের। ঘিরে আছে অথচ শৃঙ্খল দিয়ে না—পাখা দিয়ে। সে-পাখাও স'রে স'রে যায়—অথচ আশ্বাস দেয় যে পড়তে দেবে না। মা যেন—হাঁটি হাঁটি পা পা করায়—অথচ বুঝতে দেয় না, আলগোছে দিলীরখাঁর কথা : "দুর্গাদাস, জানতাম তুমি মহৎ, কিন্তু এত মহৎ তা ভাবিনি।" লীলা তো তাঁকে দেখে মুগ্ধ—ছড়া কাটে আর কি :

বাঁশি শুনি' তব লাহোরে, ভাবি নি হে চিরস্মরণীয়।
পরোপকারের তরে তুমি ধরো তনু, ওগো কমনীয়!
কত না পথিক আসে হেথা হায় বজরা-বিহার আশে
কাণ্ডারী তুমি, তাই তো তোমারে প্রতি নর ভালোবাসে।
নারী ভালোবাসে তোমারে, কারণ বদান্য তব প্রাণ :
শাড়ী, দুল, হার কে না দিতেপারে?—শুধু তুমি দাও পান।

সত্যি মুকুল, দুনিচাঁদ বদান্য সন্দেহ নেই: শুধু লীলার পান নয়—আমাদের বজরা ঠিক ক'রে দিলেন ঐ দুপুর রোদে—সব দরদস্তুর করলেন একাই—এই অশীতিপর বৃদ্ধ চক্ষের নিমেষে সে যে কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ক'রে ফেললেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না। সব বলা সম্ভবও হবে না, তবে জেনে রাখো যে, অমন যে ধরণীদা, তাঁকেও সাবাস দিতে হ'ল; মানতে হ'ল যে, "when a Greek meets a Greek then there is tug-of-war," কিন্তু দুনিচাঁদ অত্র নিজের খাসতালুকে দেদীপ্যমান, কাজেই ধরণীদাকে তাঁর সঙ্গে তুলনা অনুচিত হবে। তুলনা করা আমার উদ্দেশ্যও নয়। (শেক্সপীয়রের বিখ্যাত ডগবেরি কি বলেন নি যে, "comparisons are odorous?") না, ধরণীদাও দুনিচাঁদদা উভয়েই আমাদের নমস্য—তবে দুনিচাঁদদাকে একটু বেশি প্রশংসা করলে অন্যায় হবে না, যেহেতু তিনি এত বৃদ্ধ যে তাঁকে দিয়ে দুটো বৃদ্ধ হয়।

এ হেন দুনিচাঁদদা ঠিক ক'রে দিলেন আমাদের দুটি বেশ সুন্দর বজরা। একটিতে আমি মায়া মানুদা ও এষা, অন্যটিতে ধরণীদারা আটজন। বজরা দুটি বাঁধা থাকত ঘাটেই পাশাপাশি—জল-বিহার করতে হ'লে শিকারা মানে গদিওয়ালা চমৎকার কাশ্মীরী গণ্ডোলা, স্থলবিহার করতে হ'লে বাস, শারাবান্স বা মোটর। এই তো ব্যবস্থা। খাওয়াবে দাওয়াবে অবশ্য বজরাওয়ালারাই—দুই জনেই মুসলমান মিঞা। দুনিচাঁদের কৃপায় আমরা খুব ভালো কমিসারিয়েট পেয়েছিলাম। খাওয়াত সত্যিই ভালো—গরম জল, সেবা শুশ্রূষা, আদর যত্ন—পরমানন্দে ছিলাম ওদের হেফাজতে। আর ওদের কথাও এত মিষ্ট—তেমনি কি ভদ্র চেহারা!

* * * *

বজরায় মালপত্র নিয়ে উঠতে না উঠতে লীলা, হাসি ও এষা তুমুলকাণ্ড ক'রে তুলল।

হাসি বলে: আমি শুধু গেয়ে যাব গান।
এষা বলে: আমি শুধু নেচে যাই।
লীলা বলে: দাও আরো দু'হাজার পান।
আহ্লাদে আমি শুধু সেজে খাই।

কিন্তু হায় রে, এত সুখ সইল না। আমাদের বজরা থেকে ওদের বজরায় লাফাতে গিয়ে লীলা ভূমিতলে পপাত। ছোট্ট ছোট্ট। সঙ্কটতারণ দুনিচাঁদ এলেন পদসেবা করতে। দুদিন আমাদের বেড়ানো বন্ধ রইল বটে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ মিলল অশীতিপরের এই রোম্যান্টিক উৎসাহ দেখে মানুদা লীলাকে রোজ যা বলত তার মর্মার্থ:



ডালহ্রদ ও শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়

রূপার চামচটি ধরি' যে-দেবী মুখে জনমে লীলা-সুখে ভুবনে
প'ড়েও ফুল হ'য়ে ফোটে, উধাও ছোটে
অশীতিপরও লোটে চরণে।

লীলা কিন্তু জানত যাদু। ঐ অশীতিপর রাজর্ষিধককে এমন পটিয়ে নিল যে, দেখতে দেখতে বস্তা বস্তা পান এসে হাজির! লীলা ছিল আমাদের আনন্দকেন্দ্র। কাজেই দেখতে দেখতে তার আনন্দ ঠিকরে বেরুতে লাগল সবাইয়ের মধ্যে দিয়ে—যদিও আধার ভেদে খুশির প্রকারভেদ হ'ল রকম রকম। যথা, মানুদা বলল: "রাঁধতে হবে।" মামা বললেন: "বেড়াতে হবে।" ধরণীদা বললেন: "মোটরের

জোগাড় দেখতে হবে।" মায়া বলল: "লেপ মুড়ি দিতে হবে।" রুণু বলল: "বাঃ!" প্রভাদি বললেন: "ও।"

হাসি বলল: "কী কাণ্ড ভাই এষা!"

এষা বলল: "যা বলেছ ভাই। নয় বাবুল?"

(বাবুল হাসির ভাই, খুব রসিক) বাবুল বলল: "ছেলেমানুষদের সবই ভালো লাগে" (বাবুলের বয়স তের)! মায়া বলল: "এর নাম কাশ্মীর?" (মায়ার কাশ্মীর ভালো লাগে নি।) আমি খাতা পেন্সিল বার ক'রে বজরার উপর বসবার প্রস্তাব করলাম। লীলা বলল: "না না, এখন নয় ভাই। আগে দুটো পান।" প্রভাদি বললেন: "ও।"

ভারি জ'মে উঠল পরদিন। সারাদিন এখানে ওখানে যখন তখন বেরিয়ে পড়া শিকারায়, আর সন্ধ্যায় শ্রীমতী হাসির গানের তালে এষার নাচ। সঙ্গে লীলার তাম্বুল-প্রসাধন ও মানুদার তব্‌লাসঙ্গত।

কিন্তু অকস্মাৎ বিনা নোটিসে গগনে গরজে মেঘ—কি যে বরষা! দিন তিনেক আর বেরুতে দেয় না। প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। প্রথম দুদিন মন্দ লাগে নি। নৌকায় বৃষ্টির শোভা—অপূর্ব! কিন্তু বৃষ্টি একটু কায়েম হ'তে না হ'তে যা শীত পড়ল যে হাড়ের মধ্যে ধরল কাঁপুনি। দশ বৎসর শীতের সঙ্গে মোলাকাৎ নেই—পারি কখনো? মেঘমল্লার ছেড়ে বিষাদের গান ধরলাম। কোথাও যাওয়াও হয় না ছাই—নৌকায় বন্দী—আঃ, উঃ, ইঃ। সবাই খিটখিটে হ'য়ে উঠল। মামা বেড়াতে পান না, হাসি গান গায় না, এষা নাচে না। একা লীলা শুধু পান খেয়ে আর কত সাম্‌লাবে?

এমন সময়ে থাম্‌ল বৃষ্টি। আকাশে বেজে উঠল সূর্যের তূর্য। আমরা বজরা ভিড়িয়েছিলাম মুন্সিঘাট, না, অম্‌নিধারা কি একটা গালভরা নামওয়ালা ঘাটে। কাছেই দুনিচাঁদের বাড়ি, আর সাম্‌নেই শঙ্করাচার্য পাহাড়ের ওপর শিবমন্দির। কি চমৎকার যে লাগত ঐ পাহাড়টি মুকুল! আর এধারে ঝিলমের তট দিয়ে রাস্তা চলেছে এঁকে বেঁকে—কারণ ঝিলম হ'ল একটি অষ্টাবক্র মুনি—সোজা পথ ভালোবাসেন না। ঘুরতে ঘুরতে ওর মাথাও ঘোরে না ছাই, এঁকতে বেঁকতে শিরদাঁড়াও যায় না ভেঙে?



ঝিলম ও বজরা

কিন্তু মুকুল, সংসারে সোজা পথ সুন্দর হ'লেও নদীর পক্ষে বেঁকা পথই বেশি ভালো। ঝিলম প্রতিপদে বাঁক না নিলে তার এমন শোভা হ'ত না। ঐ দেখ আবার—সরলতাও সবার পক্ষে ভালো না—নদীর পক্ষে "বেঁকালো" তাই ভালো। ঝিলমের তট দিয়ে চলতে তাই তো ক্লান্তি আসে না: প্রতি পদেই নতুন মোড় আসে আর নতুন নতুন দৃশ্য! ঠিক যেন পট-পরিবর্তন হ'তে থাকে প্রতি মুহূর্তে—ঘোরানো নাটমঞ্চে। এখানে পপ্‌লারের বীথি, ওখানে চেনার গাছের জটলা, সেখানে আকস্মিক তুষার-মালার দৃশ্য। আবার ও কি—ঐ শঙ্করাচার্যের পাহাড় ছিল ডান দিকে, হঠাৎ বাঁ দিকে এল কি ক'রে গো!

ঝিলমকে অনেক সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ মানুষ কিন্তু ভালোবাসেন না—কেন জানি না। একজন ভদ্রলোক ভেনিসে গিয়ে লিখেছিলেন ভেনিস কোথায় সুন্দর! আমার এক আত্মীয়া কাশ্মীরে এসেই ঝিলমের ময়লা জল দেখে দে দৌড়। ইনি নব্যা।

আমি বুঝতে পারি না এ ধরণের মনোবৃত্তি। কাশ্মীরে

ঝিলমের জল অবশ্য সুপেয় নয়—ব্যবহার্যও নয়, কেন না, শহরের ড্রেন হ'ল ঝিলম। কিন্তু শহর থেকে একটু দূরে বজরা রাখলেই জল স্বচ্ছ না হোক, মলিন দেখায় না। কিন্তু ঝিলমের জলের স্বাস্থ্য-মূল্য যেমনই হোক না কেন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকে সমার্থক মনে করার এ রীতি হ'ল আমেরিকান। ওদের মতে রূপশ্রী হ'ল পরিচ্ছন্নতা। ওদের যতই বোঝাও, ওদের মাথায় ঢুকবে না যে হাইজীন ও বিউটি এক বস্তু নয়। ঝিলমের জল সুপেয় নয় ব'লেই যে সে সুন্দর নয়, এ ওদের কাছে স্বতঃসিদ্ধের মতন সত্য। চিল্কা হ্রদের বাষ্প ম্যালেরিয়ায় ভরা। একবার সেখান থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরেছিলাম আমি বছর বারো আগে। কিন্তু তবু সে চিল্কা-বিহারের স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। অমন সুন্দর হ্রদ জগতে কমই দেখেছি। ঝিলমের দিকে যখন সকাল-সন্ধ্যা চেয়ে থাকতাম, তখন কই, একবারও তো আমার মনে প্রশ্ন ওঠে নি এ-জলে মাইক্রোব আছে কি-না? ঝিলমের জল খেতে বলি না। কিন্তু ঝিলমের জল সুস্বাদু নয় ব'লে ঝিলম অসুন্দর—লোকে বলে কি ক'রে? পক্ষান্তরে হাজার হাজার হাসপাতাল স্যানিটোরিয়াম একেবারে স্বাস্থ্যে ঠাসা। তাই ব'লে কি সে সব পরিপাটি খাঁচাকে বলতে হবে নন্দনকানন? জীবনে রূপশ্রী হ'ল খামখেয়ালি—অজ্ঞাতকুলশীল—স্বয়ংসিদ্ধ—কোনো শুভবাদ বা প্রয়োজনবাদেরই সে তোয়াক্কা রাখে না। সে বলে :

বিস্ময় শুধু আমার মন্ত্র, কুলশীলে মোর তৃষ্ণা নাহি!
স্বৈরাচারিণী দুরাশিনী আমি—আপন পুলকে তরণী বাহি।
কারো সাথে নাই মিতালি আমার, নিরাপদে হায়
আমি না চিনি।
শুভ যদি চাও আমারে বিদাও, আমি যে উধাও বিদ্রোহিণী।
নীতির নিলয়ে বাঁধি না তো বাসা, চাহি না রীতির
ধ্রুববিহারে।
ক্ষতি-কিঙ্কিণি চরণে বাজায়ে ধাই অক্ষতি-নাচ দুয়ারে।
ছলকি ঝলকি' আলোক-মুকুরে আপনি নৃত্য নিরখি' আমি
চলি চিরদিন ছন্দবিভোরা দলি' সুখদুখ দিবসযামী।

যেখানে আমরা নৌকা বেঁধেছিলাম—তার এপারে পপ্‌লারের লাইন, ওপারে চেনার গাছের জটলা। ডান দিকে রক্ত নীলাভ শঙ্করাচার্য পাহাড়ের উপরে শিবমন্দির ঝিক ঝিক করে রাতে—ধার দিয়ে ধার দিয়ে বিজলী লণ্ঠন চলেছে, এঁকে বেঁকে—মন্দিরের পথ দেখিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে আশ মেটে না। গভীর রাতে উঠেও বার বারই দেখতাম চেয়ে। কখনো মন্দিরটা মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে কখনো বা আরো জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছে। ওধারে এক রাশ পাহাড় বরফের কম্বল মুড়ি দিয়ে দিবানিশি আকাশের দিকে চেয়ে কি যে স্বপ্ন দেখে! কত শিকারা চলে দিনরাত! নৌকায় পসারীরা আনে কত রকম যে সুন্দর সুন্দর জিনিষ—কৌটো, দুল, শালদোশালা, ছড়ি, কাঠের আসবাব—কত কি! স্বপ্নের মতন লাগে! মনে পড়ে বিখ্যাত আইরিশ কবি এ-ই-র একটি অপূর্ব কবিতা, কয়েক বছর আগে তিনি লিখেছিলেন মৃত্যুর পূর্বে।

মৃদুল কণ্ঠে ধরণীরে ডাকি' কহি :
"শেষ বিদায়ের এসেছে সময় আজি।"
সে-মোহিনী আরো মৃদুল মন্ত্র বহি'
বাঁধে মোরে এ কি অপরূপ রূপে সাজি'!

যে-সুষমা ছিল অধরা আমার কাছে,
পাই নি যে-প্রীতি চাহিয়াও প্রাণপুরে,
সেই শিখরিণী গরবিণী বাঁশি বাজে
নিরভিমানিনী স্নেহ বিগলিত সুরে :

ধেয়ানে আমার ঝলকিয়া ওঠে তারা
চাহনিতে জ্বালি' কত কি অঙ্গীকার!
আপন মাধুরী-আবেশে আপনহারা :
দিন-রজনীর উন্মাদ উপহার।

"মোরি মধুকোষে সুচিরের সন্ধান,
জীবননিশাস আলেয়া-অলীক যদি,
আপনার সবি নিঃশেষে দিলে দান
মরণে বহি হয় প্রেম—নিরবধি।

"এ-দীপদীক্ষা দিনু তোরে অমলিন
জ্বলিবে সে তোরি অন্তর তৃষাতলে :
স্বরগের রাজধানী হ'তে যতদিন
না ফিরিবি মোর ধরার ধুলারি কোলে!"

Now as I lean to whisper
To earth the last farewells,
The sly witch lays upon me
The subtlest of her spells :

Beauty that was not for me,
The love that was denied,
Their high disdainful sweetness
Now melted from their pride :

They run to me in vision,
All promise in their gaze,
All earth's heart-choking magic,
Madness of nights and days.

"These gifts are in my treasure.
Though fleeting be the breath ;
Here only to wild giving
Is love made fire by death.

"This spell I put upon thee
Must in thy being burn,
Till from the Heavenly City
To me thou shalt return."

ইতি স্নেহার্থী দিলীপদা

সহযাত্রী

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত বি, এস-সি

শনিবার। ডেলী প্যাসেঞ্জারী করি। বত্রিশ বছর বয়েস হ'লেও দেখে চল্লিশের ওপর না ব'লে কোন উপায় নেই। জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, আজও যে মাঝে মাঝে মনের ফাঁকে ফাঁকে লটারীর টিকিটের কথা মনে না পড়ে এমন নয়। কিন্তু সে মনে পড়ার সঙ্গে গত জীবনের মনে পড়ার তফাৎ অনেকখানি। শনিবার অফিস একটু সকাল সকালই ছুটি হয়। হাতে যেটুকু সময় থাকে তা কিন্তু আলস্য অথবা দুটো আনন্দদায়ক ভাবনা ভেবে কাটিয়ে দেবার উপায় নেই। কলকাতার বাজারে বাজারে ঘুরে সামান্য দু-একটা জিনিস না কিনলেও চলে না। সপ্তাহের ছ'টা দিনের মুখের-বিস্বাদ কাটাতে সন্ধ্যার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব তা করতেই হয়। তাই বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে গাড়ীর সময় হ'য়ে ওঠে—শেষ পর্য্যন্ত হাওড়ার পোলের ওপর দিয়ে মোট হাতে নিয়ে ছুটোছুটিও করতে হয়।

আজও হয়েছিল তাই। হাওড়ার পোলের ওপর উঠেই ওদিকের ষ্টেসনের বড় ঘড়িটার দিকে কড়া নজর দিয়ে কয়েক পা এগোতে না এগোতেই মহাবিভ্রাটে পড়ে যাই। কোথা থেকে একটা কুলী দৌড়ে এসে আমার হাতের বোঝাটা নিয়ে টানাটানি সুরু ক'রে দেয়। বোঝাটা ভারী ছিল খুবই—আমার শীর্ণ দেহ ধনুকের আকার গ্রহণ করেছিল জানি, কিন্তু এও জানা ছিল যে, কুলীর পয়সা দেওয়া আমাদের চলে না। কিন্তু কুলীটা অতশত বোঝে না—বুঝলেও তার চলে না।—আমার হাত থেকে বোঝাটা টেনে নেবার তার সে কি আগ্রহ। কিন্তু সেটা হাতছাড়া করবারও আমার ইচ্ছা ছিল না। তাই অনেক কষ্টে যখন তার হাত থেকে রেহাই পাই, তখন আমার হাঁপ ধ'রে গেছে। কিন্তু জিরোবারও সময় নেই। পাশ দিয়ে আমারই সহযাত্রীরা যেন বন্যার স্রোতের মত এগিয়ে চলেছে। গাড়ী বোধ করি বা ছেড়েই দেয়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই।

ষ্টেসনে এসে দেখি গাড়ী ছাড়বার উদ্যোগ করছে। ভাগ্যে আমাদের রেল কোম্পানীর সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত! প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়ি। গাড়ীগুলোর দরজা আগলে ভদ্রলোকেরা রীতিমত পাহারা দিতে লেগে গেছেন—ওর মধ্যে মাথা গলায় কার সাধ্য? অনুরোধে ফল হয় না—ছুটোছুটি ক'রেও নয়।

গাড়ী চলতে সুরু ক'রে দেয়। আর দেরী করা চলে না। বাড়ীতে যারা আমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে, একে একে তাদের প্রত্যেকের মুখ মনে পড়ে। ঘণ্টা দু-তিন নষ্ট করা চলে না। চলতি গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায় উঠে পড়ি। একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে একধারে—ব'সে থাকি। এ আমার নিজস্ব স্থান নয়—পাশের বেঞ্চে যে দু'টি যুবক সাহেবী পোষাক প'রে ব'সে আছে, এ তাদেরই স্থান বুঝে তাদের মাঝে নিজেকে যেন নিতান্ত বেমানান মনে হয়। কিন্তু আর উপায়ও নেই—গাড়ী চলতে সুরু করেছে। পরের ষ্টেসনেই নেমে প'ড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচব একথা মনে ক'রে কতকটা শান্ত হই।

চশমাধারী যুবকটি বন্ধুর দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা অরুণ, তোর বাগানবাড়ী ষ্টেসন থেকে কত দূর? দেখিস্, বেশ আরাম পাওয়া যাবে ত এ দুটো দিন?

অরুণ বলে, তুই ভাবছিস্ কেন বিকাশ? আমাকে কি বোকা ভেবেছিস্ নাকি—না, আমার কোন পছন্দই নেই? কি চাই সেখানে?

ষ্টেসনে গাড়ী থাকবে—একেবারে গঙ্গার ধারে যেতে হবে আমাদের। চমৎকার জায়গাটা—তোর ফেরবার ইচ্ছেই হবে না। বেয়ারাগুলোও একেবারে কেতাদুরস্ত। কখন কি দরকার তা তাদের ব'লে দিতে হয় না।

বিকাশ বলে, আচ্ছা যদি সত্যি ভাল লাগে ত ফের আর একবার আসা যাবে—মিস্ রায়কেও নিয়ে আসব'খন। এবারেই আনতুম, কিন্তু অসুস্থ। মেয়েদের সব ভাল, কিন্তু এই অসুখটাই বড় বিশ্রী—আমাদের যখন দরকার ওরা তখন বিছানায় প'ড়ে থাকে।

অরুণ ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে, ভাল কথা, মিস্ রায়কে নিয়ে যে তোর মোটর টুরে যাবার কথা ছিল তার কি হ'ল ?

বিকাশ হাসে, বলে, জানিস্ দেখছি। হ্যাঁ, ও খুব ধরেছে—একসঙ্গে কাশ্মীর যেতে চায়, আমারও আপত্তি নেই। ওর মত মেয়ে সঙ্গে থাকলে টুরটা খুবই উপভোগ্য হবে ; কিন্তু একটা নূতন গাড়ী কিনে নেব তার আগে, বেশ হাল্‌কা হওয়া চাই আমাদের মনের মতই।

ওদের কথা শুনতে শুনতে দুটা ষ্টেসন পার হ'য়ে যায়। বাইরের দিকে নজর ছিল না, নজর ছিল ওদের প্রদীপ্ত মুখের দিকে। আমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট কিন্তু তফাৎ যেন আকাশ পাতাল। আর একটা ষ্টেসনে এসে গাড়ী থামে।

অরুণ হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে, আপনার কি সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট নাকি ?

আমার চমক ভেঙ্গে যায়। মোটটাকে হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাই। পেছনে শুনতে পাই বিকাশের কথা। ও বলে, এই আমাদের বাঙালী জাত, ছোঃ। এই জন্যেই ত ওদের পোষাকটা পর্য্যন্ত আমি ঘৃণা করি। ফাঁকি দিয়ে যেটুকু পায় আর কি। চেকার ডেকে এদের ধরিয়ে দেওয়াই উচিত—পয়সা নেই, তবু সখ আছে ষোল আনা।—

ওদের কথা আর শুনতে চাই না—আমাদের নিজস্ব তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো এরই মধ্যে একটু হাল্‌কা হ'য়ে গেছে—তারই একটাতে আশ্রয় নেই। গাড়ী আবার চলতে থাকে।

এখানকার অনেককেই আমি চিনি। রোজকার সঙ্গী আমার। ওদের ঘরের দু-চারটে কথাও যে না জানি এমন নয়, আমার চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়। বয়েসের পার্থক্য থাকলেও অবস্থার পার্থক্য না থাকায় আমরা সবাই সমবয়সী ব'লেই চলে যাই।

প্রৌঢ় হারাণবাবু জিজ্ঞাসা করেন, এতক্ষণ ছিলে কোথায় হে অবিনাশ ? মুখের ওপর দিয়ে একটা ক্ষীণ হাসি খেলে যায় ; বলি, স্বর্গে। কিন্তু সত্যি বলছি ঘোষ মশায়, শেষ পর্য্যন্ত জায়গাটা বরদাস্ত হ'ল না—আমাদের ভূতলই ভাল, কি বলেন ?

হেসে উঠে হারাণবাবু বলেন, একশো বার ভায়া, একশো বার। আজ বড়বাবুর সঙ্গে ওই কথাই হচ্ছিল। তিনি বললেন, ওহে, মেয়েটার যখন একটু বাড়াবাড়িই চলছে, তখন কদিন ছুটি নিয়ে ফেল না। কিন্তু তাই কি পারি ভায়া—ছুটি নিতে গিয়ে শেষকালে কি সাহেবের সুনজরে প'ড়ে চিরকালের জন্যেই ও বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে নাকি ? ঘানিতে ঘুরছি ত অনেক দিন থেকেই, হট্ বললেই কি থামতে পারি ? দুঃখ নিয়েই ত আমাদের কারবার, সুখের কথা ভাববার কি অধিকার বল দেখি ! মেয়েটার বাড়াবাড়ি, ছেলেটার পেটের ব্যারাম, গিন্নীর মাথাধরা, এ ত রোজকার ব্যাপার হে।

বলি, মেয়ের অসুখ কি এক বেড়ে উঠেছে নাকি ?

তেমনি হাসি হেসেই হারাণবাবু বলেন, হ্যাঁ, তবে আর কটা দিন বাদেই বোধ হয় অসুখ আর থাকবে না। মেয়েটার বড় সখ ছিল কলকাতায় এসে একবার ট্রাম গাড়ী দেখবে—তা ও দেখবে এর পরের জন্মে, কি বল ভায়া ? শাস্ত্রে আছে জান ত, মরবার সময় যে মায়া নিয়ে মানুষ মরে সে-মায়ার টানেই আবার ফিরে আসে। এর পর ও কলকাতাতেই জন্মাবে, এইটুকু আমার ভরসা।

আমি চুপ ক'রে তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকি। আমার অনেক আগে থেকেই আমার মত জোয়াল কাঁধে ক'রে নিয়েছেন উনি। আজ দয়া মায়া ব'লে কিছুই যেন ওখানে অস্তিত্ব নেই। আমারও ওই অবস্থাই হয় ত হবে—মনে মনে শিউরে উঠি। স্ত্রী, পুত্র পরিবারের কাউকেই সুখী করতে পারিনি, পারবও না—কিন্তু তাই ব'লে এমন এক দিন কি সত্যিই আসবে যেদিন তাদের কথা একটু স্নেহ মমতার সঙ্গে ভাবতেও পারব না ?

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হারাণবাবু মুখ ফিরিয়ে একজনকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেন, অমন চুপ ক'রে ব'সে থেকে লাভ কি কালিদাস, দুদিন আগে কোলের ছেলেটা মারা গেছে, বাড়ী গেলেই স্ত্রীর কান্না শুনতে হয় এই ত ? কিছুই শেখনি হে এত দিনে, ভগবানের ওপর বরাত দিতে জান না বুঝি ? ভগবান লোকটা মন্দ নয়, বুঝলে ? ছেলেটা বেঁচে থেকেই বা করত কি ? ওর মঙ্গলের পথই ত ও দেখে নিয়েছে—আপত্তির কি আছে তোমার ?

গাড়ী এসে থামে একটা ষ্টেসনে। কেউ কেউ নেমে যায়। ছোট্ট সুটকেশ হাতে শীর্ণ দেহ একটি লোক উঠে আসে আমাদের কামরায়—ছেঁড়া কেড্‌স্ পায়ে, মাথার চুলে তেল নেই, চিরুণীও পড়েনি অনেক দিন। একটু জিরিয়ে নিয়ে দু বার জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে সে সাধ্যমত চীৎকার ক'রে বলতে থাকে, কাঞ্চননগরের ছুরী কাঁচি নিতে পারেন, ছোট ছোট ছেলেদের জন্য বাগেরহাটের হাফ-প্যাণ্ট ; তারপর একটু দম নিয়ে আবার বলতে সুরু করে, ছ আনার প্রমাণ-সাইজের স্যাণ্ডেল আছে—চমৎকার টেঁকসই, হালফ্যাসানের—

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কালিদাসবাবু চীৎকার ক'রে ওঠেন, থাম হে বাপু, থাম, ওসব চাইনে আমাদের। ভালই যদি সব ত নিজের জন্যেই নিয়ে যাও। যত সব—এদের জেল হওয়া উচিত।

কালিদাসবাবুর চীৎকারে লোকটি ভয় পেয়ে যায়, সঙ্কুচিতভাবে একধারে দাঁড়িয়ে থাকে।

হারাণবাবু ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডেকে বসতে বলেন। লোকটি নিতান্ত বিস্মিত হ'য়ে ব'সে পড়ে। একটু চুপ ক'রে থেকে ওর মুখের

দিকে চেয়ে হারাণবাবু হেসে বলেন, বাড়ীতে কে কে আছে? রোজ খাওয়া হয় ত? এতে কি কিছু উপায় হয়?

লোকটি মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকে—চোথ দিয়ে তার টপ্ টপ্ ক'রে জল ঝ'রে পড়ে হাতের স্যুটকেশের ওপর।

আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে হারাণবাবু বলেন, সবারই এক অবস্থা, বুঝলে ভায়া? একঘেয়ে জগতের একঘেয়ে কথা।

পরের ষ্টেসনে গাড়ী এসে থামে। হারাণবাবু উঠে পড়েন, বলেন, আসি ভায়া—কালকের দিনটা গাড়ীর এ আনন্দটুকু আর পাব না। তারপর সেই লোকটির দিকে ফিরে বলেন, তুমিও নেমে পড়, পাশের গাড়ীতে ত যেতে হবে তোমায়—ব'সে থাকলে কি চলে?

হারাণবাবু নেমে যান—লোকটীও উঠে পড়ে।

কবি কৃত্তিবাস স্মরণে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিস্মৃতি-দ্বারের গায়ে করাঘাত করে বহু নর,
'হে কবি, দুয়ার খোল, বারেক শুনাও তব স্বর।
বাহিরে বাদল রাতি, ঝঞ্ঝায় শ্বসিছে মত্ত বায়ু
অন্ধকারে মাথামাথি বাতাস হরিছে দীপ-আয়ু।
এই বেলা খোল দ্বার স্বল্পালোকে হোক পরিচয়
যে-বাণী রাখিয়া গেছ পড়িবার এই ত সময়।
তুমি যে মোদের প্রিয় বুঝিয়াছি দীর্ঘ দিন পরে;
বুঝিতে পারিনি কেন ও-পারের ঘন অন্ধকারে—
যে-কবি হারায়ে গেছে বহুদিন জীবনের দেশে
উচ্ছ্বসিত বাক্য আর অশ্রু ফেলি তাহারি উদ্দেশে!
বৎসর-ভুলানো কথা এক দণ্ডে জ্বালি স্মৃতিতলে
তাহারে বাঁধিতে চাহি ক্ষণজীবী স্তুতি পুষ্প দলে।'

*

ভাগীরথী কলস্বনে প্রকৃতির মৌন পরিবেশে
মাঠ, বন, গুল্ম মাঝে অকস্মাৎ সেই কণ্ঠ ভেসে
বিস্মৃতি দুয়ার পরে নিত্য বুঝি করাঘাত করে,
বলে, 'আমি মরি নাই, মরিব না কল্প-কল্পান্তরে।
অন্তরের চক্ষু মেলি যদি চেয়ে থাক কোন দিন
তোমাদের অঙ্গনেতে সন্ধ্যাকালে পরিচয়হীন
যে-বধূ রাখিয়া দীপ গলবস্ত্রে করে নমস্কার
জেন সে কল্যাণস্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি রচনা আমার।
অযোধ্যা প্রাসাদ কোথা? বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে
আছে সে শাশ্বতী সীতা সমাজের শুধু রূপান্তরে।
কোথায় দণ্ডক বন? কল্পনার ছায়াছবিতলে
পরিপুষ্ট সে-অরণ্য বাংলারই স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চলে।
ভ্রাতৃ-সমর্পিত প্রাণ ত্যজে ভোগ ত্যজে মাতা জায়া,
তোমাদেরই পাশে দেখ সে-মানব নিত্য লভে কায়া।
রাত্রির প্রথম যামে সুপ্ত পল্লীপথ—চলা কালে
কোন ভগ্ন গৃহ মাঝে বর্ষীয়সী নারীকণ্ঠ তালে
বিমাতা বিরূপ হেতু রাজপুত্র নির্ব্বাসন কথা
শোন নি কি সেই স্বরে বেজে ওঠে চিরন্তনী ব্যথা!
সহজ সরল ছন্দে তোমাদেরই সুখ ব্যথা নিয়া
রামায়ণ কাহিনীতে হৃদয় যে দিয়াছি ঢালিয়া।
মানুষের আয়ু-সূর্য্য চিরদিন নামে অস্তাচলে
এ-জীবন পার হয়ে জ্যোতিরূপে অন্য কোথা জ্বলে;
আমার আকাশ 'পরে সূর্য্য ছাড়া নাহি অন্য গ্রহ
অন্তহীন, জরা, ব্যাধি, ক্ষয়হীন জ্যোতিপূর্ণ দেহ।
শতাব্দী চলিয়া গেছে কাল হতে কালান্তরে ঘুরি
সৃষ্টির অক্ষয়ানন্দে তোমাদেরই রয়েছি আঁকড়ি।'

*

সহসা খুলিল দ্বার গন্ধ বয়ে বায়ু এল ভেসে,
স্মৃতিস্তম্ভ-পাদমূলে বদ্ধাঞ্জলি তোমারি উদ্দেশে
যে-শ্রদ্ধা প্রণতি সনে, হে কবীশ, করিতেছি দান
বুঝিতেছি লেখা তাহে আমাদেরই নব অভ্যুত্থান।

বিজ্ঞানের পরিস্থিতি ও দর্শন

শ্রীগোবিন্দপদ দত্ত

বস্তুর সহিত সাধারণ ভাবের সহজ পরিচয় হ'তে আমাদের অনুসন্ধিৎসা আসে; ধাপে ধাপে এই ইচ্ছা নিগূঢ়তর হ'তে হ'তে পরিচয় সূক্ষ্মতর ও বিস্তৃততর হয়। এই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের সম্বন্ধ সুরু হয় এবং পারম্পর্য্য স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধের পরিণতির ফল বিজ্ঞান; আর এই সম্বন্ধের একত্র এবং স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণের ফল দর্শন—অর্থাৎ যা বিজ্ঞানেরই মূল দর্শন।

জ্ঞাতা জ্ঞেয়-বস্তু থেকে আপনাকে স্বতন্ত্র গ্রাহ্য ক'রে সকল রকম বিচার সুরু করেন। এই "স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করা" তাঁর স্বতঃসিদ্ধান্তের মত; এই "স্বাতন্ত্র্য"-এর মধ্য দিয়ে তাঁর বস্তুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতা হ'তে স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি-না বা কতটুকু আছে এই প্রশ্ন ভুললে পরিচয়ের সূত্রই খণ্ডিত হয়; অথচ বিচার্য্য-বিষয় সন্দেহ নেই।

জ্ঞাতার পরিমাপক যন্ত্রের ভেদ এবং ব্যবহারের ফলে এই জ্ঞেয় বা পরিমেয় বস্তুর বিরুদ্ধ-প্রকৃতি অনুমিত হয়েছে এবং পরিমিতির ফলেব প্রভেদ পাওয়া গেছে। সে বিরুদ্ধ-গামিতা, সে ভেদ, মাপক যন্ত্রের ও মাপের ভ্রান্তির জন্য নয়। অবস্থাবিশেষে আলোকরশ্মির প্রকৃতি জানা যায় যে, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে তার শক্তি ছুটে চলে; অবস্থা-বিশেষে জানা যায় যে, বস্তুর আনবিক স্ফোটনের পর, অণুর সূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণার অর্থাৎ ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন ইত্যাদির পরস্পর আঘাতে, এক কণার শক্তি অপর কণায় আক্রান্ত হয় এবং এর নীতিই হচ্ছে আলোক-রশ্মি। আলোক-রশ্মির এই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিতা সম-সাময়িক, তার গতি একই সময়ে তরঙ্গীয় এবং সরলরৈখিক। এই প্রকৃতি, পরিমাপক যন্ত্র ও পরিমেয় বস্তুর আপেক্ষিকসম্বন্ধ হেতু ভিন্ন হয়েছে; জ্ঞাতা বা জ্ঞেয়ের সম্পর্কগত পরিবর্ত্তন ঘটলে, যে আপেক্ষিক সম্বন্ধ অর্থাৎ জ্ঞান তাদের সংযোজন হতে আসে, তারও পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং পরিমিতির ফল ভিন্ন হয়। সেখানে পরিমিতিগত নিরালম্ব রূপ ও গুণকে বস্তু-প্রকৃতির পরে আরোপ করে তাই বস্তুর একান্ত গুণ বলে গ্রাহ্য করা চলে না। সে গুণ পরিমেয় ও পরিমাপক-সাপেক্ষ। ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া আলোক-রশ্মির গতি ভিন্ন হয়েছে; যদিও ভেদগত বৈশিষ্ট্যের পরিধি অল্প, তবু এই ভেদগত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করা যায় না, সুতরাং ভ্রান্তিও বলা যায় না। যাঁরা পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধকে কঠোর-ভাবে অনুধাবন করতে চান, তাঁরা কার্য্য-কারণ নীতিধর্ম্মী; তাঁরা পরিমিতির ফলকে পরিমাপক ও পরিমেয় থেকে নিরপেক্ষ বলেন এবং বলেন, বস্তু-প্রকৃতিই একে অপরের সাপেক্ষ, পরের গুণ পূর্ব্ব গুণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং প্রকৃতিগত ও মানগত যে ভেদ প্রমাণিত হয় তা ভ্রান্তি। এখানে নিছক কার্য্য-কারণ-নীতিকে বাঁচাবার জন্যে একে শুধু ভ্রান্তি বললে চলে না, কোথায় ভ্রান্তি এবং কিভাবে ভ্রান্তি তা প্রদর্শন করতে হবে। পরিমাপক-যন্ত্র-গত ও পরিমাণগত ভ্রান্তি ঘোষণা করলে বিজ্ঞানের মূল-নীতির উপর আঘাত করা হয়। বস্তুর সন্ধান পেতে গিয়ে অবস্তুর উপর নির্ভর করতে হয়। জীন্‌স ও এডিংটন বলেছেন যে, জ্ঞাতা তাঁর ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ক'রে পরিমেয় বস্তুর যে ছবি পান সেই তার পরিচয় এবং তারই নিগূঢ় পবিচয় তাঁর বিজ্ঞান। সুতরাং পরিমেয় বস্তুর জ্ঞাতা হতে কোন ভিন্ন সত্তা নাই, এডিংটন ও জীন্‌স-এর স্কুল এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে এসেছেন। ম্যাক্স প্লাঙ্ক বলেছেন, বস্তু-জগৎ অতিরিক্ত যে বৈজ্ঞানিক প্রতিচ্ছবির জগৎ, সেই অতিরিক্ত-জগতের পক্ষেই এই পরিমিতির ফল সত্য। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রতিচ্ছবির জগতের নামে অবস্তু-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তবে ম্যাক্স প্লাঙ্ক একথাও বলেছেন যে, পরিমাপক ও অপরিমেয়ের সঙ্গে পরিমিতি আপেক্ষিক, সুতরাং ফলগত কিছু ভেদ যন্ত্র এবং অবস্থা অনুযায়ী স্বাভাবিক। তবে বিজ্ঞানের এই প্রতিচ্ছবির জগৎ, বহির্জগতের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতিতে এবং রূপে একত্বের দিকে আসছে। নিশ্চয়তাকে

বাঁচাবার জন্য ম্যাক্স প্লাঙ্ক মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছেন ; তিনি আপেক্ষিকতা গ্রহণ ক'রে পরিমিতির ভেদ পরিমাপক ও পরিমেয় সাপেক্ষ স্বীকার করেছেন, আবার বিজ্ঞানের প্রতিচ্ছবির জগতের নামে স্বতন্ত্র জগৎ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবির জগৎ ও বাস্তব জগৎ একত্বের দিকে চলেছে। অথচ এই ত্রয়ীর মধ্যে অর্থাৎ—পরিমাপক, পরিমেয় ও পরিমিতির মধ্যে, বিরুদ্ধ ধর্ম্মিতার প্রকাশ যদি তিনি গ্রাহ্য করতেন, তবে এই অবাস্তব জগতের আশ্রয় তাঁকে নিতে হ'ত না। এক প্রকারের আবরণে বস্তুর যে ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, অন্য প্রকারের আবরণে সে ধর্ম্ম উহ্য থাকে। গুরুত্ব-জ্ঞাপক যে শক্তির প্রকাশ বস্তু-সত্তার এক প্রকারের আবরণে ও অবস্থায়, অন্য প্রকারের আবরণে সে শক্তির গুরুত্বজ্ঞাপক রূপটিই উহ্য থাকে এবং তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তির ব্যঞ্জনে প্রকাশ পায়। আইনষ্টাইন তাঁর আধুনিক রচনায় এই দুই শক্তির সমভূমির ছেদরেখাকে বস্তু আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ বস্তুর বাস্তবতা এই দুই শক্তিব সেতু-স্বরূপ। যৌক্তিক বস্তুবাদ ব'লে প্রকৃতির স্বাভাবিক দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মিতার সংযোজনই এই বাস্তবতা। যে পরিমাপে গুরুত্বমাপক শক্তি প্রকাশ ছিল তড়িৎচুম্বকীয় শক্তি তাতে উহ্য ছিল এবং যাতে তড়িৎচুম্বকীয় শক্তির প্রকাশ ছিল, গুরুত্বমাপক শক্তি ছিল তাতে উহ্য। এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংযোজনকে অর্থাৎ একের অবস্থানে অন্যের নীরবস্থান ইত্যাদি এবং উভয়ের সংযোগে সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণ হওয়া রূপ এই নৈয়ায়িক রীতিকে দ্বিত্বমূলক যুক্তিবাদ বলে। বস্তু-পরিচয়ের প্রারম্ভে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞানের ফল বিশ্লেষণ করতে আমরা যে সম্বন্ধ পাই তা দ্বিত্বমূলক বিরুদ্ধধর্ম্মী।

এখন বস্তুবাদী দার্শনিকদের একটা প্রতিষ্ঠান এই যুক্তিবাদকে যন্ত্রবাদ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রগতির পথে প্রতিষ্ঠা নিয়েছে। কিন্তু এই যৌক্তিক বস্তুবাদকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই গ্রহণ করেন নি। বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা তাঁরা যতদূর নিতে বাধ্য হয়েছেন ততদূর নিয়েছেন। তবে জ্ঞেয় বস্তুর আশ্রয় হিসাবে জ্ঞাতার মন গ্রহণ করা বা বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিচ্ছবির জগৎ খাড়া করা—এ শুধু বস্তুচরিত্রের এবং বস্তুবিশ্লেষণের দিক থেকেই অযৌক্তিক নয়, এ অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈতিহাসিক। সৃষ্টিতত্ত্বের এবং প্রাণিবিবর্ত্তনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাণসৃষ্টির পূর্ব্বে বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা ছিল এবং বস্তুর ক্রমপরিবর্ত্তনে প্রাণেরও পরে মনের জন্ম। সুতরাং মন বস্তুর আশ্রয় হওয়া দূরের কথা, বস্তুর ক্রমবিকাশেই মনের জন্ম। পূর্ব্বকথিত বৈজ্ঞানিকেরা—যাঁদের নাম পরে বিচারের মধ্যে করছি, তাঁদের পক্ষে বলা যেতে পারে যে এঁরা বিশুদ্ধ বস্তুবাদের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করবার চেষ্টায় ঐতিহাসিক প্রমাণগত ধারণা গ্রাহ্য না ক'রে অনৈতিহাসিক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। এঁরা নতুন ক'রে এবং নূতন রূপ দিয়ে চিরপুরাতন কান্টেরই মতের আশ্রয় নিয়েছেন। ক্যান্ট বলেছেন, বস্তুর গুণ দিয়ে বস্তুকে জানি বটে, তবে তার অন্তরকে জানি নে এবং পরে একটা অন্তরকে সৃষ্টি করে বস্তুকে চিররহস্যের মধ্যে রেখেছেন। এই মতাবলম্বীরা আজ মানুষের মন বস্তুর রূপকে ধারণ করে বলে বস্তুর সম্বন্ধ বিচার করতে গিয়ে মনকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বস্তুর আশ্রয়ী বলে বস্তুবিচারের চরম সিদ্ধান্তে মনের আশ্রয় নিয়েছেন। এই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের আমরা বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক প্রমাণের কঠিন পথ ছেড়ে তাঁরা অনৈতিহাসিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আরও ব'লতে পারি যে ঐতিহাসিক প্রমাণের পথ নিয়ে বিজ্ঞানতত্ত্বের অর্থ বুঝবার ও অনুধাবন করবার প্রচেষ্টায় যে নিশ্চিত পথে পৌছতে হয়, তাকে ত্যাগ করেছেন—শ্রেণীগত পূর্ব্বসংস্কারের ব্যথায়, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। সুতরাং এ হচ্ছে ক্যান্ট ও বিশপ বার্কলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ও অদ্ভুত হাস্যাস্পদ অনুকরণ। জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝতে এম্পিরিও ক্রিটিসিজ্‌মে লেনিনের কথা জানবার মত। "বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যতবেশী বস্তুর গুণসমূহ জানা যাবে, বস্তুকে জানা তত সম্পূর্ণ হবে।" সেই জানার চেষ্টা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে দিনে দিনে চলেছে। এই চেষ্টার মধ্যে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা বস্তু এবং বৈজ্ঞানিকের মধ্যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ঘটছে। এই বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞানের বিচারে যদি ভুল পথ অবলম্বন না করতেন, যদি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানকে পরস্পর নিরপেক্ষ করবার চেষ্টায় বদ্ধগৃহে যান্ত্রিক বস্তুবাদের আশ্রয় না নিতেন,

তবে অকৃতকার্য্য হয়ে আজ অনৈতিহাসিক ভাববাদের আশ্রয় নিতে হ'ত না এবং যৌক্তিক বস্তুবাদেও এসে পৌছতেন। এই ত্রয়ী—জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান, পরস্পর সাপেক্ষ-ধর্ম্মী, তবে এই হিসাবে যে বস্তুপ্রকৃতি মনকে প্রভাবান্বিত করে এবং পরে সেই পূর্ব্বপ্রভাবান্বিত মন আবার বস্তুপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটায়। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে যেমন বস্তুপ্রকৃতির পরীক্ষা হচ্ছে, সেখানে সত্যসিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে হলে সেই বস্তুপ্রকৃতি যার পরে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে—সেই যে বৈজ্ঞানিকের মন, তাকে সূক্ষ্মভাবে প্রতিবীক্ষণ করতে হবে। এই প্রতিবীক্ষণ চলবে, বস্তু-পরীক্ষার ফলস্বরূপ প্রত্যেক সিদ্ধান্তের দিক থেকে, যাতে প্রতিক্রিয়া গ্রহণকারী মনে কোন অনৈতিহাসিক কল্পনা আশ্রয় না পায়। এই পরীক্ষা ও প্রতিবীক্ষণের পরমপ্রাপ্য হ'ল—বস্তুপ্রকৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান।

বিজ্ঞান-প্রমাণ বাস্তব ফলকে আশ্রয় ক'রে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিতা-যুক্ত যুক্তিবাদের পথে, বস্তুপ্রকৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের আশায় এগিয়ে যেতে পারে। এইখানে বলা যেতে পারে যে, বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধে একান্ত সম্পূর্ণতা ও প্রাপ্ত সম্পূর্ণতার মধ্যে যে অজানার ফাঁক রইল তাকে অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে দিলে চলবে না বা মনকে প্রাধান্য দিয়ে কাল্পনিক আদর্শ সৃষ্টি করাও ভুল হবে। যে ঘটনা বাস্তব অর্থাৎ সত্যি ঘটেছে ব'লে প্রমাণ হয়েছে, সুতরাং পরীক্ষিত এবং বিজ্ঞানসম্মত, তাকেই আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা ব'লে গ্রাহ্য করেছি। অনৈতিহাসিক ধারণার পরে আশ্রয় ক'রে যুক্তিবিচার চলে না—তা বর্জ্জনীয়।

আর কার্য্যকারণ-নীতির সম্পর্কে কথা। জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে হ'লে কার্য্যকারণ-নীতিই একমাত্র প্রযুজ্য নীতি, এটা বিজ্ঞান জগতের পণ্ডিতী ধারণা। এ ধারণার প্রগতি ঘটানোর প্রয়োজন আছে। পূর্ব্ব কারণে পরের কার্য্য পরিপূর্ণভাবে নিহিত থাকে, সুতরাং পূর্ব্ব-কারণই পরের কার্য্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল—শুধু এমন ধারণা চলে না। যেহেতু পূর্ব্বকারণকে গ্রহণ নিশ্চয় ক'রতে হবে, তবু তাকে অস্বীকার ক'রে পরের কার্য্যের সমবায়স্থলে এমন শক্তি থাকে, যাতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিতার সংযোগে নূতন সৃষ্টির প্রকাশ পায়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এই নূতন সৃষ্টির প্রকাশ যেমন প্রকট হয়ে উঠছে, তেমন কার্য্যকারণ-রীতির মধ্য দিয়ে এই পণ্ডিতদল আইন ও শৃঙ্খলাকে তত দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। অথচ বস্তু-প্রকৃতিতে কারণ যে দ্বিধাভাজ্য এবং পূর্ব্ব কারণকে অস্বীকার ক'রে অন্য কারণ থাকতে পারে এবং উভয়ের সমবায়ে কার্য্য ঘটতে পারে যা অপূর্ব্বও বটে, অনন্যও বটে। এই সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এ যুগেও ক্বচিৎ বিচার করেছেন ও কচিৎ সামঞ্জস্য খুঁজেছেন। অথচ চলতে ও বুঝতে গিয়ে বারে বারে এর আভাস দিয়েছেন। এই বস্তু-প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে এখানে আধুনিক দুইজন বাদী ও প্রতিবাদীর উপর দুই দিক্‌কার প্রতি-নিধিত্ব আরোপ করতে পারি। ক্যাক্সটন হলে বস্তু-প্রকৃতি সম্পর্কে চ্যাপম্যান কোহেন ও জোয়াড্‌ সাহেবের সঙ্গে বিচার-বিতর্ক হয়েছিল। চ্যাপম্যান কোহেন জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক সম্বন্ধের কথা বলেছেন এবং আপেক্ষিক সম্বন্ধকে পরিষ্কার করেননি; কারণ পরে তিনি কার্য্য-কারণ-সিদ্ধান্তকে বস্তু-প্রকৃতির নীতিনির্দ্দেশক ব'লে নিছক যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কোহেন এই দিকে গেলেন, আর জোয়াড্‌ মনগড়া জগৎ সৃষ্টি করলেন—নূতন সৃষ্টি ও আপেক্ষিকতার মনস্তত্ত্বমূলক কদর্থ প্রয়োগ ক'রে। তিনি বস্তু-প্রকৃতির বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিতাকে শ্রেণীমনের পূর্ব্বসংস্কারের চাপে অবলুপ্ত করলেন অর্থাৎ জোয়াড্‌ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-প্রমাণের নির্দ্দিষ্ট দিক্‌কে অস্বীকার ক'রে, স্থানকালের আপেক্ষিকত্ব নিয়ে অনৈতিহাসিক কল্পিত ধারণায় চলে গেলেন।

আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের আপেক্ষিক সম্পর্কের ফলে অর্থাৎ পরিমাপক ব্যক্তি ও যন্ত্র এবং পরিমেয় বস্তুর আপেক্ষিক সম্পর্কের সংযোগে জ্ঞানের জন্ম হয়। কিন্তু শুধু কি এই? বস্তু ঘটনার বৈজ্ঞানিক পরিমাণ করতে গিয়ে পরিমাপক যে সূত্রগুলি অবলম্বন করেন—তা বস্তু-অতিরিক্ত কতকগুলি—যা জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত ও যন্ত্র-বিজ্ঞানের মূল সত্য হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছে। পূর্ব্বতন বস্তু-ঘটনা থেকে এই স্বতঃসিদ্ধান্ত-গুলি নিষ্কাসিত হয়েছে। বায়ুর চাপ ও স্থানের তাপ মাপ করতে গেলে, চাপ ও তাপ-পরিমাপক যন্ত্রের ভিতরের বিশেষ গুরুত্ব দীর্ঘতামূলক বৃদ্ধি, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির উপ-

পাদ্যগুলি এবং গণিত বীজগণিতের বিশ্লেষণকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। মূল সত্যের প্রয়োগের মধ্যেও কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকবে, কারণ এগুলি অন্য অবস্থায় পূর্ব্বতন কোন জ্ঞাতার, অন্য কোন জ্ঞেয়বস্তুর সমষ্টি সম্বন্ধে সাধারণ-সম্মত ধারণা করবার চেষ্টার ফল। আমাদের প্রথম সর্ব্বগ্রাহ্য ধারণা যা আজও জ্ঞানার্জ্জনের কাজে প্রয়োগ হচ্ছে তা হচ্ছে ইউক্লিডের জ্যামিতি। এ ধারণার মধ্যে কিছুটা ভুল থাকবেই ; "এক পরিমাপক ও পরিমেয়ের আপেক্ষিক সম্পর্কের সংযোগ-গত ধারণা," অন্যভাবে অতি সমতুল্য ঘটনার মধ্যেও পরিপূর্ণ প্রয়োগ হয় না। উভয় স্থানেই ভাবগত ও অভাবগত বস্তুশক্তি এক হয় না, সুতরাং যৌক্তিক পন্থার ফল উভয়ক্ষেত্রে এক নয়। সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ঘটনার সহজ অর্থ ক'রে ইউক্লিড্ যে পরিমাণ পেয়েছেন, তা সেই অল্প স্থানের মধ্যেই প্রযুজ্য। তাঁর দেওয়া বিন্দুর, সরল রেখার, সমান্তরাল সরল রেখার, ত্রিভুজ প্রভৃতির "সংজ্ঞানির্দ্দেশ" সুনির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই প্রযুজ্য। কার্য্য-কারণ-নীতি ধরে তিনি এই পন্থা নিয়ে বিজ্ঞান-শাস্ত্র খাড়া করলেন এবং এই প্রয়োগস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কল্পিত অনন্তে চলে গেলেন। যথা "সরল রেখার উভয় দিকে অনন্তবৃদ্ধি হতে পারে," "উভয় দিকের অনন্ত-বৃদ্ধিতে সমান্তরাল রেখার মিল হয় না", "অনন্তের মধ্যে পরিদৃশ্যমান ক্ষুদ্র অবিভাজ্য অংশের নাম বিন্দু" ইত্যাদি। এদের বলা যেতে পারে নিরালম্ব সংজ্ঞার অনির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ ও বৃদ্ধি। অবশ্য বাস্তব ঘটনাতেই অনন্ত খণ্ডিত হয়, বিশ্ব-জগৎ অর্থাৎ নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহসহ এই বিশ্বজগৎ সসীম, তবে মাত্র আলোক-রশ্মির গতিই তার পরিমাপক হ'তে পারে। আলোক-রশ্মির গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক শত ছিয়াশী হাজার মাইল পরিভ্রমণ করে এবং এই বিশ্ব-জগৎ যা মণ্ডলাকৃতি, তাকে পরিভ্রমণ করতে এর কয়েক কোটী বৎসর লাগে। কত কোটী, এ নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে ; কিন্তু সসীমত্ব এবং মণ্ডলাকৃতির সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। স্থানের সসীমত্ব সম্বন্ধে এখানে পরীক্ষিত প্রমাণ হ'ল, স্থানের সমতলত্ব সম্বন্ধে এখানে সন্দেহের অবকাশ এল।—অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি ও ঘনত্ব পরিমাপক যে রেখা, তা সরল না মণ্ডলাকৃতি? লেভাচেস্কি এই মণ্ডলাকৃতি রেখাকে গ্রাহ্য ক'রে সরলরেখা ও ত্রিভুজের গুণসমূহ বিস্তৃত পরিসরে প্রযুজ্য নয়, এমন প্রমাণ করেছিলেন। সিরিয়াস নক্ষত্রকে শীর্ষবিন্দু ক'রে ও এই পৃথিবীর মার্গকে ভিত ক'রে যে ত্রিভুজ সৃষ্ট হয়, তার কোণত্রয় দুই সমকোণের সমান নয়, এটা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। পরে এই অনুসন্ধানেই দেখা গেল যে, যে আলোকরশ্মি এই ত্রিভুজের ভুজ নির্দ্দেশ করে, তা সরল রৈখিক নয়। এটা পরীক্ষিত প্রমাণ এবং এটা গ্রাহ্য করার পর বলতে হয় যে, দুই সমকোণ থেকে ত্রিভুজের এই কোণ সমষ্টির ভেদ, বর্গপরিসরের বিস্তৃতির অনুসারে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। সরল রৈখিকত্ব—যার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ইউক্লিড্ করেছেন—তা সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে প্রযুজ্য, সাধারণ ধারণা হিসাবে তা আংশিকভাবে সত্য এবং যতখানি এই সঙ্কীর্ণস্থান-সাপেক্ষ—তার অতিরিক্ত-প্রয়োগ অনৈতিহাসিক ও কল্পিত। সঙ্কীর্ণ-স্থানেও কোন গতিশীল বস্তুর গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে সরলরৈখিক নহে। অথচ সাধারণ ধারণা হিসাবে ইউক্লিড-অতিরিক্ত লেভাচেস্কির জ্যামিতি এখানে প্রযুজ্য। এখানে বলতে চাই, পরিমাপক ও পরিমেয়ের আপেক্ষিকতা, তার পারস্পরিক গ্রাহ্যশক্তি ও উহ্যশক্তির সমবায় হেতু, পরিমিতির ফলপ্রয়োগ বস্তুবিচারের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রেখেছে। যৌক্তিক বস্তুবাদকে গ্রাহ্য করে নিলে এইখানে সমস্ত ঘটনার বিচার শোভন এবং সুষ্ঠু হয়। যান্ত্রিক বস্তুবাদ নিরালম্বসংজ্ঞাকে অতিক্রম করতে পারে না, আপেক্ষিকতাকে অগ্রাহ্য করে, সুতরাং অনৈতিহাসিক ঘটনার উপর বৈজ্ঞানিকেরা দর্শন কল্পিত করেন, যার কথা পরে ব'লব।

এখন নিরালম্ব সংজ্ঞার এই প্রভাব সমস্ত বিজ্ঞান জগৎকে আক্রান্ত করেছে। নিউটনের মূলভিত্তি ইউক্লিডের উপর স্থাপিত হয়েছে। যে বস্তুজগতের মধ্যে নিউটনের পরীক্ষা-প্রমাণ আবদ্ধ, তার পরিসর ইউক্লিডকে অতিক্রম করেনি। এই স্থানকালের পরিসরের মধ্যে ইউক্লিডের মত নিউটনও বিজ্ঞানসম্মত ও সত্য এবং তাঁর সিদ্ধান্তও এই সঙ্কীর্ণ পরীক্ষিত বিষয়ের উপর ব্যবহারিকভাবে প্রযুজ্য। এই পরিসর অতিরিক্ত যে স্থান ও কাল পরবর্ত্তী বিজ্ঞান পেয়েছে—তাতে সমগ্র বিশ্বের প্রমাণিত অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। ইউক্লিড এবং তাঁর তিন পরিমাণ দণ্ড (দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি ও ঘনত্ব) সেখানে আংশিকভাবে প্রযুজ্য—সেখানে চতুর্থ পরিমাণদণ্ডের

প্রয়োজন হয়েছে এবং এই চতুর্থ পরিমাণ দণ্ড গ্রহণও করা হয়েছে রাইম্যানের জ্যামিতি থেকে। এই চতুর্থ পরিমাণ দণ্ডের নাম—সময়। সেদিন এই স্থান-কালের মধ্যে থেকেই ইউক্লিডকে প্রমাণখণ্ড গ্রহণ করতে হয়েছিল। নিউটনের কাছে যা এই প্রমাণখণ্ড-সাপেক্ষ তাই হয়েছে সত্য। পরিমাণ দণ্ডের এই তিন মূলনীতি গ্রাহ্য ক'রে তিনি এই পথ ধ'রে গিয়েছেন, সুতরাং তাঁর বস্তু হয়েছে হয় গতিশূন্য, নয় সরলরৈখিক, তাঁর স্থান হয়েছে অন্তহীন, তাঁর সময় হয়েছে অনন্ত-বহমান ও স্থান-নিরপেক্ষ, আর শক্তি-প্রয়োগের জন্য তাঁর বিন্দু হয়েছে পরিদৃশ্যমান কিন্তু অবিভাজ্য। প্রমাণ-খণ্ডগত সিদ্ধান্তগুলি বাঁচাবার জন্য অজ্ঞাত স্থান ও সময়ের কল্পনা হয়েছে। অন্যবস্তু থেকে নিরপেক্ষ ক'রে কোন বস্তুর অধিষ্ঠান নির্দ্ধারণ করা যায় না, সুতরাং বস্তুর কল্পনা করতে হ'লেই গতিশীল বস্তুর কল্পনা করতে হয়। আর সরলরৈখিক গতি ধারণা হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে কিন্তু অবাস্তব। তাঁর "সরলরৈখিক গতি" শক্তি-প্রয়োগের দ্বারা গতি-সৃষ্টিজাত কল্পিত আদর্শ। পরিমাপক, পরিমেয় সত্য এবং উৎপন্ন সিদ্ধান্ত এই সম্বন্ধ-সাপেক্ষ, সুতরাং পূর্ব্ব-পরিমাণ-সাপেক্ষ প্রমাণখণ্ডকে এই যৌক্তিক প্রথায় বিচার ক'রে নিতে হবে। ফরাসী পণ্ডিত হেনরী পঁয়কার এবং জর্মান পণ্ডিত আর্নজ কেশীরার পরিমাণ, পরিমেয়, প্রমাণখণ্ড ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এভাবে বিচার বিতর্ক করেছেন, কিন্তু এই যৌক্তিক প্রথার নামকরণ করেন নি। আমরা বলতে চাই যে যৌক্তিক বস্তুতন্ত্রবাদের বিচার-বিতর্কের বিধি এমনই পথ ধ'রেই চলে।

অতীত যুগে নিউটন তাঁর কল্পিত সরলরৈখিক গতিকে বাঁচাবার জন্যে ঘূর্ণ্যমান গ্রহ-উপগ্রহের প্রয়োজনে গুরুত্ব-মূলক শক্তি ধারণা করেছেন। আর বর্ত্তমানে এই চতুর্থ পরিমাণ দণ্ডের যুগে, এই আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের যুগে, ম্যাক্সপ্লাঙ্ক যখন বস্তুর সকল অণু বৈদ্যুতিক কণায় নিঃশেষ করেছেন, জিন্‌স ও এডিংটন আজ বিজ্ঞানের মূল-দর্শন সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে পরীক্ষিত বস্তুবিষয়কে মানসিক ধারণা মাত্রে পর্য্যবসিত করেছেন। সেখানে দর্শনের বিচারে বস্তুর অস্তিত্ব হচ্ছে মাপযন্ত্র নিরীক্ষিত অর্থাৎ কতকগুলি ধারণা মাত্র। অবশ্য ও'রেল তাঁর উত্তর দিয়েছেন এবং যৌক্তিক বস্তুতন্ত্রবাদের পথ ধরে এর অবাস্তবতা নির্দ্দেশ করেছেন, কিন্তু বাস্তবতাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি। অতীতে নিউটনের গতির অসীমত্ব আদর্শ পেয়েছিল আলোর গতিতে, তিনি একে কল্পনা করেছিলেন সীমাহীন। অবশ্য তখন আলোক সম্বন্ধে কণিকাবাদ গ্রাহ্য ছিল। আলোককণিকা ছুটে আসে প্রদীপ্ত উৎস থেকে এবং যখনই নির্গত হয়, তখনই দীপ্যমান বস্তুতে উপস্থিত হয়। এই নির্গতি এবং উপস্থিতির মধ্যে কোন সময়ের অবকাশ নেই, এর গতি অনন্ত। আজ বিচার-বিতর্কের প্রয়োজন নেই, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-প্রমাণে এর গতি ও প্রকৃতির ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে, এর গতি সসীম হয়েছে, স্থানের পরিমিতির মত। এখন বিষয় ও বস্তুপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করা যায় এবং সেখান থেকে প্রকৃতির দার্শনিক পরিমাপ করা যায়। 'বস্তুপ্রকৃতি সম্বন্ধে'—জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বেশ তৃপ্তিদায়ক। আলোক-কণিকাবাদের পরে আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমিত হয়েছে যে আলোর শক্তি তরঙ্গ তুলে ছুটে চলে। তবে শব্দের শক্তির তরঙ্গ থেকে এ তরঙ্গ বিভিন্ন, আলোর শক্তির তরঙ্গের নর্ত্তন, এর তরঙ্গের গতি-নির্দ্দেশের সঙ্গে সমকোণ ক'রে চলে, শব্দের মত একই দিকে চলে না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ম্যাক্স প্লাঙ্ক নূতন অনুমান এনেছেন—যা আলোক-কণিকাবাদ ও তরঙ্গবাদ এই দুইকে মেনে নিয়েছে ও অতিক্রম করেছে। তাঁর কোয়াণ্টাম থিওরি সিদ্ধান্ত করছে যে, আলোকমণ্ডল বৈদ্যুতিক কণা বিকীর্ণ করে গোছা গোছা বন্দুকের গুলির মত, যার প্রতি কণার শক্তি পরের বাস্তব অণুর বৈদ্যুতিক কণাতে দান করে এবং শক্তি এমন ক'রে চলে। আলোকরশ্মি একটা বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তি, আর তার রীতি এইরূপ। এই শক্তি বিকীর্ণ হওয়ায় আমরা এই কোয়াণ্টাম থিওরির মধ্যে তরঙ্গবাদের আভাস পাই এবং প্রকৃষ্ট কণিকাবাদকে দেখতে পাই। বিস্তীর্ণ-ভাবে পরীক্ষা-প্রমাণের বিচারে দেখা যায় যে, এই দুই বিশেষ অনুমানই বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার ফলহিসাবে গ্রাহ্য। অথচ একটা পরীক্ষার ফলহিসাবে একটা অনুমান সেখানে প্রথম-কারণ বা বাদ বলে গ্রাহ্য, অন্য অনুমানে সেখানে তার প্রতিবাদ—এণ্টিথিসিস এবং অগ্রাহ্য। এখানে বস্তুর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিতায় প্রকৃতির যৌক্তিক সংযোগকে পাই। ম্যাক্স প্লাঙ্কের অনুমানের মধ্যে শক্তির সংখ্যাগত পরিমাপ-সংযোগেও

এই যৌক্তিকতা আছে। আলোর বিদ্যুৎকণার শক্তি-সমষ্টি তরঙ্গের নর্ত্তনসংখ্যার এই আপেক্ষিকতায় একটা নিরলম্ব সংখ্যা-নিরপেক্ষ হয়েছে এবং এতে কোয়াণ্টাম থিওরি ও ওয়েভ থিওরি এ দুয়ের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিতার চমৎকার সমবায় হয়েছে।

এখন বিস্তৃত ক্ষেত্রে আলোর মধ্যে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিতার সমবায়ে যে যৌক্তিক বস্তুতন্ত্রবাদের প্রকাশ পরিষ্কারভাবে দেখা গেল, তা ক্ষুদ্র পরিসর ক্ষেত্রে আলোক-রশ্মিব্যতিরেকেও দেখা যাবে। বাস্তব অণুর অর্থাৎ য়্যাটমের মধ্যে যে বিদ্যুৎকণা ঘূর্ণ্যমান, তাদের অন্তর্গত গতিমাপ সম্বন্ধে নীল্‌স বোর এই নিরপেক্ষ পরিমিতি প্রয়োগ করে মিলন দেখিয়েছেন। বিদ্যুৎকণার যে প্রহরণ শক্তি অন্য অন্য ভেঙে বা গড়ে নূতন অন্য সৃষ্টি করে, সে শক্তিসমষ্টির সঙ্গে বিদ্যুৎকণার নর্ত্তনসমষ্টির সমতুল্য তাল আছে। বাস্তব অণুর অন্তর্গত যে বিদ্যুৎকণা নিত্য তার নিজ গতিমার্গ ছেড়ে নূতন পথ নেয় এবং ফলে যে বৈদ্যুতিক শক্তি বিকীর্ণ হয়, সে শক্তিসমষ্টিও বিদ্যুৎকণার নর্ত্তনসমষ্টি দিয়ে বিভক্ত হলে ম্যাক্স প্লাঙ্কের নিরপেক্ষ এমনি নিরলম্ব সংখ্যায় পরিণত হয়। আবার রাদারফোর্ডে পরীক্ষাপ্রমাণে পাই যে, সৃষ্টির বৃহত্তম সংযোগের মত, বস্তুর সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌরজগতের প্রমাণ ও বিরুদ্ধধর্ম্মিতার পরিচয় আছে। বিরুদ্ধধর্ম্মী বিদ্যুৎকণা বস্তু-অণুর শেষ বিভাগ। যোগান্ত বিদ্যুৎকণা বা প্রোটন কেন্দ্র স্থানে বস্তু-অণুর গুরুত্ব রাখে আর তার বিরুদ্ধ-প্রকৃতি বিয়োগান্ত বিদ্যুৎকণা (ইলেকট্রন) গুরুত্ব-প্রতিবাদী শক্তি নিয়ে ঘূর্ণ্যমান থাকে। এই গুরুত্ব-প্রতিবাদী শক্তিকে বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তির আধার বলে আখ্যান দেওয়া হয়েছে। এই বিয়োগান্ত-বিদ্যুৎকণা, ম্যাক্স ওয়েল-নির্দ্দিষ্ট বৈদ্যুতিক-চুম্বকক্ষেত্রে শক্তি উদ্গীর্ণ করছে, কিন্তু তাতে গুরুত্বের আভাস-মাত্র নেই। বস্তু-অণুর যে অবস্থায় গুরুত্ব অবলম্বিত হচ্ছে, তাতে বিদ্যুৎকণার বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তির আভাস নেই এবং যেখানে বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তির আভাস পাচ্ছি সেখানে গুরুত্বমূলক শক্তির আভাস নেই। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আধুনিক এক প্রবন্ধে আইনস্টাইন ও নব-উত্থিত বৈজ্ঞানিক রোসেন এ সম্বন্ধে নূতন ধারণা গড়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এই প্রাথমিক বস্তু-কণা একটা সেতুরেখা, যা দুটি পরস্পর প্রতিবাদী শক্তিক্ষেত্রকে সংযোগ করেছে—যাদের একটি গুরুত্বমূলক এবং অপরটি বৈদ্যুতিক-চুম্বক এবং সংযোগমূলক এই দুই ক্ষেত্র কর্ত্তিত সেতুরেখাকে আমরা বস্তু বলি। এখন ধারণা করা যেতে পারে, পরস্পর-প্রতিবাদী শক্তিক্ষেত্রের সমবায়ে বস্তু-প্রকৃতির মূল ধারণা দিচ্ছে এবং এর পরে যৌক্তিক বস্তুতন্ত্রবাদ পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

এখানে আবার আলোর সম্বন্ধে নূতন দিকে ভাববার আছে। আলোক ও তড়িৎচুম্বক শক্তিকণা এবং তারও তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্র আছে শক্তিতরঙ্গের ক্ষেত্রও আছে। আলোর বিদ্যুৎকণা গুরুত্বমূলক শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হয় ধরে নিতে হবে, কারণ আলো সরলরৈখিক গতিতে আসে না, গুরুত্বহীন গুণগত বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে, আলো এসেছে গুরুত্বমূলক রূপগত বিবর্ত্তনে। বস্তু-অণু হতেও আল্‌ফাকণার প্রহরণে বিদ্যুৎশক্তির উদ্গীর্ণ হয়ে বস্তুরূপের বিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ রূপগত বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে আকস্মিক গুণ-গত বৈষম্য আসে। রূপগত হবে গুণগত এবং গুণগত হতে রূপগত এই আকস্মিক বিবর্ত্তন, প্রকৃতির মধ্যে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিতার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। এখানে নিউটন-গঠিত শক্তির যে অনপচয়ত্বের সিদ্ধান্ত তা নাকচ হয়ে গেছে। নিউটনী বস্তু-অতিরিক্ত শক্তি, অনপচয় শক্তি হয়েই থাকে, বস্তু হতে গুণগত বৈষম্য হয়ে তার বৃদ্ধি হয় না বা বস্তু-মূলক রূপগত বৈষম্যে তার অপচয় ঘটে না। সুতরাং "শক্তির এই অনপচয়ত্বের" নাকচে যৌক্তিক বস্তুতন্ত্রবাদের সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণভাবে প্রযুজ্য হ'ল।

আবার "আলোক-রশ্মির গতির পরিমাণ" নির্দ্ধারণ করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা যৌক্তিক বস্তুতন্ত্রবাদের পরিচয় পাই। এখানে দেখি, বিরুদ্ধধর্ম্মী দুইটি পরিমাণ ক্ষেত্র—"স্থান ও কাল"। আলোর গতির নিরপেক্ষতা থেকে এই দুইটি পরিমাণ ক্ষেত্রের আপেক্ষিকতা আসে। কারণ আলোকরশ্মির দিকে বা আলোকরশ্মির বিরুদ্ধদিকে যাই; স্থানকে কাল দিয়ে ভাগ দিলে আলোর গতির পরিমাণ সকল অবস্থাতেই নিরপেক্ষ থাকবে; সুতরাং আলোর গতি নির্দ্দিষ্ট স্থান ও কাল নিশ্চয়ই বাস্তব ও আপেক্ষিক হবে। এ কারণ স্থানের তিনটি পরিমাণ দণ্ড দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব, সময়ের সঙ্গে আপেক্ষিক অর্থাৎ ঘটনার চতুর্থ পরিমাণদণ্ড সময়। তিনের অধিক পরিমাণ

দণ্ড ইউক্লিডে নেই, আইনস্টাইন ইউক্লিড-অতিরিক্ত জ্যামিতি রাইম্যান থেকে চতুর্থ পরিমাণ দণ্ড গ্রহণ করেছেন এবং জ্যামিতির রেখায়ও অঙ্কের সংখ্যায় আপেক্ষিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। আবার আপেক্ষিকতা নিয়ে অবাস্তব রহস্যের ব্যবহার দর্শনে যথেষ্ট হয়েছে। অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যদিও স্থান কালের আপেক্ষিকতা সিদ্ধান্তহিসাবে গ্রহণ করেছেন, তবু যান্ত্রিক বস্তুতন্ত্রবাদের অভাব অনুপপত্তির হেতু শুধু কার্য্যকারণ-নিয়মে সমগ্র ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি। অবশেষে বস্তু-প্রকৃতির পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রিত প্রমাণ অনুমানের সঙ্গে, আপেক্ষিকতার প্রমাণ অনুমান মিলিয়ে আদর্শবাদের কাল্পনিক সৌধ গড়েছেন। আর আমাদের দেশে স্যার মহম্মদ সুলায়মান বিজ্ঞান জগতেও পুরাতন পথ নিয়ে বারে বারে অগ্রসর হয়েছেন। বিশ্বজগতের সম্বন্ধে "পরিধিমূল সসীমত্ব" বিজ্ঞান জগতে গৃহীত হ'লেও তিনি নিছক সসীমত্বের ধারণাকে স্বীকার করেন নি। ইউক্লিডের জ্যামিতির জন্য স্থানের বিস্তৃতি সম্পর্কে অনন্তের ধারণা তিনি নিয়েছেন এবং "ইউক্লিড-নিউটন" অতিরিক্ত অনুমান ও আইন তিনি প্রথম থেকেই পরিহার করেছেন। সুতরাং আইনস্টাইন ও তাঁর স্কুলের বিরুদ্ধে স্যর মহম্মদ সুলায়মানের অভিযান খুব পরিষ্কার; তিনি স্থান ও কালের বাস্তব স্থিতিতে কাল্পনিক সত্তা আরোপ করেছেন এবং বলেছেন, স্থান ও কালের আপেক্ষিকতা আলোর গতি পরিমাপক আরোহীর আপনার এবং একান্ত মনঃসম্পর্কিত ধারণা। বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক আরোহী আলোর গতির যে নিরপেক্ষ পরিমাণ পায়—সেটা তার মনের কোন বিশেষ গুণ থেকে নয়; যদি এই স্থানকালের সংযোজক মাপের জন্য পরিমাপক আরোহী না থাকে, যদি মাত্র কোন আপন পরিমাপক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সেখানে থাকে, তবে এই নিরপেক্ষ পরিমাণ বা স্থানের সঙ্গে কালের আপেক্ষিকতার পরিমাণ তা থেকেই আসত।

এক্ষণে কালের সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। স্থান ও কালের আপেক্ষিকতার জন্য আলোক-রশ্মির গতি নিরপেক্ষ এবং স্থান সসীম বলে পরিমাণ হয়েছে। তা হ'লে কালও সসীম এবং অনন্ত কালের ধারণা অবাস্তব ও কাল্পনিক। এই পরস্পর আপেক্ষিক স্থান ও কাল নিয়ে মিনকাউস্কি ঘটনা-সংযোগের সূত্র পরিমাপ সৃষ্টি করেন; অর্থাৎ বৃহত্তর পরিসর থেকে গৃহীত এই সূত্র, ভৌগোলিক স্থান ও কালের চেয়ে সত্য। স্বতন্ত্র স্থান ও স্বতন্ত্রকাল নিয়ে আলোর গতির যে পরিমাণ পাওয়া গিয়েছিল, তাদের মত মিন্-কাউস্কির আপেক্ষিক স্থানও কালের সূত্রের কমবৃদ্ধি নেই। এখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধধর্ম্মিতার বাস্তব-সমবায় হ'ল। ব্যবহারিক স্থান এই আণুমিক পরিমাপ সূত্রের বিভাজ্য অংশ। এই পরিমাপ সূত্র "নিরপেক্ষ", এর এক বিভাজ্য অংশ—ব্যবহারিক স্থানে যেখানে সসীম, অন্য বিভাজ্য অংশ ব্যবহারিক কাল, সেখানে সমভাবে অসীম। বিশ্বজগতের বর্গ পরিমাণ সসীম, কিন্তু মণ্ডলাকৃতি ব'লে। তার উপর অঙ্কিত রেখার শেষ পৌঁছান যায় না। সুতরাং এক বিভাজ্য অংশ ব্যবহারিক স্থানে যদি সীমা-রেখা পাওয়া না যায়, অন্য বিভাজ্য অংশ ব্যবহারিক কালেও অতীত ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করতে সীমারেখা তেমনি পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ যৌক্তিকতার বিরুদ্ধধর্ম্মিতা ও সমবায় অনুমান ও ব্যবহারে সম্পূর্ণভাবে প্রযুজ্য। মিনকাউস্কির জ্যামিতির এই আণমিক পরিমাপসূত্র গ্রাহ্য ক'বে কোন গতিশীল বস্তুর বর্গের সমষ্টি পেতে হ'লে দেখা যাবে যে, বস্তুর গতির সঙ্গে তার এই বর্গসমষ্টিও বেড়ে চলেছে এবং আলোর গতিতে উপস্থিত হয়ে এই সমষ্টি পরিমাণের মাত্রা হারিয়েছে। মিনকাউস্কির পূর্ব্বগ্রাহ্য ধারণার মধ্যে তার প্রতিবাদ রয়েছে, যদিও এখন ব্যবহারিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চিত পরিমিতির কাজের জন্য স্থান-কালের নিরপেক্ষ যে সূত্র গড়া হয়েছিল অনিশ্চিত পরিমিতিতে তারও পরাকাষ্ঠা হ'ল।

আবার বস্তু-অণুর সম্বন্ধে পরীক্ষা ও গবেষণায় পাওয়া যায় তার ইতিহাসের নিত্য বিবর্ত্তন ঘট্‌ছে। কেন্দ্রীভূত প্রোটনের মত কেন্দ্রীভূত নিউট্রন পাওয়া গেছে, যাতে বৈদ্যুতিক কর্ম্মের পরিচয় নেই এবং বৈদ্যুতিক শক্তিতে বিরুদ্ধধর্ম্মী প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমবায় হয়েছে। আবার ঘূর্ণ্যমান বিয়োগান্ত বিদ্যুৎকণা যে ইলেকট্রন, তাও নূতন যোগান্তরূপে পাওয়া গিয়েছে—তার পজিট্রন এই নামকরণ হয়েছে। বস্তু-অণুর মধ্যবর্ত্তী চলমান বিদ্যুৎকণার পথের প্রতিচ্ছবি থেকে আমরা জেনেছি যে, ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎকণা উপগ্রহের মত সূক্ষ্মকেন্দ্রীয় পথে চলে এবং প্রতি বিদ্যুৎকণার এই পথের পটভূমির পরিবর্ত্তন হয়। এই পটভূমির পরিবর্ত্তনের মধ্যে কোন কার্য্যকারণ-নীতি নেই, কখন কোন্

বিদ্যুৎকণা কোন্ ভূমিতে যাবে তার কোনও নির্দ্দেশ নেই। যাবে অকস্মাৎ লাফ দিয়ে; যদি কেন্দ্রের বাইরের দিকে যায় তবে শক্তি দিয়ে যাবে, যদি ভিতরের দিকে আসে তবে শক্তি নিয়ে নেবে। এখানে বস্তুর অন্তরীণ বিদ্যুৎকণার সমস্ত পরিচালনা কার্য্যকারণনীতির প্রতিকূল হ'ল এবং যৌক্তিক বিরুদ্ধধর্ম্মিতার অনুকূল হ'ল। অর্থাৎ এখানেও বিরুদ্ধধর্ম্মী বস্তুতন্ত্রবাদের পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আবার বস্তু-অণুর গতি-প্রকৃতিতে কার্য্যকারণনীতির নির্দ্দেশ নেই, আপেক্ষিক গুরুত্বেরও সে নির্দ্দেশ নেই। আপেক্ষিক গুরুত্বে, অনুকূল ও প্রতিকূলধর্ম্মিতার সংযোগে বস্তু-অণুর নূতন রূপ এসেছে আইসোটোপ। যেমন হাইড্রোজনের আপেক্ষিক গুরুত্ব এক ছিল, হাইড্রোজন আইসোটোপের আপেক্ষিক গুরুত্ব কখনও দুই হ'ল, কখনও বা হ'ল তিন। এক বস্তুর অণু অন্য বস্তুর অণুতে রূপান্তরিত হতে পারে না এই ধারণা ছিল; রেডিয়াম গঠিত L-particle-এর বোমপ্রহরণে নাইট্রোজেন অণু ভেঙেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে আরও অণু ভেঙেছে ও ভাঙবার চেষ্টা হচ্ছে এবং এরা প্রত্যেক নূতন অণুতে রূপান্তরিত হয় ও হবে। যান্ত্রিক বস্তুতন্ত্রবাদ একে মিলাতে পারে না, কিন্তু যৌক্তিক বস্তুতন্ত্রবাদ পারে, এই L-particle-এর অভ্যন্তরে ঘূর্ণ্যমান বিয়োগান্ত বিদ্যুৎকণার সহজ-সংখ্যায় দুই কম ছিল, যা পেলে সে সপ্রতিষ্ঠ হিলিয়াম হ'ত। আকর্ষণী শক্তিকে পূর্ণ করবার অভাব হেতু সে অন্য অণু থেকে উপপত্তি নিয়েছে ও ভেঙেছে গড়েছে। পরে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে (গত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে) যে যাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব L-particle-এর চেয়ে বেশী তারাই একে প্রসব করতে পারে।" 'বস্তু-অণু'রূপান্তরিত হওয়ায় পাওয়া গেল যে, প্রতি বস্তু-অণুর মধ্যে সেই অণুর প্রতিকূল শক্তি ছিল।

অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যে সত্যকে মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, দার্শনিক, বিচারে তাকেই খণ্ডন করেছেন, বিশেষ বিশেষ স্থানে বস্তু-তন্ত্রকাজে অভাব ও দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন ক'রে এঁরা ভাবাদর্শ-বাদকে টেনে নিয়ে এসেছেন, বিজ্ঞানের সকল দিক্‌কার বিবর্ত্তনের মধ্যে যান্ত্রিকতার প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদেরই সিদ্ধান্তকে তাঁদেরই পথ দিয়ে এই ভাবাদর্শবাদী আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা খণ্ডন করেছেন এবং অতি সতর্কতা সহকারে বিরুদ্ধধর্ম্মী বস্তুতন্ত্রবাদীদের উপায় এবং পথ পরিহার করেছেন।

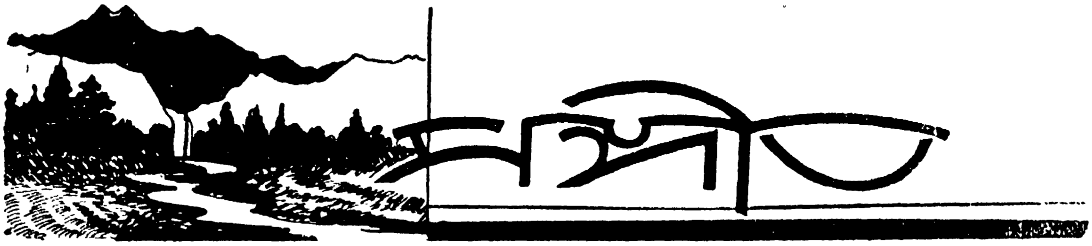
এখানে বিচারের একটা মস্ত জিনিষ আছে যে, এইভাবে যৌক্তিকবস্তুতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করলে সমস্ত বন্ধনমূলক শৃঙ্খল ভেঙে দেওয়া হয় ও একমাত্র পরীক্ষাজাত ঘটনার উপরই নির্ভর করা যায়।

জোনাকি

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

আঁধারে আমার জোনাকিরা খেলা করে।
আমি চুপ করি দেখি সেই ছুটাছুটি,
কেহ আসি মোর বুকে কোলে পড়ে লুটি'
চলে যায় পুনকম্প্র ঘূর্ণীভরে।
পরাণে আমার সুখের লহমাগুলি
দুখের কাজলে অশোকের রেখা টানি
সহসা আজিকে কেন করে হানাহানি
উদাস ভরে হিন্দোলমালা তুলি?

পারিনা গাঁথিতে অখণ্ড মালিকার
ক্ষণভঙ্গুর স্ফুলিঙ্গ শিহরণি,
ওষ্ঠেনাত ফুটি সুললিত লিপিকার
ছন্দোবদ্ধ কিরণ গুঞ্জরণি।
আথরে আথরে তোলে মধু কলরব,
পরাণে আমার আনে বাণী বিপ্লব।



ভজন

সুর মিশ্র—কাহার্‌বা

সখি, আর না কহব শ্যাম নাম
চিদ্ পীতম লাগি, বৃথা দিন গোঁয়ায়নু
বিধি হওয়ল মোর বাম ॥

বাঁশরী বাজায়ে যব নিরদয় মাধব
রাধা রাধা বলি গাওয়ে
থর থর কাঁপহি তনু মন সবহি
বিকল হৃদি মোর ভওয়ে

যদি না মিলয়ে হরি ক্যয়সে জীয়ন ধরি
একলি যাওবো পারে

যমুনা ছল ছল মুছয়ি আঁখি জল
রাধারে দেয়বো তারে ॥

কথা ঃ—শ্রীসমরেশ গুহ
সুর ও স্বরলিপি ঃ—কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার

+ ০ + ০
{ সা রা II গা পা ধা ণা | ধা পা গা সা I গপা -া -া -ক্ষাপক্ষা | গা -া } -া -া I
স খি আ র না ক হ ব শ্যা ম না ০ ০ ০০ ম্ ০ ০ ০

I পা -ক্ষা -ধপা -ক্ষাপা | পা -ক্ষা গা রা I গা পমা গরা -গা | -া -া -া -া I
চি ০ ০০ ০ দ্ পী ০ ত ম লা ০ গি ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা না ধা র্সা | না ধপক্ষা গা ক্ষা I পা -া পা পা | গপা ধণা ধা পা I
বৃ থা দি ন গোঁ য়া ০ ০ ০ য় নু ০ বি ধি হ ০ ও ০ য় ল

I মা গরা গপমা -া | -গা -া সা রা II
মো র ০ বা ০ ম্ ০ স খি

II সা সা গা গা | সা ন্া ন্া I

বাঁ শ রী বা জা য়ে য ব

I সা গা মা পা | গপমা -া গা গা I গা পা পা -া | -পমা -গমা -গা -া I

নি র দ য় মা ০ ধ ব রা ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা ধা না | ধনা -ধনা ধপা -হ্মাপা I পা পা পর্সা র্সা | র্সনা র্সা -া পা I

রা ধা ব লি গা০ ০ও য়ে০ ০ ০ থ র থ র কাঁ ০ প ০ ছি

I পা পা হ্মা পা | ধণা পধা -ধাপ মা I মা মা গমা -পধা | মা মা রা রা I

ত নু ম ন স ০ ব ০ ০ হি বি ক ল০ ০ ০ হৃ দি মো র

I সনা -রা সা -া -া -া -া -া I পা হ্মা ধা পা | না ধা না না I

ভ ও য়ে ০ ০ ০ ০ ০ য দি না মি ল য়ে হ রি

I র্সা -া র্সাধ ধনা | নর্রা র্গর্রা সনা র্সা I র্সা র্সা র্গর্রা র্গা | র্রা -া র্রর্সা নধা I

ক্য য়্ সে জী০ য় ণ০ ধ রি এ ক লি০ ০ যা ০ ও বো

I না -র্রর্সা না -া | -া -া -া -া I পা পা পর্রা -া | র্সা র্সা র্সা র্সা I

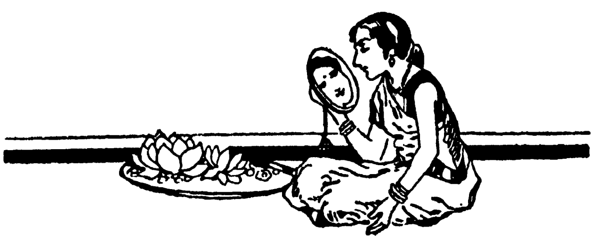
পা ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ য মু না০ ০ ছ ল ছ ল

I পা পা -হ্মা পা | ধণা পধা পমা মা I রমা -পধা পা পা | মা -মা রা রা I

মু ছ ০ য়ি আঁ খি জ ল রা০ ০ ০ধা রে দে ০ য় বো

I সনা রা সা -া | -া -া সা রা II'II

তা ০ রে ০ ০ ০ স খি



অকারণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অফিসার ও অফিসারিকা-মহলে টি-টি পড়ে' গেল।

স্পর্ধিত স্ত্রী-প্রত্যয় করলুম। আর এমন কী কথা আছে যা দিয়ে এক কথায় বোঝানো যায়? স্ত্রী-অফিসার বলতে পারেন না, কেননা কথাটা সত্যি নয়; আর অফিসারের স্ত্রী যদি বলেন তবে আমার-আপনার পাড়ার পাঁচ জনের স্ত্রীর মতোই কথাটা অর্থহীন হবে। তাই অফিসারের স্ত্রী-লিঙ্গে অফিসারিকা।

চটের ইজিচেয়ারে আলোয়ানে পা ঢেকে বসে' যোগেন্দ্র রায় অমৃতবাজারে ক্যালকাটা-গেজেট পড়ছিলো, দর্পিত জুতোর শব্দে চেয়ে দেখলো, স্ত্রী। খুব যেন ব্যস্ত, উত্তেজিত হ'য়ে বাড়ি ঢুকছে। নিচের ঘরেই স্বামীকে দেখতে পেয়ে যেন কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে সামনের একটা চেয়ারে সে বসে' পড়লো, তপ্ত ক্ষুব্ধ গলায় বললে, 'যত সব নীচ ছোটলোক ইতর কোথাকার!'

যোগেন্দ্র চম্‌কে উঠলো। দুই হাতের থাবড়ায় একটা মশা মেরে সে জিগ্‌গেস করলে: 'হলো কী?'

সর্বাণী বললে, 'সেই সেদিন দাস-সাহেবের সঙ্গে পাহাড়ে ক্যাম্প করতে গিয়েছিলুম, তাতে সব অফিসারনিদের চোখ টাটিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।'

ঢোঁক গিলে কথাটা যোগেন্দ্র হজম করে' নিল। বোকার মতো বললে, 'তাতে দোষের কী হয়েছে?'

'দোষের হয়নি?' সর্বাণী চুড়ি বাজিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'ওঁদের কাউকেও নেমন্তন্ন করেনি যে। সইবে কেন? এতবড় একেকটা রাঘব বোয়াল ছেড়ে পুঁচকে একটা পুঁটিমাছের ডাক পড়লো, গায়ে লাগবে না তাতে? তাই দুর্নাম করে' শুধু গায়ের ঝাল মিটোনো হচ্ছে। কাওয়ার্ডস্!'

গাল চুলকোতে-চুলকোতে যোগেন্দ্র বললে, 'দুর্নাম—দুর্নাম কিসের?'

'বা, পরপুরুষের সঙ্গে দু'দিন পাহাড়ে-জঙ্গলে কাটিয়ে দিয়ে এলুম, দুর্নাম করবে না?'

'ছি ছি ছি,' লজ্জায় যোগেন্দ্র যেন কালো হ'য়ে গেল: 'সঙ্গে মিসেস্ দাস ছিলেন, তাঁর মেয়ে ছিল—এমনি একটুখানি আউটিং করে' আসা—'

'সে-কথা শোনে কে? অশোকবনেও তো মন্দোদরী ছিল, সরমা ছিল, তবু কি এঁরা সীতাকে রেহাই দিয়েছেন নাকি? আগুনে ঢুকিয়ে তবে ছেড়েছেন।'

'তুমি বললে না কেন, আমার স্বামী রামচরিত্র নন। নেহাৎই প্র্যাকটিক্যাল র‍্যাশন্যাল মানুষ, তাঁর এতে অমত ছিল না।'

'সে-কথা বলে' আমি ছাড়া পেতে যাবো কেন?' সর্বাণী বিষিয়ে উঠলো। গায়ের স্কার্ফটা দিয়ে গীতিমান, উড্ডীয়মান, অপম্রিয়মান মশা তাড়িয়ে বললে, 'শুধু স্বামীর দোহাই দিয়ে যারা কাজের ভালো-মন্দ দেখে, সে-সব মেয়েমানুষকে আমি মানুষ বলি না। এটাতে স্বামীর মত আছে অতএব এ-কাজটা ভালো—এ একটা অসার যুক্তি; এ-কাজটা মন্দ নয় বলে'ই স্বামীর অমত নেই, এইটেই হচ্ছে কাজের আসল নিরিখ।'

'তোমার এই ফিলজফি তারা বুঝবে কিসে? শুধু মোটা জিনিস দেখে—মোটা মাইনে, মোটা শরীর আর মোটা বুদ্ধি।' যোগেন্দ্র সূক্ষ্ম করে' হাসলো: 'তাই এ-জিনিসটাও কিঞ্চিৎ মোটা করে' দেখেছে। ওদেরকে কৃপা করো, ক্রোধ কোরো না।'

পায়ের সঙ্গে পা ঘসতে-ঘসতে সর্বাণী বললে, 'আর কাউকে না বলে' মিসেস দাস আমাকে বলেছেন সেইখেনেই ওদের রাগ। কম মাইনে পেয়েও ওঁর সঙ্গে সমানে-সমানে মিশি তাই হয়েছে চক্ষুশূল।'

'তুমি কম মাইনে পাও মানে?' চশমা বাঁচিয়ে যোগেন্দ্র কপালের উপর একটা চড় মারলো।

'হা অদৃষ্ট! মাইনে কি তবে অফিসাররা পায় নাকি? তুমি আছ কোথায়? আমাদের শান্ত-দিদি কী বলেন শোনোনি বুঝি?'

'কী বলেন?'

'বলেন, যখন আমার চারশো টাকা মাইনে তখন

জ্যোৎস্না হয়, সাড়ে-চারশো না হতেই শ্যামু জন্মায়, আর পাঁচশো পেরোলে তবে পরিমল।'

যোগেন্দ্র হা-হা করে' হেসে উঠলো।

'সেই হয়েছে রাগ। কম মাইনে পাই অথচ কম-মাইনের মতো দেখাই না—সেইটেই আমার অহঙ্কার। সেদিন রলিন্‌সনের স্ত্রী এসেছিলেন গার্লস-স্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনে—আমি ওঁর সঙ্গে বসে' ইংরিজিতে কথা বলেছি, মেয়েদের অভিনয়ের বিষয়গুলি দিয়েছি বুঝিয়ে সেইটে নাকি আমার বাড়াবাড়ি।' সর্বাণী ঘৃণায় বিষাক্ত হ'য়ে উঠলো: 'আর সেদিন মুখার্জি-সাহেবের বাড়িতে ওদের কথা হচ্ছিলো, ছেলে পেটে এলে কার কী রকম বমির উপসর্গ হয়, অপরাধের মধ্যে আমি সরে' বসে' মিসেস্ দাসের সঙ্গে তাঁর সিঙ্গাপুর বেড়ানোর একটু গল্প করছিলুম—হ'য়ে গেল সেটা আমার চাল, সেটা আমার ফুটুনি।'

'ছেড়ে দাও! আমাদের যা খুসি তা করবো, পরে যা খুসি তা বলবে। ছেড়ে দাও!' আলোয়ানটা আরো গুটিয়ে গুঁজে নিয়ে যোগেন্দ্র কাগজে মন দিলে।

'কিন্তু চরিত্রে কটাক্ষ করবে?'

'কটাক্ষকুটিল যাদের চোখ, তাদের চরিত্রই বা তুমি শোধরাবে কি করে'?'

'দাঁড়াও না, কথাটা আমি দাস-সাহেবের কানে তুলবো।'

'যাও!' যোগেন্দ্র একটা ধমক দিলো।

'হ্যাঁ, কথাটা তিনি শুনুন।'

'শুনে তিনি কী করবেন? কমপ্লেনেণ্ট তো সব মেয়েরা।'

'তা জানি।' সর্বাণী উঠে পড়লো: 'রত্নাকরের পাপ না-হয় তার বাপমাকে স্পর্শ করেনি, সেটা ছিল রামায়ণের যুগ, এ-কালে আর সে-নিয়ম নেই তোমার নাগাল না পাই, তোমার বাড়ির কুকুরটাকে দেখে নেব।' জুতোর দর্পিত শব্দ করে' সর্বাণী অন্তরালে অন্তর্হিত হ'লো।

উদ্যত হাতে কিছুকাল একটা মশার পশ্চাদ্ধাবন করে' ব্যর্থ হ'য়ে যোগেন্দ্র কাগজের পৃষ্ঠা উলটোল।

মিত্র বললে, 'সঙ্গে স্ত্রী ছিল তো!'

'সেইটেই তো চালাকি।' গাঙ্গুলি ফোড়ন দিল: 'স্ত্রীরা শিখণ্ডীর পার্টে চমৎকার।'

'আর এমন জিনিস ইউরোপের সমাজেও পাবেন না মশাই!' মহলানবিশ এক পোঁচ রঙ চড়ালো।

'তাতে আপনাদের কী আপত্তি?' সান্যাল বললে, 'আমি আমার স্ত্রীকে যদি যেতে দি, তাতে আপনাদের কী মাথা-ব্যথা? আপনাদের সঙ্গে দিইনি, এই তো গ্রিভ্যান্স!'

'যা বলেছেন দাদা!' দত্ত-মজুমদার টেবিলে একটা চড় মারলো।

'মানে কি না, ফল-মূলের ডালি দেয়া তো উঠে গেছে—' রসালো করে' গাঙ্গুলি কি বলতে যাচ্ছিল, লাঠি ঘুরোতে-ঘুরোতে ক্লাবে যোগেন্দ্র এসে উপস্থিত।

'আজকের স্টেট্‌সম্যানটা কই রে, কেশব?' গাঙ্গুলি কথাটাকে বেলাইনে নিয়ে গেল।

'কি রে, এখনো তোর তামাক সাজা হল না?' মহলানবিশ পকেট থেকে পাশিং-শো বার করলে।

'নতুন তাস বার কর্।' বললে দত্ত-মজুমদার।

ওদিকে, দিদিদের ওখানে, যূথিকা বললে, 'শুনেছেন দিদি, দাস-সাহেবের ওখানে কাল আবার একটা টি-পার্টি হয়ে গেল। হোমরাচোমরা কে-না-কে এসেছিল তার জন্যে।'

'সর্বাণীর নেমন্তন্ন হয়নি?' কালীতারা চোখের তারাটাকে কালো করে' জিগ্‌গেস করলে।

'হয়েছিলো বৈ কি? শুনলুম দু'খানা গানও নাকি গেয়েছে।' যূথিকা বললে।

'তুমি জানলে কোত্থেকে?' শান্তদিদি প্রশ্ন করলেন।

'কর্তা গিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে শুনলুম।'

'আর কে গিয়েছিল?'

'গিন্নিদের মধ্যে রলিন্‌সনের স্ত্রী, চূড়ামণির স্ত্রী, আর উনি।'

'আর ওঁর কর্তা?'

'সে তো মফস্বলে, টুরে। পাড়ায় থাকেন, তাই' হেমনলিনী বললেন।

যূথিকা বেশি খবর রাখে, তাই বললে, 'না, শুনলুম, কোথায় নাকি সাক্ষী দিতে গেছে।'

'তা, তোমাদের আপত্তি কোথায়?' শান্তদিদি জিগগেস করলেন, 'আপত্তি তো এইখানে যে তোমাদের কাউকে না বলে' শুধু ওকে বলেছে? কী বলো কালী?'

'আমাদের বললেও আমরা যেতে পারতুম না এমন স্বামী-ছাড়া।' কালীতারা বললে।

'আর আমরা হয়তো এমন সব দেখতে-শুনতে, স্বামীরা সঙ্গে নিতে আপত্তি করতেন।' শান্তদিদি নিজেই হেসে উঠলেন।

কথাটা যূথিকার লাগলো। কেননা এখনো সে পিঠের আঁচলটা আগে ঠিক করে' নিয়ে সাড়িতে প্যাঁচ দেয়। চোখের পাতার নিচে, কানের পাশে ও কণ্ঠার হাড়ের কাছে একটু-আধটু পাউডারের আভাস লুকিয়ে রাখে। গম্ভীর হ'য়ে সে বললে, 'না দিদি, অমন অসভ্যতা আমরা করতে পারবো না।'

'যাই বলো, সভ্যতাই বা করবো কোত্থেকে?' শান্ত-দিদি কৌটো থেকে জর্দা বার করে' মুখের রক্তিম গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন: 'ওর মতো না পারি গাইতে গান, না পারি না-থেমে ইংরিজি বলতে। আর আমার শ্যামুর বাপ টাকার জন্যে যেমন বিয়ে করেছিলো, পেয়েওছে তেমনি এই শ্যামকান্তি।'

যূথিকা ছাড়া আর সবাই হাসলো। তার দশ বছরের মেয়ে বিভার যে এরি মধ্যে পঞ্চাশের উপর গানের স্টক হ'য়ে গেল তার খবর হয়তো এরা রাখে না।

'তার পর শুনি দু'-তিনটে কি পাশ করেছে।' বললেন হেমনলিনী।

'আমাদের পড়ালে আমরাও পাশ করতে পারতুম।' কালীতারা চোখ দুটোকে টেরছা করলো: 'সাত-ছেলের মা গদাধর-মাষ্টারের বউ, কেমন একবারে ম্যাট্রিকটা পাশ করে' গেল।'

'যাই বলো দিদি, একাধটা পাশ করে' রাখলে মন্দ হতো না।' হেমনলিনী সাংসারিক বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, 'নইলে তিনটে ছেলে-মেয়ের জন্যে, তিনেক্কে তিন, তিন দু'গুণে ছয়—ছয়টা মাষ্টার রাখতে হচ্ছে। যোগেন্দ্রবাবুর ঐ এক ছেলে—ন বচ্ছর বয়েস—স্কুলে ক্লাশ ফোরে না ফাইভে না-জানি পড়ছে—একটাও মাষ্টার রাখতে হয়নি। সব ওর মা-ই পড়িয়ে নিতে পারছে। বাংলা-ফাংলা যদি বা পারি দিদি, অঙ্কেতেই একেবারে গুড়ুম!'

নরেন-মাষ্টারের স্ত্রী এতক্ষণ চুপ করে' ছিলেন। এবার তিনি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন, হাত ঘুরিয়ে বললেন, 'আগো, থোন্ ফালাইয়া। জানা আছে ঐ পোলার বিদ্যা। এইবার হাপিয়ালি পরীক্ষায় অঙ্কে পাচ পাইছে। পাচ!' বলে' তিনি দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি আঙ ল প্রসারিত করে' দেখালেন।

ভর-সন্ধেটার সময়, এমন সময় ভদ্রলোক কেউ বাড়ি থাকে না, নিচে থেকে কে ডাক দিলো: 'ব্যেরা।'

সাড়া নেই।

ডাকটা মধ্যবিত্ততায় অবতরণ করলে: 'ঠাকুর!'

সর্বাণী বাইরের ঘরে বেরিয়ে এসে প্রথমটা অবাক হ'য়ে গেল। করজোড় করে' নমস্কার করে' বললে, 'কি আশ্চর্য, বসুন।'

বেতের একটা মোটা চেয়ারে বসে' পড়ে' দাস বললেন, 'রায় কোথায়?'

সর্বাণী মনে-মনে হাসলো। বললে, 'ক্লাবে।'

'আর আপনি একা বাড়িতে বসে' আছেন? আপনাকে নিয়ে উনি বেড়াতে বেরোন না?'

'কদাচিৎ।'

'এটা অন্যায়। আপনি জোর করে' ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন।'

'মায়া করে।' সর্বাণী চমৎকার করে' হাসলো: 'দিনে-রাত্রে আপিস আর সংসারের মাঝে এইটুকু সময় ওঁর ফাঁকা—সন্ধের এ ঘণ্টা তিনেক। এটুকু সময় উনি নিজের খেয়ালে কাটান, চেঁচিয়ে হাসেন, বেফাঁস দু'-চারটে কথা বলেন, পরনিন্দা করে' আনন্দ পান—এ-সময়টায় আমি আর হস্তক্ষেপ করতে চাই না।'

'কিন্তু আপনার কাটে কি করে—তাঁর তো সেটা দেখা উচিত।' দাস পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করলেন: 'এ-সময়টায় বেরিয়ে পড়বেন বাড়ি ছেড়ে। ফাঁকায় খুব খানিকটা ঘুরে আসবেন। স্বাস্থ্য—গ্লো. গ্লো—গ্লোর বাঙলা কী?'

'আভা। দীপ্তি।' সর্বাণী হাসলো।

'হ্যাঁ, সেই দীপ্তিই হচ্ছে সৌন্দর্য। ইচ্ছে করলে ভালো বাঙলা শিখতে পারতুম।' দাস সিগারেটটা মুখে পুরে ফের নামিয়ে রাখলেন, বললেন, 'একেবারেই বেরোন না নাকি?'

'বেরোবার লোক পেলে বেরোই, আবার ঘরে বসে' গল্প করবার লোক পেলে ঘরে বসে' গল্প করি।' সর্বাণী সপ্রতিভের মতো বললে।

বেরোবেন কি বসবেন দাস হঠাৎ ভেবে পেলেন না। বললেন, 'অসুবিধে না হয় চলুন না, একটু আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

'মোটরে ঘুরলে কি স্বাস্থ্যের খুব বেশি উন্নতি হবে?' সর্বাণী সূক্ষ্ম একটু কটাক্ষ করলো।

'তবু দেয়ালের বাইরে খানিকটা ফ্রি এয়ার—'

'মুক্ত বাতাস', সর্বাণী ধরিয়ে দিলো: 'আমার আপত্তি নেই, তবে' বাইরের দিকে চেয়ে বললে, 'আমার কাছে যেন কে আসছেন। এই যে আসুন, ছোড়দি।'

আর কেউ নয়, যূথিকা।

'আপনার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দি। ইনি মিসেস্ গাঙ্গুলি—আর ইনি—'

দাস উঠে দাঁড়িয়েছিলেম, কপালে হাত ঠেকালেন। যূথিকাকেও প্রত্যুত্তর করতে হল।

'ওর ছোট বোন মল্লিকার সঙ্গে পড়তুম আমি কলেজে।' সর্বাণী বললে, 'সেই সুবাদে আমারো ছোড়দি। মল্লিকার স্বামীকে আপনি চিনতে পারেন। নাগপুর না জব্বলপুরের প্রফেসর।'

'প্রফেসর নয়, পুনার ডাক্তার। এম-আর-সি-পি। ভিয়েনার ট্রেনিং আছে।' যূথিকা সংশোধন করলো।

'কী নাম বলুন তো?' চেয়ারে বসে' দাস প্রশ্ন করলেন।

'অবনী মুখুজ্জে না?' সর্বাণী বললে।

'অবনীশ মুখার্জি।' যূথিকা সংশোধন করলো।

'কে, অবু? Good God! বিলেতে যে একসঙ্গে ছিলুম আমরা। কত ইয়ার্কি করেছি—সেই অবনী? ইস, একেবারে অবনীশ হয়ে গেছে? বাঃ, কী আশ্চর্য, বসুন, সেই সম্পর্কে আপনিও যে আমার ছোড়দি হলেন, মিসেস গাঙ্গুলি। মানে, এই আর কি, অবুর সম্পর্কে। বসুন।' দাস নিজেই একখানা চেয়ার দিলেন এগিয়ে।

যূথিকা বসলো।

'আপনারা বসুন, আমি চা করে' আনছি।' সর্বাণী দ্রুত অন্তর্ধান করলে।

বড় জোর দশ মিনিট লাগবার কথা, কিন্তু আধঘণ্টাতেও সর্বাণীর হয় না। চাকরকে চা করতে বলে' সে উপরে উঠে গেল কাপড় বদলাতে। তার পর বিনিয়ে-বিনিয়ে চুল বাঁধা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাড়ি পরা—একটার পর একটা বেড়েই যাচ্ছে তার শোভাচর্চা।

তার ননদ মুকুলিকা, সেকেণ্ড-ক্লাশে পড়ে, ব্যস্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকে বললে, 'এ কী বৌদি, এখনো তোমার হলো না? উনি বসে' আছেন যে নিচে।'

কব্জিতে ও কনুইয়ে, ঘাড়ে ও গলায়, একটু-একটু সেণ্ট বুলিয়ে সর্বাণী বললে, 'একা নন। সঙ্গিনী আছে কথা বলবার। চা-টা তুমি ততক্ষণ সার্ভ করো না, আমি যাচ্ছি।'

'আমার বয়ে গেছে।' মুকুলিকা ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নিক্ষেপ করে' পলায়ন করলে। চাকরের হাতে ট্রে নিয়ে সর্বাণী ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করলো। দেখলো যূথিকার আড়ষ্ট ভাব তখনো কাটেনি, তাই আর কিছু না পেয়ে তার বাপের বাড়ির গল্প করছে, আর দাস তাঁর হাতের সিগারেটটা নখে চিরে টুকরো-টুকরো করছেন।

'How late!' দাস পিঠ বেঁকিয়ে চেয়ারে ভেঙে পড়তে-পড়তে বললেন।

সর্বাণী মুচকে হেসে বললে, 'এই সামান্য কথাটারো কি আপনি বাঙলা জানেন না?'

'I am sorry, কী বিলম্ব!' দাস শব্দ করে' হেসে উঠলেন।

'দরকার নেই আর আপনার ভালো বাঙলা শিখে।' সর্বাণী চা ঢালতে-ঢালতে বললে, 'তবু এইটুকু রক্ষে যে ইংরিজিতে হাসেন না।'

চায়ে মাত্র এক চামচ চিনি ঢেলে দাস পেয়ালাটা হাতে তুলে নিলেন। বললেন, 'কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?'

সর্বাণী বললে, 'হ্যাঁ, আমরা দু'জনে এখন একবার অশান্তদিদির বাড়ি যাবো।'

'শান্ত-দিদি।' যূথিকা সংশোধন করলে।

'ঐ, যা বায়ান্ন, তাই তেপান্ন। একবার শান্ত একবার অশান্ত—তাতে কিছু আসে যায় না।' সর্বাণী মিনতির সুরে বললে, 'আমাদের সেখানে একটু পৌছে দিয়ে আসতে পারবেন আপনার গাড়িতে?'

'With pleasure.' দাস লাফিয়ে ওঠবার ভঙ্গি করলেন।



রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে —রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বাগচী

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

'বলুন, স্বচ্ছন্দে।'

'আপনারই ভুল হলো।' দাস বললেন, 'With pleasure মানে আনন্দের সঙ্গে, সানন্দে।'

'কিন্তু চলতি ভাষায় সানন্দে না বলে আমরা স্বচ্ছন্দে বলি।'

'মরুক গে, কিন্তু আপনার চা কই ?'

'ও খেতে গেলেই আমার মুখের মধ্যে কেমন ফুৎ-ফুৎ শব্দ হয়, তাই সাহেবদের সামনে আমি ও সব খাই না।'

চা মুখে নিয়ে হাসতে গিয়ে দাসের প্রায় বিষম লাগার জোগাড়।

'চলুন ছোড়দি, শান্ত-দিদিদের বাড়িটা একটু ঘুরে আসি। নতুন কী-সব সস্তায় ফার্নিচার আনিয়েছে, দেখে না এলে দেমাক বলবে।'

অগত্যা যূথিকাকেও এসে গাড়িতে উঠতে হলো। কিন্তু মুখখানা যেন ল্যাপা একখানি উনুন।

দাস বসলো স্টিয়ারিঙে।

শান্ত-দিদিদের বাড়ির গেটের কাছে গাড়ি থামতেই বেয়ারা বললে, বাড়িশুদ্ধ সবাই গিয়েছে সিনেমায়।

তবু, বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে, দরজা খুলে নেমে এলো সর্বাণী। বললে, 'পাশেই আমার পিসিমার বাড়ি, আমি সেখানে একটু যাবো। ওঁকে আপনি দয়া করে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসুন, কিম্বা অন্য যেখানে উনি যেতে চান। আমি এখান থেকে কাউকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাড়ি যেতে পারবো।'

'Mind, স্বচ্ছন্দে—সানন্দে নয়।' দাস মোটর ছুটিয়ে দিলেন।

তার পরদিন বৈঠক বসলো যূথিকার বাড়িতে।

সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে রাগে গজগজ করতে-করতে যূথিকা বললে, 'অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার!'

'কাকে বলছ, বৌদি?' যূথিকার নবাগত ননদ, সুপ্রভা প্রশ্ন করলো।

'ঐ সর্বিকে।' যূথিকা উঠলো ঝঙ্কার দিয়ে: 'ও বাইরের ঘরে আমাকে বসিয়ে রাখলো কেন শুনি ?'

'দেখতে, তোমার গায়ে কত বড় একেকটা ফোস্কা পড়ে। কিন্তু জিগগেস করি, সুপ্রভা ঝাঁজ মিশিয়ে বললে, 'তুমিই বা বসে' রইলে কেন? আচ্ছা, আপনি বসুন—বলে' কেন সোজা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলে না ?'

'কিন্তু ওর বাড়িতে গেছে, ওই তো সেধে ভিতরে ডেকে নিয়ে যাবে।' হেমনলিনী যূথিকার পক্ষ নিলেন।

'বেশ, এতই যখন আপনাদের আত্ম-পর বিবেচনা, এতই যখন মান-অপমান-জ্ঞান, তখন', সুপ্রভা যূথিকার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলো: 'তখন যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলে সেই পথ দিয়ে ফিরে এলে না কেন ?'

'কি করে' আসবো', যূথিকা নিজের পক্ষে বলবার মতো একটা কথা পেল: 'আমার সঙ্গের চাকরটাকে যে সর্বাণী আগেই বিদায় করে' দিয়েছে।'

'এতই যখন তুমি নির্বল, নিঃসম্বল, তখন তো মোটরে চলে' এসে ভালোই করেছ। সুপ্রভা টিপ্পনি কাটলো।

'যাই বলো বাপু', শান্ত-দিদি হাঁ করে' খানিকটা দোক্তা গ্রহণ ও খানিকটা দোক্তা লেহন করে' বললেন, 'ও যখন পিসির বাড়ি যাবো বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও তো নেমে গেলে পারতে।'

'আমি নামবো কোথায়?' যূথিকা হাঁসফাঁস করতে লাগলো।

'কেন, আমার বাড়িতেই যেতে। আমার বুড়ো শাশুড়ি বাড়ি আছেন—তা তো তুমি জানো, আর এ-ও নিশ্চয় জানো যে তিনি সিনেমায় যেতে পারবেন না। তাঁর সঙ্গেই না-হয় গল্প করতে খানিকক্ষণ।'

'কিন্তু সময় পেলুম কোথায় ?'

'কিন্তু তাঁকে তুমি একবারো বলেছিলে যে তুমি আমার বাড়িতেই ঠিক যাবে?' শান্ত-দিদি হাকিমি গলায় জেরা করলেন।

'সব—সব আগে থাকতে চক্রান্ত করা।' কালীতারা বললেন, 'জাঁহাবাজ মেয়ে, বাবা।'

'চক্রান্তই হোক, আর উপস্থিত-বুদ্ধিই হোক ভদ্রমহিলাকে আমি কিন্তু প্রশংসা না করে' পারছি না।' সুপ্রভা গম্ভীর হ'য়ে বললে।

'প্রশংসা!' হেমনলিনী নিজের গালে একটা বিস্ময়সূচক চড় মারলেন: 'মেয়ে হ'য়ে এ-প্রশংসা যেন না পেতে হয়!'

'দস্তুরমতো খারাপ।' কালীতারা চোখের তারাদুটোকে

যথেষ্ট গোল ও যথেষ্ট ঘোরালো করে' তুললো: 'যে খারাপ, তারই আবার ঝোঁক হয় অন্যকে খারাপ করার।'

'ঠিক কইছেন।' নরেন-মাস্টারের স্ত্রী এতক্ষণে উল্লসিত হলেন: 'আমার যে এউক্কা হ্যাওর আছে, কোনোই কাম-কাইজ্জ করে না, ক্যাবল সিগারেট ফুইক্যা ঘুইর‍্যা বেড়ায়। সেদিন দেখি আমার পোলার পকেটে পোড়া একটা সিগারেট। বোঝনের আর বাকি রইল না কার কীর্তি। নিজে তো গেছেই, ছ্যামরার মাথাটাও চাবাইয়া খাইব।'

'সত্যি, আমাদের সব্বাইর সাবধান হওয়া উচিত।' বললেন হেমনলিনী।

'অর লগে আমাগ মিশনই উচিত না।' নরেন-মাস্টারের স্ত্রী ফতোয়া দিলেন।

আর তার খেই ধরে' কালীতারা 'বলে' উঠলো: 'বয়কট।'

যূথিকা এতক্ষণে আশ্বস্ত হল, কিন্তু সুপ্রভার হাসি সে সহ্য করতে পারলো না, রাগে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: 'তুমি উকিলের বউ, তুমি এর বুঝবে কী?'

অনেক দিন পরে, প্রায় মাসখানেকেরো উপর—সর্বাণী একদিন সন্ধ্যাবেলা দাস-সাহেবের বাড়িতে এসে হাজির। একলা, মানে, শুধু একটা চাকর সঙ্গে।

ড্রয়িং-রুমে দাস, দাস-পত্নী, আর তাঁদের মেয়ে চঞ্চরী।

চঞ্চরী বেহালা বাজাচ্ছে, আর, কিছু হচ্ছে না বলে' নাকের ভিতর থেকে বেহালারই আওয়াজ বার করছে। দাস-পত্নী তাকে শাসন করছেন কিম্বা উৎসাহিত করছেন। আর এত বড় মেয়েকে এখনো তিনি ফ্রক পরান কেন—দাস তারি নালিশ জানাচ্ছেন আর পাইপে তামাক ভরছেন।

এমন সময় সর্বাণী এলো।

রেহাই পেল ভেবে চঞ্চরী ছুটে পালালো—সাদা-মোজা-পরা লিকলিকে বকের ঠ্যাঙে।

'কী সৌভাগ্য আমাদের!' দাস সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'অনেক দিন অনর্থক প্রতীক্ষা করলুম, শেষকালে বিরক্ত হ'য়ে নিজেই পড়লুম বেরিয়ে।' কুশানটা আরেকটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে সর্বাণী বসলো।

'এখানে ছিলুম না অনেক দিন।' দাস অপ্রস্তুত হবার একটা মোলায়েম ভঙ্গি করলো: 'বনে-বাদাড়ে ঘুরতে হয়েছে।'

'আমিও ছিলুম না।' দাস-পত্নী ঠোকর দিলেন।

'ক্ষমা করুন, আপনাদের জন্যে অপেক্ষায় ছিলুম না।' সর্বাণী মুখে একটি সরল অসঙ্কোচ আনলো: 'ছিলুম আমার মধ্যবিত্ত দিদিদের জন্যে। কিন্তু বহু দিন ধরে' তাঁদের দেখা নেই, আমাকে তাঁরা বর্জন করেছেন।'

'কেন, কারণ?' দাস-পত্নী জিগ্‌গেস করলেন।

'কারণ, আপনাদের সঙ্গে আমি মিশি সেটা তাঁদের চক্ষুশূল।'

'মেশেন? কোথায়?' হাসলেন দাস-পত্নী।

'মেশেন, তাতে harm কী?' দাস ঈষৎ উষ্ণ হ'য়ে উঠলেন: 'আমরা কি বাঘ না বনমানুষ যে আমাদের সঙ্গে মেশা যায় না?'

'আপনারা কী জানি না, কিন্তু আমি তো সামান্য একটা টিকটিকি! আমার কী শোভা পায় মাটির খুরি হয়ে ডিকেণ্টারের পাশে বসতে? ছ্যাকড়া গাড়ি হয়ে এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দিতে?' কুপিত মুখে আরক্ত হাসি হেসে সর্বাণী বললে।

'তাতে ওঁদের কী?' দাস-পত্নীও কিঞ্চিৎ তপ্ত হলেন এবং তাঁর চিবুকে দুটি ভাঁজ পড়লো।

'ওঁদের কিছু নয় বলেই তো ওঁদের এত মাথাব্যথা!'

'Talking about—কিছু বলছে বুঝি?' দাস চোখ দুটোকে একটু ছোট করলেন।

'ভীষণ বলছে। যা মনে আসে মুখে আসে না তাই বলছে। মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের সম্বন্ধে যা বলতে পারে তাই।'

'Darned nonsense!' দাসের মুখে প্রতিহিংসার কুটিল কয়েকটা রেখা পড়লো: 'কে কে বলতে পারেন?'

'বলবো বলেই তো এসেছি।'

'লোকের কথা শুনে আপনি ভয় পেয়েছেন নাকি?' দাস-পত্নী গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

'ভয় পাবো তো এলুম কেন? আর, সোজা পায়ে হেঁটে এলুম।' সর্বাণী বললে।

'That's it'. দাস উৎফুল্ল হয়ে সোফার পিঠে একটা ছোট্ট দোল খেলেন।

'তবে নালিশ করতেই শুধু আসেননি।' দাস-পত্নী কথার সুরে তরল একটি হৃদ্যতা আনলেন: 'এমনি চলে' আসাতে আপনার স্বাধীনতা আছে, সাহস আছে, বন্ধুতার অধিকারও বা আছে ; পরনিন্দা আপনি ভয় করেন না, গণ্ডীর ক্ষুদ্রতার আপনি উপরে—এ-সব ব্যক্ত করবার জন্যেই তো তবে এসেছেন। আপনাকে তা হ'লে ধন্যবাদ।'

'আমি হাত-তালি দেব ঊর্মিলা, such a fund of রবীন্দ্রনাথ!' দাস আবার দুটো দোল খেলেন ; বললেন, 'চা করতে বলো। একটু চা খাও। It's darned thirsty work, speech-making'. পরে সর্বাণীর দিকে তাকিয়ে: 'ঠাকরুণদের নাম বলুন। I shall see.'

সে-কথাটাকে ঢাকা দিয়ে ঊর্মিলা বললেন, 'তাই বলে' আপনাকে সবাই ওঁরা ত্যাগ করলেন ?'

'তাতে কী আসে যায় ?' সর্বাণী বললে, 'কে বা ওঁদের চিনতো, কবেই বা ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে ?'

'কিন্তু একটাও বা অন্যায় কথা বলবার ওঁদের কী right আছে? Have the cheek to revile a—' দাস বাকিটা বিজবিজ করলেন।

'ওঁরা আপনাকে ত্যাগ করে' থাকেন, আমরা আছি।' ঊর্মিলা অনেকদূর যেন হাত বাড়িয়ে দিলেন: 'ওরা না মেশেন, আমাদের সঙ্গে মিশবেন। বিকেলে চলে' আসবেন এ-বাড়ি, বললেই গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। তার পর আমরা ঘুরবো বেড়াবো গল্প করবো গান করবো—কে ওঁদের তোয়াক্কা রাখে!'

দাসের অনেকদিন পরে ইচ্ছে হলো ঊর্মিলাকে ডার্লিং বলে' সম্বোধন করেন। কিন্তু সর্বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু গদ্গদ গলায় বললেন, 'Sure'.

'ঐ কথাটার বাঙলা আপনি জানেন নিশ্চয়।' সর্বাণী হেসে উঠলো: 'নিশ্চয়। এইখেনেই আমি আসবো। আমাকেও আমার সঙ্গী খুঁজে নিতে হবে।'

ঊর্মিলা চায়ের তদারকে ভিতরে অন্তর্হিত হ'ল। দাস বললেন, 'এবার সূর্পনখাদের নামের লিস্টিটা আমাকে দিন।'

,

দেখতে-দেখতে প্রায় একটা ভোজবাজী হয়ে গেল। কেউ হলো কাৎ, কেউ হলো জখম, কেউ খেল গোপ্তা, আর যোগেন্দ্র রায় বসে' ছিল এক মাটির ঢিপিতে, চড়ে' বসলো গিয়ে এক পাহাড়ের চূড়ায়। আর টেলিগ্রাফে বদলি হয়ে গেল সে সুদূর কোন মহকুমায়।

এত দ্রুত, এতটা যেন দাস ভাবতে পারেননি।

কেরোসিন কাঠের বড়-বড় সিন্দুক বানানো হচ্ছে, খাট-টেবিল ভেঙে চট মোড়া হচ্ছে, প্রেসে ল্যাবেল পর্য্যন্ত গেছে ছাপতে—এমনি একটা তছনছ ওলোট-পালোটের দুপুরে সর্বাণী যখন ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, শ্লথায়িত, জিনিসে আর জিনিসে, ঝাঁটায় আর ঝুলে—হঠাৎ তাদের বাড়ির দুয়ারের সামনে মোটর এসে দাঁড়ালো।

'ব্যেরা।' নিচে থেকে দাস ডাকলেন।

চাকরটা ছিল কাছে, সর্বাণী বললে, 'নিচে গিয়ে বলে' আয়, মা-জি এখন দেখা করতে পারবেন না।'

চাকর তাই গেল বলতে।

ফের উপরে এসে বললে, 'ভারি জরুরি কথা, আপনাকে একবার নিচে যেতে বলেছেন।'

ক্ষিপ্র হাতে টেবিলের পায়া থেকে কাগজের একটা ফালি ছিঁড়ে ও দোয়াত-দানি থেকে ছোট একটুকরো পেন্সিল কুড়িয়ে নিয়ে সর্বাণী বললে, 'বল্‌গে, জরুরি যদি কিছু কথা থাকে এতে যেন লিখে দেন।'

কাগজের ফালি আর পেন্সিলের টুকরোটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে' দাস খানিকক্ষণ মূঢ়ের মতো বসে' রইলেন। পরে কি ভেবে উঠে পড়ে' পরদা সরিয়ে ভিতরের বারান্দায় এলেন চলে'।

তারই পর থেকে সিঁড়ি চলে' গেছে উপরে, মাঝখানে বাঁক নিয়ে।

সর্বাণী যেন আতঙ্কিত কতগুলি পদশব্দ শুনলো; শূন্যে, না ঘরে, না তার বুকের মধ্যে বুঝতে পারলো না। তাড়াতাড়ি ছুটে এলো সে সিঁড়ির বাঁকের মুখে, দেখলো নিচে দাস, ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত।

'এ কি, আপনি এ-সময়ে? একেবারে গৃহস্থের অন্তঃপুরে ?' তির্যক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সর্বাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

অপ্রতিভ না হয়েই দাস বললেন, 'আপনারা চলে' যাবেন, তাই দেখা করতে এসেছি।'

'তা এখানে কেন? আমার স্বামী এখন আপিসে

আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করুন গে যান। আপনার আপিস নেই ?'

দাস যেন দু' চোখে ধাঁধা দেখলেন। সব যেন তাঁর কাছে কেমন অলৌকিক মনে হল। এতদিনের এত আলাপ এত ঘনিষ্ঠতা এত সোহার্দ—সব যেন এক ফুঁয়ে মিথ্যা হয়ে গেল। যেন আর কিছু নয়, রৌদ্রদগ্ধ আদিগন্ত মরুভূমির উপরে ভাসমান একটা রূপালি মরীচিকা !

দাস কষ্টে একটু হাসলেন। বললেন, 'কেন, আপনিও তো আমার বন্ধু, আপনার সঙ্গে দেখা করতে কি দোষ আছে ?'

'আছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো স্ত্রী-বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটা আমি শিষ্টাচার মনে করি না, আমাদের সমাজে-সংসারে তার প্রশ্রয় নেই।' সবাণী সিঁড়ির বাঁক ঘুরে উঠে দাঁড়ালো, রেলিঙে একটু ঝুঁকে পড়ে' বললে, 'আর বন্ধুতা হয় সমানে-সমানে। বাঘের সঙ্গে গিরগিটির নয়। আচ্ছা, নমস্কার।' সাদা দেয়ালগুলি খিলখিল করে' হেসে উঠলো।

'Darned nonsense.' দাস দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর মোটরে গিয়ে বসলেন।

ফুলছড়ি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

আহ্বান করি, বলে ফুলছড়ি দম্ভেতে
হে যূঁই ক্ষুদ্র হওনা মোটেই লজ্জিত,
আমি কি মস্ত ? আড়াই হস্ত লম্বেতে—
তোমারি লাগিয়া রহি নিশিদিন দুঃখিত।

২

নাহিক যাহার রঙের বাহার অঙ্গেতে
ঠাঁই নাই তার মোদের ফুলের চত্বরে,
প্রভাতে আলাপ না হতে তোমার সঙ্গেতে
কাহিনী তোমার ফুরাইয়া যায় সত্বরে।

৩

ফুলের রাজ্যে আমার আসন উচ্চে হে
আমি ছড়ি পারি সারাইতে সব ধৃষ্টতা
ধরা দিন দিন আমার কদর বুঝ্ছে হে—
জ্ঞানী জন বলে টিকিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠতা।

৪

যূঁই বলে ছড়ি ! সুন্দর তব বক্তৃতা,
আকার যেমন তেমতি তোমার প্রজ্ঞা ত—
ব্যর্থ করোনা মানুষের দেওয়া শক্তিটা,
ফুল ও ছড়ির প্রভেদ রেখ না অজ্ঞাত।

৫

ঘুঙ্গুর পরায়ে যদিই নাচায় পাঁচজনায়—
নাচিতে পারে কি সোলার ময়ূর পক্ষীটি
ফুলছড়ি তুমি ফুলছড়ি থাকো দুঃখ নাই—
ফুল তুমি শুধু হতে এসোনাক লক্ষীটি।



দক্ষিণ মেরু কাহিনী

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল এম-এস্‌সি

(প্রবন্ধ)

পৃথিবীর উত্তর মেরু সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। দক্ষিণ মেরু বিরাজমান এক বিরাট স্থলভাগের অভ্যন্তরে, দশ হাজার ফুট উচ্চ তুষারক্ষেত্রের মধ্যে। দক্ষিণ মেরু মহাদেশ বা এণ্টার্টিকা অতি গভীর ও সুবিস্তৃত সমুদ্রের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত স্থলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। সর্ব্বাপেক্ষা কাছের দেশ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এণ্টার্টিকা সাত শত মাইল দূরে আছে। প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত সমুদ্র ও আটলান্টিক সাগর যেখানে উহাকে ঘিরিয়াছে, সমুদ্র সেখানে যেমন উত্তাল, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রবল ঝঞ্ঝায় ইহার বারিরাশি অতি মাত্রায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই সমুদ্রের দক্ষিণের দিকে শৈত্য বাড়িয়া গিয়া শেষে যেরূপ অতি-হিম অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য। ছোট-বড় নানা আকারের বরফ খণ্ডের দ্বারাও দক্ষিণ মেরু সাগর ঘন ভাবে আচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং ইহা কিছু বিচিত্র নয় যে পূর্ব্বযুগে মেরুবৃত্তের মধ্যে অর্থাৎ ৬৭ ডিগ্রীর বেশী দক্ষিণ অক্ষাংশে কোন অভিযানকারী প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।



দক্ষিণ মেরুদেশের 'গ্রেট আইস বেরিয়ার' এবং (বামে) আকাশের 'আইস ব্লিঙ্ক' বা তুষারের শ্বেত আভা:

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা পৃথিবীকে গোল বলিয়া জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা উহার দক্ষিণভাগকে অনধিগম্য ভাবিয়া নিষিদ্ধ ও পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। মধ্যযুগীয় অন্ধকারে পৃথিবীর স্বরূপ বোঝা কঠিন হয় এবং সকল ভৌগলিক সমস্যা একরূপ অমীমাংসিত থাকে। তাহা সত্ত্বেও লিওনার্ডো-দা ভিঞ্চি ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে যে ভূগোলক প্রস্তুত করেন তাহাতে কাল্পনিক দক্ষিণ মেরুসাগর প্রদর্শিত হইয়াছিল জানা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর নাবিকেরা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ কালে এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগ দিয়া দূর দক্ষিণে চলিবার সময় ক্রমবর্দ্ধমান শৈত্যের পরিচয় পান। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ম্যাগিলান দক্ষিণ আমেরিকার এক অংশকে পৃথিবীর সর্ব্বদক্ষিণ মহাদেশ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ফ্রান্সিস্ ড্রেক দক্ষিণ আমেরিকা প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া দেখেন, আরও দক্ষিণের দিকে তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ এক মহাসমুদ্র প্রসারিত রহিয়াছে। পরের এক শত বৎসরে কল্পিত দক্ষিণ মহাদেশ আবিষ্কারের যে কয়েকটী চেষ্টা হয় তাহার ফলে কেরাজেট্, বুভেট্, কাণ্ডইলান নামক কয়েকটি দ্বীপ ও সাউথ জর্জ্জিয়া নামক বৃহৎ দ্বীপটী আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম ক্যাপ্টেন কুকের অধীনে প্রকৃত দক্ষিণ মেরু অভিযান আরম্ভ করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কুক্ দুইবার মেরুবৃত্ত পার

হইয়া তাঁহার জাহাজকে দুর্ভেদ্য বরফরাশির ধারে লইয়া যান। ইহার পরে কোন অভিযানকারী স্বেচ্ছায় এই মেরু-সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হন নাই। প্রতিকূল বাত্যায় কেহ কেহ মেরুবৃত্তের তুষারখচিত আকাশের নীচে তাড়িত হইয়া থাকিলেও সে কথা তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন না। কুক্ একবার ৭১ ডিগ্রীরও বেশী উচ্চ অক্ষাংশে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। সুদূর দক্ষিণসাগর প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি প্রমাণ করেন, যদি কোন দেশ এই সাগরে বর্ত্তমান থাকে তবে তাহা মেরুবৃত্তের মধ্যে থাকিবে। সত্যই সেরূপ কোন স্থলভাগ দক্ষিণ মেরু সাগরে আছে কি-না কুকের এই অভিযান হইতে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। কুক্ নিজে কোন মেরুদেশ আবিষ্কার করেন নাই সত্য, কিন্তু ভবিষ্যত অভিযানের পথ তাঁহার চেষ্টাতেই উন্মুক্ত হয়।

ইহার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেলে ক্যাপ্টেন বেলিংশোসেনের অধীনে রুশিয়া হইতে আর এক অভিযান ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু সাগরে প্রেরিত হয়। পৃথিবীর যতদূর সম্ভব দক্ষিণে যাইবার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। বেলিংশোসেন ভীষণ ঝড়ের সম্মুখীন হইয়াও ৭০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি চল্লিশ মাইল দূর হইতে দক্ষিণ মেরু দেশের বহিরাংশের এক দ্বীপ প্রথম দেখিতে পান। প্রায় একই কালে টিরাডেলফিউগো এবং সাউথ জর্জ্জিয়া—এই দুইটি দ্বীপ সীল মৎস্যের সলোম চর্ম্ম পাইবার



দক্ষিণ মেরু-সমুদ্রের এক তুষার প্রাচীর। উহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তর উপরে উঠিয়াছে

ক্ষেত্র বলিয়া সন্ধান মিলে। কেবল মাত্র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তখন হইতে যে সামুদ্রিক অভিযান চলিতে থাকে, দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের ইতিহাসে তাহা এক বিচিত্র অধ্যায়। সীল মৎস্যের সন্ধানে প্রথমতঃ তুষারাবৃত সাউথ শেটল্যাণ্ডস্ এবং দুই বৎসর পরে সাউথ অর্কনিজ—দক্ষিণ সাগরের এই দুই দ্বীপপুঞ্জের আবিষ্কার হয়। প্রথমটিতে প্রচুর সীল মৎস্য জন্মাইতে দেখা যায় এবং আমেরিকা হইতে জাহাজ আসিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করে। আমেরিকার মধ্য রেখায় এই দ্বীপ পুঞ্জের আবিষ্কার দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের কার্য্য অনেক দূর আগাইয়া দিতে পারিয়াছিল। সীল শিকারীদের মধ্যে জেম্স্ ওয়েডেল সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসী ছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রের অন্বেষণে ১৬০ টনের জাহাজে সোজা দক্ষিণে চলিয়া ৭৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন। ওয়েডেল দেখিলেন, সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী উন্মুক্ত সাগর। দুই-একটি হিমশৈল মাত্র এখানে সেখানে ভাসিয়া আছে। কেবল খাদ্যের অভাবে তিনি পিছন ফিরিতে বাধ্য হইলেন। ঐ স্মরণীয় দিবসে ওয়েডেল-সমুদ্র যেরূপ হিমানীমুক্ত ছিল, পরে আর কখন উহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখা যায় নাই। কিছুদিনের মধ্যে জন বিস্কো নামক আর একজন সীলান্বেষী জাহাজে দূর দক্ষিণ পরিভ্রমণ কালে প্রকৃত মেরুমহাদেশ আবিষ্কার করেন। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে এণ্টার্টিকার এণ্ডার্বি নামক উপকূলভাগের সঠিক অবস্থান তাঁহার দ্বারা নির্ণীত হয়। সাউথ শেটল্যাণ্ডের দক্ষিণে গ্রাহামল্যাণ্ডও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সীল মৎস্য দ্রুত ধ্বংস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সকল অভিযান শেষ হইয়া যায়। তখন হইতেই হইল দক্ষিণ মেরুর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সূত্রপাত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য,

ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেন প্রত্যেকেই দক্ষিণ মেরু দেশের চৌম্বক অবস্থা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিবার পরিকল্পনা করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ডি উর্ভিলি-কে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। উহার কোন লাভমূলক উদ্দেশ্য ছিল না। ফ্রান্সের গৌরববর্দ্ধন করিবার সঙ্কল্প লইয়া ডি উর্ভিলি চৌম্বকমেরু (ভৌগোলিক মেরু হইতে পৃথক) পৌছিবার প্রয়াস পান। টাস্‌মেনিয়া হইতে দক্ষিণের দিকে যাত্রা করিয়া তিনি বিশ দিনের মধ্যে মেরু-মহাদেশের তুষারাবৃত এক নূতন উপকূলভাগ আবিষ্কার করেন এবং তাহার নাম দেন এডেলিল্যাণ্ড। এই স্থলভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ছয় হাজার ফুট উপরে উঠিয়াছে। ডি উর্ভিলির অভিযান সুপরিচালিত ও বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। গ্রাহামল্যাণ্ডের সন্নিকটে বহুসংখ্যক স্থলভাগের আবিষ্কার এই অনুসন্ধান প্রসঙ্গে সাধিত হয়। আমেরিকার চারখানি জাহাজ একই অভিপ্রায়ে ঐ সময় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রা করে। ক্যাপ্টেন উইলকিন্স ডি-উর্ভিলির অনুসরণ করিয়া এডেলিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

রয়াল সোসাইটী সেই কালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে এণ্টার্টিক অভিযানে প্ররোচিত করে। ফলে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে চৌম্বক মেরু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ইরিবাস ও টেরার নামক দুইখানি জাহাজকে মেরু সাগরে প্রেরণ করা হয়। উহাদের বৈজ্ঞানিক সাজসজ্জার আয়োজন অভূতপূর্ব্ব হইয়াছিল। এই অভিযানের চমকপ্রদ আবিষ্কার দক্ষিণ মেরুদেশীয় অবস্থার উপর নূতন আলোকপাত করিতে সমর্থ হয়। জেম্‌স রস্‌ 'ইরিবাস' ও ক্যাপ্টেন ক্রোজিয়ার 'টেরারে'র অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। সমগ্র অভিযানটি রসের অধীনে থাকে। হুকার নামক একজন তরুণ উদ্ভিদবিদ্যাবিদও সহযাত্রী হইয়াছিলেন। রস্‌ তিন বৎসর দক্ষিণে যাপন করেন। প্রথম গ্রীষ্ম ঋতুতে তাঁহার পাল-তোলা জাহাজ নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণে ঘন তুষার রাশির পরিবেষ্টনী ঠেলিয়া মুক্ত সাগরে উপস্থিত হয়। এই সমুদ্রের নাম এখন রস্‌ সাগর। ৭১ ডিগ্রী লাটিচুডে হিমশৃঙ্গ-শোভিত এক বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী রসের দৃষ্টিগোচর হয়। বিশিষ্ট আকারের যে এক অন্তরীপ হইতে উহা দক্ষিণের দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহার নাম দেওয়া হয় কেপ এডেয়ার। রস্‌ এই স্থলভাগে উত্তরণ করিতে সক্ষম হন নাই। ভীষণাকৃতি নিঃসঙ্গ পার্ব্বত্য উপকূল ধরিয়া পাঁচ শত মাইল দক্ষিণে চলার পর প্রকাণ্ড এক আগ্নেয়গিরির দ্বারা রসের জাহাজের পথ অবরুদ্ধ হইল। রস্‌ দেখিলেন, সমুদ্রের জল হইতে খাড়া ভাবে তের হাজার ফিট উপরের দিকে উঠিয়া একান্ত নির্জ্জনে উহা আকাশে অগ্নিশিখা বিস্তার করিতেছে। ঐ আগ্নেয়গিরির নামকরণ হয় 'ইরিবাস'। পাশে যে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আগ্নেয়গিরি চোখে পড়ে তাহার ক্রিয়া থামিয়া গিয়াছে। উহার নাম 'টেরার' রাখা হয়। গিরিমূলের পূর্ব্বভাগে দ্বিতীয় প্রকার বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণের জন্য আবির্ভূত হইল। দেখা গেল, গড়ে এক শত ফিটেরও বেশী উচ্চ এক অতিকায় তুষার প্রাচীর অভগ্ন অবস্থায় বরাবর পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে। রস্‌ তাঁহার নাম দেন—'গ্রেট আইস্‌ বেরিয়ার'। প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ অপরূপ দ্রব্য থাকিতে পারে—কল্পনা করা যায় না বলিয়া



ক্যাপ্টেন এলস্‌ওয়ার্থের উড়োজাহাজ 'পোলারষ্টার'। এণ্টার্টিকার 'ব্লিজার্ড' বা তুষারঝঞ্ঝায় উহা চাপা পড়িয়াছে, দেখা যাইতেছে

রস লিখিয়া গিয়াছেন। পর বৎসর আইস্ বেরিয়ারের ধারে ধারে তিনি চার শত মাইল অবধি জাহাজ চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন স্কট্ পরে বেরিয়ারের দৈর্ঘ্য পাঁচ শত মাইলের কিছু বেশী বলিয়া নিরূপণ করেন। ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অমূল্য সম্পদ লইয়া রসের জাহাজ মেরুদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসে—সে কথার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

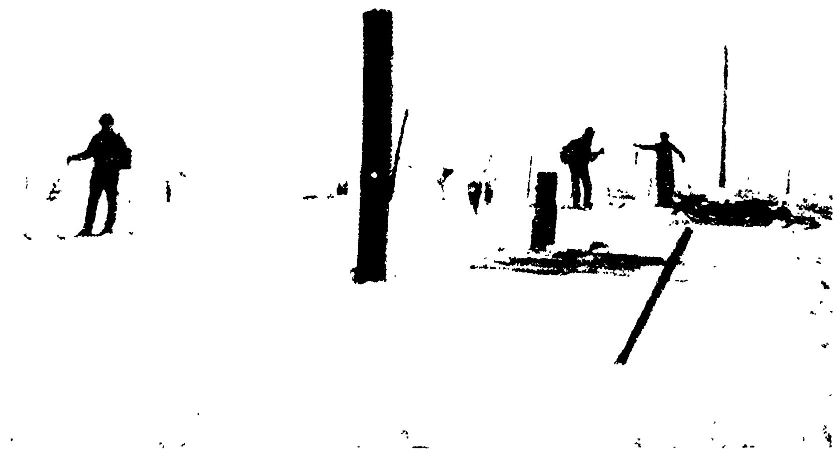
ইহার পর দীর্ঘকাল এ্যাণ্টার্টিকা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। 'চ্যালেঞ্জার' এবং আর দুই-একটীর অভিযান মাত্র তাড়াহুড়া করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে শেষ করিয়া দেওয়া হয়। অর্দ্ধ শতাব্দীর বেশী কাটিয়া গেলে পুনরায় উপযুক্তভাবে সজ্জিত বৈজ্ঞানিক অভিযান দূর সিন্ধু পারে দক্ষিণের নূতন তথ্য অন্বেষণে প্রেরিত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নরওয়েবাসী বর্চগ্রেভিঙ্ক 'সাদার্ণ ক্রসে' এণ্টার্টিকা পৌছিয়া উহার উপর প্রথম শীতকাল যাপন করেন। 'মূল মেরুমহাদেশে মানুষ এই প্রথম পদার্পণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে অতীব ভীষণ স্থানকে তিনি বাসের জন্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলেন। বরফের উপর চালাইবার টানাগাড়ী বা শ্লেজ, কুকুরের পাল প্রভৃতি মেরু পরিক্রমণের নানারূপ সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও তিনি এণ্টার্টিকার অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ লাভে কৃতকার্য্য হন নাই। যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহে অবশ্য ত্রুটি হয় নাই। অনুসন্ধান কার্য্যে নূতনত্বও ছিল। পদার্থ-বিদ্যাবিদ্ বার্নেকি চৌম্বক ও আবহতত্ত্ব এবং একজন জীবতত্ত্ববিদ্ সামুদ্রিক জীবের নমুনা এণ্টার্টিকার উপকূলে সেই প্রথম সংগ্রহ করেন। পরবর্ত্তী শীতকালে শেষোক্ত বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু ঘটে। এণ্টার্টিক পেঙ্গুইন ও সীল মৎসের প্রকৃতি এই অভিযানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছিল। বর্চগ্রেভিঙ্ক ফিরিবার পথে রস্-বেরিয়ার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পান, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা উহা বহুদূর দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। 'সাদার্ণ ক্রসের' সমসাময়িক আর এক অভিযান বেলজিয়াম নৌবিভাগের গার্লেকি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই মেরু অভিযানকারী ৭১ ডিগ্রী লাটিচুডের কাছাকাছি স্থানে আপন জাহাজ 'বেলজিকাকে' ইচ্ছা করিয়া ভাসমান তুষার রাশির মধ্যে আটকাইয়া দেন এবং তের মাস ধরিয়া অসহায় অবস্থায় উহার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া বেড়ান। এইরূপ পরীক্ষা কিরূপ বিপজ্জনক সহজেই অনুমেয়। অভিযানের সদস্যেরা একবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং এক জনের মৃত্যু ঘটে। আমণ্ডসেন ঐ দলে ছিলেন। বেলজিকার নিরুদ্দেশ যাত্রায় সমুদ্রসংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য অবশ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলও উপযুক্ত আকারে সর্ব্বপ্রথম এই ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে সুইডেনের ডক্টর নর্ডেনস্কিয়োল্ড তুষার স্তূপের আঘাতে জাহাজ চূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত মেরুদেশীয় ভূতথ্য সংগ্রহের কাজে সফল হইয়াছিলেন এবং জার্মান অভিযানের নেতা ড্রাইগলস্কি মেরু মহাদেশের বাহিরের দিকের কিছু স্থান পরিদর্শন করিতে এবং ঐ দেশে বিমান সংক্রান্ত গবেষণা চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বিশেষ কৃতিত্বের সহিত মেরুযাত্রা চালনা করা হইলেও এ পর্য্যন্ত অভিযানকারীদের কার্য্যক্ষেত্র এণ্টার্টিকার প্রান্ত-ভাগে আবদ্ধ ছিল। উহার প্রধান অংশ এবং তাহার অবস্থার বিষয় ঐ-সময় পর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই। স্কট্, শ্যাক্লটন, মসন ও আমণ্ডসেন—এই চার জনের নেতৃত্বে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণ মেরুদেশে যে বিরাট অভিযান পরিচালিত হয় তাহা হইতে উক্ত দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গিয়াছে। অভিযানকারীর প্রত্যেকের আবিষ্কার সমান মূল্যবান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। স্কট্ নানা দিকে প্রচুর ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করেন। অন্যের সহিত তাঁহার তুলনাই হয় না। শ্যাক্লটন বিস্তৃত স্থলভাগ আবিষ্কারে সমর্থ হন। দক্ষিণ মেরুর অল্প দূরের মধ্যে তিনি পৌছিয়া ছিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তুষার নদী—বীয়ার্ডমিয়ার এবং দক্ষিণ মেরুর দশ হাজার ফুট উচ্চ সমতল ভূমি—শ্যাক্লটনের আবিষ্কার। মসন দুই হাজার মাইল ব্যাপী নূতন তটভাগ আবিষ্কার করেন এবং আমণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে সর্ব্বপ্রথম পৌছেন।

স্কটের প্রথম অভিযানে (১৯০১—১৯০৪) ডিস্কভারী নামক সুবৃহৎ জাহাজকে মেরু-সমুদ্রের উপযোগী করিয়া গঠিত করা হয়। ইরিবাসের পাদমূলে উহা দুই বৎসর বরফ-সাগরে জমাট বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া ছিল। ঐ সময়ে স্কট্ ডক্টর উইলসন ও লেপ্টনাণ্ট শ্যাক্লটনকে সঙ্গে লইয়া শ্লেজে ৮২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পৌছেন। এই স্থলযাত্রায়

মেরু মহাদেশের অনেকগুলি পর্ব্বত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ডিস্‌কভারীর অভিযান হইতে প্রমাণিত হয় যে এণ্টার্টিকার প্রায় সমুদয় অংশ তুষারে আবৃত। উদ্ভিদ ও জীব উহার মধ্যে নাই বলিলেই চলে। গ্রীষ্মের দিনে শুধু পেঙ্গুইন, সীল ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীব আসিয়া উহার তটভাগে ভিড় জমাইয়া থাকে। টেরানোভা জাহাজে স্কটের শেষ অভিযানের কাহিনী (১৯১১—১২) তাঁহার নিজের ও সহযাত্রীদের মৃত্যুবরণরূপ শোকাবহ ঘটনার সহিত জড়িত। 'টেরানোভা'র বৈজ্ঞানিক সাজসজ্জা পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও সুসম্পন্ন করা হইয়াছিল। পদার্থবিদ্যায় ও ভূতত্ত্বের অনেক আবিষ্কার তাহাতে সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—ডক্টর এডওয়ার্ড উইলসন, ডক্টর সিম্পসন, (পরে মেটিরিয়লজি অফিসের ডিরেক্টর) এবং অধ্যাপক ডিবেনহাম (পরে পোলার রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর)। একজন বিশেষজ্ঞ মেরুমহাদেশের কতকগুলি সুন্দর ফটোগ্রাফ এবং চলচ্চিত্র সংগ্রহ করেন। ডক্টর উইলসন সবর্ণ ফটোগ্রাফও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মেরুদেশের এক গভীর উপসাগরে পৌঁছানর পর স্কট্ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন যে, বিখ্যাত 'ফ্রাম্' আমণ্ডসেন ও তাঁহার নরওয়ের দলবলকে যাত্রী করিয়া একই দিকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমণ্ডসেনের উত্তর মেরুযাত্রা উদ্দেশ্য ছিল। হঠাৎ সেই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তিনি দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছিবার সঙ্কল্প করেন। ঐ সময় 'ফ্রাম' আশ্চর্য্য রকমের এক সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করে। সংবাদ গোপন রাখিবার জন্য উহা কোন বন্দরে না থামিয়া মাদিরা হইতে একটানা রস্ সমুদ্রে চলিয়া আসে এবং যাত্রীদের তীরে নামাইয়া দিয়া শীতযাপনার্থ বুয়েনস এরিসে ফিরিয়া যায়। আমণ্ডসেন সাহস করিয়া চলমান বেরিয়ার আইসের উপর শীতকাল কাটাইয়া দেন এবং শরতকাল আসিতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতকদূর পর্য্যন্ত খাদ্যের ডিপো স্থাপন করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া তিনি দেখিতে পান—শীত অতিরিক্ত মাত্রায় বেশী। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর ৭১ ডিগ্রী নীচে নামিয়াছে এমনও লক্ষ্য করা যায়। যাত্রা তখন স্থগিত রাখিয়া ১৯শে অক্টোবর তারিখে ৫২টী কুকুর, পাঁচজন সঙ্গী ও চারখানি শ্লেজ লইয়া আবার তিনি মেরুর দিকে চলিতে সুরু করেন। ৮৫ ডিগ্রী লাটিচুডে এক্সেল-হাইবার নামক মেরু-সমভূমিতে উঠিবার এক গ্লেসিয়ার বহু কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করা হয়। এই ভূমির উপর দিয়া চলিতে আমণ্ডসেনের বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। প্রতিদিন গড়ে কুড়ি মাইল রাস্তা চলিয়া ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হন এবং তিন দিন মেরুর উপর কাটাইয়া মাত্র ৩৯ দিন সময়ে তাঁহার প্রধান আড্ডায় ফিরিয়া আসেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৫ই জানুয়ারী যখন আমণ্ডসেন ফ্রামহাইমে পৌঁছিলেন, তখনও ১২টী কুকুর, দুইখানি শ্লেজ ও যথেষ্ট খাদ্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। আমণ্ডসেন দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন। বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চেষ্টা তিনি করেন নাই।



এড্‌মিরাল বার্ডের 'লিট্‌ল আমেরিকা'। সাদা তুষার ক্ষেত্রের উপরে খুঁটী প্রভৃতি চোখে পড়িতেছে। নীচে ঘর আছে

ইতিমধ্যে স্কট মোটর শ্লেজ এবং কতকগুলি কুকুর ও পনী লইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর সদলে মেরুযাত্রা

আরম্ভ করেন। যাত্রা ভালরূপ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মোটর ভাঙ্গিয়া যায় এবং ৮৩ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে প্রবেশ-মাত্র শেষ পনীটিকে মারিয়া ফেলিতে হয়। শ্যাফ্‌লটনের ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পথ ধরিয়া স্কট্‌ বীয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ারে উঠিতে আরম্ভ করেন। পথে তিনখানি শ্লেজ নিজেদেরই টানিয়া চলিতে হইয়াছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী যাত্রীদল দক্ষিণ মেরুতে পৌছিয়া দেখিতে পান—আমণ্ডসেনের এক তাঁবু সেই স্থানে পড়িয়া আছে। ৬৯ দিন রাস্তা চলিয়া সকলেই তখন একেবারে ক্লান্ত। আমণ্ডসেন এক মাস পূর্ব্বে দক্ষিণ মেরু ঘুরিয়া গিয়াছেন জানিয়া দারুণ নিরাশায় তাঁহাদের মন ভরিয়া গেল। ফিরিবার পথে আকাশের অবস্থা খুব খারাপ হইল। বিপদও একটার পর একটা আসিয়া জুটিতে লাগিল। অফিসার ইভান্‌স বীয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ারে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং যাত্রায় বিলম্ব ঘটাইয়া দিয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাপ্তেন ওটীস্‌ নিজেকে শক্তির শেষ সীমায় আসিতে দেখিয়া এবং আপনার ভারে সকলের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন বুঝিয়া তুষারঝঞ্ঝার মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন দেন। ওটীসের আত্মবিসর্জ্জন সত্ত্বেও অবশিষ্ট তিন জনের জীবন রক্ষা হয় নাই। অতি কষ্টে তাঁহারা দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শেষবারের জন্য তাঁবু ফেলেন। ঐ সময় নয় দিন ধরিয়া চারিদিকে মেরুদেশীয় তুষার ঝঞ্ঝার অবিরাম তাণ্ডব চলিতে থাকে। তাঁবুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ধীরভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া মেরু প্রত্যাগতদিগের তখন অন্য উপায় ছিল না। বৎসর খানেক পরে তিনটী জমাটবাঁধা মৃতদেহ ঐ তাঁবুর ভিতর খুঁজিয়া বাহির করা হয়।



হোয়েল উপসাগরের একটি দৃশ্য

শ্যাক্‌লটন 'নিমরড' অভিযানে (১৯০৬-৭) ৮৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। দক্ষিণ মেরুর আর মাত্র ৯৭ মাইল বাকি ছিল। খাদ্যের অনটন পড়ায় তিনি মেরু আবিষ্কারের গৌরবলাভে বঞ্চিত হন। শাক্‌লটনের এই অভিযানে অধ্যাপক ডেভিড ও ডগলাস মসন্‌ ইরিবাস আগ্নেয়গিরির শিখরদেশে উঠিয়াছিলেন। তের শত মাইল নূতন দেশ আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও কোন লোকের প্রাণহানি হয় নাই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় অভিযানে শ্যাক্‌লটনের প্রতি ভাগ্য তেমন প্রসন্ন হয় নাই। তিনি ওয়েডেল সমুদ্র হইতে মেরু মহাদেশের উপর দিয়া রস সাগরে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জাহাজ 'এন্‌ডিওরেন্স' তুষার সমুদ্রে আটকাইয়া গিয়া শেষে চুরমার হইয়া যায়। যাত্রীরা পলায়ন করিয়া বরফের এক বৃহৎ স্তূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ছয় মাস ধরিয়া সাগর জলে ভাসিতে থাকেন। বরফ গলিয়া পড়িলে শ্যাক্‌লটন সদলে বোটে চড়িয়া এলিফ্যাণ্ট দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উহাতেই আবার সাউথ জর্জ্জিয়ার হোয়েলিং ষ্টেশনে যাত্রা করেন। ভীষণ সমুদ্রের বক্ষে শ্যাক্‌লটনের আট শত মাইল বোট যাত্রার কাহিনী রূপকথার মত। সেখান হইতে বহু চেষ্টার পর তিনি দলের সকলকেই উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

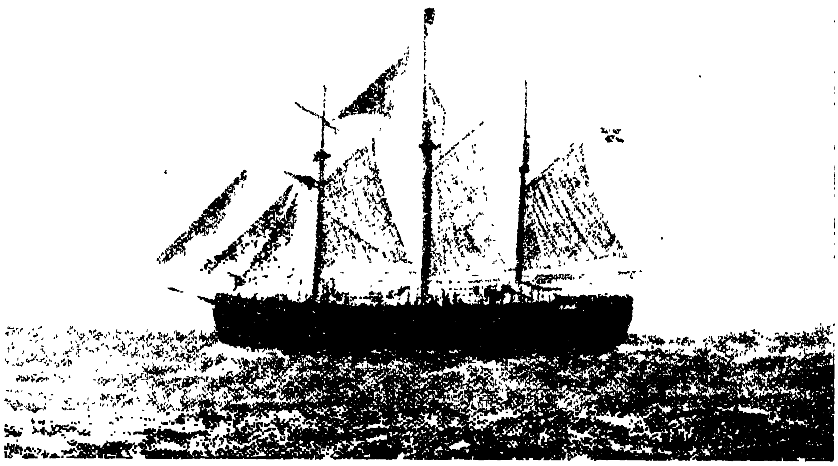
মসনের আবিষ্কার তেমন চমকপ্রদ না হইলেও উহা দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'অরোরা'র প্রথম বারের অভিযানে (১৯১১-১৪) মসন এডেলিল্যাণ্ডে শীত যাপন করেন। এমন ঝড়ের দেশ পৃথিবীতে নাই। মসন এই স্থানে আসিয়া দেখিলেন—

হুহু করি বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন জলোচ্ছ্বাস।

বাতাসের বেগ ঘণ্টায় এক শত মাইলেরও বেশী তিনি এই স্থানে লক্ষ্য করেন। 'হোম অফ্ দি ব্লিজার্ড' পুস্তকে সমুদ্রোপকূল ভাগটীর দারুণ অবস্থা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এণ্টার্টিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিনিস্ ও মার্জ্জ—তাঁহার এই দুই সঙ্গীই প্রাণ হারাইয়া ফেলেন। নিনিস্ তুষারে লুক্কায়িত এক অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যান এবং মার্জ্জ কুকুরের মাংস ভক্ষণে পীড়িত হইয়া মারা পড়েন। মসন তখন একাকী শ্লেজ টানিয়া চলিতে আরম্ভ করেন এবং মাসভোর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে তাঁহার প্রধান আড্ডায় পৌঁছিতে সমর্থ হন। মসনের এই মেরু-যাত্রাকে প্রকৃতই ভয়াবহ ও অনন্যসাধারণ বলা যায়।

স্কট ও আমণ্ডসেনের সতের বৎসর পরে এডমিরাল বার্ড এরোপ্লেনে দক্ষিণ মেরু পরিভ্রমণ করেন। বার্ড শক্তিশালী ফোর্ড মেসিনের সাহায্যে ফ্রামহাইম ষ্টেশন হইতে 'গ্রেট বেরিয়ার' পার হইয়া পাঁচ ঘণ্টার কম সময়ে এক্সেলহাইবার গ্লেসিয়ারে পৌঁছিয়াছিলেন এবং উহার শীর্ষদেশ উড়িয়া পার হইয়া দশ হাজার ফুট উচ্চ তুষার-ভূমির উপর দিয়া সোজা দক্ষিণ মেরুতে গিয়াছিলেন। তিনি এরোপ্লেনেই মেরু প্রদক্ষিণ করেন এবং ঝড় আসিবার পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া ১৯ ঘণ্টার মধ্যে ফ্রামহাইমে ফিরিয়া আসেন। আকাশপথে আরও কয়েকবার দক্ষিণ মেরু প্রদেশে অভিযান হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্টেন এল্স্ওয়ার্থ তাঁহার উড়া জাহাজ 'পোলারষ্টারে' ওবেডেল সমুদ্র ও হোয়েল উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। কার্য্যটী অবশ্য খুব সহজে সাধিত হয় নাই। দুই বার ব্যর্থচেষ্টা করার পর তৃতীয় বার এল্স্ওয়ার্থ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইয়াছিলেন। পোলার-ষ্টার পথে একবার তিন দিনের তুষার ঝঞ্ঝায় আক্রান্ত হইয়া বরফে চাপা পড়িয়াছিল। যাত্রা শেষে এল্স্ওয়ার্থ ও তাঁহার এরোপ্লেন চালক উভয়কে কাপ্টেন বার্ডের 'লিট্‌ল আমেরিকায়' আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। সেখান হইতে ব্রিটিশের দ্বিতীয় ডিস্কভারী তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করে।

অনেকের চেষ্টায় দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে সাধারণ রকমের জ্ঞান এখন লাভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে, এণ্টার্টিকা পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া আছে। এই বিরাট স্থলভাগ আকারে ইউরোপ অপেক্ষা বড় এবং উচ্চতায় উহার সাত গুণ ও সহিমালয় এসিয়ার দুই গুণ। বড় পর্ব্বত ও তুষার নদীতে সমগ্র মহাদেশটী পূর্ণ হইয়া আছে। উহার এক শত বর্গ মাইল স্থানও তুষারমুক্ত নয়। সেইজন্য উদ্ভিদ বা জীবের কোন চিহ্ন এই স্থলভাগে দেখা যায় না। সমুদ্র সংলগ্ন পাহাড়ে মাত্র কিছু শেওলা জন্মিয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপ স্তব্ধ, নিষ্প্রাণ ও মরুময় দক্ষিণ মেরু মহাদেশের কোন তুলনা পৃথিবীতে মিলে না। উহার দিগন্তব্যাপী নিঃসঙ্গতায় মেরুযাত্রীর বীর হৃদয়ে পর্য্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হয়। শীতলতায় দক্ষিণ মেরু প্রদেশ উত্তর মেরুকে ছাড়াইয়া যায়। গ্রীষ্মকালেও এণ্টার্টিকার তাপ-মাত্রা শূন্য ডিগ্রীর অনেক নীচে থাকে। বার্ড –৮০ ডিগ্রী তাপ মাত্রা পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। উত্তর মেরুর বরফ গ্রীষ্মের দিনে গলিয়া যায় এবং উহার অনাবৃত স্থান সূর্য্য কিরণ পাইয়া উত্তপ্ত হয়। কেবল মাত্র গ্রীণল্যাণ্ড এণ্টার্টিকার ন্যায় চির-তুষারে আবৃত থাকে।



মেরু-সাগরের বরফস্তূপের চাপ সহিবার উপযুক্ত করিয়া গঠিত 'ফ্রাম'। নানসেন উহাকে উত্তর মেরুদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের সময় আমণ্ডসেন এই জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন

শীতের ন্যায় দক্ষিণ মেরুর ঝড়ও নিদারুণ। তীব্র শীতল বায়ু এণ্টার্টিকার ভিতর দিক হইতে চারিদিকের সাগরে বহিয়া চলে। দক্ষিণ ভূমণ্ডলে ৫৫ হইতে ৬৫ ডিগ্রীর মধ্যে কোন স্থলভাগ নাই। কাজেই পশ্চিম হইতে বায়ু অপ্রতিহত গতিতে পূর্ব্বদিকে বহিতে পারে। স্থলভাগের উষ্ণ বাতাস সাগরের দিকে না আসায় দক্ষিণ মেরুবৃত্তের শীতলতা উত্তর মেরু অপেক্ষা বেশী। দক্ষিণ মেরুবৃত্তে কোন দিন বৃষ্টি হয় না। কেবলমাত্র তুষারপাত ঘটিয়া থাকে। প্রবল ঝড়ের সহিত তুষারবৃষ্টির সংযোগই দক্ষিণ মেরুর বিখ্যাত 'ব্লিজার্ড'। এই তুষার ঝঞ্ঝা অবস্থাবিশেষে বহুদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া থাকে। প্রবল ঝড়ে স্থলভাগে সঞ্চিত বরফরাশি খসিয়া পড়িয়া চারিদিকের সমুদ্রে ছড়াইয়া যায়। দক্ষিণ মেরু সাগরের আইস্‌বার্গ বা হিমশৈল এবং তুষারের ঘন আবেষ্টনী এইভাবে সৃষ্ট হয়। গ্রেট বেরিয়ারের আইস্ বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড জোগাইয়া থাকে। ভাসমান বরফ স্তূপ গলিয়া গিয়াও সমুদ্রের শীতলতায় জোগান দেয়। আইস্ ব্লিঙ্ক বা তুষারের শ্বেত আভা আকাশে প্রতিফলিত দেখিয়া জাহাজের যাত্রীরা জলের উপর উহার অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারেন। সাগর যেখানে তুষারমুক্ত, সেখানকার দিগন্তরেখা ধূম্রবর্ণ। সমুদ্রের জল জমাট বাঁধার কালে উপরের দিকে কয়েক ফুট পুরু আবরণ গঠিত হয়। নীচের জল তরল অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকে। দক্ষিণ মেরু মহাদেশ মোটের উপর জীব ও উদ্ভিদ-শূন্য হইলেও মেরু সমুদ্রে প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে। দক্ষিণ মেরু সাগরে সীল, পেঙ্গুইন ইত্যাদিরূপ সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ জীব বাস করে। গ্রেট বেরিয়ারের ধারে এম্পারার পেঙ্গুইনেরা এমন শৃঙ্খলার সহিত বসবাস করে যে, দেখিলে মনে হয় উহারা সভ্যতার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনেক সময় এই সুখী পাখীর দল বরফস্তূপের উপর চড়িয়া ক্রীড়াচ্ছলে ভাসিয়া বেড়ায়। ঝড়ো সমুদ্রে দোল খাওয়া এল্‌বাট্রস্ নামক সামুদ্রিক পাখীর এক বিলাস। স্নো পেট্রেল, চিল প্রভৃতি দক্ষিণ মেরুর সাধারণ জীব।

পৃথিবীর চৌম্বক গুণ, আকাশের বিদ্যুৎ, অরোরা ইত্যাদি কয়েক প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পক্ষে মেরু দেশের বিশেষত্ব আছে। সূর্য্য হইতে উৎক্ষিপ্ত তড়িত্যুক্ত কণিকাসমষ্টি পৃথিবীর পানেও চলিয়া থাকে এবং অরোরা, চৌম্বক-বাত্যা প্রভৃতির জন্ম দেয়। মেরু দেশের অরোরা প্রাকৃতিক আলোকের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। স্কট এবং আরও অনেকে 'অরোরা অষ্ট্রেলিস' বা দক্ষিণ মেরু জ্যোতির বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সিন্ধুপারের হিমদেশে অন্য প্রকার সুন্দর সৃষ্টিও চোখে পড়ে। কোন কোন স্থানে সাদা তুষার প্রাচীরের গায়ে কৃষ্ণ প্রস্তর উঠিয়া মেরু যাত্রীকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও কেহ কেহ নিঃসঙ্গ ধরণীর ভীষণ সুন্দর দৃশ্যে মোহিত হইয়াছিলেন দেখা যায়।

পৃথিবীর প্রাচীন যুগের অনেক প্রস্তর—দক্ষিণ মেরুদেশে পাওয়া যায়। নানা প্রকার উদ্ভিদ ও জীবের দেহাবশেষও দক্ষিণ মেরুতে মিলিয়া থাকে। পূর্ব্বযুগে যে এণ্টার্টিকা পৃথিবীর অপর স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল এবং একদিন যে উহার অবস্থা নাতিশীতোষ্ণ ছিল তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। বিরাট তুষার যুগে পৃথিবীর অনেক দেশ দীর্ঘকাল বরফে আবৃত ছিল। দক্ষিণ মেরু মহাদেশ এখনও তুষার যুগের শেষ চিহ্নে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।



গহনার বাক্স

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

পুলিস-কোর্টের উকীল নির্ম্মলকুমার দুরন্ত মক্কেলের দুষ্কৃতির দুশ্চিন্তায় কাতর ছিল। ধর্ম্মাধর্ম্ম বা বিবেক-বিচারে নয়—বিচারকের ধর্ম্ম-গৃহে অভিভাষণকে মর্ম্মস্পর্শী কর্ব্বার উৎকণ্ঠায়।

সুতরাং যখন বাল্য-বন্ধু বিপুল ভট্টাচার্য্য কক্ষে প্রবেশ কর্লে, নির্ম্মলের মাত্র এক সুদূর, আত্মহারা, নীরব চাহনী তাকে অভিবাদন কর্লে।

সুমিত্রের উদাসীনতা ব্যথিত কর্লে বিপুলকে। অভিমান তাকে পরামর্শ দিলে—সরে পড়।

সে বল্লে—আচ্ছা আসি।

চমক-ভাঙ্গা নির্ম্মলকুমার চকিতে উঠে বন্ধুর হাত ধরলে।

মৃদু-হাসির ক্ষণিক জবাব-দীহির পর তারা বসলো—সুখ দুঃখের আলোচনা কর্ত্তে।

বাহিরে খট্‌কীন্ ফলওয়ালী কাতর-কণ্ঠে হাঁকলে—বেদানা—কাবুলী বেদানা—বেদানা!

শর-বিদ্ধের মত উঠে দাঁড়ালো বিপুল। তার তৃষিত আঁখি গবাক্ষ পথে অনুসন্ধান করলে—ফলওয়ালীর।

বিস্মিত হ'ল বন্ধু। কি ভীষণ! উত্তর-কলিকাতার মৌচাকে প্রেম-সাহারার তৃষাতুর পথিক! বিশেষ পুলিস কোর্টের উকীলের কক্ষে!

অদৃশ্য ফল-ওয়ালী আবার হাঁক্‌লে—কাবুলী-বেদানা!

—ওঃ! আহাঃ!—বল্লে আগন্তুক।

—কি ব্যাপার হে!—জিজ্ঞাসিল গৃহ-স্বামী।

এবার বিপুল দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো—জানালার ধারে গেল। মর্ম্ম-ছোঁয়া কণ্ঠস্বর যার—তাকে দেখবার জন্য।

উকীলের ধৈর্য্য-চ্যুতি হ'ল। তার রুগ্ন আত্মীয়ের জন্য কিছু বেদানা কেনবার আবশ্যক ছিল—কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেদানা-ওয়ালীকে ঘরে ডাকলে—ওকালতী ছেড়ে ঘট্‌কালী কর্ত্তে হবে। সে বন্ধুকে বল্লে—আরে ছিঃ! তোমার এমন দুর্দ্দশা হ'ল কেন?

—দুর্দ্দশা!

—নয় তো কি? তুমি বিপুল কুমার। একটি রাজত্ব আর অর্দ্ধেক রাজ-কন্যার প্রত্যাশায় দিনে রাতে স্বপ্ন দেখ—তোমার হৃদয়-গাঙে বান ডাকালে খট্‌কীন্ ফল্ ওয়ালী।

সে অবজ্ঞার চাহনীতে মিত্রকে ভস্ম কর্ব্বার চেষ্টা কর্লে। অগ্নি-পরীক্ষায় স-গৌরবে উত্তীর্ণ হ'য়ে উকীল উদাসীন ভাবে হাঁস্‌লে।

বিপুল একজন নবীনা মহিলা-কবির নাম কর্লে। বল্লে—শ্রীমতী—যদি নিজের-রচা কবিতা আউড়ে তোমার বাতায়ন পথে চলে যায়—তুমি ডিঙি মেরে দেখ না?—

—পাগল না কি? তুলনায় রবীন্দ্রনাথ। ততোধিক বড় পুরুষ-কবি বলেছেন—স্বার্থের প্রয়োজনে শয়তানও শাস্ত্র আওড়াতে পারে।

সে আবার বল্লে—উঃ!

নির্ম্মল বল্লে—কাবুলী বেদানার মধ্যে হটাৎ কি মর্ম্ম-কথা পেলে ব্রাদার?

বিপুল আবার মহিলা কবির উল্লেখ করলে। বল্লে—উনি বড় কেন? তোমার লুকানো মর্ম্ম-বীণার গভীর তারে ঝঙ্কার মারেন ব'লে তো।

নির্ম্মল বল্লে—ফল্‌-ওয়ালীর হুঙ্কারের মধ্যে ঝঙ্কার কোথা পেলে বন্ধু?

—কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে—কাবুলী বেদনা! উঃ! চাই হিট্‌লার! কাবুলী-নির্ব্বাসন!

এবার উকীলের মস্তিষ্কের তারে ঝঙ্কার অনুভূত হল। ওঃ!

সে বল্লে—ওঃ! মানে হ'চ্চে, তুমি কি, অর্থাৎ কাবুলীর কাছে—মানে গেরস্ত ঘরে টাকা সকলকেই ধার করতে হয়।

নিজের মনে বল্লে বিপুল—ওঃ! সানের মেঝেয় বাঁশের লাঠি ঠুকে যখন বলে—রূপী লাও—আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়। ওঃ—কাবুলী বেদনা।

নির্ম্মল বল্লে—বুঝেছি শুভাগমনের উদ্দেশ্য। পুলিস কোর্টের উকীলের বাড়ি সহজে কেহ আসে না স্বার্থ—খুড়ি—প্রয়োজন ছাড়া। কাল করে দ'ব পুলিস ধম্‌কীর দরখাস্ত—সহৃদয় বিশ্বাস মশায়ের এজ্‌লাসে।

কথাটা তার মর্ম্ম-বীণায় ঝঙ্কার দিলে বোধ হয় কারণ প্রত্যুত্তরে বিপুল মন খুলে হাস্‌লে। সে বল্লে—হাঁ স্বার্থ টেনে এনেছে তোমার অ—ন্নানে ধর্ম্মকুটীরে। কিন্তু কাবুলী-বেদনায় নয়।

—ফল-ওয়ালীর প্রেমে? বৃত্তি হিসাবে ঘট্‌কালি নীচ।

—আরে গো কর রসিকতা। তার হাঁকে স্মৃতি জেগে উঠেছিল—তাই—যাক—সে অনেক কথা।

—ক্ষু ভাল। পাড়ার মাঝে একটা কেলেঙ্কারীর দায় হ'তে নিষ্কৃতি পেলাম—ফলওয়ালীর প্রেম! ওঃ!

সত্যই বিপুলের সে আকাশ-চাওয়া কবির ভাবটা কেটে গিয়েছিল। সে বল্লে—আপাততঃ কাবুলী-আতঙ্ক কাটিয়েছি—ঋণ-মুক্ত হ'য়েছি। বীকানীরের টুপী কাবুলের মাথায় চাপিয়ে। তবে শোন।

নির্ম্মল বল্লে—শুন্‌বো যদি সাদা কথায় বল—কবিতার রসান না দিয়ে।

সে সাদা কথায় বোঝালে। কাজ-কর্ম্ম ছিল না—অর্থেরও প্রয়োজন। ঘোড়দৌড়ের মাঠে তার বাজি রাখা পক্ষীরাজ ঘোড়াগুলা বাজি মারতে পারে নি। তাকে টাকা ধার করতে হ'য়েছিল কাবুলীর কাছে। অশিষ্ট আফগানী তাগাদা বন্ধ করবার জন্য সে দৈনিক কাগজের—হারানো-নিরুদ্দেশ—স্তম্ভে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। বন্ধুর অবগতির জন্য সে কাগজখানা টেবিলের উপর রাখলে। বিজ্ঞাপন নিম্নলিখিত—

—দুই শত টাকা পুরস্কার—

টোক্‌রেখালির জমিদার শ্রীযুক্ত বিপুলকুমার ভট্টাচার্য্যের অপহৃত একটি বাক্সের সন্ধান দিলে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। বাক্সে দলিল-পত্র ছিল, আর ছিল দশ হাজার টাকার অলঙ্কার এবং নগদ নোটে ও টাকায় পাঁচ শত টাকা দশ আনা ছ পাই এবং একটি রক্ষা-কবচ।

তার পর তার কলিকাতার ঠিকানা।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করল—মিথ্যা বিজ্ঞাপন!

সে হেঁসে বল্লে—ষোল-আনা মিথ্যা। ছাপার অক্ষরে হারানো সম্পদের বিবৃতিতে কাবুলীকে মুগ্ধ করলাম। তার তাগাদায় শ্রদ্ধা এলো—তাগাদা বারেও কম্‌লো।

—তার পর?—জিজ্ঞাসা কর্লে বিস্মিত নির্ম্মল।

—তার পর ঘটনা ঘট্‌লো একটা—যার ফল হ'ল দু-মুখো তরবারের চোটের মত। কাবুলীর দেনা শোধ হ'ল। হাতে কিছু টাকা এলো। কিন্তু বিজ্ঞাপন-সমুদ্র হ'তে যেমন সুধা উঠ্‌লো তেমনি গরলও উঠল। বলা বাহুল্য শেষোক্ত ব্যাপারের হাঙ্গামায় তোমার শরণাপন্ন হ'য়েছি।

সে সুধার কথাটা প্রথমে বল্লে। বিজ্ঞাপনের ফলে সহসা সে সম্ভ্রান্ত হল—অবহেলা-নীরব জীবন স-চঞ্চল হল। অনেক দালাল তার কাছে এলো গহনার ফর্দ্দর জন্য—পোদ্দারের দোকান পাহারা দিয়ে চোর ধরে দেবার সাধু সঙ্কল্প নিয়ে। সে কিন্তু গহনার ফর্দ্দ কাকেও দিল না। পাছে তারা মিথ্যা সংবাদ দিয়ে তার ক্লিষ্ট চিত্তে আরও অশান্তি উৎপন্ন করে—এই অজুহাতে।

—যুক্তিটা বুঝলাম না—বল্লে নির্ম্মল।

—যা বোঝা যায় না তা শ্রদ্ধা জাগায় অতি মাত্রায়। কারণ এই সব ছোট দালালদের সঙ্গে এলো এক অযাচিত বড় বন্ধু—মুলুকরাজ ফট্‌ফটিয়া। সে হারানো গহনার শূন্য স্থান পূর্ণ কর্ত্তে ধারে দশ হাজার টাকার অলঙ্কার বিক্রী করতে সম্মত হল। চৈত্র কিস্তির জমিদারীর খাজানা আদায়ের পর তার টাকা দিলে হবে।

নির্ম্মল ভীত হচ্ছিল। তার ভয় ভাঙ্গালে বন্ধু।

—আমি ধারে জহরত কিন্‌তে সম্মত হলাম না—যদিও আমার জমিদার পূর্ব্ব-পুরুষেরা চিরদিন ধারে হাতি কিনেছেন। সংযত নির্লোভিত কিন্তু আমার জীবনের মূল-সূত্র।

মুলুক-রাজকে বোঝালে বিপুল যে আপাততঃ তার মাথায় আগুন জ্বলছে। নগদ টাকা তার হাতে নাই। যে সব হ্যাণ্ড-নোট তমসুক ছিল—তাদের মধ্যে কোন্‌টা তামাদি হ'য়ে যাবে তার ঠিক্ ছিল না।

ফট্‌ফটিয়া না-ছোড়। সে বল্লে—কুছ পরোয়া নাই। টাকা কত চাই।

এ অযাচিত কল্যাণ তার জীবনের উপস্থিত সমস্যার সমাধান কর্লে। সে সেক্ষপীরের জোয়ার ভাঁটার উপদেশ স্মরণ কর্লে। ২৭৫৲ টাকা নিয়ে ফট্‌ফটিয়াকে ৩০০৲ টাকার হুণ্ডি লিখে দিলে। বিপুল ২০০৲ টাকা দিয়ে

কাবুলির দেনা শোধ করলে, বাকি ৭৫ টাকা ঘোড়দৌড়ের মাঠের জন্য রেখে। কাল হুণ্ডির ভুক্তানের দিন।

নির্ম্মল হাঁসলে। বল্লে—বিকানীরবাসীর নিকট আরও ১৫০্ টাকা নিযে ৫০০্ টাকার হুণ্ডি লিখে দাওনা। এর জন্য উকীলের পরামর্শ অনাবশ্যক।

—তা জানি। এখন আমার কাছে নগদ ৫০০্ টাকা আছে। কাল তার টাকা শোধ করে দেব। এখন আমার পছন্দ-করা ঘোড়াগুলা স্ফূর্ত্তি করে ছুট্‌ছে। ব্যাপার ঘটেছে অন্য একটা।

—ওঃ! গরল। নীলকণ্ঠ চাই?

এবার সে গম্ভীর হল। বল্লে—চিরদিন পুলিস আমার অপ্রিয়। টিক্‌টিকি পুলিস পূর্ব্বে কখনও স্বচক্ষে দেখিনি। সেদিন দেখেছি।

—কি ব্যাপার?

—ভাই হটাৎ পরশু একটি ভদ্র-লোক এসে বল্লেন তিনি সি-আই-ডি। মিষ্টি জিলিপি খেলে যেমন জল-তেষ্টা পায় তেমনি তাঁকে দেখে আমার তেষ্টা পেলে। ভদ্র-লোক সেই বিজ্ঞাপন বার ক'রে নানা প্রশ্ন কল্লেন। মোট কথা তিনি আবার কাল আসবেন—গহনার ফর্দ্দ আর দলিলের বর্ণনা নিতে।

প্রাণ খুলে হাসলে নির্ম্মল। গম্ভীর হল বিপুল। শেষে বিপুল বল্লে—তোমার দাঁতের গড়ন খুব ভাল নয়। আর যখন হাস, নাকের ডগাটা কুঁচকে কুশ্রী দেখায় তোমাকে।

উকীল বল্লে—গাম্ভীর্য্য বা ভয় তোমার ফুলো গাল দুটোকে আরও গোবিন্দের মার গালের মত ফুলিয়ে দেয়। যাক্—দেহতত্ত্ব। কি ভয়?

সে বল্লে—ফ্যাসাদে পড়ব মিথ্যা লিষ্টি দিয়ে।

নির্ম্মল বল্লে—যখন মিথ্যার হ্রদে একটা ঢিল ফেলেছ চক্রের সৃষ্টি হবেই। সুতরাং বোঝার ওপর শাকের আঁটি। একখানি জুয়েলারের ক্যাটালগ এনে—দশ হাজার আন্দাজ দামের গহনার ফর্দ্দ দাও।

বিপুল নিজের মনে বল্লে—ওঃ! কি মিঠে অন্তর-টেপা হাঁসি মিত্র মশায়ের। যেন পাশ করা ছেলের বাপ। গহনার ফর্দ্দের জন্য কেবল মারে ইস্কুরুপের প্যাঁচ।

নির্ম্মল বল্লে—তা দিয়েই দাও না ছাই। কেবল যদি কোনো চোরাই মাল ধরে আনে, বলবে তোমার গহনটা ছিল—তার চেয়ে মোটা আর বেঁটে আর নক্সাটা ছিল অন্য রকম।

বিপুল বল্লে—তা যেন হল। আর তমসুক? এখন কত দেন্‌দার কল্পনা করব? কেবল দেনাদার কল্পনা করলেই হবে না। প্রত্যেকটির বাপের নাম আর গ্রামের নাম—দুর ছাই।

নির্ম্মল একটু চিন্তিত হল। বল্লে—আপাততঃ কি বলে স্থগিত রেখেছ মিত্র মশায়কে?

সে বল্লে—গহনার ফর্দ্দ সম্বন্ধে বলেছি জিনিসগুলা ছিল আমার ভগ্নির—আর দলিল সম্বন্ধে বলেছি—গোমস্তাকে চিঠি লিখব।

নির্ম্মল ভাবলে। বল্লে—কতকগুলা সত্যি তমসুকের বর্ণনা দাও—পরে বোলো ভুল হয়েছে।

এবার বিপুল হাঁসলে। বল্লে—তমসুক নেই। যদি থাকে দেনাদার হিসাবে আমার কিম্বা দাদার সহি করে। আর গোমস্তা—নিজেদের একজন ছিল। কয়েক বৎসর বেতন না পেয়ে যা পেরেছে আদায়পত্র ক'রে নিয়ে বসে আছে। যৌথ সম্পত্তি কাকার হাতে—আমাদের প্রবেশ নিষেধ।

নির্ম্মল বল্লে—আমি মিত্র মশায়ের সঙ্গে দেখা করব এখন। তুমি গেজেট দেখে ম্যাট্রিকের পাশের লিষ্ট থেকে গোটা কুড়িক নাম জোগাড় কর। দশটাকে তোমার দেনাদার করব আর দশজনকে লটারি করে তাদের পিতৃ-স্থানে বসাব। আতুরের নিয়ম নহে।

-বাপের নাম ছেলের নাম ম্যাট্রিকের ফর্দ্দ থেকে নিলে মানান সই হবে না। বাপের নাম ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বরের তালিকা থেকে নিতে হবে—প্রাচীন হবে—বল্লে বিপুল, তার বিরাট মনস্তত্ত্বের আলোচনার ফলে।

পরাস্ত-বুদ্ধি উকীল ব'ল্লে—তা বটে।

(২)

বনমালী নস্করকে অশিষ্ট ক্লাসের-ছেলেরা বল্‌ত বনমালী তস্কর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের—পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়—নীতি নিত্য তার শোণিত স্রোতের সঙ্গে চলা-ফেরা করত। আর একটা প্রাচীন নীতি নিয়ন্ত্রিত কর্ত্ত বনমালীর চরিত্র—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। নবীন চাকুরী-নীতির উদার মহিমায় ম্যাট্রিক্ পাশ করা

বনমালী অনায়াসে ত্রিশ টাকার একটা চাকুরী সংগ্রহ কর্ত্তে পারত। কিন্তু—উহুঁ!

বনমালী কস্‌বায় এক অট্টালিকার ভিদ্ কাটার কাজ পেয়েছিল, আর পেয়েছিল গড়িয়াহাটায় পুকুর বোঝাবার ঠিকাদারী। সুতরাং সে কস্‌বার অতিরিক্ত মাটি গড়িয়াহাটার ডোবায় ফেলে—এক ঢিলে দুই পাখি বধের ব্যবস্থা কচ্ছিল। শ্রমিকদের কর্ম্ম-কুশলতা পর্য্যবেক্ষণ করবার ফাঁকে ফাঁকে বনমালী সংবাদ-পত্র পাঠ কর্ত্ত।

হটাৎ বিপুল ভট্টাচার্য্যের হারানো-বাক্সের বিজ্ঞাপন পড়লো তার আঁখি পথে। জয়-মা-কালী! পরোপকারের সঙ্গে নগদ দু'শো টাকা! দু'শো টাকা! কত জমির মাটি কাটলে লাভ হয় দু'শো টাকা- শুভঙ্করের প্রথায় সে জমির কালি কষ্‌লে মনে মনে।

রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লে বনমালি। গড়িয়া-হাট বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণে মাদার গাছের পাশে যে যজ্ঞ ডুমুরের গাছ আছে—তার ঈষৎ দক্ষিণে পোঁতা আছে বিপুল ভট্টাচার্য্যের অলঙ্কারের বাক্স। একদিকে মাত্র দু'শো টাকা, অপরদিকে তার অনাগত কালের ভার্য্যার কোমল-কণ্ঠে-হীরা-মুক্তার নেক্‌লেস—কবজীতে ব্রেসলেট—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয়-ভাগ জয়-যুক্ত হ'ল লোভ বর্জ্জনায়। ২০০৲ টাকাই যথেষ্ট। চোরাই অলঙ্কারে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য মলিন হবে—বাড়বে না। সুতরাং সে সঙ্কল্প কল্লে যে পোঁতা-বাক্স উদ্ধার ক'রে অচিরে বিপুলকে প্রত্যর্পণ করবে।

প্রভাতে যখন সে কর্ম্মস্থলে যাচ্ছিল—সানি পার্কের মোড়ে এক ভস্ম-মাখা নাগা ফকীর তাকে বল্লে—বাঃ বাঃ বাঃ বেটা! তোর কপালে আজ কি দেখছি! হায়! হায়! দে বেটা সাধুকে সের ভর আটা। বা রে ভাগ্যিবান বেটা!

বনমালী শিহরে উঠ্‌লো। রাত্রের স্বপ্ন দিনের আলোয় প্রোজ্জ্বল হল। রবির আলো মণিমালা হতে বিচ্ছুরিত'হল। দিনটাও ছিল লক্ষীবার!

গেঁজে থেকে পয়সা বার ক'রে বনমালী নাগা ফকীরকে আধ সের আটার দাম দিলে। সে শুক্‌নো লাউয়ের কমণ্ডলু থেকে ছাই নিয়ে নস্করের কপালে টীকা দিলে।

কিন্তু ভস্ম-মাখা ললাটে যখন বনমালী কস্‌বার কর্ম্মস্থলে পৌঁছিল—সে ছাই-ভস্ম অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়লো। কুলীরা জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছে আধখোঁড়া বুনিয়াদের পাশে। তাদের মাঝে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে কয়েকজন অপরিচিত। সবার মাথার উপর স-গৌরবে উড়ছে এক লাল-পতাকা—যাতে আঁকা আছে কাস্তে আর লাঙ্গলের ফলা।

নস্করকে দেখে জনতা চঞ্চল হল। একজন অপরিচিত মাথার উপর হাত তু'লে তর্জ্জনী ঘুরিয়ে বল্লে—লাল ঝাণ্ডাকী—

অপর সকলে সমস্বরে বল্লে—জয়।

আবার সেই অপরিচিত বল্লে—মজদুরকী—

সমস্বর—জয়!

—পুঁজীবাদকী—

—ক্ষয়—

—ইন্‌কেলাব—

—জিন্দাবাদ—

তার পর সমস্বরে—বোলো মহাত্মা গান্ধীকী জয়।

বিস্মিত বনমালী ব্যাপারটা বুঝলে। সে সরদারকে বল্লে—সরদারজি কাম করো। পরশুদিনকা মধ্যে যে কাজ শেষ করনে হোগা। না হলে ড্যামেজ দেনে হোগা। মহা কেলেঙ্কারী হোগা।

উত্তরে একজন বল্লে—মজ্‌দুরকী।

জলদগম্ভীর স্বরে সকলে বল্লে—জয়।

কে কার কথা শোনে। কোথায় যুক্তি! কিসের অনুরোধ উপরোধ। বনমালী নস্কর হুরমুতের দায়ে পড়বে, অথবা অবসর পাওয়া জেলাজজের সৌধ নির্ম্মাণে বিলম্ব ঘট্‌বে—এ তুচ্ছ চিন্তা তাদের বিরত করতে পারলেনা—যাদের দেহ মন আত্মা নিঙড়ে, অপরে ভাল খায়, নরম শয্যায় শোয় আর নরম গরম কাপড় পরে। কভি নেহি!

তারা আর একবার জয়ধ্বনি ক'রে লাল-পতাকার অনুসরণ করলে। বস্‌লো মাটির স্তূপে বনমালী। টাকায় অন্ততঃ চার আনা মজুরি বৃদ্ধি—তার ওপর রবিবারে কাজ বন্ধ। লাভের গুড় পিঁপড়েতে খাবে। শ্রমিকরা যে হুজুকে পড়ে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ল মারছে সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না নস্করের। সে মাটির ঢিপির ওপর বসে কপালে হাত দিলে।

হাতে ভস্ম লাগ্‌লো নাগা ফকীরের দেওয়া—নগদ এক

আনার বিনিময়ে। হাতের ছাইয়ের দিকে চেয়ে নস্কর বল্লে—দুর ছাই।

(৩)

দুই বন্ধু মিলে গেল করুণাসিন্ধুর বাড়ি বালীগঞ্জে। করুণা বিপুলের ভগ্নি-পতি। ইনস্পেক্টর মিত্র তাগাদা দিচ্ছিল গহনার ফর্দ্দর জন্য। বাস্তবের ভিত্তিতে অলঙ্কারের তালিকা রচনার উদ্দেশে তাদের এই অভিযান।

—হ্যালো ?—বল্লে করুণা।

বিপুল বল্লে—বন্ধুর কাছে এলাম একটা গহনার ফর্দ্দর জন্য নির্ম্মলের মেয়ের বিয়ে। ওর হবু বেহাই ফর্দ্দর জন্য হা-পিত্যেস করে বসে আছে।

করুণা একটু বিস্মিত হল! নির্ম্মলের বিবাহ হয়েছে মোটে সেদিন—বছর দুই পূর্ব্বে। রসিকতাটা উৎকট, কিন্তু সে তার সমাধানে আত্ম-নিয়োগ করলেনা। সে ভাবতে পারলে না।

করুণা ধনী। করুণা পণ্ডিত। প্রত্ন-তত্ত্ব-গবেষণা করুণার সখের ও সুখের খেয়াল। সে আয়নী-আক্‌বরী হতে অধুনা এক অলঙ্কারের তালিকা সংগ্রহ করেছিল। তাদের বর্ণনা মিলিয়ে সে রূপার উপর সোনার গিল্টি ক'রে তাতে রঙীন কাঁচ বসিয়ে এক সেট অলঙ্কার নির্ম্মাণ করেছিল—কোনো যাদুঘর বা সাহিত্য-প্রদর্শনীকে উপহার দিবার জন্য।

পতি-প্রাণ বন-লতা বাধ্য হয়ে স্বামীর খাম-খেয়ালীর প্রশ্রয় দিয়েছিল, যদিও তার অন্তরাত্মা চেয়েছিল, ঐ সব গহনা আসল সোণায় নির্ম্মিত হয়ে, তার শ্রীঅঙ্গের শোভা বাড়ায়। তার উপর জরোয়া হীরা-মুক্তা মণি-মাণিক সন্নিবেশিত হয়ে। এদের গহনার ফর্দ্দ শুনে করুণা বল্লে—নির্ম্মলবাবু—বিপুলকে বলা মিথ্যা। আপনি কৃতবিদ্য—

বিপুল বল্লে—আমি নই ?

করুণা বল্লে—হ্যাঁ পাস করেছ। কিন্তু কৃষ্টি তোমার ধাতু-গত নয়। যাক্ দুজনকেই বলছি—আমি এক বাক্স গহনা গড়িয়েছি—আক্‌বরী আমলের—

—আকবরী আমলের ?—সমস্বরে বল্লে মিত্র-যুগল।

—হ্যাঁ আকবরী আমলের গ্রন্থে বর্ণিত—বহুদিন যার প্রচলন ছিল ভারতে। যথা—শীশ্-ফুল কোটিলাদার, পীপলপট্টী, ময়ুর ভান-ওয়ার—

সভয়ে বিপুল বল্লে—থাক্, থাক্, হ'য়েছে। আবৃত্তি বৃথা। কাগজে লিখে দাও। ঐ রকম অলঙ্কারই আমরা চাই।

তার মগজের মধ্যে বিজলী-প্রবাহ খেলছিল। ঐ রকম একটা তালিকা দিতে পারলে সি-আই-ডি কাবু হবে—তাকেও চোরাই মাল সনাক্ত কর্ব্বার দায়ে পড়তে হবেনা।

উৎসাহ পেলে করুণা। শ্যালক রেসিয়াল হলেও শিক্ষিত—ঘোড়-দৌড়ের মাঠে একেবারে জলাঞ্জলি দেয়নি জ্ঞান-পিপাসা। আর তা না হবেইবা কেন, সে যখন বনলতার অগ্রজ।

সে বল্লে—তালিকা তো দব। তোমরা চক্ষুকর্ণের বিবাদ মেটাও। রূপ-প্রিয় প্রাচীন ভারতের—

কথা শেষ করবার পূর্ব্বেই প্রত্নতাত্ত্বিক ছুটলো।

নির্ম্মল বল্লে—বেচারা সত্যই জ্ঞান-পাগল। তোমার বুদ্ধিটাও ভাল। ঐ চোয়াল-ভাঙ্গা নাম আবৃত্ত কর্ত্তে লাল-বাজারে ভূমিকম্প হবে।

বনলতা অগ্রজের শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে বেয়ারা ফুলুয়া মারফত চা ও বিস্কুট পাঠিয়ে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে ব্যস্ত ত্রস্ত করুণাসিন্ধু এসে বল্লে—সর্ব্বনাশ! চুরি! ডাকাতী! সর্ব্বনাশ।

বহু প্রশ্নের উত্তরে বিদিত হ'ল মিত্র-যুগল—যে আকবরী গহনার প্রতিকৃতি ভরা বাক্স চুরি গেছে।

ক্ষিপ্ত-প্রায় করুণা-সিন্ধু বল্লে—ওঃ! পৃথিবী থেকে দশ হাজার টাকার সম্পত্তি লোপ পেলে। সে পাবে তার কিছুনা—গিল্টী করা গহনা।

বিপুল নিজেকে তিরস্কার কচ্ছিল। ছিঃ! তার পরমাত্মীয় বিপন্ন। এই দুঃসময় তার এই স্বার্থ-ভরা চিন্তা। তার ভাগ্য ভাল না হলে রেসে লাভ হয়! আর ভাগ্য ভালো না হলে এই পাগলা গহনার বাক্স চুরি যায়!

কিন্তু সত্য মানেনা উদার অনুদার মনোবৃত্তি বা দগ্ধ-রোম ও নীরোর বেহালা-বাদ্য। সত্য বলছিল, এবার বিপুল বিরাট বিক্রমে পুলিসের সম্মুখীন হতে পারবে।

নারীর ভূষণ পতি। সেই পতির প্রত্ন-তত্ত্ব-গড়া ভূষণ চুরি গেলে বাদসাহী আমলের জীর্ণ অবরোধ অবরুদ্ধ রাখ্‌তে পারেনা সাধ্বী-নারীকে। আর বিশেষ নির্ম্মলবাবু যখন দাদার বন্ধু—অগ্রজ-প্রতিম।

বনলতা বাহিরে এলো। তাকে দেখে শোক-বিহ্বল স্বামী বল্লে—কি হ'বে বন্নু ?

অগ্রজের ভালবাসা একটু সান্ত্বনার খাতে গেল। সে বল্লে—ভয় পাসনি বন্নু। টিক্‌টিকি পুলিস মিত্র মশায় আমাদের বন্ধু। রাত পোহাবার আগেই সে চোরের টিকি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আন্‌বে। তার সঙ্গে চোরকে। কি বল নির্ম্মল ?

কাজেই অগ্রজ-প্রতিমকে বল্‌তে হল—হ্যাঁ, তার আর কথা কি ? তবে শ দুই টাকা না হয় উপহার দেওয়া যাবে।

—নিশ্চয়—বল্লে বাক্স হারা।

গবেষকের শ্যালক ভাবলে—রাম না হ'তে রামায়ণ—ঠিক কথা। ভাগ্‌গিস্ বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলাম। এ সব দৈব সঙ্কেত—নষ্ট রত্ন উদ্ধার হবে নিশ্চয়। অশ্বের বেগের উপর যার ভাগ্য-ফল, তার পক্ষে দৈব না-মানা দুর্দ্দৈব।

নির্ম্মল ভাবছিল—লে লুল্লু ! অর্থাৎ কি ভাব্‌বে তা ভেবে পাচ্ছিলনা।

করুণা ভাবছিল—অসংখ্য ভাবনা।

কিন্তু মতিলার মন বিচরণ করে পৃথিবীর শক্ত মাটির উপর—যখন সে প্রেমের ভাবনা ভাবেনা। সার্লক হোমসের প্রক্রিয়া ও যুক্তির কৌশলে সে স্থির করলে চোর—ফুলুয়া। কারণ—নানা কারণ।

সে বল্লে—ফুলুয়া আমি বুঝেছি। তুমি না বলে অন্যমনস্ক-ভাবে বাক্স নিয়ে গেছ। আজ রাত্রের মধ্যে সেখানকার বাক্স সেখানে না রাখ্‌লে—শুনছতো টিক্‌টিকির কথা। দাদা—

—ঠিক্ কথা !—বল্লে বিপুল—অবিকল আমার মনের কথা টেনে বলেছ বন্নু। ফুলুয়া যে চোর, তা ওর কপালের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা রয়েছে।

ফুলুয়া কাতর স্বরে প্রতিবাদ করতে গেল।

বনলতা বল্লে—চোপ্।

কাজেই সভাস্থ বাকি তিন জনকে বল্‌তে হ'ল—চুপ্।

নির্ম্মলকুমার ফলুয়ার বেদনা-কাতর মনে ডুব দেবার চেষ্টা করছিল। কাবুল বেদনা কি এ হেন বেদনা অপেক্ষা ভীষণ ?

(৪)

ইনস্‌পেক্টর মিত্রের অফিসে বসে যখন নির্ম্মল ও বিপুল স-গৌরবে গহনার ফর্দ্দ দিচ্ছিল—তার এসিষ্টাণ্ট কমিশনার তাকে ডেকে পাঠালে। মিত্র হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। বাস্ গহনা বটে !

—তুমি একটা গহনার বাক্সর তদন্ত করছিলে না মিত্র ?

—হ্যাঁ স্যার। উকীল নির্ম্মলবাবু পার্টিকে নিয়ে এসেছেন।

—ওঃ ! একটি ভদ্র-লোক বাক্স ধরেছেন চোর সমেত। শোন !

আর্‌দালী নিয়ে এল ভদ্র-লোককে। এসিষ্টাণ্ট কমিশনার তাকে মিত্রের সঙ্গে কথা কহিতে বল্লেন।

ভদ্‌্রলোক বল্লে—আমার বক্‌সিস্‌টা, রায় বাহাদুর হুজুর !

রায় বাহাদুর হেঁসে বল্লেন—ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু দেবেন।

ভদ্র-লোক নাম বল্লে—শ্রীবনমালী নস্কর।

মিত্রের কর্ম্ম-কক্ষে বসে বনমালী স্বপ্নের কথা বল্লে !

—বাক্সর কথা বলুন নস্কর মশায়।

কিন্তু সে সাধুর কথা না ব'লে বাক্সর কথা বলে কেমন করে। তারপর ধর্ম্মঘট, তারপর হুড়মুতের ভয়।

—তা বুঝ্‌লাম। বাক্সর কথা বলুন।

—আজ্ঞে বলছি স্যার। মনের দুঃখে গেলাম গড়িয়া-হাটে পুকুর বোজাবার বাগানে। কানাই-হারা ব্রজ—একটি কুলি নাই, একখানা গাড়ি নাই, এক কোদাল মাটি নাই। সন্ধ্যা অবধি ঘুরলাম—কুলির সন্ধানে। কিন্তু কলির অধর্ম্ম-

নির্ম্মল স্মরণ করিয়ে দিলে—বাক্স। গহনার বাক্স।

—হ্যাঁ ! বিপুল-বপু বাবুর গহনার বাক্স।

—ননসেন্স ! বিপুল-বপু নয়—কুমার।—বল্লে ব্যথিত বিপুল। তার স্বর্গীয় পিতৃদত্ত নাম নিয়ে রঙ্গরস তার বরদাস্ত হ'ত না।

মোট কথা সন্ধ্যার আঁধারে নস্কর একবার মাদার গাছের তলায় গেল দৈব-স্বপ্ন পরীক্ষা করতে। যখন বাগানের কাছাকাছি, তখন সে দেখলে বাগান থেকে একটা লোক আসছে একটা বাক্স হাতে করে। সে জয়মা কালী ব'লে তাকে জড়িয়ে ধরলে—বাক্স সমেত।

—নস্কর ধরেছে তস্কর।—বল্লে মিত্র।

বাক্স ও চোর ছিল বালীগঞ্জ থানায়। সেখানকার ইন্‌স্‌পেক্টর বনমালীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল লালবাজারে, কারণ পুলিস গেজেটে ছিল বিপুলবাবুর বাক্সর কথা।

তারা সদল বলে গেল করুণা নিদানে। করুণার যখন উল্লাসের মাত্রাটা কেটে গেল, সকলে গেল বালীগঞ্জ থানায়।

পথে বার দুই বনমালী নস্কর বক্‌সিসের টাকার তাগাদা করলে।

তারা সমস্বরে তাকে বল্লে—থামুন না মশায়।

সর্ব্বনাশ! হাজতে ফুলুয়া।

আর টেবিলের উপর—আকবরী যুগের অলঙ্কার ভরা লোহার বাক্স।

ফুলুয়া যখন বুঝলে গহনাগুলা গিল্টি-করা, সে চুপি চুপি বাক্সটা যথাস্থানে রাখবার উদ্দেশে তাকে আনছিল। পূর্ব্ব রাত্রে সে হাতীলতার ঝোঁপে বাক্সটাকে লুকিয়ে রেখে এসেছিল।

নির্ম্মল চুপি চুপি বল্লে—টাকাটা কে দেবে নস্করকে?

—আক্কেল-সেলামীরূপে আমিই দেব। ফটফটিয়ার টাকায় জেতা রেসের টাকা—এই বাজে কাজেই ব্যয় হ'ক। চোরের ধন বাট্‌পার খাক—কিন্তু দেখ ত বেটা ফুলুয়ার কাণ্ড।

বিপুল রাগ সামলাতে পারলে না। সবেগে এক চপেটাঘাত করলে ফুলুয়াকে।

স্থূল রাজ-পুরুষ বল্লে—আহা করেন কি থানার মধ্যে?

কপালের ঘাম মুছে বিপুল বল্লে—বেগ্‌ ইয়োর পারডন্‌।

মধ্যভারতের দার্জ্জিলিং—পাঁচমাড়ী

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

ভ্রমণ

মে মাসের একদা আমরা বোম্বে মেলে পাঁচমাড়ী রওয়ানা হইলাম। পিপারিয়া ষ্টেশনে যখন পৌঁছাইলাম তখন বেলা সাড়ে দশটা। পিপারিয়া ষ্টেশনটি ছোট। আমরা পূর্ব্ব হইতেই মেল মোটরের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। প্ল্যাটফরমের বাহিরে আসিতেই দেখি মোটর কণ্ডাক্টর অপেক্ষা করিতেছে। সে বাস লইয়া আমাদের লগেজগুলি মোটরে উঠাইয়া লইল এবং বলিল যে বেলা ১১টায় রওয়ানা হইবে। আমরা তৎক্ষণ প্লাটফরমের পাশে মুসাফিরখানায় উঠিলাম। সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েরা থাকায় তাহাদের খাবার খাওয়াইয়া লইলাম এবং গরমে অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় নিজেরাও মুখ হাত ধুইয়া একটু বিশ্রাম লইলাম।

বেলা ১১টার পর আমরা মোটর বাসে উঠিলাম। বাসখানি পিপারিয়া পোষ্ট আপিসে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিল। সেখানকার কাজ সারা হইলে ডাক্তারের নিকট আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য লইয়া গেল। পাঁচমাড়ীতে কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিতে না পায় তাই এরূপ ব্যবস্থা। গ্রীষ্মের সময় এখানে মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর আসিয়া বাস করেন। নাগপুর অত্যন্ত গরম বলিয়া সেখান হইতে বড় বড় আপিসগুলিও প্রায় এইখানে আসে। এ ছাড়া এটি একটি স্বাস্থ্যনিবাস; সেই জন্য বহু রাজা, জমিদার এবং ভদ্র উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা আসিয়া এপ্রিল হইতে প্রায় জুলাই পর্য্যন্ত বাস করেন।

আমরা ডাক্তারের নিকট গেলাম—ডাক্তার সাহেব বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "যান আপনারা।" ডাক্তারের নিকট এইরূপে পাশ হওয়ায় আমার খুব হাসি পাইল—এই তবে ডাক্তারের পরীক্ষা! আমি ভাবিয়াছিলাম, বুঝি-বা এই ডাক্তারী হাঙ্গামে কতই না দেরী হইবে। এ এক প্রসাদ হ'ল; কিন্তু ডাক্তার সাহেব যে এতদূর অভিজ্ঞ, তাহা আমার জানা ছিল না—দৃষ্টিমাত্রেই পরীক্ষা শেষ। আমাদের সহিত এই গাড়ীতে আরও তিন জন স্ত্রীলোক ছিল, একজন হিন্দুস্থানী ও অপর দুজন পাঞ্জাবী মুসলমান, মা ও মেয়ে—তাহাদেরও পরীক্ষা এই ভাবে শেষ হইল। আমরা এইবার পাঁচমাড়ী দেখিবার আশায় বলিলাম—চল বাবা! আর ত দেরী সইছে না—বেলা ত বারটা বাজল।

তাহারা বলিল, হাঁ, এইবার যাব। মনে আশা হইল, গাড়ীও চলিতে লাগিল, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই দাঁড়াইল। আমরা বিস্মিত হইয়া যখন ব্যাপার কি দেখিতে উঠিলাম, তখন দেখি যে বস্তা বস্তা চাল এবং গম এই গাড়ীতে উঠাইতেছে। জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, পিপারিয়া হইতে পাঁচমাড়ী এই সব জিনিষ যায় এবং সেখানে বেশী দরে বিক্রয় হয়। বাসের মালিকের সেখানে দোকান আছে। পিপারিয়া হইতে যদি কোন জিনিষ না যায়, তাহা হইলে পাঁচমাড়ীর লোকেদের বড়ই মুস্কিল, কারণ পাহাড়ে কোন জিনিসই হয় না। প্রায় আধঘণ্টা ইহাদের মোট তোলার পর মোটর ছাড়িল। ভীষণ গরম হাওয়ার জন্য চোখের উপর ভিজা গামছা চাপা দিয়া সকলে বসিয়াছিলাম। পিপাসায় ছেলেরা কুঁজোর জল সবই খালি করিয়া ফেলিল। কতক্ষণে যে পৌঁছাইব, তাহাই ভাবিতেছিলাম।

পাঁচমাড়ী হোসেঙ্গাবাদ জেলায়। হোসেঙ্গাবাদ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে মহাদেব পর্ব্বতের উপর অবস্থিত।



পাণ্ডব গুহা

প্রায় চৌদ্দ মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ এরূপ একটি শীতল হাওয়া আসিয়া চোখে মুখে লাগিল যে চোখের গামছা সরাইয়া চাহিয়া দেখিলাম—চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ছোট্ট একটি রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমেই মোটর-খানি উচ্চ হইতে উচ্চতরে উঠিতেছে, আর এ স্থানটিতে গরমের লেশ মাত্র নাই—আছে মৃদুমন্দ সমীরণ, যাহাতে বসন্তের আভাষ পাওয়া যায়। এইখানে একটি ছোট গ্রাম দেখিলাম—নাম শুনিলাম মাট্‌কুলি। চতুর্দ্দিকে মনোরম পর্ব্বতশ্রেণী—পাশে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া ওঠে। নীচে হইতে যে কত উঁচুতে উঠিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না; তবে নীচে দেখিবার সামর্থ্যও ছিল না। পাহাড় কাটিয়া এই সব রাস্তা। পাহাড়গুলি প্রাচীরের ন্যায় দুপাশে দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে গুহার মতও রহিয়াছে—কত জঙ্গলী গাছ যে এই পাহাড়ে, কিন্তু আশ্চর্য্য যে মাটি গাছের নীচে প্রায় নেই বলিলেই হয়; কিন্তু ভগবানের কি মহিমা, এই গাছগুলি কেমন সজীব এবং নানা ফলে ফুলে ভরিয়া আছে।

পিপারিয়া হইতে পাঁচমাড়ী মোটরে বত্রিশ মাইল। যতই পাঁচমাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছাইতে লাগিলাম ততই বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করিতেছিলাম। রাস্তার মধ্যে একটি ছোট পাহাড়ী নদীর নিকট গাড়ী দাঁড় করাইয়া সকলে জলপান করিতে গেল। সে নদীতে অনেকে স্নানও করিতেছিল। এই নদীটির নাম জেল্‌ওয়া—সেখানে প্রায় পনর মিনিট বিলম্বের পর আমাদের মোটরবাস ছাড়িল। কিছু দূর যাওয়ার পর সুন্দর একটি তরকারীর বাগান দেখিতে পাইলাম। এই বাগানটির নাম "পাগারা গার্ডেন"। এখান হইতে পাঁচমাড়ী আট মাইল।

ইহার পর একটি পুষ্করিণীর পাশ দিয়া মোটর সমতল ভূমিতে আসিল। এই পুকুরটি বাঙ্গলাদেশের বিলের ন্যায়। ইহার নাম "পাগারা তালাও"। ইহার পাশেই ছোট একখানি গ্রাম, পাহাড়ের উপর, নাম "পাহাড়ী আণ্ড"। পাহাড়ী লোকেরা এই স্থানে বাস করে এবং পাহাড় হইতে কাঠ ভাঙ্গিয়া পাঁচমাড়ী শহরে বিক্রয় করে—ইহাই তাহাদের উপজীবিকা। এখান হইতে পাঁচমাড়ী সাত মাইল।

অতি উচ্চ একটি পাহাড় দেখিতে পাইলাম—এত উঁচু পাহাড় পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। শুনিলাম ইহার উপর উঠিবার রাস্তা নাই। পাহাড়টির নাম—"মে হিউ পিক।" ইহার নিকটেই ভূপালের বেগমের সুন্দর একখানি বাংলো। এখান হইতে পাঁচমাড়ী শহর দুই মাইল। মোটর আসিয়া যখন আমাদের বাসায় পৌঁছাইল, তখন বেলা প্রায় তিনটা।

এখানে জলের কল নাই। প্রত্যেক পাড়ায় একটি করিয়া ইঁদারা। এখানে বর্ষা খুব বেশী হওয়ায় কূপগুলি শুকাইতে পায় না। বাড়ীতে জল লইবার জন্য ঝি চাকরদের স্বতন্ত্র পয়সা দিতে হয়।

আমরা পরের দিন পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ কুটীর দেখিতে গেলাম। ইহা বাসা হইতে দুই মাইল দূরে, সেই জন্য একখানি গোযান লওয়া হইয়াছিল। এখানে ঘোড়ার গাড়ী নাই। পাহাড়ের নিকট আসিয়া দেখিতে পাইলাম উপরে অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। সিঁড়ি দিয়া আমরা খানিকদূর উঠিয়া দেখিলাম, একখানি বড় ঘর, কিন্তু তার দরজা বা জানালা নাই। আরও উপরে উঠিয়া এই প্রকার পাঁচখানি ঘর দেখিলাম—পাশে আর একটি ছোট্ট ঘর দেখিলাম। বহুদিন ধোঁয়া লাগিলে যে রকম রং হয় এই ঘরগুলি সেইরূপ দেখিতে। ইহার ছাতে উঠিয়া ভারি তৃপ্তি পাইলাম। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের শোভা যে কি মনোরম, তাহা ভাষায় বোঝান কঠিন। সন্ধ্যার তখন আর দেরী ছিল না, পশ্চিমের কোলে সূর্য্য তখন ঢলিয়া পড়িয়াছে, দূরে পাহাড়ের নীচে ক্রমেই নামিয়া যাইতেছিল। সারা পশ্চিম আকাশখানি রক্তবর্ণ রবির ছটায় উদ্ভাসিত—তার শেষ রশ্মিকণা পাহাড়ের চূড়ায় এবং গাছগুলির পাতায় পাতায় চিক্ চিক্ করিতেছিল। এই শোভা দুইটি চোখে দেখিয়াও যেন আমার তৃপ্তি হইতেছিল না। দূরে পাঁচমাড়ী শহরখানিকে একখানি ছবির মতই দেখাইতেছিল। বিশ্রাম লইবার জন্য সেই স্থানে আমরা বসিলাম এবং গাড়োয়ালার নিকট শুনিলাম, প্রবাদ, যখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত অজ্ঞাতবাসে বাহির হন, সেই সময় এই স্থানে



ধূপ গড়

আসিয়া পাহাড় কাটিয়া আড়াই দিনে এই ঘরগুলি প্রস্তুত করিয়া বাস করেন। এই পঞ্চ কুটীর হইতে শহরের নামকরণ হয়। হিন্দিতে

কুটীরকে "মেড়ি" বলে। পাহাড়ের উপর সরকার হইতে কার্ণিসের ন্যায় করিয়া দিয়াছে—হিন্দুরা ইহাকে তীর্থের ন্যায়ই মনে করে।



লাট প্রাসাদ

পাঁচমাড়ী যে একটি হিল্ ষ্টেসন, ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন ক্যাপ্টেন জে ফর্‌সাইথ, ১৮৬২ খৃঃ।

৬ই মে প্রাতঃকালে আমরা জটাশঙ্কর দর্শন করিতে বাহির হইলাম। একমাইল যাওয়ার পর পাহাড়ের মধ্য দিয়া দেড় মাইল যাইতে হয়। এখানে কোন যান বাহনাদি যাইবার রাস্তা নাই। উপর হইতে সাড়ে তিন শত ফুট নীচে জটাশঙ্কর আছেন। কাঠের সিঁড়ি দিয়া আমরা নামিয়া গেলাম। নীচে আসিয়া দেখিলাম, পাহাড়ে নদী এবং তাহাতে বহু যাত্রী স্নান করিতেছে। পাণ্ডার সহিত জটাশঙ্করকে দেখিতে চলিলাম। একটি ঘৃত-প্রদীপ হাতে লইয়া সে বলিল—মাথা নীচু ক'রে এস মাঈ। তাহার কথামত আমরা চলিলাম। ঠিক যেন একটি পাহাড়ের ছাতা, ইহারই মধ্যে জটাশঙ্কর আছেন, ছাতাটি কিন্তু খুব নীচু। মাথা বাঁচাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, জটাশঙ্করের কোন লিঙ্গ নাই, শুধু কতকগুলি পাথর জটার ন্যায় একস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে এবং ইহা যে পাহাড়ের গা হইতে নামিয়াছে তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। হিন্দুদের ইহা একটি মস্ত তীর্থস্থান।

পূজা শেষ করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম।

৮ই মে আমরা বড় মহাদেব দর্শন মানসে সকালবেলা যাত্রা করিলাম, এখানেও গরুর গাড়ীই সম্বল। এখানে যাইতে হইলে চাল-চিড়া বাঁধিয়া যাইতে হয়। পাঁচমাড়ী শহর হইতে এ স্থান সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে। তিনমাইল গাড়ী মোটর যায়, তারপর রাস্তা দুর্গম, পদব্রজে যাইতে হয়। তিন মাইলের পর হইতে আমরা পায়ে হাঁটিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য জায়গা আছে। বেলা সাড়ে দশটার সময় আমরা মহাদেবের নিকট গিয়া পৌঁছাইলাম। ঐস্থানে তিন-চারজন সন্ন্যাসী বাস করেন। শহর হইতে কেহ কেহ দর্শনের জন্যও আসে। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন এইরূপ পাঁচ-সাত জন দর্শকের দেখা পাইলাম। আমরা যাওয়ার পরই তাহারা বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হইল। শিবরাত্রির সময় এখানে অসংখ্য লোকসমাগম হয়। চারিপাশে পাহাড়ের মধ্যে এই দুর্গমস্থানে কে যে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

পাহাড়ের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আছে। উপরের পাহাড়ে কোন স্রোতধারা থাকায়, তাহা হইতে এই পুষ্করিণীতে বৃষ্টির ন্যায় অনবরত জলের বড় বড় ফোঁটা পড়িতেছিল। এই পুষ্করিণীর মধ্য দিয়া শিবের নিকট যাইতে হয়। জল গভীর নয়। ইহার চারিপাশ পাহাড়েরই দুই ফুট সরু বারান্দার মত। উপরটি প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু এবং পিলানকরা ছাদের মত। ইহা যে কোন মানুষের নির্ম্মাণ নয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। ভগবানের নিপুণ হস্তের শিল্প, প্রকৃতিরাণীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, যাহা দেখিলে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে সেই শিল্পীর চরণে আপনিই মাথা নত হইয়া আসে।

পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীতে স্নান সারিয়া আমরা মহাদেবকে পূজা করিতে গেলাম। পুষ্করিণীর জল অত গরমের দিনেও বরফের ন্যায় শীতল। শিবকে পূজা করিতে একজন করিয়া যাইতে হয়, কারণ দুজনের যাইবার বা পূজা করিবার স্থানাভাব। শিবের নিকট অন্ধকার খুব বেশী, তবে অনেকগুলি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মহাদেবের দুটি লিঙ্গ—একটি "বড়া মহাদেব," অপরটির নাম শুনিতে পাইলাম না। পাশেই পার্ব্বতীর মূর্ত্তি। ইহার সম্মুখে অপর একটি পাহাড়ে আরও একটি পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দেখিলাম।

দর্শন পূজা শেষ করিয়া বিশ্রামের জন্য পাহাড়ের নীচে পুষ্করিণীর ধারে আমরা সতরঞ্চি বিছাইলাম। এখানে চাঁপা ও আম গাছই খুব বেশী। বেলা তিনটার সময় আমরা বাসা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

বাসায় আসিবার রাস্তায় "হাণ্ডিখোড়" দেখিতে যাওয়া হইল। পাহাড় হইতে তিনশত ফুট গভীর নীচে। ইহার অবয়ব ঠিক হাঁড়ীর ন্যায়, ভিতরে অল্প জল আছে। কিম্বদন্তি, পূর্ব্বকার গোঁড় রাজাদের সময় যাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত, তাহাকে পাহাড়ের উপর হইতে এই খাদে ফেলিয়া দেওয়া হইত। এস্থানে ধূমপান নিষেধ। ইহার ভিতর দেখিবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দুইটি স্থান রেলিং দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে নাকি এরূপ ছিল না। কোন গোরা

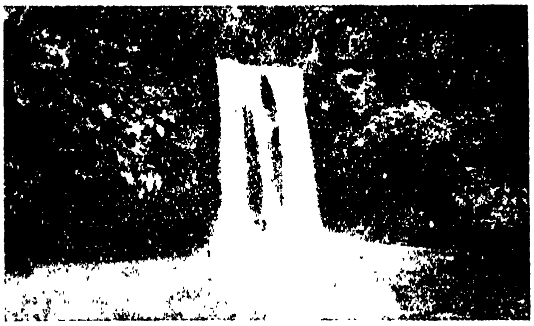


সরকারী বাগান

সৈনিক অত্যধিক নেশা করার ফলে ইহার নিকটে আসায় ভিতরে পড়িয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই হইতে এইরূপ সাবধানতা।

পাঁচমাড়ীতে আর্‌মি স্কুল থাকায় বহু সৈনিক এস্থানে থাকে। হাণ্ডিখোড় দেখা শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা বাসায় ফিরিলাম।

ইহার পর একদিন গভর্ণমেণ্ট গার্ডেন দেখিতে গেলাম। ইহা পাঁচমাড়ী



ফেয়ারী পুল—জলপ্রপাত

শহরের মধ্যে একটি দেখিবার মত জিনিষ। ইহা ১২৫৫ একর জমি লইয়া তৈরি। নানারূপ ফুল এবং তরকারী যাহা শীতকালে হয়, তাহা সবই ছিল। বাঁধাকপি তখনও খুব বেশী দেখিলাম।

হিন্দুদের আরও একটি শিব আছেন। সেটি—"ছোট মহাদেও"। তাহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

ফেয়ারী পুল—একটি জলপ্রপাত। পাঁচমাড়ীর লোকেদের বিশ্বাস, রাত্রিকালে স্বর্গ হ'তে পরীরা নাকি এইস্থানে স্নান করিতে আসে।

ধুপগড় পাহাড়—ইহার উচ্চতা (elevation) ৪৪২৯ ফিট্। সাতপুরা পাহাড়ের মধ্যে এই পাহাড়টি সব চাইতে উচু। ইহার ২৫০ ফিট নীচে একটি রেষ্ট হাউস্ আছে। এই পর্য্যন্তই মানুষে উঠিতে পারে। এস্থানে আসিতে হইলে পাশ লইতে হয়। এই রেষ্ট-হাউস্ হইতে হোসেঙ্গাবাদ শহরের কাছারি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও একটি জলপ্রপাত আছে।

ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে—যেমন "বি ফল্," "লিট্‌ল্ ফল্", "বি ড্যাম," "বিগ্‌ফল্"—ইহাই এখানকার সকলের চাইতে বড় জলপ্রপাত। ইহার উচ্চতা ৩৫০ ফিট।

পাঁচমাড়ীর উত্তাপ মে এবং জুন মাসে ৮৮°০ ডিগ্রি হইতে ৬৮°০ ডিগ্রি, এ স্থানটি সমুদ্র হইতে ৩৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। শহরটি চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা থাকায় দৃশ্য অতি মনোরম, কিন্তু এখানে আমার বেশী দিন থাকিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমরা ১৯এ মে ওখান হইতে চলিয়া আসি।

হালখাতা

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

যে বর্ষ লভিল জন্ম বৈশাখের বিদগ্ধ জঠরে,
শৈশব হিন্দোল যার রুদ্র দোলা কালবৈশাখীর,
পৌষের তুষার স্পর্শ দিল যারে বার্দ্ধক্য স্থবির,
যাহার অন্ত্যেষ্টি শেষ রৌদ্র দাহ চৈত্র-চিতাপরে,
আষাঢ়ের মেঘমায়া দগ্ধ যার উত্তপ্ত শিয়রে
দুলালে দুদিন তরে স্নিগ্ধ তার ধূসর অঞ্চল,
শরতের শ্যামায়ন—সেও স্বল্প-বিরাম, চঞ্চল,
বসন্তের পুষ্প শোভা—তাও মাত্র দুদিনের তরে;
আদি অন্ত দুঃখভরা গতায়ু সে বর্ষান্ত সীমায়
স্বাগত নবীন বর্ষ, শুভ্র তব নব মহিমায়!

কালবৈশাখীর করে সমর্পিনু আজিকে নিঃশেষে
অতীতের শতছিন্ন জরা-জীর্ণ ইতিবৃত্ত পাতা,
রচিব নূতন করি জীবনের নব হালখাতা,
স্মৃতির সঞ্চয় যত ঝঞ্ঝা মুখে সব যাক্ ভেসে,
লভিনু বঞ্চনা যত, যত ব্যথা যারে ভালবেসে,
যত সুখ, যত শান্তি লভিলাম যাহার প্রণয়ে,
সে সবার শত স্মৃতি তাহাদের ক্ষত-প্রীতি লয়ে,
বর্ষ সাথে যাক্ বয়ে বিস্মৃতির সাগর উদ্দেশে,
দেনা ও পাওনা যত গতপ্রায় এই বরষের
হালের হিসাবে আর তাহাদের টানিব না জের।

নেপাল ও পশুপতিনাথ

প্রবোধকুমার সান্যাল

(দ্বিতীয় স্তবক)

সেদিন চন্দ্রগিরির চূড়ায় উঠে বিদায় নিয়েছিলাম, আজ সেখান থেকেই আরম্ভ।

দূরে শাদা তুষারময় হিমালয়, তারই পাদদেশে নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু শহর ছবির মতো। আমরা চূড়া থেকে নামতে লাগলাম। আমাদের পথের পাশে অরণ্যময় গভীর খদ, সাবধানে নামতে হচ্ছে। এত রৌদ্রেও নীচের দিকে অন্ধকার। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে রজ্জু-পথে দূর শহরে মাল আমদানি রপ্তানি চলছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা লাগলো নীচে নামতে; প্রথম যে শহর পাওয়া গেল তার নাম থানকোট্, ধুলো বালিতে আচ্ছন্ন। থানকোট্ থেকে কাট্মাণ্ডু ছ' মাইল। অনেকেই হেঁটে যায়, কিন্তু আমরা গেলাম মোটরবাসে। পথ সমতল বটে কিন্তু বড় কর্কশ। যানবাহনের চলাচলের ব্যবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের অনেক ত্রুটি দেখা গেল।

কাট্মাণ্ডু পৌঁছবার আগে বাঘমতি নদীর পুল পার হতে হয়। মধ্যাহ্নকালে আমরা রাজধানীতে এসে পৌঁছলাম। শহরের নোংরা ও ঘিঞ্জি চেহারা প্রথমে দেখলে মন বিষণ্ণ হয়। অনেক বাড়ীর অন্দরমহলের দিকে চোখ পড়তে অস্বাস্থ্যকর মনে হতে লাগলো। শোনা গেল শহরের যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তারা বেশির ভাগ নানা রোগে জীর্ণ। যাই হোক, ত্রিপুরেশ্বর মন্দিরের কাছে এসে আমাদের মোটর দাঁড়ালো। পথের মাঝখানে অনেক জায়গায় সিঁদুরমাখা শিবলিঙ্গ চোখে পড়লো, কোথাও কোথাও পথে হাঁড়িকাঠে পশু বলি দেওয়া হয়েছে তারই রক্তের দাগ। শহরের গঠন সৌষ্ঠবের মধ্যে শৃঙ্খলার চেহারা দেখতে না পেলে আমাদের আধুনিক মন একটু পীড়া বোধ করে বৈকি। তীর্থস্থানে এসে পৌঁছে প্রাণে আনন্দ হোলো, কিন্তু মন খুশি হোলো না।

একজন বাঙ্গালী ডাক্তারের বাড়ীতে আতিথ্য নেওয়া গেল। পরিচিত মানুষের মতো তিনি যত্ন ক'রে তুলে নিলেন।

আমাদের বাসাটা হোলো সিভিল্ লাইনে অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত পল্লীর ধারে। স্কুল, হাসপাতাল, ময়দান, কলেজ, প্রধান সেনানায়কের প্রাসাদ—সবই কাছাকাছি। সম্মুখে পথের ধারে মহারাজা চন্দ্র শমসের জঙ্গ বাহাদুরের একটি প্রস্তর মূর্ত্তি। নিকটে ময়দানে প্রায়ই নেপালী সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখা যায়। পূর্ব্বদিকে একটি প্রকাণ্ড সরোবর—কল্‌কাতার লালদীঘির মতো। সরোবরের মাঝখানে একটি সুন্দর মন্দির। তার তীরে একটি টাওয়ার ঘড়ি। এই মন্দির আর ঘড়ি যাত্রীদের অমৃতশহরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শহরের এই দিকটা একটু পরিচ্ছন্ন বটে। টাওয়ার ঘড়িটির আওয়াজ মাইল তিনেক দূর থেকেও শোনা যায়।

চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর, মাঝখানে কাট্মাণ্ডু শহর, সেজন্য শহরের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। রোদ না উঠলেই সমস্ত শহর ভিজে স্যাঁতস্যাঁত করে, মানুষের শরীর খারাপ হয়। নেপালীরা দরিদ্র, তাদের শিক্ষার প্রসারও তেমন নয়। দেশের যিনি রাজা, তিনি অনেকটা দেবতারই মতো, অর্থাৎ নিজের মন্দিরেই তিনি অধিষ্ঠিত, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বড় কম। তিনি আপন রাজ্য ছেড়ে দুনিয়ার কোথাও যান না; তার কারণ, নেপালীদের বিশ্বাস, রাজা দেশ ছেড়ে গেলেই রাজ্যের ঘোর অমঙ্গল। দেশ যিনি শাসন করেন তিনি সপারিষদ্ মহারাজা নিজে, তিনি প্রধান মন্ত্রী, তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছায় রাজ্যের ভালো মন্দ। যিনি রাজা তিনি ধীরাজ নামে পরিচিত। বর্ত্তমানে যিনি মহারাজা তাঁর নাম যোদ্ধশমসের জঙ্গ বাহাদুর, তিনি 'পাঁচ-সরকার' এই নামে চলেন। যিনি রাজা-ধীরাজ, তিনি হলেন 'তিন সরকার।'

ধীরাজ ও মহারাজা সম্বন্ধে বহু সম্ভব ও অসম্ভব জনশ্রুতি শোনা গেল; তবে একটি কথা আমি আজো মনে রেখেছি যে, দেশবাসীর বহুতর অভাব ও অভিযোগের সকল রকম প্রতিকারের ক্ষমতা রাজ সরকারের হাতে নেই, অনেক সময়ে তাঁদের ইংরাজের দিকে চেয়ে থাকতে হয়।

নেপালে কেটি শব্দটার খুব প্রচলন। কেটি শব্দটার প্রচলিত অর্থ দাসী বা বাঁদি। সেই অর্থে কেটা মানে চাকর। নেপালে এমন বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আছেন যাঁরা বাড়ীর কন্যাকে রাজপ্রাসাদে কেটির পদমর্য্যাদা দিতে চান্। ধীরাজ ও মহারাজার প্রাসাদে এইভাবে শত শত কেটি প্রতিপালিত হয়। কেটিরা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকতে পায় এবং নিজ নিজ মাসোহারা থেকে পিতামাতা অথবা আত্মীয়কে সাহায্য করতে পারে। যারা কেটির সন্তান, তারা অনেক সময়ে জায়গা জমি ধন দৌলতও পায়।

নেপালের মুদ্রাগুলি ভারি কৌতুকপ্রদ। এক-আধলা, দু-আধলা, পাঁচ-আধলা, মোহর ইত্যাদি। তামারগুলি সুশ্রী ও সমান-গঠনের নয়, মোহরগুলি রৌপ্য—একটি মোহরের দাম আমাদের সওয়া ছ'আনা। নেপালের ডাক বিভাগ—স্বদেশ ও বিদেশ—সমস্তই বৃটিশ লিগেশনের হাতে, তাদের পররাষ্ট্রনীতি ইংরেজের সহযোগিতার পথ ধ'রে চলে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য নেপালীরা বাঙালীর কাছে কিছু পরিমাণে ঋণী বৈকি। স্কুলে, কলেজে, ডাক-ঘরে, রাজকোষে, সরকারি চাকুরীতে, হাসপাতালে, পূর্ত্ত-বিভাগে, বিচারালয়ে—সকল স্থানেই এই সেদিন পর্য্যন্ত বাঙালীরাই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। আজো রাজ-বাড়ীতেও মহারাজার পরিবারে গৃহশিক্ষক, কেরাণি ও চিকিৎসক বাঙালী। অন্যান্য সরকারি চাকুরী বলতে ওখানে সৈন্যবিভাগকেই বোঝায় এবং যে কোনো গৃহস্থ ঘরের যুবক সৈন্যবিভাগে চাকুরী নেবার জন্য উৎসুক। সম্প্রতি কাট্‌মাণ্ডু শহর থেকে দূরে দারাগাঁও নামক পর্ব্বতের উপরে একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সার্জ্জেন্ মার ও পরিদর্শক একটি বাঙালী নিযুক্ত ছিলেন।

নেপালের সমাজব্যবস্থা প্রাচীনপন্থী। বহির্জগতের প্রবহমান চিন্তার ধারা মনে হয় আজো অনেকখানি নেপালে পৌছয়নি। প্রাচীনপন্থীর সকলের বড় অভিশাপ হোলো রক্ষণশীলতা। সেইজন্য বর্ত্তমানকালের যে সকল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সভ্যতার আলো পৃথিবীর সকল দেশে এমন কি ভারতবর্ষেও বিকীর্ণ হয়েছে সেই আলো এখনো এই পার্ব্বত্যজাতির অন্দরে এসে পৌছয়নি। তাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে, আচার আচরণে, সমাজবিধিতে, শিক্ষায়তনে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আধুনিক ও উদার আদর্শের অভাব লক্ষ্য করেছি। আমার এই মন্তব্যের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ হোলো যে, ব্যাধি ও অস্বাস্থ্যে এমন সুন্দর পার্ব্বত্যশহরটির বাতাস ভারাক্রান্ত। গরম জল ছাড়া আর কোনোরূপ জল ব্যবহার করা এখানে প্রায়ই বিপজ্জনক।

একদা বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের উত্তরভাগে হিমালয় পর্ব্বতে নেপাল রাজ্য বিস্তৃত ছিল—দার্জ্জিলিং ছিল একদা নেপালের অন্তর্গত। আজ সেই বিস্তৃত রাজ্যের বহু অংশ উপেক্ষিত ও বিরল-বসতি। কোথাও পর্ব্বতের দুর্গমতা, কোথাও চিরস্থায়ী তুষারের স্তূপ, কোথাও বা ভীষণ তুষারগলিত জলপ্রপাত। তবু এদের মধ্যেও ছোট ছোট গ্রাম, ছোট ছোট শহর আমরা দেখতে পাই। যে সকল গ্রাম ও শহরগুলির অধিকতর খ্যাতি আছে তাদের মধ্যে পাটান্, স্বয়ম্ভু, দত্তাত্রেয়, দক্ষিণকালী, নারায়ণথান, চৌবাহার, কীর্ত্তিপুর ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব গ্রাম ও শহর অবশ্য কাটমাণ্ডুর কাছাকাছি অবস্থিত। অনেক গ্রামে মানুষের মধ্যযুগের জীবনযাত্রার বিস্ময়কর পদ্ধতি দেখা যায়—নেপালের বাইরে অথবা হিমালয় পর্ব্বত ভিন্ন যে আর কোথাও কোনো জগৎ আছে এ তাদের জানা নেই।

ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মস্থান নেপাল হলেও বৌদ্ধধর্ম্ম নেপালে পরিচিত হয়েছিল অনেক পরে; বুদ্ধদেবের মন্ত্র যতদূর মনে হয় উত্তর ভারতের সমতল ভূভাগে আগে প্রসারিত হয়েছিল। আজো পালা-পার্ব্বণে উৎসবাদিতে নেপালে অনার্য্য জাতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কাট্‌মাণ্ডু শহর থেকে পূর্ব্বদিকে প্রায় তিন মাইল দূরে হিন্দুর বিখ্যাত তীর্থ পশুপতিনাথের প্রস্তর মন্দির অবস্থিত। শহর থেকে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। বৎসরে কেবলমাত্র এই শিবচতুর্দ্দশীর সময়েই ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে এখানে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়ে থাকে। যারা আসে তারা মাসখানেক পর্য্যন্ত নেপালে বাস করার হুকুম পায়—যতদূর আমি শুনেছি। শিবরাত্রির মেলা এখানে

বিখ্যাত। সমগ্র ভারতের একান্ন পীঠের মধ্যে এটিও একটি পীঠস্থান—পীঠস্থানে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। পশুপতিনাথের মূল মন্দির ছাড়াও অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির দেখা যায়। মূল মন্দির বিশাল সোনার পাতে মোড়া, রূপার তোরণ, ভিতরে মহাদেবের কৃষ্ণকায় প্রতিমূর্ত্তি—মন্দিরের বাইরে প্রকাণ্ড এক কনককান্তি বলিবর্দ্ধ। এই বিশাল মন্দিরের নীচেই শীর্ণকায়া বাগমতী নদী। যারা তীর্থযাত্রী তাদের জন্য পশুপতিনাথ গ্রামে কতকগুলি যাত্রীশালা আছে, কাটমাণ্ডুতে থাকা যাত্রীদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক। এখানকার মেলা উপলক্ষে শিবচতুর্দ্দশীর দিনে নানারকম শোভাযাত্রা দেখা যায়—রাজপুরুষগণ অনেকেই এই শোভাযাত্রায় যোগদান ক'রে থাকেন। দেশটা প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ নয়।

বর্ত্তমানে যিনি নেপালের রাজসম্রাট অর্থাৎ ধীরাজ তাঁর নাম আমি জানিনে, তবে তাঁকে দেখেছি। তাঁর বয়স অল্প এবং প্রিয়দর্শন, তাঁকে দেখে একজন বাঙালী যুবক ব'লে মনে হয়েছিল। তাঁকে দেখে আমার এই কথাটা মনে হোলো, রাজ্যের রাজা যিনি, তিনি একটি সামান্য প্রচলিত সংস্কারের অধীন? নেপালের বাইরে পা বাড়াবার অধিকার তাঁর নেই?

নেপালের যেটি রাষ্ট্রভাষা সেটি সংস্কৃত ও দেবনাগরী মিশ্রিত। ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা সেখানে অল্প। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে সাধারণ লোকে ইংরেজি শেখেনা। দেশী ব্যবসার প্রচলন বেশ আছে। সরকারি দপ্তরে যে কাগজপত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলি নেপালেই প্রায় তৈরী। বিদেশী পণ্যের চাহিদা অল্পই। নেপালে গ্রীষ্মকাল ব'লে কোনো ঋতু নেই—শীত কম এবং শীত বেশি এই মাত্র।

রাজার ছেলে নেপালে রাজা হয় কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্কে নিয়ম অন্যরূপ। প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ মহারাজার মৃত্যু ঘটলে তাঁর ভাই হবেন মহারাজা। ভাই না থাকলে তখন ভ্রাতুষ্পুত্র। এই নিয়ে রাজ্যে অনেক সময়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কিছুকাল পূর্ব্বে এমনি একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। শোনা গেল, একদা অকস্মাৎ কয়েকজন রাজপুরুষের সঠিক পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ায় মহারাজা একদিনের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট শাসনকর্ত্তা ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে বরখাস্ত করেন। যারা রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা হবে মনে করেছিল, আজ তারা অনেকেই সামান্য মাসোহারায় নিভৃত জীবনযাপন করছে। শোনা গিয়েছিল রাজপুরুষগণের উত্তরাধিকার সূত্রকে নির্ম্মল করবার জন্যই মহারাজা এই ব্যবস্থা করেছেন। এই বিপর্য্যয়ের ভিতরকার ইতিহাস আমি সম্পূর্ণ জানিনে।

আন্দাজ এক সপ্তাহ কাট্‌মাণ্ডুতে আমি বাস করেছিলাম। তারপর একদিন শয্যাগত অবস্থায় চারটি লোক আমাকে ঝাঁপানে তুলে থান্‌কোট্‌ থেকে ভীমপেডী পর্য্যন্ত প্রায় কুড়ি মাইল পথ বহন ক'রে আনে। পুনরায় হেঁটে ফিরতে হয়নি এজন্য আনন্দবোধ করেছি। এইভাবে আমার নেপাল ও পশুপতিনাথ যাত্রা শেষ হয়।

দলিতা

কমলরাণী মিত্র

তোমার আহ্বানখানি কাঁদিবে বাতাসে
জন্ম-জন্ম ধরি'
ব্যর্থতায় যুগে যুগে ঘনদীর্ঘশ্বাসে
অশ্রুজল ভরি'!
তোমার প্রেমের দাম হ'লো ধূলিসাৎ
লক্ষ অপমানে,
তোমার আশার শিরে বিপদসম্পাত
বজ্র ব্যথা হানে!
বুক-ফাটা সেই তব ব্যাকুল-ক্রন্দন,
বেদনার বাণী,
মহাশূন্যে কাঁদিতেছে তীব্র স্পষ্টতম—
আকুল পরাণী।

সন্ধ্যা হ'তে রজনীর অন্তিম-প্রহরে
নিদ্রাহারা চোখে
তোমার অ-তনু ছায়া ওই বুঝি ঘোরে
হেরি গ্রহ-লোকে!
নিশ্চেতন নেত্রে মোর জাগেনাকো সাড়া,
নিশ্চল-নিশ্চুপ;
পাণ্ডুর চন্দ্রের চোখে তব দৃষ্টিধারা
যেন ম্লানরূপ!
বিরহ-বেদনাতুর ব্যর্থতা তোমার,
প্রেম দীপ্তিমান্
পেলোনা সম্মান কভু—তাই আজি তা'র
হোক্ জয়গান!!

আধুনিক মেয়ে

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

অমিতার জীবনে বছর-দশেক, আজ হইতে প্রায় পনর বছর আগে একটা সমস্যা আসিয়াছিল। আজ সেই সমস্যার কোন চিহ্নই হয় ত তার জীবনের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। সুদীর্ঘ কালাতিক্রমণের মুখে অমিতার জীবনের সেই সমস্যাটি আজ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

কথাটা একটু খুলিয়াই বলি। যদি কাহারও নিকট অমিতার জীবনের সেই পুরাতন কাহিনী নিতান্তই সাধারণ বা ভাবপ্রবণতা-দুষ্ট বলিয়া মনে হয়, তবে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। অমিতা সমাজের মধ্যে মিঃ গুপ্তের স্ত্রী-হিসাবে আজ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রমের অধিকারিণী বলিয়াই যে তার বিগত জীবনের একান্ত সাধারণ কাহিনী নিতান্ত অসাধারণ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে, এমন হাস্যকর দাবী আমরা করিব না। * * *

অমিতার বয়স তখন সতেরো কি আঠারো—ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে ফলাফলের দুশ্চিন্তা এড়াইবার জন্য সবিশেষ অভিনিবেশসহ অসংখ্য মাসিক আর সাপ্তাহিক পড়িতেছে। যথাসময়ে ফল বাহির হইল, ভালই পাস করিল সে। কিন্তু তাহাদের ছোট শহরটির অনেকেরই মত সে-ও বিস্মিত হইয়া গেল—যখন দেখা গেল যে, তাহাদেরই নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজের একটি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

অমিতার দাদা বলিল, খবর শুনেছিস অমি ?

কোন্ খবর ?—সাগ্রহে প্রশ্ন করিল অমিতা। কারণ প্রশান্ত সহজে কোন প্রসঙ্গ অবতারণা করে না।

আমাদের কলেজ প্রথম হয়েছে, জানিস ?

শুনেছি। আজ বাবা বেঁচে থাকলে…

অমিতার চোখে মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিল। অমিতার বাবা হরিহরবাবু এই শহরের জমিদার ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে এই কলেজ তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রশান্ত গাঢ়কণ্ঠে বলিল, তাঁর আত্মা আজ নিশ্চয়ই স্বর্গে বসে তৃপ্তি পাচ্ছে। আত্মা কখনও মরে না ; গীতায় পড়িসনি অমি ?

প্রশান্তকে শহরের অনেকেই হরিহরবাবুর যোগ্য পুত্র বলিয়াই মনে করে। তার নিষ্ঠ ও কঠোর চরিত্রের কথা শত্রুর মুখেও শুনা যায়। কিন্তু অমিতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া আজ সে নিজের ভাবাবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। * * *

তার পর প্রশান্তর সাদর আমন্ত্রণে রবীন্দ্র এই প্রাচীন জমিদার বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল। রবীন্দ্রের প্রতি সাধারণের চেয়ে আলাদা একটা কৃতজ্ঞতার আকর্ষণ প্রশান্তর ছিল। আর আর দশজনের মত গর্ব ছাড়া তার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনের উজ্জ্বল রত্ন হিসাবে সে রবীন্দ্রর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। সে জন্যই রবীন্দ্রকে এ-বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য অমিতার ওকালতি কখনও বিশেষ আবশ্যক হয় নাই।

প্রথম সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনারই নাম রবীন্দ্র বসু ?

হাঁ।

আপনার বাবা কোথায় থাকেন ?

অনেক দিন যাবত ইহজগতে নেই।

মা ?

গ্রামে থাকেন।

আত্মীয়স্বজন ?

ঠিক জানিনে।

আরও অনেক প্রশ্ন অমিতা করিয়াছিল। অতিশয় সংক্ষিপ্ত যে-সব উত্তর পাইয়াছিল, তাহাতে রবীন্দ্রকে ভাল না লাগিলেও সে অনুরোধ করিয়াছিল মাঝে মাঝে আসিবার জন্য। মনকে বুঝাইয়াছিল, ভদ্রতার খাতিরেও ত এটুকু বলিতে হয়! অমিতার অনুরোধের আন্তরিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্র চিন্তা করিয়াছিল কি-না জানি না ; কিন্তু কলিকাতায় বি-এ পড়িতে যাইবার পূর্বে আরও দুই সন্ধ্যায় সে অমিতার সংগে সাক্ষাৎ করিয়াছিল। হয় ত অমিতার চেয়ে প্রশান্তকে এবং প্রশান্তর চেয়ে তাহাদের প্রাচীন বাড়ির পুরাতনগন্ধী আবহাওয়াটাকেই রবীন্দ্রর ভাল লাগিয়াছিল। প্রশান্তর বলিষ্ঠ ঋজু দেহ, সৌম্য শ্রী এবং ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অতি সহজেই রবীন্দ্রকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রশান্তর প্রকাণ্ড প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রাচীন গৃহসজ্জার মাঝখানে বসিয়া গল্প করিতে করিতে রবীন্দ্রের চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। তার চৈতন্যরাজ্যে পশ্চিমের বারান্দায় উপবিষ্টা অমিতার অস্তিত্ব কখন এক সময়ে ঝাপসা হইয়া উঠিত। কতক্ষণ পরে হয় ত প্রশান্ত বলিত, যাওয়ার আগে আর একদিন এসো। আজ আমাকে এক্ষুণি উঠতে হচ্ছে। অভিভূতের মত রবীন্দ্রও প্রশান্তর পিছনে পিছনে লাইব্রেরী-ঘরের দিকে চলিতে থাকিত—আর এমন সময়েই হয় ত শুনা যাইত, রবীনবাবু কি চলে যাচ্ছেন ?

কেন, বলুন ত ?

সেই আলোচনার কথা ভুলে যাননি আশা করি ?—অমিতা প্রশ্ন করিত।

থতমত খাইয়া নেহাৎ চিন্তাচ্ছন্ন মুখে রবীন্দ্র সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিত। প্রায় অমিতার মুখোমুখি হইয়া প্রশ্ন করিত, আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না।

অমিতা নিজেও বিস্মিত হইয়া যাইত। এমন রূঢ়-কঠিন রবীন্দ্র কেমন করিয়া এমন স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া যাইত? ছোটবেলা হইতে যে স্নেহ-বঞ্চিত, শৈশব হইতে যে বিমুখ ভাগ্যদেবতার সংগে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, এমন তন্দ্রা-তদ্গতভাবে সে পথ চলে নাকি! হরিবাবু বা প্রশান্তের কাছে অমিতা কোনদিনই অসুস্থ কবি-পনার উপাসনা করিতে শিখে নাই। তাই রবীন্দ্রর রুক্ষ-বাস্তবের সচেতনতা অমিতাকে আঘাত করিলেও মনের গহনে আশৈশব শিক্ষার সূত্রে সংবেদন পাঠাইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রর স্বপ্নময় রূপ-ও ঐতিহ্যের গণ্ডী এড়াইয়া অমিতাকে স্পর্শ করিয়াছিল। রবীন্দ্রর মত দুঃখ-তিক্ততাপূর্ণ জীবন যার—তার নিকট এরূপ চারিত্রিক বিলাস অমিতা কখনও প্রত্যাশা করে নাই। সে জন্যই হয় ত এই বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিত পরিচয়ে অমিতা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল।

কতক্ষণ ব্যর্থ অপেক্ষার পর রবীন্দ্র হয় ত প্রশ্নটি আবার উত্থাপন করিত।

অমিতা গম্ভীরভাবে উত্তর দিত—মানে, ইতিহাসে বি-এ পড়াই ত স্থির হ'ল আপনার?

হাঁ। আপনার কি হ'ল?

মনে নেই আপনার?

না।

একটু মনে করতে চেষ্টা করুন।

কতক্ষণ চেষ্টার পরে রবীন্দ্র অকপটে স্বীকার করিত, পারছি নে।

বিশ্বাস করিনে আমি। নিশ্চয় মনে আছে আপনার।—অদ্ভুত অমিতার ব্যবহার।

রবীন্দ্র চটিয়া যাইত। কঠোরভাবে বলিত, মনে নেই আমার; মনে হচ্ছে না। ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করুন, না-হয় চলে যাচ্ছি আমি।

রবীন্দ্রর মুখেচোখে—সারা দেহে অপরিসীম বিরক্তি ফুটিয়া উঠিত। সত্যই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইত সে।

অমিতা শংকিত হইয়া উঠিত। সে অনুভব করিত যে, রবীন্দ্র জাগিয়া উঠিতেছে। ইহাই রবীন্দ্রর সত্যকার আটপৌরে রূপ। প্রতিমুহূর্তে যেন অমিতা তার অবয়বে মেঘমুক্তির চিহ্ন দেখিত। হাসিয়া বলিত, কালই না বললাম যে আমি পড়ব না আর? কিন্তু সৌজন্যের এত অভাব রবীন্দ্রর যে, অমিতার এই প্রাঞ্জল স্মারকের পরে-ও সে আপন রূঢ়তার জন্য ক্রটিস্বীকার করিত না।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই অদ্ভুত মানুষটি তার জীবনে যে-পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল, তা' রবীন্দ্রর কলিকাতা চলিয়া যাইবার আগে অমিতা বুঝিতে পারে নাই। অমিতা নিজেকে লইয়া কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

চা খাইতে-খাইতে একদিন প্রশান্ত প্রশ্ন করিল, রবীন্দ্রর কোন খবর জানিস অমি?

না।

তোর কাছে চিঠি দেয় না?

খানকয়েক চিঠি লিখবার পরে গেল সপ্তাহে একটা কার্ডে দু ছত্র লিখেছে। পকেটে পয়সা না-থাকবার দরুণ সময়মত পত্র দিতে পারেনি বলে জানিয়েছে। থাকবার জায়গা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি গুছিয়ে নেওয়ার কাজে ভয়ানক অনবসর…

নীরসকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, আজ আমার মনিঅর্ডার ফেরত এসেছে। বোধ হয় সে-ঠিকানায় আজকাল নেই।

অমিতা শুধু বলিল, তবে।

হঠাৎ মনে হইল, এ-ভাবে প্রশান্ত বলিল, ইচ্ছে করে-ও রবীন্দ্র আমার সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে থাকতে পারে।

অমিতা কোন মন্তব্য করিল না। যদি দাদার এই সন্দেহ সত্য হইয়া থাকে—তবে তার চেয়ে সুখী কে হইবে আর? রবীন্দ্রর মনে যদি অমিতাকে কেন্দ্র করিয়া এটুকু বড়াই অসাধারণত্বের জন্য না-হইয়াই থাকে, তবে নিঃসংকোচে প্রশান্তর কৃপা গ্রহণ করিতে সে পারিল না কেন? অমিতাকে পত্রোত্তর যথাসময়ে না-দেওয়ার অজুহাত হিসাবে নিজের শোচনীয় দরিদ্রতার সংবাদ জানাইবার মধ্যে হয় ত তাহাকে ধনীকন্যা হিসাবে খোঁচা দিবার প্রয়াস থাকিতে পারে—তথাপি তাহার নিকট আত্মোদ্ঘাটনের নিরংকুশ সংকোচমুক্ততা! কিন্তু প্রশান্তর সাহায্য কেন লইবে সে—এত তার কিসের দায়দায়! মুগ্ধ হইয়া গেল অমিতা।

ইহার পরে কয়েক বছরের কথা বৈচিত্র্যহীন এবং সংক্ষিপ্ত। রবীন্দ্র আর দুইবার মাত্র এ-বাড়িতে আসিয়াছে—অতান্ত সাধারণ কুশল-বিনিময় ও সাক্ষাৎকারের জন্য। কোন রকমে একটা বি-এ ডিগ্রি লইবার পর এম্-এ পড়িবার সুবিধা আর তার হয় নাই। অমিতার প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্র বলিয়াছিল, এ-দু-বছরে অনেক শিখলাম। বই পড়বার সময় পেলাম কই? লেখাপড়ার ব্যাপারে ইচ্ছে করলে যে ভাল করতে পারি আমি, সে-পরীক্ষা তো হয়েই গেছে!

অমিতা এই জবাবে খুশী হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রের ভাব দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে অমিতাকে খুশী করিবার মাথা-ব্যথা হয় ত তার থাকিতে পারে; তবু এমন সব তুচ্ছ ব্যাপারে কেন সে অ-খুশী হইয়া বসিয়া থাকিবে?

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িবার পরে এই পরিবারের সংগে কোন সম্পর্কই আর রবীন্দ্রর ছিল না। প্রশান্ত নিতান্তই কৌতূহল-পরবশ হইয়া একবার বাড়ি ফিরিবার পথে কলিকাতায় খোঁজ করিয়া জানিয়াছিলাম যে, সে বাংলাদেশেই নাই: কি একটা ব্যবসায়ের ব্যাপারে কয়েকজন অ-বাংগালী বন্ধুর সহিত ভয়ানক অনবসর আছে। জব্বলপুরের কোন্ এক মিলওয়ালার ঠিকানায় চিঠি দিলে সে নাকি (যেখানেই থাকুক) চিঠি পাইবেই। বলা উচিত যে প্রয়োজনের অভাবে প্রশান্ত আর গোঁড়ামির অহংকারে অমিতা কখনও রবীন্দ্রর জব্বলপুরী ঠিকানাটা পরখ করিয়া দেখে নাই।

বিরাট জমিদারবাড়ির নীরবতা-ক্লিষ্ট এই মানুষ দুইটির জীবনে স্রোতোবেগ ছিল না বলিলেই চলে। তবু রবীন্দ্রের স্মৃতি এককালে মিলাইয়া যাইতে বসিল। ঠিক এ-রকম সময়েই মিঃ গুহের আবির্ভাব অমিতার জীবনে।

হয় ত বা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যই সে-বারে প্রশান্ত অমিতাকে ঘাটশিলায় লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একটা শুষ্কপ্রায় ঝরণার পাশ দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখা হইল শার্ট-পরিহিত মিঃ গুহের সংগে। ঘাটশিলার ইতিহাসে হয়ত মিঃ গুহের মত সারা দিনরাত্রি স-রাইফেল্ শীকারের নিদারুণ ঐকান্তিক সাধনা আর কেহ-ই করে নাই। চায়ের টেবিলে অবশ্য প্রশান্ত মিঃ গুহের আচরণের অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে অনেক সাগাই আলোচনা করিল। জন্ম হইতে পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে থাকিবার পরে হাঁটু গাড়িয়া প্রেম নিবেদন করা বা নিতান্ত অল্প পরিচয়েই প্রত্যাখ্যান করিলে বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যার কথা বলা প্রভৃতি নাকি খুব অস্বাভাবিক নয়। বরঞ্চ সমস্ত বিদেশী শিক্ষার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া যে মিঃ গুহ সেণ্ট-পার-সেণ্ট স্বদেশী, অর্থাৎ—বাংগালী মেয়ে বিবাহ করিবার জন্য দুর্য্যোধনী পণ করিয়াছিলেন, তাহা নাকি প্রশান্তের মত মানুষেরও প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তবু দুই দিন ভাবিবার পর যখন অমিতা নিতান্ত সবিনয়ে প্রশান্তকে অনুরোধ করিল—জব্বলপুরের ঠিকানায় একটা পত্র দিতে, তখন সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কতক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রশান্ত বলিল, তোর কথা আমি ফেলব না। এ-রকম কথা যদি তোর মনে ছিল তবে আমাকে আগে বলিসনি কেন?

অমিতা কোন জবাব দিল না।

প্রশান্ত চিন্তিতমুখে বলিল, চিঠির উত্তর না দেয় যদি?

অমিতা বলিল, খুব সম্ভব দেবেই না। যে রকম অভিমানী মানুষ—তবু।

বেশ!

একথা তুমি ঠিক জেনো দাদা যে তোমাকে আমি সমস্যার মধ্যে ফেলব না। উত্তর যদি না আসে তবে মিঃ গুহকেই আমি বিয়ে করব।

অমিতার কণ্ঠ মোটেই কাঁপিল না লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত খুশী হইল। কিন্তু অনেক ভাবিবার এবং খুঁজিবার পরে-ও রবীন্দ্রর সেই জব্বলপুরী ঠিকানাটা পাওয়া গেল না। অবশেষে অমিতারই পুরাতন নোট্-বইয়ের এক কোণায় তাহা আবিষ্কার করিয়া প্রশান্ত একটা সুদীর্ঘ তার করিয়া দিল।

কিন্তু অমিতা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। রবীন্দ্রর কোন জবাব পাওয়া গেল না।

ইহার পরে অমিতার গল্প যে শেষ হইয়া যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অমিতা ও মিঃ গুহের কন্যা (এবং একমাত্র সন্তান) শুভ্রার কথা বলিবার জন্যই অমিতার ভূমিকা ফাঁদিতে হইয়াছে। অমিতা যে আধুনিক নয় সে বিষয়ে হয়ত আপনারাও নিঃসন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস যে শুভ্রাই হয় ত সত্যকার আধুনিক মেয়ে। আজ শুভ্রার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। আশা করি ভবিষ্যতে আমরা শুভ্রাকে সত্যকার আধুনিক মেয়ে বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারিব।

জাপানের শিল্প-প্রচেষ্টা

আনোয়ার হোসেন এম-এ, বি-টি

'মেড্ ইন জাপান' অঙ্কিত দ্রব্যসম্ভার আজ পৃথিবীর অলিগলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কাপড়, জুতা, (চামড়া এবং রবার), নকল ও আসল রেশম, শিল্প, কলকব্জা তৈয়ারী, মোটর, এরোপ্লেন, কাগজ, কাগজের লণ্ঠন, চীনা মাটীর বাসন, টুপী, নানাবিধ ধাতু দ্রব্য, পাথরীভূত কাঠের তৈয়ারী জিনিষ, ফটিক, ঝিনুক, মুক্তা, লৌহ দ্রব্য, গ্রামোফন, গ্লাস, সূচ, মোজা গেঞ্জির কল, খেলনা, বেত ও বাঁশের জিনিষ, নকল ফুল, কারুকার্য্যময় মাদুর ইত্যাদি নানা জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হয় এই ক্ষুদ্র দেশ জাপানে। কি যেন পেষ্ট-এর সাহায্যে মোজা ইত্যাদি সহজে সেলাই ও মেরামত করা যায়। ইহাতে আর সেলাইয়ের সূচের দরকার পড়ে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উপরই জাপানীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। জাপান দুনিয়ার পৃষ্ঠে বাঁচিয়া থাকিতে চায়—আধমরা হইয়া নয়, জীবন্ত ও সুস্থ জাতি হিসাবে। জাপান অন্যান্য ব্যবসায়ী জাতির দুর্দ্দমনীয় প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, জাপান তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে অচিরে পৃথিবী জয় করিবে, যেমন অস্ত্রের সাহায্যে জয় করা হয়। কিন্তু Commercial Penetration এবং Imperialistic Penetration কি বাস্তবিক একই কথা?

কথা হয়ত এক নয়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতে পাই? বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের মূলে কি? উপনিবেশ স্থাপন, আর বাজার সম্প্রসারণ, অস্ত্রবলে রাজ্য জয়ের নামান্তর নয় কি?

কেহ কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সুদূর প্রাচ্যই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার (বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুতরাং রাজনীতি-ক্ষেত্রে) লীলানিকেতন হইবে। আর জাপান দাঁড়াইবে এই প্রতিযোগিতার কেন্দ্রস্থলে। বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিবে—অনেকাংশে এই উক্তির সত্যতা এবং সারবত্তা।

সম্পদানব সাধারণত মানুষকে ভোগবিলাসে মত্ত এবং আত্মসর্বস্ব করিয়া থাকে, সৌন্দর্য্যবোধ ও তাহার বিকাশে প্রবল বাধা জন্মায় এই দানব। জাপান সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। ছোট দেশ, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া জাপান খুবই বড়। জাপানী-মন

এখনও সৌন্দর্য্যের পূজারী। তাহার পরিচয় পাওয়া যায় জাপানীদের সামাজিক এবং ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে, আর তাহাদের কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশে। তাহাদের ফুলসজ্জা এবং চায়ের অনুষ্ঠান সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক—তাহাদের উৎপন্ন কোন কোন দ্রব্যে প্রকৃত শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপানীরা এখনও মনে করে যে সে দেশে যন্ত্রদানব এবং আধুনিক ধনিক মনোবৃত্তি তাহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি এতটুকু ম্লান করে নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পাশে দাঁড়াইয়া আছে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য—পুরাতনের পাশে আছে নূতন।

গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর জাপানের দৃষ্টি কৃষির দিক হইতে বাণিজ্য ও শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৯২৪ এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপানে কৃষির অবনতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯২৮এ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরীতে যে সব মজুর কাজ করিত তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। দুনিয়া জোড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আজ একটা মন্দার ঢেউ উঠিয়াছে, তবুও জাপানে কারখানার সংখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ কি? একটা কারণ হইতে পারে: জাপানের শিল্প-প্রচেষ্টা খুবই আধুনিক—এই সেদিন মাত্র জাপান শিল্পের ক্ষেত্রে নামিয়াছে, নূতন শক্তি, নূতন উদ্যম তার—নূতন বেগে ছুটিয়াছে আজ দুনিয়া জয় করিতে।

'মেড ইন জাপান' জিনিষ আজ দুনিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে মনে হইতে পারে, জাপান কেবল জিনিষ রপ্তানিই করে—আর আমদানী করে না। জাপান যেমন উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করে, আবার সেরূপ প্রচুর কাঁচা মাল বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপান পারস্পরিক সহযোগিতা, চুক্তি ও নিয়ন্ত্রণমূলক স্বাধীন বাণিজ্যে বিশ্বাস করে। সর্ব্বত্র আজ বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা ভীষণ লড়াই শুরু হইয়াছে, একটা অন্ধ প্রতিযোগিতার তুফান উঠিয়াছে। যে শক্তিশালী সে চায় দুর্ব্বলকে পিষিয়া মারিতে। এই সর্ব্বনাশী প্রতিযোগিতামূলক লড়াই জমাইবার জন্য জাপান 'দাও ও লও' নীতির অনুসরণ করিতে প্রয়াসী—বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানি না করিলে জাপানের কলকারখানার খোরাক জোগান দায়—আবার বিদেশে জিনিষ রপ্তানি করিতে না পারিলে জাপানের একদিনও চলে না। তাই জাপান যথাসম্ভব বিদেশীদের সহিত বন্ধুতা-মূলক আদান-প্রদানের ভিত্তির উপর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে চায়। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে ভারতের, ইংলণ্ডের এবং ডাচ্ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। নূতন জাপান-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে জাপান প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ বেল কাঁচা তুলা খরিদ না করিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় ভারতে রপ্তানি করিতে পারে না। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও জাপানের বাণিজ্য চুক্তি আছে—নিবে আর দিবে এই হইল জাপানের বর্ত্তমান নীতি। মিঃ হিরোটা, জাপানের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, "আমরা তোমাদের (অন্য দেশের) তুলা, রবার, দস্তা, সীসা, কাঠ ইত্যাদি খরিদ করিব—আর তোমরাও আমাদের উৎপন্ন দ্রব্য অবশ্য কিনিবে।" জাপানী জিনিষ যদি অন্য দেশে বিক্রী হয় তাহা হইলে অন্য দেশের কাঁচামালও প্রচুর পরিমাণে জাপানে বিক্রী হইবে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের এই তো মূল নীতি।

জাপানের শিল্প-প্রচেষ্টা কেবল স্বদেশেই আবদ্ধ রহে নাই—জাপানের বাহিরেও অনেক জাপানী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, রেলওয়ে কোম্পানী, রবার বা মাছের কারবার গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে জাপানী অর্থে গঠিত এবং চালিত হয়। রুশো-জাপানিজ ফিশিং কোং, মাঙ্কো টেলীগ্রাফ ও টেলিফোন কোং এবং অসংখ্য রবার কোম্পানি দেশবিদেশে কাজ করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর তুলনা চলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে—ইহার মূলধন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ছিল ৮০ কোটি। ইহা একটি অর্দ্ধ সরকারী রেল লাইন।

এ ছাড়া বিদেশে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী গড়িবার এবং তাহাদিগকে মূলধন দিবার জন্য জাপানে অনেক সুব্যবস্থা আছে—ওরিয়েণ্টাল কলো-নিজেশন কোং, সাউথ আমেরিকা কলোনিজেশন কোং এই দুইটিই সবচেয়ে বড়। প্রথমোক্ত কোম্পানীর মূলধন পাঁচকোটি ইয়েন (এক ইয়েন=৸০ আনা)

বিদেশে কোম্পানী গড়িয়া অর্থ উৎপাদনের চেষ্টা ছাড়াও জাপান নিজ দেশে বিভিন্ন ছোট খাটো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। টাকার অভাবে কেহ কোন নূতন কলকারখানা করিতে পারিবে না এমন ঘটনা জাপানে বড়-একটা দেখা যায় না। বড় বড় কলকারখানার—পাশাপাশি ছোট খাটো কারখানাও প্রচুর আছে সেখানে। ছোটদরের কৃষক আর ছোটদরের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক—এরাই জাপানের জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রস্তর। অধিকাংশ লোক এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত—আর যত জিনিষ সেখানে উৎপন্ন হয়—রপ্তানি বা দেশে ব্যবহারের জন্য তার বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় এই শ্রেণীর ছোটদরের কারখানার মালিকদের হাতে। শতকরা গড়ে সত্তর জন এইরূপ কারখানার মালিক। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, দেশে যত ফ্যাক্টরী আছে তাহার শতকরা নিরানব্বইটি (ছোট দরের), ইহারা উৎপন্ন করিয়াছে ২৮২ কোটি ডলার; আর বড়দরের কারখানা উৎপন্ন করিয়াছে ১৩৩ কোটি ডলার মূল্যের জিনিষ।

জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের মূলে আছে স্বদেশের ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া বংশানুক্রমিকভাবে যাহারা জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া গিয়াছে এরূপ তিনটি বংশ—মিৎসুই, মিৎসুবিশী এবং সুমিটমো। এইসব ধনকুবের অজস্র অর্থের মালিক—রাশি রাশি অর্থ ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যে খাটাইতেছে। জাপানের অর্থনৈতিক জগতে ইহাদের ক্ষমতা অসীম এবং সুদূরপ্রসারী। এমন কোন শিল্প-বাণিজ্য নাই—যাহা ইহাদের হাতে নাই। এইরূপ একচেটিয়া ধনের ব্যবসা ইহারা কিরূপে হস্তগত করিল?

য়ুরোপ বা আমেরিকায় যখন রাশি রাশি মূলধনের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ হয় তাহার অনেক পরে জাপানে কোটি কোটি টাকার মূলধন খাটাইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য নিয়মে যখন মূলধনকে ভিত্তি করিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির দিকে মন দেওয়া হয় তখন জাপানে অল্পসংখ্যক উৎসাহী লোকই মূলধন সরবরাহের নায়কত্ব গ্রহণ করে। সর্ব্বসাধারণ এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই, কারণ এ দেশে অবাধ প্রতিযোগিতার সক্রিয় হইয়া উঠিবার মত যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ছিল না— এত শীঘ্র সেখানে মূলধনের রাজত্ব স্থাপিত হয়। বন্যার জলের মত ভীষণ বেগে দেশের শিল্প-বাণিজ্য কতিপয় ধনকুবেরের কুক্ষিগত হয়। সাধারণ লোক সে সুযোগ পায় নাই। যাহারা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাহাদিগকেও ঐসব ধনকুবের গ্রাস করিয়া ফেলে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবনীয় সমৃদ্ধির পর জাপানে একটা মন্দার ঢেউ ওঠে— সন্ত্রস্ত ত্রাস, অনিশ্চয়তা এবং নিষ্ক্রিয়ভাব। তারপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে টোকিয়ো শহর একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। এখানেই শেষ নয়। ১৯২৭এ সারা জাপানে একটা অর্থনৈতিক ত্রাসের সঞ্চার হয়। এসব কারণে সাধারণ ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান একেবারে ধ্বংসের কবলে পতিত হয়, আর সেখানে দৃঢ় হইয়া ওঠে একচেটিয়ার রাজত্ব। মিৎসুই, মিৎসুবিশী ইত্যাদি ধনকুবেরগণ এই দারুণ দুর্দ্দিনেও একটুক কাহিল হইয়া পড়ে নাই বরং ছোটখাটো বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাদের শক্ত সমৃদ্ধ রাজমহল। সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সর্ব্বব্যাপী মিৎসুই বংশ। ব্যারণ হেকিরয়েমণ-মিৎসুই ইহার ডিরেক্টর। বংশানুক্রমিকভাবে (১৮৭০ হইতে) ইহারা জাপানের বাণিজ্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। ষাট কোটি ডলার বর্ত্তমানে ইহাদের (১৯৩১) মূলধন। সম্প্রতি আফগান গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের খনিজ দ্রব্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধারের জন্য বিদেশী কোম্পানীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন এই মিৎসুইবংশ আমেরিকান কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়; মিৎসুবিশী, সুমিটমো ইত্যাদি যে দুই-তিনটি ধনকুবের বংশ আছে তাহাদের মূলধন পাঁচকোটি ডলার (১৯৩১)। পশম, গম ইত্যাদি যত আমদানি করা হয় তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী এই মিৎসুই বংশ করে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ইহাদের চল্লিশটা শাখা আছে। মিৎসুবিশী বংশের ডিরেকটর ব্যারণ কয়াটা ইওয়াসাকি। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ইহাদের বেশী সংযোগ—ইহারা সরকারীয় প্রয়োজনী জিনিষ সরবরাহ করে। ইহাদের অধীনে অনেক ব্যাঙ্ক আছে। বহু বীমা কোম্পানী ইহাদের হাতে।

সুমিটমো বংশ দশকোটি ডলারেরও বেশী মূলধনের মালিক। ব্যাঙ্কিং এবং খনি হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করাই ইহাদের প্রধান কাজ।

ইয়াসুদা বংশ সোজাসুজি জিনিস উৎপাদন বা মাল আমদানি-রপ্তানির কাজে বেশী হাত দেয় না। ব্যাঙ্কিং এবং মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়া ইহারা অন্য কোন কাজ বড় একটা করে না। ইহাদের অধীনে যে ছয়ালিশটা কোম্পানী আছে, তার চৌদ্দটাই ব্যাঙ্ক। ইহারা ছয়টা বীমা কোম্পানীর মালিক। পরলোকগত জেঞ্জিরো ইয়াসুদা এই বংশের প্রতিষ্ঠা করে। মাল উৎপাদন বা আমদানি রপ্তানির দিকে তাহার ঝোঁক ছিল না—"একমাত্র ব্যাঙ্কিং" ইহাই ছিল তাহার জীবনের মূলনীতি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া তাহারাও তাহাদের চিরাচরিত নীতি বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে। কয়েকটা রেলওয়ে কোম্পানী ও কাগজের কোম্পানী ইহাদের হাতে আসিয়াছে। জাপানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে এই কয়েকটা ধনকুবের বংশের প্রভাব খুব বেশী। জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতি, তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, কোটি কোটি টাকার মূলধন সরবরাহ—এক কথায় শিল্পসম্পদের ক্ষেত্রে তাহাদের একছত্র রাজত্ব, জাপানকে আজ দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিয়াছে।

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ষাড়জী জাতির তাল, মার্গ ও গীতি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে প্রদর্শন করিব। আপাততঃ নৈষ্ক্রামিক ধ্রুবা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া ষাড়জী জাতি সম্পর্কে অন্যান্য কথার অবতারণা করিতেছি।

প্রাচীন যুগে নাটকে মুখ, প্রতিমুখ প্রভৃতি কতগুলি গীতাঙ্গ ছন্দে নিবদ্ধ হইত, তাহাদের নাম ধ্রুবা। এই ধ্রুবা ছিল পাঁচ প্রকার, ইহাদের নাম প্রাবেশিকী, ক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, অন্তরা ও নৈষ্ক্রামিকী। ইহাদের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ হইতে অভিনেতৃগণের নিষ্ক্রমণ বা বহির্গমনে যে ধ্রুবা বা গীতাঙ্গ উপযোগী তাহাকেই নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবা বলে। ষাড়জী জাতি এই নৈষ্ক্রামিক ধ্রুবা-রূপে অথবা ভগবান্ মহেশ্বরের স্তুতিরূপে ব্যবহৃত হইত।

ষাড়জী জাতি বারটি কলায় পরিসমাপ্ত। কলাশব্দের অর্থ জাতি ও গীতির এক একটি অংশ বা কালি। ইহার প্রত্যেকটি কলা অষ্টলঘু পরিমাণ, অ, ই উ ঋ ৯ এই পাঁচটি লঘু অক্ষরের যে-কোন একটি উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ সময় আবশ্যক সেই পরিমাণ সময়কে বলে লঘু। ষাড়জী

জাতির প্রত্যেক কলা বা কলি আটটি লঘুপরিমাণ সময়ে গেয়। সুতরাং এই জাতিটি দক্ষিণ মার্গের অন্তর্গত। চারি কলা বিশিষ্ট—পঞ্চপাণি তালের দুই বার আবৃত্তিতে এই আটটি কলা প্রয়োগ করিতে হয়। বৃত্তিমার্গে কলার সংখ্যা চব্বিশ হইলে দ্বিকল পঞ্চপাণি তালের চারিবার আবৃত্তিতে জাতিটি পরিসমাপ্ত হইবে। আবার চিত্র মার্গের আশ্রয়ে কলা আটচল্লিশটি হইলে যথাক্ষর পঞ্চপাণি নামক (ছয় মাত্রা বিশিষ্ট) তালের আট আবৃত্তিতে এই জাতি নিষ্পন্ন হয়। এই জাতিতে ষড়জ ন্যাসস্বর, গান্ধার বা পঞ্চম অপন্যাস স্বর, বরাটী রাগে এই ষাড়জী জাতির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। শার্ঙ্গদেব এইরূপে ষাড়জী জাতির লক্ষণ উল্লেখ করিয়া ইহার প্রস্তার নিম্নলিখিতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রস্তার শব্দের অর্থ এখানে কলাসমূহে স্বর সন্নিবেশের প্রণালী, কূটতান প্রসঙ্গে কথিত বৈচিত্র্য নহে।

ষাড়জী জাতির প্রস্তার

সা	সা	সা	সা	পা	নিধ	পা	ধনি	১
তং	০	ভ	ব	ল	লা০	০	ট০	
রী	গম	গা	গা	সা	রিগ	ধস	ধা	২
ন	য়০	না	০	ম্বু	জা০	০০	ধি	
রিগ	সা	রী	গা	সা	সা	সা	সা	৩
কং০	০	০	০	০	০	০	০	
ধা	ধা	নিধ	নিস	নিধ	পা	সা	সা	৪
ন	গ	সু০	০০	তা০	প্র	ণ	য়	
নী	ধা	পা	ধনি	বা	গা	সা	গা	৫
কে	০	লি	০০	স	মু	০	দ্	
সা	ধা	ধনি	পা	সা	সা	সা	সা	৬
বং	০	০০	০	০	০	০	০	
সা	সা	গা	সা	মা	মা	মা	মা	৭
স	র	স	কৃ	ত	তি	ল	ক	
সা	পস	মা	ধনি	নিধ	পা	গা	রিগ	৮
পং	০০	০	কা০	ম্বু০	লে	প	০০	
গা	গা	গা	গা	সা	সা	সা	সা	৯
নং	০	০	০	০	০	০	০	
ধা	সা	রী	গরি	সা	মা	মা	মা	১০
প্র	ণ	মা	০০	মি	কা	০	ম	
ধা	নী	পা	ধনি	রী	গা	রী	সা	১১
দে	০	হে	০০	ন্ধ	না	০	ন	
রিগ	সা	রী	গা	সা	সা	সা	সা	১২
লং০	০	০	০	০	০	০	০	

উল্লিখিত স্বর সন্নিবেশের চিত্রে—

তং ভব-ললাট নয়নাম্বুজাধিকং নগসুতা প্রণয় কেলি সমুদ্ভবম্
সরসকৃত তিলক পঙ্কাম্বুলেপনং প্রণমামি কামদেহেন্ধনানলম্ ॥

এই পদ্যটি যে বারটি কলায় বিভক্ত হইয়াছে, ভাগ চিত্র দর্শন মাত্রেই প্রতীয়মান হইবে। ইহার প্রত্যেকটি কলা পূর্ব্ব কথিত নিয়মে অষ্টলঘু পরিমাণ, যথা—প্রথম কলায় চারিটি ষড়্জ স্বরের প্রত্যেকটি পাঁচটি লঘু অক্ষর উচ্চারণের উপযোগী সময়ে উচ্চারণীয়—এক লঘু কাল স্থায়ী। তৎপর মধ্যস্থানের পঞ্চম স্বরটিও পূর্ব্বোক্তরূপে এক লঘু কালে উচ্চারণ করিতে হইবে। অতঃপর মধ্যস্থানেরই নিষাদ ও ধৈবতস্বর মিলিতভাবে এক লঘু কালে গেয়। পুনরায় মধ্যস্থানের পঞ্চম একলঘু পরিমিত কালে গান করিয়া পূর্ব্ববৎ এক লঘুরূপে ধৈবত ও নিষাদ গান করিতে হইবে। ইহাই হইল একটি কলার স্বর সন্নিবেশ প্রণালী। এই স্বরসমূহ (স১+স১ +স১+স১+প১+ নিধ১+প১+ ধনি১) বন্ধনী নির্দ্দিষ্টরূপে অষ্টলঘু হইয়াছে।

দ্বিতীয় কলায় মধ্যস্থানের রি একলঘু, এইরূপে মিলিত গ ও ম এক লঘু, তৎপর গ গ ও স এই তিনটি স্বরের প্রত্যেকটি একলঘু বলিয়া তিনটি স্বরে তিনটি লঘুকাল। অতঃপর সম্মিলিত রিগ-ও ধ স স্বরে একটি করিয়া দুইটি লঘু; তৎপর ধ-স্বরে একলঘু। এইরূপে (রি১+গম১ +গ১+ গ১+স১+রিগ-১+ধস১+ধ১=৮) দ্বিতীয় কলার স্বরসমূহও অষ্টলঘু হইয়াছে।

তৃতীয় কলায় 'রিগ' এই মিলিত দুইটি স্বরে একলঘু, তৎপর স রি গ স স স স এই সাতটি স্বরের প্রত্যেকটি একলঘু বলিয়া সাতটি লঘু, সুতরাং তৃতীয় কলায় ও অষ্টলঘুর সমাবেশ হইয়াছে।

চতুর্থ কলায় দুইটি ধ-স্বরে একটি একটি করিয়া দুইটি লঘু, নিধ ও নিস এই মিলিত দুই দুইটি স্বরে একলঘু করিয়া দুইটি লঘু। পুনরায় মিলিত নিধ এই দুইটি স্বরে একলঘু, তৎপর 'প' স্বরে একলঘু, অতঃপর দুইটি তার ষড়জ স্বরের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া দুইটি লঘু। এইরূপে (ধ১+ধ১+নিধ১+নিস১+নিধ১+প১+র্স১+র্স১=৮) তৃতীয় কলায় অষ্টলঘু হইয়াছে।

পঞ্চম কলায়—নি একলঘু, ধা একলঘু মিলিত ধ নি একলঘু, তৎপর রিগ সগ এই চারিটি স্বরে একটি করিয়া চারিটি লঘু, সুতরাং (নি ১+ধ ১+প ১+ধ নি ১+রি ১ +গ ১+স ১+গ ১=৮) এইরূপে পঞ্চম কলায় অষ্ট লঘু সমাবেশ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ কলায়—স ১+ধ ১+মিলিত ধ নি ১+প ১+স ১ +স ১+স ১+স ১=৮ এই প্রণালীতে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

তৎপর সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ছয়টি কলায় অষ্ট লঘু যোজনা নিম্নলিখিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সপ্তম কলায় অষ্ট লঘু—স ১+স ১+গ ১+স ১+ ম ১+ম ১+ম ১+ম ১=৮ এইরূপ।

অষ্টম কলায় অষ্ট লঘু যোজনা—স ১+মিলিত প স ১+ ম ১+মিলিত ধনি১+মিলিত নি ধ ১+প ১+গ ১+ মিলিত রিগ ১=৮ এইরূপ।

নবম কলায় অষ্ট লঘু যোজনা—গ ১+গ ১+গ ১+ গ ১+স ১+স ১+স ১+স ১=৮ এইরূপ।

দশম কলায় অষ্টলঘু যোজনা—মন্দ্র ধ ১+মধ্য স ১+ রি ১+মিলিত গ রি ১+স ১+ম ১+ম ১+ম ১=৮ এইরূপ।

একাদশ কলায় অষ্ট লঘু যোজনা—ধ ১+নি ১+প ১+ মিলিত ধ নি ১+রি ১+গ ১+রি ১+স ১=৮ এইরূপ।

দ্বাদশ কলায় অষ্ট লঘু যোজনা—মিলিত রি গ ১+স ১ রি ১+গ ১+স ১+স ১+স ১+স ১=৮, এইরূপ।

টীকাকার কল্লিনাথ পূর্ব্বোক্ত পদ্যের পদসমূহে স্বর যোজনার প্রণালী ও বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। উল্লিখিত চিত্রে স্বরসমূহের নিম্নে পদ্যের পদগুলির যে যে অংশে যে যে স্বর ব্যবহৃত হইবে, তাহাও প্রদর্শন করা হইয়াছে, সুতরাং পদে স্বর যোজনার কল্লিনাথ নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বোধ হইলনা। স্বর-সন্নিবেশের চিত্রে কোন্ কোন্ স্বরের অল্পব্যবহার, কোন্ কোন্ স্বরের বহুবার ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা বুঝিবায় সুবিধার্থে টীকাকার প্রস্তাব ব্যবহৃত স্বরসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত প্রস্তাবে ষড়জ স্বর ৩৬+ঋষভ ১২+গান্ধার স্বর ১৯+মধ্যম ৮+পঞ্চম ৮+ধৈবত ১৭+ নিষাদ ১২=সম্মিলিত স্বরসংখ্যা ১১২।

এই প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে ষড়জ স্বরটিকে অংশ স্বর করিয়া। গান্ধার প্রভৃতি অপর চারিটি (গ ম প ও ধ) স্বর অংশস্বর হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে অংশ স্বরের বহুত্ব প্রভৃতি নিয়ম রক্ষা করিয়া প্রস্তাব করিতে হইবে। ষাড়জী প্রভৃতি সকল জাতি ও গীতিতে যখন যে স্বরটি অংশ স্বর হইবে,

তখন তদনুরূপ রস সেই জাতি ও গীতিতে অভিব্যক্ত হইবে। এখানে গীতি বা জাতির রসাভিব্যঞ্জনা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া আমরা এই অংশের উপসংহার করিব।

রসসৃষ্টি জাতি ও গীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও কাব্য, চিত্র ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি অন্যান্য কোমল কলাসমূহও রস-উদ্বোধনের উপযোগিতা লইয়াই সামাজিকগণের হৃদয়-গ্রাহী হইয়া থাকে, তথাপি অন্যান্য কলার সহিত গীতির রস-সৃষ্টির একটা বিশেষ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য কলাবোদ্ধার বিকসিত বুদ্ধির সাহায্য না পাইলে রসাভি-ব্যঞ্জনায় অসমর্থ। এই জন্যই চিত্রকর ও ভাস্করের নৈপুণ্য-সূচক উদ্ভাবনা নিম্নস্তরের মানবসমাজ বুঝিতে পারে না। কাব্যের রসসৃষ্টিও উত্তম ও মধ্যম শ্রেণীর সমাজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু গীতির রসসৃষ্টি অনন্যসাধারণ, অতুলনীয়। ইহা উত্তম মধ্যম ও অধম মানবসমাজের তিন স্তরকেই স্বীয় স্বরঝঙ্কারে অল্লাধিক রসাবিষ্ট করিয়া থাকে। বীররসের উদ্বোধক বাদ্য ও গীতি বীরপুরুষগণকে যেমন সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য উত্তেজিত করিয়া তোলে, যুদ্ধের হস্তীঅশ্বসমূহকেও স্বীয় উদ্দীপনায় তেমনই যুদ্ধোন্মত্ত করিয়া থাকে। সুনিপুণ গায়কের সুপ্রযুক্ত গীতির স্বরঝঙ্কারে গাভীর অবশদেহ হইতে সমধিক দুগ্ধক্ষরণ পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয়, ইহা আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা স্বরসাধনায় অগ্রসর, তাঁহারা সময় বুঝিয়া সময়োপযোগী রসের উদ্বোধনকল্পে গীতির প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা শুধু ব্যক্তির নহে, জড়তা দূরীভূত করিয়া জাতিরও সুমহৎ কল্যাণ সম্পাদন করিতে পারেন।

এখানে আরও একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—সঙ্গীত-রত্নাকরে উপরিলিখিত জাতির আলোচনায় যেরূপ সহজবোধ্যভাবে গীতির শব্দসমূহে স্বর তাল ও মাত্রার যোজনা প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, সঙ্গীতনিপুণ আধু-নিক যে-কোন গায়ক রত্নাকরবর্ণিত বিধি-নিষেধগুলির প্রতি মনোনিবেশ করিলে অনায়াসেই ইহা গাহিয়া শুনাইতে পারেন। তথাপি বাঙ্‌লার একজন খ্যাতনামা কলাবিদ্ গ্রন্থকার প্রাচীন শাস্ত্রবর্ণিত রাগগুলি গাহিয়া শুনান একেবারেই অসম্ভব বলিয়া কেন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গান স্বরলিপি সাহায্যে গীত হয়, তাহাতেও ভাষা, স্বর ও মাত্রাই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে আধুনিক গীতি-গুলি যদি ঐ তিনের সাহায্যে গীত হইতে পারে, তাহা হইলে আলোচ্য শাস্ত্রীয় গীতিই বা ঐ তিনের সাহায্যে গাহিয়া দেখান অসম্ভব হইবে কেন?

আর্ষভী জাতি

আর্ষভী জাতিতে নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবত এই তিনটি স্বরের মধ্যে যে-কোনও একটি অংশস্বর হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণে গ্রহস্বরের পৃথক উল্লেখ নাই বলিয়া ঐ তিনটি স্বরের যে-কোন একটি স্বরই গ্রহস্বর হইয়া থাকে। গান্ধার ও নিষাদ এই দুইটি স্বরের অন্য পাঁচটি (স, রি, ম, প, ধ) স্বরের সহিত সঙ্গতি। সুতরাং এই জাতিতে গান্ধার ও নিষাদ স্বরের বহুল প্রয়োগ ও অন্য স্বরের অল্প প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। সম্পূর্ণ অবস্থায় পঞ্চম স্বরের লঙ্ঘন বা অল্পত্ব এবং ওড়ুব অবস্থায় পঞ্চম লোপ্য স্বর বলিয়া তাহার অল্পতরত্ব। এই জাতি ষড়জ স্বরের লোপে ষাড়ব এবং ষড়জ ও পঞ্চম স্বরের লোপে ওড়ুব হইয়া থাকে। ইহার মূর্চ্ছনা পঞ্চমাদি, তাল চঞ্চৎপুট, কলা বা কলি আটটি। বিনিয়োগ বা ব্যবহার ষাড়জী জাতির ন্যায় নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবারূপে অথবা ভগবান শঙ্করের স্তুতিরূপে। এই জাতির ন্যাসর ঋষভ ও অংশস্বরগুলি অপন্যাস স্বর হইয়া থাকে। দেশী ও মধুকরী আর্ষভী জাতির সদৃশ রাগ, সুতরাং দেশী ও মধুকরী রাগে আর্ষভী জাতির ছায়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিম্নে এই জাতির প্রস্তাব লিখিত হইতেছে—

আর্ষভী জাতির প্রস্তাব

রী গা	সা	রি গ	মা	রি ম	গা	রি রি	১
গুণ	লো	০ ০	চ	না ০	০	০ ধি	
রী রা	নি ধ	নি ধ	গা	রি ম	মা	প নি	২
কম	ন ০	০ ০	ন্ত	ম ০	ম	র ০	

মা ধা	নী	ধা	পা	পা	সা		গা	৩
মঞ্জ	র	ম	০	০	ক্ষ		য়	
নী	ধ নি	রী	গ রি	স ধ	গ রি		রী রী	৪
ম	জে০	০	০০	০০	০০		য়ং০	
রী	মা	গ রি	স ধ	স স	রি স	রিগ	মম	৫
প্র	ণ	০০	মা০	০০	০০	মি০	দিবা	
নি ধ	পা	ধা	রী	রি প	গ রি	স ধ	স	৬
ম০	ণি	দ	০	প০	ণা০	০০	ম	
রি স	রি স	রি গ	রি গ	মা	মা	মা	গ রি	৭
ল০	নি০	কে০	০০	০	০	তং	০০	
পা	নী	নী	ম গ	নী	স ধ	গ রি	গ রি	৮
ভ	ব	ম	মে০	০	০০	০০	য়ং০	

উল্লিখিত আটটি কলায় পূর্ব্ববৎ অষ্ট লঘু যোজনা ও প্রত্যেক পদাংশে স্বর যোজনা করা হইয়াছে, যথা—

প্রথম কলায়—রী ও গা স্বরে এক এক লঘু, সা স্বরে এক লঘু মিলিত রিগ স্বরে একলঘু প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ মা একলঘু, মিলিত রিম স্বরে একলঘু, গা স্বরে এক-লঘু ও মিলিত রি রি স্বরে একলঘু প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম কলায় এইরূপে অষ্ট লঘু সমাবেশ হইয়াছে।

দ্বিতীয় কলায়—রী ১+রী ১+মিলিত নিধ ১+ মিলিত নিধ ১+গ ১+মিলিত রি ম ১+মা ১+মিলিত প নি ১=৮, অষ্ট লধু যোজনা এইরূপ।

তৃতীয় কলায়—মা ১+ধা ১+নী ১+ধা ১+পা ১+ পা ১+সা ১+গা ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

চতুর্থ কলায়—নী ১+মিলিত ধ নি ১+রী ১+মিলিত গ রি ১+মিলিত স ও মন্দ্র ধ ১+মিলিত গ রি ১+রী ১+ রী ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

পঞ্চম কলায়—রী ১+মা ১+মিলিত গ রি ১+ মিলিত স ও মন্দ্র ধ ১+মিলিত সস ১+রি স ১+মিলিত রি গ ১+মিলিত মম ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা।

ষষ্ঠ কলায়—মিলিত নি ধ ১+প ১+রি ১+রি ১+ মিলিত রি প ১+মিলিত গ রি ১+মিলিত স ধ ১+স ১ =৮, অষ্ট লঘু যোজনা এইরূপ।

সপ্তম কলায়—মিলিত রি স ১+মিলিত রি স ১+ মিলিত রি গ ১+মিলিত রি গ ১+ম ১+ম ১+মিলিত গ রি ১=৮, অষ্ট লঘু যোজনা এইরূপ।

অষ্টম কলায়—প ১+নি ১+নি ১+মিলিত ম গ ১+ রি ১+মিলিত স ধ ১+মিলিত গ রি ১+মিলিত গ রি ১ =৮, অষ্ট লঘু যোজনা এইরূপ।

যে পদ্যটির পদসমূহের উপরে এইরূপে স্বরযোজনা ও স্বরসমূহে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে সে পদ্যটি এই—

গুণ লোচনাবিকমনন্তমমরনজরমক্ষয়মজেয়ম্।

প্রণমামি দিব্যমণিদর্পণা মল নিকেতং ভব মমেয়ম্॥

এই জাতিতেও ঋষভ স্বরকেই অংশস্বর করিয়া উপরে প্রস্তাব প্রদর্শিত হইল। নিষাদ ও ধৈবত অংশস্বর হইলে তাহার প্রস্তাবপদ্ধতি অন্যরূপ হইবে।

গান্ধারী জাতি

এই জাতিতে ঋষভ ও ধৈবত ভিন্ন অপর পাঁচটি (স গ ম প নি) স্বরের মধ্যে যে-কোন একটি অংশ ও গ্রহস্বর হইবে। গান্ধার ইহার ন্যাসস্বর, ষড়জ ও পঞ্চম অপন্যাস স্বর। ন্যাসস্বর গান্ধার ও অংশস্বরের সহিত অন্যান্য স্বরের সঙ্গতি। সম্পূর্ণ অবস্থায় কখনও ধৈবত ও ঋষভের সঙ্গতিও হইয়া থাকে। এই জাতি ঋষভ লোপে ষাড়ব এবং নিষাদ ও ধৈবতের লোপে ঔড়ুব হয়। পঞ্চম অংশস্বর হইলে গান্ধারী জাতিটি সম্পূর্ণ জাতিই হয়, ষাড়ব হয় না। আর নিষাদ ষড়জ ও মধ্যম অংশস্বর হইলে সম্পূর্ণ ও ষাড়ব দুই

প্রকার জাতিই হইতে পারে। কেবল গান্ধার অংশস্বর হইলেই এই জাতিটি সম্পূর্ণ ষাড়ব ও ঔড়ুব এই তিন প্রকার অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। এই জাতির কলা ষোলটি, চতুষ্কল চঞ্চৎপূট তালের চারি আবৃত্তিতে এই ষোলটি কলা পরিসমাপ্ত হয়। ইহার মূর্চ্ছনা ধৈবতাদি (মধ্যম গ্রামের অন্তর্গত) পৌরবী। নাটকীয় তৃতীয় অঙ্কে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার ধ্রুবার যে-কোন একটি ধ্রুবা গানরূপে এই জাতি গীত হইয়া থাকে। এই জাতির প্রয়োগকালে গান্ধার, পঞ্চম, দেশী ও বেলাবলী রাগের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রস্তাব নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

গান্ধারী জাতি

গ	গা	সা	নী	সা	গা	গা	গা	
এ	০	০	০	ও	০	০	০	১
গ	গম	পা	পা	ধপা	মা	নিধ	নির্স	
র	জ০	নি	ব	ধূ০	০	মু০	খ০	২
নিধ	পনি	মা	মপানি	গা	গা	গা	গা	
বি০	০০	০	ভ্র০০	ম	০	দং	০	৩
গা	গম	পা	পা	ধপ	মা	নিধ	নির্স	
নি	শা০	ম	য়	ব০	রো	০০	ক০	৪
নিধ	পনি	মা	মপানি	মা	গা	মা	সা	
ত০	ব০	ম	খ০০	বি	ল	০	স	৫
গা	সা	গা	গা	গা	গম	গা	গা	
ব	প্র	চ	ক	০	ন০	ম	ল	৬
গা	গম	পা	পা	ধপ	মা	নিধ	নির্স	
মৃ	দু০	কি	র	ণ০	০	০০	০০	৭
নিধ	পনি	মা	পমানি	গা	গা	গা	গা	
ম০	মৃ০	ৎ	ভ০০	ব০	০	০	০	৮
রী	গা	মা	পধ	রী	গা	সা	সা	
র	জ	ত	গি০	রি	শি	খ	র	৯
নী	নী	নী	নী	নী	নী	নী	নী	
ম	নি	শ	ক	ল	শ	০	থ	১০
গা	গম	পা	পা	ধপ	মা	নিধ	নির্স	
ব	র০	য়	ব	তি০	দং	০০	ত০	১১
নিধ	পনি	মা	মপরি	গা	গা	গা	গা	
পং০	০০	ক্তি	নি০০	ভং	০	০	০	১২
নী	নী	পা	নী	গা	মা	গা	সা	
প্র	ণ	মা	০	মি	প্র	ণ	য়	১৩
গা	সা	গা	গা	গা	গম	গা	গা	
র	তি	ক	ল	হ	র	ব	তু	১৪

গা	পা	মা	মা	নিধ	নির্স	নিধ	পনি	
মা	পরিগ	গা	গা	গা	গা	গা	গা	১৬
শ	শি০০	০	০	০	নং	০	০	

উপরিলিখিত প্রস্তাবে নিম্নলিখিতরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে, ইহার—

প্রথম কলায়—গ গ স নি স গ গ গ এই স্বরসমূহের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া আটটি স্বরে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় কলায়—গা ১+মিলিত গ ম ১+পা ১+পা ১+মিলিত ধ প ১+মা ১+মিলিত নি ধ ১+মিলিত নি ও তার ষড়জ ১=৮, অষ্ট লঘু প্রয়োগ এইরূপ।

তৃতীয় কলায়—মিলিত নি ধ ১+মিলিত প নি ১+মা ১+মিলিত ম প রি ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

চতুর্থ কলায়—গা ১+মিলিত গ ম ১+পা ১+পা ১+মিলিত ধ প ১+মা ১+মিলিত নি ধ ১+মিলিত নি স ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু সংযোজনা করা হইয়াছে।

পঞ্চম কথায়—মিলিত নি ধ ১+মিলিত প নি ১+ম ১+মিলিত স প রি ১+মা ১+গা ১+মা ১+সা ১=৮, অষ্ট লঘু যোজনা এইরূপে করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ কলায়—অষ্টলঘু স্থাপন নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে—গা ১+সা ১+গা ১+গা ১+গা ১+মিলিত গ ম ১+গা ১+গা ১=৮।

সপ্তম কলায় অষ্ট লঘু যোজনা এইরূপ—গা ১+মিলিত গ ম ১+পা ১+পা ১+মিলিত ধ প ১+মা ১+মিলিত নি ধ ১+মিলিত নি স ১=৮।

অষ্টম কলায়—মিলিত নি ধ ১+মিলিত প নি ১+মা ১+মিলিত প ম রি ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু স্থাপন করা হইয়াছে।

নবম কলায়—রী ১+গা ১+মা ১+মিলিত প ধ ১+রী ১+গা ১+সা ১+সা ১=৮ এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

দশম কলায়—আট মন্দ্র নিষাদ স্বরে আটটি লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

একাদশ কলায়—গা ১+মিলিত গ ম ১+পা ১+পা ১+মিলিত ধ প ১+মা ১+মিলিত নি ধ ১+মিলিত নি স ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু সংযোজনা করা হইয়াছে।

দ্বাদশ কলায়—মিলিত নি ধ ১+মিলিত প নি ১+মা ১+মিলিত ম প রি ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ কলায়—নী ১+নী ১+পা ১+নী ১+গা ১+মা ১+গা ১+সা ১=৮, এইরূপে আটটি লঘু যোগ করা হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ কলায় গা ১+সা ১+গা ১+গা ১+গা ১+মিলিত গ ম ১+গা ১+গা ১=৮, এই রূপে অষ্টলঘু যোজনা করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ কলায়—অষ্ট লঘু যোজনা নিম্নরূপে করা হইয়াছে—গা ১+পা ১+মা ১—মা ১+মিলিত নি ধ ১+মিলিত নি স ১+মিলিত নি ধ ১+মিলিত প নি ১=৮।

ষোড়শ কলায় মা ১+মিলিত প রি গ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮, এইরূপে অষ্ট লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

যে পদ্যটির উপরে এইরূপ প্রস্তাব প্রদর্শিত হইল, সে পদ্যটি এই-

এতং রজনি বধূ মুখ বিভ্রম দংনিশাময় বরোরু
তব মুখ বিলাস বপুশ্চারুমমল মৃদু কিরণমমৃত ভবম্।
রজত গিরিশিখর মনিশ কলশঙ্খ বর যুবতি
দন্ত পঙক্তি নিভম।
প্রণমামি প্রণয় রতি কলহ রব তুদং শশিনম্॥

স্নেহস্মৃতি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আজিকে সন্ধ্যায় শুয়ে একা একা রোগের শয্যায়
এ প্রবাসে ভাবিতেছি, কেহ নাই এই দুনিয়ায়
মোরে স্নেহ করিবার, অসহায় এ সংসারে রেখে
স্মৃতির কণ্টকবনে সবে চলে গেছে একে একে।

মনশ্চক্ষে উঠে ভাসি জননীর মুখখানি ম্লান,
চকিত উদ্বেগে ভয়ে ছলছল কাঙাল নয়ান,
রোগশয্যা শীর্ষে বসি মা আমার জাগি সারারাত
স্মরিতেন ভগবানে তপ্ত শিরে বুলাতেন হাত

ভুলাতেন সর্ব্বজ্বালা। মনে পড়ে আজি বারবার
ক্লান্ত শুষ্ক মুখখানি স্নেহময় আমার পিতার—
সেই এক দিবসের, শুনি মোর পীড়ার খবর
একদিনে বিশ ক্রোশ পথ হেঁটে আসিয়া সত্বর,

ধূলাপায়ে দাঁড়ালেন ত্রস্তব্যস্ত শিয়রে আমার
নেবু ও বেদানা হাতে। 'ভয় নাই' কহিল ডাক্তার
স্বস্তির নিশ্বাসে তাঁর সব ক্লান্তি সকল উদ্বেগ
দূরে গেল, চোখে তাঁর ঘনাইল আনন্দের মেঘ।

মনে পড়ে পিশীমারে, দেবতার মানসিক তরে
দশক্রোশ পায়ে হেঁটে বৈশাখের খর রৌদ্র করে
চলেছেন কোলে ক'রে বারবাব তরুচ্ছায়ে বসি'
দূর করি পথক্লান্তি। মনে মোর উঠিছে উচ্ছ্বসি'

কাকার বদনখানি, ইষ্টিমারে উঠায়ে আমায়
উদ্বেলিত অশ্রুবেশ ওষ্ঠে চাপি', রাখিয়া মাথায়
হাতখানি, বলিবার ছিল যাহা —সব গিয়ে ভুলে
দাঁড়াইয়া রহিলেন শ্রাবণের জাহ্নবীর কূলে

তাকাইয়া একদৃষ্টে যতক্ষণ সেই ইষ্টিমার
দিগন্তে না মিলাইল। মনে পড়ে দাদারে আমার,
অন্ধকারে গলিপথে ফিরিতেছি গৃহে আপনার,
সস্নেহে কহিল দাদা—'দাঁড়া আমি আগে আগে যাই
এখানে সাপের ভয় সাবধানে পিছে আয় ভাই।'

গ্রাম ছাড়ি যেইদিন আসিলাম প্রথম নগরে
শৈশবের শিক্ষাগুরু আমারে রাখিয়া বক্ষ'পরে
বর্ষিলেন এই শিরে, অকপট তপ্ত অশ্রুজল,
বলিলেন আশীর্ব্বাদে, 'এ গ্রামের কর মুখোজ্জ্বল'।

তাঁর সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি পড়ে আজি মনে।
বৃদ্ধ ভৃত্য উমেশের মুখখানি কল্পনা নয়নে
জাগে আজি, ভূমিকম্পে কাঁপিতেছে জীর্ণ গৃহখানি
ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ মোরে তার বক্ষে লয়ে টানি

দাঁড়াইল আঙিনায়। এইরূপ আজি চারিধারে
কত স্নেহভরা মুখ জাগি মনে সন্ধ্যার আঁধারে
স্মরায় শৈশব-স্বর্গ। ছিলাম না হেন অসহায়
কত স্নেহাতুর চোখ চারিদিকে ঘিরিয়া আমায়

রক্ষিত প্রহরিসম। জাগে আজি এ তৃষার্ত্ত চোখে
বাৎসল্যের উৎসগুলি। আমি যেন আজি প্রেতলোকে
আসিয়াছি দৈববলে। পাথেয় ফুরায়ে গেছে মোর
বাকি জীবনের লাগি, পুন রক্ষাকবচের ডোর

পথের সম্বলরূপে লভিবারে স্নেহের জগতে
আবার এসেছি যেন আজি দূর কল্পনার পথে
রিক্ত নিঃস্ব অসহায়। শিশু হয়ে চারিপাশে চাই—
স্নেহ বিগলিতকণ্ঠে পুন সেই আশীর্ব্বাদ পাই॥



মিস্ স্মিথ

শ্রীলীলা ভট্টশালী

তোমরা তাকে চেন না। আর চিনবেই বা কি করে—তোমরা ত সিটাডেল কলেজের ছাত্রী অথবা ছাত্রীর বন্ধু নও। হয় ত কোনও মিটিং কিংবা অফিসিয়াল ডিনারে আমাদের মিস্ স্মিথকে তোমরা দেখে থাকবে—কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ সেখানে তোমরা তার যে রূপ দেখতে পেয়েছ, সেটা তার বাস্তবিক রূপ নয়। রূপসী হাস্যময়ী মধুভাষিণী মিস্ স্মিথের যে আর একটা রূপ আছে সেটা দেখবে ত চল আমার সঙ্গে। কি, সাহস হচ্ছে না?

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সামনের ঘরটাতে ঢুকলেই দেখতে পাবে সেটা একটা লাইব্রেরী। মাঝখানে পাশা প্রকাণ্ড গোল টেবিলটার চারপাশে কয়েকটি ফার্ষ্ট ইয়ারের মেয়ে বসে রেফারেন্স বই ঘেঁটে কি সব জিনিষ নোট বইতে তুলে নিচ্ছে। ওদের এখন ছুটি।

অবাক হলে? তা—অবাক হবার অধিকার তোমাদের আছে বটে। ছুটির ঘণ্টা পেলে লাইব্রেরীতে ছুটে এসে রেফারেন্স বই এর পৃষ্ঠা উল্টান ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্রীদের স্বভাব নয়—সেটা ঠিক—কিন্তু তোমরা ত প্রিন্সিপ্যাল মিস্ স্মিথের কাছে লজিক আর জেনারেল ইংলিশ পড় না—তাই ওদের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছ না। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—অবিশ্বাসে তোমাদের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে এসেছে। আচ্ছা—বেশ ত চল না—ঐ ত দেখা যাচ্ছে ফার্ষ্ট ইয়ারের খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে মিস স্মিথের সিল্কের গাউনের প্রান্তটি। নিশ্চয় এখন লজিক ক্লাশ, নইলে খানিকটা আগে মেমসাহেবের গলা সপ্তমে উঠেছিল কেন।

প্রকাণ্ড বোর্ডটার উপর একটা ডায়গ্রাম এঁকে মিস স্মিথ তার নাম লিখতে ব্যস্ত। তিন টি বিভাগের দুটোর নাম লিখতে যতদূর সম্ভব সময় নেওয়া যায়, নিয়েও ত তার তৃতীয়টার নাম মনে পড়ল না। কি করা? এদিকে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জোড়া সপ্রশ্ন দৃষ্টির অনুভূতি তার পিঠের উপর। অপমানে তার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠবার কথা ছিল—কিন্তু বেশী পাউডার ঘসে নষ্ট করে দেওয়া চামড়ায় সহজে রঙ ধরে না। অন্য কেউ হলে অন্তত লজ্জা পেত। কিন্তু এ মিস্ স্মিথ, যে-সে মেয়ে পাও নি। ভাল করে চেয়েই দেখ না, কি চমৎকার অভিনয় করছেন।

চট্ করে বোর্ডের দিক থেকে ফিরতেই তার চোখ পড়ল তপতীর উপর। মিহি গলার ইংরেজী যতদূর সম্ভব মোটা করে চ্যালেঞ্জের সুরে বলে উঠলেন, "ভাল—তপতীই বল এটার নাম কি হবে। মেয়েরা—তোমরা কেউ যেন পিছন থেকে বলে দিও না। অন্যের পড়া বলবার বেলায় পিছন থেকে বলে দেওয়া তোমাদের ভারী বদ অভ্যাস।

মেয়েদের মধ্যে কেউই কিন্তু উত্তর দেবার লক্ষণ দেখাচ্ছিল না।

কি আশ্চর্য্য! মিস্ স্মিথ অবাক হয়ে যাবার ভান করলেন, না—এতক্ষণ ধরে তোমরা কি লেকচার শুনলে? অনিমা, তুমি বলতে পার?

অনিমা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লেকচারের মধ্যে বিভাগগুলোর নাম তিনি কখন্ বলেছেন তা সে ভেবে পেল না। অবশ্য আমাদের মিস স্মিথ তার লেকচারের মধ্যে বিভাগগুলোর নাম যে একবারও বলেন নাই, সে বোধ হয় আর বলে দিতে হবে না।

মিস্ স্মিথের বিস্ময় এবার কূল ছাপাল, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও। "সত্যি মেয়েরা", গলায় তীব্র সুর এনে তিনি বলে চললেন, "তোমরা যে কি করে এত সহজ জিনিষটাও বুঝতে পার না তা আমার কল্পনার বাইরে। তোমাদের ক্লাশে কলেজের লেকচার হয় না—স্কুলের পড়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পড়াতে পড়াতে যখন ত্রিশ মিনিট কেটে যায় তখন যদি একটা প্রশ্ন করেও তার জবাব না পাই তবে কেমন লাগে বল। লেকচারের গলা শুকিয়ে যায় তোমাদের সঙ্গে বকাবকি করে।" পরম বিরক্তিসূচক একটা ভঙ্গী করে মিস্ স্মিথ ডেস্কের উপর হাতখানা রাখলেন। "দেখো, তোমরা চুপ করে পাঁচ মিনিট বস, আমি একটু জল খেয়ে এক্ষুণি আসছি। তোমাদের সততার উপর নির্ভর করে যাচ্ছি কেউ কথা বলো না।" হাই হিল জুতা খটখট্ করতে করতে মিস স্মিথ তার নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করলেন।

কিই বা আর তার করবার ছিল বল? ক্লাশের কোনও মেয়ে উত্তর দিতে না পারলে যখন তার নিজের বলে দেবার পালা আসবে তখন কি হবে? তার চাইতে এক্ষুণি নিজের ঘরের প্রাইভেট কাবার্ডটা খুলে ওয়েল্টন ও মনোহানের বইটা একটু দেখে আসা ভাল। এ কি তোমার মুখে যে হাসির ভিড় জমে গেল। দাড়াও না—দেখবে আরও কত মজা, এখনই কি।

ক্লাশময় একটা চাপা হাসির হিল্লোলের সঙ্গে বহু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। অকস্মাৎ জলখাবার ছুতো করে ক্লাশ ছেড়ে যাওয়ার অর্থখানা বুঝতে আর কারুর দেরী হয়! মিস স্মিথ যে মেয়েদের মনের কথা টের পান না, তা নয়। কিন্তু মন আর মুখ আলাদা জিনিষ। মেয়েরা মুখে কেউ তার বিদ্যার প্রতি কটাক্ষপাত না করলেই হ'ল।

রেখাটা একটু ভালমানুষ গোছের। এ সব চাপাহাসির অর্থ বুঝতে ওর একটু দেরী আছে। কথা বলা নিষেধ—তাই আসিয়াকে একটু ঠেলে দিয়ে ও ডেস্কের উপর লিখল "কিরে—বই দেখতে গেলেন নাকি?"

"তাও বুঝতে পারলে না।" আসিয়া লিখে জবাব দিল।

হাসি চাপতে চাপতে মেয়েদের মুখে চমৎকার রঙ্ দেখা দিয়েছে। অবশ্য এত হাসবার তেমন কিছু কারণ নেই। কিন্তু চালিয়াত মিস স্মিথের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ রকম হাসতে পাওয়াটা একট সান্ত্বনা।

মিস স্মিথ রেজিষ্টারী খাতা ও ব্যাগ ছাড়া আর কিছু সঙ্গে করে ক্লাশে আসেন না—সর্ব্বদাই দেখাতে চেষ্টা করেন লজিকের আদ্যোপান্ত তাঁর নখাগ্রে। মেয়েদের কাউকে বই কিনতে দেন না—কারণ তাতে নাকি মেয়েরা শুধু কলের মত শিখে যায়—ভেতরে তাদের কিছুই ঢোকে না। কোনও মেয়ে বই কিনেছে বা পড়ে জানলে তাকে ক্লাশ থেকে বা'র করে দেন। ক্লাশে নোট দেন না—কোনও মেয়ে লেকচারের বিশেষ জায়গাগুলো খাতায় টুকে নিলে তাকে বকুনি দেন। এমন কি বোর্ডে যা লেখা হয় তাও তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও মেয়ে টুকে নিতে পারে না। এমনি ধারা তাঁর নিয়ম। সবই মনে করে রাখতে হবে। স্মরণ শক্তির উপর এ হেন আস্থাবান শিক্ষকের সঙ্গে স্মরণশক্তি যখন এমন নিদারুণ পরিহাস করে, তখন মেয়েদের সেটা উপভোগ করা উচিত কি-না সে তুমিই ভেবে দেখ।

খট্ খট্ খট্। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মিস স্মিথ এসে ঘরে ঢুকলেন।

কি অনিমা, মনে করতে পেরেছ? মিস্ স্মিথের মুখখানায় যেন একটু সদয় ভাব দেখা যাচ্ছে।

অনিমা অসহায়ভাবে একবার বোর্ড ও একবার টিচার ডেস্কের প্ল্যাটফর্ম্মটার দিকে তাকাতে লাগল।

"ক্লাসের যে কেউ বলতে পার।"

ক্লাশ নীরব।

"কি অদ্ভুত ব্যাপার!" মিস স্মিথের চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। "এতবড় ক্লাশের একটি মেয়েও মনে করতে পারছ না? তোমরা ক্লাশে কর কি? স্বপ্ন দেখ? আজ আমি একটা দরকারী জিনিষ বোঝাব ভেবেছি আর তোমরা কি-না—" মিস স্মিথের মনের ভাব আর ভাষায় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেল না। "—যাক আমিই লিখে দিচ্ছি ভাল করে চেয়ে দেখ। কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে আর এমন করলে চলবে না বলে দিচ্ছি!" চক হাতে নিয়ে তিনি বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

অনিতার মুখে একটা কড়া জবাব এসেছিল। ও উঠে দাঁড়াতেই পিছনের বেঞ্চ থেকে উমা পা দিয়ে ঠেলে নিষেধ করল—পাশের মেয়ে মিলি হাত ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিল। অনিতাটা ভারী বোকা! যেখানে কড়া কথায় কোনই ফল হবে না—সেখানে মিথ্যা নিজের মেজাজের অপব্যয় করে।

হাতে টান দেওয়ার ফলে ঝাকুনী লেগে ডেস্কটা একটু শব্দ করেছিল শুনতে পাওনি? তাই মিস স্মিথ ফিরে চাইলেন। ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর আর দেরী নাই নিশ্চয়। আজ অনিতার অদৃষ্টে আছে কিছু।

ডেস্কের শব্দটা আবার মিস স্মিথের মেজাজ পঞ্চমে চড়িয়ে দিল। বোর্ডের লেখা শেষ করে এসে তিনি মেয়েদের চট্‌পট্ করে রাফ্ খাতা বের করে দশ মিনিটের মধ্যে যা লিখতে দেবেন তা লেখা শেষ করে আনতে বললেন। দিলেন উত্তরের সঙ্গে কারণ দেখিয়ে কতগুলি ডেফিনিশন টেষ্ট করতে।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করে খাতা এনে হাজির করল। অনিতা বেচারীর রাফ্ খাতার মলাটটা ছেঁড়া। এটাকে উপলক্ষ্য করেই যে মিস স্মিথ ওর উপর রাগ ঝাড়বেন সে বেচারী নিজেই বুঝতে পেরেছিল। এ বিষম সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য উপদেশের আশায় ও উমার মুখের দিকে ফিরে তাকাল। উমা এখন ধ্যানী বুদ্ধ সেজেছে। আর মিলি? সেও এখন তাকাবে না। ছাতের কাছে কার্নিশের উপর যেখানটায় দুটো পায়রা মিলে বাসা বাঁধছে সেখানেই ওর দৃষ্টি।

"অনিতা চৌধুরী!" মিস স্মিথের গলায় ঝড়ের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

অনিতা চট্ করে উঠে দাঁড়াল।

"তোমার খাতা এত নোংরা যে ছুঁতেও ইচ্ছে হয় না। খাতার মলাট কোথায়?"

"ছিল—ছিঁড়ে গেছে।"

"প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে তোমরা—দু হাজার মিথ্যা কৈফিয়ৎ দাও। এই তোমাদের স্বভাব। সোজা সত্য কথা বলতে অভ্যাস করো।"

অনিতার গলাও এবার ঝাঁঝাল হয়ে উঠল।

"মলাট একটা ছিল—এবং সেটা ছিঁড়ে গেছে।"

ও মিস্ স্মিথের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অবস্থা দেখে তিনি চেপে গেলেন।

মেয়েদের যা রাগ হচ্ছে এখন। একবার লিখতে দিলে তিন মাসের মধ্যেও মিস্ স্মিথ খাতা ফেরত দেন না। নিজে যখন সময় মত দেখে খাতা ফেরত দিতে পারেন না—তখন রাফ্ খাতার আকৃতি নিয়ে তার এত মাথা ব্যথা কেন?

হঠাৎ কার্নিশের উপর থেকে একটা পায়রা করুণ কণ্ঠে ডেকে উঠে মিস স্মিথকে একটা বুদ্ধি জোগাল।

'ভাল কথা অনিতা'—তাঁর গলার সুর তীব্র শাসনসূচক।

"কাল তোমাকে ক্লাশের পায়রা তাড়াতে বলেছি—তাড়িয়েছ? অতটা মিথ্যা অহঙ্কার ভাল নয়। পায়রা তাড়ানটা হীন কাজ নয়। এই ক্লাশের মেয়ে হিসেবে এটুকু কাজ করা তোমার কর্ত্তব্য। এ সামান্য কর্ত্তব্য কাজটুকু করবার মত মনের প্রসার যদি তোমার না থাকে তবে বলে দিলেই পার যে করতে পারবে না। মিছেমিছি কেন নিজের দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে এত বড় একটা ক্লাশের অসুবিধা—

"ক্ষমা করবেন—ভয়ঙ্কর দুঃখিত, কিন্তু আমি পায়রা তাড়াতে পারব না।" অনিতা তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে বলল। কারণ, জানা কথাই যে, মিস্ স্মিথ একবার বকুনী দেবার সুযোগ পেলে শিগ্‌গির থামতে চাইবেন না।"

"ধন্যবাদ!" রাগে মিস্ স্মিথের মুখখানা যেন ফেটে পড়ছে। "মঞ্জু, তুমি পায়রা তাড়িও। পারবে না? হ্যাঁ—খুব পারবে।"

মঞ্জু যে মিস্ স্মিথের কথা শুনতে পেয়েছে তার লক্ষণ ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।

হেসো না—ভেবে দেখ কি অদ্ভুত হুকুম! ক্লাশে একটা বাঁশ এনে রাখতে হবে। ক্লাশে যখন লেকচার চলতে থাকবে তখন যদি পায়রা

ডেকে ওঠে তবে একজন মেয়ে ওঠে সেই লম্বা বাঁশটা দিয়ে পায়রা তাড়াবে—অথবা নিজের জায়গা থেকে হাত তুলে তুলে ওদের গায়ে চকের টুকরো ছুঁড়বে—উদ্দেশ্য ওদের তাড়ান। কাল প্রিন্সিপ্যাল মিস স্মিথ হেসে হেসে এই হুকুম দিয়েছিলেন, তাই মেয়েরা এটাকে ঠাট্টা বলে ধরে নিয়েছিল। এখন থেকে দেখছি মিস স্মিথকে জিজ্ঞেস করে রাখতে হবে, কোন্‌টা তাঁর ঠাট্টা আর কোন্‌ কথাটি তিনি সিরিয়াসলী বলছেন।

ঘণ্টা পড়বার মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।—চলো যাই, ফোর্থ পিরিয়ডে আবার এই ক্লাশেই তাঁর একটা জেনারেল ইংলিশের ক্লাশ আছে, সে সময় আবার আসব'খন।

(২)

জেনারেল ইংলিশের ক্লাশে মিস স্মিথ যতটা ফাঁকি দিতে পারেন, এমন ফাঁকি বোধ হয় তিনি তাঁর নিজের ছাত্রী জীবনেও দেন নি। পড়া দেবার আগে তিনি ক্লাশে কখনও কিছু বুঝিয়ে দেন না। বলেন "নিজেরা ভাল করে পড়া শিখে এসো।" পরদিন ক্লাশে এসে জিজ্ঞেস করেন কার কোথায় বুঝবার বাকী রইল। তারপর যা সাধারণত হয় তা আজকের ক্লাশেও দেখতে পাবে।

মঞ্জু সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়িয়ে তার অসুবিধাটা কোথায় জানাল। মিস স্মিথ তাকে সেই জায়গাটা পড়তে বললেন। মঞ্জু পড়ে চলল,—

"He was one of those wretched and evil men, whose yearnings are downward to the darkness, instead of Heavenward, and, who, could they but extinguish the lights which God hath kindled for us, would count the mid-night gloom their chiefest glory."

মিস স্মিথ বলে উঠলেন, "In simple English it means that he was a pessimist."

বাস—হয়ে গেল! সোজা ইংলিশে এর অর্থ কি, সেটুকু বোঝার সাধ্য মঞ্জুর নিজেরও আছে। ও বেচারী ভাষার মারপ্যাঁচ দেখলে ভয় পেয়ে যায়—তাই একটু বিশেষ ব্যাখ্যা চেয়েছিল।

আজকের পড়ায় এক জায়গায় ছিল, "In Abraham's bosom." একটি মেয়ে উঠে এর অর্থটা জানতে চাওয়ায় মিস স্মিথ জবাব দিলেন "নিজেরা খুঁজে বা'র করবে। লাইব্রেরী থেকে রেফারেন্স বই নিয়ে ছুটীর ঘণ্টায় দেখে নিও।"

এলেন পো-র একটা গল্পও আজকের পড়ায় ছিল। একটা প্যারাগ্রাফ মেয়েরা কেউই বুঝতে পারেনি—এ কথা মিস স্মিথকে জানাতেই তিনি বললেন, "আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, এই আমার শেষবার এই প্যারাগ্রাফটা বোঝান।" মিস স্মিথ আর কোনও দিন এই প্যারাগ্রাফটা বুঝিয়ে দিয়েছেন বলে কেউ মনে করতে পারল না। সর্ব্বাণী ললিতাকে দেখিয়ে ডেস্কের উপর লিখল—"নোট বইতে টুকে নে, প্রথম—শেষ।"

দায়সারা রকমের করে প্যারাগ্রাফটা বুঝিয়ে দিয়ে মিস্ স্মিথ বললেন "কাল কবিতা হবে—Isle of Greece-টা তৈরী করে এসো।"

"অনেক allusion যে!" তপতী মৃদু আপত্তি জানাল।

"লাইব্রেরীতে একটা কাবার্ড ভর্ত্তি রেফারেন্স বই রয়েছে কিসের জন্য?" মিস্ স্মিথের কড়া জবাব এল। তপতী একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। টেম্পারেচারটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।

মিস্ স্মিথের নিয়ম নোট-খাতায় পড়ার সমস্ত কঠিন শব্দগুলো লিখতে হবে; কিন্তু সেখানে কেউ অর্থ লিখতে পারবে না—অন্য কোনও পাতায়ও না। তারপর একটা একটা করে শব্দ ডিক্সনারী খুঁজে বা'র করে তখন তার অর্থ মুখস্থ করতে হবে। কেউ এই নিয়ম পালন করেনি জানতে পেলে অথবা ক্লাশে পকেট অক্সফোর্ড ডিক্সনারী কিংবা বই আনতে ভুললে কলেজের মেয়েদের ক্লাশ থেকে বা'র করে দিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না।

এমনি করে পড়া শিখতে হলে শুধু জেনারেল ইংলিশ পড়া শিখতেই সারাটা সন্ধ্যা ও সকাল কেটে যায়। একদিন অনিতা বলেছিল, "আমি ওরকম করে পড়া শিখতে পারি না এবং ভবিষ্যতেও পারব না। আমাকে ত সব পড়াই শিখতে হবে, শুধু জেনারেল ইংলিশের জন্য সমস্ত সময় ব্যয় করলে চলবে কি করে?"

"চলবে কি করে তা আমি জানি না—তবে আমার নিয়ম মত কাজ আমি চাই। যদি তা করতে না পার তবে আমার ক্লাশে দয়া করে এসো না।" মিস স্মিথ জবাব দিয়েছিলেন।

প্রায় সব মেয়েরই রোজ দুটো করে ছুটির ঘণ্টা থাকে। তার মধ্যে এক পিরিয়ড প্রত্যেক মেয়েকে খেলতে হবে। বাকী আর এক পিরিয়ডে লাইব্রেরীর টেবিলে যত পত্রিকা থাকে—বিশেষ করে আর্থার মি-র সম্পাদিত Children's News Pap r-টা সবাইকে পড়তেই হবে—না পড়লে বকুনী। রেফারেন্স বই ঘেঁটে পড়ার মধ্যে যত allusion আছে, খুঁজে বা'র করতে হবে—আর অন্য বিশেষ কোনও কাজ থাকলে তাও করতে হবে। মিস্ স্মিথ মেয়েদের কাছে বলে বেড়ান যে, মেয়েদের ভালর জন্যই তিনি এসব জিনিষ বাধ্যতামূলক করেছেন। নিজের পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য এমন নির্লজ্জভাবে মেয়েদের অবসরটুকু চুরি করতে তার একটুও বাঁধে না। মেয়েরা নিরুপায়, মিস্ স্মিথ যে প্রিন্সিপ্যাল—তাঁকে অমান্য করতে ওদের সাহসে কুলোয় না। এই সময় ছেলেদের উপর ওদের হিংসা হয়। থাকত তাদের মত গায়ের জোর, আর ইচ্ছেমত রাস্তায় বা'র হয়ে যাবার ক্ষমতা, তবে দেখিয়ে দিত মিস্ স্মিথের সিটাডেল কলেজের প্রিন্সিপ্যালগিরি ক'দিন টেকে।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, সময় চলে যায়। তাই ক্রমে এমন পীড়াদায়ক, বিরক্তিকর ও অপমানজনক ক্লাশেরও অবসান হয়। ঐ টিফিনের ঘণ্টা বাজছে।



কলেজের পশ্চিম দিকের প্রকাণ্ড বাদামগাছটার তলে শীতের বেলার উপভোগ্য রোদে দাঁড়িয়ে মেয়েরা জটলা করছে। শোনা যাচ্ছে, আজ স্কুলের মেয়েদের প্রমোশন হবে। কেউ সঠিক জানে না। মিস্ স্মিথ কোনও কাজই জানিয়ে করেন না। তাতে তাঁর সম্মানের হানি হয়। সব কাজেই তার অবাক ক'রে দেওয়া চাই।

মেয়েরা মিস স্মিথের কথা আলোচনা করতে আরম্ভ করলেই সেটা নিন্দার সীমায় গিয়ে পৌঁছয়। আজকের এমনিধারা আলোচনার মাঝখানে সুরেখা বলে উঠল, "আচ্ছা, মিস্ স্মিথ বিয়ে করেন না কেন—চেহারাটা ত বেশ সুন্দর। উনি বিয়ে করলে আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

"ওকে বিয়ে করবে কে? সুন্দর চেহারা দেখে যারা কাছে এগোয় তারা মেমসাহেবের দু-একখানা মিষ্টি কথা শুনলেই প্রাণ নিয়ে পালায়।" অনিতা উত্তর করল।

"কেন, সেই ব্যাঙ্কারটির খবর কি?" তপতীর গলা শোনা গেল। জনরব কোনও এক রূপমুগ্ধ ব্যাঙ্কার মিস্ স্মিথের পাণিপ্রার্থী।

"কে জানে ভাই!" মঞ্জুর গলায় ঔদাস্যের আভাস পাওয়া যায়। "তবে তিনিও যে শিগগীরই সরে পড়বেন সে নিশ্চিত জেনো। আমাদের আর শান্তির আশা নেই।"

"শোন, আমরা সবাই চাঁদা করে ওর বিয়ের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। মাসখানেক বিজ্ঞাপন দিলে দু-একজন পাণিপ্রার্থী নির্ভীক সাহেব নিশ্চয় জুটবে।" একটী মেয়ে গম্ভীরভাবে প্রস্তাব করল।

"কিন্তু, তিনি এই শহরের লোক হলে চলবে না বলে দিচ্ছি" তপতী কাতরকণ্ঠে বলে উঠল। "তা হ'লে আমাদের চাঁদা তোলাই বৃথা হবে, কারণ মিস্ স্মিথ বিয়ের পরেও চাকরী করবেন।"

"তা হ'লে বিজ্ঞাপনে এই কথাটাও লিখে দিতে হবে" গৌরী প্রস্তাবটা সংশোধন করে দিল। "আর তিনি যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তখন তাঁকে খুব ভাল করে উৎসাহ দিয়ে দেব—যেন মিস্ স্মিথের মেজাজ দেখে কিছুতেই হাল না ছাড়েন।"

"ঠিক, 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিসে'র মিঃ কলিন্সের কোর্টশিপের দশা হবে।" মিলি খিল খিল করে হেসে উঠল।

গৌরী ভিড়ের মধ্যে নিজের জন্য একটু জায়গা করে নিয়ে বলতে সুরু করল "দেখ, মিস্ স্মিথকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই তিনি বলেন find it yourself, অথবা consult your dictionary'. ভদ্রলোক যখন তাঁকে বলবেন, Do you love me? মিস্ স্মিথ উত্তর দেবেন, Consult your dictionary, কি বলিস?

গৌরীর কথায় মেয়েগুলো একসঙ্গে হেসে উঠল। ওদের প্রাণখোলা হাসিতে চারদিকের বাতাস ঝিম ঝিম করে বেজে ওঠে। সেই হাসির সঙ্গে তাল রেখে টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টাও বেজে উঠল।

৩

বাংলার ক্লাশ। মিস রায় যখন 'অশেষ' কবিতাটা শেষ করে এনেছেন এমন সময় দপ্তরী খবর নিয়ে এল যে ফার্ষ্ট ইয়ারের মেয়েদের প্রিন্সিপ্যাল ডাকছেন। ব্যাপারখানা কি! মেয়েরা এ ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়—কিন্তু কোথাও উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। অফিস ঘরে মেয়েরা সার বেঁধে ঢুকতেই দেখা গেল মিস্ স্মিথ গুম হয়ে বসে আছেন। অজানা আশঙ্কায় মেয়েরা, 'গুড আফ্‌টার নূন' বলতে ভুলে গেল।

"গুড আফটার নূন গার্লস।"

"গুড আফটার নূন মিস্ স্মিথ।" সমবেত কণ্ঠে উত্তর হ'ল।

"তোমাদের ক্লাশে কটি মেয়ে?"

"বায়ান্নটি।"

"তোমরা এ মাসের সোশ্যাল ফণ্ডের চাঁদা দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"এই বায়ান্নটি মেয়ে মিলে মাত্র ছ টাকা তিন আনা তোমরা দিলে। লজ্জা করল না? সিনেমা দেখে তোমরা টাকা ওড়াও, শাড়ী ব্লাউজে তোমরা যত ইচ্ছে খরচ কর, কেবল গরীবদের দিতে তোমাদের হাতে ওঠে না! পৃথিবীতে নিজের বিষয় ছাড়া অন্যের কথাও ভাবতে শিখো—মনকে নয় ত উদার করতে পারবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনকে উদার করা—তোমাদের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তোমরা কে কত করে চাঁদা দাও?"

"গড়ে প্রায় মাথা পিছু দু আনা।" সুরেখা উত্তর করল।

"গড়ে মাথা পিছু দু আনা!" মিস্ স্মিথ গর্জ্জে উঠলেন। "দয়াটা কি নিক্তি দিয়ে মেপে রেখেছ যে দু আনার বেশী চাঁদা দিতে পার না? ইচ্ছে থাকলে এই সোশ্যাল ফাণ্ডের চাঁদা তোমরা নিজেদের পকেট মানি থেকেই দিতে পার। সিনেমার খরচ একটু কমাও—তবেই হবে। এর জন্য তোমাদের বাবা-মা'র কাছে টাকা চাইতে হয় না।" একটু দম নিয়ে মিস স্মিথ আবার সুরু করলেন, "অসহায়কে সাহায্য করা মানুষের ধর্ম্ম। দরিদ্রকে দান করা, ব্যথিতকে সহানুভূতি দেখান মানবতার লক্ষণ। দুঃখে পড়ে মানুষ যদি কাঁদে, তবে তাকে সহানুভূতি দেখিয়ে চোখের জল মুছে দেওয়াটা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু—কিন্তু তোমরা কি করছ? তোমরা দরিদ্রদের অপমান করছ। তাদের এমনি করে দু আনা পয়সা দিয়ে অপমান করার তোমাদের কি অধিকার আছে? মিস্ দে—ওদের চাঁদা ফিরিয়ে দিন। আমি ওদের এমনি করে দরিদ্রদের অপমান করতে দিতে পারি না। তোমরা যেতে পার—গুড আফটার নূন।"

মেয়েরা অফিস থেকে বাইরে এলে মিস্ দে ওদের চাঁদা ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থটা স্পষ্ট—মেয়েরা যেন আরও বেশী করে এনে দেয়।

অপমানে ও রাগে মেয়েরা বলবার মত কথা খুঁজে পেল না। বাধ্যতামূলক চ্যারিটির চাঁদা একটা আছে—আবার এই সোশ্যাল ফাণ্ড। তা বাদে বন্যার চাঁদা, দুর্ভিক্ষের চাঁদা, এর চাঁদা, ওর চাঁদা—এসব ত লেগেই আছে। বাড়ীতে গিয়ে রোজ রোজ চাঁদার পয়সা চাইতেও লজ্জা করে। মিস্ স্মিথ যখন সোশ্যাল ফাণ্ড খোলেন তখন

বলেছিলেন, যে যতটা পারে সে তাই দেবে—জোর করার কিছু নেই। বাস্তবিকই ত—মিস্ স্মিথ কি জোর করে চাঁদা নিচ্ছেন?

"আমাদের বাঙালী মেয়েদের পকেট মানি থাকে না"—সিঁড়িতে পা দিয়ে মঞ্জুর রাগটা প্রকাশ হবার পথ পেল।

সুরেখার রাগটা সব চাইতে বেশী। প্রিন্সিপ্যাল চাঁদার কথা উঠলেই ওকে দুটো মোটর রাখার কথা বলে খোঁচা দেন। বাবা ডাক্তার আর দাদা দালাল। দুটো মোটর দরকার, কিন্তু মোটর থাকলেই যে বোঝাই হয়ে ঘরে টাকা আসবে তার কোনও মানে নেই। আর বেশী চাঁদা দিতে পারলেও সব সময় দেওয়া চলে না—কারণ বহু মেয়ের সমতার থেকে নিজের স্থানটা তা হ'লে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। "নিজে বোধ হয় খুব সিনেমা দেখে টাকা ওড়াতেন, তাই সব সময় আমাদের সিনেমা দেখার কথা বলে বকুনী দেন। বৎসরের মধ্যে কদিন যে সিনেমা দেখা ভাগ্যে জোটে সে নিজেরাই জানি।" মঞ্জুকে সায় দিয়েও বলে উঠল। কিন্তু বৃথাই গর্জ্জন! মেয়েরা সব ক্লাশে ফিরে গেল।

ছুটির ঘণ্টাটা যত এগিয়ে আসছে, মেয়েরা ততই চঞ্চল হয়ে উঠছে। কেউই পড়ায় মন দিতে পারছে না। স্কুল-বাড়ীটা কি ভীষণ চুপ! নিশ্চয় ওদের প্রমোশন জানান হচ্ছে। দূর থেকে বাতাসে যেন কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। কলেজের মেয়েরা আর ক্লাশ করতে পারছে না—বাইরে যাবার জন্য ছটফট করছে। কেউ যেন বাইরে যেতে না পারে এ জন্যই বোধ হয় আজ লাষ্ট পিরিয়ডে একটা জেনারেল ক্লাশ দিয়ে মেয়েদের আটকে রেখেছেন। সেকেণ্ড ইয়ারের মেয়েদের ত টেষ্ট হচ্ছে। সময়টা যেন আর ফুরোতে চায় না।

ছুটির ঘণ্টা পড়তেই কলেজের মেয়েরা নীচতলার দিকে ছুটল। বাস্তবিক আজ ওদের প্রমোশন হয়েছে। কেউ কাঁদছে প্রমোশন পায়নি বলে—কেউ কাঁদছে পরীক্ষায় তেমন ভাল ফল করতে পারেনি বলে। প্রথম দলের কান্নাটাই প্রবল।

জীবনে সাফল্য লাভ করতে অনেকেই পারে না। পারে না নিজেদেরই দোষে। কিন্তু তবু—তবু তাদের বিফলতাটা বড় করুণ। গাছ তার ফুলকে ফোটাবার, ফলকে পুষ্ট করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু তার রস সংগ্রহের প্রাচুর্য্য যদি ফুল ফোটাবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল না হয়, তবেই তার সাধের কুঁড়িগুলো পাপড়ি মেলে চাইবার আগেই ঝরে পড়ে যায়, ফলগুলো পোকায় কেটে দেয়। সামর্থ্য নেই—তাই আসে বিফলতা। ছাত্রী-জীবনে এই একটা দিন যায় যেদিন নিজের চরম সাফল্যও মনে আনন্দের রেখাপাত করে না।

ছুটির সময় খেলাটা বাধ্যতামূলক। ফার্ষ্ট ইয়ারের একদল মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকে নিজেদের কাবার্ড থেকে খেলার সরঞ্জাম বা'র করে আনতে গিয়ে দেখে সিঁড়ির পাশের অফিস রুমের জানলাটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে মিস্ স্মিথ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছেন। নিজেদের পাশে গিয়ে কাবার্ডটা খুলতেই ওদের কানে এল হাততালির শব্দ। মেয়েরা গোলমাল করলে অফিস থেকে মিস্ স্মিথ হাততালি দেন, ওটা তার মেয়েদের চুপ করাবার সঙ্কেত।

নীচে মেয়েরা কেঁদে গোলমালের সৃষ্টি করছে। এ ধরণের গোলমাল করা এ কলেজের নিয়মের বাইরে—তাই এই হাততালি। এই ত সহানুভূতি।

কেউ কাঁদলে তাকে চুপ করান মানবতার লক্ষণ—সে যেমন করেই হোক না কেন—গলাটিপে হ'লেও ক্ষতি নেই। আমাদের মিস্ স্মিথ মানবতার পরাকাষ্ঠা, তাই নয় কি? এবার তাঁকে চিনলে?

বিয়োগিনী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আমার দুয়ার ছেড়ে খুঁজে' নিলে হরির দুয়ার!
—সেই ভালো, সেই ঠিক; জীবনের ক্ষণিক জুয়ার
ক'দিন রাখিবে ধরে'? সেই পঙ্ক, সেই তো শৈবাল-
ভরা এই শীর্ণ নদী! সেথা যে অমৃত পারাবার!

ঐটুকু ছিলে তুমি, সহসা হইলে এত বড়
তোমারি মাঝারে দেখি, সারা সৃষ্টি হইয়াছে জড়—
তিলে-তিলে পলে-পলে সঙ্গোপনে মনের নয়নে।
যা-কিছু দেখি এ চোখে—বারবার শুধু পড়ে মনে
সে তব সুন্দর মূর্ত্তি—সেই শান্ত সেই সুসংযত
দীর্ঘপক্ষ্মচ্ছায়াতলে আয়ত নয়ন অবনত!

—এই রাত্রি-অন্ধকারে, নিরালায় এ পরমক্ষণে
একবার কথা কও—কও কথা একান্ত গোপনে।
যে দ্বারে গিয়াছ চলি', একবার খুলি' সেই দ্বার
হরির দোহাই, আজি একবার—ডাক একবার।

সহপাঠিনী

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্ সি

৪

বিয়ে আমার হয়ে গেল। ব্রাহ্ম মন্দিরে গিয়ে 'আমার প্রাণ তোমার হোক', 'তোমার প্রাণ আমার হোক', 'আমাদের উভয়ের প্রাণ শ্রীভগবানের হোক'—এই সরল মন্ত্র উভয়ে উচ্চারণ ক'রে একে অন্যের আইবুড়োত্ব ঘুচিয়ে বেরিয়ে এলাম। ট্যাক্সি ক'রে আমরা বালীগঞ্জ গেলাম। ডক্টর ডসের বাড়ী বালীগঞ্জে—একডালিয়া রোডে। আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছিল। সবটাই বোধ হয় শেফালির অভাবে। আর একটা কারণ থাকতে পারে—মানুষ যদি একটা খুব বড় কাজ কোনও বিষয়ে করতে আশা বা ইচ্ছা করে—আর সেটা যদি হ'য়ে যায় একেবারে সাদাসিধে ব্যাপার, তা হ'লে একটা অবসাদ আপনিই আপনি আসে। ট্রাইডাইমেন্‌শানাল থিওরী ও ফিলিং—এই রকম ব'লে — তাই একজন 'সাইকলজিষ্ট্' বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। আমার জীবনের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে ছিল আদর্শ স্বামীলাভ এবং আদর্শ দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনযাপন। সেই আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত হ'ল কি-না কে জানে। কারণ এই অনাড়ম্বরপূর্ণ বিবাহকে আমি অন্ধকার রন্ধন-শালায় গোপনে ব'সে পান্তা ভাত খাওয়ার চেয়ে বেশী স্নেহের চক্ষে দেখতে পারছি না। যা হোক, এখন এ নিয়ে ভেবে বেশী সময় নষ্ট না ক'রে আমি মায়ের চেঞ্জে যাবার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলাম। আমরা কলেজ খোলার আগে হাজারীবাগ বেড়িয়ে আসব ঠিক ছিল। মাকে রওয়ানা না ক'রে দিয়ে আমি যেতে না চাওয়ায় আমাদের যাওয়া স্থগিত ছিল। মা কোথায় যাবেন কোথায় থাবেন ঠিক করছেন, এমন সময় একদিনের ভেদবমিতে তিনি আমাকে ফেলে রেখে ইহলোক ত্যাগ করলেন। ব'লে গেলেন, "বেলা, স্বামীর ক্রোড়ই তোমার চিরকালের আশ্রয়।" মাকে এমন অতর্কিতে হারিয়ে আমি পাগলের মত হ'য়ে গেলাম। কোনও উপায়েই মনস্থির করতে পারলাম না। একাধারে জনক ও জননী আমার মা, আমাকে চিরদিন শিশুর মতনই যত্নে লালনপালন ক'রে এসেছিলেন—আজ কোন্ ভরসায় তিনি আমাকে ফেলে চ'লে গেলেন। আমার প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে গেছে—কেন তিনি এখন ভাবতে পারলেন না আমার বিবাহ, আমার স্বামী—আমার কাছে এত নতুন যে মায়ের অভাবে আমি এদের ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে পারি না। আমার স্বামী প্রথমটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন আমার কাতরতা দেখে। তাঁরও পিতামাতা নেই। একজন বড় ভাই বর্মায় বড়চাকরী করেন এবং সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকেন। আমার শ্বশুরালয়ে স্বামী ছাড়া আর কোনও একটা লোক নেই, যার মুখ চেয়ে আমি একটু নিজের ব্যথার ভার লাঘব করি। স্বামী অনেক রকম চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিজে এ বিষয় আনাড়ী। এদিকে আমাদের বিবাহ নিয়ে সাপ্তাহিক বাংলা কাগজগুলো মহা হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ "গুরু-শিষ্যা উপাখ্যানম্" নাম দিয়ে প্রবন্ধ লিখ্‌ছে, কেউ কলেজের ছাত্রীদের লেখা আমাদের উদ্দেশ ক'রে কবিতা ছাপছে, কেউ মেঠাইমণ্ডা চাই, কেউ ফটো চাই—ব'লে হাল্লা ক'রে স্বামীকে ও মধ্যে মধ্যে আমাকে বিরক্ত ক'রে যাচ্ছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কেউ এসে বলে, খাওয়াতে হবে; মেয়েরা কেউ আবার স্বামীর চিরকুমার-ব্রত ভঙ্গ করাবার আমি কারণ হওয়ায় আমার 'বাহাদুরী'র প্রশংসা ক'রে যায়। আমার সহপাঠিনী মেয়েরা আমার 'পেটে পেটে এই ছিল', 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া' প্রভৃতি ব'লে যত পার্‌ল ঠাট্টা ক'রে গেল। কেউ বললে বিয়ের আর সন্তানের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন একবারে খেয়ে যাবে—এর জন্য আমাকে যে যত পার্‌ল আশীর্ব্বাদ করল। অতিশয় রসিকারা আমার 'খুরে' নমস্কার ছলে আমার পায়ে হাত দিতে গেল। এদের এত ঝামেলার মধ্যে আমার মাতৃশোক 'ছাইচাপা আগুন' হ'য়ে থাক্‌ত—মুখ ফুটতে দিতাম না। দরদী কি সকলে হয়? হ'ত শেফালি—তার গলা জড়িয়ে

ধ'রে মায়ের জন্য কাঁদতাম—সেও কাঁদত। কিন্তু শেফালির কোনও খবর আমি চেষ্টা ক'রেও পেলাম না। সহপাঠিনী রমলা দত্ত কিছুদিন পরে দেখা করতে এল—আমরা যখন পড়তাম তখন সে বিবাহিতা। সে এসে আমার শরীরে পূর্ণ মাতৃত্বের চিহ্ন দেখে একেবারে গালে হাত দিয়ে বললে, "ওমা, আমি কোথা যাব, তোর এ অবস্থা—একটা খবর দিস নি। ভয় হয়েছিল আমার পেটটা বড়, যদি খেতে চাই, ডক্টর ডসের অনেক খরচ হ'য়ে যাবে?" সে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ দিয়ে—আবার আসবে বলে চ'লে গেল।

যথাসময়ে আমার মাষ্টার মহাশয়কে আমি একটি কন্যা-রত্ন উপহার দিলাম। মেয়েটির মুখ হয়েছিল, আমার মায়ের মুখের অবিকল প্রতিচ্ছবি। স্বর্গের পরিমল মাখান ছিল ওর মুখে—আমি ওর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারতাম না। কলেজ শুদ্ধ মেয়ে এল আঁতুড়েই মেয়ে দেখবে ব'লে—এখনও আমার জন্যে ওরা এত 'ইন্টারেস্টেড্'। আজ শেফালি যদি এখানে থাকত তা হ'লে সে 'ফোর্ট উইলিয়মে' একচল্লিশটা তোপ দাগার ব্যবস্থা ক'রে শহরের লোকদের জানাত—তার বেলাদির ক্রোড়ে স্বর্গের একটি পারিজাতের আবির্ভাব হয়েছে। মেয়েটি অনিমেষ নয়নে আমার মুখের দিকে দুদিন চেয়েছিল। তৃতীয় দিনে একবার তিড়িঙ্ ক'রে উঠল—তখনই তার চোখ উল্‌টে গেল। আমি মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে স্বামীর কাছে ছুটে গেলাম—ডাক্তার আন্‌তে বলতে। মায়ের মন—আমার বিশ্বাস হয় না—ও আমার কাছে এসেছে যখন আমার ক্ষত হৃদয়ের প্রলেপ হয়ে—আমার মায়ের মুখের প্রতিচ্ছবি নিয়ে তখন সে আমাকে কেন ছেড়ে যাবে। আমি ত ওর কোনও অযত্ন এ দু দিনে করি নি। কোনও অপরাধ শ্রীভগবানের চরণেও এর মধ্যে করি নেই। তবে কেন আমার এ কঠিন শাস্তির বিধান হবে? ডাক্তারবাবু কিন্তু এসে যা বললেন—তাতে আমার ফিলজফি বদ্‌লাতে হ'ল। মাতৃত্বের আস্বাদন পরম পিতা আমাকে এক-মুহূর্ত্তের জন্যও যে দিয়েছেন—এর জন্য আমাকে তাঁর কাছে কোটি কোটি প্রণিপাত জানাতে বললেন। কবে একটা কোথায় পড়েছিলাম, "It is better to have loved and lost, than never to have loved at all".—মনে প'ড়ে গেল। স্বামী মৃত শিশুকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিলেন—আমি আছড়ে পড়লাম সেইখানেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে। আমাকে ধ'রে ঘরে নিয়ে গেছে কখন জানি না। জ্ঞান হ'ল যখন খাটের ওপর শুয়ে আছি—মেয়েকে ওরা তখন কোন্ জলার ধারে কোথায় একাকী রেখে ফিরে এসেছে।

মনে বোধ হয় আমার আর প্রফুল্লতা কখনও আস্‌বে না নিজের যৌবনের স্বপ্নে কত সৌধ প্রাসাদ রচনা করে-ছিলাম—কোনটাই কি সফল হবে না! যখন কলেজে পড়তাম তখন আমার বই-খাতায় আমার নিজ রচিত 'মটো' লেখা থাকত,—

'স্বপন কেন স্বপন রবে, সফল কেন হবে না
আমার স্বপন করব সফল, ব্যর্থ হ'তে দেবো না।'

সহপাঠিনীরা তা দেখে বলত, "ইস্, তুই যে বিধিলিপির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিস!" আমার সত্যই মনে হত, ভাগ্য সকলের নিজের হাতে। সংসারের সুখ দুঃখ সকলের মনগড়া। আদর্শ জীবন আমি নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোল্‌বার সঙ্কল্প করেছিলাম। আর আজ কি অবস্থা আমার! মনের অবস্থা যখন এই রকম, তখন আমি এক দিন ট্রামে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে সকালে যেতে যেতে হেদোর কাছে একটা খুব বড় সাইন বোর্ড দেখে নেমে গেলাম। তাতে লেখা আছে—'প্রাচ্য-প্রতীচ্য জ্যোতিষ গবেষণা মন্দির'। 'মন্দিরে' একটি তক্তপোষ রয়েছে, সাদা চাদরে ঢাকা, তদুপরে অধিষ্ঠিত একটি দীর্ঘ শ্মশ্রু প্রৌঢ় ভদ্রলোক। একটা বড় কুলুঙ্গীতে কতকগুলি পুরান পাঁজী, কয়েকটা কোষ্ঠি ও খাতা এবং মেজের এককোণে একটা হান্ট্‌লি-পামারের বিস্কুটের বাক্সে কতকগুলি টিকে, একটা নেভিকাট সিগারেটের টিনে খানিকটা তামাক প'ড়ে রয়েছে। তক্তপোষের একধারে একজন যুবক—বোধ হয় নিজের ভাগ্য গণনা করতে এসেছিলেন—যাবার সময় দু-একটা কথা হবে এজন্য দাঁড়িয়ে আছেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটা খেলো হুঁকো মুখে দিয়ে ধূমপান করছিলেন, আমাকে ফুটপাতের ওপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান দেখে ডাকলেন। আমি ওপরে উঠ্‌তেই যুবক নেমে গেলেন। কিন্তু নেমেই ফুটপাথে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেলেন। সকলে 'হা হা' ক'রে উঠল—প্রৌঢ় জ্যোতিষী ভদ্রলোক

ব'লে উঠ্‌লেন—দেখ্‌লেন ত বললাম "পতনাৎ দুর্ঘটনাং চ", আর কেমন মিলে গেল। যুবক ধূলিধূসরিত হ'য়ে উঠ্‌লেন এবং ভক্তিভরে 'আজ্ঞে' ব'লে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ়ের আজ্ঞার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে আমি একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি—যুবক উৎপল। সে আমাকে আগেই চিনেছিল—আমি তাকে চিন্‌তে পেরেছি জেনে সে একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল—বিশেষ "পতনাৎ দুর্ঘটনা"র জন্য। "আমি তা হ'লে পরে আস্‌ব," এই কথা ব'লে সে খঞ্জপদে একটা রিক্‌সা ডেকে তাতে উঠে পড়ল—যাবার সময় একবার আমার দিকে তাকিয়ে যেতে ভোলে নি—আমিও যে সে সময় তাকে দেখলাম তাও সে লক্ষ্য করলে। সে চ'লে যাবার পর ফুটপাথে একটা সিঙ্গাপুরী কলার খোলা দলিত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে দেখলাম। সেটাই যে উৎপলের 'দুর্ঘটনা চ'-এর কারণ, তাও বুঝ্‌লাম। তবে জ্যোতিষী সেটা রাস্তায় দেখে উৎপলের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা মনে হবার কারণ হ'ল না—কারণ ওটা ওখানে প'ড়ে থাকা সত্ত্বেও ফুটপাথের অন্য কোনও লোকের 'দুর্ঘটনা চ' হ'তে দেখলাম না। যত লোকে এটা থেকে রক্ষা পায়, তত আমার জ্যোতিষীর উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। খানিকক্ষণ বাদে একজন বালক সেটা দেখে পায়ে ক'রে রাস্তার এক ধারে ফেলে দিল। আমি জ্যোতিষীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। তিনি ইতিমধ্যে আমার জন্ম সনের পাঁজী বের ক'রে আমার রাশি-চক্র প্রস্তুত করতে লেগে গেছেন। আমার জন্মদিন, সময় ও স্থান তাঁকে ব'লে দিয়েছিলাম—এগুলি আমার জানা ছিল—মায়ের কাছে শুনে লিখে রেখেছিলাম। তবে ভাগ্যবিচার কখনও হয় নি।

কোষ্ঠী প্রস্তুত হ'ল। জ্যোতিষী হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "সপ্তমে রবি, চন্দ্র, বুধ, শুক্র—আর মিথুন লগ্নে বৃহস্পতি—এর ফলে আপনার বিবাহিত জীবনের গতি সম্পূর্ণ আপনার হাতে; আপনি ইচ্ছে ক'রে অর্থাৎ স্বকৃত দোষে প্রলয়ের তুফান তুল্‌তেও পারেন, আবার শান্ত স্নিগ্ধ সমীরণে জীবন-নৌকা বেয়ে যেতেও পারেন—সব নির্ভর করছে আপনার নিজের অচঞ্চল চিত্তে ও স্থির বুদ্ধিতে কাজ করা না-করার উপর। মানসিক উদ্বেগকে আপনি আমল মোটেই দেবেন না। এই আমার আপনার প্রতি পরামর্শ। জীবনের বারো আনা কষ্ট আপনার মনগড়া রকমের—অর্থাৎ আপনি ভাবপ্রবণতা দিয়ে অনেক মিথ্যা কষ্টের সৃষ্টি করবেন।" মনে পড়ে গেল আমার কলেজের নোট বইয়ে লেখা মটোর কথা। জ্যোতিষী ব'লে যেতে লাগ্‌লেন, "স্বামী আপনার করতলগত হ'য়ে আপনার অত্যন্ত অনুগতও হ'তে পারেন—আবার আপনি স্বামী গৃহ হ'তে বিতাড়িতও হ'তে পারেন। লগ্নে বৃহস্পতির সঙ্গে মঙ্গলের যোগ হওয়ায় আপনার বিবাহিত জীবনে আরও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যাক্ আর কিছু আপনার জেনে কাজ নেই, বুঝ্‌বেন্ না ওসব। আপনার প্রতি আমার কেমন স্নেহের সঞ্চার হয়েছে—আপনাকে আমি দুটি কবচ দেবো—একটি 'রণপ্রতাপ কবচ' অপরটি 'দুর্জ্জয় কবচ'—মোট ব্যয় হবে আপনার একুশ টাকা তিন আনা। অন্য কাকেও এ-দুটি কবচ আমি বত্রিশ টাকার কমে দিই না। আপনার কাছে পারিশ্রমিক কিছু নেবো না। উপরন্তু আপনাকে একটি 'বিপুল-বৈভব' কবচ ফাউ দেবো।" আমি অনেকক্ষণ ওঁর কথায় মনোযোগ না দিয়ে ভাবছিলাম এই কি আমার বড় হওয়ার আকাঙ্খার পরিণতি—এই লক্ষ্য নিয়ে এতদিন কাজ ক'রে এসেছি? জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই করতে পারছিলাম না। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আপনার গণনা যে নির্ভুল হয়েছে তার প্রমাণ ত কিছু পেলাম না।" তিনি তখনি 'যুদ্ধং দেহি'ভাবে সোজা হ'য়ে ব'সে বললেন, "ভালকথা—আপনার জীবনের মোটামুটি অতীত ঘটনা সব ব'লে যাচ্ছি। এই ব'লে তিনি আমার সূতিকাগারের কোন দিকে দ্বার ছিল, বাড়ীর কোন্ দিকে নিমগাছ পুকুর গোশালা শিবমন্দির ছিল, তা রাশিচক্র দৃষ্টে সব ঠিক ব'লে দিলেন। এমন কি, গ্রামের কোন্ দিক দিয়ে নদী বয়ে গেছে—শিবমন্দিরে কবে চূণ ফেরান হয়েছে—সব যেন তিনি আমাদের গ্রামের 'সেট্‌লমেণ্ট সার্ভের' ম্যাপপ্রণেতা ছিলেন—এই রকম সড়গড়ভাবে ব'লে গেলেন। আমি বললাম, "আমার জীবনের অতীত ইতিহাস নানা ঘটনা পূর্ণ—আপনার বিচারে তার কিছু আভাস পান কি না দেখুন।" তিনি তখন আমাকে জেরা আরম্ভ করলেন, "অমুক সময়ে আপনার মন খুব বিক্ষোভিত হ'য়েছিল, না বিচলিত হ'য়েছিল?" আমার মনে প'ড়ে গেল এক হোমিওপ্যাথিক

ডাক্তার আমার একবার মাথাধরিকার চিকিৎসা ক'রতে এসে জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন, আমার মাথা 'বন্ বন্' ক'রছে, না 'টন্টন্' করছে? আমি বলেছিলাম, 'কোনটাই না'—তাতে তিনি আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বেশ, 'কন্-কন্' ক'রছে, না, 'ঝন্ঝন্' করছে?" আমি তাঁর জেরা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বলেছিলাম, "কন্কন্ করছে।" সেইরকম এক্ষেত্রেও বললাম, "হাঁ সে সময় মন খুব বিলোড়িত হয়েছিল"। তাতে তিনি খুব উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, "ঠিক হ'য়েছে - রবির ওপর দিয়ে গোচরে বাণীর অতিক্রমণ, এ না মিলে যায় না।" আমি তাঁকে প্রণামী দুটি টাকা দিয়ে উঠে গেলাম। ব'লে গেলাম "কবচগুলির কথা ভেবে দেখ্‌বো।" ভাবলাম তিনি আবার "পতনাৎ দুর্ঘটনা চ" নজিরের পুনরুল্লেখ করেন বুঝি। তা তিনি না ক'রে নিজের মনে পুঁথিপত্র বাঁধতে লাগলেন। আমি সেই অবসরে পলায়ন করলাম।

জ্যোতিষীর কথায় মন আরও ভেঙ্গে গেল। আমার ক্ষত মন বিক্ষত হ'য়েই রইল। স্বামীর কাছে কিছু বললাম না। তিনি আমার মনের অবস্থা দেখে ভাবলেন, আমার দেহ ও মন এখনও সেরে ওঠে নি। চেঞ্জে যাবার কথা ভাবছিলেন। এমন সময় তাঁর বড় ভাই ছুটি নিয়ে কলকতায় এলেন। তাঁর স্ত্রী ও একটি মাত্র মেয়ে তাঁর সঙ্গেই এলেন। মেয়েটি তার পিতার কর্ম্মস্থলে স্কুলে ম্যাট্রিক্ ক্লাশে পড়ে। আমার সঙ্গে সহজেই তার বেশ ভাব হ'য়ে গেল। আমার জা আমাকে বেশ স্নেহের চক্ষে দেখতে পারলেন না। তাঁর দেবরের স্বগোত্রে বিবাহের জন্য আমাকেই দায়ী ভেবে মনে মনে দোষী সাব্যস্ত ক'রে আমাকে একটু এড়িয়ে চলতেন। একদিন আমার ভাশুর আমার স্বামীর সঙ্গে এবিষয় আলোচনা করছিলেন শুনতে পেলাম। আমি পাশের ঘরে ছিলাম। তিনি স্বামীকে একটু তিরস্কার ছলে এজন্য অনুযোগ ক'রে যা বলছেন, স্বামী তার কোনও জোরাল যুক্তিপূর্ণ উত্তর না দিয়ে অনেকটা লজ্জিত এমন ভাব দেখাচ্ছেন। একটা কথা শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, "এখন কি করা যায়? এখন ত আর কোনও উপায় নেই। আর আমার শোন্বার ধৈর্য্য থাক্‌ল না—আমি সেখান থেকে সরে গেলাম। আমাকে এই দশায় এনে এখন আমাকে একটা বোঝা মনে করছেন তিনি, একথা ভেবে আমার কি রকম মনের অবস্থা হ'ল তা বর্ণনাতীত। ভাশুর তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে কয়েকদিন পরে চ'লে গেলেন। আমি গুরুভার পাথরের চাপ বুকে ব'য়ে বেড়াতে লাগ্‌লাম। স্বামী নির্ব্বিকারভাবে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের পড়া নিয়ে দিন কাটান—আমার দিন যেন আর কাটে না। নিজের দুঃখের কথা কাকেও ব'লে হাল্‌কা হ'তে পার্‌ছি না। সহপাঠিনী কলেজের মেয়েরা পাশ ক'রে বেরিয়ে গেছে—কারও বিয়ে হ'য়ে গেছে, কেউ বিদেশ গেছে—কেউ নিজেদের দেশে। আমার কাছে বড় একটা আর কেউ আসে না। বহু চেষ্টায়ও শেফালির সংবাদ পাই নি। ইদানীং স্বামী মধ্যে মধ্যে আমি মনমরা হ'য়ে থাক্‌লে একটু বিরক্ত ভাব দেখাতেন। একদিন বললেন, "এতদিন বিয়ে হ'ল, একদিনও তোমার মুখে হাসি দেখ্‌লাম না—এ ত ভাল লাগে না।" আমি কিন্তু জবাব না দেওয়ায় তিনি ব'ললেন "যদি তোমার জীবনে বিবাহটা ভুল ব'লে মনে হ'য়ে থাকে তবে সেটাও বল—তোমাকে মুক্তি দিতে পারি আমি।" আমি কিছু না ব'লে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় প'ড়ে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রতে লাগ্‌লাম। কত আকাশ-পাতাল চিন্তা ঠেলে আস্‌তে লাগ্‌ল। কেউ একটা লোক নেই যে আমার অন্তরের আঘাত অন্তর দিয়ে অনুভব করে। মাকে স্বপ্ন দেখ্‌লাম—সেদিন রাত্রে। তিনি যেন বললেন, "বেলা, স্বামীর ক্রোড়ই তোমার চিরকালের আশ্রয়।"

মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে আমি নিজের মন বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম। স্বামী বললেন, "ক'দিন তোমাকে একটু সুস্থ দেখাচ্ছে—এবারে চল একটু বেড়িয়ে আসি।" মায়ের অসুখের সময় হাজারীবাগ যাবার কথা হ'য়েছিল—এবার পূজার ছুটিতে সেই হাজারীবাগই আমরা গেলাম। সেখানকার জলবাতাসে আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হ'ল। আমার সহপাঠিনী অলকার সঙ্গে হাজারীবাগে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। তার সেখানকার একজন বড় ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। অলকার সঙ্গে ক'দিন খুব হল্লা ক'রে কাটল। প্রত্যহ আমরা দল বেঁধে ঝিলের পাড়ে বৈকালে বেড়াতে যেতাম। মনের স্ফুর্ত্তিতে আমার শরীরের দ্বিগুণ উন্নতি হ'ল। অলকার স্বামীর মোটরে আমরা একদিন ক্যানারি হিল দেখ্‌তে গেলাম! সেখানে

সমস্ত দিন ছিলাম। অলকা নিজে রাঁধলে এবং আমার স্বামী ওরফে তার মাষ্টার-মশায়কে খাওয়ালে। অলকার একটি মেয়ে হয়েছে। আমি তাকে কোলে ক'রে সমস্ত দিন কাটালাম—মেয়ের বাহক নেপালী 'বয়' তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়ে হাতে ছড়ি নিয়ে চারিদিকে খবরদারি ক'রে বেড়াচ্ছিল। স্বামী আমায় মেয়ে নিয়ে বেড়াতে দেখে মধ্যে মধ্যে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। আমি কেমন একটু লজ্জিত বোধ করছিলাম—হাজার হোক, অলকার পাশে দাঁড়িয়ে উনি যে আমার মাষ্টার মশায় সেটা যেন একটু বেশী বেশী মনে হচ্ছিল।

হাজারীবাগ থেকে ফিরে এসে কটামাস বেশ কেটে গেল। একদিন স্বামী বললেন, "তুমি এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ—তোমার এখন এমন অবস্থা—কে বা শরীরের প্রতি যত্ন নিতে বলে—তা ছাড়া প্রথম বারে এমন দুর্ঘটনা হয়ে গেল—কেউ দেখ্‌বার লোক নেই, তুমি অলকার কাছে হাজারীবাগে দিনকতক গিয়ে বেড়িয়ে এস।" আমি একটু সরম জড়িত লাজের ভাব দেখিয়ে অন্য কথা পাড়লাম। স্বামী বুঝ্‌তে পেরে ক্ষান্ত হলেন।

দিনকতক পরে একদিন স্বামীর রাত্রে বাড়ী ফির্‌তে দেরী হ'ল। আমি 'ভারতবর্ষ' পড়ছিলাম। যখন স্বামী ঘরে ঢুক্‌লেন, একটা উগ্র গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে গেল। আমার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল। কিছু না বলে আমি অর্দ্ধপঠিত গল্পটি প'ড়ে যেতে লাগ্‌লাম। স্বামী কিছু না ব'লে জামা খুলে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগ্‌লেন। একটু পরে বাথরুমে ঢুক্‌লেন এবং অনেকক্ষণ ধ'রে কুল্‌কুচো ক'রে আমার ঘরে ঢুক্‌লেন। তারপর আমার ওপর গরম মেজাজে চড়া চড়া কথা কইতে লাগ্‌লেন। আমার মন হু হু ক'রে উঠ্‌ল। যাহোক, চড়া কথার সোজা উত্তর আমি এড়িয়ে গেলাম এবং আহারাদি শেষ ক'রে শুয়ে পড়লাম।

তারপর দু'-চারদিন বেশ কেটে গেল। আমি ভাব্‌লাম, আমার হয় ত ভুল হয়েছিল। কিন্তু স্বামী তারপর একদিন রাত্রে যে অবস্থায় বাড়ী ফির্‌লেন—তাতে আমার আর কিছু জান্‌তে বাকী রইল না। ঘরে ঢুকেই তিনি খাটে শুয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ বিছানায় বমি ক'রে ফেল্‌লেন। সমস্ত পরণের কাপড় ও বিছানায় মদের গন্ধে ভ'রে গেল। আমি ভয়ে, দুঃখে ও অনুশোচনায় কাঠ হ'য়ে গেলাম। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও অহমিকা আমার চূর্ণ হ'য়ে গেল—আমি অশ্রু সম্বরণ ক'রতে পারলাম না। স্বামীর অর্দ্ধচেতন অবস্থা। বহুকষ্টে তাঁর পরণের জামা-কাপড় ও বিছানা প্রভৃতি পরিষ্কার ক'রে তাঁকে খেতে দিলাম। তিনি খাটে শোবার পর নিজে মেঝেয় শুয়ে রইলাম। কিছু খাবার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। শুয়ে শুয়ে আমি অধীর হ'য়ে নিজের ভাগ্যের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, আর অবাধ অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগ্‌লাম। মনে প'ড়ে গেল জ্যোতিষীর কথা, "আপনার বিবাহিত জীবনের গতি সম্পূর্ণ আপনার হাতে"। আমি ভেবে পাই না, এতবড় ঝঞ্ঝার মুখে আমার জীবন-নৌকার গতি সম্পূর্ণ আমার হাতে কি ক'রে হ'তে পারে। কখন নিদ্রা এসে আমার ভাবনা শেষ ক'রে দিয়েছিল—মনে নেই। রাত্রে শেফালিকে স্বপ্ন দেখ্‌লাম। সে যেন আমাকে চিন্‌তে পারছে না তাকে আমি ছুটে জড়িয়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু সে যেন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মদমত্ত-ভাবে চ'লে গেল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শেফালির কল্পিত ব্যবহারে আমি যুগপৎ আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হলাম। আবার ভাব্‌না আরম্ভ হ'ল। মনে হ'ল; আমার এ দুঃখের কথা শেফালি ছাড়া আর কাকেও এ জগতে জানিয়ে শান্তি পাব না। খবরের কাগজে বক্স নম্বর দিয়ে ওর সন্ধান জান্‌বার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা মনে হ'ল। পরদিন প্রাতে উঠে সমস্ত বড় বড় ইংরেজী ও বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিলাম।

স্বামী প্রাতে বেশ প্রকৃতিস্থ হ'য়ে উঠেছেন। তিনি চায়ের টেবিলে আমাকে বসতে না দেখে ডেকে পাঠালেন। আমি শরীর ভাল নেই ব'লে অন্য দিকে চলে গেলাম। কলেজ যাবার আগে তিনি স্নানান্তে আহারে বসলেন—এ সময়ও আমি তাঁর সঙ্গে আহারে যোগ দিলাম না। তিনি ডাকলেন। আমি বললাম, "আমি পরে খাব।" তিনি বোধ হয় বুঝ্‌তে পারলেন, আমার ব্যথা কোথায় এবং তার কারণ কি। তাই তিনি হঠাৎ চটে উঠ্‌লেন এবং অকথ্য ভাষায় রূঢ়-ভাবে আমাদের যা-তা ব'লে গেলেন। আমার কল্পনার প্রাসাদ নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। আমি কঠিন প্রতিজ্ঞা

ক'রলাম। স্বামী ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার গায়ে। আমি এমন অপমানিত বোধ জীবনে কখনও করি নি। স্বামী হাতমুখ ধুয়ে এসে তারপর আমাকে যে সব কথা বলতে লাগ্‌লেন, তাতে এতদূর আত্মশ্লাঘা আমার হ'ল যে আত্মহত্যা ক'রতে হয় তাও স্বীকার, তথাপি ওঁর ত্রিসীমানার মধ্যে থাক্‌ব না—ব'লে দিলাম। স্বামী তাতে আরও রুখে উঠ্‌লেন। আমি তখন নিজের ঘর থেকে গহনার বাক্স ও নিজের পরিধেয় কাপড়-চোপড়ের একটা স্যুটকেস্ নিয়ে স্বামীর সাম্‌নে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। অভিমানে, দুঃখে ও অপমানে আমার অশ্রু তখন শুকিয়ে গেছে। অভুক্ত অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে এমনভাবে গৃহ থেকে চ'লে যেতে হ'চ্ছে দেখে স্বামী বোধ হয় নিজের উক্তিগুলির কটুত্ব বুঝতে পারলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অতি নিরীহ ভদ্রলোকের মতন—"কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে জান্‌তে পারি কি?" আমি কোনও কথার জবাব না দিয়ে চ'লে এলাম। একবার পেছনে তাকাবার মতনও ক্ষমতা তখন আমার ছিল না।

কয়েক দিন মধ্যে স্বামীর সহিত আমার বিবাহবন্ধন বিধিমতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল।

৫

নিজের জিনিষপত্র নিয়ে আমি একটা হোটেলে উঠেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, একটা চাকরী জুটিয়ে নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করব। রোজ মেয়ে স্কুল ও প্রাইভেট কলেজগুলিতে একবার ক'রে যাই—শিক্ষয়িত্রী, লাইব্রেরিয়ান, কেরাণীগিরি প্রভৃতি চাকরীর খোঁজ করতে। হাওড়া স্টেশনের 'ফিমেল বুকিং ক্লার্কের' একটা চাকরী একজন লোক ক'রে দেবে ব'লে আশা দিলেন। তিনি আমার হোটেলেই থাকেন। তাঁর ঘরে একজন স্ত্রীলোকও থাকেন—সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। স্ত্রীলোকটি বলেছিলেন ভদ্রলোক তাঁর দাদা। ভদ্রলোকটি কথার-ছলে একদিন আমাকে বললেন, স্ত্রীলোকটি ওঁর কেউ হন না—"তবে সাম্‌নের অগ্রহায়ণ মাস থেকে হবেন"। হঠাৎ একদিন দেখ্‌লাম ওঁরা দু'জনে হোটেল ছেড়ে চ'লে গেছেন—আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিলেন—সেটা ফেরত না দিয়েই। ম্যানেজার একদিন তাকে ধ'রে নিয়ে এলেন অফিস ঘরে এবং 'আরে হতভাগা দাঁতের ডাক্তার না ঠগ' ইত্যাদি সুবচন শুনিয়ে দিলেন। আমার টাকা কিন্তু আদায় হ'ল না। বুকিং ক্লার্কের চাকরীর আশায় এতদিন ব'সে থাকায় আমার কত অর্থদণ্ড হ'য়ে গেল।

ক'দিন পরে। বেশী দিন ব'সে থাক্‌লে আমার নগদ পয়সা সব শেষ হ'য়ে যাবে—তখন উপায় কি হবে ভাবছি, এমন সময় 'ইসাবেলা থবার্ণ কলেজ' লক্ষ্ণৌ থেকে সেখানকার 'লাইব্রেরিয়ানের' পদের নিয়োগপত্র ডাকে পেলাম। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলাল। সেইদিনই সামান্য কিছু মার্কেটিং ক'রে লক্ষ্ণৌ রওয়ানা হবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বৈকালে একবার দোকানে গেছি—একটা জিনিষ বদ্‌লাতে। হোটেলে ফিরে এসে দেখি আমার ঘর থেকে ইতিমধ্যে যথাসর্ব্বস্ব চুরি হ'য়ে গেছে। অন্য চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকে গহনা, টাকাকড়ি, নূতন কেনা খুচরা জিনিষ সমস্ত নিয়ে কে স'রে পড়েছে; আবার তালা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে গেছে। অবস্থা উপলব্ধি হওয়া মাত্র আমি মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলাম। একটু পরে উঠে বসলাম। হোটেলের টাকা মিটিয়ে দেবার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গতি নেই। পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা আমার—আর ভাববার কোনও সূত্র পেলাম না। ভাগ্যের উপর একটা প্রতিশোধ নেবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ল। হ্যাণ্ডব্যাগে কয়েক আনা পয়সা ছিল মাত্র—তাই নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে গঙ্গার ঘাটে গেলাম। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে—কৃষ্ণপক্ষের আকাশ। ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। তীরে সিঁড়ির অপর প্রান্তে একজন ব'সে আছে আধ-অন্ধকারে দেখ্‌তে পেলাম। সে নিজের মনে গান গাইছিল। আমাকে বোধ হয় সে লক্ষ্য করেছিল—আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম—হঠাৎ তার গান বন্ধ হয়ে গেল। আবার একটু পরে সে গাইতে লাগল—

"তুমি অনন্ত, চির বসন্ত, বাঞ্ছিত আমার হে
তুমি শরতের শশী, সরসে সরসী, শুভ্র জ্যোৎস্না যে
তুমি জলধি অতল, হও হিমাচল, পুষ্পিত-তরুদল
তুমি কুলু কুলু নাদে, বহ ধরা পরে, হও তুমি নদীজল
তুমি বিহগের তান, ভ্রমর গুঞ্জন, তুমিই কাকলি রব।"

আমি শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গান শুন্‌ছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল আর না, ফের যেন বাঁচতে সাধ হ'চ্ছে। সৃষ্টি-কর্ত্তাকে এত মধুরভাবে আপ্যায়নে আমার বোধ হয় অসোয়াস্তি লাগ্‌ছিল। আমি জলে লাফিয়ে পড়লাম। 'ঝুপাং' করে একটা শব্দ হ'তেই তীরস্থ গায়ক তীরবেগে জলে লাফিয়ে পড়ল। সে বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করছিল। এক সেকেণ্ডও বোধ হয় তার দেরী হয় নি। যেখানটায় লাফিয়ে পড়েছিলাম—গর্ত্ত অনেকটা ছিল—আমি সেখানটায় ডুবে ঝট্‌পট্‌ করছি—এমত অবস্থায় সে আমাকে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় তুলে এনে সিঁড়ির ওপর শোয়াল। কিয়ৎক্ষণ বাদে আমার হাত পা ঘষাঘষি ক'রে সে আমার পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার করলে। ততক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে—আমি চোখ মেলে দেখ্‌লাম, আমার মুখে চাঁদের আলো পড়েছে এবং সে আমার মুখের দিকে পলকহারা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি, যে আমাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছে—সে উৎপল। আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। সে আমাকে চিনেছে—স্পষ্ট বুঝ্‌লাম। নির্জ্জন গঙ্গাতীরে আলুথালুবেশে সিক্ত বসনে আমি শুয়ে র'য়েছি—ওপরে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ—আমার পাশে ব'সে উৎপল—কত বাল্যস্মৃতি আমার মনে ফিরে এল—আমার বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ল—আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ব'য়ে গেল। উৎপল আমার বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থা দেখে কথা বলল। আমি কোন্‌ দুঃখে আত্মহত্যার মত মহাপাপ করতে জলে ডুবেছিলাম সে জিজ্ঞাসা করল। তাকে যেন আমি কোনও লজ্জা না করি। তার বোন নেই—আমি তার বোন হলাম। ভাগ্যে সুইমিং ক্লাবের ভলান্টিয়ার-ডিউটির পালা আজ তার ছিল—ভাগ্যে সে এদিকটায় এখন গঙ্গাবক্ষে পেট্রোল ডিউটিতে এসেছিল—তা না হ'লে কত বড় বিপদ আজ হ'য়ে যেত—ইত্যাদি কত কথা সে বলল। আমি কোনও কথার জবাব না দিয়ে অশ্রু-বিসর্জ্জন করতে লাগ্‌লাম। কি অনুশোচনা, কি আত্ম-নিগ্রহ। শেষ পর্য্যন্ত উৎপলের কাছে এ অবস্থায় আমি আজ ধরা প'ড়ে গেলাম! আমার পুনরায় মরতে ইচ্ছা হ'ল। আমি তাকে বললাম, "কেন আপনি আমাকে তুল্‌লেন, আমার জগতে কোথাও আজ স্থান নেই"—এই ব'লে আমি অঝোর কাঁদতে লাগলাম। উৎপল বড় মুস্কিলে পড়ল, এমন ভাব দেখাল—কারণ আমায় একা ফেলে রেখে লোক বা গাড়ী ডাকতে যেতেও তার সাহস হয় না—পাছে ফিরে এসে আমাকে সেখানে আর দেখ্‌তে না পায়—আমাকে তুলে নিয়ে যেতেও খুব সঙ্কোচ বোধ করছে। আমি তার অবস্থার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে নিজের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাব্‌ছি। ট্যাঁকে শেষ সম্বল কয়েক আনা পয়সা ছিল ও চাবি ছিল—জলের স্রোতে এতক্ষণ কোথায় ভেসে গেছে জানি না। এইভাবে কেটে গেল—উৎপল বিমূঢ় হ'য়ে তার কর্ত্তব্য চিন্তা করছে। আমি পেটে একটা ব্যথা বোধ করলাম। ব্যথাটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে গেল। কি জানি কেন উৎপলকে বললাম, "আমাকে একটা প্রসূতি হাসপাতালে রেখে আস্‌তে পারেন? আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে।" উৎপলের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস প'ড়ে গেল। সাম্‌লে নিয়ে সে বললে, "আপনাকে ফেলে রেখে যেতে আমার সাহস হ'চ্ছে না—একটু এগিয়ে না গেলে কোনও গাড়ী ত পাব না।" আমি তার ভয়ের কারণ অনুমান ক'রে বললাম, "আমার নড়বার শক্তি নেই—আপনি নির্ভয়ে একটা গাড়ী ডেকে আনুন।" একটু পরেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে উৎপল এল। আমাকে যতদূর সমীহ ক'রে পারল—ট্যাক্সিতে তুলে শুইয়ে দিলে। ট্যাক্সি কয়েক মিনিট পরেই মেডিকাল কলেজের ইডেন্‌ হস্‌পিটালের সাম্‌নে দাঁড়াল। উৎপলের এক বন্ধু ডাক্তারের সাহায্যে আমি একটা বেড্‌ সহজেই পেলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে শেষ রাত্রে আমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলাম। উৎপল তার ভগ্নী ব'লে আমার পরিচয় লিখিয়ে গেছ্‌ল—তার বন্ধু ডাক্তারের সাহায্যে হাসপাতালে যতদূর সম্ভব সুবিধা হ'য়েছিল। ভোরে এসে উৎপল সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল। বেলা এগারটার সময় আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেল। সন্ধ্যায় আবার এল—'কাকে খবর দিতে হবে' আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, সেজন্য সে চুপ ক'রে গেল। কিন্তু একটু আশ্চর্য্য হ'ল—এমন মনে হ'ল। হবারই কথা। আমার একটু লজ্জাও হ'ল—ওর সবিস্ময় জিজ্ঞাসু ভাব দেখে। যে ক'দিন হাসপাতালে আছি—সে ক'দিন কেটে যাবে—তার পর নবজাত শিশুকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব—এই ভেবে আমি কোনও কূল পাই না। উৎপল দুবেলা রোজ আসে, কেমন আছি খবর নিয়ে যায়—ডাক্তার-বন্ধুকে আমার সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনুরোধ করে—বাস্‌। হাসপাতালে আমি ভর্ত্তি হবার দিন দুই পরে একজন অল্পবয়স্কা মেয়ে আমার পাশের বেডে ভর্ত্তি হ'ল। সে একটি সুন্দরী কন্যা প্রসব ক'রেই অজ্ঞান হ'য়ে গেছল—দিন

দুই তার মেয়েটিকে আমি বুকে ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। উৎপলের বন্ধু হাসপাতালের ডাক্তার ব'লে নার্স্‌রা আমাকে বেশ যত্ন করত এবং সেজন্য আমার অনুরোধে নবজাতা মেয়েটিকে তার মায়ের অজ্ঞান অবস্থায় আমার কোলে তুলে দিয়েছিল। তার মা জ্ঞান হ'য়ে মেয়ে ফিরে নিলে—কিন্তু আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হ'য়ে গেল। আমাকে দিদি বলে—রোজ বিকেলে চুল আঁচড়ে দেয়—কিন্তু আমার বিরস মুখ দেখে কি যেন ভাবতে থাকে—কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারে না। একদিন তাকে আমি নিজের জীবন কাহিনী সব বললাম। মেয়েটি শুনে ত প্রথমে কেঁদেই খুন হ'ল। তারপর বল্‌লে, "দিদি তোমাকে আমি ছাড়ব না। তুমি আমার মেয়ের মা, তুমি আমার দিদি হ'য়ে থাক্‌বে। আমি চট্‌ ক'রে কিছু স্থির ক'রতে পারলাম না। মনটা একটু হাল্কা হ'ল বটে, কিন্তু উপায় বিশেষ কিছু হ'ল ব'লে মনে হ'ল না। উৎপলের কাছে নিজের জীবনকাহিনী তখন বললাম এবং এও বল্‌লাম পঞ্চাশটি টাকা আমাকে যদি সে ধার দেয় তা হ'লে আমি হোটেলের দেনাটা শোধ ক'রে আরও কিছু দিন চেষ্টা ক'রে একটা কাজকর্ম্ম দেখে নিই। সে আনন্দের সঙ্গে রাজী হ'ল। সে নিজেও একটা মেসে থাকে—এজন্য এর চেয়ে বেশী কিছু করতে সে ইচ্ছা থাক্‌লেও করতে পারত না। মেয়েটির এ সিদ্ধান্ত বেশ মনঃপূত হ'ল না। সে বল্‌লে, তার মেয়ের ওপর আমার কোনও মায়া জন্মে নাই—তা না হ'লে আমি তাকে এমন পর ভাবতাম না ইত্যাদি। আমি তার মেয়ের মুখে অজস্র চুম্বন ঢেলে দিয়ে তাকে দুঃখ করতে মানা করলাম। তার বাড়ী আমি মধ্যে মধ্যে যাব—এই অঙ্গীকার ক'রে উভয়ে একসঙ্গে হাসপাতাল থেকে বেরোলাম। উৎপল আমার হোটেলের দেনাটা মিটিয়ে দিয়ে এসেছিল এবং সেখান থেকে আমার সামান্য জিনিষ যা ছিল তা নিয়ে এসেছিল—আমি তার মেসের কাছে আর একটা হোটেলে গিয়ে উঠ্‌লাম। সামান্য কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিষ কিন্‌লাম এবং সেখানে নূতন সংসার পাড়লাম। লক্ষ্ণৌ থেকে একটা পত্র এসে পড়েছিল—উৎপল হোটেল থেকে নিয়ে এসেছিল—তারা লিখেছিল, আমার বিলম্ব দেখে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ অন্য মেয়েকে লাইব্রেরীয়ান্‌ নিযুক্ত করেছেন, অতএব আমি যেন চট্‌ ক'রে আর লক্ষ্ণৌ না যাই।

ক্রমশঃ

অবারিত দ্বার

শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়

পাঞ্জাবী শিখ মালব বণিক পারসীক চীনাগণ
গুজরাটী যোধ জয় ভোজপুরী বেহারীও অগণন,
ইরানী, তুরানী নেপালী জাপানী ভূটান কচ্ছবাসী
বাংলার দ্বারে কাতারে কাতারে সবে মিলিয়াছে আসি।
কাবুলী, আসামী আর্‌বি বর্‌মি মগ্‌ যাহাদের কয়,
আরও কত জাতি নানা ছল পাতি নিজ দেশে ধন বয়
আমরা বাঙ্গালী উদার হৃদয় অতিথির পূজা জানি
দৈন্যের বোঝা বহি সবে গাহি বিরামের জয়বাণী।
ক্ষুধিতে অন্ন বিলায়ে ধন্য অন্নদারূপা মরি—
সে নারী-মহিমা সূপকার বেশে উৎকলী নিল হরি,
ভার বহে দেয় তৃষ্ণায় বারি 'ফরাস' পিওন্‌ মালী—
উদ্যান রচি ফলমূল বেচি ভরিছে শূন্য থালি—
রাজার 'সেপাই' বাঙ্গালী না পাই ক্ষৌর রঙ্গকার,
খেয়া মাঝি মুটে, রেলে একচেটে বাঙ্গালী না মিলে আর
আমরা ততই যাই পশ্চাতে, তারা যত যায় আগে—
কমলার কৃপা তাহারাই লভে দৈন্য মোদের ভাগে।
'ভূতো' 'রামা' আদি মহাজন মুদী অনাদরে হত মান
দূর পল্লীতে অবাঙ্গালী যত করিতেছে অভিযান।
সব অলিগলি গৃহপ্রাঙ্গণ কাবুলীরা ফিরে ঘুরি,
দৈন্যকাতর বঙ্গের বুকে হানে কুসীদের ছুরি।

চীনারা লয়েছে বিনামা বিপণি দারু শিল্পের ভার—
ইন্দিরা মায়ে বন্দিনী করি রাখিয়াছে মাড়োয়ার
বিশাল সৌধ মঞ্জু কুঞ্জ রমণীয় নিকেতন
রচি সুখ যত শ্রমসঞ্জাত ভুঞ্জয়ে অগণন,
পঞ্চ নদের কত শূর আজি মোটর চালকরূপে—
বঙ্গের ধনভাণ্ডারে ভাগ বসাতেছে চুপে চুপে
লেখনী গরবে দাস্যবৃত্তি বঙ্গের শেষ পুঁজি—
আয়ার আচারী চেটি পিলে মিলি তাও আজি হরে বুঝি
হিসাব-নবিশ কাজের হদিশ মোরা কিছু নাহি রাখি—
সব ছাড়ি আছি অতীত আঁকড়ি আলস আবেশ আঁখি
পরানুকরণ বিলাসব্যসন ক্ষীর ত্যজি নীর পান
জাতির মজ্জা অস্থি শোণিতে ত্রিদোষ পেয়েছে স্থান
উদ্যমে ত্যজি দৈবে নিয়ত দিই পূজা আদি ভাগ
সদ্য ফলদ ভেষজে ভুলিয়া হলাহলে অনুরাগ
যাপি অনশনে পীড়ার পীড়নে চিন্তাকাতর মুখ—
দৈবের যোগ দুর্গতি ভোগ ভাবি মনে পাই সুখ।
এ যুগ তীব্র প্রতিযোগিতার—যোগ্যতম যে জয়ী—
অবসাদ মোহ না ত্যজিলে ত্বরা অদূরে ধ্বংস ওই
জগৎ জুড়িয়া জীবিকার লাগি চলেছে বিপুল দ্বন্দ্ব
পিচ্ছিল পথ—চলিতেই হবে ছাড়ি সব বাধা বন্ধ।

সর্প

প্রবন্ধ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

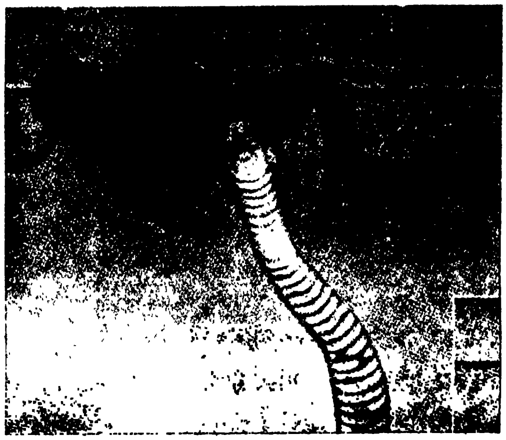
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চার্লস ডারউইনের প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশতত্ত্ব বর্ত্তমানে সংশোধিত আকার ধারণ করিলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার আবিষ্কারের ফলেই আজ প্রাকৃতিক ঐতিহাসিকদের কার্য্যপদ্ধতি সহজতর হইয়া উঠিয়াছে। ডারউইনের পূর্ব্বে সমস্ত প্রাণীজগতকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে চিন্তা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। সমগ্র প্রাণী যে, এক ক্ষুদ্রতম অংশ এবং নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে উদ্ভূত হইয়াছে এ মাত্র অনুমান করা ছাড়া সমগ্র প্রাণীজগতকে অখণ্ডভাবে গণ্য করা সে সময় খুবই শক্ত ছিল। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদগণ বলেন, উভচর এবং সম্পূর্ণ স্থলচর জীবের মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তা সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যমান। সরীসৃপ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। আমাদের আলোচ্য সর্প-



গোখুরা

জাতি তাদের মধ্যে অন্যতম। গবেষণার ফলে জানা যায় সমগ্র সর্পজাতির মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ শ্রেণীর সর্প সম্পূর্ণ নিরীহ; অবশিষ্ট ভীষণ প্রকৃতি সর্পের মধ্যে দশভাগের নয়-ভাগ সর্প যুদ্ধ করা অপেক্ষা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাই শ্রেয়ঃ মনে করে, ফলে ভীষণ প্রকৃতির সর্প যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার সংখ্যা খুবই অল্প। সর্পজাতির এরূপ একটি সংখ্যালঘিষ্টদল হিংস্র হওয়ায় সমগ্র সর্পজাতি মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে আসছে।

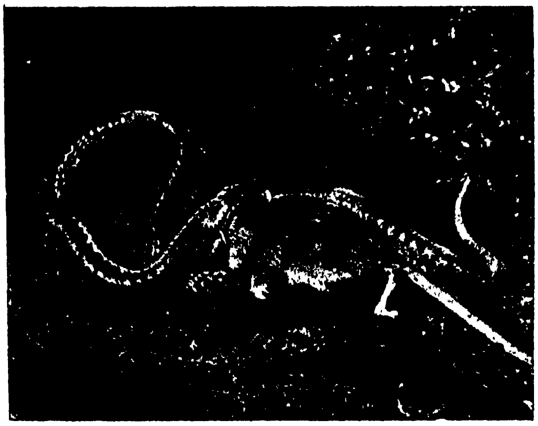
সর্পের দেহ লম্বাকৃতি ও গোল, লেজের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হ'য়ে এসেছে; সেই জন্যই অন্ধকার রাত্রিতে আমাদের রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। সর্পের মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে অসংখ্য অস্থিপঞ্জর; বক্ষঃদেশে কোন অস্থি না থাকায় অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় দুই পার্শ্বের পঞ্জরগুলি বক্ষঃদেশের অস্থির সহিত সংলগ্ন নয়। এদের দেহ ছোট বড় আঁইস দ্বারা আবৃত। দেহের নিম্নদেশের আঁইশগুলি বেশ চওড়া ও পুরু। বিভিন্ন জাতি অনুযায়ী সর্পের আঁইশও বিভিন্ন। নির্ব্বিষ ও বিষধর



ঘোসো সর্পের ভেক শীকার

সর্পের আঁইশের মধ্যেও আবার প্রভেদ আছে। বক্ষঃদেশের আঁইশের উপর ভর দিয়াই সর্প মাটির উপর আঁকাবাঁকাভাবে হাঁটিয়া চলে—ইহারা সোজা অর্থাৎ লম্বাভাবে এবং মসৃণ পদার্থের উপর হাঁটিতে পারেনা।

আঁইসগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকায় এবং ইহাদের বর্ণও বিভিন্ন হওয়ায় সর্পের দেহে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা লক্ষিত হয়। সর্পের দেহের উপরিভাগ এক পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে—চলতি কথায় ইহাকে 'খোলস' বলে। সময়ে সময়ে ইহারা পুরাতন আবরণ ত্যাগ করিয়া নূতন আবরণ গ্রহণ করে। পরিত্যক্ত খোলসে সর্পের শরীরের প্রত্যেক অংশের চিহ্নগুলি পর্য্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। বিভিন্ন জাতি অনুযায়ী সর্পের মস্তকের আকৃতিও ভিন্ন হয়। সর্পের



সর্পের ইন্দুর ভক্ষণ

মুখমণ্ডল দেখিতে ছোট হইলেও মুখগহ্বর বেশ বড়। আমাদের দুই চোয়াল যেমন কানের সন্নিকটে যুক্ত, ইহাদের সেইরূপ নহে বলিয়াই অনায়াসে মুখগহ্বর বৃহৎ আকার ধারণ করে; সেই জন্য বড় শিকারও গলাধঃকরণ করিতে ইহাদের বিশেষ কষ্ট করিতে হয়না। সর্পদন্ত মুখের ভিতরের দিকে বাঁকান; সাধারণ সর্পের পাঁচ ছয় সারি দাঁত থাকে। শিকারকে ধরা ছাড়া ইহাদের আর কোন কার্য্য নাই। শিকারের শরীরে দাঁতগুলি এরূপভাবে আটকাইয়া যায় যে শিকার পলায়নে সক্ষম হয়না। বিষধর সর্পের সমস্ত দাঁত-গুলিই বিষপ্রয়োগ করে না; উহাদের উপরিভাগের চোয়ালের সম্মুখে দুইটী বিষ দাঁত থাকে। দাঁত দুইটির আকারও বড়। সর্পের মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটী উজ্জ্বল চক্ষু আছে, কিন্তু তাহাতে পাতা না থাকায় ইহারা পলক ফেলিতে সক্ষম হয়না। চক্ষুর পাতা যুক্ত ও আলোকসঞ্চারী। শ্রবণের নিমিত্ত সর্পের কর্ণ নাই। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য ইহারা জিহ্বা দ্বারা সম্পন্ন করে। জিহ্বা সরু এবং অগ্রভাগ দুইভাগে বিভক্ত। এক ছিদ্র পথ হইতে জিহ্বাটিকে সর্ব্বদাই বহির্মুখে চালনা করে। ইহারা সকলের গতিবিধি লক্ষ্য রাখে। সর্পের ফুসফুস অনেকখানি বাতাস একসঙ্গে গ্রহণ করতে সক্ষম। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের সর্ব্বশরীর যে বায়ু চলাচলে স্পন্দিত হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রক্ত চলাচল প্রণালী ইহাদের ভিন্নরূপ হওয়ায় শরীর বরফের ন্যায় শীতল।

সর্প অণ্ডজ প্রাণী; সাধারণতঃ সর্প ১০।১২টি ডিম প্রসব করে; কয়েক জাতীয় সর্প ডিম প্রসবের পর ডিমের



ঘোসো সর্পের ডিম

উপর আর কোন যত্ন লয় না; কয়েক জাতীয় সর্প আবার কুণ্ডলীকারে ডিমে তা দেয়।

এইবার বিষধর সর্পের দন্ত সম্বন্ধে বলি। কয়েক জাতীয় বিষধর সর্পের বিষ-দন্ত সম্মুখভাগে অবস্থিত আবার কয়েক-জাতির বিষ-দন্ত মুখের খুব ভিতরদিকে বিদ্যমান। সেইজন্য সম্মুখ বিষ-দন্তধারী সর্প (Front fanged) ও পশ্চাৎ-বিষ-দন্তধারী সর্প (Back fanged)—এই দুইভাগে বিষধর সর্পকে ভাগ করা হ'য়েছে। সম্মুখ বিষ-দন্তধারী সর্প অর্থাৎ গোখুরা, ম্যামবাস, কোরাল প্রভৃতি—ইহাদের বিষই মারাত্মক।

বিষধর সর্পের উপরিভাগের চোয়ালে মুখের সম্মুখভাগে বিষদাঁত থাকে। সর্পের মুখগহ্বরে চক্ষুর পশ্চাৎভাগে

যে লালাবাহী থলী অবস্থিত তারই এক অংশ বিষকোষে পরিণত হয়। বিষকোষ হইতে বিষনালী চোয়ালের গাত্র বাহিয়া মাড়ীর উপর বিষ-দন্ত মূলে শেষ হয়। বিষ-দন্ত মাড়ীর সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নয়। সাধারণ অবস্থায় উহা তালুদেশে শায়িত থাকে, দংশনকালে সোজা হয়। মাংসপেশীর চাপপ্রদানে বিষ-কোষ হইতে নালা বাহিয়া বিষ-দন্তের ছিদ্র পথ দিয়া বিষ দন্তাগ্রে আসিলে সর্প উহা অপরের শরীরে প্রবেশ করায়। বিষ শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া হৃদ-যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ করায় মৃত্যু সংঘটিত হয়।

সকল সময়েই সর্প বিষ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ দন্তদ্বারা দংশন করিয়া উহাদের গ্রীবা বাঁকাইয়া বিষ ঢালিতে হয়। একার্য্য সর্প বিশেষ তৎপরতার সহিত শেষ করিলেও কোন কোন সময়ে তাহারা ভয়ে অথবা তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হয়।



এ্যাড়ার সর্পের বিষ-দন্ত

বিষ-দন্ত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন না থাকায় বেশী পুরাতন হইলে দংশন কালে অথবা অন্যকোন কারণে উহা স্থানচ্যুত হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কয়েক সপ্তাহ পরেই আবার নূতন বিষ দন্তের আবির্ভাব হয়।

আমাদের দেশে সাপুড়িয়ারা বিষ-ধর সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া নিরাপদে ক্রীড়া প্রদর্শন করে কিন্তু বিষ-দন্তের পুনার্বিভাবের দিকে তাদের লক্ষ্য রাখতে হয়।

পৃথিবীতে যে কত বিভিন্ন জাতীয় সর্প রহিয়াছে তা' গণনায় শেষ করা যায় না। খ্যাতনামা প্রকৃতি বিজ্ঞানবিদ ডাঃ বার্ণেট চারভাগে সমগ্র সর্পজাতিকে ভাগ করেছেন। (১) গর্ত্তখননকারী সর্প (Borrowing snake) (২) বৃহৎ অজগর বিশেষ—The constricting snake-পাইথন ও বোয়া (৩) প্রতিরূপ প্রকাশক (Typical snake)—ইহাদিগকে আবার এইরূপ ভাবে ভাগকরা যেতে পারে (ক) নির্ব্বিষ (খ) পশ্চাৎ বিষ-দন্তধারী সর্প (Back Fanged) (গ) সম্মুখ বিষ-দন্তধারী সর্প (Front Fanged)—ভয়ঙ্কর বিষাক্ত (৪) ভাইপার।

গর্ত্তখননকারী সর্পের মধ্যে মালয় পেনিনসুলার রক্তচিহ্ন-যুক্ত গর্ত্তখননকারী সর্পই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট এই জাতীয় সর্প Ular kepala dua– দু'মুখো সাপ বলে পরিচিত। কোনরূপে



মৃত্যুচুম্বন—ক্রীড়ারত সঙ্খচূড় সর্প

উত্তেজিত করিলে ইহাদের লেজের খানিক অংশ দণ্ডায়মান হয়। লেজের শেষ দিকে চক্ষু আকারের দুইটি লাল চিহ্ন আছে এবং অগ্রভাগে লাল চিহ্ন এরূপ ভাবে রঞ্জিত যে হঠাৎ মনে হয় যে দণ্ডায়মান সর্পের লেজটি সর্পের রাগত মুখ বিশেষ। এই জাতীয় সর্প গর্ত্তখননে অভ্যস্ত। ইহারা নিরীহ—অনিষ্টকর নয়। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় এই জাতীয় কয়েকটী সর্প রক্ষিত আছে।

বৃহৎ অজগর সর্পের অন্তর্ভুক্ত পাইথন ও বোয়া। এসিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় পাইথনের বাসভূমি। আমেরিকার

গ্রীষ্মপ্রধান স্থান সমূহের জঙ্গলে বোয়া পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার জল-বোয়া (Water Boa) লম্বায় ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত হয় এবং উহাদের কোমরের বেড় মানুষের উরুর ন্যায় স্থূল। সমগ্র সর্প জাতির মধ্যে অজগর সর্পই আকারে বৃহৎ। প্রাচীন কাল থেকে অজগর সর্পের কত বিচিত্র কাহিনী বহু দেশের রূপ কথায়ও ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোন প্রাকৃতিক গ্রন্থে প্রকাশ, একশত বৎসর পূর্ব্বে সিংহলে এক বৃহৎ হাইবোয়া (Great Hyboa) একটি পূর্ণবয়স্ক মহিষকে গলাধঃকরণ করতে সক্ষম হ'য়েছিল। শোনা যায় আমাজন জঙ্গলের এ্যানাকোনডাস (Anacondas) লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফিট পর্য্যন্ত হয়। আমেরিকা ও

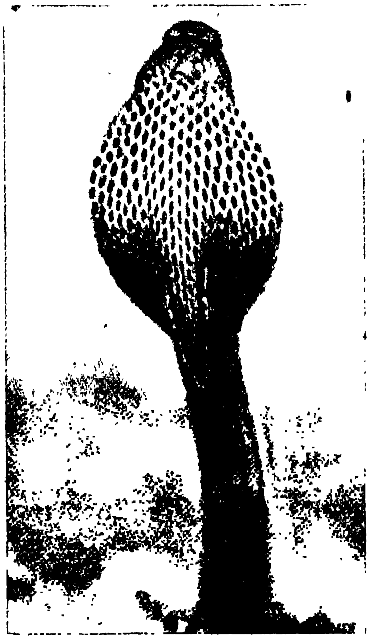


রয়েল পাইথন

ইউরোপের চিড়িয়াখানায় পঁচিশ ফিট লম্বা পাইথন রক্ষিত আছে। ব্রেজিলের যাদুঘরে যে বত্রিশ ফিট ছ' ইঞ্চি পরিমিত একটী এ্যানাকোনডাসের চর্ম্ম রক্ষিত আছে তাহাই নাকি যাদুঘরে রক্ষিত চর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অজগরের খাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নানারূপ অতিরঞ্জিত গল্প শুনা যায়। চিড়িয়াখানায় রক্ষিত পাইথন বড় ছাগল ও শূকর ভক্ষণ করে। ভারতীয় পাইথন বা ময়াল লেজ সম্বলিত চার ফিট চিতাবাঘ ভক্ষণে যে সক্ষম তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এগার ফিট আকারের একটি ইম্পিরিয়াল বোয়া শৃঙ্গবিহীন হরিণকে উদরস্থ ক'রেছিল। এইরূপ গুরুভার খাদ্য পরিপাক হ'তে প্রায় এক সপ্তাহ কিম্বা কিছু বেশী সময় লাগে। সর্পেরা বহুদিন পর্য্যন্ত উপবাসে থাকতে অভ্যস্ত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস লণ্ডনের জুয়োলজিক্যাল সোসাইটিকে একটি বৃহৎ পাইথন উপহার দিয়েছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত পাইথনটি কোনরূপ খাদ্য ভক্ষণ করে নাই; পরে সেখানকার রক্ষকের নিকট থেকে একটি মোরগ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ দিনের উপবাস ভঙ্গ করে। এই জাতীয় সর্প এককালে প্রায় চল্লিশটি ডিম প্রসব করে, স্ত্রী-পাইথন কুণ্ডলী আকারে ডিমের উপর তা দেয়—এই সময় ইহাদের স্বভাব অত্যন্ত উগ্র হয়। পাইথন ও বোয়ার আর এক ছোট জাত আছে। ভারতের ও আফ্রিকার সাধারণ পাইথন পনের ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ডায়মণ্ড ও কার্পেট নামক পাইথন মাত্র ছয় ফিট হয়। অষ্ট্রেলিয়ার এ্যামেথিষ্ট পাইথনই দর্শন যোগ্য। আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান স্থানসমূহের পূর্ব্ব অঞ্চলে সাধারণ বোয়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইন্দুর ভক্ষণে অভ্যস্ত বলে সেখানের কৃষকগণ ইহাদের আগমন কামনা করে। বৃক্ষবাসী বোয়া সর্পের গাত্র বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। এই জাতির মধ্যে পিঙ্গল বর্ণের ও রামধনু বর্ণের বৃক্ষবাসী সর্পই দর্শনীয়। মৃত্তিকায় ইহাদের শত্রু অনেক, সেইজন্য ইহাদের বাচ্চারা ডিম হইতে বাহির হইলেই বৃক্ষে আশ্রয় লয়।

ইহার পর নির্ব্বিষ সর্প। এই জাতীয় সর্পের কোন বিষ দাঁত নেই। সমস্ত দাঁতগুলিই নিরেট। প্রায় এক সহস্র জাতীয় সর্প নির্ব্বিষ জাতীয় সর্পের অন্তর্ভুক্ত। উহাদের মধ্যে আবার উপজাতিও আছে। এই জাতীয় সর্প মৃত্তিকা, জল ও বৃক্ষে বাস করে। জলচর সর্পের চক্ষু ও নাসারন্ধ্র মস্তকের উপরিভাগে এরূপভাবে অবস্থিত যে জলের মধ্যে থেকেও ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও কোন কিছু দেখিতে অসুবিধা বোধ করে না। আফ্রিকার ডিম্ব-ভক্ষণকারী নির্ব্বিষ সর্পের ডিম্ব-ভক্ষণ প্রণালী বড়ই চমৎকার। ছোট ছোট ডিম মুখগহ্বরে পুরিয়া পরে মাংসপেশীর চাপে ডিম ভাঙ্গিয়া লয়, ইহাতে সার অংশ পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে; অসার অংশ উহারা উদ্গীরণ করে। চিড়িয়াখানায় এই জাতীয় সর্প রাখা হয়; কিন্তু রাত্রিকালে আহার গ্রহণ করায় ইহাদের ডিম্ব ভক্ষণ কৌশল

দেখিয়া দর্শকেরা আমোদ উপভোগ করিতে পায় না। বৃটনে মাত্র কয়েক জাতীয় সর্প পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে এ্যাডার সর্পই (Adder) বিষধর। ঘেসো সর্প (Grass snake) নির্ব্বিষ সর্পের মধ্যে অন্যতম। ইহাদের এ্যাডার সর্প ভ্রমে সেখানের অধিবাসীরা হত্যা করে; উভয়েরই গ্রীবাদেশে সুস্পষ্ট পিঙ্গল বর্ণের ডোরা চক্রাকারে রঞ্জিত এবং উভয় জাতীয় সর্পের লেজ কৃশ। ঘেসো সর্প জলে সন্তরণ বেশী পছন্দ করে। ইহারা বসন্তের শেষে অথবা গ্রীষ্মের প্রথম ভাগে সংখ্যায় আটটি কি দশটি ডিম প্রসব করে; উত্তেজিত করিলেও ইহারা দংশনে উদ্যত



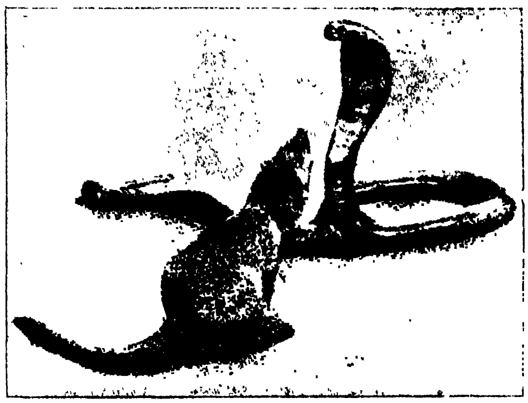
গোখুরার ফণার পশ্চাৎভাগ

হয় না। নির্ব্বিষ সর্পের মধ্যে কয়েক জাতীয় সর্প আছে যাহাদের মস্তক উত্তোলন ও দংশন অনেকখানি বিষধর সর্পের ন্যায়। এই জাতীয় সর্প মানুষের মনে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি করে।

পশ্চাৎ বিষ-দন্তধারী (Back Fanged) সর্পের বিষ-দন্ত মুখের খুব ভিতরদিকে অবস্থিত। সেইজন্য ইহারা খুব বেশী মারাত্মক নয়। আফ্রিকার বুমশ্ল্যাঙ্গ সর্প এই জাতীয় এবং একমাত্র ইহাই মানুষের মৃত্যু ঘটায়। এই জাতীয় সর্পের মধ্যে মালয়ের কৃষ্ণ ও সুবর্ণ বৃক্ষবাসী সর্প অতি মনোরম। বৃক্ষবাসী সর্পের গাত্রের বর্ণ বৃক্ষের বর্ণের সহিত এইরূপ মিশিয়া যায় যে সহজে তাহাদের উপস্থিতি লক্ষ্য হয় না।

সম্মুখ বিষ-দন্তধারী সর্পই মারাত্মক। গোখুরা, করেতা, কপারহেড ও কোরাল এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে ভারতীয় গোখুরার বিষের সহিত কাহারও তুলনা করা যায় না।

গোখুরা আবার কয়েকটি উপজাতিতে বিভক্ত এবং সেই সকল উপজাতি ভারতের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আসল গোখুরা শ্বেতবর্ণ এবং তসর বর্ণের ফুটি ফুটি চিহ্নযুক্ত। ইহাদের ফণার উপরিভাগে দুইটী চক্ষুর ন্যায় চিহ্ন আছে। অনেকের বিশ্বাস এই চিহ্নের অনেকখানি গরুর খুরের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাদের গোখুরা নামকরণ হ'য়েছে। ফণা থাকিলেও সকল জাতীয় গোখুরার একইরূপ



সর্প ও বেজীর যুদ্ধ

চিহ্ন থাকে না। দুইটি কিম্বা একটি অথবা কোন কোন জাতীয় গোখুরার ফণার কোন চিহ্ন নাই। এই জাতীয় সর্পের উপরের চোয়ালের সম্মুখভাগে দুইটী বিষ দাঁত থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে ইহারা মানুষের শরীরে বিষ প্রয়োগ করে। ইহাদের বিষের জ্বালা অত্যন্ত তীব্র এবং মৃত্যু নিশ্চিত। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে হাজার হাজার লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। তার মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই মৃত্যুর সংখ্যা বেশী।

বর্দ্ধমান বিভাগের কোন কোন জেলায় গোখুরা সর্প 'খরিস সাপ' নামে অভিহিত হয় এবং দুধে, কেঁথো, তেঁতুলে, শামুক ভাঙ্গা, কাল খরিস—এই কয়েকটি উপজাতিতে বিভক্ত। গোখুরার গাত্রের বর্ণ, আকৃতি ও বাসস্থানের তারতম্য অনুযায়ী ইহাদের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে শঙ্খচূড় সর্প দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে ইহাদের বাসভূমি।

বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে আসল গোখুরা সর্প অর্থাৎ দুধে খরিস লোকালয়ে গৃহস্থের গৃহমধ্যস্থ গর্ত্তে ইন্দুর ভক্ষণের জন্য আশ্রয় লয়। অনিষ্ট না করিলে ইহারা মানুষকে আক্রমণ করে না। কোন কোন জায়গায় বাস্তুসাপ হিসাবে ইহাদের গৃহস্থ শ্রদ্ধা করে; গৃহস্থের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া তাহাদের হত্যা করা পাপ মনে করে। এইরূপ সংস্কার আমাদের দেশে এখনও বিরল নয়। কেঁথোর বর্ণ আসল গোখুরা হইতে অনেকখানি নিষ্প্রভ। দেওয়ালের (গ্রাম্য কথায় কাঁথ বলে) ফাটালে ইহাদের বাসভূমি। তেঁতুলে জাতীয় সর্প অন্যান্য গোখুরা অপেক্ষা কৃশ। শামুক-ভাঙ্গা' সর্পকে ধান ক্ষেতে আহার অন্বেষণে ব্যস্ত দেখা



র‍্যাটল সর্প

যায়। ছোবলের আঘাতে শামুকের আবরণ মুক্ত করিয়া খাদ্যাংশ ভক্ষণ করে। ইহারা কেউটিয়া নামেই বেশী পরিচিত। স্বভাব ইহাদের অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। অকারণে মানুষ কিম্বা অন্য কোন জন্তু জানোয়ারকে আক্রমণ করে। গোখুরা জাতীয় সর্পের মধ্যে শঙ্খচূড় সর্পের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লম্বায় ইহারা পনের ফিট। ফণার আকার অন্যান্য সর্পের ফণা অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাদের আকারও যেমন ভয়ঙ্কর, স্বভাবও তদ্রূপ উগ্র। সেইজন্য শঙ্খচূড় সর্পরাজ আখ্যা লাভ করেছে। বিষধর রাজ সাপ ও চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি করেতা জাতীয় সর্পের অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতাল পরগণা ও বিহার অঞ্চলে ইহাদের বাসভূমি। নির্ব্বিষ সর্প আমাদের দেশে নানাজাতীয় পাওয়া যায়; জলঢোড়া তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে বিভিন্ন জাতীয় সর্প আছে, এই সমস্ত হিংস্র সর্পকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহুদিন হইতেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই মনসা পূজার প্রচলন আছে। সর্প মনসা-দেবীর বাহন, এই মনসা দেবীর কোপে পড়িয়া কিরূপে চাঁদসদাগরের বংশ নিঃশেষ হ'য়েছিল তাহা বেহুলার কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে মনসা পূজা উপলক্ষে বিশেষ ধূমধাম হয়। গ্রামবাসীরা দল বাঁধিয়া বাঙ্গলার প্রাচীন গ্রাম্য কবি লিখিত মনসার পাঁচালী গান করে। সাঁপুড়িয়ারা বহু বিষধর সর্প সহযোগে 'ঝাপান' খেলা দেখায়; ইহাকে এক প্রকার সর্প প্রদর্শনী বলা চলে। বহুকাল হইতেই আমাদের দেশে ওঝারাই সর্প-দষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে। মন্ত্র ও বৃক্ষের শিকড় সাহায্যে তাহারা নাকি বিষক্রিয়ার গতিরোধ করে। পল্লীগ্রামে অনেকেই হয়ত সাপ ও বেজীর লড়ায়ের সহিত পরিচিত। ইহা বিশেষ উপভোগ্য।

আমেরিকার বিষধর প্রবাল সর্প (coral snake) লম্বায় দুই বা তিন ফিটের বেশী হয় না। ইহাদের গাত্র সাদা এবং তাহার উপর কালো ও লাল বর্ণের ডোরা আছে।

বৃটিশ এ্যাডার ভাইপার জাতীয় সর্প; ইহা বৃটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের একমাত্র বিষধর সর্প। তবে ইহার বিষ খুব মারাত্মক নয়, খুব অল্পসংখ্যক লোক ইহার দংশনে মারা যায়।

ভাইপার জাতীয় সর্পের মধ্যে য়্যাসপ্ ভাইপার খুবই বিষাক্ত। সেক্সপিয়ারের নাটকে বর্ণিত ক্লিয়োপেট্রার মৃত্যু ইহার বিষক্রিয়ার ফলেই নাকি সংঘটিত হয়; ইহারা আবার দুইটি উপজাতিতে বিভক্ত। য়্যাস্পের এক উপজাতি সাহারা ও অপরটি ঈজিপ্টে বাস করে। বালুকার মধ্যে আত্মগোপন করিয়াই ইহারা শিকারের অপেক্ষায় থাকে।

রাসেল ভাইপার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর সর্প। ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে পাওয়া যায়।

র‍্যাটেল সর্পের লেজের বিশেষত্বের জন্যই ইহারা বিশেষ পরিচিত। লেজের অগ্রভাগে শৃঙ্গবৎ গোলাকার অস্থি আছে। ঐগুলি দ্রুত কম্পিত হয় ও এক উচ্চ শব্দের

সৃষ্টি করে; সেই জন্যই র‍্যাট্‌লের আগমন পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই জাতীয় সর্প যখন খোলোস পরিত্যাগ করে সেই সময় নূতন আর একটি অস্থি লেজের অগ্রভাগে যুক্ত হয়। বৎসরে সাধারণতঃ তিনবার ইহাদের খোলস পরিবর্ত্তন হয় এবং প্রতিবারই নূতন অস্থির আবির্ভাব হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ফার-ডা-লান্স র‍্যাটল সর্পের ন্যায়; তবে ইহাদের লেজে কোন অস্থি নাই।

বর্ত্তমানে সর্প বিষের উপযুক্ত প্রতিশোধক ঔষধ আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণায় রত আছেন; বিজ্ঞানের কল্যাণে অদূর ভবিষ্যতে যে তাঁহাদের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হ'বে বিজ্ঞানের উন্নতির প্রসারতা দেখে তাহা আশা করা যায়। অকালমৃত্যুর হাত থেকে সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন রক্ষা বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার সফলতার উপরই নির্ভর করে।

তার নিজের দেশ

পার্ল এস. বাক

[পার্ল এস. বাক এবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। সবচেয়ে নাম করেন চীনদেশের গল্প লিখে। 'দি গুড আর্থ' বইহিসাবে এবং চিত্রহিসাবে সকলেরই খুব প্রিয়। এ গল্পটিতেও চীন দেশের যে বিবরণ পাওয়া যাবে তা যেমন মর্ম্মস্পর্শী, তেমনি বাকের কথাতেই বলা যেতে পারে—Sorrowful truth.]

জন ডিউই চাং বরাবরই জানত যে নিউ ইয়র্কের মট ষ্ট্রীট তার নিজের দেশ নয়। লোকে বলত, এটা চীনে শহর, কিন্তু এটা তার স্বদেশের মত নয়। ছোটবেলা থেকেই চাং এইসব সরু ও মুখর গলিগুলির সাথে সুপরিচিত; দোকানঘরগুলো যেখানে সাগর পারের আর আমেরিকার জিনিসগুলো জানালায় সাজানো থাকত তাও সে ভাল করেই চিনত। আশে পাশের লোকেরা, পুরুষ ও স্ত্রী আর ছোট ছোট শিশুরা প্রত্যেকেই তার চেনা। তাদের গায়ের রঙ তার নিজের রঙের মতই পীতাভ আর চোখগুলো গভীর কালো। আর তার মত তাদের অনেকেই এই কর্ম্মব্যস্ত জনবহুল পথে জন্মেছে এবং এ ছাড়া আর কিছুই জানে না। তবু চাং জানত, ভালো করেই জানত যে এটা তার নিজের দেশ নয়।

এমন নয় যে এই পথ, এই চীনে শহর তার মোটেই ভাল লাগে না। মায়ের কোলে কোলে শিশুকালে সে এখানে বেড়ে উঠেছে। সে সময় ঘুম ভেঙে তার পিতার পুরানো জিনিষ-বেচা দোকানের সামনের পথটির নানা বৈচিত্র্যের দিকে অবাক হয়ে সে তাকিয়ে থাকত। ঘুমিয়ে পড়লে তাকে ছোট একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে শুইয়ে রাখা হ'ত। ঘরটার মধ্যে শুকনো তরকারী, আদা আর চায়ের গন্ধ। ঐ দুটি স্থান ছিল তার পৃথিবী, আর যতদূর তার ধারণায় আসত ঐ তার স্বদেশ।

যেদিন সে স্কুলে যায় সেদিন সে প্রথম বুঝতে পারলে যে এইটে তার নিজের দেশ নয়। শুধু তার একার নয়, চীনে শহরে যারা থাকে তাদের কারু এটা দেশ নয়। ভাত খেতে খেতে তার বাবা-মা এই নিয়েই কথা বলছিল, আর তারা ত ঠিক করেছে যে চাংকে কিণ্ডার গার্টেন পড়তে দেওয়া হবে না। না দিক, চাং-এর তাতে কিছু মনে হয়নি। এর চেয়ে তার বেশী মজা লাগত আরও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ায়। ছেলেগুলোর রঙ অবশ্য তার চেয়েও শাদা। তার ভাল লাগে মোটরের পিছনে চুপটি করে উঠে বসা, অথবা পুলিশের লোকদের একটু জ্বালাতন করা। কিন্তু একদিন ত বয়স এসে পড়ল ছয়ের কোঠায়। সেই দিন থেকে তারও শিক্ষা সুরু হল।

পুরানো গলা-খোলো কালো এক তুলোর চীনা জামার উপর তার মা তাকে পরিয়ে দিল নীল চেকের নাবিকদের পোষাক। তারপর চীনা ভাষায় খানিকটা উপদেশ দিলে, কেমন করে ব্যবহার করতে হয় প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে। মা কখনও ইংরেজী শেখেননি। চাং মাকে চীনা ভাষায়ই জবাব দিল! অবশ্য রাস্তায় এসে তৎক্ষণাৎ ভুলে গেল যে চীনা ভাষায় কোন কিছু বলেছে কি না।

তার গভীর মনোযোগ দিয়ে সে শুনে যাচ্ছিল—মা তার কি বলছিল। ছোট হলেও সে বুঝতে পেরেছে যে, কতগুলো উপদেশ তাকে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি নিউ ইয়র্কের নয়। এই নিয়মগুলোই চীনের ছোট ছোট ছেলেরা পালন করে, মা বলে দিলে। তার বাবা তাকে বলে দিলেন, "কখনও ভুলে যেও না যে, তুমি হানের বংশধর। আর তুমি এখানকার দুরন্ত শাদা চামড়াওয়ালাদের একজন নও। এখানে আমাদের থাকতেই হবে যতদিন আমরা ধনী না হতে পারি। শিক্ষকের কাছে সর্ব্বদাই বিনীত থাকবে। গুরুজনরা যা বলেন তা, পালন করবে, আর তোমার মন থাকবে বইয়ের উপর।"

প্রাতরাশের সময়ে ভাত খেতে খেতে তারা হাতের কাঠি মাঝে মাঝে থামিয়ে অন্যান্য চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন। প্রাতরাশের শেষেই তার বাবা তার নামকরণ করলেন জন ডিউই চাং। এর আগে বাড়ীতে তাকে সোহাগ করে ডাকা হ'ত ছোট কুকুর, আর বাইরে চিঙ্ক। এখন তার বাবা একটুকরা কাগজে এই নামটা লিখে দিলেন, যাতে স্কুলের মাষ্টাররা শুদ্ধ করে লিখে নেন। নতুন নামটির ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, জন ডিউই হচ্ছে একজন আমেরিকানের নাম—যিনি চীনদেশে অনেক স্কুল খুলতে সাহায্য করেছিলেন।

চাং-এর পিতা এসে তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপরেই তার পড়াশুনা সুরু হয়ে গেল। ছেলে-মেয়েদের একলাইনে সার বেঁধে দাঁড়াতে বলা হ'ল, এই ছোট স্কুলঘরটা ছেড়ে মার্চ্চ করে যেতে হবে অন্য একটি বড় হলে। দুজন দুজন করে তাদের সারি হবে।

জন চাং বেশ তৎপরতার সঙ্গে একটি স্থান দখল করলে। তার মুখে চোখে নতুন আনন্দ ফুটে উঠেছে। দুজন দুজন করে অন্য সবাই সার বেঁধে দাঁড়াল। তার আগে আর পিছনে। কিন্তু তার পাশে কেউ দাঁড়াল না। দুজন দুজন করেই তারা দাঁড়াল, তবু একা সে মাঝখানে রইল। আর একটি ছোট ফরসা মেয়ে একা দাঁড়িয়েছিল—একটি ছোট মেয়ে একটুকরা লাল ফিতে বাঁধা চকচকে চুল নিয়ে। "মেরী"। তাকে সম্বোধন করে মিস্ পিন্‌কনে বলে উঠলেন—"তুমি এসে জনের পাশে দাঁড়াও।"

কিন্তু মেরী আসবে না। জন অবাক হয়ে এই ছোট মেয়েটির মাথা নাড়া দেখলে, "আমি কিছুতেই একজন চীনাম্যানের পাশে দাঁড়াব না"। —মেয়েটির স্বর ঝাঁঝালো।

মিস্ পিন্‌কনে তার দিকে কটমট করে একমুহূর্ত্ত চাইলেন, তারপর জনের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, বেশ, তুমি একাই হাঁটো, আমিই জনের পাশে দাঁড়াচ্ছি।"

অন্যান্য সারি তখন স্তব্ধ। জন ডিউই চাং বেশ অনুভব করল যে, এদের স্তব্ধতা মোটেই সহানুভূতিসূচক নয়। খুব আস্তে সে মিস পিন্‌কনের হাত ধরল, কিন্তু তার উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে। এর চেয়ে মেরীর সাথে চলাই ভাল ছিল।

এমনি করে তার শিক্ষা সুরু হল এবং অনেক বছর ধরে চলল। কিছুদিন বাদেই সে এইসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে দেখত অন্য সবাই নিজেদের সাথী পেয়েছে কি না। যদি সে দেখে, সে-ই শুধু বাকী আছে, তবে পিছনে যেয়ে একা দাঁড়াত। যদি দেখত, তাকে নিয়ে সংখ্যাটা জোড় হয়েছে এবং বিশেষ করে অন্যটি একটি মেয়ে, তবে সে একটু তফাতে আলগোছে অপেক্ষা করত। চাং-এর মধ্যে যেন একটি বিশেষ চেতনা এসেছিল যাতে সে বুঝতে পারত যে, পাশে দাঁড়ানোটা অন্যের পছন্দসই হবে কি না। সে তার বাপ-মাকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলত না। বরঞ্চ সে সরে আসত। এমনি করে জন হয়ে উঠল একটি শান্ত পরিচ্ছন্ন যুবক, সে সর্ব্বদাই চুপচাপ ও পড়াশুনা করে। ক্লাশে সে প্রথম হবে এবং পুরস্কারগুলো কেড়ে নেবে এই ছিল তার কাম্য।

তার বাপ-মা তার সম্বন্ধে বেশ আশান্বিত। তারা আলোচনা করত ছেলে যখন বড় হয়ে তাদের দোকানের ভার নেবে তখন তারা কি করবে। কিন্তু চাং যদিও পড়াশুনার শেষে দোকানে হিসাব-পত্রের খাতা নিয়ে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিত, তবু মনে মনে সে স্থির জানত যে সে কখনও দোকানের ভার নেবে না। কারণ এতদিনে চাং বেশ বুঝে নিয়েছে যে, এটা তার নিজের দেশ নয়। অন্তরে সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত—একটি সুগোপন ইচ্ছা—যে বড় হয়ে সে তার নিজের দেশকে খুঁজে বার করবে।

দোকানে যে সব পুরানো বিস্ময়কর জিনিষ সাজানো থাকত, পুতুল-গুলো কাগজের উপর, চাঁদির উপর রহস্যময় আঁকা ছবিগুলো, হাজার রকমের দুষ্প্রাপ্য অদ্ভুত সুন্দর বস্তুগুলো চাংকে আরও ব্যাকুল করে তুলত—কোথায় এদের পাওয়া যায়, সেই রহস্যময় দেশকে দেখবার জন্য। খড়-বোঝাই প্যাকিং-এর কাঠের বাক্সগুলো সে সযত্নে খুলে ফেলত। বাক্সগুলোর উপরে লাল কালো আক্ষরিক ছবিগুলো দেখে তার মন চঞ্চল হয়ে আর একটি দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠত। আর একটি দেশের স্বপ্ন, যে-দেশ এই জিনিষগুলোর মতই সুন্দর—আর যে-দেশ তার নিজের।

এই দেশের কথা সে অনেকের মুখেই শুনেছে। তার নিজের ভাষার অক্ষরের লম্বা রেখাগুলো এতদিনে সে চিনে নিয়েছে। রাত্রে একজন বুড়ো মাষ্টার তাকে পড়াতে আসেন, তাঁর কাছে সে সেকালের কবিতার গীতিমধুর ছন্দও শিখেছে।

চাং-এর প্রতিবেশী জর্জ্জ লিউ এবং মলি কিন এতে ভয়ানক চটে যেত। তারা কখনই ঐ সব আঁকা ছবিগুলোর গূঢ় অর্থ বুঝতে চাইত না। মলি তার কালো কোঁকড়ানো চুল দুলিয়ে ঠোঁট কামড়ে জোরে জোরে বলত, "গী, এসব কি হচ্ছে? তার চেয়ে বল ও পদার্থ ছাড়াই আমি অনেক পেয়েছি।" পাশের বাড়ীর মুদিখানার হ্যারী সিল্‌সের প্রতি মলি বাঁকা চাউনি ছুঁড়ে দেয়। এমন নয় যে মলি একজন শাদা লোককে বিয়ে করবে। কিন্তু পুরানো হালচালের লোক নয়, একজন আধুনিক চীনাকে সে বিয়ে করতে রাজী হতে পারে। সে চটপটে লোককে ভালবাসে। জর্জ্জ লিউকেও সে বিয়ে করতে পারে, যদি সে সত্যি চটপটে হয়। কেউ যদি মলিকে প্রশ্ন করত যে, সে চীনদেশে যাবে কি-না, তবে সে হেসেই ফেলত। "কোথায় যাবে সে? ও দেশটা আমার জন্য নয়। তার সঙ্গে বল না কেন যে, ওরা নাকি ঘরে ইলেকট্রীক আলো পায় না এবং এটাও বল যে ওরা মেয়েদের ঘরে পুরে রাখে!" সে হেসে ওঠে বারবার এবং একটু জোরের সঙ্গে, কেন না, হ্যারী সিল্‌সকে তার ঘরের দরজায় দাঁড়াতে দেখা যায়। হ্যারী সিল্‌স বলে ওঠে, 'আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে, ওরা তোমাকে ঘরে আটকে রাখতে পারবে না।"

"এটা ত জানা কথাই, এতে আর বাজীর কি আছে?"

মলি চোখ দুটাকে ছোট করে হ্যারীর পানে তাকাল। সিনেমায় এনা মে ওয়াংকে সে এভাবে তাকাতে দেখেছে এবং মলিও প্রাচ্যের এ মনোরম কলাবিদ্যাটা পছন্দ করে।

জন ডিউই চাং মলিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে। সূর্য্যাস্তের পর সে স্কুল থেকে ফিরছিল। স্কুলে এই তার শেষ বছর। এর পর কলেজে যাবে সে। তারপর তাকে যেতে হবে সেখানে, যেটা তার নিজের দেশ। স্বদেশ—এই কথাটা যেন তার কাছে সৌন্দর্য্যের প্রতীক বলে মনে হচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে সে রাস্তা দিয়ে চলল। এখানে সেখানে সবখানে কোলাহল, মোটরের শব্দ, ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি। সবচেয়ে ছোট ভাইটা তার পায়ের কাছে জুতার ফিতা খুলতে এল। পুরা দুবছর বয়স এখনও হয় নি তার। জনের আসবার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের উপর তলাটা লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেল।

শেষ বসন্তের সন্ধ্যায় রাস্তার কোলাহল ও অবিশ্রান্ত আনাগোনার পানে তাকিয়ে চাং-এর মন স্বদেশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেখানে নিশ্চয়ই শান্ত পথ, কলকণ্ঠ গ্রামবাসী আর শস্যশ্যামলা উদার মাঠ—মধুর, নীরব আর সুশৃঙ্খল।

চাং মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছে। দক্ষিণ চীনে এক ছোট পল্লীর কাহিনী—যেখানে মায়ের ছোটবেলা কেটে গেছে। মায়ের মুখে সে শুনেছে সবাই সেখানে সুখী, মেয়েরা সুন্দরী আর শান্ত। এই রঙ-করা-ঠোঁট মেয়েদের মত নয়, বিশেষ করে মলি কিনের মত ফচ্‌কে তারা নয়। হঠাৎ সে বাড়ীর জন্য পাগল হয়ে উঠল—এতটা পাগলামী আগে ছিলো না।

চার বছর কলেজ-জীবনেও সে এই কল্পনায় মেতে ছিল। সে একজন চৈনিক হয়ে উঠল এবং সবাইকে ভাবতে দিলে যে, সে নিউ ইয়র্কের কোলাহলময় বিশৃঙ্খল একটি পথের অধিবাসী নয়, সে এসেছে সেই দূর দক্ষিণ চীনের একটি প্রশান্ত পল্লী থেকে।

এই চার বছরের মধ্যেই চীনে বিপ্লব সংঘটিত হল। কলেজের সাতটি চীনা ছাত্র নিয়ে চাং একটি স্বদেশী দল গঠন করলে। রোজ দুপুর বেলা না খেয়ে খেয়ে পয়সা জমাতে লাগল এবং তার সাথীদের প্রত্যেককে বেশ কিছু চাঁদা দিতে বাধ্য করলে। তিন মাস পরে তহবিলে যখন নব্বুই ডলারের কিছু বেশী উঠেছে তখন তারা জোর আলোচনা সুরু করল—চীনদেশে কোন্ কাজের জন্য টাকাটা দেওয়া যেতে পারে। পত্রিকা পড়ে, দেশের বুলেটিনগুলো পাঠ ক'রে তারা জানতে পারল—অনেক কিছুর জন্যই এই টাকাটা পাঠানো যায়। ক্ষুধার উৎপীড়ন আছে, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়েছে, নতুন গবর্ণমেন্টের এরোপ্লেনেও দরকার আর নতুন পথঘাট তৈরী করারও আবেদন আছে।

সপ্তাহ কয়েক বিতর্কের পর তারা ঠিক করল, পথঘাট তৈরী করার জন্যই এই টাকাটা পাঠিয়ে দেবে। জাতীয় গবর্ণমেন্টের কাছে টাকাগুলো নোট করে পাঠিয়ে দেওয়া হল—আর সেই সঙ্গে একটা চিঠি, সেখানে দাতার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রায় ছ মাস পরে তাদের কাছে এল সানন্দ উত্তর। চিঠির উপর রিপাব্লিকের ছাপ মারা। তাতে প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়েছে এবং এই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে যে টাকাটা যথাযথভাবেই খরচ হবে। চিঠির শেষে ছিল এই রকম স্বাদেশিকতার প্রশংসা এবং চিঠিটা সই করেছেন সভাপতির প্রথম সেক্রেটারী।

চিঠিটা হাতে করে জন অন্তরে এক বিপুল উচ্ছ্বাস অনুভব করল। উচ্চৈস্বরে যখন সবাইকে পড়ে শোনাল তখন শুধু তার কাঁদতে বাকী। আর্ট লক এক সন্দেহজনক মন্তব্য করলে, "হ্যাঃ, এসব চমৎকার বুলি। বাবা বলছিলেন এরাই নাকি গত বছর যে টাকাটা পাঠান হয়েছিল তা দিয়ে একখানা এরোপ্লেন খরিদ করেছে। একটাও তখন ছিল না।"

জন চাং তাকে তেড়ে গেল, "তুমি কি তোমার দেশকে নিন্দা করতে চাও? তুমি কি বলতে চাও তোমাদের প্রথম সেক্রেটারী মিথ্যেবাদী?"

আর্ট চুপ করে গেল। হাজার হোক, এতে তার কোন দরকার নেই। এই চার বছর সবাই যখন ফুটবল খেলে সিনেমা দেখে সময় কাটাতে লাগল, তখন চাং নীরবে তার মতলব এঁটে ফেলল। সমস্যাটা এই, সে কি অন্য কিছু—কোন একটা বিশেষ লাইনে, যেমন ধর ডাক্তারী, স্থপতিবিদ্যা অথবা পাইলটিং-এ পারদর্শী হবার জন্য আরও দেরী করবে, না কলেজে পড়া শেষ করে সরাসরি স্বদেশে চলে যাবে? মনে মনে সে বিচার করল। সরাসরি যাবারই তার ইচ্ছা। কলেজের শিক্ষারও একটা দাম আছে, সে নিশ্চয়ই একটি অধ্যাপকের কাজ পেতে পারে অথবা সরকারী চাকুরী। তার নিজের দেশে এই নতুন গৌরবময় যুগে কাজের অভাব হবে না। বিস্তর কাজ আছে। এই যুক্তরাজ্যের মত ত আর নয়—যেখানে চাকরীর বাজারে বিস্তর ঠেলাঠেলি আর বিপুল প্রতিযোগিতা। ওখানে নতুন শহর গড়ে উঠেছে, এরোপ্লেন উড়ছে, নতুন বাড়ী ইমারত সব তৈরী হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রম প্রসারিত—গোটা দেশটাই এখন জেগে উঠছে, চলছে দ্রুত এবং আগে আগে। এখানে পড়ে থাকার চেয়ে তার যৌবন-শক্তি নিয়ে সেই উৎসবে যোগ দেওয়া ভাল।

গ্রাজুয়েট হ'ল সে। তাড়াতাড়ি চলে গেল নিউ ইয়র্কের মট ষ্ট্রীটে বাপ-মার কাছে বিদায় নিতে, চীনদেশে যাবার একটি থার্ডক্লাশ টিকিট কিনতে।

সেইখানেই হ'ল তার দেরী। অবাক হল সে—তার মন যেতে দ্বিধা করছে দেখে। দুটো সপ্তাহ ধরে এখানে সে হল্লা ও গরম সহ্য করেছে, এখন তার টিকিট কেনাও হয়েছে, যাত্রার আয়োজনও তার ঠিক। বাপ মার সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করারও তার আর বাকী নেই। মা বারবার বলেছে, "দেখ, তুমি যখন তোমার ঠাকুমাকে দেখতে পাবে তখন নিশ্চয়ই তাঁকে বলবে যে, সেখানে তাঁর কাছে থেকে তাঁর সেবা না করতে না পারায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমার পিতামহকে আমার প্রণাম জানাবে। আমার ভাইদের ও তার স্ত্রীরা..." তার পিতা উৎসাহের সঙ্গে তাকে বলেছেন, "দেখ, যৌবনে আমাদের দেশে যে ছেলে অষ্টম জন্মেছে ছোট জমির উপর, তার আর কিছুই করার থাকে না। তাই আমাকে বাধ্য হয়ে এ বিদেশে আসতে হয়েছে এক জ্যেঠামশাইর সাথে

তাঁর ব্যবসায়ে। এখানে থাকার সময় তারা তোমার মাকে পাঠিয়ে দিলে এবং এইখানে তুমি জন্ম নিয়েছ। গৌরবের সঙ্গেই আমি আবার আমার দেশে তোমায় পাঠাচ্ছি…"

সবই যখন বলা হয়েছে, সবই যখন করা হ'ল, জন চাং তখন হঠাৎ বুঝতে পারলে তার যাবার ইচ্ছে নেই।

প্রথমটা সে এর হেতু অনুমান করতে পারলে না। এই কোলাহলময় শহরটা তাকে টেনে রাখেনি নিশ্চয়ই। একটি রাতে সে বিমর্ষ হয়ে বাইরে পথের পানে তাকিয়ে ছিল। এই যে আলোগুলি এদিকে জোরে ছুটে আসে, ক্ষণিকের জন্য মুখে উজ্জ্বল আলো ফেলে চকিতে আড়ালে চলে যায় এ তার ভাল লাগে না। ঘস্‌ঘস্ ইঞ্জিনের শব্দে, হর্নের শব্দে কোন সঙ্গীত নেই। এমন কোনও মুখ নেই—অবশ্য তার নিজের পরিজনদের ছাড়া—যা দেখল কি না দেখল এ নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামায় না। এমন কোনও মুখ নেই—সহসা তার একটি মুখের—কালো কোঁকড়ানো চুলে ঢাকা একটি ছোট গোল মুখের কথা মনে এল। এই মুখখানিই তাকে এতটা টেনে রেখেছে, এই মুখখানিই সে বারে বারে দেখতে চায়, আর এই মুখখানিই মলি কিনের।

তাড়াতাড়ি সে ঢুকে পড়ল ঘরে। অন্ধকার ছোট দোকানের এক অন্ধকার কোণায় ছুটে পালাল। সেইখানে বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির মাঝে, মাটীর পাত্রের গায়ে আঁকা হান ঘোড়ার পাশে, ঝুলানো রাজরাজড়ার কোট-গুলির তলে সে বসে পড়ল। হাতের মধ্যে মাথাটিকে রাখলে। সে ত চায়নি—মলি কিনকে সে ভালবাসে! বিয়ে করার কথা যদি সে কখনও ভেবেই থাকে তবে মলি কিনের মত কাউকে নয়! তার মা তার কাছে গল্প বলেছে সাগর পারের সেই তরুণীদের কথা, তাদের শান্ত স্নিগ্ধতা, তাদের নম্র আয়ত চোখ, তাদের পতিভক্তি। হয় ত একদিন, সে ভেবেছিল বাঁশবনে ঢাকা করবী গাছের তলায় একটি ছোট বাগান ঘেরা ছোট্ট কুটীরে সে তার পাশে পাবে বিনম্র মধুর তেমনি এক তরুণীকে। মলি কিন নয়, কথার ফানুষ, লাস্যময়ী চঞ্চলা মলি কিন নয়। তথাপি এইত সে। চাং যেতে চাইছে না আর।

মলিকে চাং দেখেছে, কতবার দেখেছে। উত্যক্ত হয়েই নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছে, কেমন করে মলিকে এড়ান যায়? এখনও সে পাশের বাড়ীতেই আছে, এখনও সে কথা বল্‌তে বল্‌তে স্ফূর্ত্তি করে স্কুলে যায়, আর আসে। শর্টহ্যাণ্ড শিখছে মলি, যাতে সে তার বাবাকে সাহায্য করতে পারে। মলির বাবা চা ও তেলের ব্যবসা করেন কিন্তু কখনও শুল্ক বিভাগের জটিলতা ও হিসাবপত্র রাখা শেখেন নি। মলি ঠিক করেছে যত শীঘ্র পারে ব্যবসাটা সে নিজের হাতে নেবে। সে সর্ব্বদাই চায় কোন একটা কাজ করতে, কোন জিনিষ গুছাতে। তাই বছরের পর বছর নিরীহ বুড়ো লোকটির অনেকখানি কাজ একটু একটু করে সম্পন্ন করছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকার খুচরো ব্যাপারীরা তাদের দোকানে এসে এক চটপটে মাকিন যুবকের দ্বারাই অভ্যর্থিত হ'ত। এই যুবকটির কালো চুল কোঁকড়ানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঋজু হয়ে থাকত। তীক্ষ্ণ কালো চোখ, আর চমৎকার মসৃণ বর্ণাভ ত্বক। কিন্তু স্বর ছিল খাটি মার্কিনী, পরিষ্কার এবং একটু কটকটে; তার যে লাল ওষ্ঠ হতে কথাগুলি ছিটকে বেরোত সে হচ্ছে নিউ ইয়র্কের।

পুরুষেরা মলির দিকে হাসিমুখে চাইত এবং মাঝে মাঝে কিছু আশা করেও। কিন্তু মলি সে পাত্রীই নয়। সবাই জানে মলি নিজের কাজ নিজেই গোছাতে জানে।

আর এটাও সবাই জানত যে, মলি জর্জ্জ লিউকেই বিয়ে করবে। দুই পরিবারই একথা ভেবে রেখেছিল। তারপর হঠাৎ ছমাস আগে মলি তার মন বদলে ফেললে। "না", মলি তার পিতাকে দৃঢ়স্বরেই বলে দিলে, "আমি তাকে বিয়ে করতে পারব না।"

সবাই জানত মলি এ কথাগুলি কেমন করে বলেছে, কারণ জর্জ্জ বলেছে তার বন্ধুদের, তারা বলেছে তাদের স্ত্রীদের এবং এমনি করে জন চাং একদিন তার মাকে রাত্রে খাবার টেবিলে বলতে শুনেছে।

"ঐ মলি মেয়েটা", তার মা দুঃখিত হয়ে বললে, "যেন আমেরিকানদের মত; এদ্দিন লিউর পরিবারে তার বিয়ে হ'বার কথা সব ঠিকঠাক ছিল, বাপমায়েরাই ব্যবস্থা করেছিল, আর এখন সে আর লিউকে বিয়ে করতে চাইছে না।"

তার বাপ প্রশ্ন করলেন, "কেন করছে না?"

"সে বলে, জর্জ্জ নাকি তেমন চটপটে নয়। মলি একথা বলে বেড়াচ্ছে যে খুব চটপটে লোক ছাড়া সে বিয়ে করবে না।"

দোকানে একলা বসে জন চাং ভাবছিল, মলি ত আমাকেও এতটা চটপটে বলে ভাববে না। আমি আমার দেশের বাড়ীতে যেতে চাইছি বলে সে কেবলই ব্যঙ্গ করছে। কতবারই তাকে বলতে শুনেছি, আমি একটা বোকা। তার মতে আমার পৈতৃক ব্যবসাটার ভার নেওয়াই নাকি উচিত।

স্মৃতিপথে উদয় হ'ল মলির উজ্জ্বল কালো চক্ষুদুটি এবং তার টকটকে লাল মুখ। না, মলিকে চাং অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছে।

সুতরাং তার যাত্রার দিন গেল, কেবল ভাবল—আর মলি কিন থেকে দূরে সরে থাকল। বাড়ী আসা অবধি রোজই সে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত কখন মলি বাড়ী ফেরে। আজ এখন সে যাবে না। একটা দিনের মধ্যে একবারও দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াবে না।

পরের দিন ছিল শনিবার; অকস্মাৎ সে অনুভব করল, আজ এখুনি যদি মলি কিনকে সে একবার না দেখতে পায় তবে রবিবার তার আর যাওয়া হয় না। কিন্তু কাল তাকে যেতেই হবে, নইলে জাহাজ ধরতে পারবে না।

নিজের উপর চাং চটে গেল। বিছানায় শুয়ে বিড়বিড় করে বকতে বকতে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করলে। তারপর হঠাৎ উঠে সে নীচে দৌড়ে গেল, দোকানটা পেরিয়ে একেবারে পাশের বাড়ীতে। আজ শনিবার, সুতরাং সে জানত যে ভিতরের একটা কামরায় মলি পিতার হিসাব মেলাতে বসবে।

একমুহূর্ত্ত সে অযথা ব্যয় করল না, মলির সামনে এসে দাঁড়াল। চুলগুলো তার পারিপাট্যহীন। শার্টে টাই নেই। ক্রুদ্ধস্বরে সে

কথা বলতে আরম্ভ করলে, কেন না মলিই তাকে এতটা দেরী করিয়েছে !

"তুমি আমার সাথে চায়না যাবে, কি যাবে না ?"

অবাক হয়ে চোখ দুটি বড় করে মলি তার দিকে তাকাল। জন চাং-এর উদ্দেশে সে কখনও চোখমুখের কলাশিল্প প্রয়োগ করে নি! কখনই করেনি। প্রায়ই তারা ঝগড়া করত। যেমন তারা ঝগড়া করেছে জনের চায়না যাওয়া নিয়ে। মলি পেন্সিলটা কোঁকড়ানো চুলে গুঁজলে। খাড়া হয়ে সেটা রইল যেন উপেক্ষার নিদর্শন।

"আমি কেন চায়না যাবো ?" সে জবাব দিল, "আমি ওখানে যেতে চাইনে। আমি একজন আমেরিকান, যে কেউ নিউইয়র্কে জন্মাবে সে-ই আমেরিকান।"

"তুমি যাবে. কারণ তোমার দেশ তোমায় চায়" সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল ; মলিকে এত সুন্দর দেখায় যে চাং না চটে পারে না। কেন মলি আজ সকালবেলায় গোলাপী রঙের সাজ করেছে ? কেন তার গায়ের ত্বক সোনালি ক্রীমের মত নরম ?

"তোমার দেশের যখন সবচেয়ে দরকার তোমায়, তুমি থাকতে চাও এখানে !"

মলি একটু শান্তস্বরেই জবাব দিল, "আচ্ছা আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব—যখন সেখানে কতগুলো ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে আর সকল পল্লীতে স্নানঘর পাওয়া যাবে।"

চাং আবার বল্লে, "তুমি চাও শুধু নিজের স্বাচ্ছন্দ্য, দেশ যখন তোমায় চাইছে !"

চাং-এর ইচ্ছা হল—মলিকে একটা ঝাকুনি দেয় আর গালে চড় মারে। সে জোর দিয়েই বললে, "তোমায় যেতেই হবে "

তখন মলি উঠে দাঁড়াল। সে তার হাত দুটোকে সরু কোমরের উপর রেখে চাং-এর বিপর্য্যস্ত চুল হতে পায়ের হলদে রঙের জুতার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে !

"মিঃ জন ডিউই চাং, আপনি কি দয়া করে বলবেন আপনি কে ?" মলি জবাব চাইল, "আপনি একজন আমেরিকান মহিলাকে কখনই এভাবে বলতে পারেন না। কেন আমায় সেখানে যেতেই হবে শুনি ?"

"কারণ, কারণ," চাং ফস করে বলে ফেল্‌ল, "কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।"

জন ঠিক এ কথাটা বলতে চায় নাই। তারা দুজনে পরস্পরের পানে চেয়ে রইল। মলি হঠাৎ বসে পড়ে চুল থেকে পেন্সিলটা নামিয়ে এনে কাগজের উপর খস্ খস্ করতে লাগ্‌ল। ধীরস্বরে সে আদেশ দিলে, "যাও এখান থেকে, জন ডিউই চাং! এখন ফাজলামি করো না।"

"এটা ফাজলেমি নয়," মরিয়া হয়ে চাং জবাব দিল।

"আমার কাছে এটা ফাজলামি। আমি যাব ফিরে চায়নায় ? যাও তোমার সাথে ? ফাজলামি ছাড়া এটা কি ?"

সে তার লাল ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরল। এইবার চাং-এর প্রতি, মলি একটু কটাক্ষ করে চাইল। কিন্তু যখন চাং তার দিকে এগিয়ে এল তখন সে প্রায় চেঁচিয়ে বললে, "না, আমি ভেবেই বলেছি, চলে যাও !"

খুব মৃদুস্বরে চাং শুধাল "তুবি ভেবেছ—চায়নায় চলে যাব ?"

"বেশ চায়নায়", মলি দৃঢ়স্বরে জবাব দিলো, তারপর মুখ বন্ধ করে হিসাবের খাতার একটা পাতা উল্টে গেল।

এক সেকেণ্ড চাং মলিকে লক্ষ্য করল, কিন্তু মলি ফিরে তাকাল না। চাং ফিরে দাঁড়াল, হাঁ এইবার সে যাবে। কিন্তু দ্বারের কাছে যেতেই মলি তাকে ফিরে ডাকলে। চিন্তিতের মত তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, "তুমি কি জন, তুমি কি, আমি যদি বলি আমি তোমার যত্ন নেব, থাক্‌তে পার এখানে ?"

বিরক্তির চিহ্ন চাং-এর মুখে ফুটে উঠল। কি ! তার নিজের দেশকে ছেড়ে দেবে ? তার নিজের দেশ, বহু বছরের স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা ? তার প্রিয় সুন্দর দেশ ? চেঁচিয়ে জবাব দিল চাং, "না।"

মলি নড়ে উঠ্‌ল হাসির চোটে। তারপর হাল্‌কা তালে বল্‌ল, "তবে যাও, যাও তোমার চায়নায় !"

সুতরাং চাং চলে গেল দ্রুত। কোন কিছু ভাববার আগেই তার ট্রেন সবুজ মাঠ ঘাট পেরিয়ে সাগর তীরে ছুটে চলেছে। কোন কিছু ভাববার আগেই সে মস্ত এক জাহাজে উঠে পড়েছে থার্ড ক্লাশ যাত্রীদের ভীড়ে। আর বাইরে সাগর জলের গর্জ্জন, ভেতরে অপরিচিতদের মাঝে ভাববার, কল্পনার অফুরন্ত সময়।

কিন্তু স্বপ্ন এখন তার ঠিক আসছে না। পুরানো স্বপ্ন আর নয়, তার নিজের দেশের লোকদের স্বপ্ন নয়, নিজের লোকদের কাছে এই ফিরে যাওয়া, তার জীবন, একজন নেতা, একজন মস্ত বড় লোকের স্বপ্ন এখন এল না। নাঃ, গোপনে স্বপ্ন ভেসে এলো একটি ছোট গোল মুখের, আমেরিকান ছাঁটে কোঁকড়ান চুলের নীচে একজোড়া কালো চাইনিজ চক্ষুর, গোলাপী আমেরিকান পোষাকের নীচে একটি পাতলা পীতাভ চাইনিজ দেহের ; মলির স্বপ্ন এল, যে তার সাথে ফিরে এল না তাদের নিজেদের দেশে।

বার্থের বাইরে সে বারবার গেল। ডেকের উপর পায়চারী করল। সে ত এখনও ভালবাসছে মলিকে, সে ত এখনও তার উপর রাগে টং হয়ে আছে। বারবার সে নিজকে বোঝাল, মলি মেয়েটার হাজার দোষ। দেখাতে সে চেষ্টা করল—একা একা সে কত ভাল আছে এবং মনে মনে, গুমরাতে লাগল যে সে মলিকে ভালবাসে, আর এ ইচ্ছেটাও হ'ল যে সে একা না থাকলেই পারত !

নিজের দেশের পানে নতুন আকাঙ্ক্ষায় সে চাইল, এখন তার দেশই তাকে মলির কথা ভোলাতে পারে।

কিন্তু কোথায় তার দেশ ? সাগরের বুকে মনে হয়েছিল কত কাছে। ঐ যেখানে শেষ হয়েছে বিপুল জলরাশি, ঐ যেখানে বড় নদীর মোহনা। এই তার দেশ। দিগন্তে একটি কালো রেখার মত। অন্তঃসমুদ্রে একটি পর একটি সুন্দর দ্বীপ সে অমনি পার হয়ে গেল। উচ্ছ্বাস-

হীন দৃষ্টিতে জাপানের মনোরম পর্ব্বতরাজির দিকে সে চাইল, কখন আসবে ঐ আকাশ-সাগরের মাঝখানে কালো প্রথম রেখাটি।

প্রত্যুষে চাং উঠে পড়ল তা দেখবার জন্য। ভোরের একটু পরেই কুয়াশা মলিন ধূসর আকাশে চেয়ে সে তা দেখতে পেলে, নিশ্চল মাটীর কালো রেখাটি। আস্তে আস্তে জাহাজটিকে যেন সেই মাটীর দুটো বাহু আলিঙ্গনে টেনে নিল। কোথাও পাহাড় নেই, অথবা গৃহ—যারা তাকে প্রথম সম্ভাষণ করতে পারে। শুধু ঐ দুটি কালো বাহু সাগরের বুকে প্রসারিত তাকে আলিঙ্গন করে নিতে, তাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে। ডেকের রেলিং-এর উপর চাং ঝুকে পড়ল। হৃৎপিণ্ডটা গলায় এসে বারবার ঠেকছে; এইখানে তার দেশ। সে ব্যাকুল হয়ে উঠল, এক লাফে এই পীতাভ জল সে পার হতে চাইল পায়ের তলায় মাটীকে অনুভব করবার জন্য। অচঞ্চল, প্রাচীন, স্তব্ধ দেশ নির্ব্বাক হয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

হঠাৎ এই নিস্তব্ধ মাটি তার চোখের আড়াল হয়ে গেল। হঠাৎ তার দুপাশে দেখা দিল উঁচু উঁচু বাড়ীগুলি। জাহাজটি আস্তে আস্তে একটি ডকের ধারে গিয়ে নোঙর করল। সমস্ত স্তব্ধতা নিমেষে অন্তর্হিত হল। ফুরালো সমস্ত প্রশান্তি, নীল কোর্ত্তা পরা একদল তামাটে লোক চীৎকার করতে করতে রেলিং টপকে জাহাজে উঠে এল। তাদের ভাষাটা পর্য্যন্ত চাং-এর দুর্ব্বোধ্য। সে তার ব্যাগটি তুলে নিলে তার পর ভীড় ঠেলে ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে ডকের উপর এল।

জাহাজ থেকে নামা, রাস্তা থেকে আসা, লোকের ভীড়ে দাঁড়িয়ে চাং যেন আবার নিউ ইয়র্কে এল। রাস্তার পাশে উঁচু উঁচু প্রতীচ্য ছাঁদের বাড়ীগুলি। মোটর, ট্যাক্সির শব্দ তার কানে এসে বাজল।

অকস্মাৎ ডকের টিনের চালের উপর ঝম্‌ঝম্ করে নামল বৃষ্টি। এখন তাকে এই ভীড়ের ঠেলা খেয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ধূলি-মলিন বিদেশী লোকের ভীড়। একজনও নাই যে তার পরিচিত, এমন একজনও নাই যে তাকে গৃহে অভ্যর্থনা করে নেবে। একা দাঁড়িয়ে যে জাহাজ থেকে মন কেবল পালাতে চাইছিল, বৃষ্টির ভেতর সেই জাহাজের দিকেই চাং তাকিয়ে রইল। এখন তার মনে হল, ওই যেন তার বাড়ীর মত, অন্তত নিরাপদে একটু আশ্রয় ত সেখানে মিলেছে!

না, এসব চলবে না। চাং গা ঝাড়া দিলে। তাকে দৃঢ় হতে হবে, এখন আর ফিরে যাওয়া হবে না। পকেটে তার একটি ভাল সরাইখানার নাম রয়েছে, এটা তার বাবা সন্ধান দিয়েছিলেন। আর তার একটি ভাইর নাম। এই ভাইটি তার কারবারে অংশীদার, এর কাছেই সে সাহায্য চাইবে। এখন তাকে সাহসী হতে হবে এবং তার ভুলে গেলে চলবে না যে, এই ডক এই ভীড়ের ওপারে রয়েছে তার দেশ।

নিকটের একটা কুলীকে ডেকে সে তার ব্যাগ ওঠাতে বললে। 'রিক্‌স—একটি রিক্‌স।' লোকটা তার ব্যাগ তুলে নিল। একমুহূর্ত্ত পরে একটি অয়েলক্লথের ঢাকনীর তলে বসে চাং দুলতে লাগল। সে শুধু দেখতে পেল রিক্‌সওয়ালার তামাটে পা বেয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ছে।

কোথায়, কোথায় তার দেশ!

দিন তিনেক পরে সরাইখানার একটি ছোট ঘরে বসে সরু গলির ওপর একটা বাড়ীর দিকে সে তাকিয়েছিল। বাড়ীর ভেতরে বাইরে নোংরা ছেলেমেয়েগুলো দৌড়াদৌড়ি করছে। মধ্যগ্রীষ্মের তাপে তারা নগ্ন। স্ত্রীলোকেরা তাদের উদ্দেশে চীৎকার করছে। কদাকার লোকগুলো—সলজ্জ চোখ কিশোরীরা আসে আর যায়। জন চাং এদের আগেই দেখেছে। কিন্তু এরা তার স্বরূপ নয়। এরা তার নয়, তবুও এদের তার মতই কালো টানা টানা চোখ, কালো চুল, আর তার ত্বকই এদের। কিন্তু তবু সে এদের পেতে চায় না।

ইতিমধ্যে সে সরাইটাকে ঘৃণা করতে সুরু করেছে। এটাকে সে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে। তার ভাইটি একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, "এই সরাইটা মন্দ কি? এর চেয়ে ভাল সরাইতে অনেক খরচ পড়বে।"

চাং সংক্ষেপে জবাব দিল, "এটা বড় নোংরা।"

"তুমি দেখছি বিদেশী লোকের মত। দেখো, দুদিনেই এটা গা সওয়া হয়ে যাবে।"

দুবার জন চাং এই ভাইটির সাথে দেখা করতে গেছে, দুবারই সে ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছে। এই লোকটিই তার ভাই, এ কিছুতেই হতে পারে না। প্রায় ছটা পৃথক পৃথক ঘর নিয়ে সে থাকে। তার একপাল ছেলেমেয়ে কখনও স্নান করে না। মেয়েদের ঝগড়া ও চীৎকার লেগেই আছে। এতগুলো নারী—এতগুলো স্ত্রী, আর অনেকগুলো চাকর থাকা সত্ত্বেও ওদের চায়ের পেয়ালায় বা টেবিলের মাছিগুলিকে তাড়াবার কেউ নেই। তবু ত তার ভাই দুস্থ নয়। তার টাকা রয়েছে। সে তাদের কারবারের অংশীদার। এই লোকটিই বুদ্ধমূর্ত্তিগুলো, হাতীর দাঁতের বাক্সগুলো, রূপার ঝুমকো, সাজকরা পোষাক এবং আরও কত কি—জাহাজে করে তাদের ওখানে পাঠাত। আর এই জিনিষগুলোই মট ষ্ট্রীটে তাদের দোকানে আজীবন দেখে চাং স্বদেশের স্বপ্নজাল বুনেছে।

তার ভাইয়ের মেয়েরা আনাগোনা করত। যখনই তার ভাইয়ের চায়ের দরকার, অথবা পাইপের, অথবা পায়ের পুরানো জুতার তখন সে ওদের লক্ষ্য করে তুড়ি দিত। মেয়েদের সম্বন্ধে সে গর্ব্ব করত। সে বলত, "আমার মেয়েদের কথা, আমি তাদের যথাস্থানে রেখেছি,—মানে ঘরে। ওরা অবশ্যি মাঝে মাঝে স্কুলে অথবা কোথাও যেতে চায়, কিন্তু সাহসী আধুনিকাদের আমি রাস্তায় দেখেছি, তারা কোন কর্ম্মের নয়। শুধু তাদের শিক্ষা ও সাহস নিয়ে কেবলই যন্ত্রণা দেয়। যন্ত্রণা দেয় তাদের পিতাকে—যে তাদের খাওয়ায়—আর তাদের যারা এদের বিয়ে করে। লেখাপড়া না-জানা মেয়েদের আমি বিয়ে করেছি, কিন্তু ওরা কোন যন্ত্রণাই দেয় না।"

সামনে যে-মেয়েটি আর কোন আদেশের অপেক্ষায় চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলো সে তাকে চেঁচিয়ে বললে, "তোমার মার কাছে যাও। পুরুষরা যেখানে কথা বলে সেখানে দাঁড়িয়ো না।" মেয়েটি চলে গেলে খুশী হয়ে বললে, "দেখলে, ও কেমন বাধ্য। একদিন ও তার স্বামীর কাছেও এমনি বাধ্য থাকবে।"

জন চাং মেয়েটির বাধ্যতা লক্ষ্য করল। কিন্তু যদিও মেয়েটি সুশ্রী এবং তার ব্যবহারও ভাল, আর একটি কথাও বললে না এবং যদিও সে একদিন এমনিতরো মেয়েকে কল্পনা করেছিল, তবুও তার অন্তর ওকে দেখে একটুও সায় দিয়ে উঠল না। "কারণ", মনে মনেই সে বললে, "বোধ হয় ও আমার ভাই-এর মেয়ে বলে।"

কিন্তু সরাইখানায় সে যখন নিজের ঘরে ফিরে গেল এবং একাকী চুপচাপ বসে রইল তখন সে বিস্মিত হয়ে গেল। তার ভাই-এর মেয়ে বলে নয়, এর কারণ মেয়েটিকে তার কাছে একেবারে বোকা বলে মনে হল, তার কমনীয় মুখখানিও পুতুলের মতই। এমন একটি পুতুলকে বিয়ে করলে কি সে খুশী হয়ে উঠবে।—সে স্ত্রীকে চুমু দিতে বললে চুমু খাবে? অকস্মাৎ তার মনে পড়ল মলি কিনের কথা। মলি কিন সেই জাতের মেয়ে যে নিজে না করলে কেউ তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে পারবে না। মলি তার চোখের সামনে এল, হাসিমাখা ও শঠতা-পূর্ণ মলি, কিন্তু তবু তাকে চাং পছন্দ করবে না—এখন নয়।

এর কিছুকাল পরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে চাং এর মনে হ'ল এটা তার নিজের দেশ নয়। এই নোংরা, জনবহুল, কোলাহলময় দেশ তার নয়। এদের পিছনে ওই দিগন্তের আড়ালে তার বিস্তৃত দেশ পড়ে আছে এবং সেই দেশ তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

সুতরাং সে আবার তার ভাইয়ের কাছে গেল। আমি দেশের অভ্যন্তরে যেতে চাই, আমি দেখতে চাই—আমি আবিষ্কার করতে চাই।

"তুমি যদি অভ্যন্তরে যাও", তার ভাই বল্ল, 'তবে তোমায় একটা কাজের ভার দিতে পারি। তুমি যাবে এই বড় নদীটার শেষ প্রান্তে, শেচুয়ান প্রদেশে। শুনতে পেলাম সেখানে নাকি প্রাচীন রাজাদের কতগুলো কবর খোঁড়া হয়েছে। তা যদি সত্য হয় তবে শস্তায় পুরানো জিনিষগুলো কিনে নিও। যা পার কিনে ফিরে এসো।"

অতঃপর চাং চলল তার নিজের দেশ খুঁজে বার করতে—সেই নদীর স্রোত বেয়ে বেয়ে।

সবখানে সে খুঁজে দেখল, কিন্তু মিলল সেই একই দৃশ্য। জনবহুল কোলাহলময় পল্লী শহর, নোংরা শহর, স্তুপাকার আবর্জ্জনা! গরম চা ছাড়া আর কিছু পান করতে সে ভয় পেল। সামান্য কফি আর ভাত সে খেল। আর মশারা রাত্রে তাকে খায়।

দূর পাহাড়ের নীল সৌন্দর্য্য আর সবুজ পারের দৃশ্য চাং দেখতে পেল না। তাদের ছোট ষ্টীমারে চলেছে দু শ তীর্থযাত্রী কোন পুরানো মন্দিরে পূজা দিতে। সবচেয়ে নোংরা এই ধর্ম্মধ্বজিদের দেহগুলি। আর তাদের গা থেকে ময়লার ও ধার্ম্মিকতার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। তবু এরাই চাং-এর স্বদেশবাসী!

হাঁ, এরা সকলেই তার দেশের লোক। যেখানে ষ্টীমার এসে থামে সেখানে পথের ওপর যে সকল অন্ধকে সে দেখেছে, যে নগ্ন ছেলেমেয়েরা দৌড়ায়, আর ঐ সব ঝগড়াটে স্ত্রীলোকেরা, ধূর্ত্ত দোকানদার-গুলো, আর বিকৃত অঙ্গ তুলে ধরে যে ভিক্ষুকের দল খালি চেঁচায় তারা সবাই তার স্বদেশবাসী! মুহূর্ত্তের জন্য অন্য একটি দেশের জন্য তার অন্তরটা কেঁপে ওঠে। তার মনে হয়, অবশিষ্ট জীবনটা তার পিতার পরিষ্কার দোকান-টুকুতে কাটিয়ে দেবে। নিউইয়র্কের পথঘাটগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার, সবচেয়ে ভাল।

ফিরে তাড়াতাড়ি সে কেবিনে ঢুকে বসে পড়ল। একটা চিঠি লিখল, কিন্তু তার বাবা অথবা মার কাছে নয়—মলির কাছে। অস্ফুটে বল্ল, "তুমিই ঠিক মলি, আমি বোকা ছাড়া কিছু নই।"

এর পর অনেকবার সে মলির কাছে চিঠি লিখল। কেন, সে নিজেই জানে না। মলি তার কথা ভাবে না বলেই, এখন তার মনে হ'ল, চির-কালের জন্য তার দেশ হারিয়ে গেছে। এ দেশ তার স্বপ্নের মত নয়, আর স্বপ্নের মত নয় বলেই এ তার কাছে কিছুই নয়।

যাদের কাছে তার ভাই তাকে পাঠিয়েছিল তাদের সাথে সে ঝগড়া করতে শিখে ফেললে। তাদের ভাষা বলতে গিয়ে ভিক্ষুকটাকে মুড়াতে শিখল—যাতে সে টাকা বাঁচাতে পারে দর কষাকষি করে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে নিজের উপর রাগ ক'রে উঠত—এখানে এসেছে বলে। কেন সে বাবার দোকানে না বসে হাজার হাজার মাইল দূরের অলীক স্বপ্ন দেখে এখানে এসেছে? সুতরাং সে মলির কাছে লিখল। তাকে চিঠি লিখতেই হবে কোথাও, কিন্তু তার বাবাকে নয়, বন্ধু বান্ধবদের কাছে নয়, তাদের জানতে দেবে না যে সে এতটা অনুতপ্ত হয়েছে।

মলি কিনের কাছে সে লিখল, নোংরা, মাছি আর ভিক্ষুক—এই তিনটি বিষয়ে এই দেশের জুড়ি আর দেখিনি। আর এই আমার দেশে আমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হয়—পাছে কেউ চুরি করে, এই আমার দেশে পুরুষদের চুরি করে নেয় অথচ কেউ টু বাক্যটি বলে না। আর···

এমনি করে সে অন্তরের হতাশ আর অনুতাপ ব্যক্ত ক'রে, আর নিজেকে একটু স্বস্তি দেয়।

তারপর একদিন, সমুদ্রে অকস্মাৎ উত্তরের বাতাসের মতই একটি চিঠি তার কাছে এসে পৌঁছে। চিঠিটা তার ভাইয়ের কাছে আসে প্রথমই, সে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। মলি কিন লিখেছে এ চিঠি। একটা নতুন খোঁড়া কবরে সারাটি দিন খুঁজে রাত্রে সে সরাইখানায় ফিরে এল। টেবিলে পড়ে আছে চিঠিটা, খুলে দেখতে পেলে ভেতরের এনভেলাপটা, সেটাও খুলে ফেললে। তারপর পড়ে গেলো মলির বিদ্রূপাত্মক, রূঢ় ও খাঁটি কথাগুলো:—

"হে বালক" মলি তাকে সম্বোধন করেছে। আগে এই রকম কথায় চাং বিরক্ত হয়ে উঠত। এখন সে জোরেই হেসে উঠল। এমন একটা রূঢ় কথা সরাসরি তার গালে এসে আঘাত করবে এতে সে খুশীই হয়ে গেল। আঃ, শঠ, বিনীত ও ফাঁকা কথায় মুখর এই সব ব্যবসায়ী নিয়ে সে হাঁপিয়ে পড়েছে।

"হে বালক, তুমি আর কি আশা করেছিলে? তোমার কাছে যেতে আর তোমাকে চাঙ্গা করে তুলতে আমার ইচ্ছা হয়। সত্যি আমার যাওয়া হতে পারে, তোমায় বিয়ে করব বলে নয়, বুঝতে পেরেছ, তুমি

যা বলছ সে রকম যদি খারাপ হয় তবে সব কিছুকে ঝক্ ঝকে ক'রে তুলতে !"

জানালার বাইরে সরু জনবহুল রাস্তার পানে চেয়ে সে ভাবলে, মলি কিন যেন এখানে না আসে। বর্ষাশেষের এক সন্ধ্যা এটি, তপ্ত দিনের পর বর্ষা নেমেছে। আশে পাশের লোকেরা খাটিয়া পেতে শোবার উদ্যোগ করছে। পুরুষ ও নারী আর শিশুরা শুয়ে পড়ল। একটি শিশু অন্ধকারে কেঁদে উঠল, একটি কুকুর কোথায় চীৎকার করছে! জন চাং এদের দিকে তাকিয়ে রইল। এরাই তার দেশের লোক, সে চাইল না যে মলি কিন এখানে আসে।

আবার সে ঘরে ফিরে গেল, একটি কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে চিঠির উত্তর দিতে বসল। লিখে সে চলল, কেবল লিখে চলল, তারপর সবশেষে একটু থেমে সে দুটো লাইন যোগ করে দিলে, "এমন কি, এই কেরোসিনের দীপটি পর্য্যন্ত আমেরিকান। তুমি বরঞ্চ আমেরিকায়ই থাক।"

অবশ্য তার নিজের আর ফিরে যাওয়া হয় না। অন্তরে তার এটুকু অহঙ্কার ছিল। স্কুলে সে চৈনিক ছেলেদের নিয়ে জাতীয় সমিতি গঠন করেছে, কলেজে টাকা তুলে জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে। স্বপ্ন দেখেছে কত, এর পর আর তার ফিরে যাওয়া চলে না। তার নিজের দেশকেই এখন সে আঁকড়ে থাকবে। একবার সে ঘুরে এসেছে নতুন রাজধানী, আর কেবল হেঁটেছে তার পথে পথে।

এখন তার মনে হল,সে গিয়েছিল ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্কের মত একটি দেশ দেখতে পোষ্ট কার্ডের ওপর প্যারিসের ছবির মত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সে দেখতে পেল, কতকগুলো অযত্নে তৈরী আঁকাবাঁকা পথ, তাদের ধারে ধারে নতুন তৈরী সস্তা একতালা দোকানঘর। দু-তিনটা বড় বড় নতুন বাড়ী উঠেছে। তাদের আদ্ধেকটা খালি পড়ে থাকে। সিঁড়ি বেয়ে যখন উপরে উঠতে যাচ্ছিল, তখন প্রহরী তাকে বাধা দিলে।

একবার ভাইয়ের কাছে ছুটি নিয়ে সে দক্ষিণে তার মায়ের ছোট-বেলাকার গ্রামে চলে গেল। ছোট একটি ষ্টীমার, ইঁদুরে ভর্ত্তি, তারপর একটি ছোট চাকার ঠেলাগাড়ীতে চলল। দুপাশে প্রসারিত উর্ব্বর মাঠগুলি, এই তার স্বপ্নের শেষ অবলম্বন। কিন্তু যখন সে এসে পৌছল গ্রামের ভেতর, তখন সে একই দৃশ্য দেখতে পেলে। অন্য গ্রামে দেখা লোকগুলির মতই এরা। বিদেশী বলে পুরুষেরা একটু সন্দেহের চোখে দেখল, আর স্ত্রীলোকেরা চুপ চাপ সরে গেল। সরু আবর্জ্জনাময় রাস্তা, নোঙরা একটি কি দুটি চায়ের দোকান, নিস্তব্ধ চেয়ে থাকা মেয়ের দল। তার আত্মীয় স্বজনের খোঁজ করতেও চাং দাঁড়াল না। এরাই যদি তার আত্মীয় হয়, তবে সে যেন তা জানতে না পারে। সে ফিরে গিয়ে ঠেলাগাড়ীর চালকটাকে বললে, "ওহে, আমি এখনই ফিরে যেতে চাই।"

উঁচু নীচু গ্রাম্য পথটির দোলানি খেতে খেতে সে খুশী হয়ে উঠল মলি কিনকে ওরকম ভাবে লিখেছে বলে। সে খুশী হয়ে উঠল যে, সে মলি কিনকে লিখেছে, "তুমি যেখানে আছ সেইখানে থাক; আর জর্জ্জ লিউকে বিয়ে ক'রে একটি পরিষ্কার ফ্লাটে বাস কর। সেখানে থাকবে একটি ইলেকট্রিক ষ্টোভ, পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা, ধবধবে ঝকঝকে সব জায়গা।"

তবে মলি কিনের চিঠির জন্য সাংহাইতে আসা—কি ভাবে সে তৈরী হতে পারে? এ চিঠিটা এসেছে তিনমাস পরে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে। খামের ভিতরেই চিঠিটার উষ্ণতা সে অনুভব করতে পারে। ভারী কাগজটা তার আঙুলে চেপে ধরল। এতদিন সে তার ভাইয়ের হিসাব খাতার পাতলা নরম কাগজগুলোই নাড়াচাড়া করেছে। খুলতে গিয়ে চিঠিটা খসখস করে উঠল। আর কতগুলো অবিশ্বাস্য, দৃঢ়তাপূর্ণ কথা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। মলির চঞ্চল চাউনি সে দেখতে পাচ্ছে, আর শুনতে পাচ্ছে তার হাসির শব্দ

"জন ডিউই চাং আমি আসছি।" চিঠিটা এই ভাবেই আরম্ভ হয়েছে, "আমার মন বদলেছে, তুমি আমায় জয় করেছ। আমি অনুমান করছি আমার পুরানো পল্লীশহরটি এখন আমায় চাইছে—আর তুমিও বোধ হয় তাই ভাবছ... "

তারপর একটুকরো খবর, দু-একটি কৌতুক, "জর্জ্জ লিউ চলে গেছে, আর সে বিয়ে করেছে সোডার দোকানের মেয়েটিকে। আমি ত জানতাম সে ততটা চটপটে নয়। যা হোক্, আমায় এখন আর কেউ উত্যক্ত করে না।"

তারপর সব শেষে লিখেছে, "আমি টিকিট কিনেছি। এই চিঠি পাওয়ার সপ্তাহ পরেই সেখানে পৌছব। বাবাও চলেছেন তাঁর ব্যবসায়ের জন্য। আর তোমাকেই আমার দরকার। তুমি যদি চাও, তবে আংটি গড়িয়ে রাখতে পার।"

বিমূঢ় ভাবে সে চিঠিখানিকে ভাজ করল। এ কয়দিন ধরেই তবে মলি ক্রমশঃ তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর সে তা মোটেই টের পায়নি! এখন তার ভাবনা হ'ল মলিকে নিয়ে সে কি করবে? তার একটা তীব্র অনুভূতি হ'ল যে এখন সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। মলি আসার আগেই। সহসা সে সব কিছুর জন্য লজ্জিত হ'ল, ক্ষুব্ধ হল ময়লা ও দরিদ্রতার জন্য, লজ্জা পেল এই সব মূর্খ বোবা মেয়েদের ও তার মোটা ভাইটিকে মনে করে—আর এই তার সরাই, আর এই তার ঘর!

আয়নার কাছে ছুটে গিয়ে নিজের দিকে তাকালে। নিজের উপরও সে বিরক্ত হল। তার চুলগুলো বড় হয়ে গেছে। বিন্যস্ত নয়। পরেছে একটা ময়লা শার্ট। নিউইয়র্কে সে কখনই এ রকম ভাবে থাকতে পারত না। এতদিন এগুলো তার খেয়ালেই আসেনি। কিন্তু এখন, এখন, একটি সপ্তাহে সে কি করে উঠবে?

তবুও একটি সপ্তাহের মধ্যে সে সব কিছুই করে উঠল, প্রায় সব কিছুই। এই দেশে তাদের থাকবার জন্য অন্তত একটি পরিষ্কার বাড়ী ও স্থান থাকা তার চাই-ই। ভাইয়ের কাছে চাং ছুটে গেল এবং কতগুলো টাকা ধার নিল।

যেখানে তার ভাই থাকে আর তাদের দোকান, সেই চাইনিজ পাড়ায় সে বাড়ী ভাড়া করলে না। বিদেশীদের—আমেরিকানদের—যে জায়গা

আছে তার ধার ঘেঁষে একটি ছোট বাংলো সে ভাড়া করল। স্বপ্নের অপমৃত্যুর হাত থেকে মলিকে বাঁচাতে হবে। উঠানে তার একটি কাঠগোলাপের গাছ। অনেক দিন ধরে এই ছোট বাংলোটি খালি পড়ে আছে। চাং তার ভাইয়ের বাড়ী থেকে একটি জোয়ান গোছের ঝি নিয়ে এসে মেজেঘষে সব পরিষ্কার করে ফেলল। তারপর বিদেশী দোকানে গিয়ে মলির জন্য কতগুলো জিনিষ খরিদ করে আনলে ; একটি রাগ, দুটো চেয়ার, একটি খাট, একটি টেবিল, কয়েকটি পেয়ালা প্লেট, জানালার পর্দা ও খানকতক ছবি।

তারপর খুব তাড়াতাড়ি তাকে যেতে হ'ল জাহাজঘাটে। আর ঘণ্টা খানেক মধ্যেই মলির জাহাজ এসে ডকে ভিড়বে।

সেখানে দাঁড়িয়ে জনের মনে হ'ল, মলির এখানে আসাটা নিতান্ত অসম্ভব। সে তা ভাবতেও পারে না। চারিদিক তাকিয়ে তার একটা বেদনাদায়ক অনুভূতি জাগল। যেন এই ছিন্নবাসপরিহিত কুলীদের জন্য সে-ই দায়ী, যেন ওই ধূলিপূর্ণ মিঠাইর থালা হাতে ফেরীওয়ালাদের জন্য সে-ই দায়ী। ধবধবে পোষাক পরা কয়েকটি শ্বেতকায় লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল—জন তাদেরও ঘৃণা করল, তাদের পরিচ্ছন্নতা ও অকুণ্ঠভাবের জন্য। তারপর সে বেশ একটু কৃতজ্ঞতার সহিত চেয়ে রইল দুজন চৈনিক তরুণীর দিকে। তারা লম্বা সাটিনের পোষাকে সজ্জিতা হয়ে তাদের মা ও ঝির সাথে এই দিকে এসেছিল। এই ত এইখানে তারা। আঃ ঐ উঁচু দেয়ালগুলোর আড়ালে এমনিতর কত লোক হয় ত বাস করছে।

কিছু ভাববার আগেই জাহাজটি এসে ডকে ভিড়ল—সিঁড়ি তোলা হ'ল। ঐ ত মলি! চাং দৌড়ে গেল সামনে। মলি তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে রাখল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাং তখন তার দিকে চেয়ে আছে। একটু হেসে মলি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে, "বাবা রয়েছেন।" চাং মলির পেছনের ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করল। মলি তাকে জানাল, "তোমার বাবা-মা চিঠি দিয়েছেন।"

হাতের ব্যাগটি খুলে চিঠিগুলো বার করে মলি তাকে দিলে। চাং তার দিকে তাকাল। মলিকে এত সুন্দর ত কখনও দেখেনি সে, কিন্তু কতকটা বিদেশী বলে ঠেকে! মুখের দিকে না তাকালে ঐ নীল পোষাকে মলিকে ঠিক আমেরিকানদের মত দেখায়।

মলি তার পাশে কৌতূহলী হয়ে তাকাল। "অদ্ভুত!" এগুলো মজার বলে ত লাগছে না! এর আগে দেখিনি অথচ সবই যেন দেখেছি!"

কাষ্টম্‌স্ হাউস ও ডক পার হয়ে সে একটি ট্যাক্‌সি ডাকতেই মলি তাড়াতাড়ি তার হাত ধরল, "চল না আমরা ঐ মজার জিনিষগুলোতে চড়ি।" একটা রিক্সা সে দেখালে। "ট্যাক্‌সি সবখানেই মেলে।"

সুতরাং মুহূর্ত্ত পরে হাঁপিয়ে উঠা রিক্‌শাওয়ালার পেছনে তারা বস্‌ল। মলি তার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌লে, "পিক্‌নিকের চেয়েও মজা, নয়!"

সপ্তাহখানেক পরে। কাঠগোলাপের গন্ধ মাখা ছোট বাড়ীটায় মলিকে আরও অদ্ভুত বলে ঠেকে। কিছুটা পরিবর্ত্তন তার হয়েছে কোমল পরিবর্ত্তন!

নিউ ইয়র্কে তার মুখ দিয়ে চলতি কথা খইর মত ফুটত। আর এইখানে, এই চীনা পল্লীর প্রান্তে তার চটপটে ভাব যেন উবে যাচ্ছে। সে যেন ক্রমশ বোবা হয়ে উঠছে, আর চলতি কথাগুলোও কদাচিৎ শোনা যায়। চাং ভয় পেল। মনে মনে ভাবল, নিশ্চয়ই মলি এসব ঘৃণা করছে। আমি যেমন হয়েছিলাম সেও তেমনি হতাশ হয়ে উঠেছে। মলি যা ভেবেছিল তার চেয়েও এসব খারাপ।

এক সময় মলি তাকে প্রশ্ন করল, "তুমি যে লিখেছিলে নোংরামি আর গরীবদের কথা, সে সব কই?"

সে আরও ভয় পেয়ে গেল। তাকে এড়াবার জন্য সে জবাব দিল, "আমি একটু খুঁটিনাটি কথাই লিখেছিলাম।"

এক সময় চাং তাকে বলেছিল যে মলি আসুক বা না আসুক, সে তার নিজের দেশকে সর্ব্বদাই বেছে নেবে। আর এখন … বুঝতে পারলে, খাবার সময় টেবিলের ওধারে মলিকে পাওয়ার কি অর্থ। গভীর রাতে দুটি বাহুর উষ্ণতায় মলিকে পাওয়ার কি মানে! মলি যদি এদেশে আর থাকতে না চায়, তবে এদেশ এখন তার নিজেরও দেশ নয়। কোন দেশই তার নয় যেখানে মলি নেই। ধর, এখনই যদি, যখন এই ছোট ঘরটিকে বাড়ী বলে ভেবেছে, মলি নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে চায়।

এইখানে বাস করে, যেখানে সারাদিনের কাজের শেষে সে ফিরে আসে, তার সমস্ত দেশটাই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। এখন সে ঐ আবর্জ্জনাভরা নর্দ্দমা-সঙ্কুল পথে আনাগোনা করতে পারে, এখন সে অন্ধ ও পঙ্গু ভিক্ষুকদের সইতে পারে, মূর্খ দোকানদারদের শঠতাও তার কাছে তুচ্ছ বলে ঠেকে, কেন না সে জানে রাত্রে মলির কাছে ফিরে এসে তার কথা শুনতে পারা যায়, আর হাসতে পারে।

কিন্তু এইখানেই দিন দিন মলি নিরানন্দ হয়ে পড়ল। চাং ঠিক করল যে মলিকে বিদেশী এলাকায় নিয়ে যাওয়া উচিত, নিউইয়র্কের আবহাওয়া সেখানে মিলবে।

তারা ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা বলত। মলির চাইনিজ ভাষা এখনো আয়ত্ত হয় নাই। প্রথমে চাইনিজ ভাষা নিয়ে তারা মাঝে মাঝে কৌতুক করত—যখন মলি তাকে এটা কি ওটা কি কি বলে সুধাত। তারপর কি এর কাছে দুএকটা শব্দ শিখে নিয়ে সে জানাল তার একটি মাষ্টার দরকার। জন একজন বুড়ো পণ্ডিতকে চাইনিজ শেখাবার জন্য নিযুক্ত করল।

দুমাসের শেষে একদিন সকাল বেলায় খেতে খেতে মলি তাকে বলল, "তুমি কি বল, যদি আমি এই নিউইয়র্কের পোষাক ছেড়ে এখানকার মেয়েদের মত পোষাক পরি?"

জন অবাক হয়ে তাকালো, সে ভাবতেই পারলো না এরকম পোষাকে মলিকে কি রকম মানাবে! বিদেশ থেকে আনা পোষাকেই মলিকে ভাল মানায়।

"দেখো—"

মলি তাকে বাধা দিয়ে বললে, "দাড়াও, আমায় না দেখে কিছু বলো না।"

সে রাত্রেই বাড়ী ফিরে সে অবাক হল। ইতিমধ্যেই মলি বাইরে থেয়ে নিজেই একটি লম্বা সবুজ ঘনবুনানো সিল্কের পোষাক কিনে এনেছে। কলারটা উচু। তার খাটো চুলগুলোকে আঁচড়ে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। সেই লম্বা পোষাকের উপর তার গোলগাল মুখটি একটি কমনীয় ফুলের মত। মুগ্ধ হয়ে সে চেয়ে রইল।

মৃদুস্বরে মলি প্রশ্ন করল, "পছন্দ হয়েছে?"

"হাঁ" এর বেশী কথা জোগাল না। পরে খাবার সময় আস্তে আস্তে সে ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "পোষাকটা অদ্ভুত বলে ঠেকছে না?"

"মোটেই না। তার চেয়েও অদ্ভুত ঠেকছে এইটে, যে এতদিন আমি যেন আমার কাপড় পরেই ছিলাম না!"

কিন্তু ভাইয়ের দোকানে যেতে আসতে চাং একথা ভাবলো, এখনো তো ছোট বাড়ীটা মলিকে আড়াল দিয়ে রেখেছে, সে এই পল্লীর পথ দিয়ে রোজই আসে আর যায়—আর মলি ত শুধু ওদিকে বিদেশী এলাকায় যায়। সেখানে বড় বড় বাড়ীগুলি আর মোটর গাড়ী দেখতে পায়। সে বেশ খুসী হলো যে ছোট বাড়ীটা মলিকে আড়াল দিয়ে রেখেছে। দুর্ভিক্ষ ও ডাকাতি ও যুদ্ধের কথাবার্তা সে অল্পই বলে আর তাও সতর্ক হয়ে। কিন্তু মলি তাতে বিশেষ উৎসাহিত নয়। সে সব জিনিস এ জায়গা হতে অনেক দূরে—যেমন মট্‌ ষ্ট্রীট হতেও তারা দূরে ছিলো।

ইংরেজী কাগজ মলি পড়ে না, চীনা সংবাদপত্রও সে এখনও পড়তে পারে না। সুতরাং এই ছোট বাড়ীটার মধ্যেই মলির জীবন সীমাবদ্ধ। এ চিন্তাটায় চাং বেশ স্বস্তি বোধ করল। সে মলিকে নিরাপদে ও খুসীতে রেখেছে, তাকে জানতে দেয়নি অন্ধকারময় এই পল্লীসহরগুলোর কথা। এখানেও মলি আমেরিকায় যেমন তেমনি আছে, শোচনীয় সত্য হতে দূরে।

তারপর একদিন প্রকাশিত হলো মলি অন্তঃসত্ত্বা। যেন ঠিকই জানে এমনি ভাবে সে বল্লে, "ছেলে হবে দেখো"। এখন চাংএর মনে হল কেন সে আঁটাসোটা আমেরিকান পোষাক ছেড়ে ঢিলে চাইনিজ পোষাক পরেছে। মলিই বলল, "যখনই জানতে পেরেছি এটা, তখনই ভেবেছি যে এই পোষাক পরা দরকার।" সুন্দর ঝোলানো পোষাকের নীচে মলির দেহটি আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল, মধুরতর হতে লাগল সে। আর এখন পুরাণো মধ্যযুগীয় মলিন সহরগুলির মাঝে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আধুনিক জগতে মলিকে নিরাপদে রাখাই চাং এর কর্ত্তব্য।

তারপর, এক বসন্তের প্রত্যুষে, যখন তাদের ছেলের জন্ম সম্ভাবনা নিকটতর হয়ে এসেছে তারা শুনতে পেলে কামানের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। জন মলির দিকে তাকালো, মলিও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালো। জন তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছে এর অর্থ কি! কয়েকদিন যাবৎ যদিও খবরের কাগজ পড়ার সময় সে পায়নি, তবুও বাতাসে এর ধুয়ো উঠেছে। জাপানীরা এসেছে সাগর কূলে।

কামানের গোলার শব্দ আবার শোনা গেল। তারা তাদের আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে। চাং তখন মলির কথাই ভাবছে। "ভয় পেয়োনা" সে আশ্বাস দিলে, "ভয় পাবার কিছু নেই এতে। যেমন করেই হোক তোমাকে নিরাপদে রাখব।"

আঃ, সে এখানে না আনলেই পারত মলিকে! আঃ তারা দুজনেই থাকতে পারত মটষ্ট্রীটে—যেখানে সে থাকত নিরাপদে, আর সেখানে শান্তিতে জন্ম নিত তাদের ছেলেটি।

কিন্তু দুএকদিনের মধ্যেই মলির কাছে গোপন করার কিছু রইল না। শঙ্কাকুল হতভাগ্য নরনারীতে পথঘাট ভরে গেছে, একটু মাথাগুঁজবার আশ্রয় তারা চায়। এখানে সেখানে সবখানে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। দিনরাত্রি ধরে জন তখন তাদের ব্যবসায়ের জিনিষপত্র বিদেশী এলাকায় বন্ধুদের দোকানে স্থানান্তরিত করতে লাগল।

একটি দিন আর একটি রাত কাটল অসম্ভব পরিশ্রম করে। মলির কি খবর কিছুই সে জানে না। এটুকু খালি জানে যে ছোট বাড়ীটা তবু যাহোক নিরাপদ। আসা যাওয়ার মাঝে আগুনের শিখা সে লক্ষ্য করত—না, এদের গতি অন্যদিকে। ভোরবেলার সে বাড়ীমুখে ছুটল। মনে মনে আশঙ্কা হয়তো মলি ভয়ে পীড়িত হয়ে পড়েছে।

দরজাখুলে দেখলে মলি সেখানে নেই। তার বদলে যে সব নরনারীর দৃষ্টি হতে এতদিন সে মলিকে আড়াল করে রেখেছে তারা সেখানে ভীড় করে আছে। যে রাগটা সে মলির জন্য কিনেছিল, তার উপর এক দঙ্গল পুরুষ নারী ও শিশুরা বসে। ছোট ছোট মূল্যবান পুটলী তাদের হাঁটুতে, তাদের মুখগুলি আতঙ্কে, বিমূঢ়তায় ও ক্লান্তিতে কদর্য্য। পূর্ব্বাচলে কামানের সদম্ভ গর্জ্জনের মধ্যে তারা স্তব্ধ হয়ে ভয়ার্ত্ত চোখে তার দিকে তাকালো।

তিনদিন তিনরাত্রি ধরে অবিশ্রান্ত কামানের গর্জ্জন। আর আধ মাইল দূরে বড় বড় বাড়ীগুলি ধূলিসাৎ হবার বিকট শব্দ। তাদের এই ছোট ঘরটি গৃহহীন আশ্রয়প্রার্থী লোকে পূর্ণ হয়ে তখনো মাথা তুলে আছে। মলির খবর জানবার জন্য জন রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলো।

সেইখানে দাঁড়িয়ে মলি। একদিন গর্ব্বভরে কেনা ইলেকট্রিক উনানের ওপর যতগুলো পারা যায় পাত্র চাপিয়ে মলি দাঁড়িয়ে আছে। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। কিন্তু তার চোখ দুটো তখনও সতেজ, উত্তেজনায় বড়। তার পোষাকের ওপর একটি আমেরিকান চাদর বাঁধা, সে আর তার ঝি-টি দাঁড়িয়ে খাবারগুলো তখন আস্তে আস্তে হাতা দিয়ে নাড়ছে।

"কি হচ্ছে?"

উত্তেজিতস্বরে মলি জবাব দিল, "ওরা সব ক্ষুধার্ত্ত, হতভাগ্যরা না খেয়ে রয়েছে। এদের বাড়ীঘর দোর সব পুড়ে গেছে, এরা ছুটে পালিয়ে এসেছে।"

সে বল্ল, "আমরা এদের সবাইকে খাওয়াতে পারি না।"

"তা পারি, এদের সবাইর জন্য খাবার এখানে রয়েছে।"

কি করবে চাং ভেবে পেলো না। হঠাৎ সে বলে উঠল, "ঘর থেকে বদ গন্ধ বেরুচ্ছে।" ভাতের মিষ্টি গন্ধ ছাড়িয়েও স্নান না করা দেহের ভোঁট্‌কা গন্ধ ঘরটাকে ভরে রেখেছে। এত বিশ্রী যে মলির সামনে

দাঁড়িয়ে সে বিরক্ত হল। মলি বিরক্তির সুরেই জবাব দিলে, "তোমার নিজের জন্য লজ্জা করা উচিত।" তারপর খাঁটি মাকিনীস্বরে বললে "ওহে কৃষ্ণ জোয়ারদার, এরা তোমার আপনার লোক।"

তাড়াতাড়ি একটা পাত্রের ঢাকনিটা সে খুলে ফেললে। তারপর টেবিলের উপর প্লেটগুলোকে ভর্ত্তি করে দিলে। "গী, তুমি চলে যাবার পর আমি যা শিখেছি -। যদি আগে জানতাম!"

মলি চটপট করে হাত ধুতে লাগলো। তার সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে গেছে। চাং আস্তে আস্তে বলল, "এতদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম এদের থেকে তোমায় দূরে সরিয়ে রাখতে। এরা—এই হতভাগ্য লোকেরা, ভিক্ষুকের দল আর নোঙরামি হতে সরিয়ে।"

মলি একটু থেমে চাংএর দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকালে! "জন ডিউই চাং, তুমি কি বলতে চাও যে ইচ্ছে করেই এসব আমার কাছ থেকে আড়ালে রেখেছিলে? কেন তুমি দিনগুলোকে একঘেঁয়ে করে আমার প্রাণান্ত করে তুলেছিলে?"

বোকার মত চাং প্রশ্ন করলো, "একঘেঁয়ে?"

ঝঙ্কার দিয়ে মলি বলল, "হাঁ, কিছুই করবার ছিল না। আর সে সময় এই সমস্ত লোকেরাও ছিলো—"

অস্ফুটে চাং বললো, "ছিলো, এরা লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোক!" চাং কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

মলি বলল, "যাক্, তাহলে এইই ঠিক হল।"

"কি ঠিক হল?"

"ঠিক হল আমি কি এইখানেই থাকব, না নিউইয়র্কে!"

বিমূঢ়ের মত জন তার দিকে চাইলো। মলি তার দিকে তাকিয়ে হাসলে, তার সেই উচ্ছ্বসিত পুরানো-হাসি। এমন তারা হাসির শব্দ সে বহুকাল শোনে নি, সেই যেদিন মটষ্ট্রীটে মলির পিতার হিসাব খাতায় কর্ম্মরতা মলিকে সে ছেড়ে এসেছে সেদিন হতে।

"বোকা একটা, বুঝতে পাচ্ছ না; আমি চাই কিছু একটা করতে। আর এখানে প্রচুর কাজ পড়ে আছে।"

জন একটু একটু বুঝতে পারলে। মলি এইসব লোকজন দেখে মোটেই হতাশ হয় নি। তারা শুধু বুভুক্ষু. সে তাদের খাওয়াতে চায়। যদি তারা নোঙরা হয়ে থাকে—যেন সে জনের চিন্তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে—এমনিভাবে উৎসাহভরে মলি বলে চলল, "আর যখন এদের খাওয়া হবে, আমি তাদের শিশুদের স্নান করিয়ে দেব। বড়রাও স্নান করতে পারে।"

তারপর চাংকে প্রশ্ন করল, কতদিন এই যুদ্ধ চলতে পারে বলে মনে কর?

সে জড়িতস্বরে উত্তর দিলে, "ঠিক জানিনা।"

মলি একটু খুসী হয়ে মতলব এঁটে নিলে, "আমরা এদের সবাইকেই স্নান করাতে পারি, যদি যুদ্ধটা বেশ কিছুদিন চলে।"

এবার চাং মলিকে বাধা দিলো, "মলি, অন্ততঃ খোকার জন্যও এখন তোমার অন্য কোথাও যাওয়া উচিত! যুদ্ধের কথা কিছু বলা যায় না।"

মলি ঘুরে দাঁড়াল। তারপর হাত দুটোকে মাজার উপর রাখলে। "আমার খোকার জন্ম হবে সেই দেশে যেটা তার নিজের দেশ। তার নিজের দেশে তার নিজের লোকের মাঝে।"

মলি দৃঢ়স্বরে একথাগুলো বললে; তারপর গলার স্বরকে সহজ কর্ত্তব্যপরায়ণ করে নিলে, "এই টে্টা নাও, ওই হতভাগাদের খাওয়াওগে, তাড়াতাড়ি করো।" মলি আজ কত তৃপ্ত, "এখানে আমাদের অনেক কিছু করবার আছে।"

"দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"

শ্রী বিমলকৃষ্ণ সরকার এম-এ

চণ্ডীদাস, কী অমৃত ছন্দোরূপে তব
অন্তরের সুগভীর বাণী অভিনব
"দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"
করিলে প্রকাশ। তোমার অতৃপ্ত হিয়া
বাশুলী মন্দির তলে শুভ্র আঙিনাতে
হয়ত জ্যোৎস্না ঘেরা পূর্ণিমার রাতে
চেয়েছিল সার্থক মিলন, নিকষিত
হেম সম রজকিনী প্রেমে। সমাহিত
চিত্তে তাই এলে তুমি দেবতার মত
সম্মুখে প্রেয়সী তব লজ্জা অবনত!
করপুটে প্রেম অর্ঘ্য—অপূর্ব সম্ভার,
অভিষেক হল তব মানস প্রিয়ার
গোপন অন্তর মাঝে। বিশ্ব-বৈতালিক
রচিল মিলন-গাথা, নব মাঙ্গলিক।

ময়ূরপঙ্খী

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আট

মীনা! মীনা! আরে সব এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছে না কি? ওরে ও জয়া! জয়া! মাঁ তোকে দিয়ে যে কাজ করাতে চায়···সে একটা আস্ত পাখণ্ডী···ওরে ওই! শুনছিস, বেলা দশটা বেজে গেছে রে।

প্রাতে বেলা দশটার সময় ভোলা এসে জয়ন্তকে ডাকা-ডাকি করছে। কেউ সাড়া দেয় না। মীনার বাড়ীর সেই বারান্দার দরজায় এসে সে ধাক্কা দিচ্ছিল। দরজা ভেতর থেকে লক্ বন্ধ করা। এদিককার এই ঘর-দুখানা মীনার নিজস্ব—এ যেন একটা মহলের মত। বারান্দার ওই দরজার লক্ বন্ধ থাকলে আর কেউ এধারে আসবার পথ পায় না।

ভোলার ডাকে জয়ন্তর ঘুম ঠিক ভাঙেনি, ভাঙলেও তার বেরুবার কোন উপায় ছিল না; তার ঘরের দরজা বন্ধ করা—মীনাও অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাজেই ভোলার ডাক—সেও শুনতে ঠিক পায় নি।···

ডাকা-ডাকি শুনে বাঁকা পঞ্চা এসে ভোলাকে বললে:

আহা! ভোলাবাবু ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে—এত ডাকা-ডাকি করছ কেন?

আরে! কেন? আসছে সপ্তাহে প্লে—প্ল্যাকার্ট পড়ে গেছে—আর কি তিলার্দ্ধ ঘুমবার সময় আছে। আমাকে কাল থিয়েটারে সারা রাত কাজ করতে হয়েছে।

বাঁকা পঞ্চা একটু থতমত খেয়ে বললে: প্ল্যাকার্ট পড়ে গেছে? তা—তা—ওদের যে সব টাকা দেবার কথা ছিল—তারা এখানে কাল রাত্তিরে রিহার্স্যাল দিতে এসেছিল—মাইনার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

কি রকম? মাইনে কি তারা তোমার কাছে চাইছিল?

না—না—না—আমার কাছে চাইবে কেন? তারা আপনা-আপনি বলাবলি করছিল কি-না, আমি শুনেছি—এই···আর···

আর কি? মীনার কথা···এই ত?

হ্যাঁ—না—তা থিয়েটার খোলবার আগেই··

আগেই টাকাটা দেবার কথা—টাকা না দিলে মীনা নামবে না···এই ত?

না না, হ্যাঁ—তা কথাটা কি জানেন—থিয়েটার না চললে—ধরুন যদি আপনাদের প্লে না জমে···তা হ'লে—

তা হ'লে মীনা টাকাটা কি করে পায়?

আহা ভোলাবাবু···তুমি অত চট্‌সাঁই হচ্ছ কেন?

হব না···মাসে মাসে কতগুলো টাকাই না তোমার এখানে দিতে হ'ল বাপু! জয়ার যেমন···

টাকাটা ত আর তুমি দাও নি ভোলাবাবু···তবে কেন?

সলিসিটর-এর আফিসে এটর্নি হতে গেলে প্রিমিয়াম দিতে হয় -বাবা থিয়েটারের য়্যাক্ট্রেস তাকেও প্রিমিয়ম দিতে হবে···

তা—না—হ্যাঁ—কথাটা সেই রকমই ছিল···তুমি ভোলাবাবু, মাঝখান থেকে খাপছি কাট কেন—

ওইটে বুঝতে পার না—না? অতগুলো টাকা—গা-টা করকর্ করে না···

এ-সব কাজে কর-করে টাকাই ছাড়তে হয় ভোলাবাবু।

কত টাকা তোমার চাই?

তিনহাজার টাকা দেবার কথাই ত হয়েছে ভোলাবাবু।

আচ্ছা তা হচ্ছে। টাকা আমার কাছেই আছে···জয়া উঠুক—দিচ্ছি সব ব্যবস্থা করে।

বেশ···বেশ···বেশ···দেখ ভোলাবাবু, ওরা কাল অনেক রাত অবধি জেগেছে ··তাই—

এমন সময় মীনা উঠে দরজা খুলে দেখে যে ভোলা আর বাঁকা-পঞ্চা দুজনে কথা কইছে। এই যে ভোলাদা, তুমি কখন এলে?

অনেকক্ষণ এসে দরজায় ধাক্কা, ডাকা-ডাকি—তোমাদের ঘুমই ভাঙে না···আজ বাদে পরশু প্লে···প্ল্যাকার্ট মারা হয়ে গেছে—তোমাদের কি বল না···আরামসে অভিনয়

করবে···সুনাম হবে—পয়সা কড়ি হবে···আর এই ভোলা মাতাল খেটেই মরবে···

মীনা হাসতে হাসতে বললে : ভোলাদা, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক···প্লে হোক্, টাকা-পয়সা হোক্, সুনাম হোক্।

বাঁকা পঞ্চা বললে : মীনা মা, ভোলাবাবুর কাছে তোমার টাকাটা আছে · জয়ন্তবাবু উঠলে ওটা দেখে-শুনে নিয়ে—তোমার মার কাছেই দিয়ো...আমার আবার স্নান আহ্নিকের বেলা হয়ে গেল···যাই গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি···আজ আবার ললিতা সপ্তমী···প্রাতে কুক্কুটী ব্রত আছে···

ভোলা মুখটা গম্ভীর করে বললে : চূড়ামণি মশায় কুক্কুটী ব্রতটা কি···রামপাখী দিয়ে হালুয়া তৈরী হয় বুঝি!

দুর্গা শ্রীহরি ··ভোলাবাবু হিন্দুর ছেলে, কুক্কুটী ব্রত জান না·· আরে হ্যাঃ···তোমরা আজকাল একেবারে মেলেচ্ছ হয়ে পড়েছ···আরে কাল যে শ্রীরাধিকের জন্মউচ্ছব, নাঃ তোমরা একেবারেই মেলেচ্ছ হয়ে গেছ, ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর কোন শ্রদ্ধা রাখ না, আরে ছ্যাঃ—

আরে মেলেচ্ছরাইত কুক্কুট একাদশী করে···চূড়ামণি মশায়—

মীনা ভোলাকে বললে : আঃ কেন অমন করছ : ভোলাদার সবার সঙ্গেই · কি ইয়ারকি? যাও বাবা তুমি যাও, স্নান পূজো করগে···

হ্যাঁ-তা-না-যাই মা—হ্যাঁ টাকাটা তা হলে বুঝে নিয়ো, বুঝলে, যেমন কথা আছে।

আচ্ছা বাবা···

বাঁকা পঞ্চা চলে গেল।

দেখ মীনা, আসছে সপ্তাহে প্লে—তোমার টাকা, আমার পকেটেই আছে—সে জয়া উঠলেই দিয়ে দেবো··· কিন্তু···তোমাদের রিহার্স্যাল বোধ হয় হয়নি, কাল শুনলাম···তার পর আমাকে দয়ে মজাবে নাকি?

আচ্ছা ভোলাদা, তুমিও এই রকম কথা বলবে—আমি জানতাম যে তুমিই এদের মধ্যে মানুষের মত মানুষ, তুমিও!

তাইত মীনা, তুমি আমায় একটু বেশী চিনে ফেলেছ দেখছি···

থাক্‌গে ও কথা, তুমি চা খেয়েছ? বোস, চা দিতে বলি।:

জয়া কোথা?

পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে?

এখন ওঠেনি?

কি জানি বলতে পারিনি? এ ঘরে আমি ঘুমুচ্ছিলাম। বোধহয় উঠে থাকবে · তুমি বোস, আমি আসছি···সারারাত সে ঘুময়নি, সকালে দু-পেগ খেয়ে তবে শুয়েছে।

হতভাগা সেদিন মদ খেতে শিখলে, এর মধ্যে মাতাল হয়ে গেল ··সারা রাত বুঝি মদ গিলেছে? খাওয়া-দাওয়া করেছে, না···

হ্যাঁ খাইয়েছি···

সিগারেট কোথা গেল?

ওই যে ড্রয়ারটার মধ্যে আছে, তুমি নাও না—আমি চাকরটাকে বলি চা দিতে···এখনি আসছি ভোলাদা···বলেই আসছি···তুমি একটু বোস।

ভোলা ড্রয়ারের ভেতর থেকে সিগারেটের টীন্ বার করে ধরালে।

টেবিলের ওপরে মীনার একখানা এড্‌না-লোরেঞ্জসের ওখানে তোলা ফোটোগ্রাফ ছিল, ভোলা সেই ছবিখানা নিয়ে খানিক ভ্রূ কুঁচকে বেশ ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, কাছে-দূরে রেখে দেখতে লাগল...

মীনা ফিরে এসে বললে, ও ছবি নিয়ে কি করছ ভোলাদা?

ভাবছি—প্রোগ্রামে তোমার এই ছবিখানা ব্লক করে ছাপাব নাকি?

ওমা, সে আবার কেন?

ব্যবসা···ব্যবসা···বোকা ঠকিয়ে খাওয়া···আর তোমারও দর বেড়ে যাবে···

বেশ চালাক-চালাক দেখাচ্ছে কিন্তু···

আমায় খুব চালাক দেখলে নাকি? আমার ছবি···

নাঃ খুব বেশী নয়—একটুখানি। এ চেহারায় সে চালাকী তেমন নেই, তবে তোমার মধ্যে তিনি আছেন?

আমার মধ্যে তিনি আছেন?

চালাকী তেমন নেই—তবে তোমার মধ্যে তিনি আছেন?

আমার মধ্যে কিনি আছেন?

যিনি অতি বড় ধূর্ত্ত—অতি বড় ধড়িবাজ···যাকে বলে ধরি মাছ না ছুঁই পাণি···

ভোলা একটু বিস্মিতভাবে বললে :

মীনা তোমার চেহারাটা কিন্তু—

কিন্তু কি ?

নাঃ এই রকম ধাঁজের চেহারা আমি দেখেছি আর একজনের···

কোথায় সে ভোলাদা ? সেও কি আমারই মত ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি না কি ?..

ভোলা জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে তাঁর স্মরণে প্রণাম করে বললে : রাম! রাম! তিনি মার তুল্যি—তাঁর সম্বন্ধে কোন ভাব প্রকাশের অধিকার কারও নেই—আমার ত নয়ই।···কিন্তু আশ্চর্য্য, এতদিন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথাটা ত একবারও মনে হয়নি।··আশ্চর্য্য!···

মীনা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে : সে কে—ভোলাদা ? তাঁকে একবার আমায় দেখাতে পার ?

তাঁকে কি করে দেখাব···ও বাবা !

আচ্ছা তাঁরও ডান দিকের কপালে চুলের পাশে আমার মত একটা লাল জড়ুলের দাগ আছে ?

আছে ··কিন্তু সে কথা তুমি জানলে কি করে ?

তাঁরও গালের ডান দিকে এমনি খয়েরের ছোট টীপের মত একটা তিল আছে—না ?

মীনা সত্যিই ত—তুমি কি তাঁকে দেখেছ ?

না—এমনি বলছি···আমার চেহারার সঙ্গে মিল আছে বলছ না, তাই—

ভোলা তীব্র দৃষ্টিতে একবার মীনার পানে চাইলে ; তার পর বললে : মীনা, আমার সঙ্গেও দেখছি অভিনয় করছ।

বারে! অভিনয় করা যে আমার পেশা—অভিনয় করব না ? না ভোলাদা, সত্যি বলছি—অভিনয় করিনি···তুমি বললে কি-না আমার মত চেহারা, তাই বলছি। তিনি কে ভোলাদা, বড়লোকের স্ত্রী—বড়লোকের মা ?

আমার এক সহপাঠীর—বন্ধুর মা, জয়ন্তর সঙ্গেও খুব ভাব তার—

জয়ন্তবাবুর সঙ্গে খুব ভাব ? ঠিক জান ভোলাদা ?

ভোলা মীনার মুখের পানে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললে—হুঁ! দেখ মীনা, তুমি আমার কাছে লুকোতে পারনি—তোমার কি একটা লুকান খবর আছে, এই জয়ন্তর সম্বন্ধে, সেটা আমি জানিনে একেবারে ··আমারও সন্দেহ হয়েছে, কি ব্যাপার আমায় খুলে বলতে পার ?

ওমা! আমি কি বলব, আমি কি জানি···এ আবার কি কথা—কিসের সন্দেহ—আচ্ছা ভোলাদা, আমাদের সন্দেহ না করে লোকে জলগ্রহণ করে না—না ?

সন্দেহের কারণ পেলে লোকে সন্দেহ করেই থাকে···

কারণটা কি পেলে···ভোলাদা ?

লুকিয়ো না মীনা, তোমার চোখের চটুল চাহনি আর ঠোঁটের ফাঁকে ওই হাসি—যাক্‌গে সে কথা থাক, এখনও জয়া ঘুমুচ্ছে নাকি ?

সারা 'রাত ত ঘুমোয়নি—বোধ হয় ঘুমুচ্ছে···

দেরী করলে ত চলবে না, তাকে ডেকে তোল ; আমার আর সময় নেই···

ভোলাদা—কথাটা চাপা দিলে কেন ? সংসারে যার আপন বলতে কেউ নেই—সারাটা সংসারই যার পর—আর সেই পরকে ঠকিয়ে যখন তাকে খেতে হয়, তখন চালাক না হয়ে কি করি বল—

বেশ বাপু বেশ, তুমি চালাক নয় খুব বোকা—এখন জয়াকে ডেকে তোল দিকিনি—

মীনা উঠে জয়ন্তর ঘরের চাবি খুলে দিলে—জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—এই যে ভোলা, কাল তোর কি হয়েছিল ?

পেঁচোও পেয়েছিল।

কোথায় বসে খুব মদ খাচ্ছিলি বোধ হয়

তাতে তোর genius নিশ্চয়ই বানচাল হয়ে যাবে না ; শোন্, মীনার তিন হাজার টাকা এই দিচ্ছি—থিয়েটারের আর্টিষ্টদের টাকা সকালে দিয়ে দিয়েছি—আসছে সপ্তাহে প্লে, প্ল্যাকার্ড মারা হয়ে গেছে···এখন তোমার হিরোইন তৈরী করে নাও···আর তোমায় সময় দিতে পারব না···

জয়ন্ত খানিকটা উৎফুল্ল-বিস্ময়ে ভোলার মুখের দিকে চেয়ে বললে : এত টাকা কোথায় পেলি ? কে দিলে ?

দেবে আবার কে, ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে এলাম।

ব্যাঙ্ক তোর কে হয়—যে, তোকে এত টাকা দিলে ?

শোন্, আজ থেকে মদ আর খাস নি, তা হ'লে প্লে মাটী হয়ে যাবে—এ প্লে যদি জমাতে না পারি—আমার ইজ্জত থাকবে না, বড়াই করা বেরিয়ে যাবে···সব···

চাকর চা প্রভৃতি ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এল। মীনা চা সবাইকে ঢেলে দিয়ে বললে—চা-খাও ভোলাদা, তুমি যাও স্নান করে নাও···

জয়ন্ত বললে, ভোলা কি আলাদীনের পিদীম পেলি নাকি?

আলাদীনের পিদীম সবারই কাছেই আছে, জ্বালতে জানে না, তাই—

তুই জ্বালতে জানিস না কি?

জানি বোধ হয়, এর মধ্যেই আজ সকাল থেকে কত টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছে তা জানিস—মীনার নামে···

আবার এর ভেতর টিকিটও বিক্রী করে ফেলেছিস?

সাতশ টাকার টিকিট সকাল নটার মধ্যে বেচা হয়ে গেছে···

তা বেশ হয়েছে, কিন্তু এ টাকা তুই পেলি কোথা—তোর নিজের ত টাকা নেই—ব্যাঙ্ক—কোন্ ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে এলি?

সে কথায় তোর দরকার?

কি—কিন্তু এই বর্ষা-বাদলের মুখে প্লেটা দেওয়া···

বুঝছিস নি—স্কুল-কালেজ খুলেছে—ভিড় হবেই—

তাই ত রে ভোলা, তোর—দেখছি ব্যবসা-বুদ্ধিও আছে—

না—তা কি আর আছে—তুই এখন চান করগে যা ··

যাচ্ছি···বলে জয়ন্ত চলে গেল।

মীনা, এখন সমস্ত নির্ভর করছে তোমার ওপর—ওর রকম আমার ভাল ঠেকছে না—আজ ক-মাস ধরে দেখছি ও যেন কি এক রকম ঠোঁটের ফাঁকে হাসে, সেটা তার অভিমান—না, আর কিছু বুঝতে পারি নি···

মীনা একটু হেসে বললে: ভোলাদা, অত চালাক তোমাদের মীনা নয়—তবু এটা বুঝতে পারি যে, তুমি ঘুরিয়ে সেই প্রশ্নই করছ ··আমি কিন্তু কিছুই জানি না—আর জানলেও···

বলবে না—কেন না, বললে তোমার ক্ষতি হতে পারে···

ক্ষতি! আমার ক্ষতি! হাহাহাহা! ভোলাদা, সংসারে এমন কোন্ মানুষ জীবিত—যে মীনার ক্ষতি করতে পারে? আমার লাভের ঘরই নেই ভোলাদা—কাজেই ক্ষতিও আমার নেই। এক দরজা বন্ধ হ'লে শতেক দরজা খোলা থাকবে। আপনার ত নেই, পরও কেউ আপনার নয়, দুনিয়ায় আমার আবার লাভ ক্ষতি! হায় রে! সাত জন্ম নরক ভোগ করাও ভাল, তবু এমনতর মেয়েমানুষের জীবন···জান ভোলাদা, এক এক সময়ে মনে হয় নিজের গলাটা নিজেই চেপে ধরি—আর যেন শ্বাস না পড়ে?

ভোলা খরদৃষ্টিতে মীনার দিকে চেয়ে বললে: ব্যাপারটা কি মীনা—কি হয়েছে?

কিছু না—তুমি চা-খাও।

ভোলা শুধু 'হুঁ!' বলে চা খেতে লাগল।

মীনা চা খেতে খেতে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে,

বলতে পার ভোলাদা, তোমাদের এই সব ধর্ম্ম, নীতি, সতীত্বের মানে কি?

ও বাবা! তুমি শুধু actress নও—অভিনয় কর না, আবার ধর্ম্মনীতির আলোচনাও করে থাক? তা হঠাৎ এ সকল প্রশ্ন কেন মীনা?

ওই ত দুঃখু ভোলাদা যে, তোমরা শুধু আমাদের অবহেলা কর না, আমাদের ঘৃণা কর—আমরাও যে মানুষ, মানুষের মত ভাবতে পারি, ভাবনা আসে, এটাও তোমাদের কাছে স্বীকার পায় না।

প্রশ্নটা ত এখানে নয়, প্রশ্নটা কোথা থেকে জেগেছে, সেইটে জানাই আমার প্রয়োজন বিবি-সায়েব। সঠিক খবর দাও দিকি···জয়ন্তর ব্যাপারটা কি? বল ত বিবি-সায়েব!

মীনা চোখ ঘুরিয়ে বললে: কে জয়ন্ত ভোলাদা—যার কথা ভাববার জন্যে আমার দিনে-রেতে যেন আর ঘুম হচ্ছে না—তাই জয়ন্ত—জয়ন্ত শুনতে হবে তার ব্যাপার আমি কি জানি···

তাই ত বিবি-সায়েব—এ কি, তোমার এ রূপ ত কখন দেখিনি···আমি ভোলা রায়, তোমায় ত এতদিন চিনতে পারি নি···তোমার স্বরূপ ত খুব সোজা নয় বিবি-সায়েব ··

চেনা দিলে তবে ত চিনবে ভোলাদা—চেনবার চেষ্টাও ত কোন দিন করনি ভোলাদা···বাজে মার্কা মনে করেই এসেছ···ভেবেছ—পেশা অভিনয়, আর লোক ঠকিয়ে খাওয়া আমি যদি তোমাদের ঠকাব মনে করতাম, তা হ'লে ফুঁয়ে উড়ে যেতে···বুঝলে? আর আমার স্বরূপের কথা বলছ ভোলাদা—আমি সতী নই—অসতী—সেইটেই আমার স্বরূপ—দেখ ভোলাদা, একটা কথা আজ কদিন ধরে কেবলই

মনে হচ্ছে—যে, তোমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র ব'লে মনে কর। অসতীকে দিয়ে সতীত্বের অভিনয় করাও—অথচ তাকে অসতী বলে ঘৃণা করতে একটুও বাধে না। জেনে শুনে তোমরা আস অসতীর কাছে—অথচ চাও তার কাছ থেকে সতীত্বের নিষ্ঠা—ভোলাদা, মুখ খারাপ তোমার সামনে করব না, না হ'লে ··

থাক্ থাক্ বিবি-সায়েব্ হয়েছে—মুখ করেছ তাতেই হবে বিবি-সায়েব, তাতেই হবে।

আচ্ছা ভোলাদা—শুনেছি তুমি শুধু আর্টিষ্ট নও—পণ্ডিত লোক···

হোয়ে! হোয়ে! বটে তাও আবার শুনেছ?

না শুনলে কি করে জানব, আমি ত আর তোমাদের মত পণ্ডিত নই—যে, মুখ্যু-পণ্ডিতের বিচার করব—

হুঁ, ঘুরিয়ে বেশ গাল দিলে দেখছি···ওরে জয়া! জয়া! শোন্—তোর মীনা বলছে···

ভোলাদা, ইয়ার্কি কর না—তোর মীনা মানে···

জয়ন্ত ইতিমধ্যে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে এসে বললে··· কি রে—এখন যাবি না কি? থিয়েটারে?

ভোলা হেসে বললে—তাই ত হঠাৎ দেখছি খুব কাজের লোক হ'য়ে পড়লি যে · শোন্ তোর মীনা বলছে—

মীনা ঝঙ্কার মেরে উঠে বললে :

আবার বলছ তোর মীনা ··আচ্ছা জয়ন্তবাবু—শুনেছি তুমি পণ্ডিত, তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে···

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে—কি প্রশ্ন শুনি···

মীনা একটা ঢোঁক গিলে বললে :

সতী-অসতী নিয়ে কথা হচ্ছিল—যে অসতীকে দিয়ে সতীত্বের অভিনয় করাও—আর সতীকে বল অসতী—যে অসতী সে কখন সতীত্বের অভিনয় করতে পারে?

কেন পারবে না—সেটা ত আর সত্যি নয়—সেটা ত অভিনয়···

মীনা একটু গম্ভীর হ'য়ে বললে: তা হলে সতীও অসতী হয়, অসতীও সতী হয়।

ভোলা রায় যেন গর্জ্জন করে উঠল—বললে—না! কক্ষণ না, তা হয় না, সতী কখন অসতী হয় না, অসতী কখনও সতী হয় না।

হ্যাঁ জয়ন্তবাবু! এই প্রশ্নই ত করছিলাম ভোলাদার কাছে, যে, তোমাদের এই ধর্ম্ম-নীতি আমরা বুঝতে পারি না কেন, মুখ্যু ব'লে ·

ভোলা ভুরু কুঁচকে মীনার দিকে চেয়ে বললে: তোমার উদ্দেশ্যটা কি—খুলে বল ত বিবি-সায়েব—এ প্রশ্ন তোমার বাজে কথা—তুমি কি বলতে চাও, কি ·

মীনা একটা ঝাঁঝের সঙ্গে কথা বলে উঠল: কিছু না—তোমরা থিয়েটারে যাবে ত যাও · আমার উদ্দেশ্য শুধু টাকা, বুঝলে ভোলাদা, টাকা—টাকা—টাকা···

মীনা একটা ঝন্‌ঝনার মত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ভোলা ও জয়ন্ত দু'জনেই হতভম্বের মত মীনার চলে যাওয়ার পথের দিকে খানিক চেয়ে রইল।

ভোলা জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁরে জয়া! ব্যাপারটা কি? মীনা আজ এ রকম করে কথা কইছে কেন?

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

যাক্ গে আর বুঝেও দরকার নেই তবে—চল্ এখন সিন্‌গুলো সব ঠিক হয়ে গেছে। দেখবি চল—

ভোলা ও জয়ন্ত উঠতেই মীনা আবার এসে বললে: বেলা ত প্রায় বারোটা বাজে···খাওয়া-দাওয়া হবে কখন?

জয়ন্ত বললে: ফিরে এসে—কেন?

আমায় থিয়েটারে কখন যেতে হবে?

সন্ধ্যার পর গাড়ী আসবে।

কখন ফেরা হবে তোমার? তার চেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করে তারপর যেয়ো না···আজ ত আর থিয়েটার থেকে ফিরতে পারবে না।

ভোলা বললে: না—না এখনই যেতে হবে—খাওয়া-দাওয়া না হয় সেখানেই করবে এখন···

আজ রাত্তিরে কি রিহার্স্যাল হবে?

হবে না? মাত্র ত আর হাতে ক-দিন—আজ বুধবার—আসছে বুধবার প্লে—ভাল দিন আছে—নাট্যারম্ভ। অ্যালাকাড়া দেবার আর ত সময় নেই যে চুপ করে বসে কেবল আড্ডা দেবে?

আড্ডা ত আমি কাউকে দিতে বলিনি ভোলাদা—খেয়ে যেতে বলছিলাম,··

ওরে জয়া, শোন্ তুই তবে খাওয়া-দাওয়া সেরে—ওকে নিয়ে থিয়েটারে যাস্—আমি এখন যাই, অনেক কাজ

বাকী আছে—সেগুলো সেরে নিই গে—তার পর তুই যাস্ সেই ভাল···

বলেই ভোলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

মীনা তার আঁচলের খুঁটটা খুঁটতে-খুঁটতে বললে: তা হলে তোমার খাবার দিক?

দাও···বলে জয়ন্ত শোফার ওপর আড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

মীনা চলে গেল।

* * *

খাও া-দাওয়ার পর জয়ন্ত শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মীনা এসে জিজ্ঞাসা করলে থিয়েটারে যাবে না?

বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, একটু বিশ্রাম করে নিই।

মীনা জয়ন্তর পায়ে হাত বুলাতে লাগল।

জয়ন্ত বললে: ও আবার কি হচ্ছে?

মীনা হাসতে হাসতে বললে: সেবাদাসী কি-না, পদসেবা হচ্ছে। দেখ, আমার একটা কথা আছে, রাখবে?

কি কথা মীনা?

আগে বল কথা রাখবে কি-না?

কথাটা না শুনলে কি করে বলব? আর কি কথা বল···আরো টাকা চাই?

টাকার কথায় তোমার মীনা কখন না বলবে না—এ ত জানই···টাকার কথা বলিনি।

তবে কি? বল···

যদি কথা রাখ তবে বলি।

যদি আমার অবস্থায় সে কথা রাখার শক্তি থাকে, রাখব।

বুধবার প্লে—

হ্যাঁ তাই ত ভোলা ঠিক করে গেল।

যদি প্লের পরদিন থেকে তুমি বাড়ী যাও তবে ভাল হয়। আমার সুবিধা অসুবিধা ভাল মন্দের জন্য বলিনি—তোমার বাড়ী যাওয়া কর্ত্তব্য। এটা ভাল দেখায় না—মনে কর না আমার মনে অন্য কোন লুকানো কথা আছে। তুমি ত জান, তোমার কাছে আমি মিছে কথা কইতে পারি না।

জয়ন্ত মীনার আন্তরিক ভাব বুঝে বললে:

আমাকে বাড়ী যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছ কেন?

তোমার ভালর জন্যে···আর···

আর কি?

মীনা মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললে:

আমারও তাতে ভাল···তোমায় আমায় এভাবে এখানে থাকা আর চলে না, চলতে পারে না ··আমি আর পারি না··· আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—তুমি জান না আমি কি দুঃখে কি কষ্টে দিনগুলো কাটাই।

কি তোমার দুঃখ আমায় বলবে?

শুনে লাভ নেই, শুনিয়েও লাভ নেই। এ দুঃখ আমার ঘুচবে না।

তবু শুনি···

তুমি নিজে দুঃখী—তুমি সহানুভূতি—দরদ দেখাতে পার— তাতে আমার দুঃখ ঘুচবে না।

আমি বাড়ী চলে গেলেই তোমার সে দুঃখ ঘুচে যাবে?

মীনা একটা বিষাদের হাসি হেসে বললে: দুঃখ-ছাড়া সংসারে যার আর কোন সম্পদ নেই—তার দুঃখ কি কখন ঘোচে! তোমার জন্যে যদি আমার দুঃখ আরো বাড়ে, তোমার চলে যাওয়ায় হয়ত আমার দুঃখ আরো বাড়বে— তবু তোমায় যেতে হবে—এই দুঃখই যে আমার সব চেয়ে বড় সম্পদ।

তোমার এখান থেকে বাড়ীই যে আমি যাব, এমন না হতে পারে···

সে তোমার ইচ্ছে—কিন্তু আমার কথা শোন, বাড়ী যাও; তোমার বাড়ী যাওয়াই উচিত—আমি আগুন নিয়ে আর খেলা করতে পারছিনি—আমায় রেহাই দাও···

কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না মীনা—

দেখ আমাদের এ দেশে আমার মত মেয়ের সঙ্গে ঘরকরাকে কেউ ভাল বলে না তা জান?

জানি? কিন্তু তোমার এখানে থাকি মানে যে তোমার সঙ্গে ঘর করি তার ত মানে নয়।

লোকে তা বিশ্বাস করে না। আর আমার সঙ্গে ঘরই যদি না কর, তবে এখানে থাকবে কেন? আমি একটা সামান্য স্ত্রীলোক, আমার মন-প্রাণ যেমন আছে, দেহ বলেও একটা পদার্থ আছে। তবে কেন তুমি আমার এখানে থেকে আমার অশান্তি বাড়িয়ে দাও। তার ওপর তোমার বউ আছে—বড়লোকের মেয়ে, সুন্দরী গুণবতী, তাকে ত্যাগ করবে কেন—কি তার অপরাধ? তোমার সঙ্গে মানব-দার সমস্ত ঝগড়ার কথা আমি শুনেছি—তোমার

বোঝবার ভুল—তোমার স্ত্রীর কোন অপরাধ নেই—কেন বেচারাকে কষ্ট দাও? এতে তুমিও সুখী হবে না; আমিও পরে সুখী হব না। কেন অযথা তার চোখের জল ফেলাও? আমি সংসারে অনেক দুঃখ পেয়েছি বলেই তোমায় এ সব কথা বলছি। আমার কথা রাখ—বাড়ী যাও—প্লে যখন করবে বলে ঠিক করেছ—এতদিন তার জন্যে এত টাকা খরচ করলে, তখন প্লে করতে আমি তোমায় বারণ করতে চাইনে—তবু মনে হয়, এ প্লে না করলেই তোমার পক্ষে ভাল হ'ত। ভাবছ মীনা তোমায় উপদেশ দিচ্ছে, তা নয়—উপদেশ দিতে তোমাকে মীনা পারে না; তবে তোমার মঙ্গল কামনা করতে পারি—কেন পারি তা তোমায় নতুন করে আর বোঝাতে হবে না—

হসন্ত হেসে বললে: অর্থাৎ তুমি আমায় ভালবাস, এই ত?

শুধু ভালবাসি? এইটুকুই শুধু বুঝেছ, আর কিছু বোঝনি? আর ভালই যদি বেসে থাকি তবে তার চেয়ে বেশী বোঝবার কি আছে?

আছে।

যদি আমার মন বুঝতে তা হলে সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে না।

যদি বাড়ী না গিয়ে, তোমায় নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই—তুমি যাবে মীনা?

না—কেন যাব? আমি তোমাকে আমার এ আঁচলে গেরো দিতে পারব না—আর পারবার শক্তি থাকলেও করব না, সে করতে দেবো না। তুমি বাড়ী যাও, তোমাকে যেতেই হবে।

আমি যদি বাড়ী না যাই?

একদিন প্লে করব—তার পর আর করব না, আমায় আর দেখতেও পাবে না। আমি অভিনয় আর করব না।

মীনা! সত্যি তুমি কি?

অতি দুঃখী একটা রাস্তার মেয়ে—ভগবান কোথায় একটা কি খুঁত দিয়েছে—রাস্তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েও রাস্তাকে ভালবাসতে পারি না—মন আমার কেবলই বিদ্রোহ করে···এসব আমি আর সহ্য করতে পারছিনি। আর এই অভিনয়ের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। সত্যি বলছি। বেলা চারটে বাজে, যাও থিয়েটারে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হইগে।

বাজুক গে চারটে···সন্ধ্যার পরই যাব।

মীনা একটু হাসলে—তারপর বললে···কেন অমন কর বল ত—আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে, এই ত?

বোধ হয়।

বোধ হয়? নিশ্চয়। শোন আজ তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে—

আমি শুনতে প্রস্তুত, বল।

তুমি শুনতে প্রস্তুত না হলেও তোমাকে জোর করে আজ এসব কথা শোনাতাম—কে জানে কেন আর চেপে রাখতে পারি না। তুমি শুধু থিয়েটার করবে বলে আমার এখানে আস নি—তোমার ভাব ভঙ্গী দেখে, মানবদার সঙ্গে তোমার ঝগড়ার ব্যাপার দেখে এটা বুঝেছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করে এইভাবে এখানে পড়ে আছ। ভুল করেছ।

কি ভুল করেছি?

ঠিক জায়গায় আস নি। এখানে আসা তোমার উচিত হয় নি।

কেন?

এ জায়গা তোমার নয়। আমি অনেক ভেবে দেখেছি···ছেলেবেলা থেকে এই পথের মেয়ে আমি, অনেক রকম ঠেকে দেখে শিখেছি—অনেক কিছুই শিখেছি—যা তোমরা জান না—অথবা জানলেও বুঝতে পার না।

ভাল শুনি, কি বুঝতে পারি না···

দেখ, তোমার সঙ্গে যখন আমার ছাড়াছাড়িই করতে হবে—তখন তোমাকে—

ছাড়া-ছাড়ি যে করতেই হবে—এমন ত···

নিশ্চয়ই হবে, আজ নয়, কাল—হবেই—তার চেয়ে আগে থেকেই বোঝাপড়া হয়ে যাক্—

কি হবে তাতে?

তোমারও সুবিধে, আমারও সুবিধে—আমার কথা শোন, তোমার স্ত্রী মনে করেছে, আমি তোমাকে আটকে রেখেছি। তোমার বন্ধু মানবদা মনে করে, আমি তোমার বড় বাঁধন—তোমার ভোলা মনে করে যে আমিই তোমার এই সবের মূল, আমার জন্যে যত গোল। অথচ তুমি নিজে জান—এর মূলে কি। যদি না বুঝে থাক তবে বুঝিয়ে দিই, ভাল হয়ে চুপটি করে শোন···

জয়ন্ত নিরালম্বভাবে সোফায় আবার শুয়ে পড়ল। বললে: বেশ, তোমার কথাই শোনা যাক্…

ঠাট্টা নয়—এ আমার অভিনয় নয়, এ আমি দিব্যি…

দিব্য গালতে হবে না—আমি শুনছি বল…

রাগ কর না; তোমার কানে হয় ত কথাগুলো মিষ্টি লাগবে না, তবু তোমার ভালর জন্যেই বলতে চাই…

আমার কিসে ভালমন্দ, তা ঠিক ক'রে ফেলেছ নাকি?

যদি আমার নিজের ভালমন্দ ঠিক ক'রে নিতে পারি, তাহলে তোমার ভাল মন্দটা ঠিক ক'রে নিতে পারব না কেন?

দেখছি তুমি ন্যায়শাস্ত্রও জান—

ও, আমায় ঠাট্টা করছ—বেশ—তবে আর কিছু বলব না—আমার যা করবার তাই করব—

কিন্তু এতে ত যে কথা শোনাবে বলে মনে করেছিলে, জোর ক'রে শোনাবে ব'লে, কই তা ত বলতে পারলে না—

বলতে দিচ্ছ কই—শুনতে ত তোমার ইচ্ছা নাই…

সে কি কথা, নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা আছে।

আচ্ছা একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—

কর জিজ্ঞাসা—

ভালবাসার জন্যে মানুষ, না মানুষের জন্যে ভালবাসা—ভালবাসাটাই দরকারী, না মানুষটাই দরকারী—সতীত্বের জন্যে মানুষ, না মানুষের জন্যে সতীত্ব—তোমার এই নীতি-ধর্ম্ম মানুষের জন্যে, না মানুষের জন্য নীতি-ধর্ম্ম—কোন্‌টা? তোমরা যে ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার বলে মেয়েদের ওপর দাবী কর তার মানে কি?

জয়ন্ত কথা কয়টা শুনে সোজা হয়ে উঠে বসল। অবাক হয়ে মীনার মুখের পানে চেয়ে রইল।

এটা শুধু একটা জোরে—অধিকার মানে তোমরা যেটা চাও—সেইটেই তোমাদের কাছে ধর্ম্ম বলে আমাদের ওপর জোর খাটাও, আমাদের ওপর সতীত্বের দাবী কর। এই ত?

জয়ন্ত মীনার কথার কোন উত্তর দিল না—শুধু তার মুখের দিকে চেয়েই রইল।

কিগো, মুখ দিয়ে যে আর রা বেরোয় না—একটা কিছু বল শুনি।

এ প্রশ্ন যে আমার মনে কখন জাগে নি—তা নয়, তবে…

তবে কি? জবাব দাও…কেন তুমি তোমার বিয়ে-করা স্ত্রী ত্যাগ করবে—আমার মত একটা অযত্নে অবত্নে পথের মেয়ের কাছে পড়ে থাকবে…

মীনা তোমার আসল কথাটা আমাকে যদি ভেঙে না বল, আমি তোমার এসব কথার কোন উত্তর দেব না…

দেবে না—না, উত্তর দিতে পার না?

অযত্নে—অবত্নে পথের মেয়ে বলে কি আমি এখানে পড়ে থাকি?

নয়ত কি? ভাল ঘরের মেয়ে হলে কে তোমাকে জায়গা দিত শুনি? একথা মনে ক'র না যে, আমি মীনা তোমার এখানে টাকার জন্যে থাকতে দিয়েছি—তুমি বড় দুঃখী, আমিও দুঃখী, তাই…তবে তোমার দুঃখ এক, আর আমার দুঃখ অন্য—

কিন্তু তোমায় দেখে কখন কেউ বলতে পারে না যে তুমি দুঃখী…

তোমায় দেখেই কি কেউ বলতে পারে যে তুমি দুঃখী—

কেবল তুমিই পার…

কথাটা বলে জয়ন্ত একটু হাসলে।

হাসলে যে বড়, আমার কি দুঃখ জান? জানলে তুমি আমার ছায়া মাড়াতে ঘৃণা করবে; জানলে তোমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত রি রি করে উঠবে। জানলে মনে হবে জগৎটায় মানুষ কেউ বাস করে না, সব ক্ষুধিত লোলুপ মাংসাশী জন্তু—এদের সমাজ নেই, ধর্ম্ম নেই, স্নেহ মায়া মমতা কিছু নেই—আছে কেবল ক্ষুধা।

তোমার দুঃখটা কি আমায় বলবে মীনা?

বলে লাভ?

তুমি কি সব তাতেই লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখ?

না দেখব কেন? যতদিন থেকে জ্ঞান হয়েছে—ততদিন থেকে দেখে আসছি সবাই এই লাভ-লোকসান নিয়েই রয়েছে—আর মরছে—আমি কি একা খতিয়ে দেখি…তুমি দেখ না?

হুঁ…

দেখ, তুমিও দেখ, কিন্তু তুমি বুঝতে পার না।

কেবল তুমি পার বুঝতে…জয়ন্ত আবার হেসে উঠল।

আমি কি আর সাধ করে পারি…সংসারের তাগাদায় পেয়াদায় আমায় পারিয়েছে। শোন, তোমাকে বলব-বলব

মনে করে বলিনি, এখন দেখছি তোমাকে বলাই দরকার। না বললে, তুমি কিছুতেই আমায় ছাড়বে না··

তোমাকে ছাড়বার জন্যে এত ভনিতারও কোন প্রয়োজন দেখছি না ; তুমি যদি না এখানে থাকতে দাও—তবে আমি কি জোর করে থাকতে পারব ?

পারবে, কেন না আমি যে তোমাকে ছাড়তে পাচ্ছি নি—এটা তুমি বেশ বুঝে ফেলেছ। আমার ওপর ঘেন্না না হলে তুমি আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না এটা বুঝেছি বলেই আমার কথা শোনবার জন্যে বলছি

শুনলেই আমার যে তোমার ওপর ঘেন্না আসবে—এ কথা কে বললে ?

আসতেই হবে—শোন··

বল শুনছি···

মীনা তখন তার জীবনের কাহিনী বলতে সুরু করলে—

মার কাছে শুনেছি—কুচবেহার না কোথায় ওরই কাছে আমার জন্ম হয়েছিল—সেখানটা ভূমিকম্পে দ' পড়ে গেছে তার চিহ্ন আর নেই। বড় হয়ে যখন থেকে মনে পড়ে, থাকতাম সেই জয়ন্তীয়া পাহাড়ে—সেইখানে যে খৃষ্টানী স্কুল তাতেই বাঙলা লেখা-পড়া একটু শিখেছিলাম···

জয়ন্ত হেসে বললে : এখন ত দেখছি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত—খৃষ্টানী স্কুলে পড়ে মুখ দিয়ে একেবারে খৈ ফুটছে—যে···

ঠাট্টা কর না···আমার মত দুঃখের পাঠশালে পড়লে বোবার বোল ফুটে যায়, বুঝলে ?

জয়ন্তীয়া থেকে আমরা এলাম ঢাকায়, তখন আমার বয়েস হবে দশ-এগার বছর। মা ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে এসে একটা ভাতের হোটেল খুললে। সেখানে বাবার সঙ্গে একদিন খুব ঝগড়া-মারামারি হ'ল টাকা-কড়ি নিয়ে। বাবা বল ত মেয়েটাকে দিয়ে রোজগার না করালে এতদিন ধরে পুষলাম কেন। মা বলত, না—আমি ওর বিয়ে দেব। বাবা বলত, বিয়ে দেবে না হাতী করবে··বুঝতে পাচ্ছিসনি ক্ষীরো—মেয়েটার লক্ষণ ভাল—ঢের রোজগার হবে, ওকে সামলে রেখে, দেখিস—জমিদারী করে নেব। মা বলত খেঙরা মারি তোর জমিদারীর মুখে। কিন্তু মার কথা শেষ-পর্য্যন্ত টেঁকল না—এলাম কোলকাতায়—পয়সা কড়ি কিছু ছিল না ; একখানা খোলার ঘর ভাড়া করে আমরা থাকতাম, সকল দিন ভাল করে খাওয়া জুটত না। বাবা এখানে এসে গুরুতগিরী আরম্ভ করলে—তারপর মাস পাঁচ-ছয় পরে দেখলাম বাবার কাপড় চোপড় বেশ ভাল—আমরাও—দুবেলা পেটভরে খেতে পেতাম। একদিন সেই খোলার ঘরে দেখলাম, একটা ভুঁড়িওয়ালা মাথায় টাক—বুনো মহিষের মত একটা লোক বাবার সঙ্গে এল। বাবা তাকে খুব খাতির করতে লাগল—তারপর আমায় ডাকলে, আমাকে দেখে সে এমন চোখ করে উঠল যেন আমায় একেবারে খেয়ে ফেলবে। আমি ভয়ে সরে আসতে যাব, এমন সময় সে আমার হাতটা ধরে আদর করতে এল, আমি ভয়ে হাতটা ছাড়িয়ে পালিয়ে এসে হাঁফাতে লাগলাম—সে হেসে উঠল—বাবা আমায় খুব বকতে লাগল, আমার গালে ঠাস করে একটা চড় দিলে—আমি সারারাত পড়ে-পড়ে কাঁদলাম—মা কত বোঝালে—আমার ইচ্ছে হল গলায় দড়ি দিয়ে মরি। ইচ্ছে হল নখ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ছিঁড়ে ফেলি।

জয়ন্ত সোফা থেকে উঠে পায়চারী করতে লাগল, সোজা হয়ে মীনার দিকে তাকিয়ে বললে কি আশ্চর্য্য, এই তোমার বাবা !

হ্যাঁ···

তারপর, বাবা এই পল্লীতে একটা বাড়ী ভাড়া করলে-সেই বাড়ীতে আমরা এলাম। ভাল খাওয়া ভাল কাপড়-চোপড়, বাড়ীতে চাকর, রাঁধবার লোক·· তারপর আবার বাড়ীর দরজায় একটা দরোয়ান, পাড়ার লোক সব আড়ে-আড়ে তাকাত। পাশের বাড়ীতে থিয়েটারের একজন অ্যাক্‌ট্রেস থাকত— তার সঙ্গে আমাদের খুব আলাপ হ'ল। মাঝে-মাঝে তার সঙ্গে আমি থিয়েটার দেখতে যেতাম। বাবা তাতে খুব রাগ করত। একদিন মাকে বললাম, আমি থিয়েটার করব। বাবা শুনে—রেগে আমাকে যা ইচ্ছে তাই ধমকালে—মারতে এল। মা বললে, তুমি যা চাইছ তার চেয়ে থিয়েটার করা অনেক ভাল। আড়াল থেকে শুনলাম—বাবা বলছে থিয়েটার করতে দিলে এরপর মেয়ে হাত-ছাড়া হয়ে যাবে—তখন ? তখন বুঝলাম যে আমরা ভদ্দর লোক নই।···ও কি তুমি অন্যমনস্ক হলে যে··· ভদ্দর লোক নই, শুনেই ঘেন্না হ'ল বুঝি···

জয়ন্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে : উহুঁ, না·· শুনছি···

দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে—মেঘের ওপর কি রঙের খেলা দেখ, চমৎকার! একদিক থেকে কাল মেঘ এসে পড়ন্ত সূর্য্যিকে কি রকম ঢাকছে—আর কত রঙই মাখা-মাখি হচ্ছে।

তুমি আমার কথা শুনবে, না ওই দিকেই তাকিয়ে থাকবে?

না না—বলছি—না, শুনছি, বল···

কি বলছ, আর কি শুনছ···

বলছিলাম—দেখ দেখ, দেখ কাল মেঘখানা সূর্য্যিকে ঢেকে দেওয়াতে কিরকম একটা আগুনের আভার সঙ্গে বেগুনী রঙ ফুটে উঠল···

মীনা গম্ভীর হয়ে বললে—দেখ সংসার তোমার গায়ে একটুও আঁচড় লাগায় না, অথচ আশ্চর্য্য, সংসারের খুঁটি-নাটি সবই ত বেঁধে। আমি আমার দুঃখের কথা শোনাতে গেলাম, তুমি-আকাশের রঙ দেখে—ময়ূরের মত নৃত্য করে উঠলে··

না-না, সত্যি দেখ··

তুমি দেখগে—আমার অত রঙের কবিত্ব নেই···

জয়ন্ত তবুও হাঁ করে সেই আকাশের রঙের খেলার দিকে চেয়ে রইল।

মীনা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, জয়ন্তর দিকে তীব্রভাবে তাকালে—আলমারীর ভেতর থেকে মদের ফ্লাস্ক বার করে—ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা গলায় ঢাললে···আপন মনে বললে···আজ তোমায় জয় আমি করবই·· তোমার সতীপনা ভেঙে তবে আমার কাজ রোস তুমি ··

ফ্লাস্কটা নিয়ে সোফায় ফিরে এসে বসে, একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল জয়ন্ত ফিরে দেখে মীনার চোখে বিদ্যুৎ খেলছে···হাসতে হাসতে বললে: এমন ভ্রুভঙ্গী কবি কালিদাস ও তাঁর মদনের ভ্রুতে আঁকতে পারেননি···

কবি কালিদাসের অক্ষমতা—সত্যি মদনকে জানলে আঁকতে পারতেন।

তাই নাকি···কিন্তু মদন তাতে ভস্ম হয়েছিল।

সেই ছাই সারা জগতে ছড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে সে ছাই নাড়া পায়, অমনি মদন সজাগ হয়··

জয়ন্ত মীনার কথায় এমন আকর্ষিত হয়ে পড়ল যে কি জবাব দেবে তা খুঁজে পেলে না···বললে—তুমি একাই মদটা খাবে—আমায় দেবে না···

থিয়েটারে যেতে হবে? না, থিয়েটারে যেতে হবে না?

নাই বা গেলাম···

শেষকালে ভোলাদা এসে যখন···তখন আমায় দুষো না কিন্তু··

জয়ন্ত হাসলে। মীনা মদ ঢেলে দিতে লাগল। চোখে বিদ্যুতের ঝলক, বক্ষে উদ্দাম দোলন, নাসিকা বিস্ফারিত, মাঝে-মাঝে তীব্র নিঃশ্বাস। বাহিরে সূর্য্যাস্তের মেঘের সঙ্গে সঙ্গে নীলাঞ্জন, পিঙ্গলবরণ আকাশে তীব্র বায়ুর বেগে তাড়িত খর-বৃষ্টি-ধারা ঝম-ঝম করে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার তালে-বেতালে বাজের কড়-কড়া ও মহাকালের ডমরুর ডিণ্ডিম চকিত নর্ত্তনে ধ্বনিত হতে লাগল।

নয়

চায়ের রেস্তোঁরায় ভোলার খোঁজ করার কয়দিন পরে ভোলাকে জয়ভেরী আফিসে ফোন করেও মিলনী যখন ভোলার দেখা পেলে না, ভোলাও সে রাত্রে মত্ত অবস্থায় দেখা করলে না—তখন মিলনী অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মানব ফিরে এসে যখন জানালে যে, যতদূর মনে হ'ল মীনাকে দেখে, তাতে মনে হয় না যে মীনাকে নিয়ে জয়ন্ত পড়ে আছে। জয়ন্ত-মানব-মীনার সংবাদ মিলনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁটিয়ে জেনে নিলে। মানবকে বললে: আমাকে একবার সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার ভাই?

উত্তরে মানব বললে: না মি—তা আর পারব না—আমার অন্যায়ের জন্যে যতখানি পর্য্যন্ত যেতে পারা যায়, তা আমি করেছি—তার পায়ে ধরেছি, সে শুধু আমাকে কুকুর-শেয়ালের মত তাড়িয়ে দিয়েছে। গুলির ভয় আমি করিনি মি—ব্রাউনি পিস্তল চালাতে আমিও অনভ্যস্ত নই। কিন্তু—অন্য কোন যদি উপায় থাকে তবে তা আমাকে ব'ল আমি সাধ্যমত করব। আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না। আমি নিজে আবারও যেতে পারি যদি বল—কিন্তু তাতে কোন সুবিধা হবে না।

এই ঘটনার পর মিলনী পুনরায় তার নিজের বাড়ীতে এল। কোন হতাশার ভাব সে আর দেখালে না। সারাদিন সংসার সম্বন্ধে যতটুকু তার দেখা-শোনার কাজ

ছিল, নিয়মিতভাবে করতে লাগল। সব কিন্তু ঠোঁট চেপে ··একটা বজ্র দৃঢ় ভাব তার মনকে শক্ত করে দিলে। খুড়-শাশুড়ীর কাছে চিঠি লিখলে—কলিকাতায় যেন শীগ্‌গির আসেন। স্বামীর অবস্থার বিরুদ্ধে কোন কথা তাদের জানালে না। বাপের বাড়ীতেও আর ফিরে গেল না। বাবাকেও সে কিছু আর জিজ্ঞাসা করলে না।

ভোলা রায়ের সঙ্গে আর্ দেখা করবার চেষ্টাও করলে না। মাধুরীকে বললে, মায়ের কাছে থাকলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আমি পাগল হয়ে যাব। আমি আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করব—দেখা আমি করবই যেমন করে হোক। এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সে মাধুরীকে এসব কথা বললে, মাধুরী যেন একটু অবাক হয়ে গেল। বাড়ীতে এসে সে—বি-এ ক্লাসের সাহিত্যের সমস্ত বই সংগ্রহ করলে। সে মনকে অন্যপথে চালিত করবার জন্যে আবার দস্তরমত পড়াশোনা আরম্ভ করে দিলে। কাকেও কিন্তু এ সকল কথা সে জানালে না। সমস্ত দিন সে নিজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকত—বিকালের দিকে আগেকার মত অতি পরিপাটী ভাবে নিখুঁত করে নিজের সাজ-সজ্জা করত, তারপর গাড়ীতে বেড়াতে যেত—কখন কখন সাধুচরণ চাকরটা সঙ্গে থাকত, কখন একাই যেত।

রামশরণ চক্রবর্ত্তী দেওয়ান কিন্তু এ-ভাবে একলা বেড়ান একেবারে পছন্দ করতেন না। অথচ তিনি মিলনীকে কোন বিষয়ে আদেশ করতে বা উপদেশ দিতে সাহস করতেন না। রামশরণ মিলনীর এ ব্যবহার ঠিক বুঝতে পারলেন না। তিনিও সুজনবাবুকে জয়ন্তর ব্যাপার জানালেন। সুজনবাবু লিখলেন, এতটা যে হবে এ আগে বুঝতে একেবারেই পারিনি; কিন্তু কি উপায় করা যায় সে সম্বন্ধে দাওয়ানের কাছে পরামর্শ চাইলেন। রামশরণ সকল কথা তখন খুলে লিখলেন—দেনাশোধের কথা, মিলনীর পিতা টাকা দিয়েছেন—মিলনী তার বাপের বাড়ীর দেওয়া যে টাকা ব্যাঙ্কে—ছিল, সব দিয়েছে তার উপর ওই গহনা বিক্রয়ের জন্য দাওয়ানকে নিত্যই পীড়া-পীড়ি করছে।

সুজনবাবুর স্ত্রী জয়ন্তর খুড়ীমা—স্বামীকে বললেন:

রামশরণকে জিজ্ঞাসা কর, কৈফিয়ৎ তলব কর—আমি তার হাতে জয়াকে রেখে এসেছিলাম, জয়া যে এমনতর ব্যাপার করেছে সে সব আমাকে জানান হয়নি কেন? আমি কি বাড়ীর—সংসারের কেউ নই? আমি বেঁচে থাকতে জয়ার দেনা শোধ দিতে জয়ার বউয়ের গায়ের গয়না যাবে, তার টাকা যাবে এর মানে? আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি—আমার সে টাকা শোধ করবার ক্ষমতা আছে—তুমিই বা আমার কাছে জয়ার কথা গোপন রেখেছিলে কেন? জয়াকে মাই দিয়ে মানুষ করেছি—পাঁচ দিনের ছেলে—আমি থাকতে জয়ার অকল্যাণ কখন হতে দেব না। তোমরা দু'জনেই অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ—আমাকে জানান উচিত ছিল।

সুজনবাবু হেসে বললেন: তোমার যা আছে, আমার যা আছে—সে ত সব জয়ারই, তা ত আমি জানি। এত টাকা যে দেনা করেছে তাও আমি জানি। কিন্তু সে দেনা সামলাতে গেলে এখন এ বিষয়টাও যাবে—তাই শুধু সুদ গুণে আসছিলাম—তোমায় জানাইনি।

ভাল করনি, বিবেচনার কাজ হয়নি। তোমার কলকাতার জল-হাওয়া সয় না বলেই আমার এখানে থাকা—না হ'লে এখানে আমি কি একদণ্ড থাকতাম জয়াকে ছেড়ে, মনে করেছ?

বেশ, তা এখন কি করতে বল?

কলকাতায় যেতে হবে—ছেলে আমার পর নয়···বউ হেরেছে বলে কি ছেলের কাছে মা হারবে। তুমি কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা কর।

মিলনীকে চিঠি লিখলেন:

বৌমা, সবাই সংসারে পর হয়, কিন্তু স্বামী কখন পর হয় না জেন।—ভয় পেও না বৌমা, আমি শীগ্‌গিরই কলকাতায় যাচ্ছি। তোমার গয়না কিছুতেই বিক্রী করা হতে পারে না—ওটা তোমার নিজস্ব—ছেলের দেনার টাকা আমিই শোধ দেব, তার ব্যবস্থাও করছি, যত ত্বরায়। চিরায়ুস্মতী হয়ে থাক—আবারও বলছি, মনে রেখ স্বামী কখন পর হয় না। তোমার শশুরের শরীর তত ভাল নয়—তাই কলকাতায় থাকি না—না হলে জয়াকে ফেলে কি আমি এখানে থাকতে পারি বৌমা···ইত্যাদি···ইত্যাদি···

মিলনী সকালে চিঠি পেয়ে মনে যেন আর একটু ভরসা পেলে। তার চোখ দিয়ে দুঃখ ও আনন্দ দুইয়ের আঘাতেই দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। একবার ভাবলে

শাশুড়ী যদি কাছে থাকতেন—তা হলে বোধ হয় এমন হ'ত না।···কিন্তু আশ্চর্য্য—এতখানি হীনতা যে তোমার মধ্যে আছে—এ ত এক বছর ঘর করেও বুঝতে পারিনি। হায়! হায়! মানুষকে এত আপনার করে নেওয়া—তাতে মানুষের এত ভুল হয়!

বই নিয়ে পড়তে বসল—মন কিন্তু বই পড়ায় বসতে চায় না—তবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, আমাকে আমার নিজের রাস্তা তৈরী করে নিতে হবে। হঠাৎ আবার মনে হ'ল, শাশুড়ী আসবেন লিখেছেন। তার জন্যে ঘর ঠিক-ঠাক বন্দোবস্ত করতে হবে—তাই মণি দাসীকে ডেকে বলে দিলে ··

মণিদি, মা শীগ্‌গির আসছেন চিঠি লিখেছেন, তাঁর ঘর সব ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রাখ—বুঝলে?

মা কবে আসবে বৌদি?

তা ঠিক বলেন নি, শীগ্‌গির আসছেন—কাকা মশাইও আসবেন···কার যেন কোন অসুবিধা না হয়।

মাধুরীর সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল। মাধুরী এসে দেখলে, তার দিদি দস্তরমত কলেজের পড়ুয়াদের মত বই-টই সাজিয়ে পড়তে বসেছে।

এ কি সব—তুমি যে দেখছি পড়াশোনা সুরু করে দিয়েছ?

একটা কিছু করা ত দরকার; চুপ করেত মানুষ থাকতে পারে না কোনদিন···

তুমি কি আবার একজামিন দেবে নাকি?

যে একজামিন দিচ্ছি, আগে তা শেষ হোক, তার পর দেখা যাবে।

তুমি সেদিন চলে এলে আর গেলে না যে?

কি করতে যাব—সেখানকার হাওয়ায় আমার দম আটকে আসে—

মানবের সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়েছিল?

না, সে আর এ-সব নিয়ে কিছু করতে চায় না।

তার পর কি হবে?

কি জানি, যা হবার—তাই হোক।···

এমন সময় একটা চাকর এসে একটা বইয়ের বস্তা নিয়ে এল, সঙ্গে একখানা বিল—বুক কোম্পানীর কাছ থেকে ···জিজ্ঞাসা করলে বিল কি খাজাঞ্চীখানায় নিয়ে যাব?

না দাঁড়াও, বইগুলো আগে মিলিয়ে নিই···

দুই বোনে বই কখানা মিলিয়ে নিয়ে বললে: বই সব ঠিক আছে—টাকা আমি দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

চাকর টাকা নিয়ে চলে গেল। মাধুরী কি ভেবে শুধু তার দিদির মুখের পানে চেয়েই রইল—কিছুই বললে না। একটা কথা সে কেবলই মনে করছিল—এত বড় কাতরতা দিদির যেন আর কিছুই নেই। ভাবলে, হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন?

জিজ্ঞাসা করলে—জয়ন্তর আর কোন খবর সে পেয়েছে কি-না?

না, আর কোন খবর পাইনি—তবে মানব বলেছে, নতুন কোন খবর হলে সে আমাকে জানাবে।

মাধুরীর সঙ্গেও সে আর বিশেষ কোন মনের কথা বলাবলি করলে না। শুধু বললে যে, তার শাশুড়ী শীগ্‌গিরই কলকাতায় আসছেন—শ্বশুরও আসছেন। এইবার যা হয় একটা বিলি ব্যবস্থা হবে।

মাধুরী বললে—হ্যাঁ দিদি, শুনেছ জয়ন্তর সেই 'মায়া-কমল' বই প্লে হবে বলে প্ল্যাকার্ড পড়েছে। আসছে বুধবার প্লে।

না শুনিনি, মানব আমায় কিছু বলেনি—জানায়ওনি। তোরা সবাই দেখতে যাবি নাকি?

যাব না, বারে! তুমি যাবে ত?

বলতে পারিনে—বাবা যাবে নাকি?

বাবা আবার যাবে না—বাবা তখনি ললিতবাবুকে পাঠিয়েছেন—টিকিট কিনতে; টিকিট হয়ত এতক্ষণ কেনা হয়ে গেছে।

মা যাবে?

না।

আমি যাব, ইলা যাবে—মানব তোমায় কিছু বলেনি?

এই যে বললাম যে, মানব আমায় জানায়নি কিছু। একবার ফোন কর তো!

মাধুরী টেলিফোন ধরলে: কে? মানববাবু, আজ 'মায়া-কমল' প্লে হবে বলে প্ল্যাকার্ড পড়েছে দেখেছেন? দেখেননি, এই শুনলেন? কার কাছে? ভোলাদা? ভোলাদা ওখানে বসে আছে বুঝি? ওঃ টিকিট বাবা কিনে আনতে পাঠিয়েছেন—অমনি দেখতে যাব কেন? দিদিকে ডেকে দেব? দিদি—ভোলাদা কথা কইছেন?

মিলনী উঠে ফোন ধরলে !

হ্যাঁ—বোনটীর জন্যে দাদার কত দরদ—ডাকলে আসা হয় না—হ্যাঁ, বুঝতে পারি সব—যে জন্যে ডেকেছিলাম সে এখন আর কি বলব—আবার যদি দরকার সে রকম পড়ে, তবে জানাব ? মানব যাবে ? বেশ ত…খুব interested নই, এ কথা বললে যে মিছে কথা বলা হবে। আমার স্বামীর বই প্লে হবে—তিনি সম্ভবতঃ নিজে নাচ-গান করবেন, ভাল-ভাল এ্যাকটর এ্যাক্‌ট্রেস নিয়ে—এতে আমি interested হব না, এটা কি কথা হ'ল ভোলাদা—কি ? এ—আমার কথার সুর ভাল না—বড্ড ঝাঁজ…সবাই মিলে তাতিয়ে পুড়িয়ে রাখলে—একটু ঝাঁজ দেখা দেবে বই-কি ভোলাদা—আছি ? ভালই আছি ? বন্ধুরা সবাই যাবে—বেশ ত, বন্ধুদের claim আছে নিশ্চয়। খুব ভাল হবে, দেখব সুনাম হবে—সুনাম যাতে হয়, বন্ধুত্বের দাবীই ত তাই। মানবকে ফোনটা দাও—

মানব ! তুমি একবার আজ আমাদের এখানে আসতে পারবে ? যখন তোমার অবসর হয়—তবে সন্ধ্যার পর আমি হয় ত থাকব না—তা হলে এস কেমন ? আচ্ছা ?

ফোন ছেড়ে দিয়ে মাধুরীকে বললে—তুই এবেলা থেকে যা না—

মাধুরী মাথা নাড়ল।

কেন ?

দু'টোর পর ইলা আসবে, তার কি notes-এর দরকার আছে—যদি না থাকি ইলা যে অভিমানী মেয়ে, আবার কি মনে করবে।

না মানবকে আসতে বললাম বলে—তাই চলে যাচ্ছিস ?

দেখ দিদি, তোমার মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে, আমি চল্লুম।

বাবাকে আমার এ সব পড়ার কথা জানাসনি, বুঝলি ?

আচ্ছা।

হ্যাঁ রে, ইলা কলেজ ছেড়ে দিয়েছে না ?

সে বাড়ীতে পড়েই একজামিন দেবে। তার এক fiance হয়েছে।

সে আবার কে ?

অমিয়।

ও সেই তোদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—

পড়ে না, সেও কলেজ ছেড়েছে—বিলেতে পড়বে।

বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে নাকি ?

তা শুনিনি ?

মানব এলে জিজ্ঞাসা করব ?

কি দরকার—যখন হবে তখন জানতেই পারব। ইলা আমার কাছে একটা কথা বলেছে—সেটা কি তার দাদার কানে তোলা ভাল, কি দরকার দিদি ! ওসব কথা ব'ল না।

আচ্ছা বলব-না—

তুমি কবে আসবে ?

ঠিক করে বলতে পাচ্ছি নি—যদি শ্বশুর-শাশুড়ী এসে পড়েন তা হলে আর এখন যাওয়া হবে না বোধ হয়।

মাধুরী চলে গেল।

মিলনী থিয়েটারের খবরটা শুনে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল। দেখবার কৌতূহল অস্বাভাবিকভাবে জেগে উঠল। তার অন্তরের ভেতর যে কি দারুণ আঘাত—সে আঘাতকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে সংসারের কাজে লাগাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আবার এই প্লে তাকে কি একটা ভয়ের সন্দেহের নব-আঘাতের পূর্ব্ব-আভাস বলে মনে বিঁধিয়ে দিয়ে বলতে লাগল—সাবধান মিলনী, দুর্যোগ আসছে। তবু আগ্রহ দেখবার, কৌতূহল স্বামীর অভিনয় দেখার। আবার সব ঠেলে ফেলে দিয়ে সে তার বই নিয়ে বসল। জোর করে মনটাকে পড়ার মধ্যে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগল।

বেলা চারটের পর মিলনী স্নানাগারে গেল। আকাশটা তখন মেঘ করে আসছে ! দিনের বেলা এত কাল মেঘ। সূর্য্যগ্রহণে পূর্ণগ্রাস হলে যেমন অদ্ভুদ অন্ধকার হয়—একটা স্বচ্ছ অথচ দীপ্তিহীন অন্ধকার—সেই রকম। সমস্ত গাছ-পালা বাড়ী ঘর দোর—যেন নীলাভ পিঙ্গলের রঙ মেখেছে। বাতাস স্তব্ধ—বহু দূরে মেঘের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে অতি ধীর গম্ভীর শব্দের চাঞ্চল্য উঠছে। সেই শব্দের প্রতিধ্বনি যেন মিলনীর অন্তরের ঘনায়মান মেঘেও ধ্বনিত হচ্ছে।

মানব যখন এল, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। এ-কথা সে-কথার পর মিলনী জিজ্ঞাসা করলে :

আচ্ছা মানব, থিয়েটারের জন্যে উনি এখন টাকা পেলেন কোথায় বলতে পার ?

মানব একটু চমকে উঠে আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বললে ··তা—তা আমি কি করে জানব ?

মিলনী আবার জিজ্ঞাসা করলে—আমি যতদূর খবর জানি—বাবার কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা তাঁর হাতে গেছে। আরো যা খবর আমি সংগ্রহ করেছি, তাতে এ পাঁচ হাজারে ত থিয়েটার হয় না। ভোলাদা আর আমার সঙ্গে দেখা করে না—

মানব একটু ইতস্তত করে বললে :

এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করা ভুল—কি করে কি হচ্ছে, কি করছে, ভোলাই জানে। তবে আমি তাকে যে অবস্থায় দেখলাম সে রাত্রিতে, তাতে আমার মনে হয় সে স্ত্রীলোক—সেই মীনা মেয়েটার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক নেই যে, কি করে বুঝলে ?

বোঝা যায়—মি

তবে তিনি থাকেন কেন সেখানে ?

সেইটেই একটা যে কি, তা বুঝতে পারি না। এটাও সত্যি তোমায় বলছি যে স্ত্রীলোকটা জয়াকে বাড়ী পাঠাবার জন্যে সত্যি চেষ্টা করছে—জয়াই আসে না।

তা হলে এ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য উপদেশ দাও।

ভেবে দেখেছি, কিন্তু কিছু স্থির করে উঠতে পারিনি। তাছাড়া, সে যদি এখনও শোনে যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা-শোনা করি—তাতে আরো বিতৃষ্ণা বাড়বে। যে সকল সত্য অকপটে জানানর পর তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবার পর এতখানি হিংস্র প্রকৃতির উল্লাস—দম্ভ—আত্মশ্লাঘার গরিমায় ঘৃণায় লাথি মারে—সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ—তাকে সত্য আমি ত আর বোঝাতে পারব না—আমি কি উপায় করব বল। শুধু সে ক্ষুব্ধ নয়—সে আত্মবিস্মৃত—তাকে কি ক'রে আর বোঝাব বল।

মিথ্যাটাই বড় হবে তবে, সত্যটা টেঁকবে না? আমাদের সমাজের অনেক জিনিষ জানি—যা মিথ্যা ছলনার প্রলেপ দিয়ে—সত্যি করে দেখিয়ে—সংসারে চলেছে, সমাজে চলেছে, আর আমি···উঃ !

মানবের সামনে মিলনীর সেই অপরূপ রূপ—সেই পাতলা ছিপছিপে—সঞ্চরিতা লতার মত দেহ—তার উপরে একখানা কুসুম ফুলের রঙের রেশমী কাপড়। মানব ও মিলনী মিলনীর ঘরের সম্মুখে যে ঘেরা-ছাদ, সেই ছাদে দু'জনে বসে কথা কইছিল। তখনও সূর্য্য একেবারে ডোবেনি। ছাদে নানা ফুলের গাছ—ফুলে ফুলে ভরে গেছে। তারই ছায়ার অন্তরালে—মিলনীকে যেন অগ্নিশিখার লতার মত দেখাচ্ছিল। সেই কুসুম ফুলের মসৃণ রেশমী কাপড়ের ওপর সূর্য্যাস্তের আলো পড়েছে একদিকে, অন্যদিকে হরিত-পাটল গাছ, নীল বর্ণাভামিশ্রিত পিঙ্গল মেঘের ছায়ায় সেই সঞ্চারিণী লতার অন্তরগূঢ় বেদনায় মুহ্যমান রূপ দেখে মানবের মনে হল যেন একটা অগ্নিময় সর্পিণী তার সেই তির্য্যক গতির ভঙ্গীতে বিভ্রম-বিলাস শিখা উৎকীর্ণ করতে করতে কাঁপছে আর দুলছে।

মানব বিভ্রম বিলাসে বলে উঠল—মি—মি···

মিলনী একটা ক্ষীণ হাসি হেসে সোজা হয়ে বসল।

কি ভাই মানব! আমার দুঃখ দেখে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ?

মানবের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, কথা মুখ দিয়ে বার হ'ল না। খানিক পরে বললে :

শোন মি! তোমার এ অশান্ত চিত্তকে সান্ত্বনা দেবার শক্তি আমার নেই · তবু তোমাকে বলব যে সত্যই জগতে প্রতিষ্ঠা পায়, মিথ্যা পায় না···সীতার অগ্নি পরীক্ষা—সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই তোমার এ অগ্নিপরীক্ষা, সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করবে। যদি আমার শিরা-উপশিরা হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে সমস্ত রক্ত দান করলে এই দুর্ভোগ থেকে তোমার মুক্তি হয় তা আমি করতে প্রস্তুত—কিন্তু দুর্দ্দৈব আমার, আমি আর কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি নি।

মিলনী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল—তারপর বললে : মানব! আমার সঙ্গে সেখানে তাঁর কাছে যাবে—নিয়ে যাবে ?

সেখানে তোমায়—আমি সঙ্গে করে পাগল···

Dont be sentimental···ভয়ে ভাবুক হয়ো না, be practical. স্বামীকে আমার উদ্ধার করতেই হবে—তিনি যতই আমাকে যা-তা মনে করুন, আমি যদি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, যেখানেই তিনি থাকুন—তাঁকে আমি আমার সত্য বোঝাতে পারব—তাঁকে আসতেই হবে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

তুমি যা বলবে তা করতে আমি প্রস্তুত—কিন্তু—

কিন্তু কিছু নয়···তুমি বাড়ী যাও—আমি নটার পর তোমাকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যাব। একলা যেতে একটু ভয় হয়, পল্লী আমি দেখেছি—জানি—অসম্মানের ভয় আছে—যাবে ?

বেশ যাব।

তাহলে এখন সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেছে—আমি নটার পর দশটার মধ্যে তোমার ওখানে যাব। কেমন ?

কিন্তু তার আগে ভেবে দেখ।

আর ভাববার আমার সময় নেই—এ তিন দিন আমি অনেক ভেবে নিয়েছি ··নিজের অধিকার মানুষের সাহায্যে নিতে হলেও, সময়ে প্রতিষ্ঠা না হলে কাল বয়ে গেলে আর হয় না···এখন লোহা আগুন রাঙা—এর পর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর হবে না···

তব্—একটা কথা···

যে ব্রাউনি পিস্তল আমাকে সে দেখিয়েছিল···

মিলনী একটু হাসলে—বললে :

আমি সর্ব্বেশ্বর রায়ের মেয়ে—আর রাসপুরের জমিদার বাড়ীর বৌ—প্রয়োজন হলে নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে ব্রাউনিঙের কাব্য আলোচনা করব না—আমার হাতেও সমান তালে তা বেজে উঠবে।

মানব অনেকক্ষণ দুর আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে পরে বললে : মি ! তোমার কাছে আমি যে কতখানি দুর্ব্বল তা তুমি জান···

জানি, আরো জানি, কি চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি আমার দেহে ও মনে আছে—যার জন্যে তুমি পতঙ্গ বহ্নিমুখ বিবিক্ষু···এখনও তোমার চোখের পাতা স্থির হয় না—এখনও কাঁপে···আমি অতি সাহসিকা -তাই এখনও কেন না এ জগতে যদি বিশ্বাস করবার কেউ থাকে তবে সে শুধু তুমি· দেখ সব মেয়ের মধ্যেই এমন একটা ভেতরের ভাব থাকে, যা কোন না কোন পুরুষকে আকর্ষণ করেই···সেই আকর্ষণের ভেতর আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়—কিন্তু পৃথিবী তার মূল্য দেয় না—সমাজ তার মূল্য দেয় না···

কিন্তু এটাও বোধ হয় জান মি—যে, সব পুরুষের মধ্যেই একটা দুর্ব্বিসহ নরকের আগুন জলে--যার তাপেই সে নিজে পুড়ে নিজে খাঁটি হয়ে যায় ··সে অগ্নি জাতবেদ, সেই তাকে অগ্নিরূপে পুড়িয়ে সাফ ক'রে নেয়···সেই একদিন এক মুহূর্ত্তের সংঘাতে যে আগুন জ্বলেছে—সংসার তার সমিধভার নিয়েছে, মন তাকে য়্যাসিড টেস্ট করে নেবে। জান মিলনী, তার কি ঘোর দাহ !

মিলনী মাথা নীচু করে চোখ মাটীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল।

মানব বলে যেতে লাগল : মনে কর না, আমি মিথ্যা বলছি, মনে কর না আমি ভাবুক sentimental, তোমার এই অগ্নিশিখা রূপ—অহোরাত্র—স্বপ্নে জাগরণে আমায় দহন করছে—একটা পাকান দড়ি আগুনে ফেললে যেমন পাক খেয়ে খেয়ে পোড়ে···ঠিক তেমনি···তোমার ওই রূপ যত আলো দিয়ে দেখি না কেন, যত মমতা, যত স্নেহ, যত ভালবাসা, যত প্রেম, যত জ্ঞান বিজ্ঞান, যত অমৃত সুরভি-মাখা ফুল দিয়ে সাজাই না কেন, স্বর্গের মন্দার হার পরাই না কেন···শরীর তত্ত্ববিদ যেমন শিরা উপশিরা, মাংসপেশী ভেদ করে—সেই কঙ্কাল দেখতে পায়...আমি আমার অন্তর খুঁজে দেখেছি—ওই তোমার মহনীয় রূপের পূজার অন্তরালে আমার এই বিষদগ্ধ কলুষমাখা অন্তরের কামতৃষা জাগে—জাগে। সত্য তোমার কাছে আমি কদাচ গোপন করতে পারব না—আমাকে অভয় দাও মিলনী···যখন আমি—পায়ে ধরে অপরাধ স্বীকার করলাম, বল্লাম, অপরাধী আমি শাস্তি দাও···সে ঘৃণায় অবহেলায় তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ব্রাউনি দেখালে।

মিলনী এতক্ষণ তেমনিভাবেই চোখ নত করেই ছিল, সহসা মাথা তুলে মানবের দিকে চেয়ে বললে : থাক্ মানব—ওসব কথা···তব্ তুমিই আমার ভরসা—তোমার অন্তরে যাই থাক্ এতে এটা আমার কাছে বা তোমার কাছে যত নির্ম্মম সত্য হোক্—এ আমি জানি যে, তোমার দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট কখন হবে না, হতে পারে না, বরং ইষ্টই হবে। আর একথাও তোমায় বলব যে মেয়েমানুষকে পুরুষে ভালবাসে, স্তুতি করে—এ চায় না এমন মেয়ে খুব কমই আছে। তুমি আমায় ভালবাস একথা জানলে—আমার নারী চরিত্রের ভেতর যে পুরুষ-জয়ের আকাঙ্ক্ষা আছে—তা চকিতে সজাগ হয়ে ওঠে। বলতে পারি না মানব—হয়ত কোন ত্রুটি কোনখানে মনের অগোচরে আমার ভেতর স্বামীর প্রেম সত্বেও লুকান কিছু ছিল, নইলে তোমার ভেতরই বা এ প্রকৃতির অবান্তর

প্রবৃত্তি দেখা দিলে কেন—হয়ত সে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কোন লুকান জায়গায় লুকিয়েছিল—তাই তোমার মধ্যে সে মোহ জেগেছিল। যে সুখের আবেশের ভেতর ডুবে ছিলাম তাতে তোমার জন্যে স্বামীর এই আঘাত আমায় অত্যন্ত সচেতন করে দিয়েছে···এই দুর্যোগ ও অন্তর-ঝঞ্ঝার ভেতরেও আজ আমাকে আত্মস্থ করে দেবার পথ করেছে···হয়ত মনের ভেতরের কোন গহন কোণে এমন কিছু আমার আছে, যার তাপ তোমায় পীড়িত করছে···অপর কোন মেয়ে হলে হয়ত তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইতে ঘৃণা বোধ করত, ভয় পেত···ছুটে পালাত—কিন্তু আজ তুমিই আমার ভয়, আর তুমিই আমার ভরসা···

মানব চুপ করে শুনলে—তারপর বললে :

শোন মি—আজ এভাবে তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারব সে ভরসা আমার ছিল না; তুমি যে আমায় ঘৃণা না করে—স্নেহের দিক দিয়ে সহজ সরলভাবে কথা কইতে পেরেছ—তাতে তোমার মহত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব—নারীত্ব—সব জিনিষেরই মাধুর্য্য ফুটেছে—কিন্তু···তথাপি

কি ?

তথাপি আমি দুর্ব্বল—দুর্ব্বল হলেও তোমার সত্যকে কখন মিথ্যায় ডুবে যেতে দেব না, তুমি যা বলবে—তা আজ আমি করতে বাধ্য; যদি জয়ন্তর কাছে এর জন্য আরো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়—তথাপি তোমার কথা আমার কাছে আদেশরূপে প্রতিপালিত হবে।

তাই কর—আমার আদেশই পালন কর মানব!···

Au revoir.

(ক্রমশঃ)

পলাতকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রায় ঘন্টাখানেক হ'ল বৃষ্টি থেমেছে। বড় বড় গাছের পাতা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল টপ্ টপ্ ক'রে ঝরে ঝরে পড়ছে। ঘন কুয়াশার স্তূপ ভিজে তুলোর মত যেন ভাসছে নিথর বাতাসে। অদূরে বৃহৎ-শোমা পাহাড়ের চূড়া চারিদিক-ঘেরা নৈঃসঙ্গের মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চড়াই রাস্তা ধ'রে ওরা দুজনে চলেছে আস্তে আস্তে পাশাপাশি। ছেলেটির নাম ফ্রান্সোয়া শ্বেদাঁই। দুনিয়ার মুশাফির সে। চলতি পথে আজ এখানে কাল সেখানে দুদিনের আস্তানা গাড়ে। প্রেম থেকে প্রেমান্তরে ভৃঙ্গের মত তার গতি। যেমন অকপট, তেমনি অচিরস্থায়ী তার প্রেমোন্মাদনা।

নিস্-এর হোটেলে ডোরা ক্রেগ্‌হর্নের সঙ্গে তার দেখা। তার মা বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী। সম্প্রতি নিউ আর্লিন্সে বৈধব্যের পর পুর্নবিবাহিতা। ডোরা একলা বাহির হয়েছে ইউরোপে চক্র-পরিক্রমায়। নানা চিত্রশালায় সে তীর্থযাত্রিণী। চলচ্চিত্রের ছায়াভাস হয় বন্দী তার তুলির টানে।

ডোরা ক্রেগ্‌হর্নকে একবার দেখলে তাকে ভুলতে পারা শক্ত। তন্বী, লঘুগতি, বাবুই পাখীর মত উড়ু উড়ু ভাব। ফরসা রঙে একটু সোনার আমেজ, স্বচ্ছ সরল চাউনিতে জাগায় সন্ত্রাস, আনে সুদূরের স্বপ্নাভাস।

সারা পথ ওরা তর্ক করতে করতে চলেছে। হতাশ হয়ে যুবকটি বলিল, "তুমি তা হ'লে কিছুতেই আমার ভালবাসায় বিশ্বাস করবে না ?"

মেয়েটি একটু দাঁড়িয়ে ছাতির ডগা দিয়ে ভিজে বালিতে আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, "বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই আমার নেই। কুড়ি জনের মুখে তোমার এই একই শপথ শুনেছি। তবু স্বীকার করি, মনে হয় তুমি সব চেয়ে অকপট।"

—"তা হ'লে বল, আমাকে বিশ্বাস করবে ?"

—"বন্ধু, তুমি বড্ড ছুটে চলেছ! তুমি কি প্রকৃতির লোক আগে আমায় বুঝতে দাও। বল ত, আমি তোমাকে কতটুকু জানি ? জানি তুমি ওদের মত নও। তোমায় সত্যিই ভাল লাগে। আমার মন ভুলিয়েছ, তবু বলি তোমাকে, এখনও ভালবাসি না।"

ফ্রান্সোয়া এবার জোর ক'রেই ডোরার বাহুটি আপনার ভুজবন্ধনে টেনে নিল। ডোরা বন্ধনমুক্তির চেষ্টামাত্র করল না।

—"আমাকে ভালবাসতেই হবে ডোরা! আমি যে তোমাকে ভালবাসি, সত্যই ভালবাসি। এ প্রেম ক্ষণিকের মোহ নয়, ঐকান্তিকতায় বলিষ্ঠ।

এতক্ষণে ওরা পার্কের বীথিপথের শেষে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সেখানে ডোরার মোটর অপেক্ষা করছে। ওদের কথাবার্ত্তায় পড়ল এখনকার মত পূর্ণচ্ছেদ।

গাড়ীর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডোরা বলল, "আজ আসি তবে, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। কাল আমার বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। এসো কিন্তু, তখন শুনব তোমার সব কথা।"

ডোরা থাকে র‍্যুজাকোর একটি পুরানো বাড়ীতে। সামনেই মস্ত বাগান, বড় বড় গাছের সারিতে ছায়াঘন। সমতল ক্ষেত্রটুকু তৃণগুল্মে ঢাকা, প্রস্তর মূর্ত্তির ভগ্নাংশ জড়ানো চারিদিকে। কোথাও বা দেবী মূর্ত্তির নিটোল মধ্যমাঙ্গ, মুকুটধারী রাজমুণ্ড, ডায়ানার সুঠাম দেহাংশ, য়্যাপোলোর ভগ্ন পৃষ্ঠ দেশ।

খ্যেদাঁই যে ঘরে গিয়ে বসলেন সেটাকে বৈঠকখানা বা পাঠাগার বলা চলে।

শ্রীমতী ডোরা প্রচলিত আদবকায়দা অগ্রাহ্য ক'রে তুর্কি ভঙ্গিতে বসেছিলেন একখানি অনুচ্চ আসনে। হাততালি দিয়ে সানন্দে তাঁর প্রেমভিক্ষু বন্ধুর অভ্যর্থনা করলেন। প্রাণ উৎফুল্ল, মুখে যেন খই ফুটছে, আবোল তাবোল বুলির নেই মাথামুণ্ড। খ্যেদাঁই গম্ভীর, প্রণয়বেদনায়।

গত সন্ধ্যার প্রশ্ন তাঁর মুখে এল পুনশ্চ। ডোরা, আমি দু সপ্তাহের জন্যে লণ্ডনে যাচ্ছি। আমি ভাল ক'রে একবার চিন্তা ক'রে দেখি। ফিরে এসে উত্তর দেব। হয়ত সে উত্তর হবে-হ্যাঁ। আমাকে একটু বিবেচনা করবার অবসর দাও। ওগো আমার ভীষণ ফরাসী বন্ধু, তুমি এসে যে আমার সব দিলে ওলট পালট ক'রে। যদি তোমাকে ভালবাসি, বিয়ে করি, তা হ'লে তোমার কি মূর্ত্তি দেখব? প্রভুর কাছে দাসখত লিখে দিতে যে জাগে আতঙ্ক!

প্রণয়ী শপথ ক'রে বলে, সে-ই হবে দাসানুদাস, পরদিন সে ষ্টেশনে গেল তার প্রিয়তমাকে বিদায় দিতে, একগুচ্ছ আইরিস্ ফুলের তোড়া নিয়ে। রক্তনীল আভা উছলে পড়েছে ফুলে ফুলে, সরু সরু পাপড়িগুলি যেন তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা, সাদা-কালোর ফাঁকে ফাঁকে বিকীরিত হচ্ছে সৌরভ, যেন নিভে যাওয়া ধূনুচির চন্দন গন্ধ। ফুলগুলি পেয়ে ডোরার প্রাণ হ'ল প্রেমার্দ্র, তার ছলছলে চোখ দুটি উঠল জলে ভ'রে।

"বাস্তবিক তুমি বড় লক্ষ্মী, জানো কেমন ক'রে আনন্দে প্রাণ ভরপূর ক'রে তুলতে হয়।" এঞ্জিনের সিটি বেজে উঠল, গাড়ীর দরজাগুলি বন্ধ হ'ল চটাপট। আসতে দেরী হয়েছে যাদের, তারা ছুটছে গাড়ী ধরবার জন্যে। যাত্রীরা যে যার স্থানে ব'সে রুমাল ঘুরোতে লাগল।

—"কি উত্তর পাব তোমার কাছ থেকে?

—"জানি না, আশা করি···

—"ফিরে এসেই আমাকে চিঠি লিখবে ত?

—"নিশ্চয়ই।

ডোরা তার ছোট্ট হাতখানি বাড়িয়ে দিল—কচি ছেলের হাতের মত নরম, সুকুমার। খ্যেদাঁই সে হাতখানিতে মুদ্রিত ক'রে দিল একটি দীর্ঘ বহ্নিময় চুম্বন—সে চুমা যেন আর থামে না। এবার ট্রেন চলতে সুরু করেছে। প্রথমে আস্তে আস্তে, ক্রমশ গতি হ'ল দ্রুততর। ডোরার চোখে সেই সরল তরল দৃষ্টি যার পিছনে যেন উঁকি মারে অজানা বিপদ, গালে মুখে সেই সোনালী আভা। খ্যেদাঁই-এর প্রাণের তারগুলি যেন টনটন ক'রে উঠল অন্ধ আতঙ্কের তীব্র স্পন্দনে। বুকের ভিতর গুমরে উঠল ভবিষ্যদ্বাণী—ডোরা আর ফিরবে না!

মর্ম্মান্তিক অনুভূতি বুঝি মিথ্যা হয় না! খাম্-খেয়ালী মার্কিণ মেয়েটির চিঠি আর এল না। সে তার লণ্ডনের ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল। খ্যেদাঁই-এর চিঠিগুলি ফিরে এল, খামের উপর ডাকঘরের ছাপ—'নিরুদ্দেশ'।

ফ্রাঁস্বোয়া প্রথমটা বেদনায় অধীর হ'ল। সাংঘাতিক আঘাত পেল তার প্রেম, তার চেয়েও আহত হল তার আত্মসম্ভ্রম। প্রতীক্ষায় আশায় কাটল অনেকদিন। তারপর এল নৈরাশ্যের নিস্পন্দতা। অতঃপর এল বিস্মৃতি, অধিকাংশ পুরুষের প্রাণে যেমন আসে। তাদের মতই সে করল বিবাহ। কিন্তু সে ক্ষত আর নিরাময় হ'ল না।

আট বৎসর পরে হঠাৎ তার হাতে এল একখানি ছোট্ট চিঠি। ডোরা প্যারিসে এসে পাঠিয়েছে তার আমন্ত্রণ। বারুদের বস্তায় পড়ল যেন বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ। বজ্ররবে উচ্চারিত হল শপথ—পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করবে না সে। কিন্তু পরদিনই র‍্যুজাকোর সেই পুরানো বাড়ীতে গিয়ে ফ্রাঁস্বোয়া হাজির।

সেই তরুগুল্মশোভিত পুষ্পিত উদ্যান, ভাস্কর রচনার ধ্বংশরাশি, চীনাংশুক বিলম্বিত সেই ড্রয়িংরুম্। টেবিলের উপর টবে টবে সেই বালখিল্য দেবদারু, সবুজ রঙের জাপানী পুষ্পপাত্রগুলির সেই অনুপম গঠনলালিত্য। সবই আগেকার মত, কেবল ধূলায় ধূসর, চারিদিকে একটা অযত্ন-লাঞ্ছিত মালিন্যের আবছায়া।

চেয়ার ছেড়ে একটি কৃশাঙ্গিনী নারী উঠে দাঁড়ালেন। এ ত সে মনোরমা ডোরা নয়, যেন তার ছায়াঘন প্রেতাত্মা। নিষ্প্রভ পাণ্ডুর সে স্বর্ণপ্রতিমা। পাকা চুলের রেখায় রেখায় সে মোহন চিকণ কেশপাশে জরার ঊর্ণজাল। করুণ ভগ্ন কণ্ঠস্বরে অপরিচয়ের বিস্ময়।

"বন্ধু, কি সুখী হলাম তোমাকে দেখে!"—এই ব'লে ডোরা শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দিল। ঢিলা আংটিগুলি কোনোমতে অস্থিসার আঙুল আঁকড়ে আছে।

"আমাকে অমন ক'রে কেন ফাঁকি দিয়ে গেলে?" বসবার আগে ফ্রাঁস্বোয়ার মুখ দিয়ে বাহির হ'ল এই জিজ্ঞাসা। বিবশদেহে চেয়ারে ধপ ক'রে বসে পড়ল ডোরা। বলল ক্ষীণকণ্ঠে, "তোমাকে ভালবেসেছিলাম, তাই। আমি এখন মন খুলে কথা বলতে পারি, তাই বলছি নির্ভয়ে তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তখন হয়েছিলাম শঙ্কাতুর। আমার কোন স্বপ্নকে প্রত্যক্ষে আনতে পারিনি, কোনোদিনও। তুমি ছিলে আমার আদর্শ প্রেমিক, কেবল সুদূরের ধ্যানে। তুমি হয়ত আমাকে বুঝতে পারবে না···হয়ত এ আমার মনোবিকার···আমার কাছে প্রেম ছিল এক কুহকময় বহ্নি, যে আগুন কেবল জ্বলে বুকের ভিতর যার আভা পড়ে চিরবল্লভের মুখে। আমার মার এবং অধিকাংশ বন্ধুদের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ তা জানি। তবু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি

তোমার সঙ্গে একত্রবাস। প্রতিদিনের ঘরকন্নার তুচ্ছ খুঁটিনাটির ছোঁয়াচ লেগে ভালবাসা তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিব্যদীপ্তি, স্তব্ধ সরোবর তরঙ্গ বিক্ষোভে হবে আবিল পঙ্কিল। তাই আমি আতঙ্কে করলাম পলায়ন।...তোমাকে ভালবাসার আগে আর একজনের প্রেমে পড়েছিলাম এবং তাকে বিবাহ করবার জন্যে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের দিন যখন ঘনিয়ে এল তখন দিলাম পৃষ্ঠভঙ্গ। এখন বেশ বুঝতে পারি, সত্যি সত্যি তা'র প্রেমে পড়িনি। তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র। আমি নানা দেশে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছি, কিন্তু তোমাকে ভুলিনি কখনও। তুমি আমার প্রাণ পূর্ণ ক'রে ছিলে। জীবনে যা কিছু সুন্দর মধুময়, তা রূপ পেয়েছিল তোমার মূর্ত্তিতে। যে প্রেম অলীক স্বপ্ন নয়, সেই প্রেমে আত্মসমর্পণ ক'রে শান্তি পেয়েছি।......তুমি এতদিন কি ভাবে কাটিয়েছ?

ফ্রাসোয়া তার বিবাহের কথা ডোরাকে জানাল। ডোরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল নীরবে। বলল, "তুমি ভাগ্যবান। তোমার সুখে আমি সুখী হলাম। আত্মিক আদর্শের প্রেমে যারা পড়ে তারা চিরদুঃখী। কচিৎ তারা সুখের অধিকারী হয়। সুইট্জারল্যাণ্ডে যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবার সাধ হ'ল...হাঁ, আমি কাল দাভোসে রওনা হচ্ছি। গতবৎসর লণ্ডনে আমার নিউমোনিয়া হ'ল। সুস্থ হয়ে উঠতে পারলাম না, আমাকে যক্ষ্মায় ধরেছে। এই আমার শেষযাত্রা। কে বলতে পারে? হয়ত আরও কিছুদিন বেঁচে থাকব তোমাকে ভালবাসবার জন্যে।...ওই বাক্সটা খুলে দেখ।"

ফ্রাসোয়া বাক্সটি খুলে দেখে তার ভিতর একরাশি শুকো ফুল।

"ওই আইরিস্ ফুলের গুচ্ছ তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেই ষ্টেশনে। যেখানে গিয়েছি, ওদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। আজ তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।"

* * * * *

বিদায়ান্তে ফ্রাসোয়া বাক্সটি সযত্নে হাতে তুলে নিল শিশুর 'কফিন্' যেমন ক'রে লোকে বহন করে। বাড়ী ফিরে এসে সেই পুষ্পকঙ্কালরাশি গোপনে বাগানের এককোণে পুঁতে রাখল গাছতলায়। এ সংসারে কেউ জানল না, এইখানে সমাধিস্থ রইল তার প্রেমের শবাস্থিপঞ্জর।†

† এদমো জালু-র গল্পের ইংরেজী তর্জ্জমা থেকে।

কবীরের গান

শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী

ভিক্ষা মাগিয়া চলেছে রে আজি
দীন-ভিক্ষুক-রাজ
দেখিতে নারিনু আঁখি দুটি মেলি'
তাঁর ভিখারীর সাজ।

আমি যে গো' হীন ভিক্ষুক বলি'
হেথায় না আসি' গিয়াছে সে চলি'—
না চাহিতে সব দিয়েছি তাঁহারে
ধরেছি ভিখারী সাজ,
ভিখারীর কাছে ভিক্ষা না মাগি'
চলে গেছে দীন-রাজ।

কহিছে কবীর, যা' হবার হোক,
আসিল না তায় নাহি কোন শোক
দীনের হৃদয়ে আজ—
রিক্ত এ-দীন ভিখারীর দ্বারে
আসিল না দীন-রাজ।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

২৪

দুইটি দিন ইলা একরূপ অসাড়ভাবেই পড়িয়া ছিল। কমলিনী কখনও কিছু দুধ, কখনও কিছু বেদানার রস আনিয়া খাওয়াইতেন। নিজেই প্রায় সর্ব্বদা তাহাকে লইয়া থাকিতেন। লতার কথা কখনও তুলিত না, জিজ্ঞাসাও কিছু করিত না। লতার গৃহে স্বামীকে দেখিয়া এইটুকু সে বুঝিয়াছিল, তাঁহার সঙ্গে স্বামীর একটা সম্বন্ধ কিছু ছিল—কিন্তু সেই সম্বন্ধ যে কি, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা করিয়া লইতে পারিবার পূর্ব্বেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বিরিঞ্চি তখন বুঝাইয়া তাহাকে কিছু বলিবার অবসর পায় না; পরেও সুযোগ কিছু ঘটে নাই—ঘটিতে পারে কি-না, তাহাও ভরসা করিয়া আসিয়া দেখেন নাই। পিতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবার পর তাঁহার উপদেশ মত দ্বিতীয় দিন ইলার গৃহে গিয়া মাঝে মাঝে বসিয়াছে; কিন্তু কেমন যেন ভয়ে একটা জড়সড়ভাবে। মাতা তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া বাহিরে যাইতেন; বিরিঞ্চিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিত, পাছে চোক খুলিয়া ইলা চায়, লতার সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে। যে কৈফিয়ৎ তাহাকে দিতে হইবে, সেটা নিজের মুখে কি করিয়া ইলাকে দিবে ভাবিয়া কূল পাইত না, লজ্জায় এতটুকু হইয়া যাইত। সুতরাং এই দুইদিন ইলা কি ভাবিতেছিল, ধারণা কিছু একটা করিয়া লইয়াছিল কি-না—লইয়া থাকিলেও সে ধারণা কি, কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। এমনও হইতে পারে, দেহের ন্যায় মনও তাহার এরূপ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এ সব কিছু ভাবিবার কি মনে কোনও ধারণা এ বিষয়ে করিয়া লইবার শক্তিই তাহার আদপে ছিল না। বিরিঞ্চি তাহার মাকে জানাইল, 'আমি পারিনি, পারবও না। একটু সুস্থ হ'লে তুমিই সব বুঝিয়ে ব'লো। তার পর আমার যা ক'র্‌তে হয়, দেখব।"

পরদিন সকালে ইলাকে অনেকটা সুস্থ দেখিয়া কমলিনী সব কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন; কর্ত্তা এখন যে ব্যবস্থা করিতে চাহেন তাহাও সব জানাইলেন। দুটি চক্ষের জল ইলা ছাড়িয়া দিল; কথা কিছুই বলিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল—শুইয়া পড়িয়া সারাটি দিন কেবল কাঁদিল। শাশুড়ী খাবার কিছু আনিয়া যখন তাকে ডাকেন, নিঃশব্দে উঠিয়া চক্ষু মুছিয়া খায়, আবার শুইয়া পড়িয়া কাঁদে। পরদিন অশ্রুবেগ অনেকটা সংযত হইল; ঝিকে ডাকিয়া শাশুড়ী বধূকে স্নান করাইয়া আনিতে বলিলেন, নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া ইলা স্নান করিয়া আসিল।—ঠাঁইপীড়ি করাইয়া ভাত আনাইয়া শাশুড়ী আহার করিতে বলিলেন—ও-তার আপত্তি কিছু না করিয়া ইলা যা পারিল, খাইল।—শিশু বালকটি কোলেই ছিল, বিছানায় মায়ের কোলের কাছে রাখিয়া কমলিনী নিজের কাজে বাহির হইয়া গেলেন।

বৈকালে বেশ একটা সুস্থ ও ধীর ভাবই ইলার দেখা গেল; শাশুড়ীও লক্ষ্য করিয়া একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। রাত্রিতে আহারাদির পর নিজে না গিয়া বিরিঞ্চিকে আজ তিনি শয়নগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।—ইলা তখন শুইয়া ছিল—উঠিয়া একটু আড়ঘোমটা টানিয়া মুখখানি অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিরিঞ্চি একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া শয্যার নিকটে আসিল। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব।

"ইলা!"

অশ্রু মুছিয়া কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া ইলা উত্তর করিল, "কি, বল।"

বিরিঞ্চি কহিল, "কি বলব—বলবার মুখ কিছু আমার নেই। যা করেছি—"

বাধা দিয়া ইলা বলিয়া উঠিল, "লতাদি কোথায়?"

"কোথায়—সেই যে পালিয়ে গেল—"

"খোঁজ কিছু পাওয়া যায়নি?"

"না—এখনও—"

"খোঁজ করেছ কিছু?"

"বাবা বল্লেন—লোক লাগিয়েছেন—"

"আর তুমি?"

"আমি—আমি—কি ক'র্‌তে পারি বুঝ্‌তে পারছি না। এত বড় এই কল্‌কেতার শহর—অলিগলির অন্ত নেই—"

"তাই ব'লে নিশ্চিন্ত ঘরে ব'সে থাক্‌বে? একা অসহায় একটা মেয়েমানুষ—ঐ রাত্তিরে বাড়ী ছেড়ে পথে বেরোল—"

"হাঁ, খোঁজ তাড়াতাড়ি পাওয়া দরকার।—তা বাবা বল্লেন, থানায় থানায় খবর নিতে লোক লাগিয়েছেন—"

"তুমি নিজে কোন থানায় গিয়ে খবর নেওনি? অলিগলি ঘুরে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করনি?"

অতি অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কেমন আমতা আমতা করিয়া বিরিঞ্চি কহিল, "না—সেটা ক'রে উঠ্‌তে পারিনি—শরীরটাও বড় অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছিল—আবার তোমার এই অবস্থা—"

"আমি আশ্রয়ে আছি, আর সে নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে বেরিয়েছে। নিজে অসুস্থ—তা এ দায়টাও ত কম একটা দায় নয়।"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিরিঞ্চি উত্তর করিল, "না, তা নয়।—তবে—তবে—বাবা বল্লেন—"

"যাই তিনি বলুন, দায় তাঁর এমন কিছু নয়, তোমার! তেমন গরজ হয়ত তাঁর হবে না। হয়ত—হয়ত—জানি না, বল্‌তে নেই এমন কথা—তবু—তবু—এমনও ত হ'তে পারে, খোঁজ তিনি চানই না—পেলেও চেপে রাখবেন।"

"সেটা-সেটা—হয়ত রাখ্‌তে পারেন। কিন্তু খোঁজ তিনি চান না, করবেন না,—না, সেটা হ'তেই পারে না। হাজার হ'লেও, সে ত—

"কেউ নয় তাঁর। যা কিছু তোমার—তোমারই শুধু। খোঁজ তোমাকেই করতে হবে, ক'রে বের তাকে করতেই হবে। নিজে না পার, পয়সা দিলে লোক এমন পাওয়া যায় না, খোঁজ ক'রে যে তাকে বের ক'রতে পারে?"

"যায়। পাকা গোয়েন্দা পুলিস কাউকে লাগালে তারা পারে। এসব কাজও কেউ কেউ করে।"

"তাই কেন কাউকে লাগাওনি? দু-তিনটে দিন চ'লে গেল—"

"দেখব কাল—"

"দেখবে—না, করতেই হবে এটা। কালই—রাত পোয়াতেই—"রোদনের উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বলিতে বলিতে ইলা থামিয়া গেল।

বিরিঞ্চি কহিল, "তাই করব। সকালেই কাল সুকেশদা'র কাছে যাব। আমার চাইতে এসব কাজে অনেক বেশী পরিপক্ক তিনি।"

"যাঁর কাছে যেতে হয় যাও, কিন্তু পরের হাতে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত তুমি থাকতে পারবে না। তাঁরই বা এত দায় কি? গরজই বা এত কেন হবে? শুনেছি ওঁরও খুব বাধ্য লোক তিনি।"

"হাঁ। তা-না ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত কেন থাক্‌ব? তবে নিজে এসব কাজে কখনও যাইনি, খবরাখবরও তেমন কিছু রাখি না। তাই—তাঁর সাহায্য কিছু দরকার হবে ব'লে মনে হয়।"

"অন্য কারও সাহায্য পাও না?"

"দেখব কাল। যদি পাই—"

"কেন পাবে না? তাই দেখো—"

"দেখ্‌ব। কিন্তু—"

কিন্তুটা কি ইলা কিছু অনুমান করিয়া লইতে পারিয়াছিল কি-না, সে-ই জানে। তবে বিরিঞ্চির বক্তব্য কি শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "যে ভাবেই হ'ক, যার সাহায্য নিয়েই হ'ক, খুঁজে তাকে বের করতেই হবে। আর তখন—তখন—কি করবে ভাবছ?"

অতি সঙ্কুচিতভাবে বিরিঞ্চি উত্তর করিল, "বাবা কি করতে চান, বোধ হয় শুনেছ?"

"শুনেছি। কিন্তু তুমি কি করবে?"

"আমি—আমি—কি করতে পারি বুঝ্‌তে পারছি নি। বাবা যদি বিয়েটাকে সত্যি ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে নাই চান—"

"তিনি নিতে চাননি, এখনও চান না। কিন্তু তাতেই কি বিয়েটা মিথ্যে হ'য়ে গেল? যখন করেছিলে, তখন কি সত্যি ব'লে করনি, না ফাঁকি দিয়ে কেবল তার সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছিলে?"

"না—না—না—সত্যি ব'লেই করেছিলাম। ফাঁকি দিয়ে ঠকাইনি!"

"তবে এখন তাকে ত্যাগ করবে কি ব'লে?"

বিরিঞ্চি নীরব। একটু ঘুরিয়া ইলা একবার চাহিয়া দেখিল; তারপর কহিল, "ত্যাগ করেছিলে ভুল করেছিলে, অনেক দুঃখু সে পেয়েছে। আজ ত একেবারে অকূল পাথারে ভেসেছে। খুঁজে যদি পাও—পেতেই হবে—কি

তাকে বল্‌বে? সত্যি ব'লেই যদি বিয়ে করেছিলে, কি ব'লে তখন আবার ত্যাগ করবে?"

"বাবা—"

"তিনি যা করতে চাইছেন, করতে পারেন। হয়ত তিনি সত্যি ব'লেই বিয়েটাকে মনে করেন না। কিন্তু তুমি—"

"আমি—আমি—ভেবেই কুল পাচ্ছি না ইলা। আইন কানুনের কথা তখন কিছু জান্‌তাম না; মনেও হয়নি—"

ইলা বলিয়া উঠিল, "আইন-কানুন কিছু বুঝি না। তবে সত্যি ব'লে যদি তাকে বিয়ে করেছিলে, সেই সত্যি আইন মিথ্যে ক'রে দিতে পারে না। আর সেই সত্যি মেনে যদি তাকে তুমি গ্রহণ কর, নিয়ে সংসার কর, কে তোমার কি করতে পারে? হদ্দ বাবা তোমাকে ত্যাগ করবেন। তা করলেনই বা? তাতেই কি এমন সর্ব্বনাশ তোমার হবে?"

"না, না, তা নয়, তা নয়! তবে ওঁরা বলছেন—শুনেছ ত—আদালতে গিয়ে বিয়েটাকে মিথ্যে, অসিদ্ধ, ব'লে প্রমাণ করবেন।"

"করলেনই বা?—তাতেই এত বড় সত্যিটা মিথ্যে হ'য়ে যেতে পারে না। লোকে যাই বলুক, তুমি যদি সত্যিটা মেনে তাকে নিয়ে সংসার কর, ধর্ম্মে এটা সত্যি হ'য়েই থাক্‌বে।"

"পরে অনেক অসুবিধে হবে। তা সে যাই হ'ক, আর একটা কথা—সেটা—সেটা—কিছুই কি ভাবছ না ইলা?"

"কি?"

"তোমার নিজের কথাটা—"

"সেটা ভাববারই কোনও কথা নয় আজ।"

"তোমাকেও ত বিবাহ করেছিলাম—"

"আগে তাকে করেছিলে। তার উপরে আমি কেউ নই।"

"কিন্তু ত্যাগও ত তোমায় করতে পারি না।"

"তাকে আরও পার না।"

"কিন্তু—কিন্তু—তুমি তা হ'লে কি করবে ইলা? আমাকে—আমাকে—ত্যাগ করবে?"

বিরিঞ্চি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া হাঁটুর উপরে ইলা মাথাটি রাখিল।

"ইলা!"

উঠিয়া বিরিঞ্চি বিছানায় গিয়া বসিয়া ইলার পিঠে হাতখানি রাখিল; বুকের কাছে তাহাকে টানিয়া আনিয়া অতি কোমল গদগদ কণ্ঠে ডাকিল, "ইলা!"

দুটি হাত তুলিয়া ইলা স্বামীর গলাটি জড়াইয়া ধরিল; বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিরিঞ্চি আরও বেগে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল; ধীরে ধীরে অশ্রু ইলার মাথাটির উপরে ঝরিতে লাগিল।

"ইলা!"

হঠাৎ কেমন চমকিয়া ইলা একটু সরিয়া আলগা হইয়া বসিল; অশ্রু মুছিয়া কথঞ্চিৎ সংযত হইয়া শেষে কহিল, "যাও—এখন শোওগে যাও।"

"আর—তুমি?"

"এইখেনেই থাকব!"

"একা!"

"হাঁ।"

বিরিঞ্চি উঠিয়া দাঁড়াইল। ইলা একটিবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "শোন।"

"কি বল।"

"আমি—আমি—বাবাকে খবর পাঠিয়েছি। ভেবেছি, কালই তাঁর সঙ্গে যাব। কিছু দিন সেখানেই থাকব।"

"তারপর?"

"তারপর—কি হবে জানি না। লতাদি'কে খুঁজে বের কর। আমি দেখ্‌তে চাই আগে—তাকে তুমি গ্রহণ করেছ, তার মান তাকে দিয়ে তাকে নিয়ে সংসার করছ।"

"তারপর?"

"জানি না! মাথার উপরে ধর্ম্ম আছেন, দেবতা আছেন; তাঁরা যা করাবেন তাই হবে। আজ কিছুই বলতে পারব না, ভাবতেও কিছু পারছিনি। যাও, এখন শোওগে যাও।"

নত মুখে ধীরে ধীরে বিরিঞ্চি বাহির হইয়া গেল। ত্রস্ত উঠিয়া ইলা দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া উবুড় হইয়া পড়িল। বুক মুখ চাপিয়া রোদনের উচ্ছ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টাই করিল।

(২৫)

মিসেস্ চম্পটীর বাসগৃহের নিকটেই পাঁচ-সাত মিনিট মাত্র দূরে—আর একটি বাড়ীর ছোট একটি ফ্লাটে প্রবীণা

একটি মাত্র ঝি লইয়া একটি যুবতী বাস করিত; নাম ফুল্লরা বসু। প্রসবের সময় নিকট, কেবল ঐ একটি ঝির উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে কেমন ভয় পাইতেছিল, মিসেস্ চম্পটী লতাকে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রাত দিনই তাহার কাছে থাকিতে হইবে, অল্প দিনের জন্য হইলে এসব কাজে আহার সমেত দৈনিক অন্ততঃ একটাকা করিয়া বেতন বা মুজুরী সাধারণতঃ পাওয়া যায়। তবে কিছু বেশী দিন—হয়ত বা দুই-তিন মাসও লতাকে এখানে থাকিতে হইবে, সুতরাং মাসে কুড়িটাকা হিসাবে বেতন স্থির হইয়াছে। ঝিই ইহাকে প্রায় রাঁধিয়া দিত; কিন্তু লতা ঝির হাতে খাইবে না বলিয়া সে-ই একেবারে তিন জনের জন্য রাঁধিবে। চম্পটী বলিয়াছিলেন, এই নারীর স্বামী বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন, কবে ফিরিতে পারিবেন স্থির নাই: নিকট আত্মীয় আর কেহ নাই; তাই মিসেস্ চম্পটীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছেন।

লতা আসিয়া দেখিল, মেয়েটির বয়স অল্প—সতের-আঠার বৎসরের উপরে বোধ হয় হইবে না; দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু হাতে লোহা কি সিঁথেয় সিন্দুর নাই। দুই হাতে দুই গাছি চুড়ী মাত্র আভরণ। আছেও একেবারে একা, একটিমাত্র ঝি লইয়া। মনে কেমন একটা খটকা তার উঠিল। তা—সে যাহাই হউক, যে কারণেই একা এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হউক, তাহার কি? সে আসিয়াছে চাকরী করিতে—বেতন পাইবে, বিনিময়ে ইহার সেবা করিবে। ভিতরের অত খবরে তার কাজ কি? আর সে খবর যাহাই হউক, আপাততঃ অসহায় এই অবস্থায়, বিরাগের নয় অতি করুণার পাত্রীই সে বটে। কথা-বার্ত্তায় মনে হইল, একটু দরদের, দরদী কাহারও একটু আদর যত্নের বড় কাঙাল সে। প্রাণটা লতার কাঁদিয়া উঠিল; ভাবিল, এই দরদই তাকে দিয়া তার সেবা যত্ন করিয়া, যতদূর পারে তৃপ্ত তাহাকে করিবে। এই সব গর্ভিণীদের রুচি সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, বুঝিয়া সেইরূপ দ্রব্যাদিই অতি যত্ন করিয়া রাঁধিত; পাক হইলে নিজে আসিয়া তেল মাখাইত, স্নান হইলে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইত, বৈকালে চুল বাঁধিয়া দিত। দুদিনেই ফুল্লরা বুঝিল, কেবল বেতনভোগিনী একজন সেবিকা মাত্র নহে, অতি দরদিনী একজন বান্ধবীই সে পাইয়াছে।

বৈকালে চুল বাঁধিয়া দিয়া লতা কহিল, "আপনার একটু বেড়ান দরকার। এই এতটুকু জায়গা—এর ভেতর এভাবে আটকা থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।"

ম্লান একটু মৃদু হাসি ফুল্লরার মুখ ফুটিল; কহিল, "কোথায় বেড়াব? বারান্দা নেই, ছাদে যাওয়ার পথও এদিকে নেই—"

"না, সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি।—আমি ত চিনি শুনিনা কিছু, এ পাড়ায়, সবে এই ক'দিন হ'ল এসেছি। নইলে কোনও পার্ক যদি কাছে থাকে, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে আস্‌তে পারতাম। তবে ঝি যদি একদিন গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আসে—"

একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ফুল্লরা উত্তর করিল, "পার্ক আছে, কাছেই—আমিও চিনি। খোলা ভাবেও আগে বেড়িয়েছি অনেক—"

"তা হ'লে চলুন না আপনাকে নিয়ে যাই?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ফুল্লরা কহিল, "না, বড় লজ্জা করে—"

একটু হাসিয়া লতা কহিল, "তা এ অবস্থায় লজ্জা একটু করতে পারে বই কি! কিন্তু কি করবেন? শরীরটার দিকেও ত দৃষ্টি একটু রাখতে হয়। আবার সময়ও নিকট হ'য়ে এল, বড্ড ক্লেশও হয়ত পেতে হবে তখন।"

"কি করব? কপালে যা আছে হবে। উপায় ত কিছু নেই।"

লতা কহিল, "বাড়ীতে ত জায়গা নেই, কাজকর্ম্মও এমন কিছু নেই। তা আগে মাঝে মাঝে একটু বেরোতেন ত?"

"আগে—না; এই মাস চেরেক প্রায় এখানে আছি—বেরোবার সুবিধে হয় নি। তবে—হাঁ, গোড়াতে ওধারে তেতলার একটা ফ্লাটে ছিলাম, জায়গা একটু বেশী ছিল, ছাদে যাওয়া যেত—"

"সেটা ছেড়ে এলেন তবে কেন?"

"ভাড়া বেশী ছিল, চালাতে পারলাম না।"

বলিয়া মুখখানি এক দিকে ফিরাইয়া লইয়া চাপা একটি নিশ্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করিল।

ঝি আসিয়া কহিল, "কে সুকুমারবাবু এয়েছে বৌমা ব'ল্লে দেখা করবে। দরজাটা খুল্‌তেই সরাসর অমনি

উপরেই উঠে আস্‌তে চায়। তা আমি ব'ল্লুম—সে হবে নি বাবু—অবলা একটা মেয়েমানুষ একলা রয়েছে—কেমন ভদ্দরনোক তুমি, যে বলা নেই কওয়া নেই—অমনি গিয়ে ঢুকবে? বৌমা ব'লে দিয়েছে অচেনা মানুষজন কেউ এলে —খবরদার—আমায় না জানিয়ে উপরে নিয়ে আসবি নি ককখনো।"

"বাবু কোথায়?"

"ঐ সিঁড়ির নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে এয়েছি।"

"বল গে যাও, দেখা হবে না, বৌমার শরীর ভাল নেই।"

ঘুরিয়া ঝি ফিরিতেই দরজাটা খুলিয়া গেল, সুবেশ ও সুদর্শন একটি যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ঝি বলিল, "ওমা, এই যে বাবু—সত্যি সত্যিই এসে ঢুকে প'ল দেখছি। হাঁ বাবু, কেমন ভদ্দর নোক তুমি যে—ব'লে এনু বৌমাকে খপর দিচ্ছি—"

'থাম।—যাও, তুমি এখন নীচেয় গিয়ে দরজার কাছে ব'স, দরকার হ'লে ডাকব। মিসেস রায়, আপনি—আপনি বরং একটুকাল ঐ ঘরটায় গিয়ে বসুন।"

লতা উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ফুল্লরা কহিল, "ব'স।"

এদিক ওদিক সুকুমার একবার চাহিয়া দেখিল। ঘরে আসবাব ছিল মাত্র শয়নের দুখানা চৌকি, ছোট একটি টেবিল। ছোট দুখানি চেয়ার, আর দেয়ালে কাপড় রাখিবার একটি আলনা। বালিশ টানিয়া লইয়া একখানি চৌকির উপরে গিয়া হেলিয়া সুকুমার বসিল।

"হাঁ, কেমন আছ ফুলু?"

"ভালই।"

"হুঁ! ইনি কে—এই মিসেস রায়?"

"নার্স।"

"ও। এঁকেই বুঝি মিসেস্ চম্পটী রেখে দিয়েছেন?"

"হাঁ।"

"ভালই হয়েছে। এই রকম একজন লোক সর্ব্বদা তোমার কাছে থাকা এখন অতি দরকারই বটে।"

ফুল্লরা কোনও উত্তর করিল না।

"ফুলু!"

"কি, বল।"

"তুমি—তুমি—এমন ধারা—দূর দূর কেমন একটা ঠাণ্ডা (cold) উদাসীন ভাব ধ'রেছে—সত্যি বড় ব্যথা পাচ্ছি ফুলু। হাঁ, কাজকর্ম্মে কটা মাস বাইরে থাক্‌তে হয়েছে, আস্‌তে পারিনি—কাছে থেকে নিজের তত্ত্বাবধানেই তোমাকে রাখাটা উচিত ছিল সেটা বুঝি। কিন্তু কি করব? কিছুতেই পেরে উঠলাম না—"

"সে কথা ত আমি কিছু বলছিনি।"

"বলছ না, সেইটেই ত আমার বড় দুঃখু। যেন আমি তোমার কেউ নই—পরের মত বাইরেরই একটা লোক মাত্র—"

"থাক্ ও কথা।"

"থাক্—যা মনে ক'রেই তুমি বল—আমি ত আমার দায়িত্ব—দরদ—কিছুই ছাড়তে পারছি নি। বাইরে গিয়েছিলাম—তা ভালভাবে নিরাপদে যাতে থাক্‌তে পার, সব বন্দোবস্ত ক'রেই দিয়ে গিয়েছিলাম। মিসেস্ চম্পটীর মত অভিজ্ঞ একজন লেডী ডাক্তারের হাতে তোমাকে রেখে গিয়েছিলাম। তাছাড়া—তাছাড়া—আমার বন্ধুবান্ধব যারা আছে, ব'লে গিয়েছিলাম ওঁকে, দরকার হ'লে তাদেরও খবর দেবেন। খাসা অমন ফ্লাটটায় রেখে গেলাম—ছেড়ে দিয়েছ। আমার বিশ্বাসী একটা চাকর, আবার তারই জানা একটা ঝি—তাদেরও ছাড়িয়ে দিয়েছ—"

"অত খরচ আমি চালাতে পারি না।"

"খরচ—খরচের ভাবনা তোমার কি? সে'দায় আমার। তা খরচের টাকাও তুমি চম্পটীকে ফেরত দিয়েছ। নানান জায়গায় ঘুরেছি, ঠিকানা নির্দ্দিষ্ট কিছু ছিল না, তাই জান্‌তেই পারিনি কিছু। খরচের টাকা সব ফেরত দিয়েছ কেন? চল্‌ছে কি ক'রে তোমার?"

"যাচ্ছে চ'লে—যে ভাবেই হ'ক্।"

"আছ ত এই prison cell-এর মত ঘরে—হাওয়া নেই, রোদ নেই···একে কি চ'লে যাওয়া বলে? আরও তোমার এই delicate অবস্থায়। শুন্‌লাম, তোমার গয়না যা ছিল বিক্রী করেছ—"

"হাঁ।"

"কতদিন চ'লবে তাতে?"

"তিন-চার মাস বেশ চ'লে যাবে।"

"তার পর?"

"ওসব আলোচনা কিছু করতে চাইনে। আর কোনও কথা যদি তোমার থাকে—"

"কথা আমার এই-ই। এভাবে তোমাকে থাকতে আমি দিতে পারিনে। এদ্দিন ছিলাম না, যা করেছ করেছ। এখন সব ভার আমি নিতে চাই; নিতেই আমাকে হবে, নিতে আমি বাধ্য।"

"আর কোনও কথা সত্যিই যদি তোমার না থাকে—"

"কি, তা হ'লে বিদায় হব? না, সে হবে না ফুলু! আমি যাব না—এখানেই থাক্‌ব আজ। তারপর ভাল একটা বন্দোবস্ত যা হ'ক্‌ ক'রে নিচ্ছি—হাঁ, এক কাপ চা আর কিছু খাবারের বন্দোবস্ত কর দিকি লক্ষীটি।"

বলিয়া উড়ুনীটি খুলিয়া আলনায় রাখিয়া একটি সিগারেট ধরাইল। ফুল্লরা উঠিয়া দরজা খুলিয়া গিয়া ঝিকে ডাকিল; এক পেয়ালা চা আর কিছু রুটি বা বিস্কুট নিকটবর্ত্তী চায়ের দোকান হইতে লইয়া আসিতে বলিল।

পানাহার হইল; আরও একটি সিগারেট সুকুমার ধরাইল—জানালাটির কাছে গিয়া ফুল্লরা দাঁড়াইয়াছিল—ঘুরিয়া তখন কহিল, "তা হ'লে এখন - "

"কি, বিদায় ক'রেই আমাকে দিতে চাও? কেন?"

"থাকবার এমন দরকার কিছু নাই।"

"দরকার—সে আজ এখন কিছু না থাক্‌, সত্যি তোমাকে এই অসহায় অবস্থায় একদম ত্যাগ ক'রেও ত যেতে পারিনে আমি। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের দায় যে এখন আমার। সে দাবীও আমার আছে।'

"দাবী? না, কোনও দাবী তোমার নাই। আর দায় যদি কিছু থাকে, আমি চাইলেই থাক্‌তে পারে। কিন্তু আমি চাইছি না।"

"তোমার মাথাই দেখ্‌ছি খারাপ হ'য়ে গেছে। হাঁ, রাগ তোমার হ'য়েছে, হ'তে পারে। কিন্তু তাতে ক'রে এত বাড়াবাড়ি কেন করছ বল ত? অপরাধ যাই হ'য়ে থাক্‌—ইচ্ছে ক'রে কিছু করিনি, কাজের দায়ে বাধ্য হ'য়েই করতে হয়েছে। তা—তার কি ক্ষমা নেই? এস, এই রাগটা আর মনে পুষে রেখো না লক্ষীটি! এস, আমার কাছে এসে বস।"

বলিতে বলিতে উঠিয়া সুকুমার ফুল্লরার কাছে গিয়া হাতখানি বাড়াইয়া দিল। ত্রস্ত সরিয়া ফুল্লরা বলিয়া উঠিল, "না! কাছে এসো না, হাত ধরো না ব'ল্‌ছি! ব'স্‌তে হয় একটু গিয়ে বস—কথা কিছু থাকে—কি আর আছে জানি না—বল্‌তে পার। নইলে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে এখন বেরিয়ে গেলেই ভাল হয়।"

"তা হ'লে সত্যিই কোনও সম্বন্ধ আমার সঙ্গে রাখ্‌তে চাও না?"

"না।"

"কি ক'রে না রেখে পার, বুঝতেই পারছিনি ফুলু। অন্ততঃ ঐ একটি শিশু যে আস্‌ছে—"

"আস্‌ছে, কি করব?—আস্‌ছে—যা পারি আমার দায়, আমিই করব!"

"দায়টা কেবল তোমার নয় ফুলু, আমারও বটে। পালনের দায়টা তোমার যতই হ'ক্‌, তার খরচটা জোগাবার দায় আমারই বটে।"

"আমি চাইলে হয়ত থাক্‌ত। কিন্তু আবার বলছি, আমি চাইছি না।"

"যদি দাবী আমি করি?"

"কি দাবী করবে?—যে অধিকারে তা পারতে, সে অধিকারই তোমার কিছু নাই।"

"আছে কি-না—সেটা দেখতে হবে।"

"দেখ। যদি থাকে, তখন সেই দাবী নিয়ে এস। এখন যাও।"

"তা হ'লে—এই-ই তোমার স্থির সংকল্প? কোনও সম্বন্ধ আমার সঙ্গে রাখ্‌বে না? নির্ভরও আমার উপরে কিছুতে করবে না?"

"না।"

"বেশ, যা ভাল বোঝ কর। আমি তা হ'লে আজ ঋণমুক্ত!"

দরজার দিকে সুকুমার অগ্রসর হইল—দরজাটা খুলিয়া ঘুরিয়া আবার কহিল, "তবু—ব'লে যাচ্ছি—ঠাণ্ডা হ'য়ে ভাল ক'রে একটু ভেবে দেখো ফুলু। তুমি করলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করতে পারি না, চাইও না।—আমার বন্ধুত্বের দ্বার মুক্তই তোমার কাছে থাকবে। সহায়তাও দরকার হবে। যখনই হয়, জানালেই পাবে।—চম্পটিকে জানাবে।"

বলিয়া সুকুমার নামিয়া গেল।

যতই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করুক, সহসা অপ্রত্যাশিত

এই সাক্ষাৎকার ফুল্লরার দুর্ব্বল দেহমনকে যারপর নাই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিক্রিয়ার অবসাদে একেবারে তখন সে ভাঙ্গিয়া পড়িল।—যিনি আসিয়াছিলেন চলিয়া গিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া পাশের ঘরের দরজাটা খুলিয়া লতা আসিয়া দেখিল, দুই হাতে বুক চাপিয়া গৃহতলে উবুড় হইয়া পড়িয়া ফুল্লরা কাঁদিতেছে। প্রাণটা তাহারও কাঁদিয়া উঠিল। কাছে বসিয়া পিঠের উপরে হাতখানি রাখিয়া স্নেহকরুণ কণ্ঠে ডাকিল, "মিসেস্ বোস।"

"না—মিসেস্—মিসেস্ বোস্ আমি নই—বল্‌তে আর লজ্জা নেই দিদি—যিনি এসেছিলেন, উনি—উনি আমার স্বামী নন। আমি—আমি—মিস্—না, আর মিস্‌টিস্‌ই বা কেন?—আমি ফুল্লরা—শুধুই ফুল্লরা—যদি দয়া কর—তোমারই অভাগী একটি বোন্ ফুল্লরা—ফুলু।" বলিতে বলিতে ফুল্লরা উঠিয়া বসিল, দুই হাতে লতার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পস্খলিত কণ্ঠে ডাকিল, "দিদি! দিদি!"

"বোন্!"

সাশ্রু নয়নে দুটি হাত বাড়াইয়া লতাও ফুল্লরাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

"দিদি! দিদি!—বড় অভাগী আমি। সব হারিয়েছি। একটু দরদ—বড় কাঙাল আমি—কত দিন পরে তোমার কাছে কেবল পেয়েছি। প্রাণটা যে আমার শুকিয়ে একেবারে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছিল দিদি!—এই যে দরদটুকু পেয়েছি—বল, বল দিদি তা হারাব না—ঘেন্না ক'রে আমায় ফেলে যাবে না?"

"কেন যাব বোন্? কেন হারাবে? তুমি যে আমার বোন্—বোন্ ব'লেই যে তোমাকে আজ বুকে ধ'রে নিলাম দিদি।"

আরও শক্ত করিয়া গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ চাপিয়া রাখিয়া কতক্ষণ ফুল্লরা কাঁদিল।

"ফুলু!"

"দিদি!"

মাথায় হাত বুলাইয়া লতা কহিল, "কেঁদ না আর বোন্, একটু শান্ত হও দিকি।—"

"না, কাঁদ্‌তে দেও, আর একটু—একটুখানি আর কাঁদ্‌তে দেও! অনেক কেঁদেছি—একা ঐ বিছানায় পড়ে দিনভর কত কেঁদেছি, কেঁদে কেঁদে কত রাত এমন কাটিয়েছি—একা—একা—একেবারেই একা! আজ তোমাকে পেয়েছি, তোমার দরদের বুকে মুখখানি রেখে কাঁদছি—কেঁদেও আজ কি যে শান্তি—কি যে একটা তৃপ্তি পাচ্ছি! আঃ—দিদি দিদি! আর একটু কাঁদি। এমন যে কাঁদ্‌তে পারছি—সেই যে আজ আমার বড় সুখ—বড় আনন্দ—বড় ভাগ্য দিদি!'

লতা নীরবে ধীরে ধীরে গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গলাটি ছাড়িয়া দিয়া ফুল্লরা সোজা হইয়া বসিল—আঁচলে লতা মুখখানি মুছিয়া দিল।

"একটুখানি দুধ এনে দেব, খাবে?"

"না।' একটু জল—"

এক কোণে একটা কুঁজায় জল ছিল, উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল আনিয়া লতা হাতে দিল—ঘরের নর্দ্দমাটির কাছে সরিয়া বসিয়া চোখ মুখটা একটু ধুইয়া বাকী জলটুকু ফুল্লরা খাইয়া ফেলিল। কেমন আড়ষ্টভাবে চুপ করিয়া কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া কহিল, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি।"

"বেশ, তবে ঘুমোও। রান্না হ'লে এসে আমি ডাকব।"

ধরিয়া ফুল্লরাকে তুলিয়া লতা বিছানায় আনিয়া শোয়াইয়া রাখিল। তার পর ঝিকে ডাকিয়া উনানে আঁচ দিতে বলিয়া রন্ধনের আয়োজনে গেল।

২৬

"নীরদ! নীরদ! কমরেড নীরদ বাড়ীতে আছ?"

লতার মাতুলালয়ের নিকটবর্ত্তী নিতাইডাঙ্গা বা 'সবুজ-কেতনে'র সবুজ দলের নায়ক বিমান আসিয়া উত্তর কলিকাতার একটি বাড়ীর বারান্দায় গিয়া উঠিল।—গ্রাম অঞ্চলেই সাধারণতঃ সে থাকিত; দলও তাহার ছিল গ্রামাঞ্চলবাসী কলেজে-পড়া বা কলেজ-ছাড়া যুবাদের লইয়া।—নির্ম্মল-সুস্নিগ্ধ-সমীর-সেবিত নির্ম্মল নীলোজ্জ্বল আকাশের নীচে সজীব সঞ্জীবন সবুজ শোভায় বাঙ্গলার পল্লীভূমি যতই নয়ন-মনোরঞ্জন হউক, ইহাদের সবুজ সিদ্ধি লাভের উপযোগী সুযোগ সদাসর্ব্বদা সেথায় ঘটিত না—উদ্দীপনাও সময়ে সময়ে কেমন যেন মিয়ান হইয়া পড়িত, বিশেষ কলেজে-পড়া যুবারা যখন দেশে থাকিত না, কেবল কলেজ-ছাড়া মরা মরা যুবাদের লইয়াই দলটা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইত; নূতন উদ্দীপনা লাভের উদ্দেশ্যে তাই সে মধ্যে মধ্যে কলি-

কাতায় আসিত। বাস্তবরূপে সবুজ তেমন কিছু চোখে না পড়িলেও সবুজের প্রেরণা কলিকাতার বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়, বিশেষ যদি বড় কোনও পিকেটিং বা সত্যগ্রহের হৈরৈ দেখা দেয়। ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম্মঘট লইয়া এইরূপ একটা প্রয়োজনও তখন উপস্থিত হইয়াছিল—ডাক পাইয়া বিমান তাহার দলের কয়েকজন কমরেডকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।

বিমান আসিয়া ডাকিল, "নীরদ! নীরদ!—কমরেড নীরদ বাড়ীতে আছ?"

"কে?"

গলা নীরদের নয়; তবু—চেলাই ত বটে।—বিমান গিয়া ঘরে ঢুকিল। অতি সৌম্যদর্শন প্রবীণবয়স্ক একজন ব্রাহ্মণ গৃহ-তলে আস্তৃত একখানি কম্বলের উপরে বসিয়াছিলেন; দেখিয়াই বিমান চমকিয়া উঠিল।

"কে!— পণ্ডিতমশাই! আপনি—আপনি, এখানে—"

"হাঁ। এস বিমান। এসেছি এখানে এই ক'দিন হ'ল —এঁরা আমার শিষ্য। তা—ভাল আছ ত বাবা?"

"আজ্ঞে হাঁ—আছি ভালই।"

"ব'স।"

একটুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কি ভাবিয়া বিমান প্রণাম করিল; তার পর নিকটে গৃহতলেই বসিল। ঠাকুরটির মুখেও মৃদু একটু হাসির রেখা ফুটিল—কহিলেন, "ওখানে কেন? এস, এই কম্বলের ওপরে এসে ব'স।"

বলিয়া একধারে একটু সরিয়া বসিলেন—বিমান কহিল, "আজ্ঞে থাক্—এই ত বেশ বসেছি।"

ঠাকুরটির নাম হরদাস ভট্টাচার্য্য, উপাধি বিদ্যানিধি। নানা বিদ্যালয়ে বহু বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন। বড় একজন পণ্ডিত কেবল নন, সাধক বলিয়াও বিশেষ যশস্বী হইয়া ওঠেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি কেবল ভারতীয় বিদ্যায় নহে, পাশ্চাত্য বিদ্যায়ও স্বকীয় অধ্যবসায়ে যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছেন। পৈতৃক গুরুবৃত্তি ছিল; পাণ্ডিত্যের ও সাধকত্বের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে নানা স্থানের আরও বহুলোক ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে।—পত্নীবিয়োগের পর পৈতৃক ক্রিয়াকর্ম্মাদিসহ সংসারধর্ম্ম-পালনের ভার প্রাপ্তবয়স্ক দুইটি পুত্রের উপরে রাখিয়া গত কয়েক বৎসর যাবৎ পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসের কোনও বেশ ধারণ না করিলেও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায়ই জীবনযাপন করেন। সাধু হরদাস বা ঠাকুর হরদাস নামেই শিষ্যসমাজে ও শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট জনগণের মধ্যে সাধারণতঃ ইনি এখন পরিচিত। ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরা কেহ বা পণ্ডিত-মহাশয়, কেহ বা ঠাকুর-মহাশয় বলিয়া ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়া থাকে। বিমান ইঁহার এইরূপ একজন ছাত্র।

সুগঠন বলিষ্ঠদেহ এই যুবকটির দিকে স্নেহকোমল দৃষ্টিতে একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া হরদাস কহিলেন, "তা হ'লে তুমিও 'কমরেডের' দলে বিমান!"

কেমন যেন একটু সলজ্জভাবে বিমান উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমরা সাম্যবাদী।"

"কিন্তু পুরোপুরি বোধ হয় পারনি হ'তে এখনও।" বলিয়া হরদাস একটু হাসিলেন।

"আজ্ঞে—"

"আজ্ঞেও বল্‌ছ, আবার একটু ইতস্ততঃ যাই ক'রে থাক, প্রণামটাও শেষে করলে—আমার সঙ্গে এক আসনে এসেও বসলে না—"

"তা—আপনার কাছে—কি জানেন—ভক্তিশ্রদ্ধা যা ক'রতাম—পুরোনো সেই সংস্কারটা—"

"অথবা 'কুসংস্কারটা'—"

"আজ্ঞে, তাই আমরা ব'লে থাকি বটে। তবে কি না—আপনার সামনে আর—আর—আপনার সম্বন্ধে—"

"তা হ'লেই বল পুরোপুরি সাম্যবাদী কমরেড এখনও হ'তে পার নি। নীরদকে এসে গলা ছেড়ে কম্‌রেড নীরদ ব'লে ডাকলে, আর আমার সামনে—"

"আজ্ঞে, নীরদ আমি আমরা সমান তরুণ—সমান সবুজবাদী—"

"ও, সবুজবাদীও আবার!—তা সবুজবাদীরা ত আমাদের মত বুড়ো কাউকে প্রণাম ক'রে পদধূলি নেয় না, পদাঘাতে বরং চূর্ণ ক'রেই ফেল্‌তে চায়।"

"আজ্ঞে—সেটা—সেটা—সেটা—কারও ব্যক্তিত্বের দিকের কথা নয়, ভাবের—আদর্শের দিকের কথা। চূর্ণ ক'রে ফেলতে আমরা চাই, প্রাচীন কোনও ব্যক্তিকে নয়, প্রাচীনতাকে, ধূসর জীর্ণ—"

একটু হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "সবুজও কিছু চিরকাল

সবুজ থাকে না বিমান। তাকেও একদিন প্রাচীনতায় এসে ধূসর জীর্ণ হ'তে হবে।"

"যদি হয়, যখন হবে, পিছনে যে সবুজের সব নব নব তরঙ্গ মাথা তুলে আস্‌ছে, তার আঘাত তাকে চূর্ণ ক'রেই ফেল্‌বে।"

হরদাস কহিলেন, "কিন্তু আঘাতের প্রতিঘাতও আছে বিমান।—বাইরে যে রূপই ধরুক, অথবা যে রূপই তার তোমরা দেখ, ভেতরের প্রাণে প্রাচীনও কম বল ধরে না। সত্যিকার সে বল যেখানে আছে, জীবন্ত ধারায় যেখানে বইছে—"

"সেখানে সে সবুজ! বয়সে প্রাচীন, বাইরের খোলসটায় ধূসর জীর্ণ হ'লেও প্রাণে সে সবুজ!"

"ঠিক! নিত্য শাশ্বত পুরাণ যে সবুজ, তারই রঙে চির-সবুজ—ক্ষয় নাই, বিকার নাই!"

"আমাদের তরুণের এই যে সবুজ—সেই সবুজই তার রঙ ফলিয়েছে।"

"না। বুঝ্‌তে পারবে বিমান, যখন তাতে আর এতে সত্যিকার ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হবে। আজ কেবল তোমরা আঘাতই করছ বাইরের খোলসটার ওপরে, ভেতরের সেই সবুজটায় এখনও তেমন গিয়ে সেটা লাগছে না। প্রতিঘাতটাও তাই তাও যে কিছু কিছু সাড়া দিয়ে না উঠ্‌ছে—যেখানে গিয়ে যখন বেশ একটু লাগছে—তাও ব'ল্‌তে পারি না। তোমরাও যে তোমাদের এই অভিযানে সেই সাড়াটা কখনও পাওনি—পাও নি কি সত্যি বিমান?"

বিমানের মনে পড়িল, লতার মাতুলগৃহে তাহাদের সেই অভিযানে লতার আর তাহার সেই অতি গ্রাম্যা প্রবীণা মাতুলানীর নিকট হইতে যে প্রতিঘাতের সাড়াটা তাহারা পাইয়াছিল। মনে পড়িল, আরও কিছু কিছু সাড়া এমন কোথায় কোথায় তাহারা পাইয়াছে। মুখখানি একটু নত হইয়াই পড়িল।—হরদাস কহিলেন, "তাহ'লে পেয়েছ বল?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিমান উত্তর করিল, "আজ্ঞে পাইনি—সেটা বলতে পারি নে। তবে সেটা এসেছে সত্যিকার কোনও পুরাণ সবুজ থেকে—পুরাণ যদি সবুজই হ'তে পারে—না, যুগযুগাগত প্রাচীন কুসংস্কারের যে সব শক্ত দেয়াল এখনও দেশে খাড়া হ'য়ে রয়েছে—যা ভেঙ্গে আমাদের তাজা তরল তরতরে তরুণতার নতুন সবুজের স্রোতকে দেশ ভ'রে আমরা বইয়ে দিতে চাই—সেই দেওয়ালটা থেকে—"

"না, সত্যিকার সেই সবুজের শুদ্ধ বুদ্ধির সংস্কার থেকে। দেয়াল—সময়োচিত পরিমার্জ্জনার অভাবে যতই বিবর্ণ কি জীর্ণ ব'লে মনে হ'ক, যতই আগাছা কুগাছা আজ তার গায়ে দেখা দিক—সে দেয়াল সেই সংস্কারের অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেয়াল বটে। যাক, তা হ'লে তোমাদের এই সবুজ ঠিক বস্তুটা কি, তার স্বরূপটা কি, বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পার বিমান? শুন্‌ছি তোমাদের অনেক ধুয়ো, কিন্তু তোমরা যে ঠিক কি চাও, কোন্ লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে ভাব্‌ছ—সেটা বাস্তবিক কিছু বুঝতেই পারছি নি।"

ভাব-গদগদ স্বরে বিমান বলিয়া উঠিল, "সবুজ—সবুজ—সবুজ ভাবের বস্তু—জীবনটা তার রঙে রঙিয়ে তুলে তার রঙিন পথে চলবার বস্তু! কথায় বুঝিয়ে—কৃত্রিম ভাষার রূপে কৃত্রিম কোনও রূপ দিয়ে তাকে কারও চোখের সামনে খাড়া করবার বস্তু সে নয়। করলেই তার প্রাণটা সে হারাল—সত্যিকার সবুজ আর রইল না!"

হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "ওটা কি আর একটা কথা হ'ল বিমান? একটা কিছু তোমরা করতে যাচ্ছ, একটা কিছু নূতন যা হ'ক গড়তে চাইছ, তা সেটার একটা পরিকল্পনা কিছু নাই? কি ধ'রে গড়বে? সাম্যবাদের কথাও বল্‌ছ, কম্‌রেড নামটাও গ্রহণ করেছ—"

"সবুজ আমরা সবাই সাম্যবাদী, সবাই আমরা সবার কম্‌রেড, নরনারী ভেদ নাই, সবাই সকলের সমান কম্‌রেড!"

"হুঁ! রুষ দেশে সাম্যবাদী একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হ'চ্ছে—'কম্‌রেড' এই নামটা তারাই ব্যবহার ক'রে থাকে। তাদের থেকেই তোমরা নিয়েছ। আগেও সাম্যবাদ একটা ছিল, তাতে নরনারী ছিল পরস্পর ভাই-বোন—"

"কিন্তু 'ভাই-বোন্' বল্লেই নরনারীতে একটা ভেদকে মেনে নেওয়া হয়।—সেইটেই আমরা মেনে নিতে চাই না।"

একটু হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "'নরনারী' 'তরুণ তরুণী'—এই কথাগুলো যে উচ্চারণ কর, তাতেই ত ভেদ একটা মেনে নিচ্ছে বিমান।"

একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া বিমান উত্তর করিল, "আ—

প্রকারান্তরে একটু নিতে হচ্ছে বই কি ? তবে কি-না—'বাইওলজিকাল' (biological) যে পার্থক্যটা দেহের গড়নে রয়েছে, আর তা থেকে পুং-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদে দুটো নাম যে লোকব্যবহারে চ'লে আস্‌ছে, সেটা এড়িয়ে কোনও কথা এসব সম্বন্ধে বলাও আপাততঃ শক্ত।"

"পরেও যে সহজ কিসে হবে জানি না। 'বাইওলজিকাল' এই পার্থক্যটা কেবল দেহের গড়নে নয়, প্রজননের আর প্রজাপালনের কর্ম্মেও রয়েছে ; সে পার্থক্যটা লোপ ক'রে এক্ষেত্রে সাম্য স্থাপন করা কোনও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়।"

"কিন্তু তাই ব'লে আর যত কাজ রয়েছে, জীবনের যত কিছু সুখভোগের অবসর রয়েছে, তাতে অধিকার-ভেদ কেন থাক্‌বে ?"

"কেন থাক্‌বে, থাকাটাই স্বাভাবিক কি-না সে আলোচনার মধ্যে এখন যেতে চাই না বিমান। তবে রুশ সাম্যবাদ সে ভেদটা স্বীকার করে না, তাই ভাই-বোনের বদলে 'কমরেড' নামটা গ্রহণ করেছে। আরও কারণ আছে। ভাই-বোন বল্লেই সমান এক পিতা ঈশ্বরের সন্তান—এই কথাটাকেও প্রকারান্তরে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। কিন্তু রুষ সাম্যবাদীরা নাস্তিক, ঈশ্বর মানে না, ধর্ম্ম মানে না, ধর্ম্মকে দরিদ্র জনগণের পীড়নে ধনী লোকদের উদ্ভাবিত কূট একটা কৌশল ব'লেই মনে করে। তা সে যাক। তাদের একটা পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি ধ'রেই সাম্যবাদী একটা সমাজ তারা গ'ড়ে নিতে চায়! তোমরা তা হ'লে সে আদর্শের, তাদের সে পদ্ধতির সাম্যবাদী—অর্থাৎ সাম্যবাদী সোসিয়ালিস্ট নও ?"

একটু কেমন ইতস্ততঃভাবে বিমান উত্তর করিল, "শুনেছি তাদের সব কথা। সকল ভেদবৈষম্য লোপ ক'রে সকল শ্রেণীর মানবকে কেবল নয়, নরনারীকেও তারা যখন এক স্তরে সকল রকম সাম্য আর স্বাধীনতার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সবাই সমানভাবে কাজ-কর্ম্ম ক'রে খেয়ে প'রে সমান সুখে আছে। সমান শিক্ষা পাচ্ছে। বেকার নেই, গৃহহীন ভিখারী নেই, অজ্ঞ অশিক্ষিত নরনারী কেউ নেই—অভাব কোনও দিকে কারও কিছু নেই। Food for all, clothing for all, house for all, education for all—equal rights of freedom for all—এই ত সোসিয়ালিজমের আদর্শ ব'লে শুনি।"

একটু হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "হাঁ, আদর্শটা কতক পরিমাণে এই রকমই বটে। তবে আদর্শটা এক কথা, আর একটা পদ্ধতিতে সেটাকে বাস্তব একটা রূপ দিয়ে সমগ্র সমাজকে তার ছাঁচে গ'ড়ে তোলা আর এক কথা। তা সেই রূপটা ঠিক কি, আর কি উপায়ে তার ছাচে সমাজটাকে তারা গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করছে, তার কোনও খবর রাখ ?"

"আজ্ঞে—সেটা তেমন কিছু রাখ্‌তে পারিনি। তবে শুনেছি সব তারা ষ্টেটের হাতে নিয়ে ষ্টেটের বলেই করতে চায়। আর সে ষ্টেট্ খাঁটি ডেমোক্র্যাটিক ষ্টেট্।"

হরদাস উত্তর করিলেন, "ষ্টেটের হাতে নিয়ে ষ্টেটের বলেই কর্‌তে চায়, কারণ প্রয়োগের আর কোনও যন্ত্র তাদের নেই। তবে সে ষ্টেট ডেমোক্রাটিক ষ্টেট নয়, হ'তেও পারে না। কারণ তাদের সাম্যবাদের আদর্শটা দেশের সব লোক গ্রহণ করে নি—পদ্ধতিটাও দেশের সব লোকের মতেও স্থির হয় নি। এই মতের লোক যারা তাঁরাই এই পদ্ধতিটা স্থির ক'রে নিয়েছেন, তাঁরাই পুরোণো সমাজটাকে ভেঙ্গে সেটাকে দেশের ওপর বসাতে চাইছেন, আর সবাই সেটা ভাল মনে করুক, কি না করুক। সুতরাং যে ষ্টেটের বলে তাঁরা সেটা করছেন, সেটা তাঁদের বাঁধা একটা দলের মাত্র ষ্টেট, আর তাই-ই হ'তে পারে। ডেমোক্রাটিক ষ্টেট্ ব'ল্‌তে যা বোঝায়, সে জাতীয় কোনও ষ্টেট তা নয়, হ'তেও পারে না।"

"কিন্তু স্বাধীনতার অধিকার সবাইকে যদি সমান ভাবে দেওয়া হয়—"

"সেটা তাঁরা দেন নি, দিতে পারেন না ; দিলে তাঁদের এই পদ্ধতিটাকে বজায় রাখ্‌তেই পারেন না। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে, যে-কোনও উপায়ে হ'ক, এই পদ্ধতিটা ধ'রেই সমাজকে গ'ড়ে তোলা, আর তাতেই স্থির রাখা।"

"কিন্তু সকল শ্রেণীর নরনারীর এই যে সমান স্বাধীনতার অধিকারের কথা শুনি—"

"সে অধিকার তাঁরা দিয়েছেন, আর রাখ্‌তেও চাইছেন, নরনারী জীবনের বিশেষ একটা ক্ষেত্রে, বিশেষ একটা সম্বন্ধে—এই—এই—তোমাদের সবুজবাদীরা নাকি যেটার তরে বড় মেতে উঠেছ ব'লে মনে হয়। জীবনের আর কোনও ক্ষেত্রে—বৃত্তি-নির্ব্বাচনে, জীবিকা অর্জ্জনে, অর্জ্জিত ধনে ইচ্ছামত

পরিবার-পালনে, কি লোকহিতকর ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে, শিক্ষায়, বিদ্যার আলোচনায়—নিজের জ্ঞানদৃষ্টিতে কোন সত্য ধ'রতে পারলে, কোনও সত্য কি নীতি কল্যাণকর ব'লে প্রতীত হ'লে তার প্রচারে—কোথাও কিছু স্বাধীনতা কারও নাই; সব এই একটা দলের আয়ত্ত ষ্টেটের হাতে। খেতে পরতে সবাই পায়, পায় সেই ষ্টেটের গোলামের মত। কাজ কর্ম্ম সবাইকে সেই কর্ত্তাদের হুকুমে, তাদেরই ব্যবস্থা মত, সেই ব্যবস্থা কড়া সব নিয়মে শাসনে ক'রতে হয়, খাওয়া পরারও একটা বরাদ্দ তাঁরা ক'রে দিয়েছেন। কাজেই দিতে হয়। খাওয়া পরার একটা ব্যবস্থা যদি স্বাধীন ভাবে লোকে নিজেরা না ক'রে নিতে পারে, ক'রতে দেওয়া কাউকে না হয়—খাটিয়ে তাদের যাঁরা নিচ্ছেন ব্যবস্থাটা তাঁদেরই ক'রে দিতে হবে। তবে বেশ স্বচ্ছন্দ আর সুখের একটা ব্যবস্থা সবার পক্ষে সেটা হয় কি-না, বাস্তবিক হ'চ্ছে কি-না, সেটা ভাববার কথা, তলিয়ে দেখবার কথা বটে।"

"তা বটে।—কিন্তু এত সব কথা ত—"

"জান না, ভাব নি, ভেবে বুঝতেও চাও নি।—দোষও তোমাদের বড় দিতে পারি না বিমান। কারণ দেশে এ সম্বন্ধে বক্তৃতা যা হয়, লেখা টেকা যা-কিছু বেরোয়, পুরো সত্যটাকে কেউ খুলে দেখান না, অথবা নিজেরাও খোলা সত্যটাকে চোখ খুলে দেখেন নি।"

একটু কি ভাবিয়া বিমান কহিল, "তা—আমরা পণ্ডিত মশাই, ঠিক সোসিয়ালিষ্ট সাম্যবাদী বোধ হয় নই। আমরা সবুজ সাম্যবাদী, যদিও সমান কমরেডের মতই ওদের সঙ্গে মিলি মিশি, অনেক কাজেও গিয়ে জুটি; মনেও তখন হয়, একই পথের যাত্রী আমরা, আমাদের সবুজের প্রেরণা তারাও পেয়েছে, সেই রঙে তাদের প্রাণটাও রঙিয়ে উঠেছে—"

"উঠ্‌তে পারে কারও কারও, তবে সবার নয়—সবাই তারা সবুজের কথাও কিছু বলে না। বেছেও নিয়েছে রক্তরাঙা একটা রঙ, তারই পতাকা ধ'রে সে পথে যাত্রা করেছে, তার একটা লক্ষ্যও আছে। পথটাকেও তারা হিংসার বিরোধবিপ্লবে রক্তরাঙা ক'রেই তুলতে চায়—আর সে লক্ষ্যটাকে বোঝাতে পতাকার চিহ্ন করেছে কাস্তে আর হাতুড়ী—রুষদের নকলে।"

"আর আমাদের সবুজ—কেবলই সবুজ—বিরোধের রক্তরাঙার আমেজও কিছু নাই—শুধুই শান্তির প্রাণাভিরাম স্নিগ্ধ তাজা নবকিশলয় সবুজ। পতাকাও আমাদের সবুজ—মাঝে কেবল একটি—ফোটা নয়—ফুটন্ত রক্তকমল! তরুণ প্রাণে যে urge—urge of youth—অর্থাৎ নূতন সৃষ্টির, আর তাতে যে অনাবিল আনন্দ তাই পাবার তরে, উদ্দাম যে আশা আকাঙ্ক্ষার তাগিদাটা ফুটে উঠ্‌ছে, তারই প্রতীক্ সেই ফুটন্ত রক্তকমল!"

"শুন্‌লাম।—কিন্তু কি চাও তোমরা? এই সবুজ পথে এই পতাকা ধ'রে যে যাত্রাটা সুরু করেছ, কোথায় গিয়ে পৌছুবে? কি ক'রবে?—নূতন যা সৃষ্টি করতে চাও, তার রূপটা কি? বলছ ত কোনও পরিকল্পনাই তোমাদের নেই।"

"চাই, তরুণ তরুণী আমরা সব মনেপ্রাণে সবুজ হ'য়ে—সবুজের ঐ যে urge বা তাগিদ প্রাণে উঠ্‌ছে—সেই তাগিদ মাত্র মেনে তারই গতির মুখে অবাধে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হ'যে চলব। অশেষ রকম বন্ধনে প্রাচীন এই সমাজ, সেই তাগিদটাকে চেপে মানুষকে একেবারে পঙ্গু জীবনহীন ক'রে রাখ্‌তে চায়। আমাদের এই অভিযানে সেই সব বন্ধন একদম টুটে যাবে, প্রাচীন একদম ভেঙ্গে পড়বে—সকল বন্ধনমুক্ত নরনারীর বা তরুণতরুণীর পূর্ণানন্দময় সবুজ একটা সমাজ তখন দেখা দেবে, পৃথিবীটা নন্দন কানন—পার্থিব জীবনটা সত্যকারএকটা অবাধ আনন্দ উপভোগের বস্তু হ'য়ে উঠ্‌বে। সবুজ—সবুজ—সবুজের অখণ্ড অসীম এক সাগর—আর তার উপরে ভাস্‌ছে তরুণতরুণীর প্রাণ—যেন এক একটি ফুটন্ত—না, ফুটন্ত আর তখন কেবল নয়, পরিপূর্ণ রূপ-রস-গন্ধে ফোটাই এক একটি রক্তকমল—ঢেউয়ে ঢেউয়ে গিয়ে তারা গায়ে গায়ে লুটিয়ে পড়ছে!"

"তার মানে—সোজা কথায় অসংযত যৌবনের যে উদ্দাম ভোগলালসা—কেবল সেইটের বশেই অবাধে ছেলে মেয়েরা চল্‌বে—তারই খেয়ালে যা খুশী করবে। কিন্তু তারপর?"

"তার পর আর কি? সেই আমাদের পথ, সেই লক্ষ্য!—সেই সাধনা, সেই সিদ্ধি!"

"বুঝেছি। তা ব্যাটাছেলে তোমরা যা খুশী করতে পার—করছ—বেশ, ক'রে দেখ, লুটোপুটি খেয়ে ভুল যখন বুঝ্‌বে, ফিরবে—ফিরতেও হয় ত পারবে। কিন্তু এই যে মেয়েগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলছ—"

বিমান বলিয়া উঠিল, "ক্ষেপিয়ে আমরা তুলিনি পণ্ডিত মশাই, ক্ষেপে নিজেরা উঠেছে। সবুজের ডাক এসেছে

দেশে, সবুজের সাড়া উঠেছে প্রাণে ভেসে, রসে মাতোয়ারা হ'য়ে দলে দলে সবুজের পথে আস্‌ছে ছুটে সবাই উছল উল্লাসে—পারে না এসে ?"

একটু হাসি হরদাসের মুখে ফুটিল ; বিমান কহিল, "আপনি হাসছেন পণ্ডিত মশাই ? তা—কি জানেন—ভাবের উচ্ছ্বাসকে সংযত করতে শিখি নি। সেই ত আমাদের সবুজ প্রাণের সহজ গতি, যে দিকে চালায় অবাধে চলি, যে কথা বলায় মুক্তকণ্ঠেই ব'লে ফেলি।"

"তা বল।—যাই ভাবি, সত্যি বল্‌ছি বিমান, তোমার সরলতার প্রশংসা মনে মনে না ক'রেও পারছি না।—বল যা খুশী ক্ষতি নাই ; কিন্তু চলবার বেলায়—"

"তাই বা সংযত হব কেন ? সংযত হওয়া মানেই সবুজকে চাপা দিয়ে শুকিয়ে ধূসর জীর্ণ ক'রে মেরে ফেলা !"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া হরদাস কহিলেন, "চল যেমন খুশী।—তবে মেয়েগুলোও যে সঙ্গে সঙ্গে এমনি অসংযত হ'য়ে চল্‌ছে—"

"কেন চলবে না ? তরুণ প্রাণের অবাধ স্ফূর্ত্তিতে তরুণ জীবনকে উপভোগ করবার অধিকার তরুণ যেমন আমাদের আছে, তরুণীদেরও সমান তেমনি আছে !"

"থাম ! শুন্‌তেও কানে গিয়ে লাগছে।—অসংযত প্রবৃত্তির বশে চলবার অধিকার বনের পশুর থাকতে পারে, সমাজভুক্ত মানুষ কারও নাই। সমাজ ব'লেই কিছুর অস্তিত্ব তাতে থাকতে পারে না। চলছ, ফলে ঘর ভাঙ্গছে, সমাজ ভাঙ্গছে, আর সকল আশ্রয়চ্যুত হ'য়ে সেই ভাঙ্গার ঘূর্ণীপাকে প'ড়ে মেয়েরা যে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে—"

"তলিয়ে যাচ্ছে না, সবুজ সাগরে যে নূতন জীবনের তরঙ্গ উঠেছে, সেই তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে নাচ্‌ছে—একদিল হ'য়ে তরুণদের সঙ্গে সমান এক তালে !"

"কি আর বলব বিমান !—নারীকে দেখ্‌ছ কেবল তোমাদের ভোগসহচরীরূপে। তারা যে মা—আর সেই মায়েরও একটা মহিমাময় রূপ আছে, এটা ভুলেই গেছ—চোখেই তোমাদের পড়ছে না। বুঝ্‌তেই পারি না, মায়ের সন্তান এত বড় হতভাগা এ পৃথিবীতে কি ক'রে কে থাক্‌তে পারে, যে নারীতে মায়ের এই মহিমা তারা দেখে না, কেবল ভোগের সঙ্গিনী রূপেই তাদের চায়—আরও এই দেশে—যে দেশে নারী মাত্রকেই লোকে মা ব'লে ডাকে, গৃহে গৃহে যাকেই সর্ব্বোচ্চ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে !"

"কিন্তু সেই নারী আবার পুরুষের স্ত্রীও বটে।—আর স্ত্রী—"

"স্ত্রী তার স্বামীর ভোগসহচরী মাত্র নয়। যেমন তার মর্ম্মসখী, তেমনই আবার সহধর্ম্মিণীও বটে।—তোমার মাতা জীবিত আছেন বিমান ?"

"আজ্ঞে, না।"

"পিতা ?"

"আজ্ঞে, তিনিও চ'লে গেছেন।"

"তাঁদের স্মৃতিও মনে নেই ?"

হঠাৎ কেমন একটা লজ্জায় যেন বিমানের মাথাটা একটু নত হইয়া পড়িল।—কিছু সঙ্কুচিতভাবেই কহিল, "আজ্ঞে, তাও কি কেউ ভুল্‌তে পারে ?"

"তুমি এখন কোথায় থাক ? কলকেতায় ?"

"আজ্ঞে না, দেশেই থাকি।"

"তা সেই দেশে—গৃহে গৃহে এইরূপ সব মা—এই তোমারই মা যেমন ছিলেন তেমনি সব মা—কেউ কেউ তাঁরা হয়ত দূর কি নিকট সম্বন্ধে তোমারই জেঠাইমা, খুড়ীমা, পিসীমা, মাসীমা, মামীমা, দিদিমা—এঁদের দেখনি ? দেখনি এঁরা দশ-পাঁচজনে একত্র হ'য়ে ব'সে সন্তানদের কল্যাণ-কামনায় ষষ্ঠীব্রত করেন, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করেন ? দেখ নি একসঙ্গে সবাই ফল-ফুলের ডালি হাতে ক'রে দেবালয়ে যান—সঙ্গে যায় ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, আর আনন্দের কলরব তাদের মায়েদের হুলুধ্বনির সঙ্গে মিলে—চারদিক মুখরিত ক'রে তোলে ? দেখনি কখনও কঠিন রোগ থেকে সন্তানের মুক্তি লাভে বুক চিরে রক্ত কত মা দেবতার দোরে বলি উপহার দেন ? দেখনি কত মা অনাহারে দিনের পর দিন দেব-প্রাঙ্গণে ধরণা দিয়ে প'ড়ে থাকেন, যদি দেবতার কোন কৃপাবাণী শোনেন যাতে তাঁর মরণশয্যাশায়ী প্রাণের বাছা প্রাণ পেয়ে আবার উঠ্‌তে পারে ?"

"দেখেছি, পণ্ডিত মশাই।"

গভীর একটি নিশ্বাসও বুক ভরিয়া উঠিতেছিল—চাপিয়া কহিল, "হাঁ, নীরদ কোথায় ? এসেছিলাম তার কাছে।"

"বেরিয়েছে একটু কাজে। ব'স, আস্‌বে এখুনি। এদের—এদের—কি সর্ব্বনাশ হয়েছে শোননি ?"

"সর্ব্বনাশ! কেন, কি হয়েছে?"

"তার ভগ্নী ফুল্লরা গৃহ ত্যাগ ক'রে গেছে।"

"গৃহত্যাগ ক'রে গেছে! তার মানে—"

"মানেটা—শক্ত এমন কিছু নয়। এই তোমরা যে ডাক এনেছে বল্‌ছ, অথবা যে কু'ডাক তোমরা তুলেছ বা তুলতে শিখেছ—তারই একটা ফল—অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।"

"কিন্তু তাই ব'লে একেবারে গৃহ ত্যাগ ক'রেই যেতে হ'ল—"

"আরও অনেকের হ'য়েছে—হ'চ্ছে—হবে! কারণ এরা মেয়ে—মায়ের জাত। মাতৃত্বের একটা মর্য্যাদা আছে, নারীর সে মর্য্যাদা গৃহে যদি সে না পায়, গৃহ যদি তাকে দিতে না পারে, গ্লানির লজ্জায় গৃহ ছেড়ে যাওয়া বই আর গতি কি থাক্‌তে পারে তার?"

নতমুখে একটু কাল বিমান কি ভাবিল—মুখ তুলিয়া কেমন একটু যেন উত্তেজিত ভাবেই বলিয়া উঠিল, "সে মর্য্যাদা গৃহে কেন সে পাবে না? গৃহ কেন তাকে দেবে না?"

"যেহেতু এই মর্য্যাদার স্বরূপ কি, আশ্রয় কি, তার একটা আদর্শ সমাজে চ'লে আস্‌ছে, আর সেই সমাজভুক্তই গৃহী এরা।"

"তাহ'লে এই সমাজে এ মর্য্যাদা ফুল্লরা পেতে পারে না?"

"না।"

"ভাল, আমরা আমাদের সমাজে সেই মর্য্যাদা তবে তাকে দেব!"

"তোমাদের সমাজে! তোমাদের সমাজ কোথায় যে দেবে?"

অপ্রতিভভাবে বিমান একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "অন্ততঃ—অন্ততঃ—আমাদের এই সবুজ দলে যদি তাকে বরণ আমরা ক'রে নিই।"

"মর্য্যাদা থাক্, এই গ্লানি আরও ঘন, আরও গাঢ় হবে!"

"তাহ'লে সহরের অগ্রসর সমাজ—যাঁরা এই সবুজের কথা—সাম্যের কথা—স্বাধীনতার বাণী প্রচার ক'রছেন, যাঁদের থেকেই প্রেরণা আমরা পাচ্ছি—"

"কোথায় তাঁরা? স্থির একটা আদর্শ ধ'রে বাঁধা কোনও সমাজ কি সম্প্রদায়—এমন কি একটা দলও তাঁদের কোথাও আছে? সহরের ভাববিলাসী সৌখিন বাবুরা সভায় যান, বক্তৃতা করেন, কবিতা লেখেন, গল্প-প্রবন্ধ রচেন, বাহবা নেন—ব্যস্! এই আদর্শে একটা দল কোথাও কেউ বেঁধেছেন ব'ল্‌তে পার?—এই আদর্শ ধ'রে চ'ল্‌ছেন কোথাও কেউ দেখাতে পার? ঘরের খবর এঁদের নিয়ে দেখ, সেথায় সবাই ঠিক আছেন। ঘরের ছেলেমেয়েদের বেশ আগ্‌লে রেখেছেন, মাথা খাচ্ছেন পরের ছেলেমেয়েদের! বেশী একটু ঘেঁসে ছোকরা বয়সের যারা তোমাদের সঙ্গে এসে মিল্‌ছে, 'কমরেড' ব'লে কোলাকুলি দিচ্ছে—তারাও মিশছে এসে মেয়েদের জটলায়! তারপর কতক বা এই জমকাল সব বুলির ছলে ভুলিয়ে, কতক বা অবাধ এই মেলামেশায় যে আকর্ষণটা আসে—তার সুবিধে নিয়ে, যাকে চোকে ধ'রছে তার সর্ব্বনাশ ক'রছে—এই—এই—যেমন ফুল্লরার সর্ব্বনাশ ক'রেছে কে ভাল এক ছোকরা—হাঁ, সুকুমার।"

"সুকুমার!"

"হাঁ, শুনেছি বড় ঘরের ছেলে, বাপের পয়সা আছে—নিজেও বেশ একটু সৌখিন। সাম্যবাদের ধ্বজা ধ'রে আসরে এসে নামবার কোনও তাগিদই তার থাকতে পারে না। সোসিয়ালিষ্ট দলে ত নয়ই, তবে তোমাদের সবুজ দলে—হাঁ, রঙ্গিণ একটা আকর্ষণ আছে এই সব সৌখিন যুবাদের পক্ষে, কারণ তোমাদের এটা কেবল ভোগেরই সাম্যবাদ, কাজের কিছু নয়!"

মুখখানি লালিম, আর মাথাটাও বিমানের একটু নত হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে কহিল, "সুকুমার! সুকুমারই শেষে ফুলুকে নিয়ে পালিয়েছে?"

"নীরদের দৃঢ় বিশ্বাস তাই—প্রমাণও যথেষ্ট পেয়েছে। নীরদের বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, সর্ব্বদা আসত যেত, গল্প ক'রত, গানবাজনা করত, ফুলুকে নিয়ে বেড়াত, সিনেমা থিয়েটারে যেত। একটা গীতিনাট্যেও নাকি একত্র অভিনয় ক'রেছিল। অতটা খোলাভাবে মিল্‌তে মিশ্‌তে আর কারও সঙ্গে তাকে দেখা যায়নি। তবে হ'য়ত পালাত না নিয়ে, অত বড় দায় একটা মাথায় তুলে নিত না। তবে—ফুলুর একখানা পত্রে যে আভাস পাওয়া যায়, তাতে—তাতে—ব'লেছিই ত তোমাকে, পালাতে শেষে বাধ্য হয়, ঘরে আর অভাগীর থাক্‌বার উপায় ছিল না।"

"কোথায় আছে তারা ?"

"জান্‌তে এখনও পারেনি নীরদ, খুঁজছে। সুকুমারকে ধরতেই এখনও পারেনি।"

"হুঁ! সুকুমার—ভাল কাজ ঠিক করেনি। আমাদের যে আদর্শ—"

"আদর্শ! কি এমন আদর্শটা আছে তোমাদের? আদর্শ ত এই—যে তরুণ বয়সের তরলমতি ছেলেমেয়েরা কোনও নিয়ম মান্‌বে না, ধর্ম্ম মানবে না, কোনও কাজের দায়িত্ব কিছু বুঝবে না, কেবল যা খুসী তাই ক'রে বেড়াবে, আর তাতে ক'রে এই সব সঙ্কট যে উপস্থিত হতে পারে তার একটা হিসেবও মাথায় আন্‌বে না—এও আবার মানুষের জীবনের একটা আদর্শ? ফল এই হ'চ্ছে—তোমাদের কি? মেয়েগুলোই পাথারে ভাস্‌ছে। রুষ দেশের সোসিয়ালিষ্টরা এই সব হিসেব ক'রে তাদের সাম্যবাদ দেশে প্রতিষ্ঠা ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রছে। এই ক্ষেত্রে নরনারীকে সমান একটা অবাধ স্বাধীনতা যেমন দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের আইনে এও ব্যবস্থা ক'রেছে, মাতৃত্ব কোনও অবস্থায়ই নারীর পক্ষে গ্লানিকর হবেনা, সব মাতাই—সব মাতার গর্ভজাত সন্তানই সমান সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হবে, যদিও সন্তান তার ফলে পিতৃস্নেহের আশ্রয়ে পিতৃ-পরিচয়ে আর তার গৌরবে বঞ্চিতই অনেক স্থলে থাক্‌ছে; তাও কম একটা ক্ষতি তার নয়।—তা সে যাই হক, তারা যেমন ভাঙ্গছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি গ'ড়ছে, কারণ ভাঙ্গবার সঙ্গে গ'ড়বারও পাকা একটা পদ্ধতির ছক তারা এঁকে নিয়েছিল। নইলে কেবলই ভাঙ্গলে বহু দুঃখ মানুষকে পেতে হয়। কবে কিভাবে নতুন কিছু গড়বে, আদবে কিছু গড়বেই, না দেশ সমাজ চিরতরে ধ্বংস হ'য়ে যাবে, কেউ ব'লতে পারে না। কিন্তু তোমরা কি ক'রেছ, কি ক'রছ?"

"তাহ'লে সেই রুষ-পদ্ধতিটা ধ'রে দেশটাকে যদি আমরা নূতন ক'রে গ'ড়তে চাই, আর পারি—"

"পার, চেষ্টা দেখ। কিন্তু যে বলে তারা ক'রছে, সে বল তোমাদের নেই, সংকল্পের সে দৃঢ়তা নাই, সে বুদ্ধিই তোমাদের মাথায় নেই। তবু যদি পার, দেখ। কিন্তু যদি না পার, যতদিন না পার, পুরোণ সব আশ্রয়ের বাঁধন থেকে ছিন্ন ক'রে মেয়েদের—মায়ের জাতটাকেই—এমনি ক'রে আকুল পাথারে ভাসিও না!"

"আপনি তাহ'লে নতুন এই রুষ সমাজপদ্ধতিটাকে—"

"কি, দেশে এনে বসাতে চাই কি না? না একদম চাই না। মানবজীবনের পক্ষে বিশেষ সুখের কি কল্যাণের একটা পদ্ধতি ব'লেই সেটাকে আমি মনে করি না। ভারতের যে সমাজপদ্ধতি, ধর্ম্মপদ্ধতি—তার চাইতে বড় কিছু, ভাল কিছু, পৃথিবীতে কোথাও আর হ'বে ব'লেও জানি না। ভারতসন্তান আমি—কেন সেটা ভেঙ্গে পরের একটা পদ্ধতি এনে বসাতে চাইব; আরও সেটা বাস্তবিক মানবসমাজে চ'লেই কিনা, কল্যাণ কিছু আন্‌তেই পারে কি না, এখনও পরীক্ষা একটা হয়নি। নিয়মধরণও তাদের বদ্‌লাচ্ছে—যত দিন যাচ্ছে। তবে একথা স্বীকার ক'রতেই হবে, হিসেব ক'রে তারা চ'ল্‌ছে। এই যে আদর্শটা ধ'রে দেশ গ'ড়তে চাইছে, তাতে ক'রে যে অবস্থায় যা কিছু দরকার হ'তে পাবে, পাকা হিসেবে আগেই সব ঠিক ক'রে তার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। আদর্শটা তাদের মাথায় তুলে না নিতে পারি, তাদের শক্তির বুদ্ধির হিসেবের কাছে মাথা নত ক'রতেই হবে!"

কেমন আনমনাভাবে বিমান কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। শেষে কহিল, "আজ তবে উঠি পণ্ডিত মশাই।"

"নীরদ হয়ত এখুনি এসে প'ড়বে।"

"আর একদিন দেখা ক'রব। আজ—আজ—বুঝতেই পারছিনি পণ্ডিত মশাই কি ক'রব, কি ক'রলে ভাল হবে। আপনার সঙ্গেও আবার দেখা ক'রব। আপনি—"

"আছি এখানে আরও কয়দিন। মা ফুলুর সঙ্গে দেখা না ক'রে একটা কিছু ব্যবস্থা তার না ক'রে যেতেই আমি পারছিনি কোথাও।"

"আচ্ছা, তবে আসি এখন।"

প্রণাম করিয়া বিমান উঠিল। একটু হাসিয়া হরদাস কহিলেন, "আচ্ছা, তবে এস। আবার আস্‌বে, তোমাকেও ছেড়ে দিতে পারছিনি বিমান!"

চক্ষু দুটিই বোধহয় একটু আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ ঘুরিয়া বিমান বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

অশোকের দান

শ্রীগোপালচন্দ্র দাশ

ভারত সিংহাসনে
নৃপতি অশোক ছিলেন আসীন
অতীব হৃষ্টমনে।
হেনকালে তাঁর মন্ত্রী প্রবীর
দাঁড়াইল আসি নত করি শির,
কহিল বিনয়ে "আজি ধরণীর
পরম শুভক্ষণে
চুরাশি হাজার বৌদ্ধবিহার
নিখিল ভারতে দিয়া উপহার
বাঁচিয়া রহিল হে নৃপ উদার,
মানব-হৃদয়কোণে।"

"আজি এ মহোৎসবে"
কহিলেন নৃপ—"আমি কত বড়—
তাই কি কহিবে সবে?
আজিকার দিনে আমার কি দাম,
তাহার হিসাব নাই শুনিলাম!
মোর কাজ-মাঝে বুদ্ধের নাম
যখন ধ্বনিত হবে,
বুঝিব তখনি হয়েছে সফল
আমার প্রাণেব যতন সকল;
নহিলে বুঝিব, শুধুই নকল
জুড়িয়া বসেছে ভবে।"

"চারি ক্রোশ অন্তর
ভারত ব্যাপিয়া দানের যজ্ঞ
সুরু হোক্ সত্বর।
সপ্তাহ ধরি চলুক আহুতি,
নির্বাণ-গীতি-প্রাণের কাকুতি,
তথাগত-জয়, সত্যের স্তুতি
চলুক নিরন্তর।"
কহিল নৃপতি পারিষদে ডাকি,'
"সত্য কহিও, দিওনাকো ফাঁকি,
শূন্য হইতে আর কত বাকী
আমার ভাঁড়ার ঘর?"

মৌদ্গলি-সন্তান
তিষ্য আসিয়া দাঁড়াইল দ্বারে।
নৃপ করে আহ্বান।
ভিক্ষু চরণে জানায়ে প্রণতি
বিনয় বচনে কহিল নৃপতি,
"তব ঋণ শুধি—নাহিক শকতি;
ক্ষমা করি রাখ মান।"
তিষ্য কহিল, "ওগো ভূস্বামী
দান করি হ'লে বহু সম্মানী।"
নৃপ কহে, "বল, লভিনু কি আমি
'ধরমবন্ধু' নাম?"

সংঘের নেতা তিষ্য
কহিল সভয়ে, "হে রাজা অশোক,
তুমি তো হয়েছ নিঃস্ব;
ধর্মের লাগি সকলি বিলালে,
মানুষের প্রাণ তাহাতে ভুলালে;
সে পারে স'পিতে আপন দুলালে
করিতে সংঘশিষ্য—
সে-ই শুধু একা ধরমমিত্র,
তথাগতমতে পূতপবিত্র,
সে-ই শুধু আঁকে ত্যাগীর চিত্র
ভরিয়া নিখিল বিশ্ব।"

বিষাদ-নম্র শিরে
রাজপথে আসি দাঁড়াল নৃপতি
ভাসিয়া অশ্রুনীরে।
নৃপতির মনে জাগে সংশয়,
বিলাস ব্যসনে লালিত তনয়
বুঝিবে কি তার পিতার হৃদয়
কি ব্যথা রয়েছে ঘিরে?
হেনকালে আসি রাজার কুমার
কহিল প্রণমি চরণে পিতার
"ত্যাগব্রত সাথে তব দুখভার
তুলিয়া নিলাম শিরে।"

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহারেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

যতটুকু পেয়েছে, তার এককণা বেশী পাবার আশাও করে নি কোন দিন; কিন্তু সেই পরিমিত পাওয়ার একবিন্দু হারাবার নৈরাশ্যও অতসী সইতে পারে না। যে পদ্মকে সে দস্তুরমত ভয় করত, এমন কি যার পানে মুখ তুলে চাইতেও হয়েছে ওর শঙ্কা, আজ সাম্‌না-সাম্‌নি তাকেই শুনিয়ে সে ব'লে উঠ্‌ল—"অত তেজ ভগবান সইবে না। আমি না দেখি, দশজনে দেখ্‌বে—"

পদ্ম শুনেও শোনে না; মুখোমুখি ঝগড়াটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় শুধু একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অতসীর মুখপানে চেয়ে আনমনে চলে যায় কাজে।

"অমন ক'রে কাকে শাপমন্যি দিচ্ছ?"—একতারাটা নামিয়ে রেখে দীনু অলসভাবে ব'সে পড়ল অতসীর পাশে।

প্রথমটা অতসী কোন উত্তর দিল না। দীনুর ওপরেও যে অভিযোগ ওর নেই তা নয়। তবুও কি ভেবে শেষে উত্তর দেয়—"ওই গন্নাকাটী, আবার কে! রাজ্যিসুদ্ধ নিয়েও ওর পোষাচ্ছে না। ছোট জাত কি না! তাই—"

দীনু হঠাৎ আঁৎকে ওঠে; মনটা বিব্রত হ'য়ে পড়ে নিজের কাছে জবাবদিহি করতে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে অতসীর পিঠে হাত দিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস্ করে—"কি হ'ল শুনি?"

"থাক্।"—অতসী সরে' বসে; পিঠ ঝাড়া দিয়ে দীনুর হাতের স্পর্শটুকু থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয়। মুখখানা কালো হ'য়ে ওঠে অভিমানে।

দীনু সত্যি বোঝে না ওর দুঃখ। অতসীর এই প্রচ্ছন্ন অভিমান যে কার ওপর, সেটা হয়ত অনুমান ক'রে নিতে পারে সে। কিন্তু চায় না। অকারণ অনুমান ক'রে অস্পষ্টকে স্পষ্ট করবার আকাঙ্ক্ষা আর নেই ওর। নির্ম্মম দারিদ্র্যের সঙ্গে রাত্রিদিন অক্লান্ত যুদ্ধ ক'রে ওর চেতনাটা কেমন বিকল হ'য়ে পড়েছে। নিজের কাছেই ওর অস্তিত্ব যেন দিন দিন অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। বাইরের জগৎ, পিছনে ফেলে আসা সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীত—সমুদ্র পারের কষ্ট-কল্পিত চক্রবালের মত মাঝে মাঝে ধরা দেয় নিভৃত মনের আকাশপ্রান্তে। কিন্তু নিজেকে ও একটী ক্ষণের জন্যেও আর মিলিয়ে নিতে পারে না, সেই বিস্মৃত দিনের সঙ্গে।

এখন ও ভিখিরী। ভিখিরী ছাড়া যে অন্য পরিচয় ওর ছিল কোন দিন, সে কথা আজ ঘুমের ঘোরেও একবার ভেসে ওঠে না মনে। আশ্চর্য্য! অতবড় একটা জগৎ কেমন ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছোট হ'য়ে এল। সমৃদ্ধির সমস্ত অনুভূতি, পারিপার্শ্বিক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা—সব আস্তে আস্তে ঘনীভূত হ'ল ভাঙা ওই একতারাটায়।—অতসী কিনে দিয়েছে; তার চেনা কোন্ বুড়ো ভিখিরীর কাছ থেকে কান্নাকাটি ক'রে আদায় করেছে ওটা, মাত্র তিন আনা পয়সায়। বাড়ীভাড়ার পয়সা বাকী রেখে হঠাৎ ক'রে ফেলেছে অমনি একটা দুঃসাহসিকতা।

একতারাটাকে দীনু ভালবাসে; অতসী কিনে দিয়েছে ব'লে নয়, ওই জীর্ণ একতারাটাই তার নিরালম্ব বিচ্ছিন্ন জীবনটাকে ক্ষীণ একটা অবলম্বনের সূতোয় বেঁধে রেখেছে। যে কথা মুখফুটে বল্‌তে ও রাত্রিদিন পেয়েছে বাধা, সেই না-বলা কথার প্রতিধ্বনি হয় ওরই তারে—মরচে-ধরা সরু ওই প্রাণহীন তারটা অক্লান্ত কণ্ঠে জানায় ওর আবেদন; মানুষের দ্বারে দ্বা'র পৌঁছে দেয় রিক্তের করুণ কান্না।

অতসী কাঁদে। দুই হাতে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে ওঠে কান্নায়। চাপা কান্নার স্রোতটা ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে; কুক্ষিদুটো হাফরের মত কাঁপে।

দীনু এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি। কর্‌লেও মনস্কতার অভাবে কান্নাটা ঠিক ধরা পড়ে নি ওর চোখে।

বেলা বাড়ছে।—"অতসী!"—গায়ে হাত দিয়ে দীনু আবার সরে' বস্‌ল ওর কাছে,—"বেরুবে না আজ?"

"না।" কণ্ঠস্বর যেন চাপা পড়েছে গুরুভার পাথরের তলে।

করতল থেকে অতসীর মুখখানা মুক্ত করতে গিয়ে দীনু হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল। সাম্‌নের চুলগুলো কাটা! কাটা নয়, পোড়া। পোড়া চুলের বিদ্‌কুটে গন্ধ তখনও জমে' আছে ওর রুক্ষ চুলের গোছায় গোছায়।

বিহ্বলদৃষ্টিতে দীনু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অতসীর মুখপানে। ভাব্‌তে পারে না সে, কেমন ক'রে আগুন ধ'রে গেল ওর চুলগুলোয়। নিতান্ত অপ্রতিভের মত অতসীর মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস্ করল—"কেমন ক'রে হ'ল অতসী?"

এবার অতসী জ্বলে' উঠল অভিমানে। দীনুর হাতখানা দূরে ঠেলে দিয়ে বল্‌লে—"জানি না। আমি চাই না জান্‌তে।" তারপর দ্বিতীয় কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখে উন্মত্তের মত ছুটে গেল ঘরের ভিতর।

অতসীর এই রূপান্তর আর কোন দিন সে দেখে নি। দীনু যেন মুহূর্ত্তে কেমন হতভম্ব হ'য়ে গেল। গোড়া থেকে যতখানি আপনা-আপনি পরিষ্কার হয়েছিল ওর চোখে, সবটুকু আবার আকস্মিক আবর্ত্তে ঘোলা হ'য়ে উঠ্‌ল।

পদ্মর প্রতিদিনের আচরণ, অতসীর অপ্রত্যাশিত শাপ-শাপান্ত—আরও কত খুঁটিনাটি ঘটনার ছিন্ন টুক্‌রোগুলো আপনমনে মেলাতে মেলাতে দীনু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। —তেমনি বিশ্রী চুলপোড়া গন্ধে ঘরখানা ঝাঁঝাল হ'য়ে আছে, তারই সঙ্গে মিশেছে চামড়া-ঝল্‌সানো একটা তীব্র গন্ধের ঝাঁঝ। মাথার ভিতরটা কেমন জ্বালা ক'রে ওঠে! দীনু বুঝ্‌তে পারে না, কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটেছে ওর আস্তানার আবহাওয়ায় এই অলস ভোরের একটিমাত্র প্রহরে। হঠাৎ চম্‌কে ওঠে বালিশটার দিকে চেয়ে, সেটা তখনও ধূমিয়ে ধূমিয়ে জ্বল্‌ছে!

ভোর না হ'তেই ও বেরিয়ে পড়েছিল একতারাটি হাতে নিয়ে রাস্তায়। ক্লান্ত চোখ থেকে নিদ্রার জড়তা তখনও কাটে নি। মরণোন্মুখ সহযাত্রীদের প্রাত্যহিক তীর্থযাত্রার কলরব সইতে পারে না ব'লে ওরা জাগ্‌বার আগেই দীনু পালিয়ে যায় পথে।

আগুন নিবে গেছে অনেক আগেই; কিন্তু ভিজে বালিশটার গায়ে তখনও জড়িয়ে আছে ধোঁয়া। তেলচিটে ময়লার পুরু আবরণ ভেদ ক'রে ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো মুক্ত হ'তে পারে নি।

বালিশটার গায়ে, আশে পাশে ছড়িয়ে আছে কতক-গুলো লম্বা চুল। সেই আধ-পোড়া রুক্ষ চুলগুলো দেখে আর কোন অসুবিধা হয় না ওর আগাগোড়া অনুমান ক'রে নিতে। তবুও ভাব্‌তে পারে না, কেমন ক'রে দীনুর ঘরে হ'ল এই অগ্নিকাণ্ড! কাজটা যে পদ্মর তাতে কোন সন্দেহ নেই; সে-ই মুঠো ক'রে ধ'রে আগুন ছুঁইয়ে দিয়েছে একরাশ চুলের গোড়ায়। কিন্তু, কেন? কি লাভ তার, অতসীকে অমন ক'রে শাস্তি দিয়ে?

দীনুর মনটা পাক খেয়ে যায়। এতদিনের ভিতর অতসীর কথা ও কখনও ভাবেনি এমন ক'রে। ওর চলার পথে যে অতসী পান্থপাদপের মত পাশে পাশে চলেছে পিপাসার জল নিয়ে, তার সম্বন্ধে নিজের এই নির্লজ্জ উদাসীনতা যেন ওকে আজ চাবুক মারে।

ক্ষিপ্রপদে দীনু ঘর থেকে বেরিয়ে চীৎকার ক'রে ডাক্‌ল—"অতসী!"

সাড়া নেই। অতসীরা কখন চলে গেছে ভিক্ষেয়। ওদের ঘরে চাবিসুদ্ধ তালাটা আট্‌কান।

দীনু বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে। এই মাত্র, এক মুহূর্ত্ত আগে অতসী জবাব দিয়েছে ভিক্ষেয় যাবে না ব'লে। অথচ দীনুকে একটা ডাক দিয়ে যাবারও সবুর সইল না তার!

দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দীনু কি ভাবছিল। অন্য-মনস্কতার অবসরে তর্জ্জনীটা ওর কখন আঘাত ক'রে বস্‌ল একতারার তারে।

পিছন থেকে চাপা ব্যঙ্গের সুরে হঠাৎ পদ্ম ব'লে উঠ্‌ল—"ফির্‌তে হবে গো, হাত বন্ধ।"

দীনু ফিরে চাইতে না-চাইতেই চটুল গতিতে পদ্ম ওর সাম্‌নে দিয়ে চলে গেল ভাড়াটেদের ঘরে।—মনটা সত্যি বিষিয়ে ওঠে। এই বেহায়া মেয়েটাকে ও আর একতিলও যেন সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, দৃঢ়মুষ্টিতে ওর চঞ্চল দেহটাকে দুহাতে আকর্ষণ ক'রে উদগ্র রক্তকণিকাগুলো পেষণ ক'রে ওর সবটুকু কদর্য্যতা নিঃশেষে নিঙ্‌ড়ে দেয়। আবার পরমুহূর্ত্তেই লজ্জিত হ'য়ে পড়ে অসঙ্গত চিন্তার আকস্মিক প্রতিঘাতে।

ভাল না বাস্‌লেও মেয়েদের অশ্রদ্ধা করতে ওর সংস্কার আহত হয়। রক্তে রক্তে যে দেনা-পাওনা জড়িয়ে আছে সৃষ্টির প্রথম রাত্রি হতে নারী আর পুরুষের সর্ব্বাঙ্গে, তার প্রভাব কাটিয়ে উঠ্‌তে ওর প্রত্যেকটি নর্ম্ম-কণিকা যেন

মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে। অতীত ওর মুছে গেছে, কিন্তু মনটা এখনও মাঝে মাঝে জেগে উঠ্‌তে চায় নিষ্ক্রিয়তার শিকল ভেঙে।

দু'হাতে একতারাটা বুকের ওপর আঁকড়ে ধ'রে দীনু আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

* * * *

গ্রাম্য বাউল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন বেশ কষ্ট করতে হয়েছে নিজেকে নতুন আর একটা অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। কিন্তু এখন আর কোন অসুবিধাই হয় না। একতারাটায় আঙুলের আঘাত দিয়ে ঘড়ির কাঁটার মত নির্ব্বিকার গতিতে একটির পর একটি গৃহস্থের দ্বার অতিক্রম করে। গান ও খুব ভাল গাইতে পারে না। শৈশবের স্মৃতি-স্তূপ হ'তে মাঝে মাঝে টেনে তোলে গ্রাম্যগানের দু-একটা অসম্পূর্ণ কলি। কোনটা ব্যর্থ সুরের আঘাতে ভেঙে পড়ে, কোনটা জীবন্ত হ'য়ে ওঠে ওর রিক্ত মনের ছোঁয়াচ লেগে।

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আজ দীনু এসে পড়েছে অনেক দূরে; দক্ষিণ অঞ্চলের শহরতলী ছাড়িয়ে লোকালয়ের প্রায় শেষ প্রান্তে। দুপুর গড়িয়ে গেছে, কিন্তু তখনও হয়নি ওর দিনান্তের সংস্থান। হাত পেতে ও চায় না কারো কাছে, গান শুনে আপনা থেকে যে যা দেয়, একটা পয়সা বা আধলা, তা-ই কুড়িয়ে নেয় মাথা নীচু ক'রে। মুষ্টিভিক্ষা নেবার মত মনটাকে এখনও তৈরি করতে পারেনি বলেই অতসীর দেওয়া ঝুলিটা আন্‌তে ওর রোজই হ'য়ে যায় ভুল। পারবে না সে, কোন দিনই পারবে না আর।

এবার ক্লান্তি আসে। বেশী দূর এগিয়ে যাবার মত শরীরের অবস্থা নেই আর, ইচ্ছেও করে না। সাম্‌নের বড় বাড়ী দুটো সেরে নিয়ে আজকের মত ফিরবে বাসায়।

ফটকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দীনু ইতস্তত করে। ঐশ্বর্য্যের মণিকোঠায় পা বাড়াতে ওর সাহস হয় না। ভয় ঠিক করে না, ওই আবহাওয়া—রোরুদ্যমান পৃথিবীর বুক ঝাঁঝরা ক'রে গ'ড়ে তোলা ওই প্রাচুর্য্যের উই-ঢিবিগুলো ওর বঞ্চিত দেবতাকে উৎপীড়িত করে। বুভুক্ষিত মানুষের হাহাকার ওদের অনাবশ্যক সঞ্চয়ের প্রাচীর ভেদ ক'রে মনের দরজায় গিয়ে পৌছয় না কোন দিন।

দীনুর কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে আপনা-আপনি উথ্‌লে ওঠে—

ও মন, স্বপন যে দিন ভাঙ্‌বে রে তোর
ধরবে আগুন মনে—
মরবি খুঁজে সোনার হরিণ গহন গভীর বনে॥

ফটকের ভিতর পা বাড়াতেই দারোয়ান গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—"উধার দেখো।"

প্রথমটা দীনু একটু থতমত খেয়ে গেল। তার পর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ঠিক আগের মতই আবার নির্ব্বিকার-ভাবে এগিয়ে চল্‌ল পাশের বাড়ীর দিকে।

পিছন্ থেকে কে ডাকে! কানে পৌছয়, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। হয়ত অন্য কাউকে; না-হয়, শুন্‌বার ভুল। না, ভুল নয়। ওকেই ডাকে সেই হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা। ভিতরে শোনা যায় নারীকণ্ঠের ঝঙ্কার; তিরস্কার! ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে তিরস্কার করে দারোয়ানটাকে।

দীনু উৎকর্ণ হ'য়ে শুন্‌বার চেষ্টা করে। মুহূর্ত্তে ওর অতীত স্বপ্নের আব্‌ছা অনুভূতিগুলো ভেসে ওঠে চোখের সাম্‌নে। ওই আবেষ্টন, ওই ঝঙ্কার—ওরই পিছনে জ্বলে সেই নরমেধের অগ্নিকুণ্ড!

এবার আর দারোয়ানের চোখ দুটো ধক্ ক'রে ওঠে না; ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ভিতরে।

এম্‌নি ঘর, বিচিত্র আস্‌বাবে সাজানো এই সুসজ্জিত কক্ষ দীনুর ক্ষীণ স্মৃতিতে অতিক্রান্ত পথের মাইলস্টোনগুলোর মত আজও আঁকা আছে।—সাম্‌নের সোফায় ব'সে একটি তরুণী। সর্ব্বাঙ্গে আধুনিকতার চূড়ান্ত পরিপাটি। রূপের প্রাচুর্য্য নেই সত্যি, কিন্তু অফুরন্ত সৌষ্ঠব যেন নিবিড়ভাবে ঘিরে আছে তাঁর সারাটি দেহ।

দীনু হতভম্বের মত চেয়ে থাকে। কার্পেটমোড়া মেঝেয় পা বাড়াতে ওর সত্যি সঙ্কোচ হয় আজ।—পরণের শতছিন্ন কাপড়খানায় জমে উঠেছে রাজ্যের আবর্জ্জনা, দিনের পর দিন ধূলো-মাটি ব'সে চুলগুলোয় জটা বাঁধ্‌বার উপক্রম হয়েছে, মুখখানা কদাকার হ'য়ে উঠেছে কত দিনের অবিন্যস্ত দাড়ি আর গোঁফে। চোখের চাউনিতে পর্য্যন্ত ফুটে ওঠে যেন কেমন একটা বিকৃতি।

"আর একবার গাও ত ওই গানটা।" অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বস্‌বার অনুমতি জানালেন তিনি।

ধীরে ধীরে অবস্থাটা সয়ে' নিয়ে দীনু সেইখানেই ব'সে

পড়ল মাটিতে।—গান? কি গান গাইবে ও! গানের উৎস শুকিয়ে গেছে ওর জীবনের মরুপথে। আজ যে সুর ক্ষণে ক্ষণে আর্ত্তনাদ করে ওই জীর্ণ একতারার ঝঙ্কারটুকু ঘিরে, সে শুধু প্রতিধ্বনি—ওর মৃত আত্মার করুণ কান্নার প্রতিধ্বনি।

দীনুকে নীরব দেখে তিনি আবার বল্লেন—"গাও না, যে গানটা গাইছিলে তখন।"

অগত্যা গান ধরতে হয়। কিন্তু দীনুর বুকে তখন অতীত ও বর্ত্তমানের প্রচণ্ড সংঘাতে যে প্রলয় সুরু হয়েছে, তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। ওর চোখে আজ নেমে আস্‌তে চায় জলের জোয়ার। এমনি ক'রে গান গাইতে কেউ ওকে বলে নি কোন দিন। ওর না-বলা ব্যথা, রিক্ত-জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন আজ হাহাকার ক'রে উঠতে চায় ওই গানের সুরে। ফেনিল আবর্ত্তে ওর রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কেঁপে কেঁপে ওঠে—"মরবি খুঁজে সোনার হরিণ গহন গভীর বনে—ও তুই মরবি কেঁদে রে—"

ব্রততীর মনটা যেন আজ সকাল থেকে অকারণ বেদনার্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। ওর চারিদিকে ভিড় করেছে পর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য আর স্তুতি গান। মায়ের মৃত্যুর পর হ'তে একটি দিনের জন্যেও ও পায় নি মুক্তির বাতাস। অনাবশ্যক সহানুভূতির ভারে জীবনটা ওর তিল তিল ক'রে চাপা পড়েছে জগদ্দল পাষাণের তলে। যারা ওকে ভালবাসে, তারা শুধু বেড়াজাল বুনে আট্‌কে রাখ্‌তে চায় ওর তৃষিত সত্ত্বাকে; ওর চোখের সাম্‌নে থেকে মুছে নিতে চায় পৃথিবীর রূপ। মানুষ ওর কাছে হেঁয়ালি হয়ে ওঠে।

দীনুর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে ব্রততী বলে—"তুমি কি পাড়াগাঁয়ের লোক?

"হাঁ"—ব'লে দীনু আনমনে আঁচল দিয়ে একতারার তারটা মুছবার চেষ্টা করে। ব্রততীকে অমন ভাবে চাইতে দেখে ওর শঙ্কা হয়, হয় ত কখন ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেদ করবে ওর দৈন্যের আবরণ।

ব্রততীর মনে পড়ে মায়ের কথা—পল্লীগ্রামের কথা। ওর মামাবাড়ি ছিল পল্লীগ্রামে। ছেলেবেলায় কতবার গেছে সে মায়ের সঙ্গে। সকাল না হ'তেই দাদু ব্রততীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন গ্রামের পথে। জেলেরা তখন মাছ ধ'রে ফিরত। চাষীরা দাদুকে দেখে পথের পাশে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে গড় হ'য়ে করত প্রণাম। সবুজ ঘাসে ঝরে পড়ত হলুদ রঙের বাব্‌লা ফুল। সোনালি গালিচার মত আজও ঝলমল করে ওর চোখের সাম্‌নে। ব্রততীর কথা যেন ফুরোতে চাইত না। ওর অর্থহীন অজস্র প্রশ্নে দাদু অস্থির হয়ে উঠ্‌তেন।

দীনু একটু ইতস্তত ক'রে উঠে দাঁড়ায়। দুপুর গড়িয়ে গেছে; আবার ফিরতে হবে চার মাইল পথ।

তরুণী সচেতন হয়ে উঠ্‌লেন। টেবিলের ওপর থেকে হাত-ব্যাগটা টেনে নিয়ে, একটি আধুলি বের ক'রে ছুঁড়ে দিলেন দীনুর কাছে।

দীনু তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আধুলিটা না কুড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে বলে—"মাত্র একটা গান করেছি। তা ছাড়া, এত দরকারও হয় না আমার। একটি দুটি ক'রে পয়সা কুড়িয়েই কেটে যায় দিন।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে ব্রততী আর একবার ওর মুখপানে চেয়ে বল্‌ল—"তা হোক। ওটা দিলাম তোমাকে।"

"আপনি দিলেন; কিন্তু আমি ত পারব না নিতে। অভাব আমার সত্যি; তাই ব'লে দশজনের পাওনা একাই কুড়িয়ে তাদের ফাঁকি দিতে চাই না।"—কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেলে দীনু যেন কেমন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। ওর সর্ব্বদাই ভয়, পাছে কারো চোখে ধরা পড়ে যায় তিরিশ বছরের সেই জীর্ণ ইতিহাসের কোন পাতা।

ব্রততী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখপানে চেয়ে বলে—"তুমি ভিখিরী নও?"

—"না। হাঁ, ভিখিরী; ভিখিরী ছাড়া আর কি?" দীনু একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ে।

কথাটা শুনে তরুণী যেন হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেন। ওর কথা শুনে সত্যি মনে হয় ও ভিখিরী ছিল না কোন দিন! উৎসুক হ'য়ে তিনি প্রশ্ন ক'রলেন—"তবে?"

একটু ইতস্তত ক'রে দীনু বলে—"গান গেয়ে একটা-দুটো পয়সা যা পাই, তার বেশী—"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তরুণী লঘু হাসির সঙ্গে বলেন—"বেশ ত, ওটা না হয় আগাম দিলাম। রোজ এসে গান শুনিয়ে যেও।"

—"একই পাড়ায় রোজ ভিক্ষে করতে আসা চলে না।" দীনু মাথা নীচু ক'রে ভাবে।

"তবে একদিন পর একদিন এসো। ঠিক এসো কিন্তু, এমনি সময়। বেশ লাগে তোমার গান।"—উত্তরের অপেক্ষা না রেখে ব্রততী উঠে পড়ে। সত্যি বেশ লাগে ওর গান। মন্থর পদে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মনে হয়, ওই ভিখিরী বাউলের জীবনটাও বোধ হয় ওর চেয়ে ভাল। পৃথিবী-সুদ্ধ লোক ওকে খুশী করবার জন্যে মিথ্যা অভিনয় করে না। ও গান গায়, ভিক্ষে করে। যারা ওর বন্ধু, তারা স্তুতি গান করে না। মানুষ ওর কাছে মানুষ হ'য়েই দেখা দেয়; সেই মুখোমুখি পরিচয়ের মাঝখানে কৃত্রিমতার অদৃশ্য প্রাচীর পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে না।

—ব্রততী হাঁপিয়ে ওঠে,মনটা অস্বস্তিতে ভ'রে যায়; ওর সমাজ, ওদের নিরবচ্ছিন্ন আভিজাত্যের সতর্ক পরিবেশ যেন অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে ওর অন্তরের মানুষটাকে। ইচ্ছে হয়, চীৎকার ক'রে কাঁদে। কিন্তু পারে না। স্যর সি. কে. রায়ের মেয়ে ও। প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে ওর বংশ-মর্য্যাদা। এই চাকর-খান্‌সামা, চলমান বিশ্বের জাগ্রত মানুষের দল—সকলের চোখে ও হ'য়ে থাক্‌বে চিরন্তন হেঁয়ালি। দুর্ব্বোধ্য, মানুষের কাছে ওকে দুর্ব্বোধ্য থাক্‌তে হবে চিরদিন।

অগত্যা আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে দীনুও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। জীবনের ভার যেন ক্রমেই অসহ হ'য়ে ওঠে ওর কাছে।

* * *

মনটা এমন তিক্ত হ'য়ে উঠেছে যে আজ আর কিছুই ভাল লাগে না ওর। অতসীর চুলগুলো মিছিমিছি পুড়িয়ে দিয়েছে ওই গন্নাকাটা মেয়েটা। ফলে, হয় ত অতসীর কাছে দীনুও দায়ী হ'য়ে পড়েছে অনেকখানি। ওরা বোঝে না, বুঝবার মত শক্তিও বোধ হয় নেই ওদের—দীনুর জীবনে যে বিপ্লব এসেছে, সেই দুরন্ত বিপ্লবের মুখে পদ্ম আর অতসী কতটুকুই বা! সেই ভাঙনের মুখে ওদের বালির বাঁধ একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও আটকাতে পারে না জল-স্রোতের উচ্ছ্বাস। কিন্তু সে ভুল ভেঙে দিয়ে, ও চায় না অতসীকে উৎপীড়িত ক'রে তুল্‌তে।

চল্‌তে চল্‌তে দীনু হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়। পথের পাশে একটি মেয়ে আঁচলে কুড়িয়েছে কতকগুলো বাসি ভাত। পাশে বসে চীৎকার করে একটি পাঁচ-ছ বছরের শিশু। ছেলেটা একমুঠো ভাতের জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে; কিন্তু ওর মা এক হাতে শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে কচি হাত দুটো, আর এক হাতে মুঠো মুঠো ভাত মুখে তুল্‌ছে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ ক'রে। ছেলেটা প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করেও হাত বাড়াতে পারে না। ছেলেটা কাঁদে, নিষ্ফল হাহাকার আর্ত্তনাদ করে ওর ক্ষুধার্ত্ত দেহের পেশিতে পেশিতে।

দীনু করুণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে। ইচ্ছে করে, মেয়েটার হাত দুটো মোচড় দিয়ে ভেঙে দেয়। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনটা বেদনার্ত্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের সত্যিকারের রূপ যেন জীবন্ত হ'য়ে ওঠে ওর চোখের সামনে। বুকের দুধ দিয়ে যার দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণু পুষ্ট করেছে বিপুল আনন্দে, আজ তারই মুখের ভাত কেড়ে নিতে ওঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই! অম্লান মুখে গিলে চলেছে সে ক্ষুধার্ত্ত ছেলেটাকে অসুরের মত দূরে ঠেলে রেখে।

মেয়েটার মুখপানে বিমূঢ়ের মত চেয়ে দীনু বলে—"দাও না, ওকে দু মুঠো ভাত! ছেলেটা না খেয়ে—"

"মরুক্‌। হাড় ক'খানা বাতাস পাবে।"—ওর যেন কথা বল্‌বারও অবকাশ নেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাতগুলোও প্রায় নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌ল। একসঙ্গে এত ভাত মুখে তুল্‌ছে যে, গালদুটো রবারের ব্যাগের মত ফুলে ওঠে। আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বলে—"হুঁ, খেয়ে দিক ভাতগুলো সব!"

দীনুর মনটা বিরক্তিতে ভ'রে ওঠে। ছেলেটার জন্যে ওর কষ্ট হয় না; কষ্ট হয় তার মায়ের কথা ভেবে। কতকাল না খেয়ে ওর হৃৎপিণ্ডটা পর্য্যন্ত পাথর হ'য়ে গেছে। একবার মনে হয়, ছেলেটাকে ডেকে দু পয়সার খাবার কিনে দেয়; আবার কি ভেবে হন্‌ হন্‌ ক'রে এগিয়ে চলে, দৃষ্টিপথ থেকে ওদের আড়াল করবে ব'লে। ও সইতে পারে না আর। সেই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার তাণ্ডব অগ্নিশিখা যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীময়! ওর চোখ দুটো ঝল্‌সে যায়; মনে হয়, পথের ওই গাছপালাগুলোতেও এখুনি জ্বলে উঠ্‌বে আগুন।

দীনু কিছু দূর এগিয়ে যেতে-না-যেতেই মেয়েটা হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। কেউ যেন প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে

ওর মাথায়। চাইতে ইচ্ছে হয় না; তবু না চেয়ে পারে না, তার যন্ত্রণা-কাতর চীৎকার শুনে। ছেলেটা প্রাণপণ শক্তিতে কামড়ে ধরেছে ওর ঘাড়ে। মেয়েটা দু'হাতে তার গলাটা টিপে ধ'রেও ছাড়াতে পারে না। চোখের সাম্‌নে অমনি ক'রে ভাতগুলো শেষ হ'তে দেখে, ও আর সইতে পারে নি। ওই শিশুর অন্তরের ঘুমন্ত দেবতা হঠাৎ জেগে উঠেছে উন্মত্ত দানবের মূর্ত্তিতে।

ছুটে গিয়ে দীনু জোর ক'রে ছেলেটার চোয়াল দুটো চেপে ধ'রল। তার গাল ব'য়ে তখন রক্ত ঝরছে। মেয়েটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপে; ভয়ে মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। ছেলেটা তখনও ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে ক্ষুব্ধ আক্রোশে।

পথচারী ওরা। ওদের জন্যে কিসের দরদ ওর? তবু পারে না। অমনি আর্ত্ত অবস্থায় মেয়েটাকে ফেলে যেতে ওর কষ্ট হয়। ছেলেটাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গিয়ে দীনু দু পয়সার খাবার কিনে দেয় তার হাতে। তারপর আবার ফিরে আসে; মেয়েটার দিকে চেয়ে আন্‌মনে দাঁড়িয়ে ভাবে।

মেয়েটি হঠাৎ আছাড় দিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। দু'হাতে পাদুটো জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ওঠে—"তুমি পালিও না। আমায় বাঁচাও; দুষ্‌মণটা হাড়ের ভিতর দাঁত বসিয়েছে।"

দীনু একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চায়, তারপর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেয়েটার মুখপানে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আভাটুকু ছড়িয়ে পড়েছে ওর মুখে। হঠাৎ দীনু আঁৎকে ওঠে; বুকখানা তোলপাড় ক'রে ওঠে দ্রুত স্পন্দনে। এ যেন ওর চেনা মুখ! মনে হয়, কতকাল আগে, ওর জীবনের কোন নিভৃত মুহূর্ত্তে বারবার চেয়ে দেখেছে ওই মুখখানা। বয়েস তার চব্বিশের বেশী নয়। মুখের রেখায় রেখায় তখনও লেগে আছে গার্হস্থ্য জীবনের ছাপ।

ওর সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড় হ'য়ে আসে। একবার মনে হয়—ভুল, ওর জীবনব্যাপী ভুলের চলচ্চিত্রে এও একটা ভ্রান্ত ছবি। দীনু বিশ্বাস করতে পারে না তার অতীতকে; বর্ত্তমান ওর চোখে প্রতিনিয়ত স্বপ্নের জাল বুনে চলে। উৎক্ষিপ্ত আবেগে সারা অন্তর বিদ্রোহ ক'রে ওঠে—'না, না; হ'তে পারে না। জীবনের ভাঙা পেয়ালায় যে বুদ্‌বুদ্ গাঁজিয়ে ওঠে, সে শুধু অসত্যের পঙ্কিল গ্লানি!'

স্বপ্নাবিষ্টের মত দীনু ধীরে ধীরে ব'সে পড়ল সেইখানে। মেয়েটার চেতনা বোধ হয় তখন লুপ্ত হ'য়ে আস্‌ছিল। অবসন্ন পৃথিবীর বুকে তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কালো পর্দ্দার অন্তরালে কেঁপে কেঁপে ওঠে মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

দীনুর কোলে মুখ লুকিয়ে মেয়েটি ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল!

ক্রমশঃ

সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

(জীবনী)

যে সকল বাঙ্গালী গত উনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষা লাভের পর বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া কর্ম্মজীবন যাপন করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এইরূপ একজন বাঙ্গালীর পরিচয় আমরা কয়েকমাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিয়াছি; তিনি ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার সার প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও আমরা ঐরূপ একজন বাঙ্গালীর পরিচয় প্রকাশ করিতেছি। ইনি লাহোরের স্বনামখ্যাত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনিও লাহোর চিফকোর্টের বিচারপতি এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রতুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূকৈলাসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের একমাত্র দৌহিত্র ছিলেন। প্রতুলচন্দ্রের মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী বাগবাজারের খ্যাতনামা হালদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্য-



সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে টি

কাল হইতেই প্রতুলচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি শুধু পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থ-পাঠে সর্ব্বদা আত্মনিয়োগ করিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনিষ্টিটিউসন (বর্ত্তমান স্কটীশ চার্চ্চেস কলেজ) হইতে প্রতুলচন্দ্র এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবৎসর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি পাঞ্জাবে গমন করেন ও লাহোরের চিফ কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। সে সময়ে অনেক বাঙ্গালী লাহোরে ওকালতী করিতেন। তন্মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যের খ্যাতনামা প্রধানমন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও এলাহাবাদের প্রবীণ ব্যারিষ্টার দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময়ে লাহোরে আইন ব্যবসায়ে রত ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রতুলচন্দ্র লাহোরে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন এবং লোক তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া ও অনন্যসাধারণ আইনজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। তিনি আইনের দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলি লোককে এত সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন ও তাঁহার যুক্তিতর্ক শুনিয়া লোক এত মুগ্ধ হইত যে ক্রমে ক্রমে পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান সকল লোকই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি পাঞ্জাবের বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হন ও আইন বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শদাতা পদে নিযুক্ত হন। বহুদিন তিনি কাশ্মীর রাজ্যেরও আইন-উপদেষ্টার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন এবং ক্রমে তাহার ভাইস চ্যান্সেলারও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। যে সকল মনীষীর যত্নে ও চেষ্টায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল প্রতুলচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন এবং দুইবার তাঁহাকে ভাইস চ্যান্সেলার পদে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। তিনি গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল কলেজের মধ্য দিয়া ঐ অঞ্চলে সংস্কৃত, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কনভোকেসন বক্তৃতায় প্রতুলচন্দ্র বলিয়াছিলেন, পাঞ্জাবীদের মাতৃভাষায় তাহাদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আজ যে সকল প্রদেশেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে, সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা প্রতুলচন্দ্রের এই বক্তৃতা হইতেই বুঝা যায়। পাঞ্জাব ও কলিকাতা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষই প্রতুলচন্দ্রকে 'ডি-এল' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

প্রতুলচন্দ্র যখন উদীয়মান উকীল, সেই সময় লাহোরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয় ও প্রতুলচন্দ্র বহুদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানের কমিশনারের কার্য্য করিয়াছিলেন।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে প্রতুলচন্দ্রের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। সেজন্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন সংশোধনের ব্যবস্থা হয়, তখন গভর্ণমেণ্ট প্রতুলচন্দ্রকে উক্ত সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছিলেন। লাহোরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ—সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে সমান শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন। সে জন্য সেখানে যে-কোন বিবাদ বা বিরোধ হইত, তাহা মিটাইবার ভার প্রতুলচন্দ্রের উপর অর্পিত হইত এবং তাঁহার মধ্যস্থতা সকলে সাদরে মানিয়া লইতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতুলচন্দ্র নাভা ষ্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; সেই সময়ে গভর্ণমেণ্টের সহিত নাভার মহারাজার বিবাদ চলিতেছিল। তিনি সেই বিরোধ মিটাইবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নাভার মহারাজা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করায় প্রতুলচন্দ্র নাভা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও নাভার মহারাজা রাজ্যচ্যুত হন।

লাহোরের খ্যাতনামা উকীল কালীপ্রসন্ন রায়, 'ট্রিবিউন' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি লালচাঁদ, সার সাদিলাল, ভগত ঈশ্বরদাস, মৌলবী গোলাম মুস্তাফা প্রভৃতি সকলেই সার প্রতুলচন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

লাহোরে অবস্থানকালে তিনি লাহোরের সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। পণ্ডিতগণের সাহিত্য সভা, যুবকগণের তর্কসমিতি—সর্ব্বত্রই প্রতুলচন্দ্র গমন করিতেন এবং কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত—সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই মেলামেশা করিতেন। একবার লাহোরের কালীবাড়ী ও সাহিত্যসভা শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতুলচন্দ্রের

ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় তাহা আবার পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া পাইয়াছিল। বিচারপতির কঠোর কর্ত্তব্যপালন করিয়াও তিনি নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে লাহোরে একবার কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুদূর প্রবাসে এত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতেন—ইহা তাঁহার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লাহোরে যে কৃষিশিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল, প্রতুলচন্দ্র তাহার সভাপতি হইয়া তাহার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে কাঙড়া হিন্দুদের একটি পীঠস্থান; ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে কাঙড়ার দুর্গাদেবীর মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে প্রতুলচন্দ্রের চেষ্টায় মন্দিরটি পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাঞ্জাবে যুবকগণকে কারিগরী শিক্ষা প্রদানের জন্য যে 'ভিক্টোরিয়া ডায়মণ্ড জুবিলী হিন্দু টেকনিকাল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রতুলচন্দ্র তাহার পরিচালন কমিটীর সভাপতি ছিলেন—পাঞ্জাবে তৎকালে ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান ঐ একটি মাত্রই হইয়াছিল।

প্রতুলচন্দ্র লাহোরে রাজা দয়াল সিং ট্রাষ্টের অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন এবং পরে ট্রাষ্টীদিগের সহিত রাণীদিগের মামলা উপস্থিত হইলে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, হিন্দুগণ সমুদ্রযাত্রা করিলে, সুরাপান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলেও তাহাদের জাতি বা ধর্ম্ম নষ্ট হয় না।

দেশে হিন্দু মহাসভা আন্দোলন আরম্ভ হইলে প্রতুলচন্দ্র তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন।

মাতৃজাতির উন্নতিকল্পে প্রতুলচন্দ্র সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন; অতি অল্পবয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল এবং বিধবা মাতাই তাঁহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন; সে জন্য হিন্দু বিধবাগণের দুঃখে সর্ব্বদাই তিনি বিচলিত হইতেন ও তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী লেডী বসন্তকুমারী দেবীও স্বামীর অনুপ্রেরণায় হিন্দুবিধবাদিগের দুঃখ দূর করিতে নানাপ্রকার সাহায্য করিতেন। সার প্রতুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী পুরীতে একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্য গৃহ ও প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন; বর্ত্তমানে কলিকাতার সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি উক্ত বিধবাশ্রমটি পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রতুলচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবন অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। একজন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে এতদূরে গিয়া এরূপ অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়, আমরা তাঁহার সামান্যমাত্র পরিচয় প্রদান করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলাম।

জার্ম্মানীর নূতন অভিযান

শ্রীঅতুল দত্ত

(রাজনীতি)

ইউরোপের রাজনীতিক গগনের ধূমকেতু হের হিট্‌লার এক অভিনব পদ্ধতিতে পররাজ্য-বিজয় আরম্ভ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন নাই, সৈন্যক্ষয়ের আশঙ্কা নাই, রণনীতিতে নৈপুণ্য প্রদর্শনও অনাবশ্যক। নিজের সামরিক শক্তি সম্পর্কে সত্য, মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত তথ্য ঢক্কা-নিনাদে ঘোষণা করিয়া সকলকে সন্ত্রস্ত রাখ; যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সাহস ও শক্তি না থাকিলেও "অভীষ্ট সিদ্ধিতে বাধা পাইলেই যুদ্ধ করিব" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার কর; যে রাজ্যের প্রতি তোমার লোলুপতা, সেখানে গোপন প্রচারকার্য্যের দ্বারা গৃহ-বিবাদের সৃষ্টি কর; সেই রাজ্যের সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্ম্মান্ অধিবাসীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের মিথ্যা কাহিনী প্রচারে পঞ্চমুখ হও; তার পর সুযোগ বুঝিয়া এক শনিবারে শুভ অপরাহ্ণে আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যটিকে কুক্ষীগত কর। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে পররাজ্য-বিজয়ের এই অভূতপূর্ব্ব কৌশল বিশ্বজগৎ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন্ ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর উপনিবেশ

আত্মসাৎ করিয়া "চোর" হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের এই নৈতিক দৌর্ব্বল্যের সুযোগ হিট্‌লার পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিতেছেন। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে হিট্‌লার জার্মানীকে তাহার হৃত উপনিবেশ প্রত্যপর্ণের দাবী উত্থাপন করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতে আরম্ভ করেন। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা তখন ভীত হইয়া শান্তির দূত লর্ড হ্যালিফাক্সকে বার্লিনে প্রেরণ করেন। লর্ড হ্যালিফাক্স হিট্‌লারকে জানান, "অষ্ট্রীয়া গ্রাস কর, চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মান্ অঞ্চল অধিকার কর, আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু উপনিবেশের প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত রাখ।" হিট্‌লারের অভীষ্ট হয়, ইউরোপে রাজ্য-বিস্তৃতি শেষ হইবার পূর্ব্বে উপনিবেশের জন্য ললাট স্বেদ-সিক্ত করা তাঁহার নীতি-বিরুদ্ধ। তিনি তাঁহার "মেইন্ ক্যাম্ফ" গ্রন্থে রাজ্য-বিস্তৃতি সম্পর্কে তাঁহার নীতি ঘোষণা করিয়াছেন—The sole hope of success for a territorial policy nowadays is to confine it to Europe and not to extend it to such place as the Camaroons. অর্থাৎ—বর্ত্তমান যুগে রাজ্য-বিস্তৃতির নীতিতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, উহা ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে; ক্যামারুন্স (আফ্রিকায় জার্মানীর একটি হৃত উপনিবেশ) পর্য্যন্ত ঐ নীতির প্রসারতা উচিত নহে। যাহা হউক, লর্ড হ্যালিফাক্সের নিকট হইতে আশ্বাস লাভ করিয়া হিট্‌লার অনায়াসে অষ্ট্রীয়া গ্রাস করিলেন। চেকোশ্লোভেকিয়ার অবস্থা একটু জটিল, সামরিক শক্তিতে সে নিতান্ত নগণ্য ছিল না; তাহার পর সোভিয়েট রুশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত সে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কাজেই, চেকোশ্লোভেকিয়ার জার্মান্ অঞ্চল অধিকারের উদ্দেশ্যে হিট্‌লারী নীতির প্রয়োগ সহজসাধ্য ছিল না। এই জন্য হিট্‌লার তখন বৃদ্ধ চেম্বারলেনের শরণাপন্ন হন। চেম্বারলেন্ অল্লায়াসে ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াপন্থী রেডিক্যাল্ মন্ত্রিসভাকে চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিতে সম্মত করান। তাহার পর, মিউনিকের রাজনীতিক অভিনয়-মঞ্চে চেকোশ্লোভেকিয়ার হস্ত-পদাদি বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা হয়।

লর্ড হ্যালিফক্সের আশ্বাস অনুযায়ী রাজ্য-বিস্তৃতি শেষ হইবার পর হিট্‌লার যখন মধ্য-ইউরোপে আর এক পদ অগ্রসর হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি পুনরায় বৃটেন ও ফ্রান্সের দৌর্ব্বল্যের সুযোগ গ্রহণ করিলেন। গত জানুয়ারী মাসে স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়, বৃটেন্ ও ফ্রান্স যখন জেনারল ফ্রাঙ্কোর সহিত সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ব্যস্ত, ফ্রান্স যখন ইটালীর টিউনিস্-জিবুতি-সুয়েজ সম্পর্কিত দাবীর জন্য চিন্তিত, তখন হিট্‌লার অকস্মাৎ তাঁহার রাইখষ্ট্যাগের বক্তৃতায় (৩১শে জানুয়ারী) ইটালী ও জার্মানীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া জার্মানীর উপনিবেশের দাবী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন। ডিক্টেটর-শাসিত দেশগুলিতে সংবাদপত্র রাষ্ট্রের মুখপত্র-স্বরূপ; এই সকল সংবাদপত্রও জার্মানীর উপনিবেশের দাবী জ্ঞাপন করিতে থাকে। ইহার পর, শ্লোভেকিয়ায় অশান্তির সৃষ্টি হয় মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হ্লিভকা 'গার্ড' দলের হাঙ্গামা ব্যাপক ও ভীষণ হইয়া ওঠে। তাহার পর হিট্‌লারী নীতি অনুযায়ী দ্রুত কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর অষ্ট্রীয়া গ্রাসের পূর্ব্বে ডক্টর সাইন্-ইন্-কোয়ার্ট এবং সুডেটেন্ অঞ্চল অধিকারের পূর্ব্বে হের হেন্‌লীন্ যেরূপ জার্মানীতে আহূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্লোভেকিয়ায় হিট্‌লার-অনুরক্ত নেতা ডক্টর টিশো জার্মানীতে আহূত হইলেন। তাহার পর শ্লোভেকিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হইল, ডক্টর টিশো হইলেন এই স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী উভয়ই। রুথেনিয়া, তথা কার্পেথো-উক্রেন প্রদেশটিকে লইয়া হিট্‌লার একটু "ছেলেখেলা" করিলেন। ইহার স্বাধীনতা ঘোষিত হইল, আবার হিট্‌লার তাঁহার কমিটার্ন-বিরোধী নব-বন্ধু হাঙ্গেরিকে গোপনে জানাইয়া দিলেন, তুমি এই সুযোগে তোমার বিচ্ছিন্ন প্রদেশ রুথেনিয়াকে পুনরধিকার কর, আমি তোমাকে কোনপ্রকার বাধা দিব না। শ্লোভেকিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রীয়াস্থিত জার্মান্ সৈন্য বোহিমিয়া ও মেরোভিয়ার সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহার পর অষ্ট্রীয়া গ্রাসের পূর্ব্বে ডক্টর সুশ্‌নিগকে বার্চেস্ গ্যাডেনে আহ্বান করিয়া যেরূপ কটূক্তি শুনান হইয়াছিল, সেইরূপ চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রেসিডেন্ট ডক্টর এমিল হাচা ও পররাষ্ট্রসচিব ডক্টর সলকোভস্কিকে বার্লিনে আহ্বান করিয়া চরমকথা (ultimatum) শুনান হইল। এই সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরেই বার্লিনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, জার্মানী চেক্ জাতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ

করিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে জার্মান্ সৈন্য প্রাগ অধিকার করে। ইহার পরদিন হের হিট্‌লার স্বয়ং প্রাগে পৌছেন। এদিকে ডক্টর টিশে শ্লোভেকিয়া রাজ্যটিকে হিট্‌লারের হস্তে অর্পণ করেন, হিট্‌লারও ঐ রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। রুথেনিয়া, তথা কার্পেথো-উক্রেন প্রদেশটি ক্রমে ক্রমে হাঙ্গেরি অধিকার করিয়া লয়।

এইভাবে মধ্য-ইউরোপের কার্য্য শেষ করিয়া হিট্‌লার মেমেলের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জার্মানীর পররাষ্ট্র সচিব হের ফন রিবেনট্রপ্ বার্লিনস্থিত লিথুনিয়ান্ প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জার্মানীর হস্তে মেমেল্ অঞ্চলটি অর্পণ করিবার জন্য চরমপত্র প্রদান করেন। তাহার পর লিথুনিয়া গভর্ণমেণ্ট বিনা বাক্যব্যয়ে মেমেল্ অঞ্চলটিকে জার্মানীর হস্তে অর্পণ করেন। গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে হের হিট্‌লার মেমেলে গমন করিয়া সেখানকার অধিবাসীদিগকে সদম্ভ উক্তি শুনাইয়া আসেন। পূর্ব্ব-প্রুশিয়া হইতে জার্মান্ সৈন্য পূর্ব্বেই মেমেলে পৌছিয়াছিল।

মধ্য-ইউরোপে রাজ্য-বিস্তৃতির কার্য্য শেষ করিয়া রুমানিয়াকে অর্থনীতিক চুক্তিতে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানী তাহাকে এক চরমপত্র প্রদান করিল। রুমানিয়ার রপ্তানি বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন এবং রুমানিয়াকে কৃষিজাত পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে (Agricultural country) পরিণত করাই ছিল এই চুক্তির মূল কথা। রুমানিয়া প্রথমে এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পূর্ব্ব-সীমান্তের প্রবল প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু সেদিক হইতে কোনপ্রকার আশার বাণী না শোনায় সে পরে জার্মানীর সহিত মিটমাট করিতে বাধ্য হয়। গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে রুমানিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যে অর্থনীতিক চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে জার্মানী রুমানিয়ার অর্থনীতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সে যে অধিকার পাইয়াছে তাহা অত্যন্ত ব্যাপক। হয়ত এই অধিকারের বলেই সে ক্রমে রুমানিয়ার খনিজ তৈল ও কৃষিজাত পণ্যের উপর অপ্রতিহত অধিকার বিস্তার করিবে।

এখন জার্মানীর দৃষ্টি পড়িয়াছে পোলাণ্ডের উপর। ড্যানজিগের উপর জার্মানীর সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং ড্যান্‌জিগ্ ও পোমারানিয়ার মধ্যবর্ত্তী পোলাণ্ডের অংশ (Polish corridor) জার্মান্ রাইখের অন্তর্ভুক্ত হইলে বাল্টিক সাগরের সমগ্র দক্ষিণ উপকূলে জার্মানীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং পূর্ব্ব-প্রুশিয়া ও মেমেলের সহিত জার্মানীর স্থলপথের সংযোগ স্থাপিত হয়। চেকোশ্লোভেকিয়া রাজ্যটি জার্মানীর কুক্ষীগত হওয়ায় এবং হাঙ্গেরি জার্মানীর সহিত কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ—তথা—জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে পোলাণ্ড। বস্তুত তাহার তিন দিক আজ জার্মানীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যাহা হউক, পোলাণ্ড এখন পর্য্যন্ত কোনপ্রকার দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করে নাই। সে ড্যান্‌জিগ্ বন্দরে জার্মানীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতে প্রস্তুত নহে, ড্যান্‌জিগ্ ও পোমারনিয়ার মধ্যবর্ত্তী পোল অঞ্চলও সে জার্মানীকে দিবে না, ইহাই সে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছে।

এক পক্ষকালের মধ্যে হিট্‌লারী নীতিতে ইউরোপের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক মানচিত্র কিরূপভাবে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা উল্লিখিত কয়েকটি অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। মিউনিক চুক্তির পর হের হিট্‌লার বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে তাঁহার আর কোন রাজ্যগত দাবী নাই। এই কথা তখন কেহ অবিশ্বাস করে নাই ; মিউনিক বৈঠকের পর মনে হইয়াছিল, হিট্‌লার হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আর মধ্য-ইউরোপে রাজ্য-বিস্তারে মনোযোগী হইবেন না, তিনি হয়ত বলকান্ রাষ্ট্রগুলিকে জার্মানীর অর্থনীতিক ও রাজনীতিক প্রভাবাধীনে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবেন। বিচ্ছিন্নাঙ্গ চেকোশ্লোভেকিয়া ত পূর্ব্বেই জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। হিট্‌লার বলিয়াছেন যে, চেকোশ্লোভেকিয়ার অবশিষ্ট জার্মান্‌গণ যদি দুর্ব্ব্যবহার না পাইত এবং ঐ রাষ্ট্রটি যদি কম্যুনিজমের প্রধান ক্ষেত্র না হইত, তাহা হইলে তিনি চেক্‌দিগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতেন না। "অপবাদ প্রদান করিয়া ফাঁসী দেওয়া"—হিট্‌লারী নীতির বৈশিষ্ট্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; সুতরাং চেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে হিট্‌লারের ঐ উক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই।

মিউনিকের পর হিট্‌লার মধ্য-ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে জার্মানীর প্রভাবাধীনে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। হাঙ্গেরি অল্পায়াসেই জার্মানীর অনুরক্ত হইয়াছে, কিন্তু পোলাণ্ড ও রুমানিয়া জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইতে চাহে নাই। গত জানুয়ারী মাসে হাঙ্গেরি যখন কমিণ্টার্ন-বিরোধী দলে যোগদান করে, তখন পোলাণ্ডকে দলে টানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা বিফল হয়; পোলাণ্ড এই সময় রুশিয়ার সহিত পূর্ব্ব চুক্তিগুলি নূতন করিয়া "ঝালাইয়া" লইয়াছে। রুমানিয়ার রাজা ক্যারল গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হের হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সময় হিট্‌লার তাঁহার সহিত অত্যন্ত অশিষ্ট ব্যবহার করেন এবং তাঁহার জার্মান্-বিরোধী মনোভাবের জন্য ভীতি প্রদর্শন করেন। রাজা ক্যারল স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জার্মানীর প্রতি আনুরক্তির কোন লক্ষণ ত প্রদর্শন করেনই না, অধিকন্তু রুমানিয়ার নাৎসীদল—আইরণ্ গার্ডদিগের ক্রিয়াকলাপ কঠোর হস্তে দমন করিতে থাকেন। পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার পক্ষে জার্মানীর দলভুক্ত হইবার পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল হিট্‌লারের উক্রেন আন্দোলন। উক্রেন রাজ্যটি রুশিয়া, পোলাণ্ড, রুমানিয়া ও রুথেনিয়ার মধ্যে বিস্তৃত। এই রাজ্যটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানীতে এক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। ডক্টর রোজেন্‌বার্গের নেতৃত্বে জার্মানীতে গুপ্ত "উক্রেন ব্যুরো" গঠিত হয়; সেখানে রাষ্ট্রহীন উক্রেনিয়ান্‌দিগের নাম রেজেষ্ট্রী হইতে থাকে। উক্রেন রাজ্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইলে পোলাণ্ড ও রুমানিয়া দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। সে যাহা হউক, পোলাণ্ড ও রুমানিয়া সম্পর্কে হিট্‌লারের এই ব্যর্থতা তাঁহাকে এত শীঘ্র রাজ্য-জয়ে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে। চেকোশ্লোভেকিয়ার তিনটি প্রদেশ জার্মানীর কুক্ষীগত হইলে এবং রুথেনিয়া হাঙ্গেরির অন্তর্ভুক্ত হইলে এক সঙ্গে পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে "চাপ" দেওয়া সম্ভব, ইহা হিট্‌লার স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে তিনি করিয়াছেনও তাহাই; মধ্য-ইউরোপে রাজ্যবিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রুমানিয়া ও পোলাণ্ডকে "চাপ" দিতেছেন।

মধ্য-ইউরোপে জার্মান্ রাইখের প্রসারতার জন্য হিট্‌লারের এই ব্যস্ততার আরও একটি কারণ আছে। মিউনিক বৈঠকে বৃটেন্ ও ফ্রান্স হিট্‌লারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেও তিনি এই দুইটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। মিউনিক চুক্তির পর বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সমর-সম্ভার অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ঐ দুইটি দেশে জার্মান্-বিরোধী মনোভাবও ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। কাজেই হিট্‌লারের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল—অল্পকাল পরে বিনা যুদ্ধে রাজ্য-জয় হয়ত আর সম্ভব হইবে না। এই জন্য তিনি চেকোশ্লোভেকিয়া গ্রাস সম্পর্কে এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন।

চেকোশ্লোভেকিয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ; কৃষিজাত পণ্য, খনিজ পণ্য, শ্রমশিল্প—সর্ব্ববিষয়ে চেকোশ্লোভেকিয়া সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, রেশম, পশমজাত বস্ত্র, জুতা, ইস্পাত, লৌহ, চিনি প্রভৃতি। বর্ত্তমান যুগের শ্রমশিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কয়লা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাচ-শিল্প এবং অন্যান্য শ্রমশিল্পেও চেকোশ্লোভেকিয়া উন্নত, স্কোডার অস্ত্র-কারখানা বিশ্ববিখ্যাত। চেকোশ্লোভেকিয়ার রাষ্ট্র-গুরু ডক্টর ম্যাসারিকের চেষ্টায় ভূতপূর্ব্ব হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের শতকরা আশীটি শিল্পকেন্দ্র চেকোশ্লোভেকিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়া পূর্ব্বেই জার্মানীর উদরসাৎ হইয়াছে। এখন কৃষি ও শিল্পে উন্নত চেকোশ্লোভেকিয়ার তিনটি প্রদেশ পরিপাক করিবার মত যথেষ্ট অবসর যদি জার্মানী পায়, তাহা হইলে যে সে অর্থনীতিক শক্তিতে প্রবল হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। তবে জার্মানীর এই রাজ্য-বিস্তৃতি অন্য দিক হইতে তাহার দৌর্ব্বল্যের কারণও হইতে পারে। কি চেকোশ্লোভেকিয়া, কি অষ্ট্রীয়া—কেহই নির্ব্বিবাদে জার্মানীর ডিক্টেটারী শাসন-ব্যবস্থা মানিয়া লইবে বলিয়া মনে হয় না। নাৎসী দলের প্রচার-কার্য্যের ফলে উভয় দেশেই জার্মানীর প্রতি অনুরক্ত একটি করিয়া সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহারাই ঐ দুইটি দেশের একমাত্র অধিবাসী নহে। ডিক্টেটারী শাসনের লৌহদণ্ড সজোরে সঞ্চালিত হইলেও ঐ দুইটি দেশের সকল সম্প্রদায়কে বশীভূত করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

রুথেনিয়া সম্পর্কে হিট্‌লারের মনোভাব পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের কিছুই নাই। মিউনিক বৈঠকের পর মুসোলিনির

প্ররোচনায় পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরি যখন রুথেনিয়া গ্রাস করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত দেশে পরিণত হইয়াছিল, তখন হিট্‌লার তাহাদের দাবী পূরণ করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। ইহার কারণ, তখন পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরির আনুগত্য সম্বন্ধে হের হিট্‌লার সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তখন হাঙ্গেরি তাঁহার অনুগত, এইজন্য হাঙ্গেরির রুথেনিয়া অধিকারে তাঁহার আর আপত্তি নাই। পূর্ব্বে হিট্‌লার ভাবিয়াছিলেন যে হাঙ্গেরি ও পোলাণ্ড যদি রুথেনিয়া অধিকার করে, তাহা হইলে জার্মান্ সৈন্যের পক্ষে পূর্ব্ব-ইউরোপে অগ্রসর হইবার পথ বন্ধ হইবে। এখন এই আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় তিনি স্বয়ং হাঙ্গেরকে রুথেনিয়া অধিকার করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বাল্‌টিক সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে মেমেল নামক অঞ্চলটির আয়তন ৯৪৫ বর্গ মাইল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই জার্মান্, তাহাদের সংখ্যা ১,৫০,০০০। ইহার মধ্যে ৩৮,০০০ অধিবাসী মেমেল নগরে বাস করে। এই অঞ্চলের আর একটি প্রধান নগরের নাম কালিপেদা। পূর্ব্বে মেমেল অঞ্চলটি জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তে জার্মানী মেমেল্ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে ফ্রান্স এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করে। গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হাই কমিশনার মেমেল্ শাসন করিয়াছেন। ঐ বৎসর লিথুনিয়া মেমেল্ আক্রমণ করে এবং উহা অধিকার করিয়া লয়। ইহার পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে তারিখে প্যারিস চুক্তিতে লিথুনিয়ার মেমেল অধিকার স্বীকৃত হয়। মেমেল বন্দরটি লিথুনিয়ার অধিকারভুক্ত হইলেও পোলাণ্ড ইহাকে অবাধে ব্যবহার করিবার অধিকারী ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেমেলের অধিকাংশ অধিবাসীই জার্মান্। কাজেই, নাৎসী মতবাদের বীজ অতি অল্পায়াসে মেমেলে অঙ্কুরিত হইয়াছে। মেমেল্ যে-কোন সময় জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত ছিল। বিশেষত গত ডিসেম্বর মাসে মেমেলের সাধারণ নির্ব্বাচনে স্থানীয় ডায়েটের ২৯টি আসনের মধ্যে ২৬টি আসন জার্মান্‌গণ অধিকার করিয়াছে। সেই সময়েই মেমেলের জার্মান্ দলের নেতা ডক্টর নিউম্যান্ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর লিথুনিয়ার অধীনতা সহ্য করিবেন না, জানুয়ারী মাসেই জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন। পূর্ব্বাপর অবস্থা উত্তমরূপে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, জার্মানীর মেমেল্ অধিকারে বিস্ময়ের কিছুই নাই, বরং জার্মানী এতদিন কেন মেমেল অধিকার করে নাই, তাহাই বিস্ময়ের কথা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিট্‌লারের শ্যেনদৃষ্টি তখন "পোলিস্-করিডর" (ড্যান্‌জিগ্ ও পোমারনিয়ার মধ্যবর্ত্তী পোল অঞ্চল) এবং ড্যান্‌জিগের উপর পতিত হইয়াছে। "পোলিস্ করিডর" সম্পর্কে জার্মানীর পক্ষ হইতে এতদূর প্রচারকার্য্য চালিত হইয়াছে যে, অনেকের ধারণা—ঐ অঞ্চলটি জার্মানীর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা পোলাণ্ডের পোমর্জ্জ প্রদেশ। গত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়া এই প্রদেশটিকে অধিকার করিয়াছিল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীর ধমনীতে পোল রক্ত প্রবাহিত হয় এবং অধিকাংশ অধিবাসীই পোল্ ভাষায় কথা বলে। ড্যান্‌জিগ্‌কে জার্মান্ শহর বলা যাইতে পারে; এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই জার্মান্, এই শহরের কর্ত্তৃত্বভারও নাৎসীদিগের হস্তে। বাণিজ্যের জন্য ড্যান্‌জিগ্‌কে ব্যবহারের অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই আছে। ড্যান্‌জিগ্ ও নূতন বন্দর ডিনিয়ার পথে পোলাণ্ডের শতকরা ৬৭ ভাগ বহির্ব্বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

মিউনিক চুক্তিতে হের হিট্‌লার চেকোশ্লোভেকিয়ার অবশিষ্টাংশের সমগ্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ঐ রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে মিউনিক চুক্তির স্বাক্ষরকারীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, ইহাও স্থির ছিল। হিট্‌লার কোন দিন তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করেন না, এইবারও করেন নাই। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হিট্‌লার ঘোষণা করিয়াছিলেন, "জার্মানী অষ্ট্রীয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, অষ্ট্রীয়াকে জার্মানীর অধিকারভুক্ত করিতে চাহে না, অষ্ট্রীয়ার সহিত একত্র হওয়াও তাহার বাসনা নহে" —Germany neither intends nor wishes to interfere in the internal affairs of Austria, annex Austria or to conclude an Anschluss. এই উক্তির পর তিনটি বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই হিট্‌লার কি করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। অষ্ট্রীয়ার ধ্বংস সাধিত হইবার পর মিঃ চেম্বারলেন কমন্স সভায়

ঘোষণা করিয়াছিলেন—জার্মান্ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি আশ্বাস লাভ করিয়াছেন যে তাঁহারা চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না। ঠিক সেই দিন কিন্তু মার্শাল্ গোয়েরিং চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রতিনিধিকে "সামরিক কর্ম্মচারিরূপে" (On word of honour as an officer) অনুরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। সেই হিট্লার মিউনিকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু এইবার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের পক্ষে আর তাঁহার স্বদেশবাসীকে স্তোকবাক্যে ভুলান সম্ভব হয় নাই। মিঃ চেম্বারলেন বুঝিয়াছিলেন যে এই ঘটনার পর যদি তিনি জার্মানীকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে আর প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হইবে না। তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সন্তুষ্টি বিধানের (appeasement) বুলি আওড়াইবেন, আর জার্ম্মাণী ক্রমে পূর্ব্ব-ইউরোপে বৃটেনের সমস্ত অর্থনৈতিক স্বার্থ বিনষ্ট করিবে, ইহা বৃটিশ জাতি আর সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। বৃটিশ জাতির এই মনোভাব উপলব্ধি করিয়াই চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা জার্মাণী সম্পর্কে তাহাদের পূর্ব্ব-নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; এই জন্যই মিঃ চেম্বারলেন্ গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে বার্মিংহামে জার্মানী সম্পর্কে আক্রমণাত্মক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।*

আল্সেস্-লোরেণের দিকে জার্মানীর লোলুপ দৃষ্টি আছে, ইহা ফ্রান্স জানে। তাহার পর টিউনিস্-জিবুতি-সুয়েজ সম্পর্কে ইটালীর দাবীও জার্মানীর সমর্থন লাভ করিয়াছে। সর্ব্বোপরি পোলাণ্ডে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক স্বার্থ অত্যন্ত অধিক। এই জন্য ফ্রান্স পূর্ব্ব-ইউরোপে জার্মানীর অগ্রগতিতে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে। সে-ও বৃটেনের সঙ্গে এক সঙ্গে জার্মানীর বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছে।

বৃটেন্ ও ফ্রান্স তখন অন্যান্য শক্তির সহিত জার্মানীর ঔদ্ধত্য নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। এই আলোচনার ফলাফল কি হইবে, তাহা এখনও বলিবার সময় আসে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জার্মানী যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া পররাজ্য জয় করিতে চাহে। জার্মানীর সামরিক শক্তি যাহাই হউক না কেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সে এখনও প্রস্তুত নহে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন, মধ্য-ইউরোপে রাজ্য-বিস্তৃতির পর জার্মানী বোধ হয় সোভিয়েট উক্রেন আক্রমণ করিবে। এই আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। জার্মানী জানে, বিনা যুদ্ধে সোভিয়েট উক্রেন জয় করা সম্ভব নহে—যুদ্ধের ফলাফলও অনিশ্চিত। জার্মানী যে ব্যাপক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে আদৌ প্রস্তুত নহে, তাহা সম্প্রতি হিট্লারের বক্তৃতা হইতে জানা গিয়াছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন যখন ঘোষণা করিলেন যে, পোলাণ্ড আক্রান্ত হইলেই বৃটেন্ তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবে, তখনই হিট্লার তাঁহার উইল্হেলমস্-হাভেনের বক্তৃতায় শান্তির বাণী উচ্চারণ করিলেন। মিঃ চেম্বারলেন বলিলেন, "পোলাণ্ডের স্বাধীনতা যদি বিপন্ন হয় এবং পোল্ গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহার জাতীয় শক্তির দ্বারা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে পোল্ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন।" ঠিক এই উক্তির উত্তরেই হয় ত নরম সুরে হিট্লার বলিয়াছেন, "জার্মানী অন্য জাতিকে আক্রমণ করিবার স্বপ্ন দেখে না। আমরা শুধু আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।"

ইতিপূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি যে বৃটেন্, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া যদি একযোগে ফ্যাসিষ্ট ঔদ্ধত্য দমনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে অচিরে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বৃটেন্ ও ফ্রান্স এতদিন কিছুতেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়াকে সদলভুক্ত করিতে চাহে নাই। আজ জার্মানীর ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-নীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বৃটেন্ ও ফ্রান্স যদি কোনরূপ দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন না করে এবং সোভিয়েট রুশিয়াকে যদি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে না দেখে, তাহা হইলে এখনও জার্মানী ও ইটালীর ঔদ্ধত্য দমন হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই স্বার্থপর সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির সম্পর্কে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জার্মানীর নিকট হইতে নূতনভাবে বৃটিশ ও ফরাসী স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া এই দুইটি রাষ্ট্রের পক্ষে পুনরায় জার্মানীর দলে "ভিড়িয়া" যাওয়া আদৌ বিস্ময়কর নহে।

---

* এই জন্যই ইঙ্গ-জার্মান্ বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত হইয়াছে ; এই জন্যই চেকোশ্লোভেকিয়াকে ঋণের অবশিষ্ট অর্থ প্রদান বন্ধ হইয়াছে ; এই জন্যই বার্লিন্ হইতে বৃটিশ দূত লণ্ডনে আহূত হইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর জলধর সেন

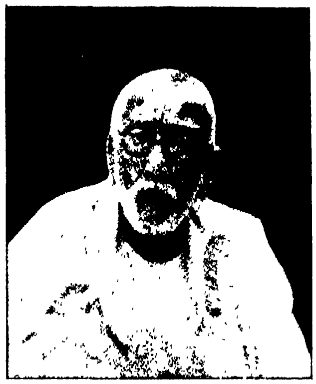
গত ২৬শে চৈত্র রবিবার বিকাল তিন ঘটিকার সময় প্রবীণ সাহিত্যিক 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককালের সাহিত্যসাধনা সমাপ্ত করিয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। গত ১লা চৈত্র তিনি ৮০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন—মৃত্যুদিনে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর ২৫ দিন হইয়াছিল।



হিমালয়ে জলধর সেন

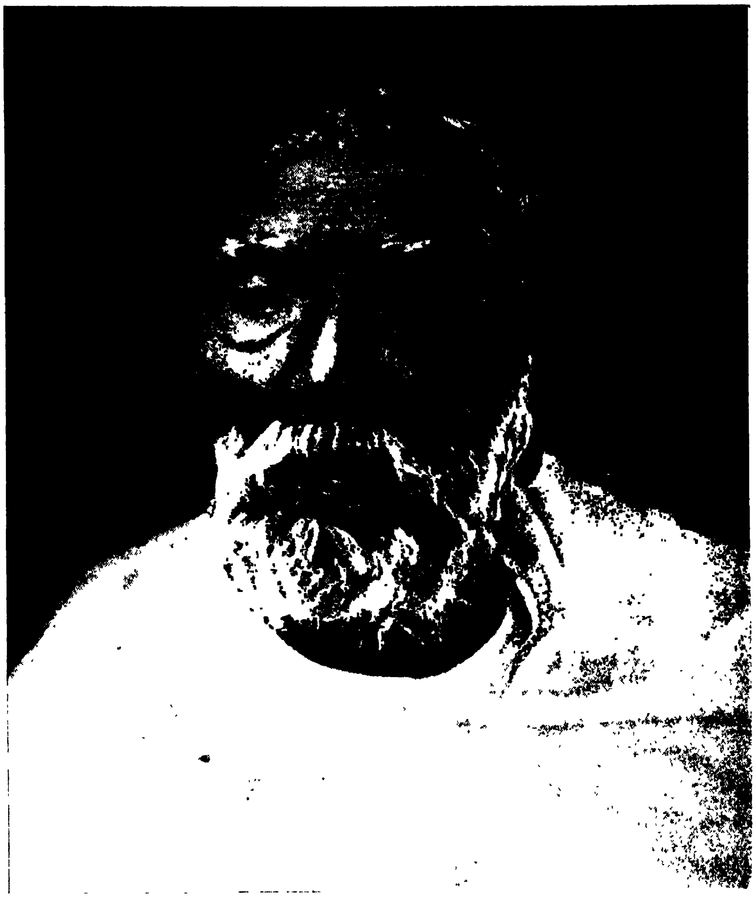
গত ৮ই মাঘ রবিবার রাত্রিতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগতা হইলে তাঁহার শরীর যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর সুস্থ হইল না। তিনি একমাসকাল অসীম ধৈর্য্যের সহিত শোকাবেগ ধারণ করিয়া সমারোহের সহিত পত্নীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অশৌচান্তের দিন অপরাহ্ণে তিনি শেষবার ভারতবর্ষ কার্য্যালয়ে পদার্পণ করেন। পরের দুই দিন শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন উপলক্ষে সকলের নিষেধসত্ত্বেও তিনি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং নিয়মভঙ্গের দিন বিকালে তিনি যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। দুর্ব্বল অশক্ত শরীর লইয়াও তিনি ৫ই চৈত্র 'রবিবাসর' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং ৬ই চৈত্র তাঁহার বৈবাহিক মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি সুস্থ হইয়া উঠিবেন; তিনি যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন, তাহা কেহ কল্পনাও করেন নাই।

সন ১২৬৬ সালের ১লা চৈত্র (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ)



(১৩৪২ সালের ২রা বৈশাখ গৃহীত চিত্র)

মঙ্গলবার জলধর সেন নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম হলধর সেন। ১২৬৯ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার প্রথমা পত্নী কলেরা রোগে দেহত্যাগ করেন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার মাতৃদেবীর মৃত্যু হয়। তাহার তিন বৎসর পরে ১২৯৬ সালের আষাঢ় মাসে তিনি প্রবাস যাত্রা করেন। দুই বৎসর কাল নানা স্থানে ভ্রমণের পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে জলধর সেন মহাশয় হিমালয় যাত্রা করেন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের নিকটস্থ





রায় জলধর সেন বাহাদুর



সুসজ্জিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের রথ, রাষ্ট্রপতির চিত্র রথে স্থাপিত হইয়াছে   ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রায় হস্তীপৃষ্ঠে ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতিদিগের ফটো   ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

উন্থী গ্রামের দত্ত পরিবারে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী হরিদাসী দাসী মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জলধর সেন কুমারখালি স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি এফ এ পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কুমারখালি হইতে প্রকাশিত 'গ্রামবার্ত্তা'র লেখক হন—তাঁহার প্রথম রচনা 'ভজহরির মেলা দর্শন' গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তখন জলধরবাবুর বয়স ১৬।১৭ বৎসর। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জলধরবাবু গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক হইয়াছিলেন, ঐ পত্রে তাঁহার ২০।২৫টি লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। সোমপ্রকাশেও জলধরবাবুর লেখা প্রকাশিত হইয়াছে।

জলধরবাবুর পিতা কুমারখালি গ্রামের রামজয় প্রামাণিকের দেশী কাপড়ের দোকানে গোমস্তার কাজ করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শশধর সেন বি-এ মহাশয় ১৩১৩ সালে বসন্ত রোগে মারা গিয়াছেন।

জলধরবাবু কলেজ ছাড়িয়া প্রথম গোয়ালন্দে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার বিবাহের পর তিনি তিন বৎসর কাল মহিষাদলের রাজপরিবারে গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর সহ-সম্পাদকের কাজ পাইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বসুমতীর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বসুমতীর সম্পাদক হইয়াছিলেন। এগার বৎসর কাল বসুমতীর সেবা করিয়া তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হিতবাদীর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন ও পরে উহার সম্পাদক হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি সুলভসমাচারের সম্পাদক হইয়াছিলেন। সুলভসমাচারের কার্য্য ত্যাগের পর তিনি সন্তোষের রাজপরিবারে কিছুদিন ছেলেদের গৃহশিক্ষক ও পরে জমিদারীর ম্যানেজারের কার্য্য করেন ও পরে কলিকাতায় আসিয়া সন্তোষের সুকবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের একটি ছাপাখানার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ঐ কাজ করিবার সময় জলধরবাবু ভারতবর্ষের সম্পাদক নিযুক্ত হন—সে ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসের কথা। তাহার পর গত ছাব্বিশ বৎসর কাল তিনি কিরূপ যোগ্যতার সহিত ভারতবর্ষের সম্পাদকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। পীড়ায় শয্যাগত অবস্থাতেও তিনি সর্ব্বদা ভারতবর্ষ সম্পাদন সম্বন্ধে সকল সংবাদ রাখিতেন এবং পরামর্শদানে উৎসাহিত করিতেন।

জলধরবাবু কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের একটি বিষয় হইতেই বুঝা যায়। তিনি যত অধিকসংখ্যক সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে আর কোন ব্যক্তিই বোধ হয় তত অধিকসংখ্যক সভায় ও সমিতিতে সভাপতিত্ব করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে নিজের লোক বলিয়া মনে করিত এবং জলধরবাবুও সাদরে সাগ্রহে সকলের অনুরোধ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।

সারা জীবন ধরিয়া জলধরবাবু কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। নিম্নে তাঁহার রচিত কতকগুলি পুস্তকের নাম প্রদান করিতেছি—(১) প্রবাস-চিত্র (২) হিমালয় (৩) নৈবেদ্য (৪) পথিক (৫) হিমালয় বক্ষে (৬) নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প (৭) দুঃখিনী (৮) পুরাতন পঞ্জিকা (৯) বিশু দাদা (১০) হিমাদ্রি (১১) সীতা দেবী (১২) করিম শেখ (১৩) আমার বর ও অন্যান্য গল্প (১৪) কাঙ্গাল হরিনাথ—১ম খণ্ড (১৫) কাঙ্গাল হরিনাথ—২য় খণ্ড (১৬) পরাণ মণ্ডল (১৭) আলেন কোয়ার্টারম্যান (১৮) কিশোর (১৯) অভাগী—১ম খণ্ড (২০) আশীর্ব্বাদ (২১) দশদিন (২২) বড়বাড়ী (২৩) এক পেয়ালা চা (২৪) চাঁগাব দরবেশ (২৫) ঈশানী (২৬) হরিশ ভাণ্ডারী (২৭) পাগল (২৮) কাঙ্গালের ঠাকুর (২৯) চোখের জল (৩০) ষোল আনি (৩১) মায়ের নাম (৩২) সোনার বালা (৩৩) অভাগী—২য় খণ্ড (৩৪) দানপত্র (৩৫) মুসাফির মঞ্জিল (৩৬) গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ—১৩৩১ সালে প্রকাশিত (৩৭) শিব সিমন্তিনী (৩৮) পরশ পাথর (৩৯) গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ—১৩৩২ সালে প্রকাশিত (৪০) ভবিতব্য (৪১) দক্ষিণাপথ (৪২) তিন পুরুষ (৪৩) বড় মানুষ (৪৪) মধ্য ভারত (৪৫) আফ্রিকায় সিংহ শিকার (৪৬) রামচন্দ্র (৪৭) সেকালের কথা (৪৮) উৎস (৪৯) অভাগী—৩য় খণ্ড (৫০) হিমালয়ের স্মৃতি (৫১) ছোট কাকী ও অন্যান্য গল্প।

ইহা ছাড়া তাঁহার লিখিত বহু শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক আছে এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিনি বহু সাময়িক পত্রিকায় কত যে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। যে কোন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক জলধরবাবুর নিকট লেখা চাহিতেন, তাঁহার জন্যই তিনি কিছু না কিছু লিখিয়া দিতেন। পূজার সময় তাঁহাকে ২৫।৩০টি প্রবন্ধ বা গল্প রচনা করিতেও হইয়াছে। ভারতী, সাহিত্য, জাহ্নবী, মানসী, ভারতী ও বালক, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ধ্রুব, বার্ষিক বসুমতী, নিরুপমা, বর্ষস্মৃতি, ঋষি, প্রদীপ, দাসী, অর্চ্চনা, নারায়ণ, বাঁশরী, পঞ্চপুষ্প, নমুনা, নির্ম্মাল্য, মাধবী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৬ বৎসরকাল শুধু ভারতবর্ষেই তাঁহার অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হইয়াছে।

জলধরবাবু ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দরিদ্র সাহিত্যসেবীর পক্ষে এই সম্মান প্রাপ্তি তাঁহার সাহিত্যসাধনায় চরম সাফল্য বলা যাইতে পারে। জলধরবাবু ১৩৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের রাধানগর অধিবেশনে (পঞ্চদশ) সাহিত্যশাখায় সভাপতি এবং ১৩৩৫ সালে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ইন্দোর অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৩২৯ সালে তিনি প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি সেইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হাওড়া সালিখায় 'গোবর্দ্ধন সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজের' প্রতিষ্ঠাবধি গত ২৫ বৎসরেরও অধিককাল জলধর সেন মহাশয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন এবং প্রতি বৎসর অন্তত সমাজের ১০।১২টি অধিবেশনে তিনি যোগদান করিতেন। গত ৯ বৎসরকাল তিনি 'রবিবাসর' নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন এবং বাসরের প্রায় সকল সভাতেই তিনি নিষ্ঠার সহিত যোগদান ও সভাপতিত্ব করিতেন। ১৩২২ সালে তিনি মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব এবং ১৩৩১ সালে তিনি জামসেদপুরে সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৩২৯ সালে গোবর্দ্ধন সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজ এবং ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী কর্ত্তৃক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। ১৩৩৯ সালের ১২ই ভাদ্র 'রবিবাসর' হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয় এবং ১৩৪১ সালের ২রা হইতে ৪ঠা ভাদ্র নিখিল বঙ্গের পক্ষ হইতে জলধরবাবুর সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। ঐ সময়ে সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে 'জলধর কথা' নামক একখানি পুস্তকও প্রকাশ করা হয়—তাহাতে জলধরবাবুর সম্বন্ধে বহু সুধী ব্যক্তির রচনা স্থান পাইয়াছে।

আমরা মাত্র কয়েকটি সভা সমিতি ও সম্বর্দ্ধনার কথা প্রকাশ করিলাম। সমগ্র বাংলা দেশে কত স্থানে কতবার যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কলিকাতার প্রায় সকল কলেজগুলিতেই জলধরবাবুকে কোন না কোন উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছে এবং ছাত্রগণও নানাভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরদিন দারিদ্র্যব্রতী থাকিলেও তাঁহার সম্মানলাভের কোনদিন অভাব হয় নাই—সারা জীবন ধরিয়া তিনি তাঁহার দেশবাসী সকলের নিকট হইতেই অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং উপযুক্ত সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। পরিণত বয়সে ৭ পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন—মৃত্যু তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি বহুকাল বাঙ্গালী জাতি শ্রদ্ধার সহিত মনে রাখিবে। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন—দ্বিতীয় পত্নীর শোকও তিনি বৃদ্ধ বয়সে আর সহ্য করিতে পারিলেন না—ইহা হইতে তাঁহার পত্নীপ্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই—ভগবান তাঁহাদিগকে শান্তি দান করুন।



সাময়িকী

কংগ্রেসের পর—

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনের পর দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে কিছুতেই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করা যায় না। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিপুরীতেই এত অধিক পীড়িত হইয়া পড়েন যে কংগ্রেস অধিবেশনের শেষাংশে তাঁহার পক্ষে আর কোন কাজ করাই সম্ভব হয় নাই। সুভাষচন্দ্র অসুস্থ শরীরে ত্রিপুরী হইতে ফিরিয়া মানভূমের এক পল্লীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলেও রোগশয্যায় শয়ন করিয়াই তিনি কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালনার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। ত্রিপুরীতে শ্রীযুত পন্থ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় গান্ধীজির প্রতি দেশবাসীর বিশ্বাস জ্ঞাপন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ প্রস্তাবটি সুভাষচন্দ্রের প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপক কি-না তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এ সকল বিষয়ে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন বটে, কিন্তু গান্ধীজির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র তাঁহার কর্ত্তব্যও স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইহার শেষ পরিণতি কি হয়, তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী সকলেই উৎসুক হইয়া আছে। এই গুরু পরিস্থিতির ফলে যে দেশে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে উৎসাহ হ্রাস পাইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। গান্ধীজি ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর যে বিষ কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার ফল অবশ্যই সকলকে ভোগ করিতে হইবে।

বড়লাট ও রাজস্ব বিল—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের যে বাজেট উপস্থিত করা হয়, প্রতি বৎসরই ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া থাকেন। কিন্তু গত পাঁচ বৎসর কাল প্রতি বৎসরই বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া পরিবর্ত্তন প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন; যখন নূতন ভারত-শাসন-আইন (১৯১৯) প্রণীত হয়, তখন বিশেষ অবস্থার প্রতীকারের জন্য বড়লাটকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় সর্ব্বদা যে ঐ অধিকার ব্যবহার করা হইবে, তাহা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, বড়লাট সর্ব্বদাই ঐ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন। ইহাই হইল এ দেশে স্বায়ত্ত শাসনের নমুনা। যাঁহারা রাষ্ট্রসংঘ গঠনের পক্ষপাতী, তাঁহারা কি এই নমুনা দেখিয়া ভবিষ্যতের মাকালফলের রূপ ঠিক করিয়া লইতে পারেন না?

রাজকোট সমস্যার সমাধান—

গান্ধীজির উপবাসভঙ্গের পর বড়লাট রাজকোট দরবারের সহিত মীমাংসার ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য দিল্লীর ফেডারেল আদালতের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গাওয়ারের উপর ভার প্রদান করিয়াছিলেন। প্রায় এক মাস কাল সকল কাগজপত্র পরীক্ষার পর গত ৩রা এপ্রিল সার মরিস তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজকোট রাজ্যের প্রজাগণের পক্ষে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল আন্দোলন করিয়াছিলেন, তিনি এখন সার মরিসের নির্দ্দেশে সম্মত হইয়াছেন ও তাঁহার বিশ্বাস এই মীমাংসার ফল সন্তোষজনক হইবে। এ নির্দ্দেশ প্রকাশিত হওয়ার পর গান্ধীজির অভিমতও প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিও এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গান্ধীজি ৪ঠা এপ্রিল বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা যে কিরূপে পরে সন্তোষজনক থাকিবে, তাহা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। ঠাকুর সাহেবের সহিত যদি সর্দ্দার পেটেলের মতান্তর হয়, তাহা হইলে ঠাকুর সাহেবের মতই ইহার পর জয়ী হইবে।

এখনকার ব্যবস্থায় যে দ্বৈতশাসনের উদ্ভব হইবে, তাহার ফলও সন্তোষজনক হইবে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

চাকুরীতে সাম্প্রদায়িকতা—

ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক হিসাবে বাঙ্গলা দেশে ও বাহিরে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি গত কয়েক বৎসর যাবত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগে অবৈতনিক দ্বিতীয় চিকিৎসকের কার্য্য করিতেছিলেন। ডাক্তার কিরোয়ান ঐ বিভাগের প্রথম বা ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার



ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

কিরোয়ান অস্থায়ীভাবে তিন বার ছুটী লইলে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে প্রথম চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার ডাক্তার কিরোয়ানের স্থানে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন ডাক্তার টি আমেদ, যিনি অভিজ্ঞতায় ও চিকিৎসাকালের অনুপাতে সুশীলকুমারের সমকক্ষ নহেন। যোগ্যতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে প্রত্যেক আত্মসম্মানজ্ঞানী ব্যক্তিই ক্ষুণ্ণ হন। সুশীলকুমারও এই নিয়োগে তাঁহার প্রতি অবিচার ও অসম্মান প্রদর্শনের জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন এবং একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া সাধারণকে সকল বিষয় জ্ঞাত করাইয়াছেন। আত্মসম্মান জ্ঞান ও দৃঢ় চিত্ততার জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের নামও করা যাইতে পারে। কলিকাতা বেথুন কলেজের উদ্ভিদ্ বিদ্যার অধ্যাপকের পদে ডাক্তার মিসেস কমলা রায়ের দাবী উপেক্ষা করিয়া একজন অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত অ-ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা এখন আর এই সকল বিষয়ের আলোচনাও করি না।

রায় সাহেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র—

গত ১৩ই চৈত্র রাত্রিতে কলিকাতা ৫৭।২বি দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে রায় সাহেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সামান্য কেরাণীর



রায় সাহেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র

কার্য্যে প্রবেশ করিয়া পরে বাঙ্গালা সরকারের রেজিষ্ট্রার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র—শ্রীযুত হরিদাস মিত্র, হাইকোর্টের ডেপুটী রেজিষ্ট্রার কানাইলাল মিত্র ও নিতাইচাঁদ মিত্র এবং এক কন্যা ও জামাতা রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রমোদচন্দ্র পালিত—

গত ৪ঠা চৈত্র বিকালে খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবী শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা হাইকোর্টের এটর্ণী

প্রমোদচন্দ্র পালিত মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যের



প্রমোদচন্দ্র পালিত

প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার পরিজনবর্গকে তাঁহাদের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীর অবস্থা—

ব্রহ্মদেশকে ভারত সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বৃটীশ সম্রাটের অধীন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করার পর হইতে ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা তথায় সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। গত কয় মাস হইতে ব্রহ্মে যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইতেছে, তাহা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া নহে, ব্রহ্মবাসী ও ভারতবাসীর সমস্যার জন্য। এতদিন ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ব্রহ্মের সহিত ভারতের সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত মিলও যথেষ্ট ছিল। হঠাৎ রাজনীতিক বিচ্ছেদের জন্য কেন এরূপ মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহা—

কলিকাতার বিখ্যাত লাহা পরিবারের স্বর্গত রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল্, পি-আর-এস, পি-এচডি মহাশয় এবার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্স নামক ভারতীয় বণিক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কলিকাতার লাহা পরিবার বাণিজ্যের জন্য সুপরিচিত এবং তাঁহাদের প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী প্রায় একশত বৎসর সাফল্যের সহিত ব্যবসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। নরেন্দ্রবাবু একাধারে লক্ষ্মী ও



শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

সরস্বতী উভয়েরই বরপুত্র এবং নিজে শুধু সাহিত্যিক নহেন, সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যিকগণের উৎসাহদাতা। তাঁহার পিতা দীর্ঘকাল উক্ত চেম্বারের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যোগ্য পুত্রের সেই পদ প্রাপ্তিতে আমরা নরেন্দ্রবাবুকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়—

কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় অতি অল্প বয়সে ভারতীয় সঙ্গীত-জগতে একটি বিশেষ স্থানলাভ করিয়া সর্ব্বত্র আদৃতা হইতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বাঙ্গালীর মেয়ে যে এরূপ ক্লাসিকাল সঙ্গীত গান করিতে পারেন, সেকথা এলাহাবাদ সম্মিলনে বীণাপাণির গান শুনিবার পূর্ব্বে কেহ বিশ্বাস করিতেন না। বোম্বাই, দিল্লী

ও কলিকাতার রেডিওতে বীণাপাণি প্রায়ই গান গাহিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার সঙ্গীত জীবনে অধিকতর সাফল্য কামনা করি।



কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়

মাদারীপুরে কৃষকগণের সত্যাগ্রহ—

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় ও বরিশালের সদর মহকুমায় কৃষকগণের এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে তাহারা না খাইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে। যে সকল কৃষকের জমি আছে তাহাদের কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য এবং যাহাদের জমি নাই তাহাদিগকে সাহায্যমূলক কাজ দিবার জন্য কৃষকগণ সম্প্রতি নানা স্থানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিল। মাদারীপুরে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ও বরিশালে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সত্যাগ্রহ হইয়াছিল। ফলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের অভিযোগ দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

জাহাজে ভারতীয়গণের প্রতি দুর্ব্যবহার—

গত ১লা এপ্রিল রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার রোগশয্যা হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বোম্বাই হইতে ইটালীগামী একখানি জাহাজের ১৪জন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় যাত্রীর উপর বৃটীশ সামরিক কর্ম্মচারীদিগের দুর্ব্যবহারের কথা দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। ঘটনাটি জাহাজেই সংঘটিত হইয়াছে। যিনি ঐ দুর্ব্যবহারের কথা জানাইয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেও একখানি জাহাজে ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল; তাহার সুদীর্ঘ ২০ বৎসর পরে পুনরায় ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। সুভাষচন্দ্র দেশবাসী সকলকে এ ঘটনার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন ও যাহাতে পুনরায় এইরূপ ঘটনা না ঘটে, সেজন্য দেশবাসী সকলকে তীব্র আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

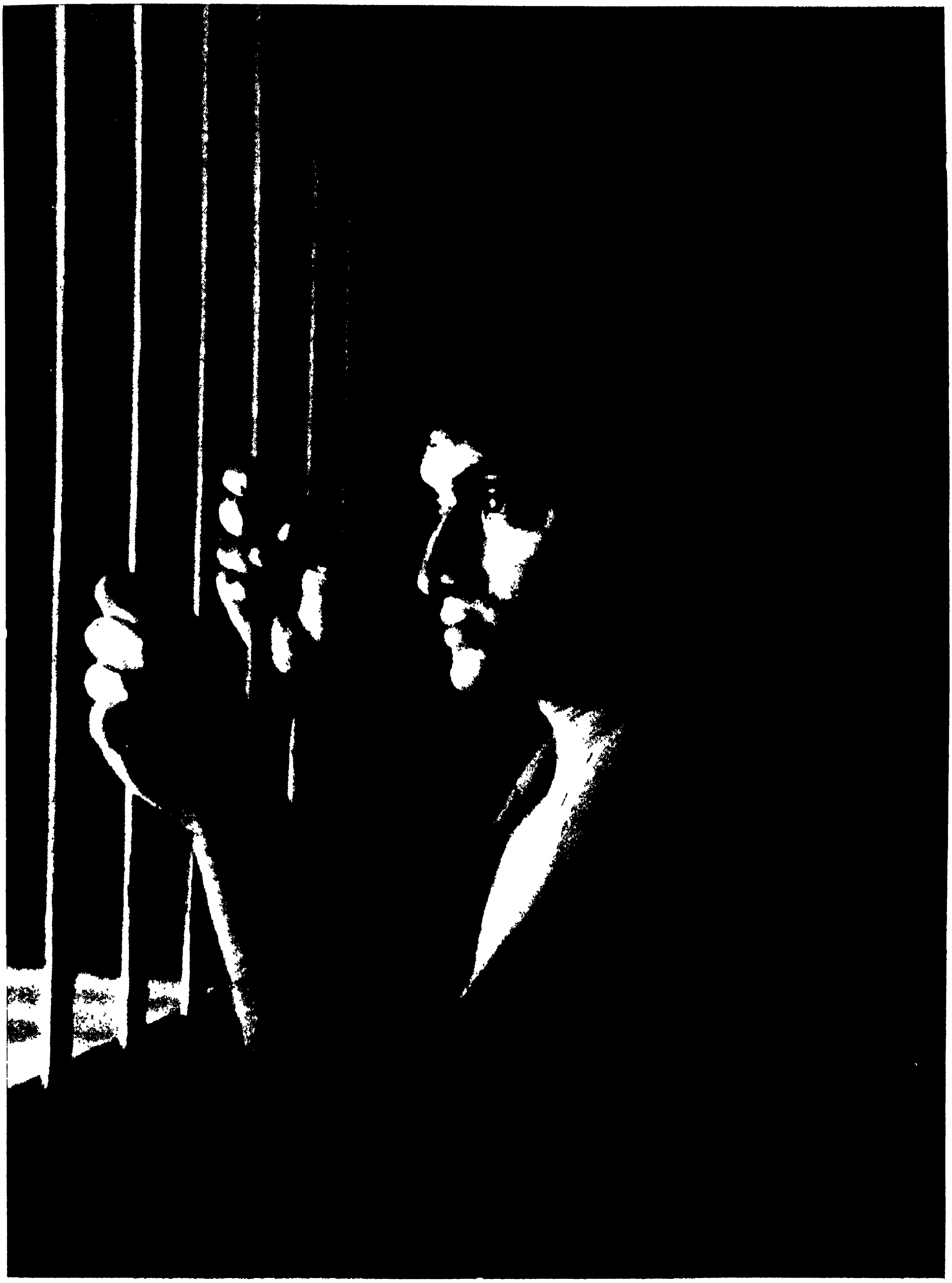
নাহার পরিবারের দান—

কলিকাতা তালতলা পল্লীতে স্বর্গত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত পুরাতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহগুলি ইতিপূর্ব্বে



পূরণচাঁদ নাহার

অনেকেই কুমার সিং হলে দর্শন করিয়াছেন। সংগৃহীত দ্রব্যগুলির মূল্য ৪০ হাজার টাকার কম হইবে না। সম্প্রতি আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীযুত বিজয় সিং নাহার তাঁহার পিতার সংগ্রহগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে দান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের



বন্দী

শিল্পী—নীরোদ রায়, গৌহাটী



বিষ্ণুদত্ত নগরের ত্রিপুরা কংগ্রেসের সাধারণ দৃশ্য

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যা

কর্তৃপক্ষ এ জন্য স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা পূরণচাঁদবাবুর নামে একটি গবেষণা বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং সম্ভব হইলে উক্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র যাহাতে জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণা করেন সে বিষয়েও অবহিত থাকিবেন। আমরা নাহার পরিবারের এই দানে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনার জন্য তাঁহাদের এই দান চিরদিন লোক শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

মহারাজা সার মন্মথনাথ—

গত ৩১শে মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রি দুইটার সময় মৈমনসিংহ সন্তোষের মহারাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া



মহারাজা স্যার মন্মথনাথ

আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। মন্মথনাথ জমিদার বংশের সন্তান হইয়াও প্রথম জীবনেই রাজনীতি-চর্চ্চায় মন দিয়াছিলেন; তিনি রাষ্ট্রগুরু সার সুরেন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন ও 'বেঙ্গলী' পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। মডারেটগণ ক্রমে কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করিলে মন্মথনাথও কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও দেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া জন-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতি হিসাবে তাঁহার খুব সুনাম হইয়াছিল। তিনি নিজে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন এবং সারা জীবন খেলা-ধূলার উৎসাহদাতা ছিলেন; মন্মথনাথ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের পর পর ছয় বার সভাপতি হইয়াছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন নাই বা এত অধিকদিনও কেহ ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন নাই। বাল্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রমথনাথকে কলিকাতায় আনিয়া শিক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রমথনাথ সুকবি বলিয়া পরিচিত। মন্মথনাথকে গত বিশ বৎসর কলিকাতার সকল জনহিতকর অনুষ্ঠান ও স্পোর্টস্ প্রতিষ্ঠানে দেখা যাইত। তাঁহার মত জনপ্রিয় ব্যক্তি এ যুগে অতি বিরল। আমরা তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি ও মহারাজা সার মন্মথনাথের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

কর্পোরেশন ও বর্ত্তমান সচিব সংঘ—

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মুসলমান প্রাধান্য বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবসংঘ একটি নূতন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা সম্প্রতি আর একটি নূতন আইন প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে চিফ একজিকিউটিভ অফিসার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, হেলথ্ অফিসার প্রভৃতি নিয়োগের ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হইবে। দুই শত টাকার অধিক মাসিক বেতনের পদে লোক নিয়োগের ভার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর দেওয়া হইবে। দুই শত টাকার কম বেতনের পদে চিফ একজিকিউটিভ অফিসার লোক নিয়োগ করিবেন। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার-দিগের অধিকার সঙ্কুচিত হইবে ও তাঁহারা শুধু পরামর্শদাতা রূপেই থাকিবেন। সার সুরেন্দ্রনাথ যে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সার্থান্ধ হইয়া বর্ত্তমান সচিবসংঘ সেই আইন পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করায় তাহা যে দেশের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক হইবে না, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ভ্রম সংশোধন—

এই সংখ্যায় 'তার নিজের দেশ' শীর্ষক 'পার্ল বাক' লিখিত একটি গল্প প্রকাশিত হইল—উহার অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুত সিতাংশু দাশগুপ্ত। তাঁহার নাম যথাস্থানে দেওয়া হয় নাই।



ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা পঞ্চম টেষ্ট ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ—৫৩০ ও ৪৮১

ইংলণ্ড ঃ—৩১৬ ও ৬৫৪ (৫ উইকেট)

দশ দিন ব্যাপী টেষ্ট খেলাও অমীমাংসিত হয়েছে।

ইংলণ্ড তৃতীয় টেষ্ট জয়ের ফলে রবার পেয়েছে, বাকী ৪টি টেষ্ট ড্র হয়েছে।



এডরিচ

ডারবানের এই টেষ্ট ম্যাচ একাধিক কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম টেষ্টের সব কিছু কৃতিত্ব ব্যাটস্‌ম্যানদের; বোলাররা তাঁদের নৈপুণ্য দেখাতে মোটেই সক্ষম হয়নি। চার ইনিংসে ৩৫ উইকেটে রান উঠেছে ১৯৮১, অর্থাৎ গড়ে প্রতি ব্যাটস্‌ম্যান ৫৬.৫ রান ক'রেচেন। ইহা পৃথিবীর রেকর্ড। ব্যাটিংয়ে সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েচেন এডরিচ ২১৯ রান ক'রে। এতদিন কোন টেষ্ট ম্যাচেই তিনি সুবিধা ক'রতে পারেন নি। তারপর ভাণ্ডারবিল ১২৫ ও ৯৭, মেলভিল ৭৮ ও ১০৩, হ্যামণ্ড ১৪০, গিব ১২০, মিচেল ৮৯, এইমস্ ৮৪ ক'রেচেন। চতুর্থ ইনিংসে ইংলণ্ডের ৫ উইকেটে ৬৫৪ রান পৃথিবীর নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেচে। ইতিপূর্ব্বে ১৯০৭-০৮ সালে নিউ সাউথ ওয়েলস্ ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ৫৭২ করে রেকর্ড ক'রেছিল। কেপ টাউনে ৯ উইকেটে ৫৫৯ রান ক'রে ইংলণ্ডের যে টেষ্ট রেকর্ড হ'য়েছিল তাও ভঙ্গ হ'ল। গিব ও এডরিচ মিলে ২৮০ রান ক'রে ৪৩৬ মিনিটে; লর্ডস মাঠে ১৯২৪ সালে ইংলণ্ডের যে দ্বিতীয় উইকেট রেকর্ড হবস্ ও সাটক্লিফ স্থাপিত ক'রেছিলেন তার সমান-সমান হ'ল এবং সাটক্লিফ ও টাইল্ডেস্লীর সহযোগিতায় ১৯২৭-২৮ সালে জোহান্সবার্গে ২৩০ রান ক'রে যে রেকর্ড হ'য়েছিল তা' ভঙ্গ হ'ল।



হ্যামণ্ড



এইমস্

ইংলণ্ডের নিশ্চিত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হ'বার কারণও অদ্ভুত। ইংলণ্ডের হাতে পাঁচটা উইকেট আছে এবং মাত্র ৪২ রান তুলতে পারলেই তারা জিতবে, খেলার জয় পরাজয় নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত খেলা চলবার কথা কিন্তু আর দেরী ক'রলে তারা দেশে যাবার জাহাজ ধ'রতে পারবে না ব'লে খেলা ঐখানেই শেষ ক'রতে তারা বাধ্য হ'ল। আগের দিন চায়ের পর বৃষ্টি না নাবলে ইংলণ্ড অবশ্য জিততে পারতো। কিন্তু ইংলণ্ড বরুণদেবকে দোষ দিতে পারে না, কারণ বরুণদেব বহুবার ইংলণ্ডকে অষ্ট্রেলিয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েচে।



গিব

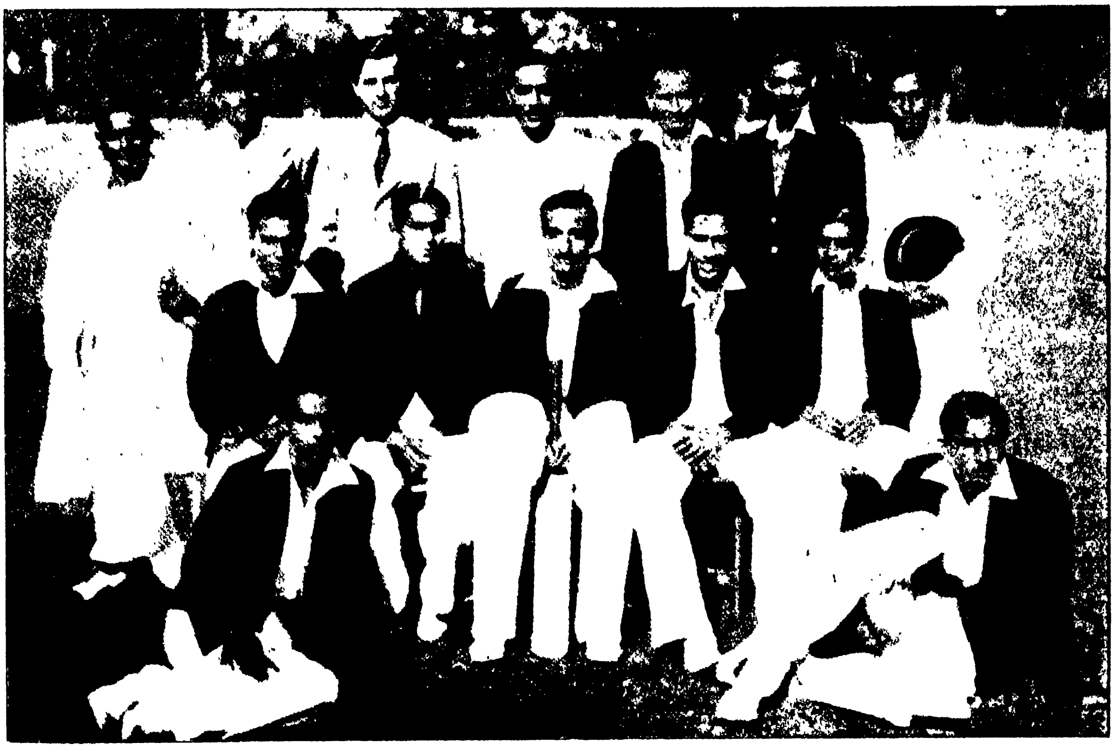
এবার ইংলণ্ডের ব্যাটিং প্রভূত উন্নতি লাভ করেচে ; অষ্ট্রেলিয়ার বোলারদের বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে।

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলার ফলাফল ঃ

	ইংলণ্ডের জয়	দক্ষিণ আফ্রিকার জয়	ড্র	মোট
দক্ষিণ আফ্রিকায়	২০	১১	১২	৪৩
ইংলণ্ডে	৯	১	১১	২১
মোট	২৯	১২	২৩	৬৪

স্পোর্টিং ইউনিয়ান দল সেমিফাইনালে উঠে না খেলার জন্য মহমেডানরা ফাইনালে ওঠে। এই প্রতিযোগিতাটি মাত্র চার বৎসর ধ'রে চলচে ; মহমেডান দল প্রথম বৎসর জয়লাভ ক'রেছিল।

মহমেডানরা প্রথম ব্যাট করে এবং মাত্র ১৩৬ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়। জব্বর সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেছিল ৪৪ ; তাতে চার ছিলো ৩টে। এইচ সাধু ৪টে উইকেট পায় ৫২ রানে, বি মিত্র ৩টে ২৭ রানে। প্রথম ইনিংসে এরিয়ান্সের ২৩৪ রান ওঠে। সুশীল বসু ৮০, আইভান



কুচবিহার কাপ বিজয়ী এরিয়ান্স ক্রিকেট দল। মহমেডান স্পোর্টিংকে চার উইকেটে পরাজিত করেছে ছবি—জে কে সান্যাল

কুচবিহার কাপ ঃ

এরিয়ান্স ঃ—২৩৪ ও ১৪২ (৬ উইকেট)

মহমেডান স্পোর্টিং ঃ—১৩৬ ও ২৩৯

এরিয়ান্স ৪ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েচে।

উডল্যান্ড মাঠে কুচবিহার কাঁপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে এরিয়ান্স দল মহমেডান দলকে ৪ উইকেটে পরাজিত ক'রে পর পর তিনবার কাপ বিজয়ী হয়েছে।

সুরিটা ৬০ করে ব্যাটিংয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েচেন। সুশীল খুব ধীরে উইকেটের চতুর্দ্দিকে সমানভাবে পিটিয়ে খেলেচেন, চার ছিলো ১১টা, ছয় একটা। আইভান অত্যধিক পিটিয়ে খেলেচে, ৬০ রানে ৬টা চার ৩টে ছয় ছিলো। ওবেদালি (বড়) ৬৩ রানে পাঁচটা উইকেট পায়।

৯৮ রান পিছনে থেকে মহমেডানরা দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৯ রান তোলে। জব্বরের খেলা খুব ভাল হ'য়েচে। জব্বর ওপনিং ব্যাটসম্যান ১২৮ রান ক'রে সাধুর বলে এল বি



লাহোরে ত্রয়োদশ বার্ষিকী বাঙ্গালী স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় থ্রেড নিড্‌ল্ রেস

ডবলিউ হয়, ১৭টা চার ছিল। এটা তার এ বৎসরের ষষ্ঠ সেঞ্চুরী। স্বীয় দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য জব্বরের এই প্রচেষ্টা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। এস দত্ত ৩টে উইকেট পেয়েচে ৪৮ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪২ রান তুলতে পারলেই এরিয়ান্সের জয়। এই প্রয়োজনীয় রান তুলতে তাদের ছ'টা উইকেট গেলো। সুধীর চ্যাটার্জ্জীর ৪৯, কে ভট্টাচার্য্য ও বলাই মিত্র উভয়ের নট আউট ৩০ ও ২৯ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইণ্টার কলেজিয়েট ক্রিকেট ফাইনাল ঃ

মেডিক্যাল কলেজ ঃ—১৪১ ও ৫৯ (৩ উইকেট)

বঙ্গবাসী কলেজ ঃ—৩০ ও ১৫৭

মেডিক্যাল ৭ উইকেটে বিজয়ী।

বঙ্গবাসী কলেজ প্রথমে ব্যাট ক'রে এবং মাত্র ৩০ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়। এইচ সাধু মাত্র ৮ রানে ৭টা উইকেট পেয়েচে এবং পঞ্চম ওভারে হ্যাটট্রিক্ করেছে। মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ইনিংসে ১৪১ রান ওঠে। সর্ব্বোচ্চ রান করে ডি' সেনা ৪০। মুস্তাফি ২৭ রানে পাঁচটা ও সুরজিৎ ঘোষ ৩৯ রানে ৪টে উইকেট পায়। দ্বিতীয় ইনিংসে বঙ্গবাসী কলেজের ১৫৭ রান হয়। সর্ব্বোচ্চ রান তোলে মুস্তাফি ৫২। সাধু ৬১ রানে ৬টা উইকেট পায়। প্রয়োজনীয় রান সংখ্যা তুলতে মেডিক্যাল কলেজের ৩টে উইকেট গিয়েছিল।

পৃথিবীর টেবল টেনিস

চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

চেকোশ্লোভাকিয়া পৃথিবীর টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থেকে সোয়াথলিংকাপ বিজয়ী হ'য়েছে। জুগোশ্লাভিয়া একটি খেলায় পরাজিত হ'য়ে দ্বিতীয় স্থান ও ইংলণ্ড দু'টিতে পরাজিত হ'য়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুমানিয়া, জুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, ভারতবর্ষ, প্যালেস্টাইন, লিথুনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ঈজিপ্ট ও লাক্সোমবার্গ এই এগারটি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। ১৯৩৮ সালের চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গারী এ বৎসর প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নি।

ভারতবর্ষ ৫-৩ ম্যাচে লাক্সোমবার্গকে পরাজিত করে।

মহিলাদের প্রতিযোগিতায় জার্ম্মানী চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে কারবিলোন কাপ বিজয়ী হ'য়েছে।

ভারতে বাজ,

ভাইন্‌স্ ও পেরী ঃ

পিথপুরামের যুবরাজের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় ত্রয়ী বাজ, ভাইন্স ও পেরীকে ভারতবর্ষে তাঁদের



ফ্রেড প্যারী

ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাবার জন্য আনবার ব্যবস্থা হ'য়েচে; সম্ভবতঃ তাঁরা আগামী নভেম্বরেই ভারতে আসবেন। বাজ ও ভাইন্সের খেলার ম্যানেজার জ্যাক হ্যারিস যুবরাজ বাহাদুরের প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে টেনিস ত্রয়ীকে ভারতে আনবার ভার নিয়েচেন। নিজেও একজন ভাল খেলোয়াড়, তিনিও ভারতে খেলবেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এঁরা খেলবেন। গত বৎসর টিলডেন ও কোসে ভারতে এসেছিলেন। এঁদের অপেক্ষা বাজ-ভাইন্‌স্‌-পেরীর খেলা আরও উন্নততর। বিশেষতঃ বাজ সখের ও পেশাদার টেনিস মহলে যে রকম চাঞ্চল্য এনেচেন, তাতে তাঁর খেলা দেখতে ভারতবর্ষ বিশেষ উৎসুক।


ডোনাল্ড বাজ

ডোনাল্ড বাজের সাফল্য ঃ

গত বৎসরের উইম্বলডন বিজয়ী ও অধুনা পেশাদার খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ পেশাদার লন টেনিস খেলাতে ২২-১৭ ম্যাচে জয়ী হয়েছেন।

বাজ পাঁচ-সেটের সাতটি খেলার মধ্যে ৪টি খেলায় জয়ী হয়ে পৃথিবীর পেশাদার চ্যাম্পিয়নসিপ্‌ বিজয়ী হলেন। অধিকন্তু তিনি তিন-সেটের বত্রিশটি খেলার মধ্যে ১৮টি খেলায় জয়ী হয়েছেন। শেষ খেলাটিতে জিতে তিনি ক্যানাডার পেশাদার চ্যাম্পিয়নসিপও পেয়েছেন।

নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে এই অভিযানের খেলাগুলির মোট আয় দু' লক্ষ ডলার (চল্লিশ হাজার পাউণ্ড) এবং তাঁর নিজের আয় গ্যারান্টি সংখ্যা ৭৫ হাজার ডলারের (পনের হাজার পাউণ্ড) অপেক্ষা অনেক বেশী। বাজ আশা করেন যে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে তিন বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে সিকি কোটি ডলার (পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড) তিনি রোজগার করবেন, তারপরে তিনি কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হবেন। এখন তাঁর বয়স মাত্র বাইস।

বালিগঞ্জ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে,—মদনমোহন ৬-২ ও ৭-৫ গেমে সি এল মেটাকে পরাজিত ক'রেচেন।


বালিগঞ্জ টেনিস বিজয়ী মদনমোহন ও মেটা (দক্ষিণে) ও বিজিত ম্যাকলিয়ড ও মূর্ত্তি　　ছবি—জে কে সান্যাল

পুরুষদের ডবলসে,—

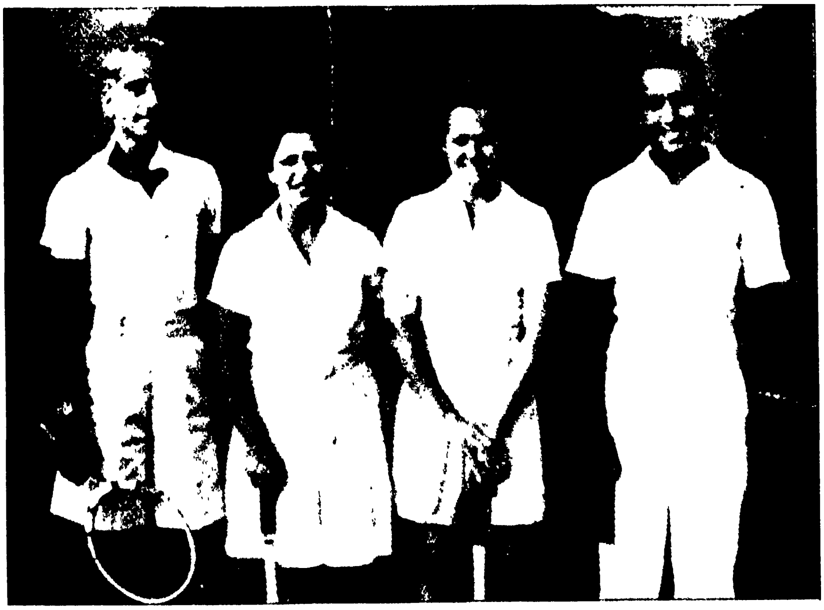
মদনমোহন ও মেটা ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ম্যাকলিয়ড ও মূর্ত্তিকে হারিয়েচেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে,—

কুমারী হার্ভে জনষ্টোন ৬-৩, ৫-৭ ও ৬-৩ গেমে শ্রীমতী মাসেকে পরাজিত ক'রেচেন।

মহিলাদের ডবলসে,—

কুমারী হার্ভে জনষ্টোন ও শ্রীমতী ফুটিট ৬-৪, ৩-৬ ও ৬-১ গেমে কুমারী পেলি ও শ্রীমতী মাসেকে হারিয়েচেন।



বালিগঞ্জ টেনিস বিজয়ী মূর্ত্তি ও মিস্ হার্ভেজনষ্টন (বামে) ও বিজিত মিসেস ফুটিট্ ও মদনমোহন ছবি—জে কে সান্যাল

বাইচ প্রতিযোগিতা ঃ

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের বার্ষিক বাইচ প্রতিযোগিতায় এবার কেম্ব্রিজ চার লেংথে বিজয়ী হ'য়েচে। এই প্রতিযোগিতায় অক্সফোড ৪২ বার এবং কেম্ব্রিজ ৪৮ বার বিজয়ী হ'য়েচে। ৪¼ মাইল জলপথ অতিক্রম ক'রতে কেম্ব্রিজের সময় লেগেছিলো ১৯ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড, তারা বরাবরই এগিয়েছিলো। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর কেম্ব্রিজ পরপর জয়ী হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে অক্সফোর্ড বিজয়ী হয়, এবারও তারা জয়ী হবে বলে সাধারণের ধারণা ছিল। কানাডার লণ্ডনস্থ হাইকমিশনার মিষ্টার ম্যাসেইর পুত্র, অক্সফোর্ডের কনিষ্ঠতম 'কক্স', যাঁর ওজন মাত্র পাঁচ ষ্টোন, বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সকল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন।

ক্লাব পরিবর্ত্তন ঃ

২৫৫ জন ফুটবল খেলোয়াড় পূর্ব্ব ক্লাব পরিবর্ত্তন করে অন্য ক্লাবে যোগদানের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ করেচেন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় আধা-পেশাদার খেলোয়াড়ের সংখ্যাই অধিক।

মোহনবাগান তাঁহাদের পুরাতন খেলোয়াড় কে দত্ত ও এস দে কে ফিরে পেয়েছে। এন ঘোষ এরিয়ান্সে ফিরে গেছে। অখিল আমেদ ভবানীপুর থেকে ইষ্টবেঙ্গলে এসেছে। সবচেয়ে বেশী নূতন খেলোয়াড় পেয়েছে এরিয়ান্স। ভবানীপুরের অবস্থা শোচনীয়, প্রায় সব খেলোয়াড় ক্লাব ত্যাগ করেছে। মহমেডান সেলিমকে হারালেও ভবানীপুরের মাসুদকে পেয়েছে।

বাইটন কাপ ঃ

এবার বাইটন কাপে ৪১টি দল যোগদান ক'রেচে। বাইরে থেকে আসবে ১৮টি টীম। ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে ঝান্সি-হিরোজ খেলতে আসবে। আগন্তুক দলের মধ্যে ঝান্সি ক'লকাতায় সবচেয়ে জনপ্রিয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবার খুব শক্তিশালী দল, এই দলে ভূপালের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় খেলবে। পাঞ্জাব থেকে দুটি শক্তিশালী দল আসচে। বি এন আর এবারও যথেষ্ট শক্তিশালী। স্থানীয় ক্লাবের কাষ্টমস্ লীগে যে রকম ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়েচে তারা যদি বাইটন কাপ জয়লাভ করে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। রেঞ্জার্স'ও কম নয়। মোটের উপর বাইটন কাপে ক্রীড়ামোদিরা যথেষ্ট উচ্চ শ্রেণীর খেলা দেখবার আশা কচ্চেন।

হকি লীগ ঃ

হকি লীগ খেলা শেষ হ'য়েছে। কাষ্টমস এবার নিয়ে উপর্য্যুপরি চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ন হলো, ৩৪ পয়েণ্ট পেয়েছে। রেঞ্জার্স ৩৩ করে রানার্স আপ থাকলো। কাষ্টমসের রেকর্ড—চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৬ বার, বাইটন কাপ বিজয়ী হয়েছে ১০ বার, ১৯৩০-৩৩ সাল পর্য্যন্ত এবং ১৯৩৬-৩৯ পর্য্যন্ত পরপর চার বৎসর চ্যাম্পিয়নসিপ্ পেয়েছে। বাইটন ও চ্যাম্পিয়নসিপ্ একই সঙ্গে পেয়েছে ৭ বার, ২ বার অপরাজেয় থেকে লীগ পেয়েছে ১৯৩৮-৩৯ সালে, ১৯০৮-১০ ও ১৯৩০-৩২ সালে উপর্য্যুপরি ৩ বৎসর বাইটন বিজয়ী হয়েছে। হকিতে কাষ্টমস চিরদিনই স্থানীয় দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবার কাষ্টমস সবশুদ্ধ গোল দিয়েচে ৮০টা আর গোল খেয়েচে মাত্র ৪টা ওয়েষ্টন একাই দিয়েচেন ২২টা আর রেণ্টন ১৯। তাদের ফরওয়ার্ডদের যেমন নিখুঁত আদান প্রদান কৌশল আবার তেমনি অপূর্ব্ব গোল প্রদানের ক্ষমতা। ওয়েষ্টনকে নিঃসন্দেহে এবছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড বলা যেতে পারে। তাঁর সহযোগী রেণ্টন, হেণ্ডারসন, সিম্যান ও রেবেলো প্রত্যেকেই উচ্চস্তরের খেলা দেখিয়েচেন। কাষ্টমসের পরই রেঞ্জার্সের স্থান। যতদিন লীগ খেলা সুরু হ'য়েচে তার গোড়া থেকেই রেঞ্জার্স ও কাষ্টমসে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। এবারও তার অভাব পরিলক্ষিত হয় নি। রেঞ্জার্সের পর পুলিস ও মিলিটারী মেডিকেলসের নাম উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এবার কোন ভারতীয় দল উচ্চশ্রেণীর খেলা দেখাতে পারে নি। মহমেডান প্রথম প্রথম ভাল খেলছিল কিন্তু শেষরক্ষা ক'রতে পারলে না। বর্ডারস্ রেজিমেণ্ট দ্বিতীয় বিভাগে খেলবারও অযোগ্য। ভবানীপুর; পোর্টকমিশনার আর ইষ্টবেঙ্গলের সমান সমান পয়েণ্ট হয়েছিল কিন্তু ভবানীপুরের গোল এভারেজ সবচেয়ে খারাপ থাকার জন্য তাকে এবং ডালহাউসীকে এর পরের বছর থেকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হবে। এবারের হকি লীগে হ্যাট্‌ট্রিক করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রেচেন কাষ্টমসের ওয়েষ্টন, মোহনবাগানের এ দেব, মিলিটারী মেডিকেলসের ডি'-সেনা ও আর্মেনিয়ান্সের বিলি।

দ্বিতীয় বিভাগ থেকে এবার উঠ্‌বে সেণ্ট জোসেফ আর লিলুয়া; এরা পূর্ব্বে প্রথম বিভাগেই খেলত।

ক্যালকাটা প্রথম বিভাগে ঃ

ক্যালকাটা মান খোয়ালে না। তার মান রাখতে অন্যদের মাথা ব্যথা পড়লো। মিষ্টার নর্টনের প্রস্তাবানুসারে আই এফ এ এ বৎসর থেকে তেরটি দলের প্রথম বিভাগে খেলবার নিয়ম করলেন এবং ক্যালকাটাকে প্রথম বিভাগে খেলবার জন্য অনুরোধ করা হলো। ক্যালকাটা যদি তাতেও প্রথম বিভাগে খেলতে না চায় তবে পূর্ব্ব নিয়মই বলবৎ থাকবে, অর্থাৎ বারটি দলই খেলবে।

প্রেসিডেণ্ট নিকলস ক্যালকাটা ক্লাবের পক্ষ থেকে স্পষ্টই জানিয়েছেন, ক্যালকাটা ক্লাবের ইচ্ছা যে তারা পূর্ব্ব নিয়মানুসারে দ্বিতীয় বিভাগেই খেলে। তা' হলেও কি হয়, আই এফ এরও আর সকলের সে ইচ্ছা নয়, তাঁদের



কলিকাতা ইউনিভার্সিটি টেনিস প্রতিযোগিতায় ল' কলেজ (দক্ষিণে) কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজকে পরাজিত করেছে ছবি—জে কে সান্যাল

মত, ক্যালকাটা যদি প্রথম বিভাগ থেকে চলে যায় তবে লীগের সমস্ত জৌলস ও প্রাধান্য উবে যাবে। বাহবা যুক্তি!! তাঁদের সবারই আন্তরিক অভিলাষ যে ক্যালকাটা ক্লাব দয়া করে তাঁদের ইচ্ছায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম বিভাগে খেলুন। ক্যালকাটা ক্লাব নিশ্চয়ই তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

পূর্ব্বে বলেছিলুম, যে, বার বার এরূপ ধাস্তামো না করে, আই এফ এ নিয়ম করে দিন যে ক্যালকাটা প্রভৃতি তাঁদের মতে জৌলুষদার কয়েকটি দল কখনই নামবে না। কেবল যাদের জৌলুষ নেই, তাদের সেই হতভাগাদের জন্য ওঠা-নামা আইন বলবৎ রহিবে। কাষ্টমস (১৯২৪), এরিয়ান্স (১৯২৫) ও ডালহৌসীকে (১৯৩২) প্রথম বিভাগে খেলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে এরিয়ান্সের পক্ষে বলা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযানে খেলোয়াড় পাঠাবার সময় ক্লাবদের কথা দেওয়া হয়েছিল যে নামা-ওঠায় তাদের বাদ দেওয়া হবে। ডালহৌসীকে কেন পুনরায় রাখা হলো না? নামবার পালা বুঝি কেবল ভবানীপুর, হাওড়া ইউনিয়ন, ই বি আর প্রভৃতির।

আই এফ এর সুমতি ঃ

প্রেসিডেণ্ট বলেছেন যে এবার কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠতম বাইরের দলদেরই নিমন্ত্রণ করা হবে। মনে রাখতে হবে, সংখ্যা নহে গুণেরই আদর করতে হবে। গৌরী সেনের টাকার অপব্যয় বন্ধ করা উচিত। এ সম্বন্ধে আমরা ১৩৪৪ সালের ভাদ্র মাসে লিখেছিলুম,—'শীল্ডে প্রতিযোগী দলগুলির সংখ্যাধিক্যের জন্য চেষ্টিত না হয়ে, আই এফ এর তাদের যোগ্যতার উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যে সকল দলের, সামরিক বা অসামরিক, কোন পূর্ব্ব রেকর্ড নাই, তাদের যোগ্যতার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করে তবে তাদের নাম অনুমোদন করা কর্ত্তব্য। বাজে মফঃস্বল বা সামরিক কোন দলের জন্যই আই এফ এর অর্থ (সাধারণের অর্থ) ব্যয় হওয়া অনুচিত।' এতদিনেও যদি আই এফ এর সুমতি হয়, তাও শুভ লক্ষণ।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পশ্চিমের যাত্রী"—২৲
ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত "উপনিষদের আলো"—৸০
শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত "মহাত্মা অশ্বিনীকুমার"—১৷৷০
লেডি ডাক্তার প্রণীত "দেশ বিদেশের যৌনতত্ত্ব"—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "মরণের রণ-ভেরী" ও "ভুতুড়ে দীপ-রহস্য" প্রতিখানা—৸০
শ্রীমতী পুষ্প বসু প্রণীত উপন্যাস "অলকা" ও "বিধির বিধান"—১৷৷০ ও ৷৷০
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগীশ প্রণীত "দর্শন সোপান" ও "বেদান্ত সোপান"—১৷০ ও ৷৷০
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র'—২৲
৺ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "দুর্গা-শ্রীহরি"—১৲
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস "দেউলিয়ার জমা খরচ"—১৷০
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "উজান গাঙের ঢেউ"
মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রণীত "আগর বাতি"—৷৷০
শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত প্রণীত "বুদ্ধির লড়াই"—।৵০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "মানুষ-পিশাচ"—৸০
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "ওগো পুষ্পধনু"—২৲
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "দূরের যাত্রী"—২৲
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "প্রেমধর্ম"—২৷৷০
শ্রীবীরেন দাস প্রণীত "সাহিত্যে বিপ্লব"—৸০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষ ফুরাইয়া যাওয়ায় অনেকে পান নাই; এক্ষণে শ্রাবণ ও ভাদ্রের ভারতবর্ষ পাওয়া যাইবে। যাঁহাদের আবশ্যক, সত্বর সংগ্রহ করুন। মূল্য প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা।

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



-শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ

মাদ্রাজী সাড়ী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



ভারতবর্ষ



জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষড়বিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ভারতের বর্ত্তমান মুদ্রানীতি

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী এম্‌-এ

ভারত সরকারের আধুনিক মুদ্রানীতি সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইতেছে এবং অনেকে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু ইহার পক্ষে কি বলা চলে সেই দিকে আমাদের মনোযোগ বিশেষ-ভাবে আকর্ষিত হয় নাই। ডক্টর যোগীশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সম্প্রতি-প্রকাশিত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত স্যার কিকাভাই প্রেমচাঁদ রীডারসিপ বক্তৃতাবলী এই ব্যাপারে একটা মস্ত অসম্পূর্ণতা দুর করিয়াছে। কয়েকটি অতি মূল্যবান এবং বহু তথ্য, হিসাব ও নক্‌সা সম্বলিত প্রবন্ধে তিনি ভারতের বর্ত্তমান মুদ্রা-নীতির বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বের ইকনমিক জর্নালের এক সংখ্যায় ডক্টর পি-জে-টমাসও একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধে ভারতের বর্ত্তমান মুদ্রানীতির স্বপক্ষে কি বলিবার আছে তাহা অতি সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।* এই প্রশ্নটি পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে বিষয়টি ধীরভাবে চিন্তা করা দরকার। সেই জন্য বর্ত্তমান মুদ্রানীতির বিপক্ষবাদীদের যুক্তি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি-পক্ষের দৃষ্টিকোণ হইতেও সমস্যাটি আলোচনা করা বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ষ্টার্লিং এক্সচেঞ্জ ষ্টাণ্ডার্ড

ভারতের মুদ্রানীতির সহিত যাহাদের পরিচয় আছে তাহারা জানেন যে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে হিল্টন ইয়ং কমিশনের

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় ডক্টর সিংহের Indian Currency Problems in the Last Decade নামক পুস্তকটি এবং ডক্টর টমাসের প্রবন্ধটি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

প্রস্তাবমত রৌপ্য মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্ধারণ করা হয়। ১ শিলিং ৬ পেনির স্বর্ণমূল্য প্রায় ৮.৪৭ গ্রেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ। এই হারে ভারত গভর্ণমেণ্ট টাকার পরিবর্ত্তে স্বর্ণথান এবং স্বর্ণথানের পরিবর্ত্তে টাকা দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই মুদ্রা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই বৎসরের ২১শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণথান ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন এবং পুরাতন বাট্টার হারেই ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকাকে যুক্ত করিয়া দেন। ইংলণ্ডের পাউণ্ড-নোটের অথবা ষ্টার্লিংয়ের তথা ১ শিলিং ৬ পেনির এবং টাকার এখন কোন নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য নাই। কিন্তু ১ শিলিং ৬ পেনি হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা বা ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করে। টাকার সহিত ষ্টার্লিংয়ের এই নির্দ্দিষ্ট বাট্টার হার আছে বলিয়া এই মুদ্রা-ব্যবস্থাকে 'ষ্টার্লিং এক্সচেঞ্জ ষ্টাণ্ডার্ড' বলা হয়।

নূতন ব্যবস্থার লাভ-লোকসানের হিসাব

কিন্তু ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার এই নির্দ্দিষ্ট-সম্বন্ধ-স্থাপন-নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হয়। অবশ্য ইহা ব্যতীত ভারত সরকার অন্য দুইটি পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পারিতেন। প্রথমতঃ রৌপ্য মুদ্রার একটি নূতন ও নির্দ্দিষ্ট কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প স্বর্ণমূল্য নির্দ্ধারণ করা চলিত। কিন্তু যে সময়ে অনেক শক্তিশালী দেশই তাহাদের মুদ্রাকে স্বর্ণের সহিত স্থিরভাবে যুক্ত রাখিতে অসমর্থ হইয়া একে একে স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং যে সময়ে স্বর্ণমূল্যের নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যত সম্বন্ধেও একটা অসাধারণ অনিশ্চয়তা বিদ্যমান ছিল সেই সময়ে ভারত সরকারের পক্ষে এদেশের আর্থিক ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রৌপ্য মুদ্রার একটি নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য স্থাপন করা এবং তাহা রক্ষা করা কতদূর দুরূহ ও অবিবেচকের কাজ হইত তাহা সহজেই অনুমান কয়া চলে।

দ্বিতীয়তঃ, টাকার কোন নির্দ্দিষ্ট বাট্টার হার স্থির না করিয়া উহাকে অবাধ গতিতে ওঠা-নামা করিয়া স্বর্ণের অথবা ষ্টার্লিংয়ের সহিত একটা 'স্বাভাবিক' সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ দেওয়া চলিত। এই মতবাদের স্বপক্ষে সাধারণতঃ দুইটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। ষ্টার্লিংয়ের ভবিষ্যত ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেই দেশের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিবে এবং ইহার সহিত টাকার নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকার দরুণ রৌপ্য মুদ্রাও ষ্টার্লিংয়ের ভাগ্যচক্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে রৌপ্যমুদ্রার স্বাধীনতা থাকিলে উহার ভবিষ্যত আমাদের দেশের আর্থিক গতিবিধির উপরই নির্ভর করিত। সুতরাং এই ভাবে টাকার স্বাধীনতা খর্ব্ব করাতে আমাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার এই ব্যবস্থায় যে সব দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করে নাই সেই সব দেশের রপ্তানিকারীর তুলনায় ইংলণ্ডের রপ্তানিকারী ভারতের বাজারে কিছুটা সুবিধা পাইবে। কারণ টাকার স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু ইহার ষ্টার্লিং মূল্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে অর্থাৎ ভারতীয় ক্রেতার পক্ষে এই অবস্থায় ইংলণ্ডের পণ্য ক্রয় করাই সুলভতর হইবে। এই ভাবে বহু নিন্দিত ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতি অন্দর পথ দিয়া এদেশে প্রবেশ করিয়া ভারতের বাণিজ্যনীতি প্রভাবান্বিত করিবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রৌপ্যমুদ্রাকে ষ্টার্লিংয়ের সহিত যুক্ত না করিলেও ষ্টার্লিংয়ের স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাইবার দরুণ ইংলণ্ড 'গোল্ড ব্লক' দেশসমূহের তুলনায় ভারতের বাজারে কতকটা সুবিধা ভোগ করিত।

কিন্তু ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার স্থির-সম্বন্ধ-স্থাপন-নীতির স্বপক্ষে অনেক অকাট্য ও সারবান যুক্তি উপস্থিত করা চলে। ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে বহু টাকা ধার করিয়াছে এবং হোম চার্জ্জ বাবদ ভারত সরকারকে প্রতি বৎসর ৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়। ইহার উপর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এবং সেই বৎসরের শেষভাগে ভারতের যথাক্রমে ১ কোটী ৫০ লক্ষ ও ৭০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের ঋণ পরিশোধ করিবার সময় উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় টাকার একটা নির্দ্দিষ্ট ষ্টার্লিং মূল্য ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা নিশ্চিত ও দৃঢ় করিতে কতদুর সাহায্য করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে ভারতের অধিকাংশ বহির্বাণিজ্য ষ্টার্লিংয়ের সাহায্যে চালিত হয়। তাই রৌপ্য মুদ্রাকে স্বাধীনভাবে ওঠা নামা করিবার সুযোগ প্রদান করিলে যে শুধু ভারত সরকারই বাজেট প্রণয়ন ব্যাপারে

মহা অসুবিধায় পতিত হইতেন তাহা নহে, পরন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রচুর ক্ষতি হইত। বাট্টার অনির্দ্দিষ্টতার সুযোগে স্পেকুলেটরগণ অন্যায়ভাবে লাভবান হইবার চেষ্টা করিত এবং এই অনিশ্চয়তায় বহির্বাণিজ্যও বিশেষভাবে প্রতিহত হইত। এই সময়ে ইংলণ্ডের ন্যায় অনেক শক্তিশালী দেশই স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই মুদ্রাবিভ্রাট ও আর্থিক ওলট-পালটের যুগে "নিশ্চেষ্টভাবে ঘটনা স্রোতে গা ভাসাইয়া" না দিয়া অন্তত ষ্টার্লিংয়ের—যাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সহিত রৌপ্য মুদ্রার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে—আঁচল আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখা আমাদের রাজনৈতিক আত্ম-সম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ করিলেও আর্থিক লাভ-লোকসানের দিক হইতে নিতান্ত অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত হয় নাই বলিয়া মনে করা হয়ত অযুক্তিকর নহে। সাম্রাজ্যের অন্য অন্য দেশগুলি বাদে সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি স্বাধীন দেশও নিজের স্বার্থের খাতিরে এই নীতি অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। তৃতীয়ত, স্বর্ণভ্রষ্ট ষ্টার্লিংয়ের সহিত রৌপ্য মুদ্রাকে যুক্ত করিয়া দেওয়াতে ইহার স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতেও পরিমিত প্রকারের অর্থপ্রসারণ (regulated inflation) আরম্ভ হয়। আমেরিকার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ভারতের তুলনায় উৎকৃষ্টতর হওয়া সত্ত্বেও সেই দেশে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সাধারণ অর্থপ্রসারণ নীতিকে শেষ পর্য্যন্ত সংযত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এই কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে রৌপ্য মুদ্রাকে অবাধভাবে উঠা-নামা করিতে দিয়া একটি অসংযত অর্থপ্রসারণ নীতি অবলম্বন করিলে আমাদের আর্থিক জীবন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিত। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা বাট্টার হার ১ শিলিং ৪ পেনির স্বর্ণমূল্য হারে নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং করিতেছিলেন, অন্তত তাঁহাদের মুখে নূতন ব্যবস্থার সমালোচনা একটু অবান্তর শুনাইবে। কারণ টাকার মূল্য এখন ১ শিলিং ৪ পেনি স্বর্ণমূল্য হইতেও কম।

এই বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের (ক) রৌপ্য মুদ্রাকে স্বর্ণের সহিত যুক্ত রাখা; (খ) ইহাকে অবাধগতিতে উঠা-নামা করিবার সুযোগ দেওয়া এবং (গ) ষ্টার্লিংয়ের সহিত রৌপ্য মুদ্রাকে বাঁধিয়া দেওয়া—এই তিনটি পন্থার মধ্যে শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন উৎকৃষ্টতর পথ ছিল না। কিন্তু 'ষ্টার্লিং এক্সচেঞ্জ ষ্টাণ্ডার্ডের' মূলনীতি সমর্থন করা চলে। এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে টাকাকে পুরাতন বাট্টার হারে ষ্টার্লিংয়ের সহিত যুক্ত না করিয়া ইহার ষ্টার্লিং মূল্য আরও কম নির্দ্ধারণ করিলে (ক) ভারত হইতে বিগত কয়েক বৎসর যাবত যে প্রচুর স্বর্ণ রপ্তানি হইতেছে তাহা হয়ত এত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হইত না; (খ) ভারতের বহির্বাণিজ্যের অধোগতির শীঘ্র অবসান ঘটিত এবং (গ) ভারতের পণ্য-মূল্য দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া আর্থিক সঙ্কটের পূর্ণ অবসান ঘটাইতে পারিত।* এক্ষণে একে একে এই প্রশ্ন তিনটির আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

স্বর্ণ রপ্তানির কারণ, স্বরূপ এবং ফলাফল

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোটী কোটী টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। এই স্বর্ণ রপ্তানি ভারতের সঙ্কটময় অর্থের বাজারে এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত আর্থিক জীবনে অনেকটা সৌভাগ্য সূর্য্যের ন্যায় উদিত হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে যে অর্থসঙ্কট সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পরে তাহার দরুণ ভারতের পণ্যমূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং আমাদের দেশের বাণিজ্যগতি ক্রমেই প্রতিকূল হইতে থাকে অর্থাৎ ভারতের রপ্তানি আমদানির তুলনায় একটা অত্যন্ত নিম্ন সংখ্যায় পৌঁছে। ইহার উপর আবার সেই সময়ের রাজনৈতিক অশান্তি, উত্তেজনা এবং অনিশ্চয়তার দরুণ অনেক বিদেশী বণিক ভারত হইতে মূলধন উঠাইয়া লইতে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারে ১৯২৯-৩১ খৃষ্টাব্দে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সব কারণে ১৯৩০-৩১ সালে বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনি স্বর্ণমূল্য হইতে ক্রমেই নিম্নের দিকে নামিতে থাকে। বাট্টার হার বজায় রাখিবার জন্য ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারকে বাধ্য হইয়া ষ্টার্লিং ঋণ গ্রহণ, গভর্ণমেন্টের ইংলণ্ডে রক্ষিত স্বর্ণ তহবিল হইতে ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ডকে স্বর্ণ প্রদান এবং রৌপ্য মুদ্রার সংকোচন করিতে হয়। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে যে স্বর্ণ রপ্তানি আরম্ভ হয়, অনেকটা তাহার জন্য

* ১৩৪২ সনের চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষ'-এ "ভারতের রেশিও সমস্যা" নামক প্রবন্ধে এই বিষয়টি অন্যভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এই সব দুর্গতির কতকটা অবসান ঘটে। এই সময় হইতে বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনিতে বজায় রাখা ভারত সরকারের পক্ষে সহজ ও সরল হইয়া ওঠে। ভারতের বহির্বাণিজ্যেরও অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং তখন ভারতে চল্‌তি টাকার পরিমাণও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু তাহাই নহে—এই সময় হইতে টাকার বাজারে বিশেষ স্বচ্ছলতা এবং এদেশে শ্রমশিল্প স্থাপন ব্যাপারে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই স্বর্ণ রপ্তানির কারণ ও স্বরূপ কি তাহা পরিষ্কারভাবে আলোচনা না করিলে বর্ত্তমান মুদ্রানীতির সম্বন্ধে একটা বড় কথাই বলা হইবে না।

আমরা জানি যে বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট ও বিশেষভাবে কৃষিসঙ্কটের ফলে ভারতের অধিকাংশ লোকের আয় অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই আর্থিক দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে অনেকে তাহাদের বহুদিনের সঞ্চিত এবং অলঙ্কার ইত্যাদি নানাভাবে সমাদরে রক্ষিত স্বর্ণ ভাণ্ডার ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে। ভারতের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিকট এই প্রকার 'ডিস্‌ট্রেশ গোল্ড'-এর বিক্রয় ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহা ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে চলিতে থাকে। এই সময়ের পর হইতে যে স্বর্ণ বিক্রয় হইতে থাকে তাহা বিশেষভাবে লাভজনক বলিয়াই অনেকে বিক্রয় করিতে এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা অন্য ভাবে খাটাইতে প্রবৃত্ত হয়। এই শ্রেণীর স্বর্ণ বিক্রয়কে 'ইন্‌ভেস্‌মেণ্ট গোল্ড' বলা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, যে স্বর্ণ, হয় ডিস্‌ট্রেশ-এর নতুবা 'ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট'এর উদ্দেশ্যে বিক্রয় হইতেছিল, তাহা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে। এই স্বর্ণ রপ্তানির মূল কারণ কি তাহা এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। স্বর্ণভ্রষ্ট ষ্টার্লিংয়ের সহিত রৌপ্য মুদ্রাকে যুক্ত করাতে রৌপ্য মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এই জন্য টাকার হারে স্বর্ণের মূল্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে অনেকে সঙ্কটের দরুণ স্বর্ণ বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি তাহাদিগকে এই ব্যাপারে আরও উৎসাহিত করে। এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ উচ্চ মূল্যের আশায় স্বর্ণ ক্রয় করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে 'ডিস্‌ট্রেশ গোল্ড'এর বিক্রেতাগণ স্বর্ণের বিনিময়ে উচ্চ মূল্য পাইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিলেই স্বর্ণ রপ্তানির কারণ সম্পর্কে সব কথা বলা হইল না। ইহার উপর আবার ষ্টার্লিংয়ের স্বর্ণ মূল্য হ্রাস রৌপ্যমুদ্রার স্বর্ণ মূল্য হ্রাসের তুলনায় কতকটা অধিক হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় স্বর্ণব্যবসায়ীদের পক্ষে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানি করা বিশেষভাবে লাভজনক হইয়া ওঠে। সহজ ভাষায়, পণ্য হিসাবে স্বর্ণের মূল্য ভারতের তুলনায় বৈদেশিক বাজারে অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াতে ব্যবসায়ীগণ ভারতে স্বর্ণ ক্রয় এবং বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী আরম্ভ করে। তাই এই কথা অস্বীকার করা চলে না যে, টাকাকে ষ্টার্লিংয়ের সহিত যুক্ত করাতেই স্বর্ণ রপ্তানি করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার যে টাকাকে ১ শিলিং ৪ পেনি হারে ষ্টার্লিংয়ের সহিত যুক্ত করিলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ রপ্তানি হইতে পারিত এবং রৌপ্য মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট ষ্টার্লিং-মূল্য না থাকিলেও স্বর্ণ রপ্তানি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এই স্বর্ণ রপ্তানি ব্যাপারে ভারত সরকার একটা নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন এবং তাহার তীব্র সমালোচনা হইতে থাকে। অনেকে স্বর্ণ রপ্তানি বন্ধ করিয়া সমস্ত স্বর্ণ ক্রয় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে থাকেন এবং এই মতের স্বপক্ষে আন্দোলন চালাইতে থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রীত স্বর্ণের অধিকাংশ 'ডিস্‌ট্রেশ সেল'এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অবস্থায় স্বর্ণ রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র স্বর্ণ বিক্রেতাদের প্রচুর ক্ষতি হইত এবং উচ্চ সুদে টাকা কর্জ করিয়া গভর্ণমেণ্ট যদি স্বর্ণ ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে দেশের জনসাধারণের ও বিশেষভাবে করদাতাদিগের উপর একটা বিরাট ঋণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইত। ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট গোল্ড-এর রপ্তানি ব্যাপারেও গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে—সেই সময়ের রপ্তানি বাণিজ্যের অধোগতির জন্য ভারতের নানা প্রকার দাবী-দাওয়া মিটাইবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা অথবা স্বর্ণ রপ্তানি অবাধভাবে চলিতে দেওয়া। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করাই হয়ত ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে।

এই স্বর্ণ রপ্তানির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিলে কথাটির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বর্ণ তহবিল হ্রাস পাওয়ার দরুণই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় অর্থাৎ সেই সব দেশে স্বর্ণ রপ্তানিই স্বর্ণমান ত্যাগের অব্যবহিত কারণ হইয়া ওঠে। কিন্তু ভারতে রৌপ্য মুদ্রা স্বর্ণ ভ্রষ্ট হওয়ার পর হইতেই স্বর্ণ রপ্তানি আরম্ভ হইয়াছে। এই স্বর্ণ রপ্তানি ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনে ও স্বার্থে তাহাদের স্বর্ণভাণ্ডার হইতে হইতেছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে স্বর্ণ রপ্তানি হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ লাভ করে সেই সকল এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে না। বরং স্বর্ণ রপ্তানির দরুণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বর্ণ ও ষ্টার্লিং তহবিল বৃদ্ধি পাইয়াছে, চল্‌তি টাকার পরিমাণ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, কেন্দ্রীয় বাজেটের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা এবং ভারতে নানা শ্রেণীর শ্রমশিল্প স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল যন্ত্রপাতি আমদানি হইতেছে তাহাদের মূল্য পরিশোধ করিবার সমস্যা সহজ ও সরল হইয়াছে। এক কথায়, অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রতি বৎসর যে প্রচুর স্বর্ণ ভারতে আমদানি হইয়া মৃত্তিকার নিম্নে, অলঙ্কাররূপে এবং দেবদেবী ও মন্দির গাত্রে রক্ষিত ও সঞ্চিত হইতেছিল তাহারই একটা অংশ সাধারণ পণ্যের ন্যায় রপ্তানি হইয়া এই দুর্দ্দিনে ভারতের আর্থিক জীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে কতকটা উপশম প্রদান করিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, অলাভজনকভাবে যে প্রচুর স্বর্ণ ভারতে রক্ষিত হইতেছে তাহার একটা অংশকে সুবিধাজনক সর্ত্তে লাভজনক ও মূল্যবান সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা ভারতের পক্ষে অকল্যাণকর হয় নাই। এই শ্রেণীর dead assets of gold-কে দেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইলে ভারত সরকারকে যে বিরাট ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত তাহা হয়ত দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক জীবনের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইত না। ইহাও আশা করা অন্যায় নহে যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে ভারতে আবার স্বর্ণ আমদানি হইতে থাকিবে।

বহির্বাণিজ্যের অধোগতি ও ভারতের পণ্য-মূল্য

স্বর্ণ রপ্তানির জন্য যে ভারতের বাণিজ্য-গতি অনেকটা অনুকূলে দাঁড়াইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবু গত কয়েক বৎসরের পণ্য রপ্তানি মোটের উপর ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের পণ্য রপ্তানি হইতে বহুলাংশে কম। কিন্তু এই ঘটনার জন্য বাট্টার হারকে কতদূর দায়ী করা চলে তাহা বিবেচনা করা দরকার। আমরা জানি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের ফলে বিশেষ ভাবে খর্ব্ব হইয়াছে। তাহার উপর প্রায় প্রত্যেক দেশই বিদেশ হইতে আমদানি হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে 'এক্সচেঞ্জ শাসন', quota ও clearing-এর বন্দোবস্ত, বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তি, উচ্চ শুল্ক প্রাচীর ইত্যাদি নানা প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়া আমদানি বাণিজ্যের সংকোচন ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার করিতে প্রয়াস পাইতেছে। হিসাব লইলে দেখা যায় যে, ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে প্রধানত এই সব কারণেই রৌপ্য মুদ্রার স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ডের সহিত আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় ফরাসী, ইতালী প্রভৃতি 'গোল্ড ব্লক' দেশসমূহের সহিত ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই ঘটনাকে অটোয়া বাণিজ্য চুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে না—কারণ অটোয়া বাণিজ্য চুক্তি ১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে কার্য্যকরী হয়। এই সময়ে আবার অনেক দেশই মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করিয়া আমদানী কমাইতে ও রপ্তানি বাড়াইতে চেষ্টিত হয়। এক কথায়, প্রত্যেক দেশই নিজের পণ্য বিদেশে বিক্রি করিয়া লাভবান হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত এবং অপরের পণ্য স্বদেশে প্রবেশ করিবার পথে নানা প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠে। এই সব অস্বাভাবিক, শক্তিশালী ও বিস্তৃত ভাবে অনুসৃত নীতিসমূহের ফলেই হয়ত ভারতের পণ্য রপ্তানি হ্রাস পাইতেছে। বাট্টার হার হ্রাস করিয়া অধিকতরভাবে টাকার মূল্য কমাইলেই তাহা এই সকল ঘটনাবলীর শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া আমাদের পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের গতিকে পূর্ব্বের ন্যায় অনুকূল করিতে অক্ষম হইত কি না সেই সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা চলে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা সম্পূর্ণ-

ভাবে ফিরিয়া না আসিলে ভারতে পূর্ব্বের ন্যায় আমদানির তুলনায় রপ্তানির আধিক্য ঘটিবে কি না তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন।

অবশ্য অর্থসঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস পাওয়া এবং স্বর্ণমান ত্যাগ করা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের পণ্য মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে না। কিন্তু এই ঘটনার মূল্যও বিনিময়ের হারকে দায়ী করা হয়ত চলে না। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে এদেশে চলতি টাকার পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিল দৃঢ়তর হইতেছে, ব্যাঙ্ক ও মার্কেট রেট্ অনেক নিম্নে অবস্থান করিতেছে এবং গভর্ণমেণ্টও অল্প সুদে প্রচুর টাকা কর্জ্জ করিতে সক্ষম হইতেছেন। এই স্বচ্ছলতার মধ্যেও যদি পণ্য মূল্য আশানুরূপ বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে রেশিওকে দোষী না করিয়া অন্যত্র কারণ অনুসন্ধান করাই হয়ত উচিত হইবে। এই অবস্থায় এই কথা বলা চলে না যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থসংকোচন নীতি অবলম্বন করিয়া একটা 'কৃত্রিম' ও 'উচ্চ' বাট্টার হার সংরক্ষণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে এবং এই জন্যই ভারতের পণ্যমূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না।

তাহা হইলে ভারতের এবং অন্যান্য দেশের পণ্যমূল্যের গতিবিধির মধ্যে তারতম্যের কারণ কি, এই প্রশ্ন উঠিবে। সাধারণভাবে বলা চলে যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহের গভর্ণমেণ্টের নানা প্রকার নির্ম্মাণ ও খনন কার্য্যে বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ, সেই সকল দেশে অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন শিল্পের বিস্তার লাভ, পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ঘটনা-সমূহ অন্যান্য দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করিতে হয়ত যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এই ব্যাপারে মুদ্রার মূল্য হ্রাস হয়ত খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার মুদ্রার মূল্য শতকরা ৪০·৫ পয়েণ্ট হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সেই দেশের পণ্য মূল্য মাত্র শতকরা ১৩ পয়েণ্ট হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের এক্সচেঞ্জ ডিপ্রিসিয়েশন শতকরা ৩৭·৭ পয়েণ্ট হয় কিন্তু পণ্য মূল্য মাত্র শতকরা ৪ পয়েণ্ট হারে বর্দ্ধিত হয়। জাপানেও শতকরা ৬৪·২ এক্সচেঞ্জ ডেপ্রিয়েশন-এর ফলে পণ্য মূল্য মাত্র শতকরা ২০·৭ বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশে উপরোক্ত কারণসমূহ বিস্তৃতভাবে এবং সম্যকরূপে বিদ্যমান নাই। নানা শ্রেণীর বিশেষভাবে খনন ও নির্ম্মাণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ব্যাপারে ভারত সরকার একটা অসাধারণ রকমের সাবধানী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন—যদিও সঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার ব্যাপারে ইহা অনেক দেশেই একটি প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। এই সব কারণেই হয়ত ভারতের পণ্যমূল্য মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে।

উপসংহার

পরিশেষে আর একটি কথা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এক সময়ে ভারতের স্বাভাবিক ও অনুকূল বাণিজ্যগতিকে ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতের ধন-দৌলত শোষণের একটা নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া মনে করা হইত। ভারতের দারিদ্র্য এবং সকল প্রকার কল্পিত ও বাস্তব আর্থিক দুর্দ্দশা এই ড্রেন থিওরির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইত। ভারতের বর্ত্তমান মুদ্রানীতিও অনেকটা সেই প্রকার কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে এবং অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, শুধু মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই ভারতের প্রধান প্রধান আর্থিক দুর্দ্দৈবসমূহ দূর করা সম্ভব। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে ভারতের আর্থিক ব্যাধির মূল উৎপত্তি স্থান-সমূহ, তাহাদের কারণ, স্বরূপ ও সমাধান নির্ণয় সম্বন্ধে যদি আমাদের মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয় তাহা হইলে গভীর পরিতাপের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য মুদ্রানীতির কোনদিনই কোন পরিবর্ত্তন দরকার হইবে না—এই কথা কেহই বলিবেন না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে এবং অর্থসঙ্কটের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিলে নূতন অবস্থানুযায়ী মুদ্রানীতির কোন কোন ব্যাপারে পরিবর্ত্তন দরকার হইতেও পারে। কিন্তু উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান মুদ্রানীতি প্রচুরতম লোকের প্রভূততম কল্যাণ সাধনের দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের পক্ষে স্বার্থহানিকর ও সমুজ্জ্বলজনক বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই।

নকুলায়ন

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

নকুল না জন্মিতে নকুলায়ন রচনা করি এমন ক্ষমতা নাই; নকুলকে যেমন দেখিয়াছি, তেমনই লিখিতেছি।

নকুল কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন জানি না; নকুলের পিতামাতাকে দেখি নাই; তবে শুনিয়াছি তাঁহারা উদ্ভিদ জাতীয় নহেন; বনে বা বৃক্ষে বসতি নহে, তাহাও চাক্ষুষ করিতেছি। নকুল নাম কে দিয়াছিল সে খবর পাই নাই, তবে সে লোক যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তাহা মানি। নকুল কলিকাতায় থাকেন, আপিসে কর্ম্ম করেন; লোকে বলে, তিনি আপিসের বড়সাহেব; আপিসের চাপরাসীরা শোনে; আর তাম্বুল-রাঙা দন্ত বাহির করিয়া হাসে, কারণ তাহারা উড়ে।

আজকাল রূপবর্ণনার রেওয়াজ নাই। নারীর রূপ বর্ণনাই কেহ করে না, তা পুরুষের! তবুও, ইচ্ছা হয় 'আইন ভঙ্গ' করি; হয় জেল—হোক্: পুলি-পোলাও দ্বীপান্তর, তাও রাজী! কিন্তু হায়, ভাষা নাই; যদি বা থাকে, নূতনত্ব কই? দীনবন্ধু মিত্র হোঁদল কুৎকুৎ লিখিয়া লেখার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন—ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা কোৎরা গুড়, আর বস্তা বস্তা তুলা লেপিলেও নূতনত্ব হইবে না। পাঠক-পাঠিকার সুকঠিন কল্পনাকার্য্যে সহায়তার জন্য একটি কথা এই বলিতে পারি যে, স্রষ্টা যদি স্থান-বিশেষে হস্তপরিমিত দ্রব্যবিশেষ সংযোগ করিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে আফ্রিকা মহাদেশ নকুলের লীলাস্থল হইত এবং তোমার আমার পক্ষে কালে-ভাদ্র খাঁচার মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া হর্ষবিস্ময়ে স্তব্ধ থাকিতে হইত। মহাশয়া ও মহাশয়গণ, মাপ করিবেন, ইহার অধিক আর বলিতে পারিব না।

দর্জ্জিপাড়ায় থাকি। একদিন সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া চা-পানান্তে গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছি, একটি ছোকরা আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, মশাই, নকুলবাবুর বাড়ী কোন্‌টা বলতে পারেন?

ছোকরা পূর্ব্ববঙ্গের বাসিন্দা, বাচন অতীব অশুদ্ধ অথবা অবোধ্য। অতি কষ্টে বোধ্য করিয়া বলিলাম, না।

ছোকরা বিস্মিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, জানেন না? অতবড় একটা লোক, সডার সডার আপিসের বড়সাহেব।

ভদ্রলোকের এককথা-হিসাবে কহিলাম, না।

অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ছোকরা আমার ভদ্রতায় ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। আমার এক হাতে সংবাদপত্র, অপর হস্তে গড়গড়ার নল, দু হাতই জোড়া, তাই, নহিলে অপমানটা নীরবে বরদাস্ত করিতাম না ইহা বলা বোধ করি বাহুল্য। যাহারা বাঙ্গালা দেশের দুর্দ্দিনের ইতিহাস লিখিয়াছে, তাহারা সিরাজের বরকন্দাজ ফৌজদিগের নিন্দায় পঞ্চমুখ। কিন্তু এটা বোঝা উচিত, তাহাদের এক হাতে ঢাল, অপর হাতে তরোয়াল, তাহারা লড়াই করে কোন্ হাতে? কাজেই তাহারা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল, লড়াই ও ফতে! আমারও যদি হাত খালি থাকিত, ঐ সপ্ত নদী, ত্রয়োদশ খাল-বিলের পারের আসামী অপমান করিয়া যাইতে পারিত কি? ক্রোধ-কষচা চোখ দুটা দিয়া ছোকরার অনুসরণ করিতে দেখিলাম, সামনের একটা বাড়ীর রোয়াকের উপর ছোকরা মাথা ঠুকিতেছে, বুঝিলাম, ভাগ্য ভাল; সহজেই দেবদর্শন মিলিয়াছে। দেব দর্শনে কাহার অরুচি? সময়ান্তরে পুণ্য সঞ্চয়ের সঙ্কল্প করিয়া গড়গড়ায় মনঃসংযোগ করিলাম। কিন্তু মেঘ না চাহিতে কখন কখন বর্ষাগম হয়—কেতাবে পুরাণে এই সত্য প্রচার করে—কথাটা মিথ্যা নয়; এক মুহূর্ত্ত পরেই দেখি, ছোকরা যেখানে মাথা ঠুকিতেছিল, সেইখানেই দেবতার আবির্ভাব! দেখিবার মত 'জিনিষ' বটে!

বিলু, আমার পাঁচ বৎসরের নাতনী, কোথায় ছিল, দৌড়িয়া আসিয়া কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, দাদু, তিলভাণ্ডেশ্বর দেখবে?

'দেখিতেছি' বলিলাম না; বলিলাম, কই দিদি?

—ঐ যে! বলিয়া বিলু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। নাতনীর উপমা-জ্ঞান বোধ হয় নির্ভুল বলা চলে। মাস খানেক হইল, বাড়ীশুদ্ধ সকলকে কাশী দেখাইয়া আনিয়াছি।

বিলু প্রশ্ন করিল, দাদু, তিলভাণ্ডেশ্বর রোজ তিল তিল বাড়ে, না?

—লোকে ত তাই বলে, দিদি।

—ও-ও বাড়ে?

প্রশ্ন কঠিন, উত্তর ও সুকঠিন।

দিন দুই পরে দেখি সেই ছোক্‌রা, মস্ত একটা পুঁটলি মাথায় লইয়া সেই রোয়াকের সামনে দাঁড়াইয়া অবোধ্য গ্রীক্ বা ল্যাটিন ভাষায় চীৎকার করিতেছে। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, দেবতা বিরূপ, ছোকরার ভাগ্য প্রসন্ন হইল না; সে কিন্তু ছাড়িবার ছেলে নয়। গ্রীক্ ল্যাটিনে কুলায় না বুঝিয়া সে পারসিক, আরবিক, চৈনিক, ইতালিক ভাষাসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিল, তবুও দেবদ্বার মুক্ত হয় না। ছোকরা পুঁটলিটি রোয়াকে নামাইয়া, কোঁচার কাপড়ে ঘাম মুছিতে লাগিল। বাড়ীটার সামনে ছিল একটা জলের কল। কলটা জলের তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে হাতল ঘুরাইয়া, কান মোচড়াইয়া, কীল-চড়-চাপড় মারিয়াও জল পাওয়া যায় না। ছোকরা তৃষ্ণার্ত্ত, পূর্ব্ব অপমান বিস্মৃত হইয়া আঙ্গুল নাড়িয়া ডাকিলান। আজ হাতে গড়গড়ার নল ছিল না। বলিলাম, জল খাবে?

সে মারিতে আসিল—হুঃ।

চাকর জল আনিয়া দিল। শুধু জল দেখিয়া আবার প্রহারোদ্যত। তাহার ভাষা উদ্ধৃত করিতে পারিব না, ভাবটা এই যে, তাহাদের দেশে শুধু জল কেহ খাইতে দেয় না, নিদেন গুড় দিতে হয়।

তথাস্তু, ভৃত্য সন্দেশ আনিল।

সন্দেশ জল খাইয়া তিরিক্ষি মেজাজ কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ করিয়া চলন্ত পাখাটার নীচে দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইতে লাগিল; চোখ দুটা রহিল অদূরের রোয়াকের উপরে রক্ষিত পোঁটলার উপর।

আমার প্রশ্নও তাহার উত্তরের সার মর্ম্ম পাঠক-পাঠিকাকে জানাইতে হইতেছে। সভার সভার আপিসে আজ তাহার একটি চাকরী প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। নকুলবাবু (সাহেব বলিব কি?) তাহাকে অতি প্রত্যূষে আসিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে আসিয়াছে। শুধু হাতে আসা ভাল দেখায় না, তাই একটি মোচা, সের দুই গলদা চিংড়ি, এক কাঁদি কাঁচকলা (আবাগের বংশধর, কাঁচকলা ঘাড়ে করিয়া চাকরী খুঁজিতে আসিয়াছ?) ও পাঁচ সের বেগুন লইয়া আসিয়াছে। ইচ্ছা আছে, সাহেবের গৃহে এবেলার খানাটা সারিয়া সাহেবের সঙ্গেই আপিস যাইবে!

ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখি, ন'টা বাজে! কাঁচকলার রূপ মন হইতে যথাসম্ভব ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্নানাগার করিতে যাইতে হইল, কারণ আমিও বাঙ্গালী, আমারও দশ'টা পঁয়ত্রিশে লালকালীর আঁচড় পড়ে। পাছে যাত্রা করিবার সময় কাঁচকলার পুঁটুলি দেখিয়া আপিসে গিয়া সাহেবের নিকট তাহাই ভক্ষণ করিতে আদিষ্ট হইতে হয়, খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেদিন আপিসে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অনেকদিন মনে থাকিবার মত বটে, তবে এখানে তাহা অবান্তর।

নকুলবাবুর সঙ্গে আমার এতদিন আলাপ হয় নাই, কারণ এ পাড়ায় আমি নবাগত। পাড়ায় ইহার মধ্যে যে দুই-চারিজন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল, সকলেই বলিলেন, লোকটি প্রাতঃস্মরণীয়!

প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম, তাহাই বটে! রোজই দেখি, কেহ বাইসিক্ল, কেহ ট্রাইসিক্ল, কেহ হ্যাণ্ডকার্ট, কেহ রিক্সা, কেহ পা-দল চালাইয়া নকুলবাবুর বাড়ীর সামনে প্যারেড করিতেছে। যত বেলা বাড়ে, তত লোক বাড়ে।

পাড়ার ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করিলাম, নকুলবাবু কোথা? তিনি কি দেবতার চেয়েও নিষ্ঠুর?

ভদ্রলোকগণ কহিলেন, দেখিবেন কোথা? ঐ দেখুন! তাঁহারা ছাদের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। তাই ত! নকুলই ত বটে! শুধু নকুল নয়—শ্রীমৎ নকুলানন্দ ভক্ত-বিটেল-শিরোমণি মহাশয়েষু। পরিধানে কৌশিক বসন, হস্তে হরিনামের মালা, সম্মুখে তাম্রটাট—কোশাকুশি!

হঠাৎ দৃষ্ট হইল, নকুলচন্দ্র অতি সন্তর্পণে আলিসার আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছেন। নীচে তখনও রাইট্ লেফ্‌ট, লেফ্‌ট রাইট্ চলিতেছে, নকুল আবার ভগবদ্‌চিন্তায় আত্মনিমগন করিলেন।

অনেক বেলায় গোলমাল করিতে করিতে মার্চ্চাররা প্রস্থিত হইলে দেখা গেল, নকুল সাইকেলে বরবপু স্থাপন করতঃ ছুটিলেন। আমিও আপিস বাহির হইতেছিলাম, বিলু উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া পিছু ডাকিয়া বলিল, দাদু, তিলভাণ্ডেশ্বর সাইকেলে চাপে?

—পিছু ডাকলি দিদি, বলিয়া বসিলাম; এক গ্লাস জল ও একটা পান খাইয়া 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' ছোট সেক্রেটারী সাহেবের "লাল কালীমাতা সহায়" জপ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। লাল কালীমাতার জয় হোক, পঁয়ত্রিশ মিনিটের পূর্ব্বেই বড়সাহেবের কামরায় ছোট সেক্রেটারী রায় সাহেবের ডাক্ পড়িয়াছে, তিনি সেখানে 'ষ্ট্যাণ্ড-আপ অন্ ওয়ান লেগ', আমাদের হাজিরা বহিতে লাল কালির আঁচড় কাটিবার ফুর্সৎ পান্ নাই।

একদিনের কথা বলি। একটি বৃদ্ধ মুসলমান নকুলের রোয়াকে চেয়ারের উপরে সুখাসীন হইয়া চা পান করিতেছেন। নকুল প্রশ্ন করিতেছেন:—

(এক) চা-টা ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই ত?
(দুই) চিনি নিশ্চয়ই কম হইয়াছে?
(তিন) আমার স্ত্রীর দোষই ঐ, চা কড়া করে ফেলে। তা আর একটু করে দিক না?
(চার) না, না, ও আর কষ্ট কি? ওরে খেঁদী!
(পাঁচ) আর এক শ্লাইস্ রুটি দিক্ না?
(ছয়) রুটিতে মাখন দেবে, না জেলি দেবে?
(সাত) মার্ম্মালেড খান্?

আমরা সামনের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া উৎকর্ণ (লম্বকর্ণও বলা যায়!) হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। এইবার অপর পক্ষ উবাচ:—

(এক) দেখিয়ে নকুলবাবু, আমার টাকাটা আড়াই বছর হইয়া গেল
(দুই) আমি ঘর হইতে টাকা বাহির করিয়া আপনার বাড়ীর মালমসলা হইতে মিস্ত্রি মজুর
(তিন) আর আমি একদিনও অপেক্ষা করিব না
(চার) আপনি আজ নয় কাল করিয়া আড়াই বছর
(পাঁচ) ইঁট-ওলা, জানলা-দরজা-ওলা, চূণ-ওলা, সিমেণ্ট-ওলা, শিক্-ওলা, রঙ-ওলা সবাই রোজ আসে আর ফিরে যায়
(ছয়) তাহারা বলে, আদালত করিবে
(সাত) আমিও ভাবিতেছি

কথা শেষ না হইতেই নকুলচন্দ্র হন্তদন্তভাবে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মিনিট দুই পরে ছোট্ট একটি পুঁটলি ও একখানি পোষ্টকার্ড হস্তে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার উক্তি:—আমার জমিদারী থেকে আখের গুড়ের পাটালী এসেছিল, খেঁদীর মা আপনার জন্যে বেঁধে রেখেছিল। ধরুন, ধরুন। আর এই চিঠিখানা পড়ুন। ও, আপনার বুঝি চশমা আনা হয় নি, তা বটে, তা বটে! তা আমিই পড়ি, আপনি শুনুন।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর নায়েক
জমিদার মহাশয় প্রবলপ্রতাপেষু—
মহাশয়, আগামী সপ্তাহের প্রারম্ভেই আপনাকে চর বাণেশ্বরপুরের বাবদ আঠার শত টাকা পাঠাইতেছি। শ্রীচরণে প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

দেখলেন ত ফুলচাঁদবাবু, আমি কি মিথ্যে বলছি, ঐ টাকাটা একবার এলে হয়!

—দেখি দেখি পোষ্টকার্ডখানা।

এই যে দেখুন-না, দেখুন-না! ও-হ্, মুস্কিল করেছে, নায়েবের যেমন বুদ্ধি-বিবেচনা, পোষ্টকার্ডে আবার কতকগুলো প্রাইভেট কথা লিখে বসে আছে। তাতে কি! দেখুন-না ফুলচাঁদবাবু, আপনিই হিসেব করুন না, আপনার সাতশ বত্রিশ, লোহাওলার তিনশ বার, রঙওলার একশ ছেয়ানব্বই, সিমেণ্টওলার দু'শ দুই, কাঠওলার তিনশ বার, চূণওলার একশ তেত্রিশ—কত হল ফুলচাঁদবাবু?

ফুলচাঁদ হিসাবে কিছু মাটো বলিয়াই হউক অথবা আগামী সপ্তাহের প্রারম্ভেই প্রাপ্য বাক্সবন্দী হইবার আনন্দেই হউক, হিসাবটা করিয়া উঠিতে পারেন নাই; বলিলেন, ঐ রকমই হবে। কিন্তু নকুলবাবু, চিঠি আপনি পড়লেন বাংলায়, ও-যে দেখি ইংরিজি হরপ।

—বাংলায় লিখলে নায়েবকে ডিস্‌মিস্ করব না? আমার সেরেস্তায় সবই ইংরিজি! আমি তর্জ্জমা ক'রে আপনাকে শোনালুম, দেখলেন না!—বলিতে বলিতে চিঠিখানা নকুলের পকেটে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নকুল পুনরপি কহিলেন, এই ক'টা দিন বই ত নয়! তারপর টাকা পেয়ে গেলে যেন ভুলে যাবেন না ফুলচাঁদবাবু, মাঝে মাঝে আসবেন, এতকালের বন্ধুত্ব! না, আর বেলা করবেন না, বুড়ো মানুষ, রোদ বাড়লে কষ্ট হবে। ওকি,

আমার জমিদারীর গুড়টা ফেলে যাচ্ছেন যে! দেখবেন খেয়ে, এমন গুড় আপনাদের কলকাতায় পাওয়া যায় না।

ফুলচাঁদবাবু ওরফে সেখ ফুলচাঁদ অথবা ফুলচাঁদ মিঞা গুড়ের পুঁটলি হস্তে পরমানন্দে রিক্সায় উঠিয়া প্রস্থিত হইলেন।

দুই-তিন সপ্তাহ নকুলবাবুর খোঁজ করা হয় নাই। বাড়ী হাসপাতাল-রূপ ধারণ করিয়াছিল। নাতনী বিলুর হাম, তাহার জননী অর্থাৎ কি-না আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার ফ্লু, তস্যা জননীর ইনফ্লুয়েঞ্জা (ধাপে ধাপে চড়িতেছে, যাহার যেমন পদ, তাহার রোগের পরিমাপ ও নাম তদ্রূপ হওয়াই সঙ্গত !), মোক্ষদা ঝির ডেঙ্গু! ক'দিন পরে নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইয়া দেখি, ফুলচাঁদবাবুকে সেলাম আলেকুম্ করা হইতেছে।' ফুলচাঁদবাবুর চক্ষুদ্বয় আজ ভাঁটা সদৃশ, রক্ত-জবার ন্যায়! নকুল একখানা টেলিগ্রাফের খাম হস্তে দণ্ডায়মান। কহিতেছেন, এই যে, আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন ফুলচাঁদবাবু, নইলে আপিসের বেলা ক'রেও আজ আপনার বাড়ী আমায় যেতে হ'ত। এই দেখুন, নায়েবের টেলিগ্রাম, লিখছে আজই টাকা পাঠাচ্ছে। আজ যদি পাঠায়, কাল দুপুর নাগাদ ইন্সিওরটা পাব, হ্যাঁ, বেলা ৩টের ভেতর নিশ্চয়ই—খুব দেরী হলেও সাড়ে তিনটে, আপনার সাতশ' বত্রিশ, ইঁটওলার দু'শ দুই, লোহা-ওলার তিনশ' বার, রঙওলার একশ' ছেয়ানব্বই, হ্যাঁ, ও আর কথা কি! কালই পাঁচটা নাগাদ—

—তা'হলে কাল পাঁচটার সময় আসব ত ?

—না, না, আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন? আমি আপিস থেকে বেরিয়ে ইন্সিওরের খাম খুলে আপনার সাতশ' বত্রিশ, ইঁটওয়ালার একশ' ছেয়ানব্বই—

—ইঁটওলা দুলাল যে বলে তার তিনশ'—তা হবে, সব লেখা আছে। কথায় বলে হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না জানেন ত ফুলচাঁদ বাবু!

—তা' কখন্ যাবেন আপনি ?

—হ্যাঁ তা স' পাঁচটা হবে বই কি!

—বেশ, আমি বাড়ীতেই থাকব, বার হব না।

—না, না, কাজ থাকে ত বার হবেন বই কি! আমি না-হয় বসব'খন। বলেন ত, একটু দেরী করেও যেতে পারি।

—না, আমি বাড়ীতেই থাকব।

নকুলবাবু অন্তঃপুরের উদ্দেশে হাঁকিলেন, কই রে, খেঁদী, তোর মা যে জমিদারীর কপি দেবে বললে ফুলচাঁদ দাদাকে, তার কি হলো রে ?

ফুলচাঁদ আপত্তি করিলেন, থাক্, থাক্, কপি থাক্। যে গরম পড়ে গেছে এখন আর কপি কে খায় ?

—তা বললে কি চলে? জমিদারী থেকে এসেছে, খেঁদীর মা না খেয়ে আপনার জন্যে তুলে রেখে দিয়েছিল; কই রে খেঁদী ?

—এই যে বাবা!—বলিতে বলিতে নেহাৎ-নাসিকা-নাই-এমন-নহে একটি মসীবর্ণা বালিকা আতপতাপ-বিদগ্ধ নাল্-ফুলের মত দুইটা বাঁধাকপি আনিয়া হাজির করিল। নকুল বলিলেন, একটু শুকিয়ে গেছে, কিন্তু খেয়ে দেখবেন, এমন মিষ্টি কপি আপনাদের শহরে আসেই না।

অগত্যা ফুলচাঁদবাবুর কপি-হস্তে প্রস্থান।

কয়েক দিন পরে দেখি, ফুলচাঁদবাবুর পুনরাগমন। ফুলচাঁদ একা নয়, সঙ্গে আরও কয়েকটি চাঁদ! সকলকার মূর্ত্তিতেই "আজ তোমার একদিন কি আমাদের একদিন"-ভাব উৎকটরূপে প্রকট। কেহ কড়া নাড়িতেছে, কেহ দ্রুত পাদক্ষেপ করিতেছে, কেহ উচ্চৈস্বরে ডাকাডাকি করিতেছে, কেহ শুধুই পরিক্রমণরত—কিন্তু নকুলানন্দের দর্শন নাই। ছাদের পানে দৃষ্টিপাত করিয়াও নকুলকে দেখিতে পাইলাম; নকুল ভগবদ্চিন্তানিবিষ্টও নহেন।

কিয়ৎপরে অঙ্গে হ্যাট কোট, গলে টাই, মাথায় টুপি এক ভদ্রলোক নকুলের দ্বার সমীপে মোটর হইতে অবতরণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নকুলও নামিলেন। নকুল খুব গম্ভীরভাবে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখ দ্বার খুলিয়া দিলেন। সাহেবী বেশ পরিহিত ব্যক্তিকে সাদর সম্বর্দ্ধনা সহকারে ভিতরে বসাইয়া নকুল নিজেও গিয়া বসিলেন। এদিকে ফুলচাঁদাদির ধৈর্য্যের বাঁধ বোধ হয় অনেকক্ষণই ভঙ্গ হইয়াছিল, আর ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না, তাহাদেরই মধ্যে একজন ডাকিল, নকুলবাবু, আমরা কি দাঁড়িয়েই থাকব ?

নকুল কোন উত্তর দিলেন না।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অধিকতর চড়া সুরে কোন রাগিণী ভাঁজিতে উদ্যত হইয়াছিল, হঠাৎ দুই ব্যক্তিই বাহিরে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। নকুল ফুলচাঁদবাবুকে বলিলেন, এই যে ফুলচাদবাবু এসেছেন! তারিণীবাবুও আছেন দেখছি! ওঁকে ত চিনতে পাচ্ছি নে!

যাহাকে তিনি চিনিতে পারিতেছিলেন না—তিনি বলিলেন, সে কি মশাই, আমি যে দুলাল সরকার, এক লাখ ইঁট দিলুম, তার একটি পয়সা—

নকুল যেন শুনেন নাই এইভাবে 'সাহেবের' পানে চাহিয়া বলিলেন, মিঃ রায়, এই যে দেখছেন ফুলচাদ সেখ, ইনি বড় ভাল মিস্ত্রি, ইনিই আমার বাড়ীটি কণ্ট্রাক্ট নিয়ে করে দিয়েছেন। অনেক নামজাদা কণ্ট্রাক্টরের চেয়ে ইনি বড় আর ভাল কণ্ট্রাক্টর। যদি আপনার বাড়ীর সময় দরকার হয়, দেখবেন।

—তা বেশ ত! আপনার আপিস কোথায় বলুন ত?

—হেঁ হেঁ আমাদের আবার আপিস্! বাড়ীতেই আপিস।

—কি নাম আপনার আপিসের? ঠিকানাটা কি বলুন ত?

—৩২ কলিন্স লেন, নাম ফুলচাদ এণ্ড সন্স।

—কলিন্স লেন, ডিষ্ট্রিক্ট থ্রি, আপনি ইন্‌কাম ট্যাক্স দেন? চাপরাসী উ বড়া কেতাবঠো লাও।

ফুলচাঁদ মেঘে ঢাকা পড়িল; শুষ্ককণ্ঠে কহিল, সে কি আবার আপিস! হেঁ হেঁ—

'সাহেব' বলিলেন—যার যেমন আপিস, তার তেমনই ট্যাক্স।

নকুল বলিলেন, আর এই যে দেখছেন তারিণীবাবু, ইনি হার্ডওয়ারের কাজ করেন, আপনার বাড়ীর সময়—

ইয়া চাপরাস, ইয়া দাড়ী, ইহা পাগড়ী, চাপরাসী যখন অতিকায় খাতা সাহেবের সামনে হাজির করিল, তখন ফুল ঝরিয়া গিয়াছে, 'তনয়ে তার তারিণী' গাহিতে গাহিতে তারিণী পগার পার, লাখ ইট-প্রদাতা দুলাল সরকার ইটখোলায় গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া পথ জনশূন্য দেখিয়া সাহেব বলিলেন, নাও, কিছুদিন নিশ্চিন্ত!

ভালুক শাক-আলু খাইতে লাগিল।

এই নকুলচন্দ্র মহারথীর সহিত আলাপ করিবার বড় বাসনা। প্রবাদে আছে, যে খায় চিনি, তার চিনি জোগান চিন্তামণি! একদা সন্ধ্যাকালে পাড়ার কয়েকটি প্রতিবেশীর সঙ্গে গড়গড়া চর্চ্চা করিতেছি একখানা প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী আসিয়া নকুলের গৃহদ্বারে থামিল। হরি হরি, আগে দেখি নাই, গাড়ীতে যে খোদ নকুলানন্দ মহারাজ!

আমরা প্রকাশ হইয়া কহিলাম, নকুলবাবু, গাড়ী কিনলেন না কি?

—কি আর করি বলুন! সস্তায় পেলুম ভাল গাড়ীখানা; আর চিরকাল হেঁটে হেঁটে আপিস করতে পারি নে, হ্যাঁ।

আমরা সমস্বরে বলিলাম, তা বেশ করেছেন। আজকালকার দিনে ভদ্রলোক without a car নো-ভদ্রলোক।

প্রায়ান্ধকারে নকুলের কুন্দধবল দন্তপাতি সমুদ্র বক্ষে সাল্‌ফার-সম জল্ জল্ করিয়া উঠিল। • • •

গাড়ীখানার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমরা বলিলাম, বেশ গাড়ী!

নকুল হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, আসুন-না বেড়াতে যাবেন? আসুন, আসুন।

—আজ থাক্, আজ থাক্, বলিয়া কাটাইয়া দেওয়া গেল। কি-জানি যদি পেট্রোল-পাম্পের কাছে গিয়া মনি-ব্যাগ ভুলিয়া আসিয়াছে বলিয়া বসে, তাহা হইলে? আমি এই ভয়েই থাক্ থাক্ বলিয়াছিলাম, পরে জানিলাম, আমার পড়শীরাও great men, কেন না তাঁহারাও think alike করিয়াছিলেন।

নকুল বলিলেন, তবে মেয়েদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি, কি বলেন?

কিন্তু আমার অদৃষ্টে ধাতা দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, খণ্ডায় কাহার সাধ্য? মাসখানেক পরে লাল বাজারের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়া আছি, ঢং ঢং ঘং ঘং ঘটাঘং শব্দে একখানা মোটর আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া ফোঁস ফোঁস ঘোঁস ঘোঁস করিতে লাগিল। চক্ষু তুলিয়া দেখি, নকুলের গাড়ী, মহারাজ নকুলই ড্রাইভ করিতেছেন। নকুল ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাঁ হাতে দরজা খুলিয়া দিয়া কহিলেন, বাড়ী যাবেন ত, আসুন।

ওমা, গাড়ী যে ষ্টার্ট হয় না! নকুল গাড়ীর কান মলিলেন, নাক ঘসিলেন, পদাঘাতে পৃষ্ঠে বেদনা ধরাইয়া দিলেন, সে কিন্তু নাচলবান্দা! নকুল হাণ্ডেল লইয়া

নামিয়া পড়িলেন। হঁ হঁ শব্দে বার কতক হ্যাণ্ডেল মারিলেন, অবাধ্য ইঞ্জিন দৃকপাতমাত্র করিল না। এদিকে মহা হুলস্থূল বাঁধিয়া গিয়াছে—আপিস-টাইম্, পিপীলিকার মত নরস্রোত, মোটরস্রোত, বাসস্রোত, ট্রামস্রোত—নকুলের অতিকায় মোটরগাড়ী রাস্তা আটকাইয়াছে, সামনে লাল পাগড়ীর দৌলতখানা, জন ছয়েক লাল পাগড়ী আর গোটা তিনেক লালমুখ আসিয়া নকুলের পিতৃমাতৃগণের সম্বন্ধে ভাল ভাল সুস্বাদু বিশেষ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। নকুল ইংরেজী ভাষা ভুলিয়া গিয়া সার্জেন্টদের বলিতেছে—একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দেও না মিষ্টার! Traffic held up—তাহারা তাহাতেই রাজী হইয়া পড়িল; অবশ্য নকুলের জীবিত ও স্বর্গত পিতৃপুরুষগণের সাধুবাদও উচ্চারিত হইতে লাগিল। গাড়ীগো মহিষাদির নিজ নিয়মিত পাদকদিগের হস্তে খানিক ধাক্কা খাইয়াই ফোঁস্ ফোঁস করিয়া উঠিল ধক্ ধক্! বোধ করি তাহার সুপ্ত আত্মসম্মান জাগ্রত হইয়া উঠিল চলিল। সার্জেন্টগণ পিছাইয়া পড়িয়াছে, ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নকুল অবাধে তাহাদের আত্মীয়কুটুম্বগণের রাশনাম ধরিয়া প্রীতি প্রকাশ করিতে করিতে চলিল। আমায় বলিল, দেখলেন বেটাদের কেমন পটিয়ে নিলাম! আমি তাহার বুদ্ধির তারিফ করিলাম। একটা মোড় ফিরিতে গিয়া গাড়ী আবার অবাধ্য হইয়া দাড়াইয়া পড়িল। যত রকম কসরৎ জানা ছিল প্রয়োগ করিয়াও যখন গাড়ীর সুমতি ফিরিল না, তখন হ্যাণ্ডেল হস্তে নকুল পুনশ্চ নামিয়া পড়িলেন। আমায় বলিলেন, ঐ তার কটার মুখ এক করে ধরুন ত!

অব্যবসায়ী লোক, বলিলাম, শক্-টক্ লাগবে না ত?

—না, না কিছু ভয় নেই।

তারের মুখগুলা এক করিয়া ধরিলাম, নকুল হ্যাণ্ডেল মারিল, এক পাকেই গাড়ী গর্জ্জিয়া উঠিল।

ফাঁকা পথে পড়িয়া নকুল বলিল, গাড়ীটার পিক্-আপ্ চমৎকার।

পিক্-আপ্ কি তাহা না বুঝিয়াই বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

নকুল উবাচ, সিক্সটি মাইলস্—ইজি!

বুঝিলাম, স্পীডের কথা হইতেছে।

নকুল বলিল, দেখবেন?

হাঁ না বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছুটিল। নক্ষত্রগতি বলিব, না তীরবেগ বলিব? দু'টাই খাটে; সঙ্গে বাদ্য—খোল করতাল কাড়া নাকাড়া মন্দিরা ব্যাগপাইপ ফ্লুট বাঁশের বাঁশী, ভেঁপু, সব এক সঙ্গে! আর সে কি নৃত্য! উদয়শঙ্কর লাজে দেশ ছাড়া; সাধনা বোস্ প্যারিসে পা সাধিতেছে! ছকি বকি হতাশ হইয়া ম্যাট্রিকে মন দিয়াছে, যাহারা পুরীর সমুদ্রে মাছ-ধরা নুলিয়াদের তরঙ্গ-যাত্রা দেখিয়াছেন তাঁহারাই কতকটা আন্দাজ করিতে পারিবেন। আমার মন বলিতেছিল, পিক্-আপ্টা কম হইলেও ক্ষতি ছিল না, বাড়ী গিয়া চুণে হলুদের ফরমাস করিতে হইত না।

বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসা গিয়াছে এমন সময়ে 'পিক্-আপ্'-দক্ষ মোটর এমন একটা ঝাঁকানি লাগিয়া গাড়ী হুমড়ি খাইল যে আমি পিছনের আসন হইতে সামনে এবং ষ্টিয়ারিং হইতে অজ্ঞাত লম্ফে নকুল গাড়ীর বনেটের উপর; আমার মনে হইল, মরিয়া গিয়াছি, স্ত্রী-পুত্রকলত্র কাহারও সহিত শেষ দেখাটা আর হইল না, তারকব্রহ্ম নাম স্মরিয়া চক্ষু মুদিলাম। কিয়ৎ পরে নকুলের ঠেলাঠেলিতে জ্ঞান ফিরিয়া পাইতে বুঝিলাম, মরি নাই। নকুলের কথায় বুঝিলাম, তাহার বিশ্বস্ত গাড়ীর বিশ্বস্ত সামনের চাকা দু'খানি গাড়ী হইতে বিমুক্ত হইয়া একটু আগেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে; তাই গাড়ীখানা হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছিল, আমাদেরও কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক হইয়াছিল—যাক্ সে কিছু না। ঘটনাটা বাড়ীর কাছেই, কাজেই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই জুতা দু'পাটি বগলদাবায় পুরিয়া ঘোরা-পথে গৃহপ্রবেশ। সোজা পথে গেলে কি-জানি চাকা দুখানার সঙ্গে যদি বা আবার দেখা হইয়া যায়।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, নকুলের গাড়ী আর চড়িব না। মানুষের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে বিলম্ব হয় না। মানুষেরই বা দোষ কি? পরমব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র রণে সারথ্য ছাড়িয়া সুদর্শন-হস্তে যুদ্ধে নামিয়া পড়েন নাই কি?

পাঁচটায় আফিসের ছুটি হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠ মাস, রৌদ্রে পাথর ফাটিতেছে, জুতার হিল সোল সুখতলা ভেদিয়া সেই পাথর-চৌচির-করা উত্তাপ পাদপদ্মের ভিতর দিয়া মাথার তালুতে পশিলেও বাড়ী না গিয়া কোথায়ই বা যাই—এমন সময়ে পশ্চাদ্দেশে ঝন্‌ঝনাঝন্ শব্দ, শ্রীমান বিকশিতদন্ত নকুল ও তস্য মোটর! নকুল হেলিয়া বাঁকিয়া, কাৎ হইয়া

পিছন-দিকের সীটের দরজা খুলিয়া দিল, আমি কৃতজ্ঞতা-মণ্ডিত কণ্ঠে কহিলাম, দোহাই নকুলবাবু, আপনি যান। আপনার বিশ্বস্ত গাড়ী, চাকাও বিশ্বস্ত, খুলিয়া গেলেও চিনিয়া বাড়ী যায়, আমাদের হাড়গোড় কিন্তু তাদৃশ বিশ্বস্ত নয়, ভাঙ্গিলে জোড়া লাগিবার সম্ভাবনা কম।

'আসুন, আসুন'—বলিয়া নকুল হাসিল; কহিল, নতুন টায়ার, কোন ভয় নেই।

'ভরসাও নেই' বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম; বলিলাম, কিন্তু পিক্-আপ্ করবেন না, দোহাই।

কালো মুখে সাদা দাঁতের হাসি হাসিয়া নকুল চলিল। আপিসের সাহেব ও মেম্‌কে লইয়া এই গাড়ীতে ডায়মণ্ড-হার্বার বেড়াইয়া আনিয়াছে, সাহেব-মেম কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহারই গল্পে নকুল মশগুল হইয়া চলিয়াছে, এক জায়গায় কয়েকটা লোক হৈ হৈ রৈ রৈ, "মোটর-চোর ভাগতা, পাকড়ো পাকড়ো" করিতে করিতে নকুলের পিছনে পিছনে ছুটিতেছে দেখিয়া নকুল সেদিনের মত পিক্-আপে মনঃসংযোগ করিয়াছে বুঝিয়া সজোরে চক্ষু বন্ধ করিলাম। মরি—মরিব, চক্ষু অন্ধ হইবে না। কতক্ষণ দৌড়িবে, লোকগুলা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল; নকুল তাহা দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া পিক্-আপ্ ছাড়িয়া দিতে চক্ষু খুলিয়া সাতঙ্কে প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যাপার বলুন ত?

নকুল কহিলেন, জোচ্চোর বেটারা, ডাকাত বেটারা, খুনে বেটারা! এই ত পচা গাড়ী, বলে কি-না দু'শ টাকা দাম; আমি বললুম পঞ্চাশ; কিছুতেই দেবে না, আমি মশাই ট্রায়েল দিয়ে দেখি বলে এনেছি।

হাসিয়া বলিলাম, তা কতদিন ট্রায়েল হচ্ছে?

নকুল বড়ই সপ্রতিভ, কহিল, তা আর কি হবে! যেমন বেটারা দাম কমায় না—

কথা শেষ হইয়াছে কি হয় নাই, "ঐ যে, ঐ যে" করিতে করিতে আর একখানা লঝঝোড় গাড়ী আমাদিগের পানে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া অথবা বুঝিয়া কিম্বা অনুভব করিয়া নকুল পলকমাত্রে 'পিক্ আপে' মন দিল। নকুলের পিক্ আপের কাছে তাহারা পারিবে কেন? নকুল একটা গলির মধ্য দিয়া অন্য একটা বড় ও ফাঁকা রাস্তায় পড়িয়া পিক্ আপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। আমি চক্ষু মুদিয়া প্রাণরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কাজটা ভাল করি নাই। হঠাৎ দুম্-ফট্। নকুলের বিশ্বস্ত রেডিয়েটর চৌচির, হাঁ! নকুল কথা নাই, বার্ত্তা নাই, গাড়ী হইতে নামিয়া হ্যাট্টা মাথায় চাপাইয়া গ্যাট্ ম্যাট্ করিতে করিতে কখন্ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন জানিতে পারি নাই, পুলিশ সার্জ্জেন্টের কুটুম্বিতা-বাচক সম্বোধনে চাহিয়া দেখি, লালমুখে লাল চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে; শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক ধরিয়া গাড়ী রাস্তার মাঝখানে রাখার জন্য ইংরেজী, হিন্দী, উর্দ্দু, লাটিন, তেলেগু, তামিল, ফার্সী ভাষায় মন-মুখ এককরতঃ সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। আমার গাড়ী নয়, আমার মৃগীর ব্যামোর ঝোঁক আসি-আসি করিতেছিল বলিয়া আমি নিরাপদ বুঝিয়া গাড়ীখানার উপরে উঠিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলাম, এখন মৃগীর ঝোঁক কাটিয়া গিয়াছে, কষ্টে-সৃষ্টে বাড়ী যাইতে পারি বলিয়া নামিয়া পড়িয়া পা চালাইয়া দিলাম।

নকুল আমার আসা-পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, শালারা ধরে নি ত?

রাগ দমন করিয়া বলিলাম, তারা ধরে নি; কিন্তু পুলিশ ধরেছে।

নকুল বলিল, আমার ঠিকানা দেন্ নি ত?

রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, বলতে হয় নি, তারা জানে।

—বলেন কি, জানে?—বলিয়া নকুল নিঃশব্দে গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

দু'-একদিন পরে পুলিসের আগমন। নকুল বলিল, আমার দোষ কি ম'শাই? বেটারা ট্রায়েল্ দিতে গাড়ী দিয়ে গেল, নিয়ে যাবার নামটি নেই। রোজ আপিস থেকে ফোন্ ক'রে বলি, নিয়ে যাও না বাপু তোমাদের ভুঁইসা গাড়ী, তা কিছুতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না; আজ নিজেই ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম মশাই—

পুলিস বলিল, কিন্তু ওরা যে লিখিয়েছে, গাড়ী চুরি গেছে?

—অ্যাঁ, বলেন কি মশাই? চোর ব্যাটারা এই কথা বললে! অ্যাঁ। আমি কোথায় ভদ্রতা ক'রে গাড়ী ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম, হয়-না-হয়, এই ভদ্রলোককে জিগ্যেস্ করুন না, উনিও ত ছিলেন গাড়ীতে যখন নিয়ে যাচ্ছিলুম—

পুলিশ আমার পানে চাহিল। অশ্বত্থামা হত ইতি—

—(গজঃ) না করিয়া উপায় ছিল না। নকুল বলিয়া বসিয়াছে, গাড়ীতে আমি ছিলুম, অস্বীকার করিলে চোরের বন্ধু চোর বনিবারই সম্ভাবনা অধিক। ঘাড় নাড়িলাম।

ঘাড় নাড়া উত্তর পুলিশের কাছে চলে না, পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল, উনি গাড়ী ফেরত দিতে যাচ্ছিলেন, না, জয় রাইডে বেরিয়েছিলেন?

'মহাপুরাণে' লিখিত আছে (শুনিয়াছি!) আর্ত্তরক্ষার্থ অপিচ আত্মরক্ষার্থ ইত্যাদি অবস্থায় মিথ্যাভাষণে পাপ নাই, কহিলাম, অবশ্যই গাড়ী ফেরত দিতে যাইতেছিলেন।

পুলিশ—তবে যে কারখানার লোক বলিতেছে, নকুল গাড়ী লইয়া পলাইতেছিল, তাহারা অন্যগাড়ীতে আপনাদের ধাওয়া করিতেছে দেখিয়া আপনারা স্পীড বাড়াইয়া পলাইতেছিলেন, পথে রেডিয়েটার ফাটিয়াছে।

আমি—আমার ধারণা অনুরূপ। আমরা যখন কারখানার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি তখন দেখি বোমা বন্দুকহস্তে একদল রেভোলিউসনারী টেররিষ্ট পোষ্টাফিস লুটিতে চলিয়াছে; দেখিয়া মহাশয়, আমাদের গাড়ী ফেরৎ দেওয়া মাথায় উঠিয়া গেল।

পুলিশ—পোষ্টাপিস্ কোথায় পাইলেন?

আমি—উহাদের কারখানার সামনে মস্ত পোষ্টাফিস। সেদিন মাসের পাচ তারিখ, বিস্তর মনিঅডার পড়িয়াছে, লুঠের দিন বটে।

পুলিশ—বোমা বন্দুক কোথায় দেখিলেন?

আমি (ক্রোধান্ধ হইয়া) টেররিষ্টের হাতে বন্দুক থাকিবে না ত কি চরকা, তকলি, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা শোভমান থাকিবে?

পুলিশ—তাহারা যে টেররিষ্ট তাহাই বা বুঝিলেন কিরূপে?

আমি (অগ্নিশর্ম্মা হইয়া) হাতে বোমা বন্দুক দেখিয়া।

পুলিশ—দেখিতে ভুল হইতেও পারে ত! আপনার বয়স কত? চালসে ধরে নাই কি?

আমি—কেন, চশমা কিনিয়া দিবেন?

পুলিশ—টেররিষ্ট হইলে আমরা খবর পাইতাম।

আমি—আপনারা টেররিষ্টদের খবর পান, না ভদ্রলোকের ছেলেদের টেররিষ্ট সাজাইয়া পুলি পোলাও চালান দেন! জানা আছে মশাই জানা আছে, থামুন না।—বলিয়া ক্রোধবিকম্পিত কলেবরে প্রস্থান করিলাম।

অনেক রাত্রে নকুল আসিয়া বলিল, আপনি ষ্টেজে নামেন না কেন? আপনি ত শিশির ভাদুড়ীর মাসতুতো ভাই।

বলিলাম, নামিবার ইচ্ছা আছে, লঙ্কা দাহন নাটকও তৈরী, কেবল রাবণ রাজার অট্টালিকায় আগুন ধরাইবার লোক পাই নাই বলিয়া এখনও এক পা এগুই ত দু'পা পিছাইতেছি। আপনি সে পার্টটা লইবেন?

নকুল একরাশ দাঁত বাহির করিয়া বলিল, স্কুলে পড়বার সময় সীতার অগ্নি পরীক্ষা নাটকে আমি বৎস হনুমান সেজেছিলুম।

এখন আর 'বৎস' নয়, বীর হনুমান সাজিতেও নকুলের কিছুমাত্র আপত্তি নাই জানিয়া স্বরচিত নাটকের তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা দৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য নকুলের কাছে গুড্ নাইট্ করিয়া শুইতে গেলাম, রাত্রি তখন স'বারটা।

অত রাত্রেও বিলু জাগিয়া বসিয়া আছে এবং তাহার দিদিমাতার ঘুমের মাথা চর্ব্বণ করিয়া গালি মন্দ, চড় চাপড়, কানুটি চিম্‌টিও খাইতেছে। আমি আসিতেই বলিল, দাদু তিলভাণ্ডেশ্বর রাবণ রাজার বাড়ীতে আগুন দেবে?

—দেয় দেবে, এখন আমি ত তোর পিঠে—বলিয়া বিলুর মাতামহী সিংহিনী-গর্জ্জন ছাড়িলেন।

আমি বিলুকে কোলে করিয়া আমার খাটে মশারীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম!



দর্শন ও বিজ্ঞান

ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী, এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

পদার্থসমূহের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্রকেই যদি দর্শনশাস্ত্র বল তবে বিজ্ঞানকে দর্শন বল না কেন? † পদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ই তো বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ইহার উত্তরে দার্শনিকেরা বলেন যে পদার্থের তত্ত্বনির্ণয় শব্দের অর্থ পদার্থের চরমতত্ত্ব, কারণতত্ত্ব বা অন্তস্তত্ত্ব নির্ণয়। পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় নহে। জড়বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতির স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় করে, আর তাহার অন্তস্তত্ত্ব বা চরমতত্ত্ব নির্ণয় করে দর্শন। জড়জগতের মৌলিক উপাদান কি? প্রকৃতির কার্য্যাবলী কোন্ নিয়মানুসারে শাসিত হইতেছে? ইহাই মুখ্যতঃ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, জড়জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কিরূপ ছিল? পরিণামেই বা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে? সেদিকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নাই, সে জগতের পূর্ব্বাপর অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণই উদাসীন। লীলাময়ী প্রকৃতির সাবলীল গতিভঙ্গির মধ্যে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে তাঁহার স্বরূপ ও স্বভাব নির্দ্দেশ করাই বিজ্ঞান গবেষণার মূল লক্ষ্য। জড়জগৎ যেমন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন সেইরূপ আমাদের মনোজগতও কতকগুলি নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেছে; মনোরাজ্যের ঐ সকল নিয়ম ও কার্য্য-প্রণালী অনুশীলন করিবার জন্য মনোবিজ্ঞান চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মনের স্বরূপ কি? মনের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ? জড়ের সহিতই বা মনের কি সম্বন্ধ? এই সকল প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান করেন দার্শনিক। দার্শনিক তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে বস্তুর মূলতত্ত্ব বিচার করেন। তাঁহার স্বীকার্য্য বলিয়া কিছুই নাই, সকলই তাঁহার বিচার্য্য। বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া যাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লন দার্শনিক সেখানে প্রশ্ন করেন যে বৈজ্ঞানিকের ঐ স্বতঃসিদ্ধ পদার্থের অস্তিত্বই আদৌ আছে কি-না? যদি থাকে তবে তাহার স্বরূপ কি? এবং ঐ স্বরূপ জানিবার উপায়ই বা কি? এই জাতীয় প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য নহে, উহা দার্শনিকের আলোচ্য। দার্শনিক প্রজ্ঞার আলোক-সম্পাতে আমরা ঐ সমস্ত মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, ফলে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যতই গভীর হউক না কেন, এই পরীক্ষার ফলে আমরা যে সত্যের সন্ধান লাভ করি তাহা হয় সসীম ও সখণ্ড। স্থাবর জঙ্গম চেতন ও অচেতন ভেদে প্রকৃতি শরীরের যেরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন ভাগ আছে প্রাকৃতিক নিয়মেরও সেইরূপ বিভিন্ন শ্রেণী আছে। ঐ ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানচিন্তা গড়িয়া উঠিয়াছে। একই বস্তুর বিভিন্ন দিক বিভিন্ন বিজ্ঞান পরীক্ষা করিতেছে এবং তাহার ফলে আমরা কতকগুলি বিভিন্ন স্তরের খণ্ড সত্যের আভাস পাইতেছি। বিজ্ঞান তাহার আবিষ্কৃত এই সকল খণ্ড সত্যের মধ্যে কোনও অখণ্ড যোগাযোগ খুঁজিয়া পাইতেছে না। সুতরাং ঐরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা বস্তুতত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় লাভ করাও কোনমতেই সম্ভব হইতেছে না। দার্শনিক প্রজ্ঞার স্বচ্ছ আলোকে আমরা সসীমের মধ্যে অসীমের সন্ধান লাভ করি; বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্য ও সাম্যের সূত্র খুঁজিয়া পাই, ফলে বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপূর্ণ রূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিকের সখণ্ড দৃষ্টির মধ্যে যে অখণ্ডের আভাস পাওয়া যায়, বহুত্বের মধ্যে একত্বের সীমার অন্তরালে অসীমের প্রকাশ অনুভূত হয়। এই অনুভূতিই সত্যের যথার্থ সাক্ষাৎকার। জ্ঞান বিজ্ঞানের উপরিতনবর্ত্তী "প্রজ্ঞানে"র সাহায্যেই সত্যের এই সার্ব্বভৌম স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তর্দৃষ্টিই এই পরিচয়ের পথে একমাত্র পাথেয়। বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধানই সত্য জিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য। কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক সকলেই ঐক্যের সূত্র খুঁজিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি বিচার করা যায় তবে তাহার মধ্যেও বস্তুতত্ত্বের মৌলিক একত্বই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞান প্রকৃতিশরীরকে স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পরীক্ষা করিতেছে। নদ নদী সাগর ভূধর,

† গত ফাল্গুনের ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ।

আকাশ বায়ু অন্তরীক্ষ, ক্ষিতি জল বাষ্প শিলা ইত্যাদিকে স্থাবর এবং বৃক্ষ লতা গুল্ম পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সরীসৃপ এমন কি, মানুষ পর্য্যন্ত সকল শরীরীকেই জঙ্গম বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে যদি কোনও স্থাবর পদার্থকে বিশ্লেষণ করা যায় তবে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষারজান, অম্লজান, পারদ স্বর্ণ রৌপ্য গন্ধক ইত্যাদি কতকগুলি মূলভূতেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূলভূতের সংখ্যা বৈজ্ঞানিক মতে সত্তরটি। এই সত্তরটি মূলভূতেরই বিবিধপ্রকার সংযোগ ও সংহননের ফলেই এই লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতি বিরচিত হইয়াছে। জঙ্গম শরীরকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যায় যে ঐ শরীর কতকগুলি কোষাণুর সমষ্টিতে গঠিত হইয়াছে। ঐ কোষাণুগুলিকে পুনরায় বিশ্লেষণ করিলে পূর্ব্বোক্ত সত্তরটি মূলভূতের অন্তর্গত কয়েকটি মূলভূতেরই সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিতে কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত জড়প্রপঞ্চই সত্তরটি মূলভূতের উপাদানে গঠিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সত্তরটি মূলভূতের উপাদান কি? এই মৌলিক পদার্থগুলি কি প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, না ইহাদেরও কোন মূল আছে? অনেকদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সত্তরটি মূলভূতকে স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে করিতেন। তাহারা বিশ্বাস করিতেন যে, স্বর্ণের পরমাণু চিরদিন স্বর্ণই আছে এবং থাকিবে। অন্যান্য মূলভূত সম্বন্ধেও অনুরূপ সিদ্ধান্তই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কালক্রমে গভীর আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে বৈজ্ঞানিকদিগের মনে এইরূপ একটা কল্পনা গড়িয়া উঠিতেছিল যে সত্তরটি মূলভূত পরস্পর স্বতন্ত্র নহে, তাহারাও হয়তো কোন এক অদ্বিতীয় উপাদানেই গঠিত, একই মহাভূতের পরিণাম মাত্র। পণ্ডিত সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের ঐ কল্পনাকে বাস্তব রূপ দান করিয়া বিজ্ঞানচিন্তায় এক যুগান্তরের সূচনা করেন। তিনি প্রতিপাদন করেন যে, পূর্ব্বোক্ত সত্তরটি মূলভূত প্রকৃত মূলভূত নহে। উহারা প্রোটাইল (Protyle) নামক এক নির্ব্বিশেষ চরমভূতের বিকারমাত্র, তথাকথিত সত্তরটি মূলপরমাণুই 'প্রোটাইল' নামক এক নির্ব্বিশেষ সর্ব্বমূল পরমাণুর বিভিন্ন-প্রকার সংযোগ ও সন্ধানের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৌলিক সাম্য থাকিলেও পরমাণুসমূহের বিভিন্ন সংস্থান ও বিন্যাসের তারতম্যানুসারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যে তারতম্য সংঘটিত হয় তাহার ফলে একই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বমূল পরমাণু হইতেই সত্তরটি সবিশেষ পরমাণুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ মূলপ্রকৃতি অবিশেষ homogeneous 'অব্যাকৃত' ও 'অপ্রকেত' undifferentiaed জগদুপাদান। মূলপ্রকৃতিগত কোন ভেদ নাই, ভেদ কেবল বিভিন্ন পদার্থের আকৃতিগত ও সংস্থানগত। মূলপ্রকৃতির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কেবল রূপান্তর হয় মাত্র। বৈজ্ঞানিকদের এই প্রোটাইল নামক মূলভূতই আমাদের সাংখ্যদর্শনের একান্ত পরিচিত বিশ্বপ্রসবিনী মূলপ্রকৃতি। জড় জগতের চরম ও পরম উপাদান।

এই জড়প্রকৃতি ব্যতীত জড়জগতে বৈজ্ঞানিকগণ আর একটি বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাহার নাম শক্তি Energy বা Power। যেখানে জড় সেখানেই শক্তি, যেখানে শক্তি সেখানেই জড়। জড় ও শক্তির হরগৌরীর ন্যায় নিত্যসম্বন্ধ। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না; এক অন্যের অভিন্ন সহচর, এই শক্তিকে ইহার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ আট ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। গতি, তাপ, আলোক, তাড়িত, চুম্বক ও রাসায়নিক শক্তি এই ছয় প্রকার ভৌতিক শক্তি। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটী শক্তি আছে—(১) প্রাণশক্তি vital force, (২) জীবশক্তি Psychic force। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে শক্তির যতপ্রকার বিচিত্র অভিনয় আমরা দেখি না কেন, ধীরভাবে বিচার করিলে জাগতিক শক্তিপুঞ্জকে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ শক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এই আট প্রকার শক্তিও স্বতন্ত্র নহে। ইহারা একই মহিমময়ী মহাশক্তির বিকাশ—এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সার উইলিয়ম গ্রোভ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে কোন ভৌতিক শক্তিকে যে-কোন ভৌতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। তাড়িত শক্তি তাপ আলোক চুম্বক শক্তিতে, তাপ আলোক চুম্বক শক্তিকে তাড়িত শক্তিতে পরিণত করা যায়। শক্তির এই ভাবান্তর ও রূপান্তর-প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় "শক্তির সমাবর্ত্তন" বলা হইয়া থাকে। পণ্ডিত গ্রোভের শক্তির এই সমাবর্ত্তন পদ্ধতি হেলম হোট্‌স্ (Helmhotts) এবং মায়র (Myer) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ আরও বিশদ-ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং তাহার ফলে ইহা প্রমাণিত

হইয়াছে যে, ভৌতিক শক্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে মৌলিক শক্তি নহে, উহা এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন বিলাস। শক্তির কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি বিনাশ নাই, উপচয় অপচয় নাই—শুধু ভাবান্তর ও রূপান্তর হয় মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার নাম দিয়াছেন conservation of energy বা শক্তির রূপান্তরীকরণ। দার্শনিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বৈজ্ঞানিকের শক্তির এই সমাবর্ত্তন প্রক্রিয়াকে অধিকতর বিশ্লেষণ করিয়া ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে শুধু কেবল তাপ আলোক তাড়িত চুম্বক প্রভৃতি ছয় প্রকার ভৌতিক শক্তিই রূপান্তরিত হয় তাহা নহে, জীবশক্তি এবং প্রাণশক্তিও রূপান্তরিত হইতে পারে। তাহাও শক্তির পূর্ব্বোক্ত সমাবর্ত্তন বিধির অন্তর্ভুক্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সকল জাতীয় শক্তিই অন্য জাতীয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। সমস্ত শক্তিপুঞ্জেরই উৎস এক মহিমময়ী মহাশক্তি। এই শক্তি চিন্ময়ী কি মৃণ্ময়ী? জগৎ কি অন্ধ জড়শক্তিরই বিকাশ, না চিন্ময়ের বিলাস? এই সমস্যাই দর্শন ও বিজ্ঞানের মূল সমস্যা। বিজ্ঞানোক্ত শক্তির সঙ্কোচ ও সংপ্রসারণ-প্রক্রিয়া আলোচনা করিলে বৈজ্ঞানিক শক্তিপুঞ্জকে জগৎশক্তি বা জড়শক্তি বলিয়াই মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। বৈজ্ঞানিকের প্রাণশক্তি বা জীবশক্তিও জড়শক্তিরই স্তরভেদ মাত্র। বৈজ্ঞানিক মৃণ্ময়ের রাজ্য ছাড়িয়া চিন্ময়ের রাজ্যে পঁহুছিতে পারেন নাই। তাঁহার সাধনা জাগতিক শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দার্শনিক কিন্তু এখানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। দার্শনিকের মতে এই নিখিল বিশ্ব জ্ঞানময়ী মহাশক্তিরই বাহ্য অভিব্যক্তি। জড়-বিজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে বিশ্বেশ্বর মহাবিজ্ঞান। ভগবৎশক্তি সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়াই জড়প্রপঞ্চকে প্রকাশ করিতেছে। জগৎ জড়শক্তির খেলা হইলে আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় "জগৎ আন্ধ্যং প্রসজ্যেত"। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারও এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, জাগতিক প্রত্যেক পদার্থই জ্ঞানময়ী মহাশক্তিরই অভিব্যক্তি। এইজন্য তিনি শক্তিকে ফোর্স (force) না বলিয়া বলিয়াছেন power. Force জড়-শক্তির ও power চিন্ময়ী শক্তির প্রতীক।

ভারতীয় দার্শনিকগণ স্মরণাতীত কাল হইতেই জড় ও জীবশক্তিকে চিন্ময়ী শক্তির অভিব্যক্তিরূপেই বুঝিয়া আসিয়াছেন; কি স্থাবর কি জঙ্গম সর্ব্বত্রই চৈতন্যময় পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বিভিন্ন জাগতিক পদার্থে আমরা দেখিতে পাই। ঐ পুরুষকে দার্শনিক পরিভাষায় আমরা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া থাকি, আর তাঁহার অধিষ্ঠানের নাম 'ক্ষেত্র'।' শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পার্থ-সারথি অর্জ্জুনকে এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি জড়প্রপঞ্চ আমার অচিৎ প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতি, আর জীবপ্রকৃতি আমার পরা প্রকৃতি। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমার অচিৎ ও চিৎ প্রকৃতি আমাতেই অনুস্যূত রহিয়াছে। আমি ইহার অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত থাকিয়া জড়শক্তি ও জীবশক্তিকে আমার ঐশী শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছি।" নিখিল বিশ্বই আমার শরীর এবং প্রতি শরীরে আমারই বিকাশ। সকল পদার্থেরই যাহা সার, যাহা প্রাণ তাহাই আমি। চন্দ্র সূর্য্যের যে তেজঃ জগৎ উদ্‌ভাসিত করে, যে তেজঃ অগ্নিতে আলোকরূপে দীপ্তি পায় তাহা আমারই তেজঃ। আমিই জলের রস। আমিই আকাশের শব্দ। আমিই পুরুষের পুরুষত্ব, আমিই জীবের জীবন। যে আমি বাহিরে অগ্নিরূপে আলোক দান করি সেই আমিই প্রাণী জঠরে প্রবেশ করিয়া বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিয়া শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করি। সুতরাং ভিতরেও আমি, বাহিরেও আমি, আমি-ময় এ ত্রিভুবন। আমি কোথায়ও ব্যক্ত কোথায়ও অব্যক্ত। বেদবেদান্তে আমি ব্যক্ত, চরাচরে আমি অব্যক্ত। আমি বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতিগ। আমি লীলাবশে মনুষ্যাদি ব্যক্তভাব গ্রহণ করিলেও আমার নিত্য চৈতন্য স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না, সেইরূপে আমি পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমরূপে আমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষর ও অক্ষর, অচিৎ ও চিৎ প্রকৃতির অতীত হইয়াও ইহাদের শাসক ও ভাসক, এই জন্যই উপনিষদের ভাষায় পুরুষোত্তমকে বলা হইয়াছে "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি"। এখানে আসিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ বা জড় ও জীব এই মহাদ্বৈতের অদ্বৈতে পর্য্যবসান হইয়াছে। উপনিষদ এই প্রকৃতি পুরুষকে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে নানা সংজ্ঞায় ও নানা ভাষায় অভিহিত

করিয়াছেন। "কোথায়ও ইহাদিগকে বলা হইয়াছে 'অন্ন' ও 'অন্নাদ', মূল প্রকৃতি ও প্রত্যগ্‌ আত্মা। কোথায়ও বলা হইয়াছে স্বধা ও প্রযতি, রয়ি ও প্রাণ, অপ্‌ ও মাতরিশ্বা—উপনিষদের এই সকল শব্দের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতই একথা মনে আসে যে, বিজ্ঞানের জঙ্গম ও স্থাবরাত্মক জড়প্রপঞ্চ দর্শনের যোগসূত্রে গ্রথিত থাকিয়াই আমাদের জ্ঞান রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছে। বিজ্ঞান শরীর, দর্শন তাহার প্রাণ। যে চৈতন্য জড়ে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছে তাঁহার স্বরূপের সন্ধানই দর্শনের কাম্য, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও জড়কে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। জড়েও তাঁহারই বিকাশ। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই ক্ষর ও অক্ষর, প্রধান ও পুরুষ matter ও force উভয়কে শাসিত করেন। কেবল শাসিত করেন তাহাই নহে, এই সমস্ত জড়-প্রপঞ্চ ও জীব পরমাত্মারই বিধা ও প্রকারভেদ মাত্র। আত্মজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে পরমাত্মার বিভাব এই চিদচিৎপ্রকৃতি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমাত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়। এইজন্য বেদান্ত বলিয়াছেন—ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে, সৎ ও তৎরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহার ব্যক্ত ও মূর্ত্তরূপ জড়বিজ্ঞানের, অব্যক্ত ও অমূর্ত্তরূপ দর্শনের জিজ্ঞাস্য। ঐ রূপদ্বয়ও স্বতন্ত্র বা বিযুক্ত নহে, উহা মহেশ্বরপরতন্ত্র, এই জন্যই মহেশ্বর শৈব আগমের মতে অর্দ্ধনারীশ্বর। এক অঙ্গে তিনি হর, অপর অঙ্গে তিনি গৌরী। হরগৌরীর নিত্য মিলনই প্রকৃতি পুরুষের মিলন। শক্তি কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াই শিব শিব, নতুবা তিনি শবমাত্র। নিখিলবিশ্বই শক্তির বিলাস। শক্তি বস্তুতঃ এক এবং অভিন্ন হইলেও জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপে শক্তির দ্বিবিধ বিভাব শৈব দার্শনিকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। জ্ঞানশক্তি অন্তর্মুখী, আর ক্রিয়াশক্তি বহির্মুখী। অন্তর্মুখী শক্তি শক্তির অব্যক্তরূপ, ব্যক্তরূপে ঐ শক্তি বহির্মুখী। এই বহির্মুখী শক্তিই জগৎপ্রসবিনী মহাশক্তি। বহির্জগতে শক্তির যতপ্রকার বিভিন্ন অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই ঐ জগজ্জননী মহাশক্তিরই বিভাব। ইহাই শৈবদার্শনিকের মহাবিদ্যা। এই বিদ্যার বিভাবেই ঈশ্বর মহেশ্বর। শৈবদর্শনের এই মহাশক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে জড়শক্তি এবং জীবশক্তিও যে একই মহাশক্তির বিকাশ তাহা স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় এবং বিজ্ঞান ও দর্শন এই দুই চিন্তাশাস্ত্রই যে একই শাশ্বততত্ত্বের বাহ্য ও আন্তর রূপ পরীক্ষা করিতেছে ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। পরীক্ষা-পদ্ধতি ও পরীক্ষিতব্য বিষয়ের ভিন্নতাবশতঃ বিজ্ঞান ও দর্শন এই উভয়বিধ পরীক্ষাশাস্ত্রের গতি ও প্রকৃতি বিভিন্নমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্যই জড়বিজ্ঞানকে দর্শন বা দর্শনকে জড়বিজ্ঞান বলা চলে না; তবে এই উভয়শাস্ত্রই এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তুরই অন্তঃ-প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি পরীক্ষায় ব্যাপৃত বলিয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যে অতিঘনিষ্ঠ যোগ আছে তাহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না, তত্ত্বজিজ্ঞাসায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যেখানে শেষ দার্শনিক পরীক্ষার সেখানেই আরম্ভ।

জীবন-তটিনী

শ্রীমোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তটিনী দুকূল হারা
বুক ভরা জলধারা
বয়ে যায় নিরবধি আপনার মনে।
ভাঙ্গন ধরিলে তায়
কে বা জানে কবে হায়
নীরবে মিশিয়া যাবে পারাবার সনে॥

জাতিভেদ ও তাহার বিষময় ফল

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় কে-টি, ডি-এসসি,

সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুদিগের মধ্যেই জাতিভেদের ন্যায় এমন একটা কুপ্রথা বিদ্যমান আছে। মানুষ মানুষকে স্পর্শ করিলে একে অন্যকে অশুচি জ্ঞান করিবে, অথচ মরা ইঁদুর মুখে করিয়া আস্তাকুঁড় ঘাঁটিয়া পোষা বিড়াল স্বচ্ছন্দে রান্নাঘরে ঘুরিতে পারিবে—অন্ততঃ ঘুরিলে কেহ অপবিত্র মনে করিবে না—ইহার মধ্যে যৌক্তিকতা কোথায়? অথচ এইভাবেই আমাদের দিন কাটিতেছে—জাতিভেদ ও তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফল অস্পৃশ্যতা আমরা দূর করিতে পারিতেছি না।

বিড়াল আমাদের থালা হইতে মাছ তুলিয়া লইলে আমরা হয়ত তত সঙ্কুচিত হই না—যত সঙ্কুচিত হই আমরা একজন তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতি যদি চৌকাঠ পার হইয়া ঘরের ভিতর মাথা গলায়! একরশি তফাতে থাকিলেও আমাদের ভাতের হাঁড়ি জলের কলসী সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় —যেন অর্জ্জুনের শরসন্ধানের ন্যায় অপবিত্রতা বিষ তাহার শরীর হইতে অলক্ষ্যে ভাতের হাঁড়িতে প্রবেশ করে! শুধু তাই নয়, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার "দৃষ্টিদোষ" বলিয়া আর একপ্রকার দোষ বর্ত্তমান। কোন পারিয়া (অস্পৃশ্য) কোন ব্রাহ্মণের আহার দেখিলে ব্রাহ্মণের দোষ হয়। তাই পরদা টাঙ্গাইয়া তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সব দেখিয়া শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বড় দুঃখে বলিয়াছেন। "হিন্দুধর্ম্ম এখন ভাতের হাঁড়ি ও জলের কলসীতে আত্মগোপন করিয়া স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে।"

সমস্ত পৃথিবী আজ আত্মোন্নতির সাধনায় মগ্ন। জাপানের নব জাগরণ আমার চোখের উপর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে হইয়াছে—মাত্র ৭০ বৎসরের মধ্যে জাপান কি করিয়াছে ইহা হয়ত কাহারও দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই—বিরাট কারখানায় সুবৃহৎ রণতরী নির্ম্মাণ করিয়া, কামান বন্দুক বিস্ফোরক প্রস্তুত করিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের 'অসভ্য জাপান' আজ ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে, অথচ হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে এই হিন্দুজাতি জীবনের কোন লক্ষণ দেখাইতে পারিল না! কেন এমন হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়িবে আমাদের অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থা। জাতিভেদের ন্যায় একটা অতি কৃত্রিম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সমাজে চালু করিয়া হিন্দু তাহার 'একত্ব'বোধ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে এবং নানাবিধ সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়া নিজের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। "চতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ইত্যাদি কতকগুলি শ্লোকবাক্যে এই কৃত্রিম ব্যবস্থাকে একটা শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডলী (background) দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে—মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুচি হইবে—পৃথিবীর কোন দেশে, কোন ধর্ম্মে, কোন কালে এ ব্যবস্থা ছিল না বা নাই। অথচ হিন্দুধর্ম্মে এমন একটা ব্যবস্থা শুধু চলিতেছে তাহাই নয়, তাহাকে শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিবার হাস্যকর প্রচেষ্টাও চলে এবং তাহা আবার এই বিংশ শতাব্দীতে! শাস্ত্রের নাকি অনুশাসন আছে—শূদ্রের কর্ণে বেদমন্ত্র প্রবেশ করিলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিতে হইবে! আদর্শচরিত্র প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্র শূদ্র হইয়াও তপস্যা করিবার অপরাধে শম্বুকের প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন! আজও দেখিতে পাই দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই—তথাকথিত ব্রাহ্মণেতর জলচল জাতি-সমূহ মন্দিরের বারান্দায় বা সিঁড়িতে উঠিতে পারিবেন কিন্তু অস্পৃশ্যগণের পক্ষে মন্দিরের সিঁড়িতে পর্য্যন্ত উঠিবার অধিকার নাই—দূরে বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দেবদর্শন করিতে হইবে! দেব আরাধনার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া যাহাদিগকে দূরে রাখা হইয়াছে তাহারা তোমার সমধর্ম্মী ইহা প্রয়োজনের খাতিরে তুমি বলিলেও জগতে কেহ স্বীকার করিবে না!

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে

বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

ভারতবর্ষ আজ বড়ই দুঃসময়ের মধ্য দিয়া চলিতেছে এবং এ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় এক সর্ব্বভারতীয় জাতি গঠন। জাতি উপজাতি সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষে একজাতি গঠন কবে সম্ভব হইবে—আদৌ সম্ভব হইবে কি'না জানি না, কিন্তু তাহা না হইলে ধ্বংস নিশ্চিত। মাত্র ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের রাষ্ট্রনেতা সুনইয়াৎ সেনের অনুপ্রেরণায় চীন-সম্রাটকে পদচ্যুত করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর হইতে গত ২৭।২৮ বৎসর ধরিয়া চীনের অন্তর্বিপ্লব প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে অধিবাসীগণের মধ্যে যে তিক্ততা আনিয়া দিয়াছিল কে জানিত কবে তাহার নিরসন হইবে। চীনের প্রবল বৈদেশিক শত্রু জাপান চীনের অন্তর্বিপ্লবের এই মহাসুযোগে চীন আক্রমণ করিল, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি চ্যাং কাই শেক্ ও তদীয় যোগ্যা সহধর্ম্মিণীর নেতৃত্বে সমগ্র চীন সংঘবদ্ধভাবে একমন একপ্রাণ হইয়া জাপানকে প্রতিরোধ করিতেছে। চীনে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বাস করে—বৌদ্ধ আছে, মুসলমান আছে, কনফিউসিয়ান আছে, খৃষ্টান আছে, কিন্তু জাতিভেদ নাই, অস্পৃশ্যতা নাই। সেইজন্যই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে একত্র করিয়া একজাতি গঠন করিতে তাহাদের কোন বেগ পাইতে হয় নাই।

চীনের সহিত তুলনা করুন আমাদের দেশের। মুষ্টিমেয় তুর্কী (মোগল ও পাঠান) সৈন্য অবলীলাক্রমে হিন্দু রাজার হাত হইতে রাজদণ্ড ছিনাইয়া লইতে পারিল, মুষ্টিমেয় ইংরেজ ব্যবসায়ী মুসলমান বাদশাহের হাত হইতে অনায়াসে শাসনভার কাড়িয়া লইল। কেন এমন হয়, প্রশ্ন করিলে জবাব পাই আমাদের জাতীয়তাবোধের অভাব—জাতি ত আমাদের নাই, বিভিন্ন 'ভেদে' কণ্টকির্ত হইয়া ইহা বহুপূর্ব্বেই মরিয়া গিয়াছে! আজ যদি জাতীয়তাবোধ জাগাইতে হয়, জাতিভেদ দূর করিতে হইবে।

পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর হইতে রণতরী লইয়া মগ দস্যুগণ পদ্মা, গঙ্গা, মেঘনা প্রভৃতি নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে নানারূপ উপদ্রব উৎপীড়ন করিত। মুষ্টিমেয় মগ দস্যুকে প্রতিহত করিতে বিন্দুমাত্র উদ্যম প্রকাশ না করিয়া গ্রামবাসীগণ পূর্ব্বাহ্নেই "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতি অনুসরণ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেন। এই বিপদের সময় যাহারা রুগ্ন, যাহারা বৃদ্ধ বা যাহারা অন্য কারণে অসমর্থ হইয়া স্থানান্তরে গমন করিতে পারেন নাই, মগ দস্যুগণ চলিয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত পলায়মান "বীরপুঙ্গব"গণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে "মগো" আখ্যা দিয়া সমাজে পতিত করিয়া রাখিলেন। এইভাবে 'মগো বামুন,' 'মগো কায়েত' নামে স্বতন্ত্র পতিত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। "যশোহর ও খুলনার ইতিহাস" লেখক একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "হিন্দু সমাজ পায়ে ঠেলিতে জানে, কোল দিতে জানে না।"

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সংখ্যায় শতকরা ৮০জন বা তাহারও বেশী। আমাদেরই রসরক্তে তাহাদেরও দেহমন গঠিত, তাহারাও এই দেশেরই লোক এবং এই হিন্দু জাতিরই সন্ততি। হিন্দুসমাজের অসহনীয় উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া তথাকথিত অন্ত্যজ অস্পৃশ্য হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা ও ভ্রাতৃত্বে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার মূলেও সেই একই জাতিভেদ। ধোপা, নাপিত প্রভৃতি এই অস্পৃশ্যগণকে তোমরা কোন অধিকারই দাও নাই—তথাকথিত তপশীলভুক্ত জাতিরা যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের সাহায্য লইয়া আজ তোমার অধিকার অস্বীকার করে—তোমাকে ন্যায্য অধিকার না দেয়—তোমার অনুযোগ করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিবে?

একবার একটা গল্প শুনিয়াছিলাম যে, এক ভদ্র মুসলমান কোন হিন্দু বাড়ীতে এক মজলিশে আসিয়া বসায় সেখানকার হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হইল। ভদ্রলোকটি ইহাতে অপ্রতিভ না হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি লেমনেড কিনিয়া আনিয়া দিলে তাহা দ্বারা হুঁকা ভরিয়া দিলে অনায়াসে মানরক্ষা হইল। আমার প্রশ্ন এই যে, জল ও লেমনেডের মধ্যে তফাৎ করা হয় ইহার মধ্যে যুক্তি কতটুকু আছে? কোন্ বিশিষ্ট কুলীন সন্তান গঙ্গাস্নান করিয়া নামাবলী গায়ে গায়ত্রী জপ করিতে করিতে ঐ লেমনেড প্রস্তুত করেন?

বাঙ্গলাদেশের জনসংখ্যায় উচ্চ বর্ণের হিন্দু কয়জন? পাঁচ

কোটি লোকের মধ্যে উর্দ্ধসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ, অর্থাৎ—শতকরা ছয় জন। জাতীয় আন্দোলনই হোক বা যে-কোন প্রগতিশীল আন্দোলনই হোক—যখন ডাক আসে তখন যদি অত্যাচারিত অবহেলিত এই অস্পৃশ্যগণ উচ্চবর্ণের পাশে আসিয়া না দাঁড়ায় তবে তাহাদিগকে দোষ দিতে পারা যায় কি? সংঘবদ্ধ হইয়া যাহারা দেবপূজা করিতে পারে না—তাহারা কি করিয়া একতাবদ্ধ হইয়া দেশমাতৃকার পূজা করিতে পারিবে? কবিবর হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন, "একবার তোরা জাতিভেদ ভুলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র মিলে"—কিন্তু সে মিল এখনও হইল না!

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কোন দিন জাতিভেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছিল কি-না তাহা গবেষণার বিষয় নহে—ইহার কুফল দেখিয়া ইহাকে দূর করিতে হইবে—এই কর্ত্তব্য। যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সনাতনীগণ জাতিভেদ সমর্থন করেন, সেই শাস্ত্রেরই শাস্ত্রকারগণের মধ্যে ব্যাসদেব, পরাশর মুনির ঔরষে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সত্যকাম কুমারী জবালার পুত্র হইয়াও 'তুমি দ্বিজোত্তম তুমি সত্যকুলজাত' বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত উদাহরণ দিয়া আমি শুধু এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি যে কতকগুলি যুক্তিবিহীন আচার মানিয়া চলা কোন দিন কোন জীবন্ত জাতির প্রাণের ধর্ম্ম হইতে পারে না, অনাগত ভবিষ্যতের ভারতীয় জাতির প্রাণ বর্ত্তমান জাতিভেদ উচ্ছেদে প্রতিষ্ঠা হইবে। এ কথা ভুলিলে চলিবে না—

"সর্ব্বত্র শাস্ত্রমাশ্রিত ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।"

দীর্ঘদিন হইতে সমাজের এই দুরারোগ্য ব্যাধি সকলের চোখে পড়িয়াছে—আমি নিজেও প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল যাবৎ "জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা" সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ, পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি—নানা সভায়, আলাপে আলোচনায় এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতীকার করিবার জন্য দেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয় তাদৃশ সাফল্য লাভ করি নাই। কেন এমন হয়—বাঙ্গালী যুবকসমাজের অনেকে কঠোর কারাদণ্ড, অসহনীয় নির্য্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে, আশ্চর্য্য হইয়াছি যখন দেখিয়াছি তাহারাই জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সঙ্কুচিত হইয়াছে। যে যুবক উদার দৃষ্টি লইয়া সংসারে বড় হইতে চাহিয়াছে অসঙ্কোচে সেও জাতিভেদের যূপকাষ্ঠে নিজের মাথা বাড়াইয়া দিয়াছে! ইহার কারণ, আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমাদের দেশের মেয়েদের দুর্ব্বলতা। নেপোলিয়ন দেশের জননীদের সাহায্যে নূতন ফরাসী গড়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, হিট্লার, মুসোলিনি, চীন, তুর্কী, আরব, তুরস্ক সকলেই জানে দেশের নারীশক্তি কোন আন্দোলনে মন না দিলে সে আন্দোলন জয়যুক্ত হইতে পারে না। কারণ মায়ের বুক হইতে সন্তান শুধু দুগ্ধ আহরণ করে না—সঞ্চয় করে তাহার অস্থিমজ্জা, তাহার দোষ গুণ, তাহার সব কিছু। অবশ্য পিতামহী মাতামহীও তাহার মনুষ্যত্ব ও চরিত্রগঠনের জন্য কতকটা দায়ী। তাই আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, দেশের মহিলাসমাজ এ আন্দোলন গ্রহণ না করিলে কোন দিন জাতিভেদ উঠিয়া যাইতে পারে না। "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" ইহা ত কবিকল্পনা নহে ধ্রুব সত্য—অত্যাজ্য প্রয়োজন।

এই কারণেই বার্দ্ধক্যের জরা ব্যাধি উপেক্ষা করিয়া এই অপটু দেহ লইয়া ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সত্বেও আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। যে অন্যায় অত্যাচার ও পাপের উপলক্ষ করিয়া আজীবন তীব্র মন্তব্য করিয়া আসিয়াছি সেই জাতিভেদের বিপক্ষে সমবেতভাবে অভিযান করিবার জন্য এই জীবনসায়াহ্নে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। কবি সত্যেন্দ্রনাথের সহিত সকলে একবাক্যে বলুন:

"গোত্র লইয়া গরুরা থাকুক
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে।" *

---

* নিখিল ভারত নারী সম্মিলনের ঢাকা শাখার অধিবেশনে আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ।

উপলক্ষ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল ইনসিওরেন্স অফিসে অমূল্য চাকরি করে। কেরাণীর কাজ। মাহিনা পায় চল্লিশ টাকা।

অমূল্য বি-এ পাশ করিয়াছে। মনে অনেক আশা ছিল এম-এ পাশ করিবে, ল' পাশ করিবে; করিয়া ··

কিন্তু একশো'জন তরুণ বাঙালীর মধ্যে নব্বই-জনের ভাগ্যে যেমন ঘটে, অমূল্যর জীবনেও তাই ঘটিয়াছে। বাপ মারা গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মা। মন ভাঙ্গিয়া গেল—কাজেই মনের আশার কুসুমকলি অবলম্বন হারাইয়া ঝরিয়া গেছে।

অমূল্য ঘরে বসিয়া রহিল চুপচাপ প্রায় ছ'মাস।

কিন্তু সুশীলা···তরুণী পত্নী! সে কেন অমূল্যর সঙ্গে পড়িয়া দুঃখভোগ করিবে?

অমূল্য বাহির হইল চাকরির সন্ধানে—চাকরি নহিলে দিন চলিবেনা! বহু-কষ্টে বন্ধু কিশোরীর দৌলতে বেঙ্গল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরি মিলিয়াছে। চাকরি পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। নহিলে কি যে হইত···

সেদিন স্নান সারিয়া খাইতে বসিবে, ডাকওলা দু'খানা চিঠি দিয়া গেল। খামের উপরে টাইপ-করা নাম-ঠিকানা। অমূল্য খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িল। প্রথম চিঠি আসিয়াছে ক্যালকাটা থিয়েটার কোম্পানির অফিস হইতে। তারা একরাশ ছাপানো কাগজের সঙ্গে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছে—তিন বৎসর মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া দিলে সেক্সপীয়রের সমগ্র গ্রন্থাবলী অমূল্য ঘরে বসিয়া পাইবে। চিঠি পাইলেই কোম্পানি খুশী মনে সচিত্র প্রশ্পেক্টাস পাঠাইয়া অমূল্যকে বিমোহিত করিয়া দিবে ইত্যাদি!

চিঠি পড়িয়া অমূল্য হাসিল। বাজার-খরচের জন্ম নিত্যদিন যার দুশ্চিন্তার সীমা নাই, তার সে দুশ্চিন্তা সেক্সপীয়র কোনোকালে ঘুচাইতে পারিবেন না···

দ্বিতীয় চিঠি পড়িয়া অমূল্য চমকিয়া উঠিল। চিঠিখানিতে নূতনত্ব আছে। সে নূতনত্ব বাস্তব জীবনে ঘটেনা। চিঠিখানি ইংরাজীতে লেখা।

অমূল্য পড়িল—

প্রিয় মহাশয়

পাঞ্জাব-কেশরী পত্রিকায় প্রকাশ, আপনার এক আত্মীয় লাহোরে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে আপনার নামে উইল-পত্র দ্বারা তিনি পাঁচ-হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের কাজ বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে গৃহস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করা। সেজন্য শতকরা পাঁচসিকা হিসাবে কমিশন গ্রহণ করিয়া থাকি। যথাসময়ে এই পত্রসহ আমাদের সঙ্গে দেখা করিলে উক্ত টাকা ঘরে বসিয়া আপনি যাহাতে প্রাপ্ত হন, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি নিরূপণ করিব।

আপনার অতি-বাধ্য ভৃত্য গণপতি সান্যাল
দী ক্যালকাটা এপার্টিম্যান্‌স্ ফ্রেণ্ডস কোং।

চিঠি পড়িয়া আনন্দাতিশয্যে অমূল্য গিয়া রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইল, ডাকিল—শীলা·· শীলা ওরফে সুশীলা তখন ঝোল সাঁৎলাইতেছে···

সুশীলা কহিল—এই যে হলো গো·· ঝোলটা নামিয়ে রেখেই তোমায় ভাত দিচ্ছি।

অমূল্য বলিল—ভাত দেবার কথা নয়। কি চিঠি এসেছে, ঢ্যাখো···

এ-কথায় শীলার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বাবা থাকেন পাটনায়। তাঁর ওখান হইতে চিঠি আসিল নাকি ·· কোনো দুঃসংবাদ? মার ব্লাডপ্রেসার বাড়িয়াছে···?

ঝোলের কড়া নামাইয়া ব্যস্তভাবে সে আসিল অমূল্যর কাছে, কহিল—মার অসুখ বাড়লো নাকি?

অমূল্য কহিল—না, না···সুসংবাদ···

সুসংবাদ! নিশ্বাস ফেলিয়া সুশীলা কহিল—রোজ আমি ঠাকুরকে ডাকি! হবেনা? তিনি মুখ তুলে চাইলেন বুঝি...

অমূল্য কহিল—শোনো, কি চিঠি! আমি চিঠি পড়ে প্রত্যেকটি কথা তর্জ্জমা করে তোমায় বলি···

অমূল্য চিঠি পড়িয়া প্রত্যেক কথা বাংলা তর্জ্জমা করিয়া সুশীলাকে বুঝাইয়া বলিল।

শুনিয়া সুশীলা বলিল—আজই যাও আপিসের ছুটীর পর···কুড়েমি করো না।

অমূল্য বলিল—পাগল! ছুটীর পরে গেলে অফিস খোলা পাবো কেন? টিফিনের সময় বেরিয়ে পড়তে হবে। নাহলে এদেরো এটা অফিস · আড়ৎ নয়···এরাও তো পাঁচটায় অফিস বন্ধ করবে।

সুশীলা কহিল—তাহলে তাই যেয়ো···আমি তুলসীতলায় পাঁচটা পয়সা পুঁতে রাখি গে···ভালো খপর নিয়ে ফিরলে হরির লুট দিতে হবে···

হাসিয়া অমূল্য কহিল—তার আগে নয়। ঠাকুর পাছে ফাঁকি দেয়,·· না?

শিহরিয়া সুশীলা কহিল—ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে এমন তামাসা করতে নেই···ছি!···তাহ'লে তুমি বসো গিয়ে —আমি ঝোলটা নামিয়ে ভাত দি। ভেবেছিলুম, বাড়ীতে হাঁসের ডিম রয়েছে, তু'খানা ডিমের বড়া ভেজে দেবো···

অমূল্য কহিল—ভাজো তুমি ডিম·· তোমার স্বামীসেবার আশা চরিতার্থ করো···সে-সুযোগ আমি তোমায় দিলুম আজ···in honour of the legacy!

সুশীলা রান্নাঘরে ঢুকিল···অমূল্য আসিল শয়ন-কক্ষে···

খোলা জানলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল · পথে লোকজন চলিয়াছে, গাড়ী-ঘোড়া চলিয়াছে। মনে হইল, তুনিয়ার চেহারা যেন এক-নিমেষে বদলাইয়া গিয়াছে · অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন আলোর লহর বহিয়া আসিয়াছে···

অমূল্য ভাবিল, পাঁচ হাজার টাকা! কোম্পানি কমিশন লইবে শতকরা পাঁচসিকা হিসাবে·· তার মানে, আড়াইশো টাকা! অনেকগুলা টাকা—পাঁচ হাজার টাকা হইতে আড়াইশো টাকা বাদ দিলে থাকে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ! সে-টাকা হইতে আরো আড়াইশো লইলে বাকী থাকিবে সাড়ে চার! এ সাড়ে চার হাজারে হাত দিবেনা। সুশীলার নামে ক্যাশ-সার্টিফিকেট কিনিয়া দিবে! সংসারে দায়-অদায় আছে···ছেলেমেয়ে হইবে—তাদের লেখাপড়া শিখানো, মেয়ের বিবাহ···আড়াইশো টাকা যে লইবে, সে-টাকায় সুশীলার অন্ত মডার্ন-ষ্টাইলের তু'খানা গহনা · এ-বয়সে সুশীলার সথ আছে তো আছে···বেচারী! বিবাহের পরে কি-বা পাইয়াছে...হাঁড়ি ঠেলিয়া তার এ সুমধুর যৌবনশ্রী জ্বলিয়া ছাই হইতে বসিয়াছে!

সামনে যেন সিনেমার পর্দ্দা···পাঁচ হাজার টাকার মেশিন ধরিয়া সে-পর্দ্দায় রঙ-বেরঙের ছবি চলিয়াছে···

সুশীলার আহ্বানে সিনেমার পর্দ্দা সরিয়া গেল। সুশীলা বলিতেছিল—এসো গো, দশটা বাজছে। ভাত বেড়ে আমি বসে আছি··

চমকিয়া অমূল্য আসিয়া আসনে বসিল, বলিল—টাকাটা পেলে কি-কি করবো, প্ল্যান করছিলুম!

হাসিয়া সুশীলা কহিল—থামো, আগে টাকা আসুক। আগে থাকতেই কালনেমির লঙ্কা-ভাগ করো না।···

আহারাদি সারিয়া অফিসে আসিয়া পৌছিতে বি[illegible] মিনিট লেট্।

পাশের চেয়ারে বসে শ্রীনাথ। সে বলিল—বাইশ-গড়া[illegible] এজেণ্ট এসেছে। তোমার কাছে তার ফাইল আছে সরকার তু'বার তোমার খোঁজ নেছে।

সরকার অর্থে পি, সরকার সেক্রেটারি। পিতৃদত্ত না[illegible] পঞ্চানন--তু'চারিটা ইনসিওরান্স অফিস ঘুরিতে ঘুরি[illegible] ধুতি ছাড়িয়া প্যাণ্ট-কোট ধরিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চান[illegible] নাম পি সরকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সরকার ভারী কড়া লোক। লোকের দোষ খুঁজি[illegible] ফিরিতে মজবুত! ভুলিয়া কাহারো সুখ্যাতি করে না তার কাছে ধমক খাইয়াছে অফিসে অনেকে; শুধু অমূ[illegible] কোনো মতে ধমক বাঁচাইয়া চাকরি করিতেছে।

শ্রীনাথের কথায় অমূল্য বলিল—একটু দেরী হয়ে গে[illegible] আজ· ·মানে, বিশেষ ব্যাপারে। বলবো'খন···

শ্রীনাথ বলিল—বৌয়ের অসুখ করেনি তো?

—না।

—তবে?

অমূল্য বলিল—আরে ভাই, খেতে বসছি, এমন সময়…

এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে, পি, সরকার আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। অমূল্য কহিল—গুড্ মর্ণিং…

সরকার কহিল—Morning…লেট্ করে এসেছো কেন? কোম্পানি যে মাসে মাসে মাহিনা-বাবদ টাকা দিচ্ছে, সে কি তোমাদের চেহারা দেখবার জন্য? কেন লেট্ হলো?

সদ্য পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্তির আশা! সে শক্তি অমূল্যকে আজ অনেকখানি সবল করিয়া তুলিয়াছে। অমূল্য বলিল—প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার নেই। কারণ, কোনো অফিসই কারো চেহারা দেখে মাইনে দেয় না—এ জ্ঞান আপনার যেমন আছে, আমারো তেমনি আছে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, আমি ছ'মাস চাকরি করছি, তার মধ্যে কোনোদিন এক মিনিট লেট হয়নি… আজ এই প্রথম।

সরকারের মুখের উপর এতখানি দীর্ঘ উত্তর এ পর্য্যন্ত কেহ দেয় নাই। না দিবার কারণ, কেহ উত্তর দিবার প্রয়াস করিলেই সরকার এমন রুক্ষ কঠিন ভর্ৎসনা সুরু করে যে নিতান্ত চাকরি করে বলিয়াই সকলে সে তিরস্কার গলাধঃকরণ করে। কোনোদিকে কোনো উপায় থাকিলে সে ভর্ৎসনার শেষ হয়তো পুলিশ কোর্টে গিয়া পৌছিত! অর্থাৎ সরকারকে তারা উত্তম-মধ্যম দিতে এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিত না!

অমূল্য এতখানি জবাব দিতেছে এবং সরকার সে জবাবের গোড়া কাটিয়া ভর্ৎসনা সুরু করে নাই…ইহাতে সকলে বিস্ময়ে ভয়ে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

অমূল্যর কথা শেষ হইলে সরকার বলিল—চল্লিশ টাকা যে মাইনে পায়, তার পক্ষে কোনো কারণেই লেট করা চলে না—বিশেষ, ইনসিওরান্স অফিসে। সরকারী অফিস হলে এত সাহস হতো না!

এ কথায় অমূল্যর রাগ হইল। সে বলিল—যাঁরা চারশো টাকা পান, তাঁরাই শুধু লেট করবেন?

Impertinence! সরকার হুঙ্কার ছাড়িল। কহিল—বি-এ পাশ করেছো বলে নিজেকে তুমি ভাবো…that…that…that…

অমূল্য বলিল—যা বলবেন, বাঙলায় বলুন। আপনার-আমার দুজনেরি mother-tongue মাতৃ-ভাষা…

জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। সরকার বলিল—বাড়ী যাও। তুমি ডিশমিস্!

বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

অমূল্য এ আঘাত সহিল অবিচলিত ভাবে; কহিল—বেশ। কিন্তু লেট হবার কারণ বলতে না দিয়ে আপনি…

—Shut up…বি-এ পাশ বেকার অনেক মিলবে। পাশের অহঙ্কারে অফিসের অনেককে তুমি revolting করে তুলেচো…কোনো কথা বলবার দরকার নেই। …এখন তোমার ছুটী। তুমি যেতে পারো। তুমি—তুমি ভয়ানক…ভ-ভ-ভ-য়ঙ্কর ইন্‌শোলেণ্ট চ্যাপ্!

অমূল্য বলিল—চ্যাপ বলবেন না · চ্যাপ্ কথার ম্যানেটা ডিক্সনারী খুলে একবার দেখবেন!…ইংরিজি কথা বললেই হয় না—তার মানে জেনে তবে বলতে হয়!…তা বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনার অপমান শিরোধার্য্য করে নিঃশব্দে চলে যাবো না। আমি যাবো স্যর মানগোবিন্দর কাছে। এ্যাপীল করবো…কম্‌প্লেন করবো আপনার insolenceএর বিরুদ্ধে। আমরা ভদ্র-সন্তান…আপনার গোলামি করতে আসিনি যে আপনি যা-খুশী তাই বলবেন!

এ কথার পর অমূল্য আর দাঁড়াইল না…চলিয়া আসিল। ঘরে ছিল আরো আটজন কেরাণী, দু'জন বেয়ারা এবং একজন টাইপিষ্ট…ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়িয়াছে…এমনি তাদের স্তম্ভিত ভাব!

স্যর মানগোবিন্দ কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তিনি অফিসে আসেন বেলা চারিটায়। ছ'মাস আগে সরকার আর-একটি ছোকরা-এপ্রেন্টিসকে ডিসমিস করিয়াছিল। সে-বেচারী স্যর মানগোবিন্দর কাছে গিয়া আর্জী করিয়া সরকারের হুকুম নামঞ্জুর করিয়া আবার চাকরিতে বাহাল হইয়াছে! তার সঙ্গে সরকার কথা কয় না—কোনো কাজের প্রয়োজন হইলে একে-তাকে ডাকিয়া সে কাজ সারিয়া লয়।

অফিস ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া অমূল্য ভাবিল, এখন কি করিবে? স্যর মানগোবিন্দর গৃহে গিয়া এখনি অভিযোগ জানাইবে?

না…হয়তো এখন তিনি বিশ্রাম করিতেছেন! বড়

লোকের বিশ্রাম-কালে গিয়া ঘ্যান-ঘ্যান করা···বেয়াদবি হইবে! তার চেয়ে···

ঠিক···ক্যালকাটা প্রপার্টিম্যান্‌স্‌ ফ্রেগুসের অফিসে গিয়া ব্যাপারখানা জানিয়া আসা যাক। খপর যদি সত্য হয়, চাকরি গেলেও দুঃখ তত বাজিবে না!

তাদের অফিস হ্যারিসন রোডে। ফ্রেগুসের চিঠিখানা পকেটে ছিল। দেখিয়া হ্যারিসন রোডের একখানা পাঁচতলা বাড়ীর সদরে আসিয়া দাঁড়াইল। সামনে ছিল দরোয়ান। সন্ধান করিয়া জানিল, চারতলার উপরে কোম্পানির অফিস।

অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙিয়া চারতলায় অফিসে আসিয়া সে একটি কেরাণী-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—সেক্রেটারি গণপতি সান্ন্যাল মশায়?

কেরাণী কহিল—কোথা থেকে আসছেন?

অমূল্য কোম্পানির-লেখা চিঠি দেখাইল। কেরাণীবাবু কহিল—বসুন। আমি খপর দিচ্ছি।

অমূল্য বসিল। কেরাণীবাবু চলিয়া গেল।

দশ মিনিট পরে কেরাণীবাবু ফিরিল, কহিল—ও-ঘরে যান···

নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া অমূল্য দেখে, একটি টেবিলের উপর রাশীকৃত খাতা ও কাগজ এবং সেই খাতা খুলিয়া বসিয়া আছেন—সাহেবী পোষাক-পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক কহিলেন—আপনার নাম অমূল্যচরণ রায়?

অমূল্য কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বসুন, বসুন·· তার আগে আপনাকে congratulations জানাই···

অমূল্য চেয়ারে বসিল। ভদ্রলোক কহিলেন—আপনার বয়সে যদি আমার এ-সৌভাগ্য ঘটতো, তাহলে আজ আর এ-অফিসে আমায় বসতে দেখতেন না!

অমূল্য কহিল—খপরটা সত্য? আপনাদের কোনো ভুল হয় নি?

—ভুল! গণপতি সান্ন্যাল কহিলেন—ভুল হতে পারে না। পাঞ্জাব-কেশরী পত্রিকার যে-ইশুতে এ-খপর বেরিয়েছে, সে ইশু-কাগজে যা যা details ছিল, তা নিয়ে আমরা সেখানকার কোর্ট থেকে খপর নিয়েছি। খপর না জেনে কি এ কাজ হাতে নিয়েছি!···সে পাঞ্জাব-কেশরীখানা চিঠির সঙ্গে attach করে পাঠানো হয়েছিল—পাঠায় নি বুঝি? আপনি শুধু ঐ চিঠি পেয়েছেন? পাঞ্জাব-কেশরী এক-কাপি পাননি?

অমূল্য কহিল—না।

গণপতি কহিলেন—বাবুদের ভুল! তা যাক, আর এক কাপি কাগজ আনিয়ে নেবো'খ'ন আপনার reference-এর জন্য···সিগারেট নিন।

কথাটা বলিয়া হাস্য মুখে গণপতি সিগারেটের বাক্স আগাইয়া দিলেন।

সলজ্জ কণ্ঠে অমূল্য কহিল—আমি স্মোক্‌ করি না··

গণপতি কহিলেন—আপনি স্মোক করেন না!.বাঃ! তা ভালো কথা,—পাঞ্জাবকেশরীখানা দেখাচ্ছি আপনাকে···

গণপতি ঘণ্টায় ঘা দিলেন...বেয়ারা আসিয়া দেখা দিল···

গণপতি কহিলেন—অশ্বিনীবাবুকে খপর দাও।

বেয়ারা চলিয়া গেল এবং একটু পরে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল—মোটা কালো দেহ লইয়া এক বাবু।

গণপতি কহিলেন—ইনি মিষ্টার অমূল্যচরণ সেন—সেই লাহোর লেগেশির ওয়ারিশন···যে পাঞ্জাবকেশরীতে এঁর খপর ছাপা হয়েছে, সেটা এঁকে দেখান্‌ তো।

মোটা কালো বাবু ওরফে অশ্বিনীবাবু কহিলেন—সেটা যে সেই লাহোর চীফ কোর্টের উকিল মহীচাঁদবাবুকে পাঠিয়েছি, তাঁর কাছ থেকে সে কাগজ আর তো ফেরত আসে নি।

—বটে!···গণপতি চাহিলেন অমূল্যর পানে, কহিলেন—দেখচেন উকিলের কাজ! এ সব দিকে এমন অমনোযোগী! অত দরকারী ডকুমেণ্ট · তা যাক! অশ্বিনীবাবু, আজই লিখে দিন পাঞ্জাব কেশরী অফিসে একখানা back number তারা কালই যেন ভি-পি পোষ্টে পাঠায়! বুঝলেন আজই লিখে দিন···এখনি।

—দিই বলিয়া অশ্বিনীবাবু বিদায় লইলেন।

গণপতি তার পর আলাপ করিলেন···অমূল্যবাবু কোথায় চাকুরি করেন, অফিসে কাজকম্ম কেমন··· প্রশ্‌পেক্টস্‌ কেমন···ছেলেমেয়ে কটি···ইত্যাদি···

প'রে হাসি-মুখে বলিলেন—আগাম কিছু চান

যদি···আমরা এ্যাডভান্স করি—কত চান? একশো টাকা এখন নিন···আর একখানা এগ্রিমেণ্ট সই করে যান···ষ্ট্যাম্প্ করা কনট্রাক্ট···এটা হলো দস্তর। মানে, একটা বাইণ্ডিং···

কথাটা বলিতে বলিতে ড্রয়ার টানিয়া গণপতি একখানা ছাপানো কাগজ বাহির করিলেন···

ছাপা কাগজের নীচে এক আনার রেভিনিউ-ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া গণপতি কহিলেন—এখানে আপনি সই করুন···পুরো নাম আর ঠিকানা। আর এ পিঠে এই জায়গায় লিখে দিন একশো টাকা···ফিগারে and in words···

খামখানা হাতে লইয়া অমূল্য পড়িবার চেষ্টা করিল—প্রথমেই লেখা···

I···son of···at present of···do hereby bind myself···

হিজিবিজি অনেক কথা···সে সব কথা মাথায় প্রবেশ করিতে চাহিতেছিল না! চাকরি গিয়াছে···এখন সে কি করিবে, তার দশা কি হইবে জানা নাই! ইহারা না চাহিতে একশো টাকা আগাম হাতে তুলিয়া দিতেছে···

ছাপার অক্ষরগুলা তীব্র আলোর ঝলক তুলিয়া চোখ ধাঁধাইয়া দিতেছিল। সে কাগজের লেখা পড়িল না। বলিল—এইখানে লিখতে হবে একশো টাকা? আর এইখানে সই করতে হবে?

গণপতি দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন—হ্যাঁ।

অমূল্য যথারীতি সই-সাবুদ করিয়া দিল··গণপতি সান্নাল তার হাতে গণিয়া দিল এক কেতা নোট ··

কম্পিত হস্তে অমূল্য নোটগুলা তুলিতেছিল, হাসিয়া গণপতি বলিলেন—গুণে নিন মশায়, টাকাকড়ির ব্যাপার···

অপ্রতিভভাবে অমূল্য নোট গণিতে লাগিল। গণপতি সান্যাল ফর্ম্মখানা লইয়া আবার ড্রয়ারে পুরিলেন।···

অমূল্য তিন-তলা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে আসিল···তার পর পথ···বেলা তখন দুটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট···

পকেটে একশো টাকা নগদ। বুকের মধ্যে রক্ত নাচিতেছিল···কি করি? এখন কি করি?···একটা কিছু করা চাই···করিতে হইবে। একশো টাকা···পড়িয়া পাওয়া···!

সামনে একখানা কাপড়ের দোকান···ম্লাশকেশে রকমারী শাড়ী···

দোকানে ঢুকিল। দেখিয়া শুনিয়া দুখানা শাড়ী বাছিল। কহিল—দাম?

সাত টাকা এগারো আনা ··

দাম দিয়া শাড়ী লইয়া অমূল্য একখানা ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল এবং সোজা আসিল গৃহে···

দেহে-মনে প্রমোদ-উৎসব সুরু হইয়াছে···আদর করিয়া সোহাগ করিয়া সুশীলাকে বিস্মিত বিমোহিত করিয়া দিল···

সুখ-স্বপ্নের কত আভাস দিল···বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাহা-যাহা করিয়াছে, সব কথা খুলিয়া বলিল। পাঁচ হাজার টাকা হাতে আসিলে কি করিবে, কি না করিবে—তা'ও বলিল।

ঘড়িতে বাজিল চারিটা···চমকিয়া সুশীলা কহিল—চারটে বাজলো। অফিসে যাও···স্যর মানগোবিন্দর সঙ্গে দেখা···

—যাবো?—অমূল্যর স্বরে দ্বিধা···

সুশীলা কহিল—নিশ্চয়। এক কথায় চাকরি ছেড়ে দেবে না কি! পাঁচ হাজার টাকা আসচে, আসুক···তা বলে চাকরিটাকে হাত-ছাড়া করবে! ক্ষেপেচো!

ঠেলিয়া ঠুলিয়া স্বামীকে সুশীলা অফিসে পাঠাইয়া দিল।

বেলা সাড়ে চারিটায় অফিস। অমূল্যর বুকখানা একবার কাঁপিল! বড়-অফিসারের বিরুদ্ধে নালিশ—স্যর মানগোবিন্দ সুবিচার করিবেন তো? কাছে আছে নব্বই টাকা—ক্যাল্‌কাটা প্রপার্টিম্যান্স্ ফ্রেণ্ডের অযাচিত প্রীতি-উপহার! কিসের ভয়?

অমূল্য দোতলায় উঠিল। সামনে দেখা পুলিনের সঙ্গে। পুলিন বলিল—সরকার-ব্যাটা বড়-সাহেবের ঘরে ঢুকেছে···বোধ হয়, তোমার নামে লাগিয়ে কাণ ভারী করে' রাখছে!

তাচ্ছিল্যভরে অমূল্য কহিল—রাখুক গে! চাকরি যায়, ভারী তো চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি—তা'ও কোনো ভবিষ্যতের আশা-ভরসা নেই···হুঁঃ···জানো, একটা legacy পেয়েছি···আমার এক আত্মীয় থাকতেন লাহোরে—তিনি মারা গেছেন।' উইলে আমাকে দিয়ে গেছেন নগদ পাঁচটি হাজার টাকা!

পুলিনের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল !···একটা ঢোক গিলিয়া পুলিন কহিল—কে আত্মীয় ?

হাসিয়া অমূল্য বলিল—তা ঠিক জানি না। তবে বোগাস্ নয়। সে পাঁচ হাজারের মধ্যে একশো টাকা আগাম পেয়েছি আজ···এই রয়েছে পকেটে···

কথাটা বলিয়া অমূল্য পকেটে হাত দিল।

পুলিন কহিল—ছাখো ভাই, সরকার-ব্যাটাকে যদি ঠিক করে দিতে পারো···

অমূল্য কহিল—Luck !

স্যর মানগোবিন্দর কামরার সামনে আসিযা শ্লিপ লইয়া তাহাতে নিজের নাম বসাইয়া অমূল্য শ্লিপ দিল পাগড়ী-পরা বেয়ারার হাতে। বেয়ারা শ্লিপ লইয়া বড়-সাহেব মানগোবিন্দর কামরায় প্রবেশ করিল এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—যান বাবু···

অমূল্য কামরায় ঢুকিল।

স্যর মানগোবিন্দ বসিয়া আছেন···মুখে পাইপ—অমূল্যকে কহিলেন—yes···কি চাই ?

কোণ হইতে শুনা গেল স্বর—এই কেরাণীটি ··এরি কথা বলছিলুম স্যর···

এ স্বর পি, সরকারের।

স্যর মানগোবিন্দ বলিলেন—বটে ! নালিশ আছে ? সরকারের বিরুদ্ধে ?

অমূল্য বলিল—হ্যা স্যর ··মানে, আমরা ভদ্র সন্তান—লেখাপড়া শিখে কাজ করতে এসেছি···ভাগ্যদোষে ঘরে পয়সা-কড়ি নেই। উনি···

স্যর মানগোবিন্দ সরকারের পানে চাহিলেন, বলিলেন—তুমি তোমার ঘরে যাও সরকার। দরকার হলে ডাকবো'খন ভালো কথা, এঁর সম্বন্ধে বলছিলে, পলিশি ডিপার্টমেণ্টে এঁর দ্বারা কাজ চলবে না ?

সরকার বলিল—না, ভারী impertinent ছোকরা ; যে ভাবে কাজ করতে বলবো, করবে না !

—আচ্ছা। তুমি এখন যাও। এঁর অসাক্ষাতে তোমার যা নালিশ তা আমাকে বলেছো···এখন এঁর নালিশও শোনা চাই এবং তা শুনবো তোমার অসাক্ষাতে···

কথাটা বলিয়া স্যর মানগোবিন্দ হাসিলেন। সে-হাসিতে অমূল্য সাহস পাইল এবং এই হাসিতেই প্রমাদ গণিয়া সরকার বড়-সাহেবের কামরা হইতে সরিয়া পড়িল।

অমূল্য আজিকার কথা খুলিয়া বলিল—ভাত খাইতে বসিবে, এমন সময় ডাকে চিঠি আসিল ক্যালকাটা প্রপার্টি-ম্যান্স্ ফ্রেণ্ডসের চিঠি···পাঁচ হাজার টাকা লেগেশি···তাই একটু লেট্···এতদিন চাকরি করিতেছে, তার মধ্যে কখনো লেট্ হয় নাই—আজ এই প্রথম ! তাছাড়া ঐ যে নালিশ, কথা শোনে না ·

অমূল্য বলিল, যে-প্রথায় অফিসের কাজ চলিতেছে, এ মামুলি ধারা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ ধারা চলিত ; এখন এ ধারা অচল !

আরো বলিল, তার মাথার নূতন আইডিয়া···সে বলিতে চায়, দশ বিশ পঁচিশ হাজার টাকার বীমার দিকে সমস্ত মন না ঢালিয়া দিয়া যে সব গরীব লোক বিশ পঁচিশ টাকা মাহিনা পায়, তাদের জন্য ইজি পলিশি বাহির ব্যবস্থা করুন। তারা মাসে প্রিমিয়াম দিবে একটাকা, দু'টাকা, তিনটাকা হিসাবে···এনডাউমেণ্ট সিষ্টেম্··· তাদের গায়ে লাগিবে না ··অথচ অফিসে অনেক টাকা আমানত হইবে··

আরো অনেক কথা বলিল। স্যর মানগোবিন্দ নিঃশব্দে মনোযোগ দিয়া সব কথা শুনিলেন ; শুনিয়া বলিলেন—ইয়েস্, ইউ আর রাইট্।

তারপর সরকারকে এত্তেলা দিলেন। সরকার আসিল। স্যর মানগোবিন্দ বলিলেন—সরকার, তোমার আর্জী মঞ্জুর·· এ-ভদ্রলোককে নিয়ে কষ্ট পেতে হবে না। ওঁকে দিয়ে নতুন একটা কিছু করাবো...ইনি থাকবেন তার চার্জ্জে··· ওঁর দায়িত্বে সে-কাজ চলবে নতুন ধরণের পলিশি···

সরকারের গায়ে যেন চাবুক পড়িল; পদে পদে অপমান··· এমন করিলে অফিসের কেরাণীরা মানিবে কেন ?

সে বলিল—তাহলে আমার একটা বক্তব্য আছে···

স্যর মানগোবিন্দ বলিলেন—বলো···

সরকার বলিল—আমাকে ছুটী দিন। মান-ইজ্জৎ রেখে এখানে কাজ করা আমার পক্ষে···

এ-কথার শেষ করিলেন স্যর মানগোবিন্দ ; বলিলেন—শক্ত হবে ?···তাহলে বেশ, এ সম্বন্ধে তোমার যা বলবার

আছে, আমার বাড়ীতে এসো রাত আটটার সময়। এসে বলো···মান খুইয়ে তোমাকে কাজ করতে বলতে পারি না··আরো কি জানো, আমি ক'দিন ভাবছিলুম তোমাকে বলবো···তোমরা experienced লোক, তোমরা অফিসের মাথায় বসে থাকলে ভালো হয়। কাজ করবে এ্যাক্টিভ ইয়ংমেনের দল···যাদের দৃষ্টিতে তেজ আছে, আশার দীপ্তি আছে··মনে ভরসা আছে, কল্পনা আছে··যারা নতুন নতুন আইডিয়া দেবে।···তোমাদের কাজ, সে-সবের বিচার করা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে। তা বেশ, তুমি এখন এসো···আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আর একটু কথা কই। উনি যে সব কথা বলছেন, তা বেশ ইন্টারেষ্টিং লেগেচে···fine···

সরকার বেত্রাহতের মতো নিঃশব্দে চলিয়া আসিল···

অমূল্য সেদিন বাড়ী ফিরিল সন্ধ্যায় ট্যাক্সিতে চড়িয়া—একগাদা জিনিসপত্র কিনিয়াছে সুশীলার জন্য। সাবান, সেণ্ট, এমনি সব জিনিসপত্র; নিজের জন্য শেভিং সেট··· আরো কত কি···

সুশীলা রাগ করিল, কহিল—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? গাছে না উঠতে এক কাঁদি!

অমূল্য বলিল—বুকে জোর বেড়েছে অনেকখানি। সেই এক্শো টাকার মধ্যে পকেটে এখনো মজুত রয়েছে সাতষট্টি টাকা সাত আনা তিন পয়সা···তার উপর জোর বাড়লো অফিসে পদোন্নতিতে···

পদোন্নতি!

অমূল্য কহিল, তাই। ইজি পাসিশি ডিপার্টমেন্ট খোলা হচ্ছে। আমি সে ডিপার্টমেন্টের হেড··আপাততঃ মাইনে হলো দেড়শো প্লাশ গাড়ী-ভাড়া-বাবদ এ্যালাউয়েন্স পনেরো অর্থাৎ মোট একশো পঁয়ষট্টি টাকা।

পনেরো দিন পরের কথা।

অফিস হইতে বাহির হইয়া অমূল্য গেল হ্যারিসন-রোডে ক্যালকাটা প্রপার্টিম্যান্স ফ্রেণ্ডসের সেই অফিসে—শ্লিপ দিয়া গণপতি সান্যালের সঙ্গে দেখা করিল।

সান্যাল কহিল—কি চাই?

অমূল্য বলিল—আমার সেই লাহোর-উইল-ম্যাটারটার খপর নিতে এসেছিলুম।

সবিস্ময়ে তার পানে চাহিয়া গণপতি সান্যাল বলিল—লাহোর-উইল?

ভদ্রলোক ভুলিয়া গিয়াছেন! অমূল্য ভাবিল, বিচিত্র নয়···কত লোকের কত-রকমের কাজ করিতে হয়···

অমূল্য কহিল—মনে পড়চেনা? পাঞ্জাবকেশরী কাগজে পড়ে লাহোরের উকিল মহীচাঁদবাবুর মারফৎ··

বাধা দিয়া গণপতি সান্যাল বলিল--আপনি ভুল করচেন।·এ অফিসের সঙ্গে পাঞ্জাবকেশরী কিম্বা মহীচাঁদ উকিলের কোনো সম্পর্ক নেই··

অমূল্য অবাক! সে কহিল—বলেন কি মশায়·আমাকে চিঠি লিখেছিলেন আপনি—ক্যালকাটা প্রপার্টি-ম্যান্স ফ্রেণ্ডস কোম্পানি···

—হ্যাঁ হ্যাঁ···হ্যাঁ···

অমূল্য কহিল—উইলে-পাওয়া আমার পাঁচ হাজার টাকা লাহোর থেকে আনিয়ে দেবেন···আমি পাঁচ পারসেট হিসাবে কমিশন দেবো···আমাকে নগদ এ্যাডভান্স করলেন একশো টাকা···

যেন ভূত দেখিয়াছে, গণপতির দৃষ্টির ভঙ্গী ঠিক তেমনি!

অমূল্য বলিয়া গেল তার বিস্তারিত বিবরণ···

শুনিয়া গণপতি কহিল—আমরা শুধু টাকাকড়ি ধার দেওয়ার কাজ করি। আপনি যা বলচেন, উইলের টাকা আদায় করা—ও হলো এটর্নির কাজ। আপনি ভুল করচেন! তা ভালো কথা, আপনার নাম বলুন দিকিনি··

—আমার নাম অমূল্যচরণ রায়।

—দেখি।

গণপতি ঘণ্টা টিপিল। সেদিনের সেই ছোকরা বেয়ারা আসিল। গণপতি কহিল—কালীবাবু···ইন্ডেক্স-কেতাব···

বেয়ারা চলিয়া গেল। পর-মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করিল টাক-মাথা এক বাতুল ভদ্রলোক, চোখে চশমা···সে চশমা কোনোমতে নাসাগ্র-ভাগ ছুঁইয়া আছে···

গণপতি কহিল—দেখুন তো কালীবাবু··"আর"-অক্ষর

নাম অমূল্যচরণ রায়···এর মধ্যে কবে ইনি একশো টাকা নিয়ে গেছেন আমাদের ফর্ম্মে সই করে···

খাতা খুলিয়া "আর" অক্ষরের ঘরে হাত বুলাইয়া কালীবাবু কহিলেন—এই যে ৩১শে অক্টোবর···অমূল্যচরণ রায়···নগদ চারশো টাকা···মাসিক সুদ শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে. এই যে নম্বর থ্রী থাউজাণ্ড সেভেন হাণ্ড্রেড সিক্সটি ফোর।

খাতা দেখিয়া গণপতি কহিল—বার করুন লোন-শীটের ফাইল···

একটা মোটা ফাইল ঘাঁটিয়া কালীবাবু বাহির করিলেন···

অমূল্যর গা আগুনের মতো গরম! যে কথা শুনিতেছে, মাথা দপ্ দপ্ করিতেছে··

গণপতি কহিল—এইটে আপনার সই?

অমূল্য সই দেখিল · এই বটে! কিন্তু এ কি···ইংরেজী 'One' কথাটি 'Four' হইয়া উঠিয়াছে···তাছাড়া এ তো রসিদ বা অন্য দলিল নয়···এ যে হ্যাণ্ডনোটের মতো·· ব্যাপার কি?

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—আপনারা জালিয়াৎ···

গণপতি কহিল—চুপ···আপনি যা বলচেন তার প্রমাণ···

অমূল্য কহিল—বুঝেছি, যে চিঠি লিখেছিলেন, সেখানা আপনার হাতে সেদিন আমি দিয়ে গেছি···

হাসিয়া গণপতি কহিল—আপনার মাথার ব্যামো আছে···না হয় ব্লডপ্রেশার···ডাক্তার দেখাবেন। বলছি, আমরা টাকা-কড়ি ধার দি·· উইলের কাজ করি না··

পায়ের তলায় সারা বাড়ীখানা যেন টলমল করিয়া দুলিতেছে! অমূল্যর চোখের সামনে দুনিয়ার আলো নিবিয়া আসিতেছিল··

নিষ্ফল আক্রোশে সে কহিল—হুঁ বুঝেছি·· হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেছেন। কিন্তু আমার কাছ থেকে কি করে এ টাকা আদায় করেন, দেখবো।

বাধা দিয়া গণপতি কহিল—আপনি বেঙ্গল ইন-সিওরেন্সে কাজ করেন · আমরা খপর না নিয়ে মানুষের অবস্থা না জেনে টাকা ধার দিই না। টাকা না দেন, ছোট আদালত আছে···মাইনে ক্রোক করে ডিক্রীর টাকা আদায় করা শক্ত হবে না!

তাই তো উপায়?

কোনো উপায় থাকুক, এ শয়তানের সঙ্গে তর্ক করিয়া লাভ নাই···

অমূল্য যেন পাগল···

এবং ঠিক সেই পাগলের বেশে সে আসিল একেবারে স্যর মানগোবিন্দর কাছে। স্যর মানগোবিন্দর কাছে সে সব কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া স্যর মানগোবিন্দ বলিলেন—এখনি আমি ফোন্ করছি···ডেপুটি-কমিশনার অফ্ পুলিশ···এত বড় জুচ্চুরি করছে সহরের বুকে বসে!

টেলিফোনে কথা বলিয়া পরামর্শ লইয়া স্যর মানগোবিন্দ বলিলেন—বসো অমূল্য···পুলিশ কোর্ট থেকে আমি উকিল আনাচ্ছি। একখানা দরখাস্ত করতে হবে। তার উপরে অর্ডার হবেথ'ন শয়তানের দল শুদ্ধু গ্রেপ্তার···

দরখাস্ত করিয়া হুকুম পাইতে একটা দিন কাটিয়া গেল···

তারপর পুলিশ গিয়া হ্যারিসন রোডের অফিসে হানা দিল। অফিস খালি···কাগজপত্রের কোনো পাত্তা মিলিল না··

গণপতি, কেরাণী কালীবাবুর বর্ণনা যা মিলিল, পুলিশ বুঝিল, এরা সেই পরিচিত দল অর্ডার সাপ্লায়ার্স সাজিয়া জেল খাটিয়া আসিয়াছে · বীড্-গ্যাম্ব্লাশের দল এখন বুদ্ধি-বিকাশ করিয়া ক্যালকাটা প্রপার্টি-ম্যান্স ফ্রেণ্ডস বনিয়াছে।

এখনো তারা ধরা পড়ে নাই··

না পড়ুক, স্যর মানগোবিন্দ বলেন—ঐ চিঠিখানি না পেলে তোমার সেদিন লেট্ হতো না—আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে না—তোমার পরিচয়ও আমি পেতুম না। যে-তিমিরে তুমি ছিলে সেই তিমিরেই থেকে যেতে···

সুশীলা বলে—ঠকাতে গিয়ে তারা তোমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়ে গেছে গো তাদের উপর আমার মায়া হয়, সত্যি। যদি তারা এ ধাপ্পা না দিত···

অমূল্য এ-কথার জবাব দেয় না! দিবার মতো জবাব খুঁজিয়া পায় না···কথাও যে খুবই সত্য · স্যর মান-গোবিন্দ যা বলেন, সুশীলা যে-কথা বলে! অমূল্য ভাবে···

কিন্তু অমূল্যর মনের কথা লইয়া আমরা কেন ভাবিয়া মরি! থাক্ সে কথা!

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

চতুর্থ স্তবক

হীরেন !

তোমাকেই টিপ ক'রে ছুড়ছি আমার চতুর্থ বাণ। আশা করি—তোমার মর্মভেদ করতে যদি না-ও পারে—তোমার ত্বক্ একটু ঘায়েল হবেই।

কিন্তু ওটা পরিহাস হে পরিহাস, ঠাট্টাও বোঝো না ?

কারণ তোমার সঙ্গে আমার আছেই আছে মিল।
অন্তত সাহিত্যে তোমার খুবই সজাগ দিল।
তাই তো, নতুন চালে যারা লেখে তাদের 'পরে
আছে তোমার দরদ কিছু দরদী অন্তরে।

অন্তত পণ্ডিচারিতে মাসকয়েক আগে তোমার সঙ্গে এবার মেলামেশা করতে করতে এ সন্দেহ আমার মনে জেগেছিল। নইলে কি ভাই লরেন্সের কথায় তোমার মন সায় দেয় যে,

অচলায়তন রচিয়া ক্রিটিক সনাতন রীতি চায়
নবীন স্রষ্টা সে-জরাদুর্গ নিমেষে ভাঙিতে ধায়।
দোঁহের প্রকাশভঙ্গির মাঝে
চির-অলংঘ্য ব্যবধান রাজে
দুঁহু দোঁহে তাই কোন্ প্রাণে বলো করিবে
মাল্যদান ?
নাগিনী নকুল কোন্ সুরে হায় ধরিবে ঐক্যতান ?

লরেন্স মিথ্যা বলেননি : আবহমানকাল এই দুই জাতের মিতালি হয়নি, ভাবীকালেও হবে না—এই সমালোচক ও স্রষ্টা। তাই তো যুগে যুগে যারা সৃষ্টি ক'রে এসেছে তারা এই পুরাতনপন্থী সমালোচকদের হাতে লাঞ্ছিতই হয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম এতে আমার শুধু দুঃখই হ'ত। কিন্তু আজকাল হর্ষই আসে বেশি। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি যে অস্বীকৃতির বাঁধ সৃজনীশক্তির স্রোতপ্রতিভাকে আরো জাগিয়ে তোলে। তোমার সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে বড় ভরসা এই যে তুমি লেখকদেরই দলে—ক্রিটিকদের না। তাই তুমি শুধু গুণধর, (থুড়ি গুণগ্রাহী) নও—তুমি কিছুতে গুরুগম্ভীরতার ভক্ত হ'তে পারলে না। নইলে "যাইতে যাইতে পড়িয়া গিয়া লাগিয়াছিল বলিয়া রোদন করিয়াছিলাম"—বর্গীয় ভাষা ভালোবাসতে। পণ্ডিচারিতে তোমার সঙ্গে বাংলাভাষার হালচাল নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ক'রে তাই আরো মনে হ'ত :

'সে-জীব' তুমি নাই বা হ'লে—শিকারী ঐ গুম্ফমূলে
ভাষার টুঁটির গন্ধ আছে—তাই না তুমি দুলে দুলে
নস্যি নিয়ে ভবিষ্যতের হুঙ্কারে ভাই কাঁপাও পাড়া,
ভুল ইডিয়ম লাগাই পাছে—ভেবে কে না ভয়ে সারা ?

অথ ····

*　　*　　*　　*

কাশ্মীরে পৌছেছি ও বেশ একটু জায়গা জুড়েছে দুটি রাজকীয় নৌকায়। একটির নাম "রয়াল কি যেন"—মনে নেই, অন্যটিরও এম্‌নি একটি খাসা গালভরা নাম।

শ্রীনগর সত্যিই শ্রীমন্ত—যদিও ঘিঞ্জির দিকটা নয়। একদিন সেদিকে নাক গলিয়ে পালাতে আর পথ পাইনে। কিন্তু তবু একটা মজা দেখলাম ও-অঞ্চলেও। এক দার্শনিকের লেখায় কবে পড়েছিলাম—নাম ভুলেছি, কথাগুলি গাঁথা রয়েছে :

"A crowd is not a company ; faces are but gallery of pictures and talk is but a tinkling cymbal when there is no love."

জনতা-অরণ্যে কোথা সাথী ?
চিত্রশালা মনে হয় সারি সারি অচিন আনন,
কণ্ঠস্বর ধাতুর নিক্বণ,
যেথা ভালোবাসা নাই সে-নিশীথে কোথায় প্রভাতী ?

ওখানে এক শাল-ওয়ালা ছিল ধরণীদার দোস্ত্। সে আমাদের করল নিমন্ত্রণ খাস কাশ্মীরী বস্তিতে। সেখানে তাদের সহজ সরল সৌহৃদ্য ভারি ভালো লেগে গেল। বুঝতে পারলাম কেমন ক'রে এখানে সবাই থাকে। ওদের মধ্যে আছে ভারি একটা সৌভ্রাত্রের ভাব। এ হ'ল সাঁচ্চা মুসলমানি সৌভ্রাত্র্য—camaraderie যাকে বলে—তাজা, স্নিগ্ধ, জমাট। তাই অমন ঘিঞ্জিতেও মানুষ বাসা বাঁধে, দুঃখে এক হাতে চোখ মুছে অন্য হাত লাগায় নবসুখের সৃষ্টিকাজে। ভারি মজার লাগল কিন্তু নানা জিনিস। প্রথম আমরা সদলবলে ওদের পর্দানশীন পাড়ায় পৌছতেই ভিড় জমে গেল। দুএকটি ফুলের মতন ছোট শিশুকে দেখে আদর করতে এত ইচ্ছে হয়—! কিন্তু তাকাতে গেলেই অম্‌নি ওরা দেয় দৌড়। ওদের বাপ-চাচারা ধ'রে এনে দেয়—বিশেষ আমার কাছে—গেরুয়া বহির্বাসের জয়! মুসলমানরাও খাতির করে।

সাঁচ্চা মুসলমানি হৃদ্যতার মধ্যে সত্যিই একটা ভারি চমৎকার দিক আছে। নিবেদিতার বিবেকানন্দ-চরিতে পড়েছিলাম যে তিনি নাকি মুসলমান সৌভ্রাত্রের বড় অনুরাগী ছিলেন। বাস্তবিক আশ্চর্য লাগে সময়ে সময়ে যে ধর্মবুদ্ধি কেমন ক'রে অধর্ম আনে—যার কাজ মিলনের ঘটকালি করা সে-ই কি-না হয় ঘরভাঙানি! হিন্দুতে মুসলমানে মিতালি হবার একটুকুও বাধা নেই। সত্যি বলতে কি, মহম্মদ শা (নামটা ভুলে গেছি) আমাদের পোলাও কালিয়া খাওয়াতে খাওয়াতে আমাদের মনটা এতই প্রসন্ন হ'য়ে উঠল যে কেবলই মনে হচ্ছিল যে মুসলমানকে ঢের বেশি সহজে আপনার ক'রে নেওয়া যায়। কারণ এদের মধ্যে একটা সহজ বিশ্বভৌম ভাব আছে—যেটা হিন্দুদের মধ্যে নেই—অন্তত জনসাধারণের মধ্যে না। কী বলতে পার্চ্ছ? সবাই জানে বিদেশীকে আমরা সম্ভাষণ করতে পারিনে। হাল আমলে নমস্কার ঠুকে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তবু মুসলমান যত সহজে হিঁদুকে সেলাম করতে পারে হিন্দু তত সহজে পারে কি মুসলমানকে নমস্কার করতে? হয়েছে কি, নমস্কার এখনো আমাদের ধাতস্থ হয়নি—কারণ আমরা হলাম বিশেষ ক'রেই ঘরোয়া জাত—শুচিবেয়ে জাত—আঁটিশুঁটি জাত। বিবেকানন্দ স্বামী এই জন্যেই হিন্দুধর্মকে করতে চেয়েছিলেন অ্যাগ্রেসিভ—কি না, অগ্রসারী। ভাবো কাশ্মীরের কোনো মুসলমান দল নবদ্বীপে গেলে কি সেখানকার গরিব হিন্দুরা তাদের এভাবে ঘরে ডেকে খাওয়াবে? না হীরেন, এদিকে ওদের কাছে আমাদের শিখবার অনেক আছে—যেমন রান্নায়ও।

আহা কী রান্নাই রেঁধেছিল ওরা! "মনে হ'লে প্রেম-ধারা বহে দুনয়নে গো মা!"—ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে না? ধরণীদা ওদের অনুরোধ করেছিলেন খাস কাশ্মীরী খানা খাওয়াতে। ওরা তাল ঠুকে বলল: বহুৎ আচ্ছা একেবারে মৌলিক বাহ্বাস্ফোট! করল কী জানো? যেদিন আমরা দুপুরে গেলাম ওদের নিমন্ত্রণে, তার আগের রাত বারটা থেকে ধরালো চুল্লি, চড়ালো রান্না। বললে ভাববে বাড়িয়ে বলছি—কিন্তু আমি "ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিয়াও হলফ করিয়া বলিতে পারি" যে ওরা

অন্তত ত্রিশ তোফা ব্যঞ্জন রেঁধেছিল,
হজম হবে কি? ভেবে শুধু মনে বেধেছিল।
এত ফেলা গেল দেখে মানুদা তো কেঁদেছিল।
তবু ওরা আরো খাওয়াতে সবারে সেধেছিল।
প্রীতিডোরে ওরা সবারে যদিও বেঁধেছিল,
রান্নায় তারো চেয়ে বড় ফাঁদ ফেঁদেছিল।
তাই কি সবাই হেন ভ্রাতৃভাবে মেতেছিল?
না না, সত্যই স্নেহাসন ওরা পেতেছিল।

কিন্তু পাতলেও এসব সময়ে ভলটেয়ারের কথা মনে না হ'য়ে পারে না। তাঁকে কে একজন ধর্মবিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করেছিল জানো তো—মন্ত্রবলে ভেড়া মারা যায় কি না? তিনি বলেছিলেন: "যায়, কেবল মন্ত্রের পিছনে একটু সেঁকোবিষ থাকা চাই।" বিশ্বনিন্দুক বলচেন—ভলটেয়ার-এর ভঙ্গিতে—যে, প্রীতি স্নেহ সবই মৈত্রী আনে সত্য—কেবল পিছনে চাই ঐ ভূরিভোজনের সুখ-সুধা।

না হীরেন, আমরা অন্তত অতটা ভলটেয়ারি হাসি হাসতে পারি নে। মহম্মদ শা-র রান্না সুধাময় না হ'লেও তাঁদের সবাইকার অহেতুক প্রীতিসৌহার্দ্যে আমরা মুগ্ধ হ'তাম হ'তাম হ'তাম—একথা তিন সত্যি ক'রে বলতে পারি এবং কেউ বিশ্বাস না করলেও এবং নানা লোক নানা কথা বললেও—এ অঙ্গীকার

আমরা করব দলে দলে
কারণ লোকে কী না বলে ?
সে-সেব শুনলে কি আর চলে !

* * * *

কিন্তু একটা জিনিষ দেখে কষ্ট হ'ত। মেয়েদের ওখানে বড় কষ্ট। কী বন্দিনী অবস্থায় যে কাটে বেচারিদের! মনে আছে গৃহপতি আমাদের বলেছিলেন ওদের একটি নববধূর কথা। হাসি ও লীলা দৌড়ল তাকে দেখতে। দেখে ফিরে লীলার চোখ ছলছল! আহা, হাসির চেয়েও ছোট। "অ হংসি! ভাব্ দেখি এ ভাবে যদি তোকে থাকতে হ'ত্!--" শুনতে না শুনতে হাসি চোখ কপালে তুলে টলমল্ ক'রে মাথা ঘুরে পড়ে আর কি! প্রভাদি ধমকে উঠলেন: "নাসির কি সাজে বোনঝিকে ফাঁসির ভয় দেখানো? লজ্জা লজ্জা লজ্জা!" (রাগ কোরো না ভাই, fie-কে এখানে ধিক্কার অনুবাদ করলে পৌরুষালি ভাব এসে পড়ত।)

সত্যি হীরেন! আমি যখন ভাবি আমাদের দেশের এই পদার কথা তখন কী যে দুঃখ হয়! ঐ নববধূটি হঠাৎ উঁকি দিল এক ছোট্ট গবাক্ষ থেকে। ওমা! এ যে একেবারে বাচ্চা—ফুটকি! এ-ও বেরুতে পায় না? উঁহুঃ। বড় কড়া পর্দা ওখানে। তবু ধনীগৃহে বন্ধ সন্ধ হ'য়ে থাকা যায়, বেরুবার পথ বন্ধ হ'লেও তবু নড়বার চড়বার জায়গা কিছু তো থাকে মস্ত বাড়িতে। কিন্তু এই ছোট ছোট ঘরে এমন ঠাশাঠাশি গাদাগাদি ক'রে মেয়েরা থাকে কী ক'রে সূর্য্যদেবকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে! এক সান্ত্বনা কবিবাক্য:

In truth, the prison, unto which we doom
Ourselves, no prison is"

যে-কারা আমরা করি বরণ স্বেচ্ছায়
মৃত্যুরূপ তার চোখে পড়ে না তো হায়!

তবু, মানুষ ইচ্ছা ক'রে অহেতুক কারাক্লেশ সয়—এ দেখতেও খারাপ লাগে। কারা হয় ত সত্যিই অভ্যাস-বশে খানিকটা গা-সওয়া হ'য়ে আসে—কিন্তু যা-ই সইতে পারি তা-ই যে সওয়া ভালো এ তো আর মেনে নেওয়া যায় না। সত্যি, মানুষের সহিষ্ণুতা দেখেই কি সব চেয়ে বেশি অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠতে হয় না? তুমি কী বলো?

* * * *

কিন্তু তবু কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বচ্ছন্দ সৌহার্দ্য আমাদের খুবই ভালো লেগেছিল। দিল্লী-লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানদের আদব কায়দা অত ভালো লাগে না। ওদের কেতা যে দুরন্ত্! অত পোষায় না ভাই আমাদের। কি জানো? যখন মন সংস্কৃত, বিদগ্ধ, শালীন হ'তে সুরু করে মনে হয় এ-সব কেতাই বুঝি কাল্চারের একমাত্র অভিজ্ঞান। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ দেখে যে এ কেতাও এক ধরণের স্বেচ্ছাকৃত কারাগার—যদিও এখানেও ফের সেই স্বেচ্ছা-বরণের গুণে কারা হ'য়ে ওঠে সুখের না হোক অভ্যাসের দুর্গ—আমরা যে অকারণ আড়ষ্টতার বন্ধনে বন্দী হ'য়ে পড়ছি তা টের্ পাই না। অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মতন এ ধরণের বাহ্য সংস্কৃতি বা দস্তুরবাজিরও একটা অপ্টিমাম (optimum) পরিমাণ আছে যার বেশি আয়তন প্রগতি আনে না অবনতি—ডেকেডেন্সেরই—সূচনা করে। লক্ষ্ণৌ মুসলমানি কায়দায় "আপ উঠিয়ে" করতে করতে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার গল্পটি সত্যিই শিক্ষাপ্রদ। একেই ইংরেজিতে বলে too much of a good thing. তা ব'লে অবশ্য অতি-সরলতার পক্ষপাতীও আমি নই: সামাজিকতায় শালীনতার তথা মার্জিত আচরণের একটা সর্বস্বীকৃত স্থান আছেই আছে। এ সম্পর্কে ল্যাম্বের একটি কথা ভারি চমৎকার যে, আমাদের হৃদয় যে সবাইকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে পারে না—ভদ্রতা যেন তারি ক্ষতি-পূরণ করে—লজ্জা পেয়ে। মানে, যাকে সত্যি ভালোবাসি তার সঙ্গে নিখুঁৎ ভদ্রতা করার অর্থ নেই ব'লেই যাকে ভালোবাসি না তাকে ভালোবাসার এই বদ্লিটি দিয়ে আত্মগ্লানির হাত থেকে পাই নিষ্কৃতি। "সবাইকে ভালোবাসো"—এটা আপ্তবচন বটে, কিন্তু মন একথায় রাজি হ'লেও হৃদয় যে করে বিদ্রোহ, উপায় কি? বাস্তবিক জীবনের একটা মস্ত সমস্যা এইখানেই: কী ক'রে বহুকে সত্যি ভালোবাসা যায়? রাসেল দুঃখ করেছেন যে স্নেহ ইচ্ছার তোয়াক্কা রাখে না। গলসওয়ার্দি আরো কাঁদলেন:

প্রীতি বন্য ফুল, সে তো ইচ্ছার কিংকরী নহে হায়!
আদেশ-উদ্যানে তার অশ্রুদলগুলি ঝ'রে যায়।

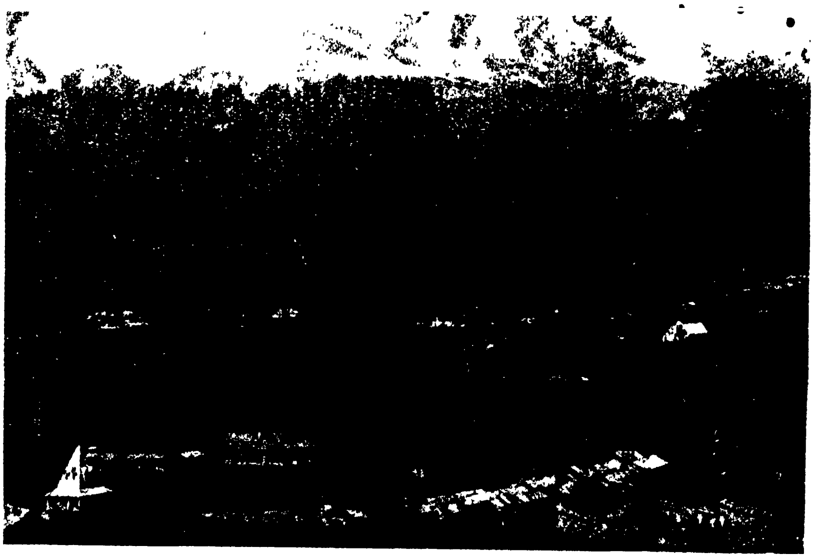
লরেন্স শেষটায় রুখে উঠে বললেন: প্রেম ক্ষণজীবী, তাতে হয়েছে কি?—

প্রেম ফুল, তাই ঝরে—সুন্দর, তাই সে হয় ম্লান:
অঝরা সে হ'ত যদি—কে চাহিত সে-লক্ষ্যসন্ধান?

কিন্তু উঁহুঃ, মন মানে না মানা। সে বলে যে আক্ষেপ শোক বিদ্রোহ ওরাই মায়া, সত্য হ'ল আনন্দ। হৃদয় যখন এমন সানন্দে বলে সর্বভূতে সমস্নেহ হ'তে হবে—তখন মনে হয় না কি যে, এ না পারলে কী-ই বা পারলাম? কিন্তু প্রীতির মৈত্রীর সাধনা বলতে যেমন সহজ করতে তেমনি কঠিন। "তুলো যেমন শুনতে তুলো বুনতে লবেজান"—বলে না? এই জন্যেই ভদ্রতা এসে মান বাঁচায়, মুখ রাখে—অনাত্মীয়কেও সমাদরের স্নিগ্ধতায় দিতে চায় অপ্রেমের ক্ষতিপূরণ। যে-ভদ্রতা এই ভাবের ভাবুক, সামাজিক দিক দিয়ে তারি মূল্য সব চেয়ে বেশি। আমি বলছি না কাশ্মীরী অশিক্ষিত মুসলমানরা এ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কৌলীন্য জানে, কারণ এ-ও একটা সাধনা যা বহু শিক্ষার অপেক্ষা রাখে; আমি বলছি যে ওরা এমন একটা সহজ ভদ্রতার রীতি জানে যার মধ্যে আছে রস, কাজেই আছে সত্য। ওখানে এক নবাব ও নবাবজাদির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে একথা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তুনিচাঁদের ওখানে এক আসরে এঁরা এসেছিলেন। গান শুনে তাঁদের না কি ভালোলেগেছিল—তুনিচাঁদকে দিয়ে তাই ব'লে পাঠালেন যে আমরা যদি তাঁদের প্রাসাদে যাই তো মোটর পাঠাবেন। নবাব সাহেব ভুলে গিয়েছিলেন যে এ-নিমন্ত্রণ তাঁর করা উচিত ছিল নিজে আগে এসে, সদ্যপরিচিত ও অপরিচিতাদের এভাবে লোক মার্ফৎ নিমন্ত্রণ পাঠানোর মধ্যে শালীনতার অভাব আছে। ঐ গরিব শালওয়ালা এ ভুল করে নি—সে নিজে এসে করল নিমন্ত্রণ। তার মোটর ছিল না, কিন্তু ভদ্রতাজ্ঞান ছিল নবাব সাহেবের চেয়ে বেশি। তাই আরো মনে হয়েছিল হীরেন, যে বিত্তবান্ হ'লেই বিজ্ঞবান্ হওয়া যায় না। বলাই বেশি যে নবাব সাহেবের সরব নিমন্ত্রণ আমরা নীরবে উপেক্ষা করেছিলাম।

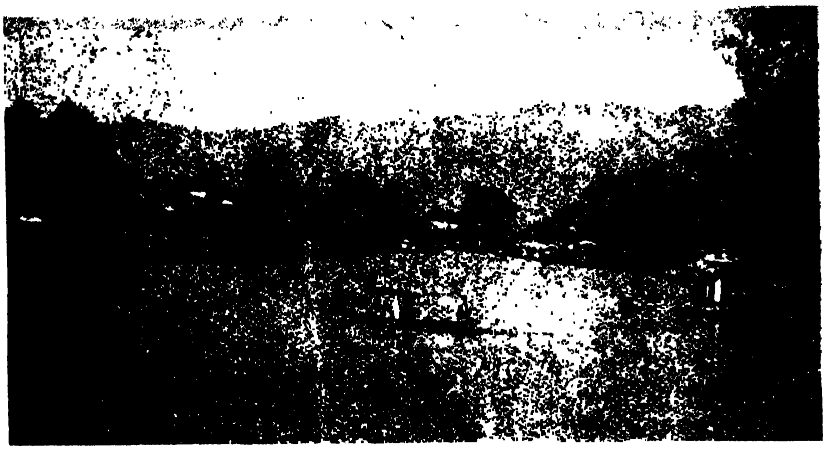
* * * *

কিন্তু এইখানে তুনিচাঁদের মহিমা আরো প্রকট হ'য়ে ওঠে। লোকটি শুধু ভদ্র নয়—সত্যি সদয়—পরোপকারী। অশীতি-পর বৃদ্ধ—তবু রোজ তাঁর আসা চাই—হয় সকালে নয় বিকেলে। আমাদের বজরা-আতিথ্যে কোনো কিছুর ঘাটতি পড়ছে কি-না—ওরা ঠকাচ্ছে কি-না—মোটরবাস বেশি দর হাঁকছে কি-না সব, সম-স্ত তিনি দেখতেন। ধরণীদা এসব বিষয়ে মোক্ষম লোক মানি, কিন্তু তিনি তো আর ওদেশের হালচাল দরদস্তুর জানেন না—কাজেই তুনিচাঁদ না হ'লে এত আরাম আমাদের হ'ত না। আরামেরও বাড়া—এরই নাম হ'ল বাকায়দা আয়েস। ভো ভো হীরেন, বাংলা বৈদগ্ধ্য তথা বাংলা ভাষার স্পেশালিস্ট, তুমি তো জানো বন্ধু, আয়েস হ'ল আরামের ঠাকুর্দা, নাও হয় চাচা তো বটেই—ব্যাকরণেও, প্রয়োগেও, উদাহরণত, আমি নিশ্চয় বলতে পারি তুনিচাঁদ যেমন প্রভাদির জন্যে ওদের বলতেন মাছ ধরতে, লীলার জন্যে পান আনতে, ধরণীদার জন্যে শালদোশালা জোটাতে, তেমনি তুমি থাকলে তোমার জন্যে নস্যির বন্দোবস্ত



গুলমার্গ

না ক'রে কখনই জলগ্রহণ করতেন না। বাংলা ভাষায় যাকে বলে গড্‌সেণ্ড্‌—তুনিচাঁদ এসেছিলেম আমাদের তাই হ'য়ে—নরতনু ধরেছিলেন বটে, কিন্তু সে শুধু ছলতে। আমাদের কাশ্মীরী আভিজাত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলও বিশেষ ক'রে এঁরই কল্যাণে। ইনি কাশ্মীররাজের একেবারে দোস্ত—একসঙ্গে ছবি তোলেন নিজে ব'সে রাজা দাঁড়িয়ে! ভাবো হীরেন, ভাবো। এ হেন অভিজাতবংশাবতংসের সুরম্য উদ্যানালয়ে ছিল আমাদের অবাধ গতিবিধি। আমাদের কাশ্মীর দেখানোর সব বিধান দিতেন তিনি ও তাঁর পুত্র। এঁর পরিবারের মেয়েরাও ভদ্র! উঃ! ভাব হ'য়ে গেল তাঁদের সঙ্গে আরো সহজেই—কারণ তাঁরা গান সত্যিই ভালোবাসেন—বিশেষত বড় পুত্রবধূ। ইনি গান করতেও পারেন কিন্তু "হাসি"র গান শুনে আর মুখে রা নেই। হাসির গাওয়া গজল লিখে লিখে অস্থির। বলতেন বাঙালি মেয়ের মুখে এমন গজল শুনবেন এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। শুধু তাই নয়, বাংলা গান শুনে এঁরা আরো মোহিত হয়েছিলেন—এবার নৃত্যসঙ্গীত। ভাবো হীরেন ভাবো। আমাদের দেশে আমরা বাঙালিকে গাইয়ে বলতে কী যে নার্ভাস হ'য়ে পড়ি—ওস্তাদদের ভয়ে বাঙালির গানকে গান বলতেও ডরাই, কিন্তু বাংলার বাইরে বাঙালির গীতি-প্রতিভা আজ সর্বস্বীকৃত। পেশোয়ারি রণবীর সানিও সেদিন আমাকে লিখেছেন যে বাঙালি শিল্পপ্রকর্ষ থেকে প্রতি অবাঙালির শেখা কর্তব্য। লাহোরেও চ্যারিটি কন্সার্টে একাধিক বাংলা গান গেয়েছিলাম আমরা, কারণ



শ্রীনগরের সপ্তম ব্রিজ

ওখানকার সঙ্গীত-কোবিদরা বললেন যে পাঞ্জাবে বাংলা গানের আদর যথেষ্ট। অথচ বাংলা দেশে কেবলই শুনি যে, সঙ্গীতে অল-ইণ্ডিয়া ফেম হবার একটিমাত্র বাঁধা শড়ক আছে—তার নাম সেঁইয়া তু কাঁহা গেঁইয়ার হুহুঙ্কার। কিন্তু যদি আজ বলি যে ভবিষ্যতে অল-ইণ্ডিয়ান গায়কদের কণ্ঠ আসবে বাংলা গানের কাছে ধর্না দিতে—যেমন অতীতে আমরা দিতাম হিন্দুস্থানী গানের কাছে, তাহ'লে হয়ত তুমি এখনো তেতে উঠবে, কারণ দুদিন আগেও বাংলা গানের নামে তোমার অধরে দিত হাসির ঝিলিক, নাসাগ্রে খেলত কুঞ্চনের ঢেউ, চোখে নিভত ঔৎসুক্যের আলো। আজ তুমি সে-মত অনেকটা বদলেছ, কিন্তু তবু এতটা হয়ত বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু যেমন পৃথিবী ঘুরছে এ-কথায় কাথলিক পাণ্ডাপুরুতদের গর্জন সত্ত্বেও গালিলিও বলেছিলেন, "তবু পৃথিবী ঘুরবেই ঘুরবে" তেম্‌নি আমরা ওস্তাদপন্থীদের তর্জন সত্ত্বেও বলব: "তবু বাংলা গানের জগৎজোড়া আদর হবেই হবে।" তাছাড়া যদিও অল্‌-ইণ্ডিয়া তো অল্‌-ইণ্ডিয়া—অল্‌-ওয়র্লড ফেমকেও আমি সঙ্গীতের লক্ষ্যসিদ্ধি ব'লে মানি না—(যেহেতু গানের আনন্দ যশের আনন্দের চেয়ে ঢের বড়)—তবু যদি তর্কের খাতিরে ধ'রেও নিই যে "অল্‌-ইণ্ডিয়া-ফেম"-ই হ'ল গানের অন্তিম লক্ষ্য, তাহ'লেও এটা মেনে নেওয়া চলে না যে, হিন্দুস্থানি নকলিয়ানার শরসন্ধানে এ-লক্ষ্যবেধ হবে। বড় প্রতিষ্ঠার রাজপথও ঐ স্বকীয়তার মন্ত্রসিদ্ধিতে। শুনতে পাই উন্নাসিক ওস্তাদপন্থীরা এ-ধরণের মনোভাবকে নাম দেন স্বাজাত্যগর্ব। ন-ওস্তাদ আমরা বলি: "উঁহুঃ, গর্বকে প্রশ্রয় দেওয়াটা ভুল বটে কিন্তু স্বাজাত্য বলতে যদি স্বভাবে প্রতিষ্ঠার সহজ আত্মমর্যাদা ধরা হয় তাহ'লে বিশ্বজাতীয়তার হুঙ্কারেও সে ডরিয়ে উঠবে না। সত্যসিদ্ধি মানে নির্বিশেষ একাকার হ'য়ে যাওয়া নয়। প্রতি জাতীয় মনের মাটি যে-ফুলের অনুকূল সেই ফুলের চাষেই সে শুভপ্রসূ হ'য়ে ওঠে—

অন্তর্জগতেও সহজপটুতা ব'লে একটা জিনিষ আছে, যে যা সহজে পারে তার উচিত সেই দিকেই ঝোঁকা—নৈলে তার সহজসিদ্ধি হয় না। মানুষের মতন প্রতি জাতিও তার আন্তর স্বভাবের খনি থেকেই আত্ম-বৈশিষ্ট্যের সাঁচ্চা জহর সংগ্রহ ক'রে বিশ্বের দরবারে পাঠায় নজর। তাই বাঙালির মনের কথা প্রাণের ভাব অন্তরের স্বপ্ন যদি সে তার কাব্য সঙ্গীতে তার নিজস্ব ঢঙে ফুটিয়ে তুলতে পারে সৌন্দর্যের রসায়নে, কেবল তাহ'লেই বাংলা গান বিশ্বচিত্তসভায় ঠাঁই পাবে—গলাবাজিতেও না, তানসেনি রাগমালার মাছি-মারা অনুকৃতি নৈপুণ্যেও না—এ সবের ঢঙ হাজারই বৈশ্বমানবিক বা সর্বজাতীয় হ'লেও নকল-নবিশিতে মুক্তি নৈব নৈব চ। বিন্দুতে মনঃ-সংযোগ করলে তবেই তার মধ্যে ধরা দেয় সিন্ধু। তাই শুধু অল-ইণ্ডিয়া অল-ইণ্ডিয়া ক'রে হাহাকার করলে বাঙালি স্বভাবের আত্মসিদ্ধি লাভ হবে না। আত্মবিশ্বাস যার নেই, বিশ্ববিশ্বাস তার কাছে শুধু কথার কথা—তাতে না ভোলে পর, না মানে মন।"

*　　*　　*　　*

কিন্তু খবর্দার হীরেন, তুমি বড় বিপাকে ফেলো। এ থেকে সিদ্ধান্ত কোরো না যেন যে আমি বলি—হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের মহত্ত্ব থেকে বাঙালির শিখবার বিশেষ কিছু নেই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হ'ল সুরের উদার তোষাখানা—তার সম্পদেও তাই প্রতি সুরপ্রেমিকের জন্মস্বত্ব। বাঃ—ভালো জিনিষ সুন্দর জিনিষ দিয়ে ঘর সাজাব না তো সাজাব কি খেলো রাঙতা দিয়ে? তবে শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখতে গেলে দেখতে পাবে যে এখানে তর্কটা হিন্দুস্থানী বা ম্লেচ্ছ নিয়ে নয়—যেটা কাম্য সেটা হ'ল ঐশ্চর্য। যেখান থেকেই ধনসম্পদ পাব আহরণ করব। এ সম্পর্কে তাই শুধু হিন্দুস্থানি সঙ্গীতেই বা আটক থাকব কেন?—শুধু স্ত্রীরত্নই না—সব রত্নই দুষ্কুলাদপি—এ-ও বুঝলে না হে! য়ুরোপীয় সঙ্গীত, পারস্য সঙ্গীত, রুষ সঙ্গীত, জাভার সঙ্গীত সবারই করব আদর—সবার কাছেই পাতব হাত, চাইব প্রভাব।



গন্ধর্ব বল



গাগরি বল

জীবনে কোনো কিছুই বিশ্ববিচ্ছিন্ন নয়—শিল্প তো নয়ই। বড় প্রভাব, বড় সৌন্দর্যকে মজ্জাগত করতে পারলে তবেই মনের উজ্জীবন, প্রাণের সমারোহ, আত্মার শ্রীবৃদ্ধি। বিশ্বের প্রতি সত্যশক্তির উদ্দীপনা চাইতে হবে, নৈলে শক্তির খোরাক মিলবে কোত্থেকে?—বাংলা গানের সাঙ্গীতিক পুঁজি বাড়াতে হবে তো। সানন্দেই মানব যে বাংলা গান

অনেক অসাধ্যসাধন করেছে, কিন্তু জীবনে সবচেয়ে বড় চিত্র আত্মপ্রসাদ নয়—আত্ম-অসন্তোষ ওরফে divine discontent : যা আছি তাতেই যে ভরপুর খুশি, সে কোনোদিনও বাড়ে না। বাড়ে সে-ই, যে প্রতি মুহূর্ত নিজের নানা অসম্পূর্ণতায় ব্যাহত হ'য়ে আহত হ'য়ে ত্রুটি গ্লানি দূর করতে চায় আরো নিখুঁৎ, আরো সুন্দর হবার প্রেরণায়। এই জন্যেই তুমি জানো (যদিও এজন্যে অনেকেই আমাকে ভুল বুঝেন) আমি মডার্ণ বাংলা গানের অনুরাগী হ'য়েও ওর পূজারী নই। তার বহু অসম্পূর্ণতা, সাঙ্গীতিক দৈন্য সুরবিহারের অল্পতা আমাকে অসহিষ্ণু ক'রে তোলে। এ দৈন্য মোচন্ন করতেই হবে, নইলে আমাদের বাংলা গান আরো বড় হবে কেমন ক'রে? এ-প্রসঙ্গে একটা ভারি চিত্তাকর্ষক ঘটনা এবার ঘটেছিল শ্রীনগরে। বলি।

ওখানে এবার এক ইংরেজ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—উইলিয়ম। সে আশৈশব সাইকিক—অর্থাৎ তার দেহে নানান আশ্চর্য আবির্ভাব হয়।

এর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ ওখানকার ডাকঘরে। সে ডাকল তার মা-র ওখানে। তাঁর নাম তুমি শুনে থাকবে—মিস মড ম্যাকার্থি। এখন ইনি তন্দ্রা দেবী নাম নিয়েছেন। এঁর কথা বলছি পরে যথাপর্যায়ে—উইলিয়ামের কথাটা আগে সেরে নিই। ও আমাকে নিয়ে গেল তো ওদের বোটে। তন্দ্রা দেবী খুবই যত্ন করলেন। বিলেতে ইনি ভারতীয় সঙ্গীতের আমদানি করেন সব প্রথম—প্রায় বিশ বৎসর আগে। উইলিয়াম তাঁর পোষ্যপুত্র। তন্দ্রা দেবী বললেন—উইলিয়ামের দেহে আশ্চর্য আশ্চর্য স্পিরিট ভর করেন, কথা কন। ওমা, বলতে বলতে আমার সৌভাগ্যক্রমে ওর ভাবান্তর। মুখের রেখা গেল বদলে। চোখের দৃষ্টি স্থির—উজ্জ্বল! কণ্ঠস্বর আর চেনাই যায় না, এমন কি কথার ঢং-ও গেল উল্টে। শুনলাম যিনি আবির্ভূত হ'লেন তিনি একজন চৈনিক সাধু ও জ্ঞানী। বাস্তবিক উচ্চারণও কি ঐ মোঙ্গোলিয়ান ঢঙের হয়ে গেল!—ইংরেজিতেও ইডিয়ম ভুল হ'তে থাকে! যদিও অতি প্রাঞ্জল ও ভাবব্যঞ্জক। বেশ বোঝা যায় সে-উইলিয়মের আর নামগন্ধও নেই। আমি বললাম: "ব্রাদার, আপনার নাম কি?" ব্রাদার বললেন (এঁকে সবাই ব্রাদারই বলত, আমিও বলব): "Names are things we misunderstand one another by."

(আরো অনেক কথা হ'ল—হয়ত পরে লিখব আরো কিছু—সে সব বিস্তর কাহিনী)। ব্রাদার বললেন; "তোমার গীতি-প্রতিভার কথা আমি জানি ব'লেই তোমাকে এত ক'রে বলি তোমার সৃষ্টির ধারা নানা শিক্ষার্থীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে—তোমাকে আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী করতে হবে, দু-একজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিভা যথেষ্ট নয়।"

আমি বললাম: "ব্রাদার, একথা আমি যে জানি না তা নয়—তবে আমার মনে হয় আমাদের দেশে এখন এসেছে সাদামাটা গানের যুগ, মানে বিলিতি ঢঙে প্রতি সুরকে অনড় অচল ক'রে গাওয়া।"

ব্রাদার বললেন: "কিন্তু তোমাদের গানকে এভাবে কাষ্ঠবন্ধনে বাঁধলে সে যে হ'য়ে উঠবে ফসিল্—পাষাণ—জীবন্ত তো আর থাকবে না। তুমি আমার এই কথাটি মনে রেখো যে ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তি তার সাবলীলতার পথে। তাই হালফ্যাশনীরা যা-ই বলুন না কেন তোমার নিজের গানকে অনড় অচল কোরো না কোরো না কোরো না। মেলডিক গান হ'ল আত্মার প্রকাশ, তার মধ্যে চাই-ই চাই সুরবিহার—ইম্প্রভাইসেশন।"

আমার মনের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল হীরেন, বললাম পুলকিত হ'য়ে: "এই নিয়ে ক—ত লোকের সঙ্গে ক—ত বার যে আমার তর্ক হয়েছে ব্রাদার! কারণ আমি চাই বাংলা গানে তানের বাহার, সুরের ঐশ্বর্য। বলি আমাদের গানের স্বকীয়ধারা হ'ল এই যে গায়ক প্রতিপদে হবে স্রষ্টা, সুরকার—কম্পোজার। বিলিতি গানে তিনি একেবারেই সুরকারের তাঁবে—কিন্তু এপথ আমরাও বেছে নেব কোন্ আলেয়ার লোভে? কেন ছাড়ব আমাদের সঙ্গীতের ঐতিহ্য, এ-অনন্ততন্ত্র ভঙ্গি—যার প্রসাদে গায়ক প্রতিপদে সুরকার হ'য়ে উঠে তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে নিতুই নব সুরসম্পদের ঝর্ণা বইয়ে দেন? আপনার একথা শুনে তাই তো আমার এত ভালো লেগেছে ব্রাদার, যে আমাদের সুরকারকে চাইতেই হবে সুরের বিচিত্র বিকাশ—সুরবিহার; কারণ এ দৃঢ়বিশ্বাস আমার বহুদিনের যে, সুরের কায়েমী-করণে আমাদের সঙ্গীতের হবে অকালমৃত্যু।"

ব্রাদার বললেন: "তোমার একথা পুরো সত্য। তুমি ঠিক ধরেছ তোমাদের সঙ্গীতের স্বাভাবিক ধারাটি কী। য়ুরোপের সুরকারদের কথা ছেড়ে দাও। তাদের সমস্যা

নিয়ে তাদেরই মাথা ঘামাতে দাও—তুমি তেল দাও নিজের চরকায়, ভাবো কিসে তোমাদের গানের শ্রীবৃদ্ধি হবে। ওরা যে পথে চলেছে তাতে ওদের মঙ্গল হ'তে পারে কিন্তু তোমাদের না। তোমাদের সঙ্গীতের—ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস তার মেলডি, মানে সুরের পাখা-মেলে-দেওয়া। তাই তোমাদের গানের পাখিকে পুরো না স্বরলিপির সোনার খাঁচায়। পোষ মানাতে যেয়ো না তাকে। গেলে সে বাঁচবে না। তাই তো তোমাকে আমি এত জোর ক'রে বলছি—তুমি এ বিষয়ে শুধু নিজের অন্তরের নির্দেশ পথেই ছুটো—বাছা বাছা যুক্তির পথে না। বুদ্ধি থাকলে যে-কোনো কিছুর চমৎকার ওকালতি করা যায়—কিন্তু অন্তরের প্রেরণা হ'ল আলো—সে বুদ্ধির নাগালের বাইরে। সে যে করুণা—উপরের আনন্দ নামে কেবল তাঁর আদেশে যিনি সব সৌন্দর্যের মূলাধার।"

এ ঘটনাটা এত ঘটা ক'রে বললাম কেন, সে কথাটা আগে একটু ব'লে নিই। তুমি নিবেদিতার My Master as I saw Him বইটি পড়েছ? না প'ড়ে থাকো তো পত্রপাঠ কিনে পোড়ো। শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতাকে বলেন শিখাময়ী এবং এই বইটিকে বলেন বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ জীবনী। এ ধরণের বই জীবনে খুব কমই পড়া যায়—কারণ এ-বইটি নিবেদিতা কালি দিয়ে লেখেন নি, লিখেছিলেন হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। আরো তিনি একজন অসামান্যা নারী—মহীয়ান্ গুরুর মহীয়সী শিষ্যা। তিনি এতে এক জায়গায় লিখেছেন: "Some of the deepest convictions of our lives are gathered from data which, in their very nature, can influence no one but ourselves." অক্ষরে অক্ষরে সত্য: জীবনের কত গভীর উপলব্ধির আলোই তো জ্ব'লে ওঠে তুচ্ছ ঘটনার চকমকিতে। লালাবাবুর কথা ভাবো। লক্ষপতি বিলাসী সন্ধ্যাবেলা শুনলেন যে বলছে: "দিন যে গেল"—অমনি তিনি এক কাপড়ে ধনজন পরিবার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেন ভগবানের খোঁজে—তাঁর অন্তরাত্মা গেয়ে উঠল: "কী বাজে কাজে সময় কাটাচ্ছি? দিন যে গেল!" কত আশ্চর্য অনুভব আমাদের জীবনে বিপ্লব বাধায় স্ফুলিঙ্গে রটে অগ্ন্যুৎপাত, অথচ বাইরের কাছে এসব তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই তো নয়! কাশ্মীরে সেদিনকার অরুণোজ্জ্বল প্রভাতের ঘটনাটা আমার কাছে এই ধরণেরই একটি আবির্ভাবের রূপ ধ'রে এসেছিল। মনে পড়ে কাশ্মীরে চারদিকে শৈলবেষ্টনীর মধ্যে চরণবিলগ্না ঝিলমের কুলুকুলু-ধ্বনিতে সামনে শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে শিবমন্দিরের নীচে উইলিয়মের সেই অর্ধসমাধিস্থ উত্তাল নয়ন। কানে বাজে



নজিন বাগ

তার মৃদু গভীর কণ্ঠস্বর—অচেনা আমাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে কত আশ্চর্য গভীর কথা বললে। আমি জানি এ-আবির্ভাব মিথ্যা নয়। জানি বিজ্ঞান এসব সত্য ও তত্ত্বের কোনো দিশাই পায় নি। তাই বুদ্ধিবাদীদের কাছে এ-সাক্ষ্য নামঞ্জুর হ'তে বাধ্য। কিন্তু আমার কাছে এ-কথা শুধু ধ্বনিস্পন্দন হ'য়ে আসে নি, এসেছিল আলোর মন্ত্রস্পন্দন হ'য়ে। কেন বলতে চেষ্টা করি এবার।

তুমি জানো হীরেন, আমাদের সঙ্গীত আমার কাছে শিল্পমাত্র নয়—এ-ও তুমি জানো আমাদের সঙ্গীতকে "শিল্প" বলতে আমার বাধে কেন। বাধে এইজন্যে যে, আমাদের সঙ্গীতকে আমি মনে করি অন্তরাত্মার দূরভিসারের একটি

পরমসাধনা। এ-সাধনার গতি আত্মনিবেদনে: মুক্তি—অমৃত-ঐশ্বর্যের ধ্রুবলোকে। এইজন্তেই আমি বরাবরই এত বড় গলা ক'রে বলতে সাহসী হয়েছি যে, য়ুরোপের বাঁধাধরা সুর ও গানের পদাঙ্ক অনুসরণে আমাদের গানের মঙ্গল নেই। কারণ আমাদের গানের স্বধর্ম হ'ল তার সুরমুক্তিতে, অন্তরাত্মার দলমেলায়, বিনা সুরবিহারে। আমাদের গায়ক যদি প্রতিপদে সুরকারের তাঁবেদার হয় তবে তার গগনচারণের পথই হবে অবরুদ্ধ। গীতার কথায় আমি বিশ্বাস করি যে, স্বধর্মে নিধনও শ্রেয় কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ। তাই স্বরলিপি ওদের কাছে সুধা হ'য়েও আমাদের কাছে হ'তে পারে বিষ। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, স্বরলিপির মোক্ষম আলিঙ্গন হবে সেই জাতীয় আলিঙ্গন, যা দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র লৌহভীমকে সংবর্ধনা ক'রেছিলেন। স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা আছেই। কিন্তু সে শুধু সুরের প্রতিমা গড়তে। তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে গায়কের সুরবিহার—স্বরপ্রতিভা। এ যদি তাকে করতে দেওয়া না হয়, যদি আমাদের গানকে অনড় অচল ক'রে জীইয়ে রাখার চেষ্টা হয় তবে সে হবে মিশরীয় "মমি"-লালন।

তুমি বলবে—কিন্তু য়ুরোপীয় সঙ্গীতের বেলায় স্বরলিপি কেন মৃত্যু আনে নি? আনে নি? অংশত এনেছে বৈ কি। কে না জানে মেলডির মৃত্যু এসেছে ওদেশে—যেকথা রোমাঁ রোলাঁও আমাকে বলেছেন বারবার। তীর্থঙ্করে তাঁর সে সব কথোপকথন বেরুল ব'লে—পোড়ো মন দিয়ে, তাহ'লেই বুঝবে যে সঙ্গীতজ্ঞ যাঁরা তাঁরা কেন মেলডির মুক্তি চান সুরবিহারে। একথা সর্ব-স্বীকৃত যে, হার্মনিতে অন্য সুরসম্পদ থাকলেও নেই মেলডির কলনৃত্য। কিন্তু আমাদের হার্মনি নেই—আমরা কোন্ দুঃখে ওদের মতন স্বরলিপিসর্বস্ব হব বলো দেখি? চৈনিক জ্ঞানীর কথা তাই তো মনে পড়ে এত বেশি: আমাদের সঙ্গীতের প্রাণ যে সুরের বিদ্যুৎসঞ্চরণে, নীলনন্দনে—তাকে স্বরলিপির খাঁচায় পুরতে গেলে তার অকালমৃত্যু যে অনিবার্য।

তবে আমাদের মধ্যে স্বরলিপির ব্যবহার চাই, প্রতিষ্ঠাও চাই। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে। আমাদের স্বরলিপি সুরকারের বৈশিষ্ট্যও রাখবে কিন্তু ধুয়ো হিসেবে—যেমন খেয়ালে অস্থায়ী অন্তরার ছক। এর বেশি না। সুরকারের বৈশিষ্ট্য আমাদের হবে এই ছক—জমি। স্বরলিপি পারে এই মস্ত কাজটি করতে: পারে সুরকারের সুরের ছক কাটতে, কাঠামো বাঁধতে। কিন্তু তার চালচিত্র আঁকার ভার সুরপটুয়ার। স্বরলিপি দিতে পারে এক সুরের জমি তৈরি ক'রে। কিন্তু তাতে ফসল ফলাবে গায়কের গীতিপ্রতিভা—সুরবিহারের প্রতিভা। এ ফসল যদি না ফলে তবে শুধু স্বরলিপির কাষ্ঠবন্ধনে গীতিপল্লী পাড়াগাঁ-ই থেকে যাবে—রাজধানী হ'য়ে উঠবে না রাতারাতি। এখানে শুধু ভারতীয় সঙ্গীতেরই কথা বলছি মনে রেখো, কারণ এ সঙ্গীতের স্বধর্ম হ'ল সুরলীলা, চলমান্ সুরপ্রেরণাকে এ-সঙ্গীতে রূপ দিতে হবে বহ্নিমান্ কণ্ঠের আনন্দ-আবেগে। ভারতীয় সঙ্গীত যেন প্রভাতী আলো—গুণীর কণ্ঠ যেন মেঘ—তার হাজারো বিন্যাসে সে ফলিয়ে তুলবে হাজারো আলো-নিজের সৌন্দর্যপ্রতিভায়, তবে না বলি গান। নইলে একটুকরো চটকদার সুর নিয়ে মিনমিন ক'রে গেয়ে করব কোন্ মহাশ্বেতা বীণাপাণির আরাধনা শুনি? স্বল্পপ্রাণা বিগতযৌবনা সুরশ্রীকে নিয়ে ঘ'ষে মেজে কত রূপশ্রী বাড়াব তার—যদি না চাই তার ব্যাপ্তি, না প্রসার? মানুষ সর্বক্ষেত্রেই হবে অসীমাশী, শুধু গানের বেলায় থাকবে অল্পাশী? নম্রতার সরলতার স্বপক্ষে যতই খাসা খাসা উপমা দাও না কেন—নাল্পে সুখমস্তি: আমাদের অন্তরাত্মার সৌন্দর্যক্ষুধা উদগ্র—তৃষ্ণা অতৃপ্য। তাছাড়া বড় প্রতিভার বেগ যে দুকূলভাঙা, দুর্বার—তাকে স্বরলিপির জাঙালে বাঁধবে কে? সে ছোট্ট চটকদার সুরের দাসত্ব করবেই বা কেন? না হীরেন, শোনো বলি একটা কথা চুপি চুপি: ত্যাগ ব'লে একটা কথা বড্ড ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু সেটা ভুল—যাকে বলে misnomer: ত্যাগ ব'লে কিছুই নেই জগতে—জীবনের দীক্ষামন্ত্র "ছাড়া" নয়—"পাওয়া"। ছোটকে ছাড়ি আমরা কখন—যখন বড়কে না হ'লে চলে না। যে-খোয়ানোর উল্টো পিঠে লাভ নেই—তাকে বরণ করতে বলবেই বা কে, আর বললে শুনবই বা কেন? তবে জীবনে অনেক সময় আসে যখন ধ্রুবকে ছাড়তে হয়—কেন না আমাদের বহ্নিবিশ্বাস বলে—কাল অধ্রুবকে মিলবে। যাদের এ বিশ্বাস নেই তারা কি কড়াক্রান্তিও ছাড়তে পেরেছে কোনো দিন? তাই একথা বললে প্রকৃত জ্ঞানীদের সায় মিলবেই যে, জীবনে পরমতম লাভের রহস্য নিহিত—এই ছোট ছেড়ে বড়কে ধরায়—বিসর্জনীকে মানতে চাই

আমরা নব-আগমনীকেই জানতে চেয়ে। কাজেই যদি কেউ আমাকে বলেন: "ওহে, গানে সুরবিহার ছাড়ো," তখন আমার এক্তিয়ার আছে তাঁকে প্রশ্ন করার: "আগে শুনি ছাড়ার বদ্‌লি পাব কী?" য়ুরোপীয় গানে মেলডির এ-অচলীকরণের ক্ষতিপূরণ করে তার হার্মনি-সঙ্গত। কিন্তু আমাদের গানে মেলডিকে নিরাভরণ বৈধব্যপন্থী করব কোন্ নববল্লভের লোভ দেখিয়ে? একথা আমাদের দেশে দেখি অনেককেই বোঝানো যায় না, কিন্তু ও দেশে বলতে না বলতে বোঝে সবাই যে কোনো বড় সম্পদকে না-হক খোয়ানো হ'ল মূঢ়তা। তাই তো ১৯২৭শে ও দেশে রোলাঁ আমাকে বলেছিলেন: "দিলীপ, সুরবিহার যদি তোমরা হারাও, তবে জগৎ একটা মস্ত সম্পদ হারাবে।"

তন্দ্রা দেবীও এই কথাই বললেন আমাকে: "দিলীপ, বড় গায়ক সবাই নয়—যারা সাদামাঠা গড়পড়তা তারা গাক সাদামাটা গান—কিন্তু বড় প্রতিভার লীলাক্ষেত্র গানের ব্যাপ্তিতে, সম্পদে, সুরের ঐশ্বর্যে।" ব'লে রাখা ভাল যে তন্দ্রা দেবী (এখন ইনি বিখ্যাত সুরশিল্পী John Foulds-এর পত্নী) একজন সত্যিকার সঙ্গীতবেত্তা। "The Music of To-day" নামে খ্যাতনামা বইটি লেখেন তিনি তাঁর স্বামীর সহযোগিতায়। ইনি ছিলেন ওদেশে একজন খুব ভালো বেহালা বাজিয়ে—য়ুরোপীয় সঙ্গীতের টেকনিক এঁর নখদর্পণে। এ হেন সঙ্গীতবিশারদ তন্দ্রা দেবী আমার মুখে মহাদেব সম্বন্ধে একটি গান শুনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন: "সুরের এ অগ্নিলীলা—this singing like Bird of fire এক তোমাদের ভারতীয় সঙ্গীতেই সম্ভব—এ সহজ নৈপুণ্য আমাদের কোথায়? এ যদি তোমরা হারাও তবে পথে বসবে জেনো।" আমাকে বার বারই তাই তিনি বলতেন আমাদের সুরবিহারের এ অদ্বিতীয় ঐতিহ্য বজায় রাখতে।

এ-ঐতিহ্য হারালে যে আমাদের বিনাশ হবে একথা আমি বহুদিন থেকেই ব'লে আসছি তুমি জানো। বিলেতেও এ যুগে বহু গায়ক গায়িকা আমাদের গানের এ স্বাধীনতার দিকে খুঁজেছেন ও ঝুঁকেছেন পরমশ্রদ্ধার আনন্দে। তাই তো আমি এত চেয়েছি সুরের সাধনা, হিন্দুস্থানী গানের চর্চা। বিনা সাধনায় কি কোনো শিল্প বড় হয় হীরেন?—বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের মত শিল্প, যেখানে প্রতি সুরকে রাখতে হবে প্রেরণার তাঁবেদার। তাই তো আমি ক্রমাগতই ব'লে এসেছি যে আমাদের সঙ্গীতে বড় সুরকার হ'তে হ'লে আগে চাই সুরের বহু চর্চা, প্রেমের অভিনিবেশ, পরীক্ষার সাধনা।

আর তারো আগে তাই ধ্যানদৃষ্টি, যার আলোয় দেখতে পাব কোন্ পথ আমাদের সঙ্গীতের মুক্তির পথ। সুরের সাধক না হ'লে এ ধ্যানদৃষ্টি ফোটে কখনো? যিনি বড় সুরকার হ'তে চাইবেন তাঁকে আগে আদর করতে হবে—শিখতে হবে ভারতীয় সুরের এই অপরূপ সমারোহ যা আজ বিশ্বের বিস্ময়। নৈলে তিনি বুঝতেও পারবেন না কেন আমাদের



কাশ্মীরের পপ্‌লারবীথি

সঙ্গীতে সুরকারের পদবি পেতে পারেন কেবল তিনি, যিনি বড় বড় ভারতীয় সুরকারদের মতনই নিজে পিছনে থেকে সুরের সম্ভাবনা—suggestiveness-কেই তুলবেন উজ্জ্বল ক'রে। অর্থাৎ ভারতীয় সুরকার যদি প্রকৃত সুরকার হন তাহ'লে নেপথ্যে সুরকে ধরবেন সামনে, একথা বলবেন না যে আমার এ-সুর কেউ এতটুকু এদিক ওদিক করতে পাবে না, বলবেন: "আমি গড়লাম এই গানের প্রতিমা, কিন্তু এতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন সুরের সাধকরা তাঁদের হৃদয়ের আরতিতে, প্রেমের প্রতিভায়।"

একথা বলতে যাঁকে বাজবে তাঁর পদবি "সুরকার" (composer) না—তাঁর পদবি বড় জোর "গান রচয়িতা।"

হীরেন, বছর পনের আগে লক্ষ্ণৌয়ে শুনেছিলাম পণ্ডিত ভাতখণ্ডের একটি অবিস্মরণীয় বক্তৃতা। রাগের রচয়িতাদের কোনো নাম নেই কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "আগেকার যুগে সুরকাররা রাগাদি রচনা করতেন কিন্তু সে সবে কোনো নাম খুদে রাখতে চাইতেন না। তাঁরা চাইতেন তাঁদের রচিত রাগের প্রদীপ সহস্র গুণীর কণ্ঠে সহস্র দীপালিকা হ'য়ে জ্বলুক—তাইতেই তাঁদের সৃষ্টির আলোক-সার্থকতা—প্রতি রাগে রচয়িতার নাম বা ভঙ্গি চির-চিহ্নিত হ'য়ে থাকুক এ তাঁরা কোনোদিনও কামনা করতেন না, যদিও আজ—" বলেছিলেন পণ্ডিতজি মৃদু হেসে—"আমরা চাই তিল পরিমাণ সুর সৃষ্টির জন্যে তাল পরিমাণ বাহবা জয়ধ্বনি।"

কথাটা আমার মনে অনপনেয় ছাপ রেখে গিয়েছিল। আমার দৃষ্টি গিয়েছিল খুলে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম ভারতীয় সুরকার কোন্ পথে অতুলনীয়। তিনি পাশ্চাত্যের মতন নিজের ভঙ্গিটিকে অচল প্রতিষ্ঠ ক'রে গৌরব চান না, তিনি চান নিজের নাম, না সঙ্গীতের গৌরববৃদ্ধি, সম্পদ বৃদ্ধি। আমি বড় সঙ্গীতকার হই এ উচ্চাশা ব্যাপক কিন্তু মহৎ নয়—মহৎ উচ্চাশা হ'ল এই যে, আমাদের সঙ্গীত বড় হোক। তাই সঙ্গীতের দীপ্তি সম্পদ বাড়াতে যদি আমার প্রতিভা-দধীচি ইন্ধনের কাজ করে তবে তার চেয়ে সুখমৃত্যু আমার কী হ'তে পারে—এই-ই ছিল তাঁদের মন্ত্র। লক্ষ্য তো নাম নয় হীরেন, লক্ষ্য হ'ল সুরের বহু বিকাশের বহু সম্ভাবনার দান।

এখানে যেন আমাকে ফের ভুল বুঝো না। আমাদের সঙ্গীতে "গান-রচয়িতা" বলতে আমি কোনো অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করছি না। গান ভালো হ'লে গান-রচয়িতাও আমাদের শ্রদ্ধেয় তো বটেই। একটি ছোট সরল স্নিগ্ধ গানেও যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায় ও পাওয়া উচিত। ভালো রামপ্রসাদী, ভালো ভাটিয়ালি, ভালো বাউল এ সবই শ্রীমন্ত সুন্দর। কাজেই এদের সাঙ্গীতিক মূল্যও অস্বীকার্য নয়। অনেক আধুনিক সরলশ্রী বাংলা গানের সম্বন্ধেও এই কথা।

কিন্তু সব বলা হ'য়ে গেলেও তবু একটা কথা বলতেই হবে জোর ক'রে যে, অন্য সব শিল্পকলার মতন সঙ্গীত জগতেও মুড়ি যা মিছরি তা নয়। অর্থাৎ, গানে যদি সুরবিহারের অবকাশ না থাকে—গায়ক নিজে স্রষ্টা হবার সুযোগ না পায়, তবে সে গানের রচয়িতাকে প্রথম শ্রেণীর "সুরকার"—কম্পোজার—বলা চলবে না। সামান্য, এমন কি, গড়পড়তার মধ্যেও রস থাকলে তাতে আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি মুড়িতে নয়—মুড়ি-মিছরির একদর ধরায়। তন্দ্রা দেবীর নৌকায় চৈনিক প্রবীণের সারগর্ভ কথায় মুগ্ধ হয়েছিলাম আরো এই জন্যেই।

আমি জানি বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বলবেন এ-ধরণের আবির্ভাবে যে সব কথা শুনি তার তাত্ত্বিক মূল্য কিছুই নেই। এঁরা মনে করেন সে সত্য বা জ্ঞানের পথ একটি—ঐ বুদ্ধি বা বিচার বা বিজ্ঞান। কিন্তু জীবন এত সরলপন্থী নয়। তার হাজারো ছন্দ হাজারো প্রেরণা হাজারো রঙচঙ। সত্য-প্রেরণারও কিছু একটিমাত্র বাঁধা পথ নেই—তার অভ্যাগমের পথ অনন্ত।—তাকে জানতে হ'লে তাই সন্ধানীই হ'তে হয় নত হ'য়ে, শুধু বিচারক হ'তেই যে ব্যগ্র তার জীবন শ্রেষ্ঠফলপ্রসূ হ'তে পারে না। বড় ভাব, বড় সূচনা, বড় প্রেরণা, বড় ইঙ্গিত নানা পথ দিয়েই ছুঁয়ে যায়। তাই এ ধরণের আবির্ভাব বা বাণীকে যাঁরা কোনো দিনই জানতে চান নি তাঁদের মতামতকে নামঞ্জুর করলে খুব অন্যায় হবে না—কেন না, তাঁদের এসব মতামত অজ্ঞান ভিত্তিই বটে—আলোক সম্ভব নয়।

ধরো, উইলিয়ম খুব সাদাসিদে লোক। বলল আমাকে যে এরকম আবিষ্ট অবস্থায় সে যে কী বলে করে নিজেও জানে না, বা এসব পরে তাকে বললে বুঝতেও পারে না। কিন্তু তবু সে এমনতর জ্ঞানগর্ভ কথা বলে কী ক'রে? কত চমৎকার চমৎকার কথাই যে সে বলত এ-ধরণের আবেশে! কিন্তু ফের বলি এ-আবেশে তার কথার মধ্যে যে ভাবগাঢ়তা ফুটে ওঠে তার আভাষ দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই বলি নিবেদিতার কথায় প্রতিধ্বনি ক'রে :

যে-বাণী আসে মন্ত্রসম পরম পরিবেশে
বুঝিতে পারি—বোঝাতে গেলে কোথা যে যায় ভেসে!

তোমার মধ্যে জ্ঞান সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সহজ ও সজাগ। তাই বলি এ পরিবারটির সম্বন্ধে আগে দু-একটি কথা।

বলেছি তন্দ্রা দেবী গীতি নিপুণা, তানপুরার সঙ্গে ওদেশে ভারতীয় গান গাইতেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ইনি বিশেষজ্ঞা ··· কত লেখাই যে লিখেছেন। চিন্তাশীলা। তার উপর মুখে শ্রমশীল পবিত্র জীবনের এমন স্নিগ্ধ আলো! আমাদের সবাইয়েরই তাঁকে ভারি ভালো লেগে গেল। এঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা হয়েছে আমার অনেকবারই। গত বছর একটি গীতিসভায় এঁকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল যে-সভায় আমি ছিলাম সভাপতি। ইনি আসবেন ভেবেও আসতে পারেন নি। প্রায় দেখা হ'তে হ'তে হয় নি। হঠাৎ কী অদ্ভুত যোগাযোগে দেখা হ'য়ে গেল ভাবো, হীরেন, একবার ভাবহ। চেস্টারটন অবশ্য বলেছেন যে সংসারে কোন্ ঘটনাটাই বা কোইন্‌সিডেন্স নয়---

আমি যে জন—শুক্রবারে দ্বিপ্রহরে কেন
হ্যারিকে দিনু মোটর চাপা অকস্মাৎ হেন?
মুহূর্তেক দেরি সে কেন করিল না যে হায়!
আমিই বা যে শীঘ্র এনু কেন—কে ভেবে পায়?

বাস্তবিক শুক্রবার দ্বিপ্রহরে জন একটু তাড়াতাড়ি খেয়েছিল—মাথা ধরেছিল ব'লে। হ্যারির হ'ল একটু দেরি, একটা চিঠি ভুলে ফেলে এসেছিল কি না—বেরিয়েই মনে প'ড়ে গেল তাই যেতে হ'ল ফিরে। কিন্তু এদিকে তার যদি এ আধ মিনিট দেরিটুকু না হ'ত এবং ওদিকে জনের যদি খাওয়া দেড় মিনিট আগে সারা না হ'ত, তাহ'লে রাস্তা পেরুবার সময়ে ওদের সংঘর্ষ হ'ত না এ কথা বলতে ত্রিকালদর্শী হওয়ার দরকার করে না। অথচ দেখা যায় যে জীবনে অনেক পরম পরিণতিই এই ধরণের এক আধ মিনিটের এদিক ওদিকের উপর নির্ভর করে। কেন যে করে জানি না—তবে করে এ সত্য এত বেশি প্রত্যক্ষ, যে অস্বীকার করলেই হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। সেদিন উইলিয়ামের সঙ্গে হঠাৎ ডাকঘরে দেখা না হ'লে ও আমার মাথায় গেরুয়া টুপি না থাকলে ও-ও আমাকে সম্ভাষণ করত না—তন্দ্রা দেবীর সঙ্গেও আমার দেখা হ'ত না। আর দেখা না হ'লে এমন মহামূল্য অভিজ্ঞতাটি থেকেও তো আমি বঞ্চিত হতাম। সত্যি বলতে কি, সেই চৈনিকের উপদেশে আমি ভারি জোর পেয়েছি যেন নতুন ক'রে—তাই তোমাকে এ প্রসঙ্গে ব'লে ফেললাম এক গঙ্গা কথা।

অথচ ভাবো হীরেন হে, ভাবো একবার। তন্দ্রা দেবীর বজরাটি ছিল আমাদের বজরার প্রায় সাম্‌নেই—ঝিলমের অন্য পাড়ে। কিছুদিন বাদে তিনি আমাদেরই এ-পারে এনে রাখলেন। তখন আরো আসা-যাওয়া। এত শত কাণ্ড নির্ভর করল ঐ হঠাৎ উইলিয়াম-দিলীপ সংবাদের উপর।

এঁদের সঙ্গে ভারি ভাব হ'য়ে গেল আমার। এঁর দুই মেয়ে ও ছেলের সঙ্গেও। নৌকায় এঁরা সবশুদ্ধ পাঁচ জন: উইলিয়াম—তন্দ্রা দেবীর পোষ্যপুত্র, প্যাট্রিক—তাঁর পুত্র, মেরি ও তার দিদি, দিদির নামটি মনে পড়ছে না কিছুতেই, ধরো লুসি। উইলিয়ামের কথা বলেছি। সে সত্যি খুব সরল ও মিশুক। তবে খামখেয়ালি। আমাদের সঙ্গে কখনো বা মিশত—কখনো বা গুম্। শিকারা ক'রে বেড়াত ওরা প্রত্যেকেই---হয় দাঁড় টেনে, নয় লগি ঠেলে। কী সহজ কর্মিষ্ঠতা! উইলিয়াম খরস্রোতা ঝিলমবক্ষে কখনো বা লাফাত শিকারায়—প্যাট্রিক সামলাতো টাল অট্টহাস্যে। মেরিও দাঁড় টানত—করত আমাদের পারাপার। স্বাবলম্বন এদের রক্তে—না, আরো বেশি—অস্থিমজ্জায়। ধরণীদা এ বিষয়ে জহুরী, তাই আরো বুঝতেন ওদের এ গুণটি। থেকে থেকে তাই তাঁর মাথায় দিব্য প্রতিভার প্রেরণা নামত, বলতেন রুখে উঠে তাঁর ছেলে বাবুলকে:

যা যা যা যাঃ—ওদের ম'ত দাঁড়া নিজের পায়ে।
ঘরের কোণে কাঁপিস কেন শাল দোশালা গায়ে?
আর কিছু না পারিস—তেড়ে মালকোঁচাটা বেঁধে
ওঠ্ না—ছোট্, খা রে হোঁচট্, শুধু হেসে—
না কেঁদে।

অমনি প্রভাদি ব'লে উঠতেন ঝঙ্কার দিয়ে:

না না না নাঃ—বিভূঁয়ে এসে ওসবে নেই কাজ
নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাস—দাঁড়া ঘরেরি মাঝ।
কী হবে মিছে দৌড়ে? ওমা! হোঁচট!!
সে কি কথা!!!
আয় তো—এ কী! গা ছ্যাক্ ছ্যাক্! নেই তো
গায়ে ব্যথা?

* *

প্যাট্রিক বড় চমৎকার ছেলে। তেইশ-চব্বিশ হবে। শুধু মিশুক না, তার উপরে ভারি অমায়িক ও স্নেহশীল। তাছাড়া সত্যিই সুন্দর আঁকে। শুনলাম সবাই বলে চিত্রপ্রতিভায় অসামান্য। আমি চিত্রজ্ঞ নই—তবু ওর নামা ছবিতে সত্যিই হৃদয় উঠত দুলে। তন্দ্রা দেবী বললেন, ওর নিষ্ঠা আছে, পরে বড় চিত্রী হবে। কাশ্মীরের এক রাজপ্রদর্শনীতে প্রকাণ্ড তৈলচিত্র এঁকেছে—কী যে চমৎকার! তবে নানা শাড়ির ডিসাইনও করে ও—নৈলে লীলা অত ভালো বলে কখনো ?

কিন্তু সব চেয়ে ভালো লাগল এ যুবকটির মধ্যে একটা সহজ গভীরতার ভাব। ও খানিকটা যাকে বলে মিস্টিক সাইকিক। গান শুনতে শুনতে ছবি দেখে খোলা চোখে—যাকে বলে vision : অন্য সময়েও দেখে। একদিন কাশ্মীরের এক মাঠে নীরন্ধ্র অন্ধকারে দেখেছিল একটি মুখ। বলল শ্যামা। হবে। আমি না দেখেছি শ্যামার মুখ, না কালীর, না ছিন্নমস্তার। কিন্তু যেটা স্পর্শ করল সেটা এই মুখখানির সুষমা ও সৌন্দর্য। ও এঁকেছিল এ-হঠাৎ দেখা মুখটি স্মৃতি থেকে। গান শুনতে শুনতেও ও পায় ছবির প্রত্যক্ষ প্রেরণা, আশ্চর্য! কী সরল স্নিগ্ধ হাসি! লীলাকে যা ক্ষেপাত! দুদিনেই ও সবাইকারই খুব আপন হ'য়ে গেল। এষার মুখ ওর ভারি ভালো লেগেছিল। গানের সময়ে হাসির মুখের ভাবও ওর মন টেনেছে, বলল। বলতে বলতে হঠাৎ চড়াও হ'ল—ওদের আঁকবেই। এষা ও হাসি তো আহ্লাদে আশিখানা। দিতে বসল সিটিং। দেখা গেল চঞ্চলা বালিকারাও অচঞ্চলা পাষাণ প্রতিমা হ'তে পারে যদি ভক্ত চিত্রী সায়েব হয়। ওরা ব'সে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হাসিকে প্যাট্রিক বলত হেসে :

"গান গাও তুমি যখন—ও হাসি!—তখন
তোমায় দেখায় কী যে—
শুধু কি অন্যে জানে? বুলবুল! বলছে আয়না :
'সে কি ও নিজে
জানে না সায়েব?—তবে কি না মুখে বলে না—'
না না না ও হাসি, শোনো :
Pose দিতে সেই ফুলেলা পাখির সুরেলা ছবিটি
চিবুকে বোনো।"

হাসি শুনে ভিতরে-খুশি-বাইরে-রাগত সুরে বলত :
"দেখ ত মন্টুদা!

গান না গেয়ে কি গানের ভঙ্গি চিবুকে বা মুখে
যায় গো বোনা?
তাছাড়া, আমাকে কেমন দেখায় তা কি স্বকর্ণে
উচিত শোনা?
সায়েব চিত্রী আঁকছে—খুশি তো হবই, তা ব'লে
ঠাট্টা এত—
করা কি উচিত 'অবলা' বালায়? 'সবলা' হ'লে
ও টেরটি পেত।"

অথ এষা-পর্ব। Variety is the spice of life—তার ভঙ্গি আরো বিচিত্র। গুরুভক্তি ওর রক্তে। যখন শম্ভুজির কাছে নাচ শিখত তখনো তার কথা ছিল ওর কাছে বেদবাক্যের ঠাকুরদাদা (আহা, এ বিষয়ে যদি হাসির ভাবগতিক এষার মতন হ'ত হীরেন!) এখন তো কথাই নেই গুরু—স্বয়ং নির্জলা সায়েব। সে ওকে যে ভাবে বসতে বলবে ও থাকবে ব'সে। ঘাড় বেঁকালো তো বেঁকিয়েই আছে ত্রিভঙ্গিনীর মতন—সাধ্য কি কেউ সে-ঘাড় সোজা করে? যায়-প্রাণ-ভিক্ষে-মেখে-খাবে—এই ভাব। থেকে থেকে মায়া-যে-মায়া সে-ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে বলত :

"কী করো খুকু? অমন ক'রে বেঁকাতে আছে ঘাড়?
একটু বেঁকে যে—সে-ই মেয়ে, বেশি বেঁকালে—পাখি।
তাছাড়া ঘাড়ে—কে জানে—যদি হাড়েই পড়ে চাড়?
ভক্তি অতি হ'লে কী নাম পায় সে—জানো না কি?"

কিন্তু এষা মানবে শাসন?—বিদ্রোহ ওর রক্তে। সায়েব-গুরুভক্তির প্রাবল্যে ওর মুখ উঠত রাঙা হ'য়ে, বলত :

"বাঁকাব আমি, বাঁকাব আমি, বাঁকাব আমি ঘাড়
'নয় মেয়ে—এ পাখি' সবাই বললে কী বা ভয়?
ছবি আঁকার কী জানো তুমি? তোমার কোথা চাড়?
একে সায়েব, শিল্পী তায়—জয় শাদারি জয়।

"তুমি কি কিছু বোঝো না? হায়, সুভাষবাবু যবে
'আপনি' বলেছিলেন মোরে—তুলেছিলে কি কানে?
আহা, শতায়ু করুন তাঁরে বিধি এ-দুখভবে
নামই যদি না হ'ল—বেঁচে থাকার কী যে মানে?

দেখেছ কি মা ভেবে? স্বয়ং সাহেব সেধে আঁকে!
ঘাড় তো ঘাড় যাক না ভেঙে দেহের যত হাড়—
কী ক্ষতি? প্রাণ কভু কি হায় নামের কাছে লাগে?
ভক্তি 'অতি' হ'লেও জেনো বাঁকাব আমি ঘাড়।

ইতি স্নেহবদ্ধ
দিলীপদা

সহপাঠিনী

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

(শেষাংশ)

আমি 'কষ্ট' করতাম না। আমার দেরী দেখে কর্ত্তৃপক্ষগণ এ রকম ব্যবস্থা করবেন, তা অনুমান করেছিলাম—এজন্য এ পত্র পেয়ে নূতন দুঃখ কিছু হ'ল না। কয়েকদিন পরে আমার পুরাণ হোটেলের ম্যানেজার জানালেন, তাঁর বোর্ডারদের মধ্যে একজনকে চুরির অপরাধে ধরা হয়েছে—আমার অপহৃত দ্রব্য তার কাছে কিছু আছে কি-না—আমি নিজে গিয়ে যেন দেখে নিই। হোটেলে গিয়ে দেখি সেই ডেন্টিষ্ট মহাপ্রভু অফিস রুম আলো ক'রে ব'সে রয়েছেন। আমার অপহৃত জিনিষের অনেক কিছুই তাঁর কাছে পেলাম। গহনার বাক্সটা সে খোলে নি—আমি সেটা খুলে দেখ্‌লাম সেগুলি ঠিক আছে। নগদ টাকার কিছুই ফেরত পেলাম না। লোকটা হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"আপনি আমাকে বাঁচান।" ওর ওপর ক্রোধে ও ঘৃণায় আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠেছিল তখন। এই লোকটার জন্য আমারই লক্ষ্ণৌ-এর চাকরীটা হ'ল না—আমি আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলাম এ আমাকে মহা বিপদে ফেলেছিল ব'লে। আমি পিছু হটে পা সরিয়ে নিলাম—তার দিকে তাকাতে বা তার সঙ্গে কথা কইতেও আমার প্রবৃত্তি তখন হচ্ছিল না। ম্যানেজার বললেন—"একে থানায় পাঠিয়ে দিই। অন্য বোর্ডারদেরও ঘড়ী, টাকা ও বোতাম ওর কাছে পাওয়া গেছে—তাঁরাই এখন অভিযোগ দায়ের করুন। দরকার হ'লে আপনার সাক্ষ্য পরে নেবার ব্যবস্থা হবে।" আমি নিজের জিনিষ নিয়ে চলে এলাম। গহনার বাক্সটা আমার অকূল সমুদ্রে আশ্রয়ের মত হ'ল। উৎপলের দেনা শোধ ক'রে দিলাম। গহনাগুলি তাকে দিয়ে একে একে বিক্রী করিয়ে আমি চাকরীর চেষ্টায় ব'সে রইলাম। উৎপল এতে খুব আপত্তি ক'রেছিল, কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করেছিলাম। বৎসরাধিককাল এইভাবে ব'সে থাকার পর যশোর জেলার এক সাবডিভিশনের 'গার্লস্ হাই স্কুলের' একটি শিক্ষয়িত্রী পদের নিয়োগপত্র পেলাম—উৎপলের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে।

ইদানীং উৎপলের সঙ্গে আমার মেলামেশাটা কিছু আন্তরিক হয়েছিল। সে আমাকে নিজের বোনের মতনই স্নেহ করত। তার কাছে শুনেছিলাম, তার বন্ধু অনঙ্গ আমাকে বিয়ে ক'রতে চেয়েছিল এবং উৎপল কেবল আমার খবরাখবর সংগ্রহ ক'রে অনঙ্গকে দিত। উৎপলের খুবই ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যাতে আমার বিয়ে হয় অনঙ্গর সঙ্গে। অনঙ্গ খুব বড় ধনী লোকের ছেলে। সে তখন উৎপলের সঙ্গে চাকরী করত। শেয়ার মার্কেটে জুট শেয়ারের দাম ক'মে যাওয়ায় ফাট্‌কায় বহু টাকা তার লাভ হয়েছে। এখন সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে তাদের জমিদারীতে চ'লে গেছে। এরা দুই বন্ধুতে কেউ বিয়ে করে নি। আমি উৎপলকে "ছোট বোনের" মত অনেক অনুরোধ করেছিলাম বিয়ে করতে—সে এটা-ওটা কারণ দেখিয়ে কথাটা প্রায় উড়িয়ে দিয়েছে।

উৎপল এখনও কলিকাতায় চাকরী করে—সে আমাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে তুলে দিয়ে বললে, "আজ রাত্রে অনেকদিন পরে ভাল ক'রে ঘুমাব।" আমার চাকরীর চিন্তায় বেচারীর মনে বহুদিন শান্তি ছিলনা। আমি নিজের ছেলেটিকে নিয়ে কর্ম্মস্থলে চ'লে গেলাম। সেখানে আগে খবর দেওয়া ছিল। বাড়ী ভাড়া করা ছিল—আমি তাতে গিয়ে উঠ্‌লাম এবং পরদিন কাজে যোগ দিলাম। হেড্ মিস্‌ট্রেস মিস্ দত্তগুপ্ত একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম। কথাবার্ত্তা কাটাকাটা—আমাকে প্রথম দিনই বললেন—"মেয়েদের যত্ন নিয়ে পড়াবেন, তা না হ'লে এখানে চাকরী থাক্‌বে না। আপনাকে বসিয়ে মাইনে দেওয়া হবে না।" আমি ত কথা শুনে অবাক। যা হোক, আমি প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টা থেকেই যত্ন নিয়ে পড়াতে লাগ্‌লাম। কত কষ্টে দিন কাটিয়ে তবে এই চাকরী পেয়েছি। ম'রে গেলেও কর্ত্তৃপক্ষদের অসন্তুষ্ট হ'তে দেবো না—এই প্রতিজ্ঞা ক'রে কাজ আরম্ভ করলাম। শিক্ষয়িত্রীর কাজ বেশ লাগল। প্রাণের উদ্যম ঢেলে দিয়ে মেয়েদের পড়াতে লাগলাম। প্রথমকার ক্লাশের মেয়েদের

অঙ্ক পড়াই আমি। মেয়েরা ত আমার পড়ান দেখে ভারী খুশী হ'ল। আমি তাদের খুব প্রিয় হ'য়ে গেলাম। তাদের শিক্ষয়িত্রী, দিদি, বন্ধু, হিতৈষিণী—একাধারে সকলভাবে পেয়ে আমাকে তারা খুব নিজের ক'রে নিলে। হেড্ মিষ্ট্রেস্ সব শোনেন ও দেখেন, আমার দিকে আর বড় একটা আসেন না। আমি মেয়েদের পেয়ে নিজের কলেজের জীবন ফিরে পেলাম। মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে তাদের পড়া-শোনা, খেলাধূলা প্রভৃতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। মেয়েদের কোনও কমনরুম ছিল না, একটা কমন রুমের ব্যবস্থা করালাম। ডিবেটিং ক্লাব্, ব্যাড্-মিণ্টন ক্লাব্ প্রভৃতিও হ'ল। কিছুদিন পরে স্কুলের বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেনডেণ্ট্ ছুটিতে গেলেন—আমি দরখাস্ত করাতে ওই পদটিও আমার হ'ল। বাড়ী ভাড়া বেঁচে গেল—উপরি কিছু এল্যাওয়েন্স্ আছে। আমি ছেলেটিকে ও নিজের দাসদাসীকে নিয়ে বোর্ডিং-এর কোয়ার্টারে উঠে এলাম। বোর্ডিং-এর মেয়েদের আমি প্রত্যেককে পড়া শোনায় যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে লাগলাম। তাদের বিশ্রামের সময় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সুগৃহিণী ও সুমাতা হবার মত উপদেশ দিতাম (যদিও আমি নিজে কোনটাই হতে পারি নেই); তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সকল রকমে সাহচর্য্য ও সৎ পরামর্শ দিয়ে তাদের মনে প্রফুল্ল থাক্‌তে সহায়তা করতাম। বোর্ডিং-এর সাম্‌নে একটু মাঠ ছিল—সেখানে বৈকালে আমি মেয়েদের নিয়ে একটি ফুলবাগান করতে লেগে গেলাম—মেয়েরা সমস্বরে সকলে তাতে রাজী হ'ল। আমি নিজে কোদাল ও খুরপি নিয়ে মাটি খুঁড়ে কাজ আরম্ভ করলাম—মেয়েরা প্রত্যেকে আন্তরিকভাবে তাতে যোগ দিল। নিজেরা জল তুলে, রোজ বাগানে জল দিতাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পতিত মাঠ্‌টি সিজন্ ফ্লাওয়ার এবং পাতা বাহারের সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হ'য়ে গেল। হেড্ মিষ্ট্রেস্ এতটা আশা করেন নি। তাঁর একটু অসহ্য হ'ল। মনে মনে গর্ গর্ করতে লাগলেন এবং আমার প্রতি একটু রূঢ় হয়ে উঠ্‌লেন। একদিন ফার্ষ্ট ক্লাসে আমি য়্যালজেব্রার ক্লাস নিচ্ছি এমন সময় তিনি রুক্ষ মূর্ত্তিতে আমার ক্লাসে ঢুকে আমাকে ধম্‌কে ব'লে গেলেন, "এটা স্কুলের ক্লাস—গল্প করবার জায়গা নয়। মেয়েদের সঙ্গে গল্প করবেন না—ভাল ক'রে পড়ান।" আমি মেয়েদের ইকোয়েশানের একটা প্রব্লেম বোঝাচ্ছিলাম—তারা নিস্তব্ধ হ'য়ে শুন্‌ছিল—আমি উৎসাহের সঙ্গে তাদের শিখিয়ে যাচ্ছিলাম। কোথায় গল্প—কে কথা কয়েছিল—কেউ বুঝ্‌তে পার্‌লে না। মেয়েরা হেড-মিষ্ট্রেসের ওপর খুব চটে গেল, আমাকে এমন ঠেকা দিয়ে অপমান করার জন্য। আমার সে পিরিয়ডের পর হেড-মিষ্ট্রেসের সে ক্লাসে ইংরেজীর পিরিয়ড। মেয়েরা আমার ক্লাস ত্যাগের পর সকলে মাঠে গিয়ে ব'সে রইল—হেড্ মিষ্ট্রেসের নিজের বোনও (সেও ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্রী ছিল)। হেড-মিষ্ট্রেস ক্লাসে এসে ঘর খালি দেখে মাঠে গিয়ে মেয়েদের শাসাতে লাগলেন। মেয়েরা বললে তাঁকে—"বেলাদিকে আপনি ক্লাসের মাঝে মিথ্যা অপমান করেছেন, সেজন্য আমরা আজ আপনার ক্লাস করব না।"

তাতে তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লেন এবং মেয়েদের নামে রিপোর্ট করবেন ব'লে ভয় দেখালেন—কিন্তু বৃথা। চেঁচামেচির কোনও ফল হ'ল না। আমি এ সব জান্‌তাম না। আমার লিজার ছিল—একটু পরে টিচার্স-রুমে আর একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে শুনে মেয়েদের কাছে গেলাম· তারা আমার একবার বলাতেই ক্লাস করতে চ'লে গেল। হেড্-মিষ্ট্রেস্ কাছেই হতাশ হ'য়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন এবং কি শাস্তি এদের দোষের অনুরূপ হবে তাই ভাবছিলেন। আমার অঙ্গুলিসঙ্কেতে মেয়েরা এখন উঠে এল দেখে তাঁর কান লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সমস্ত আক্রোশ তাঁর আমার ওপর পড়ল। শুন্‌লাম কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট আমার নামে মেয়েদের বকিয়ে দেওয়ার জন্য রিপোর্ট করবেন বলেছেন। আমার নিজের অবস্থার কথা মনে হ'ল। মেয়েদের বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দিলাম আমার কথা ভেবে যেন তারা কদাচ এ রকম কাজ আর না করে। তারা সকলে হেড্ মিষ্ট্রেসের কাছে নিজেদের দোষ স্বীকার ক'রে এল এবং আর কখনও করবে না ব'লে ক্ষমা চেয়ে এলো। আমি এতটা আশা করি নি—মনে মনে খুব খুশী হলাম—ভাবলাম আমি অন্তত সাত জন্ম ইতিপূর্ব্বে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছি—নচেৎ এত সাক্‌সেস্‌ফুল টিচার হলাম কি ক'রে।

দিনকতক আর কোনও ঘটনা হ'ল না। তারপর একদিন বিকালে মিস্ দত্তগুপ্ত কি কাজে বোর্ডিং-এ

এসেছেন। আমি বোর্ডিং-এর সংলগ্ন নিজের কোয়ার্টারে ছিলাম—মেয়েরা কোমরে কাপড় বেঁধে ফুলবাগানের কাজ করছিল। মিস্ দত্তগুপ্ত যখন জান্‌লেন, আমি সেখানে নেই—কোয়ার্টারে আছি—তখন মেয়েদের ছোটলোকের মত মালীর কাজ করার জন্য তিরস্কার করতে লাগ্‌লেন এবং আমার সাহচর্য্যে তাহাদের এরূপ ইতরবৃত্তি হ'চ্ছে এ জন্য পরোক্ষভাবে আমারও নিন্দা সেখানে করছিলেন। (বুঝলাম, তাঁর স্বভাবে কাপুরুষতা যথেষ্ট আছে)। আমি হঠাৎ আমার ছেলের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হ'তেই বাগানের প্রসঙ্গ বন্ধ হ'ল এবং মেয়েরা আমার উপস্থিতিতে সাহস পেয়ে যে যার কাজে চ'লে গেল। মিস দত্তগুপ্ত তাতে কিছু আপত্তি করলেন না। কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "ও কে?" আমি বললাম, "আমার ছেলে।" এতে তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লেন এবং ব'ললেন, "আপনি 'মিস্' ব'লে পরিচিতা—আপনার ছেলে কি রকম?" আমি লজ্জায় ও ক্রোধে লাল হয়ে সংক্ষেপে তার ইতিবৃত্ত বললাম। কিন্তু আমার কথা শোনে কে? তিনি গর্ গর্ ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেলেন। ব'লে গেলেন—"এই রকম চরিত্রের শিক্ষয়িত্রীর উপর এইটুকু মেয়েদের নৈতিক শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে!" তিনি এখনই তার প্রতীকার করবেন। আমি ভাব্‌লাম, এর কাছে কোনও কথা ব'লে কোনও লাভ নেই—এ আমার ত্রুটির সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে—যা হোক দোষ একটা দেখিয়ে আমার অনিষ্ট করতে চায়। তদন্ত হ'লে সব কথা শুন্‌লে ওরই মুখে চুণ কালি পড়বে—মেয়েদের সাম্‌নে এরূপ প্রহসন করার জন্য।

পরদিন প্রাতে স্থানীয় সাব্ ডিভিশনাল অফিসারের আর্দ্দালি পিয়নবুকে সই নিয়ে আমাকে এক খামে বন্ধ চিঠি দিয়ে গেল। এখানকার এস্. ডি. ও. একজন বাঙালী সিভিলিয়ান্—তাঁর স্ত্রী স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট শুনেছিলাম। আমার সঙ্গে আলাপ বা দেখাশোনা ইতিপূর্ব্বে হয় নি। খাম খুলে চিঠিতে সই দেখ্‌লাম প্রেসিডেন্ট—শেফালিকা দাস। আমি সই দেখে লাফিয়ে উঠ্‌লাম—এই কি আমার সহপাঠিনী সেই শেফালি? এতদিন যার খোঁজ ক'রে এসেছি? দীর্ঘ কয়' বৎসরকার পরস্পরের ইতিহাস বলবার ও শোনবার অদম্য স্পৃহায় আমি হাঁপাতে লাগ্‌লাম। ভাবলাম যদি সেই শেফালি আমার আজ মনিব হ'য়ে থাকে, তবে একবার মিস্ দত্তগুপ্তকে দেখে নেবো। একবার মনে হ'ল—এ সে শেফালি বটে কি-না সন্ধানটা আগে নেওয়া যাক্। মনের আবেগে এতক্ষণ শেফালিকা দাসের স্বাক্ষরিত পত্রখানি পড়া হয় নাই। তুলে নিয়ে সেটা পড়তে গেলাম। লেখা আছে—"এতদ্বারা মিস্ বেলা দাসগুপ্তাকে জানান যাইতেছে, যেহেতু তাঁহার নামে গুরুতর অভিযোগ আমার সমীপে উপস্থিত করা হইয়াছে, সেজন্য এ বিষয় তদন্ত ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর পদ হইতে সাস্‌পেণ্ডেড হইলেন এবং পত্র-প্রাপ্তির বার ঘণ্টা মধ্যে তিনি স্কুল বোর্ডিং যেন ত্যাগ করেন।" আমি ইহাতেও দমিলাম না। তখনই শেফালির পরিচয় সংগ্রহে এস্ ডি. ও.-র কোয়ার্টারে গেলাম। শুনিলাম, মেম সাহেব বাড়ী নাই—বেড়াইতে গিয়াছেন। বৈকালে আর একবার গেলাম—তখনও সাক্ষাৎ মিলিল না—একটু দমিয়া গেলাম। যদি এ আমার সহপাঠিনী শেফালি না হয়, তাছাড়া সে আমাকে বলেছিল সে কখনও বড় চাক্‌রেকে বিয়ে করবে না। এ ত একেবারে সিভিলিয়ান্। সাত-পাঁচ ভেবে আমার পুরাণ ভাড়া বাড়ীতে উঠে গেলাম—সেটা খালি ছিল। মেয়েরা বললে—তাদের এ অপমানের শোধ তারা নেবে—আমি তাদের মধ্যে ফিরে এলে। মিস্ দত্তগুপ্তকে বোর্ডিং-এর চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে এলাম—তাঁর মুখে একটা উল্লাস ফুটে উঠেছে দেখলাম—অতি কষ্টে চেপে আছেন।

পরদিন প্রাতে স্কুলের দারওয়ান আমাকে সংবাদ দিলে—হেড্ মিষ্ট্রেসের অফিস্-রুমে প্রেসিডেন্ট আমাকে সেলাম দিয়েছেন—অর্থাৎ ডেকেছেন। আমি তখনই উঠে গেলাম। অফিস্-রুমে ঢুকে দেখি আমার সেই শেফালি মিস্ দত্তগুপ্তর পাশে ব'সে কি একটা কাগজ পড়ছে। পরে বুঝেছিলাম সেটা আমার বিরুদ্ধে মিস্ দত্তগুপ্তর লেখা একটা রিপোর্ট। আমি লাফিয়ে শেফালিকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছি—এমন সময় সে আমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললে, "মিস্ বেলা দাসগুপ্ত, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ অতি গুরুতর—আপনার কি বলবার আছে, বলুন।" আমি তার দিকে চেয়ে হেসে ব'ললাম, "আপনি আমার বাল্যকালের সহপাঠিনী, আপনি নিজে আমাকে ভাল

ক'রেই জানেন"—তারপর আর একটু হেসে তার দিকে এগিয়ে বললাম, "চল্ তোর বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবি—সেখানে তার কান ম'লে দেবো—আমার সখিটিকে কেড়ে নেওয়ার জন্যে—আর তার সাম্নেই তোকে সব কথা বলব—কি খোঁজটাই তোর এ ক'বছর করেছি—মাগো মা, তুই কি ক'রে তোর বেলাদিকে ভুলে এমন ক'রে গা ঢাকা দিয়েছিলি?" শেফালি আমার বক্তব্য সবটা শুন্‌লে—সে আমাকে দেখেই চিনেছিল—আমি চুপ করতেই বললে, "ডোণ্ট্ বি ভাল্‌গার, এক সঙ্গে পড়েছিলাম ত কি হয়েছে; অনেকেরই সঙ্গে পড়েছিলাম, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ হয়েছিল মনে পড়ে, তা 'হ্যাং ইট্', এ বিষয় আপনার কি বলবার আছে?" আমি আকাশ থেকে পড়লাম। সীতা কত দুঃখে ধরণীকে দ্বিধা হ'তে বলেছিলেন, তখন বুঝতে যেমন পেরেছিলাম—"সীতার পাতাল প্রবেশ" উপাখ্যান সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে প'ড়ে তেমন বুঝি নি। মিস্ দত্তগুপ্ত শেফালির সঙ্গে আমার পড়ার কথা শুনে প্রথমটা ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিলেন, তারপর তার মনোভাব দেখে বেশ একটু সাহস পেয়ে আমাকে ধমক দিয়ে আমার বক্তব্য শীঘ্র জানাতে বললে, কারণ প্রেসিডেণ্ট্ সাহেবার এস্. ডি. ও.-র সঙ্গে বেড়াতে যাবার সময় হ'য়ে আস্‌ছে—এস্. ডি ও. মোটর নিয়ে স্কুলে আস্‌বেন।

শেফালি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত শেষ ক'রে স্কুল থেকে মোটরে উঠ্‌বে—এম্‌নি বন্দোবস্ত আছে শুন্‌লাম। আমি ভাবগতিক সুবিধার নয় বুঝ্‌লাম এবং নিজের জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস বিবাহের থেকে আরম্ভ ক'রে সব শেফালিকে নিজের অভিযোগ প্রক্ষালন মর্ম্মে জানালাম। শেফালি আমার ছেলেকে দেখ্‌তে চাইলে—বিচারকের কক্ষে—মাসীর কক্ষে নয়। আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। মিস্ দত্তগুপ্ত ক্রূর হাসি হেসে বললে—"নাকে কাঁদবার জায়গা এটা নয়—ওঁকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।" আমি ভ্রূকুটি ক'রে বললাম, "আপনার শিষ্টাচার শিক্ষাকে বলিহারি। কি দিয়ে আপনার হৃদয় গড়া কে জানে। মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরল শিশু কি সাক্ষ্য দিবে। তাকে এখানে আনায় যে মায়ের কি কষ্ট হ'বে আপনি নিঃসন্তানা—তার কি বুঝবেন?" মিস দত্তগুপ্তর হাসি মিলাইয়া গেল। শেফালির মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল—সেও নিঃসন্তানা বুঝ্‌লাম। এটা জান্‌লে—এ কথাটা হয় ত আমি একটু ঘুরিয়ে বলতাম। শেফালি বলল, "আপনার হ'য়ে যদি 'ডক্টর' (প্রফেসার) দাস সাক্ষ্য দেন, তা হ'লে আপনার চাকরী থাকে—নচেৎ স্কুল থেকে আপনার অন্ন উঠে গেল।" মিস্ দত্তগুপ্ত এতটা আশা করেন নাই। তিনি আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিলেন। আমি নারীর অপমান মাথায় ক'রে সেখানে থপ্ ক'রে বসে পড়লাম। শেফালি মিস্ দত্তগুপ্তর হাত ধ'রে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল। আমি চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। শেফালির কাছে কোনও দিন এ রকম ব্যবহার পাব—আমি স্বপ্নের গোপন কোণেও ভাবতে পেরেছিলাম কি? কতকক্ষণ পরে স্কুলের দারওয়ান ঘরে চাবী দিতে এসে আমাকে ডাক্‌ল - আমাকে সে ও ভাবে ব'সে থাক্‌তে দেখ্‌ল—এই আমার কতদূর অপমান। আমি সে অপমানও মাথায় ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম—সোজা নিজের বাসায়। মেয়েদের আর এ মুখ দেখাতে পারব না। ঘরে গিয়ে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরলাম। সে কিছু জানে না—আমার মুখের দিকে চেয়ে—আমার ভাব দেখে কেঁদে ফেল্‌ল। আমি তাকে ঝিয়ের কোলে দিয়ে—নিজের কাজে গেলাম। উৎপলকে একটা চিঠি লেখা ছাড়া আর কি উপায় আছে—ভেবে পাচ্ছি না। বিকেলের দিকে চুপিচাপি একবার এস্. ডি. ও-র কোয়ার্টারে গেলাম—শেফালির মনের ভাব আর একবার বুঝ্‌তে—আত্মবঞ্চনা আর কাকে বলে? শেফালি 'কে একজন ডাক্‌ছে' শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে বললে, "আবার কি চান আপনি—চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে আজই স্কুলের সংশ্রব ত্যাগ করবেন আপনি—দেরি করবেন না।" আমি তাকে বললাম, "আমার সহপাঠিনী আপনি, আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ ক'রে যাব।" স্বামীর নাম শুনে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠ্‌ল—বুঝ্‌লাম এদিকে সে সুখী নয়—সে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, "এস. ডি. ও-র সঙ্গে দেখা করতে হলে দরখাস্ত ক'রবেন—মঞ্জুর হয় যদি দেখা হবে, নচেৎ নয়।" আমার মন মথিত হ'য়ে যাচ্ছিল। সহ্যের সীমা অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে গেছে। অভাবের তাড়নায়, অন্নের তাড়নায়—এতদূর আত্মনিগ্রহ হেসে বরণ ক'রে যাচ্ছিলাম। আর পারলাম না। চ'লে এলাম। একবার

একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম, লেখা ছিল, "আপনার স্ত্রী কি খিট্‌খিটে? তা হ'লে আপনি এই ঔষধ সেবন করুন।" আমার মনে হ'ল, শেফালির স্বামীর সেই ঔষধটি সেবন করলে শেফালির খিট্‌খিটেমি যদি যায় ত আমি তাকে এক শিশি সে ওষুধ কিনে দিতাম্—কিন্তু তিনি সিভিলিয়ান হাকিম—নেবেন কি? তা ছাড়া সেটা হ'চ্ছে মামুলি গাছগাছড়ার ওষুধ।

৬

শেফালির কাছ থেকে বাসায় ফির্‌লাম। উৎপলকে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লাম। লিখি আর কাটি—যা লিখি চোখের জলে মুছে যায়। লেখা বন্ধ করলাম—মনে হ'ল, উৎপল যদি আমাকে গঙ্গাবক্ষ থেকে তুলে না আন্‌ত, তা হ'লে আজ আমার এ অপমান ও দুঃখ ভোগ করতে হ'ত না—সে-ই যত নষ্টের মূল—তাকে চিঠি লেখার কল্পনা ত্যাগ করলাম। কিন্তু কি করব তা ভেবে পাই না। খানিকটা টেবিলে মাথা দিয়ে একলা কাঁদলাম—ছেলে এসে বাধা দিলে। তাকে কোলে ক'রে নিয়ে জলে ডুবে মরব ঠিক করলাম—আর অন্য উপায় বিশেষ ছিল না। যথা চিন্তা তথা কাজ। তাকে কোলে নিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে একটু যেতেই দূরে একটা মস্ত বড় মোটর তীরবেগে ছুটে আসছে দেখ্‌লাম। দৃষ্টির মধ্যে গাড়ীখানা এলে দেখ্‌লাম একটা প্যাকার্ড গাড়ী, চালক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কি মনে হ'তেই লাফিয়ে চলন্ত মোটরখানার সাম্‌নে পড়লাম। মুহূর্ত্তে ব্রেকের ভীষণ শব্দ ক'রে গাড়ীখানা থেমে গেল। মাড্‌গার্ডের সবেগ আঘাতে আমি পাশে ছিট্‌কে প'ড়ে গেলাম—ছেলে আমার কোলে কেঁদে উঠ্‌ল। গাড়ীর চালক নেমে এসে আমাকে তাঁর গাড়ীতে উঠ্‌তে বললেন। আমার হাঁটুতে অনেকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। পাশ ফিরে প'ড়ে গিয়েছিলাম—ছেলের 'শক' ছাড়া কোনও আঘাত লাগে নেই। তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে আর কেউ লোক নেই—এ জায়গাটা ফাঁকা—লোকজন দেখা যাচ্ছে না—আপনি নিজে উঠ্‌তে না পারেন ত আমাকে ধ'রে উঠুন।" আমি চুপ ক'রে প'ড়ে থেকে নিজের ওঠ্‌বার অক্ষমতা জানালাম। আমি মুখ নীচু ক'রে থাক্‌লাম—তিনি আমাকে ধ'রে তুলে মোটরে পেছনের সীটে শুইয়ে দিলেন এবং ছেলেকে কোলে ক'রে এনে আমার কাছে বসিয়ে দিলেন। মোটরে উঠে চালকের সীটে ব'সে তিনি বললেন, "আপনাকে কোথায় রেখে আস্‌তে হবে—ঠিকানাটা বলুন।" আমি চুপ ক'রে রইলাম—তিনি আবার জিজ্ঞাসা করায় বললাম, "আমার কোথাও ঠাঁই নেই—আপনার মোটরের তলায় আমি ছেলেকে নিয়ে মরবার জন্যে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।" তাতে তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন এবং বললেন, "বড় অন্যায় করেছিলেন আপনি—এখন আপনাকে নিয়ে আমি আমার বাড়ীই যাই তা'হ'লে—সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে—আমার বাড়ী কিছু দূরে এখান থেকে—সেখানে আমার ভগ্নী আছেন—আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লে অন্যান্য ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে—আপনার কোনও আপত্তি নেই ত?" আমি কিছু বললাম না—কি আপত্তি আমার থাক্‌তে পারে—এতক্ষণ আমার রক্তাক্ত মৃতদেহ যশোর রোডের ওপর শৃগাল কুক্কুরের ভোজ্য হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌ত—তার বদলে এ ব্যবস্থায় আমি আপত্তি করবার কিছু পেলাম না। আমাকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে তিনি বললেন, 'তাহ'লে আমি গাড়ী চালালাম।' এই বলেই গাড়ী ছুট্‌তে আরম্ভ ক'রল। তখন আমি সাম্‌নের দিকে মুখ ফেরালাম। একটু পরে চালক একবার ঘাড় ফেরাতে দেখি—সে অনঙ্গ। আমি মুখ ঢেকে ব'সে রইলাম—সে যেন আমাকে চিন্‌তে না পারে। নানারকম চিন্তায় মন ভরে রইল। প্রায় আধ ঘণ্টা এম্‌নি অন্ধকারের মধ্যে ছুটে মোটর থামল এক বৃহৎ অট্টালিকার সাম্‌নে। মোটর থাম্‌তেই গেটে ও কম্পাউণ্ডে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠ্‌ল। অনঙ্গ গাড়ীর দরজা খুলে নেমে ইন্‌ভ্যালিড্ চেয়ার আন্‌তে হুকুম দিলে। চারজন লোকের স্কন্ধে ইন্‌ভ্যালিড্ চেয়ারে ব'সে আমি ছেলের সঙ্গে দ্বিতলের এক কক্ষে এলাম। লোকজনের ছুটোছুটি হাঁক ডাক প'ড়ে গেল। অনঙ্গ একটু পরে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে 'খুকু' 'খুকু' ব'লে ডাক দিতে একটি বিশ বাইশ বছরের বিধবা মেয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল। তাকে আমার অসুস্থতার কথা ব'লে দিয়ে শুশ্রূষার ভার অর্পণ ক'রে সে ডাক্তার ডাক্‌বার জন্য লোক পাঠাল। আমি বরাবর চেষ্টা ক'রে নিজের মুখ ঢেকে আছি। অনঙ্গ চ'লে যেতে 'খুকু'

অর্থাৎ অনঙ্গর বোন আমার মুখ খুলে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আলাপ করতে এল। "তোমাকে কি ব'লে ডাক্‌ব ভাই?" ব'লে আমার নাম জেনে নিলে। আমি তার হলুম বেলাদি। তারপর ডাক্তার এসে ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে চ'লে গেলেন। ছেলে খেয়ে ঘুমোচ্ছে। খুকু আমাকে শুইয়ে দরজা বন্ধ ক'রে একজন ঝি পাহারা রেখে বেরিয়ে গেল। দু-চার দিন মধ্যেই ক্ষত ও ব্যথা সেরে গেল। আমাকে খুকু এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়ে বাড়ী দেখাতে লাগ্‌ল। অনঙ্গর শোবার ঘরে ঢুকে দেখি আমার এক ফুল-সাইজ তৈল চিত্র মোটা পেতলের ফ্রেমে বাঁধান এবং ফুলের মালা দিয়ে জড়ান দেওয়ালে টাঙান রয়েছে। আমি কন্‌ভোকেশানের সময় এক্যাডেমিক্ গাউন্ প'রে যে ফটো তুলেছিলাম—এ তৈলচিত্র 'তারই' এন্‌লার্জমেণ্ট দেখে অঁাক'। ব্যাপার বোধগম্য হ'তে আমার বাকী রইল না। আমি সে ছবির দিকে চাইতেই খুকু বললে, "দাদার ওই ছবিই জগতের সারবস্তু। কতদিন আগে ওই মেয়েকে দেখে ওকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। বিয়ে করেন নি, করবেনও না। এত বড় সম্পত্তি ভোগ করবার কেউ থাক্‌ল না—বাড়ীতে আমি ও দাদা ছাড়া আর তৃতীয় মানুষ নেই। কি যে হবে তা ভগবান জানেন। তা বেলাদি, তুমিও দেখতে অনেকটা ওই রকম যেন।" আমি বললাম, "কি জানি, আমি ত নিজেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।" আমার একটা নিশ্বাস পড়ল। ঘর দেখে বাগান দেখে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। খুকু বললে, "বেলাদি, তোমার বাড়ীর কাকে খবর দিতে হবে বললে না—তাঁরা হয় ত তোমার সংবাদের জন্য কত ভাবছেন।" আমি বললাম, "আর একদিন বলব।" খুকু একটু বিস্মিত হ'ল—কিন্তু চুপ ক'রে গেল। আরও দুচার দিন পরে একদিন ভোরে দেখি অনঙ্গ আমার তৈল চিত্রের ফ্রেম অষ্ট্রিচ ফেদার দিয়ে নিজে ঝাড়ছে। সমস্ত দিন সেদিন বড় অন্যমনস্ক ছিলাম—খুকু সেটা ধ'রে ফেললে। আমি তার কাছে নিজের কথা সব বললাম। সে আহা করতে লাগ্‌ল—আমার জীবনটা ছারখার হ'য়ে গেল ব'লে। এই ঘটনার পরদিন বিকালে আমি খুকুর ঘরে ব'সে তাস খেল্‌ছি—এমন সময় অনঙ্গ হঠাৎ সে ঘরে খুকুর কাছে কি দরকারে এল এবং আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে যেতেই হাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল—আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। অনঙ্গ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে খুকুকে বাইরে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, "যে মেয়েটি তোর সঙ্গে তাস খেল্‌ছে, এখানে তার বাড়ীটা কোথায় খোঁজ নিস্ ত?" খুকু দুষ্ট হাসি হেসে বললে, "ওকেই ত তুমি সে দিন সন্ধ্যায় তোমার 'প্যাকার্ড' মোটর চাপা দিতে যাচ্ছিলে এবং রাত্রে ওই ঘরে এনে ফেল্‌লে—তারপর থেকে সে এখানেই আছে।" অনঙ্গ ব'লে উঠ্‌ল, "বেলা আমারই বাড়ীতে!" খুকু বললে, "তুমি ওর নামও জান—আবার আমাকে বাড়ীর খোঁজ করতে বলা হ'চ্ছে!" অনঙ্গ সেখান থেকে চ'লে গেল। খুকু আমাকে বললে, "বেলাদি, তোমাকে দাদা আগে থেকে চেনে দেখ্‌ছি, তোমার সঙ্গে দাদার আলাপ ছিল, তা ত বল নি!" আমি বললাম, "উনি আমাকে চেনেন, তা ত আমি জানতাম না।" খুকু সাদাসিধে মানুষ, কোনও বাঁকা অর্থ না ক'রে জিনিষটাকে ওইখানে ছেড়ে দিলে। আমরা আবার তাস খেল্‌তে আরম্ভ করলাম। এতক্ষণ খুকু হারছিল—এরপর থেকে আমি খুব অন্যমনস্ক হ'য়ে খেল্‌তে লাগলাম—তাতে ক্রমাগত হেরে যেতে লাগ্‌লাম—খুকু এতেও কিছু সন্দেহ না ক'রে মনের আনন্দে খেলায় জিতে যেতে লাগ্‌ল।

পরদিন খুব ভোরে খুকু পৌষের মকর সংক্রান্তি স্নানের জন্য তাদের এক আত্মীয়ার সঙ্গে কলকাতা গেল। একদিন পরে ফির্‌বে—আমার ও আমার ছেলের কোনও অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। অনঙ্গ বাড়ীতেই ছিল—অতএব আমার কোনও ভাবনার কারণ নেই—আমাকে ব'লে গেল। অনঙ্গ বোধ হয় এই অবকাশের অপেক্ষা করছিল। খুকু চ'লে যাবার পর আমি স্নান ক'রে সকালে ঘরে ব'সে রয়েছি—অনঙ্গ সোজা ঘরে ঢুকে খাটে আমার পাশে বসল। আমি তখন ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম। অনঙ্গ আমাকে জিজ্ঞেস করলে, আমি এখন কোথা যেতে চাই, কোথায় আমার নিজের লোক আছেন, কাকে খবর দিতে হবে, ইত্যাদি। সে আমাকে চিন্‌তে পেরেছে, তাও বললে। আমি বললাম, "আমার আর কেউ নেই।" এই ব'লে শেফালির ব্যবহারের কথা সবিশেষে বললাম। অনঙ্গ সব শুনে বললে, শেফালির 'বি, এস্, সি' পাশ না করতে



পাবার জন্য ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্ এবং নিঃসন্তান অবস্থার রিয়্যাকশান্ বিশেষত আমি সন্তানবতী ব'লে—এই দুইয়ের সমাবেশে তার মনের এই জটিল অবস্থার পূর্ণাঙ্গ ক'রেছে। তার ওপর রাগ না ক'রে আমার পিটি করা করা উচিত। খুব আবেগভরে এবং হৃদ্যতার সহিত অনঙ্গ আমার কথা শুন্‌ছিল এবং আমাকে তার কথা বলছিল। অন্যমনস্কভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দেখি আমার হাত তার হাতের ভেতর রয়েছে। আমি লজ্জায় হাত টান্‌তে গেলাম, অনঙ্গ ছাড়ল না। সে বলল, "বেলা, তোমার মুখ ধ্যান করতে করতে আমি এতকাল কি ভাবে কাটিয়েছি তা দেখ্‌বে এস।" ব'লে আমাকে তার শোবার ঘরে যেতে বলল। ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল—আমি তাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে অনঙ্গর সঙ্গে তার শোবার ঘরে গেলাম। সে আমার সেই তৈলচিত্র আমাকে দেখালে। টাট্‌কা ফোটা গোলাপের মালা তাতে জড়ান রয়েছে। আমি সে ছবি পূর্ব্বে দেখেছিলাম—বললাম না। অনঙ্গর সঙ্গে ছেলের কাছে ফিরে এলাম। অনঙ্গ একে একে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার জীবনের অজানা ইতিহাসের সবটুকু জেনে নিলে। সে বললে, উৎপলের কাছে আমার স্কুলে চাকরী নেওয়া পর্য্যন্ত সংবাদ সে শুনেছিল। এখন আমার ইতিহাস সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম ক'রে অনঙ্গ আমাকে তার প্রেমার্ঘ্য নিবেদন করলে। আমি জিজ্ঞাসুভাবে বললাম "আমার ছেলে?" অনঙ্গ লাফিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং বললে, "ওই প্রস্ফুটিত কমলের মত সুন্দর তোমার ছেলে,—ওর কি হবে তুমি ভেবে সারা হ'চ্ছ—ও, একা কেন, ওরকম এক ডজন ছেলে তোমার যদি আজ থাক্‌ত তা হ'লেও আমি তাদের নিজের নয়নের মণি ক'রে রাখ্‌তাম—তুমি আমার হবে এইটুকু ভেবে তুমি জান না আমার "সেন্স্ অফ্ পজেশান্", তোমাকে পাবার জন্য কি আকুল আগ্রহে উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে—কত উঁচুতে তোমার আসন আমার হৃদয়-সিংহাসনে, তা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব বেলা।" আমি আর শুন্‌তে চাইলাম না। অনঙ্গর বুকে মাথা দিয়ে তার 'হার্ট্ বীট্' অনুভব করতে লাগ্‌লাম। এরপর সাম্‌নের মাঘ মাস, অনঙ্গর জন্মমাস, বাদে ফাল্গুন মাসে সে আমার কে হ'ল তা বলা অনাবশ্যক। আর উৎপলের যে নিমন্ত্রণ আগে হয়েছিল, তা বলাও নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, খুকু মকরস্নান থেকে ফিরে এসে আমার 'পেটে পেটে এত' থাকার জন্যে আমাকে বেশ মোটারকম একটা চিম্‌টি কেটেছিল—ব্যাপার শুনেই। ভাগ্যে ছেলেটা ছোট থাক্‌তে থাক্‌তে কাজটা সেরে নেওয়া গেছ্‌ল—না হ'লে ওকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়তে হ'ত।

সমাপ্ত

মৈত্রী

শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র বড়ুয়া

মানব-সমাজ যবে ক্ষুব্ধ বেদনায়,
মরম-সন্ধানি ফিরে অশান্ত ক্রন্দনে;
আপন মুক্তির পথে ব্যগ্র কামনায়
এড়াইতে চায় দুঃখ কঠিন বন্ধনে।
জীবনের মরুপথে যা-কিছু অপ্রিয়,
প্রীতির পরশে হয় দীপ্ত রমণীয়।

পরীক্ষিত-নন্দান্তর

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের পর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিশুনাগ প্রতিষ্ঠিত নাগবংশের রাজত্বের অবসানে নন্দবংশ মগধে রাজত্ব করেন। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ে নন্দবংশের প্রভুত্ব লুপ্ত হয়। বিভিন্ন পুরাণে পরীক্ষিত ও নন্দগণের সময়ের ব্যবধান প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৮৯ খৃষ্টাব্দে চীন—ক্যাণ্টনের বিন্দুপঞ্জীর শেষ বিন্দু ৯৭৫ পাতিত হয়। তদনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৬ অব্দে বুদ্ধপরিনির্ব্বাণের পর প্রথম বর্ষ এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৭ অব্দে বুদ্ধপরিনির্ব্বাণবর্ষ গণিত হয়।

বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত সিংহলের ইতিহাস অনুসারে বিজয়সিংহ বুদ্ধপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে সিংহলে উপনীত হয়, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৮ অব্দে সিংহলের সিংহাসনে উপবেশন করে। বিজয়সিংহের রাজত্ব আরম্ভের ১৭৬ বৎসর পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১২ অব্দে মগধের মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে সিংহলরাজ পকুণ্ডকের মৃত্যু হয়। তদনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত মগধ অধিকার করেন। সিংহলের ইতিহাসে মৌর্য্যচন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দে মগধ অধিকার করেন বলিয়া বর্ণিত হইলেও সুকল্প-নন্দের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২২ অব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর যাবৎ নন্দবংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হয় এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২১ অব্দে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হয়।

পুরাণে নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দি, মহাপদ্ম ও সুকল্প এই চারিজন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণমতে নন্দিবর্দ্ধন ও মহানন্দি শিশুনাগবংশীয় রাজা, মহাপদ্ম মহানন্দির শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র এবং সুকল্প মহাপদ্মের পুত্র। ব্যষ্টি রাজত্বকালগণনায় নন্দিবর্দ্ধন ৪২ বৎসর ও মহানন্দি ৪৩ বৎসর (১), মহাপদ্ম ২৮ বৎসর এবং (২) সুকল্প ১২ বৎসর (৩) রাজত্ব করিয়াছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে সুকল্পের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী রাজত্বের অবসান হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩৮ অব্দে সুকল্পের অভিষেক হইয়াছিল। সুকল্পের পূর্ব্বে মহানন্দির শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৬৬ অব্দে মহাপদ্মের অভিষেক হইয়াছিল এবং মহাপদ্ম খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৬৬ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহাপদ্মের পিতা কালাশোক অভিধেয় মহানন্দির দশম রাজ্যাঙ্কের শেষভাগে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৮৭ অব্দে বুদ্ধপরিনির্ব্বাণের পর একশত বর্ষ অতীত হইয়াছিল (৪)। এই সময়ে মহানন্দি কালাশোকের আনুকূল্যে বৈশালীর কুসুমপুরী বিহারে স্থবির রেবত ও যশের নেতৃত্বে ৭০০ বৌদ্ধভিক্ষু কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতির অধিবেশন হয় (৫)। মহাবংশের এই বিবরণ অনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৯৬ অব্দে মহানন্দি-কালাশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহানন্দি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৯৬ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৭২ অব্দ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে মহানন্দি-কালাশোক তাঁহার পিতা নন্দিবর্দ্ধনের জীবদ্দশায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৫ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৯৬ অব্দ পর্য্যন্ত ১৯ বৎসর বৈশালীতে রাজত্ব করেন। বৈশালীর ১৯ বৎসর ও মগধের ২৪ বৎসর রাজত্বকাল একত্র করিলে পুরাণের বর্ণনা অনুসারে মহানন্দি-কালাশোকের ব্যষ্টি রাজত্বকাল ৪৩ বৎসর হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৭২ অব্দে মহানন্দি—কালাশোকের মৃত্যু হইলে মহানন্দির সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৭২ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৬৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর রাজত্ব করেন। মহানন্দির এই পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়া মহাপদ্ম খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৬৬ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

নন্দবংশের পূর্ব্বে শিশুনাগ প্রতিষ্ঠিত নাগবংশ মগধে রাজত্ব করিতেন। নাগবংশের শেষরাজা মুণ্ড খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৩৯

(১) বায়ু ৯৯।৩২০ ॥

(২) বায়ু ৯৯।৩২৭-৩২৮ ॥

(৩) মৎস্য ২৭২।২০ ॥

(৪) মহাবংশ ৪।৮ ॥

(৫) মহাবংশ ৪।৬১-৬৪ ॥

অব্দে পরলোকগমন করেন। মহানন্দি-কালাশোকের পিতা নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা নন্দিবর্দ্ধন মগধরাজ মুণ্ডের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৩৮ অব্দে বৈশালীতে রাজ্যস্থাপন করেন। মুণ্ডের অমাত্য নাগদাসক খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৩৯ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৫ অব্দ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। নাগদাসকের রাজত্বের অবসানে নন্দিবর্দ্ধন খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৫ অব্দে মগধ অধিকার করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৯৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বৈশালীর ২৩ বৎসর ও মগধের ১৯ বৎসর রাজত্বকাল যোগ করিলে পুরাণের বর্ণনা অনুসারে নন্দিবর্দ্ধনের ব্যষ্টি রাজত্বকাল ৪২ বৎসর হয়।

পুরাণ নন্দিবর্দ্ধনের ৪২ বৎসর, মহানন্দির ২৪ বৎসর, মহানন্দির পুত্রগণের ৬ বৎসর ও মহাপদ্মের ২৮ বৎসর রাজত্বকাল গণনা করিয়া নন্দবংশের রাজত্বের সমষ্টিকাল ১০০ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সুকল্পের ১২ বৎসর রাজত্বকাল ও মহাপদ্মের অপর পুত্রগণের ৪ বৎসর রাজত্বকাল যোগ করিয়া ১৬ বৎসরে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল বলিয়াছেন (৬)।

নন্দবংশের রাজত্বকাল

নন্দিবর্দ্ধন	বৈশালীতে	খৃষ্টপূর্ব্ব	৪৩৮	অব্দ	হইতে	খৃষ্টপূর্ব্ব	৪১৫	অব্দ	পর্য্যন্ত	২৩	বৎসর।
	মগধে	"	"	৪১৫	"	"	"	৩৯৬	"	১৯	"
মহানন্দি কালাশোক	বৈশালীতে	"		৪১৫	"	"	"	৩৯৬	"	১৯	"
	মগধে	"	"	৩৯৬	"	"	"	৩৭২	"	২৪	"
মহানন্দির পুত্রগণ	"	"	"	৩৭২	"	"	"	৩৬৬	"	৬	"
মহাপদ্ম	"	"	"	৩৬৬	"	"	"	৩৩৮	"	২৮	"
সুকল্প	"	"	"	৩৩৮	"	"	"	৩২৬	"	১২	"
মহাপদ্মের অপর পুত্রগণ	"	"	"	৩২৬	"	"	"	৩২২	"	৪	"

বিভিন্ন পুরাণে পরীক্ষিত-নন্দান্তরকাল বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও পরীক্ষিতের জন্ম ও রাজ্যাভিষেককাল এবং নন্দবংশের বিভিন্ন রাজার অভিষেককাল আলোচনা করিলে পুরাণবর্ণিত পরীক্ষিত-নন্দান্তর কালের সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ১২।২।২৬

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত একশত পঞ্চদশ অধিক সহস্র ১১১৫ বৎসর। ভাগবত পুরাণ অনুসারে সুকল্পনন্দের অভিষেকবর্ষ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৩৮ অব্দের ১১১৫ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৫৩ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয়।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্" ॥৪।২৪।৩২॥

পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত কাল পঞ্চদশ অধিক সহস্র ১০১৫ বৎসর জানিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে নন্দবংশ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দিবর্দ্ধনের বৈশালী রাজ্যাভিষেকবর্ষ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৩৮ অব্দের ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৫৩ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয়।

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,

"মহাপদ্মাভিষেকাত্তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥"২৭৩।৩৫॥

মহাপদ্মের অভিষেক হইতে পরীক্ষিতের জন্মকাল যাবৎ পঞ্চাশ অধিক সহস্র ১০৫০ বৎসর জানিতে হইবে।

বায়ুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,

"মহাপদ্মাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎ পরীক্ষিতঃ।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥"৯৯।৪১৫॥

মহাপদ্মের অভিষেক হইতে পরীক্ষিতের জন্মকাল যাবৎ

(৬) বায়ু ৯৯।৩৩০ ॥

পঞ্চাশ অধিক সহস্র ১০৫০ বৎসর জানিতে হইবে। মৎস্য ও বায়ু উভয় পুরাণ অনুসারে মহাপদ্মের অভিষেকবর্ষ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৬৬ অব্দের ১০৫০ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪১৬ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয়, কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪১৬ অব্দ পরীক্ষিতের অভিষেক বর্ষ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পরীক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন (৭)। যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৬ বৎসর সাম্রাজ্য পালন করেন (৮) এবং শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পর পরীক্ষিতকে হস্তিনায় অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা অনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৫৩ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও পরীক্ষিতের জন্ম সঙ্ঘটিত হইলে যুধিষ্ঠির খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৫২ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪১৬ অব্দে পরীক্ষিতকে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। মৎস্যপুরাণ ও বায়ুপুরাণে বর্ণিত মহাপদ্ম-পরীক্ষিতান্তর ১০৫০ বর্ষ পরীক্ষিতের অভিষেক হইতে মহাপদ্মের অভিষেক পর্য্যন্ত কালব্যবধান নির্দ্দেশ করে।

কলিসঞ্চার সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,

"যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবংসংতজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলীকলিঃ ॥৫।৩৮।৮॥

যেদিন হরি (শ্রীকৃষ্ণ) মেদিনী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন সেই দিনেই এই কালকায় বলবান কলি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সপ্তর্ষিকাল সম্বন্ধে কালিদাসকৃত জ্যোতির্ব্বিদাভরণে বর্ণিত হইয়াছে,

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ"

যুধিষ্ঠিরের পৃথিবী শাসন কালে মুনিগণ মঘায় ছিলেন।

সপ্তর্ষিকাল সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,

"তেতু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদাপ্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মক॥" ৪।২৪।৩৪॥

(৭) মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব ৬৬॥

(৮) মহাভারত, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ১॥

সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের সময়ে মঘায় ছিলেন, সেই সময়ে কলি প্রবৃত্ত হয়।

বিষ্ণুপুরাণ ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণের বচন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব ও কলির অবতারণ যুধিষ্ঠিরের শাসন-কালে এবং পরীক্ষিতের অভিষেকের অব্যবহিত পূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪১৬ অব্দে সপ্তর্ষিগণের মঘায় অবস্থানকালে সঙ্ঘটিত হয়।

সপ্তর্ষিগণ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪১৬ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ১:১৬ অব্দ পর্য্যন্ত মঘায় অবস্থান করিলে তাঁহারা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৬ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১৬ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,

'প্রয়াস্যন্তি যদাচৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ৪।২৪।৩৯॥

যখন এই মহর্ষিগণ পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন তখন নন্দ প্রভৃতির সময় হইতে কলির বৃদ্ধি হইবে। নন্দবংশের মগধে রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১৫ অব্দ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২২ অব্দ পর্য্যন্ত সময় সপ্তর্ষিগণের পূর্ব্বাষাঢ়ায় অবস্থিতি কালের অন্তর্ভূত ছিল।

পরীক্ষিত-নন্দান্তরপ্রসঙ্গে পুরাণ ও ইতিহাসের বর্ণনা অনুসারে পরীক্ষিত ও নন্দরাজগণের আনুসঙ্গিক ঘটনাবলীর সময় নিবেশিত হইল।

কুরুক্ষেত্রে ভারতযুদ্ধ	খৃষ্টপূর্ব্ব	১৪৫৩	অব্দ
হস্তিনায় পরীক্ষিতের জন্ম	„	১৪৫৩	„
হস্তিনায় যুধিষ্ঠিরের অভিষেক	„	১৪৫২	„
দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব	„	১৪১৬	„
বৈবস্বত মন্বন্তরের কলিযুগ আরম্ভ	„	১৪১৬	„
হস্তিনায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যত্যাগ	„	১৪১৬	„
হস্তিনায় পরীক্ষিতের অভিষেক	„	১৪১৬	„
বৈশালীতে নন্দিবর্দ্ধনের অভিষেক	„	৪৩৮	„
পাটলিপুত্রে মহাপদ্মের অভিষেক	„	৩৬৬	„
পাটলিপুত্রে সুকল্পের অভিষেক	„	৩৩৮	„

পুণ্ড্র নগর

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় এখন বাংলা দেশের অন্যতম একটি ঐতিহাসিক তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। গড়টির ধ্বংসাবশেষ প্রায় ৫০০০ ফিট লম্বে (উত্তর-দক্ষিণে) এবং প্রস্থে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪০০০ ফিট। ইহার পূর্ব্ব দিকে করতোয়া প্রবাহিতা এবং এক



মহাস্থানগড়ের বৈরাগীর ভিটা (খননের পূর্ব্বে)



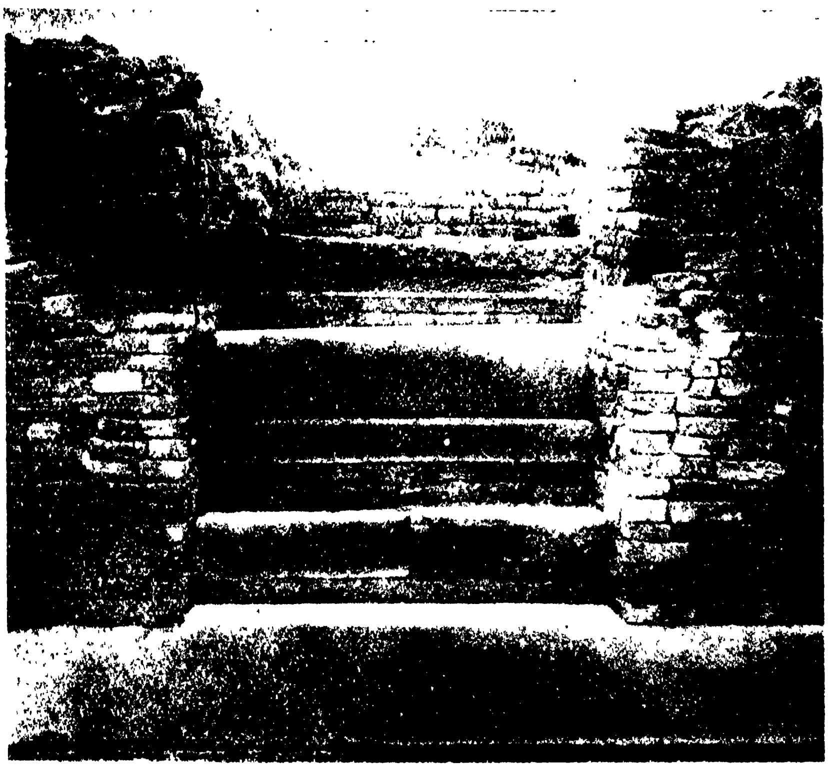
মহাস্থানগড়ের বৈরাগী ভিটা (খননের পরে)



বৈরাগীভিটায় পালযুগে প্রস্তুত ইষ্টকনির্ম্মিত বেদিকা

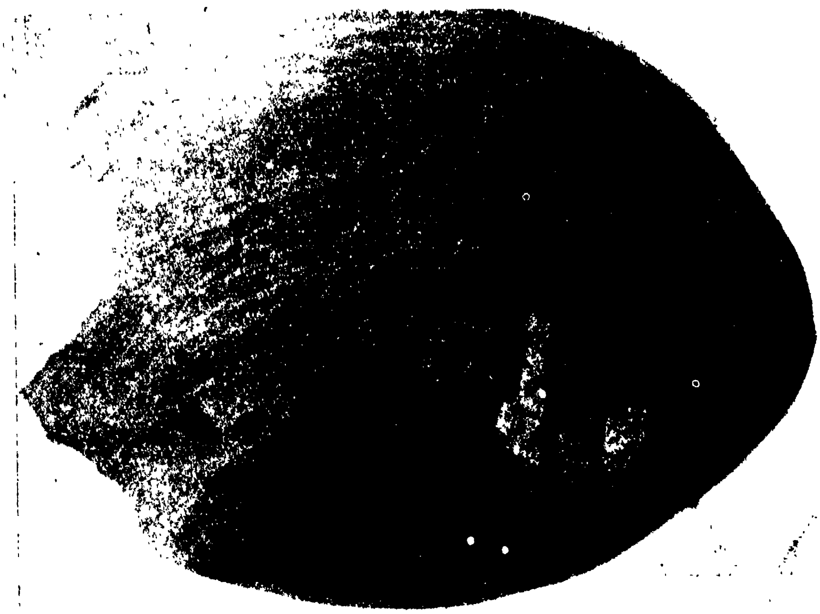
সময়ে অপর তিনদিকে গভীর পরিখা খোদিত ছিল। গড়ের পশ্চিম প্রাকারের একটি ভগ্ন স্থানকে লোকে এখন তাম্রদ্বার বলিয়া থাকে। এই তাম্রদ্বারের নিকটে একটি উচ্চ টিলা পরশুরামের সভাবাটি এই আখ্যায় ভূষিত হইয়া থাকে। ইহার কিয়ৎ দূরেই কিম্বদন্তী অনুসারে মহাস্থানগড়ের প্রথম মুসলমান বিজেতা শাহ সুলতান মহম্মদ মহী সওয়ারের সমাধি গড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত খোদাই পাথরের ধাপ, মৌকালীস, পরশুরামের রাজবাটি, নরসিংহের ধাপ, বৈরাগীর-ভিটা, গোবিন্দের ভিটা ও স্কন্দের ধাপ বলিয়া আরও অনেকগুলি টিলা গড়ের মধ্যে অবস্থিত আছে। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, শাহ সুলতানের সমাধির

দরজায় "শ্রীনরসিংহ দেবস্য" এই খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। পূণ্যসলিলা করতোয়ার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত প্রাকার বেষ্টিত এই ধ্বংসস্তূপ বাংলা দেশের প্রাচীনতম নগরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে যে নগরীর নাম সসম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-থ্‌সং যে নগরীর বিস্তৃত বিবরণ সাদরে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, রাজ-তরঙ্গিণী প্রণেতা কহ্লন মিশ্রের কল্পনাপ্রসূত রাজা জয়ন্তের রাজধানী, জয়াপীড়ের লীলাক্ষেত্র. সেই ইতিহাস-বিশ্রুত সমৃদ্ধিশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ যে গলিত শবের ন্যায় বিগত যৌবনা কর-তোয়ার এক পার্শ্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অনাদৃত-ভাবে পড়িয়া আছে, তাহা একজন বিদেশীয় ব্যতীত আর কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই।



প্রাচীন কালের পাষাণ স্তম্ভ, পরবর্ত্তী যুগে নির্ম্মিত মন্দিরে সোপানশ্রেণীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে

গড় সম্বন্ধে এখন অনেক প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদের স্থান ইতিহাসে নাই। কিন্তু অনেক সময় এই সব আবর্জ্জনার মধ্যে প্রকৃত ইতি-হাসের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সেই জন্য নিম্নে কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ করা গেল। কাহারও ধারণা যে, ইহা 'রামায়ণ' বর্ণিত পরশুরামের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে ইনি এই স্থানের শেষ হিন্দু নরপতি। স্থানীয় মুসলমান কৃষকেরা গল্প



প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা

করে যে, একদিন প্রাতঃকালে পরশুরাম যখন সভায় উপবিষ্ট তখন সন্ন্যাসীবেশে শাহ সুলতান তাঁহার নিকটে যান এবং পরে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া গড় অধিকার করেন। প্রবাদ ছাড়িয়া যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহাই বলিয়া যাই। বহুদিন পূর্ব্বে কনিংহাম সাহেব বলিয়া গিয়াছিলেন যে, মহাস্থান



বৈরাগী ভিটায় প্রাপ্ত গুপ্ত সম্রাটগণের সময় নির্ম্মিত পাষাণ স্তম্ভ—পরবর্ত্তীকালে পয়প্রণালীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে



মহাস্থানগড়ের গোবিন্দ ভিটা (খননের পূর্ব্বে)



মুসিয় ঘোণ খননের ফলে পালযুগে নির্ম্মিত নগর প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে

গড়ই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর এবং তাহার আড়াই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ভাসুয়া বিহার নামক স্থান চৈনিক পরিব্রাজক কর্ত্তৃক উল্লিখিত পো-চি-পো (বাসেব) বিহারের ধ্বংসাবশেষ। তাহার পরে এই বিষয় লইয়া স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক তর্কাতর্কি হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সমস্যার সমাধান তাঁহারা করিতে সক্ষম হন নাই। সমাধান

করিল একজন কৃষক। বারু ফকির নামক এক ব্যক্তি এই স্থানের নিকটে একখানি লিপিযুক্ত ইষ্টকখণ্ড কুড়াইয়া পায়। লিপি পাঠে জানা যায় যে মৌর্য্যবংশীয় কোন সম্রাট, তাঁহার পুণ্ড্র নগরস্থ মহামাত্যকে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাগণকে সাহায্য করিবার জন্য আদেশ দিতেছেন। সুতরাং প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। কিন্তু যে ভাগ্যবান প্রত্নতত্ত্ববিদের খনিত মেদিনীর গর্ভ হইতে নগরীর অবশেষ বাহির করিয়াছেন, তাঁহার নাম কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মহাস্থানগড়ের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের কিয়দংশ খনন করিয়া তিনি বাঙ্গালীকে চিরঋণী করিয়া গিয়াছেন। বৈরাগীর-ভিটা নামক একটি টিলায় প্রথম খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। খননের ফলে, বাংলার ইতিহাসের দুইটি বিভিন্ন যুগের নির্ম্মিত দুইটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। অনেকের হয়ত মনে আছে যে, ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাল সাম্রাজ্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নষ্ট-প্রায় হইতে বসিয়াছিল এবং এই সময়ে প্রথম মহীপাল লুপ্তপ্রায় পিতৃপুরুষের গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৈরাগীর



গোবিন্দ ভিটা (খননের পরে)



মুনির ঘোণ (খননের পূর্ব্বে)

ভিটার মন্দির দুইটি এই দুই বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত। প্রথম মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯৮ ফিট প্রস্থে ৪০´। ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ইহার কিয়দংশের উপরে দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, খননের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে, প্রাচীনতর মন্দিরটি গুপ্ত যুগে নির্ম্মিত, একটি মন্দিরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ইহা অনুমান নহে, এই প্রাচীনতর মন্দিরের গর্ভগৃহ হইতে বারি নিষ্কাসনের পয়ঃপ্রণালী, গুপ্ত-যুগের ভাস্কর্য্যসমন্বিত স্তম্ভগাত্র খোদিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং এইস্থান বাংলার ইতিহাসের তিনটি বিভিন্ন যুগে যে বিয়োগান্ত হৃদয় বিদারক নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করে। মগধের গুপ্ত রাজবংশের রাজত্বের সময়, উত্তরবঙ্গ অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি যে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলি তাহাই প্রমাণ করে। অনুমান হয় যে সেই সময় পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর সমৃদ্ধিশালী ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে বার বার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বঙ্গে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার ফলে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আত্মরক্ষার্থ বঙ্গীয় প্রজাপুঞ্জ গোপাল নামক একজন যোদ্ধাকে নৃপতিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে বোধ হয় অরাজকতার ফলে ধ্বংস-প্রাপ্ত দেবালয়ের উপরে বৈরাগীর-ভিটার প্রাচীনতর মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণে কিংবা অন্য কোন কারণে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বোধ হয় এই মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভে, মহীপাল কর্ত্তৃক পাল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার সহিত সুপ্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবালয়ের উপরে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১১১´ ফিট প্রস্থে ৫৭´ ফিট একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, ধ্বংসাবশেষের প্রাচীনত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য বৈরাগীর ভিটার নানা স্থানে খনন করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম পাল যুগে নির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহের ধ্বংসস্তূপের তলদেশে আরও প্রাচীন যুগের কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই সব কীর্ত্তিচিহ্ন খনন করিয়া বাহির করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা ব্যয়ের সামর্থ্য ভারত সরকারের এখন নাই। বাংলার জনমত যখন প্রকৃতই জাতীয় মর্য্যাদার অনুশীলনে যত্নবান হইবে, তখন হয়ত সেই সুদূর ভবিষ্যতে সুপ্রাচীন পুণ্ড্র নগরের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে খনন করিয়া বাংলার ইতিহাসের নূতন অধ্যায় লিখিবার মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া দিবে।

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরী, যুগে যুগে বহুবার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হইয়াছে। সুতরাং নগর-প্রাকারের নির্ম্মাণ-প্রণালী পরীক্ষা করিবার জন্য মুনির ঘোন নামক এক স্থান খনন করার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নগরপ্রাকার এক সময়ে প্রায় ১১´ ফিট প্রস্থে ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ইষ্টকগুলির মাপ ৯´´×৬´´×২´´ এবং আরও জানা গিয়াছে যে, এই প্রাকারগুলি বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকা গোবিন্দ-ভিটা নামক একটি টিলার খননকালে বাহির হইয়াছে। প্রবাদানুসারে এইস্থানে গোবিন্দ বা বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। খননের ফলে গুপ্ত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয়ের প্রথম অধ্যায় পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। গোবিন্দ-ভিটার একটি অট্টালিকার ইষ্টকরাশি, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোমপুর মহা-বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মহাস্থানগড় ও তাহার পারিপার্শ্বিক মৃত্তিকা ও ইষ্টকরাশির স্তূপগুলির মধ্যে মৌর্য্য সম্রাটগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের ইলিয়াসসাহী সুলতানগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘ পঞ্চদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের বহু প্রকরণ লুক্কায়িত আছে; যদি কেহ রাও বাহাদুরের ন্যায় বুদ্ধিমত্তার সহিত বিভিন্ন স্তরের ঐতিহাসিকত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া খনন পরিচালনা করেন এবং প্রবাদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হয়েন, তাহা হইলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের বহু উপকরণ ধরণীগর্ভ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। *

* ছবিগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



সঙ্গীত

নির্ঝরিণী

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নিঝরধারা!
শিহরধারা!
কার পূজারিণী আপনহারা
গান গাও কুলুকুলুধ্বনি'?
মিলনমণি
অঙ্গে অঙ্গে চমকে তোমার
আলো-পারাবার
ডাকে যে তোমায়—ডাকে যে তারা!
তাই কি উধাও নিঝরধারা?

লো চঞ্চলা!
কলোচ্ছলা!
আনন্দ কার সুর-উপলা
নূপুরিকা, হেন দিনরজনী
'সাধো সজনী?
নৃত্যে কার বা উঠিলে তুমি
রূপে কুসুমি'—
অলখ বঁধুর বাঁশিবিভলা!
তাই ধাও বুঝি নীলাঞ্চলা?

শান্তিময়ী!
কান্তিময়ী!
ছন্দে যে তুমি দিগ্বিজয়ী!
লক্ষ্যহারা তো নহ গমনে:
চল-চরণে
পুলকে তোমার সাধিলে যারে
বাঁধিলে তারে
অশ্রুমালারো বরণে অয়ি
দূরভিসারিণী, স্বপ্নময়ী!   (কাশ্মীর)

\+ ০ + ০
{ সা সা গা | রা মঝ -া | গা পা পা | হ্মা ধা -া | পা পা না | ধা ধা র্সা |
নি ঝ র ধা রা শি হ র ধা রা কা র পূ জা রি ণী

না র্রা র্সর্সা | না ধপা ধপা | পা -া ধনা | র্সর্রা র্সা র্সনা | ধনা ধনা ধা |
আ প ন হা রা গা ন গা ও কু লু কু লু

পহ্মা পা -া | হ্মা ধা পা | হ্মা গা -া | মা -া মা | মা -া মগরা | রা গা গা |
ধ্ব নি মি ল ন ম ণি অং গে অং গে চ ম কে

গা রগা -া | রন্‌া ন্‌া রা | গা পা -া | গা গা পা | ধা পনা -া | ধা না র্রা |
তো মা র আ লো পা রা বা র ডা কে যে তো মা য় ডা কে যে

র্গা র্রর্সা -া | র্সা -া র্রর্গর্মা | র্গা র্রর্সা -া | নর্সা র্গর্রা র্সনা | ধপা হ্মপা নধা |
তা রা তা ই কি উ ধা ও ধা ও

পা না র্রা | র্সনা র্সা -া | (নর্সা র্রর্গা র্মর্গা | র্রর্গা র্মর্গা র্রর্সা | নর্সা র্গর্রা র্সনা |
নি ঝ র ধা রা নি ঝ র

ধপা হ্মপা নধা | পনা ধর্সা নর্রা | র্সা -া -া | র্গর্রা র্সনা ধর্সা | না -া -া |
ধা রা ঝ রো

র্রর্সা নধা পনা | ধা -া -া | হ্মপা ধধা ধধা | পধা ননা ননা | ধনা র্সর্সা র্সর্সা
ঝ রো ঝ রো ঝ

নর্সা র্রর্রা র্রর্রা | র্গর্রা র্সনা পর্সা | নধা পহ্মা পনা | ধনা র্রর্সা নধা | পহ্মা গরা সসা |) }
রো ধা রা

নর্সা র্রর্সা নধা | পহ্মা গরা সসা | { র্সা র্সা নধা | না না ধপা | পহ্মা পহ্মা পগা | মা গা -া |
ধা ও লো চন্‌ চ লা ক লো চ্ছ লা

গা পধা নর্রা | র্সনা নধা পা | হ্মপা হ্মপা মগা | মা গা -া | সমা মা মা |
আ নন্‌ দ কা র সু র উ প লা নূ পু রি

মা মা মগরা | রগা রগা রসা | গা পা -া | গা পা ধা | র্সা না -া | র্সা র্গা র্গা
কা হে ন দি ন র জ নী সা ধো স জ নী নৃ ত্যে

র্গা -া র্মর্গর্রা | র্সনা না র্রা | র্সনা র্সা র্রা | র্সনা না র্রা | র্সনা র্সা -া | পর্সা পর্সা নধা
কা র বা উ ঠি লে তু মি রূ পে কু সু মি অ ল খ

পক্ষা পা -া | ক্ষপা ক্ষপা গপা | মা গা -া | সা গা পগা | পা ধা না | ধনা ধপা -া
ব ধু র বাঁ শি বি ভ লা তা ই ধা ও বু ঝি নী লা ন্

ধা র্সা -া | (নর্সা নর্সা ধনা | পনা ধর্সা নর্রা | র্সা -া -া | র্সর্গা র্রর্গা র্সর্রা
চ লা ধা ও নী

নর্সা ধনা পনা | র্রা -া -া | নর্সা র্রর্গা র্মর্গা | র্রর্সা নধা পধা | র্রর্সা -া -া
ল অন্ চ লা

নর্সা র্রর্রা র্রর্রা | ধনা র্সর্সা র্সর্সা | পধা ননা ননা | ক্ষপা ধধা ধধা
চন চ লা

ক্ষপা ধনা র্সর্রা | র্গা -া -া | র্মর্গা র্রর্সা নধা | পা -া -া | ক্ষপা ধপা ধনা
নি ঝ র

ধনা র্সনা র্সর্রা | র্সর্রা র্গর্মা র্গর্রা | র্সনা ধপা ধনা | নর্রা র্সর্রা নর্সা
ধা রা

ধনা পধা ক্ষপা | ক্ষপা ধনা র্সনা | ধপা ক্ষগা রসা |) } নর্সা র্গর্রা র্সনা
গো ধা

ধপা ক্ষগা রসা | { সা মা মা | মা মা রা | রা পা পা | পা পা -া | গা ধা ধা
ও কা ন্ তি ম য়ী শা ন্ তি ম য়ী ছ ন্ দে

ধা ধা না | পা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | নর্সা র্রা র্রা | র্ঋা র্ঋা র্রা | র্ঋর্রা র্ঋর্রা র্সনা |
যে তু মি দি গ্ বি জ য়ী ল ক্ষ্য হা রা তো ন হ গ

র্সা না -া | নর্সা র্রা র্রা | র্ঋা র্গা র্রা | র্ঋা র্ঋা র্সা | র্সা না -া | পা পা না |
ম নে ল ক্ষ্য হা রা তো ন হ গ ম নে চ ল চ

র্রা র্সা -া | র্সা র্গা র্মর্গর্রা | র্রা র্রা র্গর্রর্সা | র্রর্সনা না র্রা | র্সনা র্সা -া |
র ণে পু ল কে তো মা র সা ধি লে যা বে

র্সনা র্রা র্সা | না ধপা -া | পগা -া পা | পগা গা পা | পগা গা পা | ধর্সা ধর্সা -া |
বাঁ ধি লে তা রে অ শ্রু মা লা রো ব র ণে অ খি

না র্রা র্সা | না ধা পা | হ্মপা হ্মপা মগা | মা গা -া } | গমা পধা হ্মপা |
ছু র ভি সা রি ণী স্বপ ন ম য়ী নি

হ্মপা ধনা পধা | পধা নর্সা ধনা | নর্সা র্রর্গা র্রর্সা | নধা পহ্মা পধা | না -া -া |
ঝ র ধা রা

নর্রা র্সনা ধনা | পা -া -া হ্মনা ধপা হ্মপা | গা -া গা | সরা গমা পধা |
ছন্ দে ছন্ দে উ বা

পধা নর্গা র্রনা | র্সা -া -া | -া -া -া |
ও

এ গানটি নৃত্য সঙ্গীত। ত্রিমাত্রিক ছন্দ। তানগুলি অবিকল এই ভাবেই গ্রামোফোনে গেয়েছেন শ্রীমতী উমা বসু। তানগুলি গানের নির্ঝরিণীগতির আনন্দ চিত্রিত করবার উদ্দেশ্যেই, বিশেষভাবে রচিত। বাংলা গানে এভাবে তানের অজস্র অবকাশ আছে এটি দেখাতে চেয়েছি সাধ্যমত।—সুরকার।



ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

২৭

মিসেস্ চম্পটী বলিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যহ না হউক, দুই-এক দিন অন্তরই যেন মিসেস্ রায় অর্থাৎ লতা গিয়া মিসেস বোসের অর্থাৎ ফুল্লরার সংবাদ তাঁহাকে জানান এবং প্রয়োজন মত ব্যবস্থাদি লইয়া আসেন। দেখা যদি কোনও দিন না হয়, কুরঙ্গর কাছে একটা রিপোর্ট যেন লিখিয়া রাখিয়া আসেন। ব্যবস্থা, যাহা কিছু প্রয়োজন, হয় নিজে গিয়া দেখিয়া করিবেন অথবা লিখিয়া পাঠাইবেন। সন্ধ্যার পরই সাধারণতঃ লতা যাইত, যদি সুকেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয় আর 'ও বাড়ী'র এবং মাতার ও পুত্রটির সংবাদ কিছু জানিতে পারে। মাতাকে সে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার কোনও উত্তর পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ঠিকানা কিছু জানায় নাই। তবে 'ও বাড়ী' হইতে যে পত্র গিয়াছে, তাহার একটা উত্তর কিছু আসিবেই।—আর সে উত্তর কি আসে, তাঁহারা কেমন আছেন, মণি-ঠাকুরাণীই বা এই সব কথা জানিবার পর তাহার মাতাকে তাঁহার গৃহে আর রাখিবেন কি-না, মাতাই বা থাকিবেন কি-না—না রাখিলে, কি, না থাকিলে, কোথায় গিয়া তিনি আশ্রয় একটু আপাততঃ লইতে পারেন, ইত্যাদি সংবাদ সুকেশবাবুর নিকটেই লতা জানিতে পারে।—সুকেশবাবুও বলিয়াছিলেন, হরমোহনবাবুর পত্রের উত্তরে তাহার মাতা কি লেখেন, অথবা অন্য সংবাদ যখন যাহা তিনি জানিতে পারেন, লতাকে আসিয়া জানাইবেন। এই পত্রের উত্তর আসিতে হয় ত কিছু বিলম্ব হইতে পারে। কিন্তু ও বাড়ীর সকল সংবাদ সদা সর্ব্বদাই সে জানিতে পারে এবং জানিবার জন্য বড় একটা ঔৎসুক্যও লতার ছিল। কিন্তু কয়দিন আজ সুকেশবাবুর সঙ্গে দেখা হইতেছে না, কুরঙ্গর কাছে শুনিল, কি একটা মোকদ্দমার কাজে সুকেশবাবু বাহিরে গিয়াছেন, চার-পাঁচ দিন বাদেই বোধ হয় ফিরিয়া আসিবেন।

লতা আসিত যাইত; কুরঙ্গ একদিন কহিল, সুকেশবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন, এখনই বোধ হয় আসিবেন।—বলিতে বলিতেই সুকেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লতাকে লইয়া 'নুকে' গিয়া বসিলেন।

তাহার মাতার কোনও পত্র আসিয়াছে কি-না এখনও সুকেশবাবু জানিতে পারেন নাই—জানিয়া পরশুতক আসিয়া বলিবেন। তবে ওবাড়ী'র সংবাদ এই, যে, ইলা তাহার পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছে। তার পর বিরিঞ্চিও আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল। ইলা যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা জানাইয়া কোথায় কি ভাবে লতার অনুসন্ধান করিতে হইবে, তার সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ ও সহায়তাও চাহিয়াছে। লতার চক্ষে জল আসিল—মুখখানি অন্য দিকে একটু ফিরাইয়া লইয়া অতি আয়াসে অশ্রুবেগ কিছু সংযত করিয়া ঘুরিয়া শেষে কহিল, "কিন্তু আমি চাই না যে আমার কোনও সন্ধান ওঁরা পান।—"

সুকেশবাবু কহিলেন, "হাঁ, চাও না তা জানি। চাইতে যে পার না আপাততঃ, সেটাও বুঝি।—বিরিঞ্চির সঙ্গে এখুনি তোমার একটা দেখা সাক্ষাৎ—"

"না না, সে হ'তেই পারে না। আপনি—আপনি—কোনও আভাসও তাঁকে কিছু দেবেন না।—"

"না, তা দেব না। তোমাকে না জানিয়ে, তোমার অভিপ্রায় কি তা না বুঝে, সেটা দিতেই পারি না। কারণ তাহ'লে যে-বিশ্বাসে আমার আশ্রয় তুমি গ্রহণ করেছ, সেই বিশ্বাসই আমার ভাঙ্গা হবে। অবিশ্যি—তার কথা শুনে দুঃখও বড় হচ্ছিল, মনেও একবার হয়েছিল খবরটা দিয়েই ফেলি।—কিন্তু তখনই আবার ভাবলাম—না, সে আমি পারি না; বন্ধু ব'লে এই যে বিশ্বাসটা আমার উপরে রেখেছ, কি ক'রে সেটা ভেঙ্গে এত বড় একটা সঙ্কটে তোমাকে ফেলব? তার বড় বেইমানী—হীন প্রতারণা—বাস্তবিক আর কিছু হ'তেই পারে না।"

"অনুগ্রহের পার নাই আপনার।—কি ক'রে আপনার এ ঋণ আমি শোধ করব জানি না।"

"ঋণ! ঋণের কথা কি বলছ লতা? অনুগ্রহই বা কি?—আমি বন্ধু—বন্ধু ব'লে বিপদে আমার সহায়তা নিয়েছ, যেটুকু সাধ্য দিতে পেরে কৃতার্থই আমি হয়েছি।—প্রতিদানে কিছু আর চাই না লতা, চাই কেবল তোমার বন্ধুত্ব, আর তার যত কিছু দাবী পূরণ করতে পার্‌বার অধিকার। তোমার মত একজন নারীর উপরে বন্ধুত্বের এই অধিকার যে লাভ করতে পারে, তার চাইতে বড় ভাগ্যবান্ এ পৃথিবীতে কে থাক্‌তে পারে লতা?"

ওমা!—এ সব ইনি কি বলিতেছেন! সামান্য এই কথাটার উপরে এত কথা আর তার এই ভঙ্গী লতার যেন কেমন লাগিল, কেমন যেন সঙ্কুচিতই তাহাকে করিয়া তুলিল; ভাববিভোর দৃষ্টির সম্মুখেও মুখখানি নত হইয়া পড়িল, আনত মুখখানি একদিকে একটু সে ফিরাইয়া লইল। লক্ষ্য করিয়া সুকেশবাবু এই উচ্ছ্বাসকে কিছু সংযত করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। ঘুরিয়া লতা মুখ তুলিয়া একবার চাহিল—সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে উনি এখন কি করবেন, খোঁজ খবর কোথায় কি ভাবে করতে চান বল্লেন কিছু?"

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "কি করবে ও? করতে পারেই বা কি?—বারবার একথা ব'লে তোমাকে দুঃখু দিতে চাই না লতা; তবে তুমি সুধোলে, না ব'লেই বা করি কি? এ সব কিছু করবার মত শক্তি কি বুদ্ধি কিছু দূরে থাক্, একটা গরজই যেন তেমন কিছু দেখ্‌লাম না।—নইলে এই কটা দিন চুপ ক'রে বসে থাকে? এখন বৌ ডেকে ধমক দিয়েছে, তবে মাথায় ঢুকেছে, হাঁ, খোঁজখবর একটা করা উচিত! বাপ বলেছিলেন, খোঁজ খবর নিতে লোক লাগিয়েছেন—ব্যস্! অমনি চুপ! যেন নিজের একটা গরজ কি কর্ত্তব্য কিছু তার নেই। এখনই বা কি? ধমক খেয়ে ছুটে এসেছে আমার কাছে, আমি যদি কিছু ক'রে দিতে পারি কি পথ একটা বাতলে দিই! ভয়েই জড়সড়; করবে কি? কেন, ঐ রাত্তির বেলায় একা তুমি বেরিয়ে এলে—হাঁ, তখন পারে নি—বৌ মূর্চ্ছো গিয়েছিল; কিন্তু রাতটা পোয়াতেই তার উচিত ছিল থানায় থানায় গিয়ে খবর নেওয়া, নিলেই ত তখনই তোমার খোঁজ পেত!"

নিঃশব্দে আনতমুখে লতা বসিয়া রহিল, বুক ভরিয়া গভীর একটি নিশ্বাস উঠিল। সুকেশবাবু কহিলেন, "কি আর বলব লতা—বল্‌তে দুঃখও হয়—লজ্জাও হয়—নইলে তোমার মত এমন বুদ্ধিমতী আর চরিত্র-মহিমায় মহিয়সী মেয়ে—যার তুলনা নাকি দেশে কোথাও মেলে না, পৃথিবীতে কোথাও মেলে কি-না সন্দেহ, তার ভাগ্যটাকে নাকি হেলাখেলায় এমনি ডুবিয়ে দিতে পারল ওই বিরিঞ্চি!"—কিছু মনে করো না লতা, বুঝতে পারছি, বড় ব্যথা তুমি পাচ্ছ। কিন্তু কি করব? যখন ভাবি, মনটা এক দম আগুন হ'য়ে যায়। ধৈর্য্য ধ'রেই থাক্‌তে পারিনে। সে যাহ'ক, ভয় তোমার কিছু নেই। খোঁজ খবর—সে আমি ক'রে না দিলে নিজে কিছু করতে পারবে—সে সম্ভাবনা আদৌ নেই। তবে হাঁ, ব'লছিল পয়সা খরচ ক'রে গোয়েন্দা পুলিস টুলিস কাউকে লাগালে খোঁজ একটা পাওয়া যেতে পারে। আর থানায় থানায় একটা খবর গিয়ে নিলে—"

কেমন একটু চমকিয়া লতা মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, "ঐ থানায় গিয়ে যদি খবর নেন—"

"খবর পাবে না। সে রকম কিছু একটা সম্ভাবনা আছে জেনেই দারোগাবাবুকে আমি সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম, কেউ এসে খোঁজ কিছু নিলে আমাকে আগে না জানিয়ে কিচ্ছু যেন তাঁদের না বলেন। বলেছিলাম, তোমার জামিন যে আমি হয়েছি, এটা তারা কেউ জান্‌তে পারে, এটা আমি ইচ্ছা করি না। তাঁদের যদি জানাতে কিছু হয়, দরকার মত আমিই জানাব। বিশ্বাস ক'রে তিনিও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কাউকে কিচ্ছু বল্‌বেন না।"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস লতা ফেলিল। চক্ষেও জল আসিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অশ্রুবেগ যথাসাধ্য সংযত করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "ইলা কি তার বাপের বাড়ীতে চ'লেই গেছে জানেন?"

"হাঁ, বিরিঞ্চিও বল্লে, হরমোহনবাবুর কাছেও শুন্‌লাম, চ'লেই গেছে। শীগ্‌গির ফিরবেও না বোধ হয়। ব'লেই নাকি গেছে, খুঁজে তোমাকে বের করতে হবে—তার পর সে দেখ্‌তে চায় বিরিঞ্চি স্ত্রী ব'লে তোমাকে গ্রহণ করেছে।"

"সে যে হ'তেই পারে না এ অবস্থায়।"

"অতশত ভাবেনি বোধ হয় কিছু। সব জেনে মনে বড় একটা ধাক্কা লেগেছিল—নেহাৎ সরলবুদ্ধির ছেলেমানুষ ত—বলেছে বাপ যদি ত্যাগও করেন, আত্মীয়স্বজন কেউ যদি কোনও সম্বন্ধ নাও রাখে, তবু তাকে এটা করতেই হবে। তবে অতি নরম ধাতুর মেয়ে, আর বিরিঞ্চিকে ভালও খুব বাসে। এ জিদ কত দিন রাখ্‌তে পারবে জানি না। তার বাপও ধমক চমক করবেন, আবার বিরিঞ্চি গিয়েও হয়ত কাকুতি মিনতি কত করবে। সেও বড্ড ভাল ওকে বাসে। আর কেনই বা বাস্‌বে না। বিয়ে করেছে, ক'বছর তাকে নিয়ে সংসার করছে, সন্তানও একটি হয়েছে, ভালবাসার বড় একটা দরদ যে হবে, সে ত স্বাভাবিক।"

চাপিয়া একটি নিশ্বাস লতা ছাড়িল; শেষে কহিল, "তার বাবার বাড়ীর ঠিকানা জানেন?"

"জানি। কেন, কি করবে? তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

"না, তাই কি পারি? ভাবছি একটা চিঠি তাকে লিখ্‌ব। তা হ'লে ঠিকানাটা একটু লিখে আমাকে দেবেন? ঐ কাগজ রয়েছে—"

এক টুকরা কাগজ লইয়া সুকেশবাবু ইলার পিতৃগৃহের ঠিকানা লিখিয়া লতার হাতে দিলেন। লতা একবার দেখিয়া ভাঁজ করিয়া টুকরাটুকু আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া লইল। সুকেশবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "কি লিখ্‌বে ভাবছ?"

লতা উত্তর করিল, "সে বড় ভুল বুঝ্‌ছে। মিছে ও কষ্ট পাচ্ছে, ওঁকে মিছে কষ্ট দিচ্ছে। খোঁজ উনি আমার পাবেন না। পেলেও তাঁর ঘরের লোক যখন আমায় গ্রহণ করবেন না, এ রকম কোনও সম্বন্ধেও তাঁর সঙ্গে আমি আস্‌তে পারি না। এইটেই তাকে খোলাখুলি জানাতে চাই। আমি যে নিরাপদে আছি, একা অসহায় অবস্থায় বড় কোনও বিপদে পড়িনি, এটা বুঝ্‌তে পারলেও মনটায় অনেকটা সোয়াস্তি সে পাবে, ফিরে যেতে মনের খুঁৎখুঁতিও তখন আর কিছু হয়ত থাক্‌বে না।"

"হুঁ—তা লিখ্‌তে পার। বিরিঞ্চিও অনেকটা নিশ্চিন্ত তখন হবে। আহা, বেচারী—দুঃখও বড় হয়—তুমি এইভাবে পালিয়ে এলে, ওদিকে বৌটিও গেল বাপের বাড়ী চ'লে—কূল কিনেরাই পাচ্ছে না, কি করবে এখন। বড় ঘরের আদুরে ছেলে—নরম মন—দুঃখের বাতাসও কখনও কিছু গায়ে লাগেনি ত।"

চক্ষু দুটি লতার জলে ভরিয়া উঠিল, মুখখানি অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। সুকেশবাবুও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন—কি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, "আচ্ছা ধর, যদি এমন হয়—যদিও সম্ভাবনা তার কিছু বড় দেখ্‌তে পাচ্ছি না আপাততঃ—তবু ধর, যদি এমন হয়, বিবাহটার বৈধতা স্বীকার ক'রে নিয়ে বধূ বলে ওঁরা তোমাকে গ্রহণ করেন—"

চক্ষু মুছিয়া লতা উত্তর করিল, "ও সংসারে একটা কাঁটা হ'য়ে গেছি, বস্‌তে চাই না। ওসব সুখের আকাঙ্ক্ষাও কিছু আর নেই। যদি সে মতি কখনও ওঁদের হয়, ছেলেটাকে যদি ঘরের ছেলে ব'লে ঘরে নেন, ইলার কোলে তাকে দিয়ে কৃতার্থ হব। আমি বাইরেই যা হ'ক একটা কিছু কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকব। খোরপোষও কিছু তাঁদের ঠেঁয়ে নেবার ইচ্ছে নাই।"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, মুখখানি দুই হাতে ঢাকিয়া লতা টেবিলের উপরে রাখিল।

স্ত্রীর অধিকার লাভ করিলেও ঐ সংসারে স্বামীর সঙ্গে একত্র থাকিতে, এমন কি, সে পরিবারের কোনও সাহায্য গ্রহণ করিতেও এই যে অনিচ্ছা, ইহার কারণ কি মূলে হীনচেতা কাপুরুষ স্বামীর প্রতিই চিত্তের একটা বিরাগ নহে? অবশ্য সপত্নী রহিয়াছে; তাহার সঙ্গে ভাগের স্বামী লইয়া সংসার করা যে কি প্রকারে সম্ভব হয় আধুনিক মেয়েরা তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু তবু স্বামীর প্রতি সত্যকার প্রেমের টান যদি একটা থাকে, তবে তার সঙ্গলাভ, সেই সঙ্গলাভে যে সুখ, পার্থিব জীবনই যে সুখে কৃতকৃতার্থ হয়, তার প্রতি চিত্তের এরূপ বিতৃষ্ণা কি কাহারও হইতে পারে? লতার এই যে অনিচ্ছা, ইহা ত কেবল সাংসারিক অশান্তির আশঙ্কায় কি সপত্নীর প্রতি করুণায় ত্যাগবুদ্ধিপ্রসূত নহে! কথার ধ্বনিতে মুখের ভঙ্গীতে, বরং ইহাই মনে হইল, বিরাগে এই স্বামীর প্রতিই তাহার চিত্ত অতি বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সঙ্গে কোনও প্রকার সংস্রবে যারপরনাই বিতৃষ্ণ করিয়া তাহাকে তুলিয়াছে! তবে কাঁদিল, কাঁদিবে না কেন? প্রিয়জনের

প্রেম ভোগে ভাগ্য তাহাকে এমন করিয়া বঞ্চিত করিল—কাঁদিবে না কেন ?

নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষে ডাকিলেন, "লতা !"

"আজ্ঞে।"

মুখ তুলিয়া লতা চক্ষুদুটি মুছিল।

স্নেহকরুণ শ্লথকণ্ঠে সুকেশবাবু কহিলেন, "কেঁদোনা লতা! বড় ব্যথা আমি পাই। তোমার বেদনাক্লিষ্ট ঐ মলিন মুখখানি, বুকভরা যাতনার এই ছটফটানি, আর চোকদুটিভরা প্রাণগলা ঐ অশ্রুর উচ্ছ্বাস—সইতেই আমি আর পারছিনি। বড় দুর্ভাগ্য আমার, মুখে তোমার এই ক্লেশের কালিমা আমিই মেখে দিচ্ছি, বুকে এই যাতনার ছটফটানি আমিই তুলছি, আর প্রাণ গলিয়ে চোখে ঐ অশ্রুর উচ্ছ্বাস আমিই টেনে আনছি! অথচ তোমার শান্তি একটু কিসে আসতে পারে, দুঃখের নিবৃত্তি কি উপায়ে একটু হ'তে পারে, বুঝতেই কিছু পারছিনি।"

"না না, কেন ওকথা ব'লছেন? দুঃখ যা পাচ্ছি—দুঃখেরই ভাগ্য আমার তাই পাচ্ছি। তবু অকূল পাথারে ভেসেছিলাম, নিরাপদ একটা কিনেরা আপনার আশ্রয়ে পেয়েছি, যে সব খবরের তরে প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে, সব তা আপনিই এনে দিচ্ছেন।—বড় দুঃখে এই যেটুকু শান্তি সোন্তি আমি এখন পেতে পারি, আপনার কাছেই যে তা পাচ্ছি।"

"হুঁ। কিন্তু ভাবছি লতা—এই দুর্ভাগ্য তোমার কেন হ'ল? এর কি কোনও প্রতিকারই হ'তে পারেনা? হাঁ, এই যে সংকল্প তোমার জানালে এটা তোমারই যোগ্য সংকল্প বুঝতে পারছি। বর্ত্তমান অবস্থায় ত সম্ভবই নয়; অবস্থা অন্য রকম হ'লেও তোমার ন্যায্য অধিকার ওঁরা তোমাকে দিলেও, ঐ সংসারে ইলার সপত্নী হ'য়ে ঐ বিরিঞ্চির সঙ্গে গিয়ে থাকতে আর তুমি পারনা। কিন্তু তবু বয়সে তুমি এখনও তরুণী মাত্র, দীর্ঘজীবন সম্মুখে প'ড়ে র'য়েছে। প্রিয়জনের স্নেহ আর প্রেমই সেই জীবনকে সরস মধুময় ক'রে রাখতে পারে, তার অভাবে জীবন একদম কঠোর নীরস দগ্ধ মরুবৎ দুঃসহ হ'য়ে ওঠে। তার বাড়া দুর্ভাগ্যও আর কিছু মানুষের হ'তে পারে না। কেবলই ক'দিন ভাবছি—তোমার মত এমন মেয়ে—কেন এই দুর্ভাগ্য তোমার হ'ল? এ থেকে মুক্তির—আর সেই মুক্তিতে জীবনটা তোমার সত্যই মধুময় হ'য়ে উঠতে পারে, যাতে একটা ন্যায্য দাবী নাকি নরনারী সকলেরই সমান আছে তার—কি কোনও পথই তোমার সামনে খুলতে পারে না ?"

"না, এ জীবনে আর তা পারে না। এখন কোনও মতে কাজকর্ম্ম যাহ'ক, কিছু ক'রে কাটিয়ে যদি যেতে পারি, তাই বড় ভাগ্য ব'লে মনে ক'রব। তবে একথাও ঠিক, কেবল পেটে দুটি খেয়ে কোনও মতে দিন কাটান—কারও বোধ হয় ভাল লাগেনা। তবে কাজকর্ম্মও এমন অনেক আছে, যাতে - দুঃখী ত কত রকম কত এ পৃথিবীতে আছে—সেই দুঃখে একটু শান্তি তাদের দেওয়া যায়, তার ভার একটু লঘু করা যায়—তবে জীবনটা বেশ একটু শান্তিতেই বোধহয় কেটে যেতে পারে।"

"পারে। তবে সেই কাজকর্ম্ম যত মহৎ যত ব্যাপক হবে, লোকহিতে তার ডাক যত নানান দিক থেকে আসবে, যত তাতে আত্মনিয়োগ ক'রে লোকে অনুভব ক'রবে তার শক্তির একটা সার্থকতা হ'চ্ছে, তত সেই শান্তি কেবল নয়—তৃপ্তিরও বড় একটা আনন্দের অধিকারী সে হবে।—তাইত তোমাকে ব'লছিলাম, এই যে কাজ ক'রছ এ তোমার শক্তির যোগ্য কাজ নয়; পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ তৃপ্তি—পূর্ণ আনন্দ এতেই কেবল তুমি পেতে পারনা।"

"অনেক বড় দুঃখীর দুঃখে এই কাজেও অনেক শান্তি দেওয়ার অবসর ঘটে।—শক্তিই যদি থাকে, সার্থকতার তৃপ্তি তাতেও কম পাওয়া যায়না।"

অভাগী ফুল্লরার কথাই তার মনে পড়িতেছিল—আহা, কত এমন ফুল্লরা আছে—যদি—যদি—একটু শান্তি তাদের দিতে সে পারে! চক্ষু দুটি ছলছল হইয়া উঠিল।

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন—"দেখ যদি পাও। যেটুকু পাও, আপাততঃ সেই ঢের।—তবে এও ব'লে রাখছি আরও বড় কাজের ডাক তোমার সামনে আসবে, টেনেও তোমাকে নেবে। আর টেনে তোমাকে নিয়েছে সেইটে দেখলেই, আর সাধ্যমত তাতে তোমার কিছু সহায়তা ক'রতে পারলেই, জেনো বড় সুখী আমি হব।

একটি নিশ্বাস মাত্র লতা ত্যাগ করিল। সুকেশবাবু কহিলেন, "তবে কি জান, কর্ম্মে জীবনটা ভ'রে রাখতে পারলে তার যে আনন্দ, তাতে দুঃখ দুর্ভাগ্যের ভারটা অনেক

লঘু ক'রে রাখে, একথা সত্য। কিন্তু সেই কর্ম্মেও একটা ক্লান্তি আছে, অবসাদ মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। তখন মানুষকে সজীব ক'রে তুলতে পারে প্রিয়জনের স্নেহ ও প্রেম, প্রিয়জনের দরদের সঙ্গ; আর সেই সঙ্গ যে রসের প্রস্রবণ প্রাণে খুলে দেয়, তার অফুরন্ত অমৃতধারা!"

কি ভাবিতে ভাবিতে লতা কহিল, "প্রিয়জন এ পৃথিবীতে সে হারিয়েছে, আর পাবেনা; পৃথিবীর উপরে যিনি আছেন, তিনি যদি দয়া করেন, তবে সে তা হয়ত একদিন পাবে।"

"সে ভরসায় কয়জন লোক থাক্‌তে পারে লতা?"

"সব যে হারিয়েছে, সেই ভরসা ক'রেই তাকে থাকতে হবে।" বলিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে একটুখানি হাসিয়া আবার কহিল—"তবে সে তাগিদ এখুনি আমার কিছু নেই। কোলে যাকে পেয়েছি তাকে নিয়েই জীবনটা আমার ভরে থাকবে। প্রিয়জন তার চাইতে বড় আর কে হ'তে পারে জানিনা!"

সব উদ্দীপ্তিকে নিভাইয়া দিয়া আঁধার মনটা ভরিয়া কেমন যেন একটা বরফ জলের ঠাণ্ডা ঢেউ বহিয়া গেল! কোনও মতে মুখে একটু হাসির ভাতি ফুটাইয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "তাকেও ত ব'লছ সতীনের কোলে স'পে দেবে, সে সুযোগ যদি আসে।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া লতা উত্তর করিল, "দিতেই হবে।—কি ক'রব?—নিজের পাওনা ছাড়তে পারলেও তার পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রতে পারিনে। ভালর তরে ছেলেকে মা বিদেশে পাঠায়, তবু সেই ছেলেই মার বুক ভ'রে থাকে! হাঁ, ওদের একটা খবর কালপরশু তাহ'লে পেতে পারি?"

"খবর কিছু এলে অবশ্য পাবে।"

"মা হয়ত কোনও উত্তরই দেবেন না; আমার অপেক্ষা ক'রবেন। কিন্তু কতদিনে যে দেখা হবে!—যাই হ'ক কাল আবার একটা চিঠি লিখবেন—উত্তর কিছু না দিয়ে থাকলে এই যেন লেখেন, আমার সঙ্গে দেখা না হওয়া অবধি ভাল মন্দ কিছুই তিনি ব'ল্‌তে পারেন না।"

সুকেশবাবুও কহিলেন, "আমিও হরমোহনবাবুকে গিয়ে ব'লব, অগত্যা তাঁর খুড়ীমাকে লিখে যেন একটা খবর ওঁদের নেন। আচ্ছা, তাহ'লে ওঠা যাক এখন।"

বলিয়া উঠিতে উঠিতে কহিলেন, "হাঁ, আমার বড় ইচ্ছে হয়, আমাদের সভা-টভায় তোমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যাই।—এই র'ববার বড় একটা সভা আছে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হবে। বহু মহিলা সমবেত হবেন। যাবে আমার সঙ্গে?"

"সর্ব্বনাশ! বলেন কি? সভায় কি ক'রে যাব?—যদি কেউ দেখে চিনে ফেলে?"

"কে দেখ্‌ছে? কেউ বা চিন্‌ছে? হরমোহনবাবু এ সব সভা-টভায় কখনও আসেন না। বিরিঞ্চিকেও আস্‌তে কখনও দেখি না। সে মনই তার নেই। চলই না একটি দিন—অন্ততঃ আমার খাতিরে—"

বড়ই সঙ্কটে লতা পড়িল। একটু কি ভাবিয়া শেষে কহিল—"দেখি—ফুল্—এই—এই আমি যাঁর কাছে থাকি —তিনি কেমন থাকেন—"

"কি! কি নামটা ব'ল্‌ছিলে—ফুল্—কি?"

থতমত খাইয়া লতা কহিল, "মাফ ক'র্‌বেন আমাকে—দোহাই আপনার।—হঠাৎ মুখে বেরিয়ে গেল—তা নাম-টাম তিনি বাইরের কাউকে জানাতে চান না!"

"কে—ফুল্লরা?"

"আপনি জানেন তাকে?"

"জানি বই কি?—আমাদের নীরদের বোন। আমাদের সভা-টভায় আসত, গান-টান ক'রত—খুব ভাল গাইত।—তবে বড় দুর্ভাগ্য—ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। নীরদ সেদিন এসেছিল আমার কাছে, যদি একটা কিনেরা কিছু ক'রে দিতে পারি। হাঁ, কোথায় তাহ'লে আছে সে?"

নীরবে নত মুখে লতা দাঁড়াইয়া রহিল। একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "থাক্।—তোমাকে আর তার কাছে অবিশ্বাসী ক'রতে চাই না। দরকার যদি হয়, মিসেস্ চম্পটীর কাছেই জেনে নিতে পারব। জানতাম না যে ফুল্লরার কাছেই তিনি তোমাকে রেখে দিয়েছেন। বড় দুঃখ হয় ফুলুর তরে—বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল—স্নেহও তাকে ক'রতাম। তবে দিনকাল এমন প'ড়েছে—কখন যে কে এমনি ধারা সব বিপদে গিয়ে প'ড়বে, বুঝে ওঠাই দায়! বাইরের পাঁচটা কাজে, পাঁচরকম আমোদ প্রমোদে, সমান ভাবেই ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা এসে মিলছে, অথচ সাবধানে

সুপথে এদের চালাতে পারে, এমন মহিলা নেত্রী কোথাও বড় দেখা যাচ্ছে না।"

লতা উত্তর করিল, "তা যখন যাচ্ছে না, তখন মেয়েদের এই রকম বাইরে টেনে আনাও বোধ হয় ঠিক হ'চ্ছে না।"

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "টেনে যে কেউ ঠিক মতলব ক'রেই এদের আন্‌ছে তা নয় লতা। প্রগতির এই নব যুগে নূতন জীবনের যে সাড়া সর্ব্বত্র উঠেছে, সেই সাড়াটা পেয়ে আপনারাই এরা আস্‌ছে। প্রাচীন সমাজ অশেষ বন্ধনে মানুষের—বিশেষভাবে নারীর জীবনকে যে বেঁধে রেখেছিল, সেই সব বন্ধন ছিঁড়ে মুক্তির পথে এই যে যাত্রা সুরু হ'য়েছে, সেইটেই হ'চ্ছে এই যুগপ্রগতির লক্ষণ; কারও সাধ্য নাই এই যাত্রার পথে বাধা দিয়ে দাঁড়াতে পারে।"

ধীরস্বরে লতা কহিল, "পারলে বোধ হয় ভাল হ'ত। এই মুক্তির চাইতে আগেকার সেই সব বন্ধনও—অন্ততঃ মেয়েদের পক্ষে—অনেক ভাল ছিল। সেই সব বন্ধনই ছিল এদের রক্ষাকবচ!"

হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন—"সে বিচারের, কি বিচার ক'রে চ'লবারই অবসর আর কোথাও নেই। প্রাচীন ভাঙ্গছে—ভেঙ্গেই এক রকম প'ড়েছে—নতুনও আসছে অতি বেগে—অতি দ্রুত গতিতে—হুড় হুড় করে এসেই প'ড়েছে, রোধ ক'রে তাকে রাখতে পারছে না, পারবেও না!—এটাকে স্বীকার ক'রে এরই পথে আমাদের চ'ল্‌তে হবে, না চ'লে উপায় নাই। ভাল মন্দ—সেটাও আপেক্ষিক। প্রাচীন আদর্শের মাপ কাটিতে আজ যেটা মন্দ ব'লে মনে হ'চ্ছে, নূতনের মাপ কাঠিতে সেইটেই শেষে হয়ত ভাল হ'য়ে দাঁড়াবে, ভাল ব'লে মানুষ তাকে স্বীকার ক'রবে, জীবন-নীতিকে তার সঙ্গে মানিয়ে নেবে। সেটা যদ্দিন না হবে, প্রাচীনে নবীনে দ্বন্দ্বের ভাব একটা থাকবে, প্রাচীন তার আধিপত্যকে বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা ক'রবে, ততদিনই এই সব সমস্যা কিছু কিছু র'য়ে যাবে, সঙ্কটও কিছু কিছু দেখা দেবে, দুঃখ ক্লেশও কাউকে কাউকে কিছু পেতে হবে।—আমাদেরও দেখ্‌তে হবে, যতদূর সেগুলো এড়িয়ে চলা যায়, দুঃখ ক্লেশ যেখানে এসেই পড়ে তার ভার কতটুকু লঘু করা যায়।—তাই ব'লছিলাম, নূতন এই জীবনযাত্রায় তরুণীদের চালাতে বেশ পাকাবুদ্ধির, বেশ হিসেবী মহিলা নেত্রী চাই।—আচ্ছা, এস তবে এখন, বেরিয়ে পড়া যাক্‌—তোমারও দেরী করিয়ে ফেল্লাম বোধ হয় বেশী।—তা ফুল্লরা আছে কেমন?"

"শরীরগতিক মন্দ নয়।"

"বোধ হয় বড্ড মন-ভাঙ্গা হ'য়ে প'ড়েছে?"

"হাঁ।"

"আহা! নীরদ এসে আমাকে ধ'রেছে, একটা কিনেরা কিছু ক'রে দিতে হবে। কি করতে পারি, বুঝ্‌তেই পারছি নি। তার বিশ্বাস, সুকুমারের সঙ্গেই এই সম্বন্ধটা তার ঘটেছিল। তাকেও ডেকে পাঠিয়েছি। কাল পরশু একদিন দেখা ত করি—দেখি কি হয়? ফুলু যে কোথায় আছে, তাও জান্‌তে না পেরে নীরদ বড় অস্থির হ'য়ে প'ড়েছে।"

"কিন্তু যদি তিনি সেটা জান্‌তে পারেন, আর এখনি ওখানে গিয়ে ওঠেন, আর দেখা তাঁর সঙ্গে হয় এই অবস্থায়—"

"না না, সেটা ফুলু পছন্দ ক'রবে না; লজ্জাও বড় পাবে বুঝ্‌তে পারছি। আমি নিজে তাকে কিছু ব'লব না। যা হ'ক্ তোমার কাছে জানতে পারলাম, এখন তার ভালর জন্য যা দরকার, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমিও তা ক'রতে পারি। আহা বেচারী!—আচ্ছা, তবে চল এখন বেরিয়ে পড়া যাক। হাঁ, তোমাকে কি আমার গাড়ীতে ওখানে নামিয়ে দিয়ে যাব?"

"না না, কতটুকু পথ? আর ফুল্লরা জানালার কাছে পথ চেয়েই প্রায় ব'সে থাকে কখন আমি ফিরি। যদি দেখ্‌তে পায়—"

"হাঁ, থাক্ তবে।"

ঘণ্টাটা টিপিলেন; হরিসিং আসিয়া দরজা খুলিয়া সেলাম করিল।

সুকেশবাবু বরাবর নামিয়াই চলিয়া গেলেন। কুরঙ্গও তখন আসিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইল। মিসেস চম্পটী ফিরেন নাই শুনিয়া লতা সংক্ষেপে একটি রিপোর্ট লিখিয়া তার হাতে রাখিয়া আসিল।

২৮

পরদিনই লতা তাহার মাতাকে একখানা পত্র লিখিয়া জানাইল, ও-বাড়ী হইতে যে পত্র তাঁহার নিকটে গিয়াছে,

উত্তর কিছু না দিয়া থাকিলে অবিলম্বে এই মর্ম্মে একটা উত্তর তাঁহাদের দিবেন, যে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সাক্ষাৎ মত একটা কথাবার্ত্তা কিছু হইবার আগে উঁহাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছুই তিনি বলিতে পারেন না। ও-বাড়ীতে এইরূপ কোনও পত্র ব্যতীত আর কোনও উপায়ে তাঁহাদের কোনও সংবাদ সে পাইতে পারে না। ইহাও লিখিল—এই সব সংবাদ জানিবার পরেও মণিঠাকুরাণী যদি তাঁহার গৃহে তাঁহাদের রাখেন, আপাততঃ সেইখানেই যেন থাকেন। নতুবা অন্য কোথাও একটা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিবেন এবং সেভিংস্-ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা আছে তাহা হইতে কিছু তুলিয়া খরচপত্র চালাইবেন। মাসখানেক বাদে সেও বোধ হয় কিছু খরচ তাঁহাদের পাঠাইতে পারিবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাদের এখানে আনাইতে চেষ্টা করিবে। বিশেষ কারণে এখনও তাহার ঠিকানা সে তাঁহাকে পাঠাইতে পারিতেছে না।

যদি কোনও পত্র ইতিমধ্যে আসিয়া থাকে, তবে তাহার খবর সে সুকেশবাবুর কাছে পাইতে পারে এবং সুকেশবাবু বলিয়াছিলেন পরশুতক আবার তিনি আসিবেন। সন্ধ্যার পর সে গেল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, কেহই নাই। কুরঙ্গকে ডাকিল, সাড়া পাইল না। হয়ত ভিতরের দিকে কোনও কাজে আছে। 'গেষ্টরুমে'র অর্থাৎ পাশের যে ঘরটিতে সে থাকিত তাহার মধ্য দিয়া কুরঙ্গর ঘরে গিয়া দেখিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু কুরঙ্গ নাই—ডাকিয়াও সাড়া পাইল না। সহসা অতি করুণকণ্ঠে একটা আর্ত্তধ্বনি কানে আসিল। চমকিয়া লতা ফিরিয়া চাহিল—পাশেই ছোট একটা খোপর ছিল, মনে হইল সেইদিক হইতে এই ধ্বনিটা আসিল; খোপরের ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, তার ওধারে একটি ঘর, ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং সেই ঘরেই কোনও নারী বেদনায় কাতরাইতেছে—মনে হইল, 'গেষ্টরুমের একধারে একটি দরজা যে তালা বন্ধ সে দেখিত, ঐ ঘরটি তাহারই ওপাশে। ঘরে ঢুকিয়া লতা দেখিল, একখানি শয্যায় একটি নারী শায়িতা, পাশেই একটি টেবিলে ঔষধপত্রাদি রহিয়াছে এবং দেয়ালের পাশে একটি আলমারীতে অনেক রকম যন্ত্রপাতি। লতা কাছে গিয়া দাঁড়াইল—দেখিল নারী বয়সে নবীনা এবং রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। লতাকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—"কে—কে আপনি—কোত্থেকে এখানে এলেন—কুরঙ্গ কোথায়?"

"কুরঙ্গকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না—ডেকেও সাড়া পেলাম না। তা আপনি—"

"আমি—আমি—বড্ড ব্যারাম—চিকিৎসার জন্যে এখানে এসেছি। কুরঙ্গ কোথায়?—বড় তেষ্টা—বরফ আর একটা লেমনেড আন্‌তে পাঠালাম, আর ফিরছে না! উঃ! আর পারি না—একটু জল—জল!"

কুঁজায় জল ছিল; ত্বরা করিয়া লতা এক গ্লাস জল আনিয়া রোগিণীর মুখের কাছে ধরিল। জল খাইয়া যেন একটু সুস্থবোধ করিয়া রোগিণী লতার মুখপানে চাহিল; কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি কে? এখানে ত আর কেউ আসে না! আপনাকেও কখনও দেখিনি—কোত্থেকে এলেন?"

বলিতে বলিতে একটা লেমনেডের বোতল ও এক চাকা বরফ হাতে লইয়া ত্রস্ত কুরঙ্গ ঘরে ঢুকিল। লতাকে দেখিয়া একেবারে থ' হইয়া দাঁড়াইল।

"কি সর্ব্বনাশ! আপনি এখানে মিসেস্ রায়! কোত্থেকে এলেন? কি ক'রে এলেন?"

বড় অপ্রতিভ হইয়াই লতা কহিল, "আমি—আমি—এসেছিলাম—তোমার সাড়া না পেয়ে ভেতরে এসে ঢুকলাম—তখন ওঁর কাতরাণি শুনে এই ঘরে এসেছি। এখানে কোনও ঘর আছে, রোগী কেউ থাকে, জান্‌তাম না।"

"জানবার দরকারই আপনার কিছু ছিল না! আসাও উচিত হয় নি! তা যান—যান—এখুনি বেরিয়ে যান। মিসেস্ এখুনি ফিরে আস্‌বেন, এসে দেখ্‌লে একটা অনর্থ হবে।"

কাতর স্বরে রোগিণী বলিয়া উঠিল, "উঃ! বড় তেষ্টা—বড় তেষ্টা! দেও—দেও—শীগ্‌গির ক'রে বরফ লেমনেডটা দেও।"

ক্ষিপ্রহস্তে বরফটা ভাঙ্গিয়া গেলাসে ফেলিয়া লেমনেডটা ঢালিয়া কুরঙ্গ রোগিণীর কাছে আনিল। লতা বাহির হইয়া আসিতেই মিসেস্ চম্পটীর সম্মুখীন হইল। এইমাত্র ফিরিয়া তিনি রোগিণীর গৃহেই যাইতেছিলেন। লতাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—চক্ষুমুখও অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল।

"একি!—আপনি কোত্থেকে এলেন!—ওঘরে কেন গিয়ে ঢুকেছিলেন? কি দরকার ছিল আপনার?"

"আজ্ঞে, দরকার কিছুই ছিল না। ঘর যে ওখানে একটা আছে—তাও জান্‌তাম না—"

"কি ক'রে তবে এখন জান্‌লেন? ভেতরেই বা কেন এসেছিলেন কাউকে না ব'লে ক'য়ে—"

"আজ্ঞে, এসেছিলাম এখানে। তা কুরঙ্গকে ডেকে সাড়া না পেয়ে ভেতরে আসি—"

"তা ওঘরে কেন গিয়ে ঢুকলেন? কুরঙ্গ কোথায় ছিল?"

"বাড়ীতেই সে ছিল না। বাইরে গিয়েছিল বরফ-লেমনেড আন্‌তে।"

"দরজা খোলা রেখে গিয়েছিল?"

"আজ্ঞে হাঁ। তা ভেতরে এসে ওদিকে একটা কাতরাণি শুন্‌লাম—"

মিসেস্ চম্পাটী হাঁকিলেন, "কুরঙ্গ!"

ছুটিয়া কুরঙ্গ বাহির হইয়া আসিল।

"দরজা খোলা ফেলে রেখে কোথায় তুমি গিয়েছিলে? বাইরের দরজা কেন বন্ধ ক'রে যাওনি?"

"আজ্ঞে, তেষ্টায় উনি ছটফট ক'রছিলেন—ছুটে একটা বরফ লেমনেড আন্‌তে যাই। তা ছাই দোকানে ছিল ভিড়—ফিরতে একটু দেরী হ'য়ে গেল।"

"বাইরের দরজাটাই বা কেন বন্ধ ক'রে যাওনি? বাইরের লোক কেউ এসে এভাবে ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌বে—আর—" বলিতে বলিতে লতার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তা আপনাকেও বলি মিসেস্ রায়, ঠিক বাইরের লোক না হ'লেও আপাততঃ বাইরেই থাকেন, বাইরে থেকেই আসেন যান। যখন দেখ্‌লেন বাড়ীতে কেউ নেই, ডেকেও ওকে পেলেন না, বোঝা উচিত ছিল, বাড়ীতে ও নেই। সোজা আপনি ভেতরে গিয়ে কেন ঢুকলেন? এই ব্যবসা আমি করি; এমন রোগী আমার থাকতে পারে, যারা—যারা নাকি একটু প্রাইভেসী (privacy) চায়। আমাদেরও তার ব্যবস্থা রাখতে হয়। সুকেশবাবুর অনুরোধে বাড়ীতে আপনাকে স্থান দিয়েছি, কাজ-কর্ম্মের সুবিধেও যদ্দুর পারি ক'রে দিচ্ছি। তা এতটা prying habits আপনার—কি ক'রে আর বিশ্বাস আপনার ওপর রাখতে পারি বলুন!"

অতি ব্যথিত স্বরে লতা উত্তর করিল, "ভুল বুঝবেন না মিসেস্ চম্পটী। অবিশ্বাসের কাজ আমি কিছু করিনি। prying habits-ও আমার কিছু নেই। আপনার বাড়ীতেই আশ্রয় পেয়েছিলাম, এঘরে ওঘরে দরকার মত গিয়েছি—আজও তেম্‌নি—"

"আজ আপনি বাইরে থেকে এয়েছেন। সুতরাং ভেতরে গিয়ে ঢুকবার আগে একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল। ভেতরের দিকের সব ঘর—সব বাড়ীতেই কত কি ঘরোয়া ব্যাপার থাকে—আর তার privacy-ও সবাই বজায় রাখ্‌তে চায়। দুচার দিনের তরে আপনি এখানে 'গেষ্ট' (guest) ছিলেন মাত্র—স্থায়ী 'টেনাণ্ট' (tenant) কেউ আমার নন। তারা যে লিবার্টি নিতে পারে, সে লিবার্টি আপনি নিতে পারেন না।"

"বুঝ্‌তে পারিনি মিসেস্ চম্পটী, মাপ ক'রবেন—এইবারটা। এর পর আর কখনও এরকম হবে না। তবে—তবে—আপনার ঐ পেসেণ্টটির কাছে যদ্দিন আছি, খবর নিতে আস্‌তে হবে—"

"আস্‌তে হবে, আস্‌বেন; সবাই আসে। কিন্তু খালি বাড়ী দেখে একেবারে ভেতরে গিয়ে কেউ ঢোকে না। আর আপনাকে খবর নিয়ে আসতে হয় আমার কাছে—তা সময়টা আপনি এমন বেছে নিয়েছেন—সন্ধ্যে বেলায়—যখন বাড়ীতে আমি থাকিই না বড় একটা। কেন, দিনের বেলায়—সকালে দুপুরে বিকেলে—আর কি সময় আপনার কখনও হয় না!"

অতি সঙ্কুচিতভাবে লতা উত্তর করিল, "সন্ধ্যে বেলায় আসি—সুকেশবাবুর সঙ্গে দরকারী অনেক কথা থাকে—আর কখনও তাঁর দেখা পাব না—তাই—"

"হাঁ, সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি।—তা কি আপনাদের গোপনীয় দরকারী কথা এমন থাক্‌তে পারে জানি না, তবে দেখ্‌তে পাই, যখনই আসেন ঐ 'ঘরে' গিয়ে ঘণ্টা দুই-তিন দরজা বন্ধ ক'রে বসেন! তা আপনাদের private life-এর mystery কি আপনারাই জানেন। তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার এমন দরকার কিছু নেই। তবে বাইরে থেকে বন্ধু যাঁরা কেউ আসেন, সবাই এটা notice করেন। এই ত সেদিন মিস্ মিটার—সুকেশবাবুদেরও একজন বন্ধুও তিনি—তা সে যাক্—ওসব কথার ভেতর

আমার যাবার দরকার কিছু নাই।—আপনাদের ভাল-মন্দ আপনারাই বুঝবেন।—যাক্, যা হবার হয়েছে, এখন বসুন গিয়ে ও ঘরে। আমি আস্‌ছি।"

বলিয়াই চম্পটী চটাপট রোগিণীর ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে লতা বাহিরের দিকে বসিবার ঘরটিতে আসিয়া একখানি কৌচের উপরে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইতে লাগিল, ঐ গৃহসহ সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘন ঘন ঘূর্ণীপাকে তাহাকে লইয়া একেবারে রসাতলে নামিয়া যাইতেছে!—কি হইবে, কি সে করিবে, বুদ্ধি স্থির করিয়া কিছুই সে ভাবিতে তখন পারিল না। এইটুকু কেবল মনে হইল, হাঁ, চম্পটী যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতে পারেন এবং অন্য কাহারও মনেও এইরূপ একটা কুৎসিত সন্দেহ হইতে পারে।—

কতক্ষণ পরে মিসেস্ চম্পটী ফিরিয়া আসিলেন। সাড়া পাইয়া চক্ষু মুছিয়া লতা সোজা হইয়া বসিল।

"হাঁ, উনি আজ কেমন আছেন?"

"ভালই এক রকম আছেন—এই যে রিপোর্ট—" বলিয়া এক খণ্ড কাগজ লতা চম্পটীর হাতে দিল। দেখিয়া চম্পটী কহিলেন, "হুঁ—তা ব্যবস্থা যেমন আছে, তাই চলুক। তবে urine-টা আর একবার examine এখন করতে হবে—কালই পাঠিয়ে দেবেন।"

"দেব।"

"পারি ত কালই গিয়ে একবার দেখে আস্‌ব। শরীরটা বড্ড দুর্ব্বল—সময়ও নিকট হ'য়ে আস্‌ছে—তা একটু দুধ আর ফলটল বেশী ক'রে খেতে দেবেন।"

"খেতে বেশী চান না। তবে জোর ক'রে যতটা পারি খাওয়াই।"

"হাঁ, তাই খাওয়াবেন।—আর bowels-টা যাতে বেশ clear থাকে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌বেন।—দেখ্‌তে পাচ্ছি, বেশ কেয়ারফুল নার্স (careful nurse) আপনি, আর পেসেণ্টের ওপর যে দরদটা নার্সদের থাকা বড্ড দরকার, তাও বেশ আপনার আছে। খুব ভাল একজন নার্সই আপনি হ'তে পারবেন। দুটো-চারটে এই রকম 'কেস য়্যাটেণ্ড' (case attend) ক'রলে মিডওয়াইফের কাজও কিছু কিছু সুরু করতে পারবেন।—আমিও যদ্দূর পারি আপনাকে help (সাহায্য) করব।"

লতা কোনও উত্তর করিল না—চক্ষেও জল আসিতেছিল। একটু কাল চাহিয়া থাকিয়া চম্পটী আবার কহিলেন, "তা দেখুন, মিসেস্ রায়, হঠাৎ বড্ড রাগ হ'য়ে গিয়েছিল—কড়া কয়েকটা কথা ব'লে ফেলেছি—কিছু মনে করবেন না, কোনও রকম insinuation (অসঙ্গত ইঙ্গিত) আপনার সম্বন্ধে ক'রবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। তবে কি জানেন—মেয়েমানুষের ভাগ্য—অসহায় অবস্থায় প'ড়লে—যা তা একটা ছুঁতো ধ'রেও লোকে এটা ওটা ভাবে, যা খুসী বলে। কাজেই সাবধান হ'য়ে আমাদের চ'ল্‌তে হয়।—তা সত্যি ক'রে বল্‌ছি, নিজে আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, ও জাতীয় কোনও সন্দেহ মনেও কখনও আসে নি। তবে কি জানেন, ঐ লেডী strict একটা privacy রেখে এখানে থাক্‌তে চান, আমিও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেটার কোনও বাধা এখানে হবে না। তা হঠাৎ আপনাকে দেখে মনে হ'ল আমার প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারলাম না, অপ্রস্তুতও বড় ওঁর কাছে হ'তে হবে।—তাই বড্ড রাগ হ'য়ে গেল—"

"থাক্—সে যা হবার হ'য়ে গেছে। অত আর কেন বল্‌ছেন? ওঁকেও বল্‌বেন, আমি ত চিনি না ওঁকে, আর বাইরে কাউকে কিছু ব'লবও না। কেনই বা বলব?"

"হাঁ।—তা দেখুন, যা হবার হ'য়ে গেছে।—সুকেশ-বাবুকেও কিছু বলবেন আপনি। অনেক দিনের বন্ধুলোক তিনি—ঐ 'সুকের' টেনাণ্ট, আমি এখানে থাকি, দেখাশুনো সর্ব্বদা হয়—কখনও আমার এখানে এসে বসেন। তা—তিনি কিছুতে বিরক্ত হন এটা—আমি চাইনে। আবার আপনার নিজের দিকের কথাটাও একটু ভাববেন। এই লাইনে যদি কাজ করতে চান, pushing কি training (কাজের সুযোগ লাভ কি শিক্ষা) আমার কাছেই আপনি পেতে পারেন। একটা hitch (মনান্তর) এ নিয়ে হওয়া—বুঝতেই অবিশ্যি পারছেন—কারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না।"

"সে আশঙ্কা কিছু করবেন না।—এ সব কথা—তাঁকে বলবার মত কথাই নয়।—আচ্ছা, তাহ'লে উঠি আজ।"

"তা—বসুন না বরং একটু। সুকেশবাবুর সঙ্গে যদি কোনও কথা থাকে—হয় ত এখুনি তিনি আসবেন।"

কুরঙ্গ আসিয়া তখন দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল,

কহিল, "তিনি ত এয়েছেন।—এই ত আমি যখন বরফ লেমনেড নিয়ে আসি, তখনই এলেন। সঙ্গে দেখ্‌লাম, সুকুমারবাবু। দুজনে ঐ 'নুকে' গিয়ে ঢুকলেন। আমাকে ব'লেন মিসেস্ রায় এলে আমাকে একটা খবর দিও।—"

"বেশ তাহ'লে গিয়ে দেও। উনি ত এয়েছেন।"

কুরঙ্গ বাহিরে গিয়া নুকের দরজায় ঘা দিল।—লতাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া সিঁড়ির নিকটে দাঁড়াইল। সুকেশবাবু বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "এই যে! কখন এলে?—তা আমার ত এখানে দেরী হবে—"

"তা হ'ক, আমার বেশী কিছু কথা নেই। কেবল ঐ খবরটা—কাশীর যদি কোনও চিঠি ও বাড়ীতে এসে থাকে -"

"হাঁ, এয়েছে। ভালই আছেন ওঁরা। লিখেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে কিছুই তিনি বল্‌তে পারেন না।"

"ঐ বাড়ীতেই আছেন?"

"সম্ভব। ঠিকেনা ত তাই-ই দিয়েছেন।"

"হাঁ, আর একটা কথা। সদাসর্ব্বদা ত ও বাড়ীতে চিঠি কিছু আসবে না; আমিও কতদিনে তাঁদের এখানে আনাতে কি ঠিকানা দিয়ে চিঠিপত্র পাবার বন্দোবস্ত একটা করতে পারব, ঠিক কিছু নেই। তা ওখানে আপনার ভাল জানাশুনো লোক যদি কেউ থাকে—"

হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "সে বন্দোবস্ত আমি করেছি। আমার একজন বন্ধুর কাছে চিঠি লিখেছি, তিনিই গোপনে খবর নিয়ে আমাকে জানাবেন, ওঁরা কেমন থাকেন, কখন কি হয় না হয়—"

"তাহ'লেই আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারব। আচ্ছা, তবে আসি আজ, নমস্কার।" বলিয়া লতা নামিয়া গেল।

মিসেস্ চম্পটীও দরজা খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বুঝিলেন, একটা কিছু রহস্য ইহার জীবনের আছে, যাতেই সুকেশবাবুর সঙ্গে আড়ালে এরূপ কথাবার্ত্তার দরকার কিছু হয়। অন্য রকম কিছু নাও হইতে পারে। তবে—যাক্, অতশতয় তাঁর এমন দায় কি?

২৯

ঘরে বসিয়া সুকুমার সিগারেট ফুঁকিতেছিল। সুকেশবাবুও আসিয়া একটা সিগারেট ধরাইলেন। কয়েকটা টান দিয়া শেষে কহিলেন, "তাহ'লে—এই ভাবটা নিয়েই তুমি দাঁড়াতে চাও?"

"হাঁ, নীরদের সামনাসামনি যখন আমাকে হ'তেই হবে, —এছাড়া আর কি ক'রতে পারি আমি বলুন?"

"হুঁ—তবু আর একটিবার ভেবে দেখ সুকুমার, বিয়ে ক'রে একটা social status (সামাজিক মর্য্যাদা) তাকে দিতে পার কি-না।"

"সেটা out of the question! হতেই পারে না। মাথার ওপরে মা বাবা খুড়ো জ্যাঠা দাদা এঁরা সব রয়েছেন—কত আত্মীয়স্বজন চারদিকে—কলকেতায় এত বড় একটা social position (সামাজিক মান সম্ভ্রম) আমাদের রয়েছে—এখন আমি গিয়ে পারি—হঠাৎ রেজেষ্ট্রী ক'রে ঐ রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করতে—যে নাকি—দুদিন বাদেই—"

"যাই তার হ'তে হ'ক্, তার জন্যে তুমিই ত দায়ী সুকুমার।"

"সেটা হাজার হ'লেও একটা presumption (অনুমান) মাত্র। বন্ধুভাবে মেলামেশা আমরা করেছি—বহু ছেলে মেয়েরা আজকাল করে থাকে। আর এরকম বন্ধু কেবল আমিই যে তার ছিলাম তা নয়—আরও থাকতে পারে—বন্ধুত্বে কোনও restriction (বাধা) মেনে ত সে চলেনি—সুতরাং দায়ী আর কেউ ও হ'তে পারে। তবে হাঁ, friendly intimacy (বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা) আমার সঙ্গেই কিছু বেশী ছিল। তাই এই presumption লোকের হ'তে পারে, এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। আমারও মনে হ'তে পারে হয়ত আমিই দায়ী। তা যদি হ'য়েই থাকি, আমার কর্ত্তব্য যা হ'তে পারে, তা পালন করবার চেষ্টা করেছি, নিজের protection (রক্ষণাবেক্ষণে) এ তাকে নিয়েছি, তার আর সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্বও গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি—যদিও আইনত তার নয়, কেবল তার সন্তানেরই ভরণপোষণের জন্য আমি দায়ী।"

"সে দায়িত্ব যদি নেও, সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার ক'রে নিচ্ছ সুকুমার, সন্তানটির পিতা তুমি।"

"স্বীকার ঠিক না করি, অস্বীকারও ত একেবারে করতে পারছি নি। সুতরাং legal obligation (আইনের বাধ্যতা) কিছু না থাকলেও moral obligation (নৈতিক বাধ্যতা)

আছে। নিচ্ছি দায়িত্বটা সেইটে মেনে—মানুষ হ'য়ে নাকি যেটাকে অগ্রাহ্য ক'রে চল্‌তে পারি না, চলতে চাইও না। সেটুকু sense of honour (মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাবোধ) আমার আছে as a gentleman (ভদ্রলোকরূপে)। তার পর মুখে 'কনরেড' 'কমরেড' যাই করি, হাজার হ'লেও I am a man and she is but a poor girl (আমি একজন পুরুষ, আর সে একটা বেচারী বালিকা মাত্র)। যদি তাকে ruin (নষ্ট) ক'রেই থাকি, একটা কিছু reparation (প্রতিকারের উপায়) করতে আমি morally bound (নৈতিক ধর্ম্মে বাধ্য)।

একটু হাসিয়া সুকেশবাবু কহিলেন, "সে reparations হ'চ্ছে বিবাহ ক'রে একটা মর্য্যাদার স্থান তাকে দেওয়া। সেইটেই সবাই চায়।"

"চায়, সে চাইতে পারে। কিন্তু অতটা আমি যেতে প্রস্তুত নই। আমারও ত একটা মর্য্যাদা আছে সমাজে। আমাদের family-রও (পরিবারেরও) একটা মর্য্যাদা আছে। সেটা খোয়াতে আমি পারি না। বিবাহিতা স্ত্রী ব'লে যাকে গ্রহণ করব, আমার পরিবারে তার যে একটা স্থান হওয়া চাই, এর তা হ'তেই পারে না। তার পর—তা সত্যি বল্‌তে কি সুকেশদা—আপনিও অস্বীকার করতে পারবেন না—বিবাহ ক'রে স্ত্রী ব'লে যাকে ঘরে আন্‌ব—ভবিষ্যতে কুলবংশের মান ইজ্জৎ যার উপরে নির্ভর করছে—তার চরিত্রগত পবিত্রতা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ আমাকে হ'তে হবে। A wife, after all, must be a chaste wife (স্ত্রী যে হবে তাকে সতী স্ত্রী হ'তেই হবে।) আমার কাছে যে yield (আত্মসমর্পণ) করেছে, আর কারও কাছে যে সে yield ক'রে নি, বিবাহের পরেও যে কারও কাছে—করবে না, কে বল্‌তে পারে।"

"হুঁ—সেটা বল্‌তে পার বটে। আর এটাও অস্বীকার করতে পারি না, যে a wife must be a chaste wife, আর অবিবাহিত অবস্থায় যে মেয়ের চরিত্রে এই সব irregularity (অনাচার) ঘটে, যাদের সঙ্গে ঘটে তারাও কেউ তাকে বিবাহ করতে চায় না।—এখনও moral standard of society—(সামাজিক নৈতিক আদর্শ) যে রকম আছে—অন্ততঃ এদেশে, তাতে ক'রে এটা কেউ পারে না। তবে এই সব irregularity থেকে মেয়েদের যে এই রকম সব বিপদ এসে উপস্থিত হয়, সে কথাটাও ত ভাববার একটা কথা বটে।"

"ভাবা উচিত সেই মেয়েদের, তাদের অভিভাবকদের। কেন তাঁরা মেয়েদের এভাবে ছেড়ে দেন আমাদের সামনে! কেন এ opportunity (সুযোগ) তাঁরা দেন আমাদের? —পুরুষরা এ সব 'লিবার্টি' (liberty) সর্ব্বদাই নিতে চায়—সব দেশেই নিয়ে থাকে। ঘর সামলাতে হবে ঘরের লোকের।—তাঁরা যদি তা না পারেন না করেন, তার জন্যে আমরা দায়ী হ'তে পারি না।—তবু আমি—from a sense of moral duty (নৈতিক কর্ত্তব্যের বিবেচনায়) এই দায়িত্বটা নিয়েছি। তাও সবাই নেয় না।"

সুকেশবাবু কহিলেন, "সেইখেনেই বড় একটা ভুল করেছ সুকুমার।—নিজেই ব'লছ—ফুলুর এই অবস্থার জন্য দায়ী তুমি নাও হ'তে পার।—কেন তবে ঘর থেকে তাকে বের ক'রে নিয়ে এলে? হয়েছিল এই অবস্থা—তার মা বাবা সব র'য়েছেন, যা হয় ব্যবস্থা একটা করতেন। কতই ত এমন আজ কাল হচ্ছে। যা হয় একটা কিছু ক'রে মা বাবারা তাদের relieve (মুক্ত) করেন—তার পর আবার বিবাহও দেন, সব চুকে যায়।—ঝোঁ ক'রে এই রকম একটা risky step (বিপদসঙ্কুল উপায়) না নিয়ে, আমাকে এসেও যদি জানাতে, এই পরামর্শই তোমাকে দিতাম—সব দিক রক্ষা পেত। মেয়েটাও এভাবে একেবারে ভাস্‌ত না।"

একটু যেন অপ্রতিভ হইয়াই সুকুমার কহিল, "সেটা—সেটা—সত্যি বড় ভুল ক'রেই ফেলেছি! তবে তখন ফুলুর কান্নাকাটিতে পাগল হ'য়ে উঠলাম আবার নিজেরও ধারণা এই ছিল আমিই দায়ী—"

"দায়ী যে তুমি সে বিষয়ে সন্দেহ কিছু নেই—আর এখন এই সঙ্কটে প'ড়ে যে সাফাই-ই দিতে চাও, মনে মনে নিজেও জান, তুমিই দায়ী। তবে বেকুবী বড় একটা ক'রে ফেলেছ। ঘুণাক্ষরে একটু জান্‌তে পারলেও এটা করতে আমি দিতাম না। তা বেকুবী যা করেছ তা ত করেছই, আমাকেও এমন এক বিপদে ফেলেছ, সে আর কি বলব? যেমন তুমি, তেম্‌নি নীরদও বন্ধু—সকল রকম কাজে আমার সহায়। দুজনেরই সমান একজন মুরুব্বির মত আমি। সে এসে আমাকে ধ'রে পড়েছে; বলতে কি নালিশই এক রকম আমার কাছে এসে করেছে—করতেও

পারে। বলছে এর প্রতিকার আপনাকে ক'রে দিতে হবে! এখন কি জবাব তাকে আমি দেব?"

"জবাব—আপনাকে কিছু দিতে হবে না। যা দিতে হয় আমিই দেব। আস্‌ছে ত সে এখুনি।"

"জবাব যা দেবে, তাতে ত তক্ষুণি সে মরিয়া হ'য়ে উঠে একদম খুন ক'রেই ফেল্‌তে তোমাকে চাইবে!"

"সে জানি।—আত্মরক্ষার সম্বলও আমার আছে!" বলিয়া একটা রিভলবার বাহির করিল।

"কি সর্ব্বনাশ!—শেষে কি একটা খুনোখুনি রক্তারক্তি এখানে ক'রে একদম সর্ব্বনাশ আমাদের ক'র্‌বে! দেও দিকি ওটা আমার হাতে।"

"না! আত্মরক্ষার এ সম্বল হাতছাড়া কর্‌তে পারি না। সঙ্গে নিয়েই পথে বেরোই।" বলিয়া রিভলবারটা আবার পকেটে রাখিল।

"দেখছি, তোমার সঙ্গে তার মুখোমুখি না হওয়াই ভাল—অন্ততঃ আমার সামনে, আমাদের এই নুকে। পথে দেখা হয়ত তোমাদের হবে। তা যা খুসী তখন ক'বো, খুনোখুনি ক'রে মরতে হয় গিয়ে মর, কিন্তু আমি তার ভেতর গিয়ে জড়িয়ে পড়তে চাই না, আর আমাদের এই নুকটারও—যাহ'ক একটা নাম আছে—সেটাও একদম নষ্ট হ'তে দিতে পারি না!"

"বেশ, তাহ'লে উঠি আমি এখন।—তাকে যা বল্‌তে হয় আপনিই বলবেন—আমার কথা বলেই ব'লবেন।"

"কিন্তু তবু—রাস্তায় দৈবাৎ কখনও দেখা হ'লে একটা খুনোখুনি যে করবে, সেটাই কি ক'রে সত্যি আমি এলাউ (allow) করতে পারি? মুরুব্বি ব'লে মান, স্নেহও তোমাদের করি, এমনধারা একটা বিপদের সম্ভাবনায় একদম তোমাদের ছেড়ে দিয়েও ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারছিনি সুকুমার?"

"বেশ। তাহ'লে বাইরেই কোথাও আমি চ'লে যাচ্ছি! বাইরেই ত ছিলাম এদ্দিন। তা শেষে মনে হ'ল, ফুলুর ডেলিভারীর সময় নিকট, এখন কাছেই আমার এসে থাকা উচিত।—"

"তাহ'লে তাকে আবার ফেলেই বা যাবে কি ক'রে?"

"আমার protection (রক্ষণাধীনতা)সে ত্যাগ করেছে।"

"ত্যাগ করেছে—তার মানে?"

"মানে—অতি বাড়াবাড়ি এটা অভিমান কি সেরেফ মেয়েলী একটা খেয়াল—ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না। সেদিন গেলাম, বাড়ী থেকে বের ক'রেই আমাকে দিলে। খরচ-পত্রও কিছু নিচ্ছে না।"

"চলছে কি ক'রে তবে?"

"শুন্‌লাম তার গয়না-পত্তর যা ছিল বিক্রী করেছে।"

"কদিন চলবে তাতে?"

"জানি না। নীরদকে বলবেন, তারা যা পারে এখন করুক, আমার কোনও দায় আর নেই। ডেলিভারীর পর 'বেবী'টার যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে, ঘরে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে নিক, বিয়ে দিতে পারে দিক—"

"তাও কি আর সম্ভব এখন সুকুমার?"

"একদম অসম্ভবই বা কেন হবে? বাইরে থেকে এসেছে, বাড়ী ভাড়া ক'রে আছে—এমন কিছু একটা social status (সামাজিক মর্য্যাদার স্থান) এখানে তাদের নেই। হয়ত জানাজানিও তেমন কিছু হয়নি। আর নেহাৎ নাই পারে—কি, না চায়, বেশ, ঢের আশ্রম-টাশ্রম আছে, কোথাও রেখে দিক। খরচ-পত্তর—তা যদি দরকার হয় আর তারা চায়, আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

"সেটা তারা নেবে না, চাইবেও না কিছু। তবে শান্ত তারা সহজে হবে না। একটা কৈফিয়ৎও তোমার কাছে চাইবে?"

"কৈফিয়ৎ—চাইতে পারে, তবে আমাকে পাচ্ছে কোথায়?—রাত ভোরেই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, শীগ্‌গির ফিরছিও না।—তবে হাঁ, আপনি এটা তাদের বল্‌তে পারেন, আমার হ'য়ে, ইন্টিমেসী (intimacy) তার সঙ্গে আমার যাই হ'য়ে থাক, তার এ অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী এ কথা আমি স্বীকার করি না, আর দায়ী ব'লেই ঘর থেকে তাকে আমি বের ক'রে আনিনি। বিপদে প'ড়ে, বন্ধু ব'লে আমার সহায়তা চেয়েছিল, স্বেচ্ছায় এসে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে; এড়াতে পারিনি, আশ্রয় আমি দিয়েছিলাম। এখন আমার সে আশ্রয়ও স্বেচ্ছায় সে ত্যাগ করেছে—সুতরাং কোনও দায়িত্বও আমার আর নেই। সে কোথায় আছে, মিসেস চম্পটী জানেন, তাঁর কাছেই তারা জেনে নিয়ে যা ভাল মনে করে করতে পারে। আচ্ছা, তাহ'লে উঠি আমি এখন। নমস্কার।"

বলিয়াই সুকুমার বাহির হইয়া চটপট নামিয়া গেল। ভয়ও একটু হইতেছিল, নীরদ কখন আসিয়া পড়ে, পাছে তার সঙ্গে দেখা হয়।

সুকেশবাবু ঘণ্টাটা টিপিলেন; হরি সিং আসিয়া সেলাম করিল। 'পেগে'র হুকুম হইল। ভিতরের দিকে একটা গৃহেই বন্দোবস্ত সব ছিল; হরি সিং গিয়া সোডাওয়াটারসহ একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া আনিল। পান করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা শ্রান্ত ক্লান্ত অশান্ত চিত্তকে একটু চাঙ্গা করিয়া সুকেশবাবু তুলিলেন। তারপর কেবল ছোট একটা সিগারেট নয়, বড় একটা চুরুট এবার ধরাইয়া নীরদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নীরদ তখন আসিল, একটু কৈফিয়তের ভাবে কহিল, "বেশী একটু দেরী হ'য়ে গেল আমার। বাবা বড় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন—"

"কি হয়েছে তাঁর?"

"নতুন আর কি হবে? শরীর ত ভাল ছিল না, এখন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন এই আঘাতে। সন্ধ্যের পর এক একদিন এমন অস্থির হ'য়ে পড়েন যে ভয় হয় এই বুঝি গেলেন—"

"হুঁ। সে ত হ'তেই পারেন। তা এখন একটুখানি সুস্থ দেখে এসেছ ত?"

"হাঁ, আর গুরুদেবও এখানে আছেন—"

"গুরুদেব!"

"ঐ যে ঠাকুর হরদাস—নাম শোনেন নি?"

"হঁ, হাঁ, শুনেছি, শুনেছি। তিনি—"

"বাবার গুরুদেব। আমরাও গুরুদেব তাঁকে বলি। সম্প্রতি এসেছেন এখানে। আমাদের এই বিপদের কথা শুনে বাবার কাছেই আছেন ক'দিন।—সুকুমার আসেনি?"

"এসেছিল। এই ত গেল।"

"গেল! কেন, কথা ছিল না আপনার মোকাবলায় সামনা সামনি আমাদের বোঝাপড়া একটা হবে—"

"কিচ্ছু লাভ নেই নীরদ। সে যা ব'ল্লে—শুনে আর কি করবে? সহ্যই করতে পারবে ত না, একটা হাতাহাতি হ'ত। মিছে আর অপ্রিয় একটা কলহে দরকার কি? আমিই শেষে বিদায় ক'রে দিলাম।—"

"কি ব'ল্লে সে?—কি বলতে চায়!—"

"শুনতেই চাও? মিছে আর কেন—"

"শুনতেই চাই। আপনি বলুন, যা হয়েছে তার ওপর ভার আমাদের কিছু বাড়বে না তাতে।"

সংক্ষেপে সুকেশবাবু সুকুমার যাহা বলিয়া গিয়াছিল, যতদূর সম্ভব নরম করিয়াই নীরদকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। চোখ মুখ নীরদের অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল। সুকেশবাবু কহিলেন, "কি করবে দাদা? উপায় ত কিছু নেই।"

"না, তা নেই। প্রতিকারের কোনও প্রত্যাশাও তার কাছে বড় করিনি। আর এতবড় পাজী—যদি—যদি সামনে একটিবার পেতাম—"

"জানি। বুকে তার ছুরী বসিয়েও দিতে তুমি পারতে। সেও রিভলভার নিয়ে এসেছিল—তাইত শেষে বিপদ গ'ণে সরিয়ে তাকে দিলাম। আর এমন ধারা একটা খুনোখুনি কাণ্ড ক'রে লাভও ত কিছু নেই। যা ক্ষতি তোমাদের হয়েছে, শোধরাত না কিছু, বরং আরও অনেক বড় একটা কেলেঙ্কারী আবার হ'ত। তোমার বাবা সেটা একদম সইতে পারতেন না—অমনি হার্টফেল ক'রে মারা যেতেন। ওসব প্রতিহিংসার কথাটথা ছেড়ে দাও। এখন তোমাদের ভাবতে হ'চ্ছে ফুলুর কি করবে?"

চক্ষে নীরদের জল আসিল। একটুকাল দম লইয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "সে কোথায় আছে এখন?"

"ঠিকানাটা—দেখি কালই বোধ হয় তোমাদের জেনে দিতে পারব। মিসেস চম্পটীর চার্জ্জে সে আছে, ভাল একজন নার্সও তিনি রেখে দিয়েছেন—"

"তার সঙ্গে—দেখা একবার করতে চাই।"—

"দেখা এখুনি করা বোধ হয় ঠিক হবে না,—বড় লজ্জা পাবে। আর ক'রেই বা কি করবে? ডেলিভারীটা হ'য়ে যাক্—ভাবনার কারণ আপাততঃ কিছু নেই। চম্পটী আছেন—নার্সটিও আমার জানা খুব ভাল একটি মেয়ে। খবরাখবর যা করতে হয়, আমিই বরং করব। তোমাদেরও দরকার মত যা জানাতে হয় জানাব।"

"আচ্ছা, তাই তবে হ'ক আপাততঃ।—গুরুদেবকেও গিয়ে সব বলি। তিনিও খবরটার জন্যে বড় উৎকণ্ঠিত আছেন।"

"আচ্ছা, তবে ওঠা যাক এখন।"

"হাঁ, চলুন।"

বেতার বা রেডিও

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য এম্-এস্-সি

১

রেডিও কথাটি আজকাল আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। আমরা রেডিওর সাহায্যেই ঘরে বসিয়া ইংল্যাণ্ড্ ও অষ্ট্রেলিয়ার টেস্ট্ ম্যাচ্‌গুলির খবর সেই দিনই পাইয়া থাকি এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লণ্ডন, নিউ-ইয়র্ক ইত্যাদি স্থান হইতে গান, বক্তৃতা, গল্প অথবা সংবাদ বেতারের সাহায্যে শুনিয়া থাকি।

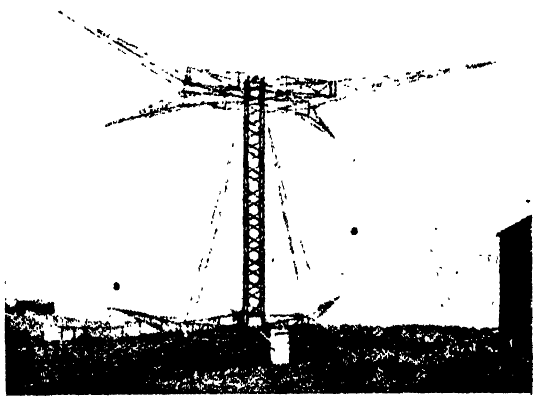
রেডিও কি, ইহাই আমাদের প্রবন্ধের বিষয়। সংক্ষেপে, রেডিও এক রকম বিদ্যুতের ঢেউ। এখন ঢেউ বলিতেই আমাদের জলের ঢেউয়ের কথা মনে পড়ে। আমরা যখন কথা বলি, তখন বাতাসে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং এই ঢেউয়ের সাহায্যেই কথা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রেডিও-ঢেউয়ের জন্যও বাতাস অথবা ঐ জাতীয় কোনো কিছুর অস্তিত্ব আবশ্যক—এই জিনিষের মধ্য দিয়া রেডিও-ঢেউ প্রবাহিত হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ ইথার নামে এক সর্ব্বব্যাপী পদার্থের কল্পনা করেন—এই ইথারে ভর করিয়াই রেডিও-ঢেউ প্রবাহিত হয়।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক (যেমন Steinmetz) বলেন যে, ইথার বলিয়া কোন জিনিষ নাই। কিন্তু আইন্‌ষ্টাইন্ "ইথার ও আপেক্ষিকবাদ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় ইথারের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই ইথারে ভর করিয়াই রেডিও-ঢেউ চলে।

সাধারণ ইলেক্‌ট্রীক্ আলো, ইলেক্‌ট্রীক্ পাখা ইত্যাদির জন্য তারের প্রয়োজন হয়, কিন্তু রেডিও-ঢেউ তারের সাহায্য ছাড়াই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। কাজেই ইহা বেতার নামেও পরিচিত।

বিদ্যুতের জন্ম অনেক দিন পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ম্যাক্‌সোয়েল্‌ই আমাদিগকে বিদ্যুতের ঢেউয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করেন। ইহার বিশ বৎসর পরে হার্‌ট্‌জ্ একটি থিওরি আবিষ্কার করেন এবং এই থিওরির উপরেই সমস্ত আধুনিক বেতার-বার্ত্তা প্রেরণের উপায় সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে হিউয়েস "কো-হিয়ারার" নামক এক যন্ত্রের মূল তথ্য আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র সাহায্যে বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে এডিসন্ রেলওয়ে ষ্টেশন ও চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বেতার-বার্ত্তা প্রেরণের একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে মারকোনিই সর্ব্বপ্রথম দেখান যে, বিদ্যুতের ঢেউ দ্বারা বেতার বার্ত্তা প্রেরিত হইতে পারে।



বেতার-যন্ত্র

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে তিনি প্রথম পৌনে দুই মাইল দূরে বেতারে বার্ত্তা প্রেরণ করেন। ইহার পর বৎসর তিনি চারি মাইল দূরে বেতারে বার্ত্তা প্রেরণ করিতে সক্ষম হন। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ১২ই ডিসেম্বর মারকোনি আঠার শত মাইল দূর হইতে ইংরেজী "এস্" অক্ষরটি বেতারে প্রাপ্ত হন। এই সময় বেতার এত দ্রুত উন্নতিসাধন করিতেছিল যে ১৯০২ খৃঃ অব্দে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের এপার হইতে ওপারে বেতারে বার্ত্তা প্রেরিত হয়।

সংক্ষেপে ইহাই রেডিওর ঐতিহাসিক সংবাদ। এই

সমস্ত মহামানবের মনীষা ছাড়া আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের নাম রেডিওর জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে জেনারেল্ ডান্উডি ও পিকার্ড আবিষ্কার করেন যে কার্বোরেণ্ডাম্ স্ফটিক (crystal) ও সিলিকন্-ঘটিত স্ফটিকের মধ্য দিয়া দ্বিরাভিমুখী (alternating) বিদ্যুৎ শুধু একদিকেই প্রবাহিত হয়। আমাদের দেশের গৌরব বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়েরও এই একই বিষয়ে আবিষ্কার আছে। এই সব আবিষ্কারের ফলেই রেডিও বিদ্যুৎকে কথায় রূপান্তর করা সম্ভবপর হইয়াছে।

রেডিওর মূল তথ্যাদি আমরা "টেলিফোন্"-এর দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বুঝিতে পারি। টেলিফোন্-এ দুইটি অংশ আছে—একটি, যাহার নাম মাইক্রো-ফোন্—আমরা মুখের কাছে ধরি এবং এই যন্ত্র সাহায্যেই আমরা কথাকে বিদ্যুতে পরিণত করিয়া তারের সাহায্যে দূর দেশে প্রেরণ করি। "টেলিফোন্" যন্ত্রটি আমরা কানের কাছে রাখি এবং ইহার সাহায্যেই অন্য স্থান হইতে প্রেরিত বিদ্যুতে পরিণত কথাকে পুনরায় কথা-রূপেই ফিরিয়া পাই। সংক্ষেপে—আমরা কথাকে একবার বিদ্যুতে পরিণত করি, পরে বিদ্যুতকে কথা করি।

" রেডিওতে কথাকে বিদ্যুতের ঢেউয়ে পরিণত করি—পরে এই বিদ্যুতের ঢেউ হইতে কথাকে খুঁজিয়া লই। রেডিও ও টেলি-ফোনে পার্থক্য এই যে, টেলিফোনে কথাকে বিদ্যুত করি, কাজেই তাহাতে তারের প্রয়োজন আছে; কিন্তু রেডিওতে কথাকে বিদ্যুতের ঢেউয়ে পরিণত করি, বিদ্যুতের ঢেউ ইথারে ভর করিয়াই চলে, কাজেই এস্থলে তারের কোন প্রয়োজন নাই। এই স্থানে একটা কথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বহু দূর হইতে যে রেডিও-ঢেউ আমরা যন্ত্রসাহায্যে ধরিয়া থাকি তাহা সাধারণত আকাশে মেঘ ইত্যাদির গায়ে প্রতিফলিত হইয়াই আমাদের নিকট আসিয়া থাকে।

সুতরাং রেডিওতে দুইটি জিনিষই প্রধানতঃ প্রয়োজন—এক বার্তাপ্রেরক যন্ত্র, দুই বার্তাগ্রাহক যন্ত্র। প্রথম যন্ত্রটিতে কথা রেডিও-বিদ্যুতে পরিণত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, দ্বিতীয় যন্ত্রটী এই সমস্ত রেডিও-ঢেউকে কথাতে রূপান্তরিত করিবে।

যে স্থান হইতে বার্তা প্রেরণ করা হইবে, সেই স্থানে একটি বায়ুস্থ তারে (aerial) বহু কম্পনযুক্ত দোলায়মান বিদ্যুত (high frequency oscillatory current) উৎপাদিত করা হয়; এই বিদ্যুতের ঢেউ ইথারে ভর করিয়া দিগন্তে ছড়াইয়া যায়। এই ঢেউগুলিকে বার্তা-বহনকারী (carrier) ঢেউ বলা হয়। রেডিও-ঢেউ যখন ঢেউ গ্রহণোপযোগী সহ-ধ্বনিত (tuned বার্তা গ্রাহক যন্ত্রের বায়ুস্থ তারে আসিয়া পড়ে, তখন এই তারেও বহু কম্পনযুক্ত দোলায়মান বিদ্যুত প্রবাহিত হয়।



স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

মানুষ যখন বার্তাপ্রেরক যন্ত্রের যন্ত্রবিশেষের (Micro-phone) সম্মুখে কথা বলে, তখন কথা বিদ্যুতে পরিণত হয়। এই বিদ্যুৎকে প্রেরকযন্ত্রের বায়ুস্থ তারে দোলায়মান বিদ্যুতের উপর ফেলা হয়। তাহাতে দোলায়মান বিদ্যুতের স্পন্দন-পরিমাণ (amplitude) কথার প্রকার-ভেদে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে এক নূতন ঢেউয়ের উৎপত্তি হয়। ইহাকে বাগাশ্রিত ঢেউ (modulated waves) বলা যাইতে পারে। এই বাগাশ্রিত ঢেউ বার্তা-

গ্রাহক যন্ত্রের বায়ুস্থ তারে সমভাবের কম্পনযুক্ত দোলায়মান বিদ্যুত সৃষ্টি করে।

যদি এই বিদ্যুতকে টেলিফোনের মধ্য দিয়া প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে এই বিদ্যুৎ কথাতে পরিবর্ত্তিত হইবে না। কারণ কম্পন-সংখ্যা যদি প্রতি সেকেণ্ডে পনের হইতে পনের হাজার পর্য্যন্ত হয় তবেই আমরা কথা শুনিতে পাই, কিন্তু রেডিও-বিদ্যুতের কম্পনের পৌনঃপুন দশ হাজার হইতে তিন কোটি পর্য্যন্ত হইতে পারে। টেলিফোনে একটি পাত্‌লা পর্দ্দা (diaphragm) থাকে, ইহা কাঁপে বলিয়াই আমরা কথা শুনিতে পাই। কিন্তু রেডিও-বিদ্যুৎ দ্বিরাভিমুখী এবং ইহার কম্পন-সংখ্যাও (frequency) বেশী। কাজেই টেলিফোনের পাত্‌লা পর্দ্দা রেডিও-বিদ্যুতে এক রকম স্থিরই থাকিবে এবং কোন কথা শোনা যাইবে না।

এইজন্য রেডিও-বিদ্যুতকে টেলিফোনে পাঠাইবার পূর্ব্বে ইহাকে একাভিমুখী করিয়া লইতে হইবে। যে যন্ত্র সাহায্যে এই কার্য্য সাধন করা হয় তাহার ইংরেজী নাম ডিটেক্‌টার্। কোন কোন স্ফটিকের এই ধর্ম্ম আছে যে ইহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ শুধু একদিকেই প্রবাহিত হইতে পারে।

এই রকম একটি স্ফটিক—ইহার আবিষ্কারের সঙ্গে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর নাম সংযুক্ত আছে। কারবোরেণ্ডাম্ আর একটি স্ফটিক, ইহারও এই একই গুণ আছে। ডিটেক্‌টার্ যন্ত্রের মধ্যে পাঠানোর ফলে বিদ্যুৎ উভয়দিকে অর্থাৎ একবার সম্মুখে আবার পশ্চাতে, আবার সম্মুখে—এই রকম ভাবে প্রবাহিত না হইয়া কেবল একটা দিকে প্রবাহিত হইবে।

এখন যদি আমরা ইহাকে টেলিফোনের মধ্য দিয়া পাঠাই, তাহা হইলে এইবার টেলিফোনের পর্দ্দা কাঁপিয়া উঠিবে এবং যে কথার ফলে বাগাশ্রিত ঢেউয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, টেলিফোন্ হইতে সেই কথাই আমরা শুনিতে পাইব।

একথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে "লাউড-স্পীকার"ও একটি টেলিফোন্-বিশেষ। পার্থক্য এইটুকু যে, টেলিফোনের সাহায্যে শুধু একজনেই মাত্র কথা শুনিতে পারে, লাউড্-স্পীকারের সাহায্যে একসঙ্গে অনেকে একই কথা শুনিয়া থাকে। রেডিওর জটিল তথ্যের ইহাই মূল কথা।

এখন কত দূর হইতে আমরা রেডিও-ঢেউ গ্রহণ করতে পারি তাহাই বলিতেছি। ইহা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে—যেমন (ক) ঋতু, (খ) দিন অথবা রাত্রি, (গ) আকাশের অবস্থা, (ঘ) বায়ুস্থ তারের অবস্থিতি, (ঙ) প্রেরকযন্ত্রের ক্ষমতা, (চ) গ্রাহক-যন্ত্রের সূক্ষ্মগ্রাহিতা (sensitiveness) এবং (ছ) পরিচালকের নৈপুণ্য।

গ্রীষ্মকালে আকাশের অবস্থা বেতারবার্ত্তা গ্রহণের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। দিনের চেয়ে রাত্রিতেই বেতারের শব্দ স্পষ্ট হইয়া থাকে। তবে ইহাও ঠিক যে রাত্রিতেও বেতার-বার্ত্তার শক্তি সব সময়ে সমান থাকে না। প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্রকৃতির উপরেও বার্ত্তাগ্রহণ যথেষ্ট নির্ভর করে। কারণ, এমন স্থান আছে, যাহা প্রেরক যন্ত্রের নিকটবর্ত্তী হইলেও, সেখানে কোন বেতারের



মার্কনি

ঢেউ পৌঁছে না। ইহা হয়তো ভূগোল অথবা আকাশ সম্বন্ধীয় অবস্থা কিংবা ভূপৃষ্ঠের গঠনের জন্যই হইয়া থাকে। রেডিও-ঢেউ স্থল অপেক্ষা জলের উপর দিয়াই ভালভাবে প্রবাহিত হয়।

কত দূর পর্য্যন্ত রেডিও-ঢেউ গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা সঠিক বলা না গেলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, একশত মাইলের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে সব সময়েই বেতার-বার্ত্তা গ্রহণ করা যাইতে পারে; তবে গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগে দুই এক সপ্তাহ বাদও যাইতে পারে। পাঁচ শত মাইলের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে বৎসরের মধ্যে নয়-দশ মাস সন্ধ্যাকালে বেতার বার্ত্তা পাওয়া যাইবেই। দুই হাজার মাইলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শীতকালের মাঝামাঝি তিন-চারি মাস

মধ্য রাত্রিতে অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য বেতার বার্ত্তা পাওয়া যাইতে পারে। দুই হাজার মাইলের উপরে হইলে শীত-কালের মধ্যভাগে অল্প কয়েক সপ্তাহ মধ্যরাত্রিতে দুই-এক ঘণ্টার জন্য বেতার বার্ত্তা পাওয়া যাইতে পারে। তবে এই সমস্ত সংখ্যাগুলি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল নয় তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন রেডিওর ব্যবহারের কথা। রেডিও সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবহৃত হইত। সমুদ্র-যাত্রায় আব-হাওয়া, দিগ্-নির্ণয় ও স্থান-নির্দ্দেশ কত প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সমস্ত কাজ রেডিওর সাহায্যেই হইত এবং এখনও হয়। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে মারকোনি একটি জাহাজ হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী তীরে



ম্যাক্স্ ওয়েল

বার্ত্তা প্রেরণ করেন। ক্রমে যন্ত্রাবলীর উন্নতির সঙ্গে দশ মাইল দশ হাজারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ১৯১০ খৃঃ অব্দে একটি যুদ্ধ জাহাজ (Principessa Mafalda) দিনের বেলায় চারি হাজার মাইল এবং রাত্রিতে প্রায় সাত হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বেতার-বার্ত্তা গ্রহণ করে।

১৯১৩ খৃঃ অব্দে Kolster সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্ট্‌কে জানান যে লাইট্‌-হাউস্, লাইট্‌-শিপ্ এবং জীবনরক্ষক ষ্টেশনে রেডিও ব্যবহৃত হইতে পারে। ১৯২৪ খৃঃ অব্দে Firth of Forth (Scotland)-এর একটি দ্বীপে একটি বেতার লাইট্‌-হাউস্ স্থাপিত হইয়াছে। বেতারের ঢেউগুলি প্রতিফলক (reflector) সাহায্যে একটি রশ্মি-সমষ্টিতে (beam) পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে এক শত মাইল পর্য্যন্ত পাঠান হয়। ইহার সাহায্যে জাহাজগুলি কুজ্ঝটিকার মধ্যে স্থান ও দিক নির্ণয় করিতে পারে।

সমুদ্রে জাহাজের মত আকাশে য়্যারোপ্লেনেও রেডিও পরম উপকারী বন্ধু। আজকাল চলন্ত য়্যারোপ্লেন হইতে নীচে মানুষের সঙ্গেও কথা বলা চলে। জল ও আকাশ ছাড়া স্থলেও যেখানে অন্যান্য উপায়ে কথোপকথন অসুবিধা-জনক, সেখানে রেডিওই এই কাজে সাহায্য করে। আজকাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রেডিওর সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদান করা হয়। মহাসাগরের এক তীর হইতে অন্য তীরে রেডিওর সাহায্যেই কথা প্রেরিত হইতে পারে।

রেডিওতে কথা বলাতে সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা এই যে ইহা যে-কোনও গ্রাহকযন্ত্র দ্বারা যে-কোনও স্থান হইতে শ্রুত হইতে পারে। তাহার ফলে কোনও কথাই গোপন রাখা যায় না। এই অসুবিধা দূর করিবার নানা রকম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেমন গাইডেড্ ওয়েভ্ টেলিফোনি, কেরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি টেলিফোনি এবং ওয়্যার-রেডিও টেলিফোনি। এই সমস্ত উপায়ে তারের সাহায্যে দুইটি স্থানের মধ্যে বেতারের ঢেউ পাঠান হয়। যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া একই সময়ে বিভিন্ন তারের সাহায্যে বিভিন্ন সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে। কিন্তু এই উপায় অনেকটা টেলিফোন্ প্রথারই রূপান্তর। আজকাল এক প্রকার প্রেরকযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে যাহা শুধু একটি বিশেষ গ্রাহকযন্ত্রের সঙ্গেই ব্যবহৃত হইতে পারে। এই উপায়ে সংবাদ গোপন রাখা অনেক সহজ।

এই সমস্ত ছাড়া রেডিও আরও অনেক ভাবে ব্যবহৃত হয়; যেমন, জাহাজ ও য়্যারোপ্লেনের জন্য বিপদজ্ঞাপক আলো প্রেরণ এবং দূর হইতে কোনও যন্ত্রনিয়ন্ত্রণ। শেষোক্ত উপায় য়্যারোপ্লেনে, যুদ্ধের ট্যাঙ্কসে এবং যুদ্ধের জাহাজে ব্যবহৃত হয়।

রেডিও প্রধানত আনন্দ বিতরণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া, ফটো, টিপ্‌সহি, হাতের লেখাও বর্ত্তমানে রেডিও সাহায্যে প্রেরিত হয়। ফটো ইলেক্‌ট্রিক্ সেল্ নামক যন্ত্র বেতারে ফটো প্রেরণে সাহায্য করে। ইহার মূল তথ্যটি এই:—

ফটোর কালো রঙের গভীরতা অনুসারে ইহার ভিতর দিয়া প্রেরিত আলোর শক্তির তারতম্য ঘটিবে। ফটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেলের বিশেষত্ব এই যে ইহার ভিতরে যে শক্তির আলো পড়িবে ইহাতে তদনুরূপ শক্তিরই বিদ্যুৎ প্রস্তুত হইবে। এই সেলের ভিতর দিয়া আলো পাঠাইয়া এইরূপে ফটোর রঙের গভীরতা ও প্রকারভেদে অনুরূপ শক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুত দ্বারা রেডিও-বিদ্যুত পরিবর্ত্তিত (modulated) করা হয়। ফটো গ্রাহকযন্ত্রে এই বিদ্যুতকে অনুরূপ শক্তিবিশিষ্ট আলোতে রূপান্তরিত করিয়া ফটোর ফিল্মে ফেলিয়া অনুরূপ ফটো তোলা হয়। টেলিভিশনও মূলত অনেকটা এই রকমই। পার্থক্য এই যে, এই ক্ষেত্রে ছবি-গ্রাহকযন্ত্রে ছবি পর্দ্দাতে ফুটিয়া ওঠে।

এই সমস্ত ছাড়া, শিক্ষা-বিস্তারক্ষেত্রেও রেডিও ব্যবহৃত হয়। এই উপায়ে মৌখিক শিক্ষাদান খুব সহজ। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহা খুব ব্যয়সাধ্য। তব কোনও কোনও স্থলে এই অতিরিক্ত ব্যয়ও অপব্যয় নয়' কারণ এই উপায়ে অতি অল্প সময়ে শুধু একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারাই বিভিন্ন স্থানের বহু লোক একই সময়ে শিক্ষিত হইতে পারে।

আধুনিক গবেষণা রেডিও যন্ত্রকে আরও উন্নত করিয়া তুলিয়াছে এবং তুলিতেছে। বর্ত্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই বায়ুস্থ তার লম্বাকৃতির না হইয়া লুপের মত। এই রকম বায়ুস্থ তারের সাহায্যে বহু দূরের ঢেউ ধরিতে না পারিলেও ইহা অনেক বিষয়ে সুবিধাজনক। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগন রেডিওর ঢেউয়ের উপর আকাশের বৈদ্যুতিক উপদ্রবের পরিমাণ যথেষ্ট কমাইয়াছেন। তাঁহারা আরও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, রেডিও-ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কম হইলেই উহা বহু দূরস্থিত গ্রাহকযন্ত্রে বিদ্যুৎ জন্মাইতে পারে এবং এই রকম ঢেউ দিন অথবা রাত্রি সব সময়েই বহু দূর হইতে গ্রহণ করা যায়। সম্প্রতি কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতেও ছোট রেডিও-ঢেউ প্রেরণ করা হইতেছে।



মাচন

রেডিওর জটিল তথ্যের মূল কথাটুকুই শুধু আমরা এখানে আলোচনা করিলাম। বর্ত্তমানে রেডিও-যন্ত্রের আরও অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। রেডিও ঢেউকে শক্তিবর্দ্ধিত করা এবং একাভিমুখী করা একটি বিশেষ যন্ত্রের (vacuum tube) সাহায্যে করা হয়।

স্বপ্ন শেষ

শ্রীমণিলাল বসু

ভেবেছিনু বুঝি বনবীথি মোর ফুলে ফলে যাবে ছেয়ে,
সাজিবে ধরণী নবীন বরণে কোকিলা উঠিবে গেয়ে।
নয়ন মেলিয়া হেরিব বিশ্ব,
অন্তর মোর রবে না নিস্ব,
আমার বীণাটি বাঁধিয়া রাখিব নিতি নব নব সুরে।
হাতছানি দেবে উতলা বাতাস দূর হ'তে বহু দূরে।

সে স্বপন মোর ভাঙে যদি প্রিয় নাই তাহে ক্ষতি নাই,
অশ্রু পিয়ালা ভরিয়া রাখিও মরণের কিনারায়।
চেয়েছিনু যাহা হয় ত সে গান,
সন্ধ্যা তিমিরে হবে অবসান,
আঁধারের মাঝে খুঁজিয়া মরিব আলোর পরশ কণা,
দূর দিগন্তে জাগিবে ভয়াল তুলিয়া লক্ষ ফণা।

ভারতের মেয়ে

শ্রীমতিলাল দাশ

পরেশ চৌধুরী অবশেষে প্যারিতে পদার্পণ করল। মনে পড়ল শৈশবের স্বপ্ন—কৈশোরের আশা—যৌবনের তপস্যা। বন্ধুরা উপহাস করত, বলত বি, এন, জি, এস অর্থাৎ বিলাত-না-গিয়ে-সাহেব—সে উপহাস সে ব্যর্থ করবে।

প্যারি—সুন্দরী—আলোকদীপ্তা। রূপসী, রসের রাণী, গা দ্যু নর্দে নেমে সে এই অশরীরিণী মানসীর উদ্দেশে নমস্কার জানাল।

ট্যাক্সি ক'রে সে যখন তার হোটেলে এল—তখন সে মনে করল—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তার নয়—উচ্ছ্বসিত জীবনের ফেনিল দ্রাক্ষাপাত্রকে সে পরিপূর্ণ পান করবে, তারপর সারাজীবন তার স্মৃতি তাকে দেবে আনন্দ ও পাথেয়। হোটেলের ড্রয়িং রুমে মিস মুক্তাবালার সঙ্গে তার আলাপ হ'ল।

তরুণী, কিশোরী—অনবদ্য রূপের মাধুরী তার বিলোল অঙ্গে ঢেউ খেলায়।

ফরাসী ভাষায় তার অধিকার ছিল না বললেই হয় তাই সে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল—তরুণী তাকে সাহায্য করল।

সেই সূত্রে আলাপ হল।

কিশোরীর মুখে বিজলীর মত হাসি, প্রশ্ন করল—'আপনি ভারত থেকে আসছেন?'

চৌধুরী বলল—'আপনি কেমন ক'রে বুঝলেন?'

কিশোরী তখন আপন পরিচয় দিল, বলল—'আমার মা জার্মান, আমার বাপ পার্শী মুক্তা ব্যবসায়ী—তাই আমার নাম মুক্তাবালা।'

চৌধুরী মুক্তাবালাকে খুব পছন্দ করল। প্রাচীর শালীনতার সঙ্গে প্রতীচীর জীবনস্পন্দন মিশে গেছে মুক্তাবালার মুখে—ওর চুল রেশমী নয়, মিশমিশে কালো; ওর চোখ নীল নয়, কৃষ্ণতার—

চৌধুরী বলল—'ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি খুব আনন্দ পেলাম। যে কদিন আছি—আপনি আমাকে—'

কথা শেষ না হতে মুক্তাবালা উত্তর দিল—'তা বলতে হবে না, যখনই যে অসুবিধা হয় আমাকে বলবেন।'

মোটর ডেকে মুক্তাবালাকে নিয়ে চৌধুরী বেরিয়ে পড়ল। খুব ভাল লাগল চৌধুরীর—নিজেকে সাম্রাজ্যজয়ী বীরের মত সে ভাবতে লাগল।

একটি কক্ষেতে বসে নিরালা আলাপ চলল—

মুক্তাবালা বলল—'আমি একটা কলেজে পড়ছি—এমব্রয়ডারি শিখছি—আমার মায়ের ইচ্ছে, আমি এদেশে থাকি। কিন্তু আমার বাপের কথা আমার বারে বারে মনে পড়ে—আমি ভারতবর্ষে যেতে চাই—'

চৌধুরী সরকারী চাকর, বক্তৃতার ধার ধারে না, কাব্যও তার আসে না। সে কিন্তু হঠাৎ বাগ্মী হয়ে উঠল, বলল—'সে ত ঠিক কথা। এখানে থাকা আপনার ঠিক হবে না। আপনি ভারতেই ফিরবেন—'

তরুণীর মুখে বেদনার সঙ্গে নিরাশা খেলে গেল। সে বলল—'আমার বাবার বন্ধুরা এখনও এখানে ব্যবসা করেন। তাঁরা আমার বিয়ে ঠিক করছেন, কিন্তু যাঁকে চিনি নে, জানি নে, তাঁকে বিয়ে করতে পারি না—'

'না, না, তা কখনই হতে পারে না, আপনি এই কুসংস্কারে আত্মসমর্পণ করবেন না, আপনি স্বাধীন দেশের আলো। আপনি ভারতে নিয়ে যাবেন মুক্তির মুক্ত হাওয়া—'

চৌধুরীর মনে ছায়াচিত্রের ছবির মত বাংলা দেশের একটি রমণীয় মুখ ভাসল, সে মুখ ক্ষান্তমণির। ক্ষান্তমণি চৌধুরীর পরিণীতা স্ত্রী—যাকে না দেখেই হৃদয় দিতে হয়েছে—হৃদয় দেওয়া হয়েছে কি-না সন্দেহ, কিন্তু এই কালো মেয়েটি দিয়েছে গভীর বন্ধন—চৌধুরীর মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে।

মুক্তাবালা জিজ্ঞাসা করল—'কিছু ভাবছেন?'

চৌধুরী বলল—'না, তেমন কিছু নয়—চলুন ফলিয়ে বার্জারে যাই—'

মুক্তাবালা বলল—'প্রথম দিনেই ওখানে যাবেন?'

পরেশ হাসতে হাসতে বলল—'হাঁ, আমার ভাগ্য ভাল—



৮ রওশন । ছবি ওয়া

প্রথম দিনেই আলাপ হ'ল আপনার সঙ্গে—সে আলাপ ধন্য করব ফলিয়ে বার্জারের উৎসব দেখে—'

(২)

ফলিয়ে বার্জার প্যারীর বিখ্যাত আনন্দ-ক্রীড়া ভূমি।

বুলেভাঁর কাছে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে তরুণী মুক্তাবালাকে পাশে নিয়ে সে চলল বিজয়ী বীরের মত—আলোয় আলোকিত জনপথে চলছে অবিরাম অফুরন্ত জনস্রোত—পাশের কাফেতে চলছে গান—

চৌধুরী শ্বশুরের পয়সায় বিলাত ঘুরছে—বাংলা দেশের লেখাপড়া জানা ছেলেরা শ্বশুরের পয়সাকে অপব্যয় করা অপব্যয় মনে করে না—বিপুলনিতম্বা হিড়িম্বাসদৃশা ক্ষান্তমণিকে সে যখন জীবনসঙ্গিনী করেছে—তখন শ্বশুর চৌধুরীর অপব্যয় জোগাতে বাধ্য—এই কথাই ওর মনে ছিল—তবু স্বভাবকৃপণ সে—পয়সার মায়া তার যথেষ্ট, কিন্তু আজ তার গৃহে সুন্দরের পরমোৎসব রাত্রি—তাই সে একটা বক্স নিয়ে বসল—

লোকেরা তাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চাইল। চৌধুরী মোটা—দেখতে মিশ-কালো—তার পাশে এই সুন্দরী তরুণী দর্শকদের কাছে এটাও একটা দৃশ্য হয়ে উঠল।

চৌধুরী বিরক্ত হয়ে উঠল। শীঘ্রই খেলা আরম্ভ হ'ল, চৌধুরীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

রঙ্গমঞ্চটি বেশ বড়, দৃশ্যপট উত্তোলিত হ'লে দেখা গেল আফ্রিকার এক আগ্নেয়গিরির দৃশ্য। সেখানে এক নিগ্রো দম্পতীর গোপন প্রীতির নগ্ন দৃশ্য।

এমন সুন্দর আয়োজন, দৃশ্যপটের এমন বৈচিত্র্য, এমন সুনিপুণ সজ্জা সে আর দেখেনি।

মুক্তাবালাকে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি এখানে আগে এসেছ?'

সে বলল—'না।'

'কেমন লেগেছে?'

মুক্তাবালা বলল—'মন্দ নয়।'

'মন্দ নয় কি, চমৎকার!'

তারপর চলল গানের পালা। সুন্দরী তরুণীদের নৃত্যচপল ভঙ্গিমা, নানা প্রকার কসরৎ, নানা মনোমোহন দৃশ্য।

শেষের দিকে একসঙ্গে এল পঞ্চাশ-ষাটজন তরুণী নাচতে নাচতে—তাদের বিবসনা বললেই চলে—অর্কেষ্ট্রায় বাজনা চলল বেগে—রামধনুর মত রঙীন রিবন-পরা এই যুবতীদের লঘুপদক্ষেপে রঙ্গমঞ্চে ও দর্শকদের মনে চলল উত্তেজনার আবেগ।

চৌধুরীও উত্তেজিত হয়ে উঠল, মুক্তাবালাকে সে বলল—'ফরাসীরা জানে আর্টের চরমোৎকর্ষ কি সুন্দর!'

চৌধুরী দেখল মুক্তাবালার গাল ও কান লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে; সে বলল—'এই আয়োজন ফরাসীদের জন্যে নয়, পৃথিবীর দিগ্দেশ থেকে যারা আসে তাদের জন্যেই এই সম্ভার—'

গানের তালে তালে তরুণীরা সবেগ পদক্ষেপ করতে লাগল, আর তাদের প্রজাপতি-আঁকা বুক দুলতে লাগল—নগ্নপদ ও নগ্ন বক্ষের এই নর্ম্মলীলায় এসে পড়ছিল বিচ্ছুরিত নানা আলো।

নৃত্য, গীত, বাদ্য সব মিলে এক সুর বাজাচ্ছিল—সে সুর ভোগের শাশ্বত মাধুরীর, বোধ হল যেন জীবনে এই আনন্দপ্রবাহই চিরন্তন—যেন এই তাণ্ডবই সত্য ও সনাতন।

'ভারতবর্ষে এই ধরণের কোনও আয়োজন আছে কি?—'

চৌধুরী বলল—'না, ভারতবর্ষের মাটীতে এ জিনিষের উদ্ভব হতে পারে না—এর জন্য চাই এই মুক্তির দেশ—যেখানে আত্মা দেহকে ক্লিষ্ট করে না—দেহ জুজুর ভয়ে পিষ্ট হয় না—'

মুক্তাবালা বলল—'ফরাসীদের এই নাচ দেখে বিচার করলে ভুল করবেন—'

চৌধুরী বলল—'না, ভুল নয়, ভুল নয়, আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যোগাভ্যাস করছি—তার ফল হয়েছে কি?—না, আমরা মরে আছি একেবারে সুপ্তির গভীর পাথারে। তাই এই আনন্দকে আমি কিছুতেই ছোট বলব না, কিন্তু তর্ক নয়, চলুন খুব খিদে পেয়েছে।'

(৩)

ওরা চলল একটা রেস্তঁরাতে।

বুলেভাঁর আলোকসজ্জা তেমনই চলছে—নিশীথ রাত্রির প্যারী—মনোমোহিনী প্যারী চৌধুরীর রক্তে উন্মাদনা

জাগায়—সে মুক্তাবালার গলায় হাত দিয়ে চলে—তাকে কাছে আনতে চায়।

গান চলছিল—গানের সঙ্গে চলছে যুগল নৃত্য—বড় একটা ঘর—ঘরের একপাশে প্লাটফর্ম্ম—তার উপর বাজনা বাজছে—

ওরা একটু দূরে নিরালায় বসে খাবার ফরমাস করল।

খাওয়া চলল। মুক্তাবালা জিজ্ঞাসা করল—"তুমি নাচতে জান?"

চৌধুরী বিপন্ন হয়ে পড়ল, নাচতে সে জানে না, তবু বলল—"তোমার সাথে নাচতে পারলে আমি সুখী হব। তুমি দেখিয়ে দেবে।"

"কিন্তু আমি ত নাচি না।"

"কেন?"

"বাবা বারণ করতেন—তিনি এসব পছন্দ করতেন না—আপনিও করেন না—"

"না, অচেনা লোকের সঙ্গে—তবে—"

চৌধুরী তানা তানা করল—মুক্তাবালা কথার মোড় বদলে বলল—"আপনি যখন ভারতে ফিরে যাবেন—তখন এই দিনটার কথা মনে পড়লে আপনার গ্লানি লাগবে।"

"না, না, গ্লানি কেন?"

"আপনার আপনজনেরা যখন শুনবে, তখন—"

চৌধুরী বিস্মিত হয়ে মুক্তাবালার চঞ্চল চোখের দিকে চাইল। সে চোখ জ্বলছে মণির মত—তাতে কৌতুক ও রহস্য ভরা—অথচ কোথাও লঘু উপহাসের ভাব নেই।

চৌধুরী দু বোতল ক্লারেটের আদেশ দিল—পান করতে করতে মন তার মশগুল হয়ে উঠল, সে বলল—"চল, আমরা হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরি, বেশী দূর ত নয়।"

মুক্তাবালা সম্মত হল।

তারা দুজনে চলল—আলোর দীপ্তি তাদের পথে কম—চৌধুরী মুক্তাবালাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, বলল—"তুমি আমার স্বপ্নের রাণী, আমার স্বপ্ন সফল করবে?"

মুক্তাবালা বলল—"আপনি আমায় বিয়ে করতে চান? কিন্তু আমাদের পরিচয় অনেক দিনের নয়—আমরা পরস্পরকে ভালবাসিনি—"

চৌধুরী তার গোলাপী ওষ্ঠে চুম্বন মুদ্রিত ক'রে বলল—"ভালবাসা এক মুহূর্ত্তেই হয়, কিন্তু বিয়ের কথা নয়—ওসব ভাবনা কেন? আজকের আকাশ বাতাস যে গান গাইছে। চল, আমরা সেই গান গাইব—আজকেই সত্য—ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

মুক্তাবালা আপনাকে ছাড়িয়ে নিল, বলল—"তার মানে?"

"মানে, কিছু নয়, এই নিশীথ কাল ফিরবে না—তুমি আর আমি—কাল হয় ত চলব অচেনা পথে অজানা হয়ে—শুধু আজ রাতে—"

চৌধুরীর কথায় মুক্তাবালা আহত হল, সে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত দৃপ্ত মস্তক তুলে বলল—"আপনাকে ভারতবাসী বলে আমি বিশ্বাস করেছিলুম—"

"অবিশ্বাসের কথা কিছু নয় মুক্তা, ভারতবর্ষ একটা নাম—একটা কল্পনা—তার ভূত আমাদেরই মাথায় চেপেছে—ভারতে যখন ফিরব—তখন আবার তার দাসত্ব করব—কিন্তু এই সুন্দর রজনী—একে ব্যর্থ ক'রে লাভ কি?"

মুক্তাবালা বলল—"মদ খেয়ে আপনার মাথার স্থিরতা নেই—ভারতবর্ষের সাধনাকে আপনি ভুলে গেছেন—"

চৌধুরী বলল—"দূর হোক এই সব সেন্টিমেণ্টলিজম—ভারতবর্ষের পাগলামি তোমার মাথায় কেন—তুমি স্বাধীন হাওয়ার পরী—তুমি অবাধ—তুমি দুর্ব্বার—"

মুক্তাবালা বলল—"কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি ভারতীয় সাধনাকে শ্রদ্ধা করি। আমার বাবার কথা সব সময় আমার মনে আছে। ভারতের সতীত্ব ধর্ম্ম—সে আমার জীবনের আদর্শ।"

চৌধুরী বলল—"আমায় ক্ষমা করো মুক্তা।"

মুক্তাবালা প্রফুল্ল হয়ে উঠল, বলল—"আপনি আমায় পরীক্ষা করছিলেন—সত্যই আমি মনে প্রাণে ভারতীয়। আমি ভুলিনি আমি ভারতের মেয়ে—আমার দেহ ও মন নিষ্কলঙ্ক, শুচি ও শুভ্র বলুন আমায় বিয়ে করবেন—"

চৌধুরী বলল—"সে হয় না মুক্তা, আমার বিয়ে হয়ে গেছে—"

মুক্তাবালা বেদনা অনুভব করল, বলল—"না, না, আপনি মিথ্যা বলচেন। যদি বিয়ে না করতেন—তাহলে এমন কথা ভারতীয় হয়ে বলতে পারতেন না—তার পর—"

হোটেল এসে পড়েছিল—তার আলোয় মুক্তাবালার মুখে শঙ্কা ও উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা গেল।

চৌধুরী বলল—"আমায় মাপ করো—আমি বিবাহিত।"

"সত্যি?"—আকুল উদ্বেগভরা স্বর।

"সত্যি!—চলো, তোমায় আমার স্ত্রীর ছবি দেখাব।"

মুক্তাবালার চোখের সমস্ত আলো নিভে গেল।

এবার কার পালা ?

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু

সারের পর রাইনল্যাণ্ড, তারপর অস্‌ট্রিয়া; অস্‌ট্রিয়ার পর সুদেতেনল্যাণ্ড, তারপর চেকোশ্লোভেকিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মেমেল; এই হ'ল নাৎসী জার্মানীর বিজয় অভিযানের তালিকা। সমগ্র ইউরোপ বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভাবছে—এর পর কার পালা? ডানজিগ, না রুমানিয়া? পোল্যাণ্ড, না হাঙ্গেরী? জিব্রাল্‌টার, না মাল্‌টা? হিট্‌লারের নজর এখন কোন্ দিকে—উক্রেনের শস্যশ্যামল তৃণক্ষেত্রে, না রুমানিয়ার তৈলবহুল উষর ভূমির দিকে? ফ্যাশিস্‌ট্ দেশ ছুটির পররাজ্যলোলুপতা ইউরোপে যে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে তার শেষ পরিণাম কি, তা কে জানে? তবে এ কথা ঠিক যে, সম্পূর্ণ প্রশমিত হবার আগে তা একটা প্রচণ্ড আলোড়ন তুলবে সারা ইউরোপে—যার ফলে বহু শক্তি হবে বিধ্বস্ত; বহু সীমান্ত-রেখা হবে বিলুপ্ত; বহু স্বল্পায়তন রাষ্ট্র হবে অন্তর্হিত; হয় ত বা এমন এক দাবানল প্রজ্বলিত হবে—যার ফলে পুরাতনপন্থী ইউরোপ ভস্মীভূত হয়ে নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে।

হিট্‌লারের যে এই মধ্য ইউরোপ গ্রাস করবার প্রচেষ্টা, এ জার্মানীর পক্ষে নতুন নয়। জার্মানীর একচ্ছত্র নায়ক এর জন্য কোনও মৌলিকতা দাবী করতে পারেন না। বিসমার্ক-কাইজার পরিকল্পিত ইউরোপে জার্মান আধিপত্য-বিস্তার-নীতির এ রূপান্তর মাত্র। জার্মান ইতিহাসে এ "দ্রাং নাখ্ অস্তেন" (Drang nach Osten) অর্থাৎ কি না প্রাচ্য অভিযান (Drive towards East) নামে খ্যাত। বিসমার্কের কূটনীতি যখন খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জার্মানীকে এক বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, সাম্রাজ্য বিস্তারের একটা তীব্র ইচ্ছা তখন জার্মানীর জেগে ওঠে। এই সাম্রাজ্যলিপ্সা রূপ পায় বিসমার্কের সুদূর প্রসারী উর্বর কল্পনায়। তাঁর অভিপ্রায় ছিল উত্তর সমুদ্র থেকে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত এক বিরাট জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করা—বার্লিন-বাগ্‌দাদ-রেলপথের পরিকল্পনা তারই ইঙ্গিত। বিসমার্কের এই কল্পনাময়ী মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন কাইজার উইলহেল্‌ম্, যার ফল হ'ল বিগত মহাযুদ্ধ এবং সেই মহাসমরে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ে সে কল্পনা আকাশকুসুমে পরিণত হ'ল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর এই স্বপ্নের সমাধি ঘটেনি। ভার্সাই সন্ধির নাগপাশ জার্মানীকে অভিভূত করেছিল মাত্র—তাকে সম্পূর্ণভাবে দমন করতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে প্রশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্তরালে ধূমায়িত হচ্ছিল অসন্তোষের অগ্নি—প্রচ্ছন্ন ছিল



হিটলার ও মুসোলিনী

অপরিতৃপ্ত কামনার লেলিহান শিখা; তারই ফলে ঘটল হিট্‌লারের অভ্যুদয়। হিট্‌লার জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদের বিংশ শতাব্দীর প্রতীক। তাঁর Mein Kampf ("আমার সংগ্রাম")—যা আধুনিক জার্মানীর কাছে বেদ বিশেষ—বিসমার্ক-কাইজারের ফিলজফির বর্তমান যুগের ভাষ্য।

প্রাচ্য-অভিযানের বর্তমান রূপ হচ্ছে রোজেনবার্গ পরি-

কল্পনা। সংক্ষেপে এর মূলকথা হচ্ছে জার্মানীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য তার আত্মপ্রসারের বিশেষ প্রয়োজন। জার্মানীর জনসংখ্যা এবং বৈশিষ্ট্য হিসাবে তার পরিসর নিতান্তই অল্প—তারা আয়তনহীন জাতি—এই হচ্ছে এদের বুলি। সুতরাং এই অসুবিধা দূর করবার জন্য আয়তন বিস্তার বিশেষ দরকার। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সকে গ্রাস করবার প্রয়াস বর্তমানে অন্তত ব্যর্থশ্রম হবে। অতএব জার্মানীকে অগ্রসর হতে হবে পূর্বাভিমুখে—বল্‌কান উপদ্বীপে, যেখানে বহু ক্ষুদ্র রাজ্য জার্মানীর ক্ষুধার আগুনে আত্মাহুতি দেবার জন্য বিরাজ করছে। আয়তন এদের অল্প, শক্তিতে এরা দুর্বল, আত্মকলহে প্রায়শ জর্জর এবং সবচেয়ে সুবিধার কথা এই, এদের মধ্যে জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসীর অভাব নেই। 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' (Ein Volk ein Reich) এই ধুয়া তুলে, সমগ্র জার্মান ভাষাভাষীদের একসূত্রে গাঁথবার ছলে এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রাস করা বিশেষ কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার হবে না। কাজেই রোজেনবার্গ লিখ্‌ছেন—

"No Franco-Jewish Pan-Europa but a Nordic Europe; that is the solution of the future with a German Mithalenropa. Germany as a racial and national state reaching from Stressburg through Memel and beyond; from Eupen through Prague and Laibach as the Central Power of the Continent and as security for the south and the south-east; the Scandinavian states with Finland as a second group to protect the north-east; and Great Britain as the protector of the West and overseas in those section where this is necessary in the interest of Nordic men." [(আমরা চাই) ফ্রান্স ইহুদী শাসিত নিখিল-ইউরোপ নয়—নর্ডিক ইউরোপ, যার মাঝখানে থাকবে জার্মান-শাসিত মধ্য-ইউরোপ। এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান। জাতিগত-ঐক্য-বদ্ধ জার্মানীর বিস্তার হবে ষ্ট্রাসবুর্গ থেকে মেমেল ও আরও দূরে। অয়পেন থেকে লেবাখ্‌ ও প্রাগ; সে হবে ইউরোপের মধ্যমণি, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বের শান্তিরক্ষক। ফিন্‌ল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশ দুটি রক্ষা করবে উত্তর-পূর্ব দিক; এবং বৃটেন রক্ষা করবে পশ্চিম দিক এবং সাগর পারের প্রয়োজনীয় উপনিবেশগুলি।]

এই উচ্চাভিলাষের কথা হিটলার কখনও গোপন রাখেন নি। তাঁর Mein Kampfএ তিনি স্পষ্টই লিখ্‌ছেন —"We the National Socialists have deliberately drawn a line under the prewar tendency of our foreign policy. We are where they were six-hundred years ago. We stern the Germanic stream towards the south and west of Europe and *turn our eyes eastwards*. We have finished with the prewar policy of colonies and trade and are going over *to the land policy of the future.*" [মহাসমরের পূর্ব যুগের যে পররাষ্ট্রনীতি সেখানে আমরা ন্যাশনাল সোস্যালিস্টরা স্বেচ্ছায় ছেদ টেনেছি। ছশো বছর আগে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যেখানে ছিলেন আমরা এখন সেখানে। দক্ষিণ এবং পশ্চিম ইউরোপে জার্মান জাতির অগ্রগতি আমরা বন্ধ করে পূর্ব দিকে তাকিয়েছি। মহাযুদ্ধের পূর্বযুগের উপনিবেশ স্থাপন এবং বাণিজ্য-বিস্তার-নীতি আমরা পরিত্যাগ করে অনাগত কালে নতুন রাজ্য বিস্তারে মন দিয়েছি।]

এই অনাগত কালের রাজ্য-বিস্তার-নীতির প্রয়োজন আমরা এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি অস্ট্রিয়া গ্রাসে, চেকো-শ্লোভাকিয়া বিভাগে এবং মেমেল অধিকারে। হিট্‌লারের দৃঢ় বিশ্বাস, সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা সফল করতে গেলে সুদূর আফ্রিকার দিকে চাইলে চল্‌বে না—লক্ষ্য ফেরাতে হবে ইউরোপের দিকেই। তিনি Mein Kampf-এ লিখছেন—The sole hope of success for a territorial policy now a days is to confine it to Europe and not to extend it to places such as Cameroons. [রাজ্য-বিস্তার-নীতিতে যদি সাফল্য লাভ করতে হয় তবে এ যুগে তাকে ইউরোপে নিবদ্ধ রাখ্‌তে হবে—কামেরুনের মত স্থানে তাকে প্রয়োগ কর্‌লে চল্‌বে না।] অন্যত্র আবার, Germany's only hope of carrying out a sound territorial policy lay in acquiring fresh lands in Europe itself. [জার্মানীর পক্ষে প্রকৃষ্ট রাজ্য-বিস্তার-নীতি হচ্ছে ইউরোপেই নতুন দেশ অধিকার করা।]

এই স্বপ্ন সফল কর্‌বার প্রধান অন্তরায় ভার্সাই সন্ধি। সর্ত অনুসারে জার্মানীর সৈন্যবাহিনী ছিল সীমাবদ্ধ, অস্ত্র-শস্ত্র ছিল অপ্রচুর, পিঠে চাপান ছিল অসহ ঋণভার এবং ক্ষতিপূরণের দাবী। ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে জার্মানী

একে একে ভার্সাই সন্ধির সমস্ত সর্তবন্ধন ফেল্‌ল ছিঁড়ে। তারপর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রাইনল্যাণ্ড অধিকার করে তাকে সুরক্ষিত কর্‌ল এবং সুরু হ'ল বিবিধ সমরোপকরণ সংগ্রহ এবং সেনাদলের বৃদ্ধি। ফ্রান্স আতঙ্কিত এবং বৃটেন উদ্বিগ্ন হলও তখনও তাদের খেয়ালে আসে-নি যে ছায়া পূর্বগামিনী। জার্মানীর এটা সোভিয়েটের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস মাত্র নয়—এ ভবিষ্যতের ব্যাপক অভিযানের পূর্ব-সূচনা। সুতরাং মিত্রশক্তিপুঞ্জ ক্ষীণ প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হ'ল এবং জার্মানীর বিজয় অভিযানের রথ সগৌরবে এগিয়ে চলল। অথচ, এর বহু পূর্ব থেকেই জার্মানীর অভিসন্ধি চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে নাৎসীদের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছিল এক বৃহত্তর জার্মানীর পরিকল্পনা। সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড, আল্‌সাস্‌-লোরেন (বর্তমানে ফ্রান্সের অংশ), লুক্সেমবুর্গ (জার্মানীর পশ্চিমে), দক্ষিণ টাইরোল (ইতালীর অধিকারে), অয়পেন-সালসেয়ি (বেলজিয়মের অন্তর্ভুক্ত), চেকোশ্লোভাকিয়া, ডান্‌জিগ, মেমেল, উত্তর সাইলেশিয়া, উত্তর হাঙ্গেরী, পোলিশ করিডর—সমস্তই এই বিরাট রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হবে। এই বিরাট রাষ্ট্র আবার জার্মানীর পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আন্‌বে এবং জার্মানীকে পৃথিবীর নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করবে।

জার্মানীর প্রাচ্য অভিযানের প্রথম সূচনা অত্যন্ত সন্তর্পণে—যতদূর সম্ভব আটঘাট বেঁধে। জার্মানীর দুদিকে দুই প্রবল শত্রু—পশ্চিমে ফ্রান্স্‌, পুবে সোভিয়েট রুশিয়া। দক্ষিণে ইতালীও অবহেলার বস্তু নয়। রুশিয়ার সঙ্গে মিতালী অসম্ভব—তার ধ্বংসই জার্মানীর কাম্য—কিন্তু সে পরের কথা। ফ্রান্স সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে—কিন্তু তাও আপাতত সমীচীন হবে না। কিন্তু ইতালীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ রয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্রে—রয়েছে নীতিগত ঐক্য। দুই দেশেরই মূলমন্ত্র হচ্ছে সাম্যবাদ বিতাড়নের জন্য একনায়কত্ব স্থাপন—ধনিকতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করা—তার ভবিষ্যতের কণ্টক উৎপাটন করা। অতএব, রোম-বার্লিন-মৈত্রী হ'ল হিটলারের জয়যাত্রার সুদৃঢ় ভিত্তি। এই দুই গণতন্ত্র-বিরোধী দেশের সমন্বয় হ'ল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব-বিলোপের প্রথম সোপান।

এর পর সুরু হ'ল এক বিচিত্র চতুরঙ্গ খেলা—পূর্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি নিয়ে। হিটলার হচ্ছেন প্রধান খেলোয়াড়—আর তাঁর প্রতিযোগী হচ্ছেন চেম্বারলেন-দালাদিয়ে-বেনেস-হ্যালিফ্যাক্স্‌ প্রমুখ রাজনীতিবিদেরা। সমগ্র ইউরোপ হচ্ছে এ খেলার ছক—সমস্ত রাষ্ট্রই হচ্ছে এর ঘুঁটি। এরই ওপর নির্ভর করছে জার্মানীর ভবিষ্যৎ, ইউরোপের ভবিষ্যৎ, হয় ত বা মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ। আজ পর্যন্ত বিজয়লক্ষ্মী হিট্‌লারের গলায় মালা দিয়েছেন; কিন্তু এর পরিণতি এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে। নিতান্ত পাকা খেলোয়াড়ের মত হিট্‌লার প্রত্যেকটি চাল দিয়েছেন নির্ভুল ভাবে—যার ফলে বৃটেন-ফ্রান্স্‌-রুশিয়ার সম্মিলন ঘটেও ঘট্‌ছে না এবং পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রী রাজ্যগুলির পদে পদে ঘট্‌ছে পরাজয়। হিট্‌লারী কূটনীতির জাল ভেদ করতে না পেরে চেম্বারলেন-দালাদিয়ে পড়্‌লেন মিউনিক চুক্তির ফাঁদে—যার ফলে ফ্রান্সের কলঙ্ক চিরস্মরণীয় হয়ে রইল আর ম্যাসারিকের জীবনব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

জার্মানীর রাজ্য বিস্তারের পক্ষে বোহেমিয়া (চেকোশ্লোভাকিয়ার উত্তরাংশ) ছিল অপরিহার্য। বিসমার্কের ভাষায়—বোহেমিয়া-অধিপতির হাতে ইউরোপের চাবিকাঠি —He who possesses Bohemia holds the key to Europe.) কেন না, রাইন থেকে দানিয়ুব অববাহিকা যাবার এই হচ্ছে সবচেয়ে সোজা পথ। তারপর, জার্মানীর লক্ষ্য হচ্ছে উক্রেনের দিকে। বছর দুই আগে বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিটলার বলেছিলেন—If we had Ukraine Germany would be swimming in plenty. (যদি উক্রেন আমাদের অধিকারে থাক্‌ত, তা হলে জার্মানীর সম্পদ উপ্‌চে উঠ্‌ত) কিন্তু বোহেমিয়া বিজয়ের উপক্রমণিকা হচ্ছে অস্‌ট্রিয়া বিজয়। কেন না, অস্‌ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া একত্র বাধা দিলে বোহেমিয়া অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ত। কাজেই প্রথমে অস্‌ট্রিয়া—তারপর সুদেতেনল্যাণ্ড, তারপর বোহেমিয়া। কূটনীতিবিশারদ হিট্‌লার প্রত্যেকটি চাল দিয়েছেন অত্যন্ত হিসেব করে—অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে—যার ফলে ভাগ্যলক্ষ্মী আজও তাঁর উপর বিরূপ হন নি। বাস্তবিক পক্ষে, বিনা রক্তপাতে, মুসোলিনীর সহায়তায় হিট্‌লার ফ্রান্স ও বৃটেনকে এত দুর্বল ও বিশ্বজনগণের সামনে এতটা হেয় প্রতিপন্ন করেছেন যে তা এখনও বোধ হয় এই দুই দেশের ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞেরা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

কিন্তু বোহেমিয়া-মোরাভিয়া-মেমেল নিয়েই যে হিট্‌লার তুষ্ট হবেন না তা বলাই বাহুল্য। এখনও জার্মান ভাষী বহু নাগরিক রয়েছে সুইটজার্লাণ্ডে, আল্‌সাস্‌-লোরেনে, দক্ষিণ টাইরোলে, অয়পেন-মালমেডিতে, দক্ষিণ ডেনমার্কে, পোলিশ্‌ করিডরে, রুমানিয়ায়, রুশিয়ায়। এদের বৃহত্তর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে হিট্‌লারের বিজয় অভিযান সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। চেম্বারলেন-হালিফ্যাক্স্‌-দালাদিয়ে যতই আশ্বাস দিন না কেন, বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই সশঙ্কিত হয়ে ভাব্‌ছে—তাই ত, এবার কার পালা?

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বছর পাঁচেক ধরে নাৎসীদের মধ্যে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রচার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নাৎসী জার্মানীর সর্বত্র এক মানচিত্র বিতরণ করা হচ্ছে যাতে হিট্‌লারের সমস্ত ভবিষ্যৎ অভিযানের একটা খস্‌ড়া দেওয়া হয়েছে। তাই থেকেই হয় ত খানিকটা হদিস পাওয়া যেতে পারে—এবার কার পালা। এই মানচিত্র অনুযায়ী হিট্‌লারের কর্মসূচী হচ্ছে এই—

১৯৩৮	অসট্রিয়া
১৯৩৮	চেকোশ্লোভাকিয়া
১৯৩৯	হাঙ্গেরী
১৯৩৯	পোল্যাণ্ড
১৯৪০	বুলগেরিয়া-রুমানিয়া
১৯৪১	ফ্রান্স, সুইটজার্ল্যাণ্ড্‌ লুথেমবুর্গ, হল্যাণ্ড্‌ বেলজিয়াম, ডেন্মার্ক, উক্রেন।

১৯৩৮এর কার্যতালিকা সুসম্পন্ন হয়েছে। ১৯৩৯—৪১-এও কি তাই হবে?

এই সুপরিকল্পিত অভিযানের কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত। এর প্রথম ধারা হচ্ছে নাৎসী প্রচার কার্য—যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বত্র সংখ্যা-লঘু জার্মান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি একটা বিদ্বেষ ভাব জাগানো এবং অসন্তোষের অগ্নি জ্বালিয়ে দেওয়া। এবং এদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে পররাজ্যে জার্মানীর অধিকার বিস্তার করা। এই নীতির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ দেখা গিয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ায়। ওখানে হিট্‌লারের তন্ত্রধারক হের হেন্‌লাইনের প্ররোচনায় সংখ্যালঘু জার্মান সম্প্রদায় স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। এই কৃত্রিম দাবীকে উপলক্ষ্য করে জার্মানী একটা নির্ভীক জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা নষ্ট করে দিল। মনে রাখতে হবে, চেক ও জার্মানেরা বহুকাল পরম সৌহার্দ্যে একত্র বাস করে এসেছে এবং হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের আগে এখানে কোনও গোলযোগ ঘটে নি। অধিকন্তু, সুদেতেন প্রদেশ কোন দিনই মূল জার্মানীর অংশ ছিল না: এরা চিরকালই বোহেমিয়ার বাসিন্দা। অথচ, এদের জার্মান বলে স্বীকার করে নিতে চেম্বারলেন প্রমুখ ধুরন্ধরদের একটুও বাধ্‌ল না। এই রকম প্রচার কার্য সর্বত্র চলেছে যেখানেই জার্মান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। তার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার পুনরাভিনয় ঘটা বহু স্থলেই বিচিত্র নয়—যদি না এখন থেকে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সতর্ক হয়।

নাৎসী প্রভাব বিস্তারের দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন। দানিয়ুব বিধৌত দেশগুলিতে জার্মানীর অর্থনৈতিক আধিপত্য ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। ফ্রান্স্‌ ও বৃটেনের সঙ্গে এদের বাণিজ্যবন্ধন ক্রমেই শিথিল হয়ে আস্‌ছে। বৃটেন তার সাম্রাজ্য নিয়েই ব্যস্ত—সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিতে বৃটিশ-বাণিজ্য বজায় রাখ্‌তেই সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে—তার ফলে জার্মানী পেয়েছে মধ্য-ইউরোপে মুক্ত দ্বার। অতএব, যুগোশ্লাভিয়া, অস্‌ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া—সর্বত্রই জার্মানীর পণ্য-সম্ভার বাজার ছেয়ে ফেলেছে। Trade follows the flag. কাজেই বণিকদের স্বার্থ বজায় রাখ্‌বার অজুহাতে নতুন রাজ্য জয়ের প্রচেষ্টা সহজেই সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে মনে হয়।

অনেকে মনে করে থাকেন, হিট্‌লারের অভিযান ভার্সাই সন্ধির প্রতিক্রিয়া মাত্র। গত মহাসমরের অবসানে জার্মানীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে যে শৃঙ্খল পরানো হয়েছিল সেই শৃঙ্খল সে আজ ছিন্ন করছে। হিট্‌লারের অভ্যুত্থান প্রকৃতির প্রতিশোধ। মিত্রশক্তিপুঞ্জ জার্মানীর ওপর যে অবিচার করেছিলেন—সুদে-আসলে জার্মানী এতদিনে তা ফিরিয়ে দিচ্ছে। এ কথা কতকটা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়েছি, প্রাচ্য-অভিযান জার্মানীর একটা বহুদিনের সঙ্কল্প যা ছিল বিসমার্কের কল্পনা এবং কাইজারের সাধনা। নাৎসীবাদের কল্যাণে এতদিনে তা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে।

প্রশ্ন উঠ্‌বে, বৃটেন এবং ফ্রান্স—যাদের প্রভুত্ব হিট্‌লারের উত্থান খর্ব করছে—তারা কেন একযোগে জার্মানীর বিপক্ষে সদর্পে দাঁড়াচ্ছে না? মিউনিক চুক্তি উপেক্ষা করে চেকো-শ্লোভাকিয়া অধিকার বেলজিয়ম আক্রমণের চেয়ে কিছুমাত্র কম অন্যায় নয়, তবুও বৃটেন নিশ্চেষ্ট কেন? এর জবাব মিল্‌বে ফরাসী-বৃটিশ-পররাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষণে। চেম্বারলেন যতই তারস্বরে বলুন না কেন—আমরা নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ। চেকোশ্লোভাকিয়ার মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা বহু লক্ষ লোককে রণক্ষেত্রে বলি দিতে প্রস্তুত নই, আসলে তাঁর সুগোপন উদ্দেশ্যটি ভিন্ন। সেটি হচ্ছে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে অটুট রেখে কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখা। ফ্যাসিজম্ হচ্ছে ধ্বংসোন্মুখ ধনিকতন্ত্রের শেষ আশ্রয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় যদি হিট্‌লারের পতন ঘটাতে হয় তা হলে রুশিয়ার সহায়তা অবশ্য প্রয়োজনীয়; এবং যদি এই অভিযান সাফল্য মণ্ডিত হয় তা হলে রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এবং সাম্যবাদের প্রসার অনিবার্য। হিট্‌লার এবং মুসোলিনী সাম্যবাদের বিপক্ষে দুই সজাগ প্রহরী; তাঁদেরই বিপক্ষতায় আজ ইউরোপে সাম্যবাদের অগ্রগতি প্রতিহত হয়েছে। কাজেই যদি বৃটেন আর ফ্রান্সের আনুকূল্যে এই দুই স্তম্ভ খসে যায় তবে ধনিকতন্ত্রের জীর্ণ প্রাসাদ ধ্বসে পড়্‌বে এবং সাম্যবাদের প্রবল তরঙ্গে সমস্ত ইউরোপ প্লাবিত হয়ে যাবে। তাতে চেম্বারলেন-হ্যালিফাক্স-দালাদিয়ে প্রমুখ বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি ঘট্‌বে এবং তা তাঁরা ঘট্‌তে দিতে নারাজ। হিট্‌লারের কামনার শিখায় তাঁরা মিত্রদ্রোহ করে তাঁদের উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা আহুতি দেবেন; কিন্তু ফ্যাসিজ্‌মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে দিতে তাঁরা অনিচ্ছুক। এ কথা বৃটেন ও ফ্রান্স বেশ ভালই জানে, রুশিয়ার সঙ্গে লড়াই না করে জার্মানী কোনও দিন তাদের আক্রমণ করবে না,—ততদিন পর্যন্ত হিট্‌লারের দাবী—তা যতই অযৌক্তিক হোক না কেন—মিটিয়ে, তাকে প্রসন্ন রাখতে আপত্তি কি?

শিক্ষা-ভ্রমণে কামরূপ

শ্রীমাধব ভট্টাচার্য, বি-এ

বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি কোন ভ্রমণ-কাহিনী নহে, ভ্রমণের ভিতর দিয়া কিছু কাহিনী সংগ্রহ করিবার প্রচেষ্টা মাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য-বিভাগ ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের নিমিত্ত প্রতি বৎসর যে শিক্ষা-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, বর্তমান বৎসরে ছাত্রেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সময়ে এই ভ্রমণের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। এক দল শারদীয়া অবকাশে পুরী অঞ্চলে গিয়াছিল; আর সে সময়ে যাহাদের যাইবার সুবিধা হয় নাই, তাহাদিগকে বড়দিনের অবকাশের আশায় প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। অবশেষে বড়দিনের ছুটি উপস্থিত হইল, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়—ইহাই দাঁড়াইল সমস্যা। শেষে একবাক্যে স্থির হইল—গৌহাটীতে যাওয়া হউক। গৌহাটীতে শিক্ষা-ভ্রমণের উদ্দেশ্য সাধনের যথেষ্ট মালমশলা রহিয়াছে; তারপর একটি প্রধান আকর্ষণ—প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন গৌহাটীতে সম্পন্ন হইতেছে। এই সুযোগ ত্যাগ না করিয়া আমরা সাত জন শিক্ষা-ভ্রমণেচ্ছু ছাত্র গৌহাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমাদের এই ভ্রমণের পক্ষে আর একটি অনুকূল সহায় হইল—সাহিত্য-সম্মেলনের বৃহত্তর বঙ্গশাখার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় আমাদের অভিভাবক হইতে স্বীকৃত হইলেন।



শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী ও ছাত্রগণ
১। বিভূতি ভট্টাচার্য্য ২। কমলা ঘোষ ৩। ভূপতি দাস
৪। অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী ৫। পীযূষ বসু ৬। নরেন সেন
৭। মাধব ভট্টাচার্য

নিছক ভ্রমণের জন্য যখন এ অভিযান নহে, শিক্ষা-ভ্রমণ এর উদ্দেশ্য, তখন যে স্থানে যাইতেছি, সে স্থান সম্বন্ধে, বিশেষত সে স্থানের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।



ভুবনেশ্বরীর মন্দির

প্রথমত মনে প্রশ্ন জাগে—গৌহাটী নামের উৎপত্তি হইল কিরূপে? আমরা সাধারণত বলিয়া থাকি গৌহাটী; কিন্তু ষ্টেশনের ফলকে লেখা রহিয়াছে—গুবাহাটী। এই গুবাহাটী বা গুয়াহাটী নামের এক-প্রকার ব্যাখ্যা এরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, এইস্থানে গুয়া বা সুপারীর প্রচুর চাষ হইত এবং সেজন্য একটি মস্ত হাট বসিত—এই অর্থে গুবাহাটী হইতে গৌহাটী হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এরূপ—স্থানটির চারিদিক পর্বতমালা বেষ্টিত, মাঝখানটায় শহরটিকে পর্বতমধ্যস্থ গুহা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এজন্য গুহাটী হইতে গৌহাটী নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

গৌহাটীর প্রাচীন ইতিহাস সমগ্র আসামের ইতিহাসের সহিত জড়িত। রংপুর, কুচবিহার আসাম উপত্যকা এককালে কামরূপ জেলার অন্তর্গত ছিল, যোগিনীতন্ত্রে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই কামরূপ জেলার রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর গৌহাটীতে অবস্থিত ছিল—অনেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কামরূপের রাজাদের মধ্যে নরকাসুর ও তৎপূর্ববর্তী কয়েকজন নৃপতির নাম পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্করবর্মা বা কুমার রাজা কামরূপের রাজা ছিলেন; তার পর শালস্তম্ভ ও তাঁহার বংশধরগণ এবং পরবর্তীকালে ব্রহ্মপাল ও তদীয় বংশধরেরা ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন। এই সময় ইহার রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে যারূপেশ্বর ও তৎপরে কমতাপুরে আনা হয়। ইহার পরে কামরূপে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ আরম্ভ হয়, ১৩শ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মুসলমানগণ এই স্থান আক্রমণ করেন, কিন্তু বিশেষ সুফল লাভ করিতে পারেন নাই; ১৫শ খৃষ্টাব্দে হুশেন শাহ কমতাপুর অধিকার করেন। কিন্তু ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শক্তিশালী কোচ-রাজগণ পুনরায় কামরূপ নিজেদের রাজ্যভুক্ত করেন। ইহাদের শাসনাধীনে কামরূপের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়—ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচ-আহম বিবাদ উপস্থিত হয় এবং এই সংঘর্ষে একপক্ষ মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরিণামে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আহমগণ শক্তি সঞ্চার করিয়া লাচিৎ বরফুকন নামে এক শক্তিশালী সেনাপতির অধীনে শ্রীঘাটের যুদ্ধে মুঘলদিগকে পরাস্ত করেন। ইহার পর প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া আহমগণ কামরূপে রাজত্ব করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মরাম জাতির বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ১৭৯২ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌স্‌কে তথায় প্রেরণ করেন। ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌স্ দুই বৎসর পরে চলিয়া আসিলে ব্রহ্মদেশ হইতে মানগণ কামরূপ আক্রমণ করিয়া রাজ্যময় ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করে। ইহার ফলে বর্মাযুদ্ধের সূত্রপাত এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ কর্তৃক মানগণ পরাজিত হয় ও সমগ্র আসাম ইংরেজ শাসনাধীনে আসে।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে আসাম বাংলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আসামের সদর গৌহাটীতে ছিল। বাংলার সহিত আসামের কৃষ্টির সংযোগ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইংরেজ রাজ্য বিস্তৃত হইবার বহু পূর্ব



জলকলের পাহাড় হইতে ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য

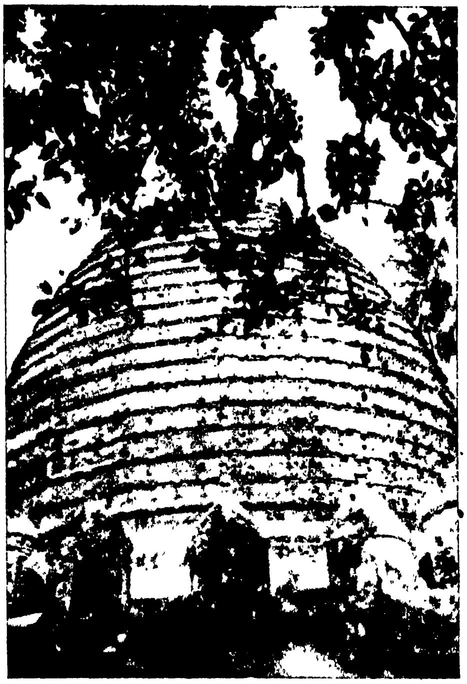
হইতে। আসাম ও বঙ্গদেশে যাতায়াত ও আদানপ্রদান, প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের পরবর্তী আহোম রাজ্যের সহিত বঙ্গদেশের বিভিন্ন

রাজ্যসমূহের আদানপ্রদানের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আহোম নৃপতি শিবসিংহ ও তদীয় রাণী ফুলেশ্বরী শান্তিপুরনিবাসী ব্রাহ্মণ সাধক কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের নিকট হিন্দুধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের একমাত্র করদ রাজ্য মণিপুরে অতীত কালে বাঙালী গোস্বামীগণ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছেন। বাংলা ও আসামের মধ্যে এই সংস্কৃতিমূলক সম্বন্ধ ও ভাবের আদানপ্রদানের কাহিনী গবেষণার বিষয়। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি, নারায়ণী হাণ্ডিকী হিষ্টরিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যপূর্ণ গবেষণা দ্বারা ছাত্রমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইহা গেল গৌহাটী তথা আসামের ঐতিহাসিক তথ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সামান্য পরিচয়। এবার, নিজেদের ভ্রমণের মধ্য দিয়া কতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হইল, শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত কতটা পরিচিত হইতে পারিলাম, তাহাই আলোচনা করিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, গৌহাটীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিবার সুযোগ আমরা ছাড়ি নাই। সাহিত্য-সম্মেলনের ছাত্রসভ্য হইয়া প্রতিনিধিনিবাস এঙ্গলো-বেঙ্গলী স্কুলে গিয়া উঠিলাম। আদর অভ্যর্থনায় কর্তৃপক্ষদের ব্যবহার আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিল। সাহিত্য-সম্মেলনের অন্য যে-কোন সার্থকতা হইতে আমাদের মনে হয় যে ইহার সর্বপ্রধান সার্থকতা হইল আলাপ পরিচয়ে, প্রত্যেকের সহিত মেলামেশা ও ভাবের আদানপ্রদানে—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়ও ইহাই বলিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙালী এখানে সমবেত হইয়াছে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার আকর্ষণে—তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয়, প্রবাসী বাঙালীদের বিবিধ সমস্যার সহিত স্বদেশবাসী বাঙালী আমরা, আমাদের নানা সমস্যার আলোচনা করিবার সুযোগ আমরা লাভ করিলাম। অধিবেশনের উদ্বোধন করিলেন আসাম প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় বরদলই। অধিবেশনের শেষে আমরা যখন তাঁহাকে বলিলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগের ছাত্র প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত একখানি ফটো তুলিতে ইচ্ছা করি, তিনি সহাস্যে আমাদের প্রস্তাবে মত দিলেন এবং আমাদের সহিত দাঁড়াইয়া ফটো তুলিলেন।

ইহার পর আমরা কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি ও হাণ্ডিকী ইনষ্টিটিউট দেখিতে গেলাম। উভয় প্রতিষ্ঠানই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কেন্দ্র। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিতে কয়েকটি মূল্যবান্ প্রস্তরমূর্তি ও কয়েকখানা চিত্রিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দেখিলাম। পুঁথিগুলি রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রায় প্রত্যেকটি পাতায় পট-চিত্রের মত নানাবিধ চিত্র রহিয়াছে। আরও কয়েকটি জিনিষ, যথা—একটি চিত্রিত কাস্কেট, খোদাই করা লোটা, একটি সুদৃশ্য কাঠের বাক্স, যুদ্ধের নিমিত্ত একটি বৃহৎ ঢাল প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন দেয়। হাণ্ডিকী ইনষ্টিটিউট আসাম সরকারের তত্ত্বাবধানে রায় বাহাদুর ভূঞার অধিনায়কতায় ঐতিহাসিক ও প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ করিবার একটি কেন্দ্রস্থল। এ পর্যন্ত ইঁহারা অনেক মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আসাম বুরঞ্জী, আহোম রাজত্বের প্রথম ভাগ হইতে আসামে



কামাখ্যাদেবীর মন্দির

ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা পর্যন্ত একখানি বিস্তৃত ইতিহাস। ইহা ব্যতীত কামরূপের বুরঞ্জী, দেওধাই আসাম বুরঞ্জী, টুঙ্গখুঙ্গিয়া বুরঞ্জী, কাছার বুরঞ্জী, জয়ন্তিয়া বুরঞ্জী, ত্রিপুরা বুরঞ্জী, আসামের পদ্যে বুরঞ্জী প্রভৃতি অনেক ইতিহাসগ্রন্থ এই ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি অর্থাৎ আসামের পদ্যে-বুরঞ্জী পদ্যাকারে লিখিত। প্রথম খণ্ড দুতিরাম হাজারিকার কালিভারত বুরঞ্জী অর্থাৎ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে সুশিক্ষা রত্নধ্বজ সিংহলোরা রাজার আসাম রাজ্য পাইবার সময় হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী কর্তৃক আসামের রাজ্যভার গ্রহণের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডে—বিশ্বেশ্বর বৈদ্যনিধির 'বেলীমারর বুরঞ্জী'—১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ওয়েল্‌সের আসাম অভিযান হইতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে খাগোরিজান বা নওগাঁয়ে বর্মা যুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাস। আর একখানি পুস্তক দেখিলাম, 'আহোম' বর্ণমালায় লিখিত আসামের ইতিহাস। পুস্তকখানি দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথির 'ফটোগ্রাফ কপি'। আসামের ইতিহাস ব্যতীত, গাছের ছালের উপর লিখিত, সুন্দর কারুকার্যখচিত ও চিত্রিত একখানি পুস্তক রহিয়াছে, নাম—হাতিনিদান। পুস্তকখানিতে হস্তী সম্বন্ধীয় অনেক কথা, ইহাকে কিরূপে পোষমানানো যায়, ইহার রোগ ও তাহার উপশমের উপায় প্রভৃতি অনেক তথ্যপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ আছে। পুঁথিখানি লম্বায় ১১ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৭ ইঞ্চি। রচনাকাল—আনুমানিক ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ,

রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালে। হস্তলিখিত এই পুস্তকখানি ব্যতীত মুদ্রিত আকারে 'ঘোড়া নিদান' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিও ঘোড়ার ব্যাধি, ইহার উপশম প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ। উপরোক্ত পুস্তকগুলি ছাড়া আর একটি মূল্যবান দ্রষ্টব্য জিনিস এইস্থানে রক্ষিত হইয়াছে—তাহা একটি ফিতা (tape)। ফিতাটি হাতে বোনা, লম্বায় ১০ ফিট, বিবিধ কারুকার্যখচিত। আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে; রাজা যোগেশ্বর সিংহের কাহিনী ফিতাটিতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মানগণ কর্তৃক আসাম আক্রমণের সময় ফিতাটি ব্রহ্মদেশে চলিয়া গিয়াছিল, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর ভুঞা ইহাকে ব্রহ্মদেশ হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া আনেন। ফিতাটির প্রথম পাঠ এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণায় নম নম।
আসাম দেশের ইন্দ্র বংশ চূড়ামণি।
যোগেশ্বর সিংহ নামে রাজ্য নৃপমণি॥ ইত্যাদি

এইবার গবেষণামূলক কাহিনী ছাড়িয়া আমরা গৌহাটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। শ্যামল পর্বতমালা পরিবেষ্টিত, বিস্তীর্ণ বনরাজি সমাচ্ছন্ন, ব্রহ্মপুত্রের কলধ্বনি মুখরিত গৌহাটী দর্শকের চোখে এক অপূর্ব রূপ আনিয়া দেয়। সৌন্দর্যপূর্ণ এই মায়াময় আবেষ্টনের মোহ আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া ছিল। বশিষ্ঠাশ্রম সংলগ্ন ত্রিধারা গঙ্গার পার্বত্য ঝরণাধারা, ব্রহ্মপুত্রের পার ঘেঁসিয়া জলকলের পাহাড়টির মনোরম দৃশ্য, লাহিড়ী পরিবারের কমলা বাগানের কমলার রস—অনেকদিন রসপিপাসুদের স্মরণে থাকিবে।



প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলুই

হিন্দুদের পক্ষে গৌহাটীর একটি প্রধান আকর্ষণ ৺কামাখ্যাদেবীর মন্দির। নীলাচল পর্বতোপস্থিত ৯০০ শত ফিট উঁচে হিন্দুর ৫১টি পীঠস্থানের অন্যতম পীঠ কামাখ্যা মন্দির দর্শনের মানসে আমরা এক প্রত্যুষে রওনা হইলাম। দেবী নারায়ণীর দেহাংশের যোনিখণ্ড এস্থানে পতিত হইয়াছিল—এরূপ কথিত হয়। কামাখ্যা মন্দির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে মহাভারতীয় যুগে নরকাসুর প্রথমে এই মন্দির স্থাপন করেন। ক্রমে এই মন্দির ধ্বংস হইয়া গেলে রাজা বিশ্বসিংহ এই পীঠস্থান আবিষ্কার করিয়া একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে কালাপাহাড় কর্তৃক মন্দিরটি পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কোচ-রাজ নরনারায়ণ ইহার পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। কামাখ্যা মন্দির হইতে আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া ভুবনেশ্বরী মন্দির দেখা হইল। পাহাড়ের উচ্চস্থান হইতে নিম্নের পথঘাট ও দূরের দৃশ্যাবলী ছবির মত মনে হইতে লাগিল। কবিশিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিলাম একমনে ভাবাবিষ্ট হইয়া ছবি আঁকিতেছেন। চারিদিকের অপূর্ব দৃশ্যাবলী, কুয়াশার উপর অরুণালোকের ঝিকিমিকি—একটি মনোরম রহস্যময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া শিল্পীমনকে ভাবাবিষ্ট করিয়া দেয়।

গৌহাটী পরিত্যাগ করিবার দিন উমানন্দ দেখিতে গেলাম। পুণ্যার্থিগণ নাকি পূর্বে উমানন্দ দর্শন করিয়া পরে কামাখ্যা মন্দিরে যান, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল পূর্বে কামাখ্যা দর্শন, পরে উমানন্দ। শীতকাল—তাই ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবল জলোচ্ছ্বাস এখন নাই—অতি শান্ত, নিরীহ। ছোট নৌকা করিয়াই এ সময়ে সেখানে যাওয়া যায়। উমানন্দের সন্নিকটে অপর দুইটি দ্বীপ উর্বশী ও কমনাশা দেখিয়া আমাদের গৌহাটীর শিক্ষাভ্রমণ শেষ করিতে হইল। আসিবার দিন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহার বাটীতে আমরা সাত জন মধ্যাহ্ন আহার করিলাম। সন্ধ্যার গাড়ীতে গৌহাটী ছাড়িয়া আমরা রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর অভিমুখে রওনা হইলাম।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ করিয়াই আমাদের গৌহাটী যাত্রা এবং এই সম্মেলনের ভিতর দিয়াই আমাদের শিক্ষাভ্রমণের সাফল্য। কর্তৃপক্ষদের আতিথেয়তা, স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিখুঁত কর্তব্যপালন, গৌহাটীস্থিত ভ্রাতাভগ্নীদের কর্মতৎপরতার দৃশ্য স্মরণ করাইয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দেয়।

মায়া-প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

দশ

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টির তবুও বিরাম নেই—মাঝে মাঝে কেবল মেঘের গর্জ্জন শব্দ। পথের লোক চলাচল—বৃষ্টির তাড়নায় অনেক কমে গেছে। সূর্য্যাস্তের পর থেকে যে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল, সেই কাল-কালিন্দীতে ধোয়া মেঘ যখন বর্ষণ আরম্ভ করলে তখন তার আর যেন শেষ নেই।

সন্ধ্যার একটু পরেই মিলনী মোটরে বেড়াতে বের হল। এদিক ওদিক ঘুরে রসারোডে বাপের কাছে এল। সর্ব্বেশ্বর রায় তখন সবেমাত্র আদালত থেকে এসে নীচের চেম্বারে বসে তামাক খাচ্ছিলেন—মিলনীকে দেখেই তিনি যেন একটু চমকে উঠলেন—তারপর সামনে নিয়ে বললেন: মিনু মা! তোমার দাওয়ান রামশরণ আমার কাছে এসেছিল, তোমার শ্বশুর সুজনবাবু একখানা চিঠি লিখেছেন। তিনি আমায় অনুযোগ করেছেন যে জয়ন্ত সম্বন্ধে আমার খানিকটা কর্ত্তব্য ছিল, যেহেতু আমি কলকাতায় থাকি—তিনি থাকতে পারেন না। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—লজ্জা করিস নি—জয়ন্ত এরকম হ'ল কেন, কিছু কি বুঝতে পেরেছিস? সে যে-ছাঁচের ছেলে তাতে এরকমটা হওয়া—একটা কোন গূঢ় কারণ ঘটেছে—আমি সেটা ধরতে পারি নি—তাই জিজ্ঞাসা করছি। ঠিক ধরতে পারছি নি··· তোর সঙ্গে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়েছে?

মিলনী চুপ করে রইল।

চুপ করে রইলি কেন—তোর মার কথা ছেড়ে দে—সে একটা আস্ত পাগল···মাধুরী বলে বইখানা failure হবার পর থেকে ওর মাথা বিগড়ে গেছে—তাই থেকে এই থিয়েটারের বাতিক···তাই থেকেই এই সব···আমার কিন্তু সন্দেহ হয়—লোকে তোদের কত সুখ্যাতি করত—অথচ হঠাৎ এমনই হ'ল কেন?

মিলনী তবু চুপ করে রইল···

আচ্ছা মানবের সঙ্গে তার কি গোলমাল বা ঝগড়া হয়েছে শুনছিলাম—কেন? কি নিয়ে?

আশ্চর্য্য, ঝগড়া হয়েছে বলে আমিও কিছু শুনিনি···

কথাটা বলেই মিলনীর বুকের ভেতর ঢিব্ ঢিব্ করতে লাগল। সে ভয় পেলে মাধুরী কি সেই চিঠির কথা বাবার কাছে বলেছে। উঃ লজ্জার আর পরিসীমা রইল না।

দেখ মা, আমি তোর বাবা, এ সংসারে আমার চেয়ে মায়া বা স্নেহ আর কেউ করবে না—সন্তানের মঙ্গল কামনা যে বাপের কতখানি—সে সন্তান না হ'লে কেউ বুঝতে পারে না। আমার ছেলে নেই—তোরাই আমার ছেলে—ভেবে দেখিস মা, যদি কোথাও কোন খুঁত হয়ে থাকে, যদি বুঝতে পারিস আমায় বলিস—আমি তার প্রতিকার করবার সাধ্যমত চেষ্টা করব। আর জয়ার দেনার জন্যে যে টাকা দিয়েছি, তার কথাটা তোর দাওয়ান রামশরণকে জানান ঠিক হয়নি। সুজনবাবু তাতে ব্যথিত হয়েছেন। আমি তাঁকে লিখেছি—জয়া যেমন আপনার ছেলে তেমনি সে আমার জামাই; মেয়ে আর জামাই কি আমার তফাৎ—আমি, মনে করুন না কেন আমার ছেলেকেই সে টাকাটা দিয়েছি—তাতে দুঃখ করবার কোন কিছু নেই। আপনি দুঃখিত হবেন না। যাক্···আমার এখুনি consultationএ বসতে হবে তুই বাড়ীর ভেতর যা।

আমি আর এখন বাড়ীর ভেতর যাব না। আমাকে একখানা French মোটরকারের ওখান থেকে ফোন করে গাড়ী আনিয়ে দাও—আমি গাড়ী ছেড়ে দিয়েছি।

কোথায় যাবি? কেন এখানকার গাড়ী···নিয়ে যা না কেন?

মিলনী বলতে যাচ্ছিল—মানবের ওখানে। কথাটা ঠোঁটের কাছে এসেছিল, চেপে গেল তখনি। পরে বললে—ভোলাদার খোঁজে—বাড়ীর গাড়ী নিয়ে যাব না। ফোন করা হল। গাড়ী এল—ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিলেন—fareটা আমার এখান থেকে বিল করে নিয়ো।

সে সেলাম করলে—মিলনী গাড়ীতে উঠে চলে গেল।

তখন রাত্রি প্রায় নটা হবে। সন্ধ্যা থেকে যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল—তা মাঝে মাঝে একটু আধটু থামলেও একেবারে থামেনি, বরং জোর করেই জল ঢালতে লাগল। মিলনী যখন মানবদের বাড়ী এল তখন বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছে। পথে স্থানে স্থানে বেশ জল দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভার বললে বিডন ষ্ট্রীটের ওদিকে জল এত দাঁড়ায় যে হয়ত পথে মোটর আটকে যেতে পারে—অতএব সারকুলার রোড দিয়ে ঘুরে যাওয়াই ভাল। মানব গাড়ীতে উঠে বললে: আমার কিন্তু সেখানে যেতে কিছুতেই মন সরছে না—ভয় হচ্ছে, যদি কোন বিপদ ঘটে। আর তাছাড়া—সে হয়ত থিয়েটারে আছে। থিয়েটারে খবরটা নিয়ে যাওয়াই উচিৎ, কি বল?

স্বামী ত্যাগ করে যাওয়ার চেয়ে অসম্মান আর কি হতে পারে মানব। একটা পথের মেয়ে তার চেয়ে বেশী কি আর অসম্মান করতে পারে?

গাড়ী সারকুলার রোড দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেও দ্রুত চলছে। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। একদিকের কাঁচের ওপর বৃষ্টির জল এসে পড়ছিল। মানব ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই আলোয় মিলনীর মুখখানা দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিল না। সে ভাবছিল—কি দুর্ভোগ…যে আগুনে ভেতর পুড়ে খাক হয়ে যায়, সেই আগুন কাছে কাছে ঘিরে রয়েছে…একি শাস্তি!

না মানব, আমার মন বলছে থিয়েটারে তিনি আজ নেই—সেই মীনার বাড়ীতেই আছেন।

কি করে বুঝলে? মন দিয়ে?

হাঁ—মন দিয়ে…এ ঝম-ঝম বৃষ্টিতে তিনি কখন ঘর থেকে বের হবেন না?

ভাল কিন্তু অন্য কিছু যদি বিপদ ঘটে, যদি সেখানে তার সামনে গেলে, তোমার কোন অসম্মান হয়—যদি মীনা তোমায় অসম্মান করে?

গাড়ী এসে মীনার বাড়ীর গলির মোড়ে দাঁড়ান। মানব বললে—তুমি ক্লোকটা ঢেকে যাও—বৃষ্টি কম হলেও—কেউ না দেখে, আমি একটু দূরে গাড়ী নিয়ে থাকি। কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে, কি করে সংবাদ পাব?

কোন ভয় নেই মানব—স্বামীর জন্যে সাবিত্রী যমকে ভয় করেনি…আমারই বা ভয় কিসের—কিছু না…আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই আমি এসেছি…

গাড়ী থেকে নেমে মিলনী গলির ভেতর এগিয়ে গিয়ে ছাখে—কে একটা মাতাল টলতে টলতে চলেছে…রোগা ঢ্যাঙা…বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলেছে আর গান গাইছে। বড় মধুর গলা…

নাম আমার হীরে মালিনী।
কীরে খেয়ে বলতে পারি
শাক দিয়ে মাছ ঢাকিনি।
বলি ও লবঙ্গ লতা
শোন লো মনেরি কথা…

এক পা এক পা চলে—আবার থেমে যায়—আবার গান গায়…মিলনীও থেমে দাঁড়ায়। মাতালের রকম দেখে মিলনীর একটু একটু ভয় হচ্ছিল। বৃষ্টি তখনও পড়ছে…মিলনী ক্লোকটা বেশ করে মুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল…মাতাল আবার গাইলে—

বলি ও লবঙ্গ লতা
শোন লো মনেরি কথা…
পরাণ মালী বিনে আমি,
আর কার' ঘর করিনি।
নাম আমার হীরে মালিনী॥

মিলনীর মনে হল—এ ভোলাদার গলা কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারছে না। কিন্তু এ মাতাল আমার মনের কথা কি করে জানলে…

মাতালও এগোয় সেও এগোয়। পিছনের পায়ের শব্দ শুনে মাতাল ফিরে দেখে বললে:

Nasty Gibberish…শালা মদের নিকুচি করেছে…

কে বাবা ভূতোমের মত পিছু নিয়েছ…আমি ভোলা মাতাল…এ-ঠেঁয়ে কিছু হবে না চাঁদ।—হঠাৎ ভোলা রায় চমকে উঠে বললে:

কে হে! দাঁড়িয়ে চমকে উঠলে যে…

মিলনী বললে: ভোলাদা!

ভোলাদা বলে ডাকতেই ভোলার নেশা খানিকটা ছুটে গেছে—সে এগিয়ে এসে বললে: দাদা! দাদা! দাদা কে বাবা! একি! বোন দিদি! একি! তুমি…By Jove! মিলনীদিদি…what's up what's amiss… তুমি! তুমি!

আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব ··

দেখা করবে এখানে·· এখানে···তুমি এখানে এলে কি করে—কে তোমায় নিয়ে এল ? তুমি, তুমি এখানে···আমি মাতাল জাহান্নামের রাস্তায় চলেছি—but no—no··· ক্লোকটা ভাল করে চাপা দাও···আহা! somebody may see···কেউ দেখে ফেলতে পারে···

দেখুক গে···আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব···

এইখানে ··সাবিত্রী মরা স্বামী ফিরিয়ে আনতে যমের বাড়ী গিয়েছিল—এ যে যমের বাড়ীর চেয়েও খারাপ জায়গা দিদি! এখান থেকে জয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ···no—no—no···তুমি বাড়ী ফিরে যাও··· তুমি এদের জান না···এরা তামাকে সোনা করে ·· সোনাকে রাঙ করে ছেড়ে দেয় ..উঁহুঁ···না—দিদি—ফিরে যাও···

মিলনী দৃঢ়স্বরে বললে : না ভোলাদা—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই যাব না···

Nasty—nasty affair···না—না It's no good··· Don't you see my dear sister, you are an aristocrat···দিদি! তুমি মহৎ লোকের মেয়ে···এ অতি নিঘিন্নে জায়গা—মানুষ যতক্ষণ মানুষ থাকে, ততক্ষণ এখানে পা দিতে পারে না।···না—না চল গাড়ীতে তোমায় তুলে দিই গে ··

না ভোলাদা—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাব না···

Nasty gibberish, শালা মদের নিকুচি করেছে··· কিন্তু দিদি তুমি ত জয়াকে নিয়ে যাবে, এদিকে থিয়েটারের কি হবে ··

থিয়েটার হবে—

আর আমার—এই ভোলা মাতাল—জয়াকে নিয়ে তুমি চাবি দেবে আর আমার মদের কি হবে ?

আমি মদ দেব !

দেবে ? That's alright.—Righto' দেখো, তুমি দিদি বড় aristocart-এর মেয়ে—দেখো ভদ্দরলোকের এক কথা···চল জয়াকে তোমার বাড়ী পৌছে দেব। নিশ্চয়ই দেব। চল।

এ পাশ দিয়ে এস···nasty gibberish শালা মদের নিকুচি করেছে···কিন্তু দিদি মনে থাকে যেন·· ভোলা আবার ফিরে বললে—কিন্তু মনে থাকে যেন, হাঁ ভদ্দর লোকের এককথা দিদি···

নিশ্চয় দেব।

এইত ভদ্রলোকের এককথা···ক্লোকটা ভাল করে ঢাকা দাও ··

মিলনীকে নিয়ে ভোলা মীনার বাড়ী ভেতর ঢুকে পড়ল। মিলনীর বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠল। তার মনে হ'ল যেন একটা বিদ্যুতের তীব্র ঝন-ঝনা—তার সারা দেহকে নাড়া দিয়ে দিলে।···

মীনার ঘর থেকে তখন গানের সুর ভেসে আসছিল। মীনার এ মোহিনী মূর্ত্তি জয়ন্ত কখন দেখেনি ? মদ্যপানে আরক্ত বিহ্বল চাহনি। গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ভঙ্গী। সুর তখন গ্রামে গ্রামে—পর্দ্দার পর পর্দ্দায় উঠছে নামছে, মূর্চ্ছনার পর মূর্চ্ছনা···তালের ওপর তাল যেন একটা পাপিয়া ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তুলছে···এমন গান জয়ন্ত কখন শোনেনি··মানুষ গানে যখন নিজের প্রাণের পরিপূর্ণ রস ঢেলে দেয়···যেমন রসসিক্ত জীয়ন্ত ফুল তার নিজের পাপড়িকে রঙে ও রসে সজীব ও সিক্ত করে দেয়, বায়ুর সঞ্চালনে তার নিজের আবেগভরে দুলে দুলে ওঠে, মীনার গানের সুর তেমনি সিক্ত। সেই সুরের প্রকাশ ভঙ্গী যেন ওই বাতাহত ফুলের রঙের খেলার সঙ্গে দোলন—তার আঁখি যেন মনোহারিণী শঙ্খিনী নাগিনীর দীপ্তিতে উজ্জ্বল। টেবিলের ওপর একটা ভাসে কতকগুলা ফুল সাজান ছিল, মীনা নাচতে নাচতে একটা করে ফুল নেয় আর জয়ন্তকে ছুঁড়ে মারে। সতীর তপস্যার বিপরীত। মদনের পুষ্প-বাণের খেলা আজ সমস্তই যেন রতি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র—নৃত্যের লাস্যে কখন সেই অঙ্গ মেঘাবরণের ভিতর থেকে ক্ষণিকের চন্দ্র প্রকাশ—কখন মেঘে ঢাকা···সে এক অপরূপ খেলা · প্রথম ফুল এসে ছুঁয়ে গেল জয়ন্তর পায়ের পাতা—তারপর বক্ষ—তারপর অধর—তারপর পুষ্পসোহাগ স্পর্শের অবিরাম বাণ বর্ষণ···সমস্ত ঘরখানা যেন ফুলের গন্ধে ও গানের সুরে ভরে গেছে···এও ঠিক সেই রকম বাইরের পৃথিবী, কোন রেখাও আর তাদের কাছে নেই, বিশেষতঃ জয়ন্তের কাছে। গান চলছে···

পিয়া পিয়ো

অতনু পুলক রসে ভরা হৃদি যৌবন

নিঙাড়ি সুবাস বধূ নিয়ো।

পিয়া পিয়ো—পিয়া পিয়ো॥

(হের) ঝঞ্ঝা গরজন চমকত বিজরী

সঘন গগনে ডাকে মেহা,

আকুল তনু দল .. ধ্বনিত ধুনিত ধ্বনি

রমিত রমন চাহে দেহা॥

উছলিত তনু রসে বিহ্বল চাতকী আজ

অধর সুধার ধারা পিয়ো—॥

পিয়া পিয়ো···পিয়া পিয়ো···

মীনার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন কোন বিদ্যাধর কলাবিদের শিক্ষার নৈপুণ্য প্রতি ছন্দে প্রকাশ পাচ্ছে—প্রতি অঙ্গ তার সেই মোহন রসমাধুর্য্যে লোলিত।

জয়ন্তও উন্মত্ত—আকুলভাবে হাত বাড়িয়ে ডাকলে

মীনা! মীনা!

মীনা তখন দুই বাহুর দোলন ভঙ্গীতে জয়ন্তের কণ্ঠে লতার মত জড়িয়ে দিয়ে বললে ··

মি—না—মি—না—তুমি! তুমি!···

উদ্বিগ্ন পুষ্প স্তবকের মত অধর প্রায় স্পর্শ করে·· সেই মুহূর্ত্তে ভোলা ও মিলনী সেই ঘরের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল! বলে উঠল—চমৎকার! চমৎকার! nasty gibberish—শালা মদের নিকুচি করেছে।

সম্মুখে শিকার ব্যর্থ হলে ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়ে সোজা হয়ে ওঠে—মীনা পা দিয়ে মাটাতে এত জোরে আঘাত করলে যে তার পায়ের নূপুর ছিঁড়ে ঘরময় নানা সুরের ভঙ্গীতে ছড়িয়ে পড়ল।

মীনা বললে—কে ভোলাদা···ও কে—ও··· দিদি!

জয়ন্ত যেন আতঙ্কিত ও স্তম্ভিতের মত সোফা থেকে নিজের দেহটা খানিক খাড়া করে তুলে মিলনীর দিকে তাকাল। মীনা অগ্রসর হয়ে তাড়াতাড়ি এসে মিলনীর হাত ধরতে গেল, মিলনী হাত সরিয়ে নিয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়ে বললে:

আমি তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি···

তাত দেখতে পাচ্ছি—যে জন্যে এসেছ সেটা না বললেও বুঝতে পারতাম—হুঁ! তবে কথা হচ্ছে আমি যাব না।

কেন?

ভোলা রায় ও মীনা দু'জনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জয়ন্ত সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—

My dear lady! Don't be silly, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক একদিন ছিল বটে, এখন নেই। আমি ব্যভিচারী; তুমি এ ভোলা রায়কে সাক্ষী মেনে, স্বচ্ছন্দে divorce suit file করতে পার—তাতে আমি adulteryতে অস্বীকার যাব না—বিয়েটা আইনতঃ ভেঙে দেওয়া অত্যন্ত সহজ পথ হয়ে গেল—now my dear lady! you can go···স্বচ্ছন্দে তোমার বাড়ীতে যেতে পার···

জয়ন্তর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মীনা এমন জোরে হা হা হা হা হা হা ক'রে হেসে উঠল—হেসে যেন গড়িয়ে পড়তে লাগল · হাসতে হাসতে বললে,

ও ভোলাদা·· হা হা হা হা···বিয়ে করা বউকে ভালবাসে না, হাহা হাহা হাহা ··আর আমার ভালবাসা চায়··· হাহা হাহা হাহা···

ভোলা রায় নির্ব্বাক!

মিলনী সোজা হয়ে বললে: দেখ সম্পর্ক ছিল, আছে এবং যতদিন বেঁচে থাকব ততদিনই থাকবে; তাই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি, না হলে এখানে এই অপমান সহ্য করা···এই একটা পথের মেয়ে আমার সম্পর্ক ছিনিয়ে নিতে পারবে না—ওঠ, চল···

মীনা আবার হাহা হাহা হাহা করে হেসে উঠল—

ও হরি! স্বামী ত্যাগ করে এল তাতে অপমান হ'ল না, অপমান হ'ল পথের মেয়ের কথায়। দিদি! রূপত' দুর্গা পিরতিমের মত—কিন্তু শিব যদি কুচনী পাড়ায় আসে, তাতে কার দোষ? তোমার শিবের না দুর্গার···তোমার স্বামীকে লোপাট করবার জন্যে আমার ত' আর ঘুম হচ্ছে না···নিয়ে যাও না দিদি! আমিত আঁচলে গেঁট দিয়ে রাখিনি···

জয়ন্ত ঘরের ভেতর একবার এদিক ওদিক করে—ফিরে দাঁড়িয়ে বললে. ভোলা—তোর হুস্তি দীঘ্যি জ্ঞান লোপ হয়েছে·· না?···

ভোলা হেসে বললে···এ রকম ব্যাপারে কারও হুস্তি দীঘ্যি জ্ঞান থাকে বলে মনে হয় না—তোর যে অনেক দিন

আগেই সে জ্ঞান লোপ পেয়েছে তা জানতাম না, এখন চাক্ষুস দেখছি।

আমি বোন দিদিকে সঙ্গে করে আনিনি, সে আপনি তোর খোঁজে এসেছে।

মিলনী সহজ ভাবে বললে :

না আমি একলা আসিনি, মানবকে সঙ্গে করে এসেছি···তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার মীমাংসা করতে ও তোমার বাড়ী নিয়ে যেতে। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি আমার সঙ্গে বাড়ী যাবে কি না?

শেষ অক্ষরটাই আমার জবাব।

এর পর তা'হলে কিন্তু আমায় আর দোষ দিয়ো না। এখনও বলছি চল ··

মীনা আবার তেমনি হাহা হাহা হাহা করে হেসে উঠল :

ও ভোলাদা'—এখনও আবার দোষ দেবার বাকী রইল নাকি—হাহা হাহা হাহা···

জয়ন্ত বললে : ভোলা তোমার বোন দিদিকে পৌঁছে দাও গে···

মিলনী বললে—আমি তাহলে মানবকে তোমার সামনে ডেকে নিয়ে আসি—সব কথার মীমাংসা হয়ে যাক্···

জয়ন্ত অত্যন্ত উগ্র মূর্ত্তিতে জোর গলায় বলে উঠল।

বিধাতাকে সাক্ষী এনে দাঁড় করালেও আমি কোন কথা শুনব না, তুমি এখান থেকে যাও—এর পর আর Scene create ক'র না···

মীনা বললে···

তোমার হয়ে অভিনয়টা আমিই না হয় দেখিয়ে দেব দিদি?···পিস্তল হাতে নিয়ে তাল বেতালে নাচ্···কি বল··· কিগো···

বলেই আবার হাহা হাহা হাহা করে হেসে উঠেই সুর করে গান ধরলে

ঝন-রন বাজে ঝঞ্ঝা মেহে···

(সজনি লো) ঝন রন বাজে ঝঞ্ঝা মেহে···

মিলনী মীনার গান ও কথায় কান দিলে না—সে বললে—ভোলা দা—ফিরে চল, আমায় গাড়ীতে পৌঁছে দেবে ···ফিরে চল—

ভোলা বললে : চল বোন দিদি! Nasty gibberish ···হুঁ এখন বুঝতে পারছি ··শালা মদের নিকুচি করেছে··· সব বুঝতে পারছি···সব মাতাল—

মীনা বলে উঠল—এতক্ষণে বুঝতে পারলে ভোলা দাদা— হাহা হাহা—কি আশ্চর্য্য! তুমি একজন অসম্ভব intellectual বুদ্ধিমান লোক ত ভোলাদা! আমি কিন্তু এখনও এর কিচ্ছুই বুঝতে পারলাম না; ভোলদা···One must confess the truth · সত্য কথা বলাই ভাল। কিন্তু সংসারটা কি রকম ব'নে গেছে যে, কিছুতেই সত্যি কথাটা মানুষ মুখ-খুলে চোখ-মেলে বলেও না···আর বললেও লোকে তা বিশ্বাস করে না—পোড়া মানুষের কেমন মিছে—অবেশ্যের সখ ··

ভোলা যাবার সময় বলে গেল···চললুম্ জয়া··কিন্তু··· না থাক্···এমন জানলে কোন্ শালা এ কাজে হাত দেয় ·· Nasty gibberish!

ঘরের দরজার কাছে গিয়ে মিলনী মুখ ফিরিয়ে বললে,

হ্যাঁ—একটা খবর দিয়ে যাই যে কাল সকালে মা— আর কাকামশায় কলকাতায় আসছেন।

মা—আর কাকা?—

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে—শশুরের ভয় অনেক দিন ভুল হয়ে গেছে—মা কাকার ভয়ও আমার নেই— যাও—যাও···

না সে ভয় তোমার নেই তা জানি, থাকবে কেন? লোক-লজ্জা মানসম্ভ্রম সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে এখানে নইলে পড়ে আছ। তা বুঝেছি·· কিন্তু একথা তোমায় আবার জানিয়ে যাই···এই বাড়ী ছেড়ে তোমায় আবার একদিন আসতে হবে—আসতে হবে—যে সম্পর্ক আজ নেই বলে গরব দেখাচ্ছ সেই সম্পর্কের জন্যে আবার তোমায় লালায়িত হতে হবে ··এই ডাইনীর মন্ত্র সেদিন খাটবে না··যদি আমি সর্ব্বেশ্বর রায়ের মেয়ে হই, যদি কোন দিন তোমাকে স্বামী বলে পূজো করে থাকি ..পৃথিবীর কোন সতী বা অসতীর সাধ্য নেই যে—সে আমার কাছ থেকে তোমায় কেড়ে নিতে পারবে।

মীনা তেমনি হাহাহাহা ক'রে হাসতে হাসতে বললে : ওমা! কি চমৎকার, দিদি তোমার বরটী একেবারে out হয়ে গেছে দেখছি, তা—তুমিও ওকে একেবারে out করে দাও না ভাই। কি বল ভোলাদা—আমরা সবাই এই

খেলায় একেবারে out হয়ে গিছি না—হাহা হাহা হাহা—সবাই বকে গেলাম। তাইত দিদি ..সবাই out… কিন্তু দিদি ভুল করেছ—ডাইনীর মন্ত্র 'এখন পড়িনি—পড়লে তোমার বরটী এতক্ষণে বানচাল খেয়ে যেত…তবে তুমি বলে যাচ্ছ দেখা যাক, ডাইনীর মন্ত্রে কি হয়…

ভোলা রায় মীনার দিকে শুধু—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে তাকালে, বললে—হুঁ!

আর কিছু বললে না—মিলনীকে নিয়ে তখনি চলে গেল।

মীনা তখন আবার খুব একচোটে হেসে নিয়ে, তখনি চোখ মুখের নতুন ভঙ্গীতে আবার গান ধরলে :

আকাশ ঘিরে জাল ফেলে সই
চাঁদ ধরেছি এ বুকে পেতে,
মীন কেতনের উড়বে ধ্বজা
পারবে না চাঁদ ছেড়ে যেতে।…

জয়ন্ত গান শুনতে-শুনতে আবার ঢক্-ঢক্ ক'রে মদ্য পান করতে লাগল… একবার করে সেই সোফায় বসে পড়ে, আবার খানিক করে মদ খায়। মীনা গানই গেয়ে যায়—সুরের তরঙ্গে ঘরটা ভরে ভরে ওঠে। বাইরের ঝঞ্ঝার রোল, বৃষ্টির ঝম ঝম, বাজের কড়কড় সুরের খেলার মাঝে আঘাত করলেও বাধা দিতে পারছে না—লীলায়িত লীলাভঙ্গে সুর মীনার কণ্ঠে খেলে যায়…গাইতে গাইতে মীনা জয়ন্তের কোলের ওপর তার দেহলতা দুলিয়ে এলিয়ে দিলে। দুই বাহু দিয়ে জয়ন্তর কণ্ঠবেষ্টন করে তার মুখখানা নমিত করে আনলে—সাইকী যেমন ইরসের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বুকের 'পরে টেনে আনে—আলুলায়িত অসংবৃতবাসা রতি যেমন কন্দর্পকে তারই বান ফিরিয়ে দেবার জন্যে কণ্ঠলগ্ন হয়ে অধরস্পর্শের আবেগ স্ফুরিত করে, মীনা যেন ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে জয়ন্তর মুখখানা তেমনি করে আকর্ষণ করলে। শরীরের উত্তমাঙ্গ জয়ন্তর কোলে—অনাবৃত বক্ষ, নিঃশ্বাসের সঙ্গে উঠছে নামছে—তার উপর নৃত্যের শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু—কণ্ঠকে টান করে মুখ মাঝে মাঝে তুলছে—তার আঁখি যেন বলছে পিয়ো, পিয়ো, জীবনভরা আবেগে যত মধু, সবই আজ তোমারি জন্য, নাসিকা ঘর্ম্মবিন্দুর সঙ্গে মাঝে মাঝে বিস্ফারিত হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে, আঁখি যেন কোন্ স্বপনের রাজত্বকে অনুভব করছে—শুধু তার অনুভূতি মাত্র এখন স্পর্শ হয়নি… যেন গাঢ় নীল ঘন সাগরের বুকের উপর সাগরের জলজ ফুল ও আকাশের তারা—দুজনেই স্বপনের ঘোরে অজানা আলোক খুঁজছে। জয়ন্ত আকুল হয়ে মীনা মীনা মীনা বলে আবেগে তাকে বক্ষে ধরলে, সিক্ত ললাটে অধর স্পর্শ হ'ল। ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে গেলে ধনু যেমন সুতীব্র বেগে ছিটকে পড়ে, অধর স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে মীনা জয়ন্তর কোল থেকে লাফিয়ে উঠে সরে গেল। অসংবৃত বস্ত্র সংবৃত করে সর্ব্ব অঙ্গ ত্বরিতে আবরিত করলে। একবার জয়ন্তর মুখের দিকে চেয়ে বললে :

না—না—না…উঃ!…না—না…

জয়ন্ত উঠে এসে মীনার হাত ধরতে গেল। মীনা সজোরে সে হাতখানা ঠেলে ফেলে দিয়ে বললে…যাও—যাও—যাও…না…

জয়ন্ত কেমন যেন ভীত, তবু দু হাত বাড়িয়ে—আবার বললে…

মীনা!

মীনা সোজা উঠে সে কক্ষ থেকে চলে গেল। জয়ন্ত অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষুকে যতদূর টেনে দেখা যায় সেই ভাবে, মীনার চলে যাওয়ার পথে তাকিয়ে রইল। বাইরে শ্রাবণ গহিন মেঘের ধারা—ঝম ঝম্ ঝম ঝম্ বর্ষণ করছে—জয়ন্তর কানে এল—বাইরে গিয়ে মীনা তখন গাইছে…

হিলি-মিলি খেলত হো বিজরী।
নাগিনী চলত যহু গমক ভরি॥
আব বাদেরা হো।…

জয়ন্ত কিছুক্ষণ ভীত ও ক্ষুব্ধভাবে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সে ভাবতে লাগল এটা কি হ'ল? যে কুসুমায়ুধ তার ত্রিভুবন বিজয়ী বানে ত্রিপুর বিজয়ী মহাসংযমী মহেশ্বরকে বিচঞ্চল করেছিল—যে মদন, হরকোপানলে দগ্ধ হলেও—পিয়াল ফুলের মঞ্জরীর—রেণু বাতাসের বুকে ছড়িয়ে পড়ার মত সেই ভস্ম যে ছড়িয়ে গিয়েছিল সে ত ব্যর্থ হয় নি। আজও তা ব্যর্থ হবে কেন? মদোন্মত্ত জয়ন্তের দেহে ও মনে এক অপূর্ব্ব নব চেতনাময় কামান্ধতার জাগরণ আক্ষেপে ও বিক্ষেপে প্রকাশ হয়ে উঠল। সে ছুটে বাইরে গিয়ে মীনার হাত ধরে ফেললে।

মীনা হাসতে হাসতে বললে :

বাঃ ডাইনীর মন্ত্র দেখছি জাগ্রত···বাঃ ··ঠিক ঠিক মন্ত্র কাজে লেগে গেছে, বাঃ তোমার বউ এখন সামনে দাঁড়িয়ে যদি দেখত কেমন বেশ হ'ত না।

তুমি ঘরে এস !

কেন বলত···কি দরকার গা ?···

যাবে না ?

যাব বলেই ত' ধরা দিয়েছি, এই ত আমার খেলা···

জয়ন্ত তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আসতে লাগল।

মীনা মুখ টিপে হাসতে হাসতে অতি সহজ পদক্ষেপে ঘরে ফিরে এল।

ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে :

বোস বোস, স্থির হও · অত উতলা কেন—পালাই নি গো—পালাই নি...

বোতল থেকে মদ ঢেলে জয়ন্তর মুখের কাছে ধরলে। স্বেদসিক্ত ও বিকম্পিত ললাটের স্ফীত শিরার উপর একবার হাত দিয়ে গেলাসটা নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে পান করলে।

মীনা তেমনি মুখ টিপে হাসতে হাসতে জয়ন্তর মদ্যপান করাটা বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে বললে :

বাঃ ! মদটা বেশ জিনিষ না ? তার ওপর মেয়ে মানুষটা—আরো বেশ ! কেমন না ?

মীনা·· কই ?

এই যে গো ! আচ্ছা তুমি কি চাও ?

তোমায় চাই ··

ওই মদের মত—না মদের গেলাসের মত নেশা ছুটলে মদেরও দরকার হয় না গেলাসও ফেলে দিলেই হয়। ভাঙলে নতুন গেলাস মেলে ··কি ব'ল।

জয়ন্ত মিনতির সুরে বললে—মীনা এস !

রোস তোমার বউ বলে গেল সতী অসতী কেউ তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না···কই তাত বোঝা যাচ্ছে না—মনে হচ্ছে, তুমি বউকে ফেলে এখানে সেই বউয়ের ভালবাসার স্বাদ মেটাতে চাচ্ছ···সে ত' তা বলে গেল না··· সে ত' ডঙ্কা-নিশান তুলে ·

মীনা ও-সব বাজে কথা রেখে দাও···আঃ !

তাই ত কাজের কথাটা কি শুনি··তোমার বউ যে বলে গেল গো—সতী অসতী কেউই···

আঃ ! তুমি এস না ! এস ! আঃ !··

তাইত ডাইনীর মন্তর ত' কম জাগ্রত নয়, একেবারে এক চুমকুড়িতে বোল্ ফুটে গেল যে চুপ করে বস দিকিনি ওইখানে···

আবার মদ ঢেলে দিয়ে বললে : নাও, ধর···

জয়ন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে আবার ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিলে।

শোন, আমায় নিয়ে কি করবে ? আমায় নিয়ে তোমার ঘর করা হবে না ··

কেন ?

তোমার বউ আছে।

না ত্যাগ করেছি।

করনি ·

করেছি ··দু'দিন পরে ডিভোর্স হবে।

হবে না ··ডিভোর্স তোমার বউ তোমায় ভালবাসে, এটা বোঝ না কেন ? নইলে সতী লক্ষ্মী এই বাড়ীতে পা দেয়—ভরসা করে, আবার যার ওপর তুমি সন্দেহ কর তাকে সঙ্গে করে আসতে পারে—অসতী··যার ভেতরে গলদ থাকে সে কখন এত বড় বুকের পাটা ধরতে পারে··· তোমায় আর কি বলব, তুমি একটা আহাম্মক, তাই ভুল করে কাঞ্চন ফেলে আমার মত একটুকরো ভাঙা কাঁচ কাপড়ের খুঁটে গাঁট ছড়া বাঁধতে চাও। এমন বোকা ত' মেয়ে মানুষেও হয় না—তুমি পুরুষ মানুষ !

তুমি ভাঙা কাঁচের টুকরো নাকি ? আমি ত দেখছি একটা গোটা মানুষ ·

নেশা নেশা পরকোলা পরেছ চোখে···

বলেই দেরাজটা টেনে খুলে একটা লম্বা ছোট চোঙের মত বার করে নাড়া দিয়ে এক চোখ বুজে দেখলে—দেখে হাসতে হাসতে সেইটে জয়ন্তর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেখ দিকিনি—এতে কি দেখছ :···

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে · ছেলেদের খেলা—ভাঙা কাঁচের ফুল —

কাঁচের রঙিন ফুল ওতে আছে ?

না—নাড়লেই এই রকম টুকরো কাঁচে ফুলের মত দেখায়।

টুকরো কাঁচে ফুলের মত দেখায়—আসলে ত আর ও-গুলো ফুল নয়—

না।

এখন বুঝতে পারলে ?

কি বুঝব ?

ওই রকম টুক্‌রো কাঁচের রঙিন ফুল—তোমার বউয়ের মত অমন আগোটা ভাল শুদ্ধ, সত্যি ফুল নই।

যাও যাও রসিকতা ক'র না···

তুমি ত রসিক নও—তা'হ'লে রসিকতা করতাম ; তাই তোমাকে সত্যিটা বোঝাতে অত চেষ্টা করছি—তুমি কিছুতেই তা বুঝবে না। আমি কে জান, আমি একটা পথের মেয়ে, সমাজ আমাকে জায়গা দেয় না, দেবেও না।

কেন দেবে না, আমি তোমায় বিয়ে করব—ধর্ম্মমতে—

ধর্ম্মমতে ত' বিয়ে করেছিলে—তবে তার সঙ্গে তুমি অধর্ম্ম করলে কেন ?

আমি অধর্ম্ম করিনি, সে করেছে।

সে করেনি, তুমিই করেছ ; এখনও করছ···অধর্ম্মের অত বড় সাহস হয় না -

কে বললে তোমায় ?

বলবে আবার কে, নিজেকে দিয়েই মানুষ বুঝে নেয়।

তুমি যে ভুল বোঝনি তার প্রমাণ ?

তার প্রমাণ দিতে পারি কিন্তু···

কিন্তু কেন প্রমাণ দাও···

দেব কিন্তু সে প্রমাণ পেলে তুমি সহ্য করতে পারবে না. একবার দিতে গিয়েছিলাম তুমি শোন নি ··

বল, শুনব, আমি জানোয়ার নই—প্রমাণ পেলে নিশ্চয়ই মেনে নেব।

তুমি যে জানোয়ার নয় মানুষ তা আমি জানি, জানোয়ারকে খেতে দিয়ে ছেকল বগলসে আটকান যায় ··· মানুষ বলেই ছেকল বগলসে আটকান যায় না···

বাজে কথা রাখ, কি প্রমাণ দেবে দাও !

দিব্য কর যে প্রমাণ পেলে বাড়ীতে যাবে ?

মীনা, তুমি আমায় সকল রকমে উন্মত্ত করেছ, যখনি তোমায় আপনার মনে করি তখন তুমি প্রজাপতির মত রঙিন পাখা ছড়িয়ে উড়ে যাও --তখনি বল বাড়ী যাও···তুমি জান যে আমি বাড়ী যাব না ··

আজ না যাও দু'দিন পরে যেতেই হবে ?

কেন পেটের ভাতের জন্যে ?

কুচনীপাড়ায় শিব গেলে কি হবে—শেষে সেই ভিক্ষের ঝুলি বগলে করে অন্নপূর্ণার দরজাতেই ফিরে আসতে হয়েছে। হারে পাগল! শোন আগে, প্রমাণগুলো শুনে নাও—চোখ কান খাড়া করে শোন···তারপর তুমি যা বলবে, আমি তা হয়ত মানতে পারি।

কি ছাই তোমার প্রমাণ তাই বল !

কেন আমি নিজেকে ভাঙা কাঁচের টুকরো বলেছি শুনবে ··শোন ! একদিন তোমায় আমার জীবনের কথা বলতে গিয়েছিলাম—তুমি ভাল করে শুনতে চাও নি··· আমিও আর তারপর বলিনি ·

দেখ মীনা --আমি আজও বুঝতে পারলাম যে তুমি কি ?

হয়ত কোনদিনই বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না। যাকগে তোমার সঙ্গে মিছে আর বকাবকি করতে পারব না।

বলেই বোতল থেকে মদ গেলাস ভর্ত্তি করে ঢাললে—ঢেলে আবার জয়ন্তর মুখের কাছে ধরলে। জয়ন্ত একবার মীনার মুখের পানে চেয়ে তারপর চীনারা যেমন সানক্ বলা মাত্রেই এক চুমুকে গেলাস নিঃশেষ করে, জয়ন্ত এক নিঃশ্বাসে সমস্ত মদটা পান করলে। সঙ্গে সঙ্গে সোফায় ঢলে পড়ল। মীনা তাড়াতাড়ি কুসনটা তার মাথার নীচে ঘাড়ের পাশে দিয়ে ভাল করে শুইয়ে দিলে। কামোন্মত্ত বিকারগ্রস্ত জয়ন্ত দু'বার শুধু মীনা—মী ··না' শব্দ উচ্চারণ করে নেশার ঘোরে অভিভূত হয়ে পড়ল।

রাত্রি তখন প্রায় দু'টা। আহত সর্পিণীর নিঃশ্বাস ফেলার মত মীনা একবার ফোঁস ফোঁস করে উঠল। তারপর উঠে দাঁড়াল। জোর আলো দু'টো নিভিয়ে দিয়ে কম বাতির আলোর ঢাকাটা লাগিয়ে দিয়ে চুপ করে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে রইল। আবার একটা শ্বাস ফেললে। ঠোঁট চাপা—অতি কঠোর দুঃখের মূর্ত্তি।

উঃ সুখে থাকতে মানুষকে কি রকম ভুতে কিলোয়। ইচ্ছে করে কম অশান্তি ত' সৃষ্টি করলাম না—এর শেষ কোথায় ? জীবনে কেউ কোন দিন প্রিয় হয় নি, কিন্তু তুমি প্রিয়তমের অধিক প্রিয় হয়েছ। এ যে কতখানি আমার ভালবাসা—তা আমি জানি আর জানে অন্তর্যামী। আমি কি করে তোমার এ ভুল ভাঙব—রাস্তা পাচ্ছি নি। আমি যে সত্যি ভালবেসেছি, আমি ত ভুল নিয়ে ব্যাসাতি করতে দেব না। ভাগ্যদোষে বা কর্ম্মদোষে ইহকাল ত' অনেকদিন

গেছে···পরকাল আছে কি নেই কে জানে·· আর তোমাকে ডুবিয়ে ভাগ্য ও কর্ম্মকে এত হেনস্থা করব না। ঘুমাও প্রিয়তম! ঘুমাও! আজ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তোমার কাছে—এমনভাবে নিজের কদর নষ্ট করব না। আজ তোমাকে অন্তরের মধ্যে পেয়ে সে জয়কে আমি সার্থক করব। আর সতী লক্ষ্মী দিদি! তোমার সাহসকে ধন্য, তোমার বুকের বলকে ধন্য, তোমার সত্যকে ধন্য—অপরাধ! রহস্য করার অপরাধ নিয়ো না দিদি! তুমি আমার নমস্য—তোমায় বার বার নমস্কার করি।

মীনা গলায় বস্ত্র দিয়ে মিলনীর উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম করলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। তারপর জানালার পদ্দাগুলো টেনে দিয়ে দরজার লক্ বন্ধ করে চলে গেল তার সেই অন্ধকার ড্রয়িংরুমে।

* * * *

সে রাত্রিতেও আগের মত সোফা থেকে একটা কুশন টেনে নিয়ে তেমনি অন্ধকারে মীনা শুয়ে পড়ল। মদ্যপান-জনিত অবসন্নতা, অস্বাভাবিক উত্তেজনাজনিত ক্লান্তি। নিবিড়তম দুঃখজনিত আবেগ—সব মিশে এক হয়ে গেছে··· অতি অবসাদে। চোখের পাতা আপনি বুজে এল। তন্দ্রাচ্ছন্ন মোহের মাঝেও তেমনি ক্ষুব্ধা সর্পিণীর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

বাইরে—গহন ঘন মেঘে নিশির তিমিরের যে অন্ধঘন প্রাণের স্ফুরণ, তা তার সেই অন্ধকারে সৃষ্টির আবর্ত্তনের মধ্যেই ঘূর্ণীপাক খেতে লাগল। রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতা ঘনশব্দ বিক্ষুব্ধা রাজধানীর সে অন্ধকারে তার মুখরতা বর্জ্জন করেছিল। শুধু মাঝে মাঝে ক্ষীণ নারীকণ্ঠের বেদনার সুরের গান আর পথচারী মোটরের বিকৃত সুরের হর্ণ—কখনও শোনা যায়·· আর বাড়ীর অনতিদূরে ডোমেদের বস্তি থেকে অতি রুক্ষ কর্কশ তীব্র হাহাকারের মধ্যে নর-নারীর মদোন্মত্ত কলহের বিকৃত নিখাদ সুরের ভাষা।

এগার

জয়ন্তর কাকীমার আসবার কথা ছিল পরদিন প্রাতে, কিন্তু এসেছেন সেই রাত্রেই। সুজনবাবুও এসেছেন। তাঁদের ঘর-দরজা ও অন্যান্য ব্যবস্থা মণিদাসী সব ঠিক করে রেখেছিল। জয়ন্তর কাকীমার বয়স প্রায় পয়তাল্লিশ বছরের কাছাকাছি হলেও—তাঁর চেহারায় সে বয়স একটুও বোঝা যায় না!—অতি গম্ভীরপ্রকৃতির মহিলা—কাকেও কোন রূঢ়-কথা জীবনে কখন বলেন নি, অথচ সংসারে—দেশে, অতবড় জমিদারবাড়ীর কেউই কোন দিন তাঁর মুখের সামনে বা আড়ালে কোন কথা বলতে সাহস করত না, আজও করেনা। এক কেবল মণি দাসীই, তাঁর সম্মুখে বকর-বকর্ করার স্পর্দ্ধা রেখেছে—আর কেউই পারে না। মণি এসে প্রণাম করতেই কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন:—"হ্যালা মণি! এ সব কি শুন্‌ছি? তোকে যে আমার ছেলে—বউকে দেখবার জন্যে বাড়ীর গিন্নী করে' রেখে গেলাম, তা

মণি একেবারে থরহরি-বিসহরির মত গর্জ্জে উঠে বললে:—"দাসী বলেই ও-কথা বলতে পারলে মা, তা নাহ'লে বলতে না···আর আমি না হয় জয়াকে মায়ের দুধই দিয়েছি—তুমি যদি সত্যি মা হতে তাহ'লে তুমিই কি ছেলে বউ ফেলে থাকতে পারতে মা? বলত শুনি?"

—"তাইত' লো, তুই যে আমাকেও ধমক দিতে চাস্···"

—"ধমক দেব না কেন বল · ধমক খাবার কাজ করলে সবাই ধমকায়, তুমিই বল দিকিনি মা—আমার কথা কে শোনে···আর শুনবেই বা কেন বাছা···আমি দাসী বইত' নয়।"

—"তা এদের ব্যাপারটা কি আমায় বলতে পারিস?"

—"বলব কি মা—এক হাতে ত' আর তালি বাজে না—দোষ তোমার ছেলে বউ দু'জনেরই। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অত মেলামেশা গান-বাজনা-খাওয়া-দাওয়া ··সবাইই উচাঙ্গা—ডবকা বয়েস—বল মা · হ্যাগা, তা তাদের বেচাল হবে নি? হতেই হবে। বলে মেয়ে-মানুষের পায়ের লেগে বেহ্মা-বিষ্টু ঘোল খেয়ে যায়—আঁা!"

—"বন্ধু-বান্ধবটা কে?"

"কেন? তোমাদের মানা গো—ওই মানববাবু জয়ার কি বলে·ওই বুজুম্ ফেরেম।"

কাকীমা 'বুজম ফ্রেণ্ড' শব্দটা শুনে ঠোটের ফাঁকে একটু হেসে বললেন,—"তা তোর 'বুজুম্ ফেরেম্' করেছে কি?"

—"তা আমি কইতে পারব না—তবে বউদিদি যে-ভাবে একলা তার সঙ্গে বসে গল্পগাছা হাসিঠাট্টা···মায় কান্না-রান্না—করে, তাতে ভাল ঠেকে না মা—আমি সত্যি

কথাই কব। গেরস্তর বউ—ওমা—একি গো—সোয়ামী রইল বাইরে আর…”

—“তা তুই বলিস নি কেন? আমাকে জানাস নি কেন?”

—“আমি কি বলব মা—ও হরি! আর আমার কথা শোনেই বা কে?…আর কাকে গিয়ে এ-সব কথা বলব।”

—“রাত ত দশটা বাজে · বউ গেছে কোথা?”

—“বললে—মা আসবেন কালকে—ঘরটর সব ঠিক করে গুছিয়ে রাখিস—আমি বাবার কাছে যাচ্ছি। তোমার আসবার একটু আগেই গাড়ী সেখান থেকে ফিরে এসেছে।—”

—“বউ কি তার বাবার কাছে আজ থাকবে বলে গেছে?”

—“না না, তা আমায় বলে যায় নি। ইষ্টিশন্ থেকে তোমা আসতে দেওয়ানজী যখন তোমাদের আনতে যায়—তার একটু আগেই সেজে-গুজে গাড়ী নিয়ে চলে গেল।”

—“জয়া বাড়ী আসে না কতদিন?”

—“তা মাসেক খানের ওপর দু'মাস প্রায় হবে গেল। মাঝে একদিন সন্ধ্যের সময় মদে চুরচুরে হয়ে এসে—বৌদিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে—টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়; তারপর থেকে আর আসে নি।”

—“তুই আমায় ভাবিয়ে তুলালি মণি! এতটা হয়েছে তা জানতে পারিনি…সে তা—বলি—জয়া যেখানে পড়ে থাকে সেটা কে? জানিস্?”

—“কে তা কি করে জানব মা—তবে সাধুচরণ জয়ার কাপড়-চোপড় দিতে গিয়েছিল, সে দেখেছে—সে বলে—মণি দিদি! একেবারে জ্যান্ত পরী বলেই হয়!”

—“তোর কি মনে হয় যে বউয়ের চেয়ে দেখতে সোন্দর বলেই…”

—“না—মা…তা নয়…বউ কি কম সুন্দরী গা—দুগ্গা পীরতিমে বললেই হয়। তা নয়…”

—“তবে?”

—“এ আরো কিছু ব্যাপার আছে মা! সে ব্যাপারটা মা আমি ধরতে পারি নি: তবে সে মাগী যে ডাইনীর মন্তর জানে—এ নিশ্চস্। নইলে আমার জয়াকে বাঁধতে পারে মা—সে? আমার দুঃখ হয় না মা, আমার মায়ের দুধের অপমান! বিশবছর বয়সে সোয়ামী পুত্তুর হারিয়ে তোমার আশ্রয়ে এসেছি · আমার মায়ের দুধের অপমান!”

কাকীমা চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর বললেন:—“মণি? যদি দাওয়ানজীকে দিয়ে—আমায় এ খবর আগে দিতিস্—আসল কথাটা ত' বুঝতে পারছি নি।”

—“দাওয়ানজীর কাছে এ-সব কথা কইতে পারি—ঘরের বউয়ের কুচ্ছ করা—বল কি কাকীমা!”

কাকীমার মনে মণির কথায় একটা দারুণ আঘাত লেগেছে—তুমি যদি সত্যি মা হতে,—সে মাই দিয়ে—জোর বেশী খাটাতে চায়। নিজের সন্তান না হলে মানুষের কতখানি দুঃখই হয়।

—“আসল কথা মা, আমার মনে হয় বউয়ের ওপর জয়ার মন ভেঙেছে…মা! ভাঙা মন সহজে কি জোড়া লাগে?”

—চল দেখিগে—ঢের রাত হয়ে গেছে—একে গাড়ীতে এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন—মা ঠাকুরকে খাবারের তাড়া দিগে। · কিন্তু কি করে ভাঙল—কেন ভাঙল!”

কাকীমা গম্ভীরভাবে চিন্তান্বিতের মত ধীর পদক্ষেপে সুজনবাবু যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাওয়ানজী ও সুজন বাবুর কথা শুনতে শুনতে ঘরে এগুলেন।

সুজনবাবু যে ঘরে বসেছিলেন সেখানা প্রকাণ্ড ঘর। তেমনি সাজান—তার চেয়ে সাজান চেহারা সুজনবাবুর। সুজনবাবু একটা প্রকাণ্ড কৌচের ওপর মখমলের তাকিয়া ঠেস দিয়ে পা-ছড়িয়ে বসেছিলেন। একখানা পাতলা শালের কাপড়ে গাটা ঢাকা। সুজনবাবুকে দেখ্‌লে মনে হয় বয়সকালে তিনি সত্যিই অপূর্ব্ব সুপুরুষ ছিলেন। শুধু সুপুরুষ নন, বেশ বলশালী ছিলেন। বয়স পঞ্চান্নের কোঠায়। চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু সেই যৌবনের যে বাবরী তা ঠিক আছে, মাথার ঠিক মাঝখানে সিঁথে কাটা থাক-থাক ঢেউখেলান চুল। পাকা গোঁফ তেমনি চোমরান—কানের পাশে সরু গালপাট্টা গালের সঙ্গে মেলান। সুজনবাবু কাত হয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে রূপার গড়গড়ায় তামাক টানছেন, আর দেওয়ান রামশরণ চক্রবর্ত্তী তাঁর সামনে একখানা চেয়ারে বসে কথা কইছেন। সুজনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন:—“তাহলে, দাওয়ানজী কি বলতে চাও যে ওই ভোলাই ওকে এই পথে নিয়ে গেছে?”

—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে ছোটবাবু। এ হলপ করে বলতে পারি।"

—"কিন্তু উঁহুঁ! আমি ভোলাকে ছেলেবেলা থেকে জানি, ওর বাপ মাতাল ছিল বটে কিন্তু কখন কোন অন্যায় সে করেনি। ভোলা বাপের মাতাল রোগ পেয়েছে তা আমি জানি, কিন্তু সে যে জয়াকে খারাপ পথে নিয়ে যাবে—এ কথা তোমার—আমার কিন্তু মনে নেয় না দাওয়ানজী। ভোলা লোক খারাপ নয়।"

—"তা ছোটবাবু তুমি যদি আমার যুক্তি না মান—তর্ক করতে চাইনে, এই ভোলাও সেখানে পড়ে থাকে দিনরাত মদের নেশায়—এসব খবর আমি পেয়েছি।"

—"হুঁ! তুমি কোন রকমে জয়াকে আমার কাছে একবার আনতে পার?"

—"না এলে জোর করে কি করে আনি বল। সে ত' আর কচি খোকাটা নয়। তবে বলত' একবার দেখতে পারি।"

—"না হলে আমাকে সেখানে যেতে হয়। আমার নিজের ছেলে নেই, কর্ত্রী তাকে নিজের ছেলে বলেই নিয়েছেন—তারপর সে দাদার একমাত্র সন্তান- রামপুরের জমিদারবংশের একমাত্র পিদীম—বুঝতে পাচ্ছ রামশরণ—আমার বংশের ছেলে মাগী নিয়ে নটী নিয়ে নাচবে বা নাচতে যাচ্ছে—ঘর-বাড়ী ছেড়ে সেই অস্থানে পড়ে থাকে—এ আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নি—আর আমার মান ইজ্জত হাটে লুটবে—ওঃ! তুমি বুঝতে পাচ্ছ না দাওয়ানজী—এ পাপ-বুদ্ধি কোন্ ফাঁক দিয়ে এল তা আমি বুঝতে পাচ্ছি নি··· নিজের ছেলের চেয়েও জয়ার জন্যে দায়িত্ব আমার আরো বেশী··· দাদা মৃত্যুকালে তোমারই সামনে, মনে আছে?—আমার হাত ধরে বলে গেছেন। বৌ-দিদি ঠাকরুণ—হাত ধরে কেঁদে কি বলেছিলেন, তা আমার চোখের ওপর আজও ভাসছে, আমি এখন তাঁর সে মমতার কথা—সেই মৃত্যু-কালের ক্ষীণস্বর শুনতে পাচ্ছি।···

সুজনবাবুর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সেই সময় আনন্দময়ী ঘরে ঢুকলেন। বললেন:—"ছেলের জন্যে হা-হুতোশ করলে ত' হবে না, রাত হয়েছে—এখন খেয়ে নেবে চল, তারপর কাল সকালে যা-করবার তাই করব। শুধু-শুধু ভেবে কি হবে?

রামশরণ আনন্দময়ী এসে কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন:—"হ্যা ছোটবাবু! তুমি ক্লান্ত আজ বিশ্রাম কর। একে তোমার শরীর ভাল নয়।"

—"যে খবর তুমি আমায় দিয়েছ দাওয়ানজী—তাতে শরীর আর মনে আগুন জ্বলছে ক্লান্ত আমি নই। আমার ভেতরে সেই রামপুরের জমিদার গর্জ্জন করছে।"

সুজনবাবু উঠে বসলেন। রামশরণ চলে গেলেন। সুজনবাবু আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন:—"বৌমাকে দেখছি না কেন?"

—"সেত জানে না যে আজই আমরা আসব—সে আজ বাপের বাড়ী গেছে। কাল সকালে আসবে।"

—"আমি এসেছি সেটা রায়-মশায়কে জানানো হয়নি?"

—"দাওয়ানজী ফোন করে জানিয়েছে নিশ্চয়।"

—"আমার আসা বৌ-মা তাহ'লে নিশ্চয়ই শুনেছেন—শুনে তিনি চলে এলেন না, এটা কি রকম কথা?"

—"রাত হয়ে গেছে এর আবার কথা কি? বাপের বাড়ী গেছে, সকালে গাড়ী যাবে নিয়ে আসবে।"

—"আনন্দময়ী! আমার কাছে কি যেন লুকাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।"

"নাও কথা, কি আবার লুকাব? তোমার কি ছেলে-ছেলে ক'রে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

—"মাথা খারাপ নয় আনন্দময়ী! মাথা-কাটা গেছে, আমি রামপুরের ছোটবাবু। আনন্দময়ী বুঝতে পারছ না, আমার বাড়ীর ছেলে ইতর ইতর হয়েছে··· ওঃ! কোথা দিয়ে এ পাপ ঢুকল··· কোন ছিদ্র দিয়ে আমার বংশে কলি প্রবেশ করেছে—বুঝতে পারছ!"

—"তুমি অমন করছ কেন···সব ভাল হয়ে যাবে—উতলা হওয়া তোমার কেমন স্বভাব!"

—"তুমিত জান আনন্দময়ী যে কেন উতলা হচ্ছি। টাকা আজ আছে, কাল না থাকতে পারে, তাতে ভয় পাইনে, জমিদারী আজ আছে কাল না থাকতে পারে—তাতে দুঃখ করব না—বাংলা দেশে কত বড় বড় জমিদারের ধর মুছে গেছে—কেন গেছে জান—যেদিন তারা হ'য়ে ইতর হয়েছে, যেদিন তারা ব্যভিচার করেছে, যেদিন অধর্ম্ম করেছে, যেদিন তারা পশ্চিমের অনুকরণ করে

নিজেদের ঘর ভেঙে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আজ আমি সেই আগুনের লাল আভার রক্তমাখা ছায়া দেখতে পাচ্ছি।…"

—"অত ভাবছ কেন? কালে-কালে সবই বদল হয়।"

—"হয়, শুধু-শুধু হয় না, তার কারণ থাকে, তবে কার্য্য হয়। যাক্ চল…"

সুজনবাবু পাশের ঘরে যেতে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি শুয়ে পড়লেন। আনন্দময়ী তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

—"তুমি খাবে না।"

—"তুমি ঘুমোও দিকি, সে হবে এখন…"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুজনবাবু বললেন :

—"এই সেবা দিয়ে যমকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দাওনি!"

—"নারায়ণ! নারায়ণ! কি যে বল…ঘুমোও—ঘুমোও!"

সুজনবাবু চোখ বুজে চুপ করে রইলেন। ক্লান্ত দেহে তন্দ্রা এসে আচ্ছন্ন করলে। আনন্দময়ী নেটের মশারির স্ক্রীনটা টেনে দিয়ে চলে গেলেন ঘরের সামনের বারান্দার দিকে। মণি দাসী এসে ডাকলে :

—"মা! খাবে চল—রাত যে অনেক হয়ে গেল।"

—"চল, যাই! মণি!"

—"কি মা?"

—"ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। বউ বোধ হয় বাপের বাড়ী যায় নি।"

—"কি করে বুঝলে মা?"

—"উনি এসেছেন, সেখানে খবর গেছে—সেখানে থাকলে সে এখনি আসত। অন্তত ফোন করত—কিন্তু"

—"তবে গেল কোথায় মা? রাত ত' এগারটা বেজে গেছে।…"

—"আর কখন সে এত রাত করেছে, একলা?"

—"কিই বা তোমায় বলি মা…এখন চল ত খেতে—একে এই গাড়ীর ঝাঁকানি—"

—"খাবার কি গলায় উঠবে রে…জয়া আমার ঘরে নেই…ওঃ!"

আনন্দময়ীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

—"ওরে! চারদিনের ছেলে দিদির কাছ থেকে বুকে করে মানুষ করেছি। দিদি মারা যাবার সাতদিন পেরল না, ভাসুর চলে গেলেন। সতী লক্ষ্মী আমার কোলে জয়াকে দিয়ে বলেছিলেন "ওর যেন জয় হয়।" তাই তার নাম রেখেছিলাম জয়ন্ত—সে জয়াকে আমি চোখের পলকে হারাতাম—ঘর-সংসার গুছিয়ে দিয়ে—নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না আমার—কোথায় আমার খুঁত হল—যে…"

আনন্দময়ী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

—"কাকীমা! এতদিন জানতাম তুমি শক্ত মেয়ে, না দেখছি তুমিও সেই পাঁচ-পাচির মতন। মা! বউ পরের মেয়ে, সে আপন না হতে পারে; তা বলে, ছেলে কি কখন পর হয় না, ভয় পাও কেন…নইলে মণিদাসী আছে ভাল ত' আছে ভাল, আমিও গুণগান জানি গো…দেখব সে মাগী কেমনে আমার জয়াকে বেঁধে রাখে…ভয় কিসের চল—চল। চোখের জল ফেলে ছেলের অকল্যাণ ক'র না মা।"

—"ওরে! মানুষকরা ছেলের জন্যে এত মায়া, নাড়ী-ছেঁড়া ধন হ'লে কি হ'ত রে!"

মণি দাসী একটু হেসে বললে :

—"নাড়ী-ছেঁড়া হ'লে এত ভয় হ'ত না মা, নিজের গাছের ফলের চেয়ে কুড়োন ফলের লোভই মানুষের বেশী হয়।"

মণির কথা সত্য হলেও আনন্দময়ী কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারলেন না—কেবলই তাঁর মনের মধ্যে আকুলী-বিকুলী করে উঠতে লাগল—সে যে আমার জয়া, আমার জয়ন্ত।

খাবারের কাছে গিয়ে বসলেন এই মাত্র। খাবার তাঁর মুখে উঠল না। মণি কত বকাবকি করলে—কিছুতেই বুঝ মানলেন না, উঠে পড়লেন। মণি পানের বাটা এনে সামনে ধরলে। একটা পান মুখে দিয়ে বললেন :

—"আমি যাই শুতে তোরা খেয়ে নিগে যা।"

ঘরে এসে দেখলেন সুজনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আনন্দময়ী গলায় কাপড় দিয়ে সুজনবাবুর পায়ের কাছে নমস্কার করে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন! ঘড়িতে টং টং করে বারোটা বাজল।

* * * *

শুয়ে-শুয়ে কেবলই মনে করতে লাগলেন, রাত্রে বউ গেল কোথায়? বাপের ওখানে যে নেই তাত বুঝতেই পাচ্ছি।

তবে? উনি যদি জানতে পারেন কি হবে? লুকোব কেমন করে? সংসার করতে গেলে অনেক কথা পুরুষ মানুষের না-জানাই ভাল, কিন্তু লুকোতে ত' পারব না। কাল সকালে যখন টের পাবেন যে বউ সেখানে নেই, তখন কি মনে করবেন। এ ত' কোনদিন উনি বরদাস্ত করবেন না, কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নি···নাঃ। ভোলাকে কাল ডেকে পাঠাব, না মানাকেই ডেকে পাঠাব। হয়ত মণি যা বলেছে তাই ঠিক। না, তা কি কখন হ'তে পারে···ভদ্র গৃহস্থ ঘরের বউ আবার জয়ন্তর কথা, তার বিয়ের কথা, আবার পেছিয়ে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা—সাতটী বছর বয়েস—শাশুড়ী কোলে করে নিয়ে এলেন, কি সে আদর। বড় হয়ে বড়জার সঙ্গে কি মনের মিল। দুই ভাইয়ের কি অভিন্ন ভাব। শ্বশুরকুলের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, অতিথিশালা—কৃষ্ণরায়জী ঠাকুর।··অমনি দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম···জয়ার যেন ভাল হয়। এমনি কত কি, তারপর তন্দ্রা এল, ক্লান্ত মন চোখের পাতা দু'খানা বুজে নিয়ে এল। একটু একটু করে ঘরের আলো চোখ থেকে ক্রমে চলে গেল।··

কিছু পরেই ঘুম যেন ভেঙে গেল। স্বামীর গলার আওয়াজ—না?··ঘুমের ঘোরেই বলে উঠলেন: "জয়া এলি! জয়া!"···আবার সব নিস্তব্ধ। বাড়ীর দাসদাসীর কলরবও একেবারে থেমে গেছে। ফটকের আলো নিভে গেছে। শুধু সিঁড়ির আলো যেন জ্বলছে * * *···হায় রে মানুষের মায়া। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তারি কথা ভাবছেন। * * * নাঃ ঘুম আর এল না। আনন্দময়ী বিছানায় শুয়ে মহা অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন। হঠাৎ যেন বাড়ীর কম্পাউণ্ডে আলো জ্বলে উঠল। তাই ত ফটকের মাথার আলোটা জ্বলে উঠেছে—মোটরের হর্ণ—কে যেন গাড়ীতে এল। আনন্দময়ী নিঃশব্দে উঠে স্বামীর বিছানার পাশ দিয়ে গিয়ে অন্য দরজা খুলে দেখতে গেলেন। বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে দেখলেন, মিলনী আপাদ-মস্তক একটা ক্লোক-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। পা যেন টলছে, পায়ের স্থিরতা নেই, সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে উঠছে। আনন্দময়ী দূর থেকে তার উপরে ওঠবার ভঙ্গী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। মিলনী—তাঁদের ঘরের দিকে তাকাল না, সোজা তার ঘরের দিকে চলে গেল।···

আনন্দময়ী চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, তাকে নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন কিনা··ভাবলেন রাতে আর কোন কথা বলবেন না, সকালে যা হয় হবে। এখন থাক্। কিন্তু অমন ক'রে টলতে-টলতে আসছে কেন·কোন অসুখ করে নি ত'—কিম্বা··তাই ত·ওকি যেন চলতে পারছে না—···

মিলনী ঘরের দরজার কাছে এসে ভিজে ক্লোকটা খুলে, ঘরের মেঝেয় ফেলে দিলে—পায়ের জুতো খুললে, জয়ন্তর ছবির সামনে অতি বিষাদ ভরা চাহনিতে খানিকক্ষণ, তাকিয়ে রইল, তার পরে "উঃ মাগো!" বলে সেই ছবির সামনে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। চাপা-কান্নায় তার বুক যেন ফেটে যাবার মত হয়ে এল। আনন্দময়ী দূর থেকে সব দেখলেন। বধূর আছাড় খেয়ে পড়া দেখে তাড়াতাড়ি কাছে এসে বসলেন:

"বৌমা! কি হয়েছে··অমন করে আছড়ে পড়ে কাঁদছ কেন মা।"

মিলনী সচকিতে উ'ঠে বসে আনন্দময়ীর কোলের কাছে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আরো ফুঁপিয়ে জোরে কাঁদতে লাগল। কোন কথা সে বলতে পারলে না।

'কেঁদ না মা—ভয় কি—আমি এয়েছি।'

'কাকীমা আমায় বাঁচাও, আমি যে আর পারছি নি।'

আনন্দময়ী বধূর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন:

'ভয় কি মা, স্বামী কি কখন পর হয়।'

মিলনী সোজা হয়ে বসে বললে:

'হয় না যদি, তবে হল কেন?'

'হয় না মা, হয় না—হয়নি, সুয্যি গেরণ হলে, সারাটা পিরথিমিই অন্ধকার হয়ে যায়; কতক্ষণ রাহু তাকে গিলে থাকতে পারে মা, আবার উগরে দিতে হয়—দেখনি, সে-বছর গেরণ, সব কেটে যাবে ওঠ মা! ওঠ কাপড় ছাড়।'

'তুমি কখন এলে—কাকা মশাই ঘুমিয়েছেন?'

'হ্যাঁ—এই কিছুক্ষণ হ'ল তোমার খবর নিচ্ছিলেন। আমি বল্লাম বাপের বাড়ী গেছে সকাল বেলাতেই আসবে।

'আমিত এখন সেখান থেকে আসছি নি মা··'

আনন্দময়ী চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—'তবে কোথায় গিছলে?'

'আমি মানবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছিলাম···তিনি আমায় একেবারে ত্যাগ করেছেন ··· সেই মেয়েটা আমায় অপমান করেছে।'

'কে—কে তোমায় অপমান করেছে?'

'সেই মেয়েটা ···'

'চুপ কর বৌমা—ত্যাগ সে করে নি, কখন করতে পারে না, কখন পারবে না ··· থাক্ সে সব কথা, চল কাপড়-চোপড় ছেড়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর তোমার কাছে শুয়ে সব কথা শুনব এখন। আমি যখন এয়েছি—তখ জয়া যাবে কোথা? চল চল · ওঠ···'

কলের পুতুলের মত মিলনী আনন্দময়ীর সঙ্গে স্নান ঘরে চলে গেল। কাপড়-চোপড় ছেড়ে আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে মিলনী বললে :

'মা অপরাধ নিয়ো না,—আমায় রক্ষে কর।'

আনন্দময়ী থুঁতিতে হাত দিয়ে বধূকে আদর করে—তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'বালাই ষাট! ভয় কি মা—তুমি যে সংসারের রাজরাজেশ্বরী··· তোমার দুঃখ কি। অ মণি মণি! বৌমার খাবার দে ··· রাত একটা বেজে গেছে। বোকা মেয়ে আগে—আগে আমায় জানাও নি কেন। বুঝতে পাচ্ছি—পাকা গিন্নী না থাকলেই সংসারের এমনি হালই হয়। চল আমরা ও-ঘরে যাই। ওবে বোকা মেয়ে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কি এমন যে কাচের বাসন—পড়ল—আর ভেঙে টুকুরো হয়ে গেল। হা আমার পোড়া কপাল—ব্যাপারটা কি আমায় খুলে বল দিকিনি।'

তখন রাত্রি দু'টা বেজে গেছে। শাশুড়ী ও বধূতে তাদের দুঃখের কাহিনীর আলাপ ও বিলাপ চলতে লাগল। মিলনী আর সকল কথাই শাশুড়ীর কাছে বললে, কেবল মানবের কথাটা বলতে গিয়ে চেপে গেল।

সকল কথা শুনে আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করলেন :

'কিন্তু মানবের সঙ্গে তার এ ঝগড়ার কারণটা কি বৌমা তা ত বুঝতে পারলাম না।'

মিলনী মুখ নীচু করে নীরবে বালিসের ওপর মুখখানা গুঁজড়ে শুয়ে রইল।

'ভয় নেই বৌমা··· আমি জয়াকে ডেকে পাঠাচ্ছি ··· কালই এর হেস্ত নেস্ত করব।'

সকালে জয়ন্তর কাছে দাওয়ান রামশরণকে পাঠালেন, জয়ন্ত কিন্তু কিছুতেই এল না।

নীরব অভিশাপ

শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

'রামু দাসটা ভারী গরীব বাবা—
খেটে খুটে চালা'ত সংসার;
ভিক্ষা ক'রে মানুষ করল ছেলে
বিদ্যাপীঠের ক'টা ছাপে বিদ্যা বাড়ল তা'র।
খোঁজা-খুঁজি ক'রে রামু দিল ছেলের বিয়ে
চাঁদপানা বৌ করল কুটীর আলো;
ছেলের মায়ের আনন্দ অশেষ
যখন সবাই বলল বৌটী ভালো।
রামুর ছেলে দামু কিন্তু বিয়ের হাওয়া পেয়ে
হঠাৎ কেমন বদলে গেল যেন;—
চাইলনা আর মানতে কোনো শাসন
সব কথাতেই বলে- "ওসব কেন?"
স্বেচ্ছাচারের সহজতায় বিগড়ে গেল বউ
সেও ভাবিল—ইচ্ছামত চলায় নাইক দোষ;
বাধা যদি চাইত দিতে কেউ
হোক্‌না যে-কেউ, তা'র কথাতে বাড়্‌ত বধূর রোষ।
এম্‌নি ক'রেই কাট্‌ল কিছু কাল
বাঁদর-নাচন নাচ্‌ছে তখন শ্বশুর ঘরে দামু;
হঠাৎ দেখে বধূটী তা'র শাসন-গণ্ডী পার—
সিনেমাতে গেছে মেতে নিয়ে হারু শামু!
চির-নীরব রামুর ব্যথার ফল্‌ল তখন ফল,
থাক্‌ল দামু সারাজীবন ফেল্‌তে আঁখিজল!

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম *

অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা ডি-এস-সি, এফ্-আর-এস্

গত নভেম্বর মাসে আমি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ শান্তিনিকেতনে গমন করি এবং কবির অনুরোধে তথায় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সম্মেলনে একটি বক্তৃতা প্রদান করি; স্বয়ং কবি এই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। এই বক্তৃতা সমস্ত দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে দৈনিক ও মাসিক পত্রে উক্ত বক্তৃতার বহু সমালোচনা বাহির হয়। সেই সময় হঠাৎ অস্ত্রোপচারে শয্যাগত থাকায় আমি যথাসময়ে এই সমস্ত সমালোচনার উত্তর দানে অসমর্থ হই। সম্প্রতি গত বৈশাখের 'ভারতবর্ষ'-এ পণ্ডিচেরী-প্রবাসী শ্রীঅনিলবরণ রায় আমার বক্তৃতার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় উক্ত প্রবন্ধ পাঠে প্রতীত হয়, তিনি আমার বক্তৃতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই, পরন্তু নানারূপ কল্পিত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; তজ্জন্য এই উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সর্ব্বপ্রথম আমার শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

শান্তিনিকেতন-প্রদত্ত বক্তৃতা

"কবি আপনাদিগকে তাঁহার নিজস্ব অতুলনীয় ভাষায় বহুবার তাঁহার আত্মজীবনের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আদর্শ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? এই পৃথিবীতে বহু সভ্যতা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে, বহু এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপনারা যদি কোনও সভ্যতার মূল উৎস অনুসন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেক সভ্যতার কার্য্যপ্রণালী উচ্চ জীবনের আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আদর্শই সভ্যতার গতি নির্ণয় করে এবং প্রথম হইতেই আদর্শের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। অনেক পুরাকালোৎপন্ন ধর্ম্ম ও দর্শনের মূলসূত্র এই যে, বিশ্বজগৎ কোন স্বষ্টিকর্ত্তার দ্বারা স্বষ্ট; কিন্তু 'স্বষ্টিকর্ত্তা' সমস্ত ধর্ম্মে একবিধ নন। প্রাচীন ইহুদীজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বষ্টিকর্ত্তা আইন ও শৃঙ্খলার দণ্ডধার। তাঁহার আদেশ যে সকলেই বাইবেল-কথিত দশটি নিয়ম প্রতিপালন করিবে এবং যাহারা তাহার অন্যথা করিবে তাহাদিগকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। আরও অনেক ধর্ম্ম মূলতঃ ইহুদীধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল ধর্ম্মে 'স্বষ্টিকর্ত্তা'র রূপ ইহুদীদের স্বষ্টিকর্ত্তা হইতে খুব বেশী তফাৎ নয়।

—'ধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা'—

যাঁহারা এইরূপ দর্শনের অনুসরণ করেন তাঁহাদিগকে কোনও গ্রন্থবদ্ধ নিয়ম পালন করিতে হয়। এই গ্রন্থবদ্ধ নিয়ম ভগবানের বাণী বা প্রত্যাদেশ বলিয়া গৃহীত হয়। এই সকল নিয়ম যাঁহারা রক্ষা করেন ও ব্যাখ্যা করেন তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য হন, ভিন্ন মত ইহাঁরা সহিতে পারেন না।

যদি প্রাচ্যতম দেশের দিকে তাকাই তবে দেখিতে পাই—প্রাচীন চীনজাতির মধ্যে স্বষ্টিকর্ত্তাকে কারিকররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি হাতুড়ি পিটাইয়া ও কুঠার দ্বারা পাহাড় কাটিয়া সমস্ত পৃথিবী স্বষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য চীনদেশে খুব বড় বড় কারিকর ও স্থপতির স্বষ্টি হইয়াছে এবং চৈনিক সভ্যতায় শিল্পীর স্থান অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক উচ্চে। চীন-সমাজে সম্মানের পর্য্যায়—রাজকর্ম্মচারী (Mandarins), কৃষক ও শিল্পী, বণিক ও যুদ্ধজীবী। হিন্দুর স্বষ্টিকর্ত্তা একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগৎ, স্থাবর ও জঙ্গম, জীব এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সমস্তই স্বষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য যাহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা স্বষ্টি করে, হিন্দু সমাজে তাহাদিগকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী, কারিকর ও স্থপতির স্থান এই সমাজের অতি নিম্নস্তরে

* গত বৈশাখের 'ভারতবর্ষ'-এ উক্ত শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীঅনিলবরণ রায় বর্ত্তমান লেখকের শান্তিনিকেতন-প্রদত্ত বক্তৃতার যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহারই প্রত্যুত্তর।—লেখক

এবং হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোন যোগাযোগ নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্পে ও দ্রব্যোৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।

প্রত্যেক সভ্যতার আদর্শেই ভুল ত্রুটি আছে এবং বর্ত্তমানে সমস্ত-প্রাচীন, ধর্ম্মাত্মক আদর্শই অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; কারণ এই সকল ধর্ম্ম তথা আদর্শ বিশ্বজগতের যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামূলক। প্রাচীনেরা মনে করিতেন, পৃথিবীই বিশ্ব-জগতের কেন্দ্র, তারকাগুলি ধার্ম্মিকলোকের আত্মা এবং সূর্য্য ও অপরাপর গ্রহ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই কল্পিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে এক সত্যযুগ ছিল, তখন মানুষ পরস্পর সম্প্রীতি-সূত্রে বাস করিত এবং তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভুগিতে হইত না। এখন আমরা জানি যে, এইরূপ সত্যযুগের ছবি ভ্রমাত্মক। পৃথিবী বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিস নয়, ইহা বিরাট সূর্য্যের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। প্রাচীনকালে ইহা সূর্য্যদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে শীতলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমে পৃথিবীতে মানুষ দূরে থাকুক, কোনওরূপ জীবের অস্তিত্ব ছিল না। পরে সর্ব্বপ্রথম অতি নিম্নস্তরের জীব উদ্ভূত হয় এবং ক্রমবিকাশের ফলে অতি আধুনিক কালে বর্ত্তমান মানবের উদ্ভব হয়। সুতরাং ঈশ্বর ধ্যানে বসিয়া এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জগৎ, মানুষ ও জানোয়ারের সৃষ্টি করেন নাই।

সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা ও পরম্পরাগত জ্ঞানরাশির উপর বর্ত্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এই দীর্ঘ সময়ে যাবতীয় শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে অনেক নব নব প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই সকল আবিষ্কারের ফলে সমাজে বহুবার বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে এবং নূতন ভাবে সমাজগঠন করা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে—বহুসহস্রবর্ষব্যাপী অতীতের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার উপর বর্ত্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ আপনার হস্ত ও মস্তিষ্ক সমানভাবে খাটাইয়া আপনাকে প্রস্তুত করে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পৃথিবী হইতে আমাদিগকে শক্তি, খনিজদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্য সম্যক উৎপাদন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এই যে 'জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম' ইহা শেষ হয় নাই, মাত্র সুরু হইয়াছে।

কিন্তু এই জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে আমাদিগকে শহর হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুটীর ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই সমস্ত যুক্তির অসারতা বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিকের স্বভাব সর্ব্বদা সংখ্যার সাহায্যে চিন্তা করা। আমাদের দেশে একজন সাধারণ লোক যে পরিমাণে কায করে, তাহার সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকের কৃত কাযের তুলনা করা যাউক। অনায়াসে প্রমাণ করা যায় (এবং অন্যত্র আমি প্রমাণ করিয়াছি) যে আমরা ভারতবর্ষে জন পিছু পাশ্চাত্যের কুড়িভাগের একভাগ মাত্র কায করি। তাহার কারণ, পাশ্চাত্য দেশে যত প্রাকৃতিক শক্তি আছে—যেমন জলধারার শক্তি, কয়লা পোড়াইয়া তজ্জাত শক্তি—তাহার অধিকাংশই কাযে লাগান হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটা ঘোড়া মানুষের দশগুণ কার্য্য করিতে সমর্থ এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্রযোগে যে শক্তি উৎপাদন করা হয়, তাহা বৎসরে মাথা পিছু একটা ঘোড়ার ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ৩৬৫ দিনের কার্য্যের সমান। আমাদের দেশে শক্তির অভাব নাই, কিন্তু মাত্র শতকরা দুই ভাগ কাযে লাগান হইয়াছে। অধিকাংশ কার্য্যই হস্তে সম্পন্ন হয়, অতএব মোটের উপর এ দেশে লোকে মাথা পিছু ২০ গুণ কার্য্য কম করে। তজ্জন্য আমরা য়ুরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশের তুলনায় ২০গুণ বেশী গরীব। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কাযে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির উপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

গ্রাম্যজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমি কোনও অলীক আশা পোষণ করি না। আমি মনে করি না যে গ্রামগুলি বসতির দিক হইতে আদর্শস্থানীয়। যদি শহরবাসী লোক জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহা হইলে তাহারা কেবল গ্রামের যাবতীয় সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিবে। গ্রামে ফিরিয়া গেলেই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য গ্রামবাসীদিগের সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিবে, গ্রামবাসীরা আমাদের ভাল চোখে দেখিবে না। গ্রামবাসীগণ

কি চায়? তাহারা চায় ভাল ঘরবাড়ী, পর্য্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্র এবং জীবনে অপেক্ষাকৃত প্রচুর অবকাশ ও প্রাচুর্য্য। যদি দেশে প্রচুর কার্য্যের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। প্রচুর পরিমাণ কার্য্যের সৃষ্টি করিলে দেশের যে কেবল দুঃখ ও দারিদ্র্যের সমাধান হয় তাহা নহে, আমাদিগের আত্মরক্ষার খাতিরেও কার্য্য-সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতেই বৈদেশিক আক্রমণের মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি কোনও দিন এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যদি আমরা পুনর্ব্বার বিদেশীয়গণের পদানত হইবার ইচ্ছা না করি—তবে আমাদিগকে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে হইবে। ভারতের অনেক শুভাকাঙ্খী আছেন, তাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষিপ্রধান হইয়া থাকা উচিত। এই মত অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করি। যদি আমরা সকলেই গ্রাম্যজীবনে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীদের পক্ষে শোষণ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে যাবতীয় "চাবি-শিল্প"—যেমন শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি তৈয়ার, যাতায়াত ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় শিল্প ইত্যাদি—সমস্তই রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এবং কখনও কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের খাতিরে এই সমস্ত শিল্পকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বহির্ভূত হইতে দেওয়া হয়না। এ দেশেও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যেমন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উদ্ধারকর্ত্তা Dr. Sanyat Sen চীনের জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এইরূপে দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে হইবে, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে মূলধন তুলিয়া দেশে নানাবিধ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমাদের দেশ য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।

—"রুশিয়ার অনুকরণ নয়"—

"এই প্রকার দেশব্যাপী শিল্পপরিকল্পনা রুশিয়ার পরিকল্পনা নহে। যদি কোন আদর্শকে ফলবান্ করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে কেবল বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। রুশিয়ার বর্ত্তমান জাতীয় জীবন খানিকটা অপূর্ণ, কারণ এখানে আদর্শে ও কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। যদি আমরা আমাদের সভ্যতার উৎসকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের জীবনাদর্শকে সামাজিক মৈত্রী, সার্ব্বজনীন প্রীতি ও নৈতিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সমালোচক বলিয়াছেন—"লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে হিন্দুর দর্শন ও হিন্দুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি কোনও মৌলিক গবেষণার পরিচয় দেন নাই; পরন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্ট পাশ্চাত্য সমালোচকগণের কতকগুলি মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।"

আমার বক্তব্য—কোনও লোক যত বড়ই হউন, স্বীকার না করিয়া তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করা আমার স্বভাব নয়। আমার বক্তৃতা সম্পূর্ণ মৌলিক। আমি কোন্ পাশ্চাত্য সমালোচকের মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছি—তাঁহার বা তাঁহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রামাণ্য উল্লেখ উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। যদি তিনি তাহা না করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার উচিত এই উক্তি প্রত্যাহার করা। হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য তাঁহার রুচিকর না হইতে পারে, কিন্তু বিনা প্রমাণে কাহাকেও অন্যের উক্তির প্রতিধ্বনিকারী বলিয়া অপবাদ দেওয়া একান্ত ভদ্রজনবিগর্হিত বলিয়া মনে হয়। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম্ম ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ডক্টর সাহা যদি কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন, পরের মুখেই ঝাল না খাইতেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেন যে ঐ বিষয়ে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই।"

বর্ত্তমান সমালোচকের মত অনেক সমালোচকই বোধহয় কল্পনা করিয়াছেন যে আমি হিন্দুধর্ম্মের ও দর্শনের কোন মৌলিক গ্রন্থ পড়ি নাই। এরূপ ধারণা করিবার পূর্ব্বে একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে বুদ্ধিমানের কায হইত। যাহা হউক, আশা করি এই প্রত্যুত্তর পাঠে তাঁহার ভ্রান্তির নিরসন হইবে।

সমালোচক মোটের উপর বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গঠনের, এমন কি বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনের সমস্ত আদর্শই বর্ত্তমান আছে।

সমালোচকের মতে বর্ত্তমান লেখকের মত অনেক অনভিজ্ঞ লোকে অনর্থক বিভ্রান্ত হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার বিশ্বাস যে হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ (Theory of Evolution), পৃথিবীর সূর্য্যপ্রদক্ষিণবাদ (Heliocentric Theory of the solar system) ইত্যাদি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যাবতীয় মূলতত্ত্ব, এমন কি National Planning পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকৃত আছে, না হয় বীজাকারে প্রচ্ছন্ন আছে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইব যে সমালোচকের মত শুধু ভ্রান্ত নয়, বিরাট অজ্ঞতাপ্রসূত। পরলোকগত শশধর তর্কচূড়ামণি যখন এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতেন, তখন তাঁহাকে লোকে ক্ষমা করিতে পারিত।

এই সমস্ত মত প্রতিপাদনের জন্য সমালোচক আরম্ভ করিয়াছেন্—

"হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মূল বেদ।"

সমালোচক কি অবগত নহেন যে বিগত ১৯২৩ খৃঃ অব্দে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবের হরাপ্পা ও সিন্ধুদেশের মহেঞ্জদারোতে দুইটী অতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন— যাহার ফলে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও মোটামুটী ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও অধিকাংশ দেশী পণ্ডিতের মতে (যেমন রমাপ্রসাদ চন্দ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিরজাশঙ্কর গুহ) এই সভ্যতা প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক্-আর্য্য। এই দুইটী নগরী অনুমানিক ৩০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ২৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। এই দুই নগরের ধ্বংসাবশেষে বৈদিক-কালীন সভ্যতা বা অসভ্যতার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন যে এই সিন্ধুনদীবাহিত সভ্যতা দক্ষিণে গুজরাট ও পূর্বে গঙ্গাযমুনার অবিবাহিকার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই সভ্যতা তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার মত উন্নতস্তরের ছিল। বর্ত্তমানে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের অধিকাংশ উপাদানই উক্ত প্রাগ্বৈদিক, প্রাক-আর্য্য সভ্যতা হইতে গৃহীত—যেমন শিব-পশুপতির পূজা, ধ্যান, যোগ, ফুলনৈবেদ্য দিয়া পূজাপদ্ধতি এবং সম্ভবতঃ পশু, সর্প ও বৃক্ষদেবতার পূজা।(১)

কাজেই হিন্দুর সমস্তই 'ব্যাদে' আছে, একথা প্রস্তরীভূত (fossilized) পণ্ডিতাভিমানী ব্যতীত এই যুগে কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না।

তথাকথিত বৈদিক সভ্যতার পরিচয় শুধু ঋগ্বেদের অতি দুর্বোধ্য ঋক্ গুলি হইতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বৈদিক সভ্যতার কোন বাস্তব প্রমাণ (material proof) এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গিয়াছে সুদূর এশিয়া মাইনরে ; প্রায় ১৪৪০ পূঃ খৃঃ অব্দের যে Mitanian জাতির মধ্যে উক্ত বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহারা তৎকালীন মিশরীয় ও বাবিলোনীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এতদূর উচ্চধারণা পোষণ করিত যে মনে হয় তাহাদের নিজস্ব সভ্যতা খুবই উচ্চস্তরের ছিল না। অথচ এই সময়ের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রায় মিশরীয় সভ্যতার সমতুল্য, সুতরাং বৈদিক সভ্যতা হইতে উন্নতস্তরের প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক্-আর্য্য সিন্ধুনদীবাহিত-সভ্যতা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ধরা যাইতে পারে, যে "বৈদিক অসভ্যেরা" সভ্যতর ভারতবর্ষ গায়ের জোরে দখল করিয়া নিজেদের শাসন স্থাপন করিলেও ভারতীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বেদমূলক করিয়া তুলিতে পারে নাই। বেদের কর্তৃকতার নীচে প্রাচীনতর ভারতীয় সভ্যতার ধারা বরাবরই প্রবাহিত হইতেছে। (২)

লেখক হয়ত পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এতটা ব্যস্ত আছেন যে গত পনর বৎসরের জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে নূতন আবিষ্কারের কথা তাহার কর্ণে পৌছায় নাই এবং ধ্যানে বসিয়াও হয়তঃ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু ভারতীয়

(১) Science and Culture, দ্রষ্টব্য।

(২) জ্যোতিষিক প্রমাণদৃষ্টে Jacobi ও Tilac ঋগ্বেদের কোন কোন অংশকে ৪০০০ বৎসরের পুরাণো বলিয়াছেন ; কিন্তু উহা হইতে সভ্যতার তুলনামূলক উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায় না। শুধু ঐ সভ্যতা পাঞ্জাব হইতে পারস্য পর্য্যন্ত ভূভাগে বিস্তৃত ছিল মনে হয়। কিন্তু এই সুপ্রাচীনকালেও প্রাচীন মিশর, মেসোপোটেমিয়া ও ভারতে সভ্যতার সবিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল ইহার প্রমাণ আছে।

সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার "যদি কিছু-মাত্র জ্ঞান থাকিত", তাহা হইলে তিনি প্রথমেই এতবড় একটা ভুল কথা বলিতে সাহসী হইতেন না।

প্রত্নতত্ত্বের বিসম্বাদপূর্ণ তর্ক না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু তিনি কি জানেন না যে এই ভারতবর্ষেই সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে সিন্ধুদেশীয় প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক্-আর্য্য সভ্যতার আবিষ্কারের পূর্বেও অন্যরকম মতও প্রচলিত ছিল। তিনি কি জানেন না যে—যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ রচনা করিয়াছিল সেই উভয়ধর্মেই বেদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি কি জানেন না যে লোকায়ত মতে

ত্রয়ঃ বেদকর্ত্তারঃ ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।

অর্থাৎ খৃষ্টের কিছু পূর্বে ভারতবর্ষে একদল যুক্তিবাদী ছিলেন, যাহারা মনে করিতেন যে বেদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা দুরূহ; শুধু কতকগুলি ভণ্ডলোকে বেদের অর্থ না জানিয়াও বেদের দোহাই দিয়া ভ্রান্তমত প্রচার করে। এখনও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই।

সুতরাং হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের গোড়া বেদে খুঁজিতে যাওয়া প্রায় পনর আনা ভ্রমাত্মক এবং এই ভুলের জন্য সমালোচকের প্রবন্ধটী আগাগোড়া ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে।

লেখক ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলের পুরুষসূক্তে ভারতে প্রচলিত জাতিভেদের গোড়া খুঁজিতে গিয়াছেন। সকল পণ্ডিতদের মতেই দশমমণ্ডল অত্যন্ত পরবর্ত্তী কালের; শুধু যখন এই সূক্ত রচিত হয় তৎকালপ্রচলিত জাতিভেদের একটী দার্শনিক ব্যাখ্যামাত্র। ইহাতে জাতিভেদের উৎপত্তির কোন ইতিহাস নাই, ইহাতে শুধু প্রচলিত জাতিভেদের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য একটী গল্প মাত্র রচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং সমালোচক এই সূক্তটী শুধু পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য অথবা আমি জাতিভেদপ্রথার যে অপকারিতা বর্ণনা করিয়াছি তাহার অসারতা প্রতিপাদনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

লেখকের মতে ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে প্রচলিত জাতিভেদের দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই সূক্তে রূপকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে বুদ্ধিজীবী ও ধর্মজীবী লোক স্বভাবতঃই সমাজের শীর্ষস্থান দখল করিবে। এই ব্যাখ্যায় আমার কোন আপত্তি নাই—কিন্তু আমার বক্তৃতায় বলার উদ্দেশ্য ছিল—জাতিভেদের সমর্থনকারী এই মত সমাজের উপর বিষময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ মণীষীর মত উদ্ধৃত করিতেছি:—

When the Indians beleived that some of them had sprung from the head, some from the arms, some from the thigh, others from the feet, of their Creator and they arranged their society accordingly; they doomed themselves to an *IMMOBILITY* from which they have not been able yet to recover.

Mazzinni—in the Duties of People.

প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ পণ্ডিত Sir Henry Maine বলিয়াছেন:—

Caste is the most *BLIGHTING* Institution ever invented by the human mind.

সুতরাং পুরুষসূক্তকার জাতিভেদের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার ভাবনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া যাওয়া শুধু অসার পাণ্ডিত্যের ভড়ং বই কিছুই নয়—দেখিতে হইবে এই মতবাদ সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সমাজ এই সূক্তকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার ফল কি হইয়াছে? সমাজ এই সূক্তের অর্থ গ্রহণ করিয়াছে—যে ব্রাহ্মণজাতীয় লোকে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ব্রাহ্মণজাতিভুক্ত প্রত্যেকেই বিরাট-পুরুষের পাদ হইতে উৎপন্ন শূদ্রজাতীয় লোকের মাথার উপর পাদপ্রসারণ করার অধিকারী। কিন্তু শূদ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানিবে না, সুতরাং তাহাকে শাস্ত্রশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। এজন্য খৃঃএর প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে মনুমহারাজের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে যে শূদ্র যদি বেদ পড়ে, তাহা হইলে তপ্ত সীসা ঢালিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে। গীতায় কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

এইরূপ জাতিভেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারেও পূর্বোক্ত অনিষ্টকারী মতবাদের কুপ্রভাব কিছুমাত্র খর্ব হয়

নাই। পুরুষসুক্তের উল্লিখিত মতবাদ এদেশে লোকে অক্ষরতঃ বুঝিয়াছে, উহার ফলে এতদ্দেশে জাতিভেদ অক্ষয় হইয়া বর্তমান আছে এবং স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থসাধনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই মতবাদ হইতেই—অস্পৃশ্যতা, বর্ণসঙ্করবাদ ইত্যাদি বহু কুপ্রথা ও কুধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু আমি ব্যাপারটা দেখিয়াছি অন্য দিক দিয়া। আমার মতে এই জাতিভেদপ্রথা হস্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে এবং এইজন্য ভারতে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা ইউরোপ-আমেরিকার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। যিনি বুদ্ধিজীবী, তিনি চিরকাল পুস্তকগত বিদ্যা, টীকাটিপ্পনী ব্যাকরণদর্শনের তর্ক নিয়া ব্যস্ত আছেন এবং লোককে বিদ্যার দৌড় দেখাইয়া চমক লাগানই মধ্যযুগের ভারতীয় পণ্ডিতদের আদর্শ ছিল। বাস্তবজীবনের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব খুবই কম ছিল। তাঁহারা শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষের জন্য কখনও মাথা খাটান নাই। করিলে হয়তঃ তাঁহার জাতিপাত হইত। যিনি যুদ্ধজীবী, তিনি তৎকালপ্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া নিজের বীরত্ব দেখাইতেই ব্যস্ত ছিলেন; কখনও এই সমস্ত অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন বা ভিন্নদেশে প্রচলিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বা দেশে প্রচলনের চেষ্টা করে নাই। ফলে বৈদিক যুগ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা একই প্রাগ্বৈদিক চরকাতেই সুতা কাটিতেছি, কাঠের তাঁতে বস্ত্রবয়ন করিতেছি এবং আধুনিককালেও মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে পুনরায় 'বৈদিক অসভ্যতায়' ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। বস্ত্রবয়ন, ভূমিকর্ষণ, স্থপতিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিতে বহুকাল হইতে ভারতে নূতন কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহার কারণ জাতিভেদপ্রথা অনুসারে মস্তিষ্কের কাজকে খুব বড় করিয়া এবং সমস্ত হাতের কাজকে হেয় করিয়া দেখা—সেজন্য মস্তিষ্ক ও হস্তের যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ প্রাকৃতবিজ্ঞানে শিক্ষাদান করিতেছি এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী বিষয়েও আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি 'যে' এদেশে ছেলেরা নিজহাতে কায করিতে অত্যন্ত নারাজ। আমেরিকায় ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিজহস্তে সূত্রধর, কর্ম্মকার ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্পীর কায করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়; কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের ছাত্রগণ উক্তরূপ কাযকে হেয় মনে করে। বুদ্ধিজীবী লোকে যদি নিজহাতে যন্ত্র লইয়া কায না করে, তাহা হইলে উক্ত যন্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন নূতন ফন্দী তাহার মাথায় আসিতে পারে না। য়ুরোপে এই করিয়াই যান্ত্রিক সভ্যতার বর্ত্তমান উন্নতি হইয়াছে। বুদ্ধিজীবী লোকে পুরাতন যন্ত্র দিয়া কার্য্য করার অভিজ্ঞতার ফলে এবং যান্ত্রিকেরা বুদ্ধিজীবী লোকের সংশ্রবে আসিয়া মাথা খাটাইবার ফলে, নব-নব উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবন সম্ভবপর হইয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার অভূতপূর্ব্ব উন্নতির গোড়ার কথা হস্ত ও মস্তিষ্কের সংযোগ।

বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যাউক—একজন পণ্ডিত হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৈদিক চরকা ও তাঁতের পর বয়নশিল্পে প্রায় ৮০০টী নূতন আবিষ্কার হইয়াছে এবং তাহারই ফলে বর্ত্তমানে বিরাট বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। এই সমস্ত উদ্ভাবনকর্ত্তাদের মধ্যে Hargreaves ছিলেন নিরক্ষর একজন মজুর, Arkwright ছিলেন Penny-barber (অর্থাৎ তিনি এক পেনী নিয়া লোককে কামাইতেন), Cartwright ছিলেন গ্রাম্য পাদ্রী। বাষ্পীয় যন্ত্রের (Steam Engine)এর উদ্ভাবনকর্ত্তা James Watt ছিলেন কর্মকার ও যন্ত্রসংস্কারক; তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Blackএর সংশ্রবে আসিয়াছিলেন বলিয়াই বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমালোচক বলিয়াছেন—

"মানুষ মনোময় জীব; দেহ ও প্রাণ অপরিহার্য্য হইলেও মনের উৎকর্ষই মানবের উৎকর্ষ। মেঘনাদ বা রবীন্দ্রনাথ কেহই কারিগর নহেন। তাই বলিয়া একজন নিপুণ তাঁতী বা মুচীর স্থান তাঁহাদের উর্দ্ধে হইবে।"

আমার উত্তর—একজন মূর্খ পুরোহিত যে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা বিবাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক সম্মান তাঁতী বা মুচীর অধিক হইবে কেন? তাঁতী বা মুচী পরিশ্রম দিয়া সমাজের একটা বিশেষ কাজ করে, কিন্তু মূর্খ পুরোহিতকে প্রতারক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কসাইর 'ছেলের' যদি প্রতিভা থাকে, তাহা হইলে ইউরোপে সে Shakespeare হইতে পারিত, কিন্তু এদেশে প্রাচীন প্রথা অনুসারে সে "রবীন্দ্রনাথ" বা 'কালিদাস'

হইতে পারিত না, হইবার চেষ্টা করিলে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাহার মাথা কাটিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করিতেন। Bata বা Lloyd Georgeএর মত মুচী বা মুচীর ছেলে প্রতিভা দেখাইলে সমাজে কেন শ্রেষ্ঠস্থান পাইবে না ?

"অবতারবাদ ও ক্রমবিবর্ত্তনবাদ"

হিন্দু অবতারবাদ (Theory of Incarnation) এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদ (Theory of Evolution) এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া সমালোচক আশ্চর্য্য রকমের গবেষণা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে জন্মান্তরবাদের (Theory of Transmigration of Soul) সহিত উভয়কেই গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

"আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে পেয়েছে মানব জীবন রে।"

এ কথা নিছক জন্মান্তরবাদ এবং ইহার স্থূল মর্ম এই যে, কোন মানুষ পাপ করিলে তাহার নীচ যোনিতে জন্ম হয় এবং বহুলক্ষবার নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পাপের অবসান হইলে সেই আত্মা পুনরায় মানুষ দেহে জন্মগ্রহণ করে এবং মুক্তিলাভের সুযোগ পায়।

ইহার সহিত পাশ্চাত্য Theory of Evolutionএর সামঞ্জস্য সমালোচকের নিজস্ব আবিষ্কার ; কারণ পরলোকগত শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণ কাহিনীকে Electrolysis বলিয়াছিলেন, তিনিও এতবড় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই সমালোচক এক লম্ফে অবতারবাদে পৌছিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দু অবতারবাদে পাশ্চাত্য Theory of Evolutionএর মূলতত্ব নিহিত আছে। সমালোচকের মত গ্রহণ করিলে বেচারা Darwin নেহাৎ ভাবচোর বই নন।

কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠক একটু পড়িলেই দেখিবেন যে, সমালোচকের Theory of Evolutionএর জ্ঞান প্রায় নাই বলিলেই হয় ; ইহা মার্জনীয়, কারণ তিনি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সহিত সম্ভবতঃ অপরিচিত। কিন্তু আমি দেখাইতেছি যে অবতারবাদ সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ।

"জন্মান্তরবাদে যাহার বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি করিতে পারেন, আমি নিজে ইহাতে মোটেই বিশ্বাস করি না। কারণ জন্মান্তরবাদের কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ (প্রত্যক্ষ বা আনুমানিক) আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস যে প্রাচীন ভারতে একশ্রেণীর নীতিকারগণ সাধারণ লোককে সৎপথে রাখার জন্য যেরূপ স্বর্গ নরক প্রভৃতি কাল্পনিক জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি অন্য শ্রেণীর নীতিকারগণ (প্রধানতঃ বৌদ্ধগণ) জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনবাদ (Theory of Evolution) সুপরিদৃষ্ট আবিষ্কার ও সুপরীক্ষিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত পৃথিবীর অতীত যুগের সহস্র সহস্র প্রাণীদেহাবশেষের আবিষ্কার রহিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এই সমস্ত আবিষ্কারকে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, বাদ ও বিচার দ্বারা তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রমাণিত করা হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সুপরীক্ষিত নিয়ম দ্বারা প্রত্যেক জীবযুগের সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে—Darwinএর সিদ্ধান্তে যে সমস্ত ত্রুটি বা অপূর্ণতা ছিল, Mendelismএর সাথে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য ছিল, তাহাও অনেকটা সমাধান হইয়া আসিয়াছে। এই তত্ত্বের সহিত জন্মান্তরবাদের সাদৃশ্য নেহাৎ কল্পনালোকপ্রবাসী ব্যতীত কেহ ধারণাও করিতে পারেন না।

অবতারবাদের মূলসূত্র সম্বন্ধে গীতায় কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ সম্ভবামি যুগে যুগে।

অর্থাৎ ভগবান্ নিজে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্টদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সহিত পাশ্চাত্য ক্রমবিবর্ত্তনবাদের সম্বন্ধ আছে, নেহাৎ গায়ের জোর ছাড়া একথা কেহ বলিতে পারেন না। উক্ত মতে অতি প্রাচীন যুগে প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে খুব নিম্নস্তরের জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় তৎপরে পর পর মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী জন্তু এব সর্বশেষ বানর ও মানুষের ক্রমবিবর্ত্তন হয়। ইহার মধে

ভগবানের কোন কথাই নাই ; সমালোচক ক্রমবিবর্ত্তন সম্বন্ধে কি পুস্তক পড়িয়াছেন জানি না ; কিন্তু কোন্ পাশ্চাত্য পুস্তকে লিখিত আছে যে এককালে এই পৃথিবীতে অর্দ্ধ-মানব অর্দ্ধ-সিংহ জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ?

কোন্ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে এককালে মানুষ বামন অর্থাৎ অতি হ্রস্বাকার ছিল। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে মানুষ Pleistocene যুগে নরাকৃতি বানর হইতে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গের ক্রমোৎকর্ষবশতঃ বর্ত্তমান মানুষে (Homo Sapiensএ) পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে অনেক রকম মানবের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেমন Peking Man Java Man, Neanderthat man, Cro-magnon Man ইত্যাদি, কিন্তু তাহারা কেহই আকারে বামন ছিল না। তাহার পর ক্রমবিবর্ত্তনবাদের সহিত সভ্যতার আধ্যাত্মিক বিকাশের একীকরণ করিতে যাইয়া সমালোচক নানা রকম অবান্তর প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি মানব-সমাজের সভ্যতার ইতিহাসও জানেন না এবং হিন্দুর অবতারবাদও সম্যক অবগত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন, "একযুগে মানুষ সভ্যতার উন্নতি করে, সেইটেই সত্যযুগ। ক্রমশঃ তাহার অবনতি হয় তাহাকে কলিযুগ বলা হয়।"

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে তিনি প্রাচীন মিশর এবং প্রাচীন ব্যাবিলোন—এই দুই দেশ—যাহাদের সম্বন্ধে প্রায় ছয় হাজার বৎসরের পুরাতন ইতিহাস বর্ত্তমান গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক পড়িয়াছেন কি ? এই দুই দেশের অথবা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে সমালোচক অনিলবরণ বর্ণিত বা হিন্দুপুরাণ কথিত পর্য্যায়ক্রমে আগত সত্য-বা কলিযুগের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল মানুষে মানুষে সংঘর্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। হয়ত অতি অল্পকালের জন্য Ramses (Egypt), Hammurabi (Babylonian), Augustus (Roman), Asoke (Hindu Buddhist) বা Akbar (Indian Moslem) ন্যায় পরাক্রান্ত রাষ্ট্রপতিগণ দেশে সম্পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিতে সমর্থ হন, কিন্তু এই সময়ের পরিমাণ ৫০ বা ৬০ বৎসরের বেশী নয় এবং ইহাকে কোনমতে হিন্দুপুরাণকথিত সত্যযুগ বলা যাইতে পারে না। সত্যযুগ এবং যুগবিবর্ত্তন প্রাচীন হিন্দু পুরাণকারের কল্পনাপ্রসূত জিনিষ। প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ যেমন H. G. Wellsএর Universal History of the World ইত্যাদি অধ্যয়ন করিলে লেখক দেখিতে পাইবেন যে বাস্তব মানব-ইতিহাসে যুগবিবর্ত্তনবাদের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। লেখক হিন্দু অবতারবাদের গোড়ার কথার সম্বন্ধে শুধু অজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই, বিশেষ বিশেষ অবতার সম্বন্ধে অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অবতারবাদ সম্বন্ধে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র একরূপ মত প্রকাশ করে নাই। মহাভারত (শান্তিপর্ব, ২৪০ অধ্যায়) মতে বুদ্ধ মোটে অবতার নন। তাহাতে অবতারের লিষ্ট দেওয়া হইয়াছে—হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী। এখানে বুদ্ধের নাম নাই। "হংস"টী কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। শুধু মহাভারতে নয়, বিষ্ণুপুরাণেও বুদ্ধকে প্রকারান্তরে মায়ামোহের অবতার বলা হইয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণব পুরাণমতে কৃষ্ণ অবতার নহেন, একেবারে পরমব্রহ্ম—বলরাম অবতার। অধিকাংশ পুরাণমতে গুপ্ত—রাজাদের পরেই কল্কী অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন অর্থাৎ কল্কী অবতার বৌদ্ধ প্রাধান্যের অবনতি ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থানের দ্যোতক মাত্র। রামায়ণ পাশবিকতা ও মানবিকতার মধ্যে যুদ্ধের একটা রূপক, এই অদ্ভুত তত্ত্বব্যাখ্যা শুনিয়া সমঝদার লোক সকলেই নিশ্চয় অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। যে কোন যুদ্ধকেই পাশবিকতা ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে।

মোটের উপর সমালোচক অবতারবাদ বা জন্মান্তরবাদ—কোন বাদেরই মূলতত্ত্বের কথা অবগত নন এবং পাশ্চাত্য ক্রমবিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে তাহার বিরাট অজ্ঞতা রহিয়াছে। তিনি প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও পুরাণে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব খুঁজিতে যাইয়া কতকগুলি অসঙ্গত প্রলাপ বকিয়াছেন মাত্র। ক্রমশঃ

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্যার সি-কে-রায়ের একমাত্র মেয়ে ব্রততী। ব্রততী যখন দশ বছরের, তখন স্যার সি-কে হয়েছেন বিপত্নীক। বিপত্নীক পিতার সর্ব্বস্নেহের আবেষ্টনে স্বপ্নলোকের কল্পলতার মত ব্রততী ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে। ওর জীবনের প্রত্যেকটি কলোচ্ছ্বাস স্যার সি-কে'র জীবনে দিয়েছে পলে পলে জাগ্রতির ছোঁয়া। রাত্রিদিন যে বৃত্তিগুলো ওঁর বাইরের জগতে ছড়িয়ে থাকে ঐশ্বর্য্যের ব্যাপ্তিকে ঘিরে, ব্রততীর স্পর্শ যেন যাদুমন্ত্রে সেগুলো ফিরিয়ে আনে মুহূর্ত্তে তার শাসন-সীমার অপরিসর গণ্ডীর ভিতর নিদ্রাতুর দুরন্ত শিশুর মত শৃঙ্খলিত ক'রে। ব্রততীর জীবনে স্যার সি-কে ছাড়া আর কারো অবস্থিতি যেমন তিলার্দ্ধের প্রতিষ্ঠা নিয়েও ওকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌তে পারে না, স্যার সি-কে'র জীবনেও তেমনি নিবিড় দীপ্তিতে ভোরের শুকতারার মত জ্বল্ জ্বল্ করে ওই ব্রততী।

ব্রততী বেড়ে ওঠে; দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপন উল্লাসে দুকূল ছাপিয়ে উথ্‌লে ওঠে ওর জীবনের স্রোত। তারই সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে ওর নিতান্ত আপনার একটা নতুন জগৎ। চারিদিকে একে একে জমে যাত্রীর ভিড়; বন্ধু, বান্ধবী, স্তাবক, তারপর প্রণয়প্রার্থীর দল। রাত্রিদিন ওকে ঘিরে যেন গুঞ্জন করে তারা। ব্রততী সুন্দরী; অনবদ্য সৌষ্ঠব ওর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে পুষ্পিত মাধবীমণ্ডপের মত। ওর সারা দেহ যেন প্রতি ভঙ্গিমায় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে উৎসবের গানে।

বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শঙ্করগুপ্তের কাছে ব্রততী নাচ শেখে। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রথম অবতীর্ণ হ'য়েছে সে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে বিদ্যুৎপর্ণার ভূমিকায়। পরদিন ভারতী-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে ডমিনিয়ন ষ্টেজে অজন্তা-নৃত্যে দিয়েছে সে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয়। তারপর থেকেই ব্রততী হয়ে উঠেছে ওদের মহলে আলোচনার কেন্দ্র। রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছে ওর নাম, প্রতিভার মুখর পরিচয়—শিলঙের শৈলনিবাস থেকে আরম্ভ ক'রে ডায়মণ্ড-হারবারের ষ্টীমার পার্টির মজ্‌লিস পর্য্যন্ত। নতুন ব্যারিষ্টার মিঃ স্যানিয়াল, প্রোফেসর ডাট্, ডক্টর শৈলেন ব্যানার্জ্জী— এঁরা যেন অফুরন্ত হ'য়ে উঠেছেন ব্রততীর স্তুতিগানে।

কিন্তু ওর আর ভাল লাগেনা। মাঝে মাঝে মনটা কেমন শিথিল হ'য়ে আসে; ব্রততীর জগতেও নেমে আসে কেমন একটা ক্লান্তি। জীবনটা যখন প্রতিফলিত হয় ওর মুখে-চোখে—সারা দেহে, স্যার সি-কে হঠাৎ শিউরে ওঠেন আতঙ্কে। সস্নেহে ব্রততীর মুখখানা বুকের কাছে টেনে নিয়ে শঙ্কিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করেন—"তোর-কি অসুখ ক'রেছে তাতু?"

"না, বাবা!"—সাড়ির আঁচল থেকে অকারণ একটা সুতো টেনে ব্রততী আঙুলে জড়ায়। ভেবে পায় না, কি উত্তর দেবে ওর অসহায় বাপকে।

নিজের উদাসীনতাকে স্যার সি-কে যেন ক্ষমা ক'রতে পারেন না। ওঁর মনে হয়, কাজের ভিড়ে কখন ব্রততী সরে' গেছে দূরে। একটু ইতস্তত ক'রে আবার বলেন—"ওরা কেউ আসে নি বুঝি আজ?"

বাপের সঙ্কোচ দেখে ব্রততীর মুখে ফুটে ওঠে ক্ষীণ একটুক্‌রো হাসি—"কা'রা বাবা?"

"অজয়, শৈলেন—ওরা সব।"

"বাবা!"—ব্রততী মুখ তুলে চায়। ওর বেদনার্ত্ত চোখদুটো যেন ঝিমিয়ে আসে বাপের দিকে চেয়ে। বলি বলি ক'রেও ব'ল্‌তে পারে না। মনে হয়, ওঁর মনটা বুঝি পীড়িত হ'য়ে পড়বে। তবুও একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে সে বলে—"ওঁরা! এসেছিলেন সবাই। এই কিছুক্ষণ হ'ল গেছেন একে একে। সবাই যেন একটা একটা আলাদা মডেলের টকিং মেসিন। মানুষকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে।"

১১৬.

ব্রততীর কথাগুলো—ওর আকস্মিক এই ভাবান্তর স্যার সি-কে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে বলেন—"তুই কি ওদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছিস্ তাতু?"

ব্রততী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে: "ঝগড়া! ওঁরা যদি জান্‌তেন কেউ ঝগড়া ক'রতে, তা হ'লে বেঁচে যেতুম বাবা। তবুও ত দেখ্‌তে পেতুম, অন্ততঃ একটা মানুষের সত্যিকারের চেহারা।"

"কি যে বলিস্ মা! কিছুই বুঝি না। তোর দুঃখ, তোর মনের কথা আমার কাছে ব'ল্‌তে কি সঙ্কোচ হয় তাতু?"

—ব্রততীর চোখমুখের ওপর থেকে এলোমেলো হাল্‌কা চুলের গোছাগুলো সযত্নে কপালের দু'পাশে সরিয়ে দিতে দিতে স্যার সি-কে মৃদু গলায় আবার জিজ্ঞেস্ করেন—"শৈলেন? শৈলেনকেও কি তোর ভাল লাগে না মা?"

ব্রততী হাসে। আবার তেমনি ক'রে হেসে জবাব দেয়—"ভাল আমার সবাইকেই লাগে বাবা। কিন্তু তার চেয়ে বেশী হয় দয়া। ওঁদের শুধু দয়া ক'রতেই ইচ্ছে করে।"

বাপের বিস্ময় যেন আরও বেড়ে ওঠে। ব্রততীর মনটাকে তিনি কোন মতেই ধ'রতে পারেন না। কি ব'ল্‌বেন, ভাব্‌তে গিয়ে বুকখানা ছাপিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস। ব্রততীর মুখপানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন খুঁজ্‌বার চেষ্টা করেন।

ব্রততী তাঁর অন্যমনস্কতাকে হঠাৎ একটু নাড়া দিয়ে ব'লে—"আমার কি ইচ্ছে করে জানো বাবা?—ইচ্ছে করে, এই শহর—লোকজন, গাড়ী, বাড়ী, আলো—সব ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে' যাই দূরে: অনেক দূরে—ছোট্ট একখানা গাঁয়ের পাশে নদীর ধারে ঘর বেঁধে থাকব শুধু তুমি আর আমি। মাঝে মাঝে আস্‌বে যাবে দু'একজন সত্যিকারের মানুষ।"

এবার স্যার সি-কে হো হো শব্দে হেসে ওঠেন। ব্রততীর কথা শুনে তিনি না ব'লে পারেন না: "ওরে পাগ্‌লি মা, দু'দিন পরেই সেরে যাবে সব। দিন এলে সবই ভাল লাগবে। তোর মত বয়েসে আমাদেরও হ'ত মাঝে মাঝে অম্‌নি বৈরাগ্য। নিতান্ত ক্ষণিক ওটা; শেষে আর চাইবি নি কিছু। কি যেন ব'লেছেন তোদের কবি? বল্ না সেই লাইন দুটো একবার!—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমাদের নয়—" কথাটা শেষ না ক'রেই স্যার সি-কে আবার হেসে উঠ্‌লেন জোরে।

পিতার কর্ম্মক্লান্ত মনটাকে আঘাত ক'রতে ব্রততীর ইচ্ছে করে না। সেই উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে সে সুর ক'রে বলে—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ মহানন্দময়।"

"তবে?"—স্যার সি-কে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ব্রততীর মাথাটা বুকের কাছে গড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তার পিঠে। মুখখানা প্রসন্নতায় ভরে উঠ্‌ল।

মনটা গুছিয়ে নিয়ে ব্রততী হঠাৎ উঠে বসে: "তুমি ত এখনো চা খাওনি বাবা? আপিসের পোষাকটাও বদ্‌লাবার সময় হয় নি বুঝি! যাও, ততক্ষণে জামা কাপড় বদ্‌লে বাথরুম থেকে ফিরে এসো: আমি আনি চা-টা তৈরি ক'রে।"

সি-কে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখপানে চেয়ে বলেন—"থাক্ তাতু, ওরাই আন্‌বে মা। বরং তুই কিছুক্ষণ বো'স আমার কাছে। সারাদিন থাকি শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে, তুই কখন স'রে যাস্ দূরে।"—চোখের পাতা ভারি হ'য়ে আসে।

ব্রততী ত্রস্ত পদে বেরিয়ে গেল। স্যার সি-কে শিথিল ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে কোচের ওপর শুয়ে প'ড়লেন: "ঠিক অম্‌নি রোগ ছিল ওর মায়ের। ঐশ্বর্য্য যেন তাকে পীড়া দিত। সে পারত না সইতে পৃথিবীর এই কোলাহল, এই তীব্র আলো; বাঁধ্‌তে চাইত ছোট্ট একখানি ঘর নদীর ধারে, না-হয় পাহাড়ের কোলে;—শুধু আমি আর সে। তাতুর মনে ছোপ লেগে আছে সেই পুরনো রঙটার। ওটাও হয় ত থাক্‌বে না বেশীদিন। দিনের পর দিন ফিকে হ'য়ে শেষে মিলিয়ে যাবে ওর বিচিত্র জগতের নানা বর্ণে।"

* * * *

রবিবার। ব্রততীর চায়ের টেবিলে জমে উঠেছে প্রভাতী মজ্‌লিস। ওদের মহলে বিখ্যাত নর্ত্তকী মুরলা নন্দী আজ এখানে নিমন্ত্রিতা। মিসেস্ গুপ্তা, প্রোফেসর দেবশঙ্কর তথা দেবশঙ্কর গুপ্ত, মিষ্টার স্যানিয়াল, ডাট্ এবং ডক্টর ব্যানার্জ্জীও আমন্ত্রিত হ'য়েছেন তাতুর চায়ের আসরে।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের চেয়ে সমৃদ্ধতর না হ'লেও, সেদিনের আসর যে বিশিষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

সকালটা সত্যি বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু মিষ্টার স্যানিয়ালের সঙ্গে দত্ত সাহেবের কেমন একটু রেশারেশি যেন কিছুদিন থেকে পাকিয়ে উঠেছিল ভিতরে ভিতরে। ওঁদের সেই রুদ্ধ প্রবাহ মনের গোপনতম স্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌লেও বাইরে প্রকাশ পায় নি তার আভাস একটী দিনের জন্যেও। কিন্তু ব্রততীর চোখ এড়িয়ে ওঁরা একপাও বাড়াতে পারেন নি তার চলাপথের ত্রিসীমানায়। ব্রততীর হাসি পায়; অত্যন্ত করুণার হাসিতে ওর সারা অন্তর যেন শুধু ক্ষমা ক'রতেই চায় ওদের। তার বেশী এক কণাও চায় না দিতে, নিতেও হয় ত চায় না ওদের এতটুকু শ্রদ্ধার দান।

আজ চায়ের টেবিলে নিতান্ত তুচ্ছ উপলক্ষ নিয়ে ডাট্-স্যানিয়ালি অন্তর্বিপ্লবটা যেন হঠাৎ একটু প্রখর হ'য়ে উঠ্‌ল। উপলক্ষ্য বিশেষ কিছু নয়; তবু ওই চেয়ারখানির ওপর সাময়িক অধিকার বিস্তারের সুযোগ হারিয়ে দত্ত সাহেব যেন সিংহাসনচ্যুতির ক্ষোভে আত্মহারা হ'য়ে পড়লেন। ওঁর অনবধানতার অবসরে স্যানিয়াল কখন দখল ক'রে বসেছেন ব্রততীর পাশের চেয়ারখানা। এই সামান্য ব্যাপারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে এমন ঘনিয়ে উঠ্‌ল যে ওঁরা পরস্পরকে যেন আর তিলার্দ্ধও সহ্য ক'রতে পারছিলেন না।

পুরুষদের এমন্বিতর অবস্থাভেদ হয় ত মেয়েদের চোখেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে বেশী। ব্রততী দেখেও দেখে নি; ক্ষমা ক'রবার মত ধৈর্য্য ওর তখন ছিল না ব'লেই ও আগাগোড়া উপেক্ষা ক'রে যাচ্ছিল। মুরলা স্বাভাবিক মেয়েদের বাইরে। ওর নাচের দোলার সঙ্গে সাগরপারের ঢেউ মিশে, জীবনের সুরটা এমন উঁচু ধাপে উঠে পড়েছে যে, নিজের বাইরে পৃথিবীর অন্য কিছু উপলব্ধি ক'রবার মত মনের অবস্থা ওর খুব কমই থাকে।

নানা আলোচনার ভিড়েও মিসেস্ গুপ্তা এতক্ষণ লক্ষ্য ক'রছিলেন ওঁদের সেই ডাট্-স্যানিয়ালি। দত্ত সাহেব তখন প্রায় নির্ব্বাক্; মিষ্টার স্যানিয়াল মাঝে মাঝে তবুও যোগ দিচ্ছিলেন চল্‌তি আলোচনায়। হঠাৎ কি ভেবে দেবশঙ্করের পত্নী সাধনা দেবীকে উদ্দেশ ক'রে মিসেস্ গুপ্তা ব'লে উঠ্‌লেন—"মেয়েদের নাচ দেখে যাঁরা মুখর হ'য়ে ওঠেন প্রশংসায়, আপনি কি বল্‌তে চান—তাঁরা সকলেই বোঝেন ওর সত্যিকারের আর্ট?"

—"আর্ট বোঝেন কিনা, জানি না। তবে একটা কিছু যে বোঝেন নিশ্চয়ই, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। নইলে প্রশংসায় অমন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌বার কোন মানে হয় না।"—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেবশঙ্করের মুখপানে চেয়ে সাধনা দেবী মৃদু একটু হাস্‌লেন।

সহাস্যে মাথা দুলিয়ে দেবশঙ্কর আরও একটু জোরের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লেন—"নিশ্চয়।"

ওদের আলোচনার ভিতর হঠাৎ কি নিয়ে যে এই side-talk-এর সূচনা হ'ল, দেবশঙ্কর সেটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না। কিছুক্ষণ আগে মিষ্টার দত্ত ওই আর্টের কথা নিয়েই লম্বা-চওড়া sermon দিয়েছেন। তখন এঁরা সবাই ছিলেন নির্ব্বাক, উর্দ্ধশ্বাসে গিলে গেছেন ওঁর শার্লেতানি লেক্‌চারগুলো।

মিসেস্ গুপ্তা বেশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে ব'ল্‌লেন—"মানে ত হয়ই একটা। আর, মানে হয় ব'লেই ওটা বেশ চলে' যাচ্ছে অব্যয়ের মত। প্রয়োগের হাঙ্গামা নেই।"

দত্ত সাহেব যেন একটু সজাগ হ'য়ে বস্‌লেন। সাধনা মিসেস্ গুপ্তার কথাটা ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন তাঁর মুখপানে।

দত্তসাহেবের দিকে চেয়ারখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে মিসেস্ গুপ্তা চাপা হাসির সঙ্গে বল্লেন—"ওই মানেটা যদি আর্ট হিসাবেই ধরা যায়, তা হ'লে সেই আর্ট ষোল আনা নির্ভর করে আর্টিষ্টের রূপ আর প্রস্‌পেক্টের ওপর।"

এবার সাধনা ও দেবশঙ্কর উভয়েই হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন—'প্রস্‌পেক্ট! আর্টিষ্টের রূপ আর প্রস্‌পেক্ট? প্রস্‌পেক্টটা কিসের শুনি, আরও বড় ডাক্তার হবার?"

ব্রততী ইচ্ছে ক'রেই মুরলার সঙ্গে অন্য কথায় জড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা যে শেষ পর্য্যন্ত কতদূর গড়াবে সেটা অনুমান ক'রতে ওর বিলম্ব হ'ল না মোটেই।

মিসেস্‌ গুপ্তা বেশ শ্লেষের সঙ্গে বল্‌লেন—"বড় ডাক্তার হবার নয় মশায়, দর্শকের তথা স্তাবকের ভবিষ্যৎ জীবনকে ফুলে ফলে সমুজ্জ্বল ক'রে তুল্‌বার।

"তার মানে ?"—দত্ত সাহেব আরও একটু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে নড়ে চড়ে বসলেন।

মিসেস্ গুপ্তা বলেন—"এই যে, ব্রততীর অজন্তা নৃত্য ! যা নিয়ে মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই মাতামাতি ক'রল ঢের বেশী, তার মূল চার্ম কি ওই আর্ট ? মোটেই নয় ; ওর রূপ, আর সেই সঙ্গে অপর পক্ষ থেকে ওকে মুগ্ধ ক'রবার সতর্ক প্রয়াস। ওর যে দুটো নাচ সত্যি খারাপ হ'য়েছিল, খারাপ না হ'লেও অন্ততঃ ভাল হয় নি, সেই দুটো নাচেরও ভূয়সী প্রশংসায় এই মাত্র ওঁরা মাতাল হয়ে উঠেছিলেন। সে মাতলামি আর্টের নেশায় নয়, প্রসাদের লোভে ! পেটুক ছেলেরা চোখের সামনে রাজভোগ বা ওই রকম হাত-ভরা সাইজের বড় কোন সন্দেশ দেখলে যেমন লোলুপ হ'য়ে ওঠে, ঠিক তেমনি। উদগ্র কামনার চঞ্চলতায় ওঁদের সর্ব্বাঙ্গ লোলুপ হ'য়ে ওঠে মেয়েদের অর্দ্ধ-উলঙ্গ দেহ-পেশির স্পন্দন দেখে। তারই মানে আর্ট।"

মিষ্টার স্যানিয়াল হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠলেন—Exactly so ! আপনার উপমাটা আরও পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'লে বলা যেতে পারে যে, মনিবের হাতে মাংসের টুক্‌রো দেখলে আদুরে কুকুরের যে অবস্থা হয়, প্রস্‌পেক্‌টিভ চেনা মেয়ের মধ্যে হঠাৎ অমনি কিছু দেখলে স্তাবকদের অবস্থাও হয় ঠিক তেমনি।"

মিষ্টার ডাট্ প্রবল আপত্তি জানিয়ে ব'ললেন—"That's vulgar and must be withdrawn."

"কক্ষনো নয়। That's truth and must be admitted."—মিঃ স্যানিয়াল মিসেস্ গুপ্তার মুখপানে চেয়ে তাঁর মতামত জানবার জন্যে অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন।

কিন্তু দত্তসাহেব ততক্ষণে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠেছেন। কথাগুলো যে ওঁকে উদ্দেশ ক'রেই বলা হ'ল, সেটা বুঝতে তাঁর বাকী রইল না। তিনি রাগে ফুলে ফুলে ও'ঠেন—"That's most uncultured. I would certainly like to—"

ওঁর কথা শেষ না হ'তেই ডক্টর ব্যানার্জ্জী, দেবশঙ্কর ও সাধনা দেবী সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। সে হাসি যেন থামতে চায় না।

এবার দত্তসাহেব ঘুষি পাকাবার উপক্রম ক'রলেন। মিষ্টার স্যানিয়ালের মুখচোখে কেমন একটা প্রসন্নতা।

ওঁদের অবস্থা দেখে সকলেই বোধ হয় একটু শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলেন। ব্রততীকে উপলক্ষ ক'রে দুজনের মনে যে ঈর্ষার বিষ সঞ্চিত হ'য়েছিল, সেটা আজ জ্বলে' উঠবার উপক্রম হ'ল আপনা-আপনি।

ব্রততী অনেকদিন থেকেই হাঁপিয়ে উঠেছিল এই পরিস্থিতির চাপে। ডাট্-স্যানিয়ালি ব্যাপারে তার মনটা হ'য়ে উঠল আরও তিক্ত।

দেখতে দেখতে ব্রততীর মুখচোখ যেন কেমন কঠিন হ'য়ে উঠল। কোন কথা না ব'লে হঠাৎ ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ব্রততীর এই আকস্মিক রুদ্রতায় ওঁরা যেন হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে গেলেন, কিন্তু চেহারা দেখে কোন কথা ব'লবার সাহস হ'ল না। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।

মুহূর্ত্ত পরেই ব্রততী আবার কি ভেবে ফিরে এলো তেমনি উগ্রভৈরবীমূর্ত্তিতে। কিন্তু এবার আর কারো দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে মুরলার কাছে বিদায় চেয়ে ব'ল্‌ল—

"কিছু মনে ক'রো না নন্দী, শরীরটা আমার ভাল নেই আজ। তোমরা গল্প কর, আমি বরং একটু—"

তারপর দেবশঙ্করের দিকে ফিরে তাঁকে জানাল—"আজ থেকে আমায় এক মাসের ছুটি দিতে হবে মাষ্টার-মশায়। একটু rest নেবো। এ ক'দিন আর শিখব না কোন নতুন ফিগার।"

—কারো উত্তরের কোন অপেক্ষা না রেখে, ব্রততী শক্ত শক্ত পা ফেলে আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মুরলা ডাক দিয়েও আর কোন উত্তর পেল না। ওরা জানে, খেয়াল ওর বরাবরই অমনি প্রখর।

দেবশঙ্করবাবু ও সাধনা দেবী হাসতে হাসতে উঠে গেলেন ; সঙ্গে সঙ্গে মুরলা, ডক্টর ব্যানার্জ্জী এবং মিসেস্ গুপ্তাও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ডাট্-স্যানিয়ালি সংগ্রামের বেশ তখনো পূর্ণমাত্রায় বাতাসটা ভারি ক'রে রেখেছে।

ব্রততী অস্থির ভাবে পড়ার ঘরে পায়চারি করে। মনে ওর একটুও স্বস্তি নেই। প্রসঙ্গটা ভুলবার জন্যে অকারণ আলমারি থেকে বইগুলো টেনে টেনে পাতা উল্টায়।

ওর জীবনের সূত্রগুলো যেন হঠাৎ কেমন খাপছাড়া হ'য়ে পড়েছে।

দরজাটা বন্ধ। বাইরে থেকে কে ভয়ে ভয়ে মৃদু আঘাত করে। ব্রততী একবার ভাব্‌ল, খুল্‌বে না। হয় ত আবার এসেছে ছুটে পিছু পিছু। ওর যেন নিষ্কৃতি নেই; তিলার্দ্ধের জন্যেও ওর মুক্তি নেই ওদের ক্ষুধাতুর কবল থেকে। ওরাই একটু একটু ক'রে জ্বালিয়ে দেবে বিষাক্ত আগুন—ওর সারাটা জীবন ধিকি ধিকি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ভাব্‌তে ব্রততীর শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

কি ভেবে জিজ্ঞেস ক'রল—"কে?"

—"আমি, মোতি।"

ব্রততী বাঁচ্‌ল; হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল—"মোতি দা?"

—তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে একমুখ হেসে দাঁড়াল এসে মোতির সাম্‌নে, একবারে ওর গায়ের কাছে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত! মোতিদা যে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবে আজ, তা ও ভাব্‌তেও পারে নি।—"কখন এলে তুমি?"

—"সকালের গাড়ীতে। তখন তোমাদের ইস্কুল বসেছিল ও ঘরে, তাই দেখা হয় নি। নইলে—"

"তা বেশ। দেশের খবর সব ভাল ত মোতিদা?"—ব্রততী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মোতির মুখপানে।

"ভালই আছে দিদি, ওদের আবার ভালমন্দ! যাক্, সে কথা পরে ব'ল্‌ব'খন। নীচে কে একজন বৈরাগী এয়েছে দিদি, তোমায় গান শোনাতে"—মোতি দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল ওর উত্তরের অপেক্ষায়।

"বৈরাগী! হাঁ, বৈরাগীই বটে; দীনু বৈরাগী। ও বেশ গান গায় মোতিদা, খুব ভাল লাগে আমার। একটু ব'স্‌তে বল, আমি যাচ্ছি কাপড়টা বদ্‌লে।"—ব্রততী তাড়াতাড়ি চ'লে গেল নিজের ঘরে।

অনেকদিন পর হঠাৎ মোতিদাকে দেখে ব্রততীর মনটা যেন নিমেষে হাল্‌কা হ'য়ে গেল। অস্বস্তির গুরুভার এতক্ষণ পাষাণের মত চেয়ে ব'সেছিল ওর বুকে: ওর শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল।

মোতি ওদের বাড়ীর পুরনো চাকর। চাকর ব'ল্‌লে হয়ত অন্যায়ই হয়। ওই মোতি ছেলেবেলা থেকে ব্রততীকে মানুষ ক'রেছে বুকে ক'রে; ওর মা তখন বেঁচে ছিল।

অনাবশ্যক সজ্জার অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর যেন আজ ব্রততীর ভাল লাগ্‌ছিল না। ওর দামী সাড়ি, ওর ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য আজ সত্যি ওকে পীড়া দিচ্ছিল; মনে হয়, ও যেন বন্দী হ'য়ে আছে ওই প্রাচুর্য্যের অন্দর মহলে।

নিতান্ত সাধারণ একটা ব্লাউস ও সূতি একখানা সাড়ি পরে' ব্রততী যখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আস্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখা মুরলার সঙ্গে—তার পিছনে লীলা হালদার। মুরলা অবাক্ হ'য়ে চায়। মুহূর্ত্তে ব্রততীর সর্ব্বাঙ্গে ওর চোখে-মুখে যে পরিবর্ত্তন ফুটে উঠেছে, সেটা মুরলা কল্পনা ক'রতেও পারে না। এই কিছুক্ষণ আগে সে দেখেছে ব্রততীকে কালবৈশাখীর আসন্ন ঝড়ের মূর্ত্তিতে।

ব্রততী একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বলে—"তুমি কি এতক্ষণ একাই ব'সেছিলে নন্দী?"

"না।"—মুরলা মৃদু হাসির সঙ্গে উত্তর দেয়—"রাস্তায় মিস্ হালদারের সঙ্গে দেখা। কিছুতেই ছাড়লেন না; তাই ফিরতে হ'ল আবার।"

"ধন্যবাদ। শুধু ধন্যবাদ নয়, তার চেয়েও বেশী কিছু। মিস্ হালদার যে দয়া ক'রে এতদূর এসেছেন, সেটা আমার সৌভাগ্য। কি বল মুরলা?"—প্রসন্ন হাসির সঙ্গে ব্রততী অভিবাদন ক'রল লীলা হালদারের দিকে চেয়ে।

মুরলা সহাস্যে বলে—"নিশ্চয়ই। মিস্ হালদার যুগান্তর এনেছেন বাংলা দেশে। ওঁর আগে কোন মেয়েই সাহস করেনি ফিল্‌মে নাম্‌তে। উনিই পাইওনিয়ার—"

"পাইওনিয়ার নয়, মার্টার বলুন।"—ব'লে মিস হালদার হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌লেন।

মিস্ হালদারের হাত ধ'রে মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়ে ব্রততী ওদের নিয়ে নীচে এলো—"চলুন একটু গান শোনাই, কেমন?"

"গান!"—মুরলা হতভম্ব হ'য়ে চায় ওর মুখপানে। একটু আগে যে ব্রততীকে সে দেখেছে উগ্রভৈরবীর মত সব কিছু ওলট-পালট ক'রে দিতে, এখন তার মুখে গান শুন্‌বার প্রস্তাব যেন ও ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারে না।

ওরা যখন নীচে নেমে এলো, দীনু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে চলে' যাবার চেষ্টায়। ভয়ে ভয়ে ব্রততীর মুখপানে চেয়ে বলে—"আজ যাই তা হ'লে; আর একদিন আস্‌ব?"

"না। তোমায় গান শোনাব ব'লেই ধ'রে আন্‌লুম

ওঁদের।"—লীলা ও মুরলার হাত ধ'রে ব্রততী জোর ক'রে বসাল।

ব্রততীর জীবনে যেন এটা সম্পূর্ণ অজানা এক দিক। মুরলা ভাবতেও পারে নি কোনদিন যে, ভিখিরীকে ডেকে এম্নি ক'রে গান শুনবার অদ্ভুত খেয়াল অন্ততঃ ব্রততীর মত মেয়ের থাক্‌তে পারে।

দীনু মাথা চুল্‌কিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে বলে—"বড্ড দেরী হ'য়ে গেল। পাঁচ-বাড়ী ফিরলে, তবে দিন চল্‌বার উপায় হবে।"

"আজ না-হয় না-ই ফিরলে। এইখানেই দেব সেটা পুষিয়ে"—ব্রততী আর কেন উত্তরের অপেক্ষা না রেখে ব'সে পড়ল।

মিস্ হালদার মুরলার পিঠে হাত দিয়ে চটুল হাসিতে সারা গা দুলিয়ে ব্রততীর দিকে চেয়ে বলে—"Lucky beggar !"

মুরলার কিন্তু সাহস হয় না আজ আর ব্রততীকে নিয়ে কোন টিপ্পনী কাটতে। ওর তখনকার চেহারাটা সে এখনও ভুল্‌তে পারে নি।

দীনুকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ব্রততী আবার বলে—"ওঁদের দেখে কি তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে দীনু ?"

"সঙ্কোচ! ভিখিরীর আবার সঙ্কোচ ?"—আপন মনে বল্‌তে বল্‌তে দীনু মেঝেয় ব'সে একতারায় সুর ধরলো।

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাংলার পল্লীগান ; হিন্দী ঠুংরির আমেজ নেই, উর্দ্দু গজলের ভাঁজ নেই, মোৎসার্টের ছোঁয়াচ লাগে নি, বিঠোফেনের চাম নেই, তবু কত সুন্দর ! কত সহজে ছুঁয়ে যায় মনের প্রত্যেকটা তার !

মুরলা কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনুর মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রে—"তোমায় আর কোথায় দেখেছি বল তো ?"

হঠাৎ দীনু শিউরে উঠ্‌ল। পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ব'লে—"পথে, কিম্বা এমনি কারো বাড়িতে।"

—"তা হবে। কিন্তু গান কোনদিন শুনেছি ব'লে ত মনে হয় না ?"—মুরলার চোখে কেমন একটা তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা! দীনুর ভয় করে। হেঁট মুখে একতারা বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে ব'লে—"আজ্ঞে না।"

কিন্তু তার সম্বন্ধে মুরলার কৌতূহল যেন সহজে মিট্‌তে চায় না ; ধারাল দৃষ্টিতে ওর আপাদ মস্তক চেয়ে দেখে।

মিস্ হালদার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা টাকা বের ক'রে ওর কাছে ছুঁড়ে দিয়ে ব'ল্‌লেন—"ফিল্‌মে গেলে তোমার উন্নতি হ'ত।"

দীনু হাসে, অত্যন্ত ম্লান ফিকে হাসি—মৃতের হাসির মত প্রাণহীন।

ব্রততী মিস্ হালদারের দিকে চেয়ে ব'লে—"টাকা ও নেবে না। এক পয়সার বেশী নেয় না।"

"তার মানে ?"—মিস্ হালদার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

ব্রততী মৃদুকণ্ঠে বলে—"ও বল্‌তে চায়, ওইটাই ওর ন্যায্য পাওনা।"

মুরলা হেসে উঠ্‌ল—"I see, dignity আছে।"

লীলা হালদারও সে হাসিতে যোগ দিয়ে কেটে কেটে বলেন—"That's a novel way of monopolising !"

ওদের আচরণে ব্রততী ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু ব'ল্‌তে পারে না।

মুরলা আবার যখন ব'ল্‌ল—"Respectable beggar", ব্রততী অনুনয়ের সঙ্গে জানাল "কারুকে অমন খোঁচা দিয়ে কোন কথা না বলাই ভাল, বিশেষতঃ তার সাম্‌নে।" ব্রততী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রছিল।

দীনু নির্ব্বিকার ভাবে ব'লে উঠ্‌ল—"আপনি ব্যস্ত হবেন না। ভিক্ষে করা যাদের পেশা, তাদের চামড়া গণ্ডারের চেয়েও শক্ত।"

লীলা ও মুরলা দুজনেই একটু অপ্রস্তত হ'য়ে পড়ে। কথাটা উল্টে দেবার উদ্দেশ্যে লীলা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস্ করে—"তোমার নামটা ব'ল তো,—আর ঠিকানা! I 'll try"

সত্যেন হাতজোড় ক'রে বলে—নাম ? "নাম আমার দীনবন্ধু। আর ঠিকানা ?—ভিখিরীর ঠিকানা কি দেবো বলুন ? পথে পথে ঘুরে বেড়াই ; পথই সব।"

দীনবন্ধু টাকাটি নিতে কোনমতেই সম্মত হ'ল না। ব্রততী ও মিস্ হালদার অনুরোধ ক'রলে, ও বলে—"পৃথিবীতে আমার মত ভিখিরীর অভাব নেই ; আমার চেয়েও কাঙাল—অসহায় মুলো কত কেঁদে বেড়াচ্ছে আপনাদেরই ফটকের সাম্‌নে। টাকাটা ভাঙিয়ে এক

পয়সা ক'রে দিলে চৌষট্টিজন মানুষ একবেলা মুড়ি খেয়ে বাঁচ্‌বে।"

দীনবন্ধু পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল। ব্রততী, লীলা ও মুরলা অবাক হ'য়ে চেয়েছিল, হয়ত ভাব্‌ছিল ওরই কথা। মুরলার মনে একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ আস্ফালন ক'রে ওঠে; ভিখিরীর এত স্পর্দ্ধা সে যেন বরদাস্ত ক'রতে পারে না। ব্রততীকে উদ্দেশ ক'রে বলে—"ছোটলোকদের অত আস্কারা দিয়ে মাথায় তুল্‌তে নেই। ভিখিরীর আবার বড়মানুষী!"

ব্রততী হেসে বলে—"সত্যিকারের মানুষকে আমরা ভুলে' গেছি, তাই হঠাৎ মানুষ দেখ্‌লে আমাদের মেজাজ কেমন বিগ্‌ড়ে যায়।"

মুরলা রাগান্বিত স্বরে ব'লে উঠল—"এই আবর্জ্জনা-গুলোকেও তুমি মানুষ ব'ল্‌তে চাও?"

—"হাঁ; অন্ততঃ আমাদের চেয়ে। পোড় খেয়ে খেয়ে বাইরের খোলসটা ওদের নষ্ট হ'য়ে গেছে। পালিশের চটকে চোখ ঝল্‌সে দেয় না ওরা।"

মুরলা যেন আরও উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল ব্রততীর কথায়; যথেষ্ট ঝাঁঝের সঙ্গে সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—"ওটা তোমার মনের কথা নয়। যাদের তুমি সত্যি সহ্য ক'রতে পার না, তাদের নিক্তিতে সকলকে ওজন ক'রতে চাও কেন? ওরাও যদি মানুষ হয় তা হ'লে—"

মুরলার কথা শেষ না হ'তেই ব্রততী বাধা দিয়ে বলে—"থামো। চোখের জল ফেলে যারা কাঁদ্‌তে জানে, তাদের হাসি মুখস্থ করা নয়।"

বিতর্ক ক্রমেই উত্তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌বে বুঝে, মিস্ হালদার প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে ব'ল্‌লেন—"চলুন মিস্ রায়, আপনার পড়ার ঘরে গিয়ে একটু ব'সি। স্যার সি-কে বোধ হয় বেরিয়েছেন?

"হাঁ। চলুন।"—ব'লে ব্রততী দু'জনকেই সঙ্গে নিয়ে ওপরে চ'লে গেল।

•

রাস্তায় এসে দীনু একবার ওদের কথা ভাবে। ওদের ঐশ্বর্য্য দেখে সে ঈর্ষা করে না, কিন্তু সংসর্গ ওকে অতীতের মাঝখানে টেনে নিয়ে ব্যথিত ক'রে তোলে। মুরলার ডান্স সে দেখেছে এম্পায়ারে। ভাগ্যিস্ মুরলা বেশী দূর এগিয়ে পড়ে নি!

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে, আবার আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ায় পাশের বাড়ীর দরজায়। একতারাটায় কয়েকবার শব্দ ক'রতেই দরজা খুলে ছোট্ট একটী মেয়ে বেরিয়ে এসে বলে—"বাড়ীতে অসুখ।"

মনে এতটুকুও আঘাত লাগে না। এমনি নৈরাশ্য, এমনি উপেক্ষা যেন এখন ওর রক্তে রক্তে সয়ে গেছে। দ্বিরুক্তি না ক'রে দীনু আবার এগিয়ে চ'ল্‌ল অন্য বাড়ির দিকে। গৃহস্থকে আগমন জানাবার জন্যে আবার তেমনি ক'রে একতারাটায় ঝঙ্কার তোলে। কিন্তু এবারে শিশু নয়, বিরক্তির সঙ্গে গজ্ গজ্ ক'রতে ক'রতে একটী প্রৌঢ়া বিধবা দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলেন—"বাপ্‌রে! ভিখিরীর জ্বালায় বাড়ীতে তিষ্ঠনো দায়।"—তারপর কি ভেবে, কণ্ঠস্বরটা একটু ছোট ক'রে জানিয়ে দেন—"হাত বন্ধ, ফিরে আস্‌তে হবে।"

দীনু তেমনি অম্লান, নির্ব্বিকার। কিন্তু আর ইচ্ছে করে না সাম্‌নের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে। মাথার ওপর সূর্য্যটা প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছে। গায়ের চামড়ায় যেন কেমন একটা তীব্র স্পর্শ লাগে। মনে হয়, ফাট ধ'রবে এবার ওর সারা গায়ে।

• • •

মুরলা ও মিস্ হালদার একখানা ফিটনে ক'রে এইমাত্র গেল ওর পাশ দিয়ে। ওদের চোখে কেমন একটা তীব্র-দৃষ্টি! দীনু বিব্রত হ'য়ে পড়ে!

সকাল থেকেই মনটা আজ কেমন বিশ্রী হ'য়েছিল। তার ওপর ব্রততীর বাড়ীতে হঠাৎ লাগ্‌ল যে অতীত দিনের ছোঁয়া, তাতে ওর সারা মন যেন বান্‌চাল হ'য়ে পড়ল আবার। সেই ভোর থেকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে মাত্র এগারোটি পয়সা পেয়েছে আজ। ছ'পয়সা ঘরভাড়া দিয়ে মাত্র পাঁচটি পয়সা থাকবে ওর হাতে। প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে যে কয়টি পয়সা ও রোজগার করে, তার পাইপয়সাটি পর্য্যন্ত তুলে দেয় অতসীর হাতে। দরজার পাশে অতসী পেয়েছে ছোট্ট একটা উনুন; দিনান্তে একবার ফুটিয়ে নেয় তিনজনের মত চা'ল। তার সঙ্গে

কোনদিন একটা বেগুন পোড়া, কোনদিন বা দুটো আলুভাতে।

আজ আর সত্যেনের ইচ্ছে করে না বস্তিতে ফিরতে। অতসীও হয় ত সারাদিনে পাঁচ-ছ' পয়সার বেশী পায় নি; সেই সঙ্গে, খুব বেশী হ'লে পেয়েছে হয়ত আরও সেরখানেক পাঁচ-মিশালী চা'ল। অন্ধ বুড়ো বাপকে টেনে নিয়ে কতদূরই বা চ'ল্‌তে পারে সে!

—বড় রাস্তার পাশে, সরকারী বাগানটার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে সত্যেন অবসন্নভাবে ব'সে পড়ে। সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। গাছের ছায়ায় ঝাঁকার ওপর মাথা রেখে অকাতরে ঘুম'চ্ছে এক দল দীন মজুর। যুদ্ধশ্রান্ত পদাতিকের মত যে যার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে চলমান পৃথিবীর নিরালা কোণে।

আবার একজন-দু'জন ক'রে ভিখিরী এসে জমে ফুটপাথে। বাগানের ওই কোণে, বড় মেহগ্নি গাছটার ডালপালাগুলো যেখানে নুইয়ে প'ড়েছে পথের পাশে, চার-পাঁচজন কুষ্ঠ রোগী এসে ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলি-গুলো একে একে নামিয়ে ক্লান্তভাবে ব'সে পড়ল। সত্যেন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। এক ঝাঁকা রুক্ষ চুল মাথায় যে মেয়েটা এতক্ষণ তেল চিটধরা ময়লা কাপড়খানা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুম'চ্ছিল ফুটপাথে শুয়ে, ওদের সাড়া পেয়ে সে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে গুটিশুটি উঠে ব'স্‌ল। মেয়েটার বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। কতকালের সঞ্চিত ময়লা ওর চামড়াটা ঢেকে ফেলেছে; গায়ের রঙ কোনদিন ফর্সা ছিল কিনা, সেটাও হয়ত আজ গবেষণার বিষয়। পরণের কাপড়খানা দিয়ে কায়ক্লেশে কোমর পর্য্যন্ত রেখেছে ঢেকে; অন্য কাপড়খানা গায়ে জড়িয়ে শীতার্ত্ত রোগীর মত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে। হয়ত জ্বর হ'য়েছে ওর, জ্বলন্ত রৌদ্রে সারা-দিন ফুটপাথে প'ড়ে থেকে এবার ধ'রেছে সন্ধ্যার কাঁপুনি।

ওদের ঝুলিগুলো একে একে টেনে নিয়ে মেয়েটা ঢালে তার আঁচলে। আধসের-তিনপো' চাল আর কয়েকটি ক'রে আধ্‌লা, দুটি কি একটি পয়সা! সকাল থেকে সারাটা দুপুর উত্তপ্ত ফুটপাথে, না-হয় আগুনের হল্‌কার মত সেই ঝলাসে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এর বেশী একটা পয়সাও রোজগার ক'রতে পারে নি ওরা, হয়ত পারেও না কোন-দিন। ওদের প্রাণান্ত চীৎকারে কেউ আর কর্ণপাত করে না। কান্না শুনে শুনে মানুষের হৃৎপিণ্ডে কড়া প'ড়ে গেছে।

রেলিঙের গায়ে যে কালিপড়া মাটির হাঁড়িটা টাঙানো ছিল, সেটা ওদের। মেয়েটা একবার এদিক ওদিক চেয়ে গা-মোড়া দিয়ে উঠ্‌ল। ফুটপাথের লোহার চৌবাচ্চা থেকে এক হাঁড়ি জল ভর্ত্তি ক'রে এনে বসিয়ে দিল ভাঙা ইঁট দিয়ে সাজানো উনুনটার ওপর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সত্যেনের দৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। ওই জল! গোরু-ঘোড়ার জন্যে রাস্তার পাশে যে লোহার চৌবাচ্চা, তারই পচা জল ওরা খায়—তাই দিয়ে হয় ওদের রান্না! শরীরটা কেমন শিরশির্ করে; ভাব্‌তে ওর মাথার মধ্যে আবার তেমনি ঝিমঝিম্ ক'রে ওঠে। ওর মনে ভেসে ওঠে—দিনের পর দিন যে সব ক্ষুধার্ত্ত মানুষের বীভৎস ছবি আজ তিন মাস ধ'রে দেখেছে ও।

এঁটো পাতা আর ছেঁড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে মেয়েটা উনুনে জ্বাল দেয়। কখনো হেঁটমুখ হ'য়ে মাটিতে বুক দিয়ে ফুঁ দেয় সেই অদ্ভুত উনুনটায়। ফুঁ দিতে দিতে ওর চোখ দুটো বোধ হয় লাল হ'য়ে ওঠে; চোখ ছাপিয়ে আসে জল। চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে সত্যেনের চোখে কখন নেমে আসে একটু তন্দ্রা। মুহূর্ত্তে মনটা স'রে যায় ব্যথিত ধরিত্রীর সীমানার বাইরে।

আবার তন্দ্রা টুটে যায়।—ও'দের রান্না হ'য়ে গেছে। মেয়েটা গায়ের কাপড়খানা খুলে ভাঁজ ক'রে পেতেছে মাটিতে। এখন আর ওর লজ্জা নেই; গরম ভাতের গন্ধে ওর সমস্ত সত্তা যেন মাতাল হ'য়ে গেছে। ওর নারীত্ব, ওর স্বভাবসুলভ শালীনতা-বোধ—সব যেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে ওই ভাতের গন্ধে।—কাপড়ের ওপর ভাতগুলো ঢেলে, এপাশ ওপাশ ক'রে ছড়িয়ে দেয় একখানা কাঠি দিয়ে। আপনা-আপনি জুড়োবার দেরীটুকুও যেন সইছে না আর।

মেয়েটা, সেই পাঁচজন কুঠে ভিখিরী—সবাই মিলে একসঙ্গে ব'সল সেই ভাতগুলো ঘিরে। ভাত, আগুনের মত গরম কতকগুলো ভাত আর খানিকটা নুন।—গোগ্রাসে গিল্‌ছে!

সত্যেনের চোখ দুটো যেন আপনা-আপনি বিস্ফারিত হ'য়ে আসে। ও ঝুঁকে পড়ে' দেখে—ভিখিরীগুলোর সর্ব্বাঙ্গে দগ্‌দগে ঘা; হাত পায়ের আঙ্‌লগুলো প'চে

প'চে খুলে গেছে! দেখে সত্যেনের সারা দেহ অবশ হ'য়ে পড়ে। ও আর সইতে পারে না। ইচ্ছে করে, মেয়েটাকে জোর ক'রে তুলে নিয়ে আসে ওদের কাছ থেকে। কিন্তু পারে না। ওর আর তখন হাত পা নড়াবার শক্তিও নেই। মাথার মধ্যে কেমন যন্ত্রণা হয়, বুকের ভিতর যেন হাহাকার ক'রে ওঠে কান্নায়।

ওর পাশে এসে ব'সল চেনা একজন ভিখিরী; পথের আলাপ। হাতে একটা ভাঙা বেহালা; মাথায় একরাশ চুল। কাপড়খানা গিরিমাটিতে রঙিয়েছে। কিন্তু দেহটাকে অমনি রঙ বদ্‌লে মানুষের মত ক'রে তুল্‌তে পারে নি।

লোকটা মৃদু হেসে ওকে অভিবাদন করে। সত্যেনও একবার হাসে তার মুখপানে চেয়ে। বুঝ্‌তে দেরী হয় না; ওর চেহারা দেখে বেশ বোঝা যায় অতীত জীবনটা। মুখে চোখে তখনও লেগে আছে স্বতন্ত্র জগতের ছাপ।

ওর দিকে চেয়ে যেন সত্যেনের হঠাৎ মনে হ'ল যে, সে ভিখিরী। সত্যেন, দীনু এখন ভিখিরী! ভিখিরী?—ও ভিক্ষে করে, সত্যি ও করে ভিক্ষে লোকের দরজায় দরজায়। কিন্তু কেন? হাত দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে; তখনও পেশিগুলো সবল হ'য়ে আছে। ওর মাংসে, শিরায়, ধমনীতে তখনও বইছে রক্তের স্রোত। ভাব্‌তে ভাবতে সত্যেনের মনটা গ্লানিতে ভ'রে উঠ্‌ল; ঘৃণায় ওর সর্ব্বাঙ্গ রী-রী ক'রে উঠ্‌ল ধিক্কারে। ও ভিখিরী! ভিখিরী ও? ওদের মত অমনি পথভিখিরী? ওই কুঠে লোকগুলোর মত! ওই···

দীনুর সমস্ত সম্বিৎ যেন হঠাৎ কেমন উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল আবার। একবার মনে হ'ল অতসীর কথা। অতসীর শরীর আজ ভাল ছিল না। হয় ত এতক্ষণে ফিরেছে ভিক্ষে ক'রে; হয় ত মাথায় নেকড়ার পটি বেঁধে ফুঁ দিচ্ছে উনুনে। চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে আগুনের তাতে।

তা হোক। অতসীকে সে আর কিছুতেই ক'রবে না ক্ষমা। ওই অতসী, তার ওই ভীরু কাতর দৃষ্টিই ক'রেছে ওকে ভিখিরী।—একতারাটা তুলে ধ'রে সত্যেন মুহূর্ত্তে কি ভেবে নিয়ে বাড়ি মারল ফুটপাথের পাথরে। চুরমার হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল সেটা ভেঙে!

ভিক্ষে ও ক'রবেনা আর। আর ফিরবে না অতসীদের বস্তিতে। ট্যাঁক থেকে পয়সাগুলো বের ক'রে ছুঁড়ে দিল সেই কুঠে ভিখিরীগুলোর দিকে। পাশের লোকটী হতভম্বের মত চেয়ে রইল ওর মুখপানে। সত্যেন তাকে একটী কথাও না ব'লে হন্‌হন্ ক'রে চল্‌ল ওদিকের ফুটপাথ ধ'রে।

ক্রমশঃ

জীবন-সংগ্রাম

শ্রীমানকুমারী বসু

১

জগদীশ!

সংসার সমুদ্র মাঝে,
কাজে কিম্বা বিনা কাজে,
এ ক্ষুদ্র জীবনতরী চলেছি বাহিয়া,
কোথা যাই কেন যাই,
তাহা কিছু জানা নাই,
সকলি দিয়াছি নাথ! তোমারে সঁপিয়া।

২

আজি

ক্ষিপ্ত কেন ভাগ্য গ্রহ,
রিক্ত প্রাণে দুর্ব্বিষহ
এ দারুণ বোঝা ভার কে পারে বহিতে,
অশক্ত অক্ষমে কেন
"জীবন-সংগ্রাম" হেন
এ নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা কে পারে সহিতে?

৩

এ যে
ভীম প্রভঞ্জনে চলে,
উত্তাল তরঙ্গদলে
এখনি এ ক্ষুদ্র তরী ফেলিবে গ্রাসিয়া,
অনন্ত আঁধার ভরা
কোথা ওগো বসুন্ধরা ?
তুমি কোথা তুমি কোথা পাই না খুঁজিয়া !

৪

কোথা বিভো বিশ্বপতি !
তুমি অগতির গতি,
হেন পরাজিত আমি জীবন-সংগ্রামে,
তুমি আছ জানি তাই,
তোমারি আশ্রয় চাই,
তুমি কি আমারে ছাড়ি রহিবে আরামে ?

৫

দেখ বা দেখ না চেয়ে,
তবু আছে প্রাণে ছেয়ে,
অদৃশ্য স্নেহের নেত্রে করুণ চাহনি,
ঝঞ্ঝা, উল্কা, বজ্রাঘাতে,
সহস্র বিপৎ পাতে,
কেন আছি ?—যুগে যুগে তুমি কি রাখনি ?

৬

হীন আমি তুচ্ছ আমি,
তুমি যে সম্রাট্ স্বামী,
সে গরবে ভুলে যাই দীনতা আমার,
মনে হয় এক দিন,
বাতাসে না হয়ে লীন
পশিবে আমার সবি চরণে তোমার।

৭

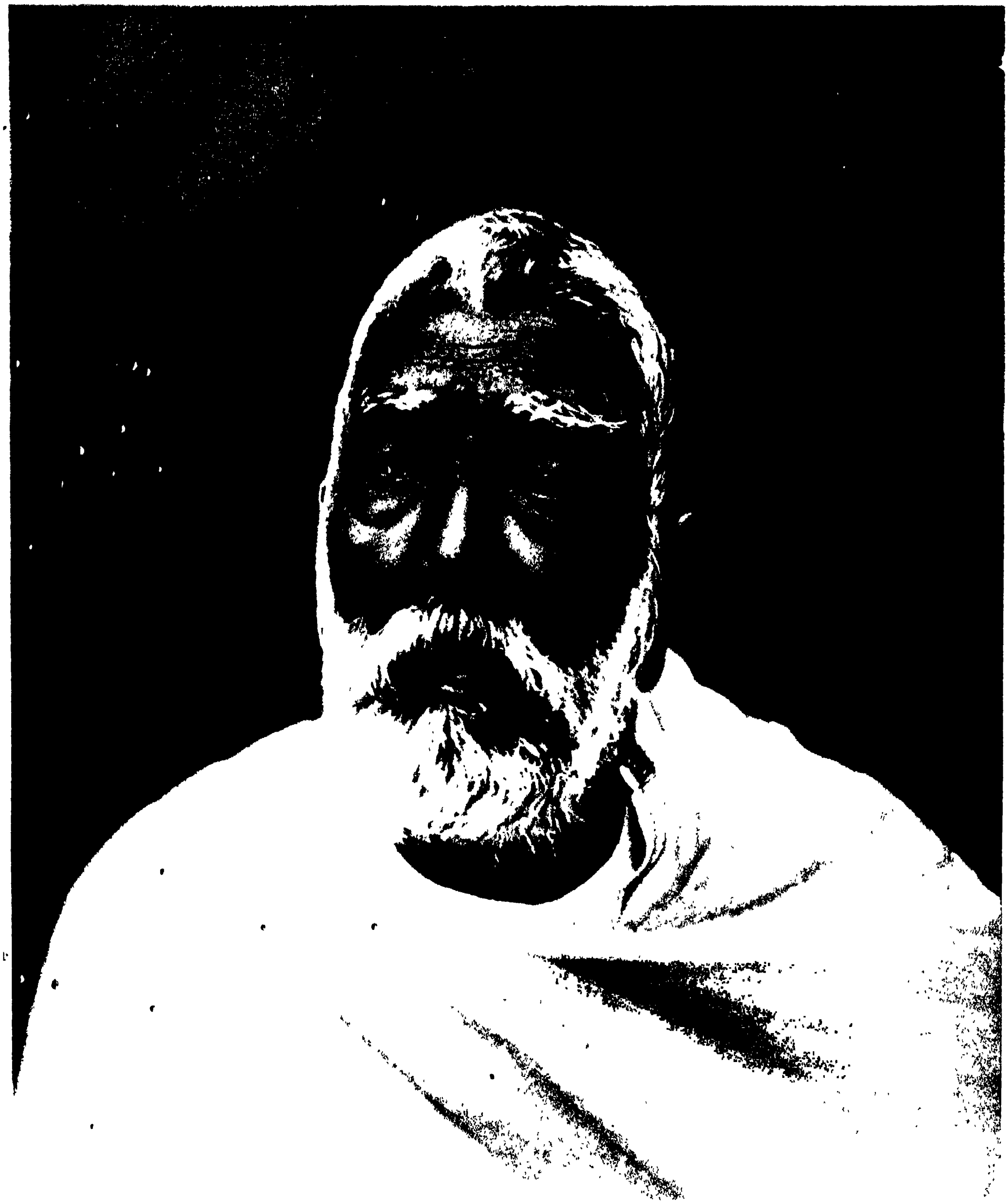
সেই সুপ্রভাত বেলা
এই উপেক্ষিত খেলা,
বেদনার বিষ অশ্রু মৌন হাহাকার
ব্যর্থ আশা, উগ্র তাপ,
অনাবৃত অভিশাপ,
সকলি জুড়ায়ে যাবে পরশে তোমার।

৮

কিন্তু তুমি কোন্ শূন্যে,
কি-বা কর্ম্ম কিবা পুণ্যে
কি-বা তপোবল লভি পশিব সেথায়,
কত জন্ম মৃত্যু বহি,
কত বা অসহ্য সহি,
সে শুভ নির্ব্বাণ মুক্তি মিলিবে কোথায় ?

৯

আমারে তা দেহ কয়ে,
আরো থাকি আরো স'য়ে,
যাক্ এ জীবনতরী ঝটিকার ভরে,
অলক্ষ্যে থাকিও সাথে
স্নেহাশিস দিও মাথে,
তুমি যে আমারি তাই বোলো ভাল করে।



জলধর স্মৃতি-তর্পণ

জলধর

বাঙালীর প্রীতিমাঝে যে দীর্ঘ জীবনের তরী
স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারসে নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।
আজি সংসারের পারে, দিনান্তের অস্তাচল ঘাটে
প্রশান্ত তোমার স্মৃতি উদ্ভাসিত অন্তিম আলোকে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরী
২১।৪।৩৯

স্বর্গারোহণ উপলক্ষে

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবীণতম সেবক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের স্বর্লোক গমনে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার পূরণ আর কখনও যে হইবে এমন মনে হয় না। আজীবন সাহিত্যসেবায় ব্রতী থাকিয়া তিনি সাহিত্যিক হিসাবে যে অসাধারণ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক কোন সাহিত্য-সেবকের ভাগ্যে ঘটে নাই ইহা বলিলে অণুমাত্রও অত্যুক্তির সম্ভাবনা নাই। তিনি একজন বড় সাহিত্যিক ছিলেন, এইমাত্র বলিলে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইল ইহা আমার মনে হয় না, তিনি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান যুগে একজন যথার্থ শক্তিধর হিন্দু ছিলেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। শুধু তাহাই নহে, আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয় দেহাত্ম ভাব-প্রবণ সভ্যতার প্রবল আবির্ভাবে নব্য বাঙ্গালী সমাজে যে সকল অকুশল মনোবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে এবং তাহাতে আমাদের ধর্ম্মময় সামাজিক জীবনে নানা প্রকার অশান্তিও ক্লেশ উদিত হইতেছে, তাহা তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতীকারের জন্য তিনি সাহিত্যের সাহায্যে নিজ অসাধারণ সামর্থ্যকে পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধে, তাঁহার ছোট ছোট উপন্যাসে, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি সরল ও সরস ভাষায় যে সকল মধুর চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার আজন্মসিদ্ধ বিশুদ্ধ হিন্দুভাবের চিরস্থায়ী নিদর্শন; প্রাচীন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র ও যাহা সর্ব্ব সাহিত্যকর, তাহা সকলই আবার বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য লেখনীর সাহায্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। এইজন্য বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না এবং তাঁহার স্মৃতি পূজায় বিরত হইবে না ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নমস্কারী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালিদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, পদস্থ, ধনী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, খুরধার ধুরন্ধর বহু মিলবে—কিন্তু যাঁর অভাব নিয়ে আজ এ প্রসঙ্গ, তিনি ছিলেন অতি সাধারণ নিরীহ নির্ব্বিবাদী, অমায়িক স্নেহশীল ভদ্রলোক ও ভাল লোক—সংসারে যা বিরল। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন 'জলধরদা' ছিলেন সেই লোক।

গত ২৬শে চৈত্র ১৩৪৫, তাঁর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে কি গিয়েছে ও কতটা গিয়েছে—সেটা তাঁর পরিচিতেরাই সম্যক অনুভব করছেন। কিন্তু আমার প্রীতিভাজন তরুণেরা—যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য উৎসুক ও সাহায্যান্বেষী, তাঁরা যে আজ কত বড় বন্ধু, মুক্তহস্ত সাহিত্যিক গৌরী সেন খোয়ালেন, সেই কথাটাই আমার সর্ব্বাগে মনে হয়। ছোট ভায়েদের আবদার অনুরোধ রক্ষা করতে তাঁর ঔদার্য্য ছিল অসীম। প্রকৃতই তিনি ছিলেন তাদের 'দাদা'। রচনা একটু চলনসই হলেই, তিনি তাদের আশা উৎসাহ ও সৎপরামর্শ দানে তুষ্ট করতেন এবং সেটিকে একটু আধটু পরিবর্ত্তিত করে' "ভারতবর্ষ"এ প্রকাশ করতেন। সে কারণ 'ক্রিটিক্‌দের' কাছে তাঁকে কত কথা শুনতে হয়েছে। তিনি বলতেন—"ভারতবর্ষকে" মহাদেশ বললে গুরুতর ভুল হয় না, তার বক্ষে ভালমন্দ থাকবে বই কি!"

দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বেদনামাখা দীর্ঘশ্বাস না ফেলে যে বিরাট পুরুষের পবিত্র নাম উচ্চারণ করা যায় না—যাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বল্ বুদ্ধি আশা আকাঙ্ক্ষা যেন বিদায় নিয়েছে, সেই চিরস্মরণীয় সার আশুতোষ একদিন 'প্রবেশিকা'র পথ সুগম করে' সহস্র সহস্র তরুণের ভবিষ্যৎ অবাধ কোরে দিয়েছিলেন। গরীব দেশের যে সব গরীব ছেলেরা দু-তিন নম্বরের জন্যে অকৃতকার্য্য হয়ে শিক্ষাক্ষেত্র হতে বিদায় নিতে বাধ্য হোতো, তারা তাঁর কৃপায় আজ দেশের উচ্চশিক্ষিত কৃতী সন্তান। সেইরূপ—'দাদা'র কাছে উৎসাহ ও 'পাসপোর্ট' পেয়ে কত উৎসাহী তরুণ লেখক সুলেখক হয়েছেন ও আজ সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন কোরে দেশের সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছেন।

বর্ত্তমানে তিনিই ছিলেন সাহিত্যিকদের মধ্যে বয়সে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠের মতই সকলকে ভালবাসতেন; অথচ শ্রদ্ধা সম্মানের পাত্রকে, ব্যবহারে ও আচরণে, প্রাপ্য' হ'তে কখনো বঞ্চিত করতেন না।

যিনি 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী পত্রিকাগুলির সম্পাদকরূপে বাংলার ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন ও 'জন-মত' গঠনে সাহায্য করিতেন—যে সকল পত্রিকাদির সাহায্যে ও অবলম্বনে বাংলা দেশ এত দ্রুত সকলের ও সকল প্রদেশে দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল—যাঁকে সহর ও সহরতলী ও সুদূর পল্লীর প্রায় সকল শিক্ষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ আসতো, যিনি অনুরুদ্ধ হয়ে ছোট-বড় সকল পত্রিকাদিতে লিখতে বাধ্য হতেন, কা'কেও ক্ষুণ্ণ করতে পারতেন না—তাঁর প্রতিষ্ঠার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সে সব কথা আজ কে না জানেন? তাঁর ছোট-বড় গল্প ও উপন্যাস অর্দ্ধ শতাধিক পুস্তকের সৃষ্টি করেছে। ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন—এবং তা গোতো উপন্যাস অপেক্ষা প্রিয় পাঠ্য। এসব তাঁর সাহিত্যসেবার পরিচয়, কিন্তু তাঁর সবার বড় পরিচয়—তিনি সাহিত্যিক সৃষ্টি করে' গিয়েছেন—বহু। তাঁর বিরাট কীর্ত্তি "ভারতবর্ষ", যা তিনি গত ২৬ বৎসর পরম নৈষ্ঠিক ব্রতচারী সাধকের মত একাগ্র শ্রদ্ধা, শ্রম ও যত্নে আপন সত্তায় পরিণত করে' রেখে গেলেন! কেহ কিছু করুন না-করুন, সেই তাঁর স্মৃতি রক্ষা করবে।

এ ক্ষতি একদিন আমাদের ঘটতই—সময়েই ঘটেছে। মালিকের কাছে নালিস করবার অবকাশ তিনি রেখে যান নি—প্রার্থনীয় আয়ু তিনি ভোগ করে' গিয়েছেন। আমার দুঃখ—আমরা একখানি আশী বছরের প্রাচীন "চলন্ত ও জ্বলন্ত" ইতিহাস খোয়ালুম—যা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে মিলবে না। যিনি বাংলার উঠতির সময় দেখেছিলেন বাংলার সকল বিভাগের গঠনকর্ত্তাদের দেখেছিলেন, বাংলার প্রবুদ্ধ ও সমৃদ্ধ সময়ের সহিত পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন,—তার প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত ছিলেন; তার আনন্দের মজলিসি দিনের—কবির গান,

হাফ্ আখড়াই, পাঁচালী, যাত্রা, কথকতা, এমন কি গোপালে উড়ের 'কেশে-মালিনী' পর্য্যন্ত যাঁর চোখে দেখা—আবার বর্ত্তমানের থিয়েটার, সিনেমা, উদয়শঙ্করের শিব-তাণ্ডব—মায় মেয়েদের কুচ্-কাওয়াজ্ সন্তরণ পর্য্যন্ত দেখা যাঁর বাদ পড়েনি, তিনি আর নূতন কি দেখ্‌তেন? বাংলার দুঃসময় দেখবার জন্য নাই বা রইলেন—কেবল মনোকষ্টই পেতেন। বয়সে আমি তাঁর "ক্যাস্-ঘ্যাসা" লোক, তাই দেশের দুর্দ্দশার সূচনা ও নিজের বয়সের বাড়াবাড়ি দেখে সশঙ্কে দিন কাটাচ্ছি!

বয়সই বাড়লো কিন্তু কিসে থেকে যে কি হয়, সে রহস্য একটুও পর্দা তুল্‌লে না। কাশীতে থাকি, ছেলেদের ভালবাসি। একটি নবাগত যুবক এসে প্রেস্ খুললেন। "যা-তা" বলে' আমার একখানা খাতা পড়তে নিয়ে গেলেন, তার পর আবদার অনুরোধ এবং অকিঞ্চিৎকর "কাশীর কিঞ্চিতে"র প্রকাশ। আমার পরম শ্রদ্ধেয় রস-সাহিত্য-রত্ন অধ্যাপক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুকূল দৃষ্টি সেখানির উপর পড়ে এবং সেই সূত্রে আমাদের বন্ধুত্ব ও আলাপ ঘনিষ্ঠতর দাঁড়ায়। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায়—"দেবী মাহাত্ম্য" নাম দিয়ে একটি রচনা পাঠাতে বাধ্য হই ও রায় বাহাদুর দাদার নেক্-নজরে পড়ে' যাই!

বহু চেষ্টায় ও বহু কষ্টে সংসারের ও মুদীর তাগাদা এড়িয়ে কাশী গিয়েছিলুম। এইবার দাদার আদরের তাগাদা আরম্ভ হ'ল! এ যে আবার—"সেই দেবী আমি"!

শরৎবাবু বললেন—"আপনার আর রক্ষা নাই কেদার-বাবু! দাদার এ কচ্ছপের কামড়—মেঘ না ডাকলে মুক্তি নেই।"—বললুম, "সে ডাক্ তো জলধরের হাতধরা।" বললেন, "তবেই বুঝুন্!"

শরৎবাবু ছিলেন ভূয়োদর্শী! বছর ঘুরে যায়—নূতন খাতা বাঁধতে হয়! এইভাবে "কোষ্ঠীর ফল"-এর জন্ম। ওর ঠিক্ নাম কিন্তু—"তাগাদার ফল"। এমনি তাঁর স্নেহ-মধুর তাগাদা ছিল! তখনো কিন্তু দাদার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নাই!

মীরাটে ছিল "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর" অধিবেশন। সাহিত্য বিভাগের সভাপতি করা হয়েছিল আমাকেই। পূর্ণিয়া থেকে পাল্লা সহজ নয়। যাবার পথে তাই কাশীধামে শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্ত্তীর ('উত্তরা'-সম্পাদকের) বাসায় বিশ্রাম করি। সেটি ছিল সাহিত্যিকদের আরামের স্থান—তার আবহাওয়া ছিল—স্বাগতম্।

সকালে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ভায়ার 'স্বপন পশারী' বিভোর হ'য়ে উপভোগ করছিলাম; দেখি ওভারকোট্ ও মফ্‌লারের উপর র‍্যাপার মোড়া 'শীত-পশারী'র মত একটি বৃদ্ধ—সিগারের ধোঁ ছেড়ে হাঁক্ দিলেন—"সুরেশের বাসা এইটাই তো—কেদারবাবু এসেছেন না?"

"এসেছেন বই কি—আসুন্ আসুন্" বলতে বলতে এগিয়ে গেলুম। তিনি আমার দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে পায়ের দিকে ঝুঁকে বললেন—"কে বড় কে ছোট, বুঝতে তো পারছি না!" বললুম—'বয়সে বড় না হলেও 'রায় বাহাদুর' হওয়া চলে, দাদাদের কিন্তু বড় হতেই হয়—তাঁরা চিরদিনই বড়—বসুন্।"

বললেন—"লেখা পড়ে' তো ধরবার জো নেই—সকলকেই ঠকিয়েছেন দেখছি!"

বললুম—"ঠকাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তো লিখি নি। আপনারাও তো ভুল করেন নি—জ্ঞান বুদ্ধিতে যে সত্যই আমি ছোট।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কাশীতে তীর্থ করতে না কি?" বললেন—"সাহিত্যসভাদি মাত্রই আমার তীর্থ—আপনারই সঙ্গী হবো।"

সাহিত্য-সভা-সমিতি মাত্রই তার তীর্থক্ষেত্র ছিল, এবং সে হিসেবে তিনি অপরাজেয় তীর্থ-পর্য্যটক ছিলেন।

অনেক কথাই হোলো। পরে মহানন্দে একত্রে মীরাট রওনা হওয়া গেল—অভাবনীয়!

মীরাট পৌছে দেখি—ঠাণ্ডা অতিরিক্ত। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য রায় মহাশয়—গরম জলের বোতল নিয়ে শুয়ে আছেন। দাদার হিমালয়ের হিম্মত্—তিনি থরথর্ কোরে বেড়াতে লাগলেন! ৭০ বছর বয়সে, ডিসেম্বরের শীতে সখ্ কোরে কলকেতা হ'তে সাহিত্য-সম্মেলনে যোগদান করতে মীরাট আসাটা বাতিকের কাজ কি প্রেমের কাজ—সেটা বলা কঠিন হ'লেও দাদার স্ফূর্ত্তি দেখে তাঁর সাহিত্য-ভক্তি সম্বন্ধে দ্বিধার অবকাশ ছিল না।

বাঙালী যেখানেই থাকুন—সম্মানিতকে সমাদরে গ্রহণ

করতে কোনো দিনই তাঁরা কৃপণ ন'ন্—তাতে তাঁদের আনন্দ উৎসাহ সমধিকই পেয়েছি। দাদাকে পেয়ে তাঁদের আনন্দ ও আদর-যত্নের অন্ত ছিল না।

দিল্লী হ'তে অধুনা পরলোকগত সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাকে দিল্লী হয়ে যাবার জন্য—আহ্বান-লিপি সহ মোটর যোগে আমার পরম প্রীতিভাজন স্বনামধন্য (চিত্রশিল্পী) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল ও ভ্রাতাকে মীরাট পাঠান এবং দিল্লীতে একটি সাহিত্য-সভার আয়োজনও করেন। মীরাট অধিবেশনের শিল্প শাখায় সারদাভায়া সভাপতিও ছিলেন। সম্মেলনান্তে আমাদের রওনা হবার কথা ছিল।

সাহিত্যবিভাগে রচনা এসেছিল অনেকগুলি (প্রবন্ধ, কবিতা, প্রভৃতিতে ৪০।৪২টি)! নির্ব্বাচন জন্য সবগুলি দেখ্‌তে রাত প্রায় দুইটা হয়ে যায়—পরে আর নিদ্রা হ'ল না—মাথার অসোয়াস্তি বাড়ালে। সকালে কানপুরের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন পরীক্ষান্তে আমার দিল্লী যাওয়া বন্ধ করলেন এবং সোজা কাশী চলে' গিয়ে একপক্ষ বিশ্রামের ব্যবস্থা দিলেন! বললেন—"এরূপ 'হাই ব্লড্ প্রেসারে' কোনো কথাই চলতে পারে না।—সার বি-এন অবুঝ নন্—যাওয়া হতেই পারে না।"

বললুম—"এখানে যে তাঁর মোটর অপেক্ষা করছে— সেখানেও সভা announced যে!—এরূপ অভদ্রতা যে জীবনে করা হয় নি।"

হেসে বললেন—"এক্ষেত্রে যে উপায় নেই। যদি যান, তা হলে বুঝতে হবে—ও খালি মোটর নয়, পরলোকে পৌঁছে দেবার রথ!—উপায় নেই—উপায় নেই কেদার-বাবু——"

বললুম—"আছে, রায় বাহাদুর দাদাকে অবস্থার গুরুত্ব জানিয়ে যেতে রাজি করতে পারলে নিশ্চয়ই তাঁরা হাঁড়ির বদলে টোপর পাবেন।"

তাই করা হোলো, দাদা চ'লে গেলেন—অর্থাৎ আমাকে বাঁচালেন। আমিও কাশী রওনা হলুম। তাঁর সেই কষ্ট-স্বীকার আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি ও তাঁকে বারবার নমস্কার করি। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক!

দূরে দূরে থাকায় তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে আমার পাওয়া হয় নি, তাই দু-একটি ঘটনা অবলম্বনে তাঁর সম্বন্ধে এই সামান্য অর্ঘ্য নিবেদন করতে হ'ল। ফল কথা, একটি ভাল লোক হারাণো গেল।

জলধর সেন

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী ও সাহিত্যসেবীদিগের অকৃত্রিম সুহৃদ্ সর্বজনপ্রিয় জলধর সেন মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু আকস্মিক না হইলেও ঠিক প্রত্যাশিত ছিল না। কাজেই অনেকে তাঁহার বিয়োগব্যথা বিশেষ করিয়াই অনুভব করিতেছেন। বিশেষত তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে তাঁহার রবিবাসরিক ভ্রাতৃগণের মধ্যে আজ তাঁহার মৃত্যুতে হাহাকার উঠিয়াছে। তাঁহার জয়ন্তীতে আমরা যাঁহারা অভিনন্দন করিয়াছিলাম, হৃদয়ের প্রীতি অকপটে ঢালিয়া দিয়াছিলাম, আজ আবার তাঁহার স্মৃতিতর্পণ করিতে হইতেছে! এ যে কত কষ্টদায়ক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

জলধর সেনের সঙ্গে যাঁহারা মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন জলধর কেমন মানুষ ছিলেন। বর্ষার জলধরেরই মত স্নিগ্ধ কোমল, শান্ত শ্যামল ছিল তাঁহার হৃদয়টি। তিনি সংসারের মধ্যে থাকিয়াও যেন এক সুদূর জগতে বাস করিতেন। এই জগতের ধূলিমলিন স্পর্শ যেন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিত না। তাঁহাকে কখনও সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা কহিতে শুনি নাই, পরচর্চায় তাঁহার উৎসাহ কখনও দেখি নাই। হয়ত কাহারও জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন, নয়ত আমারই রোগশয্যার পার্শ্বে অজস্র সহানুভূতির পসরা লইয়া বসিয়াছেন। সত্যই তিনি বিমানচারী পক্ষীর মত কোনও উচ্চস্তরে বাস করিতেন, সেখানে আকাশ আরও নিবিড়নীল, বাতাস আরও নির্মল, রৌদ্রকর আরও স্নিগ্ধ। সেই জন্য অনেকে তাঁহার নাগাল পাইত না। পরিব্রাজক হইয়া তিনি হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরিয়া ছিলেন, তাহারই ছোপ ধরিয়াছিল তাঁহার প্রাণে। জলধরবাবুর প্রাণ ছিল বড় শাদা, বড় উচ্চ।

তিনি যখন আমার রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঙ্গাল হরিনাথের আগমনী গাহিতে গাহিতে অশ্রু বিসর্জন করিতেন,

তখন বুঝিতাম তাঁহার মর্মের কথা, পাইতাম তাঁহার প্রাণের সন্ধান।

'সারা বরষ দেখিনি মা, ওমা উমা তুই কেমন ধারা।' কি দরদ দিয়াই দাদা এই গান গাহিতেন। জলধর সকলের দাদা। ভাই বলিতে যে কি আনন্দ, তাহা জলধর সেনকে দেখিলে বুঝিতাম না। আজ আমরা দাদার জন্য ব্যাকুল হইতেছি। সকল ভুলিয়া, তাঁহার সাহিত্যিক যশঃ প্রতিভা, তাঁহার রাজদত্ত সম্মান সকল ভুলিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, 'দাদা', 'আমাদের সেই দাদা আজ কোথায়!'

জলধর দাদা চিরদিন সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম হইতেই সাহিত্য জীবনের কেন্দ্রস্থলে তিনি বিরাজ করিয়াছেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কত নবীন সাহিত্যিকের জীবন স্বপ্ন গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন পূর্বে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজবাড়ী হইতে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিবার আয়োজন হইয়াছিল; তখন আমরা বোধ হয় ছাত্রজীবন অতিবাহিত করি নাই। সেই সময়েও জলধর-দাদার নাম পরিচালকদের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা-পত্রে ছিল

*   *   *   *

নলিনী গোলাপ প্রিয় চিত্ত জলধর
নির্মাল্য চালন ব্রতে হয়ে উদ্দীপিত···

ইত্যাদি। ইহা লইয়া সুরেশ সমাজপতি বোধ হয় 'সাহিত্যে' কিছু ঠাট্টাবিদ্রূপও করিয়াছিলেন। সেদিন প্রিয়নাথ সেন, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির সঙ্গে জলধরের নামটিও জুড়িয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

দাদার সম্পাদক জীবনে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের নিদর্শন—ভারতবর্ষ। 'ভারতবর্ষ' আজ ছাব্বিশ বৎসরকাল যে সাহিত্য সেবা করিয়াছে, যে প্রতিষ্ঠা শক্তি গৌরব অর্জন করিয়াছে, তাহার অনেকখানি জলধর সেনের প্রাপ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্পাদকের কার্য অনেক সময়ে খুব সহজ নহে। কত লোককে প্রত্যাখ্যান করিতে হয়, কত অপ্রিয় সত্য বলিতে হয়, কত তিরস্কার গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু জলধর সেন সারাজীবন নির্লিপ্তভাবেই কর্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। যখন আবাল্যবন্ধুর বাক্যবাণে তাঁহার হৃদয় জর্জর হইয়াছে তখনও তাঁহাকে মৌন, উদাসীন ও অবিচলিত দেখিয়াছি। ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। এই গুণে সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত।

তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই গাম্ভীর্য ও পবিত্রতাই দেখিতে পাই। 'হিমালয়ে' যে সত্যের সন্ধানে অভিযান দেখি, তাহাই সাহিত্যে তাঁহার সারাজীবনের সাধনা। প্রবৃত্তির তাড়নে তিনি আপনাকে কখনও বিচলিত হইতে দেন নাই। তাঁহার সাহিত্যের মধ্যেও তাহার চঞ্চলতা কোনও বিক্ষেপ আনিতে পারে নাই। প্রত্যক্ষ হইতে পরোক্ষে যে সত্য নিহিত আছে, তাহারই প্রতিভাস তাঁহার সাধনায় লক্ষ্য করিবার বিষয়। নবযুগের জীবনরহস্য সাহিত্যের যে অংশকে বেগবান করিয়াছে, তাহা হইতে তিনি আত্মরক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই জন্য তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র একটা শুচিতার সৌরভ পাওয়া যায়।

দাদা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সীমাহীন মহাসিন্ধু দূর হতে দাঁড়াইয়া দেখি'
নয়নে বিস্ময় জাগে, মনে জাগে ত্রস্ত কৌতূহল,
বিস্ময়ের সীমা নাই, কৌতূহলে জাগে আকুলতা
মন যত কাছে যায়, দূরে তত দাঁড়াই সরিয়া।

অনন্ত সিন্ধুর বুকে উচ্ছ্বসিত উদ্দাম প্রবাহ
ঊর্দ্ধে বাহু প্রসারিয়া জানায় স্পর্দ্ধিত আস্ফালন;
তাহারে চাহিবে কেবা? কে তাহারে রুধিয়া রাখিবে?
বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে লবণাম্বু স্পর্শে বালুবেলা।

সেথায় উদ্‌ভ্রান্ত মন শুষ্ক তৃষ্ণা বুকে বহি মোরা,
প্রলুব্ধ নয়ন মেলি' হেরি শুধু মত্ত জলোচ্ছ্বাস,
সম্মুখে অসীম সিন্ধু, বুকে তৃষ্ণা অতৃপ্ত মোদের
কি হবে সমুদ্র নিয়ে, দুষ্প্রাপ্য সে অপেয় পানীয়ে?

সমুদ্র সুদূরে রহি' সৃষ্টি করে কেবল বিস্ময়
ভয় জাগে, কুণ্ঠা জাগে, হেরি তার প্রচণ্ড আবেগ,

আভিজাত্য অহঙ্কারে, সে কাহারে করে না আপন
দু'হাতে ধরিতে গেলে, ফেলে যায় হেলায় পশ্চাতে।

তার চেয়ে শ্রেয় নদ, আপনাতে আপনি সুন্দর
অশ্রান্ত প্রবাহ তার অনুদ্দাম অমৃত-সঞ্চারী;
সেই ভালো আমাদের, বহে যায় ঘরের দুয়ারে
মধু কলধ্বনি তার অবিরাম ডেকে নেয় কাছে।

মোদের ঘরের কাছে, দেবতার মন্দির-সোপানে
প্রগাঢ় আবেগ ভরে রেখে যায় পরশ তাহার,
কুঞ্জবন-বীথিকায় একান্তে বহিয়া নিরবধি
সে জানে প্রাণের কথা, অন্তরের গূঢ় অনুভূতি।

তাহারে দেখিলে চোখে, মনে হয় কত পরিচিত
কত যুগযুগান্তের স্নেহ প্রেমে প্রশান্ত গম্ভীর,
অতীত দিনের স্মৃতি বহিয়া সে এনেছে নিয়ত
উন্মুখ হৃদয়-তল সমুচ্ছল লহরী-লীলায়।

সহস্র বর্ষের দুঃখ, বেদনার দাবদাহ জ্বালা
নিমেষে শীতল হয় পরিপূর্ণ গহন গাহনে,
শতেক তীর্থের পুণ্য পুঞ্জীভূত সে স্বচ্ছ অতলে
চিত্তের আকুল তৃষ্ণা মিটে যায় সে অমৃত পানে।

মোদের পূজার ফুল অঞ্জলী ভরিয়া সেই স্রোতে
ভাসাইয়া দিনু আজি অন্তরের অনন্ত আশায়
অনাগত দিনে যারা শ্রদ্ধায় তুলিয়া লবে হাতে
দেখিবে সে ফুলদল নির্ম্মাল্যের আশীর্ব্বাদে ভরা।

স্বর্গত রায়বাহাদুর জলধর সেন

শ্রীরাজশেখর বসু

বাঙ্গালীর আয়ু এত কম যে ষাটের উপরে কেউ মরলে আমরা অকালমৃত্যু বলি না। যদি কেউ সত্তর পার হয়ে মারা যান তবে মনে করি খেদ করলে বিধাতার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হবে। যাঁরা বহুকাল বেঁচে থেকে বিশাল কীর্ত্তি রেখে গত হন তাঁদের জন্য বিস্তর শোকসভা হয়, দেশের ক্ষতির আলোচনা হয়, স্মৃতিরক্ষারও ব্যবস্থা হয়। তবু একথা মানতে হবে যে দীর্ঘজীবী কীর্তিমানদের মৃত্যুতে যে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা যায় তার মূলে সামাজিক কর্তব্যবোধ যত থাকে শোক তত থাকে না।

কিন্তু আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত শোক অন্যরকম, বয়সের যুক্তিতে মন প্রবোধ মানে না। স্বজনবিয়োগের দুঃখ অল্প-লোকের মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু তার তীব্রতা বেশী। দৈবক্রমে মাঝে মাঝে এমন লোক দেখা দেন যাঁর সঙ্গলাভে অগণিত লোক পরিতৃপ্ত হয়, যিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারতায় সকলেরই পরমাত্মীয় হয়ে যান। কেবল প্রতিভায় বা কেবল সৌজন্যে এমন হয় না! এই রকম অসামান্য গুণশালী ব্যক্তির মরণ স্বজনবিয়োগের তুল্যই দুঃসহ, বয়সের হিসাব কোন সান্ত্বনা দেয় না। আমাদের শোকের কারণ শুধু এই নয় যে এত সদ্‌গুণের যিনি আধার তিনি আর নেই; এই চিন্তাই বেশী কষ্ট দেয় যে যার সঙ্গে এতকাল ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি তাঁকে আর পাওয়া যাবে না।

জলধর সেন এইরকম অসামান্য পুরুষ। তিনি সাহিত্যের জন্য কি করেছেন তা লিখব না, অনেকেই সে কথা আমার চেয়ে ভাল ক'রে লিখবেন। তাঁর যে গুণ সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে, তা তাঁর অশেষ দাক্ষিণ্য। তাঁর লেখায় কথায় আচরণে করুণাধারা বইত—যাকে বলে milk of human kindness. স্নেহজাল বিস্তার ক'রে তিনি ছোট বড় অসংখ্য সাহিত্যসেবীর কুলপতির পদ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু দলপতি হন নি, সব রকম দলাদলির তিনি উর্ধে ছিলেন।

বিদ্যা বা রাজপ্রসাদের নিদর্শক উপাধি অনেকেই পায়, কিন্তু জনসাধারণ একযোগে অন্তর থেকে যা দান করে এমন উপাধিলাভ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাংলা দেশের সমগ্র সাহিত্যসমাজ দাদা উপাধি দিয়ে জলধর সেনকে অন্তরঙ্গ অগ্রণী ব'লে মেনে নিয়েছে। এমন ঘনিষ্ঠ আন্তরিক মর্যাদা আর কোনও সাহিত্যিক পান নি।

জলধর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সকলে তোমার আপন, তোমার ছিল না আত্মপর,
স্নিগ্ধ কান্ত তুমি আমাদের আষাঢ়ের জলধর।
আধা-গৃহস্থ, আধা-সন্ন্যাসী,
তোমারে আমরা বড় ভালবাসি,
বচন তোমার আদর মাখানো, সব ঠাঁই ছিল ঘর।

২

সৌম্য সুজন, বিনয়নম্র, তুমি ছিলে সাধু সৎ,
আধাপথ পাক্‌দণ্ডী অধিক কূলে কূলে ছাওয়া পথ।
ছিল না চাতুরী, ছিল না দ্বন্দ্ব,
তব দর্শন সেই আনন্দ
অমানীরে তুমি যেচে দিতে মান, দীন পেত সমাদর।

৩

বুকের ভিতর গোপনে তোমার বাজিত যে একতারা
গৃহীমন তব হয় নাই কভু গৈরিকবাস হারা।
তুমি লয়ে ছিলে বহু পরিবার
গোপনে ডাকিত বদরী কেদার
হে চির পথিক এতদিনে পেলে বিশ্রাম অবসর।

৪

ফুরায়েছে পথ, দেউল সোপানে বসেছ আসিয়া আজ
অযুত ভক্ত ডাকিছে তোমায় দেবমন্দির মাঝ।
শান্তি লভুক শ্রান্ত জীবন
ডাকিয়া তোমারে ল'ন নারায়ণ
আরম্ভ কর অমৃতলোকে তুমি নব বৎসর।

জলধর-স্মৃতি

শ্রীলালগোপাল মুখোপাধ্যায় (স্যর)

শ্রীযুত জলধর সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণে বঙ্গ দেশের ও বঙ্গ সাহিত্যের একটী উজ্জ্বল তারকা লোপ পাইয়াছে। বহুদিন যাবৎ তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। "ভারতবর্ষের" সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঐ পত্রিকার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই।

যখন "ভারতবর্ষ" বাল্যাবস্থায় তার পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে হারাইল, তখন জলধরবাবু তাকে আদরে কোলে তুলিয়া লয়েন। তাঁরই যত্নে এখন ভারতবর্ষ পূর্ণবয়স্ক ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকারা জলধরবাবুর অভাব বিশেষরূপেই অনুভব করিবেন।

এই লেখকের সৌভাগ্যক্রমে তাঁর জলধরবাবুর সহিত চাক্ষুষ আলাপ ও পরিচয় ছিল। এত বিনয়ী, নম্র ও মধুরভাষী লোক অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁর দান সাহিত্য জগতে বিরাট। ন্যূনকল্পে ষাটখানি পুস্তক তিনি বঙ্গ-সাহিত্যকে দান করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের ত কথাই নাই। তিনি সাহিত্যিক বলিয়া গর্ব্বের একটি কথাও তাঁর কাছে লেখক শুনেন নাই। অনেকেই তাঁকে আদর ও সম্মান করিয়া "জলধর দাদা" বলিতেন।

যখন ভগবানের নিয়মেই উদ্ভব স্থিতি ও প্রলয় অহরহঃ ঘটিতেছে, তখন জলধর দাদা যে একদিন তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধবকে ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করিবেন, তাহা জানাই ছিল। কিন্তু এই চিরস্থায়ী নিয়ম মনে রাখিয়াও যাঁহারা তাঁকে জানিতেন, তাঁহাদেরও "দাদা"র মৃত্যুসংবাদ কাতর করিতে বাকী রাখে নাই।

ভগবানের কাছে জলধর দাদার আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

জলধর দা

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মন্থর মরশুমি বাতাসে যে মেঘ ধীরে ধীরে ভেসে আসে উত্তর পথে, বাংলার শ্যামল মাঠে সজল ছায়া দুলিয়ে চলে যায় হিমালয়ের পানে। সবুজ ধানক্ষেত হাতছানি দেয়; ঘন বটের শাখায়—পাতার আড়ালে বাজে রাখালের বাঁশী; তবু থামে না তার গতি। বাষ্পাকুল পবন-মঞ্জীর বিবাগী বাউলের মত না-বলা কথার মৃদুগুঞ্জন তুলে এগিয়ে যায় অলকাপুরীর পথে; স্বপ্ন-কল্পনার কোন যক্ষবধূর দ্বারে গিয়ে করে করাঘাত; আঁচল পাতে দেবতার আশ্রম প্রাঙ্গণে; না-জানি কার সন্ধানে ঘুরে মরে নিস্তব্ধ গিরিগুহার অন্ধকারে, কিন্তু খুঁজে পায় না পথ। অভ্রভেদী হিমাচলের সানুদেশে মাথা রেখে হয়ত শেষে জানায় প্রণাম:

হে ঋষি পাষাণ!
খোল দ্বার, ব'লে দাও পথের বারতা।
তুষার কিরীট শুভ্র অম্বর দেবতা,
বল কোন নিভৃত গুহায়
জ্বলিতেছে ধরিত্রীর মঙ্গল প্রদীপ?

• • •

পাষাণের শ্বাস অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে; মেঘের সর্ব্বাঙ্গে লাগে করুণার সস্নেহ পরশ। হিমালয়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় ক'রে

আবার ফিরে আসে বাঙলার পথে। সেই কল্যাণ আশীর্ব্বাদ অফুরন্ত হ'য়ে ওঠে মেঘের বুকে; বিগলিত ধারায় ঝরে পড়ে নদনদী, বন-উপবন প্লাবিত ক'রে। বাঙলার শ্যামলমাঠ হয় শ্যামলতর; সবুজ ধানের আঁচলে আঁচলে দোলে সোনালী শীষ্। শাখার আড়ালে দোলে মাছরাঙা; রাখালের বাঁশী প্রতিধ্বনিত হয় পিয়ালের বনে; কাজল-দীঘির কুমুদপলাশে লাগে বর্ষণের রেণু।

ঠিক তেমনি ক'রে বাষ্পাকুল মন্‌সুনের মত জলধরদাও ছুটেছিলেন বাঙলার জনসমুদ্র হ'তে হিমালয়ের গিরিপথে; খুঁজেছিলেন জীবনের পথ, পেয়েছিলেন সেই অম্বর দেবতার হিমকল্যাণ স্পর্শ। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এলেন বাঙলার মনের আকাশে শ্রাবণ দিনের অফুরন্ত শীকরসম্ভারে মন্থর অন্তরখানি পূর্ণ ক'রে, শান্ত সজল জলধরের পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে। সেই বর্ষণোন্মুখ কালো মেঘের ছোঁয়ায় তরুণের অন্তরে বিকশিত হ'ল হৈমন্তী ফসলের সোনালী শীষ্; সাহিত্যের ভীরু পূজারী আশ্রয় পেল স্নেহের সবুজ শাখায়; রাখালের বাঁশী কান্তার ছেড়ে প্রতিধ্বনিত হ'ল ছায়াশীতল লোকবীথিকায়।

সাহিত্যিক প্রতিভার কথা আজ আর বল্‌ব না। ব'ল্‌ব শুধু তাঁর সেই স্নেহপ্রবণ অন্তরের কথা, যা ভাই-এর মত আলিঙ্গন ক'রেছে অবাধ ভালবাসায় সকল পূজারীকে, মায়ের মত লালন ক'রেছে সাহিত্য-ক্ষেত্রের চারাগাছগুলি—যার শাখায় শাখায় ফুটেছে সুরভিত সোনার ফসল। জলধরদা শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন সত্যিকারের সাহিত্য-পূজারী। তাই মন্দিরদ্বার অবারিত ক'রে শত শত পূজারী কিশোরের অঞ্জলি পৌছে দিয়েছেন দেবতার পায়ে; সহপূজারীকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠতর বন্দনার পূর্ণ অধিকার। অন্যের মাথায় হাসিমুখে তুলে দিয়েছেন জয়মাল্য, সার্থকতার গৌরবে আপনাকে বিভোর ক'রে।

সহযাত্রীদের অগ্রজ ছিলে তুমি হে জলধর-দা, তোমায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিই। অনুযাত্রীদের সারথী ছিলে তুমি হে জলধরদা, তোমায় নমস্কার করি। আগামী যুগের পথপ্রদর্শক ছিলে তুমি হে জলধরদা, তোমার তর্পণ করি।

জলদ পুষ্কর!
শান্ত মৌন অচঞ্চল শ্যাম জলধর!
বিগলিত স্নেহধারে তব
শ্যামল ধানের ক্ষেত হ'ল শ্যামতর;
গ্রামপথে মধ্যাহ্ন কান্তারে
দোলায়ে সজলছায়া উতরোল দক্ষিণ বাতাসে।
তুমি স্নিগ্ধ, ছিলে প্রিয়তর
মনের মানস লোকে তাই আজ হ'লে স্মরণীয়।

স্বর্গীয় জলধর সেন

শ্রীরাধারাণী দেবী

তুমি ছিলে খাঁটি বাংলা-মাটীর খাঁটি বাঙালী,
ছিলে অকৃত্রিম খাঁটি মানুষ।
তোমার ও আমাদের মধ্যে ছিল
দীর্ঘ যুগের সুদীর্ঘ ব্যবধান।
তবু, আশ্চর্য তোমার অন্তরের ঐশ্বর্য
বহু যুগের ওপারের হয়েও
জয় করেছ তুমি আমাদের হৃদয়।
তোমার প্রতিভা ছিল সামান্য কি অসামান্য
ছিলে কতখানি ধনী মানী জ্ঞানী গুণী
আজ কেউ তা' বিচার করতে বসছে না,
ব্যথিত হৃদয়ে একটিমাত্র কথাই ভাবছে সকলে—
আমাদের পরম বন্ধু চলে গেলেন!
একান্ত আন্তরিকতায় বিষাদ সজল চোখে
এই একটি মাত্র কথাই বলছে সকলে—
যিনি গেলেন, তাঁর মত দ্বিতীয় আর কাউকে পাবো না।
প্রেমধর্মী ছিল তোমার করুণা-কোমল হৃদয়।
অন্তর ছিল অহেতুক স্নেহ-প্রীতির অনন্ত পারাবার।
উদার মন ছিল অসীম ক্ষমাশীল,
অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে
হয়েছিলে তুমি অজাতশত্রু।

কাণে শুনেচি, পুঁথিতে পড়েচি, আবৃত্তিও করেছি বহুবার
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—'
তোমার অন্তর যারা জেনেছিল,
যারা পেয়েছিল তোমার একান্ত সান্নিধ্য,
তা'রা প্রত্যক্ষ করেছে—

সাধক-কবির ধ্যান দৃষ্ট
সবার উপরের সেই সত্য মানুষটিকে।
সত্য সত্যই মানুষের—আর
'যাহার উপরে নাই'।

জলধর সেন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমরা তখন "কল্লোল"-এ, সমস্ত অভিজাত পত্রিকার থেকে দূরে সাহিত্যের আকাশ তখন বিদ্বেষবিষধূমে আচ্ছন্ন। তখন তাঁর বিস্তৃত-জ্ঞাত নামী কাগজে যিনি আমাদের সর্বপ্রথম আহ্বান করলেন তিনি জলধর সেন। শুধু স্থান দিলেন না, সম্মান দিলেন, অনুগ্রহ নয়—দিলেন অধিকার। সেদিনকার আবিল আবহাওয়ার ঊর্ধ্বে সাহিত্যের প্রতি তাঁর সেই নিষ্পক্ষপাত ও নিঃসঙ্কোচ আতিথেয়তা আমাদের পক্ষে একটা গভীর অনুভবের জিনিস ছিল যা ইহজীবনে কখনো বিস্মৃত হব না।

"দাদা"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

গত শতকের প্রতিভাদীপ্ত চন্দ্র সূর্য্য মাঝে
তুমি এসেছিলে মাটীর প্রদীপ হাতে লয়ে দীন সাজে;
তোমার দীপের স্তিমিত আলোকে—মৃদু শিখা তাপহীন—
সারা হিমালয় হবে আলোকিত কে জানিত সেইদিন!

দেবীর চরণে অতীতে একদা দিয়েছ' তুমি যে দান
কালের নিকষে হবে জানি তার যথার্থ পরিমাণ;
আজ শুধু বলি—তুমি বেঁচেছিলে যে-যুগের স্মৃতি নিয়ে,
চলে গেছ তার গৌরব-গীতে ভাগীরথী ভরে দিয়ে!

মানুষের মাঝে যে-মানুষ ছিল সবার আপন হ'য়ে
এ-কাল তাহারে বুঝিবে না জেনে দেবতারা গেল ল'য়ে।
শ্রদ্ধা-বিহীন-বন্ধু এ-যুগে ভালবাসে শুধু মুখে,
তোমার গভীর অকপট স্নেহ চিরতরে গেল চুকে!

দীর্ঘ জীবন লভেছিলে তুমি, এ নয় অকালে যাওয়া—
তবু সান্ত্বনা মানে না যে মন, আর তো যাবে না পাওয়া
সকলেরই প্রিয়, পূজ্য সবারও সহজে মেলে না আর,
সেকালের শেষ-আলোক-শিখাটি নিভে গেল এইবার!

মাটীর মানুষ, নিরহঙ্কার, উদার, মহানুভব!
অন্তরে ছিল আন্তরিকের চির-স্নেহ-উৎসব।
নীচ স্বার্থের ক্ষুদ্রতা কভু খর্ব্ব করেনি মন,
দ্বেষ হিংসার উর্দ্ধে বিছানো তোমার দর্ভাসন!

বাণীর সেবক যে এসেছে কাছে আদরে নিয়েছ বুকে,
আপদে বিপদে দাঁড়ায়েছ পাশে, জড়ায়েছ সুখে দুখে;
সঙ্গ তাদের মানিয়াছ' সদা—স্বর্গ অধিক প্রিয়,
বাণীর আসর তীর্থ-অধিক ছিল তব বরণীয়!

পরমাত্মীয় তুমি যে সবার—কেহ নহে তব পর,
মানুষের পরে ছিল বিশ্বাস, ছিল দৃঢ় নির্ভর;
ছিল না তোমার ছোট বড় কেউ, সবার বন্ধু তুমি
তোমারে হারায়ে সত্যই আজ অভাগী মাতৃভূমি।

প্রতিভা তোমার কতটুকু তার বিচার আমার নয়,
আমি জানি তুমি হৃদি-সম্পদে হৃদয় করেছ' জয়,
রস-যজ্ঞের রসিক পূজারী ছিলে কিনা মনে নাই—
শুধু বুকে বাজে-- গেল অগ্রজ—শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভাই

সুস্নিগ্ধ জলধর

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সংসারে বড়লোকেরা সাধারণত থাকেন কোলাহলের মধ্যে, শ্রদ্ধানত জনতার মুগ্ধদৃষ্টির কেন্দ্রীভূত হয়ে। তাঁদের আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই, খবরের কাগজে প্রত্যহ তাঁদের খবর পাই, লোকের চোখে-চোখে এবং কানে-কানে প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁরা বিরাজ করেন। প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মের মধ্যেও আমরা তাঁদের বিস্মৃত হই না, বিস্মৃত হওয়ার উপায়ই নেই।

কিন্তু জলধরদা সেখানে তাঁর স্থান বেছে নেন নি। তাঁর শান্ত এবং অনাড়ম্বর প্রকৃতি তাঁকে কোলাহলের মধ্যে

থাকতে দেয়নি। জীবনে তাঁর বৈচিত্র্য এবং কর্ম্মবহুলতার অন্ত ছিল না। কিন্তু তার সমস্তই ঘটেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, নিভৃত কোণে, বড় জোর নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু-মহলের মধ্যে। সংসারে বড় হওয়ার দুর্ভোগ আছে। তাঁকে কুড়োতে হয় ফুলের মালা, জনতার স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা, সভায়-সভায় অভিনন্দন। মানুষের ভিড় সমুদ্রের তরঙ্গ-মালার মতো তাঁর তটরেখায় মুহুর্মুহু আঘাত করে। তাঁর জীবনে থাকে না বিশ্রাম, থাকে না অবকাশ, থাকে না নির্জ্জনতা। কিন্তু জলধরদা কি ক'রে যে এ সবের থেকে অনেকাংশে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন, যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের সে কথা বুঝতে কষ্ট হবে না।

অথচ তাঁর জনপ্রিয়তারও অন্ত ছিল না। বাঙ্গলা দেশের চেনা-অচেনা সকল লোকের তিনি ছিলেন জলধরদা। যারা তাঁকে চোখে দেখেছে আর যারা দেখেনি, যারা তাঁকে কাছে পেয়েছে আর যারা পায়নি, সকলেরই এই সরল স্বভাব, নিরীহ এবং নিরহঙ্কার লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতির শেষ ছিল না। বোধ করি, বাঙ্গলার মাটির সঙ্গে এই শান্ত সাহিত্যাচার্য্যের একটা ঘনিষ্ঠ অথচ অদৃশ্য সংযোগ ছিল, যার জোরে তিনি বাঙ্গালী চিত্তকে এমন ক'রে আকর্ষণ করেছেন যা অল্প লোকেই পারে। বাঙ্গালীর প্রতি তাঁর প্রীতিই কি কম ছিল? বস্তুত পক্ষে আমরা যারা তাঁকে একান্ত ক'রে কাছে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলাম, গভীর সন্দেহে বারে বারেই আমরা ভেবেছি, যে স্নেহ তিনি আমাদের দিয়েছিলেন তার কতটুকু আমরা ফিরে দিতে পেরেছি! কিন্তু সেও আমাদের দোষ নয়। যত বড় মন নিয়ে তিনি ভালোবেসেছিলেন তত বড় মন সকলের থাকে না।

সাধারণত লোকে তাঁকে জানে দুইরূপে। এক—বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে, আর—একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রের সম্পাদক হিসাবে। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁর দান অসামান্য। তাঁর 'প্রবাসচিত্র', 'হিমালয়,' 'অভাগী', 'বিশুদাদা', 'দুঃখিনী', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্যের মস্ত বড় সম্পদ ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁরই চেষ্টায়, যত্নে এবং সুসম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' এত বড় খ্যাতি ও সমাদর লাভ ক'রেছে। যে কোনো প্রতিভাবান সাহিত্যিকের কর্ম্মজীবনে এ বড় সহজ কৃতিত্ব নয়। কিন্তু তাঁর প্রকাণ্ড বড় মনের কাছে এ সবও যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। রায় বাহাদুর জলধর সেন কিছুতেই জলধর দাদাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারল না।

সে অনেকদিন আগের কথা। তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। জলধরদাদাকে একটা সভায় সেই সময় প্রথম দেখি। দেখেই আমার চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠল। এই সাহিত্য জগতের জলধরদা! রাস্তায় দেখলে ভাবতাম, গ্রাম থেকে সবে এসেছেন। কালীঘাট এবং চিড়িয়াখানা দেখে গঙ্গাস্নান ক'রে দেশে ফিরবেন।

কিন্তু তিনি যখন বলতে উঠলেন, তাঁর সমস্ত অন্তর একমুহূর্ত্তে স্বচ্ছ হয়ে উঠল। তার মধ্যে এক ফোঁটাও মালিন্য কোথাও নেই। মনে হ'ল, জলধরই বটে! রসেভরা শ্যামকান্তি জলধর, কোমল এবং সুস্নিগ্ধ।

তার অনেক পরে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি এবং একদিন জলধরদা'র সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্যও হয়। একমুহূর্ত্তে এমন আপনার ক'রে নিলেন যে সে কথা আজও ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এমনি ক'রে ছোট-বড় সকল সাহিত্যিককেই তিনি কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কালের বাঙ্গলার সাহিত্যিকের ঋণের পরিমাপ নেই। বাঙ্গলার বহু সাহিত্যসৃষ্টির মূলে তাঁর প্রেরণা এবং উৎসাহ যে কতখানি কাজ ক'রেছে তা সাধারণে জানে না, জানবার কথাও নয়। যতদূর স্মরণ হয়, বোধ হয় শরৎচন্দ্র একবার একটা সভায় সে ঋণ স্বীকার ক'রেছিলেন।

জলধরদা'র মৃত্যুকে বাঙ্গালীর সাধারণ পরমায়ুর হিসাবে কোনোমতেই অকাল-মৃত্যু বলা চলে না। কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বাঙ্গলার সাহিত্য ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি এমনইভাবে জড়িত হয়েছিলেন যে, তাঁর বিয়োগ-বেদনা অকালমৃত্যুর মতোই বন্ধুজনের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করেছে। তাঁর সাহিত্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি 'ভারতবর্ষ' হয়তো অক্ষয় হয়ে থাকবে, কিন্তু তাঁর স্নেহ ও অমায়িকতা সুহৃজ্জনের চিত্তলোক ছাড়া আর কোথাও অক্ষয় হয়ে থাকবার অবলম্বন পাবে না। সাহিত্যিক জলধর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকবেন, কিন্তু দাদা জলধরের স্নেহপ্রবণ চিত্তের স্পর্শ স্মৃতি ছাড়া আর কোথাও আমরা খুঁজে পাব না।

জলধর দাদা

শ্রীকালিদাস রায়

তোমার বিদায়ে পেয়েছি বন্ধু
পরমাত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা।
তব সাহিত্যসাধনা কি ছিল
আজিকার দিনে থাক সে কথা।
সকলেরে তুমি বুকে নিলে টেনে
ভালবেসে দাদা ছোট ভাই জেনে
তোমারে ঘেরিয়া তাদের মাঝারে
ঘনাইল নব বান্ধবতা।
সাহিত্যে তোমা কেহ কয় রথী,
কেহ মহারথ, কেহ সারথি,
মোরা জানি তুমি এই সাহিত্য
সংসারে ছিলে গোষ্ঠীপতি।
এর দারিদ্র করিলে বরণ
প্রেম গদ্‌গদ্—তব আচরণ,
সবারে বাঁধিলে মৈত্রীসূত্রে,
নিজে সহি শত ক্ষত ও ক্ষতি,
ব্যথিত পতিত মানুষের লাগি
চির বরষাই ছিল ও চোখে
যত ভালবাসা বিলায়েছ তুমি
বেদনা পেয়েছ ততই শোকে।
অশনি শূন্য তুমি জলধর
তোমায়ও বিঁধিল বিদ্বেষ শর,
আজি যাও তুমি স্তুতিনিন্দার
অতীত অশোক অমৃতলোকে।
তোমার স্নেহের পুণ্যতীর্থে
আমরা ছিলাম স্নাতক দল
বিগলিত তব হৃদয় ছায়ায়
আমরা ছিলাম চাতক দল।
দরদী বন্ধু সবার লাগিয়া
আঁখি জলধারা গেলে বরষিয়া
আজিকে তোমার চিতার ভস্মে
ঝরে আমাদের অশ্রুজল।
যে লোকে আজিকে চলে গেলে দাদা
তব প্রিয়জনে পূর্ণ তা যে,
অনুজ হইয়া ছিল যারা হেথা
অগ্রজ হ'য়ে সেথায় রাজে।
তবু মনে হয় তারা কলরোলে
বুলিবে তোমারে 'এস দাদা' ব'লে,
স্বরগে মরতে তুমি চির-দাদা,
দাদা ব'লে জয় ডঙ্কা বাজে।

জলধর-প্রয়াণে

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

জলধর সেন মহাশয়ের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট যুগের শেষ-চিহ্ন মুছিয়া গেল। জলধর সেন মহাশয় যে এত সর্ব্বজনপ্রিয় এবং এতটা আকর্ষণের কেন্দ্র হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, তাঁহার ব্যক্তিত্বে, তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা গুণ ছিল, যাহা বর্ত্তমান কালে খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ এবং যাহার অভাবে আজকালকার জীবন বহুলপরিমাণে শ্রীভ্রষ্ট ও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একান্ত চর্চ্চা-ই হইয়াছে যুগধর্ম্ম; সকলেই নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে চায়, সেই স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করিয়া নিজের জীবন ও তাহার পারিপার্শ্বিক গড়িয়া তুলিতে চায়। ইহার প্রভাব আধুনিক রাষ্ট্রনীতিতে, আধুনিক সাহিত্যে এবং আধুনিক সমাজে সুস্পষ্ট। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণী ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিত্য সংঘাত, মানুষ ও মানুষের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব যেন একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি। জলধর সেন মহাশয়ের মধ্যে কিন্তু এই জিনিষটা ছিল না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাহা পরের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির বিরোধী ছিল না। সেই জন্যই তিনি হইতে পারিয়াছিলেন অজাতশত্রু। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অপরকে আকর্ষণ করিত, কিন্তু কাহারও কাহারও তীব্র ব্যক্তিত্ব যে ভাবে পরের ব্যক্তিত্বকে একেবারে গ্রাস করিয়া নিজে বড় হইতে চায় সে রকম কোন ভাব জলধর সেন মহাশয়ের ছিল না। তিনি পরকে গ্রাস করিতেন না, তিনি আপনাকে দান করিতেন। সেই জন্যই তাঁহার এত

অনুরক্ত গুণগ্রাহী থাকিলেও তিনি কাহারও গুরু হইবার স্পর্দ্ধা করেন নাই, জলধর সেনের শিষ্য বা চেলা বলিয়া কোন লোক পরিচিত হয় নাই। কোন দল গঠন করা, কোন একটা নিজস্ব মতবাদ চালাইবার চেষ্টা করা ইত্যাদি তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন সার্ব্বভৌম 'দাদা'। ইহাই ছিল তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয়, ইহার চেয়ে বেশী কিছু হইবার স্পৃহা তিনি কখনও করেন নাই। এটা বড় সামান্য কথা নহে। তাঁহার পরিচিত অন্তরঙ্গদের মধ্যে নানা রুচির, নানা প্রকৃতির লোক ছিল, কিন্তু তিনি অতি সহজেই যে তাঁহাদের প্রত্যেককে একেবারে আপনার মত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, সত্য সত্যই যে স্নেহে, যত্নে, সহানুভূতিতে ও সহচিন্ততায় প্রত্যেকের 'দাদা' হইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার অপরিসীম ঔদার্য্য ও আধ্যাত্মিক প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই যে পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা, এই যে আত্মদানের প্রবৃত্তি—এটা আগেকার দিনে বাংলা সমাজে ও বাঙালীর চরিত্রে ছিল। গ্রামে গ্রামে 'দাদা' 'খুড়ো' বলিয়া পরস্পরকে ডাকাডাকি ত ছিলই, তাহা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই দু-চার জন সরকারি 'দাদা' ও 'খুড়ো' পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে ইহাদের লইয়া রঙতামাসা চলিত, কাজ না থাকিলে লোকে খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিত, কিন্তু ইহাতেই প্রমাণ হয় যে কি ভাবে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে হৃদয়ে আসন পাইয়াছিলেন, কি ভাবে তাঁহারা লোকের আনন্দে উৎসবে ব্যসনে নিজেদের অপরিহার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। যাহার মনে সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা আছে, সে কখনও এ পদবী পাইতে পারে না। যাহার আনন্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, যাহার আত্মবিলোপের ও আত্মদানের ক্ষমতা আছে, যাহার মনে উদারতা ও প্রাণের গভীরতা আছে, তাঁহারই 'দাদা' হওয়া সম্ভব। এই প্রবৃত্তি আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপরীত প্রবৃত্তি; তাই আজকাল হয়ত অনেক সুপণ্ডিত, সুরসিক সাহিত্যিকের নাম করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও যে 'দাদা' বলিতে পারিব তাহা কল্পনা করিতে পারি না। সেই জন্যই মনে হয় যে জলধর সেন মহাশয়ের সহিত একটা যুগের অবসান হইয়া গেল। বিশ্বমানব বলিয়া একটা কথা আছে, সেই নামের যোগ্য কে আছেন, জানি না। মনে হয়, যে মানব নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বিশ্বের লোক যাঁহার কাছে আপন হইয়া গিয়াছে, যাহার মানবত্বে সকলের ভাব ও অনুভূতি আসিয়া মিশিয়াছে, তিনিই বিশ্বমানব; কতকগুলি সূক্ষ্ম চিন্তার সমষ্টিকে আমরা বিশ্বমানব বলিতে পারি না। এই সংজ্ঞা অনুসারে জলধর সেন মহাশয় যে পরিমাণে বিশ্বমানব আখ্যা পাইবার যোগ্য, তেমন কেহ এ যুগের সাহিত্যে আছেন কি না সন্দেহ।

সাহিত্যিক হিসাবেও জলধর সেন মহাশয়ের যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহাও আজকাল দুর্লভ। আধুনিক মতে সাহিত্যের উপাদান কল্পনা, কল্পনা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী; মানুষের হৃদয়ে যে লক্ষ লক্ষ আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সুপ্ত রহিয়াছে তাহা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সে এক কল্পলোকের সৃষ্টি করে। যাহা চিরপরিচিত তাহার মধ্যে কল্পনা এক অচিন্তিতপূর্ব্ব অভাবনীয় আলোকের সম্পাত করে, যাহাকে কখন বাস্তব জগতে দেখি নাই তাহারই মোহন প্রতিমা আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া এক নূতন সত্যের আভাস দেয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ইহাই অপরিহার্য্য উপাদান কি না তাহা লইয়া তর্কের প্রয়োজন নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রভাবে আমাদের বাস্তব জীবন ও আমাদের আদর্শের মধ্যে একটা ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা চাই তাহা পাই না"। আমরা মনে এক এবং ব্যবহারে অন্যরূপ। আমাদের উপলব্ধির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ, তাহার সহিত আমাদের বাস্তব জীবনের বিশেষ কোন যোগ নাই। এই জন্যই অনেক সময় কোন কোন প্রসিদ্ধ কবি, দার্শনিক বা সুধীর সাংসারিক জীবনের ঘটনা বা ব্যবহারের খবর পাইয়া আমরা চমকিয়া উঠি। কিন্তু জলধর সেন মহাশয়ের সাহিত্যের আদর্শ ছিল অন্যরূপ। তাঁহার মত সাহিত্যিকদের বিবেচনায় সাহিত্যের উপাদান নিছক সত্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যাহা কিছু সত্য জীবনে দেখা গিয়াছে, যাহা স্বতঃই মনে একটা সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আনিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। ইংরেজ কবি, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এই আদর্শের কথাই তাঁহার কাব্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন। সাহিত্য একটা অপরূপ কিছু সৃষ্টি করে না, সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে মাত্র। সাহিত্য ব্যক্তির জীবন হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে, ইহা আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফল। এই আদর্শে জলধর সেন মহাশয় চলিতেন ও লিখিতেন। তাঁহার সাহিত্য তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীন কল্পনার বিলাসলীলা তাঁহার লেখায় নাই। যে আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ছিল, তাহা তাঁহার লেখাতেও পাওয়া যায়। তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন কি না, তাঁহার আদর্শ তিনি সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন কি না ইত্যাদি প্রশ্ন এখন আলোচনার দরকার নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে যে আদর্শ ছিল, তাহা যদি আমরা গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আধুনিকতার অনেক জঞ্জালের ও সমস্যার হাত হইতে মুক্তি পাইতাম, সে কথা বুঝিবার আবশ্যকতা আছে। ইহাকে সেকেলে আদর্শ বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার অভাবে-ই আমাদের জীবনে বহু দৈন্য ও মিথ্যা প্রবেশ করিয়াছে।

আপন একজন

স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহাতপ

(মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমান)

শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের পরলোক-গমনে আমি যেন আপন একজনকে হারাইয়াছি এইরূপ মনে হইতেছে এবং যত দিন যাইতেছে ততই তাঁহার সেই শান্ত মুখখানি মনে করিয়া নিজের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। জলধরবাবুর "পথিক" ও "হিমালয়" যখন পাঠ করি তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য মনে এমন একটা ব্যাকুলতা জন্মায় তাহা বোঝান সহজ নহে। পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয় এবং তাঁহার অকৃত্রিম আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই এবং সাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত এক অভাবনীয় সৌহার্দ্দে বদ্ধ হই।

বাঙ্গলা সাহিত্যে এইরূপ সুলেখকের তিরোধানে কত দূর ক্ষতি হইয়াছে তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র সাহিত্যিকের পক্ষে বর্ণনা করিতে যাওয়া বাচালতা হইতে পারে—তবে তাঁহার মৃত্যুতে আমি যে ক্লিষ্ট ও দুঃখিত হইয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অশ্রু-তর্পণ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তোমার বিরহ-কাব্য বক্ষে করি' মর্ম্মবেদনায়
জীবন জাহ্নবী কূলে ঝরিতেছে অশ্রু-শেফালিকা।
'অভাগী'র কবি-বন্ধু চলে গেছ বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
অন্ধকারে জ্বলে তব স্মরণের মৌন দীপশিখা।
তোমার মুক্তির পথে জানি বন্ধু! পড়েছে আলোক
দুঃখসুখসমাচ্ছন্ন সংসারের কাটায়েছে মায়া;
তাহারে করিতে ছিন্ন পারি নাই—তাই করি শোক
যত দিন আছি এই পঞ্চভূতে আবরিয়া কায়া।

প্রতিদিন আসে মৃত্যু রজনীর ছায়াপথ বাহি'
প্রতিদিন জন্মলাভ প্রত্যুষের জাগরণী গানে।
যে-জীবন ছিল কাল, লক্ষ্য করি আজ তাহা নাহি,
জন্ম মৃত্যু পারে গেছ, জানি নাক আছ কোন্‌খানে!
জানি মিথ্যা ধরণীর আলোছায়া ইন্দ্রজাল ঢাকা,
সত্য যাহা, শিব যাহা, তারে বন্ধু পাইয়াছ ফিরে—
আনন্দের যাত্রী তুমি, সহযাত্রী জীবন বলাকা
মায়ার হরিণী তব মূর্চ্ছাহত সংসারের তীরে।

দুর্ভাগ্যের দ্বারে বসি ছিলে বিশ্ব পান্থশালা মাঝে,
নাহি ছিল অহঙ্কার—স্নেহমাখা ছিল দু'নয়ন;
কত না পথিকে তুমি বসায়েছ আপনার কাছে,
আত্মার আত্মীয়রূপে ভ্রাতা বলি দিলে আলিঙ্গন।
মেঘের বলাকা তব এনে ছিল নব নব আশা,
সাহিত্য-সাহারা বক্ষে বরিষণ হোলো অহরহ।
চক্ষে কারো দেখি নাই এত প্রেম, এত ভালবাসা,
সার্থক তোমারি নাম দিয়েছিল পিতৃ পিতামহ।

অজস্র তারকা দলে সাজায়েছ সাহিত্য আকাশ,
শরতের চন্দ্র তুমি দেখায়েছ অন্ধকার রাতে,
পূরায়েছ এ বঙ্গের ভারতীর চিত্ত-অভিলাষ
চারণ-কবির স্মৃতি-জয়মাল্য-অর্ঘ্য নিয়া হাতে।
চিরন্তন তীর্থ হয়ে র'বে বন্ধু! তব জন্মভিটে,
আলোক বর্ষের পথে রাত্রি দিন ঋতুর স্পন্দনে
তোমারে খুঁজিবে যাত্রী ভারতীর পুণ্যপাদ পীঠে,
পাঠায়ে দিবে কি বাণী অশ্রুনত স্মৃতির বন্দনে!

"জলধর-প্রয়াণে"

শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ

বর্ষ শেষে সমাপ্তি হর্ষের—
সম্পাদন সমাপন 'ভারতবর্ষের',
পুরাতন বর্ষ যেন রৌদ্র-তপ্ত চৈত্রের বাতাসে—
জানাইল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে—
"নাই আর নাই—
বঙ্গের আকাশপ্রান্তে শ্যামশোভা জলধর—
প্রাচীন সাহিত্য-সেবী পণ্ডিতপ্রবর,
বাণীর বরণ তরে 'আমরণ
শেষ করি' নৈবেদ্য রচন
কালের করাল চক্রে লভিয়াছে মহান প্রয়াণ।"
তবু কাঁদে পুত্র-হারা জননীর শোকাকুল প্রাণ॥
শোকতপ্ত বাঙ্গালীর কলহ বিদ্বেষ ভরা ঘরে
বসন্তের শেষ বায়ে বনের মর্মরে
দীর্ণ হাহাকার উঠে বাজি—
আপন আত্মীয়ে যেন হারায়েছে আজি।
বাঙ্গালীর তরে যার সুকোমল স্নেহ-ভরা প্রাণ—
মুক্ত ছিল ভরি দিতে নিত্য নব দান;
সে প্রাণের অমলিন স্নেহ
ভ'রে তোলে বাঙ্গালীর ক্রন্দন মুখর প্রতি গেহ;
নির্বাপিত চিতাভস্মে রহে যেন শান্তিবারি প্রায়,
করুণায় ঢল ঢল সুগভীর সমবেদনায়।
প্রতি ঘরে ঘরে—
াগি রয় 'অভাগীর' ভাগ্য মাঝে দুঃখিনীর দুঃখিত অন্তরে।
প্রবাসীর বিধুর জীবনে—
কীর্ত্তির কিরণে
রহে চিরস্মরণীয় হয়ে
কঠিন পর্বতগাত্রে দুর্গম পার্বত্য পথে দূর 'হিমালয়ে'।
বহাইতে বিকচ মন্দার-সম
স্মৃতির সৌরভ,
উচ্চ শির হিমালয় সমবহি আপন গৌরব।
নির্মম নিয়তি তারে পারেনি নাশিতে
মৃত্যু যেথা পারে নাই শূন্যতা আনিতে,
সেথা শুধু পূর্ণ রয় সঞ্চয়ের কণা—
আত্মীয় বিয়োগে দিতে সার্থক সান্ত্বনা।

জলধর স্মরণে

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

কাল ঢাকা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় জলধর সেনের জন্য আমরা শোক-সভা করিয়া আসিয়াছি। সভা-স্থলে একুশজন লোক উপস্থিত ছিল। পরিষদের সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই, নিমন্ত্রণ পত্রও শহরের গণ্যমান্য সকলের নিকটই প্রেরিত হইয়াছিল। তথাপি জলধর সেনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে দেড়-লক্ষ অধিবাসীপূর্ণ ঢাকা শহরে একুশজনের বেশী লোক পাওয়া গেল না!

জলধর সেন পরলোকে গমন করিয়াছেন, পরিব্রাজক জলধর সেন ক্লান্তপদে সংসারের দুর্গম গিরিমালা অতিক্রম করিতে করিতে সহসা মরণের বিরাট গহ্বরে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন—দরিদ্র সাহিত্যসেবীর দারিদ্র্য-বিড়ম্বিত জীবনের ইতিহাস সহসা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে—কর্ম্মব্যস্ত, —স্বরাজ-সাধনায় নিমগ্ন—গান্ধীজির সহিত সংগ্রামোন্মুখ বাঙ্গালীর ইহাতে কি আসিয়া যায়? আর, জলধর সেন বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কি-ই বা দিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য দলে দলে শোক-সভায় সমবেত হইতে হইবে? আরও কথা আছে—সে নদীয়া জেলার লোক, আমরা ঢাকাবাসী তাহার জন্য শোক করিব কেন? সে হিন্দু—আমরা মুসলমান, তাহার জন্য শোক করিব কেন? ঠিকই তো! শোক-সভায় না যাইবার অনেকগুলি কারণই তো আছে, দেখা যাইতেছে! সর্ব্বোপরি কথা, জলধর সেন back number, তাঁহার আদর্শবাদ আজকাল বাঙ্গালা দেশে অচল। আমাদের নীতি—"বলে কিংবা ছলে, মারি শত্রু যে কোন প্রকারে"—morality নিতান্ত বাজে কথা—আমাদের আদর্শ মুসলনী, আমাদের আদর্শ হিটলার। এই বাঙ্গালায় জলধর সেনের আদর্শবাদের কথা, আত্মার অম্লান অমরতার কথা—মর্ত্ত্যকে স্বর্গে পরিণত করিবার চেষ্টার কথা—জলধর সেনের ব্রহ্মাণ্ডবেদের ব্যাখ্যা কে শুনিবে? কাজেই সম্রাট শ্রেষ্ঠের ভাষায় আমরা বলিতে পারি,—চিতার আগুনে হৃদয়রস সমৃদ্ধ, দীন দরিদ্রের দুঃখে সজল-নয়ন, অত্যাচারিতের প্রতি সমবেদনার অশ্রুসজল জলধরকে



নূতন মা

শিল্পী—নরেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা



মাটীর ছেলে



শিল্পী—সুনীলকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা

এমন করিয়া পোড়াইয়া আইস যেন আর এই জলধরের রস-সম্ভাবনাসমৃদ্ধ গর্জ্জন বাঙ্গালা দেশে না শুনা যায়।

আমরা দুই-চারিজন প্রাচীনপন্থী কাঁদি, সাহিত্যিক জলধরের জন্য ততটা নহে, যতটা আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব "দাদা"র জন্য। আঠাশ বছর আগের কথা, ময়মনসিংহে সেবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে, সন ১৩১৮ সন। আমি তখন একুশ-বাইশ বছরের নবীন যুবক, কলেজের ছাত্র। এই সময় শ্রীযুক্তা সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত 'ভারত-মহিলা' নামক একখানা পত্রিকা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত। ১৩১৮ সনে "বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোটগল্প" নামক আমার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে ভারত-মহিলায় প্রকাশিত হইতেছিল। ময়মনসিংহে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের কিছু আগে এক সংখ্যায় আমার এই প্রবন্ধে জলধর সেনের ছোটগল্পগুলির সমালোচনা বাহির হয়। ময়মনসিংহ গিয়া শুনিলাম, জলধর সেন মহাশয় সম্মিলনে আসিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, আমি সম্মিলনে গিয়াছি কি-না সেন মহাশয় সে খোঁজ করিতেছিলেন। এক সুযোগে গুপ্ত আমাকে সেন মহাশয়ের নিকট লইয়া হাজির করিল। বলিল—"দাদা, ভট্টশালীর খোঁজ করিতেছিলেন, এই নিন্ আপনার ভট্টশালী!" সেন মহাশয় সভাস্থলে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, ফিরিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমিই ভারত-মহিলায় আমার গল্পের সমালোচনা লিখেছিলে? যোগেন, এ যে একেবারে ছেলেমানুষ!"—বলিয়াই—স্মরণে আজ নয়ন অশ্রুসজল হইতেছে—সেই স্বনামধন্য প্রবীণ সাহিত্যিক তাঁহার গল্পের দুঃসাহসী সমালোচক সেই ছেলেমানুষটিকে একেবারে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সেই স্পর্শ আজিও আমার বুকে লাগিয়া আছে। তাহার পরে এই দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরিয়া কতবার কতভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি, কতরূপে তাঁহার স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। সাহিত্য-সাধনার পথে যাত্রার আরম্ভে বিশালহৃদয় জলধরের নিকট যে সালিঙ্গন সমাদর পাইয়াছিলাম, তাহা অদ্যাপি পাথেয় হইয়া রহিয়াছে। আশী বৎসরের জরাজীর্ণ দেহ বৃদ্ধের জীবনের অধিকতর দীর্ঘত্ব কামনা করা সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে! কিন্তু দাদা! "পুনরাগমনায় চ"—ছাড়া তো অন্য কোন বিদায়বাণী খুঁজিয়া পাইতেছি না! যুগে যুগে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন দাদার আবির্ভাব না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্র যে দ্রুত মরুভূমিতে পরিণত হইয়া চলিবে!

জলধর-স্মৃতি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

আমরা যখন কিশোরবয়স্ক সেই সময়ে সেকালের প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র—"ভারতী" ও 'সাহিত্য'-এ জলধর সেনের হিমালয়-ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত এবং আমরা অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে ঐগুলি পড়িতাম; "ক্রমশঃপ্রকাশ্য" ডিটেকটিভ উপন্যাসের পরবর্ত্তী অধ্যায় পড়িবার জন্য লোকের মনে যেরূপ অধীর আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, জলধর সেনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রায় সেইরূপ আগ্রহই আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিত। জলধর সেনের পূর্ব্বেও বাঙ্গলা ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আরও অনেকে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীকে যেরূপে প্রাণময় ও সরস করিয়া তুলিতে হয়, তাহাকে উচ্চ-শ্রেণীর সাহিত্যে উন্নীত করা যায়, জলধর সেনই বোধ হয় প্রথমে সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিখ্যাত—স্বীয় প্রতিভা বলে ভ্রমণ-কাহিনীকে তাঁহারা রূপরসে ঐশ্বর্য্যে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জলধর সেনের "ভ্রমণ-কাহিনী" বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অমর হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

জলধর সেনের ভ্রমণ-কাহিনী পড়িবার বহু বৎসর পরে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। যদিও তিনি ও আমি এক গ্রামবাসী, তবুও ঘটনাচক্রে পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। প্রথম সাক্ষাতেই আমি কতকটা বিস্মিত হইলাম। যে দুর্দ্ধর্ষ হিমালয় ভ্রমণ-কারীর বিবরণ ইতিহাসে পড়িয়াছি, ইনি কি সেই ব্যক্তি? এমন মধুরপ্রকৃতি, উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়, অমায়িক সৌজন্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম, যাহা আধুনিক সমাজে খুব কমই দেখা যায়। প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে একেবারে 'আপনার জন' করিয়া লইলেন, আমার পিতা ও পিতৃব্যদের কথা—গ্রামের কথা বলিয়া হৃদয় অধিকার

করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু বৎসর ধরিয়া জলধরদাদার সঙ্গে আমার স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। কোন দিন তাঁহাকে আমি বিরক্ত বা ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই, ব্যবহারে সরলতার অভাব অনুভব করি নাই; এ কেবল আমার পক্ষের কথা নয়, বাঙ্গলার সাহিত্যিকমাত্রেই তাঁহাদের পক্ষ হইতে এ কথার সাক্ষ্য দেবেন। সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁহার স্নেহের অন্ত ছিল না, তাঁহাদের সকলকেই তিনি আত্মীয়বৎ জ্ঞান করিতেন, নিজের সাধ্যমত সকলকে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। এ কালের সাহিত্যিকেরা সেইজন্য তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন। "জলধর দাদা" নামেই তিনি বিখ্যাত ছিলেন। কত নবীন সাহিত্যিককে যে তিনি উৎসাহ দিয়া পাকা সাহিত্যিকে পরিণত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঙ্গলার সাহিত্য-জগতে ইহা তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি; এমন কি, পাকা জহুরীর মত বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে তিনিই প্রথম ভাল করিয়া চিনিতে পারেন এবং সাহিত্য-জগতে তাঁহাকে প্রচার করেন। অনেকেই জানেন, অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী শরৎচন্দ্র একটু অলস প্রকৃতির ছিলেন, সহজে কিছু লিখিতে চাহিতেন না। জলধরদাদা অনুরোধ করিয়া, এমন কি অনেক সময় জোর জবরদস্তী পর্য্যন্ত করিয়া তাঁহাকে দিয়া লেখাইতেন। জলধরদাদা না হইলে শরৎ-বাবুর অনেক উপন্যাস শেষ হইত না।

জলধরদাদা ভ্রমণ-কাহিনী ব্যতীত বহু উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন; সুদীর্ঘ জীবনে বলিতে গেলে সাহিত্য-সেবা ছাড়া তিনি আর কিছুই করেন নাই; তাঁহার রচনা সংখ্যা যে প্রচুর, তাহা বলাই বাহুল্য। উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায় তাহা বিচারের স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নহে, অপক্ষপাতভাবে সে প্রচার করার সময় এখনও হয় নাই। তবে প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। পল্লী-জীবনের কাহিনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সুখ দুঃখের কথা এমন বেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে তিনি গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পাঠকের মনে তাহার প্রতিধ্বনি না জাগিয়া পারে না। পল্লীজীবনের সঙ্গে, দরিদ্র জীবনের সঙ্গে জলধরদাদার নিবিড় পরিচয় ছিল বলিয়াই তাঁহার রচিত গল্প ও উপন্যাসের মানুষগুলি এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সরল ও মধুর প্রকৃতির মত তাঁহার ভাষা ও রচনার মধ্যেও একটা নিজস্ব সারল্য ও মাধুর্য্য ছিল।

জলধর সেনের চরিত্র এবং তাঁহার রচিত সাহিত্যের মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে। ইনিই ছিলেন জলধর সেনের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। কাঙ্গাল হরিনাথের কথা একালের বাঙ্গালীরা হয় ত ভাল জানেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁহাদের নীরব সাধনায় নব্য বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কাঙ্গাল হরিনাথ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম; কাঙ্গাল হরিনাথ স্বগ্রাম কুমারখালিতে বাস করিতেন, সেই সুদূর পল্লীতে বসিয়াই তিনি শিক্ষা প্রচার ও জনসেবা করিতেন। তখনকার দিনে কলিকাতা সহরেই সংবাদপত্র প্রচার করা কি কঠিন ব্যবসায় ছিল, তাহা অনুমানেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু কাঙ্গাল হরিনাথ তখনকার দিনেও কুমারখালি গ্রাম হইতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" প্রকাশ করিতেন। কাঙ্গাল হরিনাথ কেবল শিক্ষাপ্রচারক ও সংবাদপত্র-সম্পাদক ছিলেন না, তিনি একজন উচ্চস্তরের সাধক ও গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বহু সঙ্গীত এখনও বাঙ্গলার গ্রামে গীত হইয়া থাকে। ফিকিরচাঁদের ভনিতা পড়িয়া তিনি ঐ সব গান রচনা করিতেন—সেইজন্য ঐগুলি এখনও ফিকিরচাঁদের গান নামে বিখ্যাত। "ফিকির-চাঁদের গানের" বাউলের সুরের মত একটা নিজস্ব সুরও আছে। তখনকার দিনে বহু শিক্ষিত যুবকও কাঙ্গাল হরিনাথের মহান্ চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ঐতিহাসিক অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় ও জলধর সেন এইরূপে কাঙ্গাল হরিনাথের শিষ্য হইয়াছিলেন। কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'তেই জলধর সেনের রচনার হাতে খড়ি হইয়া-ছিল; তাঁহার চরিত্রের উপর—কাঙ্গাল হরিনাথের আদর্শই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জলধর সেন 'কাঙ্গাল হরিনাথের' জীবনী লিখিয়া ও তাঁহার সঙ্গীতসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া শিক্ষা-গুরুর ঋণ কিয়দংশে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জলধর সেন ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন অন্ততঃপক্ষে ৬০ বৎসরের। বাঙ্গলা দেশের সমাজ ও সাহিত্যের ৬০ বৎসরের স্মৃতি তাঁহার নখদর্পণে ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ৬০ বৎসরে বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে, তাহার সমাজ ও সাহিত্যে কি ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জলধর সেনের ছিল। যদি সেই ৬০ বৎসরের স্মৃতিকাহিনী তিনি লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তবে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা অপূর্ব্ব সম্পদ হইত। তিনি একবার তাহা লিখিতে আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বার্দ্ধক্যনিবন্ধন বেশী দূর এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

সর্ব্বশেষে 'রবিবাসরে'র সঙ্গে জলধরদাদার সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ শেষ করিব। দশ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধুকে লইয়া জলধর-দাদা এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ক্রমে ইহার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং একটা সুবৃহৎ সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে উহা পরিণত হয়। সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ আলোচনাও সাহিত্যিকদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জলধরদাদার ব্যক্তিত্বই ছিল ইহার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এই গোষ্ঠীর সদস্যরূপে জলধরদাদার মধুর প্রকৃতি ও উদার হৃদয়ের পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারিবেন না। আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। সুতরাং 'ভারতবর্ষের' সৌজন্যে জলধরদাদার প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমি সত্যই আনন্দিত হইয়াছি।

জলধর স্মৃতি

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

কলেজের পাঠ যখন সাঙ্গ করিলাম তখন হিসাব করিয়া দেখি যে বাংলা ভাষায় যাহা লিখিয়াছি তাহা প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটি বাংলা রচনা এবং সময়ে অসময়ে স্ত্রীকে বাংলায় চিঠি (তিনি ইংরাজি জানিতেন না বলিয়া)। এই অবধি।

শিক্ষকতা কার্য্যে ঢুকিবার পর প্রাণে শখ দেখা দিল বাংলায় লিখিব। একটা প্রবন্ধ খাড়া করিলাম, নাম—শকড়িতত্ত্ব। খেঁজুর রসে খই দিলে শকড়ি হয়, খেঁজুর গুড়ে খই দিলে শকড়ি হয় না মুড়কি হয়। রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে, temperature কত ডিগ্রী হইলে বা specific gravity কত হইলে খই দিলে শকড়ি হয় না? জল conductor of শকড়ি, না non-conductor? শকড়ি থালার তলা হইতে যে জল গড়াইয়া আসিতেছে তাহা যদি অপর কোন পাত্রে গিয়া ঠেকে তো সেই পাত্র শকড়ি হয়—সুতরাং জল conductor of শকড়ি; এই জলই বিকল্পে non-conductor হয়, যথা—শকড়ি হাঁড়িতে যখন জল ঢালা হয় তখন জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলা হয় না, একটি নিরবচ্ছিন্ন জলধারা ঘটির সহিত হাঁড়িকে যুক্ত করে, কিন্তু ঘটি শকড়ি হয় না—এই রকমের অনেক জ্যাঠামো ছিল।

তখন সবে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইয়াছে; জলধর সেন সম্পাদক। তাঁহার সহিত পরিচয় নাই। প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য ডাকে জলধরবাবুর নিকট পাঠাইলাম, খুব ভয়ে ভয়ে। সঙ্গে যে পত্র লিখিলাম তাহার শেষে লেখা ছিল যে সপ্তাহের মধ্যে উত্তর না পাইলে ধরিয়া লইব যে উহা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে না। চিঠিতে লেখা ছিল না বটে, তবে চিঠির উত্তর না আসিলে বাংলা ভাষায় লেখার শখ যে ঐখানেই 'উথায় হৃদি লীয়ন্তে' হইবে সেটা সুনিশ্চিত ছিল।

তৃতীয় দিনে জলধরবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। তাহাতে লেখা—"আমরা সম্পাদক শ্রেণীর জীব চিঠির উত্তর বড় দিই না। কিন্তু আপনার চিঠি পাইয়াই উত্তর দিতেছি, সুতরাং জানিবেন আপনার শকড়ি, মাথায় করিয়া লইয়াছি।"

তার পর জলধর সেন হইলেন 'দাদা'। দাদার তাড়না চলিতে লাগিল। অবশ্য দাদাকে কেহ ঘোঁড়া করিতে পারে না। লেখা থাকিল না; কিন্তু বাংলাভাষায় লেখার শখ বাড়িয়া চলিল।

এই সমস্ত কথা নূতন করিয়া স্মরণে আসিল কয়েকদিন পূর্ব্বে দার্জিলিংয়ে সংবাদপত্রে যখন দেখিলাম—জলধর সেন আর নাই।

সেদিন দাদা হারাইলাম।

জলধর

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রদ্ধেয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে যে শোক-সভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছিলেন, পরিষদের কোন সভায় তিনি একক আসিলেই প্রশ্ন হইত, "রজনীবাবু কোথায় ?"—কিন্তু সেদিন একক আসিলেও আর কেহ সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তেমনই রবিবাসরের কোন অধিবেশনে আসিয়া যাঁহাকে দেখিতে না পাইলে সকলে জিজ্ঞাসা করিতেন, "দাদা কোথায় ?"—আজ আর তিনি আমাদিগের মধ্যে নাই ; কিন্তু আজ আর কেহ, তিনি কোথায় সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না। আজ সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না ; কারণ, সেই প্রশ্ন যুগে যুগে মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহার উত্তর পায় নাই। কিন্তু মানুষ এই কথা মনে করে—কারণ, আমরা

"For the touch of a vanish'd hand
And the sound of a voice that is still"

সর্ব্বদাই ব্যাকুল হই। তাহাই মানুষের স্বভাব।

জলধরবাবুর সহিত আমার পরিচয় পূর্ণ অর্দ্ধশতাব্দী কালের না হইলেও প্রায় ঐ সময়ের। তিনি বহুবার বহু সভায় কপট কোপ প্রকাশ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছেন—তিনি যখন নিরুপদ্রব শিক্ষাকতা লইয়া সুদূর মফঃস্বলে ছিলেন, তখন যে তিনজন তাঁহাকে সাহিত্যের—বিশেষ সংবাদপত্রের ঝটিকা-তাড়িত ক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি আর যে দুই জনের কথা বলিতেন তাঁহারা—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। জলধরবাবুকে—তিনি জীবনের অর্দ্ধাংশেরও অধিককাল যে ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং যে ক্ষেত্রে তিনি ধন ও মান, পরিচয় ও বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে আনিবার প্রধান কারণ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে সাহিত্যানুরাগ লাভ করিয়া তিনি ১২৯৬-৯৭ বঙ্গাব্দে 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত 'সাহিত্য' পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে উহার প্রথম বৎসর শেষ হইলে উপেন্দ্রনাথ গ্রাহক ও পাঠকগণকে জানান—"আমি 'সাহিত্যের' সমুদায় স্বত্ব ত্যাগ করিলাম। 'সাহিত্যের' বর্ত্তমান সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অতঃপর 'সাহিত্যের' স্বত্বাধিকারী হইলেন।" 'সাহিত্য' যখন বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, তখন বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্যে আর একখানি পত্রের প্রয়োজন আছে কি না, সে কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন, তিনি স্বলিখিত যে কবিতা প্রকাশ জন্য 'ভারতী'তে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হয় নাই ; কিন্তু কয়মাস পরে তাহাই তাঁহার ভগিনীর (সরোজকুমারী) নাম দিয়া প্রেরণ করিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেশবাবু তরুণ লেখকদিগকে লইয়া 'সাহিত্য' পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় একটি তরুণ সাহিত্যিককেন্দ্র সৃষ্ট হইল। কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় উহাকে সাহিত্যের "মুক্তি-পতাকা" বলিতেন।

সেই কেন্দ্রে জলধরবাবু আসিয়া উপস্থিত হন। তখনও তিনি মহিষাদলে "মাষ্টার" ; একবার সংসার ত্যাগ করিয়া যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার সংসার পাতাইয়াছেন। প্রধানতঃ সুরেশবাবুর পরামর্শে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্র-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। সুরেশবাবুর সেই চেষ্টার সমর্থক হইয়া যাঁহারা তাঁহাকে নূতন ক্ষেত্রে আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের 'ভারতবর্ষের' কথা স্মরণ করিতে হয়। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদিগকে এক পত্র লিখেন :—

"বাঙ্গালা দেশে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকার অভাব আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকার সংখ্যাও যে কম তাহা আর বলিতে হইবে না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছি। বঙ্গ-সাহিত্যের জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত মনীষী আমাদের সঙ্কল্পিত পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

বঙ্গ-সাহিত্যের এই "সুপ্রতিষ্ঠিত মনীষী" দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দুঃখের বিষয় 'ভারতবর্ষের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন করিতে করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে লোকান্তরিত হইলে 'ভারতবর্ষের' পরিচালন যে—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার পুত্রদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়" ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি গুরুদাস বাবুর দীর্ঘকালের ঐকান্তিক সাধনায় তখন যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে তখন আর 'ভারতবর্ষ' পরিচালন সঙ্কল্প ত্যাগ করাও সম্ভব নহে। তাই তাঁহারা সেই সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া 'ভারতবর্ষ' প্রকাশ করিলেন। সম্পাদক নির্ব্বাচন যে তখন পরীক্ষামূলকভাবেই হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

সেই পরীক্ষায় জলধরবাবু উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ, তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক থাকিয়া সেই পত্রের ভার তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে দিয়া গিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ' যে বাঙ্গালা সাহিত্যিক সমাজে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদিগকে যে জলধরবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে না, ইহা আমরা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি এত অল্পদিন আমাদিগের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন যে, এখন সে সমালোচনা শোভন হইবে না। সে সমালোচনার সময়ও ইহা নহে।

তিনি যে বহু সুখপাঠ্য ভ্রমণ-কাহিনী, অনেকগুলি ছোটগল্প ও কয়খানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন সে সকলের সাহিত্যিকভাবে বিচারের সময় এখন নহে।

আমেরিকার দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত আমরা আজ স্মরণ করিতেছি: একজন– প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক এডিশন, অপরজন—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—ডাক্তার অলিভার ওয়েণ্ডয়েল হোমস্। এডিশন স্বয়ং অতি কষ্টে এবং সর্ব্ববিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইয়া উন্নতির সমুচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন। যিনি একদিন রেল ষ্টেশনে সংবাদপত্র ফিরি করিতেন তিনিই পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—আমরা যাহাকে প্রতিভা বা মনীষা বলি তাহার শতকরা ৯৫ ভাগ পরিশ্রম (perspiration) আর শতকরা ৫ ভাগ প্রেরণা (inspiration)। যাহাকে "গৃহিণীপনা" বলা যায়, তাহার অভাব ঘটিলে প্রতিভা যে আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে পারে না বাঙ্গালা সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। যদি মনে করা যায়, জলধরবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভায় প্রেরণার পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগেরও অল্প থাকিয়া থাকে—তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক করিয়াছিলেন। যখন লক্ষ্য করা যায়, বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজে পরিশ্রমের যথেষ্ট আদর করেন না, তখন জলধরবাবুর জীবনব্যাপী পরিশ্রম সাধনার উপকরণ বলিয়া মনে করিতে পারি।

হোমস বলিয়াছেন, গৃহে যদি পুস্তক সংগ্রহ থাকে, তবে লাইব্রেরী ঘরে বালক বালিকাদিগকে খেলা করিতে দিলে ভাল হয়; তাহারা অধ্যয়নের আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং তাহারা যে পুস্তক স্পর্শ করিবে, তাহাতে তাহাদিগের অধ্যয়নস্পৃহা জন্মিবে। হোমসের এই উক্তি যে একান্তই অত্যুক্তি তাহা বলা যায় না। জলধরবাবু জীবনে অনেক ভাল পুস্তকের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছেন।

তিনি কেবল পুস্তকের মধ্যেই থাকিতে ভালবাসিতেন না—সাহিত্য-সমাজে বাস তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। যে বয়সে কাব্যরস অপেক্ষা গব্যরসে লোকের অধিক অনুরাগ দেখা যায়—সাহিত্য-সেবা প্রায়ই ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়, সেই সময় তিনি নবোদ্যমে একটি সাহিত্যিক সঙ্ঘের সর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। "রবিবাসর" নামক যে সঙ্ঘটির তিনি প্রাণ ছিলেন তাহাতে নবীন ও প্রবীণ সকল বয়সের সাহিত্যিকরা সমাগত হইতেন, এবং তাহার অধিবেশনে যোগদান তিনি যেরূপ নিষ্ঠা সহকারে করিতেন, তাহাতে হিন্দু বিধবার একাদশী পালনের আগ্রহ দেখা যাইত; যেন তাহা "পালন করিলে পুণ্য নাই, কিন্তু না করিলে পাপ।" তিনি যেন কর্ত্তব্যবোধেই ঐ প্রতিষ্ঠানের সকল অধিবেশনে সাগ্রহে যোগ দিতেন—তাহার অধিবেশনে কলিকাতার বাহিরে নানা স্থানে যাইতেন। এই কলিকাতার বাহিরে গমন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে বোলপুরে গমন উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক খ্যাতি তাঁহার কবি খ্যাতিকে

ম্লান করিয়াছে বটে কিন্তু যাঁহারা তাঁহার 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' ও মেঘদূতের সুমধুর বঙ্গানুবাদ—

"যাইতে মানসসরে কারো না মানস সরে,
আছে তা'রা এমনি আরামে।"

এবং শকুন্তলার শ্লোকের অনুবাদ—

হৃদয়ে রয়েছে ভৃত অবিরত
মদির আঁখি;
হিয়া তোমারি কাছে বাঁধা আছে—
জান না তা কি?
যদি আরেকতর মনে কর
বলি গো শুণ;
একে অতনুশরে আছি ম'রে
মরিব পুনঃ।"

পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার কবি-প্রতিভার অনুরক্ত না হইয়া পারেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার রঙ্গ কবিতা 'গুম্ফ আক্রমণ কাব্যে' লিখিয়াছিলেন—"প্রবীণ সাধুর সঙ্গে এক ব্রাহ্মণযুবক ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন—উভয়ে

বয়সের যে অনৈক্য
তাহাতে বাধে না সখ্য।"

তেমনই জলধরবাবুর প্রবীণত্ব তাঁহার সহিত সাহিত্যানুরাগী যুবকদিগের সখ্যের অন্তরায় হইত না। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বার্দ্ধক্য তাঁহাকে তাঁহার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ করিতে বাধ্য করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, যৌবন বয়সে যায় না—যায় মনে। জলধরবাবুকে তাঁহার মন কখন বৃদ্ধ হইতে দেন নাই। তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

তিনি শেষে স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইংরেজ সাহিত্যিক এণ্ড্রু ল্যাং-এর সম্পাদিত ও সংগৃহীত নানা পুস্তক লক্ষ্য করিয়া কোন লেখক বলিয়াছিলে—"Andrew Lang is not the name of an individual ;—it is the name of a Syndicate"—ল্যাং ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে—ইহা একটি গ্রন্থকার সঙ্ঘের নাম। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেনের সম্বন্ধেও অনেকটা সেই ধাতের কথা বলা যায়। বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ পুস্তকে যে তাঁহার নাম দেখা যায়, তাহাতেই ঐ কথা তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়।

তিনি আপনার রচনাদি সম্বন্ধে কখন কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা মনে পোষণ করেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় তাহার প্রধান কারণ। এই বিনয় তাঁহার ব্যবহারে সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিত; এমন কি, নিন্দাও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিতে পারিত না। তিনি আপনার ত্রুটি স্বীকার করিতে কখন কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আজ দিতেছি। জন ক্যাম্পবেল ওম্যান প্রণীত The Mystics, Ascetics and Saints of India নামক পুস্তকের একাংশ অবলম্বন করিয়া 'ভারতবর্ষে' একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষ' পাইয়া আমি যাইয়া জলধরবাবুকে বলি, প্রবন্ধটি যে পুস্তকের একাংশ অবলম্বন করিয়া লিখিত, তাহার নামোল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল। তিনি বলিলেন, তিনি কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন—ঐ প্রবন্ধটি যে একখানি পুস্তকের একটি অধ্যায় তাহা জানিতেন না। তিনি পুস্তকখানি দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং উহা লইবার জন্য পরদিন আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই ভুল দেখাইয়া দেওয়ায় কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। অনুরূপ ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়ায় আর একজন সাহিত্যিক আমার প্রতি এত রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই ঘটনার পর দীর্ঘকাল আমাদিগের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

জলধরবাবুর সম্বন্ধে আর একটি বিষয় আজ আমার বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে আত্মীয় করিতে জানিতেন—স্বজনের নিকট যেমন শুধু সম্পদেই নহে, বিপদেও পরামর্শ ও সাহায্য লওয়া যায়, বন্ধুবান্ধবের নিকট তেমনই পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এই ভাবটির অভাব আজকাল এত অধিক লক্ষ্য করা যায় যে, জলধরবাবুর এই ভাবটি আমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি।

তিনি অপরের প্রশংসা করিতে কুণ্ঠাবোধ করা ত পরের কথা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সভাসমিতিতে যাঁহারা তাঁহার প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার প্রাচুর্য্যে অনেক সময় লজ্জানুভব করিতেন।

তিনি সামাজিক, বিনয়ী, পরিশ্রমী সাহিত্যিক ছিলেন। আজ আমরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

জলধর-স্মৃতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

৺জলধর সেনের নামের সঙ্গে আমি বহুকালাবধি পরিচিত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হই বিশ-একুশ বৎসর পূর্ব্বে। তারপর এই বিশ-একুশ বৎসরের মধ্যে নানা সভা-সমিতিতে তাঁর সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়। এই সূত্রে আমার মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, তাঁর তুল্য বিনয়ী লোক সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। এ গুণ আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে বিরল। আমরা প্রায় কেউই অস্মিকাবর্জ্জিত নই। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি স্বভাবতই নিরহঙ্কার ও বিনয়ী তিনি লোকসমাজে সহজেই জনপ্রিয় হন। এবং আমার বিশ্বাস আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই, ৺জলধর সেন যাঁর প্রীতি আকর্ষণ করেন নি।

যিনি বহুকাল ধরে, "ভারতবর্ষ"-এর ন্যায় প্রকাণ্ড মাসিক পত্রের ভার বহন করেছেন এবং তার উন্নতি সাধন করেছেন—তাঁর এ কৃতিত্বের জন্য আমি তাঁকে বাহবা দিতে বাধ্য, কারণ এর জন্য যে কি পরিমাণ অধ্যবসায় প্রয়োজন—তা আমি অনুমান করতে পারি। আমিও এক সময়ে একখানি স্বল্পকায় মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করি, কিন্তু বেশি দিন সেটিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারি নি যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে পত্রের সহায় ছিলেন।

জলধর দাদা

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বাণী-সেবকের প্রাপ্য মান-পত্রী, শ্রদ্ধা-উপহারে
অগ্রজ-গৌরব দিয়া বরিয়াছি আমরা তোমারে।
নিষ্পরেও ভালবেসে অধিকার করিতে হৃদয়,—
এ বিচ্ছেদ অনিবার্য্য জানি, তবু আঁখি অশ্রুময়।
মানস-কর্ত্তব্য তব অসমাপ্ত রহিল পড়িয়া,
সাধের 'ভারতবর্ষে' সেবিয়াছ মনঃপ্রাণ দিয়া।
শিশুর সারল্য-সাথে জ্ঞান-বৃদ্ধদের উপদেশ,
কত গল্প, কথা-শিল্প নন্দিত করেছে সারা দেশ।
'কাঙ্গালে'র শান্তি-পুঁথি দেয় গো তোমারি পরিচয়,—
হেরিয়া মুক্তির স্বপ্ন পদব্রজে গেলে হিমালয়।
সহিয়াছ দুঃখ ক্লেশ পূজিবারে বদরি-নারায়ণ,—
সেই তো সৌভাগ্যবান্ এ জীবনে ব্যথিত যে জন।
মানুষের বাঞ্ছনীয় যে আসন, বসিয়াছ তায়,
উজ্জ্বল তোমার নাম বাঙ্গালীর স্মৃতির খাতায়।
বিলম্বে করেন যিনি আমাদের কর্ম্মের বিচার,
মৃত্যু-দূত এসে তোমা' নিয়ে গেছে চরণে তাঁহার।

শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য

শ্রীমতী কনকলতা ঘে

বঙ্গবাণীর প্রবীণ পূজারী
বাংলামায়ের গর্ব্ব ছিলে,
আপন কর্ম্ম করে অবসান
এ জগত হ'তে বিদায় নিলে।
নূতন পুরাণো সংযোগ-স্থল
প্রিয় পরিচিত সবার দাদা,
উদার তোমার অন্তর সেথা
প্রবেশিতে কারো ছিল না বাধা।
প্রথম জীবনে বহু সংগ্রামে
ক্ষুব্ধ ব্যথিত হৃদয় তব,
ভারতীর পূজা "ভারতবর্ষে"
এনে দিল প্রাণে শান্তি নব।
খাঁটি বাঙ্গালীর ছিলে আলেখ্য
ছিলে আদর্শ সেকেলে লোক,
বহুর শ্রদ্ধা লভেছিলে তাই
তোমার প্রয়াণে বহুর শোক।
বয়সে প্রবীণ হইলে কি হয়
কর্ম্মোৎসাহে ছিলে নবীন,
তোমারে হেরিয়া তরুণ লভিত
কর্ম্মপ্রেরণা নিত্যদিন।
মনে পড়ে আজ প্রথম রচনা
প্রকাশি উৎসাহ দিলে আমায়,

আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া
শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদি পায়।
ছিলে আজীবন বাণীর সেবক
বাণীসেবকের ছিলে সহায়,
কালের আহ্বানে চলে গেলে আজ
বিয়োগবেদনা দিয়ে সবায়।
নিভিল একটি উজল দেউটী
বঙ্গভাষার দেউল হ'তে
শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতি জানাই
অমরায় তব গমন-পথে।

জলধর-বিয়োগে

কাদের নওয়াজ (বি, টি)

বৃষ্টির জলে রিষ্টি নাশিয়া 'জলধর' গেল চলি,
"হিমালয়"—হ'তে ব্যথার অশ্রু, তুষার পড়িছে গলি'।
"প্রবাসচিত্র"-আঁকি,
"পথিক" জনের আঁখি,
করিলে মুগ্ধ, ওগো বাংলার বাল্মীকি ঋষিবর,
তোমার বিহনে "করিম-সেখের" বিদরে যে অন্তর।

২

সবারে ত্যজিয়া কোথা গেলে আজি ঋত্বিক "জলধর,"
মাটীর মাঝারে বাংলার তুমি দেখেছিলে অন্তর ;
বিদেশী "ম্যাগ্‌নোলিয়া"—
ফুলেরে ভুলিয়া গিয়া,
ভাল বেসেছিলে বাংলা মাটীর ধুতুরা ও জবাফুল,
মানুষেরে তুমি, "মানুষ" দেখিতে করনিক কভু ভুল।

৩

বাংলা মায়ের আঁচলের নিধি কোথা গেলে "জলধর," ?
তব শোকে ঝরে বাঙালীর চোখে অশ্রুর নির্ঝর ;
অজাত শত্রু ঋষি,
খুঁজিয়া না পায় দিশি,
তোমারে হারায়ে বঙ্গভারতী ডুকরে কাঁদিছে আজি,
দীনের অর্ঘ্য লহ দেব লহ প্রাণের পুষ্পরাজি।

সেবাব্রতী জলধর

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

হিমালয় গিরি হ'তে
বাঙ্গালার বন-পথে
নানা পুষ্প করিয়া চয়ন,

সাধক সুমতি ধীর
বঙ্গভাষা জননীর
পূজা করি যুগল চরণ,

বিশ্ব-জননীর পাশে
চলেছ ত্রিদিব-বাসে
যেথা তব অর্দ্ধশতাব্দীর,

সেবা-ব্রত-পরিচয়
সুবর্ণ অক্ষরে রয়
লিপিবদ্ধ এই ধরণীর।

ভক্তি প্রেম সরলতা
সমাদর পায় তথা,
ধরণীর দুঃখ ব্যথা নাই,

হেথা কর্ম্ম-অবসানে
গেছ তুমি হেন স্থানে।
ভাবিয়া অন্তরে শান্তি পাই।

জলধর স্মৃতিতর্পণ

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গ সাহিত্যের ছিলে বর্ষিষ্ঠ পূজারী,—
সেই মাত্র নহে তব পূর্ণ পরিচয়।
শিষ্টাচারে ছিলে জানে যত নর নারী,
সবার অগ্রণী তুমি ; শুধু তাই নয়,
বাগ্মিতার সরসতা, গুণ লেখনীর
জিনিল কত যে যশ, কত ভক্ত দল ;

রচিলে পূজিতে পদ ভাষা জননীর
মনোহরা মধুভরা শত শতদল।

সাহিত্য সেবায় যারা অনুজ তোমার,
বয়োনির্ব্বিশেষে ছিলে 'দাদা' সকলের ;
অকপট স্নেহ দিয়া উৎসাহিয়া আর
সার্থক করেছ সেই নাম অগ্রজের।
আদর্শ তোমার আর তোমার সাধনা
রহিবে মোদের দিতে শত উদ্দীপনা।

জলধর-স্মরণে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

উদারচিত্ত, প্রসন্নহাসি—অজাত-শত্রু-ঋষি
জন-সাহিত্য-জনক-নায়ক অনেক মনস্বীর -
তুকারাম সম আত্মাভিরাম সতত-নমিত-শির --
যাঁর যশোভার "ভারতবর্ষ"—বিস্তারে দশদিশি।
অশীতিবর্ষ ধরি সংঘর্ষ মূরতি অহর্নিশি—
অন্তর যাঁর স্নেহরসধার জলধর সুনিবিড়—
সার্থক নাম জানাই প্রণাম---এই মহানগরীর
উৎসাহ বাণ অমায়িক প্রাণ মিশাইতে চায় মিশি।
আত্মীয়ে করে পরমাত্মীয় কুটিলে ঈর্ষাহীন—
খণ্ডিত দল সব কন্দল কলহ দ্বন্দ্ব নাশি—
যাঁহার প্রেক্ষা করে অপেক্ষা প্রতিভার নিশিদিন—
হিমালয় ধীর ধবল গিরির তুষার শুভ্র হাসি—
যাঁর প্রশস্তি স্বস্তি বচনে—ধন্য সকল সভা —
নিখিলের মন হরেছে সেজন---আজি স্বরগের শোভা।

জলধর-প্রয়াণে

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ এম-এ

মন্দির অঙ্গনে আজি সন্ধ্যা আরতির
মৌন কল-গুঞ্জরণ। ওগো জলধর!
লুটায় পথের প্রান্তে যুথী মালতীর
ছিন্ন দল। উদ্বেলিত অশ্রু-সরোবর
চৈত্রের প্রমত্ত সমীরণে। ছায়াম্লান
অন্ধকারে জনপদে নিস্তব্ধ প্রান্তরে
ফিরে প্রিয়-বিচ্ছেদের সকরুণ গান ;
চিতাভস্ম উড়ে যায় লোক লোকান্তরে।

লভিছে পরম শান্তি অবসন্ন হিয়া
পশ্চাতে ফেলিয়া তুচ্ছ দুঃখ-লাভ-ক্ষতি ;
সঞ্চয়ের পূর্ণ ঝুলি রহিল পড়িয়া,
সাথে গেল মানুষের সহস্র প্রণতি।
নির্ব্বাপিত প্রাণশিখা ; চির-অনির্ব্বাণ
প্রীতি প্রেমে বিরচিত দীপ জ্যোতিষ্মান।

জলধর-স্মৃতি

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জলধর সেন মহাশয়ের তিরোধানের কথা যখনই মনে করি, তখন এই কথাই ভাবিয়া মন ব্যথিত হয় যে, যাহা গেল তাহা একেবারেই গেল ;--অর্থাৎ তাঁহার মতো আর-কিছু ত' রহিলই না, অধিকন্তু অচিরকালের মধ্যে তাহার পুনরাগমনের সম্ভাবনাও অন্তর্হিত হইল।

এ কথা বলিতেছি, কারণ তিনি কাহারো মতই ছিলেন না ; তিনি ছিলেন একেবারে নিজের মতো। ইংরাজিতে বলিলে বলিতে হয়, He was a class by himself। তাঁহার চেয়ে উচ্চ এবং নিম্ন, খ্যাত এবং অখ্যাত, শ্রেয় এবং হেয় বহুজন ছিলেন এবং আছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠিত করিয়া তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্।

তাঁহার চরিত্রের বহু সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ করিয়া দুইটি গুণের সমাবেশের প্রভাবে এই শ্রেণী গঠন করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই দুইটি গুণের প্রথমটি হইতেছে, আন্তরিকতা অথবা অকপটতা বলিলে সম্পূর্ণ যাহা বুঝায় না সেই Sincerity এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে শিষ্টাচার। এই দুইটি গুণের একই মাত্রায় একত্র অবস্থান হিতং মনোহারি চ দুর্লভঃ বচনের ন্যায় দুর্লভ। সুতরাং জলধর সেন মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিও দুর্লভ।

সেন মহাশয়ের মধ্যে সরল এবং সরসের অপূর্ব মৈত্রী দেখিয়া বহুবার বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার

অন্তরের অনুভূতি এবং বাহিরের আচরণের মধ্যে যে সুষ্ঠু এবং সুপ্রতীয়মান যোগ দেখা যাইত বর্তমান সভ্যতার আবরণপরতার যুগে তাহা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি মধুর। ক্রোধ এবং বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইলে কদাচিৎ কখনো ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার যে তিনি করিতেন না তা নয়, কিন্তু রৌদ্রের মধ্যে সুশীতল বায়ুর ন্যায় সেই তিরস্কারের মধ্যে শিষ্টাচার প্রবহমান থাকিয়া তিরস্কারকে আত্মীয়তার অভিব্যক্তি করিয়া তুলিত। উপর্যপরি কয়েকবার রবি-বাসরের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকার জন্য উক্ত সমিতির এক প্রকাশ্য সভায় আমি একবার তাঁহার নিকট হইতে বেশ একটু তিরস্কার লাভ করিয়াছিলাম। অনেক দিনের কথা হইল, কিন্তু এ কথা বেশ মনে আছে যে, সেই তিরস্কারের মধ্যেই সেদিন এত বড় পুরস্কার পাইয়াছিলাম যে অপরাধ করিয়াছিলাম বলিয়া মনের মধ্যে কিছুমাত্র অনুশোচনা উপস্থিত হয় নাই।

যে অব্যাহত আন্তরিকতা জলধর সেন মহাশয়ের প্রকৃতির মধ্যে সুপ্রচুর মাত্রায় বর্তমান থাকিয়া তাঁহাকে এত জনপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেও সেই আন্তরিকতার সুস্পষ্ট ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করিতে আমাদের বিলম্ব হয় না। যে অনাবিল প্রসাদগুণ তাঁহার সাহিত্য রচনাকে এমন সরস এবং সুন্দর করিয়াছে তাহা এই আন্তরিকতা হইতেই উৎপন্ন।

জলধর সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশের যে ক্ষতি হইল তাহার কথা চিন্তা করিয়া মনে হয়, জলধর সেন হয়ত পুনরায় কোনোদিন এ বাংলা দেশে আবির্ভূত হইবেন, কিন্তু জলধর দাদার আবির্ভাবের আশা সুদূরপরাহত !

নিদাঘ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

রুদ্র মোদের দেবতা মহেশ্বর
অভিষ্টদাতা উগ্র বৈশ্বানর।
কালিকা মোদের মৃত্যুঞ্জয়ী—
অন্নপূর্ণা কল্যাণময়ী,
কঠোর কান্ত লয়ে মোরা করি ঘর।

২

বসন্ত শেষ—ধরা হারা তনুরুচি—
শোচা, শীর্ণা, প্রিয় দর্শনা শুচি।
শিরে জটাজুট—রুক্ষ ও কটু,
দেখা দাও তুমি হে চপল বটু,
হে নীলকণ্ঠ—ভয়াল—শুভঙ্কর।

৩

ভগীরথ সম আস যাও বারবার,
ভস্মীভূতের করিবারে উদ্ধার।
নূতন জীবন করিবারে দান,
কি দারুণ তপ, কি প্রখর টান,
সুরসরিতের দ্রব কর অন্তর।

৪

তুমি তপোধন—দুঃখ ও অনশন,
কর্ণেতে দাও মন্ত্র সঞ্জীবন।
বিশুষ্ক দেহ, বিশুদ্ধ মন
তুমি উল্লাসে কর অর্পণ,
হে সুলভকোপ! দাও দুর্লভ বর।

৫

শুষ্ক তৃণের কপোলে বুলাও পানি,
শুনাও তাহারে অভয়ামৃত বাণী।
সিকতালুপ্ত তটিনীরে কও,
'আসিছে সুদিন সজ্জিত হও,
রস-বাদরের এনে দাও সুখবর।

৬

নির্ম্মম তুমি দুর্জ্ঞেয় তব পথ,
কর রমণীয় দেশের ভবিষ্যৎ।
অন্নকূটের কর আয়োজন,
ডাক দিয়ে আনো সরল শোভন,
ভালবাসিবার দাও না ক' অবসর।

৭

হয় তব অনুকম্পায় মহাভাগ,
ভূমিচম্পার পুনর্জন্ম লাভ।
তোমার আকাশ দুন্দুভি ভেরী
ঘোষে ঝুলনের আর নাই দেরী,
সজ্জিত হও সজ্জিত চরাচর।

৮

আনো আনো মহা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা,
অপূর্ব্ব শোভা নাই ক' যার সীমা।
শেষ করি তব অগ্নির খেলা,
আনো প্রশান্তি, পুণ্যের মেলা,
রূঢ় আরম্ভ পরিণাম সুন্দর।

মহামানব

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা শহরে সন্ধ্যা নামছে। একে একে ঘরে জ্বলে উঠছে বিজলীবাতি। কর্ম্মকুশল দিনের শেষে সন্ধ্যা বেলায় একটা বাস্তবতা আছে—যেমন মেয়েদের গা ধোওয়া, ছেলেদের সিনেমায় কিম্বা আড্ডায় যাবার আগে একটু প্রসাধন, উড়ে ঠাকুরের উনুনে আগুন দেওয়া ইত্যাদি—এই বাস্তবতার আমেজ লেগেছে কলকাতা শহরের বুকে।

মিথিলেশ মেসের দোতলার ঘরে শুয়ে সন্ধ্যার এই আমেজ উপভোগ করছিল। কিন্তু আর দেরি করা চলে না, তাকে এখুনি ছেলে পড়াতে বার হতে হবে। অথচ উঠতে তার আর ইচ্ছে করে না। রোজই তো সে ছেলে পড়াতে যায়, আজ না হয় নাই গেল। মিথিলেশ পূবের জানালাটা খুলে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ে। মেসের ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে উঠছে, শুধু তার ঘরই রইল অন্ধকার।

একটু পরেই দীনেশের গলা শোনা গেল। সে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে চেঁচাচ্ছে—ঠাকুর, অখিলবাবু আজ খাবে না।

দীনেশের কথা শুনে মিথিলেশ একটু ভাবিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ কি অখিলের অসুখ করল নাকি?

দীনেশ ঘরে ঢুকেই ব'লে ওঠে—কি হে মিথিলেশ, এখনও যে পড়াতে যাওনি!

সে কথায় কান না দিয়ে মিথিলেশ বলে—অখিল খাবে না কেন? তার কি অসুখ করল না কি?

বিকট হাসি হেসে দীনেশ বলে—না, না, আজ যে মোহনবাগান তিন গোলে হেরেছে—কাজেই অখিলের আজ উপবাস নিশ্চিত। একটু থেমে বললে, তোমার শরীর ভাল তো? তুমি যে এই অবেলায় শুয়ে রয়েছ?

মিথিলেশ আস্তে আস্তে বল্লে—শরীর ঠিকই আছে, ভাবছিলাম নিজের অদৃষ্টের কথা। আর কত দিন ছেলে পড়িয়ে পেট চালাতে হবে বলতে পারিস্?

দীনেশের মুখের হাসি উড়ে গেল। সে কোন জবাব দিতে পারলে না, নিজের চৌকিটার উপর বসে পড়ল।

এক ঘরে অখিল, মিথিলেশ, আর দীনেশ থাকে। তিন জনেরই একই দশা। বি-এ পাশ করবার পর আর কোন উপায় না পেয়ে ওরা ছেলে পড়াতে মন দিয়েছে। মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা যা জোটে তার থেকে দু টাকা খবরের কাগজের চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করবার জন্যে রেখে বাকীটা দিয়ে কোন রকমে চালিয়ে নেয়। আর এ ছাড়া উপায়ই বা কি? চাকরীর বাজারে তো দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে। আর এ বয়সে বাপের বিধবা মেয়ের মত কাঁহাতক বাড়ী বসে বসে খাওয়া যায়!

ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দীনেশ বললে—আচ্ছা, চাকরী কি আমাদের আর জুটবে না?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মিথিলেশ বললে—আর জুটেছে! সত্যি আমরা কি কপাল নিয়ে জন্মেছিলাম বল তো?

চোরের মত চুপি চুপি অখিল এসে ঘরে ঢুকল। অখিলকে দেখেই দীনেশ বলে উঠল—ওহে, তোমার রাতের খাবার আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি। তোমার মোহনবাগান যখন তিন গোল খেয়েছে তখন তোমারও তো পেট ভরে আছে।

অখিল গম্ভীর হয়ে বললে—সব সময় এয়ারকি ভাল লাগে না। সর, আলোটা জ্বালি—আমাকে এক্ষুণি একটা নতুন টিউসনির খবর নিতে বার হতে হবে।

ঘরের আবহাওয়া আবার গম্ভীর হয়ে ওঠে।

অখিল কুঁজো থেকে এক কাপ জল খেয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে।

দীনেশ একটু পরে বলে ওঠে—কই অখিল, বার হলে না?

—না, আজ মনটা মোটেই ভাল লাগছে না—কাল যাব।

—কেন, আজ মোহনবাগান হেরেছে বলে কি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে!

—না না, তা নয়, আজ এক মহামানবের দর্শন পেয়েছিলাম, শুধু তাঁর কথাই মনে পড়ছে।

দীনেশ ও মিথিলেশ এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল: মহামানব!

—হাঁ, অদ্ভুত তাঁর শক্তি।

মিথিলেশ বিছানার উপর উঠে বসে বললে—কি রকম?

অখিল বললে, রাতে খাওয়ার পর সব কথা বলব।

উত্তেজিত হয়ে দীনেশ বলে ওঠে—না, না, রাতে নয়, এখুনি শুনতে চাই—কি ব্যাপার বল।

অখিল আর এক কাপ জল খেয়ে বলতে আরম্ভ করলে: ফুটবল খেলা দেখে মাঠ থেকে বা'র হয়ে আসার সময় দেখি মনুমেণ্টের তলায় এক ভীষণ জনতা জমে উঠেছে। কাছে এসে দেখি, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, সর্ব্বাঙ্গে আলখাল্লা জড়ান এক ব্যক্তি বক্তৃতা করছেন, আর সমস্ত শ্রোতা নীরবে শুনছে।

বক্তৃতায় একটু কান দিলাম। তখন তিনি বলে চলেছেন, ভারতের স্বাধীনতার একমাত্র অস্ত্র ধর্ম্ম—আমি হাত জোড় করে আবার বলছি, আপনারা ধর্ম্মে মতি স্থাপনা করুন। হঠাৎ বক্তৃতা থেমে গেল। তিনি একবার জনতার দিকে চেয়ে এক ব্যক্তিকে আঙ্গুল দিয়ে নির্দ্দেশ করে বললেন, আপনার নাম তারাপদ দাস, আপনি উকিল—

পাশের থেকে এক ছোকরা বলে উঠল, উকিলের পোষাক পরা দেখে সকলেই উকিল বলতে পারে।

ছোকরার কথায় কান না দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আপনার ডান কোটের পকেটে একটা উইল আছে, ওটা তিপ্পান্ন বছর আগে তৈরী হয়েছিল এবং এই উইল নিয়ে এখন মামলা চলছে। এ মামলায় আপনি হেরে যাবেন।

সমস্ত জনতা উকিল ভদ্রলোকের ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়ল। উকিল ভদ্রলোক ডান কোটের পকেট থেকে একখানা জরাজীর্ণ উইল বার করলেন।

একজন চীৎকার করে উঠল—ঠিক হয়েছে, তিপ্পান্ন বছর আগেই তৈরী হয়েছিল।

আবার ধর্ম্মের বক্তৃতা চলতে লাগল।

হঠাৎ জনতার মধ্যে থেকে এক ছোকরা হাতের আস্তিন গুটিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললে—থামান আপনার বুজরুকি, অন্য লোকের তো খুব বলে দিচ্ছেন, আমার বিষয় কি বলতে পারেন দেখি, যদি না বলতে পারেন তা হলে ঘুসিয়ে আপনার দাঁত ভেঙে দেব।

বক্তৃতা থেমে গেল—সমস্ত জনতার মধ্যে জাগল একটা চাঞ্চল্য। সকলেই উৎসুক হয়ে উঠছে, এবার একটা ভয়ানক কিছু হবে।

তিনি একটু হেসে বললেন—তিন দিন পরে ছোরার আঘাত খেয়ে ছমাস হাসপাতালে থাকতে হ'ত, তোর মায়ের পুণ্যের জোরে আজ আমার সাক্ষাৎ পেয়েছিস—যাক্, এবার বেঁচে গেলি।

ছোকরা আরও উত্তেজিত হয়ে বললে—ও সব নেকাম রাখ, এখনও সময় দিচ্ছি, যদি কিছু বলতে পার—বল, আর না বলতে পারলে তোমার একটা দাঁতও আস্ত রাখব না।

সমস্ত জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট আওয়াজ ফুটে উঠলো। তিনি আবার একটু হেসে জনতার দিকে চেয়ে বললেন—এই দেখুন পাপের চরম মূর্ত্তি। এই ছোকরা এখন ডালিম নামে এক বেশ্যার প্রেমে মশগুল। এ এর বিধবা মাকে এক মুঠো ভাত দেয় না। তিন বছর আগে উত্তর কলকাতার এক বেশ্যালয়ে এ ছুরির আঘাত খেয়েছিল—যার দাগ আজও ওর বুকে বিদ্যমান আছে। আর আমার কথা না শুনে যদি ও আবার ডালিমের বাড়ী যায়, তা হলে তিন দিন পরে ওকে আবার ছুরির আঘাত খেতে হবে।

ছেলেটির দর্প এক লহমায় ছাই হয়ে গেল। সে এক দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যাবার চেষ্টা করল; কিন্তু তিন-চারজন ছেলে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, দাঁড়ান মশাই, আপনার বুকে ছুরির দাগ আছে কি-না আমরা দেখব। তারা জোর করে ছেলেটির শার্টটা খুলে দিল—সকলেই দেখতে পেল তার বুকের ডান দিকে একটা সেরে-যাওয়া বড় ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে।

সমস্ত লোক বিস্ময়ে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, কেউ একটা প্রশংসাসূচক কথাও বলতে পারলে না।

তিনি আবার বলে চললেন: আপনারা হয়ত এ সব দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু অবাক হবার এতে কিছুই নেই। এ যোগের অতি নিম্নস্তরের জিনিষ, চেষ্টা করলে আপনারা তিন মাসের মধ্যে এ বিদ্যা শিখে নিতে পারবেন। আমি এখনও বলছি, মুনিঋষিদের ফেলে-যাওয়া খুদ কুঁড়ো এখনও যা আছে তাকে আপনারা অবজ্ঞা করবেন না। এবার আমি রোগ ও ব্যাধি সম্বন্ধে

দু-একটা কথা বলব। মানুষের নিজকৃত পাপই তার দেহে ব্যাধি আনে। আগে এই ভারতের লোক একশো কুড়ি বছর করে বাঁচত, আর আজ গড়পড়তায় বাঁচে মাত্র তেইশ বছর—এর কারণ শুধু পাপ। আমার কাছে মন্ত্রপুত এমন জিনিষ আছে যাতে এক নিমেষে যে-কোন রোগ আরোগ্য করা যেতে পারে। যদি বাতে পঙ্গু কোন লোক এর মধ্যে থাকেন তিনি দয়া করে একবার আমার কাছে আসুন, আমি এক মিনিটের মধ্যে তাঁকে জন্মের মত আরোগ্য করে দেবো।

লাঠির ওপর ভর করে এক বৃদ্ধ অতি কষ্টে তাঁর দিকে আগিয়ে এসে জানালেন—বাবা, আমি আজ দশ বছর বাতে পঙ্গু, কোন রকমে বিকেল বেলায় গাড়ী করে এসে এই গড়ের মাঠে একটু বেড়াই। তুমি যদি বাবা একটু দয়া কর।

মহামানব বললেন—আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি সবই জানি; প্রথম স্ত্রীকে জুতোশুদ্ধ লাথি মেরেছিলেন এ তারই ফল। তিনি তিন বার বৃদ্ধ লোকটির সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—দেন লাঠিটা আমাকে দেন, আর আপনার লাঠির প্রয়োজন হবে না—কেবল দিনে বার কতক ক'রে ভগবানের নাম নেবেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মহামানবের পায়ের ধূলো নিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন—মনেও হল না যে তিনি দশ বছরের বাতগ্রস্ত রোগী।

মহামানব আবার আরম্ভ করলেনঃ এবার আমি বলব অদৃষ্ট ও ভাগ্যের কথা। আকাশের গ্রহেরা মানুষের অদৃষ্টের বিধাতা। সুগ্রহের ফলে মানুষ লক্ষপতি হয়ে যাচ্ছে, আবার কুগ্রহের কবলে পড়ে মানুষকে ভিখারী হতে হচ্ছে। এই কুগ্রহের হাত হতে নিস্তার পাবার ব্যবস্থা মুনি-ঋষিরা করে গেছেন বহু শতাব্দী আগে; কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা এ সব কিছু মানতে চায় না, তাই তাদের আজ এত দুর্দ্দশা। তবে এ সব জিনিষ করতে বহু অর্থ ব্যয় হয়। আগে রাজারা যাগ-যজ্ঞ করে এ জিনিষ তৈরী করতেন, তার পর প্রজাদের হিতার্থে বিতরণ করে দিতেন; কিন্তু এখন সে রামও নেই সে রাজত্বও নেই।

একটু থেমে তিনি তার আলখাল্লার পকেট থেকে একটি মাদুলী বার করে বললেন—এই যে মাদুলী দেখছেন. এর অদ্ভুত শক্তি। এক একটা মাদুলীতে খরচ পড়ে মাত্র দশ টাকা; কিন্তু এ এনে দেয় লক্ষ টাকা। যেদিন থেকে এ মাদুলী যে কেউ অঙ্গে ধারণ করবেন, নব্বই দিনের মধ্যে তিনি সমস্ত কুগ্রহের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আজ যা আয় আছে, তিন মাসের মধ্যে সেই আয় দাঁড়াবে অন্তত দশ গুণ—এ শুধু মন্ত্রশক্তির ক্ষমতা, আর কিছুই নয়। আধা-বয়সী এক ভদ্রলোক এসে একখানি দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন—আমাকে ঐ কুগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটি মাদুলি দিন।

মহামানব তাকে একটি মাদুলী দিয়ে বললেন—ভগবানের নাম নিয়ে আজই ধারণ করুন গে, আপনার রুগ্না স্ত্রী তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করবেন আর আপনার যে ছেলে আজ তিন বৎসর গৃহ ছেড়ে পালিয়েছে সে ফিরে আসবে সাত দিনের মধ্যে।

আধা-বয়সী ভদ্রলোকটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে এলেন।

এবার মহামানব জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন—আমি এখন চলে যাচ্ছি; কিন্তু আপনারা আমার অনুরোধটি রাখবেন। আপনারা দয়া করে ধর্ম্মের পথ থেকে এক পাও সরে যাবেন না।

কথা শেষ করে তিনি একটু একটু করে চৌরঙ্গীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন আর সমস্ত জনতা ছুটল তাঁর পিছু পিছু। সকলেই চাইছে একটা মাদুলী।

মহামানব এক হাতে টাকা গ্রহণ করছেন, আর অপর হাতে মাদুলী বিতরণ করছেন। যাদের পকেটে টাকা নেই তারা আফশোসে বুক চাপড়াচ্ছে, আর যাদের পকেটে দু-টাকা চার টাকা ছিল তারা হাতে পায়ে ধরে—একটি করে মাদুলী সংগ্রহ করে নিল এবং তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত হ'ল যে বাকী টাকাটা তারা কোন দেবালয়ে দান করে দেবে।

একটু একটু করে তিনি চৌরঙ্গীতে এসে পৌঁছলেন। যাঁদের কাছে টাকা ছিল না তারা তখন তাঁকে ছিঁড়ে খাবার উপক্রম করছে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে তিনি তাতে চেপে বসলেন এবং যাবার আগে জনতাকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন—আপনারা ধর্ম্মের পথ আশ্রয় করুন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন।

ট্যাক্সি দক্ষিণ দিকে ছুটে চলল।

অখিল থামল। সমস্ত ঘরে বিরাজ করছে একটা গম্ভীর নিস্তব্ধতা। গল্পের মাঝখানে পাশের ঘরের সরোজবাবু এসে বসেছিলেন, তিনিই প্রথম কথা বললেন। সরোজবাবু বললেন—সব কথা ত বললেন, একটা কথা শুধু বাকী রইল যে।

অখিল বললে—কি কথা বাকী থাকল ?

সরোজবাবু একটু হেসে বললেন—আপনি যে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা মাদুলী কিনেছেন এ কথাটা তো বললেন না!

অখিলের মুখ সাদা হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আপনি কি করে জানলেন সে কথা, আপনি সেখানে ছিলেন বুঝি?

সরোজবাবু একটু হেসে বললেন—হাঁ, আমি তো সেখানে ছিলামই, আর সেই মহামানব আমি নিজেই।

অখিল চীৎকার করে উঠল—অসম্ভব।

সরোজবাবু পাঁচ টাকার একটা নোট অখিলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—আজ একমাস আপনার পাশের ঘরেই রয়েছি এবং আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছে খানিকটা, কাজেই অন্য লোককে ঠকালেও আপনাকে আমি ঠকাতে চাই নে; আর যেটাকে আপনি অসম্ভব ভাবছেন সেটা যে সম্ভব তার প্রমাণ আমি দু মিনিটের মধ্যেই দিচ্ছি।

সরোজবাবু উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। অখিল বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ভাবতে লাগল। সরোজবাবু আজ একমাস হ'তে তাদের পাশের ঘরে রয়েছেন। পেশা তাঁর—ইনসিওরেন্সএর দালালী করা। এই এক মাসের মধ্যেই তিনি অমায়িক ব্যবহারে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন; কিন্তু আজকের তাঁর ব্যবহারটা একেবারে অদ্ভুত রকম লাগছে।

দু মিনিট পরে সরোজবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর একটা কাগজে জড়ান বাণ্ডিল। কাগজের বাণ্ডিলটা খুলে তিনি একটা আলখাল্লা বার করে বললেন—দেখুন দেখি অখিলবাবু, এই আলখাল্লাটা কি সেই মহামানবের গায়েছিল ?

অখিল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে—সে একটা কথাও বলতে পারে না।

সরোজবাবু একটা পরচুল ও একটা নকল দাড়ি মাথায় ও মুখে এঁটে বললেন—দেখুন অখিলবাবু, এবার সেই মহামানবের মুখ দেখতে পাচ্ছেন কি না ?

অখিলের জিভে কে যেন কোকেন ইনজেক্‌সন্ দিয়ে দিয়েছে। সে চোখ দু'টো বড় বড় করে সরোজবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সরোজবাবু এবার একটু মৃদু হাসি হেসে বললেন—কি, অসম্ভব সম্ভব হ'ল !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অখিল বললে—হাঁ।

ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঘরের ভিতর যে চারজন যুবক আছে বাহির হতে তার কিছু বুঝবার জো নেই।

বেশ একটু পরে নিখিলেশ বললে—আচ্ছা সরোজবাবু, অখিল যে ঘটনাগুলোর কথা বললে ও গুলো সব সত্যি ?

সরোজবাবু একটু পাতলা হেসে বললেন—সমস্তই সত্যি, আর অখিলবাবু তার নিজের চোখ কানকে তো অবিশ্বাস করতে পারেন না।

দীনেশ বিছানার উপর উঠে বসে বললে—দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আপনার যদি বলতে আপত্তি না থাকে, তা হলে এই ধাঁধার একটা সমাধান করে দিন না।

সরোজবাবু প্রত্যেকের দিকে একটা করে সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—দেখুন, আপনাদের আমি বন্ধু বলে জানি এবং আপনারা যখন এত উৎসুক হয়ে পড়েছেন তখন সব কথাই আমি আপনাদের বলব আর কাল সকালেই আমি এখান হতে চলে যাব, জীবনে আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে কি-না সন্দেহ।

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে সরোজবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন—আমিও বি.এ পাশ ক'রে তিন বছর চাকরীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াই, ফল আপনাদের যা হয়েছে আমার তার বেশী হয়নি। ভেবে চিন্তে দেখলাম, জীবনে সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন পয়সার, যা করে হোক এ চারটি সংগ্রহ না করতে পারলে কোন রকমেই মান বজায় করে বাঁচা চলবে না। তখন সৎ পথ ত্যাগ ক'রে অসৎ পথের আশ্রয় গ্রহণ করলাম, আর এই অসৎ পথ আজ আমাকে

চল্লিশ হাজার টাকার মালিক করেছে। এই হাতে চার বছরের মধ্যে দু'লক্ষটাকা উপার্জ্জন করেছি; কিন্তু পাপের টাকা নাকি থাকে না, তাই ওটা হাজারের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি নিজে একটা প্রতারকের দল খুলেছি আর তার সর্দ্দার আমি নিজে। ত্রিশজন বেকার যুবককে আমি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে দেই। আজ অখিলবাবু—যে উকিলবাবু, পাপের চরম মূর্ত্তি সেই ছোকরা ও বাতগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখলেন, ওরা সকলেই আমার দলের মাইনে করা লোক। ওরা এখন কলকাতার নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। কোন দিন কোন স্থানে দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা আরম্ভ হবে সে খবর ওদের আগের থেকে দিয়ে দেওয়া হয়, ওরা এসে ঠিক সময়ে নিজের পার্টটা অভিনয় করে। আজকে মোহন বাগানের খেলা ছিল, কাজেই একটা মস্ত ভিড় হবে জানতাম; আর ভিড়ই হচ্ছে আমাদের কার্য্য উদ্ধার করবার প্রধান স্থান। আজ বিকেলে হাজার পাঁচেক টাকা রোজগার হয়েছে। আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু খেলা দেখতে এসে লোকে প্রায়ই সঙ্গে টাকা রাখে না, সেই জন্যে সুবিধে হ'ল না। আর যে টাকা পেয়েছি তাও আজ মাসের পয়লা তারিখ বলে। ছোকরা কেরাণীবাবুরা মাইনেটা নিয়েই মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের দয়াতেই হাজার পাঁচেক টাকা হয়েছে। তবে এর মধ্যে শ'দুই টাকা আমার নিজের আছে। কারণ প্রথম চোটে আমার দলের লোকেরা টাকা দিতে আরম্ভ করে, তাদের দেখাদেখি পরে অন্য লোকে টাকা দেয়।

একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, বড় বড় মেলাই হচ্ছে আমার এই ব্যবসার প্রধান স্থান। সেখানে লোক আসে শুধু টাকা খরচ করতে এবং তাদের মধ্যে অশিক্ষিত ও গেঁয়ো লোকের সংখ্যা থাকে বেশী। এই দল নিয়ে ভারতের প্রায় সব বড় বড় মেলা ঘুরেছি। আমার দলে এক সময়ে সাহেব, মাদ্রাজী, উড়িয়া সব রকম রাখতে হয়েছিল; কিন্তু এখন শুধু জন ত্রিশ বাঙালীর ছেলে ছাড়া আর সকলকে বিদায় দিয়েছি। এদের ত্রিশজনকেও আজ বিদায় দিলাম। মানুষ ঠকিয়ে ঠকিয়ে নিজের উপর ঘৃণা হয়ে গেছে, তাই আর এ দল চালাতে ইচ্ছে করে না। হাতে যে চল্লিশ হাজার টাকা আছে তাতেই আমার জীবন কেটে যাবে। বাড়ী আমার পাবনা জেলার এক গ্রামে। সেখানে কিছু জমি জমা কিনে গ্রামবাসীদের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো। কাল সকালে দেশে চলে যাবো, আপনারা মহামানবকে ভুলে যাবেন, কিন্তু প্রতারককে মনে রাখবেন—এটা রইল আমার অনুরোধ।

সরোজবাবু থামলেন—বড় সড়কের উপর গীর্জ্জার ঘড়িটা ঢং ঢং করে জানিয়ে দিল এখন রাত দশটা।



দিবাবসানে

শ্রীকালিদাস রায়

পশ্চিমাকাশে সূর্য্য পড়েছে ঢলে,
সন্ধ্যা হইতে বেশি দেরি নাই আর,
মাথার উপরে উড়ে দূরে যায় চলে'
এক ঝাঁক বক—কোন সিন্ধুর পার ?

রাখাল চলেছে মেঠো পথে গান গেয়ে
তাপহারা বায়ু লাগিছে তপ্ত কেশে,
দূর-দিগন্ত পানে আছি আমি চেয়ে
যেথায় আকাশ পৃথিবীর সনে মেশে।

নয়ন হইতে নিভিবে ধরার আলো
নিভিবার আগে স্তিমিত হয়েছে চোখে,
সম্মুখে শুধু গভীর আঁধার কালো
অশ্রু ঘনায়ে আসে আপনারি শোকে।

বারে বারে শুধু টিকটিকি পড়ে কেন,
রহস্যময় ভাষায় কি কথা কয় ?
রোদনের রোল দূর হতে আসে যেন,
অস্ত-রবিরে চিতানল মনে হয়।

শুকানো পাতায় পশুর পায়ের ধ্বনি,
শুনে যেন আজ বুকখানি চমকায়,
কে জানে এখন কোথায় রয়েছে শনি ?
কোষ্ঠীখানিরে দেখাইতে সাধ যায়।

কোথা তা পাইব ? পুড়ায়ে ফেলেছি তা যে
কোষ্ঠী ঠিকুজী মানি নাই কোন দিনই।
আজ মনে হয় হয়ত তা নয় বাজে,
ঝাপ্সা চোখেও অনেক সত্য চিনি।

স্বর্গ নরক হয়ত সকলি আছে
পুনর্জন্ম হয়ত মিথ্যা নয়।
মুক্তি মোক্ষ চিরদিনই লোক যাচে,
এত যুগ কভু মিথ্যা টিকিয়া রয় ?

পূজা পেয়ে গেছে শত শত বৎসর
কোটি কোটি লোক এসেছে যাদেরে পূজে,
হয়ত তাহারা নয় জড় প্রস্তর
হয়ত তাহারা মানুষের ব্যথা বুঝে।

মনে পড়ে আজ অমর কবির বাণী
"স্বর্গে মর্ত্ত্যে কত তত্ত্বই আছে,
জ্ঞান বিজ্ঞান জানে তার কতখানি ?
অনাবিষ্কৃত সবি মানুষের কাছে।"

জ্ঞানবৃদ্ধির অহমিকা যায় দূরে
শ্লথ হয়ে আসে মনের গ্রন্থিগুলি,
পোষণ-মতগুলি একে একে যায় উড়ে,
যুক্তি ন্যায়ের শক্ত শিকল খুলি'।

ছায়ার আঁধার মায়ার সৃষ্টি ঘিরে
বিশ্বটি চোখে লাগে রহস্যময়,
মনের দীপ্তি নিভে যায় ধীরে ধীরে
গ্রাসিছে জীবন ভয় দ্বিধা সংশয়।

মনে হয় আজি আমি বড় অসহায়,
কোথা আশ্রয় ? কোথা আশ্বাস বাণী ?
অজ্ঞাতে সেই অজানা জনের পায়
নুয়ে পড়ে শির, জুড়ে যায় দুটি পানি।

অভিনয়

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

বাপ-মা সাধ করে' নাম রেখেছিলেন কালিদাস—তাঁদের নাম রাখা সার্থক হয়েছে, পুরোপুরি না হ'লেও আংশিক। কালিদাস ভোলা মহেশ্বরের আর কিছু গুণ না পেলেও তাঁর ভোলামিটুকু পেয়েছে, যাকে সাধুভাষায় বলে ভালোমানুসি, আর দুষ্ট লোকের ভাষায় বলে ক্যাবলামি।

এমন যে ক্যাবলাকান্ত, সেও আবার গল্পের নায়ক! হওয়া তার উচিত নয় কিন্তু এমন কাণ্ড করে' ফেলেছে যে, তার ক্যাবলামি নিয়ে গল্প লেখা চলে। অন্তত আমি তো লিখে ফেলেছি।

কালিদাসের কনিষ্ঠা বিবাহযোগ্যা, নাম যা হোক কিছু, ধরুন মায়া। মায়ার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসছে চারিদিক থেকে। এই তো গত রোববার কালিদাস, অভিভাবক বড় ভাই কেষ্টদাসবাবুর সঙ্গে পাইকপাড়ায় গেছল ছেলে দেখতে। এঞ্জিনিয়ার ছেলেটি, বাপের একমাত্র ছেলে।

ওরা দু'ভাই যখন গেলেন, ছেলেটি তখন লণ্ডন ছেড়ে বার্লিন, বার্লিন ছেড়ে কালিফোর্নিয়া, কালিফোর্নিয়া ছেড়ে হয়তো অবশেষে দিল্লীকেই ধরাধরি করছিল—অবশ্য রেডিয়োতে।

ছেলেটির বাবা অবসর গ্রহণ করেছেন, উচ্চপদস্থ কোন সরকারী চাকরী থেকে। ছেলের বৈতারিক সৌখীন গবেষণা শোভা পায়।

যাই হোক, ওরা দুভাই খুশীই হ'লেন এবং প্রায় ওখানেই মনে মনে স্থির করে' ফেল্‌লেন—বোনের বিবাহ দেবেন।

তবু দু-চারটে না দেখে শুনে কি কনিষ্ঠার বিবাহ দেওয়া চলে? হাতে আরও গোটা কতক প্রস্তাব ছিল। ফির্‌বার পথে কেষ্টদাসবাবু বল্‌লেন, কল্‌কাতার ওপরই আরো দু-চারটে আছে। তোমায় ঠিকানা দেবো, তুমিই প্রথম যাও, তবে মনে হয় এর চেয়ে ভাল হ'বে না। যাই হোক, কাল-পরশুর ভেতর সময় করে দেখে এস!

পরদিন বিকাল।

কালিদাসের বৌদি বল্‌লেন—শেভ্-টেভ করে' একটু ভদ্রলোক হয়ে' নাও, আর যা রং, পাউডারও মেখে নাও খানিকটা!

সবিস্ময়ে কালিদাস শুধায়—কেন? কেন বৌদি?

এখানে বৌদিকে একটু পরিচিত করা দরকার। বৌদি যখন গৌরীদত্তা হয়ে' এবাড়ী এলেন, তখন কালিদাস কাপড় বা প্যান্ট ব্যবহার করাটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না।

বৌদি নিজেও মানুষ হ'লেন, সঙ্গে ক্যাবলাকান্ত দেবরপ্রবরকেও বড় করলেন।

কাজেই বৌদি-দেওরে সম্পর্কটা একটু অন্যরকম!

যাই হোক, দেবরের বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে বৌদি মুচকি হেসে বল্‌লেন, বা রে ন্যাকা, জানে না যেন! তোমায় আজ দেখতে আসবে যে! কেন, নীলা বীরু—ওদের কাছে যেন শোননি!

নীলা, বীরু যথাক্রমে কালিদাসের ভাইঝি ও ভাইপো এবং এই বৌদিরই সন্তান।

কালিদাস মুখ ঘুরিয়ে হঠাৎ খুশীর লীলাভাটা লুকিয়ে বল্‌ল, যাঃ—

বৌদিও সকৌতুকে বল্‌লেন, ভারী খুশী যে! বিয়ের এক সথ কিন্তু একটা সম্বন্ধও তো আসে না—পোড়া কপাল! তোমাকে আবার কে দেখতে আসবে—কার এমন কন্যাদায় পড়েছে!

বস্তুত কালিদাসের বিবাহের ইচ্ছা হোক-না-হোক, বয়স হয়েছে এবং আজকালকার দিনেও সে সরকারের তহবিল থেকে যাই হোক আশী-পঁচাশী টাকা আনে বই কি! তারপর, বাড়ী-ঘরদোর আছে কল্‌কাতায়। কাজেই কথাটা যে বৌদি, বৌদি বলেই, বল্‌লেন একথা কালিদাস বুঝতে পারলেও সোজা উত্তর দিল, তুমি নিজেই বল্‌ছ দেখতে আসবে; আবার নিজেই বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে বিমলী বামনীর মত ঝগড়া করছ! যাক্—কিন্তু ব্যাপার কি?

বৌদি সহজ হ'লেন এবার; না, বল্‌ছিলাম, একটি ছেলে দেখতে যেতে হ'বে বালিগঞ্জে! কেন, কাল তোমার দাদা কিছু বলেন নি?

বড় গাছের তলায় বেড়ে বেড়ে নিজের স্কন্ধে কালিদাসের আজও পর্য্যন্ত কোন গুরুভার কর্ত্তব্যের ঝক্কি পড়েনি। কাজেই এই সামান্য দায়িত্বে কালিদাস খুশী হ'ল অন্তরে অন্তরে।

দাড়িগুলো হল নির্ম্মূল, সঙ্গে জায়গায় জায়গায় চামড়াও; মুখখানাকে নির্ম্মল করবার চেষ্টায় পাউডারও খরচ হ'ল খানিক। কালোরিঙের ওপর পাউডারের ফলে অনেকটা বিভূতির মত দেখাচ্ছিল।

দাদা বাৎলে দিলেন—বালিগঞ্জের পার্কের অমুক কোণে রবীন দাঁড়িয়ে থাকবে, সে-ই তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। ভাল করে' দেখে এসো কিন্তু।

রবীন ওদের আপন ভাগ্‌নে!

কালিদাস করল টয়লেট, রবীনের হ'ল পায়ে বেদনা। বেচারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে' যাবার উপক্রম কর্‌ছিল, এমন সময়ে রবীনের ছোট মামার স্মিতমুখে আবির্ভাব!

রবীন থাকাতে বাড়ী খুঁজে পেতে দেরী হ'ল না একটুও!

ওরা দু'জন যখন গিয়ে বাড়ীর গেটে পৌঁছল, তখনও সময় অনেকটা

উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলেও দরজায় অপেক্ষমান একটি যুবক সাদরে অভ্যর্থনা করে' বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন।

যুবকটির বেশভূষা সাধারণ। কালিদাসের অবশ্য প্রথম তাকেই পাত্র বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তা হ'লে কি ছেলেটি নিজে অপেক্ষা করবে?

তবে এ নয় নিশ্চয়ই। কিম্বা বাড়ীতে অন্য লোক নেই হয়তো! আর নিজে অভ্যর্থনা করলই বা—ব্যাপারটা যে বালিগঞ্জের!

কিন্তু ছেলেটি মুচ্‌কি হাসছে কেন? পাত্রের কি হাসা উচিত?

কালিদাস শুধাল তাকে—আপনার নামটি জিজ্ঞেস করতে পারি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, দেবব্রত বসু, দেবু বলেই ডাকে সকলে।

—কোন্ ইয়ার চলেছে আপনার?

—পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস—ব্যবহারিক রসায়ন নিয়েছি—একটু বসতে হ'বে আপনাদের, আমি একবার ভেতর বাড়ীতে যাবো। আমি যাই তা হ'লে—বলে' সসৌজন্যে ভেতরকার পর্দা সরিয়ে দেবু চলে' গেল।

কালিদাস সত্যি মুগ্ধ হয়েছিল ছেলেটির ব্যবহারে! বল্‌লে—কাল্‌কের ছেলেটিও ভালো, কিন্তু এ যেন তারও চেয়ে ভাল। আমার কিন্তু ইচ্ছে যে এরই সঙ্গে

রবীন হেসে উঠ্‌ল।

কালিদাস বল্‌ল—হাস্‌ছ যে বড়!

একটু অপ্রস্তুতের মত রবীন্ উত্তর দিলে, না মানে, মানে তুমি যাকেই দেখছ তাকেই বলছ এরই সঙ্গে—এই জন্যে হাসছি আর কি!

কালিদাস চটেছে মনে মনে—তার পছন্দকে অপছন্দ করা!

—দেখেছ তুমি কাল্‌কের ছেলেকে? তার তুলনায় এ হুঃ, কত বড় বাড়ী···

রবীন সমবয়স্ক, সময়-অসময়ে একটু হাল্কা ধরণের কথাও মামা-ভাগ্নেতে হয়ে থাকে। মামাকে আরও চটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই কথার চিমটি কাটলে রবীন—হাসতে হাসতে বললে, ছেলে মানে বুঝি বড় বাড়ী, বাঃ ছেলে পছন্দর তো তুমি বেশ মাপকাঠি বের করেছ! তোমাদের তো কলকাতায় দু-তিনখানা বাড়ী আছে, তা হ'লে তুমিও—ধর তোমাকে এঁরা দেখছেন, মানে দেখতে গেছেন, তা হ'লে বাড়ীর ভূমিকা দিয়ে তুমিও তো বেশ ভাল ছেলে হ'য়ে যেতে পার!

রাগে কালিদাসের বাকস্ফূর্ত্তি হ'ল না, অধরের একটু স্ফুরণ হ'ল মাত্র। সে বললে, যা জান না, তা নিয়েও তর্ক করা একটা অভ্যাস তোমার! তুমি দ্যাখোনি দু'জনকে—কে ভাল, কে মন্দ—তুমি বুঝবে কি ক'রে?

আগের কথারই জের টেনে রবীন খোঁচা দিলে, তাই ব'লে ছেলে মানে বাড়ী কি করে হ'ল?

—যাক, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, এটা তর্ক করবার, ডিবেটিং সোসাইটির ক্লাব ঘর নয়!

ঠোঁট উল্টে রবীন বল্‌লে—বাবা, কুটুম্বিতে না হ'তেই এত দরদ? জানিনে বাবা—

মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপ্‌ল সে!

—চ্যাঁচাও এখানে, চ্যাঁচাও—ষাঁড়ের মতন, 'মিউনিসিপ্যাল বুলে'র মতন চ্যাঁচাও, তর্কের মীমাংসা হ'বেখ'ন। মানে, দেখেন তো মশাই, আর চ্যাঁচালেই যদি তর্কের মীমাংসা হ'ত?

ইতিমধ্যে ঘরে 'মশাই' অর্থাৎ দেবব্রত ঢুকছেন! নিজেদের এই ব্যাপারখানা তার কাছ থেকে লুকোবার মানসে মশাইকে এই দ্বন্দ্বের বিচারক পদে প্রতিষ্ঠিত করা!

দেবব্রত মুচকি হাসল একটু।

খানিকক্ষণ সব চুপ। এই অকারণ নির্ব্বাকতার ভারাক্রান্ত মেঘকে লঘু করে' দেবার জন্যে দেবুই আরম্ভ করল কথা—

—দেখুন, আজকে আপনারা আসবেন, বাবা কিন্তু থাকতে পারলেন না: ওঁর আবার কোর্টে আজকে একটা জরুরী 'কেস': তাঁর হয়ে' আমিই মাপ চাইছি—

রবীন ও কালিদাস সমস্বরেই বলে' উঠ্‌ল, আহা হা—সে কি কথা, সে কি কথা!

এতক্ষণে কালিদাসের মনে পড়্‌ল—দরজায় মস্থর ফলকে এ বাড়ীর কর্ত্তার নাম দেখেছিল বটে "এ-সি-বোস, য়্যাটর্ণী-য়্যাট-ল"।

দেবু বল্‌তে লাগ্‌ল, আমাদের বাড়ীতে লোকজন নেই কিন্তু আর--- গুরুজন লঘুজন বল্‌তে বাবা আর আমি, মা আর আমার বোন শোভনা। কাগজে দেখেছেন কি-না বল্‌তে পারিনে, শোভনা ম্যাট্রিকে এবার ইতিহাসে প্রথম হয়েছে।

কালিদাস সোল্লাসে বলে' উঠ্‌ল, বটে!

রবীন আর একবার হাসি গোপন কর্‌ল।

কালিদাসের মনটার ভেতর যে আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়েছিল, সেটা ভগবান বুঝ্‌তে পেরেই যেন দ্বারপ্রান্তে পর্দ্দার নীচে থেকে দুখানি শুভ্র পা দেখিয়ে দিলেন, শাড়ীর এক টুকরো পাড়ের নীচে!

বলা বাহুল্য, মুহূর্ত্তের জন্য কালিদাস সমাজ, সংস্কার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব ভুলে গিয়ে ঐ শ্রীপাদপদ্মে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" করে' নিবদ্ধদৃষ্টি ছিল। আরও বলা বাহুল্য, রবীন সেটুকু লক্ষ্য করে' মনে মনে এবং ঠোঁটের প্রান্তে হাস্‌ছিল।

তার পর যখন পর্দ্দার ওপার থেকে কথা ভেসে এল, 'দাদা!' তখন কিন্তু আসমান থেকে পড়ে গিয়ে কালিদাস ফিরে এল সমাজে, ফিরে এল বালিগঞ্জের বাড়ীতে, তাদের সোফায়! অত উঁচু অর্থাৎ আসমান থেকে পড়ে' গিয়ে হাত-পা না ভাঙলেও মনটা ভেঙে যেত—যদি না পরমুহূর্ত্তেই এই রকম কথাবার্ত্তা হ'ত!

দেবু বল্‌ল, আমাদের বাড়ী অন্য লোক নেই কিন্তু, আর ঠাকুর-চাকরের হাতে দিয়ে অতিথিদের খাবার বা চা পাঠানো মা নিতান্ত অপছন্দ করেন। কাজেই আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তবে আমার বোন শোভনা-ই চা-টা নিয়ে আসে—

রবীন তাড়াতাড়ি বলে' উঠল—না না, আমাদের আর আপত্তি কি!

কালিদাস প্রস্তুত হ'বার এতক্ষণ সময় পেয়েছিল ব'লে বল্‌তে পারল— আমরা কিন্তু এই মাত্র চা খেয়ে আস্‌ছি!

দেবু এ কথার উত্তর না দিয়ে পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, নিয়ে এসো।

পর্দ্দা তুলে ধরল হরিদ্রারাগরঞ্জিত শিরাবহুল কর্ম্মঠ একখানি হাত অর্থাৎ পাচক ঠাকুরের, ঘরে ঢুক্‌ল নায়িকা, যবনিকা আবার পড়ে' গেল।

কালিদাস অবনতমুখ, রবীন হাস্যমুখ!

দেবু, আপনাদের অনুমতি হ'লে শোভনাই চা-টা তৈরী করতে পারে!

রবীন, হ্যাঁ,—হ্যাঁ—

ঘর আবার চুপচাপ। খানিক পরে শোভনাই বলল, চিনিটা একটু দেখে দেবেন?

মাথা তুল্‌ল এতক্ষণে কালিদাস, হ্যাঁ চিনি বই-কি, হ্যাঁ চিনি—

একটু মৃদু হেসে শোভনা শুধায়, কিন্তু কতটা?

রবীন বলে উঠ্‌ল, আপনিই দিন ঠিক করে: আমরা সাধারণ, বেশী চিনি বা কম চিনির দল নই!

কালিদাস এবার মুখ তুল্‌ল তো নামাতে চায় না আর!

হাত বয়ে' মণিবন্ধ পার হয়ে', চুড়ির বন্ধন, বাহু ছাড়িয়ে, মুখে উঠে গেল, আবার খোলা চুল বয়ে' নাম্‌তে নাম্‌তে টেবিলে ধাক্কা খেয়ে পড়্‌ল—কালিদাস নয় অবশ্য, কালিদাসের চোখ দুটো!

তারপর স্বপ্ন। এর পর কি কি কথা হয়েছে, ওরা ওখান থেকে উঠে এসেছে, রবীন বাস থেকে কোথায় যেন নেমে পড়্‌ল! একটা স্বপ্নের জগৎ পার হয়ে' এসেছে কালিদাস—তবে এখন যে তাকে ছারপোকা কামড়াচ্ছে সেটা আর স্বপ্ন নয়। সে বাড়ী ফিরে এসেছে সেও সত্যি, এসে কাপড়জামা না ছেড়েই বসে' পড়েছে তাদের চাকরদের ঘরে। বসেছে তাদের বিছানায়, দুর্গন্ধ ছাড়্‌ছে সে বিছানা থেকে! আর উপস্থিত ছারপোকা কামড়াচ্ছে তাকে- সেটা আর স্বপ্ন নয়!

বাস্তবে নেমে এসে লজ্জা পেল সে, ছি ছি, তার এই দৌর্ব্বল্য ধরা পড়্‌লে কি বল্‌বে তাকে সমাজ!

নিজের ঘরে বসে' কি ভাব্‌ছিল সে কি নিজেই বল্‌তে পার্‌বে?

বৌদি অনেকক্ষণ দেখে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বল্‌লেন, কেমন দেখ্‌লে? এসে তো কই তোমার দাদাকে বলেও এলে না!

কালিদাসের স্বপ্ন আবার চুরমার হয়ে শতখান হয়ে গেল। সে বল্‌লে, য়্যাঁ, হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস কর্‌ছ?

গলাটা সপ্তমে চড়িয়ে বৌদি বল্‌লেন, বলি, কেমন দেখ্‌লে?

কালিদাস জিজ্ঞেস করলে, কি কেমন দেখ্‌লাম?

—যা দেখ্‌তে গেছ্‌লে?

—ও, হ্যাঁ চমৎকার, কাল্‌কের ছেলের চেয়ে এ ছেলে আরও ভাল!

—বাঃ তুমি তো বেশ অভিনয় করতে জান!

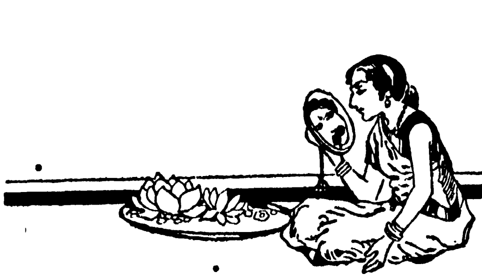
—কেন, কেন?

—আরে, মুখোষটা এখন খুলেই ফেল্‌লে না হয়!

—কেন, ছেলে তো দেখা হ'ল!

—হ্যাঁ, তা বটে—কিন্তু তোমার নয় ওদের! আর তোমার দেখা হ'ল মেয়ে! বুঝলে, গবুচন্দ্র—কাল্‌কের ছেলের সঙ্গে ঠাকুরঝির আর আজকের মেয়ের সঙ্গে তোমার। এদিকে সেদিন এই বালিগঞ্জের দলই তোমাকে দেখতে এসেছিলেন, তুমি তো রাগ করে' দেখাই কর্‌লে না, বলেছিলে—বিয়েই কর্‌বে না! আর এখন? ফির্‌বার পথে যে বাস চাপা পড়োনি—ভগবানকে ধন্যবাদ! আর রবীনের মারফৎ ওরাও ভাল অভিনয় করেছেন কি বল?

কালিদাসের বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না—বিস্ময়ে, না খুশীতে?



সাময়িকী

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ—

কলিকাতার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিয়াছেন। সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সসম্মানে অবহেলায় রাষ্ট্র গদী ত্যাগ করায় দেশবাসীর অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন প্রাপ্ত হইলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে পন্থ-প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতিকে যেরূপ নির্বীর্য্য করা হইয়াছিল, তাহাতে কোন আত্মসম্মান ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকা লজ্জাজনকই হইত। শেষ পর্য্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও অন্যদলভুক্ত অন্ততঃ চারিজন সদস্যকে ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান দিবার অধিকারের সম্মতি কোনরূপেই গান্ধীজী বা তাঁহার অনুচরবৃন্দের নিকট না পাওয়া যাওয়ায় অগত্যা সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইল। সুভাষচন্দ্র যেভাবে এইরূপ বিরক্তিকর ও উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও সংযম ও মর্য্যাদার সঙ্গে কার্য্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে তারযোগে জানাইয়াছেন—"অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও তুমি যে মর্য্যাদাবোধ ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছ, তাহা তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছে। আত্মসম্মানের জন্য বাঙ্গলাকে এখনও এই পূর্ণ সৌজন্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে হইবে এবং সেই পথে তোমার আপাততঃ পরাজয়কে স্থায়ী বিজয়ে পরিণত করিতে সহায়তা করিতে হইবে।"

সমস্তই ঠিক ছিল, তাড়াহুড়া করিয়া সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সুভাষত্যক্ত গদীতে বসান হইল, নরীম্যান প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আইনগত অনিয়মের প্রতিবাদ উড়াইয়া দিয়া। সেই সময়ে সভা মধ্যে মুহুর্মুহু ধিক্কার ধ্বনি দেশের প্রকৃত অভিমত প্রকাশিত করিয়াছে।

নূতন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-দের যে নাম ঘোষণা করেন, তাহাতে সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও জহরলাল ব্যতীত পুরাতন দলের সকলেই আছেন। সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও জহরলাল নূতন ওয়ার্কিং কমিটীতে যোগ দিতে অসম্মত হইয়াছেন। সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের স্থানে বাঙ্গলার ডাক্তারদ্বয় বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে লওয়া হইয়াছে। জহরলালের স্থান এখনও পূরণ করা হয় নাই।

কয়েকদিন রীতিমত আলাপ আলোচনা চলিবার পর গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে পত্রযোগে জানান, ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে সহায়তা করিতে তিনি অক্ষম। সুভাষচন্দ্রের ও অধি-কাংশ সদস্যের মূলগত মতদ্বৈধ বিষয়ে তিনি জ্ঞাত আছেন। এক্ষেত্রে তিনি যদি নাম দেন তাহা হইলে উহা সুভাষচন্দ্রের উপর জোর করিয়া চাপান হইবে। অতএব তিনি কোন নাম দিলেন না। ভূতপূর্ব্ব সদস্যদের সঙ্গে সুভাষকে আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিতে বলিলেন। সুভাষচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অথচ পন্থ-প্রস্তাবে গান্ধীজীর অভিপ্রায়ানুসারে রাষ্ট্রপতিকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে হইবে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। গান্ধীজী অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন, কারণ তিনি ভূতপূর্ব্ব সদস্যদের কাহাকেও বাদ দিবেন না। তাঁহারা যে সুভাষচন্দ্রকে চাহেন না, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাকে প্রকারে বলা হইল পদত্যাগ করো, নতুবা অন্যগতি নাই। যদিও মুখে বলা হইতেছে, তুমি নিজের ইচ্ছামত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করো। কিন্তু কার্য্যত সুভাষচন্দ্র যদি তাহা করিতেন, তবে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ঐ ওয়ার্কিং কমিটির ও রাষ্ট্রপতির উপর অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাব আনিতেন।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁহার রাষ্ট্রবাণীতে এতদিন পরে লিখিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী পন্থ-প্রস্তাবের বিষয় জানিতেনই না। তাঁহার অনভিপ্রায়ে গান্ধী-ভক্তরা তাঁহার স্কন্ধে ঐ দায়িত্ব চাপাইয়াছেন। উহার মূলে সত্য থাকিলে ইতিমধ্যে মহাত্মা ঐ সম্বন্ধে হরিজনে বা কোথাও



সোদপুরে সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



মহানা

শিল্পী—জয়দেব গুপ্ত, কলিকাতা

মেয়র



ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন

ডেপুটী মেয়র



প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করিতেন। কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত তাহা করেন নাই, অধিকন্তু ঐ প্রস্তাবানুসারে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন সম্বন্ধে পত্রের আদানপ্রদান করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র পন্থ-প্রস্তাব তাঁহার উপর অনাস্থা-জ্ঞাপক কিনা জানিবার জন্য মহাত্মাকে লিখিলেও মহাত্মা কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, তখন ও তিনি বলেন নাই যে উহার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

সত্যাশ্রয়ী মহাত্মার ও তাঁহার ভক্তদের বিবৃতির মধ্যে কোথায় যেন অসত্য উঁকি মারিতেছে! মহাত্মার ইচ্ছানুসারে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন করিয়াছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, পন্থ-প্রস্তাব তাঁহার উপর প্রযোজ্য নয়! ত্রিপুরীর পন্থ-প্রস্তাব কি তবে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল? উহা যে কেবল সুভাষচন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহা রাজেন্দ্রপ্রসাদের ঐ উক্তি হইতেই স্পষ্টতর প্রকাশ পাইল।

সুভাষচন্দ্রের এই সভাপতি পদত্যাগ কংগ্রেসের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে। সুভাষচন্দ্র একদিকে যেমন দেখাইয়াছেন যে গান্ধীজির মত সর্ব্বজনমান্য নেতার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে তিনি কখনও বিমুখ নহেন, অন্যদিকে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতেও তিনি কম সচেষ্ট হন নাই। সেজন্য দেশের সকল শ্রেণীর স্বাধীন মতাবলম্বীদের নিকট সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ সম্মানজনক কার্য্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি গান্ধীজির সহিত আলোচনার কয়দিন এবং পদত্যাগ করার পরও যে ধীরতা ও স্থিরতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাঙ্গালী এক সময়ে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম বিচার-ক্ষমতার জন্য ভারতের অপরাপর প্রদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; তখন সকল প্রকার নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গলার প্রাধান্য দেখা যাইত; এক্ষণে তাহার পুনরাবৃত্তির সূচনা অবাঙ্গালীদিগের পক্ষে চক্ষু-শূল হইয়া দাঁড়াইল; সেই কারণেই সুভাষচন্দ্রের উপর্য্যুপরি দুইবার কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচন কোন অবাঙ্গালী কংগ্রেসনেতার পক্ষেই সহনীয় হইল না।

ত্রিপুরী ও কলিকাতার শিক্ষা—

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেস এবং তারপর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতা অধিবেশন পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল, কংগ্রেসের ইতিহাসে তাহা খুব গৌরবজনক অধ্যায় নয়। সুভাষচন্দ্র যে প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য সংখ্যার আটগুণ। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ ঝুনা নেতৃবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা ও ষড়যন্ত্র-নিপুণতার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে জনমত কতখানি উত্তেজিত হইয়াছিল রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু অবশেষে সেই ষড়যন্ত্র নৈপুণ্যেরই জয় হইল। প্যাটেল-প্রভাবিত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণের কৌশলে অবশেষে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তথাপি যাঁহারা বিগত তিন মাসের ঘটনাবলী মনোযোগের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, স্বয়ং গান্ধীজি সুভাষ-নিধনে অগ্রসর না হইলে প্যাটেলপ্রমুখ নেতৃগণের পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে অপসৃত করা সম্ভব হইত না। যাঁহারা প্যাটেল-পন্থীগণের বিরোধী, মহাত্মার অসামান্য প্রভাব উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহারাও শেষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে সুভাষচন্দ্রকে মধ্যপথে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইলেও ত্রিপুরী ও কলিকাতায় যে শিক্ষা দক্ষিণপন্থীগণ লাভ করিলেন তাহা কি তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা, ষড়যন্ত্র-প্রবণতা ও আধিপত্যলিপ্সা সংযত করিতে পারিবে?

অশোভন আগ্রহ—

জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের বিপুল ভোটাধিক্যে যিনি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাকে অপসৃত করিবার এই অশোভন আগ্রহের হেতু আমরা জানি না। মহাত্মা সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"After all he is not an enemy of the country." ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতার প্রতি এই অসংযত কদর্য্য ইঙ্গিতের কারণও দুর্বোধ্য। সুভাষচন্দ্রের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের

ফলে বাঙ্গলায় এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বিক্ষোভ যত বড়ই হোক, কলিকাতায় বাঙ্গলার বাহিরের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের উপর যে অশিষ্ট আচরণ করা হইয়াছিল তাহা কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় না। ইহার দ্বারা বাঙ্গলার আতিথেয়তাকে কলঙ্কিত করা হইয়াছে। স্বয়ং সুভাষচন্দ্রও ইহাদের অসংযত আচরণে লজ্জানুভব করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

"ফরোয়ার্ড ব্লক" ও "র‍্যাডিকাল পার্টি"—

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের আপাত ফল স্বরূপ দেখা যাইতেছে, দক্ষিণ-পন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিরোধের জন্য দুইটি দলের উদ্ভব হইয়াছে। একটি সুভাষচন্দ্রের "ফরোয়ার্ড ব্লক", অপরটি শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ের "র‍্যাডিকাল পার্টি"। দুইটিই বামপন্থী দল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং দুইটিই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থাকিয়া কাজ করিবে। ত্রিপুরী ও কলিকাতার বৈঠকে সুভাষচন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় একযোগে কাজ করিলেও তাঁহাদের মত ও কর্ম্মপন্থায় বিরোধ আছে নিশ্চয়ই। নহিলে যে সময়ে উভয়ের সম্মিলিতভাবে কাজ করার একান্ত প্রয়োজন সেই সময়েই দুইটি বিভিন্ন দল গঠন করিয়া বাম-পন্থী দলকে খণ্ডিত করা হইত না নিশ্চয়ই। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু যে বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই তাহা সুভাষচন্দ্রের উপর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে অথবা মহাত্মার পরামর্শে তাহা সঠিক এখনও বোঝা যাইতেছে না। তিনি সদস্য না হইলেও ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেক বৈঠকে বিশেষ নিমন্ত্রণে উপস্থিত থাকিবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির দুইজন সদস্য শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরামের শূন্য পদে বাঙ্গলা হইতে আরো দুই জন সদস্য লওয়ার কথা হইলেও তাঁহার পদ এখনও খালিই থাকিবে। এক সময়ে বাঙ্গলার কোন প্রতিনিধিই ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান পান নাই। আর এক্ষণে এক বাঙ্গলা হইতেই চারি জন সদস্য নিযুক্ত করিবার কারণ বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। ইহার কারণ যাহাই হোক, জহরলাল ওয়ার্কিং কমিটিতে না যাওয়ায় উত্তর-ভারতের বাম-পন্থী নেতৃত্ব যে সুভাষচন্দ্রের হস্তগত হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত।

ডাক্তার রায়ের কর্ম্মপন্থা—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদান করায় ইতিমধ্যেই বাঙ্গলায় অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। বহু সভায় তাঁহাদিগকে অবিলম্বে পদত্যাগ করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের পরিচালনায় ডাক্তার বিধানচন্দ্রের দল কিছুকাল হইতে বাঙ্গলার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের প্রতিপক্ষদল রূপেই কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের "গোপনীয়" এবং "অত্যন্ত গোপনীয়" পত্র হইতেও জানা যায়, তাঁহারা সমগ্রভাবে মহাত্মাজীর নীতি গ্রহণ না করিলেও মোটামুটি তাঁহারই নীতিতে এবং নেতৃত্বে আস্থাবান। সুতরাং নিজেদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে তাঁহারা যদি মহাত্মার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিরণবাবু পাকা মাঝি। কিন্তু ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে কি ভাবে যে তিনি তরী চালাইবেন বোঝা যাইতেছে না। খুব সম্ভবত বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডল ধ্বংসের চেষ্টাই তাঁহার প্রথম কার্য্য হইবে। সে কার্য্য নিতান্ত সহজ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহারই মধ্যে বাঙ্গলার জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া হিন্দু জনসাধারণ বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলের কার্য্যকলাপে ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে যেরূপ বিপন্ন, বিব্রত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্ত্তন যে তাহারা সাগ্রহে ও সোল্লাসে গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নববর্ষের বাণী—

গত ১লা বৈশাখ তারিখে নববর্ষে কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে কবির বাণী যেন দেশবাসীর প্রাণে নূতন চেতনার সঞ্চার করে—বাণীটি এই :—

নববর্ষ এলো আজি দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারে,
আনে নি আশার বাণী, দেবে না সে করুণ প্রশ্রয়,
প্রতিকূল ভাগ্য আসে হিংস্র বিভীষিকার আকারে
তখনি সে অকল্যাণ যখনি তাহারে করি ভয়।
যে জীবন বহিয়াছি পূর্ণ মূল্যে আজ হোক কেনা,
দুর্দ্দিনে নির্ভীক বীর্য্যে শেষ করি তার শেষ দেনা॥



কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন উপলক্ষে গঠিত কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদল



কংগ্রেস সেবিকাবৃন্দ

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করায় কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরী হইতে তাঁহাকে জানাইয়াছেন—"অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে স্থৈর্য্য ও মর্য্যাদাবোধের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য বাঙ্গালাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতাবোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই আপাত-দৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।" রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্ব্বাদ যে সফল হইবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

নূতন দল গঠন—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসিকতার জন্য অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে গত ৩রা মে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে বিরাট জন-সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের মধ্যে 'প্রগতিশীল দল' নামে একটি নূতন দল গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"এই দল কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, আদর্শ, মূলনীতি ও কর্ম্মনীতি অনুসরণ করিবে—তাই বলিয়া কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ণধারদিগকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিবে না। গান্ধীজির প্রতিও এই দল শ্রদ্ধা পোষণ করিবে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগে আস্থা রাখিবে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষগণের মনোবৃত্তি যেরূপ এবং তাঁহারা যুগধর্ম্মকে যেভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সহিত সঙ্কট অনিবার্য্য। অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ মঙ্গলকর হয়। মডারেটরা কংগ্রেস ত্যাগ করায় দেশের মঙ্গলই হইয়াছে। স্বরাজ্য দল যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল তখন অল্প কালের জন্য কংগ্রেসে একটি সঙ্কট দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের কর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিল।" সুভাষচন্দ্রের নূতন দলে শুধু বাঙ্গালার নহে, অন্য অনেক প্রদেশের বহু নেতা যোগদান করিবেন। কাজেই তাঁহাদের দলের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা আজ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত এই প্রগতিশীল দলই নেতৃত্ব লাভ করিবে—আমরা মনে প্রাণে এই কথা বিশ্বাস করি।

কলিকাতার নূতন মেয়র—

গত ২৬শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খ্যাতনামা কংগ্রেস-সেবক ব্যারিষ্টার শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন মেয়র ও প্রিন্স ইউসুফ মির্জা ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কর্পোরেশনে যে সকল কংগ্রেস-সেবক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিশীথচন্দ্র সেন সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বহুকাল যাবৎ কংগ্রেসের কার্য্য করিতেছেন এবং কর্পোরেশনেও তাঁহার সেবার পরিমাণ অল্প নহে। তিনি কর্পোরেশনে অজাতশত্রু; রাজনীতিচর্চ্চা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক; তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ সেন সরকারী চাকরী করিয়াও বহু রাজনীতি বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। প্রিন্স ইউসুফ মির্জা সাহেব অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি সাহার পৌত্র; মির্জা সাহেবের পিতা প্রিন্স মির্জা মহম্মদ বাবরও পরহিতব্রতী ছিলেন। আমরা নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র উভয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমাদের বিশ্বাস তাঁহাদের পরিচালনাধীনে কর্পোরেশন দেশবন্ধুর কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কলিকাতাবাসীর উপকার সাধন করিবে।

নূতন মিউনিসিপাল বিল—

কলিকাতা কর্পোরেশনে হিন্দুপ্রাধান্য খর্ব্ব করিবার জন্য বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ব্যবস্থাপরিষদে যে নূতন মিউনিসিপাল বিল উপস্থিত করিয়াছেন তাহার কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে মন্ত্রিসভার মুসলমানদিগের প্রাধান্য বর্ত্তমান। সে জন্য যে ভাবে নূতন কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল রচিত হইয়াছিল, হিন্দু-মন্ত্রীরা তাহার বিরোধী হইয়াছিলেন। এমন কি শুনা গিয়াছিল যে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার-প্রমুখ হিন্দুমন্ত্রীরা ঐ ব্যাপারের প্রতিবাদে সকলে একযোগে পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু মুসলমান মন্ত্রীরা হিন্দুদের জন্য সামান্য মাত্র ব্যবস্থা করায় হিন্দুগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন

ও পদত্যাগ করে নাই। নূতন ব্যবস্থা এইরূপ হইবে (১) পূর্ব্বে ১০ জন কাউন্সিলার মনোনীত হইবেন কথা ছিল, এখন ৮ জন মনোনীত হইবেন স্থির হইয়াছে। (২) ঐ ২টি আসনের মধ্যে একটি সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য প্রদত্ত হওয়ায় ৪৬ জন নির্ব্বাচিত না হইয়া ৪৭ জন নির্ব্বাচিত হইবে (৩) পূর্ব্বে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ৭টি আসন নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল—এখন হইবে (ক) সাধারণ নির্ব্বাচিত দলে ৩জন অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ও (খ) সরকার যে ৮জনকে মনোনীত করিবেন—তাঁহাদিগের মধ্যে ৪ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের। আমাদের মনে হয়, এই সামান্য পরিবর্ত্তনে হিন্দুদের কোন ইষ্টাপত্তি হইবার কারণ নাই। যে মূলনীতি আপত্তিজনক, নূতন ব্যবস্থায় তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের মতই কাউন্সিলার মনোনয়ন করিবেন, তাঁহাদের সে ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কাউন্সিলার সংখ্যা নির্ণয়ের সময় (১) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা (২) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রদত্ত করের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া কাজ করা হয় নাই। এদিকে ব্যবস্থা পরিষদে একদল মুসলমান সদস্য বলিয়াছেন যে নূতন বিলে মুসলমানদের স্বার্থ বিন্দুমাত্রও রক্ষিত হইবে না—কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের স্বার্থই রক্ষা করা হইবে।

এই বিলটি এখনও ব্যবস্থা পরিষদে আলোচিত হইতেছে। বর্ত্তমান পরিষদে মন্ত্রিসভার সমর্থক সদস্যের সংখ্যাই অধিক। কাজেই বিলে যাহার হিত বা অহিত হউক না কেন, বিলটি পরিষদে অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হইবে। এ অবস্থায় যে মন্ত্রিসভা দেশের ক্ষতি করিয়া শ্বেতাঙ্গদের অধিকার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন, সেই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কি দেশবাসী সকলে সমবেত হইয়া জাগ্রত হইতে পারেন না?

আজি সব বলা যায়

শ্রীনিখিলেশরুদ্রনারায়ণ সিংহ

যে কথা তোমারে হয়নিকো বলা
আজি সব বলা যায়।
এসো তুমি ওগো, বাতায়ন-পথ
খুলিয়া রাখিনু তায়॥
শুনি যামিনীর পায়ের আঘাত—
জানি তার যাওয়া-আসা
দু'হাতে তাহার ঘুমের পরশ—
সাগরের ভালবাসা।

দাড়িমের বন দোলাইছে শাখা—
শোঁ শোঁ করে গম-পাতা;
আলোর কুসুম কুড়ায়ে আমার—
মনে মনে মালা গাথা।
উতল বাতাস গায়ে এসে লাগে,
শিহরণ জাগে তায়।
পাতালে সে কোন ঘুমনো পুরীতে॥
রাজ-সুতা ঘুম যায়॥

বাতাসে আজ কত কথা ভাসে—
মনে পড়ে কত কথা;
পুরোনো দিনের প্রিয়জন লাগি—
ফিরে আসে ব্যাকুলতা।

তুমি বসো হোথা, আমি বসি হেথা—
মুখ দেখা নাহি যাবে;
আঁধারের মাঝে কথা কবে আর—
চোখ তুলে তুলে চাবে।

মাতাল বাতাসে এলোমেলো চুল—
পড়িবে আননে আসি;
সারা দেহে তব জাগিবে হরষ—
থেমে যাবে নিশ্বাসি'।
যে কথা তোমারে হয়নিকো বলা
আজি সব বলা যায়।
এসো তুমি প্রিয়, ঘরের দুয়ার
খুলিয়া রাখিনু তায়॥



বাইটন কাপ ঃ

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা বাইটন কাপ বি এন আর বিজয়ী হয়েছে। গতবারে বি এন আর কাষ্টমসের কাছেই পরাজিত হয়েছিল। দুর্দ্ধর্ষ কলিকাতা কাষ্টমসের সঙ্গে এবারও ফাইনাল খেলা হয়; প্রথম দিন গোল শূন্য ড্র হয়, দ্বিতীয় দিনে অতিরিক্ত সময়ে হিল বিজয়সূচক গোলটি করেন। কাষ্টমস ও বি এন আরের বাইটন ফাইনালে প্রতিযোগিতা আরো চারবার ঘটেছিল। কাষ্টমসের এই প্রথম পরাজয়। লীগ ম্যাচে কাষ্টমস যে রকম ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়েছে, বাইটনে তা মোটেই দেখাতে পারে নি। লীগের আঠারটা খেলায় তারা ৮০টা গোল দিয়েছিল। বাইটন কাপে তাদের ফরওয়ার্ডদের খেলা দেখে নিরাশ হ'তে হ'য়েছে, তবে রক্ষণভাগ পূর্ব্ববৎ দুর্ভেদ্য; ব্যাকে হজেস সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ অলিম্পিক খেলোয়াড় ট্যাপসেলের খেলাও সময়ে সময়ে তার কাছে ম্লান হ'য়ে যাচ্ছিল। আর কারের পূর্ব্ব ক্ষিপ্রতা নেই এবং একদিনও তিনি তাঁর পূর্ব্ব সুনাম অনুযায়ী খেলা দেখাতে পারেন নি। ই বি আর, রেঞ্জার্স বিজয়ী মোহনবাগানকে ও লুসিটেনিয়ান্সকে হারিয়ে বি এন আরের কাছে শোচনীয় ভাবে হেরে যায়। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে লক্ষ্ণৌএর অবস্থাও অনুরূপ। অবশ্য খালসা কলেজকে হারান তাদের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে।



বাইটন ফাইনালে দুই ক্যাপটেনের করমর্দ্দন ছবি—বি মৈত্র

বাঙ্গলার বাইরের অনেক ভাল হকি দল এবারও বাইটন কাপে নাম দিয়েছিল কিন্তু অনেকেই যোগদান করেনি। ঝান্সি ও ব্রাদার্স ক্লাব (লাহোর) সম্বন্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই তারা যতদূর সম্ভব পূর্ব্ব থেকে এ বিষয় জানিয়েছিল, কিন্তু আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওটা একাদশ শেষ মুহূর্ত্তে জানায় যে তারা আসতে অক্ষম।

কাষ্টমস ফাইনালে উঠেছে ঃ—

ডালহৌসীকে ১-০ গোলে, পুলিসকে ১-০ গোলে,
ই আই আরকে ৩-১ „ , লক্ষ্ণৌকে ৪-১ „ হারিয়ে।

বি এন আর ফাইনালে উঠেছে ঃ—

বেরিলীকে	৩-০ গোলে
গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়কে	১-০ গোলে
রাজসাহীকে (এলবার্ট)	৭-০ গোলে
ই বি আরকে	৪-০ „ হারিয়ে।

কাষ্টমস ও বি এন আরের পূর্ব্ব বাইটন খেলার ফলাফল:—

বিজয়ী বিজিত

১৯৩১ সাল—কাষ্টমস ২-০, বি এন আর (ফাইনাল)
১৯৩২ „ —কাষ্টমস ১-১, ২-০, বি এন আর (ফাইনাল)
১৯৩৫ „ —কাষ্টমস ০-০, ২-১, বি এন আর (ফাইনাল)
১৯৩৭ „ —বি এন আর ২-০, কাষ্টমস (৩য় রাউণ্ড)
১৯৩৮ „ —কাষ্টমস ১-০, বি এন আর (ফাইনাল)
১৯৩৯ „ —বি এন আর ১-১, ১-০, কাষ্টমস (ফাইনাল)



হকি লীগ বিজয়ী ও বাইটন বিজেতা কলিকাতা কাষ্টমস্ দল ছবি—জে কে সান্যাল

উভয় দলের বাইশ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র পোর্টসমাউথের রাইট আউটেরই এফ এ কাপ ফাইনালে খেলার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা আছে। পোর্টসের এণ্ডারসন অতি চমৎকার খেলে এবং প্রথমার্দ্ধেই পর পর দু'টি গোল দেয়। বিশ্রামের পরই বারলো আর একটি গোল দেয়। ওয়েষ্টকোট ও ডরসেট বল আদান প্রদান ক'রে নিয়ে গিয়ে ডরসেট একটি গোল শোধ ক'রে। ৭২ মিনিটের সময় ওরালের সেণ্টার থেকে পার্কার খুব চমৎকার ভাবে হেড দিয়ে দলের চতুর্থ ও শেষ গোলটি দেয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীগণ ঃ

১৯৩৪—ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৩৫—সেফিল্ড ওয়েডনেষ্ট ডে, ১৯৩৬—আরসেনাল, ১৯৩৭—সাণ্ডারলাণ্ড, ১৯৩৮—প্রেষ্টন

এফ এ কাপ ঃ

এক লক্ষাধিক দর্শকের সামনে পোর্টসমাউথ ৪-১ গোলে উলভসকে হারিয়ে সর্ব্বপ্রথম এফ এ কাপ বিজয়ী হ'ল। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ কাপ এবং রাণী খেলোয়াড়দের পদক বিতরণ ক'রেছেন। লর্ড হ্যালিফাক্সও উপস্থিত ছিলেন। উলভস দু'বার কাপ পেয়েচে, আর এইবার নিয়ে চারবার ফাইনালে উঠে হেরে গেল। পোর্টসমাউথ আগে দুবার ফাইনালে উঠেছিলো ১৯২৯ ও ১৯৩৪ সালে কিন্তু দুবারই পরাজিত হয়। সাধারণের ধারণা ছিলো উলভসই বিজয়ী হবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পোর্টসমাউথ সবদিক থেকে উচ্চতর খেলা দেখিয়ে জয়লাভ ক'রল। এত বড় ম্যাচে খেলতে গিয়ে খেলোয়াড়রা যাতে 'নারভাস' না হ'য়ে পড়ে তার জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়কে 'গ্ল্যাণ্ড ইনজেক্সন' দেওয়া হ'য়েছিল। বিজয়ী খেলোয়াড়দের ওপর এর ফল ভালই হ'য়েছিল কিন্তু বিজিতদের ওপর ভাল প্রতিক্রিয়া তো হয়ই নি, বরং তাদের একটু নিস্তেজ দেখাচ্ছিল। সাধারণের ধারণা ডাক্তার বোধ হয় ভুলে 'মুরফিয়া ইনজেক্সন' ক'রে দিয়েছিলেন। উলভসের দুর্দ্ধর্ষ সেণ্টার ফরওয়ার্ড ওয়েষ্টকোট এফ এ কাপের প্রতি রাউণ্ডে গোল ক'রে এসে ফাইনালে গোল ক'রতে না পারায় স্যাণ্ডি ব্রাউন ও ফ্রাঙ্ক ও ডোনেলের সমান রেকর্ড ক'রতে পারলে না। উলভসের লীগ ও শীল্ড ম্যাচের অপরাজেয় দলই ফাইনালে নেমেছিল।



দশ মাইল দৌড় বিজয়ী বি বি চন্দ্র

ছবি—জে কে সান্যা



ধ্যানচাঁদ

ধ্যানচাঁদের সতর্কবাণী ঃ

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ পরিচালনা ও পেশাদার খেলোয়াড় সম্বন্ধে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন ;—বোম্বাইয়ের আম্পায়ারিং অত্যন্ত খারাপ। কলিকাতার বাইটন পরিচালনা উন্নততর ; পাঞ্জাব ও ইউ পির পরিচালনাও প্রশংসনীয়। বোম্বাইয়ের আম্পায়ারিং সম্বন্ধে ব'লেন, আম্পায়াররা কেন যে বাঁশী বাজান, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। ৬০ মিনিট খেলার মধ্যে ৩০ মিনিট তাঁদের বাঁশীর আওয়াজ পাওয়া যায়। পেনাল্টি বুলি তাঁদের কাছে অতি সাধারণ জিনিষ ; একটি খেলাও পাওয়া যাবে না যাতে পেনাল্টি বুলি দেওয়া হয় নি। 'এডভান্টেজ-রুল', সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁদের মোটেই নেই।

খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে তিনি ব'লেচেন, সমস্ত দেশ আধা-পেশাদারি খেলোয়াড়ে ছেয়ে গেছে। তাঁর ভয় হয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ভাল সখের খেলোয়াড় পাওয়াই যাবে না। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাজা মহারাজাদের কুস্তিতে খুব ঝোঁক ছিল, তাঁরা নিজেদের ষ্টেটে বেতনভুক্ত কুস্তিগীর রাখতেন। আজকাল হকির দিকে তাঁদের ঝোঁক যাওয়ায়, তাঁরা ভারতবর্ষের নামকরা হকি খেলোয়াড়দের অর্থের বিনিময়ে নিজেদের দলের হ'য়ে খেলাচ্চেন। ধ্যানচাঁদের মত, পেশাদার ও সখের খেলোয়াড়দের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা আবশ্যক, যেমন অন্যান্য দেশে সকল শ্রেণীর বিভিন্ন খেলোয়াড়দের মধ্যে আছে। কিন্তু তা এ দেশে হবার নহে। ফুটবলেও যেমন গোপনে অর্থ নিয়ে সখের খেলোয়াড়ী চলচে, হকিতেও তাই চলেচে। এ বিষয়ে ফেডারেশনের নিয়ম-কানুন কঠোরতর না হওয়া পর্য্যন্ত ছদ্মবেশী সখের খেলোয়াড়ের প্রাধান্য থাকিবেই।

আগা খাঁ কাপ ঃ

গতবারের বিজয়ী ভগবন্ত ক্লাব ৩-২ গোলে ভূপাল-ওয়াণ্ডারার্সের কাছে হেরে গেছে। ভূপাল ঝান্সিকে ৫-০ গোলে হারিয়ে সেমি ফাইনালে যায় এবং ফাইনালে ওঠে কিরকিরে হারিয়ে। মানাভাদার চতুর্থ রাউণ্ডে ভগবন্ত ক্লাবের কাছে ৩-১ গোলে হেরে যায়। ভগবন্ত ক্লাব ফাইনালে ওঠে সেণ্ট পেট্রিককে ৫-১ গোলে হারিয়ে।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ ঃ

অমৃতসহর আগত খালসা কলেজ এলাহাবাদের কায়স্থ' পাঠশালা কলেজকে এক গোলে হারিয়ে লক্ষ্মীবিলাস কাপ বিজয়ী হ'য়েচে। খেলা বেশ উচ্চাঙ্গের হ'য়েছিলো। গতবার বিজয়ী ছিল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তার পূর্ব্বে ছিল দু'বার ঝান্সি হিরোজ।

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিজয় ঃ

লাহোরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ডি সি এল আইকে ২—০ গোলে হারিয়ে ডি' মণ্টোরেন্সী কাপ এবং আজমীরে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়েন 'এ'কে হারিয়ে আব্দুল গফুর টুর্ণামেণ্ট বিজয়ী হ'য়েচে।

পাতৌদীর নবাব ঃ

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় পাতৌদীর নবাবের সঙ্গে ভূপালের নবাবতনয়ার বিবাহ হ'য়েচে। উভয় নবাব-পরিবারই ক্রিকেট খেলার বিশেষ উৎসাহী। বিবাহের পর নবাব পাতৌদী জানিয়েছেন যে আগামী শীতকাল থেকে তিনি নিয়মিত ভাবে ভারতের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় যোগদান ক'রবেন।

দিলীপ বসু ঃ

পাঞ্জাবের প্রবীণ খেলোয়াড় সোহানী এবারের ডেভিস-কাপে যোগদান ক'রতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় নিখিল-ভারত টেনিস এসোসিয়েশন তাঁর স্থানে বাঙ্গলার তরুণ খেলোয়াড় দিলীপ বসুকে মনোনীত ক'রেচেন। বাঙ্গলার টেনিস এসোসিয়েশন দিলীপের পাথেয় খরচ হিসাবে এক হাজার টাকা দেবেন।



সাবুর, গাউস মহম্মদ ও ইফ্‌তাখার আহমেদ—
ইঁহারা ভারতের পক্ষে ডেভিস কাপে খেলতে গেছেন



অষ্টিন

অষ্টিন ও ডেভিস কাপ ঃ

ইংলণ্ডের ১নং টেনিস খেলোয়াড় অষ্টিন ডেভিস কাপের খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলবেন না। ইংলণ্ডের পক্ষে খবরটি মোটেই শুভ নয়। অষ্টিনের পর নির্ভর যোগ্য খেলোয়াড় ইংলণ্ডে নেই। অষ্টিন এখন আমেরিকায় র'য়েচেন।

টিলডেন ঃ

টিলডেন সম্প্রতি এই অভিমত ব্যক্ত করেচেন যে গলফের ন্যায় টেনিসেও পেশাদার ও সখের খেলোয়াড়দের

সম্মিলিতভাবে কোন কোন প্রতিযোগিতা হওয়া আবশ্যক। পেশাদার খেলোয়াড়দের সঙ্গে না খেলবার এই 'মিথ্যা বাবুগিরি', টেনিসকে নষ্ট ক'রবে। ব্রিটিস টেনিস এসোসিয়েশনকে তিনি অনেক অংশে এর জন্যে দায়ী ক'রেচেন। শুধু নিজের দলের সঙ্গে খেলে পেশাদার খেলোয়াড়রা আর সন্তুষ্ট হ'তে চান না। টিলডেন ব'লচেন যে, বছর পাঁচেকের ভেতরেই সম্মিলিত চ্যাম্পিয়ানসিপ্ আরম্ভ হ'তে পারে। আর যদি তা না হয় তাহ'লে তাঁরা পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্য নূতন উইম্বলডনের ব্যবস্থা ক'রবেন যাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেনিস বীরদের সমাবেশ হবে।



টিলডেন

বৃটিস লন টেনিস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিষ্টার সবেলী টিলডেনের এই অভিমতকে 'খুব কৌতুকময়' আখ্যা দিয়েচেন।

টেবিল টেনিস ঃ

বার্ণা ও বেলেকের পর জাবাডোস ও কেলেন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের জন্য এসেচেন। এই দুইটি হাঙ্গেরীয়ান খেলোয়াড়ের নূতন ক'রে পরিচয় দেবার কিছু নেই। পৃথিবীর টেবিল টেনিস ইতিহাসে এঁরা চিরপ্রসিদ্ধ।



খেলাধূলা, সন্তরণ, সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে প্রাপ্ত ট্রফি সহ কুমারী ইলা সেন ফটো—পান্না সেন

ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড় বড় যায়গায় এঁরা খেলেচেন বা খেলবেন। কলিকাতায় খেলে গেছেন। একটি খেলাতেও



মোহনবাগান-রেঞ্জার্সে'র ফুটবল লীগের প্রথম খেলা।
রেঞ্জার্স গোলকিপার চৌধুরীর বল ধরেছে ছবি—জে কে সান্যাল

স্থানীয় খেলোয়াড়দের কেহই এঁদের হারাতে পারে নাই। সত্য সত্যই দেখবার মত খেলা। ব্যক্তিগত জীবনে ডাবাডোস 'স্পোর্টস্ গুডস্ ফ্যাক্টরী'র মালিক আর কেলেন একজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

জাবাডোস বিশ্বের টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপে সাতবার ডবলস বিজয়ী, তিনবার মিক্সড ডবলস বিজয়ী ও একবার সিঙ্গলস বিজয়ী হ'য়েচেন। সিঙ্গলসে চার বার ও মিক্সড ডবলসে দু'বার রাণার্স আপ্ হ'য়েচেন। হাঙ্গেরীয়ান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানসিপে সাতবার যোগদান ক'রেছিলেন ও সোয়েথ্লিং কাপ পেয়েছিলেন। হাঙ্গেরীয়ায় চারবার সিঙ্গলস সাতবার ডবলস্ ও চারবার মিক্সড ডবলসে বিজয়ী হ'য়েচেন। এ ছাড়া ইংলণ্ডে তিনবার সিঙ্গলস বিজয়ী এবং ফ্রান্স, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লোভেকিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ানসিপও পেয়েচেন। তিনি সর্ব্বসমেত ৭৭টি আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ানসিপ্ লাভ

ক'রেছেন। কেলেন জাবাডোসের তুলনায় কিছু কম হ'লেও তিনিও সর্ব্বসমেত ৫৭টি আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ান-সিপে জয়ী হ'য়েছেন।



জো লুইস্

মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

জো'লুই ২ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যাক রোপারকে ভূতলশায়ী ক'রে পৃথিবীর 'হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান-সিপ' অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখবার জন্যে লস্ এঞ্জেলে দর্শক সমাগম হ'য়েছিল পঁচিশ হাজার। অনেক চলচ্চিত্র অভিনেত্রী এবং পুরাতন চাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধাদের দশকের গ্যালারীতে দেখা যায়।

কাইভান কাপ ঃ

বিলাসপুর ১ গোলে টেলিগ্রাফ রিক্রিয়েশনকে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচে। রামরূপ গোলটি দেয়।

বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ঃ

বি জি প্রেস ২-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচে। বিজয়ী পক্ষে জ্যাকবও ব্রেণ্ডিস ও বিজিত পক্ষে নাইস গোল দেয়।

কল্যাণ শীল্ড ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং ৩-১ গোলে হাইবেরিয়ান্সকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েচে।

ইউনিভারসিটি নক্ আউট টুর্ণামেণ্ট ঃ

মেডিকেল কলেজ ২-১ গোলে সেণ্টজেভিয়ার্সকে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েচে।



ইণ্টার কলেজিয়েট হকি লীগ বিজয়ী মেডিকেল কলেজ, শিবপুর বি ই কলেজকে পরাজিত করেছে

ছবি—জে কে সান্যাল

লীগ খেলা ঃ

২রা মে থেকে ফুটবল লীগ সুরু হয়েছে। এবার এ আই এফ এফএর রুল নং ৩৩ নিয়ে নানা অভিযোগ হচ্ছে। কাষ্টমস মহমেডানদের সাবু, মাসুম ও কাদের আলীর বিরুদ্ধে ঐ আইনে অভিযোগ এনেছে। এরিয়ান ভবানীপুরের খেলোয়াড় সুজৎ আলির বিরুদ্ধেও ঐ কারণে অভিযোগ করেছে। অভিযোগ তো রোজই হচ্ছে। বিচারের ফলাফল কি হয়, দেখা যাক্। বিচার নিশ্চয়ই এ আই এফ এফই করবেন। রুল নং ৩৩ এর ব্যাখ্যায় এ আই এফ এফ বলেছেন, খেলোয়াড়রা যে প্রদেশের দলে খেলবেন সেইখানের habitual residence হওয়া চাই। এখন habitual কত দিন বসবাস করলে হবে? মহমেডান স্পোর্টিংদের খেলোয়াড়দের অনেকেই নাকি habitual বাসিন্দা হয়ে পড়েছে গত বৎসর থেকে, তাদের ঐ আইনে বাঁধবে না। শোনা যায়, মুর্গেশ, লক্ষীনারায়ণ প্রভৃতি ইষ্ট বেঙ্গলে খেলতে পারবে না। ইষ্ট বেঙ্গলকে তা'হলে স্থানীয় খেলোয়াড় জোগাড় করতে হবে। মোহনবাগানের ও বালাই নেই। তাঁরা ভবানীপুর, ইষ্ট বেঙ্গল থেকে যা খেলোয়াড় পেয়েছেন তাই নিয়েই চালাবেন। এম বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এস দেকে খেলান উচিত। এবার আবার তাকে বসিয়ে রাখলে তাঁরা খুব ভুল করবেন। ল্যাংচা মিত্র, জে ঘোষ, এস গুঁই প্রভৃতিকে নিয়ে ফরওয়ার্ড লাইন ভালই হবে, আশা করা যায়। মোহনবাগান এ পর্য্যন্ত তিনটি খেলা খেলেছেন ও তিনটিতেই জয়ী হয়ে প্রথমে আছেন। খুবই আশ্চর্য্য! ভবানীপুরের সকল পুরাতন খেলোয়াড়রাই চলে গেছে; কিন্তু তারা নূতন খেলোয়াড় নিয়ে আরম্ভ ভালই করেছে। ইষ্টবেঙ্গল একটি বেশ ভাল নূতন রাইট আউট পেয়েছে। কিন্তু তাঁদের আরম্ভ পূর্ব্বানুযায়ী খারাপই, হয়েছে। মহমেডানদের সকল পুরাতন খেলোয়াড়ই আছে, তা' ছাড়া মাসুদ প্রভৃতিও যোগ দিয়েছে। তারা ভালই খেলবে এবং চ্যাম্পিয়নসিপ পুনরায় রাখতে প্রাণপণ করবে। তাদের বাধা দেবার মতন কোন দলই দেখা যায় না। কিন্তু ভবানীপুরের ও কাষ্টমসের কাছে বেশ বেগ পেয়েছে। নূতন আগত ডুরাণ্ড বিজয়ী বর্ডার সৈনিক দল খেলায় এখনও বিশেষ উৎকর্ষতা প্রদর্শন করতে পারে নি। ক্যামারোনিয়ান সেই রকমই। অন্য দলের বিষয় বিশেষ বলবার নেই।

বিলাতে ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তাদের বিলাতের মাটীতে প্রথম খেলাতে উষ্টার্সের কাছে ৮৫ রানে হেরেছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১৪২ ও ১৪৭ (কনষ্টান্টাইন ৪৭)
উষ্টাস—৮৩ ও ২৯ (কুপার ৯২, মার্টিন ৯৪)

প্রথম ইনিংসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মার্টিণ্ডেল ২৭ রানে ৪ উইকেট পান। উষ্টার্সের পার্কস প্রথম ইনিংসে ২৭ রানে ৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৮ রানে ৫ এবং হোয়ার্থ ৪২ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "চঞ্চল-নিশীথে"—২৲

শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী প্রণীত রোমাঞ্চ সিরিজের "মাস্কো পাঞ্জার প্রতিহিংসা"—১৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত রাজনীতিক-গ্রন্থ 'জগৎ কোন্ পথে"—১৲

শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রহস্য সিরিজের "রক্ত তাণ্ডব"—৸৹

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রূপান্তরিতা"—২৲

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'সাংখ্য-পরিচয়"—১৷৹

শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অদৃষ্ট ও পুরুষকার"—১৲

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব প্রণীত "ব্রাহ্মণ পরিচয়"—৷৹

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ-গ্রন্থ "মনের গভীরে"—১৲

"সেনাপতি গান্ধী"—।৵৹

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য বিরচিত কৌতুক কবিতামালা "রহস্যিকা"—।৵৹

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "পাথেয়"—২৲

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "যুগ-পরিণীতা"—১৷৹

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মিলন-লগ্ন"—১।৹

শ্রীপ্রমথনাথ পাল প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "দেশপ্রাণ শাসমল"—২৷৹

শ্রীআশিস গুপ্ত প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নব নব রূপে"—১৷৹

শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী সঙ্কলিত মহাভারতের কথা "রত্নকণা'—৸৹

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "রাজার ছেলে"—৷৵৹

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত সমালোচনা-গ্রন্থ "উপমা কালিদাসস্য"—১।৹

শ্রীপ্রেমেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা গল্প"—৲

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রণীত 'সুশান্ত সা"—৩৲

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পপুস্তক "মাটীর পুতুল"—১৲

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত "বুভুক্ষা"—২৷৹

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র সপ্তবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে

'সুদীর্ঘ ষড়বিংশ বর্ষকাল যে 'ভারতবর্ষ' গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণের পরিচিত, তাহার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি? এই ষড়বিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' যে ভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সুদীর্ঘ কাল 'ভারতবর্ষ' প্রতি বৎসরে ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০খানি ত্রিবর্ণ চিত্র, শতাধিক দ্বিবর্ণ চিত্র ও অল্লাধিক ১৫০০ একবর্ণ চিত্র উপহার দিয়াছে; প্রতি মাসে পরলোকগত মনীষীবৃন্দের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা দিয়াছে; এতদ্ভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধরাজি 'ভারতবর্ষকে' সমৃদ্ধ করিয়াছে; 'ভারতবর্ষ' এই ষড়বিংশ বর্ষকাল যে উচ্চতম আসন অধিকার করিয়া আছে, আগামী বর্ষে তাহাকে আরও মনোরম করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৵৹ আনা, ভি, পিতে ৬৷৴৹, ষাণ্মাষিক ৩৴৹ আনা, ভি, পিতে ৩৷৹। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়, সুতরাং পরবর্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি, করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নম্বর** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে পত্রাদি প্রেরণের ডাকের হার পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেজন্য ব্রহ্মদেশের গ্রাহকগণের ভারতবর্ষের বার্ষিক মূল্য ৭৲ (সাত টাকা) এবং ষাণ্মাষিক মূল্য ৩৷৹ (তিন টাকা আট আনা) করা হইল।

সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta